প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড

১৩৩০

কলিকাতা

মূল্য ছয় টাকা আট আনা

প্রবাসী ১৩৩০ কার্ত্তিক—চৈত্র

২৩শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়-সূচী

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

চিত্র-সূচী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ | ২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৩১

১ম সংখ্যা

যাত্রার পূর্ব্বকথা*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার আর-একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়ত কিছু দীর্ঘকালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্ব্বে আর-একবার, এই আশ্রম-সম্বন্ধে, এই কর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাদের, যা কথা আছে তা সুস্পষ্ট ক'রে ব'লে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্ত্তমান ছবি,—এই ছাত্র-নিবাস, কলাভবন, গ্রন্থাগার, অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে কি ক'রে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়? সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য্য যে,—যে লোক একেবারে অযোগ্য—মনে করবেন না এ কোনো-রকম কৃত্রিম বিনয়ের কথা—তাঁকে দিয়ে এই কাজ সাধন ক'রে নেবার বিধান। ছাত্রদের যেদিন এখানে আহ্বান করলুম, সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড় ঋণভারে তখন আমি একান্ত বিপন্ন, তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল, তা সকলেই জানেন। আমি ভালো ক'রে পড়িনি, আমাদের দেশে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব-রকমের অযোগ্যতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিলুম। এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল ছিল—গুটিপাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না—ছেলেদের অন্ন-বস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যেমন ক'রে হোক্ আমাকেই জোগাতে হ'ত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হ'ত! বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না—বেতনের প্রবর্ত্তন হ'ল। কিন্তু অভাব দূর হ'ল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু-কিছু ক'রে বিক্রয় করতে হ'ল, এদিকে-ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল, তা

* দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বরাত্রে (১৭ই ভাদ্র, ১৩৩১) শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত।

গেল, অলঙ্কার বিক্রয় করলুম নিজের সংসারকে রিক্ত করে' কাজ চালাতে হ'ল। কি দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানিনে। স্বপ্নের ঘোরে যে মানুষ দুর্গম পথে ঘুরে' বেড়িয়েছে সে যেমন জেগে উঠে' কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন আমারও সেই-রকমের হৃৎকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্য-সাধনাও আমাকে অনেক-পরিমাণে বর্জ্জন করতে হ'ল। এর কারণ কি? এত আকর্ষণ কিসের? এর কারণ কি? এই প্রশ্নের যে-উত্তর আমার মনে আস্চে, সেটা আপনাদের কাছে বলি।

অতি গভীরভাবে, নিবিড়ভাবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেসেচি। আমি খুব প্রবলভাবেই অনুভব করেচি যে, সহরের জীবনযাত্রা আমাদের চারদিকে দম্ভের প্রাচীর তুলে' দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েচে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত শরতের পুষ্পোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে' দিয়েচি তারই আনন্দে দুঃসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে' রেখেছিল। প্রকৃতি-মাতা যে অমৃত পরিবেশণ করেন, সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেচি। এই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েচে। আর যে একটি কথা অনেক দিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল, সে হচ্চে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়ার দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল-প্রকার ব্যাপারেই দেনা-পাওনার সম্বন্ধ — কখনও বেতন দিয়ে, কখনও ত্যাগের বিনিময়ে, কখনও বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে নিরন্তর চালিয়ে রাখ্চে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু, সেই সেতুটি হচ্চে ভক্তি-স্নেহের সম্বন্ধ, সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে, তা হ'লে যারা পায় তা'রা হতভাগ্য, যারা দেয় তা'রাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বাহিরের দিক্ থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হওয়া চাই। এ-আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেকদূর পর্য্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন, খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাষা, কি ইতিহাস, কি ভূগোল, খুব উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কি শিখিয়েছি না শিখিয়েছি জানিনে, কিন্তু যে-জিনিষটাকে কোনো বিদ্যালয় কেউ অত্যাবশ্যক বলে' মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড় জিনিষ, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে' আনন্দে অন্য সকল অভাব ভুলেছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোট বিদ্যালয় বড় হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্রেরাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরো দূরে প্রসারিত হ'ল। বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা কোনো দিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে, তা কখনও ভাবিনি।

আমরা চেষ্টা করিনি, আমরা প্রত্যাশা করিনি; চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেচি; তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে' বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেচে। পাশ্চাত্যদেশের যে-সব মনীষী এখানে এসেছিলেন—লেভি, উইণ্টারনিট্জ্, লেস্‌নি, তাঁরা যে এমন-কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলা-দেশের কোণের মধ্যে বদ্ধ নয়, তা থেকে বুঝ্‌তে পারি এখানে কোনও একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে-আনন্দ, যে-শ্রদ্ধা, যে-উৎসাহ অনুভব করে' গেছেন, তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনও একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দূরাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ হ'য়ে উঠেছেন, যাঁরা কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেচে।

আজ ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েচে, মানুষে মানুষে এমন জগদ্ব্যাপী

পরম-শত্রুতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে দেশান্তরে এই আগুন ছড়িয়ে গেল।—প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়েছিলুম, আমরা যে জাগ্‌লুম সে এরই আঘাতে। জাপান মার খেয়ে জেগেচে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তা'কে জাগিয়েছিল—আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তা'কে জাগিয়েচে। লোভের, দম্ভের ঘা খেয়ে যে জাগে, সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মার্‌লে, চীনকে মার্‌তে গিয়েছিল।

মানুষের আজ কি অসহ্য বেদনা, দাসত্বে ব্রতী হ'য়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে, মানুষের পূর্ণতা সর্ব্বত্র পীড়িত! মনুষ্যত্বের এই যে খর্ব্বতা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে' যন্ত্র-দেবতার এই যে পূজা—এই যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও এ'কে নিরস্ত কর্‌বার প্রয়াস কি থাক্‌বে না? আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন—তাই বলে'ই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ্ আমাদের কাছ থেকে নেবে না? যদি সাধনা সত্য হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হেঁট করে' সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বুদ্ধ বল্‌লেন—আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর কর্‌ব। দুঃখ তিনি সত্যই দূর কর্‌তে পেরেছিলেন কি না, সেটা বড় কথা নয়—বড় কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না, সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে' দেওয়া চলে? আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্‌তে পারিনি, সে আমার নিজেরই দৈন্য—আমি যদি সাধক হ'তুম, সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাক্‌ত, তবে সব আপনিই হ'ত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ-সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ কর্‌তে হবে।

বিদেশে যখন যাই, তখন সর্ব্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে' যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে' এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি, সে দৃষ্টি কোথায়! আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্ম্মস্থান থেকে যে-ডাক এসেছে, তা অনেকেই শুন্‌তে পারে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্ব্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাব-জনিত যে-দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়ত আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়ত হবে না—আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি—ফলে লোভ কর্‌লে আপনাকে ভোলাবো, অন্যকে ভোলাবো। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য—ক'টিই বা আমাদের ছাত্র, ক'টিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক্ থেকে এর অধিকারের সীমা নেই, আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকে অবলম্বন করে' বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি করুক,—সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোট ছোট মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে' গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখ্‌ব, সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাক্‌ত, তা হ'লে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি কর্‌তুম,—কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক-পথেরই পথিকমাত্র, আমি চালনা কর্‌তে পারিনে, চাইনে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কৃপণতা করিনি, তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা কর্‌বার অধিকার আমার আজ হয়েচে।

না, বলিলেন, "আমি তখন স্নান করতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি ছেলেটি ঐখানে বসে' আপনমনে খেলা করছে; এ-ছাড়া আর কোনো খবর আমি জানিনে।"

মহেশ্বরী যখন পূজা শেষ করিয়া বাহির হইলেন, তখন সুখেন্দু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! নবীন গেল কোথায়? এখানে ছেলেটাকে ফেলে গেল নাকি?"

মহেশ্বরী পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, —এই শিশুকে লইয়া তাঁহার অনেক ভোগই ভুগিতে হইবে। তিনি হাসিয়া নরম-সুরে বলিলেন, "হাঁ বাবা! আমিই রেখে দিয়েছি।"

সুখেন্দু ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, "তোমরা আগুপিছু ভেবে ত কোন কাজ করবে না। ঐ দুধের বালক, ওকে নাওয়াতে-খাওয়াতে হবে; শুতেও ত পারবে না একা, এ-সব কি করে' চালাবে?"

মহেশ্বরী তেম্‌নি শান্তস্বরেই কহিলেন, "বাবা! আমাদের যে সব সময় আগু-পিছু দেখ্‌তে নেই। ওর-ও ত একটা আশ্রয় চাই। যিনি তোদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছেন—ওকে-ও তিনি মানুষ করবেন।"

সুখেন্দু একটু উগ্রস্বরেই কহিলেন, "তুমি দিবারাত্র পূজা-আহ্নিক নিয়ে আছ;—একটা বাগ্দীর ছেলে—যার নাড়ী-নক্ষত্তর জ্ঞান হয়নি, তা'কে তুমি মানুষ করবে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বাবা! মানুষ যখন অসহায় হ'য়ে পড়ে, তখন তার সহায় হ'তে হ'লে বিচার-আচার চলে না। শুধু মর্য্যাদার খাতিরে নিরাশ্রয় আত্মাকে আত্মা থেকে পৃথক্ করে' আপনাকে বৃথা একটা তৃপ্তি ও স্বস্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখ্‌তে বলিস্‌নে বাবা!"

সুখেন্দু কহিলেন, "তুমি সোজা কথায় বলো, তুমি তা হ'লে ঐ বাগ্দীর ছেলেটাকে নিয়ে একাকার করে' তুল্‌তে চাও?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা চাইনে, তা করবও না। কিন্তু মনে ঐ রকম একটা বিকার থাকাই দোষের। ভিতরের চেয়ে বাইরের দিকে কেন অযথা অতটা জোর দিস্? তুই দেখিস্, ওকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে আমার জা'ত খোয়াতে হবে না। বাগ্দীর ছেলে বলে'ই এমন সুযোগ ছেড়ে আতঙ্কে পিছিয়ে যেতে বলিস্? দ্যাখ্ সুখেন! আমার জা'তকে আমি যেমন বাঁচিয়ে চলি, সেইরূপ অপর একজন তার নিজের জা'তকেও বাঁচিয়ে চলে, সেজন্য কেহ কারও গ্লানি করে না। যার যেটুকু পেতে বাধে না, সে-টুকু না পেলেই বিচ্ছেদ ঘটে, দুয়েরই বলক্ষয় হয়।"

অগত্যা সুখেন্দু একটুকু স্বর নামাইয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি বুঝ্‌তে পারছ না মা! ওকে নিয়ে তোমাকে কতটা অসুবিধের মধ্যে পড়্‌তে হবে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা বুঝ্‌বার দরকার নেই ত বাবা! সে বুঝ্‌তে গেলে সেবাধর্ম্ম চলে না। ওর যে সেবা পাবার একান্তই দরকার! এখানে নিজের অসুবিধার চেয়ে ওর সুবিধাটাই বেশী বড় করে' দেখ্‌বার কথা। আর তাও বলি, ওকে বিমুখ করলে শুধু জাতি নিয়ে কতটা পুণ্য সঞ্চয় হবে?"

মহেশ্বরীর সঙ্গে পারা গেল না। তর্ক ফেলিয়া সুখেন্দু আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতার নিরলস সেবাবৃত্তি আজ কিছু নূতন নহে। সুতরাং তিনি ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন না, কিন্তু এই অস্পৃশ্য শিশুটিকে লইয়া তাঁহার শুদ্ধাচারিণী বিধবা জননী যে কিরূপে ঘরকন্না করিবেন, তিনি তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

ছেলেটির দেহের সন্ধিস্থলগুলিতে ময়লা জমিয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছিল। সুখেন্দু চলিয়া গেলে মহেশ্বরী উঠানে একখানা চৌকী পাতিলেন, ঘড়া ভরিয়া জল আনিলেন, নূতন গামছা বাহির করিলেন। তার পর ছেলেটিকে লইয়া সাবান দিয়া রগ্‌ড়াইয়া-রগ্‌ড়াইয়া মাজিয়া-ঘষিয়া, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া দিলেন। চিরুণী দিয়া মাথার তিন-পুরু ময়লা তুলিয়া, কেশ রচনা করিয়া কপালে একটি খয়ের-টিপ পরাইলেন এবং কাজল-লতা লইয়া চোখে কাজল দিয়া দিলেন। ছেলের চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। মহেশ্বরী পুত্রবধূকে ডাকিয়া গর্ব্বভরে কহিলেন,

"শৈল? বের হ'য়ে একবার দ্যাখ!"

মহেশ্বরীর কন্যাসন্তান না থাকায় পুত্রবধূর নাম ধরিয়া ডাকিয়া সে-সাধ পূর্ণ করিতেন। শৈলবালা

রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং হাসিতে হাসিতে কহিল, "মা'র অসাধ্য কাজ নেই!"

ছেলেটি গৌরবর্ণ ও দিব্য মোটা-সোটা। মহেশ্বরীর পারিপাট্যে তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। মহেশ্বরী পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, "ছেলেটি কিন্তু তোকে দিলাম।"

শৈলবালার পুত্র-কন্যা বলাই এবং শান্তি তথায় দাঁড়াইয়াছিল। তিনি মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে কহিলেন, "কি রে, কথা বল্‌ছিস্‌নে যে তোরা? আড়ি কর্‌বি না ত?" বলাই এই ছেলেটির সমবয়সী হইবে; শান্তি দুই বৎসরের বড়। শান্তি খুসী হইয়া কহিল, "বেশ হবে। বলাইটে বড় কুঁদুলে। আমি একা ওর সঙ্গে পেরে উঠিনে। ওকে আমার দলে নেবো। আমাকে দিদি বলে' ডাক্‌বে ত?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "শুধু দিদি হ'তে চাস্‌, দিদির মত যত্ন-আত্তি কর্‌তে হবে যে।"

শান্তি গিন্নীর মত মুখ নাড়িয়া কহিল, "বলাইকে ত ঘাড়ে পিঠে করে' নিয়ে সারা লঙ্কা বেড়াই—ওকে আর পার্‌ব না?"

মহেশ্বরী বালিকার মুখ চুম্বন করিলেন।

তার পর মহেশ্বরী তাহাকে বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন মাখিয়া-জুগিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। পুত্রবধূকে বলিলেন, "এর একটা নাম রাখ্‌তে হবে ত? কি রাখা যায় বল দিকি?"

শৈলবালা ভাবিয়া-ভাবিয়া কহিল, "কানাইলাল রাখ্‌লে মন্দ হয় না।"

মহেশ্বরী নামটি পছন্দ করিলেন, এবং বলিলেন, "এতদিন বলাই ছিল, এখন তোমার কানাই-বলাই দুইই হ'ল।"

বাড়ীতে ঝি-দাসীর অভাব ছিল না, তবু খাওয়া শেষ হইলে মহেশ্বরী নিজেই তাহার মুখ-হাত ধুইয়া দিলেন; এবং বলাইএর এক-প্রস্থ জামা-কাপড় লইয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন। এইসব কাজ শেষ হইলে তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয় মহলের একটি কক্ষে গেলেন। গৃহটি ক্ষুদ্র হইলেও আলোক-বাতাস বেশ ছিল। তিনি সেখানে খাটের উপর বিছানা করিলেন এবং বাতাস করিয়া ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইলেন। ছেলে ঘুমাইলে স্নান করিবার জন্য একখানি গামছা কাঁধে লইয়া, তিনি সুখেন্দুর গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুখেন্দু তখন নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু মহেশ্বরীর দেহে ক্লান্তি নাই, তিনি ডাকিলেন, "ও সুখেন! ঘুমোলি নাকি? এদিকে একবার আয় ত! দেখে' যা!"

সুখেন্দু তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া খাট হইতে নামিয়া আসিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, কি হয়েছে?"

মহেশ্বরী তখন কিছু না বলিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কানাইলাল যে-ঘরে ঘুমাইতেছিল, তথায় আসিলেন; এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "দ্যাখ্‌ দেখি, রূপে ঘর আলো করেছে।"

সুখেন্দু পুলকিত হইয়া কহিলেন, "মা! তুমি সবই পারো, পেটে তেমন ছেলে ধর্‌তে পারোনি—এই যা দুঃখ।"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "যশ গাইতে-গাইতেই যে তার পিছনে মস্ত একটা অপযশ জুড়ে' দিলি।"

সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "উপযুক্ত ছেলেই যদি ঘরে আন্‌তে না পারি, তবে যে আমাদের কিছুই পারা হ'ল না। যাক্‌ উপযুক্ত হোস্‌নি, সেটা মনে ধারণা থাকাও ভালো। তা শুনেছিস্‌? ছেলেটি কিন্তু শৈলকে দিয়েছি।"

সুখেন্দু কহিলেন, "বেশ ত! গাম্‌ছা কাঁধে করে' স্নান কর্‌তে চলেছ বোধ হয়! স্নানের সংখ্যাটা আগেও নিতান্ত কম ছিল না, এর পর খুবই বেড়ে যাবে দেখ্‌ছি। অসুখ-বিসুখ করে' না বসো।"

"অসুখ হয়—চিকিৎসা করাবি। ছেলে রয়েছে আমার ভাবনা কি?"

মহেশ্বরী হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর ক্রোড়ে কানাইলাল দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। পাড়াপ্রতিবাসীরা মহেশ্বরীর গুণে একান্ত

মুগ্ধ ছিলেন। তাহা হইলেও মহেশ্বরী যখন প্রথম এই বাগ্দীর ছেলেকে গৃহে স্থান দিলেন, তখন একটা অতৃপ্তি ও উত্তেজনা অতি নম্রভাবে প্রত্যেকের মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু যখন সকলেই দেখিতে পাইলেন, এই নিষ্কাম রমণী—আপনার নিষ্ঠাটুকু পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া নিঃসহায় ছেলেটিকে কেমন মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, তখন অধিকাংশই আপন-আপন মনের গ্লানি ভুলিয়া—শতমুখে আবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশ্য অধিকাংশ কেন, সকলেই করিতে পারিতেন, কিন্তু পৃথিবীতে সকলের প্রশংসা পাইবার মত পুণ্য কাজ কিছুই নাই।

বালকের অজ্ঞতার ফলে প্রথম-প্রথম মহেশ্বরীর কাজ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত। মহেশ্বরী হয়ত পূজায় বসিয়াছেন,—সে মাকে চমক্ দিবার জন্য চুপি-চুপি ঘরে ঢুকিয়া পিছন হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; তখন পূজার উপকরণ ফেলিয়া দিতে হইত, স্নান করিতে হইত, এবং নূতন করিয়া সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আবার তাঁহাকে পূজায় বসিতে হইত। নানা কাজে প্রায়ই এইরূপ ঘটিত। শৈলবালা সময়-সময় বিরক্ত হইতেন—সুখেন্দু মাঝে-মাঝে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেন—কিন্তু মহেশ্বরীর একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না। তিনি হাসিমুখেই বলিতেন, "ওকে কেন বকাবকি করছিস্? বালকের স্বভাব বালকের দ্বারাই প্রকাশ পায়। ও-কি এই বয়সে তোদের মত বুঝে-সুঝে' চল্‌বে? তবে আর সংসারে ছেলে-মানুষের ঠাঁই থাক্‌ত না।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কানাইলাল যখন একটু বুঝিতে-সুঝিতে শিখিল, তখন তাহার মনে সর্ব্বদা এই প্রশ্ন উঠিত,—কেন সে রান্না ঘরে—পূজার ঘরে ঢুকিতে পায় না? সে ছুঁইলে জলটুকু কেন ফেলিয়া দিতে হয়? কেন তাহার খাওয়া সন্দেশ বলাইকে দিতে পারা যায় না? বলাই ছুঁইলে কোনো জিনিস ফেলা যায় না, তাহার এঁটো সন্দেশ কানাই অনায়াসে খায়. তবে তার বেলা সবই উল্টা কেন? শৈলবালা এবং সুখেন্দুই তাহাকে বেশী সঙ্কোচ করিয়া চলিতেন। কিন্তু যাহাকে সে ভালোবাসে তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িত সেই মহেশ্বরীর উপরে। সে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার ফুল গুলি ছুঁইত, কাপড়খানি টানিয়া-টানিয়া ছিঁড়িয়া দিত মহেশ্বরী বলিতেন, "বাবা! এমন করিতে নাই।" সে সকল কথা তাহার কর্ণে পৌছাইত না। তাহার দুষ্টমি দিন-দিন বাড়িয়াই চলিত। সকলের খুঁটিনাটি ছুঁই-ছুঁই-এর ধাক্কায় শিশুর অভিমান যত ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিত, মার উপর আক্রোশে তাহা ততই প্রকাশ পাইত।

বলাই-এর সঙ্গে তাহার প্রায়ই ঝগড়া বাধিত। সে কোন-কোন দিন আঁচ্‌ড়াইয়া তাহার রক্তপাতও করিয়া দিত। কানাই ছিল হৃষ্টপুষ্ট, দুষ্ট ঘোড়ার মত, বলাই তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। শৈলবালা ছেলের লাঞ্ছনায় মুখে কিছু না বলিলেও মনে-মনে এই পরের ছেলেটার উপরই রাগ করিতেন। কানাইকে বলিলে শাশুড়ীকেই বলা হয়, এই ভয়ে বধূর রাগ মনেই জমা থাকিত। কিন্তু সুখেন্দু মাঝে-মাঝে মিষ্ট মুখে জননীকে দশ-কথা শুনাইয়া দিতেন। তাঁহার ত কাহাকেও সমীহ করিয়া চলিবার বালাই ছিল না।

ঘর-দালানে আল্‌নার উপর সুখেন্দুর জামা-কাপড় থাকিত। তাহার জামার পকেটের ভিতরটা কানাই-লালের কাছে একটা রহস্যাগার ছিল। তার লুব্ধদৃষ্টি সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজিত কি করিয়া উহার ভিতরটা একবার লুট করিয়া আসা যায়। একদিন সুবিধা পাইয়া সে জামার পকেট হইতে সুখেন্দুর সোনার ঘড়িটি উদ্ধার করিয়া লইয়া বাহিরে রকের উপর আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এপিঠ-ওপিঠ করিয়া দেখিল, কান পাতিয়া টিক্‌টিক্ শব্দ শুনিল। কিন্তু ঐ শব্দ কেন হইতেছে, কেমন করিয়া হইতেছে, কাচের আবরণের আড়ালে বসিয়া কে কথা কহিতেছে, জানিবার আগ্রহে ঘড়িটা সে রকের উপরে আছ্‌ড়াইয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, ভিতরটা ভালো করিয়া, দেখিবার উপায় করিয়া লইল। ঠিক্ সেই সময়ই কি কাজে সুখেন্দু তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বালকের হস্তে তাঁহার মূল্যবান্ ঘড়িটিকে এইরূপে রূপান্তরিত হইতে দেখিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার যেন কাণ্ডজ্ঞানসুদ্ধ লোপ পাইল। উঠানে দরমার জন্য বাঁশ চাঁছা হইতেছিল; সেখান হইতে এক

গাছা কঞ্চির ছড়ি লইয়া সবেগে তাহার পৃষ্ঠে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া কহিলেন।

"পাজি, নচ্ছার, ঘড়িটা শেষ করেছিস্।"

বালক এতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে ঘড়ির চাকার গতি নিরীক্ষণ করিতেছিল; আচম্কা বিষম আঘাত পাইয়া কানাইলাল যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মহেশ্বরী পূজায় বসিয়াছিলেন। শিশুর আর্ত্তনাদ দূর হইতে তীরের মত তাঁহার বুকে গিয়া লাগিল। তিনি পূজা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, শৈলবালা রান্নাঘরের উনানের উপর কড়া ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বলাই ও শান্তি খেলা ফেলিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাই এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল কেন তাহা জানিতে তাহার শিশু-সাথীদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল!

মহেশ্বরী দেখিলেন, বালকের পৃষ্ঠ দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। বেদনায় তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল, পুত্রের উপরে রাগটা কোনোপ্রকারে তাহা ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। নির্ম্মম-পুত্রের নির্ম্মমতা দ্বিগুণ করিয়া দেখাইয়া তাহার অভিমানী মা শিশুর উপর নূতন অত্যাচার সুরু করিলেন। তিনি সজোরে কানাইলালের কান টানিয়া ধরিয়া উঠানের একদিক্ হইতে অন্যদিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "যা, এখনি বের হ্ এবাড়ী থেকে, এঁটো পাত কখন স্বর্গে যায়? বের হ বল্‌ছি—নচেৎ ঐ কঞ্চি দিয়ে আমি আবার দু'ঘা বসিয়ে দিচ্ছি। সেয়ানা হয়েছিস্—যা নিজের বাড়ী চলে' যা।"

কানাইলাল কাঁদিতে-কাঁদিতে যখন স্থির হইল, তখন মায়ের আঁচল চাপিয়া ধরিয়াই কহিল, "মা, বড্ড জল্‌ছে—আর কর্‌ব না; বাড়ী কোথায় মা?"

মহেশ্বরী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া আঁচল টানিয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বাড়ী তোর সাত চুলোয়। যা, ঐ ঘরে গিয়ে বস্‌বি। ঘর থেকে যদি বের হবি—মেরে খুন কর্‌ব।"

এই বলিয়া কানাইলাল যে-ঘরে থাকিত তিনি আঙুল নাড়িয়া তাহাকে সেই ঘর দেখাইয়া দিলেন।

অশ্রু মুছিতে-মুছিতে ম্লানমুখে বালক তথায় যাইতে উদ্যত হইলে তিনি আবার ছুটিয়া আসিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "নে—আর যেতে হবে না, দাঁড়া।"

বিস্মিত বালক স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মহেশ্বরী তখন মহা ব্যস্ত হইয়া সাবান ও জল লইয়া গিয়া বালকের ক্ষত-স্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। শৈলবালা ইতিমধ্যে কতকগুলি গাঁদাফুলের পাতা হাতে রগ্‌ড়াইয়া সরস করিল। মহেশ্বরী তাহা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া একটা পটি বাঁধিয়া দিলেন; এবং তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া, তিনি তাহার পার্শ্বে ঝুঁকিয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, ও ক্ষণে-ক্ষণে মাথায় হাতে পায়ে হাত বুলাইয়া যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গের বেদনা মুছিয়া লইতে লাগিলেন।

সুখেন্দু আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলে, শৈলবালা অন্নব্যঞ্জন লইয়া কতক্ষণ রান্নাঘরে বসিয়া রহিল। কিন্তু যখন কানাই বা তাহার শ্বশ্রূ কাহারও ঘরের বাহিরে আসিবার সম্ভাবনা দেখিল না, তখন সে ভীতভাবে আস্তে-আস্তে মহেশ্বরীর কক্ষের নিকটে আসিল; এবং চোরের মত দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। এইরূপে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে বলিয়া উঠিল, "মা! কানাই খাবে না? ভাত বেড়েছি।"

মহেশ্বরী তখন বাতাস করিতেছিলেন। বলিলেন, "যে-আঘাতটা লেগেছে, এবেলা আর ভাত দিয়ে কাজ নেই।"

শৈল কহিল, "তবে তুমি এস, বেলা ত কম হয়নি, কখন্ স্নান কর্‌বে—আর কখন্ বা খাবে?

মহেশ্বরী কহিলেন, "তুমি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওগে, আমার দেরী হবে।"

শৈলবালা আরও কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল; এবং স্বামীকে ডাকিয়া দিল।

বালকের পৃষ্ঠে ক্ষত করিয়া দিয়া সুখেন্দু বিশেষ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মায়ের কাছে তখনকার মত মুখ দেখাইতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না, কিন্তু যখন শুনিলেন, তাঁহার জননী তখনও পর্য্যন্ত আহার করেন নাই, তখন কলঙ্কিত হস্তখানি লইয়া

তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই অতি সত্বর আবার মায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

সুখেন্দু দেখিলেন, মহেশ্বরী তখন পর্য্যন্ত সেই অস্পৃশ্য বালকটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সেবা করিতেছেন। জননীকে ডাকিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি গৃহমধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহেশ্বরী সব দেখিতেছিলেন। কিন্তু যেন কিছুই দেখিতেছেন না, এইভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। সুখেন্দু কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া সেইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে আপন-মনেই বালকের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "মা যে ছেলেকে এমন করে' ভুল্‌তে পারে, তা জান্‌লে ওটাকে এবাড়ীতে ঠাঁই দিই?"

পুত্রের এ অভিমান যে অনুতাপেরই রূপান্তর তাহা মহেশ্বরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি সেইরূপ চক্ষু বুজিয়া থাকিয়াই কহিলেন, "কিন্তু স্নেহটা যে পুত্রের চেয়ে পৌত্রে গিয়ে বেশী ভর করে' দাঁড়ায়, তা জানিস্?"

সুখেন্দু যে এত শীঘ্র জননীকে এমন সরলভাবে কথা বলাইতে পারিবেন, আশা করিতে পারেন নাই। তিনি একটু পুলকিত হইয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি আদর দিয়ে-দিয়েই ওকে এতটা বাড়িয়ে তুলেছ, নইলে ওর সাহস হয়, পকেট থেকে ঘড়িটা বের কর্‌তে আর ভাঙতে!"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ছেলেমানুষে অমন কত কি করে। তোমার একটা ঘড়ি গেছে, আর একটা কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু ওর পিঠে যে দাগ পাড়িয়ে দিয়েছ, তা জীবন থাকতে মুছে' ফেল্‌তে পার্‌বে না। ইতরের অস্ত্র আর ভদ্রের অস্ত্র পৃথক্ হ'তে পারে, কিন্তু ব্যবহারের অপরাধ ভিন্ন নয়। তোমার হাতে কঞ্চি আর চাষার হাতের কোদাল, অস্ত্র-দুটি ভিন্ন মানুষও ভিন্ন—কিন্তু ক্রোধটা একই।"

মহেশ্বরী পুত্রকে এত বড় একটা রূঢ় বাক্য বলি পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সুখেন্দু ইহা তৃপ্তি লাভ করিলেন। মাতা যে তাঁহার চিত্ত-বিক্ষে অন্তরে না চাপিয়া সরল-মনে ব্যক্ত করিলেন, ইহাতে য রূঢ়তা প্রকাশিত হউক না কেন, তিনি যে ক্ষমা করি পারিয়াছেন তাহা বেশ স্পষ্টই ব্যক্ত হইল।

সুখেন্দু কহিলেন, "আমার এইজন্যে রাগ হয়,—তু ওকে যেভাবে গড়ে' তুলছ, তা'তে ও যখন নিজেকে জান্‌তে পার্‌বে তখন মস্ত একটা ধাঁধায় পড়ে' যাবে।"

সুখেন্দুর এবাক্যটি এ-সময় তেমন সুপ্রযুক্ত হ না। মহেশ্বরী কহিলেন, "তা'তে আমার উপরই হওয়ারই কথা, ওর উপর হ'য়ে ত লাভ নেই।"

সুখেন্দু কহিলেন, "থাক্‌গে, যা হ'য়ে বয়ে' গেছে, গেছে। কিন্তু কানাই যে এখনও খেলে না, তুমি খেলে না।"

"ওকে এ-বেলা আর কিছু খেতে দেবো না। জানি যদি জ্বরজারি হ'য়ে পড়ে। যদি কুইনাইন থা দুটো বড়ি দিয়ে যা।"

সুখেন্দু দুইটি কুইনাইনের পিল আনিয়া দিলে কানাইলালকে এক বড়ি খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ত পর শৈলকে তাহার জন্য রুটি প্রস্তুত করিতে বলি মহেশ্বরী স্নান করিতে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ছুরী ও বাঁক শিক্ষা

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিষম ঘাত

বিষমঘাত পর্য্যায়ের বিভিন্ন পাঠ-মধ্যে বামে লিখিত আঘাতগুলি এক-ব্যক্তি প্রয়োগ করিবে; প্রত্যেকটি আঘাতের উত্তরে প্রতিপক্ষ সেই আঘাতটির প্রতিকার করিয়াই উহার দক্ষিণে লিখিত আঘাতটির প্রয়োগ করিবে; এইভাবে ক্রীড়া করিতে করিতে প্রথম ব্যক্তি বামে লিখিত শেষ আঘাতটি প্রয়োগ করিলে পর, প্রতিপক্ষ সেই আঘাতটির প্রতিকার করিয়াই (কোন-কোন পাঠ-মধ্যে উহার দক্ষিণে লিখিত আঘাতটির প্রয়োগ করিয়া)—তৎপরে বাম পার্শ্বে লিখিত প্রথম আঘাতটির প্রয়োগ করিয়া যথাক্রমে প্রথম ব্যক্তির পূর্ব্ববারের অনুরূপে আঘাত ও প্রতিকারাদি করিবে; এবং প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির (প্রতিপক্ষের) পূর্ব্ব-বারের অনুরূপে প্রতিকার ও আঘাতাদি করিতে থাকিবে। ইহাই বুঝাইবার সঙ্কেত-হেতু "প্রত্যারম্ভ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রত্যেকটি পাঠই প্রথমে বাম-হস্তে অভ্যাস করিয়া পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ-হস্তে অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। তামেচা	১। বাহেরা
২। কটী	২। ভাণ্ডার
৩। মন্	৩। হিমাএল
৪। গ্রীবাণ	(প্রত্যারম্ভ)

দ্বিতীয় ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। বাহেরা	১। তামেচা
২। ভাণ্ডার	২। কটী
৩। দে	৩। গ্রীবাণ
৪। হিমাএল	(প্রত্যারম্ভ)

তৃতীয় ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। বাহেরা	১। মন্
২। তামেচা	২। হিমাএল
৩। দক্ষিণ আনী	৩। বস্তি দক্ষিণ
৪। বস্তি উত্তর	৪। উত্তর আনী
৫। নেত্রতল উত্তর	৫। গলবিন্দু
৬। উদর	৬। বস্তিমধ্য
	(প্রত্যারম্ভ)

চতুর্থ ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। তামেচা	১। দে
২। বাহেরা	২। গ্রীবাণ
৩। উত্তর আনী	৩। বস্তি উত্তর
৪। বস্তি দক্ষিণ	৪। দক্ষিণ আনী
৫। নেত্রতল দক্ষিণ	৫। গলবিন্দু
৬। উদর	৬। বস্তিমধ্য
	(প্রত্যারম্ভ)

পঞ্চম ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। উদর	১। কটী
২। শির	২। বাহেরা
৩। ভাণ্ডার	৩। অংসতল দ
৪। তামেচা	৪। দে
৫। অংসস্থল উত্তর	৫। হল
৬। ঘাটিকা উত্তর	৬। বুক মধ্য
৭। গলবিন্দু	৭। ঊর্দ্ধ বুক
৮। ঘাটিকা দক্ষিণ	(প্রত্যারম্ভ)

ষষ্ঠ ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। উদর	১। ভাণ্ডার
২। বাণ্ড্য	২। তামেচা
৩। কটী	৩। অংসতল উ
৪। বাহেরা	৪। মন্
৫। অংসস্থল দক্ষিণ	৫। হল্
৬। ঘাটিকা দক্ষিণ	৬। বুক মধ্য
৭। গলবিন্দু	৭। ঊর্দ্ধ বুক
৮। ঘটিকা উত্তর	(প্রত্যারম্ভ)

সপ্তম ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ	১। দে
২। হিমাএল	২। মন্
৩। উগ্রা উত্তর	৩। কল্প দক্ষিণ
৪। যবেগা দক্ষিণ	৪। জনার্দ্দন
৫। যবেগা উত্তর	৫। শঙ্খ দক্ষিণ
৬। শঙ্খ উত্তর	৬। উত্তর আনী
৭। নেত্রস্থল দক্ষিণ	৭। অংসস্থল উত্তর
৮। অংসস্থল দক্ষিণ	৮। নেত্রস্থল উত্তর
৯। মণিবন্ধ পৃষ্ঠ	৯। ঘাটিকা দক্ষিণ
১০। কল্প উত্তর	(প্রত্যারম্ভ)

অষ্টম ক্রম (বিষমঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হিমাএল	১। মন্
২। গ্রীবাণ	২। দে
৩। উগ্রা দক্ষিণ	৩। কল্প উত্তর
৪। যবেগা উত্তর	৪। জনার্দ্দন
৫। যবেগা দক্ষিণ	৫। শঙ্খ উত্তর
৬। শঙ্খ দক্ষিণ	৬। দক্ষিণ আনী
৭। নেত্রস্থল উত্তর	৭। অংসস্থল দক্ষিণ
৮। অংসস্থল উত্তর	৮। নেত্রস্থল দক্ষিণ
৯। মণিবন্ধ পৃষ্ঠ	৯। ঘাটিকা উত্তর
১০। কল্প দক্ষিণ	(প্রত্যারম্ভ)

গহ্বর

চতুর্দ্দিক্ হইতে একযোগে বহু আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ক্ষিপ্রকারিতা-সহ শূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়া ও সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণাবর্ত্তে কিম্বা বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া ধীশক্তি-প্রভাবে মানসিক বিচার দ্বারা অভীত-চিত্তে নিমেষ মধ্যে সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া এবং আততায়ীগণের "ছিদ্র" কিম্বা দুর্ব্বলাংশ নির্ণয় করিয়া লইয়া, "সেই ছিদ্র পথ" কিম্বা দুর্ব্বলাংশ আক্রমণ করিয়া তাহাদের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হয়; প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও ধৈর্য্যহীন কিম্বা ভগ্নমনোরথ হইতে নাই। আততায়ীগণ সকলেই যদি আক্রান্ত ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ না হয়, তবে তাহাদের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হওয়া আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয় না।

অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়াই, আততায়ী-সমষ্টিকে বেষ্টন করিয়া অতি দ্রুতবেগে পাদচালনা সহ সম্মুখস্থ কিম্বা নিকটাগত প্রত্যেক আততায়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব (য তাহাদের দক্ষিণ হস্তে ছুরী কিম্বা অসি-আদি থাকে) পৃষ্ঠদেশ আক্রমণের চেষ্টা দেখিতে হয়; কিম্বা সুযে অনুরূপে তাহাদের দুর্ব্বলাংশ কিম্বা "ছিদ্রপথ" ে করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্নরূপে বিভক্ত করিবার চে দেখিতে হয়; ঐরূপ চেষ্টাকালে মন ও চক্ষুর ক্ষি কারিতার সাহায্যে সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকের অবস্থা-সম্ব সতর্ক থাকিতে হয়, এবং যাহাতে আততায়ী-সমষ্টি হই এক ব্যক্তির অধিক এক-সময়ে আক্রমণ করিবার অব না পায়, কিম্বা কেহ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ হইতে আক্র করিতে না পারে, এতদনুরূপেই অতি দ্রুতবেগে বিভি গতিতে পাদচালনা করিতে হয়। দক্ষতার সহিত কি কাল এইরূপ করিতে পারিলেই আক্রমণকারিগণ বিহ্ব হইয়া পড়িবে, হয়ত বা প্রমাদগ্রস্ত হইয়া স্বপক্ষীয়গণে আঘাত করিতে থাকিবে।

এতদনুরূপ দক্ষতা অর্জ্জন করিতে হইলে "গহ্বর পর্য্যায়ে বিভিন্ন পাঠের সম্যক্ অভ্যাসের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে।

"গহ্বর" পর্য্যায়ের পাঠ-পদ্ধতি "লাঠি খেলা ও অ শিক্ষা" মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর তাহা পুনরুল্লেখ হইল না।

নির্ঘাত

"ঘাত" "বিষমঘাত" ও "গহ্বর" পর্য্যায়ান্তর্গত পা গুলি বিশুদ্ধ-পদ্ধতিতে অভ্যাস করিয়া ক্ষিপ্রকারী হই পারিলেই "নির্ঘাত" অভ্যাস-হেতু উপযোগী হওয়া যায় কিন্তু বিশুদ্ধতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষিপ্রকারিত সহ হস্ত-চালনা অভ্যাস করিলে পরিণামে অশুভই ঘটি থাকে।

প্রথমে বাম হস্তে ছুরী ধারণ করিয়া নির্ঘাত অভ্যা করিতে হইবে; পরে পূর্ব্ব-প্রচেষ্টাসহ সম ক্লান্তি অবা দক্ষিণ হস্তে ছুরী ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন, "প্রয়োগ" "প্রতিকার", উভয় সম্পর্কেই উভয় হস্তই সম-ক্ষিপ্রকার ও সম-বলশালী হইয়া সমভাবে গঠিত হইতে থাকে।

নির্ঘাত-সম্পর্কে কোনও বিধি-নির্দ্দিষ্ট পাঠের স্থিরত

নাই; গতির লঘুতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষিপ্রকারিতা, এবং মন ও দৃষ্টিশক্তির বিশুদ্ধতার উপরেই "নির্ঘাত" ক্রীড়ার দক্ষতা নির্ভর করিয়া থাকে।

"লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা" মধ্যে "নির্ঘাত"-সম্পর্কে যে-সমস্ত সতর্কতার উল্লেখ করা হইয়াছে, "ছুরী ও বাঁক শিক্ষা" সম্পর্কেও তাহাদের অধিকাংশগুলিই প্রযোজ্য। তথাপিও ঐসমস্ত সতর্কতাগুলির বারম্বার আলোচনা সবিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, তাহাদের মধ্য হইতেও কতকগুলি এস্থলেও নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। হস্তদ্বয় সর্ব্বদাই সুরক্ষিত রাখিতে হয়।

২। শরীর ও গতির ভঙ্গী সর্ব্বদাই সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ রাখিতে হয়।

৩। কদাচ অন্যমনস্ক হইতে নাই।

৪। হস্তদ্বয় কদাচ যেন অতি সন্নিকটে কিম্বা অতি ব্যবধানে না হইয়া পড়ে। দ্রুতচালনা-কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে ও প্রতিপক্ষের হস্তগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তন্মুহূর্ত্তেই হস্ত চালনা দ্বারা ক্রটি সংশোধন করিয়া লইতে হয়, এবং এবিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়।

উভয় হস্তের ব্যবধান সাধারণতঃ দেড় হস্ত ও এক হস্তের মধ্যে রাখিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

৫। হস্তদ্বয়ের কফোণি (কনুই) কদাচ যেন একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া না যায়।

৬। হস্তদ্বয়ের ব্যবধানের মধ্যদেশে কদাচ যেন প্রতিপক্ষের "ছুরী" কিম্বা "বাঁক" প্রবেশ করিবার অবসর না পায়।

৭। কদাচ যেন এক হস্ত কটীর নিম্নে, ও অপর হস্ত মস্তকের উপরে, অথবা, এক-হস্ত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে ও অপর হস্ত শরীরের বাম পার্শ্বে প্রতিহত হইয়া না পড়ে।

৮। সর্ব্বদাই গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উভয় হস্ত চালনা করিতে হয়, নতুবা স্বকীয় আঘাতেই স্বহস্ত ও শরীর আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিম্বা হস্তদ্বয়ের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িতে পারে; সাধারণতঃ কোন হস্তই নিষ্ক্রিয় রাখিতে নাই,—তবেই "যুযুৎসু" প্রয়োগের অবসর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৯। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইলেও তাচ্ছীল্য-সহকারে কোনরূপ সতর্কতার লাঘব করিতে নাই।

১০। কদাচ স্বকীয় যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া আস্ফালন ও স্পর্দ্ধা দেখাইতে যাইতে নাই।

১১। হস্তগতির ক্রমধারা অনুযায়ী সহজ পথ অবলম্বনেই প্রতিপক্ষের অরক্ষিত স্থান-সমূহে আক্রমণহেতু আঘাতের প্রয়োগ করিতে হয় (proceed through shortest cuts)। বিশৃঙ্খল আক্রমণে ও আঘাতে সুফল না হইয়া কুফলই অধিক হয়।

১২। যাহাতে অল্প সময়-মধ্যে অধিক আঘাতের প্রয়োগ-মাত্রার আধিক্য (maximum strokes in minimum time) সম্ভবপর হইতে পারে, তদনুরূপেই "প্রয়োগ" ও "প্রতিকার" সম্পর্কে ক্ষিপ্রকারিতাসহ হস্তচালনা সুরক্ষিত রাখিতে হয়।

১৩। নিরবচ্ছিন্ন সমবেগসম্পন্ন দ্রুতগতি (swift, uniform and continuous motion) হইতেই আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুরু আঘাতই কার্য্যকারী, লঘু আঘাতে সময় ও শক্তি ক্ষয় মাত্র।

১৪। আক্রমণ-প্রারম্ভে "হস্ত" কিম্বা "চক্ষু" (প্রধানতঃ হস্ত) আক্রমণের উপক্রম কিম্বা ভাণ করিয়া, পরে আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়; অথবা প্রতিপক্ষের হস্তদ্বয়ের কোন-রূপ বাধা জন্মাইয়া আরম্ভ করিতে হয়।

১৫। যে-হস্তে প্রতিপক্ষ "ছুরী" কিম্বা "বাঁক" ধারণ করিবে, আক্রমণ-সংযোগে সেই পার্শ্বে পতিত হইতে পারিলেই যথেষ্ট সুবিধা হয়। সফলতাসহ পৃষ্ঠ আক্রমণ করিতে পারিলেই সাধারণতঃ জয়লাভ নিশ্চিত হইয়া থাকে।

১৬। প্রতিপক্ষ যাহাতে পৃষ্ঠ আক্রমণের অবসর না পায় সেইহেতু সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিয়া "আক্রমণ" ও "প্রতিরোধ" কিম্বা "অব্যাহতি" সহ বিভিন্ন-গতিতে পদচালন করিতে হয়।

১৭। সর্ব্বদাই প্রতিপক্ষের "দুর্ব্বলতা" ও "ছিদ্র" বুঝিয়া আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়; সেইহেতুই সুযোগ মতে "ধাঁধাঁ"র প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার শিষ্টতা ও উদারতা ভুলিয়া যাইতে হয়,—নতুবা নিজেকেই প্রতিহত হইতে হয়।

[সর্ব্বপ্রকার অনবধানতা, এবং সতর্কতার ব্যভিচারই "ছিদ্র" বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ যে-কোনরূপ অপারগতার নামই "দুর্ব্বলতা"।]

১৮। দ্রুত চালনায় আঘাতের পর আঘাতের প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষকে প্রমাদগ্রস্ত করিতে পারিলেই তাহার "ছিদ্র" ও "দুর্ব্বলতা" প্রকট হইয়া পড়ে।

১৯। কৌশলক্রমে প্রতিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম হস্তকে তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অপসারিত করাইয়া হস্ত আক্রমণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই আশু শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

২০। প্রতিপক্ষের আক্রমণে অস্থির হওয়ার উপক্রম হইলেই চক্ষু আক্রমণ দ্বারা তাহাকে বিহ্বল করিতে হয়। শ্রেষ্ঠ কৌশলীগণ সাধারণতঃ "যুযুৎসুর" প্রয়োগেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন।

২১। গ্রীবা, মস্তক, হৃদয়, বস্তি ও মর্ম্মস্থল-সকল লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়। ঐসমস্ত স্থলে নিশ্চিতরূপে গুরু আঘাত করিতে পারিলেই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইবে।

২২। প্রতিপক্ষের আঘাত অতিক্রম করিয়া কোনও মর্ম্মস্থলে তাহাকে নিশ্চিত গুরু আঘাত করিতে পারিলেই সাধারণতঃ নিঃশঙ্ক হওয়া যায়। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রতিপক্ষ আক্রমণের অবসর না পাইলে আর শঙ্কা কোথায় ?

২৩। কদাচ পশ্চাৎপদ হইতে নাই; প্রতিপক্ষ পশ্চাৎপদ হওয়ার উপক্রম করিলেই শরীর সুরক্ষিত রাখিয়া আক্রমণ সহযোগে তীব্রগতিতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

২৪। দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির প্রতিযোগিতা হইলে সময়ে-সময়ে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিকে এক লম্ফে শূন্যে উঠিয়া "অভিযান-স্থিতির" ভঙ্গী যথাসম্ভব স্থির রাখিয়া, এবং প্রতিপক্ষের হস্তদ্বয়কে প্রতিহত করিতে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্রগতিতে তাহার অতি সন্নিকটে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

২৫। প্রতিপক্ষ লম্ফ-সহযোগে আক্রমণের উপক্রম করিলে, "বেতসী" গতি অবলম্বনে, কিম্বা লম্ফ-সহযো[গে] দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্বে সরিয়া পৃষ্ঠ আক্রমণের চে[ষ্টা] দেখিতে হয়।

২৬। চক্ষু আক্রান্ত হইলেই প্রতিকারের সঙ্গে সা[থে] "অবনমন"-সহযোগে তীব্রগতিতে আক্রমণসহ প্রব[ল] বেগে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হয়।

২৭। "ছুরী ও বাঁক" সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লা[ভের] হেতু বিভিন্ন প্রকারের "বেতসী" গতি ও বিভিন্ন-প্রকারে[র] "অঙ্গামোটন" (ডিগ্‌বাজী) অভ্যাস করিতে হয়।

২৮। পৃষ্ঠ আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হইলেই অ[তি] ক্ষিপ্রকারিতা-সহ "অবনমন"-সহযোগে, কিম্বা বসি[য়া] পড়িতে-পড়িতে দক্ষিণাবর্ত্তে (অথবা বামাবর্ত্তে) সম্প[ূর্ণ] ঘুরিয়া আসিয়া তীব্রবেগে আক্রমণ-সহ প্রতিপক্ষের সম্মুখী[ন] হইতে হয়। (সাধারণতঃ যে-হস্তে ছুরী কিম্বা বাঁক ধ[রা] থাকে, সেই দিকের আবর্ত্তনেই ঘুরিতে হয়।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

প্রকৃত সংঘর্ষকালে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মপ্রণালী [ও] সতর্কতাগুলির বিচার করিবার অবসর পাওয়া অসম্ভব কিন্তু শিক্ষাভ্যাস কালে এইসমস্ত সতর্কতা প্রভৃতি আয়[ত্ত] করিয়া রাখিতে পারিলেই, প্রকৃত সংঘর্ষকালে আপন[া] হইতেই পূর্ব্ব-শিক্ষা, অভ্যাস ও সংস্কারের সমষ্টীভূত প্রভা[ব] প্রতিভাত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি-সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকে তবে জয়লাভ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আয়ত্তাধীন।

অভিবাদন (নির্ঘাত ক্রীড়াকালে)

নির্ঘাত ক্রীড়াকালে "ঘাত" পর্য্যায়ের অনুরূপে পরস্পরে ক্রমান্বয়ে "বাহেরা", "তামেচা", "কটী" ও "ভাণ্ডারের" প্রয়োগ ও প্রতিকার করিয়া বামে ও দক্ষিণে নিজ-নিজ বাঁক দুই-দুই বার শূন্যে হেলাইয়া-দোলাইয়া ঈষৎ পশ্চাতে যাইয়া দুই হস্ত মিলিত করিয়া পরস্পর অভিবাদন করিয়া ক্রীড়ারম্ভ করিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; ক্রীড়া শেষ হইলেও ঐরূপে অভিবাদন সম্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হইতে হইবে। অভিবাদন-প্রয়োজন, "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা"-মধ্যে সম্যক্ বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

"কলতলার কাব্য"

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

বেশ জুতসই আহারের পর "ওদের" বোঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম যে, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাটা নিতান্তই শোচনীয়। নখ-সঞ্চালনে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া "ওরা" বলিল, "হ্যাঁ, তোমাদের আব্দার দিন-দিন বেড়েই যাচ্ছে ; গাঁটের পয়সা খরচ করে' সরকার বাহাদুর রাস্তায়-রাস্তায় জলের কল পর্য্যন্ত করে' দিলে, তবু তোমাদের মন পায় না—"। অনেক বুঝাইলাম যে, এক-মাইল আধ-মাইলের মধ্যে এক-একটা কল বসাইয়া সরকার-বাহাদুর জল-প্রার্থীদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, আর এই কলহ সৃষ্টিই সকল বিষয়ে সরকারের মূল নীতি, কিন্তু যেখানে যুক্তির নমুনা উক্তরূপ, সেখানে আর বৃথা বাক্য-ব্যয় করিয়া কি হইবে ? আর বিশেষতঃ যেখানে হারিয়াই খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেখানে জিতিবার জেদটাই বা করে কোন্ মূঢ় ?

একটু নিশ্চিন্ত থাকিলে বাঙ্গালী হয় রাজনীতি না হয় কাব্যের আলোচনা করিয়া থাকে। প্রথমটিতে নিরুৎসাহ হইয়া আজ এই জলের-কল-সম্পর্কে যে-একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

টিটাগড়ের ষ্টেশন এবং কোম্পানীর চটকলের মাঝের সুদীর্ঘ রাস্তাটার মধ্যখানে সিংহমুখো একটা জলের কল অদ্যাবধি দাঁড় করানো আছে। রাস্তাটার দুই পাশে এখন ছোটবড় অনেকগুলা বাড়ী উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে, দীর্ঘান্তরালে দু-একটা দোকান ছাড়া আর-কিছুই ছিল না। তখন যে-কোন সময়ই লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, কলটি দশ-বারোটি ঘড়া, বাল্‌তি ও অন্যান্য জলপাত্রে পরিবৃত, একটিতে ক্ষীণ ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে এবং কয়েকজন পশ্চিমা স্ত্রী ও পুরুষ বাঙ্গালার দুঃখ-কষ্ট ও নিজ-নিজ "মুল্লুকের" সুখৈশ্বর্য্যের গল্প করিতেছে। একটা পাত্র ভরিয়া গেলে "ভাড়া" অর্থাৎ পালা লইয়া একচোট বিবাদ-বচসা হইত। যে জিতিত সেই ন্যায়কে সপক্ষে করিয়া নিজ পাত্রটা জলের মুখে বসাইয়া দিত এবং প্রায়তঃ দেখা যাইত, যাহার রূপা-গালার বিচিত্র চুড়ী-পরা হাতখানা বেশী খেলে, বিজয়-লক্ষ্মী সেই অঙ্গনারই সঙ্গিনী হইতেন।

দুপুর-বেলায় এ-দৃশ্যপট বদ্‌লাইয়া যাইত। তখন আর লোকের ভিড় থাকিত না। নিকটের নারিকেল-বৃক্ষটা হইতে দু-একটা রৌদ্রতপ্ত কাক নামিয়া আসিয়া, কলের শান ভাঙ্গিয়া যেখানে-যেখানে জল জমা হইয়াছে, সেখানে দু এক চুমুক জল পান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। এই সময় প্রায়ই দেখা যাইত কলসীটি মাথায় লইয়া একটি তের চৌদ্দ বৎসরের পশ্চিমা মেয়ে দক্ষিণ দিকের একটা রাস্তা দিয়া মন্থর গতিতে আসিয়া কলতলায় উপস্থিত হইত। মুখের উপর তাহার এমন একটি কৌতুক-চঞ্চলতার ভাব ফুটিয়া থাকিত যাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হইত কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা—সকল ঋতুরই দিনগুলা, বিশেষ দ্বিপ্রহরের এই সময়টা তাহার নিকট বসন্তের আকারেই বর্ত্তমান। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত অসময়ে নিরিবিলিতে আসিলেও বেচারা নিরুপদ্রবে কখনো তাহার গাগরীখানি ভরিয়া লইতে পারিত না। কারণ, লোক না থাকিলেও তাহার আগমনের পূর্ব্বে হইতেই কলের পাশে দুইটি ঘড়া বসান থাকিত এবং সে আসিয়া কল টিপিলেই "আরে, হামারা ভাজা, হামারা ভাজা" বলিয়া চেঁচাইতে-চেঁচাইতে একটা ছেলে ছুটিয়া উপস্থিত হইত। প্রথম-প্রথম মেয়েটা কিছুই বলিত না। কলসীটি সরাইয়া লইবার ভঙ্গিমায় বিরক্তির লক্ষণ পরিস্ফুট করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ছেলেটা, কলসীতে খানিকটা জল জমা হইলে সেই জল দিয়া কলসীটা উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া ধুইয়া লইয়া আবার ভর্ত্তি করার জন্য বসাইয়া দিত। ইহাতে

অসহিষ্ণুভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বালিকা বলিত—"ই সব হারামজাদগি!" ছেলেটা কোন দিন মৃদু হাসিয়া সে বিরক্তিতে ইন্ধন যোগাইত, আর কোন দিন বা সাফাই দিত—"আরে ভাই, গাগ্‌রী ধিপল বা, ধোই না?"

বচসাটা কোন-কোন দিন বাড়িয়াও যাইত। মেয়েটা প্রশ্ন করিত, "এতক্ষণ পর্য্যন্ত কলসীটা রোদে বসাইয়া রাখিতেই বা কে মাথার দিব্য দিয়াছিল? এসবই 'হারামজাদগি'—।" ছেলেটা উত্তর দিত—'গুরমিণ্টিকে রাজমে' নিজের ইচ্ছা-ও স্থবিধা-মত কাম করিবার সকলেরই অধিকার আছে; যাহার না বনে, সে ঘরের ভিতর ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকিলেই পারে, ইত্যাদি।

কিন্তু ছেলেটার এই অবাধ প্রতিপত্তি অধিক দিন চলিল না। একদিন 'ভাজা' লইয়া গোলমাল করিতে গেলে বালিকা কলসীটা কলের মুখে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "হাম না হটায়ব, দেখি কৌনাকে অখ্‌তিয়ার বা।" ছেলেটা হতভম্ভ হইয়া গেল, মুখে বলিল, "আরে ই ঔরৎ না জমাদার বা।" কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করিতে সাহস করিল না। মেয়েটা সেইরূপ জিদের সহিতই কলসীটা ভরিয়া লইয়া, তাহা মাথায় বিঁড়া দিয়া বসাইয়া লইয়া গট্‌গট্‌ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কথা রাখিয়া গেল, "হাম হারামজাদ্‌গি তোড়ব, হাঁ।" পরদিবস আসিয়া দেখিল কলটাতে কলসীর বালাই নাই। ঠোঁটে একটু বিজয়ের হাসি ফুটাইয়া বলিল, "হুঁ, বউআ ডেরায়ল্‌ বাড়ন্" অর্থাৎ বাছাধন ভয় পেয়েছেন; তাহার পর ধীরে-সুস্থে বেশ করিয়া মুখটা ধুইয়া রাঙা করিয়া মুছিল, আল্‌গা টিকুলিটা আন্দাজে ভ্রূদুটির মাঝখানে চাপিয়া বসাইয়া দিল এবং কলসীটা কলের মুখে বসাইয়া নারিকেল-গাছের পাত্‌লা ছাওয়ায় গিয়া বসিয়া রহিল। ছেলেটা তখনও আসিল না। তাহার আগমনের রাস্তায় এক একবার নজর ফেলিয়া মেয়েটা বলিল, "আরে অইহন্ কাঁহাসে? হাম কি সে জানানী হতি?"—অর্থাৎ আসিবেন কোথা থেকে; আমি কি সেই মেয়েমানুষ?

কলসী ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; সে উঠিবার কোন প্রয়াস পাইল না। একটা খোলাম-কু লইয়া মাটিতে তাহার দেশী খেলার আঁকর কাটিতে লাগিল ও মাঝে-মাঝে চোখ তুলিয়া এক-একবা এদিক্-ওদিক্ দেখিয়া লইতে লাগিল। যখন প্র আধা কলসী জল পড়িয়া গিয়াছে, সে উঠিয়া গেল এ "পানি সব ধিপ্ গইল বা" বলিয়া সমস্ত জলটা ফেলি দিয়া আবার টাট্‌কা ও ঠাণ্ডা জলের জন্য কলসী লাগাইয়া পূর্ব্ববৎ যাইয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় দেখা গেল দুই হাতে দুইটা কল ঝুলাইয়া সেই 'হারামজাদা' ছেলেটা আসিতেছে দেখিতেই যা দেরী, মেয়েটা লড়াইয়ে মোরগের ম উগ্রভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং ত্রস্তপদে কলে পহুঁছি বিনা বাক্য-ব্যয়ে নিজের কলসীটা চাপিয়া ধরিয়া গ্রীব বাঁকাইয়া ছেলেটার পানে স্পর্দ্ধিত-নেত্রে চাহিয়া রহিল —ভাবটা, আজ একচোট দেখিয়া লইবে সে!

ছেলেটা আস্তে-আস্তে কলসী দুইটা শানের এক পাশে রাখিল এবং শান্তভাবে একটু হাসিয়া বলিল "আজ তো আর ভাজার কথাই ওঠে না, তবে এ ভয় কেন? নাও তুমিই ভরে' নাও, আমি দাঁড়িয়ে দেখি।"

বালিকা তাহার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহি ও কলসী ছাড়িয়া বলিল, "না, না, সে কথা নয়, তবে আমার অনেকটা যেতে হয়, আর এই রোদ—"

হাসিয়া ছেলেটা বলিল, "হ্যাঁ, তোমার বাসা আর দূর নয়! যে জানে না তাকে বোঝাওগে; আমি এই সহরেরই লোক, 'মুন্নাকাক্কার' বাড়ী আর চিনিনে! —না তোমায় এই নতুন দেখা আমার?"

বিস্মিতভাবে মুখটা একটু তুলিয়া মেয়েটা আবার ধীরে ধীরে নোয়াইয়া লইল। রৌদ্রে যতটা ঘামা উচিত ছিল, তাহারও বেশী বেচারা ঘামিয়া উঠিতেছিল। কাল তাহার ছিল পূর্ণ জয়, আর আজ আসিয়া অবধি অন্তরে বাহিরে সে যেন পরাজিতই হইয়া চলিয়াছে। সকলের অপেক্ষা তাহাকে সঙ্কুচিত করিতেছিল এই পরিচয়টা, কারণ সেটা তাহার তেমন গৌরবের নয়;— তাহার চাঞ্চল্য, কৌতুক-প্রিয়তা ও নিঃসঙ্কোচ ভাব পাড়ায়

তাহাকে 'বাতাহিয়া' অর্থাৎ পাগ্‌লী-নামে খ্যাত করিয়া রাখিয়াছিল। সে-কথাটা এই 'লক্ষীছাড়া' সবজান্তা ছেলেটাও যে জানে এটা তাহার তেমন রুচিকর বলিয়া বোধ হইল না।

নেহাৎ অপরাধীটির মত বেচারা পূর্ণায়মান কলসীটির পানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে—বোধ হয় একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া—এই বোঝার মত জড়তাটা দূঢ় করিবার জন্য বলিল, "যদি এতই জানো 'মুন্না কাক্কা'কে, ত ওদিকে বড় একটা যাও না যে ?"

ছেলেটা মেয়েটার পানে চাহিয়াছিল; ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি করতে যাবো আর ? 'মুন্না-কাক্কাকে' দেখ্‌লে ত আর পেট ভরবে না। যাকে দেখ্‌লে কিছু ক্ষিদে মেটে, তা'কে ত সাম্‌নে দেখতেই পাচ্ছি—"

মেয়েটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত ক্রোধের একটা দীর্ঘ "কী"—টানিয়া কলসী ছাড়িয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার কৈশোর-অবসানের কটাক্ষে যতটা দাহ ছিল সমস্ত দিয়া ছেলেটার পানে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ছেলেটা অবিচলিতই রহিল। সকৌতুক-দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর অনলবর্ষী নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার যে সবই উছ্‌লে পড়্‌ছে—তোমার রাগ—কলসীতে জল—আর আর—থাক্—সব, আমায় ভরে' নিতে দাও এখন।"

মেয়েটার ঠোঁট-দুটি কাঁপিয়া উঠিল। 'ঝাড়ু মারা' হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি গালাগাল একদমে মনে পড়িল, সবগুলি অনর্গল আওড়াইয়া সে কলসীটাকে বাঁকা কাঁকে সজোরে বসাইয়া দিল এবং ঝাঁকানির চোটে জল ছিটাইতে ছিটাইতে গৃহের দিকে চলিল।

ফণা ধরিলেই সাপকে মানায়। এই প্রচণ্ড বালিকার সহজ সৌন্দর্য্য ছেলেটা বোধ হয় উপভোগ করিতেছিল; সে খানিকটা চলিয়া গেলে গলা উঁচাইয়া কহিল, "তোমার নামটা কি বলে' যাও, এ-সব গালাগালির জন্যে 'মুন্না-কাক্কার' কাছে নালিস করতে হবে। 'পাগলী' বল্‌লে ত আবার একচোট ক্ষেপে উঠবে ?"

মেয়েটা আহত ব্যাঘ্রীর মত দৃপ্তভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। রক্তিম মুখটা দুলাইয়া-দুলাইয়া বলিল, "করিস্ নালিস মুন্নাকাক্কার কাছে, আমি ভয় করিনে। বলিস্ 'লছিয়া' আমায় ঝাড়ু মেরেছে, লাথি মেরেছে, আর খড়ের নুড়ো দিয়ে আমার বাঁদুরে মুখটা পুড়িয়ে দিয়েছে; বলিস্—একশো-বার বলিস্।"

সে আবার সবেগে ঘুরিয়া পূর্ব্ববৎ চলিল।

(২)

"মুন্নাকাক্কার" কাছে কোন পক্ষেরই নালিস্ রুজু হইল না, এবং এই অপ্রিয় ঘটনার পর হইতে দুইজনে যে, মুখ দেখা-দেখি কি কথা-বার্ত্তা বন্ধ হইল এমনও নয়। বর্ষা আসিয়া পড়ায় দেখা-শুনাটা অবশ্য প্রতিদিনই ঘটিয়া উঠিত না। যেদিন জল নামিত, সজোরে, লছিয়ার সেদিন প্রায়ই আসা হইত না। মুন্নাই ভিজিয়া ভিজিয়া কলসী ভরিয়া লইয়া যাইত। ছেলেটা নিজের নিরি-বিলি দো-চালা হইতে ব্যাপারটা দেখিত; আস্তে-আস্তে ভিতরে যাইয়া কলসী দুইটা নাড়িয়া দেখিত—যদি সামান্যও জলের শব্দ হইত, বলিত, "আজ বাসিয়ে পানিসে চলি; আরে কৌন ভিজে একটুক পানি লাগি।" যদি কলসীটা একবারেই ঢন্ ঢন্ করিত, বাধ্য হইয়া ভিজিতে ভিজিতে সিকি কি আধা ভাগ ভরিয়া চলিয়া আসিত; এবং মুখখানি বর্ষার মেঘের মতই মলিন করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিত।

বাহির হইতে যত দূর বোঝা যায় এরূপ অবস্থা লছিয়ার মনে কোন ভাবের ঢেউ তুলিত না। তাহার কারণ, তাহার মনটা ছিল স্বভাবতঃ আত্মস্থ—বাহিরের সহিত তাহার আদান-প্রদান ছিল অল্পই। নিজের কয়েকটা খেয়ালের নিগূঢ় সাহচর্য্যের মধ্যে সে বেশ নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিনগুলা কাটাইতেছিল। তাহার বয়সের সহিত সেগুলির কোন সামঞ্জস্য আছে কি না, এ সব কথা ভাবিয়া দেখিবার তাহার অবসর বা চৈতন্য ছিল না; এবং লোকে যদি কোন গরমিল আবিষ্কার করিয়া তাহাকে "বাতাহিয়া" আখ্যা দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে ত করুক গিয়া—সে গ্রাহ্য করিত না।

একটু—খুব সামান্য ব্যতিক্রম ঘটাইত কলতলাটা। সেইখানে ব্যয়িত তাহার জীবনাংশে আশা-বিষাদের একটা অজ্ঞাত-পূর্ব্ব মিশ্র অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছিল। সেটাকে সে যে পূর্ণভাবে নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল এমন নয়; সেটা শুধু ধরা-ছোঁয়ার বহির্ভূত একটা অস্পষ্ট আকারে তাহার উদ্দাম মনটাতে একটা ছায়াপাত করিয়া মিলাইয়া যাইত। তাহার এমন ভাষা ছিল না যে, সে এই আভাসটুকুকে একটা আকার দিয়া বুঝিতে-সুঝিতে পারে—কারণ, যৌবন, স্বীয় আগমনের সঙ্গে আর-সকলকে যে শব্দ-সম্ভার দিয়া চৈতন্য ও স্পন্দন দান করে, লছিয়াকে তাহা দিবার অবসর পায় নাই। কলতলার একটা টান ছিল, কিন্তু সেটা বেদনার টান কি সুখের এবং তাহার উদ্ভবই বা কোন্‌খানে সেটা সে বুঝিতে পারিত না; তাই কলতলা ছাড়িয়া সে বাঁচিত কি মরিত বলা কঠিন; তবে বাড়ী আসিলে তাহার সহজ, প্রাত্যহিক জীবনের পাশে কলের স্মৃতি আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিতে পারিত না এটা ঠিক,—কারণ মনটা ছিল তাহার বীণার মত—একটু ঘা পড়িলে একটু রণ্‌রণিয়া উঠিত বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতি সে বহন করিয়া রাখিতে পারিত না।

এক-একদিন লছিয়া বুড়ার সহিত ঝগড়া করিয়া নিজেই জল ভরিতে আসিত। বুড়াকে বলিত, "জলে ভিজে-ভিজে' তুই যদি মরিস্ তাহ'লে আমি দাঁড়াবো কোথা? সবাইকে ত পেটে পূরে' বসে' আছিস্; কাউকেও রেখেছিস্ কি?"

বুড়া বিষণ্ণভাবে মাথাটা নাড়িয়া বলিত, "ঠিক বাত, ঠিক বাত, তবে কথা এই লছ্‌মি, তুই বা যদি জ্বরে পড়িস্, তা হ'লে তোর যে একটা বন্দোবস্তের কথা ক'দিন থেকে আমি ভাব্‌ছি সেটাতেও যে, বাগড়া পড়ে' যাবে—"

একথাটা লছিয়া মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিত, মুখ ভেঙাইয়া বলিত, "বন্দোবস্ত? বন্দোবস্ত?—আমার বন্দোবস্ত করলে ঐ হাড় ক'খানা আগ্‌লাবে কে?—শেয়াল-কুকুরে? বুড়ো বয়সে তোর মতিচ্ছন্ন ধরেছে—তা আর আমার বুঝ্‌তে বাকি নেই। তা' দেখি, আমি আগে যমের সঙ্গে তোর বন্দোব[স্ত] করি কি তুই আমার বন্দোবস্ত করিস্—"

বর্ষা গেল, শীত গেল, বসন্ত ফিরিয়া আসিল। জলে কলের ভিড় আবার জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং এ জমায়েতের সুখ-দুঃখ, বাঙ্গালার নিন্দা এবং 'মুল্লুকের' তারি[ফ] প্রভৃতি সেই পুরাতন গল্পের মধ্যে একটা নূতন বিষ[য়] মাঝে-মাঝে আলোচিত হইতে লাগিল—সেটা সুনরা[ও] লছিয়ার পরিবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা। সকলেই নাসিকা কুঞ্চি[ত] করিতে লাগিল, ভ্রূ কপালে উঠাইতে লাগিল, একাল সেকালের তুলনা করিতে লাগিল এবং সবশেষে নির্লিপ্ত ভাবে এই অভিমতই প্রকাশ করিতে লাগিল যে, যাহা[র] নাত্‌নী তাহারই যখন চাড় নাই ত অপরের মাথ[া] ঘামাইয়া ফল কি?

তা প্রকৃতই, সুনরা ও লছিয়া একটু বাড়াইয়া তুলি[য়া]য়াছে। তাহাদের কলতলার কলহ দু'-একটা লোক জড় ন[া] হওয়া পর্য্যন্ত আজকাল আর থামে না, আর তাহাদে[র] গল্প-হাসি সুরু হইলেও একটু বিবেচক লোকের চক্ষে তাহ[া] কেমন-কেমন ঠেকে। এমন-কি সুনরা জ্বরে পড়িলে লছিয়া দু'-একবার তাহার জল জোগাইয়া, তাহার পটোলের ঝোলের পথ্য পর্য্যন্ত রাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছে। মুন্নাও যে কথাটা নেহাৎ না জানিত এমন নয়, কারণ জল তুলিতে যাইয়া সুনরার গৃহে এ-সব উপলক্ষে যে-টুকু বিলম্ব হইত, লছিয়া তাহার একটা মনগড়া জবাব-দিহি দিবার চেষ্টা করিত।

সুনরা কিন্তু কখন পাল্টা ভিজিট দেয় নাই—লছিয়া জ্বরে মরণাপন্ন হইলেও নয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বোধ হয় বলিবেন তাহার মনে গলদ্ ছিল বলিয়া সে এতটা খোলা-প্রাণ হইতে পারিত না;—কথাটা অসম্ভব নয়, হইতেও পারে। তবে লছিয়া ভাল হইয়া যদি মুখ ভার করিয়া অনুযোগ করিত, সুনরা বলিত সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত তাহাকে খাটিতে হয়, তাহার কি নড়িবার জো আছে? যদি মনটা লছিয়ার ভাল দেখিত, কখন কখন এটুকু যোগও করিয়া দিত—"আর তোমার অসুখ হ'লে আমিই কি এমন ভাল থাকি লছ্‌মি, যে দু'পা হেঁটে দেখে' আস্‌ব?"

লছিয়া বলিত, "আচ্ছা, 'জ্বর-বোখার' শুধু আমার

জন্যেই 'কালীমাই' তোয়ের করেননি ; তখন দেখা যাবে !"

অনেক দিন এইভাবেই গেল, তাহার পর একদিন এই ঘটনাটি ঘটিয়া বসিল।—

সেদিন ছিল দোল-পূর্ণিমা। কলের ছুটি, ঘরও খালি —লোকগুলা রাস্তায় পিচকারির উৎসবে মাতিয়া বেড়াইতেছে। শ্লীল-অশ্লীল নানাবিধ গীতে, হাসির উন্মাদ হর্‌রায় আর বেয়াড়া খঞ্জনি-বাঁধা, ঢোল ও করতালির সৃষ্টিছাড়া আওয়াজে এই অল্প-পরিসর জায়গাটা গম্‌গম্‌ করিয়া উঠিয়াছে। এতলোক যে এখানে ছিল তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না।

সুনরাও ময়লা কাপড়ের উপর একটা নূতন পিরান চড়াইয়া, মাথায় একটা ধোপকরা ফুলদার হাল্‌কা টুপি পরিয়া, রং আবির ও কাদা মাখিয়া, মুখে কালী লেপিয়া, সঙ্গীদের পালাক্রমে গাধায় চড়াইয়া ও বারকতক নিজেও চড়িয়া সমস্ত সকালটা কাটাইল! একটা রসিক ছেলে সুনরা ও লছিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বিচিত্র ছন্দে গান বাঁধিয়া আনিয়াছিল। সুনরা প্রথমটা বেজায় চটিল, দল ছাড়িবে বলিয়া ভয় দেখাইল, তাহার পর সরস গানটার মাদকতা যখন তাহার মনটা ভিজাইয়া দিল, সকলে পরামর্শ করিয়া লছিয়ার নামটা বাদ দিয়া ঘণ্টাদু'এক ছয় পংক্তির গানটা লইয়া গলার শিরা ফুলাইয়া সহরময় খুব একচোট চীৎকার করিয়া ফিরিল।

আন্দাজ ১টার সময় তাহারা বাড়ী ফিরিল।

এক-আনা দামের ছোট, গোল আর্‌সিটা ঝুড়ির 'পেটারা' হইতে বাহির করিয়া নিজের মুখটা দেখিতেই সুনরা হাসিয়া ফেলিল এবং তাহাতে দাঁতন-দিয়া মাজা শাদা দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়ায় আরও যে একটা নূতনতর রূপ খুলিল তাহাতে তাহার হাসির মাত্রাটা আরও বাড়িয়া গেল। মাথা দুলাইয়া-দুলাইয়া নিজের প্রতিচ্ছায়াটাকে বলিল, "লছিয়া দেখ্‌লে আজ আর তোমায় আস্ত রাখবে না।"

তাহার পর জামা-টুপি খুলিয়া বগলদাবা করিল এবং একহাতে কল্‌সীটা ঝুলাইয়া কলের দিকে চলিল।

দূর হইতে দেখিতে পাইল রং-কাদা-মাখা গোটা-চার পাঁচ ছোট চ্যাংড়া ছেলের সহিত লছিয়া তুমুল বিবাদ জুড়িয়া দিয়াছে। তাহারাও গা না ধুইয়া ছাড়িবে না, লছিয়ারও জিদ্—কোন মতেই তাহাদের কলতলা নোংরা করিতে দিবে না। পাটের কোম্পানী যখন এইসব 'নিশাবাজ' গুণ্ডাদের পুষিতেছে তখন তাহারা কলের ভিতরকার ভালো পুকুরটাতে গিয়া স্নান করুক্ না, কে মানা করে? 'ভলে আদ্‌মির' মেয়ে-ছেলেরা যেখানে খাবার-জল লইতে আসে সেখানে 'হারামজাদগি' করিতে আসার কি অধিকার তাদের?

সুনরা পা চালাইয়া আসিয়া পহুঁছিল; আওয়াজ ভারী করিয়া প্রশ্ন করিল, "কা ভইল রে?"

ছেলে-গুলা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌না সুন্দর ভইয়া, বাতাহিয়ার বদ্‌মাইসি—"

"বাতাহিয়ার বদ্‌মাসি, আর তোরা সব যত ভালোমানুষ না? কলতলাটা সব উচ্ছন্ন দিতে এসেছিস; পালা, না হ'লে বসালুম কিল" বলিয়া সুনরা কৃত্রিম রোষ দেখাইয়া দুই-একটা ছেলেকে ধরিতে গেল; দল ভাঙিয়া ছেলেগুলা দিগ্বিদিকে ছুট দিল। একটা ছেলে নিরাপদ্ ব্যবধানে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর তুমি গা ধুলে বুঝি দোষ নেই? নিজের চেহারার দিকে একবার দেখ দেখি—"

"আরে, আবার তর্ক করে" বলিয়া সুনরা আর-একটা তাড়া দিল। আর কেহ দাঁড়াইতে সাহস করিল না, অনেক দূরে গিয়া হাততালি দিয়া ছন্দোবন্ধে গাহিতে লাগিল—"বাতহাইয়াকে পিছে সুন্দর বাতাহা ভেলন্ বা।"

হাঙ্গামাটা থামিয়া গেলে কৃতজ্ঞতার বদলে লছিয়া সুনরার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "অনুমন্ বন্দরকে মাফিক দেখাবতাড়", অর্থাৎ ঠিক বাঁদরের মত মানিয়েছে।

সুনরা বিকট হাসি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ্ লছিয়া, আজ আমার মনটা অন্য-ধরণের, বেশি ঘাঁটাস্-নি। হোলির দিন, তোর গা'লগুলাও এত মিষ্টি লাগ্‌ছে যে না জানি কি হ'তে কি হয়ে যায়—"

লছিয়ার মেজাজ সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরিয়া গেল। চোখ

পাকাইয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "খবরদার, কার সঙ্গে কথা কইছিস্ মনে থাকে যেন। তোদের সব কাণ্ড-কারখানা দেখে আর ছেলেগুলোর ব্যবহারে আমার নিজের মনেরই ঠিক নেই, এর ওপর যদি মাত-লামি করিস্ আমার সামনে—"

স্নরা দুষ্টমির হাসি হাসিয়া বলিল, "মাত্লামি? শিউলি যদি তালের রস খাইয়ে বলে মাত্লামি করিস-নে, তবেই ত গেছি। আজ সকাল থেকে আমি তোর নেশায় ভরপুর হ'য়ে আছি লছিয়া—ধর্ম্ম জানেন, আর কোন নেশা করিনি—তোর ভাবনার রস খেয়েছি, তোর গানের রস খেয়েছি, তাই বল্‌ছি তোর কথার রস খাইয়ে আমায় আর বেসামাল করিসনে—"

লছিয়া রাগে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, "যদি এখনও মুখ না সামলাস্ ত তোর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াবো, আমি এক্ষুনি লোক জড় করে' তোর যে-দশা আজ পর্য্যন্ত হয়নি তাই করাবো—"

স্নরা শান্তভাবে বলিল, "দেখ্ লছিয়া, আমাদের দু-জনের মধ্যে যে ঝগড়া, তা'তে কি লোক ডাকা উচিত? আপোষ করে' নেওয়াই—" লছিয়া রাগে অন্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; কিছু না পাইয়া উন্মাদের মত গালাগালি করিতে-করিতে কলের মাথার উপর হইতে স্নরার পিরানটা টানিয়া ফাঁৎ ফাঁৎ করিয়া ছিঁড়িয়া দিল এবং তাহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় নিজের কলসীটা কলের শানের উপর আছাড় দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীমুখো হইল।

স্নরা ছেলেটাকে আজ ভূতে পাইয়াছিল।—নিজের ছেঁড়া জামাটা একবার চোখের সাম্‌নে মেলিয়া দেখিল, ভাঙা কলসীটার দিকে চাহিল, তাহার পর ছুটিয়া গিয়া রোরুদ্যমানা লছিয়ার হাতটা ধরিয়া নিতান্ত বেদন-মিনতির স্বরে বলিল. "লছিয়া, ঢের ত হয়েছে, মাফ্ কর্; ফিরে' চল্, তোর কলসীটা কিনে' দিই—"

কথাটা অবশ্য সমস্ত শোনানো গেল না, কারণ হাত ধরিতেই লছিয়া গলা চিরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ঝাঁকি দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া সজোরে স্নরার গালে বিরাশি-শিক্কার একটা চড় বসাইয়া দিল, লাথি ছুঁড়িল এবং রাগের আধিক্যে আর 'পাদমপি' চলিবার সামর্থ না থাকায়, রাস্তার মাঝে বসিয়া চুল ছিঁড়িয়া জা[illegible] কাড়িয়া এক কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড বাধাইয়া দিল।

স্নরা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় কানে কাছে গুরুগম্ভীর আওয়াজ হইল, "ইসব কৌ—ন বাত বা?" এবং স্নরা নিজে ফিরিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই বজ্র দৃঢ়মুষ্টিতে তাহাকে ফিরাইয়া পুনরপি প্রশ্ন করিল, "স্নন্দ[illegible] ইসব কৌন বাত বা? ভালা আদমি কহলাবতাড় না? অর্থাৎ ভদ্দর লোক বলে' তোমাকে সবাই জানে ত —তবে কি এ কাণ্ড-কারখানা?

স্নরা দেখিল, কলতলায় খানিকটা ভিড় জমি[illegible] উঠিয়াছে এবং সেটা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসি তেছে; তাহার প্রশ্নকারী স্বয়ং হলুমান মাহতো—তাহাদে 'মানজন' অর্থাৎ মোড়ল।

লছিয়া তেম্‌নি জোর গলায় চীৎকার করিতেছি[illegible] "সাজা দাও ওকে, ও ভদ্দর-লোকের মেয়ের গায়ে হা[illegible] দিয়েছে, কলসী ভেঙে দিয়েছে; ওকে দেশ থেকে তাড়া[illegible] হারামজাদাকে। আমি আর এদেশে থাকতে চাইনে এখানকার 'মানজনে'র মুখে ছাই দিয়ে, সমাজের মু[illegible] ছাই দিয়ে, আর ও-হারামজাদার মুখে নুড়ো জেলে আজই এদেশে ঝাড়ু মেরে চলে' যাবো আমি আর সেই হতভাগা বুড়ো মড়াটারও একটা ব্যবস্থা কর্[illegible] যে নিজের নাত্নীর ইজ্জৎ রাখ্‌তে পারে না—।"

কথাগুলোয় বৃদ্ধ হলুমান মাহতো স্থির গাম্ভীর্য্য হইতে হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া উঠিল; স্নরাকে একটা জবরদ[illegible] ঝাকানি দিয়া বলিল, "ঠিক কথাই ত; দাঁড়া এখানে তুই, উপযুক্ত সাজা তোকে দেওয়া হবে।" ছেলেমেয়ে গুলো বেজায় ঠাট্টা-গালাগালি লাগাইয়া দিয়াছি[illegible] তাহাদের বলিল, "এ'কে ঘিরে' দাঁড়া, যেন পালায় না।"

স্নরা পালাইবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হলুমান রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে যাইয়া লছিয়াকে লইয়া স্নেহভরে তাহাকে একবার বুকে চাপিল, তাহার ধুলা ঝাড়িয়া দিল এবং তাহার কাপড় জামাগুলা গুছাইয়া দিয়া মুন্নার বাসার দিকে চলিল পিছন ফিরিয়া স্নরাকে বলিল, "চল্, এগো, আ[illegible]

জাহাঙ্গীরের রাজসভায় পারস্যের রাজদূত

একটা হেস্ত-নেস্ত কর্‌তেই হবে, আর অসহ্য হ'য়ে পড়েছে।"

(৩)

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি।

মানজন হলুমান মাহতোর বাসার সাম্‌নে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-গাছটার তলায় পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে। মাঝখানে একটা তাড়ির কলসী, গোটাকতক কাঁচের গেলাস; চারিদিকে সমাজের বিজ্ঞেরা বসিয়া। স্থনরার বিচার হইবে সে বিধিমত একপাশে করজোড়ে দাঁড়াইয়া।

বেজায় গোলমাল হইতেছিল। নেশা চড়াইয়া হাতত্‌'টা তুলিয়া হলুমান মাহতো সকলকে চুপ করাইল, তাহার পর একটু-একটু জড়িতকণ্ঠে বলিল, "স্থন্দর, অব ভাই সব্‌কে সাম্‌নে বোল কাহে তু লচ্ছি-মাইকে লহমে হাত চড় হয়লে রহ।"

স্থনরা তেম্‌নিভাবে চুপ করিয়া রহিল, না রাম না গঙ্গা—কিছুই বলিল না।

হলুমান তাগাদা দিল, "কহ, কহ, হোঅ।"

তখন স্থির পরিষ্কার-কণ্ঠে স্থনরা বলিল, "উ হমনিকে মেহরারু বা", অর্থাৎ আমার স্ত্রী ও।

কথাটাতে সভাতে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল এবং "মারো হারামজাদাকো," "পিটো বদমাইস্‌কো" গোছের কয়েকটা অশুভসূচক ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা বেশী-বেশী শোনা যাইতে লাগিল। কয়েকটা ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া শক্ত জমিটার উপর নিজের-নিজের লাঠি ঠুকিয়া তাহাদের উৎকট অভিমত জ্ঞাপন করিল। বিজ্ঞেরা বোধ হয় কথাটা তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, তাই এক-এক চুমুকে বুদ্ধিটা একটু চাঙ্গা করিয়া লইল। মুন্নার নেশাটা একটু বেতরহ হইয়া পড়িয়াছিল। টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া বলিল, "হারামজাদা, তোর জিভ্‌টা উপ্‌ড়ে নেবো এখনি—"

একজন তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া দিল। হলুমান স্থনরাকে বলিল, "নেশা করে' তোর আজ মতিগতি ঠিক্‌ নেই, আমি টের পাচ্ছি। বুঝে-স্থঝে' কথা বল্‌বার চেষ্টা করিস্‌ ভাইদের সাম্‌নে—"

স্থনরা মাথাটা সিধা করিয়া বলিল, "স্থনরা তাড়ি খেয়েছে একথা কেউ বল্‌তে পারে না। গলায় আমার বৈষ্ণবের কণ্ঠী—সেটা দেখে'ও এ-কথাটা বলা ধর্ম্মকে গাল দেওয়া হয়েছে। আমি ঠিকই আছি, আর লছিয়া যে আমার স্ত্রী একথাও খাঁটি—"

মুন্না আবার ঠেলিয়া উঠিতেছিল. পাশের একজন লোক হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বসাইয়া দিল এবং এক গেলাস ভর্ত্তি করিয়া বলিল, "ধর, মাথা একটু ঠাণ্ডা কর, এটা ঘাব্‌ড়াবার সময় নয়।"

স্থনরা বলিল, "আমি সমস্ত কথা বলে' যাচ্ছি, মুন্না-কাকা মিলিয়ে দেখুন ঠিক্‌ কি না, আর লছিয়াও ত সাম্‌নে আছে, কিছু-কিছু তারও মনে থাক্‌তে পারে।"

লছিয়ার নামে মুন্নার সিক্ত মনে স্নেহটা বোধ করি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "লচ্ছি, আমার কাছে এসে বোস্‌ তুই, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যে ননীর পা-দু'টো তোর ভেঙে যাচ্ছে, সে আর আমি প্রাণ ধরে' দেখ্‌তে পাচ্ছি না—"

নাক সিঁট্‌কাইয়া লছিয়া বলিল, "বেশ আছি আমি, আর আদর দেখাতে হবে না; তাড়ির গন্ধের মধ্যে গিয়ে বস্‌তে পারিনে। যত সব মাতাল বসেছে, বিচার হচ্ছে উনুনের পাশ।"

মুন্না প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং অন্য মাতব্বরেরা যোগ দিল। একজন হাসির মধ্যে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "লচ্ছি-মাই আজ বড় চটে' আছে, ছেলেটাকে জবরদস্ত সাজা দিতে হবে।"

স্থনরার প্রতি হুকুম হইল, "বল্‌ তোর কি বল্‌বার আছে?"

স্থনরা বলিতে লাগিল, "আমার প্রকৃত নাম মোতীলাল, স্থন্দর নয়; বাড়ী আমার বালিয়া জেলায় গজরাজপুর গ্রামে। বাপের নাম ছিল সন্তোষী—"

মুহূর্ত্তের মধ্যে মুন্নার ভাবটা বদ্‌লাইয়া গেল, নামটা শুনিয়াই সে উঠিয়াছিল, আস্তে-আস্তে স্থনরার সাম্‌নে গিয়া একেবারে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দুই মিনিট ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "লচ্ছি, আয় দেখি, দেখ্‌ দেখি; তুই কি কিছু চিন্‌তে পারিস্‌? আমার যেন মনে হচ্ছে—"

লছিয়াও মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়াছিল, গালের

উপর ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া মাথাটা পিছনে ঘুরাইয়া, গলাটা নামাইয়া বলিল, "হাম কি জানি।"

মুন্না ফিরিয়া আসিয়া আর আধ গেলাস শেষ করিল, তাহার পর সুনরাকে বলিল, "আচ্ছা বলে' যা, দেখি আর সব মেলে কি না।"

সুনরা কৌতূহলস্তব্ধ সভার ঔৎসুক্য বাড়াইয়া বলিতে লাগিল—"আমাদের গ্রাম থেকে ১০ক্রোশ দূরে মঝৌলিতে আমার বিবাহ হয়। সে প্রায় ১০ বৎসরের কথা। নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলাম বলে' সব কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু শ্বশুরবাড়ীর সাম্‌নে প্রকাণ্ড বটতলাটার নীচে আমার পাল্কীটা নেমেছিল। রাস্তায় ভয়ানক বৃষ্টি হয়েছিল বলে' কি-একটা ছুতো করে' বাবা শ্বশুরের সঙ্গে খুব এক-চোট ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিলেন এবং শ্বশুরের পক্ষ থেকে মারামারির ভয় দেখিয়ে আমার জবরদস্তি বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। সেই তুমুল বর্ষা আর ভীষণ ঝগড়া ও গোলমালের রাতের সব কথা মনে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু মুন্না-কাক্কা বোধ হয় এইসব পরিচয় থেকেই টের পাবেন যে, আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছিনে। সে-সময়ের মুন্না-কাক্কার চেহারাটা বেশ মনে পড়ে—কেননা উনিই আমায় পাল্কী থেকে চ্যাংদোলা করে' গাজুরি-বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন,—ওঁর চেহারা তখন ছিল পালোয়ানের মত—গালে গালপাট্টা দাড়ী ছিল, হাতে লোহার একটা বালা ছিল; আমার বেশ মনে পড়ে, প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ওঁরই বুকে মুখ গুঁজে' ছিলাম। আজ আমায় ভগবান্ ভুলেছেন, সুতরাং সবাই ভুল্‌বে; তবে আমি যে-বুকে একদিন আশ্রয় পেয়েছিলাম, তার আশা কখন ছাড়্‌ব না।" বুড়া মুন্না আর থাকিতে পারিল না; হাত-দু'টা বাড়াইয়া সুনরার পানে ছুটিল, বলিল, "আবার তোকে বুকে নিই আয় মতিয়া, আর সে-সব পুরোনো কথা তুলে' আমায় পাগল করিস্‌নে—"

হনুমান মাহতো তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল, "মাথা ঠাণ্ডা কর্ দোস্ত্, আরে কে ও তা কে জানে? সে-সব কথা অন্য লোকে জেনে নিতে পারে না?" সভার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হো ভাই সব, ঠিক বোলতানি কি না?" সকলেই সমস্বরে বলিল, "ঠিক বাৎ, বহুত ঠিক, বহুত ঠিক"; একজন প্রাচীন এপর্য্যন্ত রায় দিল "আজ-কালকার জমানা, কত লোক কত মতলবে ঘুর্‌ছে কে জানে? লচ্ছি মাইয়ের লছমীর মত চেহারা দেখ্‌তে অনেক ছেলেই এ-সব কথা প্রাণ দিয়ে খুঁজে' বার কর্‌তে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি বেই করেছিলি ত এতদিন কোন্ জাহান্নমে, নিজের সমর্থ পরিবার ছেড়ে, ছিলি রে হতভাগা?"

সুনরা বলিল, "সে কথাও বল্‌ছি।—বিয়ের প্রায় ৪ বৎসর পরে—আমার বয়স তখন ১৩ কি ১৪ হবে—চা-বাগানের এক সেপাই আমাদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। এসে গ্রামের যে জোয়ান-জোয়ান ছেলেগুলো ছিল, সেগুলোকে খুব ভজাতে আরম্ভ কর্‌লে। গ্রামের এক-প্রান্তে সে বাসা নিয়েছিল। দলে-দলে আমরা সেখানে জুট্‌তুম, তার পয়সায় খাওয়া-দাওয়া, নেশা-ভাঙ্ কর্‌তুম, আর চা-বাগের গল্প শুন্‌তুম। শিকারের দল যখন বেশ জমে' এসেছে, সেপাইটা একদিন সকলের সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড খাতা খুলে' ধর্‌লে আর বল্‌লে, 'নাও, একে-একে সই কর; দু-বছরের সর্ত্ত, তবে আমি যখন মাঝখানে আছি, যার যখন খুসী ছেড়ে চলে' আস্‌তে পারো, সাহেবকে আমি মুঠোর মধ্যে রেখেছি—উঠ্‌তে বল্‌লে ওঠে, বস্‌তে বল্‌লে বসে। আর বেশি দেরী করা চলে না, কাল ভোরের গাড়ীতেই রওনা হ'তে হবে। কাল সাহেবের তার এসেছে—আমার জন্যে কাজকর্ম্ম সব বন্ধ।' আরও অনেক কথাই বল্‌লে, অনেক লোভই দেখালে, সব এখন মনে পড়ে না। সেদিন আমাদের নেশার মাত্রাটা বেশী হয়েছিল, প্রায় সবাই সই কর্‌লে; যারা কর্‌লে না, তারা যাতে গ্রামটাকে সতর্ক করে' না দিতে পারে সেজন্যে বেশী আগ্রহ করে' তাদের নেশাটা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। সকালের গাড়ীতে আমরা ক'জন রওনা হ'লাম।

"চা-বাগানে এসে দেখ্‌লাম ৬ বৎসরের জন্যে সকলের পায়ে শিকল আঁটা!

আমি খালি সাবুত দিতে বসেছি; সেখানে ৬টা বৎসর কি দুঃখে কি যন্ত্রণায় কেটেছিল তা আর বলে' কি হবে? মোট কথা, মহাবীরজীর কৃপায় ৬টা বৎসর জেল-খাটার মত কাটিয়ে দিলাম। অনেক ফন্দি করে' আবার

সর্ত্ত লেখা থেকে বাঁচ্‌লুম এবং ভাঙা শরীর, ভাঙা মন নিয়ে গ্রামে ফিরে এলুম।

খবর নিলুম—বাবা মারা গিয়েছে, মা মারা গিয়েছে, ভাই সংসার চালাচ্ছে। ঘরে যেতে আর মন সর্‌ল না। সন্ধ্যার সময় বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে শ্বশুর-বাড়ীর রাস্তা ধর্‌লুম; কেউ চিন্‌তে পার্‌লে না। 'পিপর'-তলায় 'বঢ়মঠাকুরকে' প্রণাম করে' বল্‌লুম, "যতদিন না রোজ্‌গার করে' ফিরে' আস্‌ছি, অভাগা সংসারটাকে তুমিই দেখো ঠাকুর।"

সুনরার গলা ধরিয়া আসিয়াছিল, একটু থামিল। মুন্না ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতেছিল, ভাঙা গলায় বলিল, "মোতি, আউর সাবুত দেবেকে না পড়ি বে, আ তু হামরা ছাতিমে। লছ্‌ছি—"

লছিয়া অশ্বত্থ-গাছের আড়ালে কখন আশ্রয় লইয়াছে, কোন উত্তর দিল না। সুনরা বলিতে লাগিল—

"শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লুম—সেখানেও সব ওলটপালট হ'য়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজ করে' পাওয়া গেল, লছিয়াকে নিয়ে মুন্না-কাকা বাঙ্গালা মুল্লুকে এসেছে, কোন কলে কাজ করে। বাড়ীতে আর টান নেই, আসে না কখন!

"তার পর এই দু' বছর কত কলে ঘুরেছি, কত সন্ধান করেছি কা'কে বলি? শেষকালে, আজ বছর-খানেকের বেশী হ'তে চল্‌ল, এখানে এসেছি। খোঁজ করি, কোন ফলই হয় না। শেষে একদিন কলতলায় লছিয়াকে দেখ্‌লুম। কোন্ সেই ছেলেবেলায় একবার দেখেছি, ঠিক যে চিন্‌তে পার্‌লুম তা বল্‌তে পারিনে, তবে মনে একটা খট্‌কা লেগে রইল। সন্ধান লাগাতে থাক্‌লুম। অনেক খবর ইয়ার-দোস্তদের কাছে পাওয়া গেল; অনেক খবর জল নিতে গিয়ে কলতলায় লছিয়ার কাছেই পাওয়া গেল; ওটা ভারি বেহায়া হ'য়ে পড়েছে, হাউ-হাউ করে' সব কথাই বল্‌ত। মোটের ওপর আমার আর কোন সন্দেহ রইল না যে মহাবীরজি মুখ তুলে' চেয়েছেন—"

হনুমান মাহতো বলিল, "সে-সব নয় মান্‌লুম; কিন্তু এতদিন জেনেশুনেও তোর জরুকে নিস্‌নি কেন? সে-জন্য তোর পঞ্চভাইয়েরা ত কোনমতেই মাফ্ কর্‌তে পারে না?"

সুনরা বলিল, "সে পঞ্চভাইদের 'মর্জ্জি'; তবে তারও যে একটা কারণ না আছে এমন নয়। দেখ্‌লুম আমি ত একেবারে 'বিলল্লা', ঘর-বাড়ী নেই, হাতে একটা কানা কড়ি নেই, সবদিন বোধ হয় ঠিক ভাতও জোটে না,—এর মধ্যে ও বেচারীকে এনে আর কষ্ট দিই কেন? রোজ দেখাশোনা ত হচ্ছেই, খবর ত পাচ্ছিই। ও দাদার কাছে সুখে আছে থাক্; বরং ওর প্রতি যে খরচটা হ'ত সেটা জমিয়ে-জমিয়ে একটা-কিছু ব্যবস্থা করা যাক্। এক-একদিন অবশ্য মনে হ'ত সব কথা খুলে বলি, কিন্তু ভয় হ'ত যদি কেউ বিশ্বাস না করে। তা হ'লে যেটুকু আশা মনের মধ্যে আছে তাও ভেঙে যাবে; নিজের 'মেহরারুকে' বোধ হয় জন্মের মত হারাতে হবে। আর-একটা কথা যে মনে হ'ত তা পঞ্চভাই-দের সাম্‌নে না বল্‌লে মনে পাপ থেকে যাবে, সেটা এই—ভাব্‌তুম লছিয়াকে সরিয়ে নিলে মুন্না-কাকা অন্য কোন আত্মীয়কে জোটাবে, কি 'পোষপুত' নেবে। তা হ'লে—তা হ'লে—মুন্না-কাকার সমস্ত টাকা—যার ওপর লছিয়ার সুখ এতটা নির্ভর কর্‌ছে—"

মুন্না আর কথাটা শেষ করিতে দিল না। তাড়াতাড়ি টলিতে-টলিতে সুনরার হাতটা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিজের কাছে বসাইল, হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আরে তুই চিরকেলে দুষ্টু, আমি খুব জানি।" তাহার পর হনুমানকে বলিল, "দোস্ত্, খানিকটা সিঁদুর আন্‌তে বল, মোতীয়া নূতন করে' লছিয়ার কপালে লাগিয়ে দিক্। ছেলেটা সব কথাই বলেছে ঠিক; আর মিছে বল্‌লেও আমার লছ্‌ছির একটা বিলি কর্‌তে হবে ত? আমি আর ক'দিন? কি হো ভাই সব?"

সকলে বলিল "হুঁ, হুঁ, ঠিক্ বাত, ঠিক্ বাত।"

হনুমান মাহতো কিন্তু একটু বেঁকিয়া দাঁড়াইল, কহিল

'কিন্তু তা হ'লেও ও যে নিজের স্ত্রীকে জেনেশুনেও এতদিন নেয়নি, আর দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী হ'লেও রাস্তায় যে তার গায়ে হাত দিয়েছে তার জন্যে 'ভাইয়েরা' ওকে ক্ষমা কর্‌তে পারে না। ওর সাজা—ওকে একদিন সহরের 'ভাইয়েদের' ভাত-তাড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।"

চিরন্তনী

শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী

ওগো আমার বহুদিনের মানসহারিণী !
চিরকালের নবীন সাথী গোপনচারিণী !
কবে সে কোন্ একলা খনে
হঠাৎ এলে আমার মনে,
দিলে কখন মায়াকাঠির পরশ, জানিনি ;
চিরদিনের আপন তুমি মানস-চারিণী।

ছেলেবেলায় অবুঝ সুখে হিয়ার নিজনে,
চিনেছিলাম তোমায় বুঝি নূপুর-শিঞ্জনে
ভোম্‌রা-কালো কোঁক্‌ড়া চুলে
দাঁড়িয়েছিলে কখন্ ভুলে',
কাজল চোখে সরল হাসি, চাইলে কি মনে !
দেখেছিলেম ছেলেবেলায় মনের বিজনে।

ছুটির দিনে ছাতের কোণে আস্‌তে একেলা,
আস্‌তে তুমি বিনা সাথীর খেলায় হু'বেলা।
ঝম্‌ঝমানি বাদল-রাতে
নাম্‌তে ধীরে আঁখির পাতে,
আন্‌তে ব'য়ে পরীদেশের স্বপন সোনেলা ;
পারুল-কলি, দোসর তুমি আস্‌তে ছ'বেলা।

কিশোর মনে দেখেছিলেম তরুণ-বয়সী,
আধ-চপল আধ-লাজুক ভোরের অতসী !
তনু দেহের সুষমা ছায়া
গড়্‌ত নিতি আঁখির মায়া,
দোদুল বেণী দুলিয়ে যেতে চটুল বিহসি' ;
দেখেছিলেম মনের বনে তরুণ অতসী।

নূতন বেশে এসেছিলে অরুণ-বরণা,
প্রথম ভালোবাসার সুখে আকুল-চরণা।
সকল খেলা সকল কাজে
আস্‌তে নেমে চমক্‌-মাঝে,
অন্যমনার মরমতলে কনক-ঝরণা ;
দেখেছিলেম সুনীল-সাটী চপল-নয়না।

আজকে আঁখি যায় না হেনে চকিত চাহনি
হিয়ার তটে উপ্‌ছে পড়ে উতল লাবণি।
গোলাপ-ঝরা কপোল ছুয়ে
চোখের পাতা পড়্‌ছে নুয়ে,
অলকরাশি মদির আজি বিলোল-বাঁধনি ;
নয়ন-কোণে হারিয়ে গেছে চপল চাহ'ন।

যৌবনে আজ ব্যাকুলকরা নিশাস সুরভি,
মুকুলভরা এখন তুমি সলাজ মাধবী।
মৃদুহাসির যুগল কোটে.
আজকে মৃদু সরম ফোটে,
চলার পথে রোল তোলে না নূপুর গরবী,
আজকে তুমি মুকুলধরা সলাজ মাধবী।

সুধা

কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-বছর বড়দিনের ছুটিতে কল্‌কাতায় খুব ধুমধাম। এক্‌জিবিশনের দরুন্‌ বাইরে থেকে এখানে লোক আস্‌ছেনও খুব। আমার মামা রাঁচীতে ওকালতি করেন, তাঁর কাছ থেকে হঠাৎ এক চিঠি পেলাম, তিনি সপরিবারে এই ছুটিতে কল্‌কাতায় আস্‌ছেন ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই, মাস দুই থাক্‌বেন, একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে' রাখ্‌বার জন্য আমায় লিখেছেন। একে কল্‌কাতার বাড়ী ভাড়া পাওয়া দায়, তার উপর এসময়ে, আমি তো মুস্কিলেই পড়ে' গেলাম। আমার মামার পরিবারটি খুবই ছোট অর্থাৎ মামা, মামীমা ও তাঁদের মেয়ে বিভা, কাজেই ভরসা রইল—খুব ছোট বাড়ী পেলেও চল্‌বে। বিভা আমার সমবয়সী, সে আস্‌ছে জেনে বেশ খুসী হ'য়ে উঠ্‌লাম, আর তখনি বাড়ী খুঁজ্‌তে বেরিয়ে পড়লাম। কয়দিন ঘুরে কোন বাড়ীর সন্ধান পেলাম না, আজ ২৯শে নভেম্বর, মাত্র আর একদিন বাকী ডিসেম্বর মাস পড়্‌তে, সকালে বসে' ভাব্‌ছি—কি করব, এমন সময় দেখ্‌লাম আমাদের পাশের বাড়ীর সাম্‌নে একখানা গরুর গাড়ী-বোঝাই জিনিষ। বাক্স, আল্‌মারী, বিছানা, বাল্‌তী, আল্‌মারী, আল্‌না, চেয়ার, যতদূর সম্ভব বোঝাই করা হয়েছে। গাড়ীটা রওনা হ'য়ে গেলে পর একখানা ভাড়া-গাড়ী এসে দাঁড়াল; তার ছাতেও কিছু জিনিষ চড়ল, একটা ছোট বইএর আল্‌মারী, সেলাইএর কল ইত্যাদি বোঝাই হ'লে পর, এতে আমাদের প্রতিবেশী অতুল-বাবু সপরিবারে অর্থাৎ তাঁর মেয়ে ও ছোট ছেলেটি চড়ে' রওনা হ'লেন। বুঝ্‌লাম তাঁরা এ-বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে অথবা বিদেশে চলে' গেলেন। ওঁরা চলে যাওয়ার অল্প পরেই বাড়ীওয়ালার লোক যখন বাড়ী বন্ধ কর্‌ছে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করে' জান্‌লাম, ইচ্ছা কর্‌লে বাড়ীটা ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। আমি ত বেঁচে গেলাম, বাড়ীটা ছোট হ'লেও ঠিক আমাদের পাশেই, আর বেশ নতুন। তখনি সেটা দেখ্‌তে গেলাম। বাড়ী বেশ পরিষ্কার রয়েছে, দেখ্‌লে একটুও মনে হয় না যে ভাড়াটে বাড়ী। উপরে ২ খানা ঘর—ছোট ঘরখানিতে দেখ্‌লাম খানকয়েক ছেঁড়া চিঠি, কয়েকখানা পুরানো খবরের কাগজ, কয়েকটা মাথার কাঁটা ও সেফ্‌টিপিন ছড়িয়ে পড়ে' আছে শেল্‌ফে। বুঝ্‌তে পার্‌লাম মেয়েটি এই ঘরেই থাক্‌তেন। বাড়ী নেওয়া স্থির করে' তখনি চাকর ডেকে পরিষ্কার কর্‌তে বলে' দিলাম, অবিশ্যি ভাড়া একটু বেশীই লাগ্‌ল।

আজ ৪ঠা ডিসেম্বর, মামারা এসেছেন আজ সকালে। বিকালে আমি কলেজ থেকে ফিরে' ওবাড়ীতেই চা খেতে গেলাম। বিভা চা করে' সকলকে খাইয়ে আমায় উপরে তার ঘরে নিয়ে গেল গল্প কর্‌তে। বিভাও সেই ছোট ঘরখানা নিয়েছে দেখ্‌লাম। বাবা, মা আর মামারা নীচে বসে' গল্প সুরু কর্‌লেন। বিভা বল্‌লে, "শচীদা তুমি কি এ-ঘরগুলি সব নিজে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করিয়েছিলে?" আমি বল্লুম, "হ্যাঁ"। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তাঁরা কোথায় গেছেন জানো, যাঁরা এই বাড়ীতে ছিলেন"? আমি বল্‌লাম, "জানিনে ত। তাঁদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ ছিল না।"

বিভা বল্‌লে, "আজ আমি আমার ঘর-গুছোবার সময় শেল্‌ফ পরিষ্কার কর্‌তে গিয়ে সব-উপরের তাকে হাত দিতেই কয়েকটা শুক্‌নো রজনীগন্ধা ফুল ঠেক্‌ল, আমি ভাব্‌লাম এখানে ফুল এল কোথা থেকে? একটা চেয়ারে চড়ে' দেখ্‌লাম, একখানা খাতা রয়েছে, তার ভিতরেও কয়েকটা শুক্‌নো ফুল রয়েছে। বেশ কাঁচা হাতের লেখায় আধখানি খাতা ভরা, তার পর শেষে কয়েক লাইন পরিষ্কার মেয়েলী হাতের লেখা। এ কোন তরুণ হৃদয়ের করুণ কাহিনী? ছেলেটির সঙ্গে আলাপ কর্‌বার আর সময় নেই, মেয়েটির সঙ্গে বড্ড আলাপ কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে, তাদের ঠিকানা খুঁজে' বা'র করা যায় না কি? এস আগে তোমায় পড়ে' শোনাই।"

"সুধা"

কাকাবাবুর কাছে আমি মানুষ হয়েছি। আমার মা ও বাবা যখন মারা যান, তখন আমি খুব ছোট, তার পর কাকীমার কাছেই আমি মায়ের আদরে বড় হ'য়ে উঠেছি। আমার খুড়তুতো ভাই মণ্টু আমার চেয়ে বছর সাতেকের ছোট। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব।

তখন আমার বয়েস চোদ্দ বছর হবে, থার্ড ক্লাসে পড়ি, আমায় ম্যালেরিয়ায় ধর্‌লে, বেশ কিছু দিন ভুগে' উঠ্‌লাম। স্কুল ছেড়ে দিতে হ'ল, কিছুদিন চুপচাপ বাড়ীতেই বসে' রইলাম। মাস-তিনেক পরে একটু ভাল হ'লে পর গরমের সময় আমারা জাম্‌তাড়া গেলাম চেঞ্জে। বেশ সুন্দর জায়গা জাম্‌তাড়া। আমার শরীর বেশ সেরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মাস দুই পরে আমাদের কল্‌কাতা ফের্‌বার কথা হ'ল, আমি কাকাকে বল্‌লাম, "আমাকে কাকাবাবু এখানের বোর্ডিং-স্কুলে রেখে যাওনা, শরীরও ভাল থাক্‌বে, পড়াও হবে।" আসল কথা আমার ভয় কর্‌ছিল—কল্‌কাতায় ফির্‌লে ফের জ্বরে পড়্‌ব।

দু-তিন দিন কিছুই ঠিক হ'ল না, কাকাবাবু রাজি হলেন কিন্তু কাকীমা কিছুতেই রাজি নন। অনেক বুঝিয়ে তবে তাঁকে রাজি করে' শেষে আমি স্কুলে ভর্ত্তি হ'লাম। আমি বোর্ডিংএ যাবার চার-দিন পরে কাকারা কলকাতা চলে' গেলেন। ষ্টেশন থেকে তাঁদের তুলে' দিয়ে বোর্ডিংএ ফের্‌বার সময় ভারি খারাপ লাগ্‌ছিল। ক'দিন মনটা খারাপ ছিল খুবই। তার পর আস্তে-আস্তে মন বসে' এল।

বেশ সুন্দর জায়গা এই জাম্‌তাড়া! খুব খোলা আর দূরে-দূরে আমাদের বোর্ডিং-এর এক-একটা বাড়ী। দূরে সব পাহাড় দেখা যায়, আমার বেশ ভালো লাগ্‌ত। দিনে খুব গরম হ'ত, কিন্তু বিকালটা ভারি চমৎকার লাগ্‌ত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়্‌ল। বর্ষার দিনগুলি আরও ভাল লাগ্‌ত। বিকালে রোজই খেলা হ'ত, সেদিন আমাদের ঘরের ছেলেদের সঙ্গে অন্য-এক ঘরের ছেলেদের ফুটবল-ম্যাচ্ খেলা সবে সুরু হয়েছে, খানিক পরেই ভয়ানক ঝড় আর বৃষ্টি এল। খেলার উৎসাহে বৃষ্টিতে ভিজে'ই খেল্‌লাম। রাত্রে ভয়ানক জ্বর হ'ল। স্কু[ল] বাড়ীর শেষ ঘরখানাতে হেড্‌মাষ্টার মশাই থাক্‌তে[ন] তিনি আমায় তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনদিন প[রে] জ্বর একটু কম্‌ল, কিন্তু আমার দুই হাঁটুর জোর যেন চ[লে] গেল। দিন-সাতেক পরে জ্বর একবারে ছেড়ে গেল, কি[ন্তু] পায়ের জোর আর ফিরে' এল না। আসানসোল থে[কে] বড় ডাক্তার এলেন, বল্‌লেন, বেশ কিছু দিন শুয়ে থাক্‌[তে] হবে। শুয়ে-থাকা ছাড়া এ অসুখের আর অন্য কো[ন] চিকিৎসা নাই। আমার ভারি কান্না পেলে কাকীমা[র] কথা মনে পড়ে', তিনি ত আমায় নিয়ে যে[তে] চেয়েছিলেন, আমিই জোর করে' রইলাম।

আমি যে ঘরে শুয়ে থাক্‌তাম, ঠিক তার পাশে হা[ট] বস্‌ত সপ্তাহে দুদিন, কত লোক আস্‌ত হাটে। ছো[ট] একটি ছেলে আস্‌ত বাঁশী বিক্রি কর্‌তে। সাঁওতালী সু[র] কিছুই বুঝ্‌তাম না, কিন্তু ভারি মিষ্টি লাগ্‌ত। ইচ্ছে কর্‌ত বাঁশী বাজাতে শিখি। যতক্ষণ সে বাঁশী বাজাতে কত কথাই মনে পড়্‌ত। সব চেয়ে মণ্টু আর কাকীমা[র] কথা মনে পড়ে'ই খারাপ লাগ্‌ত। আমার ঘরের সাম্‌[নে] দিয়ে রাস্তাটা পশ্চিমে চলে' গেছে কতদূরে সেই বদ্দিনাথ পর্য্যন্ত। আমার মনে হ'ত যদি আমার অসু[খ] না হ'ত, তা হ'লে বড় হ'লে এই রাস্তা দিয়ে সেই আগেকার কালের মত হেঁটেই বদ্দিনাথ বেড়াতে যেতাম। সারা দিনই শুয়ে থাক্‌তাম। এইরকম করে' পনের দিন কেটে গেল। তার পর হেড্‌মাষ্টার মশাই কাকাবাবুকে চিঠি লিখ্‌লেন, আমাকে কল্‌কাতায় নিয়ে যেতে চিকিৎসার জন্য।

কাকাবাবু এলেন আমায় নিয়ে যেতে, সে দিনও হাট-বার; সেই ছেলেটি বাঁশী বাজাচ্ছিল, আমাকে ঠিক তার দোকানের পাশ দিয়ে পাল্কী করে' ষ্টেশনে নিয়ে চল্‌ল। সে ভারি করুণ সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। মন বড় খারাপ হ'য়ে গেল, মনে হ'ল একেবারেই বিদায় নিয়ে যাচ্ছি, আর বোধ হয় আসা হবে না এখানে।

ষ্টেশনে আমায় তুলে' দিতে এসেছিলেন হেড্‌মাষ্টার মশাই আর আমার ঘরের ছেলেরা। মাত্র মাস তিনেক ছিলাম এখানে তবু ছেড়ে যেতে ভারি কষ্ট হচ্ছিল।

বাড়ী এসে ঠিক রাস্তার ধারের ঘর খানাতে আমার

শোবার বন্দবস্ত হ'ল। ঘরখানার পূব ও দক্ষিণদিক্ খোলা, ছুদিকেই ছুটি বড় জানালা আর সেই ছুই জানালা জুড়ে' আমার মস্ত খাট। আমি শুয়ে শুয়ে সারাদিন রাস্তা দেখ্তাম। কতরকম লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে, কতরকম গাড়ী-ঘোড়া। মণ্টু সারা দিনই প্রায় আমার কাছেই থাক্ত, তাকে গল্প বল্তাম তৈরী করে' করে'। চুপ করে' শুয়ে থেকে থেকে বোধ হয় আমার ভাব্বার আর তৈরী কর্বার শক্তিটা বেড়ে গিয়েছিল।

আমাকে দেখ্তে আস্তেন কাকীমার ভাই যতীন-মামা। তিনি বেশ বড় ডাক্তার। রোজই সন্ধ্যাবেলা খুব জ্বর আস্ত। মণ্টু আমার সব কাজই করে' রাখ্ত,—যখন যা চাই, ও যেন বল্বার আগেই বুঝ্তে পার্ত। মাত্র সাত বছর বয়স ওর কিন্তু আমার সেবা কর্ত ঠিক একজন বড় নার্স্-এর মতন। যদি কোন দিন ওকে না বলে' কাকীমাকে কিছু কর্তে বল্তাম ওবেচারা অভিমান করে' সে বেলাই আর আস্ত না আমার ঘরে।

আমাদের দুভাইএর বসে' বসে' কত কথাই হ'ত। বড় হ'য়ে আমরা কি হ'ব তাই। আমরা ঠিক করেছি আমরা ইঞ্জিনীয়ার হ'ব। মণ্টু কোথা থেকে একখানা ভাঙা কাঁচি, কতকটা সুতা, খানিকটা গামছা, একটু মোমবাতির টুক্রা, কতকগুলি ভাঙা সাবানের বাক্স নিয়ে এসেছে, আমি শুয়ে-শুয়ে তাই দিয়ে ছোট-ছোট বাড়ী, নৌকা, গাড়ী তৈরী কর্তাম আর মণ্টু আল্মারীতে সাজিয়ে রাখ্ত।

এইরকম করে' প্রায় মাস খানেক কাটল। যতীন-মামাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম আর কতদিন শুয়ে থাক্তে হবে, তিনি বল্লেন আর বেশী দিন নয়।

তখন পূজার ছুটি, রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ভিড়, লোক চলাচল সবই একটু কম। এই সময়ে আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের গলির শেষ বাড়ীতে কা'রা নূতন ভাড়াটে এলেন। মণ্টু এসে খবর দিলে, তারা বেহারী।

আস্তে আস্তে পূজার ছুটিও শেষ হ'য়ে গেল। একদিন রাস্তার দিকের জানালার ধারে সরে' বসে' আছি, দেখলাম মেয়েদের স্কুলের গাড়ী এসে দাঁড়াল, আর আমাদের গলির শেষের সেই বেহারীদের একটি ছোট্ট মেয়ে গিয়ে গাড়ীতে চড়্ল। গাড়ী চলে' গেল।

বিকাল বেলা মণ্টু জান্লা দিয়ে চিনেবাদাম কিন্ছে আমিও পাশে বসে' আছি, এমন সময় স্কুলের সেই গাড়ী-খানা এসে দাঁড়াল। দরজার পাশে একটি সুন্দর-দেখ্তে মেয়ে বসে' আছে, খুব ফর্সা রং, কাল চুলগুলি একটি লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, গলায় একটি সোণার হার আর কাণে ছুটি মাক্ড়ি, সে তার হাতের বইএর দিকে কি জানি দেখছিল। চীনে বাদামওয়ালা সবে চলে যাচ্ছে এমন সময় মণ্টু চেঁচিয়ে উঠ্ল "এই! আর-এক পয়সার দাও" বলে'ই সে পয়সা আন্তে দৌড়্ল। মেয়েটি তার চীৎকার শুনে' আমার জানালার দিকে চাইলে। কি চমৎকার চোখ ছুটি তার! আমি তার দিকে চাইলাম, সেও চাইলে আমার দিকে, বেহারী মেয়েটি নেমে এল,. গাড়ীও ছেড়ে দিলে। সে আমার দিকে তাকিয়েই রইল;

মণ্টু এসে চিনেবাদাম কিন্লে, কিন্তু আমার আর সে-দিন চিনেবাদাম খাওয়া হ'ল না, সমস্তক্ষণ তার চোখছুটি ভাস্তে লাগ্ল মনের ভিতর।

পর দিন দশটার সময় আস্তে-আস্তে সরে' জান্লার ধারে গিয়ে বস্লাম। গাড়ী এল। সে দরজার পাশে বসে' আছে, আজ আর সে তাকাবে না জান্লার দিকে ঠিক করেছে বলে' মনে হ'ল। বেহারী মেয়েটি যেই গাড়ীতে চড়্ল গাড়ীও ছেড়ে দিলে। সেও এইবার চট করে' জান্লার দিকে চেয়ে নিলে, আমার চোখে চোখ পড়্তেই চোখ নামিয়ে নিলে।

তার পর থেকে রোজ সকাল-বিকাল আমার জান-লার ধারে সরে' বসা অভ্যাস হ'য়ে গেল। মণ্টু একদিন বেহারী মেয়েটির বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে ভাব করে' এসে বল্লে "মেয়েটির নাম কৃষ্ণা, তার বাবা শেয়ালদার রেলের একাউণ্ট্যাণ্ট্"। বেশ লোক তারা, কৃষ্ণার মা তাকে প্যাড়া খাইয়েছেন, আরও কত কি।

এই সময়ে আমার দশ-পনর দিন ধরে-পরে খুব বেশী জ্বর হ'তে লাগ্ল। যেদিন খুব জ্বর বাড়্ত মণ্টুকে দিয়ে জান্লার পাশে একখানা বড় আয়না টাঙিয়ে দিতাম, তাতে শুয়ে-শুয়েই তাকে দেখ্তে পেতাম, সে কিন্তু একটু যেন খুঁজ্ত আমাকে জান্লায় না দেখে'।

একবার পাঁচ দিন জ্বরের পর জানলার ধারে গিয়ে সরে' বসেছি, দশটা তখনো বাজেনি, একটু পরেই গাড়ী এল কৃষ্ণাকে নিতে, তখন ডিসেম্বর মাস, তাকে দেখ্‌লাম একখানা ধূপছায়া রঙের র‍্যাপার গায় দিয়েছে, দরজা দিয়ে গাড়ীর ভিতর তার গায়ে রোদ পড়েছে, গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠেছে, সে একবার চেয়েই চোখ নীচু করে' নিলে। কৃষ্ণা এসে চড়্‌লে পর গাড়ী ছেড়ে দিলে, সে আর একবার চট্ করে' দেখে' নিলে আমার জান্‌লার দিকে।

তাকে রোজ-রোজ দেখি, সেও আমায় রোজ দেখে, তাকে একদিন না দেখ্‌লে মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। তার নাম জানিনে, জান্‌বার কোন আশাও নেই, মনে হ'ত আমার যদি একটি বোন থাক্‌ত, আর সেও যদি ঐ স্কুলেই পড়্‌ত তবে ওর নামটি জেনে নিতে পার্‌তাম। নিজে-নিজে তার কত নাম ঠিক কর্‌লাম, মালতী, অরুণা, বীণা, জ্যোৎস্না, কিছু দিন পরে আর এর কোন নামই ভালো লাগ্‌ত না।

এইরকম করে' আরও পাঁচ ছয় মাস কেটে গেল। গরমের ছুটি এখন। আমার জান্‌লা এখন খুলে' রাখ্‌বার জোও নেই, দর্‌কারও নেই, স্কুল ছুটি। কৃষ্ণাও তার মামার বাড়ী গেছে ছুটিতে। দিন আর কাট্‌তে চায় না। অনেকগুলি গল্পের বই কিনে' দিলেন কাকাবাবু। সব পড়ে শেষ করে' ফেল্‌লাম। এই সময়ে আবার আমার জ্বর হ'তে লাগল।

একদিন যতীন-মামা একখানা বই এনে দিলেন আমাকে, ডাকঘর তার নাম। খুব ভালো লাগ্‌ল পড়ে'। বইখানা একবার শেষ করে' আবার পড়্‌লাম, তার পর আবার পড়্‌লাম, শেষে সেইখানা সারাদিনই আমার বালিশের নীচে থাক্‌ত।

আমি ভাব্‌তাম আমি যদি অমল হ'তাম বেশ হ'ত। আমারও ত অসুখ করেছে, আমিও ঘরে বন্ধ। আমার তখন মনে পড়্‌ত জাম্‌তাড়ার কথা, সেখানকার সেই রাস্তা, খোলা মাঠ, শালবন আর কতদূরের পাহাড়গুলি। সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘরের সামনের সেই সাঁওতাল ছেলের বাঁশীর কথা মনে পড়্‌ত

আবার স্কুল খুলেছে। আজ তাকে দেখ্‌লাম তা মাথায় আর ফিতে নেই, একখানা লাল পেড়ে শাড় পরেছে, আর কাণে দুইটি লাল প্রবালের দুল। ি সুন্দর লাগ্‌ল তাকে আজ। কতদিন পরে দেখ্‌লা তাকে, আজ তার নাম দিলাম "সুধা"। মনে হ'ল ঠিক নামকরণ করা হয়েছে।

দিনের পর দিন চলেছে, ক্রমে বর্ষা এল। বা বিচ্ছিরি দিনগুলি হয় বর্ষায়—এই কল্‌কাতায়। জান্‌ল খুল্‌তে পারিনে। শার্শির কাঁচ জলে ভিজে' কুয়াসা মতন সাদা হ'য়ে যায়, বাইরের কিছুই দেখা যায় না কত দিন হ'য়ে গেল সুধাকে দেখিনি।

একদিন সকাল থেকে ভয়ানক বৃষ্টি, কৃষ্ণাকে নিয়ে গেল গাড়ীতে, কিন্তু সুধাকে দেখ্‌তে পেলাম না। তার পর সারাদিন খুব বৃষ্টির পর বিকালে বৃষ্টি থাম্‌ল। রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়ী এল কৃষ্ণাকে দিতে, সে বেচারা আর নাম্‌তে পারে না। গাড়ীর ফুট্‌বোর্ড জলে ডুবে' গেছে। ভিতরে জল ঢোকে-ঢোকে। সহিস কৃষ্ণার বাড়ীর চাকর ডাক্‌তে গেছে। আমি আস্তে-আস্তে জান্‌লার ধারে গিয়ে বসেছি, আজ অনেক দিন পরে অনেকক্ষণ ধরে' সুধাকে দেখ্‌লাম। সে একটা সবুজ জামা আর একখানা বেগুনি রংএর শাড়ী পরেছে, চুলগুলি একটু ভিজে-ভিজে বোধ হ'ল। তার মুখখানি আজ হাসি-হাসি দেখ্‌লাম।

কৃষ্ণাকে তাদের চাপরাশী কোলে করে' নামিয়ে নিয়ে গেল। আজকে সবচেয়ে বেশীক্ষণ গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, গাড়ী চলে' গেল, তার পেছনে ঢেউ খেলে' গেল, আমার মনেও আজ রংএর ঢেউ খেল্‌তে লাগ্‌ল।

আবার পূজার ছুটি এল বলে'। আজ শুক্রবার, কাল থেকে ছুটি, আজ সুধার মুখখানি বেশ গম্ভীর লাগ্‌ল। আমিও বোধ হয় খুব গম্ভীর হয়েছিলাম। মণ্টু এসে বল্‌লে, "দাদাভাই, কৃষ্ণা এ ছুটিতে কোথাও যাবে না"। সে ভেবেছিল আমি বোধ হয় খুব খুসী হ'ব এই খবরে, কিন্তু তার কোন লক্ষণ না দেখে' বেচারা ঘর থেকে আস্তে-আস্তে চলে' গেল।

আমার জ্বরটা আজকাল একটু বেড়েই চলেছে,

যতীন-মামা বলেন শীগ্‌গিরই ছেড়ে যাবে আর আমি উঠে' বেড়াতে পারব কিন্তু আমার হাঁটুর জোর ফেরবার লক্ষণ কিছুই বুঝতে পারছিনে।

দিন কয়েক হ'ল স্কুল খুলেছে, আজ ৬ই নভেম্বর, ঠিক এক বছর হ'ল প্রথম যেদিন সুধাকে দেখি তার থেকে। গাড়ী এলে দেখলাম সেই হাসি-হাসি মুখ, আমাকে দেখে'ই যেন সে একটু চমকে' উঠল।

গাড়ী চলে' গেলে পর আমি আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে বসলাম, মনে হ'ল একটু রোগা হ'য়ে গেছি। মণ্টুকে বললাম, "আমার একটা পাঞ্জাবী বার করে' দাও ত ভাই"। সে জামা এনে দিলে পর দেখলাম গলাটা ঢিলে লাগছে, কাঁধ ঝুলে' পড়েছে, গায়েও বড় ঠেকছে। জামা পরেই রইলাম। যতীন-মামা সেদিন যখন এলেন তখন আমার জ্বর এসেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "যতীন-মামা আমি কি খুব রোগা হ'য়ে গেছি?" তিনি অন্য দিকে ফিরে' বললেন, "না ত!"

কাকীমা পাশে বসেছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, "তবে জামাটা কি করে' বেড়ে গেল এত?" যতীন-মামা কাকীমার দিকে গম্ভীর হ'য়ে চাইলেন, কাকীমা এসে আমায় আদর করে' বললেন, "না বাবা শীগ্‌গিরই তুমি সেরে উঠবে।"

আজকাল আর বড় উঠে' বসতে পারিনে, রোজ আর লেখাও হ'য়ে উঠছে না, এখন আয়নাটাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু হ'য়ে উঠেছে। মণ্টু আয়নাখানা রোজই সকালে জানলার ধারে টাঙিয়ে দেয়। আয়নায় আর আজকাল সুধাকে রোজ দেখতে পাইনে, কোন দিন গাড়ীর চাকা দেখা যায়, কোন দিন গাড়ীর একেবারে শেষটুকু, তার পর কয়েকদিন সুধাকে দেখতে পাই। আবার মাঝে-মাঝে শুধু কোচবাক্সটাই দেখা যায়। মণ্টু বললে, "দাদাভাই, কৃষ্ণাদের গাড়ীর ঘোড়াটা বদলেছে, ভারি দুষ্ট এটা, কিছুতেই স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না।"

একদিন একজন বুড়ো বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে মণ্টুকে বললাম ওকে ডাকতে পারো ভাই? মণ্টু তাকে ডাকলে, জানলার ধারে সে দাঁড়াল, মণ্টু তাকে বললে, "দাদাভাইএর অসুখ, তুমি তাকে একটু বাঁশী শোনাবে?" সে বললে, "কি হয়েছে খোকাবাবুর?" মণ্টু বললে, "সে অনেক দিন হ'ল এক বচ্ছর দু বচ্ছর হবে, দাদা ভাইএর জ্বর হয়েছে আর পায়ে কি হয়েছে, ডাক্তার মানা করেছে বিছানা থেকে উঠতে, তুমি একটু বাজাও না, আমি পয়সা দেবো।" আমি শুনতে পেলাম, সে বললে, "আহা"। তার পর একটা ভাটিয়ালী সুর বাজাতে লাগল দাঁড়িয়ে, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বললে, "আমি আজ আসি, আবার পরে আসব" মণ্টু একটা সিকি হাতে করে' জানলা দিয়ে বাড়িয়ে বললে, "পয়সা নিয়ে যাও"। সে বললে "বাঁশী বিক্রি করি আমি, বাঁশীর সুর ত বিক্রি করিনে"। বলেই চলে' গেল।

এমনি করে'ই দিন চলেছে, বাঁশীওআলা মাঝে মাঝে দশ-পনর দিন পরে-পরে আমায় বাঁশী শুনিয়ে যেতো। এমনি করে' আরও প্রায় বছর খানেক কেটে গেল।

আবার ৬ই নভেম্বর ফিরে' এসেছে। সুধাকে দেখলাম একখানা বাদামি-রংএর গায়ের কাপড় গায় দিয়েছে বোধ হ'ল। আয়নায় ভাল করে' বুঝতে পারলাম না। এখন আমার রোজই সন্ধ্যায় জ্বর আসে, চেষ্টা করলেও আর উঠে' বসতে পারিনে আজকাল। যতীন-মামা মাঝে-মাঝে ফুল নিয়ে আসেন আমি সেগুলি জানলার ধারে রেখে দিই। অনেকদিন পরে বাঁশীআলা বাঁশী শুনিয়ে গেল আজ সকালে, বড় টানা সুর, আজ মনটা বড় দমে' গেছে। রাস্তায় তখনো বাঁশীর সুর চলেছে, সামনের মেসে কে জানি এস্‌রাজ বাজিয়ে গান ধরেছে—

"দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় যে ঘুরে' ঘুরে'
যে বাঁশীতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশীটির সুরে সুরে"

দিনের পর দিন চলেছে আমার জ্বরও বেড়ে চলেছে। আমি ফুল ভালবাসি বলে' আজকাল রোজই আমার জন্য ফুল আসে। মাঝে কয়দিন একটু ভাল ছিলাম, একটু বসতেও পারি। জানুয়ারী মাসের শেষ বোধ হয় তখন, একদিন কতকগুলি বালিশে ঠেস্ দিয়ে জানলার পাশে বসেছি সকালে। গাড়ী এসেছে কৃষ্ণাকে নিতে, সুধাকে দেখলাম। আজ আর মাথায় লাল ফিতেও নেই, খোলা

চুলও নেই, একটি খোঁপা করেছে আর লাল জামা আর সবুজ শাড়ী পরেছে। গলায় একটা লম্বা সোনার হার আর কাণে সোনার দুল, কি চমৎকার যে দেখাচ্ছিল তাকে! আমি চাইলাম তার দিকে, সেও চাইলে। কি স্নিগ্ধ চোখ-দুটি! গাড়ী চলে' গেল আমিও শুয়ে পড়্‌লাম।

বিকালে আজ আয়নায় দেখ্‌লাম তাকে, কতকগুলি চুল উড়ে' মুখে এসে পড়েছে, ভারি ভালো লাগ্‌ল তাকে. অনেক দিন পরে দেখে'। আজ অনেকটা লিখে' রাখ্‌লাম।

এম্‌নি করে'ই দিন চলেছে, আবার গরমের ছুটি এল বলে'। কাল ছুটি হবে। আমি আজ জোর করে' জান্‌লার পাশে গিয়ে বসেছি। গাড়ী এল। সে যেন আজ একটু উৎসুক হ'য়েই তাকালে আমার দিকে। গাড়ী চল্‌ল, তার পর যতক্ষণ দেখা গেল, চেয়ে রইল।

ছুটিতে কোন কাজ নেই, সময় আর কাট্‌তে চায় না। সাম্‌নের মেসে যে-ছেলেটি গান করত, সেও বোধ হয় বন্ধে বাড়ী গেছে। এই গরমে আরও দমে' গেলাম। আমার হাতের জোরও কমে' আস্‌ছে আস্তে-আস্তে। বাঁশীওয়ালা আজ অনেকদিন পরে এসেছে আমি তাকে আজ ঘরে আনিয়েছি। আজ অনেকক্ষণ সে বাঁশী বাজালে, সেও কাল বাড়ী যাবে. সেখানে তার নাতির বড় অসুখ।

সেদিন যতীন-মামা আমার জন্যে অনেকগুলি লাল পদ্ম-ফুল এনেছিলেন। বাঁশীওয়ালা যাবার সময় তাকে আমি ক'টা ফুল দিলাম, সে ফুলগুলি তার জামার ভিতর পূরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "চলি খোকাবাবু, আবার এসে বাঁশী শোনাব আমি"। দরজার কাছে গিয়ে যতীন-মামাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তার পর বোধ হ'ল, চোখ মুছে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিন আর রাস্তায় তাকে বাঁশী বাজাতে শুন্‌লাম না।

ছুটি কবে শেষ হবে, আমি কেবল দিন গুন্‌ছি। মণ্টু কৃষ্ণার কাছে শুনেছিল কবে স্কুল খুল্‌বে। হিসেব করে' দেখ্‌লাম এখনো আঠার দিন বাকী। আমি শুয়ে-শুয়ে ভাবি, ছুটিতে সুধা কোথায় গেছে? হয়ত এখানেই রয়েছে। সেও কি দিন গুন্‌ছে কবে স্কুল খুল্‌বে?

এই সময় যতীন-মামা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী থেকে একটা গ্রামোফোন নিয়ে এলেন। কতকগুলি চমৎকার বেহালার রেকর্ড্‌ রেখে বাকীগুলি আমি ফেরত দিলাম আমার ভারি ভালো লাগ্‌ত বেহালার সুরগুলি। সব-চেয়ে ভাল লাগ্‌ত "হিউমারেস্ক"খানা। এখানা আমি এক সঙ্গে চার-পাঁচ বার করে' বাজাতাম। এখানা বাজালেই আমার ইচ্ছা কর্‌ত বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠি, কিন্তু শরীর তখন আরও খারাপ হ'য়ে এসেছে।

কয়েকদিন কেটে গেল। কাল স্কুল খুল্‌বে। আজকের রাত আর কাট্‌তে চায় না. সারারাত প্রায় জেগেই কাট্‌ল। ভোরে একটু ঘুম আস্‌চে এমন সময় শুন্‌তে পেলাম্‌ সাম্‌নের মেসের সেই ছেলেটি গাইছে—

"পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে
আজ ধূলার আসন ধন্য করে' বস্‌বে কি মোর সাথে"॥

দশটা বাজে প্রায়, কোন রকমে জান্‌লার ধারে গিয়ে বসেছি। সুধাকে দেখ্‌লাম, তার হাসি-হাসি চোখ আমায় দেখে'ই গম্ভীর হ'য়ে গেল। আমি তখন জান্‌লার উপরে পদ্মফুলগুলি সাজাচ্ছিলাম, আমার নিজেরই মনে হ'ল আমার হাত কিরকম সাদা হ'য়ে গেছে। গাড়ী চলে' গেল, আস্তে আস্তে সেখানেই বসে' পড়্‌লাম। এম্‌নি করে'ই আস্তে আস্তে বর্ষাও কেটে গেল।

তার পর থেকে ক্রমেই কাহিল হ'য়ে আস্‌ছি, আয়নাতেও আর ভাল করে' দেখ্‌তে পাইনে কিছুই। এইবার একটু-একটু বুঝ্‌তে পার্‌লাম্‌ আমার এ অসুখ আর সার্‌বার নয়। মণ্টুকে একদিন বল্‌লাম, "মণ্টু ভাই, তুমি আমার সব গল্পের বই নিও।" সে বল্‌লে, "কেন তুমি কোথায় যাবে দাদাভাই?" আমি বল্‌লাম, "কোথায় জানিনে, কিন্তু সে অনেক দূরে।"

মেসে তখন সেই ছেলেটি গাইছিল—"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"। আজকাল বিকাল-বেলাটা বেশ সুন্দর হয় আকাশটা। জান্‌লা দিয়ে যতটুকু দেখ্‌তে পাই খুব ভাল লাগে। শরৎকাল এসে পড়্‌ল।

একটু-একটু ঠাণ্ডাও পড়ছে। শরীর আরও খারাপ হ'য়ে আস্‌ছে।

একদিন মণ্টু বল্‌লে, "কৃষ্ণার বিয়ে এই পূজার ছুটির পরেই হবে, আর বার দিন পরে তাদের ছুটি হবে। কৃষ্ণার বিয়ে তাদের দেশে হবে।" মণ্ট বন্ধুর বিয়ের কথা ভেবে খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, আর বারো দিন পরে ওদের ছুটি হবে, তার আগে একবার সুধাকে ভাল করে' দেখে' নিতে হবে, কি জানি যদি আমার ছুটি শেষ হ'য়ে যায় স্কুলের ছুটি শেষ হবার আগেই।

আজ বুধবার, পরশু ওদের ছুটি হবে, আমি আর পরশু অবধি অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না, খুব কষ্ট করে'ই জান্‌লার পাশে গিয়ে বস্‌লাম। গাড়ী এল মনে হ'ল, সুধা খুব চেষ্টা কর্‌লে হাসিতে, কিন্তু পার্‌লে না।

ছুটি শেষ হ'য়ে গেছে, কি করে' যে দিনগুলি কেটে গেল মনে নেই। আমার চোখের জোর কমে' আস্‌ছে, সঙ্গে-সঙ্গে মনের জোরও কম্‌ছে। কাকীমা আজকাল সারাদিনই আমার কাছে থাকেন। উঠ্‌তে আর পারিনে একেবারেই। মণ্টু একদিন খবর দিলে কৃষ্ণা এসেছে, তাদের স্কুল খুলেছে, তার বিয়ে এখন হবে না, মাঘ মাসে হ'বে। আমার ইচ্ছা কর্‌ছিল, জান্‌লার ধারে গিয়ে বসি, সুধাকে কতদিন যে দেখিনি। উঠ্‌বার শক্তি নেই।

সেদিন যতীন-মামার সঙ্গে আরও দু-জন ডাক্তার এলেন। অনেকক্ষণ আমায় দেখ্‌লেন, তাঁরা চলে' গেলে পর দেখি কাকীমা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চোখ মুছ্‌ছেন। আমি সবই বুঝ্‌তে পার্‌লাম। কাকীমাকে ডাক্‌লাম আমার পাশে, তিনি আমায় আদর করে' মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

আজ ৫ই নভেম্বর। কাল তিন বছর হবে সুধার সঙ্গে ভাব হয়েছে। আজ সন্ধ্যাটা আর কাট্‌তে চায় না। রাত্রে বেশ ভালো ঘুমিয়েছিলাম, খুব ভোরেই ঘুম ভেঙেছে, শুন্‌তে পেলাম সাম্‌নের মেসের সেই ছেলেটি গান কর্‌ছে এস্‌রাজ বাজিয়ে—

"আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে॥"

আকাশে তখন আলোর খেলা সুরু হয়েছে। সব সোনালী হ'য়ে উঠ্‌ল, খুব ভালো লাগ্‌ছিল। সকালে শরীরটা বেশ ভাল বোধ হচ্ছিল। আজকে অনেক দিন পর অনেকটা লিখে' রাখ্‌লাম।

দুপুরে ভয়ানক জ্বর বেড়ে গেল; মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, কাকীমা যতীন-মামাকে ডেকে পাঠালেন, তিনি এসেই কাকাবাবুকে তাঁর আফিসে খবর দিলেন বাড়ী আস্‌বার জন্যে।

হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দ শোনা গেল। যতীন-মামা দৌড়ে বাইরে গেলেন, একটু পরেই ঘরে এলেন সুধাকে কোলে করে' নিয়ে, আমি তাড়াতাড়ি উঠে' বস্‌লাম। মণ্টু দৌড়ে এসে বল্‌লে, কৃষ্ণার কিছুই লাগেনি, সে বাড়ী গেছে। সুধাকে আমার ঘরেই ইজি-চেয়ারে শুইয়ে তার মাথায় বরফ দিতে লাগ্‌লেন কাকীমা। আমার মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, মনে হল স্বপ্ন দেখ্‌ছি। যতীন-মামা কাকীমাকে বল্‌লেন, "Shell Petrol-এর বড় লরীখানা skid করে' এসে পড়েছে বাস্‌এর উপর গাড়ীখানা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে, সহিস, ক্যোচম্যান্ ও ঘোড়া বেঁচে গেছে কিন্তু এ-মেয়েটির অবস্থা খারাপ"। খানিক পরে বল্‌লেন, "ভয় নেই, এখনই জ্ঞান হবে, মেয়েটির তুমি মাথায় বরফ দাও, আমি দেখি বেরিয়ে লরীখানা চলে' গেল কি না" বলেই তিনি বাইরে গেলেন।

আমি আনন্দে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে' বল্‌লাম, "সুধার তবে লাগেনি বেশী", বলে'ই তার চেয়ারের পাশে গিয়ে তার হাতখানা আমার হাতে তুলে' নিয়েই মাথা ঘুরে' সেখানে পড়ে' গেলাম।

যখন জ্ঞান হ'ল, দেখি সুধা নেই সেখানে, যতীন-মামা আরও দু-তিন জন ডাক্তার বসে' আছেন ঘরে। কাকীমা আর মণ্ট বসে' আছেন মাথার কাছে। আমার ভারি ঘুম আস্‌তে লাগল। যতীন-মামা বল্‌লেন, "এখন ঘুম এলে ভালো।" তাঁরা সব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি কতক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম মনে নেই।

রাত তখন ১২টা হবে আমি উঠে' বস্‌লাম, মনে হ'ল আমার কোন অসুখ, কোন কষ্টই নেই। সুধার মুখখানি মনে পড়্‌ল, আস্তে আস্তে আজকের এই ঘটনাটা লিখ্‌লাম আমার এই খাতায়, আর আরম্ভ করেছি যে পাতায় তাতে লিখে রাখলাম "সুধা"। ভারি ঘুম আস্‌ছে আবার, এবার ঘুমোই।

সুধার কথা

বাবার সঙ্গে মণ্টুদের বাড়ী গিয়েছিলাম, আজ তিন দিন হ'ল আমাদের গাড়ীর accident হয়েছে, ভাগ্যিস্ যতীন-বাবু আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন তুলে'।

ইচ্ছা ছিল মণ্টুর দাদাকে দেখ্‌ব আজ ভালো করে', আজ তার সঙ্গে আলাপ কর্‌ব। মণ্টুর মার সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি আমায় তার ঘরে নিয়ে গেলেন, গিয়ে দেখি—তার বিছানাখানি একখানা সাদা চাদরে ঢাকা রয়েছে, আর তার উপর একরাশি রজনীগন্ধা ফুল সাজান। মণ্টু জান্‌লার পাশে বসে' আছে এক খানা খাতা কোলে করে'।

আমার চোখ জলে ভরে' এল, মণ্টুর কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে খাতাখানা নিয়ে খুল্‌লাম, আশ্চর্য্য সে কি করে' আমার নাম জান্‌লে? আমি মণ্টুকে বল্‌লাম "মণ্টু ভাই, আমাকে এ-খাতাখানা দেবে?" সে বললে, "তুমি কি সুধা?"

আমি বল্‌লাম, "হ্যাঁ, আমার নাম সুধা।" আস্‌বার সময় তার মাকে প্রণাম করে' খাতাখানা আর কয়েকটি ফুল নিয়ে বাড়ী এলাম।

তার পর যে-স্কুলে পড়্‌তাম, সে-স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হ'ব ভাব্‌ছি, সে-পথ দিয়ে যেতে মন আর চায় না।

বাদ্‌লায়

শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(সংস্কৃত গজপতি ছন্দের অনুকরণে রচিত। প্রত্যেকটি শব্দের স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত বর্ণের উচ্চারণ রীতিমত হওয়া আবশ্যক।)

(১)

নেমেছে দেশ- জুড়ে' বাদল!
বাজিছে নীল্ নভে মাদল!
ভ'রেছে নদ- নদী পুকুর!
তথাপি জল্ যাচে চাতক!
না জানি, হায়, কত পাতক!
তৃষাতে প্রাণ্ সদা আতুর!

(২)

হ'য়েছে গাছ্ পাতা সবুজ!
হৃদয়ে আজ্ জাগে অবুঝ!
চাহে না আর্ কারো শরণ!
আবেশে শিউ- রিছে কদম!
নিয়ত বায়্ ছোটে বেদম!
ক'রেছে মোর্ মনো- হরণ!

(৩)

অদূরে ওই্ ডাকে কোকিল!
বিষাদে আজ্ কাঁদে অখিল!
কে যেন কয়, 'বাঁচা বিফল!'
কি যেন বুক্- ভরা ব্যথায়,
কলাপী কার্ কাছে শুধায়,
ফুকারি' কয়, "কে-ও!" কেবল!

(৪)

দাদুরী আজ্ গানে মগন!
ঢুলিছে তায়্ যেন গগন!
বেণুও শির্ নমি' ঝিমায়!
ঝরিছে ঝম্- ঝমি' সলিল!
বহিছে তায়্ ভিজা অনিল!
অজানা দুখ্ কোথা ঘুমায়!

রুদ্র

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের পুরাণ-বর্ণিত আখ্যানের কতকগুলির মূল ভিত্তি বৈদিক আখ্যান। ঋগ্বেদের আখ্যানগুলি, দেখা যায়, বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতাদি গ্রন্থে বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া পুরাণাদিতে অনেকটা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। আখ্যানগুলির এরূপ বিভিন্নাকার ধারণ করিবার একমাত্র কারণ, মনে হয়, বেদে আখ্যান-গুলি যে উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছিল, পুরাণাদিতে সে উদ্দেশ্য রক্ষিত হয় নাই। বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, আকাশ, উষা, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি প্রভৃতি প্রত্যেক নৈসর্গিক ব্যাপারকে এক-একটি দেবতা-জ্ঞানে উপাসনা করিতেন। ক্রমে তাঁহারা নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এতটা বিস্ময়াপ্লুত হন যে, প্রত্যেক নক্ষত্রাদিকে এক-একটি দেবতা কল্পনা করতঃ, ইহাদের আকৃতি ও গতি-বিধির সহিত নৈসর্গিক ব্যাপারের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া রূপকছলে কতকগুলি আখ্যান রচনা করেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও বেদান্তর্গত সংহিতাদি গ্রন্থে এই আখ্যানগুলি বেদের মূল উদ্দেশ্যের কোনওরূপ হানি না করিয়া বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু পুরাণাদিতে এগুলি এরূপ বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে যে, ইহাদের সহিত বৈদিক আখ্যানের যে কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা কল্পনা করাও অনেক স্থলে দুরূহ হইয়া পড়ে।

রুদ্র একজন বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে অনেকগুলি ঋকের মধ্যে রুদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) এখন দেখা যাউক, প্রকৃতির কোন্ বস্তুটিকে আর্য্যগণ রুদ্র-নামে অভিহিত করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে রুদ্রকে অগ্নির রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অগ্নির কোনও বিশেষ রূপের নাম রুদ্র। সায়ণের মতে "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে" অগ্নির ক্রূর মূর্ত্তির নাম রুদ্র। রুদ্র শব্দ রুদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রুদ্ ধাতুর একটি অর্থ রোদন করা, এবং অপর অর্থ গর্জ্জন করা। রুদ্ ধাতুর রোদন করা অর্থ গ্রহণ করিয়া যাস্ক রুদ্র শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, শত্রুগণকে রোদন করান বা দুঃখ প্রদান করেন বলিয়া ইনি রুদ্র। তৈত্তিরীয়কে কথিত আছে, দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ-পরিত্যক্ত ধন অগ্নি অপহরণ করিয়া পলায়ন করেন। পরে সংগ্রামান্তে দেবগণ অগ্নির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তাঁহাদের ধন গ্রহণ করিলে, অগ্নি রোদন করিতে থাকেন, এবং এইজন্যই তিনি রুদ্র-নামে অভিহিত হন। রুদ্ ধাতুর গর্জ্জন করা অর্থ গ্রহণ করিয়াও যাস্ক বলেন, অগ্নি মেঘ-মধ্যস্থ হইয়া বারম্বার গর্জ্জন করতঃ গমন করেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র। অগ্নি ক্রূররূপ ধারণ করিলে শব্দায়মান ঝড়ের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে বেদোক্ত বজ্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ক্রূর অগ্নিরূপী ভয়ঙ্কর বজ্রের নামই রুদ্র। ক্রূর অগ্নি হইতে ঝড়ের উৎপত্তি হয় বলিয়া বেদে মরুৎগণ রুদ্রপুত্র বলিয়া অভিহিত। (২) পুরাণাদিতে রুদ্রের যেরূপ সংহারকারী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে রুদ্ ধাতুর রোদন করা অর্থের সহিত তাহার কোনও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। এ-কারণ মনে হয়, বেদে গর্জ্জন করা অর্থেই রুদ্র শব্দ পরিকল্পিত হইয়াছে,—সংহারকারী বজ্ররূপ ঐশ শক্তিকেই প্রাচীন হিন্দুগণ রুদ্র বলিয়া স্তুতি করিতেন। (৩)

(১) ২৭ সূক্ত, ১০ ঋক্। ৪৩ সূক্ত, ১, ২, ৪, ও ৫ ঋক্। ৪৫ সূক্ত, ১ঋক্। ৭২ সূক্ত, ৪ ঋক্।

(২) ১ মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ৪ ঋকে মরুৎগণকে 'রুদ্রাসঃ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সায়ণ 'রুদ্রাসঃ' অর্থ 'রুদ্রপুত্রা মরুতঃ' করিয়াছেন।

(৩) এসম্বন্ধে প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃষ্ঠা ২২৫ দ্রষ্টব্য। ৺রমেশ-চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ১ মণ্ডলের ৪৩ সূক্তের টীকায় রুদ্ ধাতুর গর্জ্জন করা অর্থ গ্রহণ করিয়া রুদ্র শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বেদে সৃষ্টিধ্বংসকারী কোনও দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভয়ঙ্কর বজ্র-নিনাদ শুনিলে স্বভাবতঃ মনে হয় যে উহা সৃষ্টি সংহার করিতে উদ্যত। এই কারণেই বোধ হয়, পুরাণে রুদ্র একজন সংহারকারী দেবতা। পুরাণে ভগবতী আদ্যাশক্তি রুদ্রপত্নী,—কালী করালী প্রভৃতি নামে খ্যাতা। বেদে এসকল দেবীর কোনও উল্লেখ নাই বটে, তবে মণ্ডুকোপনিষদে দেখা যায়, অগ্নির সাতটি জিহ্বাকে কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, ধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, ও বিশ্বরূপী নামে অভিহিতা করা হইয়াছে। দুর্গাও অগ্নির অপর একটি নাম। সুতরাং মনে হয়, সংহারকারী অগ্নির নাম যেমন রুদ্র, এই অগ্নির দাহিকা বা সংহারকারী শক্তিই তেমনি আমাদের পুরাণের আদ্যাশক্তি বা রুদ্রপত্নী।

ঋগ্বেদের পর বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ ও সংহিতাদি গ্রন্থে যে-সকল উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, নভোমণ্ডলস্থ কোনও নক্ষত্রবিশেষকে রুদ্ররূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থে বিশেষ প্রমাণ-সহকারে দেখাইয়াছেন যে, আর্য্য-ঋষিগণ আকাশের জ্যোতিষতত্ত্ব বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য রূপকছলে কয়েকটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, এবং সেইসকল উপাখ্যান রূপান্তরিত হইয়া পরবর্ত্তীযুগে পুরাণ-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত আছে, কোনও সময়ে প্রজাপতি স্বীয় কন্যা উষার প্রতি আসক্ত হইলে দেবগণ প্রজাপতির এই অন্যায় আচরণে ক্রোধান্বিত হন, এবং তাঁহাদের ঘোরতম অংশ একত্রিত করিয়া ভূতবানের সৃষ্টি করেন। ভূতবান্ প্রজাপতির অকৃতকে শরবিদ্ধ করিয়া আকাশে গমন করেন। প্রজাপতির অকৃত মৃগ নামে, এবং যিনি হনন করেন তিনি মৃগব্যাধ নামে খ্যাত হন। যে শরদ্বারা অকৃত বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা ত্রিকাণ্ড অর্থাৎ তিনটি অংশযুক্ত ছিল। এখন দেখা যাউক, এই আখ্যানের সহিত আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির কি সম্বন্ধ আছে। ৺বালগঙ্গধর তিলক মহাশয় তাঁহার ওরায়ণ (Orion) গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, যখন মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুব-সংক্রমণ হইত, সে-সময় এই নক্ষত্রকে প্রজাপতি নামে অভিহিত করিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে,—"যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ", "সম্বৎসরঃ প্রজাপতিঃ" অর্থাৎ যজ্ঞ ও সম্বৎসর উভয়েই প্রজাপতি নামে অভিহিত। মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইতে দেখিয়া তদনুসারে যজ্ঞাদি সম্পাদনের জন্য সম্বৎসরাদি গণনা করা হইত। যজ্ঞের জন্য সম্বৎসরাদি গণনা এবং এই মৃগশিরায় বিষুব-সংক্রমণ অনুসারে যজ্ঞাদি সম্পাদনের কাল নিরূপণ করা হইত বলিয়াই এই মৃগশিরা একজন প্রজাপতি। কিছুকাল পরে বৈদিক ঋষিগণ যখন দেখিলেন যে, মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালীন দিবা ও রাত্রি সমান না হইয়া, পরবর্ত্তী রোহিণী নক্ষত্রে সূর্য্য যখন গমন করিতেছেন, তখন দিবা ও রাত্রি সমান হইতেছে, তখন তাঁহারা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ঋষিগণ ঋতু বৎসরাদির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেন যে এরূপ ঘটিতেছে,—জগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অয়নবিন্দু যে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতেছে, এ-তথ্য তখন তাঁহারা সবিশেষ অবগত হইতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা রোহিণী নক্ষত্রে বিষুব সংক্রমণ হইতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হন। বিষুব-বিন্দুর পরিবর্ত্তনে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সে-কারণ যজ্ঞের জন্য সম্বৎসর গণনারও বিশেষ অসুবিধা হয়। কাজেই আর্য্যগণ বিরক্ত হন। এই বিষয়টাই রূপক-ছলে বলিবার জন্য ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে,—প্রজাপতি স্বীয় দুহিতার প্রতি আসক্ত হন, অর্থাৎ বিষুব-বিন্দু মৃগশিরাকে পরিত্যাগ করিয়া রোহিণী নক্ষত্রে উপগত হয়। যে-সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে-সময়ে মৃগশিরা হইতে নক্ষত্র গণনা আরম্ভ করা হইত বলিয়া, মৃগশিরা বা প্রজাপতি হইতে অন্যান্য নক্ষত্র উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হইত। এই হিসাবে রোহিণী প্রজাপতি-কন্যা। পুরাণে সাতাশটি নক্ষত্রই প্রজাপতি দক্ষতনয়া। বিষুব-বিন্দুর পরিবর্ত্তনে কাল-গণনার অসুবিধা হয়, কাজেই আখ্যানে দেবগণ প্রজা-

পতির আচরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ভূতবানের সৃষ্টি করেন।

এখন দেখা যাউক এই ভূতবান্ কে। আমরা দেখিতে পাই, রুদ্র আর্দ্রা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর্দ্রা নক্ষত্র হইতে দক্ষিণ দিকে একটি সরল রেখা টানিলে মৃগশিরা ভেদ করা যায়। ইহা ছায়াপথ বা স্বর্গগঙ্গার (Milky way) ঠিক নিম্নদেশে, এবং কাল পুরুষ বা প্রজাপতির (Orion) দক্ষিণ স্কন্ধে অবস্থিত। মৃগশিরার আকার কতকটা একটা মৃগের মস্তকের মত, উহার দক্ষিণ শৃঙ্গের ঠিক উপরিভাগে উজ্জ্বল তারাই আমাদের আর্দ্রা নক্ষত্র। মৃগের মস্তকদেশে সমরেখায় পাশাপাশি তিনটি উজ্জ্বল তারা আছে। ইহাই আমাদের পুরাণ-কথিত রুদ্রের ত্রিশূল অথবা বেদের ত্রিকাণ্ড ইষু অর্থাৎ যে-অস্ত্র দ্বারা মৃগরূপী প্রজাপতিকে বধ করা হইয়াছিল। এইসকল কারণে মনে হয়, এই আর্দ্রা নক্ষত্রই আমাদের আখ্যানের ভূতবান্ বা রুদ্র। বিষুব-বিন্দু রোহিণী নক্ষত্রে গমন করায় যজ্ঞাদির কাল-গণনার জন্য মৃগশিরার আর কোনও প্রয়োজন থাকে না; কাজেই এই আখ্যানে রুদ্র বা ভূতবান্ প্রজাপতিকে বধ করেন।

বিবিধ পুরাণে এই রুদ্র বা প্রজাপতি সম্বন্ধে যত-প্রকার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আখ্যান-ভাগের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা থাকিলেও এই বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাদির আখ্যায়িকাই যে তাহাদের মূল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শিব-পুরাণের আখ্যায়িকা হইতে আর্দ্রা নক্ষত্রই যে আমাদের রুদ্র বা ভূতবান্ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কথিত আছে, শিব শর দ্বারা মৃগরূপী ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করিলে, সেই শর এখনও আকাশে ষষ্ঠ নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে। অশ্বিনী হইতে গণনায় আর্দ্রাই ষষ্ঠ নক্ষত্র। মহিম্ন-স্তোত্রেও এক স্থানে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মা নক্ষত্র-মধ্যে মৃগশিরা-রূপে এবং রুদ্রের শর আর্দ্রা-রূপে অবস্থান করিতেছে।

মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব্বের ১৮শ অধ্যায়ে কথিত আছে,—"দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগের কল্পনা-সময়ে ভগবান্ ভূতবান্‌কে বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। ভূতপতি স্বীয়ভাগ কল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞ-নাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। * * * * অনন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।"

[স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ]

বিষুব-বিন্দু রোহিণী নক্ষত্রে গমন করায় সম্বৎসরাদি গণনার পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহাই মহাভারতের যুগ পরিবর্ত্তন। প্রজাপতি রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত হইলেও কাজেই দেবযুগ অতীত হইল। মহাভারতের এই আখ্যানেও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,—যজ্ঞ অর্থাৎ প্রজাপতি বাণবিদ্ধ হইয়া স্বর্গে (আকাশে) গমন করিলেন এবং মহেশ্বরও (রুদ্র) তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মৃগশিরার পরই আর্দ্রা নক্ষত্র,—উহা ইহার পশ্চাতে অথচ যেন বাণবিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ঠিক উপরিভাগে অবস্থিত।

অতঃপর বিবিধ পুরাণে শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ অংশের বিভিন্ন উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১০ঋকে কথিত হইয়াছে যে, দক্ষ-কন্যা ইলা বল-সম্পাদিত ও দীপ্তিযুক্ত অগ্নি ধারণ করিয়াছেন। রুদ্র অগ্নির একটি রূপ; এজন্য মনে হয়, পুরাণে দক্ষকন্যা সতীর সহিত শিবের যে বিবাহের কথা আছে, বেদের এই ঋক্‌ই তাহার মূল ভিত্তি। দক্ষ একজন প্রজাপতি। মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুব-সংক্রমণ-অনুসারে যখন যজ্ঞের জন্য সম্বৎসরাদি গণনা করা হইত, তখন এই নক্ষত্রকেই যজ্ঞ-পুরুষ বা প্রজাপতি বলা হইত এবং পরে ইহাকেই পুরাণাদিতে প্রজাপতি দক্ষ-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মৃগশিরার আকৃতি মৃগের মস্তকের মতন, এইজন্য পুরাণে দক্ষের ছাগ মুণ্ড কল্পনা। মৃগশিরা হইতে কাল গণনা অথবা নক্ষত্র গণনা করা হইত, এ-কারণ সাতাশটি নক্ষত্রই দক্ষ-কন্যা বলিয়া উল্লিখিত।

বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মহাভারত, ভাগবৎ প্রভৃতি বিবিধ পুরাণে দক্ষযজ্ঞ-নাশের উপাখ্যান বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইলেও, আখ্যানভাগের সারাংশে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। আখ্যানটি এইরূপ,—দক্ষ যে বাজপেয় যজ্ঞ করেন, তাহাতে রুদ্রের কোনও অংশ ছিল না। শিব-রহিত যজ্ঞ হইলেও দক্ষ-তনয়া সতী পিতৃযজ্ঞে অনাহুতভাবে গমন করেন, এবং তথায় পতি-নিন্দা-শ্রবণে খেদে প্রাণ-ত্যাগ করেন। শিব তখন ক্রোধে স্বীয় জটা উৎপাটন করিয়া তাহা হইতে বীরভদ্র উৎপাদন করেন। এই বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞনাশ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করেন। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ-নাশের আখ্যানটি অন্যরূপ আছে। শান্তি-পর্ব্বের ২৮৩ অধ্যায়ে কথিত আছে —"দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন,—তাহাতে মহাদেবের ভাগ কথিত হয় নাই। মহাদেব ক্রোধে যজ্ঞস্থলে উপদ্রব করেন। যজ্ঞ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে থাকেন। মহাদেব শরাসনে শর-সংযোগ-পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। যজ্ঞের অনুসরণ করিতে-করিতে তাঁহার ললাট-দেশ হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। ঘর্ম্মবিন্দু নিপতিত হইবামাত্র তথায় কালাগ্নিসদৃশ হুতাশন প্রাদুর্ভূত ও ঐ হুতাশন হইতে এক খর্ব্বাকার মহাবলপরাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সম্ভূত হয়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া মহাবেগে ঋষি ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হয়।"

[স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ]

এই শান্তি-পর্ব্বেরই পরবর্ত্তী ২৮৪ অধ্যায়ে কথিত আছে,—রুদ্র দক্ষের যজ্ঞনাশ-মানসে মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। সেই পুরুষ বীরভদ্র-নামে প্রসিদ্ধ হইল। বীরভদ্র যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া পলায়মান যজ্ঞের শিরশ্ছেদন করেন। মহাভারতের এই আখ্যানে দেখা যায়, প্রজাপতি ও যজ্ঞ একই,—উহার আকৃতি মৃগসদৃশ এবং উহা রুদ্র-কর্ত্তৃক নিপীড়িত। সুতরাং বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির আখ্যান অবলম্বন করিয়াই যে, এই মহাভারতের দক্ষযজ্ঞ-নাশের আখ্যান রচিত হইয়াছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির বৈদিক আখ্যান রূপান্তরিত হইয়া পুরাণ-মধ্যে সন্নিবেশিত হইলেও আখ্যানের মূল বক্তব্যের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

বিষুব-বিন্দু ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতেছে; সুতরাং মৃগশিরায় বিষুব-সংক্রমণ হইবার পূর্ব্বেও কোনও সময়ে আর্দ্রা নক্ষত্রে বিষুব-সংক্রমণ হইত। তখন আর্দ্রা নক্ষত্র হইতে যজ্ঞাদি সম্পাদনের জন্য সম্বৎসরাদি গণনা করা হইত। এ-কারণ পুরাণাদিতে আর্দ্রা বা রুদ্রও একজন প্রজাপতি। পরে যখন বিষুবন মৃগশিরা নক্ষত্র সরিয়া আইসে, তখন আর্দ্রা নক্ষত্রের সহিত যজ্ঞাদির আর কোনও সংস্রব থাকে না। দক্ষযজ্ঞে রুদ্রকে যজ্ঞভাগ না দিবার ইহাই বোধ হয় একমাত্র কারণ। সতীর দেহ-ত্যাগের কথা এই আখ্যানের মধ্যে কেন আসিল, অনুমান করা সুকঠিন। তবে দেখা যায়, পূর্ব্বে নক্ষত্র-পর্য্যায়ের মধ্যে অভিজিৎ নামে একটি নক্ষত্র ছিল, কিন্তু উহা ভচক্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া কালে উহাকে আর নক্ষত্র মধ্যে পরিগণনা করা হয় না। এই কারণেই মনে হয়, সতীর দেহ-ত্যাগের কথা কল্পিত হইয়াছে। আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রায় কতকটা সম্মুখে অভিজিৎ-নক্ষত্র অবস্থিত, এ-কারণ সতী রুদ্র-পত্নী।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী"-গ্রন্থে অনুমান করিয়াছেন যে, মৃগব্যাধ বা লুব্ধক তারা (Sirius or Canis Major) আমাদের পৌরাণিক রুদ্র বা সংহিতার ভূতবান্। লুব্ধক তারা যদি রুদ্র হয়, তাহা হইলে পুরাণের বীরভদ্র কে আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, রুদ্র স্বয়ং প্রজাপা[illegible] দক্ষের শিরশ্ছেদন করেন নাই,—তাঁহা হইতে উৎপ[illegible] অপর একজন পুরুষ করিয়াছিল। মৃগশিরার শিরো[illegible]শে যে তিনটি উজ্জ্বল তারা আছে, তাহাই প্রজাপতি যে শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল সেই ত্রিকাণ্ড শর বা রুদ্রের ত্রিশূল। মৃগব্যাধ তারা (Sirius) হইতে রোহিণী নক্ষত্র পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিলে, সেই রেখা মৃগশিরার এই তিনটি উজ্জ্বল তারা ভেদ করে। সুতরাং মনে হয়, এই মৃগব্যাধ বা লুব্ধক তারাই আমাদের পৌরাণিক বীরভদ্র। এখন কথা হইতে পারে, পুরাণে রুদ্রের যে একাদশ নামের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে একটি নাম, মৃগব্যাধ এবং

সেই হিসাবে মৃগব্যাধ (Sirius) তারাই রুদ্র হওয়া উচিত। বীরভদ্র রুদ্র হইতে উৎপন্ন, এবং সেজন্য বীরভদ্র ও রুদ্র একই,—রুদ্রকে বীরভদ্র বা মৃগব্যাধ নামে অভিহিত করায় বিশেষ কিছু দোষ হয় না। পুরাণে কথিত আছে, শিব মস্তকে গঙ্গা ধারণ করিয়া আছেন ;— এজন্য শিবের এক নাম গঙ্গাধর। আর্দ্রা নক্ষত্রের ঠিক উপরিভাগে ব্যোম-গঙ্গা (Milky way) প্রবাহিত, কিন্তু মৃগব্যাধ তারা এই স্বর্গগঙ্গা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। মৃগব্যাধ তারা রুদ্র হইলে তাঁহার মস্তকে গঙ্গা ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। কেবল ইহাই নহে, পুরাণে রুদ্রের যতগুলি নাম আছে, তাহার অধিকাংশ নাম আর্দ্রা-নক্ষত্র-সম্বন্ধে যতটা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, লুব্ধক-তারা-সম্বন্ধে ততটা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। রুদ্রের এক নাম- চন্দ্রশেখর। ইহার প্রচলিত অর্থ, চন্দ্র যাহার শিখরে অবস্থিত। কিন্তু যদি ইহার এরূপ অর্থ করা যায় যে, যিনি চন্দ্রের শিখরে অবস্থিত, তাহা হইলে দেখা যায়, মৃগশিরার অধিপতি চন্দ্র; আর্দ্রা মৃগশিরার ঠিক দক্ষিণ শৃঙ্গের উপরিভাগে অবস্থিত, এজন্য তিনি চন্দ্রশেখর। অপর পক্ষে মৃগব্যাধ-তারার চন্দ্রশেখর নাম-করণের কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। রুদ্রের আর-একটি নাম, বৃষবান্। বৃষরাশির সন্নিকটে অথচ উপরিভাগে আর্দ্রা অবস্থিত,—দেখিলেই মনে হয় যেন, আর্দ্রা বৃষের উপর চড়িয়া আছে। মৃগব্যাধ বৃষরাশির বহুদূরে,—মিথুনের প্রায় শেষভাগে অবস্থিত। রুদ্রকে কাল বা মহাকাল বলা হইয়া থাকে। যে-সময় মৃগশিরায় বিষুবন থাকিত, সে-সময় এই নক্ষত্রকে যজ্ঞপুরুষ এবং কাল-পুরুষ-নামে অভিহিত করা হইত। আর্দ্রা কাল-পুরুষের দক্ষিণ স্কন্ধ, এজন্য তিনি মহাকাল। মৃগব্যাধ তারাকে যদি রুদ্র বলা যায়, তাহা হইলে তাহাকে কালপুরুষ-নামে অভিহিত করা যায় না।

আমরা দেখিতে পাই, ভ-চক্রের প্রত্যেক নক্ষত্রের এক-একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে ;— যেমন,—অশ্বিনীর অশ্বী, ভরণীর যম, কৃত্তিকার অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা, মৃগশিরার সোম, আর্দ্রার রুদ্র, পুনর্ব্বসুর অদিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি বৈদিক দেবতা। বেদে নৈসর্গিক ব্যাপারকে দেবতা-জ্ঞানে উপাসনা করা হইত ; সুতরাং নক্ষত্রগুলির নাম-করণ করিবার জন্য যে এইসকল দেবতাগুলির নাম কল্পিত হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। বৈদিক ঋষিগণ যে-নক্ষত্রের আকৃতি ও গতিবিধি যে-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, নৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের সেইরূপ দেবতা-জ্ঞান করিয়াছিলেন ; এবং এইরূপে আটাশটি নক্ষত্রের প্রত্যেকটির এক-একটি দেবতা কল্পিত হইয়াছে। বেদে রুদ্রের মূর্ত্তি ক্রূর অগ্নিরূপী সুতরাং তিনি একজন সংহারকারী দেবতা। এজন্য বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ ও সংহিতাদি গ্রন্থে বিষুববিন্দুর গতির সম্বন্ধে আখ্যান-রচনা-কালে, প্রজাপতিকে বধ করিবার জন্য আর্দ্রা নক্ষত্রকেই রুদ্ররূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পুরাণাদিতে রুদ্র-সম্বন্ধে যে-সকল আখ্যান রচিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি বেদাঙ্গ সংহিতাদির আখ্যান অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই। জ্যোতিষ-তত্ত্ব আলোচনা করা পুরাণের উদ্দেশ্য নহে,—ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা লোকশিক্ষা দিবার জন্য পৌরাণিক আখ্যান রচিত। সুতরাং রুদ্রের পৌরাণিক সকল নামগুলির সহিত বা রুদ্র-সম্বন্ধে সকল আখ্যায়িকার সহিত আর্দ্রা নক্ষত্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, পৌরাণিক আখ্যানের কতকগুলি বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ সংহিতাদি গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির আখ্যান পুরাণ-মধ্যে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও ইহাদের যতটা অংশ পুরাণ-মধ্যে নিহিত, আমরা পুরাণ-মধ্যে মাত্র ততটাই জ্যোতিষ-তত্ত্ব আশা করিতে পারি।

পয়লা আষাঢ়

শ্রী সুধানলিনীকান্ত দে, এম-এ

বিবাহের পর প্রথম আষাঢ় মাস। কয়েক দিন বেশ রোদের পর মেঘে-মেঘে আকাশ স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। ক্ষণে আকাশ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে, ক্ষণে জোরে অথবা আস্তে বৃষ্টি নামিতেছে। রেবা এবং সুকান্ত সারাদিন বর্ষার রূপ মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করিতেছে।

"বাঃ বাঃ, সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল দেখ।"

"একটু আগে জোরে বাতাস দিচ্ছিল, এখন আর নেই।"

"বৃষ্টি এল!"

"বড় বড় ফোঁটা!"

"জান্‌লা বন্ধ করে' দাও, দাও।"

"না।"

"ভিজে, গেলে যে।"

"ভিজ্‌তে বেশ লাগ ছে। ঐ দেখ না, কাকগুলি কী ভিজ্‌ছে!"

"এখন কেন বন্ধ কর্‌ছ?"

"বড় জোরে এল।"

দুইজনে ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বসিল।

এক পশলা বৃষ্টির পর রেবা আসিয়া সব জানালা খুলিয়া দিল এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।"

সুকান্ত উত্তর দিল না দেখিয়া রেবা বলিয়া চলিল, "কি চমৎকার! বৃষ্টির পর একটা ভিজে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে, এমন ভালো লাগে! পৃথিবীর যেন নিজের গায়ের গন্ধ!"

সুকান্ত নাক উঁচাইয়া বলিল, "কবিত্ব!"

রেবা রাগিয়া বলিল, "কবিত্ব ত কবিত্ব। বর্ষার দিনে কবিত্ব কর্‌লে এমন কি দোষ হয়? যত বড় বড় কবি তো বর্ষার কবিতা লিখেই' অমর হয়েছেন।"

"কেউ-কেউ হয়েছেন হয়ত। কিন্তু কবিত্ব কর্‌লে আমাদের বিশেষ কিছু হয় না—শুধু ভাত জোটে না এ যা দোষ।"

ব্যথাটা কোথায় রেবার অজানা রহিল না, এক অন্যরকম স্বরে বলিল, "ভাত? ভাতই কি সব? সংসারে ভাতের চেয়ে বড় কি কিছুই নাই?"

"আছে। কিন্তু তা বলে' ভাতের চিন্তা ত দূর কর্‌তে পার্‌ছ না। ভাত হয়ত সবচেয়ে ছোট জিনিষ। ত ভাতের কথা আগে না ভেবে অন্য-কিছুর কথা ভাব যায় না। এ ত তুমি জান।"

বলিতে বলিতে সুকান্তের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, "ভাত চাই ভাত। এত হাহাকার, এত দৈন্য এত হীনতা সব শক্তির অভাবে। সে-শক্তি ভাতের শক্তি। হাজার-হাজার লোককে ভাত এনে দাও, পৃথিবী আরও বড় হ'য়ে উঠ্‌বে।"

রেবা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "শক্তি কি টাকার নয়?"

"টাকা মানেই ভাত, ভাত মানেই টাকা।"

বেচারা রেবা! স্বামীর এই অর্থতত্ত্বের কাছে সে এতটুকু হইয়া গেল। সুকান্তের আকাঙ্ক্ষা অফুরন্ত—রেবাকে লইয়া কতরকম স্বপ্নের না সে সৃষ্টিকর্তা! কিন্তু সে-সকল স্বপ্নমাত্র। সত্য যা তা এই যে তারা গরীব।

কিন্তু সুকান্তের ভিতর কোমল কোন দিক্‌ নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। এই ধরো আজকের বর্ষার দিনটা। দিনের মধ্যে থাকিয়া-থাকিয়া বার বার আকাশের জল ঝরিয়া পড়িতেছে, ইহা মনকে অকারণে উদাস করিয়া দেয়। সে রেবাকে লইয়া আকাশের দিকে আত্মহারার মত তাকাইয়া থাকে, রেবার দীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া কি পড়িতে চায়। বাস্তবিক কবিতাও করে।

"রেবা, জানো রেবা, আমিও অকবি নই, অন্তত চির-দিন ছিলাম না।"

"জানি—কিন্তু কাকে ভালোবেসেছিলে সেইটে শুধু জানিনে।"

রেবা হাসে।

সুকান্ত রেবাকে কাছে টানিয়া বলিল,"দুষ্টু কোথাকার! এই বুঝি!"

"মিথ্যা বলেছি নাকি?"

সুকান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "না মিথ্যা বলনি বটে।"

"কে সে শুনি না।"

"কেউ বটে। কিন্তু সে-কেউ কেউ-না!"

রেবা সুকান্তের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,"মানে?"

"আমি স্বীকার করি মনে-মনে একজনকে খুব ভালো-বাস্‌তাম অন্তত ভালো-বাস্‌তে চাইতাম। কিন্তু সে একজন কোন জীবন্ত মেয়ে নয়। চার বছর মনে মনে ভালো-বাস্‌তে শিখেছি তার পর পেয়েছি তোমাকে—"

"ওঃ, তুমি এমন-সব গল্প বানিয়ে বল্‌তে পার। আমি ভাব্‌ছিলাম কি না কি বল্‌বে।"

"সত্যি বলিনি?"

রেবা সুকান্তের মুখের দিকে আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "হবে, কে জানে। কিন্তু দোহাই তোমার, আর ভাতের কথা বলে' আজকের সুন্দর বর্ষাটা মাটি কোরো না।"

সুকান্ত হাসিল। বাস্তবিক সুন্দর বর্ষাটাকে মাটি করিতে সুকান্তও চায় না। জীবন কর্ম্মময়—অবসর বেশী ঘটে না। আর সব অবসরকে নিবিড় করিয়া পাওয়াও সম্ভব হয় না। আজ প্রিয়ার কালো চোখ আর মেঘের কালো ছায়া দুইই যদি অবসরের দিনে জুটিয়া থাকে তবে সুকান্ত কি তাহা প্রাণ দিয়া উপভোগ করিবে না? বিশেষ এই ত বিবাহের পর প্রথম বর্ষা!

সুকান্ত মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "রেবা আমার মাথায় একটা খেয়াল এসেছে।

রেবা উৎসাহের সহিত বলিল, "কি?"

"আজ বাংলা দেশে আমাদের অখ্যাত-অজ্ঞাত ছোট্ট এই ঘরে কালিদাসকে নিমন্ত্রণ করে এনে আমরা সম্মান করব। আমাদের এই দোতলা ঘরখানা হবে উজ্জয়িনী আর পাশের ঐ নালাটা শিপ্রা।"

রেবা হাসিয়া গলিয়া বলিল, "মানে?"

"মানে অত্যন্ত সহজ।"

"শুনি।"

"মনে আছে ত মেঘদূত? 'আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে' —আজ আষাঢ়ের প্রথম দিনে—"

"আজ ত আষাঢ়ের প্রথম দিন নয়।"

"আঃ! নাই হ'ল প্রথম দিন। পঞ্জিকা দেখেই যে প্রথম দিন করতে হবে তার কি মানে আছে?"

রেবা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আজ ৩রা আষাঢ়।"

"তা হোক্ ৩রা আষাঢ়। মনে করে দেখ ত ১লা আষাঢ় কিরকম দিন ছিল। সে দিন আজকের মত এমন স্নিগ্ধ মেঘ-ঢাকা আকাশ ছিল? এমন বৃষ্টি ঝর্‌ছিল? কখনই না। সেদিন রীতিমত কাঠফাটা রোদ ছিল। না, সেদিন আজকের মত রবিবার ছিল আর আমার ছুটি ছিল?"

"তা বটে।"

"বোকা মেয়ে! পঞ্জিকায় ৩রা লেখা থাকলেও আজ আমরা ১লা আষাঢ় কর্‌ব। মনে কর্‌ব যেন আজই ১লা আষাঢ়।"

"তার পর?

"তার পর সারাদিন ধরে, আমোদ কর্‌ব।"

"একা-একা?"

"তুমি আর আমি।"

সুকান্তের মনে হইল যে আমোদটাকে পাইতে চাহিতেছে তার সম্ভাবনায় বিশ্বাস সে রেবার মনে জাগাইতে পারিতেছে না। নারী যদি সচেতন হয় তবেই তার কল্যাণ-হস্তে একটা সম্পূর্ণতা আশা করা যায়। রেবা কিন্তু জিনিষটাকে মনের মধ্যে আরো বড় করিয়া ধরিতে পারিল। আগের দিন যদি প্ল্যান্ ঠিক করা হইত, তবে হয়ত সুকান্ত অনেক-কিছু করিতে পারিত। কিন্তু এতখানি বেলা হওয়ার পর সুকান্ত মনে-মনে নিরুৎসাহ-ভাব অনুভব করিল। শুধু নূতন প্রেম তাকে উদ্দীপিত করিয়া রাখিল, কিন্তু আমোদটা কি করিলে সব-

চেয়ে বেশী পাওয়া যায় তাহা বুঝিতে পারিল না, বুঝাইতে পারিল না।

রেবা কিন্তু মনে-মনে তীরের মন পথ কাটিয়া লইল। দিনটাকে সুন্দর করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে হইবে। সুকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি একটু বোসো, এখুনি আস্‌ছি।" রেবা অন্য-একটা প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল আর সুকান্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

আধঘণ্টা পরে রেবা হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। ততক্ষণ সে স্নান সারিয়া আসিয়াছে। তার দীপ্ত ও স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকাইয়া সুকান্ত বলিল, "স্নান করলে যে।"

"করতে হয়।"

"কেন?"

"আজ পয়লা আষাঢ়।"

পয়লা আষাঢ় যেন কত পবিত্র দিন। তার কথার ভঙ্গীতেই এমন-কিছু ছিল যাহা স্নানের শুচিত্ব জানাইয়া দিল। হায় মেঘদূতের কবি! তোমার লেখার পর অনেক যুগ অতীত হইয়াছে, বিরহের অনেক অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে, শুচিতার ছাপ তোমাকে কেহ দিয়াছে কি? সুকান্ত বুঝিল কালিদাসের সম্মান আরম্ভ হইয়াছে।

রেবা তেম্‌নিভাবে বলিল, "তোমাকেও স্নান সেরে নিতে বল্‌তাম, কিন্তু বাইরে তোমার কতগুলো কাজ আছে, তাই তুমি পরে স্নান কর্‌বে।"

এই বলিয়া তার হাতে সলজ্জভাবে একটা বেশী করিয়া ভাঁজ করা কাগজের টুক্‌রা দিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি, এটি হাতে করে, তুমি আমাদের বাজারে চলে, যাও। সেখানে না-যাওয়া পর্য্যন্ত এটি খুল্‌বে না। বলো, খুল্‌বে না?"

রহস্যময়ী এ-মূর্ত্তি মন্দ লাগে না। সুকান্ত তারি সুর চুরি করিয়া বলিল, "আচ্ছা, খুল্‌ব না।"

"ঠিক ত?"

"ঠিক।"

বাজার খুব বেশী দূর নহে। দু-মিনিট আগে বা পরে খুলিয়া কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয় তা বুঝাইতে পারা কঠিন। কিন্তু সুকান্ত আজ্ঞা পালন করিল। বাজারে গিয়া খুলিতেই তার চোখে নিম্নলিখিত ফর্দ্দখানি পড়িল:—

মোমবাতি	১২টা
ধূপ	/০
ধুনা	/০
দড়ি	৵০ আনা
পেরেক	৵০ আনা
ফুল (যুঁই, মল্লিকা, শিউলি)	।০ আনা
মালা	(৮টা)
কালিদাসের ছবি	১ খানা

রমণীর মন! সুকান্ত ভাবিয়া মরিতেছিল কি কি আজিকার দিনের শোভা বাড়ে, আর রেবা না ভাবি চিন্তিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। ফু মত এমন জিনিষ আর কোথায় পাওয়া যাইবে? বি রেবা ফুলের পাগল।

সুকান্ত ফর্দ্দের কতখানি বুঝিল, কতখানি বুঝি পারিল না। দড়ি, পেরেক কিসে লাগিবে বুঝি পারিল না। তার আর রেবার জন্য দুইটা মালাই য অথচ মালা দর্‌কার ৮টা। কিসে? আর এত ফুলই লাগিবে কোন্‌খানে?

যা হোক এখন আর প্রশ্ন করিবার মানুষটি না সুকান্তের মনে হইল পাছে সে প্রশ্ন ও তর্ক করে সেই চতুর রেবা চালাকিতে কাজ সারিয়াছে। নি বুদ্ধিমত কোন জিনিষ কম বা বেশী করিতে সুকা মন সরিল না। সে যথাযথ কিনিল।

কিন্তু তার হাসি পাইল রেবার ফরমায়েসী জিনিষটা দেখিয়া। কালিদাসের ছবি কোথায় মিলিবে

কালিদাসের ছবি না লইয়া ফিরিয়া আসিতেই রে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যা-যা লিখে, দিয়েছিলাম নিয়ে এসেছ ত?"

সুকান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "সবই এনেছি, একটি বাদ।"

রেবা চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ কোন্‌টি বাদ?"

"কালিদাসের ছবি।"

"করেছ কি! যাও, যাও, এখনি সেটা নিয়ে এসগে

সুকান্ত তবু নড়ে না দেখিয়া কাছে আসিয়া রে হাত নাড়িয়া বলিল, "ওগো আসলটাই যে বাকী

কালিদাসের ছবি না হ'লে আজ যে ১লা আষাঢ়ই হবে না। এতখানি কাজ করলে, লক্ষ্মীটি, আর একটু কষ্ট করে' একখানা কিনে' নিয়ে' এসগে! বেশী ত দূর নয়।"

"কিন্তু রেবা! সে ছবি আমি আন্‌ব কোত্থেকে! সে ত কোথাও পাওয়া যায় না।"

রেবা ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল, "দাও, দাও আর চালাকি করে' কাজ নেই। আমায় ক্ষ্যাপাবার জন্যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, আমি যেন বুঝিনে।"

"সত্যি পাওয়া যায় না।"

কি মুস্কিল! রেবাকে বোঝানো সহজ নহে। কিন্তু অবশেষে যখন বুঝিল, তখন তার চোখ জলভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। সুকান্ত সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া "বলিল, কেঁদো না, ছিঃ। কালিদাসের ছবি তোমার কি দর্‌কার বলো দেখি?"

"বাঃ! কালিদাসকে সম্মান কর্‌তে হবে, কালিদাসের ছবি না থাক্‌লে কি করে' হয়?"

"ওঃ এই কথা, আমি উপায় বলে' দিচ্ছি।"

রেবা সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে বলিল, "কি উপায় শুনি?"

"অত্যন্ত সহজ; আমাদের যে মেঘদূতখানা আছে সেই আজ কালিদাসের ছবির কাজ কর্‌বে।"

"মেঘদূত আর কালিদাসের ছবি বুঝি এক?"

"এক নয়! কিন্তু কালিদাসের ছবিও ত কালিদাস নয়। কালিদাস কালিদাসের ছবির চেয়ে বড়। কালিদাসের ছবিকে সম্মান করে' কালিদাসকে কি করে' সম্মান করো!"

"তবে!"

"বরং কালিদাস যেখানে বড়, সেইখানে তাকে সম্মান করো, ছবিকে সম্মান করে' কি হবে? মেঘদূত আজ কালিদাসের মহত্ত্বের সাক্ষী হোক্।"

সকল কথা রেবা বুঝিতে পারিল কি না বলিতে পারি না, তবে দেখা গেল সে চোখ মুছিয়া মেঘদূতের মলাটের ধূলা ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সুকান্তকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত দেখিয়া রেবা বলিল, "একটি প্রশ্নও না। কোন্ জিনিষ কোন্ কাজে লাগ্‌বে পরে জান্‌তে পার্‌বে। তুমি এখন স্নান করে' এস ত।"

রেবার মুখে সহজ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুকান্ত নীচে পরম আরামে কল-তলায় স্নান করিতে-করিতে রেবার মৃদু-গুঞ্জন শুনিতে লাগিল।

স্নান সারিয়া উপরে আসিয়া সুকান্ত দেখিল তাদের সব ঘরের চেহারা যেন নিমেষে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। দুইখানা ঘরের কোথাও একটু ময়লা নাই, মেজেগুলি চক্ চক্ করিতেছে। আর চুলের গন্ধ, তেলের গন্ধ, ফুলের গন্ধ ধূপধুনার গন্ধ, ও ভিজামাটির গন্ধ একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার গড়িয়া তুলিয়াছে।

সুকান্ত মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল, "আজ দেখি গন্ধের ভোজ!"

রেবা মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বিছানার দিকে চোখ পড়িতেই সুকান্ত বলিল, "এ কি করেছ? আজ আজ আবার নতুন করে' ফুলসজ্জার আয়োজন নাকি? বিছানা যে ফুলে ফুলময় হ'য়ে গেছে!"

রেবা লজ্জিতভাবে বলিল, "যাও; বিছানায় একটু ফুল ছড়িয়েছি অম্‌নি—"

সুকান্ত চাহিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে টেবিলখানি ধুইয়া মুছিয়া উজ্জ্বল করা হইয়াছে। তার উপর একখানা সাদা ধব্‌ধবে বিছানার চাদর পড়িয়াছে। বহুকালের দুইটা ফুলদানি ঘরের কোন্ কোণে পড়িয়া ছিল, রেবা তাদের উঠাইয়া আনিয়া মাজিয়া ফুল রাখিয়াছে ও জল ভরিয়াছে এবং নিপুণ হাতে টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। ফুলদানি দুইটার ঠিক মাঝখানে মেঘদূতখানা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে তার চার দিকে একটা মালা জড়ানো। একটি মালার হিসাব পাওয়া গেল না।

দড়ি এবং পেরেকগুলিও কাজে লাগিয়াছে। রেবা যে কখন অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর পাতা জোগাড় করিয়া আনিয়াছে, তা কেহ বলিতে পারে না। দড়ি ও পেরেকের সাহায্যে সে মনের মত ঘর সাজাইয়াছে। দুয়ারের কাছে ধূপ ও ধুনা পুড়িতেছে; স্বীকার করিতেই হইবে রেবার সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে।

সুতরাং মোমবাতি ও মালা-সাতটি ছাড়া আর সবেরই

হিসাব পাওয়া গেল। সুকান্ত আর প্রশ্ন করিল না, মনে করিল রেবার খরচের সার্থকতা আছেই।

ঠিক এম্‌নি সময়ে রেবা আসিয়া একগাছা মালা আল্‌গোছে সুকান্তের গলায় পরাইয়া দিল। উত্তরে সুকান্ত বাকী মালাই বীরদর্পে রেবার গলায় পরাইয়া দিতে যাইতেছে, এমন সময় রেবা বাধা দিয়া বলিল, "আ করো কি, করো কি, একটা পরিয়ে দাও, অতগুলি নয়।"

সুকান্ত হতভম্বভাবে বলিল, "কিন্তু অতগুলি দিয়ে কি হবে?"

"ওগুলি দেয়ালে টাঙিয়ে দেবো।"

ততক্ষণে ফুলের গন্ধে সদ্যঃস্নাত সুকান্তের মাথা খুলিয়া গিয়াছে। সে বলিল, "রেবা, আমার মাথায় একটা চমৎকার মৎলব এসেছে।"

"কি মৎলব, বলো ত?"

"বল্‌ছি, কিন্তু তার আগে ঐ মোমবাতিগুলি তুমি কি কাজে লাগাবে বলো।"

রেবা হাসিয়া বলিল, "এটা বুঝ্‌লে না? রাত হ'লে মোমবাতিগুলি টেবিলের চারদিকে, জ্বালিয়ে দেবো। আলো, ঘরের চারদিকে, মেজেতে, পাতার উপরে ও ফুলদানিতে পড়ে' সুন্দর দেখাবে।"

"বেশ, বেশ! কিন্তু এস আজ রাতে আমরা রীতিমত বন্ধু-ভোজ করিয়ে কালিদাসের সম্মানটা শেষ করি।"

"বন্ধু ভোজ করিয়ে?"

"দোষ কি?"

"আমরা যে গরীব।"

"রেবা, এস আজ একদিন আমরা ভুলে' যাই যে আমরা গরীব। আর বেশী লোক ত নিমন্ত্রণ কর্‌ব না।"

"কতজন?"

"এই ধরো ৭।৮ জন।"

"না। ঠিক ৫ জন। তার বেশীও নয়, কমও না।"

"কেন?"

"আমাদের আর ৫টা মালা বাকী আছে।"

সুকান্ত ও রেবা দুজনে দুজনের দিকে চাহিয়া হাসিল। ৫ জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করাই ঠিক হইল।

রেবা নিজের ও সুকান্তের গলার মালা দু-খানা খুলিয়া লইয়া অন্যগুলির সহিত জলে ভিজাইয়া রাখিল। সুকান্ত দুঃখিত-স্বরে বলিল, "খুলে' নিলে?"

"আবার রাতে সকলে মিলে' পর্‌ব, কি বল্‌ছ?"

"তুমি নিষ্ঠুর!"

রেবা সুকান্তকে ভ্যাঙাইয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সারাদিন ধরিয়া সুকান্ত ও রেবা রাতে উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত রহিল। আয়োজন বেশী নহে তাদের সামর্থ্যের মত। তবু যেন ফুরাইতে চায় না কত কল্পনা-জল্পনা, কত হাসি ও তর্ক এবং কত মীমাংসা বিহীন নালিশ যে দিনটার ভিতর বহিয়া মধুর করিয়া তুলিল, বলা যায় না।

তারা আজ পয়লা আষাঢ়কে ও পয়লা আষাঢ়ের এক কবিকে সঙ্গে-সঙ্গে অভিনন্দন করিতে যাইতেছে ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ। বিশাল জগতের মধ্যে কে তারা, কতখানি তারা? তারা আষাঢ়কে না ডাকিলে বা কালিদাসকে না মানিলে জগতে কোথাও এতটুকু ক্ষতি কারো হয় না। এ-কথা সুকান্ত-রেবা কি জানে না তারা কি জানিয়া শুনিয়া ছেলে-মানুষি করিতেছে না?

রেবা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারে না। সুকান্ত সুনিশ্চয় নয়। সে কতকটা রেবার উৎসাহের তেজে চলিয়াছে। এবং সেজন্য লজ্জা অনুভব করিতেছে।

মজা হইল এই যে শেষকালে রাত্রিটাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। অন্ততঃ সুকান্তর কাছে। সে আগ্রহের সহিত রাত্রির ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। রেবার কাছে সমস্ত দিনটাই কিন্তু পবিত্র, পয়লা আষাঢ় ও কালিদাসকে সম্মান করিবার দিন! আজিকার দিন অন্য সমস্ত দিনের মত নহে, সে যেন আজ কোথাও ফাঁক অনুভব করিতেছে না।

ক্রমে রাত্রি আসিল, মোমবাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিল সর্ব্বত্র মোমবাতির আলো প্রতিফলিত হইয়া ঘরের মধ্যে মধুর বর্ণ ও গন্ধের সমাবেশ হইল। যথাসময়ে সুকান্তের পাঁচজন বন্ধু খাইতে আসিল। রেবা সকলের সাম্‌নে বাহির হয়। সুতরাং কোন গোলযোগ হইল না। সে নিজ হাতে সকলকে এক-একখানি মালা তুলিয়া দিল এবং হাসিমুখে চাহিল।

"নমস্কার।"

"নমস্কার। আজ আমাদের পয়লা আষাঢ়!"

ওরা আষাঢ় কি করিয়া পয়লা হইতে পারে, সে-খবর পূর্ব্বাহ্নেই সকলকে দিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং বুঝিতে কারো কষ্ট হইল না।

"বেশ! বেশ!"

"আজ কালিদাসকেও আমরা সম্মান করছি। কালিদাসের ছবি ত কোথাও পেলাম না। তাই মেঘদূতকে তাঁর গৌরবের সাক্ষী করে' রেখেছি। ঐ যে ওখানে। প্রণাম করুন।"

অতিথিরা মালা পরিয়া খাইতে বসিলেন। সুকান্ত-রেবা অলক্ষিতে পরস্পর মালা-বদল করিয়াছে। রেবা আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া সকলের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত স্বামীর কপালে দিল। সুকান্ত বলিল, "তোমার কপালে আমি দেবো।"

"দাও।"

অতিথিরা বলিলেন, "আমাদেরও অধিকার আছে। আমরা দেবো।" একে-একে সকলে উঠিয়া আঙুলে চন্দন লইয়া রেবার কপাল ছুঁইল মাত্র।

সুকান্ত অস্পষ্টস্বরে বলিল, "দক্ষিণা" ?

একটা মৃদু হাসি ভাসিয়া গেল। সুকান্ত আসিয়া রেবার চন্দন-চর্চ্চা শেষ করিল। ততক্ষণে রেবা লাল হইয়া উঠিয়াছে।

খাওয়া চলিতে লাগিল, গল্প হইতে লাগিল, মোমবাতি পুড়িতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ফুলের ও খাদ্য-দ্রব্যের গন্ধ, বাতির আলো, হাসি, টুক্‌রা টুক্‌রা কথা, অর্থপূর্ণ চাহনি স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিল। আয়োজন বেশী ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় পূর্ণ ছিল। তাই সকলেই তৃপ্তি অনুভব করিল।

কি আনন্দ! কি শান্তি! এতক্ষণে সুকান্তের বুক ভরিয়া উঠিল। রেবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা বছর-বছর এম্‌নি পয়লা আষাঢ় কর্‌ব কি বলো রেবা ?"

"নিশ্চয়। আর কালিদাসকে ডাক্‌ব।"

অতিথিরা আনন্দের সহিত সায় দিল।

সেদিন আষাঢ়ের নিবিড় নিশীথে সুকান্ত-রেবা দুজনে দুজনকে নিবিড় করিয়া পাইল। বাহিরে তখন জল ঝরিয়া পড়িতেছে। দুজনেরই গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে ইচ্ছা করিতেছিল। রেবা বলিয়া উঠিল, "মা গো!

সুকান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "কি রেবা ?"

রেবা লজ্জিতভাবে বলিল, "কিছু নয়! আমার মনের মধ্যে কি যে হচ্ছে! পৃথিবী এত সুন্দর! জীবন এত মধুর! আমি মর্‌তে চাইনে, চাইনে।"

সুকান্ত সস্নেহে বলিল, "কে তোমায় মর্‌তে বলেছে, রেবা ?"

"জীবনে এ-রকম পয়লা আষাঢ় আর আসেনি, কখনো না। আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। প্রণাম করি কালিদাসকে।"

এই বলিয়া যুক্তকরে অজানার উদ্দেশে প্রণাম করিল। এইরূপে সুকান্ত ও রেবার পয়লা আষাঢ়ের উৎসব সম্পন্ন হইল। পরের দিন সকাল হইতে আবার তাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রা আরম্ভ হইল। কিন্তু পয়লা আষাঢ়কে তারা কোনোদিন ভুলিতে পারিল না।

পর বৎসর পয়লা আষাঢ় যখন ঘুরিয়া আসিল, তারা আগের দিন রাতে সমস্ত সময় ধরিয়া জল্পনা-কল্পনা করিয়া রাখিল, পয়লা আষাঢ় কি করিয়া সম্পন্ন করিবে। এবার আর সুকান্ত ইহার আয়োজনে তার সমস্ত মন দিতে লজ্জিত হইল না।

এবারকার আয়োজন আরও বহুল ও আরও সুষ্ঠু। এবার বন্ধুরা বেশী আসিল, দ্রব্যের সম্ভার কিছু বাড়িল এবং দুজনে খুব খাটিল। কিন্তু উৎসব-শেষে দুজনেরই মনে হইল, কোথায় যেন অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল, এবারের পয়লা আষাঢ় গত বারের পয়লা আষাঢের মত হইল না। সেই ফুলের গন্ধ, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ, সেই বাতির আলো, বেশী হাসি, টুক্‌রা টুক্‌রা কথা, অর্থপূর্ণ চাহনি সবই আছে। তবু স্বপ্ন-রাজ্য সৃষ্টি হইল না।

বৎসরের পর বৎসরের ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। যে-সংসারে তাহারা দু-জন ছিল সেখানে নবীন অতিথিদের

আগমন আরম্ভ হইল। সুকান্তের অবস্থার অনেক উন্নতি হইল। সুকান্ত ও রেবার জীবন আরো পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তারা প্রতিবৎসর আগের বৎসরের চেয়ে বেশী গৌরবের সহিত পয়লা আষাঢ় করে। অধিকতর যত্ন ও তৎপরতার সহিত খাটে। কিন্তু সেই যে ১৩০০ সালে ৩রা আষাঢ়ে পয়লা আষাঢ় যেমনতর হইয়াছিল তেমন আর হয় না।

তারা বলে, "সেবার যেমন শান্তি, যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম আর পাইনে কেন? আয়োজন ত কত ত্রুটিহীন করি।"

সুকান্ত বলে, "২৫ বছরে সেই পয়লা আষাঢ় পেয়েছিলাম, তার আগেও তেমন পাইনি, তার পরেও পাইনে। বোধ হয় জীবনে পাবো না।"

রেবা ক্ষুণ্নস্বরে বলে, "সব পণ্ড হ'য়ে যায়।

"কি করব বলো, রেবা।"

কিন্তু তারা পয়লা আষাঢ় ও কালিদাসকে কোন বৎস বাদ দিতে পারে না। কি জানি কোন বৎসরে সে ১৩০০ সালের পয়লা আষাঢ় আবার যদি ফিরিয়া আসে তাই উৎসব হয়। সুকান্ত, রেবা আশা ছাড়িতে পারে না।

কিন্তু ১৩০০ সালের পয়লা আষাঢ় আর ফিরিয় আসিবে না।

কেন আসিবে না? বিবাহের পর সেই প্রথম পয়লা আষাঢ়, সে উৎসব অতর্কিত অভাবিত ও আকস্মিক, সেই জন্য? না, তখন সুকান্ত-রেবা দরিদ্র ছিল সেইজন্য! না, বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়াছে, আর সুকান্ত, রেবার বয়স এবং যৌবন অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়াছে সেইজন্য! না, সেদিন সত্য-সত্য উজ্জয়িনী-শিপ্রার কালিদাস সে-ঘরে আসিয়াছিলেন, সেইজন্য? কে বলিবে?

ধ্বংস-পথের যাত্রী এরা—

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রমেশ-দা লিখিয়াছিল, কালীঘাটের কাছাকাছি ট্রাম হইতে নামিয়া এদিক্-ওদিক্ একটুখানি খোঁজাখুজি করিলেই তাহার বাসার সন্ধান মিলিবে। অজিত তাহাই করিল। হাওড়া-ষ্টেশনে ট্রেন্ আসিয়া পৌছিয়াছিল অতি প্রত্যূষে। সেখান হইতে বরাবর ট্রামে চড়িয়া কালীঘাটের কাছে আসিয়াই নামিল। বর্ষাকালের সকাল। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। দারুণ অভিমানে আকাশটা যেন ঘোম্‌টা-ঢাকা দিয়া মুখভার করিয়া আছে। অজিতের আস্‌বাব-পত্রের মধ্যে একহাতে খবরের কাগজে-মোড়া একটি ধুতি ও একখানি গাম্‌ছা, অপর হাতে রেলি-ব্রাদার্সের একটি ভাঙা তালি-দেওয়া ছাতা। পকেট্ হইতে রমেশ-দার চিঠিখানি বাহির করিয়া রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বরটা আর-একবার সে পড়িয়া লইল। পথের উপর কাদা জমিয়াছে, তাহার উপর মোটরের উৎপাত।

কোনরকমে জামা কাপড় বাঁচাইয়া পথের একপাশ ধরিয়া সে চলিতে লাগিল। যাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কেহ বলে, জানিনে; আবার কেহ বলে, অন্য কাউকে জিজ্ঞেস্ করুন। অবশেষে একজন দয়া করিয়া বলিয়া দিল, এই রাস্তা ধরে' বরাবর গিয়ে বাঁ-দিকে একটা গলি, তারই একটু আগে, এইদিকে গিয়ে ওইদিকে বেঁকে সোজা চলে' যান।

বাঁ দিকে, গলিটার ভিতর ঢুকিয়া এদিক্-ওদিক্ যে-দিকে যায়, গলির পর গলি আসিয়া তাহাকে যেন বারে-বারে পথ ভুলাইয়া দিতে থাকে। অনেক কষ্টে এই গলির গোলক-ধাঁধা হইতে বাহির হইয়া

ভোরের আলোয়

চিত্রকর— দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

Prabasi Press, Cal.

অজিত একটা ফাঁকা মাঠের উপর আসিয়া পড়িল। বৃষ্টি তখন ধরিয়া গেছে। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, এই ফাঁকা আলো-বাতাসে আসিয়া সে যেন একটুখানি হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। মাঠের সুমুখে পচা পানায়-ভর্ত্তি একটা ছোট পুকুর, তাহারই চারিপাশে অনেকখানা জায়গা জুড়িয়া খোলার বস্তি। তাহারই ও-পাশে কয়েকটা নারিকেল গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আবার সারি-সারি বাড়ী আরম্ভ হইয়াছে। বস্তির চতুঃসীমায় রাস্তার নাম বা নম্বরের কোনও বালাই ছিল না, খাপ্‌রার ছোট-ছোট বাড়ীগুলার পাশ দিয়া কর্দ্দমাক্ত সরু একটা পায়ে-চলার পথ সোজা চলিয়া গেছে।

পথটায় যেমন কাদা, তেম্‌নি দুর্গন্ধ। বাঁশের ছাতির বাঁটটা মাটিতে টিপিয়া টিপিয়া অজিত অতি সাবধানে সেই পথ দিয়া চলিতে-চলিতে হঠাৎ একটা বহু পুরাতন ইঁট-বাহির-করা ভাঙা-বাড়ীর উঠানে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি একটা দোতলা বাড়ী, সুমুখে কাঠের রেলিং-দেওয়া একটুখানি বারান্দা, তাও আবার রেলিং ভাঙ্গিয়া স্থানে-স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—আবার কোথাও বা আস্ত আছে; কুলি-ধাওড়ার মত উপর-নীচে সারি-সারি অনেকগুলি অন্ধকার ঘর। সম্মুখে একটুখানি উঠান বাদ দিয়া তাহারই সম-সমান্তরালে ঘরের আর-একটা সারি চলিয়া গেছে কিন্তু তাহার আর দোতলা নাই,—ওপারের ভাঙা বারান্দা হইতে এ-পারের ছাতে আসিবার জন্য মাঝে মাঝে সেতু প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উঠানের মাঝে দুইটা জলের কল,—এ-ধারে একটা, আর ওই ও-ধারে একটা। কিন্তু কল দুইটার চারিদিকে হিন্দুস্থানী, খোট্টা, ভাটিয়া, উড়িয়া, বাঙ্গালী, নানাজাতীয় বিস্তর পুরুষ-রমণী, লোটা, টব, বাল্‌তি ইত্যাদি লইয়া আপন-আপন-ভাষায় চেঁচামেচি করিয়া যেন হাট বসাইয়া দিয়াছে। অজিত একবার এদিক্-ওদিক্ বেশ ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল,—কোথাও-বা স্যাক্‌রার ঠক্-ঠকানি সুরু হইয়াছে, কোথাও-বা কামার-শালার হাপর্ চলিতেছে,—একটা লোক লালরঙের একটা গরম লোহা সাঁড়াসী দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে, দুইদিক্ হইতে দুইজনা তাহার উপর লোহার হাতুড়ি মারিয়া আগুনের ফিন্‌কি উড়াইতেছে। কোনও ঘরে বা ধোপার ইস্ত্রি চলিতেছে, আর তাহারই একটু দূরে একটা বন্ধ-ঘরের দরজার গায়ে ভাঙা টিনের উপর চা-খড়ি দিয়া লেখা রহিয়াছে,—ষ্টীল ট্রাঙ্ক, বুটজুতা, চটি জুতা, সুটকেস্। মিস্ত্রী—সুখন্‌লাল রুইদাস। সুতরাং এই প্রকাণ্ড বাড়ীটা কোনও ভদ্র-গৃহস্থের পর্দ্দাওয়ালা বাড়ী নয়, এবং তাহার এই অন-ধিকার প্রবেশ লইয়া যে কোনপ্রকার হাঙ্গামা হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়া অজিত কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু আজ এই প্রথম কলিকাতায় আসিয়া এখনও যে রমেশের উদ্দেশ মিলিল না, কোথায় গেলে যে মিলিবে,—মিলিবে কি মিলিবে না, এই দুশ্চিন্তায় তাহার গায়ে যেন জ্বর আসিল। চলাচলের সুবিধার জন্য জল-ছপ্-ছপে উঠানটার উপর সারি দিয়া ইঁট পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই একটা ভাঙা ইঁটের উপর অতিকষ্টে দুইটা পা রাখিয়া একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক, ঘটি হাতে করিয়া জল লইবার জন্য কলতলার জনতার একপাশে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চেহারা অত্যন্ত কদাকার,—পেটটা যেমন মোটা গলাটা আবার তেম্‌নি সরু, মাথার উপর প্রকাণ্ড একটা টাক, চোখ দুইটা নিতান্ত ছোট, নাকের নীচে বিড়ালের মত খাড়া হইয়া যে কয়েকটি গোঁফ্ উঠিয়াছে, দূর হইতে অনায়াসে সেগুলি গণিতে পারা যায়। অজিত একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যাবার পথ কোন্‌দিকে মশাই?

হাতের ঘটিটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তিনি যেন একটুখানি বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, চলে' যাও এইদিকে সোজা। ওই যে ধোপা-বৌএর দোরে গাধাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই পাশে ফটক্।

অজিত চলিয়া যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, পরাণ মণ্ডলের গলিটা কোন্ দিকে গেলে পাবো মশাই?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরাণ মণ্ডল্‌স্ লেন? এইটে এইটে,—কেন? ক' নম্বর?

অজিত বলিল, পাঁচের পর দুই, তার পর এফ্।

নম্বরটা শুনিয়া ভদ্রলোক অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, সে ত আমারই ইম্পিরিয়াল্ হোষ্টেল,—ওই যে দোতালায়। বলিয়াই তিনি আর একবার তাঁহার হাতের ঘটিটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া সেই ঝুলিয়া-পড়া ভাঙা বারান্দাটার পাশে কয়েকটা ঘর দেখাইয়া দিলেন।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এত শীঘ্র যে বাড়ীর সন্ধান মিলিবে অজিত তাহা ভাবিতে পারে নাই, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রমেশ চক্রবর্ত্তী কোন্ ঘরে থাকেন ?

তিনি বলিলেন, রমেশ চকোত্তি ? আসুন, আমার কাছে সরে' আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া আর-একবার তিনি তাঁহার হাতের ঘটিটা তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন, সাম্‌নের পাঁচখানা ঘর বাদ দিয়ে, এই যে দেখ্‌ছেন, জানালার পাখী-ভাঙা এই ঘরটা, এইখান থেকে আমার হোষ্টেল আরম্ভ হয়েছে। শুনুন্ এইখান থেকে,—রাম, দুই, তিন, তার পরেই যে দেখ্‌ছেন রুম্ নম্বর-ফোর, ওই ঘরে গিয়ে দেখুন, পশ্চিম দিকের এক কোণে মাদুর-বিছানো যে সিট্‌খানা, সেইখানা তার। ব্যস্, চলে' যান্ এইবার সোজা এই সিঁড়ি ধরে'—কিন্তু দেখ্‌বেন, একটুখানি বাঁ-পাশ চেপে' যাবেন মশাই, সিঁড়িটা একটুখানি নড়্‌বড়ে' হ'য়ে রয়েছে, বুঝ্‌লেন ?

এক-টানে এই এতগুলা কথা বলিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। অজিত অতি কষ্টে, অতি সাবধানে সিঁড়ি ভাঙিয়া ইম্পিরিয়াল-হোষ্টেলের সেই রুম্ নম্বর ফোরের দরজায় গিয়া ডাকিল, রমেশদা !

রমেশ তখন তাহার জুতায় কালি-ক্রশ ঘষিতেছিল, মুখ তুলিয়া দোরের গোড়ায় অজিতকে দেখিয়া বলিল, কে, অজিত ? দেশ থেকে আস্‌ছিস্ ? আয়। বলিয়া আবার সে তাহার নিজের কাজে মন দিল।

কর্দ্দমাক্ত ক্যান্‌ভাসের জুতা জোড়াটি খুলিয়া অজিত তাহার মাদুরের একপাশে গিয়া বসিল। সম্মুখে ওই একটি দরজা ব্যতীত ঘরের ভিতর আলো-বাতাস প্রবেশ করিবার অন্য কোনও পথ ছিল না, তাহার উপর মেঘ্‌লা আকাশে সূর্য্যের রশ্মিটুকুও ঢাকা পড়িয়াছে, কাজেই, ঘরের ভিতরটা বেশ ভাল করিয়া নজরে পড়িতে অজি একটুখানি দেরী হইল। দেখিল, সেই বায়ুলেশ অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে আরও তিনখানা 'সীট্' প য়াছে। তাহার উপর, প্রত্যেকের ছোট-খাটো অ গুলি করিয়া আস্‌বাব,—মাটিতে যাহাদের জায়গা হয় ন তাহারা দেওয়ালে উঠিয়াছে, এম্‌নি করিয়া ঘরের এবং দেওয়ালে কোথাও এতটুকু তিল-ধারণের স্থান না একটা মাদুরের উপর দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে ফিরাইয়া, একজন লোক ক্রমাগত ওঠ্-ব'স্ করিয়া করি ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছিল। একজন যুবক দে ঠেস্ দিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতে-কর বিড়ি টানিতেছিল, আর একটা মাদুর খ পড়িয়াছিল।

রমেশের শয্যার একপার্শ্বে দেয়ালের গায়ে এক মাসিক-পত্রিকা হইতে কাটা একটি বিবেকানন এবং একটি সিক্ত-বসনা নারীর, দুইখানি রঙীন ছ পাশাপাশি টাঙ্গানো ছিল। জুতা ক্রশ্ শেষ ক রমেশ তাহার জুতা-জোড়াটি তাহারই নীচে ঢু পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিল।

রমেশকে এমনভাবে চুপ করিয়া থাকিতে দে অজিত কেমন যেন একটুখানি বিব্রত হইয়াই ভাবি ছিল, এখানে আসিয়া উঠা তাহার উচিত হয় ন চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হয়ত রমেশ তাহাকে আসি লিখিয়াছিল, সে যে সত্যসত্যই এখানে আসিয়া হা হইবে তাহা সে ভাবে নাই। অজিত বলিল, রমেশ তুমি ত আপিসে যাবে ?

রমেশ এইবার মাদুরের উপর ভালো করিয়া চা বসিয়া বলিল, হাঁ, আপিসে যাবো বই কি !—তাহার উপরের কড়িকাঠের দিকে একবার তাকাইয়া কিয়ৎ চিন্তা করিয়া বলিল, এমন হট্ করে' চলে' এলি অজি কিন্তু—আচ্ছা, আপিসে-টাপিসে ঘুরে' ফিরে' দ্যা আমিও দেখি সন্ধান করে'—পঁচিশ-ত্রিশ টাকার মত এক কিছু মিলে' যেতেও পারে। ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ কর্ কি হবে ? চাক্‌রীর বাজার দেখ্‌তে হবে ত ? কি বলো হে প্রোফেসার ?

সুমুখের মাদুরে বসিয়া যে-ছোক্‌রা বিড়ি টানিতেছিল, উত্তরের আশায় রমেশ তাহার দিকে তাকাইল।

প্রোফেসারের বিড়ি টানা তখন শেষ হইয়াছিল, কিন্তু গান তখনও থামে নাই। প্রথম যেদিন সে এই ইম্পিরিয়াল হোষ্টেলে আসে, সেদিন সে এই বলিয়া পরিচয় দেয় যে, সে এম্‌-এ পাস করিয়া সম্প্রতি কোন্‌ একটা কলেজে প্রোফেসারি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে —ভালো দেখিয়া একটা বাড়ী না পাওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই থাকিবে। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাহার সে চালাকি একদিন ধরা পড়িয়া গেল। সে-সব অনেক কথা। তখন হইতে সকলেই তাহাকে প্রোফেসার বলিয়া ডাকে, অন্যান্য বিষয়েও এখানে তাহার যথেষ্ট সুনাম আছে। প্রায়ই সে ইংরেজিতে কথা বলে, চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু বাহিরের কায়দা-কানুন্‌ তাহার এম্‌নি লেফাফা-দুরস্ত,—দেখিলে বুঝিবার জো নাই যে, লোকটা বেকার।

রমেশের কথাটা সে ভালো শুনিতে পায় নাই, বলিল, I beg your pardon রমেশ-বাবু, কি বল্‌ছিলেন?

রমেশ বলিল, এই অজিত ছোক্‌রা ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পাশ করে' এল চাকরীর সন্ধানে, তাই বল্‌ছিলুম, চাক্‌রীর বাজার—

প্রোফেসার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর হাসি থামিলে অজিতের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, I graduated myself in the year of our Lord nineteen-twenty, but still not engaged.

এমন সময় 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে-বলিতে অজিতের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই কল-তলার ভদ্রলোক ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং দরজার একপাশে যে মাদুরটা খালি পড়িয়াছিল, তাহারই একধারে জলভর্ত্তি ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া একসঙ্গে সকলকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিলেন, আর চলে না দেখ্‌ছি,—আমাদের জাত-ধর্ম্ম আর কিছু রইল না মশাই...

প্রোফেসার বলিয়া উঠিল, কি হ'ল ম্যানেজার-বাবু?

ম্যানেজার-বাবু সক্রোধে কহিলেন, হ'ল? যা হবার, তাই হ'ল। ওই ব্যাটা সুখন্‌লাল, না, আমার ইয়ে লাল! ব্যাটা মুচি, ব্যাটা চামার!...বল্‌লুম, ব্যাটা নিস্‌নে, নিস্‌নে, তোদের জন্যে রাস্তায় কল রয়েছে, সেই খান্‌ থেকে জল ধরে' আন্‌! তা না ব্যাটা হাঁ হাঁ কর্‌তে কর্‌তে নিলে একঘটি জল ধরে'। তাই নিবি ত নে, আল্‌গোছেই নে রে বাপু, তা না কলের বাঁশটাও ছুঁয়ে দিয়ে গেল।—এসব হচ্ছে পয়সার গরম। ছোট জাতের পয়সা হয়েছে কিনা...

যে-লোকটি ব্যায়াম করিতেছিল, সে তাহার উঠা-বসা বন্ধ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ! বলেন কি?

কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া ম্যানেজার-বাবু বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা বাবা, আমিও দেখে' নিচ্ছি, কিছু কর্‌তে পারি কি না! আজই একটা 'মিটিং কল্‌' করি, তার পর হোষ্টেলের সবাই মিলে' একবার ভালো করে' বলা যাক্‌,—তা'তেও না শোনে, ব্যস্‌! প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ। সব বন্ধ করে' দেবো। বস্তির ওই উড়ে, খোট্টা, স্যাক্‌রা, কামার, ধোপা-টোপা সব বন্ধ। দেখি, আমাদের কলে কে জল নিতে পারে,—কত বড় মরদ্‌কা বাচ্ছা,—না, কি বলো হে পঞ্চানন?

অনেকক্ষণ হইতে কস্‌রৎ করিয়া পঞ্চানন বোধ করি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাই সে একগ্লাস ঠাণ্ডা জলের সন্ধানে তাহার চটা-উঠানো কলাই-করা টিনের গ্লাসটি হাতে লইয়া পাশের ঘরে উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সেই গ্লাস-সুদ্ধ হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আমার এই এক্‌সার্‌সাইজ-করা হাতের একটি ঘুষির চোটে বাবাজীকে 'হালিম্‌' খাইয়ে দিতে পারি, জানেন? আপনার ওই সুখন্‌লালকে দুখনলাল বানিয়ে ছেড়ে দেবো বাবা হেঁ-হেঁ! —এই বলিয়া সে তাহার উপরের এক পাটি দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে বীরদর্পে চাপিয়া ধরিল।

শেষ পর্য্যন্ত তাই হবে। বলিয়া ম্যানেজার-বাবু দেয়ালের উপরের একটি কাঠের তাক্‌ হইতে ঔষধের শিশির মত কাগজের দাগ-কাটা একটি শিশি বাহির করিলেন।

প্রোফেসার বলিল, ওকি আপনার oilএর শিশি বেরুলো নাকি?

ম্যানেজার-বাবু কহিলেন, হাঁ। কি আর করি? আমায় ত আবার গঙ্গায় ছুট্‌তে হবে কিনা! আপনাদের কি মশায়! মুচি, মোছলমান, যার ছোঁয়াই হোক্, হয়ত ওই চৌবাচ্চার জলেই চালিয়ে দেবেন, এখানে আর কে দেখ্‌তে আস্‌ছে? কিন্তু প্রোফেসার, ভগবানের চোখ ত এড়াবার জো নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ—

প্রোফেসার নিজেও ব্রাহ্মণ। কাজেই এ প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, well ম্যানেজার-বাবু, একটা question আমি আপনাকে রোজ বল্‌ব বল্‌ব ভাবি, but I forgot altogether। আপনি যে ওই তেলের শিশিটায় কাগজের দাগ কেটে রেখেছেন, ও কিসের জন্যে?

—সতর্কের বিনাশ নেই প্রফেসার! খাঁটি সরষের তেল বাবা, আজকাল অগ্নিমূল্য,—তেরটি গণ্ডা পয়সা গাঁট্‌ থেকে খসাও, তবে একটি সের তেল পাবে। এই দেখুন,—বলিয়া ম্যানেজার-বাবু তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি শিশির গায়ের একটি দাগের নীচে চাপিয়া ধরিয়া অতিশয় সতর্কতার সহিত তাঁহার বাম করতালুর উপর একদাগ তেল ঢালিয়া লইলেন এবং মাটিতে পড়িয়া যাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেই হাতটা একবার তাঁহার কেশবিরল মস্তকে এবং বার-কয়েক তাঁহার গম্বুজাকার উদরের উপর বুলাইয়া লইয়া শিশির ছিপিটি অতি সাবধানে বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, এইবার এই পুরোপুরি চারটি দাগ রইলো আমার গোনা। কই একবিন্দু এবার কেউ নিক দেখি ঢেলে, তড়াক্‌ ধরে' ফেল্‌ব। একটু বুঝে-সুঝে' চল্‌তে হয় প্রোফেসার, তা নইলে কি আর এই ইম্পিরিয়াল হোটেল খানা খুল্‌তে পারতুম ভায়া! চলি এবার। হরিবোল! হরিবোল!

গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া ম্যানেজার গঙ্গাস্নানে বাহির হইতেছিলেন, রমেশ বলিল, অজিতের নামটা খাতায় লিখে' দিয়ে গেলেন না? আজ সে এইখানে খাবে, ঠাকুরকে বলে' দিয়ে যান।

—ও হো, আপনার 'ফেরেণ্ড' এসেছে যে! তা বেশ, বেশ। 'পার্‌মিনিট্‌' না 'টেম্‌পোরালি'?

রমেশ বলিল, যতদিন থাকে, দিনকতক খ এইখানেই।

—তেল মেখে' খাতাপত্র ছুঁতে ত পারিনে মশ আচ্ছা, গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে'এসেই,—নামটি কি বল্‌লে

—অজিতনাথ লাহিড়ী।

—আচ্ছা, আমি 'রেজেষ্টলি' করে' নেবো। ব তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

স্নানাহারের পরেই ইম্পিরিয়াল হোটেল খালি ক প্রায় সকলেই আপন-আপন কাজে বাহির হইয়া গে রমেশ গেল, কুঞ্জিগীর গেল, এমন-কি বেকার প্রোফেসার একখানি কোঁচানো ধুতি পরিয়া, তাহার ইস্ত্রি-করা পরিষ্ক জামাখানি গায়ে দিয়া, গত সপ্তাহের একখানি ইংরা দৈনিক কাগজের তারিখের জায়গাটা অতিশয় দক্ষত সহিত নীচের দিকে মুড়িয়া লইয়া বাহির হই ম্যানেজার-বাবুর আপিসের বালাই ছিল না। গঙ্গাস্নানে পর নীচের সেই অন্ধকার রান্নাঘরের কোণ ঘেঁসিয়া এক পিড়ির উপর প্রায় ঘণ্টাখানেক উবু হইয়া বসিয়া-ব পরম পরিতৃপ্তির সহিত তিনি যত পারিলেন আ করিলেন, তাহার পর ঘটি ভরিয়া গঙ্গা হইতে যে জল আনিয়াছিলেন তাহাতেই আচমন শেষ করিয়া গান গাহি গাহিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। গানের ভাবার্থ এ যে, তাঁহার আহার শেষ হইয়াছে, এইবার তিনি মাদুরে উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিবেন, নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বে তিনটার সময়, কলে তখন জল আসিবে এবং ওই ব্যা মুচিকে তখন তিনি দেখিয়া লইবেন, মারের চোটে তাহ জল লওয়া আজ বাহির করিয়া দিবেন। এই কথাগুলি সে এক-বিষম অসমমাত্রিক গদ্যকবিতার ছন্দে তৎক্ষণ মুখে-মুখে সাজাইয়া লইয়া তাহাতে যেরূপ স্বর-সংযো করিয়া তিনি চেঁচাইতেছিলেন, তাহাকে যদি শ্রোত কর্ণেন্দ্রিয়ের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার না বলিয়া সঙ্গী বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে ধোপা-বৌ-এর দোরে-বা ওই গর্দ্দভ-নন্দনের কণ্ঠটিকে শ্রুতি-মধুর এবং স্বর-ব্রহ্ম বলিয়া উপায় নাই।

আহারাদি শেষ করিয়া অজিত ইতিপূর্ব্বেই রমেশে মাদুরের উপর আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

ম্যানেজার-বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়াই কহিলেন, আমার গান শুনে' মনে-মনে হাস্‌ছেন নাকি—ইয়ে বাবু?

শুধু হাসি নয়, তাঁহার এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত, অজিতের মনে করুণ এবং রুদ্র রসেরও উদ্রেক করিয়া দিয়াছিল, তাই সে কি উত্তর দিবে কিছুই ঠাহর করিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের পানে একবার তাকাইবামাত্র, তাহাকে সে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের কুণ্ঠা হইতে অব্যাহতি দিয়া ম্যানেজার-বাবু বলিয়া উঠিলেন, বুঝ্‌ছেন না মশাই, এক-সঙ্গে দুই কাজই হ'য়ে গেল। গান গাওয়াকে গান গাওয়াও হ'ল, আর ওই বেজাত ব্যাটা বিধর্ম্মী চামারটাকে শুনিয়ে দেওয়াও হ'ল। সে কি আর বুঝ্‌তে পারেনি ভাব্‌ছেন? ঠিক্ টের পেয়েছে। টিন্ পিটোতে পিটোতে যে-রকম কট্‌মট্ করে' সে আমার মুখের পানে একখানা চাউনি হান্‌লে, ভাব্‌লুম, আসে বুঝি ব্যাটা হাতুড়ি নিয়েই তেড়ে!...সাধে কি আর তাড়াতাড়ি উপরে এসে গানখানা ধরে' দিলুম, মশাই? কই, আসুক্ ত দেখি এইখানে,— একবার মজা বুঝিয়ে দিই তা হ'লে। এ আমার নিজস্ব যুরিস্‌ডিক্‌সন্ (jurisdiction) বাবা,—দশটি বছরের লীজ্ (lease). এই বলিয়া তিনি তাঁহার লালরঙের ময়লা-পড়া এবড়ো-খেবড়ো দাঁতের দুইটি পাটি বাহির করিয়া হাসিতে সুরু করিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার দুই চোয়াল বাহিয়া পানের কস্ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু তাঁহার এই সারগর্ভ কথাগুলি বুঝিবার পক্ষে অজিত যে এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাহার সেই অসাধারণ গম্ভীর মুখখানা দেখিয়াই সে-কথাটা বুঝিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না; কাজেই অরসিক এই নাবালকটার সহিত বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার মাদুরের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন এবং যত্নরক্ষিত একটি ফাঁকা দিয়াশালাইএর বাক্স হইতে কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, ঘুমিয়ে-টুমিয়ে যাই ত খাবার সময় আমায় উঠিয়ে দিয়ে যেও।

—আমি এক্ষুণি চল্‌লাম। বলিয়া অজিত উঠিয়া তাহার জুতা-জোড়াটি পায়ে দিতে লাগিল।

—আবার আস্‌ছ ত? রাত্রের খাবার—

—আজ্ঞে হাঁ, আসব। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। বারান্দাটা পায়ের ভরে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অতি সাবধানে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়িতে নামিবার পূর্ব্বে অজিত একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই ম্যানেজার-বাবুর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল; তিনি তখন দরজার চৌকাঠের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইতেছিলেন। নীচে সুখন্‌লাল মিস্ত্রির হাতুড়ি ও টিনের আওয়াজ তখনও থামে নাই এবং বোধ করি বা সেই কারণেই তিনি তাঁহার সেই জানালাহীন অন্ধকার ঘরের একমাত্র দরজাটিও তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতর হইতে সশব্দে খিল আঁটিয়া দিলেন।

* * * *

পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া অজিতের যাইবার স্থান কোথাও ছিল না, তাই সে পথে ঘুরিবার সঙ্কল্প লইয়াই বাহির হইল। রৌদ্রের তেজে ছোট রাস্তার কাদা তখন কতক শুকাইয়াছে, কতক বা শুকায় নাই, আজিকার প্রভাতে যে বর্ষা নামিয়াছিল, বড় রাস্তাগুলা দেখিলে সে-কথা বুঝিবার উপায় নাই। এম্‌নি একটা বড় রাস্তা ধরিয়াই অজিত পথ চলিতেছিল। দুই দিকের প্রকাণ্ড বাড়ীগুলার পাশ দিয়া চলিতে-চলিতে তাহার নিজের অবস্থার কথা সে যেন ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া গেল। দু'চার দিনের মধ্যেই একটা যা হোক্-কিছু চাকরির চেষ্টা দেখিয়া কিছু অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলে যে, তাহাকে এইসব বড় বাড়ীর ছায়ার নীচে পড়িয়াই অনাহারে মরিতে হইবে, সে-কথা তাহার মনে হইল না। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল, পথের পাশেই লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা একটা প্রকাণ্ড পার্কের ভিতর অসংখ্য ভিক্ষুক জড় হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কোন্ একজন বড়-লোকের নাকি মৃত্যু হইয়াছে এবং আজ তাঁহার শ্রাদ্ধের দিনে এইসব কাঙালীদের নাকি ভোজন করানো হইবে। একটা গাছের ছায়ার তলায় রেলিং ধরিয়া অজিত তাহাই দেখিতে লাগিল। পার্কের একটা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কত লোক আসিতেছে, এখনও যে কত

আসিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই,—পার্ক্ ভরিয়া গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত ভিক্ষুকের দল ক্রমাগতই আসিয়া জড় হইতেছে। মনে হইতেছিল, স্থান সঙ্কলান হইবে না, খবরও দেওয়া হয় নাই, নতুবা গোটা ভারতবর্ষটাই আজ এই খোঁয়াড়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে পারে।

কত-রকমের কত ভিক্ষুক,—বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, শিশু,—কেউ কাণা, কেউ খোঁড়া, ব্যাধিগ্রস্ত, অথর্ব্ব, নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, দারিদ্র্যে নিপীড়িত, ক্ষুধায় আর্ত্ত,—আহারের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া সকলে হাঁ হাঁ করিতেছে। কাহারও অঙ্গে শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্র,—দুইদিন পরে তাহাতে আর লজ্জা নিবারণ হইবে কি না সন্দেহ, আবার কাহারও বা সেই প্রাণান্তকর দুঃসময় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দুর্ভাবনার প্রান্তসীমায় আসিয়া একেবারে মরীয়া হইয়া তাহারা যেন লজ্জাকে লজ্জা দিবার জন্যই অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। বিকৃত, রুক্ষ, কদাকার-মূর্ত্তি, কাহারও-বা অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালের উপর ক্ষুধিত সে দুটা জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকানো যায় না;—একটা গাছের তলায় রুগ্না কঙ্কালসার একটা মেয়ে তাহার কোলের-ছেলেটাকে স্তন্য দিতে-ছিল; কিন্তু প্রাণপণে চুষিয়াও এক-ফোঁটা দুধ না পাইয়া ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া যতই ককাইয়া উঠিতেছে, মেয়েটা ততই তাহাকে এ-কোল্ ও-কোল করিয়া তাহার দুগ্ধহীন স্তনের বোঁটাটা ছেলের মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া জোর করিয়া তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছে···পার্কের পাশে একটা ছোট প্রাচীরের ওপারে একটা বড় বাড়ীর উঠানে তাহাদের জন্য আহার প্রস্তুত হইতেছিল। অপেক্ষাকৃত যাহারা সবল, প্রাচীরের ভাঙা ইঁটের উপর দাঁড়াইয়া ও-পাশে উঁকি মারিয়া এক-একবার তাহারা তাহাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি হানিয়া দেখিয়া লইতেছিল,—যাহারা উঠিতে পারিতে-ছিল না, ছুটিয়া তাহারা তাহাদের কাছে আসিয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিল। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র তাহাদের মাথার উপর দিয়া ক্রমশঃ অপরাহ্নের দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল,—কখন্ আসিয়াছে, কত দূর হইতে আসিয়াছে তাহারা, কে জানে······পেট-গুলা তাহাদের বেহালার মত ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে, ক্ষুধার জ্বালায় নাড়ীতে নাড়ীতে পাক ধরিয়া ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলা রৌদ্রদগ্ধ কচি পাতার মত নেতাইয়া পড়িয়াছে,—শুষ্ককণ্ঠে 'দাও' 'দাও' করিয়া হাঁকিয়া-হাঁকিয়া এইবার ক্রমশঃই যেন তাহারা অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় খাবার আসিল। এক-একটা শালপাতার ঠোঙায় করিয়া সন্দেশ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে একটি করিয়া আম এবং একটি করিয়া দো-আনি, বাহির হইবার সময় প্রত্যেকের হাতে-হাতে দেওয়া হইবে। ভিতরে ঢুকিবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইবার জন্য পার্কের আর-একটা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। তৎক্ষণাৎ একটা সাড়া জাগিয়া গেল,—মুহূর্ত্তমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত জনসঙ্ঘ ত্রস্ত-বিচলিত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ হুমড়ি খাইয়া একেবারে দরজার নিকট আসিয়া পড়িতে লাগিল। আহার্য্যগুলি কেহ-বা আঁচলের তলায়, কেহ বা দুই হস্তের দৃঢ়মুষ্টিতে যখের-ধনের মত অতিশয় সযত্নে চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়াও ফুটপাথ এবং রাস্তার উপর তাহাদের ভিড় জমিতেছিল; অনেকেই তাহাদের পথের সাথীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, অনেকেই আবার পুনঃ-প্রবেশের পথ খুঁজিতে আরম্ভ করিল, এবং কোন্ আমটা পচা, কোন্‌টা কাঁচা, কাহার বড়, কাহার ছোট,—এই লইয়া বুড়োবুড়ী হইতে ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত চেঁচামেচি করিতে লাগিল। এই সুযোগে কে-একটা লোক একটি ছোট মেয়ের হাত হইতে তাহার খাবারের ঠোঙাটা ফস্ করিয়া তুলিয়া লইয়া ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়িল। মেয়েটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িতেই, পশ্চাৎ হইতে আর-একটা জনস্রোত হু হু করিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। এই দুই দলের মাঝখানে চাপা পড়িয়া মেয়েটা এম্‌নিভাবে তলাইয়া গেল যে, বেচারা একেবারে মারা পড়িবার জো হইল। অজিত আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, জামার আস্তিন গুটাইয়া ভিড় ঠেলিয়া সেও ঢুকিয়া পড়িল এবং মিনিট দুই

তিন পরে টানা-হেঁচ্ড়া করিয়া মেয়েটাকে যখন বাহির করিয়া আনিল, তখন সে তাহার একহাতে দো-আনিটি এবং অন্য হাতে আমটি তাহার বুকের কাছে দাঁতে দাঁত দিয়া কিট্‌মিট্ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া হাঁপাইতেছে,—আমের আঁটি ও খোসাটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, এত লোকের চাপাচাপিতে চ্যাপ্‌টা হইয়া রসটুকু তাহার অঙ্গ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

রাস্তার জনতা হইতে কুড়ি-বাইশ বছরের একটি গৌরবর্ণ শীর্ণা মেয়ে 'অতসী' 'অতসী' বলিয়া পাগলিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। মেয়েটা এত দুর্ব্বল যে এইটুকু তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়াই সে একেবারে হাঁপাইয়া পড়িল। ছিন্ন একখানা মলিন বস্ত্রে গায়ের পাজ্‌রাগুলা সে কোনরকমে ঢাকা দিয়াছে, চোখ দুইটা ডাগর, নাকটা খাঁড়ার মত উঁচু, গালদুইটা তোব্‌ড়া, মুখে দু-একটা বসন্তের দাগ, সীঁথিতে সিঁদুর। দারিদ্র্য ও রোগ যেন তার যৌবনের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিয়া তাহাকে পথে বসাইয়া দিয়াছে,—রৌদ্রদগ্ধ অর্দ্ধপক্ক ফলের মত শুষ্ক বৃন্তের ডগায় ঝুলিয়া, সে যেন যাই-যাই করিতেছে, আর-একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা দিলেই টুপ্ করিয়া খসিয়া পড়িবে!···

অতসী তাহার মাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া অজিত বলিল, লোকজনের চাপে পড়ে', গিয়েছিল এখনি—

—বল্‌লাম আমার সঙ্গে আয়, তা না দুষ্ট মেয়ে,—বলিয়াই ক্রন্দনরতা অতসীর পিঠের উপর মেয়েটি কসিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, চড় খাইয়া অতসী যত না আহত হইল, মেয়েটির রোগ-শীর্ণ দুর্ব্বল হাতটাতেই তার [illegible] লাগিল বেশী।

মেয়েটি বলিল, কেমন? খাবার-টাবার সব নিয়েছে কেড়ে? বেশ করেছে! আয়! বলিয়া সে অতসীর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে ফুট্‌পাথ হইতে তাহাকে পথের উপর নামাইয়া দিল। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে মেয়েটি অজিতের মুখের পানে একবার তাকাইল, কিন্তু সেই একটি সকরুণ চোখের চাহনির মধ্য দিয়া মানুষ যে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা এমন সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে অজিতের তাহা জানা ছিল না। অতসীর কাঁধের উপর একটি হাত রাখিয়া মেয়েটি অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

গাছের শাখায় কাকের কোলাহল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। খাবার গন্ধ পাইয়া হ্যাংলা কুকুর-গুলা তখন পার্কের আশে-পাশে এবং 'ডাষ্ট্-বিনের' ধারে-ধারে জিভ বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল··· বাসায় ফিরিবার জন্য অজিত হাঁটিতে সুরু করিয়াছে, এমন সময় ঠিক তার চোখের সুমুখে একজন অন্ধের হাত হইতে তার খাবারের ঠোঙাটি একটা চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। অন্ধ বোধ করি পাগল ছিল। যে-ছোঁড়াটা তাহার বাঁ-হাতের লাঠি ধরিয়া তাহাকে পথ দেখাইতেছিল, তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লাঠিটা তাহার সুমুখের অন্ধকারে সে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল,—রাগে কি-যেন বলিতেও গেল, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড চিলটার তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে অন্ধ ভিক্ষুকের ডান-হাতটা তখন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেছে—সহসা তাহারই যন্ত্রণা অনুভূত হইতেই তার দৃষ্টিহীন সেই সাদা চোখ দুটা দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, হাত-পা ছুঁড়িয়া রুদ্ধ-অভিমানে সে তার চুলগুলা হাত দিয়া টানিতে-টানিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, ছাখ্ ভাই, দাখ্ মান্‌কে······ উঃ! বাবা রে—

কিন্তু তার হাতের ক্ষতে যে খুন্ ঝরিতেছিল, অন্ধের চোখে তা ধরা পড়িল না,—দেখিলে বোধ করি সে শিহরিয়া থামিয়া যাইত···

সোজা পথ ভুলিয়া বাঁকাপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজিত যখন বাসায় ফিরিল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। সেই প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ীটার ফটকের পাশে কর্পো-রেশনের একটা গ্যাশবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার তলায় শুইয়া একটা ষাঁড় ঘন-ঘন কান নাড়িয়া জাবর কাটিতেছে, আর তাহার সেই বিরাট্ বপুর আড়ালে বসিয়া আবার কেহ বা তাহার গায়ের উপরে আরামে ঠেস্ দিয়া কয়েকটা ছোক্‌রা তাস পিটাইয়া বোধ করি জুয়া

খেলিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহাদের পাশ কাটিয়া অজিত ভিতরে প্রবেশ করিল। আধো-আলো, আধো-অন্ধকার উঠানের একপাশে ধোপা-বৌএর ঘরের ভিতরে তাহারা দুই স্বামী-স্ত্রীতে কাপড় ইস্ত্রি করিতেছিল, এদিকের একটা ঘরে উড়িয়াদের তখন 'রামলীলার' 'রিহার্স্যাল্' চলিতেছে,—স্যাকরা কয়েকজন হাতুড়ি ঠুক্ ঠুক্ করিয়া গহনা গড়িতেছে, কামার-শালাটা বন্ধ, কিন্তু তাহার পাশের ঘরে সুখন্‌লাল মিস্ত্রী একটি মাটির প্রদীপের সুমুখে বসিয়া চোখে চশমা দিয়া চাম্‌ড়ার 'সুট্‌কেস' তৈরী করিতেছিল।

ভাঙা সিঁড়ির একটা ভাঙা ইঁটের উপরে কেরোসিনের যে-ডিবেটা আলোর চেয়ে ধূম উদ্গিরণ করিতেছিল বেশী,—তাহারই সেই ঝাপ্‌সা অন্ধকারে পথ দেখিয়া হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে অজিত তাহার রমেশ-দার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বস্তির ইতর লোকগুলাকে এবং বিশেষ করিয়া সুখন্‌লাল মিস্ত্রীকে জল বন্ধ করিবার মিটিং তখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, কিন্তু গোলমাল তখনও থামে নাই। অজিতকে সে-সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা না বলিলেও প্রোফেসার্ ও ম্যানেজারের যুক্তিপূর্ণ বাদানুবাদ এবং সেই কুস্তিগীর ভদ্রলোকের আস্ফালন শুনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হইল না। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আগামী কল্য প্রাতে বস্তির মেয়েগুলাকে এবং কামার, স্যাক্‌রা, উড়ে, ও সেই মুচি-ব্যাটাকে কলে জল লইতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাতেও না শোনে,—কাল শনিবার, সকলেই সকাল-সকাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিবে, এবং বৈকালে তাহারা পুনরায় যখন জল ধরিবে, প্রোফেসার নিজে অগ্রণী হইয়া গায়ে পড়িয়া তাহাদের সহিত অনর্থক একটা ঝগড়া বাধাইয়া দিবে, তাহার পর সেই ঝগড়ার সূত্র ধরিয়া কুস্তিগীর-মহাশয়, তাহাদের পালের-ধাড়ি ওই মুচি ব্যাটাকেই বেশ করিয়া ঘা-কতক বসাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে এই ইতরের ছোঁয়া জল ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের সনাতন জাতি-ধর্ম্ম নাশের আর কোনও আশঙ্কা রহিবে না।

অজিতকে কাছে ডাকিয়া রমেশ বলিল, ওরে অজিত, শোন্, কাল ত আর হবে না, পরশু রবিবার, আমার সঙ্গে হরিশ মুখুজ্যের রোডে একবার চ দেখি,—একজন উ আজ আমায় বলেছেন, কতকগুলো দলিল তাঁর ওখ বসে' বসে' কপি করে' দিয়ে আস্‌বি, দুটো টাকা দে বুঝ্‌লি? টাকা-দুটো ম্যানেজারের কাছে জমা f দিস্, নইলে তোর খাবার চার্জ্জটা...... সঙ্গে কিছু এ ছিস্? না সেদিকে অষ্টরম্ভা—

অজিত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, না রমেশ আস্‌বার সময় মার কাছে কিছু পেলাম না।

তবে এলি কেন বাপু! বলিয়া রমেশ মুখ ফিরা তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল।

ম্যানেজার-বাবু বলিতেছিলেন, তুই ছোটজাত, এত বামুন রয়েছে মাথার উপরে,—তাদের সঙ্গে ধর্‌তে ে এক-রকম বাসই কর্‌ছিস্ তুই,—তোর যে বাহান্ন প নরক থেকে উদ্ধার হ'য়ে গেল, তার ঠিক আছে?

প্রোফেসার বলিল, certainly.

এইবার প্রোফেসারের দিকে মুখ ফিরাইয়া ম্যানে কহিলেন, তা ব্যাটা কোনদিন একজোড়া পাঁচসি চটিজুতো দিয়েও বলেছে হ্যাঁ,—যে, নিয়ে যাও ঠা ছ-মাস পায়ে দিয়ে দেখো। ছোটলোকের পয়সা-ট না-হওয়াই ভালো, বুঝ্‌লে প্রোফেসার, তল-মাথা স কর্‌তে চায়। ওই যে কথায় আছে, বাঁদরের চুল হ বাঁধ্‌তে জানে না।

প্রোফেসার বলিয়া উঠিল, হ্যাঃ! পয়সা না ছাই কর Money এত cheap নয় ম্যানেজার-বাবু, ওসব বুঝ্‌ছে illiterate uneducated class কিনা! বিনয় জ না, ভদ্রতা জানে না—disobedient, rogue!

কুস্তিগীর লাফাইয়া উঠিল, সব সিধা বানিয়ে দে প্রোফেসার। কাল তুমি ঝগড়ার 'উট্‌টুংটা' একবার-তু দিও, বাস্,—তার পর আমি দেখে' নেবো। মারের ক বাবা সব জব্দ। আমার এই ডান হাতের একখানা —বাস্......এই বলিয়া সে তাহার দক্ষিণ হস্তটি সক সম্মুখে একবার প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া দিল।

—এই ত! আর কি চাই! মরদ্‌কা বাত হাতীকা দাঁত! বলিয়া ম্যানেজার তাহার সেই অপরি

দন্তপাটি বিকশিত করিয়া পেট নাচাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বাহিরের অন্ধকারের দিকে অজিত একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। নীচে 'রামলীলা'র 'রিহার্স্যাল্' তখন বন্ধ হইয়াছে। স্যাক্‌রার হাতুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে সুমুখে খোলার বস্তির একটা ঘর হইতে একটানা একটা কাশির শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। লোকটা হয়ত যক্ষ্মার রোগী,—কাশিতে কাশিতে শ্বাস তলাইয়া গিয়া মাঝে-মাঝে যেন তার দম আট্‌কাইবার উপক্রম হইতেছে।

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে উঠানের কলে যাহারা জল লইতে আসিল, ম্যানেজার, প্রোফেসার, পঞ্চানন, ইত্যাদি সকলেই তাহাদের নিষেধ করিল বটে, কিন্তু প্রাণ-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক এই পানীয়ের জন্য যাহারা আসিয়াছে, সামান্য দু'টা মুখের কথায় তাহাদের এত বড় প্রয়োজনের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া বড় সহজ নয়,—অক্ষম এবং নিরুপায় যাহারা, সক্ষমের দুয়ারে একটুখানি করুণার দাবি যে তাহাদের আছে, বোধ করি এই সহজ এবং সত্য কথাটা তাহারা জানিত বলিয়াই হটিয়া গেল না।

এদিকে ম্যানেজারের খোঁচানির চোটে এবং তাহাদের আদেশ-অমান্যের ঔদ্ধত্যে প্রোফেসারের ঝোঁক, পর্দ্দায়-পর্দ্দায় চড়িতে আরম্ভ করিল। শান্ত-শিষ্ট এই অকেজো বাংলা ভাষাটা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সে জোরালো হিন্দুস্থানী, পরে রোখালো ইংরেজী ভাষা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন গত রাত্রের ব্যবস্থাটা প্রয়োগ করাই যে এখানে যুক্তিসঙ্গত, এবং বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া যে তাহাই করিতে হইবে, এই লইয়া অদূরে দণ্ডায়মান পঞ্চানন-কুস্তিগীরের সঙ্গে সকলেরই একবার চোখ-টেপাটিপি হইয়া গেল।

আহারাদির পর সকলে আপিস চলিয়া গেলে, ম্যানেজার-বাবু গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন। সকলের ছোঁয়া সেই চৌবাচ্চার জলেই অজিত স্নান করিয়াছিল,—এই অবসরে আহারের নিমিত্ত সে নীচের রান্নাঘরে নামিয়া আসিল। ঘরটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সাত-আট হাতের বেশী নয়; মেঝেটা ছাড়া কড়িকাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আগাগোড়া কালী ও ঝুলের একটা পুরু আস্তরণ পড়িয়াছে,—দেওয়ালের একধারে উনানের উপর একটা টিন চড়াইয়া হোষ্টেলের নাক-কাটা খোঁড়া ঝি, তার ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিতেছিল, তাহারই পায়ের কাছে ভাত, ডাল, তরকারীর উপর মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। অজিত দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর কয়েকটা এঁটো থালা পড়িয়াছিল। ঝি তাড়াতাড়ি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাসন-কয়টা তুলিয়া লইয়া নোংরা দুর্গন্ধপূর্ণ ন্যাতাটা মেঝের উপর একপোঁচ বুলাইয়া দিয়া নাকিসুরে ডাকিল, ঠাঁকুর! অ ঠাঁকুর বাঁবুকে ভাঁত দিয়ে যাও—

কোনও একটা বিশেষ স্থান হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ঘটিটা কলতলায় নামাইয়া রাখিয়া পাচক-ব্রাহ্মণ অজিতের ভাত বাড়িতে বসিল। কোমরে-জড়ানো কালো রঙের যজ্ঞোপবীতটা না দেখিলে কাহার সাধ্য তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চেনে।

অজিত খাইতে বসিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ পরে উনানের নিকট হইতে ঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, ধঁর্ ত' রেঁ বঁজ্জাত মেয়েঁকে! আঁসছে মানিজাঁর-বাঁবু। বেঁরো বঁলছি—

ভাতের গ্রাসটা মুখে দিতে যাইবে, এমন সময় এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে অজিত চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া বলিল, আঁ, আঁ, কি, কি, কি বল্‌ছ ঝি?

ওঁই দেঁখুন না বাঁবু। বলিয়া বস্তির দিকে খোলা জানালাটার দিকে ঝি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আবার বলিল, সঁকালে ভাঁতের ফেঁন ধঁরে' নে গেঁছে এক হাঁড়ি, আঁবাঁর এয়েঁছে ভাঁত চাইতেঁ

অজিত তাকাইয়া দেখিল, জানালার বাহিরে নর্দ্দামাটার পাশে মাটির একটি মাল্‌সা হাতে লইয়া একটি মেয়ে অত্যন্ত সকরুণ-নয়নে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। অজিত দেখিবামাত্র চিনিল, এ সেই অতসী,—গতকল্য কাঙ্গালী ভোজন দেখিতে গিয়া যাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

সে চিনিল বটে, কিন্তু মেয়েটা চিনিতে পারিল কি না, কে জানে! অজিত জিজ্ঞাসা করিল, তোরা এইখানে থাকিস্ নাকি?

হ্যাঁ, ওই বস্তিতে। বলিয়া পশ্চাতে খোলার ও গোল-পাতার ঘরগুলার দিকে সে একবার আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, তাহার পর, মাটির মাল্‌সাটা দুইহাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ও মিছেকথা বল্‌ছে বাবু, এই নর্দ্দমা থেকে এই মাল্‌সার আধ মাল্‌সা ফেন ধরে' নিয়ে গেছি। এই দেখ বাবু, এই এতটুকুন—বলিয়া অতসী মালসাটার ভিতরে আঙুল দিয়া কতটুকু ফেন সে ধরিয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, কেন্ কি করেছিস্?

—খেয়েছি বাবু, আমি অর্দ্ধেকটা, মা অর্দ্ধেকটা। দাও না বাবু ওকে বলে'—এঁটো ভাত-চারটি দিক এতে। আমার মা কাল থেকে কিছু খায়নি।

—কেন, কাল যে সেই লুচি পেয়েছিলি?

—ও মা! সে ত' তিনটি! আমি দুটি খেলাম, আর মা একটি খেলে।

—তোর মা কোথা?

—ওই যে! বলিয়া বস্তির পাশে যে খালি জায়গাটা পড়িয়াছিল, মেয়েটা সেইদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

অজিত তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু কয়েকটা ঘেঁটু ও বন-কচুর গাছ ছাড়া সেখান হইতে কিছুই তাহার নজরে পড়িল না।

ঝি বলিয়া উঠিল, তুমি খাও না বাবু, ওর সঙ্গে কি ইচ্ছে তোমার?—দাঁড়াও, আবাগীর বেটি কেমন করে' না নড়ে তাই দেখাচ্ছি আমি। এই বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা কাঁসার বাটি দিয়া উনানের-উপর-বসানো টিন হইতে খানিকটা ফুটন্ত গরম জল তুলিয়া লইয়া, জানালার পথে সেই মেয়েটার গায়ের দিকে ছুড়িয়া দিল।

খানিকটা গরম জল অতসীর গায়ে লাগিতেই, ও মা গো! বলিয়া যন্ত্রণায় সে একবার লাফাইয়া উঠিল কিন্তু কাঁদিল না, পলাইয়াও গেল না, বরং সেইখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, খোনা, নেংচী মাগী কোথাকার! তুই কোন্‌দিন দিস্? তোকে আমি বল্‌ছি? তবে যে হাতটা আমার পুড়িয়ে দিলি?

অজিতের আর খাওয়া হইল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার পাতের এই ভাতগুলো ওকে দিয়ে দাও ঝি।

অত্যন্ত আগ্রহে অতসী তাহার হাতের মাল্‌সাটা দুই হাত দিয়া জানালার গায়ে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ওগো বাবু গো, তুমি নিজে দিয়ে যাও বাবু, ও দেবে না বাবু, তোমার পায়ে পড়ি বাবু গো—

অজিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুঠা মুঠা করিয়া জানালা গলাইয়া সমস্ত ভাত-তরকারী তাহার পাত্রের উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত দিবে না ভাবিয়া মেয়েটা আপনমনেই রুদ্ধশ্বাসে বলিতে আরম্ভ করিল, হুঁ, হুঁ, আরও, আরও, আর-চারটি···ওই তরকারীটা, ওই মাছের কাঁটাটা বাবু,—আমার মা, আমার মা আছে বাবু, আমরা দু'জনা······

পশ্চাৎ হইতে ঝি বলিয়া উঠিল, দেখো বাবু,—ভাত-ফাঁত ছিটুকিয়ে না ইদিকে এসে পড়ে, মানিজার-বাবু কিছু বাকি রাখ্‌বে না তাঁহ'লে—

তাহার সেই সানুনাসিক কণ্ঠস্বরে অজিত এবার আর চমকিয়া উঠিল না,—সেদিকে তখন তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

* * * *

বৈকালের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত ছিল,—ছোক্‌রাদের মাত্র আপিস হইতে ফিরিবার অপেক্ষা। সেদিন শনিবার; কাজেই ফিরিয়াও আসিল, কলে জল আসিবার ঠিক পরেই। সেদিন তাঁহার দিবানিদ্রাকে একটুখানি বিশ্রাম দিয়া ম্যানেজার-বাবু একবার বারান্দায় আসিয়া একবার ঘরে ঢুকিয়া সাগ্রহে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে দেখিতে-দেখিতে জল লইবার জন্য পঙ্গপালের মত পুরুষ-রমণীতে কল-তলাটা ছাইয়া গেল। সুখন্‌লালেরও জলের প্রয়োজন। সে তখন

তাহার নিজ-হাতের-তৈরী টিনের বাল্‌তিটি হাতে লইয়া জনতার একপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। পায়ের তলার জুতা যাহারা তৈরী করে, তাহার চেয়ে ছোটজাত আর নাই, কাজেই ব্রাহ্মণের জাতি-ধর্ম্ম রক্ষার পক্ষে সে-ই বোধ করি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। ম্যানেজার-বাবুর আক্রোশ তাই তাহারই উপর একটুখানি বেশী। অবশ্য বিনা-পয়সায় তাঁহার মত ব্রাহ্মণের পায়ে, বৎসরে অন্ততঃ একজোড়া করিয়া পাঁচসিকার চটিজুতা যে সে প্রাণান্তেও দিতে চায় না,—এ-কথাটা অবশ্য আপনাদের শুনাইয়া দেওয়া ভাল হইল না,—তবে ইহাও যে ইম্পিরিয়াল-হোষ্টেলের ম্যানেজার-বাবুর জাতক্রোধের একটা অঙ্গীভূত কারণ, তাহাও সত্য।

শত্রুর বিরুদ্ধে কুকুরকে যেমন করিয়া হাততালি দিয়া লেলাইয়া দেওয়া হয়, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রোফেসারকে তিনি ঠিক্ তেম্‌নিভাবেই ক্ষেপাইয়া দিলেন। পঞ্চানন-কুস্তিগীরের উপরেই যজ্ঞের দক্ষিণার ভার, সেও বারকতক গা মুড়িয়া, কোঁচা-কাছা বেশ করিয়া সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রোফেসারের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। রমেশ-দাদাটিও কম নন। একটা বড় ঘটি হাতে লইয়া ঠিক সেই সময়েই তাঁহার জলের প্রয়োজন হইল। ম্যানেজারবাবু ছারপোকার মতই চতুর, সামান্যে ধরা-ছোঁয়া দিতে নারাজ,—কাজেই তিনি উপরের বারান্দা হইতেই খুব জোর-গলায় মুখ-খিস্তি করিতে লাগিলেন।

ইংরেজীতে লেক্‌চার্ দেওয়ার চেয়ে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া নিরপরাধীর গায়ে আঘাত করা যে কত কঠিন, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র প্রোফেসার তাহা টের পাইল।

দেশে একদিন জোর করিয়া একজন চাষার জমি দখল করিতে গিয়া পঞ্চানন মার খাইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল, তখন হইতে সেই চাষাকে মারিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া অবধি পঞ্চানন ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তির উদ্বোধন তাহার যে কতখানি হইল, মাঝে-মাঝে সেটা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা তাহার বড় বেশী প্রবল হইয়া উঠিত। কিন্তু ওই গাব্‌দা মুচি বেটাকেই তা ভয়। তা হউক্, সেরূপ কিছু সম্ভাবনা দেখিলে সুমুখে রান্নাঘরটা খোলা আছে, তাহা সে পূর্ব্বাহ্ণে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল!

মেয়েগুলার সহিত দু-একটা বাক্-বিতণ্ডা হইবার পরেই উপর হইতে ম্যানেজার বাবু বলিয়া উঠিলেন, বল্‌লে কথা শোনে না, দাও ত ভায়া পঞ্চানন ওদের ঘা-কতক দিয়ে ওখান থেকে' তাড়িয়ে,—আর ওই সঙ্গে—ব্যাটাকেও।

সুখন্‌লালের নামটা উচ্চারণ না করিয়া কৌশলে ইসারা করিয়া তিনি তাহাকে দেখাইয়া দিলেন।

পঞ্চানন আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া হুড়্ মুড়্ করিয়া সে মেয়েগুলার গায়ের উপর গিয়া পড়িল এবং 'ভাগ্ যাও! ভাগ্ যাও! জল নাহি দেগা!' বলিতে বলিতে কাহারও টব উল্টাইয়া দিয়া, কাহারও ঘটি-বাল্‌তিতে লাথি মারিয়া, দু-একটা মেয়েকে এলোপাথাড়ি এদিক্-ওদিক্ ঠেলিয়া দিয়া একটা বিষম হট্টগোল বাধাইয়া দিল।

করেন কি, করেন কি, বলিয়া বাল্‌তিটা হাত হইতে নামাইয়া সুখন্‌লাল তাহাকে যখন নিবৃত্ত করিতে ছুটিয়া আসিল, মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ম্ম সমাধা করিয়া দিয়া বিজয়ী বীরের মত পঞ্চানন তখন রাগের মাথায় হাঁপাইতে-হাঁপাইতে এবং কাঁপিতে-কাঁপিতে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিয়াছে।

ঠিক্ করেছেন, আচ্ছা করেছেন মাগীদের। বলিয়া আশে-পাশে কয়েকটা লোক ঘরের ভিতর হইতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া হাসাহাসি করিতেছিল।

কিন্তু মেয়েরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে দেখিতে পাওয়া গেল, একটা শীর্ণকায়া দুর্ব্বল মেয়ের গায়েই পঞ্চাননের শক্তি-পরীক্ষার মাত্রা একটুখানি বেশী হইয়া গেছে। চৌবাচ্চার পাশে নর্দ্দমাটার উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া মেয়েটি এমনভাবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছে যে, কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টায় সেখান হইতে উঠিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

সুখন্‌লাল কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া দিবার জন্য একবার ছুটিয়াও গেল, কিন্তু হিঁদুর মেয়ে, তাহাকে স্পর্শ করিলে হয়ত ওই একমাথা চুল লইয়া এই

অবেলায় তাহাকে স্নান করিতে হইবে, এই ভাবিয়া সে তাহার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাটাকে অতিকষ্টে অতিদুঃখে দমন করিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে ইহার-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় অজিত উপর হইতে ছুটিয়া গিয়া মেয়েটির হাতে ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া দিল, কিন্তু মুখের পানে তাকাইতেই তাহার হাতটা কেমন যেন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দেখিল, সে অতসীর মা। ভাঙা ইঁটের গায়ে লাগিয়া তাহার হাতের কনুই, হাঁটু এবং মুখের যেখানে-সেখানে ছড়িয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে, ছেঁড়া কাপড়খানাও স্থানে-স্থানে ছিঁড়িয়া গেছে। মেয়েটা সংজ্ঞা হারায় নাই, কাজেই উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথমে সে অত্যন্ত লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া তাহার ছিন্ন বস্ত্রটাকে কম্পিত-হস্তে টানিয়া-টানিয়া আরও ভাল করিয়া ছিঁড়িবার ব্যবস্থা করিতেছিল, এমন সময় বস্তির ভিতর হইতে 'মা' 'মা' বলিয়া অতসী ছুটিয়া আসিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া একবার অজিতের দিকে একবার তাহার মায়েব দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল।

নিজেই একবার হাঁটিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অতসীর মা টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, অজিত অতি সাবধানে তাহাকে একখানা হাতের উপর ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, চলো।

তোবড়া বাল্‌তিটা হাতে লইয়া অতসী আগে-আগে চলিতে লাগিল।

বস্তির মাঝখানে সবচেয়ে ছোট একটা খোলার ঘরের মধ্যে পথ দেখাইয়া অতসী তাহাদের লইয়া গেল। বাঁকারি-দেওয়া দেওয়ালের গায়ে মাটি লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে, চারিদিকে কোথাও আলো-বাতাসের পথ না থাকিলেও মাথার উপরে কয়েকটা ভাঙা খাপ্‌রার ছিদ্রপথে ঘরের ভিতর যথেষ্ট আলো প্রবেশ করিতেছিল। স্যাঁৎ-সেঁতে মেঝের এককোণে ছেঁড়া একটা চাটাইএর উপর চট্ ও ছেঁড়া কাঁথার যে শয্যাটা বিছানো ছিল, অতসীর মা নিজেই ধীরে ধীরে তাহার উপরে গিয়া শয়ন করিল। ঘরের একধারে কয়েকটা হাঁড়ি ও মাল্‌সা সারি-সারি সাজানো রহিয়াছে, তাহার পাশেই মাটির একটা উনান এবং প্রয়োজন হয় না বলিয়াই রন্ধনের কয়েকটি অতি সামান্য সরঞ্জাম তাহার ঠিক মাথার উপরেই একটা দড়ির শিকায় ঝুলিতেছে। সুমুখের দেওয়ালের গায়ে 'বাঙ্গালী পল্টন' এবং 'সমর-ঋণের'একটা বৃহদাকার ছেঁড়া ছবি আঠা দিয়া জন্মের মত আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহিরের অপ্রশস্ত চালার উপর একটা বড় গাই বাঁধা ছিল। কাদা ও গোবরের উপর অসংখ্য মশা ও মাছি;—দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যায় না।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, ও গাইটা কার?

অতসীর মা অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল, ধোপাদের। ওরাই এ ঘরের ভাড়া দেয়।

অজিত আবার বলিল, খুব বেশী লেগেছে? যন্ত্রণা—

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অজিত কিয়ৎক্ষণ থামিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া কহিল, তোমার স্বা—অতসীর বাবা কোথায়?

অত্যন্ত ম্লান একটা দুঃখের হাসি হাসিয়া অতসীর মা পাশ ফিরিয়া শুইল। কোনও উত্তর দিল না।

অতসী বলিয়া উঠিল,হোই কল্‌কাতার সেই নেবুতলায় আছে বাবু। কালীঘাটের মুনিয়ার সাথে আমি একদিন গেছ্‌লাম। মেরে' তাড়িয়ে দেছ্‌ল বাবু। আর এক-দিন যাবো, নয় মা? বলিয়া সে তাহার মায়ের শিয়রের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল।

অজিত আর কোনও প্রশ্ন করিল না। নিতান্ত অসহায়া এই দুই মাতাপুত্রীকে প্রশ্ন করিবার মত আর-কিছু ছিলও না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। ভাবিল, দলিল নকল করিয়া কাল যদি সে দুইটা টাকা পায়, তাহা হইলে একটা টাকা সে ইহাদের দিয়া যাইবে।

ইম্পিরিয়াল হোষ্টেলে তখন বোধ করি তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। অজিত ঘরের চৌকাঠ মাড়াইতে না মাড়াইতে ম্যানেজার-বাবু বলিয়া উঠিলেন, হাঁ হাঁ-হাঁ-হাঁ বাইরেই দাঁড়ান, বাইরেই দাঁড়ান,—ঘরে ঢুক্‌বেন না মশাই, এটা আপনার হোটেল-খানা নয়, এর একটা রীতিমত 'প্যাস্‌টিচ্' আছে। দিন্ না রমেশ-বাবু, ওঁর গামছা কাপড়টা ছুঁড়ে'। যান্ গঙ্গাচ্চান্ করে' আসুন,—কি

জাত না কি জাত ছুঁয়ে ধম্ম-পুণ্যি ত করে' এলেন খুব। হরিবোল! হরিবোল! বাঁকাশ্যাম! মদন-মোহন!

*　*　*　*

সে-রাত্রিটা কোনও-রকমে কাটিল, কিন্তু তাহার পরদিন বড় একটা মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সকালে উঠিয়াই অজিতকে সঙ্গে লইয়া রমেশ সেই উকিলের বাড়ীতে সব ঠিক করিয়া দিয়া আসিল। দুপুরে সে একবার খাইবার ছুটি পাইবে, তাহার পর বৈকাল পর্য্যন্ত কাজ করিয়া দলিল নকল শেষ হইয়া গেলেই তিনি তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিবেন।

বেলা এগারোটার সময় ছুটি পাইয়া অজিত 'হোষ্টেলে' স্নানাহার করিল, পরে আবার ছুটিল। পথে অতসীর সঙ্গে দেখা। সে তখন রাস্তার ধারে একটা 'ডাষ্ট্‌বিনের' পাশে বসিয়া গৃহস্থের ফেলিয়া-দেওয়া আবর্জ্জনার ভিতর হইতে বাছিয়া-বাছিয়া কয়লা কুড়াইতেছিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, তোর মা কেমন আছে, অতসী?

সহসা মুখ তুলিয়া অজিতকে দেখিয়াই অতসীর মুখখানা একবার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, মা আজ আর উঠ্‌তে পারেনি বাবু!—হ্যাঁ বাবু, ওই যে সরকারী হাঁসপাতালটায় ওর ওষুধ পাওয়া যায় না? তা হ'লে আমি একবার যাই।

এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই যেন সে এই বাবুটিকে খুঁজিতেছিল,—কথাটা বলিয়া উত্তরের আশায় সে হাঁ করিয়া অজিতের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অজিত কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না, বলিল, জানি না, তবে যাস্ একবার, দিতেও পারে। ও কি কুড়োচ্ছিস্, অতসী?

ছাইএর গাদা হইতে একটি কয়লার টুক্‌রা কুড়াইয়া টুপ করিয়া আঁচলে ফেলিয়া দিয়া অতসী বলিল, কয়লা কুড়োচ্ছি বাবু।—নাঃ আর পাওয়া যাবে না। সকালেই সব নে যায়।

—না বাবু। এই একটি আঁচল-ভর্ত্তি যদি দিতে পারি,—ধোপা-বৌ একটি পয়সা দেবে।

কাপড়ে-বাঁধা বাটির মত কি-একটা জিনিষ অতসীর পাশে নামানো ছিল, কয়েকটা কাক সেইখানে আসিয়া জড় হইতেই অতসী সেটাকে একেবারে তাহার কোলের কাছে টানিয়া লইল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি?

সে বলিল, পথে কুড়িয়ে আন্‌লাম বাবু, ভাত। উ-ই যে লাল বাড়ীটা দেখ্‌ছ বাবু, ওখানে আজ মেলা লোক এসেছে—তুমি একটি পয়সা দাও না বাবু, নুন কিনে' নে যাবো। বলিয়া অতসী তাহার কয়লা-মাখা ময়লা হাত-খানা পাতিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিতের পকেটে তখন তাহার শেষ-সম্বল মাত্র দুইটি পয়সা পড়িয়া ছিল, দুইটিই তাহার হাতে ফেলিয়া দিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

একটির জায়গায় দুইটি পাইয়া অতসীর খুশির আর সীমা রহিল না। আপনমনেই সাদা দাঁতগুলা বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে ভাতের বাটিটা সে তাহার 'কাঁকালে' তুলিয়া লইল।

অজিতের কাজ যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন আটটা বাজে। উকিল-মহাশয় লোকটি বেশ ভালো। তাহার হাতের লেখা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, পাওনা হিসেব করে' দেখ্‌তে গেলে দেড়-টাকার বেশী হয় না বাপু! আচ্ছা, তোমার হাতের লেখার জন্যে আরও আট-গণ্ডা পয়সা বেশীই দিলাম। এই বলিয়া দুইটি নগদ টাকা দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় করিলেন।

টাকা দুইটি পাইয়া অজিত আর 'হোষ্টেলে' গিয়া উঠিল না,—উঠান পার হইয়া সরাসর বস্তিতে গিয়া প্রবেশ করিল। অন্ধকার বস্তির উঠানে খাটিয়া বিছাইয়া কয়েকজন হিন্দুস্থানী, কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া তামাক টানিতেছিল, গল্প করিতেছিল।

অন্ধকারে পথ চিনিয়া এই একই-রকমের বাড়ীগুলার মধ্যে অতসীদের বাড়ীটা চিনিয়া লওয়া শক্ত হইবে ভাবিয়া

মায়ের ঘর কোন্‌টা বল্‌তে পারো ?—সেই যে কাল কল-তলায় যে পড়ে' গিয়েছিল ?

গতকল্য কল-তলায় জল ধরিতে গিয়া তাহাদের মেয়েরাও রীতিমত নির্য্যাতিতা হইয়া আসিয়াছে, কাজেই এই হিন্দুস্থানী ছোক্‌রারা কাল হইতে হোষ্টেলের ওই বাঙ্গালী ছোক্‌রাদের উপর রাগে মনে-মনে ফুলিতেছিল। আজ এই অজিতের মুখে বাংলা-কথা শুনিয়া তাহারা আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, কিধারসে আতা ? কোন্‌ হ্যায় তোম্‌ ?

অপর একজন বলিয়া উঠিল, উহি মোকান্‌কা বাংগালী লউণ্ডা হোগা—

এম্‌নি করিয়া অজিতকে আর কথা বলিবার সময় না দিয়া কেহ বলিল, পাক্‌ড়ো উস্‌কো। কেহ বলিল, চোট্টা হ্যায়। কেহ বলিল, ডাঁকু হ্যায়্‌।

সঙ্গে-সঙ্গে মার্‌ মার্‌ করিয়া সকলে লাফাইয়া উঠিল। সমস্ত বস্তির মধ্যে একটা গোলমাল হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। মেয়েরা কেহ লাঠি, কেহ কেরোসিনের 'লম্ফ' হাতে লইয়া উঠানে আসিয়া জড় হইল। গোলমাল শুনিয়া 'ইম্পিরিয়াল্‌ হোষ্টেল্‌' হইতে ম্যানেজার, প্রোফেসার, পঞ্চানন, রমেশ-প্রমুখ সকলে মিলিয়া মজা দেখিবার জন্য একেবারে রান্নাঘরের ছাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

অজিত তাহাদের দু-একটা কিল-ঘুষি খাইয়াই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ম্যানেজারের তীক্ষ্ণ চক্ষু সে এড়াইতে পারিল না।

বস্তি হইতে এই অন্ধকার রাত্রিতে অজিত বাহির হইয়া আসিল, এবং এই গোলমাল নিশ্চয় তাহাকে লইয়াই, ম্যানেজার-বাবু নিমেষেই তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। রমেশ পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কেমন ? বলেছিলাম কি না রমেশবাবু, আপনার 'ফেরেণ্ড'র ইয়ে তেমন সুবিধে নয়, তা আমি কাল্‌কের সেই ব্যাপারেই বুঝ্‌তে পেরেছি। হেঁ হেঁ বাবা, মানুষ চরিয়ে খাই, আর একবার দেখ্‌লে মানুষ চিন্‌তে পারিনে! কিন্তু শুনুন্‌ রমেশ বাবু, আমি অনেক ভদ্রলোকের ছেলে বাস করে, আপনার কিছু আপত্তি আছে ?

রমেশ চুপি-চুপি বলিল, আপদ্‌ বিদেয় হ'লেই বাঁচি ম্যানেজার-বাবু, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না আমার অবস্থা ? ঘাড়ে এসে চড়ে' বসেছে।

প্রোফেসার বলিয়া উঠিল, never mind. ওসব immoral লোককে এখ্‌খুনি ঘাড়ে ধরে' drive out করে' দিন। তা না হ'লে, we must not live here.

এমন সময় অজিত উপরে উঠিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে ম্যানেজার-বাবু হাঁকাইয়া বলিয়া দিলেন, কে, অজিতবাবু নাকি ? দাঁড়ান্‌ ওইখানেই।

তাহার পর তিনি নিজেই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কি-কি জিনিষ আছে আপনার বলুন, বের করে' দিই।

ব্যাপারটা অজিত কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল, কেন ? কি ?

সে-এক বিশ্রী অভদ্রোচিত মুখভঙ্গী করিয়া ম্যানেজার-বাবু বলিলেন, ন্যাকা! কচি খোকা আর কি! কিছু বোঝেন না! একাদশীকে ফাঁকি দিয়ে ডুবে' জল খেলে' চলে না বাবা! এই ত এই গামছা, এই কাপড়, আর কি ?

ঘরের কোণে অজিত তাহার ছাতাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ওই ছাতিটা।

ম্যানেজার-বাবু এই তিনটা জিনিষ বাহিরে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, যা'ন, অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। আর বেশী গোলমালে কাজ নেই। আমার পাওনা, দুই দুই—চার. আর এক পাঁচ বেলার জন্যে পাঁচ-আনা করে' পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ আনা,—একটাকা ন' আনা। দিতে হয় দিন, না হয় আমার ভাতের পয়সা ডুব্‌বে না, আর-জন্মেও শোধ কর্‌তে হবে। হরিবোল! হরিবোল! ছি, ছি, এইসব দুষ্কর্ম থেকে' পরিত্তান আর কবে পাবো রে বাবা!

পকেট হইতে টাকা দুইটি বাহির করিয়া অজিত তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, নিন্‌ আপনার পাওনা।

ম্যানেজার-বাবু টাকা-দুইটি মাটির উপর বার-কতক বাজাইয়া লইয়া বলিলেন, কত ফেরৎ হচ্ছে তা হ'লে ?

হয়, আচ্ছা—বলিয়া তিনি তাহার শিয়রের বালিশের তলা হইতে ক্যাশ বাক্সটি খুলিয়া নয় আনা পয়সা বার-দুই-তিন ভালো করিয়া গনিয়া আল্‌গোছে অজিতের হাতে ফেলিয়া দিলেন।

অজিত একবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, রমেশ-দাদা কোথায়? তাঁর সঙ্গে একবার—

না, না, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করে' কাজ নেই। তিনি বেরিয়ে গেছেন, রাস্তায় দেখা হয়, ত হবে। এই বলিয়া ঘন-ঘন হাত নাড়িয়া তিনি তাহাকে সে-স্থান পরিত্যাগ করিবার ইঙ্গিত করিলেন।

অজিত সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া বাহিরে রাস্তা ধরিল। তাহার চোখের সুমুখে সমস্ত কলিকাতা শহরটাই তখন দুলিতেছিল।

*　　*　　*　　*

বৈশাখী বৈকালে কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত ঝঞ্ঝা পৃথিবীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, ঘন-তমসায় চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, উতল-কলরোলে বাদল নামে,—মনে হয়, বুঝি বা এই ঝঞ্ঝার দাপটে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, বাদলের প্লাবনে বুঝি বা আজ সৃষ্টি ভাসিয়া যায়, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, কিছুই করিতে হয় না, দেখিতে-দেখিতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি চোখের সুমুখে আবার শান্ত-সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে……

*　　*　　*　　*

কালীঘাটের কাছাকাছি ভবানীপুরের একটি বাড়ীতে অজিত একটি ছেলেকে পড়াইত,—একটা চাকরীও নাকি সে পাইয়াছিল।

সেদিন সকালে ছেলেটিকে পড়ানো শেষ করিয়া অজিত বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় দরজার নিকট এক ভিখারিনী আসিয়া দাঁড়াইল, হাতে একটি মাটির পাত্র, মুখে একটা শরের কাঠি।

ছাত্রটি বলিয়া দিল, ও রোজ এম্‌নি করে' ভিক্ষে করে মাষ্টার-মশাই, কথা কয় না, ও মৌনী।

কিন্তু অজিত তাহাকে দেখিয়াই চিনিল। এ সেই অতসীর মা।

এই অসহায়া উপায়হীনা নারীর মিথ্যা অভিনয়কে সে আজ অবজ্ঞা করিতে পারিল না,—তাহার হাতে প্রবঞ্চিত হইবার গৌরবটুকুর জন্য লালায়িত হইয়াই অজিত যেন তার পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার মাটির পাত্রে ফেলিয়া দিল।

অতসীর মা এতক্ষণ হেঁটমুখে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার ভিক্ষাপাত্রের উপর টাকা দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। অভাবের তাড়নায় মিথ্যার মুখোস পরিয়া দ্বারে-দ্বারে যে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়ায়, তাহাকেও আশাতিরিক্ত দান যে করিতে পারে, সে-দাতার মুখ-খানি কেমন, তাহাই একবার দেখিবার জন্য সে মুখ তুলিয়া চাহিল,—কিন্তু অজিত তখন তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ভালো দেখিতে পাইল না। তাই সে-লোকটিকে একবার অতর্কিতে দেখিয়া লইবার জন্যই অতিশয় সঙ্কোচে সে তাহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর গিয়া অতসীর মা তাহাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু চিনিবামাত্র তাহার শীর্ণ হাত দুইটা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—মাটির পাত্রটি হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া যাইবার জো হইল, তাড়াতাড়ি সেটিকে দু-হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বিপরীত দিকে বাড়ীর পথ ধরিল। চোখ-দুইটা তখন তাহার জলে ছল্ ছল্ করিতেছিল।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত সংবৎ

শ্রী সেবানন্দ ভারতী

(কলিঙ্গ-চক্রবর্ত্তী ক্ষারবেল—হস্তিগুম্ফালিপি)

বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ্চ্-সোসাইটির জর্নালের তৃতীয় ভাগে চতুর্থ অংশে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরি পাহাড়ের হস্তিগুম্ফা গুহায় উৎকীর্ণ কলিঙ্গচক্রবর্ত্তী ক্ষারবেলের ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী রাজত্বের বিবরণ-পূর্ণ লিপির অভিনব পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই গুহালিপির বার্ত্তা বিদ্বৎসমাজে আলোচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার প্রকৃত পাঠ ও ব্যাখ্যার উদ্ধার-সাধন এপর্য্যন্ত হয় নাই বলিয়া এই লিপি ঐতিহাসিকগণের নিকট একপ্রকার ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল। কলিঙ্গের প্রাচীন ইতিবৃত্তের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে নেত্রপাত করিবার পক্ষে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকারময় কক্ষে আলোক-বর্ত্তিকারূপে এই লিপি এখন ঐতিহাসিকগণের নিকট কিরূপ আদরণীয় বস্তু তাহা ১৯১৮ সালের রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত মিঃ ভিন্সেণ্ট্ এ স্মিথ সাহেবের একখানি পত্রে বুঝিতে পারা যায় (New Light on Ancient India- J. R. A. S., 1918 July and October)। তিনি অক্সফোর্ড্ হইতে পাটনার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জায়স্ওয়াল ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে এই লিপির প্রকৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা উদ্ধার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায় এই দুইজন ভারতের কৃতী সন্তান বিহার-উড়িষ্যার মহামান্য ছোটলাট গেট্ সাহেবের বিশেষ কার্য্যকারিণী সহায়তায় এই গুহালিপির স্পষ্ট প্রতিকৃতি লইয়া ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের মন্তব্যসহ প্রকাশ করেন (J. B. O. R. S., Vol. III, Part IV --Pp. 425 507)।

এই লিপি প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে খোদিত। ইহা সপ্তদশ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। প্রথম চারি পংক্তি পরিষ্কার; পঞ্চম পংক্তি প্রায় তদ্রূপ; ষষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ পংক্তিগুলি সুবিধাজনক নহে; শেষ দুই পংক্তি সুন্দররূপে পাঠের যোগ্য —এই দুই পংক্তিতেই আলোচ্য অব্দ উৎকীর্ণ···১৬৫ 'রাজ-মুরীয় কালে' সম্পন্ন। এই অব্দ **মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত সংবৎ** বলিয়া আমরা ধরিতে প্রস্তুত। কিন্তু বিভিন্ন মনীষিগণ ইহার বিভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এতদিন ইহা সংশয়পূর্ণ ছিল—এক্ষণে নিঃসন্দেহে উহা পুরাণোক্ত মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের অব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। স্মিথ সাহেব তাঁহার Early History of India নামক ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের যে-কাল নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিলেন এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে সমুৎসুক। রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটির জর্নালে তিনি স্পষ্টতর তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের কথা বিঘোষিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থে (Oxford History of India, p. 70) এই ক্ষারবেল-লিপি-অনুসারেই খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৬-৩২২ অব্দের মধ্যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক কাল বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই লিপি-অনুসারেই জৈন ধর্ম্মের প্র[illegible]ক মহাবীরের ও গৌতমবুদ্ধের নির্ব্বাণকাল যথাক্রমে ৫২৭ ও ৫৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জায়স্ওয়াল মহাশয় সুঙ্গ ও শিশুনাগ রাজবংশের বিবরণেও অনেক নূতন তথ্যের সংবাদ উপস্থিত করিয়াছেন।

নানাঘাটের লিপিকে প্রথম ধরিলে মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের পরে এই ক্ষারবেল-লিপিকে ঐতিহাসিক-ভাবে দ্বিতীয় প্রাচীন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ১৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের খোদিত লিপি,—অর্দ্ধমাগধী ও জৈন প্রাকৃতের লক্ষণযুক্ত [বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন প্রতিকৃতি] অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ। কলিঙ্গপতি সম্রাট্ ক্ষারবেলের গৌরব-কাহিনীর প্রত্যেক বর্ষের বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে খোদিত রহিয়াছে। নীরব গুহা নীরবে সেই

বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। ক্ষারবেল পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া চতুর্বিংশতিবর্ষ বয়সে অভিষিক্ত রাজা হইয়াছিলেন। প্রথম বর্ষে প্রবল বাত্যা-ঘাতজর্জ্জরিত কলিঙ্গরাজধানীর সংশোধন, পুনর্গঠন ও ৩৫ লক্ষ কলিঙ্গ প্রজার মনস্তুষ্টি-সাধন। দ্বিতীয় বর্ষে পশ্চিমে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সাতকর্ণিকে তুচ্ছ করিয়া সৈন্য চালনা এবং কশপ ক্ষত্রিয়গণের সাহায্যে মসিকদিগের রাজধানী ধ্বংস। তৃতীয় বর্ষে তাঁহার গান্ধর্ব্ববিদ্যা সাধনা। চতুর্থ বর্ষে (বোধ হয়) বিদ্যাধরদিগের [দেবতাগণের] মন্দির সংশোধন, পুনর্গঠন এবং রাষ্ট্রিক ও ভোজক-বিজয়। পঞ্চম বর্ষে রাজা নন্দ কর্ত্তৃক তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে খনিত খালের তানাস্থলিয়া রোড হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত বৃদ্ধিকরণ। ষষ্ঠ বর্ষে পৌরজনপদদিগের সুবিধাজনক কর্ম্ম-সাধন। সপ্তম বর্ষে [অস্পষ্ট লিপি] বোধ হয় বিবাহ। অষ্টম বর্ষে মগধ-আক্রমণ: বরাবর পাহাড় (গোরথ গিরি) পর্য্যন্ত অগ্রসর—গয়া হইতে পাটলিপুত্র-পথে কাহাকেও নিধন ও পথ-পরিষ্কার; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রাজগৃহপতি বহপতি মিত্রের (পুষ্যমিত্রের) মথুরায় পলায়ন। নবম বর্ষে মহাদান —কল্পতরু ব্রত—রথ, হস্তী, অশ্ব, গো, স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তুদান ও ব্রাহ্মণ-ভোজন; ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী প্রাচী নদীর উভয় তীরে পঞ্চত্রিংশ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ব্যয়ে বিজয়-প্রাসাদ নির্ম্মাণ (তোষালী----ধাউলি ?)। দশম বর্ষে ভারতবর্ষে [আর্য্যাবর্ত্তে] সৈন্য-প্রেরণ [অস্পষ্ট লিপি]। একাদশ বর্ষে পৃথুদকদর্ভ নগরে পূর্ব্বরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ত্রয়োদশশতবর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত কেতুভদ্র (কেতুমান ?) রাজার দারুমূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা—তাহাতে জনপদ আনন্দিত। দ্বাদশ বর্ষে উত্তরাপথ আক্রমণ; সেইবর্ষে মগধের প্রজাগণের বিস্ময়-ত্রাস-জনিত হৃৎকম্প; ক্ষারবেলের নিকট মগধরাজের বশ্যতা-স্বীকার; অঙ্গ ও মগধ হইতে বিজয়-চিহ্নসহ প্রত্যাবর্ত্তন; মগধের রাজধানী হইতে কলিঙ্গরাজগণের পুরুষানুক্রমিক কতক-গুলি অস্থাবর সম্পত্তি ও প্রতিমূর্ত্তির উদ্ধার-সাধন [বিশেষ বিবরণ বিনষ্ট]; কলিঙ্গ রাজধানীতে অত্যুচ্চ বিজয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং তাহাতে বিজয়-চিহ্ন ও উপঢৌকন প্রভৃতি সজ্জীভূত করণ; পাণ্ড্যরাজ কর্ত্তৃক হস্তিপোতে রথ, অশ্ব, গজ, পরিচারকবর্গ, স্বর্ণ, মণিমুক্তা, প্রস্তর প্রভৃতিসহ বহুমূল্য উপঢৌকন-প্রেরণ। ত্রয়োদশ বর্ষে [সুপ্রবৃত্ত-চক্র] রাজ্য বিস্তৃতির তৃপ্তি; ধর্ম্মচিন্তা, কুমারী (উদয়গিরি) পর্ব্বতে অর্হৎ মন্দিরের জন্য কোন কর্ম্ম-সাধন [অস্পষ্ট লিপি]; তাঁহার নবতি লক্ষ গো-পালন; অর্হৎমন্দিরের নিকট শিলাহাস-নির্ম্মাণ; চারিস্তম্ভযুক্ত মণিমুক্তা-খচিত শিবির-নির্ম্মাণ এবং লিপিসহ হস্তিগুম্ফা-গুহার উৎপাদন। পরিশেষে তাঁহার রাজনৈতিক প্রশংসাসহ তিনি ক্ষেমরাজ, বদ্ধরাজ, ভিক্ষুরাজ, ও ধর্ম্মরাজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

কলিঙ্গ-সম্রাট্ প্রতাপশালী এই ক্ষারবেলের ইতিবৃত্ত এতদিন পর্য্যন্ত ইতিহাসে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। হস্তিগুম্ফালিপির প্রকৃত পাঠোদ্ধার সাধনের পর সম্প্রতি এই প্রাচীন কাহিনী বিদ্বৎসমাজের গোচরে আসিয়াছে। এই লিপি দ্বারা অনেক অভিনব ঐতিহাসিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। মহাভারত পুরাণাদিকীর্ত্তিত প্রাচীন ইতিবৃত্ত ইহাদ্বারা সমর্থিত হইতেছে। পুরাণ-কাহিনী এখন আর ইতিহাসে স্থানলাভের অযোগ্য বলা চলে না। মহাভারতে আমরা কেতুমান্-নামক কলিঙ্গ যুবরাজের সেনাপতিত্বে কলিঙ্গ-সৈন্যের যুদ্ধ-বিবরণ প্রাপ্ত হই; সেই কেতুমান্ বোধ হয় কেতুভদ্র বলিয়া এই লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাপদ্ম নন্দের সময় কলিঙ্গের প্রথম রাজবংশের অধিকার বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে আবার কলিঙ্গ-রাজ্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। প্রিয়-দর্শী ভারত সম্রাট্ অশোকের সময় সেই দ্বিতীয় রাজবংশের পতন হয়। মৌর্য্যবংশের ধ্বংসাবসানে চেতবংশ স্বাধীন হইয়া তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লিপিতে যে-ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী কলিঙ্গ-রাজবংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কলিঙ্গপতি ক্ষারবেল পূর্ব্বতন রাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তিনি খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুইশতবর্ষ পূর্ব্বে কলিঙ্গের তৃতীয় রাজবংশ চেত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে নিম্নলিখিত-ভাবে ঐতিহাসিক সময়গুলি নির্দ্ধারণ করা চলিতে পারে :—

খ্রীঃ পূঃ ৪৬০—কলিঙ্গে নন্দবংশের রাজত্ব।

২৩৬—অশোকের মৃত্যু।

২২০—কলিঙ্গের তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা।

২১৩—সাতবাহন-বংশের রাজ্যারম্ভ।

১৯৭—ক্ষারবেলের জন্ম (চেতবংশে)।

১৮৮—মগধে মৌর্য্যবংশের পতন—পুষ্যমিত্রের সিংহাসন লাভ।

১৮২—ক্ষারবেল যুবরাজ।

১৮০—সাতকর্ণিসহ সংঘর্ষ।

১৭৩—ক্ষারবেলের রাজ্যাভিষেক।

১৬৫—প্রথম মগধ-আক্রমণ—গোরথ গিরি-সংগ্রাম।

১৬১—দ্বিতীয় মগধ-আক্রমণ।

১৬০—হস্তিগুম্ফা-গুহা-লিপি।

১৪৬০—কেতুভদ্র। কেতুমন্—মহাভারত কাল।

[১৪৬০+১৯২৪=৩৩৮৪ অর্থাৎ এখন হইতে তিন সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র সমর।]

কলিঙ্গরাজ্যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তসংবৎ প্রচলিত ছিল কেন? কলিঙ্গরাজ্য মগধের অধীন থাকায় তথায় চন্দ্রগুপ্ত অব্দ প্রচলিত হইবার সংশয় জন্মিতে পারে না। মগধ-রাজ নন্দের মুরা নাম্নী এক পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। মুরার নামানুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য-বংশীয়। "রাজমুরীয় কাল" নিশ্চয়ই এই মুরা-সন্তান চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক বর্ষ হইতে গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। মৌর্য্যবংশীয় পুরাণোক্ত চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয়ই খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কালের ১৬৫ বৎসর অতীত হইলে এই হস্তিগুম্ফা-গুহালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজমুরীয় কালই চন্দ্রগুপ্ত সংবৎ ইহাতে কোন সংশয় নাই। লিপিতে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় বর্ষের বিবরণে সাতকর্ণি-সংঘর্ষ। এই সাতকর্ণি তৃতীয় অন্ধ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্যরাজ সাতবাহন। পশ্চিম বেরার প্রদেশে ইঁহার আবির্ভাব। ইঁহাদের লিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সাতবাহন-রাজগণ বারেন্দ্র পাল রাজগণের ন্যায় প্রজাশক্তির সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়া উড়িষ্যার পশ্চিম সীমাপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ক্ষারবেল-লিপির পঞ্চমবর্ষের বিবরণে তিনশত বর্ষপূর্ব্বে খাল-খননের যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা নবম নন্দরাজ নন্দী-বর্দ্ধনের সময়ে ঘটিয়াছে। ক্ষারবেল দুইবার মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথম আক্রমণে রাজগৃহ-পতি বহপতিমিত্র মথুরায় পলায়ন করিয়াছিলেন। এই বহপতি বা বৃহস্পতি মিত্রই পুষ্যমিত্র। বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রের অধিপতি; সুতরাং বৃহস্পতিমিত্র পুষ্যমিত্রের নামান্তর হইতে পারে। পুরাণে এইরূপ নামান্তরের দৃষ্টান্ত বিরল নহে—বিম্বিসার শ্রেণীক, অজাতশত্রু কুনীয়, অশোক প্রিয়দর্শী প্রভৃতি।

মৌর্য্যবংশীয় শেষ সম্রাট্ বৃহদ্রথের শ্লথ কর হইতে তাঁহার সেনাপতি সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র আর্য্যাবর্ত্তের শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং পাটলিপুত্রে সম্রাট্ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৮৮ খৃঃ পূঃ অব্দে ঘটে। বহপতি-(বৃহস্পতি) মিত্র ও পুষ্যমিত্র যে একই ও অভিন্ন ব্যক্তি তাহার সংশয় জন্মিতে পারে না। সুতরাং পুষ্যমিত্র যে ১৮৮ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কলিঙ্গে যে মহাভারতীয় যুগ হইতে আর্য্যাধিকার বিস্তার হইয়াছিল এবং আর্য্য রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট্ ক্ষারবেল আপনাকে রাজর্ষিবংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করাইয়াছেন; তিনি স্পষ্টতঃ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ-বংশের সহিত এই ক্ষারবেলের আত্মীয়তা-সম্পর্ক অনুমান করা যাইতে পারে। শিশুনাগ নন্দ রাজগণের এবং মৌর্য্য সম্রাট্বংশের সমকালে বা তৎপূর্ব্বে এই অঞ্চলে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজবংশ বর্ত্তমান ছিল। গ্রীক-দূত ও চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত ইতিবৃত্তে তাম্র-লিপ্ত-রাজ্যের কথা বিবৃত আছে। মহাভারতে তাম্রলিপ্ত-রাজ ময়ূরধ্বজের উল্লেখ আছে। জৈমিনীয় মহাভারতে এই রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের অলৌকিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, এখনও তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুগলমূর্ত্তিতে তমলুকের জিষ্ণুহরি মন্দিরে বিরাজমান। আমরা পূর্ব্বতন ঐতিহাসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ-বংশের সহিত একবংশীয় বলিয়া ধরিয়া

লইতে পারি। তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নন্দ রাজগণের সময়ে এবং সম্রাট্ খারবেলের সময়ে উড়িষ্যার প্রজাগণের মধ্যে জৈন ধর্ম্মের প্রসার হইয়াছিল।

কলিঙ্গরাজ্য এই সময়ে উৎকল বা ওড্র ও গঙ্গারিডিরাজ্য তাহার কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল। "প্লিনিকর্ত্তৃক 'গঙ্গারিডি' এবং 'কলিঙ্গি' (কলিঙ্গ) একত্র উল্লিখিত দেখিয়া মনে হয় কলিঙ্গ তখন গঙ্গারিডি রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান উড়িষ্যা এবং উড়িষ্যার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে তখন কলিঙ্গ বলিত। পরবর্ত্তীকালে যখন উড়িষ্যা ওড্র বা উৎকল-নামে পরিচিত হইল এবং প্রাচীন-কলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগই কেবল কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইতে লাগিল, তখনও উৎকল 'সকল কলিঙ্গের' বা 'ত্রিকলিঙ্গের' এক কলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত।" (গৌড়-রাজমালা—২ পৃষ্ঠা)।

এই হস্তিগুম্ফালিপিতে কলিঙ্গ-সম্রাট্ খারবেলের তাম্রলিপ্ত বা বঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্ব-দক্ষিণদিক্‌স্থ রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না—পক্ষান্তরে তাম্রলিপ্তের রাজগণ মহাভারতীয় যুগ হইতে বরাবর অক্ষুণ্ণভাবে তাঁহাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কলিঙ্গের অন্যান্য সম্রাট্‌গণের অভিযান-কালেও তাম্রলিপ্তরাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ অথবা সমর-সংবাদ পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তাম্রলিপ্তরাজগণ প্রাচীন কলিঙ্গরাজগণের মিত্ররাজ ছিলেন। তাম্রলিপ্তরাজগণের স্বজাতীয় গঙ্গারাঢ়ী বংশীয় রাজগণ তাম্রলিপ্ত হইতেই অগ্রসর হইয়া কলিঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন (তমলুকের ইতিহাস—৫১—৫৩ পৃষ্ঠা)। এই প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রাচীনকালে 'গঙ্গারিডি' বা গঙ্গারাঢ়ী 'তাম্রলিপ্ত' ও কলিঙ্গ (ক্লীং) বলিয়াও কথিত হইতেন। এই হাওড়া, ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে অদ্যাপি সামন্ত, সেনাপতি, দলপতি, দিক্‌পতি, বাহুবলীন্দ্র, গজেন্দ্র, রণঝম্প, গড়নায়ক, দৌবারিক, পাত্র, মহাপাত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র (বাঘ), শতরা, হাজরা প্রভৃতি বীরত্ব-সূচক উপাধি বহুল-পরিমাণে বিদ্যমান। সেই প্রাচীন কালের বীরগণের সন্তানগণ এক্ষণে কেবল ব্যর্থ উপাধি বহন করিয়া প্রাচীন স্মৃতি জাগরূক রাখিতেছেন। ইঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে রোম-সম্রাটের নিকট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জগতকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; উড়িষ্যায় বিস্তৃত হইয়া ইঁহাদেরই আত্মীয়বর্গ খণ্ডাইত বা গড়জাত বলিয়া অধুনা পরিচিত হইতেছেন। যে-বাঙ্গালীর রণপাণ্ডিত্যে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত যাঁহাদের করতলগত ছিল, সেই বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া তাম্রলিপ্ত রাজ্য। এই তাম্রলিপ্তরাজ্যের অধিবাসীরা উৎকল, কলিঙ্গ, ভারতের দক্ষিণ উপকূল, সিংহল, যব, সুমাত্রা প্রভৃতি ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন, আর্য্যধর্ম্ম প্রচার ও আর্য্যজাতির বিজয়পতাকা প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা বাঙ্গালীর অসামান্য গৌরবের কথা। মান্দ্রাজের তামিল জাতিও তাম্রলিপ্ত জাতি হইতে উদ্ভূত—পণ্ডিতবর কনকসভৈ পিলে মহাশয় তাঁহার তামিল জাতি-সংক্রান্ত গ্রন্থে (Tamils Eighteen Hundred Years Ago) লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধা-কুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভারতীয় অর্ণবপোত-সংক্রান্ত গ্রন্থে (Indian Shipping) এবং ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় "বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাহার সমর্থন করিয়াছেন। যাঁহাদের রণপাণ্ডিত্যের সহায়তায় কলিঙ্গ-সম্রাট্ উত্তরাপথ ও মগধাধিপতিদিগকে পরাজিত করিয়া অত্যুচ্চ বিজয়-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যাঁহাদের সাহায্যে তিনি দাক্ষিণাত্যে সাতকর্ণি-দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন; মাসিক রাষ্ট্রিক ও ভোজকগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; যাহাদের বীরদর্পে দক্ষিণ উপ-কূলস্থ ভীতিবিহ্বল পাণ্ড্যরাজ পরিচারকগণসহ বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহার কোন সংশয় নাই। এই লিপি দ্বারা কনক-সভৈ পিলে মহাশয়ের মত সমর্থিত হইতেছে।

পঞ্জিকার মতে রাজা পরীক্ষিত হইতে এপর্য্যন্ত কলিকালের ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া পণ্ডিতগণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে বহু গবেষণা করিয়াছেন।

সমালোচনা করিয়া আমি বলিয়াছি যে "চন্দ্রগুপ্ত নামাঙ্কিত যে-কোন ঐতিহাসিক কাল দ্বারা পুরাণবর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের সময় ধরা যায় না—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কালও ধরা যায় না।" কিন্তু এখন এই প্রাচীন লিপি-অনুসারে আমরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল একপ্রকার নির্ণয় করিতে পারি। ক্ষারবেল-লিপিতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের কাল উৎকীর্ণ থাকার সন্ধান পাইয়া এখন আমরা ৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ইহা জানিতে পারি। ক্ষারবেলের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক [তেরো-শ'বর্ষ] ১৩০০ তেরো শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত কেতুভদ্রের দারুমূর্ত্তির উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ কেতুভদ্র খৃঃ পূঃ ১৪৬০ অব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। কেতুভদ্রকে মহাভারতের কেতুমান্ বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অতএব এখন হইতে ১৪৬০+১৯২৪=৩৩৮৪ বৎসর পূর্ব্বে কেতুভদ্র (কেতুমান্) মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের হিসাব-অনুসারেও মহারাজ পরীক্ষিত চন্দ্রগুপ্ত হইতে ১১১৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; মৎস্য ও বায়ু-পুরাণে ১১১৫ স্থলে ১১৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়। এই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের ১৬৫ অতীত অব্দে হস্তিগুম্ফ-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং ১১১৫+১৬৫=১২৮০ অথবা ১১৫০+১৬৫=১৩১৫ বর্ষ পরে সম্রাট্ ক্ষারবেল পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত কেতুভদ্রের দারুমূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ক্ষারবেল চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক। সুতরাং মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অব্দই ক্ষারবেল-লিপিতে 'রাজমুরীয় কালে' উৎকীর্ণ। এই 'রাজমুরীয় কাল' অতঃপর ঐতিহাসিকগণের নিকট **"মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত সংবৎ"** বলিয়া পরিচিত হইতে চলিল।

[এই ব্যাঘটি, শ্রীযুক্ত সাওাজিরাও বাবাসাহেব ঘোরপাড়ে (কপ্শির রাজা) ২৮এ মে ১৯২৪, আম্বোলির এক জঙ্গলে শিকার করেন। ২০ গজ দূর হইতে ইহাকে হত্যা করা হয়। বাঘটি সাড়ে ১১ [illegible]]

শ্যাম-রাজ্য

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

ভারতবর্ষের গৌরবের দিনে তার অভিযান যে-সব দেশের ওপর জয়ের অধিকার বিস্তার করেছিল তাদের ভিতর একটি দেশ ছিল শ্যামরাজ্য। শ্যামরাজ্যের নানা স্থানে এখনও ভারতের সেই গৌরবের দিনের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের অলিখিত ইতিহাস যারা সম্পূর্ণ কর্‌তে চান শ্যামরাজ্যের প্রত্নতত্ত্বের ভিতর তাঁরা অনেক উপাদান পাবেন—এ-বিশ্বাস খুব অন্যায় বলে' মনে হয় না।

রবিন্‌সন্ রোড শিঙ্গাপুর

শ্যামে যেতে হ'লে অবশ্য শিঙ্গাপুর পথে পড়ে না। কিন্তু তবুও সামান্য একটু ঘুরে' শিঙ্গাপুরটা দেখে' যাওয়াই ভালো। কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে এ সহরটার যোগও খুব ঘনিষ্ঠ। কলিকাতা থেকে জাহাজে শিঙ্গাপুর দিন-বারোর পথ। শিঙ্গাপুরটাকে নানা জা'তের 'হরিহর ছত্রের' মেলা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এমন জা'ত নেই যা শিঙ্গাপুরে আস্তানা গাড়েনি। চীনে', জাভার লোক, ভারতবাসী, জাপানী, আরব, মলয়ের অধিবাসী, ইউরেশীয়ান সব দেশের লোককে চোখে পড়ে শিঙ্গাপুরের রাস্তায় পা বাড়ালে। বাংলাদেশে বাঙ্গালীর যে অবস্থা, শিঙ্গাপুরে মলয়ের লোকের অবস্থা তার চেয়ে কিছুমাত্র ভালো নয়। তারাই সেখানে সব চাইতে বেশী দুর্দ্দশার জের টেনে চলেছে। বড়-বড় ব্যবসা সব অন্য জাতের একচেটে, তাদের ভাগ্যে যা জোটে সে কেবল কুলী-মজুরদের কাজ। শিঙ্গাপুরে ব্যবসায়ীদের ভিতর সব-চেয়ে উন্নতিশীল জা'ত হচ্ছে চীনেরা। আরবেরাও সেখানে বেশ উন্নতিশীল উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা করেছে। বহু পূর্ব্বে আরবদেশ হ'তে বেরিয়ে যারা মলয় উপদ্বীপে আস্তানা গেড়েছিল তারা অনেক হিন্দু এবং বৌদ্ধকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে' তোলে। তাদেরি বংশধরেরা

আজ সেখানে বেশ প্রতিপত্তির সঙ্গেই বসবাস করছে। ভারতীয়দের ভিতর মাদ্রাজের চুলিয়া বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এখানে যে সাফল্য লাভ করেছে, তাও উল্লেখ-যোগ্য।

বর্ত্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ দিয়ে শিঙ্গাপুরের খুব দুঃসময় যাচ্ছে। রবারের ব্যবসাটাই শিঙ্গাপুরের প্রধান ব্যবসা। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবসাটা দুনিয়ার বাজারে খুব জোরের সঙ্গে চল্‌ছিল। সুতরাং শিঙ্গাপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের আব্‌হাওয়াটাও তখন

শ্যামদেশীয় বালিকা

বেশ সরগরম ছিল। এখন রবারের বাজার বেজায় মন্দা পড়ায় শিঙ্গাপুরের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে পড়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি চীনে-বণিকেরাই এখানে সবচেয়ে ধনী এবং উন্নতিশীল। এই ধনী বণিকেরা তাঁদের বাড়ীগুলোও চমৎকার করে' তৈরী করেছেন। সমুদ্রের ধারে তাঁদের আবাস-গৃহগুলো ঠিক ছবির মত দেখায়। চীনের স্বভাবের সঙ্গে শিল্পের একটা যে সহজ যোগ আছে, এই বাড়ীগুলোর দিকে তাকালেই তার পরিচয় সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অল্পদিন আগে এখানকার ভারতীয় ভদ্রলোকেরাও এখানে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ক্লাবের যা আধুনিক বিশেষত্ব সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেই এই ক্লাবটি গড়ে' উঠ্‌ছে।

শিঙ্গাপুর থেকে শ্যামে যেতে হ'লে পেনাং-এর পথে যেতে হয়। কারণ এই পেনং থেকেই শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককের গাড়ী ছাড়ে। পেনং এবং শিঙ্গাপুরের মাঝ-খানের দরিয়াটা পার হ'তে হয় বর্ত্তমানে ষ্টিমারের সাহায্যে। কিন্তু এ অসুবিধেটাও মোচনের চেষ্টা চল্‌ছে। জোহোর প্রণালীর ওপর দিয়ে পুল তৈরীর কাজ এরি ভিতরই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এই পুল তৈরী শেষ হ'লেই সোজাসুজি শিঙ্গাপুর থেকে পেনাং-এ গাড়ী চল্‌বে। বর্ত্তমানে সপ্তাহে একদিন করে' অর্থাৎ প্রতি বৃহস্পতিবারে ব্যাঙ্কক এক্‌স্‌প্রেস ছাড়ে, যাত্রীদের শ্যামে পৌঁছে' দেবার জন্যে। এই রেলওয়েটির নাম Federated Malay States Railway ; পথে পড়ে ফেডারেটেড্ মলয় ষ্টেটের 'হেড কোয়ার্টার' কুএলা লামপুর। এ-সহরটাও দেখতে ভারি সুন্দর। এখানে ভারতীয় বণিক্‌দের সংখ্যা শিঙ্গাপুরের চেয়েও ঢের বেশী। এক-রকমের তাল-জাতীয় গাছ এখানে প্রচুর-পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। গাছগুলোর পাতার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন কতক-গুলো ময়ুর তাদের পুচ্ছ মেলে' দাঁড়িয়ে আছে—এম্‌নি চমৎকার—এম্‌নি সুন্দর এই গাছগুলোর গড়ন।

এর পর যে-জায়গার ওপর দিয়ে ট্রেন্ চল্‌তে থাকে, তার চার পাশে কেবল রবারের আবাদী জমি। এমন কি পাহাড়-টিলার মাথাগুলো পর্য্যন্ত রবারের গাছে ঢাকা। এইসব রবারের ক্ষেতে কাজ করে বেশীর ভাগ ভারতীয় কুলী। এই কুলীদের দুর্দ্দশার কথা নিয়ে খবরের কাগজে অনেকবার আলোচনা হ'য়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রতীকারের পথ এখন পর্য্যন্তও বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। এরা যা মাইনে পায় তা'তে এদের খাওয়া-পরাটাও ভালোভাবে চলে না, অনেক সময়
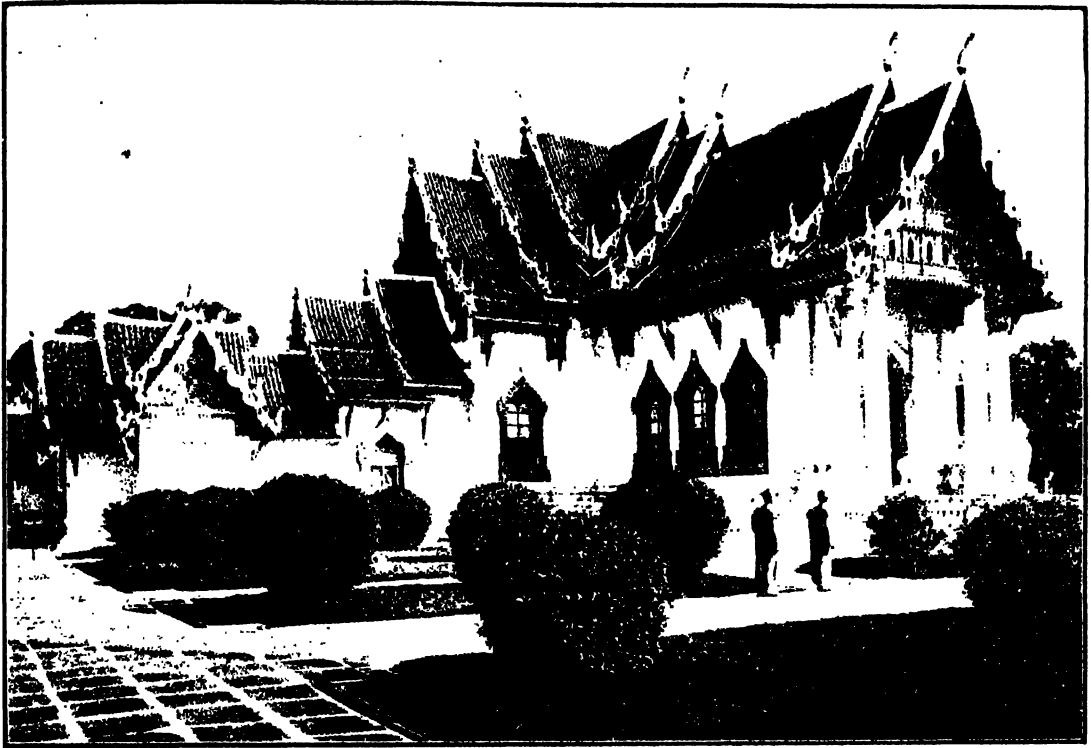
ওয়াট্ বেন্‌চামা　রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ নূতন মর্ম্মরনির্ম্মিত মন্দির

এদের উপোষ করে'ই দিন কাটাতে হয়। ভারতবর্ষ হ'তে ক্রমাগত মজুর চালান দেওয়ার ফল এম্‌নি করে'ই তাদের পক্ষে শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। কিছু দিনের জন্যে মলয়ে ভারতীয় কুলী পাঠানো বন্ধ না কর্‌লে এর আর-কোন প্রতীকার আছে বলে' মনে হয় না। ট্রেন হ'তে অনেক-গুলো টিনের খনিও চোখে পড়ে। এইসব খনির মালিক সাধারণতঃ চীনে মহাজনদের দল। বর্ত্তমানে টিনের বাজারও অত্যন্ত ঢিমে-তেতালায় চল্‌ছে।

'পডং বেশর' শ্যাম-সীমান্তের একটা সহর। এইখানে এসেই গাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষের বদল হ'য়ে যায়। ফেডারেটেড্ মলয় রেলওয়ের ভার তখন গ্রহণ করেন শ্যাম রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ। যাত্রীদের এইখানেই মলয়ের মুদ্রা বদ্‌লে শ্যামের মুদ্রায় টাকা ভাঙিয়ে নিতে হয়। তার পর এক্‌স্‌প্রেস্ গাড়ী শ্যামরাজ্যের ভিতর দিয়ে ছুটতে থাকে। গভীর বনের ভিতর দিয়ে এর পথ। খুব সম্প্রতি এপথ দিয়ে রাত্রিতে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে, নতুবা কিছুদিন আগেও বন্য হাতীর সাথে সংঘর্ষের ভয়ে এ-পথে রাত্রিতে গাড়ী চলত না। এটা যে বৌদ্ধদের দেশ, তা এদেশে পা ফেলে'ই বোঝা যায়,মাটির গায়ে-গায়ে পাহাড়ের মাথায়-মাথায় নানা-আকারের সুন্দর-সুন্দর স্তূপ দিয়ে এ দেশটা এম্‌নি-করে'ই ছাওয়া।

এই বন্যপথ পেরিয়ে ট্রেন্ চলে ধানের আবাদী জমির ভিতর দিয়ে। শ্যামরাজ্যে ধানের বিস্তৃত আবাদ হয়। মলয়, জাভা প্রভৃতি স্থানেই শ্যামের ধানের রপ্তানি বেশী। এখানকার ধান এত উৎকৃষ্ট যে, ইউরোপেও সে ধানের আমদানি হ'য়ে থাকে। শ্যামের পোষাক-পরিচ্ছদ ভারি নূতন-ধরণের—দেখ্‌তে বেশ দেখায়। ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ রঙীন রেশমী ধুতি পরিধান করেন। এই ধুতিকে দেশী ভাষায় বলা হয় 'ফনোম্'। কাপড় তাঁদের এত আঁট-সাঁট করে' পরা যে,দেখে' মনে হয় তাঁরা পাজাম
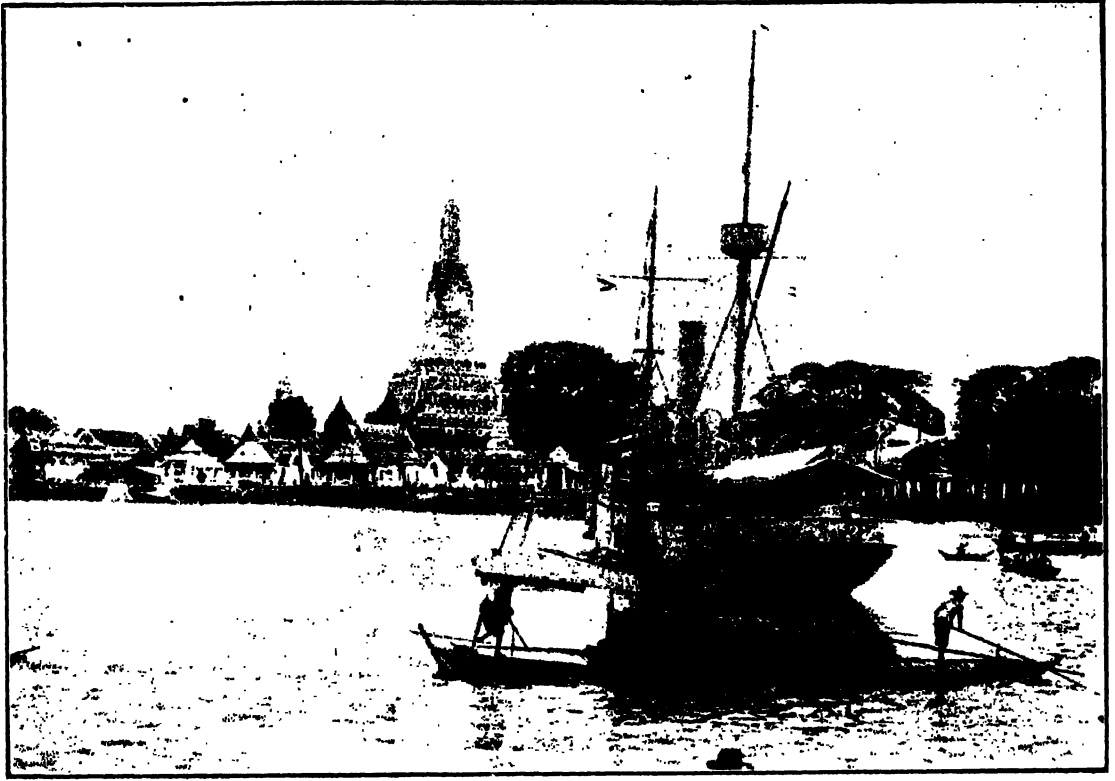
ওয়াট্ চাং, ব্যাঙ্কক

পরে আছেন। পায়ে সাদা মোজা, গায়ে উঁচু কলারের কোট এবং মাথায় ফেল্ট্ হ্যাট্—এই হচ্ছে সে-দেশের ভদ্রলোকদের সাধারণ পরিচ্ছদ। মেয়েদের পরিচ্ছদও ঐ 'ফনোম'। দূর থেকে তাদের দেখায় অনেকটা মারাঠা-রমণীদের মত।

পেনাং থেকে শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক্ ট্রেনে প্রায় ৩৬ ঘণ্টার রাস্তা। পথে সমুদ্রোপকূলের সহর হুয়েহিন দেখ্তে পাওয়া যায়,—চীন-সাগরের যোজন-বিস্তৃত নীলোর্ম্মি রাশির অপরূপ সৌন্দর্য্য মায়া-লোকের রহস্যের মত চোখের সম্মুখে জেগে ওঠে। রেলের পথের ধারেই পুরানো 'নকোন প্তোন' বা নগর প্রথম—ছুনিয়ার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম প্যাগোডা বলে' যে-মন্দিরটি খ্যাতি লাভ করেছে এই ট্রেন থেকেই তার চেহারা নজরে পড়ে।

ব্যাঙ্কক্-সহরটাকে বিভক্ত করে' রয়েছে অজস্র নদী-নালা আর সেইজন্যেই বিদেশীরা ব্যাঙ্ককে, 'এসিয়ার ভেনিস্' আখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু এই নদী-নালার চাইতেও ব্যাঙ্ককে মন্দিরের সংখ্যা ঢের বেশী। অসংখ্য প্যাগোডা অপরূপ শিল্প-কলার ছাপ বুকে নিয়ে এর যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সহরের প্রায় ১/৫ ভাগই বৌদ্ধ-মন্দিরে পরিপূর্ণ। সুতরাং এ'কে 'মন্দিরের দেশ' বল্লেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। মন্দিরের সঙ্গে বড়-বড় আশ্রম সংলগ্ন। পোর্সিলেন টালিতে এবং রঙীন কাচ-খণ্ডে মন্দিরের ঢালু ছাদগুলো একেবারে ঝক্‌মক্ করছে। দরজায় রূপো বা হাতীর দাঁতের কাজ করা—সাধারণতঃ রামায়ণের দু'-একটা দৃশ্য নিয়ে শিল্পীরা তাঁদের কলা-জ্ঞানকে নিখুঁত করে' ফুটিয়ে তুলেছেন। চক্রী-প্রাসাদের ভিতর একটি চমৎকার মন্দির আছে, এ-মন্দিরের ভিতরকার বুদ্ধ মূর্ত্তি মরকত-

ওয়াট্ প্রাকিও—প্রাচীন প্রাসাদের নিকটস্থ স্তূপ
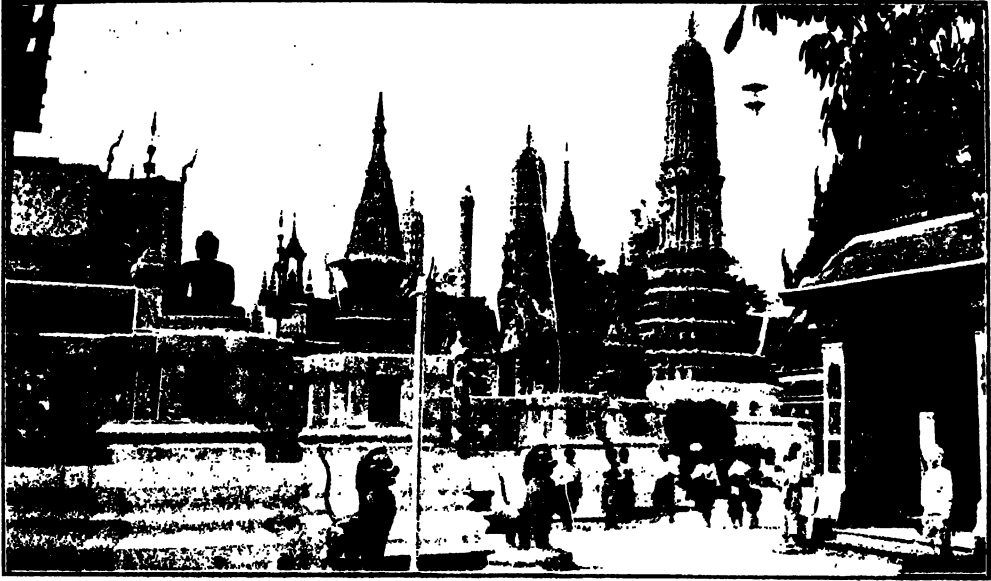
মণি-নির্ম্মিত। শোনা যায় দুনিয়ায় এর চাইতে বেশী দামের মূর্ত্তি নাকি আর কোথাও নেই। শ্যামবাসীদের কাছে এই মন্দিরগুলো কেবল ইট-পাথরের সমষ্টি নয়, তার চাইতে ঢের বড় জিনিস। জীবনের একটা বয়সে রাজা থেকে আরম্ভ করে' সমস্ত লোককেই সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে এইসব মঠে বাস করতে হয়। তা ছাড়া এই মঠগুলো শিক্ষারও কেন্দ্র। শ্যামে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রতি বাধ্যতা-মূলক করা হয়েছে এবং বালকেরা এই মঠেই তাদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। বড়-বড় মন্দিরগুলিতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পালিও পড়ানো হয়। ব্যাঙ্ককে সুদর্শন মন্দির-নামে একটা মন্দির আছে, এর পুরোহিতেরা যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসক তবু তাঁদের ব্রাহ্মণ বলে' ডাকা হয়, মন্দিরের আর-একটি নাম হচ্ছে ব্রাহ্মণ মন্দির। এই মন্দিরে বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি বহু ভারতবর্ষীয় দেবতার মূর্ত্তি আছে।

সন্ন্যাসী চোকান রাজ্বেথীর (Chokun Rajwethi) ব্যাঙ্ককে পণ্ডিত বলে' বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি বলেন, রাজা অশোকের সময় সনক্ থের এবং উত্তর থের নামে দুজন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী শ্যাম-রাজ্যে পদার্পণ করেছিলেন—তাঁরাই শ্যামবাসীদের বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছেন। তখনকার দিনে ভারতবাসীদের কাছে শ্যামের নাম ছিল সুবর্ণভূমি। এঁরা দু'জনেই ছিলেন, রাজা অশোকের মন্ত্রগুরু মৌগ্‌লি-পুত্রের শিষ্য। মৌর্য্যদের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের সঙ্গে সুবর্ণভূমির জানা-শোনা ছিল। ভারতবাসী এবং চীনেদের রক্তের মিশ্রণেই শ্যামবাসীদের জন্ম। শ্যামে হীনযান-পন্থী বৌদ্ধদের প্রতিপত্তিই বেশী। মহাযান-পন্থীদের বৌদ্ধ না বল্‌লেও বিশেষ ক্ষতি নেই কারণ ওটা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই ছদ্মবেশ।

সম্প্রতি সে দেশে চুললঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর অধ্যাপকেরা সকলেই শ্যামের লোক—ইউরোপ, আমেরিকা হ'তে জ্ঞান আহরণ করে' এনে এঁরা দেশবাসীদের ভিতর সেই জ্ঞান বিতরণ করছেন। দেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। সেজন্যে যে এঁদের বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে, তা এঁরা মনে করেন না, অথচ আমাদের দেশের শিক্ষার বাহন ইংরেজী। ইংরেজীকে বদ্‌লে তার জায়গায় দেশী ভাষাকে বসাতে গেলে যে-সব বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করা হয়, তার

ভিতরে প্রধান হচ্ছে এই যে, উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে নতুন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দেশী ভাষায় কেবল কঠিন নয়—একেবারেই অসম্ভব। এযুক্তির মূলে যে আমাদের দাস-মনোভাবই কাজ করছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্যামের অধ্যাপকেরা ব্যবসা-সম্পর্কীয় শব্দ চীনে-ভাষা থেকে গ্রহণ করেছেন, আর তাঁদের সাহিত্যিক পরিভাষা তৈরী হচ্ছে পালি বা সংস্কৃত থেকে। আধুনিক ছাঁচে দেশকে গড়ে' তুলতে ঢের টাকার দরকার অথচ প্রজার ওপর কর-ভারের চাপ বাড়িয়ে দিয়ে তাদের দুঃখকে দুঃসহ করে' তুলতেও শ্যামের রাজ-সরকার রাজি নন। সুতরাং এই অর্থ-সমস্যা তাঁদের একটু বিব্রত করে' তুলেছে। তবে এই সমস্যার সমাধানের পথও তাঁরা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করছেন Northern Railway Lines রাজসরকারের ধন-ভাণ্ডারের বেশ একটা মোটা-রকমের লাভের অঙ্কই জমিয়ে তুলছে।

শ্যামদেশীয় ফুলওয়ালী বালিকা

ব্যাঙ্ককের বৌদ্ধ পুরোহিত

ব্যাঙ্ককের 'বজ্রনব' পুস্তকাগারটাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এখানে দক্ষিণ ভারতের রেখাক্ষরে লেখা বহু সংস্কৃত শিলালিপি রক্ষিত আছে। শিলা-লিপিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে উত্তর-শ্যাম হ'তে। ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক কোক্‌ডেস্ এগুলির পাঠোদ্ধারের ভার গ্রহণ করেছেন। এ দিক্ দিয়ে তাঁর আবিষ্কার ঢের মূল্য-বান্ বলেই মনে হয়। প্রাচীন খে্মর (Khmer) সাম্রাজ্যের আওতায় হিন্দু সভ্যতা সমগ্র ইণ্ডোচায়না এবং মলয়-উপদ্বীপে কি করে' বিস্তার লাভ করেছিল তিনি তাই নিয়ে অনুসন্ধান করছেন। তাঁর মতে এই সাম্রাজ্যটি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতের একদল ঔপনিবেশিকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঔপনিবেশিকেরা ছিলেন সম্ভবতঃ পল্লব-বংশীয় লোক। কারণ খে্মরে পল্লবদের ঐতিহ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁদের সমস্ত শিলালিপি দক্ষিণ ভারতের অপ্রচলিত
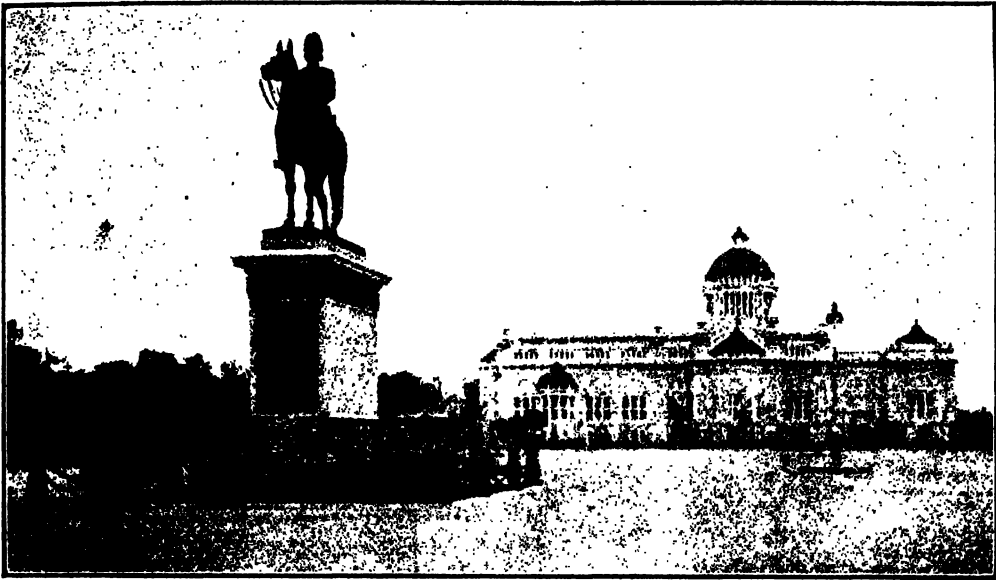
নূতন রাজপ্রাসাদে স্বর্গীয় রাজার প্রস্তর-মূর্ত্তি

গ্রন্থ-রেখাক্ষরে লিখিত। এই শক্তিশালী ব্রাহ্মণ-সাম্রাজ্য একহাজার বৎসর-কাল স্থায়ী ছিল এবং তার পর পুনঃপুনঃ চীনের আক্রমণে বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে। খেমরেরা স্থাপত্য-শিল্পেও খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কাম্বোডিয়ার 'অঙ্কোর' মন্দিরটি তাঁদেরই তৈরী। এটি বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এর চেয়ে বড় মন্দির আর একটিও নেই। অধ্যাপক কোক্‌ডেস বলেন, ভারত-বর্ষের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়টাই সম্ভবতঃ লেখা হয়নি। বিস্মৃতপ্রায় খেমর সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের ওপরেই সে-অধ্যায়টার মাল-মশলা নির্ভর করছে। তাঁর মতে খেমর-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপরেই শ্যামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—শ্যামবাসীদের ভিতর যে ভারতীয় রীতি-নীতি এবং উৎকর্ষের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় এই খেমরদের দৌলতেই তারা তার অধিকারী হয়েছে। বস্তুতঃ শ্যাম এবং ভারতের ভিতর সভ্যতাগত সাদৃশ্য এত বেশী যে, তা অতি সহজেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। শ্যামের অক্ষর-মালা হচ্ছে ভারতীয়, অসংখ্য ভারতীয় গাথা তাদের গ্রন্থের ভিতর স্থান পেয়েছে। প্রিন্স বিদ্যা যিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে' গেছেন, দেশে কবি বলে' তাঁর প্রচুর খ্যাতি আছে। তিনি একখানা বই লিখেছেন তার নাম নল-দময়ন্তী। অভিজাত-বংশের নাম বেশীর ভাগই ভারতীয়। শ্যামের রাজার নাম চতুর্থ মহা-বজ্রায়ুধ রাম, রাণীর নাম ইন্দ্র-শক্তি শচী। শ্যামের জেলা-সমূহের কোনটির নাম সৌরাষ্ট্র, কোনটির বা মহারাষ্ট্র আবার কোনটির বা বিষ্ণুলোক ইত্যাদি। অবশ্য এইসব নামের উচ্চারণ তাদের মুখে ভারতবাসীদের কাণে একটু অদ্ভুত-রকমেই শোনায়।

শ্যামের রাষ্ট্রশক্তি রাজতন্ত্র। নানা বিভাগের মন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত একটি মন্ত্রী-সভা রাজ্য-শাসন-ব্যাপারে রাজাকে সাহায্য করে। বর্ত্তমান শ্যামরাজ্য গড়ে উঠেছে বর্ত্তমান রাজা এবং তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা চুললঙ্করণের প্রচেষ্টায়। আধুনিকতার ছাপ এর ললাটে এঁকে দেবার চেষ্টা সুরু হয়েছে মাত্র বছর কুড়ি আগে। বিদ্যুতের আলো, বিদ্যুতের ট্রাম, ছায়া-বহুল রাস্তা প্রভৃতি সহরের একান্ত আধুনিক উপকরণগুলিতে এই অল্পদিনের ভিতরেই ব্যাঙ্কক এত উন্নতি করেছে যে, প্রাচ্যের আর কোথাও এর জোড়া মেলে না! কিন্তু এইসব নতুন পরিবর্ত্তন এমনি সাবধানতার সঙ্গে করা

শ্যামদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী (বর্ত্তমান রাজার মাতা)

হয়েছে যে ব্যাঙ্ককে দেখে' কেউ ইউরোপের সহর বলে'ও মনে করবে না। প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য এর চেহারার ভিতর এম্‌নি পূরো-মাত্রায় বজায় রাখা হয়েছে।

শ্যামের সামরিক বিভাগও ইউরোপীয় শিক্ষার ধারাকে অনুসরণ করে' চলেছে। রাজার দৃষ্টি এই সামরিক বিভাগটার ওপর অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ। বর্ত্তমান রাজার একটি উল্লেখ-যোগ্য কাজ হচ্ছে Wild Tiger Corps-এর প্রতিষ্ঠা। অভিজাত-বংশের লোকদের এখানে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বছর দশ পূর্ব্বে শ্যামে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করা হয়েছে। ২১ বছর বয়সের প্রত্যেক সুস্থ-শরীর নাগরিককে দু'বছরের জন্যে সমর-বিভাগে যোগদান করতে হয়। সামরিক শিক্ষা ছাড়াও এই ব্যবস্থাটার আরো অনেক উপকারিতা আছে — সংহবৎ, দেশপ্রীতি, আত্মত্যাগ, প্রভৃতি জাতীয়তা-গঠনের অনেকগুলি দরকারী অথচ আয়াস-সাধ্য উপকরণ এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে শ্যামবাসীদের মজ্জাগত হ'য়ে পড়ছে।

নভশ্চরণ-বিদ্যায় শ্যাম যে উন্নতি করেছে তা বাস্তবিকই অদ্ভুত। যুদ্ধের সময় হ'তে সামরিক এবং অসামরিক উভয় ব্যাপারেই এরা উড়ো জাহাজের ব্যবহার সুরু করে' দেয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এখানে উড়ো জাহাজে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ১৯২১ সালের মড়কে উড়োজাহাজে এদের ডাক্তার এবং ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা চলেছিল। স্থানীয় উপাদান থেকে

বর্ত্তমান শ্যাম-নৃপতি ষষ্ঠ রাম

এখানে উড়োজাহাজ তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্থানীয় স্কুল থেকেই পাশকরা লোক নিয়ে এইসব জাহাজ পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এ-বিদ্যেটায় যে এরা কতটা এগিয়ে গিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

শ্যামের রাস্তা-ঘাটে ভারতবাসীর অভাব নেই। বহু

সংখ্যক পাঠান এদেশে এসে আস্তানা গেড়েছে। গুজরান্‌-ওয়ালা থেকে একদল শিখও এখানে এসে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। শিখ গুরুদ্বার, বিষ্ণু-মন্দির প্রভৃতি ভারতীয় সম্প্রদায়গুলিরই প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তিরই পরিচয় প্রদান করে। ভারতবর্ষের এত কাছে এশিয়ারই একটা দেশ ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, এ-সংবাদ ভারতবাসী মাত্রেই যে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে, তা'তে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

ইংরেজের বাণিজ্য-নীতি

শ্রী জ্যোতিভূষণ সেন

এ-দেশের ইংরেজ বণিক্‌ ও ইংরেজ সম্পাদক ভারতীয় বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিবার কথা উঠিলেই তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন! অকস্মাৎ তাঁহাদের হৃদয় ভারতীয় জনসাধারণের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ভারতীয় কৃষকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এইসকল বণিক্‌কুল ও সম্পাদকবর্গ বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। তাঁহারা নানা প্রকারে প্রচার করিতে চান যে, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ধনবত্তার কারণ আর কিছুই নহে, উহা অবাধ বাণিজ্যের ফল। তাঁহারা উচ্চ কণ্ঠে অবাধ বাণিজ্যের গুণগান করেন ও ইংরেজের বাণিজ্য-নীতির উদারতা ও নিঃস্বার্থতা প্রচার করেন।

ইংরেজ-জাতির ধনবত্তার কারণ অবাধ বাণিজ্য কি না ও ইংরেজের বর্ত্তমান অবাধ বাণিজ্য-গ্রহণের মূলে কি তাহা আলোচনা করা যাউক,—ইংরেজ-বাণিজ্যের আদিম অবস্থায় হইতে আরম্ভ করা যাউক।

খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ফিনিসিয় বণিক্‌ ইংলণ্ডে টিন ক্রয় করিতে আসিত। রোমান্‌ অধিকারে ইংলণ্ডের কৃষি উন্নতি লাভ করে এবং অন্যান্য ধাতুর সহিত ইংলণ্ডের শস্যও বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে। স্যাক্‌সন্‌দের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ বিদেশীয় বণিক্‌দের হাতে ছিল। ইংলণ্ডের রাজারা ইংরেজদিগকে বাণিজ্যে উৎসাহিত করিতেন। এই সময় যে-বণিক্‌ বাণিজ্যের জন্য তিনবার সমুদ্র-যাত্রা করিত, তাহাকে Thaneএর অধিকার দেওয়া হইত। নর্‌ম্যান্‌ অধিকার-কালে ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য রীতিমতভাবে আরম্ভ হয়। মুসলমানদের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে (crusade) ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী বড় বড় বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলির সহিত ইংলণ্ডের পরিচয় ও বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের বাণিজ্য দ্বৈপায়ন (insular) অবস্থা হইতে ইউরোপের ও পৃথিবীর অন্যান্য হাটে প্রসার লাভ করিতে থাকে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সহিত ইটালীর বাণিজ্য-সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। পশু-পালন, বিশেষতঃ মেষ পালন, ইংলণ্ডের অতি প্রাচীন ব্যবসা। পশম-শিল্পে ইংরেজের অসাধারণ উন্নতির নানা কারণের মধ্যে ইহাও একটি। সূক্ষ্ম বস্ত্র, রেশম, তুলাজাত নানাবস্ত্র কাচ, মদ, ও অন্যান্য বিলাস-দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ইটালীর বাণিজ্যতরী ইংলণ্ড হইতে চামড়া, শস্য, পশম, ও ধাতু লইয়া যাইত। মধ্যযুগে উত্তর ইউরোপের বাণিজ্যে হান্‌সিয়াটিক লীগের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। এই লীগ উত্তর জার্ম্মাণীর একটি বণিক্‌-সম্প্রদায়। এই লীগের বহু শাখা ছিল, ইংলণ্ডেও একটি শাখা স্থাপিত হয়। কাঠ, পশুর লোম, তামা, মাছ এইসকল বস্তুর পরিবর্ত্তে লীগ ইংলণ্ড হইতে ইংলণ্ডজাত দ্রব্য গ্রহণ করিত। এই লীগের সহায়ে ইংলণ্ডের বাণিজ্য নানা স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

বাণিজ্য-শুল্ক নানাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে

প্রচলিত। রাজপথের ব্যবহার, দস্যু-তস্কর হইতে রক্ষা, বাণিজ্যের অধিকার—এইসকলের পরিবর্ত্তে বাণিজ্য-শুল্ক রাজার প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ব্ব অবস্থায় ইংলণ্ডে এই শুল্ক রাজস্ব-বৃদ্ধির উপায় ও বাণিজ্যের পরওয়ানার মূল্যস্বরূপ বলিয়া মনে করা হইত; ইহার সহিত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ বা জাতীয় কোন ভাব জড়িত ছিল না।

১২শ হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য প্রধানতঃ স্থানীয় নগর-বণিক-সমিতি-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত, এইসকল সমিতি পরে কয়েকজনের একচেটিয়া অধিকার হইয়া দাঁড়ায় ও সাধারণের ধনবৃদ্ধি না করিয়া বিশেষ কয়েকজনের লাভের উপায় হয়। প্রথম অবস্থায় এইসকল সমিতি ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্ব-কালে এক নূতন প্রথা অবলম্বিত হয়। ইংলণ্ডের কয়েকটি সহরকে বেচা-কেনা করিবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। এইসকল সহরকে Staple Town বলা হইত। এই প্রথার ফলে বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের অনেক সুবিধা হয়। ইংলণ্ডের বাহিরেও কয়েকটি নগরকে এইরূপ অধিকার দেওয়া হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এই প্রথা উঠিয়া যায়।

প্রথম এডোয়ার্ডের রাজত্ব-কালে (১২৭৫ খৃঃ অঃ) ইংলণ্ডে পশম, চামড়া ও ধাতুর উপর বহিঃশুল্ক (Export duty) স্থাপিত হয়। তৃতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্ব-কাল হইতে দেশীয় শিল্প-সংরক্ষণের জন্য অন্তঃশুল্ক (Import duty) স্থাপন আরম্ভ হয়। কাঁচা মাল যাহাতে বিদেশে রপ্তানি না হয়, তাহার জন্য বহিঃশুল্ক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। চতুর্থ এডোয়ার্ড্ বিদেশী তৈয়ারী মাল আমদানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। টিউডরদের রাজত্ব-কালে অন্তঃশুল্কের হার আরও বর্দ্ধিত হয় এবং কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এলিজাবেথের রাজত্বকালে কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বার পশম রপ্তানি অপরাধে ধৃত হইলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইত। এইসময়ে কাঁচা মালের রপ্তানি ও তৈয়ারী মালের আমদানি বন্ধ করা, দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বাণিজ্য-নীতিরূপে গৃহীত হয়। বাণিজ্য-নীতির সহিত জাতীয় উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও এই সময়ে বিশেষরূপে স্বীকৃত হয়।

এলিজাবেথের রাজত্ব-কালে ইংরেজের জাতীয় জীবনে জোয়ার আসে। শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে ইংলণ্ডকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করাই সমগ্র জাতির চেষ্টা হয়। আমেরিকার আবিষ্কার ও উত্তমাশা-পথে ভারতে আগমনের পথের সন্ধান ইংরেজ বণিক্‌কে বাণিজ্য-অভিযানে যাত্রা করিবার জন্য চঞ্চল করিয়া তুলে। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এক-যোগে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য এই সময় নানা বণিক্-সমিতি গঠিত হয়। বিশেষ বণিক্-সমিতিকে বিশেষ স্থানে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার রাজকীয় অধিকার দেওয়া হয়। রুশিয়া কোম্পানী, বাল্‌টিক কোম্পানী, গিনি কোম্পানী, (লেভান্ট্ কোম্পানী, ও আমাদের দুরদৃষ্টের মূল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬০০ খ্রীঃ অঃ) এই সময়ে গঠিত হয়। এলিজাবেথের রাজত্ব-কালে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে যে-তরঙ্গ উঠে, তাহার আঘাত বহুদূরে নানাদেশে পৌঁছায়। জাতীয় প্রাণ-শক্তির উচ্ছ্বাস ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল। ইংলণ্ডের বণিক্‌কুল লক্ষ্মীর ঝাঁপির সন্ধানে দিকে-দিকে ছুটিয়াছিল। লক্ষ্মীর ঝাঁপি তাহারা পাইয়াছিল—যে উপায়ে পাইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম্মসঙ্গত হয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে যে বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত ছিল তাহাকে সাধারণত মার্কেন্‌টাইল্ থিওরি বলে। এই নীতির মূল মতগুলি এই—(১) দেশের সমস্ত সোনা-রূপা দেশে রাখা ও অন্যান্য দেশ হইতে উহা আমদানি করা, (২) তৈয়ারী মাল রপ্তানি করা, (৩) আমদানি যথাসম্ভব কম করা। এই নীতি-অনুসারে তৈয়ারী মালের রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংরেজ বণিক্‌কে পড়্‌তা দামের চেয়ে কম দামে তৈয়ারী মাল বিদেশে বিক্রয় করিতে বলা হইত ও ক্ষতিপূরণ ও লাভের টাকা রাজ-সরকার হইতে দেওয়া হইত। আমদানি বন্ধ করিবার জন্য অন্তঃশুল্কের হার বহু-পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই নীতি দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করা হয়।

বাড়্‌তি মালের রপ্তানির জন্য ইংলণ্ড অন্যান্য জাতির সহিত বাণিজ্য-চুক্তিতে আবদ্ধ হইত। ১৭০০ খ্রীঃ অঃ পোর্ত্তুগালের সহিত ইংলণ্ডের যে-চুক্তি হয়, তাহা উল্লেখ-যোগ্য। এই চুক্তি-অনুসারে পোর্ত্তুগাল ইংলণ্ডের পশমে তৈয়ারী মালের উপর অন্তঃশুল্ক হ্রাস করিতে স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ড ইহার পরিবর্ত্তে পোর্ত্তুগালের পোর্ট্‌ মদ্যের উপর শুল্ক হ্রাস করিতে অঙ্গীকৃত হয়। ইহাতে পশমের তৈয়ারী মাল চালান দেওয়া ছাড়া ইংলণ্ডের আরও দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, পোর্ত্তুগাল ব্রেজিল হইতে বহু রৌপ্য আমদানি করিত, এই রৌপ্য ইংলণ্ডে আমদানি করা। দ্বিতীয়, ফ্রান্সের বারগাণ্ডি-মদ্যের ধ্বংস-সাধন। ইংলণ্ডের এই দুই উদ্দেশ্যই সফল হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের নানা জাতি এসিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। এইসকল উপনিবেশের সহিত যে নীতি-অনুযায়ী বাণিজ্য করা হইত, তাহা নেভিগেশ্যন্‌ ল' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক জাতি নিজের উপনিবেশগুলি নিজের সম্পত্তি বলিয়া ভাবিত। এক-জাতির উপনিবেশের সহিত অন্য-জাতির বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। উপনিবেশ-গুলির রপ্তানি ও আমদানি যে-জাতির উপনিবেশ, সেই জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উপনিবেশগুলি কাঁচা মাল যোগাইবে ও বিজেতার তৈয়ারী মাল ক্রয় করিবে, ঔপনিবেশিক বাণিজ্য-নীতির ইহাই মূল কথা। শুধু ইহাই নহে, বিজেতার জাহাজ ছাড়া অন্য কোন জাহাজে মাল আমদানী রপ্তানী করা নিষিদ্ধ ছিল। ইহাই নেভিগেশ্যন্‌ ল'। এইসকল আইন হইতে আয়ার-ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত একেবারে মুক্ত ছিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহাতে ইংলণ্ডজাত ঐ-সকল দ্রব্যের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের পশু-পালন-ব্যবসা ইহাতে নষ্ট হইয়া যায়। আইরিশ্‌রা বাধ্য হইয়া মেষ-পালনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ইংলণ্ড আইরিশ্‌ পশমও ইংলণ্ডে আমদানি করা বন্ধ করিয়া দেয়।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য-নীতির অত্যাচারে আমেরিকার উপনিবেশের ১৩টি প্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। (১৭৭৫— ১৭৮১ খৃঃ অঃ।) নেভিগেশ্যন্‌ ল আরও বহুকাল বলবৎ ছিল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে উহা তুলিয়া দেওয়া হয়। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ শস্য-শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয়, উহার সহিত আরও কয়েকটি অন্তঃশুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হয়। অবাধ বাণিজ্যমত মতহিসাবে এডাম্‌ স্মিথ্‌ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক ওয়েল্‌থ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌ ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। শস্য-শুল্কের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয় ও স্মিথের মত বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এই আন্দোলনে কব্‌ডেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজের বাণিজ্য-নীতির আলোচনা করা গেল। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ও বলশালী হইয়া উঠে। এই ধনবল, নৌবল ও সামরিক শক্তি সমস্তই অবাধ বাণিজ্য-নীতি গ্রহণের **পূর্ব্বেই** অর্জ্জিত হইয়াছিল। অবাধ বাণিজ্য-নীতি-গ্রহণে তাহার হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার কারণ পরে প্রদর্শিত হইবে। সংরক্ষণ-নীতি যেভাবে ইংলণ্ডকে বলশালী ও ধনশালী করিয়াছে, তাহা এই।—

(ক) পশমী কাপড়, রেশমী কাপড় ও সূতী কাপড়ের ব্যবসায়। পশমের ব্যবসায়ে কিভাবে সংরক্ষণ অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। তৃতীয় এডোয়ার্ড ফ্লেমিশ্‌ তাঁতিদের ইংলণ্ডে বসবাসের সুবিধা করিয়া দেন। পশমী কাপড়ের ব্যবসায়েই ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। প্রথম জেম্‌সের সময় ইংলণ্ড যত মাল রপ্তানি করিত তাহার ৯/১০ পশমের কাপড়। ইংলণ্ডের পশম-শিল্প ফ্লেমিংশদের ও হ্যান্‌সিয়াটিক্‌ লীগের পশম-শিল্প ধ্বংস করে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কাপড় ও

রেশমের ব্যবসার কিরূপ অবনতি সাধন করে, তাহা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে। (১)

(খ) উপনিবেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের প্রচুর ধনাগম হয়। ভারতবর্ষ হইতে কোম্পানীর অংশী-দাররা গড়-পড়তা বাৎসরিক ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড লাভ করিত। (২)

(গ) উপনিবেশগুলিও ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর কাঁচা মাল আমদানি ও ঐসকল স্থানে তৈয়ারী মাল প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা। উত্তর আমেরিকার উপনিবেশে ঘোড়ার নাল পর্য্যন্ত তৈয়ারী করা নিষিদ্ধ ছিল। ছোট নৌকার পালের কাপড়টুকুও ইংলণ্ড হইতে আমদানি করিতে বাধ্য করা হইত (Porritt –Fiscal and Diplomatic Freedom of the British Overseas Dominions, p. 12.

(ঘ) ইংরেজ পূর্ব্ব হইতেই বাণিজ্য-তরী-বিষয়ে মনোযোগী ছিল। ডাচ্ ও স্পেনিয়ার্ডদের যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া সে বহু বাণিজ্য-তরী বাজেয়াপ্ত করে। হ্যান্‌সিয়াটিক্ লীগের ৬০খানি বাণিজ্যতরী এলিজাবেথ অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লন। বাল্‌টিক ও উত্তর সমুদ্রের মৎস্যের ব্যবসায় ক্রমশঃ ইংলণ্ডের হস্তগত হয় ও বাণিজ্য-তরীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। তাহার পর Navigation Laws ফলে ইংরেজের বাণিজ্য-তরী অসাধারণ উন্নতিলাভ করে। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ নৌবলের এইখানেই সূত্রপাত।

(ঙ) নানাদেশ হইতে কারিগরেরা নানাপ্রকার উৎপীড়নের ফলে ইংলণ্ডে আশ্রয় লয়। হ্যান্‌সিয়াটিক্ লীগ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর লীগের বহু বণিক তাহাদের বাণিজ্য-তরী ও ধন-সম্পত্তি লইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে আসে। ইহুদী ও ইটালীয়ান্‌রা ইংলণ্ডে মহাজনী করিতে আসে। এইসকল কারিগরদের দক্ষতায় ও ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের কারিগর ও মাল তৈয়ারীর যন্ত্র যাহাতে বিদেশে ও উপনিবেশে না যায় তাহার জন্য কঠোর আইন করা হইয়াছিল। এইসকল আইন আধা-তৈয়ারী কাঁচা মাল পুরাপুরি তৈয়ারীর জন্য উপনিবেশে পাঠান বন্ধ করা হয় ও মাল তৈয়ারীর যন্ত্র ও কারিগরদের বিদেশে বা উপনিবেশে পাঠান দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া স্বীকার করা হয়। দক্ষ কারিগরেরা ইংলণ্ড ছাড়িয়া অন্যত্র ব্যবসা করিতে গেলে তাহাদিগকে দেশের সর্ব্বপ্রকার আইনের অধিকার হইতে বঞ্চিত (outlaw) করা হইত। (৩)

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ধনবত্তার মূলে যে অবাধ বাণিজ্য-নীতি নহে, এইসকল ঐতিহাসিক ঘটনা তাহার প্রমাণ। ইহা সত্ত্বেও ইংরেজ যদি বলে যে, ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার অবাধ বাণিজ্যনীতির ফল, তবে তাহা মিথ্যা। জার্মান অর্থ-নীতিবিদ ফ্রেডারিক্ লিষ্টএর মতে, এত বড় মিথ্যা বর্ত্তমান (বিংশ) শতাব্দীতে আর কেহ প্রচার করে নাই। (৪)

ইংলণ্ডের ক্রমশঃ অবাধ বাণিজ্য-নীতি গ্রহণের কারণ তাহার নিজের স্বার্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ইংলণ্ডে নেভিগেশ্যন্ ল' ও মারকেন্‌টাইল্ ল'র যাহা কিছু পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন করিয়াছে, তাহা পরোপকার বা পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য স্থাপনের জন্য নয়—স্বার্থের জন্য। (৫)

যে-দেশের তৃতীয়াংশের অধিক খাদ্য বিদেশ হইতে আসে যেদেশের আমদানির শতকরা ৯০ ভাগ খাদ্য বা কাঁচা মাল সে-দেশের পক্ষে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। (৬)

(১) (ক) ইংলণ্ড ভারতবর্ষজাত তুলার ও রেশমী কাপড় আমদানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। ইংলণ্ড বেশী দাম দিয়া নিজের দেশে তৈয়ারী মোটা কাপড় ব্যবহার করিত, কিন্তু ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম ও সস্তা কাপড় কোনমতেই ব্যবহার করিতে রাজী হয় নাই (National System of Pol. Ec. –List, p. 35. Lloyd's Eng. translation)। (খ) ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চের চিঠিতে কোম্পানী বাংলা সরকারকে লেখেন যে, বাঙ্গালা দেশে কাঁচা রেশম-উৎপাদনে উৎসাহ দিতে হইবে ও রেশম কাপড় তৈয়ারী যাহাতে কমে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রেশমের তাঁতিদের কোম্পানীর কলে কাজ করিতে বাধ্য করিতে হইবে ও তাহাদের নিজের বাড়ীতে বসিয়া কাজ করা বন্ধ করিতে হইবে। (R. C. Dutt,– Indian Trade Manufacture and Finance).

(২) R. C. Dutt—Indian Trade, Manufacture & Finance. p. 22.

(৩) Porritt—Fiscal and Diplomatic Freedom of British Overseas Dominions, p. 12.

(৪) List—(Lloyd translation) p. 20.

(৫) Porritt—Fiscal and Diplomatic Freedom of the British Overseas Dominions.

(৬) Farrar—The State and its Relation to Trade

অন্তহীন পথ
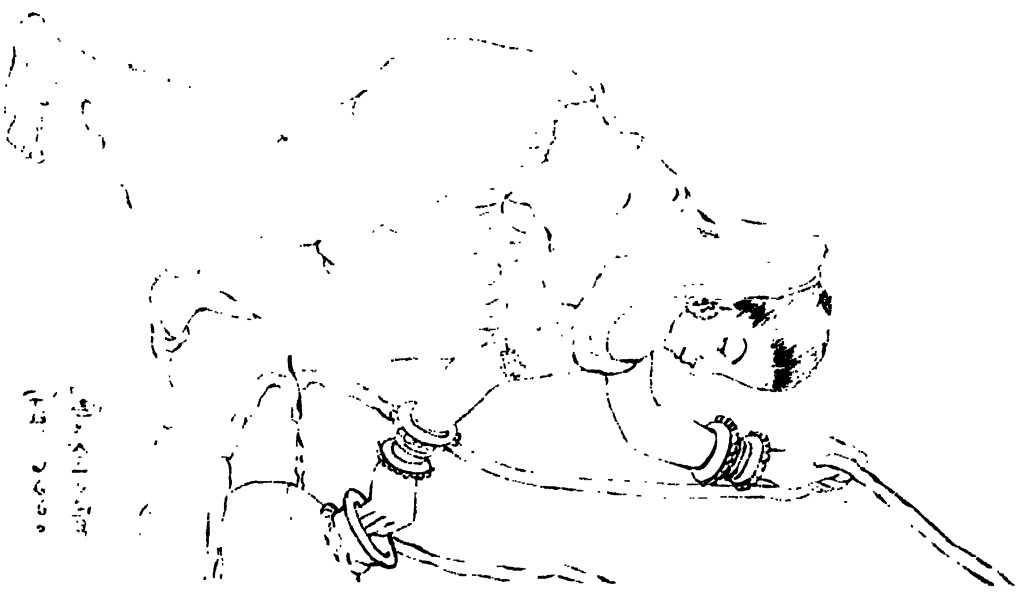
জল তোলা

কল-কারখানার জন্য কাঁচামাল ও শ্রমজীবীদের জন্য শস্য জোগাইতে ইংলণ্ড অক্ষম, সুতরাং তাহাকে দেশের বাণিজ্যের দরজা খুলিয়া রাখিতেই হইবে—অবাধ-বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ ছাড়া তাহার অন্য উপায় নাই। অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রচারকেরাও এ-কথা বুঝেন। ইংলণ্ডের বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষে মিঃ এস্কুইথ্ বলেন যে, ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ ইংলণ্ডের প্রয়োজন ও অবস্থার ফল। তিনি অবাধ বাণিজ্য-নীতির পক্ষপাতী, তাহার কারণ কব্ডেন ও ব্রাইটের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নয়, বিশ্বব্যাপী অবাধবাণিজ্য আকাশ কুসুমে বিশ্বাস নয়, তত্ত্ব বা মতহিসাবে অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রতি ভক্তি নয়; তাহার কারণ ইংলণ্ডের অবস্থা ও প্রয়োজন। (৭)

ইংরেজের বাণিজ্য-নীতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ধন অপেক্ষা ধন-উৎপাদনের শক্তি যে বড় ও বাঞ্ছনীয়, একথা ইংলণ্ড চিরকালই মনে রাখিয়াছে। (৮) যে-হাঁস সোনার ডিম দেয়, সে-হাঁস সোনার ডিমের চেয়ে দামী, একথা ইসপের মত ইংরেজও জানিত। এইজন্য গোড়া হইতেই ধন-উৎপাদনের শক্তির আইনের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও সেই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইংরেজের বাণিজ্যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ আডাম স্মিথের বই পড়িয়া বা মাঞ্চেষ্টার স্কুলের বক্তৃতা শুনিয়া হয় নাই। স্মিথ, কব্ডেন, ব্রাইট্ দেশের ও জাতির প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য নীতি প্রচার করেন, অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন।

বাণিজ্য-নীতি ও ধর্ম্মনীতিতে প্রভেদ আছে। সংরক্ষণ ও অবাধ বাণিজ্য-নীতির সম্বন্ধ বহু ঈশ্বর-বাদ ও একেশ্বরবাদের সম্বন্ধ নয়। বাণিজ্যনীতি দেশ-কালপাত্রের বিভিন্নতা স্বীকার করে ও প্রয়োজন-অনুসারে বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করে। দেশ-কাল-পাত্রের বিভিন্নতা স্বীকার ও তদনুযায়ী বাণিজ্য-নীতি-অবলম্বনই বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ পন্থা। তত্ত্ব-হিসাবে সংরক্ষণ-নীতি ও অবাধ বাণিজ্য-নীতির বিচার যাহাই হউক, তাহার চরম বিচার দেশের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যাহারা অবাধ বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পরম সাধু ও উদার ও অন্য সকলে স্বার্থপর, এরূপ মনে করা ভুল। যে বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিলে দেশের ও জাতির কল্যাণ হয়, তাহাই সাধু, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

(৭) Speech - Dewsbury Nov, 6I923

(৮) এই বিষয়ে List --Pol. ch. XII. দ্রষ্টব্য

যুদ্ধের পর

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের প্রাচ্য বিভাগে বড় বড় পুরাতন বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন ও স্থূল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত একটা বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। রাজ-পথও চলতি রাস্তা হইতে বেশ একটু দূরে অবস্থিত। দেখিলে মনে হয় ঐ বাড়ীতে যে বাস করে, সে বিজনতা ও শান্তির অনুরাগী।

ইহার চারিধারে একটা অকল্পিত ও অযত্নরক্ষিত উদ্যান—দেখিতে বনজঙ্গলের মতো। নিবিড় ঘাসের ভিতর, ঝোপঝাপের ফাবড়া পরস্পরকে জড়াইয়া রহিয়াছে—সেখান দিয়া চলা বড়ই কঠিন। বড় বড় বৃক্ষকাণ্ডের মধ্য দিয়া একটা স্রোতস্বিনী ঘুরিয়া চলিয়াছে—তাহার একঘেয়ে কল্ কল শব্দে উদ্যানটি মুখরিত। পূর্ব্বে যে পাথরের বেড়া ছিল. সেই বেড়ার পাথরগুলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একটা পুষ্করিণীকে হ্রদে পরিণত করিয়াছে। নিবিড় তরু-পল্লব কালো দর্পণের ন্যায় উহাতে প্রতি-বিম্বিত হইতেছে। একটা জীর্ণ গণ্ডোলা-নৌকা, স্রোতোহীন বদ্ধ জলে ভাসমান সবুজ তৃণজালের মধ্যে আপন ভারেই নিমজ্জিত। ইট ও প্রস্তর বাহিয়া নচোড়বন্দা আইভি লতা বাড়ীর সমস্ত দেওয়ালকে আচ্ছন্ন করিয়াছে—এবং উপর তলার আলিসা হইতে তরঙ্গিত ঝালোরের মত ঝুলিয়া পড়িয়া, বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। যেখানে ফুলের কেয়ারি থাকিবার কথা সেখানে ঘাসের সবুজ গালিচা প্রসারিত হইয়াছে; যেখানে গোলাপ ফুটিত সেখানে এখন কতকগুলা জংলী ফুল ফুটিয়াছে। ক্রমাগত চলিয়া চলিয়া একটা সরু পথের সৃষ্টি হইয়াছে, উদ্যানের ফটক হইতে ঐ পথ বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রবেশদ্বারের সোপান-ধাপের মধ্যে মধ্যে,

পাথরের ফুটো-ফাটার ভিতর, রেশমের ফিতার মতো ফালি-ফালি সবুজ শেওলা জন্মিয়াছে। সোপানের দুই প্রান্তে যে দুই এঞ্জেলের প্রতিমা ছিল, তাহার মধ্যে একটা, স্বীয় পাদপীঠের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আর একটা নীচে গড়াইয়া পড়িয়া মৃত্তিকার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। বাড়ীর অভ্যন্তরে, একটা খোলা উঠান, এবং উঠানের মধ্যস্থলে একটা কূপ, উহার লোহার গরাদে বাহিয়া কতকগুলা আগাছা উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে কামরার ভিতর যেসব বিলাস-সামগ্রী ছিল, তাহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও আছে। বিবিধ আস্‌বাব ও দেওয়ালের উপর, যে সাটিন, কিংখাপ ও মখমলের প্রাচুর্য্য ছিল, তাহা এক রাজার ঐশ্বর্য্যের সমান; জরির পাড়, ঝালোর, পর্দ্দা, গালিচা—আরও বহু মূল্যবান্ কত জিনিষ; কিন্তু সমস্তই পুরাতন, রংজ্বলা, কাল-বশে ক্ষয়গ্রস্ত। পর্দ্দার ধারের সাটিন ম্লান হইয়া গিয়াছে, কেদারার বসিবার স্থান সূত্রমাত্রাবশিষ্ট; ফ্রেমের গিল্টির কাজ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কব্‌জার উপর দরজা ভাল করিয়া ঝুলিতেছে না; এবং জীর্ণ গালিচার নীচে মার্ব্বেল টাইলগুলা খটখট করিয়া নড়িতেছে। চাঁদোয়া, রেশম ও ঢালাই-কাচের উপর ধূলিজাল প্রসারিত হইয়া, উহার রং ও উজ্জ্বলতা ম্লান করিয়াছে। ঝাড়লণ্ঠনের সাদা মোমবাতিগুলা কালক্রমে পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

অষ্ট শতাব্দীর বিশিষ্ট রং ও লক্ষণে উপরঞ্জিত এই পুরাতন প্রাচীরের মধ্যে, হর্টেন্‌শিয়া নাম্নী এক পরমাসুন্দরী রমণী নিভৃতভাবে বাস করিত।

২

কেহ জানিত না সে কে। লোকালয়ের কোলাহল হইতে স্বেচ্ছা ক্রমে বিচ্ছিন্ন, ৫।৬ জন ভৃত্যের দ্বারা পরিসেবিত, ইঁহার জীবনযাত্রা-প্রণালী অন্যের কৌতূহল উদ্রেক করিবার জন্যই যেন পরিকল্পিত হইয়াছিল।

সেখানে সমস্তই বিষাদময়, ফুলের কেয়ারির মধ্যে এখন কোন ফুলই নাই; গোলাবাড়ীতেও কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী নাই। বনবিহঙ্গেরাও এই বাড়ী ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনে আশ্রয় লইয়াছে।

এই রমণী ও তাঁহার বাসভবন—এই উভয়ের মধ্যে একটা বিলক্ষণ সাদৃশ্য ছিল। এই পুরাতন অট্টালিকা ও এই বিষাদময় উদ্যানের উপর তাহার যে একটা অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহা এই সাদৃশ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই বিষাদময় ঘর ও রাস্তাগুলার পরিবেষ্টনে, এই প্রশান্ত ও বিষণ্ণ মূর্ত্তি সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের আরও যেন একটু খোলতাই হইয়াছিল। হর্টেন্‌শিয়ার মদালস্ গতিভঙ্গী এবং জীবন-ভারে যেন ক্লান্ত, অর্দ্ধ-পতিত তরু শাখার মৃদুমন্দ হেলা-দোলা—এই দুইই খুব একরকমের। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, আকাশও শ্বেতাভ—এই দুয়ের মধ্যেও একটা রহস্যময় সাদৃশ্য ছিল—উহার মধ্যে ঐ দেশের কবিত্বপূর্ণ বিষণ্ণতা এবং রমণীর সৌম্য প্রশান্তভাব যেন বেশ মিশিয়া গিয়াছিল। তার চোখের দৃষ্টি এবং ঐ সব স্থানের আলোর ভাবটাও যেন একরকমের, অস্পষ্ট ও সর্ব্বদাই জলসিক্ত। বাহিরের আলো কুয়াসার মধ্য দিয়া আসিতেছে; এবং তার নেত্র সর্ব্বদাই অশ্রুজলে আর্দ্র—তাহাতে করিয়া আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কেহ কেহ তাহাকে মনে করে—অনুতাপিনী পতিতা, কেহ বা মনে করে—শোকসন্তপ্তা বিধবা, কেহ বা মনে করে, বিরহ-বিধুরা প্রণয়িণী। সেই অঞ্চলের লোকের নিকট হর্টেন্‌শিয়া একটা জীবন্ত প্রহেলিকা স্বরূপ ছিল। তাহার হৃদয়ের গুপ্ত কথা যে কি, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। বৃক্ষকাণ্ডের কর্কশ ছালের ভিতর প্রচ্ছন্ন কাষ্ঠ-কীটের মতো কি-একটা কষ্ট তাহার হৃদয়কে যেন কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছিল কিন্তু সে মুখে একটা নির্ব্বিকার ভাব ধারণ করিয়া উহা লুকাইয়া রাখিত।

৩

১৮৭০ সাল আসিল। জর্ম্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। ভয়ে পল্লীগ্রামের লোকেরা পলায়ন করিল। ফরাসীরা পর-পর ৪টা যুদ্ধে হারিল। ইহাকে আর যুদ্ধ বলা চলে না—ইহা "আক্রমণের অভিযান" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাষীরা তাহাদের চাষের পশুদিগকে সম্মুখদিকে খেদাইয়া লইয়া পলাইতেছে—তাহাতে করিয়া পথঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিগৃহীত পশুরা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া, মাঠের ফসল নষ্ট করিতেছে। পলায়নরত পল্লী-বাসীদিগের জিনিষপত্রে অতিভারগ্রস্ত শকটগুলা উল্টাইয়া পড়িতেছে, অগ্নিকুণ্ড হইতে ধূমস্তম্ভ উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে—দহ্যমান গৃহের ছাদের উপর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সকল নৃত্য করিতেছে।

হর্টেন্‌শিয়ার বাড়ী একটা ময়দানের উপর অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে দুইটা পাহাড়—দুই পাহাড়ের মধ্যে একটা গিরিসঙ্কট; ফরাসীরা এই গিরিপথকে কেল্লাবন্দী করিয়াছে। বাড়ীর পিছনে একটা ক্ষুদ্র পল্লী; যুদ্ধের হিসাবে ইহা একটা সুবিধার স্থান।

ময়দানে ফরাসীদের যে একটা আস্তানা ছিল, তাহার সৈনিকদিগকে পিছু হটাইবার জন্য প্রুশীয়রা সচেষ্ট হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র হর্টেন্‌শিয়া তাহার বাড়ীর ছাদ হইতে দেখিতে পাইল—রাশীকৃত বৃহৎ সৈন্যদল ঘেঁষা-ঘেঁষি পংক্তি রচনা করিয়া মাঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—কিছু পরে কালো কালো রেখার আকারে প্রসারিত হইয়া—ছোট ছোট সাদা উর্দ্ধোত্থিত ধোঁয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে কামান-নিঃসৃত আগুনের ঝলকে ঐ ধূমের পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তিন দিন ধরিয়া কামানের গর্জ্জন শোনা গিয়াছিল; চতুর্থ দিনে আরও বেশী উদ্যমের সহিত প্রুশীয়রা ফরাসীদের দখলী স্থান আক্রমণ করিল। একটু পরেই দেখা গেল, পলাতকেরা উদ্যান-প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়াছে; সৈনিকদিগের মুখে ভয়ের ভাব মুদ্রিত; এবং সর্ব্বস্বান্ত জোতদার কৃষকেরা তাহাদের বিধ্বস্ত বাসভবন, ও শত্রু-অগ্নিতে ভস্মীভূত ক্ষেত-সকল ছাড়িয়া আসিতেছে।

দিবাবসানে, যখন বিজিতেরা পলাইয়া গিয়াছে—সেই সময় হর্টেন্‌শিয়া দেখিল—তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত যে ধূসর রাস্তা প্রসারিত সেই রাস্তার উপর বায়ু-উত্তোলিত ধূলিজালে আচ্ছন্ন একদল লোক। দুই দাঁড়ি-রেখার মধ্যে একটা কালো কসি-রেখার আকারে, উহারা ধীর বিলম্বিত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পর উহারা এক জায়গায় আসিয়া থামিল। এখন উহাদের প্রত্যেককে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। দুইজন সৈনিক একটা খাটিয়ার উপর একজন আহত সৈনিককে বহন করিয়া আনিতেছিল।

হর্টেন্‌শিয়া আন্দাজে বুঝিল, উহারা উহার বাড়ীতেই আসিতেছে এবং ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া, তাহার নিজের শয্যা প্রস্তুত রাখিতে হুকুম দিল। এইসমস্ত কাজ এত তাড়াতাড়ি করিয়াছিল যে যখন উহারা উদ্যানের ফটকে আসিয়া পৌঁছিল তখন সে উহাদিগকে অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত। রমণী পথ দেখাইয়া দিয়া উহাদিগকে বলিল :—

"ঐদিক্ দিয়ে"।

৪

ঐ আহত ব্যক্তির পশ্চাতে, ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আহত ব্যক্তি আসিল। প্রথমে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদিগকে সবচেয়ে ভাল কামরায় রাখা হইল। পরিশেষে সব কামরাই ভরিয়া গেল। বাকী যাহা ছিল তাহাদিগকে ভৃত্যদের জায়গায়, বারাণ্ডায়, এমন কি চাদ-ঘরে ও আস্তাবলেও রাখিতে হইল। বাড়ীটা একটা মাঠ-হাঁসপাতালে

পরিণত হইল। সৈন্যসংশ্লিষ্ট একদল চিকিৎসক সেখানে মোতায়েন হইল। যখন কামান বন্দুকের দূরাগত গর্জ্জন থামিয়া গেল, তখন, ঐ বাড়ীর প্রাচীরের ভিতর আহতদের গোঙানি ও আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল।

হর্টেন্‌শিয়া তাহার কাপড়ের আলমারি হইতে একটা লাল সাটিনের জাঁকালো পরিচ্ছদ বাহির করিয়া উহা কাঁইচি দিয়া চারখণ্ডে বিভক্ত করিল এবং দুটো চওড়া টুক্‌রা একটা সাদা চাদরের উপর আড়াআড়িভাবে সেলাই করিয়া দিল। উপস্থিতমত এই নিশান প্রস্তুত করিয়া, উহার বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ অংশে উঠাইতে হুকুম দিল।

৫

জর্ম্মানরা ফরাসীদিগকে দূরীভূত করিয়াছিল, কিন্তু আবার ফরাসীরা ঐ বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ব্যূহ পুনর্গঠিত করিয়া, গিরিপথকে রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল; প্রুশীয়রা যে-স্থান অধিকার করিয়াছিল সেখান হইতে গিরিরন্ধ্রে উহারা গোলা নিক্ষেপ করিতে পারিত; ঐ গিরিপথ ও বিজয়ী গোলন্দাজের দল এই উভয়ের মধ্যস্থলে হর্টেন্‌শীয়ার বাড়ী অবস্থিত ছিল। হর্টেন্‌শীয়ার বাড়ীর ছাদে "রেড্‌ক্রস" নিশান উড়িতেছিল। বাড়ী খালি করিয়া ফেলিতে, জার্ম্মান্ সেনাপতি হুকুম দিলেন। এই হুকুমনামা লইয়া একজন সেনানায়ক তখনি যাত্রা করিল এবং আধঘণ্টার মধ্যে উদ্যান-ফটকের সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল।

সেনানায়ক মনে করিয়াছিল, কোন ভয়ত্রস্ত ও পদানত গ্রাম্য লোককে দেখিতে পাইবে; কিন্তু হর্টেন্‌শিয়া আসিয়া স্পষ্ট জবাব দিল—"হুকুম তামিল হইবে না।" সেনানায়কের সঙ্গে দুজন আর্দালি মাত্র ছিল—সুতরাং প্রতিরোধ করা অসম্ভব। কিন্তু রমণীর রূপে সে মুগ্ধ হইয়াছিল। হর্টেন্‌শিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেখানকার সমস্ত কামরা দেখাইল, কামরাগুলা গোলাগুলির আঘাতে আহত সৈনিকে ভরিয়া গিয়াছে। ফিরিবার সময় হর্টেন্‌শিয়া ফটক পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়া আবার বলিল, সে কখনও বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না—যদি বাড়ীর উপর গোলাগুলি বর্ষণ করা হয় তাহা হইলে, তাহার আশ্রয়ে যাহারা আছে তাহাদের যে-দশা হইবে, তাহারও সেই দশা হইবে।

এইরূপ জোরালো-ধরণের উত্তর পাইয়া, বিরক্ত হইয়া সে ফিরিয়া গেল। কিন্তু রমণীর রূপে সে এতটা মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার প্রধানের কাছে সমস্ত ঘটনা রিপোর্ট্ করিবার সময় যদিও অসংখ্য আহতের কথা এবং হুকুম নামা অগ্রাহ্য করিবার কথা বলিয়াছিল, কিন্তু এইসব বিবরণের চেয়ে সে হর্টেন্‌শিয়ার অসাধারণ রূপলাবণ্যের কথাই বেশী করিয়া বর্ণনা করিয়াছিল। সে হর্টেন্‌শিয়ার রূপের এত প্রশংসা করিল যে, যুবক সেনাপতি—তিনি ত আর নির্ব্বোধ লোক নন—তিনি নিজেই এই কঠিন ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন; এবং দুইজন রক্ষক সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে অট্টালিকার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিজয়ী জর্ম্মান্ সেনাপতি যখন অট্টালিকার গরাদে বেষ্টনের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। পথের দুধারে বৃক্ষশাখা ঝুলিয়া পড়িয়া একটা খিলানবীথি রচনা করিয়াছে। দিগন্তদেশে কতকগুলা নারাঙ্গি রঙ্গের মেঘ ক্রমশঃ কালো হইয়া আসিতেছে। জলাশয়ের উপর তরুগণের গঠনহীন পিণ্ডাকৃতি শাখাপল্লব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—প্রতিবিম্ব বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। প্রাচীরের মাথা হইতে আইভি লতা ঝুলিয়া পড়িয়া আন্দোলিত হইতেছে এবং পরিত্যক্ত ফুলের কেয়ারি হইতে ভিজা মাটির তাজা গন্ধ বাহির হইতেছে। গবাক্ষ নিঃসৃত আলোকে আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলা বাদুড় উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং ঐ আলোর পীত রশ্মি উদ্যানের কাঁকরের উপর নিপতিত হইয়াছে। শান্তি-আশ্রমের ন্যায় দ্বারের পাদমূলে রাশীকৃত অস্ত্রের দুইটা স্তূপ স্থাপিত হইয়াছে। ঘাসের উপর পাশাপাশি বিজেতা ও বিজিতের বন্দুক দেখা যাইতেছে। সোপান-গরাদের উপর হাতের উপর ভর দিয়া, হর্টেন্‌শিয়া সোপান সম্মুখস্থ প্রবেশ-দালানে সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করিল। প্রুশীয় সেনাপতি তরুণবয়স্ক। তাঁহার উচ্চপদ স্বীয় আভিজাত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সুললিত ও পুরুষোচিত সুন্দর মুখশ্রী—তাঁহার ক্ষত্র-সুলভ সামরিক ভাবভঙ্গী যে-কোন ললনাকে মুগ্ধ করিতে পারিত। তিনি যখন হর্টেন্‌শিয়াকে দেখিলেন, তখন ভুলিয়া গেলেন—তিনি একজন সৈনিক; মনে রহিল শুধু, তিনি একজন মানুষ; তিনি ভদ্রভাবে মাথা হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া হাতে রাখিয়া দিলেন;—যেন কোন সম্ভ্রান্ত মজলিশের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেছেন।

হর্টেন্‌শিয়া বলিল;—"আমি আপনাকে এইখানে অভ্যর্থনা করছি কেননা আমার বাড়ী একটা রক্তের ডোবা হ'য়ে পড়েছে। ভিতরে গেলে, আপনি ফরাসী-সৈনিকের উর্দ্দি মাড়াবেন, সেই সঙ্গে জার্ম্মান্ সৈনিকেরও উর্দ্দি মাড়াবার আশঙ্কা আছে।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া বাদানুবাদ হইল, কিন্তু সেনাপতির কথাবার্ত্তায় উগ্রভাব বা রূঢ়ভাব কিছুই ছিল না। এমন কি সেনা-নায়কের নিকটে হর্টেন্‌শিয়ার যে অস্বীকৃতি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, সেই দৃঢ় অস্বীকারোক্তি সেনাপতি আবার যখন শুনিলেন, তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি উহা বেশ শান্তভাবে গ্রহণ করিলেন। হর্টেন্‌শিয়া সিঁড়ির গরাদের উপর হেলান দিয়া ছিল। দেখিলে মনে হয়, যেন একটি কল্পনার ছবি।

প্রবেশ-দালানে যেটুকু উজ্জ্বলতা ছিল, হর্টেন্‌শিয়ার সাদা পরিচ্ছদ সমস্তই যেন শুষিয়া লইয়াছিল। তাহার চারিদিকেই কালো অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহার দেহযষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।...পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীতে ভেকেরা একটা বেসুরো ঐক্যতান উঠাইয়াছে; এবং মধ্যে মধ্যে দূর হইতে জর্ম্মান্ বিউগ্‌ল্ শোনা যাইতেছে।

কিন্তু প্রুশীয় সেনাপতি সেই সময় কেবল হর্টেন্‌শিয়ার মধুর কণ্ঠস্বরই শুনিতেছিলেন। তিনি পিতৃভূমি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, রাজাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ফরাসী-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, জয় ও যুদ্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে উত্তর প্রদেশের বর্ব্বর, ল্যাটিন রমণীর পদতলে পতিত হইল। হর্টেন্‌শিয়া রুষ্ট না হইয়া, অবিচলিত চিত্তে তাঁর হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইল। সে তাঁহাকে বলিল;—

"যাও, কাল নিশ্চয়ই তুমি আমার বাড়ীর পিছনের গিরি-সঙ্কট আক্রমণ করবে...এখন আমার কথা বেশ ভাল করে' বুঝে' দেখ; যদি একটা গোলাও এখানে না পড়ে, যদি তোমার ফৌজের একটি গুলিও এই প্রাচীরে না লাগে, যেসব আহতেরা এখানে যন্ত্রণা ভোগ করছে তোমার কোন হুকুমের দরুন্ যদি এদের যন্ত্রণার বৃদ্ধি না হয় তা হ'লে ...সন্ধ্যার সময় এখানে এসো, তোমার দ্বিগুণ বিজয় লাভ হবে।"

একটু পরেই, জর্ম্মান্ সেনাপতি তাহার ছাউনীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গীদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, ঐ বাড়ীটা খালি করিবা'র কোন প্রয়োজন নাই। অট্টালিকাটা এখন নিঝুম নিস্তব্ধ—কেবল আহত সৈনিকের আর্ত্তনাদ অথবা পার্শ্ববর্ত্তী বনের তরু-কোটর-প্রচ্ছন্ন পাখীর ডাক মধ্যে মধ্যে এই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

পরদিন, জর্ম্মানেরা ফরাসীদের স্থান আক্রমণ করিল, কয়েক ঘণ্টা কালব্যাপী ভীষণ গোলাগুলি বর্ষণের পর, ফরাসীদের তোপের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। ঐ যুদ্ধে কিরূপ হুকুম জারি হইয়াছিল কিংবা কে আক্রমণের হুকুম দিয়াছিল, ইতিহাস তাহা কখনই বলিবে না। কিন্তু আসলে দেখা যায়, বাড়ীর প্রাচীর-গাত্রে একটি গুলিও চাপ্‌ড়াইয়া যায় নাই; একটি গোলাও উদ্যানের ভিতর ফাটিয়া পড়ে নাই। সমস্ত গুলি

বাড়ীর ছাদের উপর দিয়া চলিয়া গেছে, তাহাকে ধর্ষণ করে নাই; গাছের ডালপালার উপর দিয়া গিয়াছে—ডালপালায় একটা আঁচড়ও লাগে নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে দেখা গেল হর্টেন্‌শিয়ার জমির মধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডও ভগ্ন হয় নাই, একটি গাছের গুঁড়িতেও গুলি লাগে নাই।

দিবসের যুদ্ধের পর, রাত্রির নিস্তব্ধতা ও শান্তি মাঠ-ময়দানের উপর নামিয়া আসিল। দূর দিগন্তে, যেন রক্ত-রঞ্জিত মৃত্তিকা হইতে সমুত্থিত চন্দ্রমা একটা আগুনের গোলার মতো ধীর ও গম্ভীর পদক্ষেপে উদয় হইয়াছে; প্রথম উহার কিরণচ্ছটায় খেত-বাড়ী ও বনের গাছ পালা আলোকিত হইল; তাহার পর যখন ঊর্দ্ধ-আকাশে উঠিতে আরম্ভ করিল, উহার রং আর তত হল্‌দে বলিয়া মনে হইল না, আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; মৃত্তিকা হইতে যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল ততই যেন আরও নির্ম্মল হইতে লাগিল; পরিশেষে গগনের ঊর্দ্ধতম দেশ হইতে, সমস্ত বিশালায়তন দেশের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিল।

চন্দ্রমার রজত-কিরণজালে আবৃত, এবং গ্রীষ্ম-রাত্রির মতোই প্রশান্ত হর্টেন্‌শিয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় সিঁড়ির মার্ব্বেল-গরাদের উপর বাহু ন্যস্ত করিয়া, সেই একই জায়গায় জর্ম্মান্‌ সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার দৃষ্টি উদ্যানের উপর নিবদ্ধ ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল যেন, সে ঘোড়ার দ্রুত চালের শব্দ শুনিতে পাইতেছে। হঠাৎ রাস্তার উপর ঘোড়ার নাল-বাঁধনো খুরের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই জর্ম্মান্‌ সেনাপতি ঘোড়ার রাশ তাঁহার আর্দ্দালির হস্তে অর্পণ করিয়া সোপান-ধাপের দিকে অগ্রসর হইলেন।

হর্টেন্‌শিয়া সমুচিত সৌজন্য সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, হস্ত-চুম্বনের জন্য নিজের হাত বাড়াইয়া দিল; তার পর ফিরিয়া একটা প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করিল। সেখান হইতে, পাশের দুই দরজা দিয়া, একতালার অন্যান্য ঘরে যাওয়া যায়। সে একটা ক্ষুদ্র দীপ চট্ করিয়া উঠাইয়া লইল। সে পূর্ব্ব হইতেই ঐ দীপটা একটা লোহার চৌকীর উপর রাখিয়া দিয়াছিল। তার পর, পা দিয়া দরজা একটু ঠেলিল। একটা কবাট খুলিয়া গেল। দীপটা মাথার উপর যত উচ্চে উঠাইতে পারা যায় উঠাইয়া ধরিয়া, এবং দীপের আলোক ভিতরে নিক্ষেপ করিয়া, সে তিনজন জর্ম্মান আহত সৈনিককে দেখাইল। উহারা গদি ও কম্বলের উপর শুইয়াছিল। উহার মধ্যে একজন, দেয়ালে পীঠ দিয়া বসিয়া ছিল। তাহার কপাল কাপড় দিয়া বাঁধা; সেই কাপড়ের ভাঁজের ভিতর দিয়া সরু রেখার আকারে একটা ছোট রক্ত স্রোত গড়াইয়া পড়িয়া শ্মশ্রুর কেশ-জালে মিলিয়া যাইতেছিল। আর-একজন আহত সৈনিক ঘুমাইয়া অতি কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেছে—যেন একটা প্রকাণ্ড পাথর তাহার বুক চাপিয়া রহিয়াছে। আর একজন আহত সৈনিক তাহার কোকটা বালিশের কাছে লাগাইয়া, সেই ক্লোকের ভাঁজের ভিতর মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইতেছে—দুই পাল্লা পুরু কাপড়ের ভিতরে মুখ রাখিয়া তাহার আর্ত্তনাদ চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

হর্টেন্‌শিয়া এই দৃশ্যটার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য জর্ম্মান্‌ সেনাপতিকে যথেষ্ট অবসর দিল; তাহার পর তাঁহাকে ঠেলিয়া ঐ ঘর হইতে বাহির করিয়া, সামনের কামরার দরজাটা খুলিয়া দিল। সেখানে একজন ফরাসী সেনানায়ক, পুরাতন ডামাস্ক কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা হল্‌দে রঙের পালঙ্কের উপর শুইয়া আছে। স্তূপাকার ছোট ছোট গদি-বালিশের উপর পা ছড়ানো রহিয়াছে। কষ্টে তাহার মুখমণ্ডল কুঁকড়িয়া গিয়াছে—কোন-প্রকার হা-হুতাশ মুখ হইতে বাহির করিবে না বলিয়া যেন তাহার কঠোর প্রতিজ্ঞা। স্তিমিতালোকে একটা ক্ষুদ্র দীপ ঘরের ভিতর একটা চাপা আলো ছড়াইতেছে। ঘরের মেজের উপর একটা হাল্‌কা রংএর গালিচা পাতা—কালো পর্দ্দাগুলা উহার উপর ছায়া ফেলিয়া উহাকে কালো করিয়া তুলিয়াছে। একটা দীপাধারের উপর ভুলক্রমে অস্ত্রকর্ম্মের কতকগুলা হাতিয়ার ও কতকটা মলম লাগাইবার কাপড় রাখা হইয়াছে।

প্রুশীয় সেনাপতি এই দৃশ্য দেখিবার পরেই, হর্টেনশিয়া তাঁহাকে উপরের ঘরগুলায় লইয়া গেল। মার্ব্বেলের সিঁড়িতে কাদার দাগ, কোন-কোন স্থানে রক্তের বড়-বড় ফোঁটার রেখা-চিহ্ন রহিয়াছে; একটা অবতরণ স্থানে একজন লোক একটা টুলের উপর বসিয়া আছে। তার হাতে কাপড়ের পটি জড়ানো; বাঁ হাত দিয়া পাইপে তামাক ভরিতে চেষ্টা করিতেছে। উহারা দোতালায় পৌছিল। সেই বিলাসপূর্ণ বৈঠকখানা-ঘর এক-সময়ে, উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই ঘর এখন একটা হাঁসপাতাল-কক্ষে পরিণত হইয়াছে। ঘরের মাঝখানে, একটা পাথরের টেবিলের উপর কতকগুলা ছোট ছোট সরা এবং চমৎকার খোদাই-কাজ-করা চিন্নী-থাকের উপর একটা মাটির চিলিমচি নোংরা রক্ত-মাখা জলে ভরা; সেই জলের উপর কয়েকখানা ন্যাক্‌ড়া ভাসিতেছে। পশ্চাদ্‌ভাগে সারি সারি সাদা তাকিয়া, তাহার ভিতর হইতে অনেকগুলি আহত সৈনিকের মাথা বাহির হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে একজনের মুখে আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। দরজায় নিকটস্থ পালঙ্ক হইতে একটা উগ্র, তীব্র বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতেছে। দুইটা বড়-বড় আয়না মুখামুখিভাবে স্থাপিত—উভয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রোগীর শয্যার সারি অন্তহীন বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাতেও মনের মধ্যে একটা বিষাদ ও ভীতির সঞ্চার হয়।

উহারা সমস্ত বাড়ী তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিল; দেখিল, ছাদ-ঘর হইতে রান্না ঘর পর্য্যন্ত সমস্তই হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছে। একটা দরজাও অনুদ্‌ঘাটিত রহিল না। অবশেষে নিজের কামরায় আনিয়া হর্টেন-শিয়া খাটের চারিধারের পর্দ্দাগুলা টানিয়া ফাঁক্ করিয়া দিল। উৎকৃষ্ট লিনেন কাপড়ে মণ্ডিত বালিশগুলার উপর অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন একটি সৈনিকের শিশু-সুলভ কচি মুখ দেখা গেল; সে হয়ত তার জ্বর-বিকারের ঘোরে মনে করিতেছিল, গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার সময় উহার আত্মীয়েরা উহাকে শেষ চুম্বন প্রদান করিতেছে। জার্ম্মান্‌ সেনাপতি তাঁহার বিজয়ের বলিস্বরূপ এই মুমূর্ষু বালককে নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিতে লাগিলেন। তার পর হর্টেনশিয়ার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার চোখের ভাবে মনে হইল যেন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই বিরক্তিকর তীর্থযাত্রা কখন্ শেষ হইবে।

হর্টেনশিয়া আহত-সৈনিক-পূর্ণ আরও অন্যান্য ঘরে সেনাপতিকে লইয়া গেল; তার পর যেখান হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছিল, সেই সিঁড়ির পথে আবার আসিয়া পৌছিল। সেইখানে ল্যাম্পটা নিজের মুখ-সমান উঠাইয়া ধরিল। দীপটা, প্রায় নিভ নিভ হইয়া আসিয়াছে তখন যেন তার জীবনের যে কাজ ছিল তাহা ফুরাইয়াছে।

দীপটা তাহার অন্তিম মুমূর্ষু আলোকচ্ছটায় রমণীর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। হর্টেনশিয়া উদ্যান-ফটকের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া, মৃদু-মধুর স্মিতহাস্য-সহকারে সেনাপতিকে বিদায় ইঙ্গিত করিয়া নৈশ-শান্তিসুলভ প্রশান্তভাবে বলিল :—

"আপনি ত সমস্তই স্বচক্ষে দেখ্‌লেন ;—দেখুন, আমাদের জন্য কোন স্থান নেই।"*

---

* স্পেনীয় লেখক Jacento Octovio Picon হইতে

চীনে চিত্রকলার ইতিহাস*

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

চীন মহৎ। তার কার্য্যক্ষেত্র মহত্তর। চীনের প্রতিভা চিত্রকলার ভিতর যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন্য-কিছুর ভিতর তেমন পায়নি। চীনকে জান্‌তে হ'লে, তার চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় করতে হবে।

চীনে বর্ণমালা এবং চিত্র এক-মূল থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। পুরাতন চীনে অক্ষর কোন বস্তুর যথার্থ সাদৃশ্য দিতে চেষ্টা করত। চীনের পরিভাষায় এই সাদৃশ্য প্রকাশ করার নাম হচ্ছে "ওয়েন"। এই লেখায় কোনো ঘটনা চিত্রদ্বারা ব্যক্ত করা হ'ত। লেখক তা'তে ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশ করতে পারত না। ক্রমে ক্রমে এই চিত্রাক্ষর বিশেষ কোনো চিহ্নে পরিণত হ'লে, ব্যক্তিগত ভাব-প্রকাশের উপযোগী হয়েছিল। এই চিত্রাক্ষরকে ইংরেজীতে বলে আইডিওগ্রাফ্, যা কেবল ভাবপ্রকাশ করে, কিন্তু শব্দ প্রকাশ করে না। বহু পরে এই অক্ষর ধ্বনিদ্যোতক (phonetical) হয়েছিল; তখন থেকেই চিত্র লিখিত ভাষা থেকে আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল। এই সময়েই অর্থাৎ ৎসিয়েন এবং হান্ রাজত্বের কাছাকাছি চীনের চিত্রকলাকে আর্ট্-হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। চিত্র লিখিত ভাষা থেকে ক্রমশঃ মুক্তি পেয়ে এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের সত্তাকে প্রকাশ করেছিল।

চীনের চিত্রকলার উদ্ভবের কারণ বিভিন্ন-যুগের চিত্রাবলীর ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। চীনে চিত্রকরেরা ছবি আঁকে না বলে', ছবি লেখে বল্‌লে বেশী ঠিক্ হয়। এই ছবি লেখার ইংরেজী নাম ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা। চীনের চিত্রের ন্যায় পারস্য ও জাপানের চিত্রও 'ক্যালিগ্রাফিক আর্টে'র অন্তর্গত।

জাপানী চিত্র চীনের চিত্রের কাছাকাছি; কারণ চীনই জাপানের গুরু। পারস্যের চিত্র কিছু বিভিন্ন-রকমের। তা'রাও ছবি হিসাবে আঁকেনি, বই চিত্রিত করার হিসাবে এঁকেছে। রেখার কোন বিশেষত্ব নেই। রেখার কাজ হ'ল, বস্তুর সীমানা নির্দ্দেশ করে'

উয়া উই অঙ্কিত পরী এবং পোয়েনিস্ পক্ষী

দেওয়া। চীনের চিত্রের রেখা তা নয়। তার টানে-টোনে, এমন একটা কৌশল এবং ছন্দ আছে, যা কেবল

* (১) La Peinture Chinoise.
Par Tchang Yi-Tchou et J. Hackin.
(২) Encyclopedie de la Peinture Chinoise.
Par Raphael Petrucci
(৩) Painting in the Far East
by Laurence Binyon. অবলম্বনে লিখিত

ব্যাঘ্র
মুচী কর্ত্তৃক অঙ্কিত। (স্থঙ-রাজত্বের সময়)

বস্তুর সীমানা নির্দ্দেশ করে না, তার বিশেষত্ব (character) ফুটিয়ে তোলে।

চীনের চিত্রকরেরা তুলি-চালনায় আশ্চর্য্য দক্ষতা লাভ করেছিল। তুলির টানে যেমন জোর তেমন নমনীয়তা আছে। অবলীলাক্রমে তুলি চালিয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলে। এ যেন খেলা। প্রত্যেক বস্তুর এক ভাষা আছে। প্রত্যেক বস্তুর রেখায় ভিন্নতা আছে। তুলির টানে সে-ভিন্নতা ধরা পড়ে। প্রত্যেক বস্তু আঁকতে তা'রা ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্কন-রীতি (Technique) অবলম্বন করে। বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন-রকমের লাইন ব্যবহার করে; তার নাম আছে যেমন ঘাসের শীষের লাইন, জলে-ভেজা সুতোর লাইন ইত্যাদি। চীনের শাস্ত্রকরেরা এ-সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন।

সমগ্র এশিয়ার এক ঐক্য আছে। সেই ঐক্য হ'ল রেখায়। ইউরোপীয় আর্টের ঐক্য মূর্ত্তির আকার এবং ডৌলের মধ্যে। সেজন্য ইউরোপীয় আর্টের ঝোঁক রিয়েলিজম্ বা বাস্তব জগতের হুবহু প্রকাশের দিকে এবং এশিয়ার আর্টের ঝোঁক আইডিয়ালিজম্ এর দিকে। তার প্রকাশ ornaments. । অবশ্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আর্টের এই সীমাভাগ সব সময়েই টেনে দেওয়া যায় না। প্রাচীন খৃষ্টীয় আর্ট, এশিয়ার আর্টের কাছাকাছি। গথিক

"অমিদা"
বোধ হয় ইয়েশিন্ সোজু কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

মন্দিরের চারদিকের সাধুদের ভাস্কর্য্য এবং ভিতরে মেরী এবং খৃষ্টের জীবনের চিত্র-সকল দেখলেই, এটা বোঝা যাবে।

পরে রেনাসাঁসের যুগে আর্টের ভিতর যখন পরিপ্রেক্ষণ, আলো ও ছায়ার সম্পাত প্রভৃতি ঘটিত প্রকৃতির নিয়ম ঢুক্‌ল, তখনই আর্ট আইডিয়ালিজম্ হ'তে রিয়েলিজম্‌এর দিকে ঝুঁকে' পড়্‌ল। প্রাচীন দেবদেবীরা তাদের দেবত্ব থেকে মানবত্ব পেলে।

আর্টের ভিতর দুটা দিক্ আছে। একটা হ'ল ইন্‌টেলেক্ট বা বিজ্ঞানের দিক্; আর-একটা কল্পনা বা সৃষ্টির দিক্। ইউরোপের ঝোঁক হ'ল বিজ্ঞানের দিকে, আর এশিয়ার ঝোঁক সৃষ্টির দিকে। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আমাদের আর্টকে পছন্দ করে না, কারণ তাদের গ্রন্থপুষ্ট মস্তিষ্ক সমস্ত জিনিষই বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে' বুঝ্‌তে চায়। তাদের মস্তিষ্কে কল্পনার স্থান শূন্য; কাজেই ছবি যখন এই বাইরের দৃশ্যমান বাস্তব জগতের সীমানা ছাড়িয়ে কল্পলোকে গিয়ে পৌছায়, সেখানে তা'রা থই পায় না। কোন আর্টিষ্ট যদি হুবহু ঠিক করে' কিছু আঁক্‌তে পারে, তা'রা তারিফ না করে' থাক্‌তে পারে না; বলে "হ্যাঁ, আর্টিষ্ট্ বটে! দেখেছ কি এঁকেছে, যেন ঠিক জিনিষটি"। তাদের বোঝার আর কিছু বাকী থাকে না, সব ঠিক্ পরিষ্কার জলের মত বুঝে' যায়।

গ্রীসের বিখ্যাত ভাস্কর প্রেক্‌সাইটাল্‌স্ আঙুরের গাছ এমন স্বাভাবিক করে' খোদাই করেছিল যে, পাখী তা'কে সত্যি মনে করে' ঠোক্‌র মার্‌ত। চীনের এক চিত্রকর-সম্বন্ধে এক আখ্যান চলিত আছে যে, সে দেওয়ালের উপর ড্রেগন এঁকেছিল; যখন শেষ বর্ণপাত হ'য়ে গিয়েছিল, ড্রেগন তখন প্রাণবান্ হ'য়ে বাড়ীর ছাদ ভেঙে চুরে আকাশে উড়ে' গিয়েছিল। এই আখ্যান থেকে চীনের আর্টের একটা দিক্ বোঝা যাবে। তাদের আদর্শ হচ্ছে ছবির রেখায়-রেখায় ছন্দে-ছন্দে জীবনের স্পন্দন আনা।

চীনের চিত্রে গীতি-কাব্যের দিক্‌টা প্রধান। চীনের প্রাচীন এক উক্তি, "ছবি একটি শব্দহীন কবিতা"। প্রাচীন চিত্রসমূহ অধিকাংশই লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কেবল চতুর্থ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর কু কাইচিনের কয়েক-

চেন্ স্যান্-পিন্ অঙ্কিত খরগোস এবং বৃক্ষ (১৮ শতাব্দী)

খানা আছে। চিত্রের উদ্ভব প্রথম কবে হয়েছিল; তা ঠিক করে' বলা যায় না; তবে চীনের সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, খৃঃ পূঃ প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনের চিত্রের উৎপত্তি হয়েছিল। এত প্রাচীন না হউক অন্ততঃ খৃঃ পূঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ছিল। প্রমাণ আছে, তখন চিত্রকরেরা তস্‌বির আঁক্‌ত। ধাতু পাত্রের ব্যবহার খৃঃ পূঃ বহু প্রাচীন কাল থেকে ছিল; সে-সময়ে ব্রোঞ্জ্ ধাতুর তৈরী নানা-রকম পাত্র এবং ধূপদানী এখনও বিদ্যমান আছে। এসমস্ত পাত্রে আশ্চর্য্য-রকম কারুকার্য্য।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কনফুশিয়াসের দীক্ষার আর্ট

পদ্মবন
(সুঙ্ রাজত্বের সময় অঙ্কিত)

চিত্রবিদ্যা উৎসাহ প্রাপ্ত হয়েছিল। মিষ্টিক সাধক তাও-মতের প্রচারক লাওটসের দীক্ষায় চিত্রে এবং সাহিত্যে কল্পনার বিকাশ হয়েছিল। আর্টের ভিতর একটা দিব্বের ভাব আছে—একটা শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুগত্য আর একটা শক্তি এবং স্বাতন্ত্র্য। দুই সাধকের দীক্ষায় এইই দুই দিক্।

কু কাই চি-এর ছবি খুব সমাদর লাভ করেছিল, তা এই ঘটনা থেকে জানা যায়। একবার এক বৌদ্ধমঠ-স্থাপনের জন্য তার কাছে চাঁদা চাওয়া হয়। শিল্পী লক্ষ মুদ্রা দান করবে বলে' প্রতিজ্ঞা করে, বৌদ্ধ পুরোহিতেরা তা'কে বিদ্রূপ করে' উড়িয়ে দেয়। তখন সে এক-মাস সময় প্রার্থনা করে' নিজেকে ঘরের ভিতর বন্ধ করে' রাখে। এক-মাস পরে যখন দরজা খুল্‌লে, তখন দেখা গেল, দেওয়ালে আঁকা বৌদ্ধ সাধক বিমলাকীর্ত্তির প্রমাণ মূর্ত্তি ঘরটিকে উজ্জ্বল করে' শোভা পাচ্ছে। দলে-দলে দর্শক আস্‌তে লাগ্‌ল, আর সকলে মিলে শিল্পীর প্রতিশ্রুত অর্থ পূর্ণ করে' দিলে।

তার এক ছবির কিয়দংশ বিলাতের জাদুঘরে আছে—নাম কেশ-প্রসাধন। দাসী এক মহিলার চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছে, সাম্‌নে একটা গোল আয়না, আর কতকগুলি কৌটা রয়েছে। তার আরও দুয়েকখানা ছবি পাওয়া যায়, আর সব নষ্ট হ'য়ে গেছে। সে-সব ছবির নাম "পবিত্র যশের সাধু", "স্বর্গের তিন সুন্দরী", "শীতের ঘুম থেকে ওঠা বসন্তের ড্রেগন", "বীণা তৈরি করা", "বাঘ, চিতা ও শকুন", "বৌদ্ধ-সঙ্ঘ", ইত্যাদি। ড্রেগন এবং বাঘ চীনের চিত্রে খুব বড় আসন পেয়েছে। অধিকাংশ চিত্রকরই এই দুয়ের এক বিষয়ে ছবি এঁকেছে। চীনাদের কাছে বাঘ হ'ল শক্তির প্রতীক এবং ড্রেগন আত্মার প্রতীক।

চীনা কাব্যরসিকদের মধ্যে একরকম সাহিত্যের খেলা প্রচলিত ছিল। কু কাই চি-এর বন্ধুমহলে এ-খেলা হচ্ছিল, প্রস্তাব হ'ল, একটা ভয়ের ছবি দেওয়ার। নানান্ জনে নানারকম কথা বল্‌লে। চিত্রকর শেষে বল্‌লে "এক-জন অন্ধ এক অন্ধ ঘোড়ায় চেপে অতলস্পর্শ এক হ্রদের কিনারায় এসে পড়েছে।" এক বন্ধু এ-ছবি আর সহ্য করতে পারল না, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কারণ তার চোখ কিছু খারাপ ছিল! চিত্রকরের কল্পনার জোর এর থেকে পাওয়া যাবে।

চতুর্থ শতাব্দী থেকে একেবারে ৮ম শতাব্দীতে এসে পড়তে হয়। এই সময়ের মধ্যে যদিও ভালো ভাস্কর্য্যের নমুনা পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো চিত্রের নমুনা পাওয়া যায় না। এসময়ে ভারতবর্ষ হ'তে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব চীনে এসে পড়ছিল। বৌদ্ধ অর্হত, যারা ভারত থেকে চীনে ধর্ম্ম এবং শিক্ষা প্রচার করতে এসেছিল তাদের প্রস্তর-মূর্ত্তি শিল্পীরা গড়েছে। এ-সমস্ত মূর্ত্তির মধ্যে অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিতের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দেবদেবীরা চীনে

এসে নতুন নাম গ্রহণ করেছে—যেমন করুণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অবলোকিতেশ্বর চীনে এসে হন কোয়ান্-ইন আর জাপানে হন কোয়ান্নন। হরীতি দেবী ভারতে শিশুদের ভক্ষণকারী, কিন্তু চীনে এসে তাদের রক্ষাকর্ত্রী হন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত চীনা-সভ্যতার যে মিলন চল্‌ছিল, তার ফল ফল্‌ল টেঙ-রাজত্বের সময়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর হ্‌সিয়ে হো, যার জাপানে নাম হচ্ছে শাকাকু, তিনি আর্টের ষড়ঙ্গ লিখেছেন। আমাদের ভারতীয় ষড়ঙ্গের সহিত শিল্প-সাহিত্যাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তার তুলনা করেছেন। চীনারা তাদের আর্ট-সম্বন্ধে কি ভাবে, তা এই ছয়টি নিয়মের মধ্যে আছে।—

(১) প্রতি বস্তুতে জীবনের স্পন্দন বা ছন্দ অঙ্কন কর্‌বার জন্য আত্মার জ্ঞান।*

(২) তুলিরদ্বারা দেহের অস্থি সংস্থান অঙ্কন।

(৩) স্বভাবের সহিত অঙ্কিত বস্তুর সাদৃশ্য।

(৪) বস্তুর সাদৃশ্যে বর্ণপাত।

(৫) প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব-অনুসারে রেখা-বিন্যাস।

(৬) কল্পনার উপযোগী রূপ-সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের মতে যা "সামঞ্জস্যের ঐক্য" Harmonic unity তাই চীনাদের "ছন্দে প্রাণশক্তির বিকাশ" (rhythmic vitality)। আর্টের বন্ধন ও মুক্তি এই ষড়ঙ্গের মধ্যে পাওয়া যাবে।

টেঙ রাজত্বের সময়েই (খৃঃ-অঃ ৬১৮—৭০৯) চীনের আর্ট সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছিল। এ-সময়েই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আদর্শ তাদের কল্পনাকে পুষ্ট করে' সাহিত্য এবং চিত্রকে মহৎ করেছিল। টেঙ্‌ রাজত্বের রাজধানী লো-ইয়াঙ নগরে তিনশত বৌদ্ধ সাধু এবং আরও অনেক ভারতীয় বাস করে' ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর সম্রাট্ মিং হুয়াঙ্ তাঁর সভায় বড়-বড় চিত্রকর এবং কবিদের আসন দিয়েছিলেন। চীনের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর উ-তাও-ৎস্থ এবং শ্রেষ্ঠ কবি লি পো সম্রাটের শাসন-কালকে গৌরবান্বিত

"কেশ-প্রসাধন"
[কু কাই চি-এর অঙ্কিত ছবির এক টুক্‌রা—]

করেছেন। উ-তাও-ৎস্থর তুলি-চালনায় অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। চিত্রকর একবার এক দেবতার মূর্ত্তি আঁক্‌ছিলেন। সে-জায়গায় যুবা-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যোদ্ধা, মজুর সবরকম লোক জমে' গিয়েছিল তাঁর কাজ দেখ্‌তে। তিনি তুলির এক টানে দেবতার আলোকমণ্ডল এঁকে ফেললেন। প্রথম বয়সে সরু তুলি, পরে মোটা তুলি ব্যবহার কর্‌তেন। চীনের পরবর্ত্তী লেখকেরা তাঁর ছবি সম্বন্ধে অনেক লিখে' গেছেন। বর্ণনা আমাদের কল্পনাকে প্রলুব্ধ করে; কারণ তাঁর অধিকাংশ ছবিই কালের গর্ভে বিলীন। তাঁর বিখ্যাত ছবি বুদ্ধের মহানির্ব্বাণ। মূল ছবি নাই। পুরাতন এক জাপানী আর্টিষ্টের নকল বিলাতের জাদু-

* Encyclopedie de la Peinture Chinoise হইতে অনূদিত—লেখক
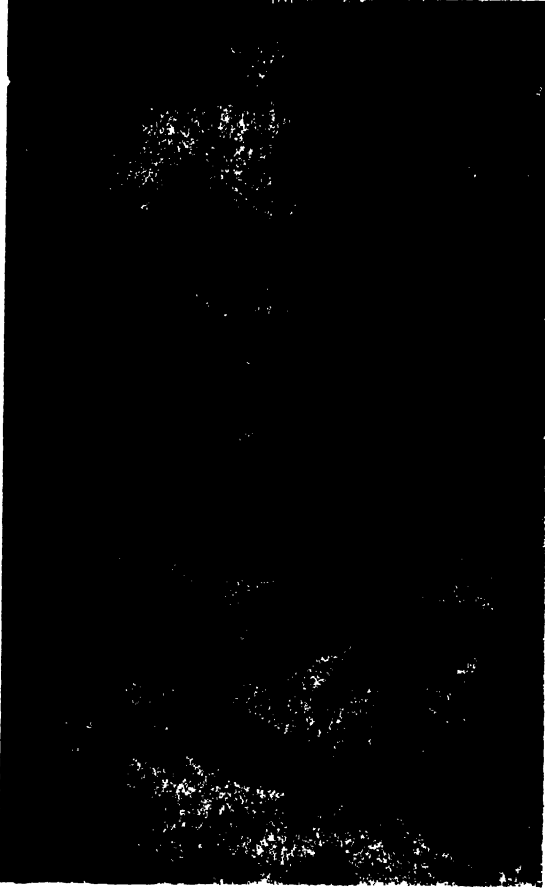
জলস্রোত এবং হংসের দল
লিন লিয়াঙ কর্ত্তৃক (১৫ শতাব্দী) অঙ্কিত]

ঘরে আছে। চারদিকে ক্রন্দনের রোল,—রাজা, প্রজা, সাধু, যোদ্ধা, দেবযোনি, দেবদেবী, পশুপক্ষী সমস্ত সৃষ্টি চীৎকার করছে; মধ্যে বুদ্ধদেব শান্তিতে শয়ান। নকল ছবিতে শিল্পীর কল্পনার বিরাটভাব অনুভব করি। মূল ছবি না জানি কি ছিল। বৌদ্ধ-বিষয়ে শিল্পী আরও ছবি এঁকেছেন—"শাক্যমুনি" "বোধিসত্ব", "সামন্ত-ভদ্র", "মঞ্জুশ্রী"।

শিল্পীর শেষ ছবি একটি স্থানচিত্র (Landscape); এসম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী আছে। সম্রাট্ বলেছিলেন এ-ছবি আঁকতে। ছবি আঁকা শেষ হ'য়ে গেলে, শিল্পী তার আবরণ খুলে' দেখালেন। সম্রাট্ মুগ্ধ হ'য়ে দেখলেন, অপূর্ব্ব দৃশ্য—বন, পর্ব্বত, পর্ব্বতের উপরে মানুষ, অনেক দূরে আকাশে পাখীর দল উড়ে' চলেছে। শিল্পী বল্লেন "দেখুন সম্রাট্, পর্ব্বতের গহ্বরে এক দেবযোনি বাস করে।" এই কথা বলে' হাততালি দিলেন, আর অমনি গহ্বরের প্রবেশ পথ খুলে' গেল। শিল্পী আবার বল্লেন, "এর ভিতর অনিন্দ্যসুন্দর, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে' ভিতরে ঢুক্‌লেন আর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। বিস্ময়াবিষ্ট সম্রাট্ কিছু বলার পূর্ব্বেই দেখ্‌লেন সমস্ত ছবি লুপ্ত হ'য়ে গেছে, কেবল খালি সাদা দেওয়াল পড়ে' রয়েছে।

এই সময় থেকে স্থান-চিত্রের খুব আদর আরম্ভ হয়! লি সু-হিসুন ওয়াঙ উই স্থানচিত্রের জন্য বিখ্যাত। এঁরা অনেক লম্বা স্থানচিত্র (roll) এঁকেছেন। এ-ছবি ঝুলিয়ে রাখার নয়, গুটিয়ে রাখতে হয়। চীনাদের প্রতিভা স্থানচিত্রে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। পাহাড়, ঝরণা, বন, জঙ্গল, ফুল, লতা, পাতা, পাখী, জীবজন্তু চিত্রকরের কাছে যেমন আমল পেয়েছে মানুষ তেমন পায়নি।

তা'রা যে বাইরের দৃশ্যমান জগতের ছবি আঁকে সেটা তার মূর্ত্তির প্রকাশ নয়, কিন্তু তার ভাবের (mood) প্রকাশ। যেমন ঝরণা আঁকবে তার তীব্র গতির এবং জলোচ্ছাসের; পর্ব্বত আঁকবে তার উচ্চতার; আকাশ আঁকবে তার দূরত্ব এবং বিস্তৃতির (space)।

ওয়াঙ্ উই একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। চীনেরা বল্‌ত, "ওয়াঙ্ উই ছবি ছিল কবিতা, আর কবিতা ছিল ছবি।" তিনি সাহিত্যিক আর্টিষ্টদের দল স্থাপন করেন।

হান্ ক্যান্ বিখ্যাত ছিলেন ঘোড়া আঁকার জন্য। তাঁর আঁকা ছবি পরবর্ত্তী যুগের চীনা এবং জাপানী আর্টিষ্টদের আদর্শ ছিল। তাঁর সময়ের সম্রাটের আস্তাবলে চল্লিশ হাজারের উপর ঘোড়া ছিল। শিল্পী সেখানে গিয়ে ঘোড়া অনুশীলন করতেন। তার ছবির নাম "তাতার শিকারী", "শত অশ্বশাবক", "খোটানের উপঢৌকন পীত অশ্ব" ইত্যাদি। খোটানের সঙ্গে এক-সময়ে চীনের খুব সম্বন্ধ ছিল। খোটানের পুরাকীর্ত্তি-সমূহ এখন আবিষ্কৃত হচ্ছে। মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত খোটান এক সময় সমস্ত এশিয়ার এবং পূর্ব্ব ইউরোপের মিলন স্থল ছিল। গ্রীক, পারস্য, ভারতীয় চীন প্রভৃতি

ঈগল পাখী [সোগা চোকুয়ান অঙ্কিত (১৬ শতাব্দী)]

দেশের শিল্প এবং সভ্যতার মিলনের নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায়।

হ্যান্ ক্যানের ইতিহাস কৌতূহলজনক। প্রথম এক সরাইয়ের বালক ভৃত্য ছিল। ওয়াঙ্উই যখন বাইরে ভ্রমণে বেরুতেন, তখন তাঁর কাজ ছিল, তাঁর সঙ্গে মদের পাত্র নিয়ে যাওয়া। ওয়াঙউই তার পারিশ্রমিক দিতে চাইতেন না। বালক হ্যকন্‌ক্যান অবসর-সময় বালির উপর ছবি এঁকে কাটাত। তার প্রভু তা এক-দিন দেখে' মুগ্ধ হন, এবং বালককে চিত্র অনুশীলন করার জন্য অর্থ দেন। এই-প্রসঙ্গে স্পেনের প্রসিদ্ধ শিল্পী মুরিলো ও তাঁর ক্রীতদাসের কথা মনে পড়ে।

চীনেদের ইতিহাসে টেঙ্‌রাজত্বের তিন শত আর্টিষ্টের নাম পাওয়া যায়। শিল্পে, সাহিত্যে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে সকল বিষয়েই টেঙ রাজত্ব গৌরবান্বিত। ঘরোয়া বিবাদের ফলে তিনকোটি লোকের প্রাণ যায়। শ্যামরাজ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে, এবং এইরূপে স্বর্ণ-যুগের অবসান হয়।

টেঙ্‌রাজত্বের পর অর্দ্ধশতাব্দী কালেই বিদ্রোহ এবং অশান্তিতে ছোট-ছোট পাঁচটি রাজত্বের অবসান হয়। তার পর আসে স্থঙ্‌রাজত্বের আমল (খ্রীঃ অঃ ৯৬০-১২৮০)। স্থঙ রাজত্ব ঐশ্বর্য্যের চরম সীমায় উঠেছিল। ভেনিসের বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো স্থঙ্‌রাজত্বের সময় চীনে ভ্রমণ কর্‌তে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন "স্থঙ রাজধানী হ্যাং চাউ পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং ঐশ্বর্য্যশালী নগর। ফুলের বাগান, রাস্তা, রাজপ্রাসাদের মত ঘরবাড়ী পণ্যবাহী বৃহৎ নৌকাসমূহ চীনের বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। গরম জল পাওয়া যাইতে পারে এমন তিনশত সাধারণ স্নানাগার নগরে আছে।"

স্থঙ্‌রাজত্ব যে কেবল বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিল তা নয়, শিল্পী, কবি এবং দার্শনিক জাতীয় জীবনের পুষ্টি করেছে। জেন্-দর্শনের (Zen philosophy) প্রভাব এ-সময়ে বেশী। যা খাঁটি চীনের, তা এসময়ের চিত্রের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। শুধু কালি দিয়ে ছবি আঁকা এসময়ে খুব উন্নত হয়েছিল। টেঙ্‌রাজত্বের আর্টের ভিতর যে একটা খুব জোর ছিল, এ-সময়ের ছবির লীলায়িত রেখায় কোমল এবং মনোরম হ'য়ে উঠেছিল। টেঙ্‌রাজত্বের চিত্রে ক্যালিগ্রাফির চরম হয়েছিল, কিন্তু স্থঙের চিত্র ক্যালিগ্রাফি থেকে দূরে সরে' এসেছিল।

স্থঙ্‌রাজত্বের প্রধান চিত্রকর লি-লুং-মিএন। তিনি ৩০ বছর সর্‌কারী কাজ করেছেন। যখন তিনি ছুটি পেতেন, কোনো বনে বা পাহাড়ের উপরে ঝরণার পাশে মদের পেয়ালা হাতে কাটিয়ে দিতেন। ছবি আঁকা তাঁর কাছে একটা আসক্তির মত ছিল। বৃদ্ধ বয়সে বাতে আক্রান্ত হ'য়ে, যখন শয্যাগত হয়েছিলেন, তখন বিছানার

চাদরের উপরে ছবি আঁকার মত করে' তাঁর পঙ্গু হাত বুলাতেন।

প্রথম জীবনে তিনি ঘোড়া আঁক্‌তেন। সম্রাটের আস্তাবলে সেজন্য অনুশীলন কর্‌তে যেতেন। বৌদ্ধ পুরোহিত তাঁকে বল্‌ত "এমন কর্‌লে নিশ্চয়ই পর জন্মে ঘোড়া হ'য়ে জন্মাবে।" কিন্তু শিল্পী পুরোহিতের ভবিষ্যৎ বাণীর উপর ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁর কয়েকটি বৌদ্ধ চিত্র আছে, "শাক্যমুনির পাঁচশত শিষ্য", "কোয়ান ইন্", ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষভাবে তাঁর প্রতিভা ছিল স্থান-চিত্রে এবং কালীর কাজে।

এসময়ের আর একজন নামজাদা দৃশ্য-চিত্রকর হু হ্‌সি স্থানচিত্র-সম্বন্ধে লিখেছেন, "আর্টিষ্ট্ নিশ্চয়ই সমস্ত জিনিষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিবে, এবং তার সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান থাকিবে; কিন্তু আঁকার সময় দেখিতে হইবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অংশ কোন্‌টুকু, অপ্রধান অংশ-গুলি ছবি হইতে বাদ দিতে হইবে। ছবিতে দূরত্ব আনিতে হইবে।" আর্টিষ্ট্‌রা ছবিতে সবটাই দেয় না। তা'রা বিষয়টাকে ইঙ্গিত করে'ই ক্ষান্ত হয়। অদেয় অংশটুকু দর্শক পূর্ণ করে' নেয়। এ যেন আমাদেরই কথা। ইউরোপের ইম্‌প্রেশনিষ্ট্‌দের মতও এই।

সুঙ্‌যুগের স্থানচিত্রের এক বিশেষত্ব তার space বা অবকাশ।

মু চি একজন দৃশ্য-চিত্রকর। তাঁর এক ছবি "দূরের মন্দির হইতে সন্ধ্যার ঘণ্টা"। গোধূলির ম্লান আকাশে উঁচুনীচু পাহাড়ের শিখর। কুয়াশাচ্ছন্ন পাদদেশে বনের মাঝে মন্দিরের চূড়া জেগে আছে। সন্ধ্যার ঘণ্টা যেন কানে এসে পৌছচ্ছে। ফরাসী চিত্রকর 'মিলে'র বিখ্যাত চিত্র "গির্জ্জার ঘণ্টা শ্রবণে"-এর সঙ্গে তুলনা চলে। কাজের শেষে কৃষক ও কৃষকপত্নী ঘণ্টা শ্রবণে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আমরা মানুষকে সাম্‌নে দেখ্‌ছি। মু চির চিত্রে মানুষ নাই; দর্শক সে অভাব পূরণ করে। সে কৃষক ও কৃষকপত্নীর ন্যায় অম্‌নি স্তব্ধ হ'য়ে মন্দিরের ঘণ্টা শুন্‌তে পায়।

চীনাদের স্থানচিত্র এ-বাস্তব জগৎ থেকে আমাদের এক স্বপ্ন-রাজ্যে নিয়ে যায়। ছবিতে দেখি দূরে সূর্য্যের আলো পড়েছে, ছোটে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে, পাল তুলে' জেলে ডিঙি চলেছে। আঁকা-বাঁকা পথের উপর এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাহাড় ঝুঁকে' পড়েছে; গ্রামের ছোট-ছোট কুটীরগুলি, পাহাড়ের নীচে নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ঝড়, পাহাড়ের শিখরে কালো মেঘ জমেছে, জলপ্রপাত ফুলে ফুলে উঠেছে।

তুষার, চাঁদ, ফুল এই তিন বিষয় সুঙ্‌চিত্রে খুব প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের ফুলের ছবিতে ফুলের যেন কোমলতা এবং গন্ধ পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ফুলের ছবির সঙ্গে তাহার ফুলের ছবির তফাৎ এই যে, ইউরোপীয় চিত্রকর বাগান থেকে ফুল এনে দর্শককে উপহার দেয়; আর চীনে চিত্রকর দর্শককে একেবারে ফুলের বাগানে নিয়ে যায়।

সুঙ্‌রাজত্ব তাতার, মঙ্গোল প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ বৈদেশিক জাতির আক্রমণে খিন্ন হ'য়ে পড়েছিল। মঙ্গোল অধিপতি কুবলাই খাঁ সুঙ্‌রাজের সিংহাসন দখল করে' বস্‌লেন। সুঙের পর মঙ্গোল বা য়ুয়েন রাজত্ব আরম্ভ হ'লে (খৃঃ অঃ ১২৮০-১৩৬৮)। মঙ্গোলরা চীনের সভ্যতাকে গ্রহণ করে' চীনাদের সঙ্গে মিশে' গেল। কুবলাই খাঁ কেবল যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না, আর্ট ও সাহিত্য তাঁর অধীনে খুব উৎসাহ পেয়েছে। মঙ্গোলদের অধীনে চীনে' আর্টে পারস্যের প্রভাব পড়েছিল।

এ-সময়ের প্রধান চিত্রকর চু মেঙ ফু ঘোড়া এবং স্থানচিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কুবলাইএর দর্‌বারে সমাদর পেয়েছিলেন। য়েন হুউ তাও-আখ্যানের ছবি আঁক্‌তেন। চিন সুন চু তস্‌বির আঁক্‌তেন। এ-যুগের আর্টিষ্টরা সুঙ্‌যুগের চিত্রকেই অনুসরণ করে' চলেছে। পারস্যের প্রভাবে রেখায় মৃদুতা এসেছিল। কোন কোন ছবিতে রংয়ের খুব ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়। কিন্তু এযুগের আর্টে কোনো সৃজনী শক্তি ছিল না।

১৩৬৮খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলরা মিঙদের দ্বারা বিতাড়িত হ'লে মিঙ রাজত্ব আরম্ভ হ'ল। সুঙ-রাজত্বের চিত্রে যে সরল সহজ ভাব ছিল মিঙ-রাজত্বের সময় সেটা আলঙ্কারিক এবং আয়াসসাধ্য হ'য়ে পড়েছিল। এযুগে চীনের genre painting বা সংসারের দৈনন্দিন চিত্রের আরম্ভ হয়।

এতে জাপানের ইউকিয়োয়ি পদ্ধতির জনশিল্পের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাবে।

দর্‌বারী ছবি, পোলো খেলা, আবর্ত্তমান জলের খেলা, মহিলাদের বিভিন্ন অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে—ছবি হয়েছে। আবর্ত্তমান জলের খেলা হচ্ছে কবিতার খেলা। একটা বাটী ঘোরানো জলধারার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ত। বাটীটা আগের জায়গায় ফিরে' আসার মধ্যে একটা কবিতা রচনা কর্‌তে হ'ত।

লিন লিয়াঙ্‌ এযুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট্‌। তার একছবি "স্রোতস্বতী তীরে, শরবনে হংসদ্বয়।" এ-ছবিতে তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। হাঁসের শুভ্র কোমলতা অনুভব করা যায়।

উ উয়েই আর-একজন বড় আর্টিষ্ট। তার কালিতে আঁকা এক ছবি "পরী ফিনিক্স পক্ষী"। ফিনিক্স পক্ষী এক কল্পিত পাখী। পাখীর লেজ পরীর মাথা ছাড়িয়ে উঠে' তা'কে একটা খুব গাম্ভীর্য্য দিয়েছে। এই শিল্পীর হাত ছিল মনোক্রোম বা একরঙা ছবি আঁকায়।

এযুগের আরও আর্টিষ্ট লু চি ওয়েন চেং মিং চিয়া ইঙ।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছিল। সম্রাট্‌ দুরন্ত যাযাবর মাঞ্চু তাতারদের সাহায্য চেয়ে পাঠান। তা'রা এল, কিন্তু এসে রাজ্য দখল করে' বস্‌ল। এ যেন ঠিক হিন্দু রাজা জয়চাঁদের মামুদ গজনীকে নিমন্ত্রণ করে' আনার মত।

মিং-সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে চীনের স্বাধীনতা অস্তমিত হ'ল। মাঞ্চুরা পরাধীনতার চিহ্নস্বরূপ চীনেদের টিকি রাখ্‌তে বাধ্য কর্‌লে। চীনের কাল্‌চার এবং আর্ট্‌ ধীরে ধীরে দেশ থেকে অন্তর্ধান কর্‌লে। এক সময় খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং ইউরোপীয় সভ্যতা চীনে ঢুক্‌ল; তা'রা ইউরোপের মোহে ভুলে' গেল যে, তাদের সভ্যতা এবং আর্ট্‌ ছিল।

মাঞ্চুদের শাসন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অনেক চীনে' পণ্ডিত সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং আর্টিষ্ট্‌ চীনে পালাল। এদের প্রধান আড্ডা ছিল নাগাসাকি বন্দরে। এ-দলের আর্টিষ্টদের প্রধান হ'ল চেন নান পিন। তার কাছে জাপানী আর্টিষ্ট্‌রা ভিড় কর্‌লে শেখার জন্যে। তাঁর একটু ইউরোপীয় বস্তুতন্ত্রতার দিকে ঝোঁক ছিল। এই আন্দোলনের ফলে জাপানে চীনের ক্ল্যাসিক্‌ অধ্যয়ন করার যুগ আরম্ভ হয়। আমরা যেমন বৌদ্ধ ভারতের অনেক তথ্য চীন থেকে জান্‌তে পাই, চীন-সম্বন্ধে অনেক তথ্য তেম্‌নি জাপান থেকে জানা যায়।

ইউরোপের রেনেসাঁস্‌ও এরকমে হয়েছিল। তুর্কিদের আক্রমণে বাইজান্টাইন সভ্যতা, মধুচক্রের মধুর মত সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে; ফলে ক্লাসিকাল্‌ চর্চ্চার সুরু হয়।

আজ মহাচীন বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির সঙ্ঘর্ষে শতাব্দীর মোহতন্দ্রা থেকে জেগে উঠেছে, তার রাজনীতি ক্ষেত্রে; কিন্তু তার কাল্‌চার এবং আর্টের জাগরণ হবে কবে?

চীন ও জাপানে ভ্রমণবিবরণ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেকে আজ আমাকে অনুরোধ করেছেন যে দেশের লোকের কাছে আমার চীন এবং জাপানে ভ্রমণবিবরণ আমি কিছু বলব। এই জন্যে আমার বন্ধুরা আজকের এই সভা আহ্বান করেছেন। ঠিক এই সভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি, একথা স্বীকার করতে পারিনে। আমার মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি। কারণ প্রথমতঃ এই যে, চীন ও জাপানে আমি যে-কাজের জন্যে আহূত হয়েছিলুম এবং যে-কাজে আমি প্রবৃত্ত ছিলুম তা'তে নিজে কিছু বিবিক্ত থেকে চারিদিকের সমস্ত অবস্থা দেখবার মত অবকাশ আমার হয়নি।

কুমারী লিন্, ডাঃ কালিদাস নাগ, রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রী নন্দলাল বসু (পিকিঙে)

বরং আমার সঙ্গে যে বন্ধুরা গিয়েছিলেন, তাঁরা যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিলেন। সে-দেশকে দেখ্‌বার জন্যে এবং সে-দেশবাসীর সঙ্গে পরিচয় বিস্তারিত কর্‌বার জন্যে তাঁদের যথেষ্ট সময় ছিল। আমি আমার বিশেষ কাজে এ-রকম নিরতিশয় ব্যাপৃত ছিলুম যে, তা'তে ভালো করে' সেখানকার যা দর্শনীয় তা দেখেছি, এ-কথা বল্‌তে পারিনে এবং যে-সকল সাধারণ লোকের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তাদের অন্তরের কথা জানা উচিত ছিল, তা'ও জান্‌বার সুযোগ পাইনি। আমার যা কর্ত্তব্য ছিল, সেটা পালন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়েছিল।

আর-একটা দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে,আপনাদের অনেকেই আজকে এই যে বিবরণ শুন্‌তে এসেছেন, আপনাদের মনের মধ্যে এমন একটা কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে, যার জন্যে আপনারা আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্যে উৎসুক হয়েছেন। আমি সেটা বুঝ্‌তে পারি। তার ভিতর আমাদের ভারতবর্ষের যদি কিছু গৌরবের বিষয় থাকে, সেটা আপনারা বোধ করি শুন্‌বার জন্যে উৎসুক। আপনাদের ভিতর কেউ-কেউ এমন আছেন যাঁরা বোধ করি ভাবছেন যে, সমস্ত এসিয়া মহাদেশকে এক কর্‌লে আমাদের শক্তি-বৃদ্ধি হ'তে পারে এবং সে-প্রয়োজন-সাধনের পক্ষে আমার ভ্রমণ কিছু সহায়তা করেছে কি না, সে-সম্বন্ধেও আপনাদের হয়ত একটা জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু আমি আপনাদের এ-কথা বল্‌তে চাই, যে আমি কোন-রকম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি এবং আপনার দেশের গৌরবকে চতুর্দ্দিকে প্রখ্যাত কর্‌বার প্রয়োজন আমি তত্টা মনে করিনি। যা বল্‌ব, তা হয়ত সেজন্যে আপনাদের ইচ্ছার সঙ্গে, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিল্‌বে না। [(গোলমাল হওয়ার পর) আপনাদের সকলকে আমার শোনাবার উপযুক্ত শক্তি নেই, এইজন্য আপনাদের ধৈর্য্য প্রার্থনা করি। আপনারা হয়ত অনেকে আমার কথা শুন্‌তে পাবেন না. কিন্তু আমার যা শক্তি তা'কে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌ব না। আপনাদের কাছে আমি এই মিনতি জানাচ্ছি, কোলাহলের ভিতর বৃথা শক্তি ব্যয় কর্‌তে আমি পারব না, আমার শরীর দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত। আমার শক্তিকে অতিক্রম করে' আমি আজকের এই সভায় বল্‌বার জন্যে এসেছি। এ-কথা জানাবো, আমি একান্ত ক্লান্ত, যাঁরা শুন্‌তে পান না, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন, আমার বয়স ও শক্তিহীনতার অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন।]

আমি এ-কথা জানাতে চাই, আমি আপনার দেশের কোন বিশেষ গৌরবকে ঘোষণা করবার জন্যে অন্য দেশে গিয়েছি এবং সেখানে গিয়ে ভারতবর্ষের জয়-কীর্ত্তন কর্‌ব ও তাদের এবং তাদের চিত্তকে জয় করে' ভারতবর্ষের খ্যাতি-বৃদ্ধি কর্‌ব, এ-কথা মনে করে' যাইনি। আমাকে যাঁরা ডেকেছিলেন, তাঁদের আমার প্রতি বোধ করি শ্রদ্ধা ছিল, তাঁরা আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, কিছু জান্‌তে চেয়েছিলেন, মানুষের কাছে মানুষে যে-রকম সাহায্য প্রার্থনা করে' থাকে। আমার শক্তি বিচার না করে' সোজা মানুষের মত গিয়েছিলুম, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হ'য়ে যাইনি, সমগ্র এসিয়াকে একত্র কর্‌তে যাইনি, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, সে-সম্বন্ধের আকর্ষণকে স্বীকার করে' আমি তাদের মধ্যে গিয়েছিলুম এবং দাঁড়িয়েছিলুম এবং তাই করেছি বলে', সেটা অন্তরের ভিতর গ্রহণ করেছি বলে', তাঁরা আমার সাহায্য গ্রহণ করেছেন, ইংরেজিতে যাকে propaganda বলে, যদি সে-রকম প্রচার কার্য্য মনে করে' যেতুম, সেটা অত্যন্ত অন্তরায় হ'ত, সেখানকার মানুষের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌বার পক্ষে। সে-রকম প্রচারের ইচ্ছা মাত্র ছিল না। আমার বহুদিনের কল্পনা, চীন-সম্বন্ধে বহুদিনের একটা আদর্শ মনে ছিল এই যে, সকলের চেয়ে প্রাচীন সভ্যতা যার অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তিকে চীন বাঁচিয়ে রেখেছিল, তার স্থান কোথায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করেছিলুম। মানুষের একটা পরম গৌরব, মনুষ্যত্ব, চীনের প্রাণকে কি গভীরভাবে জয় করেছিল, তার ভিতর সভ্যতার একটা শক্তি ছিল, সেখানে গেলে বুঝ্‌তে পারা যায়! তা'কে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল এই প্রকাণ্ড দেশ, যার উপর কত যুগ-যুগান্তের বিপ্লব, বিরোধ, কত-রকম আক্রমণ চলে' গেছে, তথাপি এই বিপুল জাতি তার বিপুল প্রাণ-শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এটা দেখ্‌বার জিনিষ। যেমন তীর্থে গিয়ে দেবতাকে অনুভব করি জ্ঞান দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, তেম্‌নি অন্তরের ভিতর যে বিপুল বিরাট শক্তি আছে, সেখানে (চীনদেশে) তার মন্দির,

সে-মন্দিরে গিয়ে তা'কে দেখ্‌লুম শ্রদ্ধা ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা, তাদের বড়-কিছু দেবো, আমার কাছ থেকে পেয়ে তা'রা ধন্য হবে এটা মনে ছিল না। সর্ব্বদাই এটা অনুভব করেছি, ওর ভিতর বহু প্রাচীন যুগ-যুগান্তের মনের ধারা বিচিত্রভাবে আপনার কাজ করছে, কত বাধা-বিপত্তি-বিকৃতির ভিতর দিয়ে চতুর্দ্দিকের বিপুল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে সে আপনাকে প্রকাশ করছে, সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজে, সভ্যতায়,—অথচ কত বড় পর্দ্দা, কত বড় বাধা ভেদ করতে হয়। ভিন্ন-ভিন্ন-রকম মুখের চেহারা, ধরণ-ধারণে, প্রতিদিনের আচার-ব্যবহারে, সমস্ত ভিন্নতার সে কত প্রাচীন তা প্রকাশ করছে, যাকে অতিক্রম করে' তার অন্তরের ভিতর প্রবেশ করবার একমাত্র উপায়, মানুষের অন্তরতম যে-গভীরতা,তার ভিতর প্রবেশ করবার একমাত্র উপায়। অন্তরে শ্রদ্ধা, তার আলোকে নত হ'য়ে সেখানে প্রবেশ করা। মাথা তুলে' প্রবেশ করতে গিয়ে মিশনারীর দল বলেছে, আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি বুঝি, তোমাদের দয়া করতে এসেছি। কোন দেশকে, কোন ভিন্ন

সাংঘাই বন্দর

জাতিকে এ-রকম অপমান করবার অধিকার কারো নেই। কোন-কোন বিষয়ে আমাদের কিছু-কিছু শ্রেষ্ঠতা থাকতে পারে, ভিন্নতার গৌরব থাকতে পারে, তা সত্ত্বেও যে জাতি যুগ-যুগান্তর বিরোধের ভিতর নিজের মহত্ত্বকে সজীব করে' রেখেছে, সে শ্রদ্ধার যোগ্য। তার ভিতর দিব্য শক্তি ছিল। মানুষের ভিতর যে অসীম শক্তি সেই শক্তিকে যে বহুধা বিস্তৃত করেছে তা'কে দেখ্‌বার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকা উচিত। তবে ভিন্ন দেশে গিয়ে সেখানকার সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারি। আমার ভিতর রাষ্ট্রীয় কোন উদ্দেশ্য যদি থাকত, এশিয়া শক্তিমান্ হবে, ভারত-বর্ষের জয়-ধ্বজা আমরা সেখানে তুলব, এমন ভাব যদি থাকত, কখনও সেখানে প্রবেশ করতে পারতুম না। আমি নত হ'য়ে গিয়েছি, মানুষের কাছে মানুষ হ'য়ে গিয়েছি, আমি কিছু দিতে যাইনি।

আমি যেদিন প্রথম চীনদেশে পদার্পণ করলুম, আমার বন্ধুগণ (বন্ধু বলে' গণ্য করবার সময় তখনো হয়নি) তাদের অতিথি দেখে' হৃদয়-বিগলিত হ'ল। আমি বললুম,আমি তোমাদেরই একজন। আমি দার্শনিক নই, তত্ত্বজ্ঞানী নই, prophet নই। দেশ-বিদেশে খ্যাতি হয়েছে বটে সেজন্যে আমি লজ্জিত, আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করবে না। আমি কবি সেইজন্য তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে চাচ্ছি, তোমাদের উপর

চীন-প্রবাসী দুইটি মাঞ্চুরিয়ার মহিলা

চীনদেশের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্

pulpit থেকে জ্ঞানের শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করতে চাইনে, সে-ক্ষমতাও নেই, সে প্রত্যাশা কোরো না। তা'রা বল্‌লে, তুমি ভারতবর্ষের লোক, কত যুগ-যুগান্তের তত্ত্বজ্ঞানের বোঝা ঘাড়ে এনেছ। আমি বল্‌লুম, তত্ত্বজ্ঞান আমি কিছুই জানিনে, মানুষের অন্তরের ভিতর, মানব-প্রকৃতির ভিতর প্রবেশ কর্‌বার একটা পাথেয়ও আমি পাইনি, ভগবান্ যে-পাথেয় দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার দুয়ার যদি রুদ্ধ হয়, আমার আর কোন সম্বল নেই।

সেখানে যাওয়ার পূর্ব্বে পশ্চিম দেশ থেকে বড়-বড় তত্ত্বজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক নানা-রকম শিক্ষক, অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেখানে গিয়েছেন, বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল, ডিউয়ি ও আরো অনেককে তা'রা নিমন্ত্রণ করেছে, তা'রা নানা-রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্ঘ্য আহরণ করে' চীন-দেশে তা প্রচার করতে গিয়ে তা'কে ছাত্রের মত দেখেছেন, তাঁ'রা গুরুগিরি করতে গিয়েছেন, বড়-বড় কথা, পরামর্শ উপর থেকে স্কুল মাষ্টারের চেয়ারে বসে' বলেছেন, হয়ত কোন গভীর রহস্যের কথা বলে' থাক্‌বেন,—তাঁ'রা তত্ত্বজ্ঞানী, চিন্তাশীল।

পিকিঙের পঞ্চচূড় মন্দির—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

আমাকে যখন নিমন্ত্রণ কর্‌লে, ভাবনা হ'ল, সে-আসনে গিয়ে কি দেবো আমি বল্‌লুম, আমি তা দিতে পারব না, আমার কাছে যা পাওয়া সম্ভব, তা নিতে হ'লে তোমাদের এগিয়ে আসতে হ'বে। আমার হৃদয়ে তোমরা এস, কবির সঙ্গে তোমাদের মাল্যের বিনিময় হউক। আমি বার-বার বলেছি, ভারতবর্ষের তত্ত্বজ্ঞান, সেখানকার ঋষিদের বড়-বড় বাণী বহন কর্‌বার শক্তি আমার নেই, আমি তা পারব না। তা'রা আমাকে স্বীকার করে' নিলে, খুসী হ'ল, বল্‌লে—বাঁচলুম। তাদের একটা ভাবনা মাথার উপর থেকে চলে' গেল। হঠাৎ যখন কোন মানুষকে মনে করি, সে অমানুষ হ'য়ে আমাদের মধ্যে এসেছে, তার ভয়ঙ্কর জ্ঞান, সে prophet, তখন কোন মানুষই তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না, তা'কে দূরে রাখে, কথা কইতে ভয় করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ভয় পায়, তা'কে ঘরে আন্‌তে ভয় হয়। আমি ছদ্মবেশী নই। তত্ত্বজ্ঞানের মুখোষ নিয়ে আসিনি, আমি তোমাদের আপনার লোক, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। বার-বার একথা বলেছি, আমি তোমাদের মাঝখানে থাক্‌ব, তোমাদের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করো।

কুমারী লিন্, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও মিঃ সু (চীন-ভ্রমণের পথপ্রদর্শক)

আর যদি সে-সৌভাগ্য আমার হয়, তোমরা আমাকে বলো—তুমি কেবল ভারতবর্ষের কবি নও, এসিয়ার কবি, চীন-জাপানের কবি, একথা যদি বল্‌তে পারো, সকলের চেয়ে বড় পুরস্কার আমি পাবো। আমাকে গুরুগিরি করতে বল্‌লে আমি পারব না।

আমার প্রথম কাজ ভূমিকা, আমি এই ভূমিকা মনের মধ্যে রেখে কাজ করেছি। অনেক চীন-দেশীয় যুবক যারা আমার সঙ্গে-সঙ্গে ছিল, অল্প তাদের বয়স, তা'রা আমাকে বয়স্য বলে' জেনেছে, সেটা আমার সকলের চেয়ে সৌভাগ্য। তা'রা খবর পায়নি, আমার ৬৪ বৎসর বয়স। অতি সহজে তা'রা আমাকে ভালোবেসেছে, যথার্থ অন্তরঙ্গ বলে' ..., মাষ্টার বলে' জানেনি, সেটা আমি সকলের চেয়ে বড় সফলতা বলে' মনে করি। আপনারা বল্‌বেন, এ ত ভূমিকা হ'ল। সেখানে কি দেখ্‌লুম, কেন গিয়েছিলুম! আমাকে যারা ডেকে-ছিল, তা'রা বলেছিল কিছু বক্তৃতা দিতে হবে। আমি যখন এদেশে ছিলুম ভাব্‌লুম, সেখানে বড়-বড় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা গিয়েছেন, বক্তৃতা ভালো-করে ভেবে-চিন্তে লিখে' নিয়ে যেতে হবে, যেন একান্ত অপদস্থ না হ'তে হয়। মনে ভারি সংকোচ, ভয়, উদ্বেগ ছিল। যাবার পূর্ব্বে এম্‌নি একটা মুস্কিলে পড়েছিলুম, মন স্থির করতে পারছিলুম না। সে-সময় দিনের পর দিন প্রতিদিন কিছু-না-কিছু গানের নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল, ১।২।৩ করে' গানের বোঝা আমি শেষ করতে পারছিলুম না বলে' ক্রমশঃ দিন পিছিয়ে যাচ্ছিল। শেষে যেদিন জাহাজে উঠি, দেখ্‌লুম কিছুই হয়নি। যাঁরা সমুদ্রযাত্রা করেছেন, তাঁরা জানেন জাহাজের ক্যাবিন্-এ বসে' রচনা কি দুঃসাধ্য কাজ। সে-কৃচ্ছ্র সাধনও করতে-করতে গিয়েছি, তাই মনে-মনে সাহস ছিল আমাকে একেবারে অপ্রস্তুত হ'তে হবে না।

পিকিঙের পশ্চিম-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতেছেন

প্রথম ঘাটে যেখানে নাম্‌লুম, সে হচ্ছে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন। আপনারা সবাই জানেন, পৃথিবীর ইতিহাসে রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশে নয়, সেখানে ব্রহ্মবাসী ছাড়া আর সব দেশের লোক আছে, অনেক চীনের লোক সেখানে আছে। যখন গেলুম, সেখানকার ভারতবাসীরা আমার সম্মান করেছিল, সেটা না কর্‌লেও ক্ষতি ছিল না। তার পর আমাকে যখন চীন-বন্ধুরা (চীনে'রা) আমন্ত্রণ কর্‌লেন, তখন আমি মনের ভিতর তৃপ্তিলাভ কর্‌লুম। এই প্রথম আমার চীনের সঙ্গে পরিচয়। সেখানে চীনবাসীদের একটা বিদ্যালয় আছে, সে-বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ আমাকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌বার জন্যে সেখানে নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। তা'তে বড় আনন্দ লাভ করেছি। চীনের আতিথ্য প্রথম সেদিন লাভ করি। তা'রা আদর-অভ্যর্থনা করে' বল্‌লে— তুমি কি বল্‌বে আগে আমাদের বলো, কেননা আমাদের অনেকে ইংরেজী জানে না। তুমি যা বল্‌বে, আমরা তখনি তা চীন-ভাষায় অনুবাদ করব। আমি বল্‌লুম, তা ত ঠিক বল্‌তে পারিনে, কি বল্‌ব। তবে মোটামুটি কথা হচ্ছে—আমি দেশ-বিদেশে গিয়েছি, নিমন্ত্রণ পেয়েছি, বক্তৃতা করেছি, সম্মান-সমাদর লাভ করিনি তা নয়, কিন্তু একটা কথা জানিনি, সেটা জান্‌বার জন্যে চীনে যাচ্ছি, সেইজন্যে তার আকর্ষণ বেশি। সেটা কি? আমি জানি এখানে মানুষের স্পর্শে অনেক হয়, আমাদের প্রাচ্য দেশে যখন নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন সত্যিকার আতিথ্য লাভ করব। গৃহস্বামী, যারা নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাদের হৃদ্যতা লাভ করব, শুধু করতালি লাভ করব না। তাদের কাছে আর্থিক পুরস্কার শুধু লাভ করব না, আমি তাদের হৃদয় লাভ কর্‌তে পারব, এ-কথা মনে করে' এসেছি। তোমাদের যারা শ্রোতা, যারা আমাকে সম্মান কর্‌তে এসেছে, তাদের এ-কথা জানিয়ে যাবো, আমি তাদের দেশে যাচ্ছি এই স্বাদ গ্রহণ কর্‌বার জন্যে। মানুষ

কুমারী লিন্‌, ডাঃ নাগ, অধ্যাপক সেন ও এল্‌ম্‌হার্ষ্ট ও রবীন্দ্রনাথ

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ব্যারন হল্‌ষ্টাইন, অধ্যাপক সেন ও ডাঃ নাগ

আপনার ঘরে অনেক আদর-অভ্যর্থনা পায়। আমার ভাগ্যে আত্মীয়ের আদর-অভ্যর্থনা জোটেনি তা নয়, তা সম্যক্ লাভ করেছি, কিন্তু মানুষের আত্মীয়তা, যাদের সঙ্গে আমাদের জাতিগত যোগ নেই, যারা ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে পৃথক্, সেখান থেকে যে আত্মীয়তা আসে, মনুষ্যত্বের গভীর উৎস থেকে আত্মীয়তার অমৃতধারা উৎসারিত হ'য়ে সমস্ত বাঁধন ভেদ করে' অনাত্মীয়তার বাইরের আবরণ-কুহেলিকা ভেদ করে' মানুষের

একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি

অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যে জ্যোতি আছে, সে-আত্মীয়তার জ্যোতি যে ভোগ করতে পারে, সে ধন্য হয়। আমি তোমাদের কাছে এই একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাচ্ছি, যারা পরদেশবাসী, পরভাষাভাষী, তা'রা আমাকে আপনাদের জাতি বলে' জানবে, আমি তাদের আপনাদের জাতি বলে' জানব, তাদের কাছে থেকে হৃদ্যতা লাভ করব, এর চেয়ে মানুষের কাছে মূল্যবান্ জিনিষ হ'তে পারে না। আমি

"চিত্রা" অভিনয়ে চিত্রার ভূমিকায় কুমারী লিন্

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন

এজন্যে যাচ্ছি, এ-কথা তাদের বলেছি। তা'রা খুসী হয়েছে, এ-কথা সত্যি কথা। এর প্রমাণ সমস্ত জায়গায় আমরা পেয়েছি, যাঁরা আমার সঙ্গে গিয়েছেন, তাঁরাও পেয়েছেন। তার পর ব্রহ্মদেশ-বাসী চীন-সমাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মালয় উপদ্বীপে যখন গেলুম, সেখানে কতকটা আমাদের স্বদেশবাসীদের সঙ্গে মিলন হ'ল। আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি কিন্তু মালয়ে একটা

মিঃ ইউ—ইনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিশ্বভারতীতে যোগদান করিবেন

চীন-প্রবাসী পার্শী বণিক্ মিঃ তালাতী, ডাঃ নাগ, মিঃ ইউ ও অধ্যাপক বসু

আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেছি, যা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই—এটা-একটা ঘাটের মত জায়গা, যেখানে চীন, জাপান, জাভা, সুমাত্রা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকের আনাগোনা চলে। এখানে নানা-জাতীয় লোকের সমাবেশ, তা সত্ত্বেও পরস্পরের ভিতর কোন-রকম বিদ্বেষবুদ্ধি জাগেনি। সকলের ভিতর একটা নম্রতা আছে। তবে সেখানে একটা জিনিষ আছে ভাব্বার কথা। চীনদেশ থেকে বহুতর শ্রমজীবী মালয় উপদ্বীপে এসে সমস্ত মালয়কে প্রায় অধিকার করেছে, সেখানকার দেশবাসী যারা তা'রা পরিশ্রম-বিমুখ। আমি তাদের দোষ দিইনে, তা'রা বলে আমরা কি অর্থ-উপার্জ্জনের জন্তে মাথা বিকিয়ে দেবো? অল্প-কিছুতেই তা'রা সন্তুষ্ট হয়, আর কাজ করতে চায় না বলে' অর্থ যারা চায়—মহাজন—তা'রা বড় রাগ করে, বলে' এরা যথেষ্ট পরিশ্রম করতে বিমুখ, এজন্ত এদের দ্বারা যথেষ্ট আয় হয় না। আর এইজন্তে এদের উপর তা'রা বিরক্ত। দুই দল লোক সেখানে কাজ করে—(১) যারা চীনদেশ থেকে এসেছে, (২) যারা ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যে-সমস্ত শ্রমজীবী গিয়েছে, তাদের অধিকাংশ মান্দ্রাজী, কয়েক অংশ পাঞ্জাবী শিখ। চীন থেকে যারা এসেছে তা'রা দক্ষিণ-চীনের লোক—আমাদের দেশে যেমন চীনবাসী আসে—ক্যাণ্টনিজ। দেখা গেছে চীনদেশের এমন একজন লোক নেই যাকে হীন কর্ম্ম করে' থাকতে হয়। তা'রা দরিদ্র, নিজের ঘর ছেড়ে বিদেশে এসেছে; দেখ্তে-দেখ্তে তাদের সমৃদ্ধি হয়েছে, তা'রা জমি-জমা করেছে,বড়-বড় rubber plantation (রবারের চাষ)—ঐশ্বর্য্যের যে লক্ষণ, তা চীনেদের ভিতর প্রকাশ পেয়েছে, অথচ কেমন চীনে' ভাব। আমাদের দেশের যারা এসেছে, তাদের মধ্যে সেই অকিঞ্চন ভাব। চেহারাও একই-রকম। মান্দ্রাজ-কুলী অবজ্ঞা-ভাজন, তা'রা কুলী কুলী কুলী, তা'রাই সমস্ত ভারতবাসীর নাম করেছে কুলী। ৩০।৪০ সেণ্ট্-এর জন্তে তাদের চিরজীবন খেটে মরতে হয়, উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। যার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সে স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারে, তা'রা ছেলে-পুলেদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে পারে। যার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না, সে পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্ত দাস্য-বৃত্তি করতে বদ্ধ হয়েছে, আর এইজন্তে মান্দ্রাজীরা অবজ্ঞা-ভাজন হ'য়ে রয়েছে, এ-কথা সকলের মনে রাখ্তে হবে এণ্ড্রুজ সাহেব সেখানে গিয়েছেন, তিনি মহাজনদের খুব গা'ল দেবেন, কিন্তু যারা অর্থ উপার্জ্জনকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করে, তাদেরকে দয়া করো দয়া করো বলে' লাভ কি? তা'রা বল্বে, কেন দয়া করব, ওরা ১০ সেণ্ট, ১ ডলার, ২ ডলার পায়, ওদের বেশী দেবো কেন? সুতরাং ওকথা বলে' অসম্মান দূর করতে পারব না, বরং যার জন্তে বলা সে দয়ার বোঝা হ'য়ে পড়ে। কেন চীনে কুলীদের জন্তে মহাজনদের বলতে হয় না, ওদের দয়া করো, কেন মান্দ্রাজী কুলীদের জন্তে বলতে হয়, তার কারণ অন্বেষণ করলে দেখ্ব, মান্দ্রাজ থেকে যারা গিয়েছে, তা'রা পরস্পর সম্মিলিত হ'য়ে পরস্পরের সম্মান রক্ষা করতে অগ্রসর হয় না। একথা কেউ বলবে না, এস আমরা একত্র হ'য়ে একটা কাজ করি। তা করে না, পরস্পরকে শোষণ করতে পরস্পরের চেষ্টা। উপর থেকে যেমন শোষণ-শক্তি কাজ করছে, ওদের নিজেদের ভিতরতেম্নি শোষণ শক্তি তাদের দুর্ব্বল করেছে। সে যে কত বড় দুর্ব্বলতা সেখানে গেলে বোঝা যায়, এটা ভাব্বার বিষয়। মহাজনকে, তাদের অমানুষিকতাকে অবজ্ঞা করো, রাজি আছি, ঘৃণা করো, রাজি আছি, সে আলাদা কথা; কিন্তু ওদের বেলা বল্তে হবে, তোমাদের যদি পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সম্মান না থাকে, প্রেম না থাকে, পরস্পরকে রক্ষা করবার জন্তে সকলে একত্র হ'তে না পারো, কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না, তোমাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না, চিরদিন তোমরা কুলী হ'য়ে থাক্বে, সমস্ত ভারতবাসীর মাথা হেঁট করবে, নাম কলুষিত করবে।

এ এক-দলের কথা। আর-এক দল পাঞ্জাবী শিখ, তা'রা রাজশক্তির পিছনে-পিছনে আছে। রাজ-শক্তি যখন অন্তকে দলন করে, তখন সে ঘৃণ্য কাজের ভার ওদের উপর। তার যা ফল,তাই হয়েছে। রাষ্ট্র-শক্তির পিছনে

শ্রীযুক্ত তালতীর গৃহে বিশ্বভারতীর দল

ক্ষমতার অভিমান আছে। দাস যখন মনে করে সে প্রভু, পরের ধার-করা প্রভুত্ব নিয়ে যখন সে তার শক্তির অপব্যবহার করে, তখন তার মত বিষময় বীভৎস জিনিষ আর কিছু নেই। এদের চেয়ে কুলীরা বরং ভালো। তাও দেখেছি, ভারতবাসীর এই পরিচয় হয়েছে বিদেশীর কাছে। আমি মালয় উপদ্বীপে তেমন করে' দেখবার সময় পাইনি, কিন্তু চীনদেশে এত বড় ঘৃণা আর কোন জাতিকে করে না। শিখেরা চীনেদের টিকি ধরে' লাথি মেরেছে, যা ইংরেজ কনেষ্টবলেরাও করে না। তাদেরও যেখানে মনুষ্যত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্য আছে, এই দাস-শিখদের ভিতর তার বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না, সেটা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হ'য়ে আছে। এত বড় কলঙ্ক ভারতবাসীর নামে হয়েছে। শিখেরা যখন গুরুদ্বারে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এল, তাদের বল্‌লুম, ভারতবর্ষ থেকে যারা এসেছে, ঋষিদের প্রেমের ধর্ম্ম ও তাদের মহত্ত্ব প্রচার করতে যারা এসেছে, তা'রা ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনকে, জাপানকে বহুরকম আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধেছে, যা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, এম্‌নি করে' করেছে। কোনো বাণিজ্যের শক্তি নেই, রাষ্ট্রের শক্তি নেই, তেমন করে' প্রেমের বন্ধনে বাঁধ্‌তে পারে। একমাত্র আপনার হৃদয়ের প্রেমের প্রাচুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে চীন-জাপানকে তা'রা আত্মীয় করেছে, তাদের বংশধর হ'য়ে তোমরা বিদ্বেষ রোপণ করে' গিয়েছ। এরা চিরকাল ঘৃণা করবে, ভারতবাসীর উপর বিদ্বেষ-বুদ্ধি নিয়ে থাকবে, এত বড় ক্ষতি তোমরা ভারতের করলে! পূর্ব্ব-পুরুষদের নামে কলঙ্ক ঢেলে দিলে! আমাকে তোমাদের গুরুদ্বারে ডেকেছ, গুরুদ্বার কিসের জন্যে, গুরু নানকের মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র, সকলে এক ভগবানের সন্তান, এ-বাক্য তিনি প্রচার করেছেন। সে-বাণী যদি এখানে না বহন করে' থাকো, কিসের গুরুদ্বার? তাঁর বাণী বহন করতে পারলে না, শুধু দুঃখ আর বেদনা দিয়ে গেলে। এরা তোমাদের আপনার লোক, এসিয়াবাসী, এদের সঙ্গে যুগ-যুগান্তের আত্মীয়তা, সে-আত্মীয়তার বন্ধনকে এমন করে' পীড়িত করলে, ক্ষুণ্ণ করলে। বলেছি, একথা তা'রা মনে নেবে কি না, জানিনে। আমি আপনাদের কাছে দুঃখ জানাচ্ছি। দুই দিকে দুঃখ। একদিকে প্রভুশক্তি যখন দাসকে অবলম্বন করে' আপনার বীভৎস মূর্ত্তি প্রকাশ করছে, সে এক দুঃখ, আর-এক দিকে, দাস-শক্তি যখন অত্যন্ত হেয়ভাবে নিজ দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত কলঙ্ককে সহনীয় বলে' মনে করে, সে আর-এক দুঃখ। দুই দিকে দুই অন্ধকার ভারতবর্ষ বিতরণ করছে। ভারতবাসী এই দুঃখ কখনও ভুলবে না।

আমি বলেছি মালয়-উপদ্বীপে দুই দল আছে। হংকং প্রভৃতি জায়গায় চীন-দেশীয় কুলী, সেখানে চীনেদের সঙ্গে পরিশ্রমে, শারীরিক শক্তি-সাধ্য কাজে প্রতিযোগিতা করবার উপায় নেই। সেখানে গিয়ে কুলীগিরি করতে পারে, এমন শক্তি কারো নেই। চীনেদের মত দীনভাবে কেউ থাকতে পারে না, ওদের পূর্ব্বাপর একটা শিক্ষা আছে, সে-শিক্ষা দ্বারা সাধারণ চীনবাসী একান্ত শ্রমপরায়ণ হয়। এত বড় পরিশ্রমী আর এমন কর্ম্মিষ্ঠ জাতি জগতে কোথাও নেই। এইজন্যে আপনারা জানেন অন্যত্র সবাই এদের ভয় করে। আমেরিকা প্রভৃতি জায়গায় চীনকে যেতে দেয় না, তার কারণ তাদের কাণ, চোখ, নাকের কমতি আছে তা নয়, তা'রা এমনতর কাজ করতে পারে, এত অল্প ব্যয়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে যে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অসাধ্য। যে-কেহ চীনের ধারে গিয়েছে, হংকং, সাংহাই প্রভৃতি জায়গায় যে গিয়েছে, সে জানে এই-রকম অসামান্য—প্রায় মানুষের শক্তির অতীত—নিয়ত কাজ করবার অভ্যাস বহুযুগ থেকে চীন-দেশীয় লোকেরা অর্জ্জন করেছে। এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, প্রথমে মনে হয় এটা মস্ত একটা জাতীয় সম্পদ, তার পর কিন্তু মনে সন্দেহ হয়, এটা দেখা গিয়েছে যে, যখন কোন জাতি আপনার কোন-একটা বিশেষত্বকে অতিমাত্রায় প্রবল করে, তখন সে তার ভিতর একটা সামঞ্জস্যের অভাব সৃষ্টি করে। যেমন কয়লার খনি কিংবা কেরোসিন তেলের খনিতে মানুষ ঝুঁকে পড়ে, তার কারণ তার মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি নিহিত আছে, সেটা কাজে লাগে। চীনে দেশ-বিদেশ থেকে লোকে যাচ্ছে কেন? তার

দুটি কারণ আছে :—(১) সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ যা, সেগুলির উপর অনেকের লোভ আছে, (২) এখন ইউরোপ-আমেরিকা সব জায়গায় যারা শ্রমজীবী তা'রা দাবি করে' বসেছে মানুষের যা প্রয়োজন সে-প্রয়োজনের জন্যে তাদের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, বেশি করে' তাদের দিতে হবে,নচেৎ তা'রা strike করে। নানারকম উপসর্গ আছে। চীনে একটা শক্তি মানুষে যা বিশেষরূপে প্রকাশিত—যেমন তেল-কয়লা, তেম্‌নি শ্রমশক্তি বলে' একটা শক্তি সেখানে বহুদিন থেকে সঞ্চিত রয়েছে, সেটা ধনীদের পক্ষে লোভনীয় জিনিষ। কি-রকম ? যেমন গুর্খা। গুর্খারা ক্রমাগত মানুষ মারবার যে-প্রবৃত্তি একান্তভাবে তার চর্চ্চা করে' মানুষঘাতকরূপে বিশেষত্ব লাভ করেছে, তার যা দুর্দ্দশা তাও লাভ করেছে। তার এই শক্তি অন্যে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে, যেমন লোহ বা ইস্পাত লোকে ব্যবহার করে—তৈরি করা মাল। ওরা আবার বড়াই করে, আমরা লড়াই করি, আমাদের ভারি গৌরব, বাঙালী কলম পিষে, ওদের চেয়ে বড়, আমরা মানুষ মারি। তার ফলে যেখানে-সেখানে লড়াই হোক্, তার বিচার নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, কিছু নেই, গিয়ে কামান-বন্দুকের মত মানুষ মারতে আরম্ভ করে। যারা মনুষ্যত্বকে বলি দিয়ে খর্ব্ব করে' প্রতিহিংসাকে অতিমাত্রায় বিকশিত করে' তোলে, তা'রা নিজেদের ক্ষতি করে' সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করে, অন্যদের ব্যবহারের জন্য লোভের সামগ্রী হয়;—মৌমাছিরা যেমন মধু সংগ্রহ করে, খায় না, ব্যবহার করে না, তার ফলে মানুষ মধু চুরি করে। যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে যারা ঢের বেশি সঞ্চয় করে,তা'রা চোরডাকাতের প্রশ্রয় দেয়। তাই সব দেশ থেকে ক্যাপিটালিষ্ট এখানে এসে কলকারখানা করছে। নিজ দেশে যারা জায়গা পায় না, তা'রা সাংহাই সোয়ানসি—নানা জায়গায় চীনের শ্রম-শক্তিকে ভোগ করছে। তা'রা হয়ত পারিশ্রমিক দেয়, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বিক্রী করে। চীনের সমাজ-তন্ত্র তাদের পল্লীতে-পল্লীতে ব্যাপ্ত, সে-সমাজকে তা'রা ক্ষুণ্ণ করে। বিদেশীরা পল্লী থেকে শিকড় তুলে' চীনেদের সহরে এনে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় কল-কারখানায় তাদের নিযুক্ত করে, মালয়ের কিন্তু তা পারেনি। আমি অবশ্য সবাইকে মালয়ীদের মত অলস হ'তে বল্‌ছিনে; তবে এর মধ্যেও একটা জিত আছে। মালয়বাসী আপনাদের পল্লীতে থাকে, মাছ ধরে' খায়, অল্প জমি চাষ করে, অল্পে সন্তুষ্ট হয়। অল্পে সন্তুষ্ট জীবন-যাত্রার দৈন্য আছে, তা'কে বড় বলিনে। কিন্তু মালয় উপদ্বীপে যারা রবারের চাষ করে' ধনী হয়েছে, তা'রা মালয়ীদের ব্যবহারে লাগাতে পারেনি, মান্দ্রাজী কুলী এই কাজে তাদের মনুষ্যত্ব উৎসর্গ করেছে। এটা ভাব্‌বার কথা। আমি আমার চীনে' বন্ধুদের সেকথা বলেছি'। ভেবে দেখ্‌লাম—সমস্ত দেশবাসী সাধারণ-লোকদিগকে এত-পরিমাণে হাতে কাজ কর্‌বার জন্য এমন একান্তভাবে গড়ে' তুল্‌বার চেষ্টা করা উচিত নয়।

সেখান থেকে আমি হংকংএ গেলুম। রেঙ্গুন যেমন, হংকং তেম্‌নি, সেটা তাদের নিজের জায়গা নয়। সেখানে ২।১ দিন থাক্‌তেই সান ইয়াৎ সেনের দূত এসে বল্‌লে, 'আপনি দেশবিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, চীনের ভিতর উপযুক্ত লোক যদি কেউ থাকে, যার সঙ্গে আলাপ করা উচিত সে সান ইয়াৎসেন, আপনি গিয়ে তার সঙ্গে চীনের সমস্যা-সম্বন্ধে আলাপ করুন'। আমার সময় ছিল না, পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বদ্ধ, আমি অনেকদিন বিলম্ব করেছি, পিকিঙে আমার চীনে' বন্ধুরা অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। আমি তাদের বল্‌লুম, ফির্‌বার পথে দেখা হবে। তার পর সাংহাই গিয়ে দেখি আমার বন্ধু যাঁরা ছিলেন, ডকে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন বন্ধু যিনি আমার সঙ্গে-সঙ্গে থেকে ইংরেজী বক্তৃতা চীন-ভাষায় অনুবাদ কর্‌বার ভার নিয়েছেন, তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন,—সৌম্যমূর্ত্তি দীর্ঘকায়—চীনদেশে এটা অতি আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। তাঁর শ্রী আর গাম্ভীর্য্য দেখে' মুগ্ধ হলুম। তিনি বরাবর আমার সাহচর্য্য করে' ইংরেজী

শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীকালিদাস নাগ

বক্তৃতা ব্যাখ্যা কর্‌বার ভার নিয়েছিলেন। আমি চীন-দেশের লোকের কাছে কি-রকম অভ্যর্থনা পেয়েছি, কি না পেয়েছি, বল্‌তে ইচ্ছা করিনে। আমার বন্ধু যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা সে-কথা বল্‌বেন। আমাকে তাঁরা পূর্ব্বে দেখেননি, আমার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ছিল, আমার দেশে হয়ত আমার কোন বিশেষত্ব আছে,অনেকে শ্রদ্ধা করে' থাকেন,তাই কিছু-কিছু মাননীয় বলে' ঠিক করেছেন। কিন্তু আমি অতিথি—তাদের(চীনদের)দ্বারা আহূত হয়েছি, একথাটি তা'রা কখনও ভোলেনি। এটা কত অন্তরের সঙ্গে তা'রা স্বীকার করেছে, কি-রকম আশ্চর্য্য তাদের হৃদ্যতা! সেটা খুব একটি মনোরম জিনিষ। আজ সেটির সঙ্গে তুলনা আমাকে করতে হচ্ছে। আমাকে আমেরিকায় নিমন্ত্রণ করেছে,তা'রা সম্মান করেনি বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হয়, কিন্তু আতিথ্যের হৃদ্যতা, মানুষ যে ডেকেছে আমাকে মানুষের ঘরে, এ আমি কখনও অনুভব করিনি। সেটি কখনও কোন ব্যক্তি-বিশেষের কাছে পাইনি বলিনে, যথেষ্ট পেয়েছি, কিন্তু সাধারণ-ভাবে, সকলের স্বীকার করা, ভারতবর্ষ থেকে আমাদের অতিথি এসেছে, আজকে বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে, এটা আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, এ চীনদেশে যেমন দেখেছি আর কোথাও তেমনটি দেখিনি। আমাদের প্রাচ্যধর্ম্মের অন্তরের প্রকাশ,মানুষের প্রতি মানুষের যে দাবি মানব-ভাবে তা স্বীকার করা,যন্ত্রের

শ্রীনন্দলাল বসু ও দুইটি চীন-প্রবাসী পার্শী শিশু

ধারা নয়, এটা পৃথিবীর আর কোথাও দেখিনি। আমেরিকায় গিয়েছি, তা'রা বক্তৃতা দিতে বল্‌লে, দিয়েছি, টাকা পেয়েছি। তা'রা ভাব্‌লে, এ'কে যথেষ্ট দিলুম। আমি খুঁজে' বেড়িয়েছি কোথায় আমার হোটেল, কোথায় যেতে হবে, গাড়ী খুঁজে' বেড়িয়েছি,—এসব নিজে করেছি। ইংরেজ যিনি সঙ্গে ছিলেন, তাঁর সাহায্যে কষ্টেসৃষ্টে অনেক জায়গায় সে হয়েছে। এ দেনা-পাওনার সম্বন্ধ অর্থের দিক্ থেকে, সম্মানের দিক্ থেকে। যা দেনাপাওনার বিষয় তার ভিতর হিসাব আছে, লোকটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, ইউরোপ তা'কে এতদূর-পরিমাণ ভালো বলেছে, সে-পরিমাণে সম্মান পাবে। চীন-জাপানের লোক ইংরেজী ভালো জানে না, ভালো করে' পড়েও না, আবার যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমার যে প্রতিষ্ঠা আছে, সে-সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট-ভাবেও তা'রা জানে না। সাধারণে জানে অতিথি এসেছে, যে-ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম, সেখান থেকে এ এসেছে। মানুষের কাছে মানুষের যে আদর সেটা প্রচুর-পরিমাণে পেয়েছি। আমার সঙ্গে যাঁ'রা গিয়েছিলেন, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী নন্দলাল বোস ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ—তাঁ'রাও এ-রকম আদর-অভ্যর্থনা, আহার-আপ্যায়ন পেয়েছেন যা সহজে হয় না। বড়লোক যেমন পায়, তেম্‌নি পেয়েছেন। গাড়ীতে দূর-দূরান্তে গিয়েছেন ভাড়া লাগেনি, সৈন্যদল সঙ্গে গিয়েছে রক্ষা করবার জন্যে। রাত্রে প্রত্যেক ষ্টেশনে সৈন্যেরা খবর নিয়েছে, ভারতবাসীদের কোন-রকম অসুবিধা, বিঘ্ন-বিপদের আশঙ্কা আছে কি না। সৈন্যদের দেখে' তাঁ'রাই কেউ-কেউ ভীত হতেন। সেখানকার গভর্ণর তাঁদের ডেকে নিয়ে আলাপ করেছেন, এমন সম্মান তাঁ'রা আপনার দেশেও পাননি। ইউরোপে গেলে তাঁরা দেখ্‌বেন কি-রকম আদর তাঁরা পান। এর ভিতর আত্মীয়তার একটু আকর্ষণ আছে, সেটা হৃদয়কে বড় মুগ্ধ করে, সেটা প্রচুর-পরিমাণে পেয়েছি।

তার পর আমাকে বল্‌তে হচ্ছে, নোট যা' লিখেছিলুম, সবাই যা লেখে, তা'তে কোন ফল হয়নি। অধিকাংশ তা বুঝ্‌তে পারে না। আমাদের মত তাদের দায় নেই, যে ইংরেজী না শিখ্‌লে জা'ত যাবে। অধিকাংশে ইংরেজী না শিখে' মাথা তুলে' থাকে, তা'তে কিছুমাত্র অবজ্ঞা বোধ করে না। ১৫ আনা লোক ইংরেজী জানে না, যারা অল্প জানে তা'রা যা জানে সে খুব সরল, আর তা-ও বল্‌লে ইংরেজী ভালো বুঝ্‌তে পারে না। এইজন্যে আমি গোড়া থেকে তা পরিত্যাগ করেছিলুম। আপনারা জানেন আমার ইংরেজীর সম্বল অতি অল্প, আমি মুখে-মুখে বিপিন-বাবুর মত বক্তৃতা দিতে পারিনে। তবু আমাকে ইংরেজী বল্‌তে হয়েছে, ২।৩ জায়গায় বলেছি, যা পেরেছি, বলেছি। বল্‌তে বল্‌তে একটা কথা মনে হ'ল, শুনে' আপনাদের অনেকে খুসী হবেন, সেখানেও আমাকে আক্রমণ করেছে। আপনারা ভাব্‌ছেন, এ-লোকটা বুঝি ভারি সম্মান পেয়েছে, সত্যই তা মিথ্যা কথা। নিছক সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সেখানেও এক-দল লোক আছে, তা'ও বলি তাদের দল খুব ভারী নয়, তা'রা বলে, "এ-লোকটি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করতে, আমরা এখন এই সমস্ত কথা, ভারতবর্ষের বাণী, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যা দিয়েছে, শুনতে পারিনে। তা'তে ক্ষতি হয়েছে, গায়ের জোর কমিয়ে দিয়েছে, হিংসা প্রভৃতি খর্ব্ব করেছে। এ লোকটি একে কবি, তা'তে ভারতবাসী, ও আমাদের মাথা খারাপ করতে পারে।" এই দল কম্যুনিষ্ট্ দল, তাদের অনেকে সোভিয়েট্ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছে। আমি যখন বক্তৃতা করতে গিয়েছি, তা'রা শ্রোতাদের নিকট ৫টি point দিলে, কেন তোমরা কবির বক্তৃতা শুনবে না—

(১) ইনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন
(২) Materialism (বস্তুবাদ)-এর উপর এঁ'র খুব অশ্রদ্ধা আছে
(৩) প্রাচীন সভ্যতার প্রতি এঁ'র সম্মান আছে
(৪।৫) এই-রকম কিছু যা আমার মনে পড়্‌ছে না

এই ৫ কারণে আমার বক্তৃতা কারো শোনা উচিত নয়। একটি কথা আপনাদের কাছে বল্‌ব, এরা কিম্বা আর যে-কোন বিরুদ্ধবাদী কেউ থাকুক না, আমাকে কেউ অসম্মান-সূচক কিছু বলেনি, personality নিয়ে কিছু বলেনি। বরাবর বলেছে, 'আমরা এঁ'কে অপমান করতে চাই-নে, ওঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে'। আতিথ্যের বিরোধী কোন কাজ তা'রা করেনি, ভদ্রতা রক্ষা করেছে। তা'রা বলেছে, এতে তাদের ক্ষতি হবে। ব্যক্তিগত-ভাবে আমার প্রতি তাদের কোন বিরোধ নেই, যদিও বক্তৃতার ফলাফল লক্ষ্য করে' তা'রা বিচলিত হয়েছে। কটু কথা বলেনি, চিরাচরিত হৃদ্যতা বিস্মৃত হয়নি। সুতরাং বহু-যুগের যে-সাধনা সেইটেই সর্ব্বগত,—চীন-জাপানে তা দেখেছি। মানুষের যে আদিম প্রবৃত্তি, তা'কে যে সংযত করতে পেরেছে, তার নাম সভ্যতা। বহু যুগের এই সাধনা চীনের সব ব্যাপারে দেখেছি। আজকালকার প্রধান কথা উন্নতি। তা অন্য-রকমে হ'তে পারে। রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলে, অধিকাংশের মতে এটা উন্নতি, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ তা'কে সুন্দর করবার জন্য যে-শিক্ষা, যে-সাধনা, তা'তে সভ্যতা গড়ে' ওঠে। এর যে-রকম পরিচয় দেখা যায় প্রাচীন জাতিদের মধ্যে, এমন

অতি অল্প জায়গায় দেখা যায়। চীনের একটা জায়গার নাম সাংসি, তার গবর্ণর একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করে' পাঠালেন। তাঁর কাছে গিয়েছি। তিনি আমাদের সমস্ত শুন্‌লেন, আমাদের আদর্শের কথা শুনে' আনন্দ লাভ কর্‌লেন, তাঁকে বল্‌লুম আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা কর্‌তে চাই। তিনি বল্‌লেন, "কি করব বলুন"। আমি বল্‌লুম, আমি জ্ঞানের দিক্ থেকে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হ'তে চাই। ভারতবর্ষের বিদ্যা চীন-ভাষায় প্রচ্ছন্ন আছে, সে-বিদ্যাকে উদ্ধার কর্‌তে হ'লে আমাদের দেশের সাধকদের যেমন এখানে আসা দর্‌কার, তেম্‌নি আপনাদের দেশ থেকে ভারতবর্ষে গিয়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে, পরস্পরের জানা-শোনার প্রয়োজন আছে।
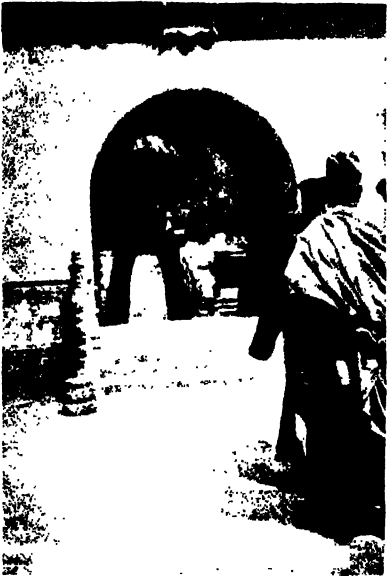
নিষিদ্ধপুরীর (পিকিঙ) রাজপ্রাসাদের একটি দরজা।
ভিতরে অপর একটি প্রবেশপথ দেখা যাইতেছে। প্রবাদ যে নব-বিবাহিত দম্পতীরা এই পথ দিয়া গমন করিলে সুখী হয়।

আমি সে-সম্বন্ধে অনেককে বলেছি, অনেকে প্রস্তুত হয়েছে, ছাত্র আসবে, আমি তাদের আহ্বান করেছি, তা'রা প্রতিশ্রুত হয়েছে, স্বীকার করেছে আস্‌বে। আমি বল্‌ছি, আমি একা গৃহ-কর্ত্তা নই, এ-অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলের হাত আছে। এই যে অতিথি ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা কর্‌তে আসবে, আপনাদের সেবা তাদের জন্য দাবি করব, স্বীকার না করলে না করবেন, দাবি করব। যাক, এটা অবান্তর কথা। আমি তাঁকে বল্‌লুম "আপনার কাছে একটা প্রার্থনা এই যে, আপনাদের এখানে পল্লীবাসীদের মধ্যে আমাদের পল্লীবাসী এসে কিছুকাল যাপন করবে, থাক্‌বে, কাজ দেখাবে। যারা পণ্ডিত নয়, ধনী নয়, জ্ঞানী নয়, সাধারণ পল্লীবাসী কৃষিজীবী, এমন লোক আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের গ্রামে কাজ করবে,—আপনাদের সঙ্গে এই বিনিময় চাই"। তিনি খুসী হলেন, বল্‌লেন খুব বড় কথা। একখণ্ড জমি দেখালেন, সুন্দর জায়গা, সেখানে আশ্রম করবেন, চীনের লোকেরা এখানে কাজ করবে, এবং আমাদের পল্লীবাসী যারা যাবে তা'রাও কাজ করবে। আমার মনে হয় এভাবে অন্তরের যোগ যদি সাধিত হয়, প্রকৃত মিলন হবে, ঘনিষ্ঠতা-দ্বারা উভয় জাতির মিলনের পথে সফলতা লাভ করব। এ হচ্ছে আমার কাজ। আমি বার-বার আবার বল্‌ছি, আপনারা ভুল করবেন না। প্যান্-এসিয়াটিক্ মিলনের দুঃস্বপ্ন আমি দেখিনে, ওটা নাইট মেয়ার, প্যান্-শব্দকে আমি ভয় করি, এটা অবাস্তব কথা, তা'তে সত্যিকার মিলন হবে না। সত্যিকার ইউনিট হ'লে এর একটা অর্থ আছে, কিন্তু দড়ির যোগ নিরর্থক। যন্ত্র-দ্বারা জোর করে' মিলন কেবল নিরর্থক তা নয়, তা'তে ক্ষতি আছে। যেমন দুজন মানুষকে এক শরীর বলা চলে, অভেদ আত্মাও বলা যায়। আমি অভেদ আত্মা বল্‌ছি,চীন আর ভারতবর্ষ অভেদ আত্মা। অভেদ শরীর বল্‌লে ইম্পিরিয়া-লিজ্‌ম্‌কে, দেহকে, ভিত্তি করা হবে। সেটা সর্ব্বনাশের কথা, সেখানে দুইটি হৃৎপিণ্ডের এক হৃৎপিণ্ড কাজ করে না। যারা তা করায় তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ-কথা তাদের (চীনেদের) সঙ্গে হয়েছে। চীনবাসীরা আমাকে বার-বার বলেছে, আপনাদের সঙ্গে আমরা মিল্‌ব, হৃদয়ের মিলন হবে, আমাদের পূর্ব্বাপর যে-মিলন আছে, ধর্ম্মগত ঐক্য আছে, সেটাকে সঞ্জীবিত করব। পোলিটিক্যাল্ শক্তি লাভ কর্‌বার জন্যে বল্‌ছিনে,

রবীন্দ্রনাথ ও চীনদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত লিয়াং-চি-চাও

তা'তে আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি মানুষকে মানুষ বলে' ভালোবাসো, সে-ভালোবাসা যদি তোমাতে-আমাতে হয়, তবেই যথার্থ মিলন হবে, এ-ভালোবাসা ভারতবর্ষ বেসেছে, নিরাসক্তভাবে ভালোবেসেছে এবং তার পূর্ণ ফল লাভ করেছে, স্বার্থ থাক্‌লে ফল হবে না। যদি হয়, সে বিকৃত ফল হবে। আমি তা করিনি। এ-কথা শুনে' হয়ত কেউ-কেউ দুঃখিত হবেন, কিন্তু এর মধ্যে ভালো কথা এই, ফল পেয়েছি। একথা নিজ মুখে বল্‌তে বাধ্য হয়েছি। রাস্তা প্রস্তুত হয়েছে, তা'রা কাছে আস্‌বে,—ধাক্কা দিয়ে না তাড়ালে, দরজা বন্ধ না করলে, যদি না বলো, 'তোমাদের জন্য মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, এখানে তোমাদের স্থান নেই'। ওরা এসেছে, বড় আত্মীয়ভাবে এসেছে, সৈন্য হ'য়ে আসেনি, বণিক্ হ'য়ে আসেনি, মিশনারী-ভাবে আসেনি। আমাদের মানসিক উন্নতি ওদের দ্বারা হবে না তা নয়, ওদের অনেক জিনিষ দেবার আছে। আমাদেরও অনেক জিনিষ দেবার আছে, পরস্পরের এই আদান-প্রদানের ভিতর মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধ রয়েছে। এই সত্য সম্বন্ধ, ইণ্টার্‌ডিপেণ্ডেন্স্—এ-সম্বন্ধ চীন-জাপানের সঙ্গে আমাদের হবে। পারসিয়া, মেসপটেমিয়া, প্যালেষ্টাইনে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, আশা করি, সেখানেও তাই হবে। মানুষের পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি, তাই ভারতবর্ষের সম্পদ্, ভেদ-বুদ্ধি একটা সাময়িক বিকার, পরস্পরকে নিয়ে আমরা শক্তিমান্। ভাই ভাইকে

পিকিঙের বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ মিঃ লিয়াং-সু-মিং

যেমন বলে, আমরা তেমনি বলব। তোমাকে ভালবাসি, না বাসলে মনুষ্যত্ব ব্যর্থ। তা বললে, সব বলা হবে।

তার পর জাপানে গিয়েছি, সেখানে যা দেখেছি,চিন্তার বিষয়, আশার বিষয়ও আছে, ব্যাখ্যা করবার জিনিষ আছে। কিন্তু আজকে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করতে চাইনে। আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মনোরম করে'বললাম, মনে হচ্ছে না। আপনারা কষ্ট করে' এই গরমের মধ্যে এসেছেন, তা'তে আবার পাখা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। আপনাদের দুঃখ বাড়াতে চাইনে। জাপানে গিয়ে অন্তরে যে আনন্দ লাভ করেছি, তা'তে বহুদিনের একটা আশা মনে উদিত হয়েছে,সে কখনও ভুলব না। আমি,বোধ হয়,ঠিক জায়গা দেখতে পেয়েছি। ভারতবর্ষ চিরদিন এসিয়ার অন্তরের বাণীকে প্রচার করেছে, সেই তার মিশন। আমরা সেই বাণীর অনেক ব্যাঘাত করেছি, কিন্তু তার পথ প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে, আমাদের গুণে নয়, পূর্ব্বপুরুষদের তপস্যার, যেমন ভগীরথ গঙ্গা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সে গঙ্গার ধারা এখন যেমন স্থান পরিবর্ত্তন করে' প্রশস্ততর হ'য়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তেমনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পুণ্যে চীন-ভারতবর্ষে একান্ত আত্মীয়তার যে-পথ সে-পথ প্রশস্ত আছে। কিছু-কিছু লুপ্ত হয়েছে,সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। তা এখনো লুপ্ত হয়নি,— ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় কর্ত্তব্য, এসিয়ার শ্রেষ্ঠ বাণীকে এসিয়ার কণ্ঠে ঘোষণা করা। ভারতবর্ষ সে-কর্ত্তব্য করবে। প্রাচীন কাল থেকে নানা বাক্যে অমর ছন্দে সে তা ঘোষণা করে' এসেছে। সে-বাণী আবার ঘোষণা করবার সাহস যেন আমাদের থাকে, যেন তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে। রাষ্ট্রীয়-শক্তি, ধনশক্তি প্রভৃতি কোন শক্তির চেয়ে তা ন্যূন নয়, এটা সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। পূর্ব্ব-পিতামহদের কাছ থেকে তা পেয়েছি, সে অমর-বাণী ভারতবর্ষকে চিরজীবী করে রেখেছে। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গর্ব্ব চলে' গেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইয়াংসি নদীর ধারে-ধারে অসংখ্য ব্যাকুল হৃদয় বুদ্ধদেবকে ধ্যান করে' শান্তি পাচ্ছে। দেখেছি বটে জাপান ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, কিন্তু তার পল্লীতে-পল্লীতে মন্দিরে-মন্দিরে বুদ্ধদেবের বাণী শঙ্খঘণ্টায় ধ্বনিত হ'য়ে, পুরোহিতকণ্ঠে মিলিত হ'য়ে, আকাশকে, বাতাসকে পবিত্র করে', আজ পর্য্যন্ত হৃদয়-ভূমিকে, চিত্ত-ভূমিকে উর্ব্বর করে' রেখেছে। এই বুদ্ধদেবের বাণী তাদের সমস্ত শক্তি বীর্য্য ও সম্পদের মূল কারণ। এরা যে-বুদ্ধবিগ্রহ করেছে, তার পিছনে আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। তা'রা শতমুখে স্বীকার করেছে জাপানের লোক ভারতবর্ষের কাছে চিরঋণে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ পর-পদানত, তার ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব বিলুপ্ত। সেই ভারতবর্ষের কাছে গর্ব্বোদ্ধত জাপান বলছে "আমাদের যা কিছু কীর্ত্তি, সফলতা—সমস্তের পিছনে যে-শক্তি রয়েছে, সে-শক্তি একদিন ভারতবর্ষ থেকে এসেছে'। দৈনন্দিন কাজের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যাপারে তা'রা বলছে,'এ-সমস্ত আমরা শিক্ষা করেছি,তোমার দেশ থেকে, বুদ্ধধর্ম্মের কাছ থেকে'। ভক্তিতে যার বিকাশ, জ্ঞানে যা উজ্জ্বল সেই বৌদ্ধধর্ম্ম তাদের অন্তরে-অন্তরে কাজ করছে। একটি গল্প বললে বুঝতে পারবেন, সে-গল্প এক সামান্য লোকের কাছে শুনেছি। তিনি ধনী বটে,ইউরোপীয় ভাষা পড়েননি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা হয়ত তিনি জানেন না। তিনি ইচ্ছা করেছেন, চাষ-বাস করবেন, পল্লীতে গিয়ে পল্লীবাসীদের মত কৃষিকার্য্য করে' পল্লীজীবন পল্লীতে সাধন করবেন। এইজন্য একখানি জমি কিনেছেন। তিনি যা বললেন, অত বড় কথা অল্পই শুনেছি। তিনি বললেন আমরা বুদ্ধদেবের কাছ থেকে মস্ত জিনিষ পেয়েছি, আমাদের মস্ত শিক্ষা এই হয়েছে—যদি কিছু পেতে হয়, বিশ্ব থেকে লাভ করতে হয়, সেটা প্রেমের দ্বারা হবে অর্থাৎ প্রেম হচ্ছে law, not a subjective state of mind. কি-রকম? দৃষ্টান্ত দিলেন, যেমন জমি—আমি জমি থেকে ফসল আদায় করছি, আমি জানি, আমি যদি জমিকে ভালোবাসি, সে বেশি দেবে। এই যে জমিকে ভালোবাসার কথা কল্পনা করতে পারি,জমিকে ভালোবাসা যায়,এ-কথা তোমাদের কাছে শিখেছি। ভালোবাসা হচ্ছে পাবার উপায়' এ-কথা আর কেউ বলতে পারেনি। মেরে-ধরে' দস্যুবৃত্তি করে' যে পেলুম, সে শুধু নিজকে ভোলালুম, এটা মৃত্যু। আমি যদি জমিকে ভালোবাসি, জমি আমাকে বেশি দেবে। একথা শুনে মনে কি আনন্দ হ'ল! আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়,কর্ম্মের রাজ্যে এমন কথা এত গভীর করে' যে বলতে পারে, কতখানি সে পেয়েছে। চাষ করতে গেলে ভালোবাসতে হয়, ধনী হ'তে গেলে ভালোবাসতে হয় যে বলতে পারে সে

কুমারী লিন্ ও রবীন্দ্রনাথ

কতখানি বলেছে, কতখানি বুঝেছে! এটা দেখে' আমি বুঝ্‌তে পারলুম বৌদ্ধধর্মের একেবারে মৃত্যু হয়নি।

জাপানে এই যে একটি দৃশ্য দেখ্‌লুম, হৃদয় পুলকিত হ'ল, জাপান আজ বার-বার বল্‌ছে—ভুল করেছি, সত্যকে দেখ্‌তে পাইনি। বল্‌ছে ভারতবর্ষ যদি না আসে, কেউ চীন-জাপানকে সত্য দান করতে পারবে না,তা'রা বার-বার ভুল করবে,মুগ্ধ হবে পশ্চিমের বিজ্ঞানে। তাই চীন বল্‌ছে, ভারতবর্ষ, তুমি এস। আমাদের একটি চীনের বন্ধু, পরম পণ্ডিত, বক্তৃতায় বলেছেন—চীন তুমি ভুলেছ, ভারতবর্ষের সংস্পর্শ আমি তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিই, কেননা সেখান থেকে কবি এসেছেন, তাঁকে তোমরা চিনবে না, ভালো করে' গ্রহণ করতে পারবে না, যদি স্মরণ করিয়ে না দিই, ভারতবর্ষ তোমাদের কি দিয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে নানা প্রমাণ-সহযোগে তিনি দেখিয়েছেন সাহিত্যে, কাব্যে, বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে কত বিষয়ে ভারতবর্ষের কাছে চীনেরা ঋণী। শাস্ত্র থেকে স্মরণ করিয়ে দিলেও মানুষ সাড়া দেয় না। আবার সময় কি হয়নি, আমরা পূর্ব্ব-পুরুষদের মহত্ত্ব স্মরণ করব, মৈত্রী দিয়ে তাদের সে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়ে দেবো। তাদের বলেছি, যে-ভারতবর্ষ তোমরা জানো, সে আজ ইংরেজের কবলিত, সে-ভারতবর্ষ আর নেই তোমরা যে-ভারতবর্ষে গিয়েছ সে আর নেই। এ-কথা কি আমরা কেউ বলতে পারব না যে আমরা সেই আইডিয়াল্‌ ভারতবর্ষের লোক, ভূগোলের ভারতবর্ষের নয়। ভারতবর্ষের লোক শিখেরা তা বল্‌তে পারলে না। আমরা কেউ কি তা পারব না? সে-ভারতবর্ষ মরেছে, একথা বল্‌তে পারিনে,আমার বিশ্বাস—ওদেরও বিশ্বাস, সে-ভারতবর্ষ সজীব রয়েছে, সে আবার তার লুপ্ত সম্পদ্‌ ফিরে' পাবে। তা'রা বলেছে আমরা যাবো, তোমাদের মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে' তোমাদের ধর্ম্ম-সম্পদ্‌ আবার দাবি করব। মন্দিরের দরজা থেকে তাড়া খেয়ে অপমানিত হ'য়ে ফিরে' আস্‌তে হবে, এ-কথা এখনো তা'রা জানে না। তা'রা আমাদেরকে মন্দিরের ভিতর নিয়ে অভ্যর্থনা করেছে, বলেছে তোমাদের মন্দিরে আমরা যাবো, গিয়ে দেখ্‌ব তোমরা কি সঞ্চয় করে' রেখেছ। তাদের অভ্যর্থনা পেয়ে কুণ্ঠিত হয়েছি, মাথা হেঁট করেছি, কি করে' বল্‌ব—ভারতবর্ষের দেবতা যেখানে সেখানে বাইরের লোকের স্থান নেই। দেবতাকে অত জা'ত বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়, তা'রা তা জানে না। এইসমস্ত ভাব্‌বার কথা। ভাবনার সময় কি হয়নি? আমি আপনাদের একান্ত মিনতি করে' জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি মনে করেন। ভারতবর্ষের গৌরব চিরকাল এ-রকম প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাক্‌বে? আমি বলি, না—রাষ্ট্রীয় শক্তিতে আমরা দুর্ব্বল হ'য়ে থাকি, কি আমাদের দারিদ্র্য চিরন্তন হোক, কিন্তু যে-সম্পদ্‌ অন্তরের, যা নিজ প্রয়োজনের অতীত, যা সমস্ত দেশের যথার্থ ঐশ্বর্য্য, সব দেশে সব কালের সব জায়গায় যে-সম্পদ্‌, তাই নিয়ে ভারতবর্ষ গৌরব করেছে। আর কি সে-গৌরব ফিরে' আস্‌বে না, আর কি বল্‌তে পারব না, তোমরা মন্দিরে ঢুকতে পারবে, মৃত্যুর ভাণ্ড যেখানে অমৃতের ভাণ্ডও সেখানে আছে? একথা বল্‌বার কি সময় হয়নি? আমরা কি বল্‌ব না, আমাদের মাতার ভাণ্ডারে যে অন্ন আছে, তা আমরা পরিবেষণ করব—তোমরা এস, এস।

[চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া (পুনশ্চ)]—একটা খবর দিতে ভুলে' গিয়েছি। চীন দেশে এবার আমার জন্মদিন পড়েছে, সেখানে তা'রা আমার জন্মোৎসব করেছে,করে' আমাকে নূতন নাম দিয়েছে, বলেছে, তুমি চীনে জন্মেছ, তোমার নূতন নাম-করণ হওয়া চাই। তা'রা যে-নাম দিয়েছে তার উচ্চারণটা চৈনিক-রকমের—চৌচিংতাং। চৌ মানে প্রভাতের রবি, চিং মানে ইন্দ্র-বজ্র, তাং মানে সূর্য্য। আমি এই নামের উপযুক্ত নই। যে-দিন এই নাম দিয়েছে, সেদিন তা'রা বিশেষ উৎসব করেছে,শিশুকে যেমন নববস্ত্র পরায়, আমাকেও সেরূপ করেছে, আমি সে-কাপড়ে নিজেকে আচ্ছন্ন করে' এসেছি, সেটা ভিতরে আছে (অতঃপর রবীন্দ্রনাথ গাঢ় নীল রঙের অন্তরাবরণ ও তাহার উপর হল্‌দে রঙের জোব্বার পোষাক খুলিয়া উপস্থিত সকলকে দেখান)। চীন-শিশুরূপে আমাকে তা'রা এইটে দিয়েছে। ক্ষুদ্র শিশুরা যেমন পায়, তাই পেয়েছি। শিশুর খাদ্য-পানীয়ও আমি পেয়েছিলুম।

ওদের দেশে একটা জিনিষ আছে ভাব্‌বার বিষয়। প্রাকৃতিক ব্যাপারের জিনিষে তা'রা ধর্ম্মনৈতিক ভাব আরোপ করে, যেমন বাঁশগাছকে তা'রা শ্রদ্ধা করে, তার ঋজুতা, বিচিত্র কর্ম্মে প্রয়োজনীয়তা, এ-সকল বিশেষণ প্রাকৃতিক ব্যাপার হ'তে নিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আরোপ করে, তেম্‌নি কোন-কোন গাছে তা'রা বড় ধর্ম্ম আরোপ করে, তা'কে ধর্ম্মের প্রতীকরূপ মনে করে। ছেলেদের জন্মকালে বলে, এ-ছেলে পাইন-গাছের মত চিরজীবী হোক, পাইন-গাছের মত ঊর্দ্ধ আকাশে তার যশঃপ্রভা বিস্তৃত হোক। তার ভিতর ধর্ম্ম-বুদ্ধি আরোপ করে' তার প্রতীক তৈয়ার করেছে, সে-রকম ছবি তৈয়ার করেছে, আমাকেও দিয়েছে। আমি চিরজীবী হব, ভালো হব, দেশে আমার প্রতিষ্ঠা হবে, এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করবার জন্যে কত নৃত্য, গীত, বাদ্য আনন্দ-উৎসব করেছিল, তা'তে মেয়েরাও এসেছিলেন।

এম্‌নি করে' চীনে আমার নামকরণ হয়েছিল। আমার বল্‌বার কথা এই যে, দৈবক্রমে একটা নামকরণ হয়েছে, তার অর্থ সূর্য্য। সূর্য্যের প্রতিদিন নবজন্ম হয় যখন এক প্রভাত শেষ হ'য়ে যায় আর-এক প্রভাতে সূর্য্যদেব জন্ম গ্রহণ করে। আমিও যেন সে-রকম ভিতরে-ভিতরে দেশে-বিদেশে নবভাবে জন্ম লাভ করতে পারি। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে' যদি নব-নব জীবন লাভ করতে পারি, তা হ'লে আমার নূতন নাম সার্থক হবে, জীবন ধন্য হবে।*

* পূর্ব্ব-এসিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে বিগত ৪ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর অনুলেখনের সংশোধিত সংস্করণ।

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৩৩]

ভাদ্র মাসের শেষ। সকালে এক-পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর অব্যাহত-সূর্য্য-কিরণে কলিকাতার পথ-ঘাট, অট্টালিকা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, কেহ যেন পূর্ব্ব-গগন হইতে এই সৌধ-সঙ্কুল বিরাট্ নগরীর গাত্রে পিচ্কারী ছাড়িয়া তাহার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আলোক-প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেছে। আকাশ ধূলিশূন্য, ঘন-নীল। সেই নির্ম্মল নীলিমার তলদেশে শুভ্র, জল-হারা, লঘু মেঘ-খণ্ডের শ্রেণী নির্বাধ দ্রুত গতিতে পরস্পরকে অনুধাবন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষ-লতায়—সর্ব্বত্র—শরতের স্নিগ্ধতা সুপরিস্ফুট।

মাসাধিক-কাল অবিরাম জ্বর-ভোগ করিয়া কয়েক-দিন হইল তারাসুন্দরী সারিয়া উঠিয়াছেন। শরীর এখনও অতিশয় দুর্ব্বল, মাধবী কোন-রূপে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে বারাণ্ডায় রৌদ্রের কাছে বসাইয়া দিয়াছে।

বসিয়া-বসিয়া তারাসুন্দরী সুরেশ্বরের কথা ভাবিতেছিলেন। মাঘ মাসে সে জেলে গিয়াছে, আর এখন ভাদ্র মাস। এই দীর্ঘ সাঁত মাস তিনি পুত্র মুখ-দর্শনে বঞ্চিত, তাহার পর এখনও পাঁচ মাস বাকি! সুরেশ্বরের কথা ভাবিতে-ভাবিতে তারাসুন্দরীর চক্ষে অশ্রু দেখা দিল; পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তাহা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন।

দেহ যখন সুস্থ ছিল, মনও তখন সবল ছিল; তাই তখন অদর্শন-জনিত ব্যথা সহ্য করিবার ক্ষমতার অভাব ছিল না। এখন সুরেশ্বরের কথা মনে পড়েও সর্ব্বদাই এবং মনে পড়িলেই হৃদয়ের মধ্যে একটা অস্থিরতা উপস্থিত হয়! অসুখের সময়ে শয্যা-প্রান্তে মাধবীর পার্শ্বে বিমানকে দেখিলেই সুরেশ্বরের কথা তারাসুন্দরীর মনে পড়িত, আর মনে হইত সুরেশ্বর যদি সে-সময়ে তথায় থাকিত! বিমানবিহারীর পরিবর্ত্তে সুরেশ্বর থাকিলে সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা যে বেশী-কিছু হইত তাহা নহে, কার্য্যতঃ সুরেশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য কোন ক্ষতিই হয় নাই; তথাচ বিমানবিহারীর নিরন্তর সেবা এবং ঐকান্তিক যত্নের অতিরিক্ত যে-জিনিসটুকুর জন্য তারাসুন্দরী ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন তাহার জোগান দিবার সাধ্য বিমানবিহারীর ছিল না।

বিমানবিহারীর মধ্যে এই অভাব অনুভব করিয়া তারাসুন্দরী মনে-মনে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বিবেচিত করিতেন। পুত্রের সমান আচরণ যে করিতেছে সে তথাপি পুত্র নয়, এই চেতনার মধ্যে অকৃতজ্ঞতার মতই একটা-কিছু অন্যায় আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত।

"মা!"

"কি বাবা!"

তারাসুন্দরী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন বিমানবিহারী হাসিতে-হাসিতে তাঁহার দিকে আসিতেছে।

"এস বাবা, এস! আমার কাছে এই গাল্‌চেতেই বোসো।"

গালিচার এক-প্রান্তে উপবেশন করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "আজ তুমি অন্ন-পথ্য কর্‌বে, তাই দেখ্‌তে এলাম কি-রকম পথ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে।"

ঘনিষ্ঠতার পর কিছুদিন হইতে বিমানবিহারী তারাসুন্দরীকে এবং মাধবীকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে।

তারাসুন্দরী স্মিতমুখে কহিলেন, "এমন একটা অকেজো প্রাণীর ওপর এত যত্ন কেন, বাবা? আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে' ত সারিয়ে তুললে, আবার খাইয়ে-দাইয়ে দু-দিনেই তা'কে তাজা করে' তুলতে হবে?"

বিমানবিহারী বলিল, "যত্ন শুধু তোমারই জন্যে করিনে মা, নিজের স্বার্থেও করি। জান ত, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে-মেঘও দেখ্‌লে চম্‌কায়! ছেলেবেলায় অজ্ঞানে যে-জিনিস হারিয়েছি, এত-বয়সে সে-জিনিস আবার পেয়ে

একটু বেশী-রকম সাবধান হওয়াই ভাল।" বলিয়া বিমান মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিমান হাসিতে লাগিল, কিন্তু তারাসুন্দরীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল! বলিলেন, "তাই মনে হয় বিমান, তোমাকে যদি পেটেও ধরতাম তা হ'লে আমার আর কোনো আক্ষেপ থাক্‌ত না! তুমি যে সুরেশ্বরের সহোদর নও, এই-টুকুই আমার দুঃখ, তা ছাড়া আর কোনো দুঃখ নেই!"

এ-কথাতেও বিমান হাসিতে লাগিল; বলিল, "আমার কিন্তু কোনো দুঃখই নেই মা! যার কথা মনে হ'লেই আমার তোমাকে মনে পড়ে। তোমার মধ্যে কোনো অভাবই আমি দেখ্‌তে পাইনে।"

এ-কথার উত্তরে কোন কথা না বলিয়া তারাসুন্দরী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

"আমি একা আসিনি মা; আমার সঙ্গে সুমিত্রা আর বউদিদিও এসেছেন।"

সুরমা ও সুমিত্রার আগমনের কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"কই?—কোথায় তা'রা?"

বিমানবিহারী বলিল, "তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাঁরা নীচে মাধবীর কাছে আছেন, এখনি ওপরে আস্‌বেন।"

তারাসুন্দরীর অসুখের সময়ে সুমিত্রা, প্রমদাচরণের সহিত তিন-চার বার এবং জয়ন্তীর সহিত একবার, এবং সুরমা ও বিমানবিহারীর সহিত কয়েকবার, তারাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছিল। আজ রবিবার, কাছারীর তাড়া নাই, তাই বিমানবিহারী সুরমার সহিত মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে সুমিত্রাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে লইয়া সকালেই তারাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছে। আসিবার সময়ে পথে বাজারের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া তাহারা তারাসুন্দরীর পথ্যের উপযোগী কয়েক-প্রকার তরকারী কিনিয়া লইয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে মাধবীর সহিত সুরমা ও সুমিত্রা উপরে আসিয়া তারাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিল। আশীর্বাদ করিয়া তারাসুন্দরী উভয়কে হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন এবং উভয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া সুমিষ্ট-স্বরে বলিলেন, "সকালে উঠে'ই এ চাঁদমুখগুলি দেখ্‌তে পাওয়া কম পুণ্যের কথা নয়!"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "তা'ই যদি পুণ্যের কথা হয় মা, তা হ'লে সকালে উঠে' তোমার পায়ের ধূলো পেয়ে এঁদের কিসের কথা হ'ল তা বল? যে-জিনিস এঁরা অর্জ্জন করলেন, সে-জিনিস তুমি অর্জ্জন করেছ বলে' এঁদের মুস্কিলে ফেলো না!"

সুরমা বলিল, "সত্যি কথা!" সুমিত্রা মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল।

তারাসুন্দরী ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা নয় বিমান, তা নয়! স্নেহ-ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, এ-সব জিনিস সংসারে এমনই দুর্লভ, যে সত্যি-সত্যিই পুণ্যের জোর না থাক্‌লে তা পাওয়া যায় না! এই যে তুমি আমাকে তোমার মা করে' নিয়েচ তা তোমার পুণ্যে, না আমার পুণ্যে?"

বিমানবিহারী কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আমার পুণ্যে, আর তোমার দয়ায়!"

বিমানবিহারীর উত্তরে ও ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

মাধবী বলিল, "মা, তোমার পথ্যের জন্য বিমান-বাবু এক-ডালা তরকারী এনেছেন। যা এনেছেন তা'তে, দশ দিন তরকারী না কিন্‌লেও আমাদের অক্লেশে চলে' যায়! কাঁচকলা, ঢ্যাঁড়স, পলতা, পটোল, ওল, আরও কত কি!"

বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিল, "আর ডালা! 'প্রভৃতি' ইত্যাদি কথাগুলো ব্যবহার কর্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লে লোকে অন্ততঃ একটা জিনিস বাকি রেখে ব্যবহার করে। শুধু ডালাটি বাকি রেখে, 'কত কি' ব্যবহার করা তোমার উচিত হয়নি মাধবী!"

বিমানবিহারীর কথায় পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

মাধবী হাসিমুখে বলিল, "আচ্ছা, ডালাটা আনিয়ে তোমাকে আমি দেখাচ্ছি মা, শুধু ডালা বাকি রেখেছি, না আরও কিছু বাকি রেখেছি!" বলিয়া রেলিং-এর ধারে

গিয়া কানাইকে আহ্বান করিয়া বলিল, "কানাই, বিমান-বাবু যে তরকারী এনেছেন ডালা-সুদ্ধ ওপরে নিয়ে এস ত।'

ডালা অন্বেষণ করিয়া মাধবীর তালিকার অতিরিক্ত দুইটি জিনিস পাওয়া গেল,—ডুমুর এবং পাতিলেবু।

বিজয়োৎফুল্ল-মুখে মাধবী বলিল, "দেখুন আমারই জিত হয়েছে; আপনি বল্‌ছিলেন একটা কিছু বাকি রেখে 'ইত্যাদি' ব্যবহার করা চলে; তা হ'লে দুটো জিনিস বাকি রেখে 'কত কি' ব্যবহার করায় আমার কোন অন্যায়ই হয়নি!"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "হিসেব-মত তোমার জিত হ'লেও, সে-জিত হারের এত কাছাকাছি যে প্রকৃত পক্ষে তা হারই!"

কপট-রোষে মাধবী বলিল, "আর আপনার হার, জিতের এত কাছাকাছি যে প্রকৃত পক্ষে তা বোধ হয় জিতই?"

মাধবীর এই সবিদ্রূপ অথচ সযুক্তি প্রতিবাদে বিমান-বিহারী এবং তাহার সহিত অপর সকলেই হাসিয়া উঠিল।

তারাসুন্দরী দুর্ব্বল-হস্তে উঠাইয়া-উঠাইয়া তরকারীগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং কষ্ট করিয়া বিমানবিহারী সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া বারম্বার অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

সুরমা বলিল, "আমার হাতের রান্না খেতে যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে মা, আমি আপনার পথ্যটা রেঁধে দিয়ে যাই।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তোমার হাতের রান্না খেতে আমার বাধ্‌বে, সে-পাপ আমি বোধ হয় করিনি! তোমার হাতের রান্না খেতে আমার কোন আপত্তি নেই মা। কিন্তু কেন তুমি অনর্থক অত কষ্ট করবে? মাধবী দেবে এখন রেঁধে!"

মাধবী একটা নূতন প্রস্তাব আনিল। সে সাগ্রহে বলিল, "বেশ ত মা, সুরমা দিদি রাঁধুন আর আমি ওঁকে সাহায্য করি। তার পর এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে' ও-বেলা ওঁরা বাড়ী যাবেন!"

মাধবীর এ-প্রস্তাব তারাসুন্দরী সানন্দে অনুমোদন করিলেন এবং নিজে তিনি এই আনন্দের রন্ধন-ব্যাপারে কোনও সাহায্য করিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সুরমা একটু বিমূঢ় হইয়া বলিল, "না না, মাধবী, আজ আর অত হাঙ্গামা করে' কাজ নেই। মা'র রান্না রেঁধে দিয়ে আমরা চলে' যাব এখন। তা'তে তুমি মনে কোরো না যে আমাদের কোনো বিষয়ে কিছু অসুবিধে হবে।"

সুমিত্রা বলিল, "তা-ছাড়া, বাড়ীতে কোনও কথা বলে' আসাও হয়নি।"

মাধবী বলিল, "তার জন্যে কিছু আট্‌কাবে না; আমি কানাইকে দিয়ে এখনি দু-বাড়ীতেই খবর দিয়ে পাঠাচ্ছি।" তাহার পর বিমানবিহারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনি কিছু বল্‌ছেন না কেন, বিমান বাবু? আপনি মত দিন!"

বিমান মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার মতের জন্যে যদি আট্‌কায়, তা হ'লে এখনি আমি মত দিচ্ছি। আমি নিজেই তোমাদের মতামতের অপেক্ষায় ছিলাম। তা-ছাড়া দু-বাড়ীতে খবর দেওয়ার ভারও আমি নিচ্ছি। দু-বাড়ীতে পাঁচ-ছটাক চাল অপচয় হ'তে দেওয়া হবে না, সে-কথা আমি তোমাদের কথা আরম্ভ হওয়া থেকেই মনে-মনে ভাব্‌ছি!"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "পাঁচ-ছটাক ত নয়, সাড়ে-সাত ছটাক। আপনাকেও এখানে খেতে হবে।"

বিমানবিহারী বলিল, "আমাকে মাপ কোরো মাধবী, আমার আজ একটু কাজ আছে। তা-ছাড়া, আমার মত দুর্ব্বৃত্ত লোককে ওলের সুক্তো আর পল্‌তার চচ্চড়ি খাইয়ে তোমাদের কোনও পুণ্য হবে না!"

"তোমার ভয় নেই ঠাকুরপো, ও-দুটি অদ্ভুত তরকারী আমাদের মধ্যে কেউ রাঁধতে জানে না!" বলিয়া সুরমা হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারীও হাসিতে-হাসিতে বলিল, "যাই হোক্, ঐসব শাকসব্‌জী দিয়েই রাঁধ্‌বে ত? ও দিয়ে কোনো-রকমেই ভদ্রলোকের ভোগ তৈরী করা যায় না!"

মাধবী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "সে-জন্য ভদ্রলোকের কোনও ভাবনা নেই, জীব-জন্তুর ব্যবস্থাও থাকবে!"

কিন্তু জীব-জন্তুর প্রলোভনেও বিমানবিহারী বশীভূত হইল না; বলিল, "আমার খাওয়া আর-এক শুভদিনের অপেক্ষায় থাক্। সুরেশ্বর যেদিন বাড়ী আস্‌বে, সেদিন আমরা দু-জনে পাশাপাশি বসে' মার হাতের রান্না খাব।"

বিমানবিহারীর কথায় তারাসুন্দরীর চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল; বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জিত করিতে গিয়াই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সুমিত্রার চক্ষুর উপর, দেখিলেন সুমিত্রার দুটি চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া চক্‌চক্ করিতেছে। নতনেত্র হইয়া বিপন্না সুমিত্রা অশ্রুনিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মাধবীরও দৃষ্টি সে অতিক্রম করিতে পারিল না। পরক্ষণে তারাসুন্দরীর দিকে চাহিতেই মাধবী দেখিল যে তারাসুন্দরী তাহার প্রতি একাগ্র ঔৎসুক্যে চাহিয়া রহিয়াছেন।

এক-একটা শব্দে যেমন এক-একটা ভাবের রাজ্য খুলিয়া যায়, তেম্‌নি সুমিত্রার চক্ষে অশ্রু এবং মাধবীর চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া তারাসুন্দরী অকস্মাৎ অনেক কথা, যাহার আভাস পূর্ব্বে কখন-কখন সন্দেহ করিতেন, বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, এই আহত আর্ত্ত তরুণীটির মুখখানা নিজ বক্ষের মধ্যে একবার চাপিয়া ধরেন! সহানুভূতির নিবিড়তায় সুমিত্রার প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় স্নেহ-রসে তারাসুন্দরীর চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিমানবিহারী বলিল, "এখন আমি তা হ'লে চল্‌লাম বউদিদি, দুটো তিন্‌টের সময়ে এসে তোমাদের নিয়ে যাব।"

সুরমা বলিল, "আচ্ছা।"

বিমানবিহারী চলিয়া গেল, কিন্তু সুরেশ্বরের উল্লেখ করিয়া যে-কথা সে বলিয়া গেল, তাহাতে আহার করিবার জন্য তাহাকে পুনরায় অনুরোধ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি রহিল না।

[৩৪]

দ্বিপ্রহরে সুরমা তারাসুন্দরীর সহিত গল্প করিতেছিল, মাধবী সুমিত্রাকে লইয়া তাহার চর্‌কা-ঘরে প্রবেশ করিল।

যে কয়েকদিন সুমিত্রা এ-গৃহে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে একদিনও এঘরে প্রবেশ করিবার তাহার সুযোগ হয় নাই। আজ প্রবেশ করিয়া গৃহের ভিতরকার ব্যবস্থা এবং সজ্জা-সম্ভার দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। প্রবেশ-পথে চৌকাঠের মাথায় 'পড়ে' থাকা মিছে মরে' থাকা মিছে' লাল সূতা দিয়া লেখা, পূর্ব্বে কয়েকবারই বাহির হইতে সে দেখিয়াছিল, আজ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, কক্ষের অধিকারী এবং অধিকারিণী উভয়েই, সেই সূক্তটি অনুসরণ করিয়া পিছন হইতে কতটা আগে চলিয়া গিয়াছে! ঘরের ভিতর সেইরূপ আর-একটি সূক্তের উপর দৃষ্টি-পাত করিয়া সুমিত্রার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল :—'আবার তোরা মানুষ হ!'

গতিহারা হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সুমিত্রা মনে-মনে বলিতে লাগিল, "সত্যি! ওগো, সত্যি! আবার আমাদের মানুষ কর! তোমার আদর্শ দিয়ে, তোমার দৃষ্টান্ত দিয়ে, অমানুষের গণ্ডী থেকে আমাদের উদ্ধার করে' মনুষ্যত্বের মধ্যে নিয়ে যাও! দেশের অন্নে আর দেশের বস্ত্রে প্রতিপালিত হবার শক্তি আর সাহস আমাদের দাও।"

সুমিত্রার স্তব্ধ-নিবিড় ভাব নিরীক্ষণ করিয়া মাধবী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্‌ছ, সুমিত্রা?"

মাধবীর প্রশ্নে যোগভঙ্গ হইয়া লজ্জিতভাবে সুমিত্রা বলিল, "ভাব্‌ছি কতদিনে আবার আমরা মানুষ হব!"

মাধবী শান্ত-স্মিতমুখে বলিল, "এ-সমস্যার সমাধান দাদা ত করে' রেখেছেন। তোমার পিছনে ফিরে' দেখ!"

সকৌতূহলে পশ্চাতে ফিরিয়া সুমিত্রা দেখিল, দেওয়ালের মধ্যস্থলে বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'রাজপথ' এবং তাহার নিম্নে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দশজন দেশনায়কের চিত্র বিলম্বিত। তাহার নীচে পুনরায় বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুসরণ'।

বিমুগ্ধ-নির্ণিমেষ-নেত্রে সুমিত্রা ক্ষণকাল সেই মহাজন-সঙ্ঘের প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর যুক্তকরে নত-মস্তকে ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া পুনরায় গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল।

"আবার কি ভাব্‌ছ, সুমিত্রা?"

সুমিত্রা তদবস্থ থাকিয়াই বলিল, "ভাব্‌ছি, এঁদের অনেকেরই ত অনেক-রকম মত, তুমি অনুসরণ কর্‌বে কা'কে ?"

"মত অনেক নয় ভাই, মত একই ; পথ ভিন্ন। সে ভিন্ন-ভিন্ন পথ আবার কি-রকম ভিন্ন জান ?"

"কি-রকম ?" বলিয়া সুমিত্রা মাধবীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"কোনও রাজপথ দেখেছ ?"

"দেখেছি।"

"রাজপথের মাঝখানটা পাথর-বাঁধানো হয়, তার দু'ধারে কাঁচা পথ থাকে ; তার পরে দু'ধারে গাছের সারির তলায় ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটা পথ থাকে ; তার পর নালা-নর্দ্দামাও থাকে। এই এতগুলো ভিন্ন-ভিন্ন পথের যেটা ধরে'ই তুমি চল না কেন, সেই একই দিকে তুমি এগোবে। এঁদের বিষয়েও ঠিক সেই কথা খাটে। এঁদের মধ্যে যাঁকেই অনুসরণ কর না কেন, গতি তোমার একই দিকে অর্থাৎ নীচু থেকে ওপর দিকে হবে। দেশ ত এক-রকমে বড় হয় না ভাই, দশ রকমে দেশ বড় হয়। তুমি কাছে গিয়ে দেখ প্রত্যেক ছবির নীচে কি লেখা আছে, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবে।"

দেওয়ালের নিকটে গিয়া সুমিত্রা দেখিল মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের চিত্রের নীচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা রহিয়াছে 'ধর্ম্ম' ; এবং সেই চিত্রকে ঘেরিয়া অন্যান্য চিত্রের কোনটির তলায় 'কর্ম্ম', কোনটির তলায় 'মর্ম্ম', কোনটির তলায় 'মিলন', কোনটির তলায় 'জ্ঞান', কোনটির তলায় 'ত্যাগ' ; এইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন কথা লেখা রহিয়াছে।

মাধবী বলিল, "এক-একটি কথা দিয়ে দাদা প্রত্যেকের বিশেষ রূপ প্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা করেছেন। সকলের আগে ইনি হচ্ছেন ধর্ম্ম ! এঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে অহিংসা ; এঁর মতে অহিংসা যেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ধারণ কর্‌বে সেদিন থেকে আর মানুষের মধ্যে বিবাদ থাক্‌বে না।"

তাহার পর অপর একটি চিত্র উদ্দেশ করিয়া মাধবী বলিল, "ইনি হচ্ছেন কর্ম্ম ; আজীবন কর্ম্মের সাধনা করে' ইনি অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ইনি কর্ম্ম করেন বলে' এঁর কর্ম্মের শেষ হয় সফলতায়।"

"ইনি হচ্ছেন কবি, তাই মর্ম্ম। কল্পনা এঁর সহচরী, তার সাহায্যে ইনি বিশ্বের মর্ম্ম প্রকাশ করে' দেখেন ! "মাধুর্য্যের মধ্য দিয়ে ইনি নিখিল মানবের মিলন-প্রয়াসী।"

তৎপরে একজন মুসলমান মহাপুরুষের চিত্র নির্দ্দেশ করিয়া মাধবী বলিল, "ইনি হচ্ছেন মিলন, কারণ এঁকে আশ্রয় করে' গঙ্গা-যমুনার মত হিন্দু-মুসলমান মিলিত হবার উপক্রম করেছে।"

"ইনি হচ্ছেন জ্ঞান। বিদ্যা বুদ্ধি আর প্রতিভার বলে ইনি সিংহের মত শক্তিশালী, তাই লোকে সিংহের সঙ্গে এঁর তুলনা করে।"

"ইনি হচ্ছেন ত্যাগ। আজীবন ত্যাগের সঙ্গে চির-ব্রহ্মচর্য্যের যোগ থাকায় ইনি ঋষির স্থান অধিকার করেছেন।"

শুনিতে-শুনিতে সুমিত্রার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ! হর্ষোৎফুল্ল-মুখে সে বলিল, "কি সুন্দর ভাই ! আর, কি সুন্দর করে' তুমি বল্‌ছ ! কত তুমি জান, তাই এমন সুন্দর করে' বল্‌তে পার !"

হাসিমুখে মাধবী বলিল, "আমার স্মরণ-শক্তি যদি আরও ভাল হ'ত, তা হ'লে আরও ভাল করে' বল্‌তে পার্‌তাম। দাদার মুখে শুনে-শুনে' এ-সব আমার প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। দাদার বল্‌বার ধরণ এমন স্পষ্ট যে তাঁর মুখ থেকে কোন কথা একবার শুন্‌লে মনের মধ্যে তা একেবারে গেঁথে যায়। কেন, তুমিও ত—"

কথাটা শেষ না করিয়াই মাধবী থামিয়া গেল। যদিও সে যাহা বলিতে যাইতেছিল তাহার মধ্যে বিমানবিহারীর সহিত সুমিত্রার মিলনের পক্ষে প্রতিকূলতা কিছুই ছিল না, তথাপি, সুরেশ্বরের নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়াই, সে-কথাটুকু বলাও সে সমীচীন মনে করিল না।

সুমিত্রা কিন্তু মাধবীর অসমাপ্ত কথার সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া বলিল, "আমিও তাঁর কাছে অনেক কথা শুনেছি ; কিন্তু আমার বোধ হয় তেমন আগ্রহ নেই বলে' সব

কথা মনে থাকে না! আচ্ছা মাধবী, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুসরণ—এ-সব কি ঠিক পরে-পরে? ভক্তির চেয়েও কি প্রীতি বড়?"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! প্রীতির চেয়ে প্রবল জিনিষ, আর নেই। দাদা বলেন, কারুর উপর শ্রদ্ধা হ'লে লোকে দেখা হ'লে তার কাছে নত হয়, তার পর ভক্তি হ'লে দেখা করে' নত হয়, আর প্রীতি হ'লে তখন আর ছাড়্‌তে পারে না, পিছনে-পিছনে অনুসরণ করে' বেড়ায়।"

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে-ভাবিতে সুমিত্রা কতকটা নিজ-মনেই বলিল, "তা-ই ঠিক, তাই আমরা এত পেছিয়ে পড়ে' রয়েছি!" বলিয়াই মাধবীর দিকে চাহিয়া আরক্ত-মুখে বলিল, "আমি তোমার কথা বল্‌ছিনে ভাই, আমি আমার কথাই বল্‌ছি!"

আরক্ত হইবার গুরুতর কারণ যে এই কথাটারই মধ্যে ছিল তাহা কথাটা বলিবার পূর্ব্বে সুমিত্রা বুঝিতে পারে নাই। বলিবার পর সমগ্র কথাটার ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র তাহার কর্ণদ্বয় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া এবং অবস্থা বুঝিয়া একটা কথা মাধবীর ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু এবারও তাহার নিজেকে নিরোধ করিতে হইল। প্রতিশ্রুতি! প্রতিশ্রুতি! প্রতিশ্রুতির জন্য সুমিত্রার সহিত কথা কওয়া বিপদ্ হইল!

"মাধবী?"

"বল ভাই?"

"আমার মনে হচ্ছে মাধবী, আমি যেন কোনও তীর্থে এসেছি। তোমাদের বাড়ীটি যেন তীর্থ, আর তোমাদের এই ঘরটি যেন দেব-মন্দির। আর তুমি যেন পূজারী!"

দুই বাহু দিয়া সযত্নে সুমিত্রার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "তা ছাড়া আরও কিছু মনে হচ্ছে কি?"

প্রশ্ন করিয়াই কিন্তু মাধবী চমকিত হইয়া সুমিত্রার মুখখানা নিজ বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না ভাই! না ভাই! তোমার কোনও কথা বল্‌তে হবে না; আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো!" মনে মনে বলিল, 'দাদা, তুমিও আমাকে ক্ষমা কোরো! কিন্তু এ-ভাবে আমাকে বিপন্ন করে' যাওয়া তোমার উচিত হয়নি!'

মাধবীর বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সুমিত্রা বলিল, "তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তার জন্যে ক্ষমা চাইবার ত কোনও কারণ নেই, মাধবী। সত্যি-সত্যিই ত আমার অনেক কথাই মনে হচ্ছে!"

মাধবী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "তা ত হ'তেই পারে; কিন্তু এ-সব কথা আর থাক ভাই। এস তোমাকে আমার সুতোগুলো দেখাই।"

"আচ্ছা দেখাও, কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখি।"

"কি অনুরোধ, বল?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা বলিল, "আজ যাবার আগে তোমাদের এই ঘরটি আমাকে পরিষ্কার করে' দিতে দিয়ো, ভাই! শুধু ঘরের মেঝেটি, আর কিছু নয়।"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ আবার তোমার কি খেয়াল, সুমিত্রা?"

সুমিত্রা তেম্‌নি আরক্তমুখে বলিল, "খেয়াল নয় ভাই, সাধ! দেবে?"

এ-প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাধবী দেখিল, বারান্দায় দ্বারের সম্মুখে বিমানবিহারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "আরও কিছু পরে যদি তোমরা বাড়ী যেতে চাও, তা হ'লে এই পাড়াতেই একটা কাজ সেরে আমি আসি। তা'তে কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে।"

প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মাধবীই দিল; বলিল, "ঘণ্টা তিনেক দেরী হ'লে আরও ভাল হয়। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজ সেরে আসুন!"

বিমানবিহারী হাস্যমুখে বলিল, "বুঝ্‌তে পেরেছি,

দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে অনাবশ্যক বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছি! আচ্ছা আপাততঃ আমি চল্‌লাম; কিন্তু যাবার আগে একবার এই ঘরের ভিতরটা গিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। বাইরে থেকে খানিকটা দেখে-দেখে' বাকিটা দেখ্‌বার জন্যে আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে!" বলিয়া বিমান জুতা খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মাধবীর তরফ হইতে বিশেষ-কিছু আহ্বান বা আগ্রহ না পাইয়া জুতা খোলা বন্ধ রাখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও আপত্তি আছে নাকি?"

শান্ত স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "একটু আছে। খদ্দর ছাড়া অন্য কাপড় পরে' এ-ঘরে ঢোক্‌বার বিধি নেই। কিন্তু তার উপায় ত রয়েছে। দাদার একখানা ধোয়া কাপড় আপনাকে দেব?"

জুতা পরিতে-পরিতে হাস্যমুখে বিমান বলিল, "না, তা কাজ নেই; তা'তেও প্রকৃত পক্ষে তোমাদের বিধি লঙ্ঘিত হবে। রাজার পোষাক পর্‌লেই লোকে রাজা হয় না! আচ্ছা, আমি খানিকক্ষণ পরে আস্‌ব।" বলিয়া বিমানবিহারী প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জেলাসমূহ—বীরভূম

১৯২১ সালের মানুষগুন্‌তি অনুসারে বাংলাদেশের যে-সকল জেলার জন-সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে বীরভূম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা বাঁকুড়ায়, ১৯১১ হইতে ১৯২১ এই দশ বৎসরে, হাজার-করা ১০৪ জন লোক কমিয়াছে। সেই দশ বৎসরে বীরভূম জেলায় হাজার-করা ৯৪ জন লোক কমিয়াছে। সুতরাং বীরভূমের অবস্থা বাঁকুড়ার মত অতীব শোচনীয় না হইলেও ইহাও যে দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং ইহার অবনতির প্রকৃত কারণসমূহ নির্দ্ধারণ করিয়া উন্নতির উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

আয়তনে ও জন-সংখ্যায় বীরভূম বাংলার অনেক জেলা হইতে ক্ষুদ্র। ইহার আয়তন ১৭৫৩ বর্গমাইল মাত্র। ১৮৭২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে কয়বার মানুষ-গুন্‌তি হইয়াছে, তাহাতে এই জেলার জন-সংখ্যা নিম্নলিখিতমতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

১৮৭২———৮৫১২৩৫
১৮৮১———৭৯২০৩১
১৮৯১———৭৯৮২৫৪
১৯০১———৯০২২৮০
১৯১১———৯৩৫৬৬৫
১৯২১———৮৪৭৫৭০

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৭২ হইতে ১৮৮১ সালের মধ্যে জেলার জন-সংখ্যা কিছু কমিয়াছিল। তাহার পর হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত জন-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছিল। পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ৮৮০৯৫ জন লোক কমিয়া গিয়াছে।

প্রাকৃতিক গঠনে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বাঁকুড়া জেলার সহিত বীরভূমের খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। বীরভূমের পশ্চিম সীমানার অনতিদূরেই সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত-শ্রেণী অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব সীমানা হইতে ভাগীরথী নদীর ব্যবধান সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ মাইল মাত্র। পর্ব্বতশ্রেণী ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী এই ভূমিভাগ সাধারণতঃ বন্ধুর ও অসমতল। উচ্চ ভূমির অনেক অংশে খর্ব্বকায় শাল-গাছের জঙ্গল দেখা যায়। নিম্ন ভূমিসকল কৃষি-কার্য্যের উপযোগী; তাহার মধ্যদেশ দিয়া ময়ূরাক্ষী, হিঙ্গলা ও বক্রেশ্বর প্রভৃতি ছোট-ছোট নদীগুলি

পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত। কৃষি-কার্য্যের সুবিধার জন্য ও অনাবৃষ্টির সময়ে শস্যরক্ষা করিবার জন্য বাঁকুড়ার কৃষকগণ যে-উপায়ে জল-সেচনের ব্যবস্থা করে, বীরভূমেও তাহা দেখা যায়।

প্রাকৃতিক গঠন ও অবস্থার এইসকল সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও অন্য কয়েকটি কারণে অবস্থার অনৈক্য ঘটিয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগে ও ইংরেজ-শাসনের প্রারম্ভে ভাগীরথী নদীই আমাদের দেশে যাতায়াতের প্রধান পথ ছিল। তাহার পর ইষ্ট্-ইণ্ডিয়ান্-রেলপথ প্রস্তুত হওয়া অবধি, দেশের অন্যান্য অংশের সহিত এই জেলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় কোনও রেলপথ ছিল না। সুতরাং শিক্ষা ও ব্যবসায়ে এই জেলার লোক বাঁকুড়া-বাসী-অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

রেলপথ নির্ম্মাণ হওয়াতে যেমন বীরভূমের এই-সকল সুযোগ ঘটিয়াছে, তেম্‌নি ইহার দ্বারা জেলার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্-রেলপথের লুপ্ লাইন বীরভূম-জেলাকে সমান আকারে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভাগীরথীর সহিত সমান্তরাল-ভাবে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে উৎপন্ন যে-সকল নদী-নালা দিয়া এই জেলার জল ভাগীরথীতে নিকাশ হইত, তাহার সবগুলিই এই রেল-লাইনে আটক পড়িয়াছে। জল-নিকাশের পথ বন্ধ হইলে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ইহা প্রমাণ হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অংশে লোক-ক্ষয়ের হার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সদর মহকুমায় হাজার-করা ৭০ জন ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় হাজার-করা ১৬২ জন কমিয়াছে। বীরভূমের বিভিন্ন অংশে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। কেবলমাত্র জেলার উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী মুরারই থানায় হাজার-করা ১৫৬ জন লোক কমিয়াছে। অন্য সব অংশের অবস্থা প্রায় সমান।

এখানকার লোকের বসতি বাঁকুড়া অপেক্ষা ঘন। বাঁকুড়ায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৮ জন লোক বাস করে; বীরভূমে ৪৮৩ জন। জঙ্গল ও পার্ব্বত্য-ভূমি এখানে অনেক কম। অন্যান্য অংশ অপেক্ষা জেলার উত্তর-ভাগে নলহাটী ও মুরারই থানায় বসতি ঘন।

এই জেলায় গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৬০২ ইঞ্চি মাত্র। বাঁকুড়ায় বৃষ্টিপাত আরও কম, ৫৩·১১ ইঞ্চি। বাংলার অন্য জেলার তুলনায় এই বৃষ্টির পরিমাণ নিতান্ত কম। অধিকন্তু বর্ষার জল, অসমতল জমিতে পড়িয়া, অতি ক্ষণকালের মধ্যেই নদী-নালা দিয়া বাহির হইয়া যায়। এইপ্রকার ছোট ছোট জল স্রোতকে এখানকার লোকেরা "কাঁদড়" বলে, বাঁকুড়ার ন্যায় এখানেও কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমান সেন্সস্ রিপোর্টে টম্‌সন্ সাহেব যে-কয়েকটি জেলার ফসলের পরিমাণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বীরভূমের উল্লেখ নাই। সুতরাং এই জেলার ফসলের পরিমাণের সঠিক খবর এই রিপোর্টে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জেলা-সম্বন্ধে যাঁহার লেশমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই জানেন যে, এখানে প্রায় প্রতিবৎসর জলাভাবে অনেক শস্য নষ্ট হয়। ইহাই বীরভূম জেলার দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। কিন্তু এখানে বাঁকুড়া জেলার ন্যায় ভীষণ অন্নকষ্ট হয় না। ওয়্যালি সাহেব প্রণীত এই জেলার বৃত্তান্তে প্রকাশ যে, ১৮৭৪ ও ১৮৮৫ সালে এই জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। প্রথম দুর্ভিক্ষ অতিশয় ভয়ানক হইয়াছিল এবং ১৮৭২ সাল হইতে ১৮৮১ সালের মধ্যে যে এই জেলার জন-সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, এই দুর্ভিক্ষই তাহার কারণ। ১৮৮৫ সালের দুর্ভিক্ষে জেলার মধ্যে ২৫৮ বর্গমাইলে ১২৯০০০ লোক অভাবগ্রস্ত হইয়াছিল। সেই কারণে ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত জন-সংখ্যা অতি সামান্যই বাড়িয়াছিল। তাহার পর আর গবর্ণ্মেণ্টের স্বীকৃত দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে এই জেলার লোক-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, অণ্ডাল হইতে সাইথিয়া পর্য্যন্ত রেল-লাইন নির্ম্মিত হইবার অব্যবহিত পর হইতে ম্যালেরিয়া রোগের বৃদ্ধি হইয়াছে। বাংলা সরকারের ১৯১৯ সালের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বাংলার অপর সকল

জেলা অপেক্ষা বীরভূমেই ম্যালেরিয়া-জ্বরে মৃত্যুর হার বেশী। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ এই চার বৎসরের গড় ছিল হাজারে ৩৪·৭; এই কয় বৎসরে একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার মৃত্যুর হার ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল। পরবর্ত্তী ১৯১৯ সালে, বীরভূমের মৃত্যুর হার ৩৪·৭ হইতে বাড়িয়া ৫১·৭ হইয়াছিল।

১৮১৮-১৯ সালে বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এই রোগে কত লোক মরিয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদ জানা যায় না, কারণ অনেক স্থলে সাধারণ লোক ও গ্রাম্য চিকিৎসকগণ প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর জ্বর-রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর বৎসরে তাহার অতিরিক্ত যে-সকল মৃত্যু ঘটিয়াছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জাই যে তাহার কারণ, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হয় না। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্টেও সেই মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। ১৯১৮ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, বীরভূমে সাধারণতঃ হাজারে যত লোক মরে, ঐ বৎসরের শেষ ছয় মাসে তাহার অপেক্ষা আর ৫·৯ জন হারে বেশী মরিয়াছিল। ১৯১৯ সালের অবস্থা আরও ভয়ানক। ঐ বৎসরের প্রথম ছয় মাসে, হাজার-করা ১৪·৯ জন লোক বেশী মরিয়াছিল। সেই বৎসর অতিরিক্ত মৃত্যুর হার বাংলার অপর সব জেলা অপেক্ষা বীরভূমেই বেশী ছিল।

সাধারণ জ্বরই হউক বা ইনফ্লুয়েঞ্জাই হউক, উপযুক্ত খাদ্য এবং পরিধেয় বস্ত্র পাইলে এবং চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা থাকিলে যে ইহাদের মধ্যে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্য-বিভাগের পূর্ব্বোক্ত রিপোর্টে যে-সকল চিত্রাবলী আছে, তদ্দৃষ্টে বীরভূমের অবস্থা যে কত শোচনীয় হইয়াছে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যে-সকল জেলায় শিশুগণের মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, বীরভূম তাহাদের অন্যতম। ১৯১৯ সালে কলেরা-রোগে বাংলাদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৃত্যু হইয়াছিল দুইটি জেলায়—বীরভূম ও চব্বিশ পরগণা। কলেরায় মৃত্যু নিবারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা শিক্ষার-বিস্তার ও চিকিৎসার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। বসন্ত ও আমাশয়-রোগের প্রকোপ এখানে কিছু কম; কালাজ্বর ও যক্ষ্মারোগ এখনও তত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু আন্ত্রিক জ্বর ও নিউমোনিয়াতে বীরভূম প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কুষ্ঠ-রোগের প্রাদুর্ভাব এই জেলায় অত্যন্ত বেশী। বাঁকুড়ায় প্রতি লক্ষে ২৭০ জন লোক কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত। বীরভূমে ১৪৮ জন। বাংলার আর কোনও জেলায় এত কুষ্ঠী নাই। এই জেলার কোন্ থানায় প্রতি লক্ষে কত কুষ্ঠী, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

শিউড়ী	১২৭	আহম্মদপুর	৯৬
সাঁইথিয়া	১৩৯	নান্নুর	১২৮
মহম্মদবাজার	২৬৮	লাভপুর	১৩১
রাজনগর	৩৬৫	রামপুরহাট	১০৬
দুবরাজপুর	২৬৭	ময়ূরেশ্বর	১৭৭
খয়রাসোল	৩১২	নলহাটী	৭৪
শাহপুর	১৫৮	মুরারই	১০০
বোলপুর	৮৪	ইলামবাজার	৮০

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় কুষ্ঠ-রোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের সাধ্যাতীত। মানুষ-গুন্‌তির সময় যে-সকল লোক কুষ্ঠী বলিয়া পরিগণিত, প্রকৃত সংখ্যা বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কুষ্ঠ-রোগীর সংস্পর্শ হইতে সুস্থকায় ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং দরিদ্র সহায়হীন কুষ্ঠ-রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের উন্নতি প্রয়োজন। বীরভূমে এত অধিক কুষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও এখানে কুষ্ঠাশ্রম নাই। বাঁকুড়ায় যে আশ্রম আছে, তাহা খ্রীষ্টীয়ান্ মিশনারীগণের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত। ইহা আমাদের লজ্জার বিষয়, সন্দেহ নাই।

যে-জেলায় লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সেখানে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী হইবেই। বীরভূমেও তাহাই হইতেছে। ১৯১৯ সালের স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রচারিত রিপোর্টে জানা যায় যে, জন্মের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কমিয়াছিল বীরভূম জেলায় এবং এই জেলায় জন্ম ও মৃত্যুর হারের পার্থক্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী

হইয়াছিল। যত শিশুর জন্ম হয়, তাহারা সকলেই বাঁচিয়া থাকে না। উপরে লিখিয়াছি যে, শিশুর মৃত্যুর হার বীরভূমে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের প্রতি ১০০ বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অনুপাতে কতগুলি সন্তান আছে, তাহার হিসাব করিলেও জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধির ক্ষমতা মাপ করা যায়। বীরভূম-জেলায় এই সংখ্যা কি-প্রকার কমিয়া যাইতেছে, দেখুন।

	বীরভূম	সমগ্র বাংলা-দেশ
১৯০১	১৭২	১৮২
১৯১১	১৫৭	১৮১
১৯২১	১৩১	১৭২

১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে, ৫৩,৮৫৮ জন লোক বিদেশ হইতে জীবিকা অর্জ্জন করিবার জন্য এই জেলায় আসিয়াছিল; এবং ৪২,৭০৯ জন লোক জেলা হইতে বাহিরে গিয়াছিল। এইসকল লোক বাদ দিলে জেলার প্রকৃত জন-সংখ্যা আরও দশ হাজার কম হইবে।

শিক্ষাই সকল উন্নতির সোপান। শিক্ষার বিস্তার হইলে মানুষ নিজের অভাব বুঝিতে পারে এবং সেই-সকল অভাব পূরণ করিবার জন্য নিজের শক্তিকে নিয়োজিত করে। এই বিষয়ে বীরভূম বাংলার অনেক জেলা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। এখানে ৫ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে হাজারে মাত্র ২১৬ জন সামান্য লিখিতে-পড়িতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থাও তদনুরূপ। ৫ বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্ক স্ত্রীলোকগণের মধ্যে হাজারে ১২ জন মাত্র লিখন-পঠনক্ষম আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই জেলার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে শিক্ষার উন্নতি-কল্পে অনেক কাজ করিতে হইবে।

এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ৫৭৬৭৫০ জন হিন্দু ও ২১২৪৫০ জন মুসলমান। মুসলমান পুরুষগণের মধ্যে হাজার-করা ১৬২ জন ও স্ত্রীলোকগণের মধ্যে মাত্র ৫ জন লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা প্রায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বীরভূমে যে-সকল প্রধান জাতি আছে, তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

বাগ্দী	৭২৯৬৭
বৈষ্ণব	১৬২৬৩
বাউরী	৩৪৭৩৪
ব্রাহ্মণ	৩৯৮০৫
ডোম	৩৫০৪৬
গোয়ালা	১১৪০৫
হাড়ী	২০৮৯৬
কলু	১০৮০৮
কোনাই	১৫৩০০
মাল	৩৬৬৯০
মুচি	৩৭৩১৭
সদ্গোপ	৭১৫০৩
সাঁওতাল	৫৭১৮০
শুঁড়ি	১৩২৬৯
তাঁতি	১১৭৮৩

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল ব্রাহ্মণ-কায়স্থের উন্নতিতে দেশ উন্নত হইবে না। অন্য জাতির লোকেরাও শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ না করিলে বর্ত্তমান হীন অবস্থা দূর হইবে না। বাউরী, বাগ্দী, সাঁওতাল ইত্যাদি অনুন্নত জাতির মধ্যে এই জেলার কত লোক শিক্ষিত তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে সমগ্র বাংলা-দেশের হিসাব সেন্সস্ রিপোর্ট্ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

বাগ্দী	হাজার-করা	শিক্ষা পাইয়াছে	২৪ জন
বাউরী	„	„	৭ জন
হাড়ী	„	„	২১ জন
সাঁওতাল	„	„	৫ জন

বাঁকুড়ার ন্যায় এখানেও শতকরা ৭৭ জন লোক কৃষিজীবী। সুতরাং কৃষিকার্য্যের উন্নতি না হইলে, এই জেলার লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যয়-সাপেক্ষ ও অর্থ না থাকিলে এইসকল সম্ভবপর হয় না। দেখা গিয়াছে

যে, এখানকার বসতি অতিশয় বিরল এবং কতক জমি প্রস্তরময় ও জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও সাধারণতঃ কৃষকদের প্রয়োজন-মত চাষের জমি আছে। বৃষ্টিপাত এখানে কম, কিন্তু তাহা যে গত ১০০ বৎসরের মধ্যে কমিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রামে-গ্রামে জল-সেচনের যে-সকল বাঁধ ও পুকুর বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে ইহাই অনুমান হয়, যে, সে কালের কৃষকগণ বৃষ্টিপাতের অভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইসকল বাঁধ ও পুকুর হইতে অনেক গ্রামে পানীয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য জল পাওয়া যাইত। নানা কারণে এইসকল বাঁধ, পুকুর মজিয়া গিয়াছে; স্থতরাং মাঠের ধান মরিয়া যায়; আখ, গম, আলু ইত্যাদি মূল্যবান্ ফসল চাষ করা সম্ভবপর নয় এবং প্রখর গ্রীষ্মের দিনে পানীয় জলের অভাবে দেশে হাহাকার উঠে।

এই জেলার দুরবস্থা অপনয়নের জন্য কি করা উচিত ও বর্ত্তমানে কি করা হইতেছে, বারান্তরে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

কর্ম্মী

কাশ্মীরে শিব-মন্দির

শঙ্করাচার্য্যের মন্দির

[কাশ্মীরের বিচারপতি বনোয়ার সাইন কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

কাশ্মীরের নিকট শঙ্কর-পর্ব্বত নামে একটি পাহাড় আছে। শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্য্যের নামানুসারে উহার নামকরণ হয়। বহুকাল হইতেই পর্ব্বতের উপর একটি শিবমন্দির স্থাপিত রহিয়াছে। এই মন্দিরটি যে-অংশে স্থাপিত সে-স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর।

গত বৎসর মহীশূরের মহারাজ-বাহাদুর এই মন্দিরটি পরিদর্শন করিতে আসেন। মহীশূরের মহারাজা একজন শৈব। তিনি ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই মন্দিরটি আলোকমালায় ভূষিত করেন। মন্দিরের চূড়ার উপরকার আলোকটি পাহাড়ের পাদদেশ হইতে দেখা যায়। দেখিলে মনে হয় যে এই আলোকটি আলোকমঞ্চের মতো দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই স্থখময় উপত্যকাটিকে আলোকিত করিতেছে। মহীশূরের মহারাজার অভিপ্রায়-অনুসারে কাশ্মীর-নৃপতির সম্মানার্থে এই সর্ব্বোচ্চ চূড়াস্থ আলোকটির নাম প্রতাপ হীরা রাখা হইয়াছে। এই মন্দিরটি কাশ্মীরের একটি দর্শনীয় স্থান।

শ্রীপ্রভাত সান্ন্যাল

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

টাকা-ধোওয়া কল—

আমেরিকার Los Angeles-এর একটি হোটেলে একটি মুদ্রা-সাফ-করা কল স্থাপন করা হইয়াছে। এই হোটেলে কোন অভ্যাগত বা অতিথিকে অপরিষ্কার টাকা পয়সা দেওয়া হয় না। অনেক হাত ঘুরিয়া নানা-প্রকার ময়লা এবং বীজাণু লইয়া হোটেলে আসে সেইজন্য হোটেলের মালিক নিয়ম করিয়াছেন, টাকা পয়সা ইত্যাদি বিশুদ্ধ এবং নতুনের মত ঝক্‌ঝকে না করিয়া কাহাকেও দেওয়া হইবে না। সেইজন্য হোটেলে কোন টাকা-পয়সার আমদানি হইলেই তাহা বিশুদ্ধ করিবার জন্য কলে পাঠান হয়।

মুদ্রা ধুইবার কল

সাতারীর টুপী—

জলের নীচে ডুব দিয়া চোখ মেলিয়া কিছু দেখার চেষ্টা করা বোকামো। এবং তাহা পারাও যায় না। কিন্তু এই কাজটি করিতে পারিবার এক উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। এক-প্রকার টুপী তৈয়ার হইয়াছে তাহাতে জলের তলায় এক-রকম বিনা-কষ্টেই নিশ্বাস লওয়া এবং চারিদিক্‌ দেখা চলিবে। টুপী পরিয়া কথা বলিবার বা মুখ দিয়া নিশ্বাস লইবার কোন অসুবিধা হয় না।

অভিনব সাঁতার-টুপী

গলদা-চিংড়ীর বাচ্চা—

নিউ ইয়র্কের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রদর্শনী-গৃহে দুইটি প্রকাণ্ড চিংড়ী মাছ সাধারণের দেখিবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড়টির ওজন ৩৪ পাউণ্ড এবং ইহার বয়স ৫০ বচর বলিয়া মনে হয়। ইহার গায়ে জল-যুদ্ধের অনেক ক্ষত চিহ্ন আছে। ছোটটির ওজন ২৮

সমুদ্রের চিংড়ি মাছ

পাউণ্ড। এই চিংড়ী মাছের বাচ্চা দুটির আকার বুঝাইবার জন্য তাহাদের মাঝখানে একটি ছয় বছর বয়সের বালককে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। এই দুইটি মাছকে ধরিবার জন্য বিশেষ কষ্ট করিতে হইয়াছে।

অগম্য-স্থানের কথা—

এমন কোন স্থান কল্পনা করিতে পারেন যেখানে কোন মানুষ নাই, যেস্থান বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, যেখানে কোন-প্রকার গাছ-পালা নাই, অদ্ভুত-অদ্ভুত সব জন্তু বিচরণ করিতেছে, যেখানে কোন-প্রকার আলো নাই—ঘোর জমাট কালো। সেই স্থানের আরম্ভ

সমুদ্র-তলের একটি নক্সা

সমুদ্রের তলায় কোন মানুষ কখনও যাইতে পারে না এবং পারিবে না, কিন্তু বিজ্ঞানের বলে মানুষ ঐ স্থানের সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছে।

সমুদ্রের তলা যে কেবল অন্ধকারময় ভীষণ এবং ভয়াবহ তাহা নহে। সমুদ্রের তলায় এমন অনেক মনোরম দৃশ্য আছে যে তাহার তুলনা এই পৃথিবীর উপরে কোথাও মেলে না। কত-রকমের গাছ-পালা, ফুল, কত-রকম যে তাহাদের রং, কত হাজার-রকমের অদ্ভুত সুন্দর-সুন্দর জীবজন্তু, কত-রকমের.. কত রং-বেরংএর দৃশ্য যে আছে, তাহার কোন-প্রকার কল্পনা আমরা করিতে পারি না।
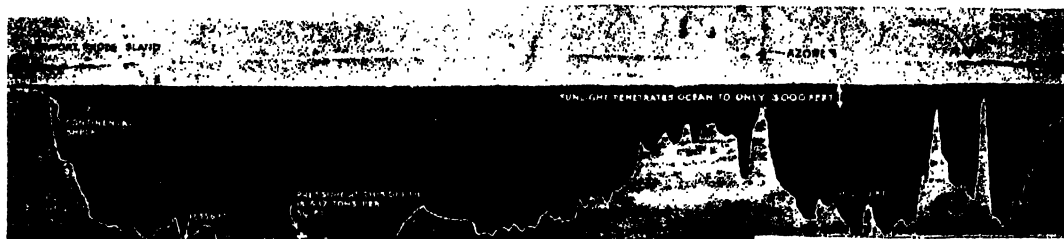
নাই, অন্ত নাই। সেই স্থানে কোন মানুষ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, মানুষের কোন সৃষ্টি-সেখানে থাকিতে পারে না। সেই স্থানের জলের চাপ এত ভয়ানক যে পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্ব্বতের ওজনও তাহার সমান নয়। এই স্থানটি সমুদ্রের তলায়।

পূর্ব্ব রক্‌অ্যাওয়ে খাড়ির ভিতরের জলের ১০০০০ ফুট উচ্চে স্থিত একখানি এরোপ্লেন হইতে গৃহীত চমৎকার ফোটো। সমুদ্র গর্ভের একটি গভীর খাদ ছবির পুরোভাবে দেখা যাইতেছে; তা ছাড়া বালির বাঁধ ও একটি আঁকা-বাঁকা জলপথও ছবিতে প্রকাশ পাইয়াছে
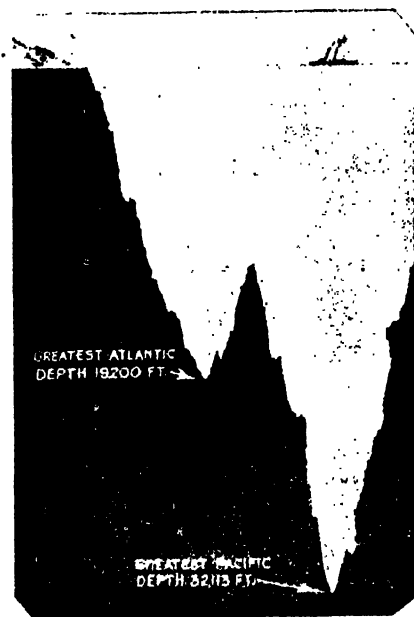
আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দুইটি "গভীরাংশে"র মাপ

স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই আমরা জানি যে পৃথিবীর এক ভাগ স্থল এবং তিনভাগ জল, অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর ৫৭,০০০,০০০ বর্গমাইল জমি এবং ১৪০,০০০,০০০, বর্গমাইল জল।

এই বর্গমাইল দেখিয়া সমুদ্রের বিশালতার, গভীরতার এবং আদি-অন্তহীনতার কোন ধারণাই আমরা করিতে পারি না।

হিমালয় পাহাড় যে দেখিয়াছে, সেই জানে কি বিরাট্ উচ্চ সেই দৃশ্য। যাহারা আবার পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ গৌরীশৃঙ্গ দেখিয়াছে, তাহারা জানে সেই দৃশ্যও কি চমৎকার। কিন্তু এই গৌরী-শৃঙ্গকেও সমুদ্রের জলের তলায় ডুবাইয়া রাখা যায়। সমুদ্রের গভীরতা গড়পড়তা ২ মাইল। তবে সমুদ্রের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ২ হইতে ৪ মাইল গভীর। সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে অতি গভীর স্থান আছে, ইহাদের ইংরেজিতে 'deep' বলে। এই এক-একটি ডীপ্-এর গভীরতা ৫ মাইলেরও বেশী এবং এক-একটি ডীপ্-এ এক একটি গৌরীশৃঙ্গকে নিমজ্জিত করিয়া রাখা যায়। এমন কেহ যদি থাকে, যে সে সমস্ত জমিকে উঠাইয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সমুদ্রের কোন-প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার বিরাট্ গর্ভ যে কিছু দিয়া পূর্ণ হইয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন বা প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর সমস্ত মাটি সমুদ্রের তলায় ফেলিয়া দিলেও সমুদ্র ২ মাইল গভীর থাকিবে।

সমুদ্রের ঘোড়া (Hippocampus)। ইহারা দাঁড়াইয়া লম্বাভাবে সাঁতার দেয়

সাবমেরিন্ বা অন্য কোন-প্রকার যন্ত্র সমুদ্রের তলায় যাইতে পারে না, সেখানের জলের চাপে সমস্তই গুঁড়া হইয়া যাইবে। কিন্তু মানুষ ওশেনোগ্রাফি-বিদ্যার সাহায্যে সমুদ্র-সম্বন্ধে প্রায় সকল তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। যাহা কিছু বাকি আছে তাহাও অতি সত্বর হইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

সমুদ্রের তলায় কৃত্রিম উপায়ে নানা-প্রকার শব্দ-সঙ্কেত দ্বারা মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, সমুদ্রের অনেক অংশই সমতল। সমুদ্রের তলায়, যুগ-যুগ ধরিয়া মৃত জন্তুদের হাড়-গোড়ের একটি গভীর পলি পড়িয়া আছে। তাহা ছাড়া নানা-প্রকার ধাতু, পাথর, পৃথিবীর মাটি ইত্যাদি আরো কত রকমের জিনিষ যে সমুদ্রের তলায় আছে তাহা বলা যায় না।

সমুদ্রের তলায় যে সমস্ত ডীপ্ বা অতি গভীর ফাটল আছে তাহা ক্রমশঃ-ঢালু নয়, হঠাৎ খাড়া গভীর, কূপের মতন। এই সমস্ত গভীর স্থান ভূমিকম্পের ফলেই হইয়াছে। সমুদ্রের তলাতে অনেক পাহাড়-পর্ব্বতও আছে। পাহাড় বেশী উঁচু হইলে তাহা জলের উপর মাথা তুলিলে মানুষের কাছে দ্বীপ-রূপে পরিচিত হয়।

সমুদ্রের জলের রং প্রায় ক্ষেত্রেই পরিষ্কার স্বচ্ছ-নীল। বিজ্ঞানে ইহার কোন বিশেষ কারণ দিতে পারে না। বোধ হয় নীল আকাশের ছায়া পড়িয়া জলকেও এই-প্রকার দেখায়। আকাশের রং নীল হইবার কারণ কি? সমুদ্রের যেখানে জল কম, সেখানের রং সবুজ—জল যত গভীর রংও তত নীল হয়। অনেক সময় দেখা যায় জল পরিষ্কার হইলে তাহা নীল বর্ণের হয়। খুব পরিষ্কার পুকুরের জল এবং গভীর সমুদ্রের জল তুলনা করিয়া একই রংএর, ইহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের মাত্র ৫০০ ফ্যাদম্ অর্থাৎ ৩০০০ফুট নীচ পর্য্যন্ত নীল রং পাওয়া যায়। তাহার নীচে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না। এই স্থান হইতেই অন্ধকার আরম্ভ। সামুদ্রিক গাছপালাও এইখান হইতে আর নাই। কারণ গাছপালা সূর্য্যের আলো ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে না।

গভীর জলে অক্টোপাস্ যমের মত তাহার শিকারের ঘাড়ে পিয়া পড়ে

জলের ৫০ ফ্যাদম্ নীচে জলের তাপ-পরিমাণ বৎসরে মাত্র একবার কমবেশী হয়। ১০০ ফ্যাদম্ নীচে তাপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ৫০০ ফ্যাদম নীচে সমুদ্রের জলের তাপ ৪০ ডিগ্রীর নীচে। সমুদ্রের একেবারে তলের জলের তাপ নোনা-জল জমিবার কিছু উপরে—অর্থাৎ ৩২। (নোনা জল ২৮ ডিগ্রীতে জমে।)

সমুদ্রের সমস্ত স্থানের জলই লবণাক্ত। কোথাও বেশী, কোথাও কম। সূর্য্যের তাপ জলে যেখানে বেশী পড়ে, সেই সব স্থানে লবণ বেশী—অন্যান্য স্থানে অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে লোহিত-সমুদ্রের (Red Sea) জল অতিশয় লবণাক্ত। সমুদ্রের প্রতি ১০০০ পাউণ্ড জলে ৩৫ পাউণ্ড করিয়া লবণ আছে। এই হিসাবে সমস্ত সমুদ্রে এত লবণ আছে যে তাহার দ্বারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে এই লবণের দেড় মাইল তলায় পুঁতিয়া রাখা যায়। সমুদ্রের জলে এত-প্রকারের লবণ নাই, আমরা যে নুন খাই, তাহা ছাড়াও আরো বহু-প্রকারের লবণ আছে। পৃথিবীতে যত সোনা খনি হইতে পাওয়া গিয়াছে, সমুদ্রের জলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সোনা আছে। প্রতি ১টন জলে ১ গ্রেন্ করিয়া সোনা আছে। রূপাও সমুদ্রের জলে অনেক-পরিমাণে আছে, তবে রূপার পরিমাণ সোনা অপেক্ষা অনেক কম।

সমুদ্রের গর্ভকে রাজ-ভাণ্ডার বলিলেও চলে। কত-রকমের মণি-মাণিক্য হীরা-জহরৎ যে এখানে আছে তাহা বলা যায় না।

পৃথিবীতে যে ৯২টি মূল ধাতুর অস্তিত্ব জানা গিয়াছে, তাহার ৩২টি সমুদ্রের জলে পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে অন্যান্য ধাতু

ভাগই পৃথিবীর মাটির ভাগ হইতে জলের স্রোতের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। একমাত্র আমেরিকা হইতেই বছরে প্রায় ৫০০,০০০,০০০ টন্ লবণ সমুদ্রে নদী বাহিয়া গিয়া পড়ে।

সমুদ্রের জল স্থির হইয়া নাই। সমুদ্রের মধ্যে-মধ্যে বিভিন্ন স্রোত ইত্যাদি রহিয়াছে। একটি স্রোত অন্য স্রোতের সঙ্গে মিশ না খাইয়া হয়ত পাশাপাশি বিভিন্নমুখে চলিয়াছে। Gulf stream-কে একটি সামুদ্রিক নদী বলা যায়। এই নদীর জল নীল, কিন্তু যে-সমস্ত জলের মধ্যে দিয়া এই স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাদের রং বেশীর ভাগ স্থানেই সবুজ-ধরণের। দুইটি জলের তফাৎ, দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ডুবুরিরা সমুদ্রের ২০০ ফুট নীচে পর্য্যন্ত নামিতে পারে—জলের বিষম চাপের জন্য আর বেশী নীচে পারে না। পুকুর কিম্বা হ্রদের জলের ২০ ফুট নীচে নামিলেই জলের চাপ বেশ বুঝিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সমুদ্রের তলায় প্রতি ১ ইঞ্চিতে ২ টন্ অর্থাৎ প্রায় ৫৬ মণ করিয়া চাপ পড়ে। সমুদ্রের অতি গভীর স্থানগুলিতে এই তাপের পরিমাণ ইঞ্চি প্রতি ৫টনেরও বেশী হয়।

সমুদ্রের তলায় অক্টোপাস্ গভীর চিন্তায় মগ্ন

কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা সমুদ্রের তলায় বিষম চাপের পরিমাণ বুঝা যায়। একটি বোতলের মুখে বেশ শক্ত করিয়া ছিপি আঁটিয়া যদি তাহার তলায় ভারী কিছু বাঁধিয়া সমুদ্রের তলায় দড়ি দিয়া নামানো যায়, তবে কিছুক্ষণ পরে তাহা উঠাইয়া দেখা যাইবে যে ছিপিটি বোতলের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং বোতলটি জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বায়ুশূন্য কোন ফাঁপা জিনিষকে এই-প্রকারে সমুদ্রের তলায় নামাইলে তাহা চূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

সমুদ্রের অনেক প্রাণীকে দেখিতে গাছপালার মত। ইহাদের দেহের অঙ্গ-বিশেষকে গাছপালার শিকড়ের মত বলিয়া মনে হয়। মাকড়সার মত একপ্রকার প্রকাণ্ড জীব দেখা যায়, তাহাদের কেবল চোখমুখওয়ালা জন্তু বলিয়া মনে হয়। এইসমস্ত জন্তুরা একে অন্যকে খাইয়া জীবন-ধারণ করে, কারণ সমুদ্রের উপর হইতে তাহারা বিশেষ কোন খাদ্য পায় না। এইসমস্ত জন্তুরা ইচ্ছামত তাহাদের শরীর বৃদ্ধি করিতে পারে। এক-একটি জন্তু তাহাদের নিজের সমান আকারের জন্তুকে গিলিয়া খায়, এই কথা ভাবিলেই অবাক্ হইতে হয়। সমুদ্রের গভীর জলে যে-সব জন্তু বাস করে, তাহাদের অন্ধ বলিয়া বোধ হয়। তাহারা অনুভব করিয়া তাহাদের খাদ্য শিকার করে বা ধরে।

পৃথিবীর জন্মের সময় সমুদ্র ছিল না। তখন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত গরম অবস্থায় আলাদা আলাদা ছিল। তার পর পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইবার সঙ্গে-সঙ্গে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলিয়া জল উৎপন্ন হইল এবং পৃথিবীর সমস্ত নীচু জমি, খাল বিল ইত্যাদি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সমুদ্র পৃথিবীকে মানুষের বাসের যোগ্য করিয়াছে। সমুদ্র পৃথিবীর তাপ-সমতা রক্ষা করে। সমস্ত নদনদীর শেষ এবং আরম্ভ সমুদ্র। নদ-নদী না থাকিলে পৃথিবীতে চাষবাস কোন-প্রকার হইতে পারিত না।

সমুদ্র সম্বন্ধে বলিবার সবই বাকি থাকিল, এই মাত্র আরম্ভ। বারান্তরে আরো বলিবার ইচ্ছা রহিল।

—

পুরাকালের কথা—

মেক্সিকো সহরের কাছে এক স্থানে কয়েকটি বহু পুরাকালের পাথর আবিষ্কার হইয়াছে। এই পাথরের উপর অনেক-কিছু লেখা আছে। এই খোদাই বোধ হয় মঙ্গোলীয় সভ্যতার সময়ের অর্থাৎ আজ হইতে ৭০০০ বছরেরও পূর্ব্বে। গত জুলাই মাসে মাটির মধ্যে প্রায় ২৫ ফুট নীচে এই প্রস্তরলিপি এক গাদা আগ্নেয়-গিরির ছাইএর মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদের আবিষ্কর্ত্তা অধ্যাপক উইলিয়ম্ নিভেন এবং ডাঃ জে, এইচ, কর্ণিন।

বহু পুরাকালে পর্ব্বতের এক উপত্যকায় এইসমস্ত প্রস্তরলিপি একের উপর আর একটি স্তরে-স্তরে সজ্জিত ছিল। সেই উপত্যকায় বহু লোকের বাস ছিল, এবং তাহাদের একটি নিজস্ব সভ্যতা ছিল। তার পর একদিন পাহাড় হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতে আরম্ভ হইল এবং সেই আগুনের ছাই, গলিত ধাতু ইত্যাদি উপত্যকার লোকজন এবং সমস্ত সভ্যতাকে সমাধি দান করিল। কথাগুলি হঠাৎ শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ঠিক এইরূপই হইয়াছিল।

এক-একটি পাথরের টুকরা এক-একখানি বই। পুস্তকগুলির মাপ এক-রকম নহে এবং সবগুলির লেখা এক-ধাঁচার হইলেও এক-রকম নহে। কতকগুলি লিপি দেখিলে মনে হয় কাঁচা হাতের লেখা, কতগুলিকে পাকা হাতের লেখা বলিয়া মনে হয়। সমস্ত লিপিগুলি সমসাময়িক নয় বলিয়া মনে হয়। প্রস্তরলিপির উপরে বিশেষ-বিশেষ চিহ্ন আছে, এই চিহ্নসকল দেখিয়া প্রস্তরলিপিগুলির বয়স ঠিক করা যায়। এক-একটি বিশেষ চিহ্ন বা নির্দ্দেশ এক-একটি বিশেষ সময়ের। অনেক পরীক্ষা এবং চেষ্টার ফলে এইসকল আবিষ্কার হইয়াছে। প্রস্তরলিপিগুলির উপর—চন্দ্র, আগুন, পৃথিবী-মাতা, জল, বিদ্যুৎ, সূর্য্যের তেজ, আগ্নেয়গিরি, দেবতা, সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকাল, নানা-রকম তারা এবং দেব-দেবীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন ইত্যাদি আছে। প্রত্যহ এই সহর হইতে নতুন-নতুন পুস্তক আবিষ্কার হইতেছে।

এই পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত পুস্তকে কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিচয়—

এক-প্রকার বিশেষ ফুল, অগ্নি বুঝায়।

অর্দ্ধবৃত্ত, উদীয়মান বা অস্তমান সূর্য্য বুঝায়।

ক্রুশ বা +চিহ্ন, সূর্য্যের চারিটি গতি বুঝায়।

অগ্নি এবং সূর্য্যের যুক্ত চিহ্নসকল, নানা-প্রকার পৌরাণিক জন্তু বুঝায়।

সূর্য্যের চিহ্ন সকলসময়ে কমলালেবুর মত হলদে-রঙের।

অগ্নির রং সকলসময় ঘোর লাল।

জলের রং সকলসময় সবুজ বা নীল।

প্রাতঃকালের চিহ্নসকল সকলসময় শুভ্র-রঙের।

প্রস্তর পুস্তকাদি ছাড়া এইখানে আরো অনেক-প্রকার ছবি এবং খোদিত চিত্র আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে। অনেক বড়-বড় পিরামিড দেখা যাইতেছে। এইসমস্ত পিরামিডের উপর হইতে সেই সময়ের লোকেরা আগ্নেয়গিরি-দেবতাকে মানুষ-বলি দিত।

মেক্সিকোতে প্রাপ্ত প্রস্তর-পুস্তক

এইসমস্ত আবিষ্কার-কার্য্য শেষ হইয়া গেলে পরে একটি বহু প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়। এবং আমরা যে কত আশ্চর্য্য নতুন ব্যাপার জানিতে পারিব তাহারও ইয়ত্তা নাই।

—

অদ্ভুত পোকা—

ডানদিকের জীবটিকে দেখুন। ইহাদের আমাদের ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। দেখিতে অনেকটা মুরগী বা টার্কী পক্ষীর মতন। ইহার পিঠে
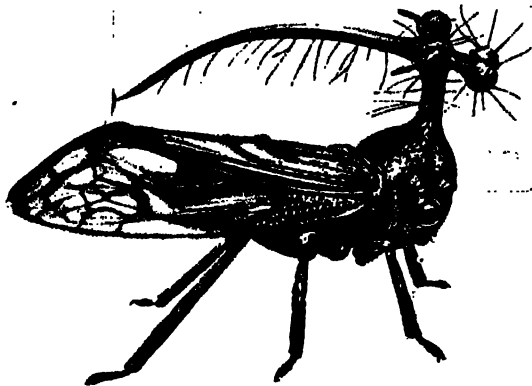
ব্রেজিলবাসী ফড়িং—বৃক্ষে বাস করেন। এমন জমকালো এবং রংচঙে কোন -প্রকার জীব পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও হয়

একটি কুজ আছে। ইহাদের আবার শিংও আছে। নীচের দিকে ডানাও দেখা যায়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা ইহাদের শিংএর কি প্রয়োজন তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এই ফড়িংদের একটি অতি আশ্চর্য্য গুণ আছে, ইহারা প্রতিদিন তাহাদের রূপের নব-নব পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে।

আর-এক-প্রকার গাছ-ফড়িং উপরে দেখুন। ইহাদের ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। ইহাদের গায়ের রং নানা-প্রকার এবং অতি উজ্জ্বল। মাইক্রোস্‌কোপে দেখিলে অতি জমকালো বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মাথার উপর তলোয়ারের মত অদ্ভুত শিং দেখিবার জিনিষ। পোকামাকড়দের জগতে এই-প্রকার অদ্ভুত এবং নানা-রংএ জমকালো পোকা আর নাই বলিলেই হয়।
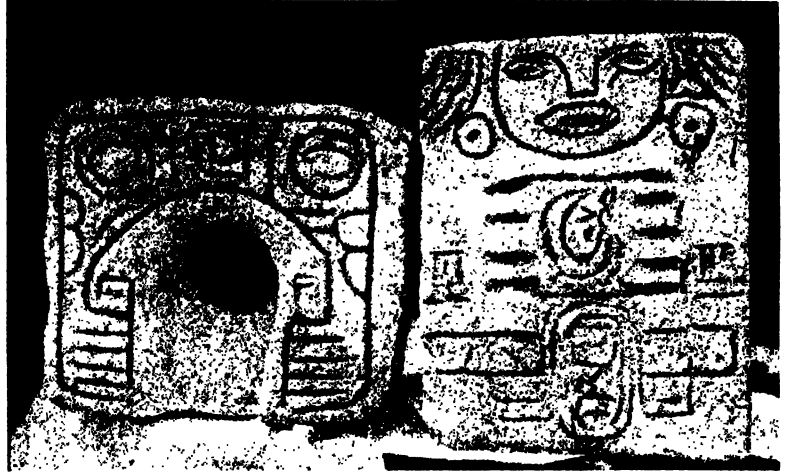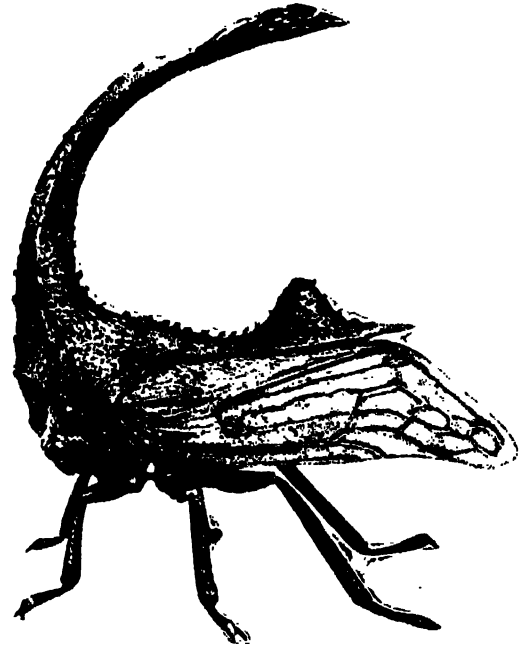
ভারতবাসী একটি ফড়িং—দেখিতে মুরগীর মত। ইহারা যখন ইচ্ছা দেহের রং পরিবর্ত্তন করিতে পারে

হারল্ড অস্‌বর্ন্‌। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উঁচুলাফ দেনেওয়ালা—ইনি ৬ফুট ৬ইঞ্চি লাফ দিয়াছেন—ইনি আমেরিকান্‌

অলিম্পিক্ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—

এই বছরের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আমেরিকানরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিষয়ে জয় লাভ করিয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরস্কার লাভ করিয়াছে। তাহারা এযাবৎ জগতে এ বিষয়ে যে শ্রেষ্ঠতা-নিদর্শন ছিল তাহাকে অতিক্রম করিয়াছে। সমস্ত প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ২৫৫ নম্বর পাইয়াছে, ফিন্‌ল্যাণ্ড ১৬৬ নম্বর পাইয়াছে ব্রিটিশ সিংহ ৮৫ নম্বর পাইয়া হইয়াছেন ৩য়। প্রতিযোগিতার ফলাফল দেখিয়া মনে হয় আমেরিকানরা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভালো খেলোয়াড়, যদিও ফিন্‌ল্যাণ্ড ১০টি বিষয়ে প্রথম হওয়াতে ক্রীড়াজগতে তাহার সম্মান বড় কম নহে। আমেরিকা ২২টি বিষয়ে প্রথম
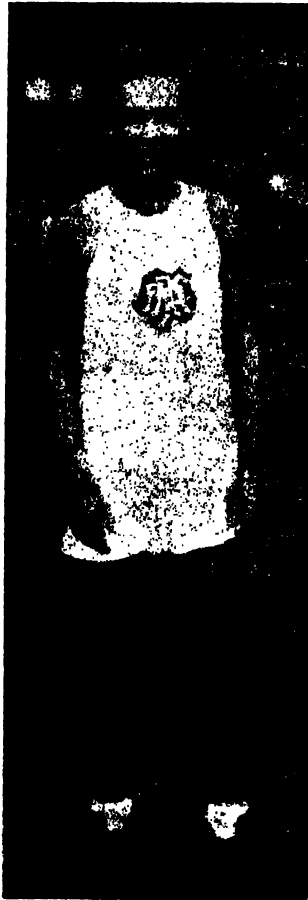
উইলি রিটোলা নুর্‌মির দলের লোক। ইনিও পৃথিবীর একজন বিখ্যাত দৌড়নেওয়ালা

এইচ এম্ আব্রাহাম্‌স্। কেম্ব্রিজের ছাত্র। ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হইয়াছেন। ইনি ইংরেজ

প্যাভো নুর্‌মি। ফিন্‌ল্যাণ্ড দেশীয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়নেওয়ালা। অনেকের মতে ইহার মত লম্বা দৌড়নেওয়ালা আর কেহ জন্মায় নাই

হইয়াছে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে আমেরিকার ধনদৌলত বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানরা বিলাসী এবং আয়াসী হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা হয়ত কতক-বিষয়ে সত্য কিন্তু শারীরিক শক্তি এবং ক্রীড়া-চর্চ্চায় আমেরিকার লোকেরা অন্য সব জাতিকে পরাজিত করিয়াছে। এ-বিষয়ে তাহাদের কোন আলস্য নাই।

আমেরিকায় সকল-প্রকার শ্বেতাঙ্গ জাতির সংমিশ্রণ ঘটিতেছে। এই কারণে মনে হয় তাহারা ঐ সকল আদি-জাতির দোষ এবং গুণের অধিকারী হইয়াছে। আমেরিকার ধনদৌলত ও লোকবল প্রচুর, এই কারণে তাহারা ক্রীড়া-চর্চ্চাতেও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে পারে এবং করে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের এ-বিষয়ে ভাগ্য বিশেষ ভালো নহে। তাহারা রাষ্ট্র ব্যাপারে খুব বড় নহে, এবং তাহাদের জাতীয় ধন-দৌলতও প্রচুর নহে। কিন্তু এই সমস্ত বাধা সত্বেও যে তাহারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের বিষয়।

আমেরিকানরা প্রথম হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের দলের মধ্যে ফিন্‌ল্যাণ্ডের পাওভো নুরমির মত কোন প্রতিযোগী ছিল না। তাহার সঙ্গে তুলনা হইতে পারে, আমেরিকান দলের এমন কোন লোক নাই। নুরমিকে অ-মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাহার শরীর শক্তি এবং অমানুষিক দম এবং মনের বল তাহাকে সাধারণ মানুষের অনেক উঁচুতে রাখিয়াছে। নুরমি চারটি লম্বা-দৌড়ে পর-পর দৌড়িয়া প্রত্যেকটিতেই প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং প্রত্যেকটি দৌড়ই সে আরম্ভ এবং শেষ একভাবেই করিয়াছে। ক্লান্তি বলিয়া কোন জিনিস তাহার শরীরে নাই। ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোকেরা মঙ্গোল জাতিদের বংশধর, তাহারা টিউটন বা গৌরবমণ্ডিত খাঁটি অ্যাংলো স্যাক্সন নহে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোকেরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অসাধারণ দৌড়িবার শক্তি লাভ করিয়াছে।

ফিন্‌ল্যাণ্ড লম্বায় ৬৬০ মাইল, চওড়ায় ৩৭০ মাইল—মোট ১৪৪,২৫৫ বর্গ মাইল। মোট জন-সংখ্যা ৩,২৭৭,০০০, ইহার মধ্যে শতকরা ৮৫ জন খাঁটি ফিন্‌ল্যাণ্ডীয় লোক।

সাধারণ আমেরিকান যুবকদের শরীর অন্যান্য প্রায় সকল দেশের সাধারণ যুবক অপেক্ষা ভাল। কম-দূর দৌড়ে তাহারা মজবুত, কিন্তু লম্বা-দৌড় তাহারা বিশেষ কাজের নহে। এ-বিষয়ে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে পরাজিত করা বিশেষ শক্ত ব্যাপার। আমেরিকান্ প্রতিযোগিতা ক্রীড়া জিনিসটাকে জাতির মান-সম্মানের একটা বিশেষ অংশ বলিয়া গ্রহণ করে এবং জগৎ-সমক্ষে এ বিষয়ে হীন হওয়াকে জাতীয় অপমান বলিয়া মনে করে; এই কারণেই তাহারা অতি কম বয়স হইতে বিশেষভাবে দৌড় লাফ ঝাঁপ ইত্যাদিতে লেখা-পড়ার মতন করিয়াই মনোযোগ দেয়। আমেরিকানদের ব্যায়াম এবং ক্রীড়া শিক্ষার আন্তরিকতা এবং আয়াস দেখিয়া মনে হয় এখনও অন্তত কয়েক বছর তাহারা ক্রীড়া-বিষয়ে জগৎ-বিজয়ী থাকিবে।

—

বিদেশে কাগজের কাট্‌তি—

আমাদের দেশে পাঁচ ছয় হাজার কাগজ বিক্রি হইলেই আমরা সে কাগজকে অতিশয় বৃহৎ এবং ধনী বলিয়া মনে করি। কি আমেরিকান কাগজের তুলনায় আমাদের দেশের সাময়িক এবং সংবাদপত্রগুলির স্থান কোথায় দেখুন—

কাগজের নাম	গ্রাহক সংখ্যা
The Saturday Evening Post —	২১,০০,০৯৮
The Ladies' Own Home Journal	১৭,৯৯,০০২
The Pictorial Review —	১৭,৬৫,৪৩০
The American Magazine —	১৬,০৪,৪৩২
The Woman's Home Companion -	১৪,৬৭,৫০৯
The Cosmopolitan - -	৯,৮৩,৩৯০
The Literary Digest —	৯,০০,০০০
The Country Gentleman - -	৭,৬৪,২৮৪
The Red-Book Magazine -	৭,৩৩,৫৭৬

সম্প্রতি জাপানের ওসাকা মাইনিচির (Osaka Mainichi) গ্রাহক সংখ্যা দশলক্ষ পূর্ণ হওয়াতে একটি উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ-স্থানের আসাহি (Asahi) নামক কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা ঐ-প্রকার।

১৯২৪ সালের এড্‌ভারটাইজারস্ এ. বি. সি-তে ইংলণ্ডে কোন্-কোন্ সংবাদপত্রের কত কাট্‌তি, তাহার একটা হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তালিকাটি এই—

দি টাইম্‌স	৭৯১৮৬৬
নিউজ অফ দি ওয়াল্‌ড্	৩০০০০০০
ডেলী হেরাল্ড	২০০০০০
ডেলী মিরার	১০০২৮৮২
ডেলী ক্রনিকেল	১০০০০০০
জন বুল	৭১৬২৫৫
অটোকার	৪১৩৫৩
পাঞ্চ	১০০০০০০
পিক্‌চার শো	২৬৮৩৮০
আন্‌সার্স	৪৭৮৬২১
বয়েজ ম্যাগাজিন	২০৪৩৫১
বয়েজ ওন পেপার	৩৬০০০
কলার	৮৬৩৫
গুড হাউস কিপিং	১৪৪৪৭৯
মাই ম্যাগাজিন	১০৯১০১
লোয়াজ ম্যাগাজিন	১৬২৯০৮
সানডে এ্যাট হোম	২০০০০
ইলাষ্ট্রেটেড ড্রেস্‌মেকার	৬১৩৬১২
লেডিস জার্ণেল	৪৪২৬৩১
স্পোর্ট টাইমস্	৫৮৯৬১
ব্রিটীশ উইকলি	৮০০০০

এই দুইটি তালিকা দেখিলেই বুঝা যায় আমাদের দেশ হইতে বিলাতে ও আমেরিকায় কাগজের পাঠক-পাঠিকা কত বেশী।

ছোট ও বড়

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌-এ, বিদ্যানিধি

অনেক দিন হ'ল, একবার দার্জ্জিলিং হ'তে আস্‌ছিলাম। দিনের বেলা, ঘণ্টা চারির পথ, গাড়ীও খালি। একখান থার্ড ক্লাসের টিকিট নিয়ে গাড়ীর আগের কামরায় আগের বেঞ্চিতে ব'স্‌লাম। একটু পরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক,—মলিনবর্ণ, আধবয়সী, দোহারা, আড়্‌ময়লা পেনটুল-চাপকান পরা,—এক হাতে খাবার ঠোঙ্গা আর হাতে পানের পুটলী নিয়ে পান চিবাতে চিবাতে, এ-কামরা সে-কামরা দেখ্যে, কি জানি কেন, সেই কামরায় উঠ্‌লেন। আমি দরজার কাছে বস্যেছিলাম, তিনি খাবার ঠোঙ্গা ও পানের পুটলীটি বেঞ্চিতে রেখে আমার পাশে ব'স্‌লেন, আর পান চিবাতে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে এক দল গোরায় ষ্টেসন ভর্যে গেল। সকলের হাতে এক এক বন্দুক, গায়ে এক এক রাশ বোচ্‌কা। গাড়ীর কামরার দরজা খুল্যে হুড়্‌মুড় কর্যে তারা উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের কামরায় প্রথমে উঠ্‌ল এক মেম, তার কোলে তিন-চার মাসের এক ছেলে, তার পর এক গোরা, আবার এক গোরা। তাদেরও সঙ্গে তেমনই বোচকা, তেমনই বন্দুক; কতক বেঞ্চিতে, কতক মেজেতে ধুপ্‌ধাপ কর্যে ফেল্যে আমাদের সাম্‌নের বেঞ্চিতে ব'স্‌ল। তা'দিকে ঢুকতে দেখ্যেই আমার সহযাত্রী বন্ধু এক হাতে খাবার ঠোঙ্গা আর হাতে পানের পুটলীটি নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। ক্ষণেকের তরে তাঁর নেত্র ভ্রুকুটি-কুটিল, মুখ আবজিত হ'ল, যেন যুদ্ধং দেহি ব'ল্‌বেন। "বেটারা দেখ্‌ছি বিপদ ঘটালে।" পরক্ষণেই কিন্তু মুখমণ্ডল প্রশান্ত হ'ল। গোরা দুজনের দিকে চেয়ে তিনি ব'ল্‌লেন, You conquerors go with us conquered? গোরাদ্বয় হাঁ না কিছুই ব'ল্‌লে না! You go first class, we go third class, তথাপি সাড়া নাই। We go third class, you go first class. মেম যেন একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। যেন কে কাকে ব'ল্‌ছে, গোরাদ্বয় বুঝ্‌তে পার্‌লে না। This my food, this my betel, you touch, I starve. এই বল্যে ভদ্রলোকটি একে একে হাত দেখাতে, তারা মুখ চাওয়া-চায়ি কর্যে মেমকে কি ইসারা ক'র্‌লে। তার পর দুজনেই তেমনই হুড়্‌মুড় কর্যে কামরা হ'তে নেমে পাশের কামরায় ভিড় ঠেল্যে গিয়ে ব'স্‌ল, মেমসাহেব সে-পাশ থেকে সরে' এসে' আমার সাম্‌নে ব'স্‌লেন। রেলের ঘণ্টা বাজ্‌ল, গাড়ীও ছেড়ে দিলে। বন্ধুবর হাঁফ ছেড়্যে স্বস্থানে ব'স্‌লেন, খাবার ঠোঙ্গা ও পানের পুটলীও পূর্ব্বস্থানে রাখ্‌লেন। চকিতের মধ্যে এত বড় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল! আমার বিস্ময় দেখ্যে তিনি নীতি বুঝিয়ে দিলেন। "বেটাদের সঙ্গে জোর ক'র্‌লে হ'ত কি?"

বাস্তবিক, তোমরা সবল আমরা দুর্বল, তোমরা বড় আমরা ছোট,—এই স্বীকার, কাজে ও ভাবে দেখ্‌তে পেলে, বর্বর ও নিষ্ঠুরও অভয় দান করে। কারণ, ক্ষমা না কর্যে শক্তির সার্থকতা হয় না। অন্য দিকে, যা প্রাপ্য বল্যে মনে করি, তা পেতে নিজকে ছোট স্বীকার ক'র্‌তে কখনও সুখ হয় না।

যখন এই দেশ ইংরেজের হাতের মুঠার মধ্যে এল, যখন ইংরেজ বুঝ্‌লেন নিজের শক্তি ও সামর্থ্য, তখন তাহা বাইরেও প্রকাশ ক'র্‌তে ব্যগ্র হ'লেন। কারণ প্রভু হ'য়ে এদেশকে অন্ধকারে ও দুর্দ্দশায় রাখ্‌লে প্রভুত্বেই সন্দেহ হয়। এই-হেতু নিজের তৃপ্তির আশায় তাঁদের উন্নতির ইতিহাস, বিপুল সাহিত্য, আইন-কানুন, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান প্রভৃতি যা কিছু তাঁদের গর্ব্বের বস্তু, যা কিছু প্রিয়, সব এনে এদেশের সাম্‌নে ধ'র্‌লেন। এই যে উপহার, ইহা কূট রাজনীতি কিংবা কূট বাণিজ্য-নীতি নয়। "আমরা বড়" এই অভিমান তৃপ্ত ক'র্‌বার অন্য উপায় ছিল না।

কিন্তু ভারতী প্রজাও বুঝ্‌লে, এটা প্রেমের উপহার নয়, সমানে সমানে বিনিময়ও নয়। দান স্বীকার ক'র্‌লে

বটে, কিন্তু শান্তি পেলে না। রাজার দানে প্রজার সন্তোষ হয়, কারণ প্রজা সে-দান প্রাপ্য মনে করে। কিন্তু এই নূতন রাজা ত সে রাজা নন।

কথাটা মনের ভিতরে রইল, প্রজা জান্‌তে পার্‌লে না। কাজেই আব্‌দার বাড়্‌তে লাগ্‌ল। প্রজা চাপকান এঁটো সামলা মাথায় পরো ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ব'ল্‌লে, "আমরা এখন তোমাদের বিদ্যা শিখেছি, দেশ শাসন ক'র্‌তে দাও।" রাজা খুসী হ'লেন, ব'ল্‌লেন "তা ত ঠিক; এজন্যেই এদেশে আমাদের আসা, কিন্তু একবারে পার্‌বে না, আমরাই পারি নি!" ক্রমে প্রার্থনার ভঙ্গি ব'দ্‌লো গেল। এখন হেটকোট পরো ইংরেজ সেজো শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় প্রজা ব'ল্‌লে, "দেখ এখন আমরা তোমাদের সমান হয়েছি, দেশও আমাদের; এখন রাজ্যের ভার সমানে সমানে নিলেই ভাল হয়।" কথাটা শুনো কোন কোন ইংরেজ হাস্‌লেন; কেহ বা মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে দিলেন, যুগযুগান্তর তপস্যা ক'র্‌লেও এ-বর লাভের যোগ্য হবে না। ইহাতেও যখন ভারতী ক্ষান্ত হ'ল না, দুর্বিনীত পুত্রের ন্যায় দিবারাত্র ঘেন্‌-ঘেন্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তখন চিরন্তন লাঠি বার ক'র্‌তে হ'ল। কেহ কেহ স্পষ্টবক্তা ব'ল্‌লেন, "মনে করোছিলাম তোমাদের কিছু বোধ জন্মোছে! কেহ কখনও নিজের জমিদারি ছাড়ে কি? আমরা সন্ন্যাসী নই, বৈরাগী নই, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা ক'র্‌তে অসমর্থও নই।" কেহ কেহ আরও স্পষ্ট করো ব'ল্‌লেন, "তোমরা রাজভোগে থাক্‌বে, আর আমরা তোমাদের বাড়ী পাহারা দিব, এমন আশ্চর্য্য কথা ব'ল্‌তে লজ্জা হ'চ্‌ছে না? কয়েকজন প্রজা খুব বুদ্ধিমান্; তারা ব'ল্‌লে, "তোমরাই যে বলোছিলে রাজ্যভার আমাদিকে দিবে? তোমাদের এ কি অন্যায়, যুদ্ধবিদ্যা না শিখিয়ে এখন ব'ল্‌ছ কে পাহারা দিবে? দু'শও বছর ধরো আমাদিকে মানুষ ক'র্‌ছ; এখনও ব'ল্‌ছ মানুষ হই নি? তোমাদের অধ্যাপনার কলঙ্ক রটাতে চাও?"

এইরূপ যখনই বলি, রোগে দেশ উৎসন্ন হ'ল, লোকে না খেতে পেয়ে মরো গেল; তখনই স্বীকার করি, তোমরা বড় আমরা ছোট, তোমরা রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার, মার্‌লে মার্‌তে পার। এই দীনতা-স্বীকারে পশুর মনেও সন্তোষ জন্মে না। ইংরেজের দর্প, দেশের অশান্তির কারণ নয়। বরং ভেবে দেখ্‌লে বুঝি, দর্পের বহু হেতু থাক্‌তেও যে-জাতি ব্যবহারে শিষ্ট, সে-জাতি বাস্তবিক মহৎ। আমরা মুখে ব'ল্‌ছি সমান, কিন্তু অন্তরে বুঝ্‌ছি সমান নই। চাই সমান হ'তে, কিন্তু পার্‌ছি না। একদিকে আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তৃপ্তির যোগ্যতার অভাব; এই দ্বন্দ্বেই ভারতীর অসন্তোষ।

আমি বড় তুমি ছোট, আমরা বড় তোমরা ছোট, —এই যে ভাব ইহা মানব-সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে আছে। আমি বড়, আমি যা-কে আমার বলি সেও বড়, একথা ভুল্‌বার জো নাই। কারণ ভুল্‌তে গেলেই আমার বাঁচ্‌বার হেতু থাকে না। সৃষ্টিমধ্যে আমার থাক্‌বার প্রয়োজন আছে, নইলে সৃষ্টির অভিপ্রায় অহেতুক হ'য়ে পড়ে। বড়ই থাক্‌বে, থাক্‌তে পারে। ছোট যে আছে, তা আমাকে বড় স্বীকার ক'র্‌তে আছে, তার থাক্‌বার এই হেতু বই অন্য হেতু নাই। ইয়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হ'য়ে গেল, কে বড় কে ছোট তারই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা চিরকাল চ'ল্‌বে। যখন চ'ল্‌বে না, তখন সৃষ্টিও থাক্‌বে না।

কে বড় কে ছোট, এই যুদ্ধে বাহুবলের সহিত বুদ্ধিবল যুক্ত হ'লে সোনায় সোহাগা হয়, ছোটকে আত্মসাৎ ক'র্‌তে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা নাকি পশুনামে গণ্য হ'তে চাই না। তাই বেঁচো থাক্‌বার যুক্তি দেখাই। হিন্দু ব'ল্‌ছেন, দেখ, তোমরা কতদিনের বা মানুষ। তোমরা যখন পশু ছিলে, তার কত আগে হ'তে যে আমরা মানুষ তা গ'ণ্‌তে গেলে কাগজ পেন্‌সিল চাই। এই যে এত কাল আছি এতেই প্রমাণ হ'চ্‌ছে আমরা বড়। আমাদের যে অতুল বিভব আছে, তা পৃথিবীময় বিতরণ না করো কি লুপ্ত হ'তে পারি? আমাদিকে থাক্‌তেই হবে, নইলে সে-সব নষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমান ব'ল্‌ছেন, যে-ইস্‌লামের বিজয়-বাদ্য পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে নিনাদিত হয়েছিল, মুসলমানের যে-কীর্ত্তি পেয়ে বর্ত্তমান ইয়ুরোপের প্রতিষ্ঠা, যার অমিত তেজ এখনও ভূখণ্ডে জাজ্বল্যমান, তাকে বড় স্বীকার ক'র্‌তেই হবে। জন-

সাম্য ঘোষণার আর কে বা আছে? খ্রীষ্টান ব'ল্‌ছেন, আমরা যে বড় তাও কি প্রমাণ ক'র্‌তে হবে? তোমাদিকেও বড় ক'র্‌ব, সভ্য ক'র্‌ব বল্যেই ত আমরা আছি।

এসব বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক। ভিতরের লোক যা'দিকে আপনার বলি,তাদের সঙ্গেও কলহ চ'ল্‌ছে। ব্রাহ্মণ ব'ল্‌ছেন, "আমার তুল্য শুচিজাতি ভূমণ্ডলে নাই। আমি মুক্তি-প্রয়াসী; আর মুক্তিপথে প্রথম পা ফেল্‌তে গেলেই বাহ্যে ও অভ্যন্তরে শুচি হ'তে হবে। এই-হেতু অহিন্দু কেহ ছুঁলে আমায় স্নান ক'র্‌তে হয়।" তখন এক শূদ্র ব'ল্‌লে, "আমিও যে হিন্দু আমায় ছুঁতে ডরান কেন?" ব্রাহ্মণ ব'ল্‌ছেন, "কি করি বল, সকলের আচার ত সমান নয়। যার ভাল নয়, তাকে কি কর্য়ে ছুঁই? কার ভাল কার নয়, তা শাস্ত্রে লেখা আছে; জাতি-নাম শুনলেই বুঝ্‌তে পারি, কার ছোঁয়া জল গ্রহণ ক'র্‌তে পারি।" শূদ্র স্মরণ করিয়ে দিলে, "সে যে দু-চা'র হাজার বছর আগের কথা! ব্রাহ্মণের সেবা এতকাল কর্য়ে আস্‌ছি, সদাচার কি শিখ্‌তে পারি নি?" শাস্ত্রবাদী নিরুত্তর, কারণ প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছেন সদাচার। শাস্ত্র-ও যুক্তিবাদী ব'ল্‌ছেন, "তুমি যা ব'ল্‌ছ তা ঠিক। শাস্ত্রেও আছে শূদ্র ভৃত্যের অন্ন গ্রহণ করতে পারা যায়, কারণ সংসর্গ-গুণে তার শৌচাচার হয়। কিন্তু তুমি ত একা নও। তোমার স্ত্রীপুত্র আছে, জাতি-বন্ধু আছে। তারা শৌচাচার শেখে নাই, কিন্তু তোমার সমান অধিকার চাইবে। এতে বিরোধের সৃষ্টি হবে।" শাস্ত্র-ও প্রত্যক্ষবাদী ব'ল্‌ছেন, "তুমি যা ব'ল্‌ছ, তা ঠিক। আপৎকালে আপদ্-ধর্ম্ম শাস্ত্রেও আছে। কিন্তু এই কাল আপৎকাল কি না, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। না বুঝ্যে কেমন কর্য়ে তোমার জল খাই?" শাস্ত্র যদি এত বলবান্, শূদ্র ব'ল্‌ছে, "ঠাকুর, শাস্ত্র আমিও দেখেছি, আমরা শূদ্র নই, ব্রাহ্মণ! লক্ষণ মিলিয়ে দেখুন।" কেহ ব'ল্‌লে আমরা ক্ষত্রিয়, কেহ ব'ল্‌লে বৈশ্য। "ব'ল্‌তে পারেন আমাদের উপনয়ন হয় নাই। তাতে বাধা কি, যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'র্‌ছি, অশৌচ-কাল কমিয়ে দিচ্ছি।" ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়্‌ছেন, রাজা বিধর্ম্মী, কলি প্রবল।

এত কাল এইরূপ বিবাদ ছিল না। যে ছোট সে আপনাকে ছোট বল্যে স্বীকার ক'র্‌ত। যে বড় সেও ছোটর প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার ক'র্‌ত। কিন্তু ইংরেজ রাজার কাছে কেহ ছোট, কেহ বড় রইল না, সকলের আসন সমান হয়ে গেল। ট্রেনে ও ট্রামে, জাহাজে ও শহরে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের গা-ঘেঁষাঘেঁষি হ'তে লাগ্‌ল। আদালতে অপরাধের দণ্ড হ'ল, অপরাধীর বিচার হ'ল না। সমাজ এইসবও সইতে পারে; কারণ অপরাধ করা আর ট্রেনে চড়া লোকের ইচ্ছাধীন। ভয়ানক এই, যারা ছোট ছিল তারা রাজার দৃষ্টির গুণে বড় হ'ল, সম্মানিত হ'ল, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ'ল। যারা বড় ছিল, তারা সকলে বড় থাক্‌তে পার্‌লে না। ছোট দেখ্‌লে, বুঝ্‌লে, তারা ছোট নয়. বড়র সমান। ভারতীর জন্মাবধি এমন সমাজ-বিপ্লব কখনও হয় নাই। অল্পস্বল্প যা হয়েছে তা ধর্ম্মের দুয়ার দিয়ে। কদাচিৎ রাজার হুকুমে ছোট, বড় হয়েছে, প্রজা স্বীকার কর্য়েছে। কিন্তু বড় কখনও ছোট হন নাই। ধর্ম্মের বাঁধনে যে-সাম্য ঘটে, তার গ্রন্থি অন্তর্যামীর হাতে; সমাজ-বিপ্লবে যে-সাম্য ঘটে, সেটা মনের ভিতরে নয়, বাইরে।

বিদেশী, বিধর্ম্মী রাজা সমাজ-সংস্থাপক হ'তে পার্‌লেন না, ইচ্ছা কর্য়ে হ'লেন না। কিন্তু প্রবল রুদ্ধ ইচ্ছার কপাট খুল্যে দিলেন। বহুকালের বৃহৎ বল্মীক-স্তূপ ভগ্ন হ'ল, ঝাঁকে ঝাঁকে পুত্তী উড়্যে পুরাতন ধর্ম-কর্ম আচার-ব্যবহার অন্ধকারে ছেয়ে ফেল্‌লে। হিন্দু, নামে মাত্র হিন্দু রইল; নিজের দীপের আলো দেখ্‌তে পেলে না, পশ্চিমের প্রখর দীপে আলো ও আঁধার বিকট হ'য়ে দাঁড়াল। বিকট দৃশ্য কেউ দেখ্‌তে পারে না। রাজা কে, যে, প্রজার কাছে এত বড় হয়ে দাঁড়াবেন? পিতা কে, যে, পুত্র তাঁর আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে? প্রভু কে, যে, ভৃত্য পদসম্বাহন ক'র্‌বে? সে নর কে, যে, নারীকে দাসী হ'তে হবে? কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়, সবাই সমান। ভারতী প্রজা রাজার কাছে সমান হ'তে গিয়ে দেখ্‌লে পশ্চিমের পক্ষে পশ্চিম সত্য, পূর্ব্বের পক্ষে নয়। রাজাও ব'ল্‌লেন, তাঁদের পোষাক এদেশে প'র্‌লে সর্দ্দিগর্ম্মি হবে। ভারতী দেশে-বিদেশে বাড়ীর বাইরে কোথাও মান পেলে না, কাজেই বাড়ীর ভিতরে সে

মান আদায় ক'র্‌তে বস্যে গেছে। বড় হবার ইচ্ছা নয়, বড় প্রমাণ ক'র্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে। কোথাও গলার জোরে, কোথাও লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে, কোথাও ধর্‌ণা দিয়ে, কোথাও রাজার দোহাই চেয়ে, কোথাও রাজার পোষাক পর্যে, বড় প্রমাণ ক'র্‌তে লেগে গেছে। কিন্তু মানুষের স্বভাবও এই, সে বড়কে সইতে মান্‌তে পারে, কিন্তু বড়াই দেখ্‌লে জল্যে উঠে। এই যে ঘরে-বাইরে বিরোধ, তা রাষ্ট্রবিপ্লব হ'তেও দারুণ।

নিম্নজাতির উচ্চ হবার ইচ্ছা বুঝ্‌তে পারি। ইহাতে আত্ম-সম্মান জন্মে। সে যে ছোট নয়, এই জ্ঞান জন্মিলে হিন্দু সমাজেরই মঙ্গল। কিন্তু উচ্চজাতিও যে উচ্চতর, উচ্চতম, প্রমাণ ক'র্‌তে ব্যগ্র, তার কারণ ঘরে মানের আশা, যেহেতু বাইরে নাই। তাঁরা বলেন, যেটা সত্য সেটা গ্রহণ ক'র্‌ছেন; কিন্তু বলেন্‌ না, এতকাল সে সত্য কোথায় ছিল, এত কাল সত্যান্বেষণ হয় নাই কেন। পূর্ব্বকালে আর্য্যেরা চারি বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। তার পর বর্ণসঙ্কর হয়ে নানাজাতির উৎপত্তি হয়েছে। এখন যদি জাতিভেদ গিয়ে বাস্তবিক চারিবর্ণ ফির্যে আসে, সমাজের পক্ষে মঙ্গল। যদি চারিবর্ণ গিয়ে আর্য্য বা আর কোন নামে হিন্দুসমাজ ঘরে ও বাইরে পরিচিত হ'তে পারে, তা হ'লে দেশের পক্ষে আরও মঙ্গল। হয়ত শাস্ত্রের কথা ফ'ল্‌তে আরম্ভ হয়েছে, আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না,—কলিকালে লোকে এক-আকার এক-বর্ণ হবে। কিন্তু জড়রাজ্যে যেমন, যেটা চলে সেটা চ'ল্‌তে থাকে, থামে না; মনের ভাবও তেমন, যেটা আছে, সেটা থাকে। অন্যদিকে প্রবল আকর্ষণ না হ'লে গতি বা গতিপথ পরিবর্ত্তিত হয় না। এতকালেও হিন্দু বুঝ্‌তে পারে নাই, সেদিন আর নাই। বণিকের বাড়ীতে ডাকাৎ পড়্যেছে; গাঁয়ের লোক ভাব্‌ছে ডাকাতে খৎগুলা পুড়িয়ে দিয়ে গেলে কালী মায়ের পূজা দিব। রাক্ষস এসে ব্রাহ্মণের কন্যা হরণ ক'র্যে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাক্ষসবধ রাজার কাজ, প্রজার নয়। মনের এই যে অবস্থান, তার পরিবর্ত্তন না হ'লে বড় কি ছোটই বা কি?

শুনি, পুরাকালে এদেশে কেবল কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যের বাস ছিল। কতকাল পরে শ্বেতবর্ণ আর্য্যেরা এস্যে দেশের এক কোণে বস-বাস আরম্ভ ক'র্‌লেন। ক্রমে তাঁদের পরিবার বাড়্‌তে লাগ্‌ল, পূর্ব্বের ভিটা-মাটিতে কুলাল না, নূতন নূতন স্থানে গাঁ পত্তন ক'র্‌তে হ'ল। প্রথম প্রথম অনার্য্যেরা এই নূতন মানুষগুলির রীতি-নীতি কৌতূহল-দৃষ্টিতে দূর হ'তে দেখ্‌ত। কিন্তু এরা ত মানুষ ভাল নয়, গাঁকে গাঁ জুড়্যে ব'স্‌ছে, মাঠকে মাঠ চষ্যে ফেল্‌ছে। আমরা যাই কোথায়, কেনই বা পৈত্রিক ভিটা ছাড়্‌ব। তখন যা হয়, তা হ'তে লা'গ্‌ল। আর্য্যেরা ব'ল্‌লেন, "তোদের মতন দস্যি কোথাও দেখি নি! তোদের কোনও ক্ষতি ক'র্‌ছি না, তবু তোরা আমাদের ক্ষতি ক'র্‌বি? বানরমুখো কি না, কৃষ্ণবর্ণ কি না, অসভ্য কি না; তোদের ভাল মন্দ জ্ঞান কি আছে?" কিন্তু গর্জ্জনে ফল হ'ল না। অসভ্যগুলা তীরধনুক নিয়ে লড়াই ক'র্‌তে এল, দুর্ভেদ্য দুর্গে লুকাতে লাগ্‌ল। তখন গোত্রে গোত্রে ডাক্ হাঁক সাড়া পড়্যে গেল, লোক জমায়েৎ হ'ল, যগ্‌গি-কাণ্ড হ'ল। একত্র ভোজন হ'ল। "হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র শত্রুগুলার মাথায় নিক্ষেপ কর; হে বরুণ, শত্রুগুলাকে রশি দিয়ে বেঁধ্যে ফেল; হে অগ্নি, ওদের ঘর দুয়ার পুড়িয়ে ফেল। তোমরা সবই জান, দস্যিরা অন্যায় ক'র্‌ছে, আমাদের যাগযজ্ঞে বাধা দিচ্ছে।" দেবতারা স্তুতি শুনলেন, অনার্য্যের পরাজয় হ'ল, উৎসব চ'ল্‌ল।

ঠিক এই ভাব নিয়ে গত মহাযুদ্ধে প্রত্যেক জাতি বল্যেছিল, আমাদের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, ঈশ্বর তা নিশ্চয়ই জানেন। যখন ব্রহ্মদেশের অসভ্য রাজা নিজের সিংহাসন ভালয় ভালয় ছাড়্‌তে চাইলে না, তখন সভ্য ইংরেজ তাকে ডাকাৎ ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। আর যখন ডাকাৎটা বন্দী হ'ল, তখন কলিকাতার গির্জায় গির্জায় ঈশ্বরের মহিমা গান হয়েছিল। যখন মুসলমান এদেশে ঢুক্যে দেখ্‌লে, হিন্দুরা বশ্যতা মান্‌তে চায় না, তখন শাস্ত্র বাহির হ'ল, কাফেরের সঙ্গে মৈত্রী নিষিদ্ধ।

আর্য্যেরা অনার্য্যদিকে ঘৃণা ক'র্‌তেন। অনার্য্যদের লেখা ইতিহাস থা'ক্‌লে দেখ্‌তাম, তারাও আর্য্যদিকে ঘৃণা ক'র্‌ত। কারণ কোন্ জেতা তার বিজিতকে ভালবাসে এবং কোন্ বিজিত তার জেতাকে বন্ধুজ্ঞানে পূজা ক'র্‌তে

পারে? শুধু যে একের প্রভুত্ব অন্যের দাসত্বহেতু দ্বেষ জন্মেছিল, তাও নয়। আর্য্য ও অনার্য্য দুই র-য় (race)। যে সূত্রে হ'ক, দুই রয় পরস্পর সম্মুখীন হ'লেই কে বড় কে ছোট, এই তুলনা চ'ল্‌তে থাকে। আর্য্যেরা বলবান্, সুতরাং তাঁরা যে বড়, তা স্বীকার ক'র্‌তেই হ'ত। তাঁদের গুণোৎকর্ষ দেখ্যে অনার্য্যদের ঈর্ষ্যা হ'ত। কিন্তু ঈর্ষ্যা এইখানেই থামে না! ক্রোধের সহিত যুক্ত হয়। যেন অনার্য্যেরা ব'ল্‌ত, আর্য্যেরা কেন বড় হবে। এই 'কেন' খুঁজ্‌তে গিয়ে কিন্তু নিজেদের অপকর্ষ দেখ্‌তে পেলে না; দেখ্‌তে পেলে আর্য্যদের দুষ্টামি। "কেমন করো জান্‌লে?" "দেখাই যাচ্ছে, তাদের দুষ্টামি না থাক্‌লে আমারা বড় হ'তাম!" এই উত্তর নূতন নয়। সে আমার অপকার ক'র্‌ছে, আমি তার অপকার ক'র্‌তে পার্‌ছি না, তারই জন্যে পার্‌ছি না, এই ত দ্বেষ। সে ত আমার নয়, আমার বংশের নয়, জাতির নয়, ধর্ম্মের নয়, দেশের নয়। এমন লোকই ত অপকার করে। রয়িক দ্বেষের তুল্য স্থায়ী ভাব, বোধ হয়, আর নাই। এর গোড়ায় সন্দেহ ও ভয়। ইহাকে জীবন-সংগ্রামও ব'ল্‌তে পারি। আমেরিকায় কৃষ্ণবর্ণের প্রতি সাম্যবাদী ভ্রাতৃ-সম্বন্ধী শ্বেত-বর্ণের ঘৃণা ঘুচ্‌তে বহুকাল লাগ্‌বে। এদেশের ফিরঙ্গী ইংরেজের কাছে কাছে চলে, তবু ফিরঙ্গীকে ইংরেজ সমান ভাব্‌তে পারে না; পাঠান ও মোগলের বনিবনাও কখনও হ'ত না, যদিও উভয়েই মুসলমান। ইয়ুরোপে সমবর্ণ খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে যুদ্ধ হ'ল, কারণ সকলের রয় এক নয়। আয়ার্লণ্ড এত কাল এক রাজ্য-গর্ব ভোগ ক'র্‌ছিল, সমাজে এক ছিল, কিন্তু ইংলণ্ড যে পর, তা ভুল্‌তে পার্‌লে না। এমন কি, শুন্‌তে পাই, স্কট্‌লণ্ডও পৃথক হতে চায়; কেন না ব্রিটন নয়।

এখন যা দেখ্‌ছি, পূর্বকালেও তাই ঘ'টত। পূর্বকাল কেন, একালেও ঘট্‌ছে। উন্নতিকামী শূদ্রেরা ব'ল্‌ছে, ব্রাহ্মণের দুষ্টামি-হেতু তারা অবনত হ'য়ে আছে। বঙ্গদেশে একথা তত স্পষ্ট শোনা যায় না। কারণ শূদ্রের বহু ভাগ আছে, আর অনেক ভাগ বড়ও আছে। সুতরাং দল বেঁধ্যে ব্রাহ্মণের বিপক্ষে দাঁড়াবার দর্‌কার হয় নাই! হিন্দুশাস্ত্রে চারি বর্ণের অধিক বর্ণ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু কতকগুলি জাতি চারি বর্ণের মধ্যে পড়ে না। ইহারা হিন্দু, কিন্তু অবর্ণ। মাদ্রাজে বলে পঞ্চমবর্ণ, সংক্ষেপে 'পঞ্চম'। বোম্বাই অঞ্চলে ইহারা 'মারাটা'। দক্ষিণাপথের সর্বত্র হিন্দুজাতি দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, সবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আর অবর্ণ অর্থাৎ অ-ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশেও নাকি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বই অন্য জাতি নাই।

দুই রয় যদি একই বর্ণ হয়, দুয়েরই যদি গায়ের রং এক হয়, তা হ'লে রয়িক দ্বেষ তত প্রকট হ'তে পারে না। বেদের সময়ে 'ব্রাত'নামে এক যাযাবর জাতি আর্য্যদিকে উত্যক্ত ক'র্‌ত। বোধ হয় এই ব্রাত জাতি বর্ত্তমান বেদিয়া জাতির আদি। সে যা হ'ক, ব্রাতজাতি কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। সচ্ছন্দে পরে 'ব্রাত্য' নামে আর্য্যসমাজে মিশ্যে গেছে। তার পর কত যবন শক হূণ, হিন্দু হ'য়ে গেছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু বেদের 'দস্যু' কৃষ্ণবর্ণ ছিল। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ বৈষম্যহেতুতে রয়-বৈষম্য প্রকট হয়ে দাঁড়াল, স্বজাতি বিজাতি বুঝ্‌তে কষ্ট হ'ল না। অনেক পশু গা শুঙ্গ্যে বা দূর হ'তে গন্ধ পেয়ে স্বজাতি বিজাতি ঠাওরাতে পারে। সমগন্ধী স্বজাতি, বিষমগন্ধী বিজাতি। স্বজাতি মিত্র, বিজাতি শত্রু। উপকথায় আছে, রাক্ষসী ও পিশাচী দূর হ'তে মানুষের গন্ধ টের পায়। মানুষের ঘ্রাণশক্তি তত প্রখর নয়, কাছে না পেলে কোন্ মানুষ শত্রু, কোন্ মানুষ মিত্র, তা বুঝ্‌তে পারে না। প্রিয় পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করো বুঝি, সে আমার আপনার। কিন্তু দূরে থাক্‌লে দেখা ভিন্ন উপায় নাই। যে কাল, সে যে দুষ্‌মন, তাতে আর সন্দেহ কি। নইলে কাল হবে কেন, আমার মতন গোরা হ'ত। চুরি-ডাকাতি যত দুষ্কর্ম, সব অন্ধকারে হয়। ঘুট্‌ঘুটি আঁধারে বাইরে যায়, কার সাধ্য! ভূত-প্রেত সব কাল। তারা অন্ধকারে থাকে, অন্ধকার পক্ষে প্রেতকার্য্য ক'র্‌তে হয়। এক-একটা লোক যেন কাল ভূত, তাদের কাছে যেতেও ভয় হয়। ডাকাৎগুলা মিস্-মিস্যে কাল নিশ্চয়। রাহু কেতু, দুটাই কাল; অমন স্বর্ণকান্তি চন্দ্র-সূর্য্যকে কাল করো ফেলে, পৃথিবীটাকে অন্ধকারে ঢাকে। তাড়াও, তাড়াও; শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও। গঙ্গাস্নান কর,

কালর ছায়া গায়ে লেগেছে। কালর সঙ্গে মিশ্‌বে না, তাকে ছোঁবে না, তার ছায়াও মাড়াবে না।

একথা কাকেও ব'ল্‌তে হ'ত না, শেখাতে হ'ত না। গ্রামের ভিতরে কাল ভূতদের (black niggers) বাসের স্থান ছিল না। তারা থাক্‌ত বাইরে। এতে গোরা সুখী, কালারাও সুখী। কালারাও সব এক জাতি, এক রং ছিল না. তারা গোরা নয়, আর্য্য নয়, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তারাও জাতিবিচার করে্য চ'লত। তাদের বিচার আরও কড়া। কাজেই তারাও এক পাড়ায় একত্র থাক্‌তে পার্‌ত না। তারা যদি পরস্পর মিল্‌তে পার্‌ত, তা হ'লে আর্য্যদিকে দেশ ছেড়্যে পালাতে হ'ত।

কিন্তু সকল কালা সমান নয়। কেউবা একটু মানুষের মতন, কেউবা আর্য্যদিকে একটু মান্‌তে লাগ্‌ল। আর্য্যেরাও বাঁচ্‌লেন, যত ইচ্ছা তত দাস ও দাসী পেতে লাগ্‌লেন। পূর্ব্বে তাঁদের মধ্যে ভর্ত্তা ও ভৃত্য ছিল; এখন দাস ও দাসী কিন্‌তে পাওয়া গেল। এরা বাড়ীতে থাক্‌তে লাগ্‌ল, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ও ক'ম্‌তে লাগ্‌ল। তা ছাড়া, সবাই কিছু জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না। দাসীর সন্তান জন্মিতে লাগ্‌ল। রাক্ষস-বিবাহ, পিশাচ-বিবাহ নামে বিবাহও স্বীকার ক'র্‌তে হ'ল। ক্রমে অনেক অনার্য্য কালা, আর্য্য আচার-ব্যবহার শিখ্যে তাঁদের সমাজের এক কোণে ব'স্‌তে আসন পেলে। পেলে বটে, কিন্তু শূদ্র নামে ক্ষুদ্রত্বের ছোটত্বের দাগ রয়ে গেল। কিন্তু বড় লোকের 'দাস' বল্যে তাঁদের নিকট 'ক্ষুদ্র' বল্যে পরিচয়ের সৌভাগ্যও সকল কালার ঘ'টল না। তারা 'হীন' জাতি, আর্য্য পরিবারের বাইরে।

দেশের গুণেই হ'ক আর কালের গুণেই হ'ক, হিন্দুর নিকট বৈষম্য প্রত্যক্ষ। সেই আদ্যকাল হ'তে সৃষ্টি-বৈষম্য হিন্দুকে অভিভূত করে্যছে। তাঁরা দেখেছিলেন, বৈষম্যেই সৃষ্টি ও স্থিতি, সাম্যে লয় বা সং-হা-র। এই ভাব কত ছন্দে কত প্রকারে যে প্রকাশ করে্য গেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। অতএব সকলেরই স্থান আছে, স্ব স্ব আসন দেখ্যে ব'স্‌তে পার্‌লেই হ'ল। যখন প্রথমে বস্যেছিল, তখন বর্ণভাগও হ'য়ে গেছ্‌ল। তখন জাতিনাম ছিল না. ছিল চারিবর্ণ। গায়ের রং দেখ্যে আদিকালে বিভাগ হয়েছিল, পরে নানা কারণে রং দেখ্যে গুণ ও কর্ম্ম বিচার কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কে বড় কে ছোট, সে পরীক্ষা বহুবার হয়ে গেল। শেষে মিলন হ'ল—ক্ষত্রিয় রাজা হলেন, ব্রাহ্মণ হলেন মন্ত্রী। তখন বৈশ্যকেও অর্থাৎ প্রজাকেও তা মান্‌তে হ'ল, শূদ্রের ত কথাই নাই। ফলে চারিবর্ণের স্মৃতি এক হয়ে গেল, ঋষিদের গোত্রে মনের গোরু চ'র্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু একের স্মৃতি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে গোঁজা-মিল দিতে হয়। আচার-ব্যবহারের হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে, কৈফিয়ৎ দিতে পারা যায় না। যারা সে-স্মৃতির মধ্যে আসে, তারা জানেও না, গোঁজা-মিল আছে। পূর্ব্বের রঙ্গিক স্মৃতি ঘুচ্‌বার নয়। বর্ণ স্মৃতি ও জাতি-স্মৃতিও বলবান্‌। আমরা বলি, সংস্কার। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার রক্তমাংসে জড়িয়ে যায়, বংশক্রমে পুত্র-পৌত্রাদিতে সঞ্চারিত হয়। পরস্পর বিবাদ না হ'লে রং বা বর্ণ বা জাতির ধর্ম্ম বা সংস্কারের মিলন হয় না। কিন্তু স্মৃতিও এমনই যে, পরস্পর মিল্‌তে চায় না, পরস্পর বিবাহে বাধা দেয়। পরস্পর একত্র ভোজনেও সেই কারণে আপত্তি। যখন বর ও কন্যা এক পাত্রে আহার করে তখন তারা এক হয়ে যায়, কন্যার গোত্রান্তর হয়। তার পূর্ব্বে হয় না। ফলে স্বাভাবিক কারণে মিলনের দুই পথই রুদ্ধ হ'ল।

কিন্তু গরজের তুল্য বালাই নাই। ক্ষুৎপিপাসা মানুষের নিত্যসঙ্গী। জানা-শোনা লোকের রান্না খেতে ভয় থাকল না। বিশেষতঃ, বড়'র হাতের অন্ন খেতে কোনও সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। সেটা বড়'র প্র-সা-দ; তাঁর 'সু' অন্নপথে হীনের দেহে চল্যে আসে। একত্র থাক্‌তে থাক্‌তে সৌহার্দ্য জন্মে। উচ্চবর্ণের পুরুষের পক্ষে নিম্নবর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্র-সম্মত হ'ল, ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রী তত দুষ্যা হলেন না। ইহার বিপরীত শাস্ত্রে রইল না বটে, কিন্তু ব্যবহারে ঘ'ট্‌তে লাগ্‌ল। তেমনই, আচার-ভ্রষ্ট দ্বিজও শূদ্র মধ্যে গণ্য হ'ত। কেন 'বড়' পুরুষ 'ছোট' কন্যা বিবাহ ক'র্‌লে দোষ হয় না, কেনই বা 'ছোট' পুরুষ 'বড়' কন্যা বিবাহ ক'র্‌লে সমাজে হাহাকার পড়ে,—

কেবল পূর্ব্বকালে নয়, একালেও—সে কথা এখন থাক্। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যে 'ছোট' সে কন্যা দ্বারা ক্রমশঃ 'বড়' হয়, আর যে 'বড়' সে পুত্র দ্বারা ক্রমশঃ 'ছোট' হয় না, চিরকাল বড়ই থাকে।

এইরূপে হিন্দু-সমাজ যে কত কাল কাটিয়েছে, কে জানে। তখন বিদেশী বিধর্মী বড়-একটা এদেশে আস্‌ত না, অল্পস্বল্প যে বা আস্‌ত, এদেশে থাক্‌তে থাক্‌তে হিন্দু-সমাজভুক্ত হয়ে প'ড়্‌ত। শাক্যসিংহ এক প্রবল ধাক্কা দিলেন। আমার বোধ হয়, তিনি তার বল বাহির হ'তে পেয়েছিলেন। রাজা হ'লেই ক্ষত্রিয়, শাক্যবংশও ক্ষত্রিয়। কিন্তু সেবংশের আদি কোথায়, না জান্‌লে সত্য মিথ্যা ব'ল্‌তে পারা যায় না। সে যা হ'ক, সে ধাক্কা সাম্‌লাতে গিয়ে পূর্ব্বের হিন্দু-সমাজ যে ওলট-পালট হয়ে গেছ্‌ল, তা সকলেই বলেন। এত গোঁজামিল দিতে হ'ল যে, পুরানা চালের পুরানা খড় থাক্‌ল কি না, সন্দেহ। আবার নূতন কাঠাম হ'ল, কিন্তু পুরানা কাঠখড় দিয়েই হ'ল। এমন সময় বিদেশী বিধর্মী দলে দলে যুদ্ধবেশে আস্‌তে লাগ্‌ল, চালের উপর চ'ড়্‌তে লাগ্‌ল, লাঠির উপর লাঠি প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। পরাধীন জাতির অধীনতা কেবল দেহে ত নয়। আর, মন যদি পরাধীন হয়, তা হ'লে আপনার ব'ল্‌তে কিছুই থাকে না। যে জাতিই হ'ক, তার আত্মরক্ষার বর্ম মাত্র একটি, তার স্মৃতি। আচারে ও ব্যবহারে হিন্দুকে পৃথক্ থাক্‌তে হ'ল, জাতি-বিভাগ দুরতিক্রমণীয় হ'ল, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মাহাত্ম্য বেড়্যে গেল। ক্রিয়া যত প্রবল হয়, প্রতিক্রিয়াও তত প্রবল হয়। বর্ত্তমান কালেও পাশ্চাত্য ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া চ'ল্‌ছে। আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের স্মৃতি ডুবিয়ে দিয়ে আমাদের চিত্ত অধিকার ক'র্‌তে বস্যেছে, ইংরেজ রাজা আমাদের যাবতীয় কার্য্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা হওয়াতে আমরা কলের পুতুল হয়ে প'ড়্‌ছি। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালর দিক্ দেখ্‌তে পার্‌ছি না, তা নয়; কিন্তু নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। আশঙ্কা, পাছে আমরা হারিয়ে যাই। তাই মহাত্মা গন্ধী ব'ল্‌ছেন, তোমার রেল চাই না, কল চাই না। প্রাচীন স্মৃতি-কার এইরূপ দুঃসময়ের নিমিত্ত লিখ্যে গেছেন, "বাপু, আপনাকে হারিও না, আঁকড়্যে থেকো।" এই উপদেশ না দিলেও ফল তাই হ'ত। হিন্দুত্বের এই সঙ্কট-কালে চিত্তের যাবতীয় বহির্মুখী ক্রিয়া স্তব্ধীভূত হ'ল। পূর্ব্বের অনুলোম বিবাহ উঠ্যে গেল, মুরা-নামক অনার্য্যজাতির কন্যা-হেতু মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি অসম্ভব হ'ল। পারসিকেরা প্রথম যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন তাঁরা মঘী-নামে হিন্দু-জাতি-বিশেষে পরিগণিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন এলেন, তখন ভারতের সেদিন নাই, বোম্বাইর পার্সীরা আর মঘী ব্রাহ্মণ হ'তে পার্‌লেন না। কারণ হিন্দু বিশ্বাস করেন, কাল অনন্ত, পরলোকে মুক্তির পথ অগণ্য। যে যে-পথই ধরুক, সকলের গন্তব্য এক। কে কোন্ পথে চ'ল্‌বে, সে তার ইচ্ছা। কিন্তু যদি সমাজে থাক্‌তে চাও পরের অধীনতা স্বীকার ক'র্‌তেই হবে। সে অধীনতাও আর কিছুতে নয়, আচারে।

এই উদার মত হিন্দুকে একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট, অন্যদিকে তেমন নিকৃষ্ট করেছে। 'তুমি স্বাধীন,' 'তুমি স্বাধীন,' ব'ল্‌তে গিয়ে পরস্পর সংহতি-শক্তি হারিয়েছে। তোমার শক্তি তোমার হাতে, কেউ দিতে পার্‌বে না; তোমার মুক্তি তোমার ইচ্ছায়, কেউ চালাতে পার্‌বে না। এই যে বিশ্বাস, হিন্দুর এই যে সংস্কার,—ইহাই তার স্বরাজ্য হারাবার মূল।

জগতে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। পরমাশ্চর্য্য এই যে, সর্ব্বত্র দ্বন্দ্ব; ভৌতিক জগতে দ্বন্দ্ব, মানসিক জগতেও দ্বন্দ্ব; দুই বিমুখী শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। একটু চিন্তা ক'র্‌লে, ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। যে হিন্দু সর্ব্বজীবে সমদর্শী, যার কাছে ভয় বল্যে কিছু থাক্‌তে পারে না, সে হিন্দুই জাতিবিচারে অগ্রগামী, সকল কাজে ভয়ে আকুল! শৌণ্ডিকনন্দন—তার কোন্ পুরুষে সুরা-ব্যবসায় ছিল, তার ঠিকানা নাই—শিবমন্দিরে প্রবেশ ক'র্‌বে, এই দুশ্চিন্তায় ব্রাহ্মণ কাতর; কিন্তু সুরাপান যে-ব্রাহ্মণের মহাপাতক, সেই মহাপাতকীর প্রবেশে কোনও চিন্তা হয় না! ইহা উপহাসের কথা নয়। দু-দশ জনের কপটতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু হীন জাতির স্পর্শে ব্রাহ্মণের আর্ত্তা সত্য। যেটা সত্য, তোমার কাছে না হ'ক, তাঁর কাছে

যেটা সত্য, সেটাকে 'ছুঁৎমার্গ' বল্যে ধিক্কার দেওয়া, আর ভূতগ্রস্তকে ভীরু বল্যে উপহাস করা, একই, একই প্রকার নিষ্ঠুরতা। বেত্রাঘাতে ভূত ভাগানা যায় বটে, কিন্তু ভূতগ্রস্তের মানসিক বৈকল্যের পরিণাম শুভ হয় না। যার কণামাত্র কারুণ্য আছে, সে এই দুঃসাহসে যাবে না। বিদ্যালয়ের বালক যখন পড়া শিখতে না পারে, তখন যদি গুরুমশায় বালককে 'নির্বোধ গাধা' বল্যে বেত্রাঘাত করেন, তিনি বালকের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। আর যেটা স্বীকার করেন না, সেটা না বলাই ভাল। সমাজসংস্কারক ব'ল্‌ছেন, কু-সংস্কার। কু-সংস্কারই ত। সে কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু একথাও স্বীকার ক'র্‌তে হবে, কু-সংস্কার কেবল ভয়ার্ত ব্রাহ্মণের একার অধিকার নয়। সকলেরই আছে, কারও এ বিষয়ে, কারও সে বিষয়ে। শনি বৃহস্পতির বারবেলায় যে কর্ম নিষ্ফল হয়, কিংবা মঘানক্ষত্রে যাত্রা ক'র্‌লে যে বিপদ্ ঘটে ইহার কোনও যুক্তি আছে কি? কিন্তু যে কারণেই হ'ক, যারা মান্‌তে শিখেছে, তারা কি সহজে মানে, মেন্যে সুখ পায়? কত লোক জানে ভূত নাই, তবু তারা ভূতের ভয় করে। কত হিন্দু ছাগ ও মেষ ও মহিষ বলি দিচ্ছে; কিন্তু গোরু বলির নাম শুন্‌লেই ক্ষেপ্যে ওঠে। গো-বধে পাপ লেখা আছে স্মরণ ক'র্‌তে হয় না। পাপও গুরুতর নয়, তার প্রায়শ্চিত্তও আছে। তেমনই মুসলমান যখন বরাহ-মাংস দেখ্‌লে পাগল-পারা হয়, কোরানের নিষেধ তার সম্পূর্ণ কারণ নয়। এই নিষেধ যদি বলবান্ হ'ত, তা হ'লে কোনও মুসলমান কখনও সুরাস্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌ত না।

সবর্ণ অবর্ণের অন্ন, ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন, শূদ্র হীন জাতির অন্ন ভোজন ক'র্‌তে পারে না। কেন পারে না? ভয়ে। কি ভয়? ভয় এই, ভোজন ক'র্‌লে সবর্ণ অবর্ণে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে, শূদ্র হীনজাতিতে প-রি-ণ-ত হয়। নিজের জাতি নষ্ট হয়, অন্নদাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। যিনি সবর্ণ বা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অবর্ণ বা শূদ্র, যে শূদ্র ছিল, সে হীন হয়ে পড়ে। ইহার তুল্য দুর্ভাগ্য বাস্তবিক আর কি আছে? ইহার দৃষ্টান্ত গোবধ ক'র্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জেন্যে শুন্যে মার্‌লে ত কথাই নাই; অপালন হেতু কারও গোরু ম'র্‌লে, সে গোরু হয়ে যায়; গলায় দোড়ী, দাঁতে তৃণ নিয়ে, বাক্‌রোধ করে্য গোরুর ডাক ডাক্‌তে থাকে। অথচ শাস্ত্রে এই দারুণ দুর্দশা লিখিত নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তত কঠোরও নয়। এই বিশ্বাসের নিশ্চয়ই মূল আছে। তেমনই, শূদ্রের অন্নগ্রহণে ব্রাহ্মণের যে শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, এই বিশ্বাসেরও মূল আছে।

এই মূল বহু বহু প্রাচীন। এত প্রাচীন যে, ঋগ্‌বেদও তত প্রাচীন নয়। সে-কালের ঘটনা অতীতের সাগর-তলে ডুব্যে গেছে, কিন্তু জলের রঞ্জন অদৃশ্য হয় নাই। জীব-জাতি মাত্রেই জাতিস্মর, নইলে পক্ষী পক্ষী থাক্‌ত না, পশু পশু থাক্‌ত না, মানুষ মানুষ থাক্‌ত না, আম ও জাম আম ও জাম থাক্‌ত না। জাতিস্মর বটে, কিন্তু সে স্মৃতি কারও জানা নাই। যখন আর্য্য ও অনার্য্য, দুই রং সমুখে সমুখে হয়েছিল, তখন উভয়েই জান্‌ত, উভয়ে এক রং নয়, এক জাতি নয়, একে অন্যের বি-রং, বি-জাতি। এই 'বি' উপসর্গ সংসারে যে কত কাণ্ড ক'র্‌ছে, তা লিখ্‌তে হ'লে সাতকাণ্ড রামায়ণেও কুলাবে না। অথচ বৈষম্যেই সৃষ্টি ও স্থিতি। আর্য্যের নাম ব্রাহ্মণ হ'ক সবর্ণ হ'ক, আর অনার্যের নাম শূদ্র হ'ক অবর্ণ হ'ক, সেই প্রাচীন কালের 'বি' অবিশ্বাসের খনি, সেটা আজাড় হয় নাই। সেই যে কালকে 'কু' মনে করা মানব-সৃষ্টির আদ্যকাল হ'তে গোরার মনে জাগ্‌ছে, যাকে আশ্রয় করে্য ভূত-প্রেতের লম্ফ-ঝম্ফ, তেল-চক্‌চক্যে কাল-কুচকুচে ডাইনীর কুদৃষ্টি, সেই কাল জুটে্য 'বি'কে ভুল্‌তে দিচ্ছে না। 'বর্ণ' আর কিছু না হ'ক, কাল রং নয়। গিন্নী বউএর 'রং' চান; সে রং কাল নয় শ্যাম নয়, উজ্জ্বল শ্যাম নয়, ফর্‌সাও নয়; সে রং গোরা! সম্বাদ-পত্রে বিবাহের বিজ্ঞাপনে, পাত্রী 'সুন্দরী হওয়া চাই, নাক মুখ চোখ যেমনই হ'ক, কাল চ'ল্‌বে না। আশ্চর্য্য এই, যে-পাত্র গোরা নয়, যে-পাত্র শূদ্র, সেও গোরা কন্যা চাচ্ছে। অথচ লেখাপড়া-জানা পাত্র মহাভারতে পড়্যেছে, কাল দ্রৌপদীকে লাভ ক'র্‌তে গিয়ে সেকালের রাজন্যবর্গ অস্ত্রা-অস্ত্রি করে্যছিলেন। ইহাতে বোধ হ'চ্ছে, শ্বেত ও কৃষ্ণের বিরোধ লোকে ভুল্‌তে চাচ্ছে। কতকাল গেছে, বর্ণে বর্ণে কত মেলামেশা ঘট্যেছে, অদ্যাপি ব্রাহ্মণ গোরা, শূদ্র কাল ব'ল্‌তে পারা যায়।

নানা কারণে বঙ্গদেশে এই প্রভেদ তত স্পষ্ট নয়, অস্পৃশ্যতার অপবাদও তত প্রকট নয়। কিন্তু দক্ষিণাপথে পঞ্চমবর্ণ কাল, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গোরা। কৃষ্ণবর্ণ, আকৃষ্ণ বা আগৌর ব্রাহ্মণ আছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মিস্-মিস্যে কাল নহেন। সবর্ণেরা দূরে থাকতে চান, পঞ্চমের সংসর্গে আসতে চান না। এটা কু-সংস্কার ব'লতে পারেন, কিন্তু এই কু-সংস্কার কোথায় নাই? আভিজাত্যের, কৌলীন্যের বড়াই না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় হবে। লোকে মনে করে, সবর্ণেরা অবর্ণকে ঘৃণা করে। কিন্তু ঘৃণা মুখ্য নয়, অবজ্ঞাও নয়; ভয় মুখ্য, ঘৃণা ভয়ের আনুসঙ্গিক ফল। ব্রাহ্মণ বলেন, অবর্ণেরা শৌচাচার-হীন; এই কারণে তিনি দূরে থাকতে চান। আসল কথা, হীন জাতি কু-এর প্রতিমূর্ত্তি, এই সংস্কারে বিসম্বাদ জন্মেছে। অবর্ণকে তিনি ভয় করেন, পাছে তার কু তাঁর দেহে সংক্রামিত হয়। দৈবাৎ যদি স্পর্শ ঘটে, আর তিনি জানতে পারেন, তা হ'লে দুশ্চিন্তা আসে —তাঁর কিংবা তাঁর প্রিয় জনের ঘোর অনিষ্ট হবে। স্নান করো, প্রায়শ্চিত্ত করো আক্রান্ত 'কু' তাড়াতে চেষ্টা করেন। এই ভয় অবর্ণও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেও সবর্ণকে ভয় করে, মনে করে সবর্ণের স্পর্শে তার অনিষ্ট হবে। তার সাধ্য কি, ব্রাহ্মণকে স্পর্শ ক'রবে, দেবালয়ে ঢুক্যে প'ড়বে। যে-পথে সবর্ণেরা যাতায়াত করেন, সে-পথ অবর্ণও ত্যাগ করে, এবং যদি সে-পথে যেতে হয়, তখন ব'লতে ব'লতে যায়, 'পঞ্চম' যাচ্ছে।

একথা বুঝতে হবে, যাকে ভয় করি, তাকে ঘৃণা করি, এইজন্য সে যেন আমাকেও ঘৃণা করে, আমার কাছে না আসে। কারণ উভয়ে দূরে দূরে থাকলে উভয়েরই মঙ্গল। অবর্ণের পক্ষে ঘৃণা তত স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট ভয়। সে ভয়ও তর্জন ও গর্জনের। "ঐ বুঝি কাপড়খানা কুকুরে ছুঁয়ে গেল" বিপথগামী কুকুরটা যদি আমার কাপড়কে ঘৃণা করত তা'হলে আমায় তর্জন ক'রতে হ'ত না। ভাইকোমে মন্দির-পথ নিয়ে অবর্ণ ও সবর্ণে যে বিবাদ চ'লছে, তার মূল ভাসা-ভাসা নয়, দুই রয়ে বিরোধ, কালতে গোরাতে বিরোধ। অবিশ্বাসী ইংরেজ রাজা এই বিরোধ মানছেন না, কারণ সেটা প্রজায় প্রজায়। ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীও দেখি মানতে পারছেন না, কারণ তা হ'লে রাজার সহিত বিরোধও মানতে হয়। তাই সবর্ণের পরাজয়, অবর্ণের জয় হ'চ্ছে। কিন্তু এই জয় যে প্রহার দ্বারা ভূত-ভাগানা, তা ভুললে চ'লবে না। যেহেতু সবর্ণ জাতি লোকের আত্ম-হত্যা দেখতে পারে না, দেখলে তার মনে কষ্ট হয়, ভাবি অনিষ্ট আশঙ্কা করে, অতএব তার পথে তার দুয়ারে 'হত্যা' দিয়ে পড়,—এর তুল্য নিষ্ঠুর প্রহার আর নাই। এখানে কি 'সত্য' আছে, যার জন্য আত্মহত্যা পণ ক'রতে হবে, তা আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে আসছে না! 'ধরণা' দিয়ে প'ড়লে হ'তে পারে ফললাভ, কিন্তু সেটা হিংসা। "আমি তোমারই মতন মানুষ"—এটা, এই ভাব আমার কাছে সত্য বটে; কিন্তু তোমাকে উৎপীড়িত করো আমার এই সত্য-প্রচার অহিংসা নয়, হিংসা। এই কারণে মহাত্মা গন্ধী যেখানে সেখানে সত্যা-গ্রহ অনুমোদন করেন না। ভাইকোমের সবর্ণ জাতির কারুণ্য নাই, তা ত নয়! কিন্তু অনিষ্ট-পাতের আশঙ্কা প্রবল হয়ে কারুণ্যকে রুদ্ধ করেছে। আর এক আশঙ্কাও আছে। আজ মন্দিরের পথ ছেড়্যে দিলে কাল অবর্ণ মন্দিরে প্রবেশ ক'রতে চাইবে। সে যে আরও বিপদ; দেবতা অবর্ণস্পর্শে দেবত্ব ছাড়বেন! ছাড়লে, সবর্ণ কাকে আশ্রয় করো বাঁচবেন? নির্ব্বোধ বলে, "হে ব্রাহ্মণ, তোমার ব্রহ্মতেজে আমার কু-কে ভস্ম ক'রতে পারছ না? তোমার দেবতাও আমার কু-কে ভয় করেন? তা হ'লে দেখছি, তোমা অপেক্ষা, তোমার দেবতা অপেক্ষা আমার শক্তি অধিক।" লোকে নিজের ছিদ্র দেখতে পায় না, তাই এ ভাবে তর্ক করতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকায় নিগ্রোদের সম্মিলন হ'চ্ছে। তাতে খৃষ্টান নিগ্রো ব'লছে, তাদের ঈশ্বর কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতজাতির শ্বেতবর্ণ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে তাদের অধঃপতন হয়েছে।

কেহ কেহ বলে ভাইকোমের মন্দির-পথে মুসলমান ও খ্রীষ্টান যেতে পারে, সবর্ণেরা আপত্তি করেন না, কিন্তু অবর্ণ গেলেই তাঁরা বাধা দেন,—এটা ভণ্ডামি, দুষ্টামি বই আর কি? আমি ঠিক খবর জানি না, কিন্তু ইহা সত্য মানতে পারি। কারণ বাঙ্গালা দেশেই ইহার অনুরূপ

দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। দেখ্ছি,যাঁরা ইংরেজী-শিক্ষিত ও কুসংস্কার-বর্জ্জিত, জাতিবিচার মানেন না, কার ছোঁয়া জল কে খাচছে, কোনও চিন্তা নাই ; তাঁদের এ ভাব শহরে, পোষাকী ভাব। কিন্তু গ্রামে যেমনই পদার্পণ, অমনই সেই বাল্যকালের সেই রাস্তার ধারের বটগাছ ভূতের বাসা হ'য়ে দাঁড়ায়। শহরে সে গাছ নাই, যদি বা থাকে সে রাস্তা নাই। গাঁয়ে গেলেই সেই গাছ ডালপালা মেল্যে ঝাঁপুড়া হ'য়ে দাঁড়ায়। তলা দিয়ে যায় কার সাধ্য, গা ছম্-ছম্ ক'র্‌তে থাকে। সাহসী ব'ল্‌ছেন, "এই দেখ না, আমি যাচ্ছি, ভূত-টুত কিছু নাই।" যে দাঁড়িয়ে আছে সে ভাবছে, "তোমাকে ধ'র্‌লে না বল্যে কি আমাকেও ধ'র্‌বে না? ভূত যে আছে, তার সন্দেহ নাই। না থাক্‌লে আমার ভয় হবে কেন?" গাঁয়ের ভূত শহরে যায় না, বিদেশে সঙ্গ নেয় না, রাত দুপরে শ্মশান মাড়িয়ে গেলেও কিছু বলে না। মুসলমান ও খ্রীষ্টান সে বটগাছ নয়, কু ক'র্‌বার যে শক্তি আছে, তা'রও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তারা হিন্দু নয়, কোনও দিন মন্দিরে ঢুক্যে ঠাকুর পূজা ক'র্‌তেও ব'স্‌বে না।

মনের ভিতর ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয় না থাক্‌লেও সামাজিক শাসনের ভয় থাকে। সমাজ 'পতিত'কে এক-সঙ্গে খেতে দেয় না, এক-ঘর্যে কর্যে রাখে। কারণ, তাকে চালিয়ে নিলে অপরেরও 'পতিত' হবার ভয় থাক্‌বে না, ফলে শেষে অনেকেই 'পতিত' হ'য়ে সমাজ ভেঙ্গ্যে দিবে। শাস্ত্রে নাকি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন্ দিকে কতখানি গেলে সমুদ্রযাত্রা হয়, বোধ হয় তা লেখা নাই। এই কারণে বঙ্গ ও আরব-সাগর পাড়ি দিলে, এমন-কি চীনসমুদ্র বেড়িয়ে এলে বাধা হ'চ্ছে না। কিন্তু ইংলণ্ডে গেলেই যে হয়, তার কারণ ইংরেজ দেখ্ছি!

হিন্দুসমাজ এক বিশাল বটবৃক্ষ। কত ক্লান্ত পথিক এর তলায় এসে আশ্রয় ও শান্তি পাচ্ছে, মুখ-দেখা-দেখি হ'চ্ছে, কথা কহা-কহি চ'ল্‌ছে, কিন্তু রান্নার 'চৌকা' আলাদা আলাদা। বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণ হ'লে কি হয়, 'মছলী খাতা' ; ঢেলার বেড়াতে কু আট্‌কাতে পারা যাবে না, দূরে গিয়া 'চৌকা' কর! পূর্ববঙ্গে মুসলমানের-দোহা গাই-দুধ অবিচারে ব্রাহ্মণের ভোজনে লাগছে, কেন না গব্যরসে জল নাই, জল মিশিয়ে বেচা হয় না। উড়িষ্যায় 'কেঅট' নামক এক ধীবর জাতি স্পর্শ ক'র্‌লে ব্রাহ্মণের মনস্তাপের অবধি থাকে না, কিন্তু তার কোটা চিঁড়া ব্রাহ্মণের ও দেবতার ভোগে চ'ল্‌ছে। চিঁড়া অগ্নি-পক্ক নয়, ঘৃত-পক্কও নয়, পয়ঃ-পক্ক। এইরূপ যে কত আচার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে চ'ল্‌ছে, সে-সব একত্র ক'র্‌লে মানব-চরিত্রের নিভৃত কন্দর অসঙ্গতি-পূর্ণ দেখা যাবে। কালে দেশাচারও স্মৃতির তুল্য বলবান্ হ'য়ে ওঠে। এমন জাতি নাই যে দেশাচারের দাস নয়। এক উচ্চ-শিক্ষিত ও উচ্চ-পদস্থ ইংরেজ একবার আমায় জিজ্ঞাস্যেছিলেন, তিনি মাছমাংস ভোজন ছেড়েছেন, হিন্দু হ'তে পারেন না কি? আমি বল্যেছিলাম, এ জন্মে নয়, চৌদ্দ জন্মেও হ'তে পার্‌বেন না। তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, অবাক্ হ'য়ে আরও শুন্‌তে চাইলেন। "আপনি কাঁটা চামচ ছেড়েছেন?" "কি, আঙ্গুল দিয়ে খেতে ব'ল্‌ছেন? আঙ্গুল দিয়ে কিছুতেই খেতে পার্‌ব না।" আঙ্গুল শব্দ উচ্চারণ করা, আর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কেঁপ্যে ওঠা! "আমাদের মতন ধুতি প'র্‌তে পার্‌বেন?" "আমি উলঙ্গ থাক্‌তে পার্‌ব না।" বলা বাহুল্য যুক্তিতে সাহেব হারেন নাই, আমিও হারি নি।

সমাজ-সংস্কারক অধীর হ'য়ে ব'স্‌ছেন, "বট-গাছটার ডাল-পালা কেট্যে দাও, ভূতের বাসা ভেঙ্গ্যে যাবে।" সমাজ ব'ল্‌ছেন, "ডালে ডালে এমন জড়িয়ে গেছে, বেছ্যে বেছ্যে কাট্‌বার জো নাই।" ধর্ম্মসংস্কারক ব'ল্‌ছেন, "গাছটাই আপদ্, গাছটাই কেট্যে ফেল, ভূতের বাসা ঘুচ্যে যাক।" ধর্ম্ম ব'ল্‌ছেন, "তা হ'লে আমি কোথায় থাক্‌ব?" শিক্ষক ব'ল্‌ছেন, "কেউ কাট্‌তে পার্‌বে না, কারও সাহস হবে না। বিলাতে তৈয়ারী এই তীক্ষ্ণ সূচী দিয়ে মূল বিদ্ধ কর, গাছটা আপনি শুখিয়ে ম'র্‌বে, কাকেও কিছু ক'র্‌তে হবে না।" কিন্তু ছাত্র ব'ল্‌ছেন, "আর সে শিক্ষা দিবেন না, আমি অমনিই শুখিয়ে ম'র্‌ছি।" রাষ্ট্রনীতিক ব'ল্‌ছেন, "ভাই হে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কর্যে তোমরা অধঃপাতে গেছ, এখন ক্ষমা দেও, ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি কর।" ভাইরা কাতর হ'য়ে ব'ল্‌ছে, "কোলাকুলি ক'র্‌তে পার্‌ছি না যে।"

জরাজীর্ণ সমাজে কেহ রসায়ন প্রয়োগ ক'রছেন না, দুর্ব্বল দেহে বল-সঞ্চারের চিন্তা ভাবছেন না। শিকড়-মাকড়, জাড়ী-বুটী দিয়ে মৃত্যু-কাল কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু যৌবন আসবে না। ভাইকোমে সত্যাগ্রহীরা মন্দিরের পাশের পথ খোলা পাবে, কিন্তু আর যে হাজার পথে লোহার কপাট প'ড়বে, বোধ হয় সে চিন্তা করে নাই। যে দ্বেষ ভিতরে ভিতরে ছিল, সবর্ণের মনে তা জেগে উঠবে, রোষে ভবিষ্যৎ মিলন কঠিন করে তুলবে।

বঙ্গদেশেও যে-সব নিম্ন জাতি নাম বদলে উচ্চ হ'তে চাচছে, তাদেরও বুদ্ধি সফল হবে মনে হয় না। কারণ, তারাও ছোট ও বড় স্বীকার ক'রছে, স্বীকার ক'রছে না কেবল নিজেদের নিম্নতা। অর্থাৎ তোমরা নীচে থাক, আমরা উপরে উঠি। যে বটগাছ সে বটগাছই থাকছে, লোক আমগাছ বলে ভাবতে পারছে না। দু-চারি পুরুষ গেলে হয়ত আমগাছ মনে হবে, কিন্তু প্রকৃত আমগাছ হওয়া অসম্ভব। ফলে এখন যে ভেদ আছে, তখনও থাকবে, অসহযোগ মাত্র প্রবল হবে। বুঝি, আত্ম-গৌরব সকলের সাধ্য নয়, সাধ্য জাতি-গৌরব। প্রত্যেক ইংরেজ কিছু বড় নয়, কিন্তু ইংরেজ জাতিটা বড়, সেই গৌরবে প্রত্যেক ইংরেজেরও গৌরব। কিন্তু এখানে গৌরব ব্রাহ্মণের কাছে; ব্রাহ্মণ বিমুখ হ'লে, কে গৌরব মানবে? শুধু ব্রাহ্মণ নন, অন্য যে-সব জাতি সহযোগে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রত, তারাও তুষ্ট হবে না। বুঝতে হবে জাতিতন্ত্র স্বতন্ত্র হ'য়েও পরতন্ত্র, এক হিন্দুতন্ত্র। সুতরাং হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে থা'কতে হ'লে প্রত্যেককে পরের অধীনতা স্বীকার ক'রতে হবে। সমাজ অর্থেই স্বাধীনতার খর্ব্বতা। কেহ উচ্চ কেহ নীচ থাকবেই, কেহ প্রভু কেহ দাস হ'বেই। কিন্তু উচ্চ-নীচের সহযোগে, প্রভু-দাসের পরস্পর সাহায্যে সংসার চ'লছে। ছোট মনে করলেই ছোট, নইলে কে কাকে ছোট ক'রতে পারে? রাজার জেল-খানা আছে, আমাদের দেহটাকে জেলে পুরতে পারেন, কিন্তু মনকে ত পারেন না। হিন্দুতন্ত্রের বাইরে গেলেও জয় হবে না। কারণ যে-জন্য যুদ্ধ তা পাবে না, নিজের অস্তিত্ব ভুলতে হবে। আর যদি অস্তিত্বই গেল, তা হ'লে যে, সর্ব্বস্ব গেল।

অবশ্য এত কথা কেহ ভাবে না, সকলে ভাবতে পারেও না। অভিমান অবশ্য চাই, কিন্তু অভিমান প্রেমের ঈর্ষা, তাতে রোষ থাকে না। এই কথা বুঝতে না পেরে নব্যা নারী ভাবছে, সে স্বামীর দাসী নয়, সমান। যখনই সাহিত্য-পত্রে নারীর অধিকার আলোচিত হ'তে দেখি, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ভাগা ভাগি করতে দেখি, তখনই বুঝি প্রেমের অভাব। "স্বামীর সেবা কেন ক'রবে?" কারণ, সেবাতেই তোমার আনন্দ, সেবা না করে তুমি থাকতে পার না, তোমার ইচ্ছা হয়, তাই সেবা কর। তেমনই যে-স্বামী স্ত্রীর সেবা আদায় করে, সেখানেও বুঝতে হবে মিলনে দোষ আছে, সে স্ত্রীর দাস হ'তে পারছে না। এরূপ ঘটনা কোনও সমাজে বিরল নয়। কোন্ আচারে কত, তা গ'ণবারও নয়। কোন কোনও সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মনান্তর হ'লে স্থানান্তরের বিধি আছে। পূর্ব্বকালে হিন্দু সমাজেও ছিল। সে যা হ'ক, দেখা যাচছে, প্রেমের বিরোধ প্রণয় কলহ, মিলন তার ফল। অপ্রেমের বিরোধে মিলন হয় না, আপোষ হ'তে পারে।

বঙ্গে উচ্চ ও নিম্নে যে বিরোধ আরম্ভ হয়েছে, যাঁরা গ্রামে থাকেন, তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। কোনও পক্ষের শান্তি নাই। নিম্ন ব'লছে, "আমি উচ্চ, আমায় উচ্চ মনে রেখে আমার সহিত ব্যবহার ক'রবে।" উচ্চ ব'লছে, "তুমি এতকাল নিম্ন আসনে ব'সতে, আজ তোমায় উচ্চ আসন দিতে গেলে সকলের আসন বদলাতে হয়, আমার সে শক্তি কোথায়?" নিম্ন ব'লছে, "যদি তোমার শক্তি নাই, দেখ আমার শক্তি আছে কি না। আমি তোমার কোনও কাজ ক'রব না।" ফলে ঘ'টছে এই, পরস্পরের সাহায্য হ'তে পরস্পর বঞ্চিত হ'য়ে উভয়ে কষ্টে কাল কাটাচ্ছে। পশ্চিম দেশে ধর্ম্মঘট হয় বেতন-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে। এদেশে তাও আছে, আর নূতন হচছে 'বড়' প্রমাণ ক'রতে গিয়ে। যাঁরা গ্রামের মধ্যবিত্ত, যাঁরা 'ভদ্রলোক' বলে গণ্য, তাঁদের দুর্দ্দশা বাড়ছে। কৃষিজাত শস্য তাঁদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু কৃষাণ অভাবে জমি পতিত থাকছে, কিংবা কৃষাণের করতলগত হ'চছে। নিম্ন তার শক্তি বুঝছে, উচ্চ 'হা অন্নে'র দল বাড়াচছে; এক

দিকে সমাজ-নীতির আক্রমণ, অন্যদিকে অর্থনীতির যোগ হওয়াতে বিরোধ ক্রমশঃ দ্বেষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। শ্রমবাদী ব'ল্‌ছেন, "নিজের কাজ নিজে কর, নিজের জমি নিজে চাষ কর, ভৃত্যের অপেক্ষা ক'র্‌ছ কেন?" জন সাম্যবাদী ব'ল্‌ছেন, "উচ্চাসন চাচ্‌ছে, দাও না; নিম্নে কেনই বা চিরকাল থাক্‌বে?" ধনসাম্যবাদী ব'ল্‌ছেন, "তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে বস্যে থাক্‌বে, আর যারা খাট্‌ছে, তারা রোদে তেত্যে জলে ভিজ্যে তোমার আহার যোগাবে?" এইরূপ, সকলে সাম্যের উপদেশ ঝাড়্‌ছেন, কারণ তাঁদিকে সে উপদেশ পাল্‌তে হ'চ্‌ছে না। পশ্চিমদেশে সেখানে একত্র আহারে, পরস্পর বিবাহে বাধা নাই, সেখানেই এই সাম্যবাদে কি বিসম্বাদ ঘট্যেছে, তা' দেখ্যেও এদেশে যেখানে মিলনের দুই পথই রুদ্ধ, সেখানে এই বাদ চালাতে গেলে বিপ্লব নয়, কারণ পুলিশ ও ফৌজদারী কাছারী আছে, স্বরাজ্যের স্বর্গের স্বপ্ন আর দেখ্‌তে হবে না। সমাজের গতি, অর্থনীতির গতি সমান নয়, ঋজু নয়। উত্থান ও পতন, পতন ও উত্থান, এইরূপ বক্র। যাঁরা নীতিজ্ঞ, তাঁরা দেখেন, কিসে উদ্‌গমন ও অবনমন ঋজু না হ'য়ে জলের তরঙ্গের ন্যায় বর্তুল হয়। 'ছোট' যে 'ছোট' ছিল, কিংবা ভূমিহীন ছিল, সে কি 'বড়'র দুষ্টামিতে? 'ছোট'র ইচ্ছা ছিল 'ছোট' থাক্‌তে, 'বড়'র ইচ্ছা ছিল 'বড়' হ'তে। 'ছোট'র সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি নাই,—এইটা সাধারণ লক্ষণ। তাদের প্রবৃত্তি ক্ষয়ের। যে কামিক এখন যত বেতন পাচ্‌ছে, সে তত ব্যয় ক'র্‌ছে; ফলে উপার্জন অধিক হ'লেও স্থিতি হ'চ্‌ছে না। কারও হ'চ্‌ছে না, এমন নয়। যাদের হ'চ্‌ছে, তারা 'বড়' আছে, 'বড়' হবে। কিন্তু ক'জনের হ'চ্‌ছে, ক'জনের হ'চ্‌ছে না, যার চোখ আছে সে দেখ্‌ছে। 'বড়'র দুষ্টামি নাই, এমন নয়। বরং আপাত-দৃষ্টিতে দুষ্টামিই চোখে পড়ে। কিন্তু সমষ্টি দেখ্‌লে বুঝি, 'বড়'র অনুকূলতা নাই, এই পর্যন্ত। তথাপি সাম্যবাদী দোষ দিয়ে ব'ল্‌ছেন, বড় ছোটকে জ্ঞানের আলো দেখান নাই কেন? কিন্তু কথাটা ঠিক সেই-রকম, যখন আমরা ইংরেজ রাজাকে বলি তোমরা যুদ্ধকৌশল শেখাও নাই কেন? ইহার উত্তরও সোজা, তোমরা শিখ্‌তে চাও নাই কেন? যারা ছোট ছিল, তারা জ্ঞানের আলো চায় নাই।

কিন্তু এখন ত চা'চ্‌ছে। তেমনই এখন কোন্ 'বড়' সে আলো তাদের কাছে নিভিয়ে দিচ্‌ছেন? বড় প্রতিকূল নন, কারণ তিনি বোঝেন ছোটকে বড় করো তুল্‌তে পার্‌লে তিনিও বড় হবেন। এটা বুদ্ধির কর্ম। ইহাও বুঝ্‌ছেন, যেমন চল্‌ছিল, তেমন আর চ'ল্‌বে না, হাত বাড়িয়ে ধ'র্‌তে হবে। কিন্তু ভয় এসে বিরোধ ক'র্‌ছে, বলে, কর কি? ভয়, মনের আদিম ভাব নয়, এটা শেখ [illegible]র্জিত একত্র বস-বাসে, লোকের দৃষ্টান্তে, লাভের লোভে, ঘুচ্‌তে পারে। ছেলেবেলা হ'তে জুজুর ভয় দেখাতে দেখাতে জুজু শেষে মূর্তিমান্ হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রথম হ'তে এই কু-শিক্ষা ছাড়্‌তে হবে। বিপদ্ এই, চিরকালের অন্তর্নিহিত সংস্কার সহজে ঘোচে না। ব্রাহ্মণ, শূদ্রের সঙ্গে এক আসনে ব'স্‌তে পার্‌ছেন না, কি জানি অশুচি হন। তেমনই উপায়ও দেখিয়ে দিচ্‌ছেন, শৌচাচারী হ'তে হবে। সুখের বিষয়, দুই-চারি জাতি ছাড়া সকলের আচার ভাল। যেখানে নয়, সেখানে শৌচজ্ঞানের অভাব মনে হ'তে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা ক'র্‌লে বুঝি, সেটা প্রায়ই অর্থের অভাবে। একথাও ঠিক, অনেকেরই শৌচ-জ্ঞান ভাসা-ভাসা, আচারের উদ্দেশ্য অজ্ঞাত। একথা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও খাটে।

তথাপি ব্রাহ্মণের যে সংস্কার হ'য়ে গেছে, তাকে দূর করা সোজা নয়। আচারে শুচি বটে, কিন্তু জাতিতে শুচি নয়, পূর্ব পুরুষে নয়। শাস্ত্রে একথা লেখা আছে। কিন্তু যেটা লেখা নাই, জানা নাই, সেটাই বিষম বাধা। এই সন্দেহ তাড়াতে হ'লে ব্রাহ্মণকে বলবান্ ক'র্‌তে হবে। উদ্‌বুদ্ধ ক'র্‌তে হবে, তিনি ও অপর মানুষ কি বস্তু, তা' তিনি ভুল্যে গেছেন, জড় মাংসপিণ্ডকে ভয় ক'র্‌ছেন। লোক-ব্যবহারে মাংসপিণ্ডের ভাল-মন্দ অবশ্য আছে, কিন্তু সে পিণ্ড যখন শুচি তখন কোন্ অপবিত্র স্থানের কোন্ অপবিত্র দ্রব্যের কতগুলা অণু দেহে সঞ্চিত হয়েছে, সে গণনা কেন ক'র্‌বেন? তিনি কালের গতি রোধ ক'র্‌তে পার্‌বেন না, নিজকে বিচ্ছিন্ন করো রেখ্যে শান্তিও পাবেন

না। যাঁর চোখ আছে, তিনি দেখ্‌ছেন, পূর্ব্বকালের জন্মগত জাতিভেদ ভেঙ্গে যাচ্ছে, নূতন বর্ণ গড়ো উঠ্‌ছে। গুণে, যার মধ্যে আচার প্রধান, নূতন বর্ণের প্রতিষ্ঠা হ'চ্ছে। যখন কর্ম্মে সে গুণ প্রকাশিত হ'চ্ছে, তখন পূর্ব্বের সন্দেহ মনে আর উঠ্‌ছে না।

বিপুল হিন্দুসমাজের অধিপতি দুর্ব্বল হওয়াতে সমাজও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্যেছে, পুরাতন জুজু বিকট আকারে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। ব্রাহ্মণ সবল হ'লে, সমস্ত সমাজ সবল হ'য়ে উঠ্‌বে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ধর্ম্মের গ্লানি দূর হবে। ধর্ম্মের গ্লানি হেতু হিন্দুর অধঃপতন; যিনি সে গ্লানি দূর ক'র্‌তে পার্‌বেন, তিনিই ব্রাহ্মণ হবেন, আচার্য্য হবেন। আচার্য্য থাক্‌লে কি তারকেশ্বরের মহান্ত অত্যাচারী হ'তে পার্‌ত? তিনি মহান্তকে একঘরে করো রেখ্যে হিন্দুর ঘৃণার পাত্র করো অক্লেশে তাকে দেশ-ছাড়া ক'র্‌তে পার্‌তেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বুঝাতে হবে, কর্ম্ম নীচ নয় উচ্চ নয়, কর্ম্ম কর্ম্ম, সে কর্ম্ম জুতা সেলাই হ'ক আর চণ্ডীপাঠ হ'ক। কর্ত্তা ও কর্ম্মের ভেদ ভুল্যে গিয়ে কর্ত্তার হীনতা কর্ম্মে আরোপিত হয়েছে। অধিকারী-ভেদ হিন্দুধর্ম্মের মজ্জাগত। অথচ সে ভেদ অস্বীকৃত হ'চ্ছে, ধর্ম্ম রক্ষিত হ'চ্ছে না।

মহাত্মা গন্ধী হ'তে ছোট বড় সব রাষ্ট্রচিন্তক একবাক্যে ব'ল্‌ছেন, অস্পৃশ্যতার ভূত তাড়িয়ে দাও। কিন্তু তাড়াবার উপায় কি, তার আলোচনা দেখ্‌তে পাই না। হীন জাতি ভূত নয়, মানুষ,—একথা শুন্‌তে শুন্‌তে কারও কারও বিশ্বাস ও সাহস জন্মিবে বটে, কিন্তু তাতে বহুকাল লাগ্‌বে। মহাত্মা কোল দিলে যে দেশসুদ্ধ কোল দিতে পার্‌বে, তাও নয়। মহাত্মা পারেন, কারণ মহাত্মা মহাত্মা। তাঁর অনুচর দশজন কি সহস্র জন গ্রামে গিয়ে হীনজাতির প্রদত্ত জল ও সন্দেশ গ্রহণ কর্‌তে পারেন? কিন্তু বিপুল হিন্দুসমাজ চেয়ে দেখ্‌বে, গ্রামে তাঁদিকে পতিত করো রাখ্‌বে। কিন্তু যে-দিন গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয় জল-সন্দেশ গ্রহণ ক'র্‌বেন, সেই দিন অস্পৃশ্যতা দূর হবে, তার পূর্ব্বে নয়। থাক্‌তেন নদীয়ার গোরা; তাঁর কাছে শুদ্ধিবারি ছিল। তথাপি তাঁর কর্ম্মস্থানেই লক্ষ লক্ষ নর-নারী সে-বারি স্পর্শ করে নাই।

কংগ্রেসের কাছে কি মন্ত্র আছে, যাতে মনে করেন এই দুষ্কর কর্ম্ম ক'র্‌তে পার্‌বেন? এত কাল হ'ল হিন্দু স্বরাজ্য হারিয়েছে, যে তার স্মৃতিও লুপ্ত হ'য়ে গেছে। সে হিন্দু ক'জন, যে স্বরাজ্যকে স্বর্গরাজ্য মনে ক'র্‌তে পারে? আর, কেবল স্বরাজ্য স্বরাজ্য শোনালে অবুঝ ভাব্‌বে, পরের প্রাপ্য পরিশোধ ক'র্‌তে হবে না, নিজের প্রাপ্য চতুর্গুণ হবে। কারণ লোকে চায় এই। যখন দেখ্‌বে, সে-সব নয় তখন কারও বাধা মান্‌বে না।

মহাত্মা ব'ল্‌ছেন, সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-ধর্ম্ম শেখাও। কিন্তু কত তপস্যায় স্বাভাবিক কাম-ক্রোধ-লোভ দমন হ'তে পারে? তাঁর কাছে সত্য ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা সহজ, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জ ইহার একটারও ধার দিয়ে যায় না। চর্‌কাকে যোগ-সাধনের আসন-বিশেষে পরিণত ক'র্‌লেও ক' জনে তা ঘুরাবে? চক্র-পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক কই? তাই মনে হয়, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যেটা সকলেরই আছে, কিন্তু উপলব্ধি নাই, সেটা না জাগালে মনশ্চক্র জাগ্‌বে না। এই কর্ম্ম কংগ্রেসের নয়, শক্তি-সাধকের। শক্তিমানে অহিংসা-ধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে পারে, সত্যাগ্রহ ক'র্‌তে পারে। কেবল মনের শক্তি নয়, দেহেও শক্তি চাই। দেহে শক্তি না থাক্‌লে ক্লৈব্য হয় অহিংসা, মনে না থাক্‌লে সত্যাগ্রহ হয় হত্যা দেওয়া। প্রথমে হিন্দুতে-হিন্দুতে সহযোগ, তার পর অন্য কথা।

শিশু

শ্রী যোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী

শিশুগণে দেখি মনে এই মোর হয়,
তা'রা যেন ওপারের জানে পরিচয়।

যে-দেশে আপন-পর ভেদাভেদ নাই,
সে-দেশ হইতে তা'রা এসেছে সবাই।
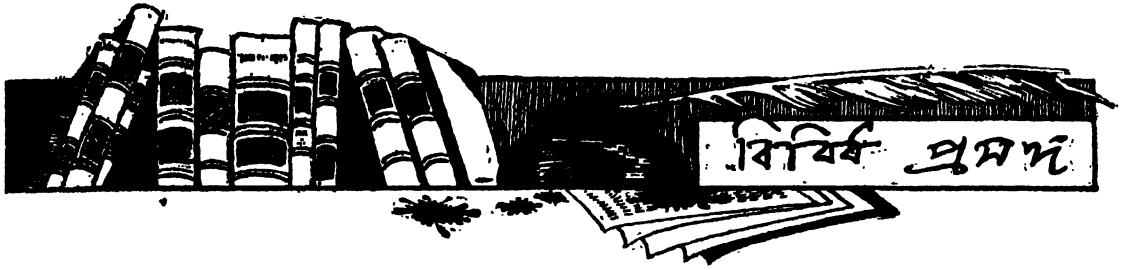
মহাত্মা গান্ধীর উপবাস

হিন্দুমুসলমানের বিরোধের অবসান কি করিয়া হইতে পারে, তাহার চেষ্টা মহাত্মা গান্ধী অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছেন; অল্পাধিক-পরিমাণে অন্য অনেকেও করিতেছেন। তাঁহার নিজের এবং অপর সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও, বিবাদের নিবৃত্তি না হইয়া, সম্প্রতি নানা স্থানে বিরোধজনিত নানা ভীষণ ঘটনা ঘটায়, মহাত্মা গান্ধী নিরুপায় হইয়া একুশ দিন উপবাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাহার অনেক দিন অতীত হইয়াছে। তাঁহার নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস-অনুসারে তিনি প্রায়শ্চিত্ত ও প্রার্থনারূপে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। যখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া ও রক্তারক্তি হয়, তখন কেবল যাহারা মারামারি ও লুটপাট করে, তাহারাই যে দোষী, তাহা নহে; সমস্ত জাতির মধ্যে যে-কেহ অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, সে-ই আংশিক-ভাবে বিবাদের জন্য দায়ী। সুতরাং হিন্দুমুসলমানের জন্য বাস্তবিক উভয় সম্প্রদায়ের অগণিত লোক দায়ী। মহাত্মা গান্ধীর নিজের মনে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আছে বা ছিল বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে না। কিন্তু জগতের অনেক সাধুপুরুষের জীবনে দেখা যায়, যে, তাঁহারা আপনাদিগকে অধমতম পাপী বলিয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের সাধুতার আদর্শ অতি উচ্চ বলিয়া তাঁহারা যে-সব স্থলে আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিয়াছেন অন্যেরা সেই অবস্থায় তাহা করিত না। এইসকল সাধুদের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি, যে, মহাত্মা গান্ধীর সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস হইয়াছে, যে-হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায়-দ্বয়ের বর্ত্তমান মনোমালিন্য দূর করিয়া সদ্ভাব স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার যাহা করা উচিত ছিল, তাহা তিনি করিতে সমর্থ হন নাই, কিম্বা তাঁহার নিজের মনের ভাব যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, উহা সেরূপ নহে। অথচ তিনি আর যে কি করিতে পারেন, সম্ভবতঃ তাহাও স্থির করিতে পারেন নাই। এইজন্য তিনি নিজেকে শাস্তি দিয়া নিজের ত্রুটির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, এবং নিতান্ত অসহায়ভাবে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিবেন। সকল সম্প্রদায়ের সমষ্টীভূত ভারতীয় জাতির প্রতি কর্ত্তব্যের ও সদ্ভাবের আদর্শ মহাত্মার যেরূপ, আমাদের অন্য-সকলের আদর্শ তাহার কতকটা কাছাকাছি হইলেও ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে অনেকটা কম হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গান্ধী-মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি আত্মনিগ্রহ দ্বারা যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার সংবাদ সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনারূপে তাঁহার উপবাসের সংবাদ জানাইতেছেন। ইহার অর্থ আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি, যে, উপবাস-দ্বারা সকলকে তিনি নিজের মনের এই ব্যাকুলতা জানাইতেছেন, যে, যাহাতে সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব, মনোমালিন্য ও বিরোধ জন্মে, সকলে যেন সেরূপ চিন্তা বাক্য ও কার্য্য হইতে বিরত থাকেন; তাহা হইলে তিনি উপবাস-যন্ত্রণার মধ্যেও শান্তি ও বল পাইবেন। আশা করি তাঁহার হৃদয়ের এই ব্যাকুল ক্রন্দন অরণ্যে রোদন হইবে না।

সকল মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-পালনের রীতি এক নহে। সুতরাং মহাত্মা যে উপবাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সকলে তাহার অনুমোদন না করিতে পারেন। কিন্তু এ-

বিষয়টির আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় ইহা নহে। বিশেষতঃ আমাদের কখনও কোনপ্রকার কর্ত্তব্যের প্রেরণাতেই প্রাণপণ করিবার শক্তি নাই, তাই আমরা মহাত্মাজীর এই প্রাণহানির আশঙ্কাপূর্ণ ব্রতগ্রহণের সমালোচনা হইতে স্বভাবতই বিরত থাকিলাম।

—

সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব-স্থাপনের উপায়-চিন্তা

গান্ধী মহোদয়ের উপবাসব্রত-গ্রহণে ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ চিন্তাকুল হইয়াছেন। ভগবান্ না করুন, যদি তাঁহার উপবাস সাংঘাতিক হয়, তাহা হইলে তাহাই আবার সাম্প্রদায়িক বিরোধের একটা গুরুতর কারণ হইতে পারে; ইহাও উদ্বেগের অন্যতম কারণ। তবে সকলে সমবেত হইয়া যদি সাম্প্রদায়িক স্থায়ী সদ্ভাব-স্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা মহাত্মাজীকে খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষাও অধিক শান্তি ও বল দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভারতীয় ও বৈদেশিক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিল্লী গিয়া একটি মন্ত্রণাসভায় যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মন্ত্রণা সফল হউক, মানব-হিতৈষীমাত্রেই এই কামনা করিবেন।

যাঁহারা মন্ত্রণাসভায় আহূত ও উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম ও পরিচয় অবগত নহি। কিন্তু মোটের উপর এই অনুমান করা বোধ হয় ভুল হইবে না, যে, ইহাদের কাহারও কখন সাক্ষাৎ- বা পরোক্ষভাবে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সহিত কোন সম্পর্ক ত ছিল-ই না, বরং অধিকন্তু ইঁহারা অনেকেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ না হয় এই ইচ্ছা (এবং কেহ কেহ এই চেষ্টাও) করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইঁহাদের নিজের মনের ভাবের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন না থাকাই সম্ভব।

একান্ত প্রয়োজন আছে তাহাদের মনের গতির ও হৃদয়ের ভাবের পরিবর্ত্তনের, যাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয় বা পশ্চাতে থাকিয়া তাহা ঘটায়। এই মানুষগুলির উপর ভারতবর্ষের বিজ্ঞ, বিবেচক ও মানবপ্রেমিক লোকদের প্রভাব বর্ত্তমানে বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেই প্রভাব জন্মাইতে হইবে। সুতরাং ইহাদের কাছে মন্ত্রণা-সভার নির্দ্ধারণ পৌঁছা ত চাই-ই, অধিকন্তু ইহাও চাই যে, সেই লোকগুলি সেই নির্দ্ধারণগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ আচরণ তাহার দ্বারা নিয়মিত করে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। সুতরাং দাঙ্গা-কারীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকও যে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম লোকও আছে, এবং অন্ততঃ কোন-কোন স্থলে সম্ভবতঃ লিখন-পঠনক্ষম লোকদের প্ররোচনা ও নেতৃত্বে বিরোধ, মারামারি, কাটাকাটি হইয়া থাকে। যে-সব স্থলে এইরকম নেতা থাকে, তাহারা প্রায়ই গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পোষণ ও বর্দ্ধন করে। ইহাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে নিরক্ষর অশিক্ষিত লোকদের হৃদয়-মনের উপর উদারচেতা, বিবেচক ও মানব-প্রেমিক লোকদের প্রভাব স্থাপন কঠিন সমস্যা। কিন্তু ইহার সমাধান করিতে হইবে। যাঁহারা নিজ-নিজ সম্প্রদায়ে খুব স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত, এরূপ নেতারা যদি এই কঠিন সমস্যা সমাধানের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কিছু ফল হইতে পারে।

সংবাদপত্র দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার হয় না, ইহা কেহই বলিবেন না। কিন্তু অনেক সংবাদপত্রের লেখার ফলে দেশে-দেশে যুদ্ধ বাধিয়াছে। তেমনি একই দেশের ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়াও অনেক সময় খবরের কাগজের লেখার দরুন্ বাধিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, যাহারা উত্তেজনা, বিরোধ ও বিদ্বেষ জন্মায় এরূপ সংবাদপত্রসকলের কাট্‌তি বেশী। তাহা হইলেও, যদি সকল প্রদেশেই অন্ততঃ একখানা করিয়া ইংরেজী ও দেশ-ভাষার কাগজ ধীর-শান্তভাবে মানব-প্রীতির সহিত চালিত হয়, তাহা হইলে কিছু সুফল ফলিতে পারে। বাংলাদেশে দেখা গিয়াছে যে, রাজনৈতিক মতে গরমিল থাকা সত্ত্বেও অনেকে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজ কিনিয়া পড়ে, কারণ ইহার ছাপা ও কাগজ ভাল

এবং ইহাতে ছবি থাকে, এবং রাজনীতি ছাড়া অন্য অনেক বিষয়ে সুনির্ব্বাচিত সুপাঠ্য ছোট-ছোট লেখা থাকে। অবশ্য ইংরেজী কিম্বা ভারতীয় কোন ভাষায় এরূপ কোন কাগজ চালান ব্যয়-সাপেক্ষ; কিন্তু যাহা হইতে মহৎ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়, এমন কোন্ কাজ সহজে হইতে পারে?

বলা বাহুল্য ভাল সংবাদপত্র এবং পুস্তক-পুস্তিকা দ্বারা দেশের লোকের চিন্তা ও ভাবের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে শিক্ষার বিস্তারও আগে আবশ্যক। তাহা অবশ্য সময় সাপেক্ষ। কিন্তু অমঙ্গল দীর্ঘকাল ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে, খুব অল্পকালের মধ্যে তাহার বিনাশ-সাধন সম্ভবপর মনে হয় না।

যে সকল লোক দিল্লীতে আহূত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগকে উপদেশ দিবার জন্য আমরা কোন কথা লিখিতেছি না;—তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিজ-নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে করিবেন। নেতৃ-স্থানীয় না হইলেও সম্পাদক-দিগকে সাময়িক প্রধান-প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়; আমরা তাহাই করিতেছি।

—

ভারতবর্ষকে কি চোখে আমরা দেখি

কখন কখন কাহারও-কাহারও মনে এ-কথার উদয় হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের সব লোক যদি মুসলমান হইয়া যায় বা অন্য কোন একটা ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা শ্রেণীতে-শ্রেণীতে ঝগড়ার অবসান হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে কোন কালে কেবল মুসলমান ধর্ম্ম বা অন্য কোন ধর্ম্ম-মত মানুষের হৃদয়-মনের উপর একাধিপত্য করিবে, আমাদেরও এরূপ মনে হয় না। আর যদিই বা তাহা হয়, তাহাতেও ত ঝগড়ার বিরাম হইবে না। ইউরোপে ভিন্ন-ভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের বিবাদের জন্য কতই না রক্তপাত হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া থাকে। ভিন্ন-ভিন্ন হিন্দু জা'তের মধ্যে মারামারি হয়। আরবদেশে সম্প্রতি মুসলমান ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের নেতা ইবন্ সাদ্ হেজাজের রাজা হোসেনের রাজত্ব আক্রমণ ও দখল করিয়াছেন।

সুতরাং ধর্ম্ম-বিশ্বাস ঠিক্ এক হইয়া গেলেই সকলের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইবে ও মিলন হইবে, এই আশায় ভবিষ্যৎ কোন সুদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যাহাতে সদ্ভাব স্থাপিত হয় ও মিলন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

ইহার এক উপায়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মত, বিশ্বাস ও আচরণের কোথায় মিল আছে, তাহা আবিষ্কার করা ও তাহারই উপর অধিকতম গুরুত্ব আরোপ করা। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে, সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেই ঈশ্বর বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, সকলকেই তাহাদের কার্য্য- ও শ্রম-অনুসারে ফল দিতেছেন, সকল সম্প্রদায়ের দ্বারাই জগতের কোন-না-কোন হিত সাধিত হইয়াছে, এবং সকল সম্প্রদায়েই সাধু মানব-প্রেমিক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা মনে রাখিলে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদারতা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

তদ্ভিন্ন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক-হিতকর চেষ্টা ও কার্য্যে যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ-নিজ সাধ্য-অনুসারে সহায়তা করেন, তাহা হইলেও মিলনের একটা উপায় হয়।

ভারতবর্ষকে আমরা কে কি চোখে দেখি, তাহার উপরও সাম্প্রদায়িক মিল অনেকটা নির্ভর করে। অন্য নানা দেশের দৃষ্টান্ত-দ্বারা ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা বহু-দেববাদী ছিল, খৃষ্টীয়ান্ ছিল না। তাহাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, নানা ললিতকলা, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার ফল নহে। গ্রীসের বর্ত্তমান অধিবাসীরা খ্রীষ্টিয়ান্ ও বহু দেবতা-পূজার বিরোধী; তাহাদের ধর্ম্ম এশিয়া মহাদেশের প্যালেষ্টাইন্ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহারা তজ্জন্য প্রাচীন গ্রীক্‌সাহিত্য-আদির এবং প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার অনাদর করে না; প্রত্যুত আদর করে, তাহার অনুশীলন করে ও তাহাতে গৌরব বোধ করে; এবং তাহারা গ্রীস্ অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে নিজেদের বেশী সম্পর্ক আছে মনে করে না।

ইটালীর লোকেরা বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টীয়ান্; কিন্তু

তাহারা তাহাদের পূর্ব্বজ অখৃষ্টীয়ান্ রোমান্‌দের সাহিত্যাদি ও সভ্যতার আদর করে ও তাহাতে গৌরব বোধ করে। তাহাদের ধর্ম্ম প্যালেষ্টাইন্ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে ইটালী অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের সহিত নিকটতর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে না।

স্কুলের ছাত্রেরাও জানেন, ইংলণ্ডে আগে ব্রিটন্ নামধেয় সেল্ট জাতীয় লোকদের বাস ছিল। তাহার পর রোমানেরা উহা জয় করে। তাহার পর ঐদেশ অ্যাংঙ্গল, স্যাক্সন্ ও জুটেরা জয় করে। তাহার পর ডেন্‌রা জয় করে। সর্ব্বশেষে ফ্রান্সের নর্ম্যাণ্ডি প্রদেশবাসী নর্ম্যান্‌রা জয় করে। এইসব বিজেতাদের বংশধরেরা কিন্তু কেহই, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের দ্বারা পরাজিত দেশের সভ্যতা বলিয়া, ইংলণ্ডীয় সভ্যতার অনাদর করে না; বরং তাহাতে গৌরব বোধ করে। ডেন্ ও নর্ম্যান্‌দের বংশধর ইংলণ্ডের অধিবাসী যাহারা, তাহারা পুরাতন অ্যাংলোস্যাক্সন্ সাহিত্যকেও নিজেদের সাহিত্য মনে করে। বিজেতাদের বংশধরেরা কেহ বর্ত্তমানে ডেন্‌মার্ক, নর্ম্যাণ্ডি প্রভৃতির সঙ্গে ইংলণ্ডের সহিত অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গৌরবান্বিত হইতে চেষ্টা করে না।

আধুনিক ইংলণ্ডের ধর্ম্ম খৃষ্টীয়; উহার উৎপত্তি প্যালেষ্টাইনে। কিন্তু তা' বলিয়া কোন ইংরেজ ইংলণ্ড অপেক্ষা প্যালেষ্টাইন্‌কে হৃদয়ে উচ্চতর স্থান দেয় না।

প্রাচ্য মহাদেশ এশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, চীন-দেশে কোটি-কোটি বৌদ্ধের বাস। তাহাদের ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তাহারা পাইয়াছে। কিন্তু তাহারা অবৌদ্ধ চীনদের মতই চীনদেশকে ও চীন সাহিত্য, শিল্প ও সভ্যতাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। চীনদেশে লক্ষ-লক্ষ লোক মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারাও স্বদেশী অন্য লোকদের মত চীন সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সভ্যতা আদির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও অনুরাগী।

জাপানে যে-সকল বৌদ্ধ ও মুসলমান জাপানী আছে, তাহারাও চীনদেশীয় বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মত নিজ দেশের ও তাহার সভ্যতা-আদির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও অনুরাগী।

ভিন্ন-ভিন্ন দেশের যে-সকল বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্ ও মুসলমানের কথা বলিলাম, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম যে-সব দেশ হইতে পাইয়াছেন, তাহাকে অবজ্ঞা করেন না, তাহাকেও ভালবাসেন। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও সাধারণতঃ সভ্যতার সম্পর্কে নিজের দেশের যাহা তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য, উদাসীনতা, বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষকে, প্যালেষ্টাইন্‌কে বা আরব দেশকে ও তত্তদ্দেশের সভ্যতাদিকে অধিকতর আপন মনে করেন না।

ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, ইহাকে এবং ইহার প্রধান সাহিত্য ও সভ্যতা-আদিকে ভারতীয় মুসলমানেরা সে-চক্ষে দেখেন না ও তাহার খবর রাখেন না, যে-চক্ষে চীনের ও জাপানের মুসলমানেরা তাহাদের দেশী প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতা-আদিকে দেখেন ও তাহার খবর রাখেন। গ্রীস্ ও ইটালীর বর্ত্তমান খৃষ্টীয়ান্ অধিবাসীরা তাহাদের অখৃষ্টীয়ান্ পূর্ব্বপুরুষদের সাহিত্য-আদির যেরূপ আদর ও চর্চ্চা করেন ও তাহাতে গৌরব বোধ করেন, ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের সেরূপ আদর ও চর্চ্চা করেন না ও তাহাতে গৌরব বোধ করেন না ও বিধর্ম্মীদিগের সাহিত্য ও সভ্যতা বলিয়া ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার অনাদরের কারণ নাই। কেননা, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্য ও সভ্যতাও গ্রীস্ ও ইটালীর বর্ত্তমান খৃষ্টীয়ান্ অধিবাসীদের পক্ষে বিধর্ম্মীর সাহিত্য ও সভ্যতা। চীন ও জাপানের মুসলমানদের পক্ষেও ঐ দুই দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতা বিধর্ম্মীর সাহিত্য ও সভ্যতা। তা ছাড়া, বিদেশী অহিন্দু অবৌদ্ধ খৃষ্টীয়ানেরাও ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার আদর ও অনুশীলন করেন; আরব দেশের অনেক মুসলমান-রাজা সংস্কৃত বহুগ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, ও ভারতীয় গণিত, রসায়ন ও আয়ুর্ব্বেদ হইতে আহরণ করিয়া নিজ জাতিকে অনেক বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং

ভারতবর্ষেরই অনেক মুসলমান নৃপতি প্রাচীন ও তাঁহাদের সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এখন একটা আপত্তি এই উঠিতে পারে, যে, গ্রীস্ ও ইটালীর খৃষ্টিয়ানেরা যে নিজ-নিজ দেশের প্রাচীন অখৃষ্টীয় সাহিত্য ও সভ্যতার আদর, চর্চা ও গর্ব্ব করে, চীন ও জাপানের বৌদ্ধ ও মুসলমানেরা যে নিজ নিজ দেশের অবৌদ্ধ ও অমুসলমান প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার আদর, অনুশীলন ও গর্ব্ব করে, তাহা নিজ-নিজ পূর্ব্বপুরুষদের বলিয়াই করে; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতা ত ভারতীয় মুসলমানদের পূর্ব্বপুরুষদের সাহিত্য ও সভ্যতা নহে। তাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া ভারত জয় করিয়াছিল।

ভুল এইখানেই। ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক মুসলমান যে বিদেশী মুসলমানদের বংশধর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষেরা এই দেশেরই লোক ছিলেন, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাস এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করে, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানও ইহার সমর্থন করে। মুসলমান-ধর্ম্মে হিন্দু ধর্ম্মের মত জাতিভেদ না থাকায়, যাঁহারা মোগল আরব প্রভৃতির বংশধর তাঁহারাও খাঁটি মোগল আরব প্রভৃতি নহেন; রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছে; যেমন মোগল বাদশাহদের পরিবারে পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। অতএব ইহা নিশ্চিত, যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার গৌরব করিবার যে অধিকার ভারতীয় হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধদিগের আছে, অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানেরও সেই অধিকার আছে।

কিন্তু যদি ইহা স্বীকার করা যায়, যে, সমুদায় বা অধিকাংশ মুসলমান বিদেশী মুসলমানদের বংশধর, তাহা হইলেও অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতা প্রভৃতির আদর ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, ইংলণ্ড-বিজেতা ডেন্ ও নর্ম্যান্দের বংশধরেরা ইংলণ্ডের প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার অনুশীলন ও আদর করেন। চীনদেশে কয়েক বৎসর হইল সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে মাঞ্চু বংশের সম্রাটেরা রাজত্ব করিত। এখনও তাহাদের বংশধর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ জীবিত আছেন। এই মাঞ্চু বংশীয় সম্রাটেরা ও তাহাদের অনুচরেরা মাঞ্চুরিয়া হইতে আসিয়া চীন জয় করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে মাঞ্চুরা পুরা চীন হইয়া যায়; যেমন ইংলণ্ডবিজয়ী ডেন্ ও নর্ম্যান্দের বংশধরেরা পুরা ইংরেজ হইয়া গিয়াছে। মাঞ্চুরা বহু শতাব্দী হইতে, চীনদেশের অন্যান্য অধিবাসীদিগের ন্যায় চীন সাহিত্য দর্শন ও শিল্প-আদির অনুশীলন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের এখন আর স্বতন্ত্র কোন সাহিত্য ও সভ্যতা নাই।

ইহা ঠিক কথা, যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ থাকায় ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান দ্বারা অন্য অনেক দেশের মত একটা সম্মিলিত জাতির উদ্ভব হইতে পায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে তাহাতে কোন বাধা দেখিতেছি না। হিন্দুদের ভিন্ন-ভিন্ন জা'তের মধ্যেও ত বৈবাহিক আদানপ্রদান চলে না। কিন্তু নানা জা'তের হিন্দুর মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের রসজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় মুসলমানদের যেমন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সহিত পরিচিত হওয়া কর্ত্তব্য, তেমনি ভারতীয় অ-মুসলমানদেরও মুসলমান সভ্যতার সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। তাহার জন্য অবশ্য ফারসী ও আরবী জানিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা না জানিলেও অনুবাদের সাহায্যে প্রভূত জ্ঞানলাভ করা যায়। মুসলমানেরাও সংস্কৃত ও পালি না জানিলেও অনুবাদের সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

ভারতের খুব প্রাচীন ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, যে, পরে সভ্যতার নানা শাখায় ও অঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কৃতিত্ব আছে। মধ্যযুগের ও

তৎপরবর্ত্তী সাহিত্যেও মুসলমান লেখকদেরও কৃতিত্ব আছে। মধ্যযুগে নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি যেসব ধর্ম্মসংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের এবং রামমোহন রায়ের মতে ইস্‌লামিক প্রভাব লক্ষিত হয়। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা প্রবর্ত্তন চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

এইরূপ কিছু সমন্বয় চেষ্টা করা চাই, ইহা আমরা বলিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই দেখান, যে, আগে হিন্দু-মুসলমান কতকটা গাঘেঁসা হইয়াছিল।

শিক্ষিত ও জ্ঞানী হিন্দু বা মুসলমান পূর্ব্বোক্তরূপ সমন্বয় চেষ্টার পক্ষপাতী হইবেন না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, জ্ঞানী হিন্দু কোরান্ শরীফের অনেক উপদেশের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং জ্ঞানী মুসলমান বুদ্ধদেবের অনেক উপদেশ ও উপনিষদের অনেক উক্তিকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া তাহা অপেক্ষা স্বাধীন তুরস্ক আরব আফগানিস্তানের সহিত ঘনিষ্টতর সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা স্বাভাবিক হইতে পারে। কিন্তু যেমন ভারতীয় খৃষ্টিয়ানেরা ধর্ম্মভাই ইংরেজ, জার্ম্মান্, ইতালীয়, আমেরিকান্ প্রভৃতিদের স্বাধীন দেশকে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক আপন মনে করেন না, তেম্‌নি ভারতীয় মুসলমানদেরও ধর্ম্মভাই তুর্ক্ আরব আফগান প্রভৃতিদের স্বাধীন দেশকে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক আপন মনে করা উচিত নয়। তাহারাও যে ভারতীয় মুসলমানদিগকে আপনজন মনে করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আমাদের বিশ্বাস যে-কেহ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিত হইবেন, তিনিই ভারতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবেন ও ইহাকে ভালবাসিবেন, এবং এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি সকলের মিলনের একটি কারণ হইবে। প্রাচীন বা বর্ত্তমান ভারতের মন্দ কিছু নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। মন্দ সকল দেশে ও যুগে সব জাতির মধ্যেই দেখা যায়; আমরা কেবল ভালর আদর করিতে বলিতেছি। ভারতীয় মুসলমানেরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হউন ও ইস্‌লামিক সভ্যতার অনুরাগী হউন; কিন্তু যেহেতু তাঁহারা ভারতীয় সেই কারণে তাঁহারা ভারতবর্ষের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

স্ত্রীলোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার

ব্যবস্থাপক সভায় দেশের লোকদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভোট দিবার অধিকার ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা পাইয়াছেন। এই সেদিন আসামের ব্যবস্থাপক সভায় নারীদিগকে এই অধিকার দানের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিছুদিন হইল, সিমলায় এক সভায় শিক্ষিতা নারীরা এবিষয়ে আপনাদের দাবী জানাইয়াছেন। পুরুষদের যেরূপ যোগ্যতা থাকিলে তাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন এবং নিজেরাও প্রতিনিধি পদপ্রার্থী হইতে পারেন, সেইরূপ যোগ্যতা-বিশিষ্ট নারীদিগকেও উক্ত দুই অধিকার দেওয়া হয়, নারীরা ইহাই চান। নারীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা দেশে সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে কেহই এই অধিকার লাভের উপযুক্ত নহেন, কিম্বা তাঁহাদিগকে এই অধিকার দিলে সৃষ্টিলোপ পাইবে, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাঁহারা তিন বৎসর অন্তর একবার ভোট দিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না, এবং যাহাদের অবসর ও যোগ্যতা আছে, এরূপ মহিলারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেও কোন ক্ষতি নাই। বরং মহিলারা সাংসারিক সমুদয় ব্যাপারকে কার্য্যসৌকর্য্যের যে-দিক্ হইতে দেখেন, ব্যবস্থাপক সভার তাহা জানিবার সুযোগ হইলে দেশের উন্নতিই হইবে। অন্তঃপুরে পথে ঘাটে রেলে ষ্টীমারে কলকারখানায় চা-বাগানে নারীদের ও শিশুদের সুবিধা ও কল্যাণের জন্য যত-রকমের বন্দোবস্ত করা দর্‌কার, নারীদের ও তাঁহাদের সন্তানদের মঙ্গলের জন্য বিবাহ-বিষয়ক ও সম্মতিবিষয়ক আইন এবং দায়াধিকারের আইন যে-যেদিকে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নারীদের উপর যাহারা অত্যাচার করে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য আইনের যেরূপ পরিবর্ত্তন দর্‌কার, নারীরা ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাইলে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে সাধিত হইবে।

রবি-বাবুর "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" নামক পুস্তকের প্রত্যেকটি পাতা নির্ম্মল হাসির ও রসিকতার ফোয়ারা। কিন্তু যাহাকে লোকে কাজের কথা বলিয়া থাকে, তাহা

যে এই বহিতে একেবারে নাই, তাহাও নহে। এই বহিতে যে-সকল পুরুষের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ রসিকতাবর্জ্জিত মানুষ আছেন কেবল চন্দ্রবাবু। চিরকুমার সভায় স্ত্রী-সভ্য লইবার প্রস্তাব-সম্পর্কে চন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ অধিকারের দাবী যে-সকল মহিলা করেন, তাঁহারা সেই কথাগুলি নিজেদের পক্ষসমর্থক মনে করিতে পারেন। চন্দ্রবাবু বলিতেছেন :—

"কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায়, তা'রা এক পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যেই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে' পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলে'ই আমাদের দেশের কাজে প্রাণ সঞ্চার হচ্চে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেই-জন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি! দেখ অবলা-কান্ত বাবু, এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো করে' মনে রেখো—স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নীচু করে' রাখি, তা হ'লে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা হ'লে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়—দু'পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি, তা হ'লে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব করতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই; সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।" (৯১ পৃঃ)।

—

তারকেশ্বরের মিট্‌মাট্

তারকেশ্বরের মিট্‌মাট্‌-সম্বন্ধে কাগজে যেসব সর্ত্ত বাহির হইয়াছে, আমাদের তাহা ভাল লাগে নাই। আমাদিগকে অবশ্য কখনও তারকেশ্বরে পূজা দিতে যাইতে হইবে না; কিন্তু হিন্দুসমাজ এইরূপ মিট্‌মাটের অনুমোদন করিতে পারেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অবশ্য কোন-কোন "সর্ব্বসাধারণের" সভায় প্রস্তাব ধার্য্য করাইয়া তাহাই দুই কোটি হিন্দু বাঙ্গালীর মত বলিয়া প্রকাশ করা সহজ। কিন্তু এইসব সভারও বৃত্তান্ত ভিন্ন-ভিন্ন কাগজে ভিন্ন-ভিন্ন-রকম বাহির হয়। সুতরাং সত্য খবর যে কি, তাহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"। পাইলেট যে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সত্য জিনিষটা কি? তা মন্দ বলে নাই দেখিতেছি। পাওনা কাহার কিরূপ হইল, জানিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

—

চীনে অন্তর্যুদ্ধ

চীন-দেশে জাতীয় দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম হইতে ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝা যায় না। দুই দলেরই লক্ষ্যস্থল শাংহাই। এক-দলের পক্ষে দেশের উত্তর ও দাক্ষিণে অবস্থিত মাঞ্চুরিয়া ও চেকিয়াং প্রদেশদ্বয়; অন্য-দলের পক্ষে দেশের মধ্য-স্থলে অবস্থিত পেকিং ও কিয়াংসু। এই কারণে শেষোক্ত দলের সুবিধা আছে। কারণ তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ আছে। অন্য-দল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন।

—

"রক্তকরবী"র ইংরেজী সংস্করণ

অনেক সময় একই জিনিষ দুই ভাষাতে লিখিত হইলে লেখকের বক্তব্য বুঝিবার অধিকতর সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবীর" একটি ইংরেজী সংস্করণ তিনি নিজেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা ইংরেজী "বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক" পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যা-রূপে বিশ্বভারতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা দুখানি দুই-রঙের ও আটখানি এক-রঙের ছবি আছে। শান্তিনিকেতনের হাঁসপাতাল ফণ্ডের সাহায্যার্থ ইহার মূল্য তিন টাকা রাখা হইয়াছে।

—

দেশী মিলের কাপড়ের উপর শুল্ক রদ

ইংলণ্ড হইতে যত কাপড় ও সূতা আসে, তাহার উপর যখন কর ধার্য্য হয়, তখন বিলাতী মিল্‌ওয়ালাদের প্রভাবে দেশী মিলের কাপড় ও সূতার উপরও কিছু ট্যাক্স ধার্য্য হয়। উদ্দেশ্য এই, যে, দেশী মিলের উৎপন্ন জিনিষ যেন বিলাতী জিনিষের চেয়ে বেশী সস্তা না হয়। বিদেশীর স্বার্থরক্ষার জন্য দেশী জিনিষের উপর এরূপ ট্যাক্স-স্থাপন অর্থনীতির সংরক্ষণ ও অবাধ বাণিজ্য কোন নীতি অনুসারেই সমর্থন করা যায় না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশী মিলে উৎপন্ন জিনিষের

উপর এই শুল্ক উঠাইয়া দিবার পক্ষে একটি প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মত-অনুসারে গৃহীত হইয়াছে। ভালই হইয়াছে।

—

আমেরিকা হইতে আগত শহিদী জথা

শিখেরা সংখ্যায় অল্প হইলেও নানা কাজে পৃথিবীর নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষের শিখেরা নাভা রাজ্যের অন্তর্গত জাইতোর গুরুদ্বারাতে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আদিগ্রন্থের অখণ্ডপাঠ অর্থাৎ অবিরাম আবৃত্তি স্থাপিত করিবার জন্য দলে-দলে জথা পাঠাইতেছেন। অন্যত্রও নানাপ্রকারে শিখ্ ধর্ম্মমন্দির সকলের শুদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। ইহা করিতে গিয়া অনেকের প্রাণ গিয়াছে।

এলাহাবাদে কানাডা হইতে আগত শহিদী জথার দল

অমৃতসরযাত্রী কানাডা হইতে আগত শহিদী জথা (এলাহাবাদে)

অনেকে আহত হইয়াছেন। বিস্তর লোক কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের উৎসাহ কমে নাই। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেন বা অন্য-প্রকারে দুঃখ বরণ করেন, তাঁহাদিগকে শহীদ্ (martyr) বলে। ভারতীয় শিখদের এইসব কাজে যোগ দিবার জন্য আমেরিকা হইতে একদল শিখ শহিদী জথা গঠন করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। অমৃতসরের পথে এলাহাবাদে তাঁহাদের যে-দুটি ফোটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল, এখানে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

—

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন কৃতীসন্তান হারাইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ছাত্র ছিলেন। তাঁহার ব্যবসা এটর্নীগিরিতে তিনি বিশেষ পার-দর্শিতা লাভ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু দেশের হিতকল্পে তিনি যে-সকল চেষ্টা করিয়া-ছিলেন তাহার জন্যই লোকে এখন তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে তিনি যৌবনকাল হইতেই আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হন। বঙ্গবিভাগের পর বাঙালী-দের মধ্যে আবার সমগ্র বাংলাকে একপ্রদেশভুক্ত করিবার জন্য যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন এবং বিলাতী পণ্য, বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র, বর্জ্জনের চেষ্টা ঐ আন্দোলনের অঙ্গীভূত ছিল। এক্ষেত্রেও ভূপেন্দ্রবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ যে কালক্রমে আবার একপ্রদেশভুক্ত হইয়াছে, তাহা অংশতঃ এদেশে ও বিলাতে ভূপেন্দ্র-বাবুর চেষ্টার ফল। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের এবং কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা প্রশংসনীয় ছিল।
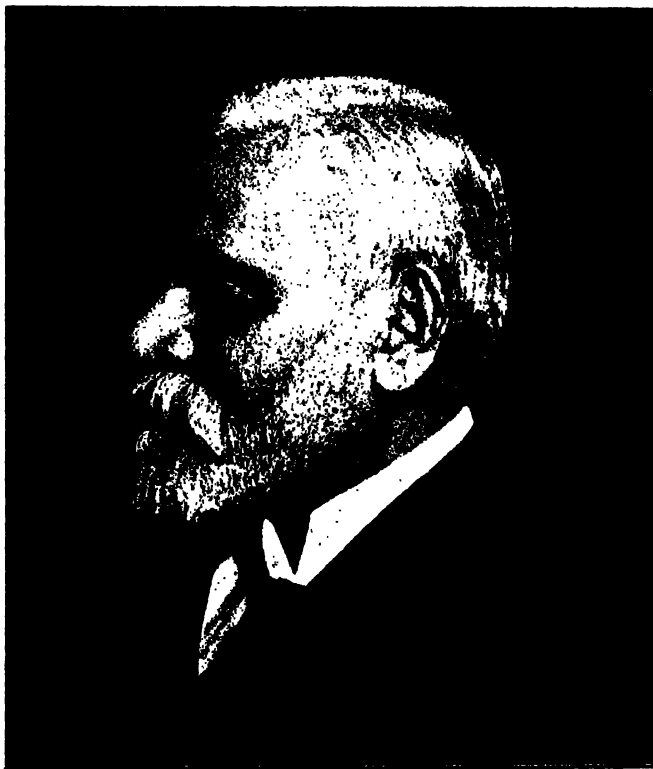
ভূপেন্দ্রনাথ বসু

তিনি কেবলমাত্র রাজনৈতিক উন্নতিরই প্রয়াসী ছিলেন না; সমাজ-সংস্কারও আবশ্যক মনে করিতেন। এই-জন্য তিনি ভিন্ন-ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ আইনসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল্ উপস্থিত করেন। তাহা পাস্ হয় নাই। কিন্তু তৎসম্পর্কে যে আলো-চনা ও আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার দ্বারা পরে শ্রীযুক্ত হরি সিং গৌড়ের সিবিল বিবাহ আইন্‌বিধিবদ্ধ হইবার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

ভূপেন্দ্র-বাবু জীবনের শেষ কয়বৎসর রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু পদমর্য্যাদা বা অর্থলাভের জন্য তিনি রাজকার্য্য গ্রহণ করেন নাই; নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে দেশের উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া রাজকর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রেত দেশের উপকার

হইয়াছিল কি না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল। তাঁহার রাজকার্য্য-গ্রহণ-সম্পর্কে আমাদের কেবল এই দুঃখ প্রকাশ করা এখানে অসঙ্গত হইবে না, যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার আয়ুঃ-ক্ষয় হওয়ায় তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন; নতুবা তাঁহার দ্বারা দেশের আরও সেবা হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি শেষ বয়সে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ধৈর্য্যের সহিত ঈশ্বর-বিশ্বাসী পুরুষের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন।

—

লী-কমিশনের রিপোর্ট

লী-কমিশনের নির্দ্দেশ-অনুসারে কাজ করা হউক, এই মর্ম্মের একটি প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর একটি প্রস্তাব অধিকাংশের মত-অনুসারে গৃহীত হইয়াছে। ঠিকই হইয়াছে!

লী-কমিশনের নির্দ্দেশ-অনুসারে কাজ হওয়ার বিরুদ্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। সংক্ষেপে তাহার কয়েকটি বলিতেছি।

কমিশন্ সিবিলিয়ান্ প্রভৃতি বড় চাকুরোদের বেতন আরও বাড়াইতে বলিয়াছেন! তাহারা এখনই অন্য অনেক ধনী দেশের ঐ-শ্রেণীর চাকর্যেদের চেয়ে বেশী বেতন পায়; সুতরাং তাহাদের বেতন আরও বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই; তাহা উচিতও নহে। আমাদের অত বেশী বেতন দিবার ক্ষমতা নাই। এখন যত বেশী সম্ভব টাকা দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য ব্যয় করা উচিত। ইংরেজরা যদি বর্ত্তমান অত্যধিক বেতনেও কাজ করিতে না চান, করিবেন না; ভারতীয়দের মধ্যেই যোগ্য লোক যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ইংরেজরা এদেশে বেতন যে কম পাই-তেছেন তাহা নহে। দেশী লোকের অল্প-কিছু কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের উপর হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও বেশী হইবে। তাহা তাঁহাদের সহ্য হইতেছে না। কিন্তু আরও বেশী বেতন পাইলে তাঁহারা, 'পেটে খেলে পিঠে সয়,' নীতি-অনুসারে তাঁবেদারীটা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ইংলণ্ডে বিস্তর শিক্ষিত ও যোগ্য লোক পর্য্যন্ত বেকার আছে। সুযোগ পাইলে তাহারা সিবিলিয়ান্দের বর্ত্তমান বেতন অপেক্ষা কম বেতনেও কাজ করিতে আহ্লাদের সহিত রাজী হইবে।

লী-কমিশন ঠিক করিয়া দিয়াছেন, যে, কত বৎসর পরে শতকরা কতগুলি উচ্চ চাকরী ভারতীয়েরা তাহাদের নিজের দেশে পাইবে। আমরা শতকরা ততগুলি চাকরী তাহা অপেক্ষা অল্প সময়েই চাই, তাহা দেশের লোকের পাওয়া উচিত এবং চাকরীর কাজ করিবার মত যোগ্য লোক ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়েরা স্বদেশে শতকরা নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক কতকগুলি চাকরী পাইবে, তাহার বেশী পাইবে না, ইহার মানে কি? আমরা নিজের দেশের সমস্ত কাজই নিজেরা করিতে চাই; তাহা অপেক্ষা কম-কিছু ন্যায়সঙ্গত নহে এবং তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যদি কোন কাজ আমরা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা নিজে উপযুক্ত লোক বিদেশ হইতে আমদানী করিব, এবং যত টাকা বেতনে সেরূপ লোক পাওয়া যাইবে তাহার বরাদ্দ করিব।

লী-কমিশন্ ধরিয়া লইয়াছেন, যে, ভারতের প্রদেশ-গুলিতে বর্ত্তমান-রকমে দ্বৈরাজ্য (অর্থাৎ ডায়ার্কী) থাকিবে ও সমগ্রভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগ ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবে না। ইহা ধরিয়া লইয়া লী-কমিশন তদনুযায়ী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দেশের সব রাজনৈতিক দল একবাক্যে প্রদেশ-গুলিতে আত্মকর্ত্তৃত্ব চাহিতেছে, এবং সমগ্রভারতীয় গবর্ণমেণ্টে কেবল সামরিক, বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগ ছাড়া আর সমস্তই দেশী মন্ত্রীদের হাতে আসুক, ইহা অপেক্ষা কম কোন রাজনৈতিক দলই চাহিতেছে না, বরং কেহ কেহ বেশী চাহিতেছে। সুতরাং লী-কমিশনের নির্দ্দেশগুলিকে অগত্যা দেশের প্রতিনিধিরা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ব্যবস্থা এইরূপ আছে, যে, সিবিলিয়ান্

প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন যদিও ভারতবর্ষ দেয় এবং যদিও তাহাদের কেহ-কেহ নামে দেশী মন্ত্রীদের তাঁবেদার, তথাপি তাহাদের নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়ে দেশের কাহারও এমন-কি ভারত গবর্ণমেণ্টেরও, চূড়ান্ত কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। বিলাতে বসিয়া ভারতসচিব এইসব করেন। ইহা অসঙ্গত ব্যবস্থা। লী কমিশন ইহা কায়েম রাখিতে চান। মানে এই, যে, এখন যেমন সিবিলিয়ান্‌রা নামে পাব্লিক্ সার্ভেণ্ট্ বা সর্ব্ব-সাধারণের সেবক হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদের প্রভু, ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব এরূপ ব্যবহারের উচ্ছেদ সাধন করিতে চাই।

ইংরেজ জাতি নিজেদের বাড়ীর খোরাকের জন্য অনেক জিনিষ রাখিয়া দেয়। যেমন, ইংরেজী সাহিত্যে স্বাধীনতার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়! এই স্বাধীনতাটি তাহাদের নিজের ভোগ্য বস্তু; তাহাদের অধীনস্থ "রঙীন্" আদমীদের ভোগ্য নহে। তেম্‌নি ইংরেজী একটি প্রবাদ বাক্য আছে, যে, সানাই-বাজন্দারকে যে পয়সা দেয়, স্বরের ফর্‌মাইস্‌টা করিবার অধিকারও তাহার। এটাও ইংরেজদের নিজের ভোগ্য বস্তু। ভারতীয়দের জন্য নিয়ম এই যে, ইংরেজ ঢাকী যে সুরে ইচ্ছা আমাদের পিঠের চামড়ার উপর ঢাক বাজাইবে, এবং তাহার মজুরীটা আমাদিগকে দিতে হইবে।

যদি সিবিলিয়ান্‌রা এখনকারই মত দেশের প্রভু থাকে, তাহাদিগকে বাগে আনিবার ভারতবর্ষের কাহারও কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে প্রাদেশিক আত্ম-কর্ত্তৃত্ব, স্বরাজ্য প্রভৃতি কথার কোন মানে থাকে না।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা লী কমিশনের নির্দ্দেশসমূহ অগ্রাহ্য করিলেও, গবর্ণমেণ্টের তৎসমুদয়ের অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে, এবং সম্ভবতঃ সেইরূপ ব্যবস্থা হইবেও। অতএব দেশী প্রতিনিধিদের জয়কে শাব্দিক জয় বলা যাইতে পারে।

—

সংশোধিত ফৌজদারী আইনের এক অংশ রদ

সংশোধিত ফৌজদারী আইনের এক অংশ-অনুসারে গবর্ণমেণ্ট্ যে কোন সভা-সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে এবং উহার সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। এই আইন-অনুসারে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দলকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রু প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবকদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের এই অংশ রদ করিবার জন্য ডাঃ হরিসিং গৌড়ের প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে।

ইহার রদ হইলেও গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন লোকদিগকে জব্দ করিবার উপায় গবর্ণমেণ্টের হাতে অনেক থাকিবে।

—

সকল দলের সম্মিলিত কংগ্রেস্

সকল দলের সম্মিলিত কংগ্রেস্ হওয়া আমরা খুব বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইহার জন্য মিসেস্ বেসাণ্ট খুব চেষ্টা করিতেছেন। তাহার কারণ, বোধ হয়, তিনি বিলাতে স্বরাজ্য লাভের দর্‌বার করিতে গিয়া বুঝিয়া আসিয়াছেন, যে, ছোট-ছোট এক-একটা দলের মতের প্রভাব বিলাতের লোকদের উপর আশানুরূপ বেশী হয় না। সম্মিলিত জাতির মতের প্রভাব বেশী।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেস্ চর্‌কায় সুতা কাটা, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, এবং হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মিলন-স্থাপন, এই কয়টি কাজ লইয়া থাকিবেন, এইরূপ সর্ত্তে তিনি সম্মিলিত কংগ্রেস্ করায় রাজী আছেন। তা ছাড়া তাঁহার ইহাও একটি মত, যে, "পরিবর্ত্তনবিরোধী"রা অর্থাৎ যে-সব অসহযোগী এখনও আদালত-আদি সর্ব্ববিধ বর্জ্জনের পক্ষপাতী তাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের বাহিরে যে-দলের যেরূপ ইচ্ছা তাহারা তদ্রূপ রাজনৈতিক আন্দোলন ও অন্যবিধ চেষ্টা করিতে পারিবেন।

মিসেস্ বেসাণ্ট চর্‌কায় সুতা কাটিতে রাজী হইয়াছেন। চর্‌কার সপক্ষে, আমাদের মতে, যাহা কিছু বলা যায়, তাহা আমরা একাধিক বার বলিয়াছি। কিন্তু চর্‌কাকে একটা জাদুযন্ত্র বা জাদুমন্ত্রে পরিণত করিতে আমরা অনিচ্ছুক। যে-ভাবে ও যে-কারণেই হউক, চর্‌কা ঘুরাইলেই স্বরাজ্য কিম্বা জাতীয় সমৃদ্ধি লব্ধ হইবে, ইহা আমরা মনে করি না। তিব্বতী বৌদ্ধ লামারা এক-একটি প্রার্থনা চক্র (প্রেয়ার্ হুইল্) হাতে লইয়া ঘুরায়। তাহার ভিতরে "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিত থাকে। পড়িয়াছি, যে, মঙ্গোলিয়ায় জলস্রোতের শক্তি দ্বারাও বৃহৎ আকারের এইরূপ প্রার্থনা-চক্র ঘুরান হয়। এইরূপ যান্ত্রিক উপায়ে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না; মুক্তি আত্মিক জিনিষ। সেইরূপ স্বরাজ্য ও জাতীয় ঐশ্বর্য্য লাভ জাতীয় প্রাণবত্তার দ্বারাতেই হইতে পারে। জাতির লোকদের আত্মা অবশ্য বাহ্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে পারে, নানা যন্ত্রের সাহায্য লইতে পারে; কিন্তু ভিতরে স্বাধীন প্রবুদ্ধ আত্মা, স্বাধীন জাগ্রত প্রাণ চাই। তাহা থাকিলে, চর্‌কা অবলম্বিত হইতে পারে, কিম্বা আর-কিছু অবলম্বিত হইতে

পারে,—তাহা অবান্তর। কিন্তু স্বাধীন আত্মা একান্ত আবশ্যক। নতুবা মহাত্মাজীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য-প্রযুক্ত কিম্বা তাঁহাকে খুসি করিবার জন্য চর্‌কা ঘুরাইলেই একটা বড় কিছু ইষ্ট লাভ হইবে, আমরা মনে করি না। এইজন্য কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে সূতা কাটিতেই হইবে, এ-নিয়মের আমরা পক্ষপাতী নহি।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন, শুধু রাজনৈতিক কারণে নহে, সকল দিক্ দিয়াই একান্ত আবশ্যক। ইহা না হইলে আমরা মনুষ্য নাম ব্যবহার করিতে পূর্ণ অধিকারী হইতে পারি না।

কংগ্রেসের বাহিরে সকল দলের লোক নিজের নিজের মত-অনুসারে সব কিছু করিতে পারিবেন, কিন্তু "পরিবর্ত্তন-বিরোধী"রা তাঁহাদের মত-অনুসারে কৌন্সিল্ প্রবেশের অনিষ্টকারিতা ও অনাবশ্যকতা দেখাইতে পারিবেন না, এরূপ নিয়ম করিলে অন্য সব দলের লোকদের চেয়ে গান্ধী মহাশয়ের অনুবর্ত্তী লোকদিগের স্বাধীনতা কম করা হয়।

গান্ধী মহাশয় কংগ্রেসের যে যে কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে সম্মিলিত কংগ্রেস্ সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কংগ্রেসের প্রকৃতি বদ্‌লাইয়া যাইবে। উহা এতদিন প্রধানতঃ রাজনৈতিক সভা ছিল; অতঃপর সাক্ষাৎভাবে তাহা আর থাকিবে না। তাহা হইলে সম্মিলিত ভারতীয় জাতির রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও অভিলাষ-সম্বন্ধে কংগ্রেস্ কিছু বলিতে আর অধিকারী থাকিবেন না। সুতরাং সম্মিলিত কংগ্রেসের অন্যবিধ সার্থকতা যাহাই থাক্, সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক সার্থকতা কিছু থাকিবে না।

কংগ্রেসের "জাতি-গঠনমূলক কার্য্য-পদ্ধতি"তে আগে মদ্যপানাদি নেশা দূর করাটাও অন্যতম কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা মহাত্মা গান্ধী এখন কেন বাদ দিতেছেন? বিদেশী কাপড় পরিলে সাক্ষাৎভাবে মানুষের কোন নৈতিক অবনতি হয় না, স্বাস্থ্যহানিও হয় না। কিন্তু মদ, আফিং, গাঁজা প্রভৃতির নেশা করিলে মানসিক ও নৈতিক অবনতি হয়, এবং স্বাস্থ্য খারাপও হয়! খদ্দরের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ (আমরাও সেই দল-ভুক্ত) অনেকবার বলিয়াছেন, যে, বিদেশী কাপড় ব্যবহার করায় ভারতবর্ষের প্রতিবৎসর ষাট কোটি টাকা লোক্‌সান হয়। মদ, আফিং প্রভৃতির নেশা করায় ভারতবর্ষের তাহা অপেক্ষা কম টাকা লোক্‌সান হয় না। সুতরাং আর্থিক ক্ষতির কারণ বলিয়াও এইসব নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা দেশের নেতাদের ও কংগ্রেসের কর্ত্তব্য।

—

গবর্ণ্‌মেণ্টের আফিং নীতি

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণ্‌মেণ্ট পক্ষ হইতে আফিং-সম্বন্ধে নানা কথা বলা হইয়াছে। তাহার একটা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সর্‌কার বাহাদুর বলেন, যে, আফিং ঔষধার্থে এদেশের লোক খুব ব্যবহার করে; কিন্তু যদি এমন নিয়ম করা যায়, যে, যোগ্যতা-বিশিষ্ট (কোয়ালিফায়েড) চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন কেহ আফিং খাইবে না, তাহা হইলে বিস্তর লোকে উহা ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে পাইবে না, এবং তাহাতে তাহাদের ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে। কারণ এদেশে যোগ্যতা-বিশিষ্ট চিকিৎসক মোটেই যথেষ্ট নাই। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, যে, যোগ্যতা-বিশিষ্ট চিকিৎসক যে এদেশে যথেষ্ট নাই, তাহার জন্য দায়ী কে? গবর্ণ্‌মেণ্ট কেন কেবল যুদ্ধের ব্যয় ও ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতনের ব্যয় বাড়াইতেই ব্যস্ত? যথেষ্ট চিকিৎসা বিদ্যালয় কেন স্থাপন করেন নাই?

বিলাতের লোকেরা চিকিৎসকের ব্যবস্থা ভিন্ন আফিং-ঘটিত কোন ঔষধ ক্রয় করিতে পারে না। ইহার মানে এই, যে, আফিং-ঘটিত জিনিষ বা আফিং ইংরেজেরা যথেষ্ট কিনিতে পাইলে তাহা বিচারপূর্ব্বক কেবল ঔষধের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে না, তাহাদের সেরূপ জ্ঞান, বিবেচনা ও সংযম নাই। ইংরেজরা এই-প্রকারে নিজের জাতিকে মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে যাহার ইচ্ছা সেই আফিং কিনিতে পারে। যদি গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বলেন, যে, ইহাতে দেশের লোকদের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহারা কেবল ঔষধের জন্যই এবং তদুপযুক্ত মাত্রাতেই ইহা ব্যবহার করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, এদেশের লোক বিলাতের লোকদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী, বিবেচক ও সংযত। অথচ ইহাও বলা হয়, যে, জাতীয় আত্ম-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার মত জ্ঞান, বিবেচনা, সংযম ইত্যাদি ভারতীয়দের নাই! কোন্ কথাটা সত্য?

ভারতবর্ষে যে বিস্তর আফিংখোর ও গুলিখোর আছে এবং বিস্তর শিশুকে তাহাদের মাতা মিলের মজুরানীরা আফিং খাওয়াইয়া জড়প্রায় করিয়া ঘরে রাখিয়া কাজ করিতে যায় ও তাহাতে তাহাদের ভীষণ ক্ষতি হয়, ইহা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ অনবগত নহেন। কিন্তু টাকার লোভে তাঁহারা সত্য কথা স্বীকার করিতে চান না। টাকার লোভে ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ আফিং চালাইবার জন্য দুই-দুই বার চীন দেশের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবাসী কার্য্যালয় ১৮ই আশ্বিন হইতে ২রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া বা অনুরোধ পালন করা যাইবে না; যাঁহার যাহা আবশ্যক তাহা ছুটির পর সন্ধান করিবেন, এবং পূর্ব্বে পত্র লিখিলেও অফিস খোলার পর উত্তর পাইবেন।
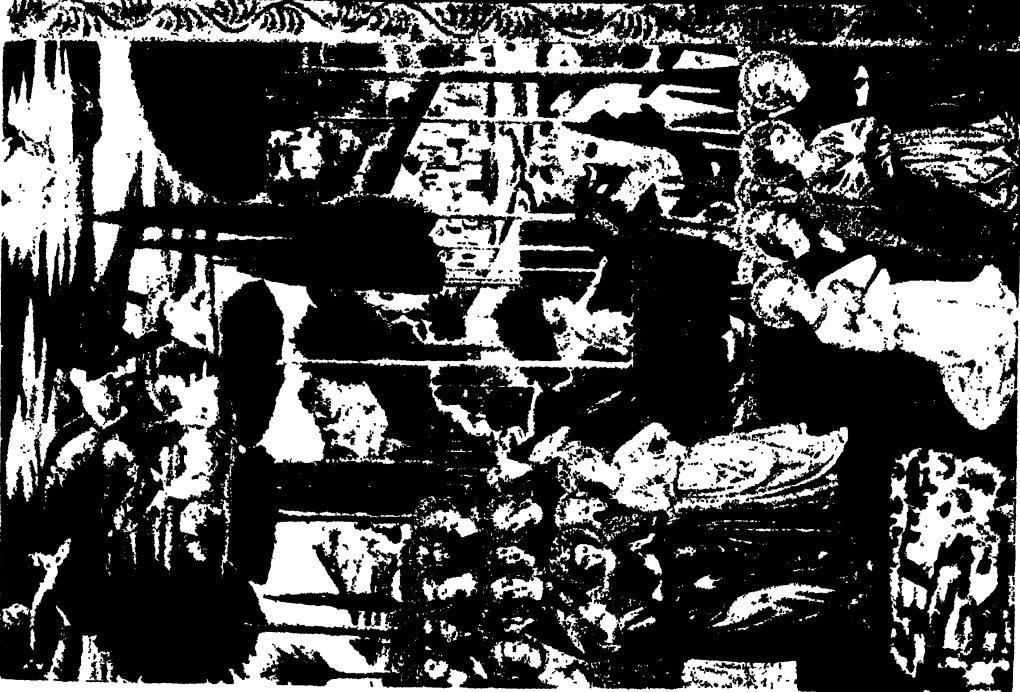
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

২য় সংখ্যা

দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বদিন*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গান 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো')

মানুষ ঘর-ছাড়া জীব, মানুষ পথিক! মৌমাছি বহুযুগ আগে যেমন মৌচাক করেচে, আজও সে তেমনি করে'ই তার মৌচাক বাঁধ্‌চে। পিপ্‌ড়েও ঠিক আগের মতই তার খাবার সংগ্রহ কর্‌চে। পাখীরা পূর্ব্বে যেমন নীড় বাঁধ্‌ত আজও ঠিক সেইরকম করে'ই নীড় বাঁধ্‌চে, পূর্ব্বে তা'রা যে-সুরটিতে গান ধর্‌ত, আজও ঠিক তাই সমান আছে। তাদের অভ্যাসের মধ্যে একটা স্থিতি আছে।

কেবল মানুষের বেলায় সেটি হ'ল না। সেই যুগ-যুগান্তর আগে মানুষ বন্য জীব-জন্তুর মতই একসঙ্গে গুহায় বাসা বেঁধেছিল, কিন্তু গুহায় তার কুলোল না। তার পরে সে খড়-কুটোর বাসা বাঁধ্‌লে, মাটির দেওয়ালের ঘর কর্‌লে। তার পরে আজ ইট-পাথরের বাড়ী-ঘর তৈরী কর্‌চে। তার ঘরের মধ্যেও তার থামা নেই—তার ঘর-বাঁধার মধ্য দিয়েও তার পথ। সে যে চিরপথিক।

যে-জাতির চলার পাথেয় ফুরোল, চলার সাধনায় যার জড়ত্ব এল, সে-জাতি তার গতির শেষে দুর্গতিতে এসে ঠেক্‌ল। ভয়ে-ভয়ে সে-জাতি তার সঞ্চয়ের খোটায় নিজেকে বাঁধ্‌লে—সেই বন্ধনেই তার বিনাশ।

চলাই মানুষের নিয়ত মুক্তি। এরই বীজমন্ত্র উপনিষদে রয়েছে, সে-মন্ত্রটি হচ্ছে 'বিশ্বকর্ম্মামহাত্মা'। সেই মহাত্মা, তাঁর কর্ম্ম কোন সীমার মধ্য বদ্ধ না, তাঁর কর্ম্ম বিশ্বের কর্ম্ম। মানুষ মহৎ, তার মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় বিশ্বকর্ম্মের দ্বারা। যে-জাতির "ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ" পরিচিতের নিশ্চিত বেড়ার মধ্যেই তার চিরপ্রসরমাণ আত্মপরিচয় বিলুপ্ত হ'ল—বিশ্বকর্ম্মের ভিতর দিয়ে সে আপন মাহাত্ম্য জান্‌লে না।

পশ্চিম মহাদেশ জানার পথে মুক্তির অন্বেষণ করেচে, তা'তে তা'রা এগিয়েচে। তা'রা কোনোখানেই জানার সীমা মান্‌লে না। জানার পথ দিয়ে তাদের পাওয়ার পথ

* ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩১, বুধবার, শান্তিনিকেতন মন্দিরের বক্তৃতা।

জলে স্থলে আকাশে বিস্তৃত হচ্চে। মাটির উপর দিয়ে চলায় তা'রা থাম্‌ল না, মহাসমুদ্রের পথে চিহ্নহীন পথে—মহাকায় জাহাজ ভাসালে। মানুষের পাখা নেই, তবু পশ্চিমের মানুষ বল্‌লে আমার পাখা চাই—সে আকাশপথে উড়্‌ল। এখনও শেষ হয়নি আর কোন দিন যেন শেষ না হয়।

এই অন্তহীন জানার পথে, পাওয়ার পথে পশ্চিমের মানুষ আপনার জ্ঞানমাহাত্ম্য লাভ করেচে। এই মাহাত্ম্যই তা'কে বিশ্বশক্তির ক্ষেত্রে মহা অধিকার দিয়েচে। কিন্তু এই অধিকার বাহিরের সঞ্চয়কে আশ্রয় করার অধিকার নয়, সঞ্চয়কে নিত্য অতিক্রম করার অধিকার।

পশ্চিম কিন্তু এই কথাই আজ ভুল্‌তে বসেচে। তার পাওয়ার মধ্যে আজ আপনাকে পাওয়ার থেকে অন্য জিনিষ পাওয়ার লোভ বেশি ঢুকেচে। সেই লোভের ধূলোয় আজ পশ্চিম তার উচ্চ শির লুটিয়েচে। সে আপনার সঞ্চয়ের মধ্যে বদ্ধ হ'ল। তার বাহিরের লোভ অন্তরের লাভের চেয়ে বড় হ'ল। পশ্চিম চলৎশক্তির দ্বারা ধনী, শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে, কারণ, চলৎশক্তিতেই আত্মার শক্তি, আত্মার মুক্তি; অন্যদিকে সে তার গৃধ্নুতার দ্বারা দুর্ব্বল হয়েচে, বদ্ধ হয়েচে। চিরকালই সকল দেশেই বিষয়লোভ মানুষের কিছু-কিছু রয়েচেই। পাছে সেই লোভে আত্মার মহত্ত্ব থেকে, মুক্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়, এইজন্যেই তার ধর্ম্মসাধনায় তা'কে এই লোভের বিরুদ্ধে লড়াই কর্‌তে বলেচে। শত্রুপক্ষ যখন অত্যন্ত প্রবল ছিল না তখন লড়াই করা সহজ ছিল। আজ মানুষ নিজের জ্ঞানমাহাত্ম্যের সাহায্যেই বিষয়সংগ্রহকে অত্যন্ত প্রকাণ্ড করে' তুলেচে; তার লোভের সামগ্রী এত নিরতিশয় প্রবল হ'য়ে উঠেচে যে, এই লোভ তার আত্মার জয়যাত্রাকে অবরুদ্ধ করেচে—মনুষ্যত্ব আপন সত্য থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে পীড়িত হচ্চে, পীড়া বিস্তার কর্‌চে। যে-আলোতে মন্দিরকে আলোকিত করার কথা ছিল সেই আলোকে পশ্চিম তার প্রমোদ-ভবনের আলো করে' তুলেচে। যে-ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা সে বন্ধন ছেদন কর্‌বে কথা ছিল, সেই অস্ত্র নিয়ে সে আজ নিজেকেই মার্‌তে বসেচে।

চল্‌তে-চল্‌তে আমরা পাই, আবার ছেড়ে দিতে-দিতেই আমরা অগ্রসর হ'তে পারি। পাওয়া এবং দেওয়া এই দুইয়ের সামঞ্জস্যেই আমাদের কল্যাণ। পাওয়ার মধ্যে দোষ নেই। যে অকিঞ্চন পাওয়া থেকে বঞ্চিত, সে কৃপাপাত্র। যে পায় কিন্তু রাখে না, দিয়ে দেয়, সেই মুক্ত।

মানুষকে আপনার সংগ্রহ থেকে বাঁচাতে হবে। কর্ম্মের অভ্যাসও মানুষের পক্ষে সংগ্রহ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। এইজন্যেই গীতায় আছে নিরাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর্‌তে হবে। অর্থাৎ কর্ম্ম থেকে যা পাই, তা'তে যেন বদ্ধ না হই। ভারতবর্ষে আমরা দুর্ব্বলভাবে এই সত্যের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌চি, আর পশ্চিম কর্‌চে প্রবলভাবে।

তাই, সমস্ত পৃথিবী আজ মরণের বিষে, অসত্যের বিষে জর্জ্জরিত, কেননা, সংগ্রহে সত্য নয়। যে শক্তি আত্মার, পশ্চিম সেই শক্তি দ্বারা আত্মহত্যা কর্‌চে। যে শক্তি নিত্য অসীমের অভিমুখে প্রবহমাণ, তার অশেষ দুর্গতি হচ্চে। ভারতবর্ষে তার প্রতি অবিশ্বাস, তাই আমাদের অন্ধকার আর যায় না।

পশ্চিম সংগ্রহের পথে চলে' একদিকে এগিয়েচে; কিন্তু অন্যদিকে রিপু এসে তা'কে বেঁধেচে। ভারত আগে কোনদিন বলেনি দেশকে ধনী, ক্ষমতাশালী কর্‌লেই তার মুক্তি। ভারত বলেচে আত্মা যখন সবদিকে বন্ধনমুক্ত, তখনই যথার্থ মুক্তি; কেবল অন্নবস্ত্রে মুক্তি বা রাজসিংহাসনে মুক্তি নেই। আজ ভারতবর্ষ পশ্চিমের মিথ্যা মুক্তির দিকে সলোভ দৃষ্টি কর্‌চে আর ভাব্‌চে ওদের মত মুক্ত হওয়াটাই বুঝি বড় জিনিষ। কিন্তু পশ্চিম যে-মুক্তি লাভ করেচে সে ত যথার্থ মুক্তি নয়। সত্যই যে মুক্ত, সে অন্যকেও মুক্তি দেয়। যে দীপ আলোকিত সে দীপ সকলকেই আলোক বিতরণ করে। পশ্চিম যদি মুক্ত হ'ত, সে সকলকে মুক্তি দিত। ইংরেজ যাকে স্বাধীনতা বলে সেই স্বাধীনতার লুব্ধতায় সে পরাধীনতার নিগড়ে দেশবিদেশকে বাঁধ্‌চে। সমস্ত পৃথিবীতে সে আজ দাসত্ব বিস্তার করে' দিলে, সে যদি যথার্থ স্বাধীন হ'ত তা হ'লে এ কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। কোন যথার্থ

সম্পদ্ মানুষ কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ করে' রাখ্‌তে পারে না। যে-জ্ঞান সকলের জন্যে উৎসর্গ-করা সেই জ্ঞানই জ্ঞান, যে মুক্তি সকলের বন্ধন মোচন করে, সেই মুক্তিই মুক্তি। মুক্তির নামে যে-শক্তি পরকে দাসত্বে বাঁধে সে-মুক্তি দাসত্বের জন্মভূমি—তা'তে কারো কোন কল্যাণ হ'তেই পারে না। পৃথিবীতে অনেক বড়-বড় সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এই ছদ্মবেশী দাসত্বের কাঁধে ভর দিয়ে রসাতলে নেমে গিয়েচে।

উদ্দালকের ব্রহ্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

উদ্দালক আরুণি উপনিষদের একজন খ্যাতনামা ঋষি। ইঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অদ্য আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

পিতার প্রশ্ন

শ্বেতকেতুর বয়স যখন ১২ বৎসর, তখন পিতা তাহাকে বেদ-অধ্যয়নের জন্য গুরু-গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু বার বৎসর বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিল। তখন পিতা তাহাকে বলিলেন—"শ্বেতকেতো! তুমি ত মহামনা, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। কিন্তু তুমি কি সেই উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হওয়া হয়, অ-মত বিষয় মনন করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়?"

শ্বেতকেতু বলিল—"ভগবন্! সে উপদেশ কি-প্রকার?"

পিতার উত্তর

পিতা বলিলেন—"হে সৌম্য! যেমন একটি মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদয় মৃন্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, একটি নাম মাত্র; কিন্তু মৃত্তিকাই সত্য; হে সৌম্য! যেমন একটা স্বর্ণ পিণ্ড জানিলেই সমুদয় স্বর্ণময় বস্তু জানা যায়; বিকার শব্দমূলক, নাম মাত্র; কিন্তু স্বর্ণই সত্য বস্তু;—হে সৌম্য! যেমন একটি নখনি-কৃন্তন (অর্থাৎ নরুণ) জানিলেই সমুদয় লৌহময় বস্তু জানা যায়; বিকার শব্দাত্মক, নাম মাত্র; কেবল লৌহই সত্য,—হে সৌম্য! এই উপদেশও সেই-প্রকার!" ছাঃ ৬৷১।

ব্যাখ্যা

উদ্দালক যাহা বলিলেন, তাহা সহজবোধ্য নহে; এইজন্য ইহার কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

তিনটি দৃষ্টান্তই একশ্রেণীর; মৃত্তিকা এবং আম-কুণ্ডাদি একই বস্তু। কুম্ভ-শরাবাদি মৃত্তিকাই। তবে যে কোন দ্রব্যকে কুম্ভ, কোন দ্রব্যকে শরাব বলা হয় তাহার কারণ ভাষা। ভাষার জন্যই ইহাদিগের ভিন্নত্ব বোধ হইয়াছে। নতুবা এ-সমুদয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মৃত্তিকা এবং ইহার বিকার কুম্ভ-শরাবাদি, পৃথক্ বস্তু নহে, ইহারা একই বস্তু। স্বর্ণ ও লৌহের দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঋষি এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। ইহার পরে উদ্দালক যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ এই :—

জগতে নানা-শ্রেণীর বস্তু রহিয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতেই অসংখ্য বস্তু। কিন্তু এইসমুদায়ের কয়টি বস্তুর বিষয় আমরা জানিতে পারি; এক-এক করিয়া যদি প্রত্যেক বস্তুকেই জানিতে হইত, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে জগতের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব হইত। কিন্তু জানিবার অন্য একটি উপায় আছে। জগতে অসংখ্য কুম্ভ রহিয়াছে, প্রত্যেক কুম্ভের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব এবং এ-প্রকার চেষ্টা করাও অনর্থক। কিন্তু কুম্ভ মৃত্তিকারই একটি রূপ।

যদি আমরা একটি মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই জগতের সমুদয় কুম্ভের জ্ঞান লাভ করা হইবে। যদি আমরা একখণ্ড স্বুবর্ণকে জানিতে পারি, তাহা হইলে স্বুবর্ণময় সমুদায় বস্তুরই জ্ঞান লাভ হইবে। যদি একখণ্ড লৌহের তত্ত্ব জানিতে পারি, তাহা হইলে জগতের সমুদায় লৌহময় বস্তুর তত্ত্ব জানা যাইবে। মৃত্তিকা মূল বস্তু, কিন্তু মৃন্ময় বস্তু বহু; স্বুবর্ণ একটি বস্তু, কিন্তু স্বুবর্ণময় বস্তু বহু; লৌহ একটি বস্তু, কিন্তু লৌহময় বস্তু বহু। এক-কথায় মূল বস্তু এক, কিন্তু বিকার বহু। যদি আমরা মূল বস্তুটিকে জানিতে পারি, তাহা হইলে সমুদয় অজ্ঞাত বিকার বস্তুকে জানা যায়। এই-প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি প্রথমে শ্বেতকেতুর মনকে প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। তাহার পরে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এমন একটি বস্তু আছে, যাহার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে সমুদয় অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর উদ্দালক শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গুরু-গৃহে এই-প্রকার উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

শ্বেতকেতু বলিলেন—"উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন না; যদি জানিতেনই, তবে বলিতেন না কেন? স্বুতরাং ভগবানই আমাকে তাহা বলুন।"

পরিণাম-বাদ

ইহার উত্তরে ঋষি যে মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই মতের নাম বিকার-বাদ বা পরিণাম-বাদ। তিনি আমাদিগের নিকট দুই-শ্রেণীর বস্তুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—(১) মূল বস্তু, (২) বিকার বস্তু। মৃত্তিকা মূল বস্তু; আম-কুম্ভ ইহার বিকার। স্বুবর্ণ মূল বস্তু, স্বুবর্ণ-কুণ্ডল ইহার বিকার। লৌহ মূল বস্তু, ছুরি, কাঁচি ইহার বিকার। জগতের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বস্তুর বিষয়ে দেখা যাইতেছে কোনটি মূল বস্তু এবং কোনটি ইহার বিকার।

সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বিষয়েও ইহাই সত্য। এস্থলেও একটা মূল বস্তু আছে; এবং সৃষ্ট জগৎ ইহার পরিণাম। ইহার অর্থ এই যে, সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই মূল বস্তু এবং এই জগৎ ইহারই পরিণাম বা বিকার বা প্রকাশ। একখণ্ড স্বুবর্ণকে জানিলে যেমন সমুদয় স্বুবর্ণময় বস্তুকে জানা যায়, তেমনি সেই সৎস্বরূপকে জানিলে জগতের সমুদয় বস্তুকে অবগত হওয়া যায়।

এই তত্ত্বই ঋষি পুত্রের নিকট নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সৃষ্টি

(ক)

ঋষি প্রথমেই ব্যাখ্যা করিলেন সৃষ্টি তত্ত্ব। তাঁহার মতে স্রষ্টাই সৃষ্টবস্তু-রূপে পরিণত হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন, এমন এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না;—তাহার পরে এই জগৎ উৎপন্ন হইল। ইহাই অন্য ভাষায় বলা যাইতে পারে অসৎ হইতে সৎবস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। এ-বিষয়ে উদ্দালক এই-প্রকার বলিয়াছেন:—

"হে সৌম্য! অগ্রে এই জগৎ সৎরূপে বর্ত্তমান ছিল। এ-বিষয়ে কেহ-কেহ বলেন, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ রূপে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু হে সৌম্য! কি-প্রকারে ইহা হইতে পারে? কেমন করিয়া অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে? এ-জগৎ অগ্রে অদ্বিতীয় সৎরূপেই বর্ত্তমান ছিল।" ছাঃ ৬।২।১,২।

ঋষির বক্তব্য এই—এখন দেখিতেছি এই জগৎ রহিয়াছে। কিন্তু এমন-এক সময় ছিল, যখন এ-জগৎ বর্ত্তমান ছিল না। এস্থলে পণ্ডিতগণ এই-প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন "যখন এ-জগৎ ছিল না, তখন কি ইহার কিছুই ছিল না?" এপ্রশ্ন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা অদ্ভুত নহে, ইহা অত্যন্ত সারগর্ভ। উদ্দালক নিজেই এপ্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার মত এই—যখন এজগৎ ছিল না, তখনও এ-জগৎ ছিল, তবে এভাবে নহে, ছিল অন্যভাবে। তখন জগৎ বর্ত্তমান ছিল অদ্বিতীয় সৎ-বস্তুরূপে। আমরা যাহাকে ব্রহ্ম বলি, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সেই ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। এখন ইহা জগৎরূপে বর্ত্তমান, সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান।

(খ)

ইহার পরে ঋষি বলিতেছেন, সেই সৎস্বরূপ আলোচনা করিলেন (বা সঙ্কল্প করিলেন) "আমি বহু হই, আমি

জন্মগ্রহণ করি"। অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। ছাঃ ৬।২।

এখানে বলা হইল সৎস্বরূপই তেজোরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহাই অন্য ভাষায় বলা হইয়াছে 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'।

(গ)

তেজের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিয়াছেন, এই তেজঃ হইতে জলের সৃষ্টি এবং জল হইতে অন্নের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখানেও ঋষি পরিণাম-বাদেরই কথা বলিয়াছেন।

যেভাবে সৎস্বরূপ তেজোরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, তেজঃও সেইভাবে জলরূপে এবং জলও সেইভাবে অন্নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ইহার পরে ঋষি অপরাপর সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই সমুদায় মতের ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক।

(ঘ)

ইহার পরে ঋষি নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমুদয়ই তেজঃ, জল ও অন্নের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। এমন কি বাক্, প্রাণ ও মনও এই তিনটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এইসমুদয় আলোচনা করিয়া ঋষি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমুদয়ই যখন তেজঃ জল ও অন্নের পরিণাম, তখন এই তিনটি বস্তু অবগত হইলেই সমুদায় বস্তু অবগত হওয়া যায়।

জীবাত্মা সৃষ্ট নহে

তেজঃ, জল, অন্ন, মন, প্রাণ, বাগাদি সমুদয়ই সৃষ্ট বস্তু; কিন্তু জীবাত্মা সৃষ্ট বস্তু নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রকরণেই উদ্দালক বলিয়াছেন, "তিনি (অর্থাৎ সেই সৎ বস্তু) জীবাত্মা-রূপে এইসমুদয় দেবতার অভ্যন্তরে (অর্থাৎ তেজঃ, জল ও অন্ন এই তিন দেবতার অভ্যন্তরে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন"। ছাঃ ৬।৩।৩।

তেজঃ, জলাদি বস্তু সেই সৎবস্তুর বিকার, কিন্তু জীবাত্মা অবিকৃত ব্রহ্ম।

সুষুপ্তি

সুষুপ্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াও উদ্দালক ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি শ্বেতকেতুকে এইরূপ বলিয়াছেন—

হে সৌম্য! আমার নিকট সুষুপ্তি-তত্ত্ব অবগত হও। যখন এই পুরুষ নিদ্রিত হয়, তখন সে সৎস্বরূপের সহিত সম্মিলিত হয়। সেই সময়ে সে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয়। ছাঃ ৬।৮।১।

সুষুপ্ত অবস্থায় আত্মার যেরূপ, তাহাই ইহার প্রকৃত রূপ; ইহাই ব্রহ্মাবস্থা।

এই উপনিষদের অন্যত্রও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। অষ্টম প্রপাঠকের একস্থলে (৮।৩।২) লিখিত আছে, সমুদয় প্রাণী সুষুপ্তির সময়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

সুষুপ্তির অবস্থাই যে আত্মার স্ব-রূপ এবং এই অবস্থাই যে ব্রহ্মাবস্থা তাহা যাজ্ঞবল্ক্যও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন (বৃঃ উঃ ৪।৩।২৩ ৩২)।

তত্ত্বমসি

উদ্দালক-আরুণি শ্বেতকেতুকে যে-সমুদায় উপদেশ দিয়াছিলেন, সে-সমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্তি—**"তত্ত্বমসি"**।

'তত্ত্বমসি'তে তিনটি কথা তৎ, ত্বম্, অসি। তৎ—তাহা, সেই বস্তু; ত্বম্—তুমি; অসি—হও। সুতরাং তত্ত্বমসি—তুমি হও সেই বস্তু। নয়টি দৃষ্টান্ত-দ্বারা ঋষি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১)

তেজঃ, জল, অন্ন এবং দেহ, মন, প্রাণ ও বাগাদি সমুদয়ই সৃষ্ট বস্তু। ঋষি বলেন—সৎস্বরূপ হইতে তেজের উৎপত্তি, তেজ হইতে জলের, এবং জল হইতে অন্নের উৎপত্তি। আবার তেজ হইতে বাক্, জল হইতে প্রাণ এবং অন্ন হইতে মনের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতে যাহা কিছু আছে, সে-সমুদয়ই তেজঃ, জল ও অন্ন হইতে উৎপন্ন। এইসমুদয় বর্ণনা করিয়া উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—

"হে সৌম্য! সৎস্বরূপই এই ভূতসমূহের মূল;

সৎস্বরূপই ইহাদিগের আয়তন এবং সৎস্বরূপই ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা।" ৬।৮।৪।

ইহার কিছু পরেই বলিয়াছেন—যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন তাহার বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত এবং তেজঃ পরম দেবতার সহিত (অর্থাৎ সৎস্বরূপের সহিত) সম্মিলিত হয়। ৬।৮।৬।

(ক)

যখন এই জগৎ সেই—সৎস্বরূপে বিলীন হয়, তখন আর ইহার স্থূলাবস্থা বর্ত্তমান থাকে না; সৎস্বরূপে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। যিনি আদি কারণ, তিনি সূক্ষ্ম বস্তু; সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ এই সূক্ষ্মবস্তুরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং বিলীন হইবার পরও এই সূক্ষ্ম বস্তুরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহার কখন আত্যন্তিক অভাবও ছিল না, কখন আত্যন্তিক বিনাশও হইবে না এবং কখন সৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ ও দ্বিতীয় বস্তুরূপে বর্ত্তমান ছিলও না এবং থাকিবেও না।

(খ)

কিন্তু এই সূক্ষ্ম বস্তুটি কি? ঋষি বলিয়াছেন,—ইহা হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ ইহারই পরিণতি এবং প্রলয়-কালে জগৎ ইহাতেই বিলীন হয়। কিন্তু ইহাও সৎস্বরূপের পরোক্ষ ভাব; এবর্ণনা দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জানা গেল না। আর এই জগৎ সৎ-স্বরূপের বিকার; বিকার বস্তু দ্বারা অবিকারী বস্তুকে কি-প্রকারে জানা যাইবে? তবে সৎস্বরূপকে জানিবার উপায় কি? ঋষি পূর্ব্বেই ইহার আভাস দিয়াছেন। তেজঃ, জল, অন্নাদি এবং বাক্, প্রাণ মনাদি সৎস্বরূপের বিকার; কিন্তু জীবাত্মা অবিকৃত সৎস্বরূপ। ইহা হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিতাম যে, আত্মাই সেই সৎস্বরূপ। কিন্তু ঋষি কিছুই অস্পষ্ট রাখেন নাই। সেই সূক্ষ্মতম সৎবস্তুর বিষয়ে ঋষি এইপ্রকার বলিয়াছেন—

এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি, "তত্ত্বমসি"।

(গ)

সর্ব্বপ্রথমে প্রশ্ন হইয়াছিল—"কোন্ বস্তুকে জানা গেলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অমত বিষয় মনন করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়"। এতক্ষণে তাহার শেষ উত্তর পাওয়া গেল। তাঁহার উত্তরের ক্রম এই:-

(১) মূল বস্তুকে যদি জানা যায়, তাহা হইলে ইহার বিকারেরও জ্ঞানলাভ হয়—যেমন মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইতে ঘটাদির জ্ঞান হয়—সুবর্ণখণ্ডের জ্ঞান হইতে সুবর্ণ-কুণ্ডলাদির জ্ঞান হয়।

(২) সৎস্বরূপ মূল বস্তু; জগৎ ইহার বিকার। সুতরাং সৎস্বরূপের জ্ঞান হইলেই জগতের বিষয় জানা যায়।

(৩) সৎস্বরূপই জগতের কারণ; কিন্তু আত্মাই জগতের কারণ। সুতরাং আত্মাকে জানিলেই জগৎকে জানা হইল।

(২)

ইহার পরে উদ্দালক আরও বলিলেন:—

"হে সৌম্য! মধুকরসমূহ যেমন নানা বৃক্ষের রস আহরণ করিয়া সেই রসসমূহকে এক-ভাবাপন্ন করে এবং তখন যেমন রসসমূহের এই বিবেক থাকে না যে, 'আমি অমুক বৃক্ষের রস' তেমনি হে সৌম্য! সমুদয় প্রাণী (সুষুপ্তি সময়ে) সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে 'আমরা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি'। ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক—ইহারা ইহলোকে (সুষুপ্তির পূর্ব্বে) যে-যে ভাবে ছিল, (সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইলেও) সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। এই যে সূক্ষ্মতম সৎবস্তু, ইহাই এই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! 'তুমিই তিনি'।" ৬।৯।

সুষুপ্তির সময়ে যাঁহাতে প্রাণী-সমূহ বিলীন হয়, সুষুপ্তির পরে যাঁহা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জাগ্রত হয়—তিনিই সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্ম কে?—মানবে যিনি আত্মা তিনিই সেই সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম। অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা বুঝাইবার জন্যই ঋষি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন—"তুমিই তিনি"।

ইহার পরে উদ্দালক বলিতেছেন—

"হে সৌম্য! পূর্ব্ব দেশস্থ নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়, পশ্চিম দেশস্থ নদীসমূহ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়; তাহারা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রেই গমন করে এবং সমুদ্রই হইয়া যায়। তখন তাহারা জানিতে পারে না যে, 'আমি এই নদী,' 'আমি এই নদী'। তেমনি হে সৌম্য! এইসমুদায় প্রজা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি। ব্যাঘ্রাদি জীব ইহলোকে সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে-যে ভাবে বর্ত্তমান থাকে, সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইলেও সেই-সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। এই যে সূক্ষ্মতম সৎবস্তু, ইহাই এইসমুদয় জগতের আত্মা; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।" ছাঃ ৬।১০।

এই তৃতীয় দৃষ্টান্তও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অনুরূপ। এখানেও ঋষি বলিতেছেন, আত্মাই ব্রহ্ম।

(৪)

ইহার পরে ঋষি বলিতেছেন, "হে সৌম্য! এই মহান্ বৃক্ষের মূলদেশে যদি কেহ আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ মধ্যভাগে আঘাত করে, তবে সে-বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে, যদি কেহ অগ্র-ভাগে আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। এই বৃক্ষ জীবাত্ম-কর্ত্তৃক অনুব্যাপ্ত হইয়া ক্রমাগত রসপানপূর্ব্বক হর্ষযুক্ত হইয়া অবস্থান করে।

"যদি জীব এই বৃক্ষের এক শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই শাখা শুষ্ক হইয়া যায়; যদি দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করে তবে দ্বিতীয় শাখাও শুষ্ক হয়; যদি তৃতীয় শাখাও পরিত্যাগ করে, তবে তৃতীয় শাখাও শুষ্ক হয় এবং যদি সমুদয় বৃক্ষ পরিত্যাগ করে তবে সমুদায় বৃক্ষই শুষ্ক হয়। হে সৌম্য! এই প্রকার ইহাও জানিবে—জীবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এই দেহ মৃত হয়, কিন্তু জীব মৃত হয় না।

"এই যে সূক্ষ্মতম সৎবস্তু ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।" ছাঃ ৬।১১।

বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি বুঝাইতেছেন যে, বৃক্ষেও জীবাত্মা আছে; এবং এই আত্মা অমর, ইহার বিনাশ নাই। যখন বৃক্ষের কোন শাখা শুষ্ক হইয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে জীবাত্মা সেই শাখা পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ যখন সমুদয় বৃক্ষ বিশুষ্ক হয়, তখন বুঝিতে হইবে জীবাত্মা বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মানব-দেহ-বিষয়েও এই-প্রকার। যখন দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। দেহেরই বিনাশ হয়, আত্মার কখন বিনাশ হয় না। সর্ব্বশেষে ঋষি বলিলেন, এই আত্মা অতি সূক্ষ্মতম বস্তু এবং এই আত্মাই সেই সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম।

(৫)

ইহার পর ন্যগ্রোধ বৃক্ষের দৃষ্টান্ত। উদ্দালক শ্বেত-কেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটি ফল আহরণ কর।"

শ্বেতকেতু বলিল—"ভগবন্! এই আনিয়াছি।"

"ইহা ভাঙ্গিয়া ফেল।"

"ভগবন্! ভাঙ্গা হইয়াছে।"

"এখানে কি-কি দেখিতেছ?"

"অণুর ন্যায় বীজসমূহ।"

"ইহাদিগের একটি ভাঙ্গিয়া ফেল।"

"ভগবন্! ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি।"

"এখানে কি দেখিতেছ?"

"ভগবন্! কিছুই না।"

তখন উদ্দালক বলিলেন:—"ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশ আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই এই মহা ন্যগ্রোধ বৃক্ষ রহিয়াছে। (এই বাক্যে) শ্রদ্ধাযুক্ত হও।

"এই যে সূক্ষ্মবস্তু, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।" ছাঃ ৬।১২।

ন্যগ্রোধ ফলের মধ্যে বীজ আছে। এই বীজের মধ্যে অতি সূক্ষ্মতম অংশ আছে; তাহা চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। এই সূক্ষ্মতম অংশই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের কারণ। এইরূপ সৎস্বরূপ সূক্ষ্মতমভাবে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

রহিয়াছেন। তিনিই এক জগতের কারণ। ঋষি বলিতেছেন—মানবাত্মাই এই সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম।

(৬)

ইহার পরে লবণখণ্ডের দৃষ্টান্ত! উদ্দালক পুত্রকে বলিলেন—"এই লবণ-খণ্ড জলে রাখিয়া যাও; কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিবে।"

শ্বেতকেতু তাহাই করিল। প্রাতঃকালে উদ্দালক তাহাকে বলিলেন, "রাত্রিতে জলে যে লবণ রাখিয়াছিলে, তাহা আন।"

শ্বেতকেতু অনুসন্ধান করিয়া তাহা পাইল না, যেহেতু তাহা বিলীন হইয়াছিল।

উদ্দালক বলিলেন,—"ইহার উপরিভাগ হইতে জল পান কর।"

শ্বেতকেতু জল পান করিল।

তখন উদ্দালক জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরূপ?"

শ্বেতকেতু বলিল—"লবণাক্ত।"

উ। "ইহার মধ্যভাগ হইতে পান কর। কিরূপ?"

শ্বে। "লবণাক্ত।"

উ। "নিম্নভাগ হইতে পান কর। কিরূপ?"

শ্বে। "লবণাক্ত।"

তখন উদ্দালক বলিলেন—"লবণ ইহার মধ্যে নিত্যকালই আছে। হে সৌম্য এইরূপ এই দেহে সৎস্বরূপ নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না। এই যে সূক্ষ্মবস্তু ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।"

লবণের দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি বুঝাইতেছেন যে, সৎস্বরূপ অতি সূক্ষ্মভাবে নিত্যই দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে এই চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। তিনিই জগতের কারণ এবং এই মানবাত্মাই সেই সৎস্বরূপ।

(৭)

ইহার পরে ঋষি বলিতেছেন:—

"হে সৌম্য কোন পুরুষের চক্ষু বন্ধ করিয়া তাহাকে যদি কোন বিজন স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে যেমন পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ বা দক্ষিণাভিমুখ বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, 'চক্ষুবন্ধন করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে, চক্ষুবন্ধন করিয়া আমাকে এখানে ফেলিয়া দিয়াছে'; তখন যেমন কেহ তাহার চক্ষুবন্ধন মোচন করিয়া বলে—'এই গন্ধার, এই দিকে গমন কর', সে যেমন তখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং (অভিজ্ঞ লোকের উপদেশে) পথ-বিষয়ে পণ্ডিত ও মেধাবী হইয়া গন্ধার প্রদেশেই উপস্থিত হয়। তেমনি আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন যে, যে-পর্য্যন্ত আমি দেহ হইতে মুক্ত না হইব (বিমোক্ষ্যে)* সেই পর্য্যন্ত আমার (তস্য=তস্য মম) বিলম্ব। তাহার পর আমি সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইব (সম্পৎস্যে)+

"এই যে সূক্ষ্মবস্তু ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।"

ঋষি বলিতেছেন, মানবাত্মাই ব্রহ্ম, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃই মানুষ বুঝিতে পারে না যে "আমিই ব্রহ্ম"। যখন অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় এবং জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, তখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, আমিই ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঋষি 'চোখবাঁধা' মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

(৮)

ইহার পরে উদ্দালক বলিতেছেন:—

"হে সৌম্য! জ্ঞাতিগণ রোগ-সন্তপ্ত পুরুষকে বেষ্টন

* বিমোক্ষ্যে=আমি মুক্ত হইব।

\+ সম্পৎস্যে=আমি সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইব। শঙ্করপ্রমুখ প্রাচ্য পণ্ডিতগণ এবং মোক্ষমূলার-প্রমুখ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বলেন উভয়স্থলেই প্রথম পুরুষস্থলে উত্তমপুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে, এই পুরুষ-ব্যত্যয় বৈদিক প্রয়োগ। ইহাদিগের মতে উক্ত বাক্যের অর্থ এই:—যতদিন সে দেহ হইতে মুক্ত না হইবে, ততদিন তাহার বিলম্ব; তাহার পর সে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এপ্রকার অর্থ করা অনর্থক।

আমাদিগের অর্থের বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি এই যে, আমরা 'তস্য' অর্থ করিয়াছি 'আমার'। এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই:—তস্য=তস্য মম। 'মম' শব্দ উহ্য। সংস্কৃতে বহুস্থলে যঃ অহম্, এষঃ অহম্, যঃ ত্বম্ ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। উপনিষদেও আছে তস্য মে (বৃহঃ ৬।১।১৩,১৪), তস্মিন্ ত্বয়ি (তৈঃ উঃ ১।৪।৪), তম্ মা (ছাঃ উঃ ৭।১।৩) ইত্যাদি। আবার উত্তমপুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ উহ্যও থাকে। যেমন 'তে যূয়ম্' স্থলে 'তে' (বৃহঃ ১।৩।১৮), যঃ ত্বম্ স্থলে সঃ (বৃহঃ ৪।১।২,৩,৪, ; ছাঃ ৩।১৬ ; তৈঃ উঃ ১।৪।৪), 'এষঃ অহম্' স্থলে 'এষঃ' (ছাঃ ২।২৪।৫), 'যঃ অহম্' স্থলে সঃ (বৃঃ ৩।৩।১), 'তে বয়ম্' স্থলে তে (বৃঃ ৩।৩।১) ইত্যাদি। এইরূপ ছান্দোগ্যের এই অংশেও তস্য মম স্থলে তস্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ "এই-প্রকার অবস্থাপন্ন যে আমি, সেই আমার"।

করিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি আমাকে চেন? তুমি কি আমাকে চেন?' তাহার বাক্ যতক্ষণ মনে লীন না হয়, মন প্রাণে লীন না হয়, প্রাণ তেজে লীন না হয় এবং তেজ পরম দেবতাতে লীন না হয়, ততক্ষণ সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে। পরে যখন বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ তেজে লীন হয় এবং তেজ পরম দেবতাতে (অর্থাৎ সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মে) লীন হয়, তখন সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না।

এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু ইহাই এই সমুদয় জগতের আত্মা, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি। ছাঃ ৬।১৫।

বাক্, মন ও প্রাণ এসমুদয় আত্মা নহে। এসমুদয়ের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে। মৃত্যুকালে বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ তেজে লীন হয় এবং তেজঃ সৎস্বরূপে লীন হয়। ঋষি বলিতেছেন, সর্ব্ববস্তু যাহাতে লীন হয়, তাহা আত্মাই এবং মানবাত্মাই এই আত্মা।

সর্ব্বশেষে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সৌম্য! যদি কোন পুরুষের হস্ত বন্ধন করিয়া আনা হয় এবং বলা হয় এ-ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, এব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, ইহার জন্য পরশু উত্তপ্ত কর—সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহা হইলে সে আপনাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। সেই অসত্যমনা অসত্যদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করিবে, দগ্ধ হইবে এবং অবশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি সে কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে, সেই সত্যাভিসন্ধ পুরুষ আপনাকে সত্যদ্বারা আচ্ছাদন করিবে, সে দগ্ধ হইবে না এবং অবশেষে মুক্তি লাভ করিবে। সেই ব্যক্তি যেমন এই স্থলে দগ্ধ হয় না এবং সে মুক্ত হয়, (তেমনি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুর পর পাপে দগ্ধ হয় না, কিন্তু মুক্তি লাভ করে এবং সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়)।

এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি। ছাঃ ৬।১৬।

এস্থলে ঋষি বলিতেছেন, যে ব্যক্তি অসত্যাভিসন্ধ, সে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে 'সত্যাভিসন্ধ' সেই ব্যক্তিই সৎস্বরূপকে লাভ করে। সেই সৎস্বরূপ কে? ঋষি শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন, 'তুমিই তিনি' "তত্ত্বমসি"

অদ্য আমরা যে ব্রহ্ম-বাদের আলোচনা করিলাম, তাহার সারাংশ এই :—

(১) একটি সৎ বস্তু আছে, যাহা নিত্য ও অবিনাশী। ইহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন।

(২) উদ্দালক পরিণামবাদী বা বিকারবাদী। যাহা কিছু আছে তাহা ব্রহ্মেরই বিকার বা পরিণাম। এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রহ্মেই লীন হইবে।

(৩) বাক্, মন এবং প্রাণ বিকার বস্তু; এসমুদয়ের উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে।

(৪) জীবাত্মা বাগাদি হইতে পৃথক্। জীবাত্মার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। ইহা অবিকৃত সত্তা।

(৫) সুষুপ্ত অবস্থায় জীবাত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি বা ব্রহ্মাবস্থা।

(৬) আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মা ও জীবাত্মা একই বস্তু। জীবাত্মাই যে সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম, ইহা বুঝাইবার জন্য উদ্দালক নয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা নয় বার বলিয়াছেন, "তত্ত্বমসি" তুমিই ব্রহ্ম।

(৭) অজ্ঞানতাবশতঃই মানব বুঝিতে পারে না যে, "আমিই ব্রহ্ম।"

(৮) যখনই মানব বুঝিতে পারে যে 'আমিই ব্রহ্ম', তখনই সে মুক্তিলাভ করে। দেহান্তে সে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই লোকে বলে ব্রহ্মলাভ।

জামাতা বাবাজীউ

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক

দু'দিকের বড়-বড় বাড়ীর চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া বেচারা গলিটার যেন মারা পড়িবার জো হইয়াছে। অত্যাচারও কম হয় না;—পাশের বাড়ীর যতপ্রকার আবর্জ্জনা, এঁঠো পাতা, বাসি ভাত, উনুনের ছাই, পচা ইঁদুর, ছেঁড়া ন্যাকড়া, সবই এই গলির উপর আসিয়া পড়ে। এই দুর্গন্ধপূর্ণ পচা গলিটার সঙ্গে বেশ মানানসই হইয়া তাহারই এক দিকের এক কোণে বহুকালের পুরাতন একটা বাড়ী। বাড়ীটা যে কবে তৈরী হইয়াছে, হিসাব করিয়া ঠিক বলা যায় না। তবে, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বাড়ীগুলার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ বলিয়াই মনে হয়। গলির দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া আধহাত-চওড়া বারান্দা, তাও আবার অর্দ্ধেকখানা ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—সদর দরজায় না আছে কপাট, না আছে চৌকাঠ,—ইঁট-বাহির-করা শ্যাওলা-পড়া দেওয়াল-গুলা অনেক বর্ষার, অনেক বৃষ্টির জলে নোনা ধরিয়া এইবার পড়ি-পড়ি করিতেছে। বুড়া অথর্ব্ব গরু যেমন করিয়া গাড়ী টানে, এবাড়ীটাও তেম্‌নি করিয়া এখনও পর্য্যন্ত ভাড়া টানিতেছিল। বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি জানিতেন, দেওয়াল ভাঙিয়া লোকই মরুক্, আর ছাত ফাটিয়া জলই পড়ুক বাড়ীটা মেরামত করিয়া অনর্থক টাকা খরচ করি-বার কোন প্রয়োজন নাই। ভাড়া চলিবেই। কারণ, যে কয়েকজন আপিসের কেরাণী সেখানে মেস্ করিয়াছে, ভাড়া বাড়িবার ভয়ে, মেরামতের তাগিদ্ তাহাদের নিকট হইতে আসিবে না। নূতন ভাল বাড়ী খোঁজ করিয়া উঠিয়া যাইবার উদ্যম এবং অবসর তাহাদের নাই, সুতরাং ঘাড়ে ধরিয়া তাড়াইয়া দিলেও যে তাহারা কেহ যাইতে চাহিবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

আগাছার জঙ্গলে ভর্ত্তি নোংরা উঠানের মাঝে একটা জলের কল। কলের নীচে ইঁট দিয়া যে অপরিমিত স্থান-টুকু বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাও আবার মান্ধাতার আমল হইতে জল পড়িয়া-পড়িয়া গর্ত্তের মত হইয়া গিয়াছে। ভাঙা শ্যাওলা-ধরা সবুজরঙের চৌবাচ্চাটার ফাটল বাহিয়া একটা ছোট অশ্বত্থ গাছ দিনে-দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। পাশেই নর্দ্দমা,—যেমন নোংরা, তেম্‌নি দুর্গন্ধ। অনতি-দূরে রান্নাঘর এবং তৎসংলগ্ন খাবার জায়গা। রান্নাঘরের অপর্য্যাপ্ত ঝুল ও কালীর মধ্যে অন্ততঃপক্ষে হাজার-দুইতিন আরসলা সপরিবারে বাস করে। সেই ঘরের মধ্যে দিনের বেলা কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া একজন সৎশ্রেণীর উৎকল ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছিলেন।

সেদিন রবিবার। কেহ কলতলার আশেপাশে আবার কেহ বা রান্নাঘরের দোরে কয়েকটা ইঁটের উপর বসিয়া, কলে জল থাকিতে-থাকিতে ময়লা কাপড় জামায় প্রাণপণে সাবান ঘষিয়া লইতেছিল। দু'চার জন স্নান সারিয়া আহারের তাগিদে নীচে নামিয়া আসিল।

ভাঙা সিঁড়ির উপর ভবতোষ চাটুজ্যের পায়ের খড়মের শব্দ হইল। ভদ্রলোকের একটুখানি পরিচয়ের আবশ্যক। তাঁহাকে ঠিক প্রৌঢ়ও বলা চলে না, আবার ঠিক লোলচর্ম্ম বৃদ্ধও তিনি নন্। নিতান্ত ক্যাকার চেহারা, চুলগুলা এখনও সব পাকে নাই, কিন্তু দাঁতগুলা পড়িয়া গেছে। এই কলিকাতার কোন্-একটা সওদাগরী আপিসে মোটা-মাহিনার চাকুরি করেন,—কিছু-কিছু উপরি পাও নাও আছে। সে-আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এই পোড়ো বাড়ীটা আবিষ্কার করিয়া সন্তাদরে একটা হোটেল খুলিয়া বসেন। এখন তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের অভাবেই হোক কিংবা অন্য-কোনও কারণেই হোক সম্প্রতি সেটা মেস্ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে কেহ এখান হইতে নড়াইতে পারে নাই। জীবনে তিনি রোজগার করিয়াছেন যথেষ্ট, কিন্তু আয়ের পাশেই ব্যয়ের যে সুবৃহৎ ছিদ্রটি তিনি নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বনাশা ফুটা দিয়া তাঁহার বুকের রক্তে জমানো

টাকাগুলি নিঃশেষে নির্গত হইয়া গিয়াছে—তাই আজ বুড়া বয়সে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। বিবাহ করিয়াছিলেন পাঁচ বার, দুঃখের বিষয়, পাঁচজনেই এখন স্বর্গীয়া; কিন্তু তাঁহারা পাঁচটিতে মিলিয়া একজোটে ধর্ম্মঘট করিয়া যেন এই বুড়াকে জব্দ করিবার জন্যই চতুর্দ্দশটি পুত্রকন্যা উপহার দিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে মেয়ে দশটি। ভগবানের কৃপায় তিনটি মরিয়াছিল; বাকী সাতটিকে পাত্রস্থা করিতেই তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। চারটি মেয়ে আবার বিবাহের বছর দুই পরে ছেলেমেয়ে লইয়া বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাবিয়াছিলেন, ছেলেগুলা মানুষ হইয়া যাহা হউক একটা-কিছু করিবে; কিন্তু তিনটির আশা-ভরসা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন,—এখন সর্ব্বকনিষ্ঠ, রতনমণির যদি কিছু আশা থাকে, তবেই…। গ্রামের স্কুলের ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অবধি পড়িয়া তাহার বদ্‌খেয়াল ধরিয়াছিল; তাই বছর দুই হইল,ছেলেটাকে নিজের অফিসেই শিক্ষানবিশীতে ঢুকাইয়া দিয়া, এইখানেই আনিয়া রাখিয়াছেন। গত বৎসর রতনমণির বিবাহ-কার্য্যটিও সমাধা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা দিয়া কন্যাদায়ের যে ঋণ তিনি পরিশোধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহা হইয়া উঠে নাই; এবং এই প্রসঙ্গে দেনাপাওনার হাঙ্গামায় পড়িয়া নূতন বৈবাহিকের সহিত একটা ঝগড়ার সূত্রপাতও হইয়াছে। তাই সে ছোট লোকের কন্যাকে গ্রহণ করিবেন কি না এই লইয়া সম্প্রতি তিনি বিস্তর চিন্তা করিতেছেন।

যাহাই করুন অন্ধকার সিঁড়িটা দেওয়াল ধরিয়া কোন-রকমে পার হইয়া আসিয়া উঠানে পা দিতেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া রতনমণি আপন-মনে গান করিতে-করিতে তাহার জামা-কাপড়ে সাবান ঘসিতেছে।

গলাটা একটুখানি পরিষ্কার করিয়া লইয়া ভবতোষ ডাকিলেন, রতন!

সহসা রতনের গান বন্ধ হইয়া গেল। পিছন্ ফিরিয়া বলিল, কি।

—বলি হাঁরে ছোঁড়া, এমন করে' চুল কাটতে তোকে কে বল্‌লে?

—কই, কেমন করে'? এম্‌নি ত সবাই কাটে। বলিয়া তাহার মাথার পিছনে ক্ষুরবুলানো চাম্‌ড়াটার উপর রতন একবার হাত বুলাইয়া দেখিল।

—হুঃ! কাটে! বলিয়া ভবতোষ রান্নাঘরের দরজায় উঠিয়া কহিলেন, আমার বালিশের ওয়াড় দুটো এনেছিস্?

—হ্যাঁ,ওই মেলে' দিয়েছি।—বলিয়া উঠানের একটা ঝোঁপের দিকে রতন তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

অন্ধকার রান্নাঘরের কোণের দিকে কাঠের পিঁড়ির উপর ঠাসাঠাসি করিয়া যে-কয়জন খাইতে বসিয়াছিল, ভবতোষ তাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কে হে চন্দর-কান্ত রয়েছ নাকি আমাদের? চল তা হ'লে আজ ছুটির বাজারে পাশায় একহাত বসা যাক্‌গে।

চন্দ্রকান্ত যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পাৎলা ছিপছিপে,—বেশ রসিক লোক। ভাতের গ্রাসটা কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া একগাল হাসিয়া কহিল, হেঁ হেঁ দাদা, আমরা ত অল্‌ওয়েজ্‌ রেডি।

ঠাকুর ভাতের থালাটা ভবতোষের সুমুখে নামাইয়া দিতেই তিনি সেই আহার্য্যের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আলু এত কম কেন হে ঠাকুর?

কোণের দিকে একটি ছোক্‌রা বলিয়া উঠিল, ঝিএর দ্বারা 'পটেটো ষ্টিলিং' চল্‌ছে বোধ হয়।

চন্দ্রকান্ত আর থাকিতে পারিল না। গম্ভীরভাবে বলিল, কেন, সে বুড়ি-বেটী জানে না,—টু ষ্টীল্ ইজ্‌-সিন্ এণ্ড এ ক্রাইম্!—দ্যাখ্ ঝি, আর যা-ই কর না কেন বাপু, নিজের 'ক্যারেক্‌টার্' ঠিক্ রাখ্‌বে!

ঝি ভবতোষকে জল দিতে আসিয়া চন্দ্রকান্তের মুখের পানে বিস্মিতভাবে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্‌ছ বাবু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি—

চন্দ্রকান্ত তেম্‌নি গম্ভীরভাবে বলিল, হেঁ হেঁ বুঝবে, বাবা। বল্‌ছি, বর্ষাকাল আস্‌ছে, জলের কলসী দুটো ঢাকা দিয়ে রেখো, নইলে ব্যাং ট্যাং লাফিয়ে পড়্‌বে—বুঝলে এবার?

বেশ বাবু বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

সমবেত সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া

রতনমণির কাছে বসিয়া তাহার সমবয়সী একজন

ছোক্‌রা কাপড়ে সাবান দিতেছিল। তাহারা দুজনে পাশাপাশি একঘরেই থাকে। রতনমণি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'বুড়োর ফোক্‌লা দাঁতের হাসি শুনেছিস্। যাবার বেলা ত' আমায় খুব একচোট্ নিয়ে গেলেন,—এদিকে রসিকতা দেখ বুড়োর। কেন, এই ত আজকাল-কার ফ্যাশান্,—না, কি বল্ খগেন্ ?

খগেন তাহার হাতের সাবানটা কাপড়ের উপর ঘষিতে ঘষিতে বলিল, বুড়োরা বুড়োর মতই থাক্ না রে বাবা, আমাদের সঙ্গে কি বটে তোদের!

রতনমণি বলিল, চল্ না খগেন, ওরা ত পাশাখেলায় মাত্‌বে, আমাদেরও একবাজি তাস্ নিয়ে বসা যাক্।

খগেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, বাই নো মিন্স্। বোএর চিঠি এসে পড়ে' আছে আজ সাত দিন,—'রিপ্লাই' না দিলে আর চল্‌ছে না।

রতনমণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জামাটা কাচিতে কাচিতে গুন্-গুন্ করিয়া কি একটা থিয়াটারী-গানের সুর ভাঁজিতে সুরু করিয়া দিল।

আহারাদির পর উপরের একটা ভাঙা ঘরে চূণ সুরকির চটা-ছাড়ানো ধূলায়-ভর্ত্তি মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া ভবতোষদের পাশাখেলা আরম্ভ হইল এবং দেখিতে-দেখিতে মিনিট্‌-কয়েকের মধ্যেই খেলায় তাঁহারা এম্‌নি মাতিয়া উঠিলেন যে, ক্ষণে-ক্ষণে তাঁহাদের হুঙ্কারের চোটে সেই ভাঙা বাড়ীটার কড়িকাঠ হইতে ভিত্তি পর্য্যন্ত এক-এক বার থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খেলোয়াড়দের এত চীৎকার সত্ত্বেও, কয়েকজন ছোক্‌রা তাঁহাদেরই আশে-পাশে, কেহ বা শতছিন্ন মলিন বিছানার উপর আবার বিছানা ময়লা হইবার ভয়ে কেহ বা মাদুরের উপর পুরানো খবরের কাগজ বিছাইয়া তাহাদের সেই শ্রমজীর্ণ পঞ্জরাস্থি-সম্বল দেহগুলি লুটাইবামাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িল। একে অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, তাহাতে আবার অনেকের সংসার চলে না, কাজেই সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা 'প্রাইভেট্ টুইশনি' আছে,...এম্‌নি করিয়া প্রত্যহ ভোর সাড়ে ছয়টায় উঠিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত, শাকচচ্চড়ি ভাত খাইয়া যাহাদের কাজ করিতে হয়, সপ্তাহের মধ্যে একটা দিন তাহারা যে বাহিরের সমস্ত শব্দ-কোলাহল উপেক্ষা করিয়া এম্‌নি করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

খগেনের নূতন বিবাহ হইয়াছিল। বৌকে একুশপৃষ্ঠা-ব্যাপী একটি সুবৃহৎ শোকোচ্ছ্বসিত ব্রজকাব্য লিখিয়া সে যখন চিঠিখানি ডাকে দিয়া ফিরিয়া আসিল, বেলা তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গেছে।

অন্ধকার সিঁড়ির একপাশে পেরেক্ আঁটা পুরাতন একটি বিস্কুটের টিন্ বহুকাল হইতে এই বাড়ীর 'লেটার-বক্সের' কাজ করিতেছে। খগেন যতবার উপর-নীচে উঠা-নামা করিত, কিছু থাকুক আর না থাকুক, এই চিঠির বাক্সটা একবার নাড়িয়া দেখা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। উপরে উঠিবার সময় টিনটা হাত্‌ড়াইতে গিয়া দেখিল, পিয়ন কোন্ সময় একটা পোষ্ট-কার্ডের চিঠি দিয়া গিয়াছে। কাহার চিঠি, অন্ধকারে নামটা ভাল পড়া গেল না, খগেন চিঠিখানা হাতে লইয়া উপরের আলোতে আসিয়া দেখিল, রতনমণির নাম লেখা। চিঠির মালিককে খুঁজিতে বিশেষ দেরি হইল না। অনতিদূরে সে তখন ময়লা জলের 'ট্যাঙ্কের' উপর বসিয়া পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া মিহিসুরে গান ধরিয়াছে, এবং গানের মাত্রা ও তালের সঙ্গে-সঙ্গে জল-ভর্ত্তি সেই টবটার উপরেই বাঁয়া-তবলার কাজ চলিতেছে।

খগেন পোষ্টকার্ড্‌খানা তাহার দিকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, রতন, এই দ্যাখ্ তোর চিঠি।

রতনমণি ভাবিল, তাহার কাজে বাধা দিয়া এখান হইতে তাহাকে নামাইবার জন্যই খগেন এ দুষ্টমি করিতেছে। গম্ভীরভাবে বলিল, কে দিয়েছে বল্ ত দেখি ?

খগেন পড়িয়া বলিল, শ্রী নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখ্‌ছে।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইল না। রতনমণি একেবারে ডিগ্‌বাজি খাইয়া মরি-পড়ি করিয়া নীচু ছাতটা হইতে ঝুপ্ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া খগেনের হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আমার 'ফাদার্-ইন্-ল' লিখ্‌ছে।

রতনমণি মনে-মনে এক নিশ্বাসে চিঠিখান পড়িয়া ফেলিল। শ্বশুর মহাশয় লিখিয়াছেন--

শ্রীমান্ রতনমণি, নীরাপৎ দীর্ঘকালজিবীতেষু—পরম শুভাশির্ব্বাদ বিশেষঞ্চ—

বাবাজীউ, আগত ১৫ই তারিখে ৺জামাতা ষষ্ঠীর দিবসে তোমাকে আনিতে পাঠাইবার লোক পাইলাম না, সেই জন্য কাহাকেও পাঠাইতে পারিলাম না এবং তৎকারণবশতঃ এই পত্র লিখি বাবাজীবন উক্ত তারিখে এখানে আসিতে কোন রকম অন্যথা করিও না। আমার রেলের চার্কুরিতে কামাই করিবার যো নাই, নচেৎ আমি নীজে যাইয়া তোমাকে সমবিহারে লইয়া আসিতাম। বাবা যাহা হউক, সেকারণে কিছু মনে করিও না। বাবাজী না আসিলে আমার মনস্তাপের অবধী রহিবে না। বৈবাহিক মহাশয়কেও অত্র পত্রে নিবেদন করিলাম। আলাদা চিঠিও দিলাম। অত্রস্থ শুভ। ইতি, আঃ—শ্রী নিকুঞ্জ-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

অত্র পত্রে বৈবাহিক মহাশয় আমার নমস্কার জানাবেন। আগত জামাই ষষ্ঠীতে শ্রীমান্ রতনমণি বাবাজীবনকে অতি অবশ্য অবশ্য একবার এ-বাটী পাঠাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়। আমি শুভবিবাহের সময় যাহা যাহা অঙ্গিকার করিয়া বাবাজীকে দিতে অক্ষম হইয়াছি, এই কালিন তাহাকে এই বাটী পাঠাইয়া দিলেই সমস্ত চুকাইয়া দিব জানাবেন। এ-বাটীস্থ সমস্তই মঙ্গল। আপনাদের কুশল সমাচারদানে পরম সুখি করিবেন। ইতি।

ভাঙাহাতের লেখা এই নীরস চিঠিখানি পড়িয়াও রতনমণির আনন্দের আর সীমা রহিল না। মনে হইল,পথ চলিতে-চলিতে যেন কোন্-একটা বন্ধ-করা চলন্ত গাড়ীর ফাঁকে হঠাৎ কোন্-এক অনিন্দ্য সুন্দরীর মুখখানি একবার চুরি করিয়া দেখিয়া লইল। আপিসের বড়-সাহেব যেন খুসী হইয়া তার পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন।

হাসিতে হাসিতে রতনমণি বলিল, আমি ত প্রিপেয়ার্ড্ হ'য়েই আছি ভাই, এইবার 'ফাদারের' মত হ'লেই হয়। তা, তুই একটি কাজ কর্ না ভাই খগেন, বাবার হাতে এই চিঠিখানা দিগে যা; মানে কথা হচ্ছে, আমি যেন এ 'লেটার্'-খানা এখনও দেখিনি, এই ভাব আর কি, বুঝ্লি? পড়ে' কি বলে, শুনে' আসিস্। এই বলিয়া চিঠিখানি খগেনের হাতে দিয়া রতনমণি তাহার ঘরে ঢুকিয়া আয়না চিরুণী লইয়া চুল আঁচড়াইতে বসিল।

পাশাখেলা তখনও পুরাদমেই চলিতেছিল। খগেন ধীরে ধীরে পোষ্টকার্ডখানি ভবতোষের হাতে দিতেই তিনি একবার মুখ তুলিয়া বলিলেন, কে দিলে?

—লেটার-বক্সে ছিল।

—ও। বলিয়া তাঁহার বামহস্তধৃত খেলো হুঁকায় একবার কটাক্ষপাত করিয়াই পায়ের নীচে চাপা দিয়া রাখিয়া পাশাগুলা তিনি কুড়াইয়া লইলেন এবং সেগুলা কিয়ৎক্ষণ হাতের মধ্যেই খট্ খট্ করিয়া সে এক অদ্ভুত কৌশলে মাদুরের উপর হাতের পাশা-তিনটা ছুঁড়িয়া দিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—ছ'তিন্ নয় মারো ত' বাবা একবার!

ভবতোষ একান্ত মনোনিবেশ-সহকারে গুটি বসাইতে লাগিলেন। এইবার চন্দ্রকান্তর পালা। তাহার উভয় করতলের মধ্যে আবার পাশার খটখটানি সুরু হইল। দেখিতে-দেখিতে তাহার সেই গিরগিটির মত দেহের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা খিঁচিয়া, ভাঁটার মত তাহার সেই বড়-বড় চক্ষুদুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া, হাতের পাশাগুলা ছুঁড়িয়া দিয়া সেও চেঁচাইয়া উঠিল, পড়ে' যা একটা পনেরো বেশ লক্ষ্মী করে'—

সত্যই পনেরো পড়িয়া গেল। আনন্দাতিশয্যে চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধেই-ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল। 'কেয়াবাৎ' 'কেয়াবাৎ' বলিয়া আবার সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

খগেন এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু এইবার বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল।

রতনমণি আগ্রহের সহিত তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্লে রে?

খগেন বলিল, পড়্লেই না ত' আর কি বল্বে ছাই!

—পড়্লে না? একবার উল্টেও দেখ্লে না?

—হাঁ, দেখে'ই চেপে' রাখ্লে। খেলায় মেতে উঠেছে, এখন কি আর পড়্বার অবসর আছে তার?

রতনমণি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, চিঠিখানা যখন সে দেখ্‌লে, তখন তার মনের ভাবটা কিরকম বুঝ্‌লি? হাসি-হাসি না রাগ-রাগ?

বিরক্ত হইয়া পগেন বলিয়া উঠিল, অত সব জানিনে বাবু, তুই দেখে' আয়গে যা—

রতনমণি তাহার পিতার উদ্দেশে এইবার দাঁত কটমট করিয়া বলিতে লাগিলেন, চব্বিশ ঘণ্টা শুধু খেলা আর খেলা। ষ্টুপিড্ কোথাকার! ননসেন্স্...

দুই

অবশেষে পাওনার লোভে ভবতোষ রাজি হইলেন। কিন্তু কেরাণীর শুধু বাপ রাজি হইলেই চলে না, তাঁহার উপরেও আর একজনকে রাজি করিতে হয়,—তিনি আপিসের বড়বাবু। দুপুর রৌদ্রে রতনমণি সেদিন আর তাহার প্রাতিদিনের অভ্যাসমত হাঁটিয়া আপিসে যাইতে পারিল না, ভবানীপুর হইতে হাইকোর্টের একটা ট্রামে চড়িয়া নগদ দুইআনা পয়সার একটা ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া বসিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেক অনুনয়-বিনয়, অনেক খোসামোদির পরে বড়বাবু বলিলেন, চার দিনের ছুটি ত' হ'তেই পারে না,—মেরে'-কেটে দুটো দিন দেওয়া যেতে পারে। রতনমণি ভাবিয়া আকুল হইল। সুদূর বিহারের একটা ছোট ষ্টেশনে তাহাকে যাইতে হইবে। শ্বশুর ষ্টেশন-মাষ্টার,—সেইখানেই বাস করেন। হাওড়া ষ্টেশনে রাত্রের ট্রেণে চড়িলে পরদিন সন্ধ্যায় সেখানে গিয়া পৌঁছিবে। আবার ফিরিবার সময়েও তাই। সেদিন সোমবার। রতন আঙুল গণিয়া দেখিল, আজ অফিস করিয়া রাত্রে যদি ট্রেণে চড়া যায়, মঙ্গলবারের ছুটির দিনটা পথেই কাটিয়া যাইবে। রাত্রিটা সেখানে বাস করিয়া আবার বুধবার সকালে ট্রেণে চড়িয়া বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আসিয়া অফিস করিতে পারিবে। মোটে একটা রাত্রি। আচ্ছা, তা-ই তা-ই!

সমস্তদিনের ভুখা ভিখারী দাতার কাছে হাত পাতিয়া যেমন আধলা কি সিকি পয়সার বিচার করিতে পারে না, যাহা পায় তাহাই মাথায় তুলিয়া লয়,—রতনমণিও তেম্‌নি আজ একটি রাত্রির ছুটি পাইয়া আপিসে ছুটি হইবার কিছু আগেই ছুটিতে-ছুটিতে প্রায় উৰ্দ্ধশ্বাসে তাহাদের সেই ভাঙা মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও আপিস হইতে বাবুরা কেহই ফিরে নাই। দরজার তালা খুলিয়া রতনমণি ঘরে ঢুকিয়াই সন্ধিক্ষণের পাঠার মতই থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে কি যে করিতে হইবে, কেমন করিয়া যে সে এই মহাযাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবে, তাহা সে ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—মাথার ভিতর কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। ভবতোষ আজ সকাল-বেলায় একটা টাইম্-টেবল্ দেখিয়া তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছেন। রাত্রি নয়টার সময় ট্রেণ,—সুতরাং সময় অনেক; এখন হইতে এত-বেশী ব্যস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই, এই কথাটা সে মনে-মনে বহুবার আলোচনা করিয়া একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইল। তবে একটা কাজ বাবুরা আসিবার পূর্ব্বেই তাহাকে সমাধা করিয়া রাখিতে হইবে। সেটা এমন বিশেষ কিছুই নয়। মুরারি-বাবুর চৌকির তলায় জুতার কালী আছে, তাহাই একটুখানি চুরি করিয়া লইয়া জুতা জোড়াটা ঠিক করিয়া লওয়া। রতনমণি তৎক্ষণাৎ তাহার জুতা দুইটি খুলিয়া ফেলিল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই কার্য্যটা সমাধা করিয়া দিয়া তাহার তালি-দেওয়া ছেঁড়া জুতাটার সৌন্দর্য্য না ফিরাইতে পারিলেও অন্ততঃ তাহার বর্ণটা ফিরাইয়া লইল। কাপড় জামা সে গত-কল্য পরিষ্কার করিয়াছে,—এইবার পিতার নিকট হইতে ট্রেণভাড়ার টাকাগুলি আদায় করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত-মনে ষ্টেশনে চলিয়া যাইতে পারে। ততক্ষণ পগেনের আরশী চিরুণী লইয়া সে তাহার মাথার অবাধ্য চুলগুলাকে প্রাণপণ শক্তিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আপিস হইতে দু'একজন বাবু আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার বাবা তখনও আসিতেছে না দেখিয়া রতনমণি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বুড়া যদি আজ পয়সা বাঁচাইবার জন্য ট্রামে না চড়িয়া লাঠি ধরিয়া তাহার গ্রামভারী চালে' হাঁটিতে সুরু করিয়া থাকে,

তাহা হইলেই ত সে গিয়াছে···দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল,—রতনও চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, রাগে দুঃখে এইবার তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া মরিবার ভয়ে গলির দিকের যে ঝোলা বারান্দাটার উপর অতি বড় দুঃসাহসীও কোনদিন পা দিতে সাহস করিত না, আজ দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া রতনমণি বারে-বারে তাহারই উপর ছুটিয়া গিয়া গলির মোড় পর্য্যন্ত এক-একবার দেখিয়া আসিতে লাগিল।

ভবতোষ হাঁটিয়াই আসিলেন। রাত্রি তখন সাতটা বাজিয়াছে। বলিলেন, হ্যাঁরে চারটি খেয়ে গেলে হ'ত না রতন? আজ সারারাত, আবার কাল সারাটা দিন! কিন্তু ঠাকুর ত এখনও আসেনি দেখ্‌ছি—

কিন্তু পেটের ক্ষুধার চেয়ে আর-একটা প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় রতনমণির তখন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান ছিল না, বলিল, তা হ'লে কি আর ট্রেণ ধরতে পারব, বাবা? তার চেয়ে ষ্টেশনেই যা হোক কিছু—

ভবতোষ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বেজেছে ত সাতটা, দেখে' এলাম ওই দোকানের ঘড়িতে। উনোন ধরে' গেছে, ঠাকুরও এল বলে'।

রতনমণি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কোথায় দেখে' এলে সাতটা বেজেছে? ওই বিড়িওয়ালার দোকানে? ও বেটা কি ঘড়িতে দম্-টম্ দেয় কখনও? ওটা ঘড়ি নয়, ঘোড়া! এখন আটটা ত বেজেইছে,—বরং বেশী ত কম নয়।

মেসে কাহারও ঘড়ির বালাই ছিল না। সকাল হইতে আপিস যাইবার সময়টুকুপর্য্যন্ত মেসের বাবুরা আন্দাজি ঠিক কয়টা বাজিয়া কয় মিনিট হইল বলিয়া দিতে পারে, কিন্তু আপিস ছুটির পর তাহাদের সে অলৌকিক শক্তিটুকু আর থাকে না; সুতরাং এখন আর সময় লইয়া বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া ভবতোষ, পুত্রের শুধু যাইবার ট্রেণ ভাড়া পাঁচ টাকা বারো আনা এবং রাহা-খরচ-বাবদ সর্ব্বসমেত আটটি টাকা দিয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, পকেটে টাকাকড়ি রাখিস্‌নে বাপু, জানিস্ ত, সে-বারে সেই বাড়ী থেকে আস্‌বার সময়, এই হাবড়া ইষ্টিশনেই পকেট থেকে সাড়ে তিনটা টাকা আমার কোন্ গোলমালে ফস্ করে' কে তুলে' নিলে টেরই পেলাম না।··আর হাঁ, ভালো কথা মনে পড়্‌ল, শোন্‌,—বলিয়া রতনকে তিনি একটুখানি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন, লিখেছে যখন, চেন-ঘড়িটা ত দেবেই, আর সেই পণের দরুন গোটা ষাটেক টাকা এখনও পাওনা রয়েছে, তোর যাওয়া-আসা ইণ্টার্ ক্লাসের ভাড়াটাও আদায় করে' নিস্—মোটের মাথায়, শ' খানে-কের কম যেন ফিরিস্‌নে বাপু,—বুঝ্‌লি?

সে-সব বুঝিবার মত মনের অবস্থা রতনমণির তখন ছিল না। কোন রকমে ঘাড় নাড়িয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে-ছুটিতে ট্রামে গিয়া চড়িল এবং আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

ইহাকে-উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া টিকিট কিনিয়া ছুটাছুটি ধস্তাধস্তি করিয়া অতিরিক্ত-রকমে নাকাল হইয়া সে যখন ট্রেণের থার্ড্ ক্লাসের একটা বেঞ্চির উপর চাপিয়া বসিল, তখন তাহার মনে হইল, এই-বার যেখানে হোক চলিল বটে। বাণ্ডিল-দুই বিড়ি পথের জন্য এবং সম্বাদরের এক বাক্স হাওয়াগাড়ী-মার্কা সিগারেট্ শ্বশুর-বাড়ীর জন্য সে কলিকাতা হইতেই কিনিয়া আনিয়াছিল। পয়সা দুই-এর পান কিনিতে গিয়া তাহার যে আহারাদি কিছুই হয় নাই সে-কথাটা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু এসময় মনে হইলেই বা কি হইবে? সে যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে, গাড়ী আনিয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে লাগিতে তখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরি ছিল। এই সময়ের মধ্যে অনায়াসে সে কিছু লুচি মিষ্টি খাইয় লইতে পারিত, কিন্তু ওই হিন্দুস্থানী মেয়েটাই তাহার সব মাটি করিয়া দিল। অনর্থক তাহার মুখের পানে তাকাইয়া এমন করিয়া ওই ওয়েটিংরুমের পাশে বসিয়া থাকা তাহার ভালো হয় নাই। সে যে কোথায় গিয়া কোন্ গাড়ীতে চড়িয়া বসিল, ভিড়ের মাঝে ছাই দেখাও গেল না।···

ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল, চাই চিনাবাদাম।

রতনমণি তাহাই চার পয়সার কিনিয়া ফেলিল। ভাবিল, বর্দ্ধমান কিংবা অণ্ডালে এক পেয়ালা চা এবং কিছু মিষ্টি খাইয়া লইলেই চলিবে! গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তৃতীয় শ্রেণীর সস্তা যাত্রীর বস্তার ঠেলাঠেলির চোটে এক কোণে জড়পুঁটুলি হইয়া রতনমণি যে পরম সুখকর চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িল, সে-কথা না বলাই ভালো। যাহাই হউক, সহধর্ম্মিণীর কোষ্ঠী চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার পেটের চিন্তাও চলিতে লাগিল। এক-একটি করিয়া বাদাম ছাড়াইয়া কোনবার খোসার পরিবর্ত্তে বাদাম, আবার কখনও বা বাদমের পরিবর্ত্তে খোসা মুখে দিয়া চিবাইতে-চিবাইতে ক্ষণে-ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন এই তিন নম্বরের কুলি-গাড়ী ছাড়িয়া কোথায় কোন-একটি সুসজ্জিত বাড়ীর ভিতর প্রিয়তমার রূপসুধা গোগ্রাসে গিলিবার চেষ্টা করিতেছে।

যাহা হউক, স্বপ্ন তাহার আংশিক সত্যে পরিণত হইল, তাহার পরের দিন। সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন সমস্ত দিনের বেলাটা কোন রকমে কাটাইয়া দিয়া রতনমণি যখন সেই ইস্‌মাইলপুরের ছোট ষ্টেশনে আসিয়া নামিল, সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা। ট্রেণ হইতে নামিয়াই প্ল্যাট্‌ফর্‌মের অন্ধকারে সে একবার তাহার কোঁচার খুঁট দিয়া জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইল। তাহার পর মুখখানি একবার ঘষিয়া লইয়া সেইখানেই মিনিট-কয়েক চুপ করিয়া দাঁড়াইল। পাঁচ-ছয়জন হিন্দুস্থানী যাত্রী লোটা-কম্বল লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। জন-দুই লোক, গাড়ীতে চড়িবার জন্য ট্রেণ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই প্ল্যাট্‌ফর্‌মের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল। অদূরে একটা মিট্‌মিটে কেরোসিনের 'ল্যাম্প-পোষ্টের' কাছে দাঁড়াইয়া ধুতি-পরা একজন ভদ্রলোক মাথায় কালো-রঙের একটা টুপি পরিয়া টিকিট আদায় করিতেছিলেন। অন্ধকারে হয়ত কোনও আসামী টিকিট না দিয়াই তার ডিঙাইয়া ভাগিয়া পড়িবার মতলব করিতেছে ভাবিয়া রতনমণির দিকে তাকাইয়া তিনি গম্ভীরকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, এয়্, তোম্ উধার্‌সে মৎ যাও।

গলার আওয়াজ শুনিয়া এবং চেহারা দেখিয়া রতনমণি এইবার তাহার শ্বশুর মহাশয়কে বেশ চিনিতে পারিল। কাছে আসিয়া একটি প্রণাম করিতেই নিকুঞ্জবিহারী আনন্দাতিশয্যে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; বিনা-টিকিটের আসামী ভাবিয়া এখনই যে কি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন তাহার ঠিক নাই,—সেজন্য তিনি একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়াই তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন, এস, বাবাজী, এস, এস। আমি ত' ভাব্‌লাম বুঝি বা,—বেশ, বেশ, বাড়ীর সব মঙ্গল ত? দেখ্‌ছ ত বাবা, আমার এই কাজ, একদণ্ড ছুটি পাবার উপায় নেই। আমিই যেতাম, নিজে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব ভেবেছিলাম, কিন্তু—আরে শুক্‌দেউ! না, থাক্ থাক, আমিই যাচ্ছি। এস বাবা রতন। বলিয়া ষ্টেশনের গোল-কাঁচ দেওয়া বাতিটা হাতে লইয়া তিনি বাসার দিকে চলিতে লাগিলেন।

লাল কাঁকরের রাস্তার পাশেই 'রেলওয়ে কোয়ার্টার',—ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নয়।

দরজার কড়া নাড়িয়া নিকুঞ্জবিহারী তাঁহার বড়-ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, হরিপদ! হরিপদ!

তিন-ভাই-বোনে ঝগড়া করিতেছিল। এমন অসময়ে পিতার ডাক শুনিয়া তাহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা হঠাৎ থামিয়া গেল। হরিপদ খুব জোরে-জোরে জ্যামিতি মুখস্থ করিতে লাগিল,—ক খ সরল রেখাকে যদি সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতে হয় তাহা হইলে—এ্যাঁ, এ্যাঁ—উঁ,

শ্যামাপদ তাহার ছোট। দাদাকে টেক্কা দিয়া মিহি-গলায় সেও চেঁচাইয়া উঠিল, মূষিক-ব্যাঘ্র। বয়ে য ফলা আকার, ঘয়ে র-ফলা,- ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র। মহাতপা নামে এক মুনি ছিলেন। একদিন তাঁহার আশ্রমের নিকট একটা কাক একটা ছোট ইন্দুর ধরিয়াছিল।

নিকুঞ্জবিহারী আবার ডাকিলেন, শুন্‌তে পাচ্ছিস্-নে হরে!

শুন্‌তে পাবে কেন? দাঁড়াও তোমাদের দুষ্টুমি বার কর্‌ছি। বাবা! বলিয়া তাঁহার কন্যা প্রভাবতী ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু দরজা খুলিয়াই বেচারা এমন বিপদে পড়িয়া গেল যে, না পারিল কোনও কথা বলিতে, না পারিল ছুটিয়া পলাইতে। মাথার কাপড়টা তাড়াতাড়ি টানিয়া দিয়া দরজার এক-

পাশে কবাটের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া লজ্জায় সে যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। রতনমণির বুকের ভিতরটা তখন ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতেছিল।

সামান্য একটুখানি উঠানের পরেই হাত-দুই চওড়া একটি বারান্দা, তাহার পরেই থাকিবার মত পাশাপাশি দুইখানি ঘর। উঠানের বাঁদিকে আর-একটা ঘরে রান্না চলে। সোজা কথায় ইহাকেই বাঙালী ষ্টেশন-মাষ্টারের 'বাংলো' কহে।

যে-ঘরে হরিপদ ও শ্যামাপদর ভয়ঙ্করভাবে পাঠাভ্যাস চলিতেছিল, রতনমণিকে লইয়া অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া নিকুঞ্জবিহারী সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। বলিলেন, মাদুরটা ছেড়ে ওঠ, ওঠ, আজ আর পড়তে হবে না, ওঠ,—দেখ্‌ কে এসেছে—

হরিপদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া রতনমণির একটা হাতে ধরিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, কখন্‌ এলেন জামাইবাবু? এখখুনি?

বিবাহের পর রতনমণি মাত্র দুইবার আসিয়া সপ্তাহ-খানেক এখানে থাকিয়া গিয়াছেন, কাজেই শ্যামাপদ প্রথমে তাহাকে ভালো চিনিতে পারে নাই। এইবার চিনিতে পারিয়া বইগুলা সরাইয়া দিয়া সেও লাফাইয়া উঠিল।

—বসো বাবা, বসো।—বলিয়া রতনমণিকে সেইখানে বসাইয়া রাখিয়া নিকুঞ্জবিহারী রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, জ্বলন্ত উনানের উপর ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহারই একধারে বসিয়া প্রভাবতী নিতান্ত অন্যমনস্ক-ভাবে তরকারী কুটিতেছে। বলিলেন, ঘি, ময়দা সব আছে ত মা?

প্রভা তেম্‌নি হেঁট্‌মুখেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

—ও কি—আমাদের ভাত চড়িয়েছিস্‌ নাকি?

—হ্যাঁ।

—তা বেশ, আমাদের জন্যে না হয় ভাতই হোক্‌। শুকদেউএর বৌ আসেনি?

বঁটির উপর প্রভা আর-একটা আলু কাটিতে-কাটিতে ধীরে-ধীরে বলিল, এসেছিল। উনোন ধরিয়ে, জল-টল

আচ্ছা, আমি আবার ডেকে' দিচ্ছি। ময়দা মেখে' লুচিগুলো বেলে-টেলে দিক। দেখিস্‌ মা, আজ একটু দেখে'-শুনে' রাঁধিস্‌—বলিয়া নিকুঞ্জবিহারী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ষ্টেশন-খালাসী শুকদেবের বাসার দিকে চলিয়া গেলেন। কুলীনের ঘরে আজ জামাই আসিয়াছে, আজ তাঁহার আনন্দের দিন, কিন্তু কাহাকে লইয়া আনন্দ করিবেন? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী চলিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে আনন্দ বলিতে তাঁহার যাহা-কিছু সবই ফুরাইয়াছে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, বিবাহ দিয়াছেন, দুদিন বাদে সেও পরের বাড়ী চলিয়া যাইবে,—থাকিবে ওই ছেলে-দুটো। তাহাদের মানুষ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার ছুটি।... হঠাৎ তাঁহার মৃতা পত্নীর মুখখানি মনে পড়িয়া গেল। সজলচক্ষু দুইটা জামার আস্তিনে মুছিয়া লইয়া তিনি শুকদেবের দরজায় গিয়া ডাকিলেন, শুকদেউ!

ডাকিবামাত্র শিকে-ঝোলানো একটা কেরোসিনের ল্যাম্প হাতে লইয়া শুকদেব ও তাহার স্ত্রী বাহির হইয়া আসিল। শুকদেব বলিল, আপনি নিজে কেন এলেন বাবু, আমরাই যাচ্ছিলাম।

শুকদেবের স্ত্রীর হাতের দিকে তাকাইয়া নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার হাতে ওটা কি বৌ?

শুকদেব উত্তর দিল। বলিল, ও কিছু না বাবু, সেই বাচ্ছা পাঁঠাটা আজ কেটে দিলাম। জামাইবাবু এলেন, খাওয়াবেন কি বাবু?

নিকুঞ্জবিহারী বলিলেন, তাই ত রে শুকদেউ, মেয়েটা কি আর এত সব রাঁধ্‌তে পার্‌বে?

শুকদেব ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্ত্রীর দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া বলিল—আমার 'বহু' যে পাকা রাঁধুনী আছে বাবু, উহি সব দেখিয়ে দিবে।

বাবুর দরজা পর্য্যন্ত তাহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া শুকদেব বলিল,—আমি 'ইষ্টিশানে' যাই বাবু, ছোট-বাবু এসেছেন, আপনি ঘরে থাকুন।

শুকদেব কিয়দ্দূর চলিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ছুটিতে-ছুটিতে নিকুঞ্জবিহারী তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহার হাতে

আছে শুকদেব, এখনও জল খেতে দেওয়া হয়নি—দূর ছাই! এসব কি আর আমাদের বেটাছেলের কাজ! যা বাপু, জল্‌দি কিছু ভালো মিষ্টি-ফিষ্টি—

শুকদেব উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তিন

চৌদ্দ বছরের সেই মা-হারা মেয়েটাকেই সব করিতে হইল। 'বন্থ'কে রান্নাঘরে বসাইয়া প্রভা একসময় ঘরে গিয়া তাহার উস্কোখুস্কো মাথার চুলগুলা চিরুণী দিয়া তাড়াতাড়ি আঁচড়াইয়া লইল। কপালে একটা নূতন কাঁচ-পোকার টিপ পরিয়া তাহার পরনের ময়লা কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল। আরশিতে ভালো করিয়া মুখখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, রাত্রে মেয়েদের নাকি আরশি দেখিতে নাই। আরশিখানা তুলিয়া রাখিয়া পুনরায় সে রান্না-ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু শাড়ীটার দিকে তাকাইতেই লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল,—এই বেশপরিবর্ত্তন তাহার বাবার নজরে পড়িলে তিনি কি ভাবিবেন।···কাজ নাই। প্রভা আবার তাহার সেই পরিত্যক্ত ময়লা কাপড়খানাই পরিয়া লইল। পাশের ঘরে ছেলেদের সহিত রতনমণি গল্প করিতেছিল। নিকুঞ্জবিহারী পুনরায় ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রভা রান্না-ঘরে ফিরিয়া আসিতেই বন্থ বলিল, একটি ভালো রঙ্গিলা শাড়ী পরে' এস দিদি, বুঝ্‌লে? জামাইকে খাইয়ে দিয়ে নিজে খেয়ে নাও। নিয়ে ঘুমোওগে যাও। বাবু ছেলেদের নিয়ে এর পর খাবেন।

প্রভা মুখে কিছুই বলিল না। বন্থর মুখের পানে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া একবার হাসিল।

মাংস ইত্যাদি রান্না করিতেই সাড়ে-বারোটা বাজিয়া গেল।

হরিপদ এক-সময় ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—রান্না কখন হবে দিদি? জামাই-বাবু বল্‌ছে, আজ কি তা'কে উপোষ খাওয়াবে নাকি?

প্রভার অত্যন্ত লজ্জা হইল। বলিল,—ফাজ্‌লমি কর্‌তে হবে না। যা দেখি, বাবাকে ডেকে' আন্।

—তা হ'লেই দেবে ত খেতে?

—হাঁ।

হরিপদ তাহার বাবাকে ডাকিতে গেল। 'বন্থ' বারান্দার উপর আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিয়া দিল।

খাওয়া শেষ হইতেই দেড়টা বাজিল। নিকুঞ্জ-বিহারী রতনমণিকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। চাকৃরি, বেতন-বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই তিনি তাহাকে করিতেছিলেন। প্রশ্নের উত্তর দিবে কি, রতনমণি তখন ছট্‌ফট করিতেছিল।

প্রভা নিজে খাইল। 'বন্থ'কে খাওয়াইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ঘুমের ঘোরে এইবার তাহার চোখ দুইটা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। চোখে জল দিয়া ঘুম ছাড়াইয়া নিজের হাতেই বিছানা পাতিল। অবসন্ন শরীরটা তাহার যেন বিশ্রামের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। যতবার ঘুম আসে, চোখ দুইটা রগড়াইয়া ততবার সে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করে; কিন্তু পোড়া ঘুম যেন আজ তাহাকে ছাড়িতে চাহিতে-ছিল না। যে শাড়ীখানা একবার পরিয়া লজ্জায় সে খুলিয়া রাখিয়াছিল, এইবার সেখানা ভালো করিয়া পরিল। তাহার পর, বিছানার এক পাশে আনন্দে ও লজ্জায় চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া ঢুলিতে-ঢুলিতে কোন্ একসময় বালিশের পাশে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

নিকুঞ্জবিহারী বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া ছেলে-দুটিকে লইয়া সেই ঘরেই মাদুরের উপর শয়ন করিলেন।

রতনমণি অনেক রাত্রে তাঁহার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পাশের ঘরে আসিয়া বসিল। দেখিল, প্রভা বিছা-নার এক পাশে শুইয়া আছে। ইহা তাহার কপট নিদ্রা ভাবিয়া প্রথমে তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল না। আহারাদির পর বিড়ি-সিগারেট না টানিতে পাইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার পেট ফাঁপিতেছিল, এইবার পকেট হইতে একটা হাওয়াগাড়ী সিগারেট বাহির করিয়া চোঁ-চোঁ করিয়া টানিতে-টানিতে সস্তা তামাকের বিকট গন্ধে ও ধোঁয়ায় সারা ঘরটা একেবারে মশ্‌গুল করিয়া ফেলিল।

এইবার প্রভাকে উঠাইবার পালা। প্রথমে ধীরে, পরে জোরে-জোরে বারকতক নাড়া দিয়া রতনমণি বুঝিল নিদ্রা তাহার কপট নয়, সত্যই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বহু দিন পরে যাহার স্বামী আসিয়াছে, সে-মেয়ে যে কেন ঘুমায় এবং ঘুমাইলেও বা ডাকিলে উঠে না কেন, এই কথাটা সে কোনপ্রকারেই বুঝিতে পারিতেছিল না। ঘুমন্ত প্রভার গায়ে সুড়্সুড়ি দিয়া আদর করিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেও যখন তাহাকে উঠাইতে পারিল না, রতনমণি তখন রাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে সুরু করিল। বেশী জোরে-জোরে কিছু করাও যায় না, পাশের ঘরে শ্বশুর-মহাশয় আছেন,—তাহার লজ্জাও করিতেছিল। অবশেষে সে একবার জোর করিয়া বিছানার উপর তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দিতে গেল, কিন্তু ঘুমের ঘোরে প্রভা এম্নি জোরে কাঁই-মাঁই করিয়া উঠিল যে, ভয়ে লজ্জায় রতন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। আলোটা নিভাইয়া দিয়া সে এইবার রাগ করিয়া নিজেও এক পাশে শুইয়া পড়িল। মনে-মনে সে এই অসভ্য ঘুমন্ত মেয়েটার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিতে লাগিল, অনেক গর্হিত অপবাদ দিতে লাগিল, অথচ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইতেও পারিল না। ঘুম ভাঙাইবার যতপ্রকার কৌশল তাহার জানা ছিল, একে-একে প্রভার উপর সেগুলি সমস্তই প্রয়োগ করিতে কসুর করিল না, কিন্তু এই এত রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করিয়া প্রভার পরিশ্রান্ত দেহ-মন গাঢ় নিদ্রায় এত বেশী অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দেহের উপর কোনপ্রকারের অত্যাচার সে টের পাইল না।

রাত্রির শেষ-প্রহরে প্রভা হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। চোখ খুলিয়া দেখিল, পার্শ্বে তাহার স্বামী তখন নিশ্চেষ্ট-ভাবে ঘুমাইতেছে। প্রভার বুকের ভিতরটা কি যেন এক অজানা অনুভূতিতে দুলিয়া উঠিল। অতি সন্তর্পণে বালিশের উপর মাথাটা তুলিয়া হাত দিয়া সে তাহার ঘুমন্ত স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল। ডাকিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না,…নড়াইতে গিয়া দেখিল, হাতে তাহার এতটুকু শক্তি নাই।…খোলা জানালা দিয়া শেষ-রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আবার ধীরে-ধীরে কোন্ সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রাতে রতনমণির যখন ঘুম ভাঙিল, বাহিরে তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। অনতিদূরে জানালার সুমুখে রেল-লাইনের উপর সূর্য্যের আলো চিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রথমেই তাহার মনে হইল, এখনই তাহাকে এই লাইনের উপর দিয়াই কলিকাতার ট্রেন্ ধরিয়া ছুটিতে হইবে। তাহার এই অঙ্কশায়িনীর বিরুদ্ধে রাগ তাহার শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। আর-একবার সে শেষ-চেষ্টা করিয়া প্রভাকে জোরে-জোরে নাড়িয়া দিল, মুখে কোনও কথা বলিল না।

জোরে-জোরে নাড়িবার প্রয়োজন ছিল না। প্রভা চোখ খুলিল, কিন্তু খোলা জানালার পথে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লজ্জায় সে ধড়্-মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া একেবারে খাট হইতে লাফাইয়া পড়িল। এবং তাহার বিস্রস্থ বসনের প্রান্ত-ভাগ রতনের হাত হইতে টানিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

রাগে দাঁত কট্‌মট্ করিতে-করিতে জামার পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া রতনমণি ফস্ করিয়া দিয়াশলাইটা জ্বালিয়া ফেলিল।

রতনকে আজই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে শুনিয়া, নিকুঞ্জবিহারী যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন, সে কি বাবা? তাই কি হয় কখনও! আজকার দিনটা থেকে, কাল যেও।

একে সে রাগিয়াই ছিল, তাহার উপর চাক্‌রির অজুহাত দেখাইল। তাহার মুখ-চোখের দৃঢ় ভাবভঙ্গী দেখিয়া নিকুঞ্জবিহারী বেশী জেদ করিতে পারিলেন না। নিতান্ত কাতর অনুনয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কবে আস্‌বে বাবা?

রতনমণি আশ্বাস দিল যে, সে ছুটি পাইলে আবার আসিবে।

এক ছড়া রূপার চেন ও একটি ঘড়ি জামাইএর জন্য তিনি আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া ইণ্টার

ক্লাসের একখানি হাওড়ার টিকিট, চেন, ঘড়ি এবং রাস্তা-খরচের জন্য দশটি টাকা তিনি রতনমণির হাতে দিয়া বলিলেন, ছুটি পেলেই আবার এসো বাবা, বুঝ্‌লে? বেয়াই-মশাইকে আমার নমস্কার দিও।

চেন-ঘড়িটা রতন তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, এটা আপনি রাখুন, এইবার যখন আস্‌ব তখন নিয়ে যাবো!

হয়ত এটা তাহার মনে লাগিল না ভাবিয়া নিকুঞ্জ-বিহারী বলিলেন, কেন বাবা, এ কি তোমার পছন্দ হ'ল না? কেমন চাই বলো, তেম্‌নি আনিয়ে দেবো।

—না, পছন্দ হয়েছে। ধরুন, আমি এবার এসে নিয়ে যাবো, পাল্টাতে হবে না!—বলিয়া সেটি তাঁহার হাতের উপর ফেলিয়া দিল।

ট্রেন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই কম্পিত-হস্তে চেন-ঘড়িটি ধরিয়া নিকুঞ্জবিহারী হাঁ করিয়া সেই-খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শ্বশুরের বাসার পাশ দিয়া ট্রেন্‌খানা পার হইতেছিল। রতনমণি দেখিল, গতরাত্রে যে-ঘরে সে শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরের খোলা জানালার পাশে সতৃষ্ণনয়নে প্রভা দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাকে সে দেখিতে পাইল কিন্তু চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে প্রভা যে মুখখানি দেখিতে চাহিতেছিল, তাহা সে বেশ ঠাহর করিতে পারিল না।

কিন্তু প্রভাকে যখন আর কচি খুকী বলা চলে না, তখন তাহার এই নিতান্ত গর্হিত কর্ম্মটা রতন তাহার স্বামী হইয়া কোনপ্রকারেই সমর্থন করিতে পারিল না। সে যে লোক দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রতিদিন হয়ত সে এম্‌নি করিয়াই ট্রেনের ধারে আসিয়া দাঁড়ায়, ইহা সে অসংশয়ে ধারণা করিয়া লইল। এবং তাহার এই দুর্ব্বিনীত অবাধ্য স্ত্রীকে সে যে কেমন করিয়া চিরদিনের মত জব্দ করিয়া দিবে, আজ এই চলন্ত ট্রেনের গদি-আঁটা ইণ্টার-ক্লাসে বসিয়া রতনমণি সেই কথাটাই বারে-বারে চিন্তা করিতে লাগিল।

* * * *

পথে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। অণ্ডাল ষ্টেশনে একখানা মালগাড়ী লাইন হইতে পড়িয়া গিয়াছিল; কাজেই রতনমণির ট্রেনখানি সমস্ত রাত্রি আসানসোল ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরের দিন বেলা প্রায় দুইটার সময় আসান্‌সোল হইতে ট্রেন্ ছাড়িল। হাওড়ায় আসিয়া যখন পৌঁছিল, রাত্রি তখন প্রায় আটটা। বৃহস্পতি-বারটাও পথেই কাটিয়া গেল। সেদিন আর রতনমণির অফিস করা হইল না।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ভবানীপুরের গলির ভিতর তাহাদের সেই ভাঙা মেসে রতনমণি যখন আসিয়া পৌঁছিল, ভবতোষ ইত্যাদি খেলোয়াড়গণের পাশাখেলার কলহ-কোলাহল তখন বেশ জোরে-জোরেই চলিতেছে। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার থম্‌থম্ করিতেছিল।

সিঁড়িতে দিয়াশালাই জ্বালিয়া ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রতন-মণি উপরে উঠিয়া আসিল।

অফিস কামাই করিয়া রতনমণি যখন একদিন সেখানে দেরি করিয়া আসিয়াছে তখন তাহার পরামর্শমত রসদ যে সে নিশ্চয়ই কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, ভবতোষ পাশাগুলা হাঁক্ মারিয়া ফেলিয়া দিয়া পুত্রের মুখের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই নিঃসংশয়ে তাহা বুঝিয়া লইলেন।

—আচ্ছা, তোমরা একহাত বন্ধ রাখো, আমি এলাম বলে'!—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পাশার চেয়েও প্রিয়তম কোনও বস্তুর সন্ধানে রতনমণিকে একটুখানি তফাতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন, দেরি হ'ল যে? কত দিলে?

রতনমণির রাগ তখনও কমে নাই। সুযোগ বুঝিয়া সে অম্লানবদনে বলিয়া বসিল, একটি পয়সাও না। এমন কি গাড়ীভাড়ার টাকাটা পর্য্যন্ত দিলে না, বিনা টিকিটে আস্‌তে হ'ল, তাই আসান্‌সোলে একদিন আট্‌কে' রেখেছিল।

রাগে প্রথমতঃ ভবতোষের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। কোটরপ্রবিষ্ট চোখ দুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, বটে?—জানি, সে চামার-বেটাকে চিরকাল জানি আমি। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী!······আচ্ছা—

বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইয়া

কহিলেন, এলি কেমন করে'? তা হ'লে পথে ভারি কষ্ট হয়েছিল বল্?

রতনমণি ঘাড় নাড়িয়া তাহার কষ্টের কথা জানাইয়া দিল।

ভবতোষ গম্ভীরভাবে বলিলেন, যা সকাল-সকাল খেয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়্‌গে। তার পর আমি দেখে' নিচ্ছি, আমার ছেলের আর-একটা বিয়ে দিতে পারি, না, সে-বেটা বজ্জাৎ তার মেয়ের আর-একটা বিয়ে দিতে পারে! হারামজাদা, পাজি কোথাকার!

বলিতে-বলিতে সেইখান হইতেই তিনি হাঁকিলেন, চন্দ্রকান্ত!

কি বল্‌ছ দাদার্?—বলিয়া চন্দ্রকান্ত উঠিয়া আসিল।

—বল্‌ছি আমার মাথা-মুণ্ডু! যা ভেবেছিলাম তাই। হাঁ হে, সেই যে কালীঘাটে যে-মেয়েটি তুমি আমায় এক-দিন দেখাতে নিয়ে যাবে বল্‌ছিলে সেটি এখনও আছে, না বিয়ে হ'য়ে গেছে?

কেন দাদা? আবার কি 'ম্যারি' কর্‌বার ইচ্ছে হ'ল নাকি?

বস্তুতঃ ভবতোষ নিজের জন্যই সে-মেয়ে একদিন দেখিতে যাইবেন বলিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তকে চোখ টিপিয়া দিয়া বলিলেন, না রতনের বিয়ে দেবো।

চন্দ্রকান্ত বলিল, কেন? সে-বউ?

আরে সেকথা আর বল্‌ছ কেন চন্দর্, শিবের অসাধ্যি ব্যামো—যক্ষ্মা। আমি চিরকাল এই ছোঁড়াটাকে বলে' এসেছি, বলি, যাস্‌নে হতভাগাটা, বাপের ব্যামো থাক্‌লে মেয়ের থাক্‌বে তা'তে আর আশ্চর্য্যি কি? কিন্তু ও-বেটা শুন্‌লে না, মা-মরা বাছুরের মত কুঁদে' ছুট্‌ল।—তবে তাই দেখ ভাই চন্দর্, বুঝ্‌লে?

চন্দ্রকান্ত বলিল, সে আর বেশী কথা কি দাদা! সে ত হ'য়েই আছে। তবে তোমার 'ওপিনিয়ন্' কি রতন? মেয়ে বেশ ডাগর মেয়ে।—বলিয়া সে রতনের মুখের পানে তাকাইল।

সেইরাত্রে হইলেও রতনমণির বিশেষ-কিছু আপত্তি ছিল না। দু'তিনবার ঘাড় নাড়িয়া প্রফুল্লমনে সে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

নরওয়ের পুরাণ*

বল্‌ডারের কাহিনী

শ্রী সত্যভূষণ সেন

এই পুরাণে বল্‌ডারের কাহিনী অতি মনোহর। বল্‌ডার আলোক এবং পবিত্রতার দেবতা। ইঁহার মূর্ত্তি আলোকে সমুজ্জ্বল; তাঁহার তুষারশুভ্র ভ্রূ এবং কেশ-রাশি হইতে সর্ব্বদাই সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। সূর্য্যরশ্মির যেমন সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ এবং প্রাণীমাত্রকেই সঞ্জীবিত করে' বল্‌ডারও ছিলেন সেইরূপ তরুলতা, দেব, মানব সকলেরই প্রীতি ও আনন্দ-দায়ক। বাস্তবিকপক্ষেও এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় দেবতা এদেশের সমগ্র পুরাণের মধ্যে আর নাই।

বল্‌ডার ছিলেন ওডিন্ (Odin) এবং ফ্রিগার (Frigga) পুত্র; তাঁহার এক যমজ ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম হোডার (Hodur)। এই দুই ভাইএর মধ্যে আকৃতি এবং প্রকৃতিতে যতটা বৈষম্য ছিল তাহা খুবই অসাধারণ—এক পিতামাতার সন্তান বিশেষতঃ যমজ ভাইএর মধ্যে এরূপ কখন হয় না। হোডার অন্ধকারের দেবতা এবং তিনি যেমন পাপের আধারের প্রতিরূপ তেম্‌নি নিজেও ছিলেন অন্ধ এবং বাক্‌সংযমী। অপর-

* পৌরাণী-সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

পক্ষে বল্ডার ছিলেন সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহ, Balder the Beautiful বলিয়া পরিচিত। এরূপ সুশ্রী বল্ডারের এরূপ কুৎসিত আকৃতির ভাই আপাতদৃষ্টিতে খুবই অসামঞ্জস্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আলো এবং অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত, একই ব্যাপারের দুই দিক্ মাত্র।

তরুণ দেবতা বল্ডার দেখিতে-দেখিতেই বাড়িয়া উঠিলেন এবং অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই দেবাদিদেব ওডিনের মন্ত্রণাসভায় স্থানলাভ করিলেন। বল্ডারের অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানে দখল ছিল, বিশেষ তিনি আলোকের দেবতা বলিয়া তাঁহার নিকট সকলই যেন স্বতঃপ্রকাশিত। কিন্তু প্রদীপের নীচেই যেমন অন্ধকারের স্থান তেমনই আলোকের দেবতার নিকট তাঁহার নিজ ভবিষ্যৎই অজ্ঞাত ছিল।

বল্ডারের এমন হাস্য-সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে একদিন পরিবর্ত্তনের ছায়াপাত হইল। তাঁহার চোখের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া পড়িল, বদনমণ্ডলে স্পষ্টই চিন্তার রেখাপাত হইল, এমন কি তাঁহার পদবিক্ষেপেও গাম্ভীর্য্যের ভাব আসিয়া পড়িল। দেবতারা সকলেই—বিশেষতঃ ওডিন্ এবং ফ্রিগা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কেহই ইহার কোন মীমাংসা খুঁজিয়া পান না, অবশেষে পিতামাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বল্ডার প্রকাশ করিলেন যে অধুনা তাঁহার সুনিদ্রা হইতেছে না। ঘুমাইবামাত্রই নানারূপ দুঃস্বপ্ন আসিয়া তাঁহাকে পীড়া দেয়; নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের কিছুই মনে থাকে না, কিন্তু একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার ভাব যেন লাগিয়াই থাকে। ওডীন্ এবং ফ্রিগা ইহা শুনিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যেন কিসের একটা অজ্ঞাত অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহাদের উভয়ের চিত্তও পীড়িত। তাঁহাদের বিশ্বাস হইল যে, নিশ্চয়ই ইহা বল্ডারেরই কোন অমঙ্গলের পূর্ব্বসূচনা, হয়ত বা তাঁহার জীবনই বিপন্ন। তখন তাঁহারা এই বিপদ্‌কে দূর করিবার উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফ্রিগা দিকে দিকে অনুচর পাঠাইলেন, তাহাদের প্রতি আদেশ রহিল যে, তাহারা ফ্রিগাদেবীর নাম লইয়া সকলকে অনুরোধ করিবে—চেতন-অচেতন উদ্ভিদ্ মায় প্রস্তরাদি খনিজ পদার্থ পর্য্যন্ত সকলেই যেন অঙ্গীকার করে যে, তাহারা কেহই বল্ডারের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিবে না।

বল্ডার ছিলেন বিশ্বের সকলেরই প্রিয় কাজেই এরূপ অঙ্গীকারে সকলেই স্বীকৃত হইল। তখন ফ্রিগা-দেবীর অনুচরেরা আসিয়া খবর দিল যে, বিশ্বের সকলকে অঙ্গীকার করান হইয়াছে শুধু ভলহল্লার (Valhalla; Walhalla) দ্বারে যে ওক্-বৃক্ষ আছে তাহার উপরের মিস্‌ল্‌টো নামে একটি ক্ষুদ্র পরগাছা বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু সেই মিস্‌ল্‌টো এমনই ক্ষুদ্র নিরীহ পদার্থ যে, তাহা হইতে কোনপ্রকার অপকারের আশঙ্কাই হইতে পারে না। তখন ফ্রিগাদেবী একরূপ আশ্বস্ত হইলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের আর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই।

এদিকে ওডিন্ মনস্থ করিলেন যে, তিনি মৃত্যুরাজ্যে অবস্থিত একজন ভলা (Vala) বা অদৃষ্টদেবীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া বল্ডারের ভবিষ্যৎ জানিয়া লইবেন। তিনি তাঁহার অষ্টপদ অশ্ব স্লাইপ্‌নীরে (Sleipnir) আরোহণ করিয়া ব্রিফ্রষ্ট (Brifrost) সেতুর উপর দিয়া নিফ্‌ল্‌হাইমে (Nifl-heim) মৃত্যুদেবীর অন্ধকার রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

সেখানে গিয়া ওডিন্ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, মৃত্যুরাজ্যের অন্ধকার-প্রদেশে একটা ভোজের আয়োজন হইতেছে এবং পালঙ্কসমূহ স্বর্ণালঙ্কারে ও নানাপ্রকার পরিচ্ছদে ভূষিত হইতেছে, যেন সকলে কোন মহা সম্ভ্রান্ত অতিথির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ওডিনের এসব দেখিবার অবসর ছিল না। তিনি ক্রমাগত চলিয়া আসিয়া যেখানে সেই ভলাদেবী কোন্ যুগ হইতে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি এমন সব মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন যাহাদের মৃত্যু হইতে প্রাণীকে জাগরিত করিবার শক্তি আছে।

হঠাৎ সমাধি-ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইল এবং ভলাদেবী উত্থিত হইয়া জানিতে চাহিলেন যে কে এমন দুঃসাহসী যে, তাঁহার এতকালের বিশ্রামে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। ওডিন্

নিজের পরিচয় গোপন করিয়া বলিলেন যে, তিনি ভল্‌টামের (Valtam) পুত্র ভেগ্‌টাম্ (Vegtam) এবং তিনি ভলাদেবীকে জাগরিত করিয়াছেন, শুধু এইমাত্র জানিবার অভিপ্রায়ে যে, কাহার জন্য মৃত্যু-রাজ্যে এইসব ভোজ এবং সাজসজ্জার আয়োজন হইতেছে। ভলাদেবী তখন ওডিন্‌কে শুনাইয়া দিলেন যে, বল্‌ডারের জন্যই এইসকল আয়োজন—নিজভ্রাতা অন্ধকারের দেবতা অন্ধ হোডারের দ্বারা নিহত হওয়াই বল্‌ডারের নিয়তি।

ওডিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন এই হত্যার প্রতিশোধ লইবে কে—ইহাদের দেশে হত্যার প্রতিশোধ অতি অবশ্যকরণীয়। ভলাদেবী আর কোন কথা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ওডিনের পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে বলিতে হইল যে,পৃথিবীর দেবী রিণ্ডার (Rinda) গর্ভে ওডিনের এক পুত্র জন্মলাভ করিবে তাহার নাম ভলী (Vali)। এই ভলী বল্‌ডারের হত্যার প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত তাহার মুখও ধুইবে না এবং চুলও আঁচ্‌ড়াইবে না। ভলাদেবী এতটা বলিলে, ওডিন্ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, বল্‌ডারের মৃত্যুতে কোন্ ব্যক্তি অশ্রুমোচনে অস্বীকৃত হইবে। এই একটিমাত্র প্রশ্নের অসতর্কতায় ভলাদেবীর নিকট ওডিনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, কারণ প্রশ্নমাত্রেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিশ্চয়ই প্রশ্নকর্ত্তা ভবিষ্যতের খবর জানেন যাহা কোন মর্ত্ত্যবাসীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভলাদেবী আর একটিমাত্র কথাও প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমাধির নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হইলেন—বলিয়া গেলেন যে, পৃথিবীর শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আর কেহ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

অগত্যা ওডিন্ ধীরে ধীরে স্বরাজ্যের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার মন চিন্তাভারাক্রান্ত—কারণ নিয়তির বিধান যখন অলঙ্ঘ্য তখন হয়ত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র এবং দেবরাজ্যের সর্ব্বজনপ্রিয় উজ্জ্বলকান্তি তরুণ দেবতা বল্‌ডার অচিরেই সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে পৌছিবামাত্রই ফ্রিগ্‌গা আসিয়া সকল খবর নিবেদন করিলে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন কারণ যখন সকলেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে কেহই বল্‌ডারের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিবে না, তখন বল্‌ডারের অকল্যাণ কিরূপে সম্ভবে ?

ফ্রিগ্‌গাদেবীর ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বনে দেবতারা সকলেই একরূপ আশ্বস্ত হইলেন এবং তখন তাঁহারা নূতন উদ্যমে আমোদ-প্রমোদে মন দিলেন। আস্‌গার্ডে (Asgard) দেবতাদের এক ক্রীড়াভূমি ছিল তাহার নাম ঈডাভোল্‌ড্ (Ida-vold) বা ঈডা (Ida)। তাঁহাদের ক্রীড়া-কৌতুক ব্যায়ামাদি সব এই ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইত। সেদিন তাঁহাদের নিত্যকার ক্রীড়া-কৌতুকে যেন তাঁহারা অল্পেতেই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; তখন তাঁহারা বুদ্ধি করিয়া এক নূতন ক্রীড়ার আবিষ্কার করিলেন। যখন তাঁহারা জানিলেন যে, কিছুতেই বল্‌ডারের কোন অনিষ্ট হইবে না, তখন তাঁহারা বল্‌ডারকে মাঝখানে দাঁড় করাইয়া চারিদিক্ হইতে নানা-প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তরাদি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলেই ফ্রিগাদেবীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, কেহই বল্‌ডারের কোন অনিষ্ট করিবেন না কাজেই যিনি যতই লক্ষ্য স্থির করিয়া যাহাই নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন সকলই হয় বল্‌ডারের গাত্রমাত্র স্পর্শ করিয়া ভূমে গড়াইয়া পড়িল অথবা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পাইল না। এইরূপে প্রতিবারই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট অথবা ব্যর্থ-লক্ষ্য দেবতাদের হাস্য-কৌতুকের আনন্দ-ধ্বনিতে সমস্ত ঈডাভোল্‌ড মুখরিত হইয়া উঠিল।

ফ্রিগা নিজ প্রাসাদে বসিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত বয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। দেবতাদের আনন্দধ্বনি তাঁহার কানেও গিয়া পৌছিয়াছিল, প্রাসাদের ধার দিয়া এক বৃদ্ধা যাইতেছিল, ফ্রিগাদেবী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দেবতাদের হঠাৎ এত আনন্দের কারণ কি ? বৃদ্ধা বলিল যে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া বল্‌ডারের প্রতি নানা-প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন,কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বল্‌ডারের কিছুতেই কিছু হয় না। তিনি মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন আর দেবতারাও সকলে ইহাতে আমোদ অনুভব করিতেছেন এবং হাস্যধ্বনিতে তাঁহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ফ্রিগা বলিলেন, ইহাতে

হইবার নয় কারণ সকলেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে, কেহই বল্‌ডারের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিবে না।

এই বৃদ্ধা আর কেহই নয়—ইনি ছদ্মবেশে লোকী (Loki)। লোকী ছিলেন অগ্নির প্রতিরূপ, কাজেই বল্‌ডার যিনি সূর্য্যের প্রতিরূপ, তাহার নিকটে তিনি স্বভাবতঃই নিষ্প্রভ। আর বল্‌ডার ছিলেন সর্ব্বজনপ্রিয়, আর লোকী শুধু সকলের ভয়ের আধারমাত্র কারণ সকলেরই জানা ছিল যে, অনিষ্ট উৎপাদনে ইহার রুচি অসাধারণরূপে সতেজ। এইসব কারণে বল্‌ডারের প্রতি লোকীর ঈর্ষ্যা সর্ব্বদাই সজাগ ছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও বল্‌ডারের অনিষ্ট-সাধনের কোনপ্রকার উপায় আছে কি না, সেই খোঁজেই সে ছদ্মবেশে ফ্রিগাদেবীর নিকটে দেখা দিয়াছিল। ফ্রিগার কথার উত্তরে সে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি বল্‌ডার-সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই কি আপনার নিকট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে।" ফ্রিগা বলিলেন—"সকলেই বই কি। আমার অনুচরেরা ব্রহ্মাণ্ডের দিকে-দিকে বাহির হইয়া সকলের নিকট হইতেই অঙ্গীকার আদায় করিয়া লইয়া আসিয়াছে, বাদ পড়িয়াছে শুধু এক "মিস্‌ল্‌টো"—ভল্‌হল্লার তোরণ-দ্বারে ওক্-বৃক্ষের উপরে ক্ষুদ্র এক পরগাছা। এই মিস্‌ল্‌টো এম্‌নি ক্ষুদ্র এবং নিরীহ প্রাণী যে ইহার নিকট ওরূপ গুরুতর অঙ্গীকার আদায় করিতে যাওয়াও বাড়াবাড়ি আর অঙ্গীকার না করাইয়া থাকিলেও উহার ন্যায় ক্ষুদ্র এক পরগাছা হইতে আশঙ্কারও কোন কারণ থাকিতে পারে না।

লোকীর নিকট এই খবরটুকুই যথেষ্ট। সে ছিদ্রান্বেষণই করিতেছিল, যখন দেখিল যে ফ্রিগাদেবী এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও যেন লোকীর জন্যই একটু ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন, তখন সে পুলকিত হইয়া উঠিল। সে তাহার নিজের মনোভাব গোপন করিয়া ফ্রিগাদেবীর নিকট হইতে তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিল। একটু দূরে সরিয়াই লোকী তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং ভল্‌হল্লাতে গিয়া সেই "মিস্‌ল্‌টো" খুঁজিয়া বাহির করিল। তখন সে মন্ত্র-গুণে সেই ক্ষুদ্র পরগাছাটিকে বৃহৎ আকার এবং কঠিন অবয়ব দান করিল। তার পর সেই মিস্‌ল্‌টোর বৃক্ষকাণ্ড হইতে সে নিপুণহস্তে একটি তীর তৈয়ার করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ঈডাভোল্‌ডে গিয়া হাজির হইল। সেখানে তখনও বল্‌ডারকে কেন্দ্র করিয়া সেই-রূপ ক্রীড়া-কৌতুক চলিতেছে। দেবতারা সকলেই আমোদে ব্যস্ত, শুধু অন্ধ হোডার বিষণ্নবদনে একধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। লোকী যেন নির্লিপ্তভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কথায়-কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি কেন ঐ-সব ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান না করিয়া ওরূপ বিষণ্নবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। হোডার বলিলেন যে, তিনি অন্ধ, কাজেই তিনি আর কি করিয়া ওসবে যাইবেন। লোকী তখন আগ্রহ দেখাইয়া সেই মিস্‌ল্‌টোর তীর হোডারের হাতে দিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া গিয়া বল্‌ডারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিবার জন্য হাতে ধরিয়া তাঁহার লক্ষ্য স্থির করিয়া দিল। হোডার্ সেই-অনুসারে তীর নিক্ষেপ করিলেন। প্রতিবারই দেবতারা লক্ষ্যভ্রষ্ট অথবা ব্যর্থ-লক্ষ্য হওয়াতে হাস্যধ্বনিতে ক্রীড়াভূমি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। হোডারও তীর নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ-ধ্বনিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে চম্‌কাইয়া দিয়া হাস্য-ধ্বনির পরিবর্ত্তে এক আর্ত্ত নিনাদ উঠিয়া সমস্ত আস্‌গার্ড ছাইয়া ফেলিল, সেই মিস্‌ল্‌টোর তীরে বিদ্ধ হইযা বল্‌ডার পড়িয়া গেলেন। দেবতারা উদ্বিগ্ন হইয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু ততক্ষণে বল্‌ডারের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তখন দেবতাদের সকলের রোষদৃষ্টি পড়িল হোডারের উপর। হোডার নিশ্চয়ই তাহাদের হস্তে হত হইতেন, কিন্তু দেবতাদের মধ্যে এক নিয়ম ছিল যে, আস্‌গার্ডের পবিত্র-ভূমিতে কাহারও প্রতি স্বেচ্ছাকৃত কোনপ্রকার অত্যাচার হইতে পারিবে না।

হোডার দেবতাদের হাত হইতে মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু তিনি অন্তরে গ্লানি এবং অনুশোচনায় ক্লিষ্ট হইতেছিলেন। দেবতাদের কাছে তাঁহার আর মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। তিনি তখন পথ ধরিয়া-ধরিয়া ফেন্‌সালিরে (Fensalir) ফ্রিগাদেবীর প্রাসাদে গিয়া হাজির হইলেন। সেখানে ফ্রিগাদেবীকে এই মারাত্মক দুঃসংবাদ শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন মা

আমার এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? বল্ডারকে ফিরিয়া পাইবার জন্যই বা আমি কি করিতে পারি? মৃত্যু রাজ্যে গিয়া হেলাদেবীর (Hela) নিকট বল্ডারের বিনিময়ে আমার নিজের প্রাণ দান করিলে কি ইহার কোন প্রতীকার হয় না?

ফ্রিগা পুত্রশোকে অভিভূত হইলেন। বল্ডারকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, এত সতর্কতা সকলই ব্যর্থ হইল। তিনি হোডারকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—হে পুত্র! ইহাতে তোমার নিজের বিশেষ অপরাধ নাই! নিয়তিই বল্ডারকে গ্রাস করিয়াছে, তুমি শুধু নিমিত্তের ভাগী হইয়াছ মাত্র। যাহা হউক একেবারে আশা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার অবশ্যই চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার প্রাণদানে কোন ফল হইতে পারে না, কারণ নিয়তি যদি বল্ডারকে চায় তাহার বিনিময়ে অপরের প্রাণদানে মৃত্যু-দেবী কখনই তৃপ্ত হইবেন না। যদি সম্ভব হইলে আস্গার্ডের যে-কোন দেবতা বল্ডারকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ-দানে স্বীকৃত হইতেন। আমার মনে হয় যে একবার মৃত্যুদেবী হেলাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিয়া দেখিলে হয়, স্বর্গরাজ্যে বল্ডারের অভাবে সকলের কিরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থা, সেটুকু বিবেচনা করিয়া যদি তিনি বল্ডারকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হন। কিন্তু হেলার রাজ্যে যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইতে হয় জান? দেবতারা সদা-সর্বদা যে-পথে যাতায়াত করেন, হাইম্ডালের (Heimdal) (Mid-gard) স্বর্গের দ্বার দিয়া মনুষ্যের দেশ পৃথিবী পর্যন্ত যে-পথ সে পথ নয়। এ-পথ স্বর্গ এবং আলোকের রাজ্য হইতে বহুদূরে, নির্জন এবং দেবতাদের পদচিহ্ন-রহিত। এ-পথে যাইতে হইলে ওডিনের অশ্ব স্লাইপ্নির ব্যতীত অন্য কোন যান-বাহন হইলে চলিবে না। আস্গার্ডের উত্তর প্রান্ত হইতে এই পথ ধরিয়া ক্রমাগত নয় দিন এবং নয় রাত্রি অশ্বারোহণে উত্তর দেশের তুষারের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—পথে কত গভীর উপত্যকা, কত উচ্ছ্বসিত পার্ব্বত্য স্রোত অতিক্রম করিতে হইবে। দশম দিবসে নিফল্হাইমের সীমান্তে গিয়ল (Gioll) নদীর উপরে এক সেতু দেখিতে পাইবে। এই সেতুর প্রহরী আবার উত্তর দিকের পথ দেখাইয়া দিবে, এই পথও অন্ধকারময়; এই পথে চলিতে-চলিতে সমুদ্রের তীরে যাইয়া পৌঁছিবে। এই সমুদ্র পৃথিবীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার একদিকে দৈত্য-দানবের দেশ। কিন্তু তুমি যাইয়া পৌঁছিবে সমুদ্রের অপর দিকে উত্তর-তীরে নিরবচ্ছিন্ন বরফ এবং তুষারের দেশে। এই অভিনব রাজ্য অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরে যাইতে-যাইতে অবশেষে দেখিতে পাইবে সম্মুখে বিস্তৃত এক প্রাকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া, এই প্রাকার-তলে নামিয়া স্লাইপ্নিরের জিন কষিয়া লইয়া লম্ফ প্রদান করিয়া এক লৌহদ্বার উল্লম্ফন করিয়া প্রাকার পার হইয়া যাইবে। প্রাকার পার হইয়া গেলেই নিফ্ল্হাইমের বিস্তৃত প্রান্তর, ইহাই হেলার রাজ্য। এইখানে নানা-প্রকার ছায়াময় প্রাণীসকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাঝখানে বল্ডার উপবিষ্ট, তাহার শিরে মুকুট; তার পরেই হেলাদেবীর সিংহাসন। তোমাকে এইসব ছায়ামূর্ত্তিগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া বল্ডারকে আপাততঃ পশ্চাতে রাখিয়া সর্ব্বপ্রথমে গিয়া হেলাদেবীকে অভিবাদন করিতে হইবে।"

হোডার বলিলেন, মা, আমি যে অন্ধ, আমি কি করিয়া এই দুর্গম পথে যাইব।

ফ্রিগাদেবী বলিলেন, না, তোমার যাইতে হইবে না। তুমি আস্গার্ডে ফিরিয়া যাও। আস্গার্ডে সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিবে। ... থাকিয়া তাহার সহায় হইবে।

ইতিমধ্যে দেবতারা বল্ডারের দেহ শবাধারে স্থাপন করিয়া তাঁহার নিজ প্রাসাদে ব্রাইডাব্লিকে (Breidablik) রাখিয়া আসিলেন। দেবতাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল হার্মড্ (Hermod)। তিনি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রতীক, বল্ডারের দেহ তাঁহার প্রাসাদে রাখিয়া ফিরিবার সময় হার্মড সর্ব্বশেষে একাকী চিন্তাভারাক্রান্তচিত্তে নিজ প্রাসাদের দিকে

অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ ছিল সমুদ্রের তীরে। সাগরতীরের নিকটে আসিতেই কে যেন তাঁহার বাহুতে একবার স্পর্শমাত্র করিয়া তাহার কানেকানে বলিয়া গেল—হার্মড্, একবার মৃত্যুদেবী হেলার রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। কাল অতি প্রত্যুষে ওডিনের অশ্ব স্লাইপ্‌নিরে আরোহণ করিয়া রওনা হইবে এবং সেখানে গিয়া বল্‌ডারকে স্বর্গরাজ্যে ফিরাইয়া দিবার জন্য হেলাদেবীকে অনুরোধ করিবে। মাতা ফ্রিগাদেবী অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমার সহায় হইবেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে—হার্মড্ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কে এমনভাবে আদেশ করিয়া প্রত্যুত্তরের জন্যও অপেক্ষামাত্র না করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। মনে হইল, এ যেন হোডারের কণ্ঠস্বর। যাহাই হউক, আমাকে যাইতেই হইবে, কারণ এ যেন দৈব-বাণীর মত শুনাইল।

মতান্তরে আছে যে বল্‌ডারের পতনে দেবতাদের আর্তনিনাদ শুনিয়া ফ্রিগাদেবীও সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। ফ্রিগা আসিয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার প্রিয় পুত্র মৃত্যুলাভ করিয়াছে, তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, দেবতাদের মধ্যে কেহ নিফ্‌ল্‌হাইমে গিয়া মৃত্যু-রাজ্যের অধীশ্বরী হেলাদেবীকে অনুরোধ করুন, তিনি যেন স্বর্গরাজ্যের জন্য বল্‌ডারকে তাঁহার অধিকার হইতে ছাড়িয়া দেন, নিফ্‌ল্‌হাইমে যাইবার পথ অতিশয় দুর্গম এবং কষ্টদায়ক বলিয়া প্রথমে কেহই সেখানে যাইতে স্বীকৃত হয় না। তখন ফ্রিগাদেবী বলিলেন যে, যিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন তিনি বিশেষভাবে তাঁহার (ফ্রিগার) এবং ওডিনেরও প্রিয়পাত্র হইবেন। তখন হার্মড্ হেলাদেবীর নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই দুর্গম অভিযানে হার্মডের ব্যবহারের জন্য ওডিন্ তাঁহার অষ্টপদ অশ্ব স্লাইপ্‌নিরকে ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পৃষ্ঠে ওডিন্ ব্যতীত আর কেহ ব্যবহার করিতে পান নাই, কাজেই স্লাইপনিরও তাহার পৃষ্ঠে অন্য আরোহী গ্রহণে অভ্যস্ত হয় নাই।

হার্মড যখন সেই দুর্গম পথে নিফ্‌ল্‌হাইমের দিকে অশ্বারোহণে ধাবমান, তখন আস্‌গার্ডে বল্‌ডারের দেহ সংকারের আয়োজন হইতে লাগিল, ওডিনের আদেশে দেবতারা সকলে বনভূমি মথিত করিয়া অনেকপ্রকার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। সমুদ্রতীরে বল্‌ডারের জাহাজ রিংহর্নের (Ringhorn) উপরে চিতা প্রস্তুত হইল, চিরাচরিত প্রথা-অনুসারে অসংখ্য পুষ্পমালা, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার এবং বহুমূল্য বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারে চিতা সজ্জিত হইল। তার পরে ব্রিডাব্লিকের প্রাসাদ হইতে বল্‌ডারের দেহ আনিয়া চিতার উপরে স্থাপিত হইলে সকলে তাহার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী তরুণী নান্না (Nanna) স্বামীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়া আর নিজকে সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হইল—সেইখানেই তিনি পড়িয়া গেলেন এবং মৃত্যুতে স্বামীর সঙ্গলাভ করিলেন।

ম্যাথু আর্নল্ডের 'বল্‌ডার ডেড্' নামক কবিতায় নান্নার মৃত্যুকাহিনীতে একটু প্রকার ভেদ আছে—যাহা কোন পুরাণে দেখা যায় না। ম্যাথু আর্নল্ড্ পুরাণকার নন—তিনি কবি; কাজেই তাঁহার কাহিনী পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। তিনি হয়ত কাব্যভাবেই এটুকু গড়িয়া থাকিবেন। কাব্য-হিসাবে কাহিনীটি বেশ উপাদেয় এবং সুসমঞ্জসও হইয়াছে। সেজন্য এখানে উহা লিপিবদ্ধ হইল।

বল্‌ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ শবাধারে নীত হইয়া ব্রিডাব্লিকে রক্ষিত হইয়াছিল। পত্নী নান্না অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শবাধারের নিকটে কাটাইয়া উপরে তাঁহার শয়ন-গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন। মাতৃস্বরূপা ফ্রিগাদেবী যেন তাঁহার চক্ষু-পল্লবে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিলেন রাত্রি যখন গভীর হইতে গভীরতর হইয়া ক্রমে শেষ যামে আসিয়া পৌঁছিল, আকাশের নক্ষত্রসমূহ অস্ত যাইতে বসিয়াছে, ভোরের শীতল বায়ুরও যেন আভাস পাওয়া যাইতেছে—এমন সময় বল্‌ডারের বিমুক্ত আত্মা

জীবিত অবস্থায় তিনি যেরূপ ছিলেন, সেই মূর্ত্তিতে এবং সেই পরিচ্ছদে নান্নার শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি কিছুক্ষণ সস্নেহ-নয়নে নান্নাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি নিদ্রামগ্ন হইয়া তোমার দুঃখকষ্ট ভুলিয়া রহিয়াছ, কিন্তু তোমার চক্ষুতে অশ্রু-চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তোমার উপাধান পর্য্যন্ত অশ্রুতে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। মনে হয় শিশু যেরূপ কাঁদিতে-কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে, তুমিও সেরূপ ঘুমাইয়া পড়িয়াছ। আমি এখানে আসিয়াছি তোমাকে দেখিতে এবং তোমার সহায় হইতে। জীবিতাবস্থায় আমি তোমা হইতে দূরে যাই নাই, মৃত্যুতেও আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না, প্রত্যূষে দেবতারা আমার দেহ-সৎকার করিবেন; তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, চিরাগত প্রথা-অনুসারে আমার সমস্ত রত্নালঙ্কারের ন্যায় তোমাকেও তাঁহারা আমার দেহের সহিত অগ্নিসংকৃত করিবেন। কিন্তু তাহা হইবার নয়। তাহার পূর্ব্বেই মাতা ফ্রিগাদেবী তোমাকে মৃত্যু দান করিবেন; সেই মৃত্যু হইবে যন্ত্রণাবিহীন। মৃত্যুতে তোমার আত্মা দেহ-বিমুক্ত হইলে দেবতারা আমার দেহের সহিত তোমার দেহমাত্র অগ্নিসংকৃত করিবেন—তোমাকে নয়। আমি জানি যে তুমি আমাকে কত ভালবাস, কাজেই আমার সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য যে কোনও-প্রকার মৃত্যু তোমার অনভিপ্রেত হইবে না। আমার ইচ্ছামত হইলে আমি মৃত্যুকে একেবারেই অপসারিত করিয়া স্বর্গরাজ্যে তোমার জীবিতকাল যথেষ্টপরিমাণে বাড়াইয়া দিতাম। কিন্তু তাহা শুধু তোমার অনভিপ্রেত বলিয়া নয়—তাহাতে আমার অধিকারও নাই। তুমি মৃত্যুতেও আমার সহযাত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, কিন্তু জানিয়া রাখিও, মৃত্যু-রাজ্যে হেলাদেবীর সে অন্ধকার-প্রদেশে জীবন বড় সুখের নয়। সেখানকার অধিবাসীরা সব ছায়াময় প্রাণী, কারণ তাহারা সকলেই মৃতের আত্মা। দেবতাদের মধ্যে সেখানে আছি এক আমি আর আছেন হেলাদেবী। মানব-জগতের মধ্যেও যাহারা সম্রান্তচিত্ত, যাহা· বী রের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা ত জানই ভল্‌হল্লাতে স্থান পাইয়াছে। কাজেই হেলাদেবীর রাজ্যে আসিয়াছে যত অজ্ঞাত অখ্যাত অকর্ম্মণ্যের দল, যত ভীরু, বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি, যাহারা রোগে আক্রান্ত হইয়া জরায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যু লাভ করিয়াছে। অবশ্যই তুমি আসিলে আমরা দু-জনে পরস্পরের সাহচর্য্যে অন্ততঃ কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পাইব এবং স্বর্গরাজ্যের কথা আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে পারিব।

বল্‌ডার এইপর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিলেন, অমনি তাঁহার দেহাবয়ব যেন অস্পষ্ট হইতে লাগিল। নান্না ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিয়া তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। বল্‌ডার বিষণ্ণচিত্তে মস্তক সঞ্চালন করিলেন এবং অদৃশ্য হইয়া গেলেন। নান্না আবার শয্যাতে পড়িয়া নিদ্রাগত হইলেন। তখন মাতা ফ্রিগাদেবী লঘুহস্তে তাঁহাকে দেহ বিমুক্ত করিয়া দিলেন। সেই মুক্তাত্মা তখন বল্‌ডারের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাত্রি প্রভাত হইল।

যাহাই হউক নান্নার মৃত্যু যেরূপেই সংঘটিত হইয়া থাকুক, দেবতারা তাঁহাকে চিতার উপরে বল্‌ডারের পার্শ্বে শয়ান করাইলেন—যেন মৃত্যুতেও তিনি স্বামীর সহগামিনী হইতে পারেন। সহমরণের প্রথা ইঁহারা অত্যন্ত সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন—ইহাতে হিন্দুদের সহিত তাঁহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। এবিষয়ে ইঁহারা আবার হিন্দুদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। দেবতারা বল্‌ডারের সহিত তাঁহার পত্নীকে মাত্র সহমরণে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা বল্‌ডারের অশ্ব এবং কুকুরসমূহ বধ করিয়া বিস্তৃত চিতার উপর স্থাপন করিলেন। বল্‌ডারের প্রতি স্নেহ-ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ দেবতারা সকলেই নিজ-নিজ পক্ষ হইতে নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য-সম্ভারে চিতার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিলেন। সর্ব্বশেষে ওডিন আসিয়া তাঁহার মন্ত্রপূত অঙ্গুরী দ্রাউপ্‌নির (Draupnir চিতার উপরে প্রদান করিলেন এবং শেষ সময়ে বল্‌ডারের কানে-কানে কি যেন বলিয়া দিলেন—কি যে বলিলেন তাহা কেহই জানিল না। কাহারও কাহারও মতে বল্‌ডার যে কল্পান্তে মৃত্যুরাজ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া

দেবরাজ্যে পুনরাবির্ভূত হইবেন, সেই কথাই ওডিন এই সময়ে তাঁহাকে বলিয়া দিলেন।

এইরূপে চিতা-সজ্জা সম্পূর্ণ হইলে জাহাজখানা সাগর-জলে ভাসাইবার জন্য দেবতারা সকলে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু দেবতাদের চিত্ত ভারাক্রান্ত থাকিবার দরুনই হউক অথবা যে-কারণেই হউক দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগেও জাহাজ নড়িল না। তখন তাঁহারা হিরোকিন (Hyrrokin) নামে এক দৈত্য-কন্যাকে আহ্বান করিলেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য। দৈত্য-কন্যা আসিয়া হাজির হইল। তাহার বাহন ছিল এক বিশালাবয়ব নেকড়ে-বাঘ। আর তাহার বাহনকে সংযত করিবার রশ্মিরজ্জু ছিল একগোছা জীবন্ত সর্প। হিরোকিন তাহার বাহন হইতে অবতরণ করিলে ওডিন চারিজন অসুরকায় যোদ্ধাকে আদেশ করিলেন, সেই নেকড়েকে বশে রাখিতে। কিন্তু ভীম-বলশালী সেই চারিজনের সম্মিলিত শক্তিতেও হিরোকিনের নেকড়ে বশ মানিল না; অগত্যা হিরোকিন নিজে আসিয়া উহাকে ভূপাতিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। তার পরে হিরোকিন একাই তাহার বিপুল শক্তি প্রয়োগে জাহাজখানি সাগরজলে নামাইয়া দিল। এই কার্য্যে এতটা শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল যে, তাহার আলোড়নে সমস্ত তটভূমি ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল, তাহাতে দেবতাদেরও প্রায় পদস্খলনের উদ্যোগ হইয়াছিল। ইহাতে থোর (Thor) দেবতার ক্রোধ-বহ্নি উদ্দীপিত হইল; তিনি হিরোকিনকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গদা উত্তোলন করিলেন, তখন অন্যান্য দেবতারা আসিয়া এই হত্যাকার্য্যে বাধা দিলেন এবং দেখিতে দেখিতেই থোর দেবতার ক্রোধাগ্নিও নির্ব্বাণ লাভ করিল।

থোর ছিলেন বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা, কাজেই তিনি বলডারের চিতাতে অগ্নি-যোগ করিলেন। তখন জ্বলন্ত চিতা বক্ষে ধারণ করিয়া জাহাজ সাগরজলে ভাসিয়া চলিল। বিপুল চিতাগ্নির জ্বলন্ত শিখাসমূহ বায়ু-প্রবাহে অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব ও গরিমাময় সৌন্দর্য্য-দৃশ্যের অবতারণা করিল। দেবতারা সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ-নয়নে এই অভিনব দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চিতাগ্নির লেলিহান জিহ্বা ক্রমে-ক্রমে সমস্ত জাহাজখানিকে গ্রাস করিতে লাগিল। জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে পশ্চিম দিগন্তের সীমারেখার নিকটবর্ত্তী হইলে অগ্নিশিখার প্রদীপ্ত বর্ণচ্ছটায় যেন আকাশ ও সমুদ্র ছাইয়া ফেলিল। চিতাগ্নি সমস্ত গ্রাস করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলে তাহার দীপ্তিও মলিন হইয়া আসিতে লাগিল, তার পরে পশ্চিম আকাশে অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ স্বর্ণরশ্মির সহিত চিতাগ্নির শেষ দীপ্তিটুকুও যেন একসঙ্গেই সাগর-সলিলে নিমজ্জিত হইল।

দেবতারা বলডারের দেহ সংকারের পর আসগার্ডে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চিত্তে আর সুখ নাই, স্বর্গরাজ্যে আর আনন্দধ্বনি শুনা যায় না। বলডার ছিলেন উত্তাপ ও আলোকের প্রতিরূপ, কাজেই তাঁহার তিরোধানে স্বর্গরাজ্যে যেন একটা মলিনতার ছায়া পড়িল। দেবতারা যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, যুগাবসানে তাঁহাদের তিরোধানের কাল ঘনাইয়া আসিতেছে; কল্পান্তে যে এক ভয়াবহ হিম ঋতুর আবির্ভাবের কথা আছে, এ যেন তাহারই সূচনা। শুধু ফ্রিগাদেবী আশা করিতেছিলেন যে, হয়ত বলডারের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে; তিনি ব্যাকুল-অন্তরে হারমডের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

এদিকে হারমড স্লাইপ্‌নির অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি আসগার্ড ছাড়িয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিলেন; সমস্ত দিন গেল, দিনের আলো নিভিয়া আসিল, রাত্রির অন্ধকার দিক্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিল—তবু তাঁহার আর বিরাম নাই। নিশাবসানে আবার দিনের আলো ফুটিয়া উঠিল, তবু তিনি চলিতেছেন। এইরূপে নয় দিন এবং নয় রাত্রি তিনি ক্রমাগত উত্তর দেশের তুষারের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন—পথে কত গভীর উপত্যকা, কত উচ্ছ্বসিত পার্ব্বত্য-স্রোত অতিক্রম করিলেন। দশম দিবস-প্রভাতে তিনি নিফ্‌ল্‌হাইমের সীমান্তে গিয়ল নদীর তীরে উপনীত হইলেন। ঐ নদীর উপরে কাচ-নির্ম্মিত এক সেতু,—সেতুর উপরের গিলান স্বর্ণ-নির্ম্মিত। সমস্ত সেতুটি একগাছি চুলের উপরে

বিলম্বিত। এই সেতুর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল মোড্-গাড্ (Modgud) নামে এক কঙ্কালমূর্ত্তি—তাহার কাজ ছিল মৃত্যুপথ-যাত্রীসকলের নিকট হইতে শোণিতের কর আদায় করা। হারমড্ এই সেতু অতিক্রম করিবার সময় তাঁহাদের পদভরে সেতুটি অসম্ভবরূপে কাঁপিয়া উঠিল। মোড্গাড্ আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে? একদল যাত্রী চলিয়া গেলে এই সেতু যতটা আন্দোলিত না হয় তুমি কে যে তোমার অশ্বের পদভরে সেতু তাহার চেয়েও বেশী আন্দোলিত হয়? আর কেনই বা তোমার মতন একজন জীবন্ত ব্যক্তির হেলাদেবীর রাজ্যে প্রবেশের এরূপ প্রয়াস?

তখন হারমড্ তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন যে, বল্ডার এবং নান্নাও এই পথেই গিয়াছেন। হারমড্ দেবতা বলিয়া মোড্গাড্ তাঁহাকে হেলাদেবীর রাজ্যে যাইবার জন্য শুধু পথ ছাড়িয়া দিল তাই নয়, তাঁহাকে পথের পরিচয়ও বলিয়া দিল। আবার উত্তর দিকে চলিতে-চলিতে এক অন্ধকারময় রাজ্য অতিক্রম করিয়া হারমড্ সমুদ্রের তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখান হইতে আরও উত্তরে নিরবচ্ছিন্ন তুষারের দেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বকথিত প্রাকার-তলে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেখানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্লাইপ্নিরের জিন কষিয়া লইয়া আবার অশ্বে আরোহণ করিলেন, তখন স্লাইপ্নির লম্ফ প্রদান করিয়া হারমড্কে সঙ্গে লইয়া প্রাকার অতিক্রম করিয়া নিফ্ল্হাইমের প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। এখানেও হারমডের বিশ্রামের স্থান নাই, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া হেলাদেবীর সিংহাসনের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে দেখিতে পাইলেন হেলাদেবীকে চারিদিকে ঘিরিয়া অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি। নিকটে বল্ডার উপবিষ্ট, তাঁহার শিরে মুকুট।

হেলাদেবী তাঁহাকে দেখিবামাত্রই একটু কঠোরস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি উপায়ে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছ, আর স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া এখানে আসিবারই বা তোমার উদ্দেশ্য কি?

হারমড্ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং হেলাদেবীর পদ-প্রান্তে পড়িয়া দেশীয় প্রথা-অনুসারে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—হে দেবী, দেবতাদের অভিপ্রায় আবার পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবার দরকার আছে কি—দেবতাদের নিকট ত কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তুমি জান বল্ডারের অভাবে আমরা স্বর্গরাজ্যে কিরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছি আমি সেই বল্ডারের জন্য আসিয়াছি। তোমার এই অন্ধকার রাজ্যে বল্ডারের স্থান কোথায়? এখানে বসিয়া তিনি কোন্ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন? বল্ডারের জন্ম হইয়াছিল স্বর্গরাজ্যের জন্য—সেখানে তিনি আলো এবং আনন্দ বিকীরণ করিবেন। তুমি অনুমতি দাও তিনি আবার স্বর্গরাজ্যে গিয়া পুনর্বধিষ্ঠিত হউন—সেইখানেই তাঁহার স্থান।

হেলাদেবী বলিলেন—হারমড্, তুমি এক অসম্ভব প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছ। দেবতারা আমার অনুগ্রহ চান এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা। কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে কতটা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন সেটা মনে আছে কি? আমার পিতা লোকীর আমরা তিন সন্তান; প্রথম ফেন্রিস্ (Fenris) নেকড়ে বাঘ—তাহাকে তোমরা কোন পর্ব্বতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তার পরে অনন্ত নাগ ইয়র্মুঙ্গাণ্ডর (Iormungandr)—তাহাকে তোমরা সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়াছ। আর আমাকে দিয়াছ অন্ধকার প্রদেশে মৃত্যু রাজ্যে রাজত্ব করিতে। আমাদের পিতা লোকী এখনও স্বর্গরাজ্যে আছেন বটে, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে কি-চক্ষে দেখ এবং ভবিষ্যতে যে তোমরা তাঁহার কি-অবস্থা করিবে তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। অবশ্যই আমাদেরও সুদিন আসিবে; আমরা তাহারই প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু দেবতারা আমাদের এত নিগ্রহ করিয়া আবার তাঁহারাই আমাদের সাহায্য চান? আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমরা যে বল্ডারের অত জগৎ-জোড়া প্রীতির কথা শুনাইতেছ—আমাকে দেখাইতে হইবে যে, বল্ডার সত্য-সত্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বজনপ্রিয়। যদি জগতের চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থ, দেব, দানব,

মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেই বল্‌ডারের জন্য অশ্রু মোচন করে, তবেই জানিব যে বল্‌ডার সর্ব্বজনপ্রিয়। তখন তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যের জন্য ছাড়িয়া দিব। কিন্তু মনে রাখিও যে, যদি একটি প্রাণী অথবা একটি পদার্থও তাহাতে অস্বীকৃত হয় অর্থাৎ অশ্রুমোচনে বিরত থাকে, তবে বল্‌ডার যেমন আছে এখানেই থাকিয়া যাইবে।

হার্‌মড্ হেলাদেবীর এই প্রস্তাবে খুবই আশ্বস্ত হইলেন, কারণ বল্‌ডারের জন্য শোক-প্রকাশে কেহই অস্বীকৃত হইবে না ইহা তিনি খুবই জানিতেন। তখন তিনি হেলাদেবীর অনুমতি লইয়া বল্‌ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত খবর তাঁহাকে বলিলেন। হেলাদেবীর রাজ্য হইতে তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনার কথাও তাঁহাকে জানাইলেন। হার্‌মড্ ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে নান্না ফ্রিগাদেবীর জন্য সুন্দর কারুকার্য্য-সমন্বিত একখানা গালিচা পাঠাইলেন। বল্‌ডার ওডিনের জন্য ওডিনেরই দেওয়া সেই মন্ত্রপূত অঙ্গুরী ড্রাউপ্‌নির ফেরত পাঠাইলেন এবং হার্‌মডের যোগে দেবতাদের সকলকে তাঁহার সম্ভাষণ জানাইলেন এবং তাঁহার খবরাখবর জানাইতে বলিয়া দিলেন। হার্‌মডের নিকট এ-সব বাহুল্য বলিয়াই মনে হইল, কারণ তাঁহার পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস ছিল যে, বল্‌ডার ত শীঘ্রই সশরীরে আস্‌গার্ডে ফিরিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বল্‌ডার হার্‌মডের নিকট শুনিয়া হেলাদেবীর ও-সব কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, হেলাদেবীও ত লোকীরই কন্যা।

যাহাই হউক হার্‌মড্ বল্‌ডারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আস্‌গার্ডের দিকে রওনা হইলেন। পথে বাহির হইয়া দেখিলেন সেই প্রাকারের লৌহদ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত এবং সমস্ত পথই তাঁহার জন্য এতটা সহজ হইয়া রহিয়াছে যে, যাইবার সময় যে-পথ তিনি নয় দিনে অতিক্রম করিয়াছিলেন এবারে সেই পথ তিনি দুই দিনে পার হইয়া আসিলেন—অবশ্য অন্যের পক্ষে হেলাদেবীর রাজ্যে একবার প্রবেশ করিলে আবার ফিরিয়া আসিবার পথ একেবারেই বন্ধ।

হার্‌মড দ্বাদশ দিবসে স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কাহারও কাহারও মতে ওডিনের আদেশে এই দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত বল্‌ডারের দেহ-সৎকার স্থগিত রহিয়াছিল। হার্‌মড্ আসিয়া পৌঁছিবামাত্রই তাহার নিকট খবর শুনিয়া ওডিন বল্‌ডারের দেহ সৎকারের আদেশ দেন।

যাহাই হউক হার্‌মডের নিকট খবর শুনিয়া দেবতারা সকলে সমবেত হইলেন। ওডিন বলিলেন—বল্‌ডারের মুক্তির পন্থা আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ বলিয়াই মনে হইতেছে কারণ বল্‌ডারের জন্য শোক না করিবে এমন কে আছে, কিন্তু এই প্রস্তাব আসিতেছে চির বিশ্বাস-ঘাতক লোকীর কন্যার নিকট হইতে। অতএব ইহার মধ্যে কোন-প্রকার দুষ্ট অভিসন্ধি না থাকিয়া যায় না; আমার ত মনে হয় ইহার উপরে নির্ভর না করিয়া আমাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করাই উচিত। এক পন্থা হয় যদি আমি স্বয়ং ওডিন—সমর-সাজে সজ্জিত হইয়া আমার অষ্ট-পদ অশ্ব স্লাইপ্‌নিরে আরোহণ করিয়া বাহির হই; সঙ্গে প্রধান সহচর বজ্র ও বিদ্যুতের সমস্ত শক্তি-সমন্বিত থোর আর দিব্য শক্তিসম্পন্ন আস্‌গার্ডের সমস্ত দেবগণ। এইরূপে যদি আমরা দেবভূমির সমগ্র শক্তি সম্মিলিত হইয়া একটা ধূমকেতুর ন্যায় হেলাদেবীর রাজ্যে আবির্ভূত হইয়া হেলাদেবীকে চমকিত করিয়া বল্‌ডারকে স্বাধিকারে গ্রহণ করিয়া বিজয়-গর্ব্বে তাহাকে আনি এবং স্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি। আমার ত মনে হয় ইহাই হইবে দেবতাদের উপযুক্ত কাজ।

ওডিনের প্রস্তাব শুনিয়া আস্‌গার্ডের দেবগণ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং এক তুমুল আনন্দ-ধ্বনি করিয়া এই প্রস্তাবে তাঁহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ওডিন জানিতে চাহিলেন—"রাণীর কি মত?" তখন ফ্রিগাদেবী তাঁহাদের উল্লাসে বাধা দিয়া ওডিনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—তুমি দেবতাপ্রধান, তোমার মুখে এ কি অন্যায় প্রস্তাব ওডিন—শুধু অন্যায় নয়, অসম্ভবও বটে! স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরী, মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলের তুমি প্রধান, বিশ্বরাজ্যে সকল শক্তির উপরে তুমি শক্তিমান্; কিন্তু তোমার শক্তিরও একটা সীমা আছে—তুমি যেখানে যে বিধান দিয়া রাখিয়াছ, তাহা লঙ্ঘন করিবার শক্তি

তোমারও নাই। তোমারই বিধানে লোকীর কন্যা হেলা নিফ্‌লহাইমের পাতালপুরীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নয়টি অন্ধকারময় প্রদেশের উপরে রাজত্ব করিতে পাইয়াছে। তুমিই তাহাকে মৃত্যু রাজ্যে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিয়া রাখিয়াছ। এখন আবার তুমিই চাও তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে, তাহার অন্ধকারের রাজ্যে আলোকের অনধিকার প্রবেশ ঘটাইতে আর তাহারই রাজ্যের একটি প্রজাকে বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে। তোমার ইহা অভিপ্রেত হইলেও আমি ইহাতে মত দিতে পারি না; এবং আমার মত একেবারে অবহেলা করাও তোমার উচিত হইবে না, কারণ তুমি দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেও আমিও একেবারে অজ্ঞাত, অখ্যাত তুচ্ছ ব্যক্তি নই। কালের হিসাবে আমি তোমার পরে আবির্ভূত হইয়াছি সত্য, কিন্তু মনে রাখিও আমিই দেবীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা এবং সমস্ত দেবগণের আমিই মাতৃ-স্থানীয়া। আমার কি মত যদি জানিতে চাও তবে শোন—বল্‌ডারের উপর এখন হেলা-দেবীর পূর্ণ-অধিকার, সেই হেলাদেবীই যখন তাহার উদ্ধারের একটা উপায় বলিয়া দিয়াছেন, তখন সেই সর্ত্তই গ্রহণ কর—তার চেয়ে বেশী তোমরা পাইতে পার না। যদি সর্ত্ত রক্ষা করিতে পার, তবে হেলা তাহার অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিতে পারিবে না, তখন সে বল্‌ডারকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। কাজেই যাহাতে সেই সর্ত্ত রক্ষিত হয় তাহার জন্য দিকে-দিকে দূত প্রেরণ কর।

ওডিন ফ্রিগাদেবীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ দিকে-দিকে দূত প্রেরণের আদেশ প্রদান করিলেন। দেবতারা তখন নিজ-নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া বিশ্ব-রাজ্যের চারিদিকে বাহির হইলেন। মতান্তরে আছে দেবরাজ ওডিন দেবকন্যা ভ্যাল্‌কিরদিগকে (Valkyrs) এই দৌত্যে নিযুক্ত করিলেন; তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন শুধু এই তিনটি কথা প্রচার করিতে যে—"বল্‌ডারের মৃত্যু হইয়াছে"। বল্‌ডারের মৃত্যু-সংবাদ এমনই ভয়ানক যে প্রথমবারে দেবকন্যাদের মুখে এই কথা কয়টি স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইল না। সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট-ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিরূপে আস্‌গার্ডে ফিরিয়া আসিয়া চারিদিকে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। দেবতারা সেই ধ্বনি শুনিয়া আবার যেন নূতন করিয়া বল্‌ডারের জন্য শোক করিতে লাগিলেন। এইরূপে শোকের উচ্ছ্বাস স্বর্গরাজ্য হইতেই আরম্ভ করিয়া দিকে-দিকে বহিয়া চলিল। ভ্যাল্‌কির-দেবকন্যাগণ পৃথিবীতে আসিয়া প্রচার করিলেন—বল্‌ডারের মৃত্যু হইয়াছে। অমনি পুরুষেরা তাহাদের কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বল্‌ডারের জন্য শোক করিতে লাগিল, রমণীগণ জল আহরণার্থে যাইতেছিল, পথে এই সংবাদ শুনিয়া তাহারা আর শোক সংবরণ করিতে পারিল না—অশ্রুতে তাহাদের জলপাত্র ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে শিশুগণও কাঁদিতে লাগিল। দেবকন্যারা বিজন প্রান্তরে গিয়া প্রচার করিলেন—বল্‌ডারের মৃত্যু হইয়াছে; অমনি তৃণ পুষ্পসমূহ সকলে অশ্রু মোচন করিল, পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তরগুলি পর্য্যন্ত তাহাতে যোগ দিল। পর্ব্বতে-প্রান্তরে যে-সকল স্থলে ম্যামথ (Mammoth) ম্যাষ্টডন্ (Mastodon) প্রভৃতি পুরাকালের অতিকায় জন্তুসমূহ বহুকাল হইল পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাদের অস্থিসমূহও যেন মহানিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া এই ক্রন্দনে যোগদান করিল। তখন ভ্যাল্‌কির-দেবকন্যারা তাহাদের দৌত্যের সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিতে-করিতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে মহাদেব ওডিন তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া একবার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রথমে দেখিলেন যে, দেবকন্যারা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল দিকেই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বল্‌ডারের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন আর সঙ্গে-সঙ্গেই যেন অশ্রু-প্রবাহও বহিয়া চলিয়াছে। দেখিতে-দেখিতেই অশ্রুরাশি বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া একটা ঘন মেঘের আবরণে ওডিনের দৃষ্টিপথ রোধ করিল। তখন তিনি মেঘরাশি ভেদ করিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন এবং দেবকন্যাদিগকে ডাকিয়া পৃথিবীর খবর জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারা উত্তর করিলেন—হাঁ, পিতা, সমস্ত পৃথিবীই শোকে মগ্ন।

দেবকন্যারা সাগর-তীরে আসিয়া সাগর-দেবতা নিয়র্ডের (Niord) সাহচর্য্যে চারিদিকে সমুদ্রের কোণে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইলেন যেন কেহই বাদ না পড়ে।

সমুদ্রের অপর পারে দানবদের দেশ। তাহারই একপ্রান্তে এক বনভূমি—সেখানকার বৃক্ষসমূহ লৌহ-নির্ম্মিত। ভ্যাল্‌কির-কন্যারা যখন তাহাদের দৌত্য-কার্য্য শেষ করিয়া এই পথে আস্‌গার্ডে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন এই বনভূমির গুহামুখে দেখিতে পাইলেন এক দানবী বসিয়া আছে, ইহার নাম থক্ (Thok)। থক্ দেবকন্যাদিগকে দেখিয়াই উচ্চ হাস্য-ধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের স্বর্গরাজ্য কি নেহাৎ একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে কি আর আনন্দ-উৎসব নাই যে তোমরা আমার এই দেশে বেড়াইতে আসিয়াছ?

দেবকন্যারা বলিলেন—আমরা তোমার এখানে আমোদ-আহ্লাদ করিতে আসি নাই, আমরা আসিয়াছি দুঃখের কাহিনী লইয়া—বল্‌ডারের মৃত্যু হইয়াছে—তাহার জন্য অশ্রু মোচন কর। থক্ ইহা শুনিয়া আবার হাসিয়া উঠিল এবং বলিল—বল্‌ডারের মৃত্যু হইয়াছে; বেশ; তোমাদের দুঃখ হইয়া থাকে তোমরা শোক কর, কিন্তু বল্‌ডারের মৃত্যুতে আমার অশ্রু ঝরিবে না।

এই বলিয়া আবার হাস্য-ধ্বনি করিয়া থক্ তাহার গহ্বরে গিয়া প্রবেশ করিল। এই থক আর কেহই নয়—লোকীই থকের রূপ ধারণ করিয়া সেই গুহামুখে বসিয়া ছিল।

দেবদূতেরা এই সংবাদ লইয়া আস্‌গার্ডে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে দেবতারা আশান্বিত-হৃদয়ে ইহাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ইহাদের বিষণ্ণ বদনে নৈরাশ্যের স্পষ্ট ছায়া দেখিয়া তাহাদের সমস্ত আশা মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণ লাভ করিল। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, নিয়তির বিধান খণ্ডন করা দেবতাদেরও অসাধ্য।

এই কাহিনীর শেষ অঙ্কে বল্‌ডারের হত্যার প্রতিশোধের কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ওডিন ভোলা-দেবীর নিকট হইতে জানিয়া আসিলেন যে, পৃথিবীর দেবী রিণ্ডার গর্ভে ওডিনের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সেই বল্‌ডারের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। ওডিন ইহা জানিতেন বলিয়াই অনেকপ্রকার কষ্ট এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও রিণ্ডাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন—রিণ্ডার কাহিনীতে আছে, যে তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করা ওডিনের পক্ষেও বেশ কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। যথাকালে রিণ্ডার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হইল। ইহাঁর নাম ভ্যালি (Vali)। ইনি অবিনশ্বর আলোকের দেবতা, আর-এক হিসাবে ইহাকে ক্রম-বিবর্দ্ধমান দিনমানের প্রতিরূপ বলা হয়। ভ্যালি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই এতটা বাড়িতে লাগিলেন যে, এক দিনমান শেষ না হইতেই তিনি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি—যেমন বিধিলিপি ছিল—মুখও না ধুইয়া এবং মাথার চুলও না আঁচ্‌ড়াইয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে আস্‌গার্ডে আসিয়া দেখা দিলেন এবং হোডারকে হত্যা করিয়া নিয়তির বিধানের পূর্ণতা সাধন করিলেন।

মতান্তরে (ম্যাথু আর্‌নল্ডের কাব্যে) আছে যে হোডার ফ্রিগাদেবীর কাছে নিজের হৃদয়-বেদনার কথা জানাইয়া হেলাদেবীর অভিমুখে অভিযান-সম্বন্ধে হার্‌মডের নিকট ফ্রিগাদেবীর আদেশ বিজ্ঞাপিত করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া আত্ম-হত্যা করিলেন। পরে বল্‌ডারের দেহ-সৎকারের সময় দেবতারা তাহার চিতার উপরে বল্‌ডারের দক্ষিণ পার্শ্বে নান্নাকে এবং বামপার্শ্বে হোডারকে স্থাপন করিলেন। হোডারের মৃত্যুর কাহিনী এরূপভাবে সাজাইলে ইহার একটা অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায় এই যে, বল্‌ডারের হত্যার জন্য হোডারের প্রতি কোন-প্রকার প্রতিশোধের ব্যবস্থা হয় না। কোন পুরাণকার এরূপ ব্যবস্থায় রাজি হইবেন বলিয়া মনে হয় না। হয়ত ইহা শুধুই কবির কল্পনা—কবি এস্থলে পুরাণের সমস্ত কাহিনী বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

বিচ্ছেদের কাতরতা ত ছিলই। ভ্যালির হস্তে মৃত্যু লাভ করিয়া তিনি আত্ম-গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং মৃত্যু-দেবী হেলার রাজ্যে গিয়া ভ্রাতা বল্‌ডারের সহিত যুক্ত হইলেন।

এই কাহিনীর প্রাকৃতিক অর্থ ত বেশ স্পষ্ট। বল্‌ডার ছিলেন আলোক ও উত্তাপের দেবতা, আর অন্ধ হোডার

অন্ধকারের দেবতা। কাজেই হোডারের হস্তে বল্‌ডারের মৃত্যুর অর্থ প্রতিদিন দিবাবসানে সূর্য্যের অস্তগমন এবং অন্ধকারের আবির্ভাব; অথবা উত্তর প্রদেশের স্বল্পকাল-স্থায়ী গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে সুদীর্ঘ শীতঋতুর আগমন। হোডারের হস্তে মৃত্যুর অর্থ যেন অন্ধকারের আগমনে আলোকের পরাজয়—শীত-ঋতুর আবির্ভাবে বসন্তের তিরোধান। ভ্যালির হস্তে বল্‌ডারের হত্যার প্রতিশোধের অর্থ নিশাবসানে সূর্য্যের পুনরুদয়, শীতাবসানে আবার বসন্তের আবির্ভাব। শীতঋতুতে চারিদিকে সমস্ত জমিয়া তুষার হইয়া পড়িয়া থাকে, শীতের পরে বসন্তের আগমনে চারিদিকে তুষার গলিতে আরম্ভ হয়, তখন বৃক্ষ-পল্লব, এমন কি প্রস্তরাদি হইতেও জল ঝরিতে থাকে, শুধু কয়লা মাটির অনেক নীচে থাকে বলিয়া তাহাকে তুষারের শৈত্য স্পর্শ করে না। তাহার মধ্যে সিক্ততার ভাবও কিছু দেখা যায় না। সেইরূপ বল্‌ডারের পুনরাগমনের আশায় সকলেই অশ্রুমোচন করিল—বৃক্ষ-পল্লব প্রস্তরাদি পর্য্যন্ত—এক বাকী রহিল দানবী থক্—সে এক হিসাবে কয়লার প্রতিরূপ।

এই কাহিনীর নৈতিক হিসাবে একটা ব্যাখ্যাও আছে—বল্‌ডার এবং হোডার যেরূপ বিরুদ্ধ-প্রকৃতির, তাহারা যথাক্রমে পুণ্য এবং পাপের প্রতিরূপ বলিয়া কথিত আর লোকী হইল মায়া বা পাপের মোহ যে সকলকে ভুলাইয়া পাপে প্রবর্ত্তিত করে।

বল্‌ডারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি উৎসবেরও প্রচলন হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান ছিল দক্ষিণায়নে যেদিন দিনমান বৎসরের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সেই দিনে। তাহারা প্রতিবৎসর এই দিনটাকে বল্‌ডারের মৃত্যু এবং পাতালপুরী প্রবেশের দিন বলিয়া গণনা করিত; প্রাকৃতিক হিসাবেও এই দিন হইতেই দিনমানের পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করে। উৎসবের অঙ্গ ছিল বাড়ীর বাহিরে সকলে একত্র হইয়া নানা-প্রকার আমোদ-আহ্লাদ, বাজি-পোড়ানো, ইত্যাদি। এই উৎসব মিড্‌ সামার্স্‌ ইভ্‌ বলিয়া খ্যাত ছিল; এখন খ্রীষ্টীয় যুগে মিড্‌ সামার্স্‌ ইভ্‌—সেন্ট্‌ জন্‌স্‌ ডে'তে পরিণত হইয়াছে।

ফুলি

শ্রী কিশোরীলাল দাশ গুপ্ত

"দাদা, শীগ্‌গির আয়" বলিয়া দশ বছরের একটি মেয়ে রামচরণের হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। রামচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কিরে, ফুলি?"

"দেখ্‌বি এখন" বলিয়া, ফুলি তাহাকে একরকম টানিয়া আনিয়া তাহাদের একটা আমগাছের নীচে খাড়া করিল। রামচরণ এক ঝট্‌কায় তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "দূর ছাই, বল্‌ না কি?"

ফুলি, কোন কথা না বলিয়া, আমগাছের একটা উঁচু ডালের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া রহিল। রামচরণ, ফুলির আঙ্গুলের লক্ষ্য অনুসন্ধান করিয়া উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল, কিন্তু কিছু দেখিতে না পাইয়া বলিল, "পাখীর বাসা?"

ফুলি, অবজ্ঞায় তাহার গায় একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "তুই কাণা নাকি? দেখ্‌ছিস্‌ নে?",

রামচরণ, ফুলির চার বছরের বড় সুতরাং গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতা ফুলির চেয়ে তাহার বেশী নহে। ফুলি তাহাকে কাণা বলিতেই সেও রাগিয়া বলিল, "তুই বোবা নাকি? বল্‌তে পারিস্‌নে নাকি?"

ফুলি, এবার একটু নরম-সুরে বলিল, "ভালো করে' চেয়েই ছাখ্ না ?"

রামচরণ, সমস্ত দেহটাকে আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া, মাথাটাকে চারিদিকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, কৌতূহলী চোখ ছুইটি দিয়া পাতার মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার চোখ ছুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে হাসিতে-হাসিতে বলিল, "দেখেছি রে ফুলি, আম!"

ফুলি, সগৌরবে বলিল, "কেমন ?"

তখন আষাঢ় মাসের শেষ। সে-অঞ্চলের আম অনেক দিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ ফুলিদের এই সিঁদুরে গাছটার আম, ছেলেদের এম্নি প্রলোভনের ছিল যে, কেবল সিঁদুরে রঙের গৌরবে থাকিবার অনেক পূর্ব্বেই একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইত। তবুও ছেলে-মেয়েদের অনুসন্ধিৎসু ও প্রলুব্ধ দৃষ্টি এড়াইয়া একটি আম যে তখনো আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং ফুলি যে সেটিকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাহাও তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

রামচরণ আমটি দেখিয়াই তাড়াতাড়ি গোটা-কয়েক ঢেলা কুড়াইয়া আনিল, কিন্তু পাতার আড়ালে, বহু ঊর্দ্ধে স্থিত আমটিকে ঢেলা ছুঁড়িয়া পাড়া যে মৎস্য-লক্ষ্যভেদ করা অপেক্ষাও কঠিন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। তাহার সব কটা ঢেলাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

ফুলি বিরক্ত হইয়া বলিল, "গাছে ওঠ্ না।"

রামচরণ নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "উঠ্ছি আর কি! যে মাদালি গাছে, আমায় খেয়ে ফেলুক্।"

ফুলিও তাহার স্বরের অনুকরণ করিয়া বলিল, "মাদালিই ত—বাঘ ত আর নয়। অমন দু'চারটা কামড় আমিও সইতে পারি।"

মেয়ে-মানুষের কাছে, পুরুষ মানুষ কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিতে চায় না—সে বালকই কি, যুবকই কি। রামচরণের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। সে অম্নি বলিয়া উঠিল, "আমিও পারি।"

তখন সে মাদালির কামড় উপেক্ষা করিয়া গাছে উঠিতে লাগিল। মোটা ডাল ছাড়াইয়া যখন সে অতি ঊর্দ্ধে, সরু মগডালে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন ফুলির ভয় হইল। সে রামচরণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিল, "দেখিস্, পড়ে' যাস্‌নে যেন।"

"পড়ি ত পড়্‌ব" বলিয়া রামচরণ, তাহার পড়া যে অসম্ভব, তাহা ফুলিকে বুঝাইয়া দিবার জন্য পায়ের নীচের ডালগুলিকে এক-একটা ঝাঁকুনি দিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ মড়াৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। তার পর পাতার মধ্য দিয়া হুড়মুড় করিয়া রামচরণ, ধুপ্ করিয়া, ফুলির সাম্‌নে মাটির উপরে আসিয়া পড়িল।

"ওগো, শীগ্‌গির এস, রামা গাছ থেকে পড়ে' গেছে" বলিয়া চেঁচাইয়া ফুলি সভয়ে রামচরণকে যাইয়া জড়াইয়া ধরিল। রামচরণ জেলের ছেলে, বেশ শক্ত-সমর্থ। আঘাতটা খুব গুরুতর হইলেও সে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সে ফুলিকে বলিল, "ডান হাত আর পা টায় বড্ড লেগেছে রে ফুলি, আমি উঠ্‌তে পারছি নে।"

ফুলি, কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "আমিই ত তোকে গাছে উঠ্‌তে বলেছিলাম।"

রামচরণ, তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল, "আমি কাউকে তা বল্‌ব না রে, ফুলি। তুই ছুটে' যা, বাবাকে ডেকে আন্।"

ফুলি, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া, রামচরণের বাবাকে ডাকিয়া আনিল।

(২)

গাঁয়ের ডাক্তার নিধিরাম, রামচরণকে দেখিতে আসিল। নিধিরামের ডাক্তারিতে যে বিদ্যা কত দূর তাহার কোন নিদর্শন ছিল না। কোন্ ডাক্তারী স্কুল বা কলেজে তাহার পড়া ছিল, তাহাও কেহ জানিত না। তবে কিছুদিন সে কলিকাতায় ছিল। তাহার পর দেশে আসিয়া ডাক্তারি আরম্ভ করিয়াছিল।

নিধিরাম, রামচরণের হাত ও পা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "হাতের এল্‌বা-জাইন্ (Elbow-joint) আর পায়ের আঙ্কেল্-জাইনের (Ankle-joint) ডিজ্‌লোকেসন্ (dis-location) হয়েছে।"

কয়েকখানা বাঁশের বাখারী আনিয়া নিধিরাম, রামচরণের হাত ও পা সোজা করিয়া বেশ কষিয়া বাঁধিয়া দিল। দু'চার দিন পরে-পরে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল, হাত ও পায়ের বাঁধন মজবুত আছে কি না। তিন সপ্তাহ পরে, হাড় জোড়া লাগিয়াছে বলিয়া যখন সে রামচরণের হাত ও পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল, তখন দেখা গেল, হাড় জোড়া লাগিয়াছে বটে, কিন্তু বেচারার কনুই ও হাঁটুর জোড়া এমন শক্ত হইয়া গিয়াছে যে হাত-পা আর খেলে না। নিধিরাম, একটা মালিশের ব্যবস্থা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। সেই হইতে রামচরণের ডান পা-টা খোঁড়া এবং ডান হাত-টা একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

কিন্তু এই অঙ্গহানির জন্য রামচরণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না। ডাক্তার তাহার হাত-পা ছাড়িয়া দিতেই সে খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে ফুলির কাছে যাইয়া বলিল, "চল্ রে ফুলি, আমাদের বারোমেসে পেয়ারা গাছটা দেখে' আসি, যদি কিছু থাকে।"

ফুলি, শঙ্কিত হইয়া বলিল, "না রে রামা, আর গাছে উঠ্‌তে যাস্‌নে।"

রামচরণ হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি কি আর গাছে উঠ্‌তে পারি রে, যে, গাছে উঠ্‌তে যাবো? চল্ আঁকৃষি দিয়ে পাড়্‌ব'খন।"

রামচরণের কথায় ফুলির চোখে জল আসিয়াছিল। সে তাহার ভাঙা হাতখানা ধরিয়া বলিল, "আর জাল দিয়ে মাছও ধর্‌তে পার্‌বিনে?"

রামচরণ বলিল, "না রে ফুলি, তা আর পার্‌ব না।"

গরীবের ছেলেমেয়ে, যারা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, পেটের ভাতের কথাই তাহাদের সকলের আগে মনে আসে, তাই ফুলি প্রশ্ন করিল, "তবে কি করে' খাবি?"

রামচরণ, বলিল, "যে ক'দিন বাবা আছে সে-ই খাওয়াবে।"

"তার পর?"

রামচরণ একটু দুঃখিত হইয়া বলিল, "কি জানি—হয়ত না খেয়ে মর্‌ব।"

ফুলি যেন তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল, "দূর, তা কেন? আমি তোকে খাওয়াবো।"

রামচরণ হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুই খাওয়াবি! তুই ত বে হ'লে কোথায় থাক্‌বি তার ঠিকানা নেই।"

ফুলি বলিল, "আমি তোকে বে কর্‌ব।"

রামচরণ পেয়ারা গাছের দিকে যাইতে-যাইতে বলিল, "তা হ'লে পার্‌বি।"

(৩)

রামচরণের বাবা বনমালী হালদারের জেলেদের মধ্যে অবস্থা একটু ভালোই। মাছ বেচিয়া কিছু টাকা সে হাতে করিয়াছিল। আর দু'খানা নৌকাও তাহার ছিল। ছেলের বয়স যখন আঠারো বছর হইল, তখন বনমালীর ইচ্ছা হইল, তাহার বিয়ে দেয়। সে মেয়ের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার টাকার লোভে কেহ ভুলিল না। রোজগারের জন্য শরীরটাই যাহাদের পুঁজি, হাত-পা না থাকিলে তাহারা একেবারে দেউলে। সুতরাং এই খোঁড়া ও নুলো ছেলেটির হাতে কেহই মেয়ে দিতে রাজি হইল না।

ফুলিও জেলের মেয়ে। বিধবা মা, আর কেউ নাই। মা মাছ বেচিয়া কোন রকমে চালায়। দায়ে ঠেকিলে অনেক সময়ে বনমালীর কাছে সাহায্যও পায়। বনমালী যখন আর কোথায়ও মেয়ে পাইল না তখন ফুলির সহিত ছেলের বিবাহের প্রস্তাব করিল। বুড়োর যে কিছু টাকা আছে তাহা ফুলির মাও শুনিয়াছিল। সে মনে করিল, রামচরণের বুদ্ধি আছে, বাপের টাকাটা সুদে খাটাইলেও খাইতে পাইবে। নৌকা দু'খানা ভাড়ায় খাটাইলে, তাহাতেও পনেরোটা টাকা আসিবে। নিজের মন ঠিক করিয়া, ফুলির মন বুঝিবার জন্য সে বিয়ের কথা ফুলির নিকটে তুলিয়া বলিল, "ছোঁড়ার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তবে খোঁড়া আর নুলো।"

ফুলি, মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হ'লই বা।"

ফুলির মা প্রফুল্লমনে বিয়ে দিতে রাজি হইল। বিয়েও হইয়া গেল।

দু'টা বছর বেশ কাটিয়া গেল। ফুলি সময় পাইলেই

জালের জন্য শণের সূতা কাটিতে বসিত আর রামচরণ তাহার কাছে বসিয়া তামাক টানিত এবং মধ্যে-মধ্যে এক-গাল ধোঁয়া ফুউ-উ করিয়া ফুলির মুখের উপর ছাড়িয়া দিত। তামাকের গন্ধে এবং ধোঁয়ায় ফুলির দম্ আট্‌কাইয়া আসিত। "আঃ কর কি" বলিয়া হাসিয়া সে তাহার মুখখানা ধোঁয়ার কুণ্ডলী হইতে সরাইয়া লইত। দেখিয়া রামচরণ হাসিত। সুতরাং দিন বেশ সুখেই যাইতেছিল।

এক বছর পরে ফুলির মা মারা গেল। পরের বছর আশ্বিন মাসে ভয়ানক ঝড় হইল। সেদিন বনমালী পদ্মানদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। রাত্রে ঝড় প্রলয়-মূর্ত্তি ধরিল; ঝড়ে ডাঙার গাছ উপড়াইয়া জলে ফেলিতে লাগিল, নদীর জল ঠেলিয়া ডাঙায় তুলিতে লাগিল। মহাকালের ফুৎকারে সে-অঞ্চলের ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা কোথায় যে উঠিয়া গেল তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ঝড়ে জেলেদের অনেক নৌকা ডুবিল—অনেক লোকও মারা গেল। বনমালী ও তাহার নৌকা দুখানিরও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

বনমালী হঠাৎ মরিয়া গেল, সুতরাং সে যে টাকা কোথায় রাখিয়া গেল রামচরণ ও ফুলি তাহার কোনই সন্ধান পাইল না। কিন্তু রামচরণের কাকা গদাই একথা একেবারেই বিশ্বাস করিল না। সঞ্চিত টাকা তাহাদের দুই ভাইয়ের রোজগারি, সুতরাং তাহার অর্দ্ধেক গদাইএর প্রাপ্য। রামচরণ যে তাহাকে ফাঁকি দিল, তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ থাকিল না। টাকা যখন সে সত্যই পাইল না, তখন রাগ করিয়া তাহার বাড়ীর অংশ বেচিয়া দিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল।

রামচরণ ও ফুলি প্রথমে মনে করিল বেশ হইল। কিন্তু অভাব যখন ক্রূর মূর্ত্তিতে দেখা দিল, তখন দু'জনেই ভয় পাইল। রামচরণ কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। সে জেলে, মাছ-ধরা, মাছ-বেচা তাহার কাজ। তাহা ছাড়া আর যে কিছু করা যায়, তাহা তাহার মনেও আসিত না। অথচ মাছ ধরিবার মত শক্তিও তাহার নাই। রামচরণের হাসিতে-ভরা মুখ ম্লান হইয়া পড়িল। স্বামীর ম্লান মুখ ফুলির মনে মর্ম্মান্তিক ব্যথা জাগাইয়া তুলিল। সকল অনিষ্টের মূল যে সেই-ই, একথা সে যতই ভাবিত ততই তাহার মন গ্লানিতে ভরিয়া যাইত।

সংসার যখন সত্যই অচল হইল, তখন রামচরণ ফুলিকে বলিল, "আয় ফুলি, আমরা ভেক নিয়ে বোষ্টম হই, তবু দু-মুঠো ভিক্ষে মিল্‌বে।"

কথাটা বলিতে-বলিতে রামচরণের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। ফুলি তাহা দেখিল এবং সেই মুহূর্ত্তে সংসারের সকল ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইল। ফুলি বলিল, "ছি. ভিক্ষে কর্‌ব কেন? আমি মাছ বেচ্‌ব।" রামচরণ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তোর বয়সে কে মাছ বেচ্‌তে যায় রে ফুলি?

ফুলি বলিল, "হাট-বাজারে ত আর যাবো না। আমি গাঁয়ের মেয়ে, কোন্ বাড়ীতে না গিয়েছি? ভিন্ জাত হ'লেও সকলের সাথেই একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে, তা'তে গাঁয়ে মাছ বেচ্‌তে আমার লজ্জা কর্‌বে না।"

অবশেষে তাহার অক্ষমতার জন্য ফুলিকে যে পথে-পথে ঘুরিতে হইবে, ইহা রামচরণকে ব্যথিত করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা ছাড়া আর উপায় নাই, কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল।

এক বুড়ী জেলেনী দয়া করিয়া নদী হইতে ফুলির জন্য মাছ কিনিয়া আনিয়া দিত, ফুলি গাঁয়ে ফেরি করিত। কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল, স্বামী-স্ত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটিল। কিন্তু দু'চার দিন পরেই ফুলি দেখিল ডাকের সম্পর্কের কোন মূল্য ত নাই-ই বরং সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার অজুহাতে গাঁয়ের কতগুলি লোক তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। হঠাৎ ফুলির জন্য তাহাদের মনে বিষম সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। পথে-ঘাটে ফুলিকে একা পাইলেই তাহারা তাহার জন্য এমন দুঃখ ও দরদ দেখাইত যেন হাত-পা-ভাঙা স্বামীর হাতে পড়িয়া, ফুলির অপেক্ষা তাহাদের ক্ষতিটা বেশী হইয়া গিয়াছে। লজ্জায়, অপমানে ফুলি কাঁদিয়া ফেলিত। কিন্তু রামচরণের নিকটে এসকল কথা কিছুই বলিত না, বলিলে প্রতিকার যে কিছু হইবে না তাহা সে জানিত, লাভের মধ্যে স্বামীর দুঃখ কেবল বাড়ানো হইবে। সমস্ত অপমান মাথায় বহিয়া

ফুলি মাছ বেচিতে লাগিল। কিন্তু একদিন গ্রামের পুরোহিত কেনারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র খেলারাম, তাহাদের বাগানের পথে ফুলিকে একা পাইয়া খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। ফুলি এক ঝট্‌কায় তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিয়া মাছের চুবড়ীটা টান দিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া ঘরের কোণে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। ফুলিকে কাঁদিতে দেখিয়া রামচরণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। "কি হয়েছে রে ফুলি ?"

ফুলি কিছুই বলিতে পারিল না। স্বামীর আদরের স্বরে তাহার ক্রন্দনের বেগ বাড়িয়া গেল। রামচরণ, তাহার পাশে বসিয়া, অতি কোমল-স্বরে বলিল. "কি হয়েছে, বল্ না ?

তখন ফুলি তাহার অপমানের কথা রামচরণকে বলিল। রামচরণ শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। তাহার মুখে একটি কথাও বাহির হইল না। প্রতিহিংসা তখন রক্তলোলুপ হইয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছিল। খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর রামচরণ বলিল, "কাঁদিস্‌নে, ফুলি, তুই আর মাছ বেচতে যাস্‌নে।"

স্বামীর কথায় ফুলি কোন সান্ত্বনা পাইল না। মাছ তাহাকে বেচিতেই হইবে, কিন্তু এ-অপমান সে রোজরোজ সহিবে কি করিয়া ? লজ্জা, অপমান, দুঃখ ও দুর্ভাবনা তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। রূপ ও যৌবন,—যাহার জন্য তাহার এত লাঞ্ছনা, পথে-ঘাটে যাহাকে বাহির হইতে হইবে, দশজনের সাম্‌নে যাহাকে দাঁড়াইতে হইবে—ভগবান্ তাহাকে যে কেন দিয়াছেন, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তীক্ষ্ণচঞ্চু শকুনীর মত তাহার মন, প্রবল আক্রোশে দেহের রূপ ও যৌবনকে যেন টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

রাত্রে ফুলি বলিল, "কাল হ'তে শ'শের দিদির সঙ্গে বেরুব। সেও পাড়ায় ফেরি করে। দু'জনে এক পাড়ায় গেলে, বিক্রির তেমন সুবিধে হয় না, তাই যেতাম না।'

রামচরণ কেবল বলিল, "তাই যাস্।"

(৪)

ভোরে ঘরের কাজ সারিয়া ফুলি শ'শের দিদির সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তাহার একটু পরেই রামচরণ, একখানা দা হাতে করিয়া, কেনারাম চক্রবর্ত্তীর বাগানের দিকে চলিল। বাগানের মাঝ দিয়া একটা সরু পথ গিয়াছে। জায়গাটা বড় নিরিবিলি। রামচরণ সেই পথ দিয়া চলিল। খানিকটা যাইতেই সে দেখিল, খেলারাম ও তাহার বন্ধু নদের-চাঁদ দু'জনে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে। তাহাদের দেখিয়াই রামচরণ বুঝিতে পারিল তাহারা ফুলির অপেক্ষাতেই দাঁড়াইয়া আছে। ফুলি সেদিন এপথে আসে নাই, কিন্তু বন্ধুদ্বয় প্রতিমুহূর্ত্তে ফুলির আগমন আশা করিতেছিল। কিন্তু ফুলির পরিবর্ত্তে খোঁড়া রামচরণকে দেখিয়া দুইজনে একটু গা টেপাটিপি করিয়া হাসিল। তার পর খেলারাম, রামচরণকে বলিল, "কি রে খোঁড়া কোথা যাচ্ছিস্ ?"

রামচরণ তখন ঠিক খেলারামের পাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হঠাৎ সে দা দিয়া খেলারামের ঘাড়ে একটা কোপ্ বসাইয়া দিয়া বলিল "এই তোমারি কাছে।"

রামচরণের ডান হাতখানা যেমন অকর্ম্মণ্য, বাঁ হাত-খানা তেম্‌নি সবল। সুতরাং কোপ্‌টা এত গুরুতর হইল যে, খেলারামের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। নদের-চাঁদ "খুন" "খুন" বলিয়া চীৎকার করিতে-করিতে খেলারামের বাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহার চীৎকারে অনেক লোক আসিয়া জুটিল। ঘটনা দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। রামচরণ পলাইবার কোন চেষ্টা করিল না। সকলে যখন তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তখনো সে কাহারো উপরে আক্রমণের চেষ্টা করিল না। তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দেওয়া হইল। রামচরণ যেজন্য খেলারামকে খুন করিয়াছে তাহা সকলেই জানিতে পারিল। কেহ বলিল, "বেশ করেছে।" কেহ বলিল, "গাঁয়ের দশ জনকে বল্‌লেই এর বিহিত হ'ত। এখন ঝুলুক্ ফাঁসিতে!"

সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতেই ফুলির কানেও তাহা যাইয়া পৌঁছিল। সে তাহার মাছের চুব্‌ড়ি ফেলিয়া দিয়া, ছুটিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রামচরণকে

জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "এ কি করলে ?"

রামচরণের এতক্ষণ পরে যেন হুঁস্ হইল। সে উদ্ধত-স্বরে বলিল, "বেশ করেছি। আমি গরীব, অক্ষম বলে' যে-সে যে তোকে অপমান করবে তা আমি সইব না।"

ফুলি, চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, "এখন উপায় ?"

"উপায় ফাঁসি। কিন্তু তোর অপমানের ত শোধ দিয়েছি।"

যথাসময়ে পুলিশ আসিয়া রামচরণকে ধরিয়া লইয়া গেল। কয়েকদিন পরে তাহার সেশনে বিচার হইল। রামচরণ খুন স্বীকার করিল, কিন্তু তাহার ফাঁসি হইল না। তাহার উত্তেজিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল দেখিয়া জজ তিন বছরের জেল দিলেন। ফুলি কাঁদিতে-কাঁদিতে জজকে বলিল, "হুজুর আমাকেও জেলে দিন ?"

জজ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত কোন অপরাধ করনি যে, জেলে দেবো।"

পুলিশ রামচরণকে লইয়া গেল। ফুলি, কাঁদিতে-কাঁদিতে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইল।

রামচরণ জেলে গেল, জেলের খাটুনিও খাটিতে লাগিল,—আর ভাবিতে লাগিল ফুলির কথা। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সে খুন করিয়াছে, কিন্তু এখন যে সে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভাবিতে-ভাবিতে তাহার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। সে জেলের কয়েদি হইতে আরম্ভ করিয়া, ওয়ার্ডার, পাহারাওয়ালা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিত, "হ্যাঁ ভাই, আমার অপরাধের জন্য সর্‌কার ত আমাকে শাস্তি দিলেন ; কিন্তু ফুলি যে এখন একেবারে নিরাশ্রয়, তার রক্ষার জন্য ত কিছু করেননি ?"

এই পাগলের মত প্রশ্ন শুনিয়া সকলে হাসিত আর বলিত, "হ্যাঁ ফুলির জন্য এখন সেপাই-সান্ত্রী মোতায়েন হয়েছে।"

এ-উপহাস রামচরণ বুঝিত। সে মনে-মনে ভাবিত "এর চেয়ে ফুলিকে নিয়ে দেশ ছেড়ে গেলেও যে ভালো হ'ত।" নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য সে আত্মগ্লানিতে জলিত। জেলের খাটুনি তাহাকে একটুও কাতর করিতে পারিত না—কাতর করিত নিরাশ্রয় ফুলির চিন্তা।

(৫)

ফুলি কাঁদিতে-কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল। কিন্তু এখন স্বামীর চিন্তা অপেক্ষা, নিজের চিন্তাই বড় হইল। এখন সে দাঁড়ায় কোথায় ? দুঃখ যত বড়ই হউক, দু'টি ভাতের সংস্থান তাহাকে শরীর খাটাইয়া করিতেই হইবে। কাজেই ফুলি শ'শের দিদির আশ্রয়ে থাকিয়াই মাছ বে'চতে লাগিল। রাত্রেও শ'শের দিদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার কাছে আসিয়া শুইতে লাগিল।

কয়েকটা দিন এম্‌নিভাবে কাটিয়া গেল। কিন্তু যে শ'শের দিদির সে আশ্রয় লইয়াছে, সেই শ'শে লোকটা ভালো ছিল না। নিরাশ্রয় বলিয়া ফুলির উপরে এখন অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল। নদের-চাঁদ গ্রামের মধ্যে ধনীর ছেলে, চরিত্রও তাহার জঘন্য। শ'শের দিদিকে সে সহজেই হাত করিল।

একদিন শ'শের দিদি বলিল, "ফুলি, আজকে আমি আমার বোনের বাড়ী যাবো। কাল দুকুরে ফিরে' আস্‌ব।"

ফুলি, উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "আমি একা থাক্‌ব কি করে', শ'শের দিদি ?"

"আঃ সবে ত একটা রাত্তির, তা না হয় একটু সাবধানে শুয়ে থাকিস্। আর ভয়ই বা কি এত ?"

নিরুপায় হইয়া ফুলি চুপ করিয়া রহিল। সে রাত্রে শ'শের দিদি আসিল না। আত্মরক্ষার জন্য ফুলি, জালের সুতাকাটার একখানা বড় ছুরী বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিল। মনে করিল আজ আর ঘুমাইবে না। কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিছানায় পিঠ দিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

ফুলির ঘরখানা একেবারে জীর্ণ। চাটাইয়ের বেড়া উইএ খাইয়া একেবারে জির্‌জিরে করিয়া রাখিয়াছে, একটু হাত লাগিলেই খসিয়া পড়ে। সুতরাং ঘরে প্রবেশ করিতে কাহারো একটুও কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ফুলির ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার মনে হইল কেহ যেন তাহার গায়ে হাত দিতেছে। সে ধড়্‌মড়্ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং দেখিল, তাহার বিছানার কাছে একটা লোক বসিয়া আছে। ফুলি

চেঁচাইয়া উঠিতেই সে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ ছুরীখানার কথা ফুলির মনে হইল। সে কোন-রকমে ছুরী-খানা বালিশের নীচ হইতে টানিয়া লইয়া আক্রমণ-কারীর হাতে পোঁচ লাগাইয়া দিল। লোকটা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইল। ফুলির চেঁচামেচিতে দু'একজন লোক আসিল। কিন্তু কোন লোকজন দেখিতে না পাইয়া, তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে বলিয়া চলিয়া গেল। ফুলি চুপ করিয়া বিছানার উপরে বসিয়া-বসিয়া রাত্রি কাটাইল।

ভোরে ঘরের কাজ সারিয়া মাছ বেচিতে বাহির হইবে এমন সময়ে নদের-চাঁদ, গ্রামের কয়েকজন লোক ও একজন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। নদের-চাঁদ ফুলিকে দেখাইয়া বলিল, "এই!"

কনেষ্টবল্ ফুলির হাত ধরিল। ফুলি, লজ্জা ও ভয়ে থতমত খাইয়া বলিল, "কি করেছি আমি?"

কনেষ্টবল্ দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "নেকি, জানেন না কি করেছেন! এই যে নদের-চাঁদবাবুর হাত জখম করে' দিয়েছিস্।"

ফুলি বলিল, "ও রাত্রে আমাকে বে-ইজ্জত কর্‌তে এসেছিল—"

কনেষ্টবল্ ধমক্ দিয়া বলিল, "ও ত নষ্টা মেয়েমানুষের বাঁধি গৎ। গেছিলি ওঁদের কলা-বাগানে কলা চুরি কর্‌তে, ধরা পড়ে' হাত জখম করে' পালিয়েছিস্। চল এখন দিন-কয়েক ছিরি ঘরে মজা করে' আস্‌বি।"

ফুলিকে আর কথা বলিতে না দিয়া কনেষ্টবল তাহাকে হিড়্‌হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

নদের-চাঁদ অর্থবান্ সুতরাং গ্রামের গরীবদের সাধ্য কি যে তাহার বিপক্ষে কথা বলে। সাক্ষীও দু'চারটি জুটিয়া গেল। রামচরণের মত ফুলিকেও আদালতে লইয়া গেল, প্রমাণও হইল সে কলা চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছিল এবং নদের চাঁদের হাতে আঘাত করিয়া পলাইয়াছিল। ফুলির দু'মাসের জেল হইয়া গেল।

থানা, পুলিশ ও আদালত দেখিয়া, ফুলি প্রথমে ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু জেলের হুকুম শুনিয়া সে একটুও ভয় পাইল না। বরং সে মনে-মনে খুসীই হইল। জেলকে সে শাপে বর মনে করিতে লাগিল। কেননা জেলে গেলেই সে রামচরণের কাছে থাকিতে পারিবে। সে জানিত সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র একটি জেল আছে। সুতরাং স্বামীর কাছে যাইতেছে বলিয়া সে খুব উৎফুল্ল হইল। কিন্তু বেচারা জানে না যে, রামচরণ ঘানি ঘুরাইতেছে বর্দ্ধমান জেলে, আর সে যাইতেছে সাজাদপুর। জেলে যাইয়াই ফুলির ভুল ভাঙিয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আশা ও আনন্দ উড়িয়া গেল। নিরুপায় হইয়া সে সাজাদপুরের জেলে শুরকি কুটিতে লাগিল। কেবল শুরকি কোটাই যদি শাস্তি হইত তাহা হইলে চাষার মেয়ে ফুলির বিশেষ কষ্টের কথা ছিল না, কেননা এরূপ পরিশ্রম করা তাহার আজন্মের অভ্যাস। কিন্তু প্রথম দিনেই সে বুঝিতে পারিল, প্রাচীরবেষ্টিত প্রহরীরক্ষিত জেলখানা ও তাহার গ্রামের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। পাহারাওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ার্ডার পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে দেখিলে কদর্য্য রসিকতা করিত। না সহিয়া উপায় নাই বলিয়া ফুলি সমস্ত নীরবে সহিয়া যাইত।

যেখানে মেয়ে কয়েদীদের সহিত ফুলি শুরকি কুটি-তেছে, একদিন জেলার-বাবু সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই-লেন। নূতন কয়েদী ফুলির উপরে নজর পড়িতেই তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ক'মাসের মেয়াদ?"

ফুলি বলিল, "দু'মাসের।"

"কি করেছিলি?"

ফুলি তাহার দুঃখের কথা বলিতেই তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, দেশে তা হ'লে তোর আর কেউ নেই?"

"না।"

"খালাস পেলে কি করবি?"

"দেশে যাবো।"

"কার কাছে? দেশে যেয়ে আবার জেল খাট্‌বি নাকি?"

ফুলি দেখিল সত্যই তাহার আর আশ্রয় নাই। সে চুপ করিয়া রহিল।

জেলার-বাবু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যতদিন রামচরণ খালাস না পায়, আমার বাড়ীতে থাক্‌তে পারিস্। কাজকর্ম্ম এমন কিছু নয় সুখে থাক্‌বি।"

জেলার-বাবুর ইঙ্গিত বুঝিয়া ফুলি লজ্জা ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। বাবু তখনি ওয়ার্ডারকে হুকুম দিলেন, "ওকে সুর্‌কি চাল্‌তে দাও।"

সুর্‌কি কোটা অপেক্ষা এ-কাজটা সহজ। যাহাদের উপরে জেলার-বাবুর বিশেষ অনুগ্রহ তাহারাই এ-কাজ পায়। বাবু চলিয়া যাইতেই পুরানো মেয়ে-কয়েদীদের মধ্যে বেশ-হাসির ধূম পড়িয়া গেল। একজন বলিল, "ফুলি, তোর বরাতী জোর।"

আর-একজন তাহার ভ্রমসংশোধন করিয়া দিয়া বলিল, "রূপ-যৌবনের জোর।"

রূপ-যৌবন লইয়া ফুলি বিব্রত হইয়া পড়িল। এ রূপ-যৌবন সে এড়াইবে কেমন করিয়া?

বড়-বাবুর নজর পড়িয়াছে দেখিয়া, পাহারাওয়ালা ও ওয়ার্ডারের দল সাবধান হইল। ফুলির সঙ্গে রসিকতা করা তাহারা বন্ধ করিল।

তাহার পর হইতেই ফুলি দেখিল, তাহার বরাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ সে যাহা পাইত তাহা অন্য কয়েদীর মত নহে। জেলে সপ্তাহে একদিন দুধের বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তাহা কাগজে-কলমে। ফুলি কিন্তু তাহা ঠিকই পাইত এবং যেটুকু পাইত তাহা নির্জ্জলা। এ-আদর যে কেন, ফুলি তাহা বুঝিয়াছিল। এই আদরের ভাতব্যঞ্জন তাহার মুখে উঠিত না। সে ঘৃণায় শুধু দুইটি ভাত খাইত, আর সব ফেলিয়া দিত।

এম্নি করিয়া দুইটি মাস কাটিয়া গেল। যেদিন সে খালাস পাইল, সেদিন জেলার বাবু তাহাকে আদর করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কিন্তু ফুলি সেইদিনই সকলের অলক্ষ্যে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

অনেক কষ্টে সে বাড়ী ফিরিল। আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরখানি মাত্র আছে, আর কিছুই নাই। তাহারি মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, কোন মতে সে স্বামীর অপেক্ষায় দিন কাটাইবে স্থির করিল। কিন্তু দিন কাটানো তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। গ্রামের দুষ্ট লোকেরা তাহাকে এম্নি উৎপীড়ন করিতে লাগিল যেন তাহার চরিত্র বলিয়া কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, লজ্জা, মর্য্যাদা, সব যেন সে জেলের মধ্যেই ফেলিয়া আসিয়াছে। নন্দের-চাঁদ এখন তাহাকে দশজনের সাক্ষাতেই অপমান করিতে লাগিল এবং সে অপমান দশজনে যেন উপভোগ করিতে লাগিল।

ফুলির জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। সে নিরাশ্রয়, রূপ-যৌবন লইয়া তাহার বাঁচিয়া থাকা চলে না। সে স্থির করিল গলায় দড়ি দিয়া মরিবে। কিন্তু তাহার স্বামী যখন ফিরিয়া আসিবে, কে তখন তাহাকে খাওয়াইবে এই চিন্তাই তাহাকে কাতর করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, স্বামীর কি কুগ্রহ হইয়াই সে জন্মিয়াছিল। তাহারি জন্য রামচরণ এমন অক্ষম হইয়াছে—তাহারি জন্য সে তিন বছরের জন্য জেলে গিয়াছে। সব দিক্‌ দিয়া একটা প্রবল ধিক্কার তাহার মনটাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সে-দিন সে মাছ বেচিতে বাহির হইল না—সমস্ত দিন কিছু খাইলও না। সে ভাবিয়া-ভাবিয়া ঠিক করিল, মৃত্যু-ভিন্ন নিষ্কৃতির পথ নাই। প্রায় দীর্ঘ তিনটা বছর বাঁচিয়া থাকা না, তা আর হয় না।

ঘরের মধ্যে কতকগুলি জালের দড়ি পড়িয়া ছিল, তাহারি একগাছা লইয়া সে ঘরের চালে ঝুলাইয়া দিল এবং তাহার পর তাহা নিজের গলায় পরাইয়া দিয়া পৃথিবীর সমস্ত লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

পরদিন আবার পুলিশ আসিল—আবার ফুলিকে থানায় লইয়া গেল। পথে-ঘাটে ফুলির কত কুখ্যাতি রটিল, কিন্তু কি অভিমানে যে ফুলি চলিয়া গেল—কত-বড় একটা ধিক্কার যে সে পুরুষ-চরিত্রের উপরে দিয়া গেল, তাহা কেহ একবার ভাবিয়াও দেখিল না।

আমেরিকান্ মহিলা

শ্রী অমলকুমার সিদ্ধান্ত, এম্-এ

আমেরিকান্ মেয়েদের কথা, কোন বই বা অপরের কথার উপর নির্ভর না করে' নিজে যা দেখেছি, তাই লিপিবদ্ধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

স্কুল, কলেজ, সামাজিক সম্মিলনী, স্কাউটিং, বাগানের কাজ, গৃহ-মার্জ্জনা ইত্যাদি নানা ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে আমেরিকান্ মহিলার জীবনের সকল দিকই কোনও-না-কোনও ভাবে কিছু-কিছু দেখেছি ও দেখ্‌ছি। এপর্য্যন্ত যা দেখেছি তার মধ্যে 'মন্দ'র চেয়ে 'ভালো'র ভাগই বেশী; তাই 'ভালো'র দিক্‌টা একটু স্পষ্ট করে' দেখাতে চেষ্টা কর্‌ব।

ভারতে আমেরিকান্ মহিলা-সম্বন্ধে অনেক-কিছু শুন্‌তাম, এখানে এসে নিজে দেখে'-শুনে' বেশ বুঝ্‌ছি যে, দুই-একটা জিনিস দেখে' হঠাৎ সমগ্র জাতির সম্বন্ধে একটা সাধারণ মত প্রকাশ করে' বস্‌তে জগতের সকলেই সমভাবে পটু। যেমন ভারত-ফেরৎা একশ্রেণীর লোক এদেশে বা বিলাতে ভারতের 'মন্দ' দিক্‌টা সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে বেশ পটু তেম্‌নি আমেরিকা-ফেরৎা (বিশেষতঃ বৃহৎ সহর-ফেরৎা) এক শ্রেণীর লোক ভারতে ফিরে' আমেরিকার ' দক্ ছাড়া আর কিছু নিয়ে যেতে সম্পূর্ণ অক্ষম। উভয় ক্ষেত্রেই কতটা যে অন্যায় করা হচ্ছে তা সব সময় আমরা বুঝিনে।

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার তুলনা করা একেবারেই সহজ নয়। ইতিহাসের দিক্ থেকে কেবল নয়, সব দিক্ থেকেই এই দুই জাতির মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যায়। অবশ্য অনেক দিক্ থেকে সমতাও দেখা যায়। এক-কথায় বল্‌তে গেলে এদেশের মেয়েরা মুক্ত বায়ু ও আবহাওয়ায় থেকে, নানা দিক্ থেকে সুবিধা পেয়ে ও তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে' বেশ একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করেছে। প্রতিভা ও মনীষার ক্ষেত্রে, সামাজিক মিলন-ভূমিতে, এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক জগতেও মহিলাদের প্রভাব বেশ দেখা যায়। কলেজে, তর্ক-সভায়, শিল্প-সমিতিতে, পাঠাগারে সর্ব্বত্রই মহিলাদের প্রভাব দেখেছি। দোকানে জিনিস বিক্রয় করার ক্ষেত্রে, সংবাদপত্রের খবর-সংগ্রহ ও চালনা-ব্যাপারে, পর্য্যটকের কার্য্যে এবং মনস্তত্ত্ববিদের ভূমিকায় মহিলাদের সংখ্যা অগণ্য; এইসব কার্য্য-ক্ষেত্রগুলি ইহাদের দ্বারাই পূর্ণ। একদিন এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনারা জিনিস বিক্রি কর্‌তে মেয়েদের রাখেন কেন?' উত্তরে তিনি বল্‌লেন, "মেয়েরা সহজে ও শীঘ্র জিনিষ বিক্রি কর্‌তে পারে -তা ছাড়া ব্যাবসায়িক সহজ বুদ্ধি আমাদের মেয়েদের খুব বেশী। নিজেদের কাজটা ছেলেদের চেয়ে বেশী সাবধানে ও পরিষ্কারভাবে এরা কর্‌তে পারে।" এই উত্তর শোন্‌বার পর নিজে দেখেছি সহরের বড়-বড় দোকানে মেয়েরা তাদের নিজেদের পণ্য-বীথি কেমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে; অবশ্য 'পোষাক'-বিভাগেই এই মেয়েরা বেশী দক্ষ। ক্লেভ্‌ল্যাণ্ড্ (Cleveland) সহরে নয় লক্ষ লোকের বাস। সেখানে মেয়েদের একটা ব্যাঙ্ক্ আছে—সবই সেখানে মেয়েরা চালায়। অন্যান্য সহরেও আছে শুনেছি তবে দেখিনি। অবশ্য সেখানে সব মেয়েরাই যে মেয়েদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তা নয়। এখানে বলে' রাখা ভালো যে, এদেশে মেয়েদের কাজ করার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি কখনও শুনিনি। ভাবপ্রবণতা ও রমণীরঞ্জনের পাশ্চাত্য কেতা এখানে আমাদের কলেজ-মহলের মেয়েদের কাছে খাটে না। একদিন আমাদের খাবার ঘরের নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তনের সময় একজন যুবক প্রস্তাব করেন যে, মেয়েদের যেন টেবিলে পরিবেষণ ইত্যাদি কর্‌তে না হয়। আমরা খরচ কমাবার জন্য পালা করে' খান্‌সামার কাজ করি—কোন চাকরের ধার ধারিনে। কাজেই এ-সব ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তিনটি মহিলা আমাদের

সঙ্গে খেতেন, তাঁরা মেয়েদের প্রতি করুণাব্যঞ্জক ব্যবস্থার সুবিধাটুকু নিতে রাজি হননি। পালা করে' ছেলে ও মেয়ে সকলেই কাজ কর্‌বে এই এদেশের মেয়েদের ইচ্ছা। মেয়েরা সবল ও প্রফুল্ল, তাই ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ কর্‌তে পারেন। আমাদের দেশে ও বিলাতে যাদের "গার্ল্ গাইড্‌স্" (Girl Guides) বলা হয়, এ-দেশে তাদের নাম ক্যাম্প্ ফায়ার গার্ল্। বয়-স্কাউট্‌স্‌দের যা প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম তা প্রায় সবই মেয়েদেরও কর্‌তে হয়; অবশ্য কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ছুটির দিন দলে-দলে এই মেয়ে স্কাউটের (Scout) দল ও অন্যান্য সকলে চড়াইভাতি কর্‌তে যায়। মেয়েদের দলে সাধারণত কেবল মেয়েরাই যায়।

ছাত্র-জীবন

এদেশের শিক্ষা-বিভাগ মেয়েদের খুব যত্ন নেয়। পাব্‌লিক স্কুলে (সাধারণের বিদ্যালয়ে) সব শ্রেণীতেই (প্রাথমিক, গ্রামার ও উচ্চশ্রেণীর স্কুলে) শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। স্কুলে ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ একসঙ্গে পড়ে, তবে মেয়েদের জন্য আলাদা ক্লাসও আছে, সেখানে সাংসারিক অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়। যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা এক-সঙ্গে পড়ে, সেখানে সর্ব্বত্রই ব্যায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা ও শিক্ষা মেয়েদের একেবারে আলাদা। মেয়েদের উপযোগী নানা-প্রকার খেলার জন্য প্রত্যেক স্কুলেই তাদের ব্যায়ামাগার (Gymnasium) আলাদা আছে,অবশ্য টেনিস্ ইত্যাদি খেলা তা'রা ছেলেদের সঙ্গে খেলে।

আমেরিকায় প্রায় ২৭২০০০ পাব্‌লিক স্কুল—৫ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েরা এ-সব স্কুলে বিনা খরচে পড়্‌তে পারে। এমন-কি বই পর্য্যন্ত কিন্‌তে হয় না। শিক্ষা-ট্যাক্সে সব খরচ চলে' যায়। ছাত্রীদের কেবল পেন্‌সিল ও খাতা কিন্‌তে হয়। বাণিজ্য-ব্যবসায়-শিক্ষার বিদ্যালয়ে নানা-প্রকার যন্ত্রপাতি দর্‌কার হয়। ছাত্রদের পয়সা দিয়ে তাও কিন্‌তে হয় না। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স আন্দাজ ৫ থেকে ৯।১০ বছর পর্য্যন্ত। গ্রামার স্কুলে ১০ থেকে ১২।১৩ বছর বয়সের ছাত্র আছে। আমাদের হাই স্কুলে যা শেখান হয়, এখানে অনেকটা তাই হয়। হাই স্কুল-বিভাগে তিন বা চার বছর পড়্‌তে হয়, এখানে সাহিত্যিক, ব্যাবসায়িক দুইটি বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয়। সাহিত্যিক শ্রেণীতে ইংরেজি সাহিত্য, লাটিন বা গ্রীক্, ফরাসী বা জার্ম্মান্ ভাষা ইতিহাস, গণিত, রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা এবং ভূগোল ইত্যাদি শেখানো হয়। ব্যাবসায়িক বিভাগে শর্ট-হ্যাণ্ড, টাইপ্-রাইটিং, হিসাব-রক্ষণ ইত্যাদি নানা বিষয় শেখানো হয়। অবশ্য যাহার যা ইচ্ছা এদেশে সে তাই শিখ্‌তে পায়। গ্রামার স্কুলেও শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। মনে রাখা দর্‌কার সবই বিনা পয়সায়। প্রত্যেক পাব্‌লিক হাই স্কুলে যেমন মানসিক ও শারীরিক দিকের বিকাশের প্রতি মন দেওয়া হয় তেম্‌নি সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির বিকাশের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এপর্য্যন্ত যদিও মাত্র ২।৩টি পাব্‌লিক স্কুল আমি দেখেছি, তবে তার প্রত্যেকটিতেই একটি করে' গায়ক ও বাদক-দল আছে দেখেছি। সবই ছেলে-মেয়েরা চালায়। ১০।১২-রকমের বাজ্‌না ব্যবহার করে, একটি স্কুলে ১৬-রকমের যন্ত্র ব্যবহার কর্‌তে দেখেছি। এরা সকলে সঙ্গীত শ্রেণীর ছাত্র। অনেকে স্কুলের বাইরে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে বা কলেজে সময় মতন সঙ্গীতের পাঠ নেয়। প্রত্যেক স্কুলে একটি বড় হল্ থাকা চাই; সেখানে প্রতিসপ্তাহে কোন-না-কোন সভা-সমিতি হবেই। হলের দেওয়ালে নানা-প্রকারের চিত্র দেখা যায়, তার ভিতর অনেকগুলি ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতারা যা উপহার দিয়েছেন, কতকগুলি স্থানীয় শিল্প-সমিতি উপহারস্বরূপ স্কুলকে দিয়েছেন বাকিগুলি স্কুলের টাকায় কেনা হয়েছে। সম্প্রতি মাসাচুসেটস্-প্রদেশের একটি গ্রাম্য মেয়েদের স্কুলে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখ্‌লাম যে, মেয়েরা স্কুল-কামরাটা নিজেদের আঁকা পেন্‌সিল-চিত্রও জল-রংএর ছবিতে পূর্ণ করে' রেখেছে। এপর্য্যন্ত বড় সহরে বা ছোট-খাট সহরে কোন পাব্‌লিক স্কুলের মেয়েদের ক্লাস নেই, তবে একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে মধ্যে-মধ্যে পড়াতে গিয়ে হাই স্কুলের দু-চারজন মেয়ের সংস্পর্শে মধ্যে-মধ্যে আসি। প্রথম দিন যেদিন একটি ছোট-খাট সহরে মেয়েদের

একটি ক্লাস নিই, একটি তের-চৌদ্দ বছরের হাই স্কুলের মেয়ে আমাকে ভারত-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করে। অবশ্য আমি ভারতের সম্বন্ধে কিছু-কিছু তাদের বল্‌ছিলাম। সেদিন যে-যে প্রশ্ন পেয়েছিলাম, নোট বই থেকে তার ২।১টা তুলে' দিচ্ছি।

১। ভারতে স্কুল-কলেজ থাকা সত্ত্বেও আপনারা এদেশে এসে আবার স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হন কেন ?

২। ভারতের জাতি-ভেদ-প্রথার ভালো-মন্দ দিক্-গুলি কি ?

৩। ভারতে সাপ ও বাঘ কি খুবই পাওয়া যায় ? এত লোক সাপের কামড়ে মরে কেন ? ইত্যাদি।

৪। ভারতের মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

অবশ্য এ হ'ল বুদ্ধিমতী মেয়েদের প্রশ্ন। বোকা-রকমের প্রশ্নও পেয়েছি। একবার নিউ-ইয়র্কের একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতে কি কোন বিশ্ববিদ্যালয় আছে ? মেয়েটি বোধ হয় শ্রমিক মেয়ে। বয়স তেইশ-চব্বিশ হওয়া সম্ভব। অবশ্য এরকম প্রশ্ন কর্‌বার কারণটা তিনি বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, "আমি ভারত-সম্বন্ধে কিছুই জানিনে, কেননা গ্রামার স্কুল পর্য্যন্ত আমার বিদ্যা —তা'ছাড়া উপন্যাস ও কিছু সাহিত্য ছাড়া বড় কিছুর সঙ্গে আমার যোগ আর নেই। তবে আপনারা এদেশে আসেন দেখে' দুই-একবার মনে হয়েছিল আপনাদের দেশে হয় একেবারেই কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই, নয় ভালো বিশ্ব-বিদ্যালয় নেই।" এই শ্রমিক-ধরণের মহিলাটি কিন্তু নিজের দেশ-সম্বন্ধে বেশ খোঁজ রাখেন। এই যুক্ত-রাজ্যের ইতিহাস ও ভূগোল প্রত্যেক ছাত্র বেশ ভালো করে' জানে। মহিলাটি বেশ সরলভাবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার কর্‌লেন এবং আরও ২।৪টি প্রশ্ন কর্‌লেন ; তবে খুব বেশী নয়।

শিকাগোতে গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ের সময় ওল্ড্ ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট্ ডিপার্টমেণ্টের একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আত্ম-নির্ভরশীল ছাত্রী। সময়-মত আপিসে টাইপিষ্টের কাজ করেন। আপিসের কর্ত্তা তখন না থাকাতে কয়েক মিনিট মহিলাটির সঙ্গে কথা বলি। আস্‌ছে বছর তিনি এম্-এ পরীক্ষার জন্য একটি গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন। পরে পাব্‌লিক স্কুলে কাজ কর্‌বেন। এবং টাকা জমিয়ে ইউরোপ ও এসিয়া ভ্রমণে যাবেন বল্‌লেন। তিনি ভারত অপেক্ষা ব্রহ্মদেশ-সম্বন্ধে বেশী কৌতূহল দেখালেন। কেননা রেঙ্গুনে তাঁর কয়েকটি আমেরিকান্ বন্ধু আছেন। শিকাগো-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা প্রায় আধা আধি, অন্ততঃ গ্রীষ্মকালে ত নিশ্চয়। সবচেয়ে বেশী মেয়ে মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা-শ্রেণীগুলিতে। আমাদের তুলনা-মূলক মনস্তত্ত্বের ক্লাসে মোট ৮টি মেয়ে ও ৮টি ছেলে (গ্রীষ্ম-পর্ব্বে)। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী তৈরি হ'য়ে ক্লাসে আসেন ; তবে এক্‌সপেরিমেণ্ট্ ইত্যাদিতে মেয়েরা সব-সময়ে ছেলেদের চেয়ে বেশী দক্ষ নন। বোধ হয় ব্যাঙ্, ইঁদুর ইত্যাদি জীব তাঁরা তেমন পছন্দ করেন না। গ্রীষ্ম-পর্ব্বটা কি একটু বলে' রাখা দর্‌কার। এদেশে মেয়েদের জন্যই কেবল অনেকগুলি প্রসিদ্ধ কলেজ আছে। তবে প্রধান-প্রধান বে-সর্‌কারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মেয়েরা খুবই আসেন। এবং সকলের সুবিধার জন্য যখন অন্য সব কলেজ বন্ধ হয়, সেই গ্রীষ্মকালে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রীষ্ম-পর্ব্বে হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ে ছাত্র পায়। এদেশে সব নির্ব্বাচন-প্রণালীতে হয়। এক-বছরের কাজ পৃথক্ তিনটি গ্রীষ্মে শেষ করা যায়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্ম-পর্ব্বে এবছর প্রায় তিন হাজার ছাত্র ও ছাত্রী এসেছেন ; প্রায় ৩৫০ জন অধ্যাপক নানা বিভাগে নানা-রকমের পাঠ নিচ্ছেন। মনে রাখা দর্‌কার অ-প্রধান বিষয়গুলি ছয় সপ্তাহে এবং প্রধানগুলি তিন মাসে শেষ করা হয়। প্রত্যেক পর্ব্বের শেষে লিখিত পরীক্ষা ও একটি প্রবন্ধ (সাধারণতঃ ৩০০০ কথা কি কিছু বেশী) প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পেশ কর্‌তে হয়।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আজকাল আমেরিকায় প্রথম শ্রেণীর দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি। এই গ্রীষ্মে "আধুনিক সহর" বিষয়ে সমাজ-তত্ত্বের ছাত্রদের একটি পাঠ খুবই চমৎকার। আমি মাত্র দর্শকরূপে ক্লাসের সঙ্গে সহরের নানা স্থান দেখেছি, খুবই কাজের-লোকের উপযোগী পাঠ। অধ্যাপকটি সহরের ইমপ্রুভ্‌মেণ্ট্ ট্রাষ্টের সভ্য। ও-ক্লাসে অর্দ্ধেকের বেশী মেয়ে। মনস্তত্ত্ব-

বিভাগে "উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ও কলেজে ব্যক্তিগত প্রণালী"-বিষয়ে একটি চমৎকার পাঠ দেওয়া হচ্ছে; এক্ষেত্রেও অর্দ্ধেকের বেশী মেয়ে। তা ছাড়া নানা বিভাগে নানা ভাবের পাঠ দেওয়া হচ্ছে, এখানে প্রত্যেক পর্ব্বে সংস্কৃতে "শকুন্তলা" ও অন্যান্য বই পড়ানো হয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম-সম্বন্ধে চমৎকার পাঠ দেওয়া হয়। এই "মুসলমান ধর্ম্মের" ক্লাসে আমরা চার জন মাত্র আছি। একটি সুশিক্ষিত পাদ্রী, একটি কাবুলী ছাত্র, একটি শিক্ষা বিভাগের মহিলা এবং আমি। নিরপেক্ষভাবে মুসলমান ধর্ম্ম পড়ানো হচ্ছে। ডক্টর্ স্পেলংলিঙ এই মোস্‌লেম ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পাঠ নেন। তিনি একজন বিখ্যাত আরবী পণ্ডিত। তিনি প্রাচ্য দেশে ১৫ বছর কাটিয়েছেন শিক্ষার জন্য। একদিন আমাদের জানা একটি মহিলা একজায়গায় একটি বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, সহরতলিতে থাকেন বলে' তিনি একটু দেরি করে' সেখানে পৌঁছবেন, তাছাড়া তাঁর একটা গরু আছে—তিনি নিজে গরুর দুধ দোওয়ান, সেজন্যও দেরী হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের 'পিএইচ্. ডি'দের মধ্যে ক'জন নিজে কৃষিকার্য্য করেন জানিনে; এখানে অনেকে করেন। সংস্কৃত বিভাগের ডক্টর্ ক্লার্ক্ ও তাঁর স্ত্রী ভারতে এক-বছর কাটিয়ে এসেছেন সেদিন। স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। স্ত্রী সহরের জনহিত-কার্য্য নিয়ে ব্যস্ত। ক্লার্ক-পত্নী বলেন যে, আমরা ভারতে কিছু শিখতে গিয়েছিলাম; সেজন্যে কিছু নিয়ে আস্‌তে হয়ত পেরেছি, কিন্তু হিন্দু ছাত্র বা কেহ-কেহ এদেশের (আমেরিকার) ভালো দিক্‌টা নিতে চেষ্টা করেন না—হয়ত তাঁরা সুবিধা পান না; কিন্তু এ-বিষয়ে অবিলম্বে একটা-কিছু করা দর্‌কার। মিসেস্ ক্লার্কের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি একেবারে একমত, কেননা গত এক বছরে যা দেখেছি তা'তে মনে হয় এদেশে অনেক কিছু শেখ্‌বার আছে। ভারত যেমন কেবল সাপ ও বাঘে পূর্ণ নয়, তেম্‌নি এদেশেও সকলে "লিঞ্চিং" নিয়ে বা K. K. K. নিয়ে ব্যস্ত নয়। এদেশে ১১ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ছয় কোটি K. K. Kএর শত্রু এবং বাকী ৫ কোটির মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরা ইহার বিপক্ষে। তবে K. K. K. এদেশের অনেক 'ভালোও' করেছে স্বীকার করতে হবে। লিঞ্চিং কেবল দক্ষিণে হয়, সেখানে নিগ্রোর সংখ্যা খুবই বেশী। তবে গত বছর মাত্র ২৬।২৭টি ঘটনা হয়েছিল—১২০ লক্ষ নিগ্রো ও ১০ কোটি সাদা চাম্‌ড়ার মধ্যে। একজন মহিলা আমাকে বল্‌লেন, "কোন প্রকৃত আমেরিকান্ লিঞ্চিংকে ঘৃণা না করে' পারেন না; তবে দেখুন, আমরা চেষ্টা কর্‌ছি খুব। ইংলণ্ডে ১২০ লক্ষ নিগ্রো থাক্‌লে বা ভারতে ৩৫ কোটি নিগ্রো থাক্‌লে কি অবস্থা দাঁড়া'ত বলা যায় না। এদেশে সাদা-কালোর মধ্যে যে ভাব, আপনাদের দেশে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে তেম্‌ন অনেকটা—নয় কি?" মহিলাটি ভারতে তিন বছর ছিলেন।

আবেদন

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

(ওকাকুরা হইতে)

যখন জাগেনি উষা আমি সেই ক্ষণে
অন্তরের আবেদন আনি তার দ্বারে,
চন্দ্র-আঁকা শৈল-চূড়ে গুহার আঁধারে
যেথা অজানার বাস নিঃশব্দ ভুবনে।

আমার অন্তর ভাসে স্তব্ধ সরসীর
বাষ্প-কুয়াশায়, যেথা অরণ্যের তীরে
শৈবালে চাঁদের আলো স্বপ্নে দেয় ঘিরে',
চকিত ছায়ায় কাঁপে আবেগ নিশির!

বনের হরিণ আমি সবল স্বাধীন,
মানব-পরশ-ভীরু, দূরতা-প্রয়াসী;
শুধু তুমি ওগো মোর কল্প-লোক-বাসী,
আনন্দে করিলে মোরে চির-ভয়-হীন!

কমলা, কমল-আঁখি তোমার কিরণে
অপূর্ব্ব পুলকে পূর্ণ সর্ব্ব বনস্থল,
মাণিক্য-কণ্ঠের সুরে উল্লাসে চঞ্চল,
দূরতার ব্যবধান নাহিক স্মরণে!

(১) কাশ্মীরের পণ্ডিতানী

(২) কাশ্মীরের মাঝিয়ান্

চিত্রকর শ্রী সারদাচরণ উকিল

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিশুদিগের একটা প্রধান গুণ এই,—তাহারা পরস্পরের মধ্যে যত শীঘ্র বিচ্ছেদ ঘটায়, আবার তত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতাও করে। সে-ঘনিষ্ঠতায় একে অন্যের অপরাধের প্রতি অন্ধ হইয়া তাহার দুঃখের অংশটাই এমন সহজ ও সরলভাবে অতি শীঘ্র গ্রহণ করিয়া বসে যে, তাহাদের সরলতায় কিছু-মাত্র সন্দেহ করিবার থাকে না। বলাই, শান্তি এবং কানাইলাল তিন জন একত্রে অঙ্গনের একপার্শ্বে খেলাঘরে বসিয়া পুতুল লইয়া খেলিতেছিল। বলাই ও শান্তির পুত্র-কন্যার বিবাহে কানাইলালের বিধি-ব্যবস্থার সহিত যখন তাহাদের মতের ঐক্য হইল না, তখন সে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিল। এবং এই সঙ্গী-বিরহের বেদনা ঝট্‌পট্ মনের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিতে সে যখন হাতের কাছে কোন কাজই পাইল না, তখন দর-দালানে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে সুখেন্দুর জামার পকেট হইতে ঘড়িটা টানিয়া বাহির করিল এবং একটা বড় নিগ্রহ ঘাড়ে লইবার জন্য তাহার পঞ্চত্বও ঘটাইল।

কানাইলালের পৃষ্ঠে সুখেন্দু—রক্তের নদী বহাইয়া দিলে তাহার করুণ চীৎকারের শব্দে বলাই ও শান্তি খেলা ফেলিয়া তথায় ছুটিয়া আসিল। দুই ভাই-বোনে ভয়ে জড়সড় হইয়া বিস্মিত-নেত্রে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তার পর মহেশ্বরী আসিয়া যখন কানাইলালকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহার কান ধরিয়া উঠানের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখনও তাহারা পুতুলের মত নিশ্চলভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজল চক্ষু চারিটা কানাই-লালের পিঠ জোড়া ক্ষতটার উপর ন্যস্ত করিয়া সমবেদনা জানাইতেছিল। কানাইলালের আর্ত্তনাদে তাহাদের শিশু-হৃদয়ের স্নেহ-তন্ত্রীগুলি একই সুরে কাঁপিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। মহেশ্বরী কানাইকে সঙ্গে লইয়া বিছানায় যাইয়া শয়ন করিলে তাহার শিশু সাথী দুটিও ধীরে-ধীরে ম্লানমুখে সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া বসিল। এবং পলক-হীন হইয়া কানাইলালের দিকে তাকাইয়া রহিল। উদ্বেগ ও কৌতূহল, বিস্ময় ও করুণা তাহাদের ছোট হৃদয়গুলির ভিতর এমন ভিড় করিয়া তুলিয়াছিল যে, কথায় তাহার কোনোটাকেই তাহারা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না।

ভাত খাইবার জন্য রান্নাঘর হইতে শৈলবালা কয়েক-বার বলাই ও শান্তিকে ডাকাডাকি করিলেন, তাহারা উঠিল না। কানাইকে ফেলিয়া তাহারা যায় কি করিয়া? ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত, তাহারা অনায়াসে আহারের কথা ভুলিল, চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। শেষে শৈলবালা এক সময় তাহাদের হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া গেলেন। না খাওয়াইয়া ত আর ছেলেদের ফেলিয়া রাখা যায় না? কিন্তু মা টানিয়া আনিলে না খাইয়া উপায় নাই, তাই খাইতে হইল। কিন্তু কোন-মতে নাকে-মুখে চারিটি গুঁজিয়া আবার তাহারা সেইখানে আসিয়া বসিল। কিসের পর কি যে খাইল আজ তাহা তাহাদের চোখেই পড়িল না। তার পর মহেশ্বরী যখন স্নান করিতে গেলেন, তখন সেই অবসরে তাহারা গৃহে ঢুকিল। কানাইলালের সঙ্গে দু'টা কথা বলিবার জন্য বন্ধুদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এতক্ষণে বাক্‌-শক্তিও তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছিল। বলাই ডাকিল, "কানাই-দা, ঘুমিয়েছ?" তাহার কথার স্বরে মমতা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কানাইলালের পৃষ্ঠে ক্ষত। সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। বলাইএর ডাকে সে থুঁতিটি বালিশের উপর ভর করিয়া মাথা উঁচু করিল। ডাগর চোখে বলাইএর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "বিছানার উপর বস্‌বি?—আয়।"

মুহূর্ত্তে বলাই ও শান্তি বিছানার উপর উঠিয়া কানাই-লালের পৃষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কানাই ডাকিয়াছে আর কি দূরে থাকা যায়? কাপড়ের পটিটা রক্তে ভিজিয়া

গিয়াছিল, বলাই দরদের সহিত বলিল. "দেখেছ দিদি, কি কাটাই কেটেছে !"

দিদির মত সস্নেহ-স্বরে শান্তি কহিল, "বড্ড কি জল্‌ছে ভাই,—বাতাস করব ?"

বালিশে মুখ গুঁজিয়া কানাই বলিল, "খুবই জল্‌ছিল, বড়-মা বাতাস কর্‌তে-কর্‌তে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।" শান্তির আদরে তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। মুখে ঢাকা দিয়া সে সঙ্গীদের দৃষ্টি এড়াইতেছিল।

বলাই কহিল, "আচ্ছা ? তুমি ঘড়িটা ভাঙতে গেলে কেন ?"

কানাইলালের সদ্যপীড়িত মনে আবার ব্যথা লাগিবার ভয়ে শান্তি তাড়াতাড়ি বলাইকে ধমক দিয়া কহিল, "যাঃ ! নিজের জ্বালায় বাঁচ্‌ছে না, এখন তোকে তাই শোনাতে বস্‌বে ?"

তবু বলাই বলিল, "তোমার মোটে বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। আমাদের খেলার ঘরে নিয়ে গিয়ে যদি ভাঙ্‌তে, তা হ'লে কি আর বাবা দেখ্‌তে পেত ?" এমন উপদেশটা দিদির ধমকেও সে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারিল না। এবার শান্তির গাম্ভীর্য্যও টুটিয়া গেল। কথায় মাতিয়া সে নিজেই বলিল, "ঘড়ির মধ্যে শব্দটা কে করে, তাই দেখ্‌বার জন্যে বোধ হয় ভেঙেছিলে—না কানাই ?"

কানাই বিমর্ষমুখে কহিল, "হুঁ।"

কানাই তাহার নিজের অপরাধটা তখন একটু-একটু বুঝিতেছিল। বিজ্ঞভাবে শান্তি বুঝাইয়া কহিল, "ও আর কিছু না, ঘড়ির মধ্যে যে চাকা ঘোরে, তারই দাঁতে-দাঁতে আর-একটা ডাণ্টা লেগে অমন্‌ শব্দ হয়।" এ-ব্যাপারের বিচার-বিভ্রাটটা বলাইকে তখনও ভাবাইতেছিল। সে তাই কহিল, "বড় মারও কিন্তু বড় দোষ ! বাবা এই মার্‌লে, তার পর বড় মা আবার কান ধরে' সমস্ত উঠানটায় টানাটানি কর্‌তে লাগল। দু-জনে মিলে' কেন মার্‌বে ? একটা ত মোটে দোষ করেছে।"

কানাইলালের চোখের কোণে জল আসিয়া জমিতে লাগিল। এততেও তাহার মায়ের নিন্দা সহিল না। সে কহিল, "বড়-মা বুঝি সেইজন্যে মেরেছে ?"

রাগিয়া বলাই উঁচু গলায় কহিল, "না—সেইজন্যে না কি জন্যে ?"

কানাই কহিল, "ও বড়-বাবুর উপর রাগ করে'।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য সে আবার কহিল, "নইলে পটি বেঁধে দেয়—বসে'-বসে' বাতাস করে ?"

মহেশ্বরী বাহিরে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু-দু'টিও সজল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হারামজাদা ! সেজন্যে মেরেছি না, কি জন্যে মেরেছি ? তুই আমার ছেলের ঘড়িটা ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো কর্‌লি—আর রাগ কর্‌তে গেলাম বড়-বাবুর ওপরে ?"

শিশুদের সমস্ত বিচার-বিতর্ক থামিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মহেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বস্ত্র ত্যাগ করিতে-করিতে আপন-মনে বলিতে লাগিলেন, "নইলে পটি বেঁধে দেয়— বাতাস করে ?—নইলে যে মরে' যেতিস্‌, গায়ে কি আর রক্ত আছে ? আমার পাপের ভোগ ছিল নইলে শেষকালে এমন বন্ধনে লোকে পড়ে ?"

মহেশ্বরী বকিতে-বকিতে রান্না-ঘরে চলিয়া গেলেন। গৃহের মধ্যে তখন আবার তাহাদের কথা-বার্ত্তা জমিয়া উঠিল।

বলাই বলিল, "দিদি ? দেখ্‌লে বড় মায়ের কাণ্ডটা ? এখনও পর্য্যন্ত গালি-মন্দ কর্‌ছে, বড়-মা ভাই বড় নিষ্ঠুর।"

কানাই পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া বিছানা ভিজিতে লাগিল।

কানাইলালের মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "ক্ষিধে পেয়েছে ? কিছু খেতে দেন্‌নি বোধ হয় ?" কথার গতিটা অন্য পথে ফিরাইয়া দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল।

কানাইলালের ক্ষুধার উদ্রেক খুবই হইয়াছিল। সে তাহাদের দিকে ফিরিয়া শুইল। কহিল, "বড়-বাবুর সঙ্গে বল্‌ছিল. আজ আর কিছুই খেতে দেবে না, ক্ষিধে যা লেগেছে—।"

শান্তি বলাইকে কহিল, "বলা ! তুই এক কাজ কর্‌।

আমাদের ঘরে সর্‌দেওয়ালের উপর হাঁড়িতে সন্দেশ আছে, খাটের উপর দাঁড়িয়ে গোটা-চারেক পেড়ে নিয়ে আয়; আমি চুপি-চুপি গিয়ে রান্না-ঘর থেকে চিঁড়ে নিয়ে আসি।"

দুই ভাই-বোনে সাবধানে খাদ্য-দুইটি আনিয়া কানাইলালকে খাওয়াইল। মহেশ্বরী কানাইকে ছোট একটি টিনের বাক্স দিয়াছিলেন। সে তাহার মধ্যে কাপড়-চোপড় হইতে বই, শ্লেট, সন্দেশ, খেজুর, খেলনা সবই রাখিত। কোমর হইতে সে চাবিকাঠিটা খুলিয়া বলাইকে দিল। বলিল, "বাক্সটা খোল।"

বলাই বাক্স খুলিলে কানাই কহিল, "লাটিমটা বের কর্।"

বলাই বাহির করিল।

"হনুমানটা আর-একটা বড় দাঁড়ানো পুতুল আছে। সে-দু'টোও বের কর্।"

বলাই বাহির করিল। কানাই কহিল, "লাটিমটা তুই নে, আর পুতুল-দু'টো দিদিকে দে।"

বলাই বলিল, "আমার লাটিম আছে যে!"

কানাই কহিল, "নে না—যা' বলি তাই কর্। লাটিম আছে—তা'র কাঁটাটা কি আও রেখেছিস্? সে যে ভেঙে গেছে।"

বলাই পুতুল-দু'টি তাহার দিদিকে দিতে গেল।

সে হাজার হইলেও দিদি। সহজে ছোট হয় কি করিয়া? কহিল, "কেন কানাই, তুমি এ-সব আমাদের দিচ্ছ? আমার ত পুতুল রয়েছে। তুমি সেরে উঠ্‌লে ত খেল্‌তে হবে?"

কানাই কহিল, "তুমিও দেখি কম বোকা নও। দু'চারটা পুতুলে কি যে-যার কাজ হয়? নিয়ে যাও।"

শান্তি বলিল, "তুমি কি দিয়ে খেল্‌বে?"

কানাই বলিল, "সে তখন হবে। আমার ত খেলার জন্য বড় ভাবনা পড়ে' গেছে? নাও—বড়-মা এল ব'লে'।"

মহেশ্বরী কানাইলালের জন্য রুটি-তরকারী লইয়া ঘরে আসিতে শান্তি ও কানাই তাহাদের লভ্য সামগ্রী কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কানাইলালের জ্ঞান-বুদ্ধি যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই সে বলাই ও শান্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই পরিবার হইতে সকল অধিকারটুকু সমানভাবে ভোগ করিতে চাহিত। সে নিজেকে বাহিরের মানুষ বলিয়া বুঝিত না, তাই ভিন্ন ব্যবহারে ব্যথা পাইত। কিন্তু লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিবার জন্য তাহার জন্মের গোড়ায় যে একটা প্রতিকূল শক্তি চাপিয়া বসিয়াছিল, সে-ই এই বালকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সকলের ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দিত। কেবলমাত্র মহেশ্বরীর প্রগাঢ় অনুরাগই দুঃখের মধ্যে সুখ-স্বপ্ন আনিয়া তাহাকে শান্ত রাখিতেছিল। তথাপি বালকের অজ্ঞতা ও দুর্ব্যবহারের ফলে এমন এক-একটা ক্ষণ আসিত, যে-সময়ে বালকের সপক্ষে বলিবার সুযুক্তির রিক্ততায় মহেশ্বরীকেও অত্যন্ত চঞ্চল ও বিব্রত করিয়া তুলিত।

একদিন শিলাবৃষ্টি হইতেছিল। কানাই, বলাই ও শান্তি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা এক-একবার দৌড়াইয়া গিয়া রকের উপর শিল সংগ্রহ করিতেছিল এবং আবার দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। একবার একটা বৃহৎ শিল পড়িল। তিন জনেরই সেটা পাইবার ইচ্ছা; তবু শান্তি ভিতরেই রহিল, কিন্তু কানাই ও বলাই দুইজনেই তাহার দিকে ছুটিয়া, বলাই যখন শিলটি সংগ্রহ করিল, তখন কানাই এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে উঠানে ফেলিয়া দিল। বলাই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছেলের কান্না মায়ের কানে পৌঁছিতে দেরি হইল না। শৈলবালা তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইয়া জলে ভিজিতে-ভিজিতেই তাহাকে তুলিয়া আনিলেন। আঁচল দিয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় লেগেছে?"

বলাই কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, "ওমা, আমি গেছি—আমার হাতখানা ভেঙে গেছে।"

শৈলবালা দেখিলেন, সত্যই তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জার সন্ধিস্থানটা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে। তিনি আহত স্থানে তৈল মালিশ করিয়া দিতে লাগিলেন এবং

বাহির বাড়ীতে সুখেন্দুর নিকট খবর পাঠাইলেন। রাগে দুঃখে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিতেছিল।

কানাইলাল অত্যন্ত অপ্রস্তত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং কেহ বলিবার পূর্ব্বে চোরের মত একপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যখন দেখিল, সুখেন্দুর নিকট খবর গেল, তখন তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। না জানি বলাইএর কতগুণ শাস্তিই আজ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সে একটুও নড়িল না। সেইখানে ম্লানমুখে একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

খবর পাইয়া ব্যস্ত হইয়া সুখেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈলবালা কহিল, "দেখ ছেলেটা আর নেই, হাতখানা একেবারে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে' দিয়েছে।"

সুখেন্দু বিরক্তিপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দিলে?"

শৈলবালা কহিল, "আর কে দেবে? যে দেবার সেই দিয়েছে।" তার পর সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "নিতাইএর ছেলে ত! প্রজা-মনিব সম্বন্ধ, কাঁহাতক এসকল বর্দাস্ত করা যায়?"

সুখেন্দু রোষপূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার কানাইলালের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না। শান্তির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "মাকে একবার ডেকে আন্‌বি—যা ত?"

মহেশ্বরী নিজের ঘরে বসিয়া ময়নার সহিত কথা বলিতেছিলেন। বৃষ্টির শব্দে তিনি এসকল কিছুই শুনিতে পান নাই। শান্তি ভীতমুখে গিয়া কহিল, "বড়-মা! বাবা ডাক্‌ছেন।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "কেন রে?" কিসের একটা আশঙ্কায় তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শান্তি কেবল বলিল, "তুমি, শীগ্‌গির করে' এস—দেখ্‌বে।

শান্তি সেই পায়ে ফিরিয়া গেল।

মহেশ্বরী চঞ্চলপদে আসিয়া দেখিলেন, বলাই তাহার মাতার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। শৈলবালা চূণ ও হলুদ গরম করিয়া তাহার হাতে লাগাইয়া দিতেছেন। কানাই জড়সড় হইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মহেশ্বরীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার অশান্ত ছেলেটিই এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে।

সুখেন্দু বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে কহিলেন, "মা! কানাইটে বড় বেড়ে উঠেছে। ওকে আর একমূহূর্ত্তও এখানে রাখা যায় না। আমি এখনিই নবীনকে আন্‌তে লোক পাঠাচ্ছি।"

মহেশ্বরী যেন অনায়াসেই কহিলেন, "তা পাঠাও—নিয়ে যাক্‌ এসে। এখন ত সেয়ানা হয়েছে—আপদ্‌-বালাই নেই।" তার পর কানাইএর এক-গোছ চুল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিব্যি ভালোমানুষের মতন দাঁড়িয়ে আছিস্‌ যে! বলি এ হয়েছে কি?" এই বলিয়া চুল ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

কানাই আর্ত্তস্বরে কহিল, "আমার শিলটে নিলে কেন?"

বলাই তাহার বেদনা ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "ওর বুঝি? আমি আগে ধর্‌লাম না?"

মহেশ্বরী চুলে আর-একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, "হতভাগা কোথাকার,—আমার শিলটে নিলে কেন?—আকাশ থেকে তোর নাম লিখে' পাঠিয়েছিল—নয়?"

মহেশ্বরী তখন বলাইকে তাহার মাতার ক্রোড় হইতে নিজের ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। এবং বেদনার স্থানে আগুনের সেক দিতে লাগিলেন।

সুখেন্দু কহিলেন, "শেষটা একদিন একটা প্রাণ নষ্ট করে' বস্‌বে! কি বলো মা?

সে-কথার উত্তর না দিয়া মহেশ্বরী বলিলেন, "বল্‌লাম যে নবীনকে ডেকে পাঠা! নিয়ে যাক্‌ না যেখানকার আপদ্‌ সেইখানে!"

মার মত আছে বুঝিয়া সুখেন্দু তখন নবীনকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

মহেশ্বরী আপনার ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিয়া কানাইএর কাপড়, জামা, জুতা যেখানে যাহা ছিল খুঁজিয়া-খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "নে—তোর জিনিস-পত্তর কোথায় কি আছে দেখে'-শুনে' নে।"

জিনিস-পত্রগুলি গোছাইয়া লইয়া বোঁচকা বাঁধা যে

তাহার পক্ষে সদুপায় নহে, সে তাহা বুঝিয়াছিল, এবং গালের মধ্যে একটি আঙুল পুরিয়া দিয়া সজল-চক্ষে দাঁড়াইয়া ছিল। মহেশ্বরী একে-একে সকল বাক্স-পেট্‌রা খুলিয়া, কোথায় কি আছে না আছে সকলই খুঁজিতে লাগিলেন। এবং যখন যে-পরিচ্ছদটি বাহির হইতে লাগিল, অমনি টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। একবার বালকের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে! দেখে' নে না কোথায় কি আছে! আমাকে জ্বালা'তে দু-একটা রেখে যাবি নাকি?"

কানাই এবার কথা বলিল। আস্তে-আস্তে কহিল, "কোথায় যাবো বড়-মা?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "কেন, নবীনের কথা তোকে দু'শো দিন বলিনি? তোর দাদা হয়। ডাক্‌তে পাঠিয়েছে, এলে তা'র সঙ্গে চলে' যা।"

গাল ফুলাইয়া কানাই বলিল, "আমি যাবো না।"

মহেশ্বরী জোর-গলায় কহিলেন, "যাবিনে—থাক্‌বি কোথায়? এবাড়ীতে তোর জায়গা হবে না।"

স্বচ্ছন্দে সে বলিল, "কেন?"

"কেন তা এখনও বুঝ্‌তে পারিস্‌নি? ও আমার কপাল! তুই লোকের হাত-পা খোঁড়া কর্‌বি—চোখ কানা কর্‌বি—লোকে সইবে কেন?"

কানাই যুক্তিতে হারিবার পাত্র নয়। সে কহিল, "আমি ত তাদের কাছে থাক্‌তে যাচ্ছিনে!"

মহেশ্বরী হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "হারাম-জাদার জোর দেখ! তুই আমার ছেলেদের খুন কর্‌বি, আর আমি—"। মহেশ্বরীর ঠোঁটে আট্‌কাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "তোকে নিয়ে পড়ে' থাক্‌ব?"

কানাই সেইখানে বসিয়া পড়িল। বলিল, "আর কর্‌ব না।"

"সে-কথা আমার কাছে বল্‌লে কি হবে, তা'রা শুন্‌বে কেন?"

মহেশ্বরী তখন কানাইলালের জিনিসপত্রগুলি একে-একে পাট করিয়া তাহার টিনের বাক্সে পুরিয়া রাখিলেন। তার পর গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে এই যে একটা আকর্ষণ—নক্ষত্রের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া আসিয়া তাঁহার প্রাণের গোড়ায় বাঁধন ফেলিয়াছে, ইহাকে তিনি আর কিছুতেই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতে-ছিলেন না; তিনি সেই পায় চাটুয্যেদের বাড়ী আসিয়া ডাকিলেন, "ক্ষান্ত-দি নাকি বাপের বাড়ী যাবে শুন্‌ছিলাম?"

ক্ষান্ত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "হাঁ। ভাই এসে বসে' রয়েছে, কাল যাবো ভাবছি।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি ও ত যাবো-যাবো অনেক দিন থেকে মনে কর্‌ছি। চল—তোমার সঙ্গেই গিয়ে দিন কতক বেড়িয়ে আসি।"

ক্ষান্ত পুলকিত হইয়া কহিলেন, "বেশ ত! ভালোই হবে। দূরের পথ—দুই বোনে বেশ যাওয়া যাবে।"

এইরূপে ক্ষান্তর সহিত পিতৃভবনে যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া মহেশ্বরী গৃহে ফিরিলেন। নবীনের আসার পূর্ব্বেই যে তাঁহার কোথাও-না-কোথাও বাহির হইয়া পড়া চাই। মহেশ্বরী গৃহে আসিয়া আবার বাক্স-পেট্‌রা খুলিলেন ও নিজের জন্য গোছ-গাছ করিতে লাগিলেন। শৈল সেসকল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হচ্ছে, মা?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "এক-জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে' থাক্‌তে আর ভালো লাগ্‌ছে না, দিন-কতক বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায় যাবে?"

"বাপের বাড়ীতেই যাই। ক্ষান্ত দিদি যাচ্ছেন, সেই নৌকোতেই যাবো।"

শৈলবালা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। সে স্বামীর নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল।

সুখেন্দু মাতার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মা! তোমার টাকা-পয়সার কি খুবই অভাব হয়েছে যে, ক্ষান্ত মাসীর নৌকোয় যাবে? এমন ত কোন দিন যাও না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা'তে আর হ'ল কি? এক-জায়গার মেয়ে, পড়েছিও পাশাপাশি ঘরে, তা'তে দোষ নেই।"

সুখেন্দু কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি বুঝেছি সব।' নবীন ত আর শমন হাতে করে' আস্‌বে না, যে তোমার কানাইকে দিতেই হবে। সে ত তুমি দিলেও পারো—না দিলেও পারো।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "না—তা'তে আর কাজ নেই! ঘরটা-সুদ্ধ লোক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে, কাঁহাতক লোকে সহ্য কর্‌বে?"

সুখেন্দু কহিলেন, "বলাইএর যদি একটা ভাই থাক্‌ত—আর দুষ্ট হ'ত, তার জন্যে ত কোন নবীনকেও খুঁজে' পাওয়া যেত না। রাগের মাথায় দু'-এক কথা বলি বলে' কি তোমার অভিমান করা উচিত?"

মহেশ্বরী কিছু বলিলেন না।

পরদিন যখন সংবাদ আসিল, নবীন তাহার বাড়ীতে বা কর্ম্মস্থলে নাই, মনিবের কার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছে, তখন মহেশ্বরী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ে যাওয়াও স্থগিত হইল। এক-জায়গার মাটির প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা অকস্মাৎ দূর হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিত্যসঙ্গীর প্রতি ভালবাসা শিশুদের মনে বয়স্কদের তুলনায় গভীর। তাই কখনও বয়োধর্ম্মের গুণে হঠাৎ একে অন্যকে আঘাত করিয়া বসিলে সেই আঘাতটাই আবার নিষ্ঠুরের মত তাঁহারই শক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়। বলাইকে ফেলিয়া দেওয়ার পর হইতে কানাইএর অন্তরে এমন একটা আঘাত বাজিয়া উঠিয়াছিল যে, প্রাণের কোন্ নিবিড় অনুরাগের স্পর্শে সে তাহার সঙ্গীটিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়া-ভাবিয়া কোন কূল-কিনারাই পাইতেছিল না। কাল হইতে বলাই তাহাদের ঘরে শয্যায় শুইয়া আছে। কানাইলালের সে-গৃহে যাইতে বরাবরই নিষেধ ছিল; সেখানে জল থাকিত, সুখেন্দুর খাদ্যাদিও থাকিত। বন্ধুকে চোখের দেখা দেখিবার উপায়ও তাহার নাই।

কানাই এ-দুইদিন ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কি ছলে সে বলাইকে দেখিতে পাইবে এই ছিল তাহার একমাত্র চিন্তা। শান্তির কাছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছে যে, ব্যথাটা খুবই বাড়িয়াছে। রান্না-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সে আজ দুইদিন শৈলবালাকে চুণ-হলুদ গরম করিয়া লইয়া বলাইএর গৃহে ঢুকিতে দেখিতেছে। এই সামান্য ঔষধে বন্ধুর সেবায় তাহার মন উঠিতেছিল না। "চুণ-হলুদে নাকি আবার ব্যথা ভালো হয়?" তাহার মনে একটা বুদ্ধি যোগাইল। তাহাদের বাড়ীর কিছু দূরে পরেশ নন্দী থাকিত, সে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জানিত। সে প্রায়ই দেখিত, ঐরকমের মচ্‌কা ঘা, ফুলা, ব্যথা ইত্যাদি লইয়া অনেকে তাহার দ্বারে ঝাড়া-ফুঁকা করিতে আসিত এবং অনেকে বেশ ফলও পাইত। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি-চুপি পরেশের কাছে গেল। পরেশ তখন ঘুন্‌সী বুনিতেছিল। উঁচু হইয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া সে অনেকক্ষণ গালে-মুখে হাত দিয়া তাহার বুনন-কার্য্য দেখিতে লাগিল। পরেশ এই প্রতিবাসীটিকে চিনিত। এবং সে যে তাহার মনিবমাতা মহেশ্বরীদেবীর অতি প্রিয়পাত্র তাহাও সে জানিত। কানাইলালকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কানাই-বাবু! চুপ করে' বসে' যে! কি মনে করে'?"

ইতস্ততঃ করিয়া কানাই বলিল, "তুমি ঘুন্‌সী বুন্‌ছ যে—"

"তা'তে কি হয়েছে, বলোই না—বুন্‌তে-বুন্‌তে শুন্‌ব।"

কি করিয়া কথাটা ফেলিবে কানাই ভাবিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "লজ্জা কি? বলে' ফেল না শুনি। আমি কি পর?"

ঢোক গিলিয়া কানাই বলিল, "তুমি অনেক মন্তর-তন্তর জানো—।"

"তা ত জানি।"

কানাই ঘুরিয়া পরেশের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জিতভাবে বলিল, "মচ্‌কা ঘার মন্তরটা যদি আমায় শিখিয়ে দাও।"

পরেশ হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—সে-মন্তর নিয়ে কি হবে? কা'কে চিকিৎসা কর্‌বে?"

গম্ভীরভাবে কানাই কহিল, "শেখা থাক্‌বে।"

পরেশ বলিল, "দেশসুদ্ধ মন্তর পড়ে' রয়েছে, মচ কা-ঘার মন্তরটি তোমায় পেয়ে বস্‌ল কেন?"

কানাই কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "তুমি দেবে কিনা বলো?"

পরেশ কহিল, "দেবো না কেন? বিনা পয়সায় কি হয়? টাকা লাগে।"

কানাই ভাবিয়া কহিল, "ক' টাকা?"

পরেশ বলিল, "চার টাকার কম হয় না, তুমি দু'টাকা দিলে হবে।"

কানাই আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। সে জানিত মহেশ্বরীর বিছানার নীচে খরচপত্রের জন্য প্রায়ই দু'-দশ টাকা থাকিত। সে চুপিচুপি গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানা তুলিয়া দেখিল, পাঁচটি টাকা রহিয়াছে। সে তাহা হইতে দুইটি টাকা লইয়া পরেশের নিকট আসিল। কতদিন কত টাকা-পয়সা তাহার চোখের উপর ছড়ানো থাকিত, সে একটি পয়সায়ও কোনদিন হাত দিত না। আজ সে তাহার এক-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আর-একটি পাপ করিয়া বসিল।

পরেশের নিকট টাকা দুইটি রাখিয়া সে কহিল, "এই নাও—কিন্তু এই বেলার মধ্যে মুখস্থ করিয়ে দিতে হবে।"

টাকা দুইটি এবং বালকের তাড়াহুড়া দেখিয়া পরেশ কিছু আশ্চর্য্য হইল। যা হোক্ সে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া টাকা দুইটি তুলিয়া লইল এবং কানাইলালকে মন্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিল।

কানাই বেশ মেধাবী ছিল। দু'-দশবার আবৃত্তি করিতে তাহার অনেকটা আয়ত্ত হইয়া উঠিল। সে একবার ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মিথ্যে মিথ্যে শেখাচ্ছ না ত?"

পরেশ কহিল, "টাকা পেলাম, মিথ্যা কেন শেখাবো?"

তবু কানাই নিশ্চিন্ত হইল না। সকল সন্দেহ আগেই মিটাইয়া রাখিবার জন্য সে বলিল, "আমায় ছুঁয়ে বল্‌ছ? খাটবে ত? আমি কিন্তু আজই খাটিয়ে দেখ্‌ব।"

পরেশ কহিল, "তা দেখ, বালকের সঙ্গে কেউ মিথ্যে ব্যবহার করে?"

সত্য-সত্যই পরেশ কোন মিথ্যা আচরণ করিল না। সে ঝাড়-ফুঁক সবই ঠিক-ঠিক শিখাইয়া দিল।

কানাই তখন হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। এবং কি সুযোগে বলাইএর ঘরে প্রবেশ করিতে পারা যায় তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। থাকিলই বা জল—থাকিলই বা বড়-বাবুর খাবার-সামগ্রী—তাহাকে আজ সে-ঘরে প্রবেশ করিতেই হইবে। না হয় জল নষ্ট হওয়ার জন্য সে আজ একটা শাস্তিই পাইবে। শাস্তিকে সে আজ ভয় করে না। সারাদিন সে বলাইএর গৃহপথের দিকে দৃষ্টি পাতিয়া রহিল। তার পর সে এক সময় দেখিল, ঘরে কেহই নাই—শাস্তিও না। বাহিরে আর-এক মুহূর্ত্তও কানাই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। চঞ্চল-চরণে এই অবকাশে সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। বলাইএর তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। কানাই আস্তে-আস্তে তাহার শিওরের কাছে বসিয়া স্ফীত স্থানটা টিপিয়া-টিপিয়া দেখিতে লাগিল। বলাই চমকিত হইয়া উঠিল। কানাইকে দেখিয়া সে চোখ রাঙাইয়া কহিল, "মাকে ডাক্‌ব?—আমার হাতে ব্যথা দিচ্ছ!"

সন্তর্পণে হাত সরাইয়া কথায় স্নেহের সুর ঢালিয়া কানাই কহিল, "ব্যথা দিইনি ত, দেখ্‌ছিলাম। কমেছে?"

কানাইএর উপর আক্রোশটা বলাইএর মনে তখনও উদ্দাম হইয়া ছিল। সে উদ্ধতভাবে বলিল, "তা শুনে' তোমার কাজ কি? তুমি সরে' যাও।"

কানাই যে বলাইএর ঘরে প্রবেশ করিল, অন্য ঘর হইতে সুখেন্দু তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি মহেশ্বরীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "দেখ গিয়ে মা! ছোঁড়াটা ঘরে ঢুকে' পড়েছে। সবই দেখ্‌ছি ফেলে' দিতে হবে।"

জানিয়া-শুনিয়াও কানাই লুকাইয়া এঘরে ঢুকিল দেখিয়া মহেশ্বরীর মনে সন্দেহ জাগিল,—তিনি বুঝিলেন এ স্নেহের টান। তখন মাতা-পুত্র অন্য-ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

ব্যথিত কানাই কহিল, "রাগ করেছিস্, ভাই?"

বলাই বলিল, "কর্‌ব না রাগ? তুমি ফেলে' দিলে কেন?"

"তুই শিলটা ধর্‌লি কেন?"

"তুমি ধর্‌তে গেলে কেন ?"

"আমি বুঝি খেতাম ?"

"কি কর্‌তে ?"

"তোকে দিতাম।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলাই কহিল, "তাই বুঝি হাতটা ভেঙে দিলে ?'

কানাই বলিল, "ভাঙ্‌বে—জানি ?'

"ভাঙল ত !'

"মিথ্যে-মিথ্যে ফেল্‌তে গেলাম যে !'

একটু পরে বলাই জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা মার-ধোর করেছে ?"

"না।"

"কোথায় যেতে বল্‌ছিল যে ?"

"কাল বলেছিল, আর বলেনি।"

"বলুকগে—তুমি যেও না।"

কথা ঘুরাইয়া কানাই কহিল, "চূণ-হলুদ দিয়ে কি হবে ? হাতটা বিছানার উপর পেতে দে, মন্তর পড়ে' দিই, সেরে যাবে।"

পার্শ্বের ঘরে সুখেন্দু ও মহেশ্বরী নীরবে হাসিতে লাগিলেন।

বলাই বিছানার উপর হাত ছড়াইয়া দিল।

কানাই কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার বেদনার স্থানে হাত বুলাইতে লাগিল ও সাগ্রহে সমস্ত মন ঢালিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। মহেশ্বরীর মন আনন্দ-গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি শৈলবালাকে সে-ঘরে ডাকিয়া আনিয়া সে-দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন। কানাই-লালের স্নেহের এ-নিদর্শনে যেন তাঁহারই স্নেহ একটা মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

কানাই অনেকক্ষণ মন্তর পড়িয়া তিনবার ফুঁ পাড়িল। বলিল, "বল্—নেই।"

বলাই বলিল, "নেই।"

শৈলবালা হাসিতে-হাসিতে মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন।

কানাই এইরূপে পর-পর তিনবার মন্ত্র পড়িল ও ফুঁ পাড়িল।

তার পর কহিল, "আজ রাত্রের মধ্যে সব-ব্যথা কমে' যাবে, কাল বেশ বেড়াতে পার্‌বি।"

ঝাড়ান শেষ হইলে কানাই তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহাকে এখনি চলিয়া যাইতে হইবে। নহিলে না জানি কে দেখিয়া ফেলিবে যে, সে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে। এ-আশঙ্কটা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়াই ছিল। যাইবার সময় বলাইকে সাবধান করিয়া দিয়া সে কহিল, "এঘরে এসেছিলাম, কা'কেও বলিসনে যেন।"

বলাই কহিল, "না। আর তুমি যেন—বাবা কা'কে আন্‌তে পাঠিয়েছে, তা'র সঙ্গে যেও না।"

কানাই কহিল, "না।"

এই বলিয়া সে আর কোথাও না দাঁড়াইয়া আপনার ঘরে ছুটিয়া গেল এবং তার পর রোজকার মতন তেল মাখিয়া স্নান করিতে চলিল।

সুখেন্দু তখন মহেশ্বরীকে কহিলেন, "যাদের বিবাদ তা'রাই দেখি মিটিয়ে নিলে। মা! তোমার মনে ত আর কোন গ্লানি নেই ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "গ্লানি কি রাখা যায় ? দেখ্‌লি ত এদের ব্যাভার ? তুই যে আমার কাছে এদেরই মতন।'

এইসময় পরেশ আসিয়া ডাক দিল "বড়-মা !"

পরেশের ভয় হইয়াছিল যে, টাকার কথা এখনই বাড়ীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এবং সে যে বালকের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া লইয়াছে ইহাই প্রমাণিত হইবে।

মহেশ্বরী বাহিরে আসিলে পরেশ টাকা-দুইটি তাঁহার হস্তে দিয়া কহিল,"এই নিন, কানাই-বাবু মচ্‌কা-ঘার মন্তর শেখ্‌বার জন্যে এই টাকা-দুটি দিয়ে এসেছিলেন। আমি শেখাতে চাইনে, তাঁর জিদ দেখে' তামাসা করে' বল্‌লাম, টাকা লাগ্‌বে।—বাবু দৌড়ে এসে টাকা নিয়ে গেলেন। বল্‌লেন, এই-বেলার মধ্যেই তাঁকে শিখিয়ে দিতে হবে।"

মহেশ্বরী দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। শৈলর সমস্ত রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, "মা ! শুন্‌লে—এমন ভাইকে ভাইএর কোল থেকে টেনে ফেলে' দিতে হয়! বাইরে কোথাও কিছু রেখেছিলে নাকি ? এটাকা পেলে কোথায় ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বিছানার নীচে ত বরাবর থাকে, হাতও দেয় না। আজ যে টান পড়েছে হয়ত নিতেও পারে। পাঁচটা টাকা ছিল বিছানার নীচে—দেখি!"

মহেশ্বরী যাইয়া দেখিলেন, তিনটি টাকা মাত্র আছে। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "আর পাবে কোথায়? বিছানার নীচে থেকেই নিয়েছে।

পরেশ চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কানাই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিছানার নীচে টাকা ছিল, নিয়েছিস্?"

কানাইলালের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার হৃৎপিণ্ডটা ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। সে সাহসপূর্ব্বক কহিল, "না।"

মহেশ্বরী তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "না কি রে? চুরি করলে পাপ হয় তা জানিস্?"

বেচারা আর মিথ্যা বলিতে পারিল না। সে যে জেরায় পড়িবে এমন আশঙ্কা পূর্ব্বে তাহার হয় নাই তাই শুষ্কমুখে কহিল, "দুটো টাকা নিলে বুঝি চুরি হয়?"

মহেশ্বরী হাসি দমন করিয়া কহিলেন, "একটা আধ্‌লা পয়সা নিলেও চুরি করা হয়, এ জানিস্‌নে? কেন নিলি?"

কানাই অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বলিবার উপায় নাই!

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্তর শিখ্‌তে গিয়েছিলি কেন?"

কানাই তথাপি নিরুত্তর।

তিনি ধমক দিয়া কহিলেন, "বল্ না, কেন গিয়েছিলি?"

কানাই একান্ত সঙ্কোচভরে নিম্নস্বরে কহিল, 'বলা'র হাত ভেঙেছে যে!"

শৈল কহিল, "দেখ্‌লে মা! সব মিলে' গেল ত। ওকে আর ভিজে-কাপড়ে কষ্ট দাও কেন? যা, কাপড় ছাড়্‌গে—যা। সন্ধ্যার সময় তোর ভাইকে আর-একবার ঝাড়িয়ে দিবি।"

মহেশ্বরী একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কানাই আজ তাঁহার স্নেহের মান রাখিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বিস্মৃতি ও স্মৃতি

(সুইন্‌বার্ণের অনুসরণে)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

:তোরে লোকে ভুলে' যাবে; দেয়ালের দগ্ধ মসী-রেখা
তার চেয়ে বেশী কিছু তোর নামে নাহি রবে লেখা
কালের দেউলে; পুরুষ যেমন ভোলে চেতনা-নিমেষে
মাথী সে রিপুর রচনা, ভুলে' যায় নিশাশেষে
পন-বিকার; যেমতি সে অর্দ্ধ-পূর্ণ পাত্র হ'তে তার
লিত মদিরাটুকু মদ্যপ চাহে না ফিরে' আর—
লিবে তেমনি তোরে আগত ও অনাগত লোক,
তার ছায়া ভুলে' যাবে হেথাকার এই সূর্য্যালোক।
ধু যেই অগ্নিকণা হানিয়াছি আমি তোর মুখে,
র ক্ষত,—সেই মোর বিষ-দিগ্ধ বিষম কৌতুকে
পদষ্ট মৃত-সম মরিয়াও হইবি অমর—
র হ'য়ে জাগিবি রে মর্ত্ত্যের [illegible]-বাসর।

আর আমি!—নেহারিবে যবে নর জলদর্চ্চিশিখা
লেলিহান, পশিবে শ্রবণে যবে শ্রুতি-বিভীষিকা
উদধির উন্মাদ কল্লোল, যবে সঙ্গীত তরল
আর্ত্ত-হৃদি আর্দ্র করি' প্রণয়ীরে করিবে চপল,
যবে ওই কুবিহীন নীল নভ-উষর-অঙ্গন
দীর্ণ করি', শীর্ণদ্যুতি ইরম্মদ করিবে লঙ্ঘন
যোজন-সমান ব্যোম,—সে আলোকে, পুলকে, ক্রন্দনে,
গীতোচ্ছ্বাসে, অধরে-অধর, আর বাহুর বন্ধনে,
সীমাহীন বারিধির সারাদেহ-মর্ম্ম-শিহরণ
সেই আতট-আক্ষেপে, আমারেই করিবে স্মরণ
সর্ব্বলোক, অর্চ্চিবে আমার স্মৃতি নিত্য-মনোরমা,
[illegible]

পূর্ণতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি',—
"তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হ'য়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হ'তে করিবে হরণ,—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধশোক
মরণের অধিক মরণ" ॥

শুনে', তোর মুখখানি
বক্ষে আনি'
বলেছিনু তোরে কানে কানে,—
"তুই যদি যাস্ দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে।
বিরহ, বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।

তুমি খুঁজে' পাবে, প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্ম্মের নিকটতম দ্বার,—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার" ॥

৩

দু'জনের সেই বাণী,
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা ;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে' গেল সে বাণীর ধারা।
তা'র পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখা শুনা হ'ল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ॥

১লা অক্টোবর।

যাত্রারম্ভ

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা, বাদ্‌লার হাওয়া খুঁৎখুঁতে ছেলের মত কিছুতেই শান্ত হ'তে চাচ্চে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জ্জে উঠ্‌চে, কা'কে যেন ঝুঁটি ধরে' পেড়ে ফেল্‌তে চায়, নাগাল পায় না। স্বপ্নের আক্রোশে সমস্ত মনটা যেমন বুকের কাছে গুম্‌রে ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে থাকে, আর রুদ্ধ-কণ্ঠের বদ্ধবাণী কান্না হ'য়ে হা হা করে' [illegible] গর্জ্জন শুনে' বৃষ্টিধারায় পাণ্ডুবর্ণ সমুদ্রকে তেম্‌নি বোধ হচ্চে একটা অতলস্পর্শ অক্ষম ক্ষোভের দুঃস্বপ্ন।

যাত্রার মুখে এইরকম দুর্য্যোগকে কুলক্ষণ বলে' মনটা ম্লান হ'য়ে যায়। আমাদের বুদ্ধিটা পাকা, সে এ-কেলে, লক্ষণ-অলক্ষণ মানে না; আমাদের রক্তটা কাঁচা, সে আদিম-কালের; তার ভয়ভাবনাগুলো তর্ক-বিচারকে ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে ঝেঁকে ওঠে, ঐ পাথরের বেড়ার ওপারের অবুঝ ঢেউগুলোরই মত। বুদ্ধি আপন যুক্তির কেল্লার মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির যত-রকম ভাষাহীন আভাস-ইঙ্গিতের স্পর্শ

বেড়ার বাইরে; তার উপর মেঘের ছায়া পড়ে, ঢেউয়ের দোলা লাগে; বাতাসের বাঁশিতে তা'কে নাচায়, আলো-আঁধারের ইসারা থেকে সে কত কি মানে বের করে; আকাশে যখন অপ্রসন্নতা তখন তার আর শান্তি নেই।

অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেচি, মনের নোঙরটা তুল্‌তে খুব বেশি টানাটানি কর্‌তে হয়নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। তার থেকে বোধ হচ্চে এতদিন পরে আমার বয়স হয়েচে। না চল্‌তে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হ'লে খরচ কর্‌তে সঙ্কোচ হয়।

তবু মনে জানি ঘাটের থেকে কিছু দূরে গেলেই এই পিছু-টানের বাঁধন খসে' যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আস্‌বে রাজপথে। এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিল, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" আজই সেই গান কি উজান হওয়ায় ফিরে' গেল? সাগরপারে যে অপরিচিতা আছে তার অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুন্‌তে চেয়েছিল কোনো পাকা কথা। অর্থাৎ সে নিমন্ত্রণ প্রবীণকে নিমন্ত্রণ।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবার আমার নিমন্ত্রণ এল, তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। তাই হাল্‌কা হ'য়ে চলেচি, আমাকে প্রবীণ সাজ্‌তে হবে না। বক্তৃতা যত করি তার কুয়াশার মধ্যে আমি আপনি ঢাকা পড়ে' যাই। সে ত আমার কবির পরিচয় নয়।

গুটির থেকে প্রজাপতি বেরোয় তার নিজের স্বভাবে। গুটির থেকে রেশমের সুতো বেরতে থাকে বস্তুতত্ত্ববিদের টানাটানিতে। তখন থেকে প্রজাপতির অবস্থা শোকাবহ। আমার মাঝ-বয়স পেরিয়ে গেলে পর আমি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে গেলুম—সেখানে আমাকে ধরে' বেঁধে বক্তৃতা করালে তবে ছাড়্‌লে। তার পর থেকে হিতকথার আসরে আমার আনাগোনার আর অন্ত নেই। আমার কবির পরিচয়টা গৌণ হ'য়ে গেল। পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছিলুম সংসারের বেদরকারী মহলে বেসরকারী ভাবে; মনুর মতে যখন বনে যাবার সময়, তখন জড়িয়ে পড়েচি দরকারের জালে। সভা সমিতি আমার কাছে সরকারী কাজ আদায় কর্‌তে লেগে গেল। এতেই বোধ হচ্চে আমার শনির দশা।

২৫শে সেপ্টেম্বর।

কাল সমস্ত দিন জাহাজ মাল বোঝাই কর্‌ছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল, তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত। কিন্তু তখনও মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না। শরীর মনও ক্লান্ত।

জাহাজটা তীর থেকে যেন এক টুক্‌রো সংসার ছিন্ন করে' নিয়ে ভেসে চলেচে। ডাঙায় মানুষে মানুষে ফাঁক থাক্‌বার অবকাশ আছে, এখানে জায়গা অল্প, ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাক্‌তে হয়। কিন্তু তবু পরস্পর পরিচয় কত কঠিন। প্রত্যেকবার জাহাজে ওঠবার আগে এই চিন্তাটি মনকে পীড়া দেয়, এই নৈকট্যের দূরত্ব, এই সঙ্গবিহীন সাহচর্য্য।

আদিম অবস্থায় মানুষ যে-বাসা বাঁধে তার দেয়াল পাৎলা, তার ছিটে-বেড়ায় যথেষ্ট ফাঁক, ঝাঁপটা ঠেলে ফেলে ঘরে ঢোকা সহজ। কালক্রমে বাসা বাঁধবার নৈপুণ্য তার যতই বেড়ে ওঠে, ততই ইটকাঠ লোহাপাথরে ঘরের দেয়াল পাকা হয়ে ওঠে; দরজা হয় মজবুৎ। তার মধ্যে মনের অভ্যেসগুলো হ'য়ে যায় পাঁচিলে-ঘেরা। খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা সব-কিছুর জন্যই আড়ালের দরকার হয়। এই আড়ালটা সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। এইটেকে রচনা ও রক্ষা করতে বিস্তর খরচ লাগ্‌চে। ঘর-বাহিরের মাঝখানে মানুষের সহজ-চলাচলের রাস্তায় পদে-পদে নিষেধ।

সূর্য্যের বরে কর্ণের যেমন একটি সহজ-কবচ ছিল, তেম্‌নি প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ বেড়ার দরকার আছে। নইলে ভিড়ের টানে দশের সঙ্গে মিশে গেলে নিজের বিশেষত্বের সম্পদ ব্যর্থ হ'য়ে যায়। নিজেকে

বিচ্ছিন্ন না করলে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। বীজ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্তই মাটির ভিতরে আড়াল খোঁজে, ফল আপনাকে পরিণত করবার জন্তেই বাহিরের দিকে একটা খোসার পর্দা টেনে দেয়। বর্ব্বর অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জোর থাকে না, তার কাজও থাকে কম। এইজন্তেই ব্যক্তি-বিশেষের গোপনতার পরিবেষ্টন সৃষ্ট হ'য়ে ওঠে তার সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু এই বেড়া জিনিষটার আত্ম-প্রাধান্ত-বোধ ক্রমেই অতিমাত্র বাড়তে থাকে। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে যে একান্ত প্রয়োজন আছে, সেটা বাধা গ্রস্ত হ'য়ে অনভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। সেই আতিশয্যটাই হ'ল বিপদ।

এই মারাত্মক বিপদটা কোন্ অবস্থায় ঘটে? ভোগের আদর্শ অপরিমিত বেড়ে উঠে মানুষের যখন বিস্তর উপকরণের প্রয়োজন, যখন অন্নের জন্তে তার সময় ও সম্বল খরচ করবার বেলায় বিস্তর হিসেব করা অনিবার্য্য; যখন তার জীবিকার উপাদান উৎপাদন করবার জন্তে প্রভূত আয়োজন চাই, তখন তার সভ্যতার বাহন-বাহিনীর বিপুলতায় তার লোকালয় অতি প্রকাণ্ড হ'য়ে ওঠে। জনতার পরিমিত আয়তনেই মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঐক্য সম্ভবপর। তাই পল্লীর অধিবাসীরা কেবল যে একত্র হয় তা নয়, তারা এক হয়। সহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিস্তীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত হৃৎপিণ্ড তৈরী করে' উঠ্তে পারে না। প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘ কাজ চালাবারই যোগ্য, আত্মীয়তা চালাবার নয়। কারখানা ঘরে হাজার লোকের মজুরি দরকার, পরিবারের মধ্যে হাজার লোকের জটলা হ'লে তাকে আর গৃহ বলে না। যন্ত্রের মিলন যেখানে, সেখানে অনেক লোক, আর অন্নের মিলন যেখানে সেখানে লোক-সংখ্যা কম। তাই সহর মানুষকে বাহিরের দিকে কাছে টানে, অন্তরের দিকে ফাঁক ফাঁক করে' রাখে।

আমরা আজকাল সেই দেয়াল-কোটরে ভাগে-ভাগে বদ্ধ সভ্য মানুষ। হঠাৎ এসে ঠেসাঠেসি করে' মিলেছি এক জাহাজে। মেলবার অভ্যেস মনের মধ্যে নেই। তীর্থে যারা দল বেঁধে রাস্তায় চলে, মিল্তে তাদের সময় লাগে না, তা'রা গাঁয়ের লোক, মেলাই তাদের অভ্যেস। সার্থবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চড়ে' চলে, তা'রাও মনকে নীরব আড়ালের বুর্খা দিয়ে ঢেকে চলে না; তাদের সভ্যতা ইট-পাথরে অমিলকে পাকা করে' গেঁথে তোলেনি। কিন্তু ষ্টীমারের যাত্রী, রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে আসে, তাদের দেয়ালগুলোর সূক্ষ্ম শরীর তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল্তে থাকে।

তাই দেখি; সহরের কলেজে-পড়া ছেলে হঠাৎ দেশাত্ম-বোধের তাড়ায় যখন খামকা পল্লীর উপকার করতে ছোটে, তখন তা'রা পল্লীবাসীর পাশে এসেও কাছে আস্তে পারে না। তা'রা বেড়ার ভিতর দিয়ে কথা কয়, পল্লীর কানে বাজে যেন আরবী আওড়াচ্ছে।

যা হোক্, যদিও সহরে সভ্যতার পাকে আমাদের খুব কষে' টান দিয়েচে, তবু মনের গ্রাম্য অভ্যেস এখনো যায়নি। সময়কে বল্তে আরম্ভ করেচি মূল্যবান, কিন্তু কেউ যদি সে-মূল্য গ্রাহ্য না করে, তা'কে ঠেকিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থা আজো তৈরি হয়নি। আমাদের আগন্তুক-বর্গ অভিমন্যুর মত অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে জানেন, কিন্তু নির্গমনের পথ যে তাঁরা জানেন, সে তাঁদের ব্যবহারে বোঝা যায় না। অত্যন্ত বেগার লোককেও যদি বলা যায়, কাজ আছে, সে বলে, "ঈস্ লোকটা ভারি অহঙ্কারী।" অর্থাৎ তোমার কাজটা আমাকে দেখা দেওয়ার চেয়েও মহার্ঘ্য, একথা মনে করা স্পর্দ্ধা।

অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিন-তলার ঘরে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি। আমি নিতান্তই মৃদুস্বভাবের মানুষ বলেই আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অনতিবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম বলে' গণ্য করেন না। এইটুকুমাত্র সুবিধা যে, পথটা পুরবাসী-দের সকলেরই জানা নেই। খবর এল, একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। অস্বাস্থ্য বা ব্যস্ততার ওজরকে আমাদের ভদ্রলোকেরা শ্রদ্ধা করেন না, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা বন্ধ করে' নীচে গেলুম। দেখি একজন কাঁচা-বয়সের যুবক; হঠাৎ তার চাদরের অজ্ঞাতবাস থেকে

আপন সম্প্রদায়ের লোক। কবি-কিশোর একটুখানি হেসে আমাকে বল্‌লে, "একটা অপেরা লিখেচি।" আমার মুখে বোধ হয় একটা পাংশুবর্ণ ছায়া পড়ে' থাক্‌বে, তাই হয়ত আশ্বাস দেবার জন্যে বলে' উঠ্‌ল, "আপনাকে আর কিছুই কর্‌তে হবে না, কেবল গানের কথা-গুলোতে সুর বসিয়ে দেবেন, সবসুদ্ধ পঁচিশটা গান।" কাতর হ'য়ে বল্‌লুম, "সময় কই ?" কবি বল্‌লে, "আপনার কতটুকুই বা সময় লাগবে ? গান-পিছু বড় জোর আধ ঘণ্টাই হোক্।" সময় সম্বন্ধে এর মনের ঔদার্য্য দেখে হতাশ হ'য়ে বল্‌লুম, "আমার শরীর অসুস্থ।" অপেরা-রচয়িতা বল্‌লে, "আপনার শরীর অসুস্থ, এর উপরে আর কি বল্‌ব। কিন্তু যদি - "। বুঝ্‌লুম প্রবীণ ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ আন্‌লেও নবীন কবি বিচলিত হবে না। কোনো একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের ঘরে এই নাট্যের অবতারণা হ'লে কোন্ ফৌজদারীতে তার যবনিকা-পতন হ'ত, সে কথা মনে করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

মানুষের ঘরে "দরওয়াজা বন্ধ্" এ কথাটিও কটু, আর তার ঘরে কোথাও পর্দ্দা নেই, এটাও বর্ব্বরতা। মধ্যম পন্থাটাই দেখি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই বিরুদ্ধ-শক্তির সমন্বয়েই সৃষ্টি, তাদের একান্ত বিচ্ছেদেই প্রলয়, মানুষ নিজের ব্যবহারক্ষেত্রে এইটেই কেবলি ভোলে আর মার খেয়ে মরে।

সূর্য্যের উদয়াস্ত আজো বাদলার ছায়ায় ঢাকা পড়ে' রইল। মেঘের থলিটার মধ্যে কৃপণ আকাশ তার সমস্ত সোনার আলো এঁটে বন্ধ করে' রেখেচে।

২৬শে সেপ্টেম্বর।

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মার্‌চে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সঙ্কোচ এখনো ঘুচ্‌ল না। বাদল-রাজের কালো উর্দ্দিপরা মেঘগুলো দিকে-দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্চে।

আচ্ছন্ন সূর্য্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোত-স্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে' গেচে। জোয়ার আস্‌বে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেচি, বাপ-মায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেচে। আমাদের দেশে শেষ পর্য্যন্তই সেটা থাকে। যেমনিই দেখেচি সূর্য্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সে দেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরল-রৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্য্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দ্দা কখনো বা অর্দ্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে' মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় ত কি ? সূর্য্যের আলোর ধারা ত আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইচে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই ত উৎসরূপে রয়েচে ঐ মহা-জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌর-জগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন ত পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিল ওরি বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই ত শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে-তরঙ্গে ঐ আলোই ত প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ঐ তেজই মানস-ভাব ধারণ করে' আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ঐ যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুক মদ হ'য়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই ত আমার গানে গানে সুর হ'য়ে পুঞ্জিত হ'ল। এখনি আমার চিত্ত হ'তে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেচে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির মত সংহত হ'য়ে আছে ?

হে সূর্য্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হ'য়ে গাছ হ'য়ে আকাশে উঠ্‌চে, বল্‌চে জয় হোক্! বল্‌চে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুল-ফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝর-ধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে' আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চল্‌ল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে' বল্‌চি, হে পুষন্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরন্ময়

পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য,
তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই।
আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক্।

২৬শে সেপ্টেম্বর।

কাল অপরাহ্ণে আচ্ছন্ন সূর্য্যের উদ্দেশে একটা কবিতা সুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হ'ল।

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হানি'
ফেল, ফেল টুটি'।
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক পদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি'!
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তা'রে জানি!
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে॥

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বসি' উঠিল মন্দ্রি' বারম্বার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সঙ্গীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত!
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত॥

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নমঃ!
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি' তমঃ
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি'
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি'
জীবন হিল্লোল॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, সুরের তরণী ;
আয়ুস্রোতমুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে,—কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশির-চ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ ॥

তেজের ভাণ্ডার হ'তে কি আমাতে দিয়েছ যে ভরে'
কেইবা সে জানে ?
কি জাল হ'তেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্তপ্রাণে ?
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা ;
মুহূর্ত্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে'।
তেমনি সহজ হোক্ হাসি কান্না ভাবনা বেদনা,
না বাঁধুক্ মোরে ॥

তা'রা সবে মিলে' থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ বর্ষণে ;
যোগ দিক্ নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন কলরবে
উপল ঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে !
তার পরে যেন তা'রা সর্ব্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে ॥

তোমার উৎসব ধারা আসা-যাওয়া দু'-কূল ধ্বনিয়া
নিত্য ছুটে যায়।
তোমার নর্ত্তকীদল বিরহমিলন ঝঞ্ঝনিয়া
খঞ্জনী বাজায়।

স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তাল-ছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নূপুর-মন্দ্রিত,
দুঃখ আর সুখ।
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দ্ববেগে ব্যথিত স্পন্দিত,
করে ধুক্-ধুক্॥

এই ভালো, এই মন্দ, এই দ্বন্দ্ব আঘাতে সংঘাতে
নিক্ মোরে টেনে!
আলো আঁধারের দোলে পুনঃপুনঃ আশা আশঙ্কাতে
যাক্ মোরে হেনে!
সেই তরঙ্গের উর্দ্ধে দিক্ দেখা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর,
জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিষ্ণুর,
অম্লান-মহিমা!
সব দ্বন্দ্ব মগ্ন করে গন্ধ তা'র আনন্দের সুর,
নাহি তা'র সীমা॥

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্চ্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কি মত্ততায়, কি আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হ'য়ে বিবাগিনী,
লয়ে' তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালী?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হ'ল শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক্, ধৌত হোক্ সকল আবেশ
অগ্নি-উৎস-ধারে।
সীমন্তে, গোধূলিলগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তা'র স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সঙ্গীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক্ সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

২৭শে সেপ্টেম্বর।

আজ মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আলোকের দাক্ষিণ্য আজ আকাশে বিস্তীর্ণ, রৌদ্র-চকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আজ আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। সুরলোকের আতিথ্য থেকে আজ একটুও বঞ্চিত হ'তে ইচ্ছা করচে না।

আজকের দিনে কি ডায়ারি লিখ্‌তে একটও মন সরে? ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটবড় কিছুই নষ্ট না হোক্, সমস্তই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ও'তে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগোতে চায় না, আগ্‌লাতে চায়।

বিধাতা আমাকে মস্ত একটি বর দিয়েচেন, সে হচ্চে আমার অসামান্য বিস্মরণ-শক্তি। সংবাদের ভাণ্ডার-ঘরের জিম্মে তিনি আমার হাতে দেননি। প্রহরীর কাজ আমার নয়; আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ভুলে' যাবার অধিকার দিয়েচেন।

ভুলে' যেতে দেওয়া যদি হারিয়ে যেতে দেওয়া হ'ত, তা হ'লে তিনি তেমন বিষম ভুল কর্‌তেন না। বসন্ত বারে-বারেই তার ফুলের সমারোহ ভুলে' গিয়ে শূন্য-সাজি-হাতে অন্যমনস্ক হ'য়ে উত্তরের দিকে চলে' যায়; সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নব-জন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়। আমার চৈতন্যের উপরের তলায় আমি এত বেশি ভুলি যে, তা'তে আমার প্রতি-দিনের জীবনযাত্রার ভারি অসুবিধা হয়। কিন্তু আমার ভোলা সামগ্রীগুলো চৈতন্যের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নীচের তলায় নেপথ্যে এসে জড় হয়; সেখানে নতুন-নতুন বেশ পরি-বর্ত্তনের সুযোগ ঘটে। আমার মনটাকে বিধাতা নাট্য-শালা কর্‌তে ইচ্ছা করেচেন, তা'কে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই জমা করে' পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে-হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ। এই হারিয়ে যাওয়ার ভিতর দিয়ে এক যখন আর সেজে এসে হাজির হয়, তখন তীক্ষ্ণ স্মরণ-শক্তিওয়ালা, বৈজ্ঞানিক যদি সওয়াল-জবাব কর্‌তে সুরু করে, তা হ'লে মুস্কিল। তখন বিশ্লেষণের চোটে বেরিয়ে পড়্‌তে পারে, যেটাকে নতুন বল্‌চি সেটা পুরোনো, যেটাকে আমার বল্‌চি সেটা আর কারো। কিন্তু সৃষ্টির ত এই লীলা, এইজন্যেই ত তা'কে মায়া বলে। কড়া পাহারা বসিয়ে শিশির-বিন্দুর যদি আঁচল ঝাড়া দেওয়া যায়, তা হ'লে বেরিয়ে পড়্‌বে দুটো অদ্ভুত বাষ্প, তাদের নাম যেমন কর্কশ, তাদের মেজাজও তেম্‌নি রাগী। কিন্তু শিশির তবুও স্নিগ্ধ শিশির, তবুও সে মিলনের অশ্রুজলের মতই মধুর।

কথায় কথায় কথা বেড়ে যায়। বল্‌তে যাচ্ছিলুম ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা, ঝুলি বোঝাই করে' আমি তথ্য সংগ্রহ করিনে। আমার জলাশয়ের যে-জলটাকে অন্য-মনস্ক হ'য়ে উবে' যেতে দিই, সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হ'য়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।

তা ছাড়া আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারী বাটখারা দিয়ে ওজন কর্‌তে চাইনে। কিন্তু বিশেষ ঘটনার বিশেষ তুলাদণ্ড তৈরি হ'য়ে উঠ্‌তে সময় লাগে। ঘটনা যখনি ঘটে তখনি সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারী পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়ত হাল্‌কা, যেটাকে বুঝি হাল্‌কা সেটাই হয়ত ভারী। দীর্ঘকালে আনুষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিষ ভুলে' যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিষের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।

যারা জীবন-চরিত লেখে তা'রা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে' লেখে, সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে, না বাড়াতে পারে। অথচ আমাদের প্রাণ-পুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে-পদে বাড়িয়ে-কমিয়েই এগিয়ে চলেচে। অতিবিশ্বাস-যোগ্য তথ্য স্তূপাকার ক'রে তা'দিয়ে স্মরণ-স্তম্ভ হ'তে পারে, কিন্তু জীবন-চরিত হবে কি করে? জীবনচরিত থেকে, যদি বিস্মরণধর্ম্মী জীবনটাই বাদ পড়ে, তা হ'লে মৃত-চরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কি? আমি যদি বোকামি করে' প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে' যেতুম, তা হ'লে তা'তে করে' হ'ত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা'হ'লে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি করে' দিত।

যে যুগে রিপোর্টার ছিল না, মানুষ খবরের কাগজ বের করেনি, তখন মানুষের ভুলে যাবার স্বাভাবিক শক্তি কোনো কৃত্রিম বাধা পেত না। তাই তখনকার কালের মধ্যে থেকেই মানুষ আপন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের পেয়েচে। এখন হ'তে আমরা তথ্য-কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকদের হাত থেকে প্রতিদিনের মানুষকে পাব, চিরদিনের মানুষকে সহজে পাব না। বিস্মরণের বৃহৎ ভিতের উপর স্থাপিত মহাসিংহাসনেই কেবল যাঁদের ধরে, সর্ব্বসাধারণের ঠাসাঠাসি ভিড়ে তাঁদের জন্যে জায়গা হবে না। এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোট-টুকনে-ওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক হ'য়ে চারিদিকেই মাচা বেঁধে বসে'।

ছেলেবেলায় আমাদের অন্তঃপুরের যে-বাগানে বিশ্বপ্রকৃতি প্রত্যহই এক-একটি সূর্য্যোদয়কে তার নীল থালায় সাজিয়ে এক-একটি বিশেষ উপহারের মত আমার পুলকিত হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ত, ভয় আছে একদিন আমার কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা-হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আস্‌বে। সে অরসিক জান্‌বেই না, সে-বাগান সেইখানেই, যেখানে আছে ইদেনের আদিম স্বর্গোদ্যান। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রতি উদাসীন আর্টিষ্ট্ সেই স্বর্গে যেতেও পারে কিন্তু কোনো ক্যামেরা-ওয়ালার সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে—দ্বারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ম্ময় খড়্গ হাতে।

এত বুদ্ধি যদি আমার, আর এত ভয়, তবে কেন ডায়ারি লিখ্‌তে বসেচি? সে-কথা কাল বল্‌ব।

২৮শে সেপ্টেম্বর।

যখন কলম্বোতে এসে পৌঁছলুম বৃষ্টিতে দিগ্‌দিগন্তর ভেসে যাচ্চে। গৃহস্থের ঘরে যেদিন শোকের কান্না, যেদিন লোকসানের আলোড়ন, সেদিন তার বাড়িতে আগন্তুকদের অধিকার থাকে না। কলম্বোর অশান্ত আকাশের আতিথ্য সেদিন আমার কাছে তেম্‌নি সঙ্কুচিত হ'য়ে গিয়েছিল, মনটা নিজেকে বেশ মেলে দিয়ে বস্‌বার জায়গা পাচ্ছিল না। বাহির জগতের প্রথম গেট্‌টার কাছেই অভ্যর্থনায় ঔদার্য্যের অভাব দেখে মনে হ'ল, আমার নিমন্ত্রণের ভূমিকাতেই কোন্ কুগ্রহ এমন করে' কালী ঢেলে দিলে? দরজাটা খোলা থাক্‌লে হবে কি, নিমন্ত্রণকর্ত্তার মুখে যে হাসি নেই।

এমন সময়ে এই বিমর্ষ দিনের বিমুখতার মধ্যে একটি বাঙালী ঘরের বালিকার একখানি চিঠি পাওয়া গেল। এই বালিকাই কিছুকাল পূর্ব্বে আমার শিলঙ্‌বাসের একটি পদ্যময় বর্ণনার জরুরী দাবি করে' তাড়া দিয়েছিল। সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করিনি। এবার সে আমার এই প্রবাস-যাত্রায় মঙ্গলকামনা জানিয়েচে। মনে হ'ল বাঙালী মেয়ের এই শুভ-ইচ্ছা আমার আজকের দিনের এই বদ্-মেজাজী ভাগ্যটাকে অনুকূল করে' তুল্‌বে।

পুরুষের আছে বীর্য্য, আর মেয়েদের আছে মাধুর্য্য, এ কথাটা সব দেশেই প্রচলিত। আমরা তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করেচি, আমরা বলি মেয়েদের মধ্যে মঙ্গল। অনুষ্ঠানের যে-সকল আয়োজন, যে-সকল চিহ্ন শুভ সূচনা করে, আমাদের দেশে তার ভার মেয়েদের উপর। নারীশক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসে যাত্রায় বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদের জোর বেশি বলে' জানি। মনে হয় যেন ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের প্রার্থনা নিয়ত উঠ্‌চে দেবতার কাছে, ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মত। সে প্রার্থনা তাদের সিঁদুরের ফোঁটায়, তাদের কঙ্কণে, তাদের উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে মেয়েরাই দেয় ভাই-ফোঁটা। আমরা জানি সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিল। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ।

তার মানে, আমরা এক-রকম করে' এই বুঝেচি, প্রেম জিনিষটা কেবল যে একটা হৃদয়ের ভাব তা নয়, সে একটা শক্তি, যেমন শক্তি বিশ্বের ভারাকর্ষণ। সর্ব্বত্রই সে আছে। মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন কর্‌চে সেই শক্তিই ত লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী-সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।

সঙ্গীতে সৌন্দর্য্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ! সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনি সুন্দরের আবির্ভাব।

পুরুষের কর্ম্মপথে এখনো তার সন্ধান চেষ্টার শেষ হয়নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলি সে পথ খনন করচে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্ত্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানেনি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে।

নারী-প্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুট্‌তে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েচে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী, তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই! প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য তার দেহে মনে পর্য্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েচে ব'লেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্য্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্ম্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যা'কে আমরা সভ্যতা বলি, সে হ'ল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।

তানের বেগে চঞ্চল গান তার সুরসঙ্গের প্রবাহ বহন করে' ছোট্‌বার সময় যেমন নিজের কল্যাণের জন্যেই একটা মূল লয়ের মূল সুরের স্থিতির দিকে সর্ব্বদাই ভিতরে ভিতরে লক্ষ্য রাখে, তেমনি গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্ব্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখ্‌তে চায়, পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন করে' চল্‌বার সময় সুন্দরের প্রবর্ত্তনার অপেক্ষা রাখে। সেই স্থিতির ফুলই হচ্চে নারীর মাধুর্য্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্চে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্চে নারীর শ্রীসৌন্দর্য্য।

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্ত্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তাহ'লেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েচে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে' করে' আন্‌চে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্ব্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে' মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেচে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেচে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে' রাখ্‌বার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেচে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়্‌ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগ্‌ল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্ত্তনায় কি করে' পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে' প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'ল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

যে কথাটা বল্‌তে সুরু করেছিলুম সে হচ্ছে এই যে, পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও সমাপ্তি নেই, এইজন্যেই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্যে তার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য্য এই রসই তাকে পান করায়। পুরুষের সংসারে কেবলি চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙা-গড়ার আবর্ত্তন। এই নিরন্তর প্রয়াসে তার ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হ'য়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণের লীলা। বাতাসে লতার আন্দোলনের মত, বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটবার মতই এই লীলা সহজ, স্বতস্ফূর্ত্ত; চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তের পক্ষে পূর্ণতার এই প্রাণময়ী মূর্ত্তি নিরতিশয় রমণীয়। এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে, তা নয়, তাকে বল দেয়,—তার সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদ্‌ঘাটিত করে' দিতে থাকে। আমাদের দেশে এইজন্যে পুরুষের

সাধনায় মেয়েকে শক্তি বলে' স্বীকার করে। কর্ম্মের প্রকাশ্য-ক্ষেত্রে এই শক্তিকে দেখিনে; ফুলকে দেখি প্রত্যক্ষ কিন্তু যে গূঢ়-শক্তিতে সেই ফুল ফোটায় তা'কে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। পুরুষের কীর্ত্তিতে মেয়ের শক্তি তেম্‌নি নিগূঢ়।

২৯ সেপ্টেম্বর।

যে-মেয়েটি আমাকে শুভ-ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল তার চিঠিতে একটি অনুরোধ ছিল, "আপনি ডায়ারি লিখ্‌বেন।" তখনি জবাব দিলুম "না, ডায়ারি লিখ্‌ব না।" কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেচে বলে'ই যে সেই কথাটা অটল সত্যের গৌরব লাভ কর্‌বে এত-বড় অহঙ্কার আমার নেই।

তার পর ২৮ তারিখে জাহাজে উঠ্‌লুম। বাদলার হাওয়া আরো যেন রেগে উঠ্‌ল—সে যেন একটা অদৃশ্য প্রকাণ্ড সাপের মতো জাহাজটার উপর ক্ষণে-ক্ষণে ছোবল মেরে ফোঁস-ফোঁস কর্‌তে লাগ্‌ল। যখন দেখ্‌লুম দুর্দ্দৈবের ধাক্কায় মনটা হার মান্‌বার উপক্রম কর্‌ছে, তখন তেড়ে উঠে' বল্‌লুম, "না, ডায়ারি লিখ্‌বই।" কিন্তু লেখ্‌বার আছে কি? কিছুই না, যা-তা লিখ্‌তে হবে। সকল লেখার সেরা হচ্চে যা-তা লেখা। যথেচ্ছাচারের অধিকার রাজার অধিকার।

বিশেষ কোনো-একজনকে চিঠি লেখ্‌বার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সাম্‌নে পাওয়া যেত, তা হ'লে তারই নিভৃত-ছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে-বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জ্বেলে নিজের কাছেই নিজে বক্‌তে বস্‌লুম। আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়। সংসারে যখন মনের মতো দ্বৈত দুর্লভ হ'য়ে ওঠে, তখনি মানুষ অদ্বৈত-সাধনায় মনকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চায়। কারণ, সকলের চেয়ে দুর্ব্বিপাক হচ্চে অ-মনের মতো দ্বৈত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভারতীয় শ্রমজীবী

শ্রী রজনীকান্ত দাস এম্‌-এ, এম্‌-এস্‌সী, পি-এইচ্‌ডি

১। এদেশে বাসকালীন অবস্থা

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবাসী ভারতীয়দের অধিকাংশই পঞ্জাব-প্রদেশস্থ হোসিয়ারপুর, জালন্ধর, অমৃতসর, লাহোর, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর প্রভৃতি জেলা হইতে গিয়াছে। তবে তাহাদের মধ্যে, গুজরাত, বাংলা, ও অযোধ্যা-প্রদেশেরও কতিপয় লোক ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইসকল ভারতীয়দের প্রায় অধিকাংশেরই জন্ম ভারতের পল্লী-অঞ্চলে এবং ব্যবসায় কৃষিকর্ম্ম। ইহাদের কেহ-কেহ বৃটিশ ভারতীয় গবর্ণমেন্টের সৈন্য-বিভাগ-কর্ত্তৃক রিক্রুট্ হইয়া পল্টনের বা পুলিশ-বিভাগের কাজে বিদেশে প্রেরিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ লোকই আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে পল্লী-গামে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আর ইহাদের সামান্য কয়েকজন মাত্র বেতনভুক্ শ্রমজীবী ছিল।

উল্লিখিত কৃষকদের অধিকাংশেরই চাষে প্রায় ১০০ হইতে ২৫০ বিঘা পর্য্যন্ত জমি ছিল। সেই জমি উর্ব্বরা থাকিলেও উহাদের চাষবাসের প্রণালী সেকেলে ধরণের ছিল। কৃষিকার্য্যের যন্ত্রগুলি সাদাসিধে এবং বেশীর ভাগই বর্ত্তমান-কালের উপযোগী নয়। তাহারা যে-সব শস্য উৎপন্ন করিত, সেসকলের মধ্যে গম, যব, ইক্ষু, জোয়ার, ছোলা, মটর, তুলা, তরমুজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। কানাডায় প্রবেশ

যেসমস্ত ভারতীয় সর্ব্বপ্রথম কানাডায় যায়, তাহারা তৎপূর্ব্বে শাংহাই, হংকং ও পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য স্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পল্টনে বা পুলিশে কাজ করিত।

চীনে "মুষ্টিযোদ্ধা"র দলের লড়াইয়ের (Boxer War) সময় ইহারা ভিন্নরাষ্ট্রীয় লোকদের সংশ্রবে আসে এবং আন্তর্জাতিক সংগ্রামে নিজেদের সাহায্যের আবশ্যকতা বুঝিতে পারে। বিদেশ-ভ্রমণে ও সাগর পাড়ি দেওয়ায় ইহাদের দেশ-বিদেশ পর্য্যটনের স্পৃহা বাড়িয়া ওঠে। এইকারণে কিয়দংশ লোক চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, বা বিদায় লইয়া প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া কানাডায় যায়।

এই প্রথম-আগত ভারতীয়গণ ব্যতীতও আর-এক দল শিখ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর হীরক-জুবিলির পরে কানাডার ভিতর দিয়া পর্য্যটন করায় সময় ঐ দেশে পণ্যদ্রব্য-উৎপাদন-সম্পর্কিত সমৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে ইহা লক্ষ্য করে। সেই-সময় তাহাদের কেহ-কেহ ঐ দেশে থাকিয়া যায় এবং অবশিষ্ট লোকেরা ঐ সংবাদ লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসে।

এই যে দুই দল ভারতীয় কানাডায় গমন করে, তাহারা সংখ্যায় বড় কম ছিল; কিন্তু যখন হইতে তাহাদের প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবগণ তাহাদের অল্পাধিক কৃতকার্য্যতার কথা শুনিতে পাইল, তখন হইতেই বড়-বড় দলে তাহারা কানাডায় যাওয়া আরম্ভ করিল এবং তাহার পরে তিন বৎসর ধরিয়া অধিকতর বড়-বড় দল তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

তালিকা—১

কানাডায় ভারতবাসীর প্রবেশ।[১]

হিসাব-সম্পর্কিত বৎসর	সংখ্যা
১৯০৫ … … …	৪৫
১৯০৬ … … …	৩৮৭
১৯০৭ … … …	২১২৪
১৯০৮ … … …	২৬২৩
মোট—	৫১৭৯

১। Canada, Report of the Royal Commission, p. 75.

১৯০৮ সালের পর কানাডার গবর্ণমেণ্ট্ এক নূতন কার্য্য-প্রণালী অবলম্বণ করেন, তাহার ফলে ভারতীয়-দের আগমন প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। নিম্নের তালিকা দেখিলে ইহা বুঝা যাইবে।

তালিকা—২

কানাডার ভারতবাসীর প্রবেশ। ২

হিসাব-সম্পর্কিত বৎসর				সংখ্যা
১৯০৯	...	...	...	৬
১৯১০	...	...	...	১০
১৯১১	...	...	...	৫
১৯১২	...	...	...	৩
১৯১৩	...	...	...	৫
১৯১৪	...	...	...	৮৮
১৯১৫	...	..	...	০
১৯১৬	...	...	...	১
১৯১৭-২০	...	...	...	০
				মোট—১১৮

উল্লিখিত তালিকা-দুইটি হইতে দেখা যাইবে, যে, স্থলে প্রথম চারি-বৎসরে ৫১৭৯ জন ভারতবাসী কানাডার উপকূলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, সে-স্থলে ১৯০৯ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ১২ বৎসরে কানাডায় প্রবিষ্ট ভারতবাসীদের সংখ্যা মাত্র ১১৮ জন।

প্রায় ঠিক সেই-সময়েই বহুসংখ্যক লোক কানাডার বন্দরে প্রবেশে বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল। ৩

তালিকা—৩

কানাডায় প্রবেশের বাধা-প্রাপ্ত প্রবেশেচ্ছু ভারতীয়গণ।

বর্ষ				সংখ্যা
১৯০৬	...	...	...	১৮
১৯০৭	...	...	...	১২০
১৯০৮	...	...	...	২১৮
১৯০৯	...	...	...	৪
১৯১০	...	...	...	৬
১৯১১	...	...	...	০
১৯১২	...	...	..	২
১৯১৩	...	...	...	৮
১৯১৪	...	...	...	১৪
				মোট-৩৯০

উল্লিখিত ৩নং তালিকায় দেখা যায় যে, ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৯০ জন ভারতীয় কানাডায় বন্দরসমূহ হইতে বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

ঐ-সময়ের মধ্যে কানাডায় প্রবেশের পরেও কতিপয় ব্যক্তি দেশ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিল। ১৯০৮-০৯ হইতে ১৯১৩—১৪ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে ২৯ জন লোক কানাডা হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিল। নিম্নে তালিকা দেওয়া হইল।

তালিকা—৪

কানাডা হইতে বহিস্কৃত ভারতীয়গণ

বর্ষ			সংখ্যা
১৯০৮—০৯	...	...	২৪
১৯০৯—১০	...	...	১
১৯১০—১১	...	...	১
১৯১১—১২	...	...	২
১৯১২—১৩	...	...	১
১৯১৩—১৪ (৪)	...	...	০
			মোট—২৯

কারণ

ভারতীয়দের কানাডা প্রবেশের মূল কারণ অর্থ-সম্পর্কীয়। কানাডায়, বিশেষভাবে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়, প্রাকৃতিক সম্পদ্ প্রচুর কিন্তু জন-সংখ্যা কম, আর এদিকে ভারতে জন-সংখ্যা বহুল কিন্তু তদনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদ্ হীন; এবং মজুরের বেতন অল্প—এই-হেতু কানাডায় তাহারা আয়ের একটি মস্ত সুযোগ দেখিতে পাইয়াছিল। এরূপে যে-ভারতবাসী দেশে থাকিয়া দৈনিক ।৵০-॥০ মাত্র উপার্জ্জন করে, সে কানাডায় গিয়া রোজ ৬৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পাইতে পারে। ভারতীয়গণ কিরূপে এই আর্থিক সুবিধার সন্ধান পাইল সে-সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ রহিয়াছে।

প্রাচ্য দেশবাসী শ্রমজীবীগণ কি কারণে কানাডায় আকৃষ্ট হয় তাহার অনুসন্ধানের জন্য ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয়, তাহার রিপোর্টে ভারতীয়

২— The Canada Year Book 1920. The Dominion [Bu]reau of Statistics, p. 125

৩ Canada, Rept. of the Sup. of Immigration for 1913-14, p. 76

৪। মাত্র নয় মাসের।

শ্রমজীবীগণের কানাডা-প্রবেশের নিম্নলিখিত কারণগুলি পাওয়া যায়। ৫

(১) নিজ স্বার্থ-সম্পাদনের জন্য কতিপয় জাহাজ-কোম্পানী ও তাহাদের প্রতিনিধিগণের নানা চেষ্টা।

(২) কানাডাস্থিত কতিপয় ব্যবসায়ীর প্রচার কার্য্য; এই ব্যবসায়ীরা সস্তায় শ্রমজীবী পাইবার জন্য কানাডার আর্থিক সচ্ছলতা বর্ণনা করিয়া মুদ্রিত পত্র প্রচার করিয়াছিল।

(৩) কানাডার অর্থ শোষণ করিবার জন্য যাহারা নিজ দেশবাসীগণকে তথায় আনিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের চেষ্টা।

ইহা এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, প্রাচ্য-দেশীয় শ্রমজীবীদের আগমন কমাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং গোড়া হইতেই বাধা-মূলক আইন কমিশনের কর্ত্তাদের মনে ছিল। এই হেতু পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধানের ফল রাষ্ট্রনীতি দ্বারা অল্লাধিক রঞ্জিত হওয়া সম্ভব।

যেসমস্ত আত্মীয়-স্বজন কানাডায় যাইয়া কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল এবং ঐ-দেশের শিল্পজনিত অর্থাগমের সুবিধা দেখিতে পাইয়াছিল, তাহাদের সহিত পত্রব্যবহার করিয়া ঐ-দেশে যাইবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা জন্মে, উহাই ভারতীয়দের কানাডা-যাত্রার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বিদেশ পর্য্যটন-স্পৃহা ও অর্থাগমের সুবিধা-দর্শন, এই দুইটিতে মিলিয়া উহাদিগকে কানাডায় প্রবাসী হইতে উৎসুক করিয়াছিল।

উহারা এমন এক সৌভাগ্যময় ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল যে, তাহারা নিজ-নিজ সম্পত্তি বা ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক দিয়াও পথের খরচ সংগ্রহ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে সুদের হার অত্যন্ত বেশী; বিশেষভাবে অল্প টাকার সুদ অত্যন্ত চড়া। তাহাদের অনেকে শতকরা ১৫ হইতে ২০ পর্য্যন্ত সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই আশা ছিল,যে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে।

প্রায় কোন ভারতীয়ই কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে যায় নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়া কয়েক-বৎসর পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা। আমেরিকা-প্রবাসী, ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশের শ্রমজীবীদের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যই রহিয়াছে। অবশ্য কানাডায় আসিবার পর তাহাদের কেহ-কেহ তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ দেশে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করিতেও ইচ্ছুক হইয়াছে।

বাধা-প্রদান

পূর্ব্ব হইতেই জাপান ও চীন-দেশীয় আগন্তুকদের সম্বন্ধে কানাডাবাসীদের মন বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল; তাহার উপর ১৯০৭ ও ১৯০৮এ যে বড়-বড় দুই দল ভারতবাসী কানাডায় প্রবেশ করে, তাহাদিগকে দেখিয়া সঞ্চিত-বিদ্বেষ নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে। তাহারি ফলে ঐ-বিষয়ে তদন্তের জন্য ১৯০৭ সালের রাজকীয় কমিশন বসান হয়। ঐ কমিশন প্রাচ্য-দেশীয়, তথা ভারতীয়, শ্রমজীবীগণের প্রবেশ রোধ করিতে বা সংযত করিতে আইন-প্রণয়নের উপদেশ দেয়। আইন-প্রণয়নের পূর্ব্বে মিঃ ডব্লিউ,এল্,ম্যাকেঞ্জি-কিং (শ্রমবিভাগের সহকারী সচিব,) ১৯০৮ সালে বিলাতে প্রেরিত হন। ঐসময়ে কানাডার ও বিলাতের গবর্ণ্‌মেণ্টের যে-মন্ত্রণা ও পত্র-ব্যবহারাদি চলিয়াছিল, তাহার বিবরণ গোপনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রহিয়াছে। ৬ কিন্তু ঐ মন্ত্রণাদির ফলেই প্রকৃত-পক্ষে কানাডায় ভারতবাসীদের প্রবেশ বন্ধ হয়। কানাডা গবর্ণ্‌মেণ্টের মতে বাধামূলক আইন করিবার উদ্দেশ্য

(১) ভারতীয়গণকে কানাডার দুরন্ত আব্‌হাওয়া-জনিত কষ্ট হইতে রক্ষা করা।

(২) জাতি-বিদ্বেষ ও তজ্জনিত গোলমাল এড়ানো।

(৩) কানাডার শ্রমজীবীদের জীবনের ও পারিবারিক কর্ত্তব্যের এবং সামাজিক দায়িত্বের উন্নত আদর্শ রক্ষা করা।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট উপায়গুলি অবলম্বিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ যেসমস্ত জাহাজ-কোম্পানী ভারতের

5. Canada Sessional Papers, 1907-08, Vol 17 No. 36a, 1908, p. 8.

(৬) Canada Sessional Papers, 1907-08 Vol 17, no. 36a, p. 7.

লোকদিগকে কানাডাবাসী করিবার জন্য কিছুমাত্র দায়ী ছিল।

কানাডার ও ভারতের গবর্ণমেণ্ট্ তাহাদিগের কার্য্যাবলীর নিন্দা করেন।

দ্বিতীয়তঃ—ক্যানাডার শিল্পসম্পর্কিত সমৃদ্ধির সুবিধা বর্ণনা করিয়া কোন মুদ্রিত পত্রিকা যাহাতে প্রচারিত না হইতে পারে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয়তঃ—১৮৮৩ সালে ভারতীয় অন্তর্গমন আইনের ব্যবস্থা মতে সিংহল, প্রণালী-উপনিবেশ ও অন্যান্য দেশে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমজীবী প্রেরণ বিশেষ-বিশেষ কারণ ব্যতীত আইন-বিরুদ্ধ ছিল। যদিও এই আইন চুক্তিবদ্ধ শ্রমজীবী-সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য ছিল, তথাপি উহা কানাডায় আগত ভারতীয়দের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইল।

চতুর্থতঃ—কানাডায় নবাগত লোককে যে ৭৫ টাকা সঙ্গে দেখাইয়া অবতরণ করিতে হইত, তাহার পরিমাণ কাউন্সিলে আইন করিয়া ৬০০ টাকা করা হয়।

সর্ব্বশেষ এবং বিশেষ শক্ত বাধা হইয়াছিল অন্তর্গমন আইনের প্রয়োগ। ঐ আইনানুসারে যাহারা স্বদেশে টিকিট না কিনিয়া বা স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া পথে অন্য কোথাও অপেক্ষা করিয়া কানাডায় যাইত, তাহাদিগকে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয়দিগের পক্ষে ঐ বাধা হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ছিল না। কাজেই ঐ আইনে প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিকদের আগমন বারিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত আইন দ্বারা যে কানাডা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কানাডায় আগত ব্যক্তিদের সংখ্যার (২৬২৩) সহিত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আগত ব্যক্তিদের সংখ্যা (৬) তুলনা করিলে সহজেই বুঝা যায়।

৩। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ

১৯০০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে দেখা যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২০৫০ জন ভারত হইতে আগত রহিয়াছে।

ইহাদের প্রায় সকলেই বিদ্যার্থী বা ব্যবসায়ী; কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভিন্ন-দেশীয়। (৭) ১৮৯৯ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া দোকানে বিক্রেতার কর্ম্ম আরম্ভ করে, পরে সে শ্রমজীবী হয়। (৮) প্রথম কয়েক বৎসর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রে আগত ভারতীয়দের সংখ্যা নগণ্য ছিল, কিন্তু ১৯০৪ অব্দ হইতেই তাহারা বড়-বড় দলে আসিতে আরম্ভ করে। নীচে তালিকা দেওয়া হইল।

তালিকা—৫

বৎসর	১৮৯৯—১৯০৭	সংখ্যা (৯)
১৮৯৯	...	১৫
১৯০০	...	৯
১৯০১	...	২০
১৯০২	...	৮৪
১৯০৩	...	৮৩
১৯০৪	...	২৫৮
১৯০৫	...	১৪৫
১৯০৬	...	২৭১
১৯০৭	...	১০৭২
		মোট—১৯৫৭

৫নং তালিকা হইতে দেখা যায় ১৮৯৯ হইতে ১৯০৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১৯৫৭ জন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। ঐসময়ের মধ্যে তাহাদের অনেকে চলিয়াও আসে, কিন্তু ঐসমস্ত লোকদের সম্বন্ধে কোন বিবরণী পাওয়া যায় না। ১৯০৮ অব্দ হইতে বিদেশাগত লোকদের আসা-যাওয়া পৃথক্‌ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

(৭) The immigration is reported both by country and by race. The writer has collected the statistics by race; as a large number of persons of other races is liable to be included in the list reported by country.

(৮) Mr. Bakais Singh, now a resident of Astoria Oregon. He has been back and forth several times and finally returned to this country in 1910 with his family.

(৯) U. S. Report of the Commissioner General of Immigration 1919-20, pp. 181-182.

তালিকা—৬

বর্ষ		প্রবিষ্ট		বহির্গত
১৯০৮	...	১৭১০	...	১২৪
১৯০৯	...	৩৩৭	...	৪৮
১৯১০	...	১৭৮২	...	৮০
১৯১১	...	৫১৭	...	৭৫
১৯১২	...	১৬৫	...	১৬৪
১৯১৩	...	১৮৮	...	২১৩
১৯১৪	...	১৭২	...	১৪৩
১৯১৫	...	৮২	...	১৬২
১৯১৬	...	৮০	...	৯১
১৯১৭	...	৬৯	...	১৩৬
১৯১৮	...	৬১	...	১৫৪
১৯১৯	...	৬৮	...	১০৬
১৯২০	...	১৬০	...	১৬২
		৫৩৯১		১৬৫৪

৬নং তালিকায় দেখা যায় ১৯০৮ হইতে ১৯২০ অব্দ পর্য্যন্ত ৫৩৯১ জন ভারতবাসী যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হয়, কাজেই ১৮৯৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত মোট ৭৩৪৮ জন লোক (৫ম ও ৬ষ্ঠ তালিকার সমষ্টি) যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ লাভ করে। আর ঐসময়ের মধ্যে ১৬৫৮ জন তথা হইতে চলিয়াও আসে। ঐ তালিকায় আরও দেখা যায় শেষের কয়েক বৎসরে অপেক্ষাকৃত বেশীসংখ্যক লোক যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করে। ১৯১২ অব্দে ১৬৫ জন যুক্তরাষ্ট্রে যায়, ১৬৪ জন তথা হইতে চলিয়া আসে। ১৯১৩ অব্দে ১৮৮ জন যায়, ২১৩ জন চলিয়া আসে, কেবল ১৯১৪ অব্দে যত লোক চলিয়া আসে, তদপেক্ষা বেশী লোক প্রবেশ করিয়াছিল। আবার ১৯১৫ অব্দ হইতে প্রবিষ্ট লোকদের অপেক্ষা বহির্গত লোকদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৯১৫ হইতে ১৯২০ অব্দ পর্য্যন্ত ৫২০ জন লোক প্রবেশ করে, ৮১১ জন চলিয়া আসে। আর যাহারা চলিয়া আসিতে প্রস্তুত ছিল তাহাদের সংখ্যা আরও বেশী ছিল।

এ কথা উল্লেখ থাকা উচিত যে ১৯০৭ পর্য্যন্ত যে-সব লোক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বসবাস বা উপার্জ্জনের জন্য যায় নাই এমন লোকও ছিল। ১৯০৮ অব্দের পর হইতে অবশ্য এই শ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ করিয়া হিসাবে লেখা হয়। ঐসময় হইতে এই শ্রেণীর লোকদের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। তাহারা বিদ্যার্থী, ব্যবসায়ী অথবা ভ্রমণকারী। ইহাদের প্রবেশ ও বহির্গমন নিম্নের তালিকায় দেখান হইল।

তালিকা ৭।

অ-প্রবেশকামী ভারতীয়গণের প্রবেশ ও বহির্গমন।১২

বর্ষ		প্রবিষ্ট (১৩)		বহির্গত (১৪)
১৯০৮	...	২০	...	১৮০
১৯০৯	...	১১৩	...	৫৫
১৯১০	...	৮৬	...	৯৮
১৯১১	...	৫৮	...	১৭৭
১৯১২	...	৫৬	...	১৪৮
১৯১৩	...	৪৫	...	১২২
১৯১৪	...	৫১	...	১৮৮
১৯১৫	...	৫৩	...	২৫৬
১৯১৬	...	৪৮	...	১০০
১৯১৭	...	৫০	...	৫২
১৯১৮	...	৪০৪	...	৪২
১৯১৯	...	৫৭১	...	৩০
১৯২০	...	১২১	...	৪২
		১৬২৬		১৪৯৭

৭নং তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯০৮ হইতে ১৯২০ অব্দের মধ্যে ১৬২৬ জন ভারতীয় বসবাস করিবার ইচ্ছা না লইয়া তথায় প্রবেশ করে এবং ১৪৯৭ জন তথা হইতে ফিরিয়া আসে। ঐ সমষ্টি দুইটির প্রথমটি দ্বিতীয়টি হইতে ১২৯ বেশী।

প্রত্যাখ্যাত

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবিষ্ট লোকগণ ব্যতীতও ১৯০৮ হইতে

(১২) Adapted from the table iv of the Annual Report of the Commissioner General of Immigration for the year indicated.

(১৩) By country. Annual Report of the Commissioner General of Immigration for 1908, p. 51.

(১৪) By country. Ibid, p. 88.

১৯২০ অব্দের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক প্রবেশের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমূহ হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। তাহাদের তালিকা দেখানো হইতেছে।

তালিকা ৮

যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ। (১৫)

বৎসর	সর্ব্বসাধারণের গলগ্রহ হওয়ার মতন অবস্থা	মানসিক ও শারীরিক ত্রুটি-সম্বন্ধে ডাক্তারের মত—উপার্জ্জনের অযোগ্যতা	মারাত্মক ব্যাধি		চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক	বহুবিবাহ	নিষিদ্ধ ভৌগোলিক সীমা	অন্যান্য কারণ	মোট
			ট্রাকোমা	অন্যান্য					
১৯০৭(১৬)	২৮৬	—	১০২		২৯	—	—	—	৪১৭
১৯০৮	২৮৬	১০৭	১৯২	১	২০	—	—	—	৬০৬
১৯০৯	১৪৬	৬৪	৯৪	২	১৭	১৬	—	—	৩২৯
১৯১০	২০০	১৬	১৬১	৭	৭	১৮	—	—	৪-৯
১৯১১	৫৩৬	৬৪	১০৫	১৫১	৮	২৭	—	—	৮৬১
১৯১২	৫৮	৫	৭	২২	৪	৩	—	--	৯৯
১৯১৩	১৫৯	৮	১৮	২৩	২৩	৩	—	—	২৩৪
১৯১৪	১১৫	৬	১৯	৪	১১	২	—	—	১৫৭
১৯১৫	২১১	১৪	৪২	২৮	৩	২	—	—	৩০০
১৯১৬	৩৬	৩	২	১	১	১	—	—	৪৪
১৯১৭	১৭	১	—	৫	—	১	—	—	২৪
১৯১৮	৪	—	—	—	—	—	১৩	—	১৭
১৯১৯	২	—	—	—	—	—	১৮	—	১৮
১৯২০	—	—	—	—	—	—	২২	৪	২৮
	২০৫৬	২৪৮	৬৬২	২৪৪	১২৩	৭৩	৫৩	৪	৩৫৪৩

৮নং তালিকায় দেখা যায় ১৯০৮ হইতে ১৯২০ অব্দের মধ্যে ৩৫৪৩ জন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমূহ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায়, যে-সময়ের মধ্যে ৬নং তালিকানুসারে ৫৩৯১ জন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমূহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে-স্থলে ৩৫৪৩ জন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। ঐ প্রত্যাখ্যাতদের মধ্যে ২০৫৬ জনের অথবা শতকরা ৫৮ জনের প্রবেশের বিরুদ্ধে কারণ এই যে, তাহারা ঐ-দেশের গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ৯০৬ জনের বা শতকরা ১৬'৭ জনের সম্বন্ধে কারণ তাহাদের ট্রাকোমার মতন সাংঘাতিক ব্যাধি ছিল, ২৪৮ জনের বিরুদ্ধে কারণ ডাক্তারের পরীক্ষায় তাহারা ক্ষীণস্বাস্থ্য ও জীবিকা-উপার্জ্জনের অযোগ্য; ১২৩ জন বারিত হয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপে আসার দরুন্; আর ৭৩ জনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ধর্ম্মে বহু বিবাহের বিধি বা প্রশংসা আছে বলিয়া, আর ৫৩ জনকে নিবারণ করা হইয়াছে এই-কারণে যে, তাহারা অন্তঃপ্রবেশ-আইনে (১৯১৭) নিষিদ্ধ দেশ হইতে গিয়াছিল বলিয়া।

বহিষ্কার

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রত্যাখ্যাত লোকদের ছাড়াও এমন অনেক ভারতীয় ছিল যাহাদিগকে প্রথমে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় কিন্তু পরে আবার বহিষ্কৃত করা হয়। নিম্নের তালিকায় তাহাদের সংখ্যা দেখানো হইল।

(১৫) Adapted from Table XVIII of Annual Reports of the Commissioner General of Immigration.
(১৬) Table III, Report of the Commissioner General of Immigration for 1907 pp. 16-17.

তালিকা—৯।

যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত ভারতবাসী (১৭)

বর্ষ	সর্ব্বসাধারণের গলগ্রহ হওয়ার ভয়	বিনা-পরীক্ষায় প্রবেশ	নিষিদ্ধ ভৌগোলিক সীমা হইতে প্রবেশ	অন্যান্য কারণ	মোট
১৯০৭-০৮ (১৮)	...	৮	...	১	৯
১৯০৮-০৯	...	১	...	...	১
১৯০৯-১০	...	৪	...	...	৪
১৯১০-১১	২	৩৪	...	...	৩৬
১৯১১-১২	১	৪	...	৬	১১
১৯১২-১৩	২১	৯	...	২	৩২
১৯১৩-১৪	২৫	৬	...	১১	৪২
১৯১৪-১৫	১৮	১৫	...	২	৩৫
১৯১৫-১৬	১৪	২৩	...	১	৩৮
১৯১৬-১৭	৩	২	...	১	৬
১৯১৭-১৮	১	১	...	...	২
১৯১৮-১৯	১	১	৮	১	১১
১৯১৯ ২০	২	...	১৯	১	২২
	৮৮	১০৮	২৭	২৭	২৪৯

৯নং তালিকাতে দেখা যায়—আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে দিয়া পরে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে এমন ভারতবাসীর সংখ্যা ২৪৯। ইহাদের মধ্যে ৮৮ জন বা শতকরা ৩৫·৩ জন সর্ব্বসাধারণের গলগ্রহ হইতে পারে বলিয়া তাড়িত হইয়াছিল, আর ১০৮ জন উপযুক্তভাবে পরীক্ষিত না হইয়া প্রবেশের দরুন্ বহিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারা প্রথমে নাবিকরূপে তথায় প্রবেশ করে, কিন্তু পরে ঐ দেশ ত্যাগ করে নাই। ইহাদের প্রায় সকলেই পূর্ব্ব-উপকূলস্থ বন্দরসমূহে ছিল। ২৭ জন বা শতকরা ১০·৮ জন আইননিষিদ্ধ দেশ হইতে আগত বলিয়া বারিত হয়। ২৫ জন বা শতকরা ১০·৪ জন অপরাধী, বেশ্যা বা চুক্তিবদ্ধ শ্রম ইত্যাদি অজুহাতে তাড়িত হয়।

(১৭) Adapted from Table XVIII, Annual Report of the Commissioner General of Immigration.

(১৮) Table IIIA, Annual Report of the Commissioner General of Immigration for 1907-08, p. 18.

কারণ

যে-ই কারণে ভারতবাসীরা কানাডায় প্রবেশ করে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার মূল কারণও ঠিক্ তাহাই। তথায় শ্রমদ্বারা সমৃদ্ধি-লাভেরসম্ভাবনা দেখিয়াই তাহারা দেশ ছাড়িয়া যুক্তরাষ্ট্রে যায়।

কতকগুলি ভারতীয় বৃটিশ কলম্বিয়া হইতে যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসে। তাহারা সীমান্ত ছাড়াইয়া ওয়াশিংটন, ওরিগণ ও কালিফর্ণিয়ায় উপনীত হয়। কালিফর্ণিয়ার সুন্দর জলবায়ুই এই দেশ-পরিবর্ত্তনের কারণ। কিন্তু ইহা-ব্যতীতও একটি বিশিষ্ট কারণ ছিল। উহারা বাল্যকাল হইতেই কৃষিকার্য্যে অভ্যস্ত। কাজেই কালিফর্ণিয়ার চাষ-বাসের সুবিধার প্রলোভন তাহারা সহজে সাম্‌লাইতে পারিল না। অধিকন্তু, ভারতবর্ষে তাহাদের প্রায় সকলেরই বাস্তু ও চাষবাসের জমি ছিল। ভূ-সম্পত্তি থাকিলে যে স্বাধীনতার স্পৃহা বর্ত্তমান থাকে, উহা তাহাদের জীবনে মজ্জাগত। কাজেই যখন তাহারা দেখিল যে, কালিফর্ণিয়ায় ভূমি কেনা যায় বা ইজারা লওয়া যায়, তখনই তাহারা দক্ষিণমুখে চলিয়া আসিল। ক্রমশঃ তাহাদের অধিকাংশই উত্তর কালিফর্ণিয়ায় ধানের জমি ও দক্ষিণ কালিফর্ণিয়ায় তুলার জমিতে আসিয়া জুটিল।

বাধা-প্রদান

১৯০২অব্দে ৮৪জন ভারতবাসী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে, কিন্তু ১৯১০-অব্দে ঐ সংখ্যা ১৭১০ জনে পৌছে। এইরূপ ক্রমাগত সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখিয়া বিদ্বেষ দেখা দিল। চীনা ও জাপানীদের আগমনে ইতিপূর্ব্বে এশিয়া-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতবাসীদের গমনে সেই আন্দোলন যেন নূতন প্রাণ পাইয়া চলিতে লাগিল। এশিয়ান্-বহিষ্কার-সঙ্ঘ-নামক সভা-বিশেষ জোরে কাজ চালাইতে লাগিল। উহাদের আন্দোলনে প্রবেশের সময় কড়াকড় পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং প্রবেশকামীদের অনেককে ফিরিয়া আসিতে হইল (১৯)। এই নীতির ফলস্বরূপ ১৯০৭খৃষ্টাব্দে যে-স্থলে ১৭১০জন প্রবেশ করিয়াছিল ১৯০৯অব্দে সে-স্থলে মাত্র ৩৩৭ জন প্রবেশ

(১৯) Cf. Report of the Commissioner General of Immigration for 1918-19, p. 59.

করিল। কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষে প্রবেশ বিষয়ক আইন একটু পরিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রবিষ্ট লোকদের সংখ্যা ১৭৮২তে উঠিল। ঐ বৃদ্ধির ফলে খবরের কাগজে ভয়ানক আন্দোলন প্রকট হইল।

প্রশিয়ান্ বহিষ্কার-সংঘ ও ঐ-ধরণের সভাগুলি ১৯১০ অব্দে (২০) ওয়াশিংটনস্থ বিদেশী প্রবেশ-বিভাগের সচিবের নিকট ভারতবাসীদের প্রবেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইল।

আন্দোলনে অভীষ্ট ফল ফলিল। বিশেষ কড়া বিধি প্রযুক্ত হওয়ায় প্রবিষ্ট লোকদের সংখ্যা ১৯১১ অব্দে ৫১৭ জনে এবং ১৯১৩ ও ১৯১৪ অব্দে কিছু বাড়িয়া (ঐ দুই সনে ক্রমে ১৮৮ ও ১৭২ জন প্রবেশ করে) ১৯১৫ অব্দে মাত্র ৮২ জনে নামিয়া যায়। পরবর্ত্তী ৪ বৎসর ধরিয়া ক্রমে আরো নামিয়া যায়। ঐ সময়ে মাত্র ২৭৮ জন প্রবেশ করে। ১৯২০ অব্দে সংখ্যা কিছু বাড়ে ও মাত্র ১৬০ জন ভারতবাসী ঐ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে।

ঐ সময়ে নানা আইনের প্রস্তাব হইতে অবশেষে ১৯১৭ অব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয়দের প্রবেশে বাধা দেওয়ার আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ঐ আইনের ৫৩ ধারা-মতে ভারতবর্ষ, শ্যাম, ইন্দোচীন, সাইবীরিয়ার কতকাংশ, আফগানিস্থান, আরব, মালয় দ্বীপপুঞ্জ 'নিষিদ্ধ দেশ' বলিয়া ঘোষিত হয়; এবং এই ৫০ কোটি লোকের বাসস্থান হইতে কোন লোকের যুক্তরাষ্ট্র-প্রবেশ অবৈধ করিয়া দেওয়া হয়। (২১) অবশ্য ভ্রমণকারী, বিদ্যার্থী ও রাজকর্ম্মচারীরা ঐ নিষেধের বাহিরে রহিলেন। এই আইনে ভারতীয় শ্রমজীবীর আগমন রহিত-করণে কৃতকার্য্য হইল।

(২০) The San Francisco Call, June 29, 1910, p. 7 c 1.

২১ Report of the Commissioner General of Immigration for 1918-19, p. 60.

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৩৫]

তারাসুন্দরী ক্রমশঃ দেহে পূর্ব্বশক্তি এবং সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং যথাপূর্ব্ব গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে বারাণ্ডায় বসিয়া তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিতেছিলেন এবং অদূরে মাধবী বসিয়া চর্‌কা কাটিতে-কাটিতে একমনে তাহা শুনিতেছিল, এমন-সময়ে তথায় বিমানবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিমানবিহারীর নূতন বেশ লক্ষ্য করিয়া তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "রাজবেশ ত্যাগ করে' এ তাপস-বেশ কেন, বাবা?"

বিমানবিহারী আজ খদ্দরের ধুতি, জামা ও চাদর পরিয়া আসিয়াছিল। সে স্মিতমুখে উত্তর দিল, "তাপস-বেশ ভিন্ন মাধবীর আশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, তাই। আজ মাধবীর চর্‌কা-ঘরে ঢুকে' দেখ্‌তে হবে কি তার মধ্যে আছে!"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া প্রথমটা মাধবীর মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার পর সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেখানে আপনাদের দেখ্‌বার মতন তেমন কিছুই ত নেই। তার জন্যে এত উয্‌যুগ করে' এসে শেষকালে ভারি নিরাশ হবেন!"

বিমানবিহারী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "একটা কৌতূহল অতৃপ্ত রাখা অপেক্ষা নিরাশ হওয়া ভালো। নিরাশ হওয়ার দুঃখের চেয়ে না-জানার যন্ত্রণা বেশী কষ্ট-কর!"

এ-কথাটা মাধবীর ভালো লাগিল না। তাহাদের চর্‌কা-ঘরকে বিমানবিহারী কি জাদুঘর অথবা চিড়িয়া-

খানার মতনই একটা-কিছু মনে করে যে, তদ্বিষয়ে কৌতূহল এবং নৈরাশ্যের কথা এমন করিয়া উঠিতেছে? সে তাহার মুখে-চোখে হাস্য-কৌতুকের কোনও চিহ্ন বর্ত্তমান না রাখিয়া ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, "চলুন, দেখ্‌বেন চলুন। কিন্তু তার মধ্যে তিমিমাছের কঙ্কালও নেই, কিম্বা সিন্ধুঘোটক, জলহস্তীও নেই যে, আপনার কৌতূহল তৃপ্ত হবে। আপনার পোষাকের খরচা পোষাবে না দেখ্‌ছি!"

কথাটা বলিয়াই কিন্তু মাধবী হাসিয়া উঠিল। তাহার বাক্যের দ্বারা বিমানবিহারীর প্রতি কতকটা রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে পারিবামাত্র হাস্যের দ্বারা সে তাহা যথাসম্ভব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিল।

বিমানবিহারী কিন্তু মাধবীর রূঢ়তা প্রকাশ অথবা রূঢ়তা অপনয়ন করিবার চেষ্টার কোনও হিসাব না লইয়া পূর্ব্ববৎ হাসিতে-হাসিতে বলিল, "খরচা পোষাবে কি পোষাবে না, সেটা ভবিষ্যতের কথা, তোমার ঘর না দেখে' তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু ঘর না দেখে' ফির্‌লে যে পোষাবে না তা ত নিশ্চয়ই! অতএব প্রথমে তোমার ঘরটা দেখাই যাক্।"

তারাসুন্দরী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "তোমার কোনও ভয় নেই বিমান, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তোমার খরচা পোষাবে।"

বিমান স্মিতমুখে বলিল, "তোমার অভয়বাণী আমার জীবনে সার্থক হোক, মা!"

চর্‌কা-ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেখিতে-দেখিতে এবং শুনিতে-শুনিতে বিমানবিহারীর মুখ আনন্দে, বিস্ময়ে, পুলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে প্রফুল্লমুখে বলিল, "তোমার এ-ঘরে কঙ্কাল নেই বটে মাধবী, কিন্তু কঙ্কাল ঢাক্‌বার ব্যবস্থা আছে! সৃষ্টি কর্‌বার গৌরবে তোমার এ-ঘর গৌরবান্বিত!"

মনে-মনে আনন্দিত হইয়া মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "এর সামান্য ব্যাপার আপনার ভালো লাগ্‌ছে?"

অসংশয়িত দৃঢ়স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "লাগ্‌ছে! একটি অতি ক্ষুদ্র বীজকণার মধ্যে একটা বিরাট্ বটগাছের সমস্ত সম্ভাবনা যেমন নিহিত থাকে, তেম্‌নি তোমার এই সামান্য চর্‌কা-ঘরটির মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের একটা বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে!"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া মুগ্ধস্বরে মাধবী বলিল, "এ আপনি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন, বিমানবাবু?"

বিমান সনির্ব্বন্ধে বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় করি! কেন বিশ্বাস করি তা বল্‌লাম ত, এর মধ্যে সৃষ্টি কর্‌বার একটা ব্যবস্থা রয়েছে। অপরকে মারা এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য নিজেকে বাঁচানো। সংহারে আমার বিশ্বাস নেই, আমার বিশ্বাস সৃষ্টিতে, এ-কথা আমি তোমার দাদার কাছে অনেকবার বলেছি।"

বিমানবিহারীর মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি-পাত করিয়া মাধবী বলিল, "কিন্তু দাদার বিশ্বাসও ত আপনার এ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ নয়?"

ঈষৎ ব্যগ্রভাবে বিমান বলিয়া উঠিল, "না, না, তা ত নয়ই! তা যে নয়, তোমাদের এই ঘরখানিই ত তার প্রমাণ!"

মৃদু হাস্য করিয়া মাধবী বলিল, "তবে সর্ব্বদাই আপ-নাদের দু'জনের ও-রকম বিরোধ বাধ্‌ত কেন?"

মনে-মনে একটু চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "মুখের বিরোধ কি সব সময়েই মতের বিরোধের জন্য হয় বলে' তুমি মনে কর? কত সময়ে কত কারণে যে আমরা আমাদের নিজের প্রতিই অবিশ্বাসী হই, তা হয় ত তুমি জানো না!"

বিমানবিহারীর কথায় আহত হইয়া ঈষৎ উত্তেজিত-স্বরে মাধবী বলিল, "কিন্তু সে ত ভারি অন্যায়!"

মাধবীর বিস্ময় এবং বিরক্তি দেখিয়া বিমানবিহারী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "অন্যায় ত বটেই; কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন যে কত ত্রুটি আছে—তা ধারণা করাই যায় না, মানুষ এখনও অর্দ্ধ পরিণত জীব।"

বিমানবিহারীর তত্ত্বনিরূপণের প্রতি কিছুমাত্র মনো-যোগ না দিয়া মাধবী ঔৎসুক্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু নিজের মতের বিরুদ্ধেও দাদার সঙ্গে বিরোধ কর্‌বার কি কারণ আপনার ছিল?"

"কি কারণ ছিল তা প্রথম-প্রথম আমিও ঠিক বুঝ্‌তে

পারতাম না, তবে বুঝতে বড় বেশী দেরীও হয়নি। কিন্তু সে-সব কথা বলতে হ'লে অনেক কথাই বলতে হয়।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারীর এ-কথায় নিজের সমস্ত কৌতূহল সংবরিত করিয়া লইয়া শান্তভাবে মাধবী বলিল, "না, না, আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। আমার মনে-মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে আপনি গবর্মেণ্টের চাকরী করেন তাই হয়ত কারণ। কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি যে, সে-রকম সন্দেহ করা আমার ভুল হয়েছিল।"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারীর মুখ-মণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু বেগের সহিত সে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল! যে-কারণে আমি তোমার দাদার বিরুদ্ধাচরণ করতাম তা অন্যায় হ'লেও অত নীচ নয়! বিদ্বেষের বশীভূত হ'য়ে আমি তোমার দাদার সঙ্গে বিরোধ করতাম; চাকরি বজায় রাখবার উদ্বেগে নয়!"

সমস্ত সংযম একমুহূর্ত্তে হারাইয়া মাধবী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বিদ্বেষের বশীভূত হ'য়ে? কেন,—কিসের বিদ্বেষ?" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, বলতে হবে না! আমি বুঝতে পেরেছি। আসুন আপনাকে আমাদের প্রথম সুতোর আর এখনকার সুতোর নমুনা দেখাই।"

বিমানবিহারী কিন্তু মাধবীর আমন্ত্রণের প্রতি কোন-প্রকার মনোযোগ না দিয়া বলিল, "দেখ মাধবী, এ-সব কথা এমন করে' তোমার সঙ্গে আলোচনা করায় আমার পক্ষে যদি কোন-রকম ধৃষ্টতা হয় তা হ'লে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, কিন্তু কথায়-কথায় কথাটা যখন এতটাই গিয়েছে তখন আমার কথার অন্ততঃ একটা দিক আজ স্পষ্ট করে' দিই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

কোনও কথা না বলিয়া মাধবী নীরবে বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া রহিল। আপত্তি করিবে, কি করিবে না, এবং যদি করে ত কি বলিয়া করিবে কিছুই সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

তখন, মৌন সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া, বিমানবিহারী সংক্ষেপে সকল কথা মাধবীকে খুলিয়া বলিল। কিছুদিন হইতে সুমিত্রার সহিত তাহার বিবাহের কথা চলিতেছিল; উভয়পক্ষের মধ্যে কথাটা যখন একরকম পাকা হইয়া আসিয়াছে, তখন সহসা একদিন কেমন করিয়া সুরেশ্বর বন্ধুরূপে তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর একদিন যখন সে বুঝিতে পারিল যে, সুরেশ্বর তাহার প্রবল মত এবং প্রবলতর যুক্তির দ্বারা সুমিত্রাকে তাহার নিজের দিকে টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কেমন করিয়া ক্রমশঃ সুরেশ্বরের প্রতি বিদ্বেষে তাহার মন ভরিয়া উঠিল, ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদবিচার লুপ্ত হইল, নিজের মত এবং যুক্তি দ্বারা নির্ব্বিচারে সুমিত্রার সম্মুখে সুরেশ্বরের যুক্তিখণ্ডন করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল; অবশেষে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া কেমন করিয়া ঈর্ষানল ক্রমশঃ এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে একদিন নিজ গৃহে সুরেশ্বরকে অপমানিত করিতেও তাহার ভদ্রতায় বাধিল না, সকল কথাই বিমানবিহারী অকপটে মাধবীকে জ্ঞাপন করিল। মাধবীর এ-সকল কথা কতক জানা ছিল এবং কতক জানা ছিল না। সে শুনিতে-শুনিতে নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে বিমানবিহারীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "এখন কিন্তু মাধবী, সুরেশ্বরের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, সুমিত্রার বিষয়ে আমি আমার মন একেবারে হাল্কা করে' নিয়েছি!"

বিমানবিহারীর কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মাধবী উৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রার বিষয়ে মন হাল্কা করে' নিয়েছেন তার মানে কি?"

এতক্ষণ বিমানবিহারী সহজভাবেই সমস্ত কথা বলিতেছিল, কিন্তু মাধবীর এ-প্রশ্নে সহসা কোথা হইতে তাহার মনের মধ্যে এক অনতিবর্ত্তনীয় বিহ্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইল; বিচারকের নিকট নিজের অধিকার-স্বত্ব হইতে নিজেকে চিরদিনের জন্য রিক্ত করিবার সময়ে যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। মনে হইল মনে-মনে সে যে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা প্রকাশ্যে মাধবীর নিকট স্বীকার করার পর আর তাহার কোনরূপ দাবিই জীবিত থাকিবে না; সাক্ষীর সমক্ষে দান-পত্র সহি করিবার পর দান-সামগ্রী হইতে চিরদিনের জন্য অপসৃত হইতে হইবে!

অনধিকার স্বীকার করিবার সময়ে কিন্তু বিমানবিহারী

অধিকারের কোন কাঁদুনিই কাঁদিল না; বলিল, সুমিত্রার উপর কোনোরকম অধিকারের কল্পনায় আমার মন আর ভারাক্রান্ত নয়, অই হাল্‌কা। সুমিত্রার উপর আমার কোন-রকম অধিকার আছে বলে' আমি মনে করিনে।"

নিরতিশয় বিস্ময়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কেন? কারণ সুমিত্রা অপরের অধিকৃত। তার সমস্ত মন আর আত্মা তোমার দাদার অধিকারে রয়েছে।"

একথা মাধবীর নিকট নূতন তথ্য নহে, সুতরাং ইহার মধ্যে বিস্মিত হইবারও কিছু ছিল না। তাই সে শুধু সুরেশ্বরের দিক্‌টা উল্লেখ করিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা ত সুমিত্রার উপর কোন অধিকারই রাখেন না; সুমিত্রাদের বাড়ী যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর এখন ত জেলেই রয়েছেন।"

হাসিতে-হাসিতে বিমান বলিল, "জেলে গিয়েই আরও বিপদ্ করেছেন, বাইরে থাক্‌লে আমার বোধ হয়, কিছু আশা থাক্‌ত!" তাহার পর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি চুম্বক দেখেছ, মাধবী?"

"দেখেছি।"

"তোমার দাদা সুমিত্রার চুম্বক, দূরে গেলেও সুমিত্রাকে আকর্ষণ করে' থাকেন। আমি জানি সুমিত্রা আজকাল আলিপুর জেলের দিকেই সর্ব্বদা উন্মুখ হ'য়ে থাকে।"

সাগ্রহে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করে' জান্‌লেন? কারো কাছে কিছু শুনেছেন?"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

"আজকাল রেডিয়োর দিনে সাম্‌না-সাম্‌নি সব কথাই শোন্‌বার দর্‌কার হয় কি? এখন ত আকাশে কান পেতে লোকে দূরের গান শুন্‌ছে। কিন্তু আমি তা'ও শুনেছি। সুমিত্রা নিজে আমার কাছ থেকে আলিপুর জেলের দিক্ ঠিক করে' নিয়েছে।"

মাধবী যেন শিহরিয়া উঠিল,—"সুমিত্রা নিজে!"

"হ্যাঁ, নিজে। কিন্তু তা হোক, আর তার জন্যে আমার মনে কোনও গ্লানি নেই।"

...তার পর মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, সমস্ত সম্ভাবনা ...

"সুমিত্রা সে-কথা জিজ্ঞাসা করার পর আপনার মন থেকে দাদার প্রতি বিদ্বেষ চলে' গেল বুঝি?"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী পুনরায় মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ, মাধবী! তা'ও কখন যায়? তার পরই সুরেশ্বরের ওপর বিদ্বেষটা সবচেয়ে বেড়ে উঠেছিল! এক-একবার মনে হচ্ছিল যে, জেলের মধ্যে ছুটে' গিয়ে সুরেশ্বরের দেহের উপর আক্রমণ করে' পড়ি! একটা নিষ্ঠুর, নিষ্ফল আক্রোশে নিজের হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে' ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল! কিন্তু—"

বিমানবিহারী আর কথা কহিতে পারিল না, সহসা তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সভয়ে নিরুদ্ধশ্বাসে মাধবী বলিল, "কিন্তু কি?" বিমানবিহারীর মুখমণ্ডলে সঞ্চীয়মান রক্তোচ্ছাস এবং নেত্রদ্বয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যগ্রতা লক্ষ্য করিয়া মাধবী মনে-মনে কাঁপিতে লাগিল!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু বন্দুকের ভেতর থেকে সমস্ত বারুদ যেমন একমুহূর্ত্তে বেরিয়ে যায় ঠিক্ তেম্‌নি তার পরদিন আমার মন থেকে সমস্ত বিদ্বেষ নিঃশেষে বেরিয়ে গেল! সে যেন এক জাদুবাজী! সুরেশ্বরের জেলের পর প্রথম যে-দিন তোমাদের বাড়ী এলাম সে-দিনকার কথাই বল্‌ছি! তোমাদের বাড়ীতে যখন ঢুক্‌লাম তখনো মন বিদ্বেষে পরিপূর্ণ; কিন্তু তোমাদের বাড়ী থেকে যখন বেরোলাম তখন বন্দুক থেকে সমস্ত বারুদ একেবারে বেরিয়ে গিয়েছে।"

শুনিয়া মাধবীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তাহার ভয় হইল যে, বিমানবিহারী হয়ত তাহার ধ্বক্-ধ্বক্ শব্দ শুনিতে পাইতেছে! ইচ্ছার অবর্ত্তমানেও তাহার অনায়ত্ত কণ্ঠ হইতে স্খলিতভাবে বাহির হইল, "কি করে' তা হ'ল?" নিজ-কর্ণে তাহার বিকৃত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত শুনিয়া মাধবী চমকিয়া উঠিল।

বিমানবিহারী ধীরে-ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কি করে' তা হ'ল তা আর বল্‌ব না! সে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়! আমি সকলের কাছেই তা অগোচর রাখ্‌তে চাই। প্রথম অধ্যায়ে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ

করেছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেটা স্মরণ রাখ্‌লে বোধ হয় অনেক দুঃখ অতিক্রম কর্‌তে পারব।"

আর কোনও কথা না বলিয়া বিমান দেওয়ালে অবস্থিত 'রাজপথ'-চিত্রাবলীর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। বোধ হয় সে সেই সুযোগে তাহার উদ্যত উদ্বেল হৃদয়কে শান্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"মাধবী!"

"কি বলুন।"

মাধবীর কম্পিত-আর্ত্তস্বরে চমকিত হইয়া বিমান চাহিয়া দেখিল, মাধবীর নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত! সে কিন্তু তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া বলিল, "মাধবী, আমাকে তোমাদের এই রাজপথের পথিক করে' নেবে? আমি তোমাদের পথের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করব!"

বিমানবিহারীর এ-কথায় মাধবীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। সে বলিল, "পার্‌বেন? সে যে ভারি শক্ত কাজ!"

অপ্রতিভ হইয়া বিমান বলিল, "তা বটে! নিজের ক্ষমতার মানটা আমি পদে-পদে ভুল করি বলে' আমার এত পদস্খলন হয়!"

বিমানবিহারীর দুঃখ প্রকাশে ব্যথিত হইয়া মাধবী বলিল, "না, না, আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন বিমানবাবু, আমার ও-কথাটা বলা অন্যায় হয়েছে। কারণ আমার মনে হয় যে, রাজপথের অনেক কাজই আপনি কর্‌তে পারেন।"

ক্ষণকাল মাধবীর দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী বলিল, "এ তোমার মনের বিশ্বাস?"

"হ্যাঁ, আমার মনের বিশ্বাস!"

প্রসন্নমুখে বিমান বলিল, "তোমার কথা শুনে' আমার মনে আশা হচ্ছে, মাধবী! মনে হচ্ছে, আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টা প্রথম অধ্যায়ের মতন নিষ্ফল না হ'তেও পারে!"

এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাধবী নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাঁত-ঘরের সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রস্থান করিবার সময়ে বিমান মাধবীকে বলিল, "সুমিত্রার বিষয়ে অনেক কথাই তোমাকে আজ বল্‌লাম মাধবী, কিন্তু আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি। সুরেশ্বর জেল থেকে বা'র হবার আগেই সুমিত্রার সঙ্গে সুরেশ্বরের বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে' রাখ্‌তে হবে। অবশ্য এ বিষয়ে আমি এক দিকের সমস্ত ভার নেব—কিন্তু তোমার সহায়তাও একান্তভাবে চাই।"

মাধবীর মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় অথচ শান্তভাবে বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন বিমানবাবু, আমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা কর্‌তে পার্‌ব না।"

"কেন?"

"কেন, তা জেনে ত আপনার কোনও লাভ নেই।"

"তুমি কি চাও না যে, সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হয়?"

"আমি কি চাই অথবা চাইনে—আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন—আমি সে-কথা আপনাকে জানাতে পার্‌ব না! আমি কি কর্‌তে পার্‌ব না, সে কথা আপনাকে জানিয়েছি।"

একটা নিবিড় অন্ধকারে বিমানবিহারীর মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্ষণকাল সে নীরবে কি চিন্তা করিল, তাহার পর "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্। এখন আমি চল্‌লাম।" বলিয়া ধীরে-ধীরে প্রস্থান করিল।

মাধবীর একবার মনে হইল যে, একটা কথা বিমানকে ডাকিয়া বলে, কিন্তু পাছে সেই একটা কথাকে উপলক্ষ্য করিয়া একাধিক কথা আসিয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় চুপ করিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মান্-জীবনে নবীন-প্রবীণ

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

(১)

ত আজও নিম্নশিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হয় নাই। রামেরিকার সর্ব্বত্র এবং জাপানেও সে আজকাল পঞ্চাশ বৎসরের না জিনিষ। এইসকল দেশের লোকেরা এখন উচ্চশিক্ষাকেই তনিক এবং কথঞ্চিৎ সার্ব্বজনিক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছে।

জার্ম্মানিতে একমাত্র চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় পাঠাইলেই না বালকবালিকা বিদ্যাপীঠের আব হাওয়া ছাড়াইতে অধিকারী নয়। রা যে-কোনো কারখানায় বা অফিসে নক্‌রি সুরু করুক না কেন, থানেই তাহাদিগকে আরও চারবৎসর-কাল লেখাপড়ায় কাটাইতে করিবার জন্য আইন আছে। জার্ম্মানির মজুর, কিষাণ সমাজকে উপায়ে জগতের সঙ্গে টক্কর দিয়া জীবনসংগ্রামে জয়ী করিয়া তুলিবার া করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান জগৎ কতখানি আগাইয়া আসিয়াছে একমাত্র এই তথ্য চই ভারতবাসীর কথঞ্চিৎ মালুম হইবে। ভারতবর্ষে আজ যদি াক বালকবালিকাকে সার্ব্বজনিক শিক্ষার অধিকারী করিয়া দেওয়াও গাহা হইলেও দুনিয়ার তুলনায় আমরা যে-কে সেই থাকিয়া যাইব, হ নাই।

দুনিয়া চলিতেছে বরাবর সোজা,—একই মাপকাঠির ধাপে-ধাপে। কল জাতি আমাদিগকে এতদিন পঞ্চাশ বৎসর পেছনে ফেলিয়া া গিয়াছে তাহাদিগকে পাক্‌ড়াও করিবার সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে কম।

(২)

আজকাল যুবক-ভারতে শিল্প সম্বন্ধে, ফ্যাক্ট্‌রি-সম্বন্ধে, রাষ্ট্রশাসন-, শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে, পল্লীসেবা সম্বন্ধে ান্য-সম্বন্ধে যে-সকল বাণী, আদর্শ, বোল্‌চাল বা বুখ্‌নি চলিতেছে লা ইয়োরামেরিকান্ এবং জাপানী চিন্তায় "সেকালের" কথা। হাসিক স্তর বা যুগ-বিন্যাসের হিসাবে এইগুলাকে "মান্ধাতার লের" বা প্রাগৈতিহাসিককালের বস্তুরূপে নির্দ্দেশ করা চলে। আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, জীবনের সকল বিভাগেই আমরা ার বহু পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছি।

ভারতে এক্ষণে "সর্ব্বপ্রথম" লোহার কার্‌খানা গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম" রাসায়নিক, "সর্ব্বপ্রথম" এঞ্জিনিয়ার, "সর্ব্বপ্রথম" শিল্পবীর, 'প্রথম" মজুর-নায়ক ইত্যাদি-ধরণের লোক ভারতীয় সমাজে এখনো জন্ম করিতেছেন। এইখানেই আমাদের শৈশবাবস্থা হাতে-হাতে পড়িতেছে।

জার্ম্মানিতে দেখিতেছি ব্যাঙ্ক্‌বিকাশের ভরা যৌবন, ফ্যাক্ট্‌রিগঠনের াবস্থা, মজুরসঙ্ঘের পরিণত বয়স—সর্ব্বত্রই বিপুলতা, জটিলতা, । এই-কারণেই ভারতসন্তান জার্ম্মান্-সমাজের ধরণ-ধারণ দেখিয়া খু খায় আর হা-হুতাশ করে। এই-জীবনের কোনো তথ্য সহজে ়া উঠা ভারতীয় পর্য্যটকের পক্ষে অসাধ্য।

বীর" ইত্যাদির যুগ গিয়াছে। বার্লিনের যে-কোনো মহলে আলাপ-পরিচয় করিলে কতকগুলা নাম আপনা-আপনি হাজির হয়।

নব্যশিল্পের প্রবর্ত্তকরূপে বয়েট্ (১৭৮১-১৮৫৩) জার্ম্মানির এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, পূর্ত্ত-পত্রিকা, শিল্প-শিক্ষা ইত্যাদি সকল বিভাগে আজও পূজা পাইয়া থাকেন। বয়েট্ ছিলেন গ্যেটের আমলের লোক। কবিবরের সঙ্গে তাহার লেন-দেনও চলিত।

নব্য শিল্পের প্রবর্ত্তক, বয়েট্
(১৭৮১—১৮৫৩)

বর্ত্তমান-জগৎ জার্ম্মানিতে দেখা দিয়াছে কোথাও-কোথাও বংশ-পরম্পরাক্রমে। তিনচার পুরুষ ধরিয়া রুর্ অঞ্চলের ক্রুপ্ পরিবার লোহা, ইস্পাতের কারখানায় লাগিয়া আছে। আল্‌ফ্রেড্ ক্রুপের আমলে (১৮১২-১৮৮৭) জার্ম্মানির কৃতিত্বে বনিয়াদী ইংরেজ কর্ম্মকারেরা চঞ্চল হইতে থাকে। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রুশিয়ার লড়াইয়ের যুগ অর্থাৎ জার্ম্মান্ "সাম্রাজ্য" গঠনের কালটা মনে আনিতে হইবে।

বার্লিনের বর্জিশ পরিবার শত বৎসর ধরিয়া রেলওয়ে শিল্পের বাজার চালাইতেছে। এই লাইনের প্রবর্ত্তক (১৮০৪-১৮৫৪) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। বর্ত্তমান বংশধরেরা ক্রুপের সমানই ইজ্জৎ পাইয়া থাকে। সোভিয়েট্ রুশিয়ার সঙ্গে কারবারে আজকালকার বর্জিশ্ অগ্রণী।
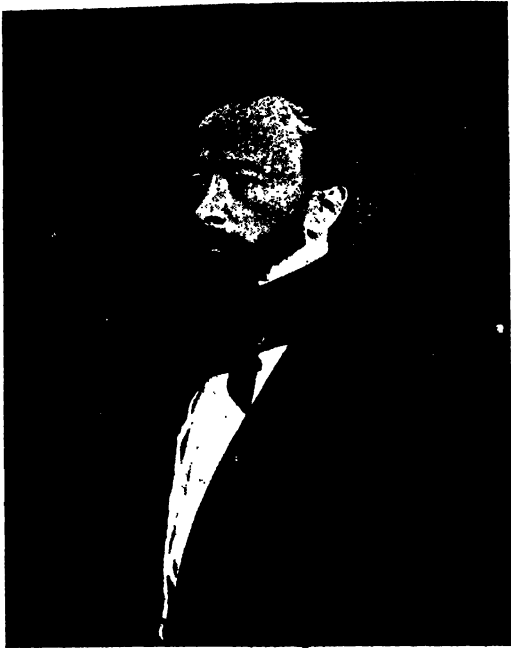
আল্‌ফ্রেড্ ক্রুপ্
(১৮১২—১৮৮৭)
(মাট্‌শোস-প্রণীত গ্রন্থ হইতে)

রেলওয়ে-শিল্পের প্রবর্ত্তক বর্জিগ
(১৮০৪ -১৮৫৪)

তাড়িতের শিল্পে জীমেন্স-পরিবার বার্লিন্‌কে জগৎপ্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বহু ভারতবাসী জীমেন্স শুকার্ট্ কারখানা দেখিয়া গিয়াছেন। হ্বর্ণ্যার্ ফোন জীমেন্স্ (১৮১৬-১৮৯২) বিজ্ঞানবীর হেল্মহোল্‌ট্‌সের (১৮২১-৯৪) সমসাময়িক।

তড়িৎশিল্পের প্রবর্ত্তক হ্বার্নার্ ফন্ জীমেন্স
(১৮১৬—১৮৯২)

(৪)

রাইন-রুর্ অঞ্চলে একাধিক ক্রুপের কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে পাই। হুগো ষ্টিন্নেসের নাম বোধ হয় ক্রুপ্‌কেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ধাতু ও খনির কাজ, ষ্টীম, যন্ত্রপাতি এবং তাহার তৈয়ারি, এইসকল বিভাগে ষ্টিন্নেসকে ফরাসী বা "রুরের রাজা" বলিয়া থাকে। জার্ম্মানির আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বোধ হয় ষ্টিন্নেসের সমান প্রভাবশালী লোক বেশী নাই। ষ্টিন্নেসও পারিবারিক উত্তরাধিকার-সূত্রেই শিল্পজগতে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন।

এই-ধরণের আর-এক ক্রুপ্, বর্জিগ বা ষ্টিন্নেসের নাম আউগুষ্ট্ টিসেন। গত বর্ষের রুর্ হাঙ্গামায় ফরাসীরা যে-সকল জার্ম্মান শিল্পপতিকে নির্য্যাতন করিয়াছে তাহার ভিতর ক্রুপের নাম জগতের সকলেই শুনিয়াছে। কিন্তু টিস্‌সেনও শিল্পী-মহলে কিছু খাটো লোক নন। জার্ম্মানরা টিস্‌সনকে বর্ত্তমান ধন-সম্পদের মস্ত খুঁটা বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত।

(৫)

বর্ত্তমান জগতে আর মান্ধাতার আমলে এই খনি, কয়লা, লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রেল, তড়িৎ ইত্যাদি লইয়াই যা-কিছু প্রভেদ। কাজেই এইসকল লাইনে যাঁহারা প্রবর্ত্তক, গুরুস্থানীয় অথবা সংগঠন-কর্ত্তা তাঁহারাই নবীন-জীবনবেদের মধুচ্ছন্দা বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য বা ঐ পদস্থ কিছু।

রাজা-রাজড়াদের নাম ও কীর্ত্তি-কলাপ, ধর্ম্মমন্দির ও সাধু-সন্তদের মাহাত্ম্য ইত্যাদি "কিচ্ছা" ইতিহাস-কেতাবে পড়া যায়। মিউজিয়াম্, চিত্রশালা, সংগ্রহালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদিতেও এই-শ্রেণীর তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পাই।

রাইন্ল্যাণ্ডের শিল্পপতি আউগুষ্ট্ টিসেন্
(এঞ্জিনিয়ার মাট্শোস-প্রণীত গ্রন্থ হইতে চিত্র সঙ্কলিত)

এইগুলার কিম্মৎ কমাইবার প্রয়োজন আছে কি না জানি না। কিন্তু হাতার আমলের আগুন, কৃষিকার্য্য, বয়ন ইত্যাদির আবিষ্কার হইতে একালকার রেডিও, জেপেলিন, টেলিফোন্ আবিষ্কার পর্য্যন্ত মানব-তির সুখবৃদ্ধির যে-সকল কল বা যন্ত্রপাতি দেখা দিয়াছে সকল-াই মানুষের "পুজাস্থান"। এইসকল আবিষ্কারের কাহিনী বিষ্কারকের জীবন এবং আবিষ্কার-অবিষ্কারকের পীঠস্থান অর্থাৎ ফ্যাক্টরি র্খানা, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্রগুলা অন্যান্য "ঋষি" মন্দির ঃ প্রাসাদের সঙ্গে-সঙ্গে সমান ইজ্জৎ পাইবার যোগ্য। যে-ব্যক্তি বা জাতি এই-কথাটা বুঝিতে গোঁজামিল দিবে, সেই ব্যক্তি ও সেই জাতি, াগৈতিহাসিক" যুগেই আরও কিছু কাল অনর্থক জীবন কাটাইতে ্য হইবে। সভ্যতা জরীপ করিবার সময়ে এই কথাটা ভুলিলে, ়বে না।

(৬)

জার্ম্মানরা মরে নাই। শীঘ্র মরিবার সম্ভাবনাও নাই। ইহাদের া সজোরে চলিতেছে। জার্ম্মান্ নর নারী নিত্য-নূতন আবিষ্কারের । জগতের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে। প্রতিদিনই যুবক জার্ম্মান্ নরা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছে। নতুন তেজের ফোয়ারা দাই জার্ম্মান্ সমাজে ছুটিতেছে।

পরাজিত জার্ম্মানির মহলে-মহলে মরা হিন্দু-মুসলমান-চীনা-সুলভ দুর্ব্বলতা এবং চরিত্র দোষ দেখা যাইতেছে সত্য। কিন্তু ইহাদের া অন্যান্য মরা-জাতির মাথার মতন পচিয়া যায় নাই। এই-ই ফরাসীরা, ইংরেজরা, জার্ম্মানদিগকে হারাইয়াও এখনো ইহাদের া-ভয়ে চলিতেছে।

জার্ম্মানদের যৌবন-আন্দোলন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস্-ফরাসী রুসো-প্রবর্ত্তিত প্রকৃতি-পূজার এবং রোমান্টিকতার সুরে গাঁথা। এই আন্দোলনের ফলে ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতীরা পাখীর মতন হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতে চাহে; বস্তুতঃ, "ভ্যাণ্ডার ফোগেল" অর্থাৎ 'উড়ো-পাখী" নামে ইহারা পরিচিত। স্বাধীনতা, বন-জঙ্গলে ঘোরা, শরীরচর্য্যা চরিত্র-রক্ষা, ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা এইসব ইহারা হাতে কলমে শিখিতেছে। ইহারা দুনিয়াতে একটা নূতন-কিছু দিয়া ছাড়িবে, এই ইহাদের সাধ। এই ভাবুকতায়ই ভাঙাগড়া সম্ভব হয়।

(৭)

যৌবন-আন্দোলনের ঢেউ চলিতেছে ১৯০৫ সাল হইতে। বার্লিনের ষ্টেগ্লিটস্ পাড়ার ইস্কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এক ভাবুকদল নবজীবনের সূত্রপাত করে। ফোষ্টার প্রণীত যুগেণ্ড বেভেগুঙ্ (যৌবন-আন্দোলন) গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাই।

ছেলে-ছোকরারা অথবা ভাবুকেরা যাহা আরম্ভ করে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা বাড়াইয়া তুলিয়াছে অনেক পথে। একটা পথ ব্যায়াম শিক্ষার দিকে। বার্লিনের ষ্টাডিয়োন-মাঠে "ডয়চে হোখ্শুলে ফ্যির্ লাইবেস্ য়িবুঙ্গেন্" (শারীরিক ব্যায়ামের জার্ম্মান্ কলেজ) তৈয়ারি হইয়াছে।

শার্লোটেন-বুর্গের টেকনিশে হোখ্শুলে যে-দরের শিল্প কলেজ, হাণ্ডেলস্ হোখ্শুলে যে-দরের ব্যবসায়-কলেজ এই ব্যায়াম-বিষয়ক হোখ্শুলেটাও সেই-দরের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এই কেন্দ্র এক ছোট-খাটো লাঠি খেলার বা কুস্তিকসরতের কিংবা টেনিস্-হকির আখাড়া-মাত্র নয়। পুরা তিন বৎসরের "পঠন-পাঠন" কুচ-কাওয়াজ খেলাধুলা দস্তুর-মতন চলে। ১৯২০ সালে এইটার গোড়াপত্তন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতার নাম ডাক্তার বিয়ার।

ব্যায়াম-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসাধ্যাপক বয়ার্

এই কলেজের বিদ্যা শেষ করিয়া জার্ম্মান্‌রা দেশের সর্ব্বত্র ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হয়। মেয়েরাও এইখানে শিখে এবং পরে শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে। ভিন্ন-ভিন্ন ফ্যাক্টরিতে মজুরদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। সেইসকল কার্‌খানায়ও এই নতুনধরণের ব্যায়াম-শিক্ষকের চাকুরি জুটিতেছে।

জার্ম্মানিতে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্ত সরকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সেইসকল চিকিৎসকের পদের জন্ত ব্যায়াম-কলেজের ছাত্র বাহাল করা সুরু হইয়াছে। প্রত্যেক খেলাধূলার পরিষদে পরিচালকদিগকে ব্যায়াম-কলেজের বিদ্যায় পাকা করিয়া তোলা হইতেছে।

অধিকন্তু জার্ম্মান্-সমাজে ব্যায়াম, দৌড়্‌ধাপ ইত্যাদির জন্ত বহুসংখ্যক আখ্‌ড়া আছে। তাহা-ছাড়া এইসকল বিষয়ে মাসিক, সাপ্তাহিক এবং অন্তান্ত পত্রিকাও চলে। ব্যায়াম-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই দুই দিকেই ব্যায়ামের ওস্তাদ লোককে নায়ক, সম্পাদক বা লেখকরূপে বাহাল করিবার সুযোগ জুটিয়াছে।

দুনিয়ার লোকের সঙ্গে জার্ম্মান্ নরনারীকে টক্কর দিতে হইবে, সন্দেহ নাই। তাহাতে বিজয়ী হইবার জন্ত অনেক-কিছু করিতে হইবে। ব্যায়ামের এই ব্যবস্থাটা দেখিয়া আবার মনে হইতেছে জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আজও সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই রহিয়াছে।

১৯২২-২৩ সালের শীতকালে বার্লিনের ব্যায়াম কলেজে ৯৩৮ জন শিক্ষা পাইয়াছে। তাহার ভিতর ছাত্রীসংখ্যা ২২। বিদেশী ছাত্রও লওয়া হয়। সেই সময়ে ২৮ জন ছিল বিদেশী। কলেজটা পরিদর্শন করিতে যাইয়া তোকিওর এক জাপানীকে এইখানে ছাত্রভাবে দেখিয়াছি। এই ব্যক্তি জাপানী পুলিশ-বিভাগের লোক শুনিলাম।

শিক্ষাপদ্ধতি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে কসরতের কাণ্ড। মামুলী জিম্‌নাষ্টিক ত আছেই। সাঁতার কাটা, দৌড়, যন্ত্রপাতির খেলা, বরফের উপর নানা-শ্রেণীর ক্রীড়া-কৌতুক, নৌকা-চালানো, বন-ভ্রমণ ইত্যাদি শরীরচালনা বিষয়ক কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। দ্বিতীয় বিভাগে স্বাস্থ্যতত্ত্বের সকল কথা। অস্থিবিদ্যা এবং শারীর বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, গা মালিশ করা (মাসাজ), খেলাধূলার ব্যায়াম, অস্ত্র-চিকিৎসা ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্গত।

তৃতীয় বিভাগ ব্যায়াম-শিক্ষা-বিষয়ক। চিত্তবিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, দর্শন, পরীক্ষামূলক শিক্ষাতত্ত্ব, যৌবন-বিষয়ক চিত্তবিজ্ঞান, শিশুপালন এবং এই-ধরণের অন্তান্ত বিদ্যা এই বিভাগে আলোচিত হয়। চতুর্থ বিভাগে ছাত্র ছাত্রীরা শাসন-বিষয়ক বিদ্যা অর্জ্জন করে। সমিতি, পরিষৎ, গোষ্ঠী, আখ্‌ড়া, খেলার মাঠ, খেলার সংবাদপত্র, ব্যায়ামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গ্রন্থশালার পরিচালনা, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যা এই-বিভাগের সামিল।

(৯)

ডাক্তার বিয়ার্ বলিতেছেন:—"আমাদের এখানে বুলগার, রুশ, ইত্যাদি জাতীয় লোক শিখিতে আসিতেছে। ভারতসন্তানকেও সাদরে গ্রহণ করিতে রাজি আছি।"

বিয়ার অস্ত্রচিকিৎসায় জার্ম্মানির নং১। অস্ত্র-ঘটিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে ইঁহার আবিষ্কার আছে। ক্ষয়রোগ-সম্বন্ধে বিয়ারের অনুসন্ধান ও চিকিৎসাপ্রণালী সুপ্রসিদ্ধ। শরীরের হাড়,মাংসপেশী ইত্যাদি কোনো উপায়ে নষ্ট হইয়া গেলে সেইসবের জীর্ণোদ্ধার বা পুনর্গঠনের কাজেও ইঁহার যশ আছে। চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞেরা বিয়ারের কৃতিত্ব বুঝিতে সমর্থ। বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত আছেন।

বিয়ারের সঙ্গে কোনো ভারতীয় চিকিৎসক বা চিকিৎসা-ছাত্র এখনো বোধ হয় কাজ করেন নাই। বার্লিনের অন্তান্ত বড়-বড় ডাক্তারদের দু'চারজন বিগত দুই-বৎসরের ভিতর কোনো কোনো ভারতসন্তানের সংস্পর্শে আসিয়াছেন।

(১০)

জার্ম্মান্-জাতির অর্থাৎ জার্ম্মান্-ভাষাভাষীর বহু নরনারী আজকাল ইয়োরোপের নানা-দেশে পরাধীন। তাহাদিগকে এই পরাধীনতার ফলে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। এইসকল পরাধীন এবং পরপীড়িত জার্ম্মান্‌দের জন্ত জার্ম্মানির জার্ম্মান্‌রা একটা পরিষৎ কায়েম করিয়াছেন।

এল্‌জে ফ্রোবেনিয়ুস্

এই পরিষদের স্ত্রীবিভাগও বেশ করিৎকর্ম্মা। জার্ম্মান্ নারী-সমাজের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি পরিষদের তদ্‌বির করিয়া থাকেন। শ্রীমতী এল্‌জে ফ্রোবেনিয়ুস বলিতেছেন:—"দুনিয়ার যত দেশে জার্ম্মান্ ভাষা-ভাষী লোক বসবাস করিতেছে তাহারা যে জার্ম্মান্-সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই জ্ঞান জার্ম্মানির নারী-মহলে প্রচার ও বদ্ধমূল করা আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই-সম্বন্ধে লেখা এবং বক্তৃতা করা ছাড়া অন্ত কোনো কাজের জন্ত আমার সময় নাই। পূর্ব্বে আমি থিয়েটার এবং নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনায় কলম ধরিতাম। গ্যেটে সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ এরিখ্ শ্মিড বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গুরু ছিলেন।"

এইধরণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ম জার্ম্মানিতে নানা-প্রকার নারী-সমিতি আছে। পার্লামেন্টের মেম্বর শ্রীমতী ক্লারা মেণ্ডে বলেন,—"সকল সমিতি আবার নিখিল জার্ম্মান্ নারী-পরিষদের বিভিন্ন শাখা-বিশেষ।" এই উপলক্ষ্যে বার্লিনের শ্রীমতী ফন ফেলজেন্‌কে জার্ম্মানির এবং বিদেশের অনেকেই চিনে।

(১১)

সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্মে যে-সকল মহিলা অগ্রণী অথবা সময় খরচ করেন তাঁহারা প্রত্যেকেই লেখক ত বটেই, কেহ-কেহ পাকা বক্তাও বটে। লেখক বলিলে একমাত্র সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবন্ধ বা কেতাবের কথাই মনে আনিতে হইবে না। খাঁটি সাহিত্য অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক এবং এইসকল বিভাগের সমালোচনায়ও অনেক জার্ম্মান্ "করিৎকর্ম্মা" নারী হাত দেখাইয়াছেন।

বর্ত্তমানে জার্ম্মানির সব-সে নামজাদা মহিলা কে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বোধ হয় শ্রীমতী গ্যার্টড্ ব্যয়মার্

শ্রীমতী গার্টুড্ ব্যয়মার্

জগতের নারী-মহলে এবং পুরুষ মহলেও নং ১ শ্রেণীর লোক বিবেচিত হইবেন। ইনি রাইখ্‌ষ্টাগের পার্লামেন্টের মেম্বর।

ব্যয়মার্ বিবেচনা করেন যে, রাজতন্ত্র জার্ম্মানি হইতে চিরকালের মতন বিদায় লইয়াছে। জার্ম্মানরা আর কোনো দিন কাহাকেও রাজতক্তে বসাইবে না। অর্থাৎ ইনি ঘোরতর গণ-তন্ত্রিণী। জার্ম্মান্ ভাষায় ইঁহাকে বলা হয় "ডেমোক্রাটিন", (সাম্যবাদিনী।)

ব্যয়মারের সঙ্গে "বাত্‌চিৎ" চালাইলে বুঝা যায় যে, ইঁহার মর্ম্ম কথা অতি সোজা। ইনি বলিয়া থাকেন :—"নারীর দ্বারা পৃথিবীতে যদি কোনো মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাদিগকে পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া সমগ্র সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যত বেশী নারী এই সমগ্রতার লক্ষ্য অর্থাৎ গোটা দেশের কল্যাণ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিবে ততই মানব্ জাতির পক্ষে উন্নতির পথ বিস্তৃত হইতে থাকিবে।"

(১২)

ব্যয়মার্ বলিলেন :—"বিপ্লবের পর হ্বাইমারে যে পার্ল্যামেণ্ট্ বসে, সেই পার্ল্যামেণ্টেই আমার প্রথম রাষ্ট্রীয় হাতে-খড়ি। সে ১৯১৮-১৯ সালের কথা। বর্ত্তমান জার্ম্মানির শাসন-পদ্ধতি তৈয়ারি করিবার কাজে বিশেষতঃ নারীজাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-সম্পর্কিত বিধান-সম্বন্ধে আমার কিছু-কিছু হাত আছে।"

আজকালকার জার্ম্মান্-শিক্ষা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে ব্যয়মারের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইল। ইনি বলিতেছেন :—"পূর্ব্বে জার্ম্মানিতে ইস্কুলপাঠশালায় ছোটবড়, ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ ইত্যাদি জাতিভেদ চলিত খুব বেশী। বিদ্যাপীঠের আব্‌হাওয়ায় যাহাতে এই ভেদ ভাঙিয়া যায় তাহার জন্য আমরা—ডেমোক্রাটিক্ অর্থাৎ গণতন্ত্রী দলের মেয়ে-পুরুষেরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি।"

১৯১৯ সালের হ্বাইমার পার্ল্যামেণ্টে ব্যয়মার্ যে বক্তৃতা করেন তাহা জার্ম্মান্‌দের জীবনে এবং সমাজ-চিন্তায় যুগান্তর আনিয়াছে। বক্তৃতাটা "সোৎসিয়ালে আরল্যা রুঙ" অর্থাৎ সামাজিক নবযুগ বা সমাজে নবজীবন নামে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছে। গণতন্ত্র এবং নারী-স্বাধীনতার তরফ হইতে এই রমণীর দাম অনেক।

ব্যয়মারের বয়স সম্প্রতি পঞ্চাশ পার হইয়াছে। পার্ল্যামেণ্টে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পনর বৎসর ধরিয়া ইনি নানাপ্রকার মহিলা-বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আভ্যন্তরীণ বিভাগের সরকারী মন্ত্রণা সভার সচিবের কাজেও ইঁহার পরামর্শ লওয়া হইত।

সাহিত্যে ব্যয়মারের নাম সুপরিচিত। "গ্যেটের বান্ধবীকুল" (১৯০৯) সম্বন্ধে এবং "সাহিত্য ও সমাজে প্রসিদ্ধ মহিলা" সম্বন্ধে রচনা প্রথম-বয়সের লেখা। "দার্শনিক ফিক্‌টে" বিষয়ক গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে, বিশেষতঃ নারী-সম্পর্কিত ধনদৌলতের কথায় ইঁহার বহু রচনাই আছে। "ডি ফ্রাও" (নারী) নামক পত্রিকা ইঁহার সম্পাদনে চলিতেছে। নারী-বিষয়ক সমাজ চিন্তা "ডি ফ্রাও ইন্ কোন্ধাস্ হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট উণ্ড্ ষ্টাট্‌সলেবেল ডার গেগেনহ্বার্ট" অর্থাৎ "বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর স্থান" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯১৫)।

গল্প সাহিত্যের রচনায়ও ব্যয়মারের যশ আছে। "ডেন্নখ্" অর্থাৎ "তবুও" বা "তাহা সত্ত্বেও" নামক কেতাবে "যদিও মা তোর দিবা আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর" ইত্যাদি ধুয়ায় অনুপ্রাণিত।

নয়াপুরানোর সন্ধিক্ষণে যে-জার্ম্মানি গড়িয়া উঠিতেছে গার্টুড্ ব্যয়মার্ তাহার এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ইনি বিবাহ করেন নাই।

ইহুদি কুমারী আলিসে সোলেমন্ "সোৎসিয়ালে ফ্রাওয়েন্‌শুলে" (সমাজসেবার জন্য নারী-বিদ্যালয়) চালাইতেছেন। বার্লিনের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যয়মারের সংস্রব ছিল এবং এখনো আছে।

(১৩)

কুমারী ব্যয়মার্ এক তরফ হইতে জার্ম্মান্ সমাজ দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আর-এক তরফ হইতে জার্ম্মানির ঠানদিদি-স্বরূপ বিধবা হেড্‌ভিগ হাইল জার্ম্মান্-রনারীর অতি প্রিয়। ইনি সত্তর পার হইয়াছেন। ইঁহার স্বামী ছিলেন ফ্যাক্টারির মালিক। "লর্ড্ ডায়চার লয়েড্" নামক জাহাজকোম্পানীর স্থাপয়িতা হাইলের পিতা।

হেড্‌ভিগ হাইল্

হাইল্‌কে লোকে বর্ত্তমান জার্ম্মানির "প্রথম গৃহিণী" বলিয়া পূজা করে। পার্‌ল্যামেণ্টে প্রবেশ না করিয়া কোনো নারী কত অসংখ্য উপায়ে নরনারীর উপকার সাধন করিতে পারে, হাইল্ তাহার উজ্জ্বল সাক্ষী। স্ত্রীশিক্ষা, নারী-সমিতি, শিশুপালন, গৃহচর্য্যা ইত্যাদি বিভাগে এমন কোনো জিনিস নাই যেখানে হাইলের হাত অথবা নেতৃত্ব দেখিতে পাই না। ব্যয়মার্ সোলেমন নারী-মহলে "সমাজ-সেবক" তৈয়ারি করেন। হাইলের কাজ নারীকে গৃহস্থধর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

ইঁহার লেখা কেতাবগুলা দেখিলেই ব্যক্তিত্বটা ধরা পড়িবে। একখানা বইয়ের নাম "রান্নাবাড়ীর অ, আ, ক, খ" আর একটার নাম "হাও্‌-বুখ্ ফিয়্ হাউস্ আর্‌বাইট" (গৃহকর্ম্মের পঞ্জিকা)। লড়াইয়ের রান্নাবাড়ী হইতে দরিদ্রপাড়ার পরিবারদের গিন্নীপনা পর্য্যন্ত কোনো-কিছুই হাইলের রচনাবলীতে বাদ পড়ে নাই।

ফ্রোবেলের এক আত্মীয়া ছিলেন হাইলের শিক্ষয়িত্রী। হাইল্ বার্লিনে ফ্রোবেল্ এবং পেষ্টালোট্‌সির নামে শিশুবিদ্যালয় কায়েম করিয়াছেন। শিশুচিকিৎসালয়, যৌবনভবন, নারী-হাঁসপাতাল ইত্যাদি শ্রেণীর বহুবিধ প্রতিষ্ঠান হাইলের গড়া।

ঘরবাড়ীর কাজে বাগান-রচনা হাইলের উপদেশের অন্তর্গত। এই উপলক্ষ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শাকসব্জীতত্ত্ব, জীবজন্তুর জীবন-কথা ইত্যাদি প্রচার করিয়া বার্লিনের (এবং পরে জার্ম্মানির) মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থ-মহলে হাইল্ জীবন আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

সামাজিক লেন-দেনের জন্য বহুবিধ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করাও হাইলের কৃতিত্বের মধ্যে দেখিতে পাই। বার্লিনের "লিৎসেয়ুম ক্লুব" জার্ম্মান্ মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। নারীদের সার্ব্বজনিক স্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেও ইনি অনেকগুলা সমিতি বা সঙ্ঘ কায়েম করিয়াছেন।

(১৪)

দরিদ্র জীবনের ছবি আঁকিয়া শ্রীমতী ক্যেটে কোল্‌হ্বিট্‌স্ প্রসিদ্ধ হইতেছেন। বার্লিনের ন্যাশন্যাল্ গ্যালারিতে ইঁহার আঁকা মজুর-জীবন প্রদর্শিত হইয়াছে। কোলহ্বিট্‌স চিত্রশিল্পে চরম মাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক। দারিদ্র্য, দুঃখ, নির্য্যাতন, অভাবপীড়ন ইত্যাদি লইয়া ভাবুকতা করা ইঁহার তুলির ও রঙের অভ্যাস নয়।

নারী-মহলে ভাবুকতা ও রোমাণ্টিকতার জের চালাইতেছেন রিকার্ডা

রিকার্ডা হুখ্

হুখ্। লাইপ্‌ৎসিগের ইন্‌সেল্-কোম্পানী ইঁহার প্রকাশক। সাহিত্যের ইতিহাস-ঘটিত তথ্যসম্বন্ধে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা হুখের বিশেষত্ব।

গ্যেটে-শিলারের যুগের কথা লইয়া হুখ্ দুইখণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জার্ম্মান্ রোমাণ্টিকতার মূলসূত্র এই রচনায় প্রচারিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশ-সাহিত্য-বীর মাইকেল বাকুনিন্ স্বদেশে রোমাণ্টিক ভাবুকতা ছুটাইতেছিলেন। পল্লী-প্রীতি, "মির" নামক পল্লী-স্বরাজের গৌরব বাকুনিন সাহিত্যের প্রাণ; হুখ্ সেই সাহিত্য-সম্বন্ধেও উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মান্ সাহিত্যের পূর্ব্বাপর অনেক কথা লইয়া হুখ্ জীবন কাটাইয়াছেন। ইয়োরোপের ত্রিশ বৎসরব্যাপী সংগ্রাম (১৬১৮-৪৮) এবং ধর্ম্ম-সংস্কারক লুথার ইত্যাদি-সম্বন্ধে লেখিকা বিশেষজ্ঞের ইজ্জৎ পাইয়া থাকেন। হুখ্ ব্যাহ্বেরিয়ার—মিউনিকের লোক। ইঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই—পত্র-ব্যবহার চলিয়াছে মাত্র।

যেনা সহরের শ্রীমতী লুলু ডিডেরিখ্‌স্ কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত। ইঁহার লেখা গাথাগুলা জার্ম্মান্ সাহিত্য-সংসারে সমাদৃত হয়। স্বামী-স্ত্রীকে মিলিয়া "ডি টাট্" (অর্থাৎ কর্ম্ম বা কৃতিত্ব) নামক মাসিক চালাইয়া থাকেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে এই কাগজের বা সম্পাদকদের কোনো যোগাযোগ নাই। ব্যক্তির জীবনীশক্তি, আধ্যাত্মিক ভাবুকতা

শ্রীমতী লুলু ডিডেরিখ্স্

ইঁহাদের রচনার বিশেষত্ব। ডিডেরিখ্স্ কোম্পানী জার্ম্মানির এক প্রসিদ্ধ প্রকাশক।

গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন শ্রীমতী ক্লারা ফীবিগ্। "ডাস্ হ্বাইবার ডোর্ফ" অর্থাৎ "মেয়ে-পল্লী" নামক গল্পে ঐতিহাসিক তথ্য উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। পল্লীর কিষাণরা লেখিকাকে সু-নজরে দেখে নাই। কিন্তু রচনা এতই উপাদেয় যে, পল্লীবাসীরা নিজ গ্রামকে "ক্লারা ফীবিগের মেয়ে পল্লী" নামে অভিহিত করিয়া পোষ্ট কার্ড ছাপিয়াছিল।

জার্ম্মানির উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম, সকল অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ফীবিগের নানা রচনায় ঠাঁই পাইয়াছে। পল্লী, সহর কিছুই বাদ পড়ে নাই। দরিদ্রের জীবন, বিশেষতঃ শহুরে মজুর-জীবন-সম্বন্ধেও ইঁহার কলম খেলিয়াছে। "ডাস্ ট্যেগ্লিখে ব্রোট্" বা "রোজ আনি রোজ খাই" নামক উপন্যাসের মতলব "নামেই প্রকাশ।"

গল্প-উপন্যাস যাহারা লেখে, তাহারা গণ্ডা-গণ্ডাই লেখে। ফীবিগ বলিতেছেন—"উপকরণ বা মাল-মশলা আমাকে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে হয় নাই। এইগুলাই আমাকে ঢুঁড়িয়া বেড়াইয়াছে।" অর্থাৎ কোনো বিষয়ে কিছু লেখা ফীবিগের পক্ষে কষ্ট-কল্পনা-সাধ্য কাণ্ড-কারখানা নয়। কলম ধরিলেই লেখা আসে। ইতি ভাবার্থঃ। বুক ঠুকিয়া মাথা ঠুকিয়া উপকরণ বা বিষয় খুঁজিতে-খুঁজিতে যাহারা হয়রান হয়, তাহাদের কলমের আগায় "সাহিত্য" বাহির হয় না।

(১৬)

মারিয়া ফন্ বুন্জেন্ সাহিত্য-ক্ষেত্রের নানা বিভাগে হাত দিয়াছেন। ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকার নানা দেশে পর্য্যটন ইঁহার জীবনের এক বড় তথ্য। গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, জীবন-বৃত্তান্ত, সমালোচনায় তাঁহার ছাপ পড়িয়াছে।

ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কোন্ বইয়ে নাম হইয়াছে?" জবাব—"ইম্ রুডেনবোট্ ডুর্ চ ডয়েচ্লাণ্ড" (অর্থাৎ নৌকাবক্ষে জার্ম্মান্

মারিয়া ফন্ বুন্জেন্

মুলুক) জার্ম্মানির অজানা বা অল্প পরিচিত নদনদী, খাল-বিল, হ্রদ-সাগর, ইত্যাদির উপর একলা দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালাইয়াছি। সেই নৌকাবক্ষে একাকী জীবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই গল্পে বিবৃত।" বার্লিনের ফিশার্ কোম্পানী গ্রন্থের প্রকাশক।

ছবি আঁকায়ও ফন্ বুন্জেনের হাত আছে। বার্লিনের বড় বড় প্রদর্শনীতে "জল-চিত্র"গুলা দেখানো হইয়াছেও। ইনি বলিতেছেন;—শিল্প-রীতি-সম্বন্ধে আমি পুরানোপন্থী। নতুন কায়দাগুলার কদর বুঝিতেও রাজি আছি বটে। কিন্তু মোটের উপর প্রাচীন এবং মধ্যযুগের নিদর্শনগুলাই আমার প্রিয়।"

ডায়চে রুণ্ডশাও, ডায়চে আল্গেমাইনেৎসাইটুঙ ইত্যাদি মাসিক ও দৈনিকে ফন্ বুন্জেনের লেখা প্রায়ই বাহির হয়। বিপ্লবের পর হইতে ইনি রাষ্ট্রক্ষেত্রেও দেখা দিয়াছেন। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী "ডায়েচ নাট্সিওনাল" দলের সঙ্গে ইনি কর্ম্ম করেন।

ফন্ বুন্জেন্ বলিতেছেন:—কাইজারিন্ জার্ম্মান্ সম্রাটের পত্নী আমার এক মুরুব্বি ছিলেন। রাজদরবারে সম্রাজ্ঞীসকাশে আমার অনেক কাল কাটিয়াছে। তে হি নো দিবসা গতাঃ।" বুন্জেন্ ব্যায়মারের উণ্টাপক্ষ।

(১৭)

যুগধর্ম্ম এত শীঘ্র-শীঘ্র বদ্লাইয়া যাইতেছে যে, জার্ম্মানরা আজকাল একমাত্র রাজবংশকে উঠাইয়া দিয়া সুখী নয়। মামুলী-রিপারিক্ বা গণতন্ত্রে ইহাদের পেট ভরিতেছে না। বোল্শেহ্বিক রুশিয়ার মার্কামারা লেনিন্ ট্রট্স্কির মজুর মাফিক সোহ্বিয়েট-শাসন কায়েম করিবার জন্যও জার্ম্মানির মহলে-মহলে লোক দেখা যায়। স্যাক্সনি, টুরিঙ্গেন এবং রাইন-রূরের কোথাও কোথাও কমিউনিষ্ট পন্থী ধনসাম্য-ধর্ম্মী দলের প্রভাব বেশী। ১৯২৩ সালে দুই-তিন বার রুশ জননায়কগণ জার্ম্মানিতে সোহ্বিয়েট্ বিপ্লব আশা করিতেছিলেন। কয়েকবার নানা জায়গায় মজুর-দাঙ্গা দেখা গিয়াছেও।

বর্ত্তমান-জগতের সর্ব্বত্রই নবীনপ্রবীণের দ্বন্দ্বের ভিতর বোল্শেহ্বিক্ বেদের মন্ত্রধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবেই যাইবে। জার্ম্মানিতেও শুনা যায়। কিন্তু মোটের উপর জার্ম্মান মজুরেরা অনেকটা সুখময় জীবন যাপন করে। ইহাদের দরিদ্রতাময় অবস্থাও বিশেষরূপে শোচনীয় নয়। এইজন্যই বোধ হয় রুশ পেটেণ্টের মজুরতন্ত্র জার্ম্মান্-সমাজে আজ পর্য্যন্ত বিজয়লাভ করিতে পারে নাই।

মজুরজীবনকে সুখময় করিয়া তুলিবার জন্য চল্লিশ বৎসর ধরিয়া

জার্ম্মান্ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ অনেক কিছু করিয়াছে। সেইসকল কাজ বাধ্যতামূলক সরকারী বীমাপ্রথার অন্তর্গত। কি রোগ, কি বার্দ্ধক্য, কি দৈব,—যত প্রকারে ফ্যাক্টরির মজুরদের এবং আফিসের কেরাণীদের আপদ্-বিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে সকল দিক্ দেখিয়া-শুনিয়া রাষ্ট্রবীর বিস্‌মার্ক্ ১৮৮৩-৮৯ সালের ভিতর কতকগুলা আইন কায়েম করিয়াছিলেন। এই আইন-গুলা মানবজাতির কল্যাণের জন্ম জার্ম্মানির বিশিষ্ট দান-বিশেষ।

আইনের ফলে মহাজন এবং ফ্যাক্টরির মালিকেরা দেশের নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে হাঁসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা কায়েম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সত্তর বৎসরের বুড়া লোকমাত্রেই বৎসরে প্রায় তিনশ মার্ক্ (২২৫৲) করিয়া পায়। মজুরদের বিধবা পত্নী এবং ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকারা পেন্সন্ ভোগ করে। ফলতঃ বিনা উদ্বেগে সাহসের সহিত জার্ম্মানির আবালবৃদ্ধবনিতা কঠিন-কঠিন কাজের দায়িত্ব লইতে সমর্থ হয়।

মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ম যে-সকল আইন আছে সেই সমুদয় "ডি সোৎসিয়াল্ পোলিটিশে গেজেট্‌স্ গেবুঙ্" অর্থাৎ সমাজ-রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা নামে প্রচারিত। বার্লিনের "ৎসেণ্ট্রাল ফার্লাগ্" এই গ্রন্থের প্রকাশক। বার্লিনের হব্বিং কোম্পানীও ১৯২৩ সালে এইসম্বন্ধে এক-খানা গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছে। তাহার নাম "আরবাইট্‌স্‌রেখ্ট্ উণ্ড্ আরবাইটার্ শুট্‌স্" (মজুরদের অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণ)। দুনিয়ার বড়-বড় সকল জাতি জার্ম্মানির নিকট এই বীমা-প্রথা এবং সামাজিক বিধান শিক্ষা করিয়াছে। যুবক ভারতের পক্ষেও এইসব জার্ম্মানিতে অন্যতম প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়।

(১৮)

বিপ্লবের পর জার্ম্মানিতে নতুন নতুন মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি সাময়িক পত্র দেখা দিয়াছে। নবযুগের নবীন লেখকেরা "নয়েস্ ডায়েচ্‌লাণ্ড্" নয়া জার্ম্মানি "নয়ে রুণ্ড্‌শাও" (নবীন পর্য্যবেক্ষক) ইত্যাদি কাগজে লিখিতে অভ্যস্ত।

পুরানো মাসিকের ভিতর "ডায়চে রুণ্ড্‌শাও" সম্প্রতি পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই কাগজ প্যারিসের "রেভ্যি দে দ্য মঁদ" অথবা বষ্টনের "আট্‌লাণ্টিক মান্থ্‌লি" ইত্যাদির সমকক্ষ দেশী-বিদেশী নামজাদা লোক এই আসরের লেখক।

"ডায়চে রুণ্ড্‌শাও"য়ের বর্ত্তমান সম্পাদক রুডল্‌ফ্ পেখেল্ স্বয়ং নাট্য-সাহিত্যের সমালোচক। পেখেল্ বলিতেছেন,—"রুশ স্কাণ্ডিনাভিয়ান্, ইটালিয়ান্, আইরিশ্ ইত্যাদি নানা জাতীয় সাহিত্যবীরদিগকে এই কাগজের সাহায্যে জার্ম্মান্-সমাজে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

পেখেল্ ঠিক কোনো দলের লোক নন, কিন্তু স্বদেশ-সেবক বটে। "পোলিটিশে কোল্লেগ" নামক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পর্কে যুবক জার্ম্মানির শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তার সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ আছেন। নবীন জার্ম্মানী গড়িয়া তুলিবার কাজে ইনি নিজকে সজাগভাবে মোতায়েন রাখিয়াছেন।

ঠিক এইধরণেরই কোনো দলের মুখপত্র নয় এমন দৈনিক কাগজ বার্লিনে "ডায়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ"। দৈনিকটা ষ্টিনেসের সম্পত্তি। জার্ম্মান ফ্যাক্টরি এবং শিল্পবিকাশের সকল খবর এই কাগজে পাই।

অবশ্য এই দুই কাগজকেই খাঁটি ডেমোক্রাটপন্থীরা রাজতন্ত্রঘেঁশা এবং অতিমাত্রায় "বুর্জোয়া" বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটকের পক্ষে—বিশেষতঃ যাহারা ধনবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতিঘটিত আন্দোলনে নামলেখানো দলের লোক নয় তাহাদের পক্ষে এই দুই দৈনিক ও মাসিককে জার্ম্মান্ "কুল্টুরের" বাহন বিবেচনা করিলে চলিতে পারে।
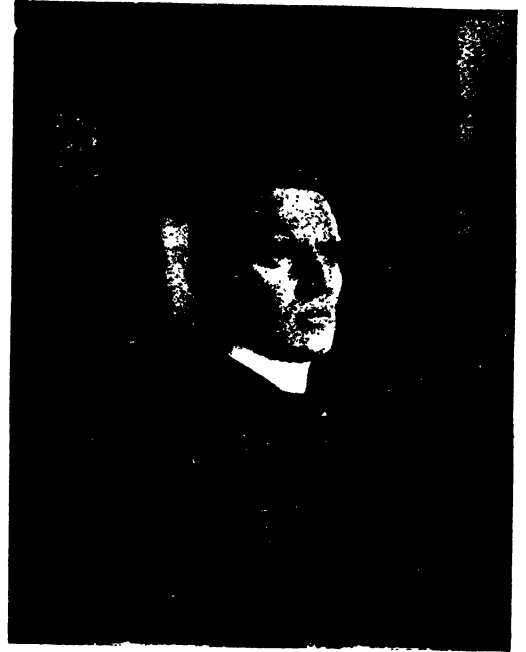
রুডল্‌ফ্ পেখেল্ ("ডায়চে রুণ্ড্‌শাও"র সম্পাদক)

ইহাদের আদর্শেই জার্ম্মান্-গৌরবের যা-কিছু সব নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এখনো অনেক দিন নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(১৯)

চিত্রশিল্পী ম্যাক্‌স্ রেবেল বলিতেছেন:—"আজকাল জার্ম্মানীর প্রদর্শনীগুলায় নবীনতম শিল্পরীতির অত্যধিক প্রস্তাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি অতদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই।"

বস্তুতঃ চরমপন্থী জ্যামিতিকরূপবহুল চিত্রাঙ্কন জার্ম্মানির বাজারে বিজ্ঞাপনে যত দেখিতে পাই, প্যারিসে, লণ্ডনে বা নিউইয়র্কে তত দেখিতে পাই নাই। একটা বিশেষ কথা এই যে, এমন-কি বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতেও চরমপন্থী চিত্রকর এবং ভাস্করদের হাতের কাজ আদরের সহিত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্যারিসের "আকাডেমিতে" সেটি হইবার জো নাই। বার্লিনের ডিরেক্টর্ শ্রীযুক্ত জুষ্টি এই হিসাবে অনেকটা উদারতা অবলম্বন করিয়া চলেন।

রেবেলের চিত্রশালায় বুঝিলাম ইহাঁর কাজকে একদম মামুলিপন্থী বলা অসম্ভব। নিজের মাথা খাটাইয়া নতুন নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য গড়িয়া তোলায় ইহাঁর হাত খেলিয়াছে। রূপগুলার ভিতর কল্পনার ঠাঁই বিস্তর। শক্তির সঙ্গে সুষমাও একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইসব ওস্তাদিই সাবেক কালের পুরানো পথেও দেখানো সম্ভব।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী শিল্পগুরু সেজান্ যে-পথ ধরিয়া গিয়াছেন সেই পথের পথিকেরা আজকাল বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার ছাপ রেবেলের পক্ষে এড়ানো সম্ভবপর হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে, আজকালকার যে কোনো চিত্রশিল্পীর কাজেই অল্পবিস্তর এই সেজান্ ধর্ম্ম দেখিতে পাই।

রেবেল সুকুমার শিল্পের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন:—"যে যে পথের পথিকই হউক না কেন, প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কালের জন্ম কোনো

চিত্রশিল্পী রেবেল্

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানাধ্যাপক ডীল্‌স্

নামজাদা আর্ট্ ইস্কুলে ছাত্রভাবে হাত মক্স করা উচিত এবং আবশ্যক। শিল্পবিদ্যালয়কে একদম অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে প্রবীণ বয়সে চিত্রকরদের অনেক অসুবিধা জুটিতে বাধ্য।"

(২০)

বার্লিনের শার্লোটেনবুর্গ্ ভারতে যতটা পরিচিত, ডালেম পাড়া তত পরিচিত নয়। কিন্তু ডালেম জার্ম্মানিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। "কাইজার হ্বিল্‌হেল্ম্ ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামক "ফলিত বিজ্ঞান" ও শিল্পবিষয়ক পরীক্ষাগার এই পাড়ার গৌরব।

পরীক্ষাগারগুলা ছোটখাট ল্যাবরেটরি মাত্র নয়। এই-সব এক বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়। এইখানে আজকাল ভারতীয় অধ্যাপকগণ নানা বিভাগে "রিসার্চ্চ" করিতেছেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের অনুসন্ধানকারী ছাত্র হিসাবেও বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি, ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব।

ডালেম পাড়াতেই বার্লিনের বোটানিক্যাল্ বাগান এবং উদ্ভিদ্‌বিষয়ক সংগ্রহালয়। এইখানেই ফার্ম্মেসি বা ভেষজ-রাসায়নিক বিদ্যালয় অবস্থিত। এই ধরণের বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ডালেম পরিপূর্ণ। এ এক বিজ্ঞান-পল্লী বিশেষ। জার্ম্মানরা বিজ্ঞান ও শিল্পজগতে যে সকল উচ্চতম আবিষ্কার সাধন করিতেছে, তাহার অনেকগুলিই এই পল্লীর ভট্টাচার্য্যদের কীর্ত্তি।

তরুলতার ওস্তাদ অধ্যাপক ডীল্‌স্ বিশেষ করিয়া গাছ-গাছড়ার ভূগোল-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইনি নানা খোঁজ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইসকল বিষয়ে বহুবিধ মৌলিক রচনাও ইঁহার আছে বলাই বাহুল্য। নীউজীলাণ্ড্ এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার উদ্ভিদ-রাজ্য-সম্বন্ধে ইনিই দুনিয়ার সর্ব্বপ্রথম শৃখলা-কারক। মধ্য এবং পশ্চিম চীনের উদ্ভিদ্ লইয়াও ইনি অনেক কাল কাটাইয়াছেন। উদ্ভিদের ভূগোল-বিষয়ক ইঁহার রচনা রুশ ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। বোটানিকাল উদ্যান এবং সংগ্রহালয়ের কর্ত্তা হইতে হইলে কি-কি গুণ লাগে ডীল্‌সের কাজকর্ম্ম দেখিলে এবং জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাহা কিঞ্চিৎ বুঝা যায়।
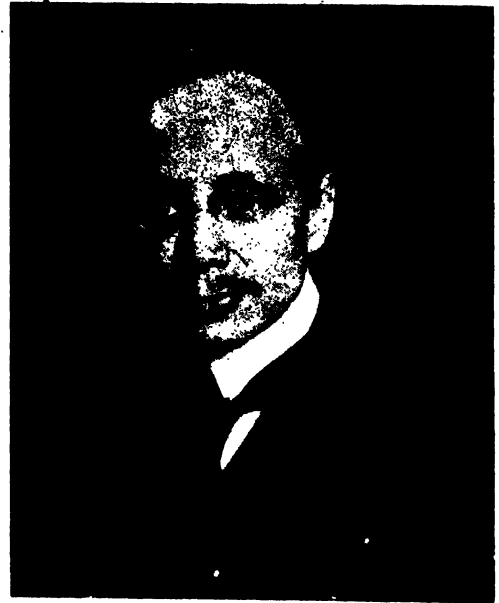
(২১)

ফার্ম্মেসি-রাসায়নিক টোম্‌স্ বার্লিনে অধ্যাপক হইবার পূর্ব্বে জার্ম্মানির নানা অঞ্চলে "ঔষধ" তৈয়ারি করিবার একাধিক ফ্যাক্টরিতে কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ "ফার্মাৎসয়টিশেজ্ ইনষ্টিটিউট"টা টোম্‌সের নিজ-হাতে গড়া। এই ইন্‌ষ্টিটিউটে যে-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলে তাহার বৃত্তান্ত প্রতিবৎসরই বাহির হইয়া থাকে। সেইগুলার সম্পাদনের ভার টোম্‌সেরই হাতে।

মামুলী রসায়ন সম্বন্ধে বোধ হয় টোম্‌স কখনো কিছু লেখেন নাই। গাছ-গাছড়ার রসায়ন সহজ-কথায় "পাঁচনের" বিজ্ঞান-বিষয়ে ইঁহার বহুবিধ রচনা আছে। এইগুলার কোনো-কোনোটার পাঁচ-সাত সংস্করণ ছাপা হইয়া গেছে। অধিকন্তু সাধারণ ফার্ম্মেসি-বিষয়ক বিশ্বকোষ বা ঐজাতীয় বিপুল গ্রন্থও টোম্‌সের হাত হইতে বাহির হইয়াছে। তেলের রসায়ন ইঁহার একটা বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র। জাপানী সরকারের নিমন্ত্রণে ইনি সম্প্রতি সপরিবারে জাপান দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন (১৯২৩ আগষ্ট)। দুর্ভাগ্যক্রমে ইয়োকোহামায় পৌঁছিবার সমকালে ভূমিকম্প সুরু হয়।

টোম্‌স্ কয়েকবার বলিয়াছেন :—"ভারতীয় ছাত্রেরা মেহনৎ করে মন্দ নয়। ইহারা বুঝে-সুজেও ভালোই। কিন্তু রসায়নে ইহাদের গোড়ায় গলদ অনেক। দেশ হইতে যতটা শিখিয়া আসে, তাহার বনিয়াদ যথোচিত পাকা নয়। এই-কারণে ইহাদের পুরানো অসম্পূর্ণতা-গুলা শুধরাইয়া ইহাদিগকে নূতন-প্রণালীতে দীক্ষিত করিতে অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়।"

জেহন্স রসায়নাচার্য্য টোম্‌স্

(২২)
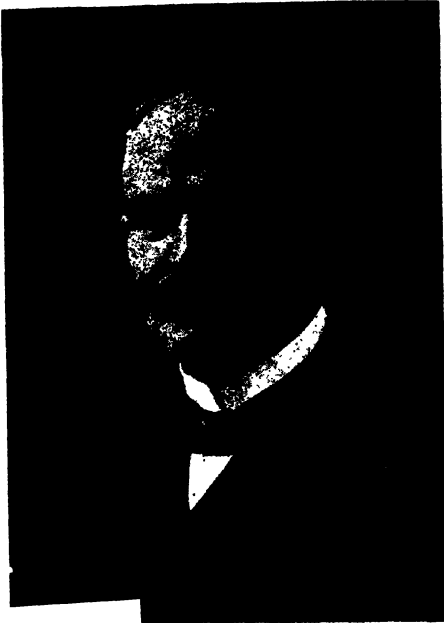
রসায়ন গুরু নান্‌ষ্ট্‌-এর নাম জগৎ-জোড়া। জার্ম্মানির আবালবৃদ্ধ-বনিতা ইঁহাকে বিদ্যুতের বাতির উদ্ভাবক বলিয়া জানে। ইনি রসায়নের
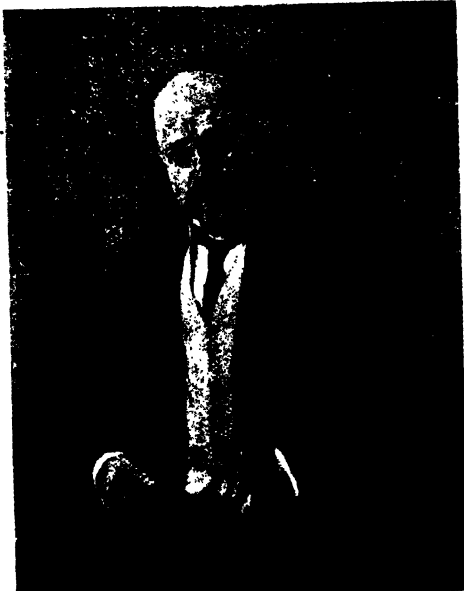
রসায়নগুরু স্নর্ন্‌ষ্ট্‌
(চিত্রশিল্পী লিবার্মানের আঁকা ছবি হইতে)

যে-মুলুকে ঘুরা-ফিরা করেন, সেটাকে ফিজিক্‌স (প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত এবং রসায়ন এই তিনের রাজ্য বলা যায়। এ একটা ন বিভাগ। বুঝিসুঝি না বলাই বাহুল্য।

শার্লোটেনবুর্গে অবস্থিত সরকারী এক পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজক ইনি প্রেসিডেন্ট্‌। ছেলে পিটাইবার ব্যবসা কয়েক বৎসর হইল ছাড়ি দিয়াছেন। ইঁহার ভবনে একদিন নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে দেখিলাম জার্ম্মান্‌-অজার্ম্মান্‌ শিল্পবীর ও বিজ্ঞান-নায়কের দল।

স্নর্ন্‌ষ্ট্‌ বলিলেন :—"ভারতবর্ষে এখন ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানসেবী সমবেত হইয়া আকাডেমি বা পরিষদ্‌ করিয়া তুলিতে থাকুন। জার্ম্মানি এবং ইয়োরোপের সকল দেশে এইরূপ পরিষদের সাহায্যেই জ্ঞানবিজ্ঞা উন্নতি লাভ করিয়াছে। এইদিকে পয়সাওয়ালা লোকদের—রাজ-রাজড় আমীর-ওমরাদের লক্ষ্য ছিল বলিয়া পাশ্চাত্য সমাজে বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া বিদ্যার রাজ্য বাড়িয়া চলিয়াছে।"

অধ্যাপক স্নর্ন্‌ষ্টের সঙ্গে তাঁহার পরীক্ষাগারে কয়েকবার দেখা হইয়াছে। একবার তিনি তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিলেন পাতা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বুঝিলাম ইহাতে রামা-শ্যামার দন্তস্ফুট সম্ভব নয়।

সুইডেনের আরেনিউস, জার্ম্মানির আইনষ্টাইন ইত্যাদি পণ্ডিতেরা দুনিয়াখানার ভিতর-বাহিরের গড়ন-সম্বন্ধে নতুন-নতুন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেই-সম্বন্ধেই স্নর্ন্‌ষ্টের এই বইয়ে আলোচনা আছে। ইঁহাদের মতনই স্নর্ন্‌ষ্ট্‌ও জগৎ-কথা-সম্বন্ধে বিজ্ঞান-বিপ্লবী।

নিউটনের আমল হইতে দুনিয়ায় যেসকল মত চলিতেছে সেইগুলা আর পুরাপুরি টেঁকসই বিবেচিত হইতেছে না। বিজ্ঞান রাজ্যের "ঝাড়-দারেরা" সেগুলা ঝাড়িয়া-বাছিয়া নতুন-কিছু প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। স্নর্ন্‌ষ্ট্‌ এইদরেরই একজন বিচক্ষণ ঝাড়ুদার।

আইনষ্টাইনের সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হইয়াছে। কয়েক-মিনিটের জন্য। বার্লিনের ভারতীয় রিসার্চ্‌ ও পি-এইচ্‌-ডি-ওয়ালারা সকলে মিলিয়া নিজ-নিজ জার্ম্মান্‌ পণ্ডিতগণকে এডেন হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। মিষ্টান্ন চুঁড়িতে-চুঁড়িতে সেই পণ্ডিত-মজলিসে এই "ইতর জনের"ও উপস্থিতি ঘটিয়াছিল।

(২৪)

জগৎ ভরিয়াই চলিতেছে বিপ্লব। নয়া-পুরানোর দ্বন্দ্ব দেখিতেছি সঙ্গীতকলায়ও। সঙ্গীতে বিপ্লব? কথাটা ভারতবাসীর মাথায় বসা কঠিন। কেননা সঙ্গীতের ক্রম-বিকাশ, উন্নতি, ঊর্দ্ধগতি বা বিস্তৃতি ইত্যাদি-সম্বন্ধে ভারতে একদম কোনো ধারণা নাই। বস্তুতঃ, গোটা সুকুমার-শিল্পের মুলুকেই জগৎ যে কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে তাহা জরীপ করিবার ক্ষমতা ভারত-সন্তানের দেখিতে পাই না। এই-কথাটা বুঝিবার জন্য খেয়ালও ভারতবাসীর আছে কিনা সন্দেহ।

গোটা জার্ম্মানিতে, বস্তুতঃ সমগ্র ইয়োরামেরিকায়ই এতদিন চলিতে-ছিল হ্বাগ্নারের রাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের হার্‌ভার্ডে যখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতে "সমজদার" (?!) হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তখন সেখানকার সঙ্গীতাধ্যাপককে অনেকবার খোলাখুলি বলিতে শুনিয়াছি :—"উনবিংশ শতাব্দীটা হ্বাগ্নারেরই যুগ।"

জার্ম্মানিতে আসিয়া অবধি অপেরায় এবং অপেরার বাহিরে হ্বাগ্নারের স্বরতরঙ্গেই জার্ম্মানি নরনারীকে ভাসমান দেখিয়াছি। এখানকার যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা হ্বাগ্নারের রসেই জীবন অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। চিত্রশিল্পী, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, এবং সখের পিয়ানোবাদক, বেহালা-বাদক হইতে সুরু করিয়া সঙ্গীত-গুরু-স্থানীয় লোক-জনও বলেন :—"হ্বাগ্নার আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে।"

(২৫)

কিন্তু জার্ম্মানরা এই হ্বাগ্নারকেই দুনিয়ার শেষ পীর বিবেচনা করিতেছে কি? না। চিত্র-শিল্পের লাইনে যেমন ফরাসী সেজানের পর হইতে "ফিউচারিজ্‌ম্‌" বা ভবিষ্যবাদ নানারূপে দেখা দিয়াছে, সঙ্গীত-শিল্পের বিভাগেও সেইরূপ ভবিষ্যপন্থী "বোল্‌শেভিজ্‌ম্‌" দেখা যাইতেছে।

ফ্রান্সের ক্লোদ দ'বুসি (১৮৬২) সঙ্গীত বিপ্লবের প্রবর্ত্তক। আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার "হার্মনি"। এই শব্দের অর্থগত বস্তু ভারতীয় শিল্পে নাই। কাজেই সম্প্রতি ইহার জন্য একটা ভারতীয় প্রতিশব্দ ঢুঁড়িতে প্রলুব্ধ হইতেছি না।

ভিন্ন ভিন্ন-শ্রেণীর একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে "কর্ড্‌" তৈয়ারি হয়। সেই কর্ডগুলার স্রোত বহাইতে পারিলে হার্মনি সৃষ্টি করা সম্ভব। চিত্র-শিল্পে পারিপ্রেক্ষিক (পার্স্পেক্টিভ) যে-বস্তু, সঙ্গীতে কর্ড্‌ বা "সন্ধি"মূলক হার্মনি অনেকটা তাই। হার্মনির দস্তুর এই যে, প্রথম দুই-তিনটা কর্ড্‌ শুনিবামাত্র পরে কোন্‌ ধরণের কর্ড্‌ আসিতে বাধ্য তাহার আন্দাজ করা সম্ভব। অবশ্য আমি পারি না। ওস্তাদরা পারে। জার্ম্মাণ পরিবারের অনেক স্ত্রী পুরুষও পারে। কারণ তাহারা এইদিকে অল্প-বিস্তর শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

তাহা ছাড়া অঙ্ক-শাস্ত্রের মতন সঙ্গীত একটা অতি মাত্রায় মাপ-জোকসমন্বিত বিদ্যা। এখানে গোঁজা-মিল চলিবার সম্ভাবনা নাই। যেমন "তাল কাটিয়া" গেলে আপ্‌ড়ার রসিকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিতে পারে, সেইরূপ কর্ডগুলার "লক্ষ্যমুখীনতা"ও পাক্‌ড়াও করা সম্ভব।

দ'বুসি বলিলেন:—"যদি আমার ওস্তাদি তোমরা ধরিতেই পারিলে, তাহা হইলে আর আমার ওস্তাদি রহিল কোথায়? একটা নতুন-কিছু করা চাই-ই চাই।" কাজেই দ'বুসি হার্মনির মামুলী পথ বর্জ্জন করিয়া একদম "অকথ্য" উপায়ে কর্ডগুলা লইয়া "ছেলে খেলা" সুরু করিয়াছেন। ইহার নাম সঙ্গীত-রাজ্যে বোল্‌শেভিক পথ।

জার্ম্মান ওস্তাদ আর্নল্ড্‌ শোন্‌ব্যর্গ (১৮৭৩—) এইখানেই ঠেকিবার পাত্র নয়। কর্ডগুলাকে বিতিকিচ্ছিরূপে যেখানে-সেখানে বসাইয়াই ইঁহার সাধ মিটে না। সঙ্গীত-কলার যে আদিম ভিত্তি "মেলডি" বা সুর, শ্যেনব্যর্গ্‌ তাহাকেও লণ্ডভণ্ড করিয়া ছাড়িয়াছেন। এমন কি "স্বর"গুলাকেও টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ধ্বনির নতুন-নতুন রূপ তৈয়ারি করিবার পথে ইনি অনেক-দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এই ভাঙা-ভাঙির লঙ্কাকাণ্ডে পশ্চিমা সনাতন বার-বিভাগওয়ালা সকল স্বরপর্য্যায় আমাদের সুপরিচিত বাইশ"শ্রুতির" কাঠাম ছড়াইয়াও উঠিতেছে। শ্যেনব্যর্গের পিয়ানোর গৎগুলি শুনিয়া কার সাধ্য বুঝে? এই যন্ত্রে কিসের আওয়াজ বাহির হইতেছে? সুরের তাণ্ডব না অসুরের ওস্তাদি?

(২৬)

ভারতবাসীর পক্ষে সঙ্গীতের এই বিপুল ভাঙাগড়া বুঝা অসম্ভব। আমরা ভরতমুনির আবিষ্কার পর্য্যন্ত—শুনিতে পাই মিঞা তানসেন ইত্যাদিরও নাকি অনেক আবিষ্কার আছে—উঠিয়াছিলাম। তাহার পর আর আগাইয়া আসিতে পারি নাই।

কিন্তু ইয়োরোপীয়ানরা গ্রীক্‌ রোমান্‌ এবং মধ্যযুগের গীর্জ্জাসঙ্গীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নত হইতে-হইতে জার্ম্মান্‌ বাখ (১৬৮৫-১৭৫০) এবং ফরাসী রামো (১৬৮৩-১৭৬৪) ইত্যাদি ঋষির যুগে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। রামো ১৭৪০ সালে "হার্মনি"-সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন। সেই গ্রন্থই আধুনিক সঙ্গীতের বেদস্বরূপ। সঙ্গীতে এইখানেই বর্ত্তমান জগতের গোড়া। গ্রীক্‌, রোমান্‌ এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান্‌ বাখ রামোকে কোন-মতেই বুঝিতে পারিবে না। এই দুনিয়া একদম নয়।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে গোটা ইয়োরোপ ও আমেরিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরানো ভাঙিয়া নবীন গড়িতেছিল। এই যুগেই ষ্টীম-এঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়। এই যুগেই নতুন-নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে (১৭৭০-৮৫)। এই যুগেই আডাম্‌ স্মিথ্‌ তাঁহার "ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থ প্রচার করেন (১৭৭৬)। এই যুগেই ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয় (১৭৮৯-৯২)। এই যুগেই যুক্তরাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়, (১৭৮৫) অর্থাৎ এইখানেই শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজ-বিন্যাসে, শ্রেণীবিপ্লবে, মজুর-সমস্যায় "বর্ত্তমান জগৎ" দেখা দেয়। ভারতবর্ষ এই যুগেই গোলাম হয় (১৭৭২)। ভারতবাসীর দাসত্ব এবং বর্ত্তমান জগতের উৎপত্তি একসূত্রে গাঁথা।

এই বর্ত্তমান-জগতে ভারত-সন্তান—আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, নাগার্জ্জুন, পাতঞ্জলি, আল্‌ফারাবি, আলবেরুনির বংশধরেরা নিজ-নিজ মাথার পরিচয় দিতে পারিয়াছে কি? পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে ষ্টীম-এঞ্জিন বলিলে শিল্প, রাষ্ট্র ও সমাজের যাহা-কিছু বুঝা যায় সবই ভারতবাসীর স্ববশে আসিত। যদি পারিত তাহা হইলে হার্মনি বলিলে সঙ্গীতে যাহা-কিছু বুঝা যায় সবই ভারতীয় স্বরাজে দেখা দিত। অর্থাৎ ভারত-তানসেনের বাচ্চারা নিজেই বেঠোফেন, শোপাঁ, হ্বাগ্নার, চাইকোভ্‌স্‌কি হইয়া জন্মিতে পারিত। তাহা হইলে তাহার পরের ধাপটা—অর্থাৎ দ'বুসি-শোনবার্গের কেরদানি, পাগলামি বা বীরত্ব এবং ওস্তাদি বুঝিবার, বুঝাইবার এবং সৃষ্টি করিবার লোকও ভারতীয় হাড়-মাসেই পাওয়া যাইত।

(২৭)

যাহা হউক জার্ম্মানেরা এই নবীন সঙ্গীত-সম্বন্ধে অনেকেই নারাজ। নতুনের ঠাঁই দুনিয়ার কোথাও অতি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। অধিকন্তু নবীনেরা অনেক-সময়েই কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া বসে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে এই কথাটা সহজেই বুঝা যায়। অতিবৃদ্ধির পর বিপ্লবীরা এক ধাপ পেছন হটিয়া "বুর্জোআ" "সনাতনী" বা নরম ও মডারেট্‌দলের সঙ্গে খানিকটা অপেক্ষা করিয়া চলে। জগতের যে কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু নয়ায়-পুরানায় "রফা" করিতে-করিতে শেষ পর্য্যন্ত নয়াই দিগ্‌বিজয়ী হয়।

বার্লিনে এক সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। নাম ওপস। পিয়ানো এবং বেহালার মহলে ইঁহার নামডাক খুব উঁচু। অর্কেষ্ট্রার পরিচালক (কণ্ডাক্‌টার) হিসাবে ইঁহার ব্যবসা এবং যশ। লড়াইয়ে "সেনাপতি"র কাজ যেরূপ সঙ্গীতে কণ্ডাক্‌টারের কাজ সেইরূপ। ভারতে এই-পদের মর্ম্ম বুঝা সহজ নয়।

ভবিষ্যপন্থী সঙ্গীতের ঠাট্টা করিয়া ওপস্‌ একদিন বলিতেছিলেন,—"আমি এক দিন এক মজলিসে কতকগুলা সঙ্গীতের পাকা সমজদারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে নবীন সঙ্গীতের নমুনা শুনাইব এইকথা জানাইয়াছিলাম। কি করিয়াছিলাম জানেন? বাখ, বেঠোফেন, মোৎসার্ট ইত্যাদি সঙ্গীত গুরুদের সুপ্রসিদ্ধ গৎগুলা বাজাইয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতরই যেখানে সেখানে যথেচ্ছরূপে ভুল চালাইয়া দিতে ত্রুটি করি নাই। সুরের, কর্ডের, হার্মনির শ্রাদ্ধ করা যাহাকে বলে ঠিক তাহাই করিয়াছিলাম। সমজদারেরা আমার এই বদমায়েসি ত ধরিতে পারিলেনই না। বরং প্রত্যেক বাজনার পরই তাঁহারা নবীন সঙ্গীতের খুব তারিফ করিতেছিলেন।
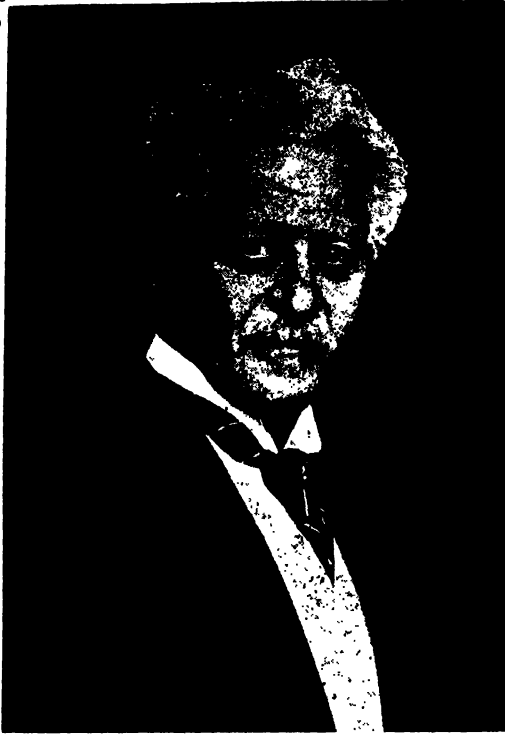
সঙ্গীতাচার্য্য ওখ্‌স্‌

শেষে গোমর ফাঁক করিয়া বলিলাম—'বুঝিলেন, আপনারা কি আহাম্মুক ? ভুল এবং দোষগুলাই আপনাদের চিন্তায় গুণ ?"

অর্থাৎ শিশুরা হাতে-খড়ির সময় যেমন কাগের-বগের ছবি চালায় সঙ্গীতাচার্য্য ওখ্‌সের মতে নবীন সঙ্গীত মানুষের কানে ঠিক সেইরূপই ঠেকিতে বাধ্য। কিন্তু যাহারা নতুন মালের পক্ষপাতী তাহারা বুঝুক না বুঝুক সেইটার প্রশংসা করিবেই করিবে। এই গেল সনাতনপন্থী প্রধান সঙ্গীত-গুরুর মত। ওখ্‌স্‌ বার্লিনের সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্প-কলেজের অধ্যাপক। আকাডেমিতে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিপ্লব সৃষ্ট হয় না। বিপ্লবের জন্ম হয়—নয়া জগৎ গড়িয়া উঠে—এইসকল প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির বাহিরে। নবীন-প্রবীণে দ্বন্দটা বুঝিবার সময় এই-কথা মনে রাখা আবশ্যক। ভাগ্নারকেও সেকালের লোকেরা সঙ্গীত-বিপ্লবী বলিয়া গালাগালি করিত।

(২৮)

বার্লিনের বিরাট্‌ গ্রন্থশালায় এক নয়া বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগকে "লাউট্ট আব্‌টাইলুঙ" বা ধ্বনি-বিভাগ বলে। পরিচালকের নাম ডোগেন। ইনি ধ্বনি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ডোগেন বলিতেছেন :—"আমাদের ধ্বনিশালায় বিশ-পঁচিশ হাজার মানুষের আওয়াজ ফনোগ্রাফের রেকর্ডে ধরিয়া রাখিয়াছি। দুনিয়ার নানা-দেশের লোকের, নানা-ভাষার উচ্চারণ ও সুর এই ধ্বনিশালায় 'পাঠ' করিতে পারেন। ভাষা-বিজ্ঞানের তরফ হইতে এমন সুযোগ জগতের আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।"

দু'চারবার যাওয়া-আসা করা গেল। ডোগেন বলিলেন :— "ওহে বাবু, আমার কলে যা-হক কিছু একটা বাংলা কথা বলিয়া যাও। তোমাকে ধরিয়া রাখি।" কাছে ছিল দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত "দ্বিজেন্দ্রলাল"। কেতাব হইতে তিন মিনিট পড়িয়া দিলাম। তিন মিনিটের বেশী কলে ধরা যায় না। পরে জুটি আর-এক ফরমায়েশ। ডোগেন চাহিলেন বাঙালীর মুখে ইংরেজী আওয়াজ শুনিতে। "যুবক-এশিয়ার বাণী" নামে খানিকটা লিখিয়া আওড়াইয়া দেওয়া গেল।

(২৯)

হুম্বোল্ড এবং হেল্মহোল্ট্‌স্‌ ইত্যাদি জার্ম্মান বিজ্ঞানবীরগণ 'জগদ্‌গুরু" বিবেচিত হন। দার্শনিক কাণ্ট্‌ এবং হেগেলকেও দুনিয়ার সকল দার্শনিক-মহলেই জগদ্‌গুরুর আসন দিতে কাহারও আপত্তি নাই। বেঠোফেন ভাগ্নারও সেই পদেরই লোক।

বিজ্ঞানবীর হেল্মহোল্ট্‌স্‌
(১৮২১—১৮৯৪)

সেইরূপ সমাজ-বিজ্ঞান (ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি) বিষয়ক বিদ্যার ক্ষেত্রে জগদ্‌গুরু-স্থানীয় পণ্ডিত জার্ম্মানিতে কাহারা ? এই প্রশ্নটা অনেকবার মাথায় উঠিয়াছে। "জগদ্‌গুরু" বলিলে বুঝিতে হইবে এমন একটা লোক যাহার মত-অনুসারে বিভিন্ন "বিদেশে" বহুসংখ্যক নর-নারী জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। যে কোনো নামজাদা পণ্ডিত বা বহু গ্রন্থের লেখককে এই আসন দেওয়া যায় না অথবা বহুসংখ্যক বিদেশী ভাষায় কোনো দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্য-সেবীর রচনার তর্জ্জমা প্রচারিত হইলেই তাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিতে পারি না।

প্রশ্নটার জবাব দেওয়া বড় কঠিন। তাহার প্রধান কারণই এই যে, ফরাসী সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের চিন্তা ইংরেজিতে যত পাওয়া যায় জার্ম্মানদের চিন্তা তত পাওয়া যায় না। এইখানেই বোধ হয় বুঝিতে হইবে যে এই বিদ্যার ক্ষেত্রে জার্ম্মানিতে "জগদ্‌গুরু" বেশী জন্মেন নাই।

(৩০)

কিন্তু অনেক দিক্‌ তলাইয়া মজাইয়া ভাবিতেছি যে উনবিংশ শতাব্দীর

প্রথম অর্দ্ধে ফ্রিড্‌রিশ লিষ্টের সমান প্রভাবশালী লোক ইয়োরা-মেরিকায় আর কেহ ছিল না। লিষ্ট্ বিলাতী জগদ্‌গুরু আডাম্ স্মিথের ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ইংরেজবীরকে ন'কড়া-ছ'কড়া করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। বৃটিশ সন্তান ছিলেন অবাধ বাণিজ্যের ধুরন্ধর। তাহার বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন প্রুশিয়ার স্বদেশ-সেবক। লিষ্ট্ দার্শনিক হিসাবে সংরক্ষণ-নীতির অর্থাৎ সশুল্ক বাণিজ্য-প্রথার জন্মদাতা।

জার্ম্মানিতে লিষ্টের প্রধান কৃতিত্ব ছিল পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জার্ম্মান্ ভাষা-ভাষী রাষ্ট্রগুলাকে "ৎসোল-ফারাইন" অর্থাৎ শুল্ক সঙ্ঘে ঐক্যবদ্ধকরা। তাহার ফলে জার্ম্মান্ সমাজে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ্ জন্মিতে থাকে। এই সুফল লক্ষ্য করিয়াই সেকালের জার্ম্মানরা লিষ্ট্‌কে "স্বদেশের উদ্ধার-কর্ত্তা" রূপে পূজা করিত। এই-কারণেই আবার তখনকার ইংরেজরা ইহাকে যমের মতন ভয় করিত। ফরাসী নেপোলিয়নকে লড়াইয়ে হারাইয়াও ইংরেজের নয়নে নিদ্রা আসিত না। চিন্তাবীর লিষ্ট্ তাহাদের "শয্যা-কণ্টক" ছিলেন।

লিষ্ট্ যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া ইয়াঙ্কি-সমাজে ধনবিজ্ঞানের জন্ম প্রদান করেন। মার্কিন-জাতির আর্থিক প্রচেষ্টা, সংরক্ষণ-নীতি এবং বিজ্ঞান-সেবার ইতিহাসে জার্ম্মান লিষ্ট্ ছিলেন অগ্রদূত। আমেরিকা দখল করিবার পর হইতে লিষ্ট্ এবং লিষ্টের চিন্তা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হয়। হাঙ্গারির স্বদেশ-সেবক লুই কোসুথ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিষ্ট্‌কে "দুনিয়ার ধন-বিজ্ঞান-শিক্ষক" নামে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। আজ পর্য্যন্ত কি আয়ৰ্লণ্ড, কি চীন, কি চেকোস্লোভাকিয়া, কি ইতালী, কি ভারত,—জগতের যেখানেই স্বাধীনতা এবং সম্পদের লড়াই চলিতেছে সেইখানেই লিষ্টের বাণী শিরো-ধার্য্য। লিষ্ট্ জার্ম্মানির এক অমর পণ্ডিত।

(৩১)

আর-একজন "জগদ্‌গুরু"ও জার্ম্মানির সমাজবিজ্ঞানের আবহাওয়ার দেখিতে পাই। তাঁহার নাম কাল্‌ মার্ক্‌স্। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি "ডাস্ কাপিটাল্" (বা পুঁজি) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে যে-সকল সূত্র প্রচারিত হইয়াছে সেগুলা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগতের সর্ব্বত্র মজুর-সম্প্রদায় নিজেরা বাইবেল, কোরাণ বা গীতা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। "মার্ক্‌সিস্‌মুস্" বা মার্ক্‌স্-নীতি অগ্রাহ্য করিয়া আজকালকার বিজ্ঞানের আসরে কোনো মিঞা দাঁড়াইতে পারেন না। এই-নীতির চরম প্রয়োগ হইয়াছে রুশিয়ার বোল্‌শেভ্বিক গণতন্ত্রে।

লিষ্ট্ বা মার্ক্‌সের প্রত্যেক কথাই অকাট্য বা গ্রহণীয় একথা কেহই বলিবে না। দুনিয়ার কোনো ক্ষেত্রেই কোনো জগদ্‌গুরুর সকল মত সর্ব্বদা টেঁকসই নয়।

বার্লিনের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শুমাখারকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম :—"ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকালকার চিন্তাধারা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হইলে আপনি কোন্-কোন্ বিষয় বাছিয়া লইবেন?" খানিকক্ষণ ভাবিয়া ইনি বলিলেন :—"আপনি কি আমাকে সোৎসিয়ালিস্‌মুস বা সমাজ-তন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" শুমাখার অথবা অধ্যাপক সোম্বার্ট্ সোশ্যালিষ্ট্ নন। কিন্তু এইসকল বিষয় আলো-চনা না করিয়া ইঁহাদের উদ্ধার নাই। অর্থাৎ সকলকেই—মায় সোশ্যালি-জমের কট্টর শত্রুদিগকেও সেই কাল্‌ মার্ক্‌সের "মহাভারত"-খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই হয়।

(৩২)

শুমাখার মামুলী ধনবিজ্ঞান নামক কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইনি ব্যাঙ্ক্, ইন্সিওরেন্স্, শিল্প-বাণিজ্যের গতিবিধি, নগরজীবন, রেলপথ,
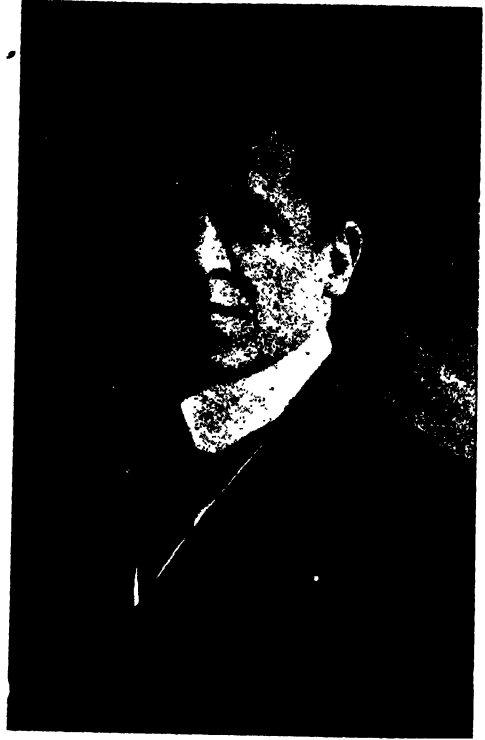
ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শুমাখার্

মুদ্রাতত্ত্ব, লড়ায়ের ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যতালিকা-মূলক নানা অনুসন্ধানে সময় কাটাইয়া থাকেন। জার্ম্মান্ ধনবিজ্ঞানবীরগণের মধ্যে, শ্মোল্লার ছিলেন নামজাদা। তাঁহার নামে একটা পত্রিকা চলিতেছে। নাম "শ্মোল্লারস্ য়ারবুখ্"। শুমাখার এই ত্রৈমাসিকের সম্পাদক।

শ্মোল্লারের মতন প্রসিদ্ধ লোক আডোল্‌ফ্ হ্বাগ্‌নার্। তাঁহার "ঠেওরে-টিশে সোৎসিয়াল য়েকোনোমিক্" জার্ম্মান-সংসারে চলে খুব। এইধরণেরই একজন বড় লেখক ছিলেন কার্ল্ মেঙ্গার্। ইনি প্রকৃতপক্ষে অষ্ট্রিয়ান। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মেঙ্গারের নাম ধনবিজ্ঞানের মহলে-মহলে অল্পবিস্তর শুনা যায়। ভারতেও যাঁহারা উচ্চতম অনুসন্ধান চালাইতে অভ্যস্ত তাঁহাদিগকে মেঙ্গারের আব-হাওয়ায় আসিতেই হয়।

বর্ত্তমানে অষ্ট্রিয়ার সমাজতত্ত্ববিৎ ওথ্‌মান্ স্পান জার্ম্মান্‌জাতির নং ১ শ্রেণীর লোক। ইনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজসঙ্ঘের সম্বন্ধ আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। জার্ম্মানির ধনবিজ্ঞানবিৎ ক্লাপ্ মুদ্রাতত্ত্বের আসরে এক বিপ্লব ঘটাইতেছেন। ১৯০৫ সালে তাঁহার "ষ্টাট্‌লিখে ঠেওরি ডেস্ গেল্‌ডেস্" বাহির হইয়াছে। তাহার মোটা কথা এই :—"জগতে কোনো একটা ধাতু বা কাগজকে লোকে টাকা বলিয়া স্বীকার করে কেন? গবর্ণমেণ্ট্ এই বস্তুগুলাকে টাকা বলিয়া প্রচার করে বলিয়া। ঐ বস্তুগুলার নিজের ইজ্জৎ কিছুই নাই।" ইহার নাম "মুদ্রাতত্ত্বের রাষ্ট্রীয় ব্যাখ্যা"।

(৩৩)

প্রাচীন ভারত যে-বিদ্যার আলোচ্য বস্তু তাহাকে "ইণ্ডোলোগি" বা ভারততত্ত্ব বলে। বর্ত্তমান জগৎ, যুবক ভারত ইত্যাদি বলিলে যাহা কিছু

বুঝায় তাহা ইণ্ডোলোগির অন্তর্গত নয়। এই-বিদ্যার ধুরন্ধরেরা বাসি-মালের "শুঁটকি মাছের" ব্যাপারী।

ভারততত্ত্ব-বিদ্যায় আজকাল "নতুন" কি-কি চলিতেছে? ভারতীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের লেখা বা অনুসন্ধানগুলার খতিয়ান করিলে এক-কথায় বলিব,—প্রাচীন ভারতের লোকগুলা রক্তমাংসের মানুষ ছিল কি না সেই-বিষয়ে খোঁজ চলিতেছে। অর্থাৎ ভারতীয় "ইণ্ডোলোগেরা" সেই সাবেক-কালের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় তথ্যগুলা জানিবার জন্যই সবিশেষ চেষ্টিত। পুরানো জীবনের অভিব্যক্তিগুলা সনতারিখ-সমন্বিতভাবে সাজাইবার-গুছাইবার দিকে ভারতের ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের প্রধান প্রয়াস।

কিন্তু ইয়োরোপে "ইণ্ডোলোগ"দিগের অনুসন্ধান কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ইঁহারা চিরকালই প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ববিৎ। শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় ইত্যাদির আবিষ্কার এবং এইগুলার যোগাযোগ ব্যাখ্যা করা ইঁহাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। এই-দিক্ হইতে মধ্য এসিয়া বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ফরাসী ও জার্ম্মান্ ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

মধ্য এশিয়া-সংক্রান্ত ভারততত্ত্বে বার্লিনের "ফ্যেল্কার কুণ্ডে" অর্থাৎ নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহালয়ের পণ্ডিত ফন্ লেকক্ জগৎ প্রসিদ্ধ। সেই-

সংস্কৃতাধ্যাপক্ লিডার্স্
(বার্লিনের হ্বোল্‌টার কোম্পানীর তোলা ফোটো হইতে)

ক্ষেত্রেই সংস্কৃতাধ্যাপক লিডার্স্‌ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অশ্বঘোষ-প্রণীত সংস্কৃত-নাটকের কয়েক টুক্‌রা মাত্র মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেইগুলার পাঠ উদ্ধার করিয়া লিডার্স্ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাহার ফলে প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটককে কালিদাস এবং ভাস এই দুয়ের বহু পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতবাসীর পক্ষে মধ্য এশিয়া "বৃহত্তর ভারতে"র এক প্রদেশ। মধ্য-এশিয়া-বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় ইণ্ডোলোগদের নজর পড়া উচিত।

(৩৪)

ভারতে অনেকেই শুনিয়াছেন কলযন্ত্রের দ্বারা আকাশ হইতে নাইট্রোজেন চুষিয়া লওয়া সম্ভব। সেই নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রিক্ অ্যাসিড তৈয়ারি করিয়া পরে তাহার সাহায্যে অনেক চীজ তৈয়ারি করা হইয়া থাকে। এই আবিষ্কারের জন্য রসায়নাচার্য্য হাবার প্রসিদ্ধ। হাবার, কাইজার হ্বিল্‌হেল্ম্ ইন্‌ষ্টিটিউটের এক-বিভাগের পরিচালক।

রসায়ন-গুরু হাবার

হাবারের সঙ্গে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি বলিয়া থাকেন,—"তোমরা ভাবিয়াছ যে মান্‌হাইম সহরের "বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফাব্রিক্" ইত্যাদি কারখানায় কয়েকজন ভারতীয় রাসায়নিককে পাঠাইয়া ফলিত-রসায়ন-বিদ্যাটা দখল করিয়া ফেলিবে? বেকুবির চূড়ান্ত। দুনিয়ার কোনো কারখানায় প্রাণপাত করিলেও আসল জিনিষ কিছুই হস্তগত করিতে পারিবে না। সেজন্য চাই স্বদেশে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা। যত দিন ভারতে ধনপতিরা রিসার্চ্চ, গবেষণা, শিল্পরীতির প্রয়োগ ও

এঞ্জিনিয়ার মাটশোস্

পরীক্ষা করাইবার জন্ত টাকা ঢালিতে রাজি না হইবে ততদিন তোমাদের দেশে নব্য ধনদৌলতের উৎপত্তি অসম্ভব। কথাটা শুনাইল খারাপ। কি করি?"

(৩৫)

এই-উপলক্ষে এঞ্জিনিয়ার মাট্‌শোসের একটা কথা মনে পড়িতেছে। ইনি বলেন:—"ইংরেজরা বর্ত্তমান্-জগতের শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী। জার্ম্মানরা প্রথম-প্রথম বিলাতে যাইয়া ইংরেজদের নিকট শিখিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখনকার দিনে নতুন-নতুন যন্ত্রপাতিগুলা সবই ছিল ইংরেজদের একচেটিয়া। ইহারা কোনো-মতেই এইসকল যন্ত্রের একটা সামান্ত অংশ পর্য্যন্তও বিদেশে রপ্তানি হইতে দিত না। কঠোর আইনের দ্বারা রপ্তানি বন্ধ করা হইত। কিন্তু জার্ম্মানরা কি করিয়া স্বদেশে সেই বিলাতী গুপ্তবিদ্যা বা ব্রহ্মাস্ত্রগুলা আনিয়া হাজির করিয়াছে? বিলাত-প্রবাসী একজন জার্ম্মান্ মিস্ত্রী যন্ত্রের এক টুকরা লুকাইয়া লইয়া গিয়া রুশিয়ার হাজির হইত। আর-একজন সেই যন্ত্রেরই আর-এক টুকরা লইয়া স্পেনে উপস্থিত হইত। আর কেহ বা তৃতীয় এক টুকরা ট্যাঁকে করিয়া ডেন্মার্কে যাইয়া আড্ডা গাড়িত। পরে এইসকল লোক (যন্ত্রচোর) বিভিন্ন মুল্লুক হইতে বার্লিনে আসিয়া সম্মিলিত হইত। সেই সম্মিলনের ফলেই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যাতেই হাতে-খড়ি কঠিন। একবার কোনো-মতে কাজ সুরু করিয়া দিতে পারিলে তাহার পর স্বদেশ-সেবকেরা দেশটাকে অনেক দূর ঠেলিয়া তুলিতে পারে।"

মাটাশোস্ পূর্ত্তবিদ্যার, যন্ত্রপাতির এবং শিল্পবীরগণের ইতিহাস-সম্বন্ধে বহু-সংখ্যক কেতাব লিখিয়াছেন। জার্ম্মানির শিল্প-জীবনের গলিঘুঁচি ইঁহার আঙুলের ডগায় অবস্থিত। জার্ম্মান্-এঞ্জিনিয়ারিঙ্ পরিষদের এবং অনেকগুলা কটমট টেক্‌নিক্যাল কাগজের ইনি পরিচালক।

গান
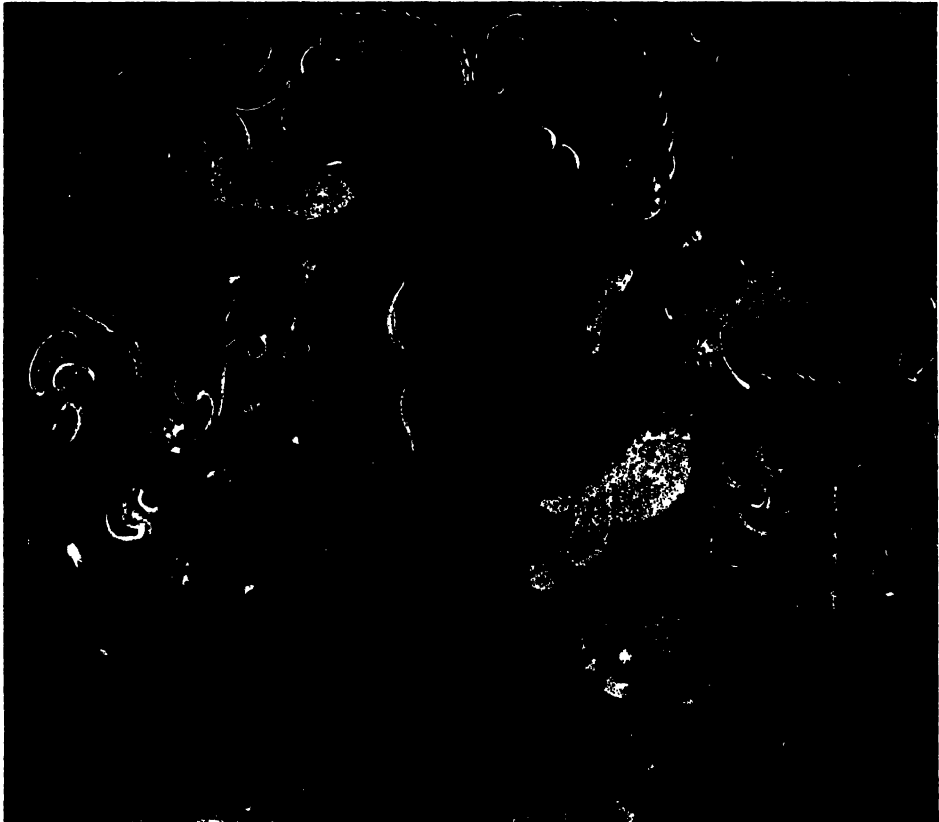
আকাশভরা সূর্য্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে-হিল্লোলে
জোয়ার-ভাঁটার ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্ত-ধারায় লেগেছে তার টান,—
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ ॥
ঘাসে-ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ ॥

(ভারতী, আশ্বিন ১৩৩১) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

"উপায়"-পত্রিকার প্রস্তাবনা

"উপায়" এই শব্দটি শুনলেই প্রথমেই মনে হয় বাহিরের পন্থা। ছেলে পড়াশুনায় কাঁচা, পাস্ করে কি উপায়ে? নোট মুখস্থ করাও। মনে লোভ আছে, দ্বেষ আছে, শান্তি পাবো কি উপায়ে? লোভীরা দ্বেষীরা একত্র মিলে' লীগ্ অফ্ নেশনস্ ফাঁদলে শান্তি পাওয়া যাবে।

আমাদের দেশে দুঃখ দৈন্য অপমানের প্রতিকার কি উপায়ে হবে এ-প্রশ্ন যখনি জেগে ওঠে তখন মনে এই প্রত্যাশা থাকে যে, পথ বাইরে। অন্নকষ্ট হয়েছে? আচ্ছা, ভালো করে' চাষ করো। অর্থ-কষ্ট হয়েচে? দেশসুদ্ধ সকলে মিলে' চর্‌কা চালাও। রোগে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে? এমন ডাক্তার খুঁজে' বের করো যাঁরা সহরে জীবিকার চেষ্টা ত্যাগ করে' গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করবেন।

কিন্তু আসল উপায় পথে নয়, পথে যে-মানুষ চলবে তার নিজের মধ্যে। যে-মানুষ চলতেই পারে না, পথ তা'কে চালায় না। আমাদের দেশে যতকিছু দুর্গতি আছে তার মূলগত কারণ হচ্ছে এখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিল্‌তে পারে না। রাস্তার ওপারে আগুন লাগ্‌লে এপারের লোক যে-দেশে ঘড়া লুকিয়ে রাখ্‌তে ব্যস্ত হয়, পাছে সে-ঘড়া নিয়ে টানাটানি করে, সে-দেশের আগুন বাহিরের উপায়ে নিব্‌বে না, কেননা তার কপালে আগুন।

মালয়-উপদ্বীপে গিয়ে দেখ্‌লুম, সেখানে চীন থেকে যে-সব দরিদ্রলোক এসেছিল তারা প্রায় সকলেই সঙ্গতিশালী হ'য়ে উঠেচে—তারা কেউ হীনবৃত্তি নিয়ে দীনভাবে থাকে না। কেননা তারা পরস্পরের আনুকূল্য করে। ভারতবর্ষীয় কুলির মধ্যে সেই পরস্পরের যোগ ত নেই-ই, বরঞ্চ তারা সুযোগ পেলেই পরস্পরকে শোষণ করতে থাকে। এই-কারণে তা'রা পুরুষানুক্রমে কুলিই থেকে গেল।

দেশের সকল অভাব সকল অপমানের মূল প্রতিকার হচ্ছে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিলিত হওয়া। আমাদের সমাজ-প্রথার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবধানকে চিরন্তন করে' রাখা হয়েছে। এমন-কি সেই ব্যবধানগুলিকে আমরা ধর্ম্মানুশাসন বলে'ই গণ্য করি। এই কারণেই একদিকে যখন আমরা বলি আমরা সনাতন ধর্ম্ম মানি, তখনই অন্যদিকে উপায়ের বেলা বল্‌তে হয় চর্‌কা চালাও। কিন্তু চর্‌কার সুতোয় মানুষকে মেলাবে না। মানুষ না মিল্‌লে কোনো বাহ্য উপায়ে কোনো মহাবিপদ্ থেকে মানুষ ত্রাণ পাবে না। মানুষের সত্য হচ্ছে মানুষের মিলনে—যে-দেশে মানুষের বিচ্ছেদকেই ধর্ম্ম বলে' স্বীকার করে, সে-দেশকে দুর্গতি থেকে কোনো উপায়ে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

(উপায়, বৈশাখ ও শ্রাবণ, ১৩৩১)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

ডাক্তারীতে নোবেল্ প্রাইজ্

আল্‌ফ্রেড্ বার্নার্ড নোবেল্ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টক্‌হল্‌ম্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্যাসোমিটার প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনিই ডিনামাইট্ আবিষ্কার করেন। পরে তিনি ধূমহীন বারুদ ও নকল রবার প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আবিষ্কার করেন। এইসকল আবিষ্ক্রিয়া হইতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়।

পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা-শাস্ত্র, সাহিত্য ও শান্তি-সংস্থাপন এই ৫টি বিষয়ের বিশিষ্ট কর্ম্মীদিগকে প্রতিবৎসর ১,২০,০০০ টাকার পুরস্কার দিবার জন্য তিনি মৃত্যু-সময়ে ২,৭০,০০০০০ টাকা উইল করিয়া দিয়া যান।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার পাইয়াছেন :—

১৯০১ খৃষ্টাব্দে এমিল্ বেরিং, ডিপ্‌থেরিয়া এন্টিটক্সিন আবিষ্কারের জন্য।

১৯০২ " রোনাল্ড রস্, এনোফিলিস্ মশাদ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয় এই বৈজ্ঞানিক সত্য এবং ঐ মশার বিনাশ-সাধনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য।

১৯০৩ " নীল ফিন্‌সেন্, আলোক দ্বারা চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবনের জন্য।

১৯০৪ " পাভ্‌লাভ্, আহারদ্বারা আমাদের শরীরের পুষ্টি কিরূপে হয় তাহা নিরূপণের জন্য।

১৯০৫ " রবার্ট্ কক্, যক্ষ্মার বীজাণু ও অন্যান্য বীজাণু-সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের জন্য।

১৯০৬ খৃঃ রামন্ কাজাল্ ও ক্যামিলো গল্‌গি, স্নায়ু-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য।
১৯০৭ „ আলফোস্ লাভেরা, ম্যালেরিয়ার বীজাণু আবিষ্কারের জন্য।
১৯০৮ „ এরলিক্, উপদংশের ইন্‌জেকসন্ সাল্‌ভারসান্ আবিষ্কারের জন্য ও মেটসনি কফ্ শরীরের আত্মরক্ষার্থ বিবিধ পন্থার আবিষ্কারে।
১৯০৯ „ থিয়োজের ককার্, অস্ত্র-বিদ্যায় গলগ্রহের অস্ত্র-চিকিৎসার প্রবর্ত্তনের জন্য।
১৯১০ „ কসেল্, দেহ-কোষের রাসায়নিক আদান-প্রদান আবিষ্কারের জন্য।
১৯১১ „ গুলস্ট্রাণ্ড, চক্ষের মধ্যে আলোক-রশ্মির গতি নিরূপণের জন্য।
১৯১২ „ ক্যারেল্, রক্তশিরা সেলাই করার জন্য ও এক জন্তুর আভ্যন্তরিক অঙ্গ জন্তুতে স্থানান্তরিত করার জন্য।
১৯১৩ „ রিসে, এনাফিলাক্‌সিস্ সম্বন্ধীয় আবিষ্কারে।
১৯১৪ „ বারানি, কানের রোগের চিকিৎসার উন্নতি-বিধানের জন্য। (গত মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ নোবেল্ প্রাইজ্ দেওয়া বন্ধ ছিল।)
১৯১৯ „ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ রক্তের রোগ-নিবারণী শক্তির আবিষ্কারের জন্য।
১৯২০ „ ক্রগ কৈশিক শিরার মধ্যে রক্তের গতি নিরূপণের জন্য।
১৯২১ „ প্রাইজ দেওয়া হয় নাই।
১৯২২-২৩" শরীর-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আবিষ্কারে।
১৯২৪ " ব্যান্টিং ও ম্যাকলাউড্ বহুমূত্র রোগের ঔষধ ইন্‌সুলিন্ আবিষ্কারের জন্য।

(স্বাস্থ্য, ভাদ্র) শ্রী গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

প্রাকৃত-সাহিত্যে মহিলা কবিগণ

যে-সব স্ত্রীকবিরা সংস্কৃত-সাহিত্যে অল্পবিস্তর যা-কিছু রেখে গিয়েছেন তার মূল্য বড় কম নয়। হয়ত এখনো কত অজ্ঞাত লুপ্ত স্ত্রীকবিগণের কবিতা আছে—কে বল্‌তে পারে?

প্রাকৃত-সাহিত্যেও স্ত্রীকবিগণের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এককালে আমাদের দেশে প্রাকৃত ভাষার চর্চ্চা খুবই ছিল। সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে (২য় পরি॰) বলা আছে যে, একজন রাজার রাজত্বকালে দেশের সবাই প্রাকৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ জৈনদের হাতে পড়ে' প্রাকৃতের চরম উন্নতি হয়। সংস্কৃতের চেয়ে প্রাকৃত যে মধুর, তা বড়-বড় সংস্কৃতবাজ পণ্ডিতরাই স্বীকার করেছেন। তার উপর চারিদিকের বাঁধন কম বলে' প্রাকৃততে ভাব জিনিষটা বেশ হাত-পা ছড়িয়ে জায়গা করে' নিতে পারে। তাই রস-সাহিত্যটি এই ভাষায় খুবই গাথ্যাসা হওয়ায় পণ্ডিতরা বলেন—যার প্রাকৃত-ভাষায় জ্ঞান নেই রসচর্চ্চা তাঁর পক্ষে লজ্জার কথা। এহেন ভাষায় স্ত্রীকবিদের হাতে কবিতার ভাবগুলি যে বেশ অনুভূতপূর্ণ হ'য়ে ফুটে' উঠেছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। পুরুষ কবিরা স্ত্রীভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে-কথা লেখেন তার চেয়ে স্ত্রীকবিগণের লেখার ভাবটি বেশী স্বাভাবিক হয় বলে' মনে হয়—যদি সরম-সম্ভ্রম এসে বাধা না দেয়। তাই অমরুর "অস্মাকং সখী বাসসী"র চেয়ে বিজ্জিকার "যঃ কৌমারহরঃ" মনোহরণ বেশী করে।

পালি-ভাষা প্রাকৃত-ভাষার মাসতুত বোন্। তা'তেও স্ত্রীকবিদের ঢের পদ্য আছে। সেইসব পদ্য থেরীগাথা নামে একখানা বইয়ে সংগৃহীত আছে। ঐ বই এখন ছাপা হ'য়ে গেছে, সুতরাং তার কথা এখানে বলা দরকার নেই। উদাহরণ স্বরূপে একটি পদ্য উল্লেখ করা যাচ্ছে, এ কবিতাটি একজন পতিতা রমণীর কবিতা।—

"কাননম্হি বনসণ্ডচারিণী
কোকিলাব মধুরং নিকূজিতং।
তং জরায় খলিতং তহিং তহিং
সচ্চবাদি বচনং অনঞ্‌ঞথা॥"

এখানে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অনুবাদটি উদ্ধৃত করা গেল—

"উপবনে কোকিলার মত আমি নিতি গো
গাহিতাম সুস্বরে গীতি গো;
গেছে সে মধুর স্বর তবু কেন করে নর
এ দেহের 'পরে এত প্রীতি গো।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা?"

(ইনি যৌবনে রূপগর্ব্বিতা ছিলেন। বুদ্ধদেব বলেন যে, একদিন জরা আসবে আর তা'তে এই রূপ নষ্ট হ'য়ে যাবে। পরে সত্যই জরা এসে নষ্ট করলে। ইনি সেই সময় কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা লেখেন।)

এখানে আজ কয়েকটি প্রাকৃত-ভাষার স্ত্রী-কবিদের কথা বল্‌ব। তাঁদের কবিতাগুলি আদিরস-ঘটিত কিন্তু তখনকার কাল-ভাব, সমাজ ও রচয়িতা প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে অর্থ দেখ্‌লে তত দূষণীয় হয় না। দুঃখের বিষয় এই-সব কবিদের নাম ছাড়া আর কোন পরিচয় পাওয়া দুর্লভ। হয়ত এমন দিন আসতে পারে যাতে আমরা আরও স্ত্রী-কবিদের কাব্য, নাম পরিচয়ের সঙ্গে পেতে পারি, কেননা—

"কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী"।

"হালে"র সংগৃহীত প্রাকৃত শ্লোকগুলির মধ্যে রেবা, প্রহতা, বদ্ধাবহী, অণুলক্ষ্মী, শশিপ্রভা, রোহা, অস্থলব্ধি ও মাধবী—এই কয়জন স্ত্রী-কবির নাম আর তাঁদের কবিতায় পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে শব্দ বা অর্থের ছটা না থাকলেও এতে বেশ সোজা কথা আছে। দু-একটা নমুনা দেওয়া যাক্—

কবি—রেবা,

অবলম্বিঅ মাণপরম্মুহী এন্তস্‌স মাণিণি পিঅস্‌স।
পুট্‌ঠ পুলউগ্‌গমো তুহ কহেই সম্মুহট্‌ঠিঅং হিঅঅং॥

সখীকে উপহাস করে' বলা হচ্ছে—মানেতে তুমি এইরকম বিমুখ হ'য়ে বসে' আছ, তোমার নিজের ইচ্ছাতে নয়। কেননা তোমার প্রিয়জন কাছে আসছেন জেনে তোমার পিঠে পুলক দেখা দিয়েছে। এতে বোঝাচ্ছে তোমার হৃদয় যেন পিঠের দিকে ফিরে' এসেছে।

কবি—মাধবী,

ণ মেন্তি জে পহুত্তং কুবিঅং দাসাব্ব পসাঅন্তি।
তে বিঅ মহিলাণং পিআ, সেসা সামি বিঅ অরাআ॥

যাঁরা গৃহিণীদের উপর খামকা প্রভুত্ব খাটান না, আর গৃহিণীরা রেগে গেলে তাঁদের সন্তুষ্ট রাখ্‌তেই সেবকের মত চেষ্টা করেন, তাঁরাই গৃহিণীদের প্রিয় হ'তে পান। যাঁরা ওরূপ নন, তাঁরা শুধু স্বামী মাত্র, অর্থাৎ প্রিয় নন।

কবি—রোহা,

জেণ বিণা ণ জিব্বই অণুণিজ্জই সো কআবরাহো বি।
পত্তে বি ণঅর দাহে ভণ কস্‌স ণ বল্লহো অগ্‌গি॥

যাকে নইলে চলে না সে যদি কখনো দোষ করে' ফেলে, তা' বলে' উপর মান না করে' অনুনয়ই করতে হয়। আগুনে নগর পুড়ে গেলেও আবার আদর করে'ই ত তা'কে ঘরে তুলতে হয়।

কবি—শশিপ্রভা,

জহ জহ বাএই পিও তহ তহ ণচ্চামি চঞ্চলে পেম্মে।
বল্লী বলেই অঙ্গং সহাব থদ্ধে বি রুক্‌খ ম্মি।

তিনি যেমন-যেমন বাজান, আমরা তেম্‌নি-তেম্‌নি নেচেই মরি। গাছ ত স্থির থাকে, লতাই তা'কে ঘিরে' ঘিরে' বাড়তে থাকে।

এই-সব কবিতাগুলির ভাব বেশ স্বাভাবিক। শত-শত বৎসর আগেও যে মহিলাগণের প্রতিভার আলোয় আমাদের দেশের সাহিত্য উজ্জ্বল হ'য়ে ছিল তা আমাদের গৌরবের বিষয়।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৩১)

শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

—

ভারতের বাহিরে রামায়ণী কথার প্রচার

রামায়ণী কথা যে কেবল ভারতবর্ষের দেব-ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষা-সমূহেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; প্রাচীন কালে হিন্দুর গতি-বিধি ও উপনিবেশ যে-যে স্থানে ছিল, সেই-সেই স্থানেই রামায়ণও নীত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে সেই-সেই দেশের কবি-ভাষায় তাহার প্রচার হইয়াছিল। এইরূপে যবদ্বীপে, বালীদ্বীপে, লম্বকদ্বীপে ব্রহ্ম দেশে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশে মূল রামায়ণ-কথা প্রচারিত হইয়াছিল।

যবদ্বীপে বোধ হয় খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে রামায়ণ-কথা নীত হয়। যবদ্বীপের রামায়ণের সহিত উত্তরকাণ্ড গ্রথিত নহে।

এই কারণে কেহ-কেহ মনে করেন, যবদ্বীপে যে-সময় ভারতীয় রামায়ণ-কথা নীত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ড ছিল না। ইহার পরে ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার কৃত্তিবাসের ন্যায় যবদ্বীপের কবিরাও মূল রামায়ণকে নানা-ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া তথাকার কবি-ভাষায় রচনা করিয়া লইয়াছেন।

যবদ্বীপের কবি-ভাষায় রচিত রামায়ণের নাম 'রামকবি'। রামকবি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা রাম গুণক্রং, রামবদ্র বা রামভদ্র, রামতালী এবং রামায়ণ। রামগুণক্রং অংশে আদি-কাণ্ডের কথাই বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে রাম-বনবাস হইতে রাহ্বণ (রাবণ) কর্ত্তৃক সীতা হরণ পর্য্যন্ত আছে। তৃতীয় অংশে হনুমানের দৌত্য ও অঙ্গলঙ্কা (স্বর্ণলঙ্কা) গমনের সেতু-নির্ম্মাণের কথা পর্য্যন্ত আছে। চতুর্থ বা শেষ অংশে রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতি (সীতা) উদ্ধার ও সকলের নাবুদ্ধ্যা (অযোধ্যা) প্রত্যাগমন এবং বিবিষণকে (বিভীষণ) লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে।

যবদ্বীপের কবি-ভাষায় "কাণ্ড" নামেও একখানা পুরাণ-গ্রন্থ আছে। তাহাতেও সৃষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদির বর্ণনার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর এবং অন্যান্য পুরাণ-বর্ণিত কাহিনীর বর্ণনা আছে।

যবদ্বীপে উত্তরকাণ্ডও আছে। তাহা পৃথক্ গ্রন্থ।

যবদ্বীপ হইতে যবদ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা যখন বালীদ্বীপে ও লম্বকদ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহারাও তাঁহাদের এই সম্পদটিকে অন্যান্য প্রিয় সম্পদের সহিত লইয়া আসিয়াছিলেন।

বালীদ্বীপের রামায়ণও বাল্মীকি-প্রণীত বলিয়া পরিচিত; কিন্তু এই রামায়ণ বালীদ্বীপের কবি-ভাষায় রচিত। এই কবি-ভাষায় সংস্কৃত-শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। বালীর রামায়ণ ৬ কাণ্ডে ও ২৫ সর্গে সম্পূর্ণ। এই রামায়ণেও উত্তরকাণ্ড নাই। এখানেও উত্তরকাণ্ড পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া প্রচলিত। উহার বিশেষত্ব এই যে—উহাতে রামের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয়দিগের বিবরণ ও চরিত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বালী-রামায়ণের ছয় কাণ্ডে সংক্ষেপে মূল রামায়ণের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে এবং শেষে রামের বার্দ্ধক্য অবস্থায় বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বালীর কবি-ভাষায় রাজা কুসুম-রচিত দ্বিতীয় আর-একখানা রামায়ণ আছে। সেখানাও উত্তরকাণ্ডহীন। বালীতে সেই রামায়ণেরই এখন প্রচার বেশী।

ব্রহ্মদেশের রামায়ণী কথার নাম "রামযৎ" রামযতেব রাবণ দশ-গিরি নামে পরিচিত; দশগ্রীব নহে। বাল্মীকির রাবণও কিন্তু দশমুণ্ড বিশ হস্তধারী নহে। রাবণের রাজমুকুট দশশৃঙ্গ-সমন্বিত হেতু ব্রহ্ম-দেশের রামযতে তিনি দশগিরি।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহে এবং ব্রহ্ম, আসাম, মালয় প্রভৃতি স্থানে দ্রাবিড়-সভ্যতাই বিস্তৃত হইয়াছিল; সেইজন্য মনে হয়, ঐ-সকল দেশের রামায়ণে দ্রাবিড়-প্রভাব বেশী সংক্রামিত হইয়াছিল।

শ্যামদেশে অযোধ্যার আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, সেজন্য শ্যামে মূল বাল্মীকি রামায়ণই প্রচারিত হইয়াছিল। শ্যামের প্রাচীন রামায়ণ এখন আর পাওয়া যায় না। শ্যামের বালী-ভাষায় (বোধ হয় পালী-ভাষা) এই রামায়ণ লিখিত ছিল। বালী ভাষাও সংস্কৃত শব্দ-বহুল ভাষা।

এগুলি সমস্তই সংস্কৃতমূলক ভাষা; আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার বিস্তৃতি-ব্যপদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তৃতি-ব্যপদেশ ব্যতীত, বিভিন্ন আগন্তুক জাতিকর্ত্তৃকও রামায়ণী কথা পৃথিবীর দিকে-দিকে নীত হইয়াছিল; যখনই যে-জাতীয় লোক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতের এই মনোরম জাতীয় চিত্রটিকে অতি যত্নের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপে রামায়ণী কথা এসিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং ক্রমে ইয়ুরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল।

গ্রীক চিন্তার সহিত ভারতীয় চিন্তার বহু বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। এইসকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হইবে, প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন গ্রীসের একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ছিল। ম্যাক্সমুলার মনে করেন, বেদের পণি ও সরমার গল্প লইয়া হোমার ইলিয়ড রচনা করিয়াছিলেন। আর ওয়েবার্ বলেন, দক্ষিণ-ভারতে কৃষি প্রবর্ত্তনের রূপক-কথা লইয়াই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণী কথা চীন-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ "মহাবিভাষা" কাত্যায়নীপুত্র কৃত "জ্ঞানপ্রস্থান" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের একখানা বিরাট টীকা-গ্রন্থ। এই বিরাট টীকা-গ্রন্থ মহাবিভাষার রামায়ণের গল্পাংশ—সীতা-হরণ হইতে সীতা-উদ্ধার পর্য্যন্ত আছে। মহাবিভাষা দুইশত খণ্ডে সমাপ্ত; ইহার ৪৬শ খণ্ডে এই রামায়ণী কথা প্রদত্ত হইয়াছে। মহাবিভাষা শকরাজ কণিষ্কের সময় রচিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত চীন ভাষায় অনূদিত হইয়া চীন দেশে নীত হইয়াছিল। অতঃপর চীন পরিব্রাজক য়ু-য়েনসঙ্গও এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শকরাজ কণিষ্ক বুদ্ধের দেহ-ত্যাগের ৩০০ বৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দশরথ-জাতকের গল্পাংশের সহিত মহাবিভাষার গল্পাংশ যুক্ত করিয়া লইলে খৃঃ পূঃ তৃতীয়, ৪র্থ শতাব্দীতেও যে বৌদ্ধ-সাহিত্যে সম্পূর্ণ

রামায়ণ-কথা ছিল, তাহা প্রকাশ পায়। এই চিন্তা গ্রাহ্য করিতে গেলে কিন্তু লঙ্কাবতারসূত্রকে অগ্রাহ্য করিতে হয়।

অতঃপর আরবের অভ্যুদয়-কালে বোগদাদের রাজা হারুণ-অল্-রসিদ ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ চরক-সুশ্রুতের সহিত রামায়ণ-মহাভারতেরও অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট্ আকবর সাহের রাজত্বকালে তাঁহার আদেশে আবদুর কাদের বদায়ুনি রামায়ণের এক পারস্য অনুবাদ সুসম্পন্ন করেন। চারি বৎসরে তাঁহার অনুবাদ শেষ হয়। বদায়ুনি লিখিয়াছেন, তিনি ৬৫অক্ষর-সমন্বিত পঁচিশ হাজার শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ অধিকারের পর ইয়ুরোপীয়দিগের দৃষ্টি ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকে নিপতিত হয়। ফলে শ্রীরামপুরের মিশনারী কেরী ও মার্শম্যান ১৮০৬ ও ১৮১০ সালে বঙ্গদেশীয় সংস্করণের বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেন।

১৮২৯ অব্দে ফন্ শ্লিগেল (Augustus William Von Schlegel) কাশীসংস্করণ রামায়ণের বালকাণ্ডের সম্পূর্ণ ও অযোধ্যা-কাণ্ডের কতক-অংশের মূলসহ লাটিন অনুবাদ প্রচার করেন।

১৮৪০ অব্দে ইটালি-দেশবাসী সিগ্‌নর গোরেসিও বঙ্গীয় সংস্করণের সম্পূর্ণ রামায়ণ-মূল সংস্কৃত সহ ইটালীয় ভাষায় প্রকাশ করেন। গোরেসিও সরকারী সাহায্যে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৪০ অব্দে তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৮৬০ অব্দে তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার রামায়ণের ন্যায় উৎকৃষ্ট সংস্করণ এপর্য্যন্ত আর প্রচারিত হয় নাই।

গোরেসিওর রামায়ণ অবলম্বন করিয়া হিপোলিট্ ফুশে (M. Hippolyte Fouche) ফরাসী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ প্রচার করেন।

এইসময় বিলাতের ওয়েষ্ট্‌মিন্‌সটার রিভিউ (Vol. L.) পত্র রামায়ণ-সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রচার করিয়া ইয়ুরোপীয়-দিগের দৃষ্টি এই কাব্যের প্রতি আকর্ষণ করেন এবং ভারতীয় সিভিলিয়ান্ কাষ্ট্ সাহেব (R. N. Cast) কলিকাতা রিভিউ (No. 45) পত্রিকায় রামায়ণের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই আলোচনাদ্বয়ের ফলে ইয়ুরোপের বহু মনীষী ব্যক্তির মনে রামায়ণ-আলোচনার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে।

কাশী কুইন্স্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিৎ সাহেব (Ralph T. H. Griffith M. A.) কাশী সংস্করণ রামায়ণের সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেন। মনিয়র উইলিয়ম্ ইণ্ডিয়ান্ এপিক্ পোয়েট্রি লিখিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। স্পাইয়ার-পত্নী (Mrs. Speir) লাইফ্ ইন্ এন্‌সেণ্ট্ ইণ্ডিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। ফরাসী লেখক Mlle Clarisse Bader—La Femme dans L' Inde Antique প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কবিগুরু বাল্মীকির যশ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

দেশীয়দিগের মধ্যে স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্ত রামায়ণের সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে রামায়ণ-কথার আলোচনা বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই করিয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মের, ইণ্ডিয়ান্ এপিক্ পোয়েট্রি ব্যতীত তাঁহার ইণ্ডিয়ান্ উইসডাম্, ওমান্ সাহেবের গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ এপিক্‌স্, ডোনাল্ড মেকেঞ্জির ইণ্ডিয়ান্ মিথ্ এণ্ড্ লিজেণ্ড্, জনৈক ইংরেজ মহিলার ইলিয়াড অব দি ইষ্ট্ প্রভৃতি ঐসকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

টাল্‌বয়েড্ হুইলারও একখানা রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ রামায়ণ তাঁহার প্রণীত ভারত-ইতিহাসের (History of India) একটি খণ্ড মাত্র। এই রামায়ণ-খণ্ড দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম অংশে রামায়ণী-কথা ও দ্বিতীয় অংশে রামায়ণের আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার বৃহৎ; কিন্তু দুঃখের বিষয় হুইলার সাহেব শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার মনের ঈর্ষাপ্রসূত কলুষ-ভাব আলোচনার কথায়-কথায় ব্যক্ত হইয়াছে।

(সৌরভ, ভাদ্র ১৩৩১) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

—

যাহা বলিয়াছিলাম

"শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের বিপ্লবের ভয়"

খুব বেশী দিন আগে নয়, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন যে বাংলায় অরাজকপন্থী ও বিপ্লববাদী অনেক আছে এবং তাহাদের একটা তালিকা-গোছের কিছুও তাঁহার নিকট আছে। তখন শ্রীযুক্ত দাশ তাঁহার এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বাংলায় বিপ্লববাদ নাই বলিলেই চলে।

আজ আবার নূতন কথা শুনিতেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিতেছেন যে, শীঘ্র স্বরাজ যদি ইংরেজরা আমাদের না দেয় তাহা হইলে ঘোর বিপ্লবের সূচনা হইবে। বাংলায় নাকি অসংখ্য বিপ্লববাদী রহিয়াছে এবং তাহাদের বহু কষ্টেই শান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। কে তাহাদের শান্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা দেশবন্ধু দাশ বলেন নাই। হয় তিনি নিজে নয় অপর কেহ নিশ্চয়ই। কিছুদিন আগে বিপ্লববাদীরা ছিল না; আজ হঠাৎ তাহারা কোন্ মায়ার বলে জীবিত হইয়া উঠিল? এবং এই অল্পকিছু দিনের মধ্যে বাংলায় কি এমন ঘটিল যাহার জন্য বিপ্লব সুরু হইবে এইরূপ আশঙ্কা করা যায়? পরাধীন আমরা বহুকাল ধরিয়া রহিয়াছি; সেই পরাধীনতা হঠাৎ এমন কোন্ নূতনরূপ ধারণ করিল যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে বিপ্লব বিশেষ করিয়া আজ আবার উগ্র হইয়া উঠিতে পারে? শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের অভিনব (ও পাশ্চাত্য ইতিহাসের চির-পুরাতন) উপায়ে আজ কিছুকাল ধরিয়া স্বাধীনতার দিকে লইয়া যাইতেছেন, এইরূপ একটা মত তাঁহার অনুচরগণ চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। যদি আমরা স্বাধীনতার দিকেই স্বরাজ্যপথ ধরিয়া চলিতেছি, তাহা হইলে হঠাৎ বিপ্লববাদীগণ জাগিয়া উঠিল কেন? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের যে পরাধীনতা সেই পরাধীন-তার মধ্যেই রাখিয়া শুধু কথা ও চমক্‌প্রদ ঘটনার চাঞ্চল্যে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং বিপ্লববাদীগণ সমস্ত ব্যাপারটার অসারতা দেখিয়াই আজ উঠিয়াছে? অথবা একি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের আর-একটা স্বরাজ-লাভের প্রচেষ্টা? বিপ্লবের ভয় দেখাইয়াই কি তিনি ইংরেজের নিকট হইতে আমাদের হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে চান?

এই যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব এইবার তাঁহাকে ভুল পথে লইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে যদি কোন বিপ্লবের সূচনা হয়, তাহা হইলে তাহার খবর পুলিশের নিকট পৌঁছাইতে খুব অল্প সময়ই লাগিবে। ইহার কারণ আমাদের দেশের বিপ্লববাদীদের কৈশোর ও পুলিশের অভিজ্ঞতা। এবং বিপ্লবের সূচনা হইবে এই ভয়ে অন্ধের মতো ইংরেজ সব দিয়া ফেলিবে ইহা মনে করা ভুল। কেননা বিপ্লব হইলে তাহার শক্তি-সামর্থ্য-সম্বন্ধে ইংরেজ বেশ পরিষ্কার খবরই পাইবে মনে হয়।

আমাদের মনে হয় না যে বাংলার অন্তরে কোন বিরাট্ বিপ্লবের সূচনা হইতেছে, যদি কিছু হয় তাহা ছোটখাট ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। সুতরাং তাহার ভয়ে ইংরেজ স্বরাজ দিয়া ফেলিবে এমন আশা করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এইসকল উপকথাজাতীয় খবর প্রকাশ করিয়া দেশের একটা বড় অনিষ্ট করিয়াছেন। বিপ্লবকারীদের সম্বন্ধে পুলিশের জ্ঞান যাহাই থাকুক না কেন, শ্রীযুক্ত দাশের কথায় তাহাদের বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হইবে। এখন যদি পুলিশ সন্দেহ মাত্র সম্বল করিয়া দোষী-নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে বাংলার যুবকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে, তাহা হইলে পুলিশ তাহাদের নিজেদের সপক্ষে শ্রীযুক্ত দাশের কথা যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করিতে পারিবে। ইহাতে আমাদের স্বরাজ-লাভের কোনই সুবিধা হইবে না।

শ্রীযুক্ত দাশের এইসকল কথা তাঁহার কিছুকাল পূর্ব্বের কথার বিরুদ্ধ, তাহা বলিয়াছি। এইসকল কথায় অথবা এইসকল কথার সাহায্যে স্বরাজলাভ হইবে না ইহাও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এবং এইসকল কথার ফলে দেশের অনেক নির্দ্দোষ লোকের অদৃষ্টে দুঃখ-ভোগ আছে, এইরূপ আমাদের আশঙ্কা।

স্বরাজ্যদল জগৎ-প্রসিদ্ধ ভুয়ো কন্‌ষ্টিটিউশন্‌কে ভুয়ো প্রমাণ করিয়াছেন। ভুয়ো কন্‌ষ্টিটিউশন্ সংক্রান্ত অনেক ভুয়ো ভোটের ব্যাপারে জয়লাভও করিয়াছেন। দেশের অনেক জায়গায় উপস্থিত হইয়া শব্দ, গোলমাল ও "আন্দোলনের" সৃষ্টি করিয়াছেন। এইসকল ব্যাপারে দেশের ভাল বা মন্দ কিছুই হইতেছে না; কিন্তু আজ শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয় যাহা করিলেন ইহাতে মন্দের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইরূপ কথা বলা তাঁহার মতো বিচক্ষণ লোকের উচিত হয় নাই।

* (শনিবারের চিঠি, ২১ ভাদ্র, ১৩৩১)

দেশবন্ধুর অবিবেচনার ফসল

সারা বাংলাময় ইংরেজের প্রভুত্ব আইনের রূপ ধরিয়া আবার বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ঘা দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। বাঙ্‌লা শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ইংরেজের ক্ষতি, কাজেই বাঙালীরা সংঘবদ্ধ হইয়া যে-কোন উপায়ে ও যে-কোন ক্ষেত্রে শক্তি প্রকাশ করিলে তাহা ইংরেজের চক্ষে বিপ্লবের রঙে রঙীন হইয়া দেখা দেয়। তাই আজ উন্নতচেতা সুভাষচন্দ্রের মতো লোকেরা ১৮১৮ খৃঃ অব্দের উৎপীড়ন আইনের কবলে পড়িয়া নরহত্যা ও চোরডাকাতের সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন।

স্বরাজ্য-দলের প্রভুদের শক্তি অপেক্ষা বিজ্ঞাপনের দিকে অধিক নজর দেওয়ার এই ফল। "দেশবন্ধু" চিত্তরঞ্জন নিজের অবিবেচনার চিত্তরঞ্জন করিতে গিয়া বাংলা দেশটাকে অত্যাচারের রঙে রাঙাইয়া দিলেন। আমরা তখনই বলিয়াছিলাম যে, ভাবুক পলিটিশিয়ান "দেশবন্ধু" অযথা বাক্যাড়ম্বর দেখাইতে গিয়া অনেক ঘরে দুঃখের আগুন জ্বালাইয়া দিবেন। আজ তাহাই হইল। বিলাতে লাটমহলে ও পুলিশের দপ্তরে সর্ব্বত্র একই কথা, "তোমাদের নেতাই ত বলিয়াছে যে বিপ্লব আছে। তবে কেন আপত্তি করিতেছ?" কিন্তু বিপ্লবের গল্পও শুনিলাম, লর্ড রেডিংএর ১৯০৮ হইতে সুরু করিয়া পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নানা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া বাঁধা উৎপীড়ন সমর্থনের জয়মাল্যও দেখিলাম, টেগার্টের নিকট চিত্তরঞ্জনের বিপ্লবভীতির পুনরাবৃত্তির কথাও শুনিলাম, বিপ্লবকারীরা অসংখ্য ও ভীষণ অস্ত্রে সজ্জিত তাহাও জানিলাম, আকস্মিকভাবে ধৃত হইলেও এবং সকলের বাসস্থান ও আড্ডা পুলিশের জানা ছিল এইরূপ কথা সরকারী ইস্তাহারে বাহির হইলেও কোন তথাকথিত বিপ্লবকারীর নিকট কোন অস্ত্র পাওয়া যায় নাই তাহাও জানিলাম; শুধু বুঝিলাম না কাহার বিষ-কল্পনাপ্রসূত বাণীতে আজ এই অত্যাচার আরম্ভ হইল। বিপ্লবাতঙ্কে অধীর ইংরেজ যে বিনা কারণেও লোকের উপর নিপীড়ন সুরু করিতে পারে এ-বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নির্ব্বুদ্ধিতা যে এই অত্যাচারের অন্যতম ও প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(শনিবারের চিঠি, ১৫ই কার্ত্তিক ৩৩১১)

* ৮ই কার্ত্তিক তারিখে গভমেণ্টের নূতন আইন প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত হয়—প্রঃ সঃ।

মুসলমানের অদ্ভুত আতিথেয়তা

শ্রী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার আবাল্য বন্ধু এবং সহপাঠী। আমরা উভয়ে একই বৎসর বাঁকুড়া জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া একত্র কলিকাতা আসিয়া একই বাসায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হই। তাহার পর আমাদের উভয়ের জীবন-চরিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। একটা কথা কেবল বলিয়া রাখি, যে, তিনি সামাজিকভাবে বরাবর হিন্দু-সমাজভুক্ত আছেন, আমি তাহা নহি। তিনি সরকারী কাজে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগে ও ঢাকা বিভাগে স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। এক্ষণে অবসর লইয়া বাঁকুড়ায় আছেন। তিনি বহু বৎসর পূর্ব্বে "নবীনা জননী" নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার তিন সংস্করণ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আর কোন বহি তিনি লেখেন নাই। গত বৎসর আমি যখন বাঁকুড়া

যাই, তখন বহু বৎসর পরে একত্র আহারের পর নানা কথা-বার্ত্তার মধ্যে নিম্নে বিবৃত ঘটনাটি তিনি আমাকে বলেন। বরাবরই আমার ইচ্ছা ছিল, তিনি ইহা লিখিয়া প্রকাশ করুন। কিন্তু এতদিন কোন কারণে তাঁহাকে কোন অনুরোধ করি নাই। এক্ষণে আমার অনুরোধে তিনি ইহা লিখিয়া দিয়াছেন। যে-কারণে আমি তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে অনুরোধ করি নাই, তাহার প্রভাব তাঁহার মনের উপর এখনও থাকা সত্ত্বেও তিনি ইহা লিখিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়]

স্কুলের ডেপুটি ইনেস্‌পেক্টারি করিতাম। জেলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, বেশীর ভাগ গরুর-গাড়ীতে। "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে" এইভাবেই প্রায় মফঃস্বলে জীবন যাপন করিতাম। কখনও রাজভোগ কখনও বা অনশন, কখনও জ্যোৎস্নার আলোকে শাল-জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে বিপুল আনন্দ অনুভব, কখনও বা নিবিড় অন্ধকারে জঙ্গলে পথ হারাইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সন্নিকটে রাত্রি যাপন, কখনও সাধু সঙ্গ, কখনও দস্যু-তস্করের সহিত সাক্ষাৎ, কখনও আতিথেয়তার উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি, কখনও বা গৃহস্থের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া উপবাসে রাত্রি যাপন করিয়াছি।

আজ পাঠকবর্গের নিকট একটি অদ্ভুত আতিথেয়তার পরিচয় দিব।

সে আজ প্রায় ২৫ বৎসরের কথা—একবার র— জেলায় একটি স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। স্কুল দেখিয়া ৮।৯ মাইল অন্তরে একটি বাঙ্গালায় রাত্রি যাপন করিব মনস্থ করিয়াছিলাম। বেলা আন্দাজ ৩টার সময় সেই বাঙ্গালায় যাইব বলিয়া গরুর-গাড়ীতে উঠিলাম। পশ্চাতে আর-একটি গাড়ীতে একজন সব্‌ইনেস্‌পেক্টার্‌ ছিলেন, তিনি একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। খুব নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু।

বৈশাখ মাস। কিছুদূর আসিতে না আসিতে আমার নিদ্রা আকর্ষণ হইল। আমি ঘুমাইতে লাগিলাম। গাড়ী মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল। হঠাৎ বেলা পাঁচটার সময় মেঘের গুরু গর্জ্জনে ঘুম ভাজিয়া গেল। উঠিয়া দেখি চতুর্দ্দিক্‌ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন—প্রকৃতির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। অতি শীঘ্র ঝড় ও তাহার সহিত শিলাবৃষ্টি ও জল আরম্ভ হইল—মুহুর্মুহু বজ্রপাতও আরম্ভ হইল;—নিকটে কোথাও আশ্রয় দেখিতে পাইলাম না। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নিকটে কোন গ্রাম আছে? সে বলিল, রাস্তার বামদিকে প্রায় এক মাইল যাইলে একটি গ্রাম পাওয়া যাইবে। আমি বলিলাম, যেমন করিয়া পার সেইখানে চল, এখানে থাকিলে মৃত্যু নিশ্চয়। গাড়োয়ানও ভয় পাইয়াছিল। সে প্রাণপণে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিতে লাগিল। পশ্চাতে সব্‌-ইনেস্‌পেক্টার্‌ বাবুও আসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে আমরা একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তখনও তুমুল ঝটিকা বহিতেছে। এক লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সিক্ত-বস্ত্রে সম্মুখে যে গৃহটি দেখিলাম—সেই গৃহেই প্রবেশ করিলাম—বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া—বাহিরেই একটি গোয়াল-ঘরে প্রবেশ করিলাম। সব্‌-ইনেস্পেক্টার্‌-বাবুটিও আমার পথ অনুসরণ করিলেন। ঘরটি গোয়াল ঘর হইলেও বেশ পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন ছিল—সেইখানেই দুই-খানা ভিজা কম্বল পাতিয়া বসিলাম—অন্যান্য জিনিষ-পত্রও ক্রমশঃ গাড়ী হইতে উঠাইয়া আনা হইল। যাহা হউক একটি আশ্রয় পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তখন অন্ধকার হইয়াছে—কোন গতিকে হারিকেন-লণ্ঠন জ্বালিয়া—সেইখানে বেশ আড্ডা জমা-ইয়া দিলাম। বাড়ীর কর্ত্তার কোন সন্ধান পাইলাম না। কেই বা সে দুর্য্যোগে বাটীর বাহির হইবে? কিছুক্ষণ পরে ঝড় থামিল ও বৃষ্টিও অনেকটা কম হইল। গাড়োয়ান বলিল, এটি একটি মুসলমানের গ্রাম, এখানে একটিও হিন্দু নাই। আমার সব্‌ইন্‌স্পেক্টের্‌ বাবু ঈষৎ বিচলিত হইলেন—সন্ধ্যা-আহ্নিক হইবার আশা নাই। আহারেরও কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে না। প্রায় ১ ঘণ্টা বসিয়া থাকার পর বাড়ীর কর্ত্তা দেখা দিলেন। তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট দেহ, সৌম্য মূর্ত্তি, শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু ও শুভ্র বেশ দেখিয়া আমার মনে আশার সঞ্চার হইল। মুসলমান সাধারণতঃ যে-প্রকার কাট-খোট্টা-রকমের হয়—তাহার কিছুই দেখিলাম না।

প্রথমে ভয় হইয়াছিল বুঝি বা অর্দ্ধচন্দ্র কপালে আছে; কিন্তু লোকটির চেহারা দেখিয়া আমার সে ভয় একবারেই গেল।

আসিয়াই আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া তিনি বলিলেন, "বাবুরা বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। আজকাল ঝড়-জলের সময়, বিকেলে আসাটা অন্যায় হইয়াছে। যাক্, তোমাদিগকে দেখিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কি জোগাড় করিব?"

আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই সুব্রাহ্মণ সব্-ইন্‌স্পেক্টার্-বাবুটি বলিলেন, "মোল্লা-সাহেব, আমাদের জন্য চিন্তিত হইবেন না; আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বৃষ্টি একটু থামিলেই—বাঙ্গলায় যাইব।"

"বাবু, তাও কি হয়? আমার অতিথি তোমরা আমি কি করিয়া তোমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিব? তাহা হইতেই পারে না।"

আবার চট্ করিয়া সব্-ইন্‌স্পেক্টার-বাবু বলিয়া ফেলিলেন—"দেখুন মশায়, আমরা হিন্দু-ব্রাহ্মণ আপনাদের গ্রামে আমাদের জন্য ব্যবহার করিবার জলই মিলিবে না; কি করিয়া আমরা আহার করি বলুন?"

আমি মনে-মনে বলিলাম, "আবাগের বেটা ভূত, তোমার পাল্লায় পড়িয়া আজ অনাহারে রাত্রিটা কাটাইতে হইল!" যাহা হউক মধ্যাহ্নে আহারটা কিছু গুরুতর-রকমের হইয়াছিল বলিয়া আহারের ইচ্ছাটা বড় ছিল না—সুতরাং আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবু, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য;—কি করিব, এই দুর্য্যোগে অন্য উপায় আপাততঃ দেখিতেছি না। তবে তোমরা যদি অভুক্ত থাক, তবে আমরা স্ত্রী-পুরুষ কিছুই আহার করিব না। আমাদের ধর্ম্মে বলে, অতিথিকে না খাওইয়া খাইও না। কিন্তু বাবু আমার একটি অনুরোধ—আজ রাত্রে আর যাইও না, কাল সকালে আমার সহিত দেখা না-হওয়া পর্য্যন্ত থাকিও। বুড়োর এই অনুরোধটি রাখিও।" আমার দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ এই কথাগুলি বলিলেন। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম। এই ভীষণ দুর্য্যোগে রাত্রিকালে বাহির হইবার ইচ্ছাটা আমার একেবারেই ছিল না। বৃদ্ধ আমার আশ্বাস পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের অন্যকোন জিনিসপত্রের দরকার হইবে কি না।" আমি বলিলাম, "যদি দুইখানি শুষ্ক কম্বল দেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হই।" বৃদ্ধ কম্বল আনিয়া দিয়া কিছুক্ষণ আমাদের নিকট বসিয়া নিজের সুখদুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নাই, একটি বিধবা কন্যা ঘরে আছে। চাষ-বাস করিয়া বৃদ্ধ অনেকগুলি ধান পান তাহাতেই তাঁহাদের সামান্য অভাব মোচন হয়। বাড়ীতে দুই তিনটি দুগ্ধবতী গাভী আছে ও হালের বলদও চার-জোড়া আছে। সে-রাত্রিতে গোয়াল-ঘরটি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বৃদ্ধ অন্য স্থানে তাঁহার গরুগুলি রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রাত্রি ৯।১০ টার সময় বৃদ্ধ আমাদের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। আমরাও শুষ্ক কম্বল বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিলাম এবং কিছুক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইলাম।

রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। মেঘ কাটিয়াছে। বৃষ্টিও নাই। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। এমন সময় বাহিরে একটা কোলাহলের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ভয় হইল বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। চাপ্‌রাসীকে উঠাইয়া দিয়া বলিলাম, "দেখ ত বাহিরে কিসের শব্দ?" সে উত্তর-পশ্চিম দেশীয় লোক; গায়ে বল ত ছিলই, সাহসও ছিল। সে অবিলম্বে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল এবং আধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু, আপনাদের জন্য একটা কুয়া হচ্ছে। তাই লোকজনের এত শব্দ। সেই মুসলমানটি রাত্রেই গ্রামান্তরে গিয়া কতকগুলি হিন্দু মজুর লইয়া আসিয়া কুয়া খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।" অবশ্য এখানে বলিয়া রাখা উচিত, যে ঐ জিলায় ৫।৬ হাত খুঁড়িলেই কুয়ার জল পাওয়া যায়।

আমি ত শুনিয়া অবাক্। হিন্দু-ব্রাহ্মণের পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠিয়া বৃদ্ধ গ্রামান্তরে গিয়া হিন্দু মজুর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ঢের আতিথেয়তার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এরকমের অতিথি-সৎকারের কথা ত কখনও শুনি নাই। ধন্য মুসলমান বৃদ্ধ, তুমিই ধন্য! শাস্ত্রে শুনিয়া আসিতেছি

যে অতিথি নারায়ণ : সে-কথার সারবত্তা আজ একজন মুসলমানের নিকট উপলব্ধি করিলাম। আজ সে ২৫ বৎসরের কথা। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু সেই রাত্রের ঘটনা মনে হইলে এখনও আমার গা শিহরিয়া উঠে। এখনও আমি উদ্দেশে সেই মুসলমানের চরণে প্রণিপাত করি।

ভোর না হইতে হইতেই বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই। আমাদের কিসে সুবিধা হইবে, এইচিন্তায় তিনি ঘুমাইতে পান নাই। আসিয়া বলিলেন, "বাবু কুয়া প্রস্তুত; মুসলমানেরা কেহই এই কুয়ার জল স্পর্শ করে নাই। তোমরা নিশ্চিন্তমনে এই কুয়ার জল ব্যবহার করিতে পার।"

আমার যেন বাক্‌রোধ হইল, আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। তিনি ভাবিলেন আমি বুঝি সন্দেহ করিতেছি। আবার বলিলেন, "দোহাই খোদাতালার—আমি সত্য কথা বলিতেছি"।

আমি তখন একলম্ফে উঠিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলাম এবং বলিলাম, "পানীয় জল ত হইল; কিছু আহার করাবেন না?" সব্‌ইনেস্‌পেক্টার্ বাবুটি তখন আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন, আমি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সাদরে তাঁহাকে আমার বিছানায় বসাইলাম—এবং বলিলাম, "কিছু খাইতে দিন।" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "সেইজন্যই ত আসিয়াছি। "আমি আপনাদের আহারের জন্য বিশেষ কিছু উদ্যোগ করিব না—আমার ঘরে যাহা আছে তাহাই দিব। আপনারা এখন স্নান-আহ্নিক শেষ করুন। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

সব্-ইন্‌স্‌পেক্টার-বাবুটি আমার দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "কি করা যায়?" আমি বলিলাম, "দেখুন দুবে-মশায়, যদি ভালো চান তবে কোন আপত্তি করিবেন না।" দুবে মহাশয়ের সে-মাসের মস্ত একটা রাহা-খরচের বিল্ আমার হাতেছিল—তিনি আমার মুখের চেহারা দেখিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, —"না না, আমার কি আপত্তি? আপনি ত কুলীন ব্রাহ্মণ, আপনি যদি খান, তবে আমি কেন আপত্তি করিব?" এই বলিয়া তিনি নিজের চাকরকে প্রায় দশ-সের আন্দাজ গোময় আনিয়া ঘরের মেজেটি উত্তমরূপে প্রলেপ করিতে বলিলেন। এবং শিশিতে গঙ্গাজল ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন—"বাস্, আর কোন আপত্তি নাই।"

যথাসময়ে বৃদ্ধ আসিলেন। কলার পাতা ৮।১০খান, সুগন্ধি চালের সরু চিঁড়া, ক্ষেতের গুড়, পাকা মর্ত্তমান কলা ও আন্দাজ তিনসের টাট্‌কা দুগ্ধ আনিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া দিলেন।

আমরা স্নানাদি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেগুলির যথাবিহিত সম্মান করিলাম এবং বেলা ১০টার সময় গরুর গাড়ীতে উঠিলাম।

আসিবার সময় ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃদ্ধের পাদস্পর্শ করিয়া বন্দনা করি; কিন্তু সব্-ইন্‌স্‌পেক্টার-বাবুর ভয়ে পারি নাই। এই দুর্ব্বলতার জন্য এখন আমি লজ্জিত।

আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কথা শুনিতে পাইতেছি। তাই ইচ্ছা হইতেছে, সেই অমায়িক বৃদ্ধ মুসলমানের স্বর্গীয় আত্মাকে আহ্বান করিয়া বলি, "হে মহাপুরুষ, তুমি আসিয়া এই মনোমালিন্য দূর করিয়া দাও।"

শ্রীচৈতন্যের গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শন

চিত্রকর—শ্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস—কলিকাতা।
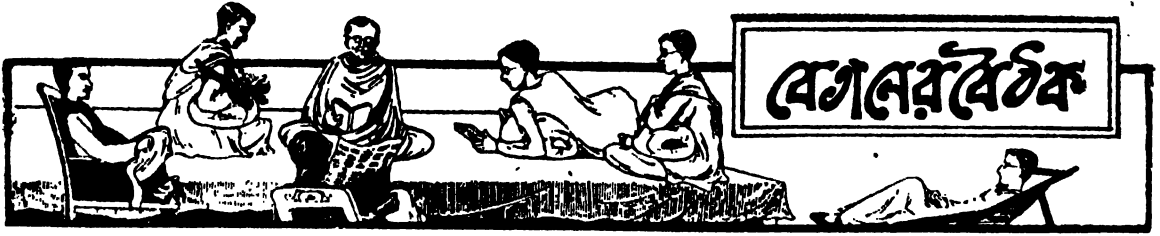
[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্কোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

(৩২)

পাটীগণিতের মুদ্রা

আমাদের দেশের সরকারী হিসাবে টাকা, আনা ও পাইএর প্রচলন দ্বারা সমস্ত মুদ্রার কার্য্য পরিচালিত হয়। তাহা ছাড়া টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী, আনী, ডবল পয়সা, পয়সা ও আধ-পয়সা মুদ্রারূপে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ উর্দ্ধতম মুদ্রা টাকা ও নিম্নতম মুদ্রা পাই বা আধপয়সার প্রচলনে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কারবার ইত্যাদি পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু গণিতশাস্ত্রে বিশেষতঃ নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে ব্যবহৃত পাটীগণিতে গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, কাগ, তিল, ঘুণ, রেণু ইত্যাদি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বহুবিধ মুদ্রার প্রচলন না থাকিলেও শুধু পুঁথিগত ব্যবহার আছে বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাদের কোনও প্রয়োগ বর্ত্তমানে নাই। তবুও এগুলির ব্যবহার বা প্রয়োগ নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের গণিতকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছে এবং কার্য্যক্ষেত্রে শিশুগণকে এগুলির কোনও ধারণাও দেওয়া যায় না। আবার দেশীয় প্রচলিত মুদ্রা লিখিবার সময় আধপয়সা (আড়াই গণ্ডা), এক পয়সা (পাঁচ গণ্ডা), দুই পয়সা (দশ গণ্ডা), তিন পয়সা (পনর গণ্ডা) বলিয়া লিখা হয়।

এখন প্রশ্ন এই :—

(১) যেমন পাইকে ক্ষুদ্রতম মুদ্রা ধরিয়া সরকারী কাজকর্ম্ম ও হিসাবপত্র সমস্ত চলিতেছে সেইরূপ আধ-পয়সাকে প্রচলিত ক্ষুদ্রতম মুদ্রা ধরিয়া ও গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, কাগ, তিল ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া পাটীগণিতের আর্য্যা, এককাবলী ও শুভঙ্করী নিয়মসমূহ পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে কি না ?

(২) এরূপ করিলে গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলী কোন্-কোন্ স্থলে পরিবর্ত্তিত হইবে ও এরূপ পরিবর্ত্তন উচিত কি না ?

(৩) কেহ এরূপ পাটীগণিত লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি ? করিয়া থাকিলে তাঁহার ও তাঁহার পুস্তকের নাম কি ও সেই পুস্তক কোথায় পাওয়া যায় ও তাহার মূল্যই বা কত ?

(৪) যদি আধপয়সা, পয়সা, দেড়-পয়সা, দুই পয়সা, আড়াই পয়সা, তিন পয়সা ও সাড়ে তিন পয়সা যথাক্রমে ৴২।, ৴৫, ৴৭।, ৴১০, ৴১২।, ৴১৫ ও ৴১৭। এরূপ না লিখিয়া সহজ করার জন্য এগুলি যথাক্রমে ।, ১, ১।, ২, ২।, ৩, ৩। আকারে অথবা তাহাদের প্রত্যেকের বামে ইলেক দিয়া লিখিলেই ক্ষতি কি বা কোনরূপ গোলমাল দাঁড়াইবে কি ?

(৫) যেমন সরকারী হিসাবে আধ-পাইয়ের কম হইলে ছাড়িয়া দেওয়া ও উর্দ্ধ হইলে তদূর্দ্ধ পাই ধরা হয় সেইরূপ আধপয়সার অর্দ্ধেকের নীচে হইলে ছাড়িয়া দিয়া ও উর্দ্ধে হইলে তদূর্দ্ধ আধপয়সা ধরিয়া পাটীগণিত ও মানসাঙ্কের আর্য্যা ও এককাবলী গঠন করিতে পারা যায় কি না এবং করিলেই বা গণিতশাস্ত্রের কি ক্ষতি হইবে ?

(৬) শুভঙ্করী হিসাবে সর্ব্বদা ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বৎসর ধরিয়া মাসমাহিনা দিন প্রতি ও বৎসর মাহিনা দিন প্রতির আর্য্যা করা হইয়াছে। কিন্তু সকল মাস বা যে-কোনও বৎসরই এরূপ নয়। তবুও এইসমস্ত আর্য্যার ব্যবহার ও প্রয়োগ আছে। এরূপ উপরোক্ত নিয়মে গণিতশাস্ত্রের আর্য্যা ও এককাবলীসমূহ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা পুনর্গঠিত করতঃ প্রচলন করা হইলে কোনও অসুবিধা হইবে কি ? অথবা গণিতশাস্ত্রের কোনরূপ ক্ষতি না হইয়া তাহা সরল হইবে কি ?

(৭) গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি ইত্যাদি মুদ্রারূপে প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও কোমলমতি বালকবালিকাদের মস্তিষ্ক এগুলির দ্বারা ভারাক্রান্ত করিয়া লাভ কি ?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত চৌধুরী

(৩৩)

স্বদেশী সূতা

কার্পেট্, আলেক্‌জেণ্ডার সূতা, ক্রোশেট্, কট্‌স্, রেশমীচুড়ি, কুর্শিকাটা, রুমালের কাপড় প্রভৃতি বিদেশী জিনিষের পরিবর্ত্তে ঐ-ঐ কাজের উপযোগী কোন দেশী জিনিষ বাহির হইয়াছে কি ? কাজ চলার মত অনেক জিনিষ থাকিতে পারে ; আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঐ ঐ জিনিষের যথাসম্ভব সমতুল্য সুন্দর ও সস্তা দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত হয় কি না অন্ততঃ কোথাও এরূপ জিনিষ প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে কি ?

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

মীমাংসা

(১২)

ষড়যন্ত্র শব্দ

ষট্ এবং যন্ত্র এ উভয় শব্দই সংস্কৃত, সুতরাং ষড়যন্ত্র শব্দকে সংস্কৃতশব্দ বলা চলে।

ষট্ ছয় ; যন্ত্র, যন্ত্রধাতু আল প্রত্যয়। যন্ত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সামগ্রী বিশেষ। ষড়যন্ত্র, ছয়টি যন্ত্রের সংযোগে উহার উৎপত্তি। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও মনের সংযোগে দুষ্কার্য্যের পরামর্শই ষড়যন্ত্র।

শ্রীজ্ঞানদাশঙ্কর সান্যাল সাংখ্যতীর্থ

(১৯)

মেরু-পর্ব্বত

মেরু-পর্ব্বতের অবস্থান-বিন্দু নির্ণয়-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ পরস্পর বিবাদমান। পণ্ডিত-প্রবর William F. Warren তাঁহার "Paradise Found" নামক গ্রন্থে, মেরু পর্ব্বত উত্তর বৃত্তে অবস্থিত ইহাই স্থির করিয়াছেন। দেশপূজ্য ৺মহাত্মা তিলক মহোদয় ওয়ারেন্ সাহেবের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার "Artic Home in the Vedas" নামক গভীর-গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থে মেরু-পর্ব্বত, মেরু প্রদেশে সংস্থিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় তাঁহার মেরুতত্ত্ব নামক গ্রন্থে মনীষী ওয়ারেন্ সাহেব ও মহাত্মা তিলকের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত-প্রবর বেদাচার্য্য পূজ্যপাদ ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার "মানবের আদি-জন্মভূমি" নামক গ্রন্থে "উত্তরকুরু পিতৃভূমি নহে" এতদ্‌বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে, স্বমত সংস্থাপনের জন্য মনীষী ওয়ারেন্ সাহেব, মহাত্মা তিলক ও শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মেরু-পর্ব্বত ও মেরু-প্রদেশ এক নহে। তাঁহার মতে "মেরু পর্ব্বত ইলাবৃত বর্ষে অবস্থিত। বর্ত্তমান 'আলটাই' পর্ব্বত ও মেরু পর্ব্বত একবস্তু এবং উহাই মানবজাতির আদি নিকেতনভূমি।" মহাত্মা তিলক ও ওয়ারেন্ সাহেবের গ্রন্থ ইংরেজিতে লিখিত ; পক্ষান্তরে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত। সুতরাং যতদিন না উহা ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া বিশেষজ্ঞের দ্বারা সমালোচিত হইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উক্তি নিরাকৃত হয় ততদিন পর্য্যন্ত অনুসন্ধিৎসুগণ মেরু-পর্ব্বতের অবস্থান-সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার অবসর পাইবেন কি না তদ্বিষয়ে গভীর সন্দেহ।

শ্রীললিতমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ

(২৩)

বিবাহের পর কালরাত্রি

কালরাত্রে বরবধূর মিলন অমঙ্গলজনক—এতদ্দেশে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। আমরা রামায়ণে পাই রাজা দশরথ সিংহলরাজকন্যা সুমিত্রাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে রথের উপর কালরাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, এবং এইজন্য সুমিত্রা দুর্ভাগ্যা হইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

বাসিবিয়ার পরদিন হয় কালরাতি।
স্ত্রী-পুরুষ একঠাঁই না থাকে সংহতি॥
কালরাত্রে যে নারীর করে পরশন।
সে স্ত্রী দুর্ভাগী হয় না হয় খণ্ডন॥
* * *
সকল সপত্নী-মাঝে সুমিত্রা সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী॥
হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাদ।
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ॥

শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়

(২৮)

চৈতার বউ

প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ শব্দের তালে-তালে এমন কতকগুলি কথা মিলাইয়া দেওয়া চলে যাহা সেই শব্দের প্রত্যেক ধ্বনির সঙ্গে প্রাণের মধ্যে বারবার একই সুরে আঘাত করিতে থাকে। পাপিয়া, ঘুঘু, হলদেপাখী, কোয়াল ইত্যাদি কতকগুলি পাখীর ডাকও এমন তালে-তালে চলে যে, ইহাদের সঙ্গে অনেক কথাই জুড়িয়া দেওয়া চলে। যেমন,—

পাপিয়ার ডাক—

১। চৈতার বউ গো
ও চৈতার বউ।
টেকা দে গো!
টেকা দে গো!
তোর পোলা নে-গো!
তোর পোলা নে গো।
২। হস্ত কত দূর?
হস্ত কত দূর?
৩। বউ কথা কও।
বউ কথা কও।

ঘুঘুর ডাক—

ইতি-ঝি পুকুর পুকুর,
টুকলে বাকলে টুকাইয়া তুল।
টুকলে বাকলে টুকাইয়া তুল।

কোয়াল পাখীর ডাক—

বন্ধুরে—! নীল চক্ষু দি লাল।
হাঃ——হাঃ——হাঃ—।

হলদেপাখীর ডাক—

ইষ্টি কুটুম!
ইষ্টি কুটুম!

অনেকস্থলে এইসমস্ত ডাকেই পাখীর নামকরণ করা হইয়া থাকে, এবং ইহাদের সঙ্গে সুন্দর-সুন্দর উপাখ্যানও জড়িত আছে। পাপিয়া পাখীর নাম চৈতার বউ হওয়ার উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিতেছি,—

কোন গ্রামে এক বৃদ্ধা বাস করিত। সংসারে তার আপন বলিতে কেহ ছিল না। সে সারাজীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া শেষ-জীবনের সম্বল সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঞ্চিত অর্থের সন্ধান গ্রামের অন্য কেহ জানিত না, জানিত শুধু একজন—চৈতা নামে এক গৃহস্থ ছিল,—তার বউ। চৈতার বউ একদিন তার সপত্নীপুত্রকে আপন ছেলে বলিয়া বৃদ্ধার নিকট বন্ধক রাখিয়া তাহার টাকাগুলি লইয়া সরিয়া পড়িল, আর খোঁজ পাওয়া গেল না। এদিকে বৃদ্ধা সারা জীবনের কষ্টসঞ্চিত টাকাগুলি হারাইয়া অর্থ-শোকে ও অনাহারে মারা গেল। মরিয়া সে হইল পাপিয়া পাখী। এখনও বনে-বনে ঘুরে আর ডাকে,—চৈতার বউ গো! টাকা দে গো! তোর পোলা নে গো! ইত্যাদি।

শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়

মহিলা-প্রগতি

ভাদ্রমাসের "প্রবাসী"র মহিলা-মজলিস ভাগের প্রথমেই "শ্রীমতী দেবী" স্বাক্ষরিত মহিলা-প্রগতি-শীর্ষক একটি "লেখা" রহিয়াছে।

প্রবন্ধের তৃতীয় প্যারায় "পুরুষ-ছাত্রেরা অনেক সময় নানাপ্রকার বেয়াদবি করে, তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া মধ্যে-মধ্যে মনে হয় যে, তাহারা কোন কালে নারী দেখে নাই এবং তাহারা ভদ্রতা, ভব্যতা ও শিষ্টতার ধারও ধারে না। এইসমস্ত বদ্‌রোগের ঔষধ মেয়েদের হাতেই আছে, তাঁহারা রাস্তায় যদি চাবুক লইয়া বেড়ান এবং দরকার-মত তাহার ব্যবহার করিতে পারেন, তবে দেশের অনেক উপকার হইবে।" ইত্যাদি দেখিতে পাই।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোন-কোন কলেজে একই ক্লাশে পুরুষ-ছাত্র এবং মহিলা-ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ত সেদিনের বিশ্ববিদ্যালয়-মাত্র। কিন্তু অদ্যাবধি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ পুরুষ-ছাত্রগণ সম্বন্ধে শ্রীমতী দেবী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ ছাত্রদের-সম্বন্ধে যে-সমস্ত কলঙ্কময় নীচতার আরোপ করিয়াছেন সেরূপ কোন কলঙ্ক আরোপিত হয় নাই। কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ ছাত্রেরা "বেয়াদব", "অভদ্র", "অভব্য" এবং "অশিষ্ট" ও ফলে তাহাদের অভদ্রাচরণের জন্য পথে-ঘাটে সমপাঠিনীগণের হস্তে 'চাবুক খাইবার যোগ্য' ইহা অপেক্ষা জাতীয় দুর্গতির ও জাতীয় অধঃপতনের জ্বলন্ত, জীবন্ত পরিচায়ক আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে ইহা অসত্য হইলে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়ই বা কি হইতে পারে?

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ-ছাত্রেরা সত্য-সত্যই উপযুক্ত বিশেষণগুলিতে ভূষিত হইবার যোগ্য কি না সে-সম্বন্ধেই দু'এক কথা বলিতে চাই।

প্রথম কথা হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্ত অল্পবয়স্ক; তাহার ছাত্রগণ কেহই প্রথম হইতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই লেখাপড়া আরম্ভ করেন নাই।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও অনেক স্থলে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়াই বেশীর ভাগ ছাত্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা পুষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং এক-হিসাবে বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংক্ষিপ্তসার বলিলেও দোষ হইবে না। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ-ছাত্রেরা সকলেই ভালো নহেন, বেশীর ভাগই ভালো। সেইসমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দ ছাত্রেরাই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

অতএব ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সকলেই যদি অভদ্র, অশিষ্ট, ও অভব্য না হয়েন তাহা হইলে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ "পুরুষ-ছাত্রেরা" কেন যে অভদ্র, অভব্য ও অশিষ্ট হইবেন তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাই না।

আবার ভারতবর্ষের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন থাকেন তখন ভদ্র, ভব্য ও শিষ্ট থাকেন—কিন্তু হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিলেই অমনি অভদ্রতা, অভব্যতা ও অশিষ্টতার সংক্রামকতায় আক্রান্ত হন এরূপ মনে করিলেও ঠিক সুস্থ ও সহজ মস্তিষ্কের কাজ হইবে না।

কাজেকাজেই একথা বেশ জোর-গলায় বলা যায় যে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ-ছাত্রেরা সকলে ভালো না হউন—সকলে কখনই বেয়াদব হইতে পারেন না, তাঁহারা সকলে কখনই এমন কার্য্য করিয়া থাকিতে পারেন না যাহাতে কোন-কোন সমপাঠিনীর তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া মধ্যে-মধ্যে মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই, অথবা তাঁহারা সভ্যতা, ভব্যতা ও শিষ্টতার ধারও ধারেন না।

ছাত্রদের মধ্যে কেহ-কেহ অভদ্র আচরণ করিয়া থাকিতে পারেন, কেহ বা সমপাঠিনীদের দেখিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে পারেন—কিন্তু একের বা কয়েক-জনের অপরাধে সমস্ত ছাত্রদের প্রতি এরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিদুষী লেখিকা নিজেই বিবেচনা করিবেন।

ছাত্রেরা কেহ-কেহ কোন-প্রকার অন্যায়াচরণ করিয়া থাকিলে তাহার প্রতীকারকল্পে কি ছাত্রীদের চাবুক ব্যবহার করিতে হইবে? চাবুকের ব্যবহার কি খুব সুরুচির পরিচায়ক?

লেখিকা স্বয়ং হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কি না জানি না—না হইলেও তিনি হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাহার ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন, অন্ততঃ জানেন বলিয়াই বোধ হয়। লেখিকার ন্যায় হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার ছাত্র-ছাত্রী-সম্বন্ধে আমার ততটা জ্ঞান আছে কি না জানি না—তবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় আছে, অনেকে আমার বিশেষ বন্ধু ও সমপাঠী তাঁহারা কে কেমন সে-সম্বন্ধে লেখিকা অপেক্ষা আমার জ্ঞান বেশী বলিয়াই মনে করি ও সেজন্যই তাঁহার এ অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করি।

আধুনিক প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষা অথবা পুরুষ শিক্ষা কিছুই আমাদের দেশে ছিল না। পুরুষ-শিক্ষা যদিইবা ইংরেজ আমলে আরম্ভ হইল, স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি লোকের তেমন মনোযোগ গেল না। অবশেষে কয়েকজন মহাত্মার বিশেষ চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষার (আধুনিক-ভাবে) প্রচলন হইল। তৎপর হইতে অদ্যাবধি স্ত্রী-শিক্ষা, পুরুষ-শিক্ষা হইতে একটু দূরে-দূরেই জীবন কাটাইতেছিল, কচিৎ এক-আধজন সাহসিনী মহিলা পুরুষদিগের সহিত একত্র পড়িতে আসিতেন। ক্রমশঃ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের একত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। শীঘ্রই অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও একসঙ্গে ছাত্রছাত্রীগণ অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যদি সহসা এক-সঙ্গে বেশী ছাত্র ও ছাত্রীদের পড়াইবার ব্যবস্থারূপ নূতন একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করিতে সাহসী না হইয়া থাকেন তাহার জন্য দায়ী পুরুষ-ছাত্রেরা নহে। নারীদের চরিত্রবল নাই বলিয়া, তাঁহাদের স্বতন্ত্র পড়াইবার ব্যবস্থা করা দরকার, বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়কর্তারা কখনই এরূপ মনে করেন না ও করেন নাই। সেজন্য অনাবশ্যক দুঃখিত হইয়া পুরুষ-ছাত্রদের উপর মনের ঝাল মিটানো ভাল হয় নাই। নিতান্ত মূর্খ ব্যতীত স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী কেহই নহে, শিক্ষার প্রণালী লইয়া হয়ত গোলমাল ও আপত্তি থাকিতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্ত্রী-পুরুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি। বক্তব্য কেবলমাত্র ইহাই যে, ভারতবর্ষের এখনও সে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয় নাই (কোনদিন হইয়াছিল কি না জানি না, কোন দিন হইবে না ইহা নিশ্চয়) যাহাতে মহিলাদের (বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের মহিলাদের) স্কুল, কলেজের পুরুষ-ছাত্রগণের নির্য্যাতন, অভদ্রাচরণ, অশিষ্টতা প্রভৃতি

ব্যাধিরোগের হাত এড়াইবার জন্ম চাবুক-রূপ অমোঘ মহৌষধ প্রয়োগ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষিতা মহিলাগণের হাতে চাবুক কিরূপ শোভা পাইবে তাহা লইয়া কেহ-কেহ মাথা ঘামাইতেছেন—তাঁহারা মাথা ঘামাইতে থাকুন, চাবুকের ব্যবহার যে মার্জ্জিত শিক্ষা ও রুচির সহিত বেশ মোলায়েম-ভাবে খাপ খাইবে না তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারা শক্ত হইবে না।

চাবুকের দ্বারা দেশের উন্নতি যদি এত দ্রুত হইতে পারিত তাহা হইলে ভারতবর্ষের বহুদিন পূর্ব্বেই আদবকায়দা, সভ্যতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার প্রভৃতিতে দোরস্ত হওয়া উচিত ছিল; কেননা এদেশে চাবুক বেশ নির্দ্দয়ভাবে চলিয়াছে।

আমাদের নিবেদন এই যে, আমাদের সমপাঠিনীগণ ভবিষ্যতে আমাদের উপর চাবুক প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যেন নিজেরা এরূপ দৃষ্টান্ত দেখান যাহাতে পুরুষ-ছাত্রেরা তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিতে আকৃষ্ট হন।

পরস্পরকে সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ভালয় মন্দয়, সুদিনে-দুর্দ্দিনে ছাত্র হইয়াই থাকিতে হইবে, অধ্যয়নের পবিত্র কঠোর ব্রতে তাঁহারা ব্রতী ইহা ভুলিলে চলিবে না।

পুরুষ-ছাত্রেরা মন্দ, কিন্তু তাই বলিয়া মহিলা-ছাত্রেরাও মন্দ হইবেন কেন? তাঁহারা উন্নত থাকিলে পুরুষ-ছাত্রেরা অবশ্যই একদিন প্রকৃত শিক্ষিত হইতে পারিবে।* শ্রী—

গত ভাদ্রমাসের 'প্রবাসী'তে 'মহিলা-প্রগতি'-শীর্ষক স্তম্ভে শ্রীমতী দেবী একস্থানে লিখিয়াছেন 'পুরুষছাত্রেরা অনেক-সময় নানাপ্রকার বেয়াদবি করে তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া মধ্যে-মধ্যে মনে হয়, যে, তাহারা কোন-কালে নারী দেখে নাই, এবং তাহারা ভদ্রতা, ভব্যতা, শিষ্টতার ধারও ধারে না।' বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র পুরুষছাত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত এই উক্তিটি পড়িয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। আমি বলি না, যে, তাহারা সকলেই দেবচরিত্র—কেহ-কেহ এমন কি অধিকাংশ ছাত্রও লেখিকা-মহাশয়া কর্ত্তৃক লিখিত দোষে দুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র পুরুষছাত্রদের মণ্ডলীকে অপরাধী বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। উক্ত বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রকে আমি ঘনিষ্ঠভাবেই জানি, কিন্তু তাহাদের কাহারও চরিত্রে ওরূপ দোষের আভাস-মাত্রও কখন পাই নাই। এইজন্যই লেখিকার কথার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ এবং বাধ্য হইলাম।

লেখিকা মহাশয়া অবশ্য পরে বলিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের বড় কর্ত্তারা মেয়েদের জন্ম আলাদা বন্দোবস্ত না করিয়া পুরুষছাত্রদের জন্ম 'মহিলাদিগের প্রতি ভদ্র-ব্যবহার শিক্ষার ক্লাস' নামে একটি বিশেষ ক্লাস খুলিতে পারেন। অবশ্য সকল ছাত্রকেই যে এই ক্লাসে পড়িতে হইবে তাহার কোন মানে নাই', ইহা হইতেও বোঝা যায় না যে, তিনি বিদ্যালয়ের মাত্র কয়েকটি ছাত্রকে দোষী বলিতে চান। তাঁহার সমগ্র লেখাটি পড়িয়া যদি কেহ মনে করে 'উক্তবিদ্যালয়ের সমস্ত পুরুষছাত্রই মহিলাদিগের প্রতি বেয়াদবি করে, তাহাদিগের ভদ্রতা শিক্ষার জন্ম একটি বিশেষ ক্লাস খুলিলে হয়। অবশ্য সকল ছাত্রকেই এই ক্লাসে পড়িতে হইবে না, কারণ তাহাদের কাহারও কাহারও বেয়াদবি মার্জ্জনীয় হইতে পারে। যাহাদিগকে মার্জ্জনা করা যাইবে না, তাহাদিগকে শুধু উক্ত ক্লাসে পড়িতে হইবে', তাহা হইলে তিনি তাহাকে দোষ দিতে পারেন না। তাঁহার লেখাটির এরূপ মানে সহজেই আসে এবং ইহাকে কষ্ট-কল্পনা বা বিকৃত অর্থ বলা যায় না।

এটি পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন আমি বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অপর কোনও স্থানের বেয়াদব পুরুষদিগের বেয়াদবির সমর্থন করিতেছি। আমার বক্তব্য সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া বলিতে না পারার দোষে যদি সমর্থনের ভাব আসিয়াও থাকে তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। সমর্থন করা বা কুৎসিত আচরণে সদুদ্দেশ্য আরোপ করার কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা আমার নাই। উপরি-উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধে আমি শুধু এইকথাই বলিতে চাই, যে, সমস্ত পুরুষ-ছাত্রই ভদ্রতা ভব্যতা, শিষ্টতাহীনতার দোষে দুষ্ট হইতে পারে না।*

শ্রী বারিদকান্তি বসু

আমি "পুরুষছাত্র" সকল পুরুষ-ছাত্র অর্থে ব্যবহার করি নাই। অসাবধানতাবশতঃ ভাষার ব্যবহারে ত্রুটি হইয়াছে। ইহা অনিচ্ছাকৃত, তবুও এই ভ্রমের জন্ম আমি বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীমতী দেবী

—

জামশেদপুরে ইউরোপীয় আমদানি

ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে বিবিধ মন্তব্যের মধ্যে দেখিলাম, "জামসেদপুরে 'আরও ইউরোপীয় আমদানি' প্রসঙ্গে ক্যাথলিক হেরাল্ড্ হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। লোক আসিতেছে ৬৬ জন, ৮০ জন নহে। তাহারা সকলেই ফোর্‌ম্যান বা সর্দ্দার-মজুর নহে। মাত্র একজন ফোর্‌ম্যান। বাকী সকলে নানারকম মিস্ত্রীর কাজ করিবে। তাতা কোম্পানী যে নূতন Sheet Mill বা ইস্পাতের চাদর তৈয়ারী করিবার কারখানা খুলিতেছেন, এই লোকগুলি ঐ কারখানায় কাজ করিবেন। Sheet Mill ভারতে একেবারে নূতন। এই Millএর কার্য্যে অভিজ্ঞ ভারতীয় সর্দ্দার-মজুর বা সাধারণ মজুর নাই। সুতরাং বিদেশ হইতে লোক আনাইবার আবশ্যকতা আছে। এইসমস্ত লোক ইংলণ্ডের ওয়েল্‌স্ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। অভিজ্ঞেরা বলেন জগতের মধ্যে ওয়েল্‌স্ মজুরেরাই এই Sheet Millএর কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু মহাশয় এখানে অবস্থানকালে এবিষয় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। Sheet Millএর কার্য্যে ওয়েলে্স্ কারিগরেরা শ্রেষ্ঠ কেন—ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, তাহারা প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই কার্য্য করিতেছে, সুতরাং ভারতীয় মজুরদের এই কার্য্যে দক্ষ করিতে হইলে, Tees-side iron workersদের সাহায্য বিশেষ দরকার।

তাতা কোম্পানীর বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে অভিযোগ করা হয় যে, তাঁহারা যথেষ্ট-সংখ্যক ভারতীয়কে লোহা ও ইস্পাতের কারখানার কাজ শিখাইবার বন্দোবস্ত করেন নাই তাহার প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইহা সত্য যে, তাতারা ৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। ৩ বৎসর পূর্ব্বে যে টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট্ খুলিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবৎসর ২৪টি করিয়া শিক্ষানবীশ লওয়া হইতেছে। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১৪ চৌদ্দ জন ৩ বৎসর পরে, শিক্ষা সমাপন করিয়া কারখানায় ঢুকিয়াছে। এইরকম শিল্পালয় দশ বৎসর পূর্ব্বে খোলা উচিত ছিল। তা ছাড়া আরও অধিক-সংখ্যক ছাত্র লইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

একথা সত্য যে তাতা কোম্পানীর কোনো-কোনো বিভাগ এখন সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ইহা কলঙ্কের কথা যে, Steel Furnace এবং Blast Furnaceএ ভারতীয়গণকে এমন-ভাবে রাখা হইয়াছে যে তাহাদের পক্ষে ইউরোপীয়দের বিনা সাহায্যে ঐ

* অনাবশ্যক-বোধে কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইল। —প্রঃ সঃ

* অনাবশ্যক-বোধে কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। —প্রঃ সঃ

দুই বিভাগের কার্য্য করা অসম্ভব। তাতা কোম্পানী বিদেশ হইতে যাহাদের আনেন তাহাদের সহিত একটা চুক্তি আছে যে, তাহারা ভারতীয়দের কার্য্য শিখাইবে। কার্য্যতঃ কার্য্য শিখানো ত দূরের কথা, শিক্ষিত ভারতীয় যুবক এপ্রেন্টিস্‌দের সহিত এমন অভদ্র ব্যবহার ইহারা করে যে অনেককে বাধ্য হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। ইহার প্রতিবিধানকল্পে ম্যানেজার বা ডাইরেক্টরগণ কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

কারখানার কাজে এমন অনেক ইউরোপীয় আছেন যাঁদের স্থানে যোগ্য বা যোগ্যতর ভারতীয়দের নিযুক্ত করা উচিত। একথা সত্য হইলেও আপনাদের মন্তব্যে সাঁওতালেরা জার্ম্মান্ মজুরদের স্থান অধিকার করিয়াছে", এই উক্তি সত্য নহে। জামসেদপুর Labour Association যে আবেদন লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লির মেম্বরদের নিকট পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথা আছে। Labour Associationএর সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি এই তথ্য কোথায় পাইলেন। তিনি বলেন, Rail Finishing Millএ straightening of the rails এর কার্য্যে সাঁওতাল দেখিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভ্রম। Rail Finishing Millএ কোন সাঁওতাল বা হো বা ছোটনাগপুরের লোক কাজ করে না। এখানকার কম-বেশী ১৬০০০ ষোল হাজার ভারতীয় skilled labour আছে। তাহাদের মধ্যে সাঁওতাল বা হো-জাতীয় মজুর মোট ৫০ পঞ্চাশের অধিক নহে। Unskilled labour, যাহারা মাটি কাটে, ইঁট বয়, মোট উঠায়-নাবায় তাহাদের মধ্যেও সাঁওতাল কম। তাদের অপেক্ষা, হো, উরাওঁ, ভূমিজ বেশী। সকলের চাইতে বেশী অন্যান্য জাতের লোক।

আমরা বুঝিতে পারি না Labour Associationএর Secretary মহাশয় এইরূপ একটা অযথা উক্তির দ্বারা কি প্রমাণ করিতে চান। ইহাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় নাই।

শ্রী সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত
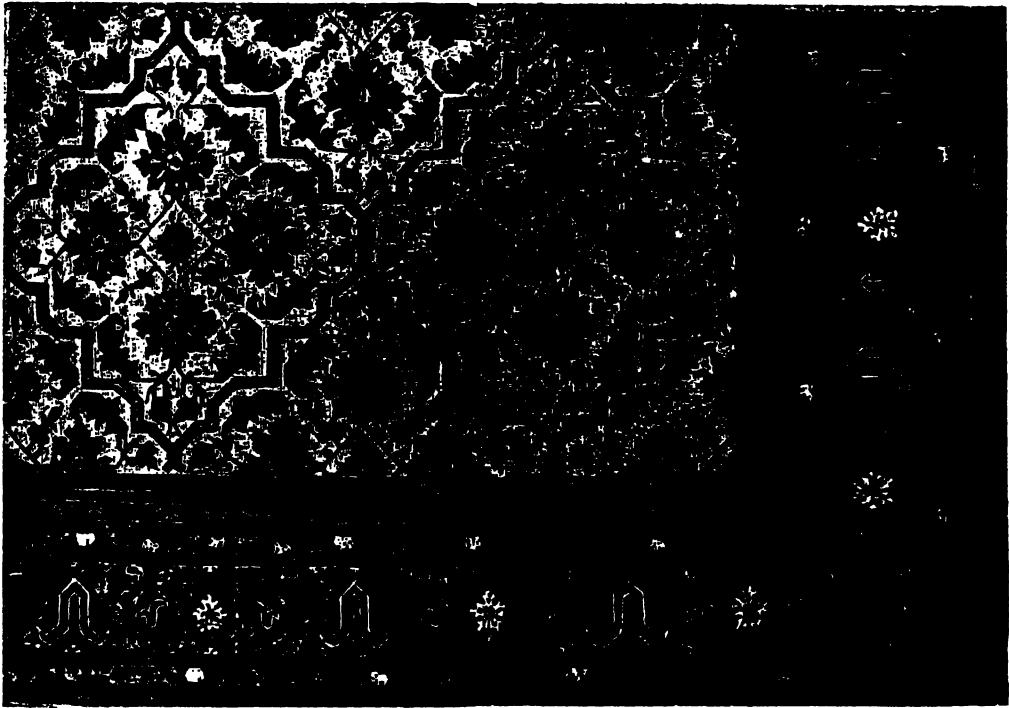
শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ক্ষুদ্রতম এরোপ্লেন—

আমেরিকার "ফ্লাই" নামক এরোপ্লেনটি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ছোট এরোপ্লেন। ইহার ডানা-মেলা অবস্থায় দৈর্ঘ্য—মাত্র ১৮ ফুট। ইহার গতি ঘণ্টায় ১১৫ মাইল।
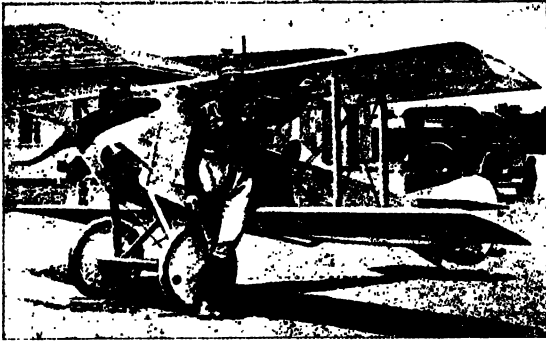
পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এরোপ্লেন

এই এরোপ্লেনটির মটর ৩-সিলিণ্ডারযুক্ত এবং ৬০"হস-পাওয়ারের"। এই এরোপ্লেন একটানা ৫০০ মাইল যাইতে পারে এবং ২হার মধ্যে, ১১৫ বেগে চলিলে ৪ ঘণ্টার মতো, এবং একটু আস্তে চলিলে ৫॥০ ঘণ্টার মতো পেট্রল লওয়া যায়। ইহা একটি মানুষের সমান উঁচু—ইহা পাশে দণ্ডায়মান—লেফ্‌টেনাণ্ট ফিলিপ্‌স্‌—বিমানবীরকে দেখিলেই বুঝা যায়।

এরোপ্লেনে ঘোড়া—

ছবিতে যে ঘোড়াটি দেখিতেছেন ঐ ঘোড়াটি ঘোড়াজাতির মধ্যে

ঘোড়াকে এরোপ্লেন চড়ানর ছবি

প্রথম এরোপ্লেনে করিয়া আকাশ ভ্রমণ করিয়াছে। ঘোড়াটি এক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, এরোপ্লেনে করিয়া ইহাকে প্যারিস্ হইতে হল্যা লইয়া যাওয়া হয়। এরোপ্লেনে চড়াইবার সময় এই ছবি তো হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দামী ডিম—

ছবিতে অক্ (auk) পক্ষীর একটি ডিম রহিয়াছে, আ ডিমটির দাম মাত্র ১০,০০০ টাকা। এই পাখী বর্ত্তমানে লোপ পাইয়া লোপ পাইবার প্রধান কারণ শ্বেতাঙ্গদের এই পাখী শিকার। পাখীদের ঐ ডিমটি শেষ ডিম। এই অক্ পাখীরা এককালে উ
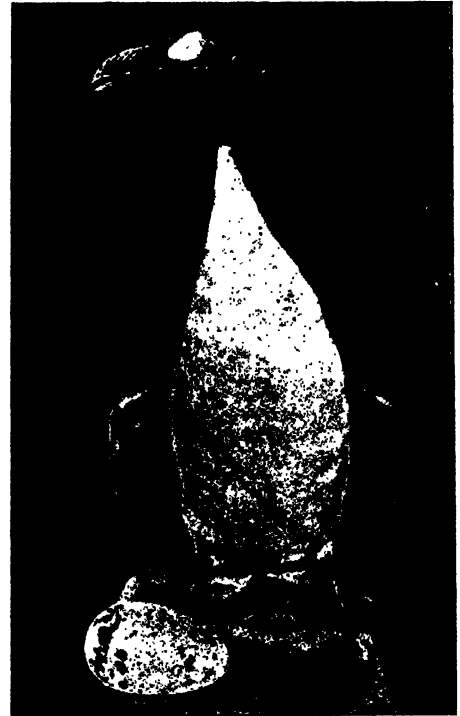
পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দামী ডিম

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে প্রচুর-পরিমাণে বাস করিত। অক্ পা দেখিতে হাঁসের মতন ছিল। কিন্তু ডানা অতিরিক্ত ছোট ছিল বলি উড়িতে পারিত না। জাহাজে এই পাখীর মাংস খাদ্যরূপে খুব বে ব্যবহৃত হইত।

খবরের কাগজের ঘর—

আমাদের দেশে কথায় বলে তাসের ঘর। কিন্তু তাস সাধারণ কাগজ অপেক্ষা শক্ত। সম্প্রতি ট্রেস্‌ম্যান্ নামক এক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যার সাহায্যে খবরের কাগজের একটি বাঙ্গ্‌লো তৈয়ার করিয়াছেন।

খবরের কাগজের তৈরী বাঙ্গ্‌লো

এই বাঙ্গ্‌লোটি কাঠের ফ্রেমের উপর দাঁড়াইয়া আছে—ইহার দুয়ার-জান্‌লা ইত্যাদি সবই সাধারণ বাঙ্গ্‌লোর মতনই আছে। ঘরের মধ্যে আলো-হাওয়া যথেষ্ট এবং ঘরগুলি খুব শুক্‌নো খট্‌খটে।

এরোপ্লেনের কথা—

১৯১১ খৃঃ অব্দে ক্যাল রজার্স প্রথম আমেরিকা মহাদেশ এরোপ্লেনে করিয়া পার হন। নিউ ইয়র্ক হইতে পাসাদেনা পর্য্যন্ত আকাশপথে যাইতে তাঁহার মাত্র ৫৪ দিন সময় লাগিয়াছিল। এই পথ তাঁহাকে অতি কষ্টে অতিক্রম করিতে হয়। মাঝে-মাঝে রেল লাইন দেখিয়া-দেখিয়া আকাশে চলিতে হইত। পাছে তিনি দেখিতে না পাইয়া রাস্তা ভুল করেন, এইজন্য রেলগাড়ীর ছাতে বিশেষ রং করিতে হইয়াছিল। মাঝে-মাঝে তাঁহাকে অন্য গাড়ীর উপরে করিয়া এরোপ্লেনটিকে বহন করিতে হইত। তিনি ১৩৩ মাইলের বেশী একটানা যাইতে পারেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার লেফ্‌টেনান্ট্ ম্যাঘান্ সূর্য্যাস্ত এবং উদয়ের মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়াছেন। এইটুকু সময়ে অত্যন্ত দ্রুত বেগে চলিয়াও একখানি রেলগাড়ী ইহার ১/৩ স্থান মাত্র অতিক্রম করিতে পারে। গতি-হিসাবে রজার্সের কাজ এমন কিছু না হইলেও তিনি প্রথম এই কাজটি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া করিয়াছিলেন। তিনি আদি পথ-প্রদর্শক। এরোপ্লেনের ইতিহাসে তাঁহার নাম থাকিবে।

বর্ত্তমানে এরোপ্লেনের গতি রেলগাড়ীকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এরোপ্লেনে করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করাও এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নহে এবং একদল আমেরিকান বিমানবীর ইতিমধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। এরোপ্লেনের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, এরোপ্লেন-মোটরের একটি বিশেষ উন্নতির জন্য। মোটরের এই উন্নতির জন্য মনে হয় অচিরেই এরোপ্লেন ব্যবসায়ের সহায় হইবে। এরোপ্লেনের-মোটরের এই উন্নত সংস্করণের মোটরের নাম লিবার্টি-মোটর। লিবার্টি-মোটর দেখিতে যুদ্ধের সময় নির্ম্মিত এরোপ্লেন মোটরের মতন। কিন্তু এই দুইপ্রকার মোটরের মধ্যে প্রায় ৬০০ প্রকার বিভিন্নতা আছে। সামান্য সামান্য সংস্কারের পর লিবার্টি-মোটর শ্রেষ্ঠ এরোপ্লেন-মোটরে পরিণত হইয়াছে।

নতুন-নতুন নানা-প্রকার বন্দোবস্তের জন্য বর্ত্তমান সময়ে এরোপ্লেনে করিয়া আকাশ বিহার অতি সুখের এবং নিরাপদ হইয়াছে। Earth inductor compass এর সাহায্যে এরোপ্লেন-চালক ঝড়, বৃষ্টি এবং কুয়াসার মধ্য দিয়াও তাহার গন্তব্য স্থানে নিরাপদে যাইতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বেও ঝড়, বৃষ্টি এবং কুয়াসা বিমানবীরদের নানা-প্রকার বিপদে ফেলিত। Condenser altimeter এর সাহায্যে এরোপ্লেন-চালক কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে এরোপ্লেনের দূরত্ব এবং উচ্চতা

আমেরিকান বিমানবীরদের আকাশপথে পৃথিবী ভ্রমণের নক্সা - তাঁহারা ১৬ই মার্চ্চ ১৯২৪ সান্তা মণিকা হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা প্রায় ২৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন

অনায়াসেই বুঝিতে পারে। এই যন্ত্রের জন্ত অনেক বিপদ্ হইতে এরোপ্লেন রক্ষা পায়।

আমেরিকান্ পৃথিবী ভ্রমণকারী বিমানবীরদের নেতা লেফ্‌টেনান্ট্ লাওএল্ হইচ্ স্মিথ্

ভবিষ্যতে এরোপ্লেনের কতদূর উন্নতি হইবে বলা যায় না, কিন্তু মনে হয়, আমেরিকান্‌রাই চিরকাল ইহার নেতা থাকিবে।

—

পুরাতত্ত্বের কথা—

ফ্রান্সের Langeric Basse নামক স্থানে মাটির নীচে পাথরের তলায় পুরাকালের গুহাবাসীদের অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানটি পুরাকালে একটি প্রকাণ্ড পাথরের তলায় এবং একটি স্রোতের পাশে ছিল। মাটির একটি স্তরে অদ্ভুত-গড়নের নানা-রকম পাত্র পাওয়া যায়। উনানের ছাইও পাওয়া যায়। এই স্তরের পরের স্তরে কোন-প্রকার কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় এই আশ্রয়-স্থলটি সেই গুহাবাসীরা বোধ হয় অন্ত কোথাও ভালো শিকারের এবং খাদ্যের সন্ধান পাইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহার পর তৃতীয় স্তরে যেসকল চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, এই সময়কার লোকেরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা কিছু পরিমাণে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। হরিণের খোদাই মাথা, হাতের বালা এবং পাথর খোদাই করিবার যন্ত্রপাতিও এই স্তরে দেখা যায়। তাহার পরের স্তরে সুতীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত মাছ মারিবার বর্শা দেখা যায়। নানা-রকম জন্তুর হাড়ের উপর নানাপ্রকার সুদৃশ্য খোদাই-চিত্রও দেখা যায়। ইহার পর ৩০০ বছরের মধ্যে আর কোনপ্রকার মানুষের চিহ্ন এখানে দেখা যায় না। এই স্তরে নানাপ্রকার স্বতঃসঞ্চিত আবর্জ্জনা মাটি পড়িয়া আছে
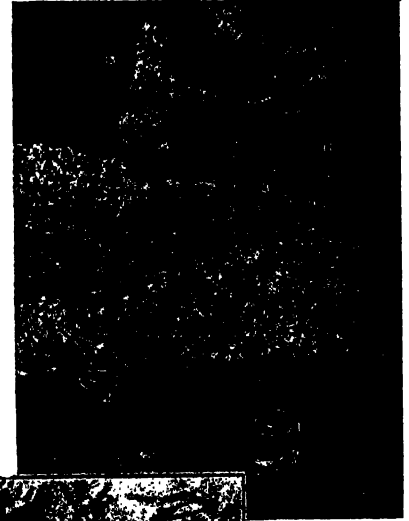
মাটির স্তর প্রাপ্ত পুরাকালের চিহ্ন। ১, ২, ৩, ৪—হরিণের চোয়ালের হাড়। ৫—কোন জন্তুর জোড়া-হাড়। ৬, ৮—হরিণের কাঁঠের হাড়ের ফলা। ৭ ঘোড়ার দাঁত। ৯, ১০—হরিণের চোয়াল এবং বর্শা-ফলক। ১১—পাথরের অস্ত্রমুখ, ১২—মাছ ধরিবার দু-কাঁটা-যুক্ত বর্শা-ফলক। ১৩—হরিণ বিদ্ধ করিবার যন্ত্র

এই স্তরের পরেই Neolithic মানুষদের চিহ্ন দেখা যায়। এই সময়ের মানুষদের কুড়াল, হাঁড়ি-কুড়ি ইত্যাদি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা ঢের বেশী সভ্যতার পরিচয় দেয়। কুকুর এবং শূকরের হাড় দেখিয়া মনে হয় এই সময়কার লোকেরা জন্তু পুষিতে আরম্ভ করে। ইহার পরের স্তরগুলিতে আর কোন-প্রকার চিহ্নাদি পাওয়া যায় না।

পায়রা-বাঁশী—

চীনদেশের লোকেরা বাঁশের একপ্রকার ছোট-ছোট বাঁশী তৈয়ার করে। এই বাঁশী ছোট-ছোট লাউয়ের খোলে লাগাইয়া সেই লাউটি

কতকগুলি পায়রার পিঠে বাঁধিবার বাঁশী

বাঁশীযুক্ত অবস্থায় পায়রার পিছনে বাঁধিয়া দেয়। এইরকম একদল পায়রাকে যখন আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন বাঁশীতে হাওয়া ঢুকিয়া

পিঠে বাঁশী-বাঁধা পায়রা

নানা-প্রকার মধুর শব্দ বাহির হয়। এই শব্দ নীচে মাটি হইতে শুনিতে বেশ লাগে।

—

তারে ছবি-পাঠানো—

প্রথম যখন আমেরিকান টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ-কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারেরা টেলিগ্রাফের তারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ফোটো পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন অনেকেই এই ব্যাপারটাকে সচিত্র সংবাদ প্রচার করিবার একটা মস্ত সহায় বলিয়া মনে করিয়াছিল। এক স্থানের খবর বহু দূরের আর-এক স্থানে পাঠাইতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে—কিন্তু পূর্ব্বে বিশেষ-বিশেষ ঘটনার খবর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এক স্থান হইতে বহু শত ক্রোশ দূরের আর-এক স্থানে পৌঁছাইলেও সেইসকল ঘটনার চিত্র বা ফোটো রেল বা ষ্টীমার ছাড়া পৌঁছাইত না। এখন কোন সংবাদ এবং তাহার ছবি প্রায় একই সময়ে এক-স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিবে। কিন্তু এই অভিনব আবিষ্কারের আর একটি
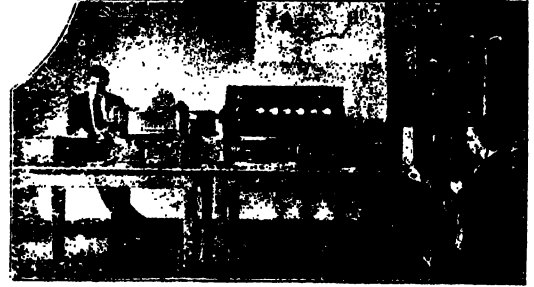
তারে ছবি পাঠাইবার কল

বিশেষ অন্য প্রয়োজন এবং দিক্‌ আছে। কোন চোর, ডাকাত বা খুনী অপরাধ করিয়া পালাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার চেহারার বিশেষ বিবরণসহ ছবি চারিদিকে টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে পাঠাইয়া দেওয়া যায়। ইহাতে অপরাধী ধরিবার বিশেষ সহায় হইবে। অপরাধীর সকল-প্রকার বিবরণ দু-এক মিনিটের মধ্যেই দেশের সকল স্থানে এবং

এই ভদ্রমহিলার ছবি পাঠানো হয়, ছবিখানি দেখিলে সাধারণ ছবির মতনই মনে হয়

প্রান্তে ছড়াইয়া দেওয়া যায়। তাহার হাতের লেখার নমুনা, তাহার

অনেকগুলি উপায় আছে, তাহার মধ্যে কেবল একটিমাত্র ব্যবসার এবং অন্যান্য সকল দিক্ হইতে সুবিধার হইয়াছে। এই প্রথার একটি photographic negative film হইতে তৈরী একটি positive film তারে পাঠানো চলে। এই বিশেষ যন্ত্রে ৭ × ৫ ইঞ্চি একখানি ছবি পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাঠানো চলে। অন্য প্রান্তে ছবিটি রিসিভ্ করিবার পর তাহাকে নিয়ম-মত 'ডেভেলাপ' করিবার পর ছাপানো চলে।

—

মোটরকারের কথা—

আমরা আজকাল পথে-ঘাটে হাজার-রকমের মোটরকার দেখিতে পাই। দিন-দিন মোটরকারের নতুন-নতুন নানা-প্রকার উন্নতি হইতেছে।
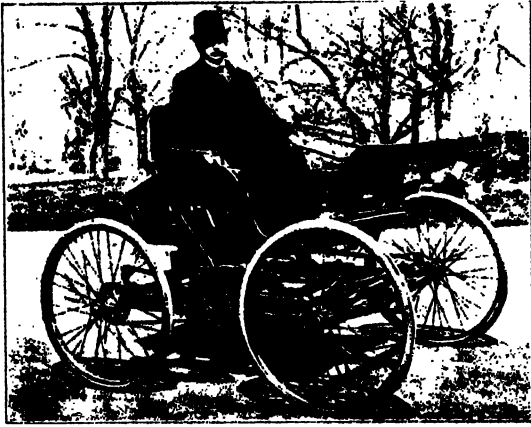
আদি মোটরকার

কিন্তু এই মোটরকারের প্রথম রূপটি দেখিলে অনেকে হয়ত হাসিয়া উঠিবেন। জিনিষটিকে দেখিলে একটা ঠেলা-গাড়ী বা ছাগলে-টানা গাড়ী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহা আসলে মোটর-কার। গত ২৫ বছর ধরিয়া মোটর-কারের যে রকম উন্নতি হইতেছে, আগামী ২৫ বছর ধরিয়া উন্নতির গতি যদি ঠিক অনুপাতে থাকে ১৯৫০ খৃঃ অব্দের লোকেরা আমাদের সবচেয়ে ভালো মোটরকার দেখিয়া হাসিয়া উঠিবে। একজন চিত্রকর ১৯৫০ খৃঃ অব্দের মোটরকার কেমন-ধরণের হইবে, তাহার একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই গাড়ীর সামনে মাত্র একটি প্রকাণ্ড চাকা থাকিবে, ইহার টায়ার বেলুনের মতন দেখিতে হইবে। ছবিটি দেখিলেই ব্যাপারটি ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

—

ম্যঘানের আকাশ ভ্রমণ—

লেফ্টেনাণ্ট্ ম্যঘান (আমেরিকা) ২১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট এবং ৪৫ সেকেণ্ডে নিউ ইয়র্ক্ হইতে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো এরোপ্লেনে করিয়া ভ্রমণ করেন।

বিমানবীর লেফ্টেনাণ্ট্ ম্যঘান

করেন। ম্যঘানের বিশেষ বাহাদুরি এই যে, তিনি সমস্ত পথ একলা ভ্রমণ করেন। তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য অন্য কোন লোক ছিল না। ম্যঘানের এরোপ্লেনটিও খুব উচ্চ শ্রেণীর ছিল না—সকল সময় তাঁহাকে ইঞ্জিনের দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইত। এই প্রায় ২২ ঘণ্টাকাল সময় ম্যঘান এরোপ্লেনের ষ্টিয়ারিং ছাড়েন নাই, প্রত্যেকটি মিনিট তাঁহাকে কল-চালানোর কাজই করিতে হইয়াছে।

ম্যঘান ২৮৫০ মাইল আকাশ-পথ ঘণ্টায় ১৫৪ মাইল বেগে গিয়াছিলেন। এই পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার সময় লাগিয়াছিল ১৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড। এই সময়টি তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। আকাশের পাৎলা হাওয়ায় তাঁহার ক্রমাগত গা বমি বমি করিয়াছিল, মাথাও খালি-খালি মনে হইতেছিল। উপরের হাওয়াতে প্রথমসমুদ্র যাত্রীর মতনই ভাব হয়। এইসমস্ত বাধা এবং বিপদ্ মাথায় করিয়া ম্যঘান এই অসাধ্য কাজটি করিয়াছেন। পথে এরোপ্লেন মেরামত এবং পেট্রোল ভরিবার সময় ৩ ঘণ্টা ১৭ মি বিশ্রাম পান। এই তাঁর একমাত্র বিশ্রাম।

ম্যঘানের এই কৃতকার্য্যতায় দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। বিপদের সময় আমেরিকার সমস্ত আকাশ-জাহাজকে একদিনের মধ্যেই এক-স্থানে জমা করা যায়। দ্বিতীয়—
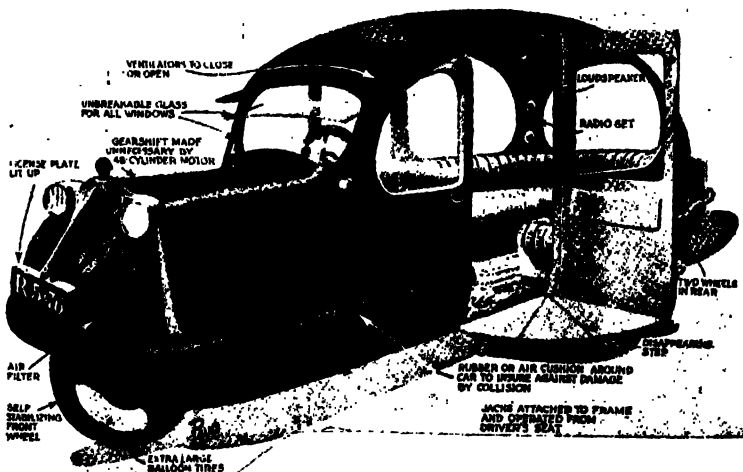
প্রান্ত পর্য্যন্ত এরোপ্লেন-ডাক বসানো যাইতে পারে। দ্বিতীয় কাজটি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

এরোপ্লেন-ক্যামেরা—

আকাশ হইতে ফোটো তুলিতে হইলে সাধারণ ক্যামেরা বিশেষ সুবিধার হয় না। উপরে যে ক্যামেরার ছবি দেওয়া হইল, উহার সাহায্যে ৬ মাইল উপর হইতে নিম্নের যে-কোন জিনিসের ছবি তোলা যাইবে।

এরোপ্লেন ক্যামেরা

অনেক নদী এবং পর্ব্বত এবং জঙ্গল আছে, নীচ হইতে যাহাদের ছবি তোলা অসম্ভব, এই ক্যামেরার সাহায্যে তাহাদের ছবি আকাশ হইতে তোলা হইবে।

পশু-পক্ষীর সহিত কথা বলা—

পশু-পক্ষীর প্রতি ভালোবাসা থাকিলে তাহার সহিত বেশ আলাপ করা যায়। এই আলাপ তাহাদেরই ভাষাতে করিতে হয়, কারণ পশু-পক্ষীরা মানুষের কথা বুঝিতে পারে না। গিল্‌বার্ট জিরার্ড নামক এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি নানা-প্রকার জন্তুর সহিত তাহাদের জাতীয় ভাষার নানা প্রকার কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন। তিনি জন্তুদের ভালোবাসেন, জন্তুরাও তাঁহাকে ভালোবাসে। তিনি নানাপ্রকার জীব-জন্তুর ধরণ-ধারণ, কি-রকম শব্দ করে, বিশেষ-বিশেষ শব্দ করিয়া মুখের এবং গলার কি-কি পরিবর্ত্তন করে, আনন্দের সময় কি-প্রকার শব্দ করে, দুঃখের সময়েই বা কি-প্রকার করে, ক্রোধ প্রকাশ কি প্রকার শব্দের দ্বারা করে, ইত্যাদি সব অনেক কাল ধরিয়া বহুকষ্টে শিক্ষা করিয়াছেন। এবং তিনি চেষ্টা করিতে-করিতে এইসমস্ত শব্দ নিজেও করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার মতে জীবজন্তুর প্রতি বন্ধুত্বের ভাব এবং ধৈর্য্য থাকিলেই এইসব

বাঁদরের সঙ্গে কথা বলিবার সময় মিঃ জিরার্ড কেমন মুখ করেন দেখুন, এইরকম মুখ দেখিয়া বাঁদর বেজায় সুখ পায়

শিক্ষা করা সহজ হয়। যেব্যক্তি জীবজন্তু ভালোবাসে না, তাহার এই-সকল শিক্ষা করিবার চেষ্টা করা বৃথা।

বাড়ীর উঠানে যে সমস্ত চড়ুই পাখী উড়িয়া বেড়ায়, তাহারা লোক দেখিলে ভয়ে উড়িয়া যায়, কিন্তু তাহাদের মতন শব্দ যদি কেহ
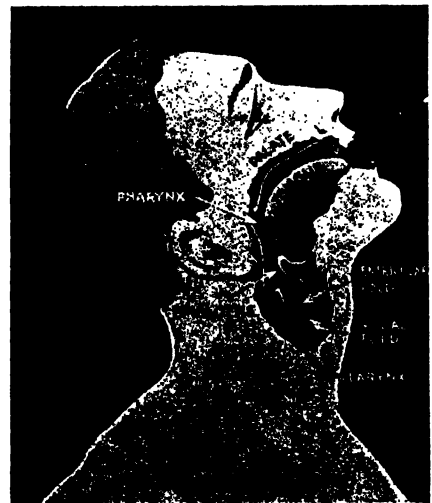
মুখ এবং গলার কলকব্জা - এইসমস্ত কলকব্জার সাহায্যেই পশুপক্ষীর ভাষা নকল করা যায়

করিতে পারে, তবে পাখীরা ক্রমে-ক্রমে তাহার বশ মানিবে এবং তাহার হাতে, মাথায়, পিঠেও বসিবে। পাখীরা তখন আর সেই ব্যক্তিকে শত্রু বলিয়া মনে করিবে না, নিজেদেরই একজন বলিয়া

মিঃ জিরার্ড চাদুররের একটি জন্তুর সহিত কথা বলিতে বলিতে তাহাকে খাবার দিতেছেন

মনে করিবে। পাখীরা যখন কোন-প্রকার শব্দ করে, তখন তাহার মাথার ভঙ্গী দেখিলে সেইপ্রকার শব্দ করিবার পক্ষে অনুকরণকারীর সুবিধা হয়।

যেসকল জন্তুর ভাষা কণ্ঠ-স্বরের দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহারা কোন-

বালিকাটি একটি কাঠ-বিড়ালের সহিত

প্রকার শব্দ করিবার সময় মাথা নীচু করিয়া করে। সিংহ এবং বাঘের বিষয়ে এইকথা খাটে না, কারণ তাহাদের স্বর কণ্ঠ দিয়া নির্গত হইলেও উদর হইতে উত্থিত হয়। জন্তুদের স্বর অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে এইসমস্ত ব্যাপারগুলি ভালো করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। শব্দ অভ্যাস করিবার সময় নানা-প্রকার অদ্ভুত শব্দ গলা দিয়া বাহির হয়। ইহাতে ভয় করিবার কিছু নাই।

বিড়ালের শব্দ অনুকরণ করিয়া তাহাকে স্থির করিয়া বসাইয়া তাহার ছবি তোলা হইতেছে

অনেকসময় জন্তুরা মানুষের মুখে তাহাদের শব্দ শুনিয়া ঘাবড়াইয়া যায়, কারণ শব্দ শুনিয়াই তাহারা মনে করে তাহাদের জাতভাই বুঝি কেহ নিকটে আছে, কিন্তু কাহাকেও কাছে দেখিতে পায় না—ইহাতেই তাহারা ভয় পায়। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে ইহা তাহাদের সহিয়া যায় এবং শব্দ-অনুকরণকারী ব্যক্তিকে তাহারা স্বজাতি বলিয়া মনে করিতে থাকে। কুকুর তাহার ডাক মানুষের মুখে শ্রবণ করিয়া ভয় পায়, কিন্তু মানুষের মুখে কুকুরের আদর-যাচী কাঁদুনে ডাক শ্রবণ করিয়া কুকুর বেজায় খুসী হইয়া উঠে এবং আনন্দে ল্যাজ নাড়িতে থাকে। এই ডাক শ্রবণে তাহার ভয়ডর দূর হইয়া যায়, সে মনে-মনে ভরসা পায়। অনেকের ধারণা যে—কুকুর ডাকে "ভউ ভউ" করিয়া কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে তাহা নয়; কুকুর ডাকে "ওউ" করিয়া।

জন্তুদের জীবন-যাত্রা প্রণালী ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহাদের একটি বিশেষপ্রকার ডাকের বিশেষ-বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়।

জন্তুদের বশ করিবার প্রধান উপায় তাহাদের খাবার দেওয়া। তাহাদের বোল করিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের খাবার দিতে হইবে—প্রথমে খাবার দূরে ছুঁড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের অবিশ্বাস দূর হইয়া তাহারা কাছে আসিবে এবং অবশেষে হাত হইতে খাবার লইয়া যাইবে। পাখীরা খুব তাড়াতাড়ি পোষ মানে, খাবার পাইলে তাহারা দু-চার দিনের মধ্যেই হাতে বসিয়া খাবার খাইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু কাক-সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না। খাবার দিবার সময় হাতে লাঠি, ছাতা, বা বন্দুক-ধরণের অন্যকিছু রাখা চলিবে না।

একটা কথা সকলকে মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের মতন পাখীদেরও শরীর খারাপ হয়, মনও খারাপ থাকে। সেই সময় তাহাদের কিছুই ভালো লাগে না। এই সময় তাহাদের খাবারের লোভ দেখাইয়া বা নানা-প্রকার বোল করিয়া কাছে আনিবার বা পোষ মানাইবার চেষ্টা বৃথা হইবে। জীব জন্তুর এবং পাখীদের একটু ভালো করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাদের শরীর এবং মেজাজ কেমন আছে। মেজাজ এবং শরীর ভালো না থাকিলে তাহাদের চুপ-চাপ থাকিতে দেওয়াই ভালো।

জীবজন্তুদের সহিত কথা বলিতে হইলে প্রথমে ভ্যাড়ার-বোল নকল করিবার চেষ্টা করাই ভালো। কারণ ভ্যাড়ার ডাক অন্য সব জন্তুর ডাক হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ। বাছুরের ডাকও প্রায় তাই।

পাখীদের মধ্যে কাকের ডাক সবচেয়ে কর্কশ এবং খারাপ হইলেও ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহা নকল করা সহজ এবং সহজেই ইহার ফল পাওয়া যায়। কাকের ডাক নকল করিলে দেখা যায় একটুক্ষণের মধ্যেই একদল কাক জমা হইয়া যায়। কাকদের পাওয়াইলে নানা-প্রকার আমোদ পাওয়া যায়।

—

সর্দ্দির বৈজ্ঞানিক প্রতিকার—

আমাদের দেশের লোককে প্রায়ই সর্দ্দিতে ভুগিতে দেখা যায়; বিশেষতঃ ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় সর্দ্দিগ্রস্ত হন না এমন খুব কম সৌভাগ্যবানই আছেন। সাধারণতঃ এই রোগটিকে আমরা উপেক্ষা করি; তিন কি চার দিন একটু কষ্ট সহ্য করিয়া থাকি তাহার পর সর্দ্দিটা আপনা হইতেই সারিয়া যায়। কেহ-কেহ মরিচ, মিছরী ও আদার কাথ, দু-চার টিপ নস্য, গরম ঘী, গরম জিলিপী, ইউক্যালিপটাস্ অয়েল, বাসক সিরাপ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া উপকার পান বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সর্দ্দিটা যত সহজে ধরে তত সহজে ছাড়িতে চায় না; এ ব্যায়রামটি অবহেলা করিয়া অনেকেই সাংঘাতিক Pneumonia, Pleurisy, Bronchitis প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হন। মোটের উপর সর্দ্দি সারাইবার প্রচলিত প্রথাগুলি যে বিশেষ ফলপ্রদ নয় তাহা অনেকেই অনুভব করেন, কারণ ঐ সব টোট্‌কা ব্যবহার সত্ত্বেও যতদিন থাকিবার ততদিন সর্দ্দি থাকিয়াই যায়;—তাহার পর হয় বসিয়া যায়, নয় সারিয়া যায়, কিন্তু আজকাল সাধারণ সর্দ্দি-কাশির প্রভৃতির একটি বৈজ্ঞানিক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন আমরা প্রায় জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, সর্দ্দি রোগটিকে একেবারে দূর করা যায়। এই বৈজ্ঞানিক প্রথাটি অতি সহজ এবং এত সহজেই ইহাতে সর্দ্দি প্রশমিত হয় যে প্রথমতঃ অবিশ্বাস জন্মে। একটি ছোট কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টাখানেকের জন্য সেখানে বসিয়া হয় দৈনিক পত্রাদি কিছু পড়িলেন কিম্বা গল্প করিলেন; সেই কুঠরী হইতে বাহিরে আসিয়াই অনুভব করিলেন যে আপনার সর্দ্দির চিহ্নমাত্রও নাই। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের স্থানে-স্থানে ঐরূপ কুঠরী স্থাপন করিয়া এই আশ্চর্য্য চিকিৎসা করা হইতেছে। Washingtonএর Chemical Warfare Service আবিষ্কার করিয়াছেন যে Chlorine গ্যাসকে মানব-জাতির প্রভূত উপকার সাধনে লাগানো যাইতে পারে। ফুসফুস-সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহা একপ্রকার অব্যর্থ ঔষধ অথচ এই গ্যাসই বিগত মহাযুদ্ধে মানুষ মারিবার দারুণ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

Chlorine যে সত্য-সত্যই সর্দ্দি সারাইতে পারে, তাহা নানা কারণে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। Washingtonএর Chemical Warfare Serviceএর ডাক্তারী-বিভাগে প্রত্যহ দুইতিন ডজন লোককে এই আশ্চর্য্য ফলপ্রদ চিকিৎসা করা হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে Mr. Martin নামে একজন লিখিতেছেন—"আমি বেশ একটু খারাপ-ধরণের সর্দ্দিতে ভুগ্‌ছিলাম—কিন্তু যখন সেই ছোট্ট ঘর থেকে (যেখানে Chlorine gas প্রয়োগ করা হয়) বেরিয়ে এলাম আমার সর্দ্দির চিহ্নমাত্র ছিল না এবং এখন পর্য্যন্ত আমার আর সর্দ্দি হয়নি।" প্রত্যহ প্রায় ত্রিশবত্রিশ জন সেখানে যান এবং প্রায় কুড়ি জন একেবারে নিরাময় হইয়া বাহির হন। বাকী দশ-বারজনও যথেষ্ট উপকার লাভ করেন। আজ পর্য্যন্ত বহু লোকেরই Chlorine প্রয়োগে সর্দ্দি সারিয়াছে। President Coolidge তাঁহাদের একজন; ইতিমধ্যে যুক্ত রাষ্ট্রে সৈন্যবিভাগের দু-জন বিখ্যাত চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শতকরা পঁচাত্তর জন যে Chlorine প্রয়োগে সর্দ্দির হাত হইতে রক্ষা পায়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। Chemical Warfare Service ছাড়াও নিউইয়র্ক, শিকাগো প্রভৃতি বিখ্যাত নগর-গুলিতেও এই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে Chlorine প্রয়োগ কি-প্রকার ফলদায়ক হইয়াছে তাহার একটা সর্কারী হিসাব ও তালিকাও প্রস্তুত করা হইয়াছে। ফুস্‌ফুস্ সংক্রান্ত রোগে ৯৩১ জনের মধ্যে ৬৬৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৭১ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য (তন্মধ্যে ৫৪৭ জন প্রথম বারেই ১ ঘণ্টা Chlorine প্রয়োগে) এবং ২১৮ জন আংশিকভাবে সুস্থ হইয়াছিল, মাত্র ৪৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৫ জন কোনই উপকার পান নাই। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই নাকের ভিতর ঘা হওয়াতে নাক দিয়া Chlorine ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এমন আশ্চর্য্য ফলপ্রদ উপায় আবিষ্কার চিকিৎসা-জগতে একটা বড় আবিষ্কার সন্দেহ নাই। তবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, Chlorine প্রায় সকলপ্রকার সর্দ্দিরই অমোঘ ঔষধ। এখন পর্য্যন্ত যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে ইহাই মনে হয় যে, বিশেষ কতকগুলি ফুস্‌ফুস্ সংক্রান্ত রোগে ইহা ফলদায়ক। সাধারণ সর্দ্দিতে (যাহাতে আমাদের দেশের শতকরা ৪০ জন প্রায় ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় আক্রান্ত হয়) Chlorine একরকম অব্যর্থ বলিলেই হয়। তবে যত শীঘ্র সম্ভব Chlorine প্রয়োগ করা প্রয়োজন। খারাপ-ধরণের Bronchitis, Laryngitis, Pharyngitis, Whooping Cough এবং Influenzaতেও অধিকাংশ-ক্ষেত্রে Chlorine প্রয়োগে আরোগ্য হয়। অনেক কালের পোষা Bronchitis এবং Laryngitis ইহাতে সহজে সারে না বটে, তবে কিছু আরাম দেয় সন্দেহ নাই। হাঁপানি (Asthma), আলজিব-বাড়া (Tonsilitis) যক্ষ্মা (Tuberculosis) কিম্বা Pneumonia-তে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়।

Chlorine নাকের ভিতর দিয়া শরীরের ভিতরে এইভাবে কাজ করে:—এক-ধরণের জীবাণু (bacteria) নাকের ভিতরে ঝিল্লীর (mucous membrane) উপরে বাসা বাঁধিয়া সর্দ্দি প্রভৃতি সাধারণ ফুসফুস্ সংক্রান্ত রোগের সৃষ্টি করে—Chlorine লাগিবামাত্র এই জীবাণু মরিয়া যায়। সুতরাং যেধরণের শ্বাসরোগে এই জীবাণুর সম্পর্ক নাই (যথা হাঁপানি) তাহাতে Chlorine প্রয়োগে কোনই ফল দর্শায় না।

Chlorine প্রয়োগের রীতি অতি সহজ। একটি ক্ষুদ্র কামরায় যাইয়া ঘণ্টাখানেক বসিতে হয়। যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয় সেইজন্য নানাপ্রকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা সেখানে রাখা হয়। নিজের গৃহে বসিয়াই আরামে Chlorine লেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাড়ীতে বসিয়া Chlorine লেওয়াতে কোনই বিপদ্ নাই। (অনেকে হয়ত ভয় পাইতে পারেন, কারণ Chlorine যুদ্ধের সময় প্রাণিহত্যায় সহায়তা করিয়াছিল।) Chlorine-চিকিৎসায় সাধারণতঃ যে পরিমাণ Chlorine থাকে, তাহার ১০০গুণ বেশী Chlorine হইলে তবে কিছু

বিপদের সম্ভাবনা আছে। Chlorine-ঘরে রোগীরা গিয়া বসিলে পর একটি valve খুলিয়া দেওয়া হয় এবং liquid Chlorine cylinder হইতে অল্পে-অল্পে Chlorine ছাড়া হয়। নলের ঠিক মুখে সাধারণ একটি বৈদ্যুতিক পাখা Chlorineকে সমস্ত ঘরময় ছড়াইয়া দেয়। এক-দফা চিকিৎসা শেষ হইবামাত্র সমস্ত Chlorine মিশ্রিত বাতাস পাখা দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

Chlorine চিকিৎসার যন্ত্র একটি কাঁচের cylinder। ইহাতে আধ পোয়া আন্দাজ liquid Chlorine থাকে। উপরের একটি valve খুলিয়া দিলেই রবারের নলযোগে Chlorine আর একটি পাত্রে যায়। এই পাত্রটিতে লবণজাতীয় কোনও পদার্থ (salt) জলে গুলিয়া রাখা হয়। এই পাত্রটি এবং এই নুন-জল পিচ্‌কারীর মতন কাজ করে এবং এখান হইতে Chlorine কাঁচের নলের সাহায্যে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

৭ জনকে একত্র একবার Chlorine এর ভাপ দিতে হইলে আনা-তিনেক খরচ পড়ে।

সুতরাং আজকালও যদি কোনও লোক সর্দ্দিতে কষ্ট পায়, তবে সেটা অন্যায় নিশ্চয়। সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় একঘণ্টা Chlorine-ঘরে গিয়া বসিলেই সর্দ্দির চিহ্নমাত্র থাকিবে না—সাধারণ সর্দ্দি-সম্বন্ধে একথা জোর করিয়াই বলা যায়।

আমাদের দেশে এখনও এই নূতন চিকিৎসার আমদানি হয় নাই। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এই চিকিৎসা মোটেই ব্যয়সাধ্য নয় অথচ কেন যে আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা ইহার প্রবর্ত্তন করেন না জানি না। সামান্য একটু অধ্যবসায় হইলেই লক্ষ-লক্ষ লোক যদি অযথা একটা কদর্য্য রোগের হাত এড়াইতে পারে তবে তাহা অতি শীঘ্র করা আবশ্যক।

Chlorine চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইলে Influenza Epidemic এর কোনই ভয় থাকিবে না—ইহা নিশ্চয়।

সাধারণ লোকের ধারণা আছে যে, Chlorine একটা ভীষণ রকমের মারাত্মক বিষ—তাহা ভুল। নিউ-ইয়র্কের Chemical Warfare Service দেখাইয়াছেন যে, গত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় ১৮৪৩ জন আমেরিকান যোদ্ধাকে Chlorine প্রয়োগে বিপন্ন করা হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৭৪জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। Chlorine হত্যার জন্যে ব্যবহৃত হইয়াও তুলনায় যখন এত কম অপকার করে, তখন চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত Chlorineএ বিপদের ভয় অনেক কম, তবে কেহ যেন Chlorine দিয়া নিজেই নিজের চিকিৎসা না করেন। Chlorine-চিকিৎসার যদি কোনও উপায় হাতের কাছে থাকে, তাহা হইলে সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় কেহ যেন তাহার সাহায্য লইতে ইতস্ততঃ না করেন।

আশা করা যায়, শীঘ্রই এই সহজসাধ্য চিকিৎসা আমাদের দেশে প্রচলিত হইবে। এবিষয়ে আমরা দেশের চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সর্দ্দি-রোগটি সাধারণতঃ তুচ্ছ হইলেও কি ভয়ানক কষ্টদায়ক তাহা অল্পবিস্তর সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং এই Chlorine-চিকিৎসা অনেকটা কষ্টের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে।

—

মৌমাছির টুপী-দাড়ি—

যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের এক ভদ্রলোকের পোষা মৌমাছির দল আছে। মৌমাছিদের সঙ্গে তাঁহার ভাব এত-বেশী যে, মৌমাছিরা সময়-সময় তাঁহার দাড়ি এবং মাথাতে কেমন করিয়া বসে তাহার পরিচয় ছবি

মাথায় এবং দাড়িতে মৌচাক দেখুন

দেখিলেই পাইবেন। মৌমাছিদের নাড়াচাড়া করিবার বিশেষ কতকগুলি নিয়ম এবং প্রথা আছে। এই প্রথাগুলি জানা থাকিলে মৌমাছিরা কাহাকেও কামড়ায় না।

ভারতবর্ষ

হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা—

হিন্দু-মুসলমানের ভিতর হইতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া ২১ দিন অনাহারে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া নানা স্থানে এই বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে। এলাহাবাদে, জব্বলপুর, বাংলার ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

ভিক্ষু উত্তমার কারাদণ্ড—

গত ৮ই অক্টোবর তারিখে ব্রহ্মের বিখ্যাত নেতা ভিক্ষু উত্তমার প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষু উত্তমাকে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ভিক্ষু উত্তমা মান্দালয়ে গমন করিলে তথায় এক ভীষণ দাঙ্গা হয়। তিনি সেখান হইতে রেঙ্গুনে প্রত্যাগমন করিয়া যে বক্তৃতা দেন তাহাই নাকি রাজদ্রোহিতায় পূর্ণ ছিল।

বিচারক বলিয়াছেন, উত্তমা বহুবার তাঁহার বক্তৃতায় ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন। বিনাশ্রমে কারাদণ্ড লাভের জন্য যে যোগ্যতা এবং শিক্ষা থাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহার নাই এবং তাঁহাকে বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিকবাদী বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না। সেইজন্যই তাঁহাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

গত ৮ই অক্টোবর রেঙ্গুনের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক নোটিশ জারি করিয়া একমাসের জন্য সহরে সভাবন্ধের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উত্তমার কারাদণ্ডের ফলে পাছে সভা-সমিতি হইয়া গোলমাল হয় সেই জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রেঙ্গুন মেল সংবাদ দিয়াছেন, কারাগারে ভিক্ষু উত্তমার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এই নির্দ্দয় ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। এক সপ্তাহকাল যাবৎ তিনি পানীয় জল ব্যতীত আর কোনো আহার্য্যই নাকি গ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের রীতিনীতি অনুসারে তাঁহাকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেও দেওয়া হইতেছে না। এমন কি গবর্ণ্‌রের কাছে প্রতিনিধি-প্রেরণের দাবিও নাকি তাঁহার মঞ্জুর হয় নাই।

কোহাটের হিন্দুদের সহায়তা—

কোহাটের দাঙ্গায় যেসমস্ত হিন্দু বিপন্ন হইয়াছেন তাহাদের সহায়তার জন্য কলিকাতা মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি হইতে অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করা হয়। সম্প্রতি উক্ত সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জাজোদিয়া জানাইয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্যে এ-পর্য্যন্ত মোট ৮৭৫৬।০ আনা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বিরলা একা তিন হাজার টাকা দিয়াছেন।

কোহাটের হিন্দুমুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতর প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী কতিপয় মুসলমান বন্ধুর সহিত কোহাট গমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বড়লাট রেডিং তাঁহাকে যাইবার অনুমতি দেন নাই। মহাত্মা সেখানে গমন করিলে চাঞ্চল্য আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে এই আশঙ্কা করিয়াই নাকি বড়লাট তাঁহাকে কোহাট যাত্রার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা এবং শিশুশিক্ষা—

বোম্বাই কর্পোরেশনের আগামী অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির অধীন সমস্ত বিদ্যালয়ে বালকবালিকাগণকে সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা ও ঐক্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য দিল্লীর মিলন-বৈঠকের প্রস্তাব-অনুসারে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হউক।

অনুন্নত জাতির উন্নতি বিধান—

দিল্লীর অনুন্নত জাতির উন্নতি বিধান সমিতি তাঁহাদের কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :—

মাদ্রাজশাখা—তামিল ও মালাবার অঞ্চলের বন্যা-পীড়িত অনুন্নত জাতিদের সাহায্যার্থে নানা স্থানে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্মীরা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। দরিদ্রদিগকে কয়েক সহস্র টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

ভাইকম সত্যাগ্রহে ৫০০ টাকা দান করা হইয়াছে। অর্থাভাব হওয়ায় মহাত্মাজীকে তার করা হইয়াছিল। তিনি মিঃ জর্জ্জ জোসেফ্‌কে ভাইকম অঞ্চলের বন্যাপীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছিলেন। এজন্য আমেদাবাদ ৮৪ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া দিয়াছে।

দিল্লীশাখা—অনুন্নতদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। নানাস্থানে পাঠশালা খোলা হইয়াছে। যেখানেই জমিদারেরা অনুন্নতের পীড়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন সেইখানেই সাহায্য করা হইতেছে। অনুন্নতদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনুন্নত বালকদের কলে সুতা কাটা ও কাপড় বোনা শিখানো হইতেছে। যমুনার বন্যায় বিপন্নদিগকে সাহায্য করা হইতেছে। শেঠ যুগলকিশোর বিরলা অনুন্নতদের ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য সাড়ে তিনহাজার টাকা দান করিয়াছেন।

রোটক জেলা—একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রলোভন ও অন্যদিকে জমিদারদের উৎপীড়ন চলিতেছে। এজন্য অনুন্নতদের সাহায্যেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গুরগাঁও জেলা—অনুন্নতদের পাঠশালায় সন্ধ্যাহ্নিক ও বেদমন্ত্র পাঠ ও ভজন স্তোত্র শিখানো হইতেছে। মিশনারীদের স্কুল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সোহানা সহরে জমিদারদের সহিত মতান্তরের সুযোগে চামার ও ঝাড়ুদারদিগকে খৃষ্টান করা হইয়াছে। এখন জমিদারেরা সহানুভূতি দেখাইতেছেন। উহাদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

মীরাট জেলা—শেখর নামক স্থানে মুসলমানদের সহিত বিবাদে অনুন্নতদের সাহায্য করা হইয়াছে। জনৈক ভারতীয় খৃষ্টান প্রচারককে সপরিবারে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। হাপুরেও একজনকে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে পুনহিন্দু করা হইয়াছে।

বুলন্দসহর—বাথড়া গ্রামের চামারদিগকে ঠাকুরেরা এবং মুসলমানেরা ভয় দেখাইতেছিলেন। সেসব ঠাণ্ডা করা হইয়াছে। দানাপুরেও চামারদের পীড়নে বাধা দেওয়া হইয়াছে। জল-খেরা নামক স্থানে জমিদারদের সহিত মনোমালিন্যে চামারদের খৃষ্টান হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। কর্ম্মীরা সেদিকেও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। গালুথীও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে যেসব অনুন্নত খৃষ্টান আছে কর্ম্মীরা এখন তাহাদের ভিতর কাজ করিতেছেন।

অনেক স্থানে নূতন পাঠশালা করা হইয়াছে ও পুরাতনগুলি ভালো-ভাবে চালানো হইতেছে। জমিদারদের জন্য যেখানেই অনুন্নতরা খৃষ্টান হইবার উপক্রম করিতেছে সেইখানেই লোকজন পাঠাইয়া, অনুন্নতদের মামলায় সাহায্য করিয়া বা মনোবিবাদ মিটাইয়া তাহাদিগকে ঠিক রাখা হইতেছে।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা—

শ্রীযুক্ত ভোপতকর মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সালিসী ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য এক পাণ্ডুলিপি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন। গত ২৩শে অক্টোবরের সভায় তাঁহার পাণ্ডুলিপি গৃহীত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি আছে:—

(১) মিউনিসিপ্যালিটি নিয়োগ-ব্যাপার মনোনয়নের দ্বারা হইবে না, নির্ব্বাচনের দ্বারা হইবে।

(২) মিউনিসিপ্যালিটি সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নিয়োগ করিবেন।

(৩) অভিনন্দন-পত্র প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যয় হইবে তাহার টাকার জন্য কলেক্টরের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন।

মহাত্মার উপবাস—

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ২১ দিন অনাহারে থাকিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ৮ই অক্টোবর ২১ দিন উপবাসের পর বেলা ১২টার সময় তিনি আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। সে-সময় তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নেতাই উপস্থিত ছিলেন।

হাকিম আজমল খাঁ, মৌলানা মহাম্মদ আলি, শৌকত আলি, ও আবুল কালাম আজাদকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মাজী বলেন, হিন্দু মুসলমানের একতা আমার কাছে নূতন জিনিষ নহে। গত ৩০ বৎসর কাল আমি এজন্য চেষ্টা করিতেছি কিন্তু এখনও এবিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। ভগবানের কি ইচ্ছা তাহা আমি জানি না।

মুসলমান জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলিয়াছেন, আপনাদের নিকট আজ আমি এক নিবেদন জানাইতেছি. হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্য আপনারা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হউন। আজ সকলে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন, আপনারা আমার কথামত এবিষয়ে কাজ করিবেন।

মহাত্মার ব্রতভঙ্গের দিন মৌলানা ও বেগম মহম্মদ আলি দিল্লীর কসাইখানা হইতে একটি গাভী কিনিয়া মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন।

সাইকেলে ভূপ্রদক্ষিণ—

তিন জন ভারতীয় সৈনিক সাইকেলে করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা বোম্বাই পাওনিয়ার্স দলের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের লোক। নাম—গোপকানওয়ালা, হাকিম, এবং হাবেরাম। ইউরোপ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও চীনভ্রমণে উদ্দেশ্যে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে জাহাজে করিয়া এখেন্সে গিয়াছেন। গত বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া এই কয় মাসে তাঁহারা যেপথ অতিক্রম করিয়াছেন তাহার পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার মাইল। সিরিয়ার মরুভূমির বালির উপর দিয়া তাঁহাদিগকে প্রায় ৬ শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

শিশুদের প্রতি বেত্রদণ্ড—

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় শিশুরক্ষা আইনের পাণ্ডুলিপি আলোচনার সময় মিঃ জয়াকর শিশুদের প্রতি বেত্রদণ্ড ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কাউন্সিলে অধিকাংশ সভ্যের মতে আইন হইতে উক্ত ধারা তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি—

দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি সহরের তিন ভাগের দুই ভাগ মদের দোকান বন্ধ করিয়া দিবার জন্য পঞ্জাব গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

গয়ার মহাবোধি মন্দির—

বুদ্ধগয়া কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের প্রস্তাব-অনুসারে মহাবোধি মন্দির সমস্যার সুমীমাংসার জন্য সমসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। এই মন্দিরের অধিকার লইয়া হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। আশা করি কমিটি সেই চাঞ্চল্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন।

মান্দ্রাজ কাউন্সিল—

মান্দ্রাজ কাউন্সিলের স্বরাজ্যদলের সভ্যদিগের একটি সভায় স্থির হইয়াছে যে, কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে তাঁহারা মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করা এবং রাজনৈতিক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাউন্সিলে সভ্য হওয়ার বাধা উঠাইয়া দেওয়া-সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

—রায়

—

বাংলা

বিশ্ব-ভারতী-সংবাদ—

শান্তিনিকেতনস্থ বিদ্যা-আয়তনকে নূতন শিক্ষা প্রণালী অনুসারে নিম্নলিখিত-প্রকার তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) পাঠ ভবন

(২) শিক্ষা ভবন

(৩) বিদ্যা ভবন

ইহাদের প্রথমটিকে স্কুল, দ্বিতীয়টিকে কলেজ এবং তৃতীয়টিকে গবেষণা-বিভাগের অনুরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। হাতের কাজ এবং চিত্রকলা ও সঙ্গীতেরও বিশেষ স্থান আছে। এতদ্ভিন্ন সুরুলস্থ শ্রীনিকেতন পল্লী-সংস্কার-বিভাগের সাহায্যে ছাত্রগণ চারিপাশের গ্রাম্য-জীবন যাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পায়। ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে পরিচয়ের নিবিড়ত্ব এই নব-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক ছাত্র একজন শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া কাজ করিবার সুযোগ লাভ করে। সাধারণত শিক্ষার বাহন বাংলা ভাষা—কিন্তু অসুবিধাস্থলে অন্য ভাষাও ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যেক বিভাগের পাঠান্তে ছাত্ররা তুষ্টি-পত্র (certificate) পাইয়া থাকে। ইহাতে পরীক্ষার ফল ও শিক্ষকের অভিমত লিপিবদ্ধ থাকে। শিক্ষকের মন্তব্যে ছাত্রের সমগ্র পাঠ্যজীবনের উন্নতিবিবরণ লিখিত হয়। বিশিষ্টিকৃত পাঠ্যবিষয়ে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা করা হইবে। প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ্য বিষয় সমগ্রভাবে বিচার করিবার প্রথা আছে যাহাতে কোনো এক অংশের সামান্য ত্রুটি অন্য অংশের উন্নতির পক্ষে বাধা-স্বরূপ না হয়।

পাঠ ভবন

পাঠ-ভবন দুইভাগে বিভক্ত। অল্পবয়স্কদের জন্য আদ্য বিভাগ। অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের জন্য মধ্যবিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের পাঠান্তে কৃতী ছাত্ররা তুষ্টিপত্র পাইয়া থাকে।

(ক) আদ্য-বিভাগ—ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য। এই বিভাগে পাঠার্থী ছাত্রদের ভর্ত্তির সাধারণ বয়স ছয় হইতে নয়। বালিকাদের পক্ষে সেরূপ কোনো নিয়ম নাই।

আদ্য-বিভাগের পাঠ্য-তালিকা

(ক) পাঠ্য বিষয় (পরীক্ষার্থ নহে) প্রকৃতি-বীক্ষণ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, চিত্রকলা, সঙ্গীত, হাতের কাজ।

(খ) পাঠ্য বিষয় (পরীক্ষার্থ) সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস।

(গ) স্বেচ্ছামূলক-বিষয়—হিন্দী, গুজরাটি, উর্দ্দু, ফারসী, ফরাসী। এতৎব্যতীত অন্য ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

যে-সব ছাত্ররা কলিকাতা বা অন্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়—তাহাদিগকে ইহার পরে দুই বৎসরে উক্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি অনুসারে ছাত্রগণকে বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টারের অধীনে নির্ব্বাচনী পরীক্ষা দিতে হয় না।

মধ্য-বিভাগ

যে-সব ছাত্র আদ্য-বিভাগের তুষ্টিপত্র পাইয়া এই বিদ্যা-আয়তনেই পাঠ করিতে চাহিবে তাহাদের সম্মুখে তিনটি পথ আছে। উপার্জ্জন-মূলক কোনও শিক্ষা, সাহিত্য, কিম্বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা।

মধ্য-বিভাগের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম—যে সব ছাত্র ভবিষ্যতে সাহিত্যচর্চ্চা বা গবেষণাদি করিবে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া—এবং যাহারা ব্যবসা, কৃষিবিদ্যা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে তাহাদিগকে জ্ঞানের সাধারণ একটা আব্‌হাওয়ার মধ্যে বাড়াইয়া তোলা।

উপার্জ্জন-মূলক শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত কোনো একটি বিভাগে যোগ দিতে হইবে। কলাভবন—(এখানে চিত্রবিদ্যা ও অন্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।) কিম্বা, শ্রীনিকেতনে। (পল্লীসংস্কার বিভাগ) শ্রীনিকেতনে একটি গোশালা, বিভিন্ন কার্য্যশালা, ব্রতীবালক (Scout) শিক্ষার ব্যবস্থা, পল্লীসংস্কারের জন্য ডাক্তারখানা, প্রভৃতি আছে।

শ্রীনিকেতনের একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষিকাজে ও হাতের কাজে নিপুণ ছাত্র প্রস্তুত নহে ; যাহাতে পল্লীসংস্কারের বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলিতে বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ গড়িয়া উঠে তাহাও এই বিভাগের একটি উদ্দেশ্য।

যেসব ছাত্র সাহিত্যচর্চ্চা ও জ্ঞানমূলক শিক্ষা লইয়া থাকিতে চাহে তাহাদিগকে ইহার পরে আরও চার বৎসর পড়িতে হইবে। এই সময়ের শেষে যাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে মধ্য-বিভাগের তুষ্টিপত্র দেওয়া হইবে। —শান্তিনিকেতন।

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির রিপোর্ট—

সম্প্রতি রিলিফ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় ১৯২২ সনে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬০৩ এবং ১৯২৩ সনে ১,১৮,৯৭৭ টাকা ব্যয় হয়। (১) অসহায় লোকদের পর্ণকুটীর নির্ম্মাণে ১৯২২ সনের শেষ কয়েক মাসে ৭৩,৬২৩ টাকা এবং ১৯২৩ সনের প্রথম ভাগে ৩৯,১৩২ টাকা মোট ১,১২,৭৫৫ টাকা দেওয়া হয়, মোট ১০,০০০ খানি কুটীর নির্ম্মিত হয়। (২) চাউল ডাইল বিতরণে ৩২৮৩ টাকা দেওয়া হয়। (৩) ১৯২২ সনে ৪৩৮২১ এবং ১৯২৩ সনে ১০,৩৭৯ টাকার কাপড় বিতরণ করা হয়। (৪) ৪০০০ টাকা গরুর ঘাসের জন্য দেওয়া হয়। (৫) বীজ ধানের জন্য ১০,৭৯৮, (৬) দানে ১৪,২৯১। ইহা হইতে কালিকাপুর বাঁধে ৫৭৯৮, চট্টগ্রামের কক্সবাজার অঞ্চলের জন্য ২০০০৲ পাটনায় ২০০০৲ বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতিতে ৫০০৲ পাবনার জলপ্লাবিত স্থানে ৫০০৲ চাঁদপুরের জ্বরনিবারণের জন্য অভয়াশ্রমের শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৫০৲ মেদিনীপুরের জলপ্লাবনে শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায়কে ৪৪১৲ এবং তদ্ব্যতীত আত্রাইতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দান আছে। চর্‌কা প্রবর্ত্তনের ব্যয় ১২০১ টাকা। এইক্ষণ তথায় ২৪০০ চর্‌কা চলিতেছে, প্রতিমাসে দরিদ্র লোকেরা ৫৫০০ টাকা আয় করিতেছে। বৃথা সময়-ক্ষয়ের পরিবর্ত্তে গরীব মেয়েরা এই টাকা আয় করিতেছে।

—জ্যোতিঃ

শিক্ষার জন্য দান—

আদর্শ দান—স্বনামখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর মহাশয় সম্প্রতি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কৃষি-বিভাগের জন্য যাদবপুরে উক্ত বিদ্যালয়ের সংলগ্ন তাঁহার ৫০/ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউট যাদবপুরে তাঁহাদের নিজস্ব নব প্রতিষ্ঠ গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং ইহার কৃষি বিভাগও খোলা হইয়াছে।

—নীহার

বাঙ্গালাদেশে ক্ষয়কাশ—

বাংলাদেশে প্রতিবৎসর ক্ষয়কাশ রোগে একলক্ষ লোক মরিতেছে, অর্থাৎ ঘণ্টায় ১২জন করিয়া লোক মরিতেছে। যাহাতে এই মারাত্মক রোগের শীঘ্র প্রতিকার হয় তাহার জন্য সকলেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

—হিন্দুরঞ্জিকা

বিলাতে বিল্বমঙ্গল অভিনয়—

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভক্ত নাট্যকার ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত প্রসিদ্ধ নাটক "বিল্বমঙ্গল" গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে লণ্ডনের উইগমর হলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনের উদ্যোগে অভিনীত হইয়াছে। নাটকখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "ডিভাইন ভিশন"।

—শিক্ষা-সমাচার

স্বর্গীয় দলবাহাদুর গিরি—

প্রসিদ্ধ নেপালী-নেতা দলবাহাদুর গিরি ক্ষয়কাশে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আজীবন দেশ-সেবার কথা সকলেই জানেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী ও পাঁচটি সন্তান একবারে অসহায়। এই অসহায় পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য কাগজে-কাগজে আবেদন বাহির হইয়াছে। আশা করি, দেশবাসী এই সৎকার্য্যে বিমুখ হইবেন না।

দাতব্য চিকিৎসালয়—

স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্রের দুই পৌত্র তাঁহাদের কলিকাতার ঝামাপুকুরের বাটীতে একটি দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই চিকিৎসালয়টি গরীব সাধারণের অশেষ উপকার করিতেছে। চিকিৎসালয়টি সাধারণের এত উপকার সাধন করিতেছে যে, বহু দূর দেশ হইতে দরিদ্র রোগীরা এখানে ঔষধ লইতে আসে।

সেবক
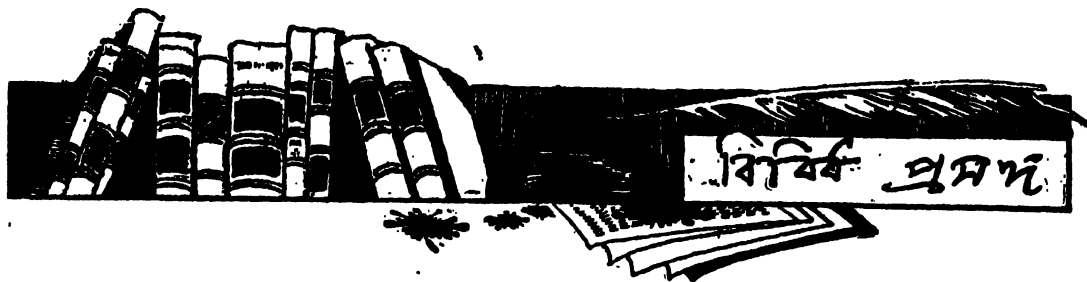
বঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহবাদী

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য-সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইরকম মত দেখা যায়।—(১) ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া উচিত; (২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া কানাডা প্রভৃতির মত স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভারতবর্ষের পাওয়া উচিত। যাঁহারা দ্বিতীয় মতাবলম্বী, তাঁহারা কেহ কেহ বা সকলেই এবম্বিধ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনকেই চরম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য মনে করেন কি না, জানি না। কারণ কেহ কেহ এমন আছেন, যে, আপাততঃ ঐরূপ স্বরাজই চান, কিন্তু উহাকে সোপান-স্বরূপ করিয়া পরে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে চান। আমাদের নিজের মত আমরা এইরূপ বলিয়া আসিতেছি, যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই চাই, কিন্তু তাহা যদি ঔপনিবেশিক স্বরাজের পথ দিয়া হয়, তাহাতে আপত্তি নাই।

ভারতবর্ষকে কি উপায়ে স্বাধীন করা যাইতে পারে, সে-বিষয়ে প্রধানতঃ দুইপ্রকার মত দেখা যায়। এক মত এই, যে, আমাদের স্বাধীনতালাভের বিরোধীদের রক্তপাত না করিয়াও ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইতে পারে। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা ইহাও বলেন, যে, প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতাকামীদিগকে কিন্তু নিজের রক্ত নিজের ধনপ্রাণ সবই স্বাধীনতার জন্য বলি দিতে হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই, যে, অস্ত্রবল ও অস্ত্রব্যবহার ব্যতিরেকে আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। মাঝামাঝি রকমের একটা মতও এই আছে, যে, অহিংসার পথে থাকিয়া চেষ্টা করাই ভাল; তাহাতে ফল না হইলে অস্ত্রপ্রয়োগের চেষ্টা করিতে হইবে, এবং তাহা করা উচিত।

যাঁহারা অস্ত্রবলে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইতিহাস-বর্ণিত নানাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মত কিছু করিবার আয়োজন এপর্যন্ত করিতে পারেন নাই। বোমা নির্ম্মাণ ও নিক্ষেপ, রিভল্‌ভার সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা খুন, এবং "রাজনৈতিক ডাকাতি" ও খুন, এইসকলের সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়াছি বটে। এইসকল উপায়ে দেশকে স্বাধীন করা যাইতে পারে, আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু দল যথেষ্ট পুরু এবং আয়োজন যথেষ্ট প্রচুর থাকিলে গবর্ণমেণ্টকে কতকটা ব্যতিব্যস্ত করা যায় বটে। "ভদ্র"লোকদের দ্বারা সশস্ত্র ডাকাতি এবং তৎসম্পর্কে খুনের বিষয়ও খবরের কাগজে পড়িয়াছি। এইগুলি সমস্ত বা অধিকাংশই "রাজনৈতিক" কি না বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার মধ্যে কেবলমাত্র রোজগারের জন্য ডাকাতিও অনেক আছে—সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। "ভদ্র"-লোকদের দ্বারা ডাকাতি এদেশে বা কোন দেশেই নূতন নহে। ইউরোপের জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অভিজাত ব্যারন্ প্রভৃতিরা ডাকাতি করিত, ইহা ইতিহাস ও উপন্যাসে প্রসিদ্ধ। এখনও পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও "ভদ্র" লোকেরা রাহাজানি, ব্যাঙ্ক্‌লুট, মোটরডাকাতি, প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিয়া থাকে। আমাদের দেশের অনেক বনিয়াদী ঘরের পূর্ব্বপুরুষেরা ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। অবশ্য আমাদের দেশের ও বিদেশের সাবেক ও আধুনিক "ভদ্র" ডাকাতরা সকল স্থলে কেবলমাত্র রোজ্‌গারের জন্যই যে, ডাকাতি করিত ও করে, তাহা নয়। দুঃসাহসের কাজ করিবার দিকে ঝোঁক মানব-প্রকৃতিতে নিহিত আছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত নির্ভীক, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্য উপায়ে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিলে, ডাকাতি প্রভৃতি গর্হিত কাজও করে। যাহারা গায়ে আঁচড় লাগাইতে রাজী নহে, তাহারা ইতিহাসে, পন্যাসে, খবরের উকাগজে দুঃসাহসিকতার গল্প পড়িয়াই নিজেদের ঐ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে।

যাহা হউক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডাকাতি একটাও হয়

না বা হইতে পারে না, ইহা আমরা বলিতে পারি না; হওয়া অসম্ভব নহে। এ-সম্বন্ধে আমাদের কোনও সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। ডে-নামক ইংরেজকে গোপীনাথ সাহা খুন করিয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, যে, তাহার মতাবলম্বী লোকও আরও থাকিতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমানে প্রশ্ন এই, যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডাকাতি ও খুন করিবার পক্ষপাতী লোকেরা সংখ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, দক্ষতায়, দলবদ্ধতায়, প্রভাবে ও আয়োজন-প্রাচুর্য্যে এরূপ কি না, যাহার জন্য গবর্ণ্মেণ্টের ব্যতিব্যস্ত ও নিরুপায় হইয়া বিশেষ আইন করিয়া পুলিশকে ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স্ দ্বারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ ক্ষমতা দিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা ইহাও মনে করি, সাধারণ আইন যাহা আছে, বিপ্লববাদী দল থাকিলেও উহার দ্বারাই তাহাদিগকে দমন করা যায়।

—

স্ববিরোধী মত

খবরের কাগজে পড়িয়াছি, পূর্ব্বে যখন শ্রীযুক্ত সতীশ-রঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন, বিপ্লববাদীর দল আবার দেশে দেখা দিয়াছে এবং তাহাদের এক ফর্দ্দও তাঁহার নিকট আছে, তখন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁহার দলের লোকেরা একথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বেঙ্গল্ অর্ডিন্যান্স্ জারী ও অনেক বাঙালী ভদ্রলোক গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই চিত্তরঞ্জনবাবু একাধিকবার খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, যে, গবর্ণ্মেণ্ট্ যেরূপ মনে করেন তাহার অপেক্ষাও গুরুতর বিপ্লবের আয়োজন মজুদ্ আছে; অবশ্য গবর্ণ্মেণ্ট্ যদি দেশের লোকদের স্বরাজ-কামনা চরিতার্থ করেন, তাহা হইলে বিপ্লবপ্রয়াসীদের এঞ্জিনের বাষ্প জল হইয়া যাইবে এবং তাহারাও তুষ্ট ও ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কি উদ্দেশ্যে বা কি কারণে দেশবন্ধু দাশ এরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না; কিন্তু সর্‌কার বাহাদুরকে কিছু উদ্বিগ্ন করিয়া কার্য্য উদ্ধারের ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? সতীশরঞ্জন-বাবু যখন বিপ্লবায়োজনের অস্তিত্ব প্রকাশ এবং চিত্তরঞ্জন-বাবু সদলবলে তাহা অস্বীকার করেন, তখন হইতে এখনকার মধ্যে ভারতে এমন কোনও অবিচার-অত্যাচার ঘটে নাই, যাহা অপেক্ষা গুরুতর অবিচার-অত্যাচার তাহার আগেই হইয়া যায় নাই। সুতরাং সতীশরঞ্জন-বাবুর উক্তির সময় যদি বিপ্লবায়োজন ছিল না বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তৎপরে কেন হঠাৎ উহার আবির্ভাব হইল, বুঝা যায় না। এই কারণে আমাদের মনে হয়, প্রকৃত অবস্থা যাহা, তাহা আগে যেরূপ ছিল, এখনও তাহাই আছে; প্রতিবাদের দর্‌কার যখন মনে হইয়াছিল, তখন চিত্তরঞ্জন-বাবু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং বিপ্লববাদীর অস্তিত্ব প্রকাশ করা যখন দর্‌কার মনে হইয়াছে, তখনও তিনি তাহাই করিয়াছেন। ইহার নাম রাজনীতি। সুতরাং কোন্ সময়কার কোন্ কথাটা সত্য, কোন্‌টাই বা মিথ্যা, এবং কি অর্থে সত্য বা মিথ্যা, তাহার বিচার সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, এবং তাহা করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। অবশ্য এরূপও হইতে পারে, যে, "সূক্ষ্ম" বিচার করিলে দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের দুই সময়কার আপাত-বিরোধী দুই উক্তির মধ্যে কোন অসঙ্গতি দৃষ্ট হইবে না। কিন্তু সেরূপ "সূক্ষ্ম" বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই।

—

সাংবাদিকদিগের মত

বাংলা দেশে যে নূতন অর্ডিন্যান্সটি জারী হইয়াছে, তাহার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতায় বঙ্গের জার্ন্যালিষ্টস্ এসোসিয়েশনের অর্থাৎ সাংবাদিক-দিগের সভার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে-প্রস্তাবটি ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে:—

"This Association denies the existence of any dangerous or widespread revolutionary criminalism in the country"......

"এই সভা দেশে বিপ্লবচেষ্টাসম্ভূত কোন বিপজ্জনক বা ব্যাপক অপরাধিতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন"......

গবর্ণ্মেণ্ট্ দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য নূতন নিয়মাবলী

প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহার বলে অনেক লোককে গ্রেফতার করিয়াছেন, সাংবাদিক সভা বলিতেছেন, দেশের অবস্থা সেরূপ নহে। সভার এই প্রতিবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উক্তিরও প্রতিবাদ করা হইয়াছে কি না, তাহা তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা বিবেচনা করিবেন। আমরা মনে করি, হইয়াছে। সাংবাদিক সভার প্রতিবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে, (১) নানাবিধ মতাবলম্বী ভারতীয় সাংবাদিকেরা ইহার সভ্য, (২) সভার অধিবেশনে উপস্থিত নানামতাবলম্বী সভ্যদের সকলের সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি ধার্য্য হয়, এবং (৩) প্রস্তাবটি সভায় পেশ করেন দেশবন্ধু দাশের সম্পাদিত ফর্ওয়ার্ড কাগজের প্রধান সম্পাদকীয় সহকারী শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু।

—

অস্ত্রশস্ত্র নিরুদ্দেশ

সাংবাদিক সভার প্রস্তাবটিতে একথাও আছে, যে, সম্প্রতি যে-সব বাড়ীতে খানাতল্লাসী করা হইয়াছে, তাহার কোথাও অস্ত্রশস্ত্র না-পাওয়া-দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে, দেশে কোন ব্যাপক বিপ্লব-চেষ্টা ও তাহার আয়োজন হইতেছে না।

কোথাও অস্ত্রশস্ত্র না-পাওয়ার নানা কারণ অনুমান করা যায়। হইতে পারে, যে, পুলিশ বিপ্লবী মনে করিয়া যাহাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়াছিল, তাহারা কেহই বিপ্লবী নহে (আমরা এই অনুমান সত্য হইবার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী)। হইতে পারে, যে, ধৃত লোকদের মধ্যে কেহ কেহ বিপ্লবী থাকিলেও তাহারা আগে হইতে সংবাদ পাইয়া অস্ত্রশস্ত্র সরাইয়া ফেলিয়াছিল (ইহা আমরা সম্ভব মনে করি না)। হইতে পারে, যে, বিপ্লবীদের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র থাকে না, পুলিশের অজানা কোন সাধারণ অস্ত্রাগারে থাকে (ইহাও সম্ভব মনে হয় না)। হইতে পারে, যে, যে অল্পসংখ্যক বিপ্লব-প্রয়াসী হয়ত আছে, পুলিশ তাহাদের সন্ধান জানে না, এবং এইজন্য তাহারা অবিপ্লবী নিরপরাধ লোকদের বাড়ী হাত্ড়াইয়া বৃথা বেকুব বনিয়াছে (ইহা আমরা সম্ভব মনে করি)। ইহাও হইতে পারে, যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দৃঢ়তার সহিত বিপ্লব-চেষ্টার অস্তিত্ব ও ব্যাপকতার কথা বলায় পুলিশ মনে করিয়াছিল, যে, তাহা হইলে দেশবন্ধুর জানাশুনা লোকদের মধ্যেই বিপ্লবী আছে ও তাহাদের বাড়ী খুঁজিলেই নিশ্চয় অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাইবে; এবং এই কারণে বোমা, রিভল্ভার আদি "আবিষ্কারের" জন্য আগে হইতে আয়োজন করাইতে অন্বেষক পুলিশ ভুলিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, পুলিসের ঈপ্সিত অস্ত্রশস্ত্র "ফেরার্" হওয়ায় দেশের লোকেরা হাসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে "ফর্ওয়ার্ড্" কাগজও পুলিশের ব্যর্থ খানাতল্লাসীতে হাসিতেছেন। ফর্ওয়ার্ডের মনে হয়ত এসন্দেহের উদ্রেক হয় নাই, যে, কোথাও অস্ত্রশস্ত্র বাহির না হওয়ায় দেশবন্ধু দাশের উক্তিও অমূলক প্রমাণ হইতেছে, এবং তজ্জন্য তাঁহারও "কিঞ্চিৎ" বেকুব বনিবার কথা। অবশ্য তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত ও সপ্রতিভ লোক বলিয়া, পুলিশের বেকুবীতে সকলের হাসির সঙ্গে যোগ দিয়া নিজের "কিঞ্চিৎ হাস্যকর" অবস্থাটা ঢাকা দিতেছেন।

তবে, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া দু'একটা কথা যে বলা না যায়, এমন নয়। তিনি বলিতে পারেন, আসল বিপ্লবীদের সন্ধান পুলিশ না জানায় বেকুব বনিয়াছে; কিম্বা ইহাও বলিতে পারেন, যে, তাঁহার উল্লিখিত বিপ্লবীরা কেবল মানসিক বিপ্লবী, তাহারা অস্ত্রশস্ত্রের ধার ধারে না। পুলিশের কাছে কোন গৃহস্থ চৌর্য্যের সংবাদ দিলে, গৃহস্থ যদি চোরের ঠিক্ নাম ও ঠিকানা এবং ফোটোগ্রাফ আদি দিতে পারে, তাহা হইলে পুলিশ তস্করকে ধরিয়া শাস্তি দিতে পারে; এরূপ দক্ষতা পুলিশের আছে। তেম্নি পুলিশ এ-ক্ষেত্রেও দেশবন্ধুকে বলিতে পারে, "মশায়, বড় যে হাস্‌ছেন? শুধু বিপ্লবী আছে বলিয়া দিয়াই আপনার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত ছিল না; তাহাদের নাম, ঠিকানা, ফোটোগ্রাফ, সাধারণ আড্ডা, প্রভৃতিও আমাদিগকে দেওয়া উচিত ছিল।"

—

চিত্তরঞ্জনের দায়িত্ব

দেশে বিপ্লবীদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে ও বিপজ্জনক আয়োজন বর্ণনা করিতে গিয়া গবর্ণ্মেণ্ট্ও প্রমাণ-স্বরূপ চিত্তরঞ্জন-বাবুর উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন-বাবু এবিষয়ে কিছু না বলিলে গবর্ণ্মেণ্ট্ মোটেই অর্ডিন্যান্স্ জারী করিতেন না, বা এতগুলি মানুষকে গ্রেফ্তার করিতেন না, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণ্মেণ্টের প্রমাণাবলীর জোর খুব বাড়িয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। গবর্ণ্মেণ্ট্ পক্ষ হইতে যাহা করা হইয়াছে, চিত্তরঞ্জনের উক্তি তাহার একমাত্র বা প্রধান কারণ না হইলেও, অন্যতম কারণ যে বটে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সিরাজগঞ্জের গোপীনাথ সাহা-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব এবং তৎপরে স্বরাজ্য দলের ফর্ওয়ার্ড-আদি কাগজে তাহার পুনঃপুনঃ সমর্থনও যে গবর্ণ্মেণ্টের কার্য্যের অন্যতম কারণ তাহাতেও সন্দেহ নাই। অতএব এতগুলি মানুষ ধৃত হওয়ায় ধৃতব্যক্তিদের ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের যে দুঃখকষ্ট হইতেছে, দেশবন্ধু দাশ ও তাঁহার দলের লোকদের অবিবেচনা ও অমিতভাষিতা তাহার জন্য, যতই কমপরিমাণে হউক, আংশিকভাবে দায়ী।

—

গান্ধীজির পরামর্শ

বঙ্গের বিপ্লবী যুবকদিগকে গান্ধী-মহাশয় হিংসা হইতে বিরত হইয়া অহিংসার পথে স্বরাজ্যলাভের চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। ইহা যে ধর্ম্মানুগত সদুপদেশ এবং সকাল পাত্রেরও উপযোগী, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গান্ধীজি বিপ্লবীদের কার্য্য ও পন্থা গর্হিত মনে করিলেও তাহাদের স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন, "তোমাদের যদি প্রাণদণ্ড হয়, তাহা সত্ত্বেও তোমাদের দোষ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার কর; তাহা হইলে তোমাদের সততা ও সাহস প্রমাণিত হইবে, এবং সন্দেহের জন্য আর নিরপরাধ লোকদিগকে ধৃত হইয়া কষ্ট পাইতে হইবে না।" যাহারা সত্যসত্যই দোষ করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া দোষ স্বীকার করে, এবং তজ্জন্য প্রাণান্ত পর্য্যন্ত দুঃখকে বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের কার্য্যের প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয়। কিন্তু গান্ধীজি যে সুফলের প্রত্যাশায় এই পরামর্শ দিয়াছেন, সে-বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একমত নহি বলিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

যাহারা বিপ্লব ঘটাইবার ইচ্ছায় খুন করিয়াছে বা ডাকাইতি করিয়াছে, কিম্বা তাহাতে সাহায্য করিয়াছে, অথচ এপর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই, তাহারা যদি **প্রত্যেকেই** নিজ নিজ দোষ স্বীকার করে ও ধরা দেয়, তাহা হইলেও পুলিশের ও গবর্ণ্মেণ্টের কখনই বিশ্বাস হইবে না, যে, যত বিপ্লবী সকলকেই হাতের মুঠায় পাওয়া গিয়াছে; বরং তাহাদের এই ধারণাই হইবে, যে, যখন এত লোক দোষ স্বীকার করিয়াছে, তখন আরও অনেক লোক আছে, যাহাদের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই, সুতরাং সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া ধরপাকড় চলিতে থাকিবে, এবং তাহাতে অনেক নিরপরাধ লোকের অকারণ নিগ্রহ হইবে। এইজন্য আমরা মনে করি, যে, গান্ধী-মহাশয়ের পরামর্শের অনুসরণ সকল বিপ্লবী করিলেও তাঁহার অভিপ্রেত নিরপরাধ লোকদের অব্যাহতি ঘটিবে না।

মহাত্মা গান্ধী যেমন চান, আমরাও তেম্নি চাই, যে, বিপ্লবীরা হিংসার পথ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া অহিংসার পথ অবলম্বন করুন। তিনি যদিও বলেন নাই, তথাপি আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, তিনি ইহাও চান, যে, অনুতপ্ত বিপ্লবীদের পার্থিব জীবন ভবিষ্যতে পূরামাত্রায় সফল হয়। কিন্তু বিপ্লবী একবার পুলিশের হাতে পড়িলে এজীবনে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। পূর্ণমাত্রায় রাজভক্ত সাজিলে কিম্বা কতকটা গোয়েন্দার মত হইতে পারিলে কিছু সুবিধা হইতে পারে বটে; নতুবা আমরা যাহা বলিতেছি, মোটামুটি তাহা খাটি-সত্য। যে একবার বিপ্লবী বা রাজনৈতিক অপরাধী বলিয়া দণ্ডিত কিম্বা পুলিশের নিকট পরিচিত হইয়াছে, তাহার প্রতি খর দৃষ্টি পুলিশের

সর্ব্বদাই থাকিবে। তাহাতে তাহার পক্ষে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে দেশের কাজ করা অতিশয় কঠিন হয়। কখন কখন সন্দেহভাজন ব্যক্তির জীবন এমন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, যে, আত্মহত্যাও ঘটে।

এইজন্য আমরা বলি, কোন বিপ্লবী যদি কোন দুষ্কর্ম করিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও, যদি তিনি অনুতপ্ত হন এবং আত্মসংস্কার করিয়া সুপথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। পুলিসের নিকট দোষ স্বীকার ও তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া পার্থিব জীবন ব্যর্থ ও দুঃখময় করা অনাবশ্যক ত বটেই, অধিকন্তু তাহা তাঁহার নিজের ও সমাজের ক্ষতির কারণ।

কেহ যদি খুনও করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহার প্রাণনাশ ঘটা অপেক্ষা তাহার অকপট অনুতাপ ও নবজীবন লাভ বাঞ্ছনীয়।

রোম্যান্ ক্যাথলিক্ পুরোহিতগণের নিকট যদি কোন নরহন্তা গিয়া দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন না;—যাহাতে তাহার প্রকৃত অনুতাপ হয় এবং হৃদয়ের ও জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, এরূপ উপদেশই তাঁহারা দিয়া থাকেন। কেহ কাহারও আইনভঙ্গ দোষ জানিতে পারিলেই তাহা গবর্ণ্‌মেণ্টের গোচর করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন; কিন্তু আমরা সকলেই সাধু জীবন যাপন করিতে এবং পরস্পরের দোষ সংশোধনে সহায়তা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

বিপ্লবী বা অন্য কেহ কোন আইনভঙ্গ করিয়া যদি আপনা হইতে দোষ স্বীকার করেন ও ধরা দেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি এরূপ কেহ অব্যাহতির আশায় বা অন্য কারণে নিজের সহকর্ম্মীদিগেরও দোষ বলিয়া দেয় ও তাহাদিগকে ধরাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশ্বাসঘাতক নীচ লোক বলিয়া স্বভাবতই সকলে ঘৃণা করে, এবং তাহা করাই উচিত। অতএব দোষ স্বীকারের সীমা নিজের দোষ পর্য্যন্ত; সহকর্ম্মীর দোষের কথা আত্মমর্য্যাদা-বিশিষ্ট লোকেরা বলে না। অবশ্য গান্ধীজি এরূপ ব্যবহার করিতে কাহাকেও বলেন নাই।

নিগ্রহ-নীতি প্রবর্ত্তনের কারণ

গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কেন এ-সময়ে নিগ্রহ-নীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহা গবর্ণ্‌মেণ্টই নিশ্চিত জানেন; আমরা কেবল অনুমান করিতে পারি। অবশ্য অনুমান বলিয়াই যে তাহাকে অসত্য হইতেই হইবে, এমন নয়।

বাংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এই বিশ্বাসে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ নূতন অর্ডিন্যান্স্ জারী ও পুরাতন রেগুলেশ্যন্ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা ত সবাই জানে। কিন্তু গবর্ণ্‌মেণ্টের বর্ণনা-পত্র হইতেই জানা যায়, যে, সরকারী-মতে দেশের এই অবস্থা নূতন নয়; বিশেষতঃ গোপীনাথ সাহা মিষ্টার ডেকে হত্যা করার পর এবং সিরাজগঞ্জে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব ধার্য্য হওয়ার পর বিপ্লববাদের প্রতি গবর্ণ্‌মেণ্টের এবং ইংরেজদের প্রখর দৃষ্টি পতিত হয়। তখন নিগ্রহ-নীতি বিশেষভাবে অবলম্বিত না হইয়া সম্প্রতি হইবার কারণ কি?

এবিষয়ে আমাদের অনুমান বলিতেছি। বিলাতের শ্রমিকদল যতদিন তথাকার রক্ষণশীল বা উদারনৈতিক গবর্ণ্‌মেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষভুক্ত ছিল, ততদিন তাহারা ভারতবর্ষে শক্ত-শাসন ও দলন-নীতির বিরোধী ছিল। শ্রমিকদের নেতা মিষ্টার রাম্‌জে ম্যাক্‌ডন্যাল্ড্ তাঁহার একখানি বহিতেও ভারতীয় নিগ্রহ-নীতির নিন্দা করিয়াছেন। শ্রমিকেরা যখন বিলাতে ক্ষমতা পাইল ও তাহাদের লোকেরাই গবর্ণ্‌মেণ্ট্ গঠন করিল, তখন তাহারা স্বভাবতঃই ভারতে শক্ত-শাসনের ভক্ত হয় নাই। এই কারণে ডের হত্যা ও সিরাজগঞ্জের প্রস্তাব-সম্পর্কে বিলাতী ও এদেশী ইংরেজদের আন্দোলন-সত্ত্বেও নিগ্রহ-নীতি অবলম্বিত হয় নাই। তাহার জন্য বিলাতে শ্রমিকদলের বিপক্ষ রাজনৈতিকগণ শ্রমিক গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে দুর্ব্বল বলিয়া আসিয়াছে, এবং বলিয়াছে, যে, তাহাদের দুর্ব্বলতার জন্য ভারতে ইংরেজ রাজত্ব অদৃঢ় হইয়াছে এবং ইংরেজের প্রতিপত্তি ও প্রভাব লোপ পাইতে বসিয়াছে; ভারতে ইংরেজের সম্পত্তি এবং ইংরেজ নর-নারীর মান, ইজ্জৎ ও প্রাণ বিপন্ন হইয়াছে।

তাহার পর কিছুকাল পূর্ব্বে নূতন করিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন স্থির হইল। ওয়ার্কার্স্ উইক্‌লি-নামক

কাগজে স্থলসৈন্ত ও নৌসৈন্তদিগকে নাকি সর্কারী হুকুম অমান্ত করিতে প্ররোচিত করা হয়। উহা কম্যুনিষ্ট্ দলের কাগজ। এইদল রুশিয়ার বল্‌শেভিক্‌দের মত রাজনৈতিক মতাবলম্বী। এই কাগজটির সম্পাদক মিঃ ক্যাম্বেল্‌কে প্রথমে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হয়। পরে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া লওয়া হয়। ইহার বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হওয়ায় শ্রমিক গবর্ণ্‌মেণ্টের পতন হয়। এই কারণে শ্রমিকদলের বিরোধীরা তাহাদের বিরুদ্ধে বলিবার এই একটা কথা পায়, যে, শ্রমিকরা রুশীয় বিপ্লবীদের সদৃশ-মতাবলম্বী বিলাতী কম্যুনিষ্টদের বন্ধু। শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই সময়ে রুশিয়া হইতে লিখিত একটা চিঠি প্রকাশিত হয়, যাহাতে বল-প্রয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান বিলাতী শাসন তন্ত্রের পরিবর্ত্তে রুশিয়ার মত শাসনতন্ত্র স্থাপন করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। এই চিঠি জাল হইতে পারে, না হইতেও পারে। যাহা হউক, শ্রমিক গবর্ণ্‌মেণ্ট রুশিয়ার সহিত একটা সন্ধির মত ব্যবস্থা আগেই করিয়াছিলেন বলিয়া এই চিঠিটার দোষও শ্রমিকদের বিরোধীরা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপায়। অধিকন্ত ভারতবর্ষে শ্রমিক গবর্ণ্‌মেণ্ট দৃঢ়তা দেখাইতে পারে নাই, এই অভিযোগ, নির্ব্বাচন-উপলক্ষ্যে, আবার খুব জোরের সহিত বল্‌ডুইন্, কার্জন্ প্রভৃতি বলিতে থাকেন। সুতরাং নির্ব্বাচনের সময় শ্রমিক গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমুদয় অভিযোগের জবাব দিতে বাধ্য হইতে হয়। নতুবা তাহাদের যথেষ্ট-সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অন্ত অভিযোগগুলি-সম্বন্ধে তাহারা কি করিয়াছিল, এখানে বলা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষ-শাসন-সম্বন্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছিল, তৎ-সম্বন্ধেই কিছু বলা এখানে দর্‌কার। ভারতবর্ষে যে তাহারা খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য, নিগ্রহ-নীতিমূলক যে-সব নিয়ম-প্রবর্ত্তনে এবং ধর-পাকড়ে আগে শ্রমিক গবর্ণ্‌মেণ্ট্ মত দেয় নাই, এখন তাহাতে মত দিল। কিন্তু এখন এই "মরণকালে হরিনাম" করিয়া যে কোন ফল হইল না, তাহা সকলেই জানেন—শ্রমিকদল পরাজিত হইয়াছে, এবং রক্ষণশীলদলের জিত হইয়াছে।

ভারতগবর্ণ্‌মেণ্ট্ রৌলট্ আইন রদ্ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার পর আবার গবর্ণ্‌মেণ্টের প্রবল বিরোধিতা-সত্ত্বেও সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের দ্বিতীয় ভাগ রদ্ করিবার জন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল্ পাস্ হইয়াছে। এখনও অবশ্য গবর্ণমেণ্টের হাতে সন্দেহভাজন ও বিরক্তিভাজন লোকদিগকে জব্দ করিবার জন্ত যথেষ্ট ক্ষমতা ও অস্ত্র আছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়; আরো যে অধিক ক্ষমতা ছিল, তাহার লোপের দুঃখ গবর্ণ্‌মেণ্ট সহ্য করিবেন কেমন করিয়া?

লর্ড্ লিটনের আমলে ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক গবর্ণ্‌মেণ্ট্ পক্ষের পরাজয় অনেকবার হইয়াছে। তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। আলিপুরে ও শিয়ালদহতে দু'টা মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাওয়াতেও বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একাধিক-বার বিপ্লব-চেষ্টার ব্যাপকতা-সম্বন্ধে প্রকাশ্য উক্তি করায় গবর্ণ্‌মেণ্টের নিগ্রহ-নীতি অবলম্বনের সুযোগ মিলিয়াছে। তা ছাড়া, ইহা সকলেই জানে, যে, বড়লাট ও ছোটলাট যিনি যখনই হউক এবং তাঁহাদের মতি-প্রকৃতি যেরূপই হউক, ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌দের মতামতই বড়লাট-ছোটলাট-আদিকে চালিত করে; এবং এই ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌রা বরাবর জবরদস্ত হাকিম ও শাক্ত-শাসনের ভক্ত।

এবম্বিধ নানা ঘটনা ও অবস্থার সমাবেশে নিগ্রহ-নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা।

—

নূতন নিগ্রহ-আইনের অনাবশ্যকতা

অর্ডিন্যান্স্ যখন জারী হয় নাই, তখনও ত এই সেদিন পর্য্যন্ত সন্দেহভাজন বিস্তর লোককে গ্রেফ্‌তার করিয়া জেলে বন্ধ করা এবং তাহাদের বাড়ী খানা-তল্লাস করা হইয়াছে। বিপ্লবীরা জুরর ও আসেসর্‌দিগকে ভয় দেখায়, সাক্ষীদিগকে ভয় দেখায়, এই কারণে অপরাধীদের শাস্তি হয় না, প্রভৃতি ওজুহাতে নূতন নিগ্রহ আইন জারী করা ঠিক্ হয় নাই। কারণ জুরর প্রভৃতিকে ভয়-দেখানর কথা অনেক বিখ্যাত আইনজীবী

অস্বীকার করিতেছেন। তা ছাড়া, ইহা ত দেখা যাইতেছে, গোপীনাথ সাহা, বরেন ঘোষ এবং আরও অনেক রাজনৈতিক আসামীকে জুররা অপরাধী বলিয়াছিলেন। আলিপুরের মোকদ্দমায় জজ এস্ কে ঘোষ মহাশয় জুরীর সঙ্গে একমত হওয়ায় উহা ফাঁসিয়া যায়। অধিকন্তু জজ এই মোকদ্দমার রায়ে বলেন যে, আসামীদিগকে পুলিস্ দীর্ঘকাল নিজের হেফাজতে রাখে, ও সাতবার তাহাদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে, এবং প্রত্যেক বারেই স্বীকারোক্তিতে "উৎকর্ষ" লক্ষিত হয়! গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ইহাতে পুলিসের কারসাজি না দেখিয়া আসামীরা খালাস পাইবামাত্র তাহাদিগকে আবার গ্রেফ্‌তার করিয়া জেলে নিক্ষেপ করান। ইহাতে জুররদের ভীত হইবার প্রমাণ কোথায়? শিয়ালদহের দলবদ্ধ ডাকাতি মোকদ্দমাতে একজন "রাজার সাক্ষী" বলে যে, সে, রাত্রে মোটর চালাইয়াছিল; কিন্তু সে দিনের বেলাতেও ঠিক্ তাহার বর্ণনামত মোটর চালাইতে পারিল না। এইজন্য তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইল। এখানেই বা ভয় প্রদর্শনের প্রমাণ কোথায়?

তবে ইহা সত্য, যে, কখন-কখন আসামীদের মধ্যে কেহ "রাজার সাক্ষী" হইয়া দাঁড়াইয়া খালাস পাইবার পরেও তাহার পূর্ব্বতন সঙ্গীদের ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হয়। কিন্তু ইহা অপরাধের ইতিহাসে নূতন কথা নয়, এবং রাজনৈতিক বা বিপ্লব-সংক্রান্ত অপরাধেই যে ইহা ঘটে তাহাও নহে। সাধারণ দলবদ্ধ ডাকাতির মোকদ্দমাতেও কোন ডাকাত "রাজার সাক্ষী" হইয়া খালাস পাইলে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন আগেও হইত, এখনও হয়। কিন্তু সে কারণে কোন বিশেষ আইনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

আইনজ্ঞ ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট লোকেরা বলিতেছেন, যে, বিপ্লব-চেষ্টা বাংলাদেশে যতটুকু আছে, সাধারণ আইন দ্বারাই তাহার দমন হইতে পারে। আমাদের মত তাহাই।

—

১৮১৮ সালের তিন নং রেগুলেশ্যন্

১৮১৮ সালের তিন নং রেগুলেশ্যন্ যখন প্রণীত হয়, তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরেজ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, স্বাধীন রাজ্য অনেক ছিল, যুদ্ধ-বিদ্রোহের সম্ভাবনা খুব ছিল, ব্রিটিশ এলাকার সীমাগুলি সুরক্ষিত ছিল না। সেই সময়কার অবস্থার সঙ্গে আধুনিক অবস্থার সাম্য বা সাদৃশ্য নাই। এই কারণে দমন-আইন-কমিটি (রিপ্রেসিভ. লস্ কমিটি) অনুরোধ করেন, যে ঐ রেগুলেশ্যন কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রযুক্ত হইবে, এবং সেই মর্ম্মের একটা ক্ষুদ্র আইনও করা হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-প্রিয়তা এত বেশী যে, এপর্য্যন্ত রেগুলেশ্যন্‌টাকে সীমাবদ্ধ করিবার জন্য আইন ত হয়ই নাই, অধিকন্তু সম্প্রতি যে অনেক কুড়ি লোককে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে, তাহার কেহ কেহ ঐ রেগুলেশ্যন্ অনুসারে ধৃত হইয়াছে। বাংলা-দেশটা বোধ হয় আফ্‌গানিস্তানের সীমায় অবস্থিত!

—

দলন-নীতির কুফল

বিপ্লব-চেষ্টা যখনই যে-দেশে হইয়াছে, তখন, বিপ্লবাবস্থার কারণ দূর না করিয়া, কেবল দলননীতির অবলম্বনে কখনও তাহার মূলোচ্ছেদ হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় জবরদস্ত শাসকরা সম্ভবতঃ মনে করেন, মানব-প্রকৃতিটা ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে সাধারণ মানব-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এবং রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা সাহসী, সবল, শক্ত মানুষ বলিয়া দলননীতি সেই সেই দেশে সফল না হইলেও ভীরু, দুর্ব্বল ও নরম বাঙ্গালীর দেশে তাহা সফল হইবে। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, আগে আগে, যে, বিপ্লববাদ নির্মূল হয় নাই, তাহার কারণ দলনটা যথেষ্ট পরিমাণে করা হয় নাই। ইহা ভুল। চিকিৎসকেরা বলেন, রোগ-বিষপূর্ণ বায়ুতে বাস করিতে করিতে অনেক মানুষ পীড়িত হইয়া মারা যাইলেও অন্য অনেকের শরীর একপ্রকার অব্যাহতি অর্জ্জন করে যাহাতে তাহারা আর আক্রান্ত হয় না। তেমনি ভয়-আতঙ্কের হাওয়াতেও হয়। ভয়ের মধ্যে থাকিতে থাকিতে

ভয়ের ভীতিপ্রদতা লোপ পায়। সহুরে লোকেরা বাঘ-ভালুককে যত ভয় করে, বন্য লোকেরা তত করে না। বন্য লোকেরা অনেকে হিংস্র জন্তুর হাতে মারা পড়ে, তবুও তাদের ভয় কম। সহুরেরা হিংস্র জন্তুর দ্বারা হত হয় না, তবুও তাদের আতঙ্ক বেশী। যথাক্রমে অভ্যাস ও অনভ্যাস ইহার কারণ। প্রবল ও ভয়ঙ্কর মানুষের দ্বারা নিগ্রহ-সম্বন্ধেও, মানব-প্রকৃতির মধ্যে, সুতরাং বাঙালীর প্রকৃতির মধ্যেও, একটা অভ্যাসলব্ধ নিশ্চিন্ততা, একটা স্থিতিস্থাপকতা ও অদম্যতা আছে। কোন-প্রকার কঠোর শাসনে, জুলুমে, অত্যাচারে মানুষ প্রথমটা ভয় পাইলেও অচিরে সে ভয় অতিক্রম করিয়া উঠে। এমন যে নিরীহ বাঙালী রায়ৎ, তাহারাও শেষ পর্য্যন্ত ভীষণ অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরকে পরাস্ত করিয়াছিল। অতএব ভীতি-উৎপাদন দ্বারা কার্য্য উদ্ধার ইংরেজ বাংলাদেশেও করিতে পারিবেন না। যখন এই বাংলা দেশের স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ কয়েকজন কর্ম্মীকে নির্ব্বাসিত করা হয়, তখনকার আতঙ্কের কথা আমাদের মনে আছে। তখন প্রতিবাদ-সভায় সভাপতি হইবার জন্ম কোন রাজনৈতিক আন্দোলককে না পাইয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে সভাপতি করিতে হইয়াছিল। তখন পূরা তিন গণ্ডা লোককেও নির্ব্বাসিত করা হয় নাই। কিন্তু আজ তিন কুড়ির উপর লোক ধৃত হওয়াতেও কাহারও ভয় হয় নাই, এবং কলিকাতা সহরে প্রতিবাদ-সভার পর প্রতিবাদ-সভা হইয়াছে, টাউন হলে সভা করিয়া তাহাতে স্থানাভাববশতঃ বাহিরে ময়দানে অনেকগুলি সভা করিতে হইয়াছে, যাহার অধিকাংশের সভাপতি হইয়াছিলেন মুসলমান নেতৃবর্গ। মফঃস্বলেও বিস্তর প্রতিবাদ-সভা হইয়াছে।

অতএব কেবল সন্দেহের উপর মানুষকে ধরিয়া দণ্ড দিলে তাহাতে কোন সুফল হয় না।

রাজদণ্ডের উদ্দেশ্য এই, যে, যাহার অপরাধ প্রকাশ্য বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার শাস্তি হইলে লোকের সহানুভূতি তাহার প্রতি ত যাইবেই না, অধিকন্তু শাস্তিকে লোকে একটা ভয়ের জিনিষ ও অপমানের বিষয় মনে করিবে। কিন্তু কেবল সন্দেহে মানুষকে ধরিয়া গোপনে তথা-কথিত বিচার করিয়া তাহাকে শাস্তি দিলে তাহার প্রতি মানুষের সহানুভূতি হয় এবং সে বীরের অর্ঘ্য লাভ করে। দণ্ডিত হওয়াটা গৌরবের বিষয় হইয়া উঠে। এইপ্রকারে রাজদণ্ডের ভীতিপ্রদতা ও অপমানকরত্ব লুপ্ত হইয়া তাহা বাঞ্ছনীয় গৌরবের জিনিষ হইয়া উঠা রাষ্ট্রের পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। নির্দ্দোষ লোকদিগকেও যদি জেলে পাঠান হয়, তাহা হইলে বদ্‌ম্যায়েস্ কয়েদীদের আত্মগ্লানির হ্রাস ও লোপের সম্ভাবনা ঘটে।

নিগ্রহ-নীতির আর-একটা কুফল এই যে, বলের দ্বারা ও ভীতি-উৎপাদন দ্বারা মানুষকে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিলে, ক্রিয়ার সদৃশ প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুসারে নিগৃহীত লোকেরা এবং তাহাদের সহচর ও আত্মীয়-স্বজনেরাও বল প্রয়োগ ও ভীতি-উৎপাদনে প্রণোদিত হইতে পারে। ইহা কেবল যে রাজনৈতিক কারণে নিগৃহীত লোকদের বেলায়ই ঘটে, তাহা নয়। সকল দেশের সাবেক-ধরণের কারাগারের কার্য্যকারিতার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে, অধিকাংশ স্থলে যে সব অপরাধীকে জেলে পাঠান হয়, তাহারা জেলে যাইবার সময় যেমন ছিল, খালাস হইবার সময় তাহা অপেক্ষা মন্দ লোক হইয়া ফিরে; দণ্ডে তাহাদের সংশোধন হয় না। এইজন্য শাস্তির ব্যবস্থা ও জেলের ব্যবস্থা সভ্যদেশ-সকলে এরূপ করিবার চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দণ্ডিত লোকদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ও চরিত্রের উন্নতি হয়।

—

বিপ্লব-বাদের উচ্ছেদের উপায়

বিপ্লবীদিগকে দণ্ডিত করিও না, একথা আমরা বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি, যাহারা কোনপ্রকারে আইনভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদের শাস্তি অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে সাধারণ বিচার-প্রণালী-অনুসারে তাহাদের অপরাধ প্রমাণিত হইয়া তাহাদের দণ্ড হউক। অনেক অভিজ্ঞ আইনজীবীর মতে এই-প্রকারে বিপ্লবীদের অপরাধ প্রমাণ করিয়া শাস্তি দেওয়া অসাধ্য নহে। আমরাও তাহাই মনে করি। দণ্ডিত হইবার পর অপরাধীদের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা হওয়া

আবশ্যক যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে সুভাবের উদ্রেক হয়।

বিপ্লববাদের উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে উহার মূলে ঘা দিতে হইবে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধটাই অস্বাভাবিক। উহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইংলণ্ডের সাংসারিক সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্ম ভারতবর্ষের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষকে তাহার নিজের ইচ্ছা-অনুসারে নিজের ও জগতের কল্যাণ-সাধন করিতে দিতে হইবে। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া কেবল এই মর্ম্মের কথাই বলা হইতেছে, যে, ভারতীয়েরা নিজের কাজ চালাইতে অসমর্থ, তাহারা রাষ্ট্রীয় শিশু, নাবালক, ইংরেজরা তাহাদের অছি। এসব বাজে কথা। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় কার্য্যে আমাদের চেয়েও অদক্ষ জাতি আছে; অথচ তাহারা স্বাধীন। ইংরেজ নিজের স্বার্থের জন্ম এদেশে আসিয়াছিলেন, ছলেবলে-কৌশলে প্রভু হইয়া স্বার্থের জন্মই এদেশে আছেন, এবং প্রভুত্বের হ্রাস বা লোপের আশঙ্কা হইবামাত্র অনেক ইংরেজ বে-আইনী বেইমানী অমানুষিক কাজ করে। এসব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহারা আমাদের অছি নহে।

ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের পরস্পরসম্পর্কের ভিত্তি যদি বাহুবল, অস্ত্রবল, চাতুরীবল, দলবদ্ধতার বল হয়, তাহা হইলে, স্বাধীনতাকামী, অল্পদর্শী, উৎসাহের আতিশয্যে বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকদের পক্ষে বাহুবল, অস্ত্রবল, দলবদ্ধতার বল ও চাতুরীবলের দ্বারাই এইসম্বন্ধের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা বুদ্ধির অগম্য নহে। এইরূপ লোকেরা বুঝিতে পারে না, যে, বল, অস্ত্র, দলবদ্ধতা ও চাতুরীর বিরুদ্ধে বল, দলবদ্ধতা ও চাতুরীর প্রয়োগ করিতে হইলে তৎসমুদয় যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইতে পারে না। উৎসাহের আতিশয্য এবং অভিজ্ঞতার অভাবে ইহা ভুলিয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সশস্ত্র বিপ্লব অসাধ্য বলিয়াই উহার চেষ্টা পরিহার্য্য, সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইহা আমাদের একমাত্র বা প্রবলতম যুক্তি নহে। অন্ম যুক্তিও আছে। তাহা অনেকবার বলিয়াছি. পরে আবার বলিতে পারি। যাহা বলিলাম তাহা সহজবোধ্য বলিয়া বলিলাম। কিন্তু ইহার দুর্ব্বলতাও আমরা অবগত আছি। অমুক কাজটা অসাধ্য—ইহা বলিয়া কখনও মানুষকে, বিশেষতঃ তরুণ মানুষকে, নিরস্ত করা যায় নাই। তরুণ বলে, আকাশে উড়া একসময় অসাধ্য ছিল, এখন সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে; গৌরীশঙ্করের চূড়ায় আরোহণও অসাধ্যের পর্য্যায় হইতে সাধ্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। এইজন্ম অসাধ্যতার যুক্তি এই ক্ষেত্রে বাস্তবিক খুব প্রবল হইলেও অন্ম যুক্তির প্রয়োজন আছে।

তরুণদের অপমান-বোধ জাগাইয়া এবং গৌরব-বোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তাহাদিগকে অনেক কাজ হইতে নিবৃত্ত ও অন্ম অনেক কাজে প্রবৃত্ত করা যায়। এই-জন্ম কেহ কেহ এই যুক্তি প্রয়োগ করেন, যে, বিপ্লবীদের কোন কোন কাজ ভীরুর কাজ, কাপুরুষের কাজ। যেমন মানুষের উপর অতর্কিতে বোমা ছোড়া ও রিভল্‌ভার্ হইতে গুলি-ছোড়া। যাহারা প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিয়া এইসব অপকর্ম্ম করে, তাহারা সাহসহীন, একথা খাঁটি সত্য কথা না হইলেও, ঐ কাজগুলা যে কাপুরুষতা তাহা আমরাও মনে করি। কিন্তু আমরা ইহাও মনে করি, যে, এরোপ্লেন্ হইতে অযোদ্ধা নারী শিশু ও বুড়া মানুষ নির্ব্বিশেষে গ্রামবাসী সকলের উপর বোমাবর্ষণ জঘন্যতর কাপুরুষতা; ইরাকে রাজা ফৈসলের খাজনা আদায় করিয়া দিবার জন্য এবং আফ্রিকার এক অসভ্য জাতির নিকট হইতে কাজ আদায় করিবার জন্য ইংরেজ যে এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল তাহা জঘন্যতম কাপুরুষতা ও অমানবিকতা। আমরা এই-সমস্ত কাজকেই গর্হিত মনে করি; সুতরাং আমরা বিপ্লবীদের দ্বারা বোমা নিক্ষেপের নিন্দা খুব সঙ্গত-ভাবেই করিতে পারি এবং আশাও করিতে পারি, যে, আমাদের কথায় অন্ততঃ কেহ কেহ আস্থাবান্ হইবেন। কিন্তু যাহারা উল্লিখিত-প্রকারে ও-কারণে এরোপ্লেন্ হইতে বোমা বর্ষণ করে, বা তাহার সমর্থন করে, কিম্বা তাহার সমুচিত নিন্দা করে না, তাহারা বিপ্লবীদিগের কার্য্যকে কাপুরুষতা-প্রসূত বলিলে সঙ্গতিরক্ষা না হওয়ায় তাহাদের কথাগুলা হাওয়ায় মিলাইয়া যায়।

বস্তুতঃ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের বিচার না করিয়া সাংসারিক সুবিধা ও প্রতিপত্তি-প্রভুত্বের জন্য বলপ্রয়োগ ও অস্ত্র-চালনার রীতি যতদিন রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্রে বৈধ পরিগণিত থাকিবে, ততদিন বিপ্লবীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বল-প্রয়োগ ও অস্ত্র-প্রয়োগের নিন্দা সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইবে না। তাহা না হইলেও, আমরা ব্যক্তির পক্ষে যেমন নেশ্যন্ বা জাতির পক্ষেও তেম্নি পরস্ব-অপহরণ ও আনুষঙ্গিক অল্প বা অধিক নরহত্যাকে গর্হিত বলিয়া আসিতেছি, ভবিষ্যতেও বলিব। ফলাফল চিন্তা করিব না।

সাধারণ ডাকাতি ও রাজনৈতিক ডাকাতি উভয়ই অধর্ম্ম। কিন্তু নেশ্যন্ বা জাতি দ্বারা পরদেশ আক্রমণ বা অধিকার এবং ভিন্ন জাতির সম্পত্তি অপহ বিশালতর রাজনৈতিক ডাকাতি, ইহা বাক্যতঃ ও কার্য্যতঃ স্বীকৃত না হইলে, যাহারা ব্যক্তিগতভাবে সত্যিকার রাজনৈতিক ডাকাত তাহাদিগের কার্য্যের গর্হিততা তাহাদিগকে বিজয়ী রাজা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতিরা বুঝাইতে পারিবেন না। ব্যক্তি দ্বারাই হউক, বা নেশ্যন্ দ্বারাই হউক, ডাকাতি-মাত্রকেই আমরা অধর্ম্ম মনে করি ও বলি। অতএব আমাদের কথায় কোন অসঙ্গতি নাই।

বিপ্লব-বাদের মূল উচ্ছেদ করিতে হইলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে-পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, এবং জগতের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসকলে বৈধতা-অবৈধতার বিচার যে-নীতি অনুসারে হয় তাহার যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। এক্ষণে আরো কয়েকটি কথা বলিব।

বাংলা দেশে প্রতিবৎসর হাজার-হাজার ছেলে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু ইহাদের জন্য যথেষ্ট বিস্তীর্ণ কার্য্য-ক্ষেত্র ও যথেষ্টসংখ্যক কাজ নাই। বরং কলকারখানা, রেলওয়ে প্রভৃতির বৃদ্ধি ও বিস্তার হেতু মজুর, মিস্ত্রী ও কারিগরদের কার্য্যক্ষেত্র ও কাজ বাড়িতেছে, কিন্তু লেখাপড়া-জানা মাত্র যাহাদের সম্বল তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের নূতন পথ সামান্যই খুলিতেছে। কথায় বলে, "পেট বড় মুদ্দ্ই", পেটের দায়ে মানুষ নানা অপকর্ম্ম করে। এই কারণে অল্প বা বেশী-লেখাপড়া-জানা লোকদের শিক্ষার রকমওয়ারী চাই, এবং কার্য্যক্ষেত্রেরও বিস্তার চাই। নতুবা যদি শুধু পেটের দায়েই অনেকে ডাকাতি করে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহার সহিত বিপ্লব-বাদের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ এই, যে, বেকার অবস্থার জন্য রাষ্ট্র দায়ী, ইহা সভ্যজগতে সর্ব্বত্র স্বীকৃত। ইংলণ্ডেই ত লক্ষ-লক্ষ লোককে যুদ্ধের পর রাষ্ট্রকে খোরপোষ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইয়াছে; সরকারী ব্যয়ে কয়েক লক্ষ বাড়ী তৈয়ার করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া আছে। সুতরাং বেকার লোকেরা আমাদের দেশেও যে গবর্ণমেণ্টকে দায়ী মনে করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি অধিকন্তু ইংরেজ-রাজত্বে এমন অনেক চাকরী আছে, যাহার কাজ ভারতীয়েরা অনায়াসে করিতে পারে, অথচ সে-সব চাকরী পায় ইংরেজরা। কোম্পানীর আমলে অনেক পণ্যশিল্প ও ব্যবসা ছিল, যাহার হ্রাস বা লোপে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহার জন্য লোকে ইংরেজ সরকারকে দায়ী করে। আমাদের সরকারী শিক্ষা-প্রণালী এরূপ কেন যাহাতে মানুষ নানা উপায়ে রোজগার করিতে শিক্ষা পায় না? ইহার জবাব গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চায়। জাপানে যেমন আধুনিক ধাঁচের নানা পণ্যশিল্প, কল-কারখানা জাপানী গবর্ণমেণ্ট্ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এদেশে কেন তাহা হয় নাই, তাহার জন্যও লোকে গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করে।

অতএব বিপ্লব-বাদের মূল উচ্ছেদ করিতে হইলে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষরকম চেষ্টা করিতে হইবে, শিক্ষার রকমওয়ারী করিতে হইবে, ভারত-সম্পর্কে ইংরেজের বাণিজ্য-নীতি ও পণ্যশিল্প-নীতি বদ্লাইতে হইবে।

আমরা আগেই বলিয়াছি, বিপদ্কে তুচ্ছ করিবার সাহসের কাজ করিবার প্রবৃত্তি মানব-প্রকৃতিতে নিহিত আছে। ইংরেজরা ভুলিয়া যায়, যে, বাংলা দেশেও এই মানব-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু আমাদের ছেলেদের বিপদ্কে অগ্রাহ্য করিয়া সাহসের কাজ করিবার ক্ষেত্র ও

সুযোগ কোথায়? কেহ যদি বাইসিক্লে পথমাঠ, বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া ২।৪ শত মাইল গিয়া সামান্য একটু শক্তি, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সাহস দেখাইতে চায়, তাহার পিছনে পুলিস্ লাগে; মোটর গাড়ী করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে কেহ কেবল চিত্তবিনোদনের জন্যও যাইতে চাহিলে শান্তি-রক্ষকদের টনক নড়ে। দেশের এম্‌নি অবস্থা। বিদেশ পর্য্যটনের কথা ছাড়িয়াই দাও। তাহার জন্য ছাড়পত্র চাই passport)। তাহা সহজে এবং সকলের পাইবার জো নাই;—ভারত বৃহৎ কারাগার। সৈনিক হইবার পথ অধিকাংশের পক্ষে বন্ধ। জাহাজের ব্যবসা নাই বলিলেও হয়; সুতরাং সামুদ্রিক দুঃসাহস অসম্ভব। গ্রামে হিংস্র জন্তু আসিলে বন্দুকধারী ইংরেজকে ডাকিতে হয়। এরোপ্লেন্ কিনিয়া তাহাতে চড়িবার জো নাই। কুস্তির আড্ডা করিলে পুলিসের খাতায় তাহা লেখা হয়। আর কত বলিব? অবশ্য সরকার-পক্ষ বলিবেন, বিপ্লব-বাদের আবির্ভাব হওয়াতেই ত আমরা সবকিছুকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। সত্য কথা; কিন্তু বিপ্লব-বাদটা উৎপন্ন হইল কেন? একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, ভারতের লোকেরা অন্য অনেক দেশের লোকদের চেয়ে সহিষ্ণু, শান্তশিষ্ট এবং কম বিদ্রোহ-প্রবণ,—তাহাদের দীর্ঘ পরাধীনতার ইহা একটা কারণ। এহেন জাতির মধ্যে বিপ্লববাদের আবির্ভাব কেবল আমাদের মজ্জাগত দোষের জন্যই হইয়াছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বিপ্লব-বাদের মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে অনিশ্চয় ও বিপদকে তুচ্ছ করিবার, সাহসের কাজ করিবার, বৈধ নানা পথ খুলিয়া দিতে হইবে। নতুবা কেহ কেহ বিপদের লোভনেই যদি অবৈধ পথের যাত্রী হয়, তাহা হইলে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেই প্রতিকার হইবে না।

আমাদের শিক্ষকদের অধিকাংশই এত কম বেতন পান, যে, তাঁহাদের মন অসন্তুষ্ট ও তিক্ত-বিরক্ত থাকা একটুও অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য তাঁহারা কেহ বিপ্লব-বাদ প্রচার করেন না। কিন্তু অসন্তুষ্ট ও তিক্ত-বিরক্ত শিক্ষকদের শিক্ষার অধীন ও প্রভাবের বশবর্ত্তী ছাত্রদের মনে সাক্ষাৎ- ও পরোক্ষভাবে দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে সন্তোষের ও ক্রমোন্নতির আশার ভাব উৎপন্ন ও পুষ্ট না হইয়া অসন্তোষ, তিক্ততা ও নৈরাশ্য জন্মিলে তাহাকে অপ্রত্যাশিত ফল বলা যায় না।

রোগ এদেশে যথেষ্ট আছে, কিন্তু চিকিৎসার ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই। ইহাও যে, বেকার-সমস্যা ও দারিদ্র্যের ন্যায়, বিপ্লব-বাদের অন্যতম পরোক্ষ কারণ, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

দেশ-নায়কেরা ও গবর্ণমেণ্ট্ সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, এবং যে-ক্ষেত্রে যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করুন। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ত আছেই; দেশ-নায়কদেরও দায়িত্ব কম নহে, বরং বেশী। একটা দ্রুত ক্রমোন্নতির সম্ভাবনাতে বিশ্বাস, একটা অদম্য আশাশীলতা, এবং সর্ব্বোপরি সকল অমঙ্গলের সহিত **সাত্ত্বিক ধর্ম্মযুদ্ধে** বিশ্বাস আমাদের সকলকে সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করিতে ও তাহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-পথে চলিতে হইবে। নতুবা বিপ্লব-বাদ যাইবে না, রাষ্ট্র ও সমাজ নিরাময় হইবে না।

বিপ্লব-চেষ্টা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য

বিপ্লব কথাটি আমরা অস্ত্রপ্রয়োগে গুপ্ত হত্যা দ্বারা রাষ্ট্রীয় আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটন অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

ভারতে বিপ্লবচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা আগে কিছু বলিয়াছি। আরও দুএকটা কথা বলিতে চাই।

বলপ্রয়োগ দ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ দ্বারা আবার তাহা পণ্ড করা অসাধ্য নহে। যদি ইংরেজপক্ষের কতকগুলা ইংরেজ ও ভারতীয় লোককে খুন করিয়া কিছু ফল লব্ধ হইতে পারে, ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে, ইহা চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারিবে না। হিংসা করিলেই প্রতিহিংসার উদ্রেক হয়। আবার প্রতিহিংসার প্রতিহিংসা আছে। সুতরাং ব্যাপারটা কতদূর গড়াইবে ও কোথায় থামিবে বলা কঠিন। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, হত্যা করিবার ক্ষমতা ও উপায় আমাদের চেয়ে ইংরেজদের হাতে বেশী আছে। আমরা নিজে ইহাতে ভয় পাইয়া বিপ্লবীদিগকেও শঙ্কিত করিবার জন্য একথা বলিতেছি না। গুপ্ত-হত্যার পথে চূড়ান্ত কোন নিষ্পত্তি হইবার

সম্ভাবনা কিরূপ কম, তাহাই দেখাইবার জন্য ইহা বলিতেছি।

অবশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা দেশকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার উপযুক্ত যুদ্ধ শিক্ষা এবং আধুনিক-মত জল-স্থল-আকাশ-যুদ্ধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র যথেষ্টপরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা চাই। যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত একপ্রাণ লক্ষ-লক্ষ সৈনিকও চাই। আমাদের ধারণা এই, যে, এরূপ বিদ্রোহ-আয়োজন ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় হইতে পারে না।

বর্ত্তমান অবস্থায় যাহার সম্ভাব্যতা নাই, তাহার কথাই বলিতেছি। কোন অবস্থাতেই বিদ্রোহ দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া অসম্ভব, ইহা আমরা বলিতেছি না। যে-অবস্থায় ইহা সম্ভব, তাহা বিদ্যমান নাই, অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিদ্যমানতার সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। হিংসার পথে সিদ্ধিলাভ-চেষ্টার ফলাফলটাও বুঝা উচিত। ইহা জর্জ বানার্ড, শ' পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন:—

"India has been subjugated by violence and held down by violence. India can be freed by violence, just as Ireland has been freed by violence. It is idle in the face of history to deny these facts. It might as well be said that tigers have never been able to live by violence, and that non-resistance will convert tigers to a diet of rice. But the logical end of it will be that England will never be safe whilst there is an Indian left alive on earth, nor India ever safe whilst an Englishman breathes. The moment violence begins, men demand security at all costs: and, as security can never be obtained, and the endless path of it lies through blood, violence means finally the extermination of the human race. That is why the conscience of mankind feels it to be wicked and finally destructive of everything it professes to conserve."

তাৎপর্য্য। "ভারতবর্ষকে হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা অধীন করা হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা উহাকে বশে রাখা হইয়াছে। ঐ উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করা সম্ভব যেমন আয়র্ল্যাণ্ডকে করা হইয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ইহা অস্বীকার করা বৃথা। উহা অস্বীকার করিলে ইহাও বলা চলে, যে, বাঘেরা কখন হিংসা ও পাশব বল দ্বারা জীবন ধারণ করে নাই, এবং অহিংসাবাদ তাহাদিগকে তণ্ডুল-জীবী প্রাণীতে পরিণত করিবে। কিন্তু বল-প্রয়োগ ও হিংসার পথের ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত শেষ ফল এই হইবে, যে, যতদিন একজন ভারতীয়ও পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন ইংলণ্ড নিরাপদ্ হইবে না, এবং যতদিন একজন ইংরেজও বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষ নিরাপদ্ হইবে না। যে মুহূর্ত্তে বল-প্রয়োগ ও হিংসা আরম্ভ হয়, তখনই যে-কোন উপায়ে হউক মানুষ নিঃশঙ্ক হইতে চায়; কিন্তু, যেহেতু নিঃশঙ্কতা কখনই লব্ধ হইবার নহে এবং বল-প্রয়োগের অনন্ত পথ রক্তাকীর্ণ, সেইজন্য বল-প্রয়োগ ও হিংসার চরম ফল হইতেছে মানব জাতির সম্পূর্ণ বিনাশ। এই কারণেই মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধি এই পথকে পাপপূর্ণ এবং মানবের সংরক্ষণীয় বলিয়া ঘোষিত সকল শ্রেয়ের বিনাশক মনে করে।"

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই। এই স্বাধীনতা না-থাকায় অন্য অনিষ্ট ত হয়ই, এমন-কি আত্মারও অকল্যাণ হয়, প্রকৃত ধর্ম্মসাধনার পথেও অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু এমন উপায়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা চাই না, যাহা অবলম্বনে ধর্ম্মহানি, আত্মার অকল্যাণ হয়। যুদ্ধ জিনিষটাকে সর্ব্ববিধ পাপের সমষ্টি বলা হইয়াছে। ইহা অতি সত্য কথা। মিথ্যা-ভাষণ, প্রতারণা, পরস্ব-অপহরণ, গুপ্ত ও প্রকাশ্য নরহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার এবং আর যাহা কিছু পাপ ও অপরাধ আছে, সমস্তই যুদ্ধের অন্তর্গত। ধর্ম্মযুদ্ধের উল্লেখ, শাস্ত্রে-কাব্যে আছে; সেকালে বস্তুতঃ ছিল কি না জানি না। কিন্তু একালে এরূপ কোন যুদ্ধ হয় না, হইতে পারে না, ধর্ম্ম-নিয়ম ও নৈতিক বিধি লঙ্ঘন না করিয়া যাহাতে জয়ী হওয়া যায়। এইজন্য আমরা যুদ্ধের বিরোধী।

আমরা মনে করি যুদ্ধ না করিয়াও স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে। অকল্যাণের পথে না গেলে কল্যাণ হইবে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। ইহা ভীরুর পরামর্শ নহে। যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইতে গেলে যত অধ্যবসায়, সাহস ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইতে গেলে তাহা অপেক্ষা কম অধ্যবসায়, সাহস ও স্বার্থত্যাগে চলিবে না—বরং বেশী চাই। অন্যের প্রাণ আমরা লইব না, কিন্তু নিজের প্রাণ দিতে হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের জন্য ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় বলপ্রয়োগ ও হিংসার পথ কেন অবলম্বনীয় নহে, তাহার আর-একটি কারণের আভাস দিতে চাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলে সকল-শ্রেণীর লোকের

মধ্যে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোক দৃষ্ট হয় না। যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোক প্রধানতঃ কতকগুলি শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই আছে। এইজন্য যুদ্ধ-প্রবণতা, কঠোরতা ও হিংস্রতা তাহাদের মধ্যে বেশী-পরিমাণে দেখা যায়। সকল শ্রেণীর সকল ভারতীয়ের মধ্যে এইসব গুণ উৎপাদন যদি বা বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর নহে। বল-প্রয়োগ ও হিংসার দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে প্রধানতঃ তাহাদের দ্বারাই এই কাজ হইবে যাহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে এইসব গুণ আছে। তাহারা এত কঠিন একটা কাজ করিয়া দেশে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া দিয়া নিজের-নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবে, ইহা মনে করা বাতুলতা। তাহারা গণতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ এবং রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বসকলের ধার ধারে না। যাহারা নিজের শক্তিতে ইংরেজকে তাড়াইবে, "জোর যার মুলুক তার" নীতিরই অনুকরণ তাহারা করিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষ ইংরেজের পদানত না থাকিয়া কতকগুলি যুদ্ধ-নিপুণ ভারতীয় লোকদের অধীন হইবে। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে ইহারাই কি শ্রেষ্ঠ মানুষ, ইহারাই কি সর্ব্বজন-হিতকর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য যোগ্যতম লোক? তাহা নহে। ভারতীয় স্বাধীনতা সকলের জন্য হওয়া চাই; শ্রেণী-বিশেষের প্রভুত্ব ভারতীয় স্বাধীনতা নহে। যে-কোনরকমের ভারতীয় লোকদের দ্বারা যে-কোনরকমের শাসন-প্রণালী অনুসারে রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়াটা ভারতীয় স্বাধীনতার উচ্চতম আদর্শ ত নহেই, উচ্চ আদর্শও নহে।

আমাদের কথাটা অনেকের ভাল না লাগিতে পারে। ভাবুকতার আতিশয্যে তাঁহারা কল্পনা-নেত্রে সর্ব্বত্র ভ্রাতৃভাব দেখিতে পাইতে পারেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা ত নয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখুন, কোন-না কোন শ্রেণী যে-কোনপ্রকারেই হউক নিজেরা সুখ-সুবিধা, টাকা-কড়ি, ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় অধিকার যে যতটা পারে দখল করিবার চেষ্টায় আছে; তাহারা যথাসাধ্য দখল করিয়া লইবার পর বাকী যাহা থাকিবে, তাহাতে অপর সকলে ন্যায্য অংশ পাইবে কি না, সে-চিন্তা এই-সব শ্রেণীর লোকেরা করে না। অবশ্য এইরূপ মতিগতি অন্য দেশেও আছে। কিন্তু আমরা এখন কেবল নিজের ঘরের সমস্যার কথাই বলিব। যে-সব শ্রেণীর লোকে সুখ-সুবিধা ও ক্ষমতা-আদি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে, তাহারা দেশের জন্য বড়-একটা কিছু কাজ বর্ত্তমানে করে নাই। অথচ তাহাদের দাবী-দাওয়া চেষ্টা উক্তরূপ। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, যদি কোন-কোন শ্রেণীর লোক যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ তাড়াইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সেই কৃতিত্বের বিনিময়ে কতখানি ক্ষমতা, অধিকার, সুবিধা ও প্রভুত্ব চাহিবে।

সৈনিক শ্রেণীর শাসন যে কেমন চমৎকার জিনিষ, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। আধুনিক সময়ে জার্ম্মেনীতে প্রুশিয়ার যুদ্ধপ্রিয় জাঙ্কার্ (Junker) দল জার্ম্মেনীকে কেমন সুদশায় উপনীত করিয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় হিংসার পথে চলিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে হইলে কিরূপ ফল ফলিতে পারে, তাহার কিছু আভাস দিলাম। অহিংসার পথে চলিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে তাহা সকল শ্রেণীর লোকের সংযম, সহিষ্ণুতা, সাত্ত্বিক সাহস ও স্বার্থ-ত্যাগ ব্যতিরেকে সম্ভব হইবে না; এবং এইসকল গুণ যাহাদের মধ্যে আছে বা বিকশিত হইবে, তাহারা যে মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়-ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য কারণ ছাড়া, এইজন্যও আমরা অহিংসার পথ শ্রেয়ঃ মনে করি।

মানুষ-খুন না করিলেই যে অহিংসা হয়, তাহা নহে। রাষ্ট্রীয় বা অন্য বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ, তাহাদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথার প্রচার, ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট করিয়া তাহার অনিষ্ট ও পরাজয় সাধন, এসমস্তই হিংসা। যাহারা এইরকম আচরণ করে, তাহারা "স্বরাজ্য-দল" ভুক্ত হউক, বা অন্য দলেরই হউক, তাহারা হিংসা-পন্থী। তাহারা ভারতীয় স্বরাজ চায় না, নিজেদের প্রভুত্ব চায়। ভারতীয় যে-কোন একটা দলের প্রভুত্ব স্বরাজ নহে।

বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের অনিষ্টকারিতা

নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের তর্জ্জমা বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক নানা কাগজে বাহির হইয়াছে। মাসিক কাগজে তাহার সমুদয় দোষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। দু'-একটা কথা কেবল বলিব। দ্বাদশ ধারা-অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিলে যে-কোন ব্যক্তিকে তাহার বাড়ীর ঠিকানা ও ঠিকানার পরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীকে জানাইতে বাধ্য করিতে পারেন, পুলিশের কাছে যখন যে-স্থানে ও-প্রকারে ইচ্ছা হাজরী দিতে বাধ্য করিতে পারেন, যে-কোন প্রকারের কাজ করাইতে বা না-করাইতে বাধ্য করিতে পারেন, ব্রিটিশ ভারতের যে-কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে থাকিতে বা প্রবেশ না-করিতে বাধ্য করিতে পারেন, এবং জেলে বন্ধ করিতে পারেন। এইসব হুকুম অমান্য করিলে তিনবৎসর পর্য্যন্ত জেল এবং তদতিরিক্ত জরিমানা হইতে পারিবে। তা ছাড়া সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ার‍্যাণ্টে গ্রেফতার করাইতে ও তাহার বাড়ী বা অন্য স্থান খানাতল্লাসী করাই'ত পারেন। এই যে এত-প্রকারে মানুষকে দুঃখ দিতে ও তাহার স্বাধীনতা হরণ করিতে গবর্ণমেণ্ট পারেন, তাহার "যুক্তিসঙ্গত কারণ" যোগাইবে অবশ্য পুলিশ ও পুলিশের গোয়েন্দারা। পুলিশের মধ্যে ভাল লোক নাই এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু সাধারণতঃ পুলিশ বিভাগের যে-সব লোক ও যে সব গোয়েন্দা খবর জোগায়, তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিশ্বাস-যোগ্যতায় দেশের লোকের ও আমাদের আস্থা নাই। তাহাদের কথার বা সংগৃহীত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মানুষকে এতটা লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করা ভাল নয়। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, যে যখনই উক্তরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ও পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছে, তখনই তাহার অপব্যবহার হইয়াছে এবং বিস্তর নিরপরাধ লোকের নিগ্রহ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের বিশেষ হুকুম ব্যতিরেকেও এরূপ কোন ধৃত লোককে পনের দিন আটক করিয়া রাখা চলিবে। বিশেষ হুকুম হইলে ত্রিশ দিনের অনধিক কাল আটক রাখা চলিবে।

ধৃত ও আবদ্ধ ব্যক্তির তথাকথিত বিচারও একটা হইবে। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত সেশুন্ জজ্ ও তজ্জাতীয় দু'জন লোকের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তি-সম্বন্ধে স্থূল স্থূল প্রমাণ, দলিলাদি (**সব প্রমাণাদি নয়**) স্থাপিত হইবে। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সে যদি কোন উত্তর দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও লিখিত আকারে ঐ জজদের নিকট উপস্থিত করা হইবে। এইসব বিবেচনা করিয়া জজেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবেন, এবং তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সঙ্গত ও ন্যায্য মনে করেন তদ্রূপ হুকুম দিবেন। অর্থাৎ জজেরা যদি বলেন, যে, ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নাই, তথাপি গবর্ণমেণ্ট তাহাকে খালাস দিতে বাধ্য থাকিবেন না। তাহার পর পরিষ্কার করিয়া বলা হইতেছে, যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীল দ্বারা জজদের নিকট উপস্থিত হইতে কিম্বা (আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ কোন) কাজ করিতে পারিবে না; এবং জজদের সমুদয় কাজ-কর্ম্ম ও রিপোর্ট গোপনীয় থাকিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকার-পক্ষের সাক্ষীকে জেরা করিতে, নিজের সাফাই সাক্ষী দিতে, সমুদয় প্রমাণ দেখিতে-শুনিতে, দলিল পরীক্ষা করিতে, উকীল দিতে—কিছুই পারিবে না। গবর্ণমেণ্টও ধৃত ব্যক্তি-সম্বন্ধে সংগৃহীত সব তথ্য জজদিগকে দিবেন না, বাছাই করিয়া কিছু-কিছু দিবেন, জজদের রিপোর্ট-অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না, এবং জজদের রিপোর্ট ও কার্য্যাবলী গোপনীয় থাকিবে। ইহাতে কিরূপ ন্যায় বিচার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

—

ভারতের হাওয়া ও নিমকের দোষ

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড্ রেডিং আগে এক সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে, তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহার আদেশ-অনুসারে যে অর্ডিন্যান্স্ জারী হইয়াছে, তাহাতে ন্যায়-বিচার কিরূপ হইবে, তাহার কিছু আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই লর্ড্ রেডিংই যখন বিলাতে প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তখন স্যার্ রজার্ কেস্‌মেণ্টের বিচার-কালে কি

বলিয়াছিলেন, দেখুন। স্যার্ রজার্ কেস্‌মেণ্ট্ গত মহা-যুদ্ধের সময় আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্যতম বিপ্লব-নেতা ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগ ছিল, যে, তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংকল্পিত আইরিশ যুদ্ধে ব্যবহারের নিমিত্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের সমুদ্র-কূলে জাহাজে করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়া নামাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জার্ম্মেনীর সহিত যুদ্ধে তখন ইংলণ্ডের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। আয়ার্ল্যাণ্ড্ বিপ্লবী সমিতিতে পূর্ণ। তাহা সত্ত্বেও স্যার্ রজার্ কেস্‌মেণ্টের বিচারে জুরীকে সম্বোধন করিয়া লর্ড রেডিং বলেন ঃ—

"It is the proud privilege of the bar of England that it is ready to come into Court and to defend a person accused, however grave the charge may be. In this case, speaking for my learned brothers and myself, we are indebted to counsel for the defence, for the assistance they have given us in the trial of this case: and I have no doubt you must feel equally indebted. It is a great benefit in the trial of a case, more particularly of this importance, that you should feel as we feel, that everything possible that could be urged on behalf of the defence has been said, in this case after much thought, much study, much deliberation......" [Quoted by *The Tribune*.]

তাৎপর্য্য।—"ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টারদের ইহা একটি গৌরবপূর্ণ অধিকার, যে, তাঁহারা, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ যতই গুরুতর হউক না, তাহার পক্ষ-সমর্থনার্থ তাঁহারা আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আমি আমার সুপণ্ডিত ভ্রাতৃগণ ও আমার পক্ষ হইতে বলিতে পারি, যে আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টারেরা আমাদিগকে বিচার-কার্য্যে যে সাহায্য দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী; এবং আমার কোন সন্দেহ নাই, যে, আপনারাও (অর্থাৎ জুরারেরাও) নিজদিগকে ঐরূপ ঋণী বোধ করিতেছেন। যে-কোন মোকদ্দমায়, বিশেষতঃ এইপ্রকারের গুরুতর মোকদ্দমায়, ইহা খুব উপকারী যে, আপনারা (জুরারেরা) আমাদের মতই অনুভব করিতে পারিবেন, যে, এই মোকদ্দমায়, বহু চিন্তা, বহু অধ্যয়ন ও বহু পরামর্শ করণের পর, আসামীর সপক্ষে যাহা-কিছু বলা সম্ভব তাহা বলা হইয়াছে"...[লাহোরের ট্রিবিউন্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।]

মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা এখন সেরূপ নয়। নিরস্ত্র ভারত সশস্ত্র আয়র্ল্যাণ্ডের মত বিপ্লবী সমিতিতে ভরপূর নয়। স্যার্ রজার্ কেস্‌মেণ্টের বিরুদ্ধে যেরূপ গুরুতর অভিযোগ ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিবার যেরূপ প্রয়োজন ছিল, বঙ্গে অর্ডিন্যান্স্-অনুসারে ধৃত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে-অভিযোগ নাই এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াটাও তত জরুরী নহে। অথচ বিলাতে ন্যায়াধীশ রেডিং কি বলিয়াছিলেন, তাহা দেখা গেল, এবং এদেশে বড়লাট রেডিং কি ওজুহাতে কিরূপ "বিচার" (?) প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাহারও আভাস দিয়াছি।

দোষটা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের হাওয়ার এবং ভারতবর্ষের নিমকের।

—

লর্ড রেডিংএর আশা

যাহারা হৃদয়ের সহিত ভারতবর্ষের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চান, লর্ড্ রেডিং তাহাদের সাহায্য ও পোষকতা পাইবার ভরসা জানাইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অপমানকর কথা ভারতীয়দের পক্ষে এক্ষেত্রে কি হইতে পারে? একজনও বে-সরকারী ভারতবর্ষীয় লোকের সঙ্গে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করিলে না, কেহ ঘুণাক্ষরে কিছু দশ মিনিট পূর্ব্বেও জানিতে পারিল না, যথেষ্ট সময় থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সরকারী মতে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার উপযোগী কোন আইন করাইবার চেষ্টাও করিলে না;—এখন কিনা বল তোমাদের মধ্যে "ভাল" লোকদের সাহায্য ও পোষকতা চাই। কার্য্যতঃ বিদ্রূপ ও উপহাস আর কাহাকে বলে?

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্য

বাংলা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় অর্ডিন্যান্স্‌টার অনুযায়ী একটা আইন করাইবার জন্য উহার একটা অধিবেশন করাইবেন বলিয়াছেন। এ তামাসাও মন্দ নয়। আগে তোমাদের যা করিবার তা ত করিয়াছ; ধরপাকড় নিগ্রহ যথেষ্ট হইয়াছে। এখন চাই, এইরূপ স্বরীতি চিরস্থায়ী করা! ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের পক্ষ হইতে ইহার সমুচিত জবাব হইবে, গবর্ণমেণ্টের বিল্‌টা একবাক্যে না-মঞ্জুর করা।

ইহাতে স্বরাজ্য-দলের আবার একটা জয়জয়কার হইবে বটে। স্বরাজ্য-দলের অনেক কার্য্য ও কর্ম্মনীতি

... ব্রত উদ্‌যাপনের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মাজি তাঁহার প্রিয়পাত্রী জবাহিরলাল নেহরুর কন্যার একখানি হাত ধরিয়া বসিয়াছেন

ব্রত-উদ্‌যাপনের দিন সকাল বেলা মহাত্মাজি চরখা কাটিতেছেন

ব্রত-উদ্‌যাপনের পর গান্ধীজিকে ওজন করিয়া তাঁহার শরীরের ভার নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। সম্মুখে বামদিকে দাঁড়াইয়া আছেন ডাক্তার বিস্তলকর, দক্ষিণদিকে দাঁড়াইয়া আছেন ডাক্তার জাবরাজ মেহ্‌তা, পশ্চাতে বসিয়া ডাক্তার আনসারী পরীক্ষালব্ধ ফল লিখিয়া রাখিতেছেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার কনুই মাত্র দেখা যাইতেছে

[পণ্ডিত গোবিন্দ মালবীয় কর্ত্তৃক তোলা ফটোগ্রাফ হইতে

অনুমোদনীয় নহেও বটে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অবিমৃষ্যকারিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য স্বরাজ্য-দলের সুবিধা হইয়া যাইবে বলিয়া, বে-আইনী আইন প্রণীত হইতে দেওয়া কখনই উচিত হইবে না।

—

পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্রুর বিল্

নূতন বেঙ্গল্ অর্ডিন্যান্স্ রদ্ করিবার জন্য পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল্ উপস্থিত করিবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সমর্থন করি। শান্তির ও অহিংসার পথে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের জবরদস্তি-প্রিয়তার সর্ব্বপ্রকারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য।

—

কুঞ্জবিহারী ঘোষ

দেশহিত কেবল প্রসিদ্ধ লোকদের দ্বারাই হয় না, অবিখ্যাত লোকদের দ্বারাও হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আফিসের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় এই হিত-চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে আরও হইতে পারে। এই কারণে, তিনি বিখ্যাত লোক না হইলেও, "হিতবাদী" তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি লেখায় আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

"আমরা অতীব শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, "হিতবাদী"র পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ আর ইহজগতে নাই। গতপূর্ব্ব বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রিতে কুঞ্জবাবু হৃদ্রোগের আক্রমণে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের লাইব্রেরিয়ান্ এবং পরে হাইকোর্টের ফৌজদারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে যখন এলাহাবাদে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন, সেই সময় সেখানে কুঞ্জ-বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুণগ্রাহী আশু-বাবু কুঞ্জ-বাবুর ন্যায়নিষ্ঠা, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও উদারতা প্রভৃতি গুণ-গ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যালয়ে আনয়ন করেন; কুঞ্জ-বাবুর প্রস্তাবে ও আশু-বাবুর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ত্রুটির সংশোধন ও কার্য্য-পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। কুঞ্জ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং বহুবার অস্থায়ীভাবে সহকারী রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে ২২ বৎসর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ বৎসর, মোট ৩৫ বৎসর কার্য্য করিয়া দুই বৎসর হইল তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুঞ্জ-বাবুর মত সদালাপী, অমায়িক, মিষ্টভাষী, ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আজকাল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর হইলেও তাঁহাকে দেখিলে ৫০।৫৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার হৃৎপিণ্ডে মধ্যে মধ্যে সামান্য বেদনা অনুভূত হয়, বৃহস্পতিবারেও তিনি মৃজাপুর পার্কে খদ্দর মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় কেহ জানিতে পারে নাই যে, কুঞ্জবাবু সেই দিনই রাত্রিকালে মহাপ্রস্থান করিবেন। মৃত্যুর প্রায়

কুঞ্জবিহারী ঘোষ

একমাস পূর্ব্বে তিনি আপনার উইল্ লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার একটি কন্যা বিধবা হইলে কুঞ্জবাবু হৃদয়ে যে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার হৃদ্রোগের প্রধান কারণ। তাঁহার চারিটি পুত্রের মধ্যে তিনজন সুশিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছেন, কনিষ্ঠ পুত্র এখনও ছাত্রাবস্থায় আছেন। কুঞ্জবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাগণ যে দারুণ শোক পাইলেন, সে শোকে সান্ত্বনা নাই। আমরা কুঞ্জবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের ভীষণ শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।"

কুঞ্জবাবু হিন্দুসমাজভুক্ত একেশ্বরবাদী ছিলেন। বাল্যকালে ও ছাত্রজীবনে তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের সংস্পর্শে আসায় তাঁহার সদ্‌গুণাবলী সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি বরাবর দেশভক্ত ছিলেন। এলাহাবাদে থাকিবার সময় "দেশী তেজারৎ", "দেশী কারবার" প্রভৃতি দোকান হইতে ভারতজাত জিনিষ কিনিয়া ব্যবহার করিতেন, এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ও সঞ্জীবনীতে তিনি বিচার-বিভ্রাট-আদি সম্বন্ধে লিখিতেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং পরোপকারী ও সেবা-পরায়ণ ছিলেন, এবং পুত্রদিগকেও তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে-চেষ্টা বিফল হয় নাই। সামাজিক পবিত্রতা-বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকায় তিনি কখন সেইসব থিয়েটারে যান নাই, যাহার অভিনেত্রীরা পাপের ব্যবসা করে।

আমি যখন এলাহাবাদে একটি কলেজে কাজ করিতাম, তখন তাঁহার সহিত পরিচিত হই। আমার তখন সে-অঞ্চলের রীতি-নীতি, লোকদের ভাবগতিক জানা ছিল না; কলেজ-কমিটির বড় সভ্য অনেকেই হাই-কোর্টের উকীল ও কর্ম্মচারী ছিলেন। এইসব কারণে কুঞ্জবাবুর সাহায্যে ও পরামর্শে আমি আমার কলেজ-সম্পৃক্ত ও সার্ব্বজনিক কাজে উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহার জন্য এবং তাহার পরেও নানাভাবে তাঁহার নিকট হইতে সার্ব্বজনিক কাজে যে-সাহায্য পাইয়াছি তাহার নিমিত্ত চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু ছিলেন।

কুঞ্জবাবুর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব এই ছিল, যে, অন্য সব মানুষের ন্যায় যদিও তাঁহাকেও জীবনে অনেক দুঃখ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি তাঁহার নিজের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করিতেন না। নিজের বোঝা তিনি ধৈর্য্যের সহিত বহিতেন, এবং তাঁহার জন্য কেহ কোন চেষ্টা করিলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেন। তিনি খুব বন্ধুবৎসল ছিলেন।

মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি করযোড়ে প্রার্থনা করেন, এবং সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

—

গৌরহরি সেন

পরলোকগত গৌরহরি সেন মহাশয়ের পরিচয় দিতে গেলে ইহা বলাই যথেষ্ট, যে, তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীর গৌরহরি-বাবু। তিনি নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সহিত এই লাইব্রেরীর কাজ যৌবনকাল হইতে করিয়া আসিতে-ছিলেন। ইহা হইতে বিস্তর লোকের পাঠানুরাগ জন্মিয়াছে ও বিদ্যানুশীলনের সুবিধা হইয়াছে। তা ছাড়া, গৌরহরি-বাবুর উদ্যোগে চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পর্কে আহূত সভায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেক ভারতীয় মনীষী এবং অনেক বিদেশী কৃতী ব্যক্তি বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতা করেন। এইজন্য বিদ্যালয়-সংস্থাপক ও পরিচালকের যে প্রশংসা প্রাপ্য, গৌরহরি-বাবুও তদ্রূপ প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। চৈতন্য লাইব্রেরীর স্থায়িত্ব-বিধান ও উন্নতি-সাধন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

—

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী নিরাপদে একুশ দিন উপবাসের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হওয়ায় সুখী হইয়াছি। এই দীর্ঘ উপবাসে তাঁহার দেহ ক্ষীণ ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার চিকিৎসকেরা তাঁহাকে শারীরিক শ্রম অপেক্ষাও মানসিক শ্রম হইতে যথাসাধ্য দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই কারণে তিনি তাঁহার বন্ধু মিষ্টার্ এণ্ড্রুজকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইয়ং ইণ্ডিয়া সম্পাদন করিবার ভার দিয়াছেন।

গান্ধীজির বিশ্রামের প্রয়োজন হইলেও, সার্ব্বজনিক কাজ তাঁহাকে ছাড়ে না। কি-প্রকারে সম্মিলিত কংগ্রেস্ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। কার্য্য-সমাপনান্তে আবার দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছেন।

"ইয়ং ইণ্ডিয়া"র বর্ত্তমান সম্পাদক মানব প্রেমিক এণ্ড্রুজ

তাঁহার কলিকাতা আগমন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ও হাবড়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া সর্ব্বসাধারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছে। বিপুল জনতার মধ্যে এই কর্ত্তব্য সাধিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে গান্ধীজি বিপ্লব-চেষ্টা সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি ও তদনুযায়ী ধর-পাকড় সম্বন্ধে নিজের মত সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, একটিকে তিনি যেমন ঘৃণা করেন, অপরটিকেও সেইরূপ ঘৃণা করেন।

—

গান্ধীজির কোহাট যাত্রা স্থগিত বা বন্ধ।

কোহাটে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং হিন্দুদিগকে ধনেপ্রাণে মারিবার চেষ্টার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন নিমিত্ত গান্ধী-মহাশয় কোহাট যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু (আমরা একাধিকবার বলিয়াছি) ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ কারাগার। এই কারণে গান্ধীজি বিনা অনুমতিতে কোহাট যাইতে পারেন নাই, এবং বড় লাটের নিকট হইতে তদর্থে অনুমতি চাহিয়াও পান নাই। অনুমতি না-দিবার কারণ বড়লাটের পক্ষ হইতে এই বলা হইয়াছে যে, উভয় পক্ষের মন এখনও ঠাণ্ডা হয় নাই, গান্ধীজি গেলে হিন্দুরা দলে দলে তাঁহাকে নিজেদের দুঃখ জানাইতে আসিবে, সুতরাং মুসলমানরাও দল বাঁধিয়া আসিতে পারে, এবং এই প্রকারে আবার একটা সংঘর্ষ ও দাঙ্গা হইতে পারে। কর্ত্তার আশঙ্কা যখন এইরূপ, তখন তাঁহার অনভিপ্রেত হইলেও আশঙ্কাকে বাস্তব ঘটনায় পরিণত করিতে এই অভাগা দেশে লোকের অভাব না হইতেও পারিত। সুতরাং গান্ধীজির কোহাট না যাওয়া ভাল হইয়াছে।

কিন্তু গান্ধীজি তথায় গেলে স্বভাবতঃ, অর্থাৎ স্থানীয় কাহারও দুশ্চেষ্টা ব্যতিরেকেও, দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা ছিল, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের সন্দেহ অন্যপ্রকার। আমরা মনে করি, লর্ড রেডিঙের পরামর্শদাতাদের বা অন্য কাহারও মনে এই আশঙ্কা ছিল, যে, মহাত্মাজি কোহাটে গেলে আসল কারণ সম্বন্ধে এবং গৃহদাহ-আদির পূর্ব্বে, সমসময়ে ও পরে সরকারী লোকদের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য তিনি জানিতে পারিবেন; এবং তিনি তাহা প্রকাশ করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে। তাহাতে, যাহা গোপন রাখা হইতেছে, তাহা জানা পড়িবে। ইহা বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই।

—

চর্‌কার সম্বর্দ্ধনা

গান্ধী-মহাশয় বাণ্ডেল্ ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টীমার-যোগে কলিকাতা গিয়াছিলেন। এইজন্য যে বহুসংখ্যক ভক্ত, দেশবন্ধু দাশের অনুরোধ না-মানিয়া, হাবড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন তাঁহারা মহাত্মাজির বন্দনা করিতে না পাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়াছিলেন। তাঁহারা গান্ধী-মহাশয়ের চর্‌কাটিকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া মহা সমারোহে মোটর গাড়ীতে চড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ইহা খবরের কাগজে পড়িয়া আমাদের কথামালার একটা গল্প মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

একটি দেবমূর্ত্তিকে একটি গৰ্দ্দভের পিঠে চড়াইয়া ঘটার সহিত সহরের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। রাস্তা দিয়া যত লোক যাইতেছিল, তাহারা সকলেই দেব-মূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছিল। তাহা দেখিয়া গাধা ভাবিল, যে, এই ভক্তি-শ্রদ্ধা তাহাকেই দেখান হইতেছে। ইহাতে সে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আর এক পাও চলিতে চাহিল না। তখন গৰ্দ্দভ-চালক তাহার পিঠে খুব লাঠির বাড়ী বসাইতে বসাইতে বলিতে লাগিল, "ওরে নির্ব্বোধ, লোকেরা তোকে প্রণাম করিতেছে না, কিন্তু তুই যে দেবমূর্ত্তিটিকে বহন করিতেছিস, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে"।

সৌভাগ্যের বিষয়, মহাত্মাজির চর্কাটি সজীব প্রাণী নহে; নতুবা তাহারও অহঙ্কার হইত এবং সে সূতা কাটিতে অস্বীকার করিত। তখন তাহার কানমলা কিম্বা অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইত।

—

"প্রকৃতি"

সাধারণতঃ যে-সব সাময়িক পত্র বাহির হয়, তাহাদের বিষয় কিছু লেখা আবশ্যক মনে হয় না—সে-রকম কাগজ ত অনেক আছে। কিন্তু "প্রকৃতি" সেরূপ পত্রিকা নহে। ইহা সচিত্র সহজ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, দুই মাস অন্তর বাহির হয়। এইরূপ পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহা যোগ্যতা ও উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার অনেক ক্রেতা ও পাঠক জুটিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

—

"ভূমিলক্ষ্মী" ও "উপায়"

আরো দু'খানি পত্রিকার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

"ভূমিলক্ষ্মী" বীরভূম জেলার ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। এখন বিশ্বভারতীর হাতে আসিয়াছে।

"বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে কৃষির সম্বন্ধে যা-কিছু চেষ্টা হচ্ছে, তার পরিচয় এতে থাকবে। আর এই জেলার নানা স্থানে নানা কর্ম্মীরা দেশের ও কৃষির উন্নতির জন্য যা করছেন তার পরিচয়ও এতে থাকবে। কিসে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই জেলার কৃষি, গোধন, স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারা যায়, তার আলোচনাও এতে থাকবে।"

নবপর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় রবি বাবু লিখিয়াছেন :—

"মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির প্রাণপূর্ণ সঙ্গ থেকে যতই দূরে চলে' যাবে ততই তার মরণ-দশা ঘনিয়ে আসবে, এসম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মানুষ এতকাল বুদ্ধির জোরে ও ব্যবহারের নৈপুণ্যে যে লোকালয় গড়ে' তুলেছিল তার সঙ্গে প্রকৃতির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটেনি; তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাই ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালে কলের রাজত্ব প্রবল ও জটিল হ'য়ে উঠচে, তা'তে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কেবল ভেদ নয় বিরুদ্ধতা বেড়ে' চলেচে। এর সাংঘাতিক ফল আমাদের অন্তরে-বাহিরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে' প্রকাশ পাবেই। এই যন্ত্র-রাজক সভ্যতার প্রধান দুর্গ হচ্ছে একালের সহর। যে-পল্লী প্রকৃতির সন্তান তারি প্রাণ শোষণ করে' সহরগুলো স্ফীত হ'য়ে উঠচে। এই শোষণ-ব্যাপার মানুষের আত্মঘাতের প্রক্রিয়া। মানুষ বিনাশ হ'তে রক্ষা পেতে যায় যদি, তবে তা'কে আবার সেবাকুশলা ভূমির আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। সেইখানেই তার স্বাস্থ্য সুখ শান্তি সৌন্দর্য্য। কিন্তু এতকাল এই ভূমিলক্ষ্মীর সদাব্রত যেখানে ছিল সেই তার অতিথিশালা আজ ভেঙে পড়েচে। বাংলা দেশে যে-সাধকেরা তা'কে গড়ে' তোলবার ভার নিয়েচেন ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকায় তাঁদের বাণী সার্থক হোক্।"

প্রথম সংখ্যাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বৰ্দ্ধমান, মানভূম প্রভৃতি অনেক অঞ্চলের মৃত্তিকা ও সমস্যা একরকমের। এইজন্য বীরভূম জেলার বাহিরের লোকেরাও ইহা পড়িলে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সাহায্য পাইবেন।

"উপায়" নামক কাগজটি বৰ্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা "কৃষি শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য স্বাস্থ্য এবং আর্থিক ও অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় উন্নতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র।" ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা একত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতেও কয়েকটি ভাল প্রবন্ধ আছে, এবং ইহাও বৰ্দ্ধমান জেলার বাহিরের লোকেরা পড়িলে উপকৃত হইবেন। ইহারও একটি প্রস্তাবনা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া দিয়াছেন।

—

পাবনা হিতসাধন মণ্ডলী

পাবনা হিতসাধন মণ্ডলীর দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য বিবরণ দেখিয়া খুসী হইলাম। ইহার শিক্ষা-বিভাগ, চিকিৎসা-বিভাগ, শুশ্রূষা-বিভাগ, দাতব্য-বিভাগ, স্বাস্থ্য

বিভাগ, বয়ন-বিভাগ, এবং লাইব্রেরী-বিভাগ দ্বারা অনেক হিতকর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। উন্নতি যে সর্ব্বাঙ্গীণ জিনিষ, এই মণ্ডলী তাহা বহু পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন।

—

গল্প নির্ব্বাচনের জন্য পুরস্কার

"বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়" বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, রবি-বাবুর ছোট গল্পের বইগুলি হইতে ১৫টি ছোট গল্প নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রবিবাবু নিজে একটি তালিকা করিয়া দিয়াছেন। সেই তালিকাভুক্ত গল্পগুলির নামের সঙ্গে যাঁহাদের তালিকার নামগুলি ঠিক্ মিলিয়া যাইবে, কিম্বা অনেকটা মিলিবে, তাঁহারা মিলের পরিমাণ-অনুসারে পুরস্কার পাইবেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি হইতে উৎকৃষ্টতম কবিতাসমূহ বাছিয়া দিবার জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তখন আমরা যে-মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ বলিতেছি;—নির্ব্বাচন-উপলক্ষে কবির গল্পগুলি নূতন করিয়া পড়িবার আনন্দ ও উপকারলাভই আসল লাভ, পুরস্কারটা আনুষঙ্গিক উপরি-পাওনা মাত্র। সুতরাং পুরস্কার যদিও তিনটি, কিন্তু আসল পুরস্কার যাহা তাহা নির্ব্বাচক মাত্রেরই হইবে।

ইহার মধ্যে একটা কৌতূহলের বিষয়ও আছে। রবি-বাবু কোন্ গল্পগুলিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা পাঠকদের হওয়া স্বাভাবিক। পিতামাতার স্নেহ কেবল কৃতী গুণবান্ সন্তানের উপরই পড়ে না, অকৃতী অক্ষমের উপরও বিশেষ করিয়া পড়ে। মানস-সন্তানের সম্বন্ধে কবিদের মমতা এইরূপ উভয় দিকে ধাবিত হয় কি না, অকবিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহাদের গল্পের তালিকার সহিত রবি-বাবুর তালিকার বেশী গরমিল হইবে, তাঁহারা এই মনে করিয়া কৌতুক অনুভব ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন, যে, কবি তাঁহার মানস-সন্তানদের সম্বন্ধে কেবল গুণ-অনুসারে বিচার করিতে পারেন নাই, হয়ত জনক-জননীসুলভ দুর্ব্বলতাও আছে! আমরা যখন এই নির্ব্বাচন-পুরস্কারের কথা শুনিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম, "লিপিকার" গল্পগুলির মধ্য হইতেও নির্ব্বাচন চলিবে। পরে জানিলাম, "লিপিকা" এখন বাদ দেওয়া হইয়াছে।

"লিপিকা"র মত লেখা রবি-বাবুর কলম হইতেও আগে বাহির হয় নাই। শুনিয়াছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ গল্প নির্ব্বাচনের পুরস্কার পরে দেওয়া হইবে।

—

রবি-বাবুর ডায়েরী ও "রক্তকরবী"

রবিবাবুর যে ডায়েরী প্রবাসীতে ছাপা হইতেছে, তাহার এক জায়গায় তিনি "রক্তকরবী"তে কি বলিতে চান, তাহার একটু আভাস দিয়াছেন। কিন্তু সমজদার পাঠকেরা অবশ্য তাহাতে মনে করিবেন না, যে, এই ইঙ্গিতেই "রক্তকরবী"র সব অর্থ ও রহস্য নিঃশেষে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। কবিকে নিজের কাব্যের ভাষ্যকার হইতে বলিলে বড় বিপদে ফেলা হয়। কবি কাব্য দিয়াই নিষ্কৃতি পাইবার অধিকারী। ভাষ্য রচনার দায়িত্ব অন্যের।

—

অসহযোগী-ও "স্বরাজ্য"-দলের রফা

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর স্বাক্ষরিত একটি রফা-নামা বা চুক্তি-পত্র সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ভাল। উদ্দেশ্য দেশের সব রাজনৈতিক দলকে সম্মিলিত-ভাবে "স্বরাজ" লাভের চেষ্টা করিতে সমর্থ করা, এবং গবর্ণমেণ্ট যে দলননীতি অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতির সম্মিলিত-শক্তি প্রয়োগ করা।

মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা আসিবার এবং রফা করিবার পূর্ব্বেই বাংলা দেশে সকল দলের লোক সম্মিলিতভাবে গবর্ণমেণ্টের দলননীতির প্রতিবাদ করিয়াছিল। রফার জন্য কেহ অপেক্ষা করে নাই। এখন রফার পর বরং অনৈক্য দেখা যাইতেছে।

আমরা কোন দলভুক্ত নহি। সেইজন্য আমাদের

মতের মূল্য কম বা বেশী, কিম্বা মোটেই নাই, বলিতে পারি না। কিন্তু চুক্তিপত্রটি পড়িয়া মনে হইতেছে, যে, ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কথা নয়। তাহার কারণ অনেক।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অসহযোগী দল ও "স্বরাজ্য" দল সংখ্যায় ভূয়িষ্ঠ হইলেও তাহারা একমাত্র দল নহে। উদারনৈতিক বা লিবার্যাল্ দল, স্বাজাতিক বা ন্যাশ্যন্যালিষ্ট দল, স্বতন্ত্র বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল, ইত্যাদি দলও আছে। রফানামাটি অবশ্য একটি সুপারিশ-পত্র (রিকমেণ্ডেশন্) মাত্র, ইহা হুকুম বা আদেশ নহে। কিন্তু রফা করিবার পূর্ব্বে অসহযোগী ও স্বরাজ্যদল ছাড়া আর-কোন দলের মুখপাত্রদিগের সহিত পরামর্শ হইয়াছিল বলিয়া কাগজে দেখি নাই। সুতরাং অন্য সব দলের লোকের ইহাতে সম্মতি না হইতে পারে। কাজেও দেখিতেছি, যে, অন্যান্য দলের কাগজে ইহার প্রতিকূল সমালোচনা হইতেছে। শুধু অন্য সব দলের বলাও ঠিক্ নহে, অসহযোগদলের মুখপত্র সার্ভেণ্ট কাগজও রফাটির অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

যে-যে ওজুহাতে রফা করা হইয়াছে, তাহার যাথার্থ্যও সকলে স্বীকার করিতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের দলননীতি বাহ্যতঃ ও নামতঃ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও বস্তুতঃ ইহা যে স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা সকলে স্বীকার করিতেছেন না। আমরা দেখিতেছি, যে, ইহা **প্রধানতঃ** স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতির একমাত্র ফলদায়ক জবাব হইত, গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা সকল দিকে সকলপ্রকারে পূরামাত্রায় বর্জ্জন। তাহার পরিবর্ত্তে রফাকারীরা বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার পরিত্যাগ ছাড়া, আর-সব বিষয়ে অসহযোগ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিতেছেন। অবশ্য অসহযোগ সকল দিকে পূরা-মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব কংগ্রেস্ হইতে ইতিপূর্ব্বে কখনও করা হয় নাই; কিন্তু যে-যে দিকে সহযোগিতা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক চেষ্টাও অনেক দিন হইতে কার্য্যতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে বা মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। সুতরাং অসহযোগ স্থগিত রাখায় কার্য্যতঃ ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহের অবস্থার যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইল, তাহা নহে। তথাপি আমরা মনে করি, যে, গবর্ণমেণ্টের কাজের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও অহিংস জবাব যাহা, তাহা শুধু কাজে পরিত্যক্ত হইল না, অসহযোগ-নীতিটাকেই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ত্যাগ করা হইল। বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক পরোক্ষ-রকমের। বিদেশী কাপড় ব্যবহার না-করাকে ঠিক্ গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ বলা চলে না।

আমরা এটা বুঝি যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী চল্লিশ দিন উপবাস দিয়া উপদেশ বা আদেশ দিলেও, অসহযোগ যতটুকু আছে তাহা অপেক্ষা মাত্রায় বা প্রকারে বাড়াইতে পারিতেন না। কিন্তু তা বলিয়া উহা স্থগিত করিবারও যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি না। স্বরাজ্যদল তাঁহাদের মত, কর্ম্মনীতি, কাজ, প্রভৃতির কিছুরই কণামাত্রও ত্যাগ করেন নাই, রফাটা সম্পূর্ণরূপে অসহযোগীদের তরফ হইতেই হইয়াছে। এবং তাহা প্রধানতঃ বা একা মহাত্মা গান্ধী করিয়াছেন, তাঁহার দলের সব বা অধিকাংশ লোকে নহে। ইহা গণতান্ত্রিক কার্য্যপ্রণালী নহে।

যে-যে রাজনৈতিক দল কংগ্রেসে যোগ দিবেন, তাঁহারা কংগ্রেসের ভিন্ন ভিন্ন কাজ স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারিবেন। কিন্তু অসহযোগ নীতিটাই যখন স্থগিত রাখা হইল, তখন অসহযোগীদের নিজস্ব করিবার কিছু রহিল না; সে দিকে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিতে হইবে। অন্যান্য দলের মত তাঁহারাও চরকায় সূতা কাটা, হাতের তাঁত চালান, খদ্দর বয়ন ও ব্যবহার, হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও মিলন সাধন, এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কার্য্য করিতে পারিবেন।

মদ ও অন্যান্য নেশার জিনিষ ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা কংগ্রেসের আগেকার অনুষ্ঠেয় কার্য্যাবলীর মধ্যে ছিল। এখন উহা বন্ধ দেওয়া হইয়াছে। আমরা মডার্ণ-রিভিউ কাগজে একাধিকবার তথ্য ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি, যে, বিদেশী কাপড় ব্যবহার করা অপেক্ষাও মদ ও নেশার জিনিষ ব্যবহারে ভারতবর্ষের আর্থিক ক্ষতি অধিক

হইতেছে; তদ্ভিন্ন দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানসিক অবনতিও হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ এক বন্ধু আমাদের সব তথ্য ও যুক্তি শুনাইয়াওছিলেন; কিন্তু আমাদের লেখাটা অকাট্য বলিয়াই হউক, কিম্বা নিতান্ত অসার ও অবজ্ঞেয় বলিয়াই হউক অথবা আমাদের পশ্চাতে বৃহৎ (বা ক্ষুদ্র) কোন রাজনৈতিক দল নাই বলিয়াই হউক আমাদের যুক্তি ও সংগৃহীত তথ্যের খণ্ডন চেষ্টা হয় নাই।

সমগ্রভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সব কাজ, **কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবং কংগ্রেসের একটি অঙ্গস্বরূপ,** করিবার ভার পাইলেন স্বরাজ্যদল। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের কাজ স্বরাজ্যদল আগে হইতেই করিতেছিলেন, নূতনত্ব এই হইল, যে, তাঁহারা কংগ্রেসের একটি অঙ্গ ও মুখপত্ররূপে তাহা করিবেন। অসহযোগীদিগের ইহা বলিবার স্বাধীনতাও কি রহিল না, যে,"আমরা ব্যবস্থাপক সভার সহিত লেশমাত্রও সম্পর্ক রাখিলাম না, সুতরাং কেহ আমাদের পক্ষ হইতে উহাতে কোন কাজ করিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি?"

অসহযোগী ছাড়া অন্য যে-সব রাজনৈতিক দলকে কংগ্রেসে যোগ দিবার সুবিধা দিবার জন্য এই রফা-নামা প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহারা স্বরাজ্যদলকে ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের নেতা ও মুখপাত্র এবং সম্মিলিত কংগ্রেসের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

রফাতে বলা হইয়াছে, যে, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে সার্ব্বজনীন (য়ুনির্ভার্সাল্) চর্‌কা-কাটা ভিন্ন ভারতবর্ষ নিজে নিজের কাপড় জোগাইতে পারিবে না। এরূপ কোন অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। রফা-নামায় স্বাক্ষরকারীদিগকে, এই অভিজ্ঞতা কোথায় কবে কি-প্রকারে লব্ধ হইল, তাহার বিবরণ ও প্রমাণ দিতে আহ্বান করিতেছি। ভারতবর্ষে যখন ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই ও বিলাতী সূতা ও কাপড়ের আম্‌দানি হইত না, তখন চর্‌কায় সূতা কাটা সার্ব্বজনীন ছিল না। প্রথমতঃ, ইহা পুরুষজাতির কাজ বা পেশা ত ছিলই না; দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীলোকেরাও সকলে সূতা কাটিতেন না।

মহাত্মা গান্ধী. টাকায় চাঁদা দেওয়া অপেক্ষা শ্রমের দ্বারা চাঁদা দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রতিপন্ন করিতে এই সেদিনও চেষ্টা করিয়াছেন। আর আজ ঠিক্ তাহার উল্টাটাও সত্য হইল! টাকা দিয়া সূতা কিনিয়া তাহাও চাঁদা-স্বরূপে দেওয়া চলিবে, নিজে সূতা না কাটিলেও চলিবে, নিয়ম এইরূপ হইল। রাজনৈতিক রফার খাতিরে মূল নীতিটাই বদ্‌লাইয়া গেল।

যদি ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই হাতে সূতা কাটিত ও খদ্দর পরিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, যে, সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা সত্যকার প্রাণের যোগ ("bond between the masses and congress men and women") স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পয়সা দিয়া কাটুনীর নিকট হইতে সূতা কিনিলে তাহার দ্বারা কি যে **নূতনতর** একটা হৃদয়ের যোগ ও প্রাণের বাঁধন সৃষ্ট হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। গরীব লোকেরা যে-কোনরকম জিনিস (সূতা বা অন্য কিছু) শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন করে, তাহা সম্পন্ন লোকেরা কিনিলে যেটুকু যোগ বা বাঁধনের অস্তিত্ব বুঝায়, তাহা ত চিরকালই আছে; সূতা কিনিয়া কংগ্রেসে চাঁদা দিলে তাহাতে নূতনত্ব কি হইল? ছোট-বড় সবাই চর্‌কা চালাইলে তবু বুঝিতাম, যে দৈহিক শ্রমটার অবজ্ঞেয়তা কার্য্যতঃ দূর হইতেছে, এবং ছোট-বড় সকলের মধ্যে সমকর্ম্মিতার একটা যোগ স্থাপিত হইতেছে। উপদেশ, যুক্তি, ও নিজ-নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অবস্থা আনয়নের বিরোধী আমরা কখনও ছিলাম না, নিয়ম দ্বারা ইহা করার বিরোধী ছিলাম।

যাহা হউক, সূতা কিনিয়া চাঁদা দিবার নিয়মে যদি অধিকতর-সংখ্যক কাটুনীর আরও বেশী অন্ন হয়, তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইব।

কংগ্রেস ও তাহার অন্তর্গত সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইবার সময়, এবং তৎসমুদয়ের কাজ করিবার সময় খদ্দর পরিয়া করিতে হইবে, এই নিয়ম হইয়াছে; অন্য সময়ে পরা না-পরা স্বেচ্ছাধীন, ইহা বোধ হয় উহ্য আছে। ইহাতে যদি খদ্দর বিক্রী কিছু বাড়ে, তা মন্দ নয়। কিন্তু ইহাতে পরিচ্ছদের পোষাকী ও আটপৌরে এই দুই ভাগে বিভাগ যেমন হইবে, তেমনি লোক-দেখান

বাহ্য মতামত এবং আসল গৃহাভ্যন্তরীণ মতামতের বিভাগও জন্মিতে পারে। তাহাতে কপটাচরণ প্রশ্রয় পায়। তা ছাড়া, একটা যেমন সংস্কার আছে, যে, পূজা পাঠাদিতে কৌষেয় বস্ত্র প্রশস্ত, ইহাও সেইরূপ বিধি হইল। অনেক দিন আগে স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, যে, খদ্দর না পরিয়া কোন দেশ-হিতকর কার্য্য করিলে তাহা বিশুদ্ধ, শুচি, বা সর্ব্বাঙ্গীণ হয় (তাঁহার ভাষা ঠিক্ মনে নাই), ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। এখন সেই মতটা অংশতঃ বাহাল্ হইল। ইহা হইতে কু-সংস্কারের উৎপত্তি হইবে। কংগ্রেসের কাজের সমতুল্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনেক কাজ আছে। তাহা যদি খদ্দর না পরিয়া করা চলে, তাহা হইলে কংগ্রেসের কাজই বা খদ্দর না পরিলে কেন চলিবে না, তাহা রফা নামায় লিখিত হয় নাই।

—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নব আবিষ্কার

কাগজে দেখিলাম, উদ্ভিদের স্নায়ুজাল-সম্বন্ধে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একটি নূতন আবিষ্কার-বৃত্তান্ত শীঘ্রই ইউরোপে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। তিনি আরও অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃপুনঃ পরীক্ষা দ্বারা কোন আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে নিজে নিঃসন্দেহ না হইলে তিনি তাহা প্রকাশ করেন না। এইজন্য তিনি যখন যাহা আবিষ্কার করেন, লোকে তখনই তাহা জানিতে পারে না, অনেক পরে জানে। ভগবান্ তাঁহাকে আরো দীর্ঘজীবী করুন। তাহা হইলে মানবের জ্ঞানের সীমা আরো বিস্তৃত হইবে।

আগামী ৩০শে নবেম্বর বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্মোৎসব উপলক্ষে বসু-মহাশয় তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহের সাহায্যে অনেক নূতন আবিষ্ক্রিয়ার কথা বুঝাইয়া বলিবেন।

তিনি পাটনা ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের উপাধি-বিতরণ-সভায় বক্তৃতা করিবেন। তাহাতে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত হইবেন।

—

বিলাতে গবর্ণমেণ্ট্ পরিবর্ত্তন

বিলাতের সর্ব্বত্র পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের সভ্য অন্য দুইদলের মোট সভ্য অপেক্ষাও অনেক বেশী হইয়াছে। অতএব এখন রক্ষণশীল দল কর্ত্তৃক তথাকার গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালিত হইবে। ইহাতে ভারতের ভাবিবার বিষয় এই, যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকালের শেষ সময়ে এখানে যে দলননীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত বা কিছু নরম না হইয়া দৃঢ়ীভূত ও কঠোরতর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইল।

স্বপ্ন-জাগরণ

শ্রী সজনীকান্ত দাস

নিঃশব্দ, নিঝুম, স্তব্ধ মধ্য-যামিনীতে—
নিদ্রা হ'তে কেন জানি সহসা জাগিনু ;
শয্যা'পরে বসিলাম উঠি',—আঁখি মেলি'
স্তিমিত আলোকে স্বপ্নসম দেখিলাম

প্রিয়া মোর,—গভীর-সুষুপ্তি-মগ্ন, আশা
ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ বক্ষ তার ;—মৃদু
হাসি ওষ্ঠ-প্রান্তে—যামিনীর উচ্ছলিত
আনন্দের শেষ। এলায়িত বাহু দু'টি ;

আলুথালু কেশ ;—স্রস্ত চ্যুত গাত্র-বাস ;
সরম-সঙ্কোচ যত মুদ্রিত মুদিত
নয়ন-পল্লব-প্রান্তে ;—নগ্ন, ক্ষুদ্র তার
চরণ দু'খানি অলক্তরঞ্জিত,—শুভ্র
শয্যা সরোবর'পরে—কমলের মত।
বাহুমূলে স্তব্ধ কত কঙ্কণ-কিঙ্কিণী !
অতি মৃদু বহে শ্বাস, বক্ষ মৃদু-মৃদু
ওঠে কাঁপি,—গভীর আশ্বাস-ভরে যেন !

দেখিলাম চাহি' ক্ষীণ-দীপালোকে স্বপ্ন
যেন রচিবারে চায় ক্ষুদ্র শুভ্র মোর
সেই গৃহটি ঘেরিয়া।
　　　　ধীরে মনে হ'ল—
স্বপনের মাঝে কে যেন দিয়েছে ডাক
প্রিয়া-পাশে সুপ্তি-মগ্ন মোরে—অতি দূর—
দূরান্তর হ'তে। যেন তারে চিনি, যেন
তারে চিনি নাকো ! স্বপনের মাঝে আসি,
আমারে কহিল ডাকি', "আয় ওরে আয় !"
নিদ্রাভঙ্গে, স্বপ্নভঙ্গে সকলি মিলায়—
মূর্ত্তি তার মনে নাহি জাগে ; পরিচিত
ডাক শুধু শোনা যায়—"আয় ওরে আয় !"
আমারে করিয়া গেল উদাস ব্যাকুল।
প্রেয়সীর মুখপানে চাহি' মনে হ'ল,
সে যেন অপরিচিতা মোর ; যে-বন্ধনে
বদ্ধ ছিনু দেখিলাম বন্ধন সে নহে !
যেন আমি যেতে পারি ;—সব মিথ্যা, মোহ
সবি ; ওই প্রিয়া, এই গৃহ, এ শ্যামল
ধরা—অন্ধকারে সকলি মগন, মিথ্যা
স্বপ্নজাল সৃজন করিছে যেন ক্ষুদ্র
এই আমারে ঘেরিয়া। দেখিলাম চাহি'
বাতায়ন-পথে, ঘন-ঘটাচ্ছন্ন স্তব্ধ
নিশীথ-আকাশ ; মাঝে-মাঝে একটি কি
দু'টি স্তিমিত-তারকা ;—সত্য বলি' মনে
হ'ল ওই দূর, ওই দূর অজানার
ডাক।
　　কে তুমি ডাকিলে মোরে ? কোথা যাবো
আমি ? কেমনে কাটিব আমি এই স্বপ্ন-
জাল ? গাঢ় করি' দাও অন্ধকার ; সব
ছেড়ে চলে' যাই। আমারে দেখাও তুমি
পথ। স্বপ্ন ভুলি' মোহ ভুলি' যাই আমি
চলি'—দূর অজানিত কোন্ পরিচিত
পুরে।—
　　　ঘনাইল অন্ধকার গাঢ়তর
মেঘে। সচকিত হইল দামিনী, কৃষ্ণ
বক্ষ আকাশের চিরিয়া-চিরিয়া ; ক্ষণে
ক্ষণে গভীর গর্জ্জনে গরজি' উঠিল
মেঘ। প্রিয়া মোর উঠিল কাঁপিয়া ;—ভীত—
ত্রস্ত আঁখি মেলি' চাহিয়া আমার মুখ-
পানে ; মৃদুহাসি' গভীর আশ্বাসে মোরে
জড়াইল বাহুপাশে।
　　　　পলকে মিলায়
জাগ্রত স্বপন মোর। মনে হ'ল সত্য
প্রিয়া ; সুন্দর জগৎ। দূর গেল অতি
দূরে সরি'। যত্নে প্রেয়সীর ওষ্ঠ-প্রান্তে
করিনু চুম্বন,—বাহু-পাশ দৃঢ় হ'ল
তা'র।
　　সহসা বাতাসে দীপ-শিখা নিবে
গেল। স্বপ্ন হ'ল সবি। সত্য শুধু আমি
আর চির-পরিচিত প্রেয়সী আমার !

বাংলার পাখী—শ্রী জগদানন্দ রায়—দেড় টাকা। ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা।

প্রথমেই বইখানির মলাটের রঙীন ছবির উপর চোখ পড়ে। তার পর ভিতরেও আর দুইখানি রঙীন ছবি আছে। বৈজ্ঞানিক বলিয়া জগদানন্দ-বাবুর নাম আছে, কিন্তু কেবল বৈজ্ঞানিক বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়—বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ আবাল-বৃদ্ধবনিতার চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার মতন বাংলাদেশে আর কাহার আছে জানি না। আলোচ্য বইখানি জগদানন্দ-বাবুর অসাধারণ লিপিদক্ষতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল পাখী সম্বন্ধেই এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। ভিতরের একরঙা ছবিগুলিতে পাঠকের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পাখীকে বিশেষভাবে দেখিয়া, তাহার চরিত্র এবং মনস্তত্ত্ব জানিয়া, এবং তাহার অন্যান্য সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া এই পুস্তকখানি লেখাতে জগদানন্দ-বাবুর ধৈর্য্য এবং বৈজ্ঞানিকীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি পাঠে শিশুরা ত প্রচুর আনন্দ এবং জ্ঞান লাভ করিবেই,সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ারাও এই আনন্দ-জ্ঞান-লাভের অংশ পাইবে। আমরা চোখের সামনে আকাশে অনেক-রকমের পাখী উড়িতে দেখি, কিন্তু তাহাদের কতকগুলির নামছাড়া আর কিছুই জানি না। অনেকে আবার বেশীর ভাগ পাখীর নামও করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা অনেক চোখে না-দেখা বিলাতী পাখীর বিষয় অনেক-কিছুই বলিতে পারিব। জগদানন্দ-বাবু আমাদের ঘরের জিনিষগুলিকে চিনাইয়া দিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্য এজন্য তাঁহার কাছে চিরকাল ঋণী থাকিবে।

বইখানি ঘরে-ঘরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের এবং সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য সকলেরও নিত্য আনন্দদায়ক হইবে। মলাটের প্রথম ছবি হইতে শেষ পাতা পর্য্যন্ত বইখানি চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে। বইখানি, বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহের বাজে বিজ্ঞান-পুস্তকের স্থলে পাঠ্য পুস্তক করিলে বালকবালিকাদের মহা উপকার করা হইবে। "পাঠ্য পুস্তক নীরস হয়," এই বাক্যটি জগদানন্দ-বাবুর "বাংলার পাখী" মিথ্যা প্রমাণ করিবে।

Parts of Speech in a dialogue form অর্থাৎ গল্পচ্ছলে পদ-পরিচয় শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায়। দাম চার আনা মাত্র।

ইংরেজি শিখিতে হইলে ইংরেজি পদ পরিচয় বিশেষভাবে জানা দরকার। ব্যাকরণ পাঠে ইহা জানা যায়। কিন্তু 'ব্যাকরণ' নামেই একটা বিভীষিকা আছে। ছোট ছেলেরা ব্যাকরণ পাঠ করিতে চায় না, কারণ লেখার দোষে অনেকেই ব্যাকরণ কিছু বুঝিতে পারে না। এই পুস্তকখানিতে তাহাদের ব্যাকরণ-পাঠের ভয় ভাঙ্গিবে। অতি সরল এবং সহজ, অথচ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে Parts of Speech জিনিষটি বুঝান হইয়াছে। বইখানি "পাঠ্যপুস্তক" কি না জানি না, যদি পাঠ্য পুস্তক না হয়, তবে ইহাকে পাঠ্য-পুস্তক-তালিকায় দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থকীট

জাগ্রতস্বপ্ন বা দেবলোকে পুনর্ম্মিলন (সচিত্র)—রায় সাহেব শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১৯।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

এক নির্জ্জন শৈলাবাসে লেখক তাঁহার মৃত-পত্নীর কথা ভাবিতে-ভাবিতে মনে-মনে মরিয়া কল্পনার সাহায্যে বহু কষ্টে প্রেতলোকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া ভগবতীর পদসেবারতা স্বীয় পত্নীকে দেখিতে পাইলেন। এই জাগ্রতস্বপ্ন অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। স্বামীর পত্নীপ্রেমের কথা আছে বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার পাঠকদের নিকট এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা এপুস্তক স্বয়ং পাঠ করুন বা নাই করুন, যেন তাঁহারা নিজ-নিজ গৃহ-লক্ষ্মীকে নিশ্চয় এক-একখানি উপহার প্রদান করেন।

দেখা গেছে, গৃহ-লক্ষ্মীরা সত্য-সত্যই এগ্রন্থপাঠে কৌতুক-মিশ্রিত কৌতূহল অনুভব করেন। সুতরাং লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

বুদ্ধের জীবন ও বাণী—শ্রী শরৎকুমার রায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৲।

শিবাজী ও মারাঠা-জাতি—শ্রী শরৎকুমার রায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸০।

বঙ্গগৌরব স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রী শরৎকুমার রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ॥০।

গ্রন্থকারের বইগুলি প্রথম সংস্করণেই এই পত্রিকায় প্রশংসিত হইয়াছিল, এখন আর নূতন করিয়া তাহাদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। প্রথম দু'খানি বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে যে এত সময় লাগিল তাহাতে বাংলা দেশের অবস্থা যে কিরূপ তাহা বুঝা যাইতেছে। তৃতীয় বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ যে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে হইয়াছে তাহাতেও বাংলাদেশের আরেক-রকম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তবে এশ্রেণীর বইয়ের যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় যে সেগুলি বাঙালী পাঠকের আদৃত হইয়াছে ও ভবিষ্যতেও তাহাদের কাটতি হইবে এরূপ আশা করা যায়।

অ

রণ-সজ্জায় জার্ম্মেণী (সচিত্র)—ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পি, এইচ, ডি (বার্লিন) প্রণীত। প্রকাশক মেসার্স্ বেঙ্গল ট্রেডার্স লিঃ ৮৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৷০। (১৩৩১)

বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ডাঃ ভট্টাচার্য্য জার্ম্মেণীতে ছিলেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় জার্ম্মেণীর সেই সময়কার জীবনচিত্র অতি সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন। জার্ম্মেণী বিগত মহাযুদ্ধে কিরূপভাবে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল সেইসকল অদ্ভুত ঘটনাবলী এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। বহু আসল চিঠির প্রতিলিপি এবং চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় বইখানি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা আশা করি পুস্তকখানি বাঙালী পাঠক সমাজে আদৃত হইবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

প্র

বিপ্লবের দিনে

শ্রী মণীশ ঘটক

(আইরিশ লেখক Liam O'Flahertyর অনুসরণে)

সন্ধ্যার ম্লান আলো ক্রমে নিবিড় হ'য়ে আসছে। মেঘে ঢাকা সদ্যোজাত চাঁদের অস্ফুট আভা আর সন্ধ্যার আঁধার একসঙ্গে মিশে' সহরের রাস্তা-ঘাট নদীর উপর একটা আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। চারদিক্ থেকে মাঝে-মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্বাধীন-তন্ত্রী (Free States) আর সাধারণ-তন্ত্রীদের (Republicans) মধ্যে ঘরোয়া যুদ্ধ চল্ছে।

সহরের একটা ছাদের উপর সাধারণ-তন্ত্রীদের একজন সৈন্য লুকিয়ে বসে' আছে। তার পাশে একটা রাইফেল, কাঁধের উপর দিয়ে দূরবীন্ ঝোলানো। চেহারা পড়ুয়া ছোক্‌রার মতো, পাত্‌লা; চোখের দৃষ্টি গভীর চিন্তাপূর্ণ—মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে যেন অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে।

সে ক্ষুধার্ত্তভাবে একটুক্‌রো রুটিতে কামড় দিচ্ছিল। সকাল থেকে কিছু খায়নি। সারাদিন এমন উত্তেজনা গেছে—! রুটিটা শেষ করে' ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা হুইস্কি ঢক্-ঢক্ করে' গলায় ঢেলে দিয়ে সে বোতলটা পকেটে রেখে দিলে। একটা সিগারেট খেতে তার ভয়ানক ইচ্ছা কর্‌ছিল, কিন্তু সেটা সুবিবেচনার কাজ হবে কি না বুঝতে পার্‌ছিল না। সিগারেট ধরাতে গেলেই আলো দেখা যাবে। চারিদিকে শত্রু। যাক্‌গে!—ভেবে-চিন্তে সে ধরানোই ঠিক কর্‌লে।

দেশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়ে কষে' দু'-চার টান লাগালে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গুলি এসে ছাদের কার্নিশে লাগ্‌ল। সৈনিক আর-একটা জোর টান দিয়ে সিগারেট্টা ফেলে' দিলে, তার পর একটু সরে' বাঁ দিকে গিয়ে বস্‌ল।

ধীরে-ধীরে, খুব সাবধানে, ছাদের আল্‌সের উপর দিয়ে সে মাথা উঁচু কর্‌লে। আবার আর-একটা গুলি—মাথার উপর দিয়ে। সাম্‌নের ছাদ থেকে কে বন্দুক ছুঁড়্‌ছে।

সে একটা থামের আড়ালে গিয়ে মাথা উঁচু করে' দেখতে লাগল। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না—কেবল সার-সার ছাদ। শত্রু নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে।

ঠিক্ সেইসময় একখানা সশস্ত্র মোটর-গাড়ী নীচে রাস্তায় এসে থাম্‌ল। সৈনিকের বুক ধপ্-ধপ্ কর্‌ছিল। শত্রুপক্ষের গাড়ী। গুলি ছুঁড়্‌তে ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল তার, কিন্তু জান্‌ত যে তা অনর্থক। বন্দুকের গুলি মোটরকারের লোহার দেয়াল ফুটো কর্‌তে পার্‌বে না।

রাস্তার উল্টো দিক্ থেকে আপাদমস্তক শালমুড়ি দেওয়া এক বুড়ী এসে মোটরকারের সৈন্যটির সাথে কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌ল। তার পর আঙুল দিয়ে সৈনিকের ছাদের দিকে দেখালে,—হুঁ—। শত্রুর চর।

মোটরের দরজা খুলে' গেল। একটা মাথা বেরিয়ে এল। সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে তাগ কর্‌লে। তার পর—ব্যস্। মাথাটা মোটরের উপর ঝুলে' পড়ল। বুড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে রাস্তার ধার দিয়ে পিঠটান দিচ্ছিল। সৈনিক আবার বন্দুক তুল্‌লে। একগুলিতেই বুড়ী ঘুরে' একদম নর্দ্দমার মধ্যে—।

হঠাৎ সাম্‌নের ছাদ থেকে একটা আওয়াজ এল আর সৈনিকের হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে' গিয়ে এমন বিশ্রীরকম শব্দ হ'ল যে মনে হ'ল বুঝি মরা-মানুষও চম্‌কে জেগে উঠবে। সে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুল্‌তে গেল কিন্তু পার্‌লে না। তার ডানহাত অসাড় হ'য়ে গেছে।

ছাদের উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে' হামাগুড়ি দিয়ে সে আল্‌সের নীচে গেল। বাঁ-হাত দিয়ে আহত হাতটা তুলে' দেখতে লাগল। তার কোটের মধ্য দিয়ে রক্ত পড়ছে। বেদনা বিশেষ নেই, শুধু মনে হচ্ছিল সব অসাড় হ'য়ে গেছে।

সে চট করে' পকেট থেকে ছুরি বার করে' কোটের হাতটা চিরে' ফেল্‌লে। হাতে একটা ফুটো হয়েছে। হাতটা একটু নাড়াতে গিয়েই অসহ্য বেদনায় সে মুখ বিকৃত কর্‌লে।

পকেট থেকে আইডিনের শিশি বার করে' সে ক্ষতস্থানে ঢেলে দিলে। যন্ত্রণায় তার মুখ-চোখ নীল হ'য়ে গেল। খানিকটা তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে' সে দাঁত দিয়ে গেরো এঁটে দিলে।

তার পর খানিকক্ষণ চুপচাপ পড়ে' থাক্‌ল। আর সমস্ত মনের জোর দিয়ে দৈহিক বেদনাকে উপেক্ষা কর্‌বার চেষ্টা করতে লাগল।

নীচে রাস্তায় সব চুপ। সশস্ত্র গাড়ীটা চলে' গেছে। বুড়ীর মৃতদেহ নর্দ্দমায় পড়ে' আছে।

সৈনিক অনেকক্ষণ চুপ করে' শুয়ে-শুয়ে ভাবলে কি করে' সরে' পড়া যায়। সাম্‌নের ছাদের শত্রুটাই তার বাধা। তা'কে সাবাড় কর্‌তেই হবে—কিন্তু রাইফেল ধর্‌বার ত আর উপায় নেই। সঙ্গে কেবল একটা রিভল্‌ভার আছে। তা মাথায় একটা ফন্দী এল।

মাথার টুপীটা খুলে' সে বন্দুকের নলের উপর পরিয়ে দিলে। তার পর ধীরে-ধীরে বাঁ-হাতে রাইফেল্‌টা ঠেলে' আল্‌সের গায়ে দাঁড় করিয়ে দিলে,—যাতে শুধুই টুপীটা দেখা যায়। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বন্দুকের আওয়াজ হ'ল।

গুলিটা টুপীর ঠিক্ মাঝখান দিয়ে চলে' গেছে। সৈনিক রাইফেল্‌টা একটু কাৎ করে' দিতেই টুপীটা রাস্তায় পড়ে' গেল। তার পর বাঁ-হাতে বন্দুকের ঠিক্ মাঝখানটা ধরে' সে হাতটা আল্‌সের উপর ঝুলিয়ে দিলে। খানিক পরে বন্দুকটা ছেড়ে দিয়ে সে ছাদের উপর পড়ে' গেল।

তখন ধীরে-ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে সে আবার একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার মৎলব হাসিল হয়েছে। সাম্‌নের ছাদের শত্রুসৈনিক মনে কর্‌ছে যে সে ঠিক্ লোকই মেরেছে। সে নিশ্চিন্ত-ভাবে বুক টান করে' ছাদে দাঁড়িয়েছে, আকাশের গায়ে তার চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

এ ছাদের সৈনিক একটু হাস্‌লে। তার পর সন্তর্পণে আল্‌সের উপর রিভলভারটি বসিয়ে নিশানা কর্‌লে। তার হাত কাঁপ্‌ছে। সে দাঁতে ঠোঁট চেপে, একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে, ঘোড়া টিপে দিলে। আওয়াজে তার নিজের কানেই তালা ধরে' গেল।

ধোঁয়া সরে' গেলে সে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লে নিশানা ঠিক্‌ই হয়েছে। শত্রু মৃত্যুযন্ত্রণায় ছাদে পড়ে' ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। আস্তে-আস্তে সব ঠাণ্ডা।

শত্রুর মরণ-যন্ত্রণা দেখে' সৈনিক একটু শিউরে' উঠল। তখন তার মনে একটা অবসাদ এসে পড়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মন অনুতাপে ভরে' উঠেছে। হাতের ব্যথায় তার সমস্ত শরীর অসম্ভব-রকম দুর্ব্বল। সে সেদিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

তার হাতে তখনো সেই রিভল্‌ভার—ধোঁয়া বেরুচ্চে। সে একটা শপথ করে' সেটা ছাদের উপর আছ্‌ড়ে ফেলে' দিলে। গুলি ভরা ছিল, হঠাৎ আওয়াজ হ'য়ে গুলিটা তার কপাল ঘেঁষে' বেরিয়ে গেল।

তার মন আবার দৃঢ় হ'য়ে এল। সে পকেট থেকে ফ্লাস্ক বার করে' এক-নিশ্বাসে সবটুকু হুইস্কি শেষ করে' ফেল্‌লে। উত্তেজক পানীয়ের গুণে তার মন চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ঠিক কর্‌লে, এখন ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে দৈনিক রিপোর্ট দিতে হবে।

রাত অনেক। চার-দিক্ নির্জ্জন। রাস্তায় যেতে বিশেষ বিপদ্ কিছু নেই। সে পিস্তলটা তুলে' পকেটে রাখ্‌লে। তার পর দেয়াল বেয়ে নীচে নেমে পড়ল।

রাস্তায় পৌঁছে' তার হঠাৎ কৌতূহল হ'ল যে শত্রু সৈন্যটিকে দেখতে হবে। সে যেই হোক্ তার নিশানা খুব ঠিক্। চেনালোকও হয়ত হ'তে পারে। তার নিজের দল থেকেও অনেকে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে—তাদেরই কেউ নয় ত? বিপদের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করে' তা'কে দেখতে যাওয়াই ঠিক কর্‌লে।

সে রাস্তার চারধার তাকিয়ে একবার দেখে' নিলে। এধারে-ওধারে গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছে বটে, তবে সহরের এদিক্‌টা নির্জ্জন।

সে রওনা হ'ল। পথে, হঠাৎ একটা কামানের গোলা এসে রাস্তার খানিকটা অংশ ও গোটাকয়েক ঘরবাড়ী গুঁড়ো করে' দিলে। সে বেঁচে গেল কোন-রকমে।

ছাদে উঠে' দেখ্‌লে শত্রু-সৈনিক উপুড় হ'য়ে পড়ে' আছে। মাথাটা উল্টে' ধরে'ই সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে' বসে' পড়ল। মৃত সৈনিক তারই ভাই।

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩১ সাল পৃঃ ৫৮৬ দ্বিতীয় স্তম্ভ ১৮শ পংক্তিতে আছে 'মৈত্রী, করুণা, মুদিতা,উপেক্ষা' ইহার নিম্নে সংযোজন করিতে হইবে:—
(ব্রহ্ম বিহার)।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

আশ্বিনের "প্রবাসীর" দেশবিদেশের কথা বিভাগে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সেক্রেটারী—শ্রীমতী আনোয়ার ইয়ুসুফ নহেন। মিঃ আনোয়ার ইয়ুসুফ বার্-এট্-ল ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতার কয়েকটি দৈনিকেও ঐরূপ ভুল সংবাদ ছাপা হইয়াছে।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

পৃষ্ঠা	কলম	লাইন	যাহা আছে	যাহা হইবে
২০৯	১ম	২য়	প্রকাশ্য-ক্ষেত্রে	প্রকাশ্য ক্ষেত্রে
"	২য়	১ম	ফোঁস-ফোঁস	ফোঁস্ ফোঁস
"	"	২য়	কর্‌ছে	কর্‌চে
"	"	৪র্থ	কিছুই	কিচ্ছু ই
"	"	"	যা-তা	যা' তা'
"	"	৫ম	যা-তা	যা' তা'
"	"	৯ম	নিভৃত-ছায়ার	নিভৃত ছায়ার
"	"	১০ম	সে-বীথিকা	সে বীথিকা
"	"	১৩শ	মতো	মত
"	"	১৬শ	মতো	মত

৯১নং আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর দুইখানি ইতালীয় চিত্র

চিত্রকর—বেনৎসো গৎসোলি

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩১

৩য় সংখ্যা

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে' ধরে', মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আঁধারে
চলে' যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হ'তে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে।

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি —
"আছি, আমি আছি !"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে' টুটি',
বাঁচি, আমি বাঁচি !
তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে',
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে' আসে
নৃত্যকলরোলে ॥

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী।
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি' কা'রে
চলে' যায় ডাকি'।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে।
ঐশ্বর্য্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে ॥

কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্ণিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই ত চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে ॥

তাই ত গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি'
পত্রপুষ্পভারে।

দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বদ্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি'
রহস্যসমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি ॥

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হ'য়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু'বাহু বাড়ালে ॥

তাই ত কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে ;
মানস তরঙ্গতলে বাণীর সঙ্গীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে ;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে ॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি',
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে' জাগি
নির্জ্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস ॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান ?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে ?
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে' রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে ?

মহেন্দ্রের বজ্র হ'তে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি'।
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তা'র স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান,
কালো হ'য়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত কর, রিক্ত করি' কর পরিত্রাণ,
সব লও লুটে॥

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি' ; দিগন্ত-অঙ্গন
হ'য়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্ব্বশেষ লাভ,
সর্ব্বশেষ ক্ষতি ;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপসুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি॥

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রা-সহচরী ?
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চলে' গেছে অরণ্যের পল্লব মর্ম্মরি' ;
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস্ তুই, গেছে চলে' তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার ॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে'।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ?
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

হারুনা মারু জাহাজ
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

আমার ডায়ারিতে মেয়ে-পুরুষের কথা নিয়ে যে আলোচনা ছিল, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এই যে, "আচ্ছা, বোঝা গেল যে, প্রাণের টানে মেয়ে আট্‌কা পড়েচে আর পুরুষ ছুটেচে মনের তাড়ায়। তার পরে তা'রা যে প্রেমে মেলে সেটা কি ঠিক একজাতের ?"

গোড়াতেই বলে' রাখা ভালো যে, প্রাণই বল আর মনই বল মেয়ে কিম্বা পুরুষের একেবারে নিজস্ব দখলে নেই। অবস্থা-গতিকে পক্ষভেদে একটা মুখ্য, অন্যটা গৌণ।

মন জিনিষটা প্রাণের ঘরেই মানুষ, প্রাণের অন্ন খেয়ে; সেই জন্যেই অন্তরে অন্তরে তার একটা অকৃতজ্ঞতা আছে। প্রাণের আনুগত্য ছাড়িয়ে একাধিপত্য করবার জন্যে সে প্রায় মাঝে মাঝে আস্ফালন করে। এই বিদ্রোহটা ভিতরে ভিতরে কম বেশি পরিমাণে প্রায় সব পুরুষের মধ্যেই আছে। প্রাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে তার কিছু না কিছু কস্‌রৎ এবং কুচ-কাওয়াজ চল্‌চেই। খামকা প্রাণটাকে ক্লিষ্ট করবার বিপন্ন করবার লোভ পুরুষের। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার সখটা পুরুষের; তার একমাত্র কারণ, ঘরের খাওয়াতে তা'কে প্রাণের শাসন মান্‌তে হয় কিন্তু বনের মোষ তাড়ানোতে, প্রাণের প্রতি তার যে রাজভক্তি নেই এইটে প্রচার করবার একটা উপলক্ষ্য জোটে, সেটাকে সে পৌরুষ মনে করে। পুরুষ যুদ্ধ করে' এসেচে সব সময়ে যে প্রয়োজন আছে বলে' তা নয়, কেবল স্পর্দ্ধা করে' এইটে দেখাবার জন্যে যে, প্রাণের তাগিদকে সে গ্রাহ্যই করে না। এই জন্যে যুদ্ধ করার মত এত বড় একটা গোঁয়ারের কাজকে পুরুষ চিরকালই অত্যন্ত বেশি সমাদর করেচে; তার কারণ এ নয় যে, হিংসা করাটাকে সে ভালো মনে করে; তার কারণ এই যে, নানা-প্রকার লোভের ও ভয়ের বন্ধনে প্রাণ তা'কে বেঁধে রাখবার যে বিস্তৃত আয়োজন করে' রেখেচে সেইটেকে সে বিনা প্রয়োজনেও অস্বীকার করতে পারলে গর্ব্ব বোধ করে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি শিশু বালক আছে, তা'কে দেখি আমাদের বাড়িতে যে জায়গাটা স্থিতির পক্ষে সবচেয়ে অযোগ্য, পৃথিবীর ভারাকর্ষণ শক্তিটাকে অশ্রদ্ধা জানানো ছাড়া যেখানে ওঠবার আর কোনো হেতুই নেই, সেই-খানেই সে চড়ে' বসে' আছে। মাঝে মাঝে ভারাকর্ষণ-শক্তিও তা'কে ছেড়ে কথা কয়নি, কিন্তু তবু তা'কে দমিয়ে দিতে পারলে না। এম্‌নি করে' বিদ্রোহে সে হাত পাকাচ্চে আর কি!

মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালার ছাদের সঙ্কীর্ণ কার্নিসটার উপর দিয়ে চলে' যাওয়াটাকে উঁচুদরের খেলা বলে' মনে করতুম। ভয় কর্‌ত না বলে' নয়, ভয় কর্‌ত বলে'ই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা দিত বলে'ই তা'কে ব্যঙ্গ করাটা মজা বলে' মনে হ'ত।

পুরুষের মধ্যে এই যে কাণ্ডটা হয় এসমস্তই মনের চক্রান্তে। সে বলে, প্রাণের সঙ্গে আমার নন্‌-কো-অপারে-শন যতই পাকা হবে ততই আমার মুক্তি হবে সহজ। কেন রে বাপু, প্রাণ তোমার কি অপরাধটা করেচে, আর এই মুক্তি নিয়েই বা করবে কি? মন বলে, "আমি অশেষের রাজ্যে সন্ধান করতে বেরব, আমি দুঃসাধ্যের সাধনা করব, দুর্গমের বাধা কাটিয়ে দিয়ে দুর্লভকে উদ্ধার করে' আন্‌ব। আমি একটু নড়ে' বস্‌তে গেলেই যে-দুঃশাসন নানারকম ভয় দেখিয়ে আমাকে পিছ-মোড়া করে' বাঁধতে আসে তা'কে আমি সম্পূর্ণ হার মানাব তবে ছাড়্‌ব।" তাই পুরুষ তপস্বী বলে' বসে, "না খেয়েই বা বাঁচা যাবে না কেন? নিঃশ্বাস বন্ধ করলেই যে মরতে হবে এমন কি কথা আছে?" শুধু তাই নয়, এর চেয়েও শক্ত কথা বলে,—বলে, "মেয়েদের মুখ দেখ্‌ব না, তা'রা প্রকৃতির গুপ্তচর, প্রাণ-রাজত্বের যতসব দাস সংগ্রহ করবার তা'রাই আড়কাঠি।" যে-সব পুরুষ তপস্বী নয়, শুনে' তা'রাও বলে "বাহবা।"

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাধারণত কোনো মেয়ের দল বলে না, পুরুষকে সম্পূর্ণ বর্জন করাটাই তাদের জীবনের চরম এবং মহোচ্চ লক্ষ্য। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কখনো এমন কথার আভাস শোনা যায়, কিন্তু সেটা হ'ল আস্ফালন। প্রাণের রাজ্যে মেয়েদের যে চিরকেলে স্থান আছে, সেখানকার বন্দরের নোঙর ছিঁড়ে' মনটাকে নিয়ে তা'রা নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবে এমন কথা দুই একজন মেয়ে বল্‌তেও পারে; কারণ যাত্রারম্ভে ভাগ্যদেবতা যখন জীবনের সম্বল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে' দেয় তখন প্যাক্ করবার সময় কিছু যে উল্টোপাল্টা হয় না, তা নয়।

আসল কথা হচ্চে প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে' পেয়েছে, পুরুষরা তা পায়নি। পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজ্‌তে হবে। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সে কত নতুনেরই সন্ধান পাচ্চে, কিন্তু চরমের আহ্বান তা'কে থামতে দিচ্চে না, বল্‌চে আরো এগিয়ে এসো।

একজায়গায় এসে যে পৌচেছে তার একরকমের আয়োজন, আর যাকে চল্‌তে হবে তার আর এক-রকমের। এ ত হওয়াই চাই। স্থিতি যে পেয়েচে, বসে বসে ক্রমে ক্রমে চারদিকের সঙ্গে আপন সম্বন্ধকে সে সত্য করতে, পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। কেননা সম্বন্ধ সত্য হ'লে তবেই তার মধ্যে মুক্তি পাওয়া যায়। যার সঙ্গে ঘর করতে হচ্চে তার সঙ্গে যদি কেবলি খিটিমিটি বাধতে থাকে তা হ'লে তার মত জীবনের বাধা আর কিছু নেই। যদি ভালোবাসা হয় তা হ'লেই তার সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যে মুক্তি ঘটে। সে মুক্তি বাইরের সমস্ত দুঃখ অভাবের উপর জয়ী হয়। এই জন্যেই মেয়ের জীবনে সকলের চেয়ে বড় সার্থকতা হচ্চে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়। বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মুক্তি না হ'লে কর্ম্ম হ'তে পারে কিন্তু সৃষ্টি হ'তে পারে না। মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে চরমশক্তি হচ্চে সৃষ্টি-শক্তি। মানুষের সত্যকার আশ্রয় হচ্চে আপনার সৃষ্টির মধ্যে;—তার থেকে দৈন্যবশত যে বঞ্চিত, সে "পরাবসথশায়ী"। মেয়েকেও সৃষ্টি করতে হবে, তবে সে আপনার বাসা পাবে। তার পক্ষে এই সৃষ্টি প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। যে-পুরুষসন্ন্যাসী নিজের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবল দম্ভে মনে করে যে, যে-হেতু মেয়েরা সংসারে থাকে এই জন্যে তাদের মুক্তি নেই, সে সত্যকে জানে না। যে মেয়ের মধ্যে সত্য আছে, সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করে'ই প্রেমের দ্বারা তা'কে অতিক্রম করে, বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়। সব মেয়েই যে তার জীবনের সার্থকতা পায় তা নয়, সব পুরুষই কি পায়? অনুরাগের সত্যশক্তি সব মেয়ের নেই, বৈরাগ্যের সত্যশক্তি সব পুরুষে মেলে না।

কিন্তু, অন্তত আমাদের দেশে দেখা যায়, পুরুষ সাধক সংসারকে বন্ধনশালা বলে'ই জানে, তার থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়াকেই মুক্তির উপায় মনে করে। তার মানে, আমরা যাকে সংসার বলি স্বভাবত সেটা পুরুষের সৃষ্টিক্ষেত্র নয়। এইজন্যে সেখানে পুরুষের মন ছাড়া পায় না। মেয়েরা যখনই মাতৃত্বের অধিকার পেয়েছে তখনি এমন সকল হৃদয়বৃত্তি পেয়েছে যাতে করে' সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন তাদের পক্ষে সহজ হ'তে পারে। এই জন্যে যে-মেয়ের মধ্যে সেই হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ আছে, সে আপনার ঘরসংসারকে সৃষ্টি করে' তোলে। এ সৃষ্টি তেম্‌নিই, যেমন সৃষ্টি কাব্য, যেমন সৃষ্টি সঙ্গীত, যেমন সৃষ্টি রাজ্যসাম্রাজ্য। এ'তে কত সুবুদ্ধি, কত নৈপুণ্য, কত ত্যাগ, কত আত্ম-সংযম পরিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হ'য়ে অপরূপ সুসঙ্গতি লাভ করেচে। বিচিত্রের এই সম্মিলন একটি অখণ্ডরূপের ঐক্য পেয়েচে;—তা'কেই বলে সৃষ্টি। এই কারণেই ঘরকন্নায় মেয়েদের এত একান্ত প্রয়োজন; নির্ভরের জন্যে নয়, আরামের জন্যে নয়, ভোগের জন্যে নয়;—মুক্তির জন্যে। কেননা আত্মপ্রকাশের পূর্ণতাতেই মুক্তি।

পূর্ব্বেই বলেচি মেয়েদের এই সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হচ্চে প্রেম। এই প্রেম নিজের স্ফূর্ত্তির জন্যে, সার্থকতার জন্যে যাকে চায় সেই জিনিষটি হচ্চে মানুষের সঙ্গ। প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে হ'তেই পারে না, সে ক্ষেত্র সংসারে। ব্রহ্মার সৃষ্টির ক্ষেত্র হ'তে পারে শূন্যে, কিন্তু বিষ্ণুর শক্তি খাটে লোক-জগতে। নারী সেই বিষ্ণুর শক্তি, তার সৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য;

ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছতাও প্রেমের কাছে মূল্যবান। ব্যক্তিবিশেষের ছোটবড় বিচিত্র দাবীর সমস্ত খুঁটি-নাটিতে সেই প্রেমের আত্মদানশক্তি নিজেকে বহুধারায় উন্মুক্ত করে। ব্যক্তিবিশেষের সেই নানা ক্ষুধার নানা চাওয়া মেয়ের প্রেমের উদ্যমকে কেবলি জাগিয়ে রেখে দেয়। যে-পুরুষ আপন দাবীকে ছোট করে সে খুব ভালো লোক হ'তে পারে, কিন্তু মেয়েকে সে পীড়া দেয়, অপূর্ণ করে' রাখে। এই জন্যে দেখা যায় যে পুরুষ দৌরাত্ম্য করে' বেশি মেয়ের ভালোবাসা সেই পায় বেশি।

নারীর প্রেম যে-পুরুষকে চায় তা'কে প্রত্যক্ষ চায়, তা'কে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন করে'ই হোক্, যত দুর্গমই হোক্, বিচ্ছেদ্ পার হবার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ছট্‌ফট্ করতে থাকে। এই জন্যেই সাধনা-রত পুরুষ মেয়ের এই নিবিড় সঙ্গবন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পালাতে ইচ্ছা করে।

পূর্ব্বেই বলেচি, আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তি-বিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিষটি অত্যন্ত বাস্তব জিনিষ। তা'কে পেতে গেলে তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনোটাকে বাদ দেওয়া চলে না, তার দোষ ত্রুটিকেও মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিরূপের উপর ভাবের আবরণ টেনে দিয়ে তা'কে অপরূপ করে' তোলা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার নিজের সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে?

দেবতার মনের ভাব ঠিকমত জানি বলে' অভিমান রাখিনে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কার্ত্তিকের চেয়ে গণেশের পরে দুর্গার স্নেহ বেশি। এমন কি লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার পরে কার্ত্তিকের খোষ-পোষাকী ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় বলে' তা'র পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তার উপরে তিনি বিরক্ত; ঐ দীনাত্মা ইঁদুরটা যখন তাঁর ভাণ্ডারে ঢুকে' তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাট্‌তে থাকে তখন হেসে তিনি তা'কে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে, "মা, তুমি ওকে শাসন কর না, ও বড় প্রশ্রয় পাচ্চে।" দেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, "আহা, চুরি করে' খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম্ম, তা ওর দোষ কি! ও যে চোরের দাঁত নিয়েই জন্মেচে, সে কি বৃথা হবে?"

বাক্যের অপূর্ণতাকে সঙ্গীত যেমন আপন রসে পূর্ণ করে' তোলে, প্রেম তেম্‌নি সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেবার সুযোগ পায়।

মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম, তেম্‌নি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে' তোলে। "We are the dreamers of dreams," এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্ত্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ-পরিগ্রহ করচে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলে'ই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জ্জন করে;—যে-সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেই-গুলো সমগ্রতার পথে বাধার মত জমে' ওঠে। নারীর সৃষ্টি ঘরে, এই জন্যে সব কিছুকেই সে যত্ন করে' জমিয়ে রাখতে পারে; তার ধৈর্য্য বেশি, কেননা তার ধারণার জায়গাটা বড়। পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এই জন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে' দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি নির্ম্মম পুরুষের কত শত কীর্ত্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহুপীড়নের উপর স্থাপিত করেচে। পুরুষ অমিতব্যয়ী, সে দুঃসাহসিক লোকসানের ভিতর দিয়ে লাভ করতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, তার ধ্যান সমস্ত লোকসানকে পেরিয়ে সমগ্র লাভটাকে সুস্পষ্ট দেখে,—ছোট ছোট ক্ষতি তার কাছে নগণ্য হ'য়ে যায়। পুরুষের কল্পনাবৃত্তির সাহস এত অত্যন্ত বেশি, তার কারণ, স্থিতির ক্ষেত্রে স্থির হ'য়ে বসে' বিচিত্রের সহস্র খুঁটিনাটিকে মমত্বের আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবার দীর্ঘ সময় তার কখনো ছিল না। এই জন্যে সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রলয় করতে তার দ্বিধা নেই।

মোট কথা, বাস্তবের মধ্যে যেসব বিশেষের বাহুল্য আছে তা'কে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এই জন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা, এই জন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় এত পুরুষের এত আগ্রহ। এবং এই

জন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এত বেশি উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরাজ্যে এত বেশি সম্পদ লাভ করেচে।

পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তা'কে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্ পড়ে' দেখ। মেয়েরা একথা জানে। পুরুষের এই প্রার্থনা মেয়েদের বিশেষ করে' সৃষ্টি করতে থাকে। কেননা প্রার্থনার বেগ প্রার্থনার তাপ মানুষের সংসারে সৃষ্টির একটা প্রধান শক্তি। আমরা কি চাইব সেটা যদি ঠিকমত ধরতে পারি তা হ'লে আমরা কি পাব সেটা নিয়ে ভাবতে হয় না। পুরুষেরা একরকম করে' চেয়ে চেয়ে মেয়েদের একরকম করে' গড়ে' তুলেচে। মেয়েরা আপনার জীবনে এত জায়গায় এত পর্দ্দা খাটায় এই জন্যে; আপনার থেকে সে কত কি বাদ দিয়ে চলে। আমরা বলি লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। তার মানে, লজ্জা হচ্চে সেই বৃত্তি যাতে করে' মেয়েরা আপনার বাস্তবের বাহুল্যকে সরিয়ে রাখে; মেয়ের রাজ্যে এই জন্যে মস্ত একটা অগোচরতার ব্যবস্থা আছে। সে আপনার এতখানি বাকি রেখেচে যা পুরুষ আপনার মন দিয়ে পূরিয়ে নিতে পারে। সে আপনার খাওয়া-শোওয়া, চাল-চলন, বাসনা-সাধনা সমস্ত থেকেই অতিবাস্তবের প্রত্যক্ষতা এতটা পরিমাণে ঢাকা দেয় যাতে পুরুষের ভাবের মধ্যে তার ছবি সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে বাধা না পায়।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের ব্যবহারে সম্পূর্ণ এর উল্টো দিক্‌টাও দেখা যায়। পুরুষ কখনো কখনো এমন কাণ্ড করে যেন নারীর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তার কোনো আভাস নেই, যেন তার মাটির প্রদীপে কোনো আলোই জ্বলেনি; তখন লুব্ধ দাঁত দিয়ে তা'কে সে আখের মত চিবিয়ে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে' দেয়। সাত্ত্বিকের ঠিক উল্টো-পিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারি অন্য পারে অমাবস্যা। রাস্তার এ দিক্‌টাতে যে সত্য থাকে ঠিক তার সামনের দিকেই তার বিপরীতের বাসা। ফেউ সাক্ষ্য দেয় বাঘেরই অস্তিত্বের। সেই একই কারণে, মেয়ে সংসার-স্থিতির লক্ষ্মী; আবার সংসার ছারখার করবার প্রলয়ঙ্করীও তার মত কেউ নেই।

যা হোক, এটা দেখা যাচ্চে, সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই মেয়ে নিজের চারদিকেই একটা বিচিত্র চিত্রখচিত বেড়ার দুরত্ব তৈরি করে' রেখেচে। দুর্গমকে পার হবার জন্যে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধ্যবসায় আছে, সেইটেকে যতটা পারে সে জাগরূক করে' রাখে। পড়ে'-পাওয়া জিনিষ মূল্যবান হ'লেও তা'তে পুরুষের তৃপ্তি নেই; যাকে সে জয় করে' পায় তা'কেই সে যথার্থ পায় বলে' জানে; কেননা জয় করে' পাওয়া হচ্চে মন দিয়ে পাওয়া। এই জন্যে অনেক ছল-যুদ্ধের আয়োজনে মেয়েদের সময় কাটে।

নীতিনিপুণ বলে' বসবে, এই মায়া ত ভালো নয়। পুরুষ নিজেই চিরকাল ধরে' দাবী করলে এই মায়াকে, এই মায়াসৃষ্টির বড় বড় উপকরণ সে জুগিয়ে দিলে নিজের কল্পরাজ্য থেকে, কবিরা চিত্রীরা মিলে' নারীর চারদিকে রংবেরঙের মায়া-মণ্ডল আপন ইচ্ছায় বানিয়ে দিলে; অবশেষে এই মায়ার কাছে পরাভবশঙ্কায় ত্রস্ত সাধুসজ্জন মেয়ে জাতকে মায়াবিনী বলে' গাল দিতে লেগেছে; তার মায়াদুর্গের উপরে বহুকাল থেকে তা'রা নীরস শ্লোকের শতঘ্নী বর্ষণ করচে, কোথাও দাগ পড়চে না।

যা'রা বাস্তবের উপাসক তা'রা অনেকে বলে, মেয়েরা অবাস্তবের কুয়াশা দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেচে—এ সমস্তর ভিতর থেকে একেবারে খাঁটি সত্য মেয়েটিকে উদ্ধার করা চাই। তাদের মতে সাহিত্যে শিল্পে সব জায়গাতেই এই অবাস্তব মেয়ের ভূতের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। এরা মনে করে মায়া থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বাস্তব সত্যকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তব সত্য বলে' কোনো জিনিষ কি সৃষ্টিতে আছে? সে সত্য যদি বা থাকে তবে এমন সম্পূর্ণ নির্ব্বি-কার মন কোথায় পাওয়া যাবে যার মধ্যে তার বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব পড়তে পারে? মায়াই ত সৃষ্টি; সেই সৃষ্টিকেই যদি অবাস্তব বল তা হ'লে অনাসৃষ্টি আছে কোন্ চুলোয়, তার নাগাল পাবে কোন্ পণ্ডিত?

নানা ছলাকলায়, হাবেভাবে, সাজেসজ্জায় নারী নিজের চারদিকে যে একটি রঙীন্ রহস্য সৃষ্টি করে' তুলেচে সেই

আবরণটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেখাই তা'কে সত্য দেখা এ কথা মানিনে। গোলাপ ফুলের মায়ার পর্দ্দাটা তুলে' ফেলে তা'কে কার্ব্বন নাইট্রোজেন বলে' দেখা যেমন সত্য দেখা নয় এও তেম্‌নি। তুমি বাস্তববাদী বল্‌বে, গোলাপ ফুলের মায়া অকৃত্রিম, মেয়ের মায়া কৃত্রিম। একেবারেই বাজে কথা। মেয়ে নিজের হাতে রঙ বেঁটে যখন তার কাপড় রাঙায় তখন তার হাতের গোপনে সেই প্রকৃতিই থাকে যে প্রকৃতি সকলের অগোচরে প্রজাপতির পাখায় নিজের অদৃশ্য তুলি বুলিয়ে দেয়। প্রাণের রাজ্যে মায়ার খেলা কত বর্ণে গন্ধে রসে কত লুকোচুরিতে আভাসে ইসারায় দিনরাত প্রকাশ পাচ্চে। প্রকৃতির সেই সকল নিত্য অথচ অনিত্য চঞ্চলতায়, সেই সব নিরর্থক হাবভাবেই ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য। চিরপলাতকের এই চিরপরিবর্ত্তন-শীল লীলা থেকে বাদ দিয়ে যে অতি সারবান ভারবান নিশ্চল ধূলোমাটি লোহাপাথরের পিণ্ডটা বাকি থাকে তা'কেই তুমি বাস্তবসত্য বল না কি? বসনে ভূষণে, আড়ালে আবডালে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে, ভাবে ভঙ্গীতে মেয়ে ত মায়াবিনীই বটে। তার মায়ার জগতে সে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেচে, যেমন মায়া, যেমন ইন্দ্রজাল জলে স্থলে, ফুলে ফলে, সমুদ্র পর্ব্বতে, ঝড়ে বন্যায়।

যাই হোক এই মায়াবিনীই চাঁদের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, নববর্ষার মেঘের সঙ্গে, কলনৃত্যভঙ্গিনী নদীর সঙ্গে মিলে' পুরুষের সামনে এসে দাঁড়াল। এই নারী একটা বাস্তবের পিণ্ড মাত্র নয়, এর মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে, অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে, ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত, সে একটি অনির্ব্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্ত্তি। নানা বাজে খুঁটিনাটিকে সে মধুর নৈপুণ্যে সরিয়ে দিয়েচে, সাজে সজ্জায় চালে চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে নিজেকে সে বস্তুলোকের প্রত্যন্তদেশে রসলোকের অধিবাসিনী করে' দাঁড় করিয়েচে। "কাজ করে' থাকি"—এই কথাটা জানিয়ে পুরুষ হাত খালি রেখেচে; মেয়ে সেই হাতে কাঁকন পরে' জানিয়েচে, "আমি ত কাজ করিনে, আমি সেবা করি।" সেবা হ'ল হৃদয়ের সৃষ্টি, শক্তির চালনা নয়। যে-রাস্তায় চল্‌বে সেই রাস্তাটাকে খুব স্পষ্ট করে' নিরীক্ষণ করবার জন্যে পুরুষ তার চোখ দুটো খুলে' রেখেছে, ওটাকে সে গম্ভীর ভাষায় বলে দর্শনেন্দ্রিয়। মেয়ে সেই চোখে একটু কাজলের রেখা টেনে দিয়ে বলেচে, চোখ দিয়ে বাইরের জিনিষ দেখা যায় এইটেই চরম কথা নয়, চোখের ভিতরেও দেখবার জিনিষ আছে, হৃদয়ের বিচিত্র মায়া।

অন্তরে বাহিরে হৃদয়ের রাগরঞ্জিত লীলা নিয়ে পুরুষের জগতে নারী মূর্ত্তিমতী কলালক্ষ্মী হ'য়ে এল। রস যেখানে রূপ গ্রহণ করে সেই কলামূর্ত্তির গুণ হচ্চে এই যে, তার রূপ তা'কে অচল বাঁধনে বাঁধে না। খবরের কাগজের সংবাদ-লেখা প্যারাগ্রাফে ছন্দ নেই, রস নেই, সেই জন্যে সে একেবারে নিরেট, সে যা সে তা'ই মাত্র। মন তার মধ্যে ছুটি পায় না। ভালো কবিতা যে-রূপ গ্রহণ করে সে-রূপ নির্দ্দিষ্ট হ'য়েও অনির্দ্দিষ্ট, পাঠকের স্বাতন্ত্র্যকে সে হাঁকিয়ে দেয় না। মনে আছে, বহুকাল হ'ল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে ত আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ সব কাব্য আমি যেরকম করে' পড়লুম দ্বিতীয় আর কেউ তেমন করে' পড়েনি।

মেয়ের মধ্যেও পুরুষের কল্পনা তেম্‌নি করে'ই আপন মুক্তি পায়। নারীর চারিদিকে যে পরিমণ্ডল আছে তা অনির্ব্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা দিয়ে তৈরি; পুরুষের কল্পনা সেখানে আপনার রসের রঙ, আপনার ভাবের রূপ মিলিয়ে দিতে কঠিন বাধা পায় না। অর্থাৎ সেখানে তার নিজের সৃষ্টি চলে এই জন্যে তার বিশেষ আনন্দ। মোহমুক্ত মানুষ তাই দেখে' হাসে; কিন্তু মোহমুক্ত মানুষের কাছে সৃষ্টি বলে' কোনো বালাই নেই, সে প্রলয়ের মধ্যে বাস করে।

পূর্ব্বেই বলেচি মেয়ের প্রেম পুরুষের সমস্ত খুঁটিনাটি দোষত্রুটি সমেত বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ করে' পেতে চায়। সঙ্গ তার নিতান্তই চাই। পুরুষও আপনাকে লুকিয়ে রাখেনি, ঢেকে রাখেনি; সে অত্যন্ত অসজ্জিত এলো-মেলো আটপৌরে ভাবেই মেয়ের ভালোবাসার কাছে আগাগোড়া নিজেকে ফেলে' রেখে দিয়েচে; এতেই মেয়ে যথার্থ সঙ্গ পায়, আনন্দ পায়।

কিন্তু পুরুষের পক্ষে মেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দূরত্ব নিয়ে আসে; তার মধ্যে খানিকটা পরিমাণে নিষেধ আছে, ঢাকা আছে। ফোটোগ্রাফের মধ্যে সব আছে, কিন্তু আর্টিষ্টের ছবির মধ্যে সব নেই, এই জন্যে তা'তে যে ফাঁকা থাকে সেইখানে রসজ্ঞের মন কাজ করতে পারে। সেই-রকমের ফাঁকাটুকু মেয়েদের একটা সম্পদ, সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত করতে নেই। বিয়াত্রীচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে' তুলেচে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়ত বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তা'কে ডেকে বল্‌চে—

তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা,—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে' গেছে তার ঠিক নেই। হোক্ না সে নয়নের তারা তবুও যে নারী বেদবাদিনী হরের ঘরণী সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

২রা অক্টোবর

আমি বল্‌ছিলুম, মেয়েরা পর্দ্দানসীন্। যে কৃত্রিম পর্দ্দা দিয়ে কৃপণ পুরুষ তাদের অদৃশ্য করে' লুকিয়ে রাখে, আমি সেই বর্ব্বর পর্দ্দাটার কথা বল্‌ছিনে; নিজেকে সুসমাপ্ত-ভাবে প্রকাশ করবার জন্যেই তা'রা যেসব আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ করে' তুলেচে, আমি তার কথাই বল্‌চি। এই যে নিজের দেহকে, গৃহকে, আচরণকে, মনকে নানা বর্ণ দিয়ে ভঙ্গী দিয়ে সংযম দিয়ে অনুষ্ঠান দিয়ে নিজের বিচিত্র একটি বেষ্টনকে তা'রা সুসজ্জিত করতে পেরেচে, এর কারণ, তা'রা স্থিতির অবকাশ পেয়েচে। স্থিতির মূল্যই হচ্চে তার আবরণের ঐশ্বর্য্যে, তার চারিদিকের দাক্ষিণ্যে, তা'র আভাসে, ব্যঞ্জনায়, তার হাতে যে সময় আছে সেই সময়টার মনোহর বৈচিত্র্যে। সবুরে মেওয়া ফলে, কেননা, মেওয়া যে প্রাণের জিনিষ, কলের ফরমাসে তা'কে তাড়াহুড়ো করে' গড়ে' তোলা যায় না। সেই বহুমূল্য সবুরটা হচ্চে স্থিতির ঘরের f । এই সবুরটাকে যদি সরস এবং সফল করতে না পারা গেল তবে তার মত আপদ আর নেই। মরুভূমি অনাবৃত, তার অবকাশের অভাব নেই অথচ সেই অবকাশ রিক্ত, এই কঠিন নগ্নতা পীড়া দেয়। কিন্তু যেখানে পোড়ো জমি পোড়ো হ'য়ে নেই, সেখানে সে ফসলে ঢাকা, ফুলে বিচিত্র; সেখানে তার সবুজ ওড়না বাতাসে দুলে' উঠ্‌চে। যে পথিক পথে চলে সেখানেই সে পায় তার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, তার আরামের ছায়া, ক্লান্তির শুশ্রূষা। সেখানকার স্থিতির পূর্ণতাই তার গতির সহায়, অবারিত মরুভূমি সবচেয়ে বাধা। নারী স্বভাবতই যে স্থিতি পেয়েচে, বসে' বসে' ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে রাঙিয়ে তুলে' আপন হৃদয়রসে রসিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আপন বুকের কাঁচলি আপন মুখের ঘোমটা বানিয়েচে। এই ঢাকাতেই সে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেচে, পুষ্প-পল্লবের আবরণেই যেমন লতার ঐশ্বর্য্য।

কিন্তু হঠাৎ আজকাল পাশ্চাত্য সমাজে শুনতে পাচ্চি, নারী বলচে, "আমি মায়ার আবরণ রাখ্‌ব না, পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেব। আমি হব বিজ্ঞানের চাঁদ; তার চারদিকে বায়ুমণ্ডল নেই, মেঘ নেই, রঙ্ নেই, কোমল শ্যামলের চঞ্চল বিচিত্রতা নেই, তার কালো কালো ক্ষতগুলোর উপরে পর্দ্দা নেই, আমিও হব তেম্‌নি। এতদিন যাকে বলে' এসেচি লজ্জা, যাকে বলে' এসেচি শ্রী, আজ তা'তে আমার পরাভব ঘটচে, সেসব বাধা বর্জ্জন করব। পুরুষের চালে তার সমান তালে পা ফেলে' তার সমান রাস্তায় চল্‌ব।" এমন কথা যে একদল স্ত্রীলোকের মুখ দিয়ে বের হ'ল এটা সম্ভব হ'ল কি করে'? এ'তে বোঝা যায় পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেচে। মেয়েকে সে চাচ্চে না। এমন নয় যে সে হঠাৎ সন্ন্যাসী হ'য়ে উঠেচে,—ঠিক তার উল্টো; সে হয়েচে বিষয়ী, মেয়েকে সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে' নিতে চায়, কড়ায় গণ্ডায় যার হিসাব মেলে না তা'কে সে মনে করে বাজে জিনিষ, তা'কে সে মনে করে ঠকা। সে বলে, আমি চোখ খুলে' সব স্পষ্ট করে' তন্ন তন্ন করে' দেখ্‌ব; অর্থাৎ ধ্যানের দেখায় যা মনকে ভরিয়ে তোলে সেটাকে সে জানে

ফাঁকি। কিন্তু পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে ত কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সে ত ধ্যানের জিনিষও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী দু'য়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধূলো এবং নিজের চারদিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে। মেয়ের যা অশরীরী তা যে শরীরী মেয়েকে ঘিরে' আছে,—তার ওজন নেই কিন্তু তার বর্ণ আছে, ভঙ্গী আছে; তা ঢাকে অথচ তা প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যারা উন্নতির বড়াই করে, তা'রা বল্‌বে এই মেয়েলির প্রতি অসহিষ্ণুতায় চলার উৎসাহ প্রকাশ পায়। আমার মনে হয় এটাই থামবার পূর্ব্ব লক্ষণ। চলার ছন্দই থাকে না যদি স্থিতির সঙ্গে তার সমস্ত আপোষ একেবারে মিটে' যায়। গাড়িটার ঘোড়াও চলচে, সারথিও চলচে, যাত্রীরাও চলচে, গাড়ির জোড় খুলে' গিয়ে তার অংশ প্রত্যংশগুলোও চলচে, এ'কে ত চলা বলে না, এ হচ্চে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ, সাংঘাতিক থামার ভূমিকা। মেয়েরা সমাজের চলাকেই স্থিতির ছন্দ দেয়—সে ছন্দ সুন্দর।

একদল মেয়ে বল্‌তে সুরু করেচে যে, "মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ আমাদের আত্মপ্রকাশের ধারায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্চি।" এর থেকে বোধ হচ্চে একদিন যে পুরুষ সাধক ছিল এখন সে হয়েচে বণিক। বণিক বাইরের দিকে যদিবা চলে, অন্তরের দিকে আপনার সঞ্চয়ের বোঝার কাছে সতর্ক হ'য়ে পুড়ে' আছে। তার স্থিতি সারবান কিন্তু সুন্দর নয়। তার কারণ মানুষের সম্বন্ধকে হৃদয়মাধুর্য্যে সত্য করে' পূর্ণ করে' তোলা তার স্থিতির ধর্ম্ম নয়। ধনসঞ্চয়ের তলায় মানুষের সম্বন্ধকে চাপা দিয়ে চ্যাপ্‌টা করে' দেওয়াই হয়েচে তার কাজ। সুতরাং সে যে কেবল চলে না তা নয়, আপন স্থিতিকে ভারগ্রস্ত নীরস নির্ম্মম অসুন্দর করে। অঙ্কের কোঠার মধ্যে যাকে ধরে না তা'কে সে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে' দেয়।

পুরুষ একদিন ছিল mystic, ছিল অতল রসের ডুবারি, ছিল ধ্যানী। এখন সে হয়েছে মেয়েদের মতই সংসারী। কেবল প্রভেদ এই যে, তার সংসারে আলো নেই, বাতাস নেই, আকাশ নেই; বস্তুপিণ্ডে সমস্ত নিরেট। সে ভারি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে সেই আকাশ সে পায় না যে-আকাশে আপন কল্পনাকে রূপে রসে মুক্তি দিতে পারে।

আজকালকার কবি আপন কাব্যে, শিল্পী আপন কারুতে অনির্ব্বচনীয়কে সুন্দরকে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেচে। এটা কি পৌরুষের উল্টো নয়? পুরুষই ত চিরদিন সুন্দরের কাছ থেকে আপন শক্তির জয়মাল্য কামনা করেচে। Mystic পুরুষ তার ধ্যানশক্তিতে, তার ফলাসক্তিবিহীন সাধনায় বাস্তবের আবরণ একটার পর একটা যতই মোচন করেচে ততই রসের লোকে, শক্তির লোকে, অধ্যাত্মলোকে সে ভূমার পরিচয় পেয়েচে। আজ কেবলি সে থলির পর থলির মুখ বাঁধচে, সিন্ধুকের পর সিন্ধুকে তালা লাগাচ্চে,—আজ তার সেই মুক্তি নেই যে-মুক্তির মধ্যে সুন্দর আপন সিংহাসন রচনা করে। তাই তার মেয়েরা বল্‌চে, আমরা পুরুষ সাজ্‌ব, তাই তার কাব্যসরস্বতী বল্‌চে, বীণার তারগুলোকে যত্ন করে' না বাঁধলে যে সুরটা ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে সেইটেই খাঁটি বাস্তবের সুর, উপেক্ষার উচ্ছৃঙ্খল দুরন্তপনায় রূপের মধ্যে যে-বিপর্য্যয়, যে-ছিন্নভিন্নতা ঘটে সেইটেই আর্ট্।

দিন চলে' গেল। ভুলে' ছিলুম যে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলেচি। মন চলেছিল আপন রাস্তায়,—এক ভাবনা থেকে আরেক ভাবনায়। চলেছিল বল্‌লে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ করে' চলে, এ তেমন চলা নয়,—এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু শুধু বেরিয়ে পড়া; কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না করে', দিকের হিসেব না রেখে, তাদের আপনার ঝোঁকে চল্‌তে দেওয়া। তার সুবিধে হচ্চে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে না, নিজের কাছ থেকে নিজে পায়। মনের ভূগোলে অনাবিষ্কৃতের আর অন্ত নেই। সেসব জায়গায় পৌঁছে দেবার পথগুলো সবই নদীর মত, অর্থাৎ সে পথ নিজে চলে বলে'ই চালায়;— তারই স্রোতে মন আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে

নিজের মধ্যে অপরিচিতের পরিচয় পেতে থাকে। আর্য্যাবর্ত্তের বুকের উপর দিয়ে যে গঙ্গা চলে গেছে, সেই ত ভারতবর্ষের অপরিচিত পূর্ব্বের সঙ্গে অপরিচিত পশ্চিমকে সহজেই মুখোমুখি করে' দিয়েছিল। তেম্‌নি যে মানুষের মনের মাঝখান দিয়ে চল্‌তি নদী থাকে সে মানুষ আপনার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা করবার সুযোগ পায়। আমার মনে সেই নদীটা আছে। তারই ডাকে ছেলেবেলায় আমি ইস্কুল পালিয়েছিলুম। যেসব জ্ঞান শিখে' শিখতে হয় তার বিস্তর অভাব রয়ে গেল কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ হয়েচে। সে জন্যে আমার মনের ভিতরকার ভাগীরথীকে আমি প্রণাম করি।

বাইরে ডেক্‌-এ এসে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য্য অল্পক্ষণ আগেই অস্ত গেছে। শান্ত সমুদ্র, মৃদু বাতাসটা যেন মুখচোরা। জল ঝিল্‌মিল্‌ করচে। পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে দু-একটা মেঘের টুক্‌রো সোনার ধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে স্থির হ'য়ে পড়ে' আছে। আর একটু উপরে তৃতীয়ার চাঁদের কণা। সেখানকার আকাশে তখনো সন্ধ্যার ঘোর লাগেনি—দিনের সভা যদিও ভেঙে গেছে, তবু সেখানে তার সাদা জাজিমখানা পাতা। চাঁদটাকে দেখে' মনে হচ্চে যেন অসময়ে অজায়গায় এসে পড়েছে। যেন একদেশের রাজপুত্র আরেক রাজার দেশে হঠাৎ উপস্থিত, যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন হয়নি,—তার নিজের অনুচর তারাগুলো পিছিয়ে পড়েচে। এদিকে ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম আকাশের সমস্ত সোনার মশাল, সমস্ত সমারোহ সূর্য্যের অস্তযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত, ঐ চাঁদটুকুকে কেউ দেখতেই পাচ্চে না।

এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিম দিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ ; আকাশ এবং সমুদ্রের নীলের ভিতর দিয়ে অবসান দিনের শেষ আলো যেন তার শেষ কথাটি কোনো একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌তে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে ধরে' রাখবার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হ'য়ে পড়চে,—এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।

ডেক্‌-এর উপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তা'কে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি বলচি, যাকে বলে দৃশ্য, এ তা নয়। অর্থাৎ এর মধ্যে যা কিছুর সমাবেশ হয়েচে কেউ যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়ে পরস্পরকে মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণতার মধ্যে সাজিয়ে ধরেচে। এমন একটি সরল গভীর মহৎ সম্পূর্ণতার ছবি কলকাতার আকাশে একমুহূর্ত্তে এমন সমগ্র হ'য়ে আমার কাছে হয়ত দেখা দিত না। এখানে চারদিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত এক হ'য়ে উঠে' আমার কাছে প্রকাশ পেলে। এ'কে সম্পূর্ণ করে' দেখবার জন্যে এতবড় আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।

জাপানের কথা আমার মনে পড়ে। ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই। একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুল্‌চে। ঐ ছবি আমার সমস্ত চোখ একা অধিকার করে ; চারিপাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ করবার মত কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তার সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিষ ভিড় করত, তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাকৃত একটি আসবাবমাত্র হ'য়ে, তার ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হ'ত, সে আপনার সব কথা বল্‌তে পারৃত না।

কাব্য সঙ্গীত প্রভৃতি অন্য সমস্ত রসসৃষ্টিও এইরকম বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারিদিকে যদি অবকাশ না থাকে তা হ'লে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তা'রা রস চায় না, মদ চায় ; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তা'রা চায় চমক লাগা। ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মন যদি কাব্যকে গানকে পেতে হয় তা হ'লে তার খুব আড়ম্বরের ঘটা করা দরকার। কিন্তু সে আড়ম্বরে শ্রোতার কানটাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরো বেশি করে' ঢাকাই পড়ে। কারণ, সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল

বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা-কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরৎ দেখাবার প্রলোভনে মজে, আপনাকে দেখাতে ভুলে' যায়। আড়ম্বর জিনিষটা একটা চীৎকার; যেখানে গোলমালের অন্ত নেই সেখানে তা'কে গোচর হ'য়ে ওঠবার জন্যে চীৎকার করতে হয়,সেই চীৎকারটাকেই ভিড়ের লোক শক্তির লক্ষণ জেনে পুলকিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আর্ট ত চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয় হচ্চে তার আত্মসম্বরণে। আর্ট বরঞ্চ ঠেলা খেয়ে চুপ করে' যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঠেলা মেরে মেরে পালোয়ানি করার মত লজ্জা তার আর নেই। হায়রে, লোকের মন, তোমাকে খুসি করবার জন্যে রামচন্দ্র একদিন সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন,—তোমাকে ভোলাবার জন্যেই আর্ট আজ আপনার শ্রী ও হ্রী বিসর্জ্জন দিয়ে নৃত্য ভুলে' পাঁয়তাড়া মেরে বেড়াচ্চে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবি

ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোকচুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্য্যাস্তের শেষ সমারোহ।
ঊর্দ্ধে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসঙ্কোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্য নিঃশ্বাস।
স্বর্গসুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে,
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে॥

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারে কালের প্রান্তরে মরীচিকা॥

তার পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা, কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি' গানে তা'রে বাঁচাইতে চাস্।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেবট-জাতি

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কেবটেরা অতি প্রাচীন জাতি। বৈদিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিকযুগে এই জাতির কার্য্য ছিল খানা-ডোবায় মাছ ধরা। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে (৫৪।৭) আছে—

'মাকীং সংশারি কেবটে'।

সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—'কূপপাতেনাপি হিংসিতং মা ভবতু', (গোধন) কূপে পড়িয়া যেন মারা না যায়। ঋগ্বেদের এই যে 'কেবট'-শব্দ ইহার অর্থ জলাশয়, গর্ত্ত, কূপ। সায়ণ 'কেবটে কূপে' বলিয়া এই অর্থই মানিয়া লইয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক এই অর্থই বুঝাইয়া কূপবাচক চৌদ্দটি শব্দ দিয়াছেন, তন্মধ্যে 'কেবট'ও আছে। নিরুক্তে 'কেবটে'র ব্যাখ্যায় আছে—'সেব্যতে জলার্থিভিঃ'।

জলের জন্য, জলে জীবিকান্বেষণের জন্য যাহারা যাইত তাহারাও ক্রমশঃ 'কেবট' পদবাচ্য হইয়া উঠিল। বৈদিক যুগে বা তাহার অব্যবহিত পরেই জল অর্থাৎ পুষ্করিণী, পল্বল, তড়াগ প্রভৃতি অঙ্গীকার করিত কয়েকটি জাতি। ইহারা মৎস্যজীবী ছিল। ইহাদের একটি সাধারণ নাম ছিল—'পুঞ্জিষ্ঠ' বা 'পৌঞ্জিষ্ঠ'। অথর্ব্ববেদে মৎস্যপুঞ্জঘাতক এই জাতির উল্লেখ আছে—

"সং হি শীর্ষাণ্যগ্রভং পৌঞ্জিষ্ঠ ইব কর্বরম্।
সিন্ধোম ধ্যং পরেত্য ব্যনিজমহের্বিষম্।"—অথর্ব্ববেদ ১০।৪।১৯

বাজসনেয়ীসংহিতার রুদ্রাধ্যায়ে ছুতার, কুমার, কামার, নিষাদ, পৌঞ্জিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি বলিষ্ঠ জাতির শক্তি বা প্রভাব স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, সমাজে লোকে যাহাদের নিকট উপকার পাইত তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। বাজসনেয়ীসংহিতা বলিতেছে—

"নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ। কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ।"—১৬।২৭। (১)

'পুঞ্জিষ্ঠ' শব্দের অর্থে ভাষ্যকারগণ কিছু গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে (৪ কাণ্ড, ৫ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক—২) বলিয়াছেন—"পক্ষিপুঞ্জঘাতকাঃ পুঞ্জিষ্ঠাঃ।" মহীধর উল্লিখিত বাজসনেয়ীসংহিতার ভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন—"পুঞ্জিষ্ঠাঃ পক্ষিপুঞ্জঘাতকাঃ পুক্কসাদয়ঃ।" কিন্তু বাজসনেয়ীসংহিতা (৩০।৮) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৪।৫—১-২) নদীকে স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া জলাভিমানী এই জেলে জাতিকেই ইঙ্গিত করিয়া উপদেশ করিয়াছে—

১। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও (৪।৫।৪,২) ঠিক এই উক্তিই আছে। কেবল "নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ" ইহার পরিবর্ত্তে 'পুঞ্জিষ্ঠেভ্যো নিষাদেভ্যশ্চ' পাঠ আছে।

"নদীভ্যঃ পৌঞ্জিষ্ঠম্"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের 'বেদার্থপ্রকাশ'ভাষ্যে ভাষ্যকার কিন্তু প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছেন—

"নদীভ্যঃ নদীদেবতাভ্যঃ 'পৌঞ্জিষ্ঠং'—'কৈবর্ত্তম্'।" মহীধর বাজসনেয়ীসংহিতার 'দেবদীপা'খ্যভাষ্যে 'পুঞ্জিষ্ঠো-হস্ত্যজঃ' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ জর্মান্ পণ্ডিত হাইন্‌রিখ্ ৎিসম্‌মের্ (Heinrich Zimmer) পুঞ্জিষ্ঠ বলিতে মৎস্যজীবীই ('Fischer') বুঝিয়াছেন। ২

মৎস্যজীবীদের 'পুঞ্জিষ্ঠ' এই সাধারণ নাম ছাড়া অন্ততঃ নয়টি বিশেষ নামের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষমেধ-যজ্ঞে কতকগুলি হীন জাতিকে বলি দেওয়া হইত। যজুর্ব্বেদে এইসমস্ত জাতির একটি তালিকা আছে। এই তালিকায় মৎস্যজীবী জাতির নয়টি শ্রেণীর নাম আছে। ধৈবর, দাস, বৈন্দ, শৌষ্কল, কৈবর্ত্ত, মার্গার, আন্দ, মৈনাল ও পর্ণক—ইহারা তখনকার মৎস্যজীবী জাতি।*

যাহারা সরোবরের দুইদিকে জল বাঁধিয়া মাছ ধরিত তাহাদের নাম ছিল 'ধৈবর'। ৩

পল্বলে বঁড়শী দিয়া যাহারা মাছ ধরিত তাহাদের 'দাশ' বলিত। ৪

বৃক্ষ-সকলের নিকটস্থ জলে বিন্দু-জাল দিয়া মাছ ধরিয়া যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত তা 'বৈন্দ'। ৫

শুষ্কল বঁড়শী যাহাদের জীবিকার উপায় তা 'শৌষ্কল' বলিয়া পরিচিত হইত। ৬

তড়াগের একদিক্ হইতে মাছ টানিয়া লইয়া অ পারে জড় করিয়া যাহারা মারিত তাহারা 'কৈবর্ত্ত' ন অভিহিত হইত। ৭

জলের ভিতর হাত দিয়া যাহাদের মাছ ধরা ব তাহারা 'মার্গার'। ৮

ঘাটে সক্রু বাঁধিয়া যাহারা মাছ ধরিত তাহা নাম 'আন্দ'। ৯

জাল লইয়া যেখানে-সেখানে যাহাদের মাছ জীবিকা এইরূপ জালজীবীদের 'মৈনাল' বলিত। ১০

বিষাক্ত পাতা জলের উপর ফেলিয়া যাহারা ম ধরিত তাহাদের নাম ছিল 'পর্ণক'। ১১

মৎস্যজীবী এই জাতিগুলি পুরুষমেধযজ্ঞকালে উত্তর পশ্চিমভারতে বাস করিত তাহা পুরুষমেধয বিবরণ হইতে বেশ বোঝা যায়; সুতরাং অনুমান ক যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কৈবর্ত্ত বা মৎস্যজীবী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিত।

২। Heinrich Zimmer—Altindisches Leben (1879), p. 244.

* "সরোভ্যো ধৈবরম্। বেশন্তাভ্যো দাশম্। উপস্থাবরাভ্যো বৈন্দম্। নড লাভ্যঃ শৌষ্কলম্। পার্য্যায় কৈবর্ত্তম্। অবার্য্যায় মার্গারম্। তীর্থেভ্য আন্দম্। বিষমেভ্যো মৈনালম্। স্বনেভ্যঃ পর্ণকম্...।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।১২. [বাজসনেয়ীসংহিতা (১০।১৬)] 'দাশে'র গুণ বৈন্দে এবং বৈন্দের গুণ দাশে বসাইয়াছে। 'উপস্থাবরাভ্যো দাশং বৈশন্তাভ্যো বৈন্দং'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইহার ঠিক বিপরীত পাঠ আছে। অন্যগুলি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অনুরূপ; মার্গার ও কৈবর্ত্তের সংজ্ঞাত্মক ভাষা কিছু স্বতন্ত্র, যেমন—'পারায় মার্গারম্ অবারায় কৈবর্ত্তম্।'

৩। 'সরোভ্যঃ' যানি সরাংসি তদভিমানিভ্যঃ 'ধৈবরং' উভয়তো জলং বধ্নাতি তটানাং মৎস্যগ্রাহিণং।—সায়ণ; সরোভ্যো ধৈবরং কৈবর্ত্তাপত্যম্। —বা.স-ভাষ্যে মহীধর।

৪। বেশন্তাভ্য পল্বলসমানিভ্যঃ, 'দাশং' বড়িশেন মৎস্যগ্রাহিণং। —তৈ-ব্রা-ভাষ্যে সায়ণ; উপস্থাবরাভ্যঃ দাশং দানে দাতারম্ দাশো ধীবরো বা।—মহীধর।

৫। উপস্থাবরাভ্যঃ তরূণাং সমীপেষু প্রবাহমন্তরেণ স্থিতাঃ যা আ তদভিমানিভ্যঃ বৈন্দং বিন্দুর্জালং তেন জীবতীতি বৈন্দস্তং।—সায় বৈশন্তাভ্যো বৈন্দং বিন্দং নিষাদাপত্যম্।—মহীধর।

বিন্দু নামে এক জেলেজাতি গোয়ালন্দের অপর পারে ব করে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বিন্দুরা নৌকা বাহিয়া থাকে।

৬। শৌষ্কলং শুষ্কলং বড়িশং তেন জীবতীতি শৌষ্কলস্তং।—সায় নড লাভ্যঃ শৌষ্কলং মৎস্যজীবিনং শুষ্কলা মৎস্যাস্তৈ জীবতি তম্।—মহীধ

৭। পার্য্যায় পরতীরাভিমানিনে কৈবর্ত্তং কূলে মৎস্যানাং পুঞ্জীকৃ হন্তারম্।—সায়ণ; অবারায় কেবর্ত্তং।—মহীধর।

৮। অবার্য্যায় অবরতীরাভিমানিনে মার্গারং অন্তর্জলে হস্তাভ মৎস্যমার্গণশীলং।—সায়ণ; পারায় মার্গারম্ মৃগারেরপত্যম্ মার্গারস্তঃ —মহীধর

৯। তীর্থেভ্যঃ অবতরস্থানাভিমানিভ্যঃ, আন্দং তীর্থে সক্রুবন্ধনে মৎস্যগ্রাহিণং।—সায়ণ; তীর্থেভ্যঃ আন্দং অদি বন্ধনে অদতি আন্দং বন্ধনকর্ত্তারম্।—মহীধর।

১০। বিষমেভ্যঃ অতীর্থাভিমানিভ্যঃ, মৈনালং জালজীবিনং।— সায়ণ; বিষমেভ্যো মৈনালং অল্ মীনানলতি বারয়তি জালৈরে মীনালস্তদপত্যম্।—মহীধর।

১১। স্বনেভ্যঃ সশব্দজলাভিমানিভ্যঃ পর্ণকং সবিষং পর্ণং জলস্তোপা স্থাপয়িত্বা মৎস্যগ্রাহিণং।—সায়ণ; স্বনেভ্যঃ পর্ণকং ভিল্লম্।—মহীধর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঋগ্বেদে জলাশয়, গর্ত্ত, কূপ প্রভৃতি অর্থে 'কেবট' শব্দের প্রয়োগ আছে। এইসমস্ত স্থানে জীবিকান্বেষণে যাহারা যাইত তাহারাও ক্রমশঃ 'কেবট' পদবাচ্য হইল। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভলিপি তাহার একটি প্রমাণ। বৈদিক 'কেবট' শব্দ এই স্তম্ভলিপিতে অপরিবর্ত্তিত আকারে মৎস্যজীবী অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

অন্যূন ২৬১ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে মহারাজ অশোক কলিঙ্গ-বিজয় করেন। এই কলিঙ্গ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অশোকের সময়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে তাম্রলিপ্তি প্রধান বন্দর ছিল। এই তাম্রলিপ্তিতে অশোক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। তাম্রলিপ্তির চারিদিকে একটি প্রবল জাতি বাস করিত। ইহাদের প্রধান কার্য্য ছিল, নৌকা-বহা ও মৎস্য-ধরা। মহারাজ অশোক তাঁহার অভিষেকের ষড়্‌বিংশ বর্ষের স্তম্ভলিপিতে ঘোষণা করিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রাণিবধ নিষেধ করেন। ইহাতে তিনি অন্যান্য আদেশের সঙ্গে আদেশ প্রচার করেন যে, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চাতুর্মাস্যের প্রত্যেক পূর্ণিমায়, পৌষ মাসের পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও প্রতিপদ্ এবং বৎসরের উপোসথ দিবসগুলিতে মৎস্য বধ বা বিক্রয় কেহ করিতে পারিবে না। এইসমস্ত দিবসে নাগবনে ও কেবটভোগে যে-সকল প্রাণী আছে তাহাদিগকে কেহ বধ করিতে পারিবে না।

> "তীসু চাতুমাসীসু তিসায়ং পুংনমাসিয়ং তিংনি দিবসানি চাবুদসং
> পংনডসং পটিপদায়ে ধুবায়ে চা অনুপোসথং মছে অবধিয়ে
> নো পি বিকেতবিয়ে এতানি যেব দিবসানি নাগবনসি কেবটভোগসি
> যানি অংনানি পি জীবনিকায়ানি নো হংতবিয়ানি।"

অশোকের এই পঞ্চম স্তম্ভলিপির 'নাগবন' ও 'কেবটভোগ' দুইটি ভৌগোলিক সংস্থান। নাগবনে রাজার আদেশে হস্তী-সকলের 'খেদা' হইত বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। 'কেবটভোগ' বলিতে কেবট জাতির ভোগ বা ভুক্তি বুঝায়।

এই কেবটেরই অপর এক মূর্ত্তি 'কৈবর্ত্ত'। সম্ভবতঃ এইটি কেবটের পূর্ব্বরূপ। অন্ততঃ শব্দতত্ত্ব আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৪।১২) মৎস্যজীবীর নাম দিয়াছে—কৈবর্ত্ত। বাজসনেয়ীসংহিতা (৩০।১৬) পুরুষমেধযজ্ঞে অনেকগুলি নীচ জাতির সঙ্গে এই মৎস্যজীবিজাতির নাম করিয়া বলিয়াছে—'অবারায় কেবর্ত্তম্'। এটি কৈবর্ত্তের হ্রস্বরূপ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে 'কৈবর্ত্ত' শব্দ কোথাও পাওয়া যায় নাই। আবার বাজসনেয়ীসংহিতার পরেও 'কেবর্ত্ত' নাম কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ক্রমশঃ 'কৈবর্ত্ত' পালি ও প্রাকৃতে 'কেবট্ট' পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধগ্রন্থে কেবট্টের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উদানগ্রন্থে (নন্দবর্গ—৩।২) এই মৎস্যজীবী কেবট্টের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিতে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেছিলেন। একদিন যসোজপমুখ পাঁচশত ভিক্ষু পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন। সেই সময় বড়ই গোলমাল হয়। তখন বুদ্ধ বলিলেন—"কে পন এতে আনন্দ উচ্চাসদ্দা মহাসদ্দা কেবট্টা মঞ্ঞে মচ্ছং বিলোপা'তি।"

কৈবর্ত্তরা কেমন করিয়া জাল ফেলিতে-ফেলিতে জলে নামিয়া মাছ ধরিত দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে (৭২) তাহার বেশ একটি দৃষ্টান্ত আছে। সেটি এই—

"সেয্যথাপি, ভিক্খবে, দক্খো কেবট্টো বা কেবট্টন্তেবাসী বা সুখুমচ্ছিকেন জালেন পরিত্তং উদকদহং ওথরেয্য, তস্‌স এবমস্‌স "যে যো কোচি ইমস্মিং উদকদহে ওড়ারিকা পাণা, সব্বে তে অন্তো-জালিকতা, এথ সিতা উম্মুজ্জমানা উম্মুজ্জন্তি, এথ পরিয়াপন্না অন্তোজালিকতা বা উম্মুজ্জমানা উম্মুজ্জন্তী'তি।"—P. T. S., Vol. 1., pp. 45-46

বৌদ্ধযুগে বারাণসীতে কৈবর্ত্তদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দ্বার ছিল তাহার নাম ছিল 'কেবট্ট-দ্বার'।* ইহারই নিকটে একটি গ্রাম ছিল তাহার নাম ছিল 'কেবট্টগাম'। প্রাকৃত সাহিত্যেও কেবট্টের প্রয়োগ আছে।

যাহা হউক, বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী সাহিত্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, এই ধীবরজাতি অতঃপর সাধারণতঃ পুল্লিঙ্গ নামে পরিচিত না হইয়া 'কৈবর্ত্ত'নামে প্রসিদ্ধ হইল।

* 'কেবট্টদ্বারা নিক্খম্ম অহু ময্হং নিবেসনং। বিমানবত্থু—৬৮।

রামায়ণ-যুগ হইতে কৈবর্ত্তদের কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। তাহারা সাধারণতঃ বেশ বলিষ্ঠ ছিল। ঐ গ্রন্থে অন্যত্র (অযোধ্যাকাণ্ড—৮৪।৮) দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের একটি দলের পাঁচ শত নৌকা ছিল। তাহাদের তখন নৌকা বাহিতে দেখা যায়।

মহাভারতে মৎস্যজীবী কৈবর্ত্তদের কিছু পরিচয় আছে। অনুশাসনপর্ব্বের ৫০শ অধ্যায়ে (১৩ শ্লোক) বলা হইয়াছে যে, ইহাদের দেহ সুগঠিত, বক্ষঃস্থল সুবিস্তৃত। ইহারা অতিশয় বলশালী ও সাহসী। ভয়ে কখনও ইহারা জল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। ইহারা জালজীবী। কৈবর্ত্তগণ গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থলে বড় বড় জাল ফেলিয়া মাছ ধরিত (১৫ শ্লোক)।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মতে দেখিতে পাওয়া যায়, কৈবর্ত্তগণ প্রধানতঃ মৎস্যজীবী, নৌকর্ম্মজীবী ও তড়াগ-খননাদিজীবী ছিল। মনু প্রভৃতি কয়েকটি সংহিতায় কৈবর্ত্তদের উল্লেখ আছে। এইসকল সংহিতা প্রাচীন হইলেও বর্ত্তমান আকারে ইহারা মহাভারতের পরবর্ত্তী। তথাপি এগুলি অতি সাবধানে পাঠ করিলে জাতি-সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য জানিতে পারা যায়। এগুলির মধ্যে মনুসংহিতাই প্রধান। মনুসংহিতায় দুইবার কৈবর্ত্তের কথা আছে—অষ্টম ও দশম অধ্যায়ে। দশম অধ্যায় হইতে একটি প্রবাদের কথা জানিতে পারা যায়। ইহাতে লিখিত আছে, নিষাদের ঔরসে আয়োগবীর গর্ভে নৌকর্ম্মজীবী মার্গবের উৎপত্তি হয়। মার্গবের আর-একটি নাম—'দাশ'। আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা দাশকে 'কৈবর্ত্ত'* বলে।

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত-নিবাসিনঃ॥" ১০।৩৪

ইহা হইতে তিনটি বিষয় জানিতে পারা যায়। কৈবর্ত্তগণ সঙ্কর-জাতি। মনুর সময়ে ইহারা আর্য্যাবর্ত্তে 'কৈবর্ত্ত' বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহাদের অন্ততঃ তখনকার সাধারণ নাম ছিল 'মার্গব' ও 'দাশ'।

সঙ্কর-জাতির উৎপত্তি-সম্পর্কে বলিবার সময় মনু নিষাদ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

পিতা	মাতা		উৎপন্ন সঙ্করজাতি
ব্রাহ্মণ	শূদ্র	—	নিষাদ
শূদ্র	বৈশ্য	—	অয়োগব
ব্রাহ্মণ	অয়োগব	—	ধিগ্বন
নিষাদ	শূদ্র	—	পুক্কস
শূদ্র	নিষাদ	—	কুক্কুটক
নিষাদ	বৈদেহ	—	করবর
বৈদেহ	করবর	—	অন্ধ্র
,,	নিষাদ	—	মেদ
নিষাদ	বৈদেহ	—	অহিন্দিক
চণ্ডাল	নিষাদ	—	অন্ত্যবশায়ী
নিষাদ	অয়োগব	—	মার্গব, দাশ, কৈবর্ত্ত

এইসমস্ত সঙ্করজাতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে মনুর এই মত। এই মতটি কিন্তু সর্ব্বথা মানিয়া লইবার পক্ষে নানা অন্তরায় আছে। তবে দেখা যায় যে, এইসমস্ত সঙ্করজাতির উৎপত্তি-ব্যাপারে নিষাদ-সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এটি যে সত্য তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কৈবর্ত্তজাতি যে নিষাদজাতি বা ইহার অন্তর্ভূত জাতি সে-সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। বায়ুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, নিষাদবংশ হইতেই ধীবরগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পুরাণ বলিতেছে—

"নিষাদবংশকর্ত্তাঽসৌ বভূবানন্তবিক্রমঃ।
ধীবরানসৃজৎ সোঽপি বেণকল্মষসম্ভবান্॥"

নিষাদ নামে নিষাদের শাখা-বিশেষ যে মৎস্যজীবী ছিল, তাহার অন্য প্রমাণও আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতার উবটভাষ্যে উক্তি আছে—"নিষাদা মাৎসিকাঃ।" মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে নিষাদদিগকে মৎস্যজীবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—'মৎস্যঘাতো নিষাদানাম্।' তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে মাধবাচার্য্য

* কথাসরিৎসাগরে (২৫ তরঙ্গ) একটি গল্প আছে তাহাতে কৈবর্ত্তপতি সত্যব্রতের কথা আছে। সত্যব্রত উৎস্থলদ্বীপের মৎস্যগ্রাহী (৪৩ শ্লোক) দাশেদের রাজা ছিলেন। এই আখ্যানে সত্যব্রতকে 'দাশেন্দ্র' (৫৫ শ্লোক), 'দাশঃ সত্যব্রতঃ' (৫৩ শ্লোক) বলা হইয়াছে। এই আখ্যান হইতেও বেশ প্রমাণিত হয় যে, 'দাশ' ও 'কৈবর্ত্ত' এক পর্য্যায়ভুক্ত।

লিখিয়াছেন—"মৎস্যঘাতিনো নিষাদাঃ" (৪।৫।৪—২)। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৫১ অধ্যায় পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কৈবর্ত্ত ও নিষাদ একই জাতি। সম্ভবতঃ কৈবর্ত্তগণ বিরাট্ নিষাদজাতির শাখাবিশেষ। এই অধ্যায়ের কয়েকটি স্থানে কৈবর্ত্ত ও নিষাদ শব্দ একই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। চ্যবন রাজা নহুষকে বলিতেছেন :—

"শ্রমেণ মহতা যুক্তাঃ কৈবর্ত্তা মৎস্যজীবিনঃ।

মম মূল্যং প্রযচ্ছেভ্যো মৎস্যানাং বিক্রয়ৈঃ সহ॥"৫১।৫

উত্তরে নহুষ কৈবর্ত্তদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—

"সহস্রং দীয়তাং মূল্যং নিষাদেভ্যঃ পুরোহিত।"৫১।৬

মহাভারতের আস্তিকপর্ব্বে (২৪ অঃ—২০ শ্লোক) লিখিত আছে যে, গরুড় হাজার-হাজার মৎস্যজীবী নিষাদদের মারিয়াছিল। এইরূপে শাস্ত্রের বহু স্থান হইতে দেখাইতে পারা যায় যে, কৈবর্ত্তগণ নিষাদ-জাতির অন্তর্ভুক্ত মৎস্যজীবী নিষাদ।

তার পর, নিষাদদের আকৃতির সহিত কৈবর্ত্তদের সাদৃশ্যও খুব বেশী। শ্রীমদ্‌ভাগবতে নিষাদদের মূর্ত্তির বর্ণনা এইরূপ :—

"কাককৃষ্ণোঽতি হ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহু মহাহনুঃ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ॥"—৪।১৪।৪৪

কৈবর্ত্তরাও খুব কালো, খর্ব্বাকার, হ্রস্বাবয়ব, নিম্ননাসাগ্র, তাম্রাভকেশ।

আর্য্যগণ যখন তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া 'সপ্তসিন্ধবঃ' প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা দুইটি জাতিকে সেখানে দেখিয়াছিলেন, একটি অসভ্য নিষাদ-জাতি এবং অপর দস্যু জাতি। আর্য্যগণকে এই উভয় জাতির সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইহারা পরাজিত হইলে আর্য্যগণ এই নূতন ভূমি অধিকার করিতে সমর্থ হন। নিষাদগণ ভারতের একটি আদিম জাতি। তৈত্তিরীয়, কাঠক, মৈত্রায়ণী, ও বাজসনেয়ী সংহিতা এবং ঐতরেয় ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ইহাদের উল্লেখ আছে। এইসমস্ত জায়গায় নিষাদ বলিলে কোন বিশেষ জাতি বুঝাইত না। যাহারা আর্য্যদের অধিকার বা প্রভুত্ব মানিয়া চলিত না, তাহাদেরই নিষাদ বলিত। নিষাদরা ক্রমে যখন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন ঔপমন্যব নিষাদ সমেত পাঁচ জাতি ('পঞ্চজনাঃ') লইয়া চারি বর্ণ (চত্বারো বর্ণাঃ) তৈরি করেন। যাস্কের নিরুক্ত (৩-৮) হইতে এই ব্যাপারটি জানিতে পারা যায়। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮-২-৮) নিষাদ-গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে নিষাদ-স্থপতির উল্লেখ আছে। আর্য্য ছাড়া অনেক বর্ব্বর জাতির সাধারণ নাম ছিল—নিষাদ। কিন্তু নিষাদদের মধ্যেও কতক-কতক কালে আর্য্য-প্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে-সময় আর্য্য-সমাজের উপর নিষাদ-সমাজের এবং নিষাদ-সমাজের উপর আর্য্য-সমাজের একটু-আধটু দাবিও চলিয়াছিল। এইজন্যই বোধ হয় কৌষিতকী ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিতে হইলে আর্য্যদের কিছুদিন নিষাদদের বাড়ীতে থাকিতে হইত। রামের রাজ্যকালে প্রয়াগভূমির চারিদিকের দেশ এবং দক্ষিণেও কিছু-কিছু নিষাদদের অধিকারে ছিল। পাণ্ডবদের সময় তাহারা মালবের উচ্চভূভাগ ও মধ্যভাগ অধিকার করে। ইহাদের একদল এক সময়ে রাজপুতানা ও মধ্যগঙ্গোপত্যকার অধিকাংশ-ভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বেহার ও হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাঞ্চলের নীচজাতিদের বেশীর ভাগই এই নিষাদদের বংশধর। মহাভারত-যুগে তাহাদের যে একটা রাজ্য ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সরস্বতী নদী-তীরে বিনশনের নিকট নিষাদ-রাষ্ট্রের * প্রবেশ-দ্বার ছিল (বন-পর্ব্ব, ১৩০ অঃ, ৩-৪ শ্লোক)। ভীম 'বৎস-ভূমি' জয় করিবার পর ভর্গ ও নিষাদদের রাজাকে জয় করেন (সভাপর্ব্ব, ৩০ অঃ-১১-১১ শ্লোক)। দিগ্বিজয়কালে সহদেব দণ্ডককে জয় করিয়া ম্লেচ্ছরাজাদিগকে জয় করেন। তার পর নিষাদদিগকে জয় করেন। (সভাপর্ব্ব, ৩১ অঃ, ৬৬-৬৭ শ্লোক)। ইহাদের রাজাদেরও নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে (অযোধ্যা-কাণ্ড, ৫০ অধ্যায়) দেখিতে পাওয়া যায় নিষাদরাজ গুহ শৃঙ্গবের-

* বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার মতে মধ্য প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে নিষাদরাষ্ট্র (১৪।১০)।

পুরে * রাজত্ব করিতেন। তিনি অতি পুণ্যাত্মা ছিলেন। নির্ব্বাসনকালে রামচন্দ্র সমশ্রেণীর বন্ধুরূপে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪৬ অঃ, ২০, ৪৭, ৯-১২) কাম্ববা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদ-রমণীর গর্ভজাত। পূর্ব্বে ইনি মৎস্যজীবী ছিলেন। অসাধারণ অধ্যবসায়-বলে ইনি 'মহাসিদ্ধি' লাভ করিয়াছিলেন। শেষে রাজ্য লাভ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ইনি নিষাদ-জাতি হইয়াও বেদপারগ (শ্রুতবান্) হইয়াছিলেন (মহাভারত)।

মহাভারতের নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের কথা সর্ব্বজনবিদিত (আদিপর্ব্ব, ১৩৪ অঃ, ৩১ শ্লোক)। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা শ্রুতদেবা নিষাদরাজকে বিবাহ করেন (হরিবংশ, ৫।৩৫, ১৯৩০)। এসময়ে ইহাদের অবস্থা বেশ উন্নত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। হরিবংশে পাওয়া যায় নিষাদরা সাধারণতঃ সমুদ্রে মুক্তা তুলিত ও নাবিকের কাজ করিত। আর্য্যরা যেমন জয় করিতে-করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, নিষাদরাও হটিতে-হটিতে মধ্য-ভারতের পাহাড়ে, জঙ্গলে গিয়া বাস করিতে লাগিল। তখন তাহারা সেইসমস্ত স্থানের নিম্নতম জাতিদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যায়।

ইহার পর নিষাদরা খুব নীচু হইয়া পড়িলেও মধ্যে-মধ্যে তাহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পরে তাহাদের বীরত্বের নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। নন্দিবর্ম্মার উদয়েন্দিরম্ (উদয়চন্দ্রমঙ্গলম্) অনুশাসনে একজন নিষাদরাজের উল্লেখ আছে। ইহার নাম 'পৃথিবীব্যাঘ্র'। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। উদয়চন্দ্র তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং বিষ্ণুরাজ প্রদেশ হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই বিষ্ণুরাজ পল্লবদেশের উত্তরে সংস্থিত। নন্দিবর্ম্মা পশ্চিম চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। বিক্রমাদিত্য ৭৩৩—৩৪ হইতে ৭৪৬—৪৭ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।† নন্দিবর্ম্মা পূর্ব্বচালুক্যরাজ তৃতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনেরও সমসাময়িক। ডক্টর ফ্লিট্ (Dr. Fleet) ৭০৯ হইতে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহার রাজ্যকাল স্থির করেন।* সুতরাং নিষাদরাজ পৃথিবীব্যাঘ্র খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমার্দ্ধেই বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে পারা যায়।

এতক্ষণ যে নিষাদদের কথা বলা হইল ইহাদের বংশে কৈবর্ত্তগণ উৎপন্ন। কৈবর্ত্ত ও চণ্ডাল মনুর সঙ্কর-জাতির ভিতর স্থান পাইয়াছে। এই দুই জাতির সংখ্যাও খুব বেশী। বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তের সংখ্যা, বাঙ্গালার সমগ্র হিন্দুর সংখ্যার অষ্টাংশ। কৈবর্ত্তদের শারীরিক গঠন প্রায় একরকমের। ইহারা খুব পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু। চারি আনা কৈবর্ত্ত বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলায় এবং ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বাস করে। আর্য্যগণ বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বে কতকগুলি আদিম জাতি এখানে বাস করিত। কৈবর্ত্তেরা ইহাদেরই একজন। এক সময়ে ইহাদের প্রতাপও খুব বেশী ছিল। ইহারা সুসভ্য জাতি দ্বারা বিজিত হইয়া তাহাদের ভাষা, সভ্যতা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সমগ্র বঙ্গদেশে ইহাদের সংখ্যা ৫০০,০০০ পাঁচ লক্ষেরও অধিক। হাওড়া জেলার কৈবর্ত্তরা সকলের চেয়ে ভালো কৃষক—খুব পরিশ্রমী। এখানকার কৈবর্ত্তরা মিতব্যয়ী—তাহারা তাহাদের শস্যজাত উপযুক্ত পরিমাণে ঘরে মজুত রাখে। ইহাদের মেয়েরা ধান সিদ্ধ করে। ইহারা খাল, বিল ও ধান-ক্ষেতে মাছ ধরে। মহাজনের নিকট ইহারা বড় একটা ধার করে না। যাহারা নিতান্ত গরীব তাহারা জাত-ভাইদের কাছে হাত পাতে। দরকার হইলে ইহারা সহরে ও কারখানায় কাজ করে।

যশোহরে প্রায় ৫০,০০০ কৈবর্ত্ত আছে। ইহাদের চৌদ্দ আনা চাষী-কৈবর্ত্ত। নদীয়া জেলার কৈবর্ত্তরা প্রধানতঃ চাষ করে, মাঝে-মাঝে মাছও ধরে। তেহাটা, দৌলতপুর ও দামুর হাটায় ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী। তেহাটায় শতকরা ২০ জন কৈবর্ত্ত। নদীয়ার সকল থানায় কিছু-না-কিছু কৈবর্ত্ত আছেই।

পূর্ণিয়া জেলার মধ্যস্থলে কোহা, কাটিহার, পূর্ণিয়া,

* কাহারও মতে শৃঙ্গবেরপুর বেরারে, কেহ বলেন মির্জাপুর জেলার নিকট ইহা অবস্থিত ; কাহারও সিদ্ধান্ত, ইহা বর্ত্তমান 'সুঙ্গরুর'।

† Epigraphia Indica, vol. VII, p. 2. Table.

* Indian Antiquary. Vol. XX, pp. 99 and 283.

কসবা ও অমুর কসবায় ইহারা থাকে। গরীব কৈবর্ত্তদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই মাছ ধরে।

খুলনায় চাষী ও জেলে-কৈবর্ত্ত দুইই আছে। সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। ইহারা প্রায়ই পোদেদের সমধর্ম্মা। ২৪ পরগণায় প্রায় আড়াই লক্ষ চাষী-কৈবর্ত্ত—মাত্র ৪,০০০ জেলে। মৈমনসিংহে কৈবর্ত্ত ১৩০,০০০। এই জেলার সিকি লোক মৎস্যব্যবসায়ী। ইহারা প্রধানতঃ কৈবর্ত্ত ও ঝালো। এখানে আদমপুরে একটি বৈষ্ণব-আখড়া আছে—কৈবর্ত্তরাই তাহার পৃষ্ঠপোষক। দিনাজপুরে কৃষিজীবী জাতির মধ্যে ইহারা প্রসিদ্ধ—ইহাদের সংখ্যা ৩৩,০০০। বাখরগঞ্জে প্রায় ৩০,০০০ কৈবর্ত্ত। এখানে চাষীদের সংখ্যাই খুব বেশী। এখানকার চাষী কৈবর্ত্তরা ফরিদপুর হইতে আসিয়া এখানে বাস করে। রংপুরের জেলেদের অধিকাংশই হিন্দু। বগুড়া জেলায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অধিকাংশই কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল ও সুবর্ণ-বণিক্‌। এখানে কৈবর্ত্ত দ্বিবিধ—হালিয়া বা চাষী ও জালিয়া। জালিয়ার সংখ্যার দ্বিগুণ চাষীর সংখ্যা। এখানকার ব্রাহ্মণেরা চাষী কৈবর্ত্তের হাতে জল খায়। এখানকার পাঁচবিবির জমিদার চৌধুরীরা চাষী-কৈবর্ত্ত। ত্রিপুরার কৈবর্ত্তের সংখ্যা ৭১,০০০। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীনতম অধিবাসী। ইহারা দুইভাগে বিভক্ত—হালিয়া-দাস ও জালিয়া। হালিয়াদাস জালিয়াদের চেয়ে বড়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রথা নাই। কোন কৈবর্ত্ত বিবাহ-বন্ধন ছিন্নও করিতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা কৈবর্ত্তের হাতে জল খায় না। কৈবর্ত্তদের স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ—নাম ব্যাসোক্ত। কৈবর্ত্তের ন্যায় তাহাদের ব্রাহ্মণেরাও উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উঁচু জাতেরা কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণের হাতে জল খায় না। শুধু তাই নয়, কৈবর্ত্তরাও তাহাদের নিজেদের ব্রাহ্মণের রাঁধা ভাত খায় না। *

প্রাচীন কালে কৈবর্ত্তরা ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ছিল। ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্ত হইয়া অন্ধ্রদেশে আসিয়া পড়ে এইখানে আসিয়া ইহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। অন্ধ্র-দিগের মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিত। দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভূত আন্ধ্র, চোড়, আভীর ও পুলিন্দগণ যেমন কালক্রমে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, কালে কৈবর্ত্তগণও ক্ষত্রিয়নামের অধিকারী হইয়াছিল। ইহাদেরও সঙ্গে কৈবর্ত্তদের সংমিশ্রণ ঘটিয়া-ছিল। বায়ুপুরাণ প্রাচীনতম পুরাণ। এই পুরাণ বলিতেছে—

> মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্ফানির্ভবিষ্যতি।
> উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্বান্ সোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি॥
> কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাংশ্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা।
> স্থাপয়িষ্যতি রাজানঃ নানাদেশেষু তেজসা॥

মহাবীর্য্য বিশ্বস্ফানি মাগধদের রাজা হইবেন। তিনি তখনকার সমস্ত রাজাকে উৎসাদিত করিয়া অন্যজাতিকে রাজা করিবেন। কৈবর্ত্ত, পঞ্চক, পুলিন্দদিগকে নানাদেশে রাজতক্তায় বসাইবেন। ইতিহাস যাহাই হউক, ফলে দেখা যাইতেছে, কৈবর্ত্তগণ এই সময়ে রাজা হইতে পারিয়া-ছিলেন। ইহাদের প্রভাব দেখিয়া পুরাণকারগণ ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া তোলেন। পূর্ব্বে বোধ হয়, কতকগুলি জাতির সংমিশ্রণে এই কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। একই ব্যবসায় করায় ইহারা পরে এক হইয়া যায়। এক হইয়া গেলেও আন্তর্গণিক বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত না থাকায় এখনও পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। এই জাতি অন্ধ্র দেশ হইতে ওড়িষা, বেহার ও বঙ্গদেশে আগমন করে।

---

* রিজ্‌লী এই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) বহ—অপপুরাণ রচনা করেন। ব্রহ্মার শাপে তাহারা বিষ্ণুপুত্র কৈবর্ত্ত-যাজী হয়।

(২) কৈবর্ত্তরা বল্লালসেনের অনেক উপকার করে। তিনি কৈবর্ত্তদের পুরস্কার দিতে রাজি হন। তাহারা প্রার্থনা করে, ব্রাহ্মণ তাহাদের পৌরোহিত্য করিবে। তিনি সত্য-রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজি না হওয়ায় তিনি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, কল্য প্রাতে যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকেই পুরোহিত করিয়া দিবেন। ঝাড়ুদারের মুখ তিনি সকালে প্রথম দেখেন। কাজেই তাহাকেই যজ্ঞসূত্র দিয়া কৈবর্ত্তদের পুরোহিত করিয়া দেন।

(৩) কোন কৈবর্ত্ত-মহাজন (মেদিনীপুর) কাসিজোড়া পরগণায় পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। তিনি স্থির করেন, মুখ দিয়া যে অগ্নি জ্বালিতে পারিবে, তাহাকে দিয়াই পূজাদি করাইবেন। একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ এই কার্য্য করায় জাতিচ্যুত হয়।

এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, অন্ধ্রদেশের পূর্ব্বে এইসমস্ত দেশে ইহাদের অস্তিত্বের কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না।

কৈবর্ত্তগণ মৎস্যজীবী জাতি। ভারতে এমন অনেক জাত আছে, যাহারা মাছ ধরাকে তাহাদের পুরুষানুক্রমিক জীবিকা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশী। ইহাদের মধ্যে এখনও যাহারা প্রধানতঃ মৎস্যজীবী তাহাদের সংখ্যা খুবই কমিয়া আসিয়াছে। ইহারা নিজেদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বড় বড় নদীর তীরে ও উপকূলে বাস করিয়া থাকে। এই মৎস্যজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা মাছধরা ব্যবসা ছাড়িয়াছে তাহারা পৃথক্ শাখারূপে নিজেদের পরিগণিত করিয়া সমাজে আপনাদিগকে জালজীবীদের চেয়ে বড় মনে করে। মৎস্যজীবীরা যেমন নিজেদের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিল, অমনি তাহারা একটু-একটু করিয়া নিজেদের ব্যবসায় হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সময়ও তাহারা জলের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ভুলিতে পারে নাই। তবে পরিবর্ত্তনের প্রথমাবস্থায় মাছ-ধরা ছাড়িয়া নৌকা বাহিতে লাগিল, এমন কি, বড় নৌকা বাহিয়া সাগর পর্য্যন্ত যাইতে লাগিল। তার পর যেখানে মাছ সাধারণের প্রধান খাদ্য নয় এবং নৌকা বাহিয়া জীবিকানির্ব্বাহের তেমন সুবিধা নাই, সেখানে মৎস্যজীবী জাতি জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় ধরিল; কোথাও বা কাঁধে-কাঁকে করিয়া দ্রব্যাদি বহন করিতে লাগিল; কোনও স্থানে দূরদেশের যাত্রীদের পাল্কী বহিতে লাগিল। পাল্কীতে যাইবার সময় পথিমধ্যে সময়ে-সময়ে যাত্রীদের তৃষ্ণা-নিবারণের প্রয়োজন হইত। তখন এই বাহকদিগের দ্বারা জল আনাইতে তাঁহারা বাধ্য হইতেন। ইহা হইতেই এই মৎস্যজীবী জাতির মধ্যে যাহারা মাছধরা ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহারা ক্রমশঃ জলচল জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণভারতের লোকদের নিষ্ঠার মাত্রা একটু বেশী। তাহারা ইহাদের জলাচরণীয় জাতির মধ্যে ফেলিল না। তবে অন্যস্থানের শ্রেষ্ঠবর্ণেরা ইহাদের বহিয়া আনা জল পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করিতেন না। এইরূপে ক্রমশঃ তাহারা শ্রেষ্ঠবর্ণদিগের গৃহকার্য্যে অধিকার লাভ করে। এইপ্রকারে ক্রমে-ক্রমে অন্যান্য কর্ম্মেরও তাহারা অধিকার পায়। উত্তর ও পূর্ব্বভারতের অনেক স্থলে ইহারা ভুঁজা ভাজিয়া ও মিষ্টান্ন তৈরী করিয়া দোকানে বিক্রয় করে। ভদভুঞ্জ, কাণ্ডু ও ভাটিয়ারা—এই তিন জাতির এই বৃত্তি। কিন্তু ইহারা এখন সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে মূলতঃ ইহারা মৎস্যজীবী। যাহারা মাছের ব্যবসা ছাড়িয়াছে, তাহারা সমাজে একটু বড় হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে জেলে বা মেছো-কৈবর্ত্তদের চেয়ে হেলে কৈবর্ত্তরা বড়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে একই মৎস্যজীবী জাত হইতে দুইটি পৃথক্ জাতি হইয়াছে—কোড়ী ও তলবদা। কোড়ীরা মাছ ধরে বলিয়া তাহাদের নাম 'মাছি'—যাহারা হলকর্ষণ করে তাহাদের নাম 'তলবদা'। ভোয়ী নামে আর-একটি মৎস্য-জাতি আছে। ইহাদের দুইটি থাক্ আছে—একশ্রেণী মাছ ধরে, অপরশ্রেণী মোট বয় বা ভৃত্যের কাজ করে। তেলিঙ্গনার 'বোয়া' জাত হইতে ভোয়ীদের উৎপত্তি। বোয়াদেরও এক শ্রেণী মাছ ধরে। বেনেস্ (Baines) কৈবর্ত্তদের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। 'ব' দ্বীপের উপরে গঙ্গার উপত্যকায় এই মৎস্যজীবী জাতিকে কোন-না-কোন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরাঞ্চলের নিষাদ-জাতির কোন শাখা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। কৈবর্ত্ত জাতি ভারত, ওড়িষা ও বঙ্গের কোন-কোন স্থানে 'কেবট' নামে প্রসিদ্ধ। অযোধ্যা ও বেহারের কেবটরা প্রায় সকলেই চাষী। ফৈজাবাদের মধ্যভাগে ও পূর্ব্বাঞ্চলে ৪১,০০০ কেবট থাকে—তাহারা সকলেই চাষী। গোরখপুরের হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে কেবটদিগের সংখ্যা অধিক ও সেখানে ১২৩,০০০ চাষী-কেবট। বস্তিতে ৪০,০০০ এবং মির্জ্জাপুরেও সমসংখ্যক কেবট বাস করে। ইহারাও চাষী। রায়পুর ও বিলাসপুরে ৮৫, ৬৯০ কেবট। কতক মাছ ধরে, কতক চাষ করে। ইহারা চতুর্ভুজ দুর্গা-দেবীর পূজাও করে, আবার শূকরও খায়। (J.A.S.B. 1890 p. 299) মধ্য প্রদেশের কেবটরা মহানদী ও তাহার শাখা-নদীতে এখনও মাছ ধরে। ওড়িষার সমুদ্রতীর ও পশ্চাদ্বর্ত্তী নিম্নভূমিতে পূর্ব্বে নৌকর্ম্মজীবী ও মৎস্যজীবী কৈবর্ত্তরা

বাস করিত। এখন ওড়িষায় কেবট, গোখা ও মাল্লারা থাকে। পুরীতে ৩৪,০০০ কেবটের বাস। সম্বলপুরের কেবটরা (৩৩,০০০) নৌকা বয় বা মাছ ধরে। সোনপুরে নৌজীবী কেবট একটি প্রধান জাতি। আসামেও যথেষ্ট কেবটের বাস। দরাঙে কেবটরা বড় জাতি—সংখ্যা ১৩,৬০০। গৌহাটী সব্‌ডিভিশনে অধিকাংশ অধিবাসীই কলিতা ও কেবট; ইহারা সেখানকার সম্ভ্রান্ত শূদ্রজাতি। নওগঙ জেলায় কেবটের সংখ্যা বড় কম নয়। ইহাদের সংখ্যা ১৩,০০০। শিবসাগরে অনেক কেবটের বাস। তবে সেখানে কলিতাই (৩৬,৬০০) বেশী। ৪১,৬০০ কেবট কামরূপের অধিবাসী। পূর্ব্ববঙ্গে কেবটদের একটা মস্ত আড্ডা আছে। ইহারা মাছ ধরে না—কৈবর্ত্তদের নিকট হইতে কিনিয়া খুচরা বেচিয়া থাকে। এই কেবটরা কৈবর্ত্তদিগকে তাহাদের চেয়ে ছোট মনে করে। কেবট ও কৈবর্ত্তরা পূর্ব্বে যে একই জাতি ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কালে তাহারা নিজেদের পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছে।

হাজার বৎসরের কিছু পূর্ব্বে এই জাতির শৌর্য্যবীর্য্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা এই সময়ে যে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। কবি সন্ধ্যাকর-নন্দী লিখিত রামচরিতে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ত্তপ্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হন। ইনি অত্যাচারী ছিলেন। নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। কৈবর্ত্তবীর দিব্য বা দিব্বোক মহীপালকে যুদ্ধে নিহত করেন এবং 'জনকভূ' বা পালরাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্র অধিকার করেন। দিব্বোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'রুদোক'। ইহার পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজসিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। * পালরাজাদের সময়ে কৈবর্ত্তপ্রজারা বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের শক্তি-বলে রাজ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান উচ্চ ছিল না, কেননা পালরাজাদের সময়ে কৈবর্ত্তদের মন্ত্র দেওয়া হইত না। বল্লালচরিতে কৈবর্ত্তদিগকে নৌজীবী, হলজীবী, জালজীবী হীনশূদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। * প্রাচীন স্মার্ত্ত ততকর গুপ্ত + ইহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ইহাদের বিশেষ হীনত্বব্যঞ্জক। ততকর গুপ্তের উক্তি এই—

"তদ্ যোগাৎ অসম্বরিণঃ কৈবর্ত্ত-খাটিক-
খেটিকাদয়ঃ নপুংসকাশ্চ স্বভাবেনৈব সম্বরার্হা
ন ভবন্তি। অমীষান্ত সম্বরো ন দেয়ঃ।
কিন্তু কৈবর্ত্তাদয়শ্চ যদা প্রাণাতিপাতাদি-
ক্রিয়য়া জীবিকাং ত্যজন্তি তদা সম্বরো ন দেয়ঃ।"

বঙ্গদেশ যে সমস্ত বিষয় লইয়া গৌরব করিতে পারে তাহাদের মধ্যে নাথ-ধর্ম্ম একটি প্রধান গৌরবের জিনিস। এই নাথ-ধর্ম্মের একজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ গুরু ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। ইনি কৈবর্ত্ত-কুল-গৌরব। "মহাকৌল জ্ঞানবিনির্ণয়ে" ইহার পরিচয় আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ হইতে মৎস্যেন্দ্রের পরিচয় দিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯,৫২ পৃষ্ঠা)। মৎস্যেন্দ্রের জন্মস্থান বরিশালের চন্দ্রদ্বীপে (চেঁদোয়)। মৎস্যেন্দ্রের অনেকগুলি নাম ছিল। ইনি মৎস্যের অন্ত্র খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া ইহার একটি নাম 'মৎস্যান্ত্রাদ' (মঙ্গোলিয়ন—Dzigasum tacigaltu") বা 'লুইপা'। লুইপার রূপান্তর—লুই-ই-প (Lui-i-pa), লুয়িপ (Lu-yi-pa), লূ-ই-পা (Lu-i-pa), লুহিপাদ

* রামপালচরিত—১।২৯, ৩১—৩৯, ৪০; গৌড়রাজমালা—৪৮ পৃষ্ঠা।

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ, প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক ১৩৩০। রুদ্রযামল কুড়িটি জাতির পুরোহিত পতিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতিগুলির মধ্যে কৈবর্ত্ত একটি।
"These Seven, the Rajaka, Karmakara, Nata, Baruda, Kaivarta, and Medavilla, are the last tribes. Whoever associates with them undoubtedly falls from his class;......Whoever approaches their women, is doubtless degraded from his rank."—Colebrooke's Essays, Vol II., p. 164.

+ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট নেপাল হইতে সংগৃহীত এই দুষ্প্রাপ্য পুঁথিখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

(Luhipada) ও লো-হি-প (Lo-hi-pa)। ইহার তিনটি তিব্বতী নামও আছে—Na lto ba, Nai rgyu, ma za ba, ও Nai rgyu lto gsol ba।

ওড়িষায় একখানি প্রাচীন কাব্য আছে, নাম—"কপটপাশা"। উৎকলবাসি-সমাদৃত এই কাব্যখানির রচয়িতা—"ভীমা ধীবর"। সামান্য একজন জেলের ছেলে সেকালের একজন নামজাদা বড় কবি ছিল, কৈবর্ত্তদের ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নয়।

পুরীর ডায়েরি

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

পূজার ছুটির ভেতর যে-জরটা একান্ত আকস্মিকভাবেই দেহটাকে অভিভূত করে' ফেল্ছিল, পূজার ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও তার জের যখন মিট্‌ল না তখন ডাক্তারেরা উপদেশ দিলেন পুরীটা ঘুরে' আস্‌বার জন্যে। সুতরাং পোঁটলা-পুঁটুলী বেঁধে এক রাত্রে হঠাৎ বেরিয়ে পড়্‌লুম পুরীর পথে। বাড়ী আগে থাকৃতেই ঠিক হয়েছিল বন্ধু-বান্ধবদের কল্যাণে। বাক্স-প্যাঁট্‌রা এবং বাক্স-প্যাঁট্‌রারই সামিল একটি মেয়ের দঙ্গল নিয়ে বাড়ীর চৌকাট-টায় পা দিতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম—বাড়ীটাতে যারা বাস কর্‌ত তা'রা সদ্য-সদ্য চলে' গেছে। যাবার জন্যে যে তা'রা প্রস্তুত ছিল না, তারও পরিচয় পেলুম, ঘরে ঢুকে'ই ঘরগুলোর অবস্থা দেখে'। অনেকগুলো দর্‌কারী জিনিষ যা ধীরে সুস্থে গেলে গুছিয়ে নেওয়া চল্‌ত তা গুছিয়ে নেওয়া হয়নি। একটা তা'কের ওপর কতকগুলো বই ছড়ানো পড়ে' রয়েছে, আর-একটা ঘরের কোণে একটা কাঠের বাক্সের ভেতর ভাগে-ভাগে অনেকগুলো ডা'ল-চা'ল-মশলা সাজানো। চমৎকার একটা জলের কুঁজো সেই ঘরেরই আর-একটা কোণে দিব্য আরামে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার তাকে তিন-চারটা 'টি-কাপ' একটা বড়ট্রে'—এগুলোও নেওয়া হয়নি।

'পুরী ক্ষয়-রোগীদের ডিপো' বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এরকমের একটা পরিত্যক্ত বাড়ী দেখে' রীতিমত ভয় পেয়ে বন্ধু নীরেনকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম—বাড়ীটে 'হোয়াইট্‌ওয়াশ্‌' করা হয়নি দেখ্‌ছি; কোনো ছোঁয়াচে রোগের রোগী-টোগী ছিল না ত?

বন্ধু হেসে বল্‌লেন—আরে না না, এ-বাড়ীতে ছিল একটি মেয়ে; আর কয়েকদিন পরে তার পেছনে এসে জুটেছিল একটি যুবক। মেয়েটিকে যদি তুই দেখ্‌তিস্—একেবারে তরল চপল বিদ্যুৎপুঞ্জ!

আমি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে' বল্‌লুম—দুর্ভাগ্য—দুর্ভাগ্য! যাক্, ভালোই হয়েছে, দেহের জ্বরে তবু টি'কে' আছি, এর পর মনের জ্বর সুরু হ'লে আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে পার্‌তুম না। তার পর জানিস্ ত ভাই, তোর বৌদি সামান্য একটুতেই ভারি ঘাব্‌ড়ে যান।

নীরেন উচ্চ হাস্যে বাড়ীটাকে মুখরিত করে' তার বৌদির সন্ধানে উঠে' পড়্‌ল। তা'কে বিদেয় দিয়ে যে-ঘরটাকে শোবার ঘর কর্‌ব বলে' মনে করেছিলুম সেই ঘরটাতে প্রবেশ কর্‌লুম। ঘরটার এক পাশে কতকগুলো কাগজ ছড়ানো পড়ে' রয়েছে। হঠাৎ নীরেনের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে' কাগজগুলো হাত্‌ড়াতে বসে' গেলুম। দু'চারখানার ওপর চোখ বুলিয়ে সব ঝেঁটিয়ে ফেল্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ব মনে কর্‌ছি, হঠাৎ চোখ পড়ে' গেল, একখানা সৌখীন-ধরণের বাঁধানো খাতার ওপরে। তার মলাটের ওপর মেয়েলীহাতের পরিষ্কার-ছাঁদে লেখা—'পুরীর ডায়েরি'। লেখাগুলো মায়া-মৃগের মতন আমার

মনকে আকর্ষণ করতে লাগল। জিনিষ-পত্র গোছাবার ভার আর সকলের হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্যান্‌ভাসের ইজি চেয়ারখানা সমুদ্রের ধারের দিকের বারান্দায় বিছিয়ে নিয়ে আমি পড়তে সুরু করে' দিলুম।

(১)

১২ই আশ্বিন—১৩২৮

হঠাৎ কেন খেয়াল হয়েছিল পুরীতে আসতে জানিনে। খেয়াল যখন হ'ল বেরিয়ে পড়লুম বৃহস্পতিবারের বার-বেলায়, সেই সমুদ্রের উদ্দেশে যার রূপের কখনো অন্ত পাইনি, বহুরূপীর মত যার চেহারা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লায়। ভোরের আলো আকাশের গায় ফুটে' ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরীর তোরণ-তলে বাষ্পের রথ এসে থাম্‌ল। পাণ্ডাদের হাত এড়িয়ে যেমন সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালুম, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সারা রজনীর জাগরণ-ক্লান্ত নয়ন একেবারে জুড়িয়ে গেল। মেঘের ভেতর দিয়ে রৌদ্রের ছায়া এসে পড়েছে, আধখানি সমুদ্রের বুকের ওপরে হাসি কান্নার অপূর্ব্ব আলেখ্যের মতো। চোখ ভরে গেল, সমুদ্রের দোলার সঙ্গে তাল দিয়ে মন দুলে' উঠ্‌ল। সমুদ্রের রূপ আমায় টান্‌ছে, তার দোলানি আমার মনকে দোলাচ্ছে, তার মায়া আমার দেহ-মনে ইন্দ্রজাল রচনা করছে।

আধ-ভেজা বালির ওপরে পা ছাড়িয়ে বসে' পড়লুম। একটা ঢেউ ছুটে' এসে ফেনার ফুল দিয়ে আমার পায়ের প্রান্ত স্পর্শ করে' অভ্যর্থনা করে' গেল। তীরে বালু-বেলার ওপরে লোকজনের আনাগোনার ভিড় বেশ বেড়ে উঠেছে—ঠিক কল্‌কাতার পথের ভিড়ের মতন। কিন্তু কল্‌কাতার পথের ভিড়ের সঙ্গে এভিড়ের তফাৎও ঢের। সেখানে বাইরে মুখ বা'র করলেই হাজার ক্ষুধার্ত্ত চক্ষুর ক্ষুধা যেন মুখের ওপর পড়ে' হাহাকার করতে থাকে। এখানেও লোকে মুখের দিকে তাকায় বটে, কিন্তু সে তাকানো দূর পথ-যাত্রীর পথের মাঝে হঠাৎ সঙ্গী মিলে যাওয়ার মতো আনন্দ এবং সহানুভূতির আলোকে ভরা—তার ভেতর ক্ষুধা আছে বটে, কিন্তু অতৃপ্তির হাহাকার নেই।

বেশ লাগছে! কালো ঢেউয়ের ফণার ওপরে সূর্য্যের আলো সাপের মাথার মণির মতন জলছে। আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য এই সমুদ্রের। এই ফেন-হাস্যে মুখর হ'য়ে ওঠে, এই ক্রন্দনের বিক্ষোভে আবার বেলাতটের ওপর ভয়ার্ত্ত শিশুর মতন আছড়ে পড়ে। মেঘের মায়াজালের ভেতর এক মুহূর্ত্তে সে আপনাকে হারিয়ে ফেলে, আবার পর মুহূর্ত্তেই রৌদ্র-দীপ্ত আকাশের দিকে হাজার বাহু মেলে' ইন্দ্রধনুর রচনা করে' যায়। দেহ তার নীলার মতন নীল এবং হাসি তার ইস্পাতের ছুরির মতন সাদা!

(২)

১৫ই আশ্বিন—১৩২৮

বিকেল পাঁচটায় ডায়ারির পাতায় আজ সকালের ছবিটি ধরে' রাখছি।......

বাতাস মাতাল হ'য়ে উঠেছে। আর তারি মাত্‌লামির আমেজ এসে লেগেছে সমুদ্রের বুকে—সমুদ্র টল্‌ছে—হেল্‌ছে—দুল্‌ছে! ঢেউগুলো তা'র আছ্‌ড়ে পড়ছে আধখানি সাগরের জলরাশিকে টেনে নিয়ে বেলাতটের বুকের ওপরে। সমুদ্রের ডাক আমার মনের কাণে এসে পৌছল। সে ডাক প্রলয়ের কল্লোলের মতন গাম্ভীর্য্যে ভরা অথচ তার ভেতর হ'তে আহ্বানের বাঁশীও বেজে উঠছে। ধ্বংসের রুদ্রদেবতার মতন রূপ তার অপূর্ব্ব। এ-রূপ সকলের চোখে পড়ে না—কিন্তু যার চোখে পড়ে, সে চোখ ফেরাতেও পারে না।

তীরে স্নানার্থীর ভিড় নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সাগরের এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখে' রুদ্রদেবতার দু'চারিটি বেপরোয়া ভক্ত ছাড়া আর কেউ সমুদ্রের কোলের কাছে ভেড়েনি—ভিড়তে সাহস পায়নি। কিন্তু আমার কানে যে সমুদ্রের আহ্বান এসে পৌঁছেচে—আমি ফিরতে পারলুম না, সমুদ্রের হাজার বাহুর আলিঙ্গনের ভেতর আপনাকে এলিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে চল্‌লুম!

ঢেউয়ের পথে-পথে মেঘের দামামা বাজছে। ঐ সে অজগরের মতন গড়াতে-গড়াতে এগিয়ে আস্‌ছে;—মাথার ওপর দিয়ে একটা চলে' গেল, লাফিয়ে উঠে' আর একটাকে এড়িয়ে গেলুম। একবার একটা অসাবধান মুহূর্ত্তে মাটির সঙ্গে পা বাধাতে না পেরে একটা তীর-গামী

ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যেতেই একজন লোকের সঙ্গে হাত দুটো লতার মতো জড়িয়ে গেল। ঢেউটা সরে' যেতেই, দেখলুম, 'একটি তরুণ মানবের সঙ্গে স্রস্ত-বাস দেহখানা আলিঙ্গনের মতন হ'য়েই জড়িয়ে আছে। একান্ত অসহায় আমাকে তাঁর সবল বাহুবন্ধের বেষ্টন হ'তে মুক্তি দিয়ে যুবক বল্‌লেন—'সমুদ্র আজ ভারি ক্ষেপে উঠেছে, সাবধান!'

একটু কুণ্ঠা-মিশ্রিত অবজ্ঞার হাস্যে তাঁ'কে পুরস্কৃত করে' প্রকাণ্ড একটা ঢেউকে গ্রহণ কর্‌বার জন্যে আবার রুখে' দাঁড়ালুম। সমুদ্রের দুঃসহ আনন্দ-অত্যাচার, তার নিষ্ঠুর স্নেহের উন্মাদনা আমার সারা দেহে নির্দ্দয় আঘাত করে' গেল। তার আলিঙ্গনের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার দুর্ব্বল দেহ কখনো সাম্‌নে কখনো পেছনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন দুল্‌তে লাগল। লোণা জলের ঝাপটায় চোখ দুটো দারুণ ব্যথায় বিষিয়ে উঠল। সমস্ত শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে একটা ক্লান্তির অবসাদ অনুভব কর্‌তে লাগলুম। তবু সমুদ্রের বুকের মায়া আমাকে সাপের মতন করে'ই জড়িয়ে ধরে' রইল। মরুপথে যারা চলে তাদের চোখের সম্মুখে মরীচিকা যে ছায়া-শীতল উদ্যানের রচনা করে, তার অস্তিত্ব নেই জেনেও যেমন পিপাসাতুর মরু-যাত্রী তার পথ হ'তে আপনাকে ফেরাতে পারে না, ক্লান্তি তাদের যত বেড়ে যায়, গতি তাদের ততই দ্রুততর হ'য়ে ওঠে, ঠিক তেম্‌নি করে' সমুদ্রের মায়া আমার ভেতর একটা মরীচিকার সৃষ্টি করে' বস্‌ল। সে-মরীচিকার মোহ কাটিয়ে ফিরে' আস্‌বার আগেই একটা ফিরে-চলা ঢেউ আমাকে তার নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী করে' বুকের ভেতর জড়িয়ে নিলে। ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ ক্ষুধার্ত্ত দরিয়ার মুখের অবগুণ্ঠন হঠাৎ খসে' পড়ল। তীরের দিকে তাকিয়ে শঙ্কা-বিহ্বল-কণ্ঠে আমি চীৎকার করে' উঠলুম। সমুদ্রের মায়া তখন টুটে' গেছে, ঘন নীল নিতল জলের অন্ধকার আমার চোখের সাম্‌নে একটা বিশ্রী কালো যবনিকা মেলে' ধরেছে মৃত্যুর ছায়ার মতন, ঢেউগুলো সাপের মতন বেঁকে-বেঁকে চলেছে ফণা তুলে'-তুলে'। সেই বীভৎস, বিবর্ণ সমুদ্রের চেহারার পানে চেয়ে-চেয়ে আমার চোখের সাম্‌নের আলো নিবে' যাচ্ছে। হঠাৎ বুকের ওপর কার দুটি বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শ পেলুম। তাকিয়ে দে[খি] সেই তরুণ যুবকটি। ক্রুদ্ধ কঠিন মুখখানা তার আম[ার] বুকের কাছে ঝুঁকে' পড়েছে, দৃষ্টির ভেতর তার কঠো[র] তিরস্কার পুঞ্জীভূত। বিরক্তিতে তার মুখ ভারী হ'[য়ে] উঠেছে, কিন্তু তবু সে প্রাণপণে লড়ছে সমুদ্রের সঙ্গে। সমুদ্রের প্রহার যত কঠিন হ'য়ে উঠছে আমাকে ছিনি[য়ে] নেবার জন্যে তার স্পর্শের দৃঢ়তা ততই নিবিড় কর[ছে] অনুভব কর্‌তে লাগলুম।

জীবন-মরণের এদ্বন্দ্ব মন্দ লাগছে না। অপরিচি[ত] বন্ধুর স্পর্শ এসে লাগছে দেহের সঙ্গে, তার উষ্ণ নিশ্বা[স] আমার দেহের রক্তকণাগুলিকে দোলা দিচ্ছে, লজ্জা নেই ভয় নেই! অজানা পথ-যাত্রায় সঙ্গী—মৃত্যু-বাসরে[র] অপরিচিত প্রিয়তম! মনে হচ্ছে মরণের আগের মুহূর্তে এ-স্পর্শকে সাথী করে' বেশ চলে' যাওয়া যায়—মৃত্যুর যে পথটায় একা পা বাড়ানো যায় না, দুজনে মিলে' সে-পথ পাড়ি দেওয়া মোটেই কঠিন নয়! আমার দেহ তার বাহুর তলে একেবারে এলিয়ে দিলুম।......

* * *

আমাকে নিয়ে সে যখন তীরে ফিরে' এল তখন তার অবসন্ন দেহ একেবারে এলিয়ে পড়েছে। হাপরের হাওয়ার মতন বুকের ভেতর প্রাণটা যে তার দুপ-দাপ কর্‌ছে, বাইরে থেকে তার শব্দ শুনে' আমার চিত্ততল বেদনায় ব্যথিয়ে উঠল—কিন্তু তার বরফের মতন ঠাণ্ডা চাউনির দিকে তাকিয়ে মমতা দূরে যাক্‌, একটা কৃতজ্ঞতার কথাও ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লুম না। কেবল তাঁ'কে বলে' এলুম—সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ঐযে লাল রংএর বাড়ীটা আকাশের পানে মাথা তুলেছে—ঐটেই আমাদের···কিন্তু কথাটা শেষ কর্‌তে পার্‌লুম না—আমারও শরীর এলিয়ে আস্‌ছে!

(৩)

১৬ই আশ্বিন—১৩২৮

ভোরের বেড়ানো শেষ করে' চিঠি নিতে পোষ্ট আফিসে এসে দাঁড়িয়েছি, মেমসাহেব পোষ্টমাষ্টার আমার নামের চিঠিখানি হাতে দিয়ে একটু মৃদু হাস্‌লেন। দু'দিন আগে এই পোষ্টমাষ্টারনীর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়ে গেছে।

চিঠিখানি নিয়ে উঠে'-যাচ্ছি, তিনি কৃত্রিম অভিমানের স্বরে বল্‌লেন—You should have thanked me. আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে পড়লুম। চিঠিখানার চেহারায় এবং তার ভেতকার গন্ধে একটু বাহুল্য ছিল। মেমসাহেব হয় ত মনে করেছেন, চিঠিখানা আমার প্রিয়তমের চিঠি। বাইরে এসে খুলে দেখি—প্রিয়তমেরই বটে! চিঠি লিখেছে পরেশ—একেবারে প্রেমের নিবেদনের স্তুতিগানে ভরা। সে লিখেছে—আমার পায়ের তলে তার মুগ্ধ হৃদয়টি সে একান্তভাবেই উৎসর্গ করে' দিয়েছে, তার হৃদয়-শতদল বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, সূর্য্যের মতন আমারি মুখের পানে চেয়ে। আমি যদি গ্রহণ না করি, তার অমূল্য জীবন একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। আমি কবে ফির্‌ব? আমারি পথের পানে তার সমস্ত হৃদয় পড়ে' রয়েছে একটা দৃষ্টির মতন হ'য়ে—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এম্‌নি-ধরণের চিঠি এ-জীবনে আরো কত পেয়েছি—হয়ত আরো অনেক পেতে হবে। পুরুষের এই ক্যাঙলাপনা—এ আমার মোটেই ভালো লাগে না। পুরুষের যা বৈশিষ্ট্য এদের সেই জিনিষটারই অভাব রয়ে' গেছে—এদের মনের দৃঢ়তা নেই। এরা প্রথম যে-নারীকে চোখ মেলে' দেখে, তারি সঙ্গে প্রেমে পড়ে' যায়। তার পর দুদিন পেরুতে না পেরুতেই মোহ যখন টুটে' যায় তখন এই মাথার মণিই হ'য়ে ওঠে, বুকের ভারী বোঝার মতন। আমার চোখের সাম্‌নে এদের লালসার মদ রক্তের মতন রাঙা হ'য়ে অনেকবার পান-পাত্র পূর্ণ করে' উপ্‌চে পড়েছে। অনেকবার তা হাতে করে' তুলে' ধরেছি, কিন্তু অধর গলিয়ে তা ভেতরে গ্রহণ কর্‌তে পারিনি। এত বড়-বড় পুরুষগুলো নারীর রূপের সাম্‌নে যে কেন ডিনামাইটে ধ্বসে-পড়া পাহাড়ের মতন গুঁড়িয়ে যায় আমার কাছে তা ভারি আশ্চর্য্য বলে' মনে হয়।

পরেশকে নিয়ে খেলাটা হয়ত একটু বেশী হ'য়ে পড়্‌ছে—আর নয়। যে পতঙ্গ স্বেচ্ছায় আগুনের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তা'কে পুড়িয়ে আগুনের কোনো গৌরব নেই। তা'কে লিখে' দিচ্ছি—খেলার যবনিকা এইখানে পড়ে' গেল—সে যেন আমাকে আর চিঠি না লেখে!

দূরে সমুদ্রের সাথে আকাশ মিশে' গেছে—মহামিলনের অন্তরালে। তার পেছনে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই মিলনের বার্ত্তা তরঙ্গের তালে-তালে দুল্‌ছে, তার সঙ্গীত তরঙ্গের ভাষায় ছন্দিত হ'য়ে বিশ্বের বেলার ওপর লুটিয়ে পড়্‌ছে। অসীম আকাশ যেমন অশান্ত সমুদ্রকে গ্রহণ করেছে তেম্‌নি একজনকে পাইনে যে পরেশ নরেশ নয়—যে এই দুর্ব্বিনীত নারী-হৃদয়কে আপনার প্রেমের গভীরতার দ্বারাই জয় করে' নিতে পারে? কে জানে কেন, প্রাণে আজ, জয় কর্‌বার নয়, পরাজিত হবার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হ'য়ে উঠেছে।

(৪)

১৭ই আশ্বিন—১৩২৮

জ্যোৎস্নার সমুদ্রেও আজ বান ডেকেছে। আকাশ ছাপিয়ে বাতাসের বুক ভেদ করে' অসংখ্য অক্ষৌহিণী তার পৃথিবী বিজয়ের অভিযানে মেতে উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে ঢেউগুলো তার চক্‌চক্ কর্‌ছে। তীরের ওপর কুন্দফুলের মতন সাদা ফেনার আস্তরণ।'

সমুদ্র বুঝি চাঁদকে ভালোবাসে। তাই চাঁদের জন্য সমুদ্রের ক্ষ্যাপামির অন্ত নেই। চাঁদের পানে সমুদ্রের বাহু কি আকুল আগ্রহে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—কি আকুল আর্ত্তনাদ তার বুকে! দূরের দুষ্প্রাপ্যের জন্যে এই আকাঙ্ক্ষা—এই হাহাকার, এ-মানুষের চিরন্তন দুর্ভাগ্য!

কেবল মনে পড়্‌ছে সেদিনের সেই স্নানের কথা—আর সেই পাথরের মতন কঠিন অথচ করুণায় উজ্জ্বল সেই মুখখানি। সমস্তটা দুপুর তারি প্রতীক্ষায় কেটে গেছে, সমস্তটা সন্ধ্যাও তারি প্রতীক্ষায় কেটে গেল। সে আস্‌বে না জেনেও প্রতীক্ষার নেশাটা কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। যে উপেক্ষার অপমানের সঙ্গে সে আমাকে প্রাণটা ভিক্ষার বস্তুর মতন ফিরিয়ে দিয়ে গেল, সে ভিক্ষার সঙ্গে আমার কোনো কালের পরিচয় নেই। এতকাল আমি সকলকে অনুগ্রহ বিলিয়ে এসেছি, যাকে একটুখানি হাস্য, দুটো মিষ্টি কথা, এক ঝলক বিহ্বল চাউনি বিতরণ

করেছি, সেই আপনাকে সার্থক মনে করেছে—আর এ তার দুটো বাহুর ভেতর আমার বেপমান বিহ্বল তনুলতাখানি জড়িয়ে ধরে'ও কোনো স্পন্দন অনুভব করলে না? তার মানা না-মানার তিরস্কার দুটো চোখের কঠিন দৃষ্টির ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ তীরের মতই আমাকে বিদ্ধ করে' গেল। এখনো সে চাউনির কথা আমি ভুলতে পারছিনে। মহাভারতের ভীষ্মকে কবির কল্পনার বস্তু মনে করতুম, এখন দেখছি মানুষের রক্ত-মাংসের দেহের ভেতরেও ভীষ্মের প্রাণ আছে।

সমস্তটা সমুদ্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সাম্‌নের খানিকটা বাদ দিয়ে পেছনের সবই জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোর মধ্যে হারিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার কুহেলিকা যে মায়া রচনা করেছে তা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। এই অস্পষ্ট অজানার ভেতর হারিয়ে যাওয়ার যে একটা অপরূপ মাধুর্য্য আছে তা আমাকে মাতাল করে তুললে। বেরিয়ে পড়লুম প্রকৃতির সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের অভিসারে।

তীরে নেমে দেখলুম আরো অনেকে বেরিয়ে পড়েছে, আমারি মতন এই অজানার অভিসারে। দলে-দলে নর-নারী জ্যোৎস্নার অবগাহন করছে। বালক-বালিকাদের একটা দল হুল্লোড় করে' আমার সাম্‌নে দিয়ে চলে' গেল। তাদের পায়ে-পায়ে উৎক্ষিপ্ত ভেজা বালির খানিকটা ছিটকে এসে আমার গায়ে লাগল। ফিরে' তাকিয়ে দেখি ঠিক আমার পেছনেই একটি কিশোরী একটি কিশোরের হাত ধরে' চলেছে। কিশোরীর মুখের লজ্জার আভা সেই অস্পষ্ট আলোতেও রাঙা অরুণের রেখার মতন জ্বলছে—সম্ভবতঃ এরা সদ্য-পরিণীত। দুজনের মুখেই মিষ্টি হাসি। সেই মিষ্টি হাসিতে তাদের মুখ-দুখানি সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের কুঁড়ি বলে' মনে হ'ল। একেবারে সমুদ্রের ধারে বসে' একটি যুবক বালি খুঁড়ে' পিরামিড তৈরি করছে। যে খেলা কেবল ছোট ছেলেমেয়েদেরই মানায় এই পরিণতবয়স্ক যুবকের পক্ষেও তা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বলে' মনে হচ্ছে না। এই জ্যোৎস্নার মায়া-কাঠির স্পর্শে তার মন বুঝি কুড়ি বছর আগের একটা বয়সে ফিরে' গেছে! দূরে—অনেক দূরে একটা বাঁশী বাজছে। সুর ভালো করে' বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তার আহ্বান বাতাসকে মাতাল করে' তুলেছে। আমার বুকের রক্তের তালে-তালে তার ধ্বনি ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। কোথায়—কত দূরে সে? পৃথিবীর এই সীমানায় না চোখের দৃষ্টির পরপারে, যেখানে সমুদ্র ও জ্যোৎস্না পরস্পরের ভেতর আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে! পথ ক্রমেই জন-বিরল হ'য়ে উঠছে, বাস-বিরল দেহের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের শীকর-ধোয়া ঠাণ্ডা বাতাস একটা মৃদু বেপথুর সৃষ্টি করছে—কিন্তু বাঁশীর সুরও ক্রমেই স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছে।

বাঁশী গাইছে—'সখি জাগো জাগো'।

কা'কে জাগাবার সাধনায়, কোন্ মৃত প্রিয়াকে প্রাণ দেবার জন্যে এ-যুগের 'অর্ফিয়াস' বাঁশীর সুরে ঝঙ্কার তুলেছে আজ এই জ্যোৎস্না-ধোয়া উপকূলে?

'জাগো নবীন গৌরবে
জাগো বকুল-সৌরভে'

সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায় কি তার প্রিয়া ঘুমিয়ে আছে? নীল শাড়ীর জ্যোৎস্না-জড়ানো আঁচল অই বুঝি তার দুলছে ঢেউয়ের বুকে বুকে?

'আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে'

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তীর ছাড়িয়ে অনেকটা দূর এসে বেশ বড় একটা ঝিনুক আমার পায়ের ওপর ছুঁড়ে' দিয়ে গেল। সমুদ্রের অতল শয়নে প্রবালের শয্যায় যে সাগরিকা ঘুমিয়ে আছে, গানের তান তা'কেও আঘাত করে' বুঝি জাগিয়ে দিয়েছে; এই ঝিনুক বুঝি তারি ঝিনুকের নৌকায় অতল সাগর পাড়ি দেওয়ার নিশানা।

একটা সাদা মেঘের আড়ালে চাঁদ তলিয়ে গেল। অদূরে অস্পষ্ট ছায়ালোকে বাদকের মুখ দেখা যাচ্ছে কিন্তু চেনা যাচ্ছে না। এগিয়ে চললুম—আরো এগিয়ে! একি এ যে সেই তরুণ যুবক যার কথা সমস্তটা দুপুর মনে পড়েছে, যার স্মৃতি সমস্তটা সন্ধ্যা ভরপুর করে' রেখেছিল!

বাঁশী তখন গাইছিল—

'মৃদু মলয় বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে
জাগো আকুল ফুল সাজে
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয় শয়ন মাঝে।'

(৫)

১৮ই আশ্বিন—১৩২৮

সেই তরুণ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেছে সেই অভিসার রাতের বাঁশীর আসরেই। হঠাৎ আমাকে সেই নিভৃত-নির্জ্জনে দেখে' প্রথমটা সে চিনতে পারলে না, চোখে তখনো তার গানের ঘোর লেগেছিল! কিন্তু ঘোর কাটতেই সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্লে—আপনি! ঘটা করে' বসবার জন্যে বিছিয়ে দেবো এমন কিছুই নেই এখানে। বসুন এই বালু-বেলার সিংহাসনের ওপর। এ সিংহাসন আপনাদের ঘরের 'কুশানে'র চাইতে কিছুমাত্র কঠিন হবে না। বলে'ই সে আবার হেসে উঠল! শিশুর মতন সরল হাসি সমুদ্রের গর্জ্জনের ভেতর হারিয়ে গেলেও তার ঝঙ্কার বাতাসকে খানিকটা সরস করে' দিয়ে গেল। মুখের সে কঠিন ভাব আর নেই। একটা আত্ম-ভোলা প্রসন্ন মিষ্টি হাসিতে তার কাঁচা মুখখানি প্রস্ফুটিত ফুলের মতন সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। একটু তফাতে বালির ওপর বসে' পড়তেই সে আবার বল্লে—আপনাকে প্রথম দেখে' কি মনে হ'য়েছিল জানেন? আমার মনে হচ্ছিল—সাগরিকা! জলের দোলা হ'তে সে নেমে এসেছে এই বালুবেলায় বসে' জ্যোৎস্নার আলোকে আর্দ্র কেশপাশ শুকিয়ে নেবার জন্যে। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা আপনার নাম কি? এত কথা বল্‌ছি, এমন দুর্দ্দিনের পরিচয় কিন্তু নাম ত জানিনে!

আমি বল্লুম—অসিতা।

এবার তার দেহখানি অট্টহাস্যে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে' টেনে-টেনে হেসে সে বল্লে—আপনার বাপ-মা নিশ্চয়ই রং-কাণা ছিলেন। জ্যোৎস্নার আলোকেও যার রং হার মানিয়েছে তারই নাম অসিতা!

লজ্জায় সম্ভবত আমার কাণের ডগাটি-পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠেছিল। সে বল্লে—এঃ! আপনি যে একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছেন! না—না। আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছিনে। এই জ্যোৎস্নার আলোতে আপনার হাতখানা ধরে' দেখুন। বলে'ই সে আমার হাতখানা নিঃসঙ্কোচে নিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় তুলে' ধরলে।

লজ্জায় আরো লাল হয়ে আমি তা'কে বল্লুম—এখন ত আপনার মুখে কিছুমাত্র হাসির অভাব দেখছিনে। কিন্তু আমাকে সমুদ্রের কোল থেকে যখন টেনে তুললেন তখন মুখটা অত কালো হ'য়ে উঠেছিল কেন? জানেন, তার পর থেকে এ ক'টা দিন আমি আপনার সেই মুখ মনে করে' কিছু মাত্র সোয়াস্তি পাইনি।

আষাঢ়ের মেঘের মতন আবার একটা কালো বিরক্তির রেখা তার মুখের ওপরে ভেসে উঠল। সে বল্লে—দেখুন সমুদ্রের চেহারা দেখে'ই আমি বুঝেছিলুম সেদিন একটা দুর্দ্দৈব ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। সেই জন্যে আপনাকে আমি সাবধান করেও দিয়েছিলুম। কিন্তু আপনি সে-কথা না শুনে' আমাকে কি কষ্টটা দিয়েছেন জানেন! এখনও আমি সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করার সে ক্লান্তি শুধরে নিতে পারিনি। মেয়েরা শিক্ষিতা হ'য়ে যে অবুঝ হয়—এ আমি কিছুতেই সইতে পারিনে!

আমি হেসে বল্লুম—আমি আর এখন সমুদ্রেও তলিয়ে যাচ্ছিনে, আপনিও আমাকে রক্ষা করবার জন্যে সমুদ্রের সঙ্গে আর লড়াই করছেন না, অথচ আপনার মুখ সেই সেদিনকার সকালবেলার মুখের মতনই অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু রাত হ'য়ে গেছে, এখন উঠি।

সে ত্রস্ত হ'য়ে হেসে বল্লে—না না, এ মেঘ নয়—এ মেঘের ছায়া। তার পরেই আমার সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে' আবার বল্লে, চলুন আপনাকে পৌঁছে' দিয়ে আসি।

নিভৃত নির্জ্জন বালু-বেলা। সামনে দূরে কেউ নেই। চাঁদের কিরণে সমুদ্রের চেহারা রহস্যের মায়া-পুরীর মতন মনে হচ্ছে। কালোকালো ঢেউগুলো তার প্রিয়া-বিরহ-বিধুর দয়িতের অন্তরের মতন বিক্ষুব্ধ। চাঁদের আলোর

হাসি তার মাথায় দুল্‌ছে—মেঘের বুকের বিদ্যুতের রেখার মতন। কিন্তু অন্ধকার তা'তে কিছুমাত্র দূর হয়নি। তরুণী ধরণীর পায়ের ওপর সমুদ্র আছড়ে পড়ছে ফেনার ফুলের মালার অর্ঘ্য নিয়ে। একবার মনে হ'ল সমুদ্রের কল্লোলের ভেতর দিয়ে বাঁশী বাজছে—'সখি জাগো জাগো।'

চারিধারে স্বপ্নের সরণী গড়ে উঠেছে। তারি ভেতর দিয়ে পথ কেটে চলেছি কি জানি কোথায়!—জায়গা মনে পড়ছে না। কিন্তু তবু চলেছি। আকাশ জ্যোৎস্নার চন্দ্রাতপ মেলে' দিয়েছে স্বপ্নের একখানা আবরণের মতন। পাশে সমুদ্রের ঢেউগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে মায়াপুরীর রাজপথ কোন অজানা রহস্যের দোরে গিয়ে পৌঁছেচে। পায়ের তলায় বালুবেলায় ফেনার ফুলের কোলে-কোলে শুক্তির মুক্তা ছড়ানো। মন দুল্‌ছে—বাঁশী বাজছে—'সখি জাগো জাগো।'

হঠাৎ জেগে দেখলুম সেই লাল বাড়ীটার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। মায়া-পুরীর পথ এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল! ফুরোক কিন্তু তার নাম জেনে নিয়েছি—'অলক'—আর আজ সমস্ত রাত জেগে ডায়েরিতে লিখছি—'অলক—অলক!'

আকাশের গায়ে আলোকের পূর্ব্বাভাস জেগে উঠেছে। অরুণের আলো উষার অলকে আবার মাখিয়ে দিয়ে বল্‌ছে—

—'সখি জাগো।'

(৬)

৩০শে আশ্বিন—১৩২৮

কয়েকটা দিন জল-হারা মেঘের মতন হাল্কা হাওয়ায় উড়ে' গেল। যে শ্রান্তি এসে পড়েছিল মনের কোণে আজ তার কোনোই সন্ধান পাচ্ছিনে। মন তাজা হ'য়ে উঠেছে, প্রাণের ভেতর তপ্ত তরুণ শোণিতের ধারা দুল্‌ছে। অলকের সঙ্গে বালুতটের উপর খেলা নিয়ে মত্ত আছি, ঘর-নীড়হারা পক্ষীশাবকের মতন। চলার বিরাম নেই, তবু পায়ের তলায় ক্লান্তি অনুভব কর্‌ছিনে। চল্‌ছি তবু মনে হচ্ছে—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' চরণ-তলে সমুদ্রের বিশাল পাথার পড়ে' রয়েছে ঠিক মরুভূমির নতোন্নত বিস্তারের মতন। শূন্যে অপরিমাণ ব্যোম মদের মতন মেঘের ফেনায় ফুলে' উঠেছে। মনের বেদুইন তা'কে পান করে' নিঃশেষ কর্‌তে পার্‌ছে না।

সমুদ্রের বুকের ওপর রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে। একটা ঝাউ গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে অলক বাঁশী বাজাচ্ছিল—

'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

ছলছল উচ্ছল জলের তালে-তালে তার সুর কান্নার মতন ক'রে আমার কানে এসে বাজল। আজ ক'দিন হ'তেই অলককে উন্মনা বলে' মনে হচ্ছে। আমি তার হাতে ধরে' বল্লুম—থামাও গো বন্ধু, তোমার কান্নার সুর থামাও।

আমার হাতের ভেতরে হাতটা ছেড়ে দিয়ে অলক বল্‌লে—কান্নার যে সময় এসেছে অসিতা। আমার আহ্বান এসেছে অজানা পথের প্রান্ত হ'তে নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে। আমি বিদায় নিতে চাই।

বিদায়!—কথাটা বুকের ভেতর কাঁটার মতন খচ্ করে' বিঁধ্‌তেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। তবু চোখের জল তার দৃষ্টি এড়াল না। সে দুহাতে আমার মুখটা টেনে তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—অনেক চোখের জল আমার মনের মরুভূমিতে পড়ে' আপনি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এ যে বন্যার প্লাবন! তোমার চোখের জল আমার মনকে যে দুলিয়ে দিচ্ছে অসিতা!

আমি বল্লুম—তবে বলো, যাওয়ার কথা কখনো বল্‌বে না।

দুপুরের যে রোদন সাগরের জলে অবগাহন কর্‌ছিল, তারি মতো ম্লান হেসে অলক বল্‌লে—কিন্তু না গেলে যে চোখের জল আজ ফেল্‌ছ, তা আর কখনো শুকোবার অবকাশ পাবে না। আমার ইতিহাসটা শোনো।

একটু চুপ ক'রে থেকে, হঠাৎ ধনুকের মতন বাঁকা চোখের পাতা দুটো টেনে তুলে' একটা উদাস-বিহ্বল দৃষ্টির বাণ আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ ক'রে অলক বল্‌তে সুরু কর্‌লে—বাংলার বিপ্লব-যুগে যারা ধ্বংসের যজ্ঞানলে

হবিকাঠ জুগিয়েছে তাদের সঙ্গেই আমিও মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়েছি। অলক রায়ের নাম হয়ত তোমারো অপরিচিত নয়। এখনো তার নামের হুলিয়া পুলিশের থানায়-থানায় ঝোলানো আছে।

আজো' মনে পড়্ছে আমার সেদিনের সেই প্রলয় নৃত্যের কথা। মাথার ওপরে খড়্গ দুল্ছে, পেছন থেকে মৃত্যুর দূত ছুটে' আস্ছে, আর সাম্‌নে এগিয়ে চলেছি আমরা নির্দ্দয় উল্লাসে আত্মভোলার দল। টোটা ভরা রিভল্‌ভার কখনো হয়ত আঙুলের ইঙ্গিতে অট্টহাস্যের আর্ত্তনাদে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ত, পর মুহূর্ত্তেই হয়ত আবার পরম নিশিন্তে ঘুমিয়ে পড়্‌ত নিভৃত বুকের দোলার ওপরে। কত রাত যে আমাদের সেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় দিনের কর্ম্ম-কোলাহলে ভরে' উঠেছে, আর কত দিন যে রাতের ক্লান্ত অবসাদে ডুবে' গেছে, আজ. গুণে'ও তার সংখ্যা নির্ণয় কর্‌তে পারিনে। আমাদের তখনকার গতি ছিল উল্কার দীপ্তির মতন, তা কেবল দগ্ধই কর্‌ত না ভীতিরও সঞ্চার কর্‌ত। দেশের লোকের সেবা কর্‌তে গিয়ে আমরা দেশের লোকের পর হ'য়ে গিয়েছিলুম, আত্মীয়েরা আমাদের সহ্য কর্‌তে পারেনি, বন্ধুরা ভয়ে আমাদের পরিত্যাগ করেছিল। তবু আমাদের পণ টলেনি, মন দোলেনি। রক্তের স্রোতের ওপর দিয়ে ধ্বংসের পথে আমাদের তরী ভেসে চলেছিল। এ যে আমরা পেরেছিলুম তার কারণ, আমরা যারা দেশের সেই একান্ত দুর্দ্দিনে বিপ্লবের দলে নাম লিখিয়েছিলুম দেশকে তা'রা সত্যসত্যই ভালোবাস্‌তুম্। সে ভালোবাসার গভীরতা তোমার সাম্‌নের ঐ সমুদ্র হ'তে কিছুমাত্র কম নয়। তার ঢেউ আঘাতের পর আঘাতে আমাদের সহিষ্ণুতার সীমাকে লঙ্ঘন করেছিল, তাই কূল ছাপিয়ে উঠ্‌তে আম্‌রা ইতস্ততঃ করিনি। আমাদের সে বন্যায় কে ডুবেছে কে ডোবেনি তার সন্ধান রাখ্‌বার অবসর ছিল না।

কিন্তু সে দিনকার মেঘ কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা আমাদের হিংসা ভুলেছি। অথচ যারা যথার্থ অপরাধী তারা তাদের হিংসার আগুন রাবণের চিতার মতন করে'ই জ্বালিয়ে রেখেছে। কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, কাউকে আন্দামানে অসভ্যদের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার ভেতর নির্ব্বাসিত করে, কাউকে আবার কারা-প্রাচীরের আবেষ্টনের ভেতর আবদ্ধ রেখে তখন তারা প্রতিশোধ ত নিয়েইছে, আজ যারা সব ছেড়ে নিজের নির্ব্বাসন নিজে বরণ করে' নিয়েছে তাদেরো তা'রা সোয়াস্তি দিচ্ছে না। অনুসন্ধানের দুর্দ্দান্ত কুকুর এখনো তাদের পেছন-পেছন ঘুর্‌ছে।

তিন দিন আগে আমি জান্‌তে পেরেছি, পুলিশ সন্ধান পেয়েছে, পুরীর বালুতটের ওপর অলক রায়ের খোঁজ মিল্‌তে পারে। ধরা দিতে আমি একটুও ভয় পাচ্ছিনে। ফাঁসির দড়ি ফুলের মালার মতন বরণ করে' নিয়েই মানুষ বিপ্লবের খাতায় নাম লেখায়। কিন্তু তবু তোমার কথাটাও যে আজ ভুল্‌তে পাচ্ছিনে, অসিতা!

ওগো রুদ্র পথের পথিক, তোমার মুখে হাসি দুল্‌ছে, কিন্তু আমার বুকে যে ভয়ের সমুদ্র উথ্‌লে উঠ্‌ছে, কান্না যে আসন্ন আষাঢ়ের মেঘের মতন করে'ই সেখানে জলধারার সৃষ্টি কর্‌ছে। ঝড়ের আগে ধরণীর বুকের নিঃশ্বাসের স্পন্দন যেমন থেমে যায়,আমার বুকের নিঃশ্বাস তেম্‌নি বেরিয়ে আস্‌বার পথ খুঁজে' পাচ্ছে না!

দুই হাতে মুখ ঢেকে বালির ওপর লুটিয়ে পড়ে' বল্‌লুম—তবু তুমি এখনো আমার প্রতীক্ষায় বসে' আছ বন্ধু, এখনো পালাওনি! কি নিষ্ঠুর তুমি! কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত—আর এক দণ্ডও এখানে তোমার থাকা চল্‌বে না।

অলক আবার একটু হেসে বল্‌লে—কোথায় যাবো? পালিয়ে-পালিয়ে জীবনের ওপর ঘৃণা ধরে' গেছে। তবু এখানকার স্মৃতিটি ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছে। সমুদ্রের এই মাত্‌লামি মনে আর একটা নতুন মত্ততার সুর জাগিয়ে তুলেছে, এখানে তোমার সঙ্গ পাচ্ছি। যদি মর্‌তেই হয়, এর চাইতে ভালো জায়গা আর কোথায় পাবো?

তার সাম্‌নে সোজা হ'য়ে বসে' বল্‌লুম—কিন্তু মরা তোমার হবে না অলক। তোমার জীবন নিয়ে তুমি যা-খুসি কর্‌তে পারো। তাই বলে' আমার জীবনটাকে ত

আমি ব্যর্থ হ'তে দিতে পারিনে। তুমি কি এখনো বুঝ্‌তে পারোনি যে আমার জীবন সফল করে' তুল্‌তে হ'লে তোমার জীবনের দর্‌কার সকলের আগে?

অলকের মুখটা আমার মুখের ওপর নেমে এল এক-ঝলক জ্যোৎস্নার মতন এক-থোকা ফুলের কুঁড়িকে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যে। এ-স্পর্শ আমার কাছে নতুন, কিন্তু বুকের ভেতর তা যে নব-বসন্তের সূচনা করে' গেল তা নর-নারীর চিরন্তন জিনিষ। স্বপ্নের ঘোর কাট্‌তেই হঠাৎ চেয়ে দেখি অলকের মুখ আমার বুকের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে, সে বল্‌ছে—কিন্তু কোথায় যাবো? নিরাশায় তার কণ্ঠস্বর তখন শ্রাবণের ঘনায়মান সন্ধ্যার মতনই ভারী হ'য়ে উঠেছে।

আমি তা'কে হাত ধরে' তুলে' বল্‌লুম—সমুদ্রের এপারে আমাদের জায়গা না হয়, ওপারে জায়গা হবেই এত বড় দুনিয়াটা পড়ে' রয়েছে—তার বুকে স্থানের অভাব হবে না।

অনিচ্ছায়*

শ্রী ননীমাধব চৌধুরী

(খাসিন্তো বেনাভেন্তের স্প্যানিশ্ হইতে)

একাঙ্ক নাটিকা

পাত্রপাত্রী :

লুইসা।

পেপে।

একজন অল্পবয়সের পরিচারিকা।

দন্ মানুয়েল্।

স্থান—মাদ্রিদ, সুসজ্জিত বৈঠকখানা।

প্রথম দৃশ্য

লুইসা, পরিচারিকা ও পরে পেপে।

পরিচারিকা—সেঞোরিতা লুইসা! সেঞোরিতা লুইসা!

লুইসা—ওপরে উঠেছে?

পরি—হাঁ।

লুইসা—পিছনের সিঁড়ি দিয়ে? কেউ দেখ্‌তে পায়-নি ত?

পরি—হ্যাঁ, পিছনের সিঁড়ি দিয়েই। এ-সব বিষয়ে সেঞোরিতার অভ্যাস নেই বোঝা যায়!... বেশী করে' লোকের নজরে পড়্‌বার জন্য!...

লুইসা—তা সত্যি; চাকর-বাকররা তা'কে চেনে; আর আসল কথা বাবা তা'কে যেন না দেখ্‌তে পান... চট্ করে' নিয়ে আয়, খুব সাবধান; জ্যেঠা বাবার সঙ্গে আলাপ করে' যখন বেরিয়ে যাবেন, আমাদের জানাবি...

পরি—নিশ্চিন্ত থাকুন।

লুইসা—আর কা'কেও যেন বলে' বেড়াসনে...

পরি—সেঞোরিতা! ঘরের কোন গোপন কথা আমাকে বলে' বেড়াতে শুনেছেন বুঝি?... দেখে' যদিও খারাপ মনে হ'তে পারে তবু আপনি যখন এতে রয়েছেন এটা অবিশ্যি খারাপ কিছু হবে না।

লুইসা—নিশ্চয় ... তুই জান্‌তেই পার্‌বি ... এখন যা, ওঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে কোন গোল করিস্‌নে।

(পরিচারিকার প্রস্থান। একটু বাদে পেপের প্রবেশ।)

পেপে—লুইসিতা! *

লুইসা—আস্তে! কোন কথা বোলো না, গোল কোরো না, ছট্‌পাট্ কোরো না ... আমাদের পরামর্শের প্রয়োজন আছে; বোসো। দেখো টুপী যেন পড়ে' না থাকে, সিগারেট ফেলে' দাও ... উঃ কি ধোঁয়া! ওটা আবার এখানে কাৎ করে' রেখে যেও না। বোসো, কি আপদ, বোসো না। এমনভাবে ডেকে পাঠিয়েছি কেন তার কারণ কিছু আন্দাজ করে' থাক্‌বে ...

পেপে—হাঁ, কিছু আন্দাজ কর্‌তে পার্‌ছি...

লুইসা—আর আন্দাজে কাজ নেই, খবর শোনো ... খবর এই যে, আমার বাবা ও তোমার বাবা এই মুহূর্ত্তে পরামর্শ কর্‌ছেন।

পেপে—এখন?

লুইসা—হাঁ গো। আফিস-ঘরে খিল এঁটে বসেছেন। তাই আগে থেকে তোমাতে-আমাতে নিরিবিলি ও নিঃসঙ্কোচে দেখা করা ভয়ানক প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে... দু'জনে একটা বোঝাপড়া কর্‌বার জন্যে...ঐ ঘরটাতে বসে' তোমার বাবা ও আমার বাবা সব ঠিক্ কর্‌ছেন; তাঁরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত কর্‌তে ব্যস্ত, আমাদের

---

* Sin Querer—Boceto de Comedia en un octo yen Prosa, ১৯০১ সালের ৩রা মার্চ্চ el Teatro de la Comediaতে প্রথম অভিনীত। বেনাভেন্তে স্বয়ং পেপের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

* লুইসা+ইতা—লুইসিতা; আদর ও সম্বন্ধ-বাচক। স্পেনীয় ভাষায় ইতো, ইল্লো ইত্যাদি যোগ করিয়া নাম বা পদের ঐরূপ অর্থ পরিবর্ত্তন করা হয়। স্ত্রীলিঙ্গে আকার। এইরূপে—পেপে—পেপিতো; সেঞোর—সেঞোরিতো; সেঞোরা—সেঞোরিতা, অবিবাহিতা তরুণী।

মনের বিলি-ব্যবস্থা কর্‌তে ব্যস্ত…বুঝ্‌তেই পার্‌ছ; তাঁরা আমাদের বিয়ে দিতে চান।

পেপে—তাই বটে; বাবা আমাকে সর্ব্বদা বলেন, "বিয়ে-টিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হওয়াই উচিত; তা'তে ফল ভালো দাঁড়াবার সম্ভাবনাই বেশী…আমাদের পরিবারের ভেতরেই ভালো-ভালো মেয়ে আছে, তোমার খুড়তুত, জ্যেঠতুত বোনদের কা'কেও ঠিক্ করে' নাও।" এদিকে পরিবারের ভেতর তোমরা ত জন-কুড়ি রয়েছ… ঠিক করে' নেওয়া অসম্ভব …

লুইসা—বাবার মুখেও ঐ একই কথা; কিন্তু বিয়ের উপযুক্ত ত তুমি একা, তাই বাবা যখন বল্‌লেন, "তোমার খুড়তুত, জ্যেঠতুত ভাইদের কা'কেও বিয়ে করা উচিত", তখনই টের পেলাম যে, তোমার কথা হচ্ছে। কুড়ি জনের মধ্যে থেকে পছন্দ করা আর পছন্দ করার কেউ না থাকার মধ্যে কতখানি তফাৎ তা বোঝো ত … কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের দুজনের পিতার মতই হাস্যকর। কি জন্য আমাদের দু'জনের বিয়ে কর্‌তে হবে? তুমি কি আমাকে ভালোবাস? আমি কি তোমাকে ভালোবাসি? তাঁদের ভাবখানা এই, আমরা সুবোধ আত্মীয়ের মতন ভালোবাসি…সে হেতু,…এইখানেই ত গলদ; এর চেয়ে ভালো হ'ত যদি আমরা কেউ কা'কে দেখ্‌তে না পেতাম তোমাকে কখন দেখ্‌তে না পেলে আমার মনে হয়, হঠাৎ তোমাকে ভালোবেসে ফেলা সহজ হ'ত…আর এখন দাঁড়াচ্ছে, "তোমাকে বেশী ভালোবাস্‌তে হবে, অতএব তোমার প্রেমে পড়্‌তে যাচ্ছি, এইরকম আর কি।" কাল তোমাকে যতখানি পছন্দ কর্‌তাম আজ কেন তার চেয়ে বেশী পছন্দ কর্‌তে যাবো? আর সোজা কথায় বল্‌তে, কাল যেমন আজও যখন সেই-রকম পছন্দই কর্‌ছি, সে-অবস্থায় তাঁদের অভিপ্রায়ে কাল সকালেই হঠাৎ যে তোমাকে বিয়ে কর্‌তে বসে' যাবো এ নেহাৎ হাসির কথা।

পেপে—তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

লুইসা—আচ্ছা, দেখা যাক্; তোমার বাবা কি বলেছেন? আমার বাবার সঙ্গে পাকা করে' কথা তোল্‌বার আগে তোমাকে কিছু বলে' থাকাই সম্ভব।

পেপে—আমার উপর চট্‌লে সর্ব্বদাই যা বলেন, আমি টাকা চাইলে, আমার বিলের টাকা দেবার সময় হ'লে যা বলেন তাই বলেছেন, "এ-সব পাগ্‌লামি ছাড়্‌বার সময় হয়েছে"। পাঁচশ পেসেতার* উপরে বিল হ'লে বাবা তা'কে পাগ্‌লামি বলেন…তুমি ত দেখ্‌ছ, এগুলো দর্‌জি, পোষাক-ওয়ালাদের পাগ্‌লামি…"এখন তোমার বিয়ের কথা ভাবা উচিত"…

লুইসা—হুঁ; সেঞোরিতো যখন বাড়ীতে উৎপাত করেন…

পেপে—আর তোমার বাবা, কখন তোমার বিয়ের কথা ভাবেন?

লুইসা—ওঃ, যখনই আমাদের তিয়েত্রো-রিয়ালে যাওয়ার পালা আসে আর আমি তাস খেলা থেকে তাঁকে টেনে তুলি। তৃতীয় পালা † এলে যাকে তা'কে ধরে' আমি বিয়ে কর্‌লেও তাঁর আপত্তি থাকে না। বাবার ব্যস্ততার কারণ বোঝা যায়…বিপত্নীক মানুষ, নিজের কাজকর্ম্ম আছে … আমার আবার গভর্‌নেস বা কোনরকম সঙ্গিনী সহ্য হয় না; এই অবস্থায় পড়ে' রীতিমত আত্মত্যাগ অভ্যাস করি, কারণ তিয়েত্রো-রিয়ালে যেতে হ'লে বাবা-ছাড়া সঙ্গে যাবার আর কেউ নেই। আর বাস্তবিক যে-যে রাত্রে "লাওয়ালকিরিয়া" ‡ অভিনীত হয় আমার দুঃখই বোধ হয়।

পেপে—তা বাস্তবিক, অতি ছেলে-বেলা থেকে কেবল বাপের সঙ্গে রয়েছ, এতদিন বিয়ে করে' ফেলা উচিত ছিল …

লুইসা—এতদিন? তুমিও বাবার মতন বোলো না যে, আমি বুড়ি হ'তে চলেছি …

পেপে—কি যে বলো?

লুইসা—তা নয়; চোদ্দ-বছরের সময় খুব বেড়ে উঠি বলে' একেবারে হঠাৎ বড়দের পোষাক পর্‌তে

* পেসেতা peseta—স্পেনীয় মুদ্রা, প্রায় ২০ সেণ্ট।

† তৃতীয় পালা—tercer turno. Teatro-real এ সিজ্‌ন্ টিকিট-ক্রেতা বের্পর্য্যায়ের টিকিট কেনেন শুধু সেই পালার সমস্ত অভিনয় দেখ্‌তে পারেন।

‡ "লাওয়ালকিরিয়া"—ভ্যাগ্‌নার (Wagner) প্রণীত অপেরা।

হয়, তাই লোকের বিশ্বাস আমার মেলা বয়েস হয়েছে। কিন্তু তুমি ত জানো ...

পেপে—জানি বৈ কি! তোমার তুলনায় বুড়ো হয়েছি আমি।

লুইসা—না বুড়ো নও মোটেই; কিন্তু আর সময় নষ্ট করা ঠিক্ হচ্ছে না। তোমার-আমার বাবা ঠিক কথা বলেন; আমাদের বিয়ে করা উচিত, কিন্তু প্রত্যেকের নিজের-নিজের মতে। তোমার তাই মনে হয় না? আমি রোমান্টিক্ বলে' নয় (সারা জীবনে আমি কেবল দু'খানা নভেল পড়েছি), অথবা আইডিয়াল্ বা বড়-বড় ভাবের স্বপ্ন দেখি, এসব কারণে নয়; কিন্তু পরিবারের মধ্যে এ-রকমের বিয়ে আমার কাছে স্বার্থের, সুবিধার বিয়ে বলে' মনে হয়...এক-আধটুকু কাব্য তেমন-কিছু আপত্তিজনক নয়...আর বিশেষতঃ আমরা পরস্পরের কিছুই জানিনে বলা যায়। তুমি আমার কি জানো? আমিই বা তোমার কি জানি? কস্মিন্‌কালেও তোমার কথা জান্‌বার দর্‌কার মনে হয় না। তুমিই কি জানো, আমার কোন প্রণয়ী আছে কি না?

পেপে—আমি যতটুকু জানি, নেই; সময়-সময় আমরা ত একসঙ্গে বল-নাচে গিয়েছি, গোটা গরম কাল একত্র কাটিয়েছি।

লুইসা—বাস্তবিক আমার এক প্রণয়ী ছিল; তা হ'লেই দেখ তুমি খবর রাখো না; তোমার মন কোথায় ছিল এতে প্রমাণ হচ্ছে।

পেপে—ওহো, সেই আকাট লোকটার কথা বল্‌ছ! ...তার খবরে আমার কি প্রয়োজন?

লুইসা—দেখ্‌লে, আত্মীয়তার খাতিরেও যদি আমাকে ভালোবাস্‌তে, তা হ'লে একটা আকাটকে ভালোবাসতে যাচ্ছি দেখেও ত কিছু মনে হ'ত।

পেপে—আমার বিশ্বাস, সে-লোকটাকে ভালো না-বাসার ও বিয়ে না-করার মতন যথেষ্ট বুদ্ধি তোমার আছে...

লুইসা—বহু ধন্যবাদ, কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে; আমরা যে পরস্পরের প্রেমে অনেকখানি পড়েছিলাম, তা অস্বীকার করা যায় না; আর দেখে' থাক্‌বে কোন পুরুষ সত্যি করে' যখন প্রেমে পড়ে, তখন আকাট ও বুদ্ধিমান্ লোকের মধ্যে প্রভেদ করা কত কঠিন!...

পেপে—এ-কথা সত্যি না; বোকা কখনো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মতন ভালোবাস্‌তে পারে না, তা'কেও কেউ সেরকম ভালোবাস্‌তে পারে না।

লুইসা—কেন পার্‌বে না? জানো কি, মেয়েরা গর্ব্ব করে যে তাদের প্রেমের বলে পুরুষমানুষ রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। প্রেম বিপ্লবী, তার কার্য্য-কলাপের ওপর চোখ রেখেই লোকে বলে' থাকে,—"অমুক লোকটা* এমন হাবার মতন ছিল, তুমি ভালোবাসার পর থেকে কেমন চট্‌পটে হ'তে সুরু করেছে।" অথবা হয়ত বলে, "অমুক লোকটার * এত বুদ্ধি, তোমার প্রেমে পড়্‌বার পর থেকে দেখ কি নির্ব্বোধের মতন আচরণ কর্‌ছে!" এইজন্ত কোন ধর্ম্মাত্মা-লোককে (Santo) কখন আমি বিয়ে কর্‌তে যাবো না...ধর্ম্মাত্মা দিয়ে আমার কি হবে? আমি চাই পুরুষমানুষ, খাঁটি...হোক্ না একটু লক্ষ্মীছাড়া...আস্তে-আস্তে শুধ্‌রে নেওয়া চল্‌বে। কি চমৎকার দেখ! এক-জন পুরুষকে ভালোবাস্‌লে, তা'কে বিয়ে কর্‌লে, আর দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সে আলাদা মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবে...

পেপে—এই হোম্‌রা-চোম্‌রা স্বামী-মহাশয়, এই বড় গোঁফ।

লুইসা—এই খানেইত তোমাকে নিয়ে চলা অসম্ভব মনে হয় আমার; তুমি ভালোও নও, মন্দও নও; তেমন বড় দোষ নেই তোমার, তেমন বড় গুণও কিছু নেই, ঠিক্ বল্‌ছি না কি?

পেপে—কে জানে, কে জানে!

লুইসা—ঠিক নয়? আমার মনে হয়, কোন দিন তুমি কা'কেও আশ্চর্য্য করে' দিতে পার্‌বে না...

পেপে—কে জানে, কে জানে!

লুইসা—সত্যি? দেখে' যেমন মনে হয় তুমি কি সে-রকম নও?

পেপে—কে জানে, কে জানে!

* অমুক লোক—স্পেনীয় ভাষায় Fulanito, Menganito (সর্ব্বনাম, তৃতীয় পুরুষ) বাংলায়—রাম, শ্যাম, যদু ইত্যাদির মতনই ব্যবহার।

লুইসা—আঃ! আর জালিও না, কি কথাটা আমাকে বলো না।

পেপে—সত্যি, আমার বল্‌বার কথা কিছু নেই; কে জানে! বল্‌ছি এইজন্য যে আমি কিছুই জানিনে।

লুইসা—তা হ'লে কখনো ভালোবাসোনি?

পেপে—এককালে।

লুইসা—আসল ভালোবাসা।

পেপে—না, উৎকট পাগ্‌লামি।

লুইসা—বিয়ের কথা ভেবেছিলে কি না জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

পেপে—খুব ভেবেছিলাম।

লুইসা—তা'কে ত্যাগ কর্‌লে কেন?

পেপে—কারণ, শুন্‌লাম যে সে আরেকজনকে ভালোবাসে।

লুইসা—তা হ'লে বলো সে তোমাকে ত্যাগ করেছে।

পেপে—না সে ত্যাগ কর্‌তে চায়নি; সেও পট-পরিবর্ত্তন কর্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু অন্যপ্রণালীতে।

লুইসা—ভুল-ভাঙাতে খুব দুঃখিত হয়েছ?

পেপে—ভয়ানক! সেদুঃখ ভুল্‌বার জন্যেইত সে-সিজ্‌ন্‌টা পারীতে কাটিয়ে দিই।

লুইসা—সত্যি, তা হ'লে, বেশ, বেশ, নভেলী বটে।

পেপে—তখন রামন্ খুড়োকে বাবা আমার খোঁজে পাঠান, কারণ, লোকে তাঁকে বলে' দেয় সেখানে আমি প্রেম করে' বেড়াচ্ছি।

লুইসা—বেশ মজার ত! ফরাসী মেয়ের সাথে··· আর রামন্ খুড়ো না তা দেখ্‌তে পেয়ে তোমার একটি কর্ণ আকর্ষণ করে' আন্‌লেন···

পেপে—বাঃ, তা নয়; তার চেয়ে কাজের উপায় অবলম্বন কর্‌লেন, নিজে তার কাছে উপস্থিত হলেন··· সে এক জাপানী থিয়েটারের গায়িকা।

লুইসা—আহা, কি হতভাগ্য! সবাই তোমায় ত্যাগ কর্‌লে···তোমার হৃদয় একেবারে ভেঙে গিয়েছে।

পেপে—তা মনেও ভেবো না, দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে। জীবনে আমার যা ভুল হয়েছে সেসব সামান্য ভুল মাত্র, আশাভঙ্গ নয়; তার ফলে আমার কোন গভীর দুঃখ হয়নি, আমাকে কিছুমাত্র নিরাশও করেনি। আমার হৃদয় উন্মুক্ত হ'য়ে আছে।

লুইসা—রঙীন প্রেমের, আইডিয়ালের আশায়···

পেপে—আমার মনে হয় না যে শুধু ভালোবাসা, কাব্যের ভাষায় প্রেম, সুখের পক্ষে যথেষ্ট। কাব্যের প্রেম হাত ধরে' দোর পর্য্যন্ত আমাদের সুখে-সুখে পৌঁছে দিতে পারে; কিন্তু যাত্রার পথে কষ্ট আছে; সেখানে দুর্ব্বল শিশুর মতন প্রেমের দৃঢ়সবল আর-কিছুতে পরিণত হওয়া আবশ্যক, যাতে মানুষ কর্ত্তব্য ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে—

লুইসা—এ-খুব খাঁটি কথা বল্‌ছ—প্রথম আশ্চর্য্য!

পেপে—বাঃ! এমন আশ্চর্য্য তোমাকে ঢের করে' দিতে পারি, তুমিও আমাকে করে' দিতে পারো, দু'জনেই পরস্পরকে আশ্চর্য্য করে' দিতে পারি—জীবনের কি জানি আমরা? আমাদের শিক্ষা কিরকমে হয়েছে? স্পেনে সকল পিতার ধরণই এই:—ছেলেদের চিরকাল কচি খোকা বলে' বিবেচনা করা। আমার বাড়ীতে আমি চিরকাল পেপিতো, তোমার বাপের কাছে তুমি চির-কাল লুইসিতা; এই দুই খোকা-খুকী পারে কেবল একটা না একটা দুষ্টমি কর্‌তে, তাদের বিষয়ে কোন-টাই সত্যিকারের বলে' গণ্য হবে না; আমাদের খাম-খেয়ালিগুলো অল্পাধিক আলোচনার বিষয় হ'তে পারে, কিন্তু সেগুলো সর্ব্বদা তাঁরা খুসীমনে হজম করে' নেন; বাপের আহ্লা'দে খোকাখুকু, জীবনে আর কারো কাছে থেকে দুর্ব্যবহার সহ্য কর্‌তে আমরা প্রস্তুত নই, যখন নিজে নিজের কর্ত্তা হ'য়ে চল্‌তে হয়, তখন হয় অতিসাহস-নয় অতিসঙ্কোচ-দোষ এসে পড়ে, আত্ম-প্রত্যয়ের ফলে যে একটা অটল প্রশান্ত ভাব আসে সে-শান্তির অধিকারী হ'য়ে কখনো আমরা চল্‌তে জান্‌ব না, কারণ, আমাদের পিতা বলেন, "এমন হবে না" অথবা "এমন হ'তে হবে," কিন্তু কোন দিন "তুমি এমন," একথা বলেন না। আমি যে কেমন আমি তা জানিনে, এবং তোমার পক্ষেও সেই কথাই খাটে।

লুইসা—তোমার কথা খুব ঠিক। তাঁরা আমাদের নিজেকে জান্‌তে শেখাননি, এখন যেই তাঁদের মাথায়

ঢুকেছে যে এসব পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা ভালো, এবং আমরা নিজেরা দেখে'-শুনে' নিতে অক্ষম, অম্‌নি তাড়া-হুড়ো করে' "দে দু'জনের বিয়ে," এবং একেবারে হঠাৎ মাস-দু'য়েকের জন্তে বাগ্‌দত্ত হ'য়ে থাকো, তার পর ব্যাপারনিষ্পত্তি এবং বাকী সারা জীবন ধরে' খুঁৎখুঁৎ...এতে বাধা দেবার জন্তে আমরা দু'জনে একমত না হ'লে হয়েছিল আর কি—কিন্তু তোমাকে বলে' রাখ্‌ছি প্রথমে আমি না বল্‌তে পার্‌ব না...সেকাজ কর্‌বে...

পেপে—আমি বাধা দেবো।

লুইসা—বোলো আমি খুব ভালো, খুব চমৎকার, যা বল্‌তে তোমার ইচ্ছে হয়; কিন্তু আমি ভাবুক-গোছের মেয়ে নই—আর সকলের মতন তোমারও আদর্শমত মেয়ে হওয়া চাই। ভালো কথা, তোমার আদর্শটা কিরকমের?

পেপে—আমার আদর্শ? উপযুক্ত স্ত্রীর? তুমি হাসালে।

লুইসা—ফর্সা? শ্যামবর্ণ? ঢ্যাঙা? বেঁটে?

পেপে—তা ত জানিনে। ধূসরবর্ণের পোষাকে চলে' তোমাকে এই এক খবরই দিতে পারি।

লুইসা—আচ্ছা খেয়াল ত!

পেপে—অনেক দিন আগে আমি একখানি ইংরেজি ছবিতে সেই রং দেখেছিলাম; ইংরেজি চিত্রকলার একখানি স্নিগ্ধ দৃশ্য; ধূসর-পোষাক-পরা একটি মেয়ে খৃষ্টের জন্মোৎসব-উপলক্ষে পুডিং তৈরি কর্‌ছে, পাশে বসে' একটি যুবক, স্বামী বা বাগ্‌দত্ত প্রণয়ী হবে, চারদিকে কয়েকটা বিড়াল, একটু দূরে কয়েকটি বৃদ্ধ বাইবেল-পাঠে মগ্ন, অপর দিকে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে একটা বাগান, অতিসুন্দর কয়েকটি শিশু খেলা কর্‌ছে। জানি না সেই ছবিতে, সেই দৃশ্যে, সেই রংয়ে সমস্তে জুড়ে' কি যেন একটা মাখা ছিল, যাকে বলা যায় মানুষের সংসারে আকাঙ্ক্ষিত সুখের রং।

লুইসা—গোলাপের রং?

পেপে—না ফিকে ধূসর; ভারি মোলায়েম সুরের; লোকে যে সুখের স্বপ্ন দেখে, তার গোলাপী রং; যে-সুখ হাতে আসে, জীবনে যে-সুখ লাভ হ'তে পারে, তার ঐ ধূসর রং চিরকাল? নিঃস্পৃহ বিষাদের রং, উদার বৈরাগ্যের রং, যা মৃদু হাসে, ক্ষমা করে ও ভালোবাসে।

লুইসা—আমার একটা ধূসর পোষাক আছে, তবে ঠিক ঐ সুরের হবে কিনা জানি না; একদিন সেইটে পরে' দেখ্‌ব তোমার ইংরেজি ছবির অর্থাৎ তোমার আদর্শের মতন দেখা যায় কি না, তা হ'লে অন্তত একটা সাদৃশ্য হবে।

পেপে—আর কি কর্‌লে আমি তোমার আদর্শের মতন দেখ্‌তে হবো?—

লুইসা—আমার স্বামীর আদর্শের মতন? ওঃ! সে আদর্শ কেমন হবে না, সেইটে খুব ভালো জানি, কিন্তু কেমন হবে তা ত বল্‌তে পার্‌ব না।

পেপে—কেমন হবে না?

লুইসা—অনেক রকম। মনে কোরো না বড় দোষের মতন ছোট-ছোট দোষ দেখে' আমি ভয় পাইনে; ঐরকম সামান্য দোষ দেখতে হয়ত শোভার মতন, কিন্তু সমস্ত জীবন-ব্যাপী ঘনিষ্ঠতার পক্ষে সেগুলো সবচেয়ে মারাত্মক, উদাহরণ দিই;—আমার এক সখীর উপযুক্ত বরের সাথে বিয়ে হয়েছে, সমস্ত সংসারের মতে আদর্শ-চরিত্র যুবক; সেদিন এখানে বেড়াতে এসেছিল তা'রা; একটা তুচ্ছ ঘটনা ধরে' আমি ভবিষ্যৎ বাণী কর্‌তে পারি তা'রা কোনো দিন সুখী হবে না। শুন্‌লে নেহাৎ বাজে বলে' মনে হবে, স্বামী স্ত্রীকে বল্‌লেন—"ম্যেরথেদিতাস, তোমার পোষাক ছিঁড়েছে?" এ-কথাটি এমনভাবে তিনি বল্‌লেন যাতে বোঝা যায়, ঐ দু-জনের মধ্যে স্বামীর চোখে সকলের আগে ছেঁড়াটুকুই পড়্‌বে।

পেপে—বেশ মজার ত!

লুইসা—কথা এই যে, শুধু ঐটুকুতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ভূমিকা পরিবর্তন হয়েছে বোঝা যায়। যে-বিয়েতে স্বামীর কর্তব্য দাঁড়ায়, বেশী খরচ হচ্ছে নির্দ্দেশ করে' দেওয়া, সে-বিয়ের সম্বন্ধে কি বল্‌তে চাও? এর চেয়ে কি বেশী ভয়ানক হ'তে পারে, যখন অহরহ স্ত্রীর মুখে, শোনা যায় "আমি এটা কিন্‌ব, কিন্‌ব, আমি ওটা চাই", আর স্বামীর মুখে, "বাজার বেজায় চড়া, আমরা এত খরচ কর্‌তে পারি নে"—। তার জায়গায়, যখন স্ত্রী মুখ ফুটে' কিছু চায় না, কিন্তু সময়ে-সময়ে স্বামী যখন কোন-

কিছু উপহার এনে হাতে তুলে' দেন, তখন আহ্লাদ গোপন করতে না পেরে স্ত্রী সপ্রেমে বলে—"এটা কিন্‌লে কেন ? আমাদের বেশী খরচে হাত দিতে নেই ; এর জন্যে তোমার কাছে নিশ্চয় মেলা টাকা নিয়েছে ; খুব চমৎকার হয়েছে", ইত্যাদি, তা হোক্ না কেন জিনিসটা বাজে-কিছু এবং তার দাম তিন পেসেতা মাত্র ;—তখন তার চেয়ে আর কি বেশী সুন্দর হ'তে পারে ?

পেপে—অনেক জানো দেখ্‌ছি…

লুইসা—বাবার সঙ্গে আমার ব্যবহার এইরকম, এবং যে সর্ব্বদা আমাকে উপহার দিয়ে থাকে, সময়ে হয়ত অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস, তার সঙ্গেও তাই, কিন্তু ঈশ্বর যেন আমার মুখ দিয়ে সে-কথা বের না করেন ! স্বামীর সঙ্গেও এম্‌নি করে' চল্‌ব। এমন কুশিক্ষিতা স্ত্রী আছে, যারা বেচারা স্বামীর-দেওয়া উপহার দোকানে বদল করে, তা'রাই আবার নিজেদের শ্রেষ্ঠ রুচি-সম্পন্না বলে' গর্ব্ব অনুভব করে…তুমি বল্‌বে আমি বাজে জিনিস খুঁটে' বর করি, তুচ্ছ জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করি।

পেপে—না, না ; আমরা এক-মত—আমিও তুচ্ছ জিনিসকে মূল্যবান্ মনে করি……তোমার মতনই ভাবি…

লুইসা—এখন বুঝ্‌লে কেন শুধু বাবাকে তুষ্ট করবার জন্য আমি তোমাকে বা আর কা'কেও বিয়ে কর্‌তে রাজি নই।

পেপে—আমিও তোমাকে নয় ; একথা বিশ্বাস কর্‌তে পারো।

লুইসা—তাঁরা মনে করেছিলেন, এতে তাঁদের সুবিধা হয়, তাই।……সুখের বিষয়, তাঁরা দেখ্‌বেন আমাদের উভয়ের এক মত, এবং কোন পক্ষেরই কোন অসন্তোষের হেতু নেই।

পেপে—আমার কথার ধরণে, কোন হেতু ঘট্‌তই না ; বাবার অবাধ্য না হ'য়ে প্রণয়ীরূপে এখানে উপস্থিত হতাম ও তোমার চোখে খারাপ দেখাতে যা কিছু করা দর্‌কার সব কর্‌তাম।

লুইসা—আমাদের বাগানটি তা হ'লে অতি চমৎকার হ'ত, কারণ, আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমাকে আতঙ্ক করে' দেবো।

পেপে—সুখের বিষয়, তোমার মাথায় এমন একটা প্রকাণ্ড আইডিয়া আসে ; এই আলাপ হ'ল বলে'…

লুইসা—এতে ভালো হ'ল না ? সোজা কথায়, আলাপের সাহায্যেই লোকে পরস্পরকে বুঝ্‌তে পারে ; সেটা হাতে-হাতে দেখ্‌লে ; এখানে বসে' নিরিবিলিতে, অকপটে কথা ক'য়ে, সহজভাবে আলাপ করে'…

পেপে—এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে…… আমি আবিষ্কার করেছি আমার একটি মনের মতন তরুণী আত্মীয়া আছে।

লুইসা—এবং আমিও আবিষ্কার করেছি যে, আমার একটি চমৎকার ও খুব সুবুদ্ধি আত্মীয় আছে ও জীবনের অনেক বিষয়ে সে আমার মতনই ভাবে।

পেপে—অর্থাৎ, তুমি সব বিষয়েই খুব চমৎকার ভাবো।

লুইসা—তা হ'লে তোমার বাবা ও আমার বাবা যা পরামর্শ করছেন ঠিক সেটা না হ'লেও আমাদের জন্যে ভালো একটা-কিছু লাভ কর্‌তে সক্ষম হয়েছেন ; আজ থেকে আমরা পরস্পরকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা কর্‌তে শিখ্‌লাম ; আর মনের কথা বল্‌ছি, এর আগে তোমার প্রতি উদাসীনই ছিলাম, খুবই উদাসীন।

পেপে—আমিও তোমার বিষয়ে।

লুইসা—আর তাঁরা চেয়েছিলেন আমাদের বিয়ে দিতে'

পেপে—এখন দেখা গেল, সেটা অসম্ভব, তাই না ?

লুইসা—আমার মনে হয় এমন সদ্ভাবে আর কখনো কোন বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়নি।

পেপে—একথা নিশ্চয় যে বিয়ে কর্‌লে আমরা পরস্পরের প্রতি এত সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌তাম না।

লুইসা—আমার দিন যখন আস্‌বে, আমি চাইব আমার স্বামী যেন কতকটা তোমার মতন হয়।

পেপে—এবং আমি চাইব আমার স্ত্রী যেন সম্পূর্ণ তোমার মতন হয়।

লুইসা—সত্যি ?…হাস্‌ছ কেন ?

পেপে—যা করব না বলে' আমরা আলাপ কর্‌ছিলাম তা'তেই তুমি আট্‌কা পড়ে' গেলে, না ?

লুইসা—তাই নাকি ?…সত্যিই ত। কি মূর্খ আমরা,

কি মূর্খ! এতক্ষণে ধরা পড়্‌ল, আমরা, পরস্পরকে প্রায় ভালোবেসে ফেলেছি।

পেপে—আর সেইজন্য বিয়ে করব না ঠিক কর্‌ছি··· এটা কেমন মনে হচ্ছে? মজার ব্যাপার···

লুইসা—তাই; মজার ব্যাপার···

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্বানুরূপ ও পরিচারিকা।

পরিচারিকা—সেঞোরিতা! আপনার জ্যেঠা এখনই আফিস-ঘরের বাহিরে আস্‌ছেন।

পেপে—তা হ'লে পরামর্শ শেষ হয়েছে।

লুইসা—আমাদের ষড়যন্ত্রও। তোমার বাবা সিঁড়ির নীচে গেলে এখান থেকে বেরুবে। বাবা সঙ্গে-সঙ্গে আমার কাছে পরামর্শ-সভার সিদ্ধান্ত-তালিকা দিতে আস্‌বেন। আর যখন শুন্‌বেন!···

পরি—বাহিরের দরজা বন্ধ কর্‌লেন।

লুইসা—এখন যাও···তাড়াতাড়ি···

পেপে—শোন্‌বার ইচ্ছা হচ্ছে, রয়েছিই এখানে··· থাকা চল্‌বে না?···

লুইসা—বাবা তোমাকে দেখ্‌তে পেলে···

পরিচারিকা—আমার ঘরে তবে; আসুন।

লুইসা—না, না; কেউ যদি দেখে ফেলে···

পরি—সেঞোরিতা, নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি বল্‌ব আমার কাছে এসেছেন···আর লোকে তা বিশ্বাসও কর্‌বে।

লুইসা—তাড়াতাড়ি, বাবা আস্‌ছেন!

পরি—আপনি আসুন···

(পেপে ও পরিচারিকার প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

লুইসা, দন্‌ মানুয়েল্‌ ও পরে পেপে।

লুইসা—তোমার কি হয়েছে বাবা? উত্তর দেবে না? আমার মনে হয়, কিছু বল্‌বে আমাকে···

মানুয়েল—না।

লুইসা—কার্‌লস্‌-জ্যেঠা তোমার কাছে এসেছিলেন, না?

মানু—হুঁ।

লুইসা—এত সকালে কেন এসেছিলেন?

মানু—এম্‌নি।

লুইসা—সত্যি বল্‌ছ? উঁহু বাবা, বেশ বুঝ্‌ছি তোমার অনেক কথা বল্‌বার আছে আমাকে, কিন্তু কি করে' আরম্ভ কর্‌বে তাই নিয়ে মুস্কিলে পড়েছ।

মানু—কোন কথা বল্‌বার নেই তোমাকে। আর দেখো, তোমার জ্যেঠার কথা আর কখন আমার কাছে বল্‌বে না। আমার পক্ষে সে মৃত!

লুইসা—তা হ'লে···আমার জ্যেঠতুত ভাই পেপে···

মানু—সেও মৃত।

লুইসা—তোমাকে বলি তবে, আজ তৃতীয় পালা।

মানু—কি হয়েছে তা'তে?

লুইসা—কিছু হয়নি; তবে পরিবারের মধ্যে এত শোকের সময় আমাদের থিয়েটারে-যাওয়াটা আমার চোখে ভালো দেখায় না।

মানু—তৃতীয় পালা; তৃতীয় পালা! তা'তে কি হয়েছে আমার? আজ থেকে প্রত্যেক রাত্রে আমি তোমাকে থিয়েটারে নিয়ে যাবো, তুমি ফূর্ত্তি কর্‌বে, আমরা ফূর্ত্তি কর্‌ব। কিছু দুঃখ কোরো না মা আমার। তোমার জ্যেঠার কি বিশ্বাস তোমার জ্যেঠতুত ভাই ছাড়া আর মানুষ নেই?

লুইসা—তবে কিনা···

মানু—আর স্বার্থের কথা নিয়ে! একেবারে ভদ্রতা-জ্ঞান-বর্জ্জিত! যেখানে আমি তাদের জন্যে এতটা ত্যাগ স্বীকার করে' আমার ভালো-ভালো সম্পত্তি তোমাকে যৌতুক দিলাম, সুদের কাগজ ও ব্যাঙ্কের টাকা দিলাম, যাতে অবস্থা শুধ্‌রে নিতে পারে, সেখানে তোমার জ্যেঠা কি কর্‌লেন শুন্‌বে? ঘরের কড়ি তিনি একটা ছাড়্‌বেন না, তোমাদের কিছু টাকা মাস-মাস দেবেন, স্রেফ আর কিছু

না। তোমার জ্যেঠার কাছে কিছু টাকা কি বস্তু আমি জানি। বুড়ো কঞ্জুষ! একমাস সেটা দেবেন, তার পর না খেয়ে মর্‌বার জন্যে তোমাদের ছেড়ে দেবেন। আমার পক্ষ থেকে আমি গৃহস্থালী, গাড়ী-ঘোড়া এবং গরমের কালে বেড়াবার খরচ বাবদ যথেষ্ট দিচ্ছি; কিন্তু তিনি কিছু না দিলে তোমাদের না খেয়ে থাক্‌তে হ'বে। আর না খেয়ে কি তোমরা বাঁচ্‌বে, বলো?

লুইসা—তা বটে; আহার নাই এবং গাড়ী ঘোড়া আছে—তাই তুমি ঝগড়া করেছ?

মামু—কি আইডিয়া! তার বকাটে ছেলের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কি তা আমি অনেক দিন আগেই বলে' দিয়েছি...

লুইসা—কিন্তু, পেপে কিছু জানে?

মামু—এর মধ্যে জেনে থাক্‌বে।

লুইসা—উঃ বাবা, তুমি কত বদ্‌লে গিয়েছ!

মামু—যে-সমস্ত লোক স্বার্থের কাছে সব বলি দিতে পারে, যেন জীবনে সব অর্থেরই কথা, এবং তার জন্যে পারিবারিক বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটানো যায়, তাদের দেখ্‌তে পারি না আমি। কিছু টাকা! কিছু টাকা! বুড়ো জোচ্চরটা লেখাপড়াটুকু কর্‌তেও রাজি নয়, কোন-রকমে আপনাকে দায়ী কর্‌বে না। তুমি ভেবেছিলে কোন-রকম লেখাপড়া না করে' তোমার বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম?

লুইসা—তাই ত ফ্যাশান, বাবা।

মামু—আর ঠাট্টা কোরো না।

লুইসা—না, উল্টো। আমি বল্‌তে চাই তোমরা তোমাদের খুসী-মত গড়ো আর ভাঙো, আমাদের কথাটা একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেও এনো না,—যেন পেপে ও আমি দুইটি খোকা-খুকী যাদের নিজের কোন ইচ্ছা নেই, মনও নেই। প্রথমে তোমাদের দেখা দর্‌কার হয়নি, আমরা পরস্পরকে ভালোবাস্‌তে পারব কি না, এখনও দর্‌কার হচ্ছে না, আমরা ভালোবাস্‌তাম কি না। তাই নয় কি?

মামু—তুমি বল্‌তে চাও, তোমার জ্যেঠতুত ভাইঃ ভালোবাসো...

লুইসা—আমরা মনে করি সেরূপ সম্ভব।

মামু—মনে করার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্‌...

পেপে—(হঠাৎ প্রবেশ করিল) হাঁ, ছেড়ে দেও যাক্‌। আমি লুইসাকে ভালোবাসি।

মামু—বটে? তুমি এখানে কি মতলবে? এর অর্থ?

পেপে—অর্থ এই যে, আপনারা যখন স্বার্থের কথা মগ্ন ছিলেন, আমরা তখন আমাদের মনের কথা বল্‌বা সুবিধা করে' নিই; এবং কথা বল্‌তে বল্‌তে, কথ বলে'ই পরস্পরকে বুঝ্‌তে পারে লোকে।

লুইসা—আমরা স্থির করেছি আপনাদের সঙ্কল্পে বিপরীত, পরস্পরকে বিয়ে কর্‌তে।

মামু—হুঁ—আধ-ঘণ্টার মধ্যে। তোমরা ক্ষেপেছ!

লুইসা—কি বল্‌তে চান আপনি? দু'বছর ধরে বিয়ের কথাবার্ত্তার চেয়ে, আমাদের বিয়ে করা উচিত নয়, এই নিয়ে আধ-ঘণ্টার আলাপে পরস্পরকে ভালো করে' জান্‌বার অনেক বেশী সুযোগ হয়েছে আমাদের।

পেপে—তা'তে আমাদের কপটতা কর্‌বার কিছু ছিল না...

লুইসা—প্রতারণা কর্‌বারও কিছু ছিল না।

পেপে—পরস্পরকে ভালোবাসি না জেনে আমরা মন খুলে' কথা বলেছি।

লুইসা—এবং অনিচ্ছায়—

মামু—তাই মনে কর্‌ছ তোমরা। দু'জনে একটু ইয়ারকি দিয়েছ মাত্র। এক কথায় আমি বলি, তোমরা পরস্পরকে প্রতারিত কর্‌ছ; যেখানে মনে হচ্ছে নিজেদের সবখানি জেনেছ, আসলে সেখানে বিল্‌কুল কিছুই জানো না...

পেপে—আমাদের এর চেয়ে আর বেশী জান্‌বার প্রয়োজন নেই।

লুইসা—আপাতত আমাদের বেশী ভালোবাস্‌লেই যথেষ্ট হবে।

বীরভূমের উন্নতি

কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র পার্থিব উন্নতির বিষয় বিবেচনা করিলে, ইহা প্রথমেই উপলব্ধি করা যায় যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধন-সম্পত্তি এই তিন বিষয়ে উন্নতির প্রয়োজন। এবং ইহাও উপলব্ধি হয় যে, এই তিন বিষয়ে উন্নতি পরস্পরের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা ব্যতীত স্বাস্থ্য ও অর্থাগমের ব্যবস্থা হয় না; শরীর সুস্থ ও নীরোগ না হইলে, শিক্ষা-লাভ ও অর্থোপার্জ্জন করা চলে না; এবং দরিদ্র ও ধনহীন ব্যক্তিগণ নিজেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে বীরভূম জেলার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে এবং একথা বলা হইয়াছে যে, এই অবনতির প্রকৃত কারণ-গুলি নির্ণয় করিয়া উন্নতির উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ এই জেলাবাসী লোকের ধন-সম্পত্তির কথা বলিব। গত সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এই জেলায় শতকরা ৭৭ জন লোক কৃষিজীবী। বড় কারখানা এখানে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯২১ সালে এখানে ৪টি কয়লার খাদ ছিল; তাহাতে ৩৫০ জন পুরুষ এবং ৬৮ জন স্ত্রীলোক কাজ করিত। ২টি রেশমের কারখানায় ৭০ জন পুরুষ এবং ২২ জন স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। ২টি তেলের কল এবং ৫টি চাউলের কলে মোট ২৫৪ জন মজুর কাজ করিত। চাউলের কলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এই মুষ্টিমেয় শ্রমিকগণও অতি অল্পসংখ্যক। চাকুরী ও ব্যবসায়-জীবী লোকগণকে ছাড়িয়া দিলে, জেলার অধিকাংশ লোক, হয় নিজেরা চাষ করে, নতুবা জমিদার- ও পত্তনিদার-স্বরূপে উৎপন্ন শস্যের অংশ ভোগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষকদিগের ক্ষেত্রে ভালরূপ শস্য না জন্মিলে কেবল কৃষিজীবীগণ নহে, আরও অনেকের ঘরে অন্নাভাব ঘটে।

কৃষি

পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে পাটের চাষ নাই। ধানই এখানকার ফসল। কতক জমিতে আক, গম, আলু প্রভৃতি মূল্যবান্ ফসল জন্মে। ইহাকে এখানে 'দো'-জমি বলে। ইহাতে প্রথমে আশু ধান্যের আবাদ হয়; আশ্বিন মাসে তাহা কাটিয়া পুনরায় আবাদ করা হয়।

বীরভূম জেলার অধিকাংশ জমি অসমতল, সুতরাং বৃষ্টির জল মাঠের উপর দাঁড়ায় না, এবং বন্যার পর পলি পড়িয়া মাঠের উর্ব্বরতার বৃদ্ধি হয় না। বৃষ্টির অল্পক্ষণ পরেই জল গড়াইয়া নদী-নালা দিয়া বাহির হইয়া যায়; অতএব অনাবৃষ্টির সময় ধান-রক্ষার জন্য জল-সেচনের ব্যবস্থার প্রয়োজন; এবং শীতকালে যে-সকল মূল্যবান্ ফসল আবাদ হইতে পারে, তাহার জন্যও জল-সেচনের প্রয়োজন।

এই হিসাবে বীরভূম ও বাঁকুড়ার অবস্থা প্রায় সমান। তবে প্রভেদ এই যে, বীরভূমের অনেক অংশে বাঁকুড়া অপেক্ষা জমির উচ্চ-নীচতা কম ও মোটের উপর জল-সেচনের পুকুর-বাঁধের সংখ্যা বাঁকুড়ায় বেশী।

বাঁকুড়ার ন্যায় এখানেও জল-সেচনের অধিকাংশ বাঁধ-পুকুর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু বৎসরের পাঁক জমিয়া পুকুরের "গাবা" পার্শ্ববর্ত্তী জমির সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। মেরামতের অভাবে পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় জল ধরে না এবং অনেক স্থলে স্বার্থান্ধ জমিদার সামান্য লাভের আশায় এইসকল বাঁধের গাবা ধান চাষের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিতেছেন।

বাঁকুড়ার ন্যায় এখানেও এইসকল বাঁধ-পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি সমবায় জল-সেচন-সমিতি (Co-operative Irrigation Society) গঠিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বৈশাখের প্রবাসীতে

বাঁকুড়ার উন্নতি-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সেই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় এইসকল সমিতির উপকার-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বীরভূমের সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বথা প্রযোজ্য।

বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'ভূমিলক্ষ্মী" পত্রিকার আশ্বিনের সংখ্যায় বীরভূম জেলা-বোর্ডের চেয়ার্‌ম্যান্ এবং এই জেলার জল-সেচন-প্রচেষ্টার প্রধান কর্ম্মী রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ১৯১৮ সালে, জেলার তদানীন্তন কলেক্টর্ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্, মহাশয়ের যত্নে বীরভূমে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। তখন সমবায়-সমিতি (Co-operative Society) গঠনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। যে-সকল কৃষকের জমিতে জল-সেচন হয়, তাহারাই চাঁদা তুলিয়া পঙ্কোদ্ধারের ব্যয় বহন করিত। ঐ বৎসর দত্ত-মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের চেষ্টায় প্রায় ৪৭০০০ টাকা ব্যয়ে ৪১১টি পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হয়।

এই প্রণালীতে কিছু দিন কার্য্য করিবার পর, দেখা গেল যে, পঙ্কোদ্ধারের ব্যয়ের টাকা কৃষকদের নিকট সংগ্রহ করিবার আইনসঙ্গত ও বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা না থাকিলে চলে না। এইজন্যই, জল-সেচন-সমবায়-সমিতি (Co-operative Irrigation Society) প্রয়োজন।

গত ১৯২২ সালে এই পদ্ধতি-অনুসারে বীরভূম জেলায় প্রায় ৫০টি সমিতি গঠিত ও রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক সমিতি পঙ্কোদ্ধারের কাজ শেষ করিয়াছে। এযাবৎ সমবায়-বিভাগে (co-operative department) মাত্র একজন ইন্‌স্পেক্টর্ এই জেলায় এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত ছিল। সেইজন্য যথেষ্ট কাজ হইতে পারে নাই। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট্ এই প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আরও দুই জন ইন্‌স্পেক্টর্ ও তাহাদের অধীনে কয়েকজন সুপার্‌ভাইজার্ নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু এই জেলার যে সহস্র-সহস্র বাঁধ-পুকুর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আরও অধিক লোকের প্রয়োজন।

কিন্তু কেবল সর্‌কারী কর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় এই কাজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারে না। দেশের লোকদিগকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে হইবে, এবং গ্রামে-গ্রামে নিরক্ষর কৃষকগণকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া সমবায়-সমিতি গঠন করিতে হইলে জেলার সকল শিক্ষিত লোকের সাহায্য করিতে হইবে। এই বিষয় বৈশাখের প্রবাসীতে বাঁকুড়ার উন্নতি-শীর্ষক-প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বাঁধ ও পুকুর পঙ্কোদ্ধার ও মেরামত হইলে কেবল যে ধান ও অন্যান্য ফসল জন্মিবার সুবিধা হইবে তাহা নহে, ইহাতে স্নান ও পানের জন্য যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে। বীরভূমের মতন জলহীন স্থানে ইহাও কম সুবিধা নহে।

যে-সকল বাঁধ ও পুকুর আছে তাহার মেরামত ও পঙ্কোদ্ধার করিলেই যে জেলার সর্ব্বত্র চাষের জন্য যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে তাহা নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাঁকুড়া অপেক্ষা বীরভূম জেলায় ভূমির উচ্চ-নীচতা কম এবং বাঁধ-পুকুরের সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং এমন অনেক অংশ আছে যেখানে যথেষ্ট বাঁধ বা পুকুর নাই এবং সেচনের জন্য বাঁধ দিবার উপযুক্ত স্থানও নাই। সেইসকল স্থানে ছোট-ছোট নদী বা কাঁদড় বাঁধিয়া সেই জলে পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে অনায়াসে সেচন হইতে পারে। এযাবৎ এইপ্রকার তিনটি ছোট-ছোট বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। দাদপুর বাঁধে ৫৮২০৲, বাহিরা বাঁধে ১৫০০৲ ও জেমরান্দ স্লুইসে ২৭০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আরও কয়েকটি বাঁধ দিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহা ছাড়া, বক্রেশ্বর নদে বাঁধ দিয়া আন্দাজ ২৫০০০ হাজার বিঘা জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থার জন্য জরীপ চলিতেছে। রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাঁশলই নদে বাঁধ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু এখানে এখনও জরীপ আরম্ভ হয় নাই। এইসকল বড়-বড় কাজে স্থানীয় লোকের আগ্রহ থাকিলেও, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত সফলতা লাভ করা কঠিন।

আধুনিক বিজ্ঞানে কৃষি-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, বীরভূমের কৃষকগণ কৃষি-বিজ্ঞানের কিছুই জানে না। কৃষিকার্য্যে, পৃথিবীর অন্যদেশীয় কৃষকদের সহিত প্রতি-

যোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু যতদিন জলের অভাবে, কৃষকদের ফসল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, ততদিন হীনবল ও নিরুৎসাহ কৃষকগণের নিকট কৃষি-বিজ্ঞানের কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

বাংলা সরকারের কৃষি-বিভাগে উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের পরীক্ষা হইতেছে এবং কোন্ জেলার মাটি কোন্ ফসলের উপযোগী তাহা নির্দ্ধারণ এবং প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে সরকারী কৃষিক্ষেত্র (Domonstration farm) স্থাপিতও হইয়াছে। সিউড়ীতে সম্প্রতি সেই-প্রকার একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ভালো করিয়া কাজ হইলে, কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

শান্তিনিকেতনের সংলগ্ন শ্রীনিকেতনেও কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা হইতেছে। আশ্বিনের "ভূমিলক্ষ্মী"তে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে পরীক্ষার জন্য ধান, আদা, শণ, তুলা, পাট, গরুর খাদ্য ইত্যাদির চাষ হইতেছে এবং পেঁপে ইত্যাদি নানাপ্রকার ফলের গাছ ও ঝিঙে, মূলা, তরি-তরকারীর গাছ লাগানো হইয়াছে। এই প্রবন্ধে শ্রীনিকেতন কৃষিক্ষেত্রের উদ্দেশ্য তিনপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

(ক) ছাত্রগণ এখানে কৃষি শিক্ষা করিয়া নিজেদের কর্ম্ম করিবে এবং এখানকার আদর্শ-অনুসারে কাজ করিবে।

(খ) স্থানীয় কৃষকদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, কি করিলে একই জমিতে নানা-প্রকার ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

(গ) এখানকার উৎপন্ন ভালো বীজ যাহাতে কৃষকগণ পাইতে পারে।

শ্রীনিকেতন কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষগণের মধ্যে অনেকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শী। সুতরাং আশা হয় যে, তাঁহাদের চেষ্টায় বীরভূমের কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি হইবে।

কৃষিকার্য্যের পরেই শিল্পের কথা আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই জেলায় বেশী কলকারখানা নাই। অনেকের মতে ইহাতে দুঃখ করিবার কারণ নাই। কিন্তু কেবল কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট ধনাগম হয় না। আধুনিক সভ্যতার উপযোগী জীবনধারণের জন্য, পরিবারবর্গের শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য, রোগের চিকিৎসার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, তাহা কেবল কৃষিতে উৎপন্ন হইতে পারে না। অধিকন্তু, কৃষিকার্য্যে সমস্ত বৎসরের কাজ থাকে না। যাহারা কেবল ধান চাষ করে, তাহারা বৎসরের মধ্যে তিন-চার মাস পরিশ্রম করে মাত্র। অধিকাংশ জাতির স্ত্রীলোকগণ গৃহকার্য্য ব্যতীত কৃষি-কার্য্যের কোনও সাহায্য করে না। এক বা দুইজন প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের তিন বা চার মাসের পরিশ্রমের ফলে পরিবারস্থ সকলের সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। এইজন্য, কৃষিকার্য্য ব্যতীত, অর্থাগমের জন্য, অন্য আনুষঙ্গিক উপায় অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

গৃহ-শিল্প বীরভূমে নাই বলিলেও চলে। গ্রামে-গ্রামে দুই-একঘর কুমার হাঁড়ি গড়ে, কোনও-কোনও গ্রামে মুচিরা জুতা প্রস্তুত করে, ডোমেরা ঝুড়ি-মাদুর প্রস্তুত করে। ইহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। কয়েকটি গ্রামে কাঁসা-পিতলের বাসন প্রস্তুত হয়। অনেক গ্রামে কামার-শাল আছে, তাহাতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি তৈয়ারি হয়। দুবরাজপুর, লোবপুর, রাজনগর ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে কাঁচি, ছুরি, কুড়াল, কোদালি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। অনেক গ্রামে তাঁতি আছে। তাহারা মোটা কাপড় প্রস্তুত করে; বোলপুর, দুবরাজপুর, করিধ্যা, আলুন্দিয়া ইত্যাদি স্থানে ভালো কাপড় ও ছিট্ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কয়েকটি স্থানে তসর ও গরদের কাপড় প্রস্তুত হয়।

এইসকল শিল্পের কোনটিই যে প্রসার লাভ করিতেছে এবং পূর্ব্ব-অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। গত দুইবারের মানুষ-গুন্তিতে এই জেলার বিভিন্ন-শ্রেণীর শিল্পীদের সংখ্যা নিম্নলিখিত-মতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

	১৯১১	১৯২১
রেশমের তাঁতি	৩০৯৮	৯৫৭
সূতার তাঁতি	১০৭৭৯	১০১১৩

	১৯১১	১৯২১
কাঁসারি	৮১০	৫৪৪
কামার	২৫৩৬	২৪৬৪
শাঁখারি	৩৮৯	৩১৬

গৃহ-শিল্পে বীরভূম জেলা বাংলার অন্যান্য জেলা হইতে কত পশ্চাৎপদ তাহা দেখাইবার জন্য বীরভূম ও বাঁকুড়ার বিভিন্নশ্রেণীর কারিকরদের সংখ্যা দেওয়া হইল। আয়তনে ও লোক-সংখ্যায় এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় এই দুই জেলার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; তাহা সত্বেও বীরভূমে কারিকরের সংখ্যা এত কম কেন তাহা ভাবিবার বিষয়।

	বীরভূম	বাঁকুড়া
আয়তন (বর্গমাইলে)	১৭৫৩	২৬২৫
লোকসংখ্যা	৮৪৭,৫৭০	১,০১৯,৯৪১
তাঁতি (সুতার)	১০১১৩	১৯২০৬
ঐ (রেশমের)	৯৫৭	৩২৪০
শাঁখারি	৩১৬	১৩৯৪
ছুতার	৩২০২	৩২৪৮
ঝুড়ি, মাছুর, চাটাই ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক	৪৬৫২	৭৫১০
কামার	২৪৬৪	৪৬৪১
কাঁসারি	৫৪৪	৭৮২১
কুমার	২৪৩০	৪৯৫৩
কলু	১০৪০	৪১১৪
ময়রা	১৪৮০	৩৫৯১
মুচি	৭৬১	২৪৬২
ধোপা	৬৬৮	১৩৭৯
নাপিত	২০৪৯	৪২১১
স্বর্ণকার	২৯৮৩	৫৯১৭
মালা, বালা ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক	৫৬	২৫৬২
কম্বল প্রস্তুত-কারক	২	৩৫৬
চামড়া-ব্যবসায়ী	১৩৫	৭৭৫
রেশম, পশম ও সূত্রের বস্ত্রের ব্যবসায়ী	১৬২৬	২৮০৫
ঘৃত, মাখন ও দুগ্ধ-বিক্রেতা	১৫১৩	৩৭৩৫

এই তালিকা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, এই জেলার লোকের স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার যথেষ্ট প্রবৃত্তি নাই। ইহা বীরভূমের দারিদ্র্যের একটি কারণ। ইহার প্রতিকার কর্ত্তব্য। যাহাতে লোকে সহজে এইসকল কাজ শিক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া চাই এবং যে-সকল কারণে এইসকল ব্যবসায়ে আশানুরূপ উপার্জ্জন হয় না, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সেইসকলের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে অনেক অর্থব্যয় প্রয়োজন, এবং পাশ্চাত্য দেশের প্রচলিত যন্ত্রাদি না থাকিলে, শিল্প-বিদ্যালয়ের সার্থকতা হয় না। উন্নতপ্রণালীর যন্ত্রের প্রয়োজন নাই, একথা বলিতেছি না। কিন্তু বীরভূমের গৃহ-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের যে-সকল শিল্প আছে, তাহারই বহুল প্রচলনের ব্যবস্থা প্রথমে করা উচিত। ইহা ব্যয়সাধ্য নহে।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি অনেক জাতির লোক তাঁত ধরিয়াছে। এবং বাঁকুড়া ওয়েস্লীয়ান্ কলেজের অধ্যক্ষ কর্ম্মবীর ব্রাউন্ সাহেবের প্রবর্ত্তিত কো-অপারেটিভ্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ইউনিয়ানের (Co-operative Industrial Union) সাহায্যে বাঁকুড়ার তাঁতিরা নানা-প্রকারের উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত করিতেছে। বাংলার অন্যান্য জেলায় তাহার চাহিদা আছে। এই সমিতির চেষ্টায় বাঁকুড়ার অনেক তাঁতি ঠক্‌ঠকী (fly-shuttle) তাঁত ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। বীরভূমেও সেইপ্রণালীতে কাজ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে শিউড়ীতে একটি বয়ন-বিদ্যালয় আছে এবং গবর্ণ্‌মেণ্টের নিযুক্ত একজন শিক্ষক স্থানে-স্থানে গিয়া বস্ত্র-বয়ন শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া শ্রীনিকেতনের সংশ্লিষ্ট একটি বয়ন-বিদ্যালয় আছে। এখানে সূতা রং-করার প্রণালী শিখানো হয়। ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান্ রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের চেষ্টায় এইবৎসর গ্রীষ্মাবকাশের সময় কয়েকজন বোর্ড্-স্কুলের শিক্ষক শ্রীনিকেতনে থাকিয়া বস্ত্র-বয়ন ও পল্লী-সংস্কার-কার্য্য শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্ব-স্ব গ্রামে ফিরিয়া গিয়া, এইপ্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই কার্ত্তিক মাসে আরও কয়েকটি শিক্ষক এইপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার জন্য শ্রীনিকেতনে আসিয়াছেন। এইপ্রণালীতে জেলাবোর্ডের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বস্ত্র-বয়ন-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে অন্ন-সমস্যার কতকটা সমাধান হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে হইলে এককালীন ও মাসিক যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা জেলাবোর্ডের তহবিল হইতে দিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ।

বস্ত্র-বয়নের ন্যায় অন্যান্য শিল্প-শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা চাই। উদাহরণস্বরূপ, মালা-প্রস্তুত-শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঁকুড়া জেলায় এই শিল্পে ২৫৬২ জন লোক প্রতিপালিত হয়। এখানে মাত্র ৫৬ জন। ইহারা তুলসীকাঠ, বেলের খোলা ইত্যাদির মালা প্রস্তুত করে। এই মালা বহুলপরিমাণে পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে চালান হয় এবং বাঁকুড়া সহরের কয়েকজন মাড়োয়ারী ইহার ব্যবসায় করিয়া বড়লোক হইয়াছে। ইহার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অতিসামান্য এবং মূলধনের প্রয়োজন নাই বলিলেই চলে। এইপ্রকার অনেক সহজ গৃহ-শিল্প আছে।

শিক্ষা

বীরভূমে কি-প্রকার শিক্ষার বিস্তার হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি দেখিলে জানা যাইবে।—

	জনসংখ্যা	শিক্ষিত পুরুষ		শিক্ষিত স্ত্রীলোক		মোট
	৮৪৭৫২২	৮২৭০৪	+	৪৫১৬	=	৮৭২২০
হিন্দু	৫৭৬৭৫০	৬৪৮৭৪	+	৩৬৮৫	=	৬৮৫৫৯
মুসলমান	২১২৪৬০	১৭১৫৫	+	৬২৪	=	১৭৭৭৯
অ্যানিমিষ্ট	৫৭৬১০	৪২৬	+	৯৩	=	৫১৯

	১৯১১-১২	১৯২০-২১
সকলপ্রকার বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা	১৩৪৪	১৩৫৩
মোট ছাত্র-সংখ্যা	৪০৫৮৩	৩৭৭০৮
যেসকল বালকদের বিদ্যালাভ করা উচিত তাহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে শতকরা	৫৪·৬	৫১·৩
যেসকল বালিকার বিদ্যালাভ করা উচিত তাহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে শতকরা	৫·৭	৮·০

গত দশবৎসরে স্ত্রী-শিক্ষার সামান্য উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা এত কমিয়া কমিয়া গিয়াছে কেন, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতিসামান্যই বাড়িয়াছে।

এই দশবৎসরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে। মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়াছে; কারণ সকলেই ইংরেজী শিখিতে চায় এবং ক্রমে-ক্রমে মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়গুলি মধ্য-ইংরেজীতে পরিণত করা হইয়াছে। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৫ ছিল; এখন হইয়াছে ১০৮। নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭১টি ছিল; এখন ১১৪৯। প্রাথমিক শিক্ষার আরও বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে এবং গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিতে হইলে, যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে? গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন এইজেলায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তদনুসারে যে-সকল গ্রাম্য সমিতি (Union Board) স্থাপিত হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু গ্রামের লোকেরা আর কর দিতে নারাজ। এই প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে এই জেলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। যে-সকল বালক বর্ত্তমানে শিক্ষালাভ করে, তাহাদের অধিকাংশই অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি জাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য তথাকথিত নীচজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন। কি-প্রণালীতে, বেশী অর্থব্যয় না করিয়া ইহাদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য।

উচ্চশিক্ষার জন্য হেতমপুরে একটি কলেজ আছে। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পর্য্যন্ত পড়ানো হয়। এই কলেজে বর্ত্তমানে ছয় জন শিক্ষক ও ১৫০ জন ছাত্র আছে। হেতমপুরের রাজা মহাশয় ইহার যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। রাজা বাহাদুরের বদান্যতা প্রশংসার্হ।

বীরভূমের শিক্ষার কথা বলিতে কবি রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত শান্তিনিকেতনের উল্লেখ প্রয়োজন।

শান্তিনিকেতনে এখন মোটামুটি তিনটি বিভাগ আছে, বিদ্যা-ভবন, শিক্ষা-ভবন ও পাঠ-ভবন। বিদ্যা-ভবনে মৌলিক গবেষণার কার্য্যই বেশী হয়। এ-বিভাগে অধ্যক্ষ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি ছাড়া পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ও ডক্টর্ কলিন্‌স্ এ-বিভাগে নিজ-নিজ বিষয়ে গবেষণা করেন। কয়েক মাস হইল একজন তিব্বতী লামা আসিয়াছেন উপযুক্ত ছাত্রদের তিব্বতী ভাষা শিখাইবার জন্য। তিনি তিব্বতী পুঁথি তাঙ্গুর নকলও করিতেছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনের চীনা কলেজের

অধ্যক্ষ লিম্ আসিয়াছেন এখানে চীনাভাষা পড়াইবার জন্ম। ডক্টর্ ষ্টেন্ কোনো আসিয়াছেন এখানে মৌলিক গবেষণায় ছাত্রদের সাহায্য করিবার জন্ম। তিনি বর্ত্তমানে "ভারতীয় ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন।

বর্ত্তমানে শিক্ষা-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রী নেপালচন্দ্র রায়। এখানে সাধারণতঃ সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ম্যাট্রিক্ পরীক্ষার পর ছাত্রেরা এখানে পাঁচ বৎসর পড়িলে উপাধি সার্টিফিকেট্ পাইবে। সেইজন্ম প্রথম তিনবৎসর তাহাদের ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন ও ফরাসী বা জার্ম্মান্ ভাষা শিখিতে হয়। শেষ দুইবৎসর কোন বিষয়ে বিশেষভাবে পাঠ করিতে হয়।

পাঠ-ভবনে অনেকটা ম্যাট্রিকের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে অন্যান্ত বিদ্যালয় অপেক্ষা এখানে সঙ্গীত, চিত্র-বিদ্যা, ছুতারের কাজ ও বিজ্ঞান বেশী শিখানো হয় ও মেয়েদের সঙ্গীত ও গার্হস্থ্য-বিদ্যা, রোগী-সেবা অবশ্য শিক্ষণীয়।

এ-তিনটি বিভাগ ছাড়া কলা-ভবনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এখানে প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয় ছাত্রদের চিত্র-বিদ্যা শিখান আর শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী সঙ্গীত-বিদ্যা শিখান।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্যের জন্ম সর্ব্বপ্রথমে পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল প্রয়োজন। এই জেলায় বাঁধ-পুকুরগুলি কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অতিশয় জলাভাব ঘটিয়াছে। এই বৎসর গ্রীষ্মকালে প্রায় সকল গ্রামেই দারুণ কষ্ট হইয়াছিল। শুনিয়াছি যে, বোলপুর শহরে লোকেরা কয়েক দিন স্নান করিতে পায় নাই। এই বোলপুর সহরে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মাঠে অনেকগুলি বাঁধ ও পুকুর আছে; কিন্তু তাহার কোনটিই ভালো অবস্থায় নাই; সুতরাং জল থাকে না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইতে সমীপবর্ত্তী মাঠে জল-সেচন হয়। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, এইসকল জলাশয় যখন ভালো অবস্থায় ছিল, তখন জলের অভাব ছিল না এবং ফসল কখনও নষ্ট হইত না।

কিন্তু কেবল জল থাকিলে চলিবে না। পানীয় জলের পুকুরগুলি যাহাতে মলমূত্র ত্যাগ বা অন্য কারণে দূষিত হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, এখানে কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। এবারেও ভয়ানক কলেরা হইয়াছিল। দূষিত জল পান করিয়াই অনেক লোক এই রোগের কবলে পতিত হয়। সুতরাং জলাশয় যাহাতে দূষিত না হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গ্রামে-গ্রামে ব্রতী-বালকের দল (Boy-Scouts) গঠন করিয়া তাহাদের দ্বারা পানীয় পুকুর রক্ষার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে।

পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, এখানে ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্ট্-অনুসারে বাংলার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এখানেই ম্যালেরিয়া-জ্বরে মৃত্যুর হার বেশী। বিশ্বভারতীর পল্লী-সংস্কার-বিভাগ হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ম্যালেরিয়া-নিবারণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইকাজের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

প্রতিগ্রামে একটি করিয়া পল্লী-সমবায়-সমিতি গঠিত হয়। গ্রামের লোকেরা অবস্থা-অনুসারে অর্থ-সাহায্য বা প্রতিদিন একমুষ্টি চাউল দিয়া থাকে। যাহারা অতি দরিদ্র, তাহারা মাসে একদিন একবেলা কায়িক পরিশ্রম করিয়া সমিতির কাজে সহায়তা করে। গ্রামে একদল স্বেচ্ছাসেবক বা ব্রতী-বালক জোগাড় করা হয়। ইহারা চাঁদা সংগ্রহ করে এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদিগকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া কুইনাইন্ সেবন করায়। তাহা ছাড়া পুকুর ও ডোবার তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সপ্তাহে একবার করিয়া কেরোসিন্ তেল ছড়ানো হয়। যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে তাহাদের সাহায্যে জল ও পুকুরের আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হয়।

বলা বাহুল্য, আমাদের মতন দরিদ্র-দেশের উপযোগী অল্পব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছে। আপাততঃ স্কুলের নিকটবর্ত্তী ১০টি গ্রামে এইপ্রণালীতে কাজ

আরম্ভ হইয়াছে। বীরভূম জেলা-বোর্ডের সভাপতি অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কয়েকজন শিক্ষক স্কুলে আসিয়া এই কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের সাহায্যে তাঁহাদের নিজ-নিজ গ্রামে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ম্যালেরিয়া-নিবারণের চেষ্টা হইতেছে।

পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলে ম্যালেরিয়া কলেরা ইত্যাদি রোগে এত লোকের মৃত্যু হইত না। যে-সময় জেলার বিবরণী (District Gazetteer) লিখিত হইয়াছিল তখন এই জেলায় সর্ব্বসুদ্ধ নয়টি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। তাহার মধ্যে সিউড়ীর লেডি কার্জন্ জেনানা হাঁসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের দ্বারা স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সুখের বিষয় যে,দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বর্ত্তমানে এইজেলায় ৩০টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। জেলার আয়তন ১৭৫৩ বর্গ মাইল; সুতরাং প্রতি ৫৮ বর্গ মাইলে একটি চিকিৎসালয় আছে। ইহা যথেষ্ট নহে। সুখের বিষয় এই যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং অনেক গ্রাম্য-সমিতি (Union Board) এইবিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। এইসকল সমিতির চেষ্টায় গোল্লারপুর, বাতিকার, হাসান, বালিজড়ী, পাইকর ও কুস্তলা এই ছয়টি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। অন্য সকল গ্রাম্য-সমিতিতে এইপ্রকার উদ্‌যোগ বাঞ্ছনীয়।

১৯২১ সালের মানুষ-গুন্তিতে এখানে ৪৫১ জন পুরুষ ও ছয় জন স্ত্রীলোক চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়জন শিক্ষা পাইয়া চিকিৎসা-কার্য্যে উপযুক্ত হইয়াছেন এবং কয়জন "হাতুড়ে" আছেন, তাহা বলা কঠিন। তবে রিপোর্ট্ দৃষ্টে জানা যায় যে, জলপাইগুড়ি,দার্জ্জিলিং ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যতীত বাংলার সব জেলাতেই ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী চিকিৎসক আছেন। যে-জেলায় রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশী এবং মৃত্যুর হার অধিকাংশ জেলাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, সে-জেলায় যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসক প্রয়োজন। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে অনেক যুবক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভ করিতে চায়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। সেইসকল যুবককে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ায় যে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, বৈশাখের প্রবাসীতে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূমেও এই-প্রকার একটি বিদ্যালয় আবশ্যক।

কুষ্ঠ

বীরভূমে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাবের কথা পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। বাঁকুড়ায় কুষ্ঠীর সংখ্যা এখানকার চেয়ে বেশী। বাংলা দেশের মধ্যে এই দুই জেলা ও বর্দ্ধমানে কুষ্ঠীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইহার প্রতিকারের জন্য স্থানে-স্থানে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুমোদিত পদ্ধতি-অনুসারে ইহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বাঁকুড়ায় খৃষ্টীয়ান্ মিশনরিগণ-কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত একটি আশ্রম আছে। আর-দুই জেলাতে কোনও আশ্রম নাই। চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। প্রতি-জেলায় এই রোগের বিশেষজ্ঞ একজন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। পৃথক্ চিকিৎসক নিযুক্ত করা ব্যয়সাধ্য হইলে, এই রোগের চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরকে এই জেলার সিভিল সার্জ্জনের পদে নিয়োগ করা উচিত নহে।

রাস্তা ইত্যাদি

বীরভূম জেলার একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমনের বেশ সুবিধা আছে। মোটের উপর, এই হিসাবে বীরভূম বাংলাদেশের অনেক জেলা হইতে উন্নত বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীর লুপ্‌লাইন্ এই জেলাকে প্রায় সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরে অণ্ডাল হইতে সাঁইথিয়া পর্য্যন্ত লাইন্ নির্ম্মিত হওয়ায় জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। নল্‌হাটী হইতে ইষ্ট্ইণ্ডিয়ান রেল্‌ওয়ের একটি শাখা আজিমগঞ্জ অভিমুখে গিয়াছে। এই তিনটি লাইনের এই জেলার অন্তর্ভুক্ত অংশের দৈর্ঘ্য ১২০ মাইলের অধিক। এতদ্ব্যতীত

সম্প্রতি আহম্মদপুর ষ্টেশন্ হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত একটি ছোট রেলপথ (light railway) নির্ম্মিত হওয়ায় জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশের অনেক স্থানে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। এইসকল রেলপথে এই জেলায় ২২টি ষ্টেশন আছে।

জেলাবোর্ডের নির্ম্মিত ও সংরক্ষিত প্রায় ৫০০ মাইল রাস্তা আছে। ইহার ২৩২ মাইল পাকা, ও ২৮৯ মাইল কাঁচা। কাঁচা রাস্তাতেও, বর্ষার কয়েকমাস ব্যতীত, যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা নাই। জেলাবোর্ডের আয় পূর্ব্ববৎ আছে, কিন্তু নানাবিধ খরচ আগের অপেক্ষা বাড়িয়াছে। রাস্তার কাজের জন্য গাড়া-ভাড়া, মজুরি ইত্যাদিও বাড়িয়াছে। সুতরাং অনেক রাস্তা পূর্ব্বের ন্যায় সংরক্ষিত হইতেছে না।

যাহা হউক এইসকল রেলপথ ও রাস্তা থাকাতে এখানকার লোকেরা বিদেশে যাইতে বা জেলার মধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে বেশী কষ্ট পায় না।

জঙ্গল

পূর্ব্বে জেলার অনেক অংশে জঙ্গল ছিল। কিন্তু এখন জঙ্গল নাই বলিলেই চলে। কোথাও-কোথাও ক্ষুদ্রকায় শাল ও অন্যান্য গাছের সমাবেশ দেখা যায়, তাহা জঙ্গল নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। জঙ্গল নষ্ট হওয়ায়-জ্বালানি কাঠ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী কয়লার খাদ হইতে অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে কয়লা পাওয়া যায়, সেইজন্য জ্বালানি-কাঠের অভাব বেশী অনুভূত হয় না।

জ্বালানি-কাঠ ব্যতীত জঙ্গল হইতে আরও অনেক প্রকারে লোকের অর্থাগম হইত। হরীতকী, কুচিলা ইত্যাদি নানাবিধ আবশ্যক ফল পাওয়া যাইত। ওম্যালি সাহেবের প্রণীত জেলার বিবরণী (District Gazetteer) পাঠ করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এই জেলার পশ্চিম অঞ্চলের জঙ্গল হইতে অনেক তসরগুটি (cocoons) পাওয়া যাইত। এখন এই-জেলার জঙ্গল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এখানে আর গুটি জন্মে না। সমস্তই সাঁওতাল পরগণা হইতে আনীত হয়।

জঙ্গলে প্রচুরপরিমাণে ঘাস জন্মে। সুতরাং নিকটবর্ত্তী গ্রামের গো-মহিষাদির চরিবার সুবিধা হয়। গো-চারণ-ভূমির অভাব যে গো-জাতির অবনতির প্রধান কারণ ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই জেলার জঙ্গল-সকল সংরক্ষিত হইলে সেই অভাব কতকপরিমাণে দূর হইবে।

ইহা ছাড়া উচ্চভূমির উপরিস্থ জঙ্গল কাটিয়া ফেলাতে আর-একটি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিতেছে। জঙ্গলাবৃত স্থানে বৃষ্টি পড়িলে, ঐ বৃষ্টির জল অনেকপরিমাণে মাটিতে সঞ্চিত হয় এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিকে নরম করিয়া রাখে। অনেক বিশেষজ্ঞের মত এই যে, উচ্চ ভূ-ভাগ জঙ্গলাবৃত থাকিলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং জঙ্গল নষ্ট হওয়াই যে বীরভূমের জলাভাবের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার প্রতিকারের জন্য উন্মুক্ত স্থানসমূহে বৃক্ষরোপণের চেষ্টা হওয়া চাই। কোন্-কোন্ বৃক্ষ এই জেলার উপযোগী, তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য এবং তাহার বীজ বা চারা সরবরাহের ব্যবস্থা চাই। এই বিষয়ে জেলার প্রধান জমিদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উপসংহার

এইপ্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা-ছাড়া অবনতির আরও-অনেক কারণ আছে। তাহাও দূর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার অধিকাংশই বাংলার অন্যান্য জেলাতেও বর্ত্তমান আছে। সকলেই তাহা জানেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দলাদলি ও মাম্‌লা-মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রাম্য দলাদলিতে ও অযথা মাম্‌লা-মোকদ্দমায় অনেক লোক কষ্ট পায় ও সর্ব্বস্বান্ত হয়। চেষ্টা করিলে, ইহাদের কষ্ট কতকপরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে। বিবাহ ও শ্রাদ্ধে অতিরিক্ত ব্যয় এবং অনাবশ্যক বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহারে অনেক অর্থের অপব্যয় হয়। ইহাও অবনতির আনুষঙ্গিক কারণ। এই বিষয়ে বাহুল্য-ভয়ে কিছুই লিখিলাম না। যে-সকল কারণ বীরভূমের অবস্থার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট তাহারই উল্লেখ করিলাম। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এইপ্রবন্ধ পাঠ করিয়া, আমার সহকর্ম্মীগণের মধ্যে যদি কাহারও বীরভূমের অবনতির প্রকৃত কারণ উপলব্ধি ও স্বীয় কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের সাহায্য হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কর্ম্মী

"কোনও উত্তর নাই"

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

"আর তুমি বল্‌ছ, আমাদের একটা আপেলের বাগানও থাক্‌বে ?"—বাঁ-চোখের পাতার নীচে বেশ দক্ষতার সহিত রংএর পেন্‌সিল বুলাইতে-বুলাইতে রমণী এই প্রশ্ন করিল। অভিনয়ের উদ্দেশে রমণী নিজ মুখ কিরূপ তাড়াতাড়ি চিত্রিত করিতেছে, তাহা দেখিতে-দেখিতে যুবক উত্তর করিল—"হাঁ,—আর আপেল-গাছে যখন ফুল ধরে, তখন কি সুন্দর দেখ্‌তে হয় !"

"আর নীচে দিয়ে ভল্‌গা-নদী বয়ে' যাচ্ছে ?"

"আমার ভূ-সম্পত্তিটা একেবারে পাহাড়ের ঢালুর উপর অবস্থিত। বারণ্ডা থেকে একটা সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর বসন্ত-কালে নদীটা খুব প্রশস্ত হয়।"

"খুব চমৎকার সে—ঢালু পাহাড়, চওড়া নদী, আপেল-গাছে ফুল-ফোটা—সবই খুব সুন্দর। কিন্তু তোমার বাগানে একটা অভাব আছে।"—রমণী যুবকের দিকে মুখ ফিরাইয়া স্মিতচক্ষে এই কথা বলিল। মুখখানি দৃষ্টি-আকর্ষক,—চুম্বকের মতো যুবককে তাহার দিকে আকর্ষণ করিল। কি সুন্দর চোখ,—ধূসর ও উজ্জ্বল ; ঠোঁটদু'টি যেন গোলাপের কুঁড়ি—একটু হাসিলে তাহার ভিতর হইতে মুক্তার মতো দুই সারি দাঁত দেখা যায়। গোলাপী রংএর ছোট ঝিনুকের মতো দুইটি ছোট কান। কপাল ছোট—কিন্তু যেন খুদিয়া-গড়া। থুঁথি একটু টোল-খাওয়া—অতি সুন্দর। গালের উপর একটি ছোট্ট জড়ুল-চিহ্ন আছে। সমস্ত লইয়া মনে হয় যেন স্বল্প-কুঞ্চিত স্বর্ণাভ কোমল কুন্তলরূপ ফ্রেমের মধ্যে একটি সুন্দর মুখের ছবি রক্ষিত হইয়াছে। রমণী কথা টানিয়া-টানিয়া আস্তে-আস্তে বলিল—"হাঁ, কেবল একটা অভাব আছে—নারেঙ্গি-ফুলের অভাব"।

রমণীর কথার ভাবটা ঠিক্ ধরিতে না পারিয়া যুবক উত্তর করিল—"নারেঙ্গি-ফুল ? আমাদের দেশে নারেঙ্গি-নেবু ত জন্মায় না।"

"সত্যি ? আঃ, কেন একথাটা আমাকে বল্‌লে ? আমার মনে হয় নারেঙ্গি-ফুল বড়ই সুন্দর—কতকটা লিলির মতো—যৌবন ও পবিত্রতার যেন প্রতিরূপ।"

এখনো যুবক কথার অর্থটা ধরিতে পারে নাই ; তাহার মুখে একটু অপ্রতিভ-ধরণের হাসি লক্ষিত হইল। রমণী লীলাচ্ছলে তাহার হাত-পাখাটা যুবকের স্কন্ধে একটু আঘাত করিয়া আর-একটু গম্ভীর-স্বরে বলিল—"আচ্ছা বেশ, তোমার বাগানে আমরা কি কর্‌ব ?"

"প্রতিদিন আমরা সেখানে বেড়িয়ে বেড়াবো।"

"আর সেই জমিদারিতে ?"

"ও ! আমরা সেখানে গুছিয়ে বসে', বেশ সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন কর্‌ব।"

রমণী পিছন-দিকে মাথা হেলাইয়া হাসিয়া উঠিল। যুবক তাহার সুন্দর খোদাই-করা কণ্ঠ, তাহার সুগোল বক্ষ—তাহার স্কন্ধদেশ দেখিতে পাইল—হাসির উচ্ছ্বাসে কাঁধটা ঝাঁকাইতেছিল। তাহার মুখের হাস্যাশ্রু মুছিয়া সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"বাগানে বেড়িয়ে বেড়ানো—জমিদারিতে গুছিয়ে বসা !" দেখ তুমি আমার মুখের সমস্ত বর্ণ-রচনা নষ্ট ক'রে দিলে। আচ্ছা ভাই, তোমার বয়স কত হবে বলো ত ?"

"আমি শীঘ্রই ২৩শে পড়্‌ব।"

"সুন্দর বয়স। তোমার উপর আমার হিংসে হয়। আমার বয়স কত তোমার মনে হয় ?—না, আন্দাজ না-করাই ভালো। আমি নিজেই আমার বয়স ভুল্‌তে সুরু করেছি।"

উহারা সেন্টপিটস্‌বর্গের গ্রীষ্মকাল-সুলভ এক আমুদে রঙ্গালয়ের সাজ-ঘরের ভিতর ছিল। দরজার বহির্ভাগে এক-টুক্‌রা কাগজ কাই দিয়া লাগানো, তাহাতে লেখা আছে—"মারিয়া-ইভানভ্‌না।" কোন নব-আগন্তুক ঘরে ঢুকিলে, ঘরের আভ্যন্তরিক দৈন্যদশা তাহার সহজেই নজরে পড়ে। পুরাতন নৌকায় খারাপ-করিয়া-জোড়া কতকগুলা তক্তা দিয়া দেয়াল গঠিত ; কাঠের গোঁজগুলা উহা হইতে উঠাইয়া ফেলার দরুন,—ছিদ্রে ভরা ; ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলি, তুলার নুটি ও কাগজের দ্বারা ছিদ্রগুলা বন্ধ করিবার চেষ্টা সত্বেও, উহা হইতে অজস্রধারে জল পড়ে। আস্‌বাবের মধ্যে—একটা জীর্ণ সোফা, খান-দুয়েক কেদারা, একটা প্রসাধন-টেবিল, আর একটা হাত-মুখ-ধোবার মেজ ; ঘরের কোণে, কতকগুলা থিয়েটরী পোষাক এলোমেলোভাবে ঝোলানো রহিয়াছে। বদ্ধ বায়ু,—ওডিকলোনের গন্ধে, পাউডারের গন্ধে, সস্তা দামের কড়া সুগন্ধি আরকের গন্ধে ভরপুর। বাগানের মুখোমুখি একটিমাত্র জান্‌লা ; কালক্রমে-হল্‌দে-হইয়া-গিয়াছে এইরূপ এক টুক্‌রা মস্‌লিন্‌-কাপড়ের পর্দ্দায় জান্‌লাটা বিভূষিত। অভিনয়ের সময়, যখন মারিয়া-ইভানভ্‌না সাজসজ্জা করিতেছিল,—বলা বাহুল্য সেই সময় জান্‌লাটা বন্ধ ছিল। দিবা-রাত্রির অবশিষ্ট সময়েও উহা খুলিয়া রাখিবার কোন আবশ্যকতা হয় না। এইরূপ সাজ-ঘর শুধু "তারকা" উপাধিধারী সেরা-অভিনেত্রীরাই উপভোগ করিতে পাইত। কিন্তু মারিয়া বেশ বুঝিয়াছিল, তার রাজ্য আর বেশী দিন টিঁকিবে না ; কিন্তু যাই হোক, নাম ডাকের জোরে, এখনও পর্য্যন্ত সে এইসব গ্রীষ্ম-উদ্যানের থিয়েটারগুলায় রাজরাণীর মতো একাধিপত্য করিতেছিল। সকল জীবন-পথের মধ্যেই, সকল ব্যবসার মধ্যেই নামের প্রভাব খুবই বেশী।

যে-যুবকটি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে দেখিতে সুশ্রীও নহে, কুৎসিতও নহে। সে কেবল তরুণ-যৌবন-শ্রীতে—নিষ্কলঙ্ক-যৌবন-সম্পদে ভূষিত। ছোট্ট একগুচ্ছ ঘন দাড়ী থাকায় তাহার বয়স অপেক্ষা তাহাকে বেশী স্থিরবুদ্ধি ও পরিপক্ক বলিয়া মনে হয়। তাহার আগ্রহ-পূর্ণ শ্যামল চোখ-দু'টি দেখিলে মনে হয়, লোকটা খুব সাদাসিধে, বিশ্বাস-প্রবণ ও নির্ভরশীল। তাহার গ্রীষ্মঋতু-সুলভ ফিট্‌ফাট্ পরিচ্ছদ ও মাজাঘসা মুখের চেহারা দেখিলে মনে হয়, সে একজন সৌখীন সমাজের লোক। মারিয়া-ইভানভ্‌না, গ্রীষ্ম-থিয়েটারের জীব-তত্ত্ব বরাবর অনুশীলন করিয়া আসিতেছে, সে গোড়াতেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। যুবকের ধরণ-ধারণ তার খুব ভালো লাগিয়াছিল ; তাই তাহাকে সাজ-ঘরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিয়াছিল। কিন্তু আজ মারিয়া, তাহার কথায় এতটা বিস্মিত হইয়াছিল, যে, কথাটা পরিহাসের ভাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা-সত্বেও, সে নিজের মনকে বশে রাখিতে পারিতেছিল না।

যুবক একটু গদগদস্বরে বলিল,—"এটা ভুলো না, আমি কথাটা খুব

ভেবে-চিন্তে গভীরভাবেই বল্‌ছি”—মনের উত্তেজনায় তার গলা শুখাইয়া গিয়াছিল।

“বটে?—হাঁ তাই ত, আমাকে আর ঠাট্টা কর্‌তে হবে না। শীঘ্রই আমার পালা আস্‌ছে। আমি কোন্‌ গানটা তোমাকে শোনাবো বলো দিকি?”

“যা তোমার খুসি।”

“আচ্ছা বেশ, আমি জানি তুমি কোন্‌ গান শুন্‌তে ভালোবাসো।”

সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় তার দরজায় এক-জন কে আসিয়া টোকা মারিল;—এটা ষ্টেজ্‌-ম্যানেজারের ডাক। সে তাহার আসন হইতে চট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল, তাহার পরিচ্ছদের পিছনকার লম্বা ঝুলটা হাতে গুটাইয়া ধরিল এবং শুষ্ক ত্বক্‌ সর্পের মতো তাহার রেশমি-বস্ত্র-প্রান্ত-নিঃসৃত খস্‌খস্‌ শব্দ করিতে করিতে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইল। অল্প-অল্প-আলোকিত নোংরা ষ্টেজের সরু বারাণ্ডা-পথ দিয়া যাইতে-যাইতে, স্মিতমুখে ক্রমাগত আপনা-আপনি বলিতে লাগিল—“কি মজার লোক! কি নির্ব্বোধ এই ভালো মানুষটি!”

সাজ-ঘরের দরজাটা খোলা ছিল; তট-তাড়িত তরঙ্গ-ভঙ্গের কর্ণ-বধিরকারী গর্জ্জনবৎ দর্শকের প্রশংসাধ্বনি যুবক শুনিতে পাইল। মারিয়া তখন ফুট্‌-লাইটের সম্মুখে আসিয়াছিল—তাই, রক্ত-পিপাসু ক্ষুধিত পশুর সম্মুখে একখণ্ড তাজা মাংস ছুড়িয়া ফেলিলে, পশুটা যেরূপ গর্জ্জন করে, দর্শকমণ্ডলী সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল। গর্জ্জন শীঘ্রই থামিয়া গেল; তাহার পর, যুবক নাটকের যে প্রথম-কথাগুলি শুনিতে ভালোবাসিত, সেই কথাগুলি তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

মনের উত্তেজনায় যুবক অসাড় হইয়া শুনিতেছিল; গানের প্রত্যেক স্বরটিতে সে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেছিল—আনন্দে মাতিয়া উঠিতেছিল। মারিয়া যুবকের উদ্দেশেই গাহিতেছিল, অন্যের কথা দিয়া, নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করিতেছিল।

সমস্ত শব্দ থামিয়া গেল। ক্ষণিক বিরামের পর দর্শক-মণ্ডলী হইতে আবার প্রশংসার একটা বড় বহিয়া গেল। যুবক উঠিয়া সাজ-ঘরের এক-প্রান্ত হইতে অপর-প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চালি করিতে লাগিল। তার হৃদয় বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল—কিন্তু ঝড় জমিয়া আসিবার পূর্ব্বে যেরূপ নিস্তব্ধতা আসে—সেইরূপ বিক্ষুব্ধ হইলেও নিস্তব্ধ। এখন সমস্তের উপর তাহার একটা ঘৃণা হইল—এই উন্মাদবৎ গর্জ্জনকারী জনতা এই নীচ ইতর পানাগারের সমস্ত বায়ু যেন একটা অসংযত লাম্পট্যের দূষিত বাষ্পে পরিষিক্ত। যেন একটা পচা জলাভূমি—যেখান হইতে বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাহির হইয়া, নিকটের সমস্ত জিনিষকেই কলুষিত করিতেছে—আর এই রমণী, এই অমল ধবল পদ্মফুলটি—এইসমস্ত বিষাক্ত গন্ধের মধ্যেও অকলুষিত থাকিবে? একটা নীচ পানাগার—আর এই আধো-আধো প্রেমের প্রথম কথা! কি বৈসাদৃশ্য!

লোকেরা তখনও প্রচণ্ডভাবে হাততালি দিতেছিল—একটা গানের পর আর-একটা গান জোর করিয়া তাহাকে গাওয়াইতেছিল। মারিয়া পেশা-অপেরার কতকগুলা গান, বেদিনীদের গান—সেই সময় যাহার খুব আদর ছিল—এইসব গান গাহিল।

তার পর ক্লান্ত হইয়া তাহার সাজ-ঘরে ফিরিয়া আসিল—মুখের উপর কতকগুলা লাল দাগ এবং নেত্র উদ্বেগ-চঞ্চল। তাহার হাতে কতকগুলা “ভিজিটিং কার্ড” ছিল, সেগুলা সে অযত্নে প্রসাধন-টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। যুবকের চোখে একটা মৌন প্রশ্নের ভাব দেখিয়া সে ক্লান্তভাবে উত্তর করিল—“এগুলা পৃথক্‌ “খাস-কাম্‌রায়” সায়াহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ-পত্র। আমার ভাবকেরা মনে করে, উটের মতো আমার সাতটা পাকাশয় আছে। আর এরা আমাদের প্রদেশের ‘প্রাদেশিক’ বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা, ও প্রবীণ বয়স্ক লোক। বাড়ীতে পৃথক্‌ ঘরে একজন গায়িকার সঙ্গে সায়াহ্ন-ভোজন কর্‌তে এরা লজ্জা বোধ করবে; কিন্তু এখানে—যেখায় কেউ তাদের চেনে না,—এই সুযোগে লুকিয়ে আমোদ উপভোগ কর্‌তে চায়।”

যুবকের চোখে একটু হিংসার ভাব লক্ষ্য করিয়া, সে হাসি-মুখে তাড়াতাড়ি আরও কিছু কথা জুড়িয়া দিল—“ভয় পেয়ো না; তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। এটা আমার পক্ষে একটা দুর্লভ বিলাসের জিনিষ—কেবল এক-রাত্রি আমি আমার নিজের প্রভু—”

তাহার পর, সে, যুবকের স্কন্ধের উপর তাহার সুগোল ধবল বাহু স্থাপন করিয়া, চোখের ভাব বুঝিবার জন্য তাহার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল:—“প্রতিদিন রাত্রে আমি ত এ-রকম প্রেমের স্বীকারোক্তি, পাণিদান ও হৃদয়-দানের কথা শুন্‌তে পাইনে।”

যুবক চোখ নীচু করিল। রমণী বুঝিল, এইরকম করিয়া বলাটা তার ঠিক হয় নাই।

অভিনয়ের পর উহারা গ্রীষ্ম-উদ্যানের শেষ প্রান্তে হাঁটিয়া গেল। সেইখানে, একটা নীচু প্রস্তর-ইমারতের ভিতর কতকগুলা নিভৃত খাস-কামরা ছিল। রমণী যুবকের বাহু গ্রহণ করিয়া, ক্রমাগত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—যেন এই ভয় পাছে কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হয়। যুবকও তাহার ভয়ের ভাবটা অনুভব করিয়া, সকল লোকের মুখ ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দুইজন নটকে উহারা দেখিতে পাইল; একজন মোটা-সোটা ও লাল-মুখো; আর এক-জন সুশ্রী, শ্যামবর্ণ,—ড্যাব্‌ডেবে কালো চোখ। দুইজনে চোখ টেপা-টেপি করিল; মোটা লোকটি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কি-একটা কথা বলিল—স্পষ্টই বোধ হইল মারিয়ার সম্বন্ধে। সুশ্রী নটটির চোখে একটু হাসি দেখা দিল—এবং “উপায় কি?” এই ভাবে ফরাসী-ধরণে সে কাঁধ ঝাঁকাইল।

মারিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে-চলিতে, মনে-মনে বলিল—“পাজি লক্ষ্মীছাড়া!”

এইসব জায়গায় ‘খাস-কামরা’ যেরূপ হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ—একটা সুরাপানের আড্ডা। নোংরা, জীর্ণ আস্‌বাব-পত্রের একটা মিশ্র-সংগ্রহ—একটা ঘোলাটে, আঁচড়-কাটা বড় আয়না; একটা জীর্ণ পুরাতন, ময়লা গালিচা ইত্যাদি। কামরার দ্বারদেশে, ‘বস্ত্র-উদ্‌ঘাটক’ ভৃত্য দ্রুত চলিয়া উহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল—সে চুপিচুপি আরও দুইটা ভিজিটিং-কার্ড মারিয়ার হাতে দিতে চেষ্টা করিল—মারিয়া চটিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দূর করিয়া দিল।

“ঢের হয়েছে! ঢের হয়েছে! ওদের বলো, আমি মরেছি—হাঁ, মরেছি।”

উহারা ঘরে ঢুকিলে দরজা বন্ধ হইল। মারিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সে ক্লান্তস্বরে বলিল—“আমি কি ক্লান্তই হয়েছি, তুমি যদি জান্‌তে! ভালো কথা, আমি তোমার নামটা ভুলে গিয়েছি—আমায় ক্ষমা করবে।”

“পাভেল্‌ কনষ্টান্‌টিনিয়া রুজিশেভ্‌।”

“ঠিক্‌, ঠিক্‌; আমাকে ক্ষমা করবে। আমার এমন খারাপ স্মরণ-শক্তি, তা ছাড়া—” আরও সে বলিতে যাইতেছিল, “আমার এত আলাপী লোক, আর প্রতিদিন এত নূতন-নূতন লোক আসে”—কিন্তু রমণী ঠিক সময়ে নিজের ভুলটা ধরিতে পারিল। যুবক খাদ্য-তালিকাটি পড়িয়া দেখিল, এবং মারিয়াকে কি খাইতে বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

“পাভেল্‌ কনষ্টান্‌টিনিয়া! আজ রাতে আমি একটা-কিছু নিজে বেছে নেবো—একটা-কিছু সস্তা দামের ও সাধাসিধে-রকমের এক প্লেট বিট্‌-সুপ, সসেজ ও বাঁধা-কপি কিংবা সর-মাখানো বকুৎ—”

"গা দিয়ে ধোয়া উঠ্‌ছে এইরকম গরম-গরম অম্‌লেট্ আমি আমি হুকুম দিয়েছি।"

"আরে না,—এইসব মুখরোচক জিনিষ খেয়ে-খেয়ে আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—আমি সাধাসিধে একটা কিছু চাই।"

"আর ওয়াইন্‌?"

"ওয়াইন্ আদপে না—এক-বোতল সস্তা দামের বিয়ার্‌ আন্‌তে বলো। এস আমরা স্কুলের দুই সহপাঠীর মতো আহার করি। আমি কতক-গুলা গরম-গরম "সসেজ্‌" হুকুম কর্‌ব—আর একটুক্‌রো সস্তা দামের ঘোরো পনীর, যা একটু ছুরীর ঘায়েই ঝুরঝুর করে' ঝরে' পড়ে—খুব চমৎকার হবে!"

যুবক উঁহার খেয়াল ও আজ্‌গুবি কথা শুনিয়া ক্রমাগত হাসিতেছিল, আর খানসামা খাদ্যের হুকুম শুনিয়া, অবজ্ঞার সহিত যুবকের দিকে তাকাইল; মারিয়া-ইভানভ্‌না—যে তাহাদের "প্রথম তারকা" তাহার জন্য কিনা এক-বোতল বিয়ার্‌ আনানো হইতেছে!

অভিনেত্রী নেত্র ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া একদৃষ্টে যুবককে দেখিতেছিল এবং ক্রমাগত বলিতেছিল,—"আহারটা খুব চমৎকার হবে, খাসা হবে!"

সে তাহার লেসের টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া জানালার কাছে আসিল। জানালার ভিতর দিয়া জনতার কোলাহল—যাহা এখন সমস্ত বাগানময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দূরাগত সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

রমণী চিন্তার ভাবে গুণগুণস্বরে বলিতে লাগিল—"এখান থেকে চ'লে গিয়ে এমন একটা ছোট-খাটো ভোজন-শালায় আমাদের যাওয়া উচিত ছিল যেখানকার বাতাস পোড়া মাখনের গন্ধে, ভাজা পেঁয়াজের গন্ধে ও হেরিং মাছের গন্ধে ভরপুর। কিন্তু আমার মনে হয় খুব মাগ্যি ভোজন-শালা ছাড়া এত রাত্রে আর কোন ভোজন-শালা খোলা থাকে না।"

নৈশ-ভোজনটা নিতান্ত ঘোরো রকমের হইল। মারিয়া প্রতিদিন রাত্রে খুব ছোট-গেলাসের এক-গেলাস 'ভোদ্‌কা' সুরা প্রায়ই পান করিয়া থাকে। কৈফিয়তের হিসাবে সে বলিল, 'স্নায়ু সুস্থ রাখিবার জন্য তাহাকে ইহা পান করিতে হয়। এই সুরা পান করিয়া তাহার মুখের রংটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—আরও অধিক সুন্দর দেখিতে হইল; কিন্তু চোখের কাছে যে কৃত্রিম বর্ণ-রচনার চিহ্ন তখনো ছিল, তাহাতে করিয়া এই সৌন্দর্য্যের কতকটা যেন নষ্ট হইল। পাভেল্‌ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল এবং তাহার নারী-সুলভ অন্তহীন জল্পনা মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল।

অপরাধীর মত একটু হাসিয়া, সে অনেকবার পাভেল্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা শুনে'-শুনে' তুমি কি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ? আমি সব কথা তোমাকে বল্‌তে চাই—ঠিক সব কথা নয়—অর্থাৎ যা শুন্‌তে তোমার ভালো লাগ্‌বে। এখান থেকে দূরে দক্ষিণ দেশে আমি জন্মেছি—মানুষ হয়েছি, আমার পরিবার গরীবও নয়, ধনীও নয় মাঝা-মাঝি-অবস্থার লোক। আমার শৈশবে কোন আমোদ ছিল না, তখন সময় যেন কাট্‌ত না। তার পর যখন স্কুলের চতুর্থ ক্লাস থেকে উপর ক্লাসে উঠ্‌লুম তখন আমি ঠিক চোদ্দয় পড়েছি। কিন্তু তার চেয়ে আমাকে বড় দেখাত। আর, আমার খাটো ইস্কুলের শাদা পোষাকে আমার সমস্ত চেহারায় কেমন একটা উগ্রতা ফুটে' উঠেছিল। আমি খুব শীঘ্রই আমার রূপের কদর বুঝেছিলুম, আমার পরবর্ত্তী জীবনের সমস্ত দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণই হ'ল তাই। তোমরা পুরুষ মানুষ, কল্পনা কর্‌তে পার্‌বে না—একরত্তি বালিকার ভিতর কেমন সহজে 'নারী' জেগে ওঠে। তুমি ঐ চেয়ারে বসেছ কেন, কন্‌ষ্টান্‌টিন্ পাব্‌লোভিচ্?"

"আমার নাম পাভেল্ কন্‌ষ্টান্‌টিনিক্।"

"আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা কর্‌বে…এইখানে এসে বোসো, আমার পাশাপাশি এই কোউচের উপর; এস আমরা গেলাসে-গেলাসে ঠেকা-ঠেকি করি। বড় চমৎকার; এখন আমি আপনাকে আপনি দেখ্‌তে পাচ্চি—সেই একরত্তি মেয়ে। আমার গড়ন অতি চমৎকার ছিল—দীর্ঘ ঘন কেশের ঝাঁকালো-ধরণের কবরী—খাসা মুখের রং—আর চোখ দু'টি কি কোমল, কি সুন্দর! কতদিন হ'য়ে গেল, তাই আপনার কথা আপনি এখন বল্‌তে পারছি—রাস্তায় সম্পূর্ণ অপরিচিত সুন্দর মেয়ে দেখ্‌লে, তাদের কথা যে-রকম বলা যায়, এখন আমি সেইভাবে আপনার কথা বল্‌ছি। এস, আমার আরও কাছে এসে বোসো। কি অদ্ভুত লোক তুমি! আচ্ছা রোসো, আমি তোমার কাছে সরে' যাচ্চি—এই দেখ!"

মারিয়ার স্কন্ধ পাভেলের স্কন্ধ প্রায় স্পর্শ করিল। যুবক তাহার দেহের উত্তাপ অনুভব করিল, তাহার পাউডারের গন্ধ আঘ্রাণ করিল। যুবকের মাথা ঘুলাইয়া গেল; তাহার চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল; হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ তাহার মনকে অধিকার করিল। তাহার মনোভাব মারিয়ার নিকট প্রকাশ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল;—এমন-সব শব্দের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিল, যাহা নিজের ছায়ার মতো ধরিতে-ছুঁইতে পারা যায় না।

মারিয়া, তাহার গেলাস হইতে বিয়ার্‌ এক-এক চুমুক পান করিতে-করিতে এবং পনীরের টুক্‌রা তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর ছড়াইতে-ছড়াইতে, অবিরাম বকিয়াই চলিয়াছে "কন্‌ষ্ট—অর্থাৎ পাভেল্‌ কন্‌ষ্টান্‌টিনিক্, তুমি মানুষের চোখের ভাব কি কখনো লক্ষ্য করেছ? ছেলেদের চোখের ভাব কি সুন্দর—মানে, ছোট-ছোট ছেলেদের! বালকদের এই ভাবের বিশুদ্ধতা শীঘ্রই নষ্ট হয়, কিন্তু বালিকারা প্রায় ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবটা রক্ষা করে। হাঁ, ঠিক্ বিশুদ্ধতা। বায়ু-অক্ষুব্ধ শান্ত জলরাশির উপর চেয়ে থাক্‌তে যেমন ভালো লাগে, ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে তেম্‌নি ভালো লাগে, এইরকম চোখের ভিতর তাদের আত্মাটিকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তখনও আত্মা বিশুদ্ধ ও অক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকে। হাঁ, এইরকম করে' আমি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে উঠ্‌লুম। তার পর যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠ্‌লুম তখন আমার খাটো কোর্ত্তা একটু অসোয়াস্তিকর বলে' মনে হ'তে লাগ্‌ল।"

মারিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কোউচের পৃষ্ঠভাগে মাথা ঠেস্‌ দিয়া রহিল। পাভেল্‌ তাহার হাতখানি লইয়া নিজহস্ত দিয়া আদরের ভাবে তাহার হাতের উপর মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। সে, হাত সরাইয়াও লইল না, চোখও খুলিল না। মধুর তন্দ্রার আবেশে, মারিয়া আপনাকে অর্দ্ধ-বর্দ্ধিত বালিকারূপে দেখিতে লাগিল।

যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া সে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল—"হাঁ, সেই কালটা বড়ই সুন্দর, আর তার পরে—"

যুবক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"আমি জানি তার পর কি ঘটেছিল—অর্থাৎ আন্দাজ করতে পারি—"

হঠাৎ একটা আবেগপূর্ণ প্রবল ইচ্ছা মারিয়াকে পাইয়া বসিল। সে মনে করিল,—যে এমন শান্ত, এমন ভালো, এমন নির্ম্মল-চরিত্র, তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের ইতিহাস বলিতে হইবে। তাহার জানা উচিত, কি-রকম স্ত্রীলোককে সে তাহার পৈতৃক বাড়ীতে আনিতে চাহিতেছে, তাহার সাধের আপেল-বাগানে আনিতে চাহিতেছে। একথা সত্য, তাহার জীবনের ইতিহাস শুনিলে সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে, কিন্তু নীচ প্রবঞ্চনা অপেক্ষা তাহাও বাঞ্ছনীয়। ওঃ! সে এত মিথ্যা কথা বলিয়াছে, সমস্ত জীবন মিথ্যা কথা বলিয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বে সে যাহা কিছু

বলিয়াছিল সবই মিথ্যা কথা। পাভেল্ যখন প্রথমে বিবাহের প্রস্তাব করে, তখন সেটা উপহাস বলিয়া সে মনে করিয়াছিল—মনে করিয়াছিল, আমার মতন স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইবার জন্যই সে ঐরকম একটা প্রস্তাব করিয়াছিল। তাহার জীবনের ইতিহাসে, এইরূপ অভিজ্ঞতা তাহার অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু এইবার সে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিল যে, পাভেল্ সত্যসত্যই এই সংকল্প পোষণ করিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতেই বুঝা যায়, সে সমস্ত শরীর দিয়া, সমস্ত মন দিয়া তাহার দিকে নির্ণিমেষ-নেত্রে তাকাইয়া থাকে।

কয়েক মুহূর্ত্ত তাহারা নিঃস্তব্ধ ছিল; কিন্তু সে নিস্তব্ধতা কথা অপেক্ষাও মর্ম্মস্পর্শী; যুবক বুঝিয়াছিল,—মারিয়া কি ভাবিতেছিল; মারিয়া বলিতে না-বলিতেই সে আগেই কথাটা পাড়িল।

খুব কষ্টের সহিত শব্দ বাছিয়া পাভেল্ বলিল"—হাঁ আমি জানি, তোমার একটা অতীত ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। আমি তা জানতে চাইনে। এমন কতকগুলি অনুভূতি আছে যা সমস্ত মালিন্য ঘুচিয়ে দেয়—যেমন আগুনে ধাতুর মরিচা সাফ হ'য়ে যায়। আমি যা করতে যাচ্চি—তা জেনে বুঝে'ই করেছি। কিন্তু তোমাকে একটা সর্ত্ত রক্ষা করতে হবে—ভগবানের দোহাই, তোমার অতীত সম্বন্ধে একটি কথাও আমাকে বলবে না। সে-কথা শুনতে আমার বড়ই কষ্ট হবে, শুনলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হ'বে—বিশেষতঃ তোমার মুখ থেকে শুনলে।"

মারিয়া নীরব হইল—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—চোখের সামনে সে যেন "সর্ষে-ফুল" দেখিতে লাগিল। পাভেল তাহার হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"না, কখনই না, কখনই না! কোন মানুষকে তার ভুলভ্রান্তি ধ'রে বিচার করা উচিত না—তার হৃদয় দিয়ে তাকে বিচার করা উচিত।"

ভাই যেমন বোনকে বলে সেইরূপ গম্ভীর ও সাদাসিধা ভাষায় পাভেল ঐধরণের কথা আরও বলিতে যাইতেছিল এমন সময় উদ্যান হইতে আমুদে লোকদিগের তুমুল কোলাহল ও সংগীত-ধ্বনি তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। মারিয়া-ইভানভ্নার মনে হইল যেন ঐ জনতা উহাকে ডাকিতেছে; সে তাহাদের হইতে বহু দূরে—বহু দূরে—আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইল;—কেননা, মারিয়া জানিত, উহারা তাহাকে সাধারণের সম্পত্তি বলিয়াই মনে করে। রোগীরা এইরূপই মনে করে;—মনে করে তাহাদের পিছনে রোগটা ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে। কিন্তু সে বৃথা আশা।

মারিয়া মাতৃ সুলভ কণ্ঠস্বরে বলিল—"তুমি ভালো, তোমার মহৎ অন্তঃকরণ। প্রকৃত ভালো-লোক পৃথিবীতে এত কম দেখা যায়। কেহই ভালো হ'তে পারে না—ভালো হওয়া বংশের উপর নির্ভর করে। তোমার মা-বাপ নিশ্চয়ই খুব ভালো লোক।"

"হাঁ তাঁরা খুবই ভালো।"

অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত উহারা এইভাবে বসিয়া ছোটখাটো তুচ্ছ কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। হঠাৎ উহারা এই তুচ্ছ কথারও একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব গুরুত্ব অনুভব করিল। বিদায় লইবার সময়, মারিয়া পাভেল্কে চুম্বন করিল। ইহাই উহাদের প্রথম চুম্বন এবং মারিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, তাহার হৃদয়ের স্পন্দন সচরাচর অপেক্ষা বেশী হইতেছে।

চন্দ্রহীন রাত্রি। কেবল কতকগুলি বিলম্বাগত অতিথিই উদ্যানে রহিয়া গেছে। একটা 'খাস্-কামরা' হইতে মাত্লামির বগ্ড়ার মতো শব্দ আসিল। ক্লান্ত খান্সামারা, খালি বাসন ও বোতলগুলা বারকোশের উপর রাখিয়া, তাড়াতাড়ি পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সমস্ত বাতাস মাত্লামি ও আমোদপ্রমোদের কলুষিত বাষ্পে ভরপুর।

পাভেল্ মারিয়াকে একটা গাড়ীর কাছে লইয়া গিয়া তাহার ভিতর উঠাইয়া দিলেন।

একটু মুচ্কি হাসিয়া অতি শান্তভাবে মারিয়া বলিল—"আমি চাইনে,—তুমি আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে।"

৩

তার পরের রাত্রিগুলোও সাদা ও চন্দ্রহীন ছিল—সেন্ট্‌পিটার্স্‌বর্গের সেই সাদা রাত্রি।

মারিয়া-ইভানভ্নার মনে সুখ ছিল না। সে অনুভব করিল, যেন কি-একটা তাহার উপর চাপিয়া রহিয়াছে। সে কাঁদিতে লাগিল; নিজের উপর রুষ্ট হইল।

"বুড়ো খুব্‌ড়ী—তুই অতি নির্ব্বোধ—অতি নির্ব্বোধ!"

সে বড় আয়নার কাছে গিয়া খুব আগ্রহের সহিত নিজের মুখ দেখিতে লাগিল···দেখিল, মুখ ঈষৎ ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছে। একটু তিক্তভাবে হাসিল।

"বুড়ী, একেবারে বুড়ী!"

এমন এক সময় ছিল যখন, বয়স্ক মেয়েরা যুবতী হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া মারিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিত। এইবার তাহার পালা আসিয়াছে। কাহারও উপর কালের দয়ামায়া নাই। মারিয়া দুই হাতে মাথা ধরিয়া, আপনার উপর গালি-বর্ষণ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল। পাভেল্কে সে কখনই বিবাহ করিবে না। সে নিতান্তই হাস্যজনক হইবে—২৪ বৎসরের স্বামী, আর ৩৭ বৎসরের স্ত্রী—১৩ বৎসরের অতলস্পর্শ ব্যবধান! না সে শুধু তাকে ভালোবাসিয়া জীবন কাটাইবে—আমার উপর তার ভালোবাসা যতদিন থাকে থাকুক, সে-জন্য তাহার কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না। একটা ভালোবাসা না পাইয়া একটা "ফ্যাল্না জিনিসের" মতো থাকা—না তা'তে কিছু আসে যায় না। কিন্তু লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া যে তাহার অসহ্য! কিন্তু বৃদ্ধ লোকেরা যুবতী স্ত্রীকে কি বিবাহ করে না? এমন কতকগুলা বিবাহ আছে যাহা পরস্পরের শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কতকগুলি লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা জীবনে কেবল একবার ভালোবাসে এবং তাহাদের স্ত্রীদিগকে আপনার সর্ব্বোত্তম অংশ বলিয়া উপলব্ধি করে। এমন কি হইতে পারে না, তাহারা হয়ত দুইজনেই আমরণ চূড়ান্ত সুখে সুখী হইবে? তা ছাড়া, তাহার প্রণয়ীর হৃদয়ের একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেই সে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহার স্বাধীনতা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবে।

তাহার এই প্রেম-মত্ততা তাহার ব্যবসায়ের সঙ্গীদের নিকট আর অপ্রকাশ ছিল না। তাহার সহিত দেখা হইলেই উহারা মুচ্কি-মুচ্কি হাসিত। আর সেই মোটা নট 'বুতুসোভ্' একটা প্রসিদ্ধ ফরাসী ঠাট্টা তর্জ্জমা করিয়া বলিত—"আমাদের মারিয়া-ইভানভ্না তার ৪০ টাকার নোটখানা, দুইটা ২০ টাকার নোট দিয়া ভাঙাইতে চাহিতেছে। একটা নগদ, আর-একটা ধারে। একেই বলে যথাযথিভাবে ধার করা।"

তাহার বন্ধুরাই এইসব গল্প-গুজব ও সস্তা রসিকতার কথা তা'কে জানাইত। সে খুব চটিয়া যাইত, কিন্তু তাহার এক উত্তর ছিল—"ওরা বোঝে না, তাই ওরা রাগ করে।"

"অন্তর্জ্জাতীয় কোরাস্'-দলের মধ্যে একটি ফর্সা মেয়ে ছিল তাহার নাম—'তানিয়া'। সে রঙ্গালয়ে নূতন আসিয়াছে; এবং এখনো সে তার কুমারী-সুলভ লাজুকতা হারায় নাই। মারিয়া তাহাকে খুব আদর-যত্ন করিত, এবং মারিয়া নিজের বডিসের উপর একগুচ্ছ তাজা ফুল আল্-পিন দিয়া আটকাইয়া দিতে, তাহাকে তাহার সাজ-ঘরে প্রায়ই ডাকিয়া

আনিত, তাহার পর তাহাকে এক বাক্স লজিন্‌জিস্ দিয়া বিদায় করিত।

তানিয়া মারিয়াকে রঙ্গালয়ের মধ্যে আদর্শ নারী বলিয়া মনে করিত। রঙ্গমঞ্চে যাইবার পূর্ব্বে সে বারাণ্ডা-পথে মারিয়ার জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিত; তাহার প্রতি দৃষ্টির উপর তাহার চোখ থাকিত এবং ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাহার গতিবিধি অনুসরণ করিত। তাহার প্রতি তানিয়ার এই নির্ব্বাকৃভক্তি দেখিয়া মারিয়ার খুব আমোদ বোধ হইত এবং স্বভাবতঃই এই প্রিয়দর্শন ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিয়া তাহার মায়া করিত। রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশে লোকের গল্প-গুজব খানিকক্ষণ শুনিয়া তানিয়া সরু বারাণ্ডা-পথে মারিয়ার জন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং মারিয়া একলা আছে কি না নিশ্চিত জানিয়া, অনাহুতভাবে তাহার সাজ-ঘরে প্রবেশ করিল।

"তোমার কিছু চাই, তানিয়া?"—মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

বালিকা থতমত খাইয়া বলিল—"না—হাঁ"; তাহার পর কথা জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিল—"ওরা সবাই বল্‌ছে, তুমি নাকি প্রেমে পড়েছ?"

"ও! কি পাগ্‌লামি তানিয়া! অন্তেরা যা বল্‌ছে, সে-কথা পুনরাবৃত্তি কর্‌বার তোর দরকার কি?"

"কিন্তু আমি জানি মারিয়া, তুমি একজনের প্রেমে পড়েছ।"

"মনে কর যেন তাই হয়েছে—তা'তে হ'ল কি?"

"আমি জান্‌তে চাচ্ছিলুম, তোমার কি-রকম লাগ্‌ছে।"

মারিয়া আমোদিত হইয়া খুব হাসিয়া উঠিল।

"আরে পাগ্‌লী মেয়ে, আমার সন্দেহ হয় তুইও প্রেমে পড়েছিস্।"

"আমি জানি না। দুই জন লোক আমার সাধ্য-সাধনা করে—একজন "বস্ত্র-রক্ষক", আর একজন চুল-ছাঁটা নাপিত।"

"দু'জনের মধ্যে কা'কে তুই ভালোবাসিস্?"

"দু'জনকেই আমার সমান ভালো লাগে।"

"দুর্ পাগলী মেয়ে! যদি দু'জনকেই ভালো লাগে, তা' হ'লে তুই একজনকেও ভালোবাসিস্‌নে। একজনকেই ভালোবাসা যেতে পারে। এখন তোর সময় হয়নি, তানিয়া। ভালোবাসা হ'লে কাউকে আর সে-বিষয় জিজ্ঞাসা করতে হয় না।"

মারিয়া এই সরলা বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকবার চুম্বন করিল।

"মারিয়া, তোমাকে সকলেই ভালোবাসে। সকলেই তোমার সাধ্য-সাধনা করে।" মারিয়ার উপর বালিকা তাহার ছোট্ট মাথাটি রাখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—"তুমি আমাকে বল্‌তে চাও না, কিন্তু তুমি সবই জানো। বস্ত্র-রক্ষক নিতান্ত হতাশ হ'য়ে শুঁড়ীর আড্ডায় 'ফূর্ত্তি' করতে গেল, আর চুল-ছাঁটা নাপিত, বন্দুকের গুলিতে নিজের মগজ উড়িয়ে দেবে ব'লে ভয় দেখাচ্ছে। এখন আমি কি করি বুঝ্‌তে পারছিনে।"

পাভেলের নিকট এই গল্পটা বলিবার সময় মারিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিল, কিন্তু পাভেল্ ইহার ভিতর হাসিবার কথা কিছুই পাইল না।

প্রতিদিনই উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। পাভেল্ যেন কর্ত্তব্য মনে করিয়া, প্রতি সন্ধ্যা উদ্যানে সময় কাটাইত। শুধু আর্টিষ্ট্, বস্ত্র-রক্ষক ও খানসামারাই যে তাহার নিকট পরিচিত হইয়াছিল তাহা নহে, উদ্যানের আগন্তুক লোক ও নিত্য-দর্শকের সম্বন্ধেও তাহার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। এবং যতই এই স্থানের সহিত তাহার সংস্পর্শ ও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, ততই ইহার প্রতি তাহার ঘৃণা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে হইল—সমস্তই ভয়ঙ্কর, অতি বিশ্রী ও সংশোধনের অতীত। মাতাল জনতাকে তুষ্ট করিবার জন্ত নট ও নটীরা নানাপ্রকার ফিকির-ফন্দী করিতেছে দেখিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। বিশেষতঃ অভিনেত্রীরা পরস্পরের সহিত রেষারেষি করিয়া যেরূপ প্রগল্‌ভতা দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া সে মর্ম্মাহত হইল।

অন্তের মতো মারিয়াও মশ্‌লাদার চুট্‌কি গান গাহিবার সময় নানা-প্রকার ভাবভঙ্গী ও স্বরভঙ্গী করিতেছিল। তাহার চিত্রিত মুখ, কৃত্রিম হীরায় সমাচ্ছন্ন তাহার কণ্ঠ ও বাহুযুগল, তাহার প্রগল্‌ভতা-ব্যঞ্জক স্মিত-হাস্ত ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া পাভেলের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। প্রতিদিন সান্ধ্য-ভোজনের সময়, সে মারিয়ার নিকট একই কথা বার-বার বলিত—"মারিয়া, এস আমরা এখান থেকে চলে' যাই। ভয়ানক ব্যাপার! এই লক্ষীছাড়া রঙ্গমঞ্চের উপর তুমি যখন নানারকম মুখভঙ্গী করো, তখন তা দেখে' জানো না আমার কি কষ্টই হয়। আমি তোমাকে আর চিন্‌তে পারিনে। তোমার মুখ আমার কাছে অপরিচিত বলে' মনে হয়, আর তোমার হাসি, তোমার অঙ্গভঙ্গী, তোমার কণ্ঠস্বর—"

"ভাই, আর কিছুই না, এ শুধু তুমি এতে অভ্যস্ত নও বলে'ই এই-রকম মনে করছ—শুধু আমার বলে' নয়—যখন মেছুনীরা একটু উত্তে-জনাতেই খুব উৎসাহের সঙ্গে অকথ্য গালি-গালাজ ও অভিসম্পাত বর্ষণ করতে আরম্ভ করে, তখন তাদেরও কিছুই খারাপ বলে' মনে হয় না। কেননা, তা'রা এতে অভ্যস্ত। আর আমাকে যে তুমি থিয়েটার ছাড়্‌তে বল্‌ছ, তা ত আমি পারিনে: আমার চুক্তিপত্র আমাকে তা করতে দেবে না। আমি যদি ছেড়ে যাই, তা হ'লে আমাকে একটা মস্তরকমের ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে।"

"সে ক্ষতি-পূরণের টাকা আমিই দেবো।"

"কিন্তু আমার পসার? আমি যদি একবার চুক্তিভঙ্গ করি, তা হ'লে কোন্ ম্যানেজার আবার আমাকে কাজে নিযুক্ত করবে? আমাদের সমস্ত মূলধনই হচ্চে আমাদের নামের পসার। আজ তুমি আমাকে ভালোবাস্‌ছ—এখন সবই ভালো; কিন্তু কে জানে কাল কি ঘট্‌বে?"

"ঈশ্বরের দোহাই, মারিয়া, তুমি ও রকম ক'রে বোলো না।" পাভেল্ যেরূপ নম্রপ্রকৃতির লোক, সে নিজের কথা কিংবা নিজের কাজকর্ম্মের কথা বেশী কিছুই বলিত না। কিন্তু থিয়েটার-মহলে কিছুই গোপন থাকে না; মারিয়া অন্তের কাছে শুনিয়াছিল, পাভেল্ ভল্‌গা-নদী প্রদেশের একজন ধনী জমিদারের ছেলে; সে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পাইয়াছে, এবং বিনাবেতনে কোন-এক সচিবের আপিসে কাজ করিয়া থাকে।

একজন লোক—অতি সন্দেহজনক-চরিত্রের লোক—যার কারবার ছিল থিয়েটার ও গানের আড্‌ডার অভিনেতাদের সঙ্গে, সে উচ্চ হ্যাট্ পরিত, নাকে সোনার চশ্‌মা পরিত, এবং নানা ভাষায় কথা কহিতে পারিত; মনে হয় যেন সে সবই জানে এবং সবাইকেই জানে; এবং থিয়েটারের এজেন্টের হিসাবে, সে অভিনেতা, বিশেষতঃ অভিনেত্রীদের কাজকর্ম্ম দেখিত। তার খুব একটা বদ্‌নাম ছিল, লোকে বলিত এমন পেজমির কাজ নাই যে, সে করিতে পারে না। তার বিশেষ কাজ ছিল তার মক্কেলদের জন্ত লভ্যজনক লোক জোটানো, স্তুতি-বাচক সমালোচনা লেখা, এবং নিন্দা-অপবাদের কথা চারিদিকে রটানো। মারিয়া বহু বৎসরাবধি তাহাকে জানিত এবং অনেক সময় তাহাকে নিজের কাজে লাগাইয়াছিল। সে এখন তাহাকে যমের মতো ভয় করে। সে জানিত যে, আস্তমস্ তাহার ঘটনা-বিক্ষুব্ধ জীবনের সমস্ত কথাই অবগত আছে এবং ইচ্ছা করিলে সে বেনামী পত্র লিখিয়া তাহার উদীয়মান সুখ-সৌভাগ্যকে এক মুহূর্ত্তেই নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

আস্তমস্ নিজেও এই অবস্থাটা বেশ বুঝিত এবং তাই সে মারিয়ার প্রতি অন্তায় ঘনিষ্ঠতা দেখাইত। তাহার নিষ্ঠুর নেত্রের দৃষ্টি সোজা তাহার দিকে নিবদ্ধ করিয়া সে পরিহাস-ছলে তাহাকে বলিল—"বেশ বেশ; এখন তবে ছোট্ট একটি প্রেমের ব্যাপার চল্‌ছে, মারিয়া ইভান্‌ভনা? না

ভাই তোমার বহুমূল্য সময় তুমি আর নষ্ট কোরো না। তুমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর কর্‌তে পারো; কেননা আমি নারীদের গুপ্ত কথার জীবন্ত কবর বল্‌লেও হয়। ও-ই আমার জীবনের ব্রত মারিয়া ইভান্‌ভনা। কিন্তু একথা আমি তোমাকে কেন বল্‌ছি? লোকের সঙ্গে কারবারে আমার কি-রকম খাঁটি ব্যবহার তার প্রমাণ ত তুমি অনেক স্থলেই পেয়েছ। সে যাক্‌—মারিয়া ইভান্‌ভনা, তুমি যদি একটা ছোট-খাটো উপকার আমায় কর, তা হ'লে অনায়াসেই কর্‌বে। তানিয়া নামের কোরস্‌-দলের সেই ছোট্ট মেয়েটিকে তুমি অবশ্য জানো। তা'কে আমার ভয়ানক ভালো লাগে, কিন্তু সে একটু ইঙ্গিত মাত্রেই লাজুকতার ভাণ করে ও খাপ্পা হ'য়ে উঠে। যদি তোমার কাম্‌রায় তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি—অবশ্য যেন দৈবক্রমে—তা হ'লে সে-বিষয়ে তুমি কি বলো? তা'ছাড়া আমি বেশ অবগত আছি যে, সে তোমাকে দেবতার মতো পূজো করে। আর তুমি বিচক্ষণ কাজের লোক, তুমি অনায়াসেই এই বিষয়ে তা'কে নেওয়াতে পার্‌বে।"

মারিয়া রাগিয়া লাল হইয়া চট্‌ করিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"মোসিও আস্তমস্‌, আমাকে ক্ষমা কর্‌বে। ও-রকম ব্যাপারের কোন সংস্রবে আমি থাক্‌তে চাইনে।"

"তুমি একজন নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয় কর্‌চ—তাই না ভাই? ও-হো-হো! বাস্তবিকই আমি এটা প্রত্যাশা করিনি।"

এই কথোপকথনের পর, এই স্থান হইতে যত শীঘ্র সম্ভব পলায়ন করা ছাড়া মারিয়ার আর-কিছুই করিবার ছিল না—হাঁ পলায়ন—ছুটিয়া পলায়ন।

৪

মারিয়া পাভেল্‌কে যখন বলিল, সে থিয়েটার ছাড়িবে বলিয়া মন স্থির করিয়াছে, পাভেল্‌ আহ্লাদে একেবারে আত্মহারা হইল।

মারিয়া হর্ষোৎফুল্ল-নেত্রে পাভেলের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ আমার গানের এই শেষ দিন। কাল আমি ম্যানেজারকে জানাবো। আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে একটু লাগ্‌ছে কেননা খট্‌কা যৌবনের চূড়ান্ত সময়ে আমি থিয়েটার ছেড়ে যাচ্ছি। আমি খুব একটা আকর্ষণের জিনিষ ছিলুম। আমাকে লোকের খুব ভালো লাগ্‌ত, আমি চ'লে গেলে, সমস্ত থিয়েটারী দলের ব্যবসায়ের হানি হ'তে পারে।"

"প্রিয়তমে, ওরা নিশ্চয়ই আর-কাউকে তোমার জায়গায় ভর্ত্তি কর্‌তে পার্‌বে।"

"তুমি ভুলে' যাচ্ছ, আমাকে একটা মস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে—১২ হাজার টাকা কিংবা এইরকম একটা-কিছু। আমার কাছে কেবল ৪ হাজার টাকামাত্র আছে—ঐ টাকাটা আমি দুঃসময়ের জন্য জমিয়ে রেখেছিলুম।"

"টাকার জন্য কিছু ভেবো না মারিয়া।"

"মনে হয় যেন তোমার ভাবী পত্নীকে বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে তুমি মুক্তি পণ দিচ্ছ।"

"ঠিক তাই। তুমি ঠিকই বলেছ! তা হ'লে, তোমার এই শেষ অভিনয়?"

"হ্যাঁ ভাই, আর আজ রাতে পানাগারে আমাদের শেষ নৈশ-ভোজন হবে।"

উহারা জ্বলন্ত প্রেমের দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে একবার চাহিল, তার পর মারিয়া অভিনয়ের জন্য মুখে রং মাখিতে গেল; এবং যুবক তাহার লজ্জার জিনিস শেষ বার দেখিবার জন্য থিয়েটারে গিয়া উপস্থিত হইল। অতি নীচ পানাগার, পানাগারের আশ্রিত ভিক্ষুক দল, কতকগুলা ভদ্র-বেশধারী ঠক এবং আমোদ-মত্ত কতকগুলি প্রবীণ বয়স্ক পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক যারা রাজধানীতে কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিল—সমস্তই একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাহার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল। যুবক মুখগুলাও চিনিতে পারিতেছিল না—সমস্তই যেন মিশ্র হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। সে মনে-মনে কেবলি ভাবিতেছিল—"ওঃ! এখান থেকে পালিয়ে মুক্ত বাতাসে যেতে পার্‌লে বাঁচি। আমার দেশের ভল্‌গা-নদীর ধারে আমার মারিয়াকে নিয়ে যেতে পার্‌লে বাঁচি।"

তাহার মনে হইতে লাগিল—জলের প্রবাহ যাত্রা-পথে অপ্রতিরোধনীয় প্রতিবন্ধক পাইলে যেরূপ হয়—সেইরূপ কালের গতি হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মারিয়া ইভান্‌ভনা আজিকার প্রোগ্রামের শেষ বিষয়, এবং শীঘ্রই তাহাদের সাধের পুত্তলী চিরকালের জন্য বিদায় লইতেছে মনে করিয়া দর্শকমণ্ডলী হাততালি দিয়া অক্লান্তভাবে তাহাকে বার-বার যবনিকার সম্মুখে ডাকিতে লাগিল।

পাভেল্‌ মনে-মনে ক্রমাগতই বলিতে লাগিল—"হয়েছে, হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর না। বাপু ওকে তোমরা ছেড়ে দাও।"

উদ্যান-ভোজন-শালার একটা 'খাস্‌ কাম্‌রায়' এই শেষবার দু'জনে নৈশ-ভোজন করিবে—মারিয়ার এই সাধের খেয়াল শুনিয়া পাভেল্‌ বিস্মিত হইল। তাহার মতে, পশ্চাৎ দিকে একবারও না তাকাইয়া, এই স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইলেই শ্রেয়। কিন্তু নারীর খেয়ালের গূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিবে? তা'ছাড়া সে তার অতীতকে শেষ বিদায় দিবার জন্য, তার কদভ্যাসের পায়ে শেষ অঞ্জলি দিবার জন্য খুব সম্ভব সে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে।

যুবক তাহার খাস্‌-কাম্‌রায় মারিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। অন্য দিনের মতো আজ কিন্তু কাম্‌রাটা তত নোংরা বলিয়া মনে হইল না।

মারিয়া একটু দেরী করিয়া আসিল। মুখে বেশ একটু সুখের ভাব, মন চঞ্চল ও উৎফুল্ল। যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"সব শেষ হ'য়ে গেল ত?

"হাঁ।"

"তোমার ম্যানেজারের সঙ্গে কি দেখা করেছিলে?"

"মুহূর্ত্তের জন্য। আমার যা সঙ্কল্প আমি তা'কে জানিয়েছি; আর এসব কথায় কাজ নেই।" এই বলিয়া হাসিতে-হাসিতে সে ভজনখানেক ভিজিটিং কার্ড টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল।

তার পর একটু মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিল—এইসব পাড়াগেঁয়ে বুড়ো ভদ্রলোকগুলি আমাকে শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না। আমি দু'চক্ষে ওদের দেখ্‌তে পারিনে। ওদের উপর আমার ভয়ানক ঘৃণা হয়। এরা অদূরদর্শী তরুণ যুবক নয়, এরা বৃহৎ পরিবারের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ পিতার দল, এরা সতী-সাধ্বীর পরমারাধ্য পতিদেবতা, এরা পারিবারিক সুখের জীবন্ত দৃষ্টান্ত, ওদের কি একটুও লজ্জা নেই?"

আবার উহারা দু'জনে ছাত্রসুলভ সাদাসিধা নৈশ-ভোজনের আয়োজন করিতে খান্‌সামাকে হুকুম করিল। এবং একটা কোচে বসিয়া প্রেমের দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

মারিয়া বলিল—"আশ্চর্য্য! এইসব কাণ্ড শীঘ্রই ঘটল! ঠিক যেন স্বপ্ন! এখন দেখা যাক্‌, আমাদের পরস্পরের জানা-শুনা প্রথমে কেমন করে' আরম্ভ হ'ল? সত্যি বল্‌ছি, আমি মনে কর্‌তে পার্‌ছিনে।"

"কেমন করে' আমাদের জানা-শুনা হ'ল, সে কথা শুনতে তেমন ভালো লাগ্‌বে না। এইরকম একটা খাস্‌-কাম্‌রাতেই হয়েছিল। তুমি কি ভুলে' গেছ?"

"রোসো, মনে করে' দেখি। তোমার সঙ্গে দু'জন বুড়ো লোক একবার এসেছিল। হাঁ ওদের মধ্যে একজন এমন মজার দেখ্‌তে—একটি ছোট মানুষ—সে বল্‌বে তার নাম 'ডাক্তার কিন্দের বাল্‌সাম'। সে

আমাকে বল্লে, সেইদিন রাত্রেই নাকি এই বাগানেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়।"

পাভেল্ হাসিয়া বলিল—"তিনি শুধু তোমাকে তাঁর নাম ভাঁড়িয়েছেন, মারিয়া। এটা আমাদের ভিতরকার একটা ছোট-খাটো গুপ্ত কথা; দেখ মারিয়া, আমার বাবা বড় ভালো লোক, বড় দয়ালু—কখন-কখন তাঁর একটু 'ফূর্ত্তি' কর্‌তে ইচ্ছে যায়। তিনি ভালো গান শোন্‌বার জন্ত পাগল। তাই তোমার গান শোনাবার জন্ত তাঁকে একদিন লুকিয়ে এনেছিলুম। তিনি গান শুনে' এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তার পর ২।৪ দিন এক্‌লাই এসেছিলেন।"

মারিয়া তৎক্ষণাৎ যুবকের বাহু-পাশ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া, সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিল; তার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তিনি—তিনি—তোমার বাবা?"

যুবক উঠিল, তাহার হাতে তাহার হাতটি লইল, এবং তাহাকে আবার সোফাতে বসাইবার চেষ্টা করিল।

"হাঁ, আমার বাবা। একটু-আধটু দোষ থাক্‌লেও তিনি খুব ভালো লোক।"

মারিয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"বাবা!" "বাবা!"

আবার যুবকের নিকট হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া, দুর্ব্বল ও অসহায়ের মতো একটা চেয়ারে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

"মারিয়া, মারিয়া, তোমার কি হয়েছে? ছি ছি, কি পাগলামি কিন্তু মারিয়া কোন উত্তর না দিয়া, দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকিল।

"মারিয়া, তুমি তাঁকে ক্ষমা কর্‌বে। এটা এমন একটা তুচ্ছ জিনিষ।" মারিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া কাতর ধ্বনি করিতে লাগিল।

মাথা হইতে হাত না সরাইয়া সে বলিল—"ও কিছু না। ওরকম আমার অনেক সময় হয়, ভয়ানক মাথা ব্যথা। আমার উপর রাগ কোরো না। আমি এখনি বাড়ী যেতে চাই। কাল সন্ধ্যার সময় এইখানেই তুমি আমার শেষ নিষ্পত্তি শুন্‌তে পাবে। প্রথমে ম্যানেজারের সঙ্গে আমার কথা কওয়া আবশ্যক।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাবো মারিয়া।"

মারিয়া একটু ভীতস্বরে বলিল—"দোহাই ধর্ম্মের, যেও না; কোন দরকার নেই। তানিয়া আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে।"

যুবক মারিয়াকে সাজ-ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। তানিয়া তখন বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল,—মারিয়ার সঙ্গে যাইতে পাইবে, তাহার সহিত একাকী গাড়ীতে বসিতে পারিবে, এই কথা মনে করিয়া তাহার খুব আহ্লাদ হইল। যুবক উহাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, পাকা পদ-পথের উপর অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বিদায়ের সময় মারিয়া তাহার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল এবং কত ভালোবাসার কথা তাহাকে বলিয়াছিল; তাই, সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না ভয়ত্রস্ত তানিয়া তাহার আরাধ্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"মারিয়া ইভান্‌ভনা! দিদি! তোমার কি হয়েছে বলো আমাকে।"

মারিয়া পাগলের মতো তাহার দিকে তাকাইল। মুখের উপর দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল—অশ্রুজল মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"মারিয়া ইভান্‌ভনা আর নাই। সে মরে' গেছে। হা ভগবান্! আমার পাপের ফল শেষে কিনা আমায় এইরকম করে' ভুগ্‌তে হ'ল!"

"মারিয়া দিদি আমার, সকল পুরুষ-মানুষই ঐরকমের—ওরা সকলেই প্রবঞ্চক।"

"না, তা নয় তানিয়া। পাভেল্ উদার-হৃদয় ও বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক। তুই আজ রাতে আমার সঙ্গে থাক্‌বি? কি বলিস্?—আমার ভয় হচ্চে। যা ঘটেছে তোকে আমি ত বোঝাতে পার্‌ছিনে।"

উদ্যান হইতে মারিয়ার কাম্‌রা খুব কাছে—দুই-চারিটা রাস্তা পার হইলেই সেখানে যাওয়া যায়। ইতিমধ্যে মারিয়া সমস্ত ঘটনাটা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া একটা শেষ নিষ্পত্তি করিবার অবসর পাইল। তাহার মাথার ভিতরে ঝঞ্ঝা-তাড়িত তরঙ্গের ন্যায় একটা চিন্তা আর-একটা চিন্তাকে অনুধাবন করিতেছিল। এবং সেই মারাত্মক শব্দ "বাবা" হাতুড়ীর মতো তাহার মস্তিষ্কের ভিতর ঘা মারিতেছিল। হাঁ, "বাবা" সেই মুহূর্ত্তেই যেন তাহার চোখের সাম্‌নে তাহাকে দেখিতে পাইল—তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। আন্তমস্ তাহার সহিত পরিচয় করিয়া দিবার পর তাহার গান শুনিতে সে অনেকবার তা'র ঘরে আসিয়াছে; এবং প্রত্যেকবার তাহার জন্ত ফুল আনিয়াছে, লজিঞ্জিস্ আনিয়াছে; দামী গহনাপত্র আনিয়াছে। লোকটি পাড়াগেঁয়ে বৃদ্ধ, বেশ সুস্থ সবল শরীর, জীবনের আনন্দ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। গান শুনিয়া ডাক্তার কিন্দেরবালসাম্ ঘর হইতে চলিয়া গেলে, মারিয়া দেখিত তাহার পাউডার বাক্সের নীচে ২০০ টাকার একখানা নোট রহিয়াছে। এখন এই-সকল কথা গন্‌গনে' তপ্ত লোহের মতো তাহার অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত যেন সে শুনিতে পাইল:—যেন সে বলিতেছে—"আজিকার ছেলেরা কোন কাজের নয়। ওরা বোঝে কী, এই দুগ্ধ-পোষ্য ছেলে ছোক্‌রারা। নারী-সম্বন্ধে ডাক্তার কিন্দেরবালসাম্ একজন বিশেষজ্ঞ, তাঁর সেরা ব্যবস্থাপত্র হচ্চে একটা সাদা-রকমের চেক্ কিম্বা ব্যাঙ্ক্-নোট—যা দিয়ে সেরা জহরীর দোকানের সেরা গহনাপত্র কিন্‌তে পারা যায়।"

মারিয়া মনে-মনে অনুভব করিতে লাগিল,—যে-পঙ্কের ভিতর সে সারা জীবন লুটাইয়াছে, আবার বুঝি সেই পঙ্কের ভিতর সে আসিয়া পড়িল। ইহার পর ডাক্তারের ছেলে পাভেল্‌কে কি সে বিবাহ করিতে পারে? ঢের হয়েছে। আর সে, পরের দাস—সাধারণের সম্পত্তি, অতি নীচ পেশাদার গায়িকা, সে কোন্ সাহসে একজন সম্ভ্রান্ত বংশের যুবককে ভালোবাস্‌তে যাচ্চে! না, তার পক্ষে কোন শাস্তিই বেশী নয়!

তার পরদিন রাত্রে পাভেল্ মারিয়ার নিকট হইতে তাহার অঙ্গীকৃত প্রত্যুত্তর পাইবার জন্ত অধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। তানিয়া তাহাকে উদ্যানে দেখিতে পাইয়া নীরবে একটা চিঠির লেফাফা তাহার হাতে দিল। লেফাফা খুলিয়া পাভেল্ দেখিল, এক-তক্‌তা কাগজের উপর সংক্ষিপ্তভাবে শুধু লেখা আছে—"কোনও উত্তর নাই।"*

---

* রুশীয় লেখক মামিন্ সিবিরিয়াক্ হইতে

নাস্তিক

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

'অধ্যয়ন শেষ করে' লোকনাথ যখন তাঁর আচার্য্যের কাছে বিদায় চাইলেন, আচার্য্য তাঁকে বলেছিলেন, "একটা কথা সব সময়ে মনে রেখো তুমি, অনেক লোকের ওপরে 'লোকনাথ' নামটি সার্থক করে' জীবনের পথে অগ্রসর হবে।"

অলোকসামান্য প্রতিভাবান্ এবং প্রিয়তম ছাত্রকে বিদায় দিয়ে, আচার্য্য ২।৩ দিন পর্য্যন্ত মৌনী ছিলেন।

মঠ থেকে বার হ'য়ে লোকনাথ কোনো বড় রাজসভায় গেলেন না, অধ্যাপনা কর্‌বার কোনো আগ্রহ দেখালেন না, বিবাহ করে' সংসারী হবার বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে' গেলেন। কিছুদিন লক্ষ্যহীন অবস্থায় এদিক্-ওদিক্ ঘুর্‌বার পর শেষে পুণ্যভদ্রার নির্জ্জন তীরভূমিতে কুটীর বেঁধে সেখানেই বাস কর্‌তে সুরু কর্‌লেন। এতে বেশীর ভাগ লোকেই তাঁকে বল্‌লে পাগল।

বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ একটু অন্য প্রকৃতির। যেদিন প্রভাতের আলো খুব ফুট্‌ত, বালক লোকনাথ তার গ্রামের ধারের মাঠে একা-একা বেড়িয়ে বেড়াতো, সমবয়সী অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে সে মিশ্‌ত না। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের তলে গ্রামের অদূরের ছোট পাহাড়টা যখন বড় আকাশের গা থেকে খসে'-পড়া বড় একখণ্ড মেঘস্তূপের মতো দেখাতো, লোকনাথ দণ্ডের পর দণ্ড ধরে' মাঠের ধারের বনের কাছে বসে'-বসে' এক মনে কি ভাব্‌ত, তার অপলক শিশু-নয়ন দুইটি দণ্ডের পর দণ্ড ধরে' ওই পাহাড়ের দিকে আবদ্ধ থাক্‌ত। তার বিশ্বাস ছিল, ওই পাহাড়টাই পৃথিবীর প্রান্তসীমার পাহাড়। "আচ্ছা, যদি ও ছাড়িয়ে চলে' যাই, দূরে, দূরে, ক্রমেই দূরে, আরও দূরে, খুব, খুব দূরে, খুব, খুব, খুব, খুব দূরে, তা হ'লে কোথায় গিয়ে পৌঁছবো?" দৃশ্যমান সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে অজ্ঞাত রাজ্যে এতদূর যাবার কল্পনায় বালকের মন বিস্মিত, অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ত, নিজের ঘর, নিজের ভাই-বোনের কথা সে ভুলে' যেত, শুধু অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকে পরিবর্ত্তনশীল মেঘ-রাজ্যের পেছনে, অনেক, অনেক পেছনে যে কোন্ দেশ, যেখানে এই এম্‌নি ধূসর, মৌন চারিদিক্ সে-দেশের কথা মনে হ'তেই তার মন অবশ হ'য়ে আস্‌ত। তার দিদিমা যে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প করেন, সে-সব ঘটনা সেই দেশেই ঘটে, রাম-রাবণের যুদ্ধ সেখানে এখনও চল্‌ছে, সে-দেশের সীমাহীন, গহন বনের মধ্যে গলাকাটা কবন্ধ রাক্ষস এখনও অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যত অসম্ভব আর আজগুবি জিনিষের দেশ যেন সেটা।

কিন্তু সে-সব অনেক দিনকার কথা। বড় হ'য়ে উঠে' লোকনাথ অত্যন্ত রুক্ষদর্শন ও কঠোর প্রকৃতির লোক হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাঁর নীরস শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌বার জন্যেই যেন তাঁর আকৃতি দিন-দিন লালিত্য-হীন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যখন তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটার অসংযত দীর্ঘ চুলের গোছা আর দীর্ঘ রুক্ষ দাড়ি বাতাসে উড়্‌ত তখন সত্যই তাঁকে অত্যন্ত ভয়ানক বলে' মনে হ'ত। তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা তাঁর চোখে খেল্‌তে দেখা যেত, কিন্তু এক-এক সময় আবার সে-দীপ্তি শান্ত হ'য়ে আস্‌ত, তাঁকে খুব সৌম্য, খুব সুদর্শন, খুব উদার বলে' মনে হ'ত।

বয়স বাড়্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে লোকনাথের বাল্যের সে সুদূর-পিয়াসী মন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই দৃশ্যমান জগৎটা একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সাম্‌নে উপস্থিত হ'ল। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেউ আছে কি না এই আজগুবি প্রশ্ন নিয়ে লোকনাথ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও মহা ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় কালাতিপাত কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল আজগুবি-ধরণের। সাংসারিক সুখ-সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে তিনি পূর্ব্ব হ'তেই অবজ্ঞার চোখে

দেখ্‌তেন, যশোলাভ বিষয়েও তিনি হ'য়ে উঠ্‌লেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার মঠের আচার্য্যের কাছে মগধ থেকে পত্র এল—মঠের অতিশদের মধ্যে আচার্য্য যাঁকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকে হস্তীর পৃষ্ঠে করে' সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে, রাজসভার সূরিপদতিলক মহাচার্য্য জীবনসূরির সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেচে। আচার্য্য একমাত্র লোকনাথকেই এ-পদের উপযুক্ত বলে' ভেবেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ কিছুতেই মগধে যেতে রাজি না হওয়ায় তাঁর এক সতীর্থ মগধে প্রেরিত হলেন। এর কিছুকাল পরেই লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক-বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জ্জনতীরভূমি আশ্রয় করলেন।

(২)

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এ নির্জ্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীরখানিতে একা বাস করচেন। জৈনধর্ম্ম-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্টপরিমাণ তণ্ডুল ও দু'খানা বহির্ব্বাস তাঁকে দেওয়া হ'ত। মাঠের ধারের বুনো কাপাসের তুলা থেকে তিনি অন্য পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত করে' নিতেন। প্রথম-প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য, খ্যাতি ও উন্নতচরিত্রের আকর্ষণে শিক্ষার্থীর যখন ভিড় বাড়্‌বার উপক্রম হ'ল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ করে' দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জ্জন মাঠ তখন স্থানে-স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এইসব বন উপর-পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোনোও কোনো স্থানে নানা-রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটু অপরিসর উপত্যকায় দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্য-ভদ্রার একটা ক্ষীণ স্রোতশাখা এর মাঝখান বেয়ে পাহাড়ের ওপরে বেরিয়ে গিয়েচে, তার গৈরিক জলধারার উপর সব সময়ই দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশু দেবদারু-শ্রেণীর কালো ছায়া।

এখানে ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডারবিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত করে' বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ এক-রকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ-বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্যে তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি করে' ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত; ষড়্‌দর্শন, উপনিষদ্, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, আশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণিকদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা-কোষকারদের পুঁথি, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের কিছু-কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা-ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি ঘরের মেজেতে এমন যদৃচ্ছাক্রমে ছড়ানো পড়ে' থাক্‌ত, যে, কুটীরের মধ্যে পা রাখ্‌বার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান করে'ই লোকনাথ কুটীরের সাম্‌নের প্রাচীন নিম-গাছটার ছায়ায় গিয়ে বস্‌তেন এবং একমনে পড়্‌তেন।

এক-একদিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণে ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্য-ফোটা নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুক্লকেশ আর্য্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলশূন্যে খড়ি এঁকে গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান উপদেশ করতেন, বুনো পাখীর অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, দুর্ব্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সাম্‌নে পড়ে' সেখানে কুঞ্চিত-ললাট পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত একমনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তূপের দিকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌তেন—চমক ভেঙে উঠে' লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হ'য়ে উঠ্‌ত না যে, কেন তিনি এতক্ষণ মনে-মনে ভাষাতত্ত্ব-আলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদীজলে সন্তরণ-কারী বন্য হংসের মুখের মতন কল্পনা করছিলেন।

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে লোকনাথ ভাব্‌তেন, ওগুলো কি? প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে-ভেবে স্থির করলেন নক্ষত্রসমূহ একপ্রকার বৃহৎ স্ফাটিক পিণ্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফাটিক পিণ্ড বলে' ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্বহস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায়, তিনি

গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে' রেখে গিয়েচেন। তাদের আলোর উৎপত্তি-সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফাটিক প্রস্তরের যে-শ্রেণী দেখ্‌তে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এইসমস্ত স্ফাটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে একপ্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হ'য়ে থাকে। এ-সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতির রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না, সকলকে তাঁর মত পড়ে' দেখে' বিচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি মাঝামাঝি কিছু হওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন উচ্চজ্ঞান, নয় ত একেবারে মূর্খতা। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের উপর তাঁর একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। একবার তিনি কয়েক বৎসর ধরে' বহু পরিশ্রম করে' সাঙ্খ্যের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। লেখা শেষ করে' তাঁর মনে হ'ল তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন ভাষ্য তেমনটি হয়নি, অনেক খুঁত রয়ে' গিয়েচে, অনেক চেষ্টা করে'ও লোকনাথ সে খুঁত কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। একদিন সকালবেলা হস্তলিখিত পুঁথিখানা নিয়ে তিনি পুণ্যভদ্রার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের স্রোতে তীরলগ্ন শরবনগুলো তখন থর্‌থর্‌ করে কাঁপ্‌চে। লোকনাথ অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পুঁথি-খানাকে টান্ মেরে নদীর মাঝখানে ছুঁড়ে' ফেলে' দিলেন, একখণ্ড ইটের মতনই সেখানা সে-মুহূর্ত্তে ডুবে' গেল, শুধু সাঙ্খ্যের উগ্র পাণ্ডিত্যের সংঘাতে বন্যনদীর নিরক্ষর বুকটি অল্পক্ষণের জন্য ভয়বিহ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল মাত্র।

দিন যেতে লাগ্‌ল। লোকনাথ পূর্ব্বের মতন আর একস্থানে অনেকক্ষণ বস্‌তে পারেন না। মনের শান্তি তিনি দিন-দিন হারাতে লাগ্‌লেন। এক-একদিন সমস্ত দিন তিনি কিছুই খেতেন না, কি জানি কেন, শুধু কেবল নদীর ধারে-ধারে সারা দিনমান ধরে' উদ্ভ্রান্তের মতন ঘুরে'-ঘুরে' বেড়াতেন। রাত্রে আকাশের দিকে চাইতেন না, যদি হঠাৎ উপরদিকে চেয়ে ফেল্‌তেন, কালো আকাশে ভাঙা-ভাঙা মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে যে-সব নক্ষত্র জ্বলজ্বল্ করত, তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে তিনি অনভ্যস্তপাঠ অপরাধী বালক-ছাত্রের মতন সঙ্কুচিতভাবে দৃষ্টি নামিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেল্‌তেন। রাত্রে নির্জ্জন মাঠে চারিধার থেকে অন্ধকারে রাশি-রাশি নীরব প্রশ্ন জেগে উঠ্‌ত, ভগবান্ উপবর্ষের বেদান্তসূত্রের মধ্যে এদের উত্তর মেলে না কেন?

লোকনাথ আবার অত্যন্ত একমনে দর্শনের পুঁথি পড়্‌তে সুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যদি সে-সময় কেউ দেখ্‌ত, সে বেশ বুঝ্‌ত যে, তৃপ্তির চেয়ে অসন্তোষই হয়েচে তাঁর বেশী। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ কর্‌বার যে সহজ উপায় দার্শনিকেরা নিরূপণ করে' গিয়েচেন, পড়ে' শুনে' দেখে' লোকনাথের দুঃখ যেন তা'তে বেড়েই চলেচে। রাত্রে বাঁশের আড়ার পুস্তকাধার থেকে ভূর্জ্জপত্রের পতগুলি বক্রচক্ষে গৌতমের দিকে চাইতেন, কপিল গর্ব্ব-মিশ্রিত ব্যঙ্গ হাস্যে জৈমিনির দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইতেন, মূর্খগুলোর সঙ্গে এক-আসনে বস্‌তে হয়েচে ভেবে গভীর অপমানে ব্যাসদেব পুঁথির মধ্যে দিনদিন শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। রাত-দুপুরের সময় অধ্যয়ন-ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে শয্যাগ্রহণ করে' লোকনাথের মনে হ'ত অর্দ্ধ-অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চল্‌চে। দর্শনাচার্য্যগণ যেন কেউ কারুর কথা না শুনে' পরস্পর মহা তর্ক তুলেচেন, তাঁদের ভাষ্যকার ও উপভাষ্যকারগণের বাক্‌যুদ্ধ হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হ'য়ে উঠ্‌চে, কথার ওপর কথা চড়িয়ে দু'দিক্ থেকেই কথার পাহাড় গড়ে' তোল্‌বার চেষ্টা হচ্চে···লোকনাথের আর ঘুম হ'ত না, পুরাতন ভূর্জ্জপত্রের গন্ধে ভারাক্রান্ত বদ্ধ বাতাসে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ত, শয্যা ছেড়ে উঠে' তিনি বাইরের নিমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়ত কোন দিন ভাঙা চাঁদের নীচে বিশাল মাঠ আলো-আঁধারে অস্পষ্ট দেখাতো, কোনো দিন কষ্টি-পাথরের মতন কালো অন্ধকারে পথের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে কত কি কীট-পতঙ্গ বিচিত্র সুরে ডাকৃতে থাকৃত, বনঝোপের মাথায় জোনাকিপোকার ঝাঁক জ্বল্‌ত···নদীর ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শান্তিলাভ কর্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই-সব নীরব নৈশ প্রশ্ন প্রেতের মতন তাঁকে পেয়ে বস্‌ত।

এবার সেটা আস্‌ত অন্ধকারের রূপ ধরে'। আলোর যদি সৃষ্টিকর্ত্তা থাকে, তবে অন্ধকারের আর একটা সৃষ্টিকর্ত্তার কি প্রয়োজন আছে? আলোর অভাবেই যদি অন্ধকার হয়, অন্ধকার কি তবে স্বপ্রকাশ? স্বয়ম্ভূ?… সৃষ্টির পূর্ব্বের জিনিস?

লোকনাথ আবার ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তেন, আবার তত্ত্বসমাসের পুঁথিখানা উঠিয়ে নিয়ে প্রদীপের শিখা আঙুল দিয়ে উজ্জ্বল করে' তুল্‌তেন। সেদিন তিনি পড়্‌ছিলেন না, সারাদিন কেবল চুপ করে' আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে কি ভাব্‌ছিলেন। যে-রহস্য ভেদ কর্‌বার জন্যে তাঁর মন সর্ব্বদাই আকুল, সে-রহস্য ভেদ কর্‌বার আশা ক্রমেই যেন দূরে চলে' যাচ্ছে, সবদিকেই অন্ধকার, কোনো দিক্ থেকে কোনো আলোক আস্‌বার চিহ্ন দেখা যায় না।

(৩)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মনে হ'ত কোনো-কোনো আত্মস্থ ঋষি কোন্ প্রাচীন যুগে তাঁদের জীবনের কোনো এক শুভ মুহূর্ত্তে এ জীবন-রহস্যের সন্ধান বোধ হয় পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাই তাঁরা আশ্বাস-বাণী লিপিবদ্ধ করে' রেখে গিয়ে'ছলেন…পেয়েছি…পেয়েছি…। তাঁর মনে হ'ল প্রথম যেদিন তিনি উপনিষদের এক জীর্ণ পুঁথির পাতায় এ-কথার সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স এখনকার চেয়ে ২০ বৎসর কম। সে এক বর্ষার রাত্রিকাল, শুদ্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জ্জন মাঠ বেয়ে সেদিন অশান্ত বাধা-বন্ধহীন বাতাস হু হু করে' ঝড়ের বেগে বয়ে' যাচ্ছিল, স্তিমিত-প্রদীপ কুটীরে একা বসে' পুঁথির মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে ক্ষণিকের জন্য লোকনাথের সমস্ত শরীর সর্পপৃষ্ঠের মতন শিউরে উঠেছিল…পুঁথি বন্ধ করে' ঘরের বাইরে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল গাছপালা, দূর্ব্বা, নদীজল, সব যেন তাঁরই মতন শিউরে'-শিউরে' উঠ্‌চে। এখন তাঁর সে-কথা মনে পড়ে' হাসি পেলে। অল্প বয়সের সেই কাঁচা, ভাবপ্রবণ মনের দিকে নীচু-চোখে চেয়ে দেখে' তাঁর বর্ত্তমান সময়ের প্রবীণ মন সকৌতুক-স্নেহে রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ল। মানুষের মন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করে' অগ্রসর হ'তে পারে না—যে বলে,—জেনেছি, সে ভণ্ড, নয় সে আত্মপ্রতারক, মূর্খ! কি বুঝ্‌তে হবে, সে-সম্বন্ধে তার কিছু ধারণাই নেই।

হঠাৎ তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি দূরের নীলশৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্তপলাশের বনে আবদ্ধ হ'য়ে পড়্‌ল।

অনেকদিন আগের কথা। তখন লোকনাথ—২১ বৎসরের।

—কিছু না মায়া, লক্ষ্মীটি, আমি, এই ধরো সাত বছরের মধ্যেই আস্‌ব…পড়া শেষ হ'তে কি আর এর বেশী নেবে? সাতবচ্ছরই হোক্। তোমায় ফেলে' এর বেশী কি আর থাক্‌তে পার্‌ব? বুঝ্‌লে?

১৭ বৎসরের মায়া—(সলজ্জ হাসিয়া) সাতবচ্ছর… এত কম সময়। এ আর এমন বেশী কি!

লোকনাথ—(গাঢ়স্বরে) সেই কথাই ত বল্‌চি, মায়া… সাতবছর কি আর বেশী আমাদের পক্ষে? (মায়ার মুখে নির্ভরতার দৃষ্টিতে চাহিয়া) নয় কি, মায়া?

মায়া—(মুখে হাসি টিপিয়া) নাঃ…তা আর বেশী কৈ? মোটে সাত বছর…এবেলা-ওবেলা…(প্রগল্‌ভ উচ্চহাস্য)।

লোকনাথ—(অপ্রতিভ-মুখে) না শোনো, মায়া… আমি বল্‌চি…না…আমার বল্‌বার কথা…

যে-মায়ার অভয়-ভরা স্নিগ্ধ-দৃষ্টি সেদিন তাঁকে প্রবাসের পথে সখীর মতন আগু বাড়িয়ে দিয়ে চোখের জলে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ লোকনাথের প্রবীণ হৃদয়ে কোথায় সে মায়ার স্থান তা আমরা জানিনে, তবে এটুকু বোধ হয় ঠিক যে সে সময়ের মনোভাব এখন আর লোকনাথের ছিল না। জীবনের তুচ্ছ জিনিসে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

মঠে থাক্‌তেই লোকনাথের মন অন্যরকম হ'য়ে উঠেছিল, তিনি মায়ার কথা ভুল্‌লেন, জীবনের সুখকে মনে-মনে ঘৃণা কর্‌তে শিখ্‌লেন! তাঁর জীবনে শুধু অনুসন্ধিৎসু ঋষিদার্শনিকদের যাতায়াত সুরু হ'ল;—সে এক অন্য জগৎ, মনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে' সেখানে শুধু এক বিরাট্ রহস্যময় দার্শনিক প্রশ্ন…কে তুচ্ছ মায়া? মূর্খেই শুধু এত সামান্য জিনিসে এত বেশী আনন্দ পায়

হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ তাদের মনে কস্মিন্‌-কালে জাগে না বলে'ই।

তবু কখনো-কখনো, কোনো-কোনো অসাবধান মুহূর্ত্তে, যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন অতর্কিত-ভাবে হঠাৎ এসে পড়ে। তাঁর বিশ বৎসরের যৌবন মায়ার মুখের লজ্জানম্র হাসিতে, তার প্রসন্ন ললাটের মহিমায় স্নিগ্ধ হয়েছিল, যৌবন-লক্ষ্মীর বরণ-ডালির সেই প্রথম মাঙ্গলিক।

অনেক বৎসর পরে মঠে থাকৃতে লোকনাথ শুনেছিলেন, মায়া বিবাহ করেনি, কোন্‌ মঠে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে' ভিক্ষুণী হয়েচে। সেও অনেক দিনের কথা, তার পর তার আর কোনো সংবাদ তিনি রাখেন না, যেখানে যায় যাক্‌, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার ছায়া মাঠের চারিধারে ঘন হ'য়ে এল। কুটীরে যেতে-যেতে লোকনাথ আকাশের দিকে চাইলেন, মনে-মনে বল্‌লেন—হে অদৃশ্য শক্তি, আমি দার্শনিকাচার্য্য লোকনাথ—অজ্ঞান, মূর্খ সাধারণ মানুষের মতন আমার যুক্তি-প্রণালী বা মানসিক ধারা নয়। আমি জান্‌তে চাই, এই কার্য্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন্‌ কারণ-প্রসূত। সাধারণ লোকে যাকে ঈশ্বর বলে, তার মূলে কিছু আছে কি না। গ্রন্থের কথা আমি জানিনে, কারণ তার প্রমাণের ওপর আমার কোনো আস্থা নেই। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চাই, জানিনে তোমার শুন্‌বার ক্ষমতা আছে কি না, থাকে ত জানিও।···ভোলাবার চেষ্টা কোরো না, —তা'তে আমি ভুল্‌ব না।

(৪)

মহামণ্ডলীর মঠে প্রধান দার্শনিক বৈভাষিক-পন্থী মাধবাচার্য্য বাস কর্‌তেন। লোকনাথ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মাধবাচার্য্য বোঝা'তে গিয়ে প্রথমত মুক্তি কি, মুক্তি কয়প্রকার, মুক্তির ও নির্ব্বাণের মধ্যে প্রভেদ কিছু আছে কি না, প্রভৃতি এত বিস্তৃতভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন ও এত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে' তাঁর মতের পরিপোষণের চেষ্টা পেতে লাগলেন, যে, লোকনাথ অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপ্রিয় হ'লেও তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌ল, মুক্তির একটি স্বরূপ তিনি বুঝেচেন, সেটি সম্প্রতি মাধবাচার্য্যের বাক্যজালের হাত এড়ানো।

স্নান কর্‌তে কর্‌তে একদিন তাঁর মনে হ'ল, তাঁর পিঠে যেন কিসের লেজ ঠেক্‌চে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে' জলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন, লেজ নয়, একটা জলজ গাছের পাতা গায়ে ঠেক্‌চে। গাছটাকে তিনি টান্‌ দিয়ে উপ্‌ড়ে' তুলে' ফেল্‌লেন, দেখ্‌লেন একটা শেওলা-গাছ,—এ শেওলা নদীতে তিনি পূর্ব্বে দেখেচেন, তেমন লক্ষ্য করেননি ভালো করে', চোখ পড়্‌তে দেখ্‌লেন যে, শেওলার ডাঁটার যে-অংশটা তাঁর গায়ে সুড়্‌সুড়্‌ করে' ঠেক্‌ছিল, সেটা জলের নীচেকার অংশ, সে-অংশের পাতাগুলি ঝাউপাতার মতন—কিন্তু জলের উপরের অংশের পাতাগুলি পানের মতন। জলের উপরের অংশের পাতা জলের উপরে ভাসে, নীচের অংশের পাতা ও রকম হ'লে স্রোতের তোড়ে ভেঙে যেত, কিন্তু চুলের গোছার মতন হওয়ায় তা'রা জলকে বাধা দেয় না, জল তাদের মধ্যে দিয়ে বেশ কেটে চলে' যায়, যখন যে দিকে স্রোতের গতি পাতাগুলি তখন সে-দিকে হেলে' পড়ে। লোকনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে স্নান করে' ফির্‌লেন। একটা কি জিনিস যেন তিনি ধরেচেন!

তাঁর মনে হ'ল একই ডাঁটার উপরে নীচে দু'-রকম পাতা হওয়ার মূলে প্রকৃতির মধ্যে একটা চৈতন্যসত্তা বেশ যেন ধরা পড়্‌চে—নইলে এই নগণ্য জলজ শেওলার পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ-নিপুণতা কোথা থেকে এল? পাছে ভেঙে যায়, এজন্যে কে এর জলের নীচের অংশের পাতা ঝাউপাতার মতন করে' গড়্‌লে?

লোকনাথের আর-একটা কথা মনে হ'ল। কয়েক-দিন পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে জাগতিক শক্তির কাছে তার চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে একটা প্রমাণ চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রার্থনা কি এইভাবে কেউ পূর্ণ কর্‌লে?

ন্যায়-যুক্তির দিক্‌ থেকে এ-সিদ্ধান্ত এত বিপজ্জনক তাঁর মনে হ'ল যে, তিনি এ-কথা জোর করে' মন থেকে দূর করে' দিলেন। সাধারণ মানুষের মতন এত

শীঘ্র তিনি কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন না। তবু তিনি ভেতরে-ভেতরে দিন-দিন কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠ্তে লাগ্লেন। সেই জলজ শেওলার শুক্‌নো ডাঁটা-পাতা কুটীরের সাম্‌নে প্রায়ই পড়ে' থাক্‌তে দেখা যেত। পুঁথিপত্র তিনি আজকাল কমই খোলেন। নদীর ধারে-ধারে যেখানে বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার স্রোতের জলে ঝুপ্‌সি হ'য়ে পড়ে' থাকৃত, দীর্ঘ-দীর্ঘ ঘাসের ফুল স্তূপে-স্তূপে ফুটে' জলের ধার আলো ক'রে' থাকৃত, পত্রনিবিড় ঝোঁপগুলির তলায় জলচর পক্ষীরা ডিমগুলি গোপনে শুক্‌নো পাতা চাপা দিয়ে রাখ্‌ত, লোকনাথ বেশীর-ভাগ সময় সেইসব স্থানে কি দেখে'-দেখে' ফির্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তাঁর কুটীরের সাম্‌নে মাঠে একরকম ছোট ঘাসের কুচো-কুচো শাদা ফুল রাশি-রাশি ফুট্‌ত, লোকনাথকে দেখা যেত সেই ফুল তুলে' তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাদের গঠন লক্ষ্য কর্‌ছেন—ঘাসের ফুল-সম্বন্ধে লোকনাথের মনে হ'ত যে, সব ফুলগুলি একই-গঠনের—পাঁচটি করে' পাপ্‌ড়ি, মধ্যে একটা বিন্দু। প্রকাণ্ড মাঠে এ-রকম ফুল দু'-হাজার, দশ-হাজার, দু'-লক্ষ, দশলক্ষ ফুটে' থাকৃত, লোকনাথ যদৃচ্ছাক্রমে এখান থেকে ওখান থেকে ফুল তুলে' দেখ্‌তেন, সবগুলির সেই একই গড়ন, সেই পাঁচটা করে' পাপ্‌ড়ি, মধ্যে একটা বিন্দু।

লোকনাথের পিপাসা বিকারের রোগীর মত বেড়ে' উঠ্‌ল। কত কি প্রশ্ন তাঁর মনে আসে,—অসাধারণ, ভয়ানক বিভীষণ সব প্রশ্নদৈত্য! লোকনাথ বল্‌তেন,—জানাও হে চৈতন্যময় কারণ শক্তি, আমায় আরও জানাও। দিন-কতক পরে সত্যই তাঁর অসহ্য যাতনা হ'তে লাগল। একটা বিশাল ঘনান্ধকার গুপ্তরহস্য জগৎ-দ্বারপার্শ্বের সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটুখানি আলোক-রেখা যেন তাঁর চোখে ফেল্‌ছিল, তাঁর বুভুক্ষু মন সমস্তটা একসঙ্গে দেখবার জন্যে ছটফট্ কর্‌তে লাগল;—রাত্রে তাঁর নিদ্রা হ'ত না—কালো আকাশে চোখ তুলে' বল্‌তেন—চোখ খুলে' দাও, হে মহাশক্তি, চোখ খুলে' দাও।

ইতি মধ্যে আবার একদিন তিনি দেখলেন—একটা-কি পতঙ্গ আর-একটা ছোট পতঙ্গকে শরীরনিঃসৃত রসে অল্পে-অল্পে অচেতন করে' ফেল্‌চে...বড় পতঙ্গটা হাতে তুলে' নিয়ে লক্ষ্য করে' দেখে' তাঁর মনে হ'ল সেটার শুঁড়ের মতো ছুঁচ্‌লো একটা প্রত্যঙ্গের খানিকটা অংশ ফাঁপা,—একপ্রকার বিষাক্ত রস শরীরের মধ্যে থেকে বার হ'য়ে ঐ ফাঁপা অংশ দিয়ে বার হ'য়ে আস্‌বার বেশ সুন্দর, সুনির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত আছে।...

লোকনাথের মন একমুহূর্ত্তে আবার অন্ধকার হ'য়ে গেল। নিষ্ঠুর ধ্বংসের এ কি কৌশলময় আয়োজন! মূর্খ ভক্তিশাস্ত্রকার, এই বুঝি তোমার দয়ালু ঈশ্বর?

(৫)

বসন্তের বাকী দিনগুলো এবং সারা গ্রীষ্মকালটা এইভাবেই কেটে' গেল। অবশেষে একদিন কৌতূহল-প্রদ এক ঘটনায় লোকনাথের দুঃখ, ব্যাকুলতা ও সন্দেহের এক অপ্রত্যাশিত-রকমের উপসংহার ঘটল। সে-সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, অসহ্য রৌদ্র তাপে মাঠের ঘাসগুলো জরে' বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েচে, বাতাস আগুনের ঝলকের মতো তপ্ত। বৈকালের দিকে কিন্তু খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল, এবং একটু পরে ঈশান কোণে খুব মেঘ জম্‌ল। নদীর বড় বাঁকটায় বড়-বড় ঘাসের মধ্যে শুয়ে লোকনাথ পূর্ব্বদিক্‌চক্রবালে নবীন বর্ষার ঘনশ্যাম মেঘস্তূপের সজ্জা একমনে লক্ষ্য কর্‌ছিলেন, হঠাৎ তাঁর ডান হাতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মাঝখানে কিসে যেন কাম্‌ড়ালে। সে-দিকে চোখ ফিরিয়ে হাত টেনে নিতেই দেখতে পেলেন একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে' হাতের সেখানে, মুহূর্ত্তে আর-একটা ছোবল মার্‌বার উপক্রম কর্‌তে গিয়ে হঠাৎ মাথা নীচু করে' লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হ'ল। কি কর্‌ছি, না ভেবেই লোকনাথ সাপটার অদৃশ্যমান পুচ্ছটা তাড়া-তাড়ি হাত বাড়িয়ে চেপে ধর্‌তে গিয়ে একগোছা ঘাস মুঠোর মধ্যে চেপে ধর্‌লেন, সাপটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েচে।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি পরিধেয় বসন ছিঁড়ে' হাতের কব্জিতে ও বাহুতে বাম হাতে পাকিয়ে-পাকিয়ে দুটো বাঁধন দিলেন, বাঁধন সুবিধা হ'ল না, অনেকটা আলগা

রয়ে' গেল। তাঁর মনে হ'ল শ্বেত আকন্দের মূল সর্পাঘাতের মহৌষধ···মাঠের ইতস্ততঃ শ্বেত আকন্দের সন্ধানে গেলেন, সে-গাছ চোখে পড়ল না···হাতটা যেন অবশ হ'য়ে আস্‌চে বলে' তাঁর মনে হ'ল। বিষ তবে নিশ্চয়ই উপরে উঠ্‌চে···লোকনাথ সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন, আরও দু'একটা সর্পাঘাতের ঔষধ মনে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন,—কুসুম-ফুলের বীজ, রক্তচন্দনের ছাল, ইত্যাদি, কোনটাই হাতের কাছে নেই! এদিক্‌-ওদিক্‌ খানিকক্ষণ খুঁজ্‌তে-খুঁজ্‌তে লোকনাথের মনে হ'ল তিনি আর দাঁড়াতে পার্‌ছেন না, চোখে অন্ধকার দেখে' একটা ঝোপের কোলে তিনি বসে' পড়্‌লেন···অসহ্য-দংশন-বিষে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তখন ঝিম্‌-ঝিম্‌ কর্‌ছে।···

ধীরে-ধীরে তাঁর মনের নিভৃততম অংশ কিসের আলোকে যেন আলোকিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল···আসন্ন মরণের বজ্রকঠোর, নির্ম্মম, করাল, রৌদ্র সুর, দূরশ্রুত মুক্তস্রোত গিরিনির্ঝরের তালে যেন তাঁর কানে মুক্তির গান বাজাচ্ছে···তোমার পাষাণকারা এবার ভাঙ্‌ব··· তোমার চোখের বাঁধন এবার খুল্‌ব···

হে অনন্ত দেব, মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পারে কোন্‌ সুদূরতম, অপ্রকল্প্য রাজ্যের জ্যোতিঃসিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই ব্যাকুল, দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য রেখেছ? তাই বুঝি সেদিন জলের মধ্যে আমায় পথ দেখিয়েছিলে?···সে দিন তোমায়ও চিনিনি, তোমার পথও চিনিনি···আজ বোধ হয় বুঝেচি··হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা, পৃথিবীর অপেক্ষা মহান্‌, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা মহান্‌, স্বর্গের অপেক্ষা মহান্‌, সর্ব্ব-ভূতের অপেক্ষা মহান্‌···মেঘ যেমন ওষধিগণের উপজীব্য, তুমি তেম্‌নি আমার প্রাণধারার উপজীব্য···তুমি আমার প্রাণের কথা শুন্‌তে চাও? বেশ, তা হ'লে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো, দেব, এই অন্ধ রাজ্যের পারে, ওই দিগন্ত-সীমার পারে, জীবন-মহাসমুদ্রের পারে। কোথায় তোমার চিরবিকশিত জ্যোতিঃ প্রভাত, কোথায় দৈন্যমুক্ত জ্ঞানসম্পদের অপরাজিত আয়তন, চলো দেখ্‌ব···

হঠাৎ লোকনাথের মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি মাথা তুলে' বলে' উঠল—তোমার বিচার-শক্তি চলে' যাচ্ছে,··· বিষের যাতনায় যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হ'য়ে আস্‌চে, তখন তোমার যে বিচার, সে কি বিচার? মনের এই তরল ভাব, দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, মন থেকে দূর করে' দাও···

লোকনাথ কিছুই ঠিক কর্‌লেন না, তাঁর মন আর যুদ্ধ কর্‌তে পেরে উঠ্‌ছিল না···আফিমের নেশার মতো মরণের তন্দ্রা তাঁর ক্রমেই গাঢ় হ'য়ে এল···

কোথায় কোন্‌ দুটি বালকবালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে-ঝোপে তলায়-পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্চে···সময়ের দীর্ঘ পাষাণ-অলিন্দের দূরতম সীমায় তাদের ছোট্ট ছোট্ট পা গুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হ'য়ে আস্‌চে···ওধারে তা'রা-দুটিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্চে···

এক গ্রাম্য বনের মৌ-গাছের ডাল থেকে দু'জনে মৌ ফুল পেড়ে' খাচ্চে, বালিকাটি ভালো রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে' দিচ্চে···এই যে এটি, নিত্য দ্যাখো, বরং দ্যাখো তুমি খেয়ে···

নীলব্যোম-পথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু, সমিধ্‌বাহী, জ্যোতির্ম্ময় ঋষিরা চলেচেন···তাঁদের মধ্যে কে যেন পিছন ফিরে' সঙ্গীদের নিকট প্রস্তাব কর্‌ছেন, ওহে সঙ্গীগণ, আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেচি, এস তা ফেলে' দিয়ে পুনর্ব্বার নূতন জল সংগ্রহ করি···এত দিন ভ্রমণের পর মিষ্ট জলের উৎসের সন্ধান পেয়েচি··· তাঁদের কমণ্ডলু থেকে কালীগোলার মতো কি ঝরে' পড়্‌চে···

পথের বাঁকে একদিনের মেঘ-ভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেচে, তার এলোমেলো চুলগুলো মুখের চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়েচে···কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে' দিয়েচে··· সে কেঁদে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বল্‌চে···কেন তুমি মার্‌বে?··· কেন আমায় মার্‌বে তুমি?···এ-পাড়ায় আসি বলে'?··· আর কক্‌খনো আস্‌ব না···দেখে' নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি···

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট্‌ বিশ্বের উপর সেই-

ভাবেই মুগ্ধ, আবদ্ধ রইল, বহু বৎসর পূর্ব্বের শৈশব-কালে গ্রামসীমার মাঠে তাঁর অজ্ঞান, শিশু-নয়ন দু'টি যেভাবে আবদ্ধ রইত…প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট্ প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ করে' তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল…প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না…

মূক-বধির শিশু

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

আজ ত্রিশ বৎসর হইয়া গেল, কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কত মূক-বধির ছেলে-মেয়ে এই বিদ্যালয়ে আসিয়া নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করিতেছে। যাহারা এতদিন সমাজের আবর্জ্জনা হইয়াছিল, তাহারা আজ শিক্ষার গুণে স্ব-স্ব জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের লোক আজও এ-বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। মূক-বধিরদিগকে শিক্ষা দিয়া 'মানুষের' মতন করা যায়, এ-কথা অনেকেই জানেন না। যদি তাঁহাদিগকে বলা যায় যে, শিক্ষাদ্বারা মূক-বধিরগণ আমাদের মতন কথা বলিতে ও অপরের ওষ্ঠ-সঞ্চালন নিরীক্ষণ করিয়া কথা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা বহুক্ষেত্রে বাতুল আখ্যাই পাইব।

পাশ্চাত্য জগতে মূক-বধিরগণ উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত লাভ করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য, যে, সমগ্র বঙ্গদেশে ত্রিশ হাজার মূক-বধিরের মধ্যে মাত্র ১০০ জন শিক্ষালাভ করিতেছে। এ-দোষ কাহার? সরকার বাহাদুরের ও আমাদের, উভয়তঃ। এই হতভাগ্য মূক-বধিরদিগের জন্য যে সহানুভূতি আমাদের দেশবাসীগণের হওয়া উচিত, তাহা তাঁহাদের নাই। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের আজিও 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা। বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নানাবিধ আয়োজন আবশ্যক। অর্থের অভাবে কিছুই হইতেছে না। কলিকাতা সহরে যদি প্রত্যেকে এককালীন একটি করিয়া টাকা দেন, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আমাদের দেশবাসীগণ এই সামান্য সাহায্য করিতে বিমুখ হইবেন না?

আমরা কাহাদিগকে মূক-বধির বলিতে পারি? এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে, যাহাদের প্রথমে দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা মূক-বধির, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা মোটেই মূক-বধির নয়। তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি এত নিম্নস্তরের যে, তাহারা সমস্ত কথা শ্রবণ করে, কিন্তু উত্তর (response) দেয় না। সাধারণ লোকে এইরূপ শিশুকে মূক-বধির বলিয়াই জ্ঞান করে। কেহ-কেহ বা মূক, কিন্তু বধির নয়। এইরূপ মূকের সংখ্যা খুবই কম। কোনও রোগের দরুন্ বা কোনোপ্রকার আঘাতের (shock) দরুন্ তাহাদের কথা বলিবার শক্তি লোপ পায়। গত মহাযুদ্ধের পর এইরূপ মূকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। গোলার শব্দে বা কোন-প্রকার ভীষণ আঘাতের জন্য অনেকের বাক্‌শক্তির লোপ (aphasia) হইয়াছে। আমি ওয়াশিংটন্ সহরে এইরূপ একটি মানুষ দেখিয়াছিলাম। তাঁহার শক্তি-সঞ্চালক স্নায়ুর (motor nerves) উপর ক্ষমতা সর্ব্বতো-ভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি কথাও বলিতে পারেন না, লিখিতেও পারেন না; কিন্তু সমস্ত কথাই শুনিতে পান। এইসব কারণে প্রকৃত মূক-বধির কাহারা তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। যাহারা জন্মাবধি অথবা অতি শৈশবাবধি সম্পূর্ণভাবে বধির হওয়ায় মূক, এবং যাহাদের জন্মাবধি অথবা অতি শৈশবাবধি শ্রবণশক্তি এত

কম যে, শুধু কর্ণের সাহায্যে কথা বলিতে শিখে না, তাহারা মূক-বধির।

'মূক-বধির' এই কথাটা প্রকৃতপক্ষে 'বধির-মূক' হওয়া উচিত; কারণ বধিরত্বই মূকত্বের কারণ, মূকত্ব বধিরত্বের কারণ নয়। বোধ হয় শ্রুতিকটু হয় বলিয়া 'বধির'-কথাটা মূকের পরে ব্যবহার করা হয়।

মূক-বধির দুইপ্রকার,—জন্মাবধি (congenital) ও শৈশবাবধি (adventitious)। শতকরা ৪০ জন জন্মাবধি ও ৬০ জন শৈশবাবধি মূক-বধির। জন্মাবধি মূক-বধিরদিগের সংখ্যা অনেকটা আন্দাজের উপর নির্ভর করে। ছয় মাসের পূর্ব্বে শিশু বধির কি না, এ কথা বিচার করা নিতান্ত শক্ত, একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। হয়ত কোন শিশু কোন কারণবশতঃ তিন মাস বয়সে বধির হইল। তাহাকে আমরা কোনও বিশেষ কারণের অভাবে জন্মাবধি বধির (congenitally deaf) বলিয়াই ধরিয়া লই। যাহারা শৈশবাবধি বধির (adventitiously deaf) তাহাদের সংখ্যা আমরা চেষ্টা করিলেই কমাইতে পারি। অনেক সময় মাতাপিতার অজ্ঞতার জন্য তাহাদের সন্তানগণ বধির হয়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র মূক-বধিরদের শতকরা সংখ্যা এক নয়। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দেশ		১ লক্ষ লোকের মধ্যে মূক-বধিরের সংখ্যা
১। সুইজার্‌ল্যাণ্ড	... ...	২৪৫
২। সার্‌ভিয়া	... ...	১৬৭
৩। হাঙ্গেরী	... ...	১৩৩
৪। অষ্ট্রিয়া	... ...	১০৯
৫। সুইডেন্	... ...	১০৩
৬। ইতালী	... ...	৯৬
৭। প্রুশিয়া	... ...	৯১
৮। আমেরিকা	... ...	৬৮
৯। স্কট্‌ল্যাণ্ড্	... ...	৫৩
১০। ভারতবর্ষ	... ...	৫২
১১। ফ্রান্স্	... ...	৫১
১২। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্	... ...	৪৭
১৩। বেল্‌জিয়াম্	... ...	৩০

এইরূপ অসমান শতকরা সংখ্যার কারণ কি? বিভিন্ন-প্রকারের জল-বায়ু কি ইহার জন্য দায়ী? H. Schmaltz এ-বিষয়ে স্যাক্সনিতে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জলবায়ুর তারতম্যে মূক-বধিরদের সংখ্যার হার কম-বেশী হয় না। তাঁহার মতে সামাজিক অবস্থার নিকৃষ্টতা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানের অভাবের হেতু মূক-বধিরদের সংখ্যার হার স্থানে-স্থানে বেশী হয়। যাহাদের দারিদ্র্যের জন্য নৈতিক ও শারীরিক অধঃপতনের আশঙ্কা বেশী, তাহাদের বংশে মূক-বধিরদের সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত পরিবারে মূক-বধিরের সংখ্যা কম। Schmaltzর মত আমরা সম্পূর্ণভাবে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না। আমরা দেখিতে পাই যে, পার্ব্বত্য প্রদেশেই মূক-বধিরদের সংখ্যার হার বেশী। সুইজার্‌ল্যাণ্ড্ এ-বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংল্যাণ্ড্ অপেক্ষা স্কটল্যাণ্ডে মূক-বধিরদের সংখ্যা বেশী। ভারতবর্ষে হিমালয়ের উপত্যকা-প্রদেশে সমতল ভূমি অপেক্ষা মূক-বধিরের সংখ্যা বেশী। ইহার কারণ কি? এ-বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন।

আমরা চলিত কথায় মূক-বধিরকে "হাবা" বলিয়া থাকি। বাস্তবিক কি মূক-বধির মাত্রেই "হাবা"? মূক-বধির হইলেই জড়বুদ্ধি হইতে হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? মোটেই না। শিশু কোনো মস্তিক-রোগের জন্য জড়বুদ্ধি হইতে পারে। ইহার সঙ্গে মূক-বধিরত্বের কোনো সম্পর্ক নাই। মূক-বধিরের সাধারণ বুদ্ধি একজন সাধারণ শিশুর বুদ্ধি অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। তবে জ্ঞানলাভের জন্য একটি প্রধান অঙ্গহানির নিমিত্ত তাহার মানসিক বৃত্তির বিকাশ অত্যন্ত ধীরে-ধীরে হয়। কিন্তু যদি, "যত্নে কি না হয়, বোবা ছেলে কথা কয়"—এই কথাটা মনে রাখিয়া নিজের সমস্ত শক্তিব্যয়ে ইহাদের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারাও আমাদের মতন 'মানুষ' হইতে পারে।

নানা কারণে লোকে বধির হয়। আমরা এই কারণগুলিকে সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি,—অপ্রত্যক্ষ কারণ (remote cause) ও প্রত্যক্ষ কারণ (immediate cause)

অপ্রত্যক্ষ কারণ

১। বংশগত।

অনেক বংশে বংশ-পরম্পরায় মূক-বধির সন্তান দেখিতে পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে অনেকে বহু গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে মতের মিল আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। দুই প্রণালীতে এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম প্রণালী—কত মূক-বধির শিশুর মূক-বধির মাতাপিতা আছে? দ্বিতীয় প্রণালী—যে-যে বিবাহে হয় এক পক্ষ বা উভয় পক্ষই মূক-বধির, তাহাদের মধ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে মূক-বধির সন্তান হয়? উচারম্যান্ (Uchermann) প্রথম-প্রণালী অনুসারে নরওয়েতে প্রায় ৯০০ জন মূক-বধিরকে—পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে মূক-বধির মাতাপিতা ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, বধিরত্ব বংশ-পরম্পরাগত নয়।

গালোদে (Gallaudet) কলেজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ পরলোকগত ডাঃ এডওয়ার্ড অ্যালেন ফে (Dr. Edward Allen Fey) দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার "Marriages of Deaf-mutes" বা বধির-মূকদের বিবাহ এ-বিষয়ে একখানি মহামূল্য পুস্তক। টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ গ্রেহাম্ বেল্ (Dr Graham Bell) এ-বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন। ডাঃ ফে পাঁচ হাজার মূক-বধিরের বিবাহের ফলাফল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়,কিঞ্চিদধিক শতকরা ৯টি বিবাহে মূক-বধির সন্তানের জন্ম হইয়াছিল। ডাঃ ফের মতে, যদি এইরূপ বিবাহে উভয় পক্ষই জন্ম-বধির হয় এবং যদি তাহাদের বধির জ্ঞাতি থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানদের বধির হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এটাও দেখা গিয়াছে যে, জন্ম-বধিরদের ভ্রাতা-ভগিনীদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫০ জন বধির হয়। এ-সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, কোন-কোন বংশে বধিরত্ব বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। তবে ইহাও ঠিক যে, এই ভাবিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; কারণ চেষ্টা করিলে ইহাকে যথেষ্ট দমন করিয়া রাখা অসম্ভব নয়। বিবাহের সময় এটি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন পাত্র-পাত্রী উভয়েই জন্ম-বধির না হয়।

২। সগোত্র বিবাহ।

সগোত্র বিবাহের ফলে বধির সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। আমাদের দেশে সগোত্র বিবাহের প্রচলন নাই; কাজেই এ-বিষয়ে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজনও দেখি না।

৩। অত্যধিক মদ্যপান।

পিতামাতা যদি অত্যধিক মদ্যপান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানগণের বধির হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

৪। ব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতা।

পিতা বা মাতার যদি উপদংশ থাকে, তাহা হইলে সন্তানের বধির হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশী। এ-বিষয়ে খুব দৃঢ়ভাবে কিছু বলা শক্ত; কারণ কেহই এই ঘৃণিত রোগের কথা স্বীকার করেন না। যদি তাঁহারা প্রথম হইতে এ-বিষয়ে সাবধান হইয়া চিকিৎসা করান, তাহা হইলে নিজেরা ও নিজেদের সন্তানগণ অনেক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মানুষ দোষ করে, কিন্তু দোষ করিয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা না করা মহা পাপ।

প্রত্যক্ষ কারণ

১। মস্তিষ্কের রোগ।

মস্তিষ্কের রোগের দরুন্ অনেকে বধির হয়। শৈশবে Cerebro-spinal meningitis নামক একরূপ গলার ঘা হইলে, অনেক ক্ষেত্রে হয় চোখ না হয় কান নষ্ট হয়। এরূপ মস্তিষ্করোগের জন্য স্বাভাবিক বুদ্ধিও অনেক স্থলে sub-normal হয়।

২। পীতজ্বর (Scarlet fever)।

পীতজ্বরের দরুন্ অনেকে বধির হয়। শতকরা কতজন এই রোগের জন্য বধির হয়, ইহা বলা বড়

শক্ত, কারণ সমস্ত দেশের শতকরা সংখ্যার হার এক নয়। ইতালীতে বধিরদের মধ্যে শতকরা ১·৫ জন এবং স্যাক্সনিতে শতকরা ৪৭·৬ জন পীতজ্বরের জন্ম বধির।

৩। আরও নানা-প্রকার রোগ হইতে বধির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত রোগগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যথা, হাম, টাইফয়েড, ডিপ্থেরিয়া, বসন্ত, রক্তামাশয়, হুপিং কফ্ প্রভৃতি।

পরিশেষে আমার বিশেষ অনুরোধ যাহাতে সন্তানগণ "দস্যি ছেলেমেয়ে" হয়, সে-বিষয়ে প্রত্যেক মাতাপিতা যেন বিশেষ চেষ্টা করেন, যে-ছেলে ঘরের কোণে বা দিবারাত্র মায়ের কোলে থাকে, সে-ছেলের ভবিষ্যৎ কোন দিন কোন বিষয়ে ভালো হইতে পারে না। এই-রকম ঘরকুণো ছেলে-মেয়েদের উপরে নানা-প্রকার রোগ বিশেষভাবে আধিপত্য লাভ করে। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের অতি সামান্য অসুখের উপরও যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। সামান্য সর্দ্দি-কাশি হইতে মস্তবড় একটা-কিছু হওয়া অসম্ভব নয়। অনেক ছেলেমেয়েদের কানে পুঁজ হয়। এই পুঁজ হইতে কান চিরদিনের মতন নষ্ট হইয়া যাওয়া বিশেষ-কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়।

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেখিতে-দেখিতে শান্তির বিবাহকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বড়লোকের মেয়ে—পাত্র জুটিতে বিলম্ব হইল না। দিনও স্থির হইয়া গেল। পাত্রটি বিলাসপুরের জমিদার-পুত্র।

বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কানাইকে লইয়া মহেশ্বরীর ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে গৃহখানি পূর্ণ হইলে গৃহে নিত্যই যজ্ঞব্যাপার চলিবে। তিনি কি করিয়া এই অন্ত্যজ ছেলেটিকে লইয়া সব-দিক্ সাম্লাইয়া গৃহের মাঝখানে চলিবেন? কানাইলাল এখন সেয়ানা হইয়াছে, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু দিদির বিবাহ আসিতেছে, কত বাজি-বাজ্না, রং-রোশ্নাই হইবে—মিঠাই-মণ্ডা আসিবে, জাঁক-জমকে ও আড়ম্বরে চোখে চমক্ লাগিয়া যাইবে—

সে প্রতিদিন মহেশ্বরীর নিকট তত্ত্ব লইয়া লইয়া সেই আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহাকে কি করিয়া অন্যত্র বিদায় করা যায়? আর যে পারে পারুক্—মহেশ্বরী ত পারেন না। তিনি একদিন ভয়ে-ভয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুখেন! কানাইকে নিয়ে কি হবে?"

সুখেন্দু কহিলেন, "কি আর হবে। বাড়ীতে এই উৎসব, তুমি আমি বরং অন্যত্র গিয়ে থাক্তে পারি, ওরা গলায়-গলায় সাথী, তুমি ওকে অন্যত্র পাঠাতে চাও নাকি?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "পুরুষের কথা ধরিনি, সবাই বাইরে-বাইরে থাক্বেন। কিন্তু এই যে সব মেয়েরা আস্বেন, ছেলেটা কখন কি করে' বসে, আমার ত ভয়ে প্রাণ কেঁপে যাচ্ছে।"

সুখেন্দু কহিলেন, "তাঁরা মেয়েমানুষ হ'য়ে কি মায়ের প্রাণটা বাড়ীতে রেখে আস্বেন? দুনিয়ার উপর যে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে, এমন একটা নিঃসহায় বালকের এক-আধটু অপরাধ যদি তাঁরা ক্ষমা কর্তে না পারেন, তবে তুমিও নাচার—আমিও নাচার!"

মহেশ্বরী পুত্রের সদয় মন্তব্য শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইতেছিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি ভাব্ছিলাম কি

—ওকে সঙ্গে করে' নিয়ে দিন-কতক অন্য কোথাও গিয়ে থাকি।"

সুখেন্দু হাসিয়া কহিলেন,"অর্থাৎ এই বিয়ের দিন-ক'টা। কি যে বলো তুমি? তুমি না থাকলে শান্তির বিয়ে দেবে কে? তার চেয়ে মেয়েটাকে রেখে চলো সবাই আমরা সরে' পড়ি—তা'রা এসে নিয়ে যাক্ সব হাঙ্গামা চুকে' যাবে।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কেন এত ভাবছ? ও কিছু গোলমাল করবে না; ওকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে' দিও—আর একটু চোখে-চোখে রাখলেই হবে।"

সুখেন্দুর কথায় মহেশ্বরী তৃপ্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে এতক্ষণে একটু সাহস আসিল। আত্মীয়-স্বজন যাহারা আসিবেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পুত্রের জন্যই তাঁর অধিক ভাবনা হইতেছিল। পাছে পুত্র মনে করেন, তাঁহার জননী গৃহে এই যে একটি উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন ইহার জন্য আত্মীয়-স্বজনও হয়ত দুই-এক দিনের জন্য আসিয়া শান্তি পাইবেন না, এই চিন্তাই তাঁহাকে ক্রমাগত পীড়া দিতেছিল, অথচ প্রকাশ করিয়া তাহা বলিতেও পারিতেছিলেন না। পুত্রের কথায় তাঁহার সে-আশঙ্কা দূর হইল। অপরে তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না, পুত্র যদি সানন্দে তাঁহার পক্ষে থাকেন, তবে সকলের চেয়ে বড় দুঃখটা এ-ব্যাপারে তাঁহাকে পাইতে হইবে না।

বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। গৃহখানিও ক্রমে-ক্রমে আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইঁহাদের মধ্যে এক পরম নিষ্ঠাবতী রমণী আসিলেন। ইনি সুখেন্দুর দূরসম্পর্কীয়া পিসী, ইঁহাকে একটু ছোঁয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ। জল ঘাঁটিয়া পিসীমার দুইহাতে ও পায়ে হাজা ধরিয়া গিয়াছে; তবু পুকুরের ঘাটেই ইঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত এবং একছড়া তুলসীর মালার দানাগুলি বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা আহত হইয়া—হাতের মধ্যে অনুক্ষণ চক্রবৎ ঘুরিত। দিনের মধ্যে কতক্ষণ ইনি শুকনো কাপড় পরিতেন, বলা শক্ত। পাড়াপ্রতিবেশীর কল্যাণে ক্রমে-ক্রমে যখন ইনি কানাইলালের পরিচয় পাইলেন, তখন হইতে সে ইঁহার বিষ-নয়নে পড়িল। তিনি ঘাটে বসিয়া যখন আহ্নিক করিতেন, কানাই যদি তখন স্নান করিতে সে ঘাটে যাইত, অমনি বলিয়া উঠিতেন, "জাত জন্ম সবই মারলে রে—যা রে ছোঁড়া ও ঘাটে যা।" বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিতেন, তাঁহার ত্রিসীমানার মধ্যে কানাইলালের যাওয়ার উপায় ছিল না। তিনি যেন সর্ব্বদা নিজের চারিধারে একটা অদৃশ্য বেড়া টানিয়া ঘুরিতেন। দেখা হইলেই বলিতেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাপ করবেন, এখানে উঠবেন না—এখানে আসবেন না।" ইত্যাদি। কানাই তাঁহাকে দেখিলেই সরিয়া যাইত। সে দূরে-দূরে থাকিয়া দেখিতে পাইত, এই উৎসবে তাহার সুখ ও আনন্দটুকু হরণ করিয়া লইবার জন্যই এই রমণীর হিংস্র চক্ষু-দুটি যেন অনুক্ষণ তাহারই সন্ধানে ঘুরিতেছে। শুচিবায়ুগ্রস্তার সমস্ত অশুচিতার কেন্দ্র যেন এই বালকই হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে কোনোপ্রকারে ছাঁটিয়া ফেলিতে না পারিলে পূরাপূরি শুচিতার কলঙ্ক থাকিয়া যাইতেছিল। একদিন মোক্ষদা মহেশ্বরীকে কহিলেন, "বৌ! সুখেন ত তেমন ছেলে নয়, তুমি এ-কি খ্রীষ্টানী মত ধরেছ? কোথা থেকে তুমি এসব শিখলে?"

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খ্রীষ্টানী মত?"

মোক্ষদা কহিলেন, "বামুন-পণ্ডিতের ঘর, ওমা! একেবারে অবাক্ করেছ যে! এক বাগদী ছোঁড়াকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরোচ্ছ, এতে কি বিচার থাকে, না আচার থাকে? এ যদি তোমার হিঁদুয়ানি হয় তবে খ্রীষ্টানি আর কা'কে বলে জানিনে ভাই।"

মহেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "দিদি! ভিতরেও যে একটা আচার আছে, সেখানে বিশ্ব চরাচর বাঁধা।"

মোক্ষদা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তা হোক্ বৌ। তোমার এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভালো নয়। এ যেমন পোড়া দেশ—সহরে জিনিয়ে যাচ্ছ, আমাদের দেশ হ'লে—।"

মহেশ্বরী তাঁহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়াই কহিলেন, "বাড়াবাড়ি আর কি করছি বলো। আমরা কেবল আড়ম্বরই নিয়েই ব্যস্ত, অথচ পূজার খবর রাখিনে!"

মহেশ্বরীর এ শ্লেষ-বাক্য যেন তাঁহারই উপর নিক্ষিপ্ত হইল, মোক্ষদা এইরূপ মনে করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বল চক্ষু দুটি জলন্ত বহ্নির ন্যায় জলিয়া উঠিল। তিনি কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "এখন শেষকালটায় একটু ভগবানের নাম নিই, তাও বুঝি কারও চোখে সইছে না। তোমার মতন জা'ত খোয়াতে পারলে বুঝি ভালো হ'ত!"

মহেশ্বরীর ইচ্ছা নয় যে, বাড়ীতে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সহিত একটা মন-কষাকষি করেন। কিন্তু কথাটা এইখানে চাপা পড়িয়া গেলেও মোক্ষদার মনের আগুন জলিয়াই থাকিবে বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, "জা'ত খুইয়েছি তোমায় কে বল্‌লে? আচার-ব্যবহার নিয়েই জাত সৃষ্টি হয়েছে। সে হিসাবে বাগ্‌দী একটা নীচ জাতি স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলে' একটা মানুষের বাগ্‌দীর ঘরে জন্ম হয়েছে বলে'ই তার উপর সর্ব্বদা বিষ-দৃষ্টি রাখতে হবে, আর একটা ব্রাহ্মণের ছেলের আচার-ব্যবহার যদি অত্যন্ত হীনও হয় তবে তার উপর সু দৃষ্টি দিতে হবে—এরই বা কি মানে আছে?"

মোক্ষদা ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "তা হ'লে মুচি, মেথর সবই তোমার জা'তে তুলে' নেও! সবাই বামুন হ'য়ে যাবে, আর কোনো বালাই থাক্‌বে না।"

মহেশ্বরী ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, "আমার কথা ত বুঝে' দেখবে না, সে কথা আমি বলিনি। ছোঁড়াটার ত্রিসংসারে কেউ নেই, সে বাগ্‌দীর ছেলে, মনে-মনে এই ধারণাটা সকলের বড় করে' রেখে কি আমরা তা'কে একটু আশ্রয়ও দেবো না? সেও ভগবানের জীব, আমরা না রাখলে দাঁড়াবে কোথায়?

মোক্ষদা বলিলেন "তা দাও। একঠাঁই পড়ে' থাকতে দিলেই গড়ে' উঠবে। কিন্তু কোলে পিঠে করে' নিয়ে বেড়ানোর ত কোনো দরকার দেখিনে।

"খুবই দর্‌কার। তা'র যে বয়েস, তা'তে তা'র যা দর্‌কার, সব পূরণ কর্‌তে না পার্‌লে, তা'কে আশ্রয় দেওয়া বলে না।"

মোক্ষদা তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "আড়াই বৎসর বয়েস থেকে যখন পালন করেছ, তখন ত তা'র মাতৃ-স্তন্যেরও দর্‌কার ছিল!

মহেশ্বরী সহজভাবেই কহিলেন, "হাঁ, তা সে পেয়েছেও। আমরা যে মায়ের জাতি, এখানে সন্তান নিয়ে জাতি বিচার হয় না।"

মোক্ষদার মনে হইতেছিল, আগে জানিতে পারিলে তিনি এমন ম্লেচ্ছের বাড়ীতে আসিতেন না। তিনি সে-কথা মুখে প্রকাশ করিয়াই বলিলেন, "আগে ত ভাই সব-কথা জান্‌তে পাইনি—।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "জান্‌লে বুঝি এ-বাড়ীতে পা দিতে না? আচ্ছা দিদি! তুমি ত এই কয়েকদিন এসেছ, আমি তা'কে নিয়ে চল্‌ছি-ফির্‌ছি তাও দেখছ, কিন্তু আমার জাতির গায়ে কোন আঁচড় পড়তে দেখেছ? বিষ্ঠা গায়ে লাগলেও নেয়ে-ধুয়ে শুদ্ধ হওয়া যায়; আর জগতের যাতে কল্যাণ, এমন একটা আত্মার সংস্রবে গেলে কি শুদ্ধ হবার কোন পথই নেই?"

মহেশ্বরীর অনাচার-কদাচার মোক্ষদা কোনদিনই দেখিতে পান নাই। কানাইলালের যে-সব ঘরে যাইতে বাধিত, সে-সব ঘরে তাহার যাইতে নিষেধ ছিল। মোক্ষদা দেখিতেন এই সহৃদয়া রমণী আপনার নিষ্ঠাটুকু সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া ছেলেটিকে কেমন বুকের মধ্যে করিয়া রাখিয়াছেন। দিনের মধ্যে দুশো-বার স্নান করিতেছেন—বস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন, একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি নাই। মোক্ষদা বলিলেন, "তেমন কিছু দেখিনি। কিন্তু ধন্য সাধ্য তোমার! আড়াই বছর থেকে দশ বছরে এনে ফেলেছ, আমরা হ'লে পেরে উঠতাম না। সেজন্যে ত বলিনে; আসল কথা হচ্ছে এতে তোমারও কষ্ট হয়—লোকেও ভালো দেখে না।"

মোক্ষদা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন দেখিয়া মহেশ্বরী আনন্দিতা হইলেন। বলিলেন, "আমার কষ্ট কিছুই নেই। কিন্তু ঐ ত আমাদের দোষ! লোকে মন্দ বল্‌লে আর রক্ষে আছে? লোকে মন্দ দেখবে ভেবে যারা সৎকাজ কর্‌তে নিরস্ত হয়, তা'রা দেখতে পায় না যে, তাদের শুধু নিরস্ত হওয়া হয়নি, দলে মিশে' পড়ে' তা'রাও মন্দটা গ্রহণ করে' বসেছে—আর সৎ যেটা—সেটা হারিয়ে ফেলেছে।"

এই সময় কানাই আসিয়া কহিল, "বড় মা! বলাই রসগোল্লা খাচ্ছে।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "খাবে না? সাত লঙ্কায় টো-টো করে' বেড়াবি, সেইখানে দিয়ে আস্‌তে পার্‌লে হয়—নয়? ঘরে ঢাকা রয়েছে খাগে যা—ছোট মা রেখে এসেছে।"

কানাই প্রফুল্লমুখে এক-পায়ে লাফাইতে-লাফাইতে চলিয়া গেল। মোক্ষদার দুর্ব্বলতার মধ্যেও মাতৃ-স্নেহের স্বাভাবিক উৎসটি একটু উন্মুখ ও আকুল হইয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর সহিত আলোচনায় মোক্ষদার নারী-হৃদয়ের সার-বস্তুটি এমন সাক্ষাৎগোচর হইয়া পড়িল যে, পর দিন দেখা গেল মোক্ষদাকে যে জলখাবার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে তিনি নামমাত্র খাইয়া সমস্তই কানাইলালকে অর্পণ করিতেছেন! মহেশ্বরী চাহিয়া-চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বস্তি হইল না। মোক্ষদা ত একটি নয়! এই কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত বাড়ীতে কত মোক্ষদারই আবির্ভাব হইয়াছে! তিনি সকল দিকে চক্ষু রাখিয়া এই অবুঝ শিশুটিকে কিরূপ রক্ষা-কবচের মতো সকলের আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন?

আজ শান্তির বিবাহ। মহেশ্বরী প্রথম-প্রথম বহুক্ষণ কানাইলালকে চোখে-চোখে রাখিয়াছেন। কিন্তু বাড়ীর গৃহিণী তিনি কতক্ষণ আর কেবল কানাইকে লইয়া থাকিবেন, কাজ-কর্ম্মের গুরুভারে ক্রমে-ক্রমে তিনি চারিদিকে জড়াইয়া পড়িলেন। শেষকালটায় কোথায় যে কানাই গিয়া পড়িল আর কোথায় যে তিনি রহিলেন ঠিক করা শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে-সব ঘর অব্যবহার্য্যরূপে পড়িয়াছিল, যাহা কানাই-বলাই প্রভৃতি শিশুগণ খেলিবার স্থানরূপে ব্যবহার করিত, সেসব ঘর আজ কাজের ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। খেলা-ঘরের পথ শিশুর ভুলিয়া থাকা শক্ত; তাই বলাই দিনে দশবার সেইসব ঘরেই ঘুরিতেছিল, কিন্তু কানাইলালের অভ্যস্ত চরণ-দুখানি সেইসকল স্থানে যাইতে আজ প্রতিপদেই বাধা খাইতেছিল। লোকজনে কোথাও লুচি ভাজিতেছে, কোথাও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছে, কোথাও বা তর্‌কারী-পত্র রন্ধন হইতেছে। যাহারা লুচি ভাজিতেছিল, তাহারা কানাই-লালকে দেখিলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিয়া বলিতেছে, "উঠিস্ নে—উঠিস্ নে—এখানে উঠিস্ নে।" যাহারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছিল, তাহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিতেছে, "ঐখানে দাঁড়া, একখানা জিলিপী দিচ্ছি, নিয়ে চলে' যা।" যাহারা তর্‌কারী রাঁধিতেছিল, তাহারাও বলিতেছে, "সরে' যা—সরে' যা—যজ্ঞি নষ্ট কর্‌বি নাকি?" অকস্মাৎ আজ শুভ উৎসবের আনন্দের মধ্যে সে যেন মূর্ত্তিমান্ দুর্গ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। সারা-দিন এইরূপে প্রতিস্থানেই বাধা পাইয়া সে এক-একবার সেই স্থানে যাইয়া শুষ্কমুখে দাঁড়াইতেছিল, যেখানে তাহার প্রাণটি বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মাত্র জুড়াইবার স্থান পাইয়াছিল, মহেশ্বরীর সান্ত্বনা-বাক্যে প্রাণের সমস্ত ব্যথা ধুইয়া-মুছিয়া বাল্যস্বভাব লইয়া—সে আবার এখানে-সেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় একটি গৃহে কতকগুলি যুবতী মিলিয়া মহা কোলাহলের সঙ্গে শান্তিকে বধূ-বেশে সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। কেহ ললাটে চন্দনের ফোঁটা কাটিতেছিলেন, কেহ ওষ্ঠ দুখানি লাল রঙে রঞ্জিত করিয়া দিতেছিলেন, কেহ-কেহ বা চুড়ী আগে থাকিবে, কি ব্রেস্‌লেট আগে থাকিবে তাহারই বিচার করিতে-করিতে হয়রাণ হইয়া পড়িতেছিলেন। চারিদিকে ব্যস্ততা ও আনন্দের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

কানাই ব্যতীত আরও অনেকগুলি সঙ্গী বলাইএর জুটিয়াছিল। সে তাহাদের লইয়া যুবতীদের ঘিরিয়া তাহার দিদির এই নববেশ দেখিতেছিল। দিদিকে লইয়া এমন হুলস্থূল করিতে জীবনে সে আর কখনও দেখে নাই। কানাই কিন্তু দ্বারের কাছে চুপ্‌টি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘরে ঢুকিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। অথচ দিদিকে দেখার সাধও তাহার বলাইএর অপেক্ষা কিছু কম ছিল না।

হঠাৎ একটি যুবতীর নজর তাহার উপর পড়িল

তিনি খন্‌খনে গলায় বলিয়া উঠিলেন, "মনো-দি, ঐ দেখ, বেল্লিকটা ঠিক সময় এসে হাজির হয়েছে। বাগ্‌দীর পো! দয়া করে' একটু এদিকে-ওদিকে যাও, এখন ক'নে যাত্রা করে' বেরুবে।" আর-একটি যুবতী বলিলেন, "কতদিকে কত আমোদ পড়ে' রয়েছে, সেখানে যেতে মন ওঠে না; এখানে এসে নাগাল নিয়েছ কেন?" মোক্ষদা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কেন তোরা ছেলেটির পিছু অমন লেগেছিস্? আহা! এক-সঙ্গে চলে-ফেরে—ওঠে-বসে—দেখবে না?" অল্পবয়সের কঠোর সমালোচনার কাল তিনি অনেক দিন কাটাইয়া উঠিয়াছেন; তাই এই বালকের প্রতি একবার স্নেহদৃষ্টি পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার আচার-নিষ্ঠাও তাঁহাকে আগের মতন কঠিন বিচারক করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

প্রথম যুবতী তেম্‌নি জোর-গলাতেই কহিলেন, "কি যে বলো পিসি! জীবনের আজ একটা প্রধান যাত্রা! ম্লেচ্ছের মুখ দেখে' ঘর থেকে বেরুবে?"

ইতিমধ্যে আর একটি যুবতী উঠিয়া বালকের নিকটে গিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছিলেন, "যা ছোঁড়া—যা এখান থেকে বল্‌ছি। ফের্ যদি এখানে আস্‌বি কান টেনে লাল করে' দেবো।"

আড়াই বছরের কানাইলাল যেদিন বাড়ীতে আসে, সেই দিন হইতে শান্তি তাহাকে ভালোবাসে। আজ ইহাদের নিষ্ঠুরতা শান্তির প্রাণে বড় লাগিয়াছিল।

এইসব যুবতীদের সহিত তাহার ঝগড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, "থাক্ না—আছে দাঁড়িয়ে—হয়েছে কি?"

প্রথম যুবতী বিস্ফারিত-নেত্রে শান্তির দিকে চাহিয়া ধম্‌কাইয়া কহিলেন, "নে, তুই চুপ কর! বিয়ের ক'নে, তোর কথায় কাজ কি?" শান্তি তবু চুপ করিতে পারিল না।

কানাইলালের বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া তাহার চক্ষে জলধারা গড়াইতে লাগিল। সে কহিল, "সকলে এমন করে' লেগেছে! বলা! বড়মা মরেছে নাকি?"

মোক্ষদাকে সম্বোধন করিয়া যুবতীরা কহিলেন, "দেখ পিসি! চোখের জল ফেলে' কি অকল্যাণ করুছে।"

মোক্ষদা বলিলেন, "আহা! জুড়ি যে! অমন করে' বল্‌ছিস্—কাঁদ্‌বে না? কানাই! বাবা! তুমি যাও, লক্ষ্মী আমার, বাজি-পোড়ানো দেখগে। না গেলে ত ছাড়বে না!"

দিদির বিবাহ-সভার যাত্রা তাহার দেখা হইল না।

কানাইলালের চক্ষুদুটি দিয়া অবিশ্রান্ত জল গড়াইতে লাগিল। সে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার এই কালো মুখখানি কোথায় যাইয়া লুকাইবে, সে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। বিশ্বে এত লোক থাকিতে সে-ই কি করিয়া তাহার দিদির অকল্যাণের কারণ হইল? সে ধীরে-ধীরে সভাশোভনের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। যেখানে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত কত-রকমের আধারে কত-কত উজ্জ্বল আলোক সকল জ্বলিতেছিল; তাহার চক্ষে সে-জ্যোতিঃ অত্যন্ত ম্লান বোধ হইতে লাগিল। ঢোল, কাঁশী ও সানাইএর মঙ্গলবাদ্য তাহার প্রাণে বেদনার সুরে ঝঙ্কার তুলিতেছিল। সে সেখানে দাঁড়াইতে না পারিয়া পুকুরের ঘাটে সোপানের উপর আসিয়া বসিল। সে-গৃহের সকলেই যখন উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন একটি দশম বর্ষীয় বালক শুধু হৃদয়-ভরা নিগ্রহ লইয়া কি জানি কাহাকে তাহার প্রাণের বেদনা নিবেদন করিতে নির্জ্জন বাপীতীরে আসিয়া বসিল!

বালকের মন—চিন্তার কোন শৃঙ্খলা নাই—কোন কিছু সাজাইয়া-গোছাইয়া ভাবিবারও ক্ষমতা নাই—কেবল কতকগুলি গোলমেলে চিন্তা মনে উঠিয়া তাহাকে একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সে কেবলই ভাবিতেছিল,—আরও কত ছেলে-মেয়ে খেলিতেছে—বেড়াইতেছে—সর্ব্বত্র যাইতেছে-আসিতেছে, কাহাকেও কেহ কিছু বলে না, তাহাকে কেন সকলে এমন 'দূর' 'ছাই' করিতেছে? ইহাদের চেয়ে সে কি তাহার আরো নিজের, আরো আপন নয়? ইহারা আজ একদিন আসিয়া এত আনন্দ লুটিয়া লইতেছে;

আর তাহার চিরদিনের গৃহে তাহার কেন এ লাঞ্ছনা?

এ-বাড়ীতে কতকগুলি স্থানে তাহার যাতায়াত নিষিদ্ধ, সে এ-যাবৎ এইমাত্র বুঝিয়া আসিতেছিল; কিন্তু কোন দিন সে ইহার কিছু কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখে' নাই। মহেশ্বরী যেরূপ বুঝাইতেন, যেরূপ বলিতেন, সে সেইরূপ বুঝিত ও করিত; এবং তাহাই তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই সে মনে করিত। কিন্তু এই যে কতকগুলি উড়ো লোক আসিয়া 'বাগ্দীর পো' 'ছুঁস্‌নে' 'যাস্‌নে' করিতেছে ইহারই বা অর্থ কি? আচ্ছা! "বাগ্দীর পো"-টা কি? বোধ হয় মস্ত গালি হবে। এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে সে যখন দেখিল হাউই, চরকী তুবড়ী প্রভৃতি নানা বর্ণের বাজি পুড়িয়া বহির্ব্বাটির প্রাঙ্গণটি আলোকিত করিয়াছে, তখন সে আবার ধীরে-ধীরে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ সে-সকল দেখিয়া বাজিকরেরা যে-ঘরে বসিয়া বাজি পুরিতেছিল সে সেইখানে যাইয়া বসিল। তার পর খোলাট পুরিয়া পাতা পড়িল, হুড়-হুড় দুড়-দুড় করিয়া অসংখ্য লোক আসিয়া আহারে বসিয়া গেল, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি নানাবিধ সুরসাল খাদ্যের দ্বারা সকলে উদর পূর্ণ করিল এবং লম্বা-লম্বা ঢেকুর তুলিয়া চলিয়া গেল। কানাইলাল সেই বারুদঘরের এক অন্ধকার কোণে বসিয়া সমস্ত দেখিল!

রাত্রি তখন তিনটা। বালকের তখনও পর্য্যন্ত আহার হয় নাই। এত লোক জন আসিল—খাইল—চলিয়া গেল—সে বসিয়া-বসিয়া দেখিল!

তাহার আহারের ইচ্ছাও হইল না—সে-চেষ্টাও সে করিল না! আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সারাদিন ধরিয়া এই অযথা অপমানে তাহার কচি মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

মহেশ্বরী প্রথমত বিবাহের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তার পর মেয়েদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—কানাইলাল কোথাও-না-কোথাও বসিয়া দু'টা খাইয়া লইয়াছে।

যখন কাজকর্ম্ম সকল মিটিয়া গেল, তখন ঘরে আসিয়া দেখিলেন, কানাই আসে নাই। বলাই তাহার ঘরে ঘুমাইতেছে, অন্যান্য বালকেরাও নিদ্রা যাইতেছে। মহেশ্বরীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারাদিনের ব্যস্ততায় চাপাপড়া নানা আশঙ্কা মাথা জাগাইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি তখন তাহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাহির বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন; এবং একটি আলো লইয়া নিজে অন্দরের সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সকল অনুসন্ধানই ব্যর্থ হইল। কানাইকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সুখেন্দু সে-সংবাদ পাইয়া নিজে বাহির হইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন—কোথাও পাইলেন না।

কর্ম্মের বাড়ীতে সারাদিন খাটুনির পর তখন অনেকেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। মহেশ্বরী পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বালকের প্রতি সকলেরই ঈর্ষ্যা—কি জানি কাহারও বাক্যে কোন বিপদ্ ঘটিল না ত? সকাল হইতে তাহাকে চোখে-চোখে রাখিয়া কেন মিথ্যা-কাজের অসময়ে তাহাকে চোখের আড়াল করিলেন? আর কি তাহাকে পাইবেন? তিনি বলিলেন "সুখেন! তুই বাহিরের পুকুরটা একবার দেখে' আয়, আমি ভিতরেরটা দেখি।" কথাটা বলিতে বুক কাঁপিয়া যাইতেছিল; কিন্তু সত্য যদি হয়, কেবল কি মুখে উচ্চারণ না করিয়াই অমঙ্গল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন?

সুখেন্দুকে পাঠাইয়া দিয়া মহেশ্বরী অন্দরের পুষ্করিণীটির চারিধার একবার ঘুরিয়া আসিলেন। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া পুকুরে নামিলেন। প্রথমতঃ হাঁটু জল—তার পর কোমর জল—পরে গলা জল—তার পর ডুবের পর ডুব দিতে লাগিলেন। তাঁহার জানা ছিল যে, কানাইলাল সাঁতার জানিত, হঠাৎ জলে ডুবিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অভিমান-ভরে বয়স্ক লোকে যা করে—বালকে কি তা করিতে পারে না? প্রিয় বস্তুর অভাব হইলে অসম্ভবও অতিসম্ভব-রূপে মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসে।

ইতিমধ্যে একজন আসিয়া সংবাদ দিল, কানাইলালকে পাওয়া গিয়াছে। মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া

আসিলেন। তাঁহার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই আর-একটা ভয়ানক আশঙ্কা মনে জাগিয়া উঠিল। সুখেন্দু কহিলেন, "মা দেখে' যাও, তোমার ছেলের কীর্ত্তি।" বরযাত্রী এবং অন্যান্য লোকজনেরা তখন সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। মহেশ্বরী শঙ্কিতমনে সুখেন্দুর সহিত বাহির-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বারুদঘরের একপার্শ্বে জ্বালানী কাঠের উপর বালক অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে!

তখন প্রভাত হইয়াছিল। মহেশ্বরী তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন। দেখিলেন, চক্ষু-দুটি বসিয়া গিয়াছে—উদরটিতে বুভুক্ষার সকল লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেকে কোলে জড়াইয়া শত চুম্বনে ছাইয়া দিয়া মা বলিলেন, "এখানে শুতে কে বলেছে তোকে?"

কানাইলাল মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মহেশ্বরী চোখের জল লুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে খাস্‌নি কিছু?"

সে কথা বলিল, "না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে বুঝ্‌তে পেরেছি—আয় খাবি আয়! আহা! পেট্‌টা দেখি চিল্‌তে-পানা হ'য়ে গেছে! বাছা রে!"

গতরাত্রের লুচি, তরকারী ও মিষ্টান্ন মহেশ্বরী বসিয়া-বসিয়া, কানাইলালকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তার পর ধমক্ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে কাঠের বোঝার উপর শুতে গেলি কেন?"

কানাই চুপ্ করিয়া থাকিয়া একবার ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ইচ্ছে।"

"এ যে বড় বেজায় ইচ্ছে! অমন আরামের শয্যার উপর ইচ্ছে না হ'লে আর কোথায় হবে!"

কানাই কিছুকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "বিয়ে ত হ'য়ে গেল, এরা-সব যাবে কবে?"

"কা'রা?"

কানাই মুখ শিঁট্‌কাইয়া কহিল, "থালা-থালা খেতে দিতে পারেন,—জানেন না কা'রা!"

মহেশ্বরী হাসি চাপিয়া কহিলেন, "বরযাত্রীরা?"

কানাই আবার মুখ শিঁট্‌কাইয়া কহিল, "বরযাত্রীরা? —মুক্ষীরা।"

বস্তুতঃ মোক্ষদার ব্যবহার-গুণে কানাইলাল পশ্চাতে তাঁহার উপর সদয় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে আর কাহারও নাম জানিত না। তাই মোক্ষদাকেই মুখপাত্র-রূপে ধরিল।

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "এখুনি যাবে? কুটুম-বাড়ী এসেছে, দু'পাঁচ মাস থাক্‌বে যে!"

কানাই শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "দু—পাঁ—চ—মা—স?"

মহেশ্বরী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "মায়ের ছেলে মায়ের কাছে থাক্‌বি—তোর ভাব্‌না কি? পাঁচ মাস ছেড়ে দশ মাস থাক্ না তা'রা, আমার কোল থেকে তোকে দূরে ঠেলে' কার সাধ্যি?"

(ক্রমশঃ)

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৩৬]

মুখে চুপ করিলেও মাধবী কিন্তু মনের মধ্যে চুপ করিতে পারিল না, বিমানবিহারী প্রস্থান করিবার পর নানাবিধ প্রশ্নোত্তরে তাহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল। যেসকল কথা বিমানবিহারী তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল তাহা মনে করিয়া-করিয়া সে মনে-মনে বিশ্লেষণ করিতে লাগিল; এবং নদীর বাঁকে জলস্রোত যেখানে প্রতিহত হয় সেখানে আবর্জ্জনা যে-রূপে জমিতে থাকে ঠিক সেই-রূপে, কথোপকথনের যে-যে স্থলে বিমানবিহারী নিজেকে সংরুদ্ধ করিয়াছিল সেইসকল স্থলে মাধবীর চিন্তা একটির পর একটি করিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল।

কথোপকথনের মধ্যে বিমানবিহারী বলিয়াছিল যে সুরেশ্বরের জেলের পর প্রথম যেদিন সে মাধবীদের গৃহে প্রবেশ করে তখন তাহার মন সুরেশ্বরের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে তাহার মনে সে-বিদ্বেষের আর কিছুমাত্র অবশেষ ছিল না। সহসা সমস্ত বিদ্বেষ এরূপে অন্তর্হিত হইবার কি কারণ হইয়াছিল তাহা মাধবী জানিতে চাহিলে বিমান-বিহারী শুধু বলিয়াছিল যে সে-কথা তাহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, যাহা সকলেরই নিকট সে অগোচর রাখিতে চাহে। তাহার পর কথোপকথনের আর-এক স্থলে এই দ্বিতীয় অধ্যায় সংক্রান্তে বিমানবিহারী বলিয়াছিল, 'তোমার কথা শুনে' আমার মনে আশা হচ্ছে মাধবী! মনে হচ্ছে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের মতন নিষ্ফল না হ'তেও পারে!'

এই অবর্ণিত দ্বিতীয় অধ্যায় যে কি, এবং কিরূপে তাহার সূত্রপাত হইল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মাধবীর সমস্ত চিন্তা তৎপর হইয়া উঠিল। সংশয় এবং সম্ভাবনার মাল-মশলায় যতরকমেই সে সম্ভাবিত দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত করিল, কোনোটিই তাহার নিজ ছায়াপাত হইতে মুক্তি পাইল না। প্রথম অধ্যায় সুমিত্রাকে লইয়া শেষ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ; তাহার পর দ্বিতীয় অধ্যায় যে তাহাকে লইয়া আরম্ভ হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? বন্দুক হইতে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বারুদ নির্গত হইয়া যাওয়ার মতন মন হইতে বিদ্বেষ নির্গত হইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে যে জাদু-বাজির কথা বিমান বলিয়াছিল তাহার জাদুকরী সে ভিন্ন অপর আর কে হইতে পারে তাহা মাধবী ভাবিয়া পাইল না। স্পষ্ট করিয়া বিমানবিহারী এপর্য্যন্ত কিছু বলে নাই তথাপি তাহার পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল যে বিমানবিহারীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধিষ্ঠাত্রীর পদে সে-ই অধিষ্ঠিত হইয়াছে!

কিন্তু এরূপ মীমাংসা মাধবীর নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হইল না। বিমানবিহারীর অনুরাগ সুমিত্রার উপর হইতে অপসৃত হইয়া তাহার প্রতি প্রসারিত হইয়াছে—মনে হইবা মাত্র সর্ব্বপ্রথমে সে মনের মধ্যে একটা সকুণ্ঠ হীনতা বোধ করিল। যে-জিনিসের মধ্যে একনিষ্ঠ হইবার শক্তি নাই, অপর-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার মতো যাহা দুর্ব্বল, এবং বস্তুতঃ যাহা অপর-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার কল্পনায় অগৌরবেরই মতন একটা কিছু, মাধবীর নিষ্ঠা-প্রিয় মনে, পীড়া দিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্ব্বলতার একটা গুণ আছে; একদিকে অশ্রদ্ধা সঞ্চার করিলেও করুণা এবং সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিবার তাহার একটা প্রকৃতিজাত পটুত্ব আছে। তাই বিমান-বিহারী যে দুর্ব্বল, অনন্যব্রত হইয়া অধিকার করিবার দৃঢ়তা তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে নাই, সেই চিন্তাই মাধবীর সবলচিত্তে ক্রমশঃ একটা করুণা সঞ্চার করিতে লাগিল, এবং এই করুণা বলসঞ্চয় করিয়া-করিয়া ক্রমশঃ এমন পুষ্ট হইল যে সুমিত্রা বিমানবিহারীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়াই নিরবলম্ব বিমানবিহারীর একটা অবলম্বনের

আবশ্যকতা আছে বলিয়া মাধবীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিল।

কিন্তু এই করুণা যে করুণার অতিরিক্ত আর কিছু হইতেও পারে তাহা মাধবীর মনে হইল না। বৃন্তকে সে শুধু বৃন্ত পর্য্যন্তই দেখিল; বৃন্তের অব্যবহিত পরেই বৃন্তের উপজাত ফলও যে বৃন্ত সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে সে-কথা সে ভুলিয়া থাকিল।

ভুলিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না বলিয়া মাধবী কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সেকথা ভুলিয়া থাকিল, অন্যথা সুরেশ্বরের নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিল তাহাই ভুলিতে হইত। তাই কাজে-কর্ম্মে কথা-বার্ত্তায় বিস্মৃতির বাঁধ বাঁধিয়া-বাঁধিয়া মাধবী তাহার চিন্তা-প্রবাহকে সঙ্কীর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবাহ সঙ্কীর্ণ হইলে গভীর হইবার সম্ভাবনা যে বাড়িয়া যায় সেকথা সে ভাবিয়া দেখিল না।

কথাটা সপ্রমাণ হইল কয়েক দিন পরে একদিন সুমিত্রাদের গৃহে, সুমিত্রার জন্মদিনে। এবার সুমিত্রা তাহার জন্মদিন উপলক্ষে কোনোপ্রকার সমারোহ করিতে দেয় নাই। কেবলমাত্র মাধবীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে আহারের পর সুমিত্রার ঘরে বসিয়া দুই সখীতে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল।

সুমিত্রা বলিল, "শুনেছ মাধবী, বিমান-বাবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?"

মাধবী চমকিয়া উঠিল।

"চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন! কই, শুনিনি ত! কবে ছাড়লেন?"

"কাল তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর হয়েছে। কাল সন্ধ্যে-বেলা আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন। আজ চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে আসবেন।"

মাধবীর প্রসন্ন মুখমণ্ডলে একটা ছায়া পড়িল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে বলিল, "এবার কিন্তু তা হ'লে তোমার আর-কোনো আপত্তি থাকল না সুমিত্রা?"

"কিসের আপত্তি?"

"বিমান-বাবুকে বিয়ে করবার?"

"ও!" বলিয়া সুমিত্রা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, "কিন্তু এতেই যে আমার সব আপত্তি যাবে তা তাঁকে কে বললে? আমি ত তাঁকে কোনো অনুরোধ করিনি।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী মৃদু হাস্য করিল, বলিল, "তুমি অনুরোধ করনি সেটা ত আর তাঁর অপরাধ নয়! তোমাকে পেতে হ'লে তোমার অনুরোধের অপেক্ষায় থাকলে তাঁর চলবে কেন?"

"আচ্ছা, তা যেন তাঁর চলবে না; কিন্তু তোমার সুর আজ হঠাৎ এ-রকম বদলে' গেল কেন, মাধবী? বিমান-বাবু শুধু নিজের চাকরিই ছেড়েছেন, না তোমাকে ঘটকালিতে বাহালও করেছেন?" বলিয়া সুমিত্রা মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

মনে-মনে একটু বিব্রত বোধ করিয়া মাধবী বলিল, "বিমান-বাবু কিছুই করেননি ভাই, অদৃষ্টই আমাকে ঘটকালিতে বাহাল করেছে!"

স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "তা হ'লে অদৃষ্ট বলছ কেন? দুরদৃষ্ট বল!"

মাধবী কিন্তু সুমিত্রার একথায় খুসী হইল না। তাহার মনে হইল বিমানবিহারীর প্রতি অবজ্ঞা-বশতঃই সুমিত্রা দুরদৃষ্টের কথা বলিতেছে। এতটা দম্ভ তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে অপ্রসন্ন-স্বরে বলিল, "দুরদৃষ্টই বা কেন বলছ সুমিত্রা? বিমান-বাবুকে কি তুমি এতই অযোগ্য মনে কর যে তাঁর পক্ষ থেকে ঘটকালি করাও দুরদৃষ্ট বলে' তোমার মনে হয়?"

মাধবীর কথায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুমিত্রা বলিল, "না না, মাধবী, বিমান-বাবুকে আমি একেবারেই অযোগ্য মনে করিনে! তা কেন মনে করব ভাই, তাঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তুমি ভুল বুঝেছ, দুরদৃষ্ট আমি সে-অর্থে ব্যবহার করিনি। কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে তাঁর তরফ থেকে ঘটকালি আসা আমি আমার পক্ষে দুরদৃষ্ট বলে'ই মনে করি!"

এবার সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

"মাধবী!"

"কি ভাই?"

"আমার এক-একবার মনে হয়, হয়ত আমার জন্যেই বিমান-বাবু চাকরি ছেড়েছেন!"

মাধবীর মুখমণ্ডল পুনরায় ম্লান হইয়া গেল। অন্য-মনস্কভাবে সে বলিল, "তা হবে!"

"কিন্তু আমার দোষ নেই মাধবী, এর জন্যে আমি কোনো রকমেই দায়ী নই!"

মাধবী মনে-মনে কি ভাবিতেছিল, কোনো কথা কহিল না।

সুমিত্রা বলিল, "সুতরাং এর জন্যে বিমান-বাবু আমার কাছে কিছু দাবি করতে পারেন না। কিন্তু যদিই করেন, তা হ'লে আমি কি বলব বল ত ভাই?"

এবার সুমিত্রার কথায় মনঃসংযোগ করিয়া মাধবী বলিল, "তুমি কি বলবে, তা আমি আর কি বলব সুমিত্রা, যা তোমার ভাল মনে হয় ভাই বোলো।"

সুমিত্রা ঈষৎ অধীরভাবে বলিল, "যা আমার ভাল মনে হয় তা ত বলবই, তোমার কি ভাল মনে হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"তা আমি কিছু বলতে পারব না সুমিত্রা; আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো ভাই।"

মাধবীর এই দুর্বোধ বিসদৃশ আচরণে বিস্মিত এবং ব্যথিত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু এ-বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাই বলে'ই আজ জন্মদিনের ছুতো করে' তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি, তা নইলে কোনো হাঙ্গামাই আজ আমি করতাম না!"

মাধবী আরক্ত-মুখে মৃদুস্বরে বলিল "তা হ'লে আর কখনো এ-পরামর্শের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ কোরো না, কারণ এ-বিষয়ে আমি কোনো পরামর্শই তোমাকে দিতে পারব না।"

এবার সুমিত্রার মনে-মনে রাগ হইল; ঈষৎ কঠোর স্বরে সে বলিল, "কিন্তু কেন দিতে পারবে না? একদিন ত বিনা নিমন্ত্রণে বাড়ী বয়ে' আমাকে কত পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলে; আর আজ হঠাৎ সমস্ত উৎসাহ চলে' গেল?"

মাধবীর মুখে-চোখে বেদনা ও বিমূঢ়তার একটা সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুইহস্তে সুমিত্রার হস্ত ধারণ করিয়া সে আর্তকণ্ঠে বলিল, "রাগ কোরো না ভাই সুমিত্রা, আমাকে ক্ষমা করো। আমার দুঃখ তুমি যদি জানতে তা হ'লে কখনই এমন করে' রাগ করতে না!"

মাধবীর এই সকাতর অভিযোগে সুমিত্রার মনে সমস্ত ক্রোধ নিমেষের মধ্যে নিভিয়া গেল। অনুতপ্ত ব্যথিত-কণ্ঠে সে বলিল, "তোমার দুঃখ? কি তোমার দুঃখ, মাধবী? না তাও বলতে তোমার আপত্তি আছে?"

বিষণ্ণ স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "তা আছে।"

শুনিয়া সুমিত্রা এক-মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর দুঃখিতস্বরে বলিল "তা হ'লে কি আর বলব বল!"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাধবী আত্মনিমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। বিপন্ন মনে করিয়া সুমিত্রা তাহার নিকট পরামর্শ ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু এমনই অবস্থা-সঙ্কটে সে পড়িয়াছে যে পরামর্শ দিবার কোনও উপায় নাই! অথচ বাস্তবিক পক্ষে পরামর্শ দিবার আছেই বা কি?

পূর্ব্বে যে ছিল বিঘ্ন, এখন সে হইয়াছে বন্ধু! কিন্তু তথাপি নিরুপায়! হায় প্রতিশ্রুতি!

"মাধবী!"

মাধবী সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। "একটা কথা বলবে মাধবী?"

"কি কথা বল?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্খলিতভাবে সুমিত্রা বলিল "আচ্ছা, তুমি কি বিমান-বাবুকে—"কিন্তু এই পর্যন্ত বলিয়াই সে আর বলিতে পারিল না। অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যেই চুপ করিয়া গেল।

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ইচ্ছায় মাধবী বলিল, "বিমান-বাবুকে আমি, কি বল?"

স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "ভালবাস?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তস্বরে সে বলিল, "তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছিনে বলে'ই কি তোমার সে-কথা মনে হচ্ছে? তা হ'লে ত আরো পরামর্শ দিতাম।"

"হ্যাঁ তা দিতে তাও বুঝতে পারছি।"

"তবে?"

"তবুও মনে হচ্ছে! আচ্ছা, বল, আমার অনুমান

সত্যি, না মিথ্যে। এবারও যদি বল যে সেকথা বল্‌তে আপত্তি আছে তা হ'লে কিন্তু নিজের ফাঁদেই নিজে ধরা পড়ে' যাবে!" বলিয়া সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

মাধবী কিন্তু অন্যকথার সূত্রপাত করিয়া ফাঁদ অতিক্রম করিল; বলিল "তুমি যাঁকে ভালবাস্‌তে পার না সুমিত্রা, আমি তাঁকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা করতে তোমার বাধ্‌ছে না?"

একথার কি উত্তর দিবে তাহা সুমিত্রা সহসা ভাবিয়া পাইল না কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ায় সে হাস্যোজ্জ্বলমুখে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তুমি কি বিমান বাবুকে তোমার অযোগ্য মনে কর মাধবী যে একথা তুমি বলছ?"

"আমারি অস্ত্র দিয়ে আমাকে মার্‌তে চাও সুমিত্রা? এ'কেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।" বলিয়া মাধবীও হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে প্রমদাচরণ এবং জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া মাধবী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সুমিত্রা তাহাকে তুলিয়া দিতে গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ীর ভিতর একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল দেখিয়া মাধবী বলিল "এটা কি সুমিত্রা?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "সুতো। তোমাদের তাঁতে এই সুতো দিয়ে আমাকে এক-জোড়া ধুতি বুনিয়ে দিয়ো মাধবী, আর যা খরচা হয় আমাকে জানিয়ো, পাঠিয়ে দেব।

মাধবী সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি তোমার-কাটা সুতো?

"হ্যাঁ।"

"সবটা?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "হ্যাঁ, সবটাই। কিন্তু এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এছাড়া আমার আরও সুতো জমা করা আছে।"

সে-বিষয়ে আর কোনো কথা না বলিয়া মাধবী বলিল "আচ্ছা দেব। খুব তাড়াতাড়ি দর্‌কার আছে কি?"

"না, এমন কিছু তাড়া নেই, তোমাদের সুবিধে-মত করিয়ে নিয়ো আর তৈরি হ'লে তোমার কাছেই রেখে দিয়ো, আমাকে পাঠাবার দর্‌কার নেই।"

সবিস্ময়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুমিত্রার মুখে গোলাপী রংএর ক্ষীণ আভা খেলিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদা এলে ধুতি জোড়া তাঁকে দিয়ে বোলো যে, আমি যে তাঁর কাছে একজোড়া শাড়ী নিয়েছিলাম তারই দামের হিসাবে ধুতি-জোড়া যেন জমা করে' নেন। বাকি যা থাক্‌বে তাও এম্‌নি করে' শোধ করে' দেব।"

একটা কথা জিহ্বাগ্রে আসিতেই কোনোরূপে তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া মাধবী সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা বল্‌ব।"

মুখের ভাবে মাধবীর মনের কথা অনুমান করিয়া অভিমানে সুমিত্রার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল; গাঢ়-স্বরে মাধবীরই একদিনকার ভাষায় সে বলিল "কলের প্যাঁচ আজ হঠাৎ এম্‌নি চেপে বসেছে মাধবী, যে এক-ফোঁটা জলও পেলাম না!"

মাধবী, একমুহূর্ত্ত স্থিরভাবে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আবেগভরে বলিল "গলায় ঘা হয়েছে ভাই! বড় কষ্ট! যদি কোনো দিন ঘা সারে কথায়-কথায় তোমাকে পাগল করে' দেব। আজ আমাকে ক্ষমা কোরো সুমিত্রা।"

"আচ্ছা।" বলিয়া গাড়ীর হাতল ছাড়িয়া দিয়া সুমিত্রা দাঁড়াইল।

গাড়ী চলিতেই মাধবীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। হায় প্রতিশ্রুতি!

(ক্রমশঃ)
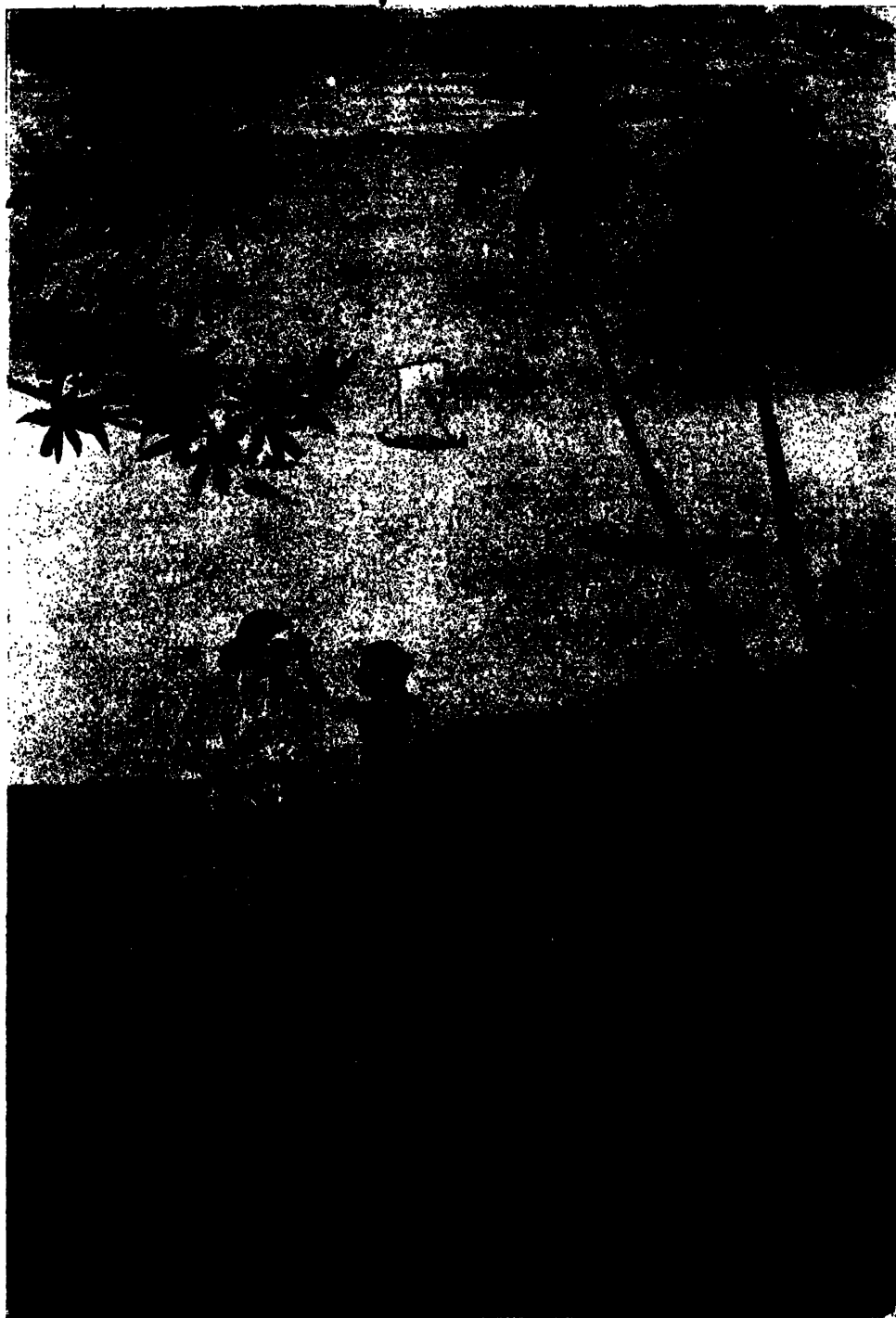
চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া

চিত্রকর—শ্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

প্রাচীন ভারতে জ্ঞাত্রিক জাতি

ডাক্তার শ্রী বিমলাচরণ লাহা, এম্-এ, বি-এল্, পি এইচ-ডি

মহাবীর জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর। ধর্ম্ম-সংস্কারক-হিসাবে তাঁহার স্থান যে খুব উচ্চে এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই মহাপুরুষ জ্ঞাত্রিক জাতিদের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জাতি ইতিহাসে কখনও-কখনও 'নায়' অথবা নাথ নামেও অভিহিত হইয়াছে। (১)

ডাঃ হরন্‌লে বলেন, (২) জ্ঞাত্রিকেরা অথবা নায়-সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়েরা বৈশালী (বসার), কুণ্ডগ্রাম এবং বাণিয় গ্রামে বাস করিত। কুণ্ডগ্রাম হইতে খানিকটা দূরে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে কোল্লাগ নামে একটি সেনা-নিবাস ছিল। এই সেনা-নিবাসের নায়-সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়দের ভিতরেই মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৩)। কেম্বি জ হিষ্ট্রী অব্ ইণ্ডিয়াতেও, (৪) বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের মতে উক্ত গ্রামটি বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ বসুকুণ্ড-নামে অভিহিত। মিসেস্ সিন্‌ক্লেয়ার্ ষ্টিভেন্‌সন্ বলেন,—"প্রায় দুই হাজার বৎসর আগেও 'বসারে' ঠিক এখনকার মতনই জাতিবিভাগ ছিল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা এমন পৃথক্‌ভাবেই বাস করিত যে অনেক সময় তাহাদের বাসস্থানের নামও এই সাম্প্রদায়িক বিভাগ অনুসারেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈশালী, কুণ্ডগ্রাম, বাণিজ্যগ্রাম প্রভৃতি নামের ভিতর দিয়াও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক্‌ভাবে বাস করার চেষ্টা চোখে পড়ে। সুতরাং বাণিয়াদের মহাপুরুষ মহাবীরের নামে যে ক্ষত্রিয় শব্দের আভাস পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর (৫)।" বৈশালী যে ক্ষত্রিয় উপনিবেশ ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈশ্যেরাও হয়ত সেখানে বাস করিত। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে, মুদ্রায় বা শিলালিপিতে কোথাও এমন কথা পাওয়া যায় না যে, বৈশালী কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই উপনিবেশ ছিল। মিসেস্ ষ্টিভেন্‌সনও এসম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য নজির দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার এ মত গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। বৈশালী কেবল মাত্র ব্রাহ্মণদেরই বাসস্থান ছিল—এই মতটি ছাড়া মিসেস্ ষ্টিভেন্‌সনের অন্যান্য মতগুলি কিন্তু অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

জৈনদের লেখার ভিতর দিয়া জ্ঞাত্রিকদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে তাহারা আদর্শ জাতিরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এইসব লেখায় পাওয়া যায় যে, জ্ঞাত্রিকেরা পাপকে চিরকাল ভয় করিত, এবং পাপকে পরিহার করিয়া চলাই ছিল তাহাদের স্বভাব। খারাপ কাজ তাহারা কখনও করিত না, কোনও প্রাণীর ক্ষতি করা ছিল একান্তভাবেই তাহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ জিনিষ। সুতরাং তাহারা মাংসও আহার করিত না (৬)। ডাঃ হরন্‌লে বলেন, কোল্লাগ উপনিবেশের বাহিরেও জ্ঞাত্রিকদের একটি চৈত্য ছিল এবং তাহার নাম ছিল দোপলাশ। অন্যান্য চৈত্যের মতনই ইহার মন্দিরের চতুর্দ্দিকেও বাগান ছিল। এই চৈত্যটিই বিপাকসূত্রে 'দোপলাশ' উদ্যান নামে অভিহিত হইয়াছে। নায়-সম্প্রদায়ই যে এই চৈত্যটির মালিক ছিল তাহা কপের ১১৫ এবং আয়ের (১১, ১৫) ২২ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এই অংশ-গুলিতে চৈত্যটি 'নায়-সণ্ডবন-উদ্যান' অর্থাৎ নায়-সম্প্রদায়ভুক্ত সণ্ডবনের উদ্যান নামে অভিহিত হইয়াছে (১)। সুতরাং জ্ঞাত্রিকেরা যে চৈত্য বা মন্দিরের সম্মান করিতে অভ্যস্ত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পার্শ্বনাথের পরবর্ত্তী অনেকগুলি সন্ন্যাসীর ভারও ইহারা বহন করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পার্শ্বনাথ মহাবীরের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন (২)। উবাসগদসাওতে পাওয়া যায়, মহাবীরের পিতা-মাতারা এবং সম্ভবতঃ নায়-ক্ষত্রিয়দের সমগ্র সম্প্রদায়টাই পার্শ্বনাথের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন (৩)। তার পর যখন মহাবীরের আবির্ভাব হইল, তখনই গোটা সম্প্রদায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সূত্রকৃতাঙ্গের মতে যাঁহারা মহাবীরের ধর্ম্ম-মত গ্রহণ করেন তাঁহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও সাধু ছিলেন। (৪)

ডাঃ হরন্‌লে বলেন, জ্ঞাত্রিকদের বৈশালী উপনিবেশটার শাসন-পদ্ধতি ছিল প্রজাতন্ত্রী। এই স্থানের অধিবাসী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মোড়লদের লইয়া ইহাদের সিনেট্ সভা গঠিত হইত। এই সিনেটের হাতেই ছিল রাজ্য-শাসনের ভার। সিনেটের সভাপতির আসন যিনি গ্রহণ করিতেন তাঁহারই উপাধি ছিল রাজা। একজন সুবেদার এবং একজন সেনা-নায়ক রাজাকে রাজ্যশাসন-ব্যাপারে সাহায্য করিত (৫)। মিসেস্ ষ্টিভেন্‌সনের মতে বৈশালীর শাসনতন্ত্র ছিল গ্রীকদের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ। (৬)

ক্ষত্রিয় নাট সম্প্রদায়ের রাজার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি চেটকের ভগ্নী ত্রিশলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। লিচ্ছবি রাজাদের ভিতর চেটকের আসন খুব উচ্চেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈনদের শেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত তীর্থঙ্কর মহাবীরের পিতা-মাতা ছিলেন এই সিদ্ধার্থ এবং ত্রিশলা। শ্বেতাম্বরদের মতে তীর্থঙ্করের যে ভ্রূণ প্রথমে ব্রাহ্মণ মহিলা দেবনন্দার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই পরে ত্রিশলার গর্ভে প্রবেশ করে। কিন্তু দিগম্বরেরা এ গল্পকে সত্য বলিয়া মনে করেন না। সিদ্ধার্থ এবং তাঁহার স্ত্রী পার্শ্বনাথের উপাসক এবং উপাসিকা ছিলেন। তাঁহারা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বর্দ্ধমান (মহাবীর)। ডাঃ হরন্‌লে সিদ্ধার্থের সম্পর্কে বলেন, "জৈন গ্রন্থগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা অতি-রঞ্জিত হওয়া যদিও স্বাভাবিক, তথাপি আমার মনে হয় তাহারা সিদ্ধার্থকে কুণ্ডপুর বা কুণ্ডগ্রামের রাজা-নামে কখনও অভিহিত

(১) Uvasagadasao, Vol. II, p. 4 f. n.

(২) Ibid., Vol. II, p. 4. f. n.

(৩) Ibid. Vol. II, p. 4 f. n.

(৪) Cambridge History of India, Ancient India Edited by Rapson, Vol. I, p. 157.

(৫) Mrs. Sinclair Stevenson, Heart of Jainism, pp. 21-22.

(৬) Jaina Sutras, Pt. II, S. B. E., Vol. XLV, p. 416.

(১) Uvasagadasao, Vol. II, pp. 4-5 f. n.

(২) Mrs. Sinclair Stevenson, Heart of Jainism, p. 31

(৩) Hoernle's Ed., Vol. II, p. 6.

(৪) Jaina Sutras, Pt. II, pp. 256-257.

(৫) J.A.S.B. 1898, p. 40.

(৬) Ibid., p. 22.

করে নাই। সাধারণ নিয়ম-অনুসারে তিনি ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ নামেই অভিহিত হইয়াছেন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত কখনও-কখনও তাঁহাকে কেবলমাত্র রাজা সিদ্ধার্থ নামে ডাকা হইয়াছে। কোল্লাগের ক্ষত্রিয়দের নেতারূপে এই অভিধানই তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। মহাবীর এই কোল্লাগতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার জন্মভূমি কোল্লাগের উপকণ্ঠে তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ের দোপলাশ-নামে যে চৈত্যটি ছিল, তাহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবীরের পিতামাতা পার্শ্বনাথের ধর্ম্মমতের উপাসক ছিলেন এ-কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১)। মহাবীর সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সম্ভবতঃ পার্শ্বনাথের ধর্ম্ম সঙ্ঘেই যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি ধর্ম্ম-সংস্কারক হন এবং জৈনধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের নায়কত্ব গ্রহণ করেন। (২)

সিদ্ধার্থ এবং ত্রিশলার পুত্র মহাবীর সাধারণতঃ জ্ঞাত্রি-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। পালি সাহিত্যে তিনি নিগন্থ নাথ-পুত্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ডাঃ হুরনলে বলেন, মহাবীরের নাম নায়পুত্ত অথবা নায়কুলনন্দন অথবা নয়মুণী (৩)। মিসেস্ সিন্‌ক্লেয়ার্ ষ্টিভেন্‌সন্ বলেন, তিনি জ্ঞাত পুত্র, নাম পুত্র শাসন-নায়ক এবং বুদ্ধ নামেও পরিচিত ছিলেন (৪)। নায় সম্প্রদায়ের নিগন্থ-দিগের মধ্যে নিগন্থ শব্দটি সর্ব্বপ্রকারের বন্ধন হইতে মুক্ত - এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৫)। স্পেন্স হার্ডি বলেন মহাবীর আপনাকে সর্ব্ব বিজ্ঞান-বিশারদ বলিয়া প্রচার করিতেন বলিয়াই তাঁহাকে নিগন্থ-নাথপুত্ত নাম দেওয়া হইয়াছিল। (৬) মহাবীর বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার আর-এক নাম ছিল বেশালি অথবা বৈশালিয় (৭)।

তিনি সব জানিতেন, সব দেখিতেন, তাঁহার জ্ঞানের সীমা-শেষ ছিল না। ভ্রমণে অথবা যখন দাঁড়াইয়া থাকিতেন ঘুমের ভিতরে অথবা জাগ্রত অবস্থায় (৮) কোনও সময়েই তাঁহার অজ্ঞাত বিষয় কিছু ছিল না। তিনি জানিতেন কে অপরাধ করিয়াছে আর কে করে নাই। (৯) এই বিখ্যাত জ্ঞাত্রিক বলিতে পারিতেন তাঁহার ভক্তেরা পূর্ব্বে কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের জন্মই বা কোথায় হইয়াছিল সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরও তিনি দিতে পারিতেন (১০)। তিনি একটি সম্প্রদায়ের নেতারূপে, একটি ধর্ম্মমতের শিক্ষকরূপে, সর্ব্বজ্ঞ এবং খ্যাতিমান্ সূক্ষ্ম তর্ক বিশারদ-রূপে বহু সম্মানিত এবং বহুদর্শীরূপে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং বৃদ্ধ বয়স্ক ভারাবনত লোকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন (১১)।

মহাবীরের জীবনের প্রধান-প্রধান ঘটনাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে জ্ঞাত্রিক জাতির বিবরণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তিনি যশোদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা ভূমিষ্ঠা হয়। যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর, তখনই তাঁহার পিতা-মাতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ইহার পর ভ্রাতার অনুমতি লইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১)।

কল্পসূত্রে পাওয়া যায় যে তিনি পণিয় ভূমিতে একবৎসর এবং মিথিলাতে ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন (২)। বারো বৎসর আত্ম-নিপীড়ন এবং চিন্তার পর তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি দীর্ঘকালজীবিত থাকিয়া এবং ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধের কয়েকবৎসর পূর্ব্বে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা জানি যে বুদ্ধদেব বয়সে মহাবীরের অপেক্ষা ছোট ছিলেন। সংযুত্তনিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায় কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "আপনি নূতন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি বয়সেও নিগন্থ-নাথ পুত্তের ছোট। নিগন্থ-নাথ পুত্ত কখনও আপনাকে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ নামে অভিহিত করিতে সাহসী হন নাই অথচ আপনি নিজেকে সেই নামে পরিচিত করিতেছেন—ইহার অর্থ কি?" (৩) বুদ্ধদেব যে মহাবীরের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন প্রসেনজিতের এই উক্তিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিক্রমাব্দ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাবীরের মৃত্যুর প্রচলিত তারিখ বিক্রমাব্দ প্রতিষ্ঠার ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে। সুতরাং সেই হিসাব-অনুসারে গণনা করিলে মহাবীর খৃঃ পূঃ ৫২৮ অব্দে মারা গিয়াছিলেন (৭)। কিন্তু ডাঃ চার্পেন্টিয়ার এই তারিখটাকে ঠিক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মহাবীরের মৃত্যুর তারিখ ৪৬৮ খৃঃ পূঃ। কিন্তু যেসব কারণে ডাঃ চার্পেন্টিয়ার্ প্রচলিত তারিখটা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত, তাহার কয়েকটি কারণ তাঁহার নিজের যুক্তির বিরুদ্ধেও ঠিক সমানভাবেই প্রয়োগ করা যায়। ডাঃ চার্পেন্টিয়ার নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে দীঘনিকায়ের সাক্ষ্য তাঁহার যুক্তিকে সমর্থন করে না (৫)। মজ্ঝিমনিকায়ের সামগাম সুত্তন্ত (৬) এবং দীঘনিকায়ের পাতিক সুত্তন্তের (৭) মতানুসারে মহাবীরের আবির্ভাব বুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। ডাঃ হুরনলের অনুমান, মহাবীর বুদ্ধদেবের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন (৮)। মহাবীরের মৃত্যুর নির্ভুল তারিখ বর্ত্তমানে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তবে ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তারিখটা বর্ত্তমান প্রমাণ প্রয়োগের হিসাবনিকাশ অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা কম আপত্তিকর বলিয়া মনে হয়। মহাবীর পাবাতে দেহ-রক্ষা করেন (৯)। তাঁহার মৃত্যুতে জ্ঞাত্রি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় একজন

(১) Uvasagadasao, Vol. II, pp. 5-6.
(২) Ibid., p. 6.
(৩) Uvasagadasao, Vol. II, Tr. p. 42, f. n. 119
(৪) Heart of Jainism, p. 27.
(৫) Dialogues of the Buddha, Vol. II, pp. 74-75.
(৬) Manual of Buddhism, p. 302.
(৭) Heart of Jainism, p. 22.
(৮) Anguttara Nikaya (P.T.S.), Vol. I, p. 220
(৯) Majjhima Nikaya (P.T.S) Vol. II, Pt. II, pp. 214-228
(১০) Samyutta Nikaya (P.T.S), Vol. IV, P. 398
(১১) Dialogues of the Buddha, p. 66.

(১) S.N. Das Gupta, A History of Indian Philosophy, p. 173.
(২) Uvasagadasao, Vol. II, p. 111.
(৩) Samyutta Nikaya Vol. I. p. 68.
(৪) The Cambridge History of India, Ancient India, Vol. I, p, 155
(৫) The Cambridge History of India, Ancient India, Vol. I, p. 156.
(৬) Vol. II (P.T.S.) p. 243.
(৭) Vol. III (P.T.S)
(৮) Ajivakas (Hasting's Encyclopaedia of Religions and Ethics)
(৯) Dialogues of the Buddha, Vol. IV, Pt. III, p. 203

অদ্ভুত ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ এবং সত্যদর্শী ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতে যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাবীর একজন অতিমাত্রায় ন্যায়নিষ্ঠ অনন্যসাধারণ বিজ্ঞ ভিক্ষু ছিলেন, চারিপ্রকারের ধ্যানের দ্বারা সংযমকে তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি যাহা দেখিতেন এবং যাহা শুনিতেন সেইসমস্ত সত্যের তিনি রহস্যোদ্ভেদ করিয়া গিয়াছেন (১)। জনসাধারণ তাঁহাকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিত (২)। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রের উল্লেখ অনুসারে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিসীম এবং বিশ্বাস ছিল অপরিমেয় (৩)। বিশ্বের সমস্ত বস্তু মন্থন করিয়া তিনি জ্ঞানামৃত আহরণ করিয়াছিলেন। দীপ-শিখার মতন তাঁহার নিকট সমস্ত রীতিনীতি, আইন-কানুনের অর্থ একান্ত সুস্পষ্ট ছিল। তাঁহার অগোচর কিছুই ছিল না, সর্ব্বপ্রকারের অপবিত্রতা হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর ভিতর তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার তুল্য জ্ঞানী ব্যক্তি আর একজনও ছিল না। ইহা ছাড়াও উক্ত সূত্র পাঠে জানা যায় কাশ্যপ গোত্রের এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিটি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বাক্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। "উদার গৌরবদীপ্ত—বিশ্বাস, জ্ঞান এবং ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন এই জ্ঞাত্রিয়।" এই সূত্রখানিতে যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভের শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর মহাবীরকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (৪) হপ কিন্স্এর মতে জ্ঞাত্রিপুত্র কখনও কোন নাটক, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি উপভোগ করেন নাই। অথচ মাতার মনে আঘাত লাগিতে পারে এই ভয়ে পিতামাতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহেই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন (৫)। তিনি অজাতশত্রুকে বলিয়াছিলেন "আমি একজন সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী লোক। পৃথিবীতে যেসব জিনিষের অস্তিত্ব আছে তাহা সমস্তই আমি জানি। যখন আমি ভ্রমণ করি বা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকি, বসিয়া থাকি অথবা শুইয়া থাকি আমার ভিতর সত্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে, জ্ঞানের স্বতঃস্ফুরণ আমার ভিতরে প্রতিনিয়তই চলিতেছে। (৬) কথাটির ভিতর দিয়া মহাবীরের অহঙ্কারের আভাসও বেশ খানিকটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া স্পেন্স হার্ডি বলিয়াছেন "মহাবীর বলিতেন, তিনি অপাপবিদ্ধ এবং যাহার যে-কোনও বিষয়েই সংশয়ের উদয় হোক না কেন তাঁহার নিকটে আসিলেই তিনি সমস্ত সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন (৭)।"

তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহে মহাবীরের যে বর্ণনা আছে তাহাতে জ্ঞাত-পুত্র নিগ্রন্থ বুদ্ধের "ছয় জন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভিতর একজন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (৮)।" সূত্রকৃতাঙ্গের মতানুসারে এই জ্ঞাত্রিকটি মানুষকে সাধু আচরণ-সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেন এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপারেই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল (৯)। তিনি বলিতেন প্রত্যেক বোধক্ষম জীব যে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে তাহা তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মার্জ্জিত ফল। ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষাই তাহাদের জন্মের কার্য্য ও কারণ। জীবের বার্দ্ধক্য এবং ব্যাধিও কার্য্য ও কারণ-শূন্য নহে। পথের সন্ধান জানিতে হইলে কার্য্য ও কারণ-সম্বন্ধে ধারণা থাকা চাই। এই কার্য্য-কারণের সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হইলে তবেই প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায় (১)। তিনি আরও বলেন জীবের বুদ্ধি-বিবেকের উপর যেসব ছাপ পড়ে, পূর্ব্বোৎপন্ন কারণ হইতে তাহাদের উৎপত্তি। পূর্ব্বের পাপগুলি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মুছিয়া ফেলা গেলেও, তাহার দ্বারা বর্ত্তমান কাজের ফল রোধ করা যায় না। ভবিষ্যতের দুঃখ না থাকিলে কর্ম্মও থাকিবে না, কর্ম্ম শেষ হইলে শোকেরও শেষ হইবে, দুঃখ শেষ হইলে দুঃখ মুক্তির অবস্থাকে পাওয়া যায় (২)। তাঁহার মতে মানুষ তাহার নিজের যোগ্যতা অনুসারে এ জগতে ভালো ও মন্দ অবস্থার ভিতর জন্ম গ্রহণ করে। কেহ যে আর্য্য এবং কেহ যে অনার্য্য, কেহ যে উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করে এবং কেহ যে নীচ কুলে জন্মায়, কেহ ধনী হয় আবার কেহ যে নির্ধন হয়, কাহারও বর্ণ সুন্দর এবং কাহারও বর্ণ যে কুৎসিত—এ সমস্তই মানুষের নিজের সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির ফল। এই সমস্ত মানুষের ভিতর একজনই শ্রেষ্ঠ—তিনি জ্ঞাত্রিদের পুত্র—তাঁহার জ্ঞাত্রিদের দ্বারা গঠিত একটি পারিষদ ছিল (৩)।

মহাবীরের এইসমস্ত কথা হইতেই বোঝা যায় যে, তাঁহার কর্ম্ম ফলের উপর অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মহাবীরের আর-একটি শিক্ষা হইতেছে এই যে, যেসকল লোক সত্য-সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারাই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে জ্ঞাত্রিকের আর-একটি শিক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে-শিক্ষাটি হইতেছে এই যে, জীবের নিজের প্রতি একটা গভীর মমতা আছে। এই মমতার কথা জানিয়া কোনো প্রাণীকেই হত্যা করা, বিপদ্‌গ্রস্ত করা বা যুদ্ধে আহ্বান করা উচিত নহে। চতুর বাক্যবিন্যাস মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। যাহারা চিন্তায়, বাক্যে এবং কাজে দেহ, বর্ণ বা আকৃতির প্রতি অনুরক্ত তাহারাই দুঃখ ভোগ করিবে (৪)। যাহারা অস্ত্র ব্যবহার করে, বিষপান করে, অগ্নিতে বা জলে আত্মবিসর্জ্জন করে এবং সেইসব জিনিস ব্যবহার করে, যাহা সাধুভাবে জীবনযাপনের আইন-কানুনের বিধি-বিধানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নহে, তাহারাই পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন (৫)। যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং জ্ঞানী তাহারাই মুক্তিমন্ত্র শুনিবার যোগ্য। (৬) যাহাদের আত্মা শাস্ত্র বিশ্বাসী, এবং পাপ-লিপ্ত নহে, মৃত্যুর সময় তাহারাই বোধি-প্রাপ্ত হইবে (৭)। লিচ্ছবি সেনা-নায়ক সীহ যে বিবরণ দিয়াছেন সেই বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মহাবীর ক্রিয়াবাদী ছিলেন অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল (৮)। তিনি বলিতেন তাঁহার পরিমিত জ্ঞানের দ্বারাই এই পৃথিবী সীমাবদ্ধ। বুদ্ধ এই মতের খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীর সত্যকার শেষ প্রান্ত কখনও দৌড়াইয়া পৌঁছানো যাইবে না, সেখানে পৌঁছাইতে হইলে সমস্তরকমের জ্ঞান অধিগত করিতে হইবে, জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের পাপকে ধ্বংস করিতে হইবে (৯)। মহাবীরের অনুশাসন-অনুসারে মানুষ প্রাণিহত্যা করিবে না, চুরি করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইবে না, মদ্যপান পরিহার করিয়া চলিবে। এগুলি বর্জ্জন না করিলেই তাহাকে নরক ভোগ করিতে হইবে। তাহা-ছাড়া তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, কোনও কাজ করা এবং তাহা হইতে

(১) The Book of Kindred Sayings, Pt.I, p.91.
(২) Ibid. p. 94
(৩) Jaina Sutras, Vol. II,pp. 287-289,
(৪) Jaina Sutras, Vol. II, p. 290
(৫) Religions of India, p. 292.
(৬) Rockhill, Life of the Buddha, p. 259.
(৭) Spence Hardy, Manual of Buddhism, p. 302
(৮) Rockhill, Life of the Buddha, p.79
(৯) Jaina Sutras, Pt. II, p. 416.

(১) Rockhill, Life of the Buddha, p. 259.
(২) Ibid. p. 104.
(৩) Jaina Sutras, Pt. II, p. 339.
(৪) Jaina Sutras, Vol. II, pp. 24—27.
(৫) Ibid., pp. 231-232.
(৬) Ibid., p. 231.,
(৭) Ibid., p. 230.
(৮) Anguttara Nikaya, (P. T. S.), Vol. IV, p. 180
(৯) Ibid., p. 429 et seq.

বিরত থাকা এই দুইটি জিনিষের গুরুত্ব-অনুসারেই মানুষকে ফল ভোগ করিতে হয়। অর্থাৎ মানুষের খুন এবং নিষ্ঠুরতা না করার সময় যদি তাহার প্রাণিহত্যা করার সময়ের অপেক্ষা দীর্ঘতর হয় তবে তাহাকে নরক-ভোগ করিতে হইবে না (১)। বুদ্ধদেবও এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। দীর্ঘ নিকায় সামাঞ্ঞফল সুত্তন্তে পাওয়া যায় যে, মহাবীর চতুর্ব্বিধ আত্ম-সংযমের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। মহাবীরের সম্পর্কে চতুর্ব্বিধ সংযম "চাতুয়াম সম্বর"—নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—"নিগন্থ সমস্তরকমের সলিল-সম্পর্কে সংযত হইয়া বাস করে, সমস্ত রকমের পাপাচার-সম্পর্কে সে সংযত, সমস্তরকমের পাপকে সে পরিহার করিয়াছে, পাপ পরাজিত হইয়াছে এই ধারণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সে বাস করে। এই হইতেছে চতুর্ব্বিধ সংযম এবং এই সংযমের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়াই তাহাকে নিগন্থ বলা হয় (২)।" মন এবং দেহ পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া তিনি মনো-কর্ম্ম এবং কায়-কর্ম্ম উভয়ের উপরই সমান জোর দিয়াছেন (৩)। সুমঙ্গলবিলাসিনীতে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, শীতল জলের ভিতরেও যে জীবিত প্রাণী আছে সে-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন (৪)। মজ্ঝিমনিকায়ের চুল-সকুল-দায়ী সুত্তন্তে দেখা যায় যে, তাঁহার মতে আত্মবঞ্চনার উপদেশ চতুষ্টয় আত্মার আনন্দ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা (৫)। তিনি বলেন আত্মা অরূপ হইলেও সংজ্ঞা-সম্পন্ন (৬) আত্মা এবং বিশ্ব উভয়েই অবিনশ্বর—ইহারা নূতন কিছুরই জন্মদান করে না। মজ্ঝিমনিকায়ের উপালি সুত্তে উপালি নামে জনৈক জৈন গৃহস্থ বলিয়াছেন, তাঁহার প্রভু মহাবীরের মতানুসারে হত্যা ইচ্ছাকৃতই হউক বা অনিচ্ছাকৃতই হউক দূষণীয়। এ মত কিন্তু বুদ্ধদেব সমর্থন করেন নাই। কারণ তিনি বলিয়াছেন, কাজ স্বেচ্ছাকৃত না হইলে তাহা দোষের হইলেও তাহাতে মানুষের পাপ হয় না (৭)। জাতকের একটি গল্প হইতে মহাবীরের একটি অদ্ভুত মতের আভাস পাওয়া যায়—সে মতটি হইতেছে এই যে, মানুষ তাহার পিতা-মাতাকে হত্যা করিয়াও নিজের স্বার্থকে বজায় রাখিবে (৮) সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ নাথ পুত্ত জৈনদের বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বজন্মে তাহারা যে পাপ করিয়াছে সেজন্য তাহাদের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। পাপের ধ্বংসের নিমিত্ত দেহে, মনে এবং বাক্যে সংযত হইয়া থাকিতে হয় এবং এইরূপভাবে থাকিতে পারিলেই ভবিষ্যৎ পাপের ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠে (৯)।

বুদ্ধ এবং মহাবীরের ভিতর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব তাঁহাদের ভক্তদের ভিতরেও সংক্রামিত হয়। সংযুত্তনিকায়ের মতে, মহাবীর বুদ্ধের সমতুল্য লোক ছিলেন না, যদিও তিনি একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন এবং নিজেও শ্রমণের গুণসমূহে বিভূষিত ছিলেন (১০)। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের বুদ্ধের গোঁড়া গ্রন্থকারেরা বলেন, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মহাবীর যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু বুদ্ধের জীবনের অপূর্ব্ব উজ্জ্বল গৌরবালোকের সম্মুখে সে যশ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তেলোবাদ জাতকে দেখা যায় যে, সত্যের মন্দিরে ভ্রাতৃবৃন্দ বলিতেছেন, "নাথপুত্ত বুদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন, পুরোহিত গোতম জানিয়া-শুনিয়াও তাঁহার জন্য প্রস্তুত মাংস আহার করেন।" এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন, "ভ্রাতৃগণ, আমার জন্য প্রস্তুত মাংস আমি ভোজন করি বলিয়া এই প্রথমবার নাথপুত্ত আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই, ইতিপূর্ব্বেও তিনি আরো অনেকবার এরূপ করিয়াছেন (১)।" ইহা হইতেই বোঝা যায় যে বুদ্ধ যতটুকু পারিয়াছেন নাথপুত্তকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুত্ত নিপাতের শভিয় সুত্তেও দেখা যায় যে, পরিব্রাজক শভিয় বুদ্ধের নিকট হইতে কয়েকটি প্রশ্নের বিষয় অবগত হন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে একথাও বলেন, যে এই প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিতে পারিবে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণেও তিনি প্রস্তুত আছেন। ইহার পর শভিয় নিগন্থ-নাথপুত্তের সম্মুখে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিতে না পারিয়া প্রশ্নগুলিকে কেবলমাত্র এড়াইয়া চলিবার জন্য শভিয়কে কতকগুলি পাণ্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটা যে মহাবীরকে তাঁহার ভক্তদের ভিতর খর্ব্ব করিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে তাহা বলাই বাহুল্য (২)। মজ্ঝিমনিকায়ে দেখা যায়, বুদ্ধ যখন রাজগৃহের বেণুবনে বাস করিতেছিলেন, অভয়রাজ কুমার সেই সময় নিগন্থ নাথপুত্তের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক উপবেশন করিলে তিনি অভয়রাজ কুমারকে বলিয়াছিলেন, "শ্রমণ গোতমকে যদি তুমি তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পার, তবে তুমি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবে।" অতঃপর তিনি অভয়কে বলেন গোতমের নিকট তুমি প্রশ্ন করিবে, আপনি কি কখনো এরূপ শব্দ ব্যবহার করেন যাহা কর্কশ এবং যাহা কাহারো উপকারে আসে না, প্রশ্ন শুনিয়া গোতম যদি বলেন 'হাঁ করি' তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও 'আপনার সহিত অন্য লোকের প্রভেদ কোথায়?' কিন্তু যদি গোতম উত্তর দেন 'না করি না' তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও আপনার 'আপায়িকো দেবদত্তো, নেরয়িকো দেবদত্তো' এই শব্দগুলি ব্যবহার করিবার অর্থ কি?" ইহার পর এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অভয় গোতমকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং গোতম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিতও হইলেন; অভয় তাহাকে তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করাইয়া নিগন্থ-নাথপুত্তের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধ উত্তর দিলেন "তথাগত যে-কথাই বলেন তাহা সত্য, মিথ্যা-বর্জ্জিত এবং সুমধুর; তিনি এরূপ কথা উচ্চারণ করেন না যাহা মিথ্যা অসত্য এবং তিক্ত। কোনও-কোনও স্থানে ক্ষণকালের জন্য তিনি সত্য এবং মিথ্যা-বর্জ্জিত তিক্ত কথা উচ্চারণ করিয়া থাকেন।" ইহার পর অভয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন (৩)। এই সম্পর্কে জাতকের আরও একটি গল্পের উল্লেখ করা যায়। এই গল্পে নগ্নসন্ন্যাসী নাথপুত্ত বুদ্ধকে রন্ধন করা মৎস্য ভোজন করিতে দিয়া একটি চাল চালিয়াছিলেন। বুদ্ধ মৎস্য ভোজন করিলে নাথপুত্ত তাঁহাকে মৎস্য ভোজনের জন্য অপরাধী করিয়া বলিয়াছিলেন, মন্দ লোকে প্রাণিহত্যা করিয়া এবং তাহা রন্ধন করিয়া খাইতে দিতে পারে, কিন্তু যে ভোজন করে সেও পাপভাগী হয়। বুদ্ধ উত্তরে বলেন, "মন্দলোকে স্ত্রী এবং পুত্র হত্যা করিতে পারে, কিন্তু যে মাংস ভোজন করে সে কোনই অপরাধ

(১) Samyutta Nikaya, (P. T. S.), Pt. IV, p. 317.
(২) Sumangalavilasini, Pt. I, p. 167.
(৩) Majjhima Nikaya Vol. I, p. 238.
(৪) Sumangalavilasini, p. 168
(৫) Majjhima Nikaya, Vol. II, pp. 35-36.
(৬) Sumangalavilasini, (P. T. S.), p. 119.
(৭) Majjhima Nikaya (P. T. S), Pt. I, p. 372, foll.
(৮) Jataka, Vol. V, p. 123.
(৯) Majjhima Nikaya (P. T. S), Pt. I, p 92..
(১০) Vol. I, p. 66.

(১) Jataka (Cowell), Vol. II, p. 182.
(২) S. B. E., Vol. X, Sutta Nipata, pp. 85-86.
(৩) Majjhima Nikaya (P. T. S.), Vol. I, p. 392 ff.

করে না (১)। সংযুক্তনিকায়ে আছে নিগন্থ-নাথপুত্ত যখন মচ্ছিকা-চন্দে বহু শিষ্য ও সেবক দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন তখন গহপতিচিত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব এবং ভদ্রতার অভিবাদন প্রভৃতির আদান-প্রদানের পর নাথপুত্ত গহপতিচিত্তকে বলেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, শ্রমণ গোতম অবিতর্ক এবং অবিকার লাভের মত আত্মসমাহিত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন—বিতর্ক এবং বিকারকে ধ্বংস করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন?' গহপতিচিত্ত উত্তর দিলেন, 'আমি তাহা বিশ্বাস করি, এবং সেই জন্যই আমি তাঁহার নিকট গমন করি নাই।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নিগন্থ নাথপুত্ত তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিলেন, "হে আমার শিষ্য-বৃন্দ, তোমরা দেখ চিত্ত গহপতি কিরূপ সরল—কিরূপ বিনয়ী।" ইহার পর চিত্ত নাথপুত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রদ্ধা এবং জ্ঞান এই দুইটির ভিতর কোন্‌টিকে আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন?" নাথপুত্ত বলিলেন, "উভয়ের ভিতর জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।" চিত্ত কহিলেন "আমি চতুর্ব্বিধ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চাই।" চিত্তের এই কথা শুনিয়া নাথপুত্ত তাহার শিষ্য-বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই চিত্ত গহপতি কি ভয়ানক শঠ এবং মায়াবী।' ইহার পর চিত্ত গহপতির পক্ষে মহাবীরের কথার অসারত্ব উপলব্ধি করা বিশেষ আয়াসসাধ্য হয় নাই। তিনি মহাবীরকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (২)।

মজ্ঝিমনিকায়ে আছে, দীঘ তপস্বী নামক জনৈক জৈন উপালীর সম্পর্কে সমস্ত কথা জানিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, যে, উপালী বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। তিনি উপালীর কথা নিগন্থ-নাথপুত্তকে জ্ঞাপন করেন। তাহাতে নিগন্থ নাথপুত্ত উপালীকে বলেন "উপালী তুমি পাগল হইয়াছে।" উপালী উত্তর দিয়াছিলেন "আমি পাগল হই নাই।" প্রভু বুদ্ধের অনুগ্রহে মুক্তির প্রকৃত পথ আমি জানিতে পারিয়াছি। আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। আপনি আর আমাকে বিপথগামী করিতে পারিবেন না (৩)।" অঙ্গুত্তরনিকায়ে আছে, শীহ মহাবীরের কাছে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। মহাবীর তাঁহাকে বলেন, "তুমি একজন ক্রিয়াবাদী এবং বুদ্ধ অক্রিয়াবাদী। সুতরাং বুদ্ধের নিকট যাওয়া তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে।" ইহার পর শীহ বুদ্ধ-দর্শনের অভিলাষ পরিহার করিয়াছিলেন (৪)। মহাযানের সংস্কৃত গ্রন্থ দিব্যাবদানে আছে, নিগ্রন্থ-নাথ-পুত্র বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতা-প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিনয়-পিটকের চুল্লবগ্গে আছে, রাজগৃহের একজন শেঠ্‌ঠী একখণ্ড অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিল। সে এই চন্দনকাষ্ঠের একটি পানপাত্র নির্ম্মাণ করিয়া প্রথমে তাহা নিজের উপরে রাখিল। তাহার পরে বাঁশের পর বাঁশ বাঁধিয়া তাহার মাথায় পাত্রটি স্থাপন করিয়া ঘোষণা করিল, "যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অরহত হইয়াছেন এবং ইদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি এই পানপাত্রটি যদি পারেন তবে নামাইয়া লইতে পারেন। আমি উহা তাঁহাকেই দান করিলাম।" মহাবীর তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন এবং পানপাত্রটি নামাইয়া লইবার জন্য অনুরুদ্ধও হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সক্ষম হন নাই (১)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, মহাবীর এবং বুদ্ধ উভয়েই উভয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং নিজেদের শিষ্য-সেবকদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে এ-কথাও বেশ বোঝা যায় যে, মহাবীর বুদ্ধের কাছে অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে মহাবীরের অনেক শিষ্যও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এগুলি যে বুদ্ধের অসাধারণ প্রভাবের ফল তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গ্রীকেরা পশ্চিম ভারতের অনেকটা অংশই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। মিলিন্দ পঞ্‌হের একটি বিবরণ হইতে জানা যায় এই সময়ে নিগন্থ নামে নাথপুত্ত ভারতীয় গ্রীকদের ভিতর প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন (২)। পাঁচ শত গ্রীক রাজা মিলিন্দকে (Menander) নিগন্থ-নাথ-পুত্তের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কাছে নিজের সমস্যাগুলির উত্থাপন করিতে এবং সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আসিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মজ্ঝিমনিকায় হইতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, নিগন্থ-নাথ-পুত্ত কূটতর্ক-যুদ্ধে বিশেষভাবেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই কূট তর্কে অঙ্গ এবং মগধ একেবারে পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল (৩)।

মহাবীরের পর জ্যাত্রিকদের সম্পর্কে মহাবীরের ভক্তদের সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। এই ভক্তদের কয়েকজনের নাম ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। মহাবীরের শিষ্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না এবং তাঁহারা উপদেষ্টা হইয়াছিলেন বহু লোকের (৪)।

মহাবীরের প্রথম শিষ্য ছিলেন গোতম ইন্দ্রভূতি। তিনি পরে একজন 'কেবলী' হইয়াছিলেন। তাঁহাকে উপদেশ দেওয়ার পর মহাবীরও বুদ্ধের ন্যায় ধনী এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছেই ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। মিসেস্ সিন্‌ক্লেয়ার্ ষ্টিভেন্‌সন্ বলেন, মহাবীরের আধুনিক ভক্তের দল যদিও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেই বেশী, তথাপি গোড়ায় সম্ভবতঃ ছোটখাট রাজ-রাজড়াই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (৫)। গোতম ইন্দ্রভূতি জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এইরূপ একটি মত আছে। লালা বেনারসী দাস জৈন-ধর্ম্ম-সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে তিনি এই মতকে খণ্ডন করিয়াছেন।

সুধর্ম্ম মহাবীরের আর-একজন শিষ্য। মহাবীরের নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণের পূর্ব্বে প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সে গৃহস্থ ছিল এবং তাহার পর প্রায় ৩০ বৎসরকাল সে মহাবীরকে অনুসরণ করিয়া কাটাইয়াছে (৬)।

জৈন ভগবতী সূত্রে পাওয়া যায়, নালন্দাতে মহাবীরের গোশাল নামে একজন শিষ্য ছিল। তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে ছয় বৎসর কাটাইয়াছেন, কিন্তু পরে মতের অনৈক্য হওয়ায় তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি

---

(১) Jataka, Vol. II, p. 182.

(২) Samyutta Nikaya (P. T. S.), Vol. II, p. 297 foll.

(৩) Majjhima Nikaya, Vol. I, pp. 371 foll.

(৪) Anguttara Nikaya, Vol. IV, p. 180.

(১) Vinaya Texts, S. B. E., Pt. III, p. 78 foll.

(২) The Questions of Milinda, S. B. E., Vol. XXXV, p. 8.

(৩) Majjhima Nikaya, Vol. II, (P. T. S.), p. 2.

(৪) Rockhill, Life of the Buddha, p. 96.

(৫) Mrs. S. Stevenson, Heart of Jainism, p. 40.

(৬) Mrs. S. Stevenson, Heart of Jainism, p. 64.

হইয়াছিল। উক্ত সূত্রেই একথারও উল্লেখ আছে যে, মহাবীর গোশালের সহিত পণির ভূমিতে ছয় বৎসর কাল একসঙ্গে বসবাস করিয়াছেন (১)।

মিসেস্ সিন্‌ক্লেয়ার্ ষ্টিভেন্‌সন্ বলেন, দিগম্বরদের মতে মহাবীর যখন নগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেন, যখন তাঁহার গৃহ ছিল না এবং যখন তিনি মৌনব্রত সম্পূর্ণভাবে পালন করিয়া চলিতেছিলেন, তখনই গোশালের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ছয় বৎসর সে মহাবীরের শিষ্যত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল এবং তার পর সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীরা সহজে যেসব পাপে লিপ্ত হয়, সেইসব অতি গর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়াছিল (২)।

(১) Uvasagadasao, p. 111.
(২) Heart of Jainism, p. 36.

মহাবীরের আর একজন শিষ্যের নাম আনন্দ। উবাসগদসাও গ্রন্থে দেখা যায় যে, গৃহস্থ আনন্দ স্বীকার করিতেছেন, মহাবীর যে জাতির ভিতর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই নায় জাতির ভিতরেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন (১)। এই গ্রন্থেই আছে যে, আনন্দ কোনও গুপ্ত স্থানে চারি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং রাজা-যুবরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বণিক্ পর্য্যন্ত সবলেই অর্থ-ঘটিত ব্যাপারে কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার এক পতিব্রতা পত্নী ছিল—তাঁহার নাম সীবনন্দা। আনন্দ মহাবীরের অত্যন্ত গোঁড়া ভক্ত ছিলেন (২)।

(১) Uvasagadasao, Vol. II, Tr.. p. 45.
(২) Ibid.. pp. 7—9.

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা

শ্রী প্রভাত সান্যাল

হিন্দুজাতির আদিগ্রন্থ বেদ। এই বেদের শাখাসমূহ যাঁহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, সেই আর্য্যজাতি হিন্দু সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এইরূপ একটি ধারণা আমাদের দেশে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ ভারতের সুসভ্য তামিল· তেলুগু ও কানাড়ী জাতির ভাষাগুলি মূলতঃ আর্য্য ভাষা হইতে বিভিন্ন,—যদিও এই দ্রাবিড়ভাষী জাতি আধুনিক কালে আর্য্যধর্ম্ম এবং আর্য্যভাষা সংস্কৃতে লিখিত শাস্ত্র পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে। দ্রাবিড় ভিন্ন এ-দেশে আরও অন্য অনার্য্য-ভাষী জাতির পরিচয় আমরা আরও বিশেষ করিয়া পাইতে লাগিলাম।

মোহেঞ্জদড়োর খননকারীর দল

মধ্যে যে-ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাই হইতেছে এদেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের ধারণা। কিন্তু তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চার ফলে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতের আর্য্যজাতির ভাষার—সংস্কৃতের—বহু আত্মীয়ের সন্ধান মিলিল এবং আরও দেখা গেল যে, দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়-সঙ্গ দেখা গেল যে, ভারতের সভ্যতার ও ইতিহাসের মূলে দুই শ্রেণীর জাতির অস্তিত্ব আছে—প্রথম আর্য্য এবং দ্বিতীয় অনার্য্য।

আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শব্দের জাতিবাচক প্রয়োগ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতেই ঘটিয়াছে। ভারতের প্রাচীন যাহা-কিছু পুস্তক, সমস্তই আর্য্যদের ভাষায় লেখা; ভারতের আর্য্যদিগের জাতি আধুনিক
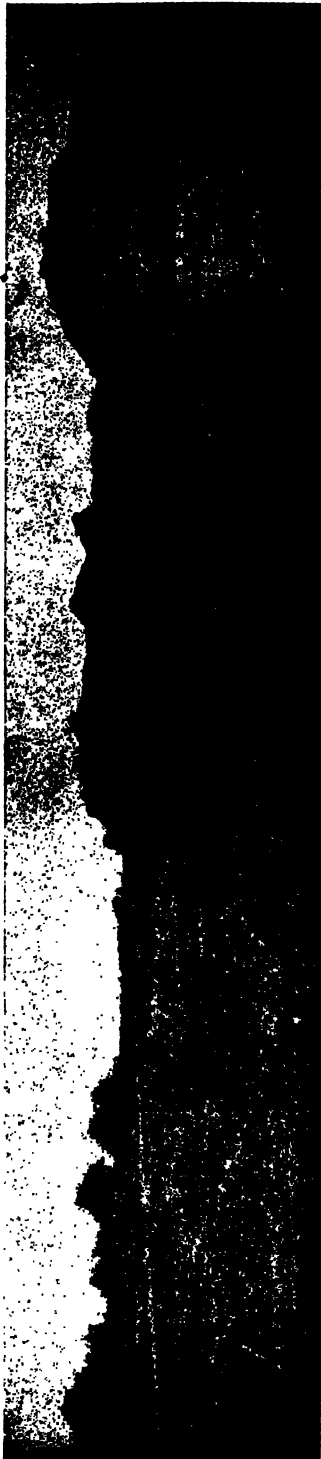
প্রাচীন নদীগর্ভে দ্বীপাবলী—১৯২২-২৩ সালে মোহেঞ্জোদড়োয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক খনিত

ইউরোপীয়েরা সভ্যতায় ও মানসিক উৎকর্ষে পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। এই দুই কারণে স্বতঃই ভারতবর্ষেও আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও ভারতীয় সভ্যতা-পত্তনে তাহাদিগের একমাত্র কৃতিত্ব সকলেই নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইল। কিন্তু আরও গভীর অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতে লাগিল যে, এমন অনেক জিনিষ হিন্দু চিন্তায় ও হিন্দু সভ্যতায় আছে, যাহা মোটেই প্রাচীনতম কালের আর্য্যদের, যে আর্য্যদের কথা আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই, তাহাদের সঙ্গে মেলে না।

আর্য্যেতর যাহা-কিছু তাহাই বর্ব্বর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, অনার্য্যদের কোনপ্রকার সভ্যতা ছিল না—এইরূপ ধারণার বিরোধী কতকগুলি বিষয় আমাদের চোখের সম্মুখে গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আসিয়া পড়িতেছে। দ্রাবিড় ভাষার ধাতু ও শব্দ অনুশীলন করিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মত প্রকাশ করিলেন যে, দ্রাবিড়দের নিজস্ব একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল যাহার সহিত আর্য্য সভ্যতার অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। আর্য্যেরা যে সভ্যতা লইয়া এবং যে-রীতিনীতি লইয়া ভারতে আসেন, তাহার নিদর্শন আমরা কতকটা বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাই। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার প্রাচীন বিশুদ্ধি আর বজায় রহিল না; আর্য্যদিগের পূর্ব্বে এদেশে যাহারা বাস করিত,সেইসমস্ত অনার্য্যদের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া উভয়ের মধ্যে একটি মিশ্রণ ঘটিল এবং সেই মিশ্রণের ফল হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু আচার-ব্যবহার এবং হিন্দু চিন্তা-প্রণালী। আর্য্যদের ভাষার প্রসারের জোরে এই-সভ্যতার বাহিরের ছাঁচ আর্য্যই রহিল, কিন্তু ইহার অনেক বস্তু আদিম আর্য্যজাতির অজ্ঞাত, কাজেই, ইহার কাঠামোটি বহু বিষয়ে অনার্য্য রহিল।

আর্য্য জাতি এদেশে তাঁহাদের সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাঁহাদের উপাস্য দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, পর্জ্জন্য, অশ্বি-দ্বয়, উষা। প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিকে মহীয়ান্ নর বা নারী রূপে কল্পনা করিয়া এই সকল দেবতা। আর্য্যেরা পশুর মাংস, ঘৃত,সোম,পুরোডাশ প্রভৃতি অগ্নিতে অর্পণ করিয়া এইসকল দেবতার অর্চ্চনা করিতেন। দেবতাদের আবাস-স্থান ছিল আকাশে—অগ্নি তাঁহাদের দূত হইয়া এইসকল উপহার তাঁহাদের নিকট লইয়া যাইতেন। এই অনুষ্ঠানের নাম "হোম"। কিন্তু হিন্দু-সমাজে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় তাহা হইতেছে "পূজা"। পূজায় দেবতার মূর্ত্তি বা যন্ত্র উপাসকের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সেই মূর্ত্তিকে প্রাণযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে মানুষের উপভোগ্য বস্তু, স্নান এবং প্রক্ষালণের জল, পুষ্প, ফল, মূল, পত্র, তণ্ডুল, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি তাঁহার সেবার্থ দেওয়া হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান বৈদিক জগতে অজ্ঞাত। আধুনিক হিন্দু সমাজে যে সকল দেবতা পূজা পাইতেছেন, যথা—শিব, উমা, বিষ্ণু,পার্ব্বতী লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি—তাঁহাদের অনেকের প্রকৃতি এমন কি নাম পর্য্যন্ত বৈদিক সাহিত্যে অজ্ঞাত। পূজা মূলতঃ আর্য্য-জগতের ব্যাপার নহে। শব্দটি আর্য্য ভাষার শব্দ নহে, বরং ইহা দ্রাবিড় ভাষারই শব্দ বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। ফলতঃ পূজার প্রধান অনুষ্ঠান—হোম হইতেছে পশুকর্ম্ম"—এবং পূজাকে "পুষ্পকর্ম্ম" নামে অভিহিত করা যায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, পূজ্ ধাতু বা পূজা শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন আর্য্য ভাষায় মেলে না। কিন্তু পু দ্রাবিড় ভাষাতেও ফুল অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং দ্রাবিড়ে পু ধাতু+চেয়্=ফুল+কৃ="পুষ্পকর্ম্ম"। বহু বহু শব্দ ও অনুষ্ঠানের ন্যায় অনার্য্যদের নিকট হইতেই এই অনুষ্ঠানও গৃহীত হইয়াছিল। এই একটি উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের সভ্যতায় হিন্দুর আনুষ্ঠানিক সৃষ্টিতে অনার্য্যের প্রভাব খুবই বেশী।

আদি আর্য্য জাতির সম্বন্ধে আধুনিক রীতিসঙ্গত আলোচনা করিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে এই জাতি ভারতের বাহিরে খুব সম্ভব পশ্চিম রুশ-দেশে বা মধ্য ইউরোপে বাস করিত। যে-সময় মিশর, ব্যাবিলন ও এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ উচ্চ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই

সময় আদি আর্য্যগণ একপ্রকার বর্ব্বর অবস্থাতেই ছিল। সভ্যতার সমস্ত অঙ্গই ইহারা আপনাদিগের পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিবার পর দক্ষিণে আগমন করিয়াই শিক্ষা করে। ইহাদের ভারতে আগমন কখন হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। কোনো কোনো মতে খৃষ্ট-জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, কোনো মতে মাত্র খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। ইহাদের আগমনের পথ-সম্বন্ধেও সেইরূপ মতভেদ আছে। স্কুলপাঠ্য বইএ আমরা পড়িয়া থাকি যে, ইহারা মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখন এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ার নানা প্রাচীন লেখা হইতে অনুমান হইতেছে যে, খুব সম্ভব তাহারা ঐ সব দেশ হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু যখনই বা যেদিক্ দিয়াই আসুক ইহাদের আগমন যে ভারতবর্ষের দ্রাবিড়দের ঢের পরে ঘটে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আর্য্যজাতির উৎপত্তি এবং তাহাদের ভারতবর্ষের বাহিরের অবস্থা আর এখন রহস্য-জালে আবৃত নহে।

বেলুচিস্তানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবরে প্রাপ্ত চিত্রিত চক্‌চকে শিকায়-ঝুলাইবার পাত্রাদি

ভারতে দ্রাবিড় ভিন্ন আর দুইপ্রকার অনার্য্য জাতি আজকাল পাওয়া যায়:—প্রথম কোল, দ্বিতীয় মোঙ্গল বা ভোট-ব্রহ্ম (Tibeto-Burmans)। শেষোক্ত জাতি হিমালয় অঞ্চলে, নেপালে, ভুটানে, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ সীমান্তে, আসামে ও ব্রহ্মদেশে বাস করে। ইহাদের আগমন হিন্দু-সভ্যতা-সৃষ্টির পরে ঘটে। ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসে ইহাদের স্থান নাই। কোল জাতি ও কোল ভাষা এখন ছোটনাগপুর, মধ্যভারত ও উড়িষ্যায় পাওয়া যায়। কোলভাষীরা সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত। কিন্তু এক সময়ে যে কোল ভাষা সমস্ত উত্তর ভারতময়—হিমালয় হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত—বিস্তৃত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই কোল জাতি হয় ত বা ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন অধিবাসী ছিল। ইহাদের জ্ঞাতি নানাজাতি এখনও ব্রহ্মদেশে, শ্যামে, কাম্বোজে বাস করে। কোলভাষীরা সকলেই উত্তর ভারতে আর্য্যভাষা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু সভ্যতার বিকাশে কোলের আহৃত উপাদানও যে যথেষ্ট-পরিমাণে ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ (যেমন কদলী, কম্বল, শর্করা, লাঙ্গল, তাম্বুল প্রভৃতি) কোলদের ভাষা হইতে লওয়া। কোলদের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি হইতেছে মালয়বাসী জাতি। আর্য্যেরা আসিবার পূর্ব্বে ভারতের কোলেরাই জাহাজে ব্রহ্মদেশে, শ্যামদেশে, কাম্বোজে ও মালয়-দ্বীপপুঞ্জে গতায়াত করিত। এই সাগরপথে গমনাগমন তাহারা আর্য্যভাষা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

কোলদের অপেক্ষা দ্রাবিড়েরা আরও বেশী উন্নত ছিল বলিয়া মনে

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

হয়। উত্তর ভারতেও প্রচুর-পরিমাণে দ্রাবিড়ভাষী জাতি বাস করিত। হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর ভারতের ভাষায় যে দ্রাবিড়দের ছাঁচ বিদ্যমান আছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দু সভ্যতার সৃষ্টি করিতে দ্রাবিড়দের আহৃত উপাদান আর্য্যদের অপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু এই দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে

হারাপ্পায় প্রাপ্ত প্রাচীন ভারতীয় নারীদের কাচের বালা

আমাদের কিছুই জানা নাই। এই জাতির উৎপত্তি কোথায়, ভারতের বাহিরের আর কোনো জাতির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে কি না, এই কথাটিই হইতেছে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জটিলতম সমস্যা। এই সমস্যা এতদিন কেহ পূরণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ আদিম দ্রাবিড়েরা নিজেদের কথা নিজেরা কিছুই বলিয়া যাইতে পারে নাই—আর্য্যেরা আসিবার পূর্ব্বে এবং তাহাদের আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেকার অবস্থার কোন পুস্তকাদি তাহারা রাখিয়া যায় নাই।

সম্প্রতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে কতকগুলি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারা মনে হইতেছে যেন

বেলুচিস্তানের প্রাচীন সমাধিতে প্রাপ্ত মদ ঠাণ্ডা করিবার জালা

মোহেঞ্জদড়োর ১নং মন্দিরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইষ্টক-কবর—মধ্যে মৃতদেহ যথোচিতভাবে শায়িত রহিয়াছে

এই সমস্যার সমাধান হইবে। ভারতের সভ্যতা খুব প্রাচীন কিন্তু এতাবৎ কাল আমরা মৌর্য্যযুগের (আনুমানিক ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দ) পূর্ব্বেকার কিছু নিদর্শন—যথা শিলা বা অন্য আধারে লিখিত লিপি,

সিন্ধুদেশে খনিত ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ছোট ছোট মাটির পাত্র

মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা ও উৎকীর্ণ মূর্ত্তি প্রভৃতি পাই নাই। ওদিকে মিশর-ব্যাবিলনের প্রাচীন যুগের ইমারত, মূর্ত্তি প্রভৃতি খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের ও তাহার পূর্ব্বের কালেরও পাওয়া গিয়াছে। মৌর্য্যযুগের যে নিদর্শন আমরা পাই, তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন হিন্দু সভ্যতা বেশ সুগঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বের কালের নিদর্শন-হিসাবে আমরা এতদিন যাহা মাটি খুঁড়িয়া পাইয়াছি, সেগুলি সভ্যযুগের নহে—বর্ব্বর বা অর্দ্ধসভ্য যুগের জিনিষ—যে যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত।

১৯০২-৩ সালে দক্ষিণভারতের তিনেভেলী জেলায় আদিত্যানল্লুর নামে একটি স্থানে কয়েকটি প্রাচীন সমাধি হইতে কতকগুলি জিনিষ বাহির হয়, যদ্দ্বারা প্রাচীনকালের একটি উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় আমরা পাই। এই সমাধিগুলিতে দেখা যায় যে, পোড়ামাটির নির্ম্মিত সিন্দুকের মতো শবাধারে মৃত-দেহকে হাঁটু মুড়িয়া বুকের কাছে আনিয়া প্রোথিত করা হইত ও সঙ্গে সঙ্গে মৃতের আত্মার ব্যবহারের জন্য ব্রোঞ্জ ধাতুতে তৈয়ারী পাত্রে করিয়া আহার্য্য, পেয়, বস্ত্র ও সোনার গহনা প্রভৃতি রাখা হইত। সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মৃদ্‌ভাণ্ডও পাওয়া গিয়াছে—আর পাওয়া গিয়াছে লোহার অস্ত্র। আদিত্যানল্লুরের মৃতদেহের করোটি মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা সাধারণ দ্রাবিড় করোটিরই মতো। এই যুক্তিতে আদিত্যানল্লুরের সভ্যতাকে প্রাক্ আর্য্য দ্রাবিড়-দেরই সভ্যতা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এই নিয়মে শব-সৎকার বিধি ভারতবর্ষের বাহিরে মেসোপটেমিয়ায়, এশিয়া
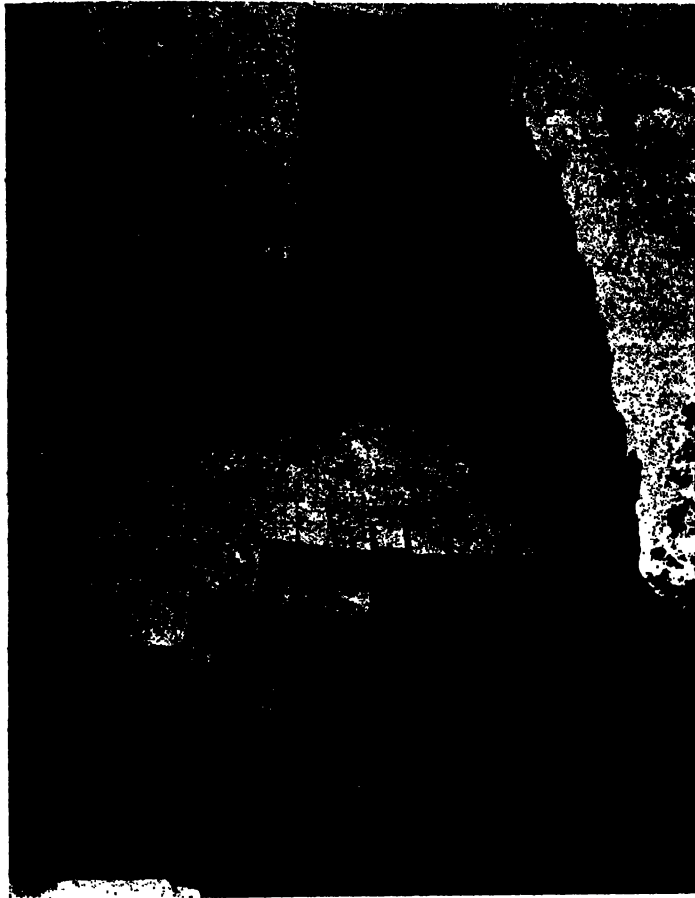
মোহেঞ্জদড়োর একটি মন্দিরাবশেষ ; মেঝে ও নর্দ্দমা মসৃণ ইঁটে তৈরী ;—উরের মন্দিরের সাদৃশ
(পৃঃ ৩৮ প্রদর্শিত)

মাইনরে, ক্রীট্‌দ্বীপে ও সাইপ্রাস্ দ্বীপে পাওয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, কোনো কোনো বিষয়ে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার সহিত সাদৃশ্য বা যোগ আছে। এই সভ্যতা লোহার অস্ত্র ব্যবহারের প্রথম যুগের সভ্যতা।

গত ১৯২৩ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিন্ধুদেশে লারকানা জেলায় সিন্ধুনদীর একটি মরাখাতের পার্শ্বে অবস্থিত মোহেঞ্জদড়ো নামক স্থানে একটি প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন যুগের নিদর্শন পাইয়াছেন এবং সেই নিদর্শন যে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ পাঞ্জাবের মণ্টগমেরি জেলায় হারাপ্পা নামক স্থানে রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী কর্ত্তৃক মোহেঞ্জদড়োর আবিষ্কৃত বস্তুগুলির অনুরূপই বহু প্রাচীন জিনিষ বাহির হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত বস্তুগুলি সুসভ্য জাতির তৈয়ারী জিনিষ। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন একবার খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক হইতে চতুর্থ সহস্রকে গিয়া পৌছিল।

যে-জাতির মধ্যে এই সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহারা কাহারা ?

হারাপ্পায় অটুট অবস্থায় প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রিত পাত্র

বিলাতের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক এই সভ্যতার সঙ্গে ব্যাবিলনের প্রাচীনতম সভ্যতার আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে প্রাচীন সুসভ্য এজিয়ান্ সাগর-অঞ্চলের ক্রীট্‌দ্বীপের আদিম অধিবাসী-দিগের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সভ্যতা যে অপরন্ত এই সভ্যতা যে দ্রাবিড়জাতির সভ্যতা ছিল, সে-পক্ষে প্রবল যুক্তি রহিয়াছে। বেলুচিস্থানে দ্রাবিড়ভাষী ব্রাহুই জাতি এখনও বাস করে এবং সেখানে এই সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। যখন আর্য্যেরা ভারতে প্রথম প্রবেশ করে, তখন সিন্ধু ও দক্ষিণ পাঞ্জাবে ও বেলুচিস্থানে

মোহেঞ্জদড়োয় প্রাপ্ত ছোট-ছোট প্রাচীন ভারতীয় শবানুষঙ্গী পাত্রাদি উর হইতে প্রাপ্ত নীচেকার পাত্রগুলির সঙ্গে অনেকাংশে সাদৃশ্যবিশিষ্ট
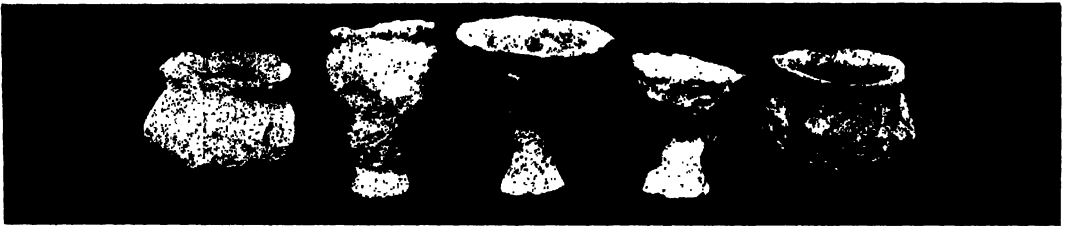
২৩০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের উর হইতে প্রাপ্ত কালদীয়দের শবানুষঙ্গী ছোট-ছোট পাত্রাদি—উপরের ভারতীয় পাত্রগুলির সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্যবিশিষ্ট
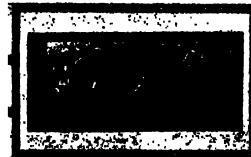
সুমেরীয় বৃষ-অঙ্কন যুক্ত দুইটি নল-মুদ্রা। ইহার সহিত নীচেকার ভারতীয় বৃষ-মূর্ত্তি মিলাইয়া দেখুন

ভারতীয় ধরণের ২০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের বৃষের গলসমন্বিত ব্যাবিলনীয় মুদ্রা

টেল এলওবায়িড হইতে প্রাপ্ত বৃষমূর্ত্তির মুদ্রা—৩০০০ খৃ: পূ
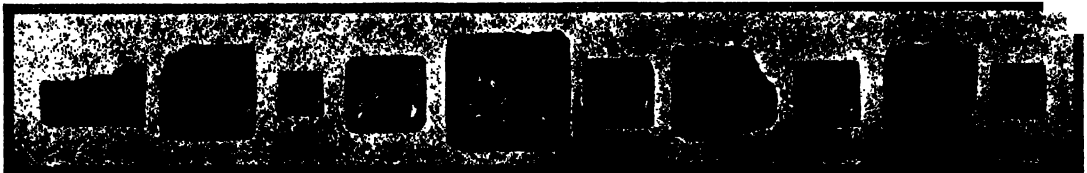
হারাপ্পা ও মোহেঞ্জদড়োয় প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় মুদ্রা—উপরের সুমেরীয় মুদ্রাগুলির সহিত মিলাইয়া দেখুন

আর্য্যজাতির সভ্যতা নয় তাহার সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রধান যুক্তি হইতেছে শব-সৎকার বিধি। শবদেহের হাঁটু বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে প্রোথিত করা আর্য্যদের প্রথা নয়, কারণ আর্য্যদের প্রথা ছিল শবদাহ করা।

এই দ্রাবিড়ভাষী জাতি বাস করিত। ইহাদের অবস্থান আর্য্যদের সিন্ধুনদ বাহিয়া সিন্ধুপ্রদেশে আগমনের অন্তরায় হইয়াছিল, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যদের অভিযান পাঞ্জাবের দক্ষিণ দিকে হয় নাই, পূর্ব্বদিকেই হইয়াছিল। পরে এই দ্রাবিড় জাতি তাহাদের
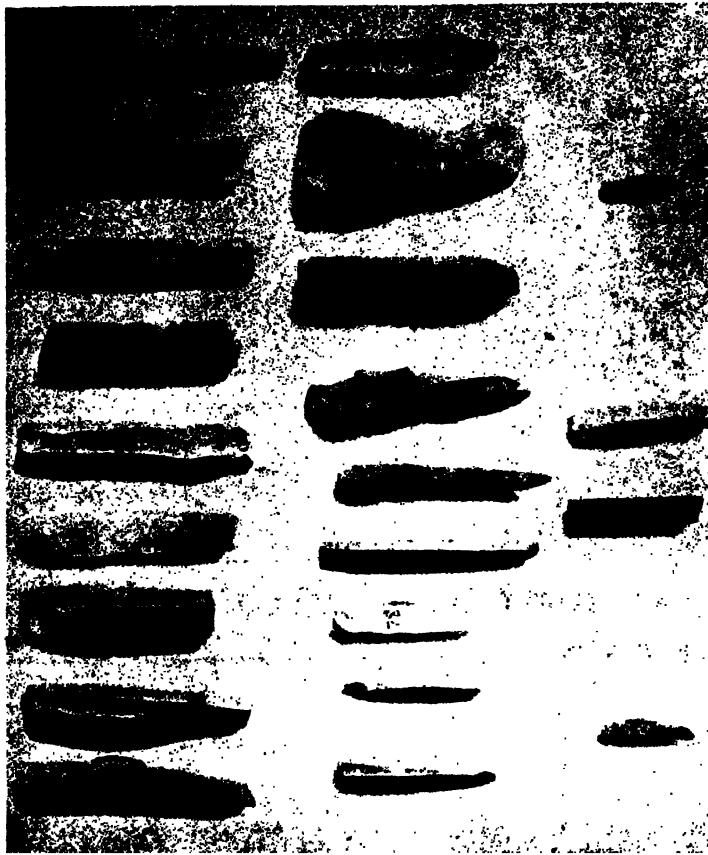
প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয়দের ব্যবহৃত হাতিয়ার ; মোহেঞ্জদড়োর খননে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ইমারৎগুলিতে প্রাপ্ত ; এইসব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোনো লৌহযন্ত্র পাওয়া যায় নাই

উত্তর ভারতের অন্যান্য জাতিদের ন্যায় আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উত্তর ভারতের হিন্দুজাতিতে পরিণত হয়। ব্যাবিলনের সভ্যতার আদিপত্তনকারী সুমেরীয় জাতির সহিত এই আবিষ্কারের ফলে ভারতের দ্রাবিড়দের একটা যোগ বাহির হইল। ইহাও সম্ভব যে, পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরের ক্রীটীয় জাতির সহিতও দ্রাবিড়দের কোনো-না-কোনো যোগ বা সম্বন্ধ ছিল। হয়ত বা ব্যাবিলনের সুমের জাতি ভারতের দ্রাবিড় জাতিরই জ্ঞাতি বা শাখা। ইহা যদি হয়, তাহা হইলে ফল এই দাঁড়ায় যে, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার গুরুর আর-একটি জড় যে,দ্রাবিড়জাতি ছিল ইহা মানিয়া লইতে হয়। কারণ সুমেরের সৃষ্ট ব্যাবিলনের সভ্যতার ভিত্তির উপর পশ্চিম এশিয়ার ও গ্রীসের সভ্যতা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধানতঃ গ্রীক্ সভ্যতারই বিকাশে আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতা।

ইহা ইহাতেই বুঝা যাইবে যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত দয়ারাম সহানী ও তাঁহাদের অন্যান্য সহকর্ম্মীর আবিষ্কার এবং তাঁহাদের সেই আবিষ্কারের গুরুত্বের উপলব্ধি মানবের প্রাচীন ইতিহাসের এক লুপ্ত অধ্যায় বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার বিষয়ে কতটা উপযোগী হইয়াছে। নানাদেশের পণ্ডিতেরা এখন এইসব বিষয় লইয়া জল্পনা করিতেছেন ও করিবেন। আশা করা যায় আরও অনুসন্ধানের ফলে নূতন তথ্য ও নূতন বস্তু আরও অনেক বাহির হইবে এবং আমরা ভারতের ইতিহাস-সম্বন্ধে যথার্থ তথ্যটি ক্রমে জানিতে পারিব। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কৃতিত্বের আভাস দিয়ে দেওয়া গেল।*

ইতিহাসের ছাত্রগণ জানেন যে মহাবীর আলেকজান্দার ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে পাথরের বারোটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রীক্ ও ভারতীয় ভাষায় তাঁহার বিজয়-লিপি খোদিত করাইয়াছিলেন। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক অনেকবার ইহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিফল হইয়াছেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পশ্চিম মণ্ডলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৮ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণ পঞ্জাব, বিকানীর, ভাওয়ালপুর এবং সিন্ধুদেশের অতি পুরানো বুজিয়া-

* প্রবন্ধের এই পর্য্যন্ত অংশটি অধ্যাপক ডক্টর্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের সারাংশ।

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ধ্বংসাবশেষ ; বিভিন্নযুগের প্রাচীরসমূহ

সিন্ধুনদীর দক্ষিণ তীরস্থ ধ্বংসাবশেষগুলি খনন-কালে শ্রীযুক্ত রাখাল-বাবু অনেকগুলি নব প্রস্তর-যুগের ছুরী ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। এই সঙ্গে তিনি নানাপ্রকার মৃন্ময় পাত্রও দেখিতে পান। এইরূপ পাত্র ইহার পূর্ব্বে ভারতে কুত্রাপিও পাওয়া যায় নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মোহেঞ্জদড়োর ধ্বংসাবশেষের একটি পরিমাপ গ্রহণ করা হয়। এই পরিমাপের ফলে নির্দ্ধারিত হয় যে, এই প্রাচীন সহরটি প্রায় ৭৫০ একর জমির উপর অবস্থিত ছিল এবং বর্ত্তমানে ইহার ধ্বংসাবশেষ ২০০ একরের অধিক জমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মোহেঞ্জদড়োর ধ্বংসস্তূপটির সন্নিকটস্থ ঝাউ-বন দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে এই স্থান দিয়া সিন্ধুনদ প্রবাহিত ছিল। নদীর মধ্যে দ্বীপের ন্যায় ছোট-বড় চড়া ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এইপ্রকার দুইটি সুবৃহৎ চড়ার উপর এই গৌরবমণ্ডিত নগরের দুইটি প্রধান দেব-মন্দির অবস্থিত ছিল। সহরের এই অংশে একটি সুবৃহৎ ইষ্টকমণ্ডিত রাজপথেরও নিদর্শন আছে।

যাওয়া খালগুলির ধার দিয়া অনুসন্ধান করিতে-করিতে অগ্রসর হন। তিনি অনুসন্ধান-কালে বর্ত্তমান ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্তানের সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত খিরদার পর্ব্বতমালা, এই ভূখণ্ডের মধ্যে সিন্ধুনদের ১৮টি বিভিন্ন গতিপথ ও তাহাদের তটদেশে ২৭টি বৃহৎ ও ৫৩টি ছোট-ছোট সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মোহেঞ্জদড়ো (মহা অন্ধকারময় ভিটা) ধ্বংসস্তূপ খনন করিতে প্রবৃত্ত হন।

এই চোরাবালি-ভরা মরুদেশ লোকালয় হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে সাত আট দিনের পথ। সে-দেশের জল চিরতা-ভিজানো জলের মতন তিক্ত—তাহাও আবার বছরের মধ্যে ছয় মাস পাওয়া যায় না। সে-দেশে খাদ্যদ্রব্যও কিছু পাওয়া যায় না। *

এই সহরের ধ্বংসাবশেষের আয়তন প্রায় ২৫০ একর। যদিও অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্তূপটির সন্ধান পান, তথাপি এই স্তূপটির ইষ্টকগুলির সহিত ভারতীয় পূর্ত্তবিভাগের নির্ম্মিত ইষ্টকগুলির সাদৃশ্য থাকায় এটিকে আধুনিক মনে করিয়া কেহই ইহার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন নাই; এমন কি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে একজন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক (ডি, আর, ভাণ্ডারকার) এই স্তূপটিকে মাত্র ২০০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

খননের পূর্ব্বে প্রথম দ্বীপের উপরকার ১ নং মন্দির—খৃষ্টপর ২য় শতাব্দের বৌদ্ধস্তূপ

দ্বীপের চারিদিকে বাঁধানো ঘাটের চিহ্ন আজও লুপ্ত হয় নাই। একটি ঘাটের নিকটে ৪০।৫০ ফুট উচ্চ একটি স্তূপ আছে, রাখাল-বাবু অনুমান করেন যে, এইটিই রাজপ্রাসাদ ছিল। পুরাতন সিন্ধুনদের গর্ভস্থিত চড়ার উপর সে-দেশের লোকেরা মঠাদি নির্ম্মাণ করিত। এই প্রথাটি সিন্ধুদেশের একটি বিশেষত্ব। সুক্কুরের সেতুর নিকটে এইরূপ একটি মন্দির সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে।

* সুখের বিষয় বর্ত্তমানে সিন্ধুরা-সাহাদকোট-লার্‌কানা রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় এই অঞ্চলে যাতায়াতের পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে।

মোহেঞ্জদড়োর পাদ-দেশ বিধৌতকারী সিন্ধু-নদের গর্ভে চারিটি বড় চড়া ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি আবার অন্য তিনটি অপেক্ষা বড় ছিল। এই দ্বীপটির উপরে সিন্ধুবাসীদের একটি বৃহৎ মন্দির অবস্থিত ছিল। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি বৌদ্ধ স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই স্তূপটি খরোষ্ঠী অক্ষরের লিপি ও চিত্রলিপি দ্বারা সুশোভিত ছিল। এই স্তূপের নীচে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভস্মাচ্ছাদিত অনেকগুলি মর্ম্মরমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। ভস্মস্তূপের নীচে একটি পাত্রে হাজারেরও অধিক নূতন ধরণের তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলির সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আবিষ্কৃত কার্ষাপণ বা কাহাপণের কোন সাদৃশ্য নাই। কতকগুলি মুদ্রার উপরে প্রাচীন অগ্নিবেদী অঙ্কিত রহিয়াছে। স্তূপের যে-স্তরে এই তাম্র-মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হয়, তাহার আর-এক স্তর নিয়ে সুদৃশ্য ও নূতন-ধরণের চক্‌চকে একপ্রকার মৃন্ময় পাত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মোহেঞ্জদড়োতে আয়তক্ষেত্রাকৃতি আড়াই ইঞ্চি লম্বা একপ্রকার তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার উপরকার উৎকীর্ণ লিপি পণ্ডিত দয়ারাম কর্ত্তৃক হারাপ্পার-প্রাপ্ত শীলমোহরগুলির

হারাপ্পার খুঁড়িয়া বাহির করা জায়গা

খুঁড়িয়া বাহির করা অবস্থায় মোহেঞ্জদড়োর প্রথম দ্বীপের উপরকার ২ নং দেবমন্দির—"পবিত্র-অগ্নি-মন্দির"

মুদ্রা হইতে অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীযুক্ত রাখাল-বাবু ও পণ্ডিত সাহানীর আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলিই জগতের প্রাচীনতম মুদ্রা।

মোহেঞ্জদড়োর ধ্বংসস্তূপে আবিষ্কৃত কবর-গুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবরগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তখন ইষ্টকনির্ম্মিত কক্ষে শবাধার স্থাপন করা হইত। মোহেঞ্জদড়োর বৃহত্তম দ্বীপটির বৌদ্ধ মঠের সান্নিধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রেণীর একটি কবর আবিষ্কার করেন। শবের কঙ্কালটি সম্পূর্ণ ছিল। মৃত দেহটি শবাধারের মধ্যে হাঁটু মোড়া দিয়া সঙ্কুচিত করিয়া বসানো হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিকযুগে ব্যাবিলনে ও মিশরে এইভাবে শবদেহ স্থাপন করা হইত। আর-এক শ্রেণীর কবরে মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নানা-প্রকার উপহার প্রদান করা হইত। শবদেহটি একটি আয়তক্ষেত্রাকৃতি সিন্দুকে রক্ষিত হইত। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর শবাধার বহু প্রাচীনকাল হইতে মাদ্রাজ প্রদেশের আরকোট ও সালেম জেলায়, সিন্ধুদেশে, ব্যাবিলনে ব্যবহার হইত। কবরে মৃতের

গাত্রে অঙ্কিত লেখার অনুরূপ। এপর্য্যন্ত যত মুদ্রার আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে লিডিয়া-রাজ ক্রীসাসের স্বর্ণমুদ্রাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মোহেঞ্জদড়ো ও হারাপ্পাতে আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি লিডিয়ার রাজার প্রবর্ত্তিত

জন্য রক্ষিত সুন্দর-সুন্দর চিত্রিত আধার পাওয়া গিয়াছে। এই আধার-গুলি চীনদেশের ধব্‌ধবে সাদা ডিমের খোলার পাত্রের ন্যায় কারুকার্য্য-খচিত। অন্যান্য রঙের চিত্রিত পাত্রও কবরে দেখা গিয়াছে। মেজর
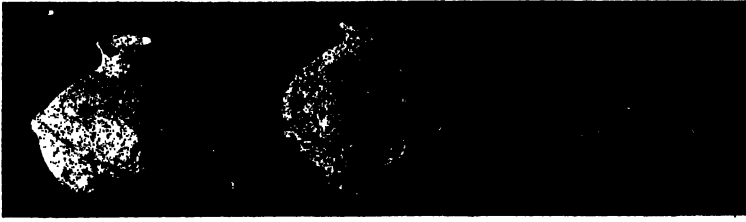
বেলুচিস্তানের প্রাগৈতিহাসিক কালের কবরে প্রাপ্ত শিকার ঝুলাইবার ও সুরাকার মদ ঠাণ্ডা করিবার পাত্রাদি

মোকলার কোয়েটা হইতে অনেকগুলি তাম্র ও প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি, চিত্রিত ও চকচকে পাত্র ও অনেকগুলি কঙ্কাল বেলুচিস্তানের ড্যাম্ব সমূহ হইতে আনিয়া কলিকাতা জাদুঘরে প্রদান করেন। কিন্তু এখানেও প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী সেগুলি অলক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী মহাশয়দ্বয়ের মোহেঞ্জদড়ো ও হারাপ্পার খনন-কার্য্যের ফল প্রকাশিত হইবার পর এগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

মোকলার কর্ত্তৃক প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বেলুচিস্তানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবরগুলিতে প্রাপ্ত পাত্রাদির সহিত এইসকল পাত্রের কিছু সাদৃশ্য আছে। অনেকক্ষেত্রে বৃহৎ গোলাকার জালাও পারিবারিক শবাধার-রূপে ব্যবহৃত হইত। কবরগুলির ভিতরে অসংখ্য প্রস্তর-নির্ম্মিত কুঠার, ছুরী, হাতুড়ী, গদা, কাঁচ ও তাম্র নির্ম্মিত বলয় প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যদিগের যে-শাখা তাম্র অথবা লৌহ যুগে আফঘানিস্তান ও পঞ্চনদ আক্রমণ করে, তাহাদিগের অপেক্ষা সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীরস্থ অধিবাসীরা অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ও সুসভ্য ছিল। দক্ষিণভারতের সমাধিগুলির সহিত মোহেঞ্জদড়োতে আবিষ্কৃত সমাধিগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া বুঝা যায় যে, একসময় প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উরে অবস্থিত বাবিলনীয় দেবমন্দির; (B) ইটের মেঝে, নর্দ্দমা আছে ৩৭৫পৃঃতে প্রদর্শিত ভারতীয় মন্দিরের সহিত সাদৃশ্য আছে, (A) রক্তের অর্ঘ্যদানের বেদী, (C) উপরের চত্বর

বেলুচিস্তানের প্রাচীন তথ্যগুলি এখনও বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায় নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মেজর মোকলার লেখেন যে, বেলুচিস্তানের লুপ্ত নদীগুলির উভয় পার্শ্বে গোলাকার ও চতুষ্কোণ অনেক কবর দৃষ্টিগোচর হয়। কবরগুলির অভ্যন্তরে তাম্রযুগের দ্রব্যাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানকার অনেকগুলি কবরে মোহেঞ্জদড়োতে প্রাপ্ত পাত্রাদির ন্যায় চিত্রিত আধারও পাওয়া গিয়াছে। বেলুচিস্তানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবরগুলি ড্যাম্ব (Damb) নামে অভিহিত। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে কালাড রাজ্যের ঝালোয়ান জেলায় অনেকগুলি চিত্রিত আধার আবিষ্কৃত হয় ও ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার্ জন্ মার্শ্যালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোয়েটা জাদুঘরে এপ্রকার পাত্র রহিয়াছে। মেজর

এইবারে আমরা মণ্ট্‌গমেরী জেলার হারাপ্পার খনন-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। হারাপ্পা শব্দের প্রাচীন সংস্কৃত অর্থ হরপাদ বা মহাদেবের পদদ্বয়। এই গ্রামটি রবি নদীর প্রাচীন গর্ভে অবস্থিত। উত্তর-

বেলুচিস্তানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবর হইতে প্রাপ্ত হাতে-তৈরী শবাস্থিযুক্ত পাত্র
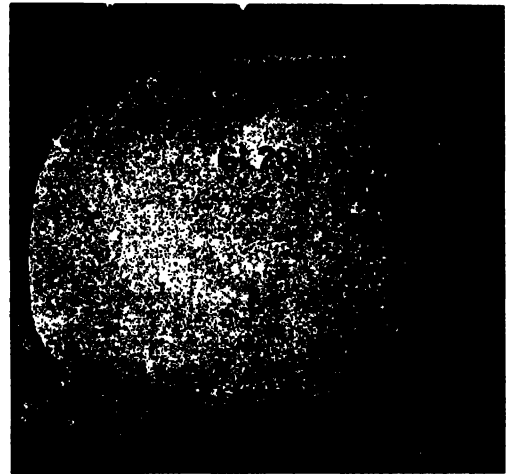
পশ্চিম রেলপথের করাচী শাখা দিয়া এইস্থানে যাওয়া যায়। হারাপ্পাতে ৭০.৮০ ফুট উচ্চ একটি প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ আছে। যুগ-যুগ ধরিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম্যলোকেরা এই বৃহৎ স্তূপ হইতে ইষ্টকাদি লইয়া গিয়া নিজেদের গৃহ-নির্ম্মাণাদি কার্য্যে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। যেসময় উত্তর-পশ্চিম রেলপথ নির্ম্মিত হয় তখন কন্‌ট্রাক্টারেরাও এই বিশাল স্তূপ হইতে মাল-মশলা লইয়া ব্যবহার করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্যার্ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ এই ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন-কালে কুষাণ-সম্রাট প্রথম বাসুদেবের (১৫৮—১৭৭ খৃষ্টাব্দ) সময়কার মুদ্রা দেখিতে পান। এই ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য দ্রব্য কতকগুলি শীলমোহর। শীলমোহরগুলিতে ককুদ-বিহীন বৃষ ও নানাপ্রকার উৎকীর্ণ লিপি রহিয়াছে। গ্রাম্যলোকেরা সময়-সময় এই সকল শীলমোহর মুলতানের হাটে বিক্রয় করিত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইপ্রকারের তিনটি শীলমোহর ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংগৃহীত হয় এবং ১৯১২ সালে গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ও আয়াল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় পরলোকগত ডাঃ জে, এফ, ফ্লিট, এইসকল শীলমোহরের পরিচয় প্রদান করেন।

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উত্তরমণ্ডলের (হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রাচীন মঠসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী হারাপ্পার খনন-কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি এখানে কয়েকটি নূতন ধরণের শীলমোহর ও মৃন্ময় আধার প্রাপ্ত হন। গ্রাম্য লোকেদের ও রেল-কন্‌ট্রাক্‌টারদের লুণ্ঠনের ফলে হারাপ্পার প্রাচীন সৌধাবলীর অনেকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতজী এইসকল ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গৃহাদির কোন-রকম সুশৃঙ্খল নক্সা প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

বেলুচিস্তানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রিত পাত্র

স্যার্ আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে হারাপ্পায় আবিষ্কৃত শীল-মোহরগুলির উৎকীর্ণলিপি ভারতীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম নিদর্শন। অনেক ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকের মত এই যে, সেগুলি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রাহ্মী ভাষার অনুরূপ। মোহেঞ্জোদড়োতে এই অনুরূপ শীলমোহর আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল যে, এইসকল শীলমোহরের লেখাগুলি তৎকালীন স্থানীয় ভাষায় লিখিত। কিন্তু হারাপ্পার প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মোহেঞ্জোদড়োতে এইপ্রকার চিত্রলেখা-যুক্ত শীলমোহর আবিষ্কার হওয়ায় বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে দক্ষিণ পাঞ্জাব হইতে সিন্ধু দেশের মধ্যস্থিত দেশসমূহে সিন্ধুনদের বরাবর একইপ্রকার সভ্যতা ছিল এবং এইসকল শীলমোহরের উৎকীর্ণ লিপি প্রাচীন কালের চিত্র-লিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত সাহানী খনন-কালে যেসকল প্রাচীন ও চিত্রিত মৃৎপাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোহেঞ্জো-দড়োতে আবিষ্কৃত মৃন্ময়পাত্রগুলির কারুকার্য্যে সুদক্ষ হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। হারাপ্পায় আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রগুলির কারুকার্য্য কিছু কাঁচা হাতের বলিয়া মনে হয়। মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মাটির জিনিষগুলি সম্পূর্ণ নূতন-ধরণের। স্যার্ জন্ মার্শ্যাল সচিত্র লণ্ডন্ নিউজ পত্রিকায় সম্প্রতি লিখিয়াছেন—"দক্ষিণ পাঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে অপ্রত্যাশিতভাবে এক-প্রকার নূতন-ধরণের জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে—এ-পর্য্যন্ত আমরা যত জিনিষ পাইয়াছি, তাহাদের কোনটার সহিতই এইসমস্ত আবিষ্কারের সাদৃশ্য নাই।"

মোহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার আবিষ্কারের আর-একটা দিকও এইস্থানে বলা প্রয়োজন। ১৯২৩-২৪ খৃঃ অব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী পণ্ডিত মাধোস্বরূপ ভাটস্ মোহেঞ্জোদড়োর একটি স্তূপে দ্বিমুখ কুঠার-চিহ্ন-বিশিষ্ট একটি তাম্র-মুদ্রা আবিষ্কার করায় একটি জটিল সমস্যার উদয় হইয়াছে। ক্রীট্ দ্বীপের প্রত্নতত্ত্বে দ্বিমুখ কুঠার সর্পদেবীর চিহ্ন। এই দ্বিমুখ কুঠারযুক্ত সর্পদেবীর মন্দির প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ স্যার্ আর্থার্ ইভান্স্ ক্রীট্‌দ্বীপে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইল যে, সিন্ধুদেশের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা খৃঃ পূঃ তিন হাজার হইতে দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার ক্রীট্ দ্বীপের ও ভূমধ্যসাগর-উপকূলের সভ্যতার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় সম্বন্ধ-যুক্ত। ইহাতে বুঝা যায় সুমেরিয়ান্ সভ্যতা, প্রাচ্যের সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের ক্রীট্ দ্বীপের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সংযোগ-সূত্র ছিল। এইসম্বন্ধে ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিশেষজ্ঞেরা লিখিয়াছেন—

প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রিত মৃন্ময় অর্ঘ্যাধার

"ব্যাবিলনিয়াতে যে মৃন্ময়পাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা খৃঃ পূঃ ৩ হাজার বৎসরের পুরাতন। সুসিয়ার মাটির জিনিষগুলিও এই-প্রকার। ব্যাবিলনের প্রাপ্ত জিনিষগুলি এমন সময়কার যখন ধাতবদ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু মোহেঞ্জোদড়োর মৃৎপাত্রগুলি তাম্রযুগের শেষ দিক্‌কার এবং ব্যাবিলনের চিত্রাদি অপেক্ষা উন্নত-ধরণের। এই বিষয়ে মোহেঞ্জোদড়োর মৃন্ময় শিল্পের সঙ্গে ক্রীট্‌দ্বীপের বহুবর্ণযুক্ত মাটির জিনিষ-গুলির সাদৃশ্য আছে। মোহেঞ্জোদড়োর চিত্রে শ্বেতবর্ণের উপর দুইতিন বর্ণে

বিচিত্র ফুলের নক্সা আছে। যদিও ঐগুলি ক্রীটে আবিষ্কৃত বহুবর্ণযুক্ত জিনিষসমূহ হইতে মূলতঃ পৃথক্, তবুও "সাব নিওলিথিক্" যুগের বহুবর্ণ-বিশিষ্ট পাত্রাদির সহিত ইহার সাদৃশ্য ধরা যায়। ভারতে ত্রিমুখযুক্ত কুঠার-

[illegible]নির্ম্মিত ভারতীয় মুষল-বিশেষ
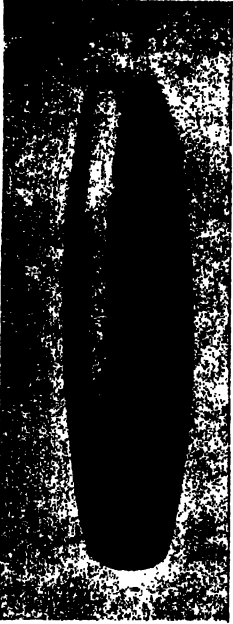
২৩০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের ব্যাবিলনীয় পাথরের বাটখারা

চিহ্ন আবিষ্কার হওয়ায় ক্রীটের সহিত ভারতীয় মৃৎশিল্পের এই সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট হইয়াছে।"

এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের পর ইউরোপের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আভাস দিয়াই আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। আসিরিয়ার পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সেইস্ বলেন—"ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তির কাল-সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমানে যেসমস্ত ধারণা আছে, এই আবিষ্কারের ফলে সেসমূহের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে।" তিনি আরও বলেন যে, এই আবিষ্কারে প্রাপ্ত জিনিষগুলি খৃঃ পূঃ ২৬ শত বৎসরের জিনিষ। ব্রিটিশ মিউজিয়মের মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞ মিঃ গাড্ ও মিঃ স্মিথ্ ভারতীয় ও সুমেরীয় চিত্রলিপিগুলি পাশাপাশি তুলনা করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, এই আবিষ্কারের চিত্রলিপিসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐগুলি সুমেরীয় জাতির (খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার) চিত্রলিপির অনুরূপ। ইঁহারা বলেন যে, মোহেঞ্জদড়ো ও বেলুচিস্তানের মেজর মোক্‌লার কর্ত্তৃক আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে, বেলুচিস্তানে ও সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে যে জাতি বাস করিত, তাহারা খুব সুসভ্য ছিল এবং তাহাদের সভ্যতা বৈদিক যুগের পাঞ্জাবের আর্য্যদের সভ্যতা অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল।

পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতার জন্ম বড়-বড় নদীর তীরেই হইয়াছিল। নীল, ড্যানিয়ুব ও টাইগ্রীস্ নদীর তীরের অধিবাসীরা যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার কিছু-কিছু পরিচয় আমরা বহুদিন আগেই পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের গঙ্গাতীরের ও সিন্ধুতীরের প্রাচীন সভ্যতা-সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই অবগত ছিলাম না। আজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত দয়ারাম সহানী, পণ্ডিত মাধো স্বরূপ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষই জগতের প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্রভূমিরূপে পরিগণিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহাদের অনুসন্ধানের শেষ ফল জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছেন।

মোহেঞ্জদড়োতে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির নমুনা বর্ত্তমানে কলিকাতার জাদুঘরে প্রদর্শন করা হইতেছে। উপযুক্ত স্থানাভাবে সমস্ত নিদর্শনগুলি দেখানো সম্ভবপর হইতেছে না। আশা করা যায় জাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে সুব্যবস্থা করিবেন এবং যাহাতে এগুলি স্থায়ীভাবে কলিকাতাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। *

* সচিত্র লণ্ডন্ নিউজ, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষজ্ঞগণ-লিখিত প্রবন্ধের সারসঙ্কলন।

নিশীথ-রাতে

(টেনিসন)

ফুলেরা ঘুমায়, শাদা আর লাল পাপড়িতে ঘুম-মাখা,
প্রাসাদ-কাননে তরুবীথি 'পরে দুলিছে না ঝাউগুলি,
নীলকাচে-ঘেরা সোনার শফরী জলতলে গতিহারা,
জোনাকীরা জাগে, মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরি!

দুধের-বরণ ময়ূর হোথায় ঝিমায় ঝরোকা-তলে—
ঝিকিমিকি করে, দেখে' মনে হয় এ কোন্ উপচ্ছায়া!
ধরা খুলে' দেছে সারা বুক তার তারাদের উদ্দেশে,
তোমারও সজনি, বুকখানি খোলা আমার নয়ন-তলে।

একটি উল্কা উলসি' উঠিল, আঁকিয়া নিথর নভে
আলোকের দাগ—মোর মনে যথা তব কথা সুন্দরি!

হের সখি, এবে কমল মুদিছে লুকায়ে বুকের মধু—
সরসী-শয়নে ঢুলে' পড়ে শেষে সহসা বিবশা বালা!
তুমিও তেমনি, হৃদয়েশ্বরী! মুদিয়া কমল-তনু
ঢুলে' পড়ো এই উরস-উপরে, মিশে' যাও একেবারে!

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

গান

গানের ঝর্‌না-তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার বরণ সুরের ধারা ঢেলে॥
যে-সুর গোপন গুহা হ'তে,
ছুটে' আসে আকুল স্রোতে,
কান্না-সাগর পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে॥
যে-সুর উষার বাণী বয়ে' আকাশে যায় ভেসে।
রাতের কোলে যায় গো চলে' সোনার হাসি হেসে॥
যে-সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে',
দেয় আপনায় উজাড় করে',
যায় চলে' যায় চৈত্র-দিনের মধুর খেলা খেলে'॥

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রী অনাদিকুমার দস্তিদার

মা গা-মা II পা-ধা -া । র্সাঃ ণাঃ -া I ধা -া -া । ধা র্সণা -ধা I
গা নে র্‌ ঝ • র্‌ না ত • লা য় • তু মি •

পা -া -া । ধা-ণা ণধা I পধা-ণধা - পা । মা গা-মা I
সাঁ • • ঝে র্‌ বে লা য় • এ লে •

পা -ধা -া । র্সা ণা -া I ধা -া -া । -া -া -া I
ঝ • র্‌ না ত • লা য় • • • •

না -া -া । না -া -া I পা-ণা -া । র্সা র্রা - র্গর্রা I
দা • ও দা • ও দা ও • আ মা •

নর্সা -া -া । -া -া -া I র্সর্রা র্সা -া । ণা ণা -া I
রে • • • • • সো না র্‌ ব র ণ্‌

ণর্সা র্সণা -া । ণধা পা -ধপা I মা গা -া । মা গা-মা II
সু রে র ধা রা • ঢে লে • গা নে র্‌

II পা পা -া । পা পা -া I ধর্সা র্সা -া । র্রা র্রা -া I
যে সু র গো প ন গু • হা • হ' তে •

র্র্পা র্মা -া । র্গা র্রা -র্গর্রা I র্সর্রা ণা -া । ধা পা -া I
ছু • টে • আ সে • আ কু ল্ স্রো তে •

না -া না । না না -র্সা I না র্সা -া । ধা র্সণা -ধা I
কা ন্ না সা গ র্ পা নে • যে যা • য়

পা -া -া । ধাঃ -র্সণঃ -ধপা I পধা -া -া
যা • • । • য় • গো • • • • •

ধা ধর্রা -া । র্সা ণা -া I ধা পা -া । মা গা-মা II
র্ কে• র্ পা থ র্ ঠে লে' • গা নে র

II সা সা -া । রা রা গা I মা পা ধপা । মা গা -া I
যে সু র্ উ ষা র্ বা ণী • ব য়ে' •

মা মা ধা । পা পা-র্সা I ণা ধা -া । -া -া -া I
আ কা • শে যা য় ভে সে • • • •

না না -া । না র্সা -া I র্সা -র্মা -র্গা । র্রা র্সা -া I
রা তে র কো লে • যা য় গো চ লে •

মা মা -া । ধা পা -া I ধা ধণা -র্সা । ণা ধা-পমগা I
সো না র্ হা সি • হে সে• • যে সু র্

মা ধা -া । পা পা-র্সা I ণা ধা -া । -া -া -া I
উ ষা র্ বা ণী • ব য়ে' • • • •
পা পা -া । পা পা -া I ধা-র্সা র্সা । র্রা র্রা -া I
যে সু র্ চাঁ পা র্ পে য়া লা ভ রে •

র্রা-র্পা র্মা । র্গা র্রা -র্গর্রা I র্সর্রা র্সণা -া । ণধা পা -া I
দে য় আ প না য় উ • জা• ড় ক• রে' •
না -া -া । না-পা -া I পা-না -া । র্সা র্রা-র্গর্রা I
যা য় • যা য় • যা য় • চ লে' •

নর্সা -া -া । -া -া -া I র্সর্রা -া র্সা । ণা ধা -মগা I
যা য় • • • • চৈ• • ত্র দি নে র্

মা ধা -া । না র্সা-র্রর্সা I ধা র্সণা -ধা । পা মগা -মা II II
ম ধু র্ খে লা • খে লে • গা নে• র্

বিজন কুটীরে মায়ার ফাঁদ*

সাধের মশা, সাধের মাছি,
সাধের পিঁপ্ড়ে পোকা-মাকোড়!
বোস্ রে পায়ে, বোস্ রে পায়ে,
কোর্‌বো না আমি ধর্-পাকোড়॥
আয় আয় কাক, ছাড়ি' কা কা ডাক,
তোরে বড় বেশী ডাক্‌তে হয় না।
তুই রে শালিক বড় বে-রসিক—
খাবার দেখ্‌লে সবুর সয় না॥
কাটবেরালী, কোথা পালালি,
আয় আয় আয়—দৌড়ে' আয়।
বড় তুই বোকা! ছাতু খাবি তো খা!
কথা বুঝিস্‌নে—এ বড় দায়॥
সাবাস শূর তুই কুকুর!
ভয়ে এগোয় না চোর-ডাকাত।
যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মবীর
ঠাকুর মানিত কুকুর জাত॥
সুখের সুখী, দুখের দুখী,
পরম বন্ধু তুই রে মোর!
দ্বিজ এ দীন শুধিবে ঋণ
কেমনে রে তোর—ভাবিয়া ভোর!
বেরাল-ডাকিনি, তোরে আমি চিনি,
মায়া-কান্নিতে মুলে না ভুলি।
আয় পিছু-পিছু, দেবো তোরে কিছু,
পাত থেকে মাছ নিস্‌নে তুলি'॥
আতপ চাউল—ঘৃত সুরভি!
ভোজে বসি' গেল বিজনে কবি॥
শত্রু মিত্র চপল ধীর।
যাহারা সবাই এসে হাজির॥
কাক চাহে আড়ে আড়ে।
বুদ্ধি তার হাড়ে হাড়ে।
না করিয়া কাল-ব্যাজ—
কুকুর নাড়িছে ল্যাজ॥
মেনিমণি ল'য়ে বাচ্ছা পাঁচ
কাঁটা-সুদ্ধ বাটা মাছ
চিবুচ্ছে দিক্‌বিদিক্ ভুলি'।
মিউ মিউ করে বাচ্ছাগুলি॥
কাটবেরালী পালে-পালে
ভোজে বসি' গেল ছাতুর থালে॥
শালিক দিচ্চে শিরে ঠোকর।
কাটবেরালী পায়ে কাম্‌ড়॥
ওধারে খাঁকিল ভূচর-ভূচরী,
খেচর এধারে বসিল সরি'॥
মিটিল বিবাদ—ঘুচিল জ্বালা।
ভালোয় ভালোয় ফুরালো পালা॥

শান্তিনিকেতন পত্রিকা — শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* কাঠবিড়ালী, শালিক, কুকুর প্রভৃতি জীবগুলি পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গের সাথী। রাত্রে ইলেক্ট্রিক্ আলোয় যখন তিনি লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন—নানাপ্রকার পোকা-মাকোড় তাঁহাকে বিরক্ত করে। প্রত্যূষে উঠিয়া উত্তমরূপে সরিষার তৈল মর্দ্দন করেন বলিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে তৈলের সুগন্ধে পিঁপড়েরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। কাঠবিড়ালী তাঁর লেখার সময় হাতে পায়ে গায়ে উঠিয়া নৃত্য করে। শালিক আসিয়া খাবার জন্য মাথায় ঠোকর দেয়। শাঃ সম্পাদক

দীপাবলী বা দেওয়ালী

জৈন গেজেট্ পত্রিকায় 'দীপাবলী' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির মোটামুটি কথা এই :—

ভারতবর্ষে যতগুলি জাতীয় উৎসব আছে দীপাবলী তাহাদের অন্যতম। সকল শ্রেণীর লোকেই এ-উৎসব পালন করে। জৈন এবং হিন্দু পঞ্জিকায় দীপাবলী খুব প্রয়োজনীয় দিন। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে এই পর্ব্বটির তাৎপর্য্য বিভিন্ন।

প্রায় পঁচিশ শতাব্দী আগে জৈন তীর্থঙ্করদিগের শেষ তীর্থঙ্কর প্রভু মহাবীর বিহার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। খৃষ্টজন্মের ৫২৭ অব্দে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশ রজনীর চতুর্থ যামে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন। যে-সময়ে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন সে-সময়ে পৃথিবীর লোকে ও স্বর্গের দেবদূতেরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে দেখেন। মহাবীরের শিষ্যগণ পাবপুরীতে মিলিত হইয়া প্রচুর সমারোহে নির্ব্বাণ-উৎসব সমাধা করেন। তাঁহারা বলেন, "জ্ঞানের আলোক যখন নিবিয়া গেল কৃত্রিম আলোকের দ্বারা সেই আলোককে অমর করিয়া রাখা যাক্।" সুতরাং যে-স্থানে মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন তাঁহারা সেইখানে উপস্থিত হইয়া প্রভুর গুণগান করিতে লাগিলেন। অগ্নি-ইন্দ্র প্রভুর দেহাবশেষকে প্রণাম করিলেন। এমন সময় প্রভুর মস্তক হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া দেহ ভস্ম করিয়া ফেলিল।

সেইদিন হইতে জৈনগণ দীপাবলী উৎসব পালন করিয়া আসিতেছেন। ইহাই দীপাবলী উৎসবের জৈন তাৎপর্য্য।

মেন্ ইন্ ইণ্ডিয়া নামক পত্রিকাতেও এই উৎসব-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহাতে হিন্দুদের দেওয়ালী-সম্বন্ধে ক্রুক্ সাহেবের মতামত আছে। তিনি দেখাইয়াছেন, খুব প্রাচীনকালে গরুমহিষ-পালন ও কৃষি-সম্পর্কেই দেওয়ালীর প্রচলন ছিল। ভুট্টা, আউশধান প্রভৃতি শস্যের সময়ে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় এই উৎসব হইয়া থাকে;

ৎ-শস্যের সময়ই দেওয়ালীর উপযুক্ত কাল। প্রেতাত্মাদের গ্রাস হইতে ংগ্রোপা দ্রব্য রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ পূজার্চ্চনায় লোক-মালা সজ্জিত হয়। আদিম লোকদিগের মধ্যে কিন্তু আলোক এ-সবের অঙ্গ নয়। তাহাদের কাছে দেওয়ালী গরু-হিষের রোগ-তাড়ক প্রথা। শরৎকালে ইহা করার কারণ, এসময়ে প্রেতাত্মারা কি বেশী উপদ্রব করে।

—

মাথা-ধরা—কারণ ও প্রতীকার

মাথাধরার অনেক ঔষধ বাজারে চলিত আছে। মাদ্রাজের হেলথ্ ত্রিকা বলেন, সেগুলি দুইরকমের—

(১) যে সব ঔষধ প্রলেপের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। অনেকেই হয়ত খিয়াছেন, এগুলি বেশী উপকারী না হইলেও ক্ষতিকর নয়।

(২) যে-সব ঔষধ গরম জল বা কফির সঙ্গে খাওয়া হয়। এগুলিকে ধারণত মাথাধরার পাউডার বলে এবং খাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গুলি ফল দেয়। কিন্তু আমাদের অনেকেরই হয়ত দেখা আছে যে, রূপ ঔষধ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে বা কয়েক দিনের মধ্যে আবার থা-ধরা উপস্থিত হয়। সাময়িক উপশমের জন্য যাঁহারা এইসব ঔষধ বহার করেন তাঁহাদিগকে বারংবার এগুলির শরণ লইতে হয়।

মাথাধরার এইসব ঔষধ তেজী উপাদানে প্রস্তুত, যেমন—ফেনাসেটিন্, ষ্টিপিরিন্ ও কয়লার সার হইতে গৃহীত ভীষণ বিষ। এগুলি হৃদ্‌যন্ত্রের বসাদ ঘটায়। ভালোরকম ডাক্তারী পরামর্শ ছাড়া এগুলি ব্যবহার রা উচিত নয়। ঘন-ঘন এগুলি ব্যবহার করিলে স্থায়ী উপকার ত ়ই না বরং এগুলিতে প্রভূত ক্ষতি করে ও হৃদ্‌যন্ত্রের নানা পীড়ার বীজ পন করে।

কি করিয়া মাথাধরার উৎপত্তি হয় ও বাজারের ঔষধগুলি ামাদের শরীরে কি প্রভাবে বিস্তার করে তাহা আমাদের জানিয়া খা ভালো। প্রথমেই আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, মাথাধরা কানো রোগ নয়, ইহা কোনো রোগের লক্ষণ। আমাদের দেহের কোন অংশ কাজ করিলেই, দেহের মধ্যে একটা বাজে আবর্জ্জনার ষ্টি হয়। আমাদের শরীর যখন বেশ স্বাভাবিক থাকে তখন এইসব াবর্জ্জনা রক্তস্রোতে ভাসিয়া আমাদের চামড়া দিয়া ও প্রস্রাবের সঙ্গে াহির হইয়া যায়। শরীর যখন অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন ই আবর্জ্জনা অধিকতর সৃষ্টি হয়, এবং তাহার কতক শরীরে জমিতে াকে। এই আবর্জ্জনাকে অধিকতর দ্রুতভাবে তাড়াইবার জন্য হৃদ্-যন্ত্র ষ্টা করে এবং রক্তস্রোতকে অধিকতর বেগে তাড়না করিতে থাকে। খন তাড়িত রক্ত এইরূপ অস্বাভাবিক বেগে মস্তিষ্কে ঢুকিতে থাকে খনই আমরা মাথাধরা বোধ করি। মাথাধরার গুঁড়া ঔষধগুলি হৃদ্-ন্ত্রের অবসাদক বলিয়া হৃদ্‌যন্ত্রকে স্বাভাবিক অবস্থা হইতেও ধীরে-ধীরে াজ করায়। ফল এই হয় যে, রক্তস্রোত অল্পতর বেগে মাথায় ঢুকিতে াকে, সুতরাং মাথাধরার উপশম হয়। রক্তকে অস্বাভাবিক ভাবে তাড়না রার যে মূল হেতু তাহাকে এই ঔষধ নষ্ট করে না, কেবল উপসর্গ মন করে মাত্র। এইরূপে অজ্ঞাতসারে শরীরে যে-অনিষ্ট সাধিত ইতে থাকে পরে তাহা ভীষণ রোগের আকার ধারণ করিতে পারে।

অতএব দেখা গেল মাথাধরা কোনো রোগ নহে। শরীরকে আমরা পব্যবহার করিয়াছি ইহা জানাইবার জন্যই ইহা অগ্রদূতস্বরূপ। ামাদের শরীর যন্ত্র আমাদিগকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া না দিয়া ভাঙিয়া ড়ে না।

মাথাধরার কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

(ক) অতি-ভোজন এবং উদরের অন্য কোনো গোলমাল। এরূপ ক্ষেত্রে অল্প ভোজনে ও মাঝে-মাঝে উপবাসে মাথাধরার উপশম হয়।

(খ) চোখের উপর অস্বাভাবিক জোর দেওয়া। খুব ছোট অক্ষরের ছাপা লেখা পড়া; খারাপ, কৃত্রিম আলোকে ও সন্ধ্যার আবছায়ায় পড়া; ঘন-ঘন বায়োস্কোপ দেখা প্রভৃতি মাথাধরার কারণ।

(গ) অতিপরিশ্রম। শারীর-ক্রিয়া বিষযুক্ত পদার্থে আবদ্ধ হয়, সেগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র বাহির করা প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে নির্ম্মল বায়ু সেবনে এবং অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলে মাথাধরা সারিয়া যায়।

(ঘ) অত্যধিক কফি, চা, তামাক, বা অপর কোন উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার। এরূপ ক্ষেত্রে ঐসব জিনিষ খাওয়া বন্ধ করিলে মাথাধরা সারিবে।

(ঙ) চোখের কিছু দোষ থাকিলেও মাথাধরার সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে চোখের কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইলে মাথাধরা সারাইবার ব্যবস্থা হইবে।

যে কারণেই মাথা ধরুক, ইহার মূল বিনাশের চেষ্টা কর্ত্তব্য।

—

বুদ্ধ কি নাস্তিক ছিলেন ?

বেদিক্ ম্যাগাজিন্ নামক পত্রিকায় এম্ এইচ সৈয়দ্ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহে যাহা দেখা যায় তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বুদ্ধ ঈশ্বরের বা আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্ট ভাবে স্বীকারও করেন নাই আবার অস্বীকারও করেন নাই। যখনই কেহ এই বিষয়ের প্রশ্ন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তিনি মৌনী থাকিতেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কথা কিছুই বলিতেন না। নিশ্চিত করিয়া বুদ্ধ যখন কিছু বলেন নাই তখন কেবলমাত্র তাঁহার মৌন ভাবকে তাঁহার নাস্তিক্যের লক্ষণ বলা যায় না।

ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিবৃত্তি-মার্গের ধর্ম্ম; যে-সব লোক জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লালসায় ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া ধর্ম্মের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে তাহাদের জন্য ইহার উদ্ভব। সেইজন্য যাহারা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইত, বৃথা কথা না বলিয়া নির্ব্বাণগামী জীবন যাপন করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইত।

—

কলাসৃষ্টিতে নারী

আমেরিকার কারেন্ট্ ওপিনিয়ন্ পত্রিকায় এসম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে সাম্য ও অসাম্য কি এবং কোথায়, এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় এই যুক্তিই প্রধানত প্রয়োগ করা হয় যে, সেকস্‌পিয়র, মাইকেল্ এঞ্জেলো, হোমার, সফোক্লিস্, দান্তে, গ্যেটে প্রভৃতির মত স্রষ্টা কোন স্ত্রীলোককে আজ অবধি দেখা যায় নাই। ইয়েল্ রিভিউ পত্রিকায় ক্লেমেন্স্ ডেন্ বলেন, এযুক্তি অনেকাংশে সত্য। স্ত্রীলোকের প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি ও সাংসারিক বাধ্যবাধকতা আছে এবং কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা ইতিহাস-স্রষ্টার তালিকায় স্থান পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—ক্লিওপাট্রা, সেমিরামিস্, আগ্রিপিনা, বোয়াডিসিয়া, জুডিথ্, ডেবোরা, ক্রিয়েম্‌হিল্ড্, মেডিচি স্ত্রীলোকগণ, টুডার স্ত্রীলোকগণ, একুইটেনের ইলিনর, সুইডেনের খৃষ্টিনা, জোয়ন্

অব্‌ আর্ক., সেন্ট্‌ ক্যাথেরিন্‌, সেন্ট থেরেসা, সেন্ট্‌ ক্লেয়ার, ফ্লোরেন্স্‌ নাইটিঙ্গেল্‌, নর্ত্তকী থিওডোরা, মাদাম কুরি, প্রভৃতি।

লোকে বলে, কলাসৃষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রকৃতিগত কোন গলদ আছে। কিন্তু ইহা বলা কি অসঙ্গত যে, মেয়েদের মধ্যেও প্রতিভা আছে, তাহা বিভিন্নক্ষেত্রে, বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যে কলাসৃষ্টির ক্ষেত্র আত্মার প্রসারের ক্ষেত্র সেখানে পুরুষ ও নারীর জীবন ও আনুষঙ্গিক কাজ কি একেবারে পরস্পর-বিরোধী? সাংসারিক ক্ষেত্রে পুরুষ সন্তান-জনক, নারী সন্তান-ধারক। কলাসৃষ্টির জগতে পুরুষ কি একেবারে নিজে অপরের সাহায্য-ব্যতিরেকে সৃষ্টি করে? প্রতিভার কাজ অপরের সহায়তা ছাড়া সম্পন্ন হয় না। জিউসের মাথা হইতে একেবারে পূর্ণগঠিত হইয়া জন্ম লইয়াছিলেন বলিয়া আথেনা স্ত্রীলোকের সন্তান নন একথা বলা চলে না। রক্তমাংস ও সংমিলিত প্রাণ যেমন সন্তানের পক্ষে প্রয়োজন,—নাটক, কাব্য, চিত্রের জন্যও মাতা ও পিতার প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ যোগ খুব বড় কথা নয়;—মাতা, ভগ্নী, প্রণয়ী, স্ত্রী, সহিষ্ণু ভৃত্য, সহিষ্ণু বন্ধু—এই সকলেই পুরুষকে চিত্রকর, ভাস্কর বা সাহিত্য-স্রষ্টা হইতে সাহায্য করে। এই যে সাহায্য ইহা কি সামান্য কথা? একজন যে এরূপ সম্পূর্ণতাসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া তাহার বাক্য, দৃষ্টি এবং কেবলমাত্র অস্তিত্বের দ্বারা আর-একজনের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা জাগাইয়া দেয়,—সে-একজন কি প্রতিভাসম্পন্ন নয়? যে-নারী দান্তে বা গ্যেটের মধ্যে সৃষ্টিকার্য্যের আলামুখী প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল সে-নারীর কি স্থান নাই? ডার্ক্‌ লেডি সেক্‌স্‌পিয়রকে কি দিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি; ভালোই হউক বা মন্দ হউক যে-প্রভাব তিনি কবির উপর বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা কবির প্রত্যেক ছত্রে বিদ্যমান। সে-নারীর মধ্যে কি জিনিষ ছিল যাহা কবিকে আকৃষ্ট করে? সিংহের সহিত খরগোসের মিলন ঘটে না। কেবল সৌন্দর্য্য নয়, এমন কোন-কিছু, এমন কোনো সমান শক্তি তাঁহাদের চরিত্রে ছিল, যাহার জোরে বিয়াট্রিস্‌, লরা প্রভৃতি নারীরা বড়-বড় কবির পাশে জুটিতে পারিয়াছিলেন। সেই গুণকে প্রতিভার স্ত্রী অংশ বলা যায়। ইহা অসাধারণ গুণ, অসাধারণ কিছু। যখন পুরুষ-প্রতিভার সংস্পর্শে ইহা আসে ও তাহার সহিত মিলিত হয় তখন ইহারই সাহায্যে কলাসৃষ্টির উদ্ভব হয়।

গুপ্ত

ছুরী ও বাঁক শিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

যুযুৎসু

"লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা"-সম্পর্কে কতিপয় সহজ-সাধ্য যুযুৎসুর কৌশল বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলেও, আরও কতিপয় যুযুৎসুর পাঠ, "ছুরী ও বাঁক শিক্ষা"-সম্পর্কে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইলাম;—নিম্নলিখিত কৌশল-গুলির প্রয়োগ "ছুরী" সহ কিম্বা শুধু হাতেই সাধারণতঃ অধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে; তবে কোনো কোনো কৌশলের প্রয়োগ "অসি" কিম্বা "লাঠি"সহও সম্ভবপর হইতে পারে।

"ফুরৎ", "তুড়ৎ" ও "ঝুড়ৎ", অর্থাৎ মন, চক্ষু ও শরীর এ তিনটির সমবেত ক্ষিপ্রকারিতা, এবং "মুদ্", "হৃদ্" ও "খুদ্", অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অঙ্গ-চালনার বিশুদ্ধতা ও স্থৈর্য্যের প্রভাবেই যুযুৎসুর দক্ষতা-সম্পর্কে সম্যক্ উৎকর্ষ জন্মিয়া থাকে; ক্ষিপ্রকারিতা ও স্থৈর্য্যের সামান্য ব্যতিক্রমেই যুযুৎসুর কৌশল সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং অধিকাংশ স্থলেই হিতে বিপরীতও ঘটিতে পারে।

যে-কোনও প্রক্রিয়ার উপক্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতি-পক্ষকে ক্ষিপ্রকারিতা সহই তুরন্তে তাহার প্রতিকার

১ম চিত্র

বলম্বন করিতে হয়। কারণ প্রতিকার-পদ্ধতি বিশুদ্ধ হইলেও ক্ষিপ্রকারিতার তারতম্য-অনুসারেই সাধারণতঃ জয়-পরাজয় ঘটিয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কৌশলগুলি-সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা-সম্বন্ধেই ক্রীড়ারত ব্যক্তিদ্বয়কে সম-বলশালী, সম-কৌশলী ও সম-ক্ষিপ্রকারী কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে।

২য় চিত্র

৪র্থ চিত্র

৩য় চিত্র
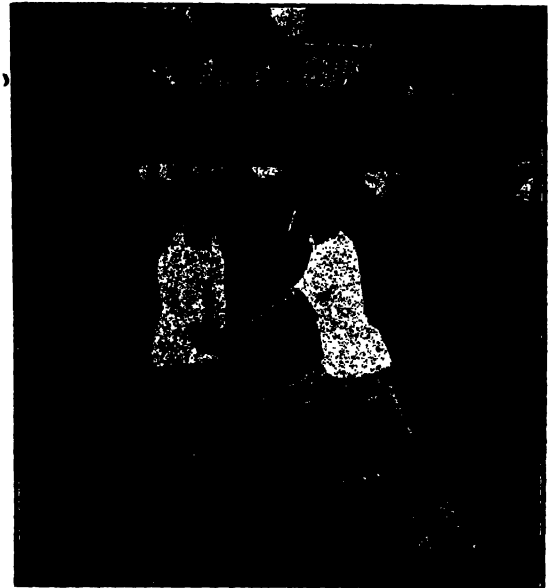
৫ম চিত্র

প্রকৃত আততায়ী-সংঘর্ষ-কালে কৌশলগুলির বর্ণনানুরূপ ক্রমিক ধারা কদাচ নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না; বিভিন্ন পাঠ ও কৌশলগুলির বর্ণনানুরূপ ক্রমিক ধারা কেবলমাত্র শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা ও অভ্যাসের সুবিধা হেতুই অবলম্বিত হইয়াছে। প্রকৃত সংঘর্ষ-কালে কিম্বা প্রকৃত শক্তি-পরীক্ষায়

৬ষ্ঠ চিত্র

যখনই যে কৌশলের সুযোগ ঘটিবে, তখনই তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে; প্রতিকার সম্বন্ধেও ঐরূপ; কোনও কৌশল, কিম্বা কৌশলের প্রতিকার, বিভিন্ন স্থলে, ও বিভিন্ন কালে, সুযোগ-অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার, কিম্বা কৌশলের, প্রতিকার-হেতুও প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার, কোনও-কোনও বর্ণিত প্রতিকারও, সুযোগমতে মূল কৌশলরূপেও প্রযুক্ত হইয়া সবিশেষ কার্য্যকারী হইতে পারে।

নিম্নের বর্ণনা-সকল-মধ্যে সর্ব্বত্রই ছুরী কিম্বা বাঁকসহ আক্রমণ বুঝাইতে দক্ষিণ হস্তেরই প্রাধান্য কল্পিত হইয়াছে, এবং ক্রীড়ারত ব্যক্তিদ্বয়ের দক্ষিণ হস্তও, ছুরী কিম্বা বাঁকধৃত পরিকল্পিত হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ বাম ও দক্ষিণ, উভয় হস্তেই ছুরী কিম্বা বাঁক ধারণ করিয়া যুযুৎসুর সমস্ত কৌশলগুলিও সমানরূপে অভ্যাস করিলে, সম-অবস্থায় সর্ব্বত্রই নির্ভীকচিত্তে আততায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে সক্ষম হইবেন।

৭ম চিত্র
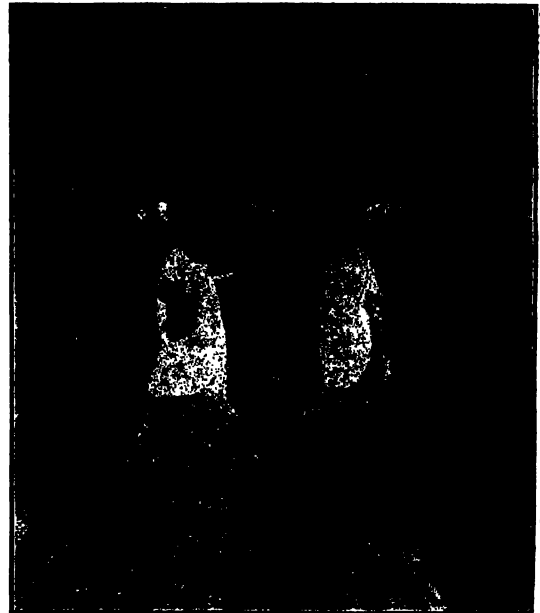
৮ম চিত্র

বাম হস্তে ছুরী কিম্বা বাঁক ধারণ করিয়া অভ্যাস-কালে, সমস্ত বর্ণনা-মধ্যেই "দক্ষিণ" স্থলে "বাম" ও "বাম" স্থলে "দক্ষিণ" ধরিয়া লইলেই হইবে।

৯ম চিত্র

১০ম চিত্র

প্রথম পাঠ

ছুরী কিম্বা বাঁক দ্বারা "মন্"এ আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাম হস্ত চিৎ করিয়া আক্রমণকারীর অঙ্গুলী-সন্ধির ভঙ্গগুলি ধরিতে হইবে,—যেন তাহার কর-তল আক্রমণকারীর কর-পৃষ্ঠের দিকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আক্রমণকারীর অঙ্গুলীগুলির উপরে থাকে; যথা প্রথম চিত্রে :—

[চিত্রমধ্যে বামদিকের ব্যক্তিকে আক্রমণকারী এবং দক্ষিণ দিকের ব্যক্তিকে "যুযুৎসু" প্রয়োগকারী বুঝিতে হইবে।]

১১শ চিত্র

পূর্ব্বোক্তরূপে ধরিয়াই চক্ষুর নিমেষে বামাবর্ত্তে মুচ্ড়াইয়া আক্রমণকারীর হস্তকে বিকল করিয়া দিতে হইবে, যথা দ্বিতীয় চিত্রে :—

আক্রমণকারী তুরন্তে প্রতিকারে অসমর্থ হইলে, যুযুৎসু প্রয়োগকারীর এই প্রক্রিয়ার ফলে, তাহার মণিবন্ধে তীব্র বেদনা অনুভূত হওয়া হেতু, তাহার (আক্রমণকারীর) পার্শ্বের দিকে ভূপতিত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

আক্রমণকারীর প্রতিকার

ঐ অবস্থায় আক্রমণকারীও তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা সবেগে আঘাত করিয়া, প্রথমে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ হস্তকে, পরে বাম হস্তকে দূরে অপসারিত করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে ; যথা, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে।

যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ হস্ত আক্রমণোন্মুখ না থাকিলে, প্রথমে তাহার দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিবার সাধারণতঃ কোনই প্রয়োজন হয় না।

১২শ চিত্র

প্রতিকারের প্রকারান্তর

অথবা, সুযোগ পাইলে দ্বিতীয় চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আক্রমণকারী ও যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলির ভঙ্গ ধরিয়া সবলে বামাবর্ত্তে মুচ্ড়াইয়া দিবে, যথা পঞ্চম চিত্রে।

এমতাবস্থায় যিনি অধিক বলশালী কিম্বা অধিক ক্ষিপ্রকারী হইবেন, অথবা যাঁহার উৎকর্ষের আধিক্য হইবে, সাধারণতঃ তিনিই প্রাধান্ত লাভ করিবেন ; কিন্তু, উভয়ের উৎকর্ষের সমতা হইলে, নিষ্কৃতি-হেতু উভয়কেই সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসিয়া (এক ব্যক্তি দক্ষিণাবর্ত্তে ও অপর ব্যক্তি বামাবর্ত্তে) নিজ-নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া লইতে হইবে, যথা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম চিত্রে।

১৩শ চিত্র

১৪শ চিত্র

অথবা, সুযোগ হইলে, পঞ্চম চিত্রের বর্ণনা-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার পরে, পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পাঠের অন্তর্গত ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার অনুরূপে, উভয়েরই হস্ত-দ্বয় ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে নিম্নাভিমুখে চালনা করিয়া (ঝাঁকানি দিয়া) মুক্ত করিয়া লওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে।

১৫শ চিত্র

দ্বিতীয় পাঠ

"বস্তি দক্ষিণ"এ আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাম হস্ত দ্বারা আক্রমণকারীর করমুষ্টি এরূপভাবে ধরিতে হইবে যেন, আক্রান্ত ব্যক্তির বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আক্রমণকারীর কর-পৃষ্ঠে এবং অপর চারিটি অঙ্গুলী তাহার (আক্রমণ-কারীর) অঙ্গুলীর ভঙ্গের উপরে থাকে, যথা নবম চিত্রে।

চক্ষুর নিমেষে ঐরূপে ধরিয়াই বামাবর্ত্তে মুচড়াইয়া আক্রমণকারীর মণিবন্ধ বিকল করিয়া দিতে হইবে, যথা দশম চিত্রে।

আক্রমণকারীর প্রতিকার

প্রতিকার-হেতু আক্রমণকারীকেও তুরন্তে নিজ বাম হস্ত দ্বারা, প্রথমে সবেগে আঘাতসহ যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে ধরিয়াই, দ্রুত হস্ত-চালনা-সহযোগে তাহার
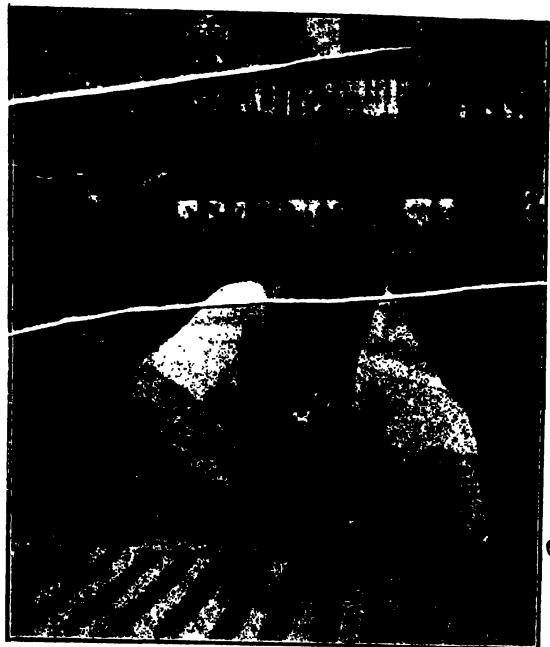
১৬শ চিত্র

১৭শ চিত্র

কর-মুষ্টির অঙ্গুলীর ভঙ্গগুলি ধরিয়া ফেলিতে হইবে ; যথা একাদশ ও দ্বাদশ চিত্রে।

১৮শ চিত্র

তদবস্থায়, যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ করপল্লব তাহার পশ্চাদ্দিকে যাইবে, এবং দক্ষিণ কফোনি (কনুই) সম্মুখে থাকিবে।

এমতাবস্থায় যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে তুরন্তে কটিদেশ ঈষৎ পশ্চাতে এবং মস্তক ও উর্দ্ধ-শরীর ঈষৎ সম্মুখে চালনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত নিম্নের দিকে এবং দক্ষিণ কফোনি (কনুই) পশ্চাদ্দিকে লইয়া তাহার প্রতিপক্ষের সম-অবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা তাহার প্রতিপক্ষেরই সুযোগ পাওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে

নিষ্কৃতি

তৎপরে, নিষ্কৃতি-হেতু উভয়কেই, পরস্পর-ধৃত হস্ত দ্বয় ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে নিম্নাভিমুখে চালনা করিয়া (ঝাঁকি দিয়া) পরস্পরমুক্ত হইয়া যাইতে হইবে, যথা ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ চিত্রে :—

তৃতীয় পাঠ

"দে"তে আক্রমণ করিলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে (যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে) তুরন্তে উভয় হস্তদ্বারা আক্রমণকারীর দক্ষিণ হস্ত এরূপভাবে ধরিতে হইবে, যেন যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আক্রমণকারীর কর-পৃষ্ঠোপরি পতিত হয়, এবং উভয় হস্তেরই অপর সমস্ত অঙ্গুলীগুলি আক্রমণকারীর করতলের দিকে তাহার অঙ্গুলী-ভঙ্গের উপর স্থাপিত হয় ; যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর উভয় হস্তেরই অঙ্গুলীর প্ররোহ-সমূহ (সমস্ত অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগের দিক্) সমস্তই একদিকে (আক্রমণকারীর মুষ্টির অঙ্গুলীভঙ্গের অভিমুখে) থাকিবে, যথা পঞ্চদশ চিত্রে :—

ঐরূপে ধরিয়াই চক্ষুর নিমিষে তুরন্তে বামাবর্ত্তে মুচ্ড়াইয়া আক্রমণকারীর মণিবন্ধ বিকল করিয়া দিতে হইবে ; যথা, ষোড়শ চিত্রে :—

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিকারে অসমর্থ হইলে আক্রমণকারীকে বাধ্য হইয়া উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) ভূপতিত হইতে হইবে।

১৯শ চিত্র

আক্রমণকারীর প্রতিকার ও নিষ্কৃতি।

প্রতিকার-হেতু আক্রমণকারীকেও, তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা সবেগে আঘাত করিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর হস্তদ্বয়কে

অপসারিত করিয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নিজ দক্ষিণ হস্ত সবেগে চালনা করিয়া নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে সরাইয়া লইতে হইবে ; যথা, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ চিত্রে :—

২০শ চিত্র

পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ চিত্র-মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যক্তিকে আক্রমণকারী এবং বাম পার্শ্বের ব্যক্তিকে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী বুঝিতে হইবে।

প্রকারান্তর প্রতিকার

অথবা, পঞ্চদশ চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিকার-হেতু আক্রমণকারী তুরন্তে দক্ষিণ হস্ত সবেগে ঊর্দ্ধে চালনা করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পূর্ণ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া আসিয়া, বেগে পশ্চাদ্দিকে চালনা করিয়া (ঝাঁকি দিয়া) দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে ; যথা, উনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ চিত্রে :—

প্রকারান্তর প্রয়োগ

(যুযুৎসু)

পঞ্চদশ চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনানুরূপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আক্রমণকারীর হস্তসহ নিজ হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিতে-তুলিতে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী স্বয়ং বামাবর্ত্তে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসিলেও আক্রমণকারীর মণিবন্ধ সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও বিকল হওয়া-নিবন্ধন তাহাকে পদস্খলিত হইয়া পতনোন্মুখ হইতে হইবে।

২১শ চিত্র

উনবিংশ চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সমস্ত চিত্র মধ্যেই বাম পার্শ্বের ব্যক্তিকে আক্রমণকারী ও দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যক্তিকে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ সমালোচনা

পাবনা জেলার ইতিহাস—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পাবনা, ১৩৩০। শ্রী রাধারমণ সাহা বি-এল্ প্রণীত।

এখন বাঙ্গালাদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলার এক-একখানি ইতিহাস লেখা হইয়া গিয়াছে, এইসমস্ত ইতিহাসের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাসের" তুল্য গ্রন্থ এখনও ছাপা হয় নাই। ইংরাজী ভাষায় গেজেটিয়ার বলিতে যাহা বুঝায় আমাদের দেশে জেলার ইতিহাস বলিলে ঠিক তাহাই বুঝায়। অনেক জেলার ইতিহাস-লেখক সরকারী গেজেটিয়ারের বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পাবনা জেলার প্রাকৃতিক বিবরণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সকল বিষয়ে গেজেটিয়ারের বিবরণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে পাবনা জেলার স্থান নদী, খাল, বিল, চর, স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাহা মহাশয়ের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত অধিক পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হইল না, কারণ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কোন্ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্য্যাদা করা উচিত তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের "ইতিহাস চর্চ্চার প্রণালী" হইতে প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড" পর্য্যন্ত স্তরের সকল গ্রন্থেরই প্রমাণ তাঁহার নিকট সমান। কোন্‌টা সত্য কোনটা অসত্য তাহা চিনিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডখানি পাঠের যোগ্য হয় নাই। এই দোষ কেবল হিন্দুযুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ৺দুর্গাচরণ সান্ন্যালের স্বকপোলকল্পিত রচনা "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস", "বগুড়ার ইতিহাস," প্রভৃতি গ্রন্থও আইন-ই-আকবরীর সহিত সমান আদর লাভ করিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান যুগের সহিত তুলনায় ইংরেজ আমলের ইতিহাস অনেকটা অধিক স্থান দখল করিয়া আছে।

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কেল্লা-ফতে—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, ৭৮পৃষ্ঠা, অনেকগুলি ছবি এবং সচিত্র রঙীন মলাট সহিত। (ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্) দাম আট আনা।

ব্রজেন্দ্র-বাবুর 'রাজাবাদশা' এবং 'রণডঙ্কা' মতন এখানিও ছেলেদের জন্য রচিত ঐতিহাসিক গল্পের বহি। ইহাতে শের শাহের অভ্যুদয় চালাকিতে রোটস্ দুর্গ অধিকার, মাড়োয়ারের মহাযুদ্ধ, শাহজাহানের প্রজাপ্রীতি, কাবুলের শাসনকর্তা আমীর খাঁ কিরূপে চালাকিতে দুর্দ্দান্ত আফগানদিগকে বশে রাখিয়াছিলেন, আমীর খাঁর স্ত্রী সাহিবজীর বুদ্ধিবল, নাদিরশাহের দিল্লী অধিকারের একটি মনোরঞ্জক ঘটনা,—এই ছয়টি গল্প আছে। প্রত্যেক গল্পই ইতিহাসের সত্যের উপর স্থাপিত। গ্রন্থকারের বিশেষত্ব এই যে গল্প মনোহর হইলেও ইতিহাসের বাহিরের অতি অল্প কথাই যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অনেকস্থলে একটি কথাও অনৈতিহাসিক নহে। শুধু লোকের বক্তৃতা, উত্তর-প্রত্যুত্তর নিজের ভাষায় রচিত, যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিক লিভি প্রভৃতির প্রথা ছিল। ভাষা সরল, অথচ ছেলেরা একদৌড়ে পড়িয়া শেষ করিতে চায়, ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

এইরূপে ব্রজেন-বাবু যে ক্রমে-ক্রমে ভারত-ইতিহাসের সব ঘটনাগুলিই আমাদের শিশুদেরও সামনে আনিয়া দিতেছেন, এবং তিক্ত পাঠ্যপুস্তকের স্বাদ হইতে ইতিহাসকে বাঁচাইয়া চারিদিকে প্রচার করিতেছেন, এজন্য ইতিহাস-প্রেমিক তথা স্বদেশ-প্রেমিক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে।

শ্রী যদুনাথ সরকার

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পদ্যানুবাদ—শ্রী ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রণীত। যোগাশ্রম (হাউজ কটোরা, বেনারস সিটি) হইতে প্রকাশিত। (কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থমালা ২৩ম সংখ্যা)।

শ্রী কৃষ্ণানন্দ স্বামীর ৭৬তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে বিনামূল্যে বিতরণার্থ। ডাকে লইতে হইলে ডাক মাশুল /০।

ইহাতে গীতামাহাত্ম্যের পদ্যানুবাদ এবং অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনীও আছে।

সাধারণের পাঠোপযোগী।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

মনস্তত্ত্বের মাপ—ডেভিড হেয়ার কলেজের অধ্যাপকদ্বয় মিঃ জি দাশগুপ্ত ও মিঃ জে এম্ সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। (১৩৩১)

এই পুস্তিকায় গ্রন্থকারদ্বয় বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্বের পরিমাপ গ্রহণ-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি সুযুক্তিপূর্ণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক বিরল, সুতরাং গ্রন্থকারদ্বয়ের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শিক্ষকদের সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত যে তাহাদের ছাত্রদের মনোবৃত্তিসকলের কি-পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে। এই পুস্তকে তৎসম্বন্ধীয় তথ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে অতি সুন্দররূপে বিবৃত করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে বাংলা দেশের শিক্ষকগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

"অমৃত", "সদ্ভাব কুসুম"—৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত ও শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ।৵০ আনা। (১৩৩০)

কান্তকবির "অমৃত" ও "সদ্ভাব কুসুমের" নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। ইতিমধ্যেই "অমৃতের" ৬ষ্ঠ এবং "সদ্ভাব-কুসুমের" ২য় সংস্করণ হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে পুস্তক-দুইখানি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে আদৃত হইয়াছে। শিশুদের শিক্ষোপযোগী

এমন সরল অথচ শিক্ষাপ্রদ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। পুস্তক-দুইখানির বাঁধাই ও ছাপা মনোরম হইয়াছে।

প্র

শব্দ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের আর-একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানির নাম "শব্দ"। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রেরা Sound বা Acoustics বলিয়া যাহা বিজ্ঞানের শ্রেণীগুলিতে অধ্যয়ন করেন গ্রন্থকার সহজ এবং সরল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। জগদানন্দ বাবুর এই প্রচেষ্টা অতি প্রশংসনীয় এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমানকালে যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে তিনি শব্দবিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রায় সব মোটা কথাই বলিয়াছেন। বিষয়গুলির মধ্যে শব্দের ঢেউ, শব্দের বেগ, প্রতিধ্বনি, শব্দের ঢেউ কত লম্বা, তারের কাঁপুনি, কোলাহল ও সুর, শব্দে শব্দে নিঃশব্দ, আমাদের বাগ্‌যন্ত্র ও সর্ব্বশেষে ফোনোগ্রাফএর অধ্যায়টি বালকদের পক্ষে এবং সাধারণ পাঠকদের পক্ষে খুবই উপাদেয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্কুলের দ্বিতীয়-তৃতীয়-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই পুস্তক সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছে। আশা করি সত্বরই বাঙ্গলার স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। বইখানির বাঁধাই ও ছাপা ভালো হইয়াছে। অনেকগুলি বিষয়-পরিচায়ক ছবিও আছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ।

গ্রন্থকীট

কুটীর-শিল্পে এণ্ডি-কীট—শ্রী মন্মথনাথ দে, এম্-এস্-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী কালিপদ ঘোষ, কৃষি-সম্পদ্ আফিস, ৩১ সূত্রাপুর রোড, ঢাকা। দাম তিন আনা।

বইটিতে ২৮খানি পাতা আছে। কিন্তু এত অল্পের মধ্যেও লেখক এণ্ডি-কীটের খাদ্য, পালন, রক্ষা ও রেশমের ব্যবসায়ের লাভালাভের কথা অতি সুন্দর ও সহজবোধ্য করিয়া বলিয়াছেন। আজও আসামের ঘরে-ঘরে মেয়েরা এই পোকার পালন করিয়া রেশম বা মুগা বা গরদের ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। "আসামের ন্যায় আমাদের বাঙ্গালাদেশেও এড়ি-কীট-পালন এবং এড়ি-রেশম উৎপাদনের প্রথা প্রচলিত হইলে, নামমাত্র ব্যয়ে ধন-আগমের একটি নূতন পথ হইতে পারে।" এই বইটি সাধারণের পক্ষে বেশ সহজ বোধ্য হইবে। বাংলার কৃষিপ্রিয় লোকে এইটি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

ছন্নছাড়া—শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক রায় চ্যাটার্জ্জী এণ্ড্ কোং, ১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

উপন্যাস। লেখকের উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যায় না, তবে তাহা বোধ হয় এই যে, তিনি শিক্ষিতা মেয়েদের হীন করিয়া পাড়াগাঁয়ের "গোবর-ঘাঁটা" মেয়েদের আদর্শরূপে প্রচার করিতে চান। বিদেশী শিক্ষার কুফল আছে স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া লেখক শিক্ষিতা মেয়েদের উপর যে-সব অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতার আরোপ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দশবছরের মেয়ের মুখ হইতে বিদেশী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে-সব কথা বাহির হইয়াছে তাহা চল্লিশ-বৎসরের লোকের মুখেই সম্ভব। এমন দুই-একটি অকথ্য কথাও পাওয়া গেল যাহা ছাপার অক্ষরে থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বইটি পড়িয়া আমরা সুখী হই নাই। তবে বইটির ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

সাহিত্য-সুধা—আবদুর রহমান খাঁ ও শ্রী অক্ষয়কুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক রিপণ লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। দাম বারো আনা।

মধুসূদনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি বাংলাদেশের বড়-বড় লেখকদের রচনা হইতে চয়ন করিয়া বইখানি গ্রথিত। বইটির বিশেষত্ব এই—ইহাতে মামুলি-রকমের সঙ্কলন নাই; চয়ন বেশ বুদ্ধির সহিত করা হইয়াছে। চয়নকারেরা আধুনিক লেখকদিগের লেখা হইতেও চয়ন করিয়া তাঁহাদের সাহিত্য-জ্ঞানের প্রসারের পরিচয় দিয়াছেন। বইটি অনায়াসেই স্কুলের পাঠ্য হইতে পারে, এবং তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।

হযবরল—৺সুকুমার রায় চোধুরী প্রণীত। প্রকাশক ইউ রায় এণ্ড্ সন্‌স্, ১০০ গড়পার রোড্, কলিকাতা। দাম পাঁচ আনা। ১৩৩১।

ছেলেমেয়েদের উপযোগী গল্পের বই। হযবরল বলিতে যে আবোল-তাবোলের ভাব বুঝায়, বইখানিতে তাহা পুরা-মাত্রায় বর্ত্তমান। বয়স্থ হইয়া এবং লেখাপড়া জানিয়া বয়সের ও বিদ্যার গাম্ভীর্য্য ডিঙাইয়া, বুদ্ধির পরিণতির গণ্ডী ছাড়াইয়া, পরিণত মনকে শিশুর মনের অনুগত করিয়া শিশুর মতন ভাবিয়া লেখা খুব শক্তির কাজ। বর্ত্তমান বইটিতে গ্রন্থকারের সে-শক্তি আশ্চর্য্য- ও চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। ছোট-ছেলেদের একচিন্তা আর-একচিন্তা হইতে লাফাইয়া-লাফাইয়া চলে,—তাহাদের মধ্যে ক্ষীণ যে যোগসূত্র থাকে তাহা সব-সময়ে ধরিতে পারা যায় না। গ্রন্থকার সেইরকম লম্ফনশীল চিন্তাগুলিকে গাঁথিয়া একটি গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার শিশু মনের ও শিশু-মনোভাবের আশ্চর্য্য পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে এমন এক শিশু প্রাণ, শিশু-হিতৈষী লেখককে আমরা অকালে হারাইয়াছি। গল্পটির মাঝে-মাঝে যে-সব পরিচায়ক চিত্র দেওয়া হইয়াছে সেগুলিও সুন্দর। মলাটটি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরঞ্জক হইয়াছে। বইটি ছেলেমেয়ে-দের প্রচুর আনন্দ দিবে।

কাকলি—শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। চুঁচুড়া সান্‌রাইজ্ প্রেস হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা। ১৩৩১।

কবিতার বই। কবি নরেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে সুকবি বলিয়া যশস্বী। নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়া পাঠকসমাজে আদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বইটিতে তাঁহার আধুনিক ও পুরাতন অনেকগুলি কবিতা আছে। কবিতাগুলির প্রধান গুণ—মাধুর্য্য ও সরলতা। কোন অস্পষ্টতা বা আড়ম্বর কবিতা-গুলিকে জটিল করে নাই। সেগুলি স্বচ্ছ এবং হৃদয়স্পর্শী। বহুদিন পরে কবিকে সাহিত্যের আসরে দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। কাব্যামোদী পাঠকমাত্রই এ কবিতা-গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

গুপ্ত

"স্বদেশী বাঁশী"র ভাষা

প্রতিবাদ

গত আশ্বিনের প্রবাসীতে "স্বদেশী-বাঁশী" গল্পটির ভাষা-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

পশ্চিম বঙ্গে ও বিহার-প্রদেশের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ, বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল-পরগণা, ও মানভূম জেলার প্রচলিত ভাষার মধ্যে যে-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয় সেই বৈশিষ্ট্য অবলম্বনেই লেখক একটি ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও যে পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় লেখক জানেন না। কারণ, তিনি কখনও বর্দ্ধমানের ভাষায় লিখিতেছেন কখনও মানভূম বা সাঁওতাল-পরগণার ভাষা ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। "এই ঠিনে আর 'জলদি', ঠিক বানিয়ে দিবি ত বাবু?" এপ্রকার বাক্যের প্রয়োগ বর্দ্ধমানে বা বাঁকুড়ায় নাই। "দেখতে নাই দিবেক," ইহা বিশিষ্টরূপে মানভূমের কথা।

বাকী অনেক কথা পড়িলে বর্দ্ধমান বা বীরভূমের বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সাঁওতাল বা কোল বা ভীলদের অনভ্যস্ত কথা বলিয়া সেগুলিকে বুঝিবারও কোন নিদর্শন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক মাঝে-মাঝে প্রকৃত স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছেন; তাহার মধ্যে 'জ্যান্ত* ফিরেনি' উদাহরণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐসমস্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও যে-সামঞ্জস্য আছে তাহা রক্ষা করিয়া চলিলেও তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে অসার্থক হইত না।

প্রথমেই ঁর দুর্ব্যবহার নির্দ্দেশ করিতেছি। গেঁয়েছিল, দিঁয়েছিল, এইরূপ কথার প্রচলন আছে, কিন্তু তাহা হইতে গেঁইছিল কথার প্রচলন কল্পনা করা সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু নাই একথা বলিতে পারি। দেখেঁছিস্, রাঁইছিস্, কথাগুলি কল্পনার উপভোগের বিষয়। যেখানে ঁ দেওয়ার আবশ্যক সেরূপ অনেক স্থলে তাহা দেওয়া হয় নাই। "মাহির বেটা হ'য়েছে দেখতে আলম্," ইহাতে হ'য়েছে শব্দটি হৈছে বা হঁয়েছে বলা উচিত। "তাড়াই দে, পালাই যা, মরাই দিয়েছি"+ এগুলি "তাড়াঁই দে, পালাঁই যা, মরাঁই দিয়েছি" হওয়া উচিত। 'তুই' শব্দটি 'তুঁই' বলিতে হইবে।

অসম্মতি-প্রকাশক 'না' শব্দটি লেখক আপন অভিজ্ঞতা-মত কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন দেখুন—"উয়াকে আমি ছেল্যা দেপাব না, দেখতে নাই দিবেক্? পেছি নাই, উ কতখুন দুধ খায়নি, আমার কিছু দুধ নেই," ইত্যাদি। সবগুলিই 'পেছি নাই'-এর মত হইবে।

কইছে, উখে, আখন, কয়ে, বেটা-টা, বাঁশীটে, ছেল্যা, যাবে, শোন্, এঠিনে, তাকৈ, জ্যান্ত, আমায়, এগুলির পরিবর্ত্তে ব'লছে, উয়াকে, আখনি বা আখুনি, ব'লে, বেটাট, বাঁশীট, ছেলা, যাবেক্, শুন্, ইঠিনে, ইঠিয়ে বা ইখানে, তাখে, জিয়ন্ত, আমাকে হইবে। লেখক অবশ্য পুনরুল্লেখের সময় কোনো কোনো স্থানে ঠিক লিখিয়াছেন; কিন্তু সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। ইহা ব্যতীত লেখকের আরো অনেকগুলি চেষ্টা হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে।

শ্রী রাসবিহারী চট্টরাজ

*এই কথাটি লেখক লিখেন নাই; ভ্রমবশতঃ ছাপা হইয়াছে। প্র, স.

+ এই কথাটি লেখক লিখেন নাই; ভ্রমবশতঃ ছাপা হইয়াছে। প্র, স

উত্তর

বর্দ্ধমান জেলার কথা যে সর্ব্বত্রই এক-প্রকার, সে-কথা বোধ হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অস্বীকার করিবেন। বর্দ্ধমানের কাছাকাছি গ্রামগুলির সহিত রাণীগঞ্জের সন্নিহিত দু'একটি গ্রামের ভাষা মিলাইয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একই জেলার দুইটি ভিন্নগ্রামের ভাষার কতখানি প্রভেদ হইতে পারে। উপাড়া, ছোড়া, জোড়জানকী এবং ইথরার গ্রাম্যভাষা একটু মনোযোগ দিয়া শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়, উচ্চারণের তারতম্য একটু-আধটু আছে। সব গ্রামগুলিই কাছাকাছি, এবং সেখানকার অধিবাসী সাধারণ ভদ্রলোকের চলিত ভাষাতেও 'চন্দ্রবিন্দু'র ছড়াছড়ি প্রচুর, ও অপব্যবহারও বিরল নহে।

আমার গল্পের 'সুকলা' ও 'মাহি'র বাড়ী চাষগাঁয়ে' এবং চাষগাঁ মানভূম জেলায়। তাহাদের মুখ দিয়া বর্দ্ধমান বা বাঁকুড়ার কথা না বাহির হইয়া তাহাদেরই গ্রামের কথা বাহির হইয়াছে বলিয়া কি আপত্তির কারণ থাকিতে পারে, জানি না। স্বীকার করি যে, প্রবন্ধের ভিতর দু'একটি অবান্তর কথার অবতারণা মাঝে-মাঝে করিতে হয়, কিন্তু সেটা কদাচিৎ ও ক্ষেত্র-বিশেষে। তার পর সেটি সম্পূর্ণ অবান্তর হইলেও চলিবে না; প্রত্যক্ষভাবেই হউক, বা পরোক্ষভাবেই হউক মূল প্রবন্ধের সহিত সেটি জড়িত হওয়া উচিত।

বড়কা, সুকলা ও মাহি, সকলেই খাদে কয়লা কাটে; কিন্তু 'মালকাটা'গণ (যাহারা কয়লা কাটে) কখনও চিরকাল একই খাদে থাকে না। তাহারা নানাদেশের নানা খাদে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং তাহাদের কথার মধ্যে যে বিভিন্ন জেলার ভাষা থাকিবে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

সাঁওতাল কুলী-কামিনগণও দশ-জায়গায় ঘুরিয়া দশ-রকম ভাষা লইয়া তাহাদের মনোমত একটি ভাষা তৈয়ারী করে;—ইহা তাহাদের পক্ষে দোষের নহে। তাহাদের মাতৃভাষা সাঁওতালী;—"ওকাতে চালাকানা" (সাঁওতালী); ইহার বাংলা,—তুমি কোথায় যাচ্ছ।—এদু'টি ভাষার মধ্যে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। সুতরাং কলিয়ারীর সাঁওতালগণের ভাষা, তাহারা যে-যে জেলায় বাস করিয়াছে, সেইসব জেলার ভাষা লইয়াই সৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাহাদের একজনের বাংলা কথা অন্য আর-একজনের কথার সহিত হুবহু মিলে না;—কিছু তারতম্য থাকেই। কোনও বিশিষ্ট জেলার নিখুঁত গ্রাম্য ভাষা ইহাদের বাংলা কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, এবং ইহা আশা করাও আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা, এবং আমি গল্পটির ভিতর কোনও বিশিষ্ট জেলার চল্তি কথার উপর অধিক লক্ষ্য না রাখিয়া নায়িকার কথাবার্ত্তা যাহাতে স্বাভাবিক হয়, সেই চেষ্টাই করিয়াছি।

চট্টরাজ-মহাশয় বলেন যে, "গেঁইছিল" কথাটির কোথাও প্রচলন নাই। সাঁওতাল-পরগণায় আমার জীবনের অর্দ্ধেকের উপর কাটিয়াছে, এবং এখনও আমার সাঁওতাল-পরগণায় যাতায়াত আছে; বহু সাঁওতালের

বিকৃত বাংলাও আমাকে এখানে প্রতিনিয়তই শুনিতে হয়। তাহাদের মধ্যে যে "গেইছিল" কথাটা আছে একথা আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বলিতে পারি।

"কইছে" শব্দটি ইচ্ছা করিলে চট্টরাজ-মহাশয় মানভূম জেলায় অজস্রবার শুনিতে পাইবেন। "আখন' শব্দটির ভিতর একবারমাত্র ব্যবহার করা হইয়াছে এবং সে-স্থলে বোধহয় সাঁওতাল ত দূরের কথা, অন্য কোন রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী· গ্রাম্য ভদ্রলোকও "আখনি" কিম্বা "আখুনি" ব্যবহার করিবেন না।

"বেটা-টা," "ছেল্যা," "বাঁশিটে" এই ভুলগুলি চট্টরাজ-মহাশয় ঠিকই বাহির করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তবে ইহাতে প্রতিপন্ন হয় না যে, ঐ শব্দগুলি কি হওয়া উচিত আমি তাহা জানি না; কারণ শব্দগুলির পুনরুল্লেখের যেখানে দরকার হইয়াছে, সেইখানেই 'বেটা-ট," "ছেলা," ইত্যাদি আছে।

শ্রী সনৎকুমার চক্রবর্ত্তী
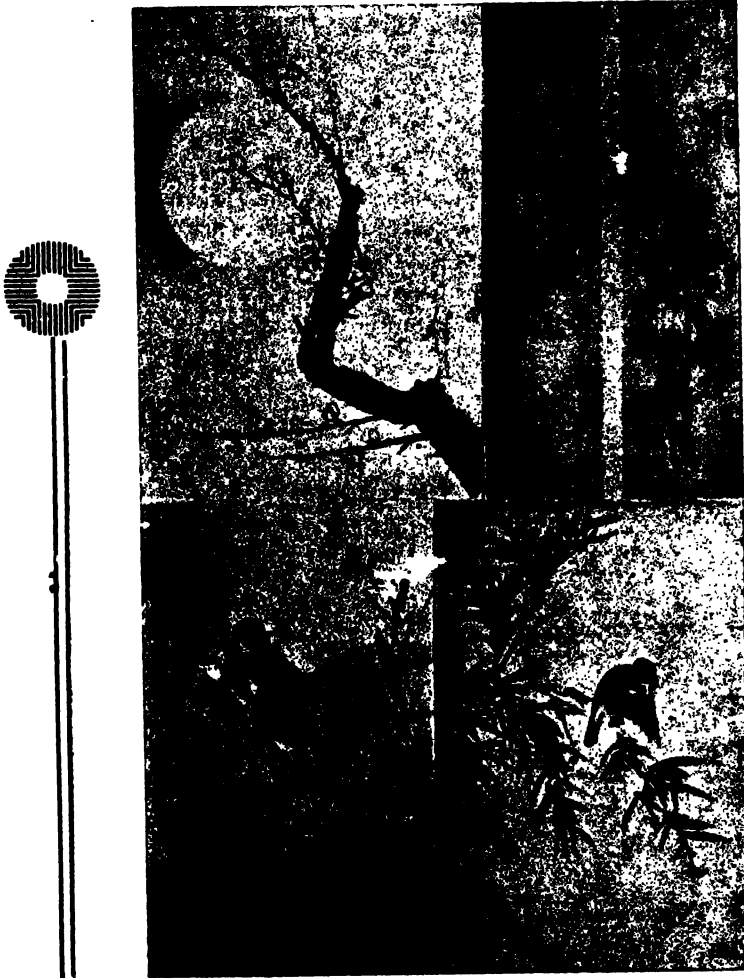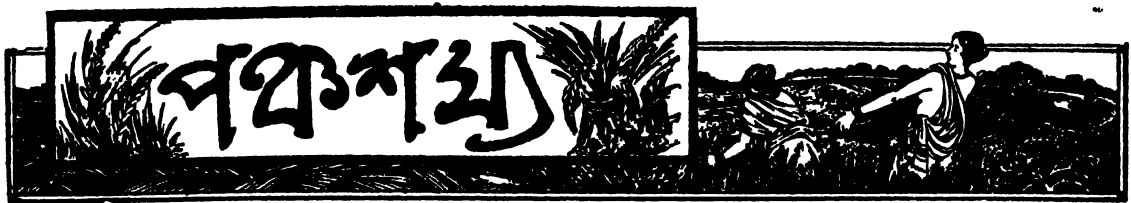
শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

শুক্র-গ্রহের কথা—

মঙ্গলগ্রহ লইয়া আমাদের এই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে নানাপ্রকার "জল্পনা-কল্পনা" চলিতেছে। একদল বৈজ্ঞানিক উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন —মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে। এদিকে আর-একদল বৈজ্ঞানিক শুক্র-গ্রহকে লইয়া পড়িয়াছেন। এই শুক্র-গ্রহ সকল সময় মেঘের আবরণে ঢাকা থাকে। এই মেঘের পর্দা ভেদ করিয়া কিছু দেখা একরকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের লিড্স্ নামক স্থান হইতে দূরবীক্ষণ এবং
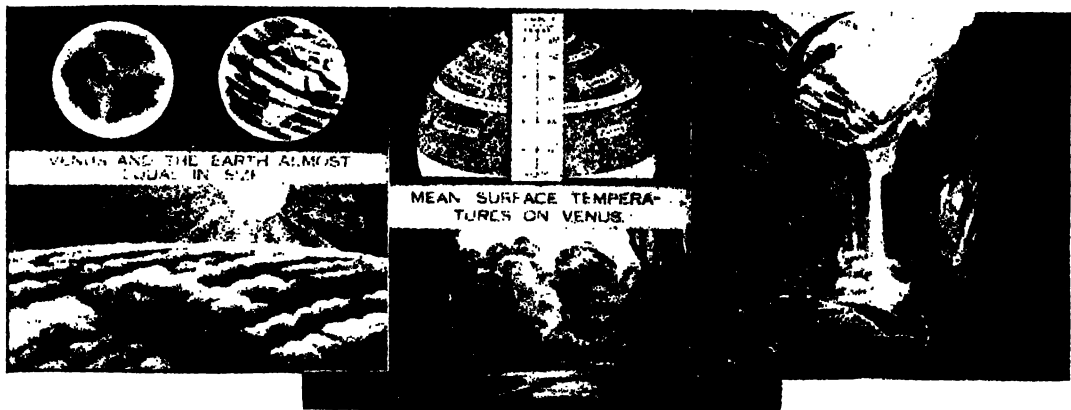
শুক্রগ্রহে ৮০ মাইল গভীর মেঘের অন্তরাল

শুক্রগ্রহের পরিচায়ক চিত্র

শুক্রগ্রহের গাছপালার দৃশ্য

শুক্রগ্রহবাসী জন্তুর কল্পিত চিত্র

আলোকছত্রবীক্ষণের ((eroscope) সাহায্যে শুক্রগ্রহের বিষয় অনেকনূতন-কিছু জানিতে পা গিয়াছে। এইসমস্ত নব আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক মনে করিতেছেন হয়ত শুক্রগ্রহে নানাপ্রকার ভীষণ-দর্শন জীবজন্তু বাস করে। এইসকল জীবজন্তু নাকি দেখিতে অনেকটা পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের পৃথিবীর জীবজন্তুদের মতন।

শুক্রগ্রহের আকার এবং অন্যান্য গুণ আমাদের এই পৃথিবীর মতনই বলা যায়। শুক্রগ্রহ অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটে আছে। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্বও মাত্র ৬৭,০০০,০০০ মাইল। শুক্রগ্রহ এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমরা এ গ্রহ-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছুই জানিতে পারি নাই এবং তাহার একমাত্র কারণ এই যে, শুক্রগ্রহের চারিদিকে একটি ঘন-মেঘের পর্দা সকল সময় পড়িয়া আছে। শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠ হইতে এই মেঘাবরণ ৮০ মাইল উচ্চে উঠিয়াছে।

আধুনিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে বোঝা যায় যে, শুক্রগ্রহের এই বহিরাবরণ ২০ দিনে একবার নিজের কক্ষে আবর্ত্তন করে। ইহার দ্বারা মনে হয়, শুক্রগ্রহের স্বীয় কক্ষে একবার ঘুরিতে প্রায় পৃথিবীর সমানই সময় লাগে। কারণ, দেখা গেছে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্র্যাকাটোয়া আগ্নেয়-গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত ধূলি পৃথিবী হইতে ৭০ মাইল দূরে থাকিয়া ২০ দিনে একবার সম্পূর্ণ আবর্ত্তন শেষ করে।

শুক্রগ্রহের আবহাওয়াও অনেকটা পৃথিবীর মতন। শুক্রগ্রহের স্যাঁৎসেতে জলহাওয়ার জন্য মনে হয় যে এইখানে নানাপ্রকারের গাছ-পালা আছে এবং অতিকায় নানাপ্রকার ভীষণ-দর্শন জীবজন্তু থাকাও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

—

রোমান্-স্থাপত্যের চিহ্ন—

অতি পুরাকালে আফ্রিকায় রোমান্‌দের একটি সহর ছিল। এই সহরটির নাম লিপ্‌টিস্ ম্যাগ্‌না। ডাঃ ব্রনো রসেলি নামক একজন অধ্যাপক এই লুপ্ত-সহরে নানা-প্রকার খনন-কার্য্য করিতেছেন। এক-স্থানে খনন করিতে একটি ভোজনাগারের চিহ্ন পাইয়াছেন। এই ভোজনাগারের মেঝেটি একটি দেখিবার জিনিষ। মেঝেটিকে দেখিলে
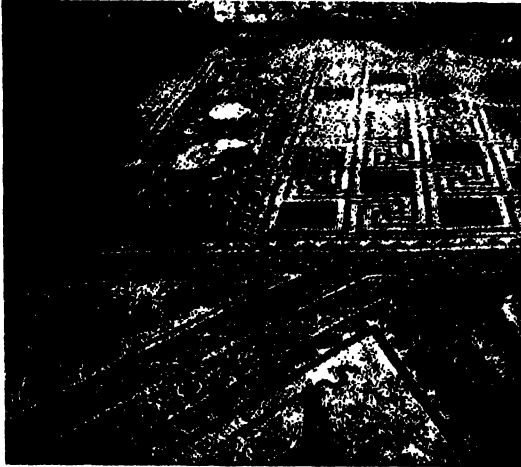
রোমানদের প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন বালির নীচে প্রাপ্ত একটি মেঝের উপর কারুকার্য্য

একটি বহুমূল্য পারস্য কারপেট্ বলিয়া মনে হয়। এই সহরে আরো এমন সমস্ত ঘর-বাড়ী ইত্যাদি বালির নীচে চাপা পড়িয়া আছে, যাহাদের আবিষ্কার পম্পিয়াই সহরের আবিষ্কারকেও পরাজিত করিবে। ইংলণ্ডেও আজকাল নানাপ্রকার, প্রাচীন রোমান্‌দের তৈরী ঘর-বাড়ী, মন্দির ইত্যাদি আবিষ্কার হইতেছে।

—

আঙুর-লতা পুতিবার কল—

আমাদের দেশে খুব কম স্থানেই চাষবাসের কাজে কল ব্যবহার করা
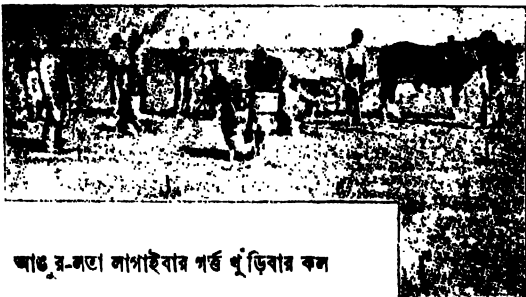
আঙুর-লতা লাগাইবার গর্ত্ত খুঁড়িবার কল

হয়। বলদ-টানা লাঙল মই ইত্যাদিই আমাদের চাষবাসের একমাত্র ভরসা। আমাদের দেশের অবস্থাই ইহার প্রধান কারণ।

আমেরিকা ইত্যাদি ধনী দেশের চাষীরা তাহাদের সব-রকম কাজেই কল ব্যবহার করে। সম্প্রতি আঙুর-লতা লাগাইবার কাজে একপ্রকার কল ব্যবহার হইতেছে। এই কলের সাহায্যে ১০ দিনে ৬০,০০০ আঙুর গাছ লাগাইবার গর্ত্ত মাটিতে করা যায়। এবং ইহাতে দিন প্রতি ১২০০ টাকা খরচ বাঁচে। প্রত্যেকটি গর্ত্তের ব্যাস ৩ ইঞ্চি এবং গভীরতা ১৮ ইঞ্চি হয়। গর্ত্তগুলি এমনভাবে করা হয়, গাছ লাগাইবার পর চারিপাশের জমা মাটির দ্বারা অতি সহজেই গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দেওয়া যায়। এই কল চালাইতে মাত্র দুইজন লোক লাগে, এবং আটজন লোক চারা লাগাইতে ব্যস্ত থাকে। এই গর্ত্ত-খোঁড়া কল-ব্যবহারে সময় এবং খরচ দুইই অনেক পরিমাণে বাঁচে।

—

অভিনব যান—

আমাদের দেশে আমরা কয়েক-প্রকারের বিশেষ-বিশেষ গাড়ী ছাড়া খুব অদ্ভুত বা অভিনব-ধরণের গাড়ী বিশেষ দেখিতে পাই না বলিয়া মনে

কুকুর-গাড়ী

হয়। বিদেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার অদ্ভুত এবং অভিনব গাড়ী দেখা যায়। তাহার কতকগুলির নমুনা দিলাম।

কুমীর-গাড়ী
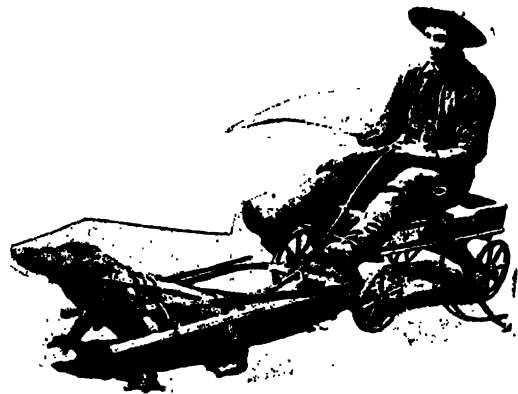
(১) রুশীয় উল্ফ্ হাউণ্ডের (কুকুরের) জুড়ি। কুকুর-দুটিকে খুব ভালো করিয়া পোষ মানাইয়া তাহাদের গাড়ী টানিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহারা অবশ্য খুব বেশী বড় গাড়ী টানিতে পারে না। তবে ইহারা যে

গাড়ী টানে, তাহা বেশ দ্রুত-বেগে এবং ভালো করিয়া টানে। এই কুকুরেরা সহজে ক্লান্ত হয় না বলিয়া, ছোট-ছোট গাড়ী টানিবার পক্ষে ইহারা বিশেষ উপযোগী।

ছাগল-গাড়ী

উটপাখীর গাড়ী

(২) কুমীর-গাড়ী—কুমীরটিকে গাড়ী টানিবার মতন পোষ মানানো শক্ত কাজ। কিন্তু সে একবার পোষ মানিলে তাহাকে দিয়া অতি সহজেই গাড়ী টানানো যায়। গাড়ীখানিকে কুমীরে টানিবার মতন করিয়া তৈয়ার করিতে হয়। পূর্ণবয়স্ক লোককে একটা কুমীর বেশ সহজেই টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

(৩) উটপাখীর গাড়ী—এই গাড়ীর গতি পূর্ব্বোক্ত গাড়ীগুলি অপেক্ষা বেশী। একবার ভালো করিয়া গাড়ী টানিতে শিখাইয়া লইলে উটপাখী খুব ভালো করিয়া গাড়ী টানিবে। আমরা উটের গাড়ী দেখিয়াছি, কিন্তু উটপাখীর গাড়ী দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

(৪) ছাগল-গাড়ী—ইহাকে একপাল-ছাগলের গাড়ী বলা উচিত। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এই ছাগল-টানা গাড়ী দেখিতে কেমন। পাঁচ-জোড়া ছাগলকে একই সময়ে এবং একইভাবে একই দিকে চলিবার শিক্ষা দেওয়া কাজটি বিশেষ শক্ত। অষ্ট্রেলিয়ার চাষারা এই ছাগল-গাড়ী ব্যবহার করে। তবে অবশ্য ভারী মাল-বোঝাই গাড়ী ইহারা টানিতে পারে না।

অঙ্গুরি-কম্পাস্—

বন-জঙ্গলে ভ্রমণকারী এবং ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রিদের "কম্পাস" বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র প্রায়ই দরকার হয়। বড় কম্পাস্ সকল সময় লইয়া বেড়ানো সুবিধার হয় না। আঙুলের আংটিতে একপ্রকার কম্পাস বসানো যায়। এই কম্পাসে সকল-রকম কাজই বেশ ভালোভাবেই চলে।

এই কম্পাস্ আংটিগুলি দেখিতে কুদৃশ্য নয়। সোনার আংটিতে পাথর-বসানোর মতন দেখিতে সুদৃশ্য।
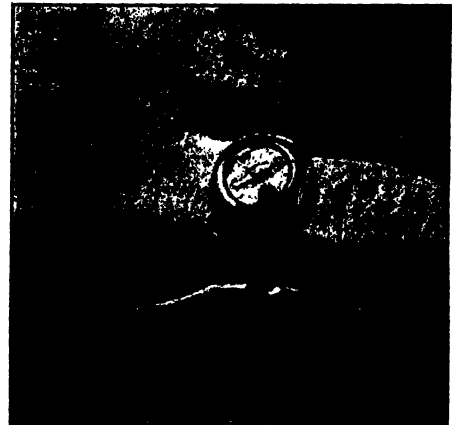
অঙ্গুরি-কম্পাস্

কম্পাসটি কাঁচের আবরণে থাকে এবং অতি শক্তভাবে বসানো। হাতের নাড়ানি-ঝাঁকানিতে সহজে নষ্ট হইবার নয়।

ছবিতে যে কম্পাসটি দেওয়া হইয়াছে ইহাই নাকি ক্ষুদ্রতম কম্পাস-অঙ্গুরি।

পরগাছা—

একটি পাকা লাউএর গায়ে যব, ধান, ছোলা ইত্যাদির বীজ একটু করিয়া ঢুকাইয়া লাউটিকে ঘরের মধ্যে একটু আলোকযুক্ত স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলে কিছুকাল পরে দেখা যাইবে, লাউএর গায়ে নানাপ্রকার

লাউ-এর উপর কতরকম গাছ জন্মাইয়াছে দেখুন

গাছের অঙ্কুর বাহির হইতেছে। এইসমস্ত অঙ্কুরে জল-সেচন করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। লাউএর মধ্যের রসের দ্বারা ইহারা নিজেদের পুষ্টিসাধন করে এবং ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। অঙ্কুরগুলি বড় হইলে লাউটিকে একটি ছোট-খাট উদ্যান বলিয়া মনে হয়। গাছগুলি যখন বেশ-একটু বড় হয়, তখন লাউটিকে আর লাউ বলিয়া চিনিবার উপায় থাকে না—এক অদ্ভুত গাছ বলিয়া মনে হয়। কুমড়াতেও এই কার্য্য চলিতে পারে।

—

মানুষ এবং ঘোড়ার দৌড়—

লণ্ডনে একটি মানুষ এবং একটি ঘোড়াতে দৌড় হয়। এই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ঘোড়া হারিয়া যায়। সি, ডাবলিউ, হার্ট নামক ৫৯ বৎসর বয়স্ক বিখ্যাত দূর-দৌড়নেওয়ালা একটি ভালো ঘোড়ার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা করেন। প্রত্যেক দিন ১০ ঘণ্টা করিয়া দৌড় হইত। পাঁচ দিনের পর ঘোড়াটি অসমর্থ হওয়ায় তাহাকে দৌড় হইতে টানিয়া লওয়া হয়। মিঃ হার্ট আট মাইলে ঘোড়াটিকে পরাজিত করিয়াছেন। হার্ট দৌড়িয়াছেন মোট ৩৪৫ মাইল। ঘোড়াটি দৌড়িয়াছে ৩৩৭ মাইল।

মানুষের সহিত ঘোড়ার দৌড়—মানুষ জিতিয়াছে

এই প্রতিযোগিতায় ইহা প্রমাণ হইল যে, দৌড়ানো অভ্যাস করিলে মানুষ, ঘোড়া অপেক্ষা, বেশীক্ষণ এবং বেশীদিন, দৌড়াইতে পারে। মানুষের ধৈর্য্য-শক্তিও ঘোড়া অপেক্ষা বেশী।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় ষাঁড়—

এই ষাঁড়টি ৬ ফুট উচ্চ। ক্যানাডা ইহার জন্মস্থান। উয়েম্বলি প্রদর্শনীতে ইহাকে দেখানো হয়। ইহার পরিধি ১০৷৷০ ফুট, ওজন ২৮৩৪

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ষাঁড়

পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪০ মণ। প্রদর্শনীতে এই ষাঁড়টি একটি বিশেষ দেখিবার জিনিষ ছিল। সামনের যে-লোকটি দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিলেই এই ষাঁড়টির আকারের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

—

গৌরীশঙ্কর অভিযান—

এ-বৎসর আবার গৌরীশঙ্কর অভিযান হইবে। ইহার পূর্ব্বে এই অভিযান তিনবার হইয়া গিয়াছে। এইবার লইয়া চতুর্থ বার হইবে। গত-

বারের অভিযান অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ম্যালোরি এবং আরভিন্ নামক দুইজন বিশিষ্ট অভিযাত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়া [ঝড় এবং বরফের আক্রমণে] অভিযানের দল গৌরীশঙ্কর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অনেকের মতে ঐ দুইজন মৃত ব্যক্তি নাকি মরিবার পূর্ব্বে গৌরীশৃঙ্গের চূড়ার উপর আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কোনো বিশেষ প্রমাণ নাই। গতবারের অভিযানের নেতা ছিলেন জেনারেল্ ব্রুস্। গতবারের অভিযানে ম্যালোরি এবং আরভিন্ ছাড়াও ডাঃ কেলা, দুইজন নন্-কমিশন্‌ড্ অফিসার এবং একজন নেপালী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এতগুলি লোকের মৃত্যুতে জেনারেল্ ব্রুসের মনে দুঃখ হইয়াছে অতি ভয়ানক, কিন্তু তাঁহাকে ভগ্নোৎসাহ করিতে পারে নাই। এই মহাবীর জেনারেল্ ব্রুস্ বয়সে প্রবীণ—কিন্তু তিনি আবার গৌরীশঙ্কর আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

গৌরীশঙ্কর অভিযানের যে-সমস্ত ছবি ইংরেজী, ফরাসী নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, অভিযাত্রী দল গৌরীশৃঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের অতি নিকটে উঠিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ম্যালোরি এবং আর্‌ভিন্ চূড়ার উপরে না উঠিলেও তাঁহারা যে গৌরীশৃঙ্গের চূড়ার মাত্র কয়েকশত ফুট নীচে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে যেস্থানে শেষ দেখা গিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে পর্ব্বত-গাত্রে অত উচ্চ স্থানে আর-কোন মানুষ আরোহণ করে নাই। তাঁহাদের শেষ যেস্থানে দেখা গিয়াছিল থিওডোলাইট্ যন্ত্রের সাহায্যে সেই স্থানের উচ্চতা ২৮,২৭৭ ফুট বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই স্থান গৌরীশৃঙ্গের চূড়া হইতে মাত্র ৮০০ ফুট নীচে।
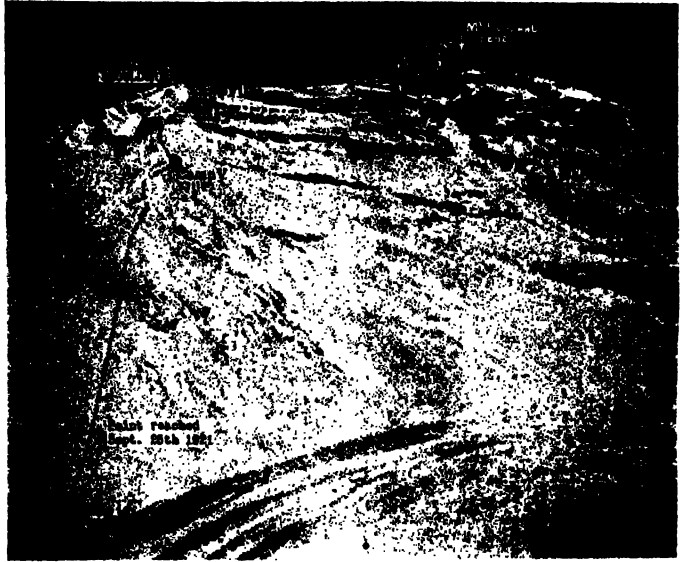
গৌরীশঙ্কর-অভিযাত্রীদের পথের নক্সা

অভিযাত্রী দলের অনেকে এইসমস্ত মহোচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার। এইসমস্ত বরফে আবৃত পর্ব্বতের উপর সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের সময় বরফের উপর সোনালি, রূপালি, সবুজ, সুনীল কতপ্রকার মনোহরণ রঙের খেলা এবং নৃত্য হয়, পর্ব্বতের নীচে সমতল-ভূমিতে কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। ম্যালোরি এবং আর্‌ভিনের সম্বন্ধে একজন বলেন :—৫নং ক্যাম্প হইতে ম্যালোরি এবং আর্‌ভিন্ আমাদের ছাড়িয়া উচ্চে গৌরীশৃঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১২-৫০ মিনিট সময়ে গৌরীশৃঙ্গের অতি নিকটে একটি চূড়ার উপর একটি কালো দাগ নড়িতেছে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে আমার মন নাচিয়া উঠিল—আর একটু পরে দেখিতে পাইলাম আর-একটি কালো দাগ পূর্ব্বোক্ত দাগের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর তাহারা আর-একটু অগ্রসর হইয়া গেল, তাহারা সর্ব্বোচ চূড়ার উপর একবার দাঁড়াইল। তাহার পর হঠাৎ সেইস্থান তুষার-ঝটিকায় পূর্ণ হইয়া গেল। ঝড় চলিয়া গেলে পর দেখিলাম, সেইস্থানে আর কোনপ্রকার চিহ্ন নাই। ম্যালোরি এবং আর্‌ভিন্ চিরকালের মত অদৃশ্য হইয়া গেল।
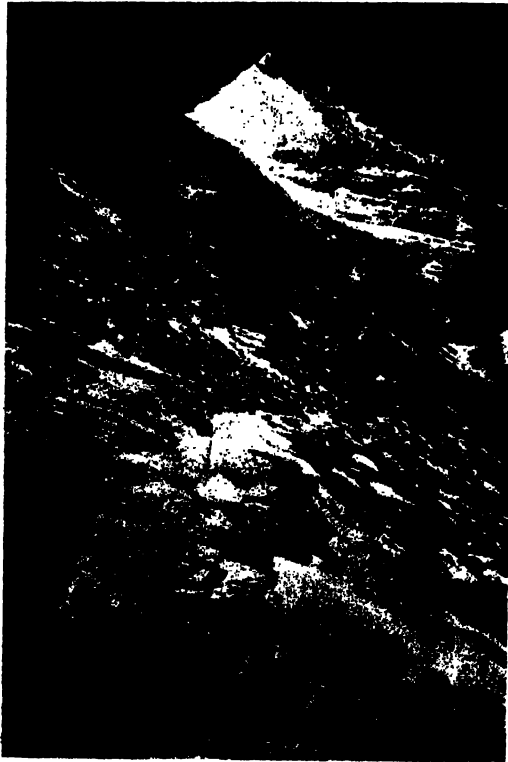
ছবিতে দেখুন একজন গৌরীশৃঙ্গ চূড়ার কত নিকটে উঠিয়াছেন। কর্ণেল্ নর্টন এই দুর্জ্জয় পথে ঘণ্টায় ৮০ ফুট করিয়া চড়িতে সক্ষম হন

এই ঘটনার পর দলের সকল লোক মৃত দুইজনের জন্য যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহারা বিষম ঝড়ের মধ্যে প্রাণপণ করিয়া যাত্রা করিবার করিলেন, কিন্তু মৃত দুইজনের

কোনোপ্রকার পাত্তা না পাইয়া, তাঁহারা ভারাক্রান্ত-চিত্তে ক্যাম্পে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

ম্যালোরি এবং আরভিন্ যে কাজ প্রায় শেষ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমাপ্ত করিবার ভার দলের অন্যান্য জীবিত সকলের উপর রহিয়াছে—এই বোধ লইয়া দলের অন্যান্য সকলে এবং নতুন কয়েকজন আবার অভিযান সুরু করিবেন। বীরের দলের এই প্রচেষ্টা দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন। মানুষের শক্তির এবং অধ্যবসায়ের নিকট প্রকৃতি অবশেষে পরাজিত হইবে। যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহারা মৃত্যুর মাঝখান দিয়া গিয়া মৃত্যুকে জয় করে। এইপ্রকার নিঃস্বার্থ বীরত্ব এবং তেজ দেখিয়া মনে আনন্দ আসে।

—

শতঘাতী হাউই—

একধরণের নতুন হাউই আবিষ্কার হইয়াছে। এই হাউই কালী-পূজার সময়কার বাজি পোড়াইবার সাধারণ হাউই নহে। যুদ্ধের সময়ে এই হাউই দ্বারা সহস্র লোকের প্রাণবধ করা চলিতে পারে। এই বিষম অস্ত্রটির আবিষ্কর্ত্তা একজন ইংরেজ। তাঁহার নাম আর্নেষ্ট্ ওয়েল্‌স্। হাউইটির মধ্যে নানাপ্রকারের বিষাক্ত ধাতু ভরা থাকিবে এবং হাউইটি শূন্যে প্রায় পাঁচ মাইল উঠিয়া এই গলিত বিষাক্ত ধাতু নীচের শত্রুপক্ষের মস্তকে বর্ষণ করিবে।

শতঘাতী হাউই-এর কেরামতির ছবি

এইধরণের একটি ছোট হাউই লইয়া যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, একটি রকেট্ ১০০ বর্গ গজ স্থানের উপর নানাপ্রকার জ্বলন্ত দ্রব্যাদি বর্ষণ করিবে। এই জ্বলন্ত দ্রব্যগুলি যে-সকল জিনিষের উপর পড়িবে, তাহাতেই আগুন ধরাইয়া দিবে।

এক-একটি হাউইএর মধ্যে ৭০০ শত পেলেট্ (pellet) ঠাসা থাকিবে। অবরুদ্ধ সহরের মধ্য হইতে এই হাউই অবরোধকারী শত্রু-সৈন্যদের উপর বেশ সহজেই নিক্ষেপ করা যাইবে। এরোপ্লেন্ ইত্যাদি হইতেও এই হাউই নীচের দিকে ছোড়া যাইবে। মাটি হইতে ৩০০ ফুট উপরে হাউই ফাটিয়া গুলি এবং অন্যান্য জ্বলন্ত দ্রব্যাদি নীচের লোকের উপর গিয়া পড়িবে।

ছবি দেখিলে এই হাউইটির কার্য্যকারিতা বেশ সহজেই উপলব্ধি হইবে।

—

কায়দা-মাফিক্ বসা—

সাধারণ লোকের কথা বাদ দিয়াই বলা যায়, বর্ত্তমান সময়ের অনেক অভিনেত্রী এবং নেতা কি-রকমভাবে বসিতে হয়, তাহা জানে না। "বসা" জিনিষটি সহজ, কিন্তু ঠিক লেফাফা-দুরস্তভাবে বসা একটি বিশেষ শিখিবার জিনিষ। অনেকে ছবি তোলাইবার সময় এমন

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বসিবার ভঙ্গি—শ্রীমতী সারা সিডন্‌স্

কদাকারভাবে সাজগোজ করিয়া বসে যে, তাহাদের দেখিলে হয় রাগ হয়, নয় হাসি পায়। বসা-অবস্থায় দেখিতে ভালো থাকে এমন নারী কিম্বা পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। ছবিতে একটি বসিবার ভঙ্গি দেওয়া হইল। এই ভদ্রমহিলার মতন এমন চমৎকার, অথচ সম্রাজ্ঞীর মতো নাকি কেহ আর 'বসিতে' পারে নাই। এই ভদ্রমহিলার নাম সারা সিডন্‌স্। এই শ্রেষ্ঠ বসিবার ভঙ্গিটিকে চিত্রকর গেনস্‌বরো অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

—

অভিনব ক্যামেরা—

একই ক্যামেরার সাহায্যে একই লোকের বিভিন্নভাবে অনেকগুলি ফোটো পর-পর তোলা যায়—এইরকম একটি ক্যামেরা আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি ছবি তোলা হইবামাত্র ফিল্মটি একপাশ হইতে অন্যপাশে একটু সরিয়া যায় এবং ক্যামেরার মুখে ফিল্মের অব্যবহৃত

অংশে আসিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত ফিল্ম্‌টিতে যাহাতে আলো না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা আছে। ফিল্ম্‌টিকে একটু-একটু করিয়া ক্যামেরার মুখে আনিবার জন্ত কোন কল টিপিতে হয় না, একটি ছবি তোলা হইয়া
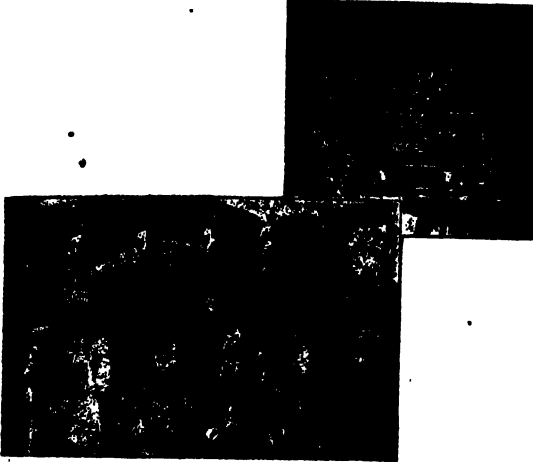
নতুন-ধরণের ক্যামেরা—একটি প্লেটে কয়েকখানি বিভিন্ন ছবি

গেলেই আপনা হইতেই এইসব হয়। এই ক্যামেরার সাহায্যে একটি ফিল্মের উপর অনেকগুলি ছবি তোলা সহজসাধ্য হইয়াছে।

গায়েনার জঙ্গলের কথা—

উইলিয়ম্‌ বিব নিউইয়র্ক পশুশালার বাগানের একজন কর্ম্মচারী। তিনি নতুন-নতুন জীব-জন্তুর খোঁজে ব্রিটিশ গায়েনার জঙ্গলের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই প্রদেশের অতি গভীর বন-প্রদেশ হইতে তিনি নানাপ্রকার অদ্ভুত-অদ্ভুত জীব-জন্তু খাঁচায় বন্দী করিয়া লোক-চক্ষুর

ব্রিটিশ গায়েনার খলজন্তু (ডগ-ফিশ) জলে বাস করে

সামনে আনিয়াছেন। এইসমস্ত জন্তুগুলির মধ্যে কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে লোকের চোখে আর কোনোদিনও পড়ে নাই।

মিঃ বিবের বয়স ৪৭ বৎসর, তাঁহাকে দেখিলেই পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় এবং তিনি পণ্ডিতের মতনই কথাবার্ত্তা বলেন। রৌদ্রে পুড়িয়া এবং ক্রমাগত বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার হাত, কপাল এবং মুখের রং মিশ মিশে কালো হইয়া গেছে। তাঁহার শরীর খুব সবল নয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি অনেক সময় কেবলমাত্র তাঁহার অসাধারণ সাহসকে অস্ত্র-রূপে লইয়া খালি হাতে অনেক অতি-ভয়ানক হিংস্র প্রাণীকে বশে আনিয়াছেন। একবার তিনি জঙ্গলে তাঁহার ছোট কুটীরে রাত্রে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড চামচিকা (vampire bat) তাঁহার হাতে আসিয়া বসিল। মিঃ বিব্‌ একটুও না নড়িয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন—চামচিকে রক্ত শুষিবার সময় শরীরে কেমন অনুভূতি হয়, কেবল এইটুকু জ্ঞান-লাভ করিবার জন্ত।

গায়েনার জঙ্গলে একটা বোড়া সাপ ধরা হইয়াছে, ডান দিকে মিঃ বিবকে দেখুন—সাপটিকে পরীক্ষা করিতেছেন

বিব একবার দলবল লইয়া জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা কোথাও জন্তু খুঁজিতে-খুঁজিতে কোনো-কিছু না পাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় তাঁহার দলের একজন লোক ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং হাঁ করিয়া সামনের দিকে আঙুল বাড়াইয়া দিল। তাহার বাক্‌শক্তি যেন হঠাৎ লোপ পাইয়া গেল। দলের সকলে সভয়ে এবং সবিস্ময়ে সামনে চাহিয়া দেখিল, সামনে প্রায় ৫০ ফুট দূরে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার তাহার রক্তচক্ষু বাহির করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ভয়ে কাহারো মুখে কথা নাই—সকলেই অসাড় হইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া কেবল সামনের দিকে চাহিয়া রহিল। জানোয়ারটা কিছুক্ষণ সকলের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ ভয়ানক বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। তাহার হঠাৎ এইরকম বিরক্তি না হইলে সে দলের অনেককেই অনায়াসে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারিত।

আর-একবার মিঃ বিবের দল একটা ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বিপদ্‌ পার হইবার পূর্ব্বে দলের কোন লোকেই বুঝিতে পারে নাই যে, তাহারা কত বড় একটা বিপদে পড়িয়াছিল। বিবের দলবল সকলে বাংলোর সামনে বসিয়া আছে, এমন সময় মিঃ বিব্‌ দেখিলেন যে, সামনের নদীর জলে একটা কালো ডাঙার মতন কি-একটা তাঁহাদের দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। মিঃ বিব্‌ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"ant-eater!"—এই বলিয়া দলবল সকলে মিলিয়া দু'খানা নৌকা এবং জাল

ইত্যাদি লইয়া তাঁহারা জলে নামিয়া পড়িলেন। জন্তুটাকে কোন-রকমে জালের মধ্যে পাকড়ানো হইল। জন্তুটা হঠাৎ জালবদ্ধ হইয়া ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিল এবং প্রাণপণে লড়াই করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত নদীর জল তাহার লাফানি-ঝাপানিতে দোল খাইতে লাগিল। মাঝে-মাঝে নৌকা দু'টাও ভাঙিয়া চুর হইয়া যাইবার মতো হইতে লাগিল।

গায়েনার রাক্ষস গিরগিটির মুখ—সমস্ত গিরগিটিটা ৬ ফুট লম্বা

এইরকম করিতে-করিতে (র‍্যান্ট্ ইটার) ...টা হঠাৎ মিঃ বিবের নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। মিঃ বিব্ প্রাণপণে তাহাকে দাঁড়ের সাহায্যে ঠেকাইতে লাগিলেন এবং অন্য লোকেরা ততক্ষণ নৌকাখানাকে

মিস্ ইসাবেল্ কুপার্ একটি সাপকে হাতে জড়াইয়া তাঁহার নক্সা আঁকিতেছেন—ইনি মিঃ বিবের দলে আছেন

ডাঙায় লইয়া তুলিল। ডাঙায় তুলিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে খাঁচা-বন্দী করা হয়। খাঁচাও পাওয়া যাইত না, কেবল দলের একজন নারীর সাহায্যে খাঁচা পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড় খাঁচায় একটা বোড়া সাপ ছিল, একজন নারী সেই বোড়া সাপটাকে হাতে করিয়া তুলিয়া একটা ছোট খাঁচায় ভরিয়া দিয়া বড় খাঁচাটাকে ant-eaterটার জন্ত খালি করিয়া আনিলে পর তাহাকে এই খাঁচায় বন্দী করা হয়।

খাঁচা-বন্দী হইলে পর সকলে এই জন্তুটিকে দেখিতে আরম্ভ করিল। বিব্ এবং তাঁহার দলের অন্য কেহ এত বড় ant-eater আর কখনও দেখেন নাই। এই জন্তুটি আট ফুট লম্বা এবং তাহার নাকটি ৭ ফুট। সমস্ত দেহটা কালো শক্ত চুলে ভরা—তাহার ল্যাজটা বেশ ঘন লোমে আবৃত। ইহার থাবাগুলি সিংহের থাবার দু'গুণ লম্বা এবং তেম্নি ধারালো।

গায়েনার জঙ্গলের অদ্ভুত-দর্শন চামাচকা—পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত জন্তু নাকি আর নাই

এই ant-eater জন্তুরা পিঁপড়ে খাইয়া প্রাণধারণ করিলেও ইহারা অতি হিংস্র এবং বলবান্।

মিঃ বিবের ধৃত আরো কয়েকটি জন্তুর পরিচয় দিব। ছবিতে দেখুন, মিঃ বিব্ এবং তাঁহার দলের কয়েকজন লোক একটি বোড়া সাপকে বন্দী করিতেছেন। এই সাপটি লম্বায় ৯ ফুট এবং ইহার পরিধিও বেশ কয়েক ইঞ্চি। দলের দুইজন স্ত্রীলোক এই বোড়া সাপটিকে ধরে। ধরিবার সময় বেশ একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোক-দুটি একটু অসাবধান বা কম তৎপর হইলে সাপটা তাহাদের জড়াইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিত। এই সাপটা এখন চিড়িয়াখানায় আছে—কিন্তু এখন তাহার তেজ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

জঙ্গলে মিঃ বিব্ এবং তাঁহার দলের লোকেরা ছোট-খাট একটি বাগানের মতো করিয়াছিলেন। একদিন সকালে উঠিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সমস্ত বাগানের সবুজ পাতা আকাশে উড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। এক-রকম পাতা-খেকো ডানাওয়ালা পিঁপড়ে এইরকম করিয়া গাছ-পালার পাতা কাটিয়া উড়িয়া যায়। ইহারা পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু কাঁচা পাতা খায় না। পাতা চিবাইয়া-চিবাইয়া ইঁহারা মাটির নীচে তাহাদের আবাসে ফেলিয়া দেয়। সেখানে এগুলি সার হয়। এই সারের

উপর একপ্রকার ছাতা হয়, এই ছাতা খাইয়াই ইহারা বাঁচে। হাজার-হাজার গাছের পাতাকে এই পোকারা তাহাদের ছাতা ভালো করিয়া গজাইবার সাররূপে ব্যবহার করে। মাটির ঢিপি খুঁড়িয়া যদি এইসব পিঁপড়েদের ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া ফেলা যায়, তবে ইহারা দল বাঁধিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে, এবং বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। ইহারা অন্ধ—স্পর্শ এবং সহজাত সংস্কারের সাহায্যে ইহারা শত্রুকে আক্রমণ করে।

ব্রিটিশ গায়েনার নদীতে ডগ্-ফিশ বা শ্বমৎস্ত নামে একপ্রকার মাছ বাস করে। ইহারা অতি ভয়ানক হিংস্র এবং কুকুরের মতন দাঁতওয়ালা। নদীর জলে ইহারা যেন সকল সময় মানুষ খাইবার জন্ম ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। সাঁতারিকে সকল সময় অতি সাবধানে জলে নামিতে হয়।

এইস্থানে একপ্রকার জঙ্গ্‌লী বাদুড় পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে ইংরেজিতে devil-headed jungle bat বলে। ইহাদের মতন অদ্ভুত জন্তু নাকি পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়। মিঃ বিব্ ইহাদের একটিকে অতিকষ্টে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন।

মিঃ বিব, ৬ ফুট লম্বা একটি গিরগিটি ধরিয়াছেন। এই গিরগিটি নাকি পুরাকালের অতিকায় জন্তুদের বংশধর। এই গিরগিটির পূর্ব্ব-পুরুষেরা মানুষ জন্মিবার বহুপূর্ব্বে এই পৃথিবীতে মনের আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বয়স বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদের আকার ছোট হইয়া গিয়াছে।

পিপীলিকা-খাদকের মতনই একপ্রকার পাখী পাওয়া যায়। এই পাখীদের ইংরেজী নাম "hoatzin bird"—ইহারা অতি দুষ্প্রাপ্য। আকারে ইহারা পোষা-মুরগীর মতন। গায়ের রং কালো এবং সোনালি-ধূসর। ইহাদের চোখ বড়-বড় এবং লাল। ইহারা অতি কদাকার-ভাবে উড়ে এবং বেশী উড়িতেও পারে না। ইহাদের ডানার শেষে একটি বেশ বড়-গোছের আঙুল আছে। এই আঙুল ইহারা বাচ্চা অবস্থায় গাছে চড়িবার সময় ব্যবহার করে। এই পাখীরাও গাছের পাতা খাইয়া জীবন যাপন করে।

বীণার নবঝঙ্কার

শ্রী জীবনময় রায়

ছন্দের মৃদঙ্গাঘাতে, হে কবীন্দ্র, আবার সহসা
প্রাণের হিল্লোলে
বহুদিন-মৌন বীণা মন্দ্রিল কি গম্ভীর নিঃস্বনে
সিন্ধুর কল্লোলে ?
যৌবন কি মুঞ্জরিল ? বসন্তের সঞ্জীবনী রসে
জাগিল আবার
মঞ্জুল-গুঞ্জন ছন্দ, মঞ্জীর-শিঞ্জিত মঞ্জু তান
সঙ্গীত মল্লার।
কবে কোন্ সিন্ধু-তীরে অযত্নে ফেলিয়া দিয়া তুমি
এই বীণাখানি
পলাতকা কুরঙ্গীর অন্বেষণে বাউলের বেশে
চলিলে না, জানি ;
শ্রাবণে, শারদ প্রাতে, বসন্তের নব সমারোহে
তাই মোর হিয়া
উৎসব-ঝঙ্কার-মাঝে দরদিয়া বাউলের গানে
গেছে উদাসিয়া।
একমনে বাজাইয়া তৃষিত প্রাণের করুণায়
বাঁধা একতারা,
গলাইয়া গগনের গভীর বেদনা ঝরাইলে
শ্রাবণের ধারা।

এমনি বরষা কত আসিয়াছে এলাইয়া তার
মেঘময়ী বেণী,
তোমারি সঙ্গীত-ছন্দে ঘন মৃদঙ্গের কলরোলে
তারে কি রচেনি ?
করেনি কি চিত্ত মোর নৃত্যমদে উন্মত্ত চঞ্চল
উতলা কলাপী ?
জাগায়নি বিরহ কি কলকণ্ঠে নিভৃত কুলায়ে
কপোত প্রলাপী ?
নব বারিধারাস্নাত ধরণীর সুগন্ধ উচ্ছ্বাস
উঠেছে আকুলি',
মুগ্ধ অভিসারে বধূ গভীর আঁধারে চলিয়াছে
গৃহদ্বার খুলি'।
বর্ষার মঞ্জীরগুঞ্জে পত্রে-পত্রে ঝর্ঝর-সঙ্গীতে
সারাদিনমান ;
শ্রাবণের অবিরল জলধারা ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে
অবসন্ন প্রাণ।
কেতকীপরাগ-রেণু ভালে তব দিল ভালোবেসে
পথিকের বালা।
বর্ষা তব কণ্ঠে দিল আপনার কেশ মুক্ত করি
বিদ্যুতের মালা।

তার পর একদিন মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হানি'
ভেদিয়া আঁধার
শরতেরে জাগাইলে মরতের পুষ্পিত লীলায়—
হাসে চারিধার।
তৃণেতৃণে পত্রে পুষ্পে শিশিরের মুক্তাফলদল
রচিল মালিকা,
ধরণী বরিল তারে পদ্মহারে বরষিয়া শিরে
লাজ-শেফালিকা।
নির্ম্মল-উজ্জ্বলসাজে সাজাইলে শারদলক্ষ্মীরে
হে ভাস্বর রবি!
আজিও ভাসিছে চিত্তে কাশপুষ্প-মেঘের ভেলায়
সেই শুভ্র ছবি।
নীলাকাশ চিত্রপটে স্বজিলে কি মায়ামন্ত্র-বলে
নয়ন-নন্দন!
সেদিন শারদলক্ষ্মী তোমারি ললাটে আঁকি' দিল
তিলক চন্দন।
আবার মাধবী মাসে নবীন মঞ্জরী উঠেছিল
হরষে মুঞ্জরি'
তোমার সঙ্গীত-ছন্দে ;—ধরার গুণ্ঠন গেল ঘুচি'
উঠিল গুঞ্জরি'
রবির অরুণ বীণা। আকাশ উঠিল গাহি' গান ;
চঞ্চল নির্ঝর
উল্লাসে ছুটিয়া চলে, আবেগে উচ্ছ্বিয়া উঠি' পড়ে
ধরণীর 'পর।
অনন্ত বিরহব্যথা নিবিড় মিলনসুখ-মাঝে
বাজে চিরদিন ;
আকুল পিপাসা জাগে সুশীতল নির্ঝরের বুকে
তীব্র সীমাহীন।
বকুল বনের ব্যথা নিঃশ্বসিয়া উঠে ক্ষণে-ক্ষণে,
তা'রে দিলে ভাষা,
ফুলের অন্তর-মধু মানবের চিত্তে ভরি দিলে,
মিটালে পিপাসা।
তোমারি সঙ্গীত ছন্দে জাগিল সে অনন্ত-যৌবনা
বসন্ত উর্ব্বশী
কুঞ্জে-কুঞ্জে কুহরিয়া দিকে-দিকে পিক গাহি' উঠে,
জাগে পূর্ণ শশী।
মিলন-বাসরশয্যা ধরণী রচিল তোমা লাগি'
পরম কৌতুকে,
অনন্ত যৌবন সঁপি' দিল তব কণ্ঠে পুষ্পমালা
বসন্ত-যৌতুকে!
বসন্ত পারেনি তাই ভুলিতে তোমায় ওগো কবি,
তাই হেরি আজি,
নবীন যৌবন-অর্ঘ্যে এসেছে তোমার হৃদিতলে—
ভরি' লয়ে' সাজি।
ছন্দে-ছন্দে তাই শুনি রণিয়া উঠিল লোকে-লোকে
আনন্দবিধুর
নবোদ্ভিন্ন জীবনের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি-ঢালা
পুরাতন সুর।
ছন্দের মায়ায় হরি' আনিলে মানব-চিত্তলোকে
প্রকৃতির বাণী
যে মোহন মন্ত্রসুরে ; আবার এ নবীন বীণায়
তা'রে দেহ আনি'।
সিন্ধুর তরঙ্গ বুঝি পেয়েছিল সৈকতে কুড়ায়ে
পুরানো সে বীণা
আনন্দে ফিরায়ে দিল ভরিয়া আপন ছন্দলীলা
সাজায়ে নবীনা।
এ নিখিল চরাচর আজিও তোমার পথ চাহে—
বাণী দেহ ফিরে',
আবার মুখর করো তোমার সঙ্গীত-ছন্দাঘাতে
মূক প্রকৃতিরে।
বাজাও বাজাও বীণা, হে কবি, আবার ধরো গান
চির-যৌবনের
সঙ্গীতমুখর ছন্দরথে আজ এস, করো জয়
চিত্ত ভুবনের।
সে-বীণা বাজুক তব মন্ত্রময় অঙ্গুলি-পরশে
সুপ্তি হোক দূর
আবার মাতুক প্রাণ দৃপ্ত যৌবনের পূর্ণতানে—
ধরো ধরো সুর।

গবর্ন্মেণ্ট্ ও হিন্দুমুসলমান-বিরোধ

সম্ভবতঃ বড় লাটের ইঙ্গিত-অনুসারে, বাংলা গবর্ন্মেণ্ট্ সম্প্রতি একটি নূতন সার্কুলার জারী করিয়াছেন। হয়ত অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট্ও এইরূপ সার্কুলার জারী করিয়াছেন।

ইহাতে হিন্দুমুসলমান বিরোধ-সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার সারমর্ম্ম এই, যে, বিষয়টিকে আর উপেক্ষা করা চলে না; ডিবিজনের কমিশনার বাহাদুরগণ উহাকে সেই চক্ষে দেখিবেন, যে-চক্ষে রাজনৈতিক গুরুত্ববিশিষ্ট ঘটনাসমূহকে ("events of political importance") দেখিবার জন্য তাঁহারা সর্‌কার কর্ত্তৃক আদিষ্ট আছেন। কোন স্থলে হিন্দুমুসলমান-সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তাহার পাক্ষিক রিপোর্ট তাঁহারা পাঠাইবেন। একতা-স্থাপন জন্য কন্সিলিয়েশ্যন্ বোর্ড্ অর্থাৎ মনোমালিন্যবিদূরক ও সদ্ভাববর্দ্ধক সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে ঐরূপ বোর্ড্ গঠিত হইয়া থাকিলে তাহার সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে হইবে, এবং তাহার নেতাদিগকে অফিশ্যাল্ রেকগ্নিশ্যন্ দিতে অর্থাৎ তাঁহাদের কাজ সর্‌কারের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিবারণের জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আবশ্যক হইলে পুলিশের দ্বারা দমনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্‌কার বাহাদুর যে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না, এই সনাতন সত্যটি বিশেষরূপে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

মোটের উপর এ-বিষয়ে গবর্ন্মেণ্টের একটু চৈতন্য জন্মিয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। হিন্দুমুসলমান বিদ্বেষ দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের রাজত্বের মূল যে দৃঢ়ীভূত হয় না, বরং তাহার বিপরীত ফলই ফলে, ইহা হয়ত আস্তে-আস্তে গবর্ন্মেণ্ট বুঝিতেছেন।

কিন্তু সার্কুলারটি জারী করিবার ইহাই একমাত্র কারণ, তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। ভারতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের একটি নীতি আছে, যাহাকে আমরা "পিত্তিরক্ষা" নীতি বলিয়া থাকি। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার না করিলে "পিত্তি পড়িয়া" শরীরের অনিষ্ট হয়, এইরূপ একটি ধারণা আমাদের দেশে আছে। "পিত্তি পড়া" নিবারণ করিবার জন্য, যদি কাহারও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার না জুটে কিম্বা যথেষ্ট আহার করিবার অবসর না থাকে, তাহা হইলে সে তখন এক মুঠা যাহা হউক কিছু খাইয়া"পিত্তি রক্ষা"করে। সেইরূপ, সর্‌কার বাহাদুর যদিও দেশের উন্নতির জন্য আবশ্যক কোন কাজ যথেষ্ট করেন না, সেরূপ কোন কাজের জন্য যথেষ্ট টাকা দেন না, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগকে যথেষ্ট আহার দেন না, কিন্তু অল্প কিছু দিয়া তাহাদের "পিত্তি রক্ষা"র ব্যবস্থা করেন। হিন্দু-মুসলমানের একতাস্থাপন ভারতীয় জাতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক। তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা দূরে থাক্, কোন চেষ্টাই গবর্ন্মেণ্ট এযাবৎ করেন নাই। হইতে পারে, যে, সেইজন্য সর্‌কার বাহাদুর এখন পিত্তি রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই কারণটারই অন্য-রকমে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে, যে, গবর্ন্মেণ্ট্ ইহা বলিতে দিতে চান না,যে, দেশের লোকে এমন কোন-একটা অত্যাবশ্যক ভাল কাজ করিতেছে যাহার বিষয়ে সর্‌কার সম্পূর্ণ উদাসীন; সেই-হেতু এই সার্কুলার জারী করা হইয়াছে।

সদ্ভাবসংস্থাপক বেসর্‌কারী সমিতিগুলির কাজে সর্‌কারী সম্মতি ও অনুমোদন জ্ঞাপন করিলে, ঐসব সমিতির সভ্যদের সহিত সর্‌কারী লোকেরা অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিবেন। সদ্ভাব-সংস্থাপন ও বর্দ্ধন ছাড়া সমিতির সভ্যেরা আর কিছু করেন কি না, তাহা তাঁহাদের জানিবার সুবিধা তদ্দারা হইবে। কারণ

গবর্ন্মেণ্ট্ দেশের লোকদের সব কাজে রাজনৈতিক মৎলবের অর্থাৎ লঘু বা গুরু বিদ্রোহাত্মক উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব সন্দেহ করেন।

যাহা হউক, সরকারী এই সার্কুলারের সুফল ফলিলে আমরা সুখী হইব।

—

গ্লানিকর জাতিবাচক নাম

মদ্যব্যবসায়ী সাহা-জাতীয় একজন ভদ্রলোক 'প্রবাসী'র সম্পাদককে একখানি দীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত লোক। স্বয়ং মদ্যব্যবসায়ী নহেন, এবং কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। চিঠিটি তিনি ছাপাইবার জন্য লেখেন নাই, তাহা সৌজন্যের সহিত লিখিত। উহা লিখিবার উপলক্ষ্য "প্রবাসী"র এই বৎসরের দুই সংখ্যায় "শুঁড়ি" শব্দটির প্রয়োগ।

"প্রবাসী"র সম্পাদককে লেখকমহাশয় ব্যক্তিগতভাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাদ দিয়া চিঠির অন্য সমস্ত অংশটি ছাপিবার যোগ্য; কিন্তু লেখক তাহা 'কেবল আমাদের পাঠের জন্য' লিখিয়া দিয়াছেন বলিয়া ছাপিলাম না। উহা হইতে কেবল এই উপদেশটি গ্রহণ করিলাম, যে, যেহেতু মদ্যব্যবসায়ী সাহারা "শুঁড়ি" নামটি অবজ্ঞাসূচক ও গ্লানিকর মনে করেন, সেইজন্য উহা ব্যবহার করা উচিত নয়। আমরা এবিষয়ে সাবধান থাকিব। আবশ্যক-বোধে চিঠিটির কয়েকটি বাক্য সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে ছাপিতেছি। আশা করি, তাহাতে লেখকের আপত্তি হইবে না।

"এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও আরও একটি কথা সংক্ষেপে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মাদকদ্রব্যের ব্যবসামাত্রেই সমাজে পাপরূপে গণ্য হওয়া উচিত—যেমন মদ্যব্যবসায়কে পাপ বলিয়া ধরা হইয়াছে। মনুর আমলে হয়ত মদই ছিল; তিনি নিশ্চয়ই গাঁজা, আফিম, সিদ্ধি, চরস, ভাং, প্রভৃতি চতুর্বর্গফলপ্রদ মাদকগুলির নাম শোনেন নাই। তাঁহার জানা থাকিলে—তিনি নিশ্চয়ই এইসকল মাদকবিক্রয়কারীগণকেও অপরাধী করিয়া রাখিতেন। চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, শর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, গোঁসাই, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, কর, মিত্র, বসু, হাজরা—অর্থাৎ হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর মহাত্মাগণই জাত বাঁচিয়ে মাদকদ্রব্যের সকলপ্রকার ব্যবসায়ই করছেন। তাঁদের ত একটুকরাও জাতি বা সম্মান নষ্ট হয় না। আর যত দোষ নন্দঘোষ—! সেই যে মনু বলে' গেছেন শৌণ্ডিকরা নীচ। ঐসব চাটুয্যে বাঁড়ুয্যের দলকে হিন্দুসমাজের শিরোমণিগণ দিন্ না আমাদের জাতে ঠেলে' ফেলে'। আমাদের দলটা পুরু হোক্। নরক গুল্‌জার হোক্। (ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তাও বলি,—হিন্দুসমাজের যদি এইরূপ ন্যায়পরতা থাকতো, তবে আমরাও কবে এ-ব্যবসা ছেড়ে দিতাম। হয়ত আমাদের চেষ্টাতে এ-ব্যবসাটা উঠেও যেতে পারতো।"

লেখক ঠিক কথা বলিয়াছেন। জাতিভেদের ব্যাখ্যা ও সমর্থনের সময় উহা গুণকর্ম্মশঃ হইয়াছে বলা হয়। সুতরাং সেই ব্যাখ্যা অনুসারে সমুদয় সমকর্ম্মীদের সমশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত।

—

"দেশের ডাক" ও "স্বরাজ সপ্তাহ"

বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের প্রথম সাতদিন "স্বরাজ-সপ্তাহ" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, এবং ইহার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ "দেশের ডাক" নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন :—

আমলাতন্ত্র গবর্মেণ্টের দেড়শত বৎসরাধিক শাসনের ফলে আত্মবিস্মৃত দেশবাসী আজ মৃতকল্প। শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, অশন, বসন, সর্ব্ববিষয়ে জাতি পরাধীন। নিজের ঘরের শস্যে তাহার কোন অধিকার নাই—প্রাণ খুলিয়া মনের দুঃখ-প্রকাশেও অনধিকারী, অনাহার, অর্দ্ধাহার কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সহস্র পথে জাতি দ্রুতগতিতে মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকারে সক্ষম একমাত্র গভমেণ্ট। কিন্তু সেই গভমেণ্ট এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, কারণ পরস্পরের স্বার্থ বিপরীত। তাই এই আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে—এই পরাধীনতার আবেষ্টনমুক্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে—আমলাতন্ত্র সরকারের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। দেশ স্বাবলম্বনের পথে যত অগ্রসর হইবে, আমলাতন্ত্র সরকার তত কঠোর দমননীতি লইয়া তাহার প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইবে। জাতীয় জীবনে যে নূতন স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতেই সরকার অতিশয় বিচলিত হইয়াছে, তাই বাংলার উপর সরকারের রক্তনীতির তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, বিনা বিচারে তিন আইন ও দমন-নীতির আর-এক অস্ত্র নূতন অর্ডিন্যান্স্ আইনে বাংলার কতকগুলি অহিংস অসহযোগী কৃতী সন্তানের অবরোধই সরকারের মনোবৃত্তির সম্যক্ পরিচয়। এই সংঘর্ষে বিজয়লাভ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে চাই একতা,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—সর্ব্বোপরি চাই স্বাবলম্বন। যদি সমস্ত গ্রামগুলিতে গ্রাম্যসমিতি স্থাপন করিয়া স্কুল, চতুষ্পাঠী, মোক্তব, নৈশ বিদ্যালয়, সালিসী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করতঃ সেই-সেই গ্রামের চাষ, আবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, ঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিবাদ-বিসম্বাদ, দলাদলি মিটাইয়া দেওয়া, উৎপন্ন শস্য রক্ষা ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, প্রতিগৃহে তুলার গাছ লাগাইয়া তদ্দারা প্রস্তুত সূত্রে কাপড় তৈয়ারি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, উচ্চ-নীচের ব্যবধান ভুলিয়া, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে, তবে সমস্ত স্বাবলম্বী গ্রামগুলির সমবায়ে একটি বিরাট্ স্বাবলম্বী দেশ তৈয়ারি হইয়া অতি সহজে এই অসহনীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের এই প্রচেষ্টাকে আমলাতন্ত্র সরকার নির্ব্বিবাদে সাফল্যলাভ করিতে দিবে না; প্রতিপদে প্রতিকার্য্যে নানা উপায়ে বাধা প্রদান করিবে, তাহার জন্য কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড,

লোক্যাল্ বোর্ড, ইউনিয়ন্ বোর্ড প্রভৃতি আমলাতন্ত্র সরকারের সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্রগুলিকে দখল করিয়া দেশের কাজে লাগাইয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিতে হইবে। এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজেদের জাতীয় জীবন দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতঃ আমলাতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যথেষ্ট একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও অর্থের আবশ্যক।

সমস্ত বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না। প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ পাঁচ হাজার গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামেই এক সময়ে কার্য্য আরম্ভ করাও অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একশতখানা গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিতেই হইবে, চার পাঁচখানি গ্রাম লইয়া এক-একটি কেন্দ্র করিয়া এই গ্রামগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। এইভাবে কার্য্য করিতে হইলে প্রত্যেক জেলায় প্রথমতঃ অন্ততঃপক্ষে ২০ জন কর্ম্মীর দরকার। প্রত্যেক কর্ম্মীকে অন্ততঃপক্ষে কুড়ি টাকা করিয়া না দিলে তাহার পক্ষে সকলপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াও জীবনধারণ করা অসম্ভব। সমস্ত বাংলাদেশে এইরূপভাবে ৬০০ শত কর্ম্মী নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের জন্য প্রতিমাসে ১২০০০ টাকা দরকার। কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় প্রথমতঃ প্রত্যেক কেন্দ্রেই কিছু-কিছু টাকা দিতে হইবে। খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রসমূহের জন্য অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা লাগিবে। এই টাকা দিতে পারিলে বাকী প্রয়োজনীয় সব টাকা সঙ্ঘবদ্ধ কেন্দ্রবাসী স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিবে। এই বিরাট্ কার্য্যের আরম্ভের জন্য এখনই অন্ততঃ দেড়লক্ষ টাকা চাই। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক খরচ আছে। সমস্ত খরচের তালিকা এখানে এখন দেওয়া অসম্ভব। মোট কথা এই, মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এককালীন তিন লক্ষ টাকা ও মাসিক বিশ হাজার টাকা তুলিতে হইবে। উপরোক্তভাবে পল্লী-সংগঠন, নূতন আইনে ধৃত দেশের সুসন্তানগণের অভাবক্লিষ্ট পরিজনের ভরণপোষণ, প্রয়োজন হইলে এই বে-আইন আইনে ধৃত ব্যক্তিগণের আদালতে পক্ষ সমর্থন এবং কাউন্সিল্, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করিতে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবন-গঠনের অনুকূল স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, দুঃস্থ অসহায় বিধবাগণের জন্য আশ্রম, নির্য্যাতিতা ও ধর্ষিতা নারীগণের জন্য আবাসস্থল নির্ম্মাণ, প্রভৃতি কার্য্যেও বহু অর্থের প্রয়োজন। এইসমস্ত কার্য্য করাই আমার জীবনের ব্রত। সেইজন্য আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ (১লা হইতে ৭ই) আমি **স্বরাজ সপ্তাহ** নামে অভিহিত করিয়াছি। ঐ সপ্তাহে আমাদের কর্ম্মীবৃন্দ প্রত্যেকের নিকট মোহরকরা বন্ধ বাক্স লইয়া উপস্থিত হইবে। আশা করি প্রত্যেক ব্যক্তি জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটক্ষণে জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য জাতীয় জীবন-সংগঠনের উদ্দেশ্যে—অন্ততঃপক্ষে **একটি টাকা** দান করিয়া দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। নিবেদন ইতি—

ঃপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধটিতে গ্রামসমূহের জন্য যে-যে কাজের ল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু াত ভিন্নভিন্ন-রকমের কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, য, সমুদয় অনুষ্ঠানটিকে একটি অতি বিশাল ব্যাপার লা ভিন্ন উপায় নাই। তাহার মধ্যে যতটুকু কাজ াথমে আরম্ভ করা হইবে বলা হইয়াছে, তাহাও বৃহৎ। তাহা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মীর সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ আমাদের বিবেচনায় অত্যন্ত কম ধরা হইয়াছে।

প্রথমে এককালীন ব্যয়ের মোট টাকাটার কথাই ধরা যাক্। কোনও একটিমাত্র জেলার একশতখানা গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতির কেবলমাত্র সূত্রপাত করিতে হইলেও ন্যূনকল্পে একলক্ষ টাকার কম হইবে না। অর্থাৎ আমরা গ্রামপিছু মোট হাজার টাকা মাত্র ধরিতেছি। ইহা যে কত কম, কাজগুলির তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। যথা—গ্রাম্য সমিতিস্থাপন; স্কুল, চতুষ্পাঠী, মোক্তব, নৈশবিদ্যালয়, সালিশী পঞ্চায়েৎ-প্রতিষ্ঠা; চাষ-আবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা; উৎপন্ন শস্য রক্ষা ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত; প্রতিগৃহে তুলার গাছ লাগাইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত সূত্রে কাপড় তৈয়ারী করিয়া দিবার ব্যবস্থা; জাতীয় জীবন গঠনের অনুকূল স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা; দুঃস্থ অসহায় বিধবাগণের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ; নির্য্যাতিতা ও ধর্ষিতা নারীগণের জন্য আবাস-স্থল নির্ম্মাণ, নূতন আইনে ধৃত দেশের সুসন্তানগণের অভাবক্লিষ্ট পরিজনের ভরণ-পোষণ; প্রয়োজন হইলে ঐ ধৃত ব্যক্তিদের আদালতে পক্ষ সমর্থন; কৌন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দখল; ইত্যাদি। এইসমুদয় কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষে গ্রামপিছু হাজার টাকা মোটেই যথেষ্ট নহে, বেশী ত নহেই। কিন্তু যদি এই কম টাকাও ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রতি জেলার একশতটি গ্রামের জন্য একলক্ষ টাকা দরকার হইবে, এবং বঙ্গের সাতাইশটি জেলার নিমিত্ত সাতাইশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। যদি এই সাতাইশ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বঙ্গের মোট সাতাইশ শত গ্রামে কাজ আরম্ভ হইবে। কিন্তু "দেশের ডাক" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, যে, বঙ্গে দেড় লক্ষ গ্রাম আছে। এই দেড় লক্ষ গ্রামের মধ্যে কেবল সামান্য সাতাইশ শত গ্রামে কাজ আরম্ভ করিবার জন্যই সাতাইশ লক্ষ টাকা চাই; এবং তাহা করিতে পারিলেও "মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে" পারা যাইবে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় মোটে এককালীন তিন লক্ষ

টাকা চাহিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা একান্তই অযথেষ্ট। কলকারখানা ও কারবারে যেমন যথেষ্ট মূলধন না লইয়া কাজে নামিলে তাহা বিফল হয়, এবং সব বা অধিকাংশ টাকা লোক্‌সান যায়, অন্তবিধ কাজেও তেম্‌নি যথেষ্ট টাকা না লইয়া কাজে নামিলে তাহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় না; অধিকন্তু ব্যয়িত টাকা বর্‌বাদ যায়। অতএব, আমাদের বিবেচনায়, তিন লক্ষ টাকা পাইলে তাহার দ্বারা কেবল একটি (কিম্বা ঊর্দ্ধসংখ্যায় তিনটি) জেলায় কয়েকটি কেন্দ্রে কাজ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। তাহাতেও বিশেষ ফল হইবে কি না, বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তিনলক্ষ টাকা বঙ্গের প্রত্যেক জেলার একশতটি করিয়া গ্রামে কাজে লাগাইলে, তাহার ফল, বহু বিস্তৃত শুষ্ক জমির উপর তিন কলসী জল বিন্দু-বিন্দু করিয়া সমভাবে ছড়াইলে যেরূপ শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে না।

যদি সমস্ত জেলাতেই কাজ আরম্ভ না করিয়া কেবল একটি বা তিনটি জেলাতেই কাজ আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে সেই জেলাগুলি নির্ব্বাচন বড় সহজ হইবে না;—তাহাতে ঈর্ষ্যা দ্বেষ ও ঝগড়ার আবির্ভাব অসম্ভব নহে। পূর্ব্ববঙ্গের না পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম, মুসলমানপ্রধান গ্রাম না হিন্দুপ্রধান গ্রাম, ইত্যাকার কলহের সূত্রপাত হইতে পারে।

প্রবন্ধটিতে প্রত্যেক জেলার একশতটি গ্রামের জন্য কুড়িজন কর্ম্মী ধরা হইয়াছে। এত ভিন্নভিন্ন-রকম কাজ করিবার পক্ষে কুড়িজন কর্ম্মী নিতান্তই কম। আমাদের দেশের যুবকদের শিক্ষা স্বাস্থ্য শক্তি ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করিলে কুড়িজনের মধ্যে উল্লিখিত সব কাজগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া চলিবে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। অর্থাৎ, এই কুড়িজনের মধ্যে শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ, কৃষিতে অভিজ্ঞ, স্বাস্থ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ, সালিসীতে অভিজ্ঞ, বস্ত্র-বয়ন-বিষয়ে অভিজ্ঞ, ইত্যাদি একটা না একটা বিষয়ে অভিজ্ঞ কেহ না কেহ থাকিবেনই, এরূপ আশা আমাদের হয় না।

কিন্তু ধরিয়া লইলাম, যে, কর্ম্মীর সংখ্যা যথেষ্ট ধরা হইয়াছে, এবং তাঁহাদের প্রত্যেক কুড়িজনের মধ্যে এক-বা অন্তবিধ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা থাকিবে ও সেইসব অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার সমষ্টি প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার সমান হইবে; এখন কর্ম্মীদের ভরণ-পোষণের ব্যয় ধরা যাক্। তজ্জন্য মাসিক বিশ হাজার টাকা চাই বলা হইয়াছে।

এককালীন তিনলক্ষ এবং মাসিক কুড়িহাজার কি আলাদা করিয়া তোলা হইতেছে? কিম্বা যে-টাকা উঠিতেছে, তাহার কতক অংশ এককালীন ব্যয়ের জন্য এবং কতক মাসিক ব্যয়ের জন্য রাখা হইতেছে কি? সে-বিষয়ে কোন সংবাদ আমরা অবগত নহি।

যে-টাকাটা দীর্ঘকাল ধরিয়া মাসে-মাসে দিতে হইবে তাহা বিরাট্ সভা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা বরাবর তোলা সম্ভবপর নহে। উদ্দীপনা ও উত্তেজনাকে স্থায়ী করা যায় না (এবং তাহা উচিতও নহে)। সেইজন্য একহিড়িকে যে-টাকা উঠে, তাহা পুনঃপুনঃ উঠে না। সাবেক স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে জাতীয় ফণ্ড উঠিয়াছিল, তাহা একবার উঠিয়াছিল; তাহা বাড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিবার ইচ্ছা, উদ্যম বা সাহস কাহারও হয় নাই। ইদানীং খুব উদ্দীপনা উত্তেজনা ও হুকুমসত্ত্বেও তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহীদের খরচ চালানো শেষের দিকে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সাধুতার জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন মহাত্মা গান্ধী একবার তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড তুলিয়াছিলেন; কিন্তু যদি পুনর্ব্বার ঐ চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তিনিও আর এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা তুলিতে পারিবেন না।

অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-টাকা মাসে-মাসে ব্যয় করিতে হইবে, তাহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে যাহাতে পাওয়া যায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করাই উচিত। ব্যাঙ্কে স্থায়ীভাবে গচ্ছিত রাখিলে মোটামুটি শতকরা বাৎসরিক ছয় টাকা সুদ পাওয়া যাইতে পারে। মাসিক কুড়িহাজার অর্থাৎ বার্ষিক দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সুদ পাইতে হইলে চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ডিপজিট্ রাখা দরকার। এইপরিমাণ টাকা তুলিবার চেষ্টা করা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কর্ত্তব্য। তাহা তিনি পারিবেন কি না, তাহা তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ ভাবিবেন।

স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা না করিয়া কর্ম্মীদিগকে কোন দীর্ঘকালসাপেক্ষ কাজে লাগাইলে অল্পকাল পরেই তাঁহাদের অনশন ঘটিতে ও কাজ বন্ধ হইতে পারে।

অবশ্য এরূপ কথা উঠিতে পারে, যে, একেবারে সবরকম কাজে হাত দেওয়া হইবে না; অতএব কম টাকাতেও কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। উত্তরে অনেক কথা বলা যায়। সব কাজে যে যুগপৎ হাত দেওয়া হইবে না, তাহা “দেশের ডাক” প্রবন্ধে লেখা নাই। যদি কেবলমাত্র কয়েকটি কাজে প্রথমে হাত দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি-ক্রম-অনুসারে কোন্ কাজগুলিতে আগে হাত দেওয়া হইবে, তাহাও উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হয় নাই। সুতরাং কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ-বিষয়ে অধিক কিছু লেখা যায় না।

কিন্তু গ্রামের উন্নতির জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহার মূলীভূত কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে ইহা বলিতে পারা যায়, যে, নানাদিকের উন্নতি এবং জীবনের নানা বিভাগে সংস্কার-সম্পাদন পরস্পরসাপেক্ষ। এবিষয়ে আমরা অনেকবার লিখিয়াছি, এবং ইহা বুঝাও সহজ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি, যদি কেবলমাত্র এই তিনটি বিষয়ই ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে, গ্রাম্যজীবনে উহাদের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ। অপর কাজগুলি সম্বন্ধেও ইহা ন্যূনাধিক-পরিমাণে সত্য। ইহা অবশ্য ঠিক্, যে, কোন-একজন মানুষ কোন গ্রামের জন্য একা এই সবকাজেই হাত দিতে পারেন না। কিন্তু ইহাও ঠিক্ যে, কোন কর্ম্মীসংঘ গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যদি কার্য্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অনেক কাজই একসঙ্গে আরম্ভ করিতে হইবে। এক-একজন মানুষের পক্ষে যাহা সত্য, সমাজের পক্ষেও তাহা সত্য। মানুষ এ-কথা বলে না, যে, এক-বৎসর উপার্জ্জন করি, তাহার পরবৎসর আহার করিব, তাহার পরবৎসর স্নান করিব, তাহার পরবৎসর ব্যায়াম করিব, তাহার পরবৎসর ঘরদুয়ার নর্দ্দমা পরিষ্কার করিব, তাহার পরবৎসর জ্ঞানলাভ ও সচ্চিন্তা করিব ইত্যাদি; তাহাকে এই সবকাজই প্রতিবৎসরই, এবং অনেক কাজ প্রতিমাসেই, প্রতিসপ্তাহেই, প্রতিদিনই করিতে হয়।

আমাদের মনে হয়, “স্বরাজ্য সপ্তাহে” যে-টাকা উঠিতেছে, তাহার দ্বারা অন্য কোন কাজ হউক বা না হউক, “কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার” করার চেষ্টা হইতে পারিবে, এবং সে-চেষ্টা অনেকটা সফলও হইবার সম্ভাবনা। কারণ, যে-কোন দল গবর্ণমেণ্টকে কড়া কথা শুনাইতে এবং ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিবে, তাহার সভ্যদের নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু স্বরাজ্য সপ্তাহে সংগৃহীত টাকাটি এইপ্রকারে স্বরাজ্য-দলের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্যই খরচ করা হইবে, ইহা কোথাও লেখা নাই। সুতরাং এ অনুমান করা ন্যায্য নহে।

স্বরাজ্যদলের এরূপ অভিপ্রায় যদি থাকে যে, আগে ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ড্-আদি দখল করিয়া লওয়া যাউক, তাহার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আয় হইতেই সংকল্পিত প্রবন্ধে উল্লিখিত সবকাজ করা যাইবে, তাহা হইলে সে-কথা প্রবন্ধে লেখা উচিত ছিল। যাহা হউক সে-আপত্তি ছাড়িয়া দিয়াও বলা যায়, যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আয় প্রস্তাবিত সবকাজের পক্ষে যথেষ্ট নহে, এবং তাহাতে এককালীন তিনলক্ষ টাকা যোগ করিয়া দিলেও তাহা সমগ্র-দেশের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না।

কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতে সকল দলেরই অধিকার আছে। সুতরাং সেরূপ চেষ্টার সমালোচনা আমরা করিতেছি না। আমাদের বক্তব্য অন্যপ্রকারের। আমাদের মনে হয়, যে, জেলার মহকুমার ও গ্রাম্য ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ব্বাচনাদি ব্যাপার কলিকাতা হইতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, কোন্ জেলায় কাহার দ্বারা কার্য্যতঃ জেলার, মহকুমার, বা বিশেষ-বিশেষ গ্রামসমষ্টির উপকার হইতেছে বা হইতে পারে তাহা কলিকাতার কোন রাজনৈতিক নেতা ও তাঁহার অনুচরদের স্থির করিবার সুযোগ এবং নিরপেক্ষ জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কেহ স্বরাজ্যদল বা অন্য-কোন বিশেষ দলের লোক হইলেই যে তিনি স্থানীয় শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তা-ঘাট, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি করিবেন বা করিবার মত শিক্ষা শক্তি অভিজ্ঞতা সুযোগ ও প্রবৃত্তি তাঁহার থাকিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। এইজন্য “উচ্চতর” ও “বৃহত্তর” সমস্ত দেশব্যাপী রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে স্থানিক পলিটিক্‌সকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইলে কুফল হয় ও হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। স্থানিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিবার ভার স্থানিক লোকদের উপর থাকাই বাঞ্ছনীয়।

“আমি স্বরাজ্য দলের লোক”, ইহা বলিয়া নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে আজকাল বিশেষ-কোন বাধা দেখা যাইতেছে না। আগে অসহযোগী বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে ওকালতী প্রভৃতি কাজ, আদালতের আশ্রয়গ্রহণ, সরকারী স্কুল-কলেজের সংস্রব, গবর্ণমেণ্ট্-প্রদত্ত সম্মান প্রভৃতি ছাড়িতে হইত। এখন এরূপ কোন স্বার্থত্যাগ না করিয়াও প্রবলতম রাজনৈতিক দলের লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে। এইজন্য, উক্ত দলভুক্ত হওয়াটাই বিশেষ-কোন গুণবত্তার পরিচায়ক নহে; সুতরাং কেহ উক্ত দলের

লোক হইলেই তাহা তাঁহার দেশহিতকর কাজ করিবার যোগ্যতার প্রমাণ না হইতেও পারে।

—

"স্বরাজ্য সপ্তাহে" সংগৃহীত টাকা

৯ই ডিসেম্বরের কলিকাতার দৈনিকগুলিতে দেখিলাম—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন, যে, "স্বরাজ্য সপ্তাহে" মোটামুটি একলক্ষ ষাট হাজার টাকা উঠিয়াছে; পরে তিনি টাকার পরিমাণ আরও ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিবেন, বলিয়াছেন। ঠিক্ করিয়া বলাই ভাল। টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড্-সম্বন্ধে প্রথমে কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছিল, যে, বাংলাদেশে উহার জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। তাহার পর খবরের কাগজে দেখা গেল, যে, উহা পঁচিশ নহে, পনের লক্ষ। তাহার পর শুনিলাম, পনের লক্ষ নহে, অনেক কম; কিন্তু ঠিক্ কত তখন তাহা জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের যে হিসাব এলাহাবাদ হইতে সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস্ কমিটির সাধারণ সেক্রেটারী বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম, বাংলাদেশে উহার জন্য ১৯২১ সালে ৬১৭৩৭৪।৶৩, ১৯২২ সালে ১৩৮০৯।৶৯, এবং ১৯২৩ সালে ১১৮৬৩৻৩ উঠিয়াছে; মোট ৬৪৩০৪৬৸৶৩।

সমগ্র বাংলাদেশে তিন বৎসরে যদি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব সত্ত্বেও মোটামুটি সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য উঠিয়া থাকে, তাহা পঁচিশ লাখ কিম্বা পনের লাখ অপেক্ষা অনেক কম বলিতে হইবে। শুকৃতি বাদ এত বেশী যাওয়া উচিত ছিল না। টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের বাংলাদেশের প্রধান সংগ্রাহক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই ছিলেন। এইজন্য "স্বরাজ্য সপ্তাহে" একলক্ষ ষাট হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে শুনিয়া, পাটীগণিতের প্রক্রিয়ায় কোন ভুল হইয়াছে কি না দেখা আবশ্যক মনে হইতেছে।

১৯২১ সালে সমগ্র বাংলাদেশ হইতে টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য মোট ৬১৭৩৭৪।৶৩ আদায় হইয়াছিল। আর এবার একমাত্র কলিকাতা হইতেই এক সপ্তাহেই একলক্ষ ষাট হাজার টাকা চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য সংগৃহীত হওয়াতে মনে হইতেছে, যে, বাঙ্গালীরা আগেকার চেয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছে, এবং ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যত বেশী ছিল, বর্ত্তমান সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাব তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী। সুতরাং দেশবন্ধুর বাহাদুরি আছে স্বীকার করিতে হইবে।

উপরে বলিয়াছি, একমাত্র কলিকাতা হইতেই ১৬০০০০ টাকা উঠিয়াছে। তাহা ঠিক্ নয়। "স্বরাজ্য সপ্তাহ"কে বাড়াইয়া "স্বরাজ্য-পক্ষ" করিবার হেতু এই দেখানো হইয়াছে, যে কলিকাতার অনেক রাস্তার ও গলির লোক এখনও টাকা দেন নাই, অথচ দিতে ব্যগ্র। তাহা হইলে কলিকাতার কোন-কোন অংশ হইতেই ১৬০০০০ টাকা উঠায় বাহাদুরি আরো বেশী বলিতে হইবে।

—

"স্বরাজ্য-সপ্তাহ" ফণ্ড্-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য

কাহারো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আয় কিরূপে ব্যয়িত হইবে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার অন্যের নাই। কিন্তু যে-টাকা সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহার সদ্ব্যয়-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কেবল যে অধিকার সর্ব্বসাধারণের আছে, তাহা নহে, এরূপ আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু "দেশের ডাক" প্রবন্ধ হইতে এরূপ আলোচনার যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায় না। এইজন্য মোটামুটি দু'-একটা কথা বলিতেছি।

উক্ত প্রবন্ধে যে-সকল কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোন-কোনটিতে অভিজ্ঞ লোক স্বরাজ্যদলে আছেন; যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইত্যাদি। এইরূপ অভিজ্ঞ লোকদের এক-একজনকে এক-একটি বিভাগের ভার দিয়া তাঁহাদিগকে নিজ-নিজ কর্ম্মী মনোনয়ন করিতে বলিলে ভাল হয়। অবশ্য এই কর্ম্মীদের নিয়োগ পরে ঐ-দলের কমিটির দ্বারা পাকা করাইয়া লইতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন এই, যে, কোন-একজন লোকের দ্বারা নানাবিধ কার্য্যের পরিচালনা ও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। টাকা যাহা সংগৃহীত হইবে, তাহার পরিমাণ-অনুসারে অল্প বা অধিকসংখ্যক গ্রামে অল্প বা অধিক-রকম কাজ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। কোন্ কাজে কত টাকা দেওয়া হইবে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহা আগে হইতে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। যে-কাজের জন্য যত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহার মধ্য হইতে কর্ম্মীদের ন্যূনকল্পে এক-বৎসরের খোরপোষের টাকা পৃথক্ করিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা উচিত। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে কর্ম্মীদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইলে যত বেশী টাকা ব্যাঙ্কে রাখা দরকার, তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, এবং চেষ্টা করিলেও সম্ভবতঃ তাহা উঠিত না। এইজন্য আমরা আপাততঃ কেবল একবৎসরের খোর-পোষের টাকা জমা রাখিতে বলিতেছি। যাহাদিগকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করা হয়, তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহের ভার লওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা যেমন আসামবেঙ্গল রেল-ওয়ের অনেক কর্ম্মচারীকে ধর্ম্মঘটে প্রবৃত্ত করাইয়া পরে তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রের কষ্টে ফেলা হইয়াছিল, সেইরূপ ঘটনা আবার ঘটিতে পারে।

অন্ততঃ একবৎসর কাজ করার প্রয়োজন এই, যে,

তাহা হইলে সকল ঋতুতে নির্ব্বাচিত গ্রামের অবস্থা ও সুখ, দুঃখ, কৃষি, স্বাস্থ্য, ভিন্ন-ভিন্ন ঋতুতে বালকবালিকাদের শিক্ষালাভের অবসরের ও অন্য সুযোগের পরিমাণ ইত্যাদি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিবে। যদি একবৎসরের মধ্যে অন্ততঃ কোন-কোন বিষয়েও গ্রামবাসীদের সেবা ও সাহায্য কর্ম্মীরা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কাজের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে পুনর্ব্বার টাকা চাহিবার অধিকার জন্মিবে। কাজ ভাল হইয়াছে—এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে টাকা পাওয়াও যাইবে।

গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, এই কথা ও সংকল্প নূতন নহে। বাংলা দেশে এই প্রস্তাব বোধ হয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে করেন, এবং প্রস্তাব-অনুযায়ী কাজও তাঁহার দ্বারা অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্ভিন্ন অন্য অনেকেও এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেমন ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ম্যালেরিয়া নিবারণ চেষ্টা। সকলেরই কাজের প্রণালী এবং কি-কি কাজ কতদূর হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা উচিত। তাহা হইলে নূতন জায়গায় কাজ ফাঁদিবার সুবিধা হইবে।

বঙ্গে টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে ব্যয়

আগে হইতে ভিন্ন-ভিন্ন কাজের জন্য টাকা ভাগ করিয়া রাখার কথা উপরে বলিয়াছি। ইহার আবশ্যকতা বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ, যেমন সকল গবর্ন্মেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি আয়-অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন বাবতে ব্যয়ের বরাদ্দ বজেটে করিয়া থাকেন, তেমনি বরাদ্দ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহেরও করা উচিত। অনেক হিসাবী গৃহস্থও আয়-অনুসারে পারিবারিক ব্যয়ের বরাদ্দ এইপ্রকারে করিয়া থাকেন।

এলাহাবাদ হইতে টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের আয় ব্যয়ের যে-হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, যে, সম্ভবতঃ আগে হইতে বিবেচনা করিয়া বঙ্গদেশে ফণ্ডের টাকা ভিন্ন ভিন্ন কাজে ও উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

১৯২১ সালের ব্যয়ের হিসাবে দেখিলাম, খদ্দরের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করা হয় নাই; ঐ কাজের জন্য ১৯২২ সালে এবং ১৯২৩ সালেও একটি পয়সাও ব্যয় করা হয় নাই। অথচ খদ্দর উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহারকে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবাধীন কংগ্রেস্ বরাবর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া আসিতেছেন!

১৯২১ সালের হিসাবে (১৯২২এর পুস্তিকার পৃষ্ঠা ৫) আর-একটা নূতনরকমের জিনিষ দেখিতেছি। সকলেই জানেন, যে, যে-যে প্রধান-প্রধান কাজে থোক্ বেশী টাকা খরচ হয়, তাহা স্বতন্ত্র দেখাইয়া, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যয়ের সমষ্টি "বিবিধ" নাম দিয়া দেখানো হয়। কিন্তু যে-ব্যয়ের হিসাবে খদ্দরের জন্য শূন্য টাকা, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ-চেষ্টায় শূন্য টাকা, সালিসীর জন্য শূন্য টাকা, কর্ম্মীদের দক্ষিণা বাবতে শূন্য টাকা দেখানো হইয়াছে, তাহাতে "বিবিধ" ব্যয়ের সমষ্টি দেখানো হইয়াছে একলক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা! এইরূপ ব্যয়-তালিকা দেখিলে এরূপ বিশ্বাস জন্মে না যে, সুশৃঙ্খলভাবে, বিবেচনাপূর্ব্বক, ভিন্ন-ভিন্ন কাজের গুরুত্ব-অনুসারে, সদ্ব্যয় করা হইয়াছে।

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত যে-পুস্তিকায় ১৯২৩ সালের হিসাব দেখানো হইয়াছে, তাহার ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় ১৯২১, ১৯২২ ও ১৯২৩ সালের প্রপ্যাগাণ্ডা অর্থাৎ মত-প্রচারের ব্যয়ের বহরটা দেখুন। ১৯২১এর হিসাবে ইহা দু'টি-দফায় দেখানো হইয়াছে। প্রথমটির নাম—মতপ্রচার, আফিসের স্বেচ্ছা-সেবক, দুর্ভিক্ষ, অবনতশ্রেণী, ইত্যাদি বাবতে। ইহার ব্যয়ের পরিমাণ দুই লক্ষ সতের হাজার তিনশত উনপঞ্চাশ টাকা চারি আনা। (ঐ বৎসর দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যয় হয় কেবলমাত্র ৬৮৮৷৷৵৯।)। দ্বিতীয় দফার নাম—মত-প্রচার প্রভৃতির জন্য জেলাসমূহকে প্রদত্ত টাকা। উহার পরিমাণ ৩,০৯,৯৮৫৷৷৶১১। মত-প্রচারের খরচ ১৯২২এ ৪৩,৭৪১ দেখানো হইয়াছে। ১৯২৩এ মত-প্রচারের জন্য ঠিক্ খরচ কত, তাহা বুঝা যায় না; কারণ ঐ সালের হিসাবে মত-প্রচার দু'টা দফার সঙ্গে মিলাইয়া দেখানো হইয়াছে, এবং ঐ দুই দফাতে খরচ ২৩৩৯১৷৵৩ এবং ১০০ টাকা। প্রত্যেক বৎসরের হিসাবের দফা বা হেডিং-গুলি যদি একই-রকম রাখা হইত, তাহা হইলে তুলনার সুবিধা হইত। তাহা করা হয় নাই। হিসাব যে সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খল নহে, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

কংগ্রেসের প্রধান কাজ খদ্দরে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে, সালিসীতে কিছু ব্যয় করা হয় নাই, তাহা বলিয়াছি। জাতীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় "বিবিধ" এবং "মত-প্রচার ইত্যাদি"র তুলনায় কিরূপ কম, এবং তাহা কেমন কমিয়া আসিয়াছে দেখুন:—১৯২১ সালে উহা ছিল ৬৯৯৯৬। তাহার পর ১৯২২ সালে হয় ২৭১৫, এবং ১৯২৩ সালে ৯৯০৬। অন্যান্য প্রদেশের সহিত নানা-রকমের ব্যয়ের তুলনা করিলে তাহা হইতে অনেক উপদেশ লাভ করা যাইত। কিন্তু এখন তাহা করিতে পারিলাম না।

বঙ্গের টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের ব্যয়ের যে-সব দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহা হইতে আশা করি ইহা বুঝা যাইবে, যে, আগে হইতে কাজের গুরুত্ব-অনুসারে সংগৃহীত টাকা ভাগ

করিয়া না রাখিলে যথাযোগ্য ব্যয় না হইয়া "মত-প্রচার" এবং "বিবিধ" বাবতেই বেশী টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা। মত-প্রচারের উদ্দেশ্য সোজা কথায় নিজের দল পুরু করা, এবং "বিবিধ" শব্দটি এমন সুবিধাজনক, যে, তাহার ভিতর দিয়া রুইকাত্‌লা ত যায়ই, হাতীও গলিয়া যাইতে পারে।

—

সুব্রহ্মণ্য আয়ার্

মাদ্রাজের প্রবীণতম ও প্রাচীনতম লোকহিত-কর্ম্মী ডাঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ার্ বিরাশী বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি চরিত্রবান্ সুপণ্ডিত এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টে জজিয়তী করিবার সময় তিনি তিনবার প্রধান বিচারপতির কাজ অস্থায়ীভাবে করিয়াছিলেন। গবর্ন্মেণ্ট্ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "স্যার্" উপাধি দিয়া এবং অন্য নানাপ্রকারে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উপাধিব্যাধিতে তাঁহাকে নিস্তেজ নির্বীর্য্য করিতে পারে নাই। যখন শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট্‌কে গবর্ন্মেণ্ট্ নজরবন্দী করেন, তখন আয়ার্ মহাশয় হোমরুল্ (আভ্যন্তরীণ স্বরাজ) প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। গত মহা-যুদ্ধের গোড়ার দিকে তিনি গোপনে লোক-মারফৎ আমেরিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি উইল্‌সনের নিকট ব্রিটিশ রাজত্বে ভারত ও ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত চেহারা আঁকিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্র প্রকাশিত হওয়ায় খুব উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। এদেশে ও ইংলণ্ডে ইংরেজেরা খুব গরম হইয়া উঠেন, চিঠিখানির কথা পার্লেমেণ্টেও উঠে। আয়ার্ মহাশয়কে নানাপ্রকার ভয় দেখানো হয়। তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও দমিয়া ত যানই নাই; অধিকন্তু বীরোচিত জবাব দেন, এবং স্বেচ্ছায় গবর্ন্মেণ্ট্-প্রদত্ত উপাধি আদি ত্যাগ করেন।

তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এবং ইহার সহিত দীর্ঘকাল সংস্রব রাখিয়া কাজ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির সভ্য ছিলেন, এবং ইহার জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

—

ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক

আমাদের দেশে এত অধিক লোক পীড়ার সময় চিকিৎসকের সাহায্য পায় না, যে, যে-কেহ শিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তিনিই দেশের সেবক বলিয়া প্রশংসা পাইবার যোগ্য। পরলোকগত ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক কালকাতায় একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন ও দীর্ঘকাল পরিচালন করিয়া চিকিৎসকের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইস্কুলটি এখনও বিদ্যমান আছে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে।

তিনি বাঙালী যুবকদিগকে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহা আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল।

—

মরক্কো ও স্পেন

লাইবীরিয়া নামক ক্ষুদ্র নিগ্রো সাধারণতন্ত্র ছাড়িয়া দিলে আফ্রিকা মহাদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ একমাত্র আবিসীনিয়া আছে, যাহার অধিবাসীদিগকে হাবসী বলে। অন্য সব দেশ পরাধীন কিম্বা, নামে স্বাধীন হইলেও, বাস্তবিক পরাধীন হইয়াছে। মরক্কো এইরূপ একটি দেশ। ইহার কতক অংশ স্পেনের শাসনাধীন ও প্রভাবাধীন। তাহার অধিবাসী রিফ্‌গণ তাহাদের

রিফ্-নেতা আবদুল করিম্

নেতা আব্দুল্ করিম্ মহাশয়ের নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এবং স্পেনীয়দিগকে বহু যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু স্পেন নিজের দর্প ভুলিয়া রিফ্‌দিগকে তাহাদের বীরত্ব-অর্জ্জিত স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিতে এবং মরক্কো ছাড়িয়া আসিতে চাহিতেছে না।

ছাড়া কঠিন। কেননা, ইউরোপের লোকেরা বলে, যে, বিধাতা পৃথিবীর অন্য সব মহাদেশের, দেশের ও জাতির উদ্ধার-সাধনের ভার তাহাদের উপর অর্পণ

করিয়াছেন। এই মহাভার তাহারা কেমন করিয়া ত্যাগ করে, বলুন।

কিন্তু পৃথিবীর অশ্বেত জাতিরা এমন একগুঁয়ে এবং অবুঝ, যে, তাহারা উপকৃত ও "উদ্ধৃত" হইতে রাজি নয়। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক জাতির মধ্যে সাংসারিক দুঃখভোগ করিবার জন্য আর একজন মানুষও পৃথিবীতে নাই; শ্বেতকায়দিগের হিত-চেষ্টার ফলে তাহারা সকলেই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরলোকে বাস করিতেছে। এমন জাজ্বল্যমান প্রমাণ-সত্ত্বেও যাহারা ইউরোপীয়দিগের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাদের পরিত্রাণ কেমন করিয়া হইবে?

—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

কোন দরিদ্র, নিরক্ষর, অনশনক্লিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত, ভগ্ন কুটীরবাসী, প্রায়-নগ্ন মানুষ যদি তাহার ধনী বিদ্বান্ সুপুষ্ট, সুস্থ, অট্টালিকাবাসী, সুন্দরপরিচ্ছদপরিহিত পূর্ব্ব-পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর হয় না। এইজন্য প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক জাতি প্রধানতঃ নিজ-নিজ বর্ত্তমান অবস্থার চিন্তাই অধিক-পরিমাণে করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও অতীত ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং কৌতূহল-পরিতৃপ্তিতেই ইতিহাসের সার্থকতা শেষ হয় না। এবিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এই একটা কথা বলিলেই এখানে চলিবে, যে, যদি কোন দুর্দ্দশা-গ্রস্ত জাতি দেখে, যে, তাহাদেরই দেশে বহু প্রাচীনকালে সভ্যতা ও সমৃদ্ধি ছিল, তাহা হইলে তাহাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে, যে, তাহাদের দুর্দ্দশা মাটির দোষে, জল-বায়ুর দোষে বা বংশের দোষে ঘটে নাই, অন্যান্য কারণে ঘটিয়াছে; সুতরাং প্রতিকার হইতে পারে। এইপ্রকারে জাতীয় নৈরাশ্য ও অবসাদের পরিবর্ত্তে আশা ও উদ্যমের আবির্ভাব হইতে পারে।

ইতিহাস-চর্চ্চার পণ্ডিতজনের বোধ্য ও আলোচ্য অন্যান্য প্রয়োজন ও উপকারিতার বিষয় বিবেচনা না করিয়া শুধু উল্লিখিত কারণেই আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা-সম্বন্ধে কৌতূহল থাকিতে পারে। ঐ সভ্যতা আর্য্য, কিম্বা দ্রাবিড়, কিম্বা উভয়ের সংমিশ্রণজাত, অথবা আরও অন্যবিধ কোন সভ্যতার মিশ্রণ তাহার সহিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বক্ষ্যমাণ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত জন্মিবে না। আমরা ভারতীয়, এবং পূর্ব্বে যাহারা এদেশে ছিলেন তাঁহারাও ভারতীয়; আমরা তাঁহাদের সকলেরই উত্তরাধিকারী। ইহা জানাই আমাদের পক্ষে আপাততঃ যথেষ্ট।

এত দিন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বয়স সম্বন্ধে ইউ-রোপীয় এবং তাঁহাদের অনুচর ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছিলেন, সিন্ধুদেশে মোহেঞ্জ দড়ো নামক স্থানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং পঞ্জাবের হারাপ্পা নামক স্থানে রায়বাহাদুর দয়ারাম সহ্নী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন-সকল দেখিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আগে যাহা ভাবা গিয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, ভারতীয় সভ্যতা তাহা অপেক্ষা আরও কয়েক হাজার বৎসর প্রাচীন।

এই-সকল নিদর্শন হইতে যে-সব ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহার কিছু আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে যুগান্তরসাধক এইরূপ আবিষ্কার দুইজন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকের দ্বারা হওয়ায় আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। রাখাল-বাবুর আবিষ্কারের কথা আমরা বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা উঁহার কাজের বিষয় বে-সরকারী কোন কাগজাদিতে আগেই কিছু লিখিতে পারেন না, শুনিয়াছি এইরূপ একটা কি নিয়ম আছে। এইজন্য

রাখাল-বাবুর দ্বারা এবিষয়ে কিছু লিখাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু ঐ বিভাগের কর্ত্তা মার্শ্যাল্ সাহেবের সম্বন্ধে বোধ হয় ঐ নিয়ম খাটে না। সেইজন্য তিনি তাঁহার বিভাগের কর্ম্মীদ্বয়ের আবিষ্ক্রিয়ার বৃত্তান্ত বিলাতের ইলাষ্ট্রেটেড্ লণ্ডন্ নিউসে লেখেন। তাহা দেখিয়া তথাকার কোন-কোন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত নিদর্শনগুলির প্রাচীনত্ব মার্শ্যাল্সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিক বলেন, এবং তৎসমুদয়ের সহিত পশ্চিম এসিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শনের সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। অতঃপর মার্শ্যাল্ সাহেব ভারতীয় নানা কাগজে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন বিভাগের গৌরব জানাইবার জন্য এই বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। অবশ্য তল্লিখিত বিলাতী ও ভারতীয় প্রবন্ধসকলে আবিষ্কারকদিগের গৌরব অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মহিমাই অধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, কর্ত্তা মার্শ্যাল্ সাহেব প্রথমে আবিষ্কারগুলির গুরুত্ব স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই; তাহা যদি গোড়াতেই পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিভাগের কীর্ত্তিপ্রচারে এত বিলম্ব ঘটিত না। এইজন্য আমাদের অনুমান হয়, যে, তাঁহাকে অন্যের সাহায্যে ব্যাপারটি বুঝিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, দয়ারাম সহনীর ও রাখাল-বাবুর নামটা একেবারেই চাপা না পড়ায় আমরা সুখী হইয়াছি।

রাজশাহী জেলায় পাহাড়পুরের প্রাচীন কীর্ত্তি খুঁড়িয়া বাহির করিবার যে-চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধর-প্রত্নতাত্ত্বিক করিয়াছিলেন এবং যে-চেষ্টার ফলে কয়েকটা নূতন কীর্ত্তি-সম্বন্ধে সালিসী নিষ্পত্তি করিতে হইতেছে, তাহা অপেক্ষা রাখাল-বাবুর খনন-চেষ্টা বেশী বিখ্যাত হইয়া পড়াটা অবশ্য বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় ইহাতে "প্রবাসী"র কোন হাত ছিল না!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র কলিকাতা রিভিউয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে, যে, বাংলা দেশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কেহই প্রত্নতাত্ত্বিকের পংক্তিতে আসন পাইতে পারেন না। তা সত্ত্বেও এরূপ অঘটন ঘটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই, যে, ইহাতেও "প্রবাসী"র কোন হাত ছিল না।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, যে, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে কাজ করিবার সময়, বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর যে মোহেঞ্জদড়ো নামক জায়গাটাকে খননের অযোগ্য ও আধুনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছিলেন, সেই জায়গাটাই এই তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধস্বরূপ অকৃতী রাখালদাসকে ডাকিয়া নিজের কুক্ষিগত অনেক জিনিষ লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছে। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, এইসব নিদর্শন "নিশার স্বপন সম" অলীক এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্ট হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলিই ধ্রুব সত্য।

"..........I also visited what is called *Mohen-jo-daro*, seven miles south-east of Dokri in Larkana district. We had received glowing accounts of this spot, and I had great hopes of finding it to be as interesting as the ruins of the Mirpur Khas *stupa* before they were dug out. But on visiting the place I was greatly disappointed. Here are spread the remains of an old place for about three-fourths of a mile. Near the western edge is a tower on a mound nearly seventy feet high from the ground-level, from which the mound gradually rises. Of the top portion only the inner core has remained, consisting of sun-dried brick work. The bottom of it appears to have been reached most probably by treasure-hunters, who, I was told, frequently excavated the most promising spots here. Close by towards the west and south are six mounds, but of far less height, and there seems to have been a river once running between the tower mound and the other heaps. On the north side of the tower again are vestiges of an old brick road running up. The bricks as a rule are of modern type and are not of large dimensions like the old. There are no doubt some here which look old, but they are few and far between. Not a single carved moulded brick I was able to discover here. What a contrast to the Mirpur Khas *stupa*, where cart-loads of such bricks were found before it was excavated! The probabilities, therefore, are that the *Mohen-jo-daro* does not represent the remains of a Buddhist *stupa* or of any ancient monument. According to the local tradition, these are the ruins of a town only two hundred years old, and the *daro* or tower itself a part of the bastion guarding its west side. This seems to be not incorrect, because the bricks here found, as just said, are of the modern type, and there is a total lack of carved terracottas amidst the whole ruins.........."*

D. R. Bhandarkar, M.A.
Superintendent, Archaeological Survey,
Western Circle.

Poona, 30th June 1912.

—

বীরভূম কর্ম্মী-সম্মিলন

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত সুরুলস্থিত শ্রীনিকেতনে গত ২২শে অগ্রহায়ণ বীরভূম জেলার কর্ম্মীদিগের প্রথম সম্মিলন হইয়াছিল। এই জেলার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ইহার উদ্দেশ্য। জেলার নানাস্থান হইতে সরকারী ও

*Extract from Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March, 1912. (Part I.) IX Excavation, pp. 4—5.

বে-সরকারী অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ মহাশয় প্রথমে তাঁহার অভিভাষণে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ করেন। তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ সকলকে এক-এক খণ্ড দেওয়া হয়। ইহা সংবাদপত্রেও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি কোন্-কোন্ দিকে জেলার উন্নতির প্রয়োজন এবং তাহা কি-প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করেন। প্রথমেই অবশ্য তিনি কৃষির উল্লেখ করেন। কারণ,

বীরভূমের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। ইংলণ্ডের ডাক্তার ভেলকার প্রভৃতি বড়-বড় কৃষিবিদ্‌গণ ভারতীয় কৃষকদের কৃষিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রশংসা করিলেও আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে জাপান, স্পেন প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশ অপেক্ষা তিনগুণ হইতে সাতগুণ পর্য্যন্ত অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের জোত ক্ষুদ্রাকার হইলেও পরস্পর পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রত্যেকের জমি এক-এক দিকে একত্রীভূত করিতে পারিলে জমির আকার বৃহৎ করিবার সুবিধা হয় এবং রাসায়নিক সার ও খইল প্রভৃতি সারের প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার জন্য মূলধন ও দেশের লোকের শিক্ষা আবশ্যক। কৃষি সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা এই অভাবের মোচন করিতে পারা যায়। বীরভূমে সেচনের জলের অভাবে ইচ্ছানুরূপ কৃষিকার্য্য করিতে পারা যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মনুষ্যত্বের ও ভবিষ্যদ্দর্শিতার ফলে এককালে বীরভূমে অগণ্য পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। কালের প্রভাবে অধিকাংশ পুষ্করিণী ভরাট হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে। সমবায়-প্রণালীতে জলসেচন সমিতির গঠন করিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের দ্বারা এই কার্য্যের আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। যেখানে এরূপভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব সেখানে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম দিয়া অর্থাৎ নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে। পানীয় জলের পুষ্করিণীর সংস্কারও এইরূপভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে।

বীরভূমের মধ্য দিয়া অসংখ্য নদনদী অবিরাম-গতিতে প্রবাহিত হইয়া কত জল যে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদূর সম্ভব এই জল আবদ্ধ করিয়া পয়ঃপ্রণালী দ্বারা আমাদের শস্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে হইবে এবং সেচনের পুষ্করিণীগুলিকে জলপূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি দয়া করিয়া ইঞ্জিনীয়ার ও তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ বীরভূমের জন্য নিয়োজিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রত্যেক গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির প্রতিষ্ঠান দ্বারা গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, গ্রামের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত ও আবশ্যকীয় ড্রেন্ নির্ম্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার করানো, পচা ডোবাদি বুজাইয়া দেওয়া ও ম্যালেরিয়া-মশকের ধ্বংস ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ম্যালেরিয়া গ্রাম হইতে দূর করিবার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।...

কিরূপ করিলে আমাদের লোক-শিক্ষা, কৃষির উন্নতি, পল্লীর সংস্কার, জল-সেচনের সুব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান আমরা স্বয়ং করিতে পারি তাহারই আলোচনার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আসুন দেশহিতৈষী ভ্রাতৃগণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, আমরা একপ্রাণ ও একযোগ হইয়া, সকলে দিবারাত্রি শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া উল্লিখিত উপায়াদির অবলম্বনে আত্মোন্নতির বিধান দ্বারা আমাদিগকে মনুষ্য নামে পরিচিত করিবার প্রয়াস করি।

শ্রীনিকেতনের দ্বারা বীরভূম জেলার কিরূপ উপকার হইতেছে, তদ্বিষয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—

শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীগণ বীরভূমের বিপদে-আপদে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যখন কয়েকমাস পূর্ব্বে কলেরার ব্যারাম সংক্রামকভাবে বীরভূমের অধিকাংশ গ্রামকে বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, যখন জলাভাববশতঃ বীরভূমের বহুস্থানে হাহাকার উঠিয়াছিল এবং যখন অগ্নিভয়ে অনেক গ্রাম ধ্বংসীভূত হইয়াছিল তখন শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীগণ জেলাবোর্ডের প্রথম ও প্রধান সহায় হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা আমি চিরকাল কৃতজ্ঞহৃদয়ে মনে রাখিব। শ্রীনিকেতনের এই পল্লী-সংগঠন বিভাগের অধ্যাপকদিগের এবং প্রধানতঃ কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে আমরা এই জেলার যাবতীয় স্কুলের শিক্ষকদিগকে পল্লী-সংগঠন কার্য্যে শিক্ষিত করিতে সমর্থ হইতেছি। ইতিপূর্ব্বেই প্রায় ৩০ জন শিক্ষক শিক্ষালাভ করিয়া স্ব-স্ব গ্রামে পল্লী-সংগঠন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং জেলা-বোর্ডের হেল্‌থ অফিসারের ও তদধীন কর্ম্মচারীবৃন্দের তত্ত্বাবধানে নূতন-নূতন পল্লীতে সংগঠনের কার্য্য আরম্ভ হইতেছে।

অতঃপর প্রবাসীর সম্পাদক সম্মিলনের সভাপতি হইয়া কিছু বলিবার পর নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্কার-বিষয়ে ও জলসেচন-বিষয়ে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে, শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু কৃষি বিষয়ে, শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ স্বাস্থ্য-বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালী-মোহন ঘোষ পল্লীসংগঠন বিষয়ে, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ডাঃ রজনীকান্ত দাস গ্রামের উন্নতি-কল্পে সর্ব্ববিধ গ্রাম্য তথ্য-সংগ্রহ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। আরও দুই-একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়, এবং জলসেচন বিষয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ও কিছু বলিয়াছিলেন। শেষে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত কিছু বলেন। মধ্যে-মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কয়েকটি গান গীত হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর শান্তিনিকেতনে বালকদের দ্বারা "মুকুট" অভিনীত হয়।

অধিকাংশ প্রবন্ধ "ভূমিলক্ষ্মী"তে প্রকাশিত হইবে শুনিয়াছি।

—

বাঁকুড়া ও বীরভূম

রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে বীরভূম-সম্বন্ধে উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং "প্রবাসী"তে পূর্ব্বে বাঁকুড়া-সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা হইতে প্রতীত হইবে, যে, এইদুইটি জেলার উন্নতির সমস্যা অনেকটা এক। এই জন্য আমরা দেখিতেছি, বাঁকুড়ায় স্বরাজ্যদলের যে জেলা-কন্‌ফারেন্স্ হইয়াছিল, তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভি-ভাষণে বলিয়াছিলেন, "কৃষিকার্য্যের উন্নতি-ব্যতীত

জেলার উন্নতির অপর কোন উপায় নাই"। তাহাতে তিনি আরও বলেন :—

"আপনারা অবগত আছেন যে, গত দুইবৎসর যাবৎ বাঁকুড়া জেলায় সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া বাঁধ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও মেরামতের চেষ্টা হইতেছে। এবং অনেক স্থলে তাহাতে বেশ ভাল ফল হইয়াছে। এতাবৎ স্থানীয় দুইচারিজন সরকারী কর্ম্মচারীগণ এই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এরূপ সামান্য চেষ্টায় বৃহৎ জনহিতকর-ব্যাপার সম্পন্ন হইবার আশা নাই। এবং আমার বোধ হয় যে, জেলার জনসাধারণের আন্তরিক ও সমবেত চেষ্টা ইহাতে প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া এই প্রচেষ্টাও আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই। সুতরাং কংগ্রেস এই কার্য্যের ভার লইতে অগ্রসর হউন। গ্রামে-গ্রামে আন্দোলন করিয়া যাহাতে বাঁধ-পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার ও মেরামত হইয়া খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব দূর হয় তাহার চেষ্টা প্রয়োজন। বাঁকুড়াকে আসন্ন বিপদ্ ও ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহাই তাহার প্রধান অঙ্গ, এবং এই কার্য্যে আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

"বর্ত্তমানে যে-প্রণালীতে সমবায় সমিতির গঠন করিয়া কার্য্য হইতেছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ আছে কি না, তাহা আপনাদের বিবেচ্য। সমবায়-সমিতির গঠন করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের আইন-অনুসারে ঐ সকল সমিতি রেজেষ্টারী করিতে হয়। যাঁহারা অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের ইহাতে কোনও আপত্তি থাকা উচিত কি না তাহাও বিবেচনার কথা। ইহাও আমাদের বিচার্য্য। বৈশাখের প্রবাসীতে বাঁকুড়ার উন্নতিশীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে, অসহযোগীদেরও ইহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এই বিষয়ে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ উদাসীন নহেন—একথা বলিয়াছি। কিন্তু বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে যতটা করা উচিত ততটা হইতেছে না।"

বীরভূমের উন্নতি

বীরভূমের উন্নতি সম্বন্ধে "প্রবাসী"র বর্ত্তমান সংখ্যায় যে-"কর্ম্মী" প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে, "এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পর বাংলা গবর্ন্মেণ্টের চীফ্-এঞ্জিনীয়ার এডামস্ উইলিয়মস্ সাহেব শিউড়ী আসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, বীরভূম জেলার জলসেচনের উন্নতির জন্য নদী ও খালে বাঁধ দিবার নক্সা ও এষ্টিমেট্ প্রস্তুত করিবার জন্য একজন বিশেষ এঞ্জিনীয়ার মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত সার্ভেয়ার ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনেক উপকার হইবে।"

ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা

ইংরেজীতে "নিউকাস্‌লে কয়লা লইয়া যাওয়া"র অনাবশ্যকতা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। কারণ ঐস্থানে কয়লার অভাব নাই। কিন্তু সরকার বাহাদুর এদেশে ঠিক্ ঐরূপ একটি কাজ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, বাংলা প্রদেশে, বিহার প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে এবং অন্যত্র ও ভারতবর্ষে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। অথচ সিন্ধুদেশে সক্কর নামক স্থানে সিন্ধুনদে যে বাঁধ বাঁধা হইবে, এবং যাহার ব্যয় অনেক-কোটি টাকা হইবে, তাহার জন্য এঞ্জিনসকল চালাইবার নিমিত্ত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়লা আনা স্থির করিয়াছেন। এই কয়লা ঝরিয়ার প্রথম শ্রেণীর কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে এবং ঝরিয়ার ঐ কয়লার দামও দক্ষিণ অফ্রিকার কয়লার চেয়ে কম। অথচ ইংরেজ সরকারের দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় কয়লা ব্যবসায়ীদিগের প্রতি অনুরাগ এত বেশী, যে, তাঁহারা কালা আদমীর দেশের সস্তা অথচ উৎকৃষ্ট কয়লা না কিনিয়া ধলা আদমীর উপনিবেশিত দেশের অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ কয়লা কিনিতেছেন।

সময়ে অসময়ে ইংরেজরা জগৎবাসীকে জানান, যে, তাঁহারা মূক, নিরক্ষর, গরীব, প্রপীড়িত কোটি-কোটি ভারতীয়ের হিতার্থ এবং আইনের মর্য্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ এদেশে আছেন। বিদেশ হইতে কয়লা খরিদ করিলে, যে, অন্ততঃ কয়লার খনির এদেশী মজুরদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা বুঝা খুব কঠিন নহে।

কোহাটের ভীষণ কাণ্ড

আইনের মর্য্যাদা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা যে কিরূপ হইতেছে, তাহারও নমুনা অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামায় এবং প্রতিসপ্তাহের বহুসংখ্যক ডাকাইতিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে কোহাট যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব।

কোহাটের হিন্দু-মহল্লা ভস্মীভূত হওয়ায় উহার প্রায় সমুদয় (প্রায় চারি হাজার) হিন্দু অধিবাসী অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট্ কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না বুঝিয়া তাহাদের অন্যত্র গমনে সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে।

এই বিষয়ে অনেক বিলম্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সহিত অনুসন্ধান করিবার ভারপ্রাপ্ত পেশাওয়ারের ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট, এবং তাহার উপর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ্-কমিশনারের মন্তব্য ছাপা হইয়াছে। এইসমুদয় কাগজ-পত্রের বিস্তারিত সমালোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। কেবল দুই-একটা কথা বলিব।

এই ভীষণ কাণ্ডটি কোহাটের মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে অসদ্ভাব ও হিংসাবিদ্বেষের ফল। হিন্দু-

মুসলমানের অসদ্ভাবের যেসব কারণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, কোহাটেও তাহা অবশ্য আছে। কিন্তু তা ছাড়া অন্য সাক্ষাৎ কারণ কি-কি ছিল, তাহার কিছু পরিচয় সরকারী কাগজপত্রগুলি হইতে পাওয়া যায়। কোন্ সম্প্রদায়ের দোষ বেশী বা কম, তাহা উহা হইতে নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। চেষ্টা করিলেও নির্দ্ধারণ করিতে পারা যাইত না। তাহা করিবার মত যথেষ্ট প্রমাণ সরকারী কাগজপত্রগুলিতে নাই।

হিন্দু পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে, তাহাদের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগে এরূপ কবিতা মুসলমানরাই আগে প্রকাশ করে, এবং তাহার জবাবস্বরূপ একজন হিন্দু (সনাতন-ধর্ম্মসভার সেক্রেটরী) একটা কবিতা রচনা করে যাহাতে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগে। এখানে বক্তব্য এই, যে, মুসলমানরা যদি কিছু অন্যায় গালাগালি দিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে তাহাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, বা সম্প্রদায়ের নিন্দা করা, এবং তাহা আবার কবিতায় করা, শিষ্টতা ও ধার্ম্মিকতার লক্ষণ নহে। ওরূপ করা কখনই উচিত নয়। উহা অত্যন্ত গর্হিত। কোন সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের গ্লানিকর কিছু করিলে, তাহা প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের গোচর করা উচিত। তাহাতে কোন ফল না হইলে বরং গবর্ন্মেণ্ট্‌কে তাহা জানানো উচিত। পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে হিন্দুমুসলমানের যেরূপ মনকষাকষি চলিতেছে তাহাতে পরস্পরের ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট কোন আলোচনা স্থগিত রাখাই উচিত। যদি সেরূপ আলোচনা করিতেই হয়, তাহা এখন (এবং সর্ব্বকালেই) বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যেরূপ শুষ্ক গদ্য ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ শুষ্ক উদ্দীপনাবিহীন উত্তেজনাশূন্য গদ্যে করা উচিত; কবিতায় তাহা হইতে পারে না।

সরকারী কাগজ হইতে জানা যায়, যে, হিন্দু কবিতাকার প্রকাশ্য সভায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। ব্যাপারটি এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল।

কাহারা আগে বন্দুক ছুড়িল বা অন্যপ্রকারে দাঙ্গার সূত্রপাত করিল, সে-বিষয়ে উভয়পক্ষের বর্ণনার মিল নাই। সরকারী কাগজের সিদ্ধান্ত এই, যে, ভয়ে আতঙ্কে অভিভূত হইয়া একজন হিন্দুই প্রথমে গুলি ছুড়ে, এবং তাহাতে একজন মুসলমান বালক হত হয়।

আমাদের বক্তব্য এই, যে, সমস্ত দোষটা কোন-কোন হিন্দুর ইহা প্রমাণিত হইলেও, কেবলমাত্র তাহাদেরই শাস্তি আদালতে ধীরভাবে বিচারের পর হওয়া উচিত ছিল। প্রতিহিংসা ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু বা মুসলমান যিনিই প্রতিপক্ষকে নিজে শাস্তি দিতে চাহিবেন, তিনিই মাত্রা অতিক্রম নিশ্চয়ই করিবেন এবং অনেক গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিবেন। তাহা করা কোন ধর্ম্মেরই অভিপ্রেত হইতে পারে না। সমগ্র হিন্দু সমাজ বা সমগ্র মুসলমান সমাজ যুক্তিপরামর্শ করিয়া অপর সম্প্রদায়কে ব্যথা দেওয়ার প্রমাণ এইপ্রকারের কোন দাঙ্গাহাঙ্গামাতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং সমগ্র কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ অনুচিত।

নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সহজ, উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বিজ্ঞোচিত কাজ করা কঠিন, তাহা জানি। কিন্তু সকল সময়েই, উত্তেজনার কারণ-সত্ত্বেও, কেবল বৈধ কথা বলিতে ও বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে আমরা অভ্যস্ত না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি, কোনও সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং ভারতীয়দিগের মানবিকতা ও মনুষ্যত্বলাভ সম্ভব হইবে না।

সরকারী কাগজগুলিতে দেখা গেল, যে, উভয় সম্প্রদায়ের মনকষাকষির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সরকারী কোন কর্ম্মচারী উভয়সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই, তাহাদিগকে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন নাই বা অনুরোধ করেন নাই। সরকারী লোক ও বে-সরকারী লোকেরা ঠিক্ যেন দুটা স্বতন্ত্র জগতের লোক। শক্তির প্রয়োগ ও হুকুমজারি করা ছাড়া যেন সরকারী লোকদের আর কোন কাজ নাই। বর্ত্তমান সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গের গোড়াতেই আমরা যে সার্কুলারের কথা বলিয়াছি, তদনুসারে কাজ হইলে সম্ভবতঃ সরকারী লোকেরা শক্তি-প্রয়োগ ও হুকুমজারি ছাড়া অন্যবিধ কাজও করিবেন। অবশ্য সব জায়গার সরকারী লোকেরা কোহাটের কর্ম্মচারীদের মত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত পাব্‌লিক সার্ভেণ্ট্ অর্থাৎ জনসাধারণের সেবক অনেকে আছেন।

মুসলমানদিগের ক্রোধের কারণীভূত কবিতার লেখক-সম্বন্ধে কোহাটের আসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিশনার যেরূপ বিচার করেন, তাহা তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিলেই ঠিক্ হইত; কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে দেখা গেল, যে, তিনি উহা একাধিকবার মুসলমানজনতার শাসানিতে করিয়াছিলেন। কবিতাকারের উপযুক্ত শাস্তি না হইলে মুসলমানেরা স্বয়ং তাহার শাস্তি দিবে, এইরূপ শপথ করা, কিম্বা আসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিশনারকে শাসন, তাহাদের উচিত হয় নাই, কিন্তু তাহারা উত্তেজনাবশে ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকিলেও তাহাদের শাসানিতে কাজ করা সরকারী কর্ম্মচারীর উচিত হয় নাই। তাহাতে রাজশক্তির অবমাননা ঘটিয়াছে, এবং কুফল যাহা হইয়াছে, তাহা ত জাজ্বল্যমান। তিনি স্বয়ং দৃঢ় থাকিতে পারিবেন না, যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন উচ্চতর কর্ম্মচারীকে, গবর্ন্মেণ্ট্‌কে এবং শান্তিরক্ষকদিগকে সব

কথা জানানো উচিত ছিল, এবং তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল। এই কর্ম্মচারীটি মুসলমান। একটি বিষয়ে তিনি এবং তাঁহার উপরওয়ালা ডেপুটি কমিশনারকে দোষ দেওয়া যায় না। কোহাটের কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর (ইনি হিন্দু) মুসলমানদিগের শপথ গ্রহণের কথা অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে জানান নাই। সরকারী মন্তব্যে ইহাকে তাঁহার জ্ঞানকৃত ত্রুটি বলা হয় নাই।

কোহাটের চারিদিকে মাটির দেওয়াল আছে। প্রথম দাঙ্গাহাঙ্গামার পর সমস্ত ফাটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং সহরের চারিদিকে অশ্বারোহী পাহারা নিযুক্ত হয়। তাহা সত্ত্বেও দেওয়ালে ১৩ (তের) জায়গায় ছিদ্র করিয়া বাহিরের লুণ্ঠনলোলুপ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকেরা ঢুকিয়াছিল। ইহা কেমন করিয়া ঘটিল, তাহা সরকারী কোন কাগজে খুলিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু সরকারী কাগজেই যখন ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে অনেকে পরে লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল, তখন ইহা খুবই সম্ভব মনে হয়, যে, অশ্বারোহী প্রহরীরা নিজেদের কাজ ত করেই নাই, অধিকন্তু বাহিরের লুণ্ঠনকারীদের দেওয়ালে সিঁধ দেওয়ায় সাহায্যও করিয়াছিল।

কোহাটে অনেক সৈনিক মতায়েন আছে, ক্যাণ্টনমেণ্ট আছে। তাহা-সত্ত্বেও সাত-সাত দিন ধরিয়া লুণ্ঠন ও গৃহদাহ চলিয়াছিল, এবং তাহার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান উভয়পক্ষের অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল। ইহাতে সরকার বাহাদুর বিস্মিত হন নাই, কাহাকেও দোষ দেন নাই। অধিকন্তু বড়লাট বলিয়াছেন, যে, প্রথম হইতেই সেনাদলের সাহায্য লইলেও এবং যথাসময়ে দাঙ্গাকারীদের প্রতি গুলি চালাইলেও হত্যা, গৃহদাহ ও লুটতরাজ বন্ধ করা কিম্বা কমানো যাইত না। আমাদের মত ঠিক্ ইহার উল্টা। আমরা কেবলমাত্র সরকারী কাগজপত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিতেছি, যে, প্রথম হইতে সরকারী কর্ম্মচারীরা সাবধান হইলে এবং তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত সব উপায় অবলম্বন করিলে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারিত হইতে পারিত;—তাহা অসম্ভব বিবেচিত হইলেও, ইহা নিশ্চিত, যে, ব্যাপারটি যেরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারীরা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে এবং হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব রক্ষা করিতে আন্তরিক ইচ্ছা তাঁহাদের থাকিলে, উহা ততটা ভয়ঙ্কর হইত না। কিন্তু যদি বড়লাটের সিদ্ধান্তই ঠিক্ হয়, তাহা হইলে ইংরেজ গবর্মেণ্টের শান্তিরক্ষার ভাণ ত্যাগ করিয়া বলা উচিত যে, "আমাদের দ্বারা ঐ কাজটা তখনই অসম্ভব যখন উহার প্রয়োজন খুব বেশী।"

তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে এবং চীফ কমিশনারের মন্তব্যে যদি বা কোহাটের সরকারী কর্ম্মচারীদের শুভ্র যশে এক-আধ ফোঁটা কালী পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধানবিচারপতি লর্ড রেডিং বড়লাটরূপে তাহা সযত্নে ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিয়াছেন,—যদিও দাগগুলা ভারতীয়দের চোখে ধরা পড়িতেছে।

বড়লাট বলিতেছেন, যে, যে-সব শান্তিরক্ষক লুটে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের কেহ-কেহ বিভাগীয় রীতি-অনুসারে পদচ্যুত হইয়াছে, এবং কাহারও-কাহারও পদোন্নতি বন্ধ করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এরূপ শাস্তি যথেষ্ট নয়। বেসরকারী-লোকে লুটতরাজ-সংপৃক্ত কোন অপরাধ করিলে তাহাদের যে শাস্তি হয়, সেরূপ অপরাধের জন্য শান্তিরক্ষকদের শাস্তি আরও বেশী হওয়া উচিত। বড়লাট ইহাও বলিয়াছেন, যে, কাহারও-কাহারও সাধারণ আদালতে বিচার হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরো যাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাহাদেরও বিচার হইবে। ইহা ঠিকই হইতেছে।

শান্তিরক্ষকদের লুণ্ঠনকার্য্যের দোষক্ষালন করিতে গিয়া বড়লাট যাহা বলিয়াছেন, বিষয়টি শোচনীয় হইলেও, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, মূল্যবান্ জিনিষ সব পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া শান্তিরক্ষকেরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এ বড় মজার কথা। মানুষ যে পাপ করে, তাহা ষড়্‌রিপুর কোন-না-কোনটার বশবর্ত্তী হইয়াই ত করে? তাহাতে অপরাধের মাত্রা কম হয় কি-প্রকারে? যদি দুর্ভিক্ষে উপবাসী কঙ্কালসার লোকেরা খাবারের দোকানের কিছু জিনিষ খাইয়া ফেলে, এবং যদি তাহাদের দোষক্ষালনের জন্য বলা যায়, যে, তাহারা দীর্ঘকাল উপবাসী বুভুক্ষিত ছিল বলিয়াই উহা করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাদের পক্ষ সমর্থনার্থ এই উক্তির বলবত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বড়লাট যে-প্রকারে সরকারী লুণ্ঠনকারীদের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারীদের দোষও এই বলিয়া খণ্ডন করা যায়, যে, তাহারা পাশব প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে।

এত বড় একটা পৈশাচিক কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ সরকারী কাগজগুলিতে কাহারও প্রতি যথেষ্ট দোষারোপ নাই, আক্ষেপপ্রকাশ নাই, অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, হৃত-সর্ব্বস্ব লোকদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ নাই, কোন-কোন লোকের দোষ হইয়া থাকিলেও তাহাদের সমস্ত সমধর্ম্মীর লাঞ্ছনার অন্যায্যতা প্রতিপাদন নাই। অধিকন্তু বড়লাট কোহাটের রাজকর্ম্মচারীদের অবিচলিত ধীরবুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন! অথচ এই দুটি-জিনিষের পরিচয় আমরা ত কোথাও পাইলাম না। সরকারী

কাগজগুলিতে পড়িয়া আশ্বস্ত হইয়াছি, যে, কোহাটের কোন-কোন সহৃদয় মুসলমান কোন-কোন হিন্দুর নিরাপদ্ স্থানে যাইবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

কোহাটের সর্‌কারী তদন্তের ফল যাহা হইয়াছে, তাহা ত দেখা গেল। বে-সর্‌কারী তদন্তের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এইরূপ তদন্ত করিয়া দোষী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিবার প্রয়োজন নাই, এবং শাস্তি দিবার ক্ষমতাও বে-সর্‌কারী কোন লোকের বা জনসমষ্টির নাই। ভীষণ ব্যাপারটির সত্য কারণ নির্ণয় করিয়া, কোহাটে ও অন্যত্র তদ্রূপ কারণের মূলোচ্ছেদ চেষ্টা করাই এরূপ তদন্তের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

—

চিত্তরঞ্জনের মন্ত্রিত্বগ্রহণে অস্বীকার

বাংলা দেশে পুরাতন ও নূতন বে-আইনী আইন-অনুসারে অনেক জনসেবক ধৃত হওয়ায়, তৎসম্পর্কে লর্ড্ লিটন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে কোন-কোন জননায়কের, জনসভার, ও সংবাদ-পত্রের সমালোচনার, অনুরোধের ও প্রস্তাবের উত্তর দিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। নূতন আইনজারি এবং তদনুসারে ও পুরাতন তিন নম্বর রেগুলেশ্যন্-অনুসারে অনেকের গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ একাধিকবার বঙ্গে বিপ্লববাদীর অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। গবর্ণ্‌মেণ্ট্ নিজেদের কাজের সমর্থনের জন্য যে সব প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, দাশ-মহাশয়ের উক্তি তাহার মধ্যে অন্যতম। দলননীতির প্রবর্ত্তনের পরও দাশ-মহাশয় বিপ্লববাদীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে, গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তাঁহার কথিত রাজনৈতিক রোগের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থা তিনি যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা করা হয় নাই। তিনি মোটামুটি দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার কথার উত্তরে লর্ড্ লিটন যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা এই, যে, চিত্ত-রঞ্জনকে মন্ত্রী হইতে বলিয়াছিলাম; তিনি সে দায়িত্ব লইতে রাজি হন নাই; সুতরাং এখন তাঁহার কথা-অনু-সারে কাজ কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? লর্ড্ লিটনের এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য তাঁহার বক্তৃতাবলীর অন্য কোন-কোন বাক্য হইতে বুঝা যায়। এক স্থানে তিনি এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যে, সকল ব্যক্তির নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে; বিপ্লববাদীদের দুশ্চেষ্টায় কোন-কোন সর্‌কারী ও বে-সর্‌কারী লোক-দের প্রাণসংশয় হইয়াছে। সেই আশঙ্কা দূর করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের। গবর্ণমেণ্ট সেই দায়িত্ব পালন করিবার নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক মনে করেন, তাহা করিয়াছেন। যদি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মন্ত্রিত্ব ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা শুনা চলিত। রাজনৈতিক কারণে যাহাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা হইয়াছে, তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার দায়িত্ব তিনি লন নাই, লইবেন না, অথচ রাজনৈতিক ব্যাধির প্রতি-কারের চেষ্টা তাঁহার ব্যবস্থা-অনুযায়ী হইবে, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে?

লর্ড লিটনের যুক্তি আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা বলিলাম। আমাদের বিবেচনায় ইহা সারবান্ নহে। তাহার কারণ বলিতেছি।

চিত্তরঞ্জন-বাবু যদি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা হইলেও তিনি হস্তান্তরিত বিভাগগুলির দুই-একটির ভারই পাইতেন; শাসন ও পুলিশ বিভাগ হস্তান্তরিত নহে, সুতরাং তাহার ভার তিনি পাইতেন না। রাজনৈতিক ও সাধারণ নরহত্যা আদি নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা শাসনবিভাগের অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটদের এবং পুলিশবিভাগের অর্থাৎ গ্রাম্য চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর্-জেনার‍্যালের কাজ। ইঁহাদের কেহ যখন কোন মন্ত্রীর তাঁবেদার নহেন এবং আইন-অনুসারে হইতে পারেন না, তখন চিত্তরঞ্জন-বাবু মন্ত্রী হইলেও কাহারও প্রাণরক্ষার দায়িত্ব পরোক্ষভাবেও তাঁহার হইত না। অতএব, "চিত্তরঞ্জন-বাবু টেগার্ট সাহেব বা অন্য কাহারও প্রাণরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার পরামর্শ শুনা যাইতে পারে না," ইহা নিতান্ত বাজে কথা।

বিপ্লববাদের মূল নষ্ট করিবার জন্য দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ কেবল চিত্তরঞ্জন-বাবু দেন নাই, অন্যেও দিয়াছে। তাঁহাদের কাহাকেও মন্ত্রী করিবার প্রস্তাব হয় নাই—সকলকে মন্ত্রী করা যাইতেও পারিত না। যাঁহা-দিগকে মন্ত্রিত্বদানের প্রস্তাব হয় নাই, তাঁহারা সবাই বাজে লোকও নহেন। তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিবার কারণ কি?

মন্ত্রিত্বগ্রহণ না করিয়া চিত্তরঞ্জন-বাবু ঠিক্ কাজই করিয়া-ছিলেন। ভারতশাসন সংস্কার আইন-অনুসারে দ্বৈরাজ্য প্রবর্ত্তিত হইবার পরই যাঁহারা উৎসাহের সহিত মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান-প্রধান কয়েকজন প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, যে, মন্ত্রীদের ক্ষমতা যেরূপ, এবং যে-যে অবস্থায় ও সর্ত্তে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়, তাহা দেশের সেবার জন্য যথেষ্ট ও তাহার অনুকূল নহে। এ-অবস্থায় চিত্তরঞ্জন-বাবু মন্ত্রী হইলে মহা ভ্রম করিতেন।

—

ভয়ে অধিকতর শাসনসংস্কার স্থগিত রাখা

লর্ড লিটন্ আর-একটা কথা বলিয়াছেন, যাহা নূতন নয়। তিনি বলেন, যে, যদি দেশের লোককে এখন

অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে যখনই কেহ রাজনৈতিক হত্যা-আদির ভয় দেখাইবে, তখনই তাহাদের দাবী গ্রাহ্য করিতে হইবে; এইরূপে, ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করা কোন গবর্ণ্‌মেণ্টের উচিত নয়। ধমক বা শাসানির বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করা উচিত নয়, ইহা সাধারণভাবে ঠিক্‌। কিন্তু কেহ ভয় দেখাইতেছে বলিয়াই, কর্ত্তব্য কাজ হইতে বিরত থাকাও নির্ব্বুদ্ধিতা এবং কাপুরুষতা। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা রক্তপাত বিস্তর করিয়াছে, এবং জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব না পাইলে আরও রক্তপাত করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পাছে জগদ্বাসী বলে, যে, ব্রিটিশ জাতি ভয়ে আইরিশদিগকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দিল, সেই কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দিতে বিরত থাকে নাই।

বঙ্গে বিপ্লবসংঘটনের ষড়যন্ত্র আছে কি না, আমরা জানি না। থাকিলেও তাহা গুরুতর কিছু নয়। যদি থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে কি এই বুঝিতে হইবে, যে, সেই কারণেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রগতি বন্ধ থাকিবে, এবং বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীন হইতে না পারিলে এদেশের আর কোন গতি থাকিবে না? সকল দেশেই রাজনৈতিক কারণে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়া শান্তিভঙ্গ হয়, এবং এইরূপ শান্তিভঙ্গ রাজনৈতিক ব্যাধির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয় ও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়। যেখানে প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না, তথায় পরিশেষে বিপ্লব ও বিদ্রোহ ঘটে; তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

এখন ভারতবর্ষকে আত্মকর্তৃত্বের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলে বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তিই এরূপ মনে করিবে না, যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট তাহা করিলেন। লর্ড লিটন্ ত স্বয়ংই বলিয়াছেন, যে, সামান্য কয়েকজন লোক ছাড়া দেশের আর-সব অধিবাসী আইন-অনুসারে চলিতেছে ও চলিতে ইচ্ছুক। আমাদের উভয় সঙ্কট। দেশে কোন-প্রকার শান্তিভঙ্গ না হইলে, কর্ত্তারা বলেন, ইংরেজ রাজত্ব রাম রাজত্ব, সকলেই খুসী আছে, কোন পরিবর্ত্তনের দরকার নাই। পক্ষান্তরে যদি কোন গোলমাল ঘটে, তখনও কর্ত্তারা বলেন, "তোমরা চোখ্‌ রাঙাইতেছ, অতএব আমরা কোন পরিবর্ত্তন করিব না।"

—

অসন্তোষের আর্থিক কারণ

লর্ড লিটন্ তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বঙ্গে কোন অসচ্ছলতা বা অর্থনৈতিক সঙ্কট নাই, যাহার জন্য অসন্তোষ ও বিপ্লব-ইচ্ছা জন্মিতে পারে। রক্তপাত করিয়া বিপ্লব ঘটাইবার ইচ্ছা ও চেষ্টার আমরা বিরোধী; কিন্তু অসন্তোষের, এবং সেই কারণে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তনচেষ্টার কোন আর্থিক কারণ নাই, ইহা চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট কোন লোক বলিতে পারে না। দেশের মামুলী দারিদ্র্য ত লাগিয়াই আছে; বেকার-সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার উপর বঙ্গের চালের গোলা বাখরগঞ্জেই চালের দর ১২৲ টাকা মণ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আরাম ও বিলাসের আয়োজনে পরিবেষ্টিত লাটসাহেব ইহাকে কি সচ্ছলতার লক্ষণ মনে করেন?

—

ওডোয়াইয়ার্ বলেন "পুনর্মুষিকো ভব"

ব্রিটিশ সিংহ ভারতশাসন-সংস্কার আইন দ্বারা আমাদিগকে হিতোপদেশের ব্যাঘ্রে পরিণত করেন নাই। তথাপি পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব জবরদস্ত শাসক ওডোয়াইয়ার্ বলিতেছেন, ভারতশাসনসংস্কার আইন অনুযায়ী দ্বৈরাজ্য বিফল হইয়াছে, ভারতীয়েরা অতটা রাষ্ট্রীয় অধিকারের যোগ্য বলিয়া আপনাদিগকে প্রমাণ করিতে পারে নাই; অতএব, উক্ত আইন ও দ্বৈরাজ্য রদ করিয়া আগেকার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হউক।

ভিক্ষার মত যাহা দেওয়া হয় ও পাওয়া যায়, তাহার প্রতি আস্থা আমাদের কোন কালেই নাই, এবং তাহা থাকা-না-থাকা-সম্বন্ধে আমাদের কোন চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইবার কারণও দেখিতেছি না। ইংরেজ নিজের গরজে ও খেয়ালে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; আমরা নিজের কৃতিত্বে যদি কিছু অর্জ্জন কখন করিতে পারি, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কথা উঠিলে আমাদের বক্তব্য বলিব ও কর্ত্তব্য করিব।

বিশ বৎসর আগে "সফলতার সদুপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, এখন তাহাই মনে পড়িয়া গেল। তদ্ যথা—

"পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে, গভর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব—তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না, যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে-উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।—তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ কাড়িতেও ততক্ষণ—যে-স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে-অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্ত চিত্তে, নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি—রিপনের জয় হউক্ এবং কার্জ্জনও বাঁচিয়া থাকুন!" (সমূহ" পৃঃ ৬৭)।

—

লর্ড্‌ রেডিং ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি

লর্ড রেডিংকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতার মেয়র হাওড়া ষ্টেশনে হাজির থাকিবেন কি না, তৎসম্বন্ধে

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সভায় আলোচনা হইয়া অধিকাংশের মতে স্থির হয়, যে, মেয়র উপস্থিত থাকিবেন না। এই সিদ্ধান্ত ঠিক্ হইয়াছে, এবং ইহার দ্বারা কলিকাতার ও বাংলাদেশের সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। যিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে এবং আরও অনেককে বিনা বিচারে বন্দী করিবার মূলে, তাঁহাকে হাসিমুখে, "আসুন মহাশয়, আপনার আগমনে কৃতার্থ হইলাম," বলাটা হেয় কপটতা হইত।

এই বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে এই একটা যুক্তির অবতারণা করা হয়, যে, বড়লাট সম্রাটের প্রতিনিধি, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা না করিলে সম্রাটের অপমান করা হয়। ইহার উত্তরে যাহা-যাহা বলা যায়, তাহার দু-একটা কথা বলিতেছি। বিলাতে রাজার কোন বিশেষ রাজনৈতিক মত নাই, ভাল-মন্দের জন্য মন্ত্রীরা দায়ী। সুতরাং বর্ত্তমানকালে কোন অবস্থাতেই বিলাতে ইংরেজদের রাজাকে আদর-অভ্যর্থনা করিতে বাধে না, যদিও অতীতকালে যখন রাজারা ক্ষমতা পরিচালন করিতেন তখন ইংরেজরা সকল সময়ে একান্ত রাজভক্তিমান্ থাকিতে সমর্থ হয় নাই। ভারতের বড়লাট যদি বাস্তবিক রাজনীতিক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতীয়দেরও তাঁহাকে সৌজন্য দেখাইতে কোন সময়েই বাধিত না। কিন্তু তিনি যখন দলননীতির প্রবর্ত্তন ও সমর্থনও করেন, তখন ভারতীয়েরা সকল অবস্থায় তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা করিতে পারে না। তা ছাড়া, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা না করিলেই যে তাঁহার বা রাজার অপমান করা হয়, এরূপ মনে করা ভুল।

আর-একটা কথা এই, যে, রাজার যাহা প্রাপ্য, রাজপ্রতিনিধিরও তাহাই প্রাপ্য ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, সকল অবস্থাতেই রাজার ও তাঁহার প্রতিনিধির প্রাপ্য একই থাকে, ইহা স্বীকার করা যায় না। সাধারণ অবস্থায়, রাজশক্তির কৃত আইন মানিতে ও ট্যাক্স দিতে জনসাধারণ বাধ্য, অপর কোন বাধ্যতা নাই। অসাধারণ অবস্থায় প্রজাদের আইন অমান্য করিবার ও ট্যাক্স না দিবার অধিকার পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যথেষ্ট কারণবশতঃ রাজপ্রতিনিধির আগমন-উপলক্ষে হাজরী না দেওয়াটায় কোন দোষ নাই।

—

বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে দান

আমরা খবরের কাগজে পড়িয়া সুখী হইলাম, যে, শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বিড়লা মহাশয় বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে দানের পরিমাণটা জানিতে কৌতূহল সকলেরই হইবার কথা।

লর্ড্ লিটনের টোপ্

নূতন ও পুরাতন বে-আইনী আইন-অনুসারে ধৃত ব্যক্তিদিগকে কিরূপ অবস্থায় ও সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, লর্ড লিটন্ একটি বক্তৃতায় তাহা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি এই, যে, ছয়মাস-স্থায়ী নূতন অর্ডিন্যান্স্‌টির অনুরূপ একটি স্থায়ী আইন প্রণয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকে রাজী হইতে হইবে! বুদ্ধিমান্ ও দেশহিতৈষী কোন ব্যবস্থাপক নিশ্চয়ই এই টোপ গিলিবেন না। ধৃত ব্যক্তিরা ত খালাস পাইবেই না, অর্ডিন্যান্সও লুপ্ত হইবে না।

কোন ব্যক্তিকে ফাঁসীকাঠে চড়াইয়া যদি বলা হয়, "তোমাকে ঐ উচ্চস্থান হইতে এই সর্ত্তে নামাইয়া লইতে রাজী আছি যে, তোমার গলায় দড়িটার ফাঁস লাগানো থাকিবে, এবং দড়িটা আমি ধরিয়া থাকিব," তাহা হইলে ঐ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলিতে পারে "কর্ত্তার কি দয়া!"

—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের দান

দান ক্ষুদ্র হউক, বা বৃহৎ হউক, দাতা তাহার জন্য প্রশংসার্হ। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ঋণশোধ এবং পারিবারিক ক্ষুদ্র বাসস্থান নির্ম্মাণ ও সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক অর্থ বাদে নিজের সমুদয় সম্পত্তি লোকহিতার্থ দান করিয়াছেন, এই সুসংবাদে সুখী হইলাম। কোন-কোন কাগজে দেখিলাম, তাঁহার সম্পত্তির মোট মূল্য আনুমানিক আট লক্ষ টাকা। ঋণ কত, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। সম্পত্তির মূল্য হইতে তাহা শোধ যাইবে। তিনি টালীগঞ্জে অল্প জমি কিনিয়া তাহাতে একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, এবং সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক দুই হইতে তিন শত টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিবেন। বাকী সব টাকা লোক-হিতার্থ ব্যয়িত হইবে। তাহার মধ্যে, তাঁহার বর্ত্তমান গৃহ ১৪৮ রসারোড্ সাউথে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও ঠাকুর সেবার বন্দোবস্ত, হিন্দু বালকদের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা, এবং নারীদের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা, প্রধান।

কলিকাতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত নারীদের কলেজ দু'টিতে যত ছাত্রী হয়, তাহাদের বেতনে কলেজ দু'টির ব্যয়ের সামান্য অংশই নির্ব্বাহিত হয়। দাশ-মহাশয়ের ইচ্ছানুরূপ কলেজ সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইবে না। তাহা হইলে তাহাতেও ছাত্রী খুব বেশী হইবে মনে হয় না। সুতরাং প্রায় সমস্ত ব্যয় দানের আয় হইতেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আমরা একটা আনুমানিক হিসাব করিয়া দেখিলাম, একটি নারী কলেজের মাসিক ব্যয় দুই হাজার টাকার কম হইবে না। চারি লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলে এইরূপ আয়

হইতে পারে। যদি কলেজের জন্য এবং ছাত্রীনিবাসের জন্য জমি কিনিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাতে এবং লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটারীতে আন্দাজ দুই লক্ষ টাকার কম ব্যয় হইবে না। ঋণ-শোধাদি বাদে যদি এই-রূপ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে নারী-কলেজ প্রতিষ্ঠা সমীচীন হইবে, এবং তাহা সুপরিচালিত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। যদি যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত না থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য একটি উৎকৃষ্ট বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইলেও দেশের কম হিত হইবে না।

—

তেল্যে মাথায় তেল

ভারতে ইংরেজ সিবিলিয়ান্ প্রভৃতির বেতন ও অন্যান্য পাওনা বাড়াইবার জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহা রিপোর্ট অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য পাওনা বিলাতের কর্ত্তারা গত এপ্রিল মাস হইতে মঞ্জুর করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এই রিপোর্টের অনুরোধগুলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কর্ত্তারা কর্ণপাত করেন নাই। ইহাতে ভারতবর্ষের এককোটি বাৎসরিক খরচ বাড়িল। ইহার পর সৈনিক বিভাগের বেতনাদি বাড়াইবার পালা। সিবিলিয়ান্দের যাহা বাড়িয়াছে, তাহাতেও বিলাতের কোন কোন কাগজওয়ালা সন্তুষ্ট হন নাই। সন্তুষ্ট কেনই বা হইবেন?

"প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির ত অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরিবার মত।...অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়।"—"সমূহ", পৃঃ ৭৮; ১৩১৪ সাল।

অনেক আগেও সিবিলিয়ান্দের যে-বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাও অধিকাংশ সভ্যদেশের ঐ-শ্রেণীর চাকরীর বেতন অপেক্ষা ঢের বেশী, এবং সেইসব দেশ আমাদের চেয়ে ধনী। তথাপি বারবার উহাদের বেতনাদি বাড়িয়া চলিতেছে। দেওয়া না-দেওয়ার মালিক আমরা নই। জোর যার মুলুক তার—নীতি এখনও এদেশে অনুসৃত হইতেছে। তথাপি বলি, যে সব ইংরেজ এদেশে এখন চাকরী করিতেছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান দাবিতে আমরা আপত্তি করিতাম না, যদি ভারতের পক্ষে এই ক্রমবর্দ্ধনশীল বোঝা তাঁহাদের চাকরী-কালের সহিতই আমাদের কাঁধ হইতে নামিত। অর্থাৎ তাঁহাদের উচ্চতর বেতনাদি প্রাপ্তিতে আমরা সম্মতি দিতাম, এই সর্ত্তে, যে, আর নূতন করিয়া ইংরেজ চাক্‌রো আমদানি করা হইবে না; তাহা হইলে আমরা ক্রমে-ক্রমে যোগ্য দেশী লোকের দ্বারা আমাদের সাধ্যমত ব্যয়ে সব কাজ চালাইতে পারিতাম। তাহা হইবে না। ইংরেজ-আমদানি চলিতে থাকিবে। কাল-ক্রমে শতকরা পঞ্চাশজন দেশী লোক ঐসব চাকরী পাইবে তার বেশী নহে। যদি গবর্মেণ্টেরই কথামত যোগ্য শতকরা ৫০ জন দেশী লোক পাওয়া যায়, তবে শতকরা একশত জনই বা কেন পাওয়া যাইবে না? ইস্পাতরূপী ইংরেজ যদি কোহাটে থাকেন, তাহা হইলে দস্তারূপী ভারতীয় এলাহাবাদে থাকিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কোহাটের মত কৃতিত্ব (!) কি-প্রকারে দেখাইতে সমর্থ হইবেন, বুঝি না। দেশের অর্দ্ধেকগুলা জেলা যদি দেশী লোকে সায়েস্তা রাখিতে পারে, বাকী অর্দ্ধেকটাই বা কেন না পারিবে?

সাদা চাক্‌রোদের যে মাইনা বাড়িল, কালা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা তাহার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ যাহাতে করিতে না পারে, তাহা কমাইতে না পারে, তাহার জন্য পার্লেমেণ্টে ভারতশাসন আইন সংশোধিত হইবে।

দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট টাকা কখনও সরকারের সিন্ধুকে থাকে না, কিন্তু স্বজাতির পকেটে টাকা ঢালিতে সর্ব্বদাই টাকা পাওয়া যায়।

—

সমবায় দ্বারা গ্রামসমূহের উন্নতি

"স্বরাজ্য সপ্তাহ" ফণ্ডের দ্বারা সমবায় বা কো-অপারেটিভ প্রণালী-অনুসারে গ্রাম-পুনর্গঠন আদি কাজ করা হইবে, ইংরেজী বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু সমবায় দ্বারা এইকাজ করিতে হইলেও তিনলক্ষ টাকা যথেষ্ট নহে।

—

"স্বরাজ্য সপ্তাহ" ফণ্ডে কেন টাকা দিতে হইবে

গ্রামসকলের উন্নতি করিয়া সমগ্রজাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করা "স্বরাজ্য সপ্তাহ" ফণ্ডের উদ্দেশ্য বলিয়া "দেশের ডাক" প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। সেরূপ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন শক্তিশালী সংঘবদ্ধ জাতির নিগ্রহ বা দলন অসাধ্য বা দুঃসাধ্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু গ্রামসকলের ও বাঙালী জাতির সে-অবস্থা দুএকদিনে দুএকমাসে দুএকবৎসরে হইবে না। অথচ, ফরওয়ার্ড কাগজে বড় বড় অক্ষরে এই মর্ম্মের কথা ছাপা হইতেছে, যেন "স্বরাজ্য সপ্তাহ" ফণ্ডে টাকাটি দিবা মাত্রই হাতে হাতে ফল পাওয়া যাইবে—একেবারে নগদ বিদায়, ডান্ হাত বাঁ হাত! নমুনা দেখুন—

"You may be the next victim of the Ordinance. Pay to Kill it."

"এর পরই তুমি অর্ডিন্যান্স-রাক্ষসটার কবলে পড়িতে পার। তাহাকে বধ করিবার জন্য টাকা দাও।"

"Are you for repression? Pay to destroy it."

"তুমি কি দলনের পক্ষপাতী? [নিশ্চয়ই নও।] উহার বিনাশের জন্য টাকা দাও।"

রাস্তায়-রাস্তায় যে-সব স্ত্রীলোক "বা-আত ভালো কোরী, দাঁতের পোকা ভালো কোরী," বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়, তাহাদের মত আশ্বাস-দান নেতৃবৃন্দকে করিতে দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয় না।

দলন-নীতি থাক্ বা না থাক্, ধ্বংসোন্মুখ গ্রামসকলকে মানুষের বাসোপযোগী করিতে হইবে। যখন অর্ডিন্যান্সটা জারী হয় নাই, তাহার আগেও কি কোন লোক বা দল, স্বরাজ্যদল্ এবং অন্যদল, গ্রামের উন্নতির সংকল্প, চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই? স্বাধীন দেশসকলে কি "ব্যাক্ টু দি ভিলেজ"—"আবার গ্রামে চল" রব উত্থিত হইয়া তদনুযায়ী কাজ কখন হয় নাই বা এখনও হইতেছে না? আমাদের দেশ স্বাধীন হইবার পরেও কি যখন যে-অঞ্চলে আবশ্যক উক্তরূপ কাজ করিতে হইবে না?

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর প্রধানতঃ ম্যাঞ্চেষ্টারকে জব্দ করিয়া ইংরেজের চেতনা করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালী স্বদেশী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষের উৎপাদন ও ব্যবহারের রব তুলিয়াছিল। তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই বলিতেছি না। কিন্তু চীৎকার ও আস্ফালনের তুলনায় কিছুই হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, মহৎ ও স্থায়ী কাজ মহৎ ও স্থায়ী উদ্দেশ্যে করিবার নিমিত্তই লোককে প্রবুদ্ধ হইতে ও করিতে হয়, সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী উদ্দেশ্যের অবতারণায় সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আমাদের যে-সব ব্যবহার্য্য জিনিষ আমাদের উৎপন্ন করিবার মত মাল-মশলা ও শক্তি আছে, তাহা আমরা করিব, ইহা মনুষ্যত্ব-ও স্থায়িত্ব-অভিলাষী জাতিমাত্রেরই চিরন্তন নীতি; কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে অনুসরণীয় অস্থায়ী-নীতি নহে।

সেইরূপ গ্রামসকলের উন্নতিও বর্ত্তমান যুগের একটি সকলসভ্যদেশব্যাপী সমস্যা। এই সমস্যার কখনও সমাধান হইলেও, যাহাতে উহার পুনরাবির্ভাব না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা সকল দেশকে সজাগ থাকিতে হইবে। এ-বিষয়ে স্বাধীন আমেরিকাতেও আন্দোলন চলিতেছে। যথা, এইপ্রকারের একটি সমস্যা-সম্বন্ধে লিটারারী ডাইজেষ্টে লিখিত হইয়াছে :—

That the modern city is doomed is the rather startling statement of Henry Ford, head of one of the biggest industrial enterprises in the United States. According to Drew Pearson, writing in *Automotive Industries* (New York), Mr. Ford declares that in the America of the future there will be no mammoth collections of sky-scrapers and teeming tenements in which millions of people are cooped within a few square miles of territory. Instead, the country will be traversed by chains of small towns clustering around individual factories and inhabited by people who will divide their time between factory and farm. The picture of the America of to-morrow which Henry Ford paints, says Mr. Pearson, is a particularly rosy one. In his opinion, the passing of the big city will mean less crime, less poverty, less wealth, less unrest, and less of that fierce, nervous strain under which myriads of our city-dwellers live to-day.

গ্রামসকলের পুনরুজ্জীবন এবং শ্রীশোভাশক্তিবর্দ্ধন সংরক্ষণের মত মহৎ ও স্থায়ী প্রচেষ্টাকে সাময়িক একটি উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বলিয়া বর্ণনা করিলে উহাকে খাট ও ছোট করা হয়, এবং প্রকারান্তরে যেন ইহাই বলা হয়, যে, অর্ডিন্যান্স্ এবং দলন-নীতি না থাকিলেই আর ঐ প্রচেষ্টারও প্রয়োজন থাকিবে না, কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা ত নহে।

সাধন-ভজন মানবের চিরমঙ্গলের কারণ বলিয়া উহা সকল দেশে ও কালে সকলের অবলম্বনীয়। কিন্তু যদি কেহ বলে, "ঠাকুর-সেবা কর, মোকদ্দমা জিতিতে পারিবে," তাহা হইলে তাহার ভগবদ্‌ভক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

—

মিশরে ইংরেজ

মিশরে স্যার্ লী ষ্ট্যাক্ নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায়, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্ মিশর গবর্মেণ্টের উপর এই দোষারোপ করেন, যে, শেষোক্ত গবর্মেণ্ট তাঁহাকে নিহত হইতে দিয়াছেন, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে তাঁহাকে যথোচিত রক্ষা করেন নাই। অথচ স্যার্ লী যে মিশর সর্কারের জ্ঞাতসারে বা তাঁহাদের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। দুর্ব্বল বলিয়াই সম্ভবতঃ মিশরকে এইপ্রকারে অপমান করা হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট মিশরের নিকট হইতে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবা করিয়াছেন। স্যার্-লীর হত্যা সাতিশয় গর্হিত ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকাটার পরিমাণ অত্যধিক। পারস্যে যখন একজন আমেরিকান্ হত হন, গ্রীসে যখন একজন ইটালিয়ান্ হত হন, মেক্সিকোতে যখন একজন ইংরেজের আমেরিকান্ স্ত্রী হত হন, তখন কোথাও এত টাকা চাওয়া বা আদায় করা হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, মিশর দুর্ব্বল পক্ষ বলিয়া ব্রিটেন্ এই সুযোগে দু'পয়সা রোজ্‌গার করিয়া লইতেছেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণটা ছাড়িয়া দিলে, উহা লওয়া অসঙ্গত হয় নাই। হত্যাকারী ও তাহার সঙ্গী থাকিলে, তাহাদের সমুচিত শাস্তি দাবী করাও অন্যায় হয় নাই। হত্যাকাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্পৃক্ত অন্য যে-কোনও দাবীও অসঙ্গত নহে বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু মিশরকে ব্রিটেন্ যতটুকু স্বাধীনতা দিয়াছিল, এই সুযোগে তাহা প্রত্যাহার করিয়া ঐ দেশকে বাস্তবিক পরাধীন দেশে পরিণত করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

সুদান মিশরের অন্তর্গত থাকিবে, বা থাকিবে না, তাহা ব্রিটেন্ ও মিশরের মধ্যে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার বিষয় ছিল। কিন্তু এই সুযোগে ব্রিটেন্ সুদান হইতে মিশরকে সমস্ত মিশরী সৈন্য হটাইয়া লইতে বাধ্য করিলেন। নীলনদ সুদান দেশ বাহিয়া মিশরে আসি-

যাছে। উহার জলের উপর মিশরের সমৃদ্ধি ও জীবন নির্ভর করে। ইংরেজরা সুদানে উহাতে এক বাঁধ দিয়া নিজেদের তুলার চাষের সুবিধা করিয়া লইতেছেন। অধিকন্তু এমন এঞ্জিনীয়ারিং ব্যবস্থাও হইতে পারে, যে, নীলের জল মিশরীরা সামান্তই পাইবে। ইহা লইয়াও ব্রিটেনে ও মিশরে তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। ব্রিটেন্ হত্যাকাণ্ডের সুযোগে নীলের যত খুসি জল সুদানে ব্যবহারের অধিকার পাকা করিয়া লইলেন, তাহাতে মিশর সরকার ইংরেজের মুঠার মধ্যে রহিলেন। অথচ বস্তুতঃ মিশরে যেমন ইংরেজদের কোন স্বাভাবিক অধিকার নাই, সুদানেও তেম্নি নাই। সুদান ও মিশর স্বাধীনভাবে নিজেদের মধ্যে শাসনপ্রণালী-সম্বন্ধে ও নীলনদের জলব্যবহার সম্বন্ধে ন্যায্য কোন বন্দোবস্ত করিয়া লইলে তাহাই স্বাভাবিক ও বৈধ হইত।

হত্যাকাণ্ডটার এরূপ ব্যবহার ব্রিটেন্ করিলেন যাহাতে মনে হয়, যে, ঘটনাটাকে যেন বিধাতার বর বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে।

—

টাটা লৌহ-ইস্পাত কারখানা

যে-সব ইস্পাতের জিনিষ টাটার কারখানায় প্রস্তুত হয়, বিদেশী সেইসব জিনিষের উপর শুল্ক বসানো সত্ত্বেও উক্ত কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, উহার মালিকগণ ভারতসরকারে শুল্কবৃদ্ধির আবেদন করেন। শুল্ক বোর্ডের সুপারিস্-অনুসারে এবার সরকার টাটাদিগকে বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অনধিক সাহায্য (বাউন্টি) দিতে রাজী হইয়াছেন। এই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অবশ্য প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে আসিবে। আগেকার শুল্কের দরুন্ও ইস্পাতের জিনিষ বেশী দামে কিনিতে হইবে বলিয়া ভারতীয় ক্রেতাদিগকে বৎসরে প্রায় দেড়কোটি টাকা বেশী খরচ করিতে হইবে। মোট এই দুই কোটি টাকা যে ভারতীয়েরা দিবে, তাহার বিনিময়ে কি পাওয়া যাইবে? বিনিময়ে আমরা এই চাই, যে, টাটার কারখানার নিম্নতম হইতে উচ্চতম সব কাজের জন্য ভারতীয়েরা উহার ব্যয়ে ও চেষ্টায় শিক্ষিত হইয়া উহাতে নিযুক্ত হউক, বিদেশীদিগকে ক্রমে-ক্রমে সব কাজ হইতে সরানো হউক, শ্রমিক ও অন্য কর্ম্মচারীদিগকে ন্যায্য বেতন ও লাভের অংশ দেওয়া হউক, এবং শ্রমিক ও অন্য কর্ম্মচারীদিগকে কারখানা পরিচালনেরও অধিকারী করা হউক।

—

কাগজের উপর শুল্ক

ভারতীয় কাগজের কলগুলির সুবিধার জন্য বিদেশী কাগজের উপর শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। যদি আমাদের দেশী লোকেরা দেশী মূলধন, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞের সাহায্যে কাগজের কল স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারেন, তাহা হইলে শুল্ক বসানো সার্থক, নতুবা নহে। বিদেশীদের ভারতীয় কাগজের কারখানার সুবিধার জন্য আমরা কেন বেশী দামে কাগজ কিনিতে যাইব?

যদি শুল্ক বসানোই হয়, তাহা হইলে যে-যে-রকম কাগজ ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না, সেইসব রকম বিদেশী কাগজের উপর শুল্ক বসানো উচিত হইবে না; যথা, সস্তা সংবাদপত্রের কাগজ, আইভরী ফিনিশ্ কাগজ এবং নকল ও আসল আর্ট পেপার, ইত্যাদি।

—

টীলক স্বরাজ্য ফণ্ডের "বিবিধ" ও "খদ্দর" ব্যয়

আমরা আগের একপৃষ্ঠায় বঙ্গের টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড হইতে "বিবিধ" ব্যয়ের আধিক্য এবং খদ্দরের জন্য ব্যয়ের নাস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছি। ১৯২১সালে অন্য কোন-কোন প্রদেশেরও এই দুই বাবতে ব্যয়ের তালিকা দিতেছি।

প্রদেশ	খদ্দর	বিবিধ
বাংলা	শূন্য	১,৬৪,৮৩৫॥৵১০
তামিল নাড়ু	৪৩৯০৮॥৵০	২৮৮
অন্ধ্র	২১০৩৻৫	শূন্য
কেরল	৭১২২৵৪	৪৮৮৬৸১৫
বোম্বাই	৭০৫৯॥৶১০	১৭৭৪৪৻১০
	৫০০০০৲	
গুজরাট	৫২৪১১১॥৴৮	৮৬২১৸৵৮
মহারাষ্ট্র	৬৬২০১৸৵০	৭৪০৵০
কর্ণাটক	৫০০৲	৯৬৸৵০
সিন্ধু	২০০০৲	১০৩২৸৴১৫
আগ্রা অযোধ্যা	২৭৩০০৲	১২৭৸০
বিহার	১১২০১৬॥৴০	১৫১৩।৶৭॥০
উৎকল	৫১৭১০৸৶২	শূন্য
পঞ্জাব ও উঃ পঃ প্রঃ	৪১৫৬৫৶০	২৫
হিন্দী মধ্য ভারত	৫০০	৮৫৫॥৶১৫

বাংলা দেশে "বিবিধ" খরচের এই অসাধারণ আধিক্যের কারণ ও মানে কি? খদ্দরের জন্যই বা কিছুই ব্যয় কেন হয় নাই? এরূপ চমৎকার ব্যয়-ব্যবস্থার মালিক ও অনুচর কে ও কাহারা ছিলেন?

৯১নং আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাজে কাজ

শ্রীমতী শান্তা দেবী
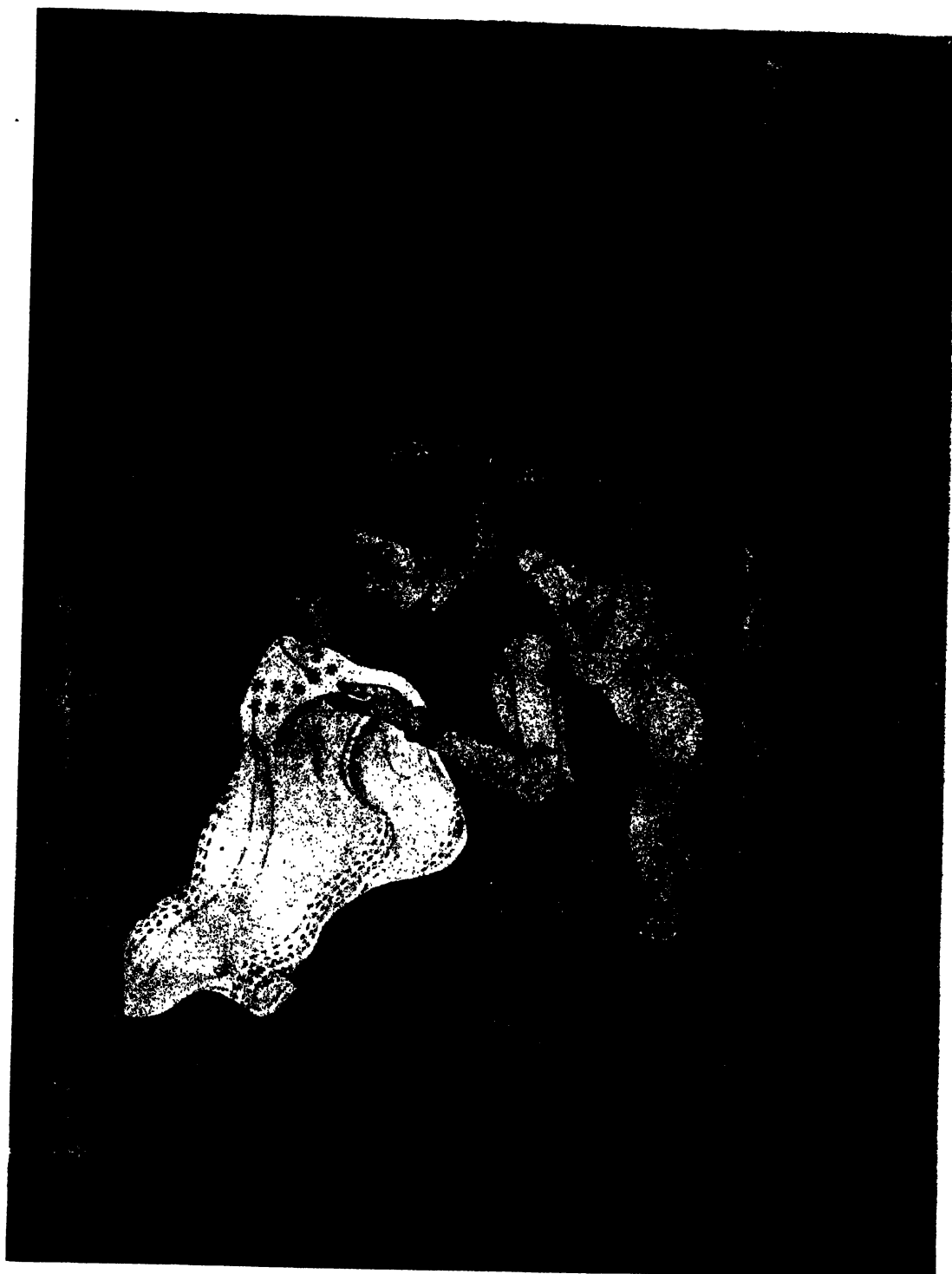
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

২৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩১

৪র্থ সংখ্যা

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

৩ অক্টোবর

এখনো সূর্য্য ওঠেনি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব্ব আকাশে। জল স্থির হ'য়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মত। সূর্য্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে' গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠ্‌ল :

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো বারে বারে ?

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মত মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে' দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূর তীরে যে-ধরণী আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ করে' একলা বসে' আছে, ছবির মত দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়্‌ল খসে', কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে' ধরে' সে একমনে পড়তে বসে' গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে-পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলচে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই; সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে' গেছে।

ধরণী পাঠ করচে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখচি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ল। বনে বনে হ'ল গাছ, ফুলে ফুলে হ'ল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হ'ল নিঃশ্বসিত। একটি চিঠির সেই একটি মাত্র কথা,—সেই আলো। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্চে আর যে পাচ্চে, সেই দু'জনের কথা এ'তে মিলেচে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্চে বিচ্ছেদ। কেননা, দূর-নিকটের ভেদ না ঘট্‌লে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কি একটা কাণ্ড আছে, সে এক-ধারাকে দুই-ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে' দিয়ে দু'খানি কচি পাতা বেরোল, তখনি সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য্য আপনি ভোগ করতে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বস্‌ল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড় সম্পদ্‌, এ নইলে সব চুপ, সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা, একটা আকাঙ্ক্ষার টান টন্‌-টন্‌ করে' উঠ্‌ল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এ-পারে ও-পারে চালাচালি হ'তে লাগল। এ'তেই দুলে' উঠল সৃষ্টি-তরঙ্গ, বিচলিত হ'ল ঋতু-পর্য্যায়; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সঙ্কোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। এ'কে যদি মায়া বল ত দোষ নেই, কেননা এই চিঠি-লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইসারা;—এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে' যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছু কাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দ্দা ফাঁক করে' দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্‌-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজচে। যে-উত্তাপটা ফেরার হয়েচে বলে' সেদিন রব উঠ্‌ল, সেই ত মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্‌ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে' বসে' ঘা দিচ্ছিল। এম্‌নি করে'ই কত অদৃশ্য ইসারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্‌ চোর-কোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কি কানাকানি করে জানিনে, তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দ্দার বাইরে এসে বলে "এসেচি"।

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি পড়ে' বল্‌লেন, "তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মানুষের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কি গোল পাকিয়েচ। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। তোমার এই লেখায় কোন্‌খানে রূপক কোন্‌খানে শাদা কথা বোঝা শক্ত হ'য়ে উঠেচে।" আমি বল্‌লুম, কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেচেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্ব্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ-মর্ত্ত্যের এই বিরহই ত সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তাছন্দেই ত বিশ্বের গান বেজে উঠচে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক্‌, কানে-কানেই হোক্‌, মনে-মনেই হোক্‌, আর কাগজে-পত্রেই হোক্‌, যে চিঠি চলে সেও ঐ বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে ?
প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্ম্মবাণী
বক্ষে টেনে' আনি'
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি করো যে মুগ্ধ মনে ॥

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথম পড়িল যবে খুলে',
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে'।
অমর জ্যোতির মূর্ত্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।
নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্ব্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উদ্ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে' ছুটে' ছুটে' কয়
"জাগ রে, জাগ রে."
বনে বনান্তরে

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি'
ঊর্দ্ধে চেয়ে কয়—
জয়, জয়, জয়।

সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে ;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয় ;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জ্জি' উঠি' কয়,—
জয়, জয়, জয় ॥

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান ;
ঊর্দ্ধ হ'তে তাই নামে গান।
চির-বিরহের নীল পত্রখানি পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তা'রে রাখো,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো ;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি',—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে ;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী করো তা'রে ;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখো তা'রে ভরি' ;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি', নারিকেল পল্লবে মর্ম্মরি',
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে ;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জ্জন নির্ঝরে ॥

রহিণী, সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।
যুগে যুগে বারম্বার লিখে' লিখে'
বারম্বার মুছে' ফেল ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে।

অবশেষে একদিন অলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে'
অবহেলে,
আত্ম-বিদ্রোহের অসন্তোষে
তার পরে আর বার বসে' বসে'
নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চলে' যায়॥

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
বসে' গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসন প্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগন্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সঙ্গীতে তা'রি পড়ুক নিঃশ্বাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে'
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে'
কটিতটে যে-কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তা'রি রিনিরিনি,
ওগো বিরহিণী!

দূর হ'তে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হ'তে মিলনের সুধা
মর্ত্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সঙ্গোপনে রেখেছ, বসুধা ;
তা'রি লাগি' নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হোক্ জ্বালাময়ী ॥

৫ অক্টোবর

মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্ত দিগন্তের দিকে হেলে-পড়া। অর্থাৎ উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সাম্‌নে এসে পড়ে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

জীবনের মাঝ-মহলে, যে কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে, অনেক বড় বড় সঙ্কল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত, "তোমার বয়স কত?" তা হ'লে আমার গোড়ার দিকের ৩৬টা বছর সরিয়ে রেখে' বলতুম, আমি হচ্চি বাকিটুকু। অর্থাৎ আমার বয়স হচ্চে কুষ্টির শেষদিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে' গম্ভীর লোকে খুসি হ'ল। তারা কেউ বল্‌লে নেতা হও, কেউ বল্‌লে সভাপতি হও, কেউ বল্‌লে উপদেশ দাও। আবার কেউ বা বল্‌লে, দেশটাকে মাটি করতে বসেচ। অর্থাৎ স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে' দেবার মত অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

এমন সময়ে ঘাটে পড়লুম। একদিন বিকেল বেলায় সাম্‌নের বাড়ির ছাতে দেখি দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি গায়ে যা-খুসি করে' বেড়াচ্চে। ঠিক সেই সময়ে চা খেতে-খেতে একটা জরুরি কথা ভাবচি।

ভাবনাটা একদমে এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চলে' গেল। হঠাৎ নিতান্ত এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠল, যে, ঐ ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে; কোনো একটা অন্যমনস্কতার ঠেলায় বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে ওর জোড় ভেঙে যায়নি। সমস্ত দিগ্‌দিগন্তরকে ঐ ছেলে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে পেয়েচে, দিগম্বর শিবের মত। কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অম্‌নি করে'ই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হ'ল, সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ আজো যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেম্‌নি করে' এসে লাগ্‌ত, তা হ'লে ঠকতুম না। তা হ'লে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্য-যুগে অকালে যুগান্তর অবতারণার যে-সব আয়োজন করা গেছে, তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত, আর বাদশাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়ীরূপে দখল করে' বস্‌বার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য্য আমি যে একলা ভোগ করতুম তা নয়, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্যে ভাণ্ডারের দ্বার খুলে' দিয়ে বলা যেত, পীয়তাং ভুজ্যতাম্।

চায়ের পাত্রটা ভুলে' গিয়ে ভাবতে লাগলুম, যে-পুলকটাতে আজ মন আবিষ্ট হয়েচে সেটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলি কি করে'? বয়স যখন ৩৬-এর নীচে

ছিল, তখন বলাই আমার কাজ ছিল, বুঝিয়ে বলার ধার ধারতুম না। কেননা তখন তেপান্তর মাঠের মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুটচে, যারা না-বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না, তারা আমার ঠিকানা পায়নি। আজ পনেরো-ষোলো, বিশ-পঁচিশ, আশি-পঁচাশি প্রভৃতি নানা-বয়সের প্রাচীন লোকের ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েচি। ওদের বোঝাব কি করে', এই দুর্ভাবনা এখন ভুলে' থাকাই শক্ত। মুস্কিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিশ আছে, স্বরাজ, পররাজ, দ্বৈরাজ, নৈরাজের ভাবনা আছে, এরই মধ্যে ঐ গা-খোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ঐ ভোলা-মন ছেলেটিতে একটি নিত্য-কালের কথা আছে, সে আমি শুনেচি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে' স্পষ্ট করে' তুলব ?

আজ মনে হচ্চে, ঐ ছেলেটার কথা আমারি খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেক-কাল তার দিকে চোখ পড়েনি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্য্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিক্‌টায় ? সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ বেলাকার ?

দায়িত্বের বোঝা মাথায় করে' ষাটের আরম্ভে একবার আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তখন য়ুরোপের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েচে, কিন্তু তারি নেশায় তখনো আমেরিকার চোখ যে-রকম রক্তবর্ণ য়ুরোপেরও এমন নয়। তার উপর তখন ইংরেজ নানা উপায়ে আমেরিকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ জুড়ে' নিজের ভেঁপুটা বাজাচ্চে। ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাববার না আছে তার উদ্যম, না আছে তার শক্তি। যে চতুর লোক কানে মন্ত্র দেবার ব্যবসা আয়ত্ত করেচে, সে নিজের ভাবনা তাকে ভাবায়। ঠিক এখনকার খবর জানিনে, তখন ইংরেজ আমেরিকার বিপুলকায় ডিমক্রাসিকে কানে ধরে' নিজের ভাবনা ভাবাচ্ছিল। সেই কানে-মন্ত্র দেবার যন্ত্রটা আমার বিরুদ্ধে তার চাকা চালিয়ে দিলে। ভয় ছিল পাছে আমি ইংরেজের অপযশ রটাই। তার আগেই জালিয়ান্‌ওয়ালা-বাগের ব্যাপার ঘটেছিল।

যাই হোক যে কয়টা মাস আমেরিকায় কাটিয়েছি, হাওয়ার মধ্যে যেন একটা বিরোধের ঠেলা ছিল। ভাবুক যেখানেই আছে সেখানেই মানুষের আপনার দেশ, কোনো দেশে সেই ভাবুকতায় স্রোতে যখন কম্‌তি পড়ে তখন পদে পদে পাঁকের বাধায় বিদেশী পথিককে গ্লানি দেয়। যেদিন ভাবুকতার ঔদার্য্য থেকে রিক্ত আমেরিকাকে দেখলুম সেদিন দেখি সে ভয়ঙ্কর ধনী, ভয়ঙ্কর কেজো, সিদ্ধির নেশায় তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। তারি পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখি আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরীব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বে-হিসাবী। এও বুঝলুম, এ-জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম সেই জায়গাটা দূরে ফেলে' এসেচি।

যতই বুঝতে পারি ততই দেখতে পাই, পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাটি কয়েদখানা। মন কাঁদ্‌চে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আরেকবার শেষ ছেলে-খেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে' নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তা'রা মস্ত বড় কিছুই নয়; তা'রা দেখা দিয়েচে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তা'রা স্থায়ী কীর্ত্তি রাখবার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয় বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই; তারা চল্‌তে চল্‌তে দুটো কথা বলেচে, সব কথা বল্‌বার সময় পায়নি; তারা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করেনি, তারি ঢেউয়ের উপর নৃত্য করে' চলে' গেছে, তারি কলস্বরে স্বর মিলিয়ে; হেসে চলে' গেছে, তারি আলোর ঝিলিমিলির মত। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লুম, "আমার জীবনে যা'তে সত্যিকার ফসল ফলিয়েচে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো স্বপ্ন আধো জাগার

ভোর বেলায় শুকতারার মত, প্রভাত না হ'তেই অস্ত গেল। মধ্যাহ্নে মনে হ'ল তা'রা তুচ্ছ, বোধ হ'ল তাদের ভুলে'ই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে' আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম সেই ক্ষণিকা ত ক্ষণিকা নয়. তা'রাই চিরকালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জান্‌তে না জান্‌তে তা'রা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। তাই মন বল্‌চে, একদিন যারা ছোট হয়ে এসেছিল আজ আমি যেন ছোট হয়ে তাদের কাছে আর একবার যাবার অধিকার পাই; যা'রা ক্ষণকালের ভাণ করে' এসেছিল, বিদায় নেবার দিনে আর একবার যেন তা'রা আমাকে বলে, "তোমাকে চিনেচি", আমি যেন বলি, "তোমাদের চিন্‌লুম।"

৬ অক্টোবর

খোলো, খোলো,হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে' নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে' তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে' গেল আমার ক্ষণিকা॥

ভেবেছিনু গেছি ভুলে'; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্ব্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তা'র
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;
দেখি তা'রি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি'॥

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি'।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত্ত বাজিয়াছিল; তার পরে শব্দহীন রাতে।
বেদনা-পদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী॥

সেদিন ঢেকেছে তা'রে কি এক ছায়ার সঙ্কোচন,
নিজের অধৈর্য্য দিয়ে পারেনি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে' গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তা'র সে অবগুণ্ঠন॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি',
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,'
তা হ'লে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হ'লে পরম লগ্নে, সখি,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি' ॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুহূর্ত্তখানি পড়ে' আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে' দেখি, বুঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি ?
ছিন্ন ফুল, একি মিছে ভাণ ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হ'ল যে অবসান ॥

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্ত্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়-মোহের নেশা ;—সে মূর্ত্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে ॥

খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হ'তে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হ'তে নামে পৃথ্বী 'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা ;
যেথা হ'তে পায় ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা ॥

৭ অক্টোবর

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণ-সভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথা-প্রসঙ্গে খবর দিলেন্ যে, আজকাল পদ্য আকারে যে সব রচনা করচি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করচে না। যারা পছন্দ করচে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা—সেই আত্মীয়েরা কবি ;—আর, যে সব পদ্য রচনা লোকে পছন্দ করে না, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন, আমার গানগুলো, আর আমার "শিশু ভোলানাথ" নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বল্‌লেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করচেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসচে।

কালের ধর্ম্মই এই। মর্ত্ত্যলোকে বসন্ত-ঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রি-শেষে দীপের আলো নেববার সময়ে যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবীতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবীটাই যার বেহিসাবী, দাবী অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাক্‌বেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস্ করে মারা গেল বলে' চিকিৎসা-শাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়চে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্চে, তা হ'লে তাকে আমি নিন্দুক বলিনে, বড় জোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্চে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক্ বৃদ্ধ হোক্ কবি হোক্, অকবি হোক্, কারো সঙ্গে তক্‌রার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক্ আর না হোক্। এমন কি, সেই অবসরে "শিশু ভোলানাথ"-এর জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তা হ'লেও মনটা খুসি থাকে। কারণটা কি, বলে' রাখি।

আজ-নাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে' খুব কষে' গানই লিখচি। লোক-রঞ্জনের জন্যে নয়, কেননা, পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোট ছোট একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মত জায়গাই নেই। কবিত্বকে যদি রীতিমত তাল ঠুকে' বেড়াতেই হয়, তা' হ'লে অন্ততঃ একটা বড় আখড়া চাই। তা ছাড়া গান জিনিষে বেশি বোঝাই সয় না,—যারা মালের ওজন করে' দরের যাচাই করে, তা'রা এরকম দশ-বারো লাইনের হাল্কা কবিতার বাজার মাড়াতে চায় না। তবু আমি এই কয় বছরে এত গান লিখেচি যে, অন্তত সংখ্যা হিসাবে লম্বা দৌড়ের বাজিতে আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।

আর-একটা কথা বলে' রাখি, গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে, যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে' যায়,—বড় বড় দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্ত্তব্যের দাবীগুলোকে মন এক ধার থেকে নামঞ্জুর করে' দেয়।

এর কারণ হচ্চে, বিশ্বকর্ম্মার লীলাখেলার স্রোতটার মধ্যে হঠাৎ পড়ে' গেলে' শুক্‌নো ডাঙার কথাটা একেবারেই মনে থাকে না। শরতের গাছতলা শিউলি ফুলের অপব্যয়ে ছেয়ে গেল, নিকেশ নেবার কোনো কথাই কেউ বলে না। যা হ'ল কেবল তা'ই দেখে'ই বলি, যথেষ্ট হয়েচে। ঘোর গরমে ঘাসগুলো শুকিয়ে সব হল্‌দে হয়ে গেল; বর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরেই হঠাৎ দেখি ঘাসে ঘাসে অতি ছোট ছোট বেগ্‌নি ফুলে হল্‌দে ফুলে মাতামাতি। কে দেখে কে না দেখে তার খেয়াল নেই। এটা হ'ল রূপের লীলা, কেবলমাত্র হয়ে-ওঠাতেই আনন্দ। এই মেঠো ফুলের একটি মঞ্জরী তুলে' ধরে' আমি বলি, বাহবা। কেন বলি? ও ত খাবার জিনিষ নয়, বেচবার জিনিষ নয়, লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে' রাখবার জিনিষ নয়। তবে ওতে আমি কী দেখ্‌লুম যাতে আমার মন বল্‌লে "সাবাস্"। বস্তু দেখলুম? বস্তু ত একটা মাটির ঢেলার মধ্যে ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে।

তবে? আমি দেখলুম, রূপ। সে কথাটার অর্থ কি? রূপ ছাড়া আর কোনোই অর্থ নেই। রূপ শুধু বলে "এই দেখ, আমি হয়ে উঠেচি।" যদি আমার মন সায় দিয়ে বলে, "তাই ত বটে, তুমি হয়েচ, তুমি আছ।" আর এই বলে'ই যদি সে চুপ করে' যায়, তা হলে'ই সে রূপ দেখ্‌লে; হয়ে-ওঠাকেই চরম বলে' জান্‌লে। কিন্তু সজ্‌নে ফুল যখন অরূপ সমুদ্রে রূপের ঢেউ তুলে' দিয়ে বলে, "এই দেখ আমি আছি", তখন তার কথাটা না বুঝে, আমি যদি গোঁয়ারের মত বলে' বসি, "কেন আছ?" তার মুখ থেকে যদি অত্যন্ত মিথ্যে জবাব আদায় করে' নিই, যদি তাকে দিয়ে বলাই, "তুমি খাবে বলে'ই আছি" তা হ'লে রূপের চরম রহস্যটা দেখা হ'ল না। একটি ছোট্ট মেয়ে কোথা থেকে আমার যাত্রাপথে জুটে' গেছে। তার বয়স আড়াই বছর। তার মধ্যে প্রাণের আনন্দ টলমল করে' ওঠে, কত মধুর প্রলাপে, কত মন-ভোলানো ভঙ্গীতে—আমার মন বলে, "মস্ত একটা পাওনা আমি পেলুম।" কি যে পেলুম তাকে হিসাবের অঙ্কে ছকে' নেবার জো নেই। আর কিছু নয়, একটি বিশেষ হয়ে-ওঠাকেই আমি চরম করে' দেখলুম। ঐ ছোট্ট মেয়ের হয়ে-ওঠাই আমার পরম লাভ। ও আমার ঘর ঝাঁট দেয় না, রান্না করে না, তাতে ওর ঐ হয়ে-ওঠার হিসাবটাতে কিছুই কম পড়চে না। বৈজ্ঞানিক এর হয়ত একটা মোটা কৈফিয়ৎ দেবে, বল্‌বে, "জীবজগতে বংশরক্ষাটাই সবচেয়ে বড় দরকার,—ছোট মেয়েকে সুন্দর না লাগ্‌লে সেই দরকারটাতে বাধা পড়ে।" মোটা কৈফিয়ৎটাকে আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিনে, কিন্তু তার উপরেও একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে যার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। একটা ফলের ডালি দেখলে মন খুসি হয়ে ওঠে, আর মাছের ঝোলের পাত্র দেখলে যারা নিরামিষাশী নয় তাদের মন খুস হ'তে পারে; আহারের প্রয়োজনটা উভয়তই আছে; সুতরাং খুসির একটা মোটা কৈফিয়ৎ উভয়তই পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ফলের ডালিতে এমন একটি বিশেষ খুসি আছে যা কোনো কৈফিয়ৎ তলবই করে না। সেইখানে ঐ একটি মাত্র কথা, ফলগুলি বল্‌চে, "আমি আছি,"—আর আমার মন বলে, সেইটেই আমার লাভ। আমার জীবনযাত্রার এই আড়াই বছরের ক্ষুদ্রতমা সহচরীটিও মানবের বংশরক্ষার কৈফিয়ৎ দাখিল করেও এমন কিছু বাকি রাখে যেটা বিশ্বের মর্ম্মকুহর হ'তে উত্থিত ওঙ্কার ধ্বনিরই সুর। বিশ্ব বল্‌চে, ওঁ; বল্‌চে, হাঁ; বল্‌চে, অয়মহং ভোঃ, এই যে আমি।—ঐ মেয়েটিও সেই ওঁ, সেই হাঁ, সেই এই-যে-আমি। সত্তাকে সত্তা বলে'ই যেখানে মানি, সেখানে তার মধ্যে আমি সেই-খুসিকেই দেখি যে খুসি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে রয়েচে। দাসের মধ্যে সেই খুসিকে দেখিনে বলে'ই দাসত্ব এত ভয়ঙ্কর মিথ্যে, আর মিথ্যে বলে'ই এত ভয়ঙ্কর তার পীড়া।

সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহৈতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহী নেই।

ছোট ছেলে ধুলোমাটি কাটিকুটো নিয়ে সারাবেলা বসে' বসে' একটা কিছু গড়চে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ৎ হচ্চে এই যে, গড়বার শক্তি তার জীবনযাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ৎ স্বীকার করে' নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হচ্চে এই যে, তার সৃষ্টিকর্ত্তা মন বলে "হোক্", "Let there be".—সেই বাণীকে বহন করে' ধুলোমাটি কুটোকাটি সকলেই বলে' ওঠে, "এই দেখ হয়েচে।"

এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সাম্‌নে যখন তার একটা ঢিবি, তখন কল্পনা বল্‌চে, "এই ত আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা।" তার ঐ ধুলোর স্তূপের ইসারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব করচে। এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করচি বলে' আনন্দ নয়, কেননা সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্চে না। একটি রূপ-বিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি বলে' আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য করে' দেখাই হচ্চে সৃষ্টিকে দেখা, তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

গান জিনিষটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি

আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের ছুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত-কাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্ত্তটি তার রঙীন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে' গেল,—তার বেশী আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙীন খেলাই হচ্চে গীতিকাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে' যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, "এটার মানে কি হ'ল," সাফ জবাব পাওয়া যেত, "কিছুই না।" "তবে?" "আমার খুসি।" রূপেতেই খুসি,—সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হ'ল শেষ উত্তর।

এই খুসির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে' আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে, একেবারে পৌঁছয় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্ব্বচনীয়।

সেদিন সমুদ্রের মাঝে পশ্চিম আকাশে "ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতে" গড়া সূর্য্যাস্তের একখানি রূপসৃষ্টি দেখ্‌লুম। আমার যে পাকাবুদ্ধি সোনার খনির মুনফা গোনে, সে বোকার মত চুপ করে' রইল, আর আমার যে-কাঁচা-মনটা বল্‌লে, "দেখেচি," সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে সোনার খনির মুনফাটাই মরীচিকা, আর যার আবির্ভাবকে ক্ষণকালের জন্যে ঐ চিহ্নহীন সমুদ্রে, নামহীন আকাশে দেখা গেল তারই মধ্যে চিরকালের অফুরান্ ঐশ্বর্য্য, সেই ইচ্চে অরূপের মহাপ্রাঙ্গণে,রূপের নিত্যলীলা।

সৃষ্টির অন্তরতম এই অহেতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনি বাদশাহী বেকারের মত সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোট জুঁই-ফুলের মত একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে' গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্চে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত্ত একই, সেখানে সূর্য্য আর সূর্য্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী, আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।

আজ পনেরো-ষোলো বছর ধরে' কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততার মধ্যে জোরে টেনে নিয়ে ফেলে' আমার কাছ থেকে কষে' কাজ আদায় করে' নিচ্চে। এখানকার সকল কাজই মোটা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। খোঁচা দিয়ে দিয়ে কেবলি জিজ্ঞাসা করে, "ফল হবে কি?" সেইজন্যে যার ফরমাস কৈফিয়তের সীমানা পেরিয়ে আপন বেদরকারী পাওনা দাবী করে, ভিতরে ভিতরে সে আমাকে কেবলি প্রশ্ন করতে থাকে, "তুমি কবি, চির-ছুটির পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেচ, তার করলে কি? কাজের ভিড়ের টানাটানিতে পড়ে' একেবারেই জাত খুইয়ে বোসো না।" নিশ্চয় ওরই এই তাগিদেই আমাকে গান লেখায়, হট্টগোলের মধ্যেও নিজের পরিচয়টা বজায় রাখবার জন্যে, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। কর্ত্তব্যবুদ্ধি তার কীর্ত্তি ফেঁদে গম্ভীরকণ্ঠে বলে, "পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে গুরুতর"—তাই আমার ভিতরকার বিধিদত্ত ছুটির খেয়াল বাঁশি বাজিয়ে বলে, "পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।" লঘু নয় ত কি! সেইজন্যে সব জায়গাতেই হাওয়ায় হাওয়ায় তার পাখা চলে, তার রঙ-বেরঙের পাখা। ইমারতের মোটা ভিৎ ফেঁদে সময়ের সদ্ব্যয় করা তার জাত-ব্যবসা নয়, সে লক্ষ্মীছাড়া ঘুরে' বেড়ায় ফাঁকির পথে, যে-পথে রঙের ঝরনা, রসের ধারা ঝরে' ঝরে' দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়চে বিপুল একটা বাজেখরচের মত।

আমার কেজো পরিচয়টার প্রতি ঈর্ষা করে' অবজ্ঞা করে' আমার অকেজো পরিচয়টা আমাকে যখন-তখন গান লিখিয়ে লিখিয়ে নিজের দলিল ঠিক করে রাখচে। যখন বিরুদ্ধপক্ষে মাতব্বর সাক্ষী এসে জোটে, তখনি নিজের দাবীর দলিল খুব বড় করে' তুলতে হয়। যতদিন ধরে' এক পক্ষে আমার কাজের রোকড় খুব মোটা হয়ে উঠচে ততদিন ধরে'ই অন্যপক্ষে আমার ছুটির নথীও অসম্ভব-রকম ভারী হয়ে উঠল। এই যে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চল্‌চে, এটা আমার অন্তরের খাস-কামরায়। আমি আসলে কোন্ পক্ষের সেইটের বিচার নিয়ে আমারই কাছে নালিষ।

তার পরে কথাটা এই যে, ঐ "শিশু ভোলানাথ"-এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম? সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়,—নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্ব্বেই বলেচি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার

মরুপারে ঘোরতর কার্য্যপটুতার পাথরের দুর্গে আট্‌কা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মত এত বড় মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্দ্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক এক জায়গায় এইসব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে' দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলা-শক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্ম্মল করে' রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড় করে' সেইগুলোকে আগ্‌লে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে' তুল্‌চে। সেই ধ্বংস-শাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়-গর্ব্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করচে,—এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলা-নিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্য্যকে পরাভূত করে' দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে' চলে যায়, এসব তেম্‌নি করে'ই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধ-যন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চির পথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ঐ পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই "শিশু ভোলানাথ" লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে' আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেম্‌নি করে'। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আট্‌কা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে' আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড় আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আট্‌কা পড়ে সেদিন আমি তেম্‌নি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্ম্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

এ কথাটার এতক্ষণ ধরে' আলোচনা করচি এইজন্যে যে, যে-লীলা-লোকে জীবনযাত্রা সুরু করেছিলুম, যে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইচে। একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল, তা'রা বল্‌চে সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি, বিদায়ের গোধূলি-বেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ করে' যেতে হবে। সেইজন্যেই সকালবেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনী-গন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্চে। বল্‌চে, তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্ত্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক করে' তোমাকে শেষ যাত্রায় রওনা করে' দিক্‌। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে' তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলি-রাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে' যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর যে-দিক্ থেকে আসচে সেই দিকে কান পাতো—আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগরপারের লীলা-লোকের আকাশপথে। যাবার বেলায় কবুল করে' যাও যে, তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।

খেলা

সন্ধ্যেবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথী ?
হঠাৎ কেন চম্‌কে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙীন শিখার বাতি ?

কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি ?
উদয় ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি ॥

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে ?
বনের পরে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুক্‌নো পাতার তলে ?
যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে' আমার পাশে
সকাল বেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ উঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল চোখের জলে,—
কাঁপ্‌ত যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুক্‌নো পাতার তলে ॥

মোর প্রভাতের খেলার সাথী আনৃত ভরে' সাজি
সোনার চাঁপা ফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি
এ কি পথের ভুলে ?
বন-বীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাক্‌তে এল আবার ফিরে' এসে ?
সেই সাজি তার দখিন হাতে, তেম্‌নি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ ছুলে।
সেই অজানা হ'তে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভুলে ॥

আমার কাছে কি চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা ?
চাও কি তুমি যেমন করে' হ'ল দিনের সুরু,
তেম্‌নি হবে সারা ?
সেদিন ভোরে দেখেছিলেম প্রথম জেগে উঠে'
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে',
কাজ-ভোলা সব ক্ষ্যাপার দলে তেম্‌নি আবার জুটে'
করবে দিশেহারা।
স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে'
তেম্‌নি হ'ব সারা ॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চল্‌তি কাজের স্রোতে
চল্‌তে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হ'তে
তাই কি আমায় ডাকো ?
সকল চিন্তা উধাও করে' অকারণের টানে,
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাকো ?
না-জেনে পথ পড়্‌ব তোমার বুকেরি মাঝখানে
তাই আমারে ডাকো ॥

জানি জানি, তুমি আমার চাওনা পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথী।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালো,—
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে
নয় আরতির বাতি॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঁইমাচা

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন, "একটা বড় বাটী কি ঘটী যা হয় কিছু দাও ত, তারক-খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।" স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকাল-বেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার-কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু কি বাটী কি ঘটী বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ ত দেখাইলেনই না, এমন-কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না। সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"কি হয়েচে, বসে' রইলে যে?……দাওনা একটা ঘটী? আঃ! ক্ষেন্তী টেন্তী সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?"

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি মনে-মনে কি ঠাউরেছ বল্‌তে পারো?" স্ত্রীর অতিরিক্ত-রকমের শান্ত স্বরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিলেন,—"কেন—কি—আবার কি—।" অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্তস্বরে বলিলেন,—"দ্যাখো, রঙ্গ কোরো না বল্‌চি—ন্যাকামি কর্‌তে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জানো না, কি খোঁজ রাখো না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে', আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে', তা বল্‌তে পারো? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জানো?" সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?—কি গুজব?—"

"কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগ্‌দীদুলে-পাড়ায় ঘুরে'-ঘুরে' জন্ম কাটালে, ভদ্দর লোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না?—সমাজে থাকতে হ'লে সেইরকম মেনে চল্‌তে হয়।" সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ স্বরেই

পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন—"একঘরে করবে গো তোমাকে একঘ'রে করবে, হাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েচে। আমাদের হাতে ছোঁয়া-জল আর কেউ খাবে না। আশীর্ব্বাদ হ'য়ে মেয়ের বিয়ে হ'ল না—ও নাকি উচ্ছুগ্যু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোনো কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালোই হয়েচে তোমার। এখন গিয়ে, দুলে-বাড়ী, বাগ্দী-বাড়ী উঠে'-বসে' দিন কাটাও।"

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে'! সবাই একঘ'রে করেছেন এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর! ওঃ!" অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। "কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই, চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে, তা আর এমন কঠিন কথা কি? —আর সত্যিই ত এদ্দিকে ধাড়ী মেয়ে হ'য়ে উঠল"—হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—"হ'ল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে বলে' বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?"—পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—"না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাবো পাত্তর ঠিক করতে?" সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটী উঠাইয়া লইয়া খিড়কী-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, —"এসব কি রে? ক্ষেন্তি-মা, এসব কোথা থেকে আনলি?—ওঃ! এযে—"।

১৪।১৫ বছরের একটি মেয়ে আর-দুটি ছোট-ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁইগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঞ্জল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই তিন পাকা পুঁইপাতা-জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর-ডাগর ও শান্ত। সরু-সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আট্কানো। পিন্‌টির বয়স ধরিবার উপায় নাই, সম্ভবতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা-জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—"চিংড়ী মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দরুন্ দু'টো পয়সা বাকী আছে, আমি বল্লাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁইশাকগুলো ঘাটের ধারের রায়-কাকা বল্লে, নিয়ে যা—কেমন মোটা-মোটা—"।

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নিয়ে যা, আহা কি অমর্ত্তই তোমাকে তা'রা দিয়েচে,—পাকা পুঁইডাঁটা, কাঠ হ'য়ে গিয়েচে, দু'দিন পরে ফেলে' দিত—নিয়ে যা—আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেচেন—ভালোই হয়েচে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে' কাটতে হ'ল না—যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে—ধাড়ী মেয়ে, বলে' দিয়েচি না তোমায়, বাড়ীর বাহিরে কোথাও পা দিও না?—লজ্জা করে না এপাড়া-সেপাড়া করে' বেড়াতে! বিয়ে হ'লে যে চার-ছেলের মা হ'তে?—যাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না?—কোথায় শাক, কোথায় বেগুন, আর-একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাশ—ফেল্ বলচি ওসব, ফেল্।" (মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল)। যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে' দিয়ে আয় ত—খা—ফের যদি

বাড়ীর বার হ'তে দেখেছি তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি ত—"।

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী-অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট্ট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে-ওদিকে ঝুলিতে-ঝুলিতে চলিল। সহায়হরির ছেলে-মেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন—"তা এনেচে ছেলেমানুষ—খাবে বলে'—তুমি—আবার—বরং—"। পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে-যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়ে-মানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর-একপাড়ায় নিয়ে আস্‌বে দু'টো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে'? যা, যা—তুই যা, দূর করে' বনে দিয়ে আয়—"

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিষ হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর-বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না—নিঃশব্দে খিড়কী-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে-রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আব্‌দার করিয়া বলিয়াছিল—"মা, অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের?……"

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী-দোরের আশে-পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুঁচা চিংড়ী দিয়া একরূপ চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারী রাঁধিলেন। দুপুর-বেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে-ভয়ে চাহিল। দু'একবার এ'দিকে-ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের এক টুক্‌রাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে ক্ষেন্তি, আর-একটু চচ্চড়ি দিই?" ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ-আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুক্‌না লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সে-দিন বৈকাল-বেলা সহায়-হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন—"সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধরো, কেষ্ট মুখুজ্যে স্বভাব নৈলে পাত্র দেবো না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেবো না করে' কি কাণ্ডটাই কর্‌লে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে' পড়ে' মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রক্ষে—তা'রা কি স্বভাব? রাম বলো, ৬।৭ পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়—", পরে স্বর নরম করিয়া বলিলেন—"তা সমাজের সেসব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন-দিন চলে' যাচ্চে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি ১৩ বছরের—", সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—"এই শ্রাবণে তেরোয়"—"আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক্, চাই ষোলোই হোক্, চাই পঞ্চাশই হোক্, তা'তে আমাদের দর্‌কার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেল, তুমি বেঁকে বস্‌লে কিজন্যে শুনি? ও ত একরকম উচ্ছুগ্‌গু-করা মেয়ে? আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত-পাকের যা বাকী, এই ত? সমাজে বসে' এসব কাজগুলো তুমি যে কর্‌বে, আর আমরা বসে'-বসে' দেখব, এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মার্‌বার ইচ্ছা না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে' ফেলো। পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তর না হ'লে কি পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ—দিতে-থুতে পার্‌বে না বলে'ই শ্রীমন্ত মজুমদারের

ছেলেকে ঠিক করে' দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জান্‌লে? জজ্‌-মেজেষ্টার না হ'লে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী, বাগান, পুকুর, শুন্‌লাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে—ব্যস্‌—রাজার হাল। দুই ভায়ের অভাব কি?"

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার-মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়-হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার-মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ-কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার-মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এগুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুই পক্ষের রটনা-মাত্র। যাহাই হউক পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন-কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েকমাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি-একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এরকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবীলেবু-গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি-চুপি বলিল—"বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল—"। সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন—"যা, শীগ্‌গির সাবলখানা নিয়ে আয় দিকি?" কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে-জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার সাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতাপুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল—ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন—মুখুয্যে-বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল—"খুড়ীমা, মা বলে' দিলে, খুড়ীমাকে গিয়ে বল্‌, মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে' দিয়ে আস্‌বে?"

মুখুয্যে-বাড়ী ওপাড়ায়;—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে একপ্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হল্‌দে পাখী আমড়া গাছের এডাল হইতে ওডালে যাইতেছে। দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—"খুড়ীমা, খুড়ীমা, ঐ যে, কেমন পাখীটা!—" পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর-একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ "খুপ," "খুপ" করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল—কে যেন কি খুঁড়িতেছে,—দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল—অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় "খুপ" "খুপ" শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের-বাটী সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—"এখনও নাইতে যাস্‌নি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?" ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—"এই যে যাই মা, এক্ষণি যাবো আর আস্‌ব।"

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে ১৫।১৬ সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং

সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ওই ওপাড়ার মরশা চৌকীদার রোজই বলে—কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাক্‌তে তবু মাসে-মাসে এদিকে তোমাদের পায়েরধূলো পড়্‌ত, তা আজকাল ত তোমরা আর আসো না—এই বেড়ার গায়ে মেটে-আলু করে' রেখেছি তা দাদাঠাকুর বরং—"

অন্নপূর্ণা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে' খানিক আগে কি কর্‌ছিলে শুনি?"

সহায়হরি অবাক্ হইয়া বলিলেন—"আমি!—না আমি কখন্? কখ্‌খনো না, এই ত আমি—" সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এই মাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন। অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"চুরি ত কর্‌বেই, তিনকাল গিয়েচে, এককাল আছে, মিথ্যাকথাগুলো আর এখন বোলো না—আমি সব জানি,—মনে ভেবেছিলে আপদ্ ঘাটে গিয়েচে আর-কি—দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ওপাড়ায় যাচ্চি শুন্‌লাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কিসের 'খুপ' 'খুপ' শব্দ—তখনি আমি বুঝ্‌তে পেরেচি. সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হ'য়ে গেল, যেই আবার খানিক দূর গেলাম, আবার দেখি শব্দ—তোমার ত ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি কর্‌তে, ডাকাতি কর্‌তে যা ইচ্ছে করো, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?"—

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সাম্‌নে তাঁহার বেশী কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

আধ-ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে-আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আল্‌নায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল, অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—"ক্ষেন্তি এদিকে একবার আয় ত, শুনে' যা—"। মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতঃস্তত করিতে-করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই মেটে-আলুটা দু'জনে মিলে' তুলে' এনেচিস্—না?" ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে-আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশ-ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অন্নপূর্ণা কড়া-সুরে বলিলেন,—"কথা বল্‌চিস্‌নে যে বড়? এই মেটে-আলু তুই এনেচিস্ কি না?" ক্ষেন্তি তখনও বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল, "হাঁ।" অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙ্‌ব তবে ছাড়্‌ব, বরোজপোতার বনে গিয়েচে মেটে-আলু চুরি কর্‌তে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হ'য়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তা'র মধ্যে দিন-দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে'? যদি গোঁসাইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাতো? আমার জোটে খাবো, না জোটে না খাবো তা বলে' পরের জিনিষে হাত? এ-মেয়ে নিয়ে আমি কি কর্‌ব, মা?"

২।৩ দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি-মাখা-হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—"মা দেখবে এস—"। অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙা পাঁচীলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারীর আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যৎসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটি-মাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসী-হইয়া-যাওয়া আসামীর মতন ঊর্দ্ধমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তাঁর বড় মেয়ের

মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে—দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—"দূর্ পাগলী, এখন পুঁই-ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁত্‌তে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে' যাবে?"

ক্ষেন্তি বলিল—"কেন, আমি রোজ জল ঢাল্‌ব?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন—"ভাখ্, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে? আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।"

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে মুখুজ্যে-বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—"হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে' জামাটা গায় দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?"—

"আচ্ছা দিচ্চি বাবা, কই শীত, তেমন ত—"

"হাঁ, দে মা, এখ্‌খুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ-রকম হ'তে পারে বুঝ্‌লিনে?"—সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে-ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এখন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। অদ্য বহুবৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই ২৷৷০ টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন্ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ-সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া ও ময়দা ও গুড় দিয়া চট্‌কাইতেছিলেন—একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার-পাত পাড়িয়া একখালা নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে-সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্র-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধুয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাথা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ ম্লান হাতখানা পাতিয়া বলিল—"মা, ঐ একটু—"। অন্নপূর্ণা বড় গাম্‌লাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল-পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু লক্ষ্মীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটী অম্‌নি ডানহাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সাম্‌নে পাতিয়া বলিল, "মা, আমায় একটু—"। ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে-কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে-মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এসময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি, ঐ নারকেল-খালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি—"। ক্ষেন্তি ক্ষিপ্রহস্তে নারিকেলের উপরের খালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটী বলিল,—"জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েচে, রাঙা-দিদি ক্ষীর তৈরী কর্‌ছিল, ওদের অনেক-রকম হবে।" ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল,—"এবেলা আবার হবে নাকি? ওরা ত ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ-কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ওবেলা ত পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এইসব হয়েচে।" পুঁটী জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপ্‌টা হয় না? খেঁদী বল্‌ছিল, ক্ষীরের পুর না হ'লে কি আর পাটিসাপ্‌টা হয়? আমি বল্‌লাম, কেন, আমার মা ত শুধু নারকেলের ছাই দিয়ে করে, সে ত কেমন লাগে?—"

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া

খোলায় মাখাইতে-মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল,—"খেঁদির ওইসব কথা। খেঁদীর মা ত ভারি পিঠে করে কিনা?—ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিয়ে ভাজ্‌লেই কি আর পিঠে হ'ল? সে-দিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখ্‌তে গেলাম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপ্‌টা খেতে দিলে, ওমা, কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপ্‌টায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়।"

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, নার্‌কোল-কোরা একটু নেবো?" অন্নপূর্ণা বলিলেন—"নে, কিন্তু এখানে বসে' খাস্‌নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐ দিকে যা।" ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ-স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ওরে, তোরা সব এক-এক টুক্‌রো পাতা পেতে বোস্ ত দেখি? গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল-দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার বার করে' নিয়ে আয়।" ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এপ্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটী বলিল, "মা, বড়দি পিঠেই খাক্। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাবো।" খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও ১৮।১৯খানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষেন্তি আর নিবি?" ক্ষেন্তি খাইতে-খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসি-ভরা-চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল—"বেশ খেতে হয়েচে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু—"। সে পুনরায় খাইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে-তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত, নিরীহ, একটু অধিক-মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে-মনে ভাবিলেন, "ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজ-কর্ম্মে বকো, মারো, গা'ল দাও, টুঁশব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি—"

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স ৪০এর খুব বেশী কোনো-মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, সহর-অঞ্চলে বাড়ী, সীলেট চুণ ও ইটের ব্যবসায়ে দু'-পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয়, এইজন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আম্‌লকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাক্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেঁদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম-দামের বালুচরের রাঙা-চেলীর আঁচলখানা পাক্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে। তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজন-পটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?—

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে-ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—"মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে

এনো—বাবাকে পাঠিয়ে দিও—দু'টো মাস ত—"। ওপাড়ার ঠান্‌দিদি বলিলেন—"তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক্—তবে ত—"। ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল,—"না, যাবে না-বৈ কি?—দেখো ত কেমন না যান্!"—

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল-বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে-দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে-তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত—তাঁর অনাচারী, লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অম্‌নি বলিবে, "মা, বল্‌ব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে' একটুখানি?—"

এক-বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু-সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে-সাজিতে বলিলেন—"ও তুমি ধরে' রাখো, ওরকম হবেই, দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভালো কি আর জুটবে?" বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চট্‌কাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—"নাঃ, সব ত আর—তা ছাড়া আমি যা দেবো নগদই দেবো। তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?" সহায়হরি হুঁকাটায় ৫।৬টি টান দিয়া কাশিতে-কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুন্‌লাম। ব্যাপার দাঁড়াল বুঝ্‌লে?—মেয়ে ত কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বল্‌লে ওটাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।"

"একেবারে চামার—"

"তার পর বল্‌লাম, টাকাটা ভায়া, ক্রমে-ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করে'ও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না, ভেবে দেখ্‌লাম কিনা?—মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে—ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খাই—আরও কত কি—পৌষ মাসে দেখ্‌তে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে' থাক্‌তে পার্‌তাম না, বুঝলে?—" সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে-জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু-সরকার বলিলেন, "তার পর?"

"আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে-শুনিয়ে বল্‌তে লাগল, না জেনে-শুনে' ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে কর্‌লেই এরকম হয়, যেম্‌নি মেয়ে তেম্‌নি বাপ, পোষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু-হাতে!—" পরে বিষ্ণু-সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বলি আমরা ছোট লোক কি বড় লোক, তোমার ত সরকার-খুড়ো জান্‌তে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েচে—আজই না হয় আমি—"। প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু-সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বার-কতক ঘাড় নাড়িল।

"তার পরে ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হ'ল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তাঁর খোঁজ পেয়েছিল—তাঁরই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তাঁরা আমায় সংবাদ দেন। তা আমি গিয়ে——"

"দেখতে পাওনি?"

"নাঃ! এম্‌নি চামার—গহনাগুলো অসুখ-অবস্থাতেই গা থেকে খুলে' নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েচে।—যাক্, তা চলো যাওয়া যাক্, বেলা গেল,—চার কি ঠিক কর্‌লে? পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার ত সুবিধা হবে না।"

তার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্ব্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দ্যাখেন

নাই। সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি-পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটী ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে, "আর-একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে' ফেল্‌লে কেন?"

পুঁটী বলিল, "আচ্ছা, মা ওতে একটু নুন দিলে হয় না?"—

"ওমা, ছাখো মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুল্‌ছে, এখনি ধরে' উঠবে"—অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—"সরে' এসে বোস্ না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বস্‌লে কি আগুন পোহানো হয় না? এইদিকে আয়।" গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল—খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন—দেখিতে-দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল। পুঁটী বলিল—"মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কাঁনাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে' দিয়ে আসি।" অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"একা যাস্‌নে, রাধীকে নিয়ে যা।"

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পেছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো-থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে। পুঁটী ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুক্‌নো পাতায় খস্-খস্ শব্দ করিতে-করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটী পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। পুঁটী ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিলি?"

পুঁটী বলিল—"হ্যাঁ মা, তুমি আর-বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে' এনেছিলে সেখানে ফেলে' দিলাম—"।

তার পর সে-রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে-গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—রাতও তখন খুব বেশী। জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাটঠোক্‌রা পাখী ঠক্-র্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে—দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে-চিরিতে পুঁটী অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"দিদি বড় ভালো-বাস্‌ত—"।

তিন জনেই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিন জনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল—যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে—বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে—সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!

ঘুমের ঘোর

শ্রী প্রফুল্লকুমার পাল

(১)

"ও নিধে, নিধে?" ছড়ি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে নির্ম্মল নিধিরামের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কুড়ি-একুশ-বৎসরের একটি বিধবা মেয়ে দাওয়া নিকাইতেছিল। একটি অপরিচিত যুবকের আকস্মিক আবির্ভাবে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ত্রস্তে আপন অসংযত বসন সংবরণ করিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মল জানিত নিধিরামের বাড়ীতে কোনো স্ত্রীলোক নাই। প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে প্রথম প্রসবের সময় তাহার স্ত্রী মারা যায়। বিশ্ব-সংসারে স্ত্রী-ভিন্ন তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না। সুতরাং অপ্রত্যাশিতভাবে এই অপরিচিত মেয়েটিকে দেখিয়া সে বিশেষ বিস্মিত হইল।

উন্মুক্ত দরজার দিকে চাহিয়া নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "নিধিরাম বাড়ী নেই?" মেয়েটি কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

উত্তর পাইয়া নির্ম্মল চলিয়া যাইতেছিল, কয়েক পা চলিয়া এই বিধবা মেয়েটির পরিচয় জানিবার জন্য তাহার বিশেষ কৌতূহল হইল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নিধিরাম তোমার কে হয়?" মেয়েটি মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কোনো উত্তর দিল না।

নির্ম্মল প্রশ্নটি বিশদ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল —"নিধিরাম সম্পর্কে তোমার কে হয়?"

তাহার এই পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসায় মেয়েটি আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া গেল। দুই হাত দিয়া ঘরের বেড়া ধরিয়া সে কাঠের মূর্ত্তির মতন দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার এই লজ্জামাখা আড়ষ্টভাব দেখিয়া নির্ম্মল আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল। পথে চলিতে-চলিতে এই কথাটি বিশেষ করিয়া তাহার মনে জাগিতেছিল, যে, এই বিধবা মেয়েটি কে এবং নিধিরামের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি জিজ্ঞাসা করায় তাহার ওরকম লজ্জাকুণ্ঠিত হইবার কারণই বা কি?

"আশীর্ব্বাদ দিন, খোকাবাবু"—নির্ম্মলের চিন্তা-স্রোতে বাধা পাইল। সাম্‌নে নিধিরামকে দেখিয়া সে দাঁড়াইল।

"কবে এসেছেন খোকাবাবু?"

"কাল রাত্রে—। তার পরে তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়? আমি যে তোর বাড়ী গিয়েছিলাম।"

"আজ্ঞে বাড়ী বসে' খবর দিলেই ত আমাকে হাজির পেতেন। কষ্ট করে'—"

বাধা দিয়া নির্ম্মল বলিল—"না, না, কষ্ট আর কি? এই বেড়া'তে বেরিয়েছিলাম, ফির্‌বার সময় ভাব্‌লাম্ যে একবার নিধেকে দেখে' যাই—। ভালো কথা—তোর বাড়ীতে ও বিধবা-মেয়েটি কে রে?"

"ও হচ্ছে খোকাবাবু.........হচ্ছে.........এই যে... ...কুসমী..."

"কুসমী কে রে? কে হয় তোর?"—"আজ্ঞে ও এই যে...এই নূতন-গাঁয়ের পীতাম্বরের পরিবার—...। খুব ছোট-বেলায় বিধবা হয়েছে, এখন শ্বশুরবাড়ী গেলে তা'রা ওকে খেতে-পর্‌তে দিতে চায় না—আর মায়েও—তাই আমি......আমার এখানে...—"

নিধিরামের ভাব-গতিক দেখিয়া নির্ম্মল কোনো রকমে হাসি চাপিয়া বলিল—"তোর কেউ হয় নাকি রে?"

হাত কচ্‌লাইতে-কচ্‌লাইতে নিধিরাম উত্তর দিল—"আমার আর হবে কে খোকাবাবু—তবে—"

বাধা দিয়া নির্ম্মল বলিল—"তা বুঝেছি। তোকে নেহাৎ ভালোমানুষ বলে' জান্‌তাম, শেষকালে—যাক্ সে-কথা—। তুই কি আর বিয়ে কর্‌বিনে?"

"বিয়ে ত করব খোকাবাবু—অত টাকা কোথায় পাবো?"

"টাকা যদি আমি তোকে দিই?" উত্তরের জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিধিরামের মুখ ক্ষণিকের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চিরকাল সে নির্ম্মলদের বাড়ী খাটিয়া মানুষ—নির্ম্মলকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, এক-শ-দেড়-শ টাকা ইচ্ছা করিলেই নির্ম্মল যে তাহাকে দিতে পারে একথা সে জানিত। ভবিষ্যের একটি মধুর দৃশ্য তাহার নয়ন সম্মুখে নাচিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষণ্নমুখে সে কহিল—"আপনাদের ওখানে খেয়ে-পরে'ই মানুষ—ঘর-সংসার যা করেছিলাম, সেও আপনাদের দয়ায়, তবে বিধি বাম—নইলে খোকাবাবু—"। স্বর তাহার জড়াইয়া আসিল।

"বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আসল কথাটা হচ্ছে কি খোকাবাবু,—সেয়ানা মেয়ে আমাদের জাতের ঘরে পাওয়া যায় না—। এখন এই বয়সে মনে করুন—একটা ছয়-সাত বছরের মেয়ে বিয়ে কর্‌লে তার দ্বারা আমার ঘর-সংসার করা হ'য়ে উঠবে না। তার পরে যখন তার উপযুক্ত বয়স হবে, তখন হয়ত আমার দিন ফুরিয়ে আস্‌বে—। তখন সে বেড়াবে পরের দুয়ারে,পেটের দায়ে কর্‌বে অপকর্ম্ম, আর লোকে বল্‌বে—নিধিরাম মণ্ডলের পরিবার—পতিত মণ্ডলের বেটার বৌ—কিনা—দেখতেই ত পাচ্ছেন সব—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নির্ম্মল বলিল,—"আচ্ছা, তুই এক কাজ কর্‌ না—এই কুস্‌মী ত বেশ বয়স্থা আছে—একে বিয়ে করে', তুই ঘর-সংসার কর্‌ না?"

হঠাৎ একটা সাপ কি বাঘ সাম্‌নে দেখিলে লোকে যেমন আঁৎকাইয়া উঠে, নিধিরাম সেইরূপ আঁৎকাইয়া উঠিয়া জিব কামড়াইয়া কহিল—"কি যে বলেন খোকাবাবু—সে যে বিধবা?"

"বিধবা বলে' বুঝি বিয়ে হবে না? আজকাল ত ঢের বিধবাদের বিয়ে হচ্ছে।"

অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া নিধিরাম বলিল—"যে আজ্ঞে, খৃষ্টেন-মোছলমানের মধ্যে হয়। আমাদের হিন্দুর ঘরে, বাবু, তা হয় না।"

"আচ্ছা তুই বিয়ে করিস ত আমাকে জানাস্‌, হয় না-হয় সে-ব্যবস্থা আমি কর্‌ব"—বলিয়া নির্ম্মল ছড়ি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

(২)

মানুষ প্রাণপণে যাহা গড়িয়া তোলে, কোন অজ্ঞাত দেবতার অলক্ষিত আঘাতে তাহা নিমেষে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। মানুষ ভাবিয়াও পায় না যে, কোন্‌ পাপের জন্য তাহার এই শাস্তি।

বড় সাধের গড়া সংসারের গৃহলক্ষ্মীটি যেদিন দিবা-স্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইয়া গেল, সেদিন নিধিরামের মনে হইল যে, এত দিন সে শুধু আলেয়ার পিছনে ছুটিয়াছে। মুহূর্ত্তে যাহার সমাপ্তি হইল তাহার জন্য যে কতখানি সাধনা তাহাকে করিতে হইয়াছে সেই কথাটা আজ বেদনার মতো তাহার বুকে আসিয়া বাজিতেছিল।

জীবনের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, অথচ ছেলেটার একটা স্থিতি হইল না দেখিয়া পতিত মণ্ডল বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। অনেক ভাবিয়া অবশেষে একদিন পতিত ছেলেকে লইয়া জমিদার-বাবুর নিকট হাজির হইল।

গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া পতিত কহিল "হুজুর, আমি ত সারাজীবন পরের দ্বারে কাটিয়ে গেলাম, ছেলেটাও কি চিরকাল ভেসে-ভেসে বেড়াবে?"

জমিদার-বাবু গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"হেঁয়ালি রেখে যা বল্‌বি, পরিষ্কার করে' বল্‌।"

কাতরস্বরে পতিত বলিল—"দয়া করে' হুজুর যদি কিছু টাকা দেন, তা হ'লে ছেলেটার একটা স্থিতি করে' দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌তে পার্‌তাম।"

"কত টাকা চাস্‌?"

"বেশী না হুজুর, এই শ-দেড়েক টাকা হ'লেই পার্‌তাম—।" "দেড়—শ'! অত টাকা শোধ দিবি কি করে'?"

"হুজুরের যদি কৃপা হয়, তা হ'লে টাকাটা নিধে আপনার এখানে খেটে শোধ করবে।"

অনেক কাঁদাকাটার পর জমিদার-বাবু টাকা দিতে সম্মত হন।

তিন বৎসর খাটিয়া নিধিরাম সেই টাকা শোধ করে।

তার পর কত কষ্ট করিয়া নিধিরাম যে তাহার ছোট সংসারখানা গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে-কথা সেই জানে।

ছেলে-মেয়েগুলি হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইবে, তাহাদের বিবাহ দিবে, পুত্রবধূ-জামাতার মুখ দেখিবে—এম্‌নি কত আশাই না প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার মনে জাগিত। কিন্তু আজ তাহার সকল আশা-উৎসাহের উৎস শুকাইয়া গেল।

জীবনের বেশীর ভাগ কাল তাহার অতীত হইয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া গড়ে, এ আশাহত কর্ম্মক্লান্ত দেহে তাহার সে সামর্থ্য নাই।

প্রতিবেশীরা ধরিয়া পড়িল—"বিয়ে করো, আমরা সব ঠিক করে' দিচ্ছি।" বিনয় করিয়া নিধিরাম কহিল—"বিধি যখন বাদ সাধলেন, তখন ওসবের মধ্যে আর টেনো না, কপালেই যদি থাক্‌বে দাদা, তা হ'লে বাঁধা ঘর ভাঙবে কেন?"

দিনের বেলায় কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় সে বরং থাকে ভালো, কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর সে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখন সন্ধ্যার আঁধারমাখা শূন্য বাড়ীখানির দিকে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসে। সারাদিনের মেহনতের পর তাহাকে যখন আবার রাঁধিতে হইত, তখন তাহার চোখে অশ্রু বাধা মানিত না। একে দিবসের শ্রান্তি—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়, তাহার উপর রাঁধিবার সময় কোনোদিন দেখে চাউল নাই, কোনোদিন দেখে কলসীতে জল নাই—কোনোদিন বা লবণ-তৈল নাই—কাঠ নাই। তখন অতরাত্রে কেই বা চালের জোগাড় করে, কেই বা অতদূরে নদীতে জল আনিতে যায়—অত রাত্রে ওরকম ক্ষিদে-তেষ্টার সময় কি আর ওসব ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে? নিধিরামের সকল শোক-দুঃখ তখন রাগে পরিণত হইত। রাগের জ্বালায় নিধিরামের আর সেদিন খাওয়া হইত না। স্ত্রী মারা যাইবার পর অধিকাংশ দিনই নিধিরামকে এম্‌নি না খাইয়া কাটাইতে হইয়াছে।

ওপাড়ার রসিক একদিন তাহাকে নিরিবিলিতে লইয়া কহিল—"দাদা, একটা কথা আছে।" খানিকক্ষণ নীরব ভূমিকার পর কহিল—"কথাটা দাদা এই যে, ফকির-সন্ন্যাসী হ'য়ে যাও সে আলাদা কথা, কিন্তু সংসারে থেকে গেরস্থালি হ'য়ে তোমার কদিন চল্‌বে? একা মানুষ তুমি—মাঠ-ঘাটের কাজ করে' সারাদিন পরে আবার ঘর-কন্নার কাজ করা—রাঁধা-বাড়া ওসব কি একটা সম্ভব হয়? আর এ দুই-একদিনের কাজ নয়, তার পরে সময়-অসময় আছে, আর ওরকম সময়ে না খেয়ে-দেয়েই বা ক-দিন কাটাবে? তার চেয়ে এক কাজ কর্‌লে—"বলিয়া রসিক একটু থামিল।

নিধিরামের মন এক অজ্ঞাত আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?" রসিক একটু ইতস্তত করিয়া কহিল,—"কত অনাথা বিধবা দুটো ভাত-কাপড়ের জন্যে কষ্ট পাচ্ছে, বিয়ে কর্‌বে না, এ যদি তোমার 'ধনুক-ভাঙা পণ' হ'য়ে থাকে, তা হ'লে বরং ঐরকম একটা অনাথা মেয়েমানুষ দেখে' সংসারে এনে রাখো, তা'তে তোমার ঘর-গেরস্থালীর কাজ চলে' যাবে, সময়ে দুটো ভাত-জলও দিতে পারবে—বলো কি, অসময়ের ভাবনাও থাক্‌বে না। আমাদের জাতের মধ্যে এটা ত আর দোষের কিছু নয়,—ঘরে-ঘরেই ত এ-রকম দুটো-একটা আছে।'

নিধিরাম কোনো কথা কহিল না, চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। এই চুপ করিয়া থাকা মৌন-সম্মতি মনে করিয়া রসিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল—

"আমি একরকম ঠিকও করেছিলাম দাদা—। সেদিন নূতন-গাঁয়ে গিয়েছিলাম। নবীন মণ্ডলের ভা'জ আজ ১২।১৪ বছর হ'ল বিয়ের মাস-পাঁচছয় পরে বিধবা হয়। এতদিন ধরে' সে তার বাপের বাড়ী ছিল। অল্পদিন হ'ল বাপ মরে' যাওয়ায় দুঃখে পড়ে' শ্বশুরবাড়ী এসেছে। সেখানে কারও সাথে তার বনিবনাও নেই। তা'রা তা'কে বিষয়-সম্পত্তির অংশ দেবে না, খেতে-পরতে দিতে চায় না, তার পর আবার কথা নেই, বার্ত্তা নেই, মার-ধর করে। সে আস্‌তে চায় দাদা, তুমি যদি—"

বাধা দিয়া নিধিরাম কহিল,—"না, না—ওসব দিয়ে কাজ নেই ভাই—। পরের মেয়েমানুষ এনে একটা নিন্দে কুড়নো—তার চেয়ে খাই-না-খাই আছি ভালো।"

রসিক অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়া বুঝাইল, কিন্তু নিধি-

রামকে সম্মত করিতে না পারিয়া সেদিনকার মতো চলিয়া গেল।

শারীরিক অনিয়ম ও নানারকম চিন্তার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই নিধিরাম অসুস্থ হইয়া পড়িল।

প্রথম দুইদিন সামান্য জ্বর বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া নিধিরাম যথারীতি স্নানাহার করিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে জ্বর প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। সারাদিন নিধিরাম জ্বরের ঘোরে অচেতন হইয়া রহিল। অনেক রাত্রে জ্বরের বেগ কমিলে যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিল, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তখন তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। জ্বরের গ্লানি ও অনাহারে শরীর এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, উঠিবার শক্তি তাহার ছিল না। শিয়রে এক ঘটি জল ছিল, হাৎড়াইয়া দেখিল, কোন্ সময়ে তাহা খালি হইয়া গিয়াছে। বিছানায় পড়িয়া যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে জমিদার-বাড়ীর বরকন্দাজ শিউশরণ মিশির মহাল হইতে একটা জরুরী খবর লইয়া সদরে ফিরিতেছিল, অত রাত্রে নিধিরামের কাতরকণ্ঠ শুনিয়া ব্যাপার কি জানিতে গেল।

"এ নিধিরাম, নিধিরাম, আরে চিল্লাতেহো কাহে?"

ক্ষীণ করুণ-কণ্ঠে নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

"আরে, হাম্‌ি ত, মিশিরজী আছে।"

"মিশিরজী, একটু জল খাওয়াতে যদি, তেষ্টায় ম'লাম দাদা—।"

নিধিরামের অবস্থা দেখিয়া ও সারাদিন অনাহারে আছে শুনিয়া মিশিরজীর বড় দয়া হইল, সে এক লোটা জল ও কোথা হইতে কিছু মুড়ি সংগ্রহ করিয়া দিয়া গেল।

খবর পাইয়া পরদিন রসিক আসিয়া হাজির হইল। দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিল—"সকালে মিশিরজীর কাছে শুন্‌লাম যে, কাল দুপুর রাত্রে নাকি গলা শুকিয়ে মারা যাচ্ছিলে! তুমি ত আমার কথা শুনবে না দাদা—কিন্তু মাস-খানেক যদি এম্‌নি বিছানায় পড়ে' থাকো, তা হ'লে বলো ত একবার কি অবস্থাটা হয়? আমরা হাজার হ'লেও পর, একদিন, দুইদিন, না হয় তিন দিনই তোমার অসময়ে কর্‌লাম, কিন্তু রোজ-রোজ পরে কি পরের জন্য মাথা ব্যথা করে? আর ভাবো দেখি, কাল মিশিরজী যদি এই পথ দিয়ে না যেত, তা হ'লে কি হ'ত?"

ছলছল-চোখে রসিকের হাত দুইখানি ধরিয়া নিধিরাম কহিল,—"এবার ভাই আমাকে বাঁচা, তুই যা বলিস্ তাই শুন্‌ব।"

পথ্যাদি খাইয়া একটু সুস্থ হইলে রসিক বলিল,—"সেদিনও তোমার জন্য নূতন-গাঁয় গিয়েছিলাম। তা'কে আন্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু সে বল্‌লে, কি দাদা যে, তুমি ত আমাকে রোজ নিতে চাও, কিন্তু যার কাছে থাক্‌ব, সে ত একবারও আসে না। একটাবার যদি তুমি একটু যাও—।"

* * * *

অসুখ সারিয়া গেলে কয়েকদিন পরে নিধিরাম তাহার বাপের আমলের ছেঁড়া ছাতাটা বগলে করিয়া, ময়লা চাদর-খানা কাঁধের উপর ফেলিয়া, খেয়া-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই পাটুনী জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাও নিধিরাম?" খেয়া-নৌকার উপর পা দিতে-দিতে নিধিরাম কহিল "একটু ওপারে যেতে হবে ভাই—এই নূতন-গাঁয়ে।"

সকালে ঘোষেদের নূতন চণ্ডী-মণ্ডপে তখন আসর জম্‌কাইয়া উঠে নাই, তখনও গ্রাম্য দুর্ম্মুখগণ 'অকাজের যত কাজ আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ের উৎস'—নব-নব সংগৃহীত সংবাদসহ উপস্থিত হন নাই—তখনও গ্রাম্য মহাসমিতির পরচর্চ্চারূপ দৈনন্দিন মহাকার্য্য আরম্ভ হয় নাই, শুধু শিরোমণি মহাশয় একা বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। এমন সময় নিধিরাম মণ্ডল সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিল, শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়া সে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। হুঁকা হইতে মুখটি তুলিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—"ভালো আছিস্ ত রে নিধে?"

"আজ্ঞে, ভালো আর কই? কোনোরকমে আপনাদের আশীর্ব্বাদে বেঁচে আছি," বলিয়া নিধিরাম চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, তার পর ফিরিয়া আসিয়া একটু এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া নিধিরাম কহিল,—"একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব কর্ত্তা-ঠাকুর?"

"কি কথা রে?" বলিয়া শিরোমণি-মহাশয় নির্ব্বিকারভাবে হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

দুই-তিনবার ঢোক গিলিয়া নিধিরাম কহিল,—"আজ্ঞে বিধবাদের নাকি আজকাল আবার বিয়ে হয়?"

"হারামজাদা পাজি বেল্লিক কোথাকার! ঠাট্টা কর্‌তে আসিস্ আমার সাথে—এত বড় আস্পর্দ্ধা! বড়-বাবুকে বলে' তোকে ভিটেছাড়া করে' ছাড়্‌ব, তবে আমার নাম সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি—।" গর্জ্জন করিতে-করিতে হুঁকা হাতে করিয়া শিরোমণি মহাশয় লাফাইয়া উঠিলেন, রাগে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল।

গোলমাল শুনিয়া চারিদিক্ হইতে পাড়ার লোক আসিয়া হাজির হইল। বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ সন্ধ্যা-বন্দনা ছাড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে তাঁহার বিপুল বপু সহ ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রাচীন ভক্তিভাজন শিরোমণি মহাশয়কে ঠাট্টা করিয়াছে শুনিয়া, মানবের পূর্ব্বপুরুষের মতন মুখ-ভঙ্গী-সহকারে, বিবিধ-ভাব ও ভাষায় নিধিরাম ও তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের ভূত ছাড়াইতে লাগিলেন। নরহরি দত্ত তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং নফর চাটুয্যে, শীঘ্রই যে নিধে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে সবংশে নির্ব্বংশ হইবে, সেই স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তের প্রমাণ করিতে লাগিলেন।

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়—দেখিয়া নিধিরাম মহা ভয় পাইয়া গেল। শিরোমণি মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া সে কাতরস্বরে কহিল,—"অপরাধ নেবেন না, দোহাই কর্ত্তা-ঠাকুর আমারে মাফ করুন—আমি এর কিছুই জানিনে—। সেদিন খোকাবাবু বল্‌লেন কিনা, যে "নিধে তুই একটা বিধবা বিয়ে করিস্ ত সব ঠিক করে' দিই—আজকাল বিধবাদের বিয়ের চলন হ'য়ে গেছে।" খোকাবাবুর মতন বিদ্বান্ ত শুনি আমাদের এ তল্লাটে নেই; তিনি এমন কথাটা বল্‌লেন, তাই ভাব্‌লাম, কর্ত্তা-ঠাকুরের কাছে একবার শুনে' দেখি—।"

নিধিরামের কাকুতি-মিনতিতে শিরোমণি মহাশয় এবার নিধিরামকে ছাড়িয়া নির্ম্মলকে ধরিলেন। স্বরটা এক পর্দ্দা উচ্চে চড়াইয়া বলিলেন,—"নির্ম্মল ত বল্‌বেই —সে যে ইংরেজী পড়ছে? আমি ত সেইকালেই বলেছিলাম যে, মশায়, ছেলেকে কল্‌কাতায় পাঠাবেন না ও ম্লেচ্ছ-শিক্ষায় ম্লেচ্ছাচার প্রাপ্ত হবে। গরীবের কথা বাসি হ'লে কাজে লাগে। ও বেহ্মজ্ঞানী হ'য়ে গেছে মশায়, নয়ত কি বিধবা-বিবাহের কথা কয়? সনাতন ধর্ম্ম আর রক্ষা হয় না—ঘোর কলি—!"

নির্ম্মল সেখানে উপস্থিত ছিল। শিরোমণি-মহাশয়ের বীরদর্পের মাঝে নিজের নাম শুনিয়া সে হাসিতে-হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আবার কি অপরাধ হ'ল, খুড়ো-ঠাকুর?" গোলমালের কারণ তখনও সে জানিতে পারে নাই।

নির্ম্মলকে দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় নরম হইয়া কহিলেন,—"এস বাবা নির্ম্মল"। নির্ম্মল নিকটে আসিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি নাকি বলেছ, যে, বিধবাদের আবার বিয়ে হয়? আমি ত—"

বাধা দিয়া নির্ম্মল বলিল,—"হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু তা'তে হয়েছে কি? এ-গোলমাল কেন?" তাচ্ছিল্যের ভাবে কথাটা বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিস্ফারিতলোচনে শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"এ্যাঁ! বলো কি! আমাদের হিন্দু-সমাজে—?"

নম্রস্বরে নির্ম্মল উত্তর দিল,—"আজ্ঞে হাঁ, বিধবা-বিবাহ ত আর অশাস্ত্রীয় নয়? বিদ্যাসাগর-মহাশয়—"

বিদ্যাসাগরের নামে শিরোমণি-মহাশয় জ্বলিয়া উঠিলেন। "বিদ্যাসাগর ত ম্লেচ্ছ। নয়ত এতকালও বড়-বড় পণ্ডিত দেশে ছিল, এখনও আছে, তা'রা কেউ ত কখনো বলে না, যে, বিধবার আবার বিয়ে হয়? আর কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে? শাস্ত্র নিয়েই চুল পাকালাম। চন্দ্র-সূর্য্য থাক্‌তে ত এসব অধর্ম্ম, অনাচার সনাতন হিন্দু-সমাজে হ'তে পার্‌বে না।"

নির্ম্মল পূর্ব্বের মতন শান্তভাবে কহিল,—"শাস্ত্রের বিচার ছেড়ে দিলেও সহজ-বুদ্ধিতে ইহা বুঝা যায়, যে, যাকে আপনারা অধর্ম্ম অনাচার মনে করে' শিউরে উঠ্‌ছেন, সেগুলির প্রচলন সমাজের পক্ষে পরম মঙ্গল-কর। কারণ পথ না পেয়েই মানুষ অনেক সময়ে বিপথে যেতে বাধ্য হয়। এই বিপথে চল্‌বার জন্যে শাস্ত্র ও সমাজ অনেক-পরিমাণে দায়ী। সমাজ ধর্ম্মের দোহাই

দিয়ে 'মানুষকে যদি বিপথে ঠেলে' না দিয়ে সুপথে চল্‌বার অধিকার দেয়, তা হ'লে সমাজ থেকে অনেক পাপের উচ্ছেদ হয়।"

অন্তরের ভাব গোপন রাখিয়া শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি-রকম ?"

"এই নিধের ব্যাপারটাই দেখুন। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ও একটা বিধবাকে সংসারে এনে রেখেছে, কিন্তু যেপথে ওরা চল্‌তে বাধ্য হচ্ছে, ধর্ম্ম ও মানুষের কাছে সেটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। আর সে-পাপের ক্ষান্তি এইখানেই নয়—ওদের মিলনে যারা সৃষ্ট হবে, অস্বাভাবিক উপায়ে ওরা তা'দেরও নষ্ট কর্‌তে বাধ্য হবে, কারণ এই পাপের বৃদ্ধি না কর্‌লে সমাজে ওদের স্থান হবে না। কিন্তু বিধবা-বিবাহ-প্রচলন থাক্‌লে এসব অনাচারের উদ্ভব হবার সুযোগ হ'ত না।"

"কিন্তু এ ত খৃষ্টেন-মুসলমানের সমাজ নয়, যে, যখন যেটা ইচ্ছা কর্‌লেই হ'ল। মুনি-ঋষিরা যে বিধি-ব্যবস্থা ক'রে' গেছেন, স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এসেও তা'র ব্যতিক্রম কর্‌তে পার্‌বেন না। আর সেই জন্যই আমাদের সনাতন হিন্দু-সমাজ সবচেয়ে বড়।" বলিয়া গর্ব্বভরে জিজ্ঞাসু-নেত্রে নির্ম্মলের দিকে চাহিলেন।

নির্ম্মল বলিল,—"কিন্তু আপনারা যে 'সনাতন সমাজ' 'সনাতন সমাজ' ক'রে' চীৎকার কর্‌ছেন, সে সমাজ যদি আর ৩০।৪০ বৎসর এইভাবে চলে, তা হ'লে তাহা পুরাণ-ইতিহাসের পাতায় মাত্র পর্য্যবসিত থাক্‌বে—বাস্তব জগতে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না। এবারকার সেন্সাস্ দেখেছেন ত—হিন্দুর সংখ্যা এই দশ বছরে কি-ভাবে কমেছে ? অপরদিকে মুসলমান প্রভৃতির বৃদ্ধির হার কত অধিক! বিশেষজ্ঞেরা স্থির করেছেন, যে, হিন্দুর এই সংখ্যা-হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে—এই বিধবা-সমস্যা। শতকরা পঁচিশ জন স্ত্রীলোক হিন্দু-সমাজে বিধবা— তার অনেকেই বিধবা হয় আবার সন্তানবতী হবার আগে—।"

"উচ্ছন্ন যাক্ হিন্দুসমাজ—চুলোয় যাক্। তাই বলে' বিধবা-বিবাহ হবে ? যত সব অনাছিষ্টি অনাচার—এতও আজ শুন্‌তে হ'ল! নারায়ণ, নারায়ণ!"

শিরোমণি-মহাশয়ের সুরে সুর মিলাইয়া রামধন মিত্র মহাশয় কহিলেন—"বেঁচে থাক্‌লে আরো কত শুন্‌তে হবে দাদা। সেইজন্যেই ত দুবেলা প্রার্থনা করি যে, হরি হে আমাকে তাড়াতাড়ি নেও।"

বৃদ্ধ আব্দুল "জমাদার এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে সাম্‌নে আসিয়া বলিল,—"কর্ত্তাঠাকুর অনুমতি করেন ত আমি একটা কথা বলি—"

শিরোমণি-মহাশয় অনুমতি দিলেন।

"বিধবা বিয়ে করার জন্যে আমাদের যতই দোষ দিন না কেন কর্ত্তা, এই নিকার জন্য আজও মোছলমান জাত আছে। কিন্তু এই এখানকার হিন্দুদের অবস্থা দেখুন ?—চক্‌দীঘির জমিদারদের সাথে যখন আমাদের বাবুদের কাৎলামারী বিলের দখল নিয়ে 'কাজিয়া' হয়, সেকথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। শেষরাত্রে চাঁদপুর ডিহির সওয়ার এসে জানালে যে, পহরখানেকের মধ্যে শ'চারেক লাঠিয়াল না হ'লে বিল বেদখল হ'য়ে যাবে।"

গল্পের আস্বাদ পাইয়া শিরোমণি-মহাশয় বলিলেন,—"সেকথা আর মনে থাক্‌বে না ? তোমার বাবা ইস্‌মাইল সর্দ্দার ত চক্‌দীঘির বাবুদের গোমস্তাকে সড়কীতে গেঁথে নিয়ে আসে—।"

"সেই সময় একডাকে এই সাম্‌নের পাড়া থেকে বাছা-বাছা দু'শ লেঠেল বেরিয়েছিল। আর আজ দু'শ পড়ে' মরুক, দায়-বেদায়ে দশজন লোকও সেখানে পাওয়া যায় না—।"

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"মরে-হেজেই সব খালি হ'য়ে গেল আর আস্‌বে কোথা থেকে ? এই ত আমরা ছোট-বেলায় দেখেছি যে, এই পাড়ায় লোক গিজ্‌গিজ্ করেছে, আর আজ দেখ সবই ভিটে খালি।" একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "কিছু চিরস্থায়ী নয়, ও বলে' আর দুঃখ করে' কি হবে ?"

আব্দুল একটু দম লইয়া কহিল,—আপনারা খোকা-বাবুর কথায় যতই অসন্তুষ্ট হন, কথাটা আমার বেশ মনে ধরেছে, কারণ খোকাবাবু হক্ কথাই বলেছেন। টাকার অভাবে বিয়ে কর্‌তে না পারায় যে, কতকগুলি ঘর নির্ব্বংশ হ'য়ে গেছে, সেকথা অস্বীকার কর্‌বার উপায়

নেই। আর দেখুন কর্ত্তা বিয়ে কর্‌তে না পেরে যারা এক-একটা বিধবা নিয়ে হীনভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মতন যদি ওদের মধ্যে নিকা থাকৃত, তা হ'লে তাদের এক-একজনের দু-পাঁচটা করে' ছেলেপুলে হ'লে কত লোক হ'য়ে দাঁড়া'ত? এই ধরুন ওপাড়ার ত প্রায় সব—"

"তোমাকেও কি বাহাত্তুরে ধর্‌লে নাকি আব্দুল, না তোমার বাবুর সাথে পরামর্শ করে' আমাদের অপদস্থ কর্‌বার মৎলবে এসেছ?" দীপ্তরোষে শিরোমণি-মহাশয় আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

হাতজোড় করিয়া আব্দুল কহিল,—"অপরাধ করে' থাকি ত মাপ করুন কর্ত্তা। আমি ত আপনাদের গোলামের গোলাম, আমার কথা ধর্‌বেন না।"

আব্দুলের অতিরিক্ত বিনয়ে শিরোমণি মহাশয় নরম হইয়া কহিলেন—"আচ্ছা, তুমিই বলো ত আব্দুল যে বিধবা-বিবাহ কোনোকালে ত আমাদের সমাজে ছিল না, তবু এতকাল ত সমাজ চলে' এসেছে আর আজ বিধবার বিয়ে না হ'লে নাকি সমাজ গোল্লায় যাবে—। অমন অনাছিষ্টি হওয়ার চেয়ে গোল্লায় যাওয়া ঢের ভালো।"

একটু থামিয়া বলিলেন,—"তুমি আবার বল্‌ছ যে ওদের বংশ থাক্‌ল না! ওদের বংশ থাক্‌বে কেন? আগের মতন ওদের কি আর দেবদ্বিজে ভক্তি আছে, না ধর্ম্ম-কর্ম্মে জ্ঞান আছে, তুমিই বলো দেখি জমাদার? আগে বছরে নূতন যে-কোনো জিনিষ হোক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে আগে না দিয়ে কিছু কর্‌ত না। আর এখন দেওয়া পড়ে' মরুক, চেয়েও একটা জিনিষ পাওয়া যায় না— আরো বলে কিনা যে দামটা কখন দেবেন? সে-বার ভাদ্র-মাসে যেমন বিষ্টি, তেম্‌নি যদি ছাইটুকু মেলে। সেই অবস্থায় ত এক নৌকো কুটুম এসে হাজির—। কি করি—খুঁজতে-খুঁজতে চেয়ে দেখি ওপাড়ায় নটবর মণ্ডলের গাছে একটা কুম্‌ড়ো ধরে' রয়েছে। বল্‌লাম— 'নটবর, তোর বরাত ভালো তোর কুম্‌ড়োটা আজ ব্রাহ্মণ-ভোজনে লাগবে। আজ কি তিথি জানিস্—শুক্লা প্রতিপদ্ তার পর পুনর্ব্বসু নক্ষত্র। আজ একটা ব্রাহ্মণ-ভোজন দিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়— তোর কপাল ভালো রে।' বেটা একটু মায়া-কান্নার সুরে বল্‌লে কিনা যে, এটা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে মানৎ আছে, পরে যেটা হবে, সেইটে দেবে। এত করে' বল্‌লাম—কিছুতেই যদি দিলে। এমন অধার্ম্মিক—এরা নির্ব্বংশ হবে না কেন?"

"সে ত ঠিক কর্ত্তা। আপনারা হলেন যে হিন্দুদের এই আমরা যাকে বলি—পীর।"

চাটুয্যে মহাশয় কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেদিকে কান না দিয়া শিরোমণি মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর-ভাবে নির্ম্মল বলিল—"আচ্ছা, আপনি ত বল্‌লেন, যে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয়—ঘোর অনাচার, আর এ-রকম অনাচার সমাজে হ'তে গেলে আপনারা তার শাসন অবশ্য করেন।"

"অবশ্যই, সে আর বল্‌তে? আমরা থাক্‌তে সমাজে এতবড় একটা অনাছিষ্টি হবে আবার?"

"আপনারা ত কোনো অনাচার সমাজে হ'তে দেন না, কিন্তু ওই নিধে যে সেই বিধবাটাকে নিয়ে ব্যভিচার কর্‌ছে, এর পর হয়ত ভ্রূণহত্যা কর্‌বে, আর শুধু ও একা নয়—সমাজের বুকে বসে' আরও অনেকে অবাধে এই পাপ করে, অথচ তার ত আপনারা কোনো শাসন করেন না? এগুলি কি আপনাদের মতে অন্যায় না—শাস্ত্রেও কি তাই বলে?"

হঠাৎ কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া শিরোমণি মহাশয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। —"শাস্ত্রের তুমি কি জানো হে—? শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব যদি সকলেই বুঝতে পার্‌ত, তা হ'লে ত আর কথা ছিল না। দুপাতা ইংরেজী পড়েছ না হয়, তাই বলে' আমরা তোমার বাপ-জ্যেঠার বয়সী, আমাদের সাথে আসো তর্ক কর্‌তে— আর এসব অশ্লীল কথার! ছি, ছি! আর কিছু না হোক বয়সে বড় বলে'ও ত একটু সমীহ করে' চলা উচিত।" রাগে তাঁহার কথা বাধিয়া যাইতে লাগিল।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন "ইংরেজী পড়ানোই দোষ মশাই—ওতে আর ছেলেরা আমাদের মোটেই মান্‌তে চায় না।"

বিরক্ত হইয়া নির্ম্মল চলিয়া গেল।

(৪)

পূর্ণ একবৎসর গত হইয়া গিয়াছে।

মাঘ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বৃক্ষের হরিৎ-শোভায়, কোকিলের কুহুতানে তখন বসন্তের আগমন সূচিত হইতেছিল।

নির্ম্মল কয়েকদিনের জন্য বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী আসিয়াও তাহার অবসর নাই—সাম্‌নেই তাহার ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা।

সকালে দোতালার খোলা বারাণ্ডায় বসিয়া নির্ম্মল পড়িতেছিল। তখনও পাখীর প্রভাতী কূজন আসে নাই। সম্মুখের স্থির নদীজল তখন নবারুণের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। পুষ্প-সৌরভমাখা শীতল সমীরণ-স্পর্শে মন এক আবেশে বিভোর হইতেছিল।

প্রভাতী মধুরিমার এই মিলিত স্বর তার প্রাণে এক হারানো ব্যথা জাগাইয়া তুলিতেছিল। পড়াশুনায় তাহার মন মোটেই বসিতেছিল না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পুস্তকে মনঃসংযোগ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। একখানি সুন্দর মুখ তাহার শূন্য-দৃষ্টিবদ্ধ নীরস সার্জ্জারির পৃষ্ঠায় ভাসিয়া উঠিতেছিল। অন্তরে তাহার যে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকটা করুণ স্মৃতিরেখা তাহার দীপ্ত মুখখানিকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

জীবন পণ করিয়া সে যাহাকে মরণের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সে একদিন প্রিয়ের কাছে আপনাকে বিলাইয়া দিল। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট ধর্ম্মসমাজ যেদিন নির্ম্মম-করে তাহাদের মিলনের মাঝে সংকীর্ণতার প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছিল, সেদিন প্রিয়ার সেই বিষাদ-মলিন নীরব দৃষ্টির ম্লান মাধুর্য্যটুকু আজ তাহার প্রাণে বিসর্জ্জনের করুণ রাগিণীর মতন বাজিতেছিল।

শুভ্র পাল উড়াইয়া একখানি পণ্যতরী ধীরমন্থর গতিতে চলিয়া গেল। মাঝি গাহিতেছিল,—"ও ললিতে এমন বাঁশী বাজায় কে?—"

বই বন্ধ করিয়া সাজসজ্জা করিয়া নির্ম্মল বেড়াইতে বাহির হইল।

পথে নামিতেই নিধিরাম প্রণাম করিয়া কহিল,—"খোকাবাবু দয়া করে' যদি আমাদের ওদিকে যেতেন একটাবার?"

"কেন? কি হয়েছে রে?"

"আজ্ঞে আমার বাড়ীতে কুসমীর অসুখ, একটু দেখে' যদি ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা করে' দেন—"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, যে কি অসুখ তাহার।

নিধিরাম কাতরস্বরে কহিল, "অসুখ সেরকম কিছু ঠিক পাওয়া যায় না, তবে অনেক দিন থেকে ভুগ্‌ছে। মাস কয়েক থেকে মোটেই খেতে পারে না, রোজ অসুখ-অসুখ বোধ হয়—গা ম্যাজ-ম্যাজ করে, তার পরে বড় কাহিল হ'য়ে গেছে। রামচরণ সাহার দোকান থেকে এক বোতল সেই ম্যালোয়ারি না কি বলে এনে খাওলাম তা কিছুই হ'ল না। দু-তিন বেলা রেঁধে আর পারিনে খোকাবাবু।"

নির্ম্মল নীরবে চলিতে লাগিল।

* * * * *

কয়েক মিনিট রোগীর দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া নির্ম্মলের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল। কাজের অছিলায় নিধিরামকে একপাশে সরাইয়া দিয়া সে মেয়েটির কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিয়া আসিল।

নিধিরাম বলিল, "হাত দেখেছেন বাবু?" গম্ভীরভাবে নির্ম্মল মাথা নাড়িল।

নির্ম্মলের এই ভাবান্তর দেখিয়া নিধিরাম ভয় পাইয়া গেল। শঙ্কাজড়িত-কণ্ঠে কহিল, "কি-রকম দেখ্‌লেন খোকাবাবু?—আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌বেন না?"

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল, "গোপন কর্‌বার কিছুই নেই, অসুখ-বিসুখ ওর কিছুই না। তবে এখন থেকে ওকে একটু যত্ন করিস্‌, কোনো শক্ত কাজ-কর্ম্ম কর্‌তে দিস্‌নে—দুই-তিন মাসের মধ্যেই ওর ছেলেপুলে হবে—।"

নিধিরাম প্রথমে ভাবিল খোকাবাবু তাহার সহিত তামাসা করিতেছেন, কিন্তু তাহার মুখে বা কথায় তামাসার রেশও খুঁজিয়া না পাইয়া নিধিরাম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ষ্টেথোস্কোপটিকে পকেটে পুরিতে-পুরিতে নির্ম্মল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া গেল।

নিকটে দাঁড়াইয়া তিনুর মা সব শুনিয়াছিল, সুযোগ পাইয়া সে তাহার স্বাভাবিক কাংস্যনিন্দিত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল,—"খোকাবাবু যা বল্লেন তা অনেক দিন আগেই বুঝেছি, বলিনে কেবল ভয়েতে, যে কোথা থেকে বড়-বাবুর কাছে গিয়ে কে লাগাবে, আর রক্ষা থাকবে না। তুমি যেন পুরুষ-মানুষ, ওসব কিছু বুঝ্লে না, কিন্তু সে বুড়ো মাগী, সেও কি কিছু বোঝে না যে, হ্যাকার মতন চুপ করে' থাকে? দুই-তিন বেলা সে ভাত খায়, না ছাই খায়!"

বেগতিক দেখিয়া নিধিরাম কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল—"দোহাই তোমার পিসি! একথা কেউ যেন জানতে না পারে। তোমার পায়ে পড়েছি, কাউকে বোলো না—।"

ভালো মানুষের মতন স্বর বদ্লাইয়া তিনুর মা কহিল, "আমি বাছা এসব ঘরের 'কুচ্ছো' পরকে বল্তে যাবো কেন? তুমি ত আর আমার পর নও।"

নিধিরাম আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল—কি করিবে।

তিনুর মা তখনই যাইয়া রামের মাসীকে, রামের মাসী আবার জগার মাকে, 'আমার মাথার দিব্যি কাউকে বলিস্‌নে ভাই' এই চুক্তিতে কানে-কানে গোপন-কথাটা জানাইল। এইপ্রকারে আধ-ঘণ্টার মধ্যে খবরটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

রামতনু বাঁড়ুয্যে হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ঘোষেদের নূতন চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া কহিল,—"শুনেছ খুড়ো, শুনেছ?"

ব্যস্ত হইয়া ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'ল আবার রামতনু—তুমি অত হাঁপাচ্ছ কেন?

একগাল হাসিয়া রামতনু বলিল,—"নিধে যে মেয়েটাকে এনেছে, তার যে—হচ্ছে, খুড়ো!"

"অ্যাঁ, বলো কি রামতনু—?"—বলিতে-বলিতে যাদব-সরকারের চক্ষু-দুইটি কপালে উঠিল।

রামতনু দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিল,—"বৌমার কদিন থেকে বুকে বেদনা হয়েছে, তাই যাচ্ছিলাম—বাবুদের বাড়ী। পথে তিনুকড়ের মা বল্লে যে, দাদাঠাকুর, খোকাবাবুকে এখন বাড়ী পাবেন না"—বলে'ই হাস্‌তে লাগল। ব্যাপার কি, কিছুতেই কি বল্‌তে চায়? অনেক সাধাসাধির পর গোপনে বল্লে যে নিধের বিধবাটার কি হয়েছে, তাই খোকাবাবুকে নিয়ে গেছে—শুনে'ই আমি একদৌড়ে এখানে এসেছি।"

চারিদিক্ হইতে 'বলো কি' 'সত্যি নাকি' 'ছি ছি!' প্রভৃতি বিস্ময়সূচক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

শিরোমণি মহাশয় কানে আঙুল দিয়া বলিলেন,—"শেষে এসবও দেখতে হ'ল! সনাতন সমাজ আর রক্ষা হয় না। মা বসুন্ধরা, এত পাপের বোঝা তুমি সহ্য করো কেন মা?"

নিধিরামের বাড়ী ততক্ষণে তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার লোকের সৌহৃদ্য, হাসি-তামাসা ও উপদেশের আতিশয্যে সে অস্থির হইয়া পড়িল। মেয়েটি ঘরের কোণে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

(৫)

বৈকালে জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ-বাবু কাছারি করিতেছিলেন, এমন সময় নিধিরাম আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—"হুজুর, আপনি আমার মা-বাপ—দোহাই আপনার, আমাকে বাঁচান—।"

কাগজ-পত্রের উপর হইতে মুখ তুলিয়া বীরেন্দ্র-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাঁদিস্ কেন রে নিধে—কি হয়েছে?"

নিধিরাম পূর্ব্বের মতন শুধু কাঁদিতে লাগিল—কোনো উত্তর করিল না। বিরক্ত হইয়া জমিদার-বাবু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কি হয়েছে আগে তাই বল্ না, তার পরে বসে' কাঁদিস্।"

নিধিরাম কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল "খোকাবাবু বলেছেন যে পুলিশে বলে' আমাকে ফাঁসিতে দেবেন।"

"কি করেছিস্ তুই?"

নিধিরাম ভয়ে-ভয়ে সমস্তই বলিল।

ছেলেরা পড়া-শুনা-ভিন্ন অন্য বিষয়ে মন দেয়, বীরেন্দ্র-বাবু মোটেই তাহা পছন্দ করিতেন না।

নির্ম্মলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার ছুটি আর কতদিন আছে, নির্ম্মল?"

নির্ম্মল বলিল, "এখনো পনর-ষোল দিন বাকী আছে।" জলদ-গম্ভীর-কণ্ঠে বীরেন্দ্র-বাবু বলিলেন, "তুমি কালই ভোরের ট্রেনে কল্‌কাতায় চলে' যাও, এখানে তোমার পড়া-শুনা ভালো হচ্ছে না।"

পিতার কথায় প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা কোনোদিনই তাহার ছিল না, মাথা নত করিয়া সে নীরবে চলিয়া গেল।

* * *

নিশীথ রাত্রে জেলেরা মাছ ধরিবার জন্য নদীতে 'কুমোর ঘিরিয়াছিল। স্তূপীকৃত জাল উঠাইতে-উঠাইতে উহার মধ্য হইতে কাপড়-জড়ানো কি-একটা দ্রব্য বাহির হইল। কৌতূহলী হইয়া জেলেরা উহার আবরণ মোচন করিয়া দেখিল—একটি অপরিস্ফুট শিশুর মৃতদেহ। হাতের হুঁকাটি নামাইয়া একটি বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সদ্য-পুত্রহারা মধুমাঝি কহিল "আহা কার আজ এমন সর্ব্বনাশ হ'ল রে—এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয়।"

...পূব আকাশের আলোকপাতে তখন নদীর জলরেখা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

নেপালরাজের ইন্দ্রযাত্রা

অধ্যাপক শ্রী সঞ্জীব চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্

সুদূর বাঙ্গালা দেশ হইতে মনে হয় নেপাল বুঝি গুর্খাদেরই দেশ, বুঝি নেপালে সভ্য, সুশিক্ষিত, বর্ত্তমান যুগের সহিত মিশিয়া চলিতে পারে এমন লোক, এমন আচার-ব্যবহার কিছুই নাই। বস্তুতঃ হিমালয়ের এই কেন্দ্রস্থলে রেল-ষ্টীমারের গণ্ডীর বাহিরে বর্ত্তমান সভ্যতা প্রবেশ করিতে পারে কি না সে-বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয় এবং সন্দেহ হওয়ার কারণও যে নাই তাহা নহে। কিন্তু নেপালে একবার আসিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নেপালকে আমরা দূর হইতে যাহা মনে করি, নেপাল ঠিক তাহা নয়। শিক্ষার আলো এবং ভদ্রতার মাধুর্য্য নেপালেও যথেষ্ট। নেপাল বায়ুবেগে পৃথিবীর অন্যান্যজাতির সমকক্ষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। শুধু ব্রিটিশ ভারতের মতন নেপাল নিজস্ব হারাইতে চাহে না। নিজস্ব বজায় রাখিয়া, নিজের ধর্ম্ম, নিজের রাজনৈতিক পদ্ধতি, নিজের শিক্ষাপদ্ধতি, এমন-কি নিজের পর্ব্ব এবং মিছিলগুলিকে পর্য্যন্ত যথাসম্ভব অনাহত রাখিয়া নেপাল উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতা বোধ করি এমন পদ্ধতিকে নিন্দনীয় মনে করিবার কোনও কারণ দর্শাইতে পারে না।

ইন্দ্রযাত্রা নেপালের সর্ব্বপ্রধান মিছিল। এই দিনে নেপালের সম্পূর্ণ সৈন্য-বাহিনী তাহাদের কুচকাওয়াজের অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ টুর্নীখাল হইতে মহারাজাধিরাজ এবং প্রধান মন্ত্রীর সুসজ্জিত গাড়ীর পিছনে নেপালের সর্ব্বপ্রধান পথ অবলম্বন করিয়া প্রায় দুই মাইল দূরস্থ হনুমানডোগা নামক স্থানে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়। হনুমানডোগার রাজপ্রাসাদে একখানা অত্যুচ্চ স্বর্ণসিংহাসনে সে-দিন সপারিষদ রাজাধিরাজ বসেন। যতক্ষণ না এপর্ব্ব শেষ হয় ততক্ষণ বিরাট্ সৈন্য-বাহিনী বিশাল প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। এবং পর্ব্ব শেষ হইলে উহারা ঠিক একই পথে পুনরায় টুর্নীখাল মাঠে একই মিছিলে উপস্থিত হয়। সুতরাং টুর্নীখাল হইতে নেপালরাজের হনুমানডোগার রাজপ্রাসাদে বাৎসরিক যাত্রার নামই ইন্দ্রযাত্রা। বর্ত্তমান নেপাল পর্ব্বটিকে একটি কুসংস্কার বা বাহ্যাড়ম্বর মনে

না করিয়া কিভাবে উহার সদ্ব্যবহার করিতেছে আমরা সে-সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিব।

ইন্দ্রযাত্রা নেপালের হয়ত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন পর্ব্ব। পুরাতন ভারতে ভগবানের নিম্নেই রাজার স্থান ছিল। রাজাকে সাধারণ লোক সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করিত। সুতরাং প্রত্যেক রাজারই যে একটি বাৎসরিক আত্মসম্বর্দ্ধনার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সাধারণ লোক যে রাজাকে বৎসরে অন্ততঃ একটিবার দেখিবার বাসনা করিত একথা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রযাত্রা এই শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার একটি পরিণতি বলিয়া মনে হয়। ফলত মিছিল হইলেও উহাকে ঠিক মিছিল বলা চলে না। বরং উহাকে বাৎসরিক অভিষেক বলিলে অধিকতর সত্য বলা হয়। কিন্তু পুরাতন ইন্দ্রযাত্রায় বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং লোকহিতকর কোন বিষয় অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না বলিয়া উহা ক্রমশঃই প্রাণশূন্য দৃশ্য মাত্র হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান নেপাল ইন্দ্রযাত্রার কয়েকটি চমৎকার সদ্ব্যবহার করিতেছে। ইন্দ্রযাত্রা হইতে চটকের ভাবটি—শুধু নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিবার ভাবটি নেপাল ক্রমশঃ উঠাইয়া দিয়াছে। গুর্খা-বিজয়ের পূর্ব্বে এদেশে অর্দ্ধহিন্দু এবং অর্দ্ধবৌদ্ধ নেওয়ার নামক এক-জাতীয় রাজা রাজত্ব করিত। এখনো নেপাল সহরের অধিকাংশ অধিবাসী নেওয়ার। উহারা হিন্দু রাজার অধীনে আছে বলিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত পরাধীন মনে করে না। নেওয়ার রাজাদের শেষ অবস্থায় ইন্দ্রযাত্রা শুধু একটি বাৎসরিক মিছিলের মতন হইয়াছিল। শুধু সেদিন রাজা সপারিষদ নূতন করিয়া সিংহাসনে বসিতেন এটুকু বিশেষত্ব মাত্র শেষ পর্য্যন্ত উহার মধ্যে নিহিত ছিল। সেদিন নেওয়ার রাজার সৈনিক বা সেনানায়কগণ মিছিলে দল বাঁধিয়া রাজার পশ্চাদনুসরণ করিত, এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না।

কিন্তু বর্ত্তমান নেপালের ইন্দ্রযাত্রা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথির একটি মিছিল মাত্র নহে। উহার মধ্যে রাজপুত রাজারা নিজেদের রাজনৈতিক বুদ্ধিতে জনসাধারণের এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনায় নানারকম অভিনব বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান গুর্খা রাজারা রাজপুত। মুসলমান রাজত্বের সময়ে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাজপুতপরিবার হিমালয়-মধ্যস্থ গোরোখা নামক উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। উহারা সেখানে নিজ শক্তিবলে ক্রমশঃ রাজা হয় এবং পার্ব্বত্য জাতিদের লইয়া একদল সৈন্য সংগ্রহ করে। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেওয়ার রাজাকে পরাজিত করিয়া গোরোখাদের রাজপুত রাজা নেপাল দখল করে। বর্ত্তমানে এই গোরোখা বা গুর্খা রাজ্যে রাজপুতের শৌর্য্য এবং রাজপুতের রাজনৈতিক বুদ্ধি ষোল আনা পরিস্ফুটভাবে দেখা যায়। এই শৌর্য্য এবং রাজনৈতিক বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজপুত রাজারা ইন্দ্রযাত্রা মিছিলের মধ্যে নানা-রকম অভিনব বিষয় সংযোগ করিয়াছে। নেওয়ার রাজাদের প্রাণহীন একটি মিছিলের মধ্যে তথা-কথিত গুর্খা অথবা রাজপুত রাজারা নিজ বুদ্ধিতে কি-ভাবে নানারকম নূতনত্বের সংযোগ করিয়া উহাকে একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় করিয়া তুলিয়াছে সে-বিষয়ের কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ রাজপুত রাজারা নেপাল জয় করিয়া সাধারণ অশিক্ষিত অধিবাসীদের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য ঠিক নেওয়ার রাজাদেরই মতন করিয়া প্রতিবৎসর মিছিলটি বাহির করিতে থাকে। এত পুরাতন একটি মিছিলকে হঠাৎ উঠাইয়া দিয়া নিজেদের আত্মশ্লাঘা প্রকাশ না করিয়া তাহারা উহাকে আপনার করিয়া লয়। এই কয়টি রাজপুত পরিবারের পরকে আপন করিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল। গুর্খার দেশে আসিয়া, গুর্খাদিগকে আপন করিয়া লইবার জন্য নিজেদের গুর্খা বলিতে এবং গুর্খার সেকেলে খুকরীকে নিজেদের নিশান-চিহ্ন করিয়া রাখিতে তাহারা একটুকুও সঙ্কোচ বোধ করে নাই। এখন রাজা হইয়াও তাহারা আপনাদিগকে গুর্খা বলিতে সঙ্কোচ মনে করে না। বস্তুতঃ এখানে প্রধান মন্ত্রী মহারাজা চন্দ্রশামশের হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের শিরস্ত্রাণেই এই পার্ব্বত্য গুর্খাজাতির খুকরী অঙ্কিত বা খোদিত। সুতরাং উহারা যে নেওয়ারদের রাজার

একটি বাৎসরিক মিছিলকে আপন করিয়া লইতে পারিয়াছিল, উহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুরাতন রাজপুতানায় রাজাদের এতদনুরূপ একটি পর্ব্বদিন ছিল কি না আমরা জানি না। তবে প্রজাদের মনে নিজেদের অস্বাতন্ত্র্যের ভাব কিছু জাগাইবার জন্য গোরোখা উপত্যকার রাজপুত রাজারা যে নেওয়ার রাজার পর্ব্বটির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছিল উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, নেওয়ার রাজাদের মিছিলটি শুধু আড়ম্বর-পূর্ণ ছিল। রাজা স্বয়ং সেদিন বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে হাতী ঘোড়া এবং সুন্দর-সুন্দর দর্শনীয় জিনিষ ও দৃশ্য প্রভৃতি মিছিল করিয়া চলিত। নানারকম নয়নতৃপ্তিকর দৃশ্য দেখিবার জন্য হাজার-হাজার লোক আসিত। মোটামুটি বিষয়টি কতকটা ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের মতনই ছিল। কিন্তু গুর্খা রাজারা ক্রমশঃ আড়ম্বরের ভাবটি তুলিয়া দিয়াছেন। এবং উহার আড়ম্বর এখন এত কমিয়া গিয়াছে যে মিছিলটিকে সম্পূর্ণ সৈনিক-মিছিল বলা যায়। সেদিন নেপালের সমুদয় সৈন্য উহাদের উপরস্থ 'অফিসার' সমেত একটি সম্পূর্ণ সৈন্য-বাহিনী হইয়া পুরাতন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়। প্রথমে মহারাজাধিরাজ, তৎপরে মহারাজ বা প্রধান মন্ত্রী, তৎপরে প্রধান সেনাপতি—এইভাবে মিছিল করিয়া সমুদয় নেপালবাহিনী পুরাতন প্রাসাদে সমবেত হয়। সেখানে সিংহাসনে রাজা অধিরোহণ করিলে একত্রিশবার কামানধ্বনি হয় এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাহার ভবিষ্যৎ বৎসরের কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। রাজার বাৎসরিক অভিষেক প্রধান মন্ত্রীর বাৎসরিক কার্য্যভার প্রাপ্তি, নেপাল-বাহিনী সমবেত হইয়া রাজা ও মন্ত্রীকে অভিবাদন, এবং ঠিক যুদ্ধসজ্জায় আপনাদের উপরস্থ অফিসারের অধীনে সজ্জিত হওয়া প্রভৃতি গুরুতর বিষয় ইন্দ্রযাত্রা মিছিলকে নানারকমে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। নেপালের যুবকেরা ইন্দ্রযাত্রা হইতে সৈনিক হওয়ার গৌরবপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হয়। পর-পদানত বাঙালীর সামরিক প্রবৃত্তি বহুকাল নিষ্পেষিত অবস্থায় আছে। তথাপি গুর্খার দেশের এই একটি দৃশ্যে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে সুপ্ত সামরিক প্রবৃত্তিতে নাড়া পড়ে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে কতরকমের মিছিল হয়। জন্মাষ্টমী এবং মহরমের সময় কত সহরে হাজার-হাজার লোক মিছিল দেখে। সময়-সময় এসমুদয় ব্যাপারে কত রক্তারক্তি হয়। কিন্তু নেপালের "গাইযাত্রা" যেমন ৮।৯ বৎসরের শিশুদিগকে যুদ্ধানুকরণ দ্বারা সামরিক বিদ্যায় দীক্ষিত করে, নেপালের ইন্দ্রযাত্রা যেমন যুবকদিগকে সৈনিক-দলভুক্ত করিবার জন্য প্রণোদিত করে, তেমন কোনো বন্দোবস্ত ত আমাদের মিছিলগুলির মধ্যে নাই! আমরা ত আমাদের দেশের দেখিবার জিনিষগুলিকে শুধু দেখিবার জন্যই দেখি। উহাদের মধ্য হইতে শিক্ষণীয় বিষয় কিছুই গ্রহণ করি না। তবে আমরা পরাধীন। স্বেচ্ছায় কোনো লোকহিতকর কার্য্য করিবার শক্তিও আমাদের নাই। যাহারা নেপালে আসিয়া নেপালবাসীদের চাল-চলন দেখিয়া বিচার করিবে তাহারা দেখিবে নেপালে দেখিবার এবং শিখিবার অনেক জিনিষ আছে—তাহারা দেখিবে নেপাল স্বাধীন এবং তাহাও বিদেশী কোনো গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনুগ্রহের জন্য নহে।

তুষার-ঝটিকা

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, রুশীয় জাতির একটা স্মরণীয় যুগে, দয়ার্দ্র-হৃদয় Gaviel, R তাঁহার নিজের নেনাবদোভা-জমিদারিতে বাস করিতেন। সেই জিলার মধ্যে, আতিথেয়তা ও চরিত্র-মাধুর্য্যের জন্ম তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। পাড়ার লোকেরা কিছু পানাহার করিবার জন্য এবং তাঁহার স্ত্রী প্রাস্কোভিয়ার সহিত তাস খেলিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিত। কেহ কেহ আবার তাঁহার কন্যা মারিয়াকে দেখিবার জন্য আসিত। বালিকার বয়স ১৭ বৎসর। লম্বা ও ফ্যাকাশে রং। সে একজন উত্তরাধিকারিণী—তাই, অনেকে নিজের জন্য কিংবা নিজের ছেলেদের জন্য তাহাকে চাহিত।

মারিয়া ফরাসী নভেলের আদর্শে মানুষ হইয়াছিল, সুতরাং প্রেমে পড়িয়াছিল। তাহার প্রেমের পাত্র ছিল সৈন্য-বিভাগের একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী। সে এখন ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে—নিজের গ্রামে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, যুবক মারিয়ার সহিত অবিলম্বে প্রেম-বিনিময় করিল। কিন্তু তাহার প্রেয়সীর বাপ-মা, উভয়ের মধ্যে এই আসক্তি লক্ষ্য করিয়া, যুবককে তাহার মনে স্থান দিতে নিষেধ করিলেন। সে তাঁহাদের বাড়ী আসিলে, তাঁহারা তাহাকে আদৌ আদর-অভ্যর্থনা করিতেন না।

আমাদের প্রেমিক যুগল চিঠি-লেখালিখি করিত এবং প্রতিদিন পাইন-বনে, কিংবা রাস্তার ধারের পুরাতন গির্জ্জার কাছে পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিত। উহারা চিরস্থায়ী প্রেমের ব্রত গ্রহণ করিল, বিধাতাকে তিরস্কার করিল, এবং নানাপ্রকার উপায় আপনাদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। অনেক লেখালিখি ও কথাবার্ত্তার পর উহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল :—

যদি আমরা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে না থাকতে পারি, যদি কঠোর-হৃদয় বাপমা রা আমাদের সুখের পথে প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমরা কি তাঁহাদের সঙ্গে কোনো সংস্রব না রেখে আলাদা থাকতে পারিনে ?

অবশ্য এই সরেস মৎলবটা যুবকের মাথায় প্রথম আসিয়াছিল ; তার পর মারিয়ার ঔপন্যাসিক কল্পনাতেও মৎলবটা বেশ সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

শীত আসিয়া পড়িল ; উহাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইল। কিন্তু উহাদের চিঠি লেখালিখিটা বরং আরও সতেজে চলিতে লাগিল। ভ্লাদিমির তাহার প্রত্যেক পত্রে মারিয়াকে অনুনয় করিত, যেন তা'রা গোপনে বিবাহ করে; কিছুকাল লুকাইয়া থাকিয়া তার পর মা-বাপের চরণ তলে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিবে। তাহাদের বীরজনোচিত চিরস্থির অনুরাগ দেখিয়া শেষে তাঁহারা নিশ্চয়ই মর্ম্মস্পৃষ্ট হইবেন এবং উহাদিগকে বলিবেন :—

"বাছারা ! আয় আমাদের কোলে"।

মারিয়া অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিল এবং অন্যান্য উপায়ের মধ্যে পলায়ন করার প্রস্তাবটা সে অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু অবশেষে উহাতেই সম্মত হইল। পলাইবার নির্দ্দিষ্ট দিনে, মাথা ধরার অছিলায় রাত্রে কিছু আহার করিবে না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যাইবে, মারিয়া এইরূপ স্থির করিল। তার পর মারিয়া ও তার দাসী (যে ভিতরকার কথা জানিত) পিছনের সিঁড়ি দিয়া বাহিরের বাগানে আসিবে ; বাগান ছাড়াইয়া একস্থানে উহাদের জন্য একটা চক্রহীন স্লেজ-গাড়ী প্রস্তুত থাকিবে। ঐ গাড়ী করিয়া নেনাবদোভা হইতে পাঁচ মাইল দূরে, জাদ্রিনো গ্রামে যাইবে—সেইখানে সোজা গির্জ্জায় গিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার প্রণয়ী ভ্লাদিমির সেইখানে উহাদের জন্য অপেক্ষা করিবে।

ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে মারিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইল না। সে বোচকা-বুচকি বাঁধিতে লাগিল। তা-ছাড়া তার এক ভাব-প্রবণ তরুণী বন্ধুকে একটা দীর্ঘ পত্র লিখিল ; আর-এক পত্র লিখিল তাহার মা-বাপকে। এই পত্রে অতীব মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাঁহাদের নিকট বিদায় লইল। সে যে এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ, প্রেমের অজেয় শক্তি এবং এই বলিয়া উপসংহার করিল, যে, যদি কখনো তাঁদের পদতলে আপনাকে নিক্ষেপ করিবার অনুমতি পায়, তবে সেই মুহূর্ত্তকে তাহার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত্ত বলিয়া জ্ঞান করিবে। দুই পত্রের উপরেই শিল-মোহরের ছাপ দিল ; সেই মোহরের উপর দুই "জ্বলন্ত হৃদয়" ও তাহার উপযোগী উৎসর্গ-লিপি খোদিত ছিল। ইহার পরেই সে নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার তন্দ্রা আসিল। মাঝে-মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল. প্রথমে মনে হইল যেন সে স্লেজ-গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই তার বাপ তাহাকে থামাইলেন এবং গাড়ীটা বরফের উপর দিয়া হড়-হড় করিয়া টানিয়া লইয়া তাহাকে একটা তমসাচ্ছন্ন অতল বিবরে নিক্ষেপ করিলেন—সে হুড়মুড় করিয়া তাহার ভিতর পড়িয়া গেল—কি এক অবর্ণনীয় অবসাদে তাহার হৃদয় পীড়িত হইল। তাহার পর ভ্লাদিমিরকে দেখিতে পাইল ; ভ্লাদিমীর ঘাসের উপর পড়িয়া আছে—মুখ পাংশুবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত ঝরিতেছে। তাহার মুমূর্ষু অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন শীঘ্র বিবাহ করিবার জন্য কাতরভাবে তাহাকে অনুনয় করিতেছে। আরও কত ভীষণ স্বপ্ন একটার পর একটা তাহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। শেষে যখন সে জাগিয়া উঠিল—তখন তাহার মুখ আরও ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে—ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে।

মারিয়ার এই অসুস্থতা মা-বাপ উভয়েই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "তোর কি হয়েছে বাছা ?—কোনো অসুখ করেছে কি" ? তাঁদের এই মমতাময় প্রশ্নে মারিয়ার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। মারিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, মুখে প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। পরিবারের মধ্যে একত্র থাকিবার এই শেষ দিন মনে করিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইল। মনে-মনে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইল, আশ-পাশের সমস্ত জিনিষ হইতেই বিদায় লইল।

নৈশভোজনের আয়োজন হইল। কম্পিতস্বরে সে বলিল, আজ তার আহার করিতে ইচ্ছা নাই ; তার পর গুড-নাইট বলিয়া উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। তাঁহারা উহাকে চুম্বন করিলেন এবং অন্য দিনের ন্যায় দস্তুরমতো আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইল।

নিজের ঘরে গিয়া সে একটা আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল। চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহার দাসী, শান্ত হইতে ও সাহসে বুক

বাঁধিতে তাহাকে অনুনয় করিল। সবই প্রস্তুত আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারিয়া তার বাপ-মায়ের বাড়ী, তাহার নিজের ঘর, তাহার বালিকাসুলভ শান্তিময় জীবন—সমস্তই চিরকালের মতো ছাড়িয়া যাইবে।

বাহিরে বরফ পড়িতেছিল, বাতাস গর্জ্জন করিতেছিল। খড়খড়ি কাঁপিতেছিল—তাহা হইতে খট্‌খট্‌ শব্দ হইতেছিল। সকল জিনিষ হইতেই যেন অলক্ষণের সূচনা ও ভাবী বিপদের আশঙ্কা হইতে লাগিল।

শীঘ্রই সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ ও নিদ্রামগ্ন হইল। মারিয়া গায়ে একটা শাল জড়াইয়া, একটা গরম ক্লোক্ পরিয়া, একটা বাক্‌স্ হাতে লইয়া পিছনের সিঁড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাসী দুইটা বোচ্‌কা লইয়া পিছনে-পিছনে চলিল। উহারা বাগানে নামিল। তুষার-ঝটিকা ভীষণ বেগে বহিতেছিল; একটা প্রবল বায়ু-প্রবাহ সম্মুখ হইতে উহাদিগকে ঠেলা মারিতে লাগিল—যেন তরুণ অপরাধিণীকে পাপকার্য্য হইতে বিরত করিবার উদ্দেশে। অতি কষ্টে উহারা উদ্যানের প্রান্তভাগে পৌঁছিল। রাস্তার উপর একটা সেল্‌জ-গাড়ী উহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

শীতের দরুন্ ঘোড়ারা স্থির হইয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে না। গাড়ীর চালক ঘোড়ার সম্মুখে এদিক্-ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে এবং উহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। চালক মারিয়া ও দাসীকে গাড়ীতে উঠাইয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিল। তার পর, বোচ্‌কা-বুচ্‌কি ও পোষাকের বাক্স বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া, রাশ হাতে লইল। ঘোড়ারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া চলিল।

তরুণীকে বিধাতার হাতে ও চালক 'তেরেস্কার' হাতে সঁপিয়া দিয়া এক্ষণে প্রেমিক যুবকের নিকট আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক্।

ভ্লাদিমির সমস্তদিন গাড়ী হাঁকিয়া সময় কাটাইয়াছে। সকালে পাদ্রি জাভ্রিনোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং অতিকষ্টে তাহার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিল। তার পর সাক্ষীর অন্বেষণে পাড়ার ভদ্রলোকদিগের নিকট গেল। প্রথমে অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন কর্ম্মচারী দাভিনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার বয়স ৪০-এর মধ্যে। সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। সে ভ্লাদিমিরকে তাহার সহিত ডিনার করিবার জন্য থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিল এবং তাহাকে আশ্বাস দিল, আর দুইজন সাক্ষী অনায়াসেই মিলিবে। ডিনারের পরেই জরিপ-আমীন স্মীথ এবং বড়-ম্যাজিষ্ট্রেটের বালক পুত্র—বয়স ১৬ বৎসর,—আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা ভ্লাদিমিরের প্রস্তাব শুধু যে গ্রাহ্য করিল তাহা নহে—অধিকন্তু উহারা শপথ করিল, উহার জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। ভ্লাদিমির আহ্লাদের সহিত উহাদিগকে আলিঙ্গন করিল; এবং সমস্ত প্রস্তুত আছে কি না দেখিবার জন্য গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল।

অনেকক্ষণ হইল, অন্ধকার হইয়াছে। ভ্লাদিমির দুই ঘোড়ার সেল্‌জ-গাড়ীর সহিত তাহার বিশ্বস্ত কোচম্যান্ তেরেস্কারের নেনারাদোভায় পাঠাইয়া দিল—সেই উপলক্ষে যাহা-কিছু বলিবার ছিল তাহাকে সমস্ত বলিয়া দিল। এবং তার নিজের জন্য একটা এক-ঘোড়ার সেল্‌জ তৈয়ার করিতে হুকুম দিল—এবং কোচম্যান্ না লইয়া সে জাভ্রিনোর একাকী যাত্রা করিল। সেইখানে ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে মারিয়ার পৌঁছিবার কথা। ভ্লাদিমি রাস্তা জানিতো; মনে করিল, গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে ২০ মিনিট মাত্র লাগিবে।

কিন্তু ভ্লাদিমির বেড়া পার হইয়া যে খোলা মাঠে আসিল, অমনি বাতাস উঠিল এবং একটু পরেই এরূপ বেগে বরফের ঝড় বহিতে লাগিল যে, সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যেই রাস্তা বরফে আচ্ছন্ন হইল। চাক্‌লা-চাক্‌লা বরফ পড়িতেছে। পীতবর্ণ নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে জমির সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। আকাশ ও পৃথিবী মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। মাঠ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িবার জন্য ভ্লাদিমির বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ঘোড়া যদৃচ্ছা-ক্রমে চলিতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্ত, হয়—গভীর বরফের ভিতর, নয়—একটা গর্ত্তে আসিয়া থামিতেছে—আর গাড়ীটা ক্রমাগত উল্টাইয়া পড়িতেছে। অন্ততঃ ঠিক্ দিক্‌টা না হারাইয়া ফেলে এইজন্য ভ্লাদিমির খুব চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহার মনে হইল, আধ ঘণ্টারও অধিক হইয়াছে তথাপি জাভ্রিনোর বনে পৌঁছিতে পারে নাই। আরও দশ মিনিট অতীত হইল, এখনও বনটা দৃষ্টির অগোচর। গভীর খানা-খন্দের দ্বারা খণ্ডিত মাঠ-ময়দানের উপর দিয়া ভ্লাদিমির গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল। বরফ-ঝড়ের বেগ একটুও কমিল না; আকাশও পরিষ্কার হইল না। ঘোড়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল; বরফের ভিতর পা ডুবিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, তার গা বাহিয়া শিলাবৃষ্টির মতন ঘাম গড়াইতে লাগিল।

অবশেষে ভ্লাদিমির দেখিল, সে ভুল দিকে যাইতেছে। সে থামিল। মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিবে ভাবিতে লাগিল। অবশেষে ঠিক্ করিল, ডান দিকে যাওয়া তার উচিত ছিল। সে ডান দিক্ ধরিল। ঘোড়া আর চলিতে পারে না। এক ঘণ্টা কাল রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে—জাভ্রিনো আর বেশী দূর হইবে না। সে হাঁকাইয়া চলিয়াছে ত চলিয়াছে; কিন্তু কোনো মতেই মাঠ পার হইতে পারিতেছে না। এখনও সেই বরফের স্তূপ—এখনও সেইমত খানা-খন্দ। প্রতিমুহূর্ত্তেই গাড়ী উল্টাইয়া পড়িতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই ভ্লাদিমিরকে উহা টানিয়া তুলিতে হইতেছে।

সময় যাইতেছে; ভ্লাদিমির উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। অবশেষে দূরে একটা কালো জিনিষ দেখিতে পাওয়া গেল।

ভ্লাদিমির সেইদিকে ফিরিয়া যখন নিকটে আসিল, তখন দেখিল উহা একটা বনভূমি। সে মনে-মনে ভাবিল:—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখন যাত্রাপথের শেষে আসিয়াছি।" ভ্লাদিমির বনভূমির ধার দিয়া গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল, মনে করিল পরিচিত পথে আসিয়া পড়িবে। জাভ্রিনো ঠিক্ এই বনভূমির পশ্চাতে অবস্থিত।

শীঘ্রই রাস্তাটা ধরিয়া ফেলিল, সেই রাস্তা ধরিয়া বনভূমির অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখানে বাতাসের প্রকোপ নাই। রাস্তা চৌরস। ঘোড়া ভরসা পাইল, ভ্লাদিমির একটু আশ্বস্ত হইল। ভ্লাদিমির গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে ত চলিয়াছে, তথাপি জাভ্রিনোর দেখা নাই। বন-ভূমি আর শেষ হইতেছে না। তার পর, তার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল:—একি! এ যে একটা অপরিচিত বনভূমি! সে হতাশ হইয়া পড়িল। ঘোড়াকে চাবুক মারিল, বেচারী ঘোড়া আবার দুল্‌কি চালে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িল; এবং বেচারা ভ্লাদিমিরের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, ঘোড়া হামাগুড়ির মতো অতি কষ্টে চলিতে লাগিল।

ক্রমশঃ গাছপালা বিরল হইল; ভ্লাদিমির বনভূমি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তবু জাভ্রিনোর দেখা নাই। তখন প্রায় মধ্য-রাত্রি। যুবকের চক্ষু হইতে অশ্রুজল উছলিয়া পড়িল। সে যদৃচ্ছাক্রমে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল। এখন ঝড় একটু কমিয়াছে, মেঘ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তাহার সম্মুখে, সাদা তরঙ্গিত কার্পেটে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ সম-ভূমি প্রসারিত হইল। রাত্রিটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার; একটু দূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম নেত্রগোচর হইল; ৪।৫টি কুটীর লইয়া এই গ্রামখানি গঠিত। প্রথম দ্বারে আসিয়াই ভ্লাদিমির গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল, জান্‌লার নিকট ছুটিয়া গিয়া জান্‌লায় টোকা মারিল।

কয়েক মিনিট পরেই একটা [illegible] খড়খড়ি উত্তোলিত হইল, এবং [illegible]র লাল দাড়ী বাড়াই[illegible]।

"কি চাও ?"

"জা[illegible] এখান থেকে কত দূর ?"

"জাব্রিনো কত দূর ?"

"হাঁ, হাঁ, জা[illegible] কত দূর [illegible] ?"

"[illegible] নয় ; প্রায় দশ মাইল।"

এই উত্তর পাইয়া ভ্লাদিমির নিজের চুল মুঠাইয়া ধরিল, এবং মৃত্যুদণ্ডে [illegible] ব্যক্তির স্থায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে লোকটা আরও বলিল :—

"তুমি কোত্থেকে আসছ ?" উত্তর দিতে ভ্লাদিমিরের সাহসে কুলাইল না। সে বলিল :—

"বাপু, জাব্রিনো যাবার জন্ত ঘোড়ার জোগাড় করে' দিতে পারো ?" চাষা উত্তর করিল :—

"আমাদের ঘোড়া নেই।"

"একজন পথপ্রদর্শক পেতে পারি কি ? যত টাকা চায় আমি দেবো।"

বৃদ্ধ খড়খড়িটা ফেলিয়া দিয়া বলিল :—

"রোসো! তোমার সঙ্গে আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেবো ; সে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

ভ্লাদিমির অপেক্ষা করিতে লাগিল। এক মিনিটের পরেই সে আবার জানালায় টোকা মারিল। খড়খড়ি উত্তোলিত হইল ; আবার সেই পাকা দাড়ী বাহির হইল।

"কি চাও ?"

"তোমার ছেলের কি হ'ল ?",

"সে এখনি বেরিয়ে আসছে ; সে তার বুট পরছে। তোমার কি শীত করছে ? ভিতরে এসে একটু গরম হও।"

"ধন্তবাদ। আর কিছু না, শীঘ্র তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেও।" ফটকে কিচ কিচ শব্দ হইল। সোঁটা হাতে এক যুবক বাহির হইয়া সম্মুখে আসিল। একবার বড় রাস্তাটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল, আর একবার যেখানে বরফ জমা হইয়াছিল, সেই জায়গাটা দেখাইয়া দিল। ভ্লাদিমির জিজ্ঞাসা করিল :—

"ক'টা বেজেছে ?" যুবক চাষা উত্তর করিল :—

"শীঘ্রই দিনের আলো দেখা যাবে।" ভ্লাদিমির আর একটি কথাও বলিল না।

মোরগরা ডাকিতে আরম্ভ করিল। উহারা যখন গাব্রিলে পৌঁছিল, তখন আলো হইয়াছে, ভ্লাদিমির গাইডকে কিছু বকশিস দিয়া, গাব্রির গৃহের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। অঙ্গনে তাহার দুই ঘোড়ার সেজ দেখিতে পাইল না। না জানি কি সংবাদ তার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে!

কিন্তু এক্ষণে নেনারদোভার দয়ার্দ্র-হৃদয় মালিকদের ওখানে আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক্। দেখা যাক্, সেখানে কি হইতেছে।

কিছুই না।

বৃদ্ধেরা জাগিয়া উঠিয়া, বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিল। জাব্রিনোর মাথায় রাত-টুপি ও গায়ে ফ্ল্যানেল জ্যাকেট্; আর প্রাসকোভিয়া পরিয়াছে একটা তুলা-ভরা ড্রেসিং গাউন্। চায়ের কাংলি আনা হইল। গাব্রিল দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইল,—রাত্রে মারিয়ার কিরূপ নিদ্রা হইয়াছিল। দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল :—"রাত্রে মারিয়ার ভালো ঘুম হয়নি, এখন অনেকটা ভাল আছে, এখনি সে বৈঠকখানায় আসবে।" [illegible] মারিয়া ঘরে প্রবেশ করিল! বাপ-মাকে অভিবাদন করিল গাব্রিল জিজ্ঞাসা করিল :—

"তোর মাথাধরাটা কেমন আছে [illegible] ?" ("মাশা" ডাক নাম)। মাশা উত্তর করিল :—"[illegible] ভালো!"

প্রাসকোভিয়া বলিল :—"[illegible] হয় উনানের ধোঁয়ায় [illegible] লেগে মাথা [illegible]।" মাশা উত্তর করিল :—

"খুব সম্ভব তাই, মা!"

দিনটা বেশ একরকম কাটিয়া গেল। কিন্তু রাত্রে মাশা হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িল। সহর হইতে একজন ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার সন্ধ্যার সময় আসিয়া দেখিল, মারিয়া প্রলাপ বকিতেছে। খুব জ্বর হইয়াছে। এবং দুই সপ্তাহের মধ্যেই মারিয়া মৃত্যুমুখে আসিয়া পড়িল।

মারিয়া যে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে, সে খবর বাড়ীর লোকেরা কেহই জানিত না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় মারিয়া যে-সব পত্র লিখিয়াছিল, তাহা পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল। মনিবরা ক্রুদ্ধ হইবেন ভাবিয়া, সে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই। পাদ্রি ও বিবাহের সাক্ষীরা সবাই সমান সাবধান ছিল—সাবধান হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কোচ্ম্যান্ তেরেস্কা বেশী কথা বলিত না—এমন কি সুরাপান করিলেও না। সকলেই কথাটা বেশ গোপন রাখিয়াছিল।

কিন্তু মারিয়া নিজে তার দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বরের প্রলাপের মধ্যে গুপ্ত-কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কথাটা সে এমন ছাড়া-ছাড়া-ভাবে বলিয়াছিল যে, তার মা শুধু এইটুকু বুঝিয়াছিল, যে ভ্লাদিমিরের প্রেমে সে একেবারে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই প্রেমই হয়ত তার পীড়ার মূল-কারণ। গৃহিণী তাহার স্বামীর সহিত, ও কতকগুলি প্রতিবেশীর সহিত পরামর্শ করিল ; এবং সকলেই ঐকমত্যানুসারে স্থির করিল যে, মারিয়াকে বাধা দেওয়া ঠিক নহে, যে ব্যক্তিকে কোন নারী বিবাহ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে তাহাকে দূরে অপসারিত করা উচিত নহে ; দারিদ্র্য ত কোনও অপরাধ নহে ; নারীকে ত অর্থের সঙ্গে বাস করিতে হইবে না—বাস করিতে হইবে একজন পুরুষের সঙ্গে ;—ইত্যাদি। এইসব স্থলে,—যখন নিজের সমর্থনার্থ আমরা কিছুই উদ্ভাবন করিতে পারি না—তখন নৈতিক প্রবচনগুলা খুবই কাজে লাগে।

ইত্যবসরে, তরুণীর শরীর ভালো হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বেকার অভ্যর্থনায় ভ্লাদিমির এতই ভীত হইয়াছিল যে, ভ্লাদিমির গাব্রিলের গৃহে বহুকাল যায় নাই। এখন ভ্লাদিমিরের নিকট এই শুভসংবাদ পাঠানো স্থির হইল যে, মারিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দিতে মারিয়ার মা-বাপ সম্মত আছেন। ভ্লাদিমির এইরূপ সংবাদ পাইবে বলিয়া কখনও প্রত্যাশা করে নাই। এই আমন্ত্রণের উত্তর-স্বরূপ মারিয়ার বাপ-মা যে পত্র পাইল, তাহাতে তাহারা যারপরনাই বিস্মিত হইল। ভ্লাদিমির তাঁহাদিগকে জানাইল যে, সে আর কখনও তাঁহাদের বাড়ী মাড়াইবে না। যেন তার মত হতভাগ্য লোককে তাঁরা ভুলিয়া যান—এখন মৃত্যুই তাহার একমাত্র আশা-ভরসা। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, ভ্লাদিমির ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়া সৈন্ত-বিভাগে যোগ দিয়াছে।

বহুদিন পরে এই কথা মারিয়াকে বলিতে উহারা সাহস করিলেন— কেননা, মারিয়া এক্ষণে একটু সারিয়া উঠিয়াছে। মারিয়া কখনই ভ্লাদিমিরের উল্লেখমাত্র করে নাই। যাহা হউক, কয়েকমাস পরে, বরোদিনোর যুদ্ধে যাহারা গুরুতর আহত হইয়াছিল এবং খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাদের তালিকার মধ্যে তাহার নাম দেখিয়া মারিয়া মূর্চ্ছিত হইল। সকলের ভয় হইল পাছে জ্বরটা আবার ফিরিয়া আসে।

কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে, মুচ্ছা হইতে আর কোনো খারাপ ফল হয় নাই।

মারিয়া আর-একটা দুঃখে অভিভূত হইল। তাহার পিতার মৃত্যু হইল; মারিয়াকে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। মারিয়া মনে করিল, তাহার শোক-সন্তপ্ত মাকে ছাড়িয়া সে এখন আর কোথাও যাইবে না।

এই সুন্দরী উত্তরাধিকারিণীর পাণিপ্রার্থীরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া রহিল। কিন্তু মারিয়া তাহাদিগকে বিন্দুমাত্রও আশা দিল না। একজন জীবন-সঙ্গী বাছিয়া লইবার জন্ত কখন-কখন তার মা তাহাকে লওয়াইতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু মারিয়া শুধু ঘাড় নাড়িত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িত।

ভ্যাদিমির আর নাই। ফরাসীদিগের পৌঁছিবার আগে কিছু পূর্ব্বেই ভ্যাদিমির ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে। মারিয়া এখন তাহার পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভ্যাদিমির যেসব বই পড়িয়াছিল, যেসব ছবি আঁকিয়াছিল, যেসব গান গাহিয়াছিল, যে-সব ছোট-ছোট কবিতা তার জন্ত মারিয়া নকল করিয়া দিয়াছিল—এক কথায় যাহা-কিছু তাহার কথা মনে করাইয়া দেয়, সমস্তই বহুমূল্য রত্নের স্তায় সে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে।

পাড়ার লোকেরা এইসব কথা শুনিয়া তাহার একনিষ্ঠ অনুরাগে বিস্মিত হইল, এবং উহারা কৌতূহলের সহিত ভ্যাদিমিরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—আমাদের বিজয়ী সৈন্ত বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। লোকেরা তাহাদের দেখিবার জন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। রেজিমেন্টের ব্যাণ্ড যুদ্ধের জয়সঙ্গীত বাজাইতেছে। যে-সব অল্প-বয়স্ক বালক যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিল, শীতের আব-হাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়া, তাহারা পূর্ণ-বয়স্ক যুবক হইয়া, সম্মান-ভূষণে ভূষিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সৈনিকেরা বেশ সহর্ষে আপনাদের মধ্যে বাক্যালাপ করিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের কথার ভিতর, ফরাসী ও জার্ম্মান শব্দ মিশাইতেছিল। এই কালটা ভুলিবার নয়—এই গৌরবের কাল,—এই আনন্দের কাল! "আমার জন্মভূমি"—এই কথায় রুশীয় হৃদয় কত শীঘ্র স্পন্দিত হয়। মিলনের অশ্রুজল কি মধুর! আমরা কেমন এক-প্রাণ হইয়া জাতীয় গর্ব্বের ভাব ও জারের উপর ভক্তির ভাব একত্র সম্মিলিত করিয়াছিলাম।

নারীরা, আমাদের রুশীয় নারীরা তখন খুব উৎসাহান্বিত ছিল। উহাদের ঔদাস্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিজয়ীদের দেখিয়া উহাদের কী আনন্দ;—উহারা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের টুপি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

সে সময়কার এমন কোন্ সৈনিক আছে যে স্বীকার না করিবে—তাদের উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য পুরস্কারের জন্ত তাহারা নারীদের নিকট ঋণী। ঐ গৌরবোজ্জ্বল সময়ে মারিয়া তাহার মায়ের সহিত নিভৃতে বাস করিতেছিল। দুজনের মধ্যে কেহই দেখে নাই, রুশিয়ার দুই রাজধানীতে প্রত্যাগত সৈনিকেরা কিরূপ আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াছিল। কিন্তু জনপদ ও গ্রামে সাধারণের উৎসাহের মাত্রা যেন আরও বেশী হইয়াছিল। ঐসব স্থানে কোনো সৈনিক দেখা দিলে, যেন লোকে একটা প্রকৃত বিজয়োৎসব বলিয়া মনে করিত। উর্দ্দিপরা সৈনিকের পাশে আটপৌরে কাপড়-পরা কোনো রমণীর প্রণয়ী হীনপ্রভ হইয়া পড়িত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মারিয়ার উদাসীনতা সত্ত্বেও মারিয়া, পাণি-প্রার্থীদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু যখন, সেণ্ট জর্জ-অর্ডারের সম্মান-ভূষণে ভূষিত, পাণ্ডুবর্ণ মুখশ্রী, হাজার-সৈন্তদলের আহত যুবক কাপ্তেন, নাম বুর্‌মিন্—তাহার প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিল, তখন আর সকলেই পিছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। বুর্মিনের বয়স প্রায় ২৬ বৎসর। বুর্মিন ছুটি লইয়া তাহার জমিদারিতে আসিয়াছে। এই জমিদারি মারিয়ার পল্লীভবনের খুব কাছাকাছি। মারিয়া তাহার প্রতি যেরূপ আদরযত্ন দেখাইতে লাগিল, সেরূপ আদর-যত্ন আর কাহারো প্রতি দেখায় নাই। বুর্মিনের সম্মুখে তাহার স্বাভাবিক বিষণ্ণতা অন্তর্হিত হইল। একথা বলা যায় না যে মারিয়া তাহার প্রতি প্রেমের ভাণ করিতেছিল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া কোনো কবি বলিতে পারিত—

"এ যদি প্রেম না হয়—এ তবে কি?"

বাস্তবিক এই যুবকটিকে দেখিলে সকলেরই খুব ভালো লাগে। যেরূপ বুদ্ধি থাকিলে, নারীদের ভালো লাগে, বুর্মিনের সেই-ধরণের বুদ্ধি ছিল। তাহার কোনো কৃত্রিম হাব-ভাব ছিল না—সে একটু পরিহাস-প্রিয়। কিন্তু ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরিহাস করিত না।

মারিয়ার প্রতি তাহার ব্যবহার সাদাসিধা ও সহজ-রকমের ছিল। তাহাকে দেখিলে শান্ত ও নম্রস্বভাব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জনরব এইরূপ যে, সে এক সময়ে খুব উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্রের লোক ছিল। কিন্তু মারিয়ার মতে, তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় নাই। মারিয়া (অন্ত তরুণীদের স্তায়) তার এইসব উচ্ছৃঙ্খলতা মনের স্বাভাবিক আবেগ ও নির্ভীকতার পরিণাম মনে করিয়া, আহ্লাদের সহিত মার্জ্জনা করিল।

কিন্তু সর্ব্বোপরি—তাহার প্রেম-সম্ভাষণ অপেক্ষাও বেশী—তাহার মনোরম কথাবার্ত্তা অপেক্ষাও বেশী, তার পাণ্ডুবর্ণ মুখশ্রী অপেক্ষাও বেশী, তার পটি-বাঁধা বাহু অপেক্ষাও বেশী—এই যুবক সৈনিকের নীরবতা তাহার কৌতূহল ও কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। সে মনে-মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে ঐ সৈনিককে তার খুব ভালো লাগিয়াছে। এবং ঐ সৈনিক যেরূপ তীক্ষ্ণদর্শী ও বহুদর্শী সেও বুঝিয়াছিল উহাকে মারিয়ার ভালো লাগিয়াছে। তবে এতদিন কেন সে ঐ তরুণীর পদতলে পড়ে নাই? এবং তরুণীও কেন তার প্রতি একটু আদর-যত্ন দেখায় নাই? তবে কি, মারিয়ার নিজের আর কোনো গুপ্ত রহস্ত আছে?

অবশেষে বুর্মিন এরূপ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল, তার কালো উজ্জ্বল চোখ-দুটি এরূপ সতৃষ্ণভাবে মারিয়ার মুখের উপর নিবদ্ধ হইত যে, বেশ বুঝা গেল, যে, শেষ পরিণামের আর বড় দেরী নাই। পাড়া-প্রতিবাসীরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, বিবাহটা হইয়া গিয়াছে; এতদিনের পর তাঁহার মেয়ের যোগ্য বর মিলিয়াছে মনে করিয়া প্রাস্কোভিয়া খুব খুসী হইলেন। গৃহিণী একদিন তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় বুর্মিন্ প্রবেশ করিয়া মারিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধা উত্তর করিলেন:—"সে বাগানে আছে; তার কাছে যাও; আমি এইখানে তোমার জন্ত অপেক্ষা করব" বুর্মিন্ ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া মনে-মনে ভাবিল—"বোধ হয় ব্যাপারটা আজই নিষ্পত্তি হবে।"

বুর্মিন্ গিয়া দেখিল, পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ লতা-কুঞ্জের ভিতর মারিয়া বসিয়া আছে। হাতে একখানি পুস্তক; পরিধানে একটা সাদা পরিচ্ছদ। ঠিক্ যেন উপন্যাসের নায়িকা। প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের পর, মারিয়া ইচ্ছা করিয়াই কথা বন্ধ করিল। ইহার দরুন্ উভয়ের সঙ্কোচ আরও বর্দ্ধিত হইল; এখন হঠাৎ একটা কিছু পষ্টাপষ্টি বলিয়া না ফেলিলে, ইহা হইতে উদ্ধার হইবার আর কোনো উপায় নাই। ব্যাপারটা এইরূপে আরম্ভ হইল। এই বিশ্রী সঙ্কোচের অবস্থাটা কাটাইবার জন্ত বুর্মিন স্পষ্ট বলিল, মারিয়ার কাছে তাহার হৃদয় উদ্ঘাটন করিবার সুযোগ অনেক দিন হইতে খুঁজিতেছিল, এবং একটু অবহিত হইয়া শুনিলে এখন সে তার মনের কথা খুলিয়া বলিবে। মারিয়া বই বন্ধ করিয়া, মনোযোগপূর্ব্বক শুনিবার ছলে, চোখ নীচু করিয়া রহিল। বুর্মিন্ বলিল:—

"আমি তোমাকে ভালোবাসি,—প্রাণ ভ'রে ভালোবাসি। আমার আচরণটা একটু অবিবেচকের মতো হয়েছিল ; প্রতিদিন তোমাকে দেখ্বার জন্ত, তোমার মুখের কথা শোন্‌বার জন্ত আমি প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। "La Nouvelle Heloise" । উপন্তাসের St. Preuxএর প্রথম পত্রটা মারিয়ার মনে পড়িল ;—"আর আমি আমার নিয়তিকে প্রতিরোধ করিতে পারিব না—সে সময় অতীত হইয়াছে। তোমার স্মৃতি তোমার অতুলনীয় রূপমাধুরী,আজ হইতে যুগপৎ আমার জীবনের যন্ত্রণা ও সান্ত্বনা হইবে। এখন একটা ভীষণ গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার আছে ; উহা আমাদের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় স্থাপন করিবে।" মারিয়া বাধা দিয়া বলিল :—"সে অন্তরায় ত বরাবরই ছিল। আমি কখনই তোমার স্ত্রী হ'তে পারতেম না।" বুর্মিন্ চট্ করিয়া উত্তর করিল—"আমি জানি, এক সময় তুমি ভালোবাসিতে।' কিন্তু মৃত্যু ও তিন বৎসরের শোক হয়ত তোমার ভিতর কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকিবে। মারিয়া আমার প্রাণেশ্বরী, আমার শেষ-সান্ত্বনা থেকে আমাকে বঞ্চিত কর্‌বার চেষ্টা কোরো না। আমাকে তুমি সুখী কর্‌তে পার্‌তে যদি—ওকথা আমাকে বোলো না—ঈশ্বরের দোহাই—আমার বিষম যন্ত্রণা হবে। হাঁ আমি জানি, আমি মনে বেশ অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি, তুমি আমার হ'তে পার্‌তে, কিন্তু আমি বড়ই হতভাগ্য—আমার বিবাহ আগেই হ'য়ে গেছে।"

মারিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। বুর্মিন্ বলিল :—আমি বিবাহিত, ৩ বৎসরের অধিককাল আমার বিবাহ হয়েছে এবং আমি জানি না, আমার স্ত্রী কে,-কিংবা কোথায় সে আছে, কিংবা আর কখনও তার সঙ্গে দেখা হব কি না। মারিয়া বলিয়া উঠিল :—"ও কী তুমি বল্‌ছ ?" একি অদ্ভুত—আচ্ছা বলে' যাও,—তার পর ? বুর্মিন্ বলিল :—১৮১২ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে, আমি উইলনায় তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলুম—সেখানে আমাদের রেজিমেণ্ট ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় দেরীতে ষ্টেশনে পৌছে, শীঘ্র আমার জন্ত ঘোড়া ঠিক্ করতে হুকুম দিলুম। সেই সময় হঠাৎ একটা ভীষণ বরফের ঝড় উঠল। ষ্টেশন-মাষ্টার ও একজন-চালক উভয়েই ঝড়টা থামা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌লে। আমি তাদের পরামর্শ শুন্‌লাম, কিন্তু একটা অহেতুক চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বস্‌ল। যেন কে-একজন আমাকে সম্মুখ-দিকে ঠেলে' নিয়ে যাচ্ছিল। ঝড় কম্‌ল না। আর আমার বিলম্ব সহ্য হ'ল না, আমি আবার ঘোড়া ঠিক্ করতে হুকুম দিলুম। আর সেই ঝড়ের মধ্যেই যাত্রা সুরু কর্‌লুম। চালকের খেয়াল হ'ল, নদীর ধার দিয়ে চল্‌বে। তা হ'লে ৩ মাইলের রাস্তা কমে' যাবে। নদীর তটদেশ বরফে আচ্ছন্ন ছিল। যে বাঁক্‌টা ধর্‌লে রাস্তায় আসা যায়, চালক ভুল করে' সেই বাঁকটা ধর্‌লে না। আমরা একটা অজানা জায়গায় এসে পড়লাম। তখনো ঝড় থামে নি, সমান চল্‌ছিল। একটা আলো আমার নজরে এল, আমি চালককে ঐ আলোর দিকে যেতে বল্‌লাম। আমরা একটা গ্রামে প্রবেশ করে' দেখলাম, একটা কাঠের গির্জ্জা হ'তে আলোটা আস্‌ছে। গির্জ্জা খোলা ছিল। রেলিংএর বাইরে কতকগুলা স্লেজ্-গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। এবং লোকেরা গির্জ্জার গাড়ী-বারাণ্ডা দিয়ে যাতায়াত কর্‌ছিল।

বহু কণ্ঠ এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল :—"এইখানে, এইখানে"। আমি কোচম্যান্‌কে বলিলাম, "গাড়ী হাঁকিয়ে ঐখানে চল।" একজন আমাকে বলিল, "এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ? কনে' মূর্চ্ছা গেছে ; পাদ্রি কি কর্‌বে' ভেবে পাচ্ছে না। আমরা আর একটু হ'লেই ফিরে' যাচ্ছিলুম। শীঘ্র গাড়ী থেকে নেমে এসো।"

আমি নীরবে গাড়ী থেকে বেরিয়ে গির্জ্জায় প্রবেশ কর্‌লুম। গির্জ্জার দুই-তিনটা মোমবাতির আলো মিট্‌মিট্ করে' জ্বল্‌ছিল। দেখ্‌লুম একটা অন্ধকার কোণে, একটা বেঞ্চের উপর একটি মেয়ে বসে' আছে। আর-একটি মেয়ে তার রগ টিপছে। শেষোক্ত মেয়েটি বল্‌লে ;—ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, অবশেষে তুমি এসে পড়েছ! আর-একটু হ'লেই তুমি এই তরুণীর মৃত্যুর কারণ হ'তে।" বুড়ো পাদ্রি আমার কাছে এসে বল্‌লে ;—"এখন তবে আরম্ভ করি ?" আমি অন্তমনস্কভাবে উত্তর করিলাম ;—"আরম্ভ করে' দেও—আরম্ভ করে' দেও, পাদ্রি বাবা।"

তরুণীকে তুলিয়া ধরা হইল। তা'কে বেশ সুশ্রী বলিয়া মনে হইল। ওঃ! আমার এই চপলতা অমার্জ্জনীয়। আমি বেদীতে গিয়া তার' পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। পাদ্রি তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে লাগিল। তিনজন পুরুষ ও একজন কুমারী কনে'কে ধারণ করিয়াছিল এবং সমস্তক্ষণ তাহাকে লইয়াই উহারা ব্যাপৃত ছিল। আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। পাদ্রি বলিল :—"তোমার স্ত্রীকে চুম্বন করো"। আমার স্ত্রী তাহার পাণ্ডুবর্ণ গাল আমার দিকে ফিরাইল। আমি চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময় সে বলিয়া উঠিল :—"ওঃ! এ সে না, এ সে না!" এই বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সাক্ষীরা একদৃষ্টে আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি তখনই গির্জ্জা হইতে বাহির হইলাম। আমাকে কেহই থামাইতে চেষ্টা করিল না। আমি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলাম ;—"হাঁকাও"! মারিয়া বলিয়া উঠিল ;—"কি! আর, তোমার হতভাগ্য স্ত্রীর দশা কি হ'ল তা তুমি জানো না।" বুর্মিন উত্তর করিল ;—"না, আমি জানিনে। যে গ্রামে আমাদেব বিবাহ হয়েছিল সেই গ্রামের নামও আমি জানিনে, যে ষ্টেশন হ'তে আমি যাত্রা সুরু করেছিলুম, সেই ষ্টেশনের নামও আমি জানিনে। আমার এই দুষ্ট পরিহাসের কথা আমি একটুও ভেবে দেখিনি, আমি গির্জ্জা থেকে বেরিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এবং তৃতীয় ষ্টেশনে এসে তবে আমার ঘুম ভাঙল। যে চাকর আমার সঙ্গে ছিল, সে যুদ্ধের সময়েই মারা পড়ে। তাই, যে তরুণীর সঙ্গে এই চালাকি করেছিলুম, সেই হতভাগিনী যে কে, এখন তা আবিষ্কার কর্‌বার কোনো উপায় নেই।"

মারিয়া বুর্মিনের হাত খপ করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল ;—"কি আশ্চর্য্য! তা হ'লে, তুমিই সে, আর তুমি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না ?"

বুর্মিনের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, সে তরুণীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িল।*

---

* রুশীয় লেখক Alexander S. Pushkin হইতে।

রুশ-ইতিহাস

শ্রী বীরেশ্বর বাগ্‌চী

রুশিয়া একবারে নেহাৎ নতুন দেশ নয়। হাজার বছর আগে যখন অনেক দেশেরই ইতিহাস আধুনিক লিখিত আকার ধারণ করেনি, সবেমাত্র যখন দেশ-চল্‌তি রূপ-কথাগুলো জমাট বেঁধে ইতিহাসের আকার ধারণ করি-করি কর্‌ছিল, তখনও রুশিয়া বলে' যে একটা স্বতন্ত্র দেশ ছিল এবং সে-দেশের অবস্থা তখনকার ঐ শ্রেণীর অন্যান্য দেশের চেয়ে যে ঢের উন্নত, এসংবাদ আমরা তদানীন্তন পণ্ডিতদের কাছে পাই। রুশিয়ার প্রকৃত ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে বল্‌তে হবে। এদেশে তখন বহু জাতি বাস কর্‌ত। তাদের ভিতর শাসন-শৃঙ্খলা ছিল না—আইন বলে' জিনিষটার অস্তিত্ব মোটেই ছিল না—ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য-বিচার ছিল না। তাদের ঘাড় ধরে' ন্যায়ের পথে চালাবার লোকেরও ছিল অভাব। ইউরোপের মধ্যে তখন সবচেয়ে ক্ষমতাপন্ন জাতি ছিল নরওয়ের অধিবাসীরা। রুশিয়ার একদল লোক নিজেদের দেশের অরাজকতায় অতিষ্ঠ হ'য়ে এদেরই রুশিয়া শাসন কর্‌তে আহ্বান করেছিল। সে-আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তিনটি সাহসী লোক। তা'রা ছিল তিন ভাই। বড় ভাইয়ের নাম ছিল রুরিক (Rurick)। আর দুই ভায়ের সন্তানাদি ছিল না। তাই রুরিকের বংশই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে নির্ব্বিবাদে বহু দিন রুশিয়ায় রাজত্ব করেছে।

রুশিয়ার প্রথম খৃষ্টান্ সম্রাট্ হচ্ছেন ভ্লাডিমির (Vladimir)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ অবধি ইনি রাজত্ব করেছিলেন। এঁর মৃত্যুর পরে দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়েছিল। দেশটাও ছোট-ছোট রাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছিল। আর এগুলির পরস্পরের মধ্যে মোটেই মিল ছিল না। এদের মধ্যে প্রধান ছিল তিনটি রাজ্য—নভগরদ (Novgorod), কিভ্ (Kiev), এবং মস্কো (Moscow)। বিবাদ-বিসম্বাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ এসব তখন ছিল রুশিয়ার দৈনন্দিন ঘটনার সামিল। এই-ভাবে অনবরত কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত গৃহ-বিবাদ কর্‌তে-কর্‌তে রুশিয়া যখন একেবারে অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময় তাতার এবং মোগলেরা হঠাৎ একদিন এসে ঝটিকাময়ী রাত্রির মতন—উৎকট দুঃস্বপ্নের মতন—রুশিয়ার বুকের উপরে চেপে বস্‌ল। সে-ব্যাপার রুশেরা নির্ব্বাক্ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে। কেউ বাধা দিলে না—একখানা তরবারিও কোষমুক্ত হ'ল না। তাতার-মোগলের পরাক্রান্ত অশ্ব-সেনা রুশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সবেগে ছুটে' বেড়াতে লাগ্‌ল। তাদের অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলায় ও গৃহ-দাহের ধূমে রুশিয়া অন্ধকার হ'য়ে গেল। উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস, আহতের কাতর আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শোনার উপায় রইল না। এমনিভাবে দু'শ বছর তাতার এবং মোগলেরা পালা করে' রুশিয়ার উপরে যে ভয়াবহ অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, তার বিবরণ পড়লে আজও হৃৎকম্প হয়। এরা স্থায়ীভাবে রুশিয়ায় কখনও বসবাস কর্‌ত না। বছর-বছর, কখনও বা দুতিন বছর অন্তর এসে দেশের লোকেদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে' নিয়ে যেত—লুটপাট কর্‌ত আর সকলের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দিত। তাতারেরা মহাসমৃদ্ধি-শালিনী সৌধকিরীটিনী মস্কো-নগরীও ৫।৭ বার পুড়িয়ে দিয়েছিল। রুশ-ইতিহাসে যিনি সম্রাট্—তৃতীয় আইভান্ বলে' পরিচিত হয়েছেন, এদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথমে মাথা উঁচু কর্‌তে তিনিই সাহসী হয়েছিলেন। আগে ইনি ছিলেন মস্কোভির (Muscovy) ডিউক্ (Duke)। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইনি তাতার শাসন-কর্ত্তাকে কর দিতে অস্বীকার করেন। ফলে একটা গুরুতর লড়াই বাধে। তাতারদেরও সেদিন আর ছিল না, তা'রা আগের চেয়ে অনেকখানি দুর্ব্বল হ'য়ে

পড়েছিল। তাই সেই লড়াইতে হেরে গিয়েই তা'রা মানে-মানে দেশ থেকে বিদায় হ'ল।

তৃতীয় আইভান্ (Ivan III) মস্কোনগরী নতুন করে' গড়েছিলেন। এর পরে রাজা হয়েছিলেন চতুর্থ আইভান্ (Ivan IV)। লোকে এঁকে "ভয়ানক আইভান্" বল্ত (Ivan the Terrible). সত্যই ভয়ানক নিষ্ঠুর-প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। এমন সব নিষ্ঠুরতা অম্লানবদনে তিনি কর্‌তেন যে, তা দেখে' সাধারণ লোককে বজ্রাহতের মতন দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'ত। প্রজারা তাঁকে যমের মতন ভয় কর্‌ত। তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খেত। দুর্দ্ধর্ষ খুনে রুশজাতটাকে কলের পুতুলের মতন তিনি চালাতেন। তাঁর শাসন কারো অমান্য করার ক্ষমতা ছিল না। মধ্য-রুশিয়ার প্রজাবিদ্রোহ এমন কঠোরভাবে তিনি দমন করেছিলেন—বিদ্রোহীদের উপর এমনই পৈশাচিক অত্যাচার করেছিলেন, যে, জন-সাধারণ ভবিষ্যতে স্বপ্নেও তাঁর বিপক্ষতাচরণ করার কথা আর ভাবত না। কিন্তু হাজার দোষ থাক্‌লেও সে-সব ঢেকে গিয়েছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং রাজ্য-শাসনাদি ক্ষমতায়। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র রুশিয়ার "জার" এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কসাকেরা তাঁর আমলেই প্রথমে নিয়মিতভাবে সর্‌কারী চাকরি কর্‌তে আরম্ভ করে। সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষার জন্য বহু-সংখ্যক কসাক্ সৈন্য তিনি রাখতেন এবং সেইসব কসাক্ সৈন্যের জোরেই সাইবিরিয়া দখল কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে স্থায়ী বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করার তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ আইভানের মৃত্যুর পরে—রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা আবার নষ্ট হ'য়ে গেল। উচ্ছৃঙ্খল প্রজা-পুঞ্জকে, বিদ্রোহী সৈনিকবৃন্দকে তাঁর মতন দৃঢ়হস্তে সংযত করে' রাখবার লোক আর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মিল্‌ল না। তলোয়ারের শাসন ছাড়া রুশিয়ায় তখন আর অন্য কোনো শাসন চল্‌ত না। সবলহস্তে তরবারি ধর্‌বার উপযুক্ত লোক না থাকাতে আবার তাতারী আমলের সেই বিপ্লব এসে রুশিয়াকে বিপর্য্যস্ত কর্‌তে লাগল। বিপদের উপর আবার নতুন এক বিপদ্ এসে চাপল। দেশের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুবিধে পেয়ে পোলেরা (Poles) হঠাৎ এসে মস্কো (Moscow) দখল করে' বস্‌ল। বেশী দিন কিন্তু তা'রা টিঁকে' থাক্‌তে পার্‌লে না। বছর চল্লিশের মধ্যেই রুশেরা একত্র হ'য়ে পোলদের তাড়িয়ে দিয়ে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের ভিতর থেকে মাইকেল্ রোমানফ (Michael Romanoff) বলে' একজন লোককে সমগ্র রুশিয়ার জার (Czar) নির্ব্বাচিত কর্‌লে। এই রোমানফ-বংশেরই শেষ সম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাস্ (Nicholas II) ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বল্‌শেভিকদের হাতে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন।

রোমানফ-বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ছিলেন মহানুভব পিতর্ (Peter the Great). ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে দশ-বছর বয়সে ইনি রুশিয়ার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মারা যান ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে। ছেলেবেলা থেকেই পিতর্ ছিলেন বিষম একগুঁয়ে। কোনো-একটা খেয়াল একবার ঘাড়ে চাপলে কিছুতেই নিরস্ত থাকতে পার্‌তেন না। তাঁর ইচ্ছাশক্তিও ছিল অপ্রতিহত। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে তা'কে বধ পর্য্যন্ত কর্‌তে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর মতের বিরুদ্ধে একটি মাত্র কথা বলার জন্যে নিজের ছেলে আলেক্সিসের পর্য্যন্ত তিনি প্রাণদণ্ড করেছিলেন। একবার স্বাভীষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হ'লে তাঁকে রুখতে পারা রুশিয়ার কারো সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে'ই হোক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হতেন না।

পিতরের (Peter) নৌ-নির্ম্মাণ শিক্ষার ঝোঁক খুব বেশী ছিল। তাঁর নিজের দেশে এসব বিদ্যা কেউ জান্‌ত না। বিদেশে গিয়ে তা শিখে' আসার মতি-গতিও কারো ছিল না। লোকগুলো সব ছিল আল্‌সে' এবং কুসংস্কার-পরায়ণ। শিক্ষার কদরও তা'রা বুঝত না, তার চর্চ্চাও রাখত না। কিন্তু আজভ (Azov) বন্দর তুর্কীদের কাছ থেকে দখল কর্‌তে গিয়ে পিতর্ নৌ-বিদ্যা এবং উন্নত প্রণালীর সামরিক বিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিজ-মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য সভ্যদেশ-গুলির আচার-ব্যবহার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি দেখে' এসে রুশিয়ার আভ্যন্তরিক উন্নতিবিধানের ইচ্ছাও এই-সময়ে

তাঁর খুব বলবতী হয়েছিল। তাই বিদেশে গিয়ে সমস্ত কাজ নিজে শেখা এবং অন্যান্য দেশের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করার মতলবে পিতর ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম হল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে কিছুদিন ছদ্মবেশে এক ছুতোরের দোকানে শিক্ষানবিশি করেন। এখানে কাজ-কর্ম্ম বেশ যোগ্যতার সঙ্গে করতেন। শিক্ষানবিশদের মধ্যে সব বিষয়েই তিনিই নাকি প্রথম থাকতেন। সেখানকার শিক্ষা শেষ হ'লে বিষয়টা আরও ভালো করে' শেখ্‌বার উদ্দেশ্যে তিনি ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। এখানে জাহাজ তৈরি এবং অন্যান্য সামরিক বিদ্যাগুলিতে ভালোভাবে অভ্যস্ত হওয়ার পর একবার ইউরোপের সবগুলো দেশ ঘুরে' আসেন। সব দেশ ঘুরে' দেখে' তিনিই প্রথম বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, কেন রুশিয়া অধঃপতিত আর কেনই বা ইউরোপের অন্যান্য জাতির মতন রুশজাতির ক্রমিক উন্নতি হচ্ছে না। বোঝ্‌বা-মাত্রই রুশিয়ার উন্নতিবিধানের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে জেগে উঠল। তখন তিনি রুশিয়াকে নতুন ছাঁচে ঢেলে, নতুন করে' গড়ে' দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যজাতির সঙ্গে একাসনে বসাবার একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে দেশে ফিরে' এলেন। এসময়ে রুশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা হঠাৎ উন্নতির পক্ষে তেমন প্রতিকূল ছিল বলে' বোধ হয় না। দেশের চারিদিকেই অসভ্য বর্ব্বর জাতির বাস ছিল। ধনপ্রাণ নিয়ে নিরাপদে এদেশে আসা তখন একেবারেই অসম্ভব ছিল। চোর-ডাকাতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তার ফলে বিদেশীর পক্ষে রুশিয়ায় ঢোকাও যেমন সহজ-সাধ্য ছিল না—খাস রুশিয়ার অধিবাসীদের পক্ষেও তেমনই অন্য দেশে যাতায়াতও ছিল বিষম কষ্টসাধ্য। কাজেই নিজের দেশের বাহিরে কোথায় কি পরিবর্ত্তন হচ্ছে না হচ্ছে তার একটা খোঁজখবরও তা'রা রাখ্‌তে সমর্থ হ'ত না এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্যও তা থেকে নির্দ্ধারণ করতে পারত না। নিজেদের মামুলী চালেই তা'রা আগাগোড়া চলে' যাচ্ছিল। তার পরে কুসংস্কার এবং কতকগুলি কদর্য্য রীতিনীতির এমন একটা শক্ত আবেষ্টন তা'রা তাদের চারিদিকে তৈরি করে' নিয়েছিল, যে, তা ভেদ করে' ভালো কোনো-কিছু তাদের কাছে পৌঁছতে পারত না। পৌঁছতে চেষ্টা করলেও সেটাকে তা'রা সবলে দূরে সরিয়ে দিত। তাই পিতর্ যখন প্রথম এসে এই অচলায়তনের দুর্ভেদ্য গড়ে আঘাত করলেন, দেশসুদ্ধ লোক তাঁর উপর একেবারে ক্ষেপে' উঠল। তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রও যথেষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। পিতর্ কিন্তু একটুকুও দম্‌লেন না। বাধা-বিঘ্ন দেখে' পিছিয়ে যাওয়া, প্রাণের ভয়ে সঙ্কল্প ত্যাগ করে' চুপ্‌চাপ্‌ বসে' থাকা ছিল চিরদিনই তাঁর অভ্যাসবিরুদ্ধ। কিছু গ্রাহ্য না করে' অদম্য উৎসাহে পূর্ণ উদ্যমে তিনি কাজে লেগে গেলেন। তাঁর প্রথম কাজ হ'ল লোকদের দাড়ি কামাতে বাধ্য করা। এর আগে রুশিয়ায় কথ্‌খনো পুরুষেরা দাড়ি কামাতো না। আজীবন দাড়ি রাখত। দাড়ি রাখা ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলে'ও অনেকের বিশ্বাস ছিল।

শীতের ভয়ে ইউরোপের লোকেরা অম্‌নিই ত স্নানের কাজ বড় একটা করে না, মাসের মধ্যে এক আধ বার 'স্পঞ্জ বাথ' (sponge bath) নিয়েই সারে, তার পরে আবার রুশিয়ার শীত ইউরোপের সবদেশের চেয়ে বেশী। শীতকালে শীতের দাপটে অনেকের নাক পর্য্যন্ত খসে' পড়ে' যায়। সেই হাড়ভাঙা নাক-খসে'-পড়া শীতে সে-দেশের লোক তখন মোটেই স্নান করত না। ফলে প্রত্যেকের গায়েই একটা বিষম বোট্‌কা গন্ধ পাওয়া যেত। রুশিয়ার মুজিক (moujik) অর্থাৎ কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই গায়ে-মাথায় উকুন থাকত—জামা কাপড়েও ছারপোকার অভাব ছিল না। দাড়ির মধ্যে আবার উকুন ছারপোকা দুইই থাকত! দুর্গন্ধটাও বেশীর ভাগ বেরুত দাড়ি থেকেই। এসব কিন্তু বল্‌ছি চাষা-ভুষার কথা—ভদ্রলোকের দাড়িতে আরও অনেক বেশী জিনিষ থাকত। পিতরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দাড়ির ভিতর থেকে নাকি একটা ডিমের খোসা, একখানা রুটির টুক্‌রা আর-একটা ছোট টিক্‌টিকি বেরিয়েছিল! এইসব দেখে'-শুনে'ই সম্ভবত তিনি দাড়ির উপর ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণাই হয়েছিল যে, দাড়ি অসভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ—মানুষের বন্যাবস্থার শেষ চিহ্ন। তাই আগেই তিনি দাড়ির বংশ নির্ব্বংশ করে' রুশিয়াকে উন্নতির প্রথম ধাপে তুলে' দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

পিতরের ছোট-বড় যত কর্ম্মচারী রাজধানীতে ছিল, প্রথমতঃ তাদের দাড়ি কামিয়ে দিতে তিনি মনস্থ করলেন। অত লোকের দাড়ি কামানো ব্যাপারটি তখন বড় সোজা ছিল না। নাপিত পাবেন কোথায়? ভয়ে নাপিতেরা সব গা-ঢাকা দিয়েছিল। কাজে-কাজেই ইংলণ্ড থেকে বহু নাপিত তাঁকে আমদানি করতে হয়েছিল। জারের (Czar) হুকুমে একদিন এই ইংরেজ নাপিতের দল রাজ-প্রাসাদের প্রশস্ত অঙ্গনে রুশ-কর্ম্মচারীদের অনভ্যস্ত মুখের উপর ক্রমাগত ক্ষুর চালাতে সুরু করলে। এই দৃশ্য দেখবার জন্য চারিদিক লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল। খোদ জার পিতর্ বেত হাতে করে' সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর পেছনে কালান্তক যমের মতন খোলা তলোয়ার হাতে করে' দাঁড়িয়ে থাকল দুর্দ্ধর্ষ ষ্ট্রেলট্সি (streltsi) সৈন্য। কেউ টুঁ শব্দটাও করতে পারলে না। কামানো শেষ হ'লে নতুন সভ্য চেহারা নিয়ে বিষণ্ণ মুখে যে-যার বাড়ীতে চলে' গেল। তার পরে আসল নাগরিকদের পালা। তাদেরও অনেকেই দাড়ি কামাতে বাধ্য হ'ল, অনেকে আবার বিদেশে পালিয়ে দাড়ি বজায় রাখল। প্রত্যেককে দাড়ি কামাতে হুকুম দিয়ে রাজ্যময় ঘোষণাপত্র জারি করা হ'ল। মস্কোর রাজপথে দাড়ি-ওয়ালাদের চলা ফেরাও বন্ধ হ'য়ে গেল। হঠাৎ পথে পুলিশের সামনে পড়লে তাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকত না। নানা রকমে তাদের লাঞ্ছিত করে' দাড়িগুলো টেনে ছিঁড়ে দিয়ে অবশেষে বেত মারতে মারতে সহর থেকে বের করে' দেওয়া হ'ত। শেষ কাণ্ডে বসল দাড়ির উপর ট্যাক্স। যে দাড়ি রাখত তা'কে মাসিক দুটাকা করে' ত ট্যাক্স দিতে হ'তই, উপরন্তু সরকারী মার-ধরও যথেষ্ট হজম করতে হ'ত। দাড়ি রেখে যারা গোপনে-গোপনে থাকত তাদেরও হ'ল বিষম বিপদ্। গুপ্ত পুলিশ খোঁজ করে', বের করে', ট্যাক্স আদায় করে' নিতে লাগল। পিতরের হাত থেকে যখন কিছুতেই নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না, রুশেরা তখন অগত্যা দাড়ি রাখা একেবারেই ছেড়ে দিলে। ছয়মাসের মধ্যে রুশিয়া থেকে দাড়ি রাখা প্রথাটা সম্পূর্ণ-ভাবে উঠে' গেল।

রুশিয়ায় স্কুল-কলেজ একরকম ছিল না বললেই চলে। দুটো-একটা যা ছিল তা'তেও বেশী ছাত্র হ'ত না। দেশের লোকে লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভব করত না। শুধু নিজের নাম লিখতে পারে এমন লোকও তখনকার দিনে রুশিয়ায় হাজার-করা দুএকজন মিলত কি না সন্দেহ। এই দেশব্যাপী নিরক্ষরতার প্রতিবিধান করা হ'ল পিতরের দ্বিতীয় কাজ। দেশের মধ্যে শত-শত অবৈতনিক স্কুল তিনি এইবার খুলে' দিলেন। কিন্তু শুধু স্কুল হ'লেই ত আর চলে না—স্কুলে পড়ার লোকও দরকার। সেই পড়ার লোক কোনো স্কুলেই জুটল না। শিক্ষার অভাবই কেউ বুঝত না, তা আর পড়বে কি? অনেক স্কুলই খালি পড়ে' থাকল। প্রজারা তাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠাচ্ছে না দেখে' পিতর্ একেবারে হাড়ে চটে' গেলেন। তৎক্ষণাৎ দেশের উপর এই মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার জারি করে' দিলেন—যে, প্রত্যেক স্কুলের তিন মাইলের মধ্যে যারা বাস করে, তা'রা যদি ইস্তাহারের মর্ম্ম অবগত হওয়া মাত্র তাদের ছেলেদের এনে স্কুলে ভর্ত্তি করে' না দেয়, তবে প্রত্যেককে শুধু এই অপরাধের জন্য প্রকাশ্য রাস্তায় গাছে লটকে' ফাঁসি দেওয়া হবে। অদ্ভুত ঘোষণা-পত্র! বিংশ শতাব্দীর এই বল্‌শেভিক্ যুগে আমরা নিরাপদে ঘরে শুয়ে হয়ত এর তীব্র সমালোচনা করতে পারি—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতি লম্বা-লম্বা কথার অবতারণা করে' পিতরকে একটা আস্ত জানোয়ারও সাব্যস্ত কবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু সে-যুগে নির্ভীক মৃত্যুভয়-বিরহিত বেপরোয়া রুশ-জাতি এই ঘোষণা-পত্র পড়ে' একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। পিতরকে যারা চিনত তারা আর কালবিলম্ব না করে' নিজেদের ছেলে এনে স্কুলে ভর্ত্তি করে' দিয়ে গেল। দেখা যাক্ কি হয় ভেবে যারা তখনও গোস্তাকি করে' চুপ করে' রইল, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁদের ফাঁসি হ'তে আরম্ভ হ'ল। প্রত্যহ ৩০।৪০ জন লোক ফাঁসিকাঠে ঝুলতে লাগল। ৮।১০ দিন এইরকম বীভৎস ব্যাপারের পর স্কুলে ছেলে পাঠাতে প্রজাদের আর কারো অমত থাকল না। একবছরে রুশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা চলতি হ'য়ে গেল। দেখতে-দেখতে দেশে উচ্চ বিদ্যালয়, সাধারণ কলেজ, মেডিক্যাল

কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, লাইব্রেরী, পশুশালা, যাদুঘর, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞেরা মোটা মাইনেতে রুশিয়ায় চাকরি করতে এলেন। খাল কাটিয়ে সেতু সংস্কার করে' বড়-বড় অনেক রাস্তা বেঁধে লোকজনের যাতায়াতের, বাণিজ্য-দ্রব্য আনা-নেওয়ার বিশেষ সুবিধা করে' দেওয়া হ'ল। জারের কঠোর শাসনে পথে-ঘাটে চোর-ডাকাতের উপদ্রব আর মোটেই রইল না। বহুদিন পরে রুশিয়ায় আবার লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ্ হ'ল।

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কতকটা উন্নতি হ'লে পিতর্ রুশ-রাজ্যের সীমা বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আগে রুশিয়ার উল্লেখ-যোগ্য নৌ-বল কিছুই ছিল না। দেশজয়ের পূর্ব্বে তাই তিনি শ্বেত-সাগরে (White Sea) এবং আজভ সাগরে (Sea of Azov) প্রথম রুশিয়ার নৌ-বল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্ব্বদেশের একচ্ছত্রী সম্রাট্ হওয়ার আশা তিনি অনেকদিন থেকেই মনে-মনে পোষণ করছিলেন। এখন কার্য্যক্ষেত্রে নেমে কিন্তু আশা ফলবতী করে' তুলতে পারলেন না। তুর্কীর কাছে অপদস্থ হ'য়ে ফিরে' আসতে হয়েছিল। বাল্‌টিক সাগরের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী সুইডেনের অধিকৃত অনেকস্থান তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন। অবিশ্যি সুইডেনের বিক্রমশালী নরপতি দ্বাদশ চার্লস্ (Charles) যত দিন বেঁচেছিলেন, ততদিন কিছুই করতে পারেননি, দেশগুলি দখল করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে। সেণ্ট-পিটার্স্‌বার্গ সহরে মস্কো থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফ্যাসাদ মিটে' যাওয়ার পরে। সে-জায়গায় সেণ্টপিটার্স বা আধুনিক পেট্রোগ্রাড বা তার চেয়েও বেশী আধুনিক লেনিন্‌গ্রাড সহর বর্ত্তমান আছে। আগে নাকি সেখানে অতি বিস্তৃত জলাভূমি ছিল। পাথর, মাটি ইত্যাদি ফেলে' জলাজমি ভরে' নিয়ে তবে তার উপরে সহর গঠন করা হয়। ওখানে রাজধানী করতে গিয়ে পিতর্‌কে নিজে হাতে-হেতেড়ে খাটতে হয়েছিল। তিনি সময়-সময় মজুরদের সঙ্গে নিজেও নাকি ঘাড়ে করে' ইঁট বইতেন।

বাস্তবিক পক্ষে রুশিয়ার অভ্যুত্থানের একমাত্র কারণ ছিলেন পিতর্ (Peter the Great)। তিনি রুশিয়াকে পেয়েছিলেন অর্দ্ধসভ্য অবস্থায়, আর তাঁর মরার সময় তা'কে রেখে গিয়েছিলেন সভ্য ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমকক্ষ করে'। অমন দুর্দ্ধর্ষ রুশজাতিকে অত অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত করে' তোলা তিনি ভিন্ন আর কারো পক্ষে বোধ হয় সম্ভবপর হ'ত না। প্রজারা তাঁকে দেখে' ভয়ে যেমন হাড়ে-হাড়ে কাঁপত, আবার ভক্তিশ্রদ্ধাও তাঁকে তেমনই যথোচিত করত। রুশিয়া সত্যিই তাঁর বড় প্রাণের জিনিষ ছিল। রুশিয়ার মঙ্গলের জন্য তিনি যমের মুখে যেতেও ভয় পেতেন না।

পিতরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী প্রথম ক্যাথারিন্ (Catherine 1) সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। ক্যাথারিন্ পিতরের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন না। তিনি রুশিয়ার এক কৃষকের কন্যা। এঁর রাজত্বকালে উল্লেখ-যোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি। এঁর পর-পর অ্যান্ (Ane), এলিজাবেথ (Elizabeth) এবং তৃতীয় পিতর্ (Peter III) রুশিয়ার রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। এঁরা কেউ তেমন কাজের লোক ছিলেন না, উল্লেখযোগ্য উপকার এঁরা রুশিয়ার কেউ করেননি। তৃতীয় পিতর্ স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হ'লে এঁর স্ত্রীই দ্বিতীয় ক্যাথারিন্ (Catherine II) উপাধি নিয়ে সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন ; ৩৪ বছর রাজত্ব করার পর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য হ'লেও রাজ্যশাসনে ক্যাথারিন্ একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রাজ্য অধিকারও তিনি ঢের করেছিলেন। যে তুর্কীদের সঙ্গে মহানুভব পিতর্ (Peter the Great) পর্য্যন্ত সুবিধে করে' উঠতে পারেননি, তাদেরও গলা টিপে' ধরে' ইনি ক্রিমিয়া (Crimea) কেড়ে নিয়ে স্বরাজ্যভুক্ত করেছিলেন। পোলাণ্ডের আধাআধি, কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) চারিদিক্‌কার প্রশস্ত ভূখণ্ড এবং বাণ্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী বহু প্রদেশ ক্যাথারিন্ রুশিয়ার দখলে এনেছিলেন। এঁর রাজত্বকালে রুশিয়া শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খুবই উন্নত হ'য়ে উঠেছিল। ক্যাথারিনেরও রকম-

সকম ছিল কতকটা মহামুভব পিতরের মতন। নিষ্ঠুরতায় ইনি ছিলেন চতুর্থ আইভানের Ivan IV) সমকক্ষ। প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় ছিলেন স্কটদের রাজ্ঞী মেরির উপরে। মেরির মতন ইনিও স্বামীহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের মৃত্যুর পর জার (Czar) হলেন তাঁর ছেলে পল্ (Paul)। ইনি ছিলেন একের নম্বর অপদার্থ, কিছু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান ছিল না। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট এঁর উপর স্বীয় প্রভাব খুবই বিস্তার করেছিলেন। ইনি নেপোলিয়ানের সঙ্গে মিলে' ভারতবর্ষ এবং তুরস্ক দখল করে' সমান ভাগ করে' নেবেন বলে' মতলব এঁটেছিলেন। কাজে কিছুই হয়নি। এঁকেও গুপ্তঘাতকে হত্যা করেছিল। তার পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রুশ-সিংহাসনে বসেছিলেন পলের ছেলে প্রথম আলেক্জ্যাণ্ডার (Alexander I)। প্রকৃতপক্ষে রুশিয়ায় ইনি নবযুগের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। প্রথমটায় ইনিও নেপোলিয়নের খুব ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এক-যোগে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, দুইজন শক্তিশালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নরপতির পক্ষে গোটা ইউরোপটাও যথেষ্ট নয় এবং বরাবর নেপোলিয়নের আবছায়ায় থাকলে তাঁর নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধিরও কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তখন থেকেই তিনি পদে-পদে নেপোলিয়নের বিপক্ষতাচরণ করতে সুরু করেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে নেপোলিয়নের মস্কো-অভিযান ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল এবং তিনিই রুশিয়ার বিখ্যাত রাজনৈতিক স্টাইনের (Stein) পরামর্শে মিত্রশক্তির সমস্ত সৈন্য প্যারিসের নগর-তোরণ পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। এতসব করা সত্বেও কিন্তু নেপোলিয়নের উপর তাঁর একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নেপোলিয়নকে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলে' মনে করতেন, রাজ্যশাসন, যুদ্ধ-কৌশল, সৈন্য-পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর একমাত্র আদর্শ ছিলেন নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট। তিনি রাজনৈতিক এবং পারিবারিক, চিঠি-পত্রগুলি পর্য্যন্ত লিখতেন নেপোলিয়নী ধাঁচে—লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন নেপোলিয়নী কায়দায়—এবং তাঁর চালচলনও ছিল সমস্তই নেপোলিয়নের মতন। নেপোলিয়নের প্রভাব তাঁর উপরে অনেকখানি কাজ করেছিল বলে'ই রাজত্বের প্রথম ভাগে আলেক্জ্যাণ্ডার রাজ্য-মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, শাসন-সংস্কার ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের পতন হওয়ার পরে ফরাসী দেশে যখন আবার বুর্ব্বোঁ (Bourbons) বংশের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, শাসনের নামে ফ্রান্সে যখন আবার অবাধ অত্যাচার চলতে লাগল—ওয়াটার্লুর পরে ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়াও যখন একটু বদলে' গেল তখন সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরও মত পরিবর্ত্তন হ'ল। তিনি ভাবলেন প্রজার আবার স্বতন্ত্র স্বাধীনতার কি প্রয়োজন? রাজার ইচ্ছাই হচ্ছে প্রজার আইন। রাজা যা আদেশ করবেন প্রজারা মাথা নীচু করে' তাই পালন করবে। রুশিয়ায় বরাবরই ত তাই চলে' আসছে—এখনও তাই চলবে। এই ভাবটাই কিন্তু আলেক্জ্যাণ্ডারের পক্ষে মস্ত ভুল হয়। এই ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে তিনি যে-সব কাজ করেছিলেন তা'তে অসন্তোষের বীজ দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রজাদের সত্যিই আর আগেকার মতন মাথা নীচু করে' থাকার অবস্থা ছিল না। ইউরোপের অন্যান্য সভ্যজাতির সংসর্গে ক্রমাগত আসার দরুন্ তাদেরও চোখ খুলে' গিয়েছিল। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র এবং প্রজাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিকে নজর রেখে রাজ্যশাসন—এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যে-ব্যবধানটুকু রয়েছে সেটা এইবার তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। তাঁদের দেখা না দেখা কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষ বড় একটা গ্রাহ্যের আমলে আনছিলেন না। ঘোড়ার সহিস যেমন অনেক সময় আস্তাবলের মধ্যে ঘোড়ার উপস্থিতিটা আপনার আক্রুর পথে কোনো বাধা না মনে করে' যথেচ্ছ ব্যবহারে কিছু সঙ্কোচ করে না, এঁরা রুশ প্রজাদের সঙ্গেও ঠিক তেম্নি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন। এখন তা'রাও যে সবই বুঝতে পারে—তাদের ভিতরে ধীরে-ধীরে যে নতুন প্রাণের উন্মেষ হচ্ছে একথাটা তাঁরা বুঝে'ও গ্রাহ্য করলেন না। বরং প্রজাদের শক্তিহীনতার সুবিধে নিয়ে নির্লজ্জ কাপুরুষের মতন শাসনের নামে তাদের উপর অবিশ্রান্ত অত্যাচার করে'

যাচ্ছিলেন। তা'রাও মনে-প্রাণে রুশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ কামনা কর্‌ছিল। রুশিয়ায় নিহিলিষ্ট প্রভৃতি বিপ্লব-বাদীদের গুপ্ত সমিতিগুলি এই সময়েই প্রথম সৃষ্টি হ'তে আরম্ভ হয় এবং তার ফলে দুই তিনবার আলেক্‌জাণ্ডারের জীবনও বিপন্ন হয়েছিল।

আলেক্‌জাণ্ডারের পরে উত্তরাধিকারীসূত্রে রুশসিংহাসন লাভ কর্‌লেন প্রথম নিকোলাস (Nicholas I)। ইনি ছিলেন কাঠ-খোট্টা-ধরণের গম্ভীর প্রকৃতির লোক—কোনো রকম ভাব-প্রবণতার ধার ধার্‌তেন না। নিজে যা ভালো বুঝ্‌তেন, কারো মতামতের অপেক্ষা না রেখে আপন মনে তাই কর্‌তেন। লোকও ছিলেন বেশ একটু রাশভারী-গোছের। শিক্ষা-বিস্তার, শাসন-সংস্কার প্রভৃতি কোনো কথা কেউ তাঁর কাছে পাড়্‌তে সাহস পেত না। মন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারীরাও এঁকে দস্তুরমতন ভয় করে' চল্‌ত। শাসন-সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রজাদের কোনো কথা তিনি মোটেই শুন্‌তে ভালোবাস্‌তেন না। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এইসব বিষয়ে প্রজাদের ফোঁপরদালালি করা শুন্‌লে একেবারে হাড়ে চটে' যেতেন। ইংলণ্ডের তৃতীয় জর্জ্জের মতন প্রজাদের সম্বন্ধে তিনিও বল্‌তেন—If they pray for reforms, give them grape-shots—if they gather for a franchise disperse them at the point of bayonet. অর্থাৎ, এরা শাসন-সংস্কার চাইলে ছর্‌রা গুলি চালিও, ভোট দেবার অধিকার লাভের ইচ্ছায় জটলা কর্‌লে সঙীনের খোঁচায় ছত্রভঙ্গ করে' দিও। তিনি তুর্কীদের কাছ থেকে ওয়ালাচিয়া, মল্‌ডাভিয়া এবং সার্বিয়ার স্বায়ত্ত শাসন আদায় করে' দিয়েছিলেন। বর্ত্তমান সন্ধিতে ওয়ালাচিয়া এবং মল্‌ডাভিয়া রোমানিয়া রাজ্যের অংশ-বিশেষে পরিণত হয়েছে। গ্রীসের স্বাধীনতা লাভের উপায়ও তিনিই করে' দিয়েছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি তুর্কীদের এতই ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছিলেন যে, শেষে তা'রা বাধ্য হ'য়ে ইংরেজ এবং ফরাসীর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। ইংরেজ ফরাসীর সমবেত সাহায্য না পেলে সম্ভবতঃ ক্রিমিয়াতেই রুশিয়ার হাতে তুর্কীর দফা রফা হ'য়ে যেত। প্রথম নিকোলাসের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন দ্বিতীয় আলেক্‌জ্যাণ্ডার (Alexander II)। রুশিয়ার সমস্ত জারদের মধ্যে শুধু তিনিই কিছুদিনের জন্যে অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন। সিংহাসনে বসে'ই তিনি সর্ব্বপ্রথমে রুশিয়ার কৃষকদের স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এর আগে কৃষকেরা বড়ই দুর্দ্দশায় দিন কাটাতো। না খেয়ে মর্‌লেও জমিদারের হুকুম ব্যতিরেকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে স্বাধীনভাবে তাদের খেটে খাওয়ার উপায় ছিল না। জমির ক্ষুদ্রতম অংশও তা'রা হস্তান্তর কর্‌তে পার্‌ত না। তার পরে, বছরে দুই মাস করে' প্রত্যেক প্রজাকে জমিদারের খাসের জমি চাষ-আবাদ করে' দিতে হ'ত। অত্যাচার-অবিচারও ঢের হ'ত এদের উপর। এসবের বিরুদ্ধে চাষারা রাজ-শক্তির কাছেও আশ্রয় পেত না। ফলে তা'রা নিরন্ন, নিরাশ্রয়, নির্ব্বান্ধব হ'য়ে নিজের দেশে নিরন্তর নিপীড়িতই হচ্ছিল। তাদের দুর্দ্দশাক্লিষ্ট মুখপানে চেয়ে সহানুভূতি করার কেউ ছিল না। রুশিয়ার দুই কোটি ত্রিশলক্ষ কৃষক উৎপীড়িত ক্রীতদাসের ঘৃণ্য জীবন যাপন কর্‌ছিল। যেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা হ'ল চাষাদের ভিতরে সেদিন নবজীবনের সাড়া পড়ে' গেল, সেদিন তা'রা দুহাত তুলে' পরম আনন্দে সম্রাটের দীর্ঘজীবন কামনা কর্‌তে লাগল। গির্জ্জায়-গির্জ্জায় দলবেঁধে এসে তা'রা রাত-দিন ভগবানের পায়ে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানাতে আরম্ভ কর্‌লে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দের হিল্লোল বয়ে' গেল। এর পরে আলেক্‌জ্যাণ্ডার বিচার-বিভাগের সংস্কার সাধন করে' চাষাদের আরও অনেকখানি সুবিধে করে' দিয়েছিলেন। তিনি বুল্‌গেরিয়ার অধিবাসীদের অর্থ এবং সৈন্য সাহায্য করে' তুর্কীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এঁরই আমলে রুশিয়া মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার কর্‌তে-কর্‌তে ভারত-বর্ষের পানেও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। বৃটিশসিংহও তা'তে একটু ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় আলেক্‌জ্যাণ্ডার ছিলেন খেয়ালী লোক। আগাগোড়া তিনি খেয়ালের উপর চল্‌তেন। তিনি যখন দেখ্‌লেন যে দু'টো-একটা সুবিধে-স্বাধীনতা দেওয়াতেও রুশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে

না, তখন একেবারে বেঁকে বস্‌লেন। পিতৃপিতামহের আচরিত পথই তাঁর কাছে ভালো বলে' মনে হ'তে লাগল। তাই আবার অত্যাচারের স্রোত তাঁর রাজত্বের মধ্যে প্রবাহিত হ'তে লাগল। ফলে নিহিলিষ্টদের বোমায় এক-দিন সন্ধ্যাকালে তিনি প্রাণ হারালেন।

দ্বিতীয় আলেক্‌জ্যাণ্ডারের ছেলে তৃতীয় আলেক্‌জ্যাণ্ডার (Alexandor III) এর পরে সম্রাট্‌ হ'য়েছিলেন। শাসন সম্বন্ধে তাঁর বাপের মতামতের সঙ্গে তাঁর নিজের মতের কোনোই সহানুভূতি ছিল না। বরং অনেক সময় তিনি প্রকাশ্যেই বল্‌তেন যে, এই অকৃতজ্ঞ রুশদের অযথা কতক-গুলো সুবিধে দেওয়াতে তাদের ডেঁপোমি বেড়ে গিয়েছে। বৈপ্লবিক গুপ্তসম্প্রদায়ের উপরেও তাঁর খুব বেশী বিদ্বেষ ছিল। তা'রাই যে তাঁর পিতৃহন্তা একথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ভুল্‌তে পার্‌তেন না। এই সম্প্রদায়গুলির মূলোচ্ছেদ কর্‌বার উদ্দেশ্যেই তিনি গুপ্ত পুলিশের সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের হাতে ক্ষমতাও অনেক দিয়েছিলেন। কারো সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হ'লেই এই পুলিশ তা'কে ধরে' সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত কর্‌ত, সাক্ষী-প্রমাণের বড় একটা অপেক্ষা রাখত না। সাধারণ প্রজাদের পারিবারিক স্বাধীনতাতেও তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। রুশিয়ায় বহুদেশের বহুজাতীয় লোক বাস কর্‌ত। তিনি তাদেরও প্রত্যেককে নিজের পরিবারের মধ্যে রুশ ভাষা ব্যবহার কর্‌তে বাধ্য করেছিলেন। আফিস-আদালতে রুশ ভাষা এবং রুশ আদব-কায়দা ছাড়া অন্য কিছুই চল্‌ত না। এঁর রাজত্বকালে নাম-মাত্র একটা আইন ছিল বটে, কিন্তু বিচারাদালতে তার বড় ব্যবহার হ'ত না। সেটা কেতাবেই থাকৃত। রাজদ্রোহীদের ত বিচারই হ'ত না। ধরা পড়লেই তাদের পক্ষে ব্যবস্থা ছিল হয় গাছে লট্‌কানো, আর না হয়ত সাইবিরিয়ায় চিরনির্ব্বাসন। এত কঠোর শাসনেও কিন্তু বৈপ্লবিকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল। আর প্রজাসাধারণের আন্তরিক ঘৃণার পাত্র হ'য়ে উঠেছিলেন। রুশিয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকে তাঁর অমঙ্গল কামনা কর্‌ত। এই সময়ে মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে রুশিয়ার একটু গোলযোগ বেধে ওঠার উপক্রম হয়েছিল। রাজ্যের সীমা বাড়া'তে-বাড়া'তে পাছে রুশিয়া এসে ক্রমে-ক্রমে ভারতের দরজায় দাঁড়ায় এই ভয়েই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রুশের মধ্য-এশিয়ার রাজত্বের একটা স্থায়ী সীমা নির্দ্ধারণের জন্য সম্রাট্‌কে বারবার তাগাদা কর্‌ছিলেন; কিন্তু পাকা-পাকি-ভাবে সীমানা ঠিক হওয়ার আগেই তৃতীয় আলেক্‌-জ্যাণ্ডারের মৃত্যু হ'ল।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ হ'লেন তাঁর ছেলে দ্বিতীয় নিকোলা'স (Nicholas II). রোমানফ বংশের শেষ রাজা। ইনি ছিলেন অতি দুর্ব্বল-প্রকৃতির লোক। প্রজাদের উপরে এঁর একটু আন্তরিক টানও ছিল, কিন্তু মন্ত্রীরা সব-সময়ে এঁ'কে ঠিক পথে চল্‌তে দিত না। তাদের কথা-মতন কাজ কর্‌তেন বলে'ই এঁর শাসন-প্রণালীর কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম থাক্‌তে পার্‌ত না। অনেক জায়গায়ই অনাবশ্যক কঠোরতা কিম্বা নিষ্ঠুরতা দেখান হ'ত, হয়ত আবার যেখানে কঠোর হওয়া দর্‌কার—যেখানে একটু আধটু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কর্‌লেও তেমন বেমানান হয় না, সেখানে কিছুই করা হ'ত না। তৃতীয় আলেক্‌জ্যাণ্ডারের রাজত্বকালে নিহিলিষ্টদের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লেও তা'রা তাঁর ভয়ে মাথা তুল্‌তে বড় সাহসী হ'ত না। এঁর আমলে কিন্তু তা'রা একেবারে বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছিল। জাপানের সঙ্গেও ঠিক্‌ এই সময়ে রুশিয়ার লড়াই বাধে। এ যুদ্ধেরও কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্য-লিপ্সা। যুদ্ধ প্রায় এক-বছর ধরে' চলেছিল। শেষটায় রুশিয়া হেরে' যায়। রুশিয়ার এই অসম্ভাবিত পরাজয়ে জগৎসুদ্ধ লোক বিস্মিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারেনি। ভেতো জাপানীর হাতে সত্যিই রুশিয়ার দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হয়েছিল। জলেস্থলে কোথায়ও রুশেরা জাপানীদের এঁটে উঠ্‌তে পারেনি। জাপানীরা রুশিয়ার নৌবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিল—পোর্ট আর্থার্‌ (Port Arther), ভ্লাডিভষ্টক্‌ (Vladivastock) প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দরগুলি কেড়ে নিয়েছিল আর প্রাচ্যে সাম্রাজ্য-বিস্তারের সুখ-স্বপ্নও কিছুদিনের জন্য একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। জাপানের কাছে হেরে' গিয়ে দেশে রুশ গভর্ণমেণ্ট প্রজাদের চোখেও অনেকখানি ছোট হ'য়ে পড়েছিলেন। যে-সব মন্ত্রীরা যুদ্ধ চালাচ্ছিল তা'রাও অকৃতকার্য্যতার জন্য লোকের

কাছে বিশেষভাবে অপদস্থ হয়েছিল। সমস্ত দেখে'-শুনে' প্রজারা ডুমা (Duma) বা জাতীয় মহাসভাদ্বারা দেশ শাসনের প্রস্তাব করে' দ্বিতীয় নিকোলাসের কাছে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করে। তার অল্প কয়েকদিন পরেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রমজীবীদের একটা বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষও বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাই প্রজাদের ঘাঁটিয়ে তাঁদেরও ঘরের ঢেঁকী কুমীর ক'রে তোলার ইচ্ছে আর আদৌ ছিল না। এইসমস্ত বুঝে'-সুঝে'ই দ্বিতীয় নিকোলাস্ প্রজাদের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ডুমা বসে। তখন এবং তার পরেও বহুদিন ডুমার তেমন বিশেষ কোনো ক্ষমতা ছিল না। জারের মতামত নিয়েই সমস্ত কাজ হ'ত—ইচ্ছা হ'লে জার ডুমার কথা না শুন্‌লেও পারতেন। মোটের উপর ওটা তখন ছিল একটা সাক্ষী-গোপাল মাত্র।

এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভাশালী একজন নতুন লোক রুশিয়ার বিপ্লববাদীদের মধ্যে দেখা দিলেন। এঁর নাম নিকোলাস্ লেনিন (Nicholas Lenin)। সাধারণ নিহিলিষ্টদের থেকে এর কার্য্যপ্রণালী ছিল স্বতন্ত্র। নিহিলিষ্টরা বাছা-বাছা লোক নিয়ে দল বেঁধে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা কর্‌ত, জারের প্রাণ বিনাশে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাক্‌ত, কিন্তু এত সব বিপজ্জনক কাজ করে'ও তা'রা কিছুই সুফল পাচ্ছিল না। গভর্ণমেণ্টকে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় কর্‌বার চেষ্টা তাদের বরাবর ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। লেনিন্ এদের ভুল ধরেছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, দু'দশ জন নিহিলিষ্টের ভয়ে রুশ গভর্ণমেণ্ট কখনো নিজের হাতের-পাঁচ ছেড়ে দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে একটা রফা কর্‌তে আস্‌বেন না, তবে যদি দেশসুদ্ধ লোককে ঐরকমের কঠোর কর্ম্মী নিহিলিষ্ট করে' তোলা যায়, তা হ'লে হয়ত কোনো না কোনো দিন রুশিয়ায় গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু সবাইকে নিহিলিষ্ট করে' তুল্‌তে হ'লে আগে জারের এবং তাঁর শাসন-পদ্ধতির উপর লোককে বীতশ্রদ্ধ করে' তোলা দর্‌কার ভেবে লেনিন্ রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা ইত্যাদি ছাপিয়ে লোকের মধ্যে অজস্র বিলি কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এর ফলে শীঘ্রই পুলিশ তাঁকে গেরেপ্তার করে' চার বছরের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত কর্‌লে। জন কয়েক পদস্থ ব্যক্তির সুপারিশে লেনিন্ প্রাণদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। সাইবিরিয়া থেকে লেনিন্ যখন ফিরে' এলেন, তখন তাঁর মনের মধ্যে রুশ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার একটা আগুন ভীষণ ভাবে জল্‌ছিল। দেশে ফিরে' এসে আর দুইজন বিপ্লব-বাদীকে সঙ্গে নিয়ে ইস্ক্রা (Iscra) নামে একখানা খবরের কাগজ বের কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ইস্ক্রা কথার মানে হচ্ছে "আগুনের ফুল্‌কি"। এতে যে-সব প্রবন্ধ ছাপা হ'ত সেগুলিও আগুনের ফুল্‌কিরই মতন ছিল। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ইস্ক্রা বন্ধ করে' দেওয়ার খুব চেষ্টা চল্‌তে লাগল। ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হ'ল—কল্পিত সম্পাদকের নামে গেরেপ্তারী পরোয়ানা বের করে' তার খোঁজ হ'তে লাগল, জামিনের টাকাও সর্‌কারে জব্দ করে' নেওয়া হ'ল, কিন্তু তবুও ইস্ক্রার অবাধ প্রচার গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই বন্ধ কর্‌তে পার্‌লেন না। দেশের লোকের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। সম্রাট্ ব্যতি-ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন—মন্ত্রীরাও পদে-পদে ভুল কর্‌তে লাগল।

সাইবিরিয়া থেকে ফিরে' এসে লেনিন্ আর রুশিয়ায় থাক্‌তেন না। সুইজার্‌ল্যাণ্ডে স্থায়ী আড্ডা গেড়েছিলেন। সেখানে বসে'ই সমস্ত কাজের বন্দোবস্ত কর্‌তেন। ফরাসী বিপ্লবের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী দেশের যে-অবস্থা হয়েছিল রুশিয়াকেও তিনি প্রথমে সেই অবস্থায় এনে পরে একটা নতুন শাসনপ্রণালী খাড়া কর্‌বেন বলে' মতলব করেছিলেন। কিন্তু সে-রকমের একটা কাজ কর্‌তে যে-ধরণের প্রতিভার দর্‌কার, লেনিনের বোধ হয় তা ছিল না। যা হোক বিগত মহাযুদ্ধ বাধবার কয়েক মাস আগেই লেনিন্ বুঝতে পেরেছিলেন যে রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর বিরোধ অনিবার্য্য। আর এটুকুও তিনি বুঝেছিলেন যে, সে-যুদ্ধে যদি রুশিয়া হেরে যায় তবে তিনি যে-রকমের বিপ্লবের আগুন দেশে জাল্‌তে যাচ্ছিলেন, সেটা অতি সহজেই সুসম্পন্ন হবে। এইসমস্ত বুঝে'-

মুঝে'ই তিনি রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীকে সাহায্য করতে কৃতসঙ্কল্প হ'লেন।

রুশিয়ার গুপ্তপুলিশের বিশেষ বিভাগের বড় কর্ত্তা জেনারেল্ স্পিরিডোভিচ (General Spiridovitch) বলেন :—"১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন্ বার্লিনে গিয়ে সেখানকার ফরিন্ (foreign) আফিসের সেক্রেটারীর কাছে একখানা কাগজ দাখিল করেন। এই কাগজে কি করে' রুশ সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে হবে—দেশের জায়গায়-জায়গায় কি উপায়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে হবে এবং কি-ভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখবার জন্যে গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা বিব্রত রাখতে হবে, সে-সমস্তই বেশ গুছিয়ে সরল ভাষায় লেখা ছিল। শেষে প্রার্থনা ছিল যে, জর্ম্মান্ গভর্ণমেণ্ট কিছু অর্থসাহায্য করলে লেনিন্ নিজেই এসব বিষয়ের বন্দোবস্ত করে' দেবেন। সহসা রুশিয়া যাতে সৈন্যবল নিয়ে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিতে না পারে তার জন্যও তিনি দায়ী থাকবেন। প্রথমটায় লেনিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। শেষে দুই সপ্তাহ পরে তাঁর একজন বন্ধু ডাক্তার হেল্পহাণ্ড প্রাভাসের (Dr. Helphand Pravas) চেষ্টায় জার্ম্মান্ সম্রাটের মত বদ্‌লে' যায়। তিনি তাড়াতাড়ি তখন লেনিনের সঙ্গে একটা চুক্তি ঠিক করে' ফেলেন। তা'তে স্থির হয় যে জার্ম্মান্ গভর্ণমেণ্ট যেদিন প্রথম রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন সেইদিনই বল্‌শেভিকদের নেতা হিসেবে লেনিন্‌কে কার্য্যনির্ব্বাহের ব্যয়-বাবদ ১০,০০০,০০০ মার্ক্ নগদ দেবেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লেই লেনিন্ সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে' গেলেন। সেখানে বসে' রুশিয়ায় বিদ্রোহের সৃষ্টি করা, সৈন্যদলকে বিগড়ে' দেওয়া, সম্রাট্ এবং প্রচলিত শাসন-নীতির উপরে লোকের বিদ্বেষ আরও বেশী করে' জন্মিয়ে দেওয়া, প্রভৃতি কাজগুলি অতি প্রচ্ছন্নভাবে অথচ বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে করতে লাগলেন।

ডুমা আগে থেকেই শক্তি সঞ্চয় করেছিল। তার পরে যুদ্ধ বাধলে সৈন্য সংগ্রহ করা, যুদ্ধের বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি নিয়ে যখন ভারি বিশৃঙ্খলা হ'তে লাগল তখন দ্বিতীয় নিকোলাস্ ডুমার হাতেই সমস্ত ছেড়ে দিয়ে নিজে রাজ্য ত্যাগ করলেন। মিত্রশক্তির পরামর্শে কেরেনস্কি (General Alexander Kerensky) সামরিক কাজ চালাবার জন্যে জোড়াতাড়া দিয়ে একটা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী দাঁড় করালেন। রাজপরিবারকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হ'ল। এর অল্প কয়েক দিন পরেই জার্ম্মান্ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে লেনিনও রুশিয়ায় ফিরে' এলেন।

দেশের তখন বড়ই শোচনীয় অবস্থা। বিপ্লবের স্রোত রুশিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত খরবেগে বয়ে' যাচ্ছিল। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। দেশে শাসন-শৃঙ্খলা মোটেই ছিল না। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেশটাকে গ্রাস করে' বসেছিল। বারে-বারে যুদ্ধে হেরে' গিয়ে জনসাধারণ এবং সৈন্যদল কেরেনস্কির গভর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। দেশের এই অবস্থায় লেনিন এসে প্রলোভনপূর্ণ ভাষায় সকলকে শান্তির লোভ দেখালেন—বিদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে' অন্নকষ্ট নিবারণ করবেন বলে' আশ্বাস দিলেন। লোকে আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। বেগতিক দেখে' কেরেনস্কি শেষ রাত্রে সামান্য কয়েকজন শরীররক্ষক নিয়ে পালিয়ে কোনো-রকমে প্রাণ বাঁচালেন। লেনিনের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল। পরের বছরে অর্থাৎ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে দ্বিতীয় নিকোলাস্ এবং তাঁর পরিবারবর্গকে বধ ক'রে বল্‌শেভিকেরা রোমানফ বংশ ধ্বংস করে' ফেল্‌লে। দেশে কিন্তু শান্তি আর ফিরে' এল না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দ্বিগুণ বেড়ে উঠল—দেশ একেবারে ছারখার হ'য়ে গেল।

পিতরের বড় সাধের সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ এখন ভেঙে-চুরে শ্রীহীন হ'য়ে গেছে—রাজধানীও মস্কো নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন সেণ্টপিটার্স্‌বর্গের মেরামত চল্‌ছে। হয়ত কালে রাজধানী আবার ওখানে উঠে' এলেও আস্‌তে পারে।

নিদালি

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

উস্‌খুস্‌ চুলগুলি চোখ থেকে তুলে' দাও,
পায়ের নূপুর-ছুটি খুলে' নাও ;
রেশ্‌মি চাদরখানি টেনে দিও পরিপাটি,
ফুলদানি হেথা হ'তে নিয়ে যাও।

দাও উপাধান শিরে সুকোমল ছন্দে
সুরভিয়া অগুরুর গন্ধে ;
বহে যথা বালু-ঘড়ি ঝিরিঝিরি ঝুরুঝুরু—
রজনী কাটুক মৃদু মন্দে।

ছুটি কোয়া কম্‌লার, কিস্‌মিস্‌ গুটিদশ,
গুলকন্দ, আনার, আনারস—
সোনার থালায় ধরি', বেলোয়ারী গেলাসে—
ঢেলে দাও নারিঙ্গীর রস।

ঢেকো না রাতের রূপ—থাক্‌ খোলা ফর্দ্দা,
সরাও সমুখ থেকে পর্দ্দা—
আমার এ ঘুম-চোখে পড়ুক মেদুর মৃদু
চাঁদের কিরণখানি জর্দ্দা !

আঁধার ঘনায় দূর বনানীর বক্ষে,
শোনো ওই শূন্যের কক্ষে
দিশি-দিশি সঙ্করে পাপিয়ার ঝঙ্কার—
ঘুম নাই পাখীটার চক্ষে !

এবার নিবাও তবে রূপার ও দীপটায়,
সেই গান গুঞ্জরো বেহালায়—
যে-গান পরীরা শোনে নির্জ্জন নদীতীরে
চেয়ে-চেয়ে চৈতালি তারকায় !

গান যেন থামে নাকো ! স্বপনের বন্ধন
পশিতে দিবে না জানি ক্রন্দন,—
তবু ও সোনার সুর কান যেন ফিরে' পায়,
মুছিলে চোখের ঘুম-চন্দন।

অবশ অলস হ'য়ে মুদে' আসে অঙ্গ,
আঁখিপাতা চায় আঁখিসঙ্গ ;
চোখ বুজে' দেখি ও যে—কত রং কত ফুল !
আলো দোলে ? আলো না পতঙ্গ !

সমগ্র ভারতের তুলনায় বাঙ্‌লার কারখানা

শ্রী রামানুজ কর

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কলকারখানাসমূহের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ৩১৯০ লক্ষ।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিদিন গড়ে ১৩৬৭১৩৬ নর-নারী কারখানা-সকলে কাজ করে। ভারতবর্ষে কল ও কারখানাসমূহের সংখ্যা ৫৩১২। গভর্ণমেণ্টের অধীনে ১২৩৬৭৫ জন লোক কাজ করে। ভারতবর্ষে সকল প্রদেশের মধ্যে কলকারখানার সংখ্যায় এবং নিযুক্ত লোকের সংখ্যায় বাংলা দেশ শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বোম্বাই দ্বিতীয়, মাদ্রাজ তৃতীয়, ব্রহ্ম দেশ চতুর্থ, বিহার ও উড়িষ্যা পঞ্চম, যুক্তপ্রদেশ ষষ্ঠ, মধ্যপ্রদেশ সপ্তম এবং পাঞ্জাব অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলা দেশে ১০০০ এক হাজার কলকারখানায় ৪৩২৫১৫ জন কাজ করে। বোম্বাই প্রদেশে ৯৫৪ কলকারখানায় ৩১২৭৪১ জন কাজ করে। দেশীয় রাজ্যসমূহে কলকারখানার সংখ্যা ৬৪০ এবং নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা ৮৯৫৯২। ইহার মধ্যে বরোদারাজ্যে কারখানার সংখ্যা ২০৩। সমগ্র ভারতবর্ষে যত কারখানা আছে, তাহার এক-ষষ্ঠাংশ বাংলা দেশে অবস্থিত এবং ভারতবর্ষে কারখানাসমূহে যত লোক কাজ করে, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় নিযুক্ত আছে। ভারতবর্ষে যত কারখানা আছে তাহার প্রায় দুইপঞ্চমাংশ বোম্বাই ও বাংলা দেশে অবস্থিত এবং নিযুক্ত ব্যক্তির অর্দ্ধেকেরও অধিক বোম্বাই ও বাংলায় কাজ করে। সকলের চেয়ে বেশী অর্থাৎ ৩০৭০০০ লোক তুলা ও কাপড়ের কলে কাজ করে, ২৭৬০০০ লোক পাটের কলে কাজ করে। ভারতবর্ষে কলকারখানার মধ্যে শতকরা ৩৭টি তুলা ও কাপড়ের কল। কোন্‌ প্রদেশে কোন্‌ কলের সংখ্যা কত, নীচের তালিকায় তাহা দেখানো হইল।—

কাপড়-কল

প্রদেশ	কলের সংখ্যা	নিযুক্ত লোকের সংখ্যা
বোম্বাই	১৮২	২০৯৮৩০
মাদ্রাজ	২১	২৫২৭৯
যুক্তপ্রদেশ	১৭	১৫৯৯৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৩	১৪৬২১
বাংলা	১২	১২০৭৩
বরোদা	১৪	

ভারতবর্ষে যত কাপড়ের কল আছে, তাহার শতকরা ৬৮টি বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত।

তুলার বীজ ছাড়ানো ও গাঁইট বাঁধাই কল

প্রদেশ	কলের সংখ্যা	নিযুক্ত লোকের সংখ্যা
বোম্বাই	৫৫৯	৩৬৫০০
মধ্য ভারত ও বেরার	৪১৫	২৯৩৩৫
যুক্তপ্রদেশ	১৩২	১২০৭৪
মাদ্রাজ	১৪৯	১৩৬৬৩
পাঞ্জাব	১৮৯	১২৯৬১
মধ্যভারত	১৯৪	১০৬৯৩
হায়দ্রাবাদ	১৫১	৮৪৫৮
বরোদা	৮০	৪৫০৯

পাটের কল

প্রদেশ	কলের সংখ্যা	নিযুক্ত লোকের সংখ্যা
বাংলা	৭১	২৭২৩১৩
মাদ্রাজ	৩	২৮৩৩
যুক্তপ্রদেশ	১	৪৯৭
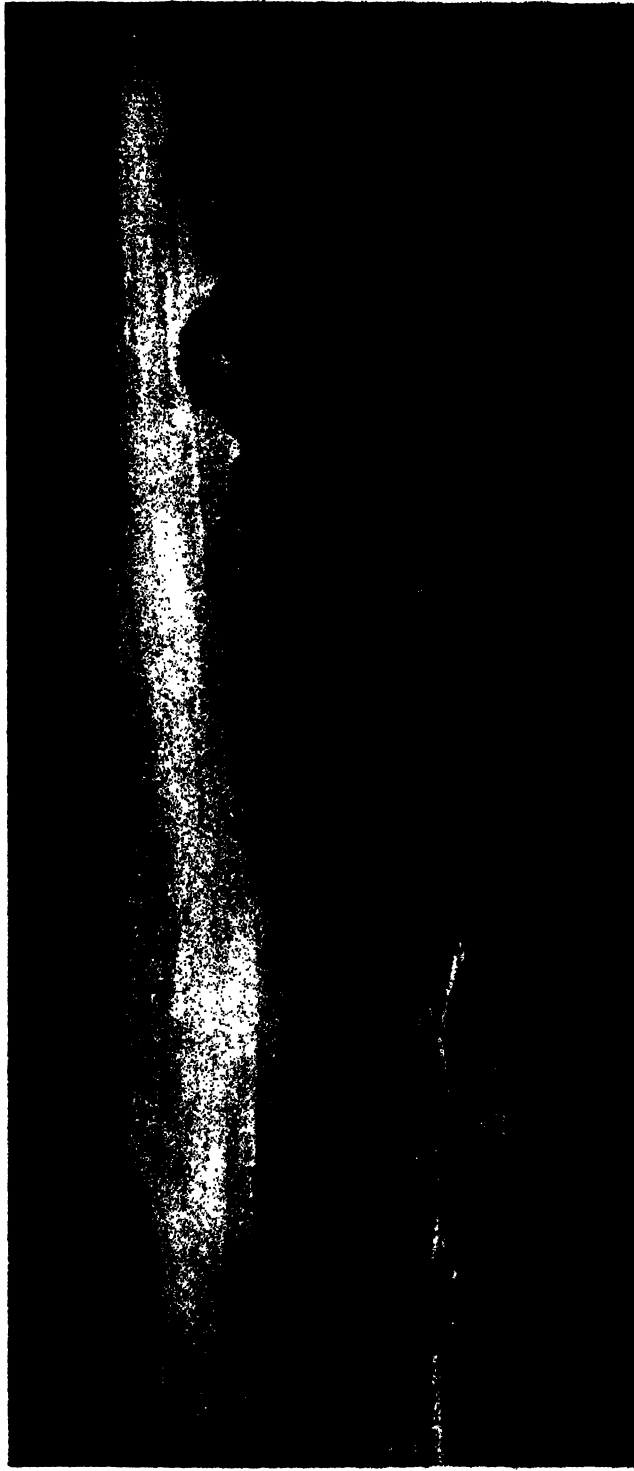
কিছুদিন হইল স্যার্‌স্বরূপ চাঁদ হুকুমচান্দ হালিসহরে ৮০ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি পাটের কল স্থাপন করিয়াছেন। কলের তত্ত্বাবধানের জন্ত একজন সুদক্ষ স্কচ ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কলে ৫ হাজার লোক কাজ পাইবে।

পাট-পেসাই কল (Jute Press)

বাংলা	১৭৯	৩০৭৪৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২৬	১৪৭০
মান্দ্রাজ	৪	২৮৫

ইঞ্জিনিয়ারীং কার্‌খানা ও লোহা ও পিতল ঢালাই কার্‌খানা ও জাহাজ নির্ম্মাণের কার্‌খানা

বাংলা	১০৫	৩২০০৪
বোম্বাই	২৪	৬২৭১
বিহার ও উড়িষ্যা	১৬	৫৯৮৯
ব্রহ্মদেশ	২১	২৪৬৫
মান্দ্রাজ	৯	১৪০৭
যুক্তপ্রদেশ	৭	১১৭৯

ইহা ব্যতীত ৭৭টি রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে কার্‌খানায় ৮৯৩৮৯ লোক এবং ১০টি ডক্‌-ইয়ার্ডে ১৫৯৯১ লোক কাজ করে।

ধানকল

ব্রহ্মদেশ	৩৩৬	৩৫৩৮৮
মান্দ্রাজ	১৩৩	৭৬৯৪
বাংলা	৯০৮	৪৫০৩

বৃহৎ ছাপাখানা

বাংলা	২১	৪০৭৬
বোম্বাই	২৯	৪৯৮৮
মান্দ্রাজ	২৯	৪০৮৭
যুক্তপ্রদেশ	১০	১৭৪৩

টালী ও ইটের কার্‌খানা

বাংলা	১০৭	৯২৯৩
মান্দ্রাজ	৩১	৪৪৫৫
যুক্তপ্রদেশ	৩৮	৩৭০৫
বোম্বাই	২১	২২৫৫
পাঞ্জাব	২৩	১৩৮০

গভর্ণমেণ্টের বন্দুক ও গোলাগুলি নির্ম্মাণের জন্য ১৬টি কার্‌খানায় ২৬৯৫৭ জন লোক কাজ করে।

জামশেদ্‌পুরে টাটার লোহা ও ইস্পাতের কার্‌খানায় ২০৮০৬ লোক কাজ করে।

চামড়ার কার্‌খানা

মান্দ্রাজ	৫৫	৫৫৭৯
যুক্তপ্রদেশ	১০	৫৮২৩
বোম্বাই	১৫	১১২৮
বাংলা	১৮	১০৮৯

ভারতবর্ষ হইতে যত চামড়া বিদেশে যায়, তাহার শতকরা ৭২ ভাগ কলিকাতা হইতে রপ্তানি হয়। গভর্ণমেণ্ট্‌ কলিকাতায় একটি চামড়ার কার্‌খানা খুলিয়াছেন। বামুন, কায়েত, বদ্দির ছেলেরাও এখানে আসিয়া চামড়ার কাজ শিখিতেছে। মূচিদিগকেও এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কাঠকল (Saw-Mill)

ব্রহ্মদেশ	১০৮	৯৯৯২
আসাম	১৫	২০১৮
বোম্বাই	৪	৭৮৯
মান্দ্রাজ	৪	৭০৭

পাথরের কার্‌খানা

বিহার ও উড়িষ্যা	৪২	৫৪৪৭
মধ্যভারত	২	২৮৬১
রাজপুতানা	৩	২২৫৩
যুক্তপ্রদেশ	৮	১৫৭০

কেরোসিন রিফাইন (Petroleum Refineries)

ব্রহ্মদেশ	৭	১৩০১৮
আসাম	১	৫৯০

টিনে কেরোসিন ভর্ত্তি করাই (Keroseine Tinning)

বাংলা	৮	৩৪২০
বোম্বাই	৭	২৩৪১
মান্দ্রাজ	৭	১২৫৪

চিনির কল

মান্দ্রাজ	৯	৩৬১০
বিহার ও উড়িষ্যা	২১	৩১৪১
যুক্তপ্রদেশ	১,৪	২৮১১

কারপেটশাল

যুক্তপ্রদেশ	৫	৪৫৫০
পঞ্জাব	৮	৩০৪৫
কাশ্মীর	৯	২৩৩০

রেশমের কল

বাংলা	৬৪	৩৬৭০
কাশ্মীর	২	২৯৯৯
বোম্বাই	২	১২৯৪

তেলকল

বাংলা	৮৪	৩৪৭০
ব্রহ্মদেশ	১৮	১১৫০

অভ্র (mica)

বিহার ও উড়িষ্যা	১৯	৮৬৭৫

তামাক

বিহার ও উড়িষ্যা	৪	২৬৯৩
বাঙ্গালোর	১	১৫০১
মান্দ্রাজ	৬	১১৮৫
বাংলা	৮	১১৫০

গত ছয় মাসে কতকগুলি পাটের কলের আয়

পাটকল	মূলধন	গত ছয় মাসের আয়	অংশীদারগণকে শতকরা মুনাফা প্রদত্ত ছয় মাসের
১। ষ্টাণ্ডার্ড জুট কোং লিঃ ;	২৩ লক্ষ,	৪২৬ হাজার	২৫৲
২। ক্লাইভ	৩২ ”	৫৮০ ”	২৫৲
৩। নর্থব্রুক্‌	২৩ ”	৩৯৫ ”	৩০৲
৪। ল্যান্স্‌ডাউন্‌	৩২ ”	৪৯১‖ ”	২০৲
৫। অক্‌ল্যাণ্ড	৩০ ”	৪০৮ ”	১৭৲
৬। ইউনিয়ন্‌	১৮ ”	৬০০ ”	৪০৲
৭। ডালহাউসী	৩০ ”	৪৫৪ ”	২৫৲
৮। লরেন্স	২৫ ”	৫০০ ”	৪০৲
৯। ক্যালিডোনিয়ান্‌.	১৯ ”	৪৭৮‖ ”	৪০৲
১০। ডেল্টা	১৯ ”	৫৮৯ ”	৩৫৲
১১। লোদীয়ান্‌	২০ ”	৫০২ ”	৩০৲

গত ছয় মাসে কতকগুলি পাটের কলের আয়

পাটকল	মূলধন	গত ছয় মাসে আয়	অংশীদারগণকে শতকরা মুনাকা প্রদত্ত ছয় মাসে
১২। ওরিয়েন্ট	১ কোটি	৫২১৸০ "	১০৲
১৩। বিলী		৪৬২৸০	
১৪। হুকুমচান্দ		৭৪৩৷৹	
১৫। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়া	১ কোটি	১৭৭৬৮৫০৲	৫০৲
১৬। হাওড়া	৫২৷ লক্ষ	১৬৫৪২১৯৲	
১৭। বিলায়োস	৩৬৷ "	১২৩৮১০৩৲	
১৮। কিগিলন্	৫৪ "	১০৩৫১৮৲	
১৯। নৈহাটী	২০ "	৩১৬৮০৮৲	
২০। ফোর্টউইলিয়াম	২৪ "	২০৮২৪৫৲	
২১। নিউসেণ্ট্রাল	২৪৷ "	৪৭৮৫৫৫৲	৩৫৲
২২। এম্পায়ার	২০ "	৪৬৭৯৩২৲	৩০৲
২৩। কেল্ভিন্	২২ "	৫৯৫৯১৯	৫০৲
২৪। কামারহাটি	৪০ "	১০০০৪৭৯	৩০৲
২৫। কাকিনাড়া	৪০ "	৯৫৫৫৬৩	২৫
২৬। স্থঁড়া	১৭ "	১৩৮৮৩৬	১০৲

প্রত্যেক কল প্রতিবৎসর লভ্যাংশের কতক টাকা গচ্ছিত-ভাণ্ডারে (Reserve Found) রাখিয়া বক্রী টাকা অংশীদারগণকে বণ্টন করিয়া দেয়। ৫১টি পাটের কলে ৫২৷ কোটি টাকা খাটিতেছে। ইহার মধ্যে গচ্ছিত ভাণ্ডারে ৩০ কোটি টাকা। (Debenture) ৪ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে কলগুলির বাড়ী ও কলকব্জার মধ্যে ৪০ কোটি টাকা। তালিকায় দেখিতে পাইবেন, অংশীদারগণকে গত বৎসরে একশত টাকার অংশের উপর বার্ষিক ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ দেওয়া হইয়াছে। পাটকলের এই অবস্থা। ইহার সহিত পাট-চাষীদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন। বাংলার অধিকাংশ পাটচাষী মুসলমান, মুসলমান নেতারা এখন সরকারের চাকরির জন্যই লালায়িত; কিন্তু তাঁহারা এই হতভাগ্য পাট-চাষীদের জন্য কি করিতেছেন? ২৬টি কলে ৬মাসে কুলী ও কর্ম্মচারীদের বেতন ও অন্য সমস্ত খরচ বাদে ৬মাসে ১৬১৮৩ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। গত ৪বৎসরে বাংলার পাটকলসমূহে সকল-রকম খরচা বাদে খাটি ৬৩ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল, ইহার মধ্যে অংশীদারগণকে ৩৪৷ কোটি দেওয়া হয় এবং গচ্ছিত ভাণ্ডারে ২৮৷ কোটি টাকা রাখা হয়।

বিদেশে পাট চট ও থলিয়া রপ্তানি

১৯১৯—২০ সাল	৭২৫১১৯৬৪০ টাকা
১৯২০—২১ ,,	৬৮৬৭৬৪৪৪০৲
১৯২১—২২ ,,	৪৩৬২৬৩৩১৩৲
১৯২২—২৩ ,,	৬২ কোটি টাকা

বাঙ্গালীর পরিচালিত বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিলের মূলধন ১৮লক্ষ টাকা। কলিকাতার কেশোরাম কটন্-মিলের মূলধন ৮০ লক্ষ টাকা। ইহাতে একজন বাঙ্গালী ডাইরেক্টর্ আছেন।

গতবৎসরে হোয়াইট অ্যাওয়েও লেডল কোং (Whiteaway Laidlaw & Co. Ltd) ২৫ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। ১৯২১ সালে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোং ১২৩৮ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ১৯২৩ সালে ২২৪১১৫৭৩, টাকা লাভ হইয়াছে। ১৯২২-২৩ সালে টাটার লৌহের কার্‌খানায় ২১ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বৃহত্তম যৌথ কার্‌বার	মূলধন
ই, ডি, সাস্থন্ ইউনাইটেড মিল্‌স্ বোম্বাই	১০কোটি
খিলচাঁদ মিল লিঃ, বোম্বাই	৮০লক্ষ
বাকিংহাম্ ও কর্ণাটিক কোং লিঃ কাপড়ের কল মান্দ্রাজ	২৷কোটি
আগ্রা ইউনাইটেড মিল্‌স্ লিঃ, আগ্রা	১৷কোটি
নিউ ভিক্টোরিয়া কোং লিঃ কানপুর	৫কোটি
দিল্লী ফ্লাউর মিলস্, দিল্লী	১২লক্ষ
ইণ্ডিয়ান্ গ্যাল্‌ভানাইজিং কোং লিঃ, কলিকাতা	১৫ "
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া টোবাকো লিঃ	৩০ "
ব্রিটেনিয়া বিস্কুট লিঃ, কলিকাতা	৬লক্ষ
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ কলিঃ	২৫ "
কেশোরাম কটন-মিলস্ লিঃ কলিকাতা	৮০ "
ক্যালকাটা সোপ ওয়াকস্	৫ "
বেঙ্গল কোল কোং লিঃ	৩০ "
বার্ম্মা কর্পোরেশন্ লিঃ	২০ কোটি
ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম্ কোং লিঃ, বার্ম্মা	২ কোটি
বার্ম্মা ফিল্ডাস ও মাইনিং কোং লিঃ	৬০ লক্ষ
বার্ম্মা রুবি মাইন্‌স্ লিঃ	২৭ লক্ষ টাকা
কন্‌সোলিডেটেড্ টি এণ্ড ল্যাণ্ডস্ কোং লিঃ আসাম	৩ কোটি
ব্যাঙ্গালোর উলেন্ এণ্ড সিল্ক্ মিলস্ লিঃ	২৬৷ লক্ষ
রাবার্ প্ল্যাণ্টেশান্‌স্ ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট্ ট্রাষ্ট লিঃ, কুইলন	৩০ কোটি
মহীশূর গোলড্ মাইনিং কোং লিঃ	৯১৷ লক্ষ
কানপুর সুগার ওয়ার্কস্ লিঃ	২০ লক্ষ
ইউনাইটেড ষ্টীল কর্পোরেশন্ অফ এশিয়া লিঃ কলিকাতা	২০ কোটি
টাটা আয়রন্ ও ষ্টীল কোং লিঃ	১০৫২ লক্ষ টাকা
বেঙ্গল আয়রন্ কোং লিঃ, কুলটী	১১২৷ লক্ষ
গ্যাঞ্জেস্ ম্যান্যুফ্যাক্‌চারিং কোং লিঃ	১৷ কোটি

ইহার মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল, পাটকল ও ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস্ বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইলেও অবাঙ্গালীর টাকা ইহাতে খাটিতেছে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীর সমবায়ে পরিচালিত।

১৮৭২ সালে বাংলা দেশে মাড়োয়ারীর সংখ্যা ৪৯১০ ছিল। ১৯১১ সালে উহাদের সংখ্যা ৩৬৭৩২ এবং ১৯২১ সালে ৪৭৮৬৫ হয়।

লাক্ষা		
বিহার ও উড়িষ্যা	৫৫	৩৪৬১
যুক্তপ্রদেশ	২৪	২২৬০
কাগজকল		
বাংলা	৩	৪৪৭৯
বোম্বাই	৩	৬০০
দড়ির কল (Rope Works)		
ত্রিবাঙ্কুর	১৩	২৫৬৮
মান্দ্রাজ	৬	১৯২৩
বাংলা	১১	১১৩৯
ময়দার কল		
বোম্বাই	১৩	১৪৩১
বাংলা	৯	১২৫৪
পাঞ্জাব	১০	৯০২
রবার		
মান্দ্রাজপ্রদেশে দেশীয় রাজ্যে	১১	৫৪৩১

চীনা মাটির কারখানা

বিহার ও উড়িষ্যা	৩	১৯৪৪
বাংলা	৩	১৭১৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩	১১৬৬

ভারতবর্ষের অন্যান্য কারখানা

তালা, চাবী, ছুরী, কাঁচী ইত্যাদি	৭	১০৬৮
নানাবিধ ধাতুদ্রব্যের কারখানা	৪৬	২৩২৭
ভাঁটি (Breweries)	১৯	২৩০৭
কাফি (Coffee Works)	১৫	৪০৬৬
মদের খোল্‌ভাটি (Distilleries)	১৫	১৪৪৫
বরফ, সোডা, লিমনেড ইত্যাদি	১৭	১২৬৩
কেমিক্যাল	১৩	২৯৩৩
রং করাই (Dye-Works)	২৩	৩৮৪২
রং (Paint)	৩	১২৩০
হাড় গুঁড়া (Bone-crushing)	১৫	২১৭৭
গাড়ী তৈরীর কারখানা	৩১	৪২৬৭
ছুতার কারখানা (Carpentry)	১১	১১৩০
কাচের কারখানা	১০	১৪২২

কয়লার খনি

বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর	১৯৬
বোম্বাই	৩
ব্রহ্মদেশ	১
পঞ্জাব	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১

ভারতবর্ষে চা-বাগানের সংখ্যা

বাংলা	১১৭
আসাম	৩৬
মাদ্রাজ	৯
কুর্গ	১

ভারতবর্ষে কোন্ প্রদেশে কত রেজেষ্টরীকৃত যৌথকারবার আছে নীচের তালিকায় তাহা দেখানো হইল।

প্রদেশ	১৯১৭—১৮ সাল সংখ্যা	১৯২০ সন সংখ্যা
বাংলা	১২৬৪	১৭৪২
বোম্বাই	৫৬১	৭৪০
মাদ্রাজ	৩৭২	৪৩৫
যুক্তপ্রদেশ	১৪৪	১৫৯
ব্রহ্মদেশ	১২৬	১৩৮
আসাম	৬৯	২১
মহীশূর	৭৬	৭৯
পঞ্জাব	৯৭	৭৬
বরোদা		৪১
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৩	৩৯
গোয়ালিয়র		৩০
দিল্লী	১৭	২৯
মধ্যপ্রদেশ	২৬	২৬
আজমীর মাড়োয়ার	১৪	২০
ইন্দোর		১৮
বাঙ্গালোর	৯	৯
কুর্গ	১	২

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১	১

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বিনিময় (Exchange Bank) ব্যাঙ্ক ৩টি এবং যৌথকারবার ব্যাঙ্ক (Joint-Stock Bank) ২টি মোট ৫টি ব্যাঙ্ক ছিল

১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

বিনিময় (Exchange)	১২
যৌথকারবার	১৮
যে-সকল ব্যাঙ্কের মূলধন ১ লক্ষ টাকার বেশী এবং ৫ লক্ষ টাকার কম	২৩

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল

বিনিময় (Exchange)	১৫
বড় যৌথকারবার	২৫
যে-সকল ব্যাঙ্কের মূলধন এক লক্ষ টাকার কম এবং ৫ লক্ষ টাকার বেশী	৩৩

এমন কতকগুলি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, যেগুলি আয়ের জন্য পরিচালিত হয় না। কোনো হিতকর কার্য্যের জন্য গঠিত হইয়াছে, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল।—

বাংলা	১৮	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১
মাদ্রাজ	৪১	ব্রহ্মদেশ	১২
বোম্বাই	১৩	আজমীর মাড়োয়ার	১
বিহার	৩	বাঙ্গালোর	২
পঞ্জাব	২০		

১৯২২ সালের মার্চ্চমাসে ৭২টি যৌথকারবার রেজেষ্টারী হয়, ইহাদের সমবেত মূলধন ১৪৮৯ লক্ষ টাকা। বাংলায় যতগুলি কোম্পানী রেজেষ্টারী হয় তাহাদের মূলধন ১৩৩৭ লক্ষ টাকা (শতকরা ৯০) বোম্বাইএর যতগুলি কোম্পানী রেজেষ্টারী হয় তাহার মূলধন ৮৩ লক্ষ টাকা (শতকরা ১৯২১ সালের মার্চ্চমাসে ৫১টি কোম্পানী ২৬৮ লক্ষ টাকা মূলধনে রেজেষ্টারী হইয়াছিল। বাংলাদেশে অধিকাংশ যৌথকারবার ঋণ ও শিল্পবিষয়ে গঠিত, ইহাদের মূলধন ১০ কোটি টাকা। ১৯২০—২১ সালে ১০২২টি যৌথকারবার ১৪৭ কোটি টাকা মূলধনে রেজেষ্টারী হয়। ১৯২১-২২ সালে ৮০ কোটি টাকা মূলধনে ৭১৯টি যৌথকারবার রেজেষ্টারী হয়। এইসকল যৌথকারবারের অধিকাংশই অবাঙালীর মূলধনে অবাঙালীর উদ্যোগে গঠিত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের টাটা পরিবারের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত কল-কারখানার তালিকা :—

কারখানার নাম	মূলধন
১। আমেদাবাদ এডভান্‌স্ মিলস্,...	১০ লক্ষ টাকা
২। অন্ধ্র ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই কোং	২১০ লক্ষ "
৩। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারীং, কোং	৯৬৮৭৫০, টাকা
৪। ডেভিড মিলস্, কোং	২৪ লক্ষ
৫। ইণ্ডিয়ান্ সিমেণ্ট কোং	৬০ লক্ষ টাকা
ইণ্ডিয়ান হোষ্টেলস্ কোং	৩০ লক্ষ টাকা
৭। সিজউইক্ কলিন্স (ইণ্ডিয়া)	৫০ হাজার
৮। ষ্টাণ্ডার্ড মিলস্ কোং	১২ লক্ষ
৯। সুগার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (চিনি)	৫ কোটি
১০। স্বদেশী মিলস্ কোং	২০ লক্ষ
১১। টাটা ইলেক্ট্রো-কেমিক্যালস্	২৫ লক্ষ
১২। টাটা হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ার সাপ্লাই কোং	৩ কোটি

১৩। টাটা লোহা ও ইস্পাতের কারখানা ১০৫২১২৫০০৲ টাকা
১৪। টাটা মিলস্ ১ কোটি
১৫। টাটা অয়েল মিলস্ ১ কোটি
১৬। টাটা পাওয়ার্ কোং ৯ কোটি
১৭। টাটা পাবলিসিটি করপোরেশন্ ৫০ লক্ষ
১৮। টাটা সন্স, ২২৫ লক্ষ

কোন্ দেশের কত অধিবাসী বাংলাদেশে বাস করে, নীচের তালিকায় তাহা দেওয়া হইল :—

দেশের নাম	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
আজমীর মাড়োবার	৫০৬	১৪৪	৬৫০
আন্দামান নিকোবর	৪৮	৩২	৮০
বেলুচিস্থান	৬৯	২৮	৯৭
আসাম	২১৩৪৪	১৪৯৪৬	৩৬২৯০
বিহার-উড়িষ্যা	৮৬৮৪৩৭	৩৬১৫৪৪	১২২৯৯৮১
বোম্বাই	৪২৪৪	১৬৭৯	৫৯২৩
ব্রহ্মদেশ	১২৬০	১৩৩৬	২৫৯৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১০৩১০	৭৭০৬	১৮০১৬
কুর্গ	২	১	৩
মান্দ্রাজ	৭৩৩৮	৫৮৩২	১৩১৭০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৮৭৬	১৩৫	১০১১
যুক্তপ্রদেশ	২৯৪১৮২	১০৫৩৯৬	৩৯৯৫৭৮
পঞ্জাব	১৩৪৯০	৩৯৯২	১৭৪৮২
দেশীয় রাজ্য	৫৫০৮০	৩২৬৯৭	৮৭৭৭৭
আসাম দেশীয় রাজ্য	৮৩	৫২	১৩৫
বেলুচিস্থান দেশীয় রাজ্য	৭	১২	১৯
বরোদা	৮৮	৩৬	১২৪
বাংলার দেশীয় রাজ্য	১৭৭২৮	১৫৯৫৫	৩৩৬৮৩
বিহার-উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য	২২৭৬	১৬৮৬	৩৯৬২
বোম্বাই দেশীয় রাজ্য	১৮৫৯	৬১৬	২৪৭৫
মধ্যপ্রদেশ দেশীয় রাজ্য	৭৯৯	৮০০	১৫৯৯
মধ্যভারত এজেন্সী	২৪৩৪	৬৮৯	৩১২৩
মান্দ্রাজ দেশীয় রাজ্য	৭২	৩১	১০৩
হায়দ্রাবাদ	১১৪	১৩০	২৪৪
কাশ্মীর	২৪২	৫১	২৯৩
মহীশূর	২৮৭	১৪০	৪২৭
কোচিন	৩৫	১৩	৪৮
ত্রিবাঙ্কুর	৩৭	১৭	৫৪
সিকিম	১৬২৯	১৭২৫	৩৩৫৪
রাজপুতানা এজেন্সী	২৫৬৪০	১০১০৪	৩৫৭৪৪
পঞ্জাব দেশীয় রাজ্য	৮০২	২০৭	১০১২
যুক্তপ্রদেশ " "	১০১৭	৪৬৩	১৪৮০
ভারতের অন্যস্থলের	৬০	৪৬	১০৬
আফগানিস্থান	২৫৪১	৮৩	২৬২৬
আরব	৩৪৬	২১৯	৪৭৫
আর্মেনিয়া	৩	১২	১৫
ভূটান	৯৫০	৮৪৬	১৭৯৬
সিংহল	৮০	৪৩	১২৩
চীন	২৬৯৮	৩৮৭	৩০৮৫
চীন তুর্কিস্থান	২	০	২
হংকং	৩১	৮	৩৯
জাপান	৩৮	১০৮	১৪৬
মাঞ্চুরিয়া	২২	০	২২
মঙ্গোলিয়া	০	১	১
নেপাল	৫৯৬৯৭	৪৬৪৩৫	১০৬১৩২
পারস্য	৩৫১	৭৮	৪২৯
রুশীয় তুর্কিস্থান	৩	১	৪
শ্যাম	৯	০	৯
প্রণালী উপনিবেশ ও মালয়	৫২	৪৯	১০১
তিব্বত	১০৫৬	৪৭৬	১৫৩২
এসিয়ার তুরস্ক	৬৪	৬৬	১৩০
এসিয়ার অন্যান্য স্থান	৫	২	৭
ইউরোপ	১০২৪২	৩২৪৭	১৩৪৮৯
আয়ার্ল্যাণ্ড	৫৫৫	২৫৯	৮১৪
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	৬৯১৮	২০৪৫	৮৯৬৩
স্কটল্যাণ্ড	১৮৭৫	৫১৭	২৩৯২
অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী	১০২	৫৪	১৫৬
বেলজিয়াম্	৫৬	৯	৬৫
ডেন্মার্ক	৯	২	১১
ফ্রান্স	১০৪	৭১	১৭৫
জার্মানী	২৪৩	৬২	৩০৫
জিব্রল্টার্	৬	৩	৯
গ্রীস	৬৬	১৫	৮১
হল্যাণ্ড	৩২	২	৩৪
ইতালী	৭৬	৫৪	১৩০
মাল্টা	১৩	৮	২১
নরওয়ে	৩	৩	৬
পর্ত্তুগাল	১৪	২	১৬
রুমানিয়া	২	৩	৫
রুশিয়া	৪১	৭৯	১২০
স্পেন	২৩	১১	৩৪
সুইডেন	২২	১২	৩৪
সুইজার্ল্যাণ্ড	৩৪	১৬	৫০
ইউরোপ তুরস্ক	৪৪	১৯	৬৩
ইউরোপের অন্যান্য স্থান	২	০	২
আফ্রিকা	১৫৭	৭৫	২৩২
আবিসিনিয়া	১	০	১
কেপ কলোনী	৩	৫	৮
মিশর (ইজিপ্ট)	১৯	৫	২৪
মরিশাস্	৩২	১৭	৪৯
নেটাল	৩২	১২	৪৪
সেণ্টহেলেনা	২	০	২
ট্রান্সভাল	১	৩	৪
জাঞ্জিবার	৭	৫	১২
আফ্রিকার অন্যান্য স্থান	৬১	২৭	৮৮
ব্রিটিশ গিনি	৮	৩	১১
কানাডা	২২	২৫	৪৭
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	২	১	৩
যুক্তরাজ্য	১২	১৭	২৯
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	১৭	৩	২০

দেশের নাম	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
আমেরিকার অন্যান্য স্থানের	১১৪	৮৭	২০১
অষ্ট্রেলেসিয়া	১৯৩	১১১	৩০৪
অষ্ট্রেলিয়া	১২৪	৯৯	২২৩
বোর্নিও	১	০	১
জাভা	৩২	০	৩১
মানিলা	২	০	২
নিউজিল্যাণ্ড	২৮	১১	৩৯
ফিলিপাইন	৪	১	৫
তাস্‌মানিয়া	২	০	২
অন্যান্য স্থান	২৬	২০	৪৬

কোন্ দেশে কত বাঙ্গালী আছে নীচের তালিকায় তাহা দেওয়া হইল

দেশের নাম	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
আজমীর মাড়োয়ার	১৩৭	১৫২	২৮৯
আন্দামান নিকোবর	১০৮৯	১৩২	১২২১
আসাম	১০৯৪৬০	৮২১৫২	১৯১১১২
বেলুচিস্তান	৭৮	৪৫	১২৩
বিহার ও উড়িষ্যা	৮৫২৫৯	৬৮০৯২	১৫৩৩৫১
বোম্বাই	৪৭২০	১৬১৭	৬৩৪৭
ব্রহ্মদেশ	১২১০১১	১৩৯৭৪	১৩৪৯৮৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৯৯০	১৫৫০	৩৫৪০
কুর্গ্	৪	২	৬
মান্দ্রাজ	৩১০৭	৩৪৩০	৬৫৩৭
পঞ্জাব	২১৯৪	১৫৫৮	৩৭৫২
যুক্তপ্রদেশ	১১৮৫৪	১৩৭২৪	২৫৫৭৮
মণিপুর	১৯৮	১০২	৩০০
বরোদা	২২৬	১০৬	৩৩২
কোচিন	১৪	৮	২২
হায়দ্রাবাদ	৫৩৪	১৮৩	৭১৭
কাশ্মীর	৮৩	৪৮	১৩১
মহীশূর	২৪৩	১৬৯	৪১২
ত্রিবাঙ্কুর	১০০	২৪	১২৪
সিকিম	১৫৯১	১৪৬০	৩০৫১
বাংলার দেশীয় রাজ্য	৪৮০৩১	৩৭৪৬৪	৭৮৪৯৬
বিহার ও উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য	৬২৫৫	৫৭২৭	১১৯৮১
বোম্বাই " "	৩৫৯	১৩৬	৪৯৫
মধ্যভারত এজেন্সী	৬৪৯	৩৫৫	১০০৪
মধ্যপ্রদেশ দেশীয় রাজ্য	১৩৮৪	৮৬৮	২৫২২
মান্দ্রাজ " "	৬	২৪	১০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ "	৬	৬	১২
পঞ্জাব দেশীয় রাজ্য	১৪০	৯৫	২৩৫
যুক্তপ্রদেশ " "	১২৮	৩২	১৬০
রাজপুতানা এজেন্সী	৩৭৬	৩৬০	৭৩৬

নেপাল, ভুটান, তিব্বত, সিকিম প্রভৃতি সীমান্তস্থিত বৈদেশিক রাজ্যে বাঙ্গালা হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য আম্‌দানি-রপ্তানি হয়। এই-সকল রাজ্যের সহিত বাংলার ব্যবসা একরকম বেশ চলিতেছে। বাংলা দেশের সহিত এইসকল দেশের আম্‌দানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১১১৯-২০ সালে ১০১ লক্ষ টাকা এবং ১৯১০-১১ সালে ১৪৪ লক্ষ টাকা ছিল। যদিও বাংলাদেশ শিল্প-কার্য্যে ভারতবর্ষে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, তথাপি ইহাতে বাঙ্গালীর গৌরব খুবই কম, কারণ ইহা বাঙ্গালীর চেষ্টায় হয় নাই। বাঙ্গালী বাংলার সৌভাগ্যের ভাগী হইতে পারে নাই। শিল্প-জগতে টাটা-পরিবার যাহা করিয়াছেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাহা করিতে পারে নাই। কলিকাতা সহরে বড়বাজার, হ্যারিসন্ রোড, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, সূতাপটী, পগেয়াপটী, আর্মেনিয়ান্ ষ্ট্রীট, আমড়াতলা কটন্ ষ্ট্রীট, বটতলা, শাঁখতলা ষ্ট্রীট, প্রভৃতি স্থানে আসিলে ইহা বাংলা দেশের সহর বলিয়া বোধ হয় না। বাংলার কলকারখানা ছাড়িয়া দিলেও বাংলার ক্রয়-বিক্রয়ের কার্‌বারের শতকরা ৯৯ ভাগ অ-বাঙ্গালীর হাতে। প্রতি জেলায় যত জন উকিল আছেন, বাঙ্গালী ব্যবসাদারের সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেকও নহে। বাংলার সকল ব্যবসাই বিদেশীর হাতে। এত দিন পিতল-কাঁসার বাসনের কার্‌বার বাঙ্গালীর হাতে ছিল মাড়োয়ারী তাহাকেও গ্রাস করিতেছে। বাংলার ব্যবসা ও শিল্পদ্রব্য যদি বাঙ্গালীর হাতে থাকিত, তবে বাঙ্গালীকে ভাত-কাপড়ের জন্য পরপদ-সেবী হইতে হইত না। প্রতিবৎসর লক্ষ-লক্ষ বাঙ্গালী অকালে অনাহারে বিনা-চিকিৎসায় প্রাণ হারাইত না; বাংলার কোনো স্থানে দুর্ভিক্ষ দৃষ্ট হইত না; দৈবাৎ দুর্ভিক্ষ হইলেও বাঙ্গালীকে অন্যের সাহায্য-প্রার্থী হইতে হইত না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলায় জলের জন্য হাহাকার হইত না। গবর্ণমেণ্টের বিনা-সাহায্যে বাঙ্গালী সকল-প্রকার অভাব ও অসুবিধার প্রতিকার করিতে পারিত। বাংলার কৃষকগণ বৎসরে ১২। কোটি টাকা রাজস্ব দেন, ইহার উপর জমিদার ও তহশীলদারকে রাজস্ব বাদে অন্য পাওনাও দিতে হয়। বাংলার জমীদার-সম্প্রদায় গবর্মেণ্টকে বার্ষিক ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার রাজস্ব দেন। জমিদারেরা বৎসর-বৎসর ৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা দরিদ্র কৃষককুলের নিকট হইতে শোষণ করেন। অ-বাঙ্গালীরা বাংলায় আসিয়া বৎসর-বৎসর অন্যূন ৭০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করিতেছে। যদি এই ৭০ কোটি টাকা আমাদের হাতে থাকিত তবে আমরা বাংলার প্রতিগ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে পারিতাম, আমরা গ্রামে-গ্রামে জলাশয় ও কূপ খনন করিতে পারিতাম। বাংলার গৌরব লক্ষগুণে বৃদ্ধি পাইত। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রতিভা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইত। আজ প্রফুল্লচন্দ্রকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ত্যাগ করিয়া গ্রামে-গ্রামে খদ্দর-প্রচারে ব্রতী হইতে হইত না। বাঙ্গালীর অর্থে শান্তিনিকেতন পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইত। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া এখানে শিক্ষা পাইতেন।

কলিকাতা ও বাংলার অন্যান্য সহরে কুলী, মজুর, ফেরিওয়ালা, হালুইকর, পান-বিড়ি, ফল-বিক্রেতা, দারোয়ান, পিওন-চাপরাশী, পাহারাওয়ালা, নাপিত প্রভৃতি অ-বাঙ্গালী। এক-এক প্রদেশের লোক বাংলায় এক-একটা জিনিষের কার্‌বার অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কাপড়, সূতা ও বস্ত্রের কাজে মাড়োয়ারীরা; তামা ও পিতলের কাজে গুজরাতী, ভাটিয়া, খোট্টা; চুড়ি-দিয়াশলাই-এর-কাজে দিল্লীর মুসলমান: সুপারি, লঙ্কা, হরিদ্রা, প্রভৃতির কাজে ভাটিয়া, পাটের কাজে মাড়োয়ারী ও ইংরেজ, স্কচ, মোটর-চালকের কাজে পাঞ্জাবী ও কাঠের কাজে চীনাদের প্রভুত্ব বেশী। কলিকাতায় বড়বাজারে অনেক উড়িয়া মুটে প্রত্যহ যাহা উপার্জ্জন করে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উপাধিধারী তাহা করিতে পারে নাই। পাট বাংলার একচেটিয়া ব্যবসা, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর বিন্দুমাত্র হাত নাই। লাক্ষার ব্যবসা বাংলার বলিলেও হয়, কেননা হহা ছোট-নাগপুরের মানভূম ও সিংহভূম এবং রাঁচী জেলাতেই জন্মে, কিন্তু ইহাতেও বাঙ্গালীর কোনো হাত নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী রিষড়া নামক স্থানে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়; ইহার ১৫

বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃঃ অঃ বোম্বাইএ প্রথম কাপড়েরকল স্থাপিত হয়, অধুনা বাংলার ১২টি এবং বোম্বাই প্রদেশে .৮১টি কাপড়ের কল আছে। বাংলার ১১টি কলের মধ্যে ১০টি অবাঙ্গালীর মূলধনে অবাঙালীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। যদিও পাটের কারবার ও কলগুলি অবাঙ্গালীর হাতে তথাপি বাঙ্গালী কৃষকেরাই পাটের চাষ করে।

বোম্বাইএ তুলা ও কাপড়ের কলে যথেষ্ট লাভ হওয়ায় ইহার অংশের মূল্য বহু গুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। অধুনা স্বদেশী মিলের একশত টাকার একটি অংশের মূল্য ৫৪০০ টাকা, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া মিলে একশত টাকার একটি অংশের মূল্য ৫০১০৲, কোহিনুর মিল ৩৬৩০৲, নাগপুর মিল ৫০১৫, ড্যাভিড মিল ১৬৮০, করিমভয় মিল ১৭৭০, আমেদাবাদ অ্যাডভ্যান্স মিল ২৬৫০, বাংলাদেশে ডান্‌বার মিলের প্রতি অংশের মূল্য ৪২১, বেঙ্গল নাগপুর ৪২০। বোম্বাইএ অন্যান্য কলেও যথেষ্ট লাভ আছে। টাটা হাইড্রো-ইলেট্রিক্ একশত টাকার অংশের মূল্য ৮৪০, ইণ্ডিয়ান্ ব্লিচিং ১০০, বোম্বাই ডাইং ১৫৪৫, ইণ্ডিয়ান সিমেণ্ট ২৮২, কাটনী সিমেণ্ট ১৯০। পাটের কলে যথেষ্ট লাভ হওয়ায় ইহারও অংশের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে—গোন্দলপাড়া ও ফিনিসন্ কলের একশত টাকার একটি অংশের মূল্য ৯৩০ টাকা, কামারহাটী কলের একটি অংশের মূল্য ৬১৫ টাকা। গৌরীপুর ৬৫৪, নিউসেণ্ট্রাল ৬২০, কেলভিন ৮৯৫ টাকা।

কলের অংশের এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া, ইহাই প্রতীয়মান হয় আমাদের শিল্পের উন্নতির জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার যত অভাব, অর্থের তত অভাব নহে। স্বার্থপরতা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরবিদ্বেষ, আলস্য-হিংসা, গৃহ-বিবাদ, ইত্যাদির আতিশয্য ও সমবেত চেষ্টার স্বদেশহিতৈষণা ও স্বজাতি-প্রীতির অভাব আমাদের অধঃপতন, অকাল মৃত্যু ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। অধুনা বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত বাঙ্গালীর কোন সংস্রব নাই বলিলেও হয়। এখনকার বাংলার উন্নতি ও বাঙ্গালীর উন্নতি এক নয়। বাংলার শ্রীবৃদ্ধিতে বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। বাংলার ব্যবসায় ও শিল্পদ্রব্যের এইরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, অথচ বাঙ্গালীর দুরবস্থার অন্ত নাই। ৪৷৷ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে ১৭৷৷ লক্ষ লোক—শতকরা দুইজনেরও কম বিশুদ্ধ জল পান করিতে পায়। শতকরা ৯৮ জনের অধিক জল নামক একপ্রকার কর্দ্দমাক্ত তরল পদার্থ পান করে। বাংলাদেশে বহু সহরের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৬টিতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত আছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ৩৬টির অনেকগুলিতে জলাভাব হয়। গত ছয় বৎসরে ৬টি সহরে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। এই হারে জলের কল স্থাপিত হইলে একশত বৎসরে বঙ্গদেশে সকল সহরে জলের কল স্থাপিত হইবে। পল্লীগ্রামের কথা স্বতন্ত্র। ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাংলার পল্লীর জলকষ্টের প্রতিকার হইবে কি না, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গভর্মেণ্টের টাকার অভাব। বাঙ্গালী অন্নচিন্তায় বিব্রত, ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার; কাহার দ্বারা বাংলার জল-কষ্ট নিবারিত হইবে?

বিহার ও উত্তর ভারতের লোকেরা বলে, বাঙ্গালী তাহাদের দেশ লুটিয়া লইতেছে। বেহারীরা 'বেহার বেহারীরই জন্য' বলিয়া থাকেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এবং পৃথিবীর নানা দেশের লোক অবাধে বাঙ্গালার অর্থ শোষণ করিতেছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশে নানা জাতির দ্বারা সেইরূপভাবে অর্থ শোষিত হয় না। এখন 'বাংলা বাঙ্গালীর জন্য' বলা চলে না, কিন্তু 'বাংলা বিশ্বের জন্য' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী এখন কেবল ইংরেজের অধীন নহে। বহু জাতি বাঙ্গালীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এতগুলি জাতির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করা বাঙ্গালীর সাধ্য নহে। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী কলা ও পেঁপে গাছের মতন হইয়া আছে, সামান্য ঝড়েই ধরাশায়ী কিন্তু মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাতী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, কাবুলিরা বাংলায় বট ও আমগাছের মতন চারিদিকে মূল বিস্তার করিয়াছে। বড় বড় ঝড়েও তাহাদের একটা ডাল ভাঙ্গিতে পারিবে না। বোম্বাইএর ধনকুবেরদের নাম করিব না, কিন্তু বাংলার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিলে রামজশ আগরওয়ালা, হরিরাম গোয়েঙ্কা, কেশোরাম পোদ্দার, সুহিরাম পোদ্দার, ঘনশ্যাম দাস বিলা, স্বরূপচান্দ হুকুমচান্দ, শিউ প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা, বিশ্বেশ্বর লাল, হর গোবিন্দ, ওঙ্কার মল জেটিয়া প্রভৃতির সমকক্ষ লোক বাংলায় বিরল।

বাংলার জমিদারেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে যে-স্থান ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছেন, মাড়োয়ারী সেই স্থানেই দোকান খুলিয়া লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

বাংলার দীর্ঘ উপাধিধারী রাজা মহারাজাদের বার্ষিক যত টাকা আয়, এক-একটি পাটকল বা কোম্পানীর তাহার চেয়ে বহুগুণ আয় বেশী। হাওড়া মিল, এংলোইণ্ডিয়া জুটমিল, রিল্যায়েন্স জুট মিলের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় খরচা-বাদে ১৫ লক্ষ টাকা। বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর বার্ষিক আয় ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। অনেক কোম্পানী ও কলকারখানার বৎসরে ১৫ ২০ লক্ষ টাকা আয় হয়। জামশেদপুরের টাটার লোহার ও ইস্পাতের কারখানায় যত লোক প্রতিপালিত হয়; বাংলার সমস্ত আইন-ব্যবসায়ীর দ্বারা তত লোক প্রতিপালন হয় না। ইহা বড়ই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় যে, এখনও বাঙ্গালীর চৈতন্য হয় নাই। বাংলায় যে আসিতেছে সেই বড় লোক হইতেছে, আর বাঙ্গালী তাহারই ঘরে চাকরির দরখাস্ত লইয়া উপস্থিত হইতেছে। বাঙ্গালী কেবল ইংরেজেরই চাকরি করে তাহা নয়, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাতী, কচ্ছী, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টা, পার্শী প্রভৃতি সকলেরই গদিতে বাঙ্গালী চাকরি করিতেছে। চাকরির সময় বাঙ্গালীর জাতি-বিচার নাই। বরোদার জনৈক মুসলমান ধনীর কলিকাতা সহরে গদি আছে। তাঁহার প্রতিবেশী কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান এই গদি চালাইতেছেন। ইহারা কেহই মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যভাষা জানেন না। ম্যানেজার মাসে ৩০০ টাকা বেতন পান। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, মালয়, প্রণালী উপনিবেশ, জাপান, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানের সহিত এই গদির কাজ আছে। বিদেশের সহিত কাজ চালাইতে হইলে ইংরেজী জানা আবশ্যক, এইজন্য ইঁহারা একজন বাঙ্গালী টাইপিষ্ট রাখিয়াছেন; তাঁহার সাহায্যেই তাঁহারা বৈদেশিক কাজ চালাইতেছেন। অধিকাংশ মাড়োয়ারী বাঙ্গালীর সাহায্যে বিদেশের কাজ চালায়।

বাঙ্গালী যদি অকুণ্ঠিতচিত্তে মরণ পণ করিয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়, তবে কোনো কালে বাঙ্গালীর মঙ্গল হইবে না।

নূতন "ভূত"

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায়

মঙ্গলগ্রহ বুদ্ধিমান্ প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত কি না, এই লইয়া আজকাল তর্ক-কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে; বৈজ্ঞানিকদের এই কলহে সাধারণ লোকের হয়ত এইসব সুধীদের মধ্যম নারায়ণ তৈল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিবেন। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি আটাশ লক্ষ আশী হাজার মাইল, ইহা প্রথমে জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞেরা গণনা করেন, কিন্তু আধুনিক গবেষণায় সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আইন-ষ্টাইন সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা নিউটন-উদ্ভাবিত মহাকর্ষণের নিয়মাবলীর মধ্যে সামান্য ভুল দেখাইয়াছেন এবং এই বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ভয়ানক সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক বন্ধুগণ অভিযোগ করেন, এই একলক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের ন্যূনাধিক্যে আমাদের জ্ঞানের মাত্রা বিশেষ আর কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং আইন-ষ্টাইনের এই চুল-চেরা হিসাবের কি এত সার্থকতা।

আমাদের মুনি-ঋষিদের "পঞ্চভূত" এখন রাসায়নিক গবেষণায় বহু-সংখ্যক "ভূতে" পরিণত হইয়াছে। বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে "ভূতের" সংখ্যা বাড়িতে-বাড়িতে পাঁচ হইতে ছিয়াশীতে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি এক নূতন "ভূত" ভূতযোনি পরিত্যাগ করিয়া শরীরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাসায়নিকের হস্তে ধরা দিয়াছেন। অবৈজ্ঞানিক বন্ধুগণ হয়ত আবার বলিবেন যে, ছিয়াশীর জায়গায় সাতাশী করিয়া কি লাভ হইল।

বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম গণনার ও আবিষ্কারের প্রয়োজনের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদিগকে এক-কথায় বুঝানো কঠিন হইলেও, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই-সকল সূক্ষ্ম গণনা ও আবিষ্কার ফলিত জ্যোতিষ ও ফলিত রসায়নের মূলভিত্তি এবং ফলিত বিজ্ঞানের উপর আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সভ্যতা নির্ভর করিতেছে। ইহা ব্যতীত পর্য্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির বিভিন্ন অংশ হইতে রহস্য-যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বিশ্বনাথের সৃষ্টি-মহিমাকে আরও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছি।

সাধারণ বর্ণচ্ছত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কয়েকটি মূল-পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছিল, সম্প্রতি X-ray spectra বা রণ্টগেন রশ্মির সাহায্যে বর্ণচ্ছত্রের ফোটোগ্রাফ লইয়া একটি নূতন বিরল ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে X-ray বা রণ্টগেন রশ্মি এবং ইহার জন্মদাতা ক্যাথোড রশ্মি-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ক্রুক্‌স্-নলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করিলে ক্যাথোড-রশ্মি উৎপন্ন হয়। ক্রুক্‌স্-নলে কোনো জটিলতা নাই। একটা ফাঁপা কাঁচের নল—ভিতরটা প্রায় বায়ুশূন্য এবং উহার দুইদিকে কিঞ্চিৎ দূরে-দূরে দুইটি সূচ বসানো; সূচ-দুইটির ছিদ্রমুখ থাকে বাহিরে, অপর প্রান্ত থাকে নলের ভিতর। সকল নলের চেহারা এক-রকম থাকে না, বিভিন্ন-আকৃতির নল বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে, কোনটি খুব লম্বা, কোনটি মোটা, কোনটি বা খুব আঁকাবাঁকা আকৃতির থাকে। সূচ-দুটাও নানা-আকারের থাকে—সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়াম্ বা প্ল্যাটিনাম্ ধাতুর সূচ ব্যবহার হয়। কখনও-কখনও সূচের যে-প্রান্তটা নলের মধ্যে থাকে, সেই প্রান্তে অ্যালুমিনিয়ামের একটি ছোট বাটি বসানো থাকে, কিন্তু মোটামুটি ব্যবস্থা সকল নলের প্রায় এক-প্রকার। নলের সূচ দুটিকে তামার তার দ্বারা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের দুই প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। তাহাতেই নলের ভিতর বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়। যে-সূচটা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের ধন-প্রান্তে সংযুক্ত করা যায়, উহাকে অ্যানোড (Anode) ধনসূচ বা অনুলোম মেরু (Positive Pole) বলা হয়, আর যে-সূচটা উহার ঋণ-প্রান্তে সংযুক্ত হয় তাহাকে বলা হয় ক্যাথোড (Cathode)

বা ঋণসূচ বা প্রতিলোম মেরু (Negative Pole). প্রবাহ জন্মে উভয় তড়িতেরই। ধনের প্রবাহ ঘটে অনুলোম মেরু হইতে প্রতিলোম মেরুতে, আর ঋণের প্রবাহ ঘটে প্রতিলোম মেরু হইতে অনুলোম মেরুতে।

ধনেরই হউক বা ঋণেরই হউক, প্রবাহ জন্মে যখন নলের ভিতরকার বায়ুর পরিমাণ খুব কমাইয়া ফেলা হয়। তখন মেরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে—বিদ্যুৎ-প্রবাহ-পথে—একটা আলোক-রশ্মি দেখা যায়। বায়ুর পরিমাণ ক্রমে কমাইতে থাকিলে এই রশ্মিটি স্তম্ভাকার ধারণ করে এবং স্তরে-স্তরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তার পর দেখা যায় যে, আলোক-স্তম্ভটা ক্যাথোড স্যচ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, আর ক্যাথোডের সম্মুখে একটা অন্ধকারময় স্থান ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বায়ুর পরিমাণ খুবই কমাইলে এই অন্ধকার অংশটা শেষে সম্মুখস্থ কাঁচের আবরণটিকে স্পর্শ করে। তখন কাঁচ-নলের ঐ অংশটা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্ধকার হইতে আলোকের উৎপত্তি—আশ্চর্য্যের ব্যাপার বটে। আমরা জানি, আলোক-রশ্মি-সম্পাতেই যাবতীয় পদার্থ আলোকিত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রুক্‌স্‌-নলের এই অন্ধকারময় প্রদেশে এমন কোনো রশ্মি রহিয়াছে যাহার প্রভাবে সম্মুখস্থ কাঁচের নলটা এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। ক্রুক্‌স্‌ ইহার নাম দিলেন অন্ধকার-রশ্মি। অন্ধকার-রশ্মি-সম্পাতেই কাঁচের নলটা আলোকিত হয়। এই রশ্মিগুলি ক্যাথোড-স্যচের ঠিক সম্মুখ-স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য ক্রুক্‌সের এই অন্ধকার-রশ্মিগুলিকে গোল্ডষ্টীন্‌, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাথোড-রশ্মিনামে অভিহিত করেন এবং এখন ইহা এই নামে পরিচিত।

গোল্ডষ্টীন্‌ হিটর্ফ, ক্রুক্‌স্‌ পেঁয়্যা, প্রকার, লেনাড প্রভৃতি পদার্থতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা দ্বারা ক্যাথোড-রশ্মির এই সকল বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেখিতে পাইয়াছেন :—

(১) ইহারা আলোক-রশ্মির ন্যায় সোজাপথে চলে। নলের অন্ধকারময় দেশে একখানা অ্যালুমিনিয়ামের চাকৃতি বা অন্য কোনো ধাতুদ্রব্য রাখিলে সম্মুখস্থ কাঁচের দেওয়ালে উহার একটি কালো ছায়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায়, ক্যাথোড-রশ্মি সাধারণ আলোকের ন্যায় সরল-পথে চলে এবং ধাতু-সমূহ এই রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ।

(২) নলের ভিতর একটি ছোট লাইন বসাইয়া উহার উপর একখান ছোট গাড়ী রাখিয়া দিলে গাড়ীখানা রশ্মি-পথে ছুটিয়া চলে—যেন রশ্মি-মুখে গুলি-বর্ষণ হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় রশ্মিগুলি পদার্থের উপর চাপ প্রয়োগ করে।

(৩) চুণ, হীরক, কৃত্রিম পদ্মরাগমণি প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ এই রশ্মিপথে থাকিলে ক্রুক্‌স্‌ নলের কাঁচের আবরণের মতন অথবা তদপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিষ্মান্‌ হয়।

(৪) ক্রুক্‌স্‌-নলের উজ্জ্বল অংশটিকে বেশ উত্তপ্ত হইতেও দেখা যায়। রশ্মি-পথে ধাতু-দ্রব্য রাখিলে কখনো-কখনো উহা গলিয়া যায়।

(৫) অনেক সময় অনেক দিন ব্যবহারের পর নলের সাদা কাচ রঙীন হইয়া যায় অর্থাৎ ক্যাথোড-রশ্মি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত করে।

(৬) বিদ্যুৎ-পরিমাপক যন্ত্রের (Electroscope) সাহায্যে দেখা যায় যে, ক্যাথোড-রশ্মি ঋণাত্মক তড়িৎপূর্ণ ও নলের অবশিষ্টাংশ ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত।

(৭) ক্রুক্‌স্‌-নলের নিকট একখানা চুম্বক আনিলে নলের আলোকিত অংশটা একপাশে সরিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, চুম্বকের প্রভাবে ক্যাথোড-রশ্মি বাঁকিয়া যায়।

(৮) ক্যাথোড-রশ্মি ধাতুর পাতলা পাত ভেদ করিয়া যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু খুব পুরু পাত ভেদ করিয়া যাইতে পারে না।

এইসকল পরীক্ষা হইতে ক্রুক্‌স্‌-প্রমুখ বৈজ্ঞানিক অনুমান করিলেন যে, ক্যাথোড-রশ্মি একপ্রকার কণা-প্রবাহ মাত্র। কণিকাগুলিতে কঠিন, তরল, বা বায়ব কোনো পদার্থের লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই আবিষ্কর্ত্তা উহাদিগকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্যতম নেতা সার্‌ উইলিয়ম্‌ লজ এই অদ্ভুত কণাগুলি হইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে জানা গিয়াছিল যে, তাহারা আকারে ও গুরুত্বে লঘুতম পরমাণু অপেক্ষাও সহস্রগুণ ক্ষুদ্র ও ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট। এই অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ কণাগুলি

বর্ত্তমানকালে ইলেক্ট্রন্ বা অতিপরমাণু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এইবার রণ্টগেন-রশ্মি-সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে। কন্‌রাড্ হ্বিল্‌হেল্‌ম্ রণ্টগেন-নামক একজন জার্ম্মান দেশীয় পদার্থ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর পরীক্ষাগারে ক্রুক্‌স্-সাহেবের কাঁচের নলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিতে-করিতে অজ্ঞাতসারে কক্ষের একপার্শ্বে দৃষ্টিপাত করেন। সেই পার্শ্বে বেরিয়ম্-প্লাটিনো-সাএনাইড (Barium-platino-cyanide) নামক লবণ মাখানো একখানি মোটা কাগজ পড়িয়াছিল। রণ্টগেন দেখিতে পাইলেন যে, কাগজটি অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, অথচ ক্রুক্‌স্-নলটি এরূপভাবে কাগজ দ্বারা আবৃত ছিল যে, উহার ভিতর হইতে কোনোক্রমে সাধারণ আলো বাহিরে আসিতে পারে না; কয়েক মিনিট অনুসন্ধানের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কাঁচের নল হইতে কতকগুলি রশ্মি বাহির হইতেছিল। ঢাক্‌নিটা ভেদ করিয়া রশ্মিগুলি নুন-মাখা কাগজের উপর পতিত হইয়াছিল। রশ্মির গুণে কাগজখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই অজ্ঞাত রশ্মির নাম দিলেন এক্স-রে (X-ray)। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক্স-রে বা রণ্টগেন রশ্মি হইতে কোনো দৃশ্য আলোকের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু যেসমস্ত দ্রব্যের ভিতর সাধারণ আলো প্রবেশ করিতে পারে না, রণ্টগেন-রশ্মি তাহাদের ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করে। রণ্টগেন এই অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে অনেক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কক্ষের এক-কোণে একটি কাঠের বাক্সের ভিতর কতকগুলি লৌহাদি পদার্থ ও কালো কাগজে উত্তমরূপে জড়ানো একখানি ফোটোগ্রাফির কাঁচ বাক্সের গায়ে হেলানো ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বাক্সের ভিতর যে-সমস্ত ধাতু ছিল, ফোটোগ্রাফির কাঁচের উপর তাহাদের ছবি পড়িয়াছে, অথচ বাক্স বা ফোটোগ্রাফির কাঁচের ভিতর-বাইরের কোনো আলো প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। আরও দেখিলেন যে, তাঁহার হস্ত পূর্ব্বোক্ত কাঁচের নল এবং বেরিয়াম্-প্লাটিনো-সাএনাইড-মাখানো কাগজের মধ্যে স্থাপন করিলে কাগজের উপর হাতের হাড়ের প্রতিমূর্ত্তি মাংসের অপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে পড়িয়াছে। তিনি কাগজের পরিবর্ত্তে কালো কাগজে-জড়ানো একখানি ফোটোগ্রাফির কাঁচ হাতের উপরে রাখিলেন; পরে যখন সেটিকে ক্রমে বিকশিত (develop) করা হইল, তখন দেখা গেল যে, ফোটোগ্রাফির কাঁচের উপর হাতের হাড়ের প্রতিমূর্ত্তি অতি স্পষ্টভাবে পড়িয়াছে। তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী দর্শনে যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া এবং অস্ত্র-চিকিৎসকগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে স্থানীয় চিকিৎসালয়ে তাঁহার এই নব আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ প্রেরণ করেন। তার পর ক্রমে-ক্রমে সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই রণ্টগেন-রশ্মির অভাবনীয় ক্রিয়ার পরীক্ষা হইতে লাগিল।

রণ্টগেন-রশ্মির প্রধান ধর্ম্ম এই যে, সাধারণ আলোক-রশ্মি যেসকল পদার্থ ভেদ করিতে সমর্থ নহে, এরূপ অনেক পদার্থকেই রণ্টগেন-রশ্মি অক্লেশে ভেদ করিয়া যায়। ক্রুক্‌স্-নল লইয়া পরীক্ষা-কালে রণ্টগেন যে মোটা কাগজের আবরণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উহা এই রশ্মির পক্ষে নিতান্ত স্বচ্ছ। কাগজ, কাপড়, কাঠ, চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতি সাধারণ আলোকের পক্ষে অস্বচ্ছ হইলেও রণ্টগেন-রশ্মির পক্ষে বেশ স্বচ্ছ। রণ্টগেন-রশ্মির এই ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রকৃতই অদ্ভুত। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রণ্টগেন-রশ্মির আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শ্রুতি-গোচর হয় নাই, এরূপ ব্যক্তি বিরল। যে-রশ্মির সাহায্যে বাক্স না খুলিয়াই ভিতরকার টাকা-কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, চামড়া না চিরিয়া হাত-পায়ের হাড় দেখিতে পাওয়া যায়, বিনা অস্ত্র-প্রয়োগে শরীরের কোন্ স্থানে গুলিবিদ্ধ হইয়াছে অথবা শরীর-যন্ত্রের কোথায় কোন্ বিকৃতি ঘটিয়াছে, ইহা নিরূপণ করিতে পারা যায়, এরূপ আবিষ্কারে যে বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অদৃশ্যকে দৃশ্য করাই রণ্টগেন-রশ্মির প্রধান গুণ। যাহা কল্পনার অতীত ছিল, রণ্টগেন-রশ্মি তাহা সম্ভব করিয়াছে।

কন্‌রাড্ হ্বিল্‌হেল্‌ম্ রণ্টগেন ১৮৪৫ অব্দে ২৭শে মার্চ্চ জার্ম্মান দেশে রাইন-প্রদেশের অন্তর্গত লেনেপ-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার অলৌকিক স্মৃতিশক্তি, প্রবল অধ্যবসায় ও বিদ্যাশিক্ষায় তীব্র অনুরাগ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্মানের সহিত জুরিক্

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হইলে হোহেনহাইম্ নগরস্থ কৃষিবিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পর ১৮৭০ অব্দে তিনি হ্বুর্ট্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান-বিভাগে অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হন। তিনি তথায় একাগ্রচিত্তে কেবল তড়িৎ-শক্তিরই বিষয়ে গবেষণা করিতেন। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলে ১৮৯৫ অব্দে তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য রণ্টগেন-রশ্মি আবিষ্কার করিয়া একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ বলিয়া অশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০১ অব্দে তিনি জগদ্বিখ্যাত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় গত বৎসর এই মনীষী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে রণ্টগেন-রশ্মির উৎপত্তি হইতেছে ক্যাথোড-রশ্মি বা ইলেক্ট্রন্-প্রবাহ হইতে। কাঁচ-নলের যে-স্থানে ক্যাথোড-রশ্মি পতিত হয় উহাই রণ্টগেন-রশ্মির উৎপত্তি স্থান। ঐ স্থানটি যে বেশ উজ্জ্বল হয় ও গরম হয়, ক্রুক্স্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা দেখিয়াছিলেন; কিন্তু ঐস্থান হইতে যে নূতন-রকমের রশ্মি নির্গত হইয়া থাকে, যাহা কাঠ, কাগজ, রক্ত, মাংস অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতে পারে, উহা আবিষ্কার করিলেন রণ্টগেন। ক্রমে দেখা গেল যখনই ক্যাথোড-রশ্মি কোনো কঠিন পদার্থে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই ঐ স্থান হইতে রণ্টগেন-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্যাথোড্-রশ্মি হইতে উৎপন্ন হইলেও রণ্টগেন-রশ্মি ক্যাথোড্-রশ্মি নহে, কেননা ক্যাথোড্-রশ্মির এত ভেদ করিবার শক্তি নাই এবং ক্যাথোড্-রশ্মির মতন রণ্টগেন-রশ্মির উপর চুম্বকের প্রভাব নাই। ইহা সাধারণ আলোক-রশ্মি নহে, কেননা ইহা অদৃশ্য। সাধারণ আলোক-রশ্মি এত তীক্ষ্ণ নহে এবং সাধারণ আলোকের যেগুলি বিশেষ ধর্ম্ম—প্রতিফলন (Reflection), তির্য্যক্বর্ত্তন (Refraction) ও সমতলীভবন (Polarisation), উহার কোনোটাই রণ্টগেন-রশ্মিতে পরিস্ফুট নহে।

উহা ক্যাথোড-রশ্মি নহে, আলোক-রশ্মিও নহে, ধারাবাহিক কণা-প্রবাহও নহে, ধারাবাহিক তরঙ্গ-প্রবাহও নহে, সুতরাং প্রশ্ন উঠে, উহা কোন্ জাতীয় রশ্মি ?

এপর্য্যন্ত যতগুলি রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই হয় কণা-বাদের অথবা তরঙ্গ-বাদের অন্তর্গত করা চলে। রণ্টগেন-রশ্মিকেও ইহার একটা কোঠায় না ফেলিলে বৈজ্ঞানিকের তৃপ্তিলাভ ঘটে না।

অধ্যাপক ষ্টোক্স্ বলিলেন, কণা-বাদে চলিবে না, খাঁটি তরঙ্গ-বাদেও সুবিধা হইবে না—একটা বিশিষ্ট তরঙ্গ-বাদের প্রয়োজন। ইলেক্ট্রনের ধাক্কা হইতে যাহার উৎপত্তি—যাহাকে বলা হয় রণ্টগেন-রশ্মি—উহা কণাজাতীয় নয়, তরঙ্গ-জাতীয়, তবে আলোক-তরঙ্গের ন্যায় উহারা একটির পর একটি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলে না—উহারা খাপছাড়া তরঙ্গ। এইজন্যই আলোক-তরঙ্গের বিশেষ ধর্ম্মগুলি রণ্টগেন-রশ্মিতে সেরূপ প্রকট নহে। রণ্টগেন-রশ্মির তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র।

আমরা যাহাকে আলোক বলি, তাহা সর্ব্বব্যাপী ইথার-নামক এক পদার্থের (?) তরঙ্গ হইতে নাকি উৎপন্ন। ইথারকে দেখা যায় না, কিন্তু ইহা সর্ব্বস্থানে অবস্থান করে। বায়ু কেবল পৃথিবীর উপরেই আছে—নব্বুই কি একশত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিলে আর বায়ুর অস্তিত্ব থাকে না। সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতিষিক অ্যাব্বে মোরো (Abbe-Moreaux) উদীচ্য ঊষা (Aurora Borealis) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বায়ু-স্তর ৫৪০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ইথার জিনিষটা সে প্রকার নয়, ইহা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছে। বায়ুতে বা জলের কোনো স্থানে একটু আলোড়ন উপস্থিত হইলে যেমন তরঙ্গাকারে সেই আলোড়ন চারিদিকে ছুটিয়া চলে, ইথারেও তাহাই হয়। কোটি-কোটি মাইল দূরের জ্যোতিষ্কে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ইথারের যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহা তরঙ্গ-পরম্পরায় আসিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয় এবং এই ধাক্কাতেই আমরা আলোককে দেখিতে পাই। শব্দ বা ধ্বনির বৈচিত্র্য বায়ুর তরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম বা বায়ুর কম্পন-সংখ্যা যত অধিক হইবে, শব্দও তত চড়িতে থাকিবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই কম্পন সংখ্যা ৩৮,০০০ বার হইলে শব্দ এতই চড়িয়া যায় যে, তাহা তখন আমাদের কর্ণদ্বারা অনুভূত

হয় না। আবার কম্পন-সংখ্যা কমাইতে-কমাইতে সেকেণ্ডে ৩০ বারের কম হইলে শব্দ এতই গম্ভীর হইয়া যায় যে, তাহা আর কোনোক্রমেই শ্রুতি-গোচর হয় না। তেমনই জলন্ত পদার্থ হইতে জাত আলোক-তরঙ্গদ্বারা যেসকল বর্ণ উৎপন্ন হয়,মানব-চক্ষু তাহার সকলগুলি দেখিতে পায় না,—অনন্ত আকাশ-ব্যাপী অনন্ত তরঙ্গের প্রত্যেক হিল্লোল লক্ষ্য করা সসীমমানবের সম্পূর্ণ অসাধ্য ব্যাপার, তাই আমরা অনতিবিস্তৃত সাধারণ বর্ণচ্ছত্রে কেবল লোহিত হইতে ভায়োলেট পর্য্যন্ত কয়েকটি বর্ণ দেখিয়া থাকি। লোহিত বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা বৃহত্তর তরঙ্গদ্বারা যে বর্ণ উৎপন্ন হয়,তাহা ক্ষুদ্রদৃষ্টি মানব কিছুতেই দেখিতে পায় না এবং ভায়োলেট উৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কম্পনদ্বারা যেসকল বর্ণ বিকশিত হয়, তাহাও মানব-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। তাই দর্শন-কার্য্যে চক্ষুর অপকর্ষতা লক্ষ্য করিয়া জনৈক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—"মানব-চক্ষুর ন্যায় একটি অসম্পূর্ণ স্থূলযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিলে তাহা চিরকালই অবিক্রীত থাকিত"।

রণ্টগেন-রশ্মির তরঙ্গ সাধারণ আলোক-তরঙ্গের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহার দৈর্ঘ্য ভায়োলেট-উৎপাদক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সহস্রতম অংশ মাত্র। সেই জন্যই ইহা অদৃশ্য।

অদৃশ্যালোকের প্রকৃত বর্ণ কি তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত, অসম্পূর্ণ মানব-দৃষ্টি উক্ত আলোক-উৎপাদক কম্পন কোনোক্রমেই অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ভায়োলেট-উৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর তরঙ্গযুক্ত অদৃশ্য কিরণের রাসায়নিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং এই শক্তিই এই অদৃশ্য আলোকের একমাত্র অস্তিত্ব-জ্ঞাপক। ফোটোগ্রাফের কাঁচ এই আলোকে উন্মুক্ত রাখিলে তৎক্ষণাৎ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কাঁচের বিকৃতি দেখিয়া আমরা অদৃশ্যালোকের অস্তিত্ব জানিতে পারি। সেই জন্যই রণ্টগেন-সাহেবের পরীক্ষায় রণ্টগেন-রশ্মির অস্তিত্ব-জ্ঞাপন করিবার জন্য ফোটোগ্রাফির কাঁচ বা চুন-মাখানো কাগজের প্রয়োজন। চুন-মাখানো কাগজের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্যই রণ্টগেন এই বিখ্যাত রশ্মির অস্তিত্ব ধরিতে পারিয়াছিলেন।

যুবক বৈজ্ঞানিক মোজ্‌লী গত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দেখাইয়াছেন যে, ক্যাথোড-রশ্মি মৌলিক পদার্থকে ধাক্কা দিবার পর যে রণ্টগেন-রশ্মি উৎপাদন করে, উহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পন-সংখ্যা (wave-length and frequency) মৌলিক পদার্থের প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে উদ্ভূত রণ্টগেন-রশ্মি রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করিতে দিয়া ফোটোগ্রাফির কাঁচের উপর পাতিত করা হয়। ফোটোগ্রাফির কাঁচটি ক্রমে বিকশিত (develop) করিয়া উহার সাহায্যে কম্পন-সংখ্যা (number of frequencies) নির্ণয় করা হয়। এইরূপে তিনি প্রত্যেক মূল-পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া এক পদার্থকে অন্য মূল পদার্থ হইতে একটি বিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা (Atomic Number) পৃথক্ করিতে প্রয়াস পান।

এইসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ রুশ-বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ এক নূতন নিয়ম আবিষ্কার করেন। সঙ্গীতের স্বরলিপিতে যেমন প্রত্যেক সপ্তকের পর স্বরের পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে, মূল পদার্থগুলিকে আণবিক গুরুত্ব-অনুসারে সাজাইয়া গেলে সেইরূপ দেখা যায় যে, প্রথম সাতটি মৌলিকের পরবর্ত্তী মৌলিকসমূহে পূর্ব্বের গুণসমূহের পুনরাবির্ভাব হইতে থাকে। পরমাণুর ওজনের এই ক্রমিক বৃদ্ধির হিসাব ধরিয়া যে তালিকা রচিত হয়, তাহার নাম মেণ্ডেলিফের তালিকা। এই তালিকায় প্রতি-মৌলিকের অষ্টম মৌলিক দ্রব্যগুণ ও অপরাপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রায় এক-ধর্ম্মাবলম্বী। এই অষ্টম মৌলিকের (Law of Octaves) নিয়ম মানিয়া বৈজ্ঞানিকগণ নূতন-নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। অনাবিষ্কৃত প্রত্যেক অষ্টম-মৌলিকের গুণ ও তাহার পরমাণুর ওজন এই হিসাব ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক আগে হইতেই বলিয়া দিতে পারেন। অবশ্য এইসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, মেণ্ডেলিফের নিয়ম অভ্রান্ত নহে এবং ইহা সর্ব্বত্র অবিসংবাদে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু মোজলী তাঁহার আণবিক সংখ্যার (Atomic Number) সাহায্যে মেণ্ডেলিফ যাহা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, তাহা বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন। তিনি আরও

দেখাইয়াছেন যে, মৌলিকের সংখ্যা অগণনীয় বা অনির্দ্দিষ্ট নহে। ইহাদের সংখ্যা বিরানব্বই। পদার্থশাস্ত্র ও রসায়ন-শাস্ত্রের দুর্ভাগ্য যে, এই মনীষী অকালে ২৮ বৎসর বয়সে বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ডার্ডানালিসের যুদ্ধে তুর্কহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

এই আণবিক সংখ্যার আরও একটি বিশেষত্ব আছে। আধুনিক গবেষণায় রাদার্‌ফোর্ড ও বোর্‌কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রতিপরমাণু-গোলকের মধ্যে একটি কোষ (nucleus) বর্ত্তমান। এই কোষের মধ্যে সমগ্র সংযোগ তড়িৎ ও কিয়দংশ ঋণাত্মক তড়িৎ-সঞ্চিত আছে। এই কোষকে কেন্দ্র করিয়া সৌরজগতের গ্রহের ন্যায় ইলেক্ট্রন্‌গুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আণবিক সংখ্যা ও এই ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রনের সংখ্যা উভয়েই সমান।

সম্প্রতি ডেন্‌মার্কের বৈজ্ঞানিক ডি কষ্টার ও অষ্ট্রিয়ার সুবিখ্যাত রাসায়নিক ফন্ হেভেসী কোপেনহেগেনে একত্র গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে রন্টগেন-রশ্মির সাহায্যে বর্ণচ্ছত্রের ফোটোগ্রাফ হইতে একটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার আণবিক সংখ্যা ৭২ ও আণবিক গুরুত্ব প্রায় ১৮০। এতদিন ইহা জিরকোনিয়াম্ (zirconium) নামক আর-একটি ধাতুর সহিত এমনভাবে মিশিয়াছিল যে, উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয়কে উহার পৃথক্ অস্তিত্ব আবিষ্কারে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই মৌলিকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে বৈজ্ঞানিকদ্বয় উহার নাম দিয়াছেন হ্যাফনিয়াম্ (Hafnium)। কোপেনহেগেনের পুরাতন ল্যাটিন নাম হ্যাফনিয়া (Hafnia). আবিষ্কর্ত্তার রাজধানীর নামে এই নূতন ধাতুর নামকরণ হইয়াছে। মজার কথা এই যে,ইংরেজ রাসায়নিক ডাক্তার স্কট্‌কে তাঁহার এক বন্ধু কয়েকবৎসর পূর্ব্বে নিউ-জীলণ্ড হইতে একপ্রকার বালুকার নমুনা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ইহা বিশ্লেষণ করিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, হয়ত ইহার মধ্যে নূতন ধাতু আছে, তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার অবসর পান নাই। পরে সুবিধামত পরীক্ষা করিবেন ভাবিয়া উহা ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে কষ্টার্ ও হেভেসী রন্টগেন-রশ্মির সাহায্যে ইহার আবিষ্কার করায় তিনি বিশেষ দুঃখিত না হইয়া ও হা-হুতাশ না করিয়া সেই নমুনার বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, উহা হ্যাফনিয়াম্ ছাড়া কিছুই নয়। তিনি পোটাসিয়াম্ ও ক্লোরিন্-এর সঙ্গে এই ধাতুর এক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার আণবিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ও খানিকটা ধাতু কোপেনহেগেনে কষ্টার্ ও হেভেসির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে এই ধাতুর ধর্ম্ম জির্‌কোনিয়াম্ ও টাইটেনিয়াম্ ধাতুর অনুরূপ। গ্রীক্ পুরাণে টিটান এক-দল দৈত্যের নাম। ঐ দলের একজন দৈত্যের নাম ওশিয়েনিয়াম্। টাইটেনিয়ামের সঙ্গে নূতন ধাতুর সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক হ্যাফনিয়াম্ নাম না দিয়া ওশিয়ানিয়াম্ (Oceanium) নাম দিতে চান। রসায়ন-শাস্ত্রের আন্তর্জাতিক অধিবেশনে নামটি স্থিরীকৃত হইবে, তবে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রথম নামের পক্ষপাতী।

বিরানব্বইটি মৌলিকের মধ্যে সাতাশীটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাকী পাঁচটির মধ্যে দুইটি ম্যাঙ্গানিজ-(Manganese)-জাতীয়। আশা করা যায়, ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত আকরিক পদার্থ (minerals) রন্টগেন-রশ্মি-সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দুইটি অজ্ঞাত মৌলিকের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে।

সাতাশীটি মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইলেও এখন আমরা জানি যে, প্রত্যেক মূল পদার্থের মধ্যে ইলেক্ট্রন্ আছে এবং ইলেক্ট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতার জন্য মূল পদার্থের প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। একই মূল পদার্থ হইতে যে সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয়, অনেক প্রাচীন পণ্ডিত ইহা বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিলেটুস্ নগরস্থ থালেস্ (Thales of Miletus) বিশ্বাস করিতেন যে, জলই এক-মাত্র মূল পদার্থ। অ্যানেক্সিমিনেস্ (Anaximines) বায়ুকে, হেরাক্লাইটস্ (Heraklcitos) অগ্নিকে, ফেরে-সাইডেস্ (Pherekides) মৃত্তিকাকে ও প্রাউট (Prout) হাইড্রোজেনকে একমাত্র মূল পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মেণ্ডেলিফ্ এই একমাত্র মূল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন ও পুরাতন গ্রীক্ পণ্ডিতগণের উদ্দেশে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ইহারা অনেকগুলি দেবতাতে বিশ্বাস করিয়া কি-প্রকারে

এক মূল পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, বুঝিতে পারি না।

সকল পদার্থের গোড়ায় একটা মূল পদার্থের উপস্থিতি থাকা সম্ভব বলিয়া ক্রুক্‌সের মনে হইয়াছিল। তিনি এই মূল পদার্থের নাম দিলেন প্রটাইল (Protyle)। ইনি তাঁহার বীক্ষণাগারে বসিয়া বিশ্ব-রচনার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।* তাঁহার মনে হইল তাঁহার আবিষ্কৃত সেই সূক্ষ্ম কণাগুলি যেন কোনো-এক অজ্ঞাত শক্তিতে একত্র হইয়া হাইড্রোজেনের পরমাণু রচনা করিতেছে। তাহারই সহিত আবার কতকগুলি নূতন কণিকা অল্পাধিক-পরিমাণে মিলিত হইয়া গন্ধক, আর্সেনিক্‌, লৌহ, স্বর্ণাদির সৃষ্টি করিতেছে ও সমবেত কণিকার সমষ্টি অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে ইউরেনিয়াম্‌ প্রভৃতি গুরুধাতুর সৃষ্টি হয়। স্বপ্নের শেষে দেখিতে পাইলেন সেই বিদ্যুদ্বাহক কণিকা লঘুগুরু পদার্থের জন্ম দিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, গুরু ধাতু হইতে গোলাগুলির মতন ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাকে লঘুতর পদার্থে পরিণত করিতেছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ক্রুক্‌সের পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সত্যই স্বপ্নের ন্যায় ছিল, বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবে কিন্তু তাহাই সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইলেক্‌ট্রনের সহিত প্রথম পরিচয় ক্রুক্‌স্‌-নলের মধ্যে এবং ইহাদের উৎপত্তি তড়িৎ-শক্তি-প্রভাবে। কিন্তু ক্রমে বৈজ্ঞানিকেরা দেখিলেন ইহা সর্ব্বত্র বিরাজমান। এখন পদার্থতত্ত্ববিৎগণ বলিতেছেন, এই যে নদী-সমুদ্র-প্রাণী-উদ্ভিদময় জগৎ দেখিতেছি, ইহা মূলে কিছুই নয়। জড় বলিয়া বিশ্বে কোনো জিনিষ নাই। জড়ের সূক্ষ্মতম কণা অর্থাৎ পরমাণুকে যদি ভাঙিয়া হাজারটি বা ততোধিক সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ করি, দেখিব এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলি সেই ইলেক্‌ট্রনের মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে। আবার ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি খাঁটি বিদ্যুতের কণিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই বলিতে হইতেছে, এই ব্রহ্মাণ্ড এক বিদ্যুতেরই রূপান্তর—অর্থাৎ জগতে জড় নাই—এক শক্তিকে লইয়াই বিশ্ব।*

* প্রবন্ধের কিয়দংশের জন্য অধ্যাপক সিল্‌ভেনাস্‌ টম্‌সন্‌ প্রণীত "দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোক" নামক পুস্তকের নিকট লেখক ঋণী।

কাব্যের আর-একটি উপেক্ষিতা

শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের সৌন্দর্য্য ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া "মুকুলিকা বালিকা-বয়সী" বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া স্বামীরূপে পাইবার জন্য কামনা করিয়াছিল। নদীয়ার জনাকীর্ণ ঘাটগুলির মধ্যে যেটিতে যেমন সময়ে শচীদেবী স্নান করিতে আসিতেন, এই বালিকাও ঠিক সেই সময়ে সেই ঘাটটিতে আসিয়া উপস্থিত হইত, আর নানারূপ সেবা করিয়া শচীমাতার প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করিত।

> আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে
> নম্র হই নমস্কার করেন চরণে।
> চৈঃ ভা, আদি, দশম অধ্যায়।

নিমাই পণ্ডিত যখন বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে লক্ষ্মীদেবী আর ইহজগতে নাই, তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরের গোপন কামনা সফলতা লাভ করিতে চলিল। শীঘ্রই নিমাই পণ্ডিতের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের জীবন ধন্য হইল বলিয়া মনে করিল।

মুরারিগুপ্ত, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিতলেখক সকল বৈষ্ণব কবিই বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ জাঁকজমক করিয়া বর্ণনা করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে পাইয়া নিমাই

পণ্ডিত সত্যসত্যই যে সুখী হইয়াছিলেন, সে-সংবাদটি আর কেহ জানুন বা না জানুন, মুরারিগুপ্ত জানিতেন।

মুরারীগুপ্ত নবদ্বীপের অধিবাসী,—নিমাই পণ্ডিতকে তিনি বড় স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাই লক্ষ্মীর বিরহ নিমাই ভুলিতে পারিয়াছেন কি না, একথাটি জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইয়াছিল। তিনি নিজে জানিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণঢালা প্রেমে ডগমগ নিমাইয়ের যে বর্ণনাটি দিয়াছেন, তাহা আর কোনো কবিই দিতে পারেন নাই।

শ্লোকটি এই :—

> সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবিলাসবিভ্রমৈঃ
> ররাজ রাজদ্বর-হেম-গৌরঃ।
> বিষ্ণুপ্রিয়া ললিতপাদপঙ্কজো
> রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্র-মৌলিঃ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই সুখের দিনের শীঘ্রই অবসান হইল। যে নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তিনি ত তাঁহার প্রেমতৃপ্ত স্বামী নহেন, তিনি কোন্ এক অজানা লোকের অপরূপ প্রেমের আস্বাদ পাইয়া একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছেন। ঘরে থাকা আর তাঁহার চলে না। তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন একথা ভক্তগণের মধ্যে জানাজানি হইল। তাঁহারা সকলে তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, নিমাইকে ঘরে রাখিবার জন্য শচীদেবী আকুল ক্রন্দন করিয়াও তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না। এইসকল কথা বিস্তার করিয়া, কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করিয়া, বৃন্দাবনদাস, মুরারীগুপ্ত প্রভৃতি আমাদিগকে বলিয়াছেন।

কবি বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব-সমাজের কণ্ঠহারস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেম বর্ণনা করিয়া ঐ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের মুকুটস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থখানির লেখক, যিনি প্রথমে একটুমাত্র আভাস দিলেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়া বাল্যকাল হইতে নিমাই পণ্ডিতের প্রতি অনুরাগ-শীলা, তিনিই পরে যেন লিখিতে-লিখিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা একবারে ভুলিয়া গেলেন। নিমাই যাহাতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া না যান, সেইজন্য নিত্যানন্দ গদাধর প্রভৃতি তাঁহার অনাথা মাতার কি অবস্থা হইবে তাহাই বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—

> স্থির হই নিত্যানন্দ মনে-মনে গণে।
> প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিবে কেমনে।
> কেমতে বঞ্চিব আই কাল দিন রাতি।
> এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি।

কাহারও কি ভুলিয়াও একবার বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা মনে আসিল না?

শ্রীচৈতন্যের চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব-সমাজে পূজিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও লেখনী হইতে কি একটি পংক্তিও বিষ্ণুপ্রিয়ার গভীরতম শোক বর্ণনার জন্য বাহির হইল না?

তাঁহারা বলিয়াছেন যে, নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে, পশু পক্ষী তরু লতা আদি কেহই না কাঁদিয়া থাকিতে পারে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া কি পাষাণী যে এই নিদারুণ শব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল না? তাঁহার নয়নকোণে অশ্রু কি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল যে তাহার এক বিন্দুও জীবনের এই ভীষণ মুহূর্ত্তে পতিত হইল না?

বৈষ্ণব কবিগণের এ উপেক্ষার কারণ কি? তাঁহারা সকলেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী এইজন্যই কি অমন স্বামী হারাইয়া স্ত্রীর কি গভীর বেদনা হয় তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই? না, তত্ত্বের দিক্ দিয়া অর্থাৎ বৃন্দাবন-লীলার সহিত নবদ্বীপ-লীলার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থান বৃন্দাবনে বৈষ্ণব কবিগণ খুঁজিয়া পান নাই বলিয়া, তাঁহাকে আর বেশী করিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত মনে করেন নাই?

অথবা ইহা উপেক্ষা নহে—সম্ভ্রম? অন্যান্য সকলের দুঃখ বর্ণনা করা যায় কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ভাঙা দুঃখ মানুষের বর্ণনার অতীত বলিয়া তাঁহারা আর সে-বিষয়ে কিছুই বলেন নাই—একবারে নিস্তব্ধ রহিয়া গিয়াছেন?

সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রিতে ও তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না ইহা লইয়া শ্রীচৈতন্যের চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মুরারী-গুপ্তের গ্রন্থ এ বিষয়ে আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্যও বলিয়া মনে হয়। তিনি স্পষ্টতঃ কিছু না বলিলেও, তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, যে উভয়ের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

শান্তশ্চ সর্ব্বরসিকেশ্বর গৌরচন্দ্রো।
সুষ্মাং নিনায় রজনীং চ তদুত্থিতোৎসুকাৎ॥

বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট বলিয়াছেন যে সে-রাত্রি তিনি গদাধর ও হরিদাসের নিকটে শয়ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারোই এবিষয়ে সঠিক সংবাদ জানিবার উপায় ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আর, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে জয়ানন্দের গ্রন্থে নানারূপ অসঙ্গতি থাকার জন্য ও লোচনের গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের উপর নাগরত্ব আরোপ করার জন্য তাদৃশ প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। আমি সম্প্রতি ৺পুরীধামে "চৈতন্য-বিলাস" নামক একখানি অপূর্ব্ব ওড়িয়া কাব্যের পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথিখানি পুরী মার্কণ্ডেশ্বরশাহীর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ জগদ্দেব রায় মহাশয়ের বাটীতে "নববৃন্দাবন-বিহার" ও "প্রেমসুধানিধি" নামক দুইখানি বিস্তৃত তাল-পত্রের পুঁথির মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় বাঁধা ছিল। খুঁজিতে-খুঁজিতে সৌভাগ্যক্রমে আমি উহা বাহির করিতে পারিয়াছি। এই পুঁথিখানি (MS.) খুব বেশী প্রাচীন নহে, তবে ঐ গ্রন্থেরই একখানি অতি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান আমি পাইয়াছি। পুঁথিখানির সহিত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের অনেক স্থানে মিল আছে।

ইহার লেখক মাধব গদাধরের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ঐ গদাধর যদি শ্রীচৈতন্যের অন্তরতম পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত হন, তাহা হইলে ঐ কাব্যখানি অত্যন্ত প্রামাণিক হয়। কেননা মাধব তাঁহার গুরুর নিকট শুনিয়া সকল কথা লিখিতেছেন বলিয়াছেন। এইসমস্ত ঐতিহাসিক বিচার এখানে না তুলিয়া তাঁহার বর্ণিত বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্রের সহিত লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়ার তুলনা করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতেছেন—

"প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চাঁদমুখী, কহে কিছু গদগদ-স্বরে।
শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনিতে প্রবেশিব আমি।
তো লাগি জীবনধন, এ রূপ যৌবন, বেশ লীলা রস কলা।
তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ-জ্বালা।
আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন যুবতী তুমি হেন মোর প্রাণনাথ।
বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিবে তুমি হাত।"

এ বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে আমরা কিছুই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারি না। স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যাইবেন বলিয়া নিজের জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে—এ-কথা বলার মধ্যে কোনো উচ্চ আদর্শ দেখা যায় না। সত্য বলিতে কি নিমাই পণ্ডিতের পত্নীর মুখে যেন ওরূপ কথা মানায় না।

মাধব এই ঘটনাটি কিরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন দেখুন—

গদগদ হোই রামাবর
কহি না পারে কিছি উত্তর।
পুনপুন গাঢ়ে রোদন করন্তি
কান্তপদ নিবেশিল শির হে। (সুন্দরী)

তখন নিমাই পণ্ডিত আবার তাঁহাকে আদর করিয়া সান্ত্বনা দিলেন।

কান্ত কোমল চরণ ধরি।
কহে বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারী।
এহি কমল চরণে যাউথিব।
খরা বরষারে দণ্ড ধরি হে। (জীবন)
দীর্ঘনীল কুঞ্চিত কুন্তল,
কিছি ন থিব শির কমল।
এমন্ত শোভাকু ধরিথিব তুম্ভে।
এহা দেখিব নেত্রযুগল হে। (সুন্দর)
দিব্য কুন্তল ন থিব কর্ণ।
তৈল বিনু শরীর বিবর্ণ।
ঘর তেজি যাই সন্ন্যাস মাত্র।
কেতে মনোরথ হেব পূর্ণহে। (জীবন)
তেজি দিব্য সুরীহু বসন।
ডোর কৌপীন পিন্ধিব ধন।
ধিক ধিক প্রাণ ন যাউ দণ্ডে হে।
কাটি যাউ শরীর বহন হে। (জীবন)
যেবে মুই বোলাইলি নাহি।
দিব্য কন্তা ত আছন্তি মহী।
যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হব তুম্ভে।
প্রাণনাথ। গৃহ ছাড় নাহি হে (সুন্দর)।

ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে নিমাইয়ের যে দুঃখ হইবে, এই-জন্যই বিষ্ণুপ্রিয়ার আক্ষেপ—তাঁহার নিজের সুখ নষ্ট

হইবে বলিয়া নহে। লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়াও অতি অল্লাক্ষরে, সন্ন্যাস করিলে নিমাইয়ের দুঃখ হইবে একথা বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছে, যে তাঁহার নিজের সুখ নষ্ট হইবে।

মাধবের বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিতের উপযুক্ত স্ত্রীর ন্যায় "গৃহিণী সচিবঃ মিথঃসখী, প্রিয়াশিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা নিমাইকে ঘরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই যুক্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার এমন একটি সতেজ সুন্দর মূর্ত্তি আমাদের কল্পনানেত্রে ভাসিয়া উঠে যাহার আভাসমাত্রও লোচনদাস আমাদের মনে আনিতে পারেন না। মাধবের বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতেছেন—

সাতগর্ভ খাইছি মাতার।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিধুর।
তাকঠারে দয়া নোহিলা হৃদয়ে,
এরে কঠোর হেলে সুন্দর হে। (জীবন)
ধর্ম্ম না সাধি গৃহরে থাই।
ঈহা কেঁউ পুরাণে পড়ই।
অণ অপরাধী রমণী তেজিলে।
জানি অছ ত ধর্ম্ম ঈহ হে।
শচী হৃদয় নোহে পাষাণ।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিহীন।
বৃদ্ধমাতা তজিথিবা কান্ত। তেজি
পুণ্যমান লভিব সুজাণ হে। (জীবন)
শিশুকাল যাহাঙ্কর তুলে।
খেলুঅছ নানা কুতুহলে।
সে সখামানঙ্কু দয়া ন বসিলা।
এহু কোমল হৃদকমল হে। (সুন্দর)
নর্দ্দীয়ার নরনারী শিরে।
বজ্র লকাঈ যিব হেলারে।
কেতে পৌরুষ লভিব জগতে।
এহু শিক্ষা দেলা কে তুম্ভরে হে।
পুনপুন করন্তি রোদন।
কান্তপদ করি আলিঙ্গন।
যেবে যিব মোতে সঙ্গেঘেনি যাও।
খটিথিবি জানি তুম্ভ মন হে।

বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু ক্রন্দনপরায়ণা না হইয়া এইরূপ সারগর্ভ যুক্তিদ্বারা স্বামীকে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার উপর তথা ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাগণের উপর আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিবার জন্য হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠে।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিবার জন্য নিজের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁহাকে দেখাইলেন, এই অলৌকিক বিবরণ লোচন তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাতেও সান্ত্বনা পান নাই। মাধবের নিমাই—বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানাপ্রকার তত্ত্বোপদেশ দিতেছেন বটে—কিন্তু সকলের অপেক্ষা বড় সান্ত্বনার কথা বলিতেছেন—

কেবেহেঁ তোতে মু উদাস নোহিবি।
তোর স্নেহে মু তোর আয়ত্তরে।

মাধব এ-প্রসঙ্গে বা অন্য কোনো স্থলেই শ্রীচৈতন্যের কোনোপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণনা করেন নাই। অপরাপর বহু কারণের মধ্যে মাধবের গ্রন্থ যে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল অবস্থানকালেই লিখিত, তাহা মনে হইবার অন্যতম একটি কারণ এইরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা।

এতগুলি প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যজীবনীর মধ্যে একমাত্র চৈতন্যমঙ্গলের লেখক যে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী একটা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বাসুঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও জয়ানন্দ এসম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু সকলেই শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী জীবনের অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদকাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন।

কাব্যে উপেক্ষিতা হইলেও ইতিহাসে বা বাস্তবজীবনে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে সম্মানিতা ছিলেন তাহা আমরা ঈশান নাগরের "অদ্বৈতপ্রকাশ" হইতে জানিতে পারি। "ভক্তিরত্নাকর" "প্রেম-বিলাস" ও "নরোত্তম-বিলাস" গ্রন্থে বর্ণিত নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবী সমগ্র বৈষ্ণব জগতের পরিচালনা করিয়া যে মহিমময় আসন অধিকার করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া সেইরূপ নেত্রীত্ব চাহেন নাই। তাঁহার গভীরতর দুঃখের জীবন বিরলে কাঁদিতে-কাঁদিতে ও সেই প্রভুর চরণ-ধ্যান করিতে-করিতে যায়, ইহাই তাঁহার অন্তরতম অভিপ্রায় ছিল। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে যেরূপভাবে সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, ঈশানের অদ্বৈতপ্রকাশে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঠিক সেইভাবেই সাধন করিতে দেখিতে পাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার শেষ জীবন

এত করুণ, ঈশানের বর্ণনা এখানে এত সুন্দর যে তাঁহার কবিতার পংক্তি উদ্ধার করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিব। ঈশান অদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীচৈতন্তের অপ্রকটের পর নবদ্বীপের অবস্থা যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন—

ভাগ্যে পণ্ডিত দামোদরে পাইলুঁ দর্শন।
তিঁহ কহে কাঁহা ইহা কৈলা আগমন॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবীর অন্তর্দ্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা যেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তাঁরে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হৈয়া।
হরি নাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেনমতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টেক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষ প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেতে
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে?

* * * *
* * *

প্রসাদ লইতে সঙ্গে দামোদর সনে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা সজল নয়নে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার আজ্ঞা-অনুসারে।
মো অধমে লঞা পণ্ডিত গেলা অন্তঃপুরে॥
যাঞা দেখি কাণ্ডা পটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা
কোটি ভাগ্যে শ্রীচরণ মাত্র পাইলুঁ দেখা॥

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর আত্মীয় কুটুম্বেরা যে-কয়দিন সে-বাড়ীতে ছিলেন, সে-কয়দিন কানাইকে গৃহে বড় পাওয়া যাইত না। সে অবসর-মতন দু'টা খাইয়া সমস্ত দিনটা পথে-পথে কাটাইয়া আসিত।

বিবাহে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, যখন একে-একে তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন, তখন সে আবার ঘরের তলে মাথা দিল। এইসকল অভ্যাগত আমন্ত্রিতেরা তাহার হৃদয়ে যে একটা শূন্যতা রচনা করিয়া গেলেন, তাহাতে মহেশ্বরীকে লইয়া সে যে আশার নেশায় ঘুরিতেছিল তাহাতেও কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। মহেশ্বরীর আচরণে তেমন-একটা যুক্তির প্রেরণা না থাকিলেও এই যে ছোঁয়া-খাওয়া লইয়া একটা গভীর নিশ্বাস মহেশ্বরীর বুক ভাঙিয়া বাহির হইত; এই নিশ্বাসই তাহার কোমল প্রাণটি দু'খানা করিয়া কাটাইয়া দিত। তাহার বিশৃঙ্খল অনুভূতির সীমার মধ্যে বিচারহীন বেদনা যে কোথা হইতে জাগিয়া উঠিত, তাহা সে স্থির করিতে পারিত না।

এই বেদনার সংগ্রামে তাহার অন্তরের দুঃখটাই নিভৃত প্রদেশে নিরালা বসিয়া তাহাকেই কুরিয়া-কুরিয়া খাইতে লাগিল। মহেশ্বরী দেখিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন দিন-দিন মুষ্‌ড়িয়া যাইতেছে। তাহার চোখের সে দীপ্তি, মুখের সে-স্বচ্ছতা যেন একখানি পাত্‌লা কুয়াশা কোন্ দিক্ হইতে আসিয়া অল্পে-অল্পে গ্রাস করিতেছে।

একদিন শয়ন করিবার পর সে মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা? আমাকে রান্নাঘরে— পূজার ঘরে যেতে দাও না—আমি পূজার ফুল তুল্‌তে পারিনে—জল ছুঁলে' ফেলা যায়—কেন?"

সুখেন্দুর কথা মহেশ্বরীর স্মরণ হইল। সুখেন্দু বলিয়াছিলেন,—"তুমি ওকে যেভাবে গড়ে' তুল্‌ছ তা'তে যখন ও নিজেকে জান্‌তে পারবে তখন মস্ত একটা ধাঁধাঁর মধ্যে

পড়ে' যাবে।"—সত্যই ত! এখন হইতে উহাকে কিছু-কিছু জানিতে দেওয়া উচিত। যত বড় হইতেছে এইসকল বাধা-বিঘ্ন উহাকে ততই একটা সমস্তার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। মহেশ্বরী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিলেন, "তোমার বাড়ী এই গ্রামেই—উত্তর পাড়ায়। তোমার মা-বাপ মারা গেলে এখানে এসেছ, তুমি তখন খুব ছোট।"

কানাইলাল নিরুদ্যম হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উত্তর পাড়া—সে আবার কোথায়? কেন—তুমি আমার মা নও?" কানাই দুই হাতে মহেশ্বরীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

মহেশ্বরী তাহার কপালে চুম্বন দিয়া কহিলেন, "মা বৈ কি! তাঁরা তোমায় ছেড়ে গেছেন—আমি যেতে পারিনি। আমি চিরদিনই তোমার মা থাক্‌ব।"

বালক হাত আল্‌গা করিয়া লইয়া ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িল, "উত্তর পাড়া কোথায় বড়-মা? সেখানে আমার বাড়ী আছে?"

মহেশ্বরী ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে একদিন দেখিয়ে আন্‌ব। সেখানে এখন অন্য লোকে বাস করে। তোমাকে আমরা বাড়ী-ঘর করে' দেবো।"

বালক হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তুমি সে-বাড়ীতে থাক্‌বে ত? সে বেশ হবে। বড়বাবু বোধ হয় যাবে না?"

সুখেন্দুকে সে বড়বাবু বলিয়া ডাকিত। সে দেখিল সুখেন্দুর সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই স্নেহের নির্ঝরিণীকে লইয়া অন্য স্থানে গেলে সে বড় সুখের হয়।

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি যতদিন আছি, কোথাও যেতে হবে না। এইখানেই থাক্‌বে।"

বালক আবার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা! আমাকে পূজার ঘরে—রান্নাঘরে, যেতে দাও না কেন?"

মহেশ্বরী অতি কষ্টে অথচ স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত করিলেন, "তুমি বাগ্‌দীর ছেলে—আমরা বামুন কিনা, তাই আমাদের বাধে।"

বালক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাগদী কি?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমরা যেমন বাঁড়ুয্যে—নেদোরা যেমন চাটুয্যে—ভূত্যেরা যেমন ঘোষ—তেম্‌নি বাগদী একটা জা'ত।"

"তা'তে কি হয়েছে? আমাকে রান্না-ঘরে যেতে দাও না কেন তাই বলো না?"

"বল্‌লাম যে—আমাদের বাধে। তোমরা জল ছুঁলে সে জল মারা যায়।"

দশম বৎসরের বালক হইলেও কানাইলালের চক্ষে যেন সমস্তই অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের বাড়ীর কাছেই কাওরারা বাস করিত। তাহারা যে অত্যন্ত হীন জাতি তাহা তাহাদের আচার-ব্যবহারে সে বেশ বুঝিতে পারিত। বিশেষত ইহারা কেহই তাহাদের ঘরে উঠিতে দেন না, জল ছোঁয়া পড়িলে ফেলিয়া দেন, এসকলই সে দেখিত, জানিত। সে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "বাগদী কি কাওরার মতন?"

মহেশ্বরী তাহার হৃদয়ের তাপ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "কাওরার মতন হবে কেন? তা'রা যে অত্যন্ত ছোট জা'ত।"

"তবে বাগদীর জল ছোঁও না কেন?"

"তা'রা লেখাপড়া শেখে না—হীন হ'য়ে থাকে সেই-জন্যে।"

মহেশ্বরী ক্রমে-ক্রমে বালককে সান্ত্বনা দিবার পথে চলিতে লাগিলেন।

কানাই একটা পথ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা লেখাপড়া শিখলে ছোঁও?"

"তা ছোঁয়া যায়।"

সে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আমাকে ত লেখাপড়া শেখাচ্ছ?"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "প্রথম ভাগ ছেড়ে দ্বিতীয় ভাগ পড়ছ, ওকে কি লেখাপড়া বলে? বেশী-বেশী বই পড়তে হবে। আমার কাছে বসে-বসে গল্প শুন্‌বে—যে-সব শ্লোক বল্‌ব মুখস্থ কর্‌বে—মানে শিখবে—তবে না লেখাপড়া শেখা হবে।"

কানাইলাল ক্রমেই উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল! সে

কহিল, "তাই যদি শিখি, তা হ'লে রান্নাঘরে ঢুকতে দেবে ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আগে সেই পর্য্যন্ত শেখো—তখন দেবো।"

বালক নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

তার পরদিন সে রকের উপর বসিয়া আপন মনে বকিতে লাগিল,—রান্নাঘরে ঢুকব না আবার! এই ত দ্বিতীয় ভাগ শেষ হ'য়ে গেল, তার পর বড়-মা বলেছে—শিশুশিক্ষা; তার পর বোধোদয়। শ্লোক—সে ত শুয়ে পড়ে' মুখস্থ করব। বড়-মা শেখালে আবার ক'দিন লাগে শিখতে? তখন দেখব ছোট-মাকে জব্দ করতে পারি কি না! ছুঁস্‌নে—যাস্‌নে— নেমে দাঁড়া—জল নেবো—ওসব নষ্টামি-বুদ্ধি তখন খাটবে না। বড়বাবু—ওঃ! বড়বাবুকে ভারি ভয় করতে হবে কিনা! লেখাপড়া শিখলে কা'কেও ভয় করতে হবে না। আচ্ছা! দাঁড়াও আমি এক-এক করে' সব জব্দ করছি।"

শৈলবালা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে-হাসিতে দম্ আটকাইবার মতন হইল। মহেশ্বরীও ঘরে থাকিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহার অন্তরে প্রত্যেকটি কথা তীক্ষ্ণ শেলের মতন বিদ্ধ হইতেছিল। হায় শিশুর মন! সংসারের দুর্ব্বোধ্য জটিলতা তাহাকে তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন? শৈলবালা হাঁপ ছাড়িয়া কহিল, "মা, তোমার ছেলেকে ঠেকাও। এই গরমের দিনে যে পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তোর ছেলে—তুই ঠেকা।"

শৈল কহিল, "তুমি যে বীজমন্তর ওর কানে ঢুকিয়ে দিয়েছ, সে ঠেকানো কি আমার কাজ?"

মহেশ্বরী ঘর হইতে কহিলেন, "কি বক্‌ছিস্ রে? পড়াশুনোর নামে ঢোঁ ঢোঁ—তা'র আবার বাক্যির জোর দেখ! আগে লেখাপড়াই শেখ—তার পর আস্ফালন করিস্।

সে লজ্জা পাইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল বাহির-বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, বলাই সুখেন্দুর নিকটে বসিয়া একখানি বই লইয়া পাতা উল্‌টাইয়া-উল্‌টাইয়া ছবি দেখিতেছে। সে দ্বারের নিকটে আসিয়া সুখেন্দু দেখিতে না পান এরূপভাবে একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া ধীরে ডাকিল, "বলা!"

বলাই মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

কানাই কহিল, "শোন্।"

বলাই তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল। সে কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "কি-ই-ই।"

"শোন্ না?"

বলাই অগত্যা পুস্তক ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। কানাই কহিল, "আয়!"

"কোথায়?"

"আয় না—"

তাহার পর উভয়ে কিছু দূরে পথের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাই একটা বাকস্‌গাছের ডাল আপনার দিকে টানিয়া লইয়া তাহার একটি পাতার উপর নখদ্বারা আঁচড় কাটিতে-কাটিতে মুখখানা কিছু গম্ভীর করিয়া কহিল, "জানিস্ বড়-মা আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেবে?"

বলাই ও শান্তি প্রভৃতি শিশুরাও বাড়ীর লোকদিগের আচার-ব্যবহারের ধরণ হইতে ধারণা করিতে পারিয়াছিল যে, কানাইলালের ভিতরে এমন কিছু-একটা জিনিস যেন রহিয়া গিয়াছে, যাহা তাহাদের গৃহের সকল লোকগুলির সামঞ্জস্যের মধ্যে তাহাকেই কেবল স্থানে-স্থানে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বলাই তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, "ইস্?"

কানাই খুব জোর দিয়া মুঠো পাকাইয়া কহিল "হ্যাঁ—বলেছে।"

"কে?"

"বড়-মা।"

"কি বলেছে?"

"বলেছে যে ভালো করে' লেখা-পড়া শিখলে তখন দেবে।"

উৎসুক হইয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মার ফুল তুল্‌তে পারবে? পূজোর ঘরে যেতে পাবে?"

কানাই দুই হাতে তালি দিয়া গৌরবে মুখ-চোখ টানিয়া কহিল, "হ্যাঁ—তাও বলেছে। রান্নাঘরে ঢুক্‌তে না দিক্, পূজোর ফুল তুল্‌তে পারলেই ত হয়। মিত্তিরদের বাগানের জবা, আর চৌধুরীদের পুকুরের পদ্ম, আমি রোজ-রোজ তুলে'-তুলে' ফেলে' দিই!"

কানাইলালের এই বাক্যচ্ছটার মধ্যে বলাই যখন ভবিষ্যৎ সত্যের জাগ্রত মূর্ত্তিটি সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া আনিতেছিল তখন তাহার মন সহানুভূতিতে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সে অর্দ্ধেক দেখিতে-দেখিতে যে ছবির বইখানা ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহারই কথা বার-বার মনে পড়ার ব্যস্ততায় সে পিছন ফিরিয়া দুই পা অগ্রসর হইল। কানাই কহিল, "আর-একটা কথা শোন্!"

বলাই ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি?"

"আচ্ছা, তখন বড়বাবু বোধ হয় আট্‌কাতে পারবে না?"

কানাই তাহার উদ্বিগ্ন নেত্র-দু'টি বলাইএর মুখের উপর ন্যস্ত করিল।

বলাই কহিল, "বড়-মা বল্‌লে কি কেউ বাধা দিতে পারে?"

কানাইলালের চক্ষু-দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরবেলা কিছু সময় গড়াগড়ি দিয়া কানাইলাল উঠিয়া পড়িতে বসিল। মহেশ্বরী বিছানায় শুইয়াছিলেন। কানাই উৎসাহিত হইয়া কহিল, "বড়-মা, আজকে কিন্তু শিশুশিক্ষার পাঁচ পাতা পড়া ধরতে হবে। আর কাল থেকে দশ পাতা। আচ্ছা, বড়-মা, বোধোদয়খানা একমাসে শেষ করতে পারব না?"

মহেশ্বরী হাসিলেন। বালক কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া সহসা যে পড়াশুনায় এতটা মনোযোগী হইয়া উঠিল তাহা মহেশ্বরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি কহিলেন, "অতটা জুলুম করিস্‌নে। রয়ে'-রয়ে' শিখলে বেশী শেখা যায়।"

কানাই আর কথা বলিতে সাহস করিল না। আপন মনে পড়িতে লাগিল। বিকালে বলাই আসিয়া তাহাকে খেলিবার জন্য ডাকিল। কানাই কহিল, "আমি এখন যাবো না।"

বলাই বলিল, "সারাদিনই কি পড়বি?"

কানাই কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুই যা—আমার এখনও দু'পাতা পড়তে বাকী।"

মহেশ্বরী ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁরে, আজ কি তোকে পড়ায় পেয়ে বস্‌ল নাকি? বলাই এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যা না, খেল্‌গে যা।"

কানাই মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, "ওর ত আর আমার মত বেশী-বেশী পড়তে হবে না! ওর কি ভাবনা? তাই খেল্‌তে ডাক্‌ছে।"

মহেশ্বরী বালকের অভিপ্রায় বুঝিলেন। তাঁহার প্রতিকথাটি সত্য করিয়া দেখিতে ও ধরিতে বালকের উদ্যোগ ও আয়োজনের অন্ত নাই ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু-দু'টি আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "যা যা, খেল্‌গে যা। সারাদিন ব'সে ব'সে পড়লে শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে যায়। একটা অসুখ ক'রে বস্‌লে তখন পড়বে কে? শরীর যাতে ভালো থাকে লোকে তাই আগে দেখে।"

কানাই অধোবদনে বলাইএর পিছু-পিছু বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে কিছু সময় পড়াশুনা করিবার পর কানাই মিত্রদের বাগান হইতে কিছু রক্তজবা এবং চৌধুরীদিগের পুষ্করিণী হইতে কিছু পদ্মফুল তুলিয়া আনিয়া রকের উপর সেগুলি একস্থানে সাজাইয়া রাখিল এবং গালে হাত দিয়া তাহার সংগৃহীত বস্তুর উপর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মহেশ্বরী আঁকশি দিয়া তাঁহাদের অঙ্গনের পার্শ্বের টগর শিউলী প্রভৃতি দুই-চারিটি বৃক্ষ হইতে যে একঘেয়ে ফুল লইয়া নিত্য পূজায় বসিতেন, কানাইলালের তাহা ভালো লাগিত না। যখন যেখানে যে ভালো ফুলটি দেখিত তখনই সেটি মহেশ্বরীকে আনিয়া দিতে তাহার লোভ জন্মিত। পরিশেষে ফুল তুলিতে যাইয়া হয় তাহার হাত দু'খানা আড়ষ্ট হইয়া পড়িত,

কখনও বা তোলা ফুল লইয়া পথে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে-করিতে সে বাড়ী আসিত।

সেদিন কি জানি কি খেয়ালের বশে সে ফুলগুলি সযত্নে তুলিয়া আনিয়া রকের উপর বসিয়াছিল এবং কাহার যেন আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মহেশ্বরী স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে প্রতিদিনের মতন সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া লইয়া যখন পূজার ঘরের দিকে আসিতেছিলেন, তখন কানাইলাল ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতে এক-একবার তাঁহাকে দেখিতেছিল এবং পরক্ষণে আবার তাহার যত্নলব্ধ সামগ্রীর উপর দৃষ্টি নত করিতেছিল। মহেশ্বরী দূর হইতে তাহা দেখিতে-দেখিতে আসিতেছিলেন। সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি দেখিয়া আনন্দের বেগে দেবতার চরণে সেইগুলি নিবেদন করিবার জন্য যেন তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঃ! বেশ ফুলগুলি ত! কোথায় পেলি?"

কানাই উৎসাহিত হইয়া কহিল, "মিত্তিরদের বাগানে আর চৌধুরীদের পুকুরে।"

মহেশ্বরী বিস্ময়ে চক্ষু-দুটি স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুকুরে? কি করে' তুল্‌লি?"

"সাঁতার কেটে।"

"অত বড় পুকুরে সাঁতার কাট্‌তে গেলি? ডুবে' গেলে কে দেখত?"

কানাই একটু হাসিয়া কহিল, "ডুবব কেন? আমি সাঁতার জানিনে?"

"কেন তুল্‌লি?"

সে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি গালের মধ্যে পুরিয়া দিয়া হাতখানা জানুর উপরে রাখিয়া ফুলগুলির দিকে দৃষ্টি নত করিল। ততক্ষণে তাহার চক্ষু-দুটি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। মহেশ্বরী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় মিত্তিরদের বাগান—আর কোথায় চৌধুরীদের পুকুর, হঠাৎ এতটা কর্‌তে কি গরজ পড়ে' গেল তোর?"

কানাই সেইরূপই বসিয়া রহিল।

মহেশ্বরী ফুলের সাজি লইয়া পূজার ঘরে ঢুকিলেন। এবং বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পূজায় বসিলেন। কিন্তু পূজায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। রহিয়া-রহিয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বালক কেন এমন ভুল জায়গায় নৈবেদ্য সাজাইবার বাসনা করিতেছে? তিনি মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন। দেবতাকে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বলো দেব! তুমি কাহার দেবতা? আমার—না জগৎসুদ্ধ সবারই? যদি তুমি ভাগাভাগির দেবতা না হও—যদি আমার—তাহার সবারই দেবতা হও, তবে ঐ দরিদ্র বালকের প্রীতি-পুষ্প গ্রহণ করিতে তোমাকে বাধিবে কেন? আমরা সীমানার চৌহদ্দি লইয়া মারা-মারি কাটাকাটি করি; কিন্তু যিনি অসীম, অনন্ত, যিনি বিশ্বেশ্বর, তাঁকে আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে আকারের বেড়াজালে বন্দী করিতে আমাদের যে-সাহস দেখাই—সে-সাহস কি তুমিই দিয়েছ নাথ?" সেদিন মন্দিরের মধ্যে এইসকল দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসা লইয়া মহেশ্বরীর অনেকটা সময় কাটিল। তাঁর অশ্রুসিক্তচক্ষে যখন তিনি বাহিরে আসিলেন তখন দেখিলেন বালকটি ফুলগুলি লইয়া তখনও পর্য্যন্ত সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া রহিয়াছে।

তাহার মনে চিন্তা বা ইচ্ছা কোনো-কিছুরই একটা স্থিতিভাব ছিল না। অথচ কি যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতার উপর কম্পনের বেগে সে ভাসিয়া-ভাসিয়া চলিতেছিল। মহেশ্বরী কহিলেন, "চুপ করে' বসে' রয়েছিস্ যে? নাইতে-খেতে হবে না?"

মহেশ্বরী চলিয়া গেলে বালক তাহার কষ্ট-চয়িত পুষ্প-গুলি ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল। অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলাইএর সঙ্গে আবার হাসিতে-হাসিতে নাচিতে-নাচিতে স্নান করিতে গেল। সে বালক বই ত নয়। ভিতরের অভিমান, অন্তরের দ্বন্দ্ব যতই তাহাকে আকুল করুক, তাহার শিশুসুলভ হাসি ও আনন্দও ত সমান সত্য! তাহাকে সে ছাড়ে কি করিয়া?

আহারাদির পর কানাইলালকে লইয়া শয়ন করিলে

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জলে সাঁতার কেটে—আর কষ্ট করে' ফুল তুলে' এনেছিলি কেন ?"

কানাই বালিশের দিকে মুখ গুঁজিল, উত্তর দিল না।

মহেশ্বরী কহিলেন, "কথা বল্‌বিনে নাকি আমার সঙ্গে ?"

সে বালিশে মুখ গুঁজিয়াই খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মহেশ্বরী কহিলেন, "হাস্‌ছিস যে! বেশ ত! কথা না বলিস্ আমিও বল্‌ব না।"

কানাই বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া মহেশ্বরীর গাত্রের মাটি তুলিতে-তুলিতে কহিল "খেতে দেবার সময় ?"

"শৈলকে দিতে বলে' দেবো।"

"শুয়ে পড়ে' ?"

"শুয়ে পড়ে' আর কি—তুই মুখ ফিরিয়ে শুবি—আমিও শোবো!"

কানাই কহিল, "সে বেশ মজা হবে কিন্তু। কিন্তু তোমাকে যখন চিম্‌টি কাট্‌ব ?"

মহেশ্বরী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওমা! সে আবার কি গো! চিম্‌টি কাট্‌বি কেন ?"

কানাই বলিল, "কাট্‌ব না ? তুমি কথা বল্‌বে না—আর আমি চিম্‌টি কাট্‌ব না ?"

মহেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ অস্ত্র আবিষ্কার করেছিস্। এখন যা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম তা'র কি ?"

"কি ?"

"ফুল আন্‌লি কেন ?"

"তোমাকে দেখাতে।"

"দেখালি কৈ ? কিছুই ত বল্‌লিনে ?"

"তুমি যে নিজে-নিজে দেখে' ফেল্‌লে।"

"তা বেশ করেছিস্। আমি খুব খুসী হয়েছি দেখে'। কিন্তু আর অমন আন্‌বিনে। পুকুরে সাঁতার কেটে—বাবা! শুন্‌লে যে আমার প্রাণ কেঁপে যায়!"

কানাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাত কি ছোটমাকে দিতে বলে' দেবে ?"

"কেন—দোষ কি ?"

"ছোট মা মেখে দেবে ?"

"মেখে দেবে কেন ? বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত মেখে খাওয়ালে লোকে বলে কি!"

কানাই নীরব হইয়া রহিল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথা বল্‌ছিস্‌নে যে ?"

কানাই মৃদুস্বরে কহিল, "আমি ত কথা বন্ধ করিনি—ছোট-মা মেখে দেবে ?"

মহেশ্বরী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিলেন, "ভাবনা কি—আমিই দেবো।"

সে সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িল।

(ক্রমশঃ)

লুই পাস্তুর

শ্রী যোগেন্দ্রমোহন সাহা

ফ্রান্সের অন্তর্গত দোল নগরের এক দরিদ্র পল্লীতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর পাস্তুরের জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স সবে দুই বৎসর তখন তাঁহার পিতা এ্যারাবয়স্ নগরে একটি ক্ষুদ্র চর্ম্ম-সংস্কার-শালা খরিদ করিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এখানেই পাস্তুরের শৈশব অতিবাহিত হয়। তাহার পিতা চরিত্রবান্ ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। প্রথম নেপোলিয়নের সেনাদলের হইয়া যুদ্ধে ইনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাহার জন্ম স্বয়ং সম্রাট্ নেপোলিয়ান্ স্বহস্তে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই তাঁহাকে সম্মান-সূচক পদকে ভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব সত্বেও তিনি কদাপি পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যে উদাসীন ছিলেন না। পরন্তু পুত্রের উপযুক্তরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

এ্যারাবয়সের কমিউনেল্ কলেজে পাঠ-কালে কিছুকাল পাস্তুরের

আদৌ পাঠে অনুরাগ ছিল না। মাত্র ধরিত্তি ও প্রতিবেশী এবং সহপাঠীদের ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকতেই তিনি বিশেষ আমোদ পাইতেন। এই চিত্রাঙ্কন-বিদ্যাটি শৈশব হইতেই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। যখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পড়াশুনার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে পিতা-মাতা কত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তখনই তিনি আলস্য ও সর্ব্বপ্রকার খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। এই পরিবর্ত্তনই উত্তর-কালে তাঁহাকে যশোমণ্ডিত করিয়াছিল।

কমিউনেল্ কলেজে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক না থাকায় পাস্তুর বেসান্‌কনে পড়িতে যান ও সেখান হইতে বি-এ উপাধি লাভ করেন।

রসায়ন-শাস্ত্রে পূর্ব্ব হইতেই পাস্তুরের অনুরাগ ছিল। এই সময়ে প্রায়ই তিনি শক্ত-শক্ত প্রশ্ন করিয়া তাঁহার প্রবীণ অধ্যাপক ডার্লিকে ক্লাশের ছেলেদের সমক্ষেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। উত্তর-দানে অপারগ অধ্যাপক মহাশয় অতিশয় গম্ভীরভাবে এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত ও আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন যে, 'প্রশ্ন করার কথা তাঁহার পাস্তুরকে, তাঁহাকে ছেলেদের সমক্ষে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শিক্ষাদান করা পাস্তুরের কর্ম্ম নয়।' এইরূপে বাধা-প্রাপ্ত হইয়া পাস্তুর প্রতিবেশী এক বিখ্যাত ভৈষজ্য-বিক্রেতার সাহায্যে তাঁহার রসায়ন-শাস্ত্রে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তিনি একোল্ নর্ম্যাল্ কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও যথারীতি পাশ করেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় স্বেচ্ছায় আবেদন পত্র প্রত্যাহার করেন। পর বৎসর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় পরীক্ষা দিয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করেন ও উক্ত কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই বিখ্যাত বিদ্যালয়ে পাস্তুর তাঁহার রসায়ন-শাস্ত্রের তৃষ্ণা মিটাইবার প্রচুর সুযোগ পাইলেন। তিনি অধ্যাপক বালার্ড ও সরবনের অধ্যাপক ডুমা উভয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উত্তরোত্তর জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। উভয়েই রসায়ন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বালার্ড ব্রোমিনের আবিষ্কর্ত্তা। ডুমার কার্য্যের পরিচয় দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। রসায়নের ছাত্রগণ সকলেই তাঁহার কথা অবগত আছেন।

পাস্তুর পাঠদ্দশাতেই অত্যন্ত কর্ম্মী ও পরিশ্রমী ছিলেন। এমন কি রবিবারেও তিনি বিজ্ঞানাগারে কাজ করিতেন। একদা এক রবিবারে ভোর চারিটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত খাটিয়া হাড় হইতে প্রায় ৬০ গ্রাম ফস্‌ফরাস্ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একমাত্র এই উদাহরণটিই তাঁহার পরিশ্রমের পরিমাণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে, গবেষণার বীজ শুধু প্রবীণ-দেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার-জগতে নবীনদের স্থান নেহাৎ হেলার নয়। নিউটন, রাদারফোর্ড, প্লাওক্, কেকোল, এমিল্‌ফিশার্, ল্যাবেল্, ফেন্টহফ্, মোজলী, আইনষ্টাইন্ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। দানাবদ্ধ পদার্থের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে-সকল গবেষণা করিয়া পাস্তুর আজ অমর হইয়া গিয়াছেন ম'সিয়ে ডিলাফস্ নামক একজন যুবকই সেদিকে প্রথম পাস্তুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

একোল নর্ম্যাল্ কলেজে পাস্তুরের পড়া শেষ হওয়ার অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে বালার্ডের সহকারী-পদে নিযুক্ত করা হইল। পাস্তুর বুঝিলেন তাঁহার জীবনের শিক্ষা-সমাপ্তির এখনও ঢের দেরি। সুতরাং গবেষণা করিবার এই মহা সুযোগকে তিনি মন-প্রাণ দিয়া বরণ করিয়া লইলেন ও বিবিধ রাসায়নিক পদার্থসমূহের দানার ধর্ম্ম- (crystalography) সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইসময়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ডিলাফসের উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ পত্রাবলী তাঁহার প্রাণে অধিকতর কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মেনীর বিখ্যাত খনিজ-বিদ্যাবিশারদ ও রাসায়নিক মিৎশ্চার্‌লিশ, টার্‌টারিক অ্যাসিড্ ও সোডিয়াম্ অ্যামোনিয়াম্ নামক টার্‌টার লবণের দানা-সম্বন্ধে গবেষণা প্রচার করেন। কিন্তু সে-গবেষণা অনেক ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ ছিল। ম'সিয়ে ডিলা প্রভস্তে-নামক একজন বিখ্যাত রাসায়নিকও এ-সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মূল রহস্যটি উভয়েরই নিকট অপর্য্যবেক্ষিত রহিয়া গেল।

হ্যায় নামক একজন রাসায়নিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিজাত স্ফটিকের দানাতে (quartz crystals) পল কাটা আছে। কতক-গুলি দানার পল ডান দিকে, কতকগুলির পল বাম দিকে কাটা অর্থাৎ উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ডান হাতের সহিত বাম হাতের, বস্তুর সহিত উহার প্রতিবিম্বের সম্বন্ধের ঠিক অনুরূপ। এইজন্য দানাগুলিকে ইনি দুইভাগে বিভক্তও করিয়াছিলেন। বিয়ো দেখাইলেন এক-জাতীয় দানা ভঙ্গী-ভেদ আলোক-পন্থাকে (polarised light) ডান দিকে ও অপরজাতীয় দানা বাম দিকে আবর্ত্তিত করে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্যার জন্ হার্শেল্ অনুমান করেন পলের স্থানিক অবস্থিতির সহিত আলোকের গতি-পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ডানপলী দানা ডানদিকে ও বামপলী দানা বাম-দিকে আলোকের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুতঃ পরীক্ষা দ্বারা হার্শেলের এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

পাস্তুর সাধারণ টার্‌টারিক অ্যাসিড ও উহা হইতে প্রস্তুত বহুপ্রকার লবণের দানা পরীক্ষা কালে উপরোক্ত-প্রকারের পল-কাটা দানা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু সকল-প্রকার লবণের ও অ্যাসিডের দানার পলই শুধু একদিকে কাটা এবং উহাদের দ্রব (solution) আলোকের গতিকে শুধু একদিকেই আবর্ত্তিত করে। প্রকৃতিজাত কাচ-ফলকের ধর্ম্মের সঙ্গে উহাদের ধর্ম্মের তফাৎ এইটুকু যে, কাঁচ দানাবদ্ধ অবস্থাতে আলোকের গতি-পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু উহারা দ্রব অবস্থায় এরূপ ব্যবহার করে না। এইটুকু বৈষম্যসত্ত্বেও পাস্তুর কিন্তু অনুমান করিলেন, একই কারণে পল-কাটা কাঁচ ও টার্‌টার দ্রব আলোক-পন্থার পরিবর্ত্তন করে। আর সেই কারণ দানার পল।

বিয়ো প্রমাণ করিয়া গিয়াছিলেন, র‍্যাসেমিক অ্যাসিড (racemic acid) নামক আর-একপ্রকার টার্‌টারিক্ অ্যাসিড ও উহা হইতে প্রস্তুত লবণ-দানার আলোক-পন্থার উপর কোনো প্রভাব নাই। পাস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইহাদের দানাগুলি পলকাটা নহে। কাজেই তাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও হার্শেলের সিদ্ধান্তের পরিপোষক।

অতঃপর পাস্তুর মিৎশ্চারলিশ-কর্ত্তৃক উল্লিখিত র‍্যাসেমিক অ্যাসিড হইতে প্রস্তুত সোডিয়াম্ অ্যামোনিয়াম্-নামক টার্‌টার লবণের দানা পরীক্ষা করিতে গিয়া উহাতে উভয়-প্রকার দানারই অস্তিত্ব আবিষ্কার করিলেন। উভয়-প্রকারের দানা সমপরিমাণে বিদ্যমান। অধ্যবসায় ও পরিশ্রম-সহকারে পাস্তুর সন্দংশ- (forcep) সাহায্যে বিরুদ্ধ-পলী দানাগুলিকে বাছিয়া পৃথক্ করিলেন। অতঃপর আলোক-পন্থার উপর উহাদের দ্রবের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন ডানপলী দানা ডানদিকে ও বামপলী দানা বামদিকে আলোক-পন্থাকে সমপরিমাণে আবর্ত্তিত করে। এই অত্যাশ্চর্য্য, অনাকাঙ্ক্ষিত, অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারের আনন্দের আবেগে অধীর হইয়া পাস্তুর বিজ্ঞানাগার হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন—পথে ম'সিয়ে বাট্রাণ্ডকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে-চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিলেন ও রুদ্ধ আবেগে এই আবিষ্কারের কথা বিবৃত করিলেন।

এই যুগান্তরকারী আবিষ্কারের কথা রাসায়নিকমাত্রেই অবগত আছেন। এই আবিষ্কারের কাল হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলোক-বিদ্যাবিশারদ ম'সিয়ে বিয়ো এই আবিষ্কারের কথা শুনিতে পাইয়া অবিশ্বাসের [illegible]

হাসি হাসিলেন, বিশেষতঃ পাস্তুরের তরুণ বয়সের কথা মনে করিয়া। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি তাঁহার সমক্ষে উক্ত পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করিবার নিমিত্ত পাস্তুরকে আহ্বান করিলেন। পাস্তুর যখন বিয়োরই প্রদত্ত দ্রব্যাদিদ্বারা সম্যক্‌রূপে পুনরাবৃত্তি করিলেন, তখন শুভ্রকেশ বিচক্ষণ বিজ্ঞান-বৃদ্ধের মন বিচলিত হইল। পাস্তুরের হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন—"Mon cher enfant j'ai tant aimé les sciences dans ma vie que cela me fait battre le cœur"—প্রিয় বৎস! বিজ্ঞানকে আমি জীবনে এত ভালোবাসিয়াছি যে, ইহার আনন্দে আমার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছে।

অতঃপর তিনি র‍্যাসেমিক্ টারটারিক্ অ্যাসিডের দানার আলোকের গতি-পরিবর্ত্তনে অক্ষমতার রহস্য ভেদ করিলেন। বামপলী টারটার লবণ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি যে টারটারিক অ্যাসিড পাইলেন, উহার দানাও বামপলী এবং আলোক-পন্থাকে বামদিকে আবর্ত্তিত করে। আর ডানপলী লবণ হইতে প্রাপ্ত অ্যাসিড-দানাও ডানপলী এবং আলোক-পন্থাকে ডানদিকেই আবর্ত্তিত করে। তিনি আরও দেখাইলেন, উপরোক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মী অ্যাসিডদ্বয়কে সম-পরিমাণে মিশাইলে পুনরায় র‍্যাসেমিক্ বা "নিষ্কর্ম্মা" টারটারিক্ অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই নিষ্কর্ম্মা অ্যাসিডকে উপরোক্ত ক্রিয়াশীল অ্যাসিডদ্বয়ে বিশ্লেষণ করিবার আরও দুইটি প্রণালী ইনি আবিষ্কার করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অর্দ্ধশতাব্দী বিগতপ্রায়, প্রচুর গবেষণাও ইতিমধ্যে এ-বিষয়ে হইয়াছে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত উপরোক্ত প্রণালীত্রয়ের বিশেষ কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন হয় নাই, বা অন্য কোনো নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই।

এপর্য্যন্ত পাস্তুর সর্ব্বসমেত তিন প্রকারের টারটারিক্ অ্যাসিড আবিষ্কার করিলেন, যথা:—বামপলী ও ডানপলী এই দুই-প্রকারের ক্রিয়াশীল ও এতদুভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন র‍্যাসেমিক্ বা "নিষ্কর্ম্মা" অ্যাসিড। পরে তিনি মেসোটারটারিক্-নামক আর-একপ্রকারের অ্যাসিড আবিষ্কার করেন। উহা র‍্যাসেমিক্ অ্যাসিডের ন্যায় বিশ্লেষণক্ষম নহে, উহা "চির-নিষ্কর্ম্মা"—আলোক-পন্থার উপর কোনো প্রভাব নাই। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দুইটি অণুর (molecule) সংযোগে র‍্যাসেমিক্ বা "আপাত-নিষ্কর্ম্মা" অ্যাসিডের উদ্ভব। মেসোটারটারিক্ বা "চির-নিষ্কর্ম্মা" অ্যাসিডের কর্ম্মহীনতা উহার অণুর আভ্যন্তরিক পরমাণু-যোজনা-প্রণালী হইতে সম্ভূত (from the intro-molecular arrangement of the atoms)। পরস্পরবিরুদ্ধ-ধর্ম্মী দুইটি আণবাংশের অচ্ছেদ্য যোজনার ফলে চির-নিষ্কর্ম্মা অণুর সৃষ্টি। উহার অন্তরের তৃপ্তিই বাহিরে উহাকে আলো-তরঙ্গের সমক্ষে নিষ্ক্রিয় ও সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখিয়াছে।

অতঃপর তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, ডানপলী টারটারিক্ অ্যাসিডের দানা জলের সহিত কিছুক্ষণ গরম করিলে উহার কতকাংশ আপাত-নিষ্কর্ম্মা ও কতকাংশ চির-নিষ্কর্ম্মা অ্যাসিডে পরিণত হয়।

জৈব রাসায়নিক জগতে (organic chemistry) লাডেনবুর্গ ও এমিল ফিশারের স্থান অতি উচ্চে। বুর্গ কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতি-জাত অ্যাল্‌ক্যালয়ড (alkaloids) ও ফিশার বহুপ্রকার শর্করাজাতীয় পদার্থের (sugars) হুবহু নকল করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই-সব যুগান্তরকারী গবেষণাগুলির সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করে পাস্তুরের উদ্ভাবিত বিশ্লেষণ-প্রণালীর উপর।

এই-সব গবেষণা-কার্য্যে পাস্তুর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৪৮ সালে ২৬ বৎসর বয়সে পাস্তুর ডিজনের বিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিন মাস যাইতে না যাইতেই তিনি ষ্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের ডেপুটি অধ্যাপক ও ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এখানেই তাঁহার ভাবী পত্নী, ষ্ট্রাস্‌বুর্গ অ্যাকাডেমীর অধ্যক্ষ ম'সিয়ে ল রের কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বিবাহ হয়। কথিত আছে বিবাহের দিন পাস্তুর গবেষণাগারে কার্য্যে এরূপ গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিলেন যে আজ যে তাঁহার বিবাহ তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গির্জ্জাতে তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া এক বন্ধু গিয়া গবেষণাগার হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। এই বিবাহ উত্তরকালে খুব সুখের হইয়াছিল। মাদাম্ পাস্তুর স্বামীকে খুব ভালোবাসিতেন, সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার চিন্তা-ভাবনা হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিতেন, প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার হইয়া লিখিতেন, গবেষণা কার্য্যে উৎসাহ দিতেন, নানারূপ প্রশ্ন করিয়া তাঁহার গবেষণার চিন্তা বস্তুগুলিকে বিশদ ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেন। বস্তুতঃ মেডেম্ পাস্তুর স্বামীর শুধু জীবন-সঙ্গিনীই ছিলেন না, পরন্তু সর্ব্বকার্য্যে সাহায্য-কারিণীও ছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে পাস্তুরের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। লিলি নগরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক-মণ্ডলীর যে অধ্যক্ষের পদ (Dean of the Faculty ot Science) সৃষ্টি হইল, ৩২ বৎসর বয়সে পাস্তুর তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। লিলি-জেলা—বিট, গম ও শর্করা হইতে গাঁজন-ক্রিয়া দ্বারা (fermentation) সুরাসার (alcohol) উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। পাস্তুর গাঁজনক্রিয়া-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন ও নিজে উক্ত কার্য্যের গবেষণায় রত হইলেন। দুগ্ধ হইতে টক্ পদার্থ-সাহায্যে দধি প্রস্তুত-ব্যাপারও এই গাঁজন-ক্রিয়ার শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ব্বে গাঁজন প্রণালী-সম্বন্ধে জার্ম্মান্ রাসায়নিক লাইবিগের মতবাদই প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন গাঁজন-ক্রিয়া বিশুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-শ্রেণীভুক্ত, ইহার সহিত জীবনীশক্তির কোনো সম্পর্ক নাই। সুরা-মণ্ড (yeast) পচন-কালে নিজের ব্যাধি বিট গম প্রভৃতিতে সংক্রামিত করিয়া দেয় এবং উহার ফলেই গাঁজন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু পাস্তুর পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে প্রমাণ করেন সুরামণ্ডের সূক্ষ্ম কোষগুলি (yeast cells) জীবিত এবং উহারাই গাঁজন-ক্রিয়ার মূল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড (দুগ্ধোৎপন্ন অম্লবিশেষ) ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সুরাসার-সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

চিনি হইতে গাঁজন-ক্রিয়া দ্বারা ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড প্রস্তুতের সময় পাস্তুর দেখিতে পান একরকম শক্ত পদার্থ পাত্রের নীচে জমা হইতেছে এবং ক্রমশঃ উহার পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন, ইহা ছোট-ছোট লম্বা-ধরণের অণুকোষের (corpuscles) সমষ্টি এবং উহারা সুরামণ্ডের কোষ হইতে বিভিন্ন। কতকগুলি কোষকে কিঞ্চিৎ সুরামণ্ডের কাথ (decoction of yeast) ও খড়িমাটি গুঁড়ার সহিত নূতন চিনি-মিশ্রিত জলে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বের ন্যায় উহারা সংখ্যায় বাড়িয়া পাত্রের নীচে জমা হইতেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিডও প্রস্তুত হইতেছে সুরামণ্ডের কাথের পরিবর্ত্তে অ্যামোনিয়াম্ লবণ (নাইট্রোজেন-সমন্বিত যৌগিক পদার্থ) প্রয়োগ করিয়া একইরূপ ফলই পাইলেন। বস্তুতপক্ষে ক্যাগ্‌নিয়ার্ড লাতুর ও খোয়ান্-নামক দুই ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রথম গাঁজন-ক্রিয়ার সহিত জীবনীশক্তির সম্বন্ধ আছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু পাস্তুরই কার্য্যতঃ পরীক্ষা দ্বারা সে মতবাদ বৈজ্ঞানিক নিয়মে পরিণত করেন।

১৮৫৭ সালে লিলির বিজ্ঞানাগার প্যারিসে উঠিয়া যায়। এই সময়েই পাস্তুর বোধ হয় তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার প্রকাশ করেন। বিউটিরিক্ অ্যাসিড-নামক পদার্থটি মানুষের ঘামে, মাখনে বর্ত্তমান। শর্করা-জাতীয় পদার্থ হইতে গাঁজন-ক্রিয়া দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়। একদা পাস্তুর গাঁজাল তরল পদার্থের এক ফোঁটা
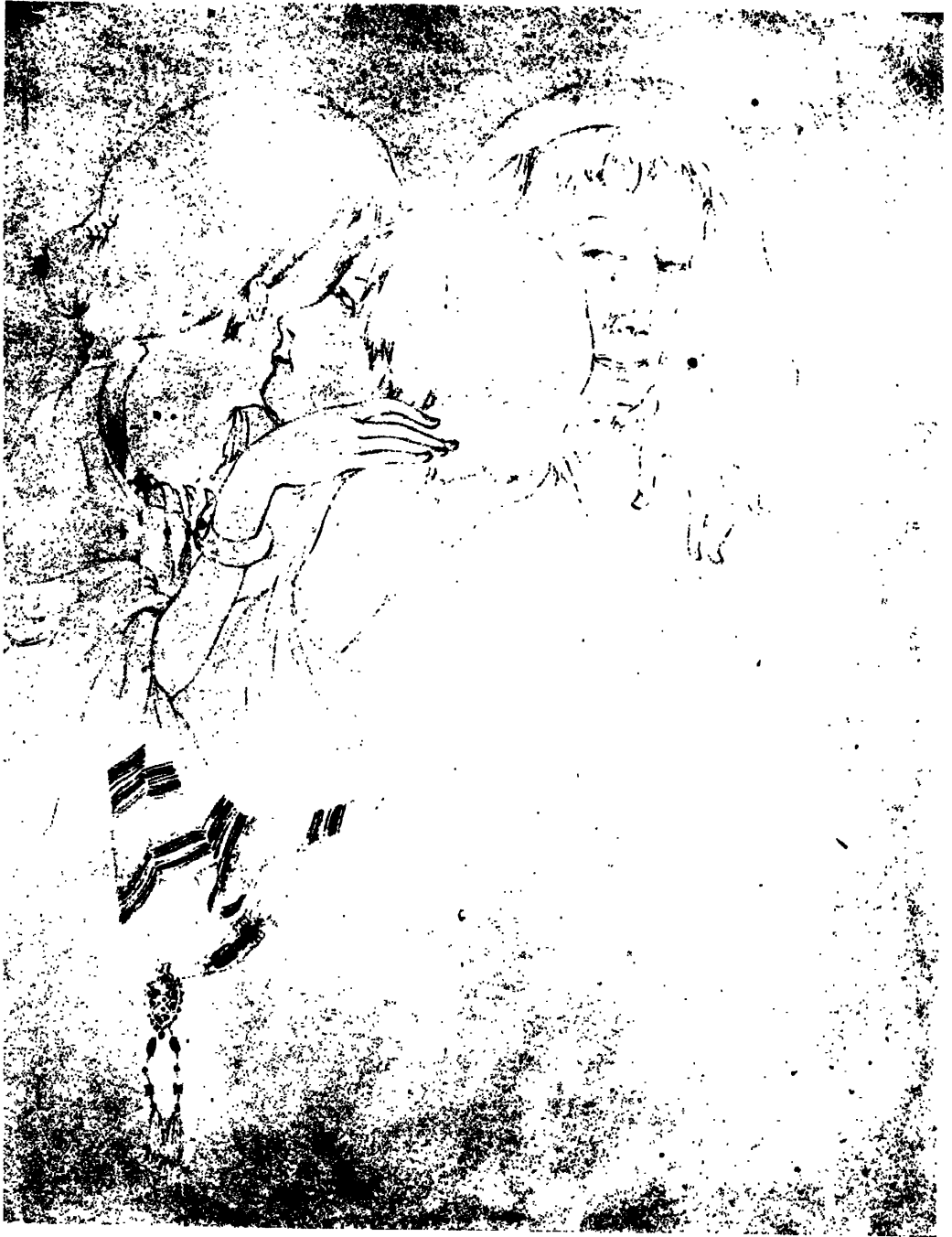
ত্রিযুগ

চিত্রকর—শ্রী সারদাচরণ উকিল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

লইয়া অণুবীক্ষণ-সাহায্যে পরীক্ষা-কালে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। পূর্ব্বে লোকের স্থির ধারণা ছিল, বায়ু বা অক্সিজেন্‌ ব্যতীত কোনো প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। বায়ু-বিহীন জীবন ধারণাতীত। পাস্তুর কিন্তু দেখিতে পাইলেন, তরল ফোঁটাটির বহির্ভাগের যে-সকল অণুকোষ বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়াছে; তাহারা স্থির, নিস্পন্দ ও অচেতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভিতরকার কোষগুলি এখনও জীবিত এবং স্বচ্ছন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাস্তুর ভাবিলেন, যে, বায়ু-ব্যতীত সমস্ত প্রাণী-জগৎ এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, সেই বায়ুই তাঁহার আবিষ্কৃত এই অদ্ভুত কোষ বা জীবাণুগুলির জীবন-ধারণের পরিপন্থী। অতঃপর তিনি উক্তপ্রকারের জীবাণু-সমন্বিত তরল পদার্থের ভিতরে বায়ু ও অক্সিজেন্‌-প্রবাহ চালিত করিয়া দেখিতে পাইলেন, জীবাণুগুলি ক্রমশঃ মরিয়া যাইতেছে এবং অবশেষে গাঁজন-ক্রিয়া একেবারে থামিয়া গিয়াছে। এইরূপে তিনি বায়ুবিহীন জীবের অস্তিত্বের আবিষ্কার করিয়া মানুষের চিরন্তন প্রত্যয়ের মূল উচ্ছেদ করিলেন।

অতঃপর পাস্তুর স্বতোজনন-সম্বন্ধে (spontaneous generation) অর্থাৎ অজৈব পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে গবেষণা করেন। স্বতোজনন-সম্বন্ধে অতি পুরাকাল হইতেই পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। এরিষ্টটল্‌ বলিতেন, প্রত্যেক শুষ্ক বস্তু আর্দ্র হইলে এবং আর্দ্র বস্তু শুষ্ক হইলে জীবোৎপাদিত হয়। ভার্জ্জিল বলিতেন, যুবক ষাঁড়ের গলিত মৃতদেহ হইতে মাছির উৎপত্তি। ভান্‌ হেলম্‌ কার্য্যতঃ ইন্দুর-উৎপাদনের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। একটি কলসীতে কিছু গম রাখিয়া উহার ভিতরে ময়লা ন্যাকড়া ঠাঁসিয়া একুশ দিন রাখিয়া দিলে গমগুলি স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতীয় ইন্দুরে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়া সমস্যাটিকে সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করেন আইরিশ্‌ পাদ্রী ফাদার নিড্‌হাম্‌, ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে। পচনশীল কোনো পদার্থকে কোনো পাত্রে রাখিয়া উহাতে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া কিছুকাল গরম করা হইল। নিড্‌হাম অনুমান করিলেন এত তাপের পরেও পাত্রের ভিতরে কোনো প্রাণী বাঁচিয়া নাই। কিন্তু পাত্রের মুখ খুলিয়া পচনশীল পদার্থে অসংখ্য জীবাণু দেখিতে পাইয়া তিনি স্বতোজনন-বাদ সত্য বলিয়া প্রচার করেন। তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকগণ এ-আবিষ্কারে এতদূর চমৎকৃত হইলেন যে, অনতিবিলম্বেই নিড্‌হাম্‌ সাহেবকে রয়েল্‌ সোসাইটি ও বিজ্ঞান-সভার (Academy of Sciences) আটজন সদস্যের একজন সদস্য মনোনীত করা হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে আবেস্পেলান্‌জানী বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। গ্যাল্‌সাক্‌ নিড্‌হামের মতের পোষক ছিলেন। অতঃপর স্ওয়ান্‌, উর্‌, হেল্‌ম্‌হোৎস্‌, সোল্‌জ, স্‌রডার ও ডাস্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-গণ এই মতবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৮৫৯ সালে ম'সিয়ে পাউকেট্‌ পরীক্ষা দ্বারা এ-মতের পোষকতা করেন। এই-সব গোলযোগের মীমাংসার জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সভা এ-বিষয়ে পরীক্ষা-মূলক প্রবন্ধ চাহিয়া পুরস্কার ঘোষণা করেন।

পাস্তুর একার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রথমেই একে-একে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের পরখ-প্রণালীগুলি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করেন। তিনি বলিলেন, বায়ুতে অনেক-প্রকারের জীবাণু বর্ত্তমান। ইহারা পচনশীল পদার্থকে আশ্রয় করিয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়। জীবাণুমুক্ত বায়ু পচনশীল পদার্থে জীবনের সঞ্চার করিতে পারে না। সুতরাং স্বতোজনন-বাদ ভ্রমাত্মক। বিশেষ-একটি পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি বিজ্ঞান-সভার সভ্যদের সমক্ষে তাঁহার এ-মতবাদ প্রমাণ করেন। বিরুদ্ধ-দলের নেতা পাউকেট্‌ তাহার নিজের মতের পোষকতা-সূচক পরখ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য পাস্তুরই ঘোষিত পুরস্কার পাইলেন এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে বিজ্ঞান-সভার সদস্য মনোনীত হইলেন। কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বাষ্টিয়ান্‌ তাঁহার পরখ-প্রণালীর কতকগুলি গলদ দেখাইয়া দেন। পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া পাস্তুর নূতন একপ্রকারের অতি সূক্ষ্ম জীবাণুর (micro-organisms) আবিষ্কার করেন। তাপের প্রভাবে এগুলিকে বিনষ্ট করা যায় না। এই জীবাণুগুলিই পূর্ব্বে অপর্য্যবেক্ষিত থাকিয়া স্বতোজনন-বাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পোষকদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল।

পাস্তুর মদ হইতে গাঁজন-ক্রিয়া দ্বারা সির্কা (syrup) প্রস্তুতের অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীও আবিষ্কার করেন। মাইকোডার্মা আসেটি (mycoderma aceti) নামক একপ্রকার জীবাণুদ্বারাই এই গাঁজন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় বলিয়া তিনি প্রমাণ করেন। উহাদের জীবন-প্রণালী বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিবার পর তিনি কিরূপে উহাদের দ্বারা বেশী পরিমাণ কাজ পাওয়া যাইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করেন। ফ্রান্সের সির্কা-প্রস্তুতকারীগণ তাঁহার এআবিষ্কারে প্রচুর লাভবান্‌ হন।

ল্যাভোয়াশিয়ে, বার্জ্জেলিয়াশ্‌, পাস্‌র্‌ন্‌, কুট্‌জিঙ্গ প্রভৃতি রাসায়নিক-গণ পাস্তুরের পূর্ব্বেই এ-বিষয়ে কিছু-কিছু কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পাস্তুরই ইহাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন।

এইবার পাস্তুর মদের টকে' যাওয়ার (souring of wine) কারণও নিরাকরণের উপায় আবিষ্কার করেন। বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট মদ ও টক মদ পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন—উৎকৃষ্ট মদে শুধু ঈষ্ট কোষই (yeast cells) বর্ত্তমান—কিন্তু টক মদে ইহা ছাড়া বিভিন্ন-প্রকারের জীবাণুও রহিয়াছে। এইগুলিকেই পাস্তুর টকে' যাওয়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কি করিয়া ঈষ্ট কোষগুলিকে বাঁচাইয়া এগুলিকে নষ্ট করা যায়, এখন ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। অনেক চেষ্টার পর আবিষ্কার করিলেন, মদকে পাত্রস্থ করিবার পূর্ব্বে যদি সামান্য তাপে কিছুক্ষণ গরম করা যায়, তবে অপকারী জীবাণুগুলি মরিয়া যায়, কিন্তু ঈষ্ট কোষগুলি বাঁচিয়া থাকে। মদের এই সংরক্ষণ-প্রণালীকে "পাস্তুরীকরণ" (Pasteurisation) কহে। তাঁহার এই আবিষ্কার মদ-প্রস্তুতকারীগণকে প্রভূত ক্ষতির হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। অধুনা দুগ্ধ, সর ও অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী-সংরক্ষণ-কার্য্যেও এই প্রণালীরই অনুসরণ করা হয়।

অগ্রেই বলা হইয়াছে গাঁজন-ক্রিয়া-সম্বন্ধে লাইবিগের মতবাদই পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। পাস্তুরের মত-বাদ প্রচারের পরই লাইবিগ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। পাস্তুর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণকে মধ্যস্থ মানিয়া লাইবিগকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু লাইবিগ নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া আর সাড়া দেন নাই। পণ্ডিতগণ অবনত-মস্তকে পাস্তুরের মতবাদই স্বীকার করিয়া লইলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে মতবাদটি এই—"জীবাণুই গাঁজন-ক্রিয়ার একমাত্র কারণ;—ভিন্ন-ভিন্ন গাঁজন-ক্রিয়ার ভিন্ন-ভিন্ন জীবাণু আবশ্যক"।

এইবার পাস্তুর নিদান-তত্ত্ব (pathology) সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। দক্ষিণ ফ্রান্স গুটিপোকার আবাদের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এখান হইতে উৎপন্ন রেশম পৃথিবীর নানাদেশে সরবরাহ করা হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গুটিপোকা পেব্রিন (Pebrine) নামক একপ্রকার সাংঘাতিক মহামারী রোগে আক্রান্ত হওয়াতে ব্যবসা ধ্বংসোন্মুখ হইল। চাষীরা সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিল। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু কোনো প্রাণীতত্ত্ব বা কীটতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে না ডাকিয়া রাসায়নিক পাস্তুরকেই আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারই উপর এ-রোগের রহস্য ও তাহা নিবারণের উপায়-আবিষ্কারের ভার অর্পণ করিলেন। পাস্তুর অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,

বিশেষ-একপ্রকারের জীবাণু-দ্বারাই উক্ত রোগের উৎপত্তি। অচিরেই এগুলিকে বিনাশ করিবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু অর্দ্ধেকাল পরেই আবার নালিশ আসিল তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপায়ে রোগের উপশম হয় না।

ইহাতে তিনি বড়ই চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার সহকারী মঁসিয়ে ডুক্লা বলেন যে, একদিন তিনি সজল নয়নে গবেষণাগারে প্রবেশ করিয়া অবসন্নভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ও দুঃখে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু শীঘ্র পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইল ফ্লাশেরি (Flacherie) নামক অন্য-একপ্রকার সংক্রামক রোগে গুটিপোকা মরিতেছে। পরে ইহার নিরাকরণের ঔষধও তিনি আবিষ্কার করিয়া দেশের, বিশেষতঃ রেশম-ব্যবসায়ীগণের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। ১৮৬৫ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষের দুই-বৎসর পক্ষাঘাত-রোগে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন।

আপনারা অনেকেই হয়ত অ্যান্থ্রাক্স্(anthrax)-নামক এক প্রকার মারাত্মক সংক্রামক পশু-রোগের কথা অবগত আছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে র‍্যায়ার ও ডেভাইন্ নামক দুই ব্যক্তি উক্ত রোগাক্রান্ত পশুর রক্তে সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পান। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পলেণ্ডার্ পরীক্ষা দ্বারা উহার সমর্থন করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডেল্‌ফন্ সুস্থ পশুর রক্ত লইয়া উহার চর্য্যা করিতে সমর্থ হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডেভাইন্ পুনরায় গবেষণা করিয়া প্রমাণ করেন, এই সূক্ষ্ম জীবাণুগুলিই দেহ হইতে দেহান্তরে গিয়া রোগ সংক্রামিত করে। জার্ম্মেনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদান ও জীবাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রবার্ট কক্ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রক্তে ও উহার জলীয় অংশে জীবাণুগুলির চর্য্যা করেন এবং অণুবীক্ষণ-সাহায্যে উহাদের জীবন-প্রণালী ও সংখ্যা-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অতীব প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ আবিষ্কার করেন। কিন্তু পাস্তুর ও জবার্টই এ সমস্যার সম্যক্ সমাধান করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা প্রমাণ করেন, অ্যান্থ্রাক্স্-রোগ-সংক্রামণে উপরোক্ত জীবাণুগুলির কোনো হাত নাই। রোগাক্রান্ত পশুর রক্তে একপ্রকার বিষ সঞ্জাত হয়—উহাই রোগকে সংক্রামিত করে।

পূর্ব্বে জানা ছিল পাখীরা কখনও অ্যান্থ্রাক্স্-রোগে আক্রান্ত হয় না। পাখীদের রক্তের তাপের মাত্রা পশুদের রক্তের তাপের মাত্রা হইতে সর্ব্বদাই কিছু বেশী থাকে—৪২ ডিগ্রি। পাস্তুর অনুমান করেন, রক্তের তাপের এই উচ্চতাই পাখীকে রোগের হাত হইতে রক্ষা করে। একটি মোরগকে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে বসাইয়া উহার দেহের তাপ কমাইয়া রক্তে অ্যান্থ্রাক্স্ রোগের বিষ অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেখা গেল, পাখীটি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেহের পূর্ব্ব তাপ ফিরিয়া আসিতেই উহা রোগমুক্ত হইয়া গেল।

পাস্তুর আরও নানা-প্রকার রোগের জীবাণু-সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জেনার সাহেব যেমন বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন পাস্তুরও তেমন মোরগের মহামারী (fowl cholera) ও গৃহপালিত পশুর অ্যান্থ্রাক্স্-রোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার উদ্ভাবিত চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ সফল হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণটি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ৩৪০০০০০ ভেড়াকে ও ৪৩৮০০০ গৃহপালিত পশুকে অ্যান্থ্রাক্স্-রোগের প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার পর ভেড়া শতকরা ১টি ও অন্য পশু হাজারে ৩টি করিয়া মারা যাইত। ইহাতে পশু-ব্যবসায়ীদের ভেড়ার দরুন্ ৫০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য পশুর দরুন্ ২০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক লাভ হইল (এক ফ্রাঙ্ক প্রায় সাড়ে নয় আনার সমান)।

অবশেষে পাস্তুর ক্ষিপ্ত-জন্তু-দংশনের ফলে যে জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগের উৎপত্তি হয় তাহার প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন। পাস্তুর এ-রোগের জীবাণু বা নিদান আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বটে (আজও তাহা বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞাতই রহিয়াছে), কিন্তু প্রতিষেধক ঔষধ তিনি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

পো'র ডাক্তার দুবুএ স্নায়ু-মণ্ডলকেই জলাতঙ্ক-রোগের কেন্দ্রস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষিপ্ত হইলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়।

পাস্তুর জলাতঙ্ক-রোগে মৃত পশুর সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্র লইয়া সুস্থ পশুর স্নায়ু-মণ্ডলে ও মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। অচিরেই পশুটি ক্ষিপ্ত হওয়ায় বুঝিতে পারিলেন, রোগ সংক্রামিত করিবার এই প্রণালীই উৎকৃষ্ট। দংশনের পরে পশু ১৫ দিনেই ক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু মানুষ মাসাধিক কালের পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত হয় না। বানরের দেহে এই বিষের ক্রিয়া খুব মৃদু, কিন্তু শশকে ইহার তীব্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। মোরগ মহামারী ও অ্যান্থ্রাক্স্ রোগের বিষের ন্যায় শুষ্ক বায়ুতে রাখিয়া দিলে ইহার তীব্রতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে ও ১৪ দিন পরে একেবারে অন্তর্হিত হয়। প্রথম দিন ১৪ দিন শুষ্ক, দ্বিতীয় দিন ১৩ দিন শুষ্ক, তৃতীয় দিন ১২ দিন শুষ্ক, এইরূপে ১৪ দিন ধরিয়া শুষ্ক বিষ একটি কুকুরের স্নায়ু-মণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট করিবার পর পাস্তুর দেখিলেন, অতঃপর তীব্র তাজা বিষ প্রয়োগ করিলেও কুকুরটি ক্ষিপ্ত হয় না। পশুর উপর পরীক্ষা সফল হওয়ার পর সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি ক্ষিপ্ত-কুকুর দষ্ট বালককে উপরোক্ত উপায়ে চিকিৎসা করেন ও তাহাতে কৃতকার্য্য হন।

অধুনা পৃথিবীর নানা স্থানে পাস্তুর চিকিৎসাশালা স্থাপিত হইয়াছে ও তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে বৎসরে হাজার-হাজার রোগী চিকিৎসিত হইয়া জলাতঙ্ক রোগের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে।

চন্দননগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা

শ্রী হরিহর শেঠ

কথক

চন্দননগরে ছোট-বড় অনেকগুলি কথকের উদ্ভব হইয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণি, উদ্ধবচন্দ্র চূড়ামণি ও ধরণীধর নামে তিনজন বিখ্যাত কথকের এই স্থানে বাস ছিল। তৎপরে স্বর্গীয় গুরুচরণ গাঙ্গুলী, তমালচন্দ্র অধিকারী, বেণীমাধব গাঙ্গুলী, ননী কথক, অক্ষয়চন্দ্র

অধিকারী, শ্রীযুক্ত রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ৺প্রফুল্লচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ও কথকতা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয় গুপ্তিপাড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কথকতা ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া প্রথম তিনি বরানগরে টোল স্থাপন করেন। তাঁহার কথকতায় মুগ্ধ হইয়া গোন্দলপাড়া-নিবাসী খ্যাতনামা স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার আগ্রহে পরে এখানে বাস করেন। শ্রীশ্রী পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী৺কালী মাতার সম্মুখে একদিন পরমহংসদেব তাঁহার ভক্তিপূর্ণ স্তব-পাঠ-শ্রবণে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি বলিতেন এরূপ ভক্ত কথক আর নাই।

৺উদ্ধবচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের জন্মস্থান হুগলি জেলার বাগনান গ্রাম, কেহ-কেহ বলেন ধনিয়াখালি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি হাটখোলার স্বর্গীয় কালিদাস ভট্টাচার্য্যের দ্বারা আনীত হন এবং তাঁহার শ্বশুর ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (লোকে বিদ্যাসাগর বলিত) মহাশয়ের সুবিখ্যাত টোলে অধ্যয়নদ্বারা শিক্ষালাভ করিয়া, পরে উক্ত রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে বহু যত্নে কথকতা শিক্ষা করেন এবং গুরুগৃহে পরীক্ষায় পারদর্শিতার ফলস্বরূপ চূড়ামণি উপাধি-ভূষিত হন। পরে ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহার কথকতায় সুযশ দেশব্যাপী হইয়াছিল। তিনিও পরে অনেককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৩২০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধরণীধরকে ধরণী-কথক বলিয়াই লোকে জানিত। তিনিও একজন পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। 'কবিতা-সংগ্রহ' গ্রন্থে উদ্ধব ঠাকুর ও অন্যান্য প্রথিতনামা কথকদিগের সহিত তাঁহার নামও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহার বাটী ছিল রাণাঘাট, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি এখানে থাকিতেন।

শ্রীযুক্ত রামনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৺রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র। বর্ত্তমানে এখানকার মধ্যে তিনি কথকতায় সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং একজন প্রতিভাশালী টপ্পা-গায়ক। স্বর্গীয় তমালচন্দ্র অধিকারী মহাশয়েরও কথকতায় খ্যাতি ছিল।

কবিওয়ালা

বহু পূর্ব্বকাল হইতে এখানে কবি ও কবির দল অনেক ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং প্রমাণও পাওয়া যায়। এমন কি, শুনা যায় যে, কবির দল এদেশে যখন প্রথম সৃষ্ট হয়, তখনই এখানে কতিপয় বড় কবির উদ্ভব হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে দাঁড়া কবি নামে এক শ্রেণীর কবির কথা শুনা যায়। তৎপূর্ব্বে প্রকৃত কবির গানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সময়েই চন্দননগরে তৎকালের তিনজন প্রসিদ্ধ কবি প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের নাম রাসু, নৃসিংহ ও নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী।

রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর ছিলেন। তাঁহারা ১৭৩৪ ও ১৭৩৮ সালে গোন্দলপাড়ায় এক ভদ্রকায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন।* তাঁহাদের পিতা আনন্দনাথ রায় ফরাসী সরকারের সামরিক বিভাগে একজন সামান্য মুহুরীর কাজ করিতেন। তিনি সেখানে বেতন সামান্য পাইলেও অন্যোপায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া দুর্গোৎসবাদি করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম স্থানীয় বিদ্যালয়ে এবং পরে মাতুলালয়ে থাকিয়া চুঁচুড়ায় মিশনারীদের বাংলা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী না দেখিয়া এক বৎসর চুঁচুড়ায় থাকিবার পর মাতুল কর্ত্তৃক তাঁহারা পুনরায় চন্দননগরে প্রেরিত হন। ইহার পর তাঁহাদের পিতৃবিয়োগের সহিত, অন্য বিশেষ অভিভাবক না থাকায় তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। সেই সময়েই তাঁহারা হরুঠাকুরের গুরু 'দাঁড়াকবি' দলের সৃষ্টি-কর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রঘুনাথের কবির দলে যোগদান করেন। কিছুকাল শিক্ষালাভের পর তাঁহারা নিজেই একটি কবির দল করেন এবং শীঘ্রই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৫৭ বঙ্গাব্দে তাঁহারা প্রথম কবির দল লইয়া কলিকাতায় কোনো ধনাঢ্যের ভবনে গাওনা করেন। দেওয়ান ইন্দ্র-

* ১৩১১ সালের 'নব্যভারতে' রাসুর জন্ম সাল ১৭৩৫ লেখা আছে।

নারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং চন্দননগর সেই সময় হইতেই কবিওয়ালাদের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। ইঁহাদের গানের বিষয় ছিল প্রধানতঃ বিরহ ও সখীসম্বাদ এবং অধিকাংশ গীতই বেশ সাত্ত্বিক ও ভক্তিভাবের ছিল।* তাঁহাদের মতন সরসমধুর রচনার মধ্যে শ্লেষ ব্যঙ্গোক্তি অন্যের মধ্যে বিরল। অথচ রচনায় উচ্ছৃঙ্খল অশ্লীলতার প্রশ্রয় নাই। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাঁহাদের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন, "নিতে বৈষ্ণব, রাসু, নৃসিংহ, রামবসু, ভবানী বেনে ইঁহাদের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল।" † কেহ-কেহ কবি-গীতের সৃষ্টিকর্ত্তাদের মধ্যে ইঁহাদের নামই প্রথম বলেন। ‡ লালু নন্দলাল নামক সুপ্রসিদ্ধ কবি ইঁহার সমকালীন লোক। রাসু ৭২।৭৩ বৎসর বয়সে ইং ১৮০৭ এবং নৃসিংহ তাহার কয়েক বৎসর পরে, সম্ভবতঃ ইং ১৮০৯ সালে গতায়ু হন।

তাঁহারা এমনই সদ্ভাবে একযোগে কার্য্য করিতেন যে এই উভয় সহোদরের মধ্যে গীত ও সুর-রচনায় কে কি-প্রকার গুণসম্পন্ন ছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ** গানের ভণিতায়ও যুগ্মনাম দেখা যায়। তাঁহাদের রচিত মাত্র ছয়টি গীতের বিষয় জানা যায়। উহাও সখী-সংবাদ ও বিরহ-বিষয়ক। অন্য বিষয়ে তাঁহাদের রচিত কোনো গীত ছিল কি না তাহা জানা যায় না। †† কিন্তু তাঁহাদের রচিত গান যাহা পাওয়া যায়, তাহা সে-সময়ের অপরের গানের তুলনায় অনেক উচ্চাঙ্গের।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীকে সাধারণতঃ লোকে নিতাই, নিতি বৈরাগী বা নিতে বৈষ্ণব বলিত। তিনি চন্দন-নগরের কুঞ্জদাস বৈষ্ণবের গৃহে আনুমানিক ১৭৫১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বা বংশ-বিষয়ক অন্য কোনো পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। নিতাই নিধুবাবু ও হরুঠাকুরের সমসাময়িক। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না, এমন কি তাঁহার খ্যাতির অনুরূপ গীতরচনায় বিশেষ পারদর্শিতার কথাও জানা যায় না। * কিন্তু তাঁহার সুর-লয়-সমন্বিত সুমিষ্ট সঙ্গীত লোকের বড়ই আদরের ছিল এবং তাঁহার সময়ে তিনি একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ডুগডুগি বাজাইয়া গ্রামে-গ্রামে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেন।† কথিত আছে কলিকাতা সিমলার গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার জন্য গীত রচনা করিয়া দিতেন। ঐসকলের অধিকাংশই 'বিরহ' খেউর ও সখী-সংবাদ বিষয়ক গীত। আবার 'বঙ্গভাষার লেখক'-গ্রন্থে তাঁহাকে একজন ভালো বাঁধনদার মাত্র বলিয়া উল্লেখ করা আছে। নিতাই ও ভবানী বেনের কবির লড়াই সে-সময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল এবং গঙ্গার উভয় পার্শ্বের বহুদূর হইতে লোক তাঁহা-দেব কবির গান শুনিতে আসিত। দুই-একদিনের পথ হইতেও লোক দলে-দলে 'নিতে-ভবানের' লড়াই শুনিতে আসিত। ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিতাইকে নাকি নিত্যানন্দ-প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বঙ্কিম-বাবু বলিয়াছিলেন, "রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাসের এক-একটি গীত এত সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই"। ‡ নব্যভারতে 'কবিওয়ালার লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় বলেন, বহু কবিদের মধ্যে রাসু, নৃসিংহ, হরুঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগীর ভাগ্যে যশোমাল্য লাভ ঘটিয়াছিল। নিতাইয়ের নামে ও ভাবে ভদ্র-অভদ্র সকলে গদগদ হইতেন। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের এমনই একটা সহানুভূতি ছিল যে, তাঁহার জয়ে তাঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না। ** নিতাই সুখ্যাতির সঙ্গে-সঙ্গে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনেও সমর্থ হইয়াছিলেন। রামানন্দ নন্দী নামে তাঁহার এক শিষ্য একজন বড় কবি হইয়াছিলেন।

* বিশ্বকোষ।
† সেকাল আর একাল।
‡ প্রাচীন কবিসংগ্রহ ও বঙ্গের কবিতা।
** সংবাদ প্রভাকর।
†† Bengali Literature in the Nineteenth Century.

* Bengali Literature in the Nineteenth Century.
† নব্যভারত, ফাল্গুন ১৩১৩ সাল।
‡ বঙ্গের কবিতা। শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।
** বঙ্গভাষার লেখক :—শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

তিনি একজন বৈষ্ণব ছিলেন এবং সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি চুঁচুড়ায় একটি আখড়া এবং চন্দননগরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধায় উৎসবাদি হইত। ইং ১৮২১ সালে পূজার সময় ইনি কাশিমবাজার রাজবাটিতে গাহিতে যাইয়া তথায় রোগাক্রান্ত হন এবং ঐবৎসরই প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র জগৎচন্দ্র, রামচন্দ্র, প্রেমচন্দ্র কবির দল করিয়াছিলেন। (১) এখন তাঁহার নিজ বংশের কেহ জীবিত নাই। উদয়চাঁদ নামে তাঁহার এক দৌহিত্র ছিলেন, ইনিও কিছুকাল তাঁহার মাতুলের দল রাখিয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, তাঁহার পুত্রসন্ততি ছিল না। (২)

কবি অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গির নাম অনেকেই বিদিত আছেন। তাঁহার পুরা নাম হেন্সম্যান্ অ্যাণ্টনি (Hensman Anthony) তাঁহার প্রতিপক্ষ ভোলা ময়রা তাঁহাকে 'হেস্মন্' বলিত। (৩) পূর্ব্বোক্ত কবিদের তুলনায় তিনি যে অধিকতর গুণসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার নাম অধিক খ্যাত, তাহা নহে। বোধ হয়, তিনি বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গি ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম এত অধিক বিখ্যাত। প্রকৃতই বিধর্ম্মী হইয়াও তিনি যেরূপ ভক্তিভাবের গীত রচনা ও গান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক কবির গানের মধ্যে দুর্লভ। তিনি হিন্দুর সহিত যেরূপ প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়াছিলেন, তাহাতে তখনকার হিন্দুও উদারহৃদয়ে তাঁহাকে কোল পাতিয়া দিতে বিমুখ হন নাই।

অ্যাণ্টনি সাহেবের আদি-বাস চন্দননগরে, পরে তিনি গরুটীতে গিয়া বাস করেন। তাঁহার ভ্রাতা কেলি সাহেব সে-সময়ের একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জাতি-সম্বন্ধে কেবল রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি ফরাসী বংশোদ্ভূত, (৪) নচেৎ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, (৫) অনাথকৃষ্ণ দেব, (৬) সুশীলকুমার দে, (১) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (২) প্রভৃতি মহাশয়গণ সকলেই তাঁহাকে পর্ত্তুগীজ বলিয়াছেন। ব্যবসার কর্ম্ম-উপলক্ষে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি একটি ব্রাহ্মণ রমণীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। তিনি হিন্দুর দোল-দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন এবং অবশেষে একটি সখের কবির দল বাঁধিয়াছিলেন, পরে উহাকে পেশাদারীতে পরিণত করেন। প্রথম-প্রথম তাঁহার রচনার
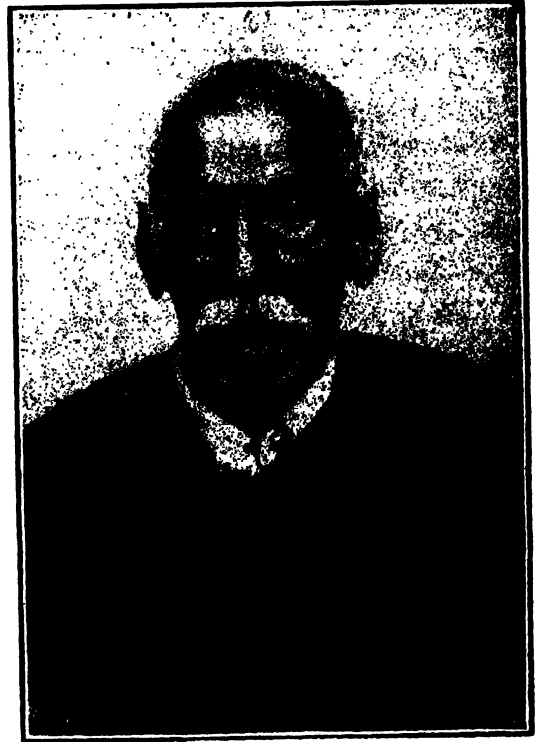
শ্রীযুক্ত মতিলাল শেঠ

ক্ষমতা ছিল না। চন্দননগর গোন্দলপাড়া-নিবাসী গোরক্ষনাথ নাথ নামে এক-ব্যক্তি ইহাঁর দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। শেষে ইহাঁর সহিত মনান্তর ঘটিবার পর হইতে ইনি নিজেই উত্তম গীত রচনা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি গাহিয়াছিলেন,—

(১) Bengali Literature in the Nineteenth Century.
(২) প্রাচীন কবিসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড।
(৩) বঙ্গের কবিতা।
(৪) সেকাল ও একাল।
(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।
(৬) বঙ্গের কবিতা।

(১) Bengali Literature in the Nineteenth Century.
(২) বঙ্গভাষার লেখক।

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজেও ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী ॥"(১)

জনরব কলিকাতা বহুবাজারে এক মন্দিরে ফিরিঙ্গী কালী নামে যে বিখ্যাত কালী-মূর্ত্তি আছে উহা এই ব্রাহ্মণ বধূর আব্দার অনুসারে ফিরিঙ্গী অ্যান্টুনীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। (২) সাহেবের ভবানীবিষয়ক স্বরচিত গানগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী ও ভাবোদ্দীপক। দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন অ্যান্টুনী যে নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। (৩) 'সেকাল ও একাল'

অ্যান্টুনী সাহেবের বাড়ী এইস্থানে ছিল। এখন পাটকলের সাহেবদের বাস-ভবন।

"বঙ্গভাষার লেখক" প্রভৃতি গ্রন্থে যে তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষের কথা লেখা আছে, এখন তাহাও আর দেখা যায় না। কয়েক বৎসর হইল গরুটীর বকুলতলায় তাঁহার ভিটার উপর অ্যাঙ্গাস্ কোম্পানির পাটকলের সাহেবদের বাসভবন নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক অ্যান্টুনীর বাসস্থান এখনও নির্ণয় করা যাইতেছে; রাসু, নৃসিংহ ও নিতাইয়ের বাসস্থান বা নিতাইয়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের কোনো সন্ধান করিতে পারি নাই।

প্রাচীন কবিওয়ালাদের মধ্যে আরও কয়েকজন এখানকার লোকের কথা জানা যায়। তাঁহাদের নাম বলরাম দাস কপালী, নীলমণি পাটনী, গোরক্ষ নাথ ও পরাণচন্দ্র রায়। শেষোক্ত তিনজনই সহরের দক্ষিণাংশে বাস করিতেন। বলরাম চন্দননগরে বাস করিতেন এবং উঁহার দৌহিত্রও কবিওয়ালা ছিলেন, এইমাত্র জানিতে পারা যায়। (১) তাঁহার দৌহিত্রের নাম কৃষ্ণদাস, তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস দল চালাইয়াছিলেন। (২) কোনো-কোনো গ্রন্থে উঁহার নাম বলরাম বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ আছে। একখানি পুস্তকে তাঁহার সরকার উপাধির কথা জানা যায়। (৩) নীলমণি ও গোরক্ষনাথের নামের উল্লেখ অনেক গ্রন্থে পাওয়া যাইলেও তাঁহাদের বাসস্থানের কোনো কথা লেখা নাই। গোরক্ষনাথ অ্যান্টুনীর দলে প্রথম গানরচয়িতা ছিলেন, পরে তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। কবি অপেক্ষা ভালো বাঁধনদার বলিয়া ইঁহার নাম ছিল। বহু গ্রন্থে ইঁহাদের সকলের গান পাওয়া যায়। (৪) গোন্দলপাড়া বিনদতলা ঢ্যাপঢেপের ঘাটের নিকট নীলমণির বাস ছিল বলিয়া জানা যায়। তথায় তাঁহার সম্পর্কিত কোনো-কোনো লোকের সন্ধান পাওয়া যাইলেও ঠিক তাঁহার বাটী কোথায় ছিল তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। এখানে একজন পেসা ধোপা নামক কবি ছিলেন। কোন্ পল্লীতে তাঁহার আবাস ছিল জানি না, তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুও জানিতে পারি নাই। সুপ্রসিদ্ধ হরুঠাকুরের জন্মস্থান সিমুলিয়া কলিকাতা, ইহা বহু গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তিনি এখানে বা অতি নিকটে কোথাও ছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু স্থানীয় কোনো-কোনো প্রাচীন ব্যক্তি বলেন তিনি এই স্থানে অনেক সময়ই বাস করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সেকালের কবির দলের প্রাদুর্ভাব কমিতে থাকে এবং ইং ১৮৮০ সালের পর হইতে আর ভালো কবির দল আর দেখা যায় না। এই সময়ের মধ্যে সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন নাথ

(১) কোনো-কোনো গ্রন্থে এইরূপ আছে,—
"ভজনপূজন জানি না মা জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গি ॥"

(২) সেকাল ও একাল।

(৩) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(১) Bengali Literature in the Nineteenth Century.

(২) প্রাচীন কবিসংগ্রহ।

(৩) বঙ্গের কবিতা।

(৪) প্রাচীন কবিসংগ্রহ, গুপ্তরত্নোদ্ধার, বাঙ্গালীর গান, বঙ্গের কবিতা, নব্যভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ইঁহাদের গান পাওয়া যায়।

নামক দুই জন কবিওয়ালা হাটখোলা ও গোন্দলপাড়ায় বাস করিতেন। সময়ের সঙ্গে এখানেও ক্রমে ভালো কবির লোপ পাইলেও, বরাবরই এখানে কবির দল ও কবিওয়ালা আছে। এখন যে দুই-একটি সামান্য দল আছে তাহার তাহার নাম উল্লেখযোগ্য নহে।

পাঁচালী, কীর্ত্তন ও বাউল

দেশে কবির গানের ও কবির লড়াইয়ের প্রাদুর্ভাব কিছু কমিলে, অন্ততঃ গুণসম্পন্ন কবিওয়ালাদের তিরোভাবের সঙ্গে, যখন দেশে পাঁচালীর গান আরম্ভ হইল, তখন চন্দননগরে যে-সকল পাঁচালীওয়ালা প্রথম উদ্ভূত হন, তাঁহাদের বিষয় বিশেষভাবে কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। কবিগানের প্রবর্ত্তন ও উৎকর্ষ সাধনে চন্দননগরের যেরূপ কৃতিত্ব দেখা যায়, পাঁচালী-সম্বন্ধে তেমন কিছুই শুনা যায় না। হাটখোলার চিন্তেমালা (চিন্তামণি মালা) ও রামভাট (রামতারণ ভাট) ইঁহাদের নামই এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই উভয় ব্যক্তির দলই এপ্রদেশে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চিন্তা দাশু রায়ের রচনা লইয়াই গান করিতেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রসিক নামক এতন্নগরবাসী এক ব্রাহ্মণ। কেহ-কেহ বলেন চিন্তা এখানে থাকিলেও, তাঁহার ঠিক বাড়ী ছিল তেলিনীপাড়া। যাত্রাওয়ালা নবীন গুঁই এবং মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন। শেষোক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্যান্য পুস্তকের সহিত 'রহস্য পাঁচালী' নামে একখানি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অপরের দলের জন্যও পালা বাঁধিয়া দিতেন।

৺মধুপাত্র, রামদত্ত ও কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামক আর তিন জন ভদ্রলোক পাঁচালী যাত্রা প্রভৃতির গান রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উক্ত সকলের গীতাবলী সংগ্রহ-আকারে একত্র কোথাও পাওয়া যায় না, চেষ্টা করিলে এখনও কতক-কতক সংগ্রহ হইতে পারে। * সহরের সর্ব্বত্রগামী সুগায়ক অন্ধ-চণ্ডী যাহাকে লোকে সচরাচর চণ্ডী কানা বলিত, তাঁহার অধিকাংশ গানই উঁহাদের দ্বারা রচিত। সময়োপযোগী কোনো ঘটনা ও বিষয় লইয়া গান বাঁধিতেও তাঁহারা সক্ষম ছিলেন। অধিকাংশ সময় জন্মান্ধ চণ্ডী উচ্চকণ্ঠে এইরূপ গান গাহিয়াই তাহার যষ্টির সাহায্যে সহরের পথে-পথে ঘুরিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতেন। চণ্ডী জাতিতে তন্তুবায়, জন্মস্থান কালনা, কিন্তু এইস্থানেই ভগিনীর বাড়ীতে বাস করিয়া, এইস্থানেই শেষে তাঁহার দেহাবসান হয়। 'বঙ্গভাষার লেখক' এবং 'জন্মভূমি' উভয়েতেই চণ্ডীকে কবি এবং তাঁহার দ্বারা যে-সব গান গীত হইত তাহা

যাত্রাওয়ালা মদন-মাষ্টারের বাড়ী

স্বরচিত বলিয়াছেন। আমরা চণ্ডীকে দেখিয়াছি, তাঁহার গান শুনিয়াছি। যতদূর জানি গান তিনি রচনা করিতেন না। ভণিতায় তাঁহার নাম থাকিলেও শেষোক্ত ৺মধুপাত্র, রামদত্ত, কেদার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত মতিলাল পলশাঁই তাঁহার গান বাঁধিয়া দিতেন। ইঁহারা সকলেই বাঁধনদার গায়ক কেহই নন। শুনা যায় চণ্ডীকে মাঝে রাখিয়া উহার মারফতে গান গাওয়াইয়া মধ্যে মধ্যে তন্তুবায়

---

* এখানকার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গীতিকবিতাগুলির মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, স্থানাভাবে তাহা এখানে দিলাম না। উহা স্বতন্ত্র প্রকাশের ইচ্ছা আছে। লেখক।

রামদত্তের সহিত ব্রাহ্মণ কেদার চক্রবর্ত্তীর টক্কা-টক্কি চলিত।

মধুপাত্র মহাশয় নাম গান ভালো বাঁধিতে পারিতেন। ৺অম্বিকাচরণ দে নামে গীত-রচয়িতা এখানে আরও এক-জন ছিলেন। অম্বিকা-বাবু পালা বাঁধিতে এবং অভিনয় করিতে পারিতেন। তাঁহার উদ্যোগে একটি নূতন ভাবের পাঁচালীর দল সৃষ্ট হইয়াছিল। উহার নাম দিয়াছিলেন 'মূর্ত্তিমান্ পাঁচালী'; উহাতে যাত্রার ন্যায় পোষাক পরিয়া
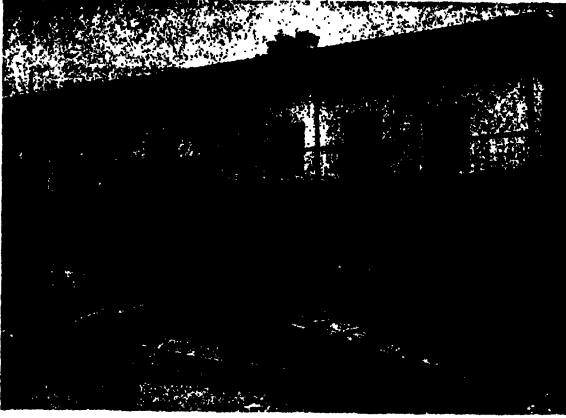
বো-মাষ্টারের যাত্রার দলের এবং পরে অন্যান্য যাত্রা দলের আড্ডাবাড়ী

গাওনা হইত। বিষয় ছিল 'তরণীসেন বধ'। উহা ভাঙ্গিয়া পরে একটি সখের অপেরার দল সৃষ্ট হইয়াছিল।

নবীন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্র দাস, রাম বাগ ও নীলমণি যুগী নামে আর চারি জন পাঁচালী-ওয়ালা ছিলেন। ক্ষেত্র-দাসের প্রকৃত বাড়ী তেলিনীপাড়ায় ছিল, কিন্তু তিনি প্রায় এইখানেই থাকিতেন। রামের বাড়ী ছিল বারাসত কৃষ্ণবাটী নীলমণির লালবাগানে।

এখানে কীর্ত্তনের দলেরও অভাব ছিল না। আনন্দ-মোহিনী বা আনন্দমণি ও শ্যামা নাম্নী দুইজন কীর্ত্তনওয়ালী ছিল, তাহাদের নাম এখানে প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ-কেহ বলেন আনন্দমোহিনী ওরফে 'আন্দি'ই এপ্রদেশে মেয়ে কীর্ত্তনের দলের প্রবর্ত্তক। এক্ষণে মোহিনী ও কুমুদা নামে দুইজন ভাল কীর্ত্তনীয়া আছে। পুরুষ কীর্ত্তন-ওয়ালার মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর সাকরেদ্ চ্যাম্না গোপালের নাম প্রসিদ্ধ। এখানে হরি-সংকীর্ত্তনের দল অনেক ছিল এবং এখনও আছে, তন্মধ্যে ষষ্ঠীতলার সম্প্রদায়ের খুব খ্যাতি ছিল।

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এখানে ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে একটি সুন্দর বাউলের দল গঠিত হইয়াছিল। মানকুণ্ডার উত্তরপাড়ার মজুমদারদের বাটীতে দোল উপলক্ষে উহার প্রথম গাওনা হইয়াছিল।

যাত্রার দল ও যাত্রাওয়ালা

পুরাকালে বাঙ্গালায় কবি-গীত সৃষ্টি ও প্রচলনের মূলে যেমন চন্দননগরের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, আধুনিক ভাবের যাত্রা সৃষ্টির আদিতেও তেমনই চন্দননগরের কৃতিত্ব নিতান্ত কম নহে। এই উভয় বিষয়ের জন্য চন্দননগরের যথার্থই গৌরব করিবার আছে।

যাত্রা এদেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও তাহা ঠিক এখনকার মতন ছিল না। আধুনিক ভাবের যাত্রা প্রথম যখন প্রবর্ত্তিত হয়, সে-সময় যে-সব দল সৃষ্ট হয় চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দল তাহাদের মধ্যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবতঃ প্রথম। লোকে ইহাকে মদন মাষ্টারের দল বলিত। ইহার পূর্ব্বে এখান-কার গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডী-যাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও অনাথকৃষ্ণ দেব উভয়েই গুরু-প্রসাদকে অদ্বিতীয় যশস্বী বলিয়াছেন।* ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। উহা একশত বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। মদন মাষ্টার তাহার অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হন। ইহার যাত্রার দল তাঁহার সময়ে বিশেষ খ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও অনাথকৃষ্ণ দেব তাঁহাদের গ্রন্থে ইহাকেও প্রাচীন যাত্রা-ওয়ালাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।† মদন মাষ্টার প্রথম সখের দল গঠিত করেন। তাঁহার দলে প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, রাম-বনবাস ও হরিশ্চন্দ্র অভিনয় হয়। বিদ্যাসুন্দরের পালাও তাঁহার দলে গাওনা হইত বলিয়া কেহ-কেহ বলেন। এখানকার বেনোহাটায় শিবতলায় প্রথম অভিনয় হয় প্রহ্লাদ-চরিত্র।

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং বঙ্গের কবিতা।

† Bengali Literature in the Nineteenth Century ও বঙ্গের কবিতা।

কথিত আছে যাত্রার দলে জুড়ির প্রথা তিনিই প্রথম প্রচলন করেন।

তিনি এই দল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। উহাকে একেবারে অবৈতনিক রাখাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনা যায় তাঁহার দলের এক ব্যক্তি কোন স্থানে গোপনে কিছু অর্থ গ্রহণ করায়, উহা মাষ্টারের কর্ণগোচর হইলে তিনি যাত্রার দলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর তিনি আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। এসম্বন্ধে অন্যরূপও শুনা যায়। কেহ-কেহ বলেন, তিনি সখের দল করিলেও প্রথম-প্রথম পেলা লইতেন। এক সময় চুঁচুড়ায় সুবর্ণ-বণিক্-জাতীয় কোনো ধনী লোকের বাটীতে গাওনা হয়, সেই সময় কোনো কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে আর পেলা লইবেন না। মাষ্টার মহাশয় তাঁহার দলের অভিনয়ের জন্য পালাগুলি নিজেই রচনা করিতেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ এই দল চালাইয়াছিলেন। উহা বৌ-মাষ্টারের দল নামে খ্যাত ছিল। প্রথম এই দলে 'শ্রীমন্তের মশান' অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কেহ-কেহ বলেন, গোন্দলপাড়া নামারের বাগান নিবাসী ৺মধুসূদন নাথ নামে উক্ত দলের একব্যক্তি 'দণ্ডী পর্ব্ব,' 'হরিশ্চন্দ্র,' 'রাম-বনবাস' ও 'প্রভাস-যজ্ঞ' পালা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রাম-বনবাস সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। 'দণ্ডীপর্ব্ব' ও 'প্রভাস-যজ্ঞের' কথা বলা যায় না, কিন্তু অন্য পালাগুলি মদন মাষ্টারের রচনা বলিয়াই অনেকের অনুমান।

মদন মাষ্টারের সমসাময়িক বেন্দা চাঁড়াল নামে আর একব্যক্তি এখানে একটি যাত্রার দল করিয়া কেবলমাত্র 'দুর্গামঙ্গল' গাহিতেন। ইহার সহিত মাষ্টারের দলের কোনো সম্বন্ধ ছিল না।

ইহার পর মাষ্টারের দলের প্রসিদ্ধ বাদক মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নবীনচন্দ্র গুঁই নামক আর-এক ব্যক্তি ঐ দল হইতে বাহির হইয়া, উভয়ে পর-পর দুইটি স্বতন্ত্র যাত্রার দল গঠিত করেন। এসময় বৌ-মাষ্টারের দলও বর্ত্তমান ছিল এবং এই তিনটি দলই তখনকার উৎকৃষ্ট দল ছিল। ইহার পর যাদু গুঁই, রাধামাধব মুখোপাধ্যায়, রাম বাঁড়ুয্যে, কালী রায়, দোয়ারি যুগী, দুর্গাচরণ নিয়োগী, নবীন ঘোষ, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ ঘোষ, সীতানাথ জেলে, কালী হালদার, গয়ারাম কোঙার, লালু আচার্য্য, সন্ধ্যা বাউরি, দয়াল চন্দ্র প্রভৃতি আরও কয়েক-

যদুনাথ পালিত

ব্যক্তি যাত্রার দল করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ নিয়োগীর দল প্রথম উমেশ আচার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে প্রথম 'শম্ভু-নিশম্ভু বধ,' (শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ) ও পরে 'রাম-বনবাস' অভিনয় হইয়াছিল। উক্ত ব্যক্তিদের অনেকেই প্রথম মদন-মাষ্টারের না হয় বৌ-মাষ্টারের দলে ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৌ-কুণ্ডুর দল ও মদন-মাষ্টারের দল ভাঙ্গিয়া গঠিত হইয়াছিল। *

কৃষ্ণ-যাত্রা নামক আর-এক শ্রেণীর যাত্রা ঐ সময়েই তৈয়ারী হইয়াছিল। বদন অধিকারীর দল হইতে বাহির হইয়া গোবিন্দ অধিকারী যেমন তাঁহার স্বগ্রাম জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে কালীয়-দমন যাত্রার দল গঠিত করিয়াছিলেন,

* বঙ্গের কবিতা।

সেইরূপ ব্রজ অধিকারী এখানে একটি দল প্রস্তুত করেন এবং প্রথম কালীয়-দমন তৎপরে 'কৃষ্ণ-মঙ্গল,' 'মানভঞ্জন,' 'কলঙ্কভঞ্জন' ও 'মাথুর' পালা অভিনয় করেন। গোপালচন্দ্র অধিকারী নামক আর-একজন কৃষ্ণ যাত্রার দল করিয়া ঐসকল পালা গাহিতেন। পূর্ব্বোক্ত দলগুলিতে বৌ-মাষ্টারের সকল পালা ভিন্ন, লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল,' 'রাবণ বধ' ও 'শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ' এই পালাগুলি প্রায় গাওনা হইত। উল্লিখিত দলগুলিই যে উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা নহে, তবে সকলগুলিই যে এক বৌ-মাষ্টারের দল হইতেই প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষ-ভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময় হইতেই বাঙ্গলার অন্যত্রও যে যাত্রার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। বহু দিবসাবধি বৌ মাষ্টারের দলের পালাগুলি আদরের সহিত বাঙ্গালার অন্যত্র ও অনেক যাত্রার দলেই গাওনা হইত।

ফরাশডাঙ্গায় যাত্রার দলের প্রসিদ্ধি ও প্রশংসা ছিল বলিয়া অন্যান্য স্থান হইতেও যাত্রার দল আসিয়া এখানে বাসা লইত এবং এখন পর্য্যন্ত অন্যান্য গ্রামের তুলনায় এখানে বাহিরের যাত্রার দল অধিক থাকে। সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্ন নিয়োগীর দল এইখানেই প্রথম সৃষ্ট হয়। তিনিও চন্দননগরের লোক।

চন্দননগরে কবি ও যাত্রা-ওয়ালা প্রভৃতির প্রাধান্যের মূল কারণ দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অর্থানুকূল্য বলিয়া মনে হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, গীত-বাদ্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এই জন্যই সংগীত-কারদিগের এখানে প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। তখন অবশ্য যাত্রার দল ছিল না, কিন্তু কবির দলের প্রাধান্য হইতেই ক্রমে যাত্রার দলগুলির সৃষ্টি এ-অনুমান বোধ হয় অমূলক নহে।

থিয়েটার, অপেরা ও ঐকতানবাদন-সম্প্রদায়

এখানে প্রথম যে থিয়েটারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা একটি ইংরেজী থিয়েটার। উহা সম্ভবতঃ ১৮০৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। * শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের লেখা হইতে জানা যায় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে L' Avocat নামক একখানি ফরাসী নাটক বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া ফরাসী বঙ্গে অভিনীত হয়। * ফরাসী বঙ্গ বলিতে চন্দননগর ভিন্ন আর-কিছু হওয়া সম্ভব নহে। বাঙ্গালা থিয়েটার-সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা যায়, ১২৭৮ সালে 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকই সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। উহার অধ্যক্ষ ছিলেন ৺যদুনাথ পালিত, সহকারী ছিলেন শ্রীযুক্ত মতিলাল শেঠ। এতদ্ভিন্ন ৺হরিচরণ সুর, ৺মহেন্দ্রনাথ নন্দী, ৺শশীভূষণ বসু, ৺ত্রিগুণাচরণ পালিত প্রভৃতি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মতি-বাবুর দ্বারা অঙ্কিত বাহ্যরেখার উপর সুখচরের গোবিন্দ পোটোর দ্বারা উহার যবনিকা অঙ্কিত হইয়াছিল। উহাতে এখানকার বার-দুয়ারির দৃশ্য ছিল। প্রথম অভিনয় হয় স্বর্গীয় ডাক্তার ক্ষীরোদচন্দ্র পালিত মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে। মাত্র চারি রাত্রি অভিনয়ের পর, সভ্যদিগের অভিনয়-স্পৃহা মিটিলে ঐ দল উঠিয়া যায়। উহার ষ্টেজ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ১৮৭৩ সালে চন্দননগর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা হয়। এই নাটকে একটি গুলিখোরের দৃশ্য চন্দননগরের এই অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়া অভিনীত হয়। উহা মতি-বাবুর দ্বারা লিখিত সাহিত্য-রথী সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার সরকার ও দীননাথ ধর মহাশয় এই অভিনয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দীন বাবুই ইহার প্রস্তাবনা-গীতটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহা প্রথমবার ৺চুনিলাল কুণ্ডুর দ্বারা গীত হইয়াছিল।

গানটির যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ,—

"পূরিল মানস এতদিনে মম,
উদয় সুদিন আজি।
এ নব বয়সে ত্যজ গৃহবাস,
কেন এ আশ্রম করিলাম আশ্রয়
করিব প্রচার কথা সে দুঃখের
আজি এ সমাজ-মাঝে
দ্বিবিবাহরূপ ঘোর হুতাশন
লইয়ে সে আগুন করিতে আপন,
জানিলাম যৌবন আদি।" †

* Carey's Good Old Days.

* রূপ ও রঙ্গ, ১ম সংখ্যা।

† নবসঙ্ঘ, ২রা কার্ত্তিক ১৩৩১।

বঙ্কিম-বাবু, ভূদেব-বাবু, অক্ষয়-বাবু প্রভৃতি সুধীবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া ইহার অভিনয় দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহারা যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। শুনা যায় গুলিখোরের দৃশ্য দেখিয়া ভূদেব-বাবু নাকি বলিয়াছিলেন,—"This is the only *scene* in the drama." * অভিনেতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ পাল ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সরকার মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। পালিতদের যে বৈঠকখানায় আখড়া ছিল তাহার আর চিহ্নমাত্রও নাই।

প্রণয় পরীক্ষা অভিনয়ের প্রায় দুই বৎসর পরে আর-একটি সখের দল 'রামাভিষেক' নাটক অভিনয় করেন। উহার অধ্যক্ষ ছিলেন ৺প্রমথনাথ বসু। ইং ১৮৭৩ সালের জুন বা জুলাই মাসে স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে ইহার প্রথম অভিনয় হয় এবং মোট দুইবার মাত্র অভিনয় হইয়াছিল। সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৺অর্দ্ধেন্দু মুস্তফি, ৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা কলিকাতা হইতে আসিয়া এই অভিনয়ে যোগদান করিতেন এবং নিয়মিত-রূপে রিহার্শেল্ দিতে আসিতেন। অমৃত-বাবু বিদূষক এবং অর্দ্ধেন্দু বাবু দশরথের অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন।

ইহার পর 'রত্নাবলী, 'পুরুবিক্রম,' 'সধবার একাদশী,' 'হরিশ্চন্দ্র,' 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন,' 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি পর-পর অনেক নাটক ভিন্ন-ভিন্ন অবৈতনিক সম্প্রদায়-কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত সকলগুলিই গত চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই গোন্দলপাড়ায় মানকুণ্ডনিবাসী ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় 'সাবিত্রী-সত্যবান্' ও 'বাঙ্গালী সাহেব' অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় হয় ৺সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানে। উহা তিন রাত্রি মাত্র অভিনয় হইয়াছিল। 'রত্নাবলী' অভিনয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন পালপাড়ার ৺নিকুঞ্জলাল পাল, প্রথম অভিনয় হয় ৺বীরচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বাটিতে। অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল এবং দুই বৎসর চারিবার মাত্র অভিনয় হইয়া উহা উঠিয়া যায়। 'সধবার একাদশী'র অধ্যক্ষ ছিলেন পালপাড়ার ৺যোগেন্দ্রনাথ দে। ইহার পর কালীতলা নামক পল্লীতে আর-একটি সখের থিয়েটারের দল হইয়াছিল, তাহার কথা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কালীতলার অভিনয়ের পর, বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এখানে একে-একে বিস্তর অবৈতনিক থিয়েটারের সৃষ্টি ও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে 'সুহৃদ্-সম্মিলনী' ও 'মনসিজ নাট্য-সমাজ' অপরগুলির তুলনায় অনেকের মতে ভালো। সুহৃদ্-সম্মিলনীর সভ্যগণের দ্বারা অভিনয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু। পরে শ্রীশ-বাবু নিজে একটি সম্প্রদায় গঠিত করিয়া ইংরেজীতে বিলাতে 'বুদ্ধ' ও কলিকাতায় 'নলদময়ন্তী' অভিনয় করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। তিনি এখানকার প্রথম ব্যারিষ্টার। সুহৃদ্-সম্মিলনীর সভ্যগণ ২২ বৎসর পূর্ব্বে 'প্রফুল্ল' অভিনয় করিয়াছিলেন। 'মনসিজ নাট্য-সমাজ' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পালের উদ্যোগে ইং ১৯০১।২ সালে স্থাপিত হইয়াছিল। 'আলিবাবা,' 'বিসর্জ্জন', 'নাট্যবিকার' প্রভৃতি অভিনীত হইয়াছিল। গেইটী ক্লাব নামে আর-একটি দল ছিল, উহাও মন্দ নহে। এখনও এখানে সংখ্যায় অনেকগুলি সখের থিয়েটারের দল আছে, তন্মধ্যে বারাসতের 'বান্ধব নাট্যসমাজ' এক-প্রকার চলিতেছে।

১৩২৯ সাল হইতে 'নারায়ণী থিয়েটার' নামে স্ত্রীলোক লইয়া একটি পেশাদারী থিয়েটার বাঁধা ষ্টেজে মধ্যে-মধ্যে অভিনয় করিতেছে। বাহিরের অন্যত্র হইতেও কোনো কোনো পেশাদারী দল আসিয়া এখানে অভিনয় করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস ঘোষ। এখানে প্রথম অভিনয় হয় 'রাণাপ্রতাপ' ও 'রাজা-বাহাদুর'। ইহাই এখানকার প্রথম পেশাদারী থিয়েটার।

সখের যাত্রার দলের মধ্যে 'চন্দননগর নাট্যসমাজ,' 'চন্দননগর সঙ্গীত-সমাজ,' 'বারাসত বান্ধব-নাট্যসমাজ,' এবং লালবাগান ও গোন্দলপাড়ার দলই উল্লেখযোগ্য। এগুলির প্রতিষ্ঠার কাল ৩৫ বৎসরের মধ্যে। লাল-

---

* সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মতিলাল শেঠ মহাশয়ের নিকট ইহা আমি শুনিয়াছি। লেখক

বাগানের দলে প্রথম 'তরণীসেন বধ' অভিনয় হইয়াছিল। অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত নীলমণি দত্ত। 'চন্দননগর নাট্য-সমাজ' প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম স্থাপিত হইলেও, নানাপ্রকার বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করিয়া শেষে ১৩০৮ সালে শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত জীউর ঠাকুরবাটীতে প্রথম 'জনা' অভিনয় করে। ৺ রাধানাথদের অধ্যক্ষতায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺নারায়ণচন্দ্র দে ও ৺শশীভূষণ চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। পাঁচ রাত্রি অভিনয়ের পর, দীর্ঘকাল বন্ধ থাকিয়া ১৩২২ সালে পুনরায় খোলা হইয়া আজও জীবিত আছে। ইহাতে 'জনা' 'প্রভাবতী-মিলন,' 'গয়াসুর' ও 'কলি-পরাজয়,' অভিনয় হইয়াছে। ইহার সভ্যগণ মধ্যে-মধ্যে থিয়েটারও করিয়া থাকেন। বারাসতের দলে 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ,' 'মহামুক্তি' ও 'বজ্রসংহার' অভিনয় হইয়াছিল। উহাও প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চূড়ামণি দে ও ৺প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সঙ্গীতসমাজ ১৩২১ সালে ৺প্রফুল্লনাথ অধিকারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ও 'জনা,' 'ভীষ্ম,' 'প্রতিজ্ঞাপালন' অভিনীত হইয়াছিল। উহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শেঠ। গোন্দলপাড়ার সম্প্রদায় 'পাণ্ডবগৌরব' অভিনয় করিয়াছিলেন।

এখানে বহু পুরাতন কন্‌সার্ট-পার্টির কথা কিছু জানিতে পারি নাই। পূর্ব্বের থিয়েটারগুলিতে ঐক্যতান-বাদনের ব্যবস্থা ছিল এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায়। যে-সব কন্‌সার্ট দল এখন আছে, তন্মধ্যে 'এমারেল্ড,' 'বারাসত মিউজিক্যাল্‌, অ্যাসোসিয়েশন্‌,' 'লা ফান্‌তাসি মিউসিকে' ও 'করোনেশনের' নাম করা যাইতে পারে। এমারেল্ড্‌ এক সময় অতি উচ্চাঙ্গের কন্‌সার্টের দল ছিল, এখন অবস্থা ভালো নহে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনাথ নন্দী ও কুমুদনাথ শেঠের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ ছিলেন ৺ যোগেন্দ্রনাথ নন্দী। বারাসতের দল ১২৯৪।৯৫ সালে নগেন্দ্রনাথ দেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'করোনেশন' ৺বলাই চাঁদ পালের দ্বারা ১৩১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পার্টিতে ও ফান্‌তাসি মিউসিকে দলে জলতরঙ্গও বাজানো হইয়া থাকে। লালবাগানে আর-একটি কন্‌সার্ট্‌-দল ছিল, তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু।*

* এই প্রবন্ধের মধ্যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়িলে, বা কাহারও নূতন কথা কিছু জানা থাকিলে, তিনি তাহা লেখককে চন্দননগরের ঠিকানায় অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে উপকৃত হইব। লেখক।

সখী

ওগো সখি শঙ্কিত-নয়না
আঁখির অঞ্জনে তব কি প্রলয়ে নিবিড় বন্ধনে
রেখেছ বাঁধিয়া! সৌদামিনী তার অনল-স্পন্দনে
ঢেলে দিল পুষ্পাঞ্জলি-সম নিঃশেষে নয়নে তব,
ভুলিয়া চঞ্চল নৃত্য মেঘ-বক্ষে
তব চক্ষে
অশনি অঞ্চল পাতি' হইল সে পল্লব-শয়না।

ওগো সখি সদাহাস্যময়ী
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গি, হাস্যে লাস্যে কঙ্কণ নিক্কণে
মর্ম্মে ঢালো কি মদিরা, অয়ি কৃষ্ণ-চিকুর-চিক্কণে!
কুণ্ডলিত কেশরাশি সুপ্তিমগ্না সর্পিণীর ফণা,
বিষগর্ব্বে আত্মহারা ক্ষণতরে
শিরোপরে
স্তব্ধ স্বপ্নে, মত্ত কোন্‌ মহাক্ষণে হবে সর্ব্বজয়ী।

ওগো সখি তড়িৎবচনা,
সাগরের ঊর্ম্মিমালা বালুবক্ষে ক্লান্তিহীন সুরে
জগতে ছলনা করে; মনোব্যথা রাখে অন্তঃপুরে,
প্রবাল মুকুতা মণি ঐশ্বর্য্য সম্ভার বক্ষে তার
কোথা আছে লুক্কায়িত কোন্‌খানে
কেবা জানে?
বাক্যস্রোতে ছলনার মন্ত্র, সখি, করেছ রচনা।

ওগো সখি মানবিকা মোর,
নহ তুমি কঠিন তুষারহৃদি কৌমুদীবরণী,
তীক্ষ্ণ-জ্যোতি বজ্রমণি নহ, ওগো হৃদয়ভরণী!
মর্ম্মর-মূরতি সম নহ, সখি, প্রাণস্পর্শহীনা।
নিভে' যায় স্বপ্নে তব ওগো কৃষ্ণা,
সব তৃষ্ণা,
তাই বাঁধিয়াছি শুষ্ক প্রাণ মোর দিয়ে স্বপ্ন-ডোর।

শ্রী—

মীরাবাঈ—শ্রী অনাথনাথ বসু, বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

মধ্যযুগের ভগবদ্ভক্তিধারায় অবগাহন করায় যাঁহারা নিজে পবিত্র হইয়া ভারতকে পবিত্র করিয়াছিলেন, মীরাবাঈ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি অনুমান ১৪৯৯-তম খৃষ্টাব্দে রাঠোর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন মাড়বার-পতি রাও যোধানীর পৌত্র, মেড়তার ভূস্বামী রত্নসিংহ। মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের দশম বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বামীকে হারান। কিন্তু জগৎস্বামী তাঁহাকে দয়া করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রী গিরধরলালের মধ্যে। তাঁহার চোখে নীদ ছিল না, পিয়ার পথ দেখিতে-দেখিতেই তাঁহার রাত বিহান হইয়া যাইত। আর তিনি ব্যাকুল হইয়া সখীকে বলিতেন—

"মৈঁ বিরহিন বৈঠি জাগূঁ
জগত সব সোবৈ রে আলী"

'সখী রে, আমি বিরহিণী, আমি বসিয়া-বসিয়া জাগিতেছি, আর জগতের সকলেই ঘুমাইতেছে!'

কোনো বিরহিণী রঙ-মহলে বসিয়া মোতির মালা গাঁথিতেন, কিন্তু মীরা গাঁথিতেন "অঁসুবন কী মালা" 'অশ্রুর মালা'। তারা গণিতে-গণিতেই তাঁহার রাত বিহান হইয়া যাইত, হায়! নাগর গিরধর যে মিলিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। মীরা এম্‌নি করিয়া রাত কাটাইতেন আর বলিতেন—

"বচন তুম্‌হারে তুম্‌হী বিসারো"
"—প্রভু গিরধর নাগর,
তুম্ বিন কাটত হিয়ো।"
'তোমার কথা তুমিই ভুলিয়া গেলে!
প্রভু গিরিধর নাগর,
তোমা বিনা যে হিয়া কাটিয়া যায়!'
"তুম বিনা রহ্যু ন জায়।"—তোমা বিনা যে, রহা যায় না।

তিনি ভাবিতেন তাঁহার গিরিধরকে চিঠি লিখিবেন, কিন্তু "লিখিহী ন জাই" লেখাই যাইত না। কলম ধরিতে হাত কাঁপিয়া উঠিত, হৃদয় চঞ্চল হইত, কথা বলিতে গেলে কথা জুটিত না, চোখ ভরিয়া আসিত। ভাবিতেন কেমন করিয়া সেই চরণ-কমল ধরিবেন, তাঁহার যে সমস্ত অঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিত।

বাদলের দিন দেখিয়া মীরা ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিতেন—

মাতোয়ারা বাদল ত আসিয়াছে, কিন্তু হরির খবর কিছুই আসিল না! দাদুর, মোর, পাপিয়া ডাকিতেছে, কোয়েল নিজের সুর শুনাইতেছে, আঁধার করিয়া বিজলী চমক দিতেছে, বাজ ডাকিতেছে, মেঘ ঝড় আনিতেছে, বিরহিণী ইহাতে ডর পাইতেছে। কালীয় নাগ যেন বিরহের জ্বালা ফুঁকিয়াছে।—

মতবারো বাদল আয়ো রে,
হরি কো সন্দেশা কুছ নহি লায়ো রে।
দাদুর মোর পপীহা বোলে,
কোয়ল সব্দ সুনায়ো রে।
কারী অঁধিয়ারী বিজলী চমকে,
বিরহন অতি ডর পায়ো রে॥
গাজে বাজে পবন মধুরিয়া,
মেহা অতি ঝড় পায়ো রে।
ফুঁকে কালী নাগ বিরহকী জারী
মীরা মন হরি ভায়ো রে॥

মীরা বাদল দেখিয়া এইরূপ বলেন আর তাঁর নয়ন-দুটি ঝরিতে থাকে। সখীকে বলেন, 'সখি, কি করি, কোথা যাই, কে আমার বেদনা ঘুচাইবে? বিরহ-নাগিনী দংশন করিয়াছে, জ্বলিতে-জ্বলিতেই জীবন যাইবে। যাও, সখি, পিয়াকে আনিয়া মিলাও। ওগো! মীরার প্রভু কবে আসিয়া মিলিবে!' মীরা প্রিয়ের বিরহে ব্যাকুল হইয়া বলেন, 'প্রিয় হে, দেখা দাও, তোমা বিনা যে থাকিতে পারি না। জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা রজনী, সেইরূপ তোমা বিনা আমি আকুল-ব্যাকুল হইয়া দিন-রাত ফিরিয়া বেড়াই। বিরহ আমার কলিজা খাইয়া ফেলিল! দিনে খিদে নাই, রাতে নীঁদ নাই, মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। কোথায় বা কহি, কিছুই তো কহা যায় না। গিরিধর, মিলিয়া আমার তাপ নিবাও। হে অন্তর্য্যামী, কেন ভয় দেখাও? দয়া করিয়া এস, মিলিত হও। তোমার জন্ম-জন্মের দাসী মীরা তোমার চরণে পড়িয়া আছে।—

প্যারে দরসন দীজ্যো আয়।
তুম বিনা রহ্যে ন জায়॥
জল বিনা কঁবল চন্দ বিন রজনী।
ঐ সে তুম দেখা বিন সজনী॥
আকুল ব্যাকুল ফিরূ রৈন দিন
বিরহ কলেজা খায়।
দিবস না ভুখ, নীঁদ নহি রৈনা।
মুখ সূঁ কহত ন আবৈ বৈনা॥
কহা কহুঁ কুছ কহত ন আবৈ
মিলকর তপত বুঝায়॥
কঁ্য তর সাবো অংতরজামী
আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনমকী
পরী তুম্‌হারে পায়॥

মীরা প্রিয়ের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা তাঁহাকে বলিতেন—প্রিয় হে, তুমি যদি এ-বাঁধন ভাঙো ত' ভাঙো, আমি ভাঙিব না। প্রভু হে, তোমার প্রেম ভাঙিয়া আমি কার সঙ্গে মিলিব? তুমি গাছ আমি পাখী, তুমি সরোবর, আমি মাছ; তুমি বড় পাহাড়, আমি চারা গাছ; তুমি চাঁদ, আমি চকোর; তুমি মোতি, আমি সুতা; তুমি সোনা, আমি সোহাগা; হে ব্রজের বাসী, মীরার প্রভু, তুমি আমার ঠাকুর, আমি তোমার দাসী।

"জো তুম তোড়ো পিয়া মৈঁ নহিঁ তোড়ুঁ।
তোরি প্রীত তোড়ি প্রভু কোন সংগ জোড়ুঁ॥
তুম ভয়ে তরুবর, মৈঁ ভঈ পংখিয়া।
তুম ভয়ে সরবর মৈঁ ভঈ মছীয়াঁ॥
তুম ভয়ে গিরিবর মৈঁ ভঈ চারা।
তুম ভয়ে চংদা, মৈঁ ভয়ে চকোরা॥
তুম ভয়ে মোতী, হম ভয়ে তাগা।
তুম ভয়ে সোনা, মৈ ভয়ে সুহাগা॥
বাঈ মীরাকে প্রভু, ব্রজ কে বাসী।
তুম মেরে ঠাকোর, মে তেরী দাসী॥

তিনি সেই সম্বন্ধেই বিনয় আরো বলিতেন—সখী রে, যাহাদের প্রিয় বিদেশে, তাহারা চিঠি লিখিয়া-লিখিয়া পাঠায়। আমার প্রিয় আমার মাঝেই আছেন, তাই আমি কোথাও যাতায়াত করি না। আমি বাপের ঘরেও থাকি না, শাশুড়ীর ঘরেও থাকি না। সদ্গুরুর উপদেশ আমার হাতে-হাতে। সখী, আমার ঘর নাই। তোরো ঘর নাই। মীরা হরির রঙ্গেই রঙিয়া আছে।

মীরা এইরূপেই হরির রসে রঙিয়া প্রার্থনা করিতেন—'চিতনন্দন আগে নাচুংগী", আমি আমার হৃদয়ানন্দের সম্মুখে নাচিব আর নাচিয়া-নাচিয়া তাঁহাকে আনন্দ দিব। মীরা হরির রঙ্গেই রঙিয়া আছে।

ভক্তিমতী সাধিকা মীরার এই মন গলানো করুণ কাহিনী তাঁহার পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু এইরূপ ৪৬টি পদাবলী বাঙলা অনুবাদের সহিত আলোচ্য পুস্তকখানিতে সঙ্কলন করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকটে এজন্য কৃতজ্ঞ। ভক্তিপথের পথিক ইহার মধুর রস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম।

অনুবাদটি স্থানে-স্থানে একটু সংশোধন করা আবশ্যক মনে হইল। দামটা কিছু কম করিতে পারিলে ভালো হইত। তত ফাঁক দিয়া ছাপাইলেও ছাপাটা তেমন কিছু সুন্দর হয় নাই। অনাবশ্যক এই ফাঁকটা না দিলে আরো অনেক পদ বইখানিতে দিতে পারা যাইত।

আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ—ডাক্তার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। প্রকাশক বি. এল্. বড়ুয়া এণ্ড কোং, মিনার্ভা মেডিকেল হল, সিল্ভার ষ্ট্রীট্, আকিয়াব্। পৃঃ ১।০+১৪৭, মূল্য ১৲ টাকা।

বুদ্ধদেব বলিতেন, ইহা সত্য যে, জগতে দুঃখ আছে; দুঃখের কারণ আছে, ইহাও সত্য; দুঃখের ধ্বংস হয়, ইহাও সত্য; এবং ইহাও সত্য যে, দুঃখ-ধ্বংসের উপায় আছে। তিনি দুঃখ-ধ্বংসের যে উপায় বা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারই নাম মার্গ অর্থাৎ পথ।

এই পথের আটটি অঙ্গ বা অবয়ব আছে বলিয়া ইহাকে বলা হয় আষ্টাঙ্গিক। এই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেই দুঃখের ধ্বংস হয়। অঙ্গ-কয়টির নাম হইতেছে—১। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব (জীবিকা), সম্যক্ ব্যায়াম (উদ্যম), সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের একটা বিশেষণ হইতেছে এ হি প স সি ক (এহি-পশ্যিক) অর্থাৎ সে সাধককে বলে যে, তাহা দ্বারা দুঃখ ধ্বংস হয় কি না এস, দেখ। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট ধর্ম্মের যাহা-কিছু সমস্তই এই আষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে সারভাবে রহিয়াছে। গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে এই মার্গেরই কথা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে অনেক ভালো কথা বলিয়াছেন। আমরা ইহা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনাবশ্যক কয়েকটা কথা বাদ দিলে ও ভাষাটা মার্জ্জিত করিয়া আরো একটু গুছাইয়া লিখিলে বইখানা বেশ ভালো হইত।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

স্বদেশী শিল্প—শ্রী এককড়ি দে, বি-এল্ প্রণীত। দাম বারো আনা।

আমাদের দেশের প্রায় সকল-প্রকার শিল্প-সম্বন্ধে মোটামুটি প্রায় সব কথাই বলা হইয়াছে। বইখানিতে অনেক তথ্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি কিসে হয় এবং ইহার পথে প্রধান বাধাই বা কি এবং তাহা দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায়ই বা কি ইত্যাদি বিষয়ে লেখক চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। আজকাল যাঁহারা "দেশ-দেশ" করিয়া চীৎকার করিতেছেন তাঁহারা যদি এই-প্রকার সব বই পড়িয়া কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া দেশের কাজে লাগেন তবে তাঁহারা দেশের কিছু উন্নতি করিতে পারিবেন এ-আশা করা যাইতে পারে।

বইখানির বাঁধা ও ছাপা মোটের উপর ভালো হয় নাই। এইপ্রকার পুস্তকের দাম বারো আনা করা ভালো হয় নাই—দাম কমিলে লেখক এবং পাঠক উভয়েরই উপকার হইবে। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সময় যদি দাম-পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখেন তবে ভালো হয়।

স্বরাজ গঠনের ধারা—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। ডি, এম্ লাইব্রেরী (কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম দশ আনা।

লেখক সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি একটি সাপ্তাহিকের জন্যই প্রথম লিখিত হয়। পুস্তক-আকারে প্রকাশের সময় লেখকের প্রবন্ধগুলির কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করা উচিত ছিল, কারণ একই কথা মাঝে-মাঝে বার বার বলা হইয়াছে—ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে কারণ ভালো কথাও লোকে বার-বার শুনিতে চায় না। সমস্ত দোষ-ত্রুটি-সত্ত্বে বইখানিতে পড়িবার এবং চিন্তা করিবার খোরাক প্রচুর আছে। বইখানি পড়িলে অনেকে উপকার পাইবেন।

বালকদের রামায়ণ—শ্রী রেবতীমোহন সেন প্রণীত। বুক কোম্পানী (কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

বইখানি ছেলে মেয়েদের উপযোগী হইয়াছে। বইখানির মাঝে-মাঝে এবং প্রচ্ছদপটে রঙীন ছবি থাকাতে বইখানি ছেলে-মেয়েদের নয়ন-রঞ্জন হইয়াছে। বইখানি পড়িলে তাহাদের মনোরঞ্জনও হইবে। রামায়ণ আমাদের জাতীয় মহাকাব্য, কিন্তু সেই মহাকাব্যের মধ্যে এমন সকল ব্যাপার এবং বর্ণনা আছে যাহা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের হাতে নির্বিচারে দেওয়া যায় না। লেখক সেইসমস্ত অংশ বিশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাষায় মূল রামায়ণের গুরুত্ব বজায় রাখিয়া গদ্যে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণের মাধুর্য্যের ইহাতে সামান্য পরিমাণে হানি হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ছেলে-মেয়েরা এই রামায়ণখানি পড়িয়া আনন্দ এবং জ্ঞান লাভ করিবে।

রত্নদীপ—শ্রী হরিদাস ঘোষ প্রণীত। দাম এক টাকা ছয় আনা।

ছেলে-মেয়েদের উপন্যাস—R. L. Stevenson-এর "Treasure Island" নামক বিখ্যাত উপন্যাসের প্লট লইয়া ইহা লেখা। সংক্ষিপ্ত করিয়া লেখা হইয়াছে। প্রথমেই চোখ পড়ে বইখানির মলাটের উপর। চমৎকার হইয়াছে। ছবিখানি দেখিয়া বয়স্ক-লোকদেরও

বইখানি পড়িতে সাধ যায়। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের জন্যও যে গল্প এবং উপন্যাসের দরকার আছে—একথা বেশীর ভাগ প্রবীণ লেখকই স্বীকার করেন না, তাহার ফলে ছেলে মেয়েদের উপযোগী গল্প এবং উপন্যাস—ভালো—নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ প্রবীণদের মতে ছেলে মেয়েরা কেবল নীতি শিক্ষা এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি মুখস্থ করিবে, তাহাতেই তাহাদের কল্যাণ হইবে। আলোচ্য পুস্তকখানি ছেলে-মেয়েদের আদরের জিনিষ হইবে। চিত্রবহুল হওয়াতে বইখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। লেখক ছেলে মেয়েদের কথা ভাবিয়া তাহাদের কচি প্রাণে যে আনন্দের খোরাক জোগাইয়াছেন, তাহার জন্য ছেলে মেয়ে এবং সঙ্গে-সঙ্গে বুড়াদেরও তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। বইখানি উপহার দিবার অতি উপযোগী হইয়াছে।

কাকলি—শ্রী বিভূতিভূষণ ঘোষাল। দাম ষোল আনা।

কবিতার বই প্রথম দিকের কবিতা কয়েকটি বেশ ভালো লাগে। সেগুলির মধ্যে কবিতা ভাবা এবং ছন্দ সবই আছে, কিন্তু শেষের দিকে কবি যেন কেমন ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মাঝে মাঝে এমন পদও আছে যাহা পড়িতে ভালো লাগে না—যেমন

"রামের মতন মানুষ তোমার
　　বুঝলে না ভড়ং;
লুব্ধ হ'ল চিত্ত তাঁহার
　　দেখে' সে রং চং।

মিলাইবার খাতিরে ইহা জোর করিয়া লেখা। এইধরণের কবিতাগুলি বাদ দিয়া বইখানি ছাপিলে ভালো হইত।

রক্তরাগ—গোলাম মোস্তাফা প্রণীত কবিতার বই।

বর্ত্তমান সময়ের মুসলমান কবিদের মধ্যে এই কবির নাম করা যায়। ইঁহার কবিতাগুলি সরস—ভাবে এবং ভাষার উভয়তই। অন্যান্য অনেক মুসলমান কবিদের মতন ইঁহার কবিতাগুলিতে অনাবশ্যক আরবী এবং ফারসী শব্দে ঠোক্‌ঠুকি নাই—অনাবশ্যক হুঙ্কার বা যাত্রাদলের ভীমের অভিনয়ের ভাণ নাই। ইনি বাঙালী মুসলমান—বাংলা ভাষাকেই নিজ ভাষা বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য ইঁহার কবিতাগুলিকে বাংলা কবিতা এবং আমাদের জিনিষ বলিয়া মনে হয়। কবির কবিতা পাঠে আনন্দ পাইলাম। কবির আর-একটি গুণ দেখিয়া আনন্দ হয়—নিজ ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া ইনি পরধর্ম্মের অনাবশ্যক নিন্দা করেন নাই। কবির সর্ব্বধর্ম্মে সমভাব প্রশংসনীয়।

নারীর মূর্ত্তি (উপন্যাস)—শ্রী জুড়নজীবন মুখোপাধ্যায়। দাম ১৸০।

উপন্যাসখানি গোড়ার দিকে পড়িতে বেশ লাগে কিন্তু লেখক শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষের দিকে গিয়া নেহাৎ যা তা লিখিয়াছেন—যাহা পড়িলে মাঝে মাঝে হাসি পায়। উপন্যাসে যে-সমস্ত নারী চরিত্র আছে, তাহাদের মুখ দিয়া লেখক অ-নারীজনোচিত কথা বাহির করাইয়াছেন। ইহা পড়িতে অত্যন্ত খারাপ লাগে এবং কানে বাজে। উপন্যাসের নায়ক প্রায় দেবতা হইয়া গিয়াছে—কাজেই তাহা অস্বাভাবিক হইয়াছে। তবে লেখক চেষ্টা করিলে আরো ভালো লিখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

নাট-মন্দির—সুবোধ রায়। দাম এক টাকা।

কথা নাট্য। লেখক নাট্যাকারে হিতোপদেশ বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এচেষ্টা প্রশংসনীয়, তবে হিতকথা প্রবন্ধ-আকারে বলিলে ভালো হইত। প্রত্যেকটি চরিত্র এবং বিষয় একটি সামাজিক সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লেখা। লোকে "হিতোপদেশ"—হিতোপদেশ-আকারেই পড়িতে চায়, তাহা নাটক-আকারে পাইলে বিশেষ উল্লসিত হয় না। হালকা জিনিষের উপর ভারী জিনিষ চাপাইলে তাহা ভাঙিয়া পড়ে। বইখানির ছাপা, কাগজ, ইংরেজীতে যাহাকে বলে গেট্‌-আপ্‌ ইত্যাদি বেশ ভালো। কল্লোল-পাবলিশিং এই কথা-নাট্যের প্রকাশক।

বেনোজল (উপন্যাস)—শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়। দাম দু-টাকা।

উপন্যাসখানি "প্রবাসী"তে ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়—কাজেই এসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ-কিছু বলিবার নাই। তবে উপন্যাসের ধারা চলিতে-চলিতে হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে, এই কারণে ইহা অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয়।

কপালকুণ্ডলা (ছোটদের বঙ্কিম)—শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী সম্পাদিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বই-সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। তবে তাঁহার উপন্যাসগুলি ছেলে-মেয়েদের উপযোগী নয়, ইহা বলা যায়। এই বইখানি ছেলে-মেয়েদের অযোগ্য অংশ বাদ দিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া ছেলে-মেয়েদের হাতে দিবার মত হইয়াছে। ছাপা বেশ ভালো।

শেক্সপিয়রের গল্প—শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী প্রণীত।

ছেলে-মেয়েদের পড়িবার মতন করিয়া ল্যাম্বের অনুসরণে লেখা হইয়াছে। অনুবাদ ছেলে-মেয়েদের উপযোগী হইয়াছে। গল্পগুলিও সরস করিয়া লেখা—ছেলে-মেয়েদের আনন্দ দিবে। বইখানিতে কয়েকটি স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি আছে। বইখানির বাঁধাই এবং ছাপা, কাগজ ইত্যাদি খারাপ হইয়াছে।

মহাত্মাজীর চিঠি—শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়, শিক্ষক, কোন্নগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান: বুক-কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার এবং সেন রায় এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস্‌-বিল্‌ডিংস্‌, কলিকাতা। দাম আট আনা।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মহাত্মা গান্ধী যে-সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সরল বাংলা অনুবাদ। বইখানি পড়িলে বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানব-মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্মমত এবং নীতির বিষয় অনেক-কিছু এই পত্রসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায়। আশা করি বইখানি পড়িতে সকলেরই ভালো লাগিবে।

গ্রন্থকীট

বোধন—শ্রী সুরেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত, পোঃ কড়টিয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। ৬৫ পৃষ্ঠা। ।৹ আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

মুসলমান, হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্ম শাস্ত্রও মহাজনদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব এক, এবং ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধের কোনো কারণ নাই, বরং বিরোধ করিলে অধর্ম্ম আছে; হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মে যে, কোনো বিরোধ নাই, কেবল স্বার্থপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরাই যে বিরোধ ঘটাইয়া তোলে, এই পুস্তকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান প্রতিবাসী এতদিন তাহাদের মধ্যে বিরোধের কথা বড়-একটা শোনা যাইত না, কিন্তু আজকাল সর্ব্বত্রে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় হিন্দু-মুসলমানের কুসংস্কার দূর করিবার এই সাধু চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসনীয়।

ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সংঘর্ষ—শ্রী দানবন্ধু আচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রী গৌরহরি আচার্য্য, সাগরকান্দি, পাবনা। ১৬ পৃষ্ঠা। এক আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্রাহ্মণ গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ-সমাজ-কর্তৃক পরম উপকারী শূদ্র-জাতির প্রতি অবিচার, অত্যাচার, ও অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দু'টি পংক্তি গ্রন্থ-প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এবং গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ-জাতির পাশবিক অত্যাচার, ক্ষত্রিয় জাতির মূর্খতা এবং শূদ্র জাতির অতি-সহনশীলতাই হিন্দু-জাতির অধঃপতনের মুখ্য কারণ।" "পারিয়া পঞ্চম সকলেই ভারতবাসী; ইহারা না জাগ্‌লে তোমাদের (ব্রাহ্মণদের) উত্থান অসম্ভব।"

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণেরাই আবহমান-কাল করিয়া আসিতেছেন; যাঁহারা আত্মত্যাগের দ্বারা স্বকৃত অপরাধ মোচন করিবার যত্ন করেন তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য। মহাভারতে যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিয়াছিলেন—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলম্ আনৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

ইহার টীকায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—

শূদ্রোঽপি শমদমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব,
ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এবেত্যর্থঃ।

এই লক্ষণ-অনুসারে বিচার করিলে আমাদের দেশের পৈতা-টিকি-ধারীদের মধ্যে কয়জন যে ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় তাহা, বিশেষ 'গবেষণার' বিষয়।

সার-ব্যবহার—বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড্, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ২৬ পৃষ্ঠা। চার আনা।

বিভিন্ন ফসলের জন্য জমিতে কি-কি সার কখন কি-কি উপায়ে কেন প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চাষের ও বাগানের কাজে এই পুস্তিকাখানি বিশেষ সাহায্য করিবে।

কৃষকের মর্ম্মবাণী—মৌলবী শেখ্ ইদ্রিস্ আহামদ, মনাকষা, মালদহ। ২৪ পৃষ্ঠা। দুই আনা।

"চাষার ধনে সবাই ধনী,
কাঙাল শুধু একাই চাষা।"

এই পরম সত্য উক্তিটির নানা দিক্ এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু তাঁহার পদ্য-রচনার শক্তি এখনও পরিপক্কতা লাভ করে নাই।

কোরানের মহাশিক্ষা—মৌলবী শেখ্ ইদ্রিস্ আহামদ। ডিমাই ৮ পেজি ৪০+।০ পৃষ্ঠা। পাঁচ আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে নিম্নলিখিত পনেরটি পরিচ্ছেদ আছে—(১) সুরাফতেহা, (২) সৃষ্টিকর্ত্তা খোদা ও মানুষ, (৩) কর্ত্তব্য-জ্ঞান, (৪) মানুষের জ্ঞান ও তাহার সীমা, (৫) বিদ্যা ও জ্ঞান-চর্চ্চা, (৬) মাতৃভাষা, (৭) পিতামাতার সেবা, সম্মান ও তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার, (৮) আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, পথিক প্রভৃতির সহিত সদ্ব্যবহার, (৯) নিঃসহায় এতিমের সহিত সদ্ব্যবহার, (১০) স্ত্রীলোকের সহিত সদ্ব্যবহার, (১১) তালাক্ বা স্ত্রী-বর্জ্জন, (১২) ধর্ম্মের পথে দান, (১৩) তক্‌দির বা অদৃষ্টবাদ, (১৪) সৎকাজ, (১৫) ইস্‌লাম-প্রচার ও সদুপদেশ। পুস্তিকাখানি উপাদেয় ও উপকারী হইয়াছে। কোরানের বাণী মূল আরবীতে ও তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বাংলায় প্রদত্ত হইয়াছে; ইহাতে পুস্তকের মূল্য প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে।

রসাঙ্কুর—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, চুঁচুড়া। ১১০ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

কবিতার পুস্তক। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। কবিতার ছন্দ বিচিত্র ও নিখুঁৎ এবং তাহা ভাবের উপযুক্ত বাহন হইয়াছে; রচনার ভাষা সুমার্জ্জিত ও ললিত; শব্দ-চয়নে পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়; সর্ব্বোপরি কবিতাগুলি ভাবের সূক্ষ্মানুভূতির রসমূর্ত্তি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। সুতরাং পুস্তকখানি সার্থক-নাম হইয়াছে।

পূজনীয় গুরুদাস—শ্রী জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ৭৭।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২৫৪ পৃষ্ঠা; কাপড়ে বাঁধা, সোনালি-লেখা। সচিত্র। ২৲ টাকা।

এই পুস্তকে স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। লেখক শ্রদ্ধার সহিত গুরুদাস-বাবুর জীবনের বহু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

মুদ্রা রাক্ষস

সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিবিজ্ঞান—শ্রী বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি-এ কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—ডাঃ শ্রী হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, বি-এইচ-এম্-এস, ১১ সি আশুবাবু লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী ৩৫+।৵০ পৃষ্ঠা; মূল্য—চারি আনা।

শিক্ষিত চিকিৎসক ব্যতীত বর্ত্তমান কালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনেকে করিয়া থাকেন; যাহাতে তাঁহারা অল্পের মধ্যে হোমিওপ্যাথি-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত। এই পুস্তিকাখানি হানিম্যানের অর্গ্যানন্ ও কেন্টের হোমিও-প্যাথি-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতার সারাংশ বলিলেও চলে—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই যাঁহারা মূল হানিমানের বই ও কান্টের বই পড়িতে পারেন না, তাঁহাদিগকে এই পুস্তিকাখানি যথেষ্ট সাহায্য করিবে। অনুক্রমণিকা, রোগিতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, আরোগ্যতত্ত্ব, ঔষধ তত্ত্ব, হোমিও-প্যাথি-বিধান এই কয়টি অধ্যায়ে বইটি বিভক্ত।

ছাপা ও কাগজ সুন্দর—উপকার হিসাবে মূল্য অতি অল্প।

ললনা-সুহৃদ্ বা গার্হস্থ্য নীতি—ডাক্তার আজিজ আহম্মদ প্রণীত। ডবল ক্রাউন, ১৬পেজী, ৮৮পৃষ্ঠা; মূল্য দশ আনা। জেলা ২৪ পরগণা, প্রতাপনগর পোঃ আঃ, চাকবেড় হইতে আমির আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত।

আপন কন্যার পঠদ্দশায় উপযুক্ত স্ত্রী পাঠ্য পুস্তক না পাওয়ায় সুকুমার-মতি বালিকাগণের কিঞ্চিৎ উপকার-সাধনের আশায় গ্রন্থকর্ত্তা এই বইটি রচনা করিয়াছেন। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য ভেদে ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সন্তান-পালন, সূতিকাগার ও প্রসূতি-চর্য্যা-সম্বন্ধে কতকগুলি সুপরিচিত ও সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত উপদেশ; দ্বিতীয় ভাগে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, স্নান, আহার, পরিচ্ছন্নতা ও ব্যায়ামের বিধান; তৃতীয় ভাগে বিদ্যা, শিল্প, বিনয়, ঈশ্বর ও গুরুজনে ভক্তি, সৎসঙ্গ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাসের উপকারিতা প্রদর্শন; চতুর্থভাগে,

সাধারণ স্ত্রীরোগের তালিকা, বিবাহ, স্বামীগৃহে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অভিমত; এবং পঞ্চম ভাগে প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, বৈধব্য প্রভৃতি অবস্থায় যেরূপ ব্যবহার গ্রন্থকারের বাঞ্ছনীয়, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সরল, রুচি স্থানে-স্থানে শ্লীলতার অমর্য্যাদা করিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"এমন নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর লোক অতি বিরল যে 'কা মনী ও কাঞ্চন' ভালবাসে না।"

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। সুকুমারমতি বালিকাদের পক্ষে এ বইটি নীতি-পুস্তক-রূপে গ্রাহ্য হওয়া সমীচীন হইবে, এরূপ আশা পাইলাম না।

মিত্র

দমকা হাওয়া (উপন্যাস)—শ্রী নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মূল্য এক-টাকা। (১৩৩১)।

উপন্যাসখানি আগাগোড়া বেশ লাগিয়াছে। লেখক প্রত্যেকটি চরিত্র বেশ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বইখানির ছাপা ও বাঁধা উৎকৃষ্ট।

প্র

আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবহার-বিজ্ঞান—শ্রী দেবপ্রসাদ সান্যাল, এল্-এম্-এস্ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩॥০ টাকা। ১৩৩১।

ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসার অপূর্ব্ব সম্মিলনে বইটি রচিত। ইহাতে আইনের সৃষ্টি, অপরাধ ও শাস্তি, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যু, মৃত্যু-লক্ষণ, অপঘাত মৃত্যু, আকস্মিক নানা-প্রকারে মৃত্যু, গর্ভাবস্থা, প্রসব, ক্ষয়কারক বিষ, উগ্র বিষ, স্নায়বিক বিষ, কার্ডিয়াক্ বিষ, বাষ্পীয় বিষ, জন্তুর বিষ, মানসিক বিকার, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ও প্রতিকার-কথা বিবৃত হইয়াছে। কেবল ভারতীয় মতে চিকিৎসার কথা নয়, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীর কথাও আছে। একই কালে দুই দেশের চিকিৎসার উল্লেখ থাকায় বইটির মূল্য বাড়িয়াছে। বইটি সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী করিয়া লেখা, এবং লেখকের সে-চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক যত প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। লেখক নিজে ডাক্তার হইয়াও প্রাচ্য জ্ঞানের প্রচুর সন্ধান রাখিয়াছেন। আমাদের জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যালয়ে বইটি পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

গুপ্ত

দুঃখবাদী

শ্রী জীবনময় রায়

লোকটা নিতান্তই কুৎসিত হ'লেও একেবারে বোকা ছিল না; তাই তার নিজের সম্বন্ধে এখবরটা জানতে বেশী দেরী লাগেনি।

সে ভাবলে যে বুদ্ধি ত ঘটে কিছু রয়েছে; একটু চেষ্টা করলে "চিন্তাশীল ঋষি"র দলে পড়তে এই আধ্যাত্মিকতার দেশে বেশী কষ্ট পেতে হবে না।

সে খুব মোটা-মোটা পুঁথি নিয়ে একটা অন্ধকার ঘরের কোণে বসে' পড়তে লেগে' গেল। স্মরণ-শক্তিটা তার ভালোই ছিল। সে বুঝলে যে জগতে বুদ্ধিটা প্রমাণ করার সোজা উপায় হচ্ছে পুঁথির বুলিগুলো খুব আড়ম্বর করে' লাগসই জায়গায় আওড়াতে পারা। পরের বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্যটাকে লোকের সামনে ফলাও করে' ধর্‌তে পারাই হচ্ছে বুদ্ধিমান্ আর পণ্ডিত লোকের কাজ।

বই সে পড়লে অনেক। আর পড়তে-পড়তে তার চোখের দৃষ্টি হ'য়ে এল ক্ষীণ। তার পর একদিন সে তার নাকের ডগার উপর খুব গোল-গোল ভাঁটার মতন চশমা লাগিয়ে তার ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এল জগৎকে তার দুঃখের বার্ত্তা জানাতে। তার কোটরগত চোখের চাউনি যেন ঝড়ের নদীতে হালভাঙা ডিঙি নৌকো কোথাও যার কূলের সন্ধান নেই। তার ফ্যাকাশে মুখের হাসি যেন মেঘলা রাতের দ্বিতীয়ার চাঁদের আলো। তার শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার দেহটাকে খাড়া করে' দু'হাত তুলে' সে যখন বক্তৃতা করত' তখন তাঁকে মনে হ'ত যেন পোড়ো মাঠের একটা বুড়ো শুকনো মরা গাছের মতন। তার চেহারায় তাঁকে এমন আশ্চর্য্য মানিয়ে-ছিল, যে, লোকের মনে আর অবিশ্বাস কর্‌বার সাহসই রইল না।

সবাইকে সে ডেকে বললে, "দ্যাখো, এই সংসারটা হচ্ছে মানুষকে বিপদে ফেল্‌বার জন্যে প্রকৃতির হাতে পাতা একটা ফাঁদ। সুতরাং......।"

বক্তৃতার পর মোটাসোটা একটি যুবক—সবে নতুন বিয়ে করে' তার মগজের ফুকরে-ফুকরে মধুরসের জোয়ার ছুটেছিল—এসে প্রশ্ন করলে, "আর প্রেম?"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে' সে একটু চমকে' গেল। কিন্তু তখ্‌খণি সে বেশ সাম্‌লে' নিয়ে জোর গলায় জাহির করলে যে "জগৎটা কবিত্ব নয়; আর সেও স্বপ্নলোকের মলয়ানিলের কবি নয়। সুতরাং সংসার পাতা-নোর সোনার খাঁচাটায় সে কিছুতেই আঁটকা পড়বে না। প্রেম?—ফু—ফু।"

বুদ্ধি তার থাকলেও প্রতিভা তার ছিলই না। সে ভাবলে গোলে কাজ কি? রাজ-চতুষ্পাঠীর দর্শনের অধ্যাপকের পদটা পাওয়া যায় কি না দেখা যাক্। টাকার তার দরকার ছিল।

সে গেল রাজার কাছে। গিয়ে বললে "মহারাজ, লোক-শিক্ষায় আমায় নিযুক্ত করুন।" রাজা জিজ্ঞেস্ করলেন—"তোমার শিক্ষার বিষয়?" সে বললে,"আমি শেখাবো যে এই জীবনটা হচ্ছে অর্থহীন। আর প্রকৃতির শিক্ষা আর প্রকৃতির দান হচ্ছে মনুষ্যজীবনের পরিপন্থী। অতএব প্রকৃতির আদেশ অমান্য করাই হচ্ছে মহৎ জীবনের লক্ষ্য। প্রকৃতির দান থেকে আপনাকে বঞ্চিত করাই হচ্ছে মুক্তির উপায়।" রাজা মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "কি বলো মন্ত্রী?" মন্ত্রী [illegible] বিজ্ঞের মতন ঘাড়

নেড়ে-নেড়ে ভাবলে "তাই ত", তার পর বুদ্ধি খাটিয়ে জিজ্ঞেস করলে "আর সরকারের আদেশ ?"

"আজ্ঞে তা ত, মানতেই হবে।" এই বলে' সে তার অনেক পড়ার চাপে টাক-পড়া মাথাটাকে নীচু করে' খুব বিনয় জানিয়ে বলতে লাগল, "মূঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাম্—" মন্ত্রী বললে "বেশ বেশ—লোক-শিক্ষার ভার তোমার উপর দেওয়া গেল। মাসে-মাসে একশত স্বর্ণ-মুদ্রা তোমার পারিশ্রমিক হবে।" হঠাৎ একটু গরম হয়ে' মন্ত্রী বললে "আর দেখ, দরকার পড়লে উল্টো পালা গাইতে হবে কিন্তু।" তার পর একটু স্বর নামিয়ে বললে, "জানই ত, বর্ত্তমান যুগে রাজ্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন করতে হ'লে……"

অধ্যাপক মনে মনে ভাবলে—"তাই ত।"

মন্ত্রী আবার বললে "বুঝলে না, এইটেই ত হ'ল নীতি।"

সাহস নিয়ে অধ্যাপক মুখে বললে "আজ্ঞে তা বটেই ত।"

কাজে সে মোতায়েন হ'য়ে গেল। আর হপ্তায় হপ্তায় খুব উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করতে লাগল—

"ভদ্র-বটুগণ, দেখ মানুষ বাইরেও সসীম আর অন্তরেও তাই; আর প্রকৃতি হচ্ছে ঠিক তার উল্টো—সুতরাং সে মানুষের শত্রু। স্ত্রীজাতি হচ্ছে প্রকৃতির চর। অতএব, সাবধান।" ইত্যাদি।

এক-কথা নিত্য বলতে-বলতে ঐরকম করে' ভাবাই তার ক্রমে অভ্যাস হ'য়ে এল। আর উৎসাহের আবেগে তার গোল চশমার ভিতর চোখ দুটো জ্বলে' জ্বলে' উঠল। অকস্মাৎ মনে হ'ত যেন তার মনের বিশ্বাস তার চোখের আগুনে প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য বলাটাও তার নেহাৎ খারাপ হ'ত না।

নিজের কৃতিত্বে খুসী হ'য়ে সে তার টাক পড়া মাথাটি দুলিয়ে তার ছাত্রদের দিকে তার অমায়িক হাসিটুকু মেলে' ধরত। তার বাঁটুল নাকটি আবেগে ফুলে'-ফুলে' উঠত। আর দিন বেশ নিরাময়ভাবে কেটে' যেত।

বড়-বড় দুঃখবাদীদের ধারা-অনুযায়ী তা'কে পেয়ে বসল দারুণ অজীর্ণ রোগে; সুতরাং হাত পুড়িয়ে খাওয়া তার আর পোষালো না।

অগত্যা,—সে যথারীতি বিবাহ চুকিয়ে বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি প্রভৃতির একটা কায়েমী বন্দোবস্ত করে' নিয়ে একে একে ২১টা বছর কাটিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে যে কখন্ তার চারটি ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করে' পর্য্যায়ক্রমে বড় হ'য়ে উঠেছে তা সে খেয়ালও করেনি। তার পর একদিন সে মারা গেল।

তার তিন মেয়ে শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। তার ছেলে রীতিমত শোকচিহ্ন ধারণ করে' সব খবরদারী করে' বেড়াচ্ছিল। তার মনের কোনো বিকার ছিল না। তার ছাত্রেরা তার চিরস্মরণীয় নামে গান বেঁধে খুব চীৎকার করে' গাইতে লাগল। তা'তে উত্তেজনা ছিল প্রচুর, কিন্তু রাগিণী ছিল না। তবে স্মৃতি-সভায় তার অধ্যাপক বন্ধুরা খুব লম্বা চওড়া বক্তৃতা করলে, আর তার অপূর্ব্ব দার্শনিকতার খুব প্রশংসা করলে। মোটের উপর ব্যাপারটা বেশ গুরুগম্ভীরই হ'ল, মাঝে-মাঝে বেশ শোকা-বহ, এমনকি মর্ম্মস্পর্শী বলে'ও মনে হ'তে লাগল।

সভার পর তার একটি ছাত্র বললে "আহা বৃদ্ধ মারা গেল। তার গলার স্বর বিরাট একটা বিষাদের উত্তাপে যেন উদাস হ'য়ে উঠেছিল।

আর একজন বললে "লোকটি যেন দুঃখবাদকে নিজের মধ্যে মূর্ত্তি দান করেছিল। দুঃখবাদই ছিল তার জীবনের সম্বল।" সে খুব যত্ন করে'ই একটি সুন্দর গেরুয়া রেশমী চাদর গায়ে দিয়ে এসেছিল।

তৃতীয় একটি শিষ্য আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। সে ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। দু'বেলা তার খাওয়াও জুটত না। পাশের একটি ছাত্রকে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "শ্রাদ্ধে আমাদের খাওয়াবে ত ?"

শ্রাদ্ধে সকলেরই নিমন্ত্রণ হ'ল।

তার পরিবারের জন্যে সে প্রচুর অর্থসঞ্চয় করে' রেখে গিয়েছিল, সুতরাং শ্রাদ্ধে আয়োজন হ'ল বিপুল। সেই দরিদ্র ছাত্রটি খুব পেট ভরে' খেলে। এমন খাওয়া তার জীবনে কখনো জোটেনি। বাড়ী ফেরবার পথে সে তার গুরুর বিপুল সম্পদের কথা ভাবতে-ভাবতে মনে-মনে হেসে বললে "দুঃখবাদটাকেও বেশ কাজে লাগানো যায় দেখা যাচ্ছে।" *

---

* গর্কির অনুসরণে।

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৩৭]

গৃহে ফিরিয়া মাধবী তারাসুন্দরীর সহিত দুই চারিটা কথা কহিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। সুমিত্রার সহিত কথোপ-কথন-কালে যে-সকল চিন্তা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, অনর্থক সে সকলের সহিত জড়িত থাকিয়া নিজেকে বিড়ম্বিত করিবে না, এ-সঙ্কল্প সে গাড়ীতে আসিতে আসিতেই করিয়াছিল। কাজ-কর্ম্মে যতক্ষণ সে ব্যস্ত রহিল ততক্ষণ একরকম কাটিল; কিন্তু সে অল্পক্ষণই। সুনিয়ন্ত্রিত সামান্য গৃহকর্ম্ম দেখিতে-দেখিতে শেষ হইয়া গেল, তখন পুনরায় নানাপ্রকার চিন্তা লঘু মেঘখণ্ডের মতন তাহার মনের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল তারাসুন্দরীর সহিত গল্প করিল, কিছুক্ষণ একটা পুস্তকের মধ্যে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিল, অবশেষে কতকটা অসময়ে চর্‌কা লইয়া সুতা কাটিতে বসিল। কিন্তু কিছু পরে সহসা যখন সে উপলব্ধি করিল যে, চর্‌কার সুতা অপেক্ষা চিন্তার সূত্রই দীর্ঘতর এবং সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়া চর্‌কা ছাড়িয়া চিন্তাই অবলম্বন করিল।

যে-প্রশ্নের উত্তর যথাকালে সুমিত্রাকে সে দিতে পারে নাই, এখন সেই প্রশ্ন নিজ হইতে তুলিয়া, নানাবিধ যুক্তি-হেতু বিচার বিতর্কের দ্বারা, সে তাহার উত্তর নির্ণয় করিতে বসিল। কিন্তু চিন্তার সূত্র কোনো মীমাংসায় তাহাকে না লইয়া গিয়া যখন চতুর্দ্দিকে কেবল দুশ্ছেদ্য জাল বুনিতেই লাগিল তখন মাধবী সমস্ত বিচার-বিবেচনা সহসা পরিত্যাগ করিয়া মনে-মনে দৃঢ়ভাবে কাল্পনিক সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, 'না, আমি বিমান-বাবুকে ভালোবাসিনে,বিমান-বাবুকে ভালোবাসিনে, আমি দাদার কাছে যে-রকম প্রতিশ্রুতির দ্বারা আবদ্ধ তা'তে আমি বিমান-বাবুকে ভালোবাস্‌তে পারিনে!'

কিন্তু চোরা বালিতে পড়িয়া লোকে যতই উঠিবার চেষ্টা করে, ততই যেমন নামিয়া যায়, তেম্‌নি মাধবী যতই জোরের সহিত মনে-মনে বলিতে লাগিল—'আমি বিমান-বাবুকে ভালোবাসিনে,' সংশয় ততই যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—বোধ হয় বাসো! নহিলে সুমিত্রার সহিত কথোপকথনের সময়ে মধ্যে-মধ্যে তোমার বুকই বা কাঁপিয়াছিল কেন, আর মুখই বা শুকাইয়াছিল কেন?

মাধবী মনে-মনে উত্তর দিল, 'সে কিছুই নয়, ক্ষণিক দুর্ব্বলতা। সে আমি কাটিয়ে উঠেছি।' কিন্তু সন্ধ্যার কিছু-পূর্ব্বে বিমানবিহারী যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সে নিঃসংশয়ে বুঝিল যে, দুর্ব্বলতাই হউক অথবা অন্য যাহা-কিছুই হউক, তাহা ক্ষণিক নহে, কারণ তখনও তাহা তাহার মনের মধ্যে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান রহিয়াছে!

তারাসুন্দরী তখন জপে বসিয়াছিলেন, কাজেই বিমান-বিহারীর নিকট তাহাকেই থাকিতে হইল।

কয়েকটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পর বিমান বলিল, "আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, মাধবী।"

অন্যদিকে চাহিয়া অবিস্ময়ের সহিত মাধবী বলিল, "হাঁ, সে-কথা শুনেছি।"

"শুনেছ? কার কাছে শুন্‌লে?"

কাহার কাছে কেমন করিয়া শুনিয়াছে, মাধবী তাহা সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিল।

বিমান বলিল, "কাল চার্জ্জ দিয়ে এসে তোমার কাছে হাজির হবো,তোমাদের রাজপথের পথিকদের দলে আমাকে ভর্ত্তি ক'রে নিয়ো।"

বিস্মিত-নেত্রে বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল, "কাল চার্জ্জ দেবেন? আজই দেবার কথা ছিল ত?"

"তা ছিল; কিন্তু কপালে আর একদিন ভোগ আছে, তাই আজ কিছুতেই হ'য়ে উঠ্‌ল না।"

আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া মাধবী চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "রাজপথে প্রবেশের জন্যে আরো যদি কিছু কর্‌বার থাকে ত আমাকে বলে' দাও, মাধবী!"

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া স্পন্দিত-বক্ষে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, চাকরী আপনি কেন ছাড়ছেন?"

এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, প্রথমে বিমানবিহারী তাহা ভাবিয়া পাইল না, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমাদের রাজপথের নিষ্ঠা রাখ্‌বার জন্যে। রাজপথে চল্‌তে হ'লে ত আর রাজার পথে চলা চলে না, তাই।"

এ-উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্যগ্রভাবে মাধবী বলিল, "কিন্তু রাজপথে চল্‌বার ইচ্ছে আপনার কেন হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি!"

শুনিয়া বিমানবিহারী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল; ব'লিল, "তোমার প্রশ্নের রীতিমত উত্তর দেবার যদি দরকার হয় ত পরে দেবো, উপস্থিত একটা গল্প মনে পড়ছে তাই বলি শোনো। একদিন আকাশের চাঁদ আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা পৃথিবী, তোমার

বুকের উপর ও-রকম জ্যোৎস্না পড়েছে কেন ?' পৃথিবী মুখে কোনো উত্তর দিতে পারেনি, মনে-মনে বলেছিল; মন্দ কথা নয়! তার কৈফিয়ৎও আমাকে দিতে হবে!" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

গল্প শুনিয়া মাধবীর কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল এবং বুকের স্পন্দন এত বাড়িয়া গেল যে, মনে হইল বিমান-বিহারী হয়ত তাহার শব্দ শুনিতে পাইতেছে!

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বিমানবিহারী ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিল, "রাজপথে চল্‌বার ইচ্ছে কেন আমার হ'ল, আরো বেশী স্পষ্ট করে' তার কৈফিয়ৎ দেবার কোনো দর্‌কার আছে কি, মাধবী ?"

কম্পিতকণ্ঠে মাধবী বলিল, "না।"

মৃদুস্বরে বিমান বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্।"

তাহার পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। যে-কথা অভিব্যক্তির প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সহসা সংরুদ্ধ হইয়া তাহা উভয়ের চিত্তে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল; বাক্যের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা না হারাইয়া ভাবের বিচিত্র বর্ণে তাহা উভয়ের হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিল! স্থূল হইয়া যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় অধিকার করিতে গিয়াছিল, সূক্ষ্ম হইয়া তাহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে স্পর্শ করিল।

"মাধবী!"

নিঃশব্দে মাধবী তাহার কুণ্ঠিত করুণ নেত্র বিমান-বিহারীর প্রতি উত্তোলিত করিল।

বিমানবিহারীর মুখে চাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ ছিল না, সে শান্তস্বরে বলিল, "না পেয়ে-পেয়ে আমি অন্য একটা জিনিস একটু লাভ করেছি। কি জানো, মাধবী ?"

মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল, "না।"

"স্পর্শ দিয়ে পাওয়াই যে একমাত্র পাওয়া নয়, সে-ই জ্ঞানের একটু আভাস পেয়েছি। পৃথিবী আর চাঁদের উদাহরণটা নিয়েই দেখ। মহাশূন্যের এতটা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে চাঁদকে পাচ্ছে। ব্যবধান সব-সময়ে বাধা নয়, আর অন্তরালও সব সময়ে অন্তরায় নয়। চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার আলো পৃথিবীর বুকে এসে পড়্‌ছে, এটা কি প্রমাণ নয় মাধবী, যে, চাঁদ পৃথিবীর প্রতি বিমুখ নয় ?"

মাধবী কিছু বলিল না, শুধু নিমেষের জন্য একবার বিমানবিহারীর প্রতি চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যা তাহার ধূপ-ছায়ার ধূসর অঞ্চল মেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচে বিকল জলের কল হইতে টপ-টপ করিয়া ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়িতেছে এবং বাহিরে পথে গাড়ী-ঘোড়া, লোক-জন চলাফেরার বদ্ধ চাপা আওয়াজ শুনা যাইতেছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিল, "এখন চল্‌লাম মাধবী, কাল হয়ত একবার আস্‌ব।"

মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "আস্‌বেন।"

তাহার পর বিমানবিহারীর পিছনে-পিছনে দুই চারি পা গিয়া দ্বিধাজড়িত-স্বরে বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি।"

"কি কথা, বলো।" বিমানবিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাধবীর দিকে ঔৎসুক্য-ভরে চাহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া নতনেত্রে মাধবী বলিল, "সুমিত্রা মনে করে, আপনি হয়ত তারই জন্যে চাকরি ছাড়্‌চেন।"

এক-মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "মনে করে না, ভয় করে। কিন্তু ধরো যদি মনেই করে, তা হ'লে কি বল্‌তে চাও তুমি ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিত-কণ্ঠে মাধবী বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে হয়ত এখন তার আপনাকে বিয়ে কর্‌তে আপত্তি নেই।"

"সেই কথাটা তা'কে স্পষ্ট করে' জিজ্ঞাসা কর্‌তে তুমি কি আমাকে বল্‌ছ ?"

"যদি বলেন, আমি তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি।"

ঈষৎ কঠিনস্বরে বিমান বলিল, "তোমার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কোরো; কিন্তু তোমার সহৃদয়তার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি! তুমি যে আমার জন্যে এতটা ভাবো তা জান্‌তাম না!"

তাহার পর চলিয়া যাইতে-যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বৈজ্ঞানিকেরা কি বলে জানো, মাধবী ? তারা

বলে এক জ্যোৎস্না-ভিন্ন চাঁদ থেকে আর অন্য কোনো সাড়া পাবার উপায় নেই। কারণ চাঁদ অসাড়, জমাট, প্রাণহীন!"

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে মাধবী স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল, সে যে সুখে, না দুঃখে, ব্যথায় না বিহ্বলতায় তাহা সে বুঝিতে পারিল না; শুধু মনে হইল একটা অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি বর্ষণস্ফীত গিরিনদীর মতন তাহার চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে! সুখের সহিত কোনো শাখা-উপশাখা দিয়া তাহার যে কোথাও যোগ আছে, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যখন সে উপলব্ধি করিল যে, সেই প্রবাহের মূল ধারাটাই সুখের গহ্বর হইতে নিঃসৃত, তখন সবিস্ময় পুলকে তাহার চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুঃখ দিয়া এবং দুঃখ পাইয়া যে এত সুখ পাওয়া যায়, জীবনে সে তাহা এই প্রথম অনুভব করিল।

তাহার পর মাধবী ধীরে-ধীরে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া উত্তর-দিকের একটা জানালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কলিকাতার ঘন সম্বদ্ধ সৌধমালার অবকাশ দিয়াও তথা হইতে আকাশের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল; সেই অস্পষ্ট বিলীয়মান নভাংশের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে যেন কোন্ আকাশের চাঁদ—আত্ম-নিহিত প্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে! মনে হইল কিরণ-রেখার মতন দুই বাহু দ্বারা সে এক পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিতেছে, 'ওগো আমার পৃথিবী, আমি তোমার বৈজ্ঞানিকের চাঁদ নই! আমি অসাড়, জমাট, প্রাণহীন নই; এই দেখ আমি চঞ্চল, স্পন্দিত, সজীব!'

মাধবী জাগ্রত থাকিয়া স্বপ্ন রাজ্যে প্রবেশ করিল। একজন অনাত্মীয় যুবা-পুরুষ তাহাকে চাঁদের সহিত উপমিত করিয়া সোহাগ করিয়াছে এই কল্পনায় তাহার নবোন্মেষিত প্রকৃতি একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)
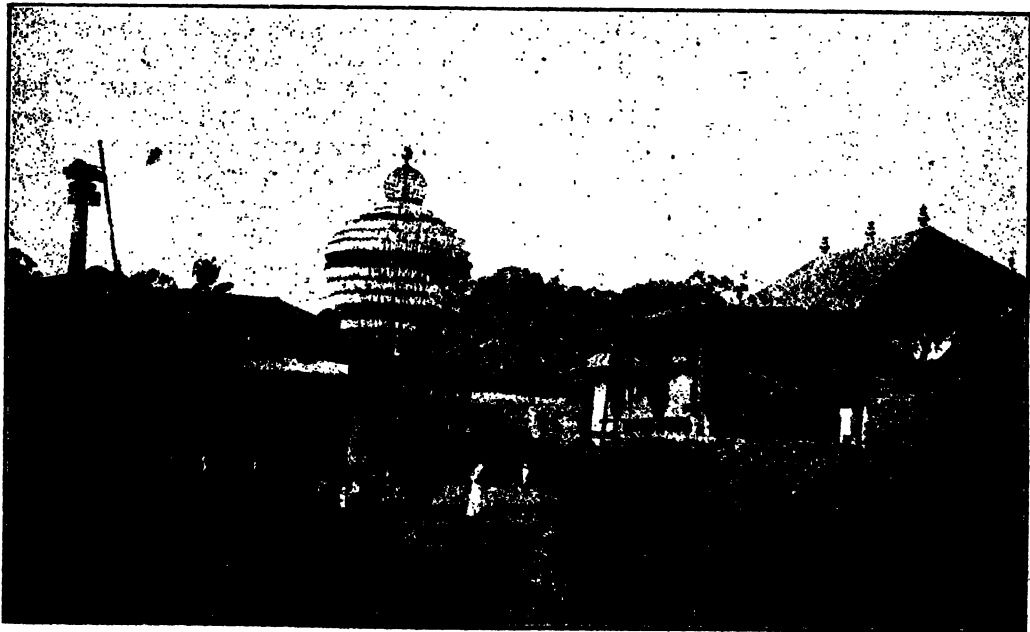
শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

এক-চাকার মোটর সাইকেল—

রোমে কিছুদিন পূর্ব্বে এক-প্রকার অদ্ভুত মোটর দৌড় হইয়া গিয়াছে। যেসকল লোকজন এই দৌড় দেখিতেছিল, তাহারা সকলে এই দৌড় দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে অবাক্ হইয়া যায়। সকলে দেখিল, একটা প্রকাণ্ড চাকার মধ্যে একজন লোক ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিয়া আছে, এবং

এক-চাকার মোটর-সাইকেল

সেই প্রকাণ্ড চাকাটা তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই চাকাটা মোটরের শক্তিতে চলে। চালকের পা রাখিবার এবং বসিবার জায়গা আছে। পাছে মাথা ঠুকিয়া আঘাত লাগে, এইজন্য চাকাটাকে খুব বড় করিয়া তৈয়ার করা হয়। বিভিন্নপ্রকারের লোকের জন্য বিভিন্নপ্রকারের চাকা তৈয়ার হয়। বড় চাকার মধ্যে আর-একটি ছোট চাকা আছে—এই চাকাটি এমন-ভাবে বড় চাকার গায় লাগানো আছে, যে, বড় চাকাটা হাজার ঘুরিলেও ভিতরের চাকা ঘুরিবে না। এই ভিতরের চাকার উপর কলকব্জা, মোটর এবং চালকের বসিবার, পাদানী ইত্যাদি সব আছে। মোড় ঘুরিবার সময় দেহের ভার এপাশ-ওপাশ করিয়া এবং সঙ্গে-সঙ্গে ষ্টিয়ারিং হুইলের অর্থাৎ গতি নিয়ামক চক্রের সাহায্য লইয়া মোড় ঘুরাইতে হয়।

এই অদ্ভুত এক-চাকার মোটরের আবিষ্কারকের নাম ডেভিড গিসলাঘি (Davide Gislaghi)। ইনি মিলানের একজন মোটর সাইকেল-কর্ম্মচারী। বর্ত্তমান সময়ে গাড়ীর ওজন নানা-প্রকারে কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই গাড়ীর ওজন কিন্তু আর কোনোদিকেই কমাইবার নাই। যতদূর সম্ভব কম কলকব্জা ব্যবহার করিয়া ইহা তৈয়ার হইয়াছে। এই গাড়ীতে অবশ্য আরোহীর বিশেষ আরাম নাই। এই গাড়ীর সুবিধা এবং হাঙ্গামা অনেকদিকে কম। একটি মাত্র চাকা, একটি মাত্র টায়ার। যাহা কিছু গোলমাল সেই একটি চাকার উপর দিয়াই যাইবে। প্রথমে যখন এই গাড়ীখানি তৈয়ার হয়, তখন সকলেই উপহাস করিয়া বলে যে ইহা একটি খেলিবার চাকা হইল, লোক চড়িবার জন্য ইহা কোনো কাজে আসিবে না। কিন্তু আবিষ্কারক হাজার লোকের সামনে এই অদ্ভুত গাড়ী চালাইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, এই গাড়ীতে চড়িয়া লোক অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে পারে। আবিষ্কারকের মতে এই গাড়ী অদূর ভবিষ্যতে সকলের কাজে লাগিবে। যাহাদের মোটর গাড়ী কিনিবার সখ আছে, কিন্তু কিনিবার পয়সা নাই, তাহারাও এই গাড়ী কিনিতে পারিবে। দাম খুব বেশী হইবে না এবং ইহা রাখিবার জন্য ভাড়া দিয়া গ্যারেজ বা মোটরগাড়ীশালা রাখিতে হইবে না।

এই গাড়ীর মোটর যাহাতে চলিবার সময় হাওয়াতেই ঠাণ্ডা থাকে তাহার ব্যবস্থা আছে। কারণ ঐটুকু সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে যদি ইঞ্জিন গরম হইয়া যায়, তাহা হইলে চালকের পা পুড়িয়া যাইবে, এবং সে কয়েক মিনিটের বেশী গাড়ীতে বসিতে পারিবে না।

জেড্-আর্-থ্রী (Z-R 3)

ইহা একখানি জেপেলিন। জার্ম্মানির তৈয়ারী। ইহা জার্ম্মান সরকার হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ-ঋণের পাওনা-শোধস্বরূপে দেওয়া হইয়াছে। এই বৃহৎ আকাশপোত-খানিতে পাঁচখানি ৪০০ হর্স্-পাওয়ার ইঞ্জিন আছে এবং ঘণ্টায় এই আকাশপোতখানির বেগ ৭৫ মাইল করিয়া হইতে পারে। ১০০,০০০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা এই জাহাজে উত্তোলন করা যায়, অর্থাৎ নাবিক এবং সঙ্গের জিনিষপত্র ছাড়া ২০ জন যাত্রী এই আকাশপোতে ভ্রমণ করিতে পারে। এই জেপেলিনখানি জার্ম্মানী হইতে যাত্রা করিয়া পথে কোথাও না থামিয়া একেবারে আমেরিকায় গিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। ইহার পূর্ব্বে এত বড় কোনো আকাশপোত আর এমনভাবে আট্লাণ্টিক্ মহাসাগর পার হইয়া যাইতে পারে নাই।
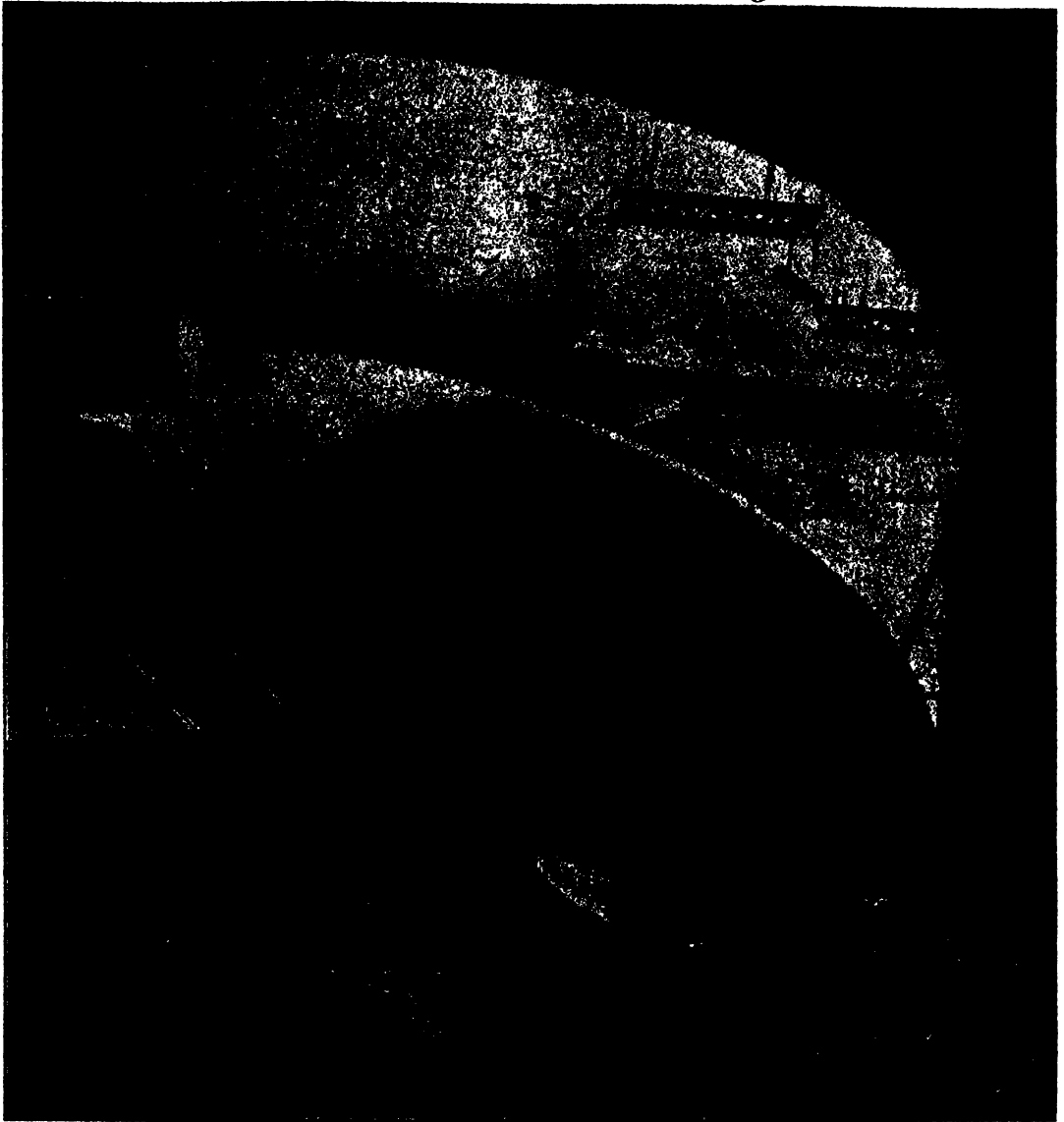
জেড্‌-আর-থ্রী-জেপেলিন। ৬৬৩·২০ ফুট লম্বা। ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে উড়িতে পারে। ইহা জার্ম্মানি হইতে একদমে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছে। ঝড় বৃষ্টি বাদল ইহার কোনো ক্ষতিই করিতে পারে না।

৫০০০ মাইল পথ একটানা যাওয়া ইহার পূর্ব্বে কেহ সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারে নাই। জাহাজখানির লম্ব ৬৬৩·২০ ফুট এবং ইহাতে ২৫০০,০০০ কিউবিক্ ফুট গ্যাস রাখিবার স্থান আছে। জাহাজখানির কঙ্কাল ডুরেলুমিন্ নামক দ্রব্যে তৈয়ারী। এই ডুরেলুমিন দ্রব্যটি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ইস্পাত হইতেও বহুগুণ শক্ত অথচ হালকা। ডুরেলুমিন্ কাঠ অপেক্ষাও হাল্‌কা। ইহা এত শক্ত যে, একটি পাৎলা ডাণ্ডার উপর ছয় জন লোক দাঁড়াইলেও ইহা ভাঙিবে না—এমন-কি সামান্য একটু বাঁকিবেও না।

ডুরেলুমিন—তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম্ এবং আলুমিনিয়মের মিশ্রণ। ইহাতে শতকরা ৯৪ ভাগ অ্যালুমিনিয়ম্ থাকে। এই মিশ্র ধাতু অ্যালফ্রেড্ উইলম্ কর্ত্তৃক জার্ম্মানীতেই আবিষ্কৃত হয়—জেপেলিন তৈয়ারীর জন্য। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতেও তৈয়ারী হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, কিছুকাল পরে লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি ভারী-ভারী দ্রব্য গৃহ ইত্যাদি নির্ম্মাণের কাজে আর দরকার হইবে না। সমস্ত কাজে এই বজ্র-কঠিন ডুরেলুমিন্ ধাতুর ব্যবহার হইবে।

Friedrichshafen-এর (জার্ম্মানি) আকাশে জেড্-আর-থ্রী। বাঁ দিকে উপরে—একজন আমেরিকান্ উড়ো-কর্ম্মচারী
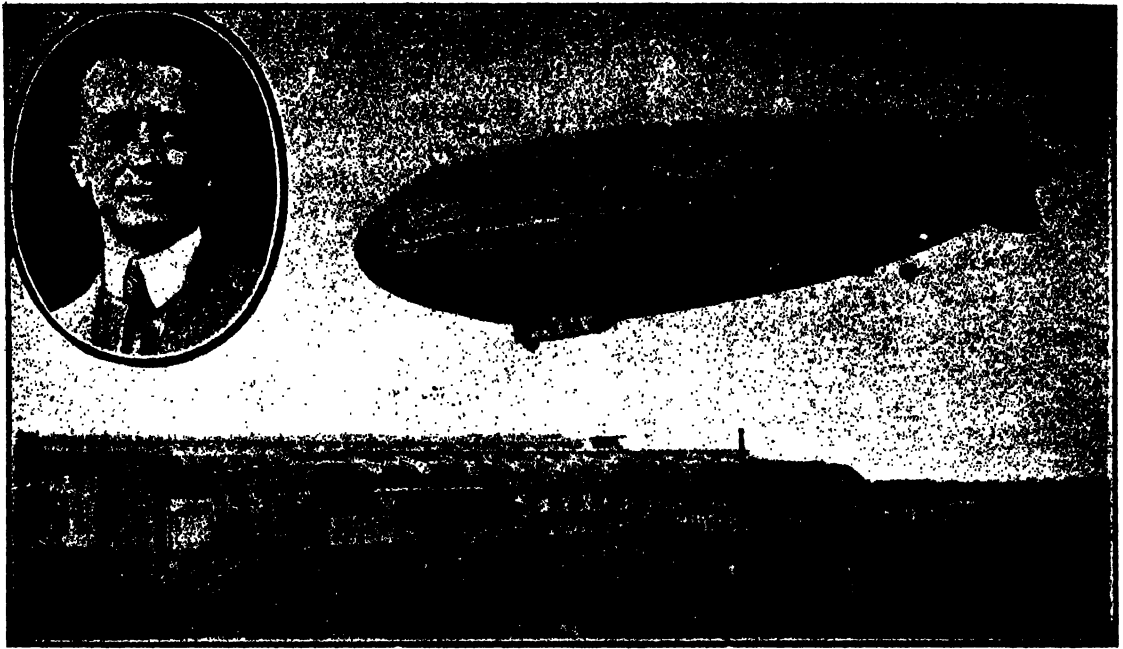
অদূর ভবিষ্যতে আকাশপোতে যাত্রী বহন করার ব্যবসা আরম্ভ হইবে। এই ব্যবসা অতি লাভজনক হইবে এবং যাত্রীগণেরও সুখ, সুবিধা, সময়-সংক্ষেপ এবং খরচও অনেকভাবে কমিয়া যাইবে। জেড-আর্ থ্রী আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে আরো কয়েকটি জেপেলিন পথেই নষ্ট হইয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। বর্ত্তমানের হেলিয়াম্ গ্যাস তখনও ব্যবহারে আসে নাই। হেলিয়াম্ গ্যাস থাকিলে পূর্ব্বের জাহাজগুলি পুড়িয়া নষ্ট হইত না। হেলিয়াম্ গ্যাস অতি নিরাপদ, ইহাতে আগুন লাগিবার কোনোই আশঙ্কা নাই। জেড-আর-টু'র কথা অনেকেরই মনে আছে—ইহা আকাশে উঠিয়াই দুই-টুক্‌রা হইয়া যায় এবং আগুন ধরিয়া আরোহীদের প্রায় সকলকেই বিনষ্ট করে। ইতালীর তৈরী রোমা নামক আকাশপোতখানিও এইভাবে আগুনে পুড়িয়া আরোহী-সমেত নষ্ট হয়। হেলিয়াম্ গ্যাসভরা থাকিলে আগুন ধরিয়া এইসমস্ত জাহাজগুলি নষ্ট হইত না। রাসায়নিকেরা বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও এই হেলিয়াম গ্যাসে আগুন ধরাইতে পারেন নাই। হেলিয়ামে যে কেবল আগুন ধরে না, তাহা নহে, হেলিয়ামের সন্নিকটে আগুন অন্য কোনো জিনিষেও লাগিতে পারে না—ইহা অগ্নি নির্ব্বাপক।

ডুরেলুমিন্ দ্রব্যের আর-একটি বিশেষ গুণ আছে—ইহা জলে ডুবিতে পারে না। এই আকাশপোতখানিতে ছোট ছোট বেলুন লাগানো আছে। প্রত্যেকটিই অদাহ্য গ্যাসে পরিপূর্ণ এবং একটি বেলুনের সহিত অন্য বেলুনের কোনো যোগ নাই। জাহাজ খারাপ হইয়া গেলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে এইসকল বেলুনের সাহায্যে আরোহীরা নির্ব্বিঘ্নে ভাসিতে-ভাসিতে ক্রমে মাটিতে আসিয়া পৌঁছিবে। প্রত্যেকটি বেলুনই বিপৎকালে আকাশ-ভেলার কাজ করিবে। আকাশে ভ্রমণ করিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রাণের ভয়ে অনেকেই সে-ইচ্ছা দমন করিবেন। বর্ত্তমান সময়ের ডুরেলুমিন্ ধাতুনির্ম্মিত আকাশপোতে কোনোপ্রকার ভয় না করিয়াই সকলেই চড়িতে পারিবে। ডুরেলুমিন্ নির্ম্মিত আকাশপোত সমুদ্রের জাহাজ অপেক্ষাও বেশী নিরাপদ্।

এখন প্রত্যেক জাতিই নিজেদের শক্তি বাড়াইবার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত আকাশ-পথে যোগ রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

জেড-আর্-থ্রী জেপেলিন যখন জার্ম্মানীর মাটি হইতে ক্রমশঃ জার্ম্মানীর আকাশে উঠিল এবং দেখিতে-দেখিতে ক্রমশঃ মেঘলোকের মধ্যে মিলাইয়া গেল তখন ফ্রিডরিশ্‌শাফেন্-এ (Friedrichshafen) সমবেত সকল নরনারীর চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। তাহাদের দেখিয়া তখন মনে হইতেছিল যে, যেন তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কোনো আত্মীয় তাহাদিগকে চিরকালের মত ছাড়িয়া একোক হইতে পরলোকে গমন করিল। জেপেলিন আবিষ্কর্ত্তা কাউন্ট জেপেলিনের কন্যাও চেপে রুমাল দিয়া চোখের জল মুছিতেছিলেন। এই আকাশপোতের কাপ্তেনকে একজন কলেজের ছাত্র দেশশত্রুবোধে খুন করিতেও উদ্যত হয়। জেপেলিন ধীরে-ধীরে জার্ম্মানীর আকাশ ত্যাগ করিয়া আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগর পার হইয়া যখন যুক্তরাষ্ট্রের লেকহার্ষ্ট নামক স্থানের আকাশে মেঘের পরদা ভেদ করিয়া লোকচক্ষুর সাম্‌নে উদয় হইল, তখন সমবেত সহস্র-সহস্র জনমণ্ডলী বিস্ময়ে স্তব্ধ এবং নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়া পায় নাই, কেমন করিয়া এত বড় একটা ভীষণ-প্রকাণ্ড জাহাজ আকাশে ভাসিয়া এতদূর আসিয়াছে—পথের ঝড় তুফান জেড-আর-থির কোনো অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তার গতির বেগও বিন্দুমাত্রও কমাইতে পারে নাই।

—

বিখ্যাত অভিনেতা—

ওদের্ঁ থিয়েটারের (পারি) ডিরেক্টার্ এম্ কারম্যা গেমিয়ের (M. Fermin Gemier) ফ্রান্স্ দেশের একজন বিখ্যাত অভিনেতা।

Fermin Gemier—পারির একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

আছে। অভিনয়ের সময় আসল ব্যক্তির চেহারার সহিত নকল ব্যক্তির চেহারার কোনো মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অভিনয় সমস্ত মন প্রাণ দিয়া এবং আন্তরিকতার সহিত না করিলে সে-অভিনয় দর্শকদের অন্তর স্পর্শ করে না। কেবল চীৎকার করিয়া দর্শকদের কানে তালা লাগাইলে অভিনয় হয় না। অভিনয় যথার্থ করিতে হইলে তাহার জন্য সাধনা এবং চরিত্রবল এবং ঐকান্তিক চেষ্টা চাই। "যাহার অন্য কোনো গতি নাই সেই থিয়েটারের দলে ঢোকে"—এ কথা আমাদের দেশেই খাটে! গেমিয়ের মতে থিয়েটার শিক্ষার স্কুল করিয়া তাহাতে ছাত্র গ্রহণ করিলে অনেক সময়েই কোনো ফল পাওয়া যায় না, তাহাতে কুফল হয় এই যে ছাত্রদের মৌলিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

গেমিয়ে একজন সাধক। থিয়েটারকে তিনি কেবলমাত্র পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। অভিনয়ের মধ্য দিয়া তিনি দেশের যথার্থ মূর্ত্তিকে-সাধনাকে লোকের সামনে ধরিতে চান। ইহাতে তিনি অনেক-পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা বলা যায়।

তাঁহার একখানি মৌলিক ছবি, এবং তিনটি অভিনয়কালীন চিত্র দেখিলে তাঁহার অভিনয়-ক্ষমতার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

—

অদৃশ্য জিনিষের ফোটো তোলা—

ফিলিপ ও' গ্রাভেল (Philip O' Gravelle) একজন ফোটোমাইকোগ্রাফার (Photomicrographer)। এই ভদ্রলোকের ফোটোগ্রাফি বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যে সমস্ত অতি ক্ষুদ্র জিনিস একটি বিন্দুর মতন দেখায়, সেইসকল জিনিষের বা প্রাণীর ফোটো ইনি তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহার মাইক্রোস্কোপের চক্ষে ১ ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগ-পরিমাণ প্রাণীকে জঙ্গলের ভীষণদর্শন প্রাণীর মতো দেখায়। পূর্ব্বে মাইক্রোস্কোপে দৃষ্ট নানাপ্রকার জীবাণুর ফোটো পীড়াতত্ব, প্রাণতত্ব এবং জীবতত্ব এই তিন বিষয়ের চর্চ্চায় দরকার

বিভিন্ন অভিনয়ে গেমিয়ার (Gemier)

সাইলক বেশে — মলিয়ারের বেশে — একজন মঙ্গোলে

সম্প্রতি ইনি আমেরিকার নিমন্ত্রণে সেখানে গিয়া তাঁহার চমৎকার অভিনয় দেখাইয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতেছেন। এই বিখ্যাত অভিনেতার মুখের হাব-ভাব এবং আকার পরিবর্ত্তনের অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা

হইত। কিন্তু গ্র্যাণ্ডেলের চেষ্টায় মাইক্রোস্‌কোপের সাহায্যে তোলা ফোটো নানা-প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যেও দরকার হইতেছে।

এই বৈজ্ঞানিক কতকগুলি এমন ফোটো তুলিয়াছেন যাহার পরিচয় পাইলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। একটা মাছির জিহ্বার ফোটো তিনি মাইক্রোস্‌কোপের ভিতর দিয়া ক্যামেরায় তুলিয়াছেন। একপ্রকার জলীয় গাছের ছবি তুলিয়া তাহাকে ১৫০০গুণ বাড়াইয়াছেন। এই গাছের ইংরেজী নাম ডায়াটম্ (Diatom)। মানুষের চামড়ার চোখে ইহাকে দেখা যায় না।
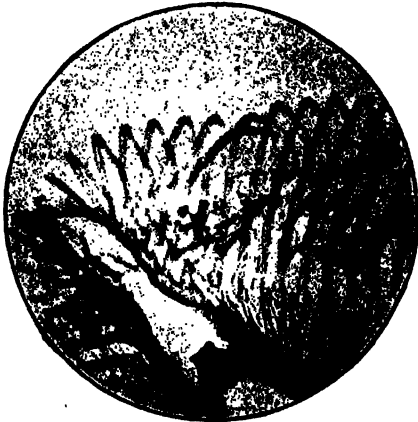
মাছির জিভ—মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তোলা ছবি

যেসমস্ত জীবাণুকে চামড়ার চোখে দেখা যায় না এবং যাহাদের অস্তিত্ব বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, এইরকম কতকগুলি জীবাণুর কার্য্য-কলাপের ছবি ফিল্‌মে তুলিয়া দেখাইয়াছেন। ছায়াচিত্রে যখন এই সমস্ত জীবাণু চলাফেরা করে, তখন তাহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। পুকুরের পরিষ্কার স্ফটিক-সমান জলে যে কত হাজার-রকমের জীবাণু বাস করে তাহা এইপ্রকার ফোটোগ্রাফির সাহায্যে ধরা পড়ে। জলের মধ্যে যে-সমস্ত গাছের পাতা পড়িয়া থাকে—তাহার উপর যে কত-প্রকার জীবাণু বাস করে তাহা খালি চোখে দেখিয়া বলা যায় না,
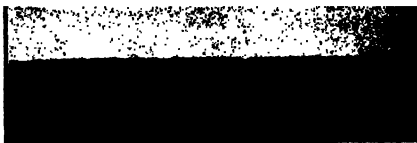
উপরে নূতন ক্ষুরের শাণিত অংশ
নীচে ব্যবহৃত ক্ষুরের শাণিত অংশ

কিন্তু মাইক্রোস্কোপের তলায় ধরিলে তাহা চমৎকার দেখা যায়। ছায়াচিত্রে এইপ্রকার একটি পাতার ফিল্‌ম্ দেখিলে দেখা যায় যে একটি পাতার উপরে একপ্রকার জিনিব জীবাণুর (rotifers) উপনিবেশ বসিয়াছে। এই জীবাণু-উপনিবেশটি সকল সময়েই নড়িতেছে দেখা যায়—নড়িবার সময় মনে হয় যেন একটি ফুলের পাপড়িগুলি একবার খুলিতেছে এবং একবার বন্ধ হইতেছে। এইপ্রকার নড়ার জন্য জলে একটা স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং এই স্রোতে এই জীবাণুর মুখে তাহাদের নানা-প্রকার খাদ্য ভাসিয়া আসে।

একটা মাছির জিহ্বা যাহা আতস কাঁচের মধ্য দিয়াও ভালো করিয়া দেখা যায় না, তাহার একটি চমৎকার ছবি তোলা হইয়াছে। এই জিহ্বার উপর প্রকৃতির যে কতপ্রকার কারুকার্য্য আছে, তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

একটি নতুন এবং একটি পুরাতন দাড়ি কামাইবার ক্ষুরের শাণিত দিকের মাইক্রোস্‌কোপে ছবি তুলিয়া তাহাদের ৬০০ গুণ করিয়া বাড়ানো হইয়াছে। ইহাতে দুইটি ক্ষুরের শাণিত অংশদ্বয়ে প্রভেদ কতখানি তাহা বেশ ভালো করিয়া বোঝা যায়।

ফোটোমাইক্রোগ্রাফি (Photomicrography) আরো কতপ্রকার কাজে লাগিবে তাহা বলা যায় না। নানাপ্রকার ধাতুর মিশ্রণ-ব্যাপারে ফোটোমাইক্রোগ্রাফি অনেক সাহায্য করিবে। রংএর গুণ-নিরূপণেরও ইহার অনেক প্রয়োজন হইবে।

বাইরনের স্মৃতি—

লর্ড বাইরন—ইংরেজী সাহিত্যের একজন বড় রোমাণ্টিক্ কবি। ইনি বিদ্রোহী-কবি ছিলেন। গ্রীসের যখন তুর্কীদের সহিত যুদ্ধ লাগে তখন ইনি গ্রীসের পক্ষে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণদান করেন। গ্রীস্ অকৃতজ্ঞ নহে। গ্রীসের ডাকটিকিটে বাইরনের মিস্‌সোলোন্‌ঘি প্রদেশের চিত্র ছাপাইয়া গ্রীস্ বাইরণের স্মৃতি অমর

বাইরন স্মৃতির ডাক টিকিট (গ্রীস)

করিয়াছে। পৃথিবীর আর-কোনো দেশের কোনো কবির ভাগ্যে এ-সম্মান লাভ ঘটে নাই। গ্রীস্ অবশ্য বাইরনকে তাহাদের বন্ধু এবং শত্রু-নিপাতকারী হিসাবেই এত বড় সম্মান দিয়াছে। কবি-হিসাবে তাহারা বাইরনকে অসম্মান না করিলেও কোনোপ্রকার বিশেষ সম্মান দান করিয়াছে বলিয়া জানি না।

—

তিনজন-চড়া বাইসাইকেল—

জার্ম্মানির আর্থিক অবস্থা এখন বড় খারাপ। সেখানকার লোক-জন অর্থের অভাবে নানা-প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। এবং এই কষ্টে পড়িয়া তাহারা নানা-প্রকার যন্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কার করিতেছে,

তাহাতে সখও মিটিতেছে এবং খরচও বাঁচিতেছে। সম্প্রতি একজন লোক এক-প্রকার ট্যাণ্ডেম্ বাইসাইক্‌ল্ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বাইসাইকেলে তিনজন লোক চাপিতে পারে। মাঝখানে একজনের

তিনজন চাপা ট্যাণ্ডেম বাইসাইকেল

বসিবার স্থান আছে। দুইজনকে প্যাডেল্ করিতে হয়। বাইসাইকেলের গতি পরিবর্ত্তন যে-কেহ করিতে পারে কারণ সামনের দুটি চাকা এমন-ভাবে যুক্ত যে, দুইজন চালকের একজন হাতল ঘুরাইলে দুইখানি হাতলই একদিকে ঘুরিবে।

রাস্তা-ধোয়া মোটরকার্—

ছবিতে দেখুন একজন লোক কেমন করিয়া মোটরকারে বসিয়া রাস্তা ঝাঁট দেওয়া এবং ধোয়ার কাজ করিতেছে। এই গাড়ীখানি

রাস্তা-ধোয়া এবং ঝাঁট-দেওয়া গাড়ী
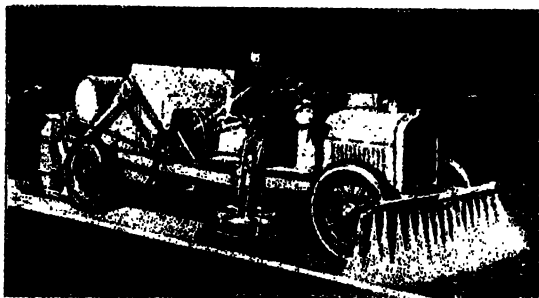
চলিতে-চলিতে রাস্তা ধুইয়া, ঝাঁট দিয়া এবং সঙ্গে-সঙ্গে ময়লা তুলিয়া লইয়া যায়। রাস্তার ময়লা গাড়ীর পিছনের একটা পাত্রে জমা হয়।

ভূপৃষ্ঠের ১২ মাইল নীচে অসীম শক্তির ভাণ্ডার—

মানুষের এখন এক চিন্তা হইয়াছে, কয়লা এবং তেলের ভাণ্ডার শেষ হইয়া গেলে তাহার কি হইবে। কারণ ইহা স্থির যে পৃথিবীর খনিগুলিতে যে কয়লা এবং তেল জমানো আছে, তার শেষ একদিন-না-একদিন হইবেই। এসমস্ত ফুরাইয়া গেলে মানুষের শক্তিও ফুরাইবে, তার বিজ্ঞান এবং কাজকর্ম্ম অচল হইবে।

স্যার্ চাল্‌স্ এ পারসন্‌স্ মনে করেন যে তিনি মানুষের এই বিষম সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এখন উপযুক্ত-পরিমাণ টাকার জোগাড়

১২ মাইল কূপ চালাইবার প্ল্যান্

হইলেই কার্য্য সমাধা হয়। স্যার্ চাল্‌স্ বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে অসীম শক্তি বাষ্পরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে। এই শক্তির পরিমাণ এত বেশী যে অনন্তকাল ধরিয়া সেই শক্তির সাহায্যে মানুষের সকল-প্রকার কলকব্জা এবং কার্‌খানার কাজ চলিতে পারে। এই শক্তি-ভাণ্ডার পৃথিবীর উপর হইতে মাত্র ১২ মাইল নীচেই পাওয়া যাইবে। স্যার্ চাল্‌স্ বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে ১২ মাইল নীচে পর্য্যন্ত কোনো নল বা কূপ চালাইতে হইবে, যাহার মধ্য দিয়া পৃথিবীর বুকের ভিতর হইতে গরম বাষ্প বাহির হইয়া আসিবে এবং এই বাষ্পের সাহায্যে ষ্টীম্ টারবাইন্ ইত্যাদি চলিবে।

স্যার্ চাল্‌সের এই মতলব খুব ছোট স্কেলে পরীক্ষা হওয়াতে ইহার কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে সমস্ত সমবেত বৈজ্ঞানিকদের সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। স্যার্ চাল্‌সের মতে এই কাজটি শেষ করিতে অন্ততঃ ৪০০,০০০,০০০ টাকা চাই। এই টাকার জোগাড় হইলেই কাজে হাত দেওয়া চলিতে পারে।

স্যার্ চাল্স্ বলে, যে, এই কূপটির ব্যাস হইবে ২০ ফুট এবং তাহা গ্র্যানাইট দিয়া বাঁধিতে হইবে। কূপটির ব্যাস বরাবর কুড়ি ফুট থাকিবে না। ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। কাজেই সমস্ত কূপটি ধাপ-ধাপ করিয়া নামিতে থাকিবে। ছ-মাইল নীচে পর্যন্ত সাধারণভাবে কাজ চলিতে পারে, কিন্তু তাহার পর হইতে গরম এবং হাওয়ার মাচাতে চাপ এত ভয়ানক হইবে যে কাজ চালানো অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। এই সময় আর সাধারণ পদ্ধতিতে কাজ চালাইলে চলিবে না। অবস্থানুযায়ী কাজের ধারাও পরিবর্তন করিতে হইবে। এইখান হইতে বাষ্পের সাহায্যে গরম বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং হাতিয়ার ইত্যাদি ঠাণ্ডা রাখিবার বিশেষ কোনো উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে।

পৃথিবীর গর্ভে কি আছে বলা যায় না। তবে স্যার্ চাল্স্ বলেন যে, পৃথিবীর গর্ভে যাহাই থাকুক—সেখানে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা মানুষের অনেক কাজে লাগিবে। কূপটি কোন্‌খান হইতে নীচের দিকে চালাইলে কাজের সুবিধা হইবে, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলিতে পারিবেন।

ইঞ্জিনিয়ার্‌দের মতে এই কূপ হইতে এত বাষ্প পাওয়া যাইবে যে, তাহা হইতে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর সকল কলকারখানা, আলো ইত্যাদি সব কাজই সম্পন্ন হইবে।

বর্তমান সভ্যতা কলকারখানা ইত্যাদির সভ্যতা। আজ যদি হঠাৎ কয়লা, তেল, পেট্রোল ইত্যাদির খনি শেষ হইয়া যায়, তবে বিংশ শতাব্দীর এই বৃহৎসভ্যতা তিনদিনে ধ্বংস হইবে। এই সভ্যতার কাজ-কর্ম্ম চালাইতে প্রত্যহ ১০০,০০০,০০০ হর্স পাওয়ারের দরকার হয়। এই সভ্যতার কাজ চালাইতে ৪,০০০,০০০,০০০ লোকেরও বেশী প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে ঐ সংখ্যার মাত্র অর্দ্ধেক লোক আছে। কয়লা বিনা আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা টিঁকিতে পারে না।

পৃথিবীর বুকের মধ্যে স্থিত শক্তিকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে, সকল জিনিষেরই উৎপাদন খরচা অনেক কমিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে বাজারে ও কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাইবে। অবশ্য একটি কূপের সাহায্যেই সকল কাজ চলিবে না, কিন্তু একটি কূপ যদি ১২ মাইল নীচে পৃথিবীর মধ্য হইতে শক্তি টানিয়া আনিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার দেখাদেখি আরো অনেক কূপ বিভিন্ন দেশে চালানো হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিজ্ঞানের এইসকল কাজকর্ম এবং নানা দিকে নব-নব আবিষ্কার দেখিয়া মনে হয় যে মানুষের শক্তির অভাব কোনো কালেই হইবে না। মানুষের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের হাতে নিরাপদে আছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার হিল্‌ডস্বর্গ নামক স্থানের মাটির তলায় বাষ্প-ভাণ্ডার, ইঞ্জিনিয়ারগণ এই বাষ্প কাজে লাগাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন

১২ মাইল খুব বেশী দূর নয়—এরোপ্লেন ইত্যাদি যান ১২ মিনিটে ১২ মাইল যাইতে পারে। কিন্তু মাটি কুরিয়া-কুরিয়া পৃথিবীর নীচে ১২ মাইল যাওয়া অতি ভীষণ ব্যাপার। কাজটি যদি আজ আরম্ভ করা যায়, তবে হয়ত পঞ্চাশ বছর পরে ইহা শেষ করিবার আশা আছে। অনেকে ইহা বৈজ্ঞানিকের কল্পনা বা স্বপ্ন বলিতে পারেন—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহা নয়। এই কাজটি সম্ভবপর এবং একদিন ইহা কার্য্যে পরিণত হইবেই।

পৃথিবীর ২০০ শত বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার্ এই কার্য্যটির পরিণতি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যটি বৃহৎ আয়তনে করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং তাহার জন্য টাকার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ইটালির কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার্ তাঁহাদের কল চালাইবার জন্য আগ্নেয়গিরির বাষ্প গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যবহার করিতেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার হিল্‌ড্‌সবার্গ নামক স্থানে মাটির ৩০০০ ফুট নীচে ৪০০০ একর-পরিমাণ স্থানের মধ্যে আবদ্ধ বাষ্প বাহির করিবার জন্য একটি নলকূপ বসানো হইতেছে, তাহাও প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

পুরাকালের জন্তু—

মানুষ পৃথিবীতে আসিবার বহু পূর্ব্বে পৃথিবীতে নানা-প্রকার বিকট বিকট জন্তু আদি বাস করিত। এইসমস্ত জন্তু ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে। তবে তাহাদের চিহ্ন এবং কঙ্কাল বরফের তলায়, মাটির নীচে প্রভৃতি নানা স্থানে পাওয়া যাইতেছে। অনেকের মতে এইসকল জন্তু মানুষের আদি পুরুষের দ্বারা নিহত হয়। এইপ্রকার কয়েকটি জন্তুর পরিচয় এবং ছবি দেওয়া হইল।

আইরিশ হরিণ—ইহাদের এক-সময় ইউরোপ এবং আয়ার্ল্যাণ্ড দ্বীপে বাস ছিল। এখন ইহাদের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইহাদের শিংএর ওজন প্রায় ১ মণ এবং তাহা প্রায় ১১৪ ফুট লম্বা ছিল।

লোমশ ম্যাষ্টডন্—বরফের যুগের পূর্ব্বে ইহারা আমেরিকায় বাস করিত। ইহারা দেখিতে অনেকটা একালের হাতীর মতন। তবে হাতীর দেহে লোম নাই—ইহাদের দেহে প্রচুর লোম ছিল।

প্রকাণ্ড দাঁত-ওয়ালা বাঘ—এইপ্রকার বাঘেদের আজকাল দেখা যায় না; বোধ হয় ইহাদের দাঁত ছোট হইয়া ইহারা আজকালকার বাঘে পরিণত হইয়াছে। বাঘগুলির উপরে গাছের ডালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চিল দেখুন।

আইরিশ হরিণ

কাইনোপুস্ নামক পুরাকালের জন্তু

ম্যাস্টডন্—বর্ত্তমানে এই জন্তু লোপ পাইয়াছে

পুরাকালের ডায়ট্রিমা পক্ষী

প্রকাণ্ড দাঁতওয়ালা বাঘ—গাছের ডালে অতিকায় চিলের দল
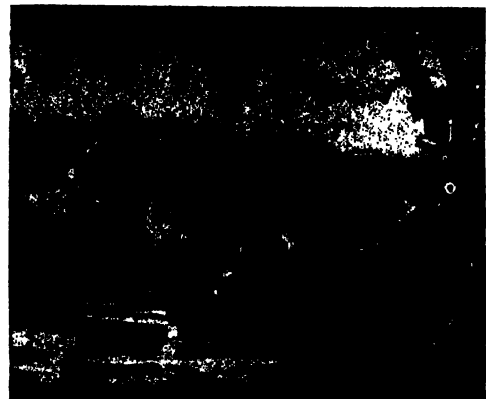
অতিকায় সথ—(Giant Sloths)

পালাইওসিঅপস্ Palaeosyops নামক পুরাকালের অতিকায় জন্তু

ক্যাএনোপুস্ (Caenopus)—ইহারা বর্ত্তমান কালের গণ্ডারের পূর্ব্ব-পুরুষ। ইহারা প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বাস করিত—দেখিতে অনেকটা যাহসির (আমেরিকা) গরুর মত।

ব্রন্টোসাউরি(Brontosauri)—ইহারা বর্ত্তমান গিরগিটিদের পূর্ব্ব-পুরুষ, দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে ঘর-সংসার করিত। কুমীর এবং উটপাখীরাও ইহাদের জ্ঞাতি এবং সমসাময়িক কালের জন্তু। এই জন্তু ২৫ ফুট লম্বা এবং ১৪ ফুট উচ্চ ছিল। কিন্তু ইহার মস্তিষ্কের ওজন ১ পোয়ার কিছু বেশী ছিল।

ডায়াট্রিমা—পুরাকালের একপ্রকার পক্ষী। এখন নাই। ইহাদের ঠোঁটগুলি হইত ১৭ ইঞ্চি লম্বা।

অতিকায় সুথ—ইহাদের চামড়া বর্ম্মের কাজ করিত। ইহাদের এই চামড়ার তলায় গোল-গোল হাড় থাকিত। এই চামড়া এবং হাড় মিলিয়া ইহাদের, কেবল প্রকাণ্ড-দাঁতওয়ালা বাঘ ছাড়া, আর সকল জন্তুর হাত হইতে রক্ষা করিত।

পাল্যাইওসিঅপস্ (Palaeosyops)—নদীর ধারে-ধারে চরিয়া বেড়াইত। ইহাদের সামান্য চিহ্ন মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

—

প্রকৃতির খেয়াল-

দুইটি গাছ একসঙ্গে লাগিয়া একটি জিরাফ্ হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় ইহা একটি সত্যিকার জন্তু। মানুষের হাত পড়িয়াছে কেবল গাছটির মাথায়। ঐখানে কেবল দুটি চোখ এবং

প্রকৃতির খেয়ালে তৈরী জিরাফ মূর্ত্তি
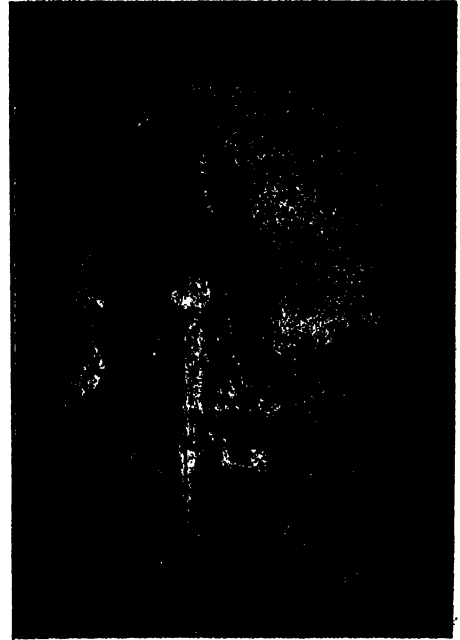
একটি মুখ খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে-গ্রামে এই প্রকৃতির খেলনা-জিরাফটি আছে, সেখানে প্রথমেই সকল পথিকের দৃষ্টি এই জিরাফটির উপর পড়ে।

বীরভূম-জেলা-সম্মিলনীর সভাপতির বক্তৃতা

সম্রাটের দরবারের, রাজা-মহারাজার দরবারের যেমন আদব-কায়দা আছে, জনসাধারণের দরবারেরও তেমনই আদব-কায়দা আছে। সেখানে সভাপতির অনেক গুণ-কীর্ত্তন করা হয় এবং সভাপতিও নানা রকমে নিজের অযোগ্যতা ব্যাখ্যা করে' উত্তর দিতে বাধ্য হন। কিন্তু আমাদের অদ্যকার যে দরবার, একে দরবার বলতে পারি না, এটা একটা ক্ষুদ্র জেলার ঘরোয়া ব্যাপার। সুতরাং এখানে বেশী বাক্যব্যয় বা আড়ম্বর না করে' আমি আপনাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং শীঘ্র যা'তে কাজে প্রবৃত্ত হ'তে পারি সে চেষ্টা করছি। এটা বীরভূম জেলার [illegible]। সুতরাং আমার বিবেচনায় এ জেলা-সম্বন্ধে যা'র খুব অভিজ্ঞতা আছে, সে-রকম লোককে সভাপতি করলে ভালো

হ'ত। কিন্তু আপনারা যখন আমাকে এখানে দণ্ডায়মান হ'য়ে সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করতে হুকুম করেছেন,তখন সেটা আমাকে শিরোধার্য্য করতেই হবে, এবং সে-কাজ যা'তে সুসম্পন্ন হয়, যথাসাধ্য তার চেষ্টাও করব। আমার একটা দাবী অবশ্য আছে, সেটা এই :—গত মানুষ-গুন্তির রিপোর্ট-অনুসারে যে-কয়টা জেলায় বাঙালী কমে' গিয়েছে, তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কমেছে বাঁকুড়ায়। শতকরা ১০ জন কমেছে আমার জন্মস্থান বাঁকুড়ায়, বীরভূম তার নীচেই আসন পেয়েছে; কারণ, এখানে শতকরা ৯ জন কমেছে। সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলার একজন লোককে তৎপরবর্ত্তী জেলার কার্য্য-নির্ব্বাহের শ্রেষ্ঠ আসনে আপনারা বসা'তে স্থির করেছেন, আপনাদের দিক্ থেকে এটা একটুও অন্যায় হয়নি। একটা চলিত কথা আছে—"এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্"। উন্নতির দিকে কিছু করতে পারিনি, অবনতির দিকে পেরেছি, সে-হিসাবে আমার দাবী অবশ্য আছে স্বীকার করি। এ-বিষয়ে বেশী না বলে' কাজের কথা বলতে চেষ্টা করব।

অবশ্য আজকার এই সভাতে আপনারা আশা করবেন না, যাকে উচ্চ রাজনীতি বলে, তা আলোচনা করব। জাতি-সংগঠনের কথা—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের কথা হচ্ছে না, এখানে আমরা একটি ছোট জেলার কথা বল্‌ব। সুতরাং এ-জেলার কর্ম্ম-নীতিসম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপার ভালো করে' বুঝবার জন্য যদি ২।১টি অবান্তর কথা আসে, চিন্তা করলে দেখবেন তা অবান্তর নয়।

আমার মনে হয়, খুব একটি বড় দেশের কিংবা খুব ছোট জেলার, যেখানকারই উন্নতি করবার চেষ্টা করি না কেন, তার প্রথম দরকার মানুষকে জাগানো। মানুষ যদি অসাড় হ'য়ে থাকে, প্রগতিশীল চিন্তা যদি তা'দের না থাকে, তা হ'লে উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আপনারা সকলেই জানেন—বাংলাতে একটি কথা আছে—"অন্ধ জাগো, (কিন্তু অন্ধের) কিবা রাত্র কিবা দিন।" অন্ধ দিনের বেলায় দেখতে পায় না, রাত্রেও পায় না। আমরা যদি সংজ্ঞাহীন অচেতন হ'য়ে থাকি, তা হ'লে উন্নতি হ'তে পারে না। সুতরাং প্রথম কথা আমাদের নিজে জাগতে হবে, তার পর ভাইবোনদের জাগাতে হবে, বলতে হবে তোমরা জাগো,বোঝো,দেখ তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে। এই যে জাগা ও জাগানোর কথা, এ আমাদের পক্ষে নূতন নয়,—বিশেষ করে' আমার মতো যারা খবরের-কাগজের ব্যবসা করে, তাদের-একথা বলতে হয়, বহুকাল থেকে বলে'ও আস্‌ছি। আমি নিজে জাগতে পেরেছি কি না বলতে পারি না, কিন্তু এই জাগার কথাটি বহুদিন থেকে বলে' আস্‌ছি। সেটা প্রথম দরকার, সন্দেহ নাই। জেগে নিজেদের দুরবস্থা বুঝতে হবে, তার পর চিন্তা করে' সে-অবস্থা দূর করে' যাতে উন্নতি লাভ হ'তে পারে, তা'র উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং সে উপায়-অনুসারে কাজ করতে সকলকে প্রবৃত্ত করাতে হবে। কিন্তু এই যে বল্‌ছি—জেগে উপায় নির্দ্ধারণ করব, চেষ্টা করব, পরিশ্রম করব, এতে গোড়াতেই এই সন্দেহ হ'তে পারে, যে, যে-সকল জাতির দুরবস্থা-দুর্দ্দশা হয়েছে, তাদের মনে যদি নিরাশা বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে, সহজে সেটা যেতে চায় না। সেইজন্য আমাদের মনে এই বিশ্বাস জাগানো দরকার—চেষ্টা করলে ফল হবেই, বিশ্বের মঙ্গল ঐ ভাবেই হ'য়ে আস্‌ছে। এর দৃষ্টান্ত দেওয়ার দরকার নাই, আমরা দেখি—মাটিতে যদি বীজ বপন করা যায়, সার ও জল দেওয়া যায়, ফল ফলে। সব কাজেই এইরকম। সুতরাং আমরা সকলে দলবদ্ধ হ'য়ে যদি এই জেলার উন্নতির চেষ্টা করি—তার ফল ফলবে সন্দেহ নাই। উন্নতির চেষ্টার মূল, জগতের মঙ্গল-নিয়ন্তার উপর গভীর বিশ্বাস।

এই যে বলেছি—চেষ্টা করতে হ'বে, একা-একা চেষ্টা করলে হবে না, সমবেত-ভাবে চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য পরস্পরের উপর বিশ্বাস থাকা দরকার, পরস্পরকে ভালো-বাসা, শ্রদ্ধা করা দরকার। যাদের দুর্দ্দশা হয়েছে—পরিবার, গ্রাম, প্রদেশ, দেশ, সাম্রাজ্য যেখানেই দেখবেন দুর্গতি হয়েছে, দুর্দ্দশা হয়েছে—তাদের মধ্যেই,সেখানেই দেখবেন মানুষের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাস, পরশ্রী-কাতরতা। আমরা অন্যের ভালো দেখতে পারি না। দুর্গতির এই কারণ আমাদের মন ও হৃদয় থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে, তা না হ'লে দলবদ্ধ হ'তে পারব না এবং সমবেত চেষ্টা করতে সমর্থ হব না।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে নানা কারণে ভাগ-ভেদ হয়েছে। এক ত রয়েছে অনেক-রকম ধর্ম্ম। এটা মন্দ বলে' মনে করি না, কারণ যিনি যত মহৎ লোকই হোন, তিনি জগতের সমস্ত সত্য একা দেখ্‌তে পাবেন, এ আশা কর্‌তে পারি না। সুতরাং কতক মানুষ হিন্দু, কতক মুসলমান, কতক খৃষ্টিয়ান, কতক বৌদ্ধ হবে, এটা অস্বাভাবিক নয় এবং এটা দুঃখের কারণও নয়। কিন্তু যখন মানুষ সত্যের একটা দিক্ দেখে, আরেকটা দিক্ দেখে না, আর সেই নিয়ে পরস্পর বিবাদ করতে প্রস্তুত হয়, তখন সেটাই হয় দুঃখের কারণ। সকল আস্তিক ধর্ম্মের মূল কথা ভগবানের পুজা ও জীবের সেবা। মানুষ যখন সেকথা ভুলে' যায়, তখন সেটাই হয় দুঃখের কারণ। পাপী পুণ্যাত্মা, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলের জন্য জমি রয়েছে, তা'তে ফসল ফলে,মেঘ থেকে সকলের জন্য বৃষ্টিধারা পতিত হয়, কারো উপর পক্ষপাতিত্ব ঈশ্বর করেন না। এইসকল দৃষ্টান্ত ভুলে' গিয়ে কতকগুলি মানুষ যখন মনে করে, আমরাই ভগবানের বিশেষ প্রীতিভাজন, তখন সেটা হয় বড় দুঃখের কারণ। আমাদের দুঃখের কারণ এই—ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে ভেদ থাকার দরুন্ আমরা মিলিত হ'তে পার্‌ছি না। হিন্দুজাতি জাতি-ভেদের দরুন্ মিলিত হ'তে পারে না। আর-একটা কারণ এই—আমাদের দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে নূতন জাগরণ হওয়াতে অনেক সুফলের সঙ্গে কুফলও ফলেছে। তার প্রথম কুফল—রাজনৈতিক দলে নূতন-রকম জাতিভেদ এসে পড়েছে। একদলের একজন লোক, হয়ত বাল্যকাল হ'তে আরেক দলের একজনের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল, দলাদলির সৃষ্টি হওয়াতে এখন আর তা'রা পরস্পর মিলিত হ'তে পার্‌ছে না। আজ এই সভায় আমরা বল্‌ছি—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাটি চাষ করো, জল সেচন করো, ভালো বীজ বপন করো, এখানে রাজনৈতিক ভেদ কোথায় আসে? যিনি যে-দলের লোকই হোন না কেন, কৃষি-কর্ম্মের নিয়ম তাঁর জন্য নূতন হ'তে পারে না, একই বৈজ্ঞানিক নিয়মে তার কাজ চল্‌ছে—এখানে নানারকম দল করবার প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় এই—আমরা এর সত্যতা সব সময় মনে বদ্ধমূল রাখতে পারি না, তাই দলাদলি করি। ধর্ম্ম নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে দলাদলি কর্‌তে হবে এর মানে কি? অনেক কাজ আমরা একত্রে কর্‌তে পারি, অনেক কাজ পারি না। বিস্তর কাজ আছে যেখানে আমরা একত্র হ'তে পারি, সেটা করা খুব উচিত; কর্‌তে হ'লে একটা কথা মনে রাখা দর্‌কার—যে, আমার নিজের মতের উপর আমার যে-রকম বিশ্বাস আছে, অন্য লোকেরও তার মতের উপর সেইরকম আন্তরিক বিশ্বাস থাক্‌তে পারে। তা হ'লে সে-বিষয় নিয়ে বিবাদ হতে পারে না; যুক্তি চল্‌তে পারে, ভ্রম-প্রদর্শন চল্‌তে পারে। সুতরাং ভেদ ভুলে' যে-সমস্ত কাজে আমরা একত্র হ'তে পারি, সে-সমস্ত কাজ মিলিতভাবে করা উচিত।

বিশেষ করে' আমাকে একটা কথা বল্‌তে হবে। তার সঙ্গে একটু রাজনৈতিক সংশ্রব আছে। সেটা বুঝাবার জন্য আমার যে-ব্যবসা তার থেকে দৃষ্টান্ত দেবো। আমার মতো এই,যে-সকল আইনের সাহায্যে আমাদের কৃষি-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, জল-সেচন প্রভৃতি হ'তে পারে, সে সকল আইনের সাহায্য সম্পূর্ণরূপে নেওয়া উচিত এবং যে-সকল রাজ-কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে কাজ কর্‌তে রাজী আছেন, আমাদের কাজে যোগ দিতে রাজী আছেন,তাঁদের সাহায্য এবং পরামর্শ নেওয়া উচিত। একথা বার-বার বলেছি। বাঁকুড়া-জেলার উন্নতি-সম্বন্ধে যে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছি তা'তেও বিশেষ করে' একথা বলেছি। বীরভূম-সম্বন্ধেও তাই বলি। বাঁকুড়া-জেলায় জলসেচন-ভিন্ন উহার দুর্গতি-নিবারণের উপায় নাই। বিস্তর ছোট-ছোট নদী আছে যাতে সারা বৎসর জল বয়ে' যায়। তা'তে বাঁধ বেঁধে আ'ল কেটে জলসেচন করা যেতে পারে। আমি দেখেছি তা'তে সুফল ফলেছে, অথচ অনেকে ভ্রান্ত ধারণা-বশত এর জন্য কৃষি-সমবায়-সমিতি গঠন করা, সর্‌কারী টাকা ধার-করা প্রভৃতি কাজে লোককে প্রবৃত্ত করান না। এটা করা উচিত। কারণ, আমার নিজের ব্যবসা থেকে বল্‌ছি, আমরা খবরের-কাগজ চালাই, কোনো খবরের-কাগজ চালা'তে হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বল্‌তে হয়, আমি কাগজের মুদ্রাকর এবং আরেকজন বা মুদ্রাকরকে বল্‌তে হয়, আমি প্রকাশক, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হ'তে যে-কাগজ পাওয়া

যায়, সেটা দিয়ে যদি ডাক-ঘরে আবেদন করা যায়, তা হ'লে সাধারণ বই যে-ডাকমাশুলে যায় এইসকল কাগজ তার চেয়ে কম মাশুলে যায়। এভাবে আমাদের সকল কাগজ,"ইয়ং ইণ্ডিয়া"ও তার মধ্যে আছে, কম মাশুলে যায়। প্রত্যেক কাগজের এক-একজন প্রিণ্টার ও পাবলিশার করতে হয়েছে। যে-সকল খবরের কাগজের মালিক একজন নয়, যাদের জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী করতে হয়েছে, সেই কোম্পানীকেও সরকারী আফিসে গিয়ে রেজেষ্ট্রি করতে হয়েছে। যে-কেহ খবরের কাগজ চালায়, প্রত্যেককে এ-নিয়মের সাহায্য নিতে হয়েছে। সরকারের ডাক-ঘরের অল্প মাশুলের সাহায্যে হাজার হাজার কাগজ এভাবে দেশ-বিদেশে বিতরিত হচ্ছে। আমরা নিজেদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য যদি এ-সাহায্য নিতে পারি, তবে আমাদের কি অধিকার আছে অপরকে বলতে, "তোমরা কৃষি-সমবায়-সমিতি রেজেষ্ট্রি করিও না?" আমি বলি হাজার বার করব। গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিসের জোরে? আমাদের টেক্সে গবর্মেণ্ট চলছে। সুতরাং টেক্স যা'তে ভালোরূপে খরচ হয়, তা দেখবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আমরা এত দিন সেই অধিকার-অনুসারে কাজ করবার চেষ্টা করিনি, অনেকটা সেইকারণে আমাদের দুর্দ্দশা হয়েছে। সমস্ত টাকা যা'তে আমাদের মত-অনুসারে খরচ হয়, সে চেষ্টা বার-বার করা কর্ত্তব্য।

তার পর বলতে চাই, আগেও বলেছি, সমবেত-ভাবে কাজ করা দরকার। আরেকটা কথা আমার বন্ধু অবিনাশ-বাবু বলেছেন, স্বাবলম্বন দরকার। নিজেদের চেষ্টা করতে হবে, অন্যের উপর নির্ভর করলে হবে না। কেহ হয়ত বলবেন—"একবার টেক্স দিলাম, আবার চাঁদা দেবো, ক'বার দেবো, মশায়?" এখানে কথা এই, আপনারা যে টেক্স দেন, তার উপযুক্ত কাজ হয় না, সমস্ত টেক্সের সদ্-ব্যবহার হয় না, যে-উন্নতি হ'তে পারত, তা হয় না, তার একটা কারণ, যারা আমাদের দেশে টেক্স দেয়, তা'রা সচরাচর কৈফিয়ৎ চায় না। অন্য দেশের লোক তা চায়, তা'রা দলবদ্ধ হ'য়ে বলে—"টেক্স আমাদের মত-অনুসারে খরচ করতে হবে।" আমরা তা করি না। সেটা আমাদের দোষ। আমি নিজেদের দোষ দেখাতে চেষ্টা করছি। আপনারা মনে করবেন না, যে-সব দেশ উন্নত হয়েছে, তা'রা একদিনেই উন্নত হয়েছে। ইংলণ্ডের মিউনিসিপ্যালিটির এখন খুব উন্নতি হয়েছে, পথ-ঘাট, জল-আলোর খুব ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে। আগে তা ছিল না। ৯০ বৎসর আগে ইংলণ্ডের মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা-সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, যে, তখন ঘুষ দেওয়া, টাকা চুরি করা, অকর্ম্মণ্যতা এই-সকলের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল; নর্দ্দমা পরিষ্কার রাখা, রাস্তা মেরামত করা, আলো দেওয়া, ইত্যাদি কাজে কেহ যথোচিত মন দিত না, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বিক্রী করা হ'ত। কেহ কোনো দলের রাজনৈতিক কাজে সাহায্য করলে তা'কে মিউনিসিপ্যালিটির চাকরি বকশিশ-স্বরূপ দেওয়া হ'ত, আর সহরের আয় অনেক সময় কমিশনারগণ নিজেদের পুঁজী বাড়াবার জন্য ব্যবহার করতেন। লর্ড জন্ রাসেল্ পার্লামেণ্টে বলেছিলেন, কমিশনারগণ বৎসরের পর বৎসর মিউনিসিপ্যালিটির জন্য টাকা ঋণ করেছেন আর সে-টাকা পরস্পরের মধ্যে ভাগ বখরা করে' নিয়েছেন; সহরের উন্নতির জন্য তা ব্যয় হ'ত না। কোনো কোনো বিলাতী মিউনিসিপ্যালিটির, ১৮৩৩খৃঃ অব্দে ১৯৮টি সহরের মধ্যে ১৮৬টি, সহরের যাঁরা কর্ত্তা ছিলেন, করদাতারা তাঁদেরকে নির্ব্বাচন করত না, তাঁরা নিজেরা নিজ-দিগকে নির্ব্বাচন করতেন; এ-ভাবে ১০।১৫।২০ বৎসর পর্য্যন্ত নিজেরা কর্ত্তা হ'য়ে থাকতেন। কল-কারখানার যে-অবস্থা ছিল, তা'কে নরক বললেও হয়। তার কারণ, কল-কারখানার মালিক যারা ছিল, ঘর-দোর যারা তৈয়ারি করত, তাদের ধর্ম্মবুদ্ধি তখন জাগরিত হয়নি।* আজ

* "Municipal corruption and inefficiency were rampant, paving and lighting were disregarded, drainage and water-supply were bad, Municipal offices were often sold or made the reward for political work, and town revenues were frequently used by private persons for their own benefit. It was declared in Parliament by Lord John Russell, that some of the town councils had actually borrowed money from year to year in order to divide it among the members. In the year 1833, in 186 of the 198 chief English towns, the governing body was co-optative, that is, it perpetuated itself.

তা'রা যদি ইংলণ্ডকে নরক থেকে স্বর্গে পরিণত করার দিকে অগ্রসর হ'তে পারে, আমাদেরও হাত-পা-মস্তিষ্ক* আছে, আমরা কেন পার্‌ব না? আপনারা মনে কর্‌বেন না, স্বর্গ আকাশ থেকে পড়ে; মানুষকে কর্‌তে হয়, মানুষকে নিজের চেষ্টায় স্বর্গ গড়তে হয়, নিজের উদ্‌যোগ না হ'লে ভালো কখনও হয় না।

তার পর আরেকটা আপত্তি আছে, কেহ বল্‌তে পারেন—"মশায়, আপনি বল্‌ছেন স্বাবলম্বন করো; ইংলণ্ডে যুদ্ধের পর আজ পর্য্যন্ত ১০ লক্ষ লোককে রাজকোষ থেকে খোরপোষ দেওয়া হয়েছে, আমাদের দেশে লোক খেতে পায় না তার কোনো কথা নাই কেন?" সে-বিষয়ে কিছু বল্‌ছি। বিলাতে শ্রমিক গবর্ন্মেণ্ট ছিল। তাঁরা প্ল্যান করেছিলেন ১৭।৷০ লক্ষ বাড়ী তৈরী হবে, অল্প ভাড়ায় শ্রমজীবীরা সেখানে থাক্‌তে পারবে। হায়দরাবাদের নিজাম নিজের রাজ্যে এইরকম অল্প ভাড়ার বাড়ী অনেক তৈরী করে' দিয়েছেন। চেষ্টা কর্‌লে এই বীরভূম জেলায়ও সে-রকম সব কাজ হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ন্মেণ্ট দ্বারা যদি কাজ করাতে চাই, তা হ'লে কথা উঠবে আমরা স্বাবলম্বন করি না। বিলেতে সে-কথা উঠে নাই, কারণ জনসাধারণ ও গবর্ন্মেণ্ট সেখানে এক। আমরা যদি গবর্ন্মেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করতে চেষ্টা করি (এবং আমার বিশ্বাস তা'তে আমরা কৃতকার্য্য হবো), তা হ'লে এই ভেদ থাক্‌বে না। তখন গবর্ন্মেণ্ট আমাদের গবর্ন্মেণ্ট হ'য়ে যাবে। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, রাজা যে কর নেন, সেটা তাঁর মাহিনা। কালিদাস রঘুবংশে লিখেছেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দিলীপ প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কর নিতেন। সূর্য্য যেমন বাষ্পাকারে জল আকর্ষণ করে' মেঘরূপে পরিণত করে' বৃষ্টিরূপে শত ধারায় তা'কে ফিরিয়ে দেন, সেইরূপ দিলীপ প্রজার নিকট থেকে কর নিয়ে প্রজার উপকারের জন্য ব্যয় কর্‌তেন। এ আদর্শ আমাদের দেশে নূতন নয়, বৌদ্ধযুগে রাজাকে বলা হ'ত গণদাস—সর্ব্বসাধারণের সেবক। ইংরেজীতে পাব্লিক্ সার্ভেণ্ট কথা আছে—অনেকে তা'র মানে বুঝেন না। অধিকাংশ হাকিম ও পুলিশের লোক মনে করেন, তাঁরা বেসর্‌কারী লোকদের প্রভু। কিন্তু অনেক পাব্লিক্ সার্ভেণ্ট আছেন, তাঁরা সত্যই জন-সাধারণের সেবক। অনেকে যদি সেটা মনে না করেন তবে সেটা তাঁদের ভুল। তাঁরা যখন সেটা বুঝতে পার্‌বেন তখন দেশের আরো অনেক উন্নতি হবে।

তার পর আমার শেষ জবাব—আমি মেনে নিলাম আমার সব কথা ভুল। কিন্তু আমরা সব দোষ গবর্ন্মেণ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে যদি নিশ্চিন্ত থাকি, তা হ'লে কি ম্যালেরিয়া দূর হবে, না কৃষির উন্নতি হবে, না রাস্তাঘাট পরিষ্কার হবে? এবং এইসকল বিষয়ে উন্নতি না হ'লে বিলেতের লোকেরা ভুগবে না, মর্‌বে না, ভুগব মর্‌ব আমরাই। এইসব বিষয়ে উন্নতি না করে' কোনো দেশ জাগে নাই—ইংলণ্ড না, আমেরিকা না, ফ্রান্স না।

আগে কয়েক-রকম ভেদ যথা—ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভেদ, জাতি-ভেদ, রাজনৈতিক দল-ভেদের সম্বন্ধে কিছু বলেছি। তা'র উপর আর একটা ভেদ আছে, সহরের লোক আর পাড়াগাঁয়ের লোকের মধ্যে ভেদ। আমরা সহরে থাকি, আমরা পরগাছা। পরগাছা সকলে দেখেছেন, এক গাছের উপর আর-একটা গাছ হয়। সে নিজে মাটির থেকে রস আকর্ষণ করে না; অন্যে যে-রস আকর্ষণ করে, তার থেকে সে কিছু আদায় করে' নেয়। আমরা সহরে থাকি, চাষ করি না, কাপড় বুনি না। কিন্তু চাষের ফসল সকলেই চায়, ভালো চা'ল সকলেই চায়। ভালো কাপড় সকলেই পর্‌তে চায়। আমরা সহরে বসে' কলমের জোরে সে-সকল সংগ্রহ করে' সুখে আরামে থাকি। পরিশ্রম, কষ্টভোগ গ্রামের লোকে করে। সহুরে পরগাছার জীবন আমাদের যতদিন থাক্‌বে, ততদিন আমরা দেশের লোকের সঙ্গে এক হ'তে পার্‌ব না। আমরা গ্রামের লোকের কাছে যে সাহায্য পাই, শান্তি পাই, আমরা যদি সে-সব সাহায্য ১০ গুণ করে' তাদের ফিরিয়ে দিতে পারি, কেবল

* "For long the new industrial towns can only be described as hells upon earth, hells created by the greed of gain on the part of manufacturer or speculative builder, a greed as yet unchecked by the awakening of the corporate conscience of the community."—Mr. J. S. Hoyland in *The Young Men of India* for November, 1924.

বাক্যালঙ্কারে নয়, যদি সত্য-সত্যই তাদের সেবক হ'তে পারি, তাদের সাহায্য কর্‌তে পারি, তা হ'লে আমাদের সাহায্য নেওয়া সার্থক হবে এবং আমরা দেশের যথার্থ উন্নতি কর্‌তে সক্ষম হবো।

এই উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ। প্রথমে ধরুন শিক্ষার কথা। শিক্ষা-ভিন্ন মানুষকে জাগানো যায় না, জ্ঞানলাভ হয় না, মানুষ উপায় চিন্তা কর্‌তে পারে না, পরস্পরের সঙ্গে একযোগে কাজ কর্‌তে হবে, এটা বুঝতে পারে না। আবার শিক্ষা-ভিন্ন ধন হ'তে পারে না। শিক্ষা বল্‌তে শুধু কেতাবী শিক্ষা, লিখতে পড়তে পারা নয়; চাষ করা, নানারকম শিল্প কাজ, ব্যাঙ্ক্ স্থাপন, ব্যবসা-চালানো, এসবও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। নানারকম শিক্ষা আছে। অন্য দিক দিয়ে দেখা যায়, যদি স্বাস্থ্য না থাকে, তা হ'লে শিক্ষা হয় না। আবার শিক্ষা না থাক্‌লে স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। যেমন শিক্ষা-ভিন্ন ধন হয় না, তেম্‌নি উল্টা দিকে বলা যেতে পারে, ধন না থাক্‌লে শিক্ষা কি করে' হবে? বই কিন্‌তে হবে, বাড়ী তৈয়ারী কর্‌তে হবে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কিন্‌তে হবে। তেম্‌নি কৃষি-ভিন্ন ধন হ'তে পারে না, শিল্প-ভিন্ন ধন হ'তে পারে না, বাণিজ্য-ভিন্ন ধন হ'তে পারে না ইত্যাদি। সুতরাং কেবল লেখাপড়া শিখলেই উন্নতি হবে, কিম্বা কুস্তি কর্‌লেই উন্নতি হবে, কি কোনোপ্রকারে টাকা রোজগার কর্‌লেই উন্নতি হবে, এরূপ মনে করা ভুল; সব-রকম চেষ্টাই কর্‌তে হবে। যার যেদিকে প্রবৃত্তি আছে, শক্তি আছে, তিনি সেদিকে কাজ কর্‌বেন, সেদিকে চেষ্টা কর্‌বেন। এর মধ্যে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে বিচার কর্‌বার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রত্যেক মানুষের শরীর রক্ষা করা চাই, স্নান করা, আহার করা, নিদ্রা যাওয়া, বিশ্রাম করা, পরিশ্রম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করা, জ্ঞানলাভ করা, পরমার্থ চিন্তা করা, রোজ এসব করা চাই; নতুবা আমরা উন্নত হ'তে ও থাক্‌তে পারি না। কেহ একথা বলে না, ১০ বৎসর ক্রমাগত খাও, তার পর ১০ বৎসর ঘুমোও, তার পরে ১০ বৎসর লেখাপড়া করো, কি রোজগার করো। আমরা সব কাজ একসঙ্গে কর্‌ছি। সেইরূপ কোনো জেলার কাজ কর্‌তে হ'লে বলা চল্‌বে না, শুধু লেখাপড়া কর্‌ব, কি চাষ কর্‌ব, কিংবা শুধু কেরোসিন ঢেলে মশা মার্‌লেই চল্‌বে, তা নয়। চতুর্দ্দিকে চক্ষু রেখে ব্যাপকভাবে উন্নতির সমস্যার সমাধান কর্‌তে হবে। কি করে' কাজ কর্‌তে হবে, অবিনাশ-বাবু সংক্ষেপে বলেছেন এবং নানা বিষয়ে যে-প্রবন্ধ পড়া হবে তা'তে আপনারা অনেক নূতন কথা জান্‌তে পার্‌বেন। *

* বীরভূম-সম্মিলনে শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, শ্রী ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্তৃক লিখিত বাংলা শর্টহ্যাণ্ড নোট হইতে অনুলিখিত।

মানস-অভিসার

শ্রী সজনীকান্ত দাস

আলসে আজি যে একেলা কাটাই বেলা,
হৃদয় ছাপিয়া কত কি যে মনে আসে;
মিথ্যা স্বপন, মধুর ভুলের মেলা,
আশার আলোকে চমকে চিত্তাকাশে।
কল্পনা-জাল বুনি যে অন্যমনায়,
চেয়ে-চেয়ে দূর সন্ধ্যাগগন পানে,
নয়নে কত না মেঘের স্বপন ঘনায়,
ভরি' উঠে বুক কোন্ অজানার গানে।

পাখীরা আকাশে সারি বেঁধে যায় উড়ে,
আঁধারে'-আলোতে ধীরে-ধীরে মিলে' যায়;
কি যেন গোপন রাগিণী হৃদয় পুরে,
ভাবনা কাহার অবশ চিত্ত ছায়।
আলোর তূলিতে আল্‌পনা আঁকে কে সে,
মেঘভরা ঐ নীল আকাশের দেশে,
পাগল করিছে অস্ত তপন ওগো
বিদায়-বেলার শেষ চুম্বন হানি।

রঙের বিলাস লাগিছে অলস চোখে,
নিদালি-রাগের ঝরিছে স্বপন-ঘোরা,
গোপন আমার গহন মানস লোকে
পরশ পুলক জাগিছে হৃদয়-জোড়া,
মনের বনের শাখায় ডাকিছে পিক,
মানস সায়রে লাগিছে দখিনা বায়,
অলস জ্যোৎস্না চেয়ে আছে অনিমিখ,
মনের কুসুম দলগুলি মেলি' চায়।
কামনা কাহার আমারে ঘেরিয়া ফেরে,
বাসনা গোপন-চরণে মূরছি যায়—
কে কোথায় কোন্ বনানীর এক টেরে
আমারি লাগিয়া কুটির বেঁধেছে হায়।
বাতাস কেশের সুরভি আনিছে বহি',
কিঙ্কিণী মৃদু শোনা যায় রহি'-রহি'।
প্রিয়ারে আমার আড়ালে রেখেছে কে সে—
শ্যামল বনের অবগুণ্ঠন টানি'।

বাহিরিব আমি অচেনার অভিসারে,
গভীর-আঁধার সেই বনপথ বাহি';
প্রেয়সী আমায় ডাকে বুঝি বারে-বারে
আঁধার যামিনী কাটায় কি পথ চাহি'!
বাতাসে ভাসিছে নিঃশ্বাস পরিমল,
সে মধু সুরভি চিনাইবে পথ মোরে
উতলা প্রেয়সী মোরে করে চঞ্চল,
ঘরে আর মন রহিতে কি চায় ওরে!
হতাশে যখন ছাড়িয়া দুয়ার দেশ
শেজের উপরে বিছাইবে দেহভার,
এলায়ে পড়িবে স্রস্ত আকুল কেশ,
নয়নে বহিবে অবিরল জলধার,
আমি অতি ধীরে পশিব কুটির-মাঝে
চমকিয়া প্রিয়া মৃদু বিস্ময়-লাজে
বক্ষে লুটায়ে কম্পিত দেহলতা
মুদিবে নয়ন অধিক লজ্জা মানি।

অতীত দিনের চিরবিরহের ব্যথা
জানাবে প্রেয়সী বক্ষে হেলিয়া মম,
নিঃশেষ যবে হবে তার সব কথা
সরমে আদরে কবে কানে, "প্রিয়তম
পেয়েছি তোমায় সব সার্থক আজি
বেদনা মধুর স্মৃতি হ'য়ে বুকে রাজে,
দেহবীণা তব পরশে উঠুক বাজি"—
থেমে গিয়ে মুখ লুকাবে বক্ষ-মাঝে।
একটি নিমেষে হবে চিরপরিচয়,
অনাগত সুখ শিরায় ধ্বনিবে তার;
জাগিবে পরাণে আবেশ সে মধুময়—
আমি, সে আমার, সবি হবে একাকার।
নিখিল ধরণী মিলায় স্বপন হ'য়ে,
দুটি প্রাণশিখা কাঁপে শুধু রয়ে'-রয়ে',
হিয়া দুরুদুরু পরশের আশ্বাসে,
আঁখিতে ফুটিবে নব সৃষ্টির বাণী।

কল্পনা সব স্বপন হইয়া উড়ে,
শারদ আকাশে শীর্ণ মেঘের মত
আধো আশা শুধু জেগে থাকে বুক জুড়ে',
দিবস-স্বপন মরমে জাগায় কত!
দশমীর চাঁদ ঢলে' পড়ে পশ্চিমে,
শ্রান্ত তারকা আলোর আড়াল মাগে
চঞ্চল মেঘ মন্থর হয় হিমে,
কুলায়ে-কুলায়ে আলোর আভাস জাগে।
পূবের আকাশ সোনার স্বপন দেখে'
হাস্নুহানা ফুলের মুদে' আসে আঁখিপাতা,
মন্দ বাতাস ফুলের সুবাস মেখে—
ফুরায় না তবু ভুলের মালিকা গাঁথা।
আমি বসে' থাকি একেলা যে আন্মনা,
সারা হ'য়ে ফের সুরু হয় জালবোনা।
ভুলের খেয়ালে একেলা ভুলিয়া থাকি,
আবেশে কাটাই অলস দিবসখানি।

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ

হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাৎ।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করেন। দেবতারা মানুষের চেয়ে একটু বড় হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নীচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি; ইঁহারা দুজনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। নারায়ণপরিপৃচ্ছা-নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া-গুজিয়া, শঙ্খ-চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড়-আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন; ঋগ্বেদী তাঁহাদের স্তব বা আহ্বান করিতেন। বেদের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম—ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্ব্বাণ ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। অনুপধিশেষনির্ব্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" অথবা—"ভজামি প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যেসব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সেসকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মতো ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্টের দেবতা নহেন; তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্ত্তি। আপনারা পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি: তাঁহারা পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তি। রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ এই পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তির নাম পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটি শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। ইঁহাদের আবার পাঁচজন বোধিসত্ত্ব আছেন, গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্নপাণি, বিশ্বপাণি। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্ত্তি। এই পনরটি শূন্যমূর্ত্তি হইতে অসংখ্য-অসংখ্য বুদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি হইয়াছে; সবই শূন্যমূর্ত্তি। বৌদ্ধেরা—আমরা সেই-সেই মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্ত্তির ধ্যানই করি না।

আমাদের শূন্য অন্ধকার, তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চর্কায় তেল দাও। তুমি কোথা হইতে আসিলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাবো। পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই। মহাবস্তু-অবদানে লেখা আছে, আগে কত কল্পকোটি বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ঠিকানা নাই, জীব ছিলেন স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক্, কাল, আকাশে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না, নিরন্তর প্রীতি-সুখে বিচরণ করিতেন। কিছুকাল পরে একটা হ্রদের মতো দেখা দিল। উহাতে অতি পাৎলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মতো একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু-একটু ভার বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর একটা কি বাহির হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীত্ব ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত।

হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন,—"অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইহাদের রাজা গণদাস; লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম্ম নগর ও গ্রাম, সর্ব্বত্রই সমানভাবে আদর পাইত। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সে-দিকে দৃষ্টিই নাই। সেজন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভালো চক্ষে ত দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত।

হিন্দুদের মতে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্ব্বর্ণ সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজী। যে সংঘে যায়, তাহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা সংঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত, হিন্দুদের ত সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌত্র-দের সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দী। মনে করো, একজন বড় ধনী আছেন; তাঁহার একটি ছেলেকে বৌদ্ধরা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইএরা তাহাতে রাজী হইত না। সর্ব্বদা ঝগড়া-বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে

বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত—ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর-সম্পত্তিতে হিন্দুর স্বত্ব হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে-যে ছেলে, পৌত্র বা প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্ত ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interest দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে-সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সংঘের জন্ত। তাঁহার বিনয় সংঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের জন্ত তিনি যে-সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাসক-উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এইসকল নিয়মের বাহিরে গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এসকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোনো আইন-কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়া চলিতে হইত। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই করিতেন। সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বলিতে পারিতেন না। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক-সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল।

হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন,—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না।

পাতঞ্জলদর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে—বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনোই আপত্তি নাই।

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের যে দুজন গুরু ছিলেন, দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উঁহাদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যান-ধারণার পর পরমার্থ-জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্য্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি অর্থাৎ কার্য্য, কারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব সৎ-কার্য্যবাদটিকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্য্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগারও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙ্গিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্যও সব জিনিষের সংখ্যা করিয়া থাকে, বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টি সূত্র মাত্র। প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া সংখ্যা আছে। যথা—১। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২। ষোড়শ বিকারাঃ। ৩। পুরুষ ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্য্যসত্য, ষট্‌-পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মত সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দুজনই একপন্থী।

দুরকম সংখ্যা আছে;—একরকম হিন্দুদের ও আর-একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কাপিল সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের ত্রিপিটকে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক আঠার রকম। উহাতে বেদের কথা আছে, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। একরকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে।

বেশী গোল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দুপক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্দ্যোতকর ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন, আবার বাচস্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন।

অশোকের সময় কথাবস্তু নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উঁহাদের তৃতীয় সঙ্গীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্য্য-গণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হদ্দজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইরূপ। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর-একরকম। ১। সন্দেহ। ২। বিষয়। তাহার পর পূর্ব্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরেজী সিলজিজম্ (syllogism) মত কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বুদ্ধদেব সাত-রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট-রকম, কেহ-কেহ প্রতিভা বলিয়া আর-একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টি মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগার্জ্জুন আর একদিকে; দুজনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন।

মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারও একশত বৎসর পরে দিঙ্‌নাগ নামে একজন বড় পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন ত বলিতেন, সে-কথায় তোমার কি? তুমি ত জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার ত ত্রিতাপ নাশ হইল, সেই যথেষ্ট। শুষ্ক জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার পর একশত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন সাহস করিয়া নির্ব্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন,—"সদসৎ তদুভয়ানুভয়-চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্।" উহা সৎও নয় অসৎও নয়। দুএ জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয়। শূন্যই পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্ব্বধর্ম্ম। আর-এক দল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মতন। শঙ্করাচার্য্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শঙ্করের উপর কিন্তু সকলেরই রাগ—তিনি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ। শঙ্করের দুই-তিনশত বৎসর পরে উদয়নাচার্য্য সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়-মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

বৌদ্ধেরা দেশীয় ভাষাতেই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুঁথি-গুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক্-পৃথক্। বৌদ্ধেরা আর-এক ভাষায় পুঁথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা; উহার কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত। গদ্যে এই লেখা, মাঝে-মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন।

বৌদ্ধদের ভিতর একজনে পাণিনির টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণ-সেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে-ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ-তারা দুই প্রস্থ, জোড়া-জোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে।

হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে। কেহ-কেহ বলেন, অপরাহ্নে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনে ও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর-একরকম। তাঁহারা একবার খাইবেন; বারোটার আগে সে-খাওয়াটি হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে-খাইতে যদি বারোটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু-আঙুল পূর্ব্বে হেলা পর্য্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারোটার পূর্ব্বেও একটু-আধটু জলযোগ করিতেন। বারোটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা—নারিকেল জল, ফলের রস, ইত্যাদি। সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা গোড়াগুড়িই খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই লইয়াই উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই লইয়াই দলাদলি।

উপবাস

শতপথ-ব্রাহ্মণে লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পরদিন এইসকল দেবতা-অতিথিকে না খাওয়াই যজমান খাইতে পারে কি না, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন—"অনশন", আর-একদল বলিলেন,—না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অরণ্যের বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম-প্রথম উহার নাম ছিল—উপোসথ, পোসথ। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'পো' করিয়াছেন। ঐদিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল-বেলাটা ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড় উপবাস করেন না। খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া-গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনোরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ-ঘিও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ-রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই।

ক্ষৌরকার্য্য

প্রাচীন কালে হিন্দুরা, কামাইতে হইলে, দুজন নাপিত রাখিতেন;—একজন নাভির ঊর্দ্ধটা কামাইত—আর একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিক্‌টা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নীচের দিক্‌টা কামাইত সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে বলেন, দাড়ী ও গোঁপ কামান চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই মাথায় চুল রাখা সেকালে পুরুষের মধ্যে চলিয়াছিল। মাথাটি গুল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড়রকমের টিকি রাখা আর্য্যাবর্ত্তে চলিয়াছিল—সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্য্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাথাটি গুল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনের দিনের বেশী রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে-যেখানে বৌদ্ধ-মঠের ঢিপি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে-সেখানেই অনেক ক্ষুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে-নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন।

বিছানা

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চার-পাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চার-পাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জ্জন করেন। উচ্চাসন বর্জ্জন করিলে তাঁহার খাট-পালং ও চৌকী, চার-পাই চলে না; মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়।

পোষাক

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ী দিতেন। এখনও কোনো বৈদিক কার্য্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয়। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন ত উপবীত, কয়েক খেই কাপাসের সুতা হইয়াছে, কিন্তু পৈতার সময় চামড়ার পৈতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্ততঃ এক-টুকরাও কালসায়রের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখানা চামড়া দিয়া গাটা ঢাকিয়া রাখিতেন।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোনো পোষাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্ব্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্তু ছোপাইয়া পরিতেন। দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা জামা বা চৌবন্দী ব্যবহার করিতেন।

স্নান

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা-রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে,—ভস্মস্নান, গোময়স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, শিখামজ্জন স্নান, অবগাহন স্নান, উষ্ণ-জলে স্নান, তোলা-জলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না। হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্ব্বদাই করিতেন, তা নয়, যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন,

অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন অথবা গা ধুইয়া ফেলিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলা-জলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধের স্নান জলে জলেই হইত, জন্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড় শুনা যায় না।

মুখ ধোওয়া

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি, হয় আট আঙ্গুল, না হয় বার আঙ্গুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সেজন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিষ দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরী করিতেন। কিন্তু তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ। মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত।

বৌদ্ধেরা দাঁতনী করিতেন। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বার আঙ্গুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন।

কাপড় কাচা ও তেল মাখা

ধোবা বা রজককে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবা-বাড়ী দিতেন, এ-কথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার করিতেন কি না, কোনো পুস্তকে দেখিতে পাই না।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া উঠেন, বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ও এইসম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখানকার নেপালী বৌদ্ধদের দুইটী মাত্র সংস্কার। একটি পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর একটি ১৭ বৎসরে—তাহার নাম বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হওয়া। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে এত-সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫।৬ বৎসরের হইলে, সে যে-বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে বড় ভিক্ষু তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটি বলেন, তুমি হইও না, বড় কষ্ট করিতে হয়—বড় বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ওকাজ পারিবে না, তুমি ছেলেমানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, আমি শাক্যপুত্র—আমি পারিব না কেন? বুড়াটি তখন একখানি রূপার ক্ষুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ-সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে, —মহাশয় আমি আর পারি না, আমি মার কাছে যাবো। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান হইতেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুর-ঘরে যাইতে পারে, ঠাকুর ছুঁইতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর-এক সংস্কার আছে—সেটা সতের বছরের সময়। যদি সে সতের বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুর ঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটি অভিষেক হয়,—মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পুরা বজ্রাচার্য্য হয় এবং সকলপ্রকার ধর্ম্মকার্য্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতের বছরের আগে স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনও বজ্রাচার্য্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে; ছেলে-পুলে হয়, গৃহস্থালী করে। দুইপ্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি।

ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়—বজ্রাচার্য্যের ছেলে বজ্রাচার্য্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার্য্য অনেক উচ্চে। যে-কেহ বৌদ্ধ হইবে,—গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিষ লইব না, ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডন করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, সুরা মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এইসকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরও তিনটি শীল দেওয়া হইত,—কটুবাক্য বলিব না, গান বাজনা করিব না, স্রক্‌চন্দনাদি ব্যবহার করিব না।

এখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য্য করিতেন।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমার স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়—আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি—তাহা ছুইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড়-বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারিদিকে দিওমালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়ই তফাৎ। বৌদ্ধের-শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে-দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়পুড়িয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়।

তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

ডতকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন ভগবান্ গৃহস্থাশ্রমীর জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়। বোধিসত্ত্বচর্য্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব —"ওঁ অদ্য অমুকমাসে, অমুকতিথিতে অমুক-গোত্রে পিতা, পিতামহ,

প্রপিতামহ, তাঁহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্ম বস্ত্রখণ্ড হইতে উৎপন্ন সমুত অন্ন আঃ হং স্বাহা," এইটি তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র-উচ্চারণ করিবে, আর সকলই পূর্ব্বের মতন। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাতমুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিলকুশ গ্রহণ করিতে হইবে—এইসব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সঙ্ঘভোজন

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া-লেপাটা বড়ই দোষের মনে করেন। পৈতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেই দিন হইতে তাহারা কাহারও এ টো খায় না এবং কেহ ছুঁইলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সে-কালে ভারতবর্ষে সঙ্ঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিড়ীর উপর বসিয়া উবু হইয়া (আসনপীড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিড়ীর মধ্যে অন্ততঃ এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সঙ্ঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে ঘটি বাঁ হাতে ধরিয়া আলগোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন।

আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারের যত সঙ্ঘ ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল—প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্রে খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া-লেপা। সারি-সারি চাদর বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড় মানুষের সারি, চাদরও তত বড়। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন, ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো-সিদ্ধ, ডাল—সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন—কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিষ নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে—যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড় বলিয়া মানে. গুরুপদ পরমপদ বলিয়া মনে করে। গুরুকে তন-মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মতন হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছে। আমরাও তেমনি গুরুতে—শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত—আমরা এখন যাহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১)

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শিক্ষায় স্বাধীনতা

এমন কয়েক-রকমের স্বাধীনতা আছে যাহা মোটেই সহ্য করা যায় না। একবার এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে এবিষয়ে আমার কথা হয়, তাহাতে তিনি বলেন—"কোনো রকম কাজ করিতেই শিশুদিগকে নিষেধ করিতে নাই কেননা তাহাদিগকে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।" আমি বলিলাম—"যদি শিশুর প্রকৃতি তাহাকে আলপিন্ খাইতে বলে, তাহা হইলে?" ভদ্রমহিলা যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা বেশ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। যদি প্রত্যেক শিশুকে আপনার মতে চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে আল্পিন খাইতে ইতস্ততঃ করিবে না, ঔষধের বোতল হইতে বিষ খাইবে, খোলা জায়গা দিয়া পড়িয়া যাইবে, বা অন্য কোনো রকমে মৃত্যুমুখে পড়িবে। আবার একটু বড় হইলে সুবিধা পাইলেই পায়ে ময়লা মাখিবে, গা ধুইবে না, অতিভোজন করিবে, তামাক ইত্যাদি খাইয়াও শরীর নষ্ট করিবে, ভিজা পায়ে থাকিয়া সর্দ্দি-কাশি আনিবে, এবং আরো কত কি। অতএব যাঁহারা শিক্ষায় স্বাধীনতার পোষণ করেন তাঁহারা বোধ হয় ইহা মনে করেন না যে ছেলেরা যাহা চায় সমস্ত দিন তাহাই করুক। শৃঙ্খলা এবং শাসনের ভাব অবশ্যই থাকা দরকার; তবে তাহা কিরূপ মাত্রায় থাকিবে ও কিভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাই বিচার্য্য।

নানা দিক্ হইতে শিক্ষার বিচার করিতে হইবে—দেশে প্রচলিত রাজকীয় শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, স্কুলমাষ্টারের শিক্ষা, পিতামাতার শিক্ষা, কিম্বা বালকের নিজের শিক্ষা। এগুলির প্রত্যেকটাই শিক্ষার আদর্শের কিয়দংশে পরিপূরক, আবার প্রত্যেকটাতেই কিছু-কিছু দোষের অংশ আছে।

সর্ব্বসাধারণের জন্য ব্যবস্থিত যে শিক্ষা তাহা ভালো-রকমে চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক উপকার হয়। ইহাতে যুবক সাধারণকে ভালোর দিকে বা মন্দের দিকে অধিকতর আত্মাবহ করে। লোকের চালচলন ইহাতে মার্জ্জিত হয়; অপরাধের মাত্রা কমে; সাধারণের হিতকর কাজের প্রেরণা আসে; কেন্দ্রগত কাজে সমাজের সহানুভূতি জাগায়। এই শিক্ষা না থাকিলে ডিমোক্রাসি বা গণতন্ত্র থাকিতেই পারে না। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞেরা যাহাকে ডিমোক্র্যাসি বলেন তাহা রাজ্য-শাসন পদ্ধতির একটা রূপ অর্থাৎ ইহা এমন এক পদ্ধতি যাহাতে নেতাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ লোকে করে অথচ লোকের মনে এই ধারণা থাকে যে তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতেছে তাহাই তাহারা করিতেছে। এইরূপ প্রচলিত শিক্ষার একটা কুসংস্কার আছে। ইহাতে যে-সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে সম্মান করিতে শিখায়; যে-সব শাসনের প্রচলন আছে তাহাদের সমালোচনা করিতে নিষেধ করে এবং বিদেশী লোকদিগকে ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতে শিক্ষা দেয়। জাতীয় জীবনের ভিত্তি ইহাতে দৃঢ় করে কিন্তু অপরাপর জাতির সহিত মিলন ও ব্যক্তিগত উন্নতির মূলে ইহা কুঠারাঘাত করে। প্রচলিত শাসনবিধি মানিতে গিয়া ব্যক্তিগত উন্নতি খর্ব্ব হয়। ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা সাধারণী বুদ্ধিবৃত্তি পুষ্ট হয়; প্রচলিত বিশ্বাস ও মতামতের সঙ্গে অনৈক্য করিবার উপায় থাকে না। এ-শিক্ষায় সমমতত্ব চায়, কেননা দেশশাসকের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক। ফলে ইহাতে অহিতের মাত্রা এত হয় যে এ-শিক্ষায় ভালো বা মন্দ কোন্টা বেশী তাহাই বিশেষ প্রশ্নের বিষয়।

রাজার প্রদত্ত শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, স্কুলের শিক্ষা বা পিতামাতার শিক্ষা ইহার কোনোটারই উপর ছেলেদের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, কেননা প্রত্যেকটাতেই কোনো-না-কোনো একটা লক্ষ্যের সাধনের জন্য ছেলেদের তৈয়ারি করে, কিন্তু ছেলেদের নিজেদের মঙ্গল-সাধনের চেষ্টা করে না। রাজা চান ছেলেরা জাতীয় ধনবৃদ্ধির সাহায্য করুক এবং বর্ত্তমান শাসনবিধির পোষণ করুক। ধর্ম্মযাজক চান ছেলেরা পৌরোহিত্যের শক্তিবৃদ্ধি করুক। স্কুলমাষ্টার চান ছেলেরা স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করুক।

পিতামাতা চান ছেলেরা বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। নিজেই নিজের লক্ষ্যের পরিপোষক হইয়া স্বতন্ত্র মানুষরূপে নিজের সুখ ও হিতের দাবী করিয়া বালক বাড়িয়া উঠুক—ইহা ঐসব বাহিরের শিক্ষায় ব্যবস্থা করে না, করিলেও তাহা যৎসামান্তই। বালকের দুর্ভাগ্য এই যে, সে নিজের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা-বর্জ্জিত এবং সেইজন্ত বাহিরের জোর-জুলুম তাহাকে পাইয়া বসে।

নৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মবিষয়ক কোনো গোঁড়ামি শিক্ষা দিলে তাহার অহিত প্রচুর। যেসব লোকের মধ্যে সাধুতা ও বুদ্ধিশক্তি বর্ত্তমান গোঁড়ামি থাকিলে সেইসব লোকই শিক্ষাকার্য্য হইতে বিরত হন, অথচ সেইসব লোক শিক্ষক হইলে ছাত্রদের উপর তাঁহাদের নৈতিক ও মানসিক প্রভাব পড়ে বেশী।

এইবার ছাত্রদের উপর দুইটি প্রভাবের কথা ধরা যাক—বুদ্ধির প্রভাব ও নৈতিক প্রভাব। বুদ্ধি-জাগরণের ক্ষেত্রে কোন্ বিষয় যুবকের পক্ষে উৎসাহকর তাহা কার্য্যতঃ জানিবার বিষয়। যেমন যে যুবক অর্থনীতি পড়িতেছে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রজ্ঞ লোকদের, রক্ষণশীল ও অবাধবাণিজ্যবাদীদের, ও সোনার বাজারজ্ঞ লোকদের বক্তৃতা শোনা উচিত। নানা সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট বই তাহাকে পড়িতে বলা উচিত। ইহাতে সে যুক্তি-প্রমাণের ওজন করিতে পারিবে, বুঝিবে যে যে-কোনো মতই নিঃসন্দেহ সত্য নয় ও গুণবত্তা অনুসারে লোকের বিচার হইতে পারে। নিজের দেশের দিক্ হইতেই কেবল ইতিহাস শিক্ষা দিলে চলিবে না, বিদেশীদের দিক্ দিয়াও শিখাইতে হইবে। কলেজে থাকিতে থাকিতে যুবকের জানা উচিত যে, সকল বিষয়ই চূড়ান্ত নয়, সমাধানযোগ্য; কোনো যুক্তি একবারে থামিতে পারে না, বহুদূর চলিতে পারে। জীবিকা-র্জ্জনের ক্ষেত্রে নামিলে এ-মনোভাব লোপ পায়; তাহার আগে পর্য্যন্ত তাহাকে এ-চিন্তায় উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

যুবকদিগকে গোঁড়ামি শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। গোঁড়ামি থাকিলে দক্ষতর শিক্ষকরা কপট হইয়া পড়েন, এবং এইরূপে ছেলেদের সামনে কুদৃষ্টান্ত খাড়া হয়। গোঁড়ামির আরও দোষ—অসহিষ্ণুতা। ক্যাথলিক্ স্কুলের ছেলেরা মনে করে প্রটেষ্টাণ্টরা বদলোক; যে-কোন স্কুলের ছেলেরই ধারণা যে, যারা নাস্তিক তা'রা বদমাইস্; ফ্রান্সের ছেলেরা মনে করে জার্ম্মানদের স্বভাব খারাপ; জার্ম্মানির ছেলেরা মনে করে ফরাসীরা পাজি। সুক্ষ্মবুদ্ধিতে যে মতামত পোষণ করা যায় না এমন কোনো মতামতকে যখন কোনো স্কুলের শিক্ষণীয় করিয়া লওয়া হয় তখন বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকমাত্রেই খারাপ—এই ধারণা ছেলেদের মধ্যে জাগিতে বাধ্য। এইরূপে ছেলেদের সঙ্কীর্ণচিত্ত, অসহনশীল ও নির্দ্দয় করিয়া তোলা হয়।

ইহাতে ব্যক্তিগত জীবনের অবনতির ফলে সমাজের প্রচুর অবনতি ঘটে। যুদ্ধ এবং নির্য্যাতন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; স্কুলের শিক্ষায়ই তাহাতে প্ররোচনা দেওয়া হয়। ওয়েলিংটন্ বলিতেন, ইটনের ক্রীড়াক্ষেত্রেই ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ জয় হইয়াছিল। তাঁহার কথা আরো সত্য হইত, যদি তিনি বলিতেন—ইটনের পাঠশ্রেণীতেই বিদ্রোহী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রেরণা দেওয়া হয়। পতাকা দুলাইয়া, এম্পায়ার ডে করিয়া, ৪ঠা জুলাই-এর উৎসব করিয়া, যুদ্ধশিক্ষার দল গঠন করিয়া, ছেলেদের মানুষ-মারার প্রবৃত্তি জাগানো হয়। এবং মেয়েদের মনে এই ধারণা জন্মানো হয় যে, মানুষ-মারায় যে-পুরুষ যত দক্ষ সেই তত সম্মানের পাত্র। নির্দ্দোষ ছেলেমেয়েদের কাছে নৈতিক অবনতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবার এই যে প্রথা ইহা একবারেই অসম্ভব হইয়া যাইত, যদি দেশশাসকেরা শিক্ষক ও ছাত্রদের মতান্তরের স্বাধীনতা সমর্থন না করিত।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানবের আত্মা আছে এবং তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করা উচিত, ইহা ধর্ম্মের কথা, এ-দৃষ্টিতে শিক্ষার কর্ত্তৃপক্ষগণ ছেলে-মেয়েদের দেখেন না। তাঁহারা ছেলেদের দেখেন সমাজ-কার্য্যের উপাদান রূপে, কলকারখানার ভবিষ্যৎ কর্ত্তারূপে, বা যুদ্ধের সজীবরূপে। যতক্ষণ না শিক্ষক মনে করেন যে, প্রত্যেক ছাত্রই নিজে নিজের লক্ষ্যসাধক, তাহার নিজের অধিকার এবং বৈশিষ্ট্য আছে, কেবল সে সৈন্যদলের এক-জন নয়, ততক্ষণ শিক্ষক শিক্ষা দিবার উপযুক্তই নয়। প্রত্যেক সামাজিক বিষয়ে জ্ঞানের আরম্ভ হইতেছে মানুষের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা। শিক্ষা-বিষয়ে ইহাই আবার মুখ্য।

(সেন্‌চুরী ম্যাগাজিন্) বার্ট্রাণ্ড্‌ রাসেল্

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্ম

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতরকার কথার সঙ্গে খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের মিল আছে। খৃষ্টিয়ান্ হোক বা হিন্দু হোক ঈশ্বরানুভূতিতে যে আনন্দ তাহাই ভক্তির প্রকৃত রূপ। দুই ধর্ম্মেই যে দেব-কল্পনার প্রাচুর্য্য আছে ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মেও ভক্তির পঞ্চ রূপ আছে। খৃষ্টিয়ান্ অলৌকিকত্ববাদ শান্ত ভাব। দাস্যভাব সেণ্ট্ পলের যুগ হইতে আজ অবধি খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এমন-কি খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মেই এই ভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মে তত নয়; কেননা খৃষ্ট ইহাকে মুখ্য গোড়ার জিনিষ বলিয়া ধরিয়াছেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইহা গৌণ। ঈশ্বরকে সখা মনে করা বা সখ্য ভাব খৃষ্টিয়ানদের কাছে খুব পরিচিত। খৃষ্টের সুন্দর ভাষাতেই ইহার মূল রহিয়াছে—"আর আমি তোমাদিগকে ভৃত্য ভাবিব না;......তোমাদিগকে বন্ধু বলি।" ঈশ্বরের সহিত পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের ভাব বা বাৎসল্য ভাব খৃষ্টিয়ান্‌দিগের নিকট স্বাভাবিক। ইহা আবার খৃষ্টিয়ান্ উপাসনার সম্পূর্ণ কেন্দ্রগত কথা। বৈষ্ণবদের কাছে এই ভাব হইতেছে ছোট ছেলের প্রতি স্নেহের ভাব; ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—ভারতীয় নারীদের কৃষ্ণকে বালকরূপে পূজা করা। ইহার সমতুল্য হইতেছে রোমান্ চার্চ্চের জ্ঞানী লোকের অর্চ্চনা ও ব্যামবিনো-পূজা। সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাব ঈশ্বরের সহিত প্রণয়ীর মধুর ব্যাকুল সম্বন্ধ বা বিবাহ-সম্বন্ধের ভাব। খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মে ইহার অধিক স্থান নাই, এবং তাহা জ্ঞানের কাজ। ইউ-রোপের মধ্যযুগের ধর্ম্মব্যবস্থায় এবং রোমান্ ধর্ম্মোপদেশে ঐ ভাব ছিল,—ইহাতে (nun) মঠধারিণীরা আপনাদিগকে খৃষ্টের পত্নী বলিয়া মনে করিতেন।

এইরূপে দুইটি ধর্ম্মের অলৌকিকত্ববাদের কথা ও সাধুত্বের আদর্শের কথা আসিয়া পড়ে। দুই ধর্ম্মেই অলৌকিকত্ববাদ নিহিত। দুইয়েতেই এই বাদ সমশ্রেণীর। ইহাতে ঈশ্বরের বাস্তবতার উপলব্ধি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এবং তাঁহার সন্ধান ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই। বৈষ্ণব গীতিসাহিত্য রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর নানা পরিণতির অনুরূপ শ্রেণী বিভক্ত। যে খৃষ্টিয়ান্ অলৌকিকত্ববাদ শতাব্দীর পর শতাব্দী গড়িয়া উঠি-য়াছে তাহার সহিত এই কাহিনীর কয়েকটির মিল আছে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকপাত অলৌকিকত্ববাদের অনুগামী যে শারীরিক অভি-ব্যক্তি তাহার সাদৃশ্য প্রকট হইবে, আশা করা যায়। বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য যে-সব ধর্ম্মতত্ত্বের আবিষ্কারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চৈতন্যের মূর্চ্ছা প্রভৃতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। তফাৎ এই যে, খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মে ঐ-সমস্ত ব্যাপারকে অস্বাভাবিক, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে করা হয়। বৈষ্ণব ভক্তের কাছে এসব ব্যাপার ভক্তির উচ্ছ্বাস বা ভগবানের সহিত মিলনের লক্ষণ বলিয়াই গণ্য। ভাবমূর্চ্ছা চৈতন্যের নিকট বিশেষ অভিজ্ঞতার ব্যাপার ছিল, বৈষ্ণব সাহিত্যে এই ভাবের কোনো সমালোচনা নাই, বরং ইহার মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে।

(দি ইয়ং মেন্ অভ্ ইণ্ডিয়া) এম্ টি কেনেডি

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
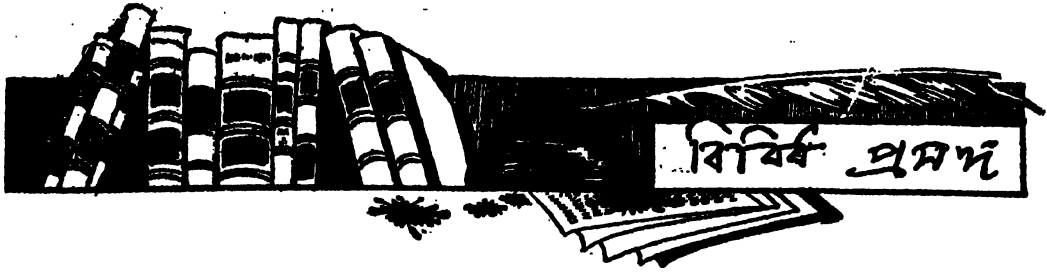
কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা

মহাত্মা গান্ধী এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহার সমস্তই পড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও আমরা পড়িতে পারি নাই। এইজন্য বেলগাঁওয়ে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমস্তই কোন-না-কোন আকারে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন কি না, স্থির করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, তাঁহার মতামত-সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহাতে মনে হয়, তিনি এই বক্তৃতায় অধিকাংশ স্থলে তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত মতসমূহের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গে নূতন কথাও কিছু বলিয়াছেন। পুরাতন হইতে নূতন কথাগুলি পৃথক্ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার সমস্তই শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করিবার যোগ্য।

কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা ইদানীং খুব লম্বা করার দিকেই ঝোঁক দেখা গিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব্বে মৌলানা মহম্মদ আলী সভাপতিরূপে যে-বক্তৃতা করেন, তাহাই সম্ভবতঃ কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাষণগুলির মধ্যে দীর্ঘতম। মহাত্মাজির বক্তৃতাটি সংক্ষিপ্ততম কি না বলিতে পারি না; তবে সংক্ষিপ্ততমগুলির মধ্যে ইহা একটি, বলা যাইতে পারে। প্রথম সাতটি কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা, এবং মিঃ ওয়েব, স্যার্ হেন্‌রী কটন্ ও স্যার্ রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতা সংক্ষিপ্তই ছিল।

মহাত্মাজির বক্তৃতায় তাঁহার চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা সাদাসিধা, সরল; ইহা সৌজন্যপূর্ণ ও হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত; ইহাতে কোন কপটতা, চাতুরী, ধাপ্পাবাজি নাই; সৎলোকের বিশ্বাসানুরূপ হৃদয়ের কথা ইহাতে আছে; ধর্ম্মবুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতা ও সাত্ত্বিকতার উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি এই বক্তৃতা করিয়াছেন।

সাক্ষাৎসম্পর্কে লোকে যাহাকে রাজনৈতিক বক্তৃতা বলে, ইহা তাহা নহে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা রাজনৈতিক বক্তৃতা ভিন্ন আর কিছু নয়। ইহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক—স্বরাজ লাভ। কিরূপে স্বরাজ লাভ করা যাইতে পারে, গান্ধীজি তাহাই তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি-অনুসারে বলিয়াছেন।

১৯২০ সালের আগে কংগ্রেসে প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের কাজেরই আলোচনা ও প্রতিবাদাদি হইত, এবং গবর্ণমেণ্টের কি করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রস্তাব ধার্য্য হইত। প্রধানতঃ এই উপায়েই আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারিব, এইরূপ ধারণাই তখন ছিল।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে কংগ্রেস্ জাতির ভিতর হইতেই শক্তির উদ্রেক ও সঞ্চয় দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভে প্রধানতঃ মন দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কি করা উচিত তাহার বরাত না করিয়া, আমাদের কি করা উচিত, সেই দিকেই ভারতীয়দিগের প্রবৃত্তি জাগাইবার চেষ্টা গত ৪।৫ বৎসর হইতেছে। চেষ্টা সমীচীনভাবে ও অবিরাম হইয়াছে, বলিতে পারি না; চেষ্টার মুখ ও গতি কোন্ দিকে তাহাই বলিতেছি।

গান্ধীজির অভিভাষণ ইংরেজী এবং বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তাঁহার যে-যে উক্তি-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে, প্রধানতঃ সেইগুলিরই উল্লেখ আমরা করিব। যাহা আমরা অপরিবর্ত্তিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি, কিম্বা যে-বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বিষয়টি গুরুতর নহে, সে সকলের উল্লেখ করিব না।

—

কংগ্রেসে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ

যে-সকল কর্ম্মী ভারতীয় বা বিদেশী হইলেও ভারতের

জন্ম আন্তরিক হিতৈষণা-প্রণোদিত হইয়া কিছু করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ গত বৎসরের মধ্যে গতায়ু হইয়া থাকিলে, তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ কংগ্রেস্-সভাপতির অভিভাষণের একটি অংশ বরাবর হইয়া আসিতেছে। এবারেও গান্ধী-মহাশয় এইরূপ কয়েকজন কর্ম্মীর নাম উল্লেখ করেন। ইঁহারা সকলেই জন্মতঃ বা বংশতঃ বা উভয়তঃ ভারতীয়। গান্ধী-মহাশয় বোধ করি অন্য জাতির কাহারও নাম উল্লেখ করিবেন না, কোনও বিশিষ্ট কারণে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। নতুবা ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর নাম করা চলিত। কারণ, তিনি যে ভারতশাসন-সংস্কার আইন প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তনের মূলীভূত, তাহা আমাদের মনঃপূত না হইলেও, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ মনঃপূত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই; বরং ইহাই সত্য কথা বলিয়া মনে হয়, যে, তাহা রক্ষণশীল ও ভারতীয় আকাঙ্ক্ষা-বিরোধী সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের সহিত রফার ফল। আমাদের ধারণা, মণ্টেগু সাহেব নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে ভারতের হিতই করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ভারতের অনুকূল নিজের কোন-কোন বক্তৃতা ও কাজের জন্ম ব্রিটিশ জাতির অপ্রিয় হইয়াছিলেন। পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা অবশ্য ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভারতশাসন-সংস্কার-বিষয়ে মণ্টেগু সাহেবের সহকর্ম্মী ছিলেন, এবং তাঁহারই মত "শয়তানী গবর্ণমেণ্টের" চাকরীও করিয়াছিলেন। স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও "শয়তানী গবর্ণমেণ্টের" কর্ম্মচারী ছিলেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অসহযোগের প্রবল বিরোধিতা কথায় ও কাজে খুব করিয়াছিলেন। অতএব, আধুনিক কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালীর সহিত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এই দু'জন কৃতী ও বিখ্যাত ভারতীয়ের নাম যখন করা হইয়াছে, এবং ঠিক্ই করা হইয়াছে, তখন মণ্টেগু সাহেবের নাম না-করার কারণ মতভেদ নহে, জাতিভেদ, অগত্যা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। তাঁহার নাম বাদ না দিলে আমাদের বিবেচনায় ভাল হইত। কারণ ব্রিটেনের সহিত রাষ্ট্রীয় যোগ বিচ্ছিন্ন না করিয়া ভারতের স্বরাজলাভ মহাত্মা গান্ধীর ও কংগ্রেসের লক্ষ্য; মণ্টেগু সাহেবের লক্ষ্যও এই প্রকারের ছিল।

"আমরা নিজে যাহা করিতে পারি বা করিয়াছি, তাহাই আমাদের বিবেচনার বিষয়, অন্য জাতীয় কাহারও চেষ্টা আমাদের অনুকূল হইলেও তাহা আমরা গণনার মধ্যে আনিব না,"—সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী এইরূপ কোন নীতির অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। এই অনুমান ঠিক্ কি না বলিতে পারি না। কিন্তু যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সেইসব লোকদেরও নাম করা উচিত নহে, যাঁহারা কথায় ও কাজে দেখাইয়া গিয়াছেন, যে, তাঁহারা বিদেশীদের সাহায্য লওয়া আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় মনে করেন ও তাহা লইয়াছেন; এবং মিসেস্ বেসাণ্টের মত বিদেশ-জাতা মহিলার সাহায্যও তাহা হইলে লওয়া উচিত নহে। অবশ্য, ইহা ঠিক বটে, যে, মিসেস্ বেসাণ্ট ভারতবর্ষকে তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছেন, এবং অনেক বিষয়ে তিনি ভারতীয়দের সহিত একমত। কিন্তু কোন-কোন গুরুতর বিষয়ে তিনি ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সহিত একমত। আমাদের মতে দেশী বিদেশী যিনি যতটুকু ভারতসেবা করেন, তাহা সেবা বলিয়া মানা ও গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য,—যদিও পরমুখাপেক্ষী হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এই বিষয়টি সামান্য মনে হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা রাষ্ট্রনেতা, তাঁহাদের ছোট-বড় সব কাজেরই মূলীভূত নীতির আলোচনা অনাবশ্যক নহে। কোন-কোন বিষয়ে সংকীর্ণতা বা তথাকথিত সংকীর্ণতা অপরিহার্য্য এবং আবশ্যক হইতে পারে;—যেমন বিদেশী কাপড় ব্যবহার না করিবার প্রতিজ্ঞায় লক্ষিত হয়। কিন্তু হিতৈষী বিদেশী মানুষকেও হৃদয় হইতে দূরে রাখা অনাবশ্যক সংকীর্ণতা মনে করি। বিদেশী যীশুখ্রীষ্ট এবং বিদেশী টলষ্টয়কে মহাত্মাজী হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। অবশ্য, ইহা আমাদের বলা অভিপ্রেত নহে, যে, মণ্টেগু খ্রীষ্ট বা টলষ্টয়ের সমান-পদবীর বা সমান ভক্তিভাজন লোক ছিলেন, আমরা কেবল দেশীবিদেশীরই বিচার করিতেছি।

—

অসহযোগের আরম্ভের কারণ

গান্ধী-মহাশয় বলিয়াছেন, ভারতীয় মুসলমানদের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করাতেই লোকের মনে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাসে প্রথম কঠোর আঘাত লাগে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, ১৯২০ সালের ৩১শে মে এলাহাবাদে রেলওয়ে থিয়েটারে মিঃ চোটানীর সভাপতিত্বে যে-সভা অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্য-বিবরণ হইতে জানা যায়, যে, মহাত্মা গান্ধী তুরস্কের প্রতি অবিচারপূর্ণ সেভর্-সন্ধির ফলেই অসহযোগ-প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু তুরস্কের প্রতি অবিচারই যে গবর্ণমেণ্টের উপর ভারতীয়দের বিশ্বাসে প্রথম বা কঠোরতম আঘাত দেয়, ইহা বলিলে ইতিহাসের দিক্ দিয়া ভুল কথা বলা হয়। কারণ তাহার আগে রৌলট্ আইন পাস্ হইয়াছিল, ও পঞ্জাবে সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় যে-সব ভীষণ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ঘটে, তাহাও ঘটিয়াছিল; এবং ইহাও পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, যে, ঐ প্রদেশে অত্যাচারী সরকারী কোন কর্ম্মচারীকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। সেভর্-সন্ধি হইবার পূর্ব্বেই এই-সব কারণে গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছিল।

অসহযোগ ও সরকারী প্রতিষ্ঠান-সকলের প্রতিপত্তি

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত উপাধি, সরকারী আদালত, সরকারের প্রতিষ্ঠিত, সাহায্যপ্রাপ্ত বা জ্ঞানিত শিক্ষালয়-সমূহ, সরকারী ব্যবস্থাপক সভাসমূহ, এবং বিদেশী কাপড় বর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করা হয়। মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন, যে, যদিও এই পাঁচ বর্জ্জনীয় জিনিষের মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হয় নাই, কিন্তু সকলগুলিরই প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়াছিল। ইহা সত্য কথা। কিন্তু হ্রাস যাহা হইয়াছিল, তাহা, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেকটা পুনর্লব্ধ হইয়াছে। ইহাও স্বীকার করা উচিত, যে, সরকারী উপাধির প্রতিপত্তি অসহযোগ আন্দোলনের আগে হইতেই অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল; কেহ-কেহ উহা আগেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের পদবী হওয়াটা যে, কিরূপ কম বাঞ্ছনীয়, তাহা রবি-বাবুর একটি বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত ছোট গল্পে দৃষ্ট হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের একটি ইংরেজী দৈনিকে দৃষ্ট হয়, যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর "স্যার্" উপাধি গ্রহণ করেন নাই।

বিদেশী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ বর্জ্জন অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগে আরম্ভ হইয়াছিল। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কাজও বহুপূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছে। সংখ্যায় কম এরূপ একদল লোকও বহুকাল অবধি আছেন, যাঁহারা সরকারী ব্যবস্থাপক সভাসকলের গুরুত্ব কখনও বেশী মনে করেন নাই। সরকারী আদালতসকলের সাহায্য না লইয়া আপোষে বিবাদ-নিষ্পত্তির চেষ্টাও পুরাতন। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ওকালতি, ব্যারিষ্টারি ছাড়া এবং সরকারী আদালতের সাহায্যগ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা, নূতন চেষ্টা।

অহিংসা

গান্ধী-মহাশয় বলিয়াছেন, যে, যাহা-যাহা বর্জ্জন করিবার সংকল্প করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে হিংসা-দ্বেষ-ত্যাগ সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী। তিনি বলেন, যে, এক সময়ে মনে করা গিয়াছিল, বুঝি বা অহিংসার সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, যে, অহিংসা অতি অগভীর,—উহা অক্ষম নিরুপায়ের অহিংসা, বহু উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ প্রজ্ঞাবানের অহিংসা নহে। ফলে, যাঁহারা অসহযোগ অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি ও তাঁহাদের মতের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা ও কখন-কখন উৎপীড়নেচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল।

অহিংস অসহযোগ প্রচারিত না হইলে মারামারি, রক্তপাতের প্রাদুর্ভাব খুব হইত, মহাত্মা গান্ধীর একথা সত্য। ইহাও সত্য, যে, অহিংস অসহযোগ লোকদিগকে তাহাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। নিজে দুঃখ ভোগ করিয়া প্রবলের ও অত্যাচারীর ইচ্ছা-প্রয়োগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যে-শক্তি মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, ইহার দরুন্ তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

ইহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে জাগরণ আনিয়াছে, হয়ত অন্য কোন উপায়ে তাহা সাধিত হইত না, ইহাও ঠিক্।

"অতএব যদিও অহিংস অসহযোগ আমাদিগকে স্বরাজ আনিয়া দেয় নাই, যদিও ইহা হইতে কোন-কোন কুফল ফলিয়াছে এবং যদিও যে-সকল প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তৎসমুদায়ের এখনও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি আমার বিনীত মত এই, যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের উপায়রূপে অহিংস অসহযোগ আমাদের মধ্যে স্থায়ীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং ইহার আংশিক সাফল্যও আমাদিগকে স্বরাজের কতকটা নিকটে আনিয়াছে। কোনও ইষ্টসিদ্ধির জন্য দুঃখ সহিবার ক্ষমতা যে, তাহা লাভের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

মহাত্মা গান্ধীর অভিভাষণের এই কথাগুলি আমাদের বিশ্বাস-অনুযায়ী।

কেবল যুক্তিতর্ক, আবেদন, সভাসমিতিতে প্রস্তাব স্থিরীকরণ ও প্রতিবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ নিজ রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে,এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। অনেকে মনে করেন, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করা ভারতবর্ষের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং এই কারণে তাঁহারা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া যাহা করা যায়, তাহার পক্ষপাতী। আমরা যুদ্ধ বিদ্যায় অভিজ্ঞ নহি; সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতার সমরে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর কি না, সে-বিষয়ে ঠিক্ কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু উহা যে অসম্ভব, তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। আমরা যে সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধী, তাহার কারণ, আমরা যুদ্ধেরই বিরোধী; কেননা উহা বর্ব্বরতার চিহ্ন, এবং সাতিশয় নৃশংস, ও সর্ব্ববিধ দুর্নীতির পরিপোষক। এই কারণে, যুদ্ধের স্থান অধিকার করিতে পারে, এপ্রকার কোন ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত উপায় আবিষ্কার করা প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় অহিংস অসহযোগ ও ধর্ম্মসঙ্গতভাবে আইন অমান্য করা (যেমন ট্যাক্স না দেওয়া, ইত্যাদি) এইরূপ উপায়। ইহাও একপ্রকার বিদ্রোহ; কিন্তু ইহাতে নৃশংস কিছু নাই, দুর্নীতি কিছু নাই। ইহাতে নিজে দুঃখ ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু অপরকে আঘাত করিতে বা দুঃখ দিতে হয় না।

—

ছাড়া ও গড়া

কেবল বর্জ্জনের দ্বারা দেশ স্বাধীন হইবে, এভুল অসহযোগীরা করেন নাই; যাহা বর্জ্জন করিলাম, তাহার জায়গায় নূতন কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এধারণাটা তাঁহাদেরও ছিল। যাহা ছাড়া হইল, তাহার স্থানপূরণের জন্য কিছু গড়া চাই, এবং গড়িবার চেষ্টা কিছু হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু যথেষ্ট হয় নাই। সরকারী আদালতের জায়গায় বেসরকারী সালিসী আদালত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত, সাহায্যে পরিচালিত ও জানিত শিক্ষালয়সকলের জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী কাপড়ের জায়গায় দেশী খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছে;—এমনকি সরকারী উপাধিসমূহ বর্জ্জিত হওয়ায় বেসরকারী "মহাত্মা," "দেশবন্ধু," "দেশভক্ত" প্রভৃতি উপাধির অত্যধিক ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। কখন-কখন এইসব উপাধি গালাগালি ও লাঠির জোরে কায়েম রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে।

কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই, যে, উৎসাহ এবং শক্তি বর্জ্জনের ও বিনাশের দিকে যতটা গিয়াছে, গড়িবার দিকে ততটা যায় নাই। বরং বিরোধের দ্বারাই শক্তি জাগে, এই মন্ত্রেরই সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। বিরোধের দ্বারা একপ্রকার শক্তি জাগে, ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। কিন্তু এই শক্তির কার্য্য স্থায়ী হয় না, এবং উহা গঠনের, সৃষ্টির, রচনার কাজে প্রযুক্ত না হইয়া বর্জ্জন ও বিনাশেই প্রযুক্ত হয়।

প্রধানতঃ এই কারণে ইতিপূর্ব্বে বর্জ্জনগুলি বন্ধ রাখিয়া বার্দোলীতে কেবল গড়িবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, এবং পরে ত সম্প্রতি অসহযোগ স্থগিতই করা হইয়াছে।

মন্দ যাহা তাহার বিনাশের প্রয়োজন নাই,তাহা ভাঙিবার দরকার নাই, ইহা কেহ বলিবেন না; কিন্তু না গড়িলেও যে চলিবে না, ইহাও মানিতেই হইবে। অসহযোগের যেটা

গড়ার দিক্, যাহা ব্যতিরেকে জাতির মঙ্গল হইতে পারে না, তাহা নূতন নহে;—অন্ততঃ বাংলা দেশে নূতন নহে। অবশ্য অসহযোগের আইডিয়া অর্থাৎ ধারণা, কল্পনা, বা চিন্তাটাও নূতন নহে। উহা গত শতাব্দীতে অধ্যাপক সীলী তাঁহার একখানা বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অন্য এক ইংরেজ গ্রন্থকারের বহিতেও উহার আভাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ মহাত্মা গান্ধী করিয়াছেন, এবং উহা যে সফল হইতে পারে, তাহারও কিছু প্রমাণ, অকৃতকার্য্যতা-সত্ত্বেও, পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম, যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বা প্রতিকূলতার চিন্তা না করিয়া দেশের অত্যাবশ্যক সমুদয় কাজ করিবার ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চিন্তাটা বাংলাদেশে নূতন নহে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে "স্বদেশী সমাজ", "সফলতার সদুপায়" প্রভৃতি প্রবন্ধে, ও তৎপরে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ এইসকল বিষয়ের অত্যাবশ্যকতা পুনঃপুনঃ দেশের লোকদের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার "সফলতার সদুপায়"-নামক প্রবন্ধ হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।—"সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্ত্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গল কর্ম্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে-অবকাশ পরের দ্বারা কখনই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকী নাই।" ("সমূহ"-নামক পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠা।) "দেশনায়ক"-নামক অপর-এক প্রবন্ধে রবি-বাবু লিখিয়াছিলেন:—"একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দির-ভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মত এমন কঠোর সত্য,—এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কি আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাতে ফাঁকি দিবার জো কি, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশ মাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। **এই দুঃখের কৃষ্ণ কঠিন নিকষ-পাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত না করিয়া থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে।** যাহা খাঁটি সোনা নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন?" ("সমূহ," পৃঃ ৪০-৪১।)

রবি-বাবুর এইসব কথায় কোন দেশব্যাপী হুজুক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নাই, কেবল "শক্তি" জাগে নাই; কেননা তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানাবলীর ভিত্তি কেবল দেশানুরাগের উপর স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, বিদেশী-বিরাগের ও বিরোধের ভেজাল তাহাতে ছিল না।

—

বিদেশী কাপড় বর্জ্জন ও অন্যান্য বর্জ্জন

বিদেশী কাপড় বর্জ্জন-ব্যতীত অন্যান্য বর্জ্জনগুলি-সম্বন্ধে গান্ধী-মহাশয় বলিয়াছেন, যে, যাঁহারা একসময়ে কাজে ঐসব বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ আবার উল্টাদিকে চলিতেছেন,—কৌন্সিলে আবার অসহযোগী অনেকে প্রবেশ করিয়াছেন, ছাত্রেরা দলে-দলে আবার পরিত্যক্ত স্কুলকলেজগুলি পূর্ণ করিতেছে, অসহযোগী উকীল-ব্যারিষ্টাররা প্রায় সকলেই আবার আইন-ব্যবসায়ে লাগিয়াছেন, আদালতের সাহায্য গ্রহণও সকলে করিতেছে। সুতরাং এই বর্জ্জনগুলিকে জাতীয় কার্য্য পদ্ধতির অঙ্গীভূত বলিয়া এখন আর চালাইতে পারা যাইবে না। সেইজন্য ঐগুলি স্থগিত করা হইয়াছে।

কিন্তু বিদেশী কাপড় বর্জ্জন স্থগিত করা হয় নাই। আমরা বিদেশী কাপড় ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি।

অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগে হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর স্বদেশজাত সূতায় স্বদেশে প্রস্তুত কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিতেছি; পশমী কাপড়ও দেশী ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে-যে কারণে অন্য বর্জ্জনগুলি গান্ধী-মহাশয় স্থগিত করিয়াছেন, বিদেশী কাপড়ের ক্ষেত্রে সেই কারণগুলি বহু-পরিমাণে বিদ্যমান আছে; দেশের অধিকাংশ লোক, এমনকি কংগ্রেসেরও অধিকাংশ লোক কেবল মাত্র খদ্দর ব্যবহার করেন না। তথাপি গান্ধী-মহাশয় আশাশীলতার সহিত বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কংগ্রেসের কাজের মধ্যে রাখিয়াছেন। খদ্দরের বিস্তৃত ব্যবহার আমরাও চাই। কিন্তু বর্জ্জনের উপর জোর না দিয়া, উৎপাদনের উপর জোর দিতে হইবে। বাংলা দেশে তাহা করা হয় নাই। আমরা গত মাসের "প্রবাসী"তে দেখাইয়াছি, যে, টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড হইতে বাংলা দেশে ১৯২৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস্ একটি পয়সাও খরচ করেন নাই। বাংলা দেশে খদ্দর উৎপাদন ও বিক্রয়ের চেষ্টা প্রধানতঃ কংগ্রেসের বাহির হইতেই হইয়াছে।

—

খদ্দর উৎপাদন ও গ্রামসমূহের পুনরুজ্জীবন

খদ্দর-উৎপাদন সম্পর্কে গান্ধী-মহাশয়ের একটি মত আমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। তিনি বলেন, "Organisation of Khaddar is thus infinitely better than co-operative societies or any other form of village organisation." "খদ্দর উৎপাদন ও প্রচলনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করা সমবায় সমিতি-স্থাপন বা গ্রামহিতসাধনের অন্যবিধ কোন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা অপেক্ষা অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠ।" কেবল খদ্দর উৎপাদন করিলে ও চালাইলে গ্রামসকলে ম্যালেরিয়া-আদির বিনাশ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও বৃদ্ধি, রোগের চিকিৎসা; শিশু, যুবা ও প্রৌঢ়দিগের জ্ঞানলাভের বন্দোবস্ত, যেখানে যত গৃহশিল্প প্রচলিত ছিল বা আছে বা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা, জলসেচনের ব্যবস্থা, উন্নত-প্রণালীর চাষের ব্যবস্থা, কৃষকদিগকে অঋণী করিবার এবং প্রয়োজন-মত অল্পসুদে তাহাদের কর্জ্জ পাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সাক্ষাৎভাবে হইবে না। সুতরাং কেবলমাত্র খদ্দর উৎপাদন ও প্রচলন কেমন করিয়া এই-সমুদয় চেষ্টা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ হইল, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। গান্ধী-মতাবলম্বীরা অবশ্য বলিতে পারেন, যে, খদ্দর চালাইলেই গ্রাম্য লোকদের আয় বাড়িবে ও দারিদ্র্য কমিবে, এবং তাহার পর তাহারা অন্য সব-রকম কাজ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহা কি বহু গ্রামের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে না, যে, যাহারা সচ্ছল অবস্থার লোক, এমনকি সমৃদ্ধিশালী, তাহারাও উপযুক্ত অনুপ্রাণনা, জ্ঞান, পরামর্শ, উপদেশ, পরিচালনা, সমবেত চেষ্টা, ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অভাবে গ্রামের হিতসাধন করিতে পারিতেছে না? গ্রামসমূহকে আবার সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জ্ঞানলাভের সুবিধায় আনন্দে মানুষের বাসের যোগ্য করিবার জন্য কত বিচিত্র চেষ্টার যে প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় মহাত্মা গান্ধী সে-বিষয়ে বিশেষ চিন্তা না করিয়া ও তাহা উপলব্ধি না করিয়া, খদ্দরের প্রতি টান থাকায়, কেবল তাহারই গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি চর্‌খা ও খদ্দরকে আমাদের জাতীয় সমুদয় ব্যাধির অমোঘ ঔষধ মনে করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ উহা তাহা নহে। যখন বিলাতী বা অন্য বিদেশী সূতা ও কাপড় আমাদের দেশে আসে নাই, যখন কেবল চর্‌খায়-কাটা সূতা হইতে হাতের তাঁতে ভারতবর্ষে বোনা কাপড়ই দেশের লোকে ব্যবহার করিত, তখনও আমাদের দেশ, আমাদের গ্রামসমূহ, স্বর্গ ছিল না। তখন কোন-কোন বিষয়ে গ্রামসকল এখনকার চেয়ে অবশ্যই ভাল ছিল, কিন্তু অভাব এবং দোষও অনেক ছিল। চর্‌খা ও হাতের তাঁতের একাধিপত্য-সত্ত্বেও সেইসব অভাব ও দোষ ছিল।

খদ্দর-সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিবার চেষ্টার গুণ বর্ণন করিয়া মহাত্মাজি বলিয়াছেন :—

"Khaddar not only saves the peasant's money, but, it enables us workers to render social service of a first class order. It brings us into direct touch with the villagers. It enables us to give them real political education and teach them to become self-sustained and self-reliant"...

"The fruition of the boycott of foreign cloth through hand-spinning and khaddar is calculated not only to bring about a political result of the first magnitude, it is calculated also to make the poorest of India, whether men or women, conscious of their strength and make them partakers in the struggle for India's freedom."

তাৎপর্য্য।—"খদ্দর কেবল যে চাষীর টাকা বাঁচায় তা নয়, এতে আমাদের কর্ম্মীদিগকে প্রথম-শ্রেণীর সমাজ-হিত করিতে সমর্থ করে। ইহা আমাদিগকে গ্রামবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আনে। ইহা তাহাদিগকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে এবং তাহাদিগকে আত্মনির্ভর-শীল ও স্ব-স্ব প্রয়োজন-সাধন-ক্ষম হইতে শিখাইতে আমাদিগকে সমর্থ করে।…হাতে সুতা-কাটা ও খদ্দর-উৎপাদন কেবল যে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক ফল উৎ-পাদন করিতে পারে, তাহা নয়, ইহা ভারতের দরিদ্রতম পুরুষ ও নারীকে নিজেদের শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন করিতে এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশী করিতে সমর্থ করে।"

যে সকল চেষ্টা অপেক্ষা খদ্দর-উৎপাদন-চেষ্টাকে মহাত্মাজি অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধেও কি উপরে উদ্ধৃত প্রায় সমস্ত প্রশংসাই প্রযোজ্য নহে?

—

চরখা ও নারী-জাতি

চরখায় সুতাকাটা কেবল নারীদের কাজ, বা উহা পুরুষদের যোগ্য কাজ নয়, এরূপ কথা আমরা কখন বলি নাই; সুতরাং উক্ত মত খণ্ডনের জন্য গান্ধী-মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের জবাব দিবার কিছু নাই। যাঁহারা ঐরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রয়োজন মনে করিলে উহার জবাব দিতে পারেন। আমরা কেবল একটি বিষয়ে গান্ধীজির আংশিক ভ্রম দেখাইতেছি। তিনি বলিতেছেন :—

"The State of the future will always have to keep some men at the spinning wheel so as to make improvements in it within the limitations, which as a cottage industry it must have. I must inform you that the progress the mechanism of the wheel has made would have been impossible, if some of us men had not worked at it and had not thought about it day and night."

তাৎপর্য্য।—"ভবিষ্যতের রাষ্ট্রকে সর্ব্বদাই কতকগুলি পুরুষ মানুষকে চরখার কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, যদ্দ্বারা গৃহশিল্প-হিসাবে ইহার যথাসম্ভব উন্নতি তাহারা করিতে পারে। আমাকে আপনাদিগকে জানাইতে হই-তেছে, যে, চরকার কলের যতটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহা অসম্ভব হইত, যদি না আমাদের পুরুষ-মানুষদের মধ্যে কেহ-কেহ চরখায় কাজ না করিত ও ইহার বিষয় দিন-রাত না ভাবিত।"

ভারতবর্ষে নারীজাতির বর্ত্তমান অনগ্রসর অবস্থায় ইহা হয়ত সত্য, যে, গান্ধী-মহাশয়ের মত পুরুষ-মানুষ চরকার উন্নতিতে না লাগিলে ইহার উন্নতি হইত না। কিন্তু ভবিষ্যতেও, সর্ব্বদা, রাষ্ট্রকে চরখার উন্নতির জন্য কতকগুলি পুরুষ-মানুষকেই উহার উন্নতি-কল্পে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, বলায়, নারীজাতির যন্ত্র-উদ্ভাবনী শক্তিতে অবিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। অথচ ইহা অসম্ভব না হইতে পারে, যে, চরখা যন্ত্রটাই নারীজাতি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। যাহা হউক, সেটা অনুমান-মাত্র, তাহা ভ্রান্ত অনুমান হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই, যে, যে-সব দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তার ও উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার কোথাও-কোথাও নারীরা ইতিমধ্যেই অনেক নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমেরিকা এইরূপ একটি দেশ। তথাকার নারীরা সম্প্রতি দশবৎসরে কত যান্ত্রিক উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার তালিকা পর্য্যন্ত আমরা একখানি আমেরিকান্ কাগজ হইতে মডার্ন্ রিভিউ কাগজে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং ভবিষ্যতেও সর্ব্বদা আমাদের দেশে বা অন্য কোন দেশে রাজশক্তিকে চরখার উন্নতির জন্য পুরুষ মানুষদেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে, ইহা সত্য না হইতেও পারে।

—

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য

গান্ধীজি বলিতেছেন, স্বরাজ-লাভের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে আবশ্যক, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত।

তাহার পর বলিতেছেন, আমি বলিতেছি, প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত, কারণ আমি এরূপ কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি মুসলমানকে জানি, যাঁহারা পুরা হিন্দু বা পুরা মুসলমানের অধীন ভারতবর্ষ না পাইলে বরং তদপেক্ষা বর্ত্তমান ব্রিটেনের অধীনতাই পছন্দ করিবেন। সুখের বিষয় তাহাদের সংখ্যা কম।" আমরাও বলি সুখের বিষয় তাহাদের সংখ্যা কম।

স্বরাজ মানে হিন্দু-রাজ নহে, মুসলমান-রাজ নহে, খ্রীষ্টিয়ান্-রাজ নহে, শিখ-রাজ নহে, অপর কোন সম্প্রদায়ের রাজ নহে, ইহা বেশ ভাল করিয়া সকলের বুঝা দরকার। ইহা যে পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বিহারী, বাঙালী, উৎকলীয় মরাঠা, গুজরাটী, অন্ধ্রদেশীয়, তামিল প্রভৃতি কোনও প্রাদেশিকদিগের রাজও নহে, তাহাও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ইহা ভারতীয়-রাজ এবং ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে, তাঁহারাই করিবেন, সমগ্র ভারতীয় জাতির হিতসাধনের ইচ্ছা ও সামর্থ্য যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

একটি আদর্শ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং তাহা বাস্তবে পরিণত হউক, এই ইচ্ছা অকপটে সর্ব্বান্তঃকরণে করিতে হইবে। তাহা, এই যে, সকল প্রদেশের, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের, জাতির ও শ্রেণীর লোক জ্ঞানে, লোকহিতৈষণায় রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ কার্য্য-নির্ব্বাহের সামর্থ্যে অগ্রসর হইবার সমান সুযোগ পাইয়া সকলেই উন্নত হইবেন। তাহা হইলে, অবস্থা এই দাঁড়াইবে, যে, যে-প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা অধিক, তথায় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর সংখ্যা স্বভাবতঃ হিন্দুই অধিক হইবে, যে-প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, তথায় মুসলমান রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর সংখ্যাই বেশী হইবে। এবং সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা বেশী বলিয়া সমগ্রভারতীয় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে হিন্দুর সংখ্যা বেশী হইবে। ভবিষ্যতে গড়ে কি হইতে পারে, ইহা তাহারই একটা পূর্ব্বাভাস। কিন্তু কখন-কখন যোগ্যতার আধিক্যবশতঃ হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান্ কর্ম্মীর সংখ্যা বেশী হইতে পারে, আবার মুসলমানপ্রধান প্রদেশে হিন্দু বা শিখ কর্ম্মীর সংখ্যা এইরূপ কারণে বেশী হইতে পারে। এমনও হইতে পারে, যে, কোন সময়ে যদি সমগ্র ভারতে যোগ্যতম লোকদের মধ্যে মুসলমান বা শিখ বা খৃষ্টিয়ানের সংখ্যাই বেশী হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদের মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী হইবে। ভারতবর্ষে পারসীদের সংখ্যা মোট একলক্ষ মাত্র; অথচ এপর্য্যন্ত তিনজন পারসী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন।

বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ ভারতে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে যোগ্যতারই দিকে দৃষ্টি থাকিবে, কে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, সে-দিকে দৃষ্টি থাকিবে না। এইরূপ ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া যাঁহাদের মন অশান্তিতে পূর্ণ হইবে, তাঁহারা এখনও স্বরাজের উপযুক্ত হন নাই, বুঝিতে হইবে।

আমাদের মনের ভাব-সম্বন্ধে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। মুসলমানরা (অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে তাঁহাদের কতকগুলি নেতা) যাহা-যাহা চান, তাহাতেই রাজী না হইলে তাঁহারা দল ছাড়িয়া দিবেন, কিম্বা স্বরাজলাভে ব্যাঘাত দিবেন, কিম্বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইবে বা নারীদের উপর অত্যাচার বাড়িবে, এইরূপ ভয়ে-ভয়ে থাকিয়া সর্ত্ত-সম্বন্ধে দরদস্তুর করিয়া স্বরাজ-লাভ-চেষ্টার পক্ষপাতী আমরা নহি। এইরূপ তথাকথিত স্বরাজ নাই বা হইল? প্রকৃত স্বরাজের অর্থাৎ ভারতীয় রাজের প্রয়োজন যেমন হিন্দুর আছে, তেমনি মুসলমানের, খৃষ্টিয়ানের, শিখের, অপর সকলেরই আছে। কেননা, স্বরাজ-লাভ ব্যতিরেকে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই সর্ব্বাঙ্গীণ সম্যক্ উন্নতি হইতে পারে না। স্বরাজ লাভটা অমুক সম্প্রদায়ের পিতৃমাতৃদায় হইতে উদ্ধার-লাভের মত একান্ত আবশ্যক, অতএব এই সুযোগে মোচড় দিয়া যতটা সম্ভব সুবিধাজনক সর্ত্ত করিয়া লওয়া হউক,—এইরূপ মনের ভাব কোন সম্প্রদায়ের থাকিতে প্রকৃত স্বরাজ-লাভ হইবে না।

আর-একটা কথা বলিলে আমরা সম্ভবতঃ লোকপ্রিয় হইতে পারিব না, জানিয়াও বলিতেছি। ভারত-শাসক ইংরেজরা এখন যে-ভাবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইতেছেন, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তাহার কারণ এই, যে, তাঁহারা নিজেদের এবং নিজেদের দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন, ভারতীয় জাতির

মঙ্গলকেই প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া কাজ করেন না। আনুষঙ্গিক আর-একটা কারণ এই, যে, প্রধান ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে থাকায় রাষ্ট্রীয় কার্য্য-নির্ব্বাহে যোগ্যতা-অর্জ্জনের সুযোগ ভারতীয়েরা যথেষ্ট-পরিমাণে পায় না। এখন কল্পনা করুন, যে, স্বরাজের আমলে যে-সব ভারতীয় মানুষ শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহক হইবেন, তাঁহারাও যদি বর্ত্তমান ইংরেজ-শাসনকর্ত্তাদের মত স্বার্থপর ও মধ্যে-মধ্যে জুলুম-বাজ ও অত্যাচারী হন, তাহা হইলেও কি সেই ভারতীয় রাজকে ইংরেজ-রাজ অপেক্ষা ভাল বলিতে হইবে? জালিয়ান্‌-ওয়ালাবাগের মত হত্যাকাণ্ড যদি স্বরাজের আমলে হয়, কোহাটের মত নৃশংস অরাজকতা যদি স্বরাজের আমলে হয়, তাহা হইলে কি তদ্রূপ স্বরাজকেও ইংরেজ-রাজ অপেক্ষা ভাল বলিতে হইবে? ইংরেজ-রাজত্ব অপেক্ষা তাহা মন্দ হইবে কি না, সে-প্রশ্নে আমাদের প্রয়োজন নাই; কারণ আমরা এখন উৎকর্ষের অনুসন্ধান করিতেছি, অপকর্ষের নহে। সমুদয় রাষ্ট্রীয় শক্তি কতকগুলি বিদেশীর হাত হইতে কতকগুলি দেশীলোকের হাতে আসিলেই তাহা বাঞ্ছনীয় হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। দেশী রাজ হইলেই তাহা ভাল হইবেই, জোর করিয়া এমন কথা কোন চক্ষুষ্মান্ লোক বলিতে পারেন না। প্রথমে ভারতবর্ষের বাহিরের স্বাধীন দেশগুলির কথা ভাবুন। আগে-আগে ইউরোপ-এসিয়ার স্বাধীন দেশগুলিতে যে-সব অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসের পাতায় তাহা লেখা আছে। **বর্ত্তমান কালেও এবং গণতন্ত্র দেশ-সকলেও** যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকায় ও ইতালীতে, বিনাবিচারে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিতেছে।

তাহার পর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসা যাক্। এখন ভারতবর্ষে যে-সব দেশী রাজ্য আছে, তাহার অনেক-গুলিতে অকথ্য অত্যাচার অদ্যাপিও হইতেছে। ইংরেজের প্ররোচনায় বা প্রশ্রয়ে এইসমস্তই ঘটিতেছে, বলিলে, সত্য কথা বলা হইবে না।

অতীত ইতিহাস দেখুন, নিরপেক্ষভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, হিন্দু, মুসলমান, মরাঠা, শিখ্ সকলের রাজত্ব গিয়াছে যোগ্যতার হ্রাস এবং দুশ্চরিত্রতার ও অত্যাচারের বৃদ্ধির জন্য।

অতএব, আমরা যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান চাই, তেম্‌নি চাই জ্ঞানী যোগ্য চরিত্রবান্ ন্যায়-পরায়ণ ভারতীয়গণের রাজত্ব। গণতন্ত্র নামটি বেশ ভাল। আমরা ঐ নামটি চাই, এবং উহা যাহার বাচক প্রকৃত সেই জিনিষটিও চাই। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, খুব অগ্রসর গণতন্ত্রেও রাষ্ট্রীয় কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার কতকগুলি লোকের হাতে আসিয়া পড়ে, সর্ব্বসাধারণের হাতে থাকে না। সেই লোকগুলি যোগ্য ও খাঁটি হওয়া চাই। আমেরিকার মত বৃহৎ গণতন্ত্র-রাষ্ট্র বর্ত্তমানে কোথাও নাই। কিন্তু সেখানেও বড়-বড় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী লক্ষ-লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়াছে ও সর্ব্বসাধারণের প্রভূত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রাচীন কাহিনী নহে; গত বৎসর ও তাহার আগেকার বৎসরের কথা। সেইজন্য আমরা এরূপ স্বরাজ চাই যাহার প্রধান কর্ম্মীরা হইবেন যোগ্য ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি।

—

খিলাফৎ-প্রচেষ্টা ও অসহযোগ

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, যে, খিলাফৎ-প্রচেষ্টা ও তাহার পরবর্ত্তী অসহযোগ-প্রচেষ্টা তৎ-কাল পর্য্যন্ত নিদ্রালু জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ আনয়ন করে। অসহযোগের সহিত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই জাগরণ আসিয়াছে, ইহা অবশ্যম্ভাবী কার্য্য বলিয়া আমরাও মনে করি।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের দিক্ দিয়া জনসাধারণকে জাগানোর অর্থটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। প্রথমে খিলা-ফৎ-প্রচেষ্টার কথাই ধরা যাউক। ইহার দ্বারা ভারত-বর্ষের মুসলমানদিগকে কিভাবে জাগানো হইল? এইভাবে যে, তাঁহারা মুসলমান এবং জগতের অন্য সকল মুসলমানের তাঁহারা সমধর্ম্মী, এবং খলিফা তাঁহাদের সকলের ধর্ম্মের ও পবিত্র স্থানসকলের রক্ষক। এই খলিফার পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, খিলাফৎ-প্রচেষ্টার পক্ষ হইতে তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছিল। এইজন্য মুসলমান জন-সাধারণের স্বধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করা হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহাদের জাগিয়া উঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই জাগরণ

দ্বারা জাগিল কি এবং কে ? মুসলমানদিগের মুসলমানত্বকেই ইহার দ্বারা জাগানো হইল ; তাঁহাদের মধ্যে সুপ্ত মুসলমানই জাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয়ত্বকে ইহার দ্বারা জাগানো হয় নাই,জাগাইবার চেষ্টাও করা হয় নাই ; মুসলমানদের মধ্যে যাহাকে ভারতীয় ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে, তাহার জাগরণ ইহার দ্বারা হয় নাই। অপ্রধানভাবে তাহা কিয়ৎপরিমাণে ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মূলতঃ ও প্রধানতঃ সেরূপ কিছু ঘটে নাই। অর্থাৎ খিলাফৎ-প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বোধটাই প্রধানতঃ সুস্পষ্ট হয় নাই, যে, তাঁহারা ভারতীয় ; পরন্তু এই বোধই সুস্পষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহারা জগতের নানা মুসলমান-সমষ্টির মধ্যে অন্যতম।

হিন্দুগণ যে মুসলমানদিগের সহিত খিলাফৎ-প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছিলেন, তাহাও ভারতীয়ত্বের দিক্ দিয়া নহে। কারণ খিলাফৎ লোপ পাওয়া-না-পাওয়া বিশেষভাবে একটি ভারতীয় প্রশ্ন বা সমস্যা কোন কালে ছিল না, এখনও নাই ; তাহার প্রমাণ এই, যে, এখন যে খিলাফৎ লুপ্ত অবস্থায় আছে, তাহাতে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতেছে না। সেইজন্যই বলিতেছি, যে, হিন্দুগণ যে খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা এই কারণে নহে, যে, খিলাফৎ না থাকিলে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভারতীয়দিগকে, অতএব হিন্দু ভারতীয়দিগকেও, ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইতে হইবে। হিন্দুদিগকে যে কারণ দেখাইয়া খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ-দিতে প্রবৃত্ত করা হইয়াছিল, তাহা এই, যে, খলিফার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিয়া মুসলমানদিগের ধর্ম্মাচরণের স্বাধীন অধিকারে যেমন হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, তেম্নি হিন্দুরও ধর্ম্মাচরণের স্বাধীন অধিকারে ইংরেজ-জাতি হস্তক্ষেপ করিতে পারে ; অতএব এখন মুসলমানদিগকে হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অধিকার রক্ষায় সাহায্য করুন, প্রয়োজনের সময় মুসলমানও হিন্দুর ধর্ম্মাধিকার-রক্ষায় সাহায্য করিবেন। এই যুক্তিটা সর্ব্বজনসহজবোধ্য স্থূল-রকমের নহে। এইজন্য, সহজ একটা যুক্তিও প্রযুক্ত হইয়াছিল। মহাত্মাজি বারবার বলিয়াছেন, যে, (যদিও যখন হিন্দুদিগকে খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিতে প্রবৃত্ত করা হয়, তখন মুসলমানদিগের সহিত এরূপ কোন সর্ত্ত করা হয় নাই, যে, তাঁহারা ইহার বিনিময়ে গো-হত্যা হইতে বিরত থাকিবেন,) হিন্দুরা মুসলমানদের কামধেনু খিলাফৎ-রক্ষায় তাঁহাদের সহায় হইলেন, অতএব মুসলমানরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুদের গাভী রক্ষা করিবেন, এইরূপ আশা ছিল।

অতএব, দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই স্ব-স্ব ধর্ম্মমতের দিক্ দিয়াই জাগিয়াছিলেন ; তাঁহাদের নিজ নিজ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্বের দিক্ দিয়া তাঁহারা জাগেন নাই। ইহা বুঝা খুব সহজ, যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক নিজ-নিজ ধর্ম্মমতের আধ্যাত্মিক ও সাত্ত্বিক অংশ অপেক্ষা উহার বাহ্য অনুষ্ঠান, লোকাচার প্রভৃতি অংশের সহিতই অধিক পরিচিত। প্রধানতঃ উহাকেই তাহারা তাহাদের ধর্ম্মমত বলিয়া জানে। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হইলে তাহারা এইসব বাহিরের জিনিষের দিকেই বেশী মন দেয়। এইসব অবান্তর বাহিরের জিনিষকে ধর্ম্মের সার অংশ মনে করাকেই সোজা ভাষায় গোঁড়ামি বলে।

মহাত্মাজি দুঃখের সহিত বলিতেছেন, "Interested persons······are trading upon the religious bigotry or the selfishness of both the communities", "মৎলবী লোকেরা উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গোঁড়ামি ও স্বার্থপরতার সাহায্যে নিজ-নিজ বৈষয়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে।" কিন্তু তিনি বুঝিতেছেন না, বা ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, তিনি যেরূপ বীজ বপন করিয়াছিলেন, তদনুরূপ ফসল সংগৃহীত হইতেছে। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিই জাগানো হইয়াছিল, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সাধারণ ভারতীয়ত্ব বা সামাজিকতা ত জাগানো হয় নাই। সুতরাং এখন যে মৎলবী লোকেরা এই উদ্বুদ্ধ গোঁড়ামির সাহায্যে নিজ-নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছে, তাহাতে বিস্মিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্য মহাত্মাজি বা অন্য কেহ ইচ্ছা করিয়া জ্ঞাতসারে গোঁড়ামির আগুন জ্বালিয়াছেন, ইহা সত্য নহে ; কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের বুদ্ধি-বিবেচনার দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে, ইহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

মহাত্মাজি বলিতেছেন, "Religion has been travestied," অর্থাৎ ধর্ম্মের আসল অংশের জায়গায় বাজে জিনিষকেই ধর্ম্মের সার অংশ বলিয়া ঘোষণা করা এবং তদনুসারে কাজ করা হইয়াছে। এইরূপ দুঃখ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কাজের ফলেই সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি জাগিয়াছে, এবং গোঁড়ামি যে অবান্তর ও আনুষঙ্গিক জিনিষকে সার পদার্থ মনে করে, তাহা সর্ব্বত্র সুবিদিত।

—

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর সম্বন্ধ

মহাত্মাজি বলিতেছেন, যে, খুব বেশী-সংখ্যক মুসলমান-দের মধ্যে অল্প সংখ্যক হিন্দু এবং খুব বেশী সংখ্যক হিন্দুর মধ্যে অল্প-সংখ্যক মুসলমান নির্ব্বিঘ্নে ও আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া বাস করিতে পারে, যদি মুসলমানরা হিন্দুদিগকে ও হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বন্ধু ও সমান বলিয়া গ্রহণ করিতে ও তদ্রূপ আচরণ করিতে ইচ্ছুক হয়; অন্য কোন সর্ত্তে বা অবস্থায় ইহা সম্ভব নহে। ইহা অতি সত্য কথা।

কিন্তু সর্ব্ববিধ শাস্ত্রাচার, লোকাচার ও দেশাচারে নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমান, কোন সম্প্রদায়ই "জাগ্রত" অবস্থায় অপর সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নিজেদের বন্ধু বা সমান মনে করেন না, করিতে পারেন না। "জাগ্রত" গোঁড়া মুসলমান হিন্দুকে কাফের বুৎপরস্ত, বিজিত গোলামের জাতি মনে করিয়া অবজ্ঞা করিবেন, বিদ্বেষের চক্ষেও দেখিতে পারেন, "জাগ্রত" গোঁড়া হিন্দু মুসলমানকে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় স্বাধীনতানাশী ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন, বিদ্বেষের চক্ষেও দেখিতে পারেন। গোঁড়ামি বিনষ্ট না হইলে "জাগ্রত" হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে বন্ধু ও সমান মনে করিতে পারেন না। ইহা অপ্রিয় সত্য, কিন্তু খাঁটি-সত্য। পাহারাওয়ালার ভয়ে, সামাজিকতার খাতিরে, বা এতদ্বিধ অন্য কারণে, "জাগ্রত" গোঁড়ারা পরস্পরের পার্থক্যসহিষ্ণু হইয়া সাধারণতঃ শান্তিতে বাস করিতে পারে; কিন্তু যখন এই কারণগুলি থাকে না, কিম্বা উত্তেজনাবশতঃ উহাদের প্রভাব লুপ্ত হয়, তখন উভয় সম্প্রদায়ের "জাগ্রত" গোঁড়ামি নিজ-নিজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। অতএব যাঁহারা হিন্দু মুসলমানের খাঁটি, আন্তরিক, ও স্থায়ী সদ্ভাব ও মিলন চান, তাঁহারা গোঁড়ামির বিনাশ যাহাতে হয় সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহার উপায় অনুসন্ধান ও অবলম্বন করুন। খৃষ্টীয় জগতে আগে গোঁড়া খৃষ্টিয়ানেরা ধর্ম্ম-মতের পার্থক্যের জন্য মানুষকে খোঁটায়, লোহার শিকলে বাঁধিয়া পুড়াইয়া মারিত, ফুটন্ত তেলের কড়ায় ভাজিত, এবং আরও নানা রকমে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা করিত। এখন তাহা করে না। এই পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করা সহজ। সেই কারণ আমাদের দেশে বিদ্যমান থাকিয়া তাহার স্বাভাবিক ফল উৎপাদন করিলেই গোঁড়ামি তিরোহিত হইবে।

—

আমাদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য

মহাত্মাজি ঠিকই বলিয়াছেন, যে, যত শীঘ্র সম্ভব সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত প্রতিনিধিনির্ব্বাচন-প্রথা দূর করিয়া, সম্মিলিতভাবে সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোক-দের দ্বারা যোগ্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সরকারী চাকরীও, তাঁহার মতে সম্প্রদায় বা শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে, যোগ্যতম পুরুষ ও নারীদেরই পাওয়া উচিত। তিনি বলেন, যে, সেই লক্ষ্যস্থলে যতদিন পৌঁছা না যাইতেছে, যতদিন সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যা-আদি দূর না হইতেছে, ততদিন সংখ্যায় ন্যূন সন্দিগ্ধচিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের অভিলাষ-অনুসারে কাজ করিতে হইবে, এবং সংখ্যায় যাঁহারা বেশী তাঁহা-দিগকে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। এই মত যুক্তি-সঙ্গত।

ইহার উপর আর-কয়েকটা কথা যোগ করা দরকার। যাহাতে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত নির্ব্বাচন এবং সাম্প্র-দায়িক হিসাবে সরকারী পদ-বণ্টন কোন-একটা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে রহিত হইয়া সম্প্রদায় ও শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতম লোকের দ্বারাই সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয়-কার্য্য সম্পাদনের আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ইহা কেবল সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ-

ত্যাগের কথা হইলে, এ-কথা বলিবার তত প্রয়োজন হইত না। কিন্তু কেবল যোগ্যতমের দ্বারাই কার্য্যনির্ব্বাহের নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন রাষ্ট্র সম্যক্‌রূপে সুপরিচালিত, উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারে না; সমগ্র জাতির সকল সম্প্রদায়ের বা কোন সম্প্রদায়েরই লোকদের হিতও সাধিত হইতে পারে না। এই কারণে আমরা লক্ষ্যস্থলে যথাসম্ভব শীঘ্র উপনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক মনে করি।

আপাততঃ সংখ্যাভূয়িষ্ঠদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, এই নীতির প্রয়োগও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে হওয়া আবশ্যক। সমগ্র ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ; অতএব সমগ্র-ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, ইহা ঠিক্ কথা। তেম্‌নি বাংলা ও পঞ্জাব ছাড়া অন্য সকল প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী। অতএব ঐসব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাতে হিন্দুদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, ইহাও ঠিক্ কথা। এই নিয়ম-অনুসারে পঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়া ঐ দুই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহারা রাজী না হইলে, মহাত্মাজি নীতিটি যে-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে বলা উচিত, যে, হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী হউক বা কম হউক, সমগ্রভারতীয় ব্যাপারে এবং প্রত্যেক প্রদেশের ব্যাপারে তাহাদিগকেই স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; সংখ্যায় বেশী হওয়ার সুবিধা তাহারা কোথাও পাইবে না, এবং যেখানে-যেখানে তাহারা সংখ্যায় কম সেখানেও সংখ্যা কম বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিবেচনা হইবে না। নীতিটি এইরূপ ভাষায় ব্যক্ত করিলে বড় কদর্য্য শুনাইবে বটে; কিন্তু সুশ্রাব্য মিথ্যা অপেক্ষা কর্কশ সত্য পরিণামে মঙ্গলকর।

—

অস্পৃশ্যতা

অস্পৃশ্যতা-সম্বন্ধে গান্ধী-মহাশয় যাহা-যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব খাঁটি কথা। অবনমিত ও দলিত জাতিদিগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে তিনি হিন্দুদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে "উচ্চ" জাতির হিন্দুরা প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অস্পৃশ্যতা দূর করিতে বাধ্য। "শুদ্ধি" অবনমিত জাতিদের আবশ্যক নাই, "উচ্চ" জাতিদেরই দর্‌কার, তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, কোন পাপ, দুশ্চরিত্রতা, এমন-কি নোংরামি ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বাসও, অবনমিত জাতিদের বিশেষত্ব নহে। "আমাদের 'শ্রেষ্ঠ' জাতিদের অহঙ্কার আমাদিগকে নিজেদের দোষত্রুটি-সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং অবনমিত জাতিদের দোষ খুব বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত করিয়াছে।" "আমাদের বর্ত্তমান দাসত্ব কতকগুলি জাতিকে অস্পৃশ্য করার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল।" "আমরা স্বরাজ পাই বা না পাই, হিন্দুদিগকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে।" মহাত্মাজির এইসব এবং আরো অনেক সত্য কথা, যে, গোঁড়া-হিন্দু অনেকের ভাল লাগে নাই, তাহার প্রমাণ বোম্বাইয়ের গোঁড়াদের সেদিনকার সভা যাহাতে গান্ধী-মহাশয়কে ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড বলা হয়, এবং তাঁহার মতাবলম্বী অনেককে যে অনেক গোঁড়া হিন্দু লিঞ্চ করিতে প্রস্তুত তাহাও বলা হয়। লিঞ্চ কথাটার মানে, আমেরিকায় নিগ্রোদিগকে যেমন কখন-কখন শ্বেতজনতা বিনাবিচারে পুড়াইয়া মারে বা গাছের ডালে বা রাস্তার আলোর খুঁটিতে লটকাইয়া দেয়, সেইরূপ করিয়া বধ করা। গোঁড়ামির হ্রাসের দর্‌কার যে বলিয়াছি, তাহা ঠিক্ কি না, ঐ-সভার বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

—

পৌর অধিকার

মহাত্মাজি স্বরাজের মূল বিধি নির্দ্দেশকল্পে যে-সব সঙ্কেত দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বলিয়াছেন, যে, যাহারা দৈহিক শ্রম করে, কেবল তাহাদিগকেই পৌর অধিকার (franchise) দিলে ভাল হয়। তাহা হইলে তাঁহার মতে যাহারা-যাহারা রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনায় ও দেশহিতসাধনে যোগ দিতে চায়, সকলকেই তাহার সুযোগ দেওয়া হয়। আমরা দৈহিক শ্রমজীবীদিগকে রাষ্ট্রীয় কোন অধিকার

হইতে বঞ্চিত করিতে চাহি না। কিন্তু কেবল তাহাদিগকেই পৌর অধিকার দেওয়া চউক, এই নীতিতেও সায় দিতে পারি না। দু'খানা হাতের সাহায্যে যে শ্রম করা যায়, তা ছাড়া অন্তবিধ সব শ্রম, যেমন মানসিক শ্রম, মূল্যহীন, ইহা সত্য কথা নহে। সত্য বটে, যে, দৈহিক শ্রমকে এপর্য্যন্ত প্রায় সকল দেশেই অন্যায়রূপে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। তাহার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্যই আবশ্যক। কিন্তু তা বলিয়া বুদ্ধি চালনা, মানসিক শ্রম অবজ্ঞেয়, ইহাই বা কেমন করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? মহাত্মা গান্ধী যে এরূপ পূজনীয় নেতা হইয়াছেন, তাহা কি চর্‌খা ঘুরাইবার দৈহিক শ্রমের জোরে? কখনই না। তাঁহা অপেক্ষা ভাল সূতা কাটিতে, বেশীক্ষণ সূতা কাটিতে, মাটি কাটিতে, কাঠ কাটিতে, হাতুড়ি পিটিতে, মোট বহিতে, কাঠ চিরিতে, পাথর ভাঙিতে, গম পিষিতে, ঘানি টানিতে পারে লক্ষ-লক্ষ লোক। কিন্তু তাহারা দেশনায়ক ও দেশপূজ্য না হইয়া তিনি কেন হইলেন? তাহাদের ব্যবস্থা ও বাণী কংগ্রেসে ত শ্রুতও হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা ও বাণী শিরোধার্য্য হইতেছে। তাহার কারণ এই, যে, দৈহিক শ্রম, অবজ্ঞেয় না হইলেও, উহা মানসিক শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনা অপেক্ষা নিম্নস্তরের জিনিষ। দৈহিক শ্রমের কত-কত কাজ মানসিক শ্রমের দ্বারা উদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারাই হইতেছে; কিন্তু কোন কল এপর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় বিধি রচনা করিতে পারে নাই, বিচার করিতে পারে নাই, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস রচনা কোন যন্ত্রের দ্বারা হয় নাই। ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, যে, দৈহিক শ্রম, আবশ্যক হইলেও, নিম্নপর্য্যায়ের জিনিষ। দৈহিক শ্রমের সাহায্যে অনেক কাজ হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধিমানের জ্ঞানবানের পরিচালনা ব্যতিরেকে শুধু দৈহিক শ্রম মহৎ ও স্থায়ী কিছু করিতে পারে নাই, পারিবে না। ইহার দ্বারাও দৈহিক শ্রম ও মানসিক শ্রমের স্থান বুঝা যায়। বস্তুতঃ আত্মার হৃদয়ের মনের সহিত কোন যোগ না রাখিয়া, স্বতন্ত্রভাবে কেবল দৈহিক শ্রমকেই প্রাধান্য দিয়া তাহাই পৌর অধিকার পাইবার একমাত্র যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট হইলে, ষ্টীম্ এঞ্জিন্, প্রভৃতিও কেন যে উক্ত অধিকার পাইবে না, বুঝা কঠিন। কারণ, ষ্টীম্ এঞ্জিন্ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী বাহ্য কাজ করিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনের ও দেশহিতসাধনের সকলে যাহাতে সুযোগ পায়, তাহার জন্যই গান্ধী-মহাশয় দৈহিক শ্রমজীবীদিগকে পৌর অধিকার দিতে চাহিয়াছেন। তাহারা দৈহিক শ্রম করে বলিয়াই দেশের কাজ করিতে ও হিত সাধিতে অসমর্থ, ইহা আমরা মনে করি না। কিন্তু ইহা অবশ্যই মনে করি, যে, রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনের ও লোকহিতসাধনের জন্য নানাবিধ জ্ঞানের এবং মার্জ্জিত ও শিক্ষিত বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োজন। এই গুণগুলি দৈহিক শ্রমজীবীদের একচেটিয়া, মানসিক শ্রমীদের নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। বরং ইহাই সত্য, যে, এই গুণগুলি অর্জ্জন করিতে হইলে তদনুরূপ পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন, এবং এই পরিশ্রম ও সাধনা সকল দৈহিক শ্রমিক করে না; কেহ-কেহ করে। মানসিক শ্রমী ও বুদ্ধিজীবী লোকদের মধ্যে তাহা শতকরা অধিক লোকে করে। সেইজন্য আমরা বলি, মহাত্মা গান্ধী দৈহিক শ্রমের মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠার ও প্রচলনের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করুন, কিন্তু অন্যবিধ শ্রম ও সাধনাকে তাহার ন্যায্য পাওনা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা যেন তিনি না করেন। সে-চেষ্টায় কুফল ফলিবে এবং তাহা ব্যর্থ হইবে।

—

স্বরাজের আমলের দেশভাষা

গান্ধীজি বলেন, স্বরাজী আমলে ভারতবর্ষ প্রধান-প্রধান ভাষা-অনুসারে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হইবে। যে-প্রদেশের যাহা প্রধান বা একমাত্র ভাষা, তথাকার সর্‌কারী কাজ সেই ভাষায় নির্ব্বাহিত হইবে। সমগ্র ভারতীয় কাজ হিন্দুস্থানী ভাষায় নির্ব্বাহিত হইবে, এবং উহা নাগরী ও ফার্‌সী এই উভয় অক্ষরে লিখিত হইবে। আন্তর্জ্জাতিক কাজের জন্য অর্থাৎ বিদেশের সহিত রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক পত্র ব্যবহারাদির জন্য ইংরেজী ব্যবহৃত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, খুব লায়েক স্বরাজ্য

হইতে হইলে অন্ততঃ তিনটি ভাষা জানিতে হইবে এবং চারিপ্রকার অক্ষর লিখিতে-পড়িতে সমর্থ হইতে হইবে। ইহা গুরুতর বোঝা।

আজকাল অনেক স্বাধীন জাতিও নিজেদের ভাষা ছাড়া ইংরেজী শিখিতেছে ও ব্যবহার করিতেছে। উহা অন্যতম জগদ্ব্যাপী ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয়, যে, আমাদের অনেকের ইংরেজীর প্রতি বিরাগের কারণ এই, যে, উহা আমাদের পরাধীনতার চিহ্ন। আমরা স্বাধীন হইলে উহার যথাপ্রয়োজন ব্যবহারে আর অপমান বোধ হইবে না। তখন অন্য স্বাধীন জাতিদের মত আমরা উহা আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতে পারিব। তাহা হইলে আমাদের ন্যূনকল্পে দুইটা ভাষা শিখিলেই চলিবে।

স্বাধীনতা ও পরস্পরাধীনতা

গান্ধী-মহাশয় বলেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও লক্ষ্য স্বাধীনতা বা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স না হইয়া পরস্পরাধীনতা বা ইণ্টারডিপেণ্ডেন্স হওয়া উচিত। কিন্তু পরস্পর-নির্ভরতার আগে স্বাধীনতা পাওয়া দরকার নহে কি? আর দশটা স্বাধীন জাতির সঙ্গে আমাদের যে মানবীয় সাদৃশ্য আছে, ইংরেজদের সঙ্গে তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য নাই। সুতরাং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের পক্ষেও যে তাহা স্বাভাবিক, ইহা অস্বীকার্য্য। যদি পরস্পর-নির্ভরতাই লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমেরিকা বা জাপান বা ফ্রান্সের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ না হইয়া কেবল ব্রিটেনের সঙ্গেই কেন হইবে বুঝিতে পারি না।

গান্ধী-মহাশয় ব্রিটেনের সঙ্গে সমান অংশিত্বের কথা বলিয়াছেন। সমান কথাটার মানে কি? আমরা এখন না হয় অনুন্নত দুর্ব্বল পরাধীন আছি। কিন্তু উন্নত শক্তিশালী আত্মকর্তৃত্ব-বিশিষ্ট বত্রিশকোটি ভারতীয় যদি সাড়ে চারি কোটি ইংরেজের সঙ্গে একই জাতি-গোষ্ঠীতে থাকে, তাহা হইলে ঐ জাতি-গোষ্ঠীর একটা সাধারণ পার্লেমেণ্ট বা ব্যবস্থাপক সভায় ইংরেজদের যত প্রতিনিধি থাকিবে, আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহার সাতগুণ হওয়া চাই। নতুবা সাম্য হইবে না। ইংরেজ কখনও ইহাতে রাজী হইবে কি? খুব সম্ভবতঃ রাজী হইবে না। যদি না হয়, তাহা হইলে সমান অংশিত্ব কেমন করিয়া হইবে?

যাহা হউক, ইহা হইল দূরের কথা। ইহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করা এখন শক্তিক্ষয়মাত্র। মহাত্মা গান্ধী কথাটা তুলিয়াছেন বলিয়াই দু'চার কথা বলিলাম। নতুবা এখন আমাদের উচিত, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে সমবেতভাবে জাতীয় কর্তৃত্ব-লাভের চেষ্টা করা। তাহা লব্ধ হইলে, তাহাতেই চিরকালের জন্য আবদ্ধ থাকিতে কেহ আমাদিগকে বাধ্য করিতে পারিবে না। আমরা তখন স্বাধীনতা বা পরস্পর-নির্ভরতা, যাহা ইচ্ছা, তাহারই চেষ্টা করিতে পারিব।

স্বরাজ-দল ও অন্যান্য দল

মহাত্মা গান্ধীর মতে স্বরাজ-দলকে কংগ্রেসে অন্য দলের সঙ্গে সমান পদবী দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মতে স্বরাজদলকে প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা করা হইয়াছে। কংগ্রেসের নাম ও ক্ষমতা ব্যবহার স্বরাজীরাই ব্যবস্থাপক-সভাসকলে করিতে পারিবেন, এই মীমাংসা গান্ধীজির মতে অনিবার্য্য হইয়াছিল। আমরা বলি, তাহা নহে। কংগ্রেস্ কৌন্সিলে প্রবেশ ও তাহার কার্য্য-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ও উদাসীন, এইমত প্রকাশ করিলে লিবারেল্, ন্যাশন্যালিষ্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, স্বরাজী সকল দলেরই কংগ্রেসে যোগ দিবার সুবিধা হইত, এবং কেহ ইচ্ছা করিলে কৌন্সিলে প্রবেশ করিয়া তথায় কাজ করিবার বাধাও হইত না। এখন কৌন্সিলে স্বরাজীদের কর্ম্মনীতি বা পলিসিকেই কংগ্রেসের পলিসি বলিয়া স্বীকার করায় লিবারেল্ প্রভৃতি দলকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় পরোক্ষভাবে বাধা দেওয়াই হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের কৌন্সিল্-নীতিকে কংগ্রেস্ আমল দিতেছেন না। অবশ্য কৌন্সিলে লিবারেল্ প্রভৃতিরা স্বরাজীদের সহিত কোন রফা বা চুক্তি করিতে পারেন। কিন্তু তাহা স্বরাজীদের মর্জ্জির উপর নির্ভর

করে। কাহারও মর্জ্জির উপর নির্ভর করায় লাঘব হয়, এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

—

জাতীয় বিদ্যা-মন্দিরসমূহ

কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে দেখিলাম খদ্দরের পরেই জাতীয় বিদ্যা-মন্দিরসকলের পরিচালনায় কংগ্রেস্ সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বাংলাদেশে কংগ্রেস্ খদ্দরের জন্ম বিশেষ কিছু করেন নাই, জাতীয় বিদ্যাপীঠেরও তিরোভাব হইয়াছে; জাতীয় বিদ্যালয় কয়েকটি স্থানে-স্থানে এখনও আছে। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা হয়ত বাংলা দেশ অপেক্ষা ভাল।

গুজরাতের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হয়। ইহার অধীনে তিনটি কলেজ, সত্তরটি স্কুল এবং নয় হাজার ছাত্র আছে। ইহা আহ্মদাবাদে নিজের জমি কিনিয়াছে এবং ২,০৫,৩২৩ টাকা ইমারতে খরচ করিয়াছে। ইহা সুসংবাদ।

সরকারের জানিত ইস্কুল-কলেজগুলি-সম্বন্ধে গান্ধী-মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে তাঁহার পুরাতন মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—"আমাদের দা.. শৃঙ্খলের প্রথম পর্ব্ব এইসব বিদ্যালয়েই গড়া হয়।" তাহার এই মতের সম্পূর্ণ সত্যতা আমরা কখন উপলব্ধি করিতে পারি নাই, এখনও পারিতেছি না। তাহার কারণ বোধ হয় আমাদের "দাসমনোভাব"। এই মতের সমালোচনা আগে অনেক করিয়াছি। আর করা আবশ্যক মনে করিতেছি না।

—

জাতীয় বিদ্যাশালার আদর্শ

মহাত্মা গান্ধী বলেন, জাতীয় বিদ্যা-মন্দিরগুলিকে হিন্দু মুসলমানের মিলনের ক্লাব-স্বরূপ হইতে হইবে, এবং তৎসমুদয়ে হিন্দু বালক-বালিকাদিগকে অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুত্বের কলঙ্ক এবং মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখাইতে হইবে। যে জাতীয় বিদ্যালয় অহিন্দু ছাত্রকে ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে উদাসীন বা অস্পৃশ্য ছাত্রদিগকে ঢুকিতে দিবে না, তাহা উঠাইয়া দিতে গান্ধী-মহাশয় কোন দ্বিধা বোধ করিবেন না।

এই আদর্শ-অনুসারে কাজ হইলে ভাল; বর্ত্তমানে হয় কি না জানি না। শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আদর্শও অভিভাষণে বিবৃত হইয়াছে, যথা :—

এই বিদ্যালয়গুলিতে সুদক্ষ সূতাকাটুনি ও তন্তুবায় তৈরী হইবে। চর্‌খার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এইসব বিদ্যালয় জোগাইবে। তাহারা খদ্দর-উৎপাদনের কার্‌খানাও হইবে। "ইহার অর্থ ইহা নহে, যে, এগুলিতে বালক-বালিকারা কোন লিখন-পঠন-বিষয়ক শিক্ষা পাইবে না। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই এই মত পোষণ করি, যে, হাত ও হৃদয়ের শিক্ষা, বুদ্ধির শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে চলিবে। কোন জাতীয় স্কুল বা কলেজের উৎকর্ষ ও ফলদায়কতা উহার ছাত্রদের বিদ্যাবত্তার চমকপ্রদতা দ্বারা মাপা হইবে না,—মাপা হইবে জাতীয় চরিত্রবল দ্বারা এবং তুলা-ধুনা, সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনার দক্ষতার দ্বারা।"

সরকারের জানিত স্কুল-কলেজসকলে সাধারণতঃ কোন-রকম কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয় না, হাতের দক্ষতা তথায় সাধারণতঃ অর্জ্জিত হয় না; সুতরাং এদিকে জাতীয় শিক্ষালয়সকলের ঝোঁক বেশী থাকিলে তাহার দ্বারা মঙ্গলই হইবে

মহাত্মা গান্ধী সর্‌কারী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে, স্কুল-কলেজগুলিকে মন্দ মনে করেন ও গোলাম বানাইবার কার্‌খানা বিবেচনা করেন। সেই কারণে ইহা আশা করা অন্যায় হইবে না, যে, তাঁহার আদর্শ-অনুযায়ী শিক্ষা-মন্দিরসকলে জাতীয় সর্ব্ববিধ শিক্ষার অভাব মোচনের চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাঁহার আদর্শ যেরূপ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, তাহাতে দেখা যাইতেছে, যে, জাতীয় বিদ্যাপীঠে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন কোন শিক্ষা পাওয়া তিনি দর্‌কার মনে করেন না, যাহাতে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ললিতকলাদক্ষ, সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি হইতে পারে। তিনি নিজে যাহা হইয়াছেন, বাল্যকালাবধি কেবল তাঁহার আদর্শ-অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইলে তিনি তাহা হইতে পারিতেন না, আমাদের ধারণা এইরূপ।

তিনি যে রুশীয় লেখক টলষ্টয়ের নিকট এত ঋণী, মহাত্মাজির আদর্শ-অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া সেই টলষ্টয়ও টলষ্টয় হইতে পারিতেন না। গোস্বামী তুলসীদাসের ভজন প্রভৃতি মহাত্মাজি যে এত ভালবাসেন, সেই তুলসীদাসও মহাত্মাজির আদর্শ-অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইলে তুলসীদাস হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস শুক্রাচার্য্য চাণক্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতির শিক্ষার স্থান মহাত্মাজির আদর্শ-অনুযায়ী ছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাই মানুষের মানুষ হওয়ার একমাত্র কারণ নহে। সম্পূর্ণ "অশিক্ষিত" নিরক্ষর মহৎ লোকের অভাব ইতিহাসে নাই। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যাহা ঘটে, তাহার কথাই বলিতেছি।

—

মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার-নিবারণ

গান্ধী-মহাশয় মদ, আফিং প্রভৃতি ব্যবহারের এবং উহার ব্যবসার বিরোধী। ইহার উচ্ছেদ তিনি চান। ইহা তাঁহার মত সাধু ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক ইচ্ছা।

তিনি বলিতেছেন, "আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে, যে, স্বরাজলাভের পূর্ব্বে আমরা এইসব অমঙ্গলের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিব না।" মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার ও ব্যবসায় বন্ধ করা যে-পরিমাণে সরকারী চেষ্টার উপর নির্ভর করে, সেইপরিমাণে মহাত্মাজির কথা ঠিক্ বলিয়াই মনে হয়। অথচ মদ্যপান হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। উহা ছাড়িবার জন্য অতিরিক্ত কোন ব্যয় করিতে হয় না, কোন পরিশ্রমও করিতে হয় না। বরং ছাড়িলে কিছু টাকা বাঁচে, এবং উপার্জ্জনাদির জন্য পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা বাড়ে, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ ঘটে। সুতরাং স্বরাজ লাভ করিবার পূর্ব্বেও মাদক-দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা-সম্বন্ধে নানা উপায়ে জ্ঞান-দানদ্বারা এবং চরিত্রবান্ লোকদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। এক-সময়ে মহাত্মাজির প্রভাবেই এ-বিষয়ে অনেক সুফল ফলিয়াছিল।

খদ্দর উৎপাদন করিতে পরিশ্রম করিতে হইবে, উহা ক্রয় করিতে হইলে অধিক অর্থব্যয় করিতে হইবে, অন্য-প্রকার বস্ত্র বর্জ্জন করিবার বিধি কোন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে নাই; তথাপি মহাত্মাজি আশা করেন, যে, খদ্দরের প্রচলন হইবে।

এক ক্ষেত্রে মহাত্মাজির আশাশীলতার অভাব এবং অন্য ক্ষেত্রে খুব আশাশীলতা লক্ষিত হইতেছে। খদ্দর উৎপাদন ও প্রচলনের দিকে মহাত্মাজির মনের খুব বেশী ঝোঁক্ আছে। মাদক-দ্রব্য-ব্যবহার বন্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে-দিকে ততটা ঝোঁক্ নাই; স্বরাজলাভের পক্ষে উহা তিনি একান্ত আবশ্যক মনে করেন না। উভয় ক্ষেত্রে আশাশীলতার পার্থক্যের সম্ভবতঃ ইহাই প্রধান কারণ। কিন্তু স্বরাজকে শুধু একটা বাহিরের বন্দোবস্ত মনে না করিয়া, যদি ইহা মনে রাখা হয়, যে, আত্মজয়, নিজের সকল প্রবৃত্তির ও শক্তির উপর প্রভুত্ব, "স্ব"-রাজের প্রকৃত ভিত্তি ও সার অংশ, তাহা হইলে দেখা যাইবে, মাদক-দ্রব্য-ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হওয়া খদ্দর-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা স্বরাজের জন্য বহুগুণে অধিক আবশ্যক।

—

সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা

কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠনমূলক অনুষ্ঠেয় কার্য্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেসকে এখন একটা সমাজ-সংস্কার-সমিতিতে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার উত্তরে মহাত্মাজি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "আমার এবিষয়ে মত ভিন্ন-রকম। যাহা-কিছু স্বরাজের জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা কেবল সামাজিক কাজ নহে, তদতিরিক্ত আরো-কিছু, এবং সেইজন্য কংগ্রেসকে তাহা করিতে হইবে।" গান্ধী মহাশয় যতটুকু বলিয়াছেন, তাহা সত্য কথা; কিন্তু তিনি আরও কিছু বলিয়া ইহা অপেক্ষাও ভাল জবাব দিতে পারিতেন। সমাজ-সংস্কার-সমিতি যাহা-কিছু করিতে চান, তাহার কোনটাই রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জ্জনের ও তদ্দারা স্বরাজলাভের পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এ-বিষয়ে একাধিক দীর্ঘ প্রবন্ধ

লেখা যাইতে পারে। আমরা এখন সংক্ষেপে দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিব।

রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভ করিতে ও বাড়াইতে হইলে জাতীয় একতা চাই। তদ্ব্যতিরেকে স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। সেই কারণে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার প্রয়োজন গোঁড়া অনেক লোকও অনুভব করিতেছেন। কিন্তু শুধু এইখানে থামিলেই একতা লব্ধ হইবে না। দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ মহারাষ্ট্র ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে, অ-ব্রাহ্মণ প্রচেষ্টার কারণ, জাতিভেদের প্রকোপ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব। সেইজন্য ঐসব অঞ্চলে অ-ব্রাহ্মণ-প্রচেষ্টার নেতা ও কর্ম্মীরা "অ-ব্রাহ্মণ" কথাটির অর্থ ব্রাহ্মণ-ছাড়া হিন্দু ও অ-হিন্দু আর সবাই, এইরূপ করিয়া, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, পারসী, প্রভৃতিকেও আপনাদের দলে টানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন;—ব্রাহ্মণদের উপর তাঁহাদের এতই রাগ। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, জাতিভেদ-সম্বন্ধে সমাজ-সংস্কার না হইলে জাতীয় একতা লব্ধ হইবে না।

সতেজ জাতীয় জীবন লাভ ও রক্ষার পক্ষে নারীদের অবরোধ অর্থাৎ পর্দ্দা-প্রথার উচ্ছেদ যে একান্ত আবশ্যক, তুরস্কে পর্দ্দার উচ্ছেদ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন স্থান ও সময়ের অভাবে এ-বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতে বিরত থাকিলাম।

রাষ্ট্রীয় শক্তি-অর্জ্জন এবং স্বরাজলাভের জন্য যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা আবশ্যক, তাহা হয়ত অনেকে কল্পনাও করেন না। অবশ্য বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা অন্য নানাকারণেও আবশ্যক, তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বরাজের সহিত ইহার পরোক্ষ সম্পর্ক বুঝিবার জন্য একটা সামান্য কথা বলিতেছি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্বরাজলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথে একটি প্রধান বাধা মুসলমান সমাজের দুশ্চরিত্র লোকদের দ্বারা হিন্দু-নারীর উপর অত্যাচার। সধবা হিন্দুনারীর উপর দুর্বৃত্ত লোকেরা অত্যাচার করে না, এমন নয়; কিন্তু যদি কেহ অত্যাচারিতাদিগের পূর্ণ তালিকা ও পরিচয় সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে বাল-বিধবাদের সংখ্যাই বেশী। অতএব, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে অত্যাচারিতার সংখ্যা কতক কমিবে, হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্যের কারণ কতকটা দূর হইবে, এবং ফলে সদ্ভাবের ও একতার অন্তরায় কিছু কমিবে, আশা করা যাইতে পারে।

—

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশী বৎসরের অধিক বয়সে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গের প্রাচীনতম সমাজসেবকের তিরোভাব ঘটিল। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রাচীন সভ্য ছিলেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের স্থাপন-কাল-অবধি উহার সভ্য ছিলেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মিলনক্ষেত্র-রূপে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে "সাধারণ ধর্ম্ম-সভা" স্থাপন করেন। তাঁহার প্রবীণ বয়সে স্থাপিত "দেবালয়"কে ঐ সাধারণ ধর্ম্ম-সভারই পরিণতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি "দেবালয়"কে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি অর্পণ জীবিতকালেই করিয়াছিলেন। যৌবনকাল হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভূমির হিত-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মাদকদ্রব্যের ব্যবহার-নিবারণ, শ্রমজীবীদিগের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা, ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপন, হিন্দু বাল-বিধবাদিগের শিক্ষা ও বিবাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রমজীবীদিগের জন্য তিনি "ভারত শ্রমজীবী"-নামক একখানি সংবাদ-পত্র স্থাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত বরাহনগর হিন্দু-বিধবা-আশ্রমে বহুসংখ্যক বিধবা শিক্ষা পাইয়া স্বাধীনভাবে সদুপায়ে উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং যে কুড়ি বৎসর ঐ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল, তাহার মধ্যে চল্লিশটি বিধবার তিনি বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহে ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন, এবং রোগে ও বার্দ্ধক্যে একান্ত অক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ অনলসভাবে কোন-না-কোন কাজ করিতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ও তাহার অধ্যক্ষ সভার ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নানাভাবে উক্ত সমাজের ও দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি

অনেক শোক পাইয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকায় তিনি কখনও শোকে অভিভূত হন নাই।

—

বাংলার নূতন দলন-আইনের দশা

বড়লাটের হুকুমে যে অর্ডিন্যান্স বা নিয়মাবলী জারী হইয়া বাংলা গবর্ণমেণ্টকে অনেকগুলি লোককে বিনাবিচারে গ্রেফতার করিতে ও আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ করিয়াছে, সারতঃ তাহাকেই পাঁচ বৎসরের জন্য আইনে পরিণত করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট একটি বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক-সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্কারের বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও উহা নয় ভোটে নামঞ্জুর হইয়াছে। এখন লর্ড লিটন্ উহা সার্টিফিকেশন্ প্রক্রিয়ার দ্বারা আইনে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করা তাঁহার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান্ প্রভৃতির যতগুলি সভায় রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, সকলগুলিতেই এইরূপ আইনের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এমনকি রোলট্ কমিটির অন্যতম সভ্য ও রোলট্ আইনের অন্যতম উৎপাদক স্যার্ প্রভাসচন্দ্র মিত্রও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিল্‌টির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন ও ভোট দিয়াছেন। দেশসুদ্ধ অধিকাংশ লোকেরই ভুল হইতেছে এবং কেবল সর্কারের পরামর্শদাতারাই ঠিক বুঝিতেছেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে লর্ড লিটন্ বিশেষভাবে দীর্ঘকাল চিন্তা ও বিচার করিলে ভাল হয়।

ব্যবস্থাপক সভার যে-অধিবেশনে এই বিল্ বিবেচিত হয়, তাহাতে উপস্থিত হইয়া লর্ড লিটন্ একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি বেশ সৌজন্য ও সংযমের সহিত তিনি করিয়াছিলেন, এবং দেশের প্রতিনিধিদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সদ্ভাবে বঙ্গের উন্নতির জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যাহা করিতে পারেন, তাহা করিবার সদিচ্ছাও তাহাতে প্রকটিত হইয়াছিল। অকপটতা ও সদভিপ্রায় প্রকাশের প্রশংসা আমরা লর্ড লিটন্‌কে অবাধে দিতে পারি। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় বিল্‌টি আইনে পরিণত করিবার সপক্ষে কোন বলবৎ কারণ আমরা দেখিতে পাই নাই।

ষ্টিফেন্সন্ সাহেব বিল্‌টি সভার সমক্ষে পেশ করেন। তাঁহার বক্তৃতাতেও কোন অকাট্য যুক্তি ও কারণ পাইলাম না। তিনি স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তকে ১৮১৮ সালের ৩নং কানুন-অনুসারে নির্ব্বাসিত করিবার কারণ এই বলেন, যে, দত্ত মহাশয় গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী উদ্দাম বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু তাহা ত বিনাবিচারে নির্ব্বাসনের কারণ হইতে পারে না। বক্তৃতা জিনিষটা গোপনে অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্ করিয়া ষড়যন্ত্র নহে। ইহা হাজার-হাজার লোক শোনে। অশ্বিনী-বাবুর বক্তৃতা সর্কারী, বে-সর্কারী, পুলিস-অপুলিস অগণিত লোক শুনিয়াছিল, এবং তাহাদের অনেকে সাক্ষ্য দিতেও পারিত। তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নামে নালিশ করিয়া তাঁহার বিচার কেন করান নাই? ষ্টিফেন্সন্ সাহেব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বিপ্লববাদী মনে করেন না, বিপ্লববাদীদের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ও সংস্রব ছিল, এরূপও বলেন নাই। বরং বলেন, যে, তাঁহাকে ষ্টিফেন্সন্ সাহেব নিজের বন্ধুই মনে করেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের এই বন্ধুত্ব ত অতীত কালে কৃষ্ণকুমার বাবুর নির্ব্বাসনের কারণ হইতে পারে না;— অথচ প্রকৃত কারণটা যে কি ছিল, তাহা বক্তার বক্তৃতার রিপোর্টে দেখিতে পাইলাম না।

—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের কৃতিত্ব

বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হন। তিনি শয্যাশায়ী থাকিয়াও কি করিতেছিলেন না-করিতেছিলেন তাহা আমরা না জানিলেও গবর্ণমেণ্টের পরাজয় হইতে অনুমান হয়, তাঁহার পরিচালনায় তাঁহার সহকর্মীরা লোকমতকে জয়যুক্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, যে, মন্ত্রের সাধন করিবার অন্য শরীর পাত করিবার মত প্রতিজ্ঞার জোর ও দৃঢ়তা তাঁহার আছে; এবং ইহাও বুঝা যায়, যে, তাঁহাতে এমন কিছু আছে যাহা তাঁহার সহকর্মীদের ও অনুচরদের অনুরক্ত বিশ্বস্ততা উৎপাদন ও সংরক্ষণে সমর্থ।

যে-দিন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়, বেঙ্গলী কাগজে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের এক চিঠিতে দেখিলাম, সবে সেই দিন প্রাতঃকালে ডাক্তার নীলরতন সরকার বলেন, যে, চিত্তরঞ্জন-বাবুর পীড়ার সঙ্কট-অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার মানে অবশ্য এ নয়, যে, তিনি তখন সুস্থ সবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ব্যবস্থাপক সভায় গেলেন। উপরে উঠিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইল। বাহিরের লোক কাহারও সভা-স্থলে যাইবার অনুমতি না থাকায়, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্যে তাঁহার কয়েক-জন বন্ধু তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি উপ-বিষ্ট হইলে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার পাশে রহিলেন। বিধান-বাবুও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল; নতুবা কি হইত জানি না। চিত্তরঞ্জন-বাবুর পত্নী তাঁহার সহিত যাইবার নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁহার স্বামীর এরূপ দুর্ব্বল অবস্থা-সত্ত্বেও তিনি যাই-বার অনুমতি পাইলেন না। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি কটন্ সাহেব বলিলেন, তিনি তাঁহার নিজের পত্নীকে এবং বিহারের গবর্ণরের পত্নী লেডী হুইলারকেও আসিতে অনুমতি দেন নাই; সুতরাং দাশজায়াকে আসিতে দিতে পারেন না। চমৎকার যুক্তি! লেডী কটনের কিম্বা লেডী হুইলারের স্বামীকে ত রোগজীর্ণ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভায় আসিতে হয় নাই, তাঁহারা মজা দেখিতে আসিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা আসিবার অনুমতি না পাওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু দাশজায়ার স্বামীকে পীড়িত ও দুর্ব্বল অবস্থায় কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আসিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া আবশ্যক হইলে তাঁহার সেবা করিবার জন্য তিনি আসিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি অনুমতি পাইলেন না। নলিনীরঞ্জন-বাবু তাঁহার চিঠিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই উপর আমরা এই মন্তব্য করিতেছি। যেরূপ অবস্থায় কটন্‌সাহেব দাশ-জায়ার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেন নাই, তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি লোকের সদ্ভাব ও শ্রদ্ধা থাকিবে না।

আমরা উপরে বলিয়াছি, মন্ত্রের সাধনের জন্য শরীর পাত করিবার মত দৃঢ়তা চিত্তরঞ্জন-বাবুর আছে। আমরা তাঁহার কোন-কোন কাজের সমর্থনও করিয়াছি। কিন্তু মন্ত্রের নির্ব্বাচন তিনি মোটের উপর ঠিক্ করিতে পারিয়াছেন, কিম্বা ঠিক্ পথ ধরিয়াছেন, আমাদের এরূপ মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, তিনি অনেক বিষয়ে নিজের ও সহকর্ম্মীদের শক্তিক্ষয়, সময় নষ্ট, ও অর্থের অপব্যয় করিতেছেন। যেরূপ মহৎ কাজ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা তাঁহাদের আছে, তাহাতে তাঁহারা এপর্য্যন্ত যথোচিত মনোনিবেশ করেন নাই। অধিকন্তু সমালোচনা-অসহিষ্ণুতা তাঁহার যথেষ্ট আছে। যাঁহাদের সুযোগ ও ক্ষমতা বেশী, উত্তেজনা ও করতালির আলেয়ায় তাঁহারা পথভ্রান্ত না হইলে ভাল হয়।

—

জাতীয় সপ্তাহ

খৃষ্টিয়ান্‌দিগের "বড় দিন" নামে অভিহিত পর্ব্ব উপলক্ষ্যে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আফিস্-আদালত স্কুল-কলেজ-আদি বন্ধ থাকে। বহুবৎসর হইতে এই সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যবিধ নানা সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। তাহার সংখ্যা যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত বড়দিনের সময় এক বেলগাঁও শহরেই কংগ্রেস্ ছাড়া আঠারটি সমগ্রভারতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল, বোম্বাইয়ে তিনটি এবং লক্ষ্ণৌয়ে দুটি। আরও কোন-কোন স্থানে অন্যান্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

আমরা আগে-আগে বলিয়াছি, এবং অন্যেরাও সম্ভবতঃ বলিয়াছেন, যে, এতগুলি সভাসমিতির অধিবেশন একই সময়ে হইলে তাহাদের বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয়গুলি সভার সভ্যদের, শ্রোতাদের, এবং সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট মনোযোগ পায় না। বৃহত্তম দৈনিক কাগজেও, বিষয়-গুলির আলোচনা দূরে থাক্, সকল সভাসমিতির ভাল রিপোর্ট্ প্রকাশ করাও সম্ভবপর হয় না। আমাদের মাসিক কাগজ; আমাদের ত কথাই নাই। আমরা "বিবিধ প্রসঙ্গের" জন্য "প্রবাসীর" যতখানি জায়গা রাখি, এবার কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণের কোন-

কোন অংশ-সম্বন্ধে কিছু বলিতেই তাহার অধিকাংশ জায়গা গিয়াছে। কংগ্রেসের অন্য কর্ম্মীদের বক্তৃতা, প্রস্তাবাবলী, প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। অন্য সব সভাসমিতির উল্লেখ পর্য্যন্ত এখনও করিতে পারি নাই।

বৎসরের একই সময়ে একই স্থানে এতগুলি সভাসমিতি না করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ও স্থানে করিলে ভাল হয়। ইহা আগে-আগেও বলা হইয়াছিল; সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন। অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে ও অধিবেশন-স্থানে অন্যান্য সভা করার কতকটা সুবিধাও আছে। কংগ্রেসে এখন অনেকে যান, যাঁহারা শুধু সমাজসংস্কার বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য দূর স্থানে যাইবেন না। তাঁহাদের উপস্থিতি, আংশিক মনোযোগ, এবং কখন-কখন কিছু সহযোগিতাও পাওয়া যায়। তাহা তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। কিন্তু মোটের উপর ইহা বলিতে পারা যায়, যে, যাঁহাদের যে-প্রচেষ্টায় খুব বিশ্বাস, অনুরাগ ও উৎসাহ আছে, তাঁহাদের দ্বারাই প্রধানতঃ উহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়। যেখানে যে-সময়েই উহার সভার অধিবেশন হউক, তাহাতে তাঁহাদের উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে। অতএব ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ও স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন সভার অধিবেশন বাঞ্ছনীয়।

আমরা এখন কোন-কোন সভাসমিতি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিতে চেষ্টা করিব। তৎসমুদয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই, কিন্তু সময় ও স্থানের অভাবে আমরা যথোচিত বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিতেছি না।

—

খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স্

বেলগাঁওয়ে ডাক্তার সৈফুদ্দিন্ কিচ্‌লু খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হইয়াছিলেন। পঞ্জাব ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশগুলির হিন্দু নেতাদের উদ্দেশে উচ্চারিত তীব্র নিন্দাবাদ ও কটুকথা তাঁহার অভিভাষণে লক্ষিত হয়। কাহারও কোন দোষ থাকিলে তাহার সংযত সমালোচনা করাই ভাল; বিশেষতঃ যখন সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ প্রবলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ডাক্তার কিচলুর মতে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়ার প্রধান কারণ, ধর্ম্মভেদ নয়, ব্যবসাবাণিজ্য ও চাকরীতে হিন্দুদের প্রাধান্য। তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ত ইহার কৃত্রিম কোন প্রতিকার হইতে পারে না। মুসলমানেরা শিক্ষায় ও ব্যবসাবাণিজ্যে মন দিলে কালক্রমে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। এ-বিষয়ে তাঁহাদের স্বাভাবিক, জাতিগত বা ধর্ম্মগত কোন অক্ষমতা নাই। তাঁহাদের মধ্যে খুব বিদ্বান্ লোক আছেন, তাহাতে বুঝা যায়, মুসলমান খুব পণ্ডিত হইতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে পীরভাই করিমভাই, জামাল ব্রাদার্স্, কোলুটোলার সওদারগণ, প্রভৃতি অনেক ধনী বণিক্ আছেন। তাহাতে মুসলমানদের বাণিজ্যে কৃতিত্বলাভ-সামর্থ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়।

গবর্ন্মেণ্ট তবু ইচ্ছা করিলে বেশীর ভাগ চাকরী জোর করিয়া পঞ্জাবী মুসলমানদিগকে দিতে পারেন; কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য ত এরূপ করিয়া কাহারও হাতে তুলিয়া দিবার জিনিষ নয়। গবর্ন্মেণ্টের আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থায় হিন্দুর ব্যবসাবাণিজ্যের যেমন সুবিধা আছে, মুসলমানেরও তেম্‌নি আছে; বরং ইহা বলা যায়, যে, কোন-কোন কারণে ইংরেজদের সুবিধা বেশী আছে। ব্যবসাবাণিজ্যে কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর লোকদের প্রাধান্য দেখিয়া ঈর্ষ্যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার মত বেকুবী আর নাই। বাংলা দেশের অধিকাংশ বড় ব্যবসাবাণিজ্য ও তেজারতী এখন মাড়োয়ারীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া বাঙালী হিন্দুরা ত মাড়োয়ারীদের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতেছে না, যদিও সংখ্যায় মাড়োয়ারীরা সমুদ্রে ছাতুমুষ্টির ন্যায়।

ডাঃ কিচলুর মতে লক্ষ্ণৌয়ের চুক্তি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সমুদয় প্রদেশে ও সমগ্রভারতে জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুমুসলমানের প্রতিনিধি উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। তাঁহার এই মত সর্ব্বত্রই একই নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। কিন্তু যে-সকল মুসলমান বলেন, যে, যেখানে তাঁহাদের সংখ্যা বেশী সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধি বেশী হইবে, এবং যেখানে

কম, সেখানেও সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কিছু বেশী প্রতিনিধি তাঁহাদের হওয়া চাই, তাঁহাদের কথার মধ্যে কোন সঙ্গত নীতি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক অন্ধ স্বার্থপরতার গন্ধই বেশী পাওয়া যায়।

—

মুস্‌লিম্ লীগ্

মুস্‌লিম্ লীগের সভাপতি মাননীয় সৈয়দ রিজা আলি ঐরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পঞ্জাবের ও বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান; অতএব ঐ দুই প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের, সরকারী চাকরোদের, এবং মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের সভ্যদের অধিকাংশ মুসলমান হওয়া চাই; অধিকন্তু যে-সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় কম, সেখানেও তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী-সংখ্যক প্রতিনিধি তাহাদের থাকা চাই। এরূপ বন্দোবস্তের সমর্থন আমরা করিতে পারি না। কারণ, কাহাকেও কিছু বেশী দিতে গেলে অন্তদিগকে সেই-পরিমাণে বঞ্চিত করিতে হয়। ইহা ন্যায্য নহে।

রিজা আলি সাহেবের অন্য অনেক কথার সমর্থন আমরা করিতে পারি।

কিছুদিন হইল কাবুলে মৌলবী নিয়ামৎউল্লা খাঁকে, তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচলিত সুন্নীমত হইতে ভিন্ন বলিয়া, রাজ-আদেশে তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা বধ করা হয়। রিজা আলী সাহেব ইহার নিন্দা করিয়া বলেন, কাহারও আত্মার সদ্গতির জন্য তাহার প্রাণবধ করিবার রীতির সমর্থন করা কোন মুসলমানের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। "যদি এই ধারণা একবার জগতে ব্যাপ্তি লাভ করে যে, মুসলমান গবর্ন্মেণ্টসমূহ প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহে, তাহা হইলে জগতে ইস্লামের অন্যতম মহতী নৈতিক শক্তি বলিয়া যে মর্য্যাদা আছে, তাহার হ্রাস হইবে।"

রিজা আলি মহাশয় ভারতীয় মুসলমানদের স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও ঠিক্ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমরা নিজেদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হইব না, যদি আমরা আমাদের মাতৃভূমির আভ্যন্তরীণ সমস্যা-সকলের সমাধানার্থ সময় ও শক্তি নিয়োগ না করিয়া, দূরদেশে কি হইতেছে, তাহার দ্বারাই বিক্ষিপ্তচিত্ত হই। যদি স্বদেশের বাহিরের প্রতি প্রেম ও হিতৈষণাকে যুক্তি-সঙ্গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে উহা খুব মহৎ ভাব। কিন্তু যখনই উহা আমাদের ভারতীয় মুসল-মান বলিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধনে ব্যাঘাত জন্মায় ভারতীয় মুসলমান বলিয়া আমাদের যে অধিকার তদনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনায় ব্যাঘাত জন্মায়, তখনই উহা নিষ্ফল চেষ্টা, এবং একটা কল্পনাপ্রসূত বস্তুর প্রতি অনুরাগ বলিয়া মনে হয়।" ভবিষ্যতে সংঘর্ষ দূরীকরণ নিমিত্ত তিনি বলেন, খিলাফৎ কমিটি মুসলমানদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভীষ্ট সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং মুস্‌লিম লীগ্ ভারতীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসকলে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবেন, এইরূপ শ্রমবিভাগ হইলে ভাল হয়।

—

মহম্মদীয় শিক্ষা কন্‌ফারেন্স্

মহম্মদীয় শিক্ষা কন্‌ফারেন্সে শিল্প-ও বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ন্মেণ্টকে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুরোধ করিয়া যে-প্রস্তাব ধার্য্য হয়, তাহা উত্তম। বাণিজ্যিক তত্ত্ব ও সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার বিভাগের ডিরেক্‌টর্ ও ডেপুটি ডিরেক্‌টর্ (Director and Deputy Directors of Commercial Intelligence Departments), এবং পৃথিবীর নানা দেশে বাণিজ্য কমিশনার, বাণিজ্য এজেণ্ট, প্রভৃতি কাজ করিবার নিমিত্ত উপযোগী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার আবশ্যকতাও এই কন্‌ফারেন্সে প্রদর্শিত হয়। মুসলমান বালিকারা কলেজে বক্তৃতা না শুনিয়াও যাহাতে প্রাইভেট্ পরীক্ষা দিতে পারে তদ্রূপ নিয়ম করিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে অনুরোধ করা হয়। মুসলমান অমুসল-মান সব বালিকাদের জন্যই এইরূপ নিয়ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। সর্ব্বত্র সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে এইরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু মুসলমান অমুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিত, যে, মেয়েদের বাড়ীতে পড়াইবার বন্দোবস্ত খুব কম লোকেই করিতে পারে; যাহারা পারে, তাহারাও উৎকৃষ্ট কলেজসকলের ভাল অধ্যাপকদের মত যোগ্য লোককে গৃহশিক্ষক রাখিতে পারে না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা নারীদিগকে দিতে হইলে পর্দ্দা-প্রথা রহিত, অন্ততঃ আংশিকভাবে রহিত করা ভিন্ন উপায় নাই।

মহম্মদীয় কন্‌ফারেন্সে মুসলমানদের শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের ইচ্ছা ও দাবী অবশ্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত রাজস্ব হইতে করা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষ কেবল হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের বাসভূমি নহে; এবং মুসলমানেরাও একমাত্র অনগ্রসর সম্প্রদায় নহে। আরও অনেক অধিক-তর অনগ্রসর শ্রেণীর লোক আছে। সকলের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইলেও তাহা বাঞ্ছনীয় হইত না। কারণ, তাহাতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি বাড়ে, এবং ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবাল্য ও আযৌবন সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব জন্মিবার সুযোগ কম হয়।

হিন্দু মুসলমান পার্সী খৃষ্টিয়ান্ শিখ সব সম্প্রদায়ের

অনেক ছাত্র বিদেশে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে যায়। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান যায়। সেখানে ত কোন সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের জন্য আলাদা শিক্ষালয় চান না; চাহিলেও পাইবেন না। তবে স্বদেশে এই পৃথক্ বন্দোবস্তের দাবী কেন করা হয়? বিলাতফেরত মুসলমান ব্যারিষ্টার,ডাক্তার প্রভৃতির মধ্যেও কাহাকে-কাহাকে স্বদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষালয়ের দাবী করিতে দেখিলে যুগপৎ হাসিকান্নার কারণ ঘটে।

—

হিন্দু মহাসভা

বেলগাঁওয়ে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে পণ্ডিত মদন-মোহন মালবীয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের সহিত হিন্দু মহাসভার সংঘর্ষের কোন কারণ নাই। কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের সভা বলিয়া এক-একটি সম্প্রদায়ের জন্য যাহা করিতে পারেন না, হিন্দু মহা-সভা হিন্দুদের জন্য তাহা করিবেন। মুসলমানদের মত হিন্দুদের সভ্যতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, শিল্প, প্রভৃতি আছে। মুসলমানরা যেমন তাঁহাদের নিজস্ব এই-সব জিনিষ আদর করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, হিন্দুরাও সেইরূপ চেষ্টা করিবেন। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের কাল্‌চ্যার অনুশীলন করিয়া তাহার গুণ গ্রহণ করে, ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে চান। হিন্দু বৌদ্ধ ও শিখেরা একটি সাধারণ কাল্‌চ্যারের উত্তরাধিকারী বলিয়া একই কার্য্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গাহাঙ্গামা-সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন, হিন্দুরা যদি দুর্ব্বল ও ভীরু না হইত, তাহা হইলে কয়েকটি স্থানের দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিত না। এইসব উপদ্রবে এমন-একটি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহা জাতীয় (national) হিসাবে গুরুতর; এবং যেহেতু হিন্দুদের দুর্ব্বলতার জন্যই কয়েকটি স্থানের উপদ্রব ঘটিয়াছে, সেই-জন্য এই দুর্ব্বলতা দূর করা জাতীয় (national) প্রয়োজনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। মালবীয়-মহাশয়ের মতে এই দুর্ব্বল-তার কারণ, (১) হিন্দুদের স্বধর্ম্মের শিক্ষার বিস্মৃতি; (২) তাহারা দুর্ব্বল-দেহ। এই শারীরিক দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ, তাঁহার মতে, বিবাহ-সম্বন্ধীয় রীতি-নীতির অবনতি। আগে পুরুষেরা কেহ-কেহ ২৫ বৎসরের আগে বিবাহ করিত না। নারীদের মধ্যেও বিবাহ আজকাল এত কাঁচা বয়সে হয়, যে, শিশু বিধবা অনেক দেখা যায়। এইসব কারণে সমাজের দৈহিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছে। এই অবস্থার তিরোভাব আবশ্যক। তিনি এইরূপ বলেন।

ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বিরোধ-সম্বন্ধে তিনি বলেন, উভয়েই এক সাধারণ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভাইয়ের মত থাকা উচিত। দক্ষতা ও যোগ্যতা যেখানেই দৃষ্ট হইবে,সেখানেই তাহার আদর করা ব্রাহ্মণদের উচিত। অব্রাহ্মণজাতীয় রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা যোগ্যতার পূজা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না—তাহা যেখানেই পাওয়া যাক্। কয়েটা চাকরী-বাক্‌রীর জন্য ভিন্ন-ভিন্ন হিন্দু-শ্রেণীর মধ্যে দলাদলি হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহাদের পরস্পরের সুখে ও শক্তিতে আহ্লাদিত হওয়াই উচিত। মহাত্মা গান্ধী ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ দেশে তাঁহার মত সম্মান কে পাইয়াছে? তিনি ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সব বন্ধুকে পরস্পরের সহিত মনোমালিন্য দূর করিয়া এক সাধারণ মহাসভায় মিলিত হইতে অনুরোধ করেন।

তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিদের অভাব অভিযোগ ও লাঞ্ছনা দূর করিবার জন্য মালবীয়জি অনেক প্রস্তাবের ও কার্য্যের উল্লেখ ও সমর্থন করেন।

যেমন খৃষ্টিয়ান্ ও মুসলমানেরা অন্যধর্ম্মের লোকদিগকে নিজেদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, পণ্ডিতজী সেইরূপ অন্যধর্ম্মের লোকদিগকে হিন্দু করিবার জন্য একটি মিশন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে, বলেন।

তিনি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা (nationalism) একত্রে থাকিতে পারে না, বলেন। সাম্প্রদায়িকতা না গেলে জাতীয়তার উদ্ভব হইবে না, বলেন। মুসলমান-সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধির দাবী করায় হিন্দুদিগকে এবিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইবে, এবং হিন্দুমহাসভা তাহা করিবেন। তাহার জন্য সকল প্রদেশের হিন্দুদের একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

মহাসভায় হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় দাবী নির্দ্ধারণার্থ কমিটি-নিয়োগ ছাড়া, নেপালের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়া উপলক্ষ্যে ঐ একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের নৃপতিকে অভিনন্দিত করা হয়, এবং তথায় দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদের জন্যও হর্ষ প্রকাশ করা হয়। কোহাটের ভীষণ দাঙ্গা-সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। "অস্পৃশ্য" জাতিদের অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ইত্যাদি।

—

শায়েস্তাবাদের নবাবজাদা

স্যার আব্দর রহিম-প্রমুখ কয়েকজন বাঙালী মুসলমান অভিন্যান্সটাকে আইনে পরিণত করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবার নিমিত্ত মুসলমানদের এক সভা আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁহারা যাঁহাকে সভাপতি করেন, তাঁহাকে তাঁহারা চিনিতেন না। তিনি শায়েস্তাবাদের নবাবজাদা সৈয়দ্ মোহামেদ্ হোসেন্। তিনি "জোহকুম" নহেন,—মানুষ। সেইজন্য তিনি

এমন বক্তৃতা করেন, যে, স্যার্ আব্দার্ রহিম প্রভৃতি গাত্রদাহে সভাস্থল ছাড়িয়া পলায়ন করেন। নবাবজাদা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ও সদ্ভাবের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বলেন, "আমরা কি একই মাতৃভূমির সন্তান নহি, একই ভাষায় কথা বলি না, অনেক আচার-ব্যবহার আমাদের এক নহে কি, পাশাপাশি থাকিয়া আমরা একত্র পরস্পরের উৎসব করি না কি? কেন তবে উভয়ের সাধারণ জিনিষগুলিকে ভুলিয়া পার্থক্যগুলির উপরই ঝোঁক দিব? আমাদের প্রভেদ অপেক্ষা মিলই অনেক বেশী। আসুন, আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসমরে ভ্রাতৃভাবে পুনর্মিলিত হই, যাহাতে আর কখন ছাড়াছাড়ি না হয়।"

স্বর্ণমন্দির

(মহারাষ্ট্রীয় উপকথা)

শ্রী অমিতাকুমারী বসু

[শ্রাবণ মাসের মেঘলা দিনে যখন শিশুরা খেলাধুলো কর্‌তে পায় না, তখন তা'রা তাদের আজীবাইর (ঠাকুরমার) কাছে গল্প শুন্‌তে ছুটে' আসে। আজীবাই তাদের নাগরাজার কথা, শিবপার্ব্বতীর কথা, আরো কত-কি কথা শুনান। অধিকাংশ গল্পেরই ঘটনাস্থল আটপাট সহর। তাহা কোথায় ছিল কেউ জানে না।

আটপাত বলে' এক নগর ছিল, সে-নগরের রাজার চারটি ছেলের বৌ ছিল। রাজা তিনটি ছেলের বৌকে খুব ভালোবাস্‌তেন, কিন্তু ছোটটিকে মোটেই দেখতে পার্‌তেন না; সে বেচারা দেখতে ছিল ভারি কুশ্রী, তার খাবার জন্য বরাদ্দ ছিল রাজার উচ্ছিষ্ট, আর মোটা ভাত, পর্‌বার জন্য মোটা কাপড়, আর তা'কে থাকৃতে হ'ত গোশালায়, গরু চরাবার ভার তার উপর ছিল। অন্য তিনটি ছেলের বৌ কিন্তু থাকৃত খুব জাঁক-জমক করে'। তা'রা সুন্দর-সুন্দর শাড়ী পরে' গয়না গায়ে দিয়ে সেজে-গুজে বসে' থাকে, সখীরা হাসিগল্প করে, দাসীরা পঞ্চ ব্যঞ্জন ভাত এনে দেয়, আনন্দে তাদের দিন কেটে যায়। এসব দেখে' ছোট বৌর মনে ভারি দুঃখ হ'ল। সেদিন শ্রাবণ মাসের পয়লা সোমবার, বৌটি মনের দুঃখ আর সইতে না পেরে রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে সহর ছেড়ে চলে' গেল। যেতে-যেতে সে একটি গভীর বনে গিয়ে ঢুকৃল। এবনটা ছিল ভারি সুন্দর, একটা কুঞ্জবনের মতন। মাঝ-খান দিয়ে ছোট একটি ঝর্‌না বয়ে' গেছে, নাগকন্যা আর অপ্সরারা এসে ঝর্‌নার স্বচ্ছ জলে মনের আনন্দে স্নান করে' পুষ্পচয়ন কর্‌ত, আর সবাই মিলে' মহাদেবের অর্চ্চনা কর্‌তে মন্দিরে যেত। ছোট বৌটি ক্রমে-ক্রমে সেই ঝর্‌নার তীরে এল, এবং দেখতে পেলে চমৎকার সুন্দরী কয়েকজন অপ্সরা আর নাগকন্যা স্নান করে' নদী থেকে উঠছে। দেখে' তার মনে এত ভয় হ'ল যে সে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরে সাহস করে' বল্‌লে, "আপনারা কে, দেবী, না অপ্সরা, না কি? আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" তখন তা'রা বল্‌লে "আমরা অপ্সরা, আর নাগকন্যা, আমরা মহাদেবের পূজো কর্‌তে যাচ্ছি, মহাদেবের পূজো কর্‌লে স্বামীর ভালোবাসা ফিরে' পাওয়া যায়, যে সন্তান কামনা করে সে সন্তান পায়, যে একজনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে তা ফিরে' পায়।" তাদের কথা শুনে' ছোট বৌটির মনে হ'ল, সে যদি শিবপূজো করে তবে হয়ত সেও তার শ্বশুরের স্নেহ ফিরে' পাবে। এসব ভেবে সে তাদের বল্‌লে, "আমি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে শিবপূজো কর্‌ব, আমাকেও নিয়ে চলুন।" তখন কন্যারা তাকে নিয়ে একটা গভীর বনে প্রবেশ কর্‌লে, সেখানে প্রকাণ্ড এক শিবমন্দির। কন্যারা ফুল-বেলপাতা চাল-সুপারি-নৈবেদ্য দিয়ে মহাদেবের অর্চ্চনা কর্‌লে। বৌটিও ঠিক তাদের মতন পূজো করে' ভক্তিভরে প্রার্থনা করে' বল্‌লে, "হে মহাদেব, তুমি আমার পূজো গ্রহণ করো, আমায় আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমার শ্বশুর-শাশুড়ী যায়েরা আমাকে ঘৃণা না করে' ভালোবাসে।" তার পর বৌটি সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে' এসে সেদিন কিছু খেলে না, উপোস করে' রইল। রাজার উচ্ছিষ্ট তা'কে খেতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে তা না খেয়ে গরুকে দিয়ে দিলে, তার পর নির্জ্জনে বসে' মহাদেবের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে লাগল।

ঘুরে'-ফিরে' আর-এক সোমবার এল, সেদিনও বৌটি ভোরে উঠে' সেই বনে চলে' গেল। সেখানে গিয়ে দেখলে নাগকন্যারাও এসেছে, সে তখন তাদের সঙ্গে মিলে' মন্দিরে চল্‌ল। অপ্সরারা তা'কে তখন বল্‌লে, "দেখ পূজো কর্‌বার জন্যে তোমাকে আজ ফুল-বেলপাতা দিলুম বটে; কিন্তু অন্যদিন তোমার এসব নিজে জোগাড় করে' আন্‌তে হবে।" বৌটি তখন তাদের দেওয়া ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজো করে' বাড়ী ফিরে' এল। সেদিনও সে তার সব খাবার

গরুকে দিয়ে নিজে উপোস করে' রইল, আর খুব ভক্তিভাবে মহাদেবের পূজো কর্‌লে। সেদিন রাজা বৌটিকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "তুমি কোন্ দেবতাকে এমন ভক্তিভাবে পূজো করো, তোমার দেবতার নাম কি, তিনি থাকেন কোথায় ?" বৌটি তখন তার শ্বশুরকে বল্‌লে, "আমার দেবতা এখান থেকে অনেক দূরে থাকেন, তাঁর কাছে যাওয়া কঠিন। পথগুলি সব কাঁটায় বিছানো, চারিদিকে সাপ বাঘ সব ঘোরাঘুরি কর্‌ছে, তারই মধ্যে আমার দেবতার মন্দির।"

শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবারে বৌটি ভোরে উঠে,' ফুল-বেলপাতা চাল-সুপারি পূজোর নৈবেদ্য জোগাড় করে' মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল, তখন রাজা এবং তার আরও কয়েকজন আত্মীয় বল্‌লেন, "তুমি আমাদিগকে তোমার দেবতার কাছে নিয়ে চলো।"

এই বলে' তাঁরাও বৌটির সঙ্গে চল্‌লেন, কিন্তু রাজপ্রাসাদ থেকে মন্দির খুব দূরে ছিল। বৌটির দুঃখ সহ্য কর্‌বার অভ্যাস আছে। সে এর আগে আরও দুবার মন্দিরে গিয়েছে, তবুও যেতে-যেতে তার পা ফুলে' পাথরের মতন ভারী হ'য়ে গেল। কিন্তু রাজা আর তাঁর সঙ্গীরা একেবারে মারা যাবার অবস্থায় পড়লেন; তাঁদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা ফুটে' একেবারে সজারুর পিঠের মতন হ'য়ে গেল; পা ফুলে' কলাগাছের মতন হ'য়ে গেল, তাঁদের আর চল্‌বার ক্ষমতা রইল না। তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি কর্‌তে লাগলেন, "ছোটবৌ কি করে' এমন গহন বন-জঙ্গল পার হ'য়ে পূজো কর্‌তে যায়, সে কি মানুষ না ?" তাঁদের অবস্থা দেখে' ছোট বৌটির মনে বড় কষ্ট হ'ল; সে তখন সেখানে একটি মন্দির তৈরি কর্‌বার জন্যে মহাদেবকে প্রাণপণে ডাক্‌তে লাগল। মহাদেব তার প্রার্থনা শুন্‌লেন। নাগকন্যা আর অপ্সরাদের নিয়ে সহসা একটা মন্দির সেখানে তৈরি কর্‌লেন; মন্দিরটা আগাগোড়া সোনায় মোড়া; তার থামগুলো সব মণিমুক্তাখচিত, আর ভিতরে সব ফটিকের ঝাড় ঝুল্‌ছে। দেখতে-দেখতে মন্দিরের মধ্যস্থলে সহসা এক স্তম্ভ উঠল, তার উপর মহাদেব তাঁর নিজমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌লেন, রাজা আর তাঁর সঙ্গীদের দেখা দিয়ে মুহূর্ত্তের পরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। রাজা আর তাঁর সঙ্গীরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে রইল, কিন্তু ছোট বৌটি মহাদেবের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে' চীৎকার করে' বল্‌লে, "হে মহাদেব, দয়া করে' আমার প্রার্থনা শোনো, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী যায়েরা আমাকে এখন যেমন ঘৃণা করে, তেম্‌নি যেন ভালোবাসে।" ছোট বৌর এই প্রার্থনা শুনে' রাজার মন গলে' গেল, তিনি ছোট বৌকে ডেকে আদর করে' কথা কইলেন; নিজের গলার হার, আংটি খুলে' নিয়ে বৌকে দিয়ে দিলেন। তার পর মাথার পাগড়ী খুলে' মন্দিরের একটা পেরেকে রেখে হ্রদের তীরে বেড়াতে গেলেন। সেখানে যে এমন সুন্দর হ্রদ ছিল, তা আগে আর কারও চোখে পড়েনি। রাজা আর তাঁর সঙ্গীরা ত বেড়াতে-বেড়াতে কিছুদূর চলে' গিয়েছেন, এমন সময় মন্দিরটি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রাজা বেড়ানো শেষ করে' তাঁর পাগড়ী নিতে এসে দেখেন, এমন চমৎকার সোনার মন্দিরটি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। রাজা বৌটিকে কারণ জিজ্ঞেস কর্‌লেন, কিন্তু বৌটি কিছু না বলে' আরও গভীর বনে প্রবেশ কর্‌তে লাগল, রাজা আর তাঁর সঙ্গীরা বিস্মিত হ'য়ে অতিকষ্টে বৌটির অনুসরণ কর্‌তে লাগলেন। সেখানে পৌঁছে' তাঁরা একটি পরিষ্কার ছোট মন্দির দেখতে পেলেন। রাজা দেখলেন তাঁর পাগড়ীটা এই মন্দিরের একটা পেরেকে ঝুল্‌ছে, আর সেই চমৎকার মন্দিরে বৌটি যে ফুল-বেলপাতা দিয়ে মহাদেবের পূজো করেছিল তাও এখানে রয়েছে। এসব দেখে' রাজার আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি তখন বল্‌লেন, "বৌমা, এসব কি ? আমি ত কিছু বুঝতে পার্‌ছিনে, তুমি আমায় সব খুলে' বলো।" তখন বৌটি বল্‌লে, "এই আমার মন্দির, এখানে এসেই আমি পূজো কর্‌তাম, আপনারা কিছুদূর এসেই পথশ্রমে এত কাতর হ'য়ে পড়লেন যে তা দেখে' আমার মনে বড় দুঃখ হ'ল, আমি মহাদেবকে ভক্তির সহিত ডেকে বল্‌লাম, এখনি যেন তিনি একটি মন্দির তৈরি করে' দেন। অগতির গতি মহাদেব আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তাই তিনি আপনাদের দেখা দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন।" ছোট বৌয়ের এই কথা শুনে' রাজার মন আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে গেল। ছোট বৌ ত সামান্য মেয়ে নয়, স্বয়ং মহাদেব তার প্রার্থনা শুনেছেন, তা'কে দেখা দিয়েছেন, একথা ভেবে তাঁর মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হ'য়ে গেল। তিনি ছোট বৌকে নেবার জন্যে রাজপ্রাসাদ থেকে চমৎকার এক পাল্‌কী আনালেন। সোনার পাল্‌কী, তা'তে মণিমুক্তোর ঝালর। তার পর ঐ পাল্‌কী করে' বৌকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে' এলেন। ছোট বৌর তখন খুব সম্মান হ'ল, রাজা তা'কে খুব স্নেহ কর্‌তে লাগলেন। তা'তে অন্য বৌদের মনে ভারি হিংসে হ'ল, কিন্তু ছোট বৌ এতে কিছু মনে কর্‌ত না। মহাদেবের আশীর্ব্বাদে সে তখন সকলের আদরিণী হ'য়ে দিন কাটাতে লাগল।

৯১নং আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাঠের খেল্‌না

শিল্পী—শ্রীমতী সরযূবালা দেবী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩১

৫ম সংখ্যা

ভাবী কাল

ক্ষমা কোরো, যদি গর্ব্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি,—মোর কাব্যখানি লয়ে' করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী,
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা ;—
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
হয়ত উঠিছে বক্ষ নেচে,
হয়ত ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"
হয়ত বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

৬ অক্টোবর, ১৯২৪
আণ্ডেস্ জাহাজ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই ত আমার, চলে' এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হ'ল গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, ম্লান শীতের ক্ষণে
ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে।
সকল শেষের শিউলিটি যেই ধূলায় হবে ধূলি,
সঙ্গিনী-হীন পাখী যখন গান যাবে তার ভুলি,
হয় ত তুমি আপন-মনে আস্‌বে সোনার রথে
শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের পথে॥

পুলক লেগেছিল মনে পথের নূতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্‌ মধুরের ডাকে।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে ;
মনের ভুলে ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি এলে,
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে।
হয়ত তুমি এসেছিলে, যায়নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয়নি প্রাণের জানা॥

হয়ত সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে।
হয়ত আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু,
বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক দুরু দুরু ;
সেদিন হ'তে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
রঙিয়েছিল হয়ত ব্যথার রক্তিম কুঙ্কুমে ;
আধেক চাওয়ায় ভুলে' যাওয়ায় হয়েচে জাল-বোনা,
তোমায় আমায় হয়নি জানা-শোনা॥

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মত
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজ্‌ল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
সেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী ;
দখিন বাতাস ফেলেচে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি,
সেদিন আমি গেয়েচি গান তোমার বিরহেরি ;
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান ॥

এ গানগুলি তোমার বলে' চিন্‌বে কখনো কি ?
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে, সখী।
তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়,
তোমার কণ্ঠে বাজ্‌বে তখন আমার পরিচয় ;
যারে তুমি বাস্‌বে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ করে' নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে' ফির্‌বে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিল্‌বে তাহার বাণী ॥

তোমার ফাগুন উঠ্‌বে জেগে, ভর্‌বে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে' ?
পূর্ণচাঁদের আস্‌বে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুল-বীথির ছায়াখানি মধুর মূর্চ্ছাভরা ;
হয়ত সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা ;
হয়ত সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা ;
সেদিন আমি আস্‌ব না ত নিয়ে আমার দান ;
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান ॥

ষ্টীমার এণ্ডিস্
১৮ অক্টোবর
১৯২৪

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতুলপ্রসাদ ও তাঁহার সঙ্গীত*

শ্রী দিলীপকুমার রায়

আমি ইতিপূর্ব্বে এই লাইব্রেরীর দু-তিনটি আসরে শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের গান-সম্বন্ধে দুচারটি কথা প্রসঙ্গচ্ছলে বলেছিলাম। তাঁর গুটিকতক গানও আমি আমার বিভিন্ন আসরে শুনিয়েছি। আমার অনেক দিন থেকে তাঁর গানের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ কর্‌বার ও তাঁর কয়েকটি গান সাধারণকে শোনাবার ইচ্ছা ছিল। আজ সেই উদ্দেশ্যেই এ-আসরের উদ্যোগ করা।

অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্গে বাঙালী অপরিচিত নয়। তাঁর "উঠগো ভারত-লক্ষ্মী" গানটি স্বদেশী যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর "বঁধুয়া নিদ্ নাহি আঁখি-পাতে" গানটি অথবা "বঙ্গভাষা" গানটিও অনেকে শুনেছেন। কিন্তু এরকম বিক্ষিপ্তভাবে অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্গে অনেকে পরিচিত হ'লেও, বোধ হয় খুব কম লোকেই খবর রাখে, যে তিনি একজন প্রকৃত সঙ্গীত-রচয়িতা—যাকে ইংরেজী সঙ্গীত-পরিভাষাতে বলে—composer. আমি আজ যে-কয়টি গান আপনাদের শোনাবার জন্ত নির্ব্বাচিত করেছি, সেগুলির দ্বারা তাঁর গান অপিচ সুন্দর-সুন্দর সুর দেওয়ার ক্ষমতাটিই যাতে পরিস্ফুট হয় সেইদিকেই বিশেষ করে' দৃষ্টি রাখব।

ইংরেজী ভাষায় composer বা ফরাসী ভাষায় compositeur কথাটির সদর্থ হচ্ছে—নূতন সুর বা সুর-সমষ্টির স্রষ্টা। তাই অতুলপ্রসাদকে শুধু composer বললে তাঁর যথার্থ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা হবে না। সুতরাং তাঁর প্রতি যথেষ্ট সুবিচারও করা হবে না। কেননা তিনি সুর-রচয়িতা মাত্র নন—সঙ্গে-সঙ্গে একজন মনোজ্ঞ কবি। তাই এক-কথায় তাঁকে গীতিকবি আখ্যা দেওয়াই বোধ হয় বেশী সঙ্গত। কারণ তাঁর গানে কবিত্ব ও সঙ্গীতের বড় সুন্দর সম্মিলন সংসাধিত হয়েছে বলে' আমার মনে হয়।

যে-কোনো গীতি-কবির মধ্যে দুটো উপাদান থাক্‌বেই। প্রথম গীতির দিক্, ও দ্বিতীয় কবিত্বের দিক্। তাই আমি অতুলপ্রসাদের রচনাকে এই দু-দিক্ থেকে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

এ গীতি-কবির রচনাকে যদি সুরের দিক্ থেকে দেখা যায়, তা হ'লে আমরা দেখ্‌তে পাবো যে, তাঁর গানগুলিকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি ধারা হচ্ছে—আমাদের খাঁটি বাউল-কীর্ত্তনকে আধুনিক refinementএর (হৃদয়ের সৌকুমার্য্যের) মধ্য দিয়ে বড় হৃদয়স্পর্শীভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস; ও আর-একটি হচ্ছে—আমাদের হিন্দুস্থানী সুরের খাঁটি হিন্দুস্থানী ঢঙকে বাংলা গানের মধ্যে অভিনবভাবে মূর্ত্ত করে' তোলা। এখন এ-দুটি ধারা-সম্বন্ধে যথাক্রমে একটু বিশদভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের দেশে বাউল, ভাটিয়ালি, ছোট চালের কীর্ত্তন প্রভৃতি সুর সাধারণ লোকমুখে পথে-ঘাটে শোনা যায়। তাদের মধ্যে একটি সরল আবেদন আছে। কিন্তু চলিত অনেক বাউল গানের কথার মধ্যেই আমরা একটা প্রাচীনতার আমেজ পেয়ে থাকি যাকে ইংরেজীতে বলে archaism. আমাদের মন বস্তুটি archaismএ কখনই ঠিক্ সাড়া দেয় না। কথাটা একটু পরিষ্কার করে' বলি। একটা পুরোনো বাউল-গান শুনেছিলাম যার আরম্ভটা ছিল—"কে গড়্‌লে এই ঘর, সে ধন্ত কারিগর।" এখানে ঘর অর্থে বোঝা হয়েছে—দেহ। পুরোনো অনেক গানে অভাবনীয় দেহতত্ত্ব, কুলকুণ্ডলিনীর মাহাত্ম্য, ষড়্‌রিপুর অত্যাচার প্রভৃতির লোমহর্ষক বর্ণনা আছে। এরূপ গানের কথার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে কি না আমি জানিনে;—তাই সে-সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে' তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু একটি কথা জানি, সুতরাং সে-সম্বন্ধে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা ভালো না;—সেটি হচ্ছে এই যে, এ-সব গানে আর যাই থাকুক না কেন, একটি জিনিষের বালাই নেই, যার নাম—কবিত্ব। এ-কথায় পুরাতন-

---

* রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত।

পন্থীগণ আশা করি ক্ষুণ্ণ হবেন না। আর যদিই বা হন, তবে তাঁরা এই কথাটি মনে করে' যেন সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেন যে মানুষের কোনো দিকে সৃষ্টিকে প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হ'য়ে গড়ে' উঠ্‌তে দেখা যায় না। তাই আমরা এইভাবে মনকে প্রবোধ দিতে পারি যে, এই পুরোনো বাউল-কীর্ত্তনের অনেক গানের কথায় যদি আমাদের মনটি সাড়া না দেয় তবে সুরে ত দেয়!—সেটাও ত একটা কম লাভ নয়—মানুষের শিল্পজগতে সৃষ্টির দিক্ দিয়ে!

তবে সে যাই হোক্ আমার মোট বক্তব্যটি এই যে, এ-সব archaic গানে সুরের সৌন্দর্য্য থাক্‌লেও কবিত্বের মাধুর্য্য প্রায়ই পাওয়া যায় না, যাতে আমাদের আধুনিক মনটি সাড়া দিতে পারে *। ধরুন,

"ধন্য কারিগর, যে গড়লে এই ঘর" এ-গানটি শুন্‌লে কি আমাদের মনে সে পুলক শিহরণ জাগে,—রবীন্দ্রনাথের বাউল "গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে" গানটির কথায় যে-শিহরণের উদয় হয়? আগেকার এরূপ অনেক তথাকথিত আধ্যাত্মিক গানের কথায় আমাদের মন সাড়া দেয় না। যেমন নরেশচন্দ্রের একটা গান:—

শ্যামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল
কলুষের কুবাতাস লেগে গোত্তা খেয়ে পড়ে' গেল।

সাড়া দেয় না কারণ, আসল কবিত্বের পরশমণিতে যে কাব্যানুরাগীর মন একবার স্বর্ণবর্ণ হ'য়ে গেছে সে যতই কেন চেষ্টা করুক মনরূপ ঘুঁড়ির গোত্তা খেয়ে পড়ে' যাবার উপমায় কখনই সাড়া দিতে পার্‌বে না। কারণ মন বস্তুটির ওরূপভাবে মাধ্যাকর্ষণের কবলিত হওয়ার মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যও থাক্‌তে পারে বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বও থাক্‌তে পারে, কিন্তু একটা জিনিষ থাক্‌তে পারে না যেটা হচ্ছে—কবিত্বের নামগন্ধ। যদি কেউ বলেন তা হোক্ বৈজ্ঞানিক তথ্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কবিত্বের সত্যের চেয়ে মহান্, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। যেহেতু আমরা বর্ত্তমানে আলোচনা কর্‌তে বসেছি—আধ্যাত্মিকতার নয়, কবিত্বের।

কিন্তু পূর্ব্বেই প্রসঙ্গতঃ বলেছি যে, পুরোনো অনেক বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতের (folk-music) কথায় না হ'লেও সুরে আমাদের আধুনিক মনও কম-বেশী সাড়া না দিয়েই পারে না। তার কারণ—এরূপ গানের সুরের স্থান অনেক-সময়েই নিছক্ সাময়িকতার উপরে। তাই সেগুলির আবেদন সরল হ'লেও হৃদয়স্পর্শী। অতুলপ্রসাদ এ-সুরগুলির ছাঁচে তাঁর কবিত্ব ঢেলে যে গান তৈরি করেছেন তার মিলিত আবেদন দাঁড়িয়েছে—ভারি মনোজ্ঞ।

এ গানটিতে আপনারা দেখবেন কীর্ত্তন ও বাউলের ঢঙ কেমন স্বাভাবিকভাবে মেশানো হয়েছে। এখানে অতুলপ্রসাদের একটা সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। আমাদের বর্ত্তমান বাংলার অনেক কবিই শুধু কীর্ত্তনে বা শুধু বাউলে উৎকৃষ্ট গান রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু বাউল ও কীর্ত্তনের সুরের এ-ভাবে মিলন সাধন করে' তা'তে কবিত্বের সাহায্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করায় কৃতিত্ব বোধ হয় অধুনাতন কবিদের মধ্যে—অতুলপ্রসাদের এককের।

তাঁর আরও কৃতিত্ব এই যে, এ-মিলন-সাধনের পর্ব্বে তিনি কোনো-কোনো স্থলে হিন্দুস্থানী ঢঙকেও মেশাতে কৃতকার্য্য হয়েছেন। ফলে হয়েছে এই যে, তাঁর সহজ কীর্ত্তনবাউল-মেশানো গানেও হিন্দুস্থানী মনোজ্ঞ তানালাপের খানিকটা রস আমদানি করা যায়; যেমন তাঁর "ওগো আমার নবীন শাখী ছিলে তুমি কোন্ বিমানে" গানটিতে। এ সুন্দর-করুণ গানটিতে কীর্ত্তন-বাউলের সঙ্গে হিন্দুস্থানী পিলুর রস দিয়ে যে ব্যঞ্জনাটি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে তার আস্বাদের বিচিত্রত্ব ও মনোহারিত্ব যে-কোনো যথার্থ সঙ্গীতানুরাগীর হৃদয়কে বোধ হয় স্পর্শ না করে'ই পারে না।

---

* এ-কথা কবিদের কীর্ত্তন-সম্বন্ধে—বিশেষতঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি দু'চারজন সত্যকার কবির রচনা-সম্বন্ধে—প্রযোজ্য নয়। কারণ এঁদের অনেক গানে শ্যামের ও রাধার রূপ বর্ণনারূপ অপেক্ষাকৃত নিম্নদরের কবিতা থাক্‌লেও—উচ্চতম কাব্যরসেরও অভাব নেই। আমি তাঁদের বিরহ-সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করে' একথা বল্‌ছি যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চরম কথা লিখে' গেছেন—"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?"

অতুলপ্রসাদের গানের কবিত্ব-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা আমার এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবু একটা কথা আমি এ-প্রসঙ্গে বল্‌তে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, অতুলপ্রসাদের গানের কথার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য মনে হয়—ভক্তিরসকে একটু অভিনব-ভাবে উদ্রেক করার তাঁর ক্ষমতা। তাঁর এ ক্ষমতার মূল শুধু তাঁর কবিত্ব শক্তি নয়—কারণ শ্রেষ্ঠতর কবিত্বের সাহায্যেও অনেক সময়ে আমাদের আধুনিক মনে ঠিক বৈরাগ্য বা other worldinessএর আবেদনটি পৌঁছয় না, যদি সে-কবিত্বের সঙ্গে একটা directness না থাকে। অতুলপ্রসাদের গানে এই directness জিনিষটি প্রায়ই আমাদের আধুনিক refinement এর সাহায্যে এক অভিনব রূপ ধরে' মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে দেখা যায়। ফলে হয়েছে এই যে তাঁর ভক্তিরসাত্মক গান ঠিক মামুলিভাবে আমাদের ভক্তি না জাগিয়ে অনেকটা তাঁর কবিত্ব ও directnessএর সাহায্যে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে। এর স্পর্শে আমাদের হৃদয়ে যে-অনুভূতিটি জাগে তা'কে একটু বিশ্লেষণ করে' দেখতে গেলে দেখা যায় যে সেটা ঠিক পুরাতন ভক্তিরসাত্মক গানের ভক্তির অনুভূতি নয়। এ একটা নূতন-রকম complex অনুভূতিটির বিষয়ে বিশদ বর্ণনা শুধু কথায় সম্ভব নয়, কারণ এ অনুভূতির জাগরণ হ'তে পারে এক কথা ও সুরের সামঞ্জস্যে। তাই আমি আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট ক'রে তোল্‌বার জন্য দুটি গান গেয়ে আপনাদের শোনাতে চাই। (এখানে লেখক "হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে" ও শ্রীযুক্ত রণজিৎ সেন 'থাকিস্‌নে বসে' তোরা সুদিন আস্‌বে বলে' " গান-দুটি গেয়েছিলেন।)

অভক্তেরও যে অতুলপ্রসাদের এ-শ্রেণীর গানগুলি সচরাচর ভালো লেগে থাকে, তার কারণ বোধ হয় (১) কবির এ-শ্রেণীর গানের সুর অনন্যসাধারণ না হ'লেও মনোহর ও (২) তাঁর শ্রেণীর গানের কথার মধ্যে যে আবেদনটি আছে তা'তে আমাদের ভক্তিরস না হোক্ মানবমনের চিরন্তন অসীমের আকাঙ্ক্ষাটি কবিত্বরূপ জাদুকরের সোনার কাঠির পরশে সজাগ ও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। "সীমার মধ্যে অসীমের সুর" চিরদিনই মানবহৃদয়-রাজ্যে এম্‌নি সুষমা বিস্তার করে' এসেছে—এম্‌নি মোহজালই বেড়ে এসেছে। —কেন?—কে জানে। সঙ্গীত ও কবিত্বের স্বপ্নরাজ্য আমাদের মনোজগতে এ-মোহপরশ যেমনভাবে এনে দেয় অন্য কোনো ললিতকলা সে-সৌরভ তেমনভাবে এনে দিতে পারে কি না জানিনে;—তবে এটা জানি যে, যে শিল্প এ অজানা-অচেনার সুরভি যত গভীরভাবে এনে দিতে পারে, তার গরিমাও ততই মহীয়সী হ'য়ে ওঠে।

অজানার চরণে মানব-মনের এই যে চিরন্তন আবেদন, মানুষের যুগযুগান্তর ধরে' তা'কে পাওয়ার এই যে নিহিত বাসনা—এ-সব অতুলপ্রসাদের নানান্ গঠনেই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। যেমন তাঁর "বাংলা ভাষা" গানটির শেষ চরণ-দুটিতে যেখানে কবি গেয়ে উঠেছেন :—

"ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকনু মায়ে মা মা ব'লে
ঐ ভাষাতেই বল্‌ব হরি সাঙ্গ হ'লে কাঁদা-হাসা।

অথবা মিছে তুই ভাবিস্ মন গানটির শেষ চরণ-দুটিতে :—

আজি তোর যাঁর বিরহে নয়নে অশ্রু বহে
(ওরে) হয়ত তাঁহার পাবি দেখা গানটি হ'লে সমাপন।

অথবা 'থাকিস্ না ব'সে তোরা' গানটির শেষ চরণ-দুটিতে :—

ভাঙলে বালির আবাস বিষাদে হোস্‌নে হতাশ
আছে ঠাঁই বলে বাতুল রাতুল চরণ-তলে।

অজানা, অচেনা, অসীমের প্রতি মানবমনের এই যে নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা, তার জন্য অবোধ হৃদয়ের এই যে চিরন্তন অশ্রু-সজল আরাধনা,—একে বোধ হয় ভারতের মনো-জগতের একটা বৈশিষ্ট্য বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। আমি অবশ্য বল্‌তে চাইনে যে এ-মনোভাবটি শুধু ভারতেরই একচেটে। কারণ পরজগতের এই যে আকর্ষণ, জীবনের নানান্ তৃষ্ণার মধ্যে অজ্ঞাত রহস্যের এই যে মাদকতা, এরা বোধ হয় মানবমন মাত্রকেই কমবেশী অভিভূত না করে'ই পারে না। তবে আমার মনে হয় যে এ মনো-ভাবটি নিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠমনারা—কবি, দার্শনিক, বাউল, কীর্ত্তনী প্রভৃতি—যতটা চেষ্টা করেছে—ততটা অন্যান্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠমনারা করেনি।

তবে এই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলেই যে তা'কে

প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের সমান থাকে তা নয়। এই-খানেই কবিত্বের বৈশিষ্ট্য। কবিত্ব বস্তুটি জগতে সুলভ নয়—বিরল। একথা সব সভ্যতার শিল্প সম্বন্ধেই খাটে। গানের উদাহরণ হিসেবে বোধ হয় বিদেশী সঙ্গীতের দু-' একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া মন্দ নয়, যেমন ধরুন ইংরেজী ধর্ম্ম-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এ ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত বল্‌লেই চলে। কিন্তু হ'লে হবে কি, যীশু-সম্বন্ধে ইংরাজ ভক্তির অধিকাংশ গানই যেমন একঘেয়ে, তেম্‌নি কবিত্বলেশহীন। এ-কথা যে অত্যুক্তি নয়, তা যে-কোনো ইংরাজী hymn-book এর গানগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই প্রতীয়মান হবে। এ-শ্রেণীর গানের অধিকাংশই কবিত্বের ধার দিয়েও যায় না এবং কৃত ও অকৃত পাপরাশির গুরু-ভাবে নিষ্প্রভ ও অবসন্ন যেমন :—

The mistakes of my life have been many
And my spirit is sick with sin.

অথবা আর-একটা গানে আছে

How helpless and hopeless we sinners had been

এরূপ গানের মধ্যে আর-কিছুর অভাব বোঝা যাক্ বা না যাক্ একটা জিনিষের অভাব কাব্যপিপাসুর কাছে —এক মুহূর্ত্তেই ধরা পড়ে, যার নাম কবিত্ব। পক্ষান্তরে Abide with me নামক প্রসিদ্ধ গানটির মধ্যে কবিত্বের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বোধ হয় কোনো কাব্যামোদীরই সংশয় থাকবে না :—

Abide with me fast falls the even-tide,
The darkness deepens, Lord ! with me abide.
Heaven's morning breaks and earth's
vain shadows flee
In life, in death, O Lord ! abide with me.

য়ুরোপে কর্ত্তব্যবোধ ও সামাজিকতার খাতিরে কত ধর্ম্মসঙ্গীতই না শুনতে হয়েছে। কিন্তু এরূপ দু'চারটি কবিত্বময় গান ছাড়া অধিকাংশ গানেই মনটা সাড়া দেয়-নি। এখানেই শিল্পের মহিমা। প্রকৃত শিল্পের মধ্যে মানুষের বাণী বা অনুভূতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে, মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যের খুব গম্ভীর-বদনে দীর্ঘশ্মশ্রুসঞ্চালন পুরঃসর ভয়াবহ তর্জ্জনী-হেলনের মধ্যেও সে অনুভূতি বা বাণীর প্রকাশ মেলে না। আমি অবশ্য এ-ক্ষেত্রে ভক্ত বা ঈশ্বর-প্রেমিকের কথা বল্‌ছিনে। তাঁদের কাছে গানের মধ্যে মুক্তি, জীবনের নশ্বরতা, হরিনামামৃত প্রভৃতির উপাদান একটু অশ্রুজলের ও হাহুতাশের মশলার সঙ্গে-সঙ্গে থাক্‌লেই যথেষ্ট। উচ্ছ্বসিত হ'তে তাঁরা আর-কিছুর অপেক্ষা রাখেন না। যেমন কথামৃতে দেখতে পাই পরম-হংসদেব দাশুরায়ের ছিল

বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে জীবনে জীবন
কেমনে হয় মা রক্ষে
আছি তোর আপিক্ষে দে মা মুক্তি তিক্ষে
কটাক্ষেতে করি পার

গান শুনে' অশ্রুবর্ষণ কর্‌তেন। কিন্তু আমরা—অর্থাৎ অভক্ত জন—সম্ভবতঃ এ-গানের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক-তায় রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে উঠব না। এর কারণ কেবল এইমাত্র যে পরমহংসদেব গানের মধ্যে খুঁজতেন কেবল—ঈশ্বরের নাম গান, ঐহিক, অনিত্যতা, বৈরাগ্যের গুণগান ইত্যাদি, ও আমরা খুঁজি—মনোজ্ঞ কবিত্ব, সহৃদয় ভাব ও মনোহর প্রকাশভঙ্গী। তাই আমরা

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙবা ডিঙে চালায় আবার
সে কোন্‌জন

কবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ—

গানটি শুন্‌লে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ ধ্যান করার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে সহসা খুব সচেতন হয়ে উঠতে পারিনে। কিন্তু যখন শিল্পী চণ্ডীদাসের অনুপম আত্মসমর্পণের কবিত্বময় বাণী পড়ি যে

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ

তখন চির বিরহীর অন্তর্গূঢ় ব্যথার মধ্যেও আত্মদানের সার্থকতার করুণ মধুর রসে আপ্লুত না হ'য়েই পারিনে। অথবা যখন স্বভাবকবি রামপ্রসাদের কলকণ্ঠে শুনি, "মন তুমি কৃষি কাজ জানো না, এমন মানব-জমি রইল পতিত আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোনা", তখন মানবজীবনের কত রঙীন কামনায় অপূর্ণতা, গোপন আশাভঙ্গের বেদনা বা নিহিত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাই না আমাদের হৃদয়কে বিষাদাশ্রুতে প্লাবিত করে' দিয়ে যায়।

তবে আর্টের বা কবিত্বের প্রকাশভঙ্গী—বড়-বড় কথা সাজিয়ে বলা মাত্র নয়। তাই এই বস্তুটি না থাক্‌লে শিল্পের শিল্পত্বই লোপ পায়, থাকে শুধু শুষ্ক ধর্ম্মোপদেশ বা বিজ্ঞম্মন্য অহমিকা যা যেতে পারে এক কানের মধ্যে, কিন্তু মরমে পশিতে একান্তই অক্ষম হ'য়ে উঠে। বর্ত্তমান য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সত্যই বলেছেন, Art is a vision (Essence of Æsthetics of Croce). উদাহরণতঃ রবীন্দ্রনাথের

"ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধনদুর্লভ

আমি মর্ম্মের কথা অন্তর-ব্যথা কিছুই নাহি কবো"

গানটি নেওয়া যেতে পারে। এ-গানটির ভাবে যে আমাদের মনে পুলক জাগে তার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্র-নাথ এ-গানটিতে আমাদের অকাট্য যুক্তিবলে ঈশ্বরে ভক্তিমত্তার ঔচিত্য-সম্বন্ধে নিঃসংশয় করেছেন;—তার কারণ এই যে, তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুভূতিটিকে তাঁর অনুপম কবিত্বশক্তির জাদুতে জাগিয়ে তুলেছেন। অতুলপ্রসাদের গানের কবিত্ব-সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ তাঁর ভক্তিরসাত্মক গান যে এত সহজে আমাদের আর্দ্র করে' তোলে তার কারণ এ নয় যে তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভীষণ তিরস্কার বা নরক-যন্ত্রণার ভয়প্রদর্শন ফুটে' উঠেছে; তার কারণ—তিনি তাঁর আন্তরিক মনোভাবকে তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বের সাহায্যে বড় সুন্দরভাবে মূর্ত্ত করে' তুলেছেন। আগেকার অনেক তথাকথিত আধ্যাত্মিক গানের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের ভক্তিরসাত্মক গানের এইখানে কত বড় একটা তফাৎ আছে, সেটা অনুধাবনীয় মনে করে'ই এ-সম্পর্কে এত কথা বলা দর্‌কার মনে কর্‌লাম। (একথা অবশ্য বর্ত্তমান বাংলার অন্য দুজন গীতিকবি অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান-সম্পর্কেও খাটে)।

অতুলপ্রসাদের দ্বিতীয় বিশেষত্বটির কথা আমি ইতি-পূর্ব্বে একাধিক বার উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ তাঁর কাব্যের কথাচিত্র (word portaiture) ও হিন্দুস্থানী সুরের আবেদনের সামঞ্জস্য সাধন করার ক্ষমতা। ওখানে তাঁর কৃতিত্ব খুবই বেশী বলে' মনে হয়। তাই এ-সম্বন্ধে দুচারটি কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার মনে কর্‌ছি।

আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি য়ুরোপে অবস্থান-কালে জগতের নানা জাতির সঙ্গীত একটু ভালো করে'ই শোন্‌-বার অবসর পেয়েছিলাম।* তবে আজ অবধি যতরকম সঙ্গীত শুনেছি, তার মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিকাশের ধারা ও আবেদনই আমার কাছে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মনে হয়, একথা আমি বহুবার বলেছি।

য়ুরোপের উচ্চতম symphony, choral singing, কীর্ত্তন, ভক্তিরসাত্মক গান,—সবেরই স্থান আমার কাছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নীচে। আমি মনে করি জগতে দুটি সভ্যতা আছে যারা সঙ্গীতরাজ্যে মহত্তম সৃষ্টি করেছে।—(১) য়ুরোপীয় সভ্যতা, harmony তে,—প্রধানতঃ জার্ম্মানদেশে ও (২) ভারতবর্ষ, melody-তে,—প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে।

অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত আমি প্রধানতঃ এই-জন্য যে তিনি হিন্দুস্থানী ঢঙ তাঁর অনেক বাংলা গানেই আম্‌দানি করেছেন। একথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয় যে, বর্ত্তমান বাংলার কবিদের মধ্যে এ ঢংকে বাংলা গানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—অতুল-প্রসাদ। নিধু-বাবুই প্রথমে ওদিকে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শুধু সুর নয়, সূক্ষ্ম ঢঙের সঙ্গে বাংলায় কবিত্বের সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্য হয়েছে বোধ হয় অতুলপ্রসাদের এই হিন্দুস্থানী-চালের গানে, যদিও শুধু কবিত্বের দিক্ দিয়ে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি বা গীতিকবি বাংলাদেশে জন্মেছেন। তবে যেহেতু মনের উপর গানের কবিত্ব ও কবিতার কবিত্বের effect(কার্য্য)ভিন্ন-রকমের, সেহেতু অতুলপ্রসাদের রচনাকে ছোট করে' দেখা চলে না। কারণ তাঁর রচনা হচ্ছে—প্রধানতঃ গীতিকাব্য, কবিতা নয়। তাই তাঁর অনেক গানের অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ভাবও সুরের মধ্য দিয়ে যেভাবে ফুটে' উঠেছে সেটা তাঁর নিছক্ কবিত্বের সাহায্যে সেভাবে ফুটে উঠতে পার্‌ত না। অতুলপ্রসাদ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্র লক্ষ্ণৌয়ে বহুকাল বাস করে' শ্রেষ্ঠ

---

* এখানে বলে' রাখা ভালো যে আমার ভাগ্যে জার্ম্মান্, রুশ, ইতালীয়ান, ফরাসী, চেক্, হাঙ্গেরিয়ান, স্কাণ্ডিনেভিয়ান, ডাচ্, সুইস, ইংরেজী, জাপানী ও চীনা সঙ্গীত শোন্‌বার নানান্ সুযোগ য়ুরোপে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্রেণীর হিন্দুস্থানী গানের সহিত গভীরভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন—বিশেষতঃ ঠুংরির সঙ্গে। তাঁকে যাঁরাই ব্যক্তিগত-ভাবে জানেন তাঁরাই জানেন যে হিন্দুস্থানী গানকে তিনি কি-রকম মনে-প্রাণে ভালোবাসেন। বাঙালীর মধ্যে হিন্দুস্থানী গানের—বিশেষতঃ টপ্পাঠুংরি তালের গানের—এরূপ বিশেষজ্ঞ ও ভক্ত যে খুবই কম মেলে একথা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কারুর কাছেই অবিদিত থাকতে পারে না।

শিল্পী তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে নিজের গভীরতা-উপলব্ধিই প্রকাশ করে' থাকেন—কেননা এইটেই হচ্ছে জীবনের ধর্ম্ম। গীতিকবি অতুলপ্রসাদের শিল্পের দিকে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি বোধ হয়—তাঁর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ। সুতরাং তাঁর চরম সৃষ্টিতে তিনি এ উপলব্ধিকে মূর্ত্তিমতী না করে'ই পারেন না। তাই তাঁর গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতানুরাগীর এতটা তৃপ্তি মেলা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে।

আমরা তাঁর "বঁধুয়া নিদ নাই আঁখি পাতে" নামক বেহাগ গানটিতে যে রসটির পরিচয় পাই তা এত করুণ-মধুর হ'য়ে উঠেছে প্রধানতঃ এইজন্য যে তার মধ্যে বাংলার কবিত্ব ও বৈষ্ণব কবির চিরন্তন চিরতম বিরহ-গানের সুরের সঙ্গে খাঁটি হিন্দুস্থানী বেহাগের এক অপরূপ মিলন সাধন করা হয়েছে।

অতুলপ্রসাদের আরও অনেক গানে এ-সামঞ্জস্যের বা মিলন-সাধনের হৃদয়স্পর্শী পরিচয় মেলে, যেমন তাঁর 'বাদল রুম ঝুম বোলে' গানটিতে। এ-গানটি ঠুংরি-খাম্বাজে রচিত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের বিকাশে টপ্পা ও বিশেষতঃ ঠুংরির স্থান অতি উচ্চে বলে' আমি মনে করি।* যে সভ্যতা সৌন্দর্য্যের রাজ্যে এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি করতে পারে তার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যদি শিল্পী বা শিল্পানুরাগী সম্প্রদায় একটু বেশীই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন, তবে আশা করি সেটা অমার্জ্জনীয় জাতীয় আত্মাভিমান বলে' গণ্য হবে না। বস্তুতঃ আমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিকাশ-ধারাকে শুধু হিন্দুর কীর্ত্তি বলে' মনে করিনে—যেহেতু এজন্য আমরা মুসলমান-সভ্যতার কাছে গভীরভাবে ঋণী। তাই আমি এ সৃষ্টিকে মানুষের কীর্ত্তি মনে করে'ই গর্ব্ব বোধ করি। এ বিয়োগবহুল জগতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুপম বিকাশ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কথা মনে করে' আমার কবির সঙ্গে বলতে ইচ্ছা হয়—Marvellous art thou ! O Spirit of Man ! In the midst of thine thraldom thou hast created the beautiful !"* আমি আমাদের অপূর্ব্ব হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মহিমময় বিকাশের কথা বলতে গিয়ে যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠি তা সত্যিই এই কথা ভেবে যে আমরা এত দুঃখ-দৈন্যের মাঝ-খানেও এমন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। দুঃখের বিষয় সাধারণ বাঙালী—বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙালী—এ-সৌন্দর্য্যের খবর বড়-একটা রাখেন না। এটা সবচেয়ে বড় আক্ষেপের কথা এইজন্য যে যথার্থ শিক্ষা ও culture-এর সংস্পর্শে এলে এ বিকাশ আরও কত মহনীয় হ'য়ে উঠতে পারত। অশিক্ষিত অনুদার ওস্তাদদের হাতেই যখন এধারার এতটা সৌন্দর্য্য বজায় আছে তখন শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভার যোগাযোগে যে এ-সৌন্দর্য্য শতগুণে বরেণ্য হ'য়ে উঠত এটা বোধ হয় অত্যধিক আশা নয়। তবে এ-বিকাশ সম্ভবপর হ'তে হ'লে আমাদের উচ্চশিক্ষিতদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আমি অতুলপ্রসাদের গানকে আরও অভিনন্দন করি ও সেটা এই ভেবে যে, এ গীতি-কবির রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী এরসের সম্পূর্ণ না হ'লেও অনেকটা পরিচয় পাবে ও আদর করতে শিখবে। অতুলপ্রসাদ অনেক গান লিখেছেন ও তার মধ্যে এ-শ্রেণী হিন্দুস্থানী ঢঙের গান বড় কম নেই। উদাহরণতঃ তাঁর কাফিসিন্ধুতে রচিত 'মধুমাসে এল হোলি' অথবা 'বাদল রুম ঝুম বোলে' গানটি নেওয়া যেতে পারে। এ-গান-দুটির মধ্যে যথাক্রমে হিন্দুস্থানী

* ধ্রুপদী ও খেয়ালীরা এরূপ heresy শুনলে হয়ত মূর্চ্ছা যাবেন, কিন্তু তবুও আমি সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য যে সঙ্গীতের উচ্চতম বিকাশে ঠুংরির দাম অন্য কোনো শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চেয়ে কম নয়। তার একটা প্রধান কারণ এই যে ঠুংরিতে গায়কের expression দেবার ও মৌলিকতা দেখাবার স্বাধীনতাও অন্যান্য শ্রেণীর গানের চেয়ে বেশী। তবে এ-সম্বন্ধে আলাদা প্রবন্ধে আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

* The Great Hunger by Johan Bojer (translation from the Norwegian).

কাফিব ও খাম্বাজের ঢঙ বড় সুন্দর খাপ খেয়েছে বলে' মনে হয়।

অতুলপ্রসাদ গজল সুরে গুটিকতক বাংলা গান বড় সুন্দর রচনা করেছেন, যেমন 'কত গান ত হ'ল গাওয়া' অথবা 'ঝরিছে ঝর্ ঝর্' অথবা 'কেগো তুমি বিরহিণী'। অতুলপ্রসাদ ঠুংরির চালে অনেকগুলি গান রচনা করেছেন, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। তার মধ্যে "শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে আয় কে ঝুলিবি আয়" গানটির মধ্যে পিলু সারঙ বড় সুন্দর ফুটে' উঠেছে।

শেষে অতুলপ্রসাদের কীর্ত্তনের দু-একটি দৃষ্টান্ত না দিয়ে বর্ত্তমান আসরের সমাপন করা চলে না। পূর্ব্বেই বলেছি এ গীতিকবি তাঁর কীর্ত্তনের মধ্যেও একটু নূতনত্বের হাওয়া এনেছেন। এ-নূতনত্ব কখনও বা কোনো মেঠো সুরকেই সুন্দর কথার সঙ্গে সাজিয়ে একটা উদাস-ভাবের প্রবাহ আনে, যেমন তাঁর বাউলের সঙ্গে মেশানো কীর্ত্তনে।—যেমন "যদি তোর হৃদ্‌যমুনা" অথবা "আর কত কাল থাক্‌ব বসে' " গানটির মধ্যে। কখনও বা এ অভিনবত্বের আমদানি হয়—পুরোনো আসল কীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে ও আধুনিক ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে, যেমন তাঁর "কতকাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে" গানটিতে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

বাঙালীর দুর্ব্বলতা

বাঙালী ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় বিশেষ কাঁচা। একথা বাঙালীরা নিজেই আজকাল "ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়" না করিয়া সজ্ঞানে বলিতেছেন। দুর্ব্বলতাটার দিকে দেশের লোকের নজর যখন পড়িয়াছে তখন একটা দাওয়াই আবিষ্কার করিবার দিকে সমবেত বা দলবদ্ধভাবে মাথা খেলানো আবশ্যক। দেশের নিকট একটা প্রস্তাব পেশ করা যাইতেছে। আলোচনা প্রার্থনা করি।

ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কেতাব বাঙালীর পেটে পড়ে নাই, একথা কেহই বলিবে না। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে দেশের ভিতর। তাহার আওতায় এইসকল কেতাবের ঠাঁই আছে। তাহা ছাড়া বিদেশেও বাঙালীরা ব্যারিষ্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইবার জন্য এইসকল বই পড়িয়াছেন আর একালে শিল্প-বাণিজ্যাদি-বিষয়ক বিদ্যা দখল করিবার জন্য বিদেশী শিক্ষাকেন্দ্রে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা অনেককেই অল্পবিস্তর করিতে হইয়াছে।

তথাপি বাঙালীর ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্যে ধন-বিজ্ঞানের ছাপ পড়ে নাই। কি দৈনিক, কি মাসিক, কি গ্রন্থ, কোনো রচনায়ই বাঙালীকে ধনবিজ্ঞান-দক্ষ বলা চলিবে না। এমন কি বিশ বৎসর ধরিয়া যে উত্তরোত্তর চরম মতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলিতেছে তাহার আব-হাওয়ায়ও এই বিদ্যার অভাব যৎপরোনাস্তি।

স্বদেশ-সেবকেরা, রাষ্ট্রিকেরা ভক্তিযোগের ভাবুকতা প্রচার করিয়াছেন। আদর্শ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ত্যাগনিষ্ঠা, ইত্যাদি বিষয়ক জীবন-দর্শন সমাজের নানা ঘাঁটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইসব তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। কিন্তু তবুও আন্দোলনটা "দেশের মাটিতে" আসিয়া শিকড় গাড়িতে পারে নাই। ধনদৌলতের কথা নিরেটভাবে পাকড়াও করিবার মত মাথা আজও বাঙালী-সমাজে দেখিতে পাই না।

ধনবিজ্ঞানের "ল্যাবরেটরি"

আসল কথা, ধনবিজ্ঞান বইয়ের বিদ্যা নয়। কেতাব

পাঠ করিয়া এই বিদ্যা দখল করা অসম্ভব। রসায়ন বিদ্যাটা গ্যাস-বিষ-"ওষুধ" চালাচালির বিদ্যা,—কেতাবী শাস্ত্র নয়। যন্ত্রপাতি লোহা-লক্কড় ঘাঁটাঘাঁটি না করিতে পারিলে এঞ্জিনিয়ারও হওয়া যায় না। কলকব্জায় আঁতকাইয়া উঠিয়া কেতাবের চিত্রগুলা লইয়া ভাবে বিভোর হওয়া এঞ্জিনিয়ারিং বা পূর্ত্তবিদ্যার সাধনা নয়। "ল্যাবরেটরি" আর "কারখানা" হইতেছে রসায়ন পূর্ত্তের জন্মভূমি। ধনবিজ্ঞানের জন্মভূমিও ঠিক এইরূপই কতকগুলা "ল্যাবরেটরি" আর "কারখানা"।

বাংলা দেশে যাঁহারা চাষ চালাইতেছেন, ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন, তেল তৈয়ারী করিতেছেন, পাটের দালালিতে মোতায়েন আছেন, কলে আমদানি-রপ্তানি করিতেছেন, সেইসকল বাঙালীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই ধনবিজ্ঞানের মশলা। নাই-নাই করিতে-করিতেও এই শ্রেণীর "ধন-স্রষ্টা" বাঙালী-সমাজে আছেন অনেক। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবনটা লইয়া "দার্শনিক" আলোচনা করিবার প্রয়াস দেখা যায় না। বাংলা দেশ এবং বাংলার ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্য এইসকল "জীবন" বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই।

ধনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি আর কারখানা চালাইতেছেন সরকারী চাকর্যেরাও। যাঁহারা ডাকঘর, রেলওয়ে ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্রের উচ্চতর পদে বাহাল আছেন, সেইসকল বাঙালীর অভিজ্ঞতা এই বিদ্যার উপকরণ। খাজনা আদায় করার বড়-বড় আফিসে যে-সকল বাঙালীর ঠাঁই, নগর-শাসনে, স্বাস্থ্য-বিভাগে, লোক-গণনার কাজে, জেলার তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য কার্য্যালয়ের আবহাওয়ায় যাঁহারা কথঞ্চিৎ মোটা মাহিয়ানা পান তাঁহাদের দৈনিক কাজকর্ম্মের ভিতরও ধনবিজ্ঞান বিদ্যার খুঁটাগুলা লুকাইয়া রহিয়াছে। এই শ্রেণীর বাঙালী বাংলার চিন্তা সম্পদকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত বোধ হয় এই হিসাবে "সবে-ধন নীলমণি"।

গণিত ও ধনবিজ্ঞান

আর্থিক বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকায় বাংলাদেশে ধন-বিজ্ঞান জন্মিতে পারে নাই। আর-একটা কারণ কিছু সূক্ষ্ম।

বাংলা দেশে যেসকল বাঙালী ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার কেতাব ঘাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই "অঙ্কে কাঁচা।" অথচ যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগে যে ব্যক্তির আত্মারাম চমকিয়া উঠে, তাহার পক্ষে ধনবিজ্ঞানে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া কঠিন। ডাইনে-বাঁয়ে অঙ্ক ছাড়া ধনবিজ্ঞান আর কিছুই নয়। সংখ্যাগুলা এই বিদ্যার প্রাণ।

সকলেই জানেন যে, পাটীগণিতের যেসকল "আঁক" পাঠশালার নিম্নতম শ্রেণীতে কষা হয় সে সবই আগাগোড়া হাটবাজার, ভাগ বাটোআরা, সুদডিস্কাউণ্ট ইত্যাদির মামলা। সেকেলে শুভঙ্কর আর একেলে গণিতকার উভয়েই ধনবিজ্ঞানের কারবার করেন।

কিন্তু ধনবিজ্ঞান বিদ্যাটার ভিতরও যে অঙ্কশাস্ত্রের ঘর অতি বড়, সেকথা সাধারণের মনেই আসে না। মনে আসে না বলিয়াই অঙ্কে যাঁহারা কাঁচা তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান-ক্লাশে নাম লিখাইয়া থাকেন। কথাটা ঠিক কিনা?

সেকালে ছিল এদেশে "এ" কোর্সের বি-এ পরীক্ষা। প্রাথমিক ধনবিজ্ঞান এই লাইনের অন্যতম পাঠ্য ছিল। এই লাইনে থাকিয়া অঙ্কশাস্ত্রকে পুরাপুরি "বয়কট" করা চলিত। আর আজকালকার বি-এ-তে বোধ হয় প্রথম হইতেই অঙ্কের সঙ্গে "অসহযোগ"। কাজেই যত রাজ্যের যে-যে ছাত্র অঙ্কে কাঁচা সকলে আসিয়া জুটে অধম-তারণ ধনবিজ্ঞানে। আর এই "কোঠে" নিরাপদ থাকিয়া তাহারা সকলেই অঙ্ককে দেখায় "কলা"।

ফল অতি স্বাভাবিক। নীলমলাটওয়ালা সরকারী "রিপোর্ট" কেতাবগুলো যখন আমরা দৈবক্রমে ঘাঁটিতে সুরু করি তখন অঙ্ক সমূহ বাদ দিয়া পড়িতে লাগিয়া যাই একমাত্র "বক্তৃতা" গুলা। খবরের কাগজের বাণিজ্য-পৃষ্ঠাটার "বাজার দর", ব্যাঙ্কের অঙ্ক ইত্যাদি পাঠ করেন এমন ধনবিজ্ঞান-সেবী বাঙালী কয়জন আছেন জানি না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞানের "রিসার্চ্চে" মোতায়েন হইবার পর আমরা আলোচনা করি প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে

প্রভেদ আর "ভারতীয়" ধনবিজ্ঞানের বাণী! অঙ্কে মাথা খেলিলে আমাদের ধরণ-ধারণ আলাদা হইত।

বাংলা ভাষায় বিদ্যা চর্চ্চা

আর-এক আপদ্ ভাষা। বিদেশী ভাষায় কোনো বিদ্যাই মগজে বসিতে পারে না। ধনবিজ্ঞানও ইংরেজির দৌরাত্ম্যেই বাঙালীর এবং অন্যান্য ভারতবাসীর মাথা দখল করিতে পারে নাই।

বাঙালীরা অনেক সময়ে নিজেদেরকে ইংরেজিতে খুব পাকা বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা নয়। ইংরেজী খবরের কাগজের সংবাদ আর টীকাটিপ্পনীগুলা আমাদের অনেকেই অতি সহজে,—জলের মতন—বুঝিয়া যাইতে পারেন। ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু যেই খানিকটা "চিন্তাওয়ালা" ইংরেজী কেতাব অথবা প্রবন্ধ চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই দেখা যায় যে, সেটা বড় শীঘ্র বেশী-সংখ্যক বাঙালীর রোচে না। "পরীক্ষা-সিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের" (এক্‌স্‌প্যারিমেণ্ট্যাল সাইকলজির) তরফ হইতে ইংরেজি-জানা বাঙালীর তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

বি-এ, এম্-এ, ক্লাসে ধনবিজ্ঞানের ইংরেজী বই পড়িতে বাঙালী যুবাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। এ-কথা কাহারও অজানা নাই। পঁচিশ' বা হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কোনো ইংরেজি বই পড়িয়া শেষ করা একটা অদ্ভুত কৃতিত্ব-বিশেষ সমঝা হইয়া থাকে। দায়ে পড়িয়া অধ্যাপকের তৈয়ারী-করা চুম্বক মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখা যায় না।

কিন্তু যদি বাংলায় বই থাকিত তাহা হইলে বৎসরে হাজার পৃষ্ঠার জায়গায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা হজম করাও অতি সহজ বিবেচিত হইত। ছাত্রজীবন-সম্বন্ধে যেকথা বলা হইতেছে সেকথা অধ্যাপক এবং গবেষক মহাশয়দের সম্বন্ধেও খাটে। কয়জন বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবী বৎসরে কত হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী নতুন বিদেশী বই পাঠ করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নের [illegible] দিতে [illegible] লে গোমর ফাঁক [illegible] বাজারে পাওয়া গেলে কি ছাত্র, কি মাষ্টার, কি গবেষক, কি স্বদেশসেবক সকলেই প্রতিবৎসর হাজার-হাজার পৃষ্ঠা গলাধঃকরণ করিতে সহজেই "সাহসী" হইবেন। অবশ্য একমাত্র মাতৃভাষার কল্যাণেই অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়।

আর্থিক অভিজ্ঞতার মিলন-কেন্দ্র

অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব বাঙালীর ধন-বিজ্ঞান সেবাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। শৈশবেই গণিতের সঙ্গে আড়ি করিবার ফলে আমরা ধন-বিজ্ঞানের অঙ্কগুলাকে "কাঁকড়া বিছা"র মতনই ভয় করিতে শিখিয়াছি। তাহার উপর বিদেশী ভাষা ও ধন-বিজ্ঞানকে জীবনের তথ্যরাশি হইতে সম্পর্কহীন করিয়া ছাড়িয়াছে সকল দিক্ হইতেই। আমাদের ধন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা বাস্তব হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব দাওয়াই অতি সহজ। একটা আখড়া কায়েম করা দর্‌কার। সেখানে ব্যাঙ্কার, শিল্পনায়ক, দালাল, কৃষি-দক্ষ, বণিক্ ইত্যাদি ধন-স্রষ্টার সঙ্গে সর্‌কারী চাকুর্য়েরা এক সঙ্গে আড্ডা মারিবেন। আর এই দুই দলের বাঙালীর জীবন কথা দুহিবার জন্য দেশের অন্যান্য লোক সেই মিলন-কেন্দ্রেই হাজির থাকিবেন। চাই বিভিন্ন আর্থিক অভিজ্ঞতাওয়ালা নর-নারীর পরস্পর যোগাযোগ, আর মেলামেশা বাক্‌বিতণ্ডা, ঝগড়াঝাঁটি, বক্তৃতা-ব্যাখ্যান, তর্কপ্রশ্ন, হাতাহাতি, মারামারি যা কিছু ইয়ারের দলে সম্ভব সবই জননী বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে। ধনস্রষ্টা আর চাকুর্য়েরা অঙ্ক লইয়া মাথা ঘামাইতে পটু। কাজেই এই বারোয়ারিতলার আবহাওয়ায় তথ্য ও অঙ্কের তালিকা বা "ষ্টাটিষ্টিক্‌স্" থাকিবে প্রচুর। এইসকল গণিত-সমন্বিত, মাপজোক-নিয়ন্ত্রিত বাস্তব আর্থিক অভিজ্ঞতার উপর চালাও যে যত পার "থিয়োরি"ও তত্ত্ব বা "দর্শন" তাহার পর বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞানের জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

এই মিলন-কেন্দ্র বা বারোয়ারিতলার নাম দিতেছি বঙ্গীয়ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সীমানা

বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের আয়োজনে দেশী-বিদেশী

কিছুই বাদ পড়িবে না। অধিকন্তু একমাত্র ইংরেজী অথবা বৃটিশ ও ইয়াঙ্কী মতগুলাই বাঙালীর জ্ঞান-মণ্ডল দখল করিয়া বসিবে এমন নয়। ফরাসী এবং জার্মান ভাষায় দুনিয়া যাহা-কিছু চিন্তা করে, সেইসবও এই আবহাওয়ায় দেখা দিবে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে সহযোগ চলিতে থাকিবে চূড়ান্ত ও নিবিড়। চিন্তারাজ্যে কোনো "বয়কট" চলিবে না। আবার কাহারও প্রতি পক্ষপাত করাও এই রাজ্যের আইনকানুনের বহির্ভূত।

অধিকন্তু কোনো মত-বিশেষের সপক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন চালানো পরিষদের মতলব নয়। মতগুলা মত-মাত্ররূপে "দার্শনিক" বা "বৈজ্ঞানিক" হিসাবে আলোচিত হইবে।

এই পরিষৎ "সাত মাসে স্বরাজ" আনিয়া দিবে না। দেশের লোককে রাতারাতি ধনী করিয়া তোলাও এই পরিষদের সাধ্য নয়। আর ম্যালেরিয়ার মূল উৎপাটন, প্লেগের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি অথবা দুর্ভিক্ষের ধ্বংসসাধন ইত্যাদি সুফলও এই পরিষদের নিকট আশা করা চলিবে না।

ধনদৌলত-সম্বন্ধে বাঙালী জাতির জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সাহিত্যসৃষ্টি হইতে থাকিবে। তাহার ফলে যদি দেশের কোনো উপকার সাধিত হয় এবং অপকার নিবারিত হয় ত হইবে। তাহার বেশী কিছু চাহিলে যে-কোনো বিদ্যা-পরিষৎই পত্রপাঠ জবাব দিতে বাধ্য। প্রত্যেক জ্ঞান মণ্ডলেরই সীমানা আছে।

কর্ম্মগণ্ডী

(ক) উদ্দেশ্য :—(১) বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চা করিবার জন্য এই পরিষদের উৎপত্তি।

(২) দুনিয়ার আর্থিক ক্রমবিকাশও এই চর্চ্চার অন্তর্গত। ভারতীয় তথ্যের সঙ্কলন এবং বিশ্লেষণ করিবার দিকেই পরিষদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

(খ) কার্য্য-প্রণালী :—(১) এইসকল বিষয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীর মিলন-কেন্দ্র কায়েম করা হইবে।

(২) আলোচনা, তর্কপ্রশ্ন, বক্তৃতা, সম্মিলন, না, প্রদর্শনী, ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের ভিতর ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ছড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

(৩) বাংলা ভাষায় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) স্কুল কলেজের ধনবিজ্ঞান পঠন-পাঠন-সম্বন্ধে উন্নতি এবং বিস্তৃতির উপায় আলোচনা করা হইবে।

(৫) দেশের ভিতর অনেক সময় সরকারী আর্থিক সমস্যা হাজির হয়। সেইসকল সাময়িক সমস্যার আলোচনায় যোগ দেওয়া যাইবে।

(৬) দেশের নানা কেন্দ্রে ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন বিষয়ক বিদ্যাপীঠ, গ্রন্থশালা, বক্তৃতা-ভবন, আলোচনা-গৃহ ইত্যাদি শিক্ষা-কেন্দ্র কায়েম করিবার দিকে লক্ষ্য থাকিবে।

(৭) কলিকাতার নানা প্রতিষ্ঠান অথবা মফঃস্বলের পল্লী সহর হইতে ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন-সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিলে সেইসকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের জবাব প্রকাশ করা হইবে।

(গ) বৃত্তিস্থাপন :—(১) এই বিদ্যার উচ্চতম অঙ্গে পাকাইয়া তুলিবার জন্য বাঙালী গবেষকদিগকে আর্থিক বৃত্তি দ্বারা সাহায্য করা হইবে।

(২) গবেষণার জন্য দেশের নানা স্থানে পর্য্যটন আবশ্যক হইলে তাহার ব্যয় বহন করা হইবে।

(৩) অনুসন্ধান এবং গবেষণা-পর্য্যটনের জন্য বাঙালী বিজ্ঞানসেবীদিগকে বিদেশের নানা কেন্দ্রে খোর-পোষদিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(মামুলী পরীক্ষায় পাশ বা ডিগ্রীলাভে সাহায্য করা এই বৃত্তির মতলব নয়।)

(ঘ) আন্তর্জ্জাতিক ভাব ও কর্ম্ম-বিনিময় :—

(১) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ অন্যান্য ভারতীয় এবং বিদেশী ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ-সমূহের সঙ্গে ভাব ও কর্ম্মবিনিময়ের সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) দুনিয়ার কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্যসচিবের আফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিত-সঙ্ঘ, শিল্প-পরিষৎ, অঙ্ক-প্রতিষ্ঠান, ...য়-মণ্ডল, মজুর-সমিতি, কিষাণ-সভা ইত্যাদি

কর্ম্মকেন্দ্র, ও চিন্তাকেন্দ্র হইতে আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিবে।

(৩) ভারতের নানা স্থানে বিদেশী কন্‌সাল এবং ব্যাঙ্ক, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির প্রতিনিধিরা মোতায়েন আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে এই পরিষৎ বাঙালী জাতির আর্থিক চিন্তাসম্পর্কিত লেন-দেন চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) দেশের সমস্যা-সম্বন্ধে বিদেশী ধন-কেন্দ্র, শিল্প-কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরিষদের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের নিকট আলোচনা-প্রণালী এবং মতামত চাহিয়া পাঠানো হইবে।

(৫) বিদেশী বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীকে বক্তা, শিক্ষক বা গবেষক-হিসাবে ভাড়া করিয়া আনা হইবে।

(৬) দেশ-বিদেশের সঙ্গে গবেষক-বিনিময়, অধ্যাপক-বিনিময়, গ্রন্থ-বিনিময়, পত্রিকা-বিনিময় ইত্যাদি কাজের ভার লওয়া হইবে।

সভ্য ও সহায়ক

ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন আলোচনা করিবার কাজে সাহায্য করা বাংলার সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ। বিশেষ করিয়া কয়েক শ্রেণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) দেশে অথবা বিদেশে শিক্ষা-প্রাপ্ত প্রত্যেক রাসায়নিক ও পূর্ত্তবিৎ (এঞ্জিনিয়ার) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎকে পুষ্ট করিয়া তুলিবেন আশা করা যায়। অধিকন্তু কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্কিং ; বীমা (ইন্‌শিওর্যান্স) ও বাণিজ্যে অথবা এই সকল বিভাগের শিক্ষাকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সকলের সাহায্যই পরিষদের পক্ষে আবশ্যক।

(২) এইধরণের আর-এক শ্রেণীর লোক দেশের আর্থিক কথা সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহারা সরকারী চাকুরে-হিসাবে কিষাণ, মজুর, জমিজমা, রেল, খাল, বন, মাছ, দুধ, স্বাস্থ্য, খনি, চাষ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সর্ব্বদা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত। বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর, এবং অন্যান্য অল্প বিস্তর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে বাঙালী কর্ম্মচারিরা এই পরিষদের বড় খুঁটা বিবেচিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহযোগিতা যার-পর-নাই বাঞ্ছনীয়।

(৩) আজকাল সহরে-মফঃস্বলে নানা ব্যক্তি সরকারী ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মমণ্ডলে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ পাইতেছেন। এই সূত্রে ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন-সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিত্য কর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্গত। সুতরাং তাঁহারা সকলেই এই পরিষদের সহায়ক হইবেন বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ তাঁহাদের আলোচনায় রসদ জোগানোই এই পরিষদের অন্যতম কাজ।

(৪) পল্লী-সেবক-মাত্রের পক্ষেই ধন-বিজ্ঞান পরিষদের কাজকর্ম্ম বিশেষ মূল্যবান্। তাঁহাদের সাহায্যে এই পরিষৎও যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে।

(৫) মজুর-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা অথবা মজুর আন্দোলনের নেতৃত্ব করা যেসকল নরনারীর সাধনার ঠাঁই পরে তাঁহাদের পক্ষেও এই পরিষদের পুষ্টি বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৬) ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় স্কুল-কলেজে ছাত্র পড়ানো যাঁহাদের ব্যবসা তাঁহাদের সঙ্গে এই পরিষদের সংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ বলাই বাহুল্য।

(৭) সংবাদ-পত্র, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি সাময়িক সাহিত্যের প্রকাশক, প্রবর্ত্তক, পৃষ্ঠপোষকেরা এবং সাংবাদিক শ্রেণীর লেখকেরা এই পরিষদের অন্যতম সহায়ক ধরিয়া লইতেছি।

(৮) বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির উন্নতি কামনায় যেস্থলে ধনী জমিদার, শিল্পপতি বা উকীল টাকা খরচ করিতে অভ্যস্ত অথবা এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা হাতে-পায়ে মাথায় খাটিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবুকতা এই পরিষদের উপরও বর্ষিত হইতে থাকিবে, বিশ্বাস করা চলে।

(৯) সার্ব্বজনিক জীবন এবং পররাষ্ট্রনীতি যাঁহাদের আলোচনার বিষয় তাঁহারা এই পরিষদের আবশ্যকতা সহজেই বুঝিবেন।

পরিচালনা ও পরিচালক

(ক) সভ্য সংখ্যা সম্প্রতি ধরিয়া লওয়া গেল ১০০০।

প্রত্যেক সভ্যকে বার্ষিক ৮৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেকে মাসিক ১০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী "ধন-বিজ্ঞান" নামক পত্রিকা পাইবেন। সঙ্গে-সঙ্গে পরিষদের পরিচালক-বাছাই এবং অন্যান্য কাজে প্রত্যেকের যোগ থাকিবে।

(খ) পরিচালক-সমিতি। পরিচালকেরা সকল সভ্য কর্ত্তৃক দুই-দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হইবেন। পঁচিশ জন এই সমিতিতে ঠাঁই পাইবেন। তাঁহাদের ভিতর পাঁচজনের বেশী ধনবিজ্ঞান বিদ্যার অধ্যাপক এবং সাতজনের বেশী উকিল ব্যারিষ্টার ও চিকিৎসক থাকিতে পারিবেন না। অন্যান্য সকলে কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত কর্ম্মে অভিজ্ঞতার জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচন ইত্যাদির নিয়ম যথাসময়ে সুবিস্তারিতরূপে আলোচনা-সাপেক্ষ।

(গ) যে পঁচিশজন লোক পরিচালক-সমিতি গড়িয়া তুলিবেন তাঁহারা ভিন্ন-ভিন্ন পঁচিশটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষজ্ঞরূপে গড়িয়া উঠিতেই সচেষ্ট এইরূপ বুঝিতে হইবে। বিষয়গুলা দ্বিবিধ।

(১) স্বদেশী :—ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, রেল, জাহাজ, বীমা কুদরতী মাল, বন, খনি, লোক-সংখ্যা, স্বাস্থ্য, জমিজমার বন্দোবস্ত, পল্লীজীবন, ফ্যাক্টরি-কেন্দ্র, আর্থিক আইন এবং শিল্প-সংগঠন, এই পনেরো বিষয়ের তথ্যের ও তত্ত্বের দেশ-সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা পরিচালক হইবার যোগ্য।

(২) বিদেশী ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানি রুশিয়া, ইতালি, জাপান ও তুর্কী এই অষ্ট দেশের জন্য আট জন বিশেষজ্ঞ বাছিয়া পরিচালক-সমিতিতে বসাইতে হইবে। তাহার উপর বিদেশ-বিষয়ক দুইটা মোটা ঘর রাখা হইবে। এক ঘরের জন্য ধনিক-সমাজের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আবশ্যক। আর-এক ঘরের জন্য শ্রমিক ও কিষাণ-সমাজের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে অপর এক বিশেষজ্ঞ দরকার হইবে। জাপান-সম্বন্ধে চাই মুসলমান বিশেষজ্ঞ আর তুর্কী-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে হিন্দুকে।

এই পঁচিশ বিভাগের পরিবর্ত্তে অন্য কোনো শ্রেণী-বিভাগও চলিতে পারে বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তর্ক-বিজ্ঞানের তরফ হইতে একটা নিখুঁত শ্রেণী-বিভাগ কায়েম করা সম্ভব নয়। যাহাতে কালে বিভিন্ন-বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হইতে পারে সেই দিকে নজর দিয়া আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইল মাত্র।

(ঘ) পরিচালকেরা পরিষৎ-সংক্রান্ত সকলপ্রকার কাজের ভার লইবেন। বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা, দেশ-বিদেশের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-ব্যবহার চালানো, গ্রন্থ-পত্রিকাদির প্রকাশ, ইত্যাদি সবই এই সমিতির অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(ঙ) পরিচালক সমিতির অধ্যক্ষ হইবেন বেতন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ধন বিজ্ঞান বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন এবং ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যক্ষের পদ দিতে হইবে। পরিষদের শাসন-বিষয়ক সকল ধান্ধাই এই কর্ম্মচারীর ঘাড়ে পড়িবে। অধ্যক্ষ গবেষকদিগের অনুসন্ধান কার্য্যের পর্য্যবেক্ষক থাকিবেন। "ধনবিজ্ঞান"-পত্রিকার সম্পাদন-ভার তাঁহার হাতেই থাকিবে। অধিকন্তু গ্রন্থ-শালার তত্ত্বাবধান করা এবং গ্রন্থ প্রকাশের তদ্বির করা তাঁহার এলাকার অন্তর্গত।

গবেষক

(ক) আপাততঃ বিভিন্ন পাঁচ বিষয়ে পাঁচ জন গবেষক বাহাল হইবেন। বিষয়গুলা নিম্নরূপ :—

(১) ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, রাজস্ব ইত্যাদি।

(২) রেল, ষ্টীমার, জাহাজ, ইন্‌শিওর‍্যান্স ইত্যাদি।

দেশের স্বাস্থ্য, লোক সংখ্যা, সার্ব্বজনিক চিকিৎসা ইত্যাদি (চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাশকরা ডাক্তারকে এই পদ দিতে হইবে। তিনি অবশ্য চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্বের যোগাযোগ আলোচনা করা তাঁহার কর্ম্ম থাকিবে।)

(৪) মজুর ও কিষাণ।

(৫) শিল্পোন্নতি ও বহির্ব্বাণিজ্য।

(খ) অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পাঁচজন গবেষক নিজ-নিজ আলোচ্য-ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাইবেন, সাময়িক সমস্যাগুলার মীমাংসায় মনোযোগী হইবেন, আন্তর্জ্জাতিক ভাব ও কর্ম্মবিনিময়ের জন্য দায়িত্ব লইবেন।

আর্থিক সংবাদ সংগ্রহ করিবেন, "ধনবিজ্ঞান"-পত্রিকা সম্পাদনের কাজে মাথা খাটাইবেন এবং অন্যান্য উপায়ে পরিষদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

(গ) গবেষকেরা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। কলেজের অধ্যাপক-হিসাবে তাঁহাদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেককেই ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষায় গ্রন্থ পত্রিকাদি ব্যবহার এবং পত্র লিখিবার মতন দখল দেখাইতে হইবে। পঁচিশ হইতে বত্রিশ বৎসরের ভিতর যাঁহাদের বয়স এইরূপ বাঙালীকে গবেষক পদে বাহাল করিতে হইবে।

"ধনবিজ্ঞান"-পত্রিকা

(ক) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষৎ "ধনবিজ্ঞান" নামে পুরাপুরি বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা চালাইবেন। একশ' পৃষ্ঠায় কাগজ বাহির হইবে। আকার থাকিবে "প্রবাসী" ইত্যাদির মতন। দাম হইবে বার্ষিক ৬৲।

(খ) অধ্যক্ষ এবং গবেষকগণ পত্রিকা বাহির করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন। তবে একমাত্র গবেষকদের রচনা, অনুবাদ বা সঙ্কলনই পত্রিকায় ছাপা হইবে এমন নয়। গবেষকেরা পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ-সম্বন্ধে দায়িত্ব লইয়া দেশের নানা অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে আহ্বান করিবেন। বাহিরের লেখকদের রচনার জন্য দক্ষিণা দেওয়া হইবে। তাঁহাদের রচনা পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে গবেষকেরা নিজ রচনার দ্বারা অভাব পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। (পত্রিকার কোথাও বাংলা হরপ ছাড়া আর কোনো হরপ ব্যবহৃত হইবে না, —মায় ফুটনোটেও নয় আর ব্র্যাকেটের ভিতরও নয়)।

(গ) একশ পৃষ্ঠার জন্য পত্রিকা নিম্নরূপ বিভক্ত হইবে :—

প্রবন্ধ (বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম্-এ, ক্লাসে যে-ধরণের বিদেশী গ্রন্থাদি পঠিত হইয়া থাকে অন্ততঃ সেই দরের মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদ বা সঙ্কলন এই অধ্যায়ে ঠাঁই পাইবে) ... ... ৫০ পৃষ্ঠা

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মাসিক সংবাদ ৫ "

মাসিক সাহিত্য (ফরাসী, জার্ম্মান, মার্কিন, ইংরেজ, জাপানী, ইতালিয়ান, রুশ এবং অন্যান্য ধনবিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার সূচী নিয়মিত ছাপা হইবে তর্জ্জমায় কোনো-কোনো প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারও দেওয়া যাইবে) ১০ পৃষ্ঠা

গ্রন্থপঞ্জী (ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী যেসকল বই ছাপা হয় সেই সকলের বাংলা নাম, ধাম, সন, তারিখ প্রকাশ করা হইবে বাংলা হরপে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ) ... ... ১০ পৃষ্ঠা

ধনদৌলতের গতিবিধি (দুনিয়ার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, টাকার বাজার, মূলধনের চলাফেরা, রাজস্বব্যবস্থা ইত্যাদি "সংবাদ" প্রকাশিত হইবে নিয়মিতরূপে) ... ১০ পৃষ্ঠা

আর্থিক ভারত (ভারতীয় কৃষিশিল্প বাণিজ্যবিষয়ক ক্রমবিকাশের তথ্য ও অঙ্ক এই বিভাগের আলোচ্য কথা। বৃটিশ ভারতের বহির্ভূত রাজরাজড়াদের "ষ্টেট্"-সম্বন্ধেও সংবাদ থাকিবে) ... ... ১০ পৃষ্ঠা

শিক্ষা ও সমাজ (দেশবিদেশের বিদ্যা-কেন্দ্রে ও ধন-কেন্দ্রে কখন কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে কোন্ কোন্ আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেছে সেইসকল বিষয়ে তথ্য প্রচার করা হইবে) ... ৫ পৃষ্ঠা

১০০ "

গ্রন্থ প্রকাশ

(ক) বাংলা ভাষায় আপাততঃ দশ খানা বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। অন্ততঃ ৫০০ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক কেতাব সম্পূর্ণ থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণীত হইবে। লেখকদিগকে যথোচিত বৃত্তি দেওয়া যাইবে। পাঁচ বৎসরের ভিতর দশখানা বই বাহির হওয়া চাই।

(খ) এইসকল গ্রন্থের লেখক ঢুঁড়িয়া বাহির করা অধ্যক্ষের কার্য্য থাকিবে। গবেষকেরা এইসকল লেখকের অন্তর্গত নন। লেখকদের সঙ্গে মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করা হইবে না। ফুরণ করিয়া পাণ্ডুলিপির উপর দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

(গ) গ্রন্থগুলা নিম্নলিখিত দশ বিষয়ে তৈয়ারি হইবে :—(১) ব্যাঙ্ক, (২) শিল্প-কারখানা, (৩) রেল,

(৪) স্বাস্থ্য ও ধনদৌলত, (৫) জমিজমা, (৬) মূল্য, (৭) বহির্ব্বাণিজ্য, (৮) বীমা, (৯) মজুর-জীবন, (১০) পাট।

(ঘ) প্রত্যেক গ্রন্থ ২০০০ কাপি ছাপা হইবে। লেখকের দক্ষিণাসহ বই-প্রতি প্রকাশের খরচ আন্দাজমানিক ধরা যাইতেছে ২০০০৲। দশখানা বাহির করিতে ২০,০০০৲।

গ্রন্থশালা ও পাঠাগার

(ক) •নানা ভাষায় ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন বিষয়ক গ্রন্থ, পুস্তিকা এবং পত্রিকা সংগ্রহ করিবার জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ একটা গ্রন্থশালা কায়েম করিবেন। এইজন্য প্রথমেই নগদ আবশ্যক ৫০০০৲।

(খ) দেশী বিদেশী দৈনিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিকের জন্য বার্ষিক লাগিবে ১৫০০৲।

(গ) বার্ষিক বই কিনিতে হইবে আপাতত:

(ঘ) পাঠাগারে বসিয়া যে-কোনো লোক কেতাব ও কাগজ পাঠ করিবার অধিকার পাইবেন।

(ঙ) গ্রন্থরক্ষক বেতনপ্রাপ্ত স্থায়ী কর্ম্মচারী। কলেজের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপকের সমান তাঁহার পদ। ফরাসী এবং জার্ম্মান্ ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

(চ) গ্রন্থরক্ষক কয়েকজন সহকারী পাইবেন এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইবেন।

খরচপত্র

পাঁচ বৎসরে দুই লাখ

	মাসিক	বার্ষিক	পাঁচ বৎসরে
গ্রন্থ প্রকাশ	...	...	২০,০০০৲
গ্রন্থশালা	...	...	১৫,০০০৲
বৃত্তি ও বেতন (অধ্যক্ষ, ৫ গবেষক, গ্রন্থরক্ষক)	১,৭০০৲	২০,৪০০৲	১০২,০০০৲
পাঁচজন সহকারী (ফরাসী এবং জার্ম্মান্ ভাষায় অভিজ্ঞ "টাইপিষ্ট" আবশ্যক)	৪০০৲	৪,৮০০৲	২৪,০০০৲
কার্য্যালয় ও গ্রন্থশালা এবং পাঠাগারের সরঞ্জাম	২০০৲	২,৪০০৲	১২,০০০৲
পাঁচজন সেবক (দপ্তরী সমেত)	১০০৲	১,২০০৲	৬,০০০৲
			১৭৭,০০০৲

পত্রিকার খরচ এইখানে দেখানো হয় নাই। একশ পৃষ্ঠার কাগজ মাসিক ৩০০০ ছাপিতে এবং ডাকে ছাড়িতে লেখকদের দক্ষিণা সহ আনুমানিক ধরা হইতেছে বার্ষিক ৬০০০৲। পরিষদের সভ্য-সংখ্যা ১০০০ হইলেই ৮০০০৲ উঠে। কাজেই পত্রিকার জন্য আলাদা আর্থিক দায়িত্ব নাই।

মোটের উপর পাঁচ বৎসরের জন্য ১৭৭,০০০এর ফর্দ্দ। ধরা যাউক, দুই লাখ মুদ্রা। এই পরিমাণ টাকা খরচ করিতে পারিলে গোটা বাঙ্গালী জাতিকে ধনবিজ্ঞানের পাঠশালায় হাতে-খড়ি দিবার জন্য পাঠানো সম্ভব। (পুসার কৃষিকলেজে গবর্মেণ্ট ভারতবাসীর টাকা খরচ করেন প্রতিবৎসর প্রায় দশ লাখ টাকা।)

লাভালাভ

পাঁচ বৎসরের পর যদি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ উঠিয়া যায় তাহা হইলে বাঙালী জাতির লাভ-লোক্‌সান কতটা? দুই লাখ টাকা খরচ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) জমার ঘরে,—দশখানা বি-এ, ক্লাসের পাঠ্য ধনবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। (৫০০০ পৃষ্ঠা)।

(২) ১৫,০০০৲ দামের ফরাসী, জার্ম্মান্ ও ইংরেজী গ্রন্থ এবং পত্রিকা। এইসব যে-কোনো লাইব্রেরিকে উপহার দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই মাল নষ্ট হইবে না।

(৩) ৬০০০ পৃষ্ঠায় ভরা "ধনবিজ্ঞান" পত্রিকার ৬০ সংখ্যা। এইসবও বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ্।

(৪) সাতজন বাঙালী যুবা পাঁচ বৎসর ধরিয়া দুনিয়ার ধনবিজ্ঞানসেবীদের সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ কায়েম করিবার জন্য মোতায়েন থাকিবেন। একমাত্র এই কাজের জন্যই দুই লাখ টাকা খরচ করিলেও অতি-কিছু করা হয় না।

(৫) পঁচিশজন পরিচালক বাংলার চিন্তা-সম্পদ্ পুষ্ট করিবার জন্য আর্থিক জীবনের ভিন্নভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইবার সুযোগ পাইবেন। সেই সুযোগ বর্ত্তমানে কোনো বাঙালী পাইতেছেন না।

(৬) পাঁচ বৎসরের কার্য্যফলে বাঙালী সমাজের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য লেনদেন-সম্বন্ধে চিন্তা একদম নয়া পথে চলিতে থাকিবে। সেই নয়া পথের প্রধান লক্ষণ হইবে বাস্তব-নিষ্ঠা। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে দেশব্যাপী এক বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব আর শক্তি-যোগের নবীন ভাবুকতা।

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

একাদশ পরিচ্ছেদ

একমাত্র লেখাপড়ার অভাবে কানাইলালের কেন—তাহাদের সমস্ত জাতিটারই অমূল্য সম্পদ্ যে গোপনে অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং সমগ্র জাতিটা যে দুনিয়ার কাছে অত্যন্ত হেয় হইয়া মাথা হেঁট করিয়া আছে, বালক হইলেও একথা যখন কানাইলালের মনে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিল, তখন সে এই প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ লাভ করিবার জন্য এমন লুব্ধ হইয়া পড়িল যে, সে পরম উৎসাহে মহেশ্বরীর নিকট পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার পড়াশুনার জ্বালায় সুখেন্দু বিব্রত হইলেন, শৈলবালা অস্থির হইল, কিন্তু মহেশ্বরী একটা গৌরব ও তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। যেখানে তাহার বুঝিতে গোল ঠেকে, সে সুখেন্দুর নিকট ছুটিয়া যায়, শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু মহেশ্বরীকে পাইলে তাহার আর কাহাকেও দর্কার হয় না।

মহেশ্বরী যাহা শিক্ষা দিতেন, তাহার চরিত্রে আবার তাহার বিকাশ দেখিতে চাহিতেন। পাঠ মুখস্থ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনি মনে করিতেন না। তিনি বলিয়া দিতেন, "আজ যাহা শিখিলে, তোমার চরিত্রে যদি সে-সকল দেখিতে না পাই, তাহা হইলে কিছুই শিখা হয় নাই বুঝিতে হইবে।" এইরূপে কানাইলাল দিন-দিন পবিত্র ও পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ব্যবহারে পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই তাহাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সে ভদ্রতায় ও ব্রাহ্মণ্যে ভদ্রব্রাহ্মণকে হার মানাইতে লাগিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে বলাই ও কানাই দুইপাশে বসিয়া মহেশ্বরীর মাথার পাকা চুল বাছিয়া দিতেছিল। হঠাৎ কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা, বলাই লেখে,—বলাই-লাল বন্দ্যোপাধ্যায়; হরি লেখে,—হরিচরণ মিত্র; আমি কি লিখব ?"

আকস্মিক প্রশ্নে বিব্রতা মহেশ্বরী একটু সাম্লাইয়া বলিলেন, "তুমি লিখ্‌বে,—শ্রীযুক্ত কানাইলাল মজুমদার।"

নিয়ত একটার পর একটা বাধা-বিঘ্নের বেদনার মধ্যে বাগ্দী কথাটা তাহার মনের মধ্যে যেন সর্ব্বদা কে খোঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে এসম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিছুকাল সকলে চুপ্-চাপ করিয়া থাকিবার পর কানাই কহিল, "যাঃ! সবই যে পেকে গেছে বড়-মা—এর আর বাছ্‌ব কি ?"

উদাসস্বরে মহেশ্বরী কহিলেন, "ডাকও পড়েছে—এখন যেতে পার্‌লে হয়।"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "কি ডাক্—বড়-মা ?"

হাসিয়া মহেশ্বরী বলিলেন, "এই যমরাজা তলব করেছেন, এখন গুছিয়ে-গাছিয়ে যেতে পার্‌লে হয়।"

যমরাজার নাম শুনিয়া কানাই শিহরিয়া উঠিল। এবং মহেশ্বরী যাহা বলিতেছেন তাহার একটা সাধারণ অর্থও সে বুঝিয়া লইতে পারিল। সে কহিল, "হ্যাঁ—তুমি ত আর বুড়ো হওনি ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "দাঁত পড়ে' গেল—চুল পেকে গেল, এখনও বুড়ো হ'তে বাকী আছে ?"

কানাই তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল, "দাঁত ত একটাও পড়েনি। আর চুল পেকেছে না হাতী হয়েছে। এই ত কত চুল এখনও কালো কুচকুচে রয়েছে। এই দ্যাখ, না বলা—চেয়ে দ্যাখ।" এই বলিয়া সে মহেশ্বরীর চুলগুলি ওলটপালট করিয়া, কখন বা চিরিয়া-চিরিয়া, কখনও বা গোছা ধরিয়া বলাইকে দেখাইতে লাগিল। বলাই কহিল, হাঁ বড়-মা, অনেক চুলই যে কাঁচা রয়েছে।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "পাকা ধর্‌লে কি আর বেশীদিন কাঁচা থাকে? ও ত পেকে গেল!"

বস্তুতঃ মহেশ্বরী যেরূপ বলিতেছিলেন, তাঁহার বয়স তেমন বেশী হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার বাক্যে কানাইলাল অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। সমস্ত দিনটা সে অস্বস্তিতে কাটাইল। পড়াশুনায়ও তেমন মন দিতে পারিল না। রাত্রিকালে মহেশ্বরী বই লইয়া তাহাকে যতগুলি প্রশ্ন করিলেন অধিকাংশেরই সে ভুল উত্তর করিল। মহেশ্বরী সে-সকল বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে যাইয়া শয়ন করিতে বলিলেন। সে শুইলে কিছুক্ষণ পরে আলো নিবাইয়া তিনিও আসিয়া শয়ন করিলেন। কতকক্ষণ গেল—কানাইলাল ঘুমাইল না। মনের দুশ্চিন্তা কিছুতেই সে দূর করিতে পারিতেছিল না। কেবলই এ-পাশ-ও-পাশ উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। মহেশ্বরী কহিলেন, "হয়েছে কি আজ? ঘুমোবি নে?"

সে চুপ করিয়া শুইল। কিছুক্ষণ বাদে সে মহেশ্বরীর বুকের উপর হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "বড়-মা!"

"কেন?"

"চুল পাক্‌লে সত্যিই কি মানুষ মরে?"

"মরে বৈকি!"

"ও-বাড়ীর ভোলা ত কত ছোট, সে মরে' গেল কেন?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে অল্প-স্বল্প হঠাৎ যায়। চুল পাক্‌লে—দাঁত পড়্‌লে—যাবার সময় হয়, তখন আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না।"

কম্পিত-কণ্ঠে কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "একজন যদি ম'রে আর একজনা যদি না থাক্‌তে পারে?"

কানাইকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া আদরে ভরাইয়া দিয়া মহেশ্বরী বলিলেন, "না থাক্‌তে পার্‌লে চল্‌বে কেন? যাওয়া আর থাকা নিয়েই ত সংসার চল্‌ছে। কাকেও আস্‌তে হবে—থাক্‌তে হবে, কা'কেও যেতে হবে।"

মিষ্টস্বরে কানাই বলিল, "আচ্ছা, দু'জনা একসঙ্গে গেলে হয় না?"

মহেশ্বরী তাহাকে চুম্বনে ছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "ছিঃ! অমন মনে কর্‌তে নেই। আমি আজই কি চলে' যাচ্ছি? তোমরা বড়-সড় হবে—ঘর-সংসার কর্‌বে—তবে না যাবো।"

তার পর কানাইলাল নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সে-রাত্রে সে দুইতিন বার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘুমের ঘোরে মহেশ্বরীকে জড়াইয়া-জড়াইয়া ধরিল।

কানাইলালের পুঞ্জীভূত বেদনার মাঝখানে যেন অমৃতের সন্ধান দিতে অকলঙ্ক মাতৃস্নেহ লইয়া একমাত্র মহেশ্বরীই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মহেশ্বরী যে বেষ্টনে নিরাশ্রয় বালককে বক্ষোলগ্ন করিতে চাহিতেছিলেন, সংসারের পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্য দিয়া সে-গণ্ডী গড়িয়া তোলা মন্থরগতিতে হইলেও নিশ্চিত ছিল। কানাইলালের দুর্ব্যবহারের বেলা মহেশ্বরীর শাসন-নীতির মধ্যেও নূপুরধ্বনির মিষ্টতার মত এমন একটি সূক্ষ্ম আকর্ষণের ছন্দ বাজিয়া উঠিত যাহা বালক হইলেও বাছিয়া লইতে এবং উপলব্ধি করিতে কানাইলালের পক্ষে অসাধ্য হইত না। তাহার বিপ্লবময় শিশুজীবনে যখন এক-একটা দুর্ঘটনা জোঁকের মতন তাহাকে জড়াইয়া ধরিত তখন সে বুঝিত যে, তাহার মহেশ্বরী-মা ভিন্ন আর কেহ তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে পারিবেন না। মহেশ্বরীর কাছ-ছাড়া হইয়া খেলাধূলা করিবার সময়ও সে যেন সেই বিচিত্র মায়ার রাজ্যেই ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইত। তাহার সেই মহেশ্বরী-মা সত্যসত্যই যখন এক-একদিন পীড়িতা হইয়া শয্যাশায়ী হইতেন তখন তাহার আহার-নিদ্রা, পড়াশুনা, খেলা-ধূলা সকলই বন্ধ হইয়া যাইত। মহেশ্বরী তাঁহার

তাঁর কাছে অনুক্ষণ তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তেন, "একটু চলাফেরা কর্। হাত-পা আড়ষ্ঠ হ'য়ে গেল যে!"

সে কথা বলিত না, সেইরূপই বসিয়া থাকিত।

তিনি গায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট করিতে থাকিলে সে কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিত, "বড়-মা, বাতাস কর্‌ব ?"

মহেশ্বরী বলিতেন, "কর্।"

পাখা টানিতে-টানিতে তাহার হাতে ব্যথা হইয়া যাইত, তবুও সে হাতের পাখা নামাইত না। মহেশ্বরীর অনুযোগও সে শুনিত না। তাহার মন-প্রাণ কেবলই সন্ধান করিয়া ফিরিত,—কোন্ ডাক্তার আসিলে—কি ঔষধ খাইলে তাহার বড়-মা শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে পারিবেন। শৈল আসিয়া বলিতেন, "কানাই, বাবা, মা ত এখন ঘুমুচ্ছেন, এখন একটু বেড়িয়ে এস।" কানাই-লালের মনের মধ্যে মহেশ্বরীর সেই পাকাচুলের কাহিনী ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিত—সে যাইতে পারিত না। কেবলি ভয় হইত বুঝি বা মা তাহার অসাক্ষাতে ফাঁকি দিয়া পলাইবেন। মহেশ্বরী সুস্থ হইয়া উঠিলে তাহার অন্তরের বিপ্লব থামিত। সে পড়াশুনা, খেলা-ধূলায় মন দিতে পারিত। এইরূপে যেন মাতৃহৃদয়ের বাদ্যধ্বনি—সন্তান-হৃদয়ের সুমধুর সঙ্গীতের সহিত একস্থানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেছিল।

একদিন সুখেন্দু হাসিতে-হাসিতে আসিয়া জননীকে কহিলেন, "মা, কানাই বালক হ'লেও ওর উপর আমার আড়ি-ভাব আসে।"

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"ও যেন মাতৃ-স্নেহ পেতে আমার দিক্‌কার সমস্ত অন্ধিসন্ধিগুলিই বন্ধ করে' দিচ্ছে।"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "কেন ?"

"তোমার অসুখের বেলা ও যেন আমাকে অত্যন্ত খাটো করে' দেয়।"

"কিসে খাটো করে ?"

সুখেন্দু বলিলেন, "তোমার প্রতি যেরূপ একান্ত সেবা নিয়ে ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে বসে' থাকে তা'তে আমার সেবা-বৃত্তিগুলো সব নেমে প'ড়ে ঠেলে উঠ্‌তে জোর পায় না।"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "ছেলেকে ফেলে পালিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা করিস্—তাইত খাটো করে।"

সুখেন্দু ভালো বুঝিতে না পারিয়া জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহেশ্বরী কহিলেন, "ওকে যেদিন শৈলকে দিয়েছিলাম সেইদিন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল,—বলাই ও কানাই এর মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ নেই। সে-কথা তোমরা ভাবতে পারো না, তাইত ও আমাকে অমন জোঁকের মতন কাম্‌ড়ে ধরে। কাউকে ত আশ্রয় করে' বাঁচতে হবে।"

সুখেন্দু লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "যতটা পারি তা কি আর করিনে!"

মহেশ্বরী কহিলেন, "করো। কিন্তু ওর ত একটি দায় না। পেটের দায়—স্নেহের দায়—সংসারে দাঁড়ানোর দায়। এতগুলি দায় ওর—তা বোঝো না।"

সুখেন্দু কহিলেন, "তা কি আর বুঝিনে, মা ?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "বোঝো—কাঙাল ব'লেই বোঝো। কিন্তু এতগুলি তোড়জোড় দর্‌কার যার, তা'কে কি দিতে হয় বোঝো না।"

"ওর যা দর্‌কার তা কি ও পাবে না ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তোমরা দর্‌কারগুলো একটু আল্‌গা-রকমে বোঝ। নিরাশ্রয় দেখলে টাকার দর্‌কার বোঝ—তা'কে টাকা-পয়সা দাও—তা'তে তার ব্যথা যায় না।"

"কেন ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সংসারে যার মা নেই তার মায়ের দর্‌কার, যার বাপ নেই তার বাপের—যার ভাই নেই তার ভায়ের দর্‌কার। তোমরা ভুল বোঝো—আর ভুল দাও, তা'তে ব্যথা জুড়োয় না।"

মহেশ্বরীর চরণ-দু'খানির প্রতি সুখেন্দুর অশ্রু-আর্দ্র চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া স্থির হইল। তিনি কহিলেন, "তোমাকে মা পেয়েছি, কিন্তু আমার এম্‌নিই কপাল যে, আজিও ঐ আধার থেকে কোন উপকরণই সংগ্রহ ও সঞ্চয় কর্‌তে পারিনি।"

কেশব ভারতীর দ্বারে শ্রীচৈতন্য

চিত্রকর—শ্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

মহেশ্বরী হাসিলেন। কহিলেন, "নিজের পুঁজিপাটা নিজের কাছেই রয়েছে। নিজের ভিতরে শিশুর ছদ্মবেশে যে-সত্য গুপ্তভাবে থাকে, তা'কে যতটা প্রকাশ করতে পারবে, ততটা বড় হবে।"

মাতার সরস বাক্যগুলি সুখেন্দু ক্ষণিকের জন্য আপনার অনুভূতির কাছে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতে পারিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর শান্তি দুই-তিন-বার শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিয়াছিল। এমন সময় তাহার মধ্যে যেন একটা ভাঙা-গড়া পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সে হঠাৎ বড় হইয়া উঠিল। শিশু জীবন হইতে নারী জীবনে আসিয়া দাঁড়াইল। সে এখন আর—কানাই ও বলাইএর সঙ্গে বসিয়া খেলা-ঘরে খেলা করিত না। সময়-সময় তাহাদের লইয়া হাসি-বিদ্রূপ গল্প-গুজব করিত। বাকী সময়টা শরীর লইয়াই থাকিত; ঝামা দিয়া পায়ের গোড়ালি ঘষিত; সাবান দিয়া গা ধুইত—মুখ মাজিত; ঘটি-ঘটি জল দিয়া চুল ভিজাইত—গামছায় মোড়ন দিয়া সিঁথি কাটিত—পাতা কাটিত, ভাঙিত—কাটিত—আবার ভাঙিত, আবার কাটিত; পায়ে আল্‌তা পরিত—গণ্ডে ছোপ ধরাইত—ওষ্ঠযুগল রঞ্জিত করিত। বিনাইয়া-বিনাইয়া বেণী রচনা করিত—আয়না ধরিত—দেখিত—মিটিমিটি হাসিত। চরণের গতিতে একটা ভঙ্গিমা দিত; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য বেশ-ভূষার উপর লক্ষ্য রাখিত—সাবধান হইত। এই-সকল বিলাস-প্রসাধনে তাহার বাকী সময়টা ব্যয়িত হইত। এইরূপে শৈশবের গতিবিধি ভাঙিয়া-চুরিয়া তাহাকে জীবনের আর এক বিচিত্র পথে লইয়া চলিয়াছিল। কানাই ও বলাই হাঁ করিয়া বসিয়া-বসিয়া এইসকল দেখিত। শান্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিলেও তাহার স্বভাব অত্যন্ত মিষ্ট ছিল। তাহার অনাবিল স্নেহ বালকদিগকে সর্ব্বদা ছুঁইয়া যাইত।

তখন মাঘ মাস। শীতটা এদিকে হাল্‌কা চাল চালিয়া মাঘের শেষ ভাগেই বেশী জাঁকিয়া বসিয়াছিল। এই সময় শান্তিকে আবার শ্বশুরালয় হইতে লইতে আসিল। যেদিন সে যাত্রা করিবে সেদিন কানাইলালের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, শান্তি একদিন তাহার নিকট কুল খাইতে চাহিয়াছিল—আনিয়া দেওয়া হয় নাই। সে আজ চলিয়া যাইবে; কানাইলাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। প্রথমতঃ সে মিত্র-পাড়ায় যাইয়া দেখিল যে, গাছের কুলে তখনও রং ধরে নাই। তখন সে ঘুরিতে-ঘুরিতে অনেক দূরে মুসলমান-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় খোঁজ করিতে-করিতে একটি গাছে সে বেশ বড়-বড় কুল দেখিতে পাইল। সে সেই গাছ হইতে অনেকগুলি সুপক্ব কুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে প্রথম জোয়ারেই শান্তিদের নৌকা ছাড়িবে। নদীতে জোয়ার আরম্ভ হইলে মাঝিরা আসিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। কানাইলালের জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহার দেখা পাওয়া গেল না, তখন অগত্যা শান্তিকে যাত্রা করাইয়া নৌকায় উঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহার কান্নাকাটি দেখিয়া সুখেন্দু বলাইকেও তাহার সঙ্গে দিলেন। নৌকা ঘাট ত্যাগ করিয়া প্রায় এক মাইল পথ আসিয়াছে এমন সময় বলাই দেখিতে পাইল কানাইলাল নদীর তীর বাহিয়া আসিতেছে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"কানাই-দা!"

কানাই সচকিত হইয়া দেখিল, নৌকায় চাপিয়া সুসজ্জিতা শান্তি শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিয়াছে। বলাইও তাহার সঙ্গে চলিয়াছে। নিমেষের মধ্যে তাহার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল। সে নৌকার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বলা, নৌকোখানা ধর্‌তে বল্।"

নৌকার দ্বারপথে শান্তি হাসিমুখখানা বাড়াইল। কানাইলালের ব্যগ্রতা দেখিয়া সে বলাইকে কহিল, "বলা, বল্ না, নৌকাখানা তীরে লাগাক্।"

যে ভদ্রলোকটি শান্তিকে আনিতে গিয়াছিলেন বলাই তাঁহাকে তাঁহাদের নূতন বধূটির অভিপ্রায় জানাইল। তিনি আদেশ করিলে মাঝিরা একস্থানে নৌকাখানি চাপাইয়া নোঙর করিল। তখনও জোয়ারের জল কূল পরিপূর্ণ করে নাই। কানাই চরের কাদায় হাঁটু পর্য্যন্ত

ডুবাইয়া উঠাইয়া হাঁফাইতে-হাঁফাইতে নৌকায় আসিয়া উঠিল। তার পর নৌকার গলইয়ের উপর বসিয়া পা ধুইয়া শান্তি ও বলাই যে-পর্দার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল তথায় প্রবেশ করিল। এবং তাড়াতাড়ি বন্ধন মুক্ত করিয়া সুপক্ক কুলগুলি শান্তির নিকটে রাখিয়া দিল। কানাই-লালের এই মিষ্ট আদরে শান্তির চক্ষু-দু'টি ছল-ছল করিয়া উঠিল! ছোট ভাইটি এত ভালোবাসে! সে কহিল, "একি! কানাই, এসব আন্‌তে গেলে কেন?"

কানাই তাহার দীন নেত্র-দু'টি শান্তির মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, "তুমি যে সেদিন খেতে চেয়েছিলে।"

শান্তি কহিল, "ও মা! তাই বুঝি মনে করে' রেখেছ, এইজন্যে সকাল থেকে তোমাকে পাওয়া যায়নি! আমরা কতক্ষণ তোমার অপেক্ষা করে' বসেছিলাম। মাঝিরা শুন্‌লে না—তাই এলাম। বলাই যাচ্ছে, তুমিও চলো আমার সঙ্গে—নইলে বড় কষ্ট হবে।"

কানাই শান্তির মানসিক অবস্থা বুঝিতে অনেকটা চেষ্টা করিলেও সে নিজে যে উত্তর প্রদান করিল তাহাতে তাহার নিজের অন্তরের এই বিচ্ছেদ-ব্যথার উন্মত্ত বেগও ততটা প্রকাশ করিতে পারিল না—যতটা তাহার অন্তরে-অন্তরে বাজিতেছিল। সে কহিল, "বড়-মাকে না বলে'-কয়ে' কি যাওয়া যায়?"

শান্তি কহিল, "এই ত পথ দিয়ে কত লোক যাচ্ছে—এদের দিয়ে একটা খবর পাঠালেই হবে। তিনি কিছু বল্‌বেন না।"

বলাই কহিল, "দাঁড়াও—আমি ব'লে পাঠাচ্ছি। বড়-মা যদি শুন্‌তে পায়, তুমি দিদির সঙ্গে গেছ, তা হ'লে কি আর কিছু বল্‌বে?"

বলাই বাহিরে আসিয়া নদীর কিনারা-পথ ধরিয়া যাহারা চলিতেছিল তাহাদেরই ভিতর একজন পরিচিত লোককে ডাকিয়া বলিল, "তুমি জমিদার-বাড়ী গিয়ে আমার বড়-মাকে একটা খবর দিও যে,—কানাই-দা দিদির সঙ্গে চলে' গেছে। এখুনি যাবে ত? নইলে তিনি ব্যস্ত হবেন।"

লোকটি তাহাদের প্রজা। সে কহিল, "আচ্ছা।"

কানাই কিছু গম্ভীর হইয়া বসিল। তাহার অন্তরের যে গূঢ় কথাটি সে গোপন করিতে যাইতেছিল শান্তি তাহা আল্‌গা করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে ত, কানাই?"

কানাই লজ্জিত হইয়া কহিল, "তা পার্‌ব। কাপড়-চোপড় আন্‌লাম না কিছু—তাই—।"

বলাই কহিল, "সেজন্যে ভাব্‌না কোরো না। আমি ত দু'জোড়া জুতো—চার পাঁচ টা জামা মোজা কাপড় সবই এনেছি।"

কানাই কহিল, "বড়-মা কিছু মনে ভাব্‌বে না?"

শান্তি কহিল, "কি ভাব্‌বেন?"

"এই না-বলে' যাচ্ছি?"

"তার আর কি ভাব্‌বেন তিনি। বাড়ী এসে বোলো দিদি ছাড়লে না—তাই গেলাম।"

বলাই কহিল, "আমরা ত পাঁচসাত দিনের বেশী থাক্‌ব না। দিদি থাক্‌বে, আমরা চলে' আস্‌ব, বাবা ত তাই বলে' দিয়েছেন।"

কানাই একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিল। বলাই তখন মাঝিকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিল। নৌকা আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে বাড়ীতে মহেশ্বরী তখন পূজায় বসিয়াছিলেন। কিন্তু মন বসিতেছিল না। কানাইকে যে অনেকক্ষণ দেখেন নাই। কোথায় গেল ছেলেটা তিনি এক-এক বার আসন ছাড়িয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "শৈল, কানাই এল?" শৈল বলিতেছিল, "না, এখনও আসেনি।" তিনি আবার যাইয়া পূজায় বসিতেছিলেন। মহেশ্বরী তাঁহার প্রাণের অব্যক্ত রোদন দেবতার পদে নিবেদন করিয়া, পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন। শৈলকে ডাকিয়া কহিলেন, "সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও এল না, আর ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।"

শৈল কহিল, "তাই ত, খাবার বেলা হ'ল, এমন ত কোনো দিন থাকে না। তুমি একবার লোক পাঠাতে বলে' দাও—খোঁজ করে' আসুক।"

মহেশ্বরী সুখেন্দুকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। সুখেন্দু তৎক্ষণাৎ চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তাহারা

ফিরিয়া না-আসা পর্য্যন্ত মহেশ্বরী গৃহের দ্বারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

যাহারা অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটি লোক, বলাই যাহার দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিল তাহাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটি বলিল, "বাবুরা খবর দিতে বলেছিলেন, আমি খেয়ে-দেয়ে আস্‌ব বলে' দেরি কর্‌ছিলাম।"

বিরক্তি চাপিয়া মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তা'কে দেখেছ নৌকোয় উঠ্‌তে?"

"হাঁ মা, আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌ছি। আমি সেই ঘাটের কাছেই কাঠ কাট্‌ছিলাম। কানাই-বাবু নৌকায় উঠ্‌লে—নৌকা ভাসালে আমি চলে' এসেছি।"

মহেশ্বরীর কতকটা ভাবনা দূর হইল বটে কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বালকের সম্বন্ধে এই যে ভেদ-জ্ঞান সংসারসুদ্ধ লোকের নিকট অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহার ফলে না জানি নূতন স্থানে যাইয়া নূতন-নূতন চক্ষুর সম্বন্ধবিহীন দৃষ্টিতে সে কতখানি টানা-টানির মধ্যে পড়িয়া যায়! সেখানে এই ব্রহ্ম-বস্তুর উপর পদাঘাত করিতে কি সকলের বাধিবে? সঙ্কীর্ণতার অপরিহার্য্য গণ্ডীতে পড়িয়া সে সেখানে কাহাকে আঁকড়িয়া ধরিবে? সে যে নিজের বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়াই পৃথিবীর একপার্শ্বে স্থানগ্রহণ করিয়াছে! সেখানে কে তাহাকে এত আঘাত হইতে বাঁচাইয়া আড়াল করিয়া রাখিবে? মহেশ্বরী ভাবিতে-ভাবিতে সেইখানে অসাড় হইয়া গেলেন।

শৈল আসিয়া কহিল, "শান্তির সঙ্গে গেছে তার আর ভাবনা কি? বলাইও ত গেছে? বরং পাঁচসাত দিন পরে লোকও নৌকো পাঠিয়ে দিলে হবে—দু' ভা'য়ে এক-সঙ্গে চলে' আস্‌বে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে-কথা ভাব্‌ছিনে। ভাবছি—এরকম চুক্তি-পত্তর বিধাতা তার হাতে তুলে' দিয়েছেন—না মানুষে দিয়েছে? শান্তির বিয়েব কথা যে এখনও গাঁথা রয়েছে!"

শৈল কহিল, "তা সেখানে কি আর সে অযত্নে থাক্‌বে? সে কি ভাবে থাকে—শান্তি, বলা এরা সব জানে না?"

"তাদের জানা-জানিতে কিছু আস্‌বে যাবে না—আমিই ঠাঁই পাই না তারা ত শিশু! এ-দেশটা শুধু ছোঁয়া খাওয়ার দ্বন্দ্ব নিয়েই চলেছে! তা'রা বুঝে' দেখে না যে—কে কা'র সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে। আত্মারূপে অন্তর্য্যামী-রূপে আমার জীবনে যাঁর বিকাশ—অন্যের জীবনেও তাঁ'রই বিকাশ—এতে কি দ্বন্দ্ব করা চলে?"

শৈল কহিল, "পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত সংস্কার নিয়েই লোকে করে।"

"কিন্তু এমন রেখা টেনে সীমা চিহ্নিত করে কেন? তা'রা যে-রেখা টানে, সেই রেখার মধ্যে এক-এক স্থানে যে-কদর্য্যতা জোট পাকিয়ে রয়েছে তা' দেখতে তা'রা অন্ধ হয়। অথচ রেখার বাহিরে যে মহৎ তা'কে তা'রা ঘৃণা করে। এরূপ ভুল সংস্কারের অধীন হ'য়ে দেশটা কি চিরদিনই চল্‌বে? আর আপনার জাতিটার গা প্রাণপণে চাট্‌বে?"

শৈল কহিল, "যাক্ গে, সে-সব ভেবে আর কি কর্‌বে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ভাবছি—সেখানে তার খেতে-শুতে পদে-পদেই বাধবে। এমন দরদের জন সে পাবে না সেখানে, যে তা'র দিকে ফিরে' চাইবে। বালকের অন্তরেও এমন একটা কিছু আছে যা বাইরে অত্যন্ত অস্পষ্ট কিন্তু ভিতরে খুবই সত্য। তার সেই মৌন নীরবতাই তার প্রাণের মাঝে বর্ষণ নামিয়ে দেবে।"

শৈল কহিল, "তোমার এই একটা দোষ যে, এক-একটা অসম্ভব ভাবনা টেনে এনে নিজকে অস্থির করে' তোলো।"

মহেশ্বরী একটু হাসিলেন। কহিলেন, "অসম্ভব কিছু ভাবিনে। যা ভাবি—না ভেবেও পারিনে। একটা হৈ-চৈ নিয়েই যেন তার জীবনটা গড়ে' উঠেছে। আরও দুঃখ, এই যে, সে মার খায়—অথচ জানে না কেন মার খায়!"

মহেশ্বরীর অন্তর এইরূপে অশান্ত হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে শূন্য বিছানায় শয়ন করিয়া কানাইলালের

অভাবে মন স্থির করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কানাইলালকে তিনি যে-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলেন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি যেন সেই শৃঙ্খল টানিয়া-টানিয়া ঘর বোঝাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলেরও শেষ হইল না, তাঁহার প্রার্থিত বস্তুটিরও নাগাল পাইলেন না। ভোর রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আবার তখনি-তখনি জাগিয়া উঠিলেন। স্বপ্নে জাগরণে কানাইলালের চিন্তা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ছিল।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতি

একদিন বসন্ত-নিশাতে
মোর সাথে
জ্যোৎস্নামাখা দিগন্তের বুকে
এসেছিলে চুপে-চুপে তুমি ;
পদ চুমি'
চন্দ্রালোক লুটেছিল সুখে।
আলো পড়ে' কালো চোখ তোর
প্রিয়া মোর
জলেছিল চমকি' সঘনে।
নিশালোকে দুনয়ন ভরে'
দেখে' তোরে
দিয়েছিনু সে সুখ-লগনে
প্রথম-যৌবন-ভালোবাসা
সব আশা
হৃদয়ের ব্যাকুল স্পন্দন।
সে-নিশার স্বপ্ন-অবসানে
তোরি দানে
হৃদি মোর মরণ-বন্ধন
পরেছিল মত্ত কি আশায় ;
তোরি পায়
ঢেলেছিল চির অশ্রুধারা।
বেদনায় সাথী নাই মোর,
শুধু তোর
স্মৃতিস্পর্শে হই দুঃখহারা।
সময়ের মহাস্রোত-মাঝে
তোরে কাছে
পেয়েছিনু কভু ক্ষণতরে,
সে-মিলন জলবিন্দুসম
বুকে মম
পড়েছিল মরুভূমি'পরে।
হাসিমাখা তোর আঁখি দুটি
সব লুটি'
নিয়েছে যে মোর মন থেকে,
সেই দিন শুভ্র চন্দ্রালোকে
মোর চোখে
স্বপ্নময়ী জ্যোতিটুকু রেখে।
নাই সখি, মিলনের আশা,
ভালোবাসা
আসিবে না তোর বক্ষ হ'তে,
সুখ দুঃখ সর্ব্ব রুদ্ধ করে'
তোর তরে
রবো আমি দীর্ণ এজগতে।
উষার আলোক-রশ্মি-ধারা
বন্ধহারা
এসেছিল জাগরণ-মাঝে
রজনীর তারকার বাণী
বক্ষে আনি'
দিয়েছিল তোরে নব সাজে,
কল্পনার জয়মাল্য বুকে
স্তব্ধ দুখে
কেটে যায় দীর্ঘ দগ্ধ বেলা,
গোধূলির অর্দ্ধ-অন্ধকারে
স্মৃতি-দ্বারে
নেচে উঠে শূন্যতার খেলা।
বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণে
মোর মনে
বাজে শুধু রুদ্ধ এ বারতা—
কোথা যায় দীর্ঘ দিনগুলি
পথ ভুলি',
নাহি জানি তোর মনকথা !
একদিন বসন্ত-নিশাতে
মোর হাতে
হাতখানি রেখেছিলে ধীরে,—
আজো আছি তারি স্মৃতি নিয়ে,
ওগো প্রিয়ে,
দাও সেই স্পর্শটুকু ফিরে'।

শ্রী—

হাতা রেশমী পাঞ্জাবী একটা পছন্দ হইল। কাপড়-জামা র‍্যাকের উপর সাজাইয়া রাখিল। দেরাজের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া নিজের হাতে-তৈরী ভেলভেটের কোট, আর দোকানে-কেনা শ্যাময়-লেদারের একটা পাৎলা চটির কোন্‌টা ভালো হইবে মনে-মনে আলোচনা করিতেছে, এমন সময়ে সমীর হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "বেশ মানুষ তুমি! এখনও কাপড়-চোপড়ই পরোনি! সাতটা বেজে গেল যে। এতক্ষণ ধরে' করছ কি? স্নানের আয়োজন চল্‌ছে? আগে আস্‌বে, তার পর ত স্নান কর্‌বে! চট্‌পট্ ওঠো, এক মিনিটে তৈরী হওয়া চাই।"

কমলা কহিল, "আমার আর ষ্টেশনে যাবার দরকার কি? তোমরা সবাই ত যাচ্ছ। আমি এদিক্‌কার সব দেখি,—রান্না-বান্নার কিছু ব্যবস্থা হয়নি।"

বহুক্ষণ ধরিয়া সাধ্য-সাধনা অনুনয়-অভিমান করিয়া কিছুতেই যখন সমীর কমলাকে নড়াইতে পারিল না, তখন অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে তাহাকে উঠিতে হইল।

স্নানান্তে গরদের শাড়ী পরিয়া কমলা তাহার পূজার ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু মন তাহার আহ্নিক-অর্চ্চনা-পুস্তক ফেলিয়া ক্ষণে-ক্ষণে হাওড়া-ষ্টেশনের গাড়ী, লোকজন, কোলাহল, কলরবের মধ্যে ছুটিয়া যাইতেছিল। হৃদয়ের উৎকট চাঞ্চল্য যতই সে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ধমনীতে-ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ততই যেন দ্রুত বহিতে লাগিল এবং যতই সময় কাটিতে লাগিল, আরব্ধ কার্য্যে মনঃসংযোগ ততই অসাধ্য হইয়া উঠিল। তবু সেইখানে বসিয়া-বসিয়া কোলের উপরকার খোলা বইখানির প্রতি সে একদৃষ্টে চাহিয়াই রহিল। আশঙ্কা হইল, কোনো রকমে সেখান হইতে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইলেই হয়ত এতদিনকার রুদ্ধ অশ্রু কোনো মতেই বাধা মানিবে না, একমুহূর্ত্তে সমস্ত ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া অন্তর-জোড়া হাহাকার গগন বিদীর্ণ করিবে।

দরজার সম্মুখে গাড়ী থামিল, তাহার শব্দে চমকিত হইয়া কমলা বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল অত্যন্ত গম্ভীরমুখে সমীর ধীরে-ধীরে উপরে উঠিতেছে। কিছু পশ্চাতে সহিস লেবেল্ আঁটা প্রকাণ্ড একটা চাম্‌ড়ার ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া অতি কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিতেছে। সমীর উপরের দিকে একবার চাহিয়া আবার ঘাড় গুঁজিয়া উঠিতে লাগিল। সে নিকটে আসিতেই তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয়ের সমস্ত উৎকণ্ঠা দমন করিয়া কোনো মতে কমলা প্রশ্ন করিল, "তিনি কি এ গাড়ীতে এলেন না?" সমীর মৃদুস্বরে জবাব দিল, "এসেছেন।" পরে রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে-মুছিতে বলিল, "মেম-সাহেবকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে রাখ্‌তে গেলেন। হোটেলের লোকও উপস্থিত ছিল, আমিও বল্‌লাম, আমি নিচ্ছি যাচ্ছি, তুমি বাড়ী যাও। তা সাহেবের মনে ধর্‌ল না।"

কমলা প্রথমে চুপ করিয়া গিয়াছিল, শেষে হাসিয়া বলিল "ও! মেম-সাহেবকে নিয়ে যেতে পার্‌লে না বলে' দুঃখ হয়েছে? আহা হা! তা' এক কাজ করো—"

"থামো-থামো। তোমার ত সবই উড়িয়ে দিয়ে বাহাদুরি। রান্না-রান্না করে' ত ব্যস্ত হচ্ছিলে! সাহেব সেখানেই খাবেন। তিনটের সময় আস্‌চেন, গাড়ী পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।"

"ঐ ঘরে চলো, বস্‌বে।" বলিয়া কমলা নিজেই আগে-আগে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কষ্টে যেন আপন মনেই সমীর বলিল, "দাদা একটি খাঁটি—কি যে হ'য়ে এসেছে। মুখে এতবড় একটা চুরুট গুঁজে ত নাম্‌ল, আর সেইটে দাঁতে চেপে ধরে'। তোমার বাবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ কর্‌লে। মাথায় হ্যাট্, মেম সাহেব-বন্ধু সঙ্গে নিয়ে কি আর প্রণাম করা চলে! তিনি ত অবাক্, সে আমি তাঁর মুখ দেখে'ই বুঝেছিলাম। শেষে যাবার সময় মেম-সাহেবের হাতের মাঝে হাত দিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্ বেয়ে চল্‌ল। আমাদের বলে' গেল, লগেজ-টগেজগুলো দেখে'-শুনে' নিতে।"

কমলা জানালার গরাদ ধরিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া সমীর বুঝিতে পারিল না যে, কোনো কথা তাহার কানে গিয়াছে। সেই মৌন নিঃস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া-চাহিয়া সমীরের দুই চোখে যেন জল আসিতে লাগিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কমলা ফিরিল না, একটি কথার জবাব দিল না। তেম্‌নি গরাদ ধরিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সমীর উঠিয়া বলিল, 'বৌদি, এখন হোষ্টেলে চল্‌লাম। খেয়ে-দেয়ে ও বেলায় পারি ত আস্‌ব।"

কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তস্বরে কহিল, "অনেক রান্না-বান্না হয়েছে, এখানেই খেয়ে যাও।"

দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়া কাজ-কর্ম্মের পর সমস্ত বাড়ী বিশ্রামের কোলে ধীরে-ধীরে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। কমলা প্রতিদিনকার মতন আজও একটা সেলাই লইয়া বসিয়াছিল। ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—সবে সাড়ে এগারোটা। উঠিয়া গিয়া কোচ্‌ম্যানকে আবার বলিয়া দিল, ঠিক আড়াইটের সময় গাড়ী যেন চৌরঙ্গীতে যায়। সেই নিস্তব্ধ খালি-বাড়ীতে সময় কাটানো যেন ক্রমেই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত ঘর-দুয়ার খাঁ-খাঁ করিতেছে, আর সেই পরিত্যক্ত বিরাট্ পুরীর মধ্যে সেই যেন উদ্দেশ্য-হীনভাবে পড়িয়া আছে। এম্‌নি কত কি চিন্তা তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্কে বার-বার আনাগোনা করিতে লাগিল। ক্রমে তিনটা বাজিল, বিনয় এখনও আসে নাই। কমলা চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া মাঝে-মাঝে কেবল দেয়াল-সংলগ্ন ঘড়িটির দিকে চাহিতেছে। তাহার মুখে, তাহার ভাবে চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র আভাসও নাই।

ভুর্‌র্ করিয়া মোটর থামিল এবং পরক্ষণেই বহুদিনের পরিচিত পদশব্দ জানাইয়া দিল, বিনয়ই আসিতেছে। এক-এক লম্ফে তিন-তিনটে সিঁড়ি পার হইতে-হইতে বিনয় ফিরিয়া বলিল, "ট্যাক্সি রহনে বোলো।" পরক্ষণেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কমলাকে কহিল "এই যে, কেমন আছ ?',

* * * *

ঘণ্টাখানেক অনর্গল বক্তৃতা করিয়া বিনয় বুঝাইল, কমলা এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ, বালিকা মাত্র। বিয়ে হওয়া ত দূরের কথা, সতেরো-আঠারো বছর বয়সে ওদেশের মেয়েরা ফ্রক্ পরিয়া লাফাইয়া বেড়ায়। এ-সময়ে তাহাদের একসঙ্গে বাস করা একেবারেই অসঙ্গত। এই সময়টিতে তাহাকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। বিলাতে কিভাবে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়, কিভাবে দাম্পত্য জীবন-যাপনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হয়, কেমন করিয়া আস্তে-আস্তে কমলাকেও সেইভাবে, সেই আদর্শ-অনুযায়ী নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, গড়-গড় করিয়া তাহারও দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বিনয় ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, I will come and see you off and on.

মুখে পাইপ্, বাঁ-হাতে হ্যাট্, ডানহাতে বিলাতী-লতার ছড়ি লইয়া বিনয় চারিদিকে চাহিয়া বলিল, বাড়ী-ঘরদোর সবই বদ্‌লে গেছে দেখ্‌ছি। A surprise, oh! তার পর শিস্ দিতে-দিতে এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দেখিল। পূজার ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে কমলা ব্যগ্রস্বরে কহিল, "জুতো-পায়ে এঘরে না।" বিনয় অবাক্ হইয়া কহিল, "জুতো-পায়ে ঘরে না, how silly" দরজা খুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় জ্বলিয়া উঠিল, ইংরাজী-বাংলা মিশাইয়া বলিল, এইসব বুজরুকি কমলার মতন হাঁদা মেয়েরই উপযুক্ত। কিন্তু সে যে এতটা অশিক্ষিত, পাড়াগেঁয়ে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। শেষে কমলার কাঁধের উপর তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া বলিল,"ঘরটা পরিষ্কার করে' ফেলো। ওটা আমার smoking-room হবে"। কমলা বলিল, "অন্য ঘরে সে-ব্যবস্থা করে' দেবো"। বিনয় গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর এ-ঘর কি হবে ?" কমলা বলিল, "এম্‌নিই থাক্‌বে"। বিনয় কহিল, "তা হ'লে বাবা আমার এবাড়ীতে আসা পোষাবে না।" রুদ্ধনিশ্বাসে কমলা বলিল, "তোমার অভিরুচি।" "আচ্ছা সে দেখা যাবে", বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া গেল।

কমলা রেলিং-এর উপর ভর দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও অগ্নিতুল্য রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, আকাশে বাতাসে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছে। আর সেই নিঃশব্দ দহনের তলে সর্ব্বংসহা বসুমতী যেন বুক পাতিয়া পড়িয়া আছেন। রৌদ্রের উত্তাপে গরম বাতাসের হল্‌কায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল এবং অজ্ঞাতে চোখের কোণ বাহিয়া ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল।

জগতের রূপ *

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন; রুশীয় এবং নরওয়েজিয়ান সাহিত্যের—নাটক এবং উপন্যাসের অনুবাদই তাহার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। রুশীয় টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কী, চেকফ, গোগোল টুর্গেনিফ, গোর্কি প্রভৃতির নাম আজ বিশ্ব-বিদিত; নরওয়ের বিয়র্ণ্‌সন ও ইব্‌সেনের নামও তেমনি বিশ্ব-সমাজে একটা শক্তির প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ ইব্‌সেন ত বর্ত্তমান নাট্য-জগতেরই একটি বিপুল শক্তিমাত্র নহেন, ইব্‌সেনের প্রাণশক্তি, তাঁহার নবজীবনাদর্শের প্রেরণা তাঁহাকে ইউরোপীয় সমাজ-ক্ষেত্রেও একটি প্রবল শক্তির অবতার করিয়া তুলিয়াছে। নরওয়ে সাহিত্যের উক্ত দু'টি সাহিত্য-রথীর দিকে চাহিলেই নরওয়ের সাহিত্যের যে বিশেষ স্বরূপটি ধরা পড়ে, সেটি হইতেছে জীবন-সম্বন্ধে একটি তীব্র সমস্যা-বোধ ও তজ্জনিত একটি বিপুল গম্ভীরতা এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ও সংগ্রাম।

জীবনের মাঝে যে একটি তরল রসাবেশের দিক্‌ রহিয়াছে, তাহাতে যে হাস্যোচ্ছ্বাস ও আনন্দোৎফুল্লতা এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মধুর স্বপ্নময় প্রেমব্যাকুলতা রহিয়াছে, কঠোর সংগ্রাম এবং জীবন-সমস্যার নিপীড়ন ছাড়াও যে জীবনের মাঝে একটি বিশাল রসোপভোগের ক্ষেত্র রহিয়াছে; এটি যেন নরওয়ের কঠোর প্রাকৃতিক জগতের কুয়াসাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে ধরা পড়িতে চাহে নাই। নরওয়ের বর্ত্তমান ঔপন্যাসিক জোহান বোয়েরের (Johan Bojer) দিকে চাহিয়াও উক্ত কথাটিরই সমর্থন করিতে হয়। ইনিও নরওয়েজিয়ান সাহিত্যের বিশেষত্বটি লইয়াই বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসী ইবসেনের মতনই বিপুল প্রাণশক্তির বেগ লইয়া তিনি বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কে বড়, কে ছোট বলিতে পারি না, কিন্তু সমস্যার গম্ভীরতায় বোয়ের হয়ত ইব্‌সেনকে ছাড়াইয়া আসিয়াছেন; তাহার কারণ ইবসেনের জগৎ হইতে জোহান বোয়েরের জগৎ বিস্তৃত, ব্যাপক এবং অন্তরাত্মার গভীরতর প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইবসেন ব্যক্তিকে বড় বেশী আত্মপ্রধান করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু বোয়ের মানব-চরিত্রের মধ্যে বিশ্ব-কল্যাণাভিমুখী পরার্থপর স্বভাবটিতে তাহার গভীর বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বটিকেই বেশী দেখিয়াছেন। এইজন্য বোয়ের মানবাত্মার শক্তি ও জ্ঞানলাভের বিপুল প্রয়াসের মধ্যে তাহার অতুলনীয় মহিমার আবির্ভাবটি যেমন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন, ইবসেন তেমনটি পারেন নাই। ইবসেন আত্ম-সার্থকতার সংগ্রামেই ব্যক্তির প্রবলতা দেখাইয়াছেন; কিন্তু বোয়েরের সৃষ্টি, বিশ্ব-সমস্যার দিকে চাহিয়া জগতের বিপুল দুঃখের দিকে চাহিয়া তাহাকে অপসারিত করিবার জন্য পরার্থপর ব্যক্তির অন্তরের মহান্‌ দুঃখ ও প্রবল সংগ্রামটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। The Great Hunger (পরম ক্ষুধা) এবং The Face of the World (জগতের রূপ) রচয়িতাকে এইজন্যই টলষ্টয়ের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে হয়। আর বাস্তবিক ইনিও বর্ত্তমান সভ্যতাকে টলষ্টয়ের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সভ্যতাকে যে ইনি জটিলতার ও জঞ্জালের কারণ বলিয়া মনে করেন, বর্ত্তমান সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান যে মানব অন্তরের অন্তরতম অধ্যাত্ম তৃষ্ণাকে মিটাইতে অক্ষম, তাহারই আভাস ইঁহার The Great Hunger পুস্তকে বিশেষভাবে পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংরাজী সাহিত্যে এবং মনে হয় আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যেও মানব-জীবনের কাম-কাতরতাকেই এত বৃহৎ করিয়া দেখানো আরম্ভ হইয়াছে যে, মনে হয় যেন আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ জীবনে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই ভাবটি আমাদের বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যেও যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তিটাই যেন এক মাত্র সত্য। এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই যেন সব চলিতেছে ও চলিবে—এই-রকমেরই একটা মতবাদ এইজাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতেছে। এইজাতীয় সাহিত্যকে বাস্তবিক সাহিত্য বলা চলে কি না, কাম-ব্যাকুল মানবের ভাব-ভঙ্গী এবং কর্ম্ম-প্রণালীর বর্ণনায় পাঠকের চিত্তে রস সৃষ্টি করা হয় কি না এবং কাম-প্রণোদিত পাশবিক জীবনাদর্শকে বাস্তবিক মনুষ্যত্বের আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া চলে কি না, তাহা আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তবে এই কথাটি বলা যাইতে পারে যে, এইজাতীয় সাহিত্য কখনও মানুষকে মহীয়ান্‌ করিতে পারিবে না, এবং তাহার বৃহৎ সত্তার কোনো সন্ধানই দিতে পারিবে না। যে সাহিত্যিক কাম-লোলুপ মানবের জীবন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া আনন্দ পান, তিনি তাঁহার সাহিত্য দিয়া কখনও মানবাত্মাকে কোনো অসীমতার সন্ধান দিতে পারিবেন না, কখনও জীবনকে কোনো গৌরবময় মহত্ত্বের পথে চালিত করিতে পারিবেন না। তাঁহার সাহিত্য বাস্তবতার স্যাকামি যতই করুক, নিত্যকালের মানবাত্মা তাহাকে অচিরেই মিথ্যা এবং হেয় বলিয়া উপেক্ষা করিবে।

সাহিত্যিকের আসন ধর্ম্ম-গুরুর আসন হইতে একটুও নীচে নহে। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই দায়িত্বটুকু স্বীকার করিয়াই শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। সাহিত্য মানুষকে তাহার প্রকৃত জীবনের দিকে দৃষ্টি চালনা করিতে সহায়তা করিবে। বাহিরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানবের অন্তরাত্মা কোন্‌ সত্যের কোন্‌ শক্তির সন্ধান করিতেছে, নানা জঞ্জালের মাঝে পথহারা হইয়া সে কোন্‌ সার্থকতার সন্ধানে কাঙাল হইয়া ফিরিতেছে, তাহার বার্ত্তা দিবার ভার সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। এইটুকু করিতে পারিলেই কি মানবের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মবোধ জাগ্রত করা হয় না? মানবকে সত্য জীবনের পথে যে প্রেরণা দেয়, অন্তরের বাস্তবিক গভীরতম প্রয়োজনের দিকে যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে চালিত করে। ধর্ম্মের এই সূত্রের অনুসরণ করিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে জগতের সাহিত্য-গুরুগণকে জীবন-ধর্ম্মের পুরোহিত বলিয়া প্রচার করিতে পারি। এবং সেইসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, জোহান বোয়েরও বিশ্ব-সাহিত্যের মন্দিরে একজন শ্রেষ্ঠ জীবন-পুরোহিত বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

কারণ ইনি মানুষকে তাহার ক্ষুদ্রতা এবং অসম্পূর্ণতার মাঝে ফেলিয়া রাখিয়া, মানব-জীবনের এবং সেইসঙ্গে ভগবানের মহাগৌরবময় সৃষ্টির অপমান ও অমর্য্যাদা করেন নাই; ইনি মানবকে এক বিপুল শক্তির বিশালক্ষেত্রে সজোরে আহ্বান করিয়াছেন। মানব-জীবনকে ইনি বৃহৎ

* জোহান বোয়েরের-লিখিত "The Face of the World" জগতের রূপ পুস্তকের আলোচনা।

ও মহৎ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। জীবনে নিরাশা ও দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা করিয়া ইনি বিশ্ব-মন্দিরে শক্তি ও আশার সঙ্গীতে মানবাত্মার স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছেন। ইঁহার সমগ্র রচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা The Face of the World (জগতের রূপ) পুস্তকখানিরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ইঁহার প্রচারিত আদর্শ-বাদের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করিব।

জীবন-সম্বন্ধে একটি নিদারুণ সমস্যা-বিধি এবং এই সমস্যা সমাধানের প্রবল প্রচেষ্টা যে নরওয়ের সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ কখনও এই হইতে পারে না যে, জগতের আর কোথাও জীবন একটা সমস্যা নহে। কোনো একটি ভাব কোনো একটি সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে প্রবল হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু যাহা কিছু সত্যকার ভাব, তাহা যে সর্ব্বমানবেরই অন্তরের ভাব—এই কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বাস্তবিক প্রত্যেক জাগ্রত মানবাত্মার নিকটই জীবন একটি বিপুল সমস্যা। অন্তর ও বাহিরের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্যকে সে প্রতিনিয়ত সন্ধান করে, অথচ জীবনের নানা জটিলতা সেই সামঞ্জস্যকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তোলে। তাহার অন্তরে সে যেন কি একটি সার্থকতার স্বপ্নময় প্রেরণা অনুভব করে, অথচ কোনো বিশেষ অবস্থার মধ্যে সে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পায় না। একটি অপূর্ব্ব জীবনাদর্শের কল্পনা তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু বিশ্ব-ব্যাপারের মাঝে সে আদর্শকে তাহার কল্পলোকের আসন হইতে কিছুতেই নামাইয়া আনিতে পারে না। এখানেই অন্তরের বিপুল বেদনা উথলিয়া উঠিয়া ব্যক্তির জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে থাকে।

অথচ মানবের যাহা-কিছু মহিমা ও গৌরব তাহা তাহার এই বিপুল প্রাণাদর্শের দিকে প্রয়াণেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। মানব-জাতির শ্রদ্ধা ও পূজা চিরকালই সেই অসম্ভব স্বপনপসারীদের চরণে অর্পিত হইয়া আসিয়াছে। যাহারা আপনাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হইয়া আছে, তাহারা হয়ত বিফলতার মুখ দেখিল না, কিন্তু তাহারা জীবনের কোনো মহিমাকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র সার্থকতাকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা বিরাট্ বিফলতাকেই বরণ করিল তাহাদের ব্যথার অন্ত নাই সত্য, কিন্তু তাহারাই জগতে প্রাণের মর্য্যাদা রাখিয়া গেল, তাহারাই বাঁচিয়া থাকার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল।

কিন্তু এই প্রাণাদর্শ বস্তুটি কি? ইহার স্বরূপ কি? অনন্ত বিচিত্র জীবন-ধারা কত না ভাবে ও বিচিত্র ছন্দে, কত না জ্ঞানে ও সৌন্দর্য্যে, এই অনন্ত বিশ্বের মাঝ দিয়া না জানি কোন্ অনির্দ্দিষ্ট সার্থকতার সন্ধান করিয়া চলিয়াছে! কেহ ত জানে না, বলিতে পারে না, এ-জীবন বাস্তবিক কি, কোথায় ইহার গতি ও চরম পরিণতি! মানুষটির অন্তরে প্রচণ্ড জীবনাবেগ, ইহারই টানে সে চলিয়াছে কিন্তু কোথায় সে ত তাহা জানে না। জীবনের অনন্ত বিচিত্ররূপের আভাস তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ ও চকিত করে, কিছু সে বোঝে, আর অনেক-কিছুই সে বুঝিতে পারে না; অসীম সৌন্দর্য্যের একটুখানি ইঙ্গিত তাহাকে বিহ্বল করে, কিন্তু সবখানি সৌন্দর্য্যের ধরা সে পায় না। অথচ মানুষ তাহার এই হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়া অনন্ত বিশ্বের অসীম জীবনকে জানিতে চায়, পাইতে চায়। ইহা ছাড়া তাহার তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। মানুষের মাঝে যে-মানুষটি জাগিয়া উঠিয়াছে, সে-ই তাই উদাস প্রাণে তাহার বদ্ধ ঘরের গণ্ডী ছাড়িয়া চলিয়াছে;—কোথায়? কেন? তাহা সে জানে না, তবু সে চলিয়াছে।

অসীম জ্ঞানের সম্মুখে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ জ্ঞানের যে-বেদনা ও ক্রন্দন তাহার সকরুণ ইতিহাস পাই ব্রাউনিংএর প্যারাসেলসাস্ কাব্যে। সৌন্দর্য্যবোধের তীব্রতাও জীবনে তেম্নি ব্যথার সঞ্চার করিয়া থাকে। বিশ্বের অসীম সৌন্দর্য্যের সবখানি ব্যক্তি তাহার একটুখানি হৃদয় দিয়া ধারণা করিতে চায় এবং বিফল হইয়া বড় ব্যথিত নৈরাশ্যে হাহাকার করিয়া উঠে। তেম্নি মানবাত্মার কল্যাণ-প্রচেষ্টাও তাহার জীবনকে বেদনাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। মানব তাহার অন্তরাত্মার মধ্যে বিশ্বের কল্যাণকে ব্যাকুল প্রাণে আহ্বান করিতেছে। জগতের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে চাহিয়া সে চারিদিকে অজস্র ক্ষুদ্রতা ও হীনতা এবং তজ্জনিত অপরিসীম দুঃখ ও দুর্দ্দশাকেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। বিশ্ব-মানবের পথখানি যে কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন তাহা নহে, সে-পথ অমঙ্গলের অজস্র কণ্টকে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিশাল-জগতের অমঙ্গল ও দুঃখ-দুর্দ্দশার দিকে চাহিয়া ব্যক্তির অন্তরাত্মার মাঝে একটি অরুন্তুদ যাতনা—একটি উৎকট প্রশ্ন—সে কি করিবে, কি করিয়া সে বিশ্বের বুকের এই পাপ দূর করিবে, সমগ্র মানব-জাতিকে কি করিয়া সে অমঙ্গলমুক্ত জগতের নির্ম্মলালোকে ডাকিয়া আনিবে। এই সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণকামী মানবাত্মা তাহার সকল শান্তি হারাইয়া বসিয়াছে। যতদিন বিশ্বের প্রত্যেকটি ব্যক্তির অন্তরে বিশ্ব-সঙ্গীতের কম্পন না জাগিবে, যতদিন কোথাও কোনো কোণে একটিও অন্তর দুঃখে দীর্ণ হইয়া থাকিবে, ততদিন তাহার কোনো আনন্দেই আনন্দ নাই; ততদিন বুদ্ধের হৃদয় মুক্তিকে পাইয়াও গ্রহণ করিতে পারে না।

'জগতের রূপ' বইখানির নায়ক হেরল্ড মার্কের জীবন এই সমস্যাটিকেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

চিকিৎসক হেরল্ড মার্ক মনে করিয়াছিল বিশ্ব-জগৎ হইতে শারীরিক ব্যাধিগুলিকে বিতাড়িত করিতে পারিলে মানব-সমাজ সুখী হইতে পারিবে। সে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, বিজ্ঞান একদিন পৃথিবীর বক্ষ হইতে ব্যাধিকে চিরতরে বিদূরিত করিতে পারিবে। অদম্য উদ্যম ও প্রাণশক্তি, প্রবল আশা ও বিশ্বাসভরা আনন্দ বুকে লইয়া সে তাহার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সে আপনার অন্তরের নিদারুণ অশান্তি ও বিশ্বব্যাপ্ত অসীম অমঙ্গলের পরিচয় পাইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

যতই সে মানব-সমাজের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে লাগিল, ততই এই কথাটি তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল যে, রোগের চিকিৎসা যতই হোক না কেন, যতদিন জীবন-যাপন প্রণালীর মধ্যে পরিবর্ত্তন না আনা যাইবে, যতদিন মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক না করা যাইবে, ততদিন রোগ দূর করা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত হইয়া থাকিবে। বাধ্য হইয়া তাই হেরল্ড মার্ক চিকিৎসা-ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের বিশাল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। মানুষের উপর মানুষের স্বার্থের অত্যাচার ও অন্যায়কে সে সমস্ত শক্তি দিয়া নির্ম্মূল করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টি-ক্ষেত্র শুধু তাহার জন্মক্ষেত্র নরওয়ের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ রহিল না, সহৃদয় দৃষ্টি তাহার প্রসারিত হইয়া গেল সমগ্র জগতের দুঃখ-দুর্দ্দশা, অন্যায় ও অমঙ্গলের উপর। সংবাদ-পত্রের মাঝ দিয়া সে জগতের প্রত্যেক স্থানের মানুষের সহিত, তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশার সহিত আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলিল; সমগ্র জগতের অত্যাচার এবং অবিচার তাহার অন্তরকে নিস্ফল ক্রোধ ও যাতনায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। এক-কথায়, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল তাহার স্বদেশের একটি ক্ষুদ্র সহরের মধ্যে, কিন্তু তাহার অন্তরের অনুভব-ক্ষেত্রটি ছিল সমগ্র জগতের দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে।

হেরল্ড মার্ক বিবাহ করিয়া ভাবিয়াছিল তাহাতে সে আনন্দ ও শান্তি পাইবে। তাহার হৃদয়েও সাহচর্য্যের কামনা, ভালোবাসার পিপাসা প্রচুর ছিল; একটি শান্তিময় পরিবারে প্রেমময়ী ভার্য্যার সাহচর্য্যে জীবন যাপন করিবার কল্পনা তাহারও চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই হেরল্ডের জীবন পারিবারিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইল। তাহার স্ত্রী থোরা পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তিগত আনন্দে

বিভোর হইয়া থাকিতে চাহিল কিন্তু হেরেল্ডের চিত্তে জগতের দুঃখ-স্মৃতি এমনই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল যে, তাহার পক্ষে কোনো-রকমের ব্যক্তিগত আনন্দোপভোগ দুঃসহ অপরাধের নামান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়াইল। তাই সে ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"I can't quite manage to feel only joy and gladness over it all, for half my inner consciousness is with the thousands that at this moment haven't even salt for their soup."—হারে, এই যে আনন্দ ইহাকে ত আমি গ্রহণ করিতে পারি না ; যারা এই মুহূর্ত্তে খাওয়ার একটু নুন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, আমার অন্তরাত্মা যে তাহাদের ভুলিয়া থাকিতে পারে না।

ফলতঃ সংবাদ-পত্রের মাঝ দিয়া সংসারের যে একটি দুঃখময় চিত্র ফুটিয়া উঠে হেরল্ড তাহা দেখিয়া আর সমস্তই ভুলিয়া গেল। পূর্ব্বযুগের মানব সমগ্র জগতের বাস্তব দুঃখের স্বরূপটাকে ধারণা করিতে পারিত না ; বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে পৃথিবীর মানব সমাজগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে পৃথক্ হইয়া আপনাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ন্যায়-অন্যায়ের আংশিক হিসাব লইয়া ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানব-সমাজের এই অনন্ত বিচ্ছিন্নতা অনেকখানিই কাটিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। ফলে সামঞ্জস্য ও মিলন না হইলেও সমগ্র বিশ্ব-সমাজ একটি অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে ; এইজন্যই জগতের একপ্রান্তের ক্ষুদ্র পল্লীর কৃষকের জীবনের সহিত অপর প্রান্তের কারখানার কুলীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আজ স্বীকৃত ও অনুভূত হইতেছে। তাই আজিকার ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিবার সময় তাহার ক্ষুদ্র সমাজনীতির দিকে চাহিলে আর চলিবে না, তাহাকে বিশাল বিশ্ব-সমাজ-নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। এইজন্য বর্ত্তমান জগতের নৈতিক সমস্যা নিতান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে ; এই জটিলতাকে সহজ করিবার জন্য মানব-সমাজকে নূতন বিশ্ব নীতির সন্ধান করিতে হইতেছে। পূর্ব্বেকার কোনো বিশেষ সমাজ তাহার নিজস্ব স্বার্থ টিকেই জীবনের চরম আদর্শ করিয়া লইয়া অপরাপর সমাজগুলির প্রতি অবিচার করিতে সঙ্কুচিত হইত না, কিন্তু বর্ত্তমান জীবনে কোনো গণ্ডীবদ্ধ সমাজের আদর্শ টিকিতেই পারিতেছে না। নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে সর্ব্বজগতের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। এবং এই প্রয়োজনের দায় ছাড়া মানুষ তাহার অন্তরেও এই ব্যাপক বিশ্ব-নীতির প্রেরণা অনুভব করিতেছে। হেরল্ড তাই জগতের এক কোণে বসিয়া থাকিয়াও সমগ্র জগতের অন্যায়ের ও অশান্তির জন্য নিজের দায়িত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিল না। "ফলে The world not only grew larger every time, but it became a power that drew him more and more out to itself with his interests, his thoughts and his dreams. He seemed to be always growing more and more wide awake and the more wide awake he grew, the more things did he meet with that vexed and depressed him."—প্রতিদিন তাহার সম্মুখে জগৎটা কেবল যে বৃহৎ হইয়াই চলিল তাহা নয়, এই জগৎ তাহাকে তাহার স্বপ্ন, তাহার চিন্তা এবং তাহার ভালো-লাগার মাঝ দিয়া কেবলই আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে প্রতিনিমেষে যেন আরও জাগ্রত সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং এই চেতনা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার দৃষ্টিপথে এমন সব ব্যাপার উপস্থিত হইতে লাগিল, যাহাতে সে কেবলই বিরক্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

বাস্তবিকই কি জগতে কেবলই দুঃখের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে, কোথাও কি ইহার হাসি নাই, সঙ্গীত নাই, আনন্দ নাই, কলা-সৌন্দর্য্যের রসস্ফূর্ত্তি নাই, যৌবনের আনন্দোচ্ছলতা নাই—এই প্রশ্নটি হেরল্ডের মনে যে জাগে নাই তাহা নয়। প্রত্যেক মানবাত্মার মতন, হেরল্ডও জগতে আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের সন্ধানেই আসিয়াছিল ; সে প্রাণের অফুরান বেগ লইয়া পরম আনন্দের উৎসবে জীবন কাটাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার অন্তরের পরার্থপর বেদনা তাহাকে আনন্দের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিল। এই বিশ্বের দুঃখকে দূর না করিয়া সকলকে সমান অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ করিতে যাওয়া নৈতিক পাপ—এই কথাটি মনে জাগিয়া হেরল্ডকে বিশ্বের হাস্যোৎসব হইতে বিমুখ করিয়া রাখিল। যদি বা কখনও সে তাহার স্ত্রীর সহিত কোনো আনন্দ-ভোজের নৃত্য-গানে যোগ দিত, তাহা হইলে সারারাত তাহাকে জাগিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। একবার হেরল্ডের স্ত্রী তাহার চিত্তের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা, জগতে কি অন্যায় ছাড়া আর কিছুই হচ্চে না ?" হেরল্ড বলিয়াছিল, "সেই ত হচ্চে ভয়ানক কথা—মানুষ এতই অক্ষম শক্তিহীন।" কিন্তু শক্তিহীনতার অজুহাতে হেরল্ডের অন্তরাত্মার রেহাই নাই। হেরল্ড্ বলে, "I want to serve my time and try to get the moral means to live some day in nice surroundings, cultivate my mind, drink in beauty and have a share in all the joy and pleasures of the world." সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মাঝে বাস করবার জন্য সৌন্দর্য্য-সুধা পান করবার জন্য জগতের সমস্ত আনন্দ-আহ্লাদের অংশী হবার জন্য আমাকে নৈতিক অধিকার অর্জ্জন করতে হবে। হেরল্ডের আশা—একদিন বিশ্ববাসী-সকলে বিশ্ব-সঙ্গীতে যোগ দিবে। কিন্তু এই আশার পশ্চাতে বুক-ভাঙা অভিজ্ঞতার নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "The great world, conscience is one thing, but the ability to alter anything is another."—ওরে মানব ! বুকে তোমার বিশ্বকল্যাণ-বোধ থাকিলে কি হইবে, সমগ্র বিশ্বের অজস্র অন্যায় দেখিয়া তোমার বুক ব্যথিত হইলেই বা কি হইবে, শক্তি যে তোমার অতি তুচ্ছ ! এই যে অবিচার ও অন্যায় জগতের জীবনকে বিষাক্ত করিতেছে, ইহার বিরাট্ বোঝা সরাইয়া বিশ্বের বুকটাকে হাল্কা করিবার সাধ্য ত তোমার নাই। বিশ্বের অমীমাংসিত রহস্যের চেয়েও যে এই অন্যায় ও অবিচার ভয়াবহ বিভীষিকার মতন জগতের বুকে চাপিয়া রহিয়াছে। "There is a still greater nightmare than the unsolved mysteries and that is all the injustice that poisons the world."

বর্ত্তমান জগতের এই যে অন্তহীন অন্ধকার, এই যে হিমালয়ের মতন বিপুল দুঃখ-দুর্দ্দশা, ইহার জন্য মানুষ যে কতখানি দায়ী সে-কথা কোনো শিক্ষিত মানবেরই অবিদিত নাই। মানুষের এই অন্যায় তাহার জ্ঞানের নিকট আজ অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জগতের এই যে অগণিত শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীর দুঃখময় জীবন তাহার সমস্ত অসুখ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের মূলে যে মুষ্টিমেয় স্বার্থপর অর্থলোলুপ ধনাধিকারীর অত্যাচার রহিয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। অথচ এই অত্যাচারকে নিরস্ত করিবার কোনো শক্তি মানুষ আবিষ্কার করিতে পারিতেছে না। এমনি-ধারা শতসহস্র দুর্দ্দশার কারণ মানুষের সৃষ্ট অন্যায় বিধি-বন্ধন। মানব-চিত্তের কাছে তাহার এ অন্যায় অবিদিত নাই, অথচ মানুষের স্বার্থপরতার এমনই মোহময় শক্তি যে, তাহার বিরুদ্ধে বুদ্ধ, বিবেকানন্দ, খৃষ্ট, গান্ধীর অভিযান শতাব্দীর পর শতাব্দী কি ব্যর্থ হইয়াই চলিয়াছে ! হেরল্ডের চিত্তের দারুণ বিদ্রোহ ও ক্ষিপ্ততার কারণ এইখানে। এই বিশ্বের শাসন-যন্ত্র এমনই দুর্নিবার শক্তিতে চলিয়াছে এবং তাহার মূলে মানুষের এমনই অতি সাধারণ অজ্ঞান রহিয়াছে যে, তাহার দিকে চাহিয়া হেরল্ড ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, সে চায় এক-আঘাতে এই স্পষ্ট মিথ্যা ও অন্যায়কে দূর করিয়া মানব-জাতির অগ্রগতিকে সহজ করিয়া দিতে। মন্দ যে জগতের

অধঃপতনের কি ভয়ানক কারণ, তাহা কে না জানে? অথচ মানুষ আজও এই মন্ত্রের ভয়াবহ পরিণাম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার কোনো বিশেষ চেষ্টাই করিতেছে না। জাতি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, অথচ এত সহজে যাহা দূর করা যায়, তাহাও মানুষ দূর করিতে পারিতেছে না; এই যে মানুষের অশক্তি ও অসহায়তা ইহার দিকে চাহিয়া হেরল্ড সকল শক্তিতে আস্থাহীন হইয়া পড়িল। এইজন্যই হেরল্ডের মুখে এক উৎকট বেদনার ক্লিষ্ট হাস্য দেখা দিল।

হেরল্ডের দৃষ্টি পড়িয়াছিল মানব-সমাজের বাহ্যিক ব্যবস্থারই উপর। সে ভাবিয়াছিল যদি বিজ্ঞান আর কিছুদূর অগ্রসর হয়, যদি মানুষ তাহার মনের নিষ্ক্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে হয়ত একদিন সুস্থ মানব আনন্দের সংসার সৃষ্টি করিতে পারিবে। কিন্তু অচিরেই আর-একটি সত্য আসিয়া তাহার আশাকেও বাতুলতা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিল। মানুষের মন-বস্তুটা যে অসীম রহস্যময়, মানুষের মনের ব্যাধি যে বলিতে গেলে আরোগ্যের অতীত, তাহা সে বুঝিতে পারিল। ইভার্-নামক লোকটির জীবনে ভালোবাসার মোহ আসিয়া তাহাকে চিরতরে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল এবং শেষকালে মানুষের ঘৃণাকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া তাহার ঠেলায় নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিল। ইভার্ একটি বিবাহিতা রমণীর প্রতি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণের ফলে তাহারই দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল; সমাজের দুর্গম তাহাকে রোধ করিতে পারিল না। আইনের শাসন তাহাকে দমন করিতে পারিল না; সে বুঝিতে পারিয়াও এই মোহের দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না; দিন-দিন তাহার সমস্ত মনুষ্যত্ব ও শক্তি নষ্ট হইতে লাগিল। ডাক্তার হেরল্ড এই নূতন ব্যাধির সন্ধান পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও সে তাহার বিপুল বিশ্বাস লইয়া ইভার্‌কে মানসিক ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। সে তাহার নিজের ইচ্ছা-শক্তির জোর দিয়া তাহার অন্তরের বিপুল বিশ্বাস দিয়া ইভারের আত্ম-বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করিল এবং ফলে ইভার্ যেন কিছুকালের জন্য কতকটা মোহমুক্ত হইয়া মানুষের মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সমস্ত সহর তাহার ঘৃণা এবং বিদ্রূপ দিয়া ইভার্‌কে পতনের পথে দুর্নিবার বেগে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

হেরল্‌ড্ শুধু ইভারের ব্যাধিটাই যে দেখিয়াছিল তাহা নয়। সে তাহার নিজের অন্তরকেও ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া অনুভব করিতেছিল। ইভার্ যেমন সেই রমণীর বাড়ীর পাশে না ঘুরিয়া আসিয়া একদিনও থাকিতে পারিত না, হেরল্ডও তেমনি জগতের দৈনন্দিন অবস্থার সংবাদ না পাইলে স্বস্তি অনুভব করিত না। ইভারের রমণী-চিন্তার মতন হেরল্ডও জগতের চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই হেরল্ড ভাবিল, সে এইভাবে বিশ্বের দুঃখ-চিন্তা দিয়া তাহার চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া রাখিবে না; সে সঙ্কল্প করিল, জীবনের আনন্দকে দশের মত সেও উপভোগ করিবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে অন্তরের দৃষ্টি-ক্ষেত্রকে যে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিতে হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। যদিও তাহার উদারহৃদয়া পরোপকার-ব্রতধারিণী মা তাঁহার দৃষ্টি-ক্ষেত্রকে সহরের সীমায় আবদ্ধ রাখিয়া বেশ আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছিলেন, তথাপি হেরল্ডের পক্ষে যে তাহা অসম্ভব, ইহা বুঝিতে হেরল্ডের বাকী ছিল না। সেইজন্য সে নিজের মুক্তির আশা ছাড়িয়া দিয়া বিশ্ব-জগতের দুঃখ লাঘব কেমন করিয়া হইবে, সেই চিন্তায় আপনাকে মগ্ন করিয়া ফেলিল। ইভারের ভার লইয়া হেরল্ড তাই সমগ্র সহরের মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করিয়া দিল। নিন্দাপ্রিয় নাগরিকগণের অপমানের হাত হইতে ইভার্‌কে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত যোদ্ধার মতন হেরল্‌ড্ তাহার প্রাণের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিল। যদিও সমগ্র বিশ্বের দুঃখে হেরল্ডের হৃদয় মথিত হইতেছিল, তথাপি হেরল্‌ড্ কখনও আপনার হাতের কাছের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। বুকের নিদারুণ ব্যথা বুকে চাপিয়া কর্ত্তব্যের পথে যোদ্ধার মতন দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হওয়ার মাঝেই হেরল্ডের প্রাণের সত্য পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। অনেকেই বিশ্বপ্রেমে পাগল হইয়া ঘরের দুর্দ্দশাকে দেখিতে পান না, হেরল্ড সেই জাতির মানুষ নয়। তাই সে বলিয়াছিল, 'I have come to the conclusion that if you can save a single human being from going to the dogs, it's better than fighting for ten programs.'—আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, দশটা কাজের প্রণালী নিয়ে লড়াই-ঝগড়া না করে' যদি একটা মানুষকেও অধঃপতনের মুখ থেকে রক্ষা করা যায় তবে তাই শ্রেষ্ঠ কাজ।

ইভার্‌কে হেরল্ড রক্ষা করিতে পারিল না। সহরের সমস্ত লোকের পুঞ্জীভূত বিদ্রূপ ও উপহাস ইভারের দুর্ব্বল চিত্তকে দাঁড়াইতে দিল না। লোকেরা তাহাকে বুঝাইল, ডাক্তার হেরল্ড তাহাকে মানুষ বলিয়া ভালোও বাসেনা সম্মানও করে না; ডাক্তার হেরল্ডের নিকট সে শুধু একটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরীক্ষার বস্তু বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এইভাবে হেরল্ডের প্রতি তাহার বিশ্বাসটি নষ্ট হইয়া গেল। যে-বিশ্বাসের বলে সে মানুষ হইতে চলিয়াছিল, সেই ভিত্তি ভাঙিয়া গেল। অপর দিক দিয়া তাহার কল্পিত প্রণয়িনীর সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদ তাহাকে একবারে পাগল করিয়া দিল। ফলে ইভার্‌কে ধরিয়া রাখা হেরল্ডের অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। হেরল্‌ড্ বুঝিল স্বপ্ন তাহার নিরাশার বিধায় ভাঙিয়া যাইতে চায়।

তাই সে আপনার মনে বলিতেছে, "তোমার মাঝে অন্তরের দিকে প্রেরণা রহিয়াছে, কিন্তু তুমি ত তোমার এই অনন্ত-বোধকে আনন্দে-উল্লাসে রূপান্তরিত করিতে পারো না, এই বিশ্বের মহান্ উৎসব-ছন্দের সহিত ত তোমার অন্তরের অনন্ত বোধ ছন্দোময় হইয়া ঐক্য-বোধে রূপান্তরিত হয় না? কিন্তু এই কি স্রষ্টার অভিপ্রায় ছিল না, ইহাই কি আমাদের সকলের কর্ত্তব্য নয়? যদি না হয়, তবে—তবে?"

"আছে, সেই অরুণ ঊষা কোথাও আছে, যার দিকে আমরা সবাই চলিয়াছি, সমস্ত ধর্ম্ম যার প্রতিবিম্ব। তুমি বিশ্বাস করো কি, যে, একদিন সেই পবিত্র মুর্ত্তিটি আসিবে, যখন সমস্ত মানুষ শান্তভাবে বসিবার সময় পাইবে, যখন তাহাদের চিত্তের মধ্য দিয়া বিশ্বসঙ্গীত আনন্দোচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতে থাকিবে। একি তুমি বিশ্বাস করো? যদি না হয়, তবে—তবে?"

নৈরাশ্যের আঘাতে ব্যর্থহৃদয় হেরল্ডের অন্তর্দ্বন্দ্বের এই প্রশ্ন বড় করুণ, প্যারাসেল্‌সাসের শেষ জীবনের মতনই মর্ম্মস্পর্শী। সবশেষে ইভার্‌ও যখন আর আপনার পাপের প্ররোচনাকে জয় করিতে পারিল না, যখন সে হেরল্‌ডের বিশ্বাসকে চূর্ণ করিয়া, নিন্দুকদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য করিয়া, সহরে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া নিজের এবং বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিল, তখন হেরল্‌ডের বুকের সব আশা, সব স্বপ্ন বুঝি একেবারে ভীষণভাবে ভাঙিয়া পড়িল। তাহার প্রচণ্ড বিশ্বাসের সৌধখানি যেন অগ্নিকাণ্ডে ভীম শব্দ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

হেরল্ডের জীবন তাহার প্রচণ্ড প্রচেষ্টার পরিণামে ব্যর্থ হইয়া গেল। এই বিশাল ব্যর্থতার মুহূর্ত্তে হেরল্ডের অন্তরে একটি অশ্রুসিক্ত বেদনা-করুণ সান্ত্বনার আবির্ভাব দেখাইয়া শিল্পী বোয়ের হেরল্ডের জীবনের উপর পরদা টানিয়া দিয়াছেন। এই অপরূপ সান্ত্বনার বাহন সুর-শিল্পী বেটোভেনের (Beethoven) Ninth Symphony। এই অপূর্ব্ব রাগিণীর সুর-তরঙ্গের উপর দিয়া সেই অপূর্ব্ব অসম্ভব স্বপ্নটি ভাসিয়া আসিতে লাগিল, যে-স্বপ্নের নেশায় পাগল হইয়া বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, খৃষ্ট আসিয়াছিলেন, জগৎ-কল্যাণকামী মহাপুরুষগণ আসিয়াছিলেন। মানুষের কল্পলোকের সেই স্বপ্নটি বাস্তব জগতের আঘাতে যুগে-যুগে যেমন ভাঙিয়া গিয়াছে,

তেমনি যুগে-যুগে স্বপনপসারীগণ আবার তাহাকে সৃষ্টিও করিয়া গিয়াছেন। কে বলিতে পারে স্বপনপসারীদের এই বিচিত্র স্বপ্ন একদিন দীর্ঘ যুগান্তের নিষ্ফল চেষ্টার শেষে, অমানিশান্তে অকস্মাৎ সূর্য্যোদয়ের মতন পরিপূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না? জগৎটা কেবলই অধঃপতন ও নীচতার অন্ধকার ও অক্ষমতার পৈশাচিক ক্ষেত্র নহে, এখানে স্বর্গের স্বপ্নও নামিয়া আসে। মুহূর্ত্তের জন্ম হইলেও ত বেটোফেন সেই কল্প-লোককে মানব-অনুভবের মাঝে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁরাই মহৎ এবং বৃহৎ হইয়া চিরকাল মানব-জাতির পূজার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, যাঁরা এমনই অসম্ভব স্বপ্নকে বরণ করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র জীবনকে বিরাট্ ব্যর্থতার মাঝে নিঃশেষ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যারা এই স্বপ্নকে অবিশ্বাস করিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কাই শুধু জানাইয়া গেল এবং তাহাদের অমঙ্গলময় ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য বলিয়া গর্ব্ব করিয়া গেল, তা'রা কখনও মানব-জাতির স্মৃতি-মন্দিরে বেশী দিন স্থান পাইবে না। খৃষ্টই নিত্যকাল রহিয়া গেলেন, তাঁহার তাৎকালিক বিচারকগণ আজ কোথায়? মহাত্মা গান্ধীর ভ্রান্তি এবং অসাফল্যকেই যারা বড় করিয়া নৃত্য করিবে, তাহাদের স্মৃতি জগৎ কয় দিন বহন করিবে? গান্ধীর বিশাল মহামঙ্গলের স্বপ্নই নিত্যকাল বিশ্বজগৎকে ঊর্দ্ধ হইতে আরও ঊর্দ্ধে আহ্বান করিয়া লইয়া চলিবে। আদর্শবাদীর এই অশ্রু-বেদনামাখা সান্ত্বনায়ই হেরলডের বিরাট্ ব্যর্থতাকে শিল্পী বোয়েরের গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

'জগতের রূপ' বইখানির ভাব-ধারার অনুসরণ করিয়া আমরা শিল্পী বোয়েরের গভীর ভাবুকতার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। ইহার মধ্য দিয়া শিল্পী বোয়েরের যে প্রবল আদর্শবাদ এবং সমস্ত বিফলতার সম্মুখে বিপুল আশার বাণী অতি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, তাহার অল্প আভাস দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। আদর্শের মহত্ব ও বিপুলতায়, জীবন-সংগ্রামের প্রবলতা ও আন্তরিকতায় বোয়ের বীর-কবি ব্রাউনিংএর কথা স্মরণ করাইয়া দেন। উপন্যাস-জগতে প্রবেশ করিলে এই ধারণাটিই বদ্ধমূল হইয়া আসিতে থাকে যে, মানব-জীবনের যাহা কিছু সত্য, তাহা হইতেছে নর-নারীর বিচিত্র প্রেমের সম্বন্ধটি। এই নর-নারীর প্রেম-লীলাটি বাদ দিলে বাস্তবিক মানুষের জীবনে চাওয়া-পাওয়ার আর-কিছু থাকে কি না শতকরা নিরানব্বই জন ঔপন্যাসিকের মনে যে সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে, তাহা তাহাদের প্রেমলীলা লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ততা দেখিলেই বোঝা যায়। কিন্তু ব্রাউনিং এবং বোয়েরের সৃষ্টির দিকে চাহিলে আমাদের এই-সব ঔপন্যাসিকগণের সন্দেহটি যে কত মিথ্যা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানব-জীবনের লক্ষ্য যে কত বৃহৎ এবং কত মহৎ, মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে বিশ্ব-সৃষ্টির মতনই বিরাট্ ও বিশাল, মানব-প্রাণ যে ব্যর্থ প্রণয়ের আঘাতেই ভাঙিয়া যাইবার মত ক্ষীণ-দুর্ব্বল নহে, সে যে অতি বিপুল সংগ্রামের জন্ম সৃষ্ট হইয়াছে, এই ভাবের কথা আমরা ব্রাউনিং বোয়েরের নিকটই শুনিতে পাই। ইঁহারা বিশ্বসাহিত্যে বীর ভাবুক ও বিজয়পন্থী মনুষ্যত্বের বাণী-প্রচারক বলিয়া পরিচিত হওয়ারই উপযুক্ত। পরার্থপর মনুষ্যত্বের বাণী প্রচারে শেলি, টলষ্টয় প্রভৃতি কেহই কম নহেন, কিন্তু ইঁহাদের রচনায় বলিষ্ঠ প্রাণের সবল আশা ও বিশ্বাস, সাহস ও সংগ্রাম এমন-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ব্রাউনিংকেই সর্ব্বপ্রথম বোয়েরের সমধর্ম্মী বলিয়া মনে হয়।

যাহা হোক শুদ্ধমাত্র ভাবুকতার বিচারেই শিল্পীর পরিপূর্ণ বিচার হইতে পারে না। কোনো একটি কথাকে বলিতে হইলে তাহাকে দুই ভাবে বলা যাইতে পারে। কার্লাইল, এমার্সন্, রবীন্দ্রনাথ, মেটার্‌লিঙ্ক প্রভৃতি গদ্য-রচনার মধ্য দিয়া এমন সুন্দরভাবে তাঁহাদের বাণী প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহারা সেইজন্ম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিন্তু হিউগো, টলষ্টয়, ইবসেন, গর্কি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টির দ্বারা মানব-সমাজকে তাঁহাদের জীবনাদর্শের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদের ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ভাবুকগণ তাঁহাদের চিন্তার দ্বারা মানুষের চিন্তাশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের জীবনাদর্শটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু চরিত্র-শিল্পীগণ সাহিত্যে তাঁহাদের আদর্শানুরূপ চরিত্র-সৃষ্টি দ্বারা মানবের হৃদয়কে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মানুষকে ভাবাইয়া ভালো করার চেয়ে চরিত্রাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করার পন্থাটিই প্রকৃষ্টতর। চরিত্রের উপর চরিত্রাদর্শের জীবন্ত প্রভাব গভীরতর হইতে বাধ্য; কারণ, চরিত্রাদর্শ মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপর, তাহার চিন্তা ও অনুভূতি উভয়েরই উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এক-কথায় শিল্প-সৃষ্টি মানবের মনীষাকেই শুধু উদ্বুদ্ধ করে না, তাহার হৃদয়কেও মুগ্ধ করিয়া থাকে। যাহা হোক, শিল্প-সৃষ্টির প্রকৃষ্টতা লইয়া তুলনা-মূলক আলোচনার স্থান ইহা নহে। বলিতেছিলাম যে, শিল্পী বোয়েরের বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার ভাবুকতার বিচার লইয়া থাকিলেই চলিবে না; তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি কি-পরিমাণে স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে, তাহা মনস্তত্ত্বানুমোদিত হইয়াছে কি না, পারিপার্শ্বিক ও চরিত্রের সম্বন্ধটি যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে কি না, এই বিষয়গুলিরও সম্যক্ আলোচনা প্রয়োজন।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে বোয়েরের উপন্যাসখানির বিশ্লেষণাত্মক চরিত্র-সমালোচনা হইতে বিরত থাকিব। তাহার কারণ, যে-বইখানির আলোচনা করা হইতেছে, সেখানির অনুবাদ বাংলায় হয় নাই: সুতরাং খুঁটিনাটি আলোচনা করিলেও তাহার অনুসরণ করিতে ইংরেজী ভাষান-ভিজ্ঞ পাঠক অসমর্থ। তবে সংক্ষেপে বোয়েরের লিখন-রীতি-সম্বন্ধে দুটি কথা বলিয়া আমার ব্যক্তিগত মতটি এখানে ব্যক্ত করিলে, আশা করি, অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হইবে না। বোয়েরের লেখার প্রধান বিশেষত্ব তাহার বাহুল্যহীন সুস্পষ্টতা; বাগাড়ম্বর ও বাহ্যিক অবস্থার খুঁটিনাটি বর্ণনার দ্বারা বাস্তব-প্রিয়তার ভড়ং তাঁহার মধ্যে একেবারেই নাই। কোনো-একটি চরিত্রের পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা বলিতে যে, তাহার ঘরের ছেঁড়া কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া দেয়ালের টিক্‌টিকির লেজ-নাড়ার বর্ণনা পর্য্যন্ত বুঝায় না, বোয়ের এ-কথাটি খুব ভাল করিয়া জানেন। কোনো-একটি ঘরে সহস্র বস্তু থাকিলেও দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তি কখনও ওই সহস্র বস্তুর প্রত্যেকটি বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হইবে না। সুতরাং যে-যে বস্তু কোনো-একটি ব্যক্তির মনের উপর কোনো প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করিবে, সেই-সেই বস্তুর বর্ণনাকেই সেই ব্যক্তির সত্যকার পারিপার্শ্বিক বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এইজাতীয় ভাবানুগত পারিপার্শ্বিক বর্ণনায় শিল্পী বোয়েরের দক্ষতা প্রশংসনীয় বলিয়া আমার মনে হয়। কোনো-কোনো স্থানে তিনি অতি অল্পকথায় বস্তু-জগতের ভাব-চিত্রটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

এই বইখানির প্রধান চরিত্র হেরল্ডকে পরিস্ফুট করিতে গিয়া তাহার মনোজগৎটিকেই শিল্পী আঁকিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার কারণ বোধ করি এই যে, হেরল্ড বহির্জ্জগতের মানুষ ততটা নয়, যতটা সে মনোজগতের। এইজন্মই বইখানির মাঝে বহির্জ্জগতের পারিপার্শ্বিক বর্ণনার বাহুল্য নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মনোজগতেও পারিপার্শ্বিক বস্তুটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মনোজগতের বিভিন্ন ভাব ও অনুভবের প্রভাবে হেরল্ড চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি যথাযথভাবে দেখানো হইয়াছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। মানুষের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা ও নীচতায় আহত হেরল্‌ডের কঠোর মূর্ত্তি, মানব-সেবায় তাহার তৎপরতা, অন্তরের বিপুল নৈরাশ্যে তাহার তীব্র হাস্য, এগুলির দিকে চাহিলে বোয়েরকে সূক্ষ্ম চরিত্রজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বোয়েরের আর-একটি বিশেষত্ব সর্ব্বপ্রকারের মানুষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা

ও সহানুভূতি। অন্যান্য পুস্তকের কথা এখানে বলিব না। শুধু এই বইখানির মধ্যে যে-কয়টি দুর্ব্বল চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি শিল্পীর ব্যবহারটি দেখিলেই তাঁহার এই সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। কয়েকটি চরিত্রের হীনতা দেখাইয়াও তিনি তাহাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা জাগ্রত করেন নাই। 'আহা, এরা অজ্ঞান, কি যে করিতেছে জানে না ত!'—এই করুণার ভাবটিই তাঁহাকে ঐসব চরিত্রের প্রতি কোনো নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিতে বিরত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া হেরল্ডের স্ত্রী যখন তাহার ভাবের ভাবুক হইতে না পারিয়া অন্যদিকে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন হেরল্‌ড যে-ভাবে বিচ্ছেদটিকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। হেরল্ডের হৃদয়ে যে একটি গভীর বেদনা বাজিয়াছিল, সে যে তাহার স্ত্রীর একখানি পত্র পাওয়ার গোপন প্রতীক্ষায় থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিত, তাহা হেরল্ডের অতি গোপনীয় কথা হইলেও শিল্পী তাহার একটু আভাস দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি হেরল্‌ড তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে একটিবারও অনুযোগ করে নাই। সে নিজের ব্যথা লইয়া নীরব হইয়া গেল মাত্র। সে নিজের ব্যথায় অধীর হইয়া তাহার স্ত্রীকে এতটুকু আঘাতও করিতে পারিল না। ইহার মূলে হৃদয়হীনতা ছিল না, ইহার মূলে ছিল থোরার দুর্ব্বলতার প্রতি সহানুভূতি, তাহার সুখ-স্পৃহার প্রতি করুণা দৃষ্টি। ইতরের প্রতি হেরল্ডের সসম্মান ব্যবহারের আন্তরিকতাটুকু শিল্পীরই আন্তরিকতাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে। শিল্পী বোয়েরের অন্যান্য বইগুলির আলোচনা করিলেও এই বিশেষত্বগুলির প্রমাণ প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। এখানে আমরা কেবল এই বইখানিকে আশ্রয় করিয়া শিল্পী বোয়েরের বিশেষত্বটি দেখাইবার চেষ্টা করিলাম; চেষ্টা কতদূর সার্থক হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে আমার চেষ্টা যদি কোথাও এই ভাবুক শিল্পীকে ক্ষুদ্র করিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক দুঃখেরই কারণ হইবে।

চন্দননগরের দেবালয় ও উপাসনাগার

শ্রী হরিহর শেঠ

হিন্দুদেবালয়

চন্দননগরে দেবদেবীর মন্দিরাদির বাহুল্য বিশেষরূপেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে শিবমন্দিরের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, এস্থান যে এক-সময় শৈবপ্রধান ছিল (১) তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এখনও এখানে শতাধিক মন্দিরের মধ্যে যাহাতে শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বা শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে, এরূপ মন্দিরের সংখ্যা এক-চতুর্থাংশের অধিক নহে। শ্রীশ্রী কৃষ্ণবিগ্রহ মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য, দেওয়ান ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী নন্দদুলাল মন্দির। উহা প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ১৭৪০ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। চন্দননগরের মন্দির-হিসাবেই কেবল যে ইহা পুরাতন তাহা নহে; কেহ-কেহ বলেন, এখানকার স্থাপত্য-শিল্পের বোধ হয় ইহাই দ্বিতীয় বা তৃতীয় নিদর্শন। ইহা অপেক্ষাও পুরাতন শ্রীশ্রীদশভুজা মন্দির ও বর্ত্তমান কনভেন্ট্ সংলগ্ন সেন্ট অগাষ্টিনের গির্জ্জা; ক্লাইভের গোলা হইতে এই দুইটি মাত্রই রক্ষা পাইয়াছিল। এই গির্জ্জার ন্যায় গঠনের খৃষ্টান-উপাসনা মন্দির ভারতবর্ষের মধ্যে লক্ষ্ণৌএ আর-একটি ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। নন্দদুলাল মন্দিরের সুবৃহৎ বিচিত্র গঠন ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টকগুলি দেখিলে শিল্পীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কালের প্রভাবে আজ এই মন্দির শ্রীভ্রষ্ট, সংস্কারাভাবে জীর্ণ। এভাবের মন্দির এ-প্রদেশে সচরাচর দেখা যায় না।

শ্রীশ্রী বোড়াইচণ্ডী এখানকার অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবী। এই দেবী কবে কাহার দ্বারা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কথিত আছে, শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রার সময় এইস্থানে চণ্ডীর উপাসনা ও পূজা করিয়াছিলেন। (২) জনপ্রবাদ এইরূপ, যে,—কোনো সন্ন্যাসী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গঙ্গাতটে বেতবনের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া এক প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ মূর্ত্তি বহুদিন এক চণ্ডীমণ্ডপে স্থাপন করিয়া রাখা হইয়াছিল, পরে ভাস্তাড়া নিবাসী ৺চকু সিংহ মহাশয় দেবীর বর্ত্তমান জোড়ামন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন ও পরে গোন্দলপাড়া-নিবাসী ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাটবাংলা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দেবীর যে চতুর্ভুজা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অষ্টধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি। উহার পশ্চাতে সেই প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। আনুমানিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কেনারাম পলসাই ও রামকানাই চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দেবীর সেবায়েত ছিলেন জানা যায়; তাহার পূর্ব্বের কথা অজ্ঞাত। এই মন্দিরের আকারও কতকটা নন্দদুলালের মন্দিরের মতন। খলিশানিস্থ শ্রীশ্রী নন্দেরনন্দন-মন্দিরের গঠনও কতকটা এইপ্রকার। এইগুলির আকার অনেকটা সাধারণতঃ চালাঘরের ন্যায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সম্ভবতঃ এই মন্দিরগুলি দেখিয়াই তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।†

শ্রীশ্রী দশভুজা দেবী ও দেবীর মন্দির চন্দননগরের আর-একটি অতি প্রাচীন দেবালয়। এই দেবীও বিশেষ জাগ্রত বলিয়া লোকে মনে করিয়া থাকেন। এই মন্দির ও দশভুজা-মূর্ত্তি স্থানীয় সদ্গোপবংশীয় জমিদার মজুমদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ রামরাম ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে মানকুণ্ড-নামক পল্লীতে স্থাপিত হইয়াছে। এই বংশ অতি প্রাচীন, তাঁহারা পূর্ব্বে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং চন্দন-নগরের মধ্যে অনেক জমিই তাঁহাদের ছিল। তাঁহাদের কোনো কৃতিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ বাদশাহ কর্ত্তৃক তাঁহারা মজুমদার উপাধি লাভ করেন। কথিত আছে, মহারাজ মানসিংহের উড়িষ্যা যাত্রাকালে, তিনি মজুমদার মহাশয়দের কোনো কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কয়েকটি মৌজা জায়গীর প্রদান করেন। তাঁহার এই স্থানে আগমনের স্মৃতি জাগরূক

(১) প্রভাবন্ধু, ২৭শে কার্ত্তিক, ১২৮৯ সাল।

(২) কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মুদ্রিত কোনো গ্রন্থে এ কথার কোনো উল্লেখ পাই নাই। হিতবাদীর সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হই, যে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে "বোড়য় বোড়াই চণ্ডী করিলা স্থাপন" এইরূপ লেখা আছে।

† Indo-Aryans, Vol. I.
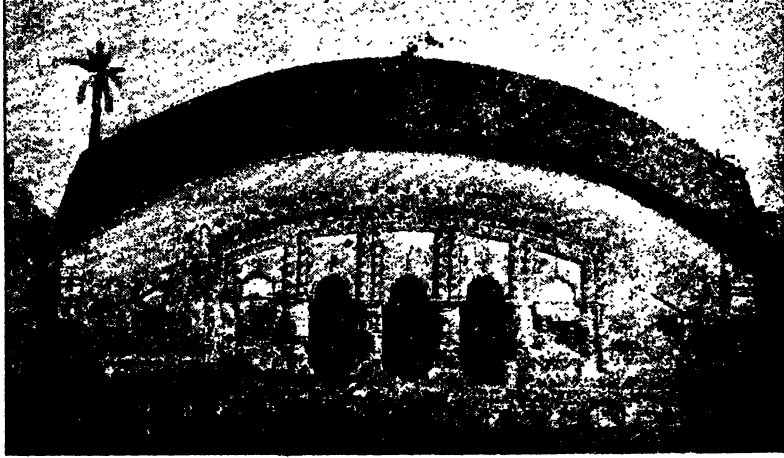
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী ৺নন্দদুলালের মন্দির

রাখিবার উদ্দেশ্যেই মজুমদার-মহাশয়েরা এই পল্লীর নাম মানকুণ্ড রাখিয়াছিলেন।

এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ। পূর্ব্বকালে একদল ডাকাত স্বর্ণমূর্ত্তি ভ্রমে এই দেবীমূর্ত্তি কোনো স্থান হইতে ডাকাতি করিয়া আনিয়া গভীর রাত্রে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত আসিয়া উপস্থিত হয়। অষ্টধাতুময় দশভুজা মূর্ত্তি তাহাদের কোনো প্রয়োজনে লাগিবে না জানিয়া তাহারা ব্রাহ্মণকে লুণ্ঠিত ধনরত্নের মধ্যে কিছু দান করিয়া ঐ দেবীর সেবার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। তদবধি দশভুজা দেবী "ডাকাতে ঠাকুর" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। শুনা যায়, স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া উল্লিখিত রামরাম ঘোষ-মহাশয় দেবীকে মহা-সমারোহে ব্রাহ্মণবাটী হইতে আনিয়া স্বীয় পুরাতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন ও কিছুকাল পরে ১০০৭ সালে এই বর্ত্তমান সুন্দর সু-উচ্চ মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতেই দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩৬ ফুট। মন্দিরের উপরে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকাতে ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক দ্বারা ইহা রচিত হওয়ায় দেখিতে অতি মনোরম হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা ইহার গাঁথুনি পাকা না হইলেও, এই সুদীর্ঘকাল প্রকৃতির নানা উপদ্রব সহিয়াও এখনও ইহা নিখুঁৎভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (১)

শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজাও বহু প্রাচীন। ঠিক কোন্ সময় কিরূপে বা কাহার দ্বারা ইহা প্রথম আরম্ভ হয়, বহু বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার ঠিকমত কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। এইরূপ কিংবদন্তী, বহু পূর্ব্বকালে সেনেটের বিশালাক্ষী দেবী নারীমূর্ত্তি ধরিয়া এখানে গঙ্গা স্নান করিতে আসিতেন। এক ব্রাহ্মণের উপর স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি প্রথমে রথের দিন দেবীমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন। তদবধি প্রতিবৎসর রথের দিন পূজা হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে যে-স্থানে পূজা হইতেছে পূর্ব্বে তথায় হইত না। হাটখোলার বাজারের নিকট পূজা হইত এবং

শ্রীশ্রী ৺নন্দদুলাল জীউর মূর্ত্তি
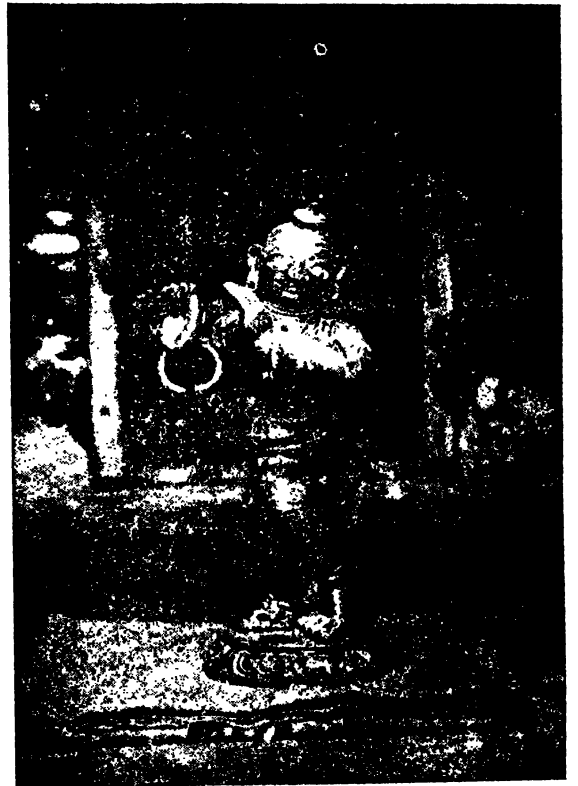
(১) নবসঙ্ঘ, ৩১শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল।

শ্রীশ্রী ৺ঘোড়াইচণ্ডী দেবীর মন্দির ও নাট বাংলা

শ্রীশ্রী ৺দশভূজা দেবীর মন্দির

এখনকার অপেক্ষা সমারোহের সহিত পূজাদি সম্পন্ন হইত। নিত্য সেবা হয় এরূপ দেবদেবীর কোনো মূর্ত্তি এখানে নাই।

শ্রীশ্রী বিনোদ রায় ঠাকুরও অনেক দিনের পুরাতন। কথিত আছে, কোনো-একজন সাধু পুরুষ ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। শুক্রবারে পূর্ণিমা হইলে তাহার পরদিন জাত হইত। এতদুপলক্ষে একটি মেলা বসিত ও লোক সমাগম হইত।

গোস্বামীঘাটের ক'নেবৌ'র মন্দির এখানকার একটি প্রসিদ্ধ মন্দির-সমষ্টি; নবরত্নের মন্দির নামেও ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। এই শিব-মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে সুবৃহৎ সু-উচ্চ নবচূড় মন্দিরটি গঙ্গাবক্ষ হইতে অতি সুন্দর দেখায়। ইহা ১৮০৮ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত দেবীচরণ সরকার-মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈদ্যনাথ সরকার মহাশয়ের বাল-বিধবা স্ত্রী গৌরমণি দাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজিও সরকার-মহাশয়ের পুণ্যময় নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই বালিকা বধূকে ক'নেবৌ বলিত, এই কারণে উহাকে ক'নেবৌ'র মন্দির বলিয়া থাকে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোনো দেবদেবীর মূর্ত্তি এক্ষণে আর ইহার মধ্যে নাই।

এখানে প্রথম দ্বাদশ শিবমন্দির এবং মধ্যের বৃহৎ দ্বিতল মন্দিরটি ছিল। এই মধ্যমন্দির দেখিতে কতকটা রথাকৃতি, উচ্চে ৫০ ফুট অপেক্ষাও অধিক। তেলিনীপাড়ার শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার মন্দির ভিন্ন এরূপ দ্বিতীয় মন্দির বোধ হয় নিকটে আর কোথাও নাই। ত্রয়োদশ মন্দিরের মধ্যে একটি বহু দিবস গত হইল গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; এবং সাতটি সরকার-মহাশয়দের নিকট হইতে হস্তান্তরিত হইবার পর সিদ্ধেশ্বর কোঙার-নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এক্ষণে পাঁচটি মাত্র আছে।

শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বন্ধকী সূত্রে ৺হারাণচন্দ্র ঘোষ পরে এই সম্পত্তির অধিকারী হন এবং প্রায় সতের বৎসর পূর্ব্বে ৮৫০৲ টাকা মূল্যে শ্রীযুত নরসিংহ বাবাজী নামক রামাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয় এক বৈষ্ণবকে ইহা বিক্রয় করেন। তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, বিশেষ চেষ্টায় কোনো সদুদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া ইহার সংস্কার সাধন করেন, কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা অন্যরূপ। শেষে এক হাজার টাকা সেলামিতে বাৎসরিক বার টাকা খাজনায় কতিপয় সর্ত্তে 'প্রবর্ত্তক' সঙ্ঘকে মৌরসি লেখাপড়া করিয়া দেন। ১৩৩০ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উক্ত সঙ্ঘের দ্বারা প্রধান মন্দির-মধ্যে সুবর্ণমণ্ডিত ওঁকার-অঙ্কিত রজত-ঘট

প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশিষ্ট মন্দির ও তৎসংলগ্ন জমিতে গৃহাদি করিয়া এক্ষণে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যে লাগানো হইয়াছে। (১)

ক'নে-বৌর বা নবরত্নের মন্দির

নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১১৯৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন উহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিব-মন্দিরের মধ্যে গোন্দলপাড়ার শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দির-চতুষ্টয় অনেক পুরাতন। উহা আনুমানিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পালপাড়ার পালেদের শিবালয় বা শিববাটীর নির্ম্মাণ-কাল ঠিক জানিতে না পারা যাইলেও, উহাও প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। এই মন্দিরের শ্রীশ্রী গোপেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের ন্যায় বৃহদায়তনের লিঙ্গমূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায় না। ইহার পার্শ্বেই শিল্পনৈপুণ্যবিশিষ্ট একটি প্রাচীন রাসমঞ্চ আছে। ইহাও পালেদের, সম্ভবতঃ রাধামোহন পাল মহাশয়ের দ্বারা এই-সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবালয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও উহার চতুষ্পার্শ্বের বারান্দা খিলান প্রভৃতি এবং অসংস্কৃত জীর্ণ রাসমঞ্চ আদি দেখিয়া পূর্ব্ব-শ্রী অনুমান করা যায়। উহা এক্ষণে বৃক্ষসমাচ্ছন্ন জনহীন অন্ধকার পল্লী-পথ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পালেদের পূর্ব্ব-গৌরব-কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দেখিলেই মনে হয় একসময় উহা অতি আড়ম্বরপূর্ণ ও সর্ব্বদা উৎসব-আনন্দ-মুখরিত থাকিত। এই পালেদের আর চারিটি শিবমন্দির আছে

অধুনালুপ্ত প্রাচীন গালার কারখানার ভগ্নাবশেষ

রথপ্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য খাদু ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন বলিয়া শুনা যায়। দ্বাদশ-গোপালের সময় এখানে পূর্ব্বে একটি মেলা বসিত। এখনও বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে, রথেও ধুম যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কারাভাবে জগন্নাথের বাড়ী এখন শ্রী হীন, রথের অবস্থাও তত ভাল নহে; কয়েক বৎসর হইল উহার সামান্যরূপ সংস্কার হইয়াছে মাত্র।

খাদু ঘোষ মহাশয় গুপিনাথের আখড়া নামে একটি আখড়া-বাটী

তন্মধ্যে শ্রীশ্রী চন্দ্রশেখর ও শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বর নামে দুইটি ১২১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, আর দুইটিও প্রায় সমসাময়িক। এগুলি সম্ভবতঃ মহাভারত পাল মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এইসব দেবালয়ে এখনও অতি সামান্য-ভাবে নিত্য সেবা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে-সব মহাত্মা এমনসব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সেবা ও সংস্কারের কোনো পাকা ব্যবস্থা করিয়া যান নাই।

সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী কাশীশ্বর, শ্রীশ্রী গঙ্গাধর ও শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বর নামে তিন সহোদরের নামে মন্দিরত্রয় ১২৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্থের ঘাট ও চন্দননগরের কাশী কুণ্ডুর ঘাট ইঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবনে প্রিয়সখী কুঞ্জ নামে যে দেবালয় আছে উহাও তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এইসকল দেব-দেবীর সেবার কিছু ব্যবস্থা আছে।

(১) U. F. C. Mission School Magazine—Vol. II. —a Line of Old and Splendid Temples—by Kamala-Kanta Banerjee.

নেড়োরমণের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মন্দির, দেওয়ান রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধর কাশীনাথ চৌধুরী মহাশয়কে স্বপদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দ্বাদশ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া সমাগত পণ্ডিত ও জনমণ্ডলীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রী কাশীনাথ নামক শিব প্রতিষ্ঠার সহিত কাশী-নাথ চৌধুরীকে গোষ্ঠীপতি পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। (১) নিতান্ত দুঃখের বিষয় এইসকল মন্দিরের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয় এবং পূজাদির আর কোনো ব্যবস্থা নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মস্থল ঘাটালেও তিনি দ্বাদশ শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

গোন্দলপাড়ার কালীবাড়ী

নেড়ার মোহনার পঞ্চরত্ন মন্দির নামে যে পঞ্চচূড় মন্দিরটি ও উহার পার্শ্বে শিব প্রতিষ্ঠা আছে, শুনিতে পাওয়া যায় উহা দুইশত বৎসরেরও পূর্ব্বের। এখানে পূর্ব্বে ধূমধামের সহিত শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর দোল-রাসাদি উৎসব হইত। এই মন্দিরের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীসত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা এক্ষণে সেবাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা কে তাহা জানিতে পারা যায় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা সম্ভবতঃ কোনো সুত্রে ইহা অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুখসনাতনতলার শ্রীশ্রী সুখসনাতনের মন্দির, গোন্দলপাড়ার রায়-মহাশয়েদের মন্দির, চাঁপাতলার নন্দীদের, এবং আরও বহু পুরাতন মন্দির চারিদিকেই আছে।

শ্রীমানী মহাশয়দের বারাসতের মন্দির চতুষ্টয় ও শ্রীশ্রী পার্ব্বতীনাথ ও শ্রীশ্রী শিব নামক শিবলিঙ্গ ১২৫৩ সালে কৌশল্যা দাসী, আনন্দময়ী দাসী, ভাগবৎ শ্রীমানী ও রাসমোহন শ্রীমানীর নামে উহাদের বংশের মহাত্মা ৺কাশীনাথ শ্রীমানী মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের গঠন সাধারণ মন্দির অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন-আকারের। এই মন্দির ভিন্ন শ্রীমানী-মহাশয়েরা গঙ্গায় একটি স্নানের ঘাট (চালদাতলার ঘাট) ও সহরের মধ্যে কতিপয় বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দেব-সেবার রীতিমত ব্যবস্থা আছে।

বোড় চাঁপাতলার মুখোপাধ্যায়দের পঞ্চ শিবমন্দিরের মধ্যে চতুর্দ্দিকে বারান্দা-সমেত শিবমন্দিরটিও কিছু স্বতন্ত্রাকারের। হাটখোলায় এই ভাবের একটি মন্দির আছে। এইসকল ভিন্ন বাহ্যিক আয়তনে বিশাল না হইলেও সাধারণ আকারের পুরাতন শিবমন্দির আরও অনেক আছে,

প্রেমনারায়ণ বসুর রাসমঞ্চ

এমন কি পালপাড়ায় শ্রী দেবীচরণ দে ও বাগবাজারে ৺আনন্দমোহন চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভিন্ন সকলগুলিই পুরাতন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে প্রাচীন গ্রাম্যদেবতা বুড়োশিবের নবমন্দির এবং হাটখোলায় শ্রীমন্মথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী মন্দিরটিও নূতন। সংস্কারাদি অভাবে পাল পাড়ার দে-দের শিববাটীর বাগানের মন্দিরের স্থায় বহু মন্দির ভূমিসাৎ হইয়াও গিয়াছে।

এখানে হরিদ্রাডাঙ্গার শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী দেবী, বোড়র শ্রীশ্রী পঞ্চানন ঠাকুর, গঞ্জের শ্রীশ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবীর প্রতিষ্ঠাও বহু প্রাচীন।

বোড়র পঞ্চানন ঠাকুর প্রথম এক সাধু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরে, স্থানীয় বসু বংশের ৺মাণিকলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান মন্দিরটি ঐ বংশের স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র

(১) আগন্তুক—কাশানাথ প্রতিষ্ঠা, শ্রী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত করা হয়। এই দেবতার পূজার একটু বিশেষত্ব আছে, ব্রাহ্মণেতর জাতি এমন-কি স্ত্রীলোক দ্বারাও পঞ্চাননের পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রী বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে প্রবাদ যে উহাও এক সাধুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার সেবা হইয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রী বোড়াইচণ্ডী মাতার মন্দিরের ন্যায় ইহার বর্ত্তমান মন্দিরও ভাস্তাড়ার সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা ছকুলাল সিংহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেবাদির জন্য তিনি বাৎসরিক বহু আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

মোল্লা হাজি প্রতিষ্ঠিত মসজিদ

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের মধ্যে খলিসানীর সুপ্রসিদ্ধ বসু মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী নন্দের নন্দন জীউর মন্দির এখানকার আর-একটি অতি পুরাতন দ্রষ্টব্য দেবালয়। শ্রীকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের দ্বারা ইহা ১৬৭০ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরে বিশেষ কোনো কারুকার্য্য না থাকিলেও ইহার গঠন কিছু বিচিত্র। ইহা দেখিতে কতকটা যশোরেশ্বরীর মন্দিরের অনুরূপ। উক্ত বসু মহাশয় একটি শিব প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের আদি-বাসস্থান খলিসানীস্থ বসুবাজারে প্রায় সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে করুণাময় বসু কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী মাতার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দেবীপ্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির-সান্নিধ্যে, পরে রামকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক একটি অতি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট শিব-মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালী-মন্দিরের মধ্যে গোন্দলপাড়ার ৺শিবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দেবী ও মন্দির, আধুনিক হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শ্রীশ্রী নীলকণ্ঠেশ্বরী কালী। এই দেবালয় প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাঁটাপুকুর, বারাসত, বাগবাজার ও কালীতলার দেবী-প্রতিষ্ঠা বহু দিনের। পদ্মপুকুর সায়রের, গঞ্জের ও ষ্টেশনের নিকট আর তিনটি কালী-বাড়ী বা কালী-মন্দির আছে। প্রথমটি ৺জগদীশচন্দ্র কুণ্ডুর পত্নী সুসরময়ী দাসী, দ্বিতীয়টি ৺নিধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃতীয় মন্দিরটি ৺কালিদাস শেঠ মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায় শেষোক্ত দেবী-মূর্ত্তি ধীবাজ-নামক প্রসিদ্ধ গায়কের দ্বারা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রেমনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রাধামদনমোহন জীউর সুবৃহৎ রাসমঞ্চ চন্দননগরের একটি দ্রষ্টব্য। উহা ১৮১৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। বহুদিন সংস্কারাভাবে উহা ক্রমেই হতশ্রী হইয়া যাইতেছে। বসু-মহাশয় শ্রীশ্রী গোপেশ্বর নামে এক মহাদেবও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে নিয়মিতরূপে অতিথিসেবা হইত এবং মহা ধূমধামের সহিত উৎসবাদি সম্পন্ন হইত। বসু মহাশয় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া যান। তাহারই আয় হইতে এখনও সেবাদি হইয়া থাকে। এখানে অন্যত্র এ উদাহরণ নাই বলিলেই হয়।

এখানে এক পালপাড়ার জগন্নাথ মল্লিক প্রতিষ্ঠিত দে মহাশয়দের শ্রীশ্রী রাধাকান্তজীউর ঠাকুরবাটী ভিন্ন, নিত্য অতিথিসেবার ব্যবস্থা উপস্থিত আর কোথাও নাই। এখানেও সেবাদির কিছু পাকা ব্যবস্থা আছে।

পালেদের রাসমঞ্চের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সরকার বাগানে সুপ্রসিদ্ধ রামকানাই সরকার মহাশয় প্রতিষ্ঠিত আর-একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাসমঞ্চ আছে। উহা ১১৯১ সালে নির্ম্মিত। সরকার মহাশয় প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাতীরে একটি স্নানের ঘাটও আছে।

কালীতলায় একটি অতি প্রাচীন দোলমঞ্চের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। উহা এক সময় বিশেষকারুকার্য্যসম্পন্ন ছিল, এক্ষণে প্রায় ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে মহাধূমধামের সহিত দোলযাত্রা ও একটি বাৎসরিক মেলা হইত, এই পর্য্যন্ত শুনা যায়। কিন্তু কবে যে তাহা হইত এবং কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অতি বৃদ্ধ লোকেও বলিতে পারেন না। শুনা যায় উহা স্থানীয় সিংহ মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

বৈষ্ণবদিগের আখড়া এখানে অনেক আছে এবং অধিকাংশই পুরাতন। উর্দ্দিবাজারের শ্রীশ্রী গোপীনাথের আখড়া শতাধিক বৎসরের। উহা এক সাধুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কানাই সরকারের ঘাটে শ্রীশ্রী মদন-মোহনের আখড়া হরিপুরের গোপালচন্দ্র গুঁই মহাশয় দ্বারা প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। সরিষাপাড়ার ভগবানচন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী চম্পমণি দাসীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়াও খ্যাতনামা। শ্রীশ্রী বৃন্দাবন-চন্দ্রের আখড়ার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর প্রতিষ্ঠিত যে আখড়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় (১) তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

রোমান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা
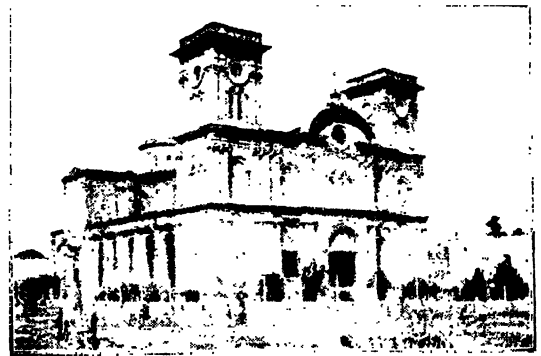
প্রায় ৩৫।৪০ বৎসর পূর্ব্বে একসময় চন্দননগরে বহু হরিসভার সৃষ্টি হইয়াছিল, তন্মধ্যে পালপাড়ার হরিসভা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানে মহা আড়ম্বরের সহিত উৎসবাদি হইত। প্রতিবৎসর বিরাট কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। উৎকৃষ্ট নাম সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নগর সংকীর্ত্তন, কেশবচন্দ্র সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি মহাত্মাদের দ্বারা

(১) Bengali Literature in the Nineteenth Century'

বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। ভাগবতাচার্য্য স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয় ইহার আচার্য্য ছিলেন। এই হরিসভার সহিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। শরৎচন্দ্র পালের উদ্যোগেই ইহা প্রধানতঃ সৃষ্ট হইয়াছিল। হাটখোলার সাধারণ হরিসভা ও পদ্মপুষ্করিণী সায়রস্থ হরিলীলা সম্বোধনী সভা (১) এবং কলাবাগান ও বাগবাজারের হরিসভার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।
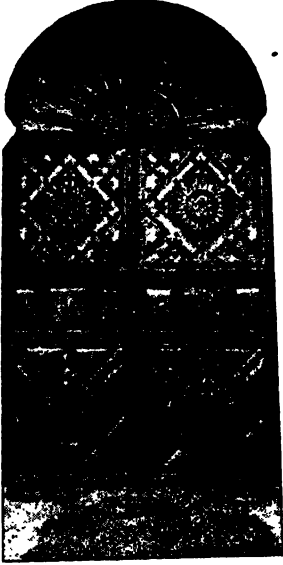
পুরাতন গির্জ্জার কবাট, ইহাতে ১৭২০ খৃঃ খোদিত আছে

মুসলমানদের মস্‌জিদ

মুসলমানদের মস্‌জিদ্‌গুলির মধ্যে যতদূর জানা গিয়াছে, কাঁটাপুকুর পল্লীস্থ সানপুকুর নামক বাগান মধ্যস্থিত মস্‌জিদ্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। উহা ১১২২ সালে আমানু ওস্তাগর মহরুম সাহেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমানু ওস্তাগর একজন মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকারিতার কথা ঐ অঞ্চলের বহু লোক বিদিত আছেন।

মোল্লা হাজির বাগানের মস্‌জিদ্‌ দুইটিও বহু পুরাতন এবং বর্ত্তমানে ঐ স্থানের বড় মস্‌জিদ্‌টির মতন আকারে বৃহৎ সুসংস্কৃত মস্‌জিদ্‌ এখানে অল্প আছে। মোল্লা হাজি নামক একজন ধনী ব্যবসাদার অন্যত্র হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মস্‌জিদ্‌ করিবার জন্য জমি লইয়া অনুমানিক ১১৫৬ সালে প্রথম মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। অপরটি সেখ মনিরুদ্দীন ও খবীরুদ্দীন দ্বারা সম্ভবতঃ ১২২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপুত্রক হাজি সাহেব মৃত্যুকালে এই দুই ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া যান।

দিনেমার ডাঙ্গায় পাটকলের নিকট মস্‌জিদ্‌ বাগানে যে দুইটি বৃহৎ মস্‌জিদ্‌ আছে উহা চাঁদখানসামা নামক এক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের দ্বারা অন্যূন দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মহাত্মা গোন্দলপাড়ায় গঙ্গাতীরে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। উহাকে আজিও লোকে চাঁদ খানসামার ঘাট বলিয়া থাকে।

মাডাঙ্গা পল্লীতে ভগ্নপ্রায় মস্‌জিদ্‌-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। এগুলিকে দেখিলে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া বুঝা যায়।

পদ্মপুকুর সায়রের বাদামতলার ভগ্ন মস্‌জিদ্‌টি ১১৮১ সালে সেখ সান্ ওস্তাগর মিয়া নামক একজন ধার্ম্মিক মুসলমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দর্জ্জির কাজ করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অধুনা উহা ভূতলশায়ী হইতে চলিয়াছে, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় একসময় উহার আকার সুবৃহৎ ছিল।

কাঁটাপুকুর পল্লীতে পথিপার্শ্বে যে আর-একটি মস্‌জিদ্‌ এখনও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, উহা একজন তৎপল্লীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা মহীয়সী রমণীর দ্বারা শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি একজন সামান্য ধাত্রী ছিলেন, তাঁহারই কষ্টলব্ধ অর্থ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বেনে পুকুরের মস্‌জিদ্‌ও প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সেখ বাড়োয়ার নামক এক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাদ্রিপাড়ার মস্‌জিদ্‌টি স্থানীয় মুসলমানদের চেষ্টায় প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে চাঁদা করিয়া নির্ম্মিত হয়। সালামৎ কোচম্যান নামক একব্যক্তি এজন্য বিনা মূল্যে জমিখণ্ড প্রদান করেন।

উর্দ্দিবাজারের মস্‌জিদ্‌টিও আধুনিক। সেখ হামানু নামক একজন মুসলমান দ্বারা ১২৮০ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অনেক জমি ও অন্য আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া সেখ হাজী আবদুল্লা সুরতি মিয়াকে মস্‌জিদের মোতায়াল্লী এবং সেখ হাজী আবদুল লতিফ মিয়া ওরফে সেখ হাজি রাখাল মিয়া, সেখ হাজী আসরথ মিয়া, সেখজান মহম্মদ মিয়া ও সেখ সাখা ওস্তাগর মিয়াকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া যান।

উর্দ্দিবাজারে কুঠির মাঠের পূর্ব্বে ও উত্তরে আর দুইটি মস্‌জিদ্‌ আছে, উহার মধ্যে পূর্ব্বদিকেরটি সেখপিরু নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং উত্তরদিকেরটি হাজি আসরথ আলির দ্বারা ১৩১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সকল ভিন্ন স্থানে-স্থানে আরও কতিপয় মস্‌জিদ্‌ ও দরগা আছে।

খৃষ্টান উপাসনা-মন্দির

প্রাচীন কাল হইতেই এখানে খৃষ্টানদের উপাসনা-মন্দির আছে। ফরাসীদের আগমনের পর তাঁহারা অর্লেআঁ নামক যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন প্রথম সেণ্ট লুই (Saint Louis) গির্জ্জা তাহার প্রাচীর-মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া বহু পুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) উহার ধ্বংসের পর দুর্গের দক্ষিণে বর্ত্তমান গির্জ্জার উত্তরে ডুপ্লে কলেজের সীমার মধ্যে পুরাতন লবণ ও আফিংয়ের গোলা যে বাটীতে ছিল এবং পরে যে বাটীতে সেণ্টমেরি নামক বিদ্যালয়ের কতক অংশ ছিল ঐ বাটী ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দ হইতে গির্জ্জারূপে ব্যবহৃত হয়। দুর্গের সীমার মধ্যে জেস্যুইট ও রোমান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা এবং হিন্দু কেরানী ও চাকরদের জন্য সামান্য ভাবের হিন্দু মন্দিরও ছিল বলিয়া জানা যায়। (২) দুর্গ-মধ্যে যে গির্জ্জা ছিল, সম্ভবতঃ সেই গির্জ্জাতেই জেনির—যিনি উত্তরকালে জোনা বেগম (Joanna Begum) নামে খ্যাত ছিলেন—সহিত ডুপ্লের বিবাহ হইয়াছিল। ডুপ্লের তখন বয়স ৪৩ বৎসর।

(১) প্রজ্ঞাবন্ধু, ১৯ পৌষ ১২৮৯ সাল।

(১) Bengal : Past and Present, Vol. II. এবং Three Frenchmen in Bengal.

(২) Three Frenchmen in Bengal.
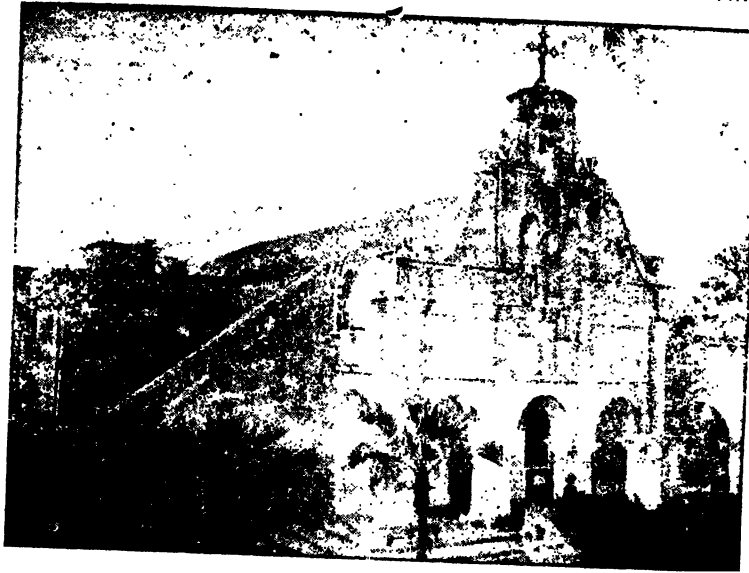
পুরাতন গির্জ্জা
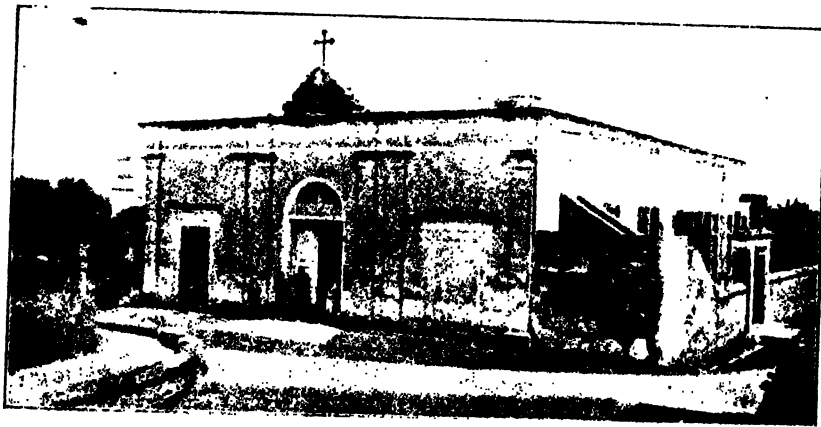
অধুনা লুপ্ত দ্বিতীয় সেণ্ট লুই গির্জ্জা। (ইহা পূর্ব্বে লবণ ও অহিফেন গোলা ছিল।)

বর্ত্তমান প্রধান গির্জ্জা ফাদার বার্থের (Rev. Father Barthet) দ্বারা গবমেণ্টের অর্থ-সাহায্যে এবং চাঁদা ও লটারির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া, ব্রাদার জোয়াকিমের (Brother Joachim) তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ১৮৭৫ সালে আরম্ভ হইয়া নয় বৎসরে নির্ম্মাণ শেষ হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি কলিকাতার তৎকালীন আর্চ বিশপ ডাক্তার পল গেথেলস্ (Dr. Paul Goethals) দ্বারা সেক্রেড হার্টের (Sacred Heart) নামে উৎসর্গীকৃত হয়। এই উপলক্ষে ফাদার লাফোঁ (Father Lafont) উদ্বোধন-বিষয়ের বক্তৃতাদি প্রদান করেন। এই ফাদার বার্থে এখানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বার্থে সাহেব ১৮৬২ সালে ভারতে আগমন করেন এবং ১৮৬৪ হইতে ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত এখানকার ধর্ম্ম যাজক ছিলেন। তিনিই সেণ্টমেরি স্কুলের (বর্ত্তমান ডুপ্লে কলেজ) প্রতিষ্ঠাতা। এই গির্জ্জার ন্যায় সুন্দর সুবৃহৎ রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা ভারতে অল্পই আছে। ইহার ফটকের প্রবেশ-পথে সম্মুখে জাঁদে আর্ক (Jeand Arc)-এর একটি সুন্দর ছোট প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার আভ্যন্তরীণ দৃশ্যাদিও অতি সুন্দর।

চন্দননগরে প্রথমাগত ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে ফাদার টাচার্ড (Father Tachard) নামে এক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর এই স্থানেই মারা যান। (১) ফরাসী জেসুইট্ পাদ্রীসকল বহু পূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও এখানে তাঁহাদের একটি উপাসনাগার ছিল (২) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জেসুইটদের এখানে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

(১) Bengal : Past and Present, Vol. VI.

(২) Bengal : Past and Present, Vol. VIII.

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত একটি বড় হাঁসপাতাল ও একটি অনাথ-আশ্রমের কথা জানা যায়। (১) তখন তাঁহারা এখানে মিশনারিরূপে বাস করিতেন। বর্ত্তমান হাঁসপাতালের পূর্ব্বের জমি খণ্ডের উপর তাঁহাদের গির্জ্জা ছিল। (২) উহা ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে যুদ্ধের পর ভূমিসাৎ করা হয়। (৩) তাঁহাদের উপর বৃটীশরা অন্ত কোনো অত্যাচার করেন নাই, তাঁহারা গির্জ্জার অলঙ্কারাদি ধনসম্পত্তিসকল লইয়া যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে জ্ঞান্ দে আর্ক-এর প্রতিমূর্ত্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বত মিশনের রোম্যান ক্যাথলিক যাজকগণের এখানে অবস্থিতি ও গির্জ্জা স্থাপনের কথা জানা যায়। মেটোরিপা (Abbate D. Matteo Ripa) ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে এখানে পর্য্যটনে আইসেন, তখন তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের দুইজন যাজককে দেখিয়াছিলেন। (৪) বর্ত্তমান কনভেণ্ট (Convent of the Immaculate Conception) তখন তাঁহাদের আশ্রম ছিল। কনভেণ্ট-সংলগ্ন বিচিত্র গঠনের যে গির্জ্জাটি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে উহা তাঁহাদের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার নির্ম্মাণ-কাল ১৭২০ খৃঃ অব্দ। ইটালীয় মিশনের দ্বারা উহা প্রস্তুত হইয়াছিল ইহাও কেহ-কেহ বলেন। কেহ-কেহ বলেন, ইহাই চন্দননগরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম অট্টালিকা। (১) বিশপ হিবার (Beshop Heber) এই উপাসনাগারের কথাই সম্ভবতঃ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। (২) ইংরেজ কোম্পানী চন্দননগরের দুর্গ জয়ের পর এখানকার সমস্ত বাড়ী ধ্বংস করিবে শুনিয়া, উক্ত সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গির্জ্জা ও আবাস স্থান যাহাতে না নষ্ট করেন সেজন্য কলিকাতার কাউন্সিলের নিকট ইং ১৭৫৯ সালের ২৪শে

রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার ভিতরের একটি দৃশ্য

যে আবেদন এবং তাহাতে ইংরেজদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করার ফলেই সম্ভবতঃ উহা ক্লাইভের গোলা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। (৩) এই গির্জ্জা-সংলগ্ন প্রধান হাঁসপাতাল বাটীটি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ এলফ্রেড্ কুর্জ্জন (M. Alfred Curjon) সত্ত্বাধিকারীদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া রোম্যান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মতে মেয়েদের শিক্ষার্থ দান করেন।

এখানে প্রটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টানদের একটি গির্জ্জা আছে, উহা ইংরেজি ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে একজন বড় পাদ্রী আসিয়া উহার উদ্বোধন-কার্য্য করেন।

ব্রাহ্ম উপাসনা-মন্দির

এখানে ব্রাহ্মদিগের উপাসনা-মন্দির একটি আছে। উহা প্রধানতঃ ৺অঘোর চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন দাস মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায় ৺যদুনাথ ঘোষ

(১) এই হাঁসপাতালে সময়-সময় তিনশত রোগী স্থান পাইত এবং আশ্রমে শতাধিক বালিকা থাকিত। হাসপাতালের নাম ছিল সম্ভবতঃ Hospital National Bengal: Past and Present, Vol. II.

(২) Orme's Indostan, Vol. II.

(৩) Bengal: Past and Present, Vol. II.

(৪) Bengal: Past and Present. The Abbate D. Matteo Ripa in Calcutta, Vol. VIII.

(১) Bengal: Past and Present, Vol. I.

(২) Heber's Journey through the Upper Provinces of India.

(৩) Selections from Unpublished Records of Government for the year 1748 to 1767, Vol. I.

মহাশয়ের উৎসাহে ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বসু-বাবু মন্দির নির্ম্মাণকল্পে দুইশত টাকা দান করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট টাকা অঘোর-বাবু প্রভৃতির চেষ্টায় সংগৃহীত হয়। ৺বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস, কালীনাথ ঘোষ, শ্রী গোবর্দ্ধন শীল প্রভৃতিও এ-কার্য্যে উদ্যোগী ছিলেন। কালী-বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একজন প্রচারক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নববিধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত। হাটখোলায় ৺অন্নদা মালাকর, ৺পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, ৺পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতির চেষ্টায় আর-একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এখানে মাঝে-মাঝে আসিয়া বক্তৃতা দিতেন। ইংরেজি ১৮৭৬ সালের পূর্ব্বে এখানে আর-একটি ব্রাহ্ম সমাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) জানি না উহা এই শেষোক্তটিই কি না।

৺হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন সে-কালের ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি গড়বাটীর বিদ্যালয়টি স্থাপিত করেন। উহাতে প্রতিবুধবারে উপাসনা হইত এবং ফাল্গুন মাসে উৎসবের সময় কাঙ্গালীদের বস্ত্রাদি দেওয়া হইত। কেহ-কেহ বলেন, গড়ের বাজারের সন্নিকটে চন্দননগরের সীমার মধ্যে দিন-কতকের জন্য আর-একটি উপাসনাগার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় ৺চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ যোগদান করিতেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কয়েকবার এখানেও আসিয়াছিলেন। এখানে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় নামক আর একজন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক বাস করিতেন। তিনি সাধারণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রবন্ধের মধ্যে কোনো ভুলভ্রান্তি যদ্যপি কাহারও নজরে পড়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাকে চন্দননগরে জানাইলে উপকৃত হইব।

(১) A Statistical Account of Bengal, Vol. III.

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৬]

পরদিন সরকারী চাকরির সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিমানবিহারী গৃহে ফিরিতেছিল। অভাব এবং দৈন্য না থাকিলেও অবস্থা ঠিক এমনই ছিল না যাহাতে এই পরিবর্জ্জন-জনিত ক্ষতি কোনো দিক্ দিয়াই তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে; তাই নিশান্তকালের পশ্চিম আকাশের মতন তাহার মনের এক দিকে একটা হাল্কা দুঃখ যাই-যাই করিয়া তখনো লাগিয়া ছিল। কিন্তু মনের অন্যদিকে চাহিতেই সে দেখিতে পাইল যে, সে-দিকের আকাশ আলোয়-আলোয় ভরিয়া গিয়াছে, কোনো-খানে মালিন্যের লেশমাত্র বাকি নাই! বিমানবিহারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! মনে হইল দিগন্ত-অবরুদ্ধ বায়ুর দ্বার উন্মোচিত হইয়া জীবন ধারণ যেন সহজ হইয়া গিয়াছে।

মনের এই নির্ব্বাধ নিশ্চিন্ত অবস্থা হইতে বিমানবিহারী একটা সুমিষ্ট মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। যে ত্যাগটা সে এই মাত্র সম্পন্ন করিয়া আসিল তাহা, আসক্তি নিঃসরণের ছিদ্রপথ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মনকে এমন অনাসক্ত করিয়া দিল যে, এই ত্যাগের একমাত্র যাহা উদ্দেশ্য তাহাও যেন ঔদাস্যের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হইয়া গেল। মনে হইল বাধাবন্ধনহীন তাহার চিত্ত আশ্রয়-নীড়ের স্তর অতিক্রম করিয়া মহা শূন্যতার রাজ্যে উঠিয়াছে, সেখানে আশ্রয় নাই, তাই আশ্রয়ের অবরুদ্ধতাও নাই, শুধু অন্তহীন নীলিমার বিস্তৃত বক্ষে সহজ স্বচ্ছন্দ সন্তরণ!

ট্রামে আরোহণ করিয়া বিমানবিহারী গৃহে ফিরিতেছিল। আরোহীদের উঠা নামা, পথে লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ার কোলাহল, দোকানে-দোকানে ক্রয়বিক্রয়ের অভিনয় কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না; সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাহার মন বৈরাগ্যের উদাস নভ-অঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিল। মধ্যে-মধ্যে মনে পড়িতেছিল মাধবীর মুখ; কিন্তু সে যেন দিবালোকে দীপশিখার মত নিষ্প্রভ, প্রত্যুষের তারকার মতন নিমীলিত!

গৃহে পৌঁছিয়া সে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, দূর হইতে সুরমা দেখিতে পাইয়া বলিল, "কি ঠাকুর-পো, একেবারে চুকিয়ে এলে না কি?"

সুরমার কথা শুনিয়া বিমানবিহারী বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিল।

"হ্যাঁ, এলাম। কেন বলো ত? তোমার দুঃখ হচ্ছে?"

সুরমা মৃদু হাস্য করিল। "না, দুঃখ আর হবে কেন?"

"তবে? রাগ হচ্ছে বুঝি?"

সুরমা হাসিতে-হাসিতে বলিল, "না, রাগও হচ্ছে না।"

"তবে কি হচ্ছে? আনন্দ হচ্ছে?"

আনন্দ হইতেছিল না তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে-কথা সুরমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিছুদিন হইতে বিমানবিহারীর নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, এবং অবশেষে তাহার এই ডেপুটিত্ব-বর্জ্জনে, সুরমা মনে-মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। এসমস্তই যে বিমানবিহারী সুমিত্রার মনস্তুষ্টির জন্য করিতেছিল তদ্বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ ছিল না; তাই এই ক্রমবৃদ্ধিশীল আত্ম-পরিহার অবশেষে একান্তভাবে নিস্ফল হইলে বিমানবিহারী কত বড় আঘাত পাইবে তাহা কল্পনা করিয়া আনন্দ ত দূরের কথা, সুরমা মনের মধ্যে একটা কঠিন দুশ্চিন্তা বহন করিতেছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুমিত্রা না দিলে এই আত্মপরিহারের পুরস্কার পাইবার বিমানবিহারীর আর অন্য উপায় ছিল না; কারণ সে-বিষয়ে সুমিত্রার বিরুদ্ধাচরণ করিতে জয়ন্তীর সাহস হইবে না এবং প্রমদাচরণের প্রবৃত্তি হইবে না।

সুরমার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "দুঃখও হচ্ছে না, রাগও হচ্ছে না, আনন্দও হচ্ছে না, তোমার ত নির্ব্বিকার অবস্থা হয়েছে দেখ্‌ছি বউদি!"

যে-আঘাতটা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ভয় হইতেছিল তাহা যাহাতে একেবারে অপ্রত্যাশিত না হয় তদুদ্দেশ্যে কতকটা কথা বিমানবিহারীকে জানাইয়া রাখা ভালো বলিয়া সুরমা মনে করিল। উদ্বিগ্ননেত্রে বিমান-বিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "ঠিক নির্ব্বিকার নয় ঠাকুর-পো, একটু ভয় হচ্ছে!"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী বলিল, "ভয় হচ্ছে? কিসের ভয় হচ্ছে বউ-দি?"

ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া দ্বিধাজড়িত-স্বরে সুরমা বলিল, "ভয় হচ্ছে, তুমি যে এতটা স্বার্থত্যাগ কর্‌লে তার মর্য্যাদা সুমিত্রা যদি না রাখতে পারে?"

শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

"এত কথা ভেবে তোমার ভয় হচ্ছে বৌদি? কিন্তু ভয়-ই বা কেন হচ্ছে? না হয় মর্য্যাদা সে না-ই রাখ্‌লে!"

বিমানবিহারীর এ-কথায় সুরমা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল; কিন্তু তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না যখন সে নিঃসংশয়ে জানিতে পারিল যে বিমানবিহারীর এই স্বার্থ-ত্যাগের সহিত সুমিত্রা কোন দিক্ দিয়াই জড়িত নহে! একইভাবে আন্দোলিত হইতে দেখিয়া সে মনে করিয়াছিল যে সুমিত্রার সহিত বিমানবিহারী নিশ্চয়ই একটা দৃঢ় যোগে আবদ্ধ আছে, কিন্তু কথায়-কথায় বিমানবিহারী স্পষ্ট করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে তেমন কোনো যোগই তাহাদের মধ্যে নাই, শুধু এক-সমীরণে উভয়ে আন্দোলিত।

"তবে তুমি এ-সব কর্‌ছ কেন ঠাকুর-পো?"

সহাস্যমুখে বিমান জিজ্ঞাসা করিল, "কি-সব?"

কি জিজ্ঞাসা করিয়া এবং কি জানিয়া লইয়া সে যে তাহার বিস্ময় চকিত চিত্তকে প্রশমিত করিবে তাহা সুরমা ভাবিয়া পাইতেছিল না; বলিল, "এই খদ্দর পরা, চাকুরি ছাড়া, এইসব।"

"তোমার বোনের জন্যে না হ'লে আর যে এ-সব কর্‌তে নেই, তা কেন ভাবছ বউ-দিদি?" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

সুরমাও হাসিতে-হাসিতে উত্তর দিল, "তবে কার বোনের জন্য কর্‌ছ, তা বলো?"

সহাস্যমুখে বিমান বলিল, "কি আশ্চর্য্য! একজন কারো বোনের জন্যেই যে কর্‌তে হবে এ-কথা তোমাকে কে বল্‌লে? ধরো, গ্রহের ফেরেই কর্‌ছি! তবে যদি শনি কিম্বা অন্য-কোনো দুষ্ট-গ্রহের কোনো বোন থাকে তা হ'লে হয়ত তারই জন্যে কর্‌ছি।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিল।

কোনোপ্রকার ব্যর্থ কল্পনা না করিয়া সহজভাবেই

বিমানবিহারী কথাটা বলিয়াছিল, সুরমা কিন্তু কথাটায় কোথা দিয়া কি যোগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, "তবে ত মাধবীর জন্তে কবৃছ ?"

পাংশু-মুখে বিমানবিহারী বলিল, "কেন ?"

বিমানবিহারীর প্রশ্নে ও ভাবে সুরমা বুঝিতে পারিল যে কথাটা বলিয়া সে ভুল করিয়াছে। কিন্তু অতখানি বলিয়া ফেলিয়া বাকিটুকু না বলিলে যাহা বলিয়াছে তাহার দূষণীয়তা আরও বর্দ্ধিত করা হইবে এই আশঙ্কায় সে বলিল, "সুরেশ্বর ত তোমার শনিগ্রহ !"

প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়া বিমান বলিয়া উঠিল, "না, না বৌদিদি! সুরেশ্বর শনি-গ্রহ কেন হবে! গ্রহ যদি সে হয় তা হ'লে সে গ্রহরাজ আদিত্য !"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সুরমা বলিল, "কিন্তু, শনি হ'লেই মন্দ হয় না, তা জানো ঠাকুর-পো ? শনি যদি মিত্র হয়, তা হ'লে কোথায় লাগে তোমার গ্রহরাজ আদিত্য !"

বিমানবিহারী সহাস্যমুখে বলিল, "তা জানি! দুষ্ট-লোক মুরুব্বি হ'লে যা হয়, তাই !"

এমনসময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে একটি ভদ্রলোক বিমানবিহারীর দর্শন ভিক্ষা করিতেছে।

"কে ভদ্রলোক ? নাম জিজ্ঞাসা করেছিস্ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নাম বল্লেন সুরেশ্বর।"

"সুরেশ্বর !" বিমানবিহারী লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর আর বাক্যব্যয় না করিয়া বহির্বাটী অভিমুখে ধাবিত হইল।

সুরমা মনে-মনে বলিল "শনিগ্রহ হ'লেও ভালো ছিল। এ যেন একেবারে ধূমকেতু।"

সুরেশ্বর দাঁড়াইয়া মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছিল। বিমান-বিহারী দুই বাহু দিয়া সবলে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

"না ব'লে-কয়ে হঠাৎ এ রকম এসে পড়লে সুরেশ্বর! মনে-মনে অনেক ফন্দি ছিল, তুমি সব নষ্ট ক'রে দিলে !"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "কি কর্‌ব বলো সর্‌কারের অতিথশালার এম্‌নি নিয়ম যে, নিজের ইচ্ছায় সেখান থেকে বেরোবারও উপায় নেই, নিজের ইচ্ছায় সেখানে থাক্‌বারও উপায় নেই। আজ সকালে যখন বল্লে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তখন দেখলাম বাড়ী আসা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নেই।"

"তা বেরিয়েও যদি সেখান থেকে একটা খবর-টবর পাঠাতে তা হ'লে আমরা অন্ততঃ গেঁদাফুলের কয়েক ছড়া মালা আর একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হতাম! নাঃ তোমার কাছে সব বিষয়েই ঠক্‌তে হ'ল! জেলে গিয়েও তুমি আমাকে ঠকিয়ে ছিলে, জেল থেকে বেরিয়েও তুমি আমাকে ঠকালে !" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ-কথা আমি একেবারে অস্বীকার করি! জেল থেকে বেরিয়ে দেখছি তুমিই আমাকে সব বিষয়ে ঠকিয়েছ !"

বিমানবিহারী সবিস্ময়ে বলিল, "এমন দুঃসাধ্য কাজ আমি কিছু করেছি বলে' মনে পড়ছে না ত !"

"জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই মনে হ'ল যে বাড়ী ছাড়া হ'য়ে বাড়ীতে যে অভাবের সৃষ্টি করেছি বাড়ী গিয়ে সেটা পূরণ করি। বাড়ী এসে দেখি আমার ফাঁকটি তুমি এমন ক'রে পূর্ণ করেছ যে কতকটা অনাবশ্যক বস্তুর মতন নিজেকে মনে হ'ল! পুরাতনের চেয়ে নূতন অধিকারীর কথাই বেশী-বেশী সকলের মুখে শুন্‌তে লাগ্‌লাম। তার পর তোমার এই নতুন বেশ, নতুন গতি! এ আমাকে একেবারে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে! সাক্ষাতে আমার সঙ্গে প্রত্যহ বিসম্বাদ ক'রে আমার অসাক্ষাতে তুমি যে এমন ক'রে তোমার স্বরূপটি গ্রহণ কর্‌বে তা কে জান্‌ত বলো! এত বড় দ্বন্দ্ব আর দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে তোমার রাজপথে প্রবেশ, এ একেবারে অতুলনীয়! মাধবীর ত দৃঢ় বিশ্বাস বিরাট্ একটা-কিছু তোমার দ্বারা সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় আছে !"

এই কথা শুনিয়া বিমানবিহারীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে বলিল, "সক্ষম ব্যক্তিরা অপরের অক্ষমতাকে ক্ষমতার আবরণ ব'লে অনেক সময় ভুল করে।" তাহার পর হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আমার বোধ হয় চাক্‌রি না ছাড়াই আমার উচিত ছিল! চাক্‌রি ছেড়ে আমি যে-রকম লোক ঠকাতে আরম্ভ করেছি, চাক্‌রি কর্‌তে-কর্‌তে এমন বোধ হয় কখনো করিনি !"

"তার কারণ, তখন নিজেকে ঠকাতে—!" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।

ক্ষণকাল উভয়ে আত্ম-নিবিষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। হেমন্তের মনোরম অপরাহ্ণের অনাবিল মাধুর্য্য এই দুইটি আহত আর্ত্ত তরুণ হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল; তন্ময় হইয়া উভয়ে অলসভাবে অসংলগ্ন চিন্তার জাল বুনিতে লাগিল।

"সুরেশ্বর!"

"বলো!"

"তোমাকে আমার অনেক সময়ে চুম্বকের মতো মনে হয়।"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "তার কারণ সংসারে সোনা-রূপোর উপর আমার কোনো অধিকার নেই, তা তুমি বুঝেছ।"

"কিন্তু সংসারের সোনারূপারূপী কত লোহার উপর তোমার চরম অধিকার আছে, তা আমি জানি! তুমি জেলে গিয়ে একটা কত বড় উপকার করেছ, তা তুমি জানো না।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "সংসারের কিছু অন্ন বাঁচিয়েছি এইত জানি।"

সুরেশ্বরের পরিহাসের কোনো উত্তর না দিয়া বিমান বলিল, "জেলে থাকার আগে তুমি আমাদের কাছে-কাছে থাক্‌তে ব'লে তোমার প্রভাবে আমরা হেল্‌তাম-দুল্‌তাম আর পরস্পরে ঠোকাঠুকি হ'ত। তুমি জেলে যাওয়ার পর দূর থেকে তোমারই আকর্ষণ আমাদের সকলকে অভিন্ন-মুখ ক'রে মিলিয়ে দিয়েছে।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাছে এলাম, এখন আবার ঠোকাঠুকি আরম্ভ হবে না ত? বলো ত একেবারে না হয়, উত্তর মেরুতে গিয়ে অবস্থান করি!"

বিমানবিহারী সহাস্যমুখে বলিল, "না, ঠোকাঠুকির ভয় আর নেই। এখন আমরা গ'লে এক হ'য়ে গিয়েছি।"

"গ'লে এক হ'য়ে গিয়েছে? সে যে খুব বড় কথা হ'ল ভাই! গল্‌বার নিয়ম জানো ত? ধাতু উত্তাপে গলে আর প্রকৃতি প্রেমে গলে। বিনা প্রেমে মানুষ গ'লে এক হয় না।"

"তা হ'লে হয়ত এখনো আমরা গলিনি, একটা কোনো বাঁধনে আবদ্ধ হ'য়ে এক হ'য়ে আছি!" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর একে-একে সকলের সংবাদ লইতে লাগিল। বিমানবিহারীর গৃহের সংবাদ এবং প্রমদাচরণের গৃহের সংবাদ লইয়া সে সুমিত্রার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বিমানবিহারী বলিল, "সুমিত্রা ভালোই আছে। তোমার চরকাটি-সুদর্শন-চক্রের মতন তার হাতে অবিশ্রান্ত ঘুরছে।" তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "সুমিত্রা-সমস্যার সমাধানও প্রায় হ'য়ে এসেছে, সুরেশ্বর!"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "সুমিত্রাকে খুব দুরূহ সমস্যা ব'লে তোমার মনে হ'ত বিমান?"

"তুমি যোগ-বিয়োগের কৌশল জান, তাই তোমার মনে হ'ত না—আমি বেহিসাবী লোক। আমার খুব মনে হ'ত", বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

"এখন কি সমাধান করলে শুনি?"

"এখন, প্রথমে বিয়োগ ক'রে তার পর যোগ করেছি।"

এমন সময়ে বিমানবিহারীর ভাগিনেয় রমেশ আসিয়া বলিল, "আপনাদের দুজনের জলখাবার দিয়ে মামীমা অপেক্ষা করছেন।"

"তা হ'লে সেই ভালো; উপস্থিত এসব যোগের চর্চ্চা বন্ধ ক'রে জলযোগ ক'রে আসা যাক্‌।" বলিয়া বিমানবিহারী সুরেশ্বরকে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ তারাসুন্দরী ও মাধবীর সহিত গল্পে অতিবাহিত করিয়া বিমান ও সুরেশ্বর পথে বাহির হইল। তাহার পর গল্প করিতে-করিতে উভয়ে গোল-দীঘির এক নির্জ্জন প্রান্তে একটা বেঞ্চে আশ্রয় লইল।

তখন ধীরে-ধীরে বিমানবিহারী সুমিত্রার বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিল। অধিকারের দিক্‌ দিয়া সে সমস্ত জিনিসটার বিচার করিল, সুতরাং যে দাবির ভিত্তি অধিকার-বিবর্জ্জিত সে দাবির অকারণ মোহ হইতে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত করিয়াছে, তাহা অসংশয়িত-ভাবে সুরেশ্বরকে জানাইল।

সমস্ত শুনিয়া সুরেশ্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দ, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর ব্যথিতকণ্ঠে বলিল; "এ

ব্যাপারটা আমার দিক্ থেকে ভাব্‌বার আর বিচার কর্‌বার—এখনো কোনো কারণ হয়নি, কিন্তু তোমার জন্মে আমি অতিশয় দুঃখিত বিমান!"

বিমানবিহারী শান্তস্বরে বলিল, "কিন্তু আমি যখন একটুও দুঃখিত নই, তখন তোমার এ-দুঃখ অমূলক।"

"তুমি যদি তোমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পেরে থাকো, তা হ'লে আমার দুঃখ অমূলক বটে।"

গভীর চিন্তা বহন করিয়া সুরেশ্বর গৃহে ফিরিল।

বিমানবিহারী গৃহে ফিরিয়া সুরমাকে বলিল, "বউদি চলো, একবার তোমার বাপের বাড়ী যেতে হবে।"

সুরমা সবিস্ময়ে বলিল, "এত রাত্রে? কেন বলো দেখি?"

"শনিগ্রহ যখন হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে তখন সুমিত্রার বিষয়ে একটা যা হয় কিছু আজই স্থির ক'রে ফেল্‌তে হবে। জানো ত ও কি-রকম পরাক্রান্ত; বেশী অবসর পেলে আবার কি একটা গোলযোগ বাধিয়ে বস্‌বে!"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুরমা হাসিতে লাগিল; বলিল, "বুঝেছি তোমার মতলব, কিন্তু এ আমার ভালো লাগছে না ঠাকুর পো!"

সুরমা ও বিমানবিহারী যখন প্রত্যাবর্তন করিল তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বিবাহের স্বর্ণ-বাসর

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

লাফোঁতেন্-রাস্তার মোড়ে, শুতই-গ্রামে, কোনো-এক দম্পতি, এই ৫০ বৎসর কাল একাদিক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে। উহাদের নাম 'ওয়াল্‌তার'—এই বিশ্বনাগরিক-ধরণের নামে উহাদিগের জন্মের ও সামাজিক পদবীর কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। এই জন-বিরল শান্তিময় প্রদেশে, এই দুই অদ্ভুত লোককে দেখিয়া লোকে কতই বলাবলি করিতে লাগিল।

দিনের মধ্যে দুইবার—একবার ১১টা ও আর-একবার ৪টার সময়, মোসিও ওয়াল্‌তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে বেড়াইতে বাহির হইতেন। তিনি বেশ সোজা হইয়া থাকিতেন এবং ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম-সত্ত্বেও, তিনি বেশ দ্রুতপদক্ষেপে চলিতেন। সুরক্ষিত আপেলের মতো তাঁর মুখের রক্তে একটা কৃত্রিম তাজা ভাব ছিল। তাঁর লম্বা কোর্তা তাঁর গায়ে বেশ ফিট্ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁর বোতাম-ছিদ্রে কোন্-এক বিদেশী সম্মানসূচক ফিতা থাকিত। বাদ্‌লার দিনে তিনি তাঁর ভ্রমণটা সংক্ষিপ্ত করিতেন, এবং একটা কাফির আড্ডায় গিয়া সেখানকার অভ্যাগত আগন্তুক-দিগের সহিত অল্প স্বল্প বাক্যালাপ করিতেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত-ধরণের কথায় ও তাঁর কথার টান হইতে তাঁর নামের মতোই তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যাইত না। তাঁহার ভাষা একটু কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হওয়ায় তাঁহাকে জার্মান্ মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁর দ্বিস্বর-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ ঠিক ইংরেজি-ধরণের, আবার তাঁর হ-খ-ঘ প্রভৃতির উচ্চারণ কতকটা রুশীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। একদল লোকের সম্মুখ দিয়া যখনই তিনি চলিয়া যাইতেন—কেহ-না-কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "এ-লোকটা কোন্-চুলোর দেশ থেকে এসেছে?" তখনই সবাই নিজের-নিজের অনুমান অনুসারে উত্তর দিত। এক-জন বলিল, "লোকটা নিশ্চয়ই জার্মান্—ও নিজের জাত ভাঁড়াবার চেষ্টা কর্‌ছে"; একজন বলিল, "ও ইংরেজ দেখ্‌ছ না ইংরেজের মতো লোকটা জড়বুদ্ধি"; আর একজন বলিল, "আমি নিশ্চয় করে' বল্‌ছি—ও রুশীয়,—ওর

আমোদ হচ্ছে আপনাকে একটা রহস্যের জিনিস করে' তোলা।"

আর মাদাম ওয়াল্‌তার,—দোকানে যাওয়া ছাড়া, বাড়ী হইতে কোথাও বাহির হইতেন না, এবং তাঁর যা-কিছু কথা-বার্ত্তা—সে শুধু দোকানদারদিগের সঙ্গেই হইত। বয়সে তিনি তাঁর স্বামী অপেক্ষা কয়েক-বৎসরের ছোট হইলেও, তাঁকে দেখিতে বড় বলিয়া মনে হয়। তাঁর চুল একেবারে সাদা, তাঁর মুখের রং মিশ্রিত বর্ণের; তিনি একটু ঘাড়-কুঁজো ও ক্ষুদ্রদৃষ্টি; চেহারা দেখিলে মনে হয়, বেচারী অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে। একজন ঠিকে চাকরাণীর সাহায্যে তিনি সমস্ত ঘরকন্নার কাজ করিতেন। চাকরাণীর নাম "মারিয়ান্‌"। সে খুব প্রাতে আসিত ও দুপুর-বেলায় চলিয়া যাইত। ঠিক্ সেই সময় মঃ-ওয়াল্‌তার তাঁর দৈনিক ভ্রমণের পর মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য আসিতেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া এবং অন্যান্য প্রমেয় কাজ মারিয়ান্‌ই করিত। রান্নার সমস্ত কাজ মাদাম নিজেই করিতেন। তাঁর রান্না সাদাসিধা-রকমের ছিল,—কিন্তু খুব উৎকৃষ্ট এবং সকল-রকম বিদেশী রান্নাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই, তাঁর রান্না দেখিয়াও বুঝা যাইত না, তাঁরা কোন্‌-জাতীয়।

দম্পতীর 'ঘোরো'-জীবন-সম্বন্ধে মারিয়ান্‌ কিছুই জানিত না। একবার কি-একটা জিনিসের খোঁজ করিবার জন্য দৈবক্রমে মনিবের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সে শুনিতে পাইল খাবার-ঘরে, মঃ-ওয়াল্‌তারের কণ্ঠস্বর ক্রোধে সপ্তমে উঠিয়াছে। দুই-তিন দিন পরে, ঐ একই অছিলায় আসিয়া সে আবার সেই রুষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। ইহার পর মাদাম তা'কে সাবধান করিয়া দিলেন তা'র কাজের সময় ছাড়া আর কোনো সময়ে যেন সে বাড়ীতে না আসে। কাজেই মারিয়ান্‌ নিজের কৌতুহল দমন করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত গৃহ-কার্য্য হইতে সে যে-একটু আভাস পাইয়াছিল, তাহা হইতেই সে বুঝিতে পারিল যে, মঃ-ওয়াল্‌তার অত্যন্ত লোভী ও যথেচ্ছাচারী লোক। তাই তাঁদের ঝগড়াঝাঁটির কথা বাহিরের লোকে যাহাতে না জানিতে পায় এইজন্য মাদাম পারৎপক্ষে গৃহ হইতে বাহির হন না। মারিয়ানের মাথায় এই কথাটাই ঘুরিতেছিল; তাই সে আশ্চর্য্য হইল যখন মাদাম তাহাকে বলিলেন:—"মারিয়ান্‌, কাল সমস্ত দিন তুই কি এখানে থাক্‌তে পার্‌বি? আমি একটা ভোজের আয়োজন কর্‌তে যাচ্ছি—আমাকে তোর সাহায্য কর্‌তে হবে।"

মারিয়ান্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "মাদাম, বাহিরের লোক আসিবে কি?"

অন্য সময় হইলে মাদাম দাসীর কৌতুহল একটা তীব্র দৃষ্টিতে দাবিয়া দিতেন—কিন্তু এখন কৃপা করিয়া সহজভাবে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"না, আমি বাহিরের কাউকে ডাক্‌চিনে। কাল আমাদের স্বর্ণ-বিবাহের সাম্বৎসরিক; তাই আমাদের নিজের জন্য ছোট-খাটো একটা ভোজের আয়োজন কর্‌তে চাই। প্রত্যেক রান্নার জিনিস টেবিলে আস্‌বার পর উঠে না গিয়ে, আমি সমস্ত খাদ্যসামগ্রী টেবিলে বসে' উপভোগ কর্‌তে চাই। আমার কথা বুঝিচিস্‌ ত?"

মারিয়ান্‌ কথাটা বেশ বুঝিয়াছিল; তাহার শ্রেণী-সুলভ সহজ বুদ্ধিতে সে তখনই বুঝিল যে, একটা-কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতে যাইতেছে—আর এই স্বর্ণ-বিবাহটা ঠিক্ সচরাচর-রকমের নয়।

* * *

স্বভাবতই মঃ-ওয়াল্‌তার স্বর্ণ-বিবাহের কথাটা ভুলেন নাই। একদিন, কারিটা তাঁর রুচি-মতো যথেষ্ট গরম না থাকায় তিনি কতকগুলা অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহার পর বলিলেন;—"ভালো কথা,—তুমি জানো ত, ১৪ই অক্টোবর শীঘ্রই আসছে?

কতকাল হইয়া গেল, কোন সাম্বৎসরিকই তাহাদের দৈনিক জীবন-ধারায় একটুও পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই—এমন কি, ঈষ্টার-পরব, ক্রিস্‌মাস-পরব, নববর্ষের উৎসবও তাহাদের গৃহের উপর দিয়া বেশ শান্তভাবে ও নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে—সুতরাং মাদাম এই তারিখের কোনো বিশেষ গুরুতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। মাদাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "১৪ই তারিখ আসছে, তা'তে কি হয়েছে?"

তার স্বামী উত্তর করিলেন, "কি! তোমার এ-

ছাড়া আর কিছুই বল্‌বার নেই? এই তারিখটা তোমায় কিছু মনে পড়িয়ে দেয় না কি? কথাটা ঠিক্ তোমার মতোই হয়েছে; তোমার মাথার মগজ যতখানি, তোমার হৃদয়টাও ততখানি···। জানো না, ১৪ই অক্টোবর যে আমাদের বিবাহের সাম্বৎসরিক দিন—পঞ্চান্নো বৎসরে পড়েছে মাই-ডিয়ার—আমাদের স্বর্ণ-বিবাহের দিন! সেদিন কোনো-রকম একটা উৎসব করা উচিত নয় কি? তোমার কি মনে হয়?—মনে করো যদি একটা বেশ ভোজের আয়োজন করা যায়—তোমার ভালো সময়ে পূর্ব্বে যেমন তুমি ভোজের আয়োজন কর্‌তে—ভোজের শেষ-ভাগে এক বোতল শ্যাম্পেন পান করা হ'ত? তা'তে আমাদের যৌবন আবার ফিরে' আস্‌বে, আস্‌বে না কি?"

মিষ্টান্ন ফলাদির সহিত শ্যাম্পেন পান করিয়া ভোজটা মধুরেণ সমাপন করিতে হইবে। হঠাৎ তারিখটা মনে পড়ায় ওয়াল্‌তার শুধু এই কথাই মনে মনে ভাবিয়াছিলেন। ওয়াল্‌তার কোনো কালেই কোনো উপলক্ষেই তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে মাথা ঘামান নাই—তাই তাঁর নজরে আসিল না—তাঁর স্ত্রীর মুখ হঠাৎ সাদা হইয়া গিয়াছে—তিনি আর কিছু খাইতে চাহিতেছেন না। ওয়াল্‌তার বেশ শান্তভাবে সেই বড় দিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

আর মাদাম-ওয়াল্‌তার—তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পঞ্চাশবৎসর! সত্যই কি অত বৎসর হইয়া গিয়াছে? তবে ত পঞ্চাশ বৎসর কাল তাঁর জীবনকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন—আস্তে-আস্তে জীবনকে বলি দিতেছেন। পঞ্চাশবৎসর ধরিয়া তিনি বুড়াইয়া যাইতেছেন এবং কবে সুখের মুখ দেখিবেন, ও একটু ভালবাসা পাইবেন, সেই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার হৃদয়ে কত বিদ্রোহের চিন্তা আসিয়াছে, আর তিনি তাহা দমন করিয়াছেন।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি অল্পবয়স্ক বালিকা ছিলেন,—সুকেশী, রূপসী, বুদ্ধিমতী, মুগ্ধ-হৃদয়া বালিকা ছিলেন, তিনি বিশ্বাসপূর্ব্বক এই লোকের হাতেই হৃদয় সমর্পণ করেন। কিন্তু ঘটনাটা হইয়াছিল বহু দূরে—যেখানেই হউক না, আসিয়া যায় না—কোন্‌-এক দক্ষিণ প্রদেশে, সৌর-করোজ্জল ঈষৎ-উষ্ণ দিবসে, প্রকৃতির স্মিতহাস্যের মধ্যে, গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, নৃত্যের মধ্যে। ওয়াল্‌তার তরুণবয়স্ক ছিল, মাদাম তা'কে ভালোবাসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এবং সুনীল অম্বর-তলে তাঁর স্বর্ণ-ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে এইরূপ তিনি স্বপ্ন দেখিতেন। তথাপি বিবাহের পর-দিনই তাঁহার নৈরাশ্য আরম্ভ হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, যাহার হৃদয় তিনি মনে করিয়াছিলেন বিবিধ গুণে বিভূষিত, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্য নীচ স্বার্থ-পরতার দ্বারা পরিচালিত। স্বামীর নিতান্ত অসঙ্গত আত্মম্ভরিতার পরিচয় পাইয়া তাঁর 'ভুল-ভাঙা'টা দিনে-দিনে, বৎসরে-বৎসরে বাড়িয়াই চলিল। যখন তাঁরা দুজনে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর দুঃখকষ্টের ভাগী হইতে চাহিতেন না—পাছে নিজের সুখে বাধা পড়ে এই-জন্য সেইসব কর্ম্মের কথা আমলেই আনিতেন না। নিরন্তর অশ্রুপাত করিয়াও রমণীর জীবনটা যেন অতি শীঘ্র কাটিয়া গিয়াছে—পৃথিবীতে আর বেশী দিন থাকিবার নাই—আর তাঁহার কোনো আশাভরসাও নাই—রহস্যময় পর-পারের দিকেই এখন তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

তথাপি তাঁর পরলোকের আশাও এই লোকের আত্মম্ভরিতায় একেবারে শুকাইয়া গেল। তাঁর বালিকা-সুলভ সুখের স্বপ্নকে ক্রমাগত উপহাস করিয়া নারী-হৃদয়ের বিশ্বাসকে কি তাঁর স্বামী কলঙ্কিত করেন নাই; প্রেমের ধ্বংসাবশেষের উপর সগর্ব্বে খাড়া হইয়া, পূর্ব্বকালের স্মৃতি-গুলিকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া তিনি কিনা এখন উত্তম ভোজের কথা ভাবিতেছেন,—শ্যাম্পেনের কথা, ফল-মিষ্টান্নের কথা ভাবিতেছেন! ওঃ! পোড়া ভোজ! যদি এই ভোজটাকে একটা প্রতিশোধের ব্যাপার করিয়া তোলা যায়! যে-বিষ সে বিন্দু-বিন্দু করিয়া এতকাল শোষণ করিয়া আসিয়াছে, যদি সেই বিষে এই ভোজটাও জর্জ্জরিত হয়! উভয়ের জীবনে এইটিই যদি শেষ-ভোজ হয়! এই শেষ মুহূর্ত্তে এখনও যদি একটু সাহসে বুক বাঁধিয়া, তার মৎলবটা সিদ্ধ করিতে পারে, দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট স্বল্প দিন তাঁহা

হইতে বহুদূরে গিয়া যদি একাকী যাপন করিতে পারে!

স্বর্ণ-বিবাহের দিনে মঃ-ওয়াল্‌তার খুব মনের স্ফূর্ত্তিতে ছিলেন—বেশ খোস্-মেজাজে ছিলেন। তিনি তাঁর "ছোটখাটো ভোজের" জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্ত্রীর হাতের চমৎকার রান্না তিনি আজ উপভোগ করিবেন! সে রকম রান্না আর কেহই রাঁধিতে পারে না। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, তাঁর বদ্-মেজাজের মতো তাঁর খোস্-মেজাজটাও কম অপ্রীতিকর ছিল না। শ্রোতার মর্ম্মে আঘাত করিয়া তিনি অনেক ছোটখাটো রসিকতা করিতেন, এবং প্রত্যেক ঠাট্টার পর, যেন একটু ঝোঁক্ দিবার হিসাবে, কর্কশস্বরে হাসিয়া উঠিতেন। ঐ কর্কশ হাসি, লোকটার অন্তরাত্মারই বাহ্য বিকাশমাত্র। দিনের মধ্যে তিন-চারিবার ওয়াল্‌তার এইভাবে তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথা কহিলেন। মনে করিলেন, খুব রসিকতা করিতেছেন। তিনি বেশ হাস্য-বদনে তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি কখনই তাঁকে ভালোবাসেন নাই। তাঁহার আহার প্রস্তুত করা ছাড়া তাঁর স্ত্রী তাঁহার আর কোনো কাজে আসে না। এই ছোটখাটো কথায় স্ত্রীর মনে খুবই আঘাত লাগিল—স্পষ্ট গালাগালি দিলেও অতটা আঘাত লাগে না। এইসকল কথায় তাঁর স্ত্রী কোনো উত্তর দিত না, কেবল করুণ আবেদনের ভাবে তাঁহার দিকে কখন-কখন দৃষ্টিপাত করিত। কিন্তু ঐ পাষণ্ড ঐ করুণ দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিত না। কতকটা সময় এইভাবে কাটিয়া গেল।

অবশেষে ঢং-ঢং করিয়া ৬টা বাজিল; ঘড়িতে শেষ ঘা-টা যখন পড়িল, মঃ-ওয়াল্‌তার তাঁর নিয়মিত ভ্রমণ সারিয়া ঠিক্ সময়ে বাড়ী ফিরিলেন। খাবার-ঘরের দরজাটা খুলিয়া দেখিলেন, তখনো টেবিলের উপর চাদর পাতা হয় নাই।

যে-সুখ অনেকক্ষণ হইতে আশা করা যায়, তাহা পাইতে বিলম্ব হইলে হৃদয় যেরূপ বিদীর্ণ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না।

ঘরটা খালি দেখিয়াই ওয়াল্‌তার অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। আপনাকে আর সাম্‌লাইতে পারিতেছেন না, রাগে মুখ নীল হইয়া উঠিয়াছে—গালিগালাজ ঠোঁট ছাপিয়া উঠিয়াছে; এইভাবে তিনি রাগে রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন—দেখিলেন, মারিয়ান্ একলা রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী কোথায়?"

দাসী উত্তর করিল, "তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"কি! বেরিয়ে গেছেন? কোথায়? যাবার সময় কিছু কি বলে' গেছেন?"

"তিনি বললেন,—আজ সাতটার আগে ডিনার খাওয়া হবে না।"

"সাতটা! আর এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌তে হবে! আর, সে বেরিয়ে গেছে! কেন বেরিয়ে গেল?"

এক ঘণ্টা যেন এক শতাব্দী বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। মঃ-ওয়াল্‌তার জীবনে কখনো এরকম বাধা পান নাই। তাঁর সঙ্কল্পকে কেহই কখনো আট্‌কাইতে পারে নাই। তিনি ঘরের ভিতর ক্রমাগত পাইচারি করিতে লাগিলেন, এবং এই সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। ক্রমে এই সমস্যাটা তাঁর মনে একটা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিল; অবশেষে ওয়াল্‌তার—যিনি কল্পনার কোনো ধার ধারিতেন না—তাঁর মাথায় নানারকম পাগলামি-ধারণা পোষণ করিতে লাগিলেন; তাঁর মনে হইল, হয় ত হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর মাথা খারাপ হইয়াছে; তিনি বেশ জানিতেন, এই দুর্ঘটনা তাঁর পক্ষে কতই বিরক্তিজনক হইবে। যখন ঘড়িতে ৭টা বাজিল, তিনি খাবার-ঘরটা ছাড়িয়া অন্য সব ঘরে দাপাদাপি করিতে লাগিলেন,—দরজাগুলো একবার খুলিতেছেন, আবার বন্ধ করিতেছেন—সময় কাটাইবার জন্য নিজের পদক্ষেপের সংখ্যা গণনা করিতে লাগিলেন—এইরূপ খানিকক্ষণ করিয়া, আবার রান্না-ঘরটা দেখিতে গেলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন, মারিয়ান্ এসম্বন্ধে তাঁকে একটু খবর দিতে পারিবে—কিন্তু মারিয়ান্ তফাতে-তফাতে থাকিতে চেষ্টা করিতেছিল। সে তারা মনিবকে খুব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—মুখে তাহার একটু অদ্ভুত হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ওয়াল্‌তার

নিজের চিন্তায় এম্‌নি তন্ময় যে তার মুখের ভাবটা তাঁর নজরে আসে নাই। অবশেষে তিনি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঁ, এখনো সে ফিরে' আসেনি ?"

"মশাই, একটা কথা আপনাকে বল্‌তে ভুলে' গিয়েছিলুম। মাদাম এই কথা আপনাকে জানাতে বলেছিলেন যে, যদি তাঁর আস্‌তে একটু দেরি হয়, আপনি তার জন্যে ভাবিত হবেন না।"

"একটু দেরি! আজকের জন্য যে-সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল তার একঘণ্টা পরে! আর এই ভোজটা, এই উৎসবের ভোজটা, এই স্বর্ণ-বিবাহের ভোজটার আয়োজন কিনা একজন ঠিকে' দাসীর হাতে দেওয়া হয়েছে, যে রান্নার কোনো ধার ধারে না! তিনি রূঢ়ভাবে মারিয়ান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ডিনারের জন্য কি-কি রান্না হবে?"

দাসী একটু ধূর্ত্তামি করিয়া উত্তর করিল, "মাদাম, এবিষয়ের কোনো কথা আপনাকে বল্‌তে মানা করেছেন—কেননা এটা হচ্চে একটা 'অবাক্‌-ডিনার' আপনাকে তিনি হঠাৎ আশ্চর্য্য করে' দেবেন।"

একটা "অবাক্‌-ডিনার"! এই কথায় হাওয়াটা একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তাঁর স্ত্রী অবশ্য কোনো দুর্ল্লভ মুখরোচক খাদ্যসামগ্রী কিনিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। হয়ত জিনিষটা বহু দূর হইতে আসিতেছে, হয়ত বৈকালের ট্রেনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাই উহা আনিতে বিলম্ব হইতেছে। যাই হোক, তাঁর স্ত্রী বেশ কর্ত্তব্যপরায়ণা। তাঁর ক্রোধ হঠাৎ বিগলিত হইয়া একটা অস্পষ্ট বাষ্পবৎ ভালোবাসায় পরিণত হইল; এবং ইহাতে-করিয়া তাঁহার জঠরানলে আর-একটু বেশী আহুতি পড়িল।

*　　　*　　　*

সিঁড়ির উপর একটা পদশব্দ শোনা গেল, তার পর দরজা খুলিয়া গেল—মাদাম ওয়াল্‌তার প্রবেশ করিলেন। তাঁকে ফ্যাকাশে দেখাইতেছিল, সিঁড়ির চার-প্রস্ত ধাপ উঠিয়া, তিনি হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর হাত খালি ছিল; অবাক্‌ করিবার মতো তিনি কোনো জিনিষ লইয়া আসেন নাই।

"এই যে, তুমি এসেছ দেখ্‌ছি; এখন প্রায় ৮ টা। এ-সময়ের মানে কি?"

"এর আর কোনো মানে নেই। আমার ইচ্ছে হ'ল, আজ ডিনারটা একটু দেরিতে খাওয়া যাবে—এই মাত্র।"

মঃ-ওয়াল্‌তার রুষ্ট প্রভুর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁর স্ত্রীর এই শান্ত উত্তর সব ওলট্‌-পালট্‌ করিয়া দিল। দম্পতি নীরবে টেবিলের ধারে আসিয়া বসিলেন। মারিয়ান্‌ এক-ডিশ গরম-গরম স্থপ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

"লাউ-র স্থপ! লাউ-র স্থপ! তুমি ত জানো লাউ-র স্থপ আমি দু-চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে।"

মাদাম শান্তভাবে উত্তর করিলেন—এবং এমনভাবে বলিলেন যে তার প্রত্যুত্তরের আর স্থান রহিল না;—"হাঁ, কিন্তু এ-স্থপটা আমার খুব ভালো লাগে, এরকম স্থপ আমি ত্রিশবৎসর খাইনি।"

মঃ-ওয়াল্‌তার একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তিনি হাঁ করিয়া অবাক্‌ভাবে তাঁর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে, একটা সন্তোষের ভাব মুখে আনিবার চেষ্টা করিয়া মাদাম ঐ স্থপ অতি কষ্টে দুই-চার চামচ গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন।

"ওঃ—এই দেখ মাছের ডিশ্‌!"

"দ্যাখো, তুমি কি আমাকে নিয়ে মজা করছ? পাইক-মাছের হুকুম দিয়েছিলে কেন?—আবার দেখ্‌ছি ওতে ওলোন্দাজি 'সস্‌' লাগানো হয়েছে! তুমি ত বেশ জানো, আমি কেবল সমুদ্রের মাছ ভালোবাসি।"

"কিন্তু আমার মিঠে জলের মাছই ভালো লাগে—অন্য মাছ ভালো লাগে না।"

মাদাম, এই মাছ ভালো লাগে বলিলেন বটে, কিন্তু প্লেটের মাছের টুক্‌রাটা স্পর্শও করিলেন না। স্বপ্ন-জড়িত-চক্ষে তিনি শূন্যের পানে চাহিয়া রহিলেন—তাঁর সেই ব্যর্থ অতীতকাল, যাহা তিনি পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন—যখন তাঁহার যৌবন, রূপ, স্ফূর্ত্তি, তাঁর প্রেম, তাঁর শক্তি, সামর্থ্য সমস্তই কাল-গর্ভে তলাইয়া গিয়াছিল। তার পর এই ৫০ বৎসরকাল কেবল দাসত্ব-জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁর হৃদয় এখন বিদ্বেষে কালো হইয়া গিয়াছে। তাঁর দৃষ্টি তাঁর স্বামীর উপর নিবদ্ধ; তাঁর স্বামী

তাঁহার সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া আছেন; একটু অপমানিত বোধ করিতেছেন—কি-একটা চাঞ্চল্য তাঁহার মনকে বিক্ষুব্ধ করিতেছে। বিদ্রোহ ও প্রতিহিংসার একমাত্র নিদর্শন-স্বরূপ ছেলেমানুষী ছলনা অবলম্বন করিয়াছেন—তাহা মনে করিয়া মাদামের হৃদয় বিজয়-গর্ব্বে পূর্ণ হইয়াছে।

এই সময় মারিয়াম্—অগে-সিদ্ধ খরগোশ লইয়া আসিল এবং আপন-মনে বলিতে লাগিল, "এটা আনন্দের স্বর্ণ-বিবাহই বটে, কোনো ভুল নেই!"

"বলি, এটা কি একটা বা'জির পণ? আমি যা ভালো-বাসিনে তারই তুমি আয়োজন করেছ?"

"কিন্তু আমার যা ভালো লাগে আমি তাই জোগাড় করেছি।"

"মনে হয় যেন এসব তুমি মৎলব করে'ই করেছ।"

"ওঃ! তা হ'লে এতক্ষণে এটা তোমার মাথায় এসেছে? —হাঁ, আমি স্বীকার কর্‌ছি আমি এ-সব মৎলব করে'ই করেছি।"

মঃ-ওয়াল্‌তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাগে তাঁর মুখ নীল হইয়া গেল; তিনি ঘুষি উঠাইলেন।

মাদাম নির্ব্বিকার কণ্ঠস্বরে আবার বলিলেন, "এইসব আয়োজন আমি মৎলব করে'ই করেছি।"

স্ত্রীর শান্তভাব ও বিদ্রোহিতা এত গুরুতর অপরাধ বলিয়া তাঁহার মনে হইল যে, তিনি অবাক্ ও একটু ভীত হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "কিন্তু দ্যাখো, আমি এসব কিছু বুঝিনে। স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে বলো। তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি যা বল্‌ছ তা কি তুমি নিজে বুঝতে পার্‌ছ? এটা কি আমার স্বর্ণ-বিবাহের দিন নয়?"

মাদাম উত্তর করিলেন, "হাঁ, দুঃখের বিষয়, এটা আমারও স্বর্ণ-বিবাহের দিন! আমি পাগল হয়েচি একথা মনে কর্‌বার কোনো দর্‌কার নেই। আমার যা মনে হচ্চে তা যদি সব জান্‌তে চাও ত আমি বল্‌ছি শোনো। এই ৫০ বৎসর ধরে' তোমার খেয়াল-অনুসারে আমাকে চালিয়েছ, যা তোমার ইচ্ছা হয়েছে তাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছ—একথা একবারও ভাবোনি যে, আমার একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাক্‌তে পারে, মর্ম্মে আঘাত লাগবার মতো আমার একটা হৃদয় থাক্‌তে পারে। ৫০ বৎসর ধরে' আমি তোমার গোলামি করে' এসেছি। তাছাড়া আর কিছুই করিনি। যাক্— তাই আমার ইচ্ছে হ'ল, এক ঘণ্টার জন্যে তুমি একবার আমার গোলাম হও—শুধু এক ঘণ্টার জন্যে;—ঘরকন্নার খুব ছোটখাটো বিষয়ে আমার গোলামি করো। তার পর তুমি তোমার স্বাধীনতা ফিরে' পাবে—আমি আবার দাসত্বশৃঙ্খল আমার পায়ে পর্‌ব। আমার উচিত ছিল, তোমাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে কোথাও চলে' যাই—তুমি তোমার ঘরকন্না আপনি দ্যাখো। কিন্তু এটা আমি কিছুতেই পারিনে। আমার বয়স বেশী হয়েছে—আমার ভয় হয়। এখন আমার কথা বুঝতে পার্‌লে?"

স্ত্রীলোক বেচারীর সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং ইহারই মধ্যে তাহার চক্ষু মূকভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিল। যখন সে কথা কহিতেছিল, মঃ-ওয়াল্‌তারের মুখ আলোকিত হইয়া উঠিল। তবে, শুধু এই ব্যাপার—আর কিছু নয়! এ ফাঁড়াটা কোনো রকমে কাটিয়া যাইবে। তিনি সহজেই অনুভব করিলেন,— বিপদটা এখনই কাটিয়া গিয়াছে। এখন তিনি তাঁকে জ্বালাতন করিতে পারিবেন, ধম্‌কাইতে পারিবেন, শাসন করিতে পারিবেন; আর সে তার বিনিময়ে কেবল ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তাঁর মনটা এখন একটু শান্ত হওয়ায়, সমস্ত জীবনের মধ্যে এই প্রথমবার তিনি একটু ঔদার্য্য দেখাইলেন। তাঁর স্মিতহাস্য প্রায় প্রীতিজনক হইয়া উঠিল এবং তিনি ঘাড় ঝাঁকাইয়া অস্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, আমার বিশ্বাস, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই থাক্‌বে চিরকাল।"

মাদামের শুষ্ক গণ্ড বাহিয়া দুই চারি ফোঁটা অশ্রুজল স্যুপের বাসনে ঝরিয়া পড়িল। মাদাম চোখ পুঁছিয়া খুব ভয়ে-ভয়ে বলিলেন, "তা হ'লে ডিনারের বাকী রান্নাগুলো আনা হো'ক। আমি তোমার জন্য একটা জিনিস রেঁধেছি যা তোমার ভালো লাগবে! এটা হচ্ছে 'হাঁসের পাই'।"

মঃ-ওয়াল্‌ত্যারের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিয়ঁা থেকে আনা হয়েছে ?"

মাদাম হাঁ-সূচক মুখভঙ্গী করিলেন।

"কিন্তু তুমি আমার ক্ষুধাটা মাটি করেছ—যাই হোক একটু পরে আবার আসবে। আর শ্যাম্পেন ?—সেটাও কি মৎলব করে' বাদ দিয়েছ ?"

"না, ঐ দেখ ঐখানে বরফে ঠাণ্ডা হচ্ছে।"

বৃদ্ধের মুখ তখনই আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিলেন, "বরফে ঠাণ্ডা হচ্ছে। এখন দেখছি তুমি আবার আপনাতে আপনি ফিরে' এসেছ ! আর আমাকে তোমায় ছেড়ে যেতে হবে না। আমি তোমার সমস্তই মার্জ্জনা করলুম।" *

* সুইস্ লেখক Edouard Rod

মহাভারত-মঞ্জরী। *

যোগেশচন্দ্র রায়, এম্-এ, বিদ্যানিধি

(সমালোচনা)

বইখানির নাম হইতে বিষয় অনুমান করিতে পারি নাই। মহাভারত বুঝি, মঞ্জরী শব্দও বুঝি। কিন্তু মহাভারত-মঞ্জরী কি বস্তু, তা বুঝিতে পারি নাই। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা, "প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সমাজের চিত্র।" পরে তিনি মহাভারত হইতে তুলিয়াছেন। "প্রিয় হইবে কি অপ্রিয় হইবে ইহা বিবেচনা না করিয়া যিনি সতত হিতকথা বলেন লোকে তাঁহা দ্বারা সহায়বান্ হয়।" এই দুই উক্তি একত্র করিয়া বুঝিলাম, তিনি প্রাচীন ভারতের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া হিত কিন্তু অপ্রিয় কথা শুনাইবেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োজনে কেহ বই লেখেন না, এবং অপ্রিয় সত্য বলিয়া, বোধ হয়, কাহাকেও নিজের মতে আনিতে পারা যায় না। এই সন্দেহে পড়াতে তাঁহার বিজ্ঞাপনটি মন দিয়া পড়িতে হইল।

তিনি লিখিয়াছেন, "যাহাতে স্বদেশের হিত সাধিত হয়, তাহা করাই এই হতভাগ্য দেশের লেখকগণের কর্ত্তব্য। যুবকগণের সম্মুখে আদর্শ চরিত্র স্থাপন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়। সংস্কৃত সাহিত্যে আদর্শ নর-নারীর অভাব নাই। কিন্তু একই চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বর্ণিত, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বর্ণিত, ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে বর্ণিত হওয়ায় কোন কোন বিষয়ে এমন কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে যে তাহা আদর্শরূপে উপস্থিত করা যায় না। তাহা হইলে কি আমরা তাঁহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিব ? তাহা হইলে যে বিশাল ভারতের অতুলনীয় পর্ব্বত-প্রমাণ ধনের আনা সাতিতাই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হয়। * * * কাক-কলুষিত মনোহর মর্ম্মর মূর্ত্তি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া উপস্থিত করাই বিধেয়। ইহাই মনে করিয়া আমরা মূল মহাভারত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। যাহা দেশ-হিতসাধনের প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিয়াছি। যাহা মহাভারতে সুন্দর ও শিখিবার আছে, দেশহিতসাধনে সহায়তা করিতেছে, সকলই চয়ন করিয়াছি। শুধু মহাভারত কেন ? হরিবংশ, বেদ, উপনিষদ, দর্শন, বৌদ্ধ গ্রন্থ, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, মনু··· (ইত্যাদি ইত্যাদি) হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সমাজের চিত্র ভারত-বাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। * * * আমরা যেভাবে বিষয় সকল বেদের সময় হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছি তাহাতে কেহই আর বলিতে পারিবেন না যে, অনুদারতাই হিন্দুজাতির স্বাভাবিক নিয়ম ছিল এবং শাস্ত্রের উদার ভাবই প্রক্ষিপ্ত। আবার যদি পূর্ব্ব ও পরের অবস্থা ত্যাগ করিয়া কেবল মহাভারতের যুগের কথা বর্ণন করিতাম তাহা হইলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিত, তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হইত না"।

গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন, "কোন্ সময় উদার শাস্ত্রের মধ্যে অনুদার ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল ও কেন হইয়াছিল, তাহা আমরা গ্রন্থ-মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। * * * যেদিন ভারতবাসী অতীতের শিক্ষা ভুলিয়া হিতবাদ পরিত্যাগ করিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া, বিচার-বুদ্ধি বিদায় দিয়া দেশাচারের দাস হইয়াছে, সেইদিন হইতে তাহার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। জানি না কবে তাহার বিরাম হইবে। * * * সত্য বটে, প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। * * * আমরা একথা বলি না যে অতীতই এখন আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। * * * আমাদের বক্তব্য এই, সমুদয় ভারতের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সময়ের উপযোগী সংস্কার সাধন করা উচিত। * * * জানি না কবে আবার ভারতের অতি উন্নত, অতি উজ্জ্বল অবস্থা আসিবে, কবে আবার ভারত-গৌরবে দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে। তাহা জানি না, তবে সেই আশাই প্রাণে লইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। আট বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছি।"

যে গ্রন্থকারের মনের ভাব এই, তিনি মহাভারতে সে ভাবের পরি-পোষক কি পাইয়াছেন তাহা দেখিবার বিষয় বটে। তা ছাড়া তিনি দৈনিক সংবাদ-পত্র ও মাসিক সাহিত্য পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ, উপনিষদ, দর্শন, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, ২১২ খানা গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায় ধন্য। তিনি যে মাত্র আট

* শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি এল, প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ। ৭॥ ইং × ৯॥ ইং, ৩১৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য পাঁচ টাকা।

বৎসরের পরিশ্রমে এই কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমিও মনে এই ভাব লইয়া বইখানির পাতা উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া বহু অংশ পড়িয়াছি। পড়িয়া কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। পুনঃপুনঃ মনে হইয়াছে গ্রন্থকার কেন এতগুলি দুষ্কর কর্ম্মে একদা প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয় আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া অতীতের দিকে তাকাইয়াছেন, সেখানে "সংস্কৃত সাহিত্য ভারতের অতীত গৌরবের ইতিহাস বক্ষে লইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।" কস্তু অতীত ও বর্ত্তমান এক নয়; এবং যে দৃষ্টিতে অতীত সমুজ্জ্বল দেখায়, তাহা কবির। কবিই অতীতের গৌরবের ইতিহাস গাহিয়া বর্ত্তমানকে সে গৌরবের অধিকারী করিতে পারেন।

মহাভারত একদিকে এক অপূর্ব্ব কাব্য, অন্যদিকে এক বিশাল ইতিহাস। এক বিপুল দেশের অন্যূন দুই সহস্র বৎসরের মানব সমাজের ঐতিহাসিক কাব্য। ইহা কুরু-পাণ্ডবের জীবন চরিত নয়। তাহা হইলে নাম হইত কুরুপাণ্ডবীয় বা এইরূপ কিছু। ইহা ভা-র-ত; ভারতও নহে মহা-ভা-র-ত। কত দেশের কত কালের কত লোকের ইতিহাস, কত ব্যাস, কত বৈশম্পায়ন, কত সৌতি, কত দৃষ্ট, শ্রুত, স্মৃত ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ই-তি-হা-স শব্দের দুই ব্যুৎপত্তি আছে (১) ইতি+হ+আস.—এই, এইপ্রকার, নিশ্চয় ছিল। (২) ইতিহ+আস,—এইরূপ ছিল, এই পারম্পর্য্য উপদেশ ছিল, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এই উপদেশ ছিল। কথাযুক্ত পুরাবৃত্ত, অর্থযুক্ত পুরাবৃত্ত। যাহাতে কথা অর্থাৎ কাহিনী নাই, যাহাতে উপদেশ নাই, তাহা প্রাচীনকালের ইতিহাস নহে।

মহাভারতে লিখিত আছে, ইহা এক সংহিতা। ইহাতে ষষ্টি শত সহস্র শ্লোক ছিল। মাত্র এক শত সহস্র মনুষ্য লোকে প্রচারিত আছে। ইহাতে এক শত পর্ব্ব আছে। তন্মধ্যে অষ্টাদশ পর্ব্ব মুখ্য। আধুনিক ঐতিহাসিক, ইহাকে ইতিহাস বলেন না। কারণ ইহাতে সন তারিখ নাই। ইহাকে জীবন-চরিতও বলেন না, কারণ ইহাতে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু ইহা যে বিপুল সামাজিক ইতিহাস, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই হেতু বলি, ধন্য সৌতিকুল। তাঁহারা বিশাল বিটপী নির্ম্মাণ করিয়াছেন বটে, শাখা,প্রশাখা আরও পল্লবিত করিলে আমরা এই দুই সহস্র বৎ র পরে তাঁহাদিগের অমৃতসমান কথা শুনিয়া পুণ্যলাভ করিতে পারিতাম।

মহাভারত-মঞ্জরী-লেখকের মনের ভাব অন্যরূপ। তিনি প্রক্ষিপ্ত অংশ ত্যাগ করিয়া বিশাল শাখীর শাখাচ্ছেদন করিয়া বিটপীকে প্রায় স্থাণুতে পরিণত করিয়াছেন। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র এই দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ধীশক্তির প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু প্রক্ষিপ্তের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তিনি মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অবলোকন করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মঞ্জরী-কর্ত্তা কুরুপাণ্ডব দুই পক্ষ হইতে আদর্শ নর-নারী, এক নয়, দুই নয়, বহু প্রকাশিত করিয়াছেন; অষ্টাদশ পর্ব্ব ধরিয়া জন্ম বিবাহ বিগ্রহ হইতে স্বর্গারোহণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাহিনী লিখিতে তাঁহার গ্রন্থের ৩৩৬ পৃষ্ঠার ১৮০ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে।

অবশিষ্ট, প্রায় অর্দ্ধাংশে তিনি বেদের কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ উদ্‌গত পত্র মহাভারত-বটের পুরাতন বল্লরীতে যুক্ত করিয়াছেন। বোধ হয় এই অংশ মহাভারতের মঞ্জরী। মহাভারত-কার শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্ম কথনচ্ছলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সম্বন্ধে অপূর্ব্ব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মঞ্জরী-কর্ত্তা সেই স্থলে মহাভারতকে বিপুলতর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অর্থাৎ যে প্রক্ষিপ্তের বিভীষিকায় তিনি কুঠার-হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই কুঠার এখানে জোড় কলম করিবার ছুরী হইয়াছে। জানি না তিনি মহাভারতকে মহৎ করিতে চাহিয়াছেন, কি মহাভারত দ্বারা মঞ্জরীকে মঞ্জুল করিতে চাহিয়াছেন। মঞ্জরী একাই মূল্যবান্, তথ্যের আকর। দেখিতেছি, এই মঞ্জরী সৃজন করিতে তাঁহাকে দ্বিশতাধিক গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

তাঁহার গ্রন্থের প্রয়োজন চতুর্ব্বিধ। (১) যুবজনের নিকটে আদর্শ চরিত্র স্থাপন; (২) মহাভারত হইতে বর্ত্তমানের উপযোগী "উপাদান" [উপদেশ ?] সংগ্রহ; (৩) "বেদের সময় হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ, জনসাধারণ এবং শাস্ত্রের উদারতা" প্রতিপাদন; (৪) "যে অজ্ঞানতার দাস, কুসংস্কারের দাস, সমাজের দাস, দেশাচারের দাস—সকলের দাস, তাহার মনের দাসভাব"—বিমোচন। কিন্তু এক ঢিলে দুটা পাখী মারিলেও মারিতে পারা যায়, তাও যদি একটার পেছুতে আর একটা থাকে। এক ঢিলে চারিটা ডালের চারিটা পাখী মারিবার প্রয়াস, বোধ হয়, অর্জ্জুনেরও ব্যর্থ হইত। যদি মনে করি চারিটা পাখী ঠিক পেছু পেছু বসিয়া আছে, তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে, এক এক পাখী মহা বলবান্ গরুৎমান্। ফলে ঘটিয়াছে তাই। একটা প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় নাই। আমার দুঃখ এই কারণে।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের সারাংশ সংগ্রহ এক কথা, আর আদর্শ চরিত্র বর্ণন আর এক কথা। তথাপি এই অংশ যুবকগণের শিক্ষাপ্রদ হইবে। কারণ যে কাশীরাম দাসের বাঙ্গালা মহাভারতে গ্রন্থকার প্রক্ষিপ্ত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাও আজি কালি এই শিক্ষা-বিস্তার-দিনেও অপঠিত রহিতেছে। গ্রন্থকারের ভাষা ভাল, রচনা রীতিও ভাল। বোধ হয় এই অংশেই তিনি বর্ত্তমানের উপযোগী উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন।

কিন্তু শান্তিপর্ব্বে একদিকে যেমন উপদেশ, অন্যদিকে তেমন তথ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এখানেই মঞ্জরী। ইহাতে যে কি নাই, সমাজ-শাসনের কি অনবলোকিত রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে কালক্ষেপ হইবে। ফলে একদিকে বিষয় যেমন অগণ্য, অন্যদিকে তেমন অস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বলি "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" এখানে দেখিতেছি, "যা নাই মঞ্জরীতে তা নাই ভারতে।" অবশ্য গ্রন্থকার বাছিয়া বাছিয়া এইসকল তথ্য তাঁহার মঞ্জরীতে বদ্ধ করিয়াছেন, যেগুলি তিনি মনে করেন বর্ত্তমানে আবশ্যক। যথা;—রাজধর্ম্মের মধ্যে জুরী প্রথা, উকিল, আপিল, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস; বিবিধ বিষয়ের মধ্যে নারীর অবরোধ প্রথা, ছাতা ও জুতা, পুরুষের সহিত একত্র নৃত্যগীত, বাদ্য ও অভিনয়; জনশিক্ষা ও বাধ্যতা মূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ, যৌবন বিবাহ, বিবাহ কন্যাদান, নহে সাময়িক চুক্তি মাত্র, বিধবা বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত, বিধবা বিবাহ আইন, একাদশী, ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি; ইত্যাদি ইত্যাদি—। গণিয়া দেখিলাম বর্গগুলিই শতাধিক; কোন কোন বর্গের অনুবর্গও অনেক আছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ চিত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন ও নবীন মিশিয়া গিয়াছে। একটা চিত্রও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। প্রাচীনের পরিধির অভাবে চিত্র সন্নিবেশ তুমুল হইয়াছে। পারম্পর্য্যের ক্রমবিকাশে বিচ্ছিন্ন রহিয়া গিয়াছে। ইহা ঠিক, তিনি যে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ধর্ম্ম ও সমাজ বিভক্ত করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতে এই আধুনিক বিচ্ছেদ ছিল না। তিনই ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। রাজ-নীতি ও রাজধর্ম্ম, সমাজ নীতি ও চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম, ঠিক এক বস্তু নয়।

তথাপি যদি সমাজকে বিভিন্ন অঙ্গে বিভক্ত করি, তাহা হইলে সে-সকল অঙ্গের পরস্পর যোগ এবং বিকাশ বুঝাইতে না পারিলে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। এবং যে ইতিহাসে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় নাই, তাহা দ্বারা সমাজ সংস্কারের পথও পরিষ্কৃত হয় না। পূর্ব কালের ইতিহাস আমাদের দুর্লভ হইয়া রহিয়াছে; ইতিহাস দূরে

থাক্, ধারাবাহিক তথ্য-সংগ্রহও দুষ্কর। কাল অল্প নয়। দেশও বিপুল। প্রাচীন ভারত,—এই নাম ধরিয়া আমরা দুইই হ্রস্ব করিয়া ফেলি, একই মঞ্জুষায় বহুকালের ও বহু দেশের কাচ ও কাঞ্চন,কৌষেয় ও কার্পাসী নিক্ষেপ করি। মহাভারত এইরূপ এক অপূর্ব মঞ্জুষা, সে-কালের শিল্পীর নেতা-কাঁথার হাঁড়ি। আমার অনুমানে অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের কথার পূর্ণ। যাহাকে পণ্ডিতেরা বেদের কাল বলেন, যদিও সে কালের আরম্ভ ও শেষ বলা দুঃসাধ্য, বেদের সেই অনির্দেশ্য শেষ কাল হইতে বৌদ্ধ কালের কথায় পূর্ণ। সুতরাং মহাভারতের সময়ে এই রীতি ছিল,—ইহা বলা যেমন, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে দুই হাজার বৎসর মধ্যে, আকুমারিকা হিমাচলের মধ্যে কোথাও ছিল, বলা তেমন। বলা বাহুল্য যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল আর বর্ত্তমান মহাভারত-সংহিতার কাল, এক নয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বৈদিক কাল—বেদ সংহিতার প্রণয়ন কাল নহে, বেদ বর্ণিত ঘটনার কাল—যুধিষ্ঠিরের বহু বহু পূর্বে। অতএব মঞ্জরী-কর্ত্তা যে এক নিঃশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ শেষ করিয়াছেন তাহাতে বহমান ধারার বিচ্ছিন্ন পঙ্কল মাত্র দেখা যাইতেছে। যদি প্রত্যেক বিষয়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমানের সহিত মিলাইয়া পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল জানিয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম। যেহেতু পূর্বকালে এই বিধি ছিল, কিংবা যেহেতু ভারতের সে অঞ্চলে এই বিধি আছে, অতএব একালের সমাজ কিংবা এদেশের সমাজ, তাহা মানিয়া লইবে,—সমাজকে এত মূঢ় মনে করিতে পারা যায় না। কারণ সমাজ-সংস্থা ও মূঢ়তা পরস্পরবিরোধী। কাল-ভেদ ও দেশ-ভেদ যাবতীয় স্মৃতির মজ্জাগত। বেদের সময়ে গান্ধর্ব বিবাহ ছিল। যদি সেই বিবাহ সর্বথা শ্রেষ্ঠ হইত তাহা হইলে সে ব্যবস্থা উঠিয়া যাইত কি? কেবল গান্ধর্ব-বিবাহ নয়, আরও সাত প্রকার বিবাহ ছিল। পঞ্চপাণ্ডব এক নারী বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিবাহ সমর্থন করিতে মহাভারতকারকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। মঞ্জরী-লেখক তিব্বত ও নেপাল ও পঞ্জাব ও দক্ষিণা-পথের কোন কোন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেসব আর্য্য-জাতি কি না, তাহা বলেন নাই। অতএব প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ এক কথা, আর সমাজ সংস্কার আর এক কথা। বাধা না পাইলে যেমন চলিষ্ণু চক্রের গতি নূতন পথে যায় না, তেমন সমাজও যায় না। যত কিছু সংস্কার হইয়াছে, তাহা বাধা অতিক্রম করিতে গিয়া হইয়াছে।

আর এক বিষয়ে সমাজ-সংস্কার-প্রার্থী ঐতিহাসিক সম্যক্ অবহিত হন না। তাঁহারা প্রায়ই ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেন, সামান্য বিধি অন্বেষণ করেন না। মঞ্জরীকার লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে ভারতে অবরোধ প্রথা ছিল না।" প্রমাণ, দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী ও শকুন্তলা ও সাবিত্রী মহাভারতে, গার্গী বৈদিক যুগে, রাজসভায় উপস্থিত হইতেন; "রামায়ণে আছে যে, কুমারীগণ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দলে দলে সন্ধ্যাকালে ক্রীড়ার্থ বিহার-উদ্যানে যাইতেন। এ কুমারী অর্থে শুধু বালিকা নহে, সে সময়ে যুবতী পর্য্যন্ত কুমারী থাকিত, যৌবন প্রাপ্তির পরে বিবাহিত হইত ইত্যাদি।" আমি কিন্তু প্রথমে অবরোধ শব্দের অর্থ বুঝিতে চাই। কারণ নারীর এই অবরোধ লইয়া অল্পদিন পূর্বে এই "প্রবাসী পত্রে রামায়ণের দৃষ্টান্তে বাদ-বিসংবাদ হইয়া গিয়াছে। অ-ব-রো-ধ শব্দ সংস্কৃত। অমরকোষ ইহার অর্থ দিয়াছেন, শুদ্ধান্ত, অর্থাৎ অন্তঃপুর। যদি এই অর্থ ধরি, তাহা হইলে বলিতে হয় সেকালে কাহারও গৃহে নারীদিগের নিমিত্ত অন্তঃপুর এবং পুরুষদিগের নিমিত্ত বহিঃপুর, এই বিভাগ ছিল না। বোধ হয় এই অর্থ মঞ্জরীলেখকের অভিপ্রেত নহে। মেদিনী-কোষ অবরোধ শব্দের তিন অর্থ দিয়াছেন, (১) তিরোধান অর্থাৎ অদর্শন; ইহা হইতে অবগুণ্ঠন; (২) রাজপত্নীগণ; (৩)রাজ-পত্নীগণের গৃহ। কোন্ রাজার কত মহিষী ছিলেন, তাহা এখানে গণিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বহু পত্নী থাকাতে অবরোধ শব্দের এই দ্বিতীয় অর্থ এবং তাঁহাদের পৃথক্ আবাস তৃতীয় অর্থ। অর্থাৎ রাজাদিগের "হারেম" ও "জেনানা" দুই-ই ছিল। বোধ হয় এই দুই অর্থ লইয়াও বিবাদ নহে। বয়স্থা নারী, সাধারণ গৃহস্থের, যেখানে সেখানে একাকী যাইতে পারিত, কি বাড়ীর ভিতরে রুদ্ধ হইয়া থাকিত? কিন্তু কোথায় কোন্ সমাজে অন্তঃপুর নাই? কিংবা কোথায় এবং কোন্ সমাজে নারী যথেচ্ছ বিচরণ করে? অতএব এই অর্থও অভিপ্রেত নহে। অবরোধ অর্থে পরপুরুষের নিকট অদর্শন। এই অবরোধও স্ত্রীজনের নৈসর্গিক শালীনতা, কোথাও অল্প কোথাও অধিক। অপরিচিত-জন-পরিপূর্ণ নগরে অদর্শন যত আবশ্যক, গ্রামে তত নয়। অতএব পূর্ব্বকালে অবরোধ ছিল, কিংবা ছিল না, ইহা এক কথায় বলিতে গেলে সত্য ও মিথ্যা দুইই আসিয়া পড়ে। সম্ভ্রান্ত বংশীয় পুরুষের ন্যায় নারীরও আচার ব্যবহার সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালেই সাধারণ হইতে ভিন্ন। রামায়ণে সীতাকে অযোধ্যার রাজপথে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া প্রজারা বলিতে লাগিল, "হা, যাঁহাকে পূর্ব্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোক অবলোকন করিতেছে।" রাবণের মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া প্রধানা রাজ্ঞী মন্দোদরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "আমি অবগুণ্ঠিতা না হইয়া নগর-দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজে এই স্থানে আসিয়াছি। ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না?" এই দুই দৃষ্টান্তই কিন্তু রাজবাড়ীর। ইহা হইতে সাধারণ বিধি আবিষ্কার কঠিন। কুমারীগণ ক্রীড়ার্থ বিহার-উদ্যানে যাইত। মঞ্জরীকার বলেন, কুমারীদিগের মধ্যে যুবতীও থাকিত। কিন্তু সেই যুবতী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া যাইত না কি? তা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে, সীতার বিবাহ বাল্য-কালে হইয়াছিল। আরও এক কথা আছে, কোন্ সময়ের কোন্ দেশের আচার রামায়ণ-কবির লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহাও জানিতে হইবে। বর্ত্তমান রামায়ণ-খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর, এবং আমার অনুমানে পঞ্জাবের পূর্ব্ব ভাগে কোথাও রচিত হইয়াছিল। সুতরাং এক রামায়ণের প্রমাণ প্রাচীন ভারতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ অন্বেষণ করিলে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে রাজ-বাড়ীর অবরোধের বিষম ফল বর্ণিত আছে। মহাভারতের প্রমাণও, কাল ও দেশ-বিশেষের। মহারাষ্ট্র-সম্বলিত পঞ্চ দ্রাবিড় জাতির মধ্যে স্ত্রীজনের অবগুণ্ঠন নাই। আর উত্তর ভারতে অবগুণ্ঠন আছে এবং ভদ্রবংশে অবরোধও আছে। দক্ষিণ ও উত্তরভেদে এই যে আচার ভেদ, ইহা প্রাচীন কাল হইতে আছে কি পরে ঘটিয়াছে, তাহা হঠাৎ বলিতে পারা যায় না।

আর এক দিক দিয়া এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইতে পারে। বিনা প্রয়োজনে সামাজিক রীতি হয় না। প্রথমে দেখি স্বাভাবিক কি? নারীর অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন কি? এবং কেনই বা উত্তর ভারতে নারীকে পুরুষ চক্ষুর দূরে থাকিতে হইয়াছে? প্রথম কথা, লজ্জাই নারীদিগের শোভা, এবং সে লজ্জা একটু বৃদ্ধি হইয়া অবগুণ্ঠনে লুক্কায়িত হয়। তথাপি যদি কোন গ্রামে এক বংশের বা জাতির বাস থাকে, তাহা হইলে সেখানে নারীদিগের স্বচ্ছন্দ বিচরণে, উন্মুক্ত মুখে, তেমন বাধা হয় না। কিন্তু যদি সেইগ্রামে অজ্ঞাত-কুলশীল বিদেশী প্রবেশ করে, তাহা হইলে বস্ত্রের আবরণ পর্য্যাপ্ত মনে না করিয়া গৃহের আবরণ অন্বেষণ করে। ইহা স্বাভাবিক, দক্ষিণাপথের মহিলা ও ইয়ুরোপী মহিলা উভয়েই দেখা যায়। কারণ পুরুষ রক্ষক সঙ্গে না থাকিলে অপমানের আশঙ্কা থাকে। অতএব পুরুষ-দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার দুই হেতু আছে। (১) শালীনতা, (২) অপমানের আশঙ্কা। যদি বিদেশী আগন্তুক, সৈন্য কিংবা নারীধর্ম্মনাশক হয়, তাহা হইলে নারীকে গৃহের আবরণ আশ্রয় করিতে হয়। বর্গীর হাঙ্গামার সময় শোনা যায় গৃহের অবরোধও যুবতীদিগের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এইরূপ, এখনও সময়ে সময়ে গৃহাবরোধ থাকিতেও যুবতী

বিপন্ন হইতেছে। এই স্বাভাবিক কার্য্য চিন্তা করিলে মনে হয় যখন বিদেশী বিধর্ম্মী দস্যু ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন উত্তর ভারতে অবরোধও প্রখর হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে সাধারণ প্রজার মধ্যে নারীর অবগুণ্ঠন হয়ত ছিল, কিন্তু গৃহের অবরোধ ছিল না। রাজ্যাভিষেকের সময় রাজাকে মহিষী লইয়া সভায় বসিতে হইত, সাধারণ যজমানকে সপত্নী যজ্ঞ করিতে হইত। ইদানীও এই বিধি আছে। আরও দেখি, উত্তর ভারতে নারীর অবরোধ যত, বঙ্গে তত নয়; বঙ্গেরও স্থান-বিশেষে ও বংশ-বিশেষে যত, সর্ব্বত্র তত নয়।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে গুরুতর বিষয় তিনটি দাঁড়াইয়াছে। আহারে ও বিবাহে জাতিভেদ এবং হিন্দু বিধবার অবস্থা। আহারে জাতি বিচার যে পূর্ব্বকালে ছিল না, তাহা সকলেই বলেন। এ বিষয়ে মঞ্জরীকার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে সে বিধি উঠিয়া গেল, এবং সে কারণ এখন বর্ত্তমান কি না, তাহার আলোচনা করিলে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। এইরূপ, অনুলোম বিবাহ যে বহুকাল পর্য্যন্ত চলিত ছিল, তাহারও বহু প্রমাণ আছে। অথচ বর্ণ সাঙ্কর্য্যের ভয় অল্প ছিল না। গীতাতেও এই ভয় স্পষ্ট লেখা আছে। সবর্ণ বিবাহ প্রশস্ত, এই মত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অনুলোম বিবাহ বরং ভাল, প্রতিলোম বিবাহ নিন্দিত ছিল। ইহার স্বাভাবিক কারণ পাওয়া যায়। কিন্তু পরে ব-র্ণ অর্থে বর্ত্তমান জাতি বুঝিয়া বিবাহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক জীবজাতির পূর্ব্বাপরত্ব বিচ্ছিন্ন নয়, এক অবিচ্ছিন্ন প্রায় অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ আছে। যেমন জীবজাতির, তেমন মানব-রয়ের (race) স্মৃতির অবিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে। দেশ ও কালের প্রভাবে পাত্রের স্মৃতি রূপান্তরিত হয়, কিন্তু সহসা লুপ্ত হয় না। আমার মনে হয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই যে তিন বর্ণ পূর্ব্বকালে আর্য্য ও দ্বিজ নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা আদিতে তিন পৃথক্ রয় বা জাতি ছিলেন। আমরা তাঁহাদিগের নাম যখন প্রথম পাই, তার পূর্ব্বে বহুকাল গত হইয়াছিল, তাহার তুলনায় বেদের উল্লেখ সেদিনকার। পৃথক্ জাতি স্বীকার না করিলে, গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে পারি না। এক জাতির মধ্য হইতে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য হইয়া দাঁড়াইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুকাল যাবৎ চলিয়াছিল, তাহা ক্ষণিক ক্রোধের ফল মনে হয় না। বিশেষতঃ বর্ণে,—দেহের রঙ্গে, প্রভেদ কেন ছিল? ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, যেন ইংরেজ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, যেন ভারতসীমান্তের পাঠান; বৈশ্য পীতবর্ণ, যেন আরবী। কে কবে কোথা হইতে আসিয়া একত্র হইয়াছিলেন, কে জানে। কিন্তু কালে সকলের স্মৃতি কোন কোন বিষয়ে এক হইয়া গিয়াছিল, কোন কোন বিষয়ে পৃথকও ছিল। পরে শূদ্রের সহিত সম্পর্ক ঘটে, শূদ্রের স্মৃতি পৃথক্ থাকিয়া যায়। এই কথাই চারিবর্ণের চারিধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইয়াছে। যাহা সমাজকে ধারণ করে, তাহা ধর্ম্ম। কারণ যাহা সমাজের হিতকর, তাহা আমারও হিতকর। এই অর্থে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্র ব্রাহ্মণের কল্পনায়, কিংবা আদর্শের অভিপ্রায়ে রচিত হইতে পারে না। সেটা এককালের ইতিহাস। সমগ্র ইতিহাস নয়, সমাজের এক অঙ্গের, সমাজ ব্যবস্থার। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, এক কালের এক দেশের মনের ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজত্রয় শূদ্রা কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কারণ বীজ প্রধান, ক্ষেত্র প্রধান নয়। আর, উৎকৃষ্টের বীজ উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্টের বীজ নিকৃষ্ট। এক দিকে ইহা হিন্দুমত বটে, আধুনিক বিজ্ঞানের মতও বটে। কিন্তু ছোট ও বড় এই জ্ঞান না থাকিলে বীজ ও ক্ষেত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করিতে পারা যায় না। যে আপনাকে বড় মনে করে, সে কিছুতেই স্বীয় কন্যায় নিকৃষ্ট বীজ বপন সহিতে পারে না। নিকৃষ্ট বীজের প্রতি এই স্বাভাবিক দ্বেষের মূল অন্বেষণ না করিয়া বলিতে পারা যায়, অনুলোম বিবাহ বরং স্বাভাবিক, প্রতিলোম বিবাহ উচ্চ বর্ণের নিকট সর্ব্বদা ভয়াবহ। যখন বর ও কন্যা, দুই পক্ষ সমান মনে হয়, তখনই বিবাহ আরও সম্ভবপর হয়। কন্যা কন্যারত্ন হইলে দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে। মঞ্জরীকার মহাভারত মনু চাণক্যশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষরত্ন গ্রহণ করিবার উপদেশ নাই। কেন নাই তাহা আর বলিতে হইবে না। মঞ্জরীকার স্ত্রীরত্ন শব্দে বুঝিয়াছেন, সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু স্বজাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, রত্ন শব্দের এই অর্থ প্রসিদ্ধ। সৌন্দর্য্য একটা গুণ বটে, কিংশুক পুষ্পের অনাদরও প্রসিদ্ধ। স্ত্রীরত্ন,—স্ত্রী জাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, রূপে গুণে উৎকৃষ্ট, যেমন পদ্মিনী। এ বিষয়ে এককালে বহু শাস্ত্রও রচিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষতঃ বীরের পক্ষে সামাজিক বিধি শিথিল ছিল। পূর্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত,—এইরূপ উক্তি সত্য বটে, অসত্যও বটে। যদি প্রচলিত ছিল এবং শাস্ত্র-সম্মত ছিল, তবে উঠিয়া গেল কেন, এই তর্ক মঞ্জরীকারের মনে উঠে নাই। বিবাহ কন্যাদান নহে, চিরস্থায়ী নহে, সাময়িক চুক্তি মাত্র,—এইরূপ মত তিনি যত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আমার নিকট ততই অ-সহজ বোধ হইয়াছে। এ সকল বিষয়, স্মৃতির বিষয়, শাস্ত্রের বিষয় আলোচনার যোগ্যতাও আমার নাই। কোন্‌টা সংস্কার কোন্‌টা নয়, তাই কি ভাল বুঝি? কোন্‌টা উদার, কোন্‌টা অনুদার, গ্রন্থকার তাহা বুঝাইয়াও দেন নাই। তাঁহার পরিশ্রমের প্রশংসা করি, কিন্তু পাঠককে বলি গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনটি মন দিয়া পড়িবার পর মহাভারত-মঞ্জরী পাঠ করিবেন।

কথা ও সুর

—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ কিছুতে যায় না মনের ভার ;
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার, (হায় রে)।
মনে ছিল আস্‌বে বুঝি,
সে কি আমায় পায়নি খুঁজি' ?
না-বলা তার কথাখানি
জাগায় হাহাকার।
সজল হাওয়া বারে-বারে,
সারা আকাশ খোঁজে কারে ;
বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে
জানায় আমায় ফিরবে না সে ;
বুক ভরে' সে নিয়ে গেল
বিফল অভিসার ॥

স্বরলিপি

—শ্রীমতী সাহানা দেবী

II I সা রা রপা পমা । পা -া মজ্ঞা রা I সা রা ন্‌া সা । স
জ্ঞা -া-া - া I সা পা
আ জ্ কি- ছু তে - যা য় না - যা য় না - - যা য়

পা মা । পা মা জ্ঞা রা I II
না ম নে র ভা র

II I { মা মপা পা -া । পা - া - া - া I পণা ণা ণা ধা । র্সণা ধা পা (ধা) - I
দি নের্ আ - কা - শ্ মে ঘে অ ন্ ধ - কা (র্) র্

পা ধা পা -া । মা -া গা রা I II
হা য় রে - - -

II { সা রা জ্ঞা রা । সা -া -া -জ্ঞা I রা মা জ্ঞা রা । সা -া -া -া - I গা মা
ম নে ছি - ল - - আ স্ বে বু ঝি - - - সে কি

মা পা । পা -া -া -মা I পা ধা র্সা -া । ণা -া ধা পা I পা -া - পা ধা । পা মা
আ - মা - - য় পা য় নি - - - পা য় নি - - -

গা া I গা -া মা পা । মগা মা -া -া I } পা না না না । না র্সা র্সা র্রা I
- - পা য় নি খুঁ জি না - ব লা তা র্ ক -

ণা র্সা ণা ধা । পা া গা মা I মা পা পা পা । পা -া -,গা মা I গা মা
থা - থা - নি - জা - গা য় হা হা কা র্ হা - হা -

পা ধা- । I ণা- জ্ঞা -া I II রসা রা
- - - কার্ "আ জ"

II { সা সা রগা রা । জ্ঞা -া -া -া- I রমা মজ্ঞা -া রা- । সা- া- পা পমা I
স জ ল্ হা ওয়া - - - বা রে - বা রে - সা রা

পা ধা- র্সা -া -া । ণা -া -ধা- পা I ধা- পা মা গা । মা -া -া -া } I II
আ - কা - - শ খোঁ জে কা - রে -

II { মপা পা -া পা । পা -া -া -া I পা -া পা পা । পা -া -া -া I পণা ণা
বা দল্ দি নে - র্ দী - র্ঘ শ্বা সে - - জা নায়

-া ধা- । ণা -া -া -া I ণা -া ণা- ধা- । র্সা -া ণা -া I ণা- ধা ধা পা । পা ধা - পা
- আ মা য় ফি র্ বে - না - - - ফি র্ বে - না - -

মা I গা -া- মা -পা । মগা মা- া- া- I } পা না না না । র্সা -া - র্সা
- ফি র্ বে না সে - - বু ক্ ভ রে সে - নি

র্রা I ণা র্সা ণা ধা । পা -া- গা মা I মা পা পা পা । পা া গা মা I
- য়ে - গে - ল - বি - ফ ল্ অ ভি- সা- র্ অ ভি

গা মা পা ধা । ণা -জ্ঞা -া- I II রসা রা
সা - - - র্ - "আ জ"

মৌমাছির ব্যবসায়

শ্রী হরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধুনা আমেরিকায় ঘরোয়া ব্যবহার এবং বাহিরে রপ্তানির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মধু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকাবাসীরা মৌমাছির নাম পর্য্যন্ত জানিত না। ১৭৬৩ খৃঃতে ইংরেজরা সর্ব্বপ্রথম তথায় মৌমাছি আম্‌দানি করেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা প্রায়ই বলে যে, শ্বেতাঙ্গ এবং

প্রথমশিক্ষার্থীগণ মক্ষিকা-পালন শিখিতেছেন

মৌমাছির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে তাহারা এবং তাহাদের মহিষগুলি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ব্যবসায়ীরা ইতালীয় মৌমাছি অধিক পছন্দ করিয়া থাকেন। ইহারা স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট, শান্ত ও নিরীহ। আক্রান্ত বা উত্তেজিত না হইলে কখনও দংশন করে না। ইহাদের বর্ণ হলদে এবং গায়ে পাঁচটি কালো দাগ আছে। মধুচক্রটিকে সর্ব্বদা ইহারা অতি যত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। উষ্ণ জলবায়ু সহ্য করিতে পারে বলিয়া দক্ষিণদেশসমূহে ইহাদের আদর বেশী।

পোষা মৌমাছি

বর্ত্তমানে আমেরিকায় জার্ম্মান্ মৌমাছিরও আম্‌দানি হইয়াছে। ইহারা মধু-আহরণে অধিক পটু। ইহাদের মোম সাদা হওয়াতে মৌচাকগুলি সুন্দর দেখায়। কিন্তু

রাণী-মক্ষিকা, গৃহ-মক্ষিকা ও শ্রমিক-মক্ষিকা

ইহারা অত্যন্ত রাগী এবং ইতালীয় মৌমাছির ন্যায় ইহাদিগকে যথেচ্ছভাবে নাড়াচাড়া করা যায় না। ইহাদের

বর্ণ যথেষ্ট কালো। এইজাতীয় মৌমাছি বন্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এইরকম উপকারী জীবগুলিকে বিনষ্ট না করিয়া মধুচক্র হইতে মধু-নিঃসারণের কোনো উপায় ছিল না। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে মক্ষিকাগুলিকে বাঁচাইবার সুব্যবস্থা হইয়াছে। কাঠের ফ্রেমদ্বারা মৌচাকটিকে বেষ্টন করিয়া রাখা হয় এবং প্রয়োজন-অনুসারে তাহা উঠাইয়া লওয়া যায়। ইহাতে মৌমাছির বা মৌচাকের

ফ্রেমে-আঁটা মৌচাক

কোনো ক্ষতি হয় না। ১৮৪৮ খৃঃ ফিলাডেল্‌ফিয়ায় মিঃ লেংসট্রথ নামক এক ব্যক্তি এইরূপ ফ্রেম প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এক পাউণ্ড মধু ধারণক্ষম চতুষ্কোণ ফ্রেম সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মধুচক্রে আবদ্ধ অবস্থাতেই মধু বিক্রয় করা হয়, তাহাতে ভেজাল বলিয়া ক্রেতাদের মনে কোনো সন্দেহ আসিতে পারে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভেজাল-সম্বন্ধে কঠোর আইনের ব্যবস্থা থাকাতে নিষ্কাশিত মধুও আমেরিকায় বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়। মধুচক্র হইতে মধু-নিঃসারণ করিবার সহজ উপায় এক আকস্মিক ঘটনা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ একদা মেজর্ হোরস্কা নামক কোনো ইতালিয়ান্ তাঁহার শিশুপুত্রকে এক-টুকরা চক্রমধু খাইতে দিয়াছিলেন। বালক উক্ত টুকরাটিকে তাহার বাস্কেটে রাখিয়া খেলা ছলে চারিদিকে ঘুরাইতে থাকে। মিঃ হোরস্কা দেখিলেন, বাস্কেট্ হইতে মধু নিঃসৃত হইতেছে। তখন তিনি একটি গোলাকার পাত্রে মধুপূর্ণ মৌচাকটি রাখিয়া পাত্রটিকে ঘুরাইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দেখা গেল সব মধু বাহির হইয়া গিয়াছে। অথচ মৌচাকটি অবিকৃত অবস্থায় আছে। হারস্কা তখন বুঝিতে পারিলেন, যে, এই প্রণালী অবলম্বন করিলে একটি চক্র বহুবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। হোরস্কা-প্রথা অবলম্বনে মিশিগানের জনৈক ব্যবসায়ী ৩০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ কতকগুলি মৌচাক ব্যবহার করিতেছেন। পুরাতন মৌচাকগুলি নূতনগুলির ন্যায় সুদৃশ্য না হইলেও সেগুলিতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এইসকল মৌচাক হইতে মধু নিঃসৃত করিয়া ক্রেতাদের নিকট উপস্থিত করা হয়।

মৌচাক রক্ষক ও পোষা মৌমাছির চাক

মৌমাছি-রক্ষণ যেমন সৌখীন ব্যবসায়, তেম্‌নি লাভজনকও বটে। একটি মাত্র রাণী-মক্ষিকা একসঙ্গে সহস্রাধিক ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। মক্ষি-মধু বেশ সুস্বাদু। বর্ত্তমানে কৃত্রিম ঔষধ-পথ্যাদির বিরুদ্ধে আমেরিকায় বেশ আন্দোলন চলিতেছে। প্রকৃতি-জাত দ্রব্যাদি অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিতেছেন।

প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও আমরা মধুর উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা একটি পুষ্টিকর সুপেয়। একদা অগষ্টস্ পমিলিয়াস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মন ও শরীর সুস্থ রাখিবার উপায় কি? তদুত্তরে পমিলিয়াস্ বলিয়াছিলেন—মধু দ্বারা

মন পবিত্র রাখিবে এবং তৈল দ্বারা শরীর সুস্থ রাখিবে। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থাতে মধুর বহুল প্রয়োগ পাওয়া যায়। ধর্ম্মোপদেশকরা মধু পান করিতেন বলিয়া বাইবেলেও উল্লেখ আছে। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রকৃতিজাত মধুই মানবের একমাত্র সুমিষ্ট পেয় বলিয়া পরিচিত ছিল।

বালক-মৌমাছি-রক্ষক ও তাহার রক্ষিত মৌচাক

এখন যথেষ্ট-পরিমাণে মধু পাওয়া যায় না। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে প্রতিবৎসর মোটামুটি হিসাবে ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড মধু উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি জগতে প্রচুর-পরিমাণে মধু উৎপন্ন হইত এবং ধনী-দরিদ্র সমভাবে তাহা চিনির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে পারিত, তবে মানবের স্বাস্থ্য অনেক উন্নতি-লাভ করিত, সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক মধুচক্রে তিন জাতীয় মৌমাছি থাকে, যথা—রাণী-মক্ষিকা, শ্রমিক মক্ষিকা ও পুং-মক্ষিকা। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক স্ত্রী-মক্ষিকারা মধুচক্রের যাবতীয় প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে কর্ম্মীদল বলা যায়। মধু-আহরণ, শাবক-পালন প্রভৃতি সমুদয় কাজ ইহারাই করিয়া থাকে। পূর্ণ বয়সে ডিম্ব প্রসব করাই রাণী মক্ষিকার একমাত্র কাজ। পুং-মৌমাছিগুলি যথাসময়ে রাণীর সাহচর্য্য করে মাত্র। মধুচক্র রক্ষা বা পালন-সম্বন্ধে ইহারা কোন সাহায্য করে না। কর্ম্মীদলের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা রাণী-মক্ষিকার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। স্ত্রী ও পুং ভেদে ডিম্ব-সংরক্ষণ-কোষগুলি বড়-ছোট করা হইয়া থাকে। মধুচক্র নির্ম্মাণ হইতে চক্রবাসীদের আহার সংগ্রহ পর্য্যন্ত সমগ্র কাজ শ্রমিকদলকেই করিতে হয়; এমন-কি সমস্ত বৎসরের খাদ্য উপযুক্ত সময়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। শ্রমিকদের মধ্যেও বয়স-অনুসারে দুইটি বিভাগ আছে। প্রৌঢ়া মক্ষিকারা বাহির হইতে আহারাদি সংগ্রহ করে এবং অল্পবয়স্কারা রাণীর পরিচর্য্যা, শাবক-প্রতিপালন, গৃহস্থালী প্রভৃতি সমুদয় গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। মধু-সংগ্রহকারী দল পুষ্প-রস আনিয়া সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুষ্প-রস সংগ্রহ করিয়া মধুচক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-করিতেই তাহা প্রায় মধুতে পরিণত হইয়া যায়। শাবকদের জন্য পৃথক্ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকরা মধু-আহরণ-কালে পশ্চাতের পায়ে জড়াইয়া ধূলিবৎ শুষ্ক সুকোমল পুষ্প-রেণু আনিয়া থাকে এবং তাহা স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে সঞ্চয় করে। যথাসময়ে রেণুগুলিতে সামান্য-পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া শাবকদিগকে দেওয়া হয়।

সিরিষ- বা রজন্-জাতীয় এক-প্রকার দ্রব্য মক্ষিকারা সংগ্রহ করিয়া থাকে। পুরাতন মৌচাক সংস্কার করিতে
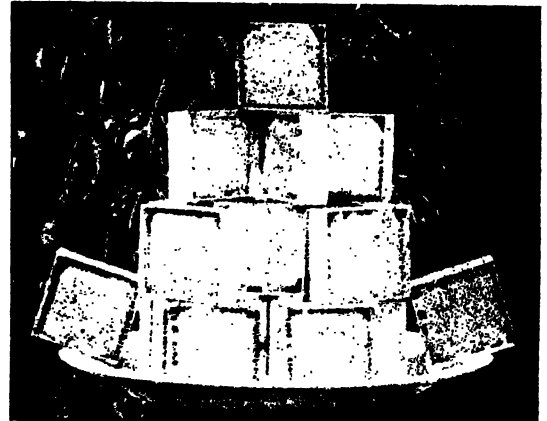
ফ্রেমে-আঁটা সুরক্ষিত মৌচাক

অথবা নূতন মৌচাক তৈয়ার করিতে উক্ত দ্রব্যটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে 'প্রপোলিস্' বলা হয়। ইহা অত্যন্ত এঁটেল। মক্ষিকার বিশেষ-বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম আছে। যথা—মুখ দ্বারা পুষ্পরস-আহরণ এবং ঐ পুষ্পরসকে মধুতে পরিবর্ত্তিত করা, এই উভয় কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। পশ্চাতের পদদ্বয়ের সাহায্যে তাহারা পুষ্পরেণু বহন করিয়া থাকে। খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য্য-সময়ে মক্ষিকার বক্ষস্থলে চক্রাকারের ন্যায়

শীতকালে তুষারাবরণে ঢাকা মৌচাক

একপ্রকার এঁটেল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন-অনুসারে ইহাকে তাহারা বিযুক্ত করিয়া মৌচাক তৈয়ার করিতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যার্থে বৈজ্ঞানিক যন্ত্ররূপে যেন ভগবান্ তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়াছেন।

কৃত্রিম ফ্রেম-নির্ম্মাণে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ইহাকে যথাসম্ভব দৃঢ় ও স্বাভাবিক করিতে হইবে, কৃত্রিম বলিয়া যেন মৌমাছিরা বুঝিতে না পারে। ডিম্ব-কোষগুলির আকৃতি দেখিয়াই পুং ও স্ত্রী মক্ষিকার সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এই ডিম্ব কোষ নির্ম্মাণ করিতে মক্ষিকাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। মোম অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিষ, অথচ মৌমাছি-পালকদের ইহা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। অনেক মধু নষ্ট করিয়া মক্ষিকারা মোম প্রস্তুত করিয়া থাকে। মৌচাক-নির্ম্মাণের সময় ইহার দরকার হয়। কৃত্রিম উপায়ে একটি মৌচাক বহুবার ব্যবহার করিলে ব্যবসায়ীদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে।

মধুমক্ষিকা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সঞ্চয়ী জীব। অসময়ের জন্য তাহারা যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং অপব্যয় কখনও করে না। সময়-সময় তাহারা মধুচক্রটির চারিদিক্ পরিদর্শন করে। যদি কোথাও খালি প্রকোষ্ঠ দেখিতে পায়, অমনি তাহা মধুপূর্ণ করিয়া রাখে।

অতীব আশ্চর্য্য প্রণালীতে পুষ্পরস খাঁটি মধুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। গর্ত্তগুলি পুষ্পরস দ্বারা পূর্ণ করিয়া মৌমাছিগুলি অতি নিকটে উড়িতে থাকে। ক্রমে তাহাদের পালকের বাতাসে জলীয় অংশ নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখন সকলে মিলিয়া খাঁটি মধুটুকু পান করে। যদি পান করিবার দরকার না হয়, তবে তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেয়। এইরূপে সঞ্চিত মধু ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করিয়া থাকে। উপযুক্ত সময়ে ব্যবসায়ীরা সাবধানতা অবলম্বন করিলে অতি সহজে যথেষ্ট মধু বিক্রয়ার্থ সংগ্রহ করিতে পারেন। ব্যবসায়-হিসাবে না হইলে ব্যক্তিগত আমোদের জন্যও মৌমাছি পালন করা যায়। ইহাতে পরিশ্রম মোটেই নাই। শীতকালে যখন পুষ্পাদি প্রচুর-পরিমাণে থাকে না, তখন মৌমাছিগুলিকে চিনি খাইতে দেওয়া উচিত।

গ্রীষ্মকালে তাহাদের জন্য জল ও লবণের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ভালো। ভারতে অল্পব্যয়ে এবং অল্পপরিশ্রমে ব্যবসায় করিতে হইলে মৌমাছির ব্যবসায় মন্দ নয়।
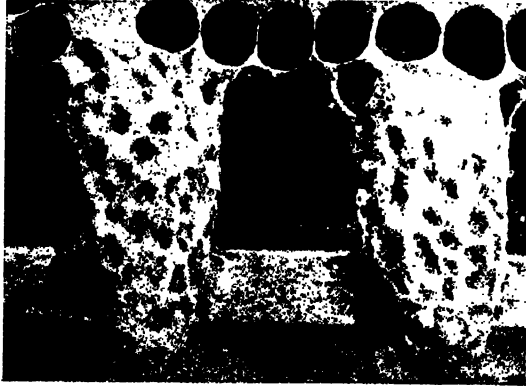
রাণী-মক্ষির কক্ষ

সৌখীন দ্রব্য এবং ঔষধ এই দুইরূপেই মধু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। আধুনিক স্বাস্থ্য-রক্ষণ ও অল্পশ্রমসাপেক্ষ প্রণালীতে মৌমাছি-ব্যবসায় করিলে বেশ দু'-পয়সা লাভ হইতে পারে, বিশেষতঃ দশ জনের উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই।

ফ্রেমে-আঁটা রাণী মক্ষির কক্ষ

ভারতের অধিকাংশ স্থানেই বিবিধ সময়োপযোগী পুষ্প পাওয়া যায়। পুষ্পবহুল প্রতিগ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া মধুচক্র থাকিলেও এ দরিদ্র দেশবাসীর অনেক উপকার হইতে পারে। খাদ্য-হিসাবে চিনি অপেক্ষা মধু অধিকতর স্বাস্থ্যপ্রদ ও পুষ্টিকর, ইহা বিশেষজ্ঞেরা প্রমাণ করিয়াছেন। অধিকাংশ চিনিই বিদেশ হইতে আসে, সুতরাং চিনির আমদানি হ্রাস পাইলে দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। অন্যদিকে, এই নূতন ব্যবসায় সুপ্রচারিত

রাণী-মক্ষির কক্ষের অপর একটি দৃশ্য

হইলে বেকার-সমস্যার অন্ততঃ কিঞ্চিৎপরিমাণে সমাধান হইতে পারে। আর যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে পশু-পাখী-পালন, ফলাদির বাগান অথবা অন্য কোনো কৃষি-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা সঙ্গে-সঙ্গে এই নূতন ব্যবসায়টিতেও অনায়াসে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব :—

মৌচাক-ধারক ফ্রেমের একটি অংশ (মৌচাক আসিবার পূর্ব্বে)

১। নির্জ্জনতাপ্রিয় ও মিশুক এই দুইপ্রকার মৌমাছি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত-জাতীয় মৌমাছিই আমাদের ব্যবসায়ের উপযোগী। ইহাদিগকে চক্রমক্ষিকা বলা হয়। উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যপটু।
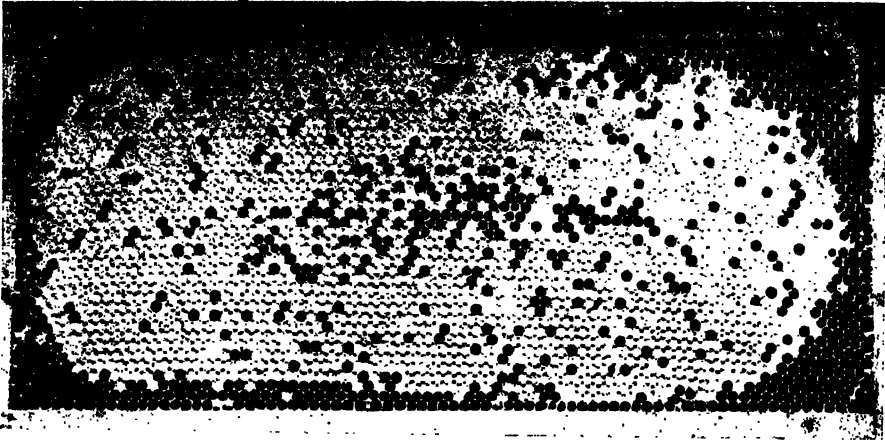
মৌচাকধারী ফ্রেম (মৌমাছি আসিবার পরে)

ক্যালিফোর্নিয়াতে কোনো ব্যবসায়ী দুই সহস্র মৌচাক হইতে ১৫০,০০০ পাউণ্ড মধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মৌমাছি-ব্যবসায়ীদের মধুর উপযোগী ফুলের বাগান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। 'ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের' বড়-বড় ব্যবসায়ীরা প্রতি-ঋতুতে ৫০,০০০—৬০,০০০ পাউণ্ড মধু সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

মৌমাছি-রক্ষক মৌচাক হইতে মাছিগুলিকে পৃথক করিতেছে

২। নানাবিধ কৃত্রিম ফ্রেম আছে। তন্মধ্যে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ ফ্রেমগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহাদিগকে প্রয়োজন-অনুসারে স্থানান্তরিত করা যায়। ফ্রেমটির উপর দিকের কাষ্ঠ-খণ্ডে (ছাঁদে) একটী মৌচাকের ক্ষুদ্র টুক্‌রা সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। উহা আল্‌গা-ভাবে লাগানো থাকে। টুক্‌রাটির অধোভাগে সরু একটি কাষ্ঠ-খণ্ড সুকৌশলে রাখা হয়। মৌমাছি আসিয়া টুক্‌রাটিকে উপরের কাষ্ঠ-খণ্ডের সঙ্গে সুদৃঢ় করিলে উক্ত সরু কাষ্ঠ-খণ্ডটি খুলিয়া ফেলা হয়। বড় একটা বাক্সে অনেকগুলি ফ্রেম একত্রে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনমতে আংশিকভাবে যাহাতে পরিদর্শন, সংস্কার ইত্যাদি করা যায়, তাহার বন্দোবস্ত থাকা

মৌচাক-পর্য্যবেক্ষণ

উচিত। স্বতন্ত্র ফ্রেমগুলির নমুনাও দুখানি চিত্রে দেওয়া হইল।

৩। মধু-নিঃসারণ-কালে যাহাতে মধুচক্রগুলি নষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য। মধুচক্রগুলি একাধিক-বার ব্যবহার করিতে পারিলে একদিকে যেমন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, অন্যদিকে মক্ষিকাদিগকেও চক্র-নির্ম্মাণের জন্য শক্তি ও সময় নষ্ট

বৃক্ষস্থিত মৌচাক

করিতে হয় না। তাহারা তৎক্ষণাৎ মধু সংগ্রহ করিতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত 'হোরস্কা' নিষ্কাশন যন্ত্রের চিত্রও দিতেছি। 'কাউন' সাহেবের 'দ্রুতগামী নিষ্কাশন যন্ত্র' ইহা অপেক্ষা অনেক ভালো উহাতে এক-সময়ে অনেকগুলি
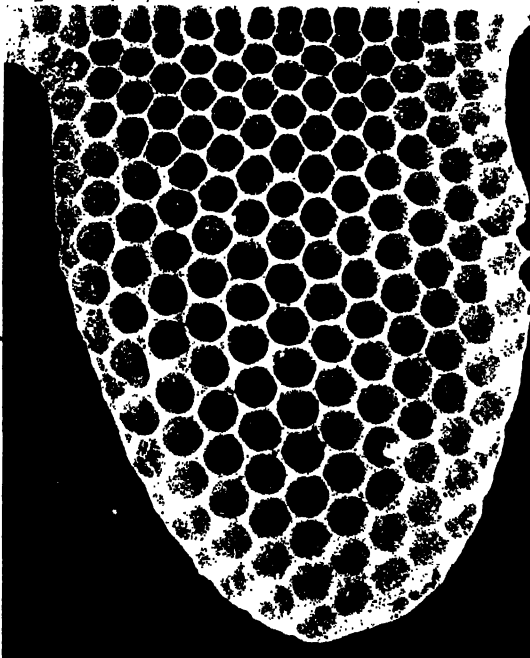
একটি নুতন মৌচাক

মৌচাক ব্যবহার করা যায় এবং চক্রের উভয় পার্শ্বের মধু আপনা হইতেই বাহির হইয়া যায়। তড়িতের সাহায্যে বড়-বড় যন্ত্রগুলি চালানো হইয়া থাকে।

৪। শ্রমিকদলের সাহায্যার্থ অধুনা কৃত্রিম উপায়ে মধুচক্র প্রস্তুত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। একখানা পাতলা তক্তায়
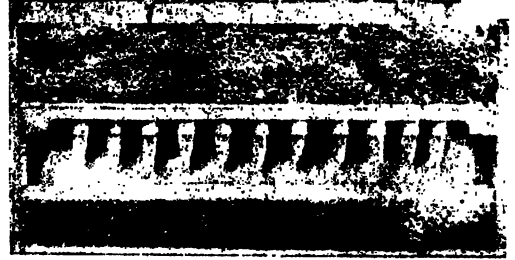
রাণীমক্ষির কয়েকটি কৃত্রিম কক্ষ

মোম মাখাইয়া তাহাতে 'রোলার' ঘুরাইলে দাগ পড়ে। এই অবস্থায় তক্তাখানাকে কৃত্রিম মৌচাকের ভিত্তিরূপে স্থাপন করা হয়। তখন মৌমাছিরা আপন কার্য্যোপযোগী করিয়া ডিম্ব-কোষগুলি তৈয়ার করে এবং মৌচাকটি সম্পূর্ণ করে। এইরূপ কৃত্রিম ভিত্তি তৈয়ার করিবার জন্যও যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
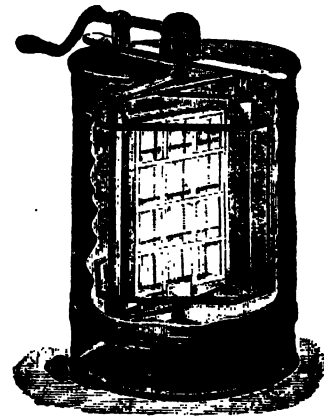
মিঃ কাউয়ানের আবিষ্কৃত মধু-নিষ্কাশন যন্ত্র

৫। প্রত্যেক মধুচক্রে একটি রাণী-মক্ষিকা, কতকগুলি পুংমক্ষিকা এবং ৮০,০০০—১০০,০০০ শ্রমিক মক্ষিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। রাণী-মক্ষিকার বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত।

অসময়ে রাণীটির মৃত্যু ঘটিলে মৌচাকে মধুর আর কোনো আশা থাকে না।

৬। পুংমক্ষিকা প্রতি-মৌচাকে ১০০টি থাকিলেই যথেষ্ট। ইহাঁরা মোটেই মধু সংগ্রহ করে না, কিন্তু খায় অত্যন্ত বেশী। খুব কম-সংখ্যক রাখাও ঠিক নয়। পুংজাতীয় ডিম্ব-কোষ অল্প থাকিলে উহাদের সংখ্যাও অল্প হয়। গর্ত্তের আকৃতি দেখিয়াই জাতির সংখ্যা নির্ণয় করা যায়।

৭। কোনো চক্রে অধিকসংখ্যক মক্ষিকা থাকিলে অনেক সময় একদল মক্ষিকা অন্যত্র চলিয়া যায়। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা তাহা লক্ষ্য করিয়া নূতন চাক নির্ম্মাণ করিয়া দেন।
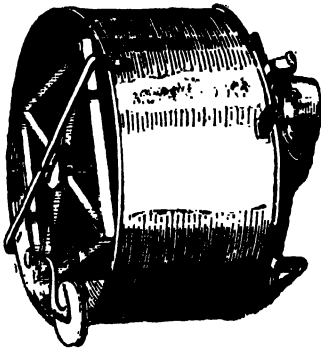
হারুস্কা মধু নিষ্কাশন-যন্ত্র

৮। পুষ্পবহুল স্থানে মৌমাছি ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত। আধুনিক উন্নত প্রণালীগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

৯। শিশুমক্ষিকাদিগকে পুষ্পরেণু অথবা সেই রকম অন্য কোনো বস্তু খাইতে দেওয়া হয়। শাবকদের খাদ্যের সুব্যবস্থা রাখা ব্যবসায়ীদের প্রধান কর্ত্তব্য।

১০। মৌমাছি-ব্যবসায়ীদের ব্যবহারার্থ একপ্রকার কালো জালের পোষাক পাওয়া যায়। সাবধানতা-সত্ত্বেও মধ্যে-মধ্যে দংশন-যন্ত্রণা ব্যবসায়ীদের সহ্য করিতে হয়। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় নূতন ব্যবসায়ীরা 'বিংহাম' নামক একপ্রকার ধূম পান করিয়া থাকে। ইহাতেও দংশন-যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হয়।

১১। শিশু-মৌমাছি অনেক সময় গর্ত্তের ভিতরে মরিয়া যায়। ইহা একটা ভীষণ সংক্রামক রোগ-বিশেষের জন্য ঘটে। প্রথম অবস্থায় ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

১২। শীতের পর অনেক সময় মৌমাছিদের খারাপ খাদ্য খাইতে হয়। ইহাতে আমাশয়ের মতন একপ্রকার রোগ ইহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। শরতের প্রথম ভাগে যদি ইহাদিগকে শুষ্ক ও গরম মৌচাকে রাখা যায়, তবে এ-রোগ হইতে পারে না।

কলিকাতায় এক সের মধুর মূল্য ২৲ টাকা। কলিকাতার আশপাশে মৌমাছির ব্যবসায় বেশ চলিতে পারে। ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ কৃষি-প্রধান। অনভিজ্ঞ গ্রাম্য কৃষকেরা অর্থাভাবে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। স্থানভেদে কৃষি-ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিকরূপে এই ব্যবসায়টি প্রচলিত করিতে পারিলে এই দরিদ্র দেশবাসীর কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।*

---

* প্রবন্ধটি ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারীর ওয়েলফেয়ার্ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্কলন। অনুসন্ধিৎসু ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য এখানে কতকগুলি পুস্তকের নাম দেওয়া গেল, যথা—1. T. W. Cowan, *British Bee-keepers' Guide Book.* 2. By the same author, *The Honey Bee, Its Natural History, Anatomy and Physiology.* 3. A. I. Root, *A. B. C. and X. Y. Z. of Bee Culture.* 4. F. R. Cheshire, *Bees and Bee-keeping.* 5. S. Simmins, *A Modern Bee Farm.* 6. *The British Bee Journal* (a weekly paper). 7. *Bee-keepers' Record* (monthly). 8. *Bee-keeping in India, by* C. C. Ghosh, a Pusa publication.

কষ্টিপাথর

আন্‌-মনা

আন্‌-মনা গো, আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর
গাঁথন-খানি আনব না।
বার্ত্তা আমার ব্যর্থ হবে,
সত্য আমার বুঝবে কবে?
তোমারো মন জানব না,
আন্‌-মনা গো আন্‌-মনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান গগন-মাঝে,
গুঞ্জনিব শান্তসুরের সান্ত্বনা,
আন্‌-মনা গো, আন্‌-মনা॥

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল;
স্বচ্ছ নদীর জল
শূন্যে-চেয়ে রইবে পেতে কান
বুকের তলে শুনবে বলে' গ্রহতারার গান;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
ক্লান্ত আলোয় এঁকে যাবে শেষ বিদায়ের ছবি,—
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে;
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা-নীরব রাতে
অন্ধকারের বরণমালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে' একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা,
আন্‌-মনা গো, আন্‌মনা॥

(বিচিত্রা, ১৮ই মাঘ, ১৩৩১) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ অক্টোবর ১৯২৪
ষ্টীমার এণ্ডিস্‌

—

ছবির পরখ

চিত্রকরের আঁকা একটি বস্তুর ছবি ও ফোটোগ্রাফে তোলা সেই বস্তুর ছবিতে তফাৎ অনেকটা। চিত্রকরের আঁকা ছবিতে বস্তুটির রূপ ছাড়া চিত্রকরের সেই বস্তুটি দর্শনে আনন্দের যে-উপলব্ধি হয়েছিল, বিশেষ করে' তারই রূপ দেখি। ফোটোতে সেই বস্তুর জড়রূপ দেখি, কিন্তু আনন্দের মূর্ত্তি দেখি না। বল্‌তে পারা যায়, যখন স্বভাবের জড়রূপ দেখে' আনন্দ হয়, তখন তারই হুবহু নকলেও (ফোটো) আনন্দের উদ্রেক হ'তে পারে, কিন্তু নাও হ'তে পারে—কারণ একটি বস্তু দেখে' কোনো ব্যক্তির রসের উদ্রেক হ'ল না, আর-একজন কবির মন মেতে উঠল। কিন্তু চিত্রকরের চিত্রে একটি বিশিষ্ট রসের উদ্রেকের প্রয়াস থাক্‌বেই।

তা হ'লে ছবি হ'ল রসের ঘনরূপ বা আনন্দের ঘনরূপ। ভগবানের সৃষ্টিতে দুটি জগৎ আছে, একটি বাহিরের বস্তুজগৎ, অন্যটি মনোজগৎ। বাহিরের জগৎ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র পৃথিবী যাবতীয় পদার্থ নিয়ে, আর মনো-জগৎ আমাদের রসাদি নিয়ে।

এই মনোজগতের আনন্দকে প্রকাশ কর্‌তে গিয়ে ৬৪ কলার উৎপত্তি মানুষ করেচে। কেহ গান গেয়ে, কেহ নেচে, কেহ এঁকে, কেহ গ'ড়ে, নানাভাবে আনন্দের রূপকে সকলের সাম্‌নে ধর্‌বে তারই জন্য ব্যাকুল হচ্চে।

এই ব্যাকুলতাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করার প্রয়োজন কি? আনন্দ প্রকাশ চায়। আলো জ্বল্‌লেই প্রকাশ হবে, ফুলের সৌরভ থাক্‌লেই ছাড়িয়ে পড়বে, অন্যের প্রয়োজন থাক্‌ বা না থাক্‌।

এখন কথা উঠবে চিত্রকরের ছবিতে বস্তু-বিশেষের রূপও রয়েছে, আর চিত্রকরের আনন্দের অভিব্যক্তিও রয়েছে,—এ কি-রকম করে' হবে?

এই কথা বোঝাতে গেলে technique বা অঙ্কনরীতি-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

চিত্র বিশ্লেষণ কর্‌লে, এই কয়টা জিনিষ পাওয়া যায়।—প্রথম চিত্র-করের মন, দ্বিতীয় যে-বস্তু নিয়ে চিত্রের অঙ্কন হচ্চে, তৃতীয় আঁক্‌বার সাজসরঞ্জাম। মনের কথা বলার আগে চোখকে দেখা যাক্‌। মন চক্ষু-যন্ত্রের সাহায্যে যাবতীয় পদার্থ দেখে। কেবলমাত্র চক্ষু কোনো জিনিষ দেখে না, একথা সকলের জানা আছে। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে মন কত-রকমে দেখে। যখন অন্যমনস্ক থাকি, তখন সাম্‌নে জিনিষ থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই না; কখনো তার অংশ মাত্র দেখি। আবার কোনো সময় জিনিষকে তার চাইতেও বেশী করে' দেখি।

যেমন প্রকাণ্ড ঝুরিওয়ালা এক বটগাছ দেখলাম, দেখেই মনে হ'ল যেন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। এখানে বটগাছের সঙ্গে সন্ন্যাসীর রূপের কতক অংশ জুড়ে' দেওয়া হ'ল। কখনো আবার এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে' মনে করেছি; যেমন সর্পে রজ্জুভ্রম—একথা ত সকলেই জানে। অনেকে প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিতে real perspective পান না। কিন্তু real perspective জিনিষটি জ্যামিতি-শাস্ত্রের ভিতরেই আছে। আমার আগের কথা-অনুসারে চিত্রকরের perspective, mental perspective ছাড়া আর কিছু নয়।

(শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩৩১) শ্রী নন্দলাল বসু

—

আনাতোল ফ্রাঁস্‌

মানুষের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের সহিত মানুষের বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান ও সুসঙ্গতি-বোধের দ্বন্দ্বের ইতিহাসই সভ্যতার ইতিহাস। মানুষের চিন্তা-শক্তি তাহাকে সামাজিক শিক্ষা বিশ্বাস সংস্কার রুচি প্রভৃতির প্রতি অন্ধ-ভাবে আসক্ত হইতে বরাবরই বাধা দেয়। সভ্যতার উষাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের বিচারবুদ্ধি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

বিচারবুদ্ধির এই সেনাদলে বহু মহারথী অগ্রণী হইয়া সমরে নামিয়াছেন। আজ আমরা যাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া গৌরব বোধ করিতেছি, ইনি বোধ হয় তাঁহার যুগে এই সমরাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ রথী ছিলেন।

ফরাসীদেশে বোধশক্তিকে দেবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল এবং ভাগ্যবিধাতা এই ফরাসীদেশেই জীবনপথের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী আনাতোল ফ্রাঁসের জন্ম লিখিয়াছিলেন।

যে-যুগে জ্ঞান ও যুক্তি মানুষের জীবনে অসাধারণ-রকম উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, আনাতোল সেই যুগেই পৃথিবীতে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে জগতে এতগুলি জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষ কখনও একসঙ্গে পরস্পরের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে দিনযাপন করেন নাই। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে জগৎব্যাপী বিস্তার ও যুক্তিবাদীদের যে দুঃসাহসিক সমালোচনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারই কথা বলিতেছি। মানুষের অন্তরলোকের যে-সকল কথা ও রহস্যকে স্পর্শ করাও মানুষ পাপ মনে করিত, যুক্তিবাদ সেইসকল বিষয়ই নির্ম্মমভাবে কাটিয়া-ছাঁটিয়া বিশ্বের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। এই যুগেই দৈবশক্তির নিশ্চিত প্রামাণ্যস্বরূপ কাহিনীগুলিকে চিত্তবিভ্রম কি কাল্পনিক সৃষ্টি আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল এবং এই যুগেই দেবতাকে স্বরচিত আইন ও অভ্যাসের কাছে হার মানিয়া খেয়াল-খুসীর খেলার অধিকার চিরতরে ছাড়িতে হইয়াছিল। নীতিকথা "অসার" "অযৌক্তিক" "পুরাতত্ত্ব" ইত্যাদি নূতন নামে ভূষিত হইল।

তত্ত্বহিসাবে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে জ্ঞান ও যুক্তির চরম উন্নতিই এযুগে হইয়াছিল। কিন্তু যখন জীবন আচরণ ও চরিত্রে এই জ্ঞান ও যুক্তিতত্ত্বকে খাটাইতে দেখি, তখন দেখি সমস্ত ব্যাপার সমস্ত কার্য্য ও চিন্তাপ্রণালী যেন মধ্যযুগের কোন্ প্রান্তে পিছাইয়া গিয়াছে। যে-যুগে মানুষ নির্ভর করিতে ধর্ম্মবিশ্বাস পাইত, জীবনপথে আগাইয়া চলিতে নীতির সাহায্য পাইত, সে-যুগে তাহাদের জীবন অনেক সুসঙ্গত ছিল, নিজের কাছে তাহারা নিজে অনেক খাঁটি ছিল। কিন্তু আনাতোলের সমসাময়িক যুক্তিতত্ত্ববাদীদের জীবন এমন ছিল না। পুরাকালের মানুষ অনেক সময় ঈশ্বরভীতি নামক স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির সাহায্যে কুচিন্তা ও পাপ কর্ম্মকে ঠেকাইয়া রাখিত। এই ঈশ্বরভীতির ভিত্তিরূপে আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি না থাকিলেও সামাজিক কল্যাণ-কাজে ইহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। আধুনিক যুগে আমরা জ্ঞান কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরভীতি বহুল-পরিমাণে বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি এখনও পূর্ণতা পায় নাই এবং ঈশ্বরভীতির স্থানে বসাইবার উপযুক্ত যুক্তিভীতিও আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। ফলে আধুনিক জীবন অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতিদোষ ও কপটতার চাপে পিষ্ট হইয়া মরিতেছে। অস্তে করে বলিয়াই মানুষ অনেক কাজ করিতেছে, পাপ বুঝিয়াও অনেক কাজের গুণগান করিতেছে; মুখে গণবাদ সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রচার করিতেছে, কিন্তু কাজে দেখা যাইতেছে, নিকৃষ্টদরের অনধিকারচর্চ্চায় আসক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। সেই যুগেই দেবতারা মানুষের দাস হইয়া পড়িলেন, যে-যুগে যুক্তি ও জ্ঞানকে দেবত্বের আসনে বসাইয়া মানুষ সনাতন ধর্ম্ম ও নীতিকে ধূলায় লুটাইয়াছিল এবং জ্ঞান ও যুক্তিকে অতিস্থূল অসামাজিক পাপ ও অমানুষিকতার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। বিশ্বাস ও ধর্ম্মের যুগে মানুষ দুঃখ সহ্য করিত এবং ভালোবাসার ও আদর্শের খাতিরে সর্ব্বস্ব ত্যাগও করিত; কিন্তু আধুনিক যুগের যুক্তিবাদীদের ভিতর সে গভীর নিষ্ঠা সে অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য তুচ্ছ লাভের জন্য সুযুক্তিকে ইহারা বিসর্জ্জন দেয়। আজ চারিদিকে যে-অবনতি দেখিতেছি তাহার অন্যতম কারণ ইহাই।

যে-কয়টি মানুষ যুক্তিবাদী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন এবং জীবনে ও আচরণে যুক্তিবাদকে সম্মান করিতেন আনাতোল ফ্রাঁস্ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সর্ব্বদাই নিজ লক্ষ্যপথে দৃষ্টি স্থির রাখিতেন, বুঝিতেন লক্ষ্য কি এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুসঙ্গত যুক্তির সাহায্যে জ্যামুক্ত তীরের মতন সরল পথে চলিয়া যাইতেন, উন্মার্গগামী হইতেন না। দেখিতে পাই সকল বিষয়কেই তিনি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন এবং সর্ব্বত্র মূর্খতা হইতে যুক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক:—ধরুন, শিল্পী সেন্ট্ (সাধ্বী) ক্যাথারিনের চিত্র আঁকিতে চাহেন। তবে কেন দেবতার মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া তুলিয়া বৃথা শক্তি ও বুদ্ধির অপব্যয় করা? দেবত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চাও, মূর্খের মতন নারীদেহের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া শিল্পকে ভ্রান্ত করো কেন? যে-শিল্পীরা মানস-আদর্শ ফুটাইতে গিয়া গঠন ও অবয়বের প্রতি আসক্তি ছাড়িতে পারেন না, আনাতোল তাঁহাদের এইরূপ উপদেশ দেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও ভয়ঙ্কর স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় যে, অচির ভবিষ্যতে যুক্তি নব অবতাররূপে মানুষের মোহজাল ছিন্ন করিতে অবতীর্ণ হইবে; এবং যুক্তিভীতি মানুষের অন্তস্তল কাঁপাইয়া তুলিবে। যুক্তি ও জ্ঞানের প্রতি মানুষের যে-শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছিল আনাতোল তাহা বহুল-পরিমাণে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। যে-দিন জ্ঞান ও যুক্তির প্রতি মানুষের পূর্ণ শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিবে সেই দিনের আশা-পথ চাহিয়া আছি; কারণ আনাতোলের আত্মার মৃত্যু হয় নাই। সেই অবিনশ্বর আত্মা ধীরে-ধীরে শক্তির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে; সেই শক্তি অচির ভবিষ্যতে মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া মানুষের চেষ্টাকে সত্য-পথ খুঁজিতে শিখাইবে।

(মডার্ন রিভিউ) অ শ চ

—

যবদ্বীপের হিন্দু-সভ্যতা

অতি প্রাচীন কাল হইতেই যবদ্বীপের ও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহার স্পষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ভাগে বোধ হয় জলযানের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূল বাহিয়া জাহাজ যাতায়াত করিত—এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। এইসব জাহাজ মান্দ্রাজ-উপকূল দিয়া সিংহলে যাইত এবং পূর্ব্ব পথে যবদ্বীপে যাইত। এই গতিবিধির কেন্দ্রস্থল ছিল বঙ্গদেশ ও ওড়িশা। বঙ্গোপসাগরের মালয় উপকূল ও আরো দক্ষিণের দ্বীপসকলের সহিত এই অর্ণবপোত-যাত্রার যোগ ছিল। কারণ এই দিক্‌কার সমস্ত ভূভাগে বহু শতাব্দী ধরিয়া "হিন্দু" নামের প্রতিশব্দ "ক্লিং" প্রচলিত আছে। যবদ্বীপবাসীদিগকে ভারতবর্ষীয় লোকদের "ক্লিং" বলিতে আমি শুনিয়াছি। এমনকি পূর্ব্ব দিকে হংকং অবধি ভারতবাসীদিগকে এই "ক্লিং" নামে অভিহিত করা হয়। আজকাল এই প্রতিশব্দের কদর্থ হইয়াছে, সেইজন্য ভারতবাসীরা এই নামে অভিহিত হইতে নারাজ। এই "ক্লিং" শব্দ মূলে "কলিঙ্গ" শব্দের অপভ্রংশ। বঙ্গোপসাগরের উত্তর কূলের প্রাচীন ঐতিহাসিক নাম ছিল কলিঙ্গ,—এখন যে-স্থান বঙ্গদেশ ও ওড়িশার কিয়দংশ ব্যাপিয়া আছে।

প্রাচীন কালের যবদ্বীপ বা এখনকার জাভা প্রথমে কলিঙ্গদেশান্তর্গত বঙ্গ ও ওড়িশার অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক সভ্য ও জনবাসযোগ্য হয়।

(কারেন্ট্ থট্) সি এফ্ এণ্ড্রুজ

—

ভারতীয় ও চীনীয় সভ্যতা

ভারতীয় ও চীনীয় সভ্যতার মতন অপর প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার জীবন ছিল ঐক্যবদ্ধ। ধর্ম্ম ছিল লোকের জীবনেরই অংশ, তাহা বিজ্ঞানের প্রমাণানুকূল কোনো-কিছু পদার্থ বলিয়া আলাদা ছিল না। ঐসব দেশে বিজ্ঞান ধর্ম্মের সন্তান-রূপে ও সমাজের সেবকরূপে গণ্য হইত। হিন্দু ও চীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিভিন্ন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সমাজশরীর সুস্থ রাখিবার জন্য পরস্পরকে সহায়তা করিত; এবং এইরূপে সমাজে শান্তি বজায় থাকিত। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে এই ঐক্য-ভাবের লোপ পাইয়াছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সেখানে পরস্পর দ্বন্দ্বে রত। যান্ত্রিক সভ্যতা ধর্ম্মকে উপহাস করিতেছে। সেখানকার সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দী এবং সেই হেতু ক্রমাগত পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত। সুতরাং জাতীয় জ্ঞানানুশীলন যে শান্তি ও ঐক্যের অপেক্ষা রাখে তাহা এসময়ে কিরূপে অগ্রসর হইবে?

(দি ইণ্ডিয়ান্ রিভিউ) ভি বি মেট্রা

—

কবি ইক্‌বালের জীবনবাদ

কবি ইক্‌বাল পঞ্জাব-প্রদেশের এক অতিপ্রসিদ্ধ বর্ত্তমান কবি। তাঁহার কবিতা উত্তর ভারতে বিশেষ আদৃত। তাঁহার গুণবত্তা-সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ-বৎসর তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ে নোবেল্ প্রাইজ্ পাইবার জনরব উঠিয়াছিল।

ইক্‌বালের জীবনবাদের ভিতরকার কথা—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, আত্মানম্ বিদ্ধি। জাতির উত্থানের বীজমন্ত্র আত্ম-বোধ। জাতিকে কেবল নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে চেতন হইলে চলিবে না, তাহার শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণও জানিতে হইবে। জীবন যদি জাতির মধ্যে জাগ্রত হয় এবং বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহা হইলে জাতি যে-কোনো কাজই করিতে সমর্থ হয়। কর্ম্মবিমুখ জনসঙ্ঘই উন্নতির সকল আশায় কুঠারাঘাত করে। এ-জগতে কিছুই অসম্ভব নয়; এবং মানুষ যাহা করিয়াছে মানুষ তাহা করিতে পারে, অবশ্যই পারিবে। মানুষের মধ্যে যে-শক্তি সুপ্ত আছে তাহাকে জাগ্রত করিতে হইবে। নানা কারণে শক্তি নিশ্চল থাকে, কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহাকে জাগাইতে ও পুনরায় কর্ম্মে নিয়োগ করিতে নিশ্চয়ই পারা যায়। অতএব মানুষের কর্ত্তব্য হইতেছে এই শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং ইহার বর্দ্ধনের পথে যে-সব বাধা তাহাদিগকে নাশ করা। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে-ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেইরূপ করিলে, তাঁহারা যাহা সম্ভব করিয়াছিলেন আমরাও তাহা সম্ভব করিতে পারিব। সৎ প্রচেষ্টার প্রতিদান আসিবেই,—যেমন ভালো গাছে ভালো ফল হইয়াই থাকে। সুতরাং যদি আমরা অগ্রসর হইবার জন্য মনস্থ করি, স্বাভাবিক বা কৃত্রিম সকল বাধাই দূর হইয়া যাইবে। পর্ব্বতের চাপ যখন ভাঙিয়া আসে তখন ছোট-বড় সব জিনিষই সে ঠেলিয়া লইয়া যায়। "পারিব না"—এই বাক্য আমাদের ভাষা হইতে দূর করিতে হইবে। আমাদের চরিত্র হইতে আত্ম-অবিশ্বাস নাশ করিতে হইবে এবং তাহার স্থানে আত্মবিশ্বাস আনিতে হইবে,—যে আত্মবিশ্বাস অদম্য প্রাণাবেগ জাগ্রত করে।

ইহাই কবি ইক্‌বালের বিশ্বাস ও মহৎ উপদেশ।

(আলিগড় ম্যাগাজিন্)

—

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন জনহিতকর অনুষ্ঠান

প্রজার হিতসাধনের জন্য রাজার নানারূপ উদ্যোগ-আয়োজনের কথায় প্রাচীন তামিল সাহিত্য পূর্ণ। প্রসিদ্ধ চোলরাজ করিকল-সম্বন্ধে দেখা যায় যে, কাবেরী নদী বৎসরে-বৎসরে বন্যায় শস্যের যে ক্ষতি সাধন করিত তাহা দেখিয়া তিনি বাঁধ গঠন করিয়া জলস্রোত নিবারণ করিতে মনস্থ করেন এবং বাঁধ তৈয়ারী করিয়া বাৎসরিক শস্যহানি নিবারণ করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে করিকল রাজত্ব করেন। অনেক রাজাই জলনালী গঠন করিয়া দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন স্থানে কাবেরীর বহু শাখা প্রবাহিত করেন; এবং করিকল তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র। মুদিকন্দন, বীর-সোলন প্রভৃতি কাবেরীর শাখাগুলির যে-সব নাম আছে, সেইসব নাম ইহাতেই জানা যায় যে, শাখাগুলির নির্ম্মাতারা ঐসব রাজারাই।

দক্ষিণ ভারতের যে-সব স্থানে বৃষ্টির অভাব ও নদী নাই, সে-সব জায়গায় হ্রদ ও পুকুর কাটাইয়া দিতে কেবল চোলরাজগণ নয় প্রাচীন ও পরবর্ত্তী পল্লব-রাজগণও বহু শতাব্দী ধরিয়া বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্রতত্তক, পরমেশ্বরতত্তক, বায়িরামেগতত্তক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির সব কয়টিই চিংগলপেট জেলায় হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আজ অবধি রহিয়াছে। পুষ্করিণীগুলিকে পরিষ্কার ও বজায় রাখিবার ভার ছিল গ্রাম্য সমিতির উপর; এবং সেগুলিকে বছরে-বছরে বা মাঝে-মাঝে সংস্কার করিবার খরচ রাজকোষ হইতে আসিত।

(দি সেণ্ট্রাল্ হিন্দু কলেজ ম্যাগাজিন্)

—

"লিঞ্চিং"এর সংখ্যা হ্রাস

আইন-অনুযায়ী বিচার না করিয়া অপরাধী বা অল্প অপরাধী লোককে মারিয়া বা পুড়াইয়া হত্যা করা আমেরিকার কোনো-কোনো জায়গায় প্রায়ই ঘটিতেছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে সভ্য জগতের আন্দোলন-সত্ত্বেও এই ব্যাপার বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সম্প্রতি সুসংবাদ আসিয়াছে যে, এই লিঞ্চিংএর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। 'নিউ রিপাবলিক' পত্রে আছে:—

গত কয়েক বৎসরে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সএ লিঞ্চিংএর সংখ্যা খুব কমিয়াছে। ১৯২৪ সালেই লিঞ্চিং সর্ব্বাপেক্ষা কম। ১৯১৯ সালে হইয়াছিল ৮৩টি; ১৯২৩ সালে ৬০ হইতে ২৮; ১৯২৪ সালে ৯টি (সমস্ত সালের সংবাদ পাওয়া যায় নাই)। ন্যাশন্যাল্ এসোসিয়েশন্ ফর্ দি অ্যাড্‌ভান্‌স্‌মেন্ট অব কলার্ড পিপল্ নামে কৃষ্ণবর্ণ জাতিদের হিতকর এক অনুষ্ঠান হইয়াছে; তাহার সম্পাদক জেম্‌স্ ডবলিউ জনসন্ লিঞ্চিং ব্যাপারের এই সংখ্যা হ্রাস করিয়াছেন। এই সমিতি এই বে-আইনী কাজ দূর করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ইঁহারা ডায়ার লিঞ্চিং-নিবারক বিলটি চালাইয়া দিয়াছেন, এখন তাহা কর্ত্তাদের সম্মতি-সাপেক্ষ। এই মহৎ কাজের জন্য আমেরিকার লোকে ও আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীরা সমিতির নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কু ক্লুক্স ক্ল্যানও (গুপ্ত সমিতি বিশেষ) মিঃ জনসনের মতন এই নিবারণ-কার্য্যের সহায়ক। এঁরাও লিঞ্চিং কাজটা লোকের অপ্রিয় করিয়া তুলেন। জাতিগত বিদ্বেষকে অনেক তুচ্ছ ব্যাপারে ও রাজনীতিক কাজে প্রয়োগ করিয়া ক্ল্যান্ ইহার প্রতি লোকের অভক্তির উদ্রেক করেন।

—

রঙ্গরস ও জাতিগত একতা

ক্ষুধা তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তি যেমন মানুষের একান্ত স্বাভাবিক, রঙ্গরসও তেমনি। জগতের শান্তি ও মানুষের পরস্পরের মিলন—ইহা যেরূপেই

ঘটুক, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ইহার মূলে আছে মানুষের স্বাভাবিক রঙ্গরস। শত বাধা ও বিভিন্নতা অতিক্রম করিয়া প্রতিবাসীকে প্রতিবাসীর সহিত মিলাইতে রঙ্গরস ছাড়া আর কি আছে? কত না সময়ে একটা সাময়িক কৌতুকরঙ্গের দ্বারা সংঘর্ষ নিবারণ করা যায়! লোকে পরস্পর মারামারি-কাটাকাটিই করিত যদি না তাহাদের মধ্যে এই রঙ্গরসেচ্ছা থাকিত। স্বাস্থ্য থাকিলে সুন্দর রঙ্গরস থাকিবে এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটিলেই রঙ্গরসের হ্রাস ঘটিবে, ও বিষাদপ্রবৃত্তি আসিবে। ধীর স্থির মানুষের চরিত্রে রঙ্গরস দ্বন্দ্ব-নিবারক গুণ।

(ভয়েস্ অব ইণ্ডিয়া) ফ্রেডুন কাব্‌রাজী

বৌদ্ধ-নীতি

বৌদ্ধ-নীতি সম্পূর্ণ কর্ম্মসাপেক্ষ এবং কর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাতে মাত্রা মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্য এরূপভাবে রক্ষিত হয় যে, অপর ধর্ম্ম-মতে সেরূপ হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মে "মধ্য পথ" শিক্ষা দেয়, তাহাতে শৈথিল্য বা নিষ্ক্রিয় সাধনের অবকাশ নাই। বুদ্ধ বলেন, "দুইটি জিনিষ বর্জ্জন করিতে হইবে,—প্রথম, আমোদপূর্ণ জীবন, ইহা নীচ ও ব্যর্থ; দ্বিতীয়, বিষাদময় জীবন, ইহা অনাবশ্যক ও ব্যর্থ। যে দুঃখবাদ ধ্বংসের মূল কারণ, বৌদ্ধ-নীতিতে তাহার স্থান নাই। পরের দুঃখ-কষ্টের জন্ম আন্তরিক সমবেদনা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি করুণ ও সদয় ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে নির্ব্বাণলাভের আশা—এইগুলি বৌদ্ধ শিষ্যের মনে আনন্দের উদ্রেক করে। ধর্ম্মপদের শ্লোকে আছে।

"আমরা সম্পূর্ণ আনন্দের মধ্যে বাস করি; দ্বন্দ্বময় জগতে আমরা দ্বন্দ্বহীন; রোগগ্রস্তের মধ্যে আমরা নীরোগ; ক্লান্ত জীবের মধ্যে আমরা অক্লান্ত। সম্পূর্ণ আনন্দের মধ্যে আমরা বাস করি; আমাদের ধনসম্পত্তি নাই; জ্যোতি যেমন চন্দ্রসূর্য্যের পুষ্টি, হৃদয়ের আনন্দ তেমনি আমাদের পুষ্টি।"

যে-সব ইউরোপ-আমেরিকাবাসীরা প্রাচ্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে-যে জায়গায় বুদ্ধের উপদেশ শিকড় গাড়িয়াছে সেখানকার সকল শ্রেণীর অধিবাসীদিগের উদার আচরণ ও অন্তরের আনন্দ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; সে-সব জায়গায় অপরাধের মাত্রা আশ্চর্য্যরকম কম। ইহার কারণ খানিকটা এই যে, নীতি, বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞান একইকালে চর্চ্চা ও অনুসরণ করিতে বুদ্ধ উপদেশ দেন। পাপ করিবে না, লোকের হিতসাধন করিবে, মন বিশুদ্ধ রাখিবে,—ইহাই বুদ্ধের উপদেশ।

নীতি-সাধন জীবনের পরিণতির অঙ্গীভূত। তাই বুদ্ধের উক্তি—"জ্ঞান ও সাধুতায় পূর্ণ হও।" কেবলমাত্র জ্ঞান বা নিভৃত নির্জ্জন নীতি-কার্য্যবিহীন তপস্যা জীবনের পরিণতি নয়। আবার সত্যের গভীরতায় অন্তর্দৃষ্টিহীন যে-নীতিসাধন তাহাও ভিত্তিহীন।

(দি থিওসফিক্ পাথ) এইচ এ ফাসেল্

জনবিশ্বাস ধর্ম্মের বাহক

'দি লাইট অব দি ইষ্ট' পত্রিকা বলেন—

একেশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদী জৈনবৌদ্ধ ধর্ম্ম বা বহুদেবদেবী হিন্দুধর্ম্ম এগুলির যেটিকেই আমরা ধর্ম্ম বলি না কেন সব বড় ধর্ম্মই বরাবর গতানুগতিক প্রচলিত বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া পরিণত হইয়া আসিয়াছে।

যে-প্রটেষ্টাণ্ট মনে করেন বাইবেলের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার উপরই তাঁহার বিশ্বাস স্থাপিত, তিনি প্রথমে জনবিশ্বাস হইতে, স্বীকার করিয়াছেন যে, বাইবেল অভ্রান্ত ও ত্রাণকারক। আধুনিক বৌদ্ধ, যিনি মনে করেন তাঁহার ধর্ম্ম যুক্তিবাদের উপর স্থাপিত তিনি একথা ভুলিয়া যান যে, ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মিতে পারিত না আর ইহার প্রতিষ্ঠাতার মন হিন্দু বিশ্বাসধারায় পূর্ণ ছিল।

ক্যাথলিক, ইহুদি, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি—সকলেই স্পষ্টত গতানুগতিক প্রচলিত বিশ্বাসে বিশ্বাসী। যে-ধর্ম্মনীতি জীবনকে পরিচালনা করে তাহা একটা মানসিক আবিষ্কার নয়; তাহা কোনো বড় উপদেষ্টার বিশ্বাস—জনমত বা জনবিশ্বাসের ধারায় আসিয়াছে, তাহা লিখিত হোক বা মৌখিক হোক। এইরূপে যে-সব ধর্ম্ম মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বা এখনও করিতেছে, সকলেরই ভিত্তি এইরূপ বিশ্বাসের উপর।

জনবিশ্বাসকে উদ্দীপিত না করিলে কোনো ধর্ম্মই বড় হইতে পারে না। বড় বা ব্যাপক হইতে হইলেই ধর্ম্মকে বহু লোককে একত্রিত করিতে হইবে, বিচ্ছিন্ন করিলে চলিবে না। কয়েকটি মাত্র লোক লইয়া ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না, বহুকে চাই। সমান বিশ্বাস ও সমান কর্ম্মই মানুষকে একত্রিত করে। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চিন্তা মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক'রে।

লেখক জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরীশ্বরবাদী এবং হিন্দুধর্ম্মকে বহুদেব-বাদী বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা তাঁহার সহিত একমত নহি।

গালার চাষ

রামায়ণ ও অন্যান্য প্রধান গ্রন্থে আমরা আলক্তার উল্লেখ পাই। ৮০।৯০ খৃষ্টাব্দে লোহিত সমুদ্রের উপকূলে বারবারিসি বন্দরে ইহা ভারত-বর্ষ হইতে যে রপ্তানি হইত পেরিপ্লাসের লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়।

পৃথিবীতে যে-পরিমাণে গালা ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা ৯৭ ভাগ কেবল ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয়। আসাম, বাঙ্গালা ও মধ্যপ্রদেশেই ইহা অধিক-পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঠের উপর বার্ণিশে, জাহাজের ডেক প্রস্তুত করিতে, গ্রামোফন রেকর্ড নির্ম্মাণে, শীলমোহরের কার্য্যে, বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিশেষ (insulator) প্রস্তুত ও গোলা নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

যেখানে কুসুম, পলাশ, কুল, পর্পটি, শিরিশ ও বাবুল গাছ পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যায়, তথায় ব্যবসা-হিসাবে গালার চাষ করা সুবিধা। বাংলার জল-বায়ুতে সর্ব্বত্র কুলগাছ (টোঁপাকুল) বিনা আয়াসেই জন্মে। সেই কারণে এদেশে কুলগাছে গালা লাগান প্রশস্ত ও সহজসাধ্য। সহজ-সাধ্য বলিয়াই পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা, ধুলিয়ান, জঙ্গীপুর প্রভৃতি গালা-প্রধান স্থানে কুলগাছেই ইহার চাষ করা হয়। গালার আধুনিক বাজার-দর অনুসারে একটি পূর্ণবয়স্ক কুলগাছ হইতে ভালোরূপ ফসল হইলে ৬০৲ হইতে ৮০৲ পাওয়া যাইতে পারে। যেখানে অধিকসংখ্যক কুলগাছ আছে এরূপ স্থানে চাষ আরম্ভ করা উচিত। নূতন করিয়া কুলবীজ লাগাইয়া পরে সেই গাছে চাষ করিতে লইলে ৪।৫ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। ১১ হাত অন্তর একটি করিয়া কুলগাছ লাগাইলে, প্রতি-বিঘায় মোটামুটি ৬৪টি গাছ পাওয়া যায়। ৪।৫ বৎসরের কম বয়সের গাছ ব্যবহার করিলে সেই গাছ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

বৈশাখী ফসলের জন্ম আশ্বিন মাসে, ও কার্ত্তিকী ফসলের জন্ম আষাঢ় মাসে বীজ বাঁধিতে হয়। বৈশাখী ফসল আট মাস ধরিয়া সময় পায় বলিয়া কার্ত্তিকী ফসলের অপেক্ষা সাধারণতঃ ভালো বলিয়া গণ্য হয়।

যে-গাছ হইতে ফসল নামানো হয় সেই গাছে সঙ্গে-সঙ্গে আবার নূতন বীজ বাঁধা হয় না।

এক-প্রকার ক্ষুদ্র কীট গাছ হইতে রস চুষিয়া লইয়া পরে উহা দেহ-রন্ধ্র দিয়া বাহির করে এবং সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ডালের উপর পাৎলা বাসা প্রস্তুত করে। এই বাসা হইতেই গালার উপাদান পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র কীট যত সরস ডাল পাইবে ততই সতেজ হইবে। পোকা সতেজ হইলে ইহার বংশবৃদ্ধিও তদনুরূপ অধিক হয় এবং কালে অধিক পরিমাণে গালা পাওয়া যায়। এইজন্য যে-গাছে গালার বীজ বাঁধা হয়, তাহাতে সরস-পল্লব থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এইহেতু কুলের গাছ ছাঁটিয়া দেওয়ার প্রথা সর্ব্বত্র আছে। পলাশ, কুসুম (Schleichera trijuga) প্রভৃতি গাছ প্রায়ই ছাঁটিতে হয় না। তবে কুলগাছ ছাঁটিলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। বীজ বাঁধিবার প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে গাছ ছাঁটা উচিত।

ডিম সহিত কুলের ডাল, যাহা সচরাচর এক হাত লম্বা ও আধ ইঞ্চি সরু হয় তাহা, গালার বীজ বা লাহার বীজ নামে অভিহিত হয়।

এই বীজ বা ডিমসহ ডাল কলার ফেঁসো প্রভৃতি দিয়া গাছে বাঁধিয়া দিতে হয়। এই ডালের সংখ্যা গাছের আকারের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ২০।২৫টি ডাল একটি গাছে বাঁধা হয়। বীজযুক্ত ডাল গাছে আটকাইয়া দিবার ১০।১২ দিন পরে আবার নামাইয়া লইতে হয়, কারণ এই সময়ের মধ্যে ডালের পোকা গাছে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ ডাল হইতে তখন গালা চাঁচিয়া লইতে হয়।

গালার পোকার বৈজ্ঞানিক নাম Eriococcus Lacca। ইহার আকৃতি ১/২৫ ইঞ্চির অধিক হইবে না। রং লাল, পা তিন জোড়া, এক জোড়া লম্বা চুলের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের নালী, ছোট ছোট দুইটি গোল চোখ, এবং গাছ হইতে রস চুষিবার জন্য শোষণ-যন্ত্র মুখে সংলগ্ন আছে। এই শোষণযন্ত্রের দ্বারা গাছের রস ইহারা চুষিয়া লয়, এবং পরে শরীরের রন্ধ্র দিয়া এই রস বাহির করে। বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া এই রস কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই কঠিনত্ব পাওয়া রস ইহার শরীরের উপর আবরণের কার্য্য করে। পুরুষ পোকার আবরণ লম্বা-ধরণের এবং তাহার পিছন দিকে সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় শ্বাসপ্রণালীর নালী দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী পোকার আবরণটি গোলাকার এবং ইহার ধার মসৃণ হয় না।

পিপীলিকা এবং কীট-ভক্ষণকারী এক-প্রকার পোকা ইহার বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। গাছের তলদেশে একটি কাপড় আল্‌কাতরায় ভিজাইয়া চতুর্দ্দিকে বাঁধিয়া দিলে পিপীলিকার উৎপাত কমে।

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর ভোঁতা ছুরি দিয়া গাছের উপরিস্থিত গালা চাঁচিয়া লইতে হয়। ঐ গালা ছায়াতে শুকাইয়া পরে গুঁড়া করিতে হয়। এই গুঁড়া পদার্থ ২৪ ঘণ্টা পরিষ্কৃত জলে ভিজাইয়া খুব রগড়াইতে হয়। এইরূপে জল দিয়া বার-বার পরিষ্কার করিলে ইহার মধ্যস্থিত লাল রং বাহির হইয়া যায়। পরিষ্কার করিবার সময় যে লাল জল পাওয়া যায় তাহাকেই আল্‌তা বলে। জলে তুলা ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলে পাত-আল্‌তা প্রস্তুত হয়। আজকাল এনিলিন রং আল্‌তার স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং সেই জলের বিশেষ ব্যবহার নাই, মাত্র সাররূপে ব্যবহার হয়। এই গুঁড়া পরিষ্কৃত হইলে উহাতে পরিমাণ-মত হরিতাল ও খাঁটি রঞ্জন ভালোভাবে মিশাইয়া রং উজ্জ্বল করা হয়। এখন এই গালা কারিকরের সাহায্যে কাঠের কয়লার অগ্নির উত্তাপে কাপড়ের থলির মধ্যে রাখিয়া থলিগুলি পাকানো হয়। গালা থলির ভিতর দিয়া গলিয়া বাহিরে আসে এবং পরে উহা টানিয়া চাদরের ন্যায় লম্বা করা হয়। এইরূপ ভাবে যে-গালা পাওয়া যায় তাহা চাঁচ গালা নামে পরিচিত।

গড়ে বৎসরে ৮কোটি টাকার গালা এই দেশ হইতে রপ্তানি হয়। এই ব্যবসার চাবিকাঠি বিদেশীয়দিগের হস্তে, কারণ উহাদের ইচ্ছামত দর নামে ও উঠে। ভারতবাসীগণ এই ব্যবসায় মাত্র কাঁচা মালের উৎপন্নকারী ও সামান্যভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থতা করে। এক মণ গুঁড়া গালা (বাজার নাম চপ্‌ড়া) গড়ে ৩০-৪০ ও চাঁচ্ গালা ১২০-১৪০ টাকায় বিক্রয় হয়। এক বিঘা জমি হইতে (অর্থাৎ যেখানে গড়ে ৫০টি ভালো কুল-গাছ আছে) আধুনিক বাজার দরে ১০০০ টাকার গালা ক্রয় করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

প্রথমে বাঙ্গালার গালা-প্রধান স্থানে সামান্য কয়েক দিবস থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। ধুলিয়ান, পাকুড়, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে যাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে খুবই সুবিধা। জমির খাজনা, বীজের দাম, গাছ কাটিবার খরচ, বীজ লাগাইবার খরচ ও গালা সংগ্রহ ও তৈয়ারী করিবার খরচের উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমানে গালার ব্যবসায় প্রতিদিনই প্রসার লাভ করিতেছে এবং এই কার্য্যে নূতন লোক প্রবেশ করিলে কোনো প্রতিযোগিতার ভয় নাই। সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই অল্প মূলধন লইয়া চাপ্‌ড়া গালা ও চাঁচ্ গালা বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন।

(প্রকৃতি, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩১)

—

তামাক-পাতায় প্লেগ নিবারণ

রোগাক্রান্ত মূষিকের রক্ত পান করিয়া তাহাদের দেহবাসী ক্ষুদ্র মাছির দলও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ঐ পীড়িত মাছি যে-মানুষকে দংশন করে তাহারই প্লেগ হয়।

তামাকের স্পর্শে ও গন্ধে ঐ মাছিগুলি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করে। অল্প দিন গত হইল, নিজাম-রাজ্যে হায়দ্রাবাদ সহরে এবিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ঐ পরীক্ষার ফলে তথাকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার এস্ মল্লনা মহাশয় যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই :—

(১) তামাক নিজে প্লেগজীবাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ না হইলেও উহা ইন্দুর-মাছিগুলিকে অতি শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া, পরোক্ষভাবে পরিশোধন-ক্রিয়া (disinfectant) প্রকাশ করিয়া থাকে।

(২) তামাকে তীব্র গন্ধ বর্ত্তমান থাকায়, ইহা ৬ ইঞ্চি দূর পর্য্যন্ত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

(৩) ইহার ক্রিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী।

তামাকপত্রের দ্বারা ঘরের মেঝে সম্পূর্ণভাবে আবৃত রাখিলে কেবল যে সেই সময়ের জন্য গৃহস্থিত ইন্দুর-মক্ষিকাগুলি বিনষ্ট হয়, এমত নহে, পরেও যে-সকল দুষ্ট মাছি রোগবিস্তার-উদ্দেশ্যে গৃহ প্রবেশ করে, তাহারাও মরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় না।

এইরূপে যতদিন ঐ পত্র মেঝের উপর পাতিত থাকে, ততদিন তাহাদের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

(৪) একবার ইন্দুর-মক্ষিকা ধ্বংস করিয়া ইহা শক্তিহীন হয় না। একই পত্র বারম্বার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৫) ইহা কখন মেঝের আর্দ্রতা আনয়ন করে না।

(৬) শুষ্ক অবস্থায় ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার ব্যবহারে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না।

(৭) ইহা অনায়াসলভ্য ও স্বল্পমূল্য।

(৮) ইহা দ্বারা প্লেগদুষ্ট গৃহ অতি সহজেই বিশোধিত হইতে পারে অধিকন্তু কালাজ্বরের বাহন ছারপোকার দলকেও হত্যা করিতে

ইহা সম্যক্‌প্রকারে সমর্থ। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে তামাকপত্রের ক্বাথ সমধিক কার্য্যকরী।

হায়দ্রাবাদ সহরে প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব-কালে উক্ত ডাক্তার সাহেব মিউনিসিপ্যালিটি ও পুলিসের সাহায্যে প্লেগদুষ্ট পল্লীর ৫২ খানি বাড়ীর ঘরের মেঝেয় তামাক রাখিয়া বহুলোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রত্যেক বাড়ীতে ইন্দুরের গর্ত্তগুলির অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্যে তামাক-চূর্ণ নিক্ষেপ করত, ইষ্টক ও চুণসুর্‌কীর দ্বারা মুখ আবদ্ধ করিয়া দেন। পরে প্রতি ঘরের মেঝে (ম্যাটিং করার ন্যায়) তামাক-পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। পাছে পাতাগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক ও চূর্ণ হইয়া যায়, এজন্য প্রতিদিন একবার করিয়া উহাতে জলসেচন করা হইত।

গোলকুণ্ডা সহরে প্লেগের দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইলে এইরূপভাবে আর-একবার তামাকের শক্তি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তথায় কতকগুলি প্লেগদুষ্ট গৃহ জনশূন্য করিয়া তন্মধ্যে এক-একটি "গিনিপিগ (Guinea-pig) ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঐ গিনিপিগগুলি শীঘ্রই প্লেগ-রোগে প্রাণত্যাগ করিলে, সমস্ত ঘরের মেঝে উত্তমরূপে তামাকপত্রাচ্ছাদিত করিয়া পুনরায় এক-একটি "গিনিপিগ" তথায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। শেষোক্তগুলির মধ্যে একটিও প্লেগরোগে আক্রান্ত হয় নাই।

(স্বাস্থ্য-সমাচার) শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অগ্নি বৈশ্বানর

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

(ঋগ্বেদ-অনুসরণে)

বিশ্বনরের বন্ধু যে তুমি, তাই নাম তব বৈশ্বানর,
তুমি অমর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যের সাথে বাস করো তবু নিরন্তর!
নিত্য তোমার জন্ম নূতন! অরণি তোমারে প্রসব করে—
ও গো প্রমন্থ! প্রসবি' তোমায় মাতা-পিতা
যে গো পুড়িয়া মরে!
তুমি হিরণ্যদন্ত! তোমার পিঙ্গল জটা! পৃষ্ঠ নীল!
তব অদ্ভুত জন্ম স্মরিয়া বিস্মিত মোরা মরণশীল।
তুমি যবিষ্ঠ, দেব-কনিষ্ঠ—চির-নবজাত সদ্য-যুবা!
যজ্ঞসারথি, সোমগোপা তুমি, তুমি মৃতাহারী ভরণ্যু বা।
ঋষিদের ঋষি তুমি যে অসুর, পুরোধা যে তুমি অশেষ-মেধা!
তুমি হুতাশন, অপাদশীর্ষ! প্রণমি তোমারে হে জাতবেদা!

আকাশে কৃশানু, বাতাসে অশনি, মর্ত্ত্যে অগ্নি-বৈশ্বানর!
মহা-অরণ্য-দহন মূর্ত্তি স্মরি গো তোমার ভয়ঙ্কর!
শতগবীযুত পুঙ্গব যেন বেগে বাহিরাও বনের পথে,
অম্বরে ধায় ধূম-কদম্ব—কেতু সে তোমার মরুৎ-রথে!
চৌদিকে ওড়ে উল্কার মালা, নব তৃণরাশি লয় সে গ্রাসি'।
পাখীরা শাখায় ভয়ে মূরছায়, পশুরা পলায় সহসা ত্রাসি'!
তব ক্ষুরধার দংষ্ট্রাশিখায় মেদিনীমুণ্ডে জটার ভার
নিমেষে ঘুচাও!—শ্মশ্রু যেমন ঘুচায় নিপুণ ক্ষৌরকার!
সিন্ধুসমান গর্জ্জন তব, সিংহের মত হুহুঙ্কার!
ওগো জ্বালাকেশ! কৃষ্ণবর্ত্মা! প্রণমি তোমারে
বারংবার।

ওগো গৃহপতি! গৃহের অতিথি! ওগো দেবদূত! হব্যবহ!
মৃত দারু-দেহে অমৃত-অগ্নি!—কেমনে বা
তুমি লুকা'য়ে রহ!
ওগো জল-ভ্রূণ! বৃষসম পুনঃ লালিত যে
তুমি জলেরি কোলে!
তুমি জলচর লোহিত হংস!—জলে আগ্নময় পক্ষ দোলে!
শ্যেনসম তুমি আকাশে বিহর, মহী'পরে তুমি ক্রুদ্ধ অহি!
বিশ্বতোমুখ! ওগো বরেণ্য! তুমি যে পাবক!—
পাতক দহি'!
উদয় হও গো উজ্জ্বল রথে, বিদ্যুৎ-বিভা হিরণ্ময়!
ও গো তেজস্বী! নিয়ে এস তব অরুণবর্ণ অশ্বচয়।
হোতা সঁপে তোমা ইন্ধন নব—গ্রহণ করো গো এই সমিধ্!
মর্ত্ত্যের জ্ঞাতি! অমৃত-বন্ধু! প্রণমি তোমারে বিশ্ববিদ্!

আদিতে আছিলে অদিতির সাথে, আকাশের
নীল পদ্ম-বনে,
ঘর্ষণে কার গগনে-গগনে উজলিয়া জাগো কি নিঃস্বনে!
আস্যে তোমার জ্যোতির্হাস্য, ঘোর তমিস্রা তুমিই হরো!
নিবিড়-আঁধার নিশার ওপারে দৃষ্টি তোমার প্রেরণ করো!
হে মধুজিহ্ব! সপ্তজিহ্বা প্রসারিয়া দাও আজি এ প্রাতে,
মিশে যাক্ তব পিঙ্গল জটা ওই বালারুণ-রশ্মি-সাথে!
শত্রু মোদের নিপাত করো গো! বর দাও দেব!
বৃষ্টি দাও!
আর কৃপা করো কবিরে তোমার—মন্ত্র শোধন করিয়া নাও!
ওগো ত্রিজন্মা! ত্রিশিখ! ত্রিতনু!
ওগো গৃহ-ভানু!— রাত্রি-রবি!
পরমাত্মীয়! প্রসীদ হে সখা!—জুহু ভরি' এই দিলাম হবি।

অদৃশ্য তার—

জর্জ্জ টেলার নামক একজন আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পাৎলা তার আবিষ্কার করিয়াছেন। এই তার চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এই তারের উপর নানা-প্রকার দ্রব্য টাঙাইয়া রাখা যায়। এই তারের সাহায্যে এখন হইতে নানা-প্রকার অস্ত্রোপচারের

অদৃশ্য তারের উপর পরীক্ষা চলিতেছে

যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ সহজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। Resistance thermometers, thermocouples ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র-নির্ম্মাণও এই অদৃশ্য তারের সাহায্যে হইবে।

—

নতুন খেলা—

পুরাণো মোটর-টায়ারের সাহায্যে এক-প্রকার নতুন খেলা চলিতে

মোটর টায়ারের নতুন খেলা

পারে। এই খেলার আনন্দ যুবক-বৃদ্ধ সকলেই পাইতে পারেন। কয়েকটি কাঠের মুগুরের মতন দ্রব্য কিছু দূরে ইচ্ছা-মত সাজাইয়া রাখিতে হইবে। তার পর খেলোয়াড়ের দল দূর হইতে টায়ার গড়াইয়া দিয়া বিশেষ-বিশেষ কাঠের মুগুরে আঘাত করিবে। এই-প্রকারে নানা-ভাবে এই খেলাটিকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় করা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও এই খেলাটির চলন হইলে ভালো হয়। বিশেষতঃ কলিকাতার মতন স্থানে যেখানে পুরাণ মোটর-টায়ারের অভাব নাই, কিন্তু ফুটবল ইত্যাদি ক্রীড়ার যোগ্য মাঠের যথেষ্ট অভাব আছে।

—

ডান্‌পিটের খেলা—

ছবিতে দেখুন—অনেক উপর হইতে একটি কাঠের নির্ম্মিত রাস্তা বাহিয়া একটি বাইসাইকেল হঠাৎ খানিকটা শূন্য স্থান—আগুন এবং ধোঁয়ায় ভরা—লাফ দিয়া পার হইয়া আর-একটা কাঠের রাস্তার উপর পড়িয়া চলিয়া গেল। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় এই কাজটি কি ভয়ানক, এবং যে এই কাজটি করে, তাহার কতখানি মনের বল দরকার হয়। যে এই খেলাটি দেখায়, সে যে কেবল লোক দেখানোর জন্যই ইহা করে তাহা নয়, নিজের আনন্দের জন্যও কতকটা করে।
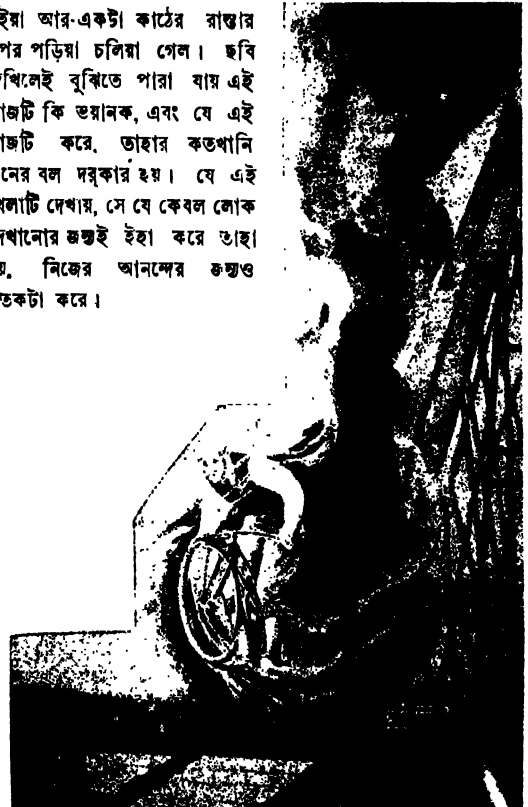
বাইসাইকেলের উপর চড়িয়া উপর হইতে অগ্নির মধ্য দিয়া লাফ
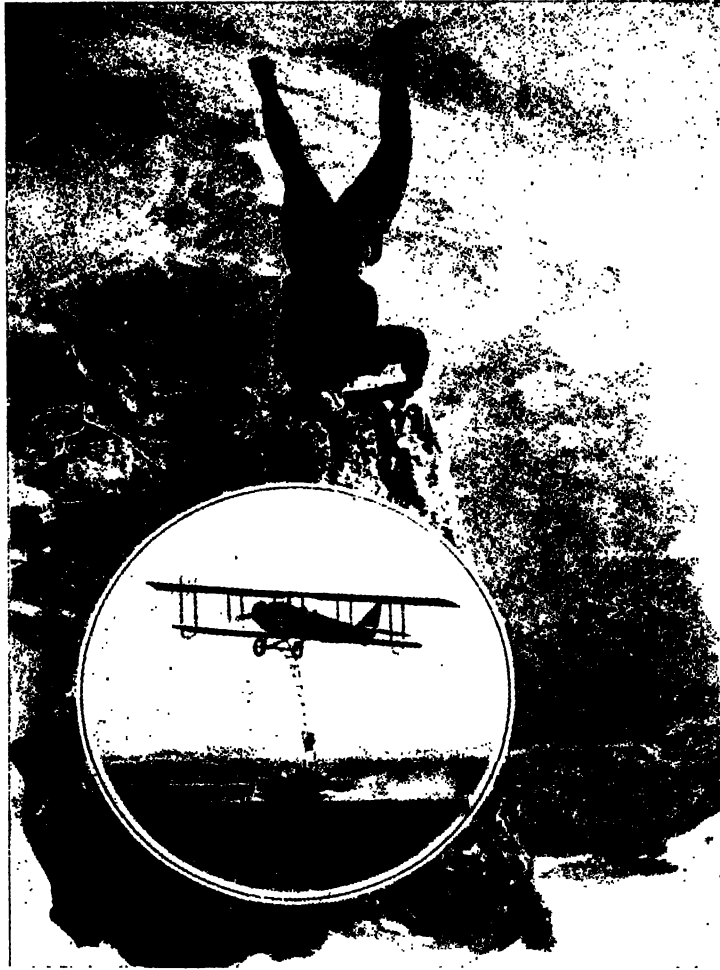
৩,০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের কিনারায় ডিগবাজি খাইবার কেরামতি

মিস্ লিলিয়ান্ বোয়ের নামক একজন মহিলা, আকাশে স্থিত এরোপ্লেনের পাখনার উপর দাঁড়াইয়া থাকেন, এবং নানা-প্রকার খেলা দেখান। একটি এরোপ্লেন হইতে আর একটি এরোপ্লেনে তিনি যাইতে পারেন। এই কাজটির কথা শুনিলে বিশেষ-কিছু মনে হয় না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কাজটি অতি ভয়ানক। দুটি এরোপ্লেন মাটি হইতে হয়ত ২ মাইল উপরে আকাশে তীর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, এই সময় ডিগবাজি খাইয়া একটি এরোপ্লেন হইতে আর একটা এরোপ্লেন ধরা, এবং তার পর তাহাতে নামিয়া পড়া একটি অসম্ভব কাজ বলিয়া মনে হয়। সামান্য একটু ভুলে প্রাণের কোনো আশা থাকিবে না—মাটিতে পড়িয়া দেহ গুঁড়া হইয়া যাইবে।

আর-একটি ছবিতে দেখুন, একজন পথপ্রদর্শক, একটি তিন হাজার ফুট উঁচু পাথরের কিনারায় কেমন মাথার উপর ভর দিয়া, পা আকাশের দিকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারসমতার সামান্য ব্যতিক্রম হইলে—লোকটি ৩০০০ ফুট নীচে পড়িয়া যাইবে। তাহার পর তাহার অবস্থা কি হইবে বলা যায় না। মাঝের গোলছবিটিতে দেখুন একটি ষ্টীমার হইতে
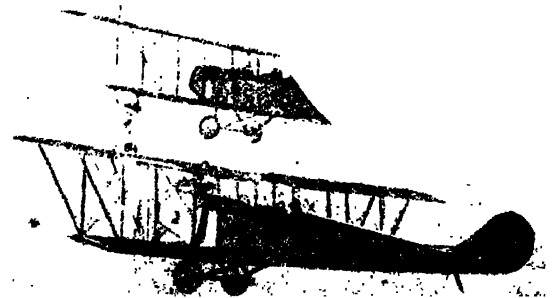
শূন্যে একটি এরোপ্লেন হইতে আর একটি এরোপ্লেনে যাওয়া—প্রথমে মাথা নীচু করিয়া উল্টা মুখী হইয়া হাত দিয়া নীচের এরোপ্লেন ধরা হয়

দড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া একজন এরোপ্লেনে চড়িতেছে। এরোপ্লেন হইতে চোর ডাকাত ধরিবার কায়দা দেখুন। এরোপ্লেন হইতে টাঙানো দড়ি-মইএ ঝুলিয়া এই কাজগুলি হয়। বায়স্কোপের ছবি তুলিতে এইসকল দৃশ্যগুলি প্রায়ই দরকার হয়।

আর-একটি ছবিতে দেখুন, এরোপ্লেনের ল্যাজের উপর একজন লোক দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে। এরোপ্লেনটি সবেগে চলিয়াছে—এবং ইহা মাটি হইতে হয়ত তিন মাইল উপরে আছে।
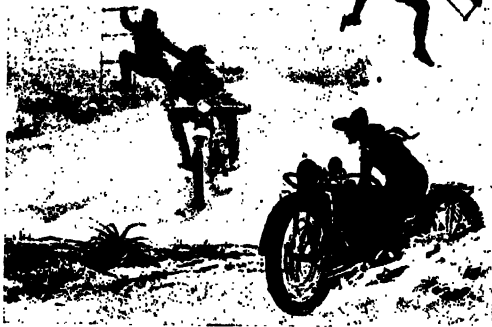
এরোপ্লেন হইতে মাটির উপর মোটর-বাইক-চাপা চোর ধরার ছবি, বায়স্কোপের জন্য ফোটো তোলা হয়
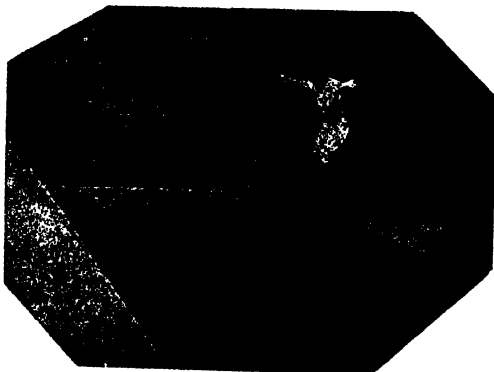
চলন্ত এরোপ্লেনের ল্যাজের উপর নৃত্য

আর-একখানি ছবিতে দেখুন একটি ঘোড়া একটি পাহাড় হইতে লাফ দিয়া আর-একটি পাহাড়ে গিয়া পড়িতেছে। এই কাণ্ডটি বায়স্কোপের জন্য করা হয়। ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েরই ইহাতে অসামান্য সাহস প্রমাণ হইতেছে।

এইসমস্ত কাজগুলি সাধারণ চোখে ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। এবং সত্যিই এই কাজগুলি অসাধারণ সাহসের পরিচায়ক। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে এই কাজগুলি সম্ভবপর হইত না। এইসমস্ত খেলোয়াড়রা সকলেই একবাক্যে বলেন যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে সকলপ্রকার ডানপিটে কাজই সহজ হইয়া যায়। যে-কোনো লোক যদি একটু সাহস করিয়া কাজগুলি অভ্যাস করে এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিজ্ঞানের সাহায্য লয়, তাহা হইলে সে এই কাজগুলি অতি সহজেই
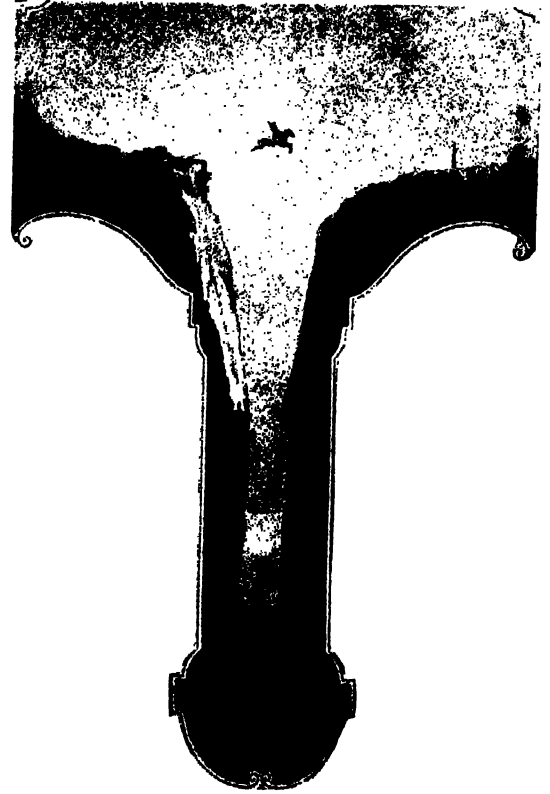
এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে ঘোড়ার লাফ

করিতে পারিবে—এইপ্রকার মত সকলেই দেয়। সর্ব্বপ্রথমেই ভয় ত্যাগ করিতে হইবে। সামান্যপরিমাণ ভয় থাকিলেও এই সকল ডানপিটে কাজ করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে প্রাণনাশ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

মোটরের সাম্‌নে-পড়া লোক বাঁচাইবার উপায়—

পারির মোটকার-সমূহে, রেলওয়ে ইঞ্জিনের মতন একপ্রকার তারের ঝুড়ি লাগানো হইতেছে। সাম্‌নে-পড়া লোক বাঁচাইবার জন্যই ইহা করা হইতেছে। মোটরের সাম্‌নে যদি কোনো লোক পড়িয়া যায়, তবে সে ঠোকর খাইবার পরেই এই তারের ঝুড়িটিতে গিয়া পড়িবে। তাহাকে আর রাস্তার কাদার উপর পড়িয়া চাকার তলায় প্রাণ
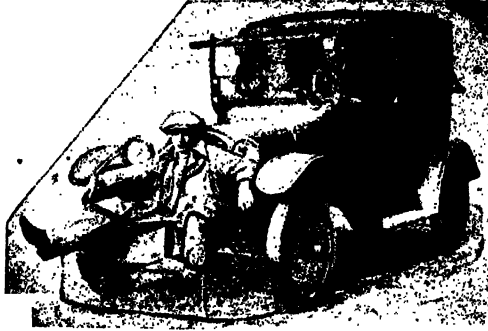
সামনে-পড়া লোক বাঁচাইবার উপায়

দিতে হইবে না। তারের ঝুড়িটিতে যাহাতে লোকটি পড়িবার সময় বিশেষ ধাক্কা না লাগে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে।

—

বরাহ ধরিবার কল—

শূকর ধরা এবং তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা অতি শক্ত কাজ। কিন্তু একটি লাঠির আগায় একটি তারের ফাঁস লাগাইয়া অতি সহজেই শূকর ধরিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা যায়। এই সহজ কলটি কি-ভাবের হইবে তাহা ছবি দেখিলেই ভালো করিয়া বুঝা যাইবে। তারটির এক

বরাহ ধরিবার কল

প্রান্ত লাঠির আগায় থাকিবে, আর-এক প্রান্ত হাতে থাকিবে। এই কলের সাহায্যে শূকর ছাড়া অন্যান্য অনেক-প্রকার জন্তুও ধরিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

—

রণ-পা-ওয়ালার কেরামতি—

একজন জার্ম্মান খেলোয়াড় "রণ-পা চড়িবার" যথেষ্ট কেরামতি দেখাইয়াছে। এই খেলোয়াড় রণ-পা চড়িয়া অন্য কোনো-প্রকার সাহায্য না লইয়া কতকগুলি আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য খেলা দেখাইয়া থাকেন। রণ-পা'র

রণ-পা-ওয়ালার কেরামতি

নীচে এক-রকম জুতা পায়ে দিয়া এই খেলোয়াড় রাস্তা-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহার পায়ের তলা দিয়া মোটর বাইক পর্য্যন্ত গলিয়া যায়। রণ-পা'র যেখানে এই খেলোয়াড়ের পা থাকে, সেই স্থানটি মাটি হইতে ৬ ফুট উচ্চ।

সমুদ্রতল ভ্রমণ—

মানুষ আকাশ জয় করিয়াছে। দুইটি মেরু, পাহাড় পর্ব্বত ইত্যাদিও আর কিছু বাকি নাই। এখন মানুষের দৃষ্টি পড়িয়াছে সমুদ্রতলের উপর। মানুষ এখন এই স্থানটিকে জয় করিতে চায়।

গত মহাযুদ্ধের সময় ১৬,০০০,০০০,০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি সমুদ্র-তলে গিয়াছে। এই অর্থ মানুষ উদ্ধার করিতে চায়।

সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিতেছেন কেমন করিয়া এবং কি বেশ পরিয়া একেবারে সমুদ্রের তলায় যাওয়া যায়। জার্ম্মানীতে একপ্রকার ডুবুরি পোষাক আবিষ্কার হইয়াছে, যাহা পরিয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নীচে নামিতে সক্ষম হইয়াছে। ইংলণ্ডে চেষ্টা হইতেছে গত যুদ্ধের সময় Scapa Flowতে যত জার্ম্মান জাহাজ ডুবিয়াছে, তাহার সবগুলিকে উদ্ধার করা।

আমেরিকার চেষ্টা হইতেছে, এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিবার, যাহা সমুদ্রের তলায় ডুবন্ত জাহাজের গায়ে শিকল জড়াইয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবে। সমুদ্রের তলায় যাওয়া অতি শক্ত ব্যাপার। এক এক

ফুট নীচে নামিতে থাকিলে ডুবুরির মাথায় অসম্ভব-রকম চাপ বাড়িতে থাকে। এই ভয়ানক চাপের জন্যই ডুবুরিরা সমুদ্রের তলায় বেশীদূর নামিতে সাহস করে না। ফ্রাঙ্ক যে ক্রিলে (Frank J. Crilley) সমুদ্র-গর্ভে ৩০৬ ফুট অবতরণ করিয়াছিলেন। এত নীচে এতদিন পর্য্যন্ত আর কেহ নামিতে পারেন নাই। কিন্তু জার্ম্মানি কীল (Kiel) নামক স্থানে
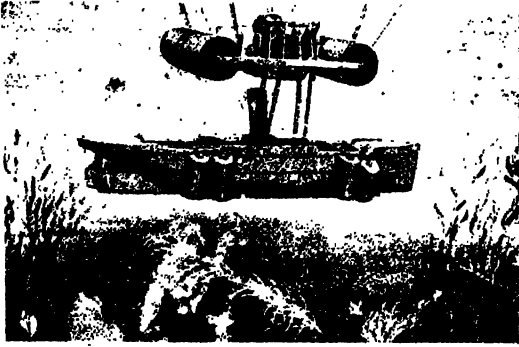
ডুবন্ত জাহাজ তুলিবার কল

একজন আবিষ্কারক একটি সমুদ্রের নীচে নামিবার পোষাক আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা পরিধান করিয়া ৫৩৫ ফুট পর্য্যন্ত নামিতে পারা যাইবে। তিনি নিজে এই পোষাক পরিয়া ব্যাভ্যারিয়ার এক স্থানে জলের মধ্যে ৫৩৫ ফুট অবতরণ করিয়াছেন।

এই পোষাক পরিয়া তিনি জলের তলার মাটিতে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন। উপরের জাহাজের সহিত টেলিফোনের সাহায্যে কথা-বার্ত্তা চলে।
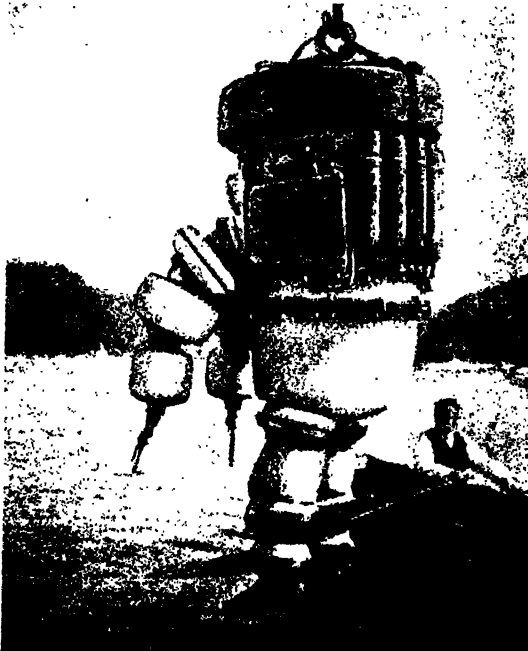
অভিনব ডুবুরির পোষাক

অক্সিজেন এই বিচিত্র পোষাকের এক স্থানে থাকে—উপরের লোকেদের উপর অক্সিজেন সরবরাহ করিবার কোনো ভার থাকে না।

এই পোষাকটি দেখিতে অতি অদ্ভুত। পোষাকের হাত পা সবই আছে। হাতের আঙুলও আছে। এখন এই পোষাক পরিয়া ডুবুরি সমুদ্র-তলে গিয়া ডুবন্ত জাহাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার গায়ে শিকল আটকাইয়া, তাহাকে টানিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

—

কেক্‌ওয়ালার কেরামতি—

এক বিয়ে-বাড়ীতে একজন কেক্‌ওয়ালা একটি অদ্ভুত এবং সুন্দর কেক্ তৈয়ার করিয়াছেন। একটি গির্জ্জা এবং তাহার চূড়া, বর-ক'নে,

কেকের শিল্প কার্য্য

পাদ্‌রী, ফুলগাছ ইত্যাদি সবই এই কেক্‌টিতে আছে। সমগ্র কেক্‌টি দেখিতে অতি চমৎকার।

—

সমুদ্রকূল-রক্ষক এরোপ্লেন—

ডেন্‌মার্কের একটি জার্ম্মান্ এরোপ্লেন-কারখানা হইতে জাপান গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার বর্ম্মাবৃত এরোপ্লেন তৈয়ার করাইয়াছেন। এই এরোপ্লেন জাপানের সমুদ্র-উপকূল পাহারা দিবে। এরোপ্লেন্‌টির ইঞ্জিন দুটি

জাপানের সমুদ্ররক্ষক এরোপ্লেন

ভয়ানক জোরওয়ালা হইবে। এরোপ্লেনটি বর্ম্মাবৃত থাকাতে ইহা যুদ্ধ-জাহাজের অতি নিকটে নামিয়া তাহার উপর বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করিতে পারিবে।

—

বরফের সহিত যুদ্ধ—

শীতপ্রধান দেশসমূহে বরফ মানুষের গতির বেগ বহু-পরিমাণে কম করিয়া দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতিও ইহাতে হয়। শীত যখন বেশী পড়ে, তখন দেশের পথ-ঘাট, রেললাইন ইত্যাদি সবই বরফের স্তূপে আবৃত হইয়া যায়। নদনদীও জমিয়া নৌকা চলাচল অসম্ভব করিয়া

বরফ-সাফ-করা পথে আস্তে আস্তে ইঞ্জিন চলিয়াছে

দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ এইসমস্ত বাধা ক্রমে-ক্রমে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। বরফ কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবার নানা-প্রকার কলকব্জা এবং গাড়ীর আবিষ্কার হইয়াছে। এই-সমস্ত গাড়ীর এবং কলকব্জার সাহায্যে বরফ এখন আর মানুষের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এখনও আমেরিকাতে মাঝে-

বরফের চাপে ছিন্ন-ভিন্ন টেলিগ্রাফের তার
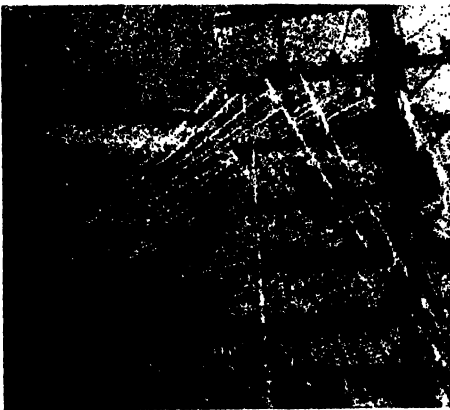
মাঝে এত বরফ পড়ে যে তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি বাৎসরিক প্রায় ২,০০০,০০০,০০০্ টাকা পর্য্যন্তও হয়। এখন এই বরফ-স্তূপ রাস্তা-ঘাট হইতে পরিষ্কার করিবার জন্য মোটর-ট্রাকের প্রচুর ব্যবহার হইতেছে।

পূর্ব্বকালে লোক লাগাইয়া কোদাল ইত্যাদির দ্বারা রাস্তা-ঘাট হইতে বরফ সরাইয়া ফেলা হইত। এইপ্রকারে সময় এবং খরচ ভয়ানক বেশী লাগিত, এবং কাজও বিশেষ ভালো হইত না। বর্ত্তমানে এই কাজ কলের সাহায্যেই ভালো করিয়া এবং কম খরচে হইতেছে।

আমেরিকাতে বরফস্তূপ সাফ করিবার জন্য যে খরচ হয়, তাহার বেশীর ভাগই রেলওয়ে কোম্পানীরা দিয়া থাকে, কারণ রেল-লাইনের উপর বরফ বেশী পড়ে, এবং রেল-লাইনের পরিমাণ বড়-বড় রাস্তা ইত্যাদি হইতে বহু-পরিমাণে বেশী।
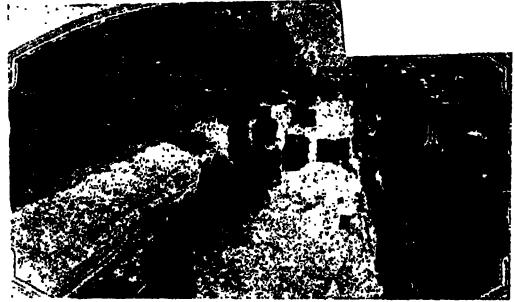
বরফে ঢাকা সহরের রাস্তার দৃশ্য

দুই বা তিন ফুট বরফ পড়িলেই গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমেরিকার পশ্চিম পাহাড়গুলিতে ৬০ ফুট বরফপাতও শীতকালে মাঝে-মাঝে হয়। এই ভয়ানক বরফের স্তূপ রাস্তাঘাট হইতে কোদাল দিয়া সরানো অসম্ভব। এইসমস্ত স্থানে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড রোটারি স্নো-প্লাউজ্ দ্বারা বরফের গাদাকে কাটিয়া রাস্তা বাহির করা হয়। পাহাড়ের উপর হইতে মাঝে-মাঝে বরফের গাদা ধসিয়া রাস্তা ইত্যাদি সব ভাঙিয়া লইয়া যায়, এবং অনেক সময় নীচের কোনো চলন্ত রেলগাড়ীর উপর গিয়াও পড়ে এবং তাহার সর্ব্বনাশ করে।
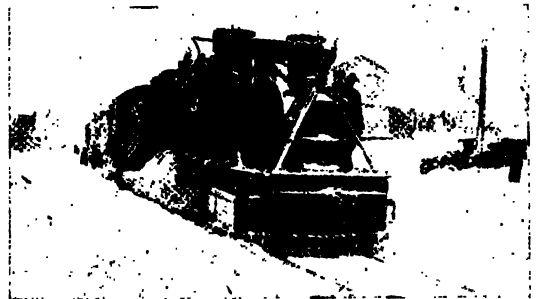
বরফ-কাটা ইঞ্জিন

টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন কোম্পানীরাও এই বরফপাত হইতে রক্ষা পায় না। মাঝে-মাঝে এমন বেশী বরফপাত হয় যে টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের পোষ্ট, তার, ইত্যাদি সব ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া যায়।

এইসঙ্গে কয়েকখানি ছবি দেওয়া হইল. ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে বরফপাতের পরিমাণ কি-প্রকার হয়, এবং তাহা হইতে উদ্ধারই বা কেমন করিয়া হয়।

—

সমুদ্র-উপকূল পাহারা—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মদ্য-ব্যবসায় বা তাহা পান করা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যতই আইন করা হোক. দেশে একদল লোক সকল সময়েই থাকে যাহারা সকল-প্রকার আইন ভঙ্গ করিয়া এবং শাস্তিভয় উপেক্ষা করিয়া নিষিদ্ধ অন্যায় কার্য্য করিবেই। আমেরিকাতেও, যদিও আইন করিয়া মদ্য ব্যবসায় বন্ধ করা হইয়াছে, তবুও একদল লোক চুরি-চামারি করিয়া নানা-প্রকার মাদক দ্রব্য দেশের মধ্যে চালান দিতেছে। জাহাজে করিয়া অন্য

স্মাগ্‌লার ধরিবার উদ্দেশে অতি সন্তর্পণে দুই কর্ম্মচারী দ্রুতগামী লঞ্চে চলিয়াছে

দেশ হইতে এইসমস্ত দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়। এইপ্রকার চুরি-চামারির ফলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হয়, কারণ সকল-প্রকার মাদক দ্রব্যের উপর খাজনা আছে, এবং তীরে নামিবার সময় কাষ্টম্‌স্-হাউসে এই খাজনা আদায় করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু যদি খাজনা আদায়কারীদের ফাঁকি দিয়া এইসমস্ত মাদক দ্রব্য দেশে ঢুকাইতে পারা যায়, তাহা হইলে কম দামে
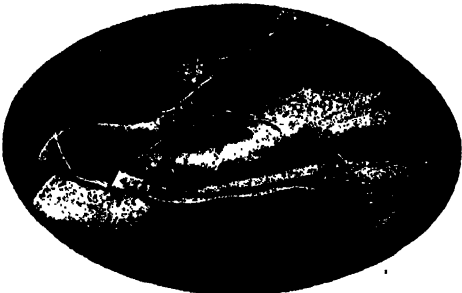
"স্মাগ্‌লার"রা পাহারাওয়ালাদের ঠকাইবার জন্ত এইপ্রকার গরুর খুরের মতন জুতা ব্যবহার করে

বিক্রয় করিয়াও বেশ দু-পয়সা লাভ করা যায়। এই অন্যায় বন্ধ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট এরোপ্লেন, মোটর, জাহাজ, লোকলস্কর ইত্যাদি অনেক-কিছুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহারা দিনরাত্রি, সমস্তক্ষণ আমেরিকার সমস্ত সমুদ্র-উপকূলে চোর ধরিবার জন্ত কড়া পাহারা রাখিয়াছে।
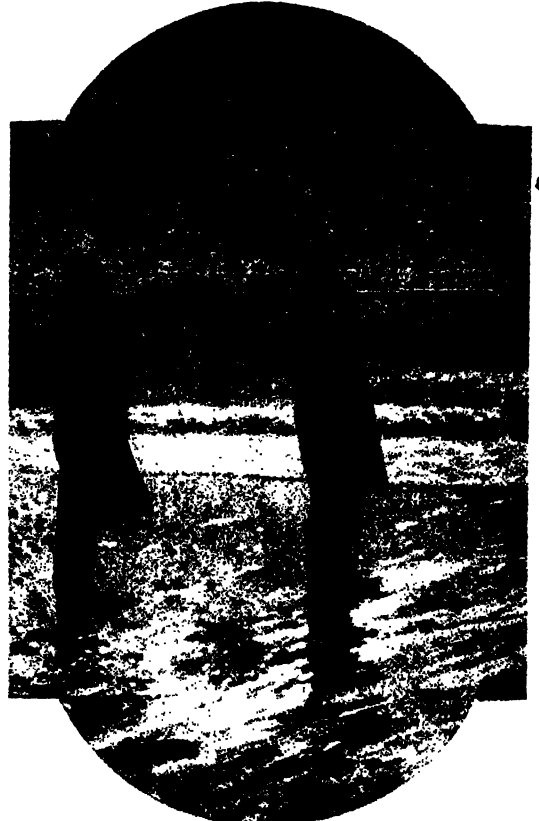
রাত্রিকালে সমুদ্র-তীরে পাহারাওয়ালারা স্মাগ্‌লারদের নৌকার খোঁজে ফিরিতেছে

"স্মাগ্‌লার" (অর্থাৎ যাহারা চুরি করিয়া এবং পাহারাওয়ালার চোখ এড়াইয়া নিষিদ্ধ দ্রব্য দেশে বাহির হইতে চালান করে) ধরিবার জন্ত বড়-বড় দ্রুতগামী জাহাজ সকলসময় তৈয়ার হইয়া আছে।

প্রথম-প্রথম "স্মাগ্‌লার"রা কেবল দামী-দামী হীরা-জহরৎ এবং অলঙ্কারাদি সীমান্ত প্রদেশ দিয়া লুকাইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে লইয়া আসিত। ইহা ধরা বড়ই শক্ত ছিল, কারণ এইসকল দ্রব্যাদি খুব বেশী-পরিমাণে কোনো কালেই আসিত না, এবং দ্রব্যগুলির আকার ছোট ছিল। কিন্তু যখন "হ্যারিসন্-ল" অনুসারে সকল-প্রকার মাদক দ্রব্যই, ঔষধরূপে ছাড়া, মাদকরূপে দেশে আমদানি বন্ধ হইল, সেই ক্ষণ হইতেই দেশের যত পাজী এবং চোর এইসকল দ্রব্য গোপনে আমদানি করিবার জন্ত লাগিয়া গেল। কারণ যাহারা একবার কোনো নেশা ধরিয়াছে, তাহারা নেশার দ্রব্য যত দাম দিয়াই হোক না কেন, ক্রয় করিবেই।

এই-প্রকার পুতুলের মধ্যে অনেক সময় নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়

প্রথম-প্রথম এই গোপন-ব্যবসায় বন্ধ করিতে গবর্ণমেন্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ, কানাডা হইতে অনেক জাহাজের কাপ্তান, নিজের জাহাজে মদ ইত্যাদি বোঝাই করিয়া লইয়া, অন্য কোনো স্থানে যাইবার অছিলা করিয়া, পাসপোর্ট আদায় করিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে সুবিধামত কোথাও মাল নামাইয়া দিয়া যথেষ্ট পয়সা উপায় করিত। এখন কানাডা গভর্ণমেন্ট এইপ্রকার দ্রব্যাদি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের যত জাহাজ আসে, প্রত্যেকটি জাহাজকেই তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময় জাহাজের প্রত্যেকটি বাণ্ডিলকে পরীক্ষা করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, কাগজের বাণ্ডিলের মধ্যে সিগারেটের বাক্স ইত্যাদিতে নানা-প্রকার মাদক দ্রব্য রহিয়াছে।
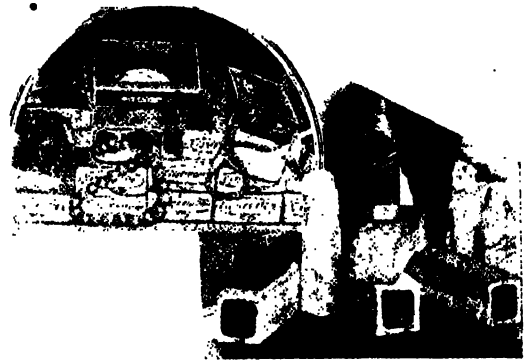
পাঁউরুটি, সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি দ্রব্যের মধ্য হইতে নানা-প্রকার নিষিদ্ধ দ্রব্য বাহির হয়

এত সাবধানতা-সত্ত্বেও অনেক-প্রকার মাদক দ্রব্য "কাষ্টম্‌স্" বিভাগের চোখ এড়াইয়া দেশের মধ্যে প্রবেশ করে।

আমেরিকান্ "কাষ্টম্‌স্" বিভাগের চর আজকাল পৃথিবীর সকল স্থানেই ছড়াইয়া আছে। তাহারা সকল দেশের "স্মাগ্‌লার"দের উপর চোখ রাখে। যখনই কোনো-প্রকার নিষিদ্ধ দ্রব্য আমেরিকায় যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখনই তাহারা কেবল্ করিয়া নিউইয়র্কে খবর পাঠায়। দামী হীরা-জহরৎ এবং বিশেষ-বিশেষ মাদক দ্রব্যের কেনা-বেচার উপর এইসকল চরেরা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে নজর রাখে। পারি এবং লণ্ডন এই দুটি স্থানের উপরেই তাহাদের নজর বেশী, কারণ এইসকল স্থানেই সবচেয়ে বেশী চুরি এবং জুয়াচুরি হয়।

আজকাল প্রায় সকল সভ্য দেশেই "স্মাগলিং" ধরিবার জন্য কাষ্টম্‌স্ বিভাগ আছে, এবং তাহারা সকলেই কিছু-কিছু কাজ করে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কাষ্টম্‌স্ বিভাগের কর্ম্মচারীদের মতন কর্ম্মতৎপর, কর্ত্তব্য-পরায়ণ এবং বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী খুব কমই অন্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

—

বাইসাইকেলের সংখ্যা—

হলাণ্ডের Amsterdam সহরে পায়ে-চলা লোকের সংখ্যা অপেক্ষা বাইসাইকেল-চাপা লোকের সংখ্যা বেশী। মোটরকারের দাম এবং রাখতি-খরচ বেশী বলিয়া সকলে মোটরকার ব্যবহার করিতে পারে না, সেইজন্য তাড়াতাড়ি নানা-প্রকার কাজের জন্য বাইসাইকেলের প্রচুর ব্যবহার এই দেশে হয়।

ডাক্তারী ও কবিরাজী

পরশুরাম

আমি চিকিৎসক নহি, তথাপি আমার ন্যায় অব্যবসায়ীর চিকিৎসা-সম্বন্ধে আলোচনা করার হেতু আছে। আমার এবং আমার উপর যাঁহারা নির্ভর করেন তাঁহাদের মাঝে-মাঝে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এবং সেই চিকিৎসা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তাহা আমাকেই স্থির করিতে হয়। অ্যালোপাথী, হোমিওপাথী, কবিরাজী হাকিমী, পেটেন্ট, স্বস্ত্যয়ন, মাদুলী, আরো কত কি,—এই-সকল নানা পন্থা হইতে একটি বা ততোঽধিক আমাকে বাছিয়া লইতে হয়। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের উপদেশে বিশেষ সুবিধা হয় না, কারণ তাঁহাদের অবস্থা আমারই তুল্য। আর যদি কেহ চিকিৎসক বন্ধু থাকেন, তাঁর মত একেবারেই অগ্রাহ্য, কারণ তিনি আপন পদ্ধতিতে অন্ধ-বিশ্বাসী। অগত্যা জীবন-মরণসংক্রান্ত এই বিষম দায়িত্ব আমারই উপর পড়ে।

শুনিতে পাই চিকিৎসাবিদ্যা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। বিজ্ঞানের নামে আমরা একটু অভিভূত হইয়া পড়ি। ডাক্তার, কবিরাজ, মাদুলিবিশারদ সকলেই বিজ্ঞানের দোহাই দেন। কাহার শরণাপন্ন হইব? সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এত গণ্ডগোল নাই। ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী গোল। প্রমাণ মনে নাই, মনে থাকিলেও পরীক্ষার প্রবৃত্তি নাই। সকলেই বলে পৃথিবী গোল, সুতরাং আমি তাহা বিশ্বাস করি। যদি ভবিষ্যতে পৃথিবী ত্রিকোণ বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে আমার বা আত্মীয়স্বজনের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি হইবে না। কিন্তু চিকিৎসাতত্ত্ব-সম্বন্ধে লোকে একমত নয়, সেজন্য সকলেই একটা গতানুগতিক বাঁধারাস্তায় চলিতে চায় না।

সর্ব্বাবস্থায় সকল রোগীকে নিরাময় করার ক্ষমতা কোনো পদ্ধতিরই নাই, আবার অনেক রোগ আপনা-আপনি সারে, অথচ চিকিৎসার কাকতালীয় খ্যাতি হয়। সুতরাং অবস্থাবিশেষে ভিন্ন-ভিন্ন লোক আপন বিবেচনা ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন চিকিৎসার শরণ লইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিকিৎসানির্ব্বাচনে এত মতভেদ থাকিলেও দেখা যায় যে মাত্র কয়েকটি পদ্ধতির প্রতিই লোকের সর্বাধিক অনুরাগ। ব্যক্তিগত জনমত যতটা অব্যবস্থিত, জনমত সমষ্টি তত নয়। ডাক্তারী (অ্যালোপাথী), হোমিওপাথী ও কবিরাজী বাংলাদেশে যতটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনায় অন্যান্য পদ্ধতি বহুপশ্চাতে পড়িয়া আছে।

যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন তাঁহারা নিজের বিশ্বাস-অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু সকলের সামর্থ্যে তাহা কুলায় না, রাজার বা জনসাধারণের আনুকূল্যের উপর আমাদের অনেককেই নির্ভর করিতে হয়। যে-পদ্ধতি সরকারী সাহায্যে পুষ্ট তাহাই সাধারণের সহজ-লভ্য। যদি রাজমত বা জনমত বহুপদ্ধতির অনুরাগী হয় তবে অর্থ ও উদ্যমের সংহতি খর্ব্ব হয়, জনচিকিৎসার কোনো সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং উপযুক্ত পদ্ধতিনির্ব্বাচন যেমন বাঞ্ছনীয়, মতৈক্যও তেমনি বাঞ্ছনীয়।

দেশের কর্ত্তা ইংরেজ, সেজন্য বিলাতে যে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এদেশে তাহাই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কবিরাজীর সপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে যে এই সুলভ সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে সাহায্য করা সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। হোমিওপাথী সম্বন্ধে যদিও জনমত খুব প্রবল, তথাপি তাহার সপক্ষে এমন আন্দোলন নাই। কারণ বোধ হয় এই, যে, হোমিওপাথী সর্ব্বাপেক্ষা অল্পব্যয়-সাপেক্ষ, সেজন্য কাহারো মুখাপেক্ষী নয়। সরকারী সাহায্যের বখরা লইয়া যে-দুটি পদ্ধতিতে এখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে, অর্থাৎ সাধারণ ডাক্তারী ও কবিরাজী,—আমরা তাহাদের সম্বন্ধেই

আলোচনা করিব। হাকিমী পদ্ধতি ভারতের অন্যত্র কবিরাজীর মতনই জনপ্রিয়, কিন্তু বাংলাদেশে তেমন প্রচলিত নয়, সেজন্য তাহার আলোচনা করিব না। তবে কবিরাজী-সম্বন্ধে যাহা বলিব, হাকিমী-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

যাঁহারা প্রাচ্যপদ্ধতির ভক্ত তাঁহাদের প্রবল আন্দোলনে সরকার একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন—বেশ ত, একটা কমিটী করিলাম, ইঁহারা বলুন প্রাচ্যপদ্ধতি সাহায্যলাভের যোগ্য কি না, তার পর যা হয় করা যাইবে। এই কমিটী দেশী-বিলাতী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মত লইতেছেন। এযাবৎ যাহা লইয়া মতভেদ হইয়া আসিতেছে, তাহা সাধারণের অবোধ্য নয়। সরকারী অর্থসাহায্য যাহাকেই দেওয়া হোক, তাহা সাধারণেরই অর্থ, অতএব সাধারণের এবিষয়ে উদাসীন থাকা অকর্ত্তব্য। অর্থ ও উদ্যম যাহাতে যোগ্য পাত্রে যোগ্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাহা সকলেরই দেখা উচিত।

প্রাচ্যপদ্ধতির বিরোধীরা বলেন,—তোমাদের শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। বাত, পিত্ত, কফ, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এ-সকল কেবল হিং টিং ছট্। তোমাদের ঔষধে কিছু-কিছু ভালো উপাদান আছে স্বীকার করি, কিন্তু তার সঙ্গে বিস্তর বাজে-জিনিষ মিশাইয়া অনর্থক আড়ম্বর করা হইয়াছে। তোমাদের ঋষিরা প্রাচীন আমলের হিসাবে খুব জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু তোমরা কেবল অন্ধভাবে সেকালের অনুসরণ করিতেছ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে পারো নাই। তোমরা ভাবো যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাই চূড়ান্ত, তার পর আর কিছু করিবার নাই। অথচ তোমরা আয়ুর্ব্বেদবর্ণিত অস্ত্রচিকিৎসার মাথা খাইয়াছ। চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে গেলে যেসব বিদ্যা জানা দরকার, যথা anatomy, physiology, botany, chemistry ইত্যাদি, তার কিছুই জানো না। মুখে যাই বলো, ভিতরে-ভিতরে তোমাদের আত্মনির্ভরতায় শোষ ধরিয়াছে, তাই লুকাইয়া কুইনীন ব্যবহার করো। তোমাদের সাহায্য করিলে কেবল কুসংস্কার ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এইবার আমাদের কথা শুন।—আমরা কোনো প্রাচীন যোগী-ঋষির উপর নির্ভর করি না। হিপোক্রাটিস গালেনের আমরা অন্ধ শিষ্য নহি। আমাদের বিদ্যা নিত্য উন্নতিশীল। পূর্ব্বসংস্কার যখনি ভুল বলিয়া মনে করি, তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করি। বিজ্ঞানের যে-কোনো আবিষ্কারের সাহায্য লইতে আমাদের দ্বিধা নাই। ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া নব-নব ঔষধ ও চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করি। আমাদের কেহ-কেহ মকরধ্বজ ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে। আমাদের কুসংস্কার ও আত্মম্ভরিতা নাই।

অপর পক্ষ বলেন,—আচ্ছা বাপু, তোমাদের বিজ্ঞান আমরা জানি না, মানিলাম। কিন্তু আমাদের এই যে বিশাল আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞান, তোমরা কি তাহা অধ্যয়ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ? বাত পিত্ত কফ না বুঝিয়াই ঠাট্টা করো কেন? আমাদের অবনতি হইয়াছে স্বীকার করি, এখন আর আমাদের মধ্যে নূতন ঋষি জন্মান না। অগত্যা যদি আমরা পুরাতন ঋষির উপদেশেই চলি, সেটা কি মন্দের ভালো নয়? তোমাদের পদ্ধতিতে অনেক ব্যয়। তোমাদের স্কুলে একটা হাতুড়ে ডাক্তার উৎপন্ন করিতে যত খরচ, তার সিকির সিকিতে আমাদের বড়-বড় মহামহোপাধ্যায় গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তোমাদের ঔষধ সরঞ্জাম পথ্যাদি-সমস্তই মহার্ঘ্য। বিদেশের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। বিজ্ঞানের অজুহাতে তোমরা চিকিৎসায় বিলাতী কুসংস্কার ও বিলাসিতা আমদানি করিয়াছ। আমাদের ঔষধ-পথ্য সমস্তই সস্তা, এ-দেশেই পাওয়া যায়, গরীবের সাধ্যায়ত্ত। আমাদের ঔষধে যতই বাজে জিনিষ থাক্, স্পষ্টই দেখিতেছি উপকার হইতেছে। তোমাদের অনেক ঔষধে সুরাসার আছে। বিলাতী উদরে হয়ত তাহা সমুদ্রে জলবিন্দু, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত পাকস্থলীতে সেই অপেয় অদেয় অগ্রাহ্য জিনিষ ঢালিবে কেন? আমাদের দেশবাসীর ধাতু তোমাদের বিলাতী গুরুগণ কি করিয়া বুঝিবেন? তোমাদের চিকিৎসা যতই ভালো হোক, এই দরিদ্র দেশের কজনের ভাগ্যে তাহা জুটিবে? যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁরা ডাক্তারী চিকিৎসা করা'ন, কিন্তু গরীবের ব্যবস্থা আমাদের হাতে দাও। বড়-বড় ডাক্তার যাকে জবাব দিয়াছে এমন

রোগীকেও আমরা আরাম করিয়াছি, বিদ্বান্ সম্ভ্রান্ত লোকেও আমাদের ডাকে, আমরাও মোটর চালাই। কেবল কুসংস্কারের ভিত্তিতে কি এতটা প্রতিপত্তি হয়? মোট কথা, তোমাদের বিজ্ঞান এক-পথে গিয়াছে, আমাদের অন্য পথে গিয়াছে। কিছু তোমরা জানো, কিছু আমরা জানি। অতএব চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দ টাকার কিছু তোমরা লও, কিছু আমরা লই।

আমার মনে হয় এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে 'বিজ্ঞান' শব্দের অসংযত প্রয়োগ এবং 'চিকিৎসা-বিজ্ঞান' ও 'চিকিৎসা-পদ্ধতি'র অর্থ বিপর্য্যয়। Eastern science, eastern system, western science, western system—এসকল কথা প্রায়ই শুনা যায়। কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা ভালো।

'বিজ্ঞান' বলিলে যদি ভ্রান্তিহীন সিদ্ধান্ত বুঝায় তবে তাহা দেশকালপাত্রনির্ব্বিশেষে সত্য। অতএব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের এরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, একই সিদ্ধান্ত কোথাও সত্য কোথাও মিথ্যা। কু-তার্কিক বলিতে পারে—শ্রাবণ মাসে বর্ষা হয় ইহা এদেশে সত্য বিলাতে মিথ্যা; মশায় ম্যালেরিয়া আনে, ইহা একালে সত্য সেকালে মিথ্যা। এরূপ যুক্তির খণ্ডনের আবশ্যকতা নাই। অতএব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের অর্থ দাঁড়াইতেছে—বিভিন্ন দেশে আবিষ্কৃত সত্য সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিকের সম্পত্তি নয়। সাধারণ লোক ও বৈজ্ঞানিকের এই মাত্র প্রভেদ যে, বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত অধিকতর সূক্ষ্ম, শৃঙ্খলিত ও ব্যাপক। আমরা সকলেই বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। অগ্নিপক্ব দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, এই বৈজ্ঞানিক সত্য অবলম্বন করিয়া রন্ধন করি, দেহ-আবরণে শীত নিবারণ হয়, এই তথ্য জানিয়া বস্ত্রধারণ করি। কতক সংস্কারবশে করি, কতক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করি। অসত্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াও অনেক কাজ করি বটে, কিন্তু জীবনের যাহা কিছু সফলতা তাহা সত্য সিদ্ধান্ত দ্বারাই লাভ করি। চরক বলিয়াছেন—

> সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ং
> সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতং।

শারীরিক মানসিক সমগ্র দুঃখ অবিজ্ঞান-জনিত। সমগ্র সুখ বিমল বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত।

গাড়ীতে চাকা লাগাইলে সহজে চলে এই সিদ্ধান্ত কোন্ দেশে কোন্ যুগে কোন্ মহা বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল জানা যায় নাই, কিন্তু সমস্ত জগৎ নির্ব্বিরোধে ইহার সদ্ব্যবহার করিতেছে। চশমা ক্ষীণ দৃষ্টির সহায়তা করে, এই সত্য পাশ্চাত্য দেশে আবিষ্কৃত হইলেও এদেশের লোক তাহা মানিয়া লইয়াছে। বিজ্ঞান বা সত্য সিদ্ধান্তের উৎপত্তি যেখানেই হউক, তাহার জাতি-দোষ থাকিতে পারে না, বয়কট চলিতে পারে না।

কিন্তু কি করিয়া বুঝিব অমুক সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক কি না? বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ আছে। আজ যাহা অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে ভবিষ্যতে হয়ত তাহাতে ত্রুটি বাহির হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তেরও মর্য্যাদা-ভেদ আছে। মোটামুটি সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে এই দুই শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে—

১। যাহার পরীক্ষা সাধ্যায়ত্ত এবং বার-বার হইয়াছে।

২। যাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইতে পারে নাই অথবা হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যাহা অনুমানসিদ্ধ এবং যাহার সহিত কোনো সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরোধ এখন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তেরই ব্যাবহারিক মূল্য অধিক। এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত আরো নানা-প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে যাহা এখনো অপরীক্ষিত অথবা কেবল লোক-প্রসিদ্ধি বা ব্যক্তি-বিশেষের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এপ্রকার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনেক কাজ করিয়া থাকি, কিন্তু এগুলিকে বিজ্ঞানের শ্রেণীতে ফেলা অনুচিত।

চিকিৎসা একটি ব্যাবহারিক বিদ্যা। ইহার প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হয়। কিন্তু এই-সমস্ত বিজ্ঞানের সকলগুলি সমান উন্নত নয়। কৃত্রিম যন্ত্রের কার্য্যকারিতা অথবা এক-দ্রব্যের উপর অপর দ্রব্যের ক্রিয়া-সম্বন্ধে যত সহজে পরীক্ষা চলে এবং পরীক্ষার ফল

যে-প্রকার নিশ্চয়তার সহিত নির্দ্ধারণ করা যায়, জটিল মানব-দেহের উপর সে-প্রকার সুনিশ্চিত পরীক্ষা করা সহজ নয়। সুতরাং চিকিৎসা-বিজ্ঞায় সংশয় ও অনিশ্চয়তা অনিবার্য্য। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর চিকিৎসাবিদ্যা যতটা নির্ভর করে, অল্প পরীক্ষিত, অপরীক্ষিত, কিম্বদন্তীমূলক বা ব্যক্তিগত মতের উপর ততোধিক নির্ভর করে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্ববিধ চিকিৎসা-সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র চিকিৎসা-বিদ্যাকে 'বিজ্ঞান' বলা অত্যুক্তি মাত্র, এবং তাহাতে সাধারণের বিচার-শক্তিকে সন্ত্রস্ত করা হয়।

কবিরাজগণ মনে করেন তাঁহাদের চিকিৎসা-পদ্ধতি একটা স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান, অতএব ডাক্তারী বিদ্যার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক রাখা নিষ্প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ্যার যে-অংশ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহা লইয়া মতভেদ চলিতে পারে, কিন্তু যাহা বিজ্ঞান-সম্মত এবং প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত তাহাকে বর্জ্জন করা আত্ম-বঞ্চনা মাত্র। অমুক তথ্য বিলাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই,—কবিরাজগণের এই ধারণা যদি পরিবর্ত্তিত না হয় তবে তাঁহাদের অবনতি অনিবার্য্য। এমন দিন ছিল যখন দেশের লোকে সকল রোগেই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইত। কিন্তু আজকাল যাঁহারা কবিরাজীর অত্যন্ত ভক্ত তাঁহারাও মনে করেন কেবল বিশেষ-বিশেষ রোগেই কবিরাজী ভাল। নিত্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রভাবে কবিরাজী-চিকিৎসার এই সংকীর্ণ সীমা ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্য পদ্ধতিরই চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও যে আয়ুর্ব্বেদ হইতে কিছু শিখিবার নাই তাহা সম্ভব নয়। নবলব্ধ বিদ্যার গর্ব্বে হয়ত তাঁহারা অনেক পুরাতন সত্য হারাইয়াছেন। এইসকল সত্যের সন্ধান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। চরকের এই মহাবাক্য সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য—

নচৈব হি সুতরাং আয়ুর্ব্বেদস্য পারং, তস্মাৎ অপ্রমত্তঃ শশ্বৎ অভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ।…কৃৎস্নোহি লোকো বুদ্ধিমতাং আচার্য্যঃ, শত্রুশ্চ অবুদ্ধিমতাং। এতচ্চ অভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং লোকহিতকরং ইতি উপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যং অনুবিধাতব্যঞ্চ।

সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের শেষ নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদা ইহাতে অভিনিবেশ করিবে।…বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন, কিন্তু অবুদ্ধিমান্ সকলকেই শত্রু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধনকর, যশস্কর, আয়ুষ্কর ও লোকহিতকর উপদেশ-বাক্য অমিত্রের নিকটেও শুনিবেন এবং অনুসরণ করিবেন।

কেহ-কেহ বলিবেন, কবিরাজগণ যদি ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা ভক্তগণের শ্রদ্ধা হারাইবেন,—যদিও সেসকল ভক্ত আবশ্যক-মত ডাক্তারী চিকিৎসাও করান। এআশঙ্কা হয়ত সত্য। এমন লোক অনেক আছে যাহারা নিত্য অশাস্ত্রীয় আচরণ করে কিন্তু ধর্ম্ম-কর্ম্মের সময় পুরোহিতের নিষ্ঠার ত্রুটি সহ্য করিতে পারে না। সাধারণের এইপ্রকার অন্ধ বিশ্বাসের জন্য কবিরাজগণ অনেকটা দায়ী। তাঁহারা এযাবৎ প্রাচীনকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সাধারণেও তাই শিখিয়াছে। তাঁহারা যদি বিজ্ঞাপনের ভাষা অন্যবিধ করেন এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সাক্ষ্য একটু কমাইয়া বর্ত্তমান কালোচিত যুক্তি প্রয়োগ করেন, তবে লোক-মতের সংস্কারও অচিরে হইবে।

শাস্ত্র এবং ব্যবহার এক-জিনিষ নয়। হিন্দুর শাস্ত্র যাহা ছিল তাহাই আছে কিন্তু ব্যবহার যুগে-যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অথচ সেকালেও হিন্দু ছিল, একালেও হিন্দু আছে। প্রাচীন চিন্তাধারার ইতিহাস এবং প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে শাস্ত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সযত্ন অধ্যয়নের বস্তু, কিন্তু কোনো শাস্ত্রেই চিরকালের উপযোগী ব্যাবহারিক পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। চরক-সুশ্রুতের যুগে অজ্ঞাত অনেক ঔষধ ও প্রণালী রসরত্নাকর ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কোনো-একটি বিশেষ যুগ পর্য্যন্ত যে-সকল আবিষ্কার বা উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাই আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত, তাহার পরে আর উন্নতি হইতে পারে না,—এরূপ ধারণা অধোগতির লক্ষণ। নূতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিলেই আয়ুর্ব্বেদীয় পদ্ধতির জাতি

নাশ হইবে না। বিজ্ঞান ও পদ্ধতি এক নয়। বিজ্ঞান সর্ব্বত্র সমান, কিন্তু পদ্ধতি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞানের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বিভিন্ন সমাজের উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং একই পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াও আপন সমাজগত বিশেষত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে পারে।

বিলাতের লোক টেবিলে চিনা-মাটির বাসন, কাচের গ্লাস ইত্যাদির সাহায্যে রুটি মাংস মদ খায়। আমাদের দেশের লোকের ক্ষমতা ও রুচি অন্যবিধ, তাই ভূমিতে কলাপাতা বা পিতল কাঁসার বাসনে ভাত ডাল জল খায়। উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। হইতে পারে বিলাতী পদ্ধতি অধিকতর সভ্যজনোচিত। কিন্তু কলাপাতে ভাত ডাল খাইলেও বিজ্ঞানের অবমাননা হয় না। দেশীয় পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আলু কপির ব্যবহার বিলাত হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী প্রথায় রাঁধি। গ্লাসে জল খাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী রুচি-অনুসারে পিতল-কাঁসায় গড়ি। এইরূপ অনেক জিনিষ, অনেক প্রথা একটু বদলাইয়া বা পুরাপুরি লইয়া আপন পদ্ধতির অঙ্গীভূত করিয়াছি। অনেক দুষ্ট প্রথা শিখিয়া ভুল করিয়াছি, কিন্তু যদি নির্ব্বিচারে ভালো মন্দ সকল বিলাতী প্রথাই বর্জ্জন করিতাম, তবে আরো বেশী ভুল করিতাম।

চাকা-সংযুক্ত গাড়ী যে একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যদি ধনী হই, আমার দেশের রাস্তা যদি ভালো হয় এবং যদি উপযুক্ত চালকের অভাব না থাকে, তবে আমি মোটরে যাতায়াত করিতে পারি। কিন্তু যদি আমার অবস্থা মন্দ হয়, অথবা পল্লীগ্রামের কাঁচা অসম পথে যাইতে হয়, অথবা যদি গাড়োয়ান ভিন্ন অন্য চালক না থাকে, তবে আমাকে গরুর গাড়ীই চড়িতে হইবে। আমি জানি যে, গোযান অপেক্ষা মোটর-যান বহু বিষয়ে উন্নত, এবং মোটরে যত-প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে গোযানে তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। তথাপি আমি গরুর গাড়ী নির্ব্বাচন করিয়া বিজ্ঞানের অবমাননা করি নাই। মোটরে যে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সমবায় আছে তাহা আমার অবস্থার অনুকূল নয়, অথচ যে সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর গরুর গাড়ী নির্ম্মিত তাহাতে আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু যদি গরুর গাড়ীর শেষ প্রান্তে চাকা বসাই অথবা ছোট-বড় চাকা ব্যবহার করি তাহা হইলে বিজ্ঞানকে বর্জ্জন করা হইবে। অথবা যদি আমাকে অন্ধকারে দুর্গম পথে যাইতে হয়, এবং কেহ গাড়ীর সম্মুখে লণ্ঠন বাঁধিবার যুক্তি দিলে বলি—গরুর গাড়ীর সামনে কস্মিন্‌কালে কেহ লণ্ঠন বাঁধে নাই, অতএব আমি এই অনাচার দ্বারা সনাতন গোযানের জাতিনাশ করিতে পারি না,—তবে আমার মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি মোটরের প্রতি অন্ধ ভক্তির বশে মনে করি বরং বাড়ীতে বসিয়া থাকিব তাহাও স্বীকার তথাপি অসভ্য গোযানে চড়িব না, তবে হয়ত আমার পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি হইবে।

কেহ যেন মনে না করেন যে আমি কবিরাজী পদ্ধতিকে গরুর গাড়ীর মতন হীন এবং ডাক্তারীকে মোটরের মতন উন্নত বলিতেছি! আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারে এমন তথ্য নিশ্চয় আছে যাহা শিখিলে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ধন্য হইবেন। আমার ইহাই বক্তব্য যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি একাধিক পদ্ধতিতে হইতে পারে, এবং অবস্থা-বিশেষে অতি প্রাচীন অথবা অনুন্নত উপায়ও বিজ্ঞের গ্রহণীয়,—যদি অন্ধ সংস্কার না থাকে এবং আবশ্যক- ও সাধ্য-মত পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধা না থাকে। এই পরিবর্ত্তন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপন-বিষয়ে কেবল যে কবিরাজী পদ্ধতিই উদাসীন তাহা নয়, ডাক্তারীও সমান দোষী। ডাক্তারী পদ্ধতি বিলাত হইতে যথাযথ উঠাইয়া আনিয়া এদেশে স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে যে নিত্য-বর্দ্ধমান বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, সে-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার ঔষধ কেবল বিলাতে প্রচলিত ঔষধ, তাহার পথ্য বিলাতেরই পথ্য। এদেশে পাওয়া যায় কি না, অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতর কিছু আছে কি না, তাহা ভাবিবার দরকার হয় না। দেশীয় উপকরণে আস্থা নাই, কারণ তাহার সহিত পরিচয় নাই। যাহা আবশ্যক তাহা বিদেশ হইতে আসিবে। চিকিৎসার সমস্ত উপকরণ বিলাতের জ্ঞান বুদ্ধি অভ্যাস ও রুচি অনুযায়ী উৎকৃষ্ট

এবং সুদৃশ্য হওয়াই চাই, তাহার খরচ এই দরিদ্র দেশ যোগাইতে না পারিলেও আপত্তি নাই। দেশসুদ্ধ লোকের ব্যবস্থা না-ই হইল, যে ক'জনের হইবে তাহা বিলাতের মাপকাঠিতে প্রকৃষ্ট হওয়া চাই। কাঙালী ভোজনের টাকা যদি কম হয় তবে বরঞ্চ জনকতককে পোলাও খাওয়ানো হইবে কিন্তু সকলকে মোটাভাত দেওয়া চলিবে না। বর্ত্তমান সরকারী ব্যবস্থায় ইহাই দাঁড়াইয়াছে।

একদল পুরাতনকে বাঁচাইবার জন্য বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন; আর-একদল পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে চান। একদিকে অসংস্কৃত সুলভ ব্যবস্থা, অন্যদিকে অতিমার্জ্জিত উপচারের ব্যয়-বাহুল্য। আমাদের কবিরাজ এবং ডাক্তারগণ যদি নিজ-নিজ পদ্ধতিকে কুসংস্কারমুক্ত এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টা করেন, তবে ক্রমশঃ উভয় পদ্ধতির সমন্বয় হইয়া এ-দেশের উপযোগী জীবন্ত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব হইতে পারে। যাঁহারা এই উদ্যোগে অগ্রণী হইবেন তাঁহাদিগকে দেশী বিদেশী উভয়বিধ পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে এবং ভ্রম, প্রমাদ, পক্ষপাত বর্জ্জন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতি হইতে বিজ্ঞান-সম্মত বিধান এবং চিকিৎসার যথাসম্ভব দেশীয় উপায় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কেবল উৎকর্ষের দিকেই লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না,—যাহাতে চিকিৎসার উপায় বহু প্রসারিত, দরিদ্রের সাধ্যায়ত্ত, সুদূর পল্লীতেও সহজপ্রাপ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য যদি নূতন এক-শ্রেণীর চিকিৎসক সৃষ্টি করিতে হয়, এবং ব্যয়লাঘবের জন্য নিকৃষ্ট প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার্য্য। কবিরাজী পাচন, অরিষ্ট, চূর্ণ, মোদক, বটিকাদির প্রস্তুত-প্রণালী যদি অল্পব্যয়সাপেক্ষ হয়, তবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এ প্রকার ঔষধ যদি ডাক্তারী টিংচার প্রভৃতির মতন standardised অথবা অসার অংশবর্জ্জিত না হয় তাহাতেও আপত্তি নাই। দেশের যে অসংখ্য লোকের ভাগ্যে কোনো চিকিৎসাই জুটে না তাহাদের পক্ষে মোটামুটি ব্যবস্থাও ভালো। ইহাতে চিকিৎসাবিদ্যার অবনতি হইবার কারণ নাই,—যাহার সামর্থ্য ও সুযোগ আছে সে প্রকৃষ্ট চিকিৎসাই করিতে পারে। অবশ্য যদি দেশের অবস্থা উন্নত হয় তবে নিম্নস্তরের চিকিৎসাও ক্রমে উচ্চস্তরে পৌছিবে।

কবিরাজগণ দেশীয় ঔষধের গুণাবলী এবং প্রস্তুত-প্রণালীর সহিত সুপরিচিত। ঔষধের বাহ্য আড়ম্বর বা চাক্‌চিক্যের উপর তাঁহাদের অন্ধভক্তি নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তারগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অধিকতর উন্নত। অতএব উভয় পক্ষের মত-বিনিময় না হইলে এই সমন্বয় ঘটিবে না।

এইপ্রকার চিকিৎসা সংস্কারের জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক। প্রচলিত কবিরাজী পদ্ধতিকে সাহায্য করিলে দেশে চিকিৎসা-অভাব অনেকটা দূর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি অসম্পূর্ণ হইবে, ডাক্তারীর ব্যয়বাহুল্য এবং কবিরাজীর অন্ধ গতানুবর্ত্তিতা কমিবে না। যদি অর্থ ও উদ্যমের সদ্‌ব্যবহার করিতে হয়, তবে সরকারী সাহায্যে এইপ্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া উচিত।—

১। ডাক্তারী স্কুল-কলেজে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদকে স্থান দেওয়া। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র না পড়িলে যেমন philosophy শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, চিকিৎসা-বিদ্যাও তেম্‌নি আয়ুর্ব্বেদের অপরিচয়ে খর্ব্ব হয়।

২। সাধারণের চেষ্টায় যে-সকল আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহাদের সাহায্য করা। সাহায্যের সর্ত্ত এই হওয়া উচিত যে, চিকিৎসা-বিদ্যার আনুষঙ্গিক আধুনিক বিজ্ঞান-সকলের যথাসম্ভব শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। বিলাতী ফার্ম্মাকোপিয়ার অনুরূপ এদেশের উপযোগী সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধসকলের তালিকা ও প্রস্তুতবিধি লিপিবদ্ধ করা। ডাক্তারী চিকিৎসায় যদিও অসংখ্য ঔষধ প্রচলিত আছে, তথাপি ফার্ম্মাকোপিয়ায় নিবদ্ধ ঔষধসকলেরই অধিক ব্যবহার। বিলাতে গভর্ণ-মেণ্ট দ্বারা নিয়োজিত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক এই ভৈষজ্য-তালিকা প্রস্তুত হয়। দশ পনর বৎসর অন্তর ইহা সংশোধিত করা হয়,—যে-সকল ঔষধ অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয়, সুপরীক্ষিত নূতন

উপাসিকা

গৃহাভিমুখে
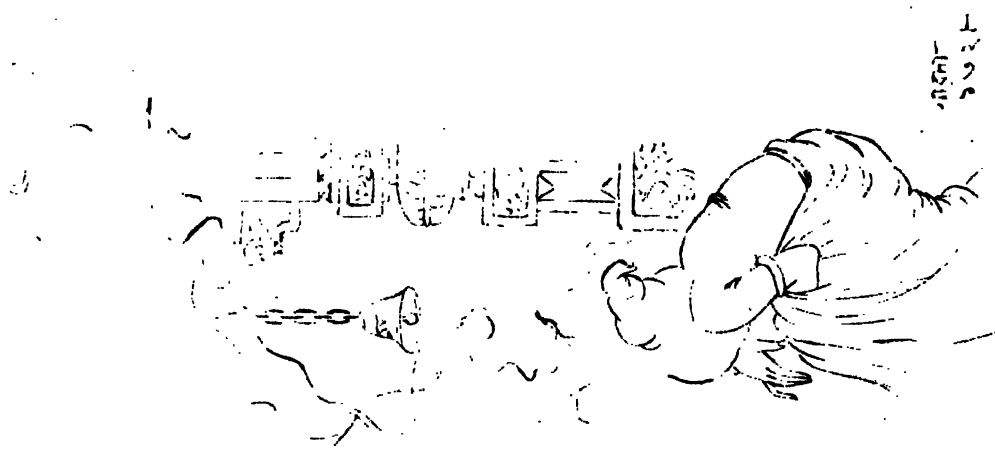
ঔষধ গৃহীত হয় এবং আবশ্যকমত ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালীও পরিবর্ত্তিত করা হয়। এদেশে এককালে শার্ঙ্গধর এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। সকল সভ্য দেশেরই নিজস্ব ফার্ম্মাকোপিয়া আছে এবং তাহা দেশের প্রথা-এবং রুচি-অনুযায়ী সঙ্কলিত হইয়া থাকে। এদেশের বর্ত্তমান কালের উপযোগী ফার্ম্মাকোপিয়ায় যথা সম্ভব দেশীয় সুপরীক্ষিত উপাদানের সন্নিবেশ হওয়া উচিত। ঔষধ প্রস্তুতের যেসকল ডাক্তারী প্রণালী আছে, তাহার অতিরিক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালীও থাকা উচিত। অবশ্য যেসকল ঔষধ বা প্রণালী বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, অখ্যাত বা অপ্রমাণিত, তাহা বর্জ্জিত হইবে। কেবল কিম্বদন্তীর উপর অত্যধিক নির্ভর করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু দেশীয় অমুক ঔষধ বা প্রণালী বিলাতী অমুক ঔষধ বা প্রণালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়াই বর্জ্জিত হইবে না, ব্যয়লাঘব এবং সৌকর্য্যের উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এপ্রকার ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে পক্ষপাতহীন উদারমতাবলম্বী ডাক্তার ও কবিরাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই সংযোগ দুঃসাধ্য, কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই হতাশ হইবার কারণ নাই। এখন ডাক্তারগণই প্রবল পক্ষ, সুতরাং আপাততঃ তাঁহারা একযোগে সাক্ষী এবং বিচারকের আসন গ্রহণ করিবেন এবং কবিরাজগণকে কেবল সাক্ষ্য দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। প্রথমে যাহা দাঁড়াইবে তাহা যতই সামান্য হোক, শিক্ষার বিস্তার এবং জ্ঞানবিনিময়ের ফলে ভবিষ্যতের পন্থা ক্রমশঃ সুগম হইবে।

৪। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাসম্ভব পূর্ব্বোক্ত দেশীয় উপাদান এবং দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধের ব্যবহার। যে সকল নূতন চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান উভয়বিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবেন তাঁহারা সহজেই এইসকল নূতন ঔষধ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এদেশের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অনেক ডাক্তার আয়ুর্ব্বেদকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই সকল নবপ্রচলিত দেশীয় ঔষধের প্রসারে সাহায্য করিতে পারেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা কার্য্যে পরিণত করা অর্থ, উদ্যম ও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় পদ্ধতিকে কালোপযোগী করা এবং চিকিৎসার উপায় সাধারণের পক্ষে সুলভ করার অন্যবিধ পন্থা খুঁজিয়া পাই না। সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হইলেই কার্য্য উদ্ধার হইবে না। চিকিৎসক অচিকিৎসক সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন। মোট কথা, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব এমন হয়, যে জ্ঞান সর্ব্বত্র আহরণ করিব, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োগ দেশের সামর্থ্য, অভ্যাস ও রুচি-অনুসারে এবং লোকের অধিকতম হিতার্থে করিব, তবেই অভীষ্টসিদ্ধি সহজ হইবে।

ভারতবর্ষের কথা

বেলগাঁও কন্‌গ্রেস :—

আমরা সময়মত কন্‌গ্রেসের ছবি পাই নাই, সেইজন্য ছবি দিতে কিছু দেরী হইল। এই ছবিগুলি হইতে এবারকার কন্‌গ্রেসের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক বছরের মত এবারকার কন্‌গ্রেসেও অনেক প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে। এবারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা অসহযোগ স্থগিত করা। এ-দেশ এখনও ইহার জন্য তৈয়ার নহে। স্বরাজ্যদলের কার্য্য পদ্ধতিকে এক-রকম মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

—

কোহাটের দাঙ্গা :—

কোহাটে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়, তাহার একটা মিটমাট গবর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। এই মিটমাট বিফল হইয়াছে। যে-সকল হিন্দু কোহাটে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কোহাটের মুসলমানেরা নাকি পুনরায় হিন্দুদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গাহাঙ্গামার পরই কোহাট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু বড়লাট মহাশয় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মহাত্মাকে কোহাটে
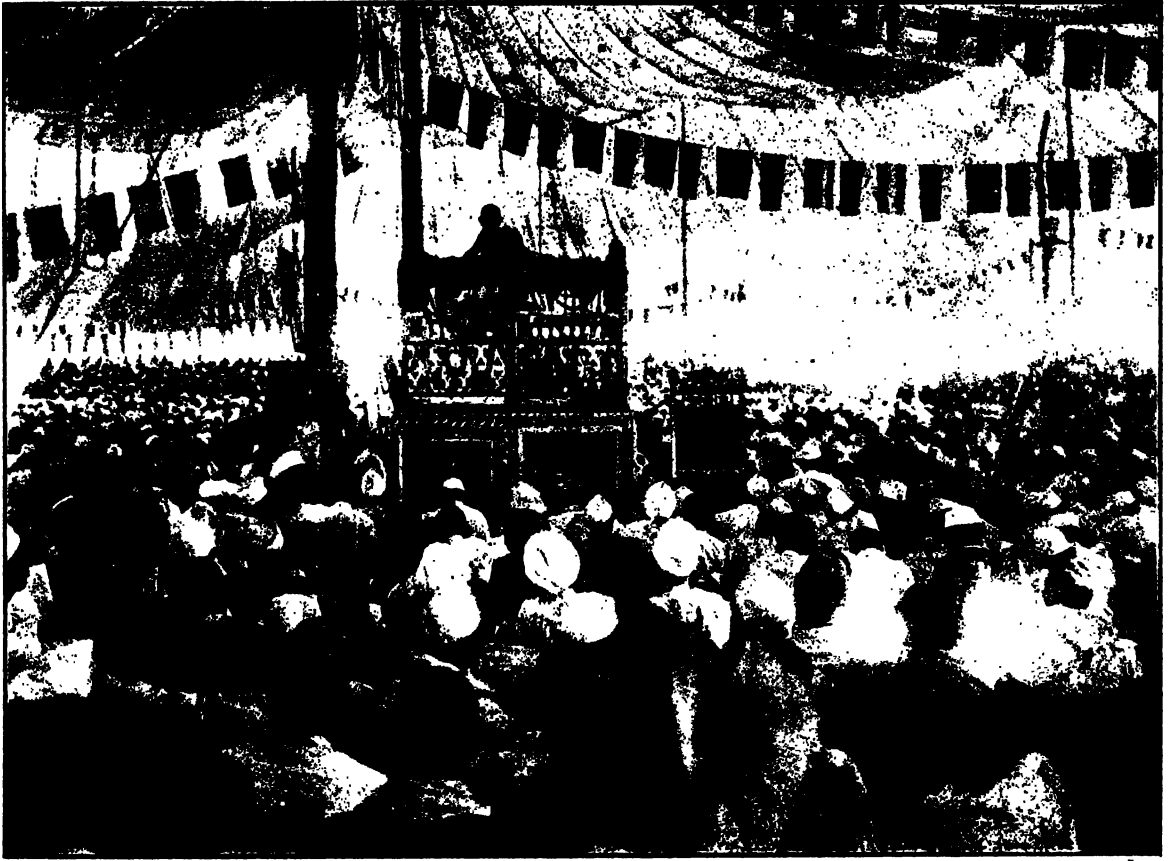
সভাপতির আসনমঞ্চ হইতে বেলগাঁও কনগ্রেসের সভাপতি মহাত্মা গান্ধী সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে নিজ কথা নিবেদন করিতেছেন

যাইবার অনুমতি দেন নাই। বর্ত্তমানে লালা লাজপৎ রায়, মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ নেতৃগণ রাওলপিণ্ডিতে গিয়া কোহাটের হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে একটা মিটমাট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া আশা আছে।

—

স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টারের ক্রোধ :—

"ষ্টার অব উৎকল" পত্রিকায় খবর পাওয়া গেল যে একজন সাহেব-পোষাক-পরিহিত ভারতবাসী স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর পুরীর স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পুরীর স্কুলের তিনজন শিক্ষক সেইদিন সাহেবী-পোষাকে স্কুলে না যাওয়াতে ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়ের ভয়ানক অপমান বোধ হয়, এবং তিনি শাস্তিস্বরূপ এই তিনজন বেয়াদব শিক্ষককে স্কুল হইতে বাহির করিয়া দেন। এই ব্যাপারটি ঘটিবার পর ইহার কোনো প্রতিবাদ বলিয়া খবর হইয়াছে পাওয়া যায় নাই।

—

ভারতের-বাহিনীর নকল যুদ্ধ :—

দিল্লীতে ভারতের বিরাট্-বাহিনীর নকল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এম্-এল্-এ দিগকে লরীতে করিয়া এই নকল যুদ্ধ দেখানো হয়। নকল যুদ্ধ বোধ হয় ভারতবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। এই-সমস্ত নকল যুদ্ধ দেখিয়া ভারতবাসীরা আসল যুদ্ধের ধাচ খানিকটা বুঝিতে পারিবে—এবং ইংরেজদের অসীম শক্তির পরিচয় পাইবে। এই শিক্ষালাভ করিবার জন্য যাহা খরচ হইবে তাহা অবশ্য ভারতবাসীদিগকেই দিতে হইবে।

—

শ্বেতাঙ্গদের স্বতন্ত্র গাড়ী :—

লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লিতে প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে যে, এখন হইতে রেলের গাড়ীতে সাহেবদের জন্য আর আলাদা ইণ্টার বা থার্ড ক্লাস গাড়ী থাকিবে না। অবশ্য রেলওয়ে কোম্পানিরা এই প্রস্তাব-অনুযায়ী কাজ করিবে, তাহার কোনো মানে নাই। গভর্মেণ্ট যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন তাহা ত বোধ হয় না।

—

আফিম ভারতবাসীদের কোনো অনিষ্ট করে না :—

অ্যাসেম্ব্লিতে আরো একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে। স্যার বেসিল ব্লাকেট বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের লোকেদের পক্ষে আফিম অহিতকারী নয়। হিতকারী কি না, তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও ভাবে

মহাত্মা গান্ধী, আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য নেতা-সমভিব্যাহারে কন্‌গ্রেস্ ভলান্টিয়ার দল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন

কতকটা বোঝা যায়। ভারতবর্ষের জল হাওয়াতে নাকি আফিম বড়ই উপকারী। আফিম ব্যবসায় গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া। লোকে আফিম খাওয়া বন্ধ করিলে গবর্ণমেন্টের অনেক টাকা লোক্‌সান্ হইবে—কাজেই আফিম চাষ বন্ধ করিবার পক্ষে গবর্ণমেন্ট কোনো কথা বলিতে পারেন না। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীদের নয়—ইহা ইংরেজদের। কাজেই এই গভর্ণমেন্টের ভারতবাসীদের সুখ সুবিধা দেখিবার কথা প্রথম নয়—ভারত গভর্ণমেন্টের প্রথম কর্ত্তব্য ইংরেজ এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের সুখ এবং সুবিধা দেখা।

—

বোম্বাই হত্যাকাণ্ড :—

বোম্বাইয়ে মিঃ বাওলা নামক একজন মুসলমান বণিক্ তাঁহার উপপত্নী মোমতাজ বেগমের সহিত ভ্রমণকালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। বাংলাদেশের কয়েকটি কাগজে ইঁহাদের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কাগজ বিক্রি বেশী হয়, কারণ বেশীর ভাগ লোকই লোমহর্ষণ ঘটনার কথা কাগজে পড়িতে চায়।

খবরের কাগজের কর্ত্তব্য লোকমত গঠন করা। এইসমস্ত কুৎসিত ব্যাপারের সংবাদ রসাল করিয়া প্রকাশ এবং তাহাকে চিত্র দ্বারা সুদৃশ্য করাতে, লোকমত গঠনের কোনো সাহায্য হয় না। অল্পবুদ্ধি এবং কম-বয়স্ক লোকদের এইসবে প্রচুর ক্ষতি হয়।

—

মালাবারের অস্পৃশ্যতা :—

মিঃ এণ্ডরুজ মালাবারে অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-চেষ্টায় গিয়াছিলেন। তিনি মালাবারের অবস্থা-সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। নীচে ঐ বর্ণনার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম—

"আমি উত্তর মালাবারের কালিয়াশেরী নামক গ্রামে একদিন বেড়াইতে যাইয়া শুনিতে পাই যে, ইহার একটি প্রধান রাস্তায় কিয়দংশ অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে যাতায়াত করিতে দেওয়া হয় না। আমি সেই রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিতে-করিতে উহার শেষপ্রান্তে অবস্থিত গবর্ণমেন্ট স্কুলে উপস্থিত হই এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত আলাপে জানিতে পারি যে, এই স্কুলে প্রথমতঃ ৪ জন অবনমিত শ্রেণীর ছাত্র অধ্যয়ন করিতে থাকে। কিছুদিন পরে তিনজন স্কুলে আসা বন্ধ করিয়া দেয় এবং একজন রীতিমত আসিতে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি তাহাকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ভীষণভাবে প্রহার করায় সে স্কুলে আসিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। আমি স্কুল হইতে প্রত্যাগমন কালে ঐ বালকটির নিকট উপস্থিত হইয়া

বেলগাঁও কন্‌গ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকদের পর্য্যবেক্ষণ-দৃশ্য

তাহাকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে পাই। সে আমাকে তাহার প্রহারের চিহ্ন দেখায়। তাহার চেহারায় ও পরিধানে অপরিচ্ছন্নতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। আমি কয়েকদিন বালকটিকে সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয় যাইতাম এবং পুনরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতাম। তৎপর ঐ স্থান পরিত্যাগ করার সময় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণকে বালকটির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া আসি। স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত বালকটি স্কুলে যায় এবং তাহাদের সহিত স্কুল হইতে ফিরিয়া আইসে। সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি যে উচ্চজাতীয় ছাত্রগণ বিদ্যালয় বয়কট করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে।"

—

আকালী শিখ ও গুরুদ্বার আইন :—

আকালী শিখদের সমস্যা এখন পর্য্যন্ত সমানভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার কোনো সমাধান করিতে পারেন নাই। শিরোমণি গুরুদ্বার-সম্বন্ধে যে আইন করিবার প্রস্তাব হইতেছে সেইসম্বন্ধে শিখদের মুখপত্র "আকালী" বলিতেছেন :—"যেপর্য্যন্ত জাইটো-সমস্যা সন্তোষজনক-ভাবে সমাধান না হয় এবং শিখদের ধর্ম্মকর্ম্মের অবাধ অধিকার না দেওয়া হয়, যেপর্য্যন্ত গঙ্গাসর গুরুদ্বার হইতে বাধা উঠাইয়া না লওয়া হয়, ২২ হাজার বন্দী আকালীকে মুক্ত করিয়া না দেওয়া হয় ও শিরোমণি গুরুদ্বার কমিটিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার রদ্ না হয়, সেই পর্য্যন্ত গুরুদ্বার-সম্পর্কে কোনো আইনে শিখ-সমাজ সম্মতি দিতে পারে না।"

আকালী শিখরা তাহাদের ধর্ম্মব্যাপারে স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ আজ দুই বৎসরেরও অধিককাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতে তাহারা অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেছে। অনেকে এই অসহযোগ যুদ্ধে প্রাণদানও করিয়াছে। শিখরা বীরের জাতি, তাহারা অনায়াসেই একটা প্রকাণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া বহু রক্তপাত করিতে পারে—কিন্তু তাহারা অসহযোগ-নীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী—সেইজন্য তাহারা আজ তাহাদের পশুবলকে দমন করিয়া আত্মবলে যুদ্ধ করিতেছে। পুলিস এবং গভর্ণমেণ্টের শত অত্যাচারেও তাহারা বিচলিত হয় নাই। তাহারা এই নৈতিক যুদ্ধে জয়লাভ করিবেই।

—

নর্ত্তকীর সুমতি :—

বোম্বাইয়ে মোমতাজ বেগমের ব্যাপারের একটি সুফল ফলিয়াছে। আর-একজন নর্ত্তকী মোমতাজ বেগমের ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায় পাপ-ব্যবসায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে। সে সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবার জন্য আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। আদালত তাহার আবেদন গ্রহণ করিয়াছেন।

—

বঙ্গদেশ হইতে লোহার রপ্তানির হিসাব :—

১৯২৩ সনের বাঙ্গালা দেশ হইতে বিদেশে মোট ১৮২৯৩৮ টন লোহা (pig iron) রপ্তানি হইয়াছে; ইহার মূল্য ১২৮ লক্ষ টাকা। ১৯২২ সনে ১১৮৫৪৫ টন রপ্তানি হইয়াছিল এবং উহার মূল্য ছিল ৯১ লক্ষ টাকা। জাপানেই অধিকাংশ লোহা রপ্তানি হইয়াছে। জাপানে ১৯২২ সনে ১১২৫১১ টন রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৩ সনে ১৪৪০১৩ টন রপ্তানি হইয়াছে। ভবিষ্যতে জাপানে আর বিশেষ রপ্তানি হওয়ার আশা নাই। কারণ চীন দেশের হেঙ্ক নগরের নিকট দুইটি লোহার কারখানা খোলা হইতেছে। যাহা হউক ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে লোহা রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তথায় ১৯২২ সনে ৩০০৭ টন রপ্তানি হইয়াছিল কিন্তু ১৯২৩ সনে ২৪১৯০ টন রপ্তানি হইয়াছে অর্থাৎ আটগুণের অধিক রপ্তানি এক বৎসরে বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংলণ্ডেও বাঙ্গালার লোহা রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২২ সনে কিছুই রপ্তানি হয় নাই। কিন্তু ১৯২৩ সনে ৩২০৪ টন রপ্তানি হইয়াছে। টাটার কারখানা মার্টিন কোম্পানীর কারখানা ও বার্‌ন্ কোম্পানীর কারখানা-

মহাত্মা গান্ধী অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে বেলগাঁও ত্যাগ করিতেছেন

গুলিতেই এদেশে লোহা তৈয়ারী হয়। এই তিন স্থানে ১৯২২ সনে ৩৪২০০০ টন লোহা উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৩ সনে ৬১০০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছে। টাটার কারখানাতেই অধিক মাল উৎপন্ন হইয়াছে।

—

মহীশূরে জল সেচনের ব্যবস্থা :—

১৯২৫ সনের বন্যা হইতে দেশ রক্ষার জন্য পুরাতন বাঁধটি আরও উচ্চ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তদনুসারে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য আরও ৩ লক্ষ টাকা অধিক মঞ্জুর হইয়াছে। মোট ৮৫২০০০৲ মঞ্জুর হইয়াছে। বন্যায় বাঁধের পশ্চাৎ ভাগ অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা মেরামতের জন্য ৭৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র কৃষ্ণরাজসাগর জরীপ, হাইড্রোইলেকট্রিকের উন্নতি ও সমুদয় স্থানে জল সেচনের বন্দোবস্ত করিয়া কৃষির বিধান করা প্রয়োজন। আগামী জুন মাসের অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় সভায় এইসকল বিষয়ের আলোচনা করিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইবে।

—

ভিক্ষানিবারণী সভা :—

শ্রীহট্ট জেলার সৈয়দপুর নামক গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিরা একটি সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ভিক্ষা বৃত্তি রোধ করিতে হইবে। এই গ্রামে ৫০ জনেরও বেশী ভিখারী ছিল। তাহাদের সম্বন্ধে অনেক খোঁজ করিয়া দেখা গেল যে মাত্র ১৫ জন ভিক্ষা করিবার মতন অবস্থায় আছে। ভিখারীদের ভার তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরা গ্রহণ করিয়াছে। যাহাদের নেহাৎ ভিক্ষা না করিলে চলে না, তাহারা সপ্তাহে মাত্র একদিন ভিক্ষা করিতে পাইবে। পাশাপাশি কোনো গ্রামের ভিখারী এই গ্রামে ভিক্ষা পাইবে না, তবে বিদেশী কোনো ভিখারী আসিলে তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিবেচনা করা হইবে। বাংলা দেশে প্রত্যেক সহরে এবং গ্রামে যদি এই ব্যবস্থা গ্রামে বা সহরবাসীরা করে, তবে সুফল ফলিবে। ভিখারীদের ভিক্ষা করা বন্ধ করিয়া তাহাদের শিক্ষা দিয়া নানা-প্রকার কাজে লাগানো যায়। ভিখারীদের এমন অনেকে আছে, যাহারা বেশ সুস্থ এবং সবল, কাজ জুটাইয়া দিলে, ইহারা সকল-কাজই করিতে পারে। বাংলা দেশের সকল গ্রামের এবং সহরের শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করা যাইতেছে।

—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী :—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের অবস্থা আবার অতি শোচনীয় হইয়া

বেলাগাঁও কংগ্রেসের আর-একটি দৃশ্য—মহাত্মাকে বক্তৃতা-মঞ্চের উপর দেখা যাইতেছে

পড়িয়াছে। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার আবার পূর্ণ-মাত্রায় আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্যাপারের প্রতিকার-কল্পে একটি ডেপুটেশন বড়লাটের সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করেন; মহাত্মা গান্ধী এইসম্বন্ধে তাঁহার ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে বলেন "দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা-সম্বন্ধে যে ডেপুটেশন বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, বড়লাট সেই ডেপুটেশনের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা সহানুভূতিপূর্ণ কিন্তু ঐ জবাবে তিনি ধরা-ছোঁয়া দিয়া কোনো কথা বলেন নাই। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা-সম্বন্ধে অনেক অনাবশ্যক বিবেচনা উহাতে আছে। এক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অপর গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা উপলব্ধি করা খুবই ভালো, কিন্তু ঐ ব্যাপারটা সহজেই সারা যায়। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট পথ বাছাই করিবার সময় অপরের মনের দিকে কোনো দিক্ তাকাইয়া কিছু করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট অনেকবার তাহা করিয়াছেন, এবং কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই নিজেদের পরিহার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। লর্ড হার্ডিংই কেবল তাহা করেন নাই; তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবাসীরা বাধা দিবার এবং দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইবার যোগ্যতা যে দেখাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহারা সর্ব্বত্রই অহিংস নীতি রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা নেতৃবিহীন। সোরাবজী কাছালিয়া, পি কে নাইডু এবং রুস্তমজীও এখন আর নাই, কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা কি করা উচিত এবং কি তাঁহারা করিতে পারেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন কি দুইজন-সম্বন্ধে আমার খুবই আশা আছে, বলা বাহুল্য রুস্তমজীর বীর সন্তান সোরাবজী তাঁহাদের মধ্যে একজন। যুবক সোরাবজী নিজে একজন সুপরীক্ষার উত্তীর্ণ সত্যাগ্রহী। তিনি নেটালে শ্রীমতী সরোজিনী দেবীকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী, আমাদের স্বদেশবাসীরা, এই কথাটা বুঝুন যে, তাঁহাদের নিজেদের মুক্তির পথ, তাঁহাদের নিজেদেরই বাহির করিতে হইবে। যাহারা আত্মনির্ভরশীল, ভগবান্ তাহাদিগকে সাহায্য করেন।

—

ভূতপূর্ব্ব নাভারাজের বৃত্তি কমিল :—

"আকালী" পত্রিকায় খবর পাওয়া গেল যে নাভার মহারাজার বৃত্তি কম করিয়া এখন মাত্র বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। নাভার মহারাজকে যখন পদত্যাগ করিতে বাধ্য

মহাত্মা গান্ধী, বেলগাঁও কন্‌গ্রেসের সভাপতি

করা হয় তখন তাঁহাকে বোধ হয় তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবার কথা হইয়াছিল। হঠাৎ এইপ্রকার বৃত্তি কমাইবার কোনোপ্রকার কারণ জানা যায় নাই।

নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা অর্থ অপব্যয় করিতেছেন কিনা জানা নাই, কিন্তু তাহা করিলেও ভারত গবর্ণমেণ্টের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করার কোনো অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না।

—

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে মহাত্মার মত :—

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মহাত্মাজি বলেন :—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিরোধী—কিন্তু কোনো বিষয়ের দ্বারা যদি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনোরূপ সম্মানজনক সন্ধি হয় এবং শান্তি আসিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহার সমর্থন করিব।"

—

দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ :—

১৯২৪ সালের ৩রা এপ্রিল কাপ্তান র‍্যাম্‌সে ব্রিটিশ গায়েনা উপনিবেশে একদল ভারতীয় কুলীর উপর গুলি বর্ষণ করিয়া তাহাদের অনেককে হত এবং আহত করেন। ব্যাপারটিকে ২য় জালিয়ানওয়ালা বাগ, বলা যায়। ১০ মাস পরে আজ ভারতগভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপার-সম্বন্ধে "চুণকাম-করা" এক সুন্দর রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। ব্রিটিশ গায়েনার করোনার মিঃ
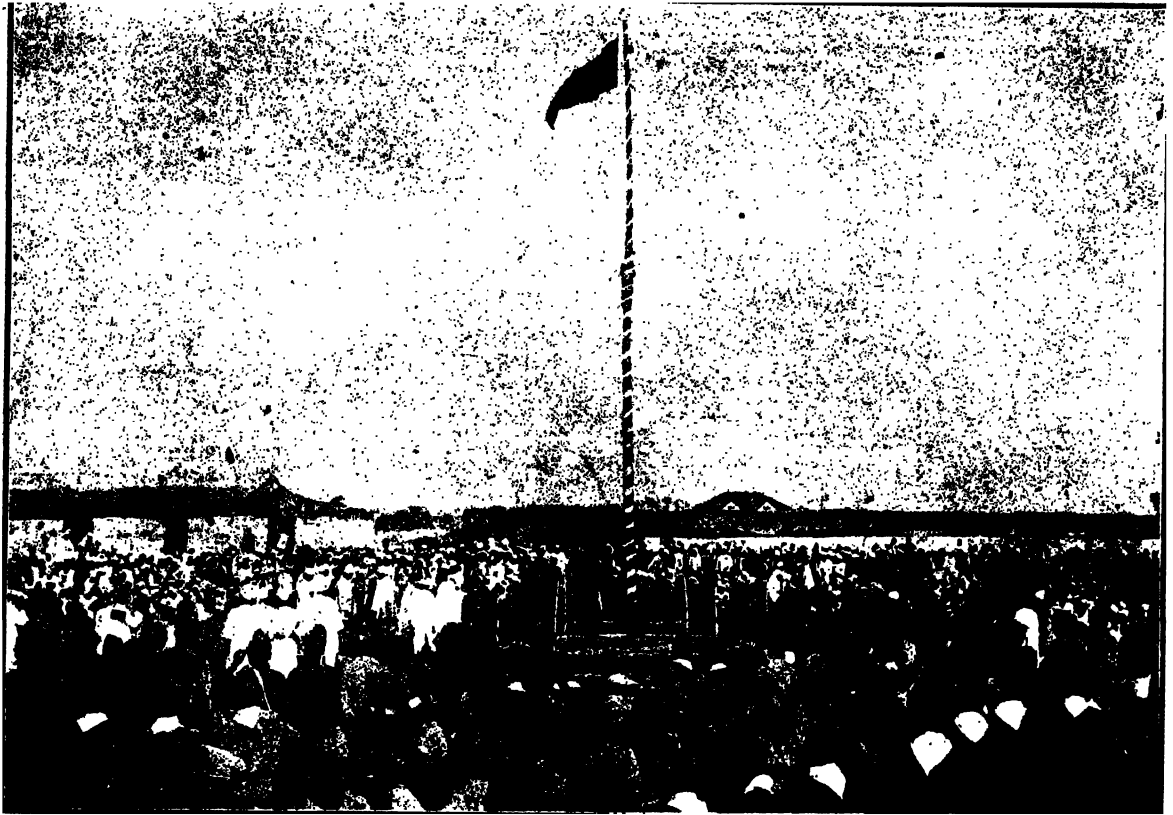
বেলগাঁও কংগ্রেসে সমবেত বয়-স্কাউট-দল জাতীয়-পতাকাকে অভিবাদন করিতেছে

জি, আর, রীড্ এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে অনেক সাক্ষীর এজাহার গ্রহণ করিয়া রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন।

"মিঃ রীড বলেন যে, ব্রিটিশ গায়েনার জর্জ্জ টাউনের কুলী বা শ্রমিকদের কোনোই দুঃখকষ্ট বা অভাব-অভিযোগ ছিল না। তাহারা বিনা কারণে হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া ধর্ম্মঘট করে। ঘটনার দিন একদল ধর্ম্ম-ঘটকারী শ্রমিক জর্জ্জ টাউনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাদের সঙ্গে ব্যাণ্ড, নিশান প্রভৃতি ছিল, এবং তাহাদের হাতে মোটা লাঠি, চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ভীষণ-ভীষণ অস্ত্র ছিল। গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা সত্ত্বেও এইভাবে জর্জ্জ টাউনের দিকে অগ্রসর হওয়া—উহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বে-আইনী কার্য্য হইয়াছিল। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল খবর পাইয়া স্থির করিলেন যে, কিছুতেই ধর্ম্মঘটকারীদিগকে জর্জ্জ টাউনে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তাঁহার হুকুমে, পুলিশ, জনতাকে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু জনতা, পুলিশের উপরে ঢিল প্রভৃতি ছুঁড়িতে থাকে এবং নানারূপ গালাগালিও দিতে থাকে। অগত্যা জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র এবং দাঙ্গা-সম্বন্ধীয় আইন পড়িয়া জনতাকে সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু ইহাতে কোনো ফল হয় না। জনতা, পুলিশের প্রতি ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতে থাকে; ইহার ফলে বারো জন অশ্বারোহী পুলিশ আহত হয় এবং কর্‌পোরাল রীড ঘোড়া হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়; কাপ্তেন র‍্যাম্‌সে তখন জনতার উপর গুলিবর্ষণ করা স্থির করেন। কাপ্তেন র‍্যাম্‌সের নেতৃত্বে 'চল্লিশ সেকেণ্ড' ধরিয়া গুলি চলিয়াছিল। তাহার ফলে জনতার মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয় এবং আঠারো জন আহত হয়।"

করোনার মহাশয়ের রিপোর্ট যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত দোষের ভাগী হয় ভারতীয় কুলীরা। কিন্তু এজেহারে দু-একজন শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী কি বলেন দেখুন:—

কাপ্তেন মার্টল্যাণ্ড বলিয়াছেন—"দাঙ্গা-সম্বন্ধীয় আইন (Riot Act) পড়িবার পূর্ব্বে জনতার মধ্য হইতে কোনো ঢিল ছোঁড়া নাই। অশ্বারোহী পুলিশেরা যখন যথেচ্ছ আক্রমণ করিয়া জনতাকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল, কেবল তখনই ঢিল ছোঁড়া আরম্ভ হইল।

মিঃ অ্যারন্ ব্রিটন্ বলিয়াছেন—"দাঙ্গা-সম্বন্ধীয় আইন পড়িবার পূর্ব্বে তিনি কোনোরূপ ঢিল-ছোড়া বা জনতাকর্ত্তৃক কোনোরূপ উপদ্রব হইতে দেখেন নাই।"

মিঃ গ্যাম্বল বলিয়াছেন—"গুলি করিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে পর্য্যন্ত গুলি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এই তিনজন সাক্ষী শ্বেতাঙ্গ এবং খুব সম্ভবত ইংরেজ। ইঁহারাও বোধ হয় মিথ্যা কথা বলেন নাই। রিপোর্টে করোনার রীড কাপ্তেন র‍্যাম্‌সের বহুৎ প্রশংসা করিয়াছেন। প্রশংসার বাক্যগুলি মাইকেল ওডায়ারের জেনারেল ডায়ারের প্রতি প্রশংসা বাক্যের সহিত প্রায় মিলিয়া গিয়াছে। ইংরেজদের এখন ইংলণ্ডে সভা-সমিতি করিয়া এই মহাবীর কাপ্তেন র‍্যাম্‌সেকে টাকাপূর্ণ থলিয়া উপহার দেওয়া উচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত খবরটি দিতেছেন :—

"সরস্বতী পূজা"

"পটুয়াখালি গবর্ণমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ গত বৎসরের মতন এবারও স্কুল-প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজার আয়োজন করিতেছিল, কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রবৃন্দ উহাতে আপত্তি করিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানা দরখাস্ত দেয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জাতিতে মুসলমান এবং উক্ত বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট। তিনি মুসলমান ছাত্রগণের দরখাস্ত পাইয়া বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা বন্ধ করিবার আদেশ দেন। উক্ত আদেশ পাইয়া হিন্দুছাত্রগণের মন অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। তাহারা ঐস্থানের মিউনিসিপাল সেমিনারী স্কুলের ছাত্রগণের সহিত যোগদান করিয়া একসঙ্গে সরস্বতীপূজার আয়োজন করিতে থাকে, কিন্তু এদিকে স্থানীয় মুসলমান নেতাগণ স্থানীয় অঞ্জুমান কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়া লন যে, মিউনিসিপাল সেমিনারীতে কোনো প্রকার পূজা করিতে দেওয়া হইবে না। ঐ প্রস্তাবের একখণ্ড অনুলিপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আর একখণ্ড মিউনিসিপাল সেমিনারীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়; কিন্তু সেমিনারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের কথায় কোনো প্রকার কর্ণপাত করেন নাই। ইতিমধ্যে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার পুত্রের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া বরিশাল হইয়া যান এবং বাড়ীতে পৌঁছিয়াই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া এক পত্র লিখেন। কিন্তু তিনি লইয়া বাড়ীতে গেলে যাহার উপর মহকুমার ভার অর্পিত হয় তিনিও মুসলমান এবং তিনিও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরবর্ত্তী আদেশের বিরোধী হইয়া দাঁড়ান। কাজেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে মিউনিসিপাল সেমিনারী স্কুলের ছাত্রগণের সহিত একযোগে পূজা করিতে হয়। এদিকে মুসলমান ছাত্রগণ সহরে এবং সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রচার করে যে, সরস্বতী পূজার দিবস মিউনিসিপাল সেমিনারী-প্রাঙ্গণে "মৌলদ সরীফ" ও "কোরবাণী" হইবে। উক্ত সংবাদ পাইয়া মুসমানগণ নির্দ্ধারিত দিবসে ঐ স্থানে সমবেত হইতে থাকেন; কিন্তু স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করায় বিশেষ কোনো গোলমাল হইতে পারে নাই। তবে প্রকাশ, হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে সামান্য বিবাদ হইয়াছিল।"

এই ব্যাপারটি পড়িয়া মনে হয় ইহার পিছনে বয়স্ক লোকেরা আছেন। এমন লোকও হয়ত আছে যাহারা "প্যাক্‌ট্ প্যাক্‌ট্" বলিয়া চীৎকারও সভাস্থলে করিয়া থাকে। হিন্দুমুসলমানের মিলনের জন্যও যাহারা প্রচুর চেষ্টা করিয়া থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যবহারও চমৎকার। স্বধর্ম্ম-প্রীতি তাঁর প্রশংসনীয় মাত্রায় আছে।

"নবোঢ়ার পত্র"

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নম্বর এক

সৈ,

তোমায় চিঠি লিখতে কেমন বাধ বাধ ঠেক্‌ছে ভাই। কথায় বলে "ছেলে ধো'ত্তে পারে না কেউটে ধো'ত্তে যায়"। আমারও হোয়েচে তাই। দাদার অত মার কানমলা খেয়েও আমার দ্বিতীয়ভাগ শেষ করা হোলো না অথচ তোমার মত ইস্কুলে পড়া মেয়েকে এই প্রকাণ্ড চিঠিখানা লিখচি। তা তোমারই দোষ। কেন অমন হাতে ধরে বোলেছিলে। আমি যত মুস্কিলে পড়ি বানান নিয়ে ভাই। তা প্রথমভাগ আর দ্বিতীয় ভাগে যতটুকু পড়েচি তার মোদ্ধে ভুল হোলে রাগ কোরো। না হোলে কোরো না ভাই।

বিয়ের রাত্তিরে আমার মনে যা যা হয়েছিলো তোমায় তো বোলেইচি, আর বাসর ঘরের কথা তো জানই। তার পর কি হো'লো বলি শোনো। না ভাই, তোমাদের বাঁড়জ্জে বড় বেহায়া লোক ভাই। ভিড় হোয়েছিলো বলে আমরা মেয়ে গাড়ীতে উঠেছিলুম। ও প্রোত্তেক ইষ্টিশানে চা খাবার কি জল খাবার নাম করে নেমেচে। তুমি বোধ হয় বোল্‌বে এ আর কি বেহায়াপানা হো'লো। বেটাছেলে কি আমাদের মতন ঘোম্‌টা টেনে থাক্‌বে। কিন্তু ভাই ঠিক মেয়ে গাড়ির সাম্‌নেই কি যত রাজ্যির সব পানওয়ালা চাওয়ালা আর জলওয়ালা আসে যে ওখানে না দাঁড়িয়ে আর ডাকা যায় না। তা আমিও সেয়ানা মেয়ে। 'যেমন বাঘা ওল তেমনি বুনো তেঁতুল'। ইষ্টিশান আস্‌চে বুঝতে পারার সংগে সংগে এক গলা ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে বোসে আছি। দেখো কাকে দেখবে। ও ভাই না পেরে শেসকালে কোল্লে কি জানো? একটা ইষ্টিশানে এসে এক্কেবারে আমার জান্‌লাটির কাছে এসে দাঁড়ালো। বোল্লে, ঝি দেখতো তোমাদের টারাণকে আমার কোটটা ভুলে চোলে গেচে কি না। আমার ভাই বড্ডই হাসি পেয়েছিল কিন্তু। আচ্ছা তুমিই বিচার করো ওর জামা আমার

বাক্সে কি কোরে আস্‌বে ভাই। আমিও নাছোড়বন্দা। কাল রাত্তিরে জিগ্যেস কোরেছিলুম। বোল্লে, ভগবানের কাছে পেরারথোনা করি আজ্জমে বেটাছেলে হোয়ে জন্মাও। তা হো'লে সব টের পাবে। কি যে কথার ছিরি। এমন আবার হয় না কি। এক জম্মে বেটাছেলে আর এক জম্মে মেয়ে মানুষ যদি হোতো তা হোলে সতীরা শতো শতো জম্ম ধরে এক সোয়ামিকে পায় কি কোরে? এ কথাটা আমি জিগ্যেস কোরেছিলুম। তাতে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তে লাগলো। তোকে একটা কথা বলি কাউকেও বলিস নি সৈ। ওর হাসিটা বড় মিষ্টি ভাই।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নাম্‌তে একজন বোল্‌লে, নাও না গো বউ কোলে কোরে নাও না। কথাটা বোধ হয় শাশুড়িকে বোল্‌লে। তিনি বোল্‌লেন, এস মা। হ্যাঁ ভাই সৈ আমি কি কচি খুকি যে হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে কোলে উঠতে যাবো। আমি ভাই লজ্জায় আধমরা হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটা ঝাঁকি দিয়ে তিনি আমাকে কোলে তুলে নিলেন আর বোল্‌লেন পেরথোম কথাটাতেই অবাধ্য হোলে মা। সৈ, তুমিই বিচার করো ভাই আমার অবাধ্যটা হোলো কোনখানে। মনে ভাই কষ্ট হোলো কিন্তু অমংগল হবে বলে তাঁর মুখটা—আর বোলব না ভাই, তুমি বোধ হয় হাস্‌চো। কিন্তু এরকম অবস্থায় ওঁর মুখ বন্ধ করতে তুমিই শিকিয়েছিলে তা মনে থাকে যেন। এটানে বরন আরম্ভ হোলো। উনি তো ছট্‌ফট সুরু কোরে দিলেন। পেটের জ্বালা, তার ওপর আবার রাত্তিরে ঘুম হয় নি। সেই শাঁকের শব্দ, উলু উলু হাসি আর ছেলেদের কান্নার সোঙ্গে আমার মনের অবস্থা কি হোয়েছিল ঠিক্ মনে নেই। তবে একটু আনন্দও হোয়েছিল। এখন যে বলা হচ্ছে "ঘুম হয় নি, শিগ গির সেরে নাও", তা কে তোমায় সমস্ত রাত জেগে ফিকিরকোরে আমার গাড়ির জানালার কাছে ঘুরে বেডাতে বোল্লেছিল ভাই? ঠিক হয়েছে। যেমন কম্ম তেমনি ফল।

তার পরে মুখ দেখবার পালা। এযে কি জ্বালা তুমি তা বুঝতে পার নি। তোমায় ভগবান সুন্দর কোরে গড়িয়েছেন। পেরথোমে দিদি শাশুড়ি দেখলেন। দেখে বোল্‌লেন যাহোগ ছিরি আছে। শাশুড়িও মুখটা তুলে ধোরে দেখলেন। মাথায় একটা টায়রা গুঁজে দিয়ে বোল্‌লেন, হ্যাঁ বোল্‌তে নেই তবে দুহাজারের মোধ্যে পার করবার মেয়ে নয়। আমার ভাই গাটা কাঁটা দিয়ে উট্‌লো। এত সাধের শোশুর বাড়ি এই। পাড়া পড়সিরাও দেখলে সব। এ পঞ্জস্ত যেসব খুঁত কেউ দেখতে পাই নি সে সব একে একে সবাই বের করতে লাগলো। এক-জন বোল্‌লে সেজদাদা যেরকম সৌখিন তাতে মনে ধর্‌লে হয়। ইনি হচ্চেন আমার ছোট ননোদ। একফুট্টে দেখতে কিন্তু কি চেটাং চেটাং বাক্যি ভাই। পেরথোমকে তিন জন সংগি নিয়ে ভাব কোরে বোস্‌লো। তোমার নাম কি ভাই। তুমি কি পড় ভাই, তোমরা কটি বোন ভাই। একজন বোল্‌লে, কথা কও না কেন ভাই। বর পচন্দো হয় নি বুঝি তাই রাগ হয়েচে। আমার, সৈ, বড় লজ্জা করতে লাগলো। আর ভয়ও হোতে লাগলো কথা কইলে নিশ্চয় ছল ধোর্‌বে। অমনি আবার ক্ষুদে ননোদটি গোমরা মুখ কোরে বোলে উট্‌লেন, চল্ চল্ লো অত ঠেকার সয় না। হ্যাঁ ভাই সৈ, তুমিই বিচার কর। তোমরা তো আমায় চিরকাল দেখে আস্‌চো। আমি কি ঠেকারে? শেষে ভাই কথা কইতে হোলো। সব কথা বল্‌লুম। অনেক গল্পসল্প হোলো। আমার বাঘিনি ননোদিনির কিন্তু এত সৈল না। গা দুলিয়ে উটে যাওয়া হোলো আবার বলা হোলো, কি বাচাল মেয়ে বাবা, এমন দেখিনি।

কি জায়গা ভাই! এখানে চুপ কোবে থাক্‌লে হয় ঠেকারে। কথা কইলে হয় বাচাল। দেরি কোরে খেলে বলে নবাবের মেয়ে। তাড়াতাড়ি খেলে বলে রাক্কুসে। হাস্‌লে বলে বাপের বাড়ির কথা একদিনে ভুলেচে। কাঁদ্‌লে বলে কি প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে। সৈ, তুই তো শোশুর বাড়ি গেচিস্। আর সব বোলে দিলি? এখানে কি কোরে থাক্‌তে হয় সেইটুকু বোলে দিলি নি কেন। আমি ভাই যেন হাঁপিয়ে উট্‌লুম। খাওয়া দাওয়ার পর যখন বিছানায় গিয়ে পোড়লুম তখন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। লোকে কেন ভাই যমের বাড়ী যা, না বলে, শোশুর বাড়ি যা বলেনা সৈ?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সৈ, তোমার সপ্ন দেখছিলুম। যেন ঘোষেদের পুকুরে দুজনে ঝাঁপাই ঝুড়চি। হঠাৎ আমি

তলিয়ে গিয়ে একটা বিজ্ঞোন পাতাল পুরিতে চোলে গেচি আর তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। মনটা কি যে কোর্‌ছিল সৈ কি বোল্‌বো। সেখানে না আছে হাওয়া না আছে মানুষ। শুন্নো বাড়ি যেন রাক্কোসের মতন গিল্‌তে আস্‌চে। আমার ছোট দেওরটি বেঁচে থাক্। তার পড়ার চেঁচানির চোটে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। যেন নিশ্বেস ফেলে বাঁচলুম। হাঁ, এ দেওরটির কথা তোমায় বলিনি। আমি এসেচি পজ্জন্ত এর পড়ার ধুম পড়ে গেচে, তাও নিজের ঘরে নয়। আমি সেখানে বোস্‌বো সেই-খানে এসে পড়া চাই। একবার একলা পেয়ে গট্ গট্ কোরে এসে জিগোস্ কর্‌লে,এটা আমায় পড়িয়ে দিতে পারো বৌদি? সে ইংরিজি বই। কি সব হিজিবিজি নেকা। কোত্থেকে বোঝাবো ভাই। বোল্‌লুম আমি যে ইংরিজি জানি না ভাই। ওম্‌নি বুকটা একটু উঁচু কোরে বোল্‌লে, হুঁ বড় শক্ত এটা কেউ বোলে দিতে পারে না। এ বাহাদুরি দেখে আমার বড় হাসি পেলে। কেউ ছিল না দেখে জিগ্যেস কর্‌লুম তোমার দাদাও কি পারে না। দুষ্ট অমনি বোল্‌লে কেন দাদা যে তোমার বর। ওতো ফেল হোয়ে গেচে। বড় দাদাও পারে না। এ বড় শক্ত পড়া। কথাগুলো আমার ভাই বড় মিষ্টি লাগছিলো। ঘাঁটাবার জন্যে বোল্‌লুম। আমি এসব কথা তোমার সেজ দাদাকে বোলে দোবোখন। সে বোল্‌লে তুমি তো ওর সংগে কথা কওনা কি কোবে বোল্‌বে? একথার কি জবাব দোবো ভাই? বেটাছেলেরা সৈ ছেলে বেলা থেকেই দুষ্ট। ওদের কথার জবাব দেওয়া যায় না।

এমন সময় খুড়-শাশুড়ি ঘরে ঢুকে বোল্‌লেন কিগো নবাব খান্‌জাখাঁর ঝি, ঘুম ভাঙলো। সুজ্যি ঠাকুর যে পাটে বোস্‌লেন। সংগে সংগে সেই খুদে ননোদটিও এসে দাঁড়ালেন। বোধ হয় এতক্ষণ নিজে ঘুমোচ্ছিলেন। ফুলো ফুলো চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে বোল্‌লেন তোমাদের বউটি একটি ছোট খাট কুম্ভকর্ণ খুড়িমা। তাই না তাই বলে খুড়-শাশুড়ি চলে গেলেন। তুমিই বিচার কর সৈ। সমস্ত রাত গাড়িতে এলে ঘুম পায় কি না। তবু আমি ওঁর দাদার মতন হৈ হৈ কোর্‌তে যাই নি। সৈ ভাই তোমায় যদি সংগে পেতুম এই রায়বাঘিনিকে দুকথা বেশ শুনিয়ে দিতুম। থোঁতা মুখ ভোঁতা কোরে দিতুম। না ভাই সত্যি, আমার বড় রাগ হোচ্চে। ননোদ কি আর কারু হয় না?

সেই দিন ফুলসজ্জে ছিল। তোমার কথা মতো আমি চেষ্টা কোরে ছিলুম না কথা কইতে কিন্তু শেষ পজ্জন্ত কথা কয়ালে তবে ছাড়লে। আমি তো বোলেইছি ওদের সংঙ্গে পার্‌বার জো নেই। না ভাই তুমি রাগ কোরোনা। ফুল-সজ্জের কথা আমার একটিও মনে পড়ছে না, যে তোমায় লিক্‌বো।

যখন যাবো পারিতো মনে কোরে কোরে বোল্‌বো এখন সপ্নের মতন আবছাওয়া আবছাওয়া এলোমেলো মনে পড়চে সুধু। সেসব গুচিয়ে নেকা ভাই আমার বিদ্যেয় কুলোবে না। তবে এক কথা বোল্‌তে পারি। বাসর ঘরে চুপ কোরে ছিলো বোলে'ভেবো না যেন তোমাদের বাঁড়ুজ্জে একটী গোবেচারি। বেহায়ার একশেষ ও। আর কাকেই বা দোষ দোবো ভাই। ওদের জাতটাই ওই রকম। এই পোরসু রাত্তিরে বউভাত ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর ওর বন্ধুরা মুখ দেখতে এলো। তাই বাপু ভাল মানুসের মতন মুখ দেখে' চলে যা, তা নয়। নানান রকম তামসা কোরে আমায় হাসিয়ে তবে গেলো। কাকে ছুয়ে কাকে ভাল বল্‌বো ভাই। ও চোর বাছ্‌তে গাঁ উজোড়। কাল সকালে শরীরটা বড় খারাপ ছিল। আর শরীরেরই বা দোষ দি কি কোবে। শুয়ে শুয়ে এলিয়ে এলিয়ে বেড়িয়েছি সমস্ত সকালটা। তবে ভাগ্যি বল্‌তে হবে যে কেউ তেমন লোক্ষ্যো কোর্‌ছিলো না। আগের রাত্তিরে খেটে সবারই এই দশা হোয়েছিল। আর আমার খুদে ননোদ তো দশটার আগে উঠতেই পারেননি। বাবা ননোদ নয় তো যেন কি। যাই বোলিস সৈ, ওর কথা মনে হোলেই একটা গাল দিতে ইচ্ছে করে আমার।

এইবার সৈ তোকে এক জনের কথা বোল্‌বো সে রকম লোক আর ভুভারতে খুঁজে পাওয়া যায় না। অবিশ্যি তুমি ছাড়া। আমি অকাতরে দুপুর বেলা ঘুমুচ্ছি এমন সময় আস্তে আস্তে আমার গা ঠেলে জাগালে। পের-থোমকে মনে হোলো তোমাদের বাঁড়ুজ্জে। ও আজকাল সুবিদে পেলেই ঘরে ঢুকে ওই রকম জালাতন করে।

কিন্তু চোখ চাইতে দেখি তাতো নয়, এ যে এক নতুন লোক। আমার মুখের দিকে কি এক রকম ভাবে চেয়ে আছে। আমিও পেরথোমটা কিছু বোল্‌তে পার্‌লুম না। তার পরে সে নিজেই কথা কইলে। পেরথোম কথা, বাঃ তোমার মুকখানি তো বড় সুন্দর ভাই। শোশুর বাড়ীতে এ কথা দ্বিতীয় বার শুন্‌লুম। কিন্তু ভাই সৈ, বোল্‌তে কি প্রথমবার যার মুখে শুনেছিলুম তার মুখেও এত মিষ্টি লাগেনি। লজ্জায় আর চাইতে পার্‌লুম না। তখন মুখটা তুলে নিয়ে বোল্‌লে, দেখি রাগ কর্‌বে না তো ভাই। কাঁচা ঘুমে তুল্‌লুম। রাগ আর কি কোর্‌ব সৈ। এই চারিদিকের গন্‌জনার মোদ্যে এঁর আদরের কথা শুনোয় আমার মনে যে কি হোচ্ছিল তা অন্তোর্জামিই জানেন। আমি বল্‌লুম না, কেউ থাকে না, তাই ঘুমুই। আপনারা যদি মাঝে মাঝে একটু আসেন। তিনি বোল্‌লেন, আমায় আর আপনি বোলে ডেকো না ভাই। তোমায় দেখে আমার বড্ড ভাল লাগচে। আপনি বোলে ডাক্‌লে কেমন পর পর বোধ হয়। আমার ভাই মনে হোচ্ছিল একি এই পৃথিবীর লোক। এক কথায় এত আপন করে নিতে কেউ তো পারে না। আর কি পিরতিমের মতন চেহারা ভাই। আমার হাতটা মুটোর মোদ্যে নিয়ে বোল্‌লেন আমার বাড়ী কাছেই। কদিন থেকে আস্‌বো আস্‌বো কোর্‌চি কিন্তু হোয়ে উঠচে না। বোল্‌তে বোল্‌তে চোক ছল ছল কোরে উট্‌লো। কি একরকম হোয়ে গিয়ে খপ কোরে চোখে কাপড় দিয়ে বোল্‌লেন, এই চোখের জল এক পোড়া আপোদ হোয়েছে। আমি তো একেবারে কিম্ভূত কিমাকার হোয়ে গেলুম। এরকম কক্ষণও দেখিনি। একটা কথাও কইতে পারলুম না। চোখ দুটো মুচে জিগ্যেস কোর্‌লেন তোমার নামটি কি ভাই। আমি নাম বোল্‌লুম। তিনি বোল্‌লেন শৈল, তা বেশ নামটি, সৈ বলে ডাক্‌লে হয় ভাল। তবে তোমায় ওনামে ডাক্‌বো না ভাই। এস আমরা একটা কিছু পাতাই। আবার সেই আমুদে ভাব দেখে আমার সাহস হোলো। বোল্‌লুম বেশ তো আমিও একটা আপনজন পেলে বাঁচি। একেবারে মন টেকেনা। হেসে তিনি বোল্‌লেন কেন ভাই লুকুচ্চো। দিনের বেলা যেটুকু কষ্ট হয় রাত্তিরের আপনজন কি সেটুকু পুষিয়ে দেয় না। আমি লজ্জায় আর হাঁ না কিছুই বোল্‌তে পার্‌লুম না। হাতটা একটু টিপে মুখটা এগিয়ে তিনি বোল্‌লেন উত্তোর দাও ভাই। কথা না কইলে কি কিছু পাতানো যায়। আমি বোললুম জানেনই তো, সমস্ত রাত ঘুমুতে না দিলে দিনের কষ্ট বাড়ে কি কমে। আমার গলাটা জড়িয়ে ধোরে ভারি আওয়াজে বল্‌লেন, আমি জানিনে ভাই, আর এ জন্মে জান্‌বোও না। তাই নারী জন্মের এই সাথ্যক সুখের কথা দুটো শুন্‌তে তোমার দারস্ত হোয়েচি। আমি বয়েসটার আন্দাজে কথাটা বোলেছিলুম এখন দেখলুম মাথায় সিঁদুর নেই। আমি ধিক্কারে যেন মাটিতে মিশিয়ে গেলুম। কেন না দেখে শুনে কথাটা বোল্‌লুম। কিন্তু কিছু বুঝতে পার্‌লুম না। বিয়ে হয়নি দুদিন পরে হবে। কিন্তু অমন কথা বোল্‌লেন কেন। তিনি গলাটা ঝেড়ে সাম্‌লে বোস্‌লেন। বোল্‌লেন পোড়াকপালি আমি যার কাছে দুদণ্ড বোসি তার কাছেই অশান্তি আনি। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। পৃথিবীতে হাসা অনেকেরই কাছে যায় কিন্তু কাঁদা সবার কাছে যায় না। তোমার ঘুমন্ত মুখখানা দেখে যেন বোধ হোলো তুমি আমার কান্না বুঝবে। তাই আর চোখের জল মানা মান্‌চে না। কে জানে কেন এমনটি হয়। আমি বোল্‌লুম, কিন্তু আপনার এ কান্না কিসের জন্যে। আমারও বুকের ভেতরটা কি রকম করচে যে। কিছুতো বুঝতে পার্‌চিনে। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বোল্‌লেন "কি বোল্‌বো আর ভাই। যে দয়া কোরে তোমার সিঁথিটি সিঁদুর দিয়ে রাঙা কোরে দিয়েচে সেই নিষ্ঠুর হোয়ে আমার চোখে জল ভোরিয়ে দিয়েচে। কত জল সে দিয়েচে বোল্‌তে পারিনে। যেন আর ফুরোতে চায় না।" আমি আর থাক্‌তে পারলুম না সৈ। হাত দুটো ধোরে মিনতি কোরে বোল্‌লুম আমার বল্‌তেই হবে কি হোয়েচে। আমি কিছুই বুঝতে পার্‌চিনে সৈ। তিনি খানিকক্ষণ ধোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রোইলেন। কি সে আদরমাখা চাউনি ভাই। আমি যে কোথায় আছি তা সে চাউনিতে আমায় ভুলিয়ে দিয়েছিল। তার পর বোল্‌লেন সে সব কথা তোমার যে ভাল লাগবে না ভাই। আমি জিদ কোর্‌তে লাগলুম। তিনি বোল্‌লেন বেশ বোল্‌বোখন একদিন।

এখন আমাদের পাতানোটা হোয়ে যাক। বোলে রাঙা মুখটা আর চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুচে একবার আমার দিকে চেয়ে হাস্‌লেন। যেন সে মানুষই নয়। আমি বোল্‌লুম বেশ তো। তিনি বোল্‌লেন তুমি ভাই আমার পথের কাঁটা, আমিও তোমার তাই, কেননা তোমার সুখের পথে মাঝে মাঝে ফুটবো—বোলে হাস্‌তে লাগলেন। কিন্তু সে হাসি কি কান্না ঠিক কোর্‌তে পার্‌লুম না।

এমন সময় আমার শাশুড়ি আর কে একজন দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। দুজনেই বোলে উঠলেন এই যে। আর আমরা সমস্ত বাড়ী এক কোরে বেড়াচ্ছি। তার পরে শাশুড়ি আমায় বোল্‌লেন, বোলি বড় মানুষের ঝির নিদ্রে হো'লো। এ সব অলুক্ষুনে ওব্যেস গুনো ছাড়ো বাছা। কি বেয়াড়া রীত দেখতো ভাই। বাপ মা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। এগুনোও শেকাতে পারেনি। শেষের কথাগুনো সংগির দিকে চেয়ে বোল্‌লেন। সংগি বল্‌লেন কে জানে দিদি আজকালকার মেয়েদের ধাত বুঝতে নারি। তবে এ-বাড়িতে থাক্‌লে সব সুদ্‌রে যাবে। কিন্তু ভয় হয় আমাদের উনি আবার জুটেছেন। বোলি হ্যালা ছিষ্টির পাট সব পোড়ে রয়েচে আর দিব্যি নিশচিন্দি হোয়ে কোনে বউয়ের সংগে কোনে-বউ সেজে বোসে আছিস। আমার যে আর সয় না। হাড় ভাজা ভাজা হোয়ে গেল। আমার তো সৈ মনে হোচ্ছিল মা ধরনি দিধা হও। আমার পথের কাঁটা কিন্তু হেসে বোল্‌লে চল আমি যাচ্চি। ওরা দুজনে রাগে গন গন কোর্‌তে কোর্‌তে চোলে গেলেন। আমার গলাটা জরিয়ে চুমো খেয়ে পথের কাঁটা বোল্‌লে, কিছু দুঃখ কোরো না, এ আমার অংগের ভূষণ। আজ তবে এখন আসি ভাই।

তিনি চোলে গেলেন। সমস্ত দিন আমার মনটা কি রকম যেন হোয়ে রোইল। আমি ঠিক কিছুই বুঝতে পার্‌লুম না। তবে মনে নানান্‌ রকমের কথা উট্‌তে লাগলো। রাত্তিরে সমস্ত কথা বোলে তোমাদের বাঁড়ুজ্জেকে জিগ্যেস কোর্‌লুম। সে একটু যেন কি রকম হোয়ে গেল। অন্য মনস্কো হোয়ে হাতের ফুটন্ত গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়তে লাগলো তার পর একটা নিস্যেস ফেলে হঠাৎ পাপড়িগুনো আমার মুখে ছড়িয়ে বোল্‌লে, ও কিছু নয়। তুমি ছেলে মানুষ শুনতে নেই। সে রাত্তিরে কিন্তু সবই যে বিস্যাদ লাগতে লাগলো। হাজার চেষ্টা কোরেও জমাতে পার্‌লে না। কথায় কথায় কেবলই ভুল হোতে লাগলো। একবার বোল্‌লে আজ একটা ভালো গোলাপ ফুল এনেচি। তোমার মুখের কাচে ধরে দেখবো কোন্‌টা বেশী সুন্দর। বোলে বিছানাটা হাৎড়াতে লাগলো। আমি বোল্‌লুম সেটা তো ছিঁড়ে আমার মুখে ছড়িয়েচো, আর পাবে কোথায়। অপ্রোস্‌তুত হোয়ে বোল্‌লে হ্যা ঠিক কথা। তা যাই হোক তোমার মুখের কাচে কিছুতেই মানাতো না। সৈ এবার আমার চিটি বন্দ করি ভাই। পেরকাণ্ডো হোয়ে পোড়্‌লো। এখন এক আনার ডাকে গেলে বাঁচি। আমরা এখানে ভাল আছি। তোমরা সব কেমন আছ লিখিবে। তুমি আমার ভালবাসা জেনো আর মিনি বিড়ালটাকে আমার হোয়ে গুনে গুনে একশোটা চুমো খেও। সেটার জন্যে বড়ই মন কেমন করে ভাই।

ইতি—তোমার সৈ।

নম্বর দুই

ভাই সই,

আজ বারো দিন হোলো নদীতে বান এসে সমস্ত দেশ ভাসিয়ে দিয়েচে। ও বোল্‌লে এখন চিটি পত্তর যাওয়া বন্ধ। কাযেই তোমার পেরথোম চিটিটাও পাঠানো হয়নি। এইখানেই পোড়ে রয়েচে। আর চিটির লিখনেওয়ালারই যাওয়া হোলো না তো চিটির। এই গেল সোমবার যাওয়ার দিন হোয়েছিলো। কিন্তু কথায় বলে "বিধি যদি হোলো বাম কেষ্ট বা পুরে মনোস্কাম"। কয়েক যায়গায় নাকি রেলের লাইন ভেংগে গেছে। গাড়ি বন্দ। তা যেখানে চিরজন্মটা থাকৃতে হবে সেখানে পেরথোমবার না হয় দুদিন বেশিই থেকে গেলাম তাতে দুঃখু নেই। কিন্তু ভাই ঠাট্টা না কর তো বোলি। আজ আট দিন হোলো তোমাদের বাঁড়ুজ্জে চোলে গিয়েচে পজ্জন্ত মনটা যেন আই-ঢাই কোর্‌চে। আমি ভাই তোমাদের ভালোবাসা না বাসা অতশত বুঝিনে। তবে এ বাড়িতে ওরই মুখে একটু হাসি দেখতুম। আর সব যেন তোলা হাঁড়ি নামিয়ে বোসে আছেন। বিশেষ কোরে ননোদটি। বাবা বাবা বাবা সাজ্জম্মে কারুর যেন ননোদ না হয়!

তা ভাই এক হিসেবে আমার কোনো দুঃখু নেই, কেননা উনি গেচেন খুব ভাল কাযে। যয়েতে যাদের ঘর বাড়ি পোড়ে গেচে,গোরু বাছুর ভেসে গেচে,খাবার পর্‌বার সংস্থান নেই, তাদের দেখতে শুন্‌তে ওঁরা সব দলবেঁধে গেছে। আমি গোড়ায় এত জলের কথা শুনে শিউরে গিছলুম। ওঁর পাদুটো জড়িয়ে বোলেছিলুম কোন মতেই যেতে পার্‌বে না। কিন্তু ভাই এমন কোরে গরিবদের কথা সব বোল্‌তে লাগলেন যে আমা হেন পাষাণেরও চোখে জল এল। পা দুটো ছেড়ে দিলুম। মনে কোল্লুম, মা জগদম্বা যদি ইচ্ছে করেন তো আমার সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখবেনই। ভাল কাযে বাধা দিতে নেই। যাবার সময় মার দেওয়া ছিখেত্তোরের ফুল আর পের্‌সাদ পকেটে রেখে দিলুম।

না ভাই আর যাই বলো পুরুষদের একটা বড় দোষ। ঠাকুর দেবতায় মোটেই বিশ্বেস নেই। এ ফুলে কি হবে বোলে হাস্‌তে লাগলো। আমিও তেম্‌নি কড়া মেয়ে। খুব কোসে এক ধমক দিয়েচি। তুমিই বিচার কর সৈ হিঁদুর ঘরে এত বাড়াবাড়ি কি ভালো। ঠাকুর দেবতার কাছে অপরাধ কোরে কি একটা বিগ্নি ঘটাতে হবে শেষে? আমার দিনগুনো যে কি কোরে যাচ্চে তা আমিই জানি। আজ আট দিন গিয়েচে। কোন একটা খবর নেই। পথের কাঁটার শরীরটা তেমন ভাল না। তবুও বেচারি পেরায় রোজ দুপুর বেলায় আসে। ঐটুকু সময় যা একটু অন্তোমনস্কো থাকি। ওর পেট থেকে কিন্তু সেই কথাটা বের কোর্‌ত্তে পার্‌চি না। বোল্‌লেই বোলে নিরিবিলি পেলে একদিন বোল্‌বোখন। সেদিন চেপে ধোর্‌তে আমার গাল দুটো টিপে ধোরে বোল্‌লে, এক তোমার বিরহের কষ্ট তার ওপর দুঃখুর কথা সইবে কেন কাঁটা, এই তো কোচি বুকখানি। আমি বোল্‌লুম বেশ তো বিষে বিষ খোয় যাবে যাবেখন। বল তুমি। আমার গলা জড়িয়ে বোল্‌লে তোমার বরের নামে নালিস। আগে আসামি আমুগ, জজসাহেব। তবে তো মকদ্দমা হবে। আমি সৈ কিছু বুঝতে পার্‌চি না। উনি তো অমন লোক নন। তবে কেন পথের কাঁটা অমন অমন কথা বলে। আমার বুকটা ভাই বড় ভারি হোয়ে থাকে। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে সৈ তোমার গলাটা জড়িয়ে তিনঘণ্টা ধোরে কাঁদি কাঁদি আর কাঁদি। কাল কেঁদে কেঁদে বালিস ভিজিয়েচি, তবু মনটা হাল্‌কা হয়নি। একবারটি ভাব ত সৈ কি কঠিন না প্রান আমার। ওর কোন খবর নেই। পথের কাঁটাও রোজ আসেনা। ননোদিনি কাল-সাপিনির তো ঐ দশা। বাড়ীতে কেউ একটু আদর করে না। তার পর ওঁদের ছেলে খবর পাটান না—সেও আমারই দোষ। কাল দিদি-শাশুড়ি আমায় শুনিয়ে-শুনিয়েই বোল্‌লেন বোধ হয় বউ পচন্দ হয়নি বোলে বিবাগি হোয়ে গেচে। অমংগলের কথা শুনে আমার বুকটা ধড়াস কোরে উট্‌ল। আগে এই দিদি-শাশুড়ি কাচে ডেকে কখনো কখনো ঠাট্টা তামাসা কোর্‌তেন একথা সেকথা রোজ জিগ্যেস কোর্‌তেন; কিন্তু এদাস্তি এঁরও ধরন বদ্‌লে গেচে। তা সৈ সত্যিই কি আমি এতই কুচ্ছিত? শুনেচি আজকাল টাকা না ঢাল্‌লে রূপ হয় না। তা ভাই বাবা কমই বা কি দিয়েচেন। বল্‌তে কি কিচ্ছুতেই যশ নেই। কাল সন্দের সময় ননোদ এসে বোল্‌লে, কিগো দাদার কোন চিটি-পত্তর এসেচে? আমরা তো পর হোয়েগেচি। বোঝো সৈ কথাটার ধরন বোঝো। তাই বোলছিলুম, পোড়া প্রাণ এতেও বেরোয় না। রূপকথার কোন্‌ ভোমরার বুকে আমার এ প্রাণ গচ্ছিত আছে বল্‌তে পারিস সৈ।

আজ কাল রোজ এইরম কোরেই কাটুচে। সমস্ত দিন হতচ্ছেদ্দা লাঞ্ছোনা সই। রাত্তিরে সবাই যখন শোয় তোমায় বোসে বোসে একটু কোরে লিকি। এইটুকু আমার শান্তিতে কাটে। তবুও ভয়ে ভয়ে লিক্‌তে হয় ভাই। মেঝেতে ঝি শুয়ে রয়েচে আর বিছানায় আমার সেই ননোদ। সাক্ষাৎ যম। কেউ উট্‌লেই আমার মাথায় বজ্রাঘাত। তবে ভগবান দয়া কোরে দুজনের চখ্যেই কুম্ভকর্ণের ঘুম দিয়েচেন। আর নয় ভাই, শুইগে। চোখ ঢুলে আসচে, কাল আবার লিক্‌বো অখন।

শনিবার। সৈ ভগবান মুখ তুলে চেয়েচেন। আজ ওর একখানা চিটি এসেচে। একখানা কেন বলি দুখানা চিটি এসেচে। একখানা বাড়িতে দিয়েচে আর একখানা আমায়। না ভাই আমার বড়ই লজ্জায় লজ্জায় দিনটা কেটেচে। ঝি পোড়ারমুখী আবার সব্বার সাম্‌নে চিটিটা দিয়ে

বকসিস চায়। আহা কি উবগারই করেচো তার আবার বকসিস। যদি খেমতা থাকতো তো এরম কোরে লজ্জা দেবার দরুন হেঁটোয় কাঁটা সিয়রে কাঁটা দিয়ে পুঁতুম তোমায়। কিন্তু কি কোরবো ভাই, শেষ পজ্জন্ত একটা টাকা আদায় কোরে ছেড়েচে। আবার ভয় হচ্চে কাউকে বোলে না দেয়।

আচ্ছা আমায় তোমাদের বাঁড়ুজ্জের এরম কোরে বিব্রত করা কেন ভাই। কে মাথার দিব্যি দিয়ে ঢং কোরে চিটি লিকতে বোলেছিলো আবার। সে আবার কাব্যি দেখে কে। সেখানে খাবার দাবার কষ্ট, সেকথা সোজা কোরে বোললেই হয়। তা নয়। তোমার অধর-সুধা আমায় অমর করিয়া রাখিয়াছে নহিলে এ কঠোর কেলেশ এ জীবন সহিতে পারিত না। বেশ বেশ বাবু বুঝেচি, এখন তুমি ফিরে এস। না হয় সে সুধা আরও একটু দেওয়া যাবে। কি বল সৈ। সেখানে বোসে বোসে খালি পেটে কাব্যি লিকলে হবে না। হ্যাঁ ভাই সৈ, মৃণাল মানেই বা কি আর ভুজ মানেই বা কি ভাই। কতকগুনো পদ্মের ডাঁটা ভেসে যাচ্ছিল দেখে নাকি আমার মৃণাল ভুজের কথা মনে পোড়ে যাওয়ায় মশায়ের ঘুম হয়নি। আমার তো বিস্সেস কিছু ঠাট্টা করেচে। ওসব লোককে পেত্তয় নেই। তাই যদি হয় তো নিজের ঘাড়েই উল্টে পড়বে। কেননা আমিতো বুঝতে পারচি না। কি বল সৈ। যাহক ভাই শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে আসবে লিকেচে এই আমার পুণ্যির বল। এলে যার ভাই তার হাতে সঁপে দোবো। আঁচলে বেঁধে রাখবেখন। আর বোলতে পারবে না যে আমি পর কোরেচি।

ভাই পথের কাঁটা আজ দুদিন আসেনি কেন। কাকে যে জিগ্যেস কোরি। প্রাণটা তার জন্তে বড় উতলা হোয়েচে। আহা বেচারার মা নেই। সৎমার হাতে কি শাসনটাই না ভোগ করে। এখন ভাই আসি তবে।

সোমবার। সৈ ন-দিন পরে আবার কলম ধরেচি। কিন্তু লিকতে কলম আর সরেনা ভাই। সৈ সত্যি আমার সেরা কপাল ভাই। নৈলে আজন্ম শিবপুজো কোরে পাওয়া এমন সাদের শোশুরবাড়িই বা এমন শত্তুরপুরি হোয়ে দাঁড়াবে কেন। আর কেনই বা ভগবান যা একটু হাত তুলে দিয়েছিলেন তাও কেড়ে নেবেন। কি কোরে কথাটা তোমায় বোলবো সৈ। আমার যেন সব এলোমেলো হোয়ে আসচে। ও আজ ৫ দিন হোলো এসেচে। সকালে এল। বিকেল বেলা ঘরে বোসে আমার সংগে গল্প কোরবে এমন সময় পথের কাঁটা দোরে এসে দাঁড়ালো। ওর গল্পসল্প একেবারে বন্দ হোয়ে গেল। আমি ঘোমটাটা টেনে দিয়ে ভেতর থেকে দেখতে লাগলুম কাঁটা ঢলঢলে চোখ দুটি দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আর ও মাথাটা নামিয়ে আমার বালাটা আস্তে আস্তে ঘুরুচ্চে। আমার একটু হাসি পেলে। তিনজনকেই কে যেন মন্তোর পোড়ে পাথর কোরে দিয়েচে। আমি ওর হাতটা টিপে দিলুম, দিতেই ওর যেন সাড় হোলো। তাড়াতাড়ি উটে কাঁটাকে বোললে, এসো বসো। এই দুটি কথা বোলতে আওয়াজ এত জড়িয়ে যেতে আর কখন আমি দেখিনি। ও চোলে যেতে কাঁটা এসে বোসলো। আমার ঘোমটাটা খুলে দিলে। গালদুটো টিপে বললে, দুজনের মুখদুটি এক সংগে দেখলেও একটু তৃপ্তি হোতো। তাতেও বাদ! মুখটি ঢেকে রাখলে। তোমার পথের কাঁটা নাম দেওয়াই ঠিক হোয়েচে। আমি বোললাম এদ্দিন কোথায় ছিলে ভাই। যখন ভোলো তখন একসংগে সক্কলেই ভোলো। এদেশের কি ধরনই এই। কাঁটা ঝোপে তোমার বিমর্ষ শুকনো মুখখানির দিকে আর আমি চাইতে পারতুম না ভাই। আর আসসাসের কথাও সব ফুরিয়ে এসেছিলো। তা-ভিন্ন আমার শরীটাও ভালো থাকতো না। অবিশ্যি সেটা কিছু নয় তেমন। আমি বোললুম কি হোতো আবার। শরীরকে যে শরীর বলোনা তুমি তা আমি জানি। সে বোললে বিশেষ কিছু নয় সুধু তোমার বিরহরোগের আঁচ লেগেছিলো। ওলাউটোর মতন এটাও ছোঁয়াচে কিনা। বোলে তার সেই হাসিকান্নার হাসি হাসতে লাগলো, আমি চেপে ধোরলুম। বোললুম না ভাই আজ আর ছাড় নেই। তোমাদের মধ্যে একটা কিছু হোয়েচে নিশ্চয়ই। বোলতেই হবে আজকে। তখন নিরুপায়ের কাঁটা তার দুঃখের জীবনের কথা বোলতে লাগলো। কিসের দুঃখু ভাই। আমি নিজের কথাই পাঁচ কাহন

কর্‌চি, কিন্তু ওর তুলনায় আমি তো সগ্‌গে আছি। জোর কোরে বলালুম বটে কিন্তু শুনে এতই কষ্ট হো'লো মনে হো'লো, না শুনে ছিলুম ভালো।

সৈ পুরুষকে তুমি ভাই ভালো বলো। অমন ভালো অতিবড় শত্তুরেরও হোয়ে কায নেই। ও গরিব বেচারি ছেলেবেলা মা হারিয়ে মামার বাড়ী পোড়ে ছিলো। আর কিছু না হোক মাতাল বাপ আর ডাকিনি সৎমার হাত থেকে তো বেঁচে ছিলো। সন্ধান নিয়ে নিয়ে দরদ দেখিয়ে এখানে আনানো হোলো কেন, আর কেনই বা মিছে আশা দিয়ে ওর এত দুগ্‌গতি করা হোলো। তুমিই বিচার কর সৈ ওকি পায়ে ধোরে বোল্‌তে গিয়েছিলো—ওগো আমার আপন বোল্‌তে কেউ নেই। আমায় পায়ে রাখ। তাতো নয়। তোমারই ঘাড়ে ভুত চাপলো, কত নভেলি-য়ানা কোর্‌লে চিটি লিখলে, উপহার দিলে, এমনকি বিয়ের সমস্তো কথা পজ্জন্ত ঠিক হোলো। তারপর অকস্মাৎ সব উল্‌টে দিলে। তোমার মনের মোধ্যে কি হোলো তুমিই জানো, বাইরে দেখালে আমায় দেখে বড় পচন্দো হয়েচে। আমায় না হো'লে আর চোল্‌বে না। এই হো'লো বিচার। ধিক তোমার কলেজে পাস করা আর ধিক তোমার পুরুষত্ত। সৈ পাস করান যদি আমার হাতে থাক্‌তো তো এমন সব লোককে পেরথোম ভাগের গণ্ডি পেরতে দিতুম না। সত্যিই ভাই আমার বড্ডই কষ্ট হয়েছিলো। সেদিন গপ্প বলতে বলতে কাঁটা এক একবার তার সেই হাসি হাসে আর আমার বুকের পাঁজরা-গুলো যেন খোসে যায়। মনে হয় এই যে আমায় ওর এত আদর অভ্যস্তনা এ যেন সবই ভুয়ো। একদিন এও শেষ হোয়ে যেতে পারে। কাঁটা উঠে যাবার সময় আমার গলা জড়িয়ে বোল্‌লে এসব কথা একটিও বরের কানে তুলনা যেন। পুরুষ মানুষের মন কোন্ দিক দিয়ে ভাঙে বলা যায় না আর বোল্লেও তো আমার কোন উবগার কোর্‌তে পার্‌বে না। বিধির নেকোন। আমার পোড়া কপাল পুড়িয়েছেন, তুমি আর কি কোর্‌বে বোন। আমার কিন্তু সৈ রাগে শরীর গিস্‌গিস কোর্‌ছিলো। মনে মনে ঠিক কোর্‌লুম এ অন্যায়ের একটা বিহিত কোর্‌বই তবে আমার নাম শৈলি বাম্‌নি।

রাত্তিরে ঘুমের ভান কোরে পোড়ে রইলুম। ও তাসের আড্ডা থেকে রাত কোরেই আসে। সে রাত্তিরে এসে পেরথোম আস্তে আস্তে ঠেল্‌তে লাগলো তার পরে জোরে নাড়া দিতে লাগলো। কিন্তু সত্যি জেগে ঘুমুচ্চে তুল্‌বেন কাকে। অনেক্ষণ চেষ্টা কোরে বোধ হয় বুঝতে পার্‌লে যে এ সোজা ঘুম নয়। তখন খোসামোদ সুরু কোরে দিলে। ছিছি সে খোসামোদ দেখলে বোধ হয় নেহাত যে বেহায়া তারও লজ্জা হোতো সৈ। আমার তো লজ্জাও হোলো কষ্টও হোলো আবার রাগও হোলো। তখন ঘুম ভাঙার ভান কোরে পাশ ফির্‌লুম। ভাবলুম একটা কপট ধমক দি, কিন্তু কইতে লজ্জা করে, পোড়া মুখে হাসি এসে গেলো। ভাই সৈ আমার এই হাসিটা হোয়েচে কাল। সময় নেই অসময় নেই বেরিয়েই আছে। লোকে সুখের সময়ই হাসে কিন্তু রাগে যখন গা রি রি কোর্‌চে সে সময়ও যে কোথা থেকে আমার এ পোড়া হাসি উদয় হয় তা জানিনে। গম্ভির হো'তে গিয়ে ওর কাছে একেবারে খেলো হোয়ে গেলুম। তখন ও ও পেয়ে বোস্‌লো আর আমায় ও সব কথা বোল্‌তে হোলো। আমার গপ্প শেষ হোয়ে গেলে ও অনেক্ষণ একভাবে চুপ কোরে পোড়ে রোইল। তার পর আস্তে আস্তে উটে গিয়ে বাক্‌সো থেকে একটা চিটি নিয়ে এসে আমার হাতে দিলে। আলোটা উস্কে দিয়ে বোল্‌লে পড়। বোলে বাইরে চোলে গেল। এক নিস্বেসে আমি সমস্তটা পোড়ে গেলুম। পোড়তে পোড়তে আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উট্‌ল। সে-সব কথা আর তোমায় কি লিক্‌বো ভাই। বুঝতে পার্‌লুম ওর কোন দোষই নেই। কাঁটার সৎমা মিচে কলংক দিয়ে কাঁটার চিরজন্মটা নষ্টো কোরে দিয়েচে। না-হোলে আমি আজ যে যায়গা জুড়ে বসেচি সেখানে কাঁটাই রানি হোয়ে থাক্‌তো। একটা ছোট চিটিতে বেচারার সুখের নেশা ভেঙে দিয়েচে রাক্কুসি। এখন একবারটি চোখের দেখা দেখবার জন্যে যেন কি কোর্‌তে থাকে। আর একবারটি দেখতে পেলে যেন হাতে সগ্‌গ পায়। আমার যেন মনে হোতে লাগলো ওরই ধন আমি কেড়ে নিয়ে আছি। যেন সত্যিই ওর সুখের পথে কাঁটা হোয়ে আছি। মনে মনে বোল্‌লুম, হে বিধাতা পুরুষ,

ত্রিসংসারে তোমার এমনি কি কোন বিধান নেই যাতে কোরে ওর জিনিষ ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি।

এইসব ভাবচি এমন সময় ও ফিরে এলো। ওমা দেখি কেঁদে চোখদুটো এরই মোধ্যে রক্তজবা কোরে তুলেচে। আমি তো দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এত কড়া এরা আবার এত নরম। বুকে ধক কোরে একটা চোট্ লাগল। সে মুখ যদি দেখতিস সৈ। কিন্তু তক্ষুনি মনকে কড়া কোর্লুম—না পুরুষ মানুষের এত দুর্বল হো'লে চলে না তো। আমি ওকে দেখিয়েই হাতের চিটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম আর জিগ্যেস কোর্লুম। দেখি ওর চোখদুটো আবার জলে ডব ডব কোরে উট্‌ল। আমার গলাটা জড়িয়ে বোল্‌লে, দেখ আমি বিশ্বেস করিনি বড় একটা। তবে ভয় হো'লো যদি ওকে বিয়ে করি তো এ রাক্কুসি এইসব কলংক রটাতে ছাড়বে না। সত্যি বল্‌তে কি পেরথোম পেরথোম চিটিটা পেয়ে আমি যে কি কোর্ব কিছুই ঠিক কোরে উট্‌তে পারিনি। এক দিকে ওর ভালবাসা আর একদিকে এই অগাধ কলংকের ভয়। এই দোটানায় পোড়ে আমি হাবুডুবু খাচ্চি এমন সময় একদিন তোমায় দেখলুম। শুন্‌চি তোমাদের মোধ্যে পথের কাঁটা-না কি একটা পাতানো হয়েচে। তা ঠিকই হোয়েচে কেন না তোমায় যদি না দেখতুম তো শেষ পর্য্যন্তো ওই ছোট চিটিটার ভয় থাক্‌তো কিনা বলা যায় না।

সৈ শোন সোয়ামির কিন্তু একথাগুনো আমার তেমন ভালো লাগলো না। খুব মুখ ভার কোরে বোল্‌লুম তা পথের কাঁটা সর্‌তে আর কত দেরি হয়। বেস্ বুঝতে পার্‌লুম কথাটা শুনে ও মনে মনে চম্‌কে উট্‌লো। আমার বুকের মদ্যে চেপে ধোরে বোল্‌লে, ছিঃ ওকথা বলে না। যা হবার হোয়ে গেচে। আর তো ফির্‌বে না। আমি মনে মনে বোল্‌লুম একবার দেখবো ফেরে কিনা। সৈ এখন তোমায় বলি সেই থেকে আমার মনে পাপ ঢুক্‌লো। ভাবলুম যাকে এত ভালবেসেচি তার জন্যে যদি তুচ্ছ জীবনটা যায়ই তো খেতি কি। আমি তো মরি তারপর পুরুষের মন,—উনি নিশ্চয় কাঁটাকে তুলে নেবেনখন। ভাবলুম যা হোক আমার নারী জন্ম তো সার্থক হোয়েচে। এখন আমার এ দেবতার কোলে ও অভাগিনীকে তুলে দিয়ে ওর নারী জন্মটা সার্থক কোরে দি। যা কোর্‌তে যাচ্চি তাতে অশেষ পাপ বটে। কিন্তু যিনি এত সব দেখচেন বুঝচেন সেই অন্তোর্জ্জামি আমার এ তুচ্ছ অন্তরের কথা কি বুঝবেন না। অনেকক্ষণ এই রকম ভেবে মনটাকে শক্ত কোরে ওর বুকের মোধ্যে থেকে মুখটা বার কোরে নিলুম। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে বুকটা গুম্‌রে উট্‌তে লাগলো। মনে হো'তে লাগলো এ অমূল্য রত্ন আর বেশি দিন দেখতে পাবো না তো। তাই এসব কথা ভুলিয়ে সমস্ত রাত ধোরে ওকে কত গপ্প বলালুম। যত চুমো চাইলে যেন শেষ দেওয়ার মতন দিলুম। বেহায়ার মতন আমিও গোটা কতক চেয়ে নিলুম। তারপর শেষ রাত্তিরে যখন ঘুমিয়ে পোড়্‌ল জন্মের সোধ পাদুটো জড়িয়ে পোড়ে রইলুম। মনে মনে বোল্‌লুম দেবতা আমার তুমি। মেয়ে মানুষ ধর্ম্মের জন্যে পরের জন্যে চিরকাল আত্ত-জলাঞ্জলি দিয়ে এসেচে, তাই আমিও চোল্‌লুম। অপরাধ নিও না।

ওর বোধ হয় সন্দেহ হোয়েছিলো। পরের দিন আমায় চোখে চোখে রাখতে লাগলো। আমার দুখুও হো'লো আবার হাসিও পেলে। দুকুর বেলা যখন সবাই শুয়েচে আমি বিছানায় শুয়ে রোইলুম আর ঝি এলে বোল্‌লুম ঝি কপালটা ধোরেচে একটু আপিন কিনে এনে দিতে পারিস। পোড়ারমুখি বোল্‌লে কি—কিন্‌তে হবে কেন মা, খান তো চেয়ে এনে দিগে। আমি ব্যাস্ত হয়ে বোল্‌লুম, না না, নতুন মানুষ আমি, একটা জানাজানি হবে। তার চেয়ে তুই চুপি চুপি এনে দে বাছা। এই আড়াই টাকার নোটটা নে। আমায় টাকা খানেক এনে দিয়ে বাকিটা তুই রেখে দিস। বুড়ো মানুষ এতটা পথ যাবি। টাকার লোভ বড় লোভ। ঝি চোলে গেল। সমস্ত ঘরটার দিকে চেয়ে যেন আমার কান্না আস্‌তে লাগলো। এ সগ্‌গো ছেড়ে যাওয়া কি শক্তো সৈ। এক একটা জিনিষ-বুকের এক একটা পাঁজরা যেন টেনে ধোরেচে। যে শশুর-বাড়ি অজগরের মত হাঁ কোরেছিল সেটা এই টুকুতে মার মত কোলে জড়িয়ে ধোরে রোইল। মনে হো'তে লাগলো সুখে হোগ দুঃখে হোগ নারী জন্মের এই বৈকুণ্ঠ। ননোদট,

থেকে যারা যারা যন্ত্রোণা দিয়েচে সবাইয়ের জন্যে প্রাণটা যাই টাই কোর্‌তে লাগলো। মনে হো'লো তারা যেন কত জন্মের আপনার লোক। যেন তাদের যন্ত্রোণা দেওয়াটাই কত সুখের কত.গরবের জিনিষ। এত আপনার যারা তাদের ছেড়ে থাকা কি সম্ভব। মনে মনে বোল্‌লুম ভগবান এ বের্‌তো উজ্জাপোন কোর্‌তে তুমিই আমায় খমতা দাও প্রভু।

বিকেল বেলা শেষবার ঝেড়ে ঝুড়ে ঘরটাকে পরিস্কার কার্‌ছিলুম। পালং এর কাছে যেতেই কালকের চিটিটার কথা মনে পোড়ে গেল। রাগের মাথায় সেই-যে ফেলে রেখেছিলুম আর তুলিনি তো। তবে গেল কোথায়। ঠিক পাগলের মতন হোয়ে গেলুম আমি। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন কোরে খুঁজতে লাগলুম। কোথাও সে চিঠি নেই। কে নিলে সে চিটি। যত ঠাকুর আছেন সবার পায়ে মাথামুড় খুঁড়তে লাগলুম। কত মানত কোর্‌লুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হো'ল না। আমার মনে যে তখন কি হোচ্ছিল কি বোল্‌ব সৈ। হাত পা ভয়ে যেন পেটের মোধ্যে সেঁদিয়ে যেতে লাগলো। শেষকালে আর দাঁড়াতে পার্‌লুম না। যেন কত দিনের রুগির মতন অবস হয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পোড়লুম। এমন সময় আমার সেই ছোট দেওরটি ঘরে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্‌লে বৌদি বেশ মজা হয়েচে। তোমার একটা চিটি ছোর্‌দি গিয়ে ওপাড়ার দাদুদিকে দিয়ে এসেচে। আজ খুব মজা হবে। আমার তার মুখে রা সর্‌ছিল না, সুদু জিগ্যেস কোর্‌লুম তুমি দেখেচো দিয়ে দিয়েচে। হাঁ দিয়ে দিয়েচে বই কি। ছোড়দি ভারি মজার লোক। খোকা হাততালি দিতে দিতে চোলে গেল। আমি কি যে হোয়ে গেলুম বোল্‌তে পারি না। প্রকাণ্ড বাড়িটাতে পিঞ্জরা-বধ্যো পক্ষির মতন ছট-ফট কোর্‌তে লাগলুম।

তারপর যে কি হোয়েছিলো মনে পড়ে না। ঝি বলে আমি অগ্যান হোয়ে গিয়েছিলুম যা হোক সন্দের সময় দেখি ঝি আস্তে আস্তে আমার রগ দুটো টিপে দিচ্চে। জিগ্যেস কোর্‌লুম আপিন কৈ। ঝি বোল্‌লে আন্‌ছিলুম। চাটুজ্জেদের বাড়ী হোয়ে আস্‌তে অনুঠাকরুন বসিয়ে তোমার কথা জিগ্যেস কোর্‌লে, তার পর বোল্‌লে আমায় দে। সুদু আপিনে হয় না, আমি ভাল ওসুদ ওর জানি। তোয়ের কোরে নিয়ে আস্‌চি। তাই আমি দিয়ে এসেচি। কিন্তু কৈ এখনও তো এলো না। বোধ হয় অনেক জিনিষ যোগাতে হবে। আমার গা সৈ ঝিম্ ঝিম্ কোরে এলো। ঐ কলংকের চিটি পাবার পর আপিন দিয়ে তুখিনি সে কি ওসুদ তোয়ের কোর্‌চে তা আর আমার বুঝতে বাকি রইল না। ঝি বলে আমি আবার অগ্যান হয়ে পড়েছিলুম। সৈ ভাই সমস্ত রাত যে কি কোরে কাট্‌ল তা অন্তোজ্জামি বই আর কেউ জানে না। সকালে যা ভেবেছিলুম সেই খবরটাই সমস্ত পাড়াটায় রাষ্টোর হোয়ে গেল। সে আমারই অস্তোর কেড়ে নিয়ে বড় প্রবোঞ্চনা কোরে আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল। আজ ৫ দিন হোয়ে গেচে। পাসানি আমি খাচ্চি দাচ্চি, বেশ ভালই আছি। আর কাঁদিও না অগ্যানও হোয়ে পড়ি না। পথের কাঁটা আমার পথ ছেড়ে দিয়েচে। কিন্তু সোয়ামি যখন আদর কোরে জরিয়ে ধরে বুকের একটা কাঁটা যেন খচ খচ কোর্‌তে থাকে। কেবলই মনে হয় এ কার জিনিষ কেড়ে নিয়েচি।

তুমি আমার ভালবাসা জেনো।

ইতি—

তোমার অভাগিনি

সৈ

চিঠি

শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু—

দূর প্রবাসে সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজ্‌ল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতিপাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলা দেশের বাণী,
একটুও ত দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানী।
প্রকাশ্যে তা'র থাক্ না যতই শাদা মুখের ঢং,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রং।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তা'র দাম ?
চারু কণ্ঠে ঠাঁই নাহি তা'র ; ধূলায় পরিণাম ॥

যূথী বলে, "আতিথ্য লও, একটুখানি বোসো।"
আমি বলি চম্‌কে উঠে', আরো রোসো, রোসো ;
জিৎবে গন্ধ, হার্‌বে কি গান ? নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম ; জানিনে কার জিৎ।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান,
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি' গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁই বাগানে আরেক দিনের গান যা' রচেছিনু।
ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুন্‌চি নাকি বাংলা দেশের গান হাসি সব ঠেলে'
কুলুপ দিয়ে কর্‌চে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ের যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি'।

এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলা দেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুন্‌চি দার্জ্জিলিঙে,
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে॥

জানি তুমি বল্‌বে আমায়, থামো একটুখানি,
বেণুবীণার লগ্ন এ নয়, শিকল-ঝম্‌ঝমানি।
শুনে' আমি রাগ্‌ব মনে, কোরো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে বলে'ই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তা'রা ত নয় ফাঁকি,
গিল্‌টিকরা তক্‌মা-ঝোলা নয় তাহাদের খাকী।
কপাল জুড়ে নেই ত তাদের পালোয়ানের টীকা,
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনো ত সাজাবে জুঁই দেবার্চ্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়্‌বে তা'রাই চিরটা কাল ? গড়্‌বে পাষাণকারা ?
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে ত একদমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাই ত তাহার আয়ু।
ধৈর্য্য বীর্য্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে'
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে' ছুটে'।
আজ আছে কাল নাই বলে' তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি'
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই ত প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইক অবকাশ,
হাত-কড়ারই কড়াক্কড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উল্টোদিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর্ সহে না তবু,
ধর্ম্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের জোরের প্রভু।

রক্তরঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তা'রে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
বাহুর দম্ভ, রাহুর মত, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্য্যকে সে একগরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগ্‌রে দিয়ে মেলায় ছায়ার মত,
সূর্য্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে' পশুপক্ষী ফুক্‌রে ওঠে ভয়ে,
অনন্ত দেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে॥

টুট্‌ল কত বিজয়-তোরণ, লুট্‌ল প্রাসাদ-চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হ'ল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব-দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙীন্ কুর্ত্তি, সঙীন্ মূর্ত্তি রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুট্‌বে লাজুক জুঁই।
ভাঙ্‌বে শিকল টুক্‌রো হ'য়ে, ছিঁড়্‌বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেল্‌বে হোলির ফাগ।
পাগ্‌লা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ স'বার তপস্যাতেই হোক্ বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তা'রাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তা'রেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচ্‌তে তা'রাই জানে।

পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন ক্ষেপে',
ফোঁসে সর্প হিংসাদর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তা'র ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জ্জি' বলে আমিই সত্য, দেব্‌তা মিথ্যা মায়া ;
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান্‌,
মেশীন্‌-গান্‌-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান :—

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হ'তে তুই,
ও আমার জুঁই ।
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
"আমারে চেন কি ?"
তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী ।
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি ।"

বিরহ-ব্যথার মত এলি প্রাণে কোথা হ'তে তুই,
ও আমার জুঁই ।
আজ তাই পড়ে মনে
বাদল-সাঁঝের বনে
ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কি স্বপনে-পাওয়া,
ঘুরে' ঘুরে' সারা ।
সজল তিমির-তলে তোর গন্ধ বলেছে নিঃশ্বাসি',
"আমি ভালোবাসি ।"

মিলন-সুখের মত কোথা হ'তে এসেছিস্ তুই,
ও আমার জুঁই।
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কি বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে রাতে তোমার মালা বলেছে মর্ম্মের কাছে আসি',
"আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস্ তুই,
ও আমার জুঁই।
বক্ষে এনেছিস্ কার
যুগ-যুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া ;
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্ নীরবের শেষে
ফিরে' ফিরে' যাওয়া ?
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশী
"আমি ভালোবাসি।"

২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ ;
বুয়েনোস্ আইরেস্।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি

শ্রী গৌরীহর মিত্র

বীরভূম প্রকৃতির লীলা-নিকেতন—এখানে দর্শনীয় বস্তুর অভাব নাই, প্রসিদ্ধ স্থানেরও অভাব নাই। গৌরব করিবার এখানে অনেকগুলি দেশবিখ্যাত স্থান আছে। সাহিত্য-জগতে অদ্যাবধি জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কেহ সমকক্ষ হইতে পারেন নাই—এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমলীলার সহযাত্রী হইতে পারিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত ও ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন কবি যে কত জন্মগ্রহণ করিয়া বীরভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। অনেক খ্যাতনামা সাধক ও ঋষিগণের আশ্রমস্থান বলিয়াও বীরভূমি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এক বীরভূমেই তিন চারিটি মহাপীঠ বিদ্যমান। অদ্য পতিত-পাবন প্রেমাবতার শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান পুরাণপ্রসিদ্ধ একচক্রা নামক ভূমিখণ্ডের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

কেহ-কেহ মহাভারত-বর্ণিত একচক্রা নগর 'আরা' জেলার নিকট অবস্থিত বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের সামঞ্জস্য দেখিয়া, বীরভূমের একচক্রাই যে মহাভারত-বর্ণিত একচক্রা নগর তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। বীরভূমেই পঞ্চপাণ্ডব-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চশিবলিঙ্গ বিরাজমান। পঞ্চপাণ্ডবের নামানুসারে অদূরসংস্থিত পঞ্চগ্রামের (পাণ্ডবতলা) নামকরণ হইয়াছে। বীরভূমেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কিয়ৎকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন—কোটাসুর (অসুরের কোঠ বা কোঠা) ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হেরম্ব বকাসুরের আবাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। "অ্যান্নালস্ অফ্ র‍্যুরাল বেঙ্গলে"র ৪২৮ পৃষ্ঠায় একচক্রার কথা আছে।

একচক্রা যাইতে হইলে বীরভূমের অন্তর্গত ই আই রেল্ওয়ের লুপ লাইন অবস্থিত মল্লারপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। রাস্তা তত সুবিধাজনক নহে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গোযান বা পদব্রজে গমন করিতে হয়। মল্লারপুর হইতে একচক্রা সাত মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

মল্লারপুর হইতে একচক্রা যাইবার সময়, পথে উত্তর-বাহিনী দ্বারকা নদী (এই নদীর পূর্ব্বতীরে বশিষ্ঠাশ্রম এবং তারা-মা'র দেশবিখ্যাত বিগ্রহ ও মন্দির অবস্থিত) অতিক্রম করিতে হয়। নদীর পরপারে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই ডাবুকেশ্বরনামক অনাদিলিঙ্গ শিবঠাকুরের অত্যুচ্চ মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটি অল্পদিনের। এই মন্দির নির্ম্মাণ এক বৃহৎ ব্যাপার—শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একমাত্র ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া কৈলাসপতি গোস্বামী অনুমান লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরের সম্মুখে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে ভোগমন্দির এবং ভোগমন্দিরের পশ্চাতে সুবিস্তৃত দীঘি। প্রাঙ্গণের আবার তিন পার্শ্বে একত্র সংলগ্ন তিনটি চত্বরে ভক্তবৃন্দের বাসোপযোগী শতাধিক প্রকোষ্ঠ। একক ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া অধ্যবসায়গুণে যে কি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ডাবুকের অধিবাসীগণ অধিকাংশই মুসলমান। কয়েক ঘর মাত্র তন্তুবায় আছে—তাহারা পলুর ব্যবসা করে।

ডাবুক হইতে একচক্রা বীরচন্দ্রপুর ন্যূনাধিক দুই মাইল। বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সন্তান বীরভদ্র গোস্বামীর নামানুসারেই পরিচিত হইয়া থাকে। বীরচন্দ্রপুরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মূর্ত্তি শ্রীশ্রী৺বঙ্কিমদেব বিরাজমান। এখানে প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন হইতে মাসাবধি কাল একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। এই উৎসবাদিতে মহাসমারোহ হয়। এই সময় এখানে বহুলোকের সমাগম হয়—সময়-সময় এত জনতা

হয় যে মানবের বাসোপযোগী সামান্য স্থান পাওয়া অতি দুষ্কর হয়। বঙ্কিমদেবের নাটমন্দিরে এই সময়ে অহরহ সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

একচক্রা-ধামের একাংশের নাম 'গর্ভবাস'। এই স্থানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেন বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই স্থান পরমরমণীয়। দর্শনমাত্রই যুগপৎ মন ও নয়ন জুড়াইয়া যায়। শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা-নিকেতন ভাণ্ডীশ্বর, কদমখণ্ডী, যমুনা ঘাট, বিশ্রামতলা. সিদ্ধ বকুলতলা, অমলীতলা (অম্বলীতলা), মালাতলা, পদ্মাতলা, রাসতলাগুলি দর্শকদের নয়নমনের পরমানন্দ বিধান করিয়া থাকে। মহাপ্রভুর জন্মস্থান বীরচন্দ্রপুরের সংলগ্ন একচক্রা গ্রাম। মধ্যে ক্ষীণকায় একটি কন্দর (যমুনা);—উহা পার হইয়াই একচক্রা। এই স্থানের অপর অংশই 'গর্ভবাস' নামে খ্যাত। এই স্থানের আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ বিবিধ ফল-পুষ্পে পরিশোভিত। বিচিত্র ঘন তরুলতাসকল আশ্রমের পরম সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য-লীলার কেন্দ্রস্থল। ১৩৯৫ শকাব্দে একচক্রা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পত্নীদ্বয় কালনা-নিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের কন্যা বসু ও জাহ্নবা। এই বসুধা দেবীর গর্ভে বীরভদ্র বা বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। জাহ্নবা দেবী অপুত্রা ছিলেন বলিয়া তিনি রামচন্দ্র গোস্বামীকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও জাহ্নবা দেবী সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা জনসাধারণে প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র স্থান নির্দ্দেশ-উপলক্ষে যতটুকু আবশ্যক তাহাই পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিব।

একচক্রা-মধ্যে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর লীলার স্থল নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই স্থানগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী।

(১) বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর—এখানে নিত্যানন্দ আরাধিত শ্রীশ্রী বঙ্কিম রায়ের (বাঁকা রায়) শ্রীবিগ্রহ-মূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে বসু ও জাহ্নবা দেবী অবস্থান করিতেছেন, ভক্তগণ এতৎসম্বন্ধে কহিয়া থাকেন যে নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্কিম দেবের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হন। এই নিমিত্ত শ্রী বঙ্কিমদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুতে অভিন্ন কল্পনা করিয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নীদ্বয়ের মূর্ত্তি ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের সিংহাসন-পার্শ্বে একাসনে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী মূর্ত্তি যোগমায়া, রাধা-মাধব ও রাধিকা, দ্বাদশ গোপাল এবং বহুতর শালগ্রাম অবস্থিত রহিয়াছেন। বঙ্কিমদেবের কৃষ্ণ-মন্ত্রে এবং বসু ও জাহ্নবার রাধা-মন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে। এখানে যথারীতি সেবাদির বন্দোবস্ত আছে। বঙ্কিমদেবের বিষয়সম্পত্তি ও জমিদারী আয় যথেষ্ট; কিন্তু ব্যবস্থা থাকিলেও অধুনা অতিথি-অভ্যাগতের তাদৃশ সমাদর পরিলক্ষিত হয় না। খনৎ খাঁ, নিত্যানন্দ প্রভুকে বীরভদ্রপুরের জমিদারীস্বত্ব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রদান করেন। প্রবাদ আছে, খনৎ খাঁ নিজ কনিষ্ঠ পুত্র নিয়াজ খাঁর খনিত গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নিয়াজ খাঁ নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাহাড়ে, নিত্যানন্দ প্রভুর মহত্ত্ব দর্শনে জীবিতাবস্থায়, সমাধিস্থ হন।

বঙ্কিম দেবের আয় সামান্য নহে; কিন্তু শ্রীমন্দিরের অভাবে ভোগমন্দিরান্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গৃহে কয়েক বৎসরাবধি বঙ্কিমদেব অধিষ্ঠিত আছেন। ভোগমন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও প্রবেশ-দ্বার একেবারে ভগ্ন ও জরা-জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে শ্রী নিতাইগৌর বিরাজ করিতেছেন। আর-একটি মন্দিরে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী মাত্র। এইটি সূতিকাগৃহ। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। সূতিকা-মন্দিরের সম্মুখেই নাট মন্দির। ইহার ছাদ ভগ্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের স্তম্ভ ও প্রাচীর আপন দুর্দ্দশা দর্শকবৃন্দকে যেন করুণস্বরে জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্য-স্থলে স্তূপাকার ইষ্টকখণ্ড; ইহার পরেই একটি বাঁধা-ঘাট-বিশিষ্ট কুণ্ড। সূতিকা-মন্দিরের পার্শ্বেই এক অতিবৃহৎ বটবৃক্ষ বর্ত্তমান—ইহা ষষ্ঠীতলারূপে পরিচিত। এই বৃক্ষ-তলায় প্রভুর ষষ্ঠীপূজা হইয়াছিল।

বঙ্কিমদেবের মন্দিরের উত্তরাংশে ভাণ্ডীশ্বর শিব

এবং জগন্নাথ-মূর্ত্তি বিরাজমান। এই স্থলে সুবৃহৎ মাধবী-লতা-পরিবেষ্টিত একটি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে বঙ্কিমদেবের গোষ্ঠবিহার হইয়া থাকে।

বীরভদ্রের বারোশত চেলা খুন্তীদ্বারা শ্বেতগঙ্গা পুষ্করিণী খনিত করে। কেহ-কেহ এই পুষ্করিণী জাহ্নবা দেবীর আদেশে, নেড়া বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক খনিত হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন। এই শ্বেত গঙ্গার পূর্ব্বে অমলীতলা (একটি অতি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ); এই বৃক্ষ-সম্বন্ধেও অদ্ভুত প্রবাদ আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম না।

(২) কদমখণ্ডী—একটি অতিক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী। প্রবাদ, এই কদমখণ্ডীর ঘাটে শ্রীবঙ্কিমদেবের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী দারু উজানে ভাসিয়া আসিয়াছিল—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কন্দরের এই স্থলে একটি বাঁধা ঘাট রহিয়াছে। ঘাটের উপরে বৈষ্ণবগণের সমাধি এবং নিতাই দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক ভক্তগণের স্বাগত প্রতীক্ষা করিতেছেন, গৌরাঙ্গ প্রভু উদ্দাম নৃত্যশীল।

(৩) অদূরে বিশ্রাম-তলা—এই স্থানে চৈতন্য মহাপ্রভু আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলরামের বিগ্রহ-মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

(৪) পদ্মাবতী পুষ্করিণী—এখানে নিত্যানন্দ-জননী প্রসবের একবিংশ দিবস গত হইলে স্নান করিয়াছিলেন।

(৫) গর্ভবাস—শ্রীমন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে অবস্থিত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মালা রাখিয়াছিলেন। এই বৃক্ষটি "মালা তোলা" নামে খ্যাত, মূল বৃক্ষটির প্রকাণ্ডের একাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, বাকী কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সূতিকাগার। এই স্থানে একটি মন্দির অধুনা কোনো ভক্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। অপর পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বিগ্রহ-মূর্ত্তি। একজন বৈষ্ণব মোহান্ত কর্ত্তৃক সেবাদি পরিচালিত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তি আছে।

(৬) সিদ্ধবকুলতলা—এই প্রাচীন বকুলবৃক্ষ একটি সমগ্র বৃহৎ প্রাঙ্গণ জুড়িয়া শাখা-প্রশাখায় ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বকুল-তলে উপবেশন করিলে মনঃপ্রাণ শীতল হয় এবং অন্তরে স্বভাবতঃ এক অপূর্ব্ব অমিয়-ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই বকুলতলায় নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যলীলা করিয়াছিলেন। ভক্তগণ এই বৃক্ষগাত্রে তাঁহার অঙ্গুলি-স্পর্শের চিহ্ন দেখিতে পান। সর্পফণাকার শাখা-প্রশাখা অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে শ্রীরাধাকান্ত দেবের বিগ্রহমূর্ত্তি বিরাজমান, সেবা-পরিচালনের বিষয়ের অভাব নাই। একজন নির্দ্দিষ্ট মোহান্ত বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু শ্রী-অঙ্গের অঙ্গরাগের প্রতি বহুদিন হইতে যেন তাঁহারা হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন।

(৭) হাঁটুগাড়া—এক চতুঃসীমা-অন্তর্গত বারবিঘা ভূমির মধ্য-স্থলে এই গর্ত্তটি অবস্থিত। এই কুণ্ড-গর্ভে জল-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকময় মন্দির আছে। প্রবাদ যে, ভূমি নিড়াইবার ছলে শ্রীবঙ্কিমদেব এই স্থানে হাঁটু-গাড়িয়াছিলেন এবং তদবধি এই গর্ত্ত হইয়াছে। বঙ্কিম-দেব পরে হঠাৎ অদর্শন হইয়া দারুমূর্ত্তি পরিগ্রহণান্তর উজান বাহিয়া কদমখণ্ডীর ঘাটে প্রকটিত হন। এই গর্ত্ত বা কুণ্ডটি "জাহ্নবী কুণ্ড"নামে খ্যাত। এখানে ভক্তগণ গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ প্রভু দাঁতন করিয়া যে নিম্বশাখা প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল—কালবশে তাহা লয় পাইয়াছে; তাহার মূল হইতে একটি অপর নিম্ববৃক্ষ জন্মিয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

(৮) পাণ্ডবতলা—এই স্থানে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কতিপয় দিবস অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। এখানে দুই-তিনটি অতি প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। কালক্রমে এইসমস্ত স্থানের অনেক বন-জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া ধেনো জমি প্রস্তুত হইয়াছে।

এইসকল স্থানে আসিয়া মানব মনে অপূর্ব্ব আনন্দ পায়। এইসমস্ত স্থান নানারূপ বৃক্ষলতা-গুল্ম-দ্বারা পরিশোভিত। প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতন বাস্তবিকই এক অপরূপ জিনিষ।

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র—শ্রী মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত। প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৫৯ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা সোনালী লেখা। সচিত্র, ২৲ টাকা।

গ্রন্থকার মন্মথ-বাবু বঙ্গদেশের অতীত গৌরবময় যুগের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনী ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া পর-পর অনেকগুলি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; এইসকল পুস্তকে প্রধান ব্যক্তির সম্পর্কে তাঁহার সম-সাময়িক ও তৎসম্পর্কিত বহু প্রথিতযশা ব্যক্তির বিবরণ ও চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া প্রত্যেক পুস্তকের উপাদেয়তা, উপকারিতা ও মূল্য প্রবর্দ্ধিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র সেকালের হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র। ভোলানাথ কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিয়া তৎকালীন স্বচ্ছ সংবাদপত্রে বহু বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিয়া এবং বিবিধ বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

ইস্‌লামের ইতিহাস—কাজি আক্‌রম হোসেন প্রণীত। মোস্‌লেম্ পাব্লিশিং হাউস্, কলেজ স্কোয়ার (ঈষ্ট), কলিকাতা। ৩৫২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, ২৷৹ টাকা।

এই পুস্তকে ইস্‌লামের উৎপত্তি হইতে পৃথিবীময় বিস্তারের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। ইস্‌লামের পূর্ব্বে আরব দেশের অবস্থা, হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাব ও ধর্ম্ম-প্রচার, চারিজন খলিফার বৃত্তান্ত, উমিয়া বংশ ও আব্বাসিয়া বংশের ইতিহাস, ক্রুসেড বা জেহাদের ইতিবৃত্ত, মিশরে, স্পেনে, তুরস্কে, পারস্তে, আফগানিস্থানে, ভারতে, চীনে ও ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস এবং ইস্‌লামের প্রভাবে সেই-সেই দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সভ্যতা কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ ভাষায় সরস করিয়া লেখা; অনেক ফারসি কবিতার পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিও সুন্দর।

রূপক ও রহস্য—অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। প্রকাশক শ্রী নলিনচন্দ্র পাল, ১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। হৃষীকেশ সিরিজের ৬নং পুস্তক, ২১৭ পৃষ্ঠা, কাগজের শক্ত মলাট ২৲ টাকা।

এই পুস্তকে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ৩৬টি গদ্য-পদ্যময় রঙ্গ-রসাল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। এইসব প্রবন্ধের জন্ত এককালে বঙ্গদর্শন, নবজীবন, সাধারণী প্রভৃতি মাসিকপত্র তৎকালীন পাঠকদিগের নিকট পরম আগ্রহের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল; চনকচূর্ণ, ভাই হাততালি প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা তখনকার লোকের মুখে মুখে বিঘোষিত হইতে আমরাও বাল্যকালে শুনিয়াছি। এই সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত হওয়াতে বঙ্গ সাহিত্যের অভ্যুন্নতির একটি দিক্ সুরক্ষিত হইল।

প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি—প্রথমভাগ। ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের ইংরেজী পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত; প্রকাশক শ্রী নলিনচন্দ্র পাল, ১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২১৯+৬+।৹+২৷৴৹ পৃষ্ঠা। ১৷৹ টাকা।

দণ্ডনীতি নাম হইতে আধুনিক পাঠকদের এই পুস্তকের উপজীব্য বিষয়ের সম্বন্ধে ভুল ধারণা হইতে পারে; ইহাতে অপরাধীর প্রতি প্রাচীন ভারতের শাস্তি প্রদানের বিষয় অল্পই আছে; ইহাতে পশুপালন, খনি খনন, জল সেচন, আবহবিদ্যা, পথ ও যান, লোকহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠান, লোক-গণনা, বিচারালয় ও বিচার পদ্ধতি, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণগ্রহণ ন্যাস বা গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক ও রাজ্যশাসন প্রণালীবিষয়ক বহু তথ্য প্রাচীন পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলা পুস্তকে সুদুর্লভ একটি বিষয় নির্ঘণ্ট এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়াতে পুস্তকস্থ বিষয় অনুসন্ধান করিবার সুবিধা হইয়াছে।

কমলাকান্তের পত্র—প্রকাশক শ্রী চারুচন্দ্র রায়, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস্, চন্দননগর। ১৯৩ পৃষ্ঠা, কাপড়ে-কাগজে বাঁধা শক্ত মলাট ১৲ টাকা।

এই পুস্তকে re-incarnation কমলাকান্তের ৩০ খানি পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সাবেক কমলাকান্ত রসিকতার আবরণ দিয়া বহু-বিষয়ের গভীরতত্ত্ব আলোচনার যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নূতন অবতারও সেইরূপ গভীর অভিনিবেশ ও বিচক্ষণতার সহিত অনেক চিন্তনীয় তত্ত্ব রসলিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে নব-নব বিষয়ে চিন্তা উদ্রিক্ত হয়, জ্ঞাত বিষয়ের উপর নূতন আলোকপাত হয়, বহু সমস্যা ও সমাধান মনের সম্মুখে উপনীত হয়। আধুনিক কালে বঙ্গসাহিত্যে চিন্তাশীলতার নিতান্ত অভাব; চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে যে-পরিমাণ বিদ্যা ও জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া প্রকাশ করিবার শক্তির আবশ্যক তাহা আধুনিক লেখকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় একখানি চিন্তাশীল প্রবন্ধের পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম।

খাদ্য—শ্রী চুনীলাল বসু, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা। ২৲ টাকা।

এই পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে—ইহাই এই পুস্তকের উপাদেয়তা, উপকারিতা ও জন-প্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সংস্করণের সুখ্যাতি প্রবাসীতে করা হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য—শ্রী চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, সুশ্রুত সঙ্ঘ, ১৭৭নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০১ পৃষ্ঠা, ৮০ আনা।

এই পুস্তকে বিবিধ খাদ্যের মূল উপকরণ ও পুষ্টিকারিতা, বিবিধ আহারের তারতম্য, মাদক দ্রব্যের অপকারিতা, উপবাসের উপকারিতা বয়স-ভেদে আহারের তারতম্য, রোগের পথ্য প্রভৃতি বহু বিষয় ১৭ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বিস্তৃত হয় ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। পুস্তকখানিতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হইয়াছে।

মুদ্রা-রাক্ষস।

ছোটদের বই—শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতার বড়-বড় বহির দোকানে পাওয়া যায়। দাম সাত আনা।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ম বই লেখাতে অমৃত-বাবুর হাত আছে। আলোচ্য বইখানিও ইহার ব্যতিক্রম নহে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা এই গল্পের বহিখানি পাঠে আনন্দ এবং উপকার দুই পাইবে। বইখানির মধ্যে কয়েকখানি ছবি থাকায় দরুন্ বইখানি আরো উপাদেয় হইয়াছে। প্রচ্ছদ-পটের ছবিখানি রঙীন এবং ভালো। ছেলেমেয়েদের এইপ্রকার ছবি ভালো লাগে। এই গল্পের বহিখানি উপহার-পুস্তকরূপে ব্যবহার করা উচিত—স্কুলপাঠ্য হইলে ত কথাই নাই। ছাপা, কাগজ ইত্যাদি সবই ভালো হইয়াছে।

মধুমালতী (কবিতার বই)—শ্রী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য দোকানে পাওয়া যায়। দাম এক টাকা।

সাবিত্রীবাবুর নাম কবিতা-লিখিয়ে-হিসাবে বাংলাদেশের মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা-পাঠকেরা জানেন। তাঁহার কবিতাগুলি মাঝে-মাঝে পড়িতে বেশ লাগে। দু-একটি কবিতার মধ্যে অতি চমৎকার চিত্র আছে যাহা পাঠে মন আকৃষ্ট হয়। আলোচ্য বইখানিতে এই কয়েকটি কবিতা নাম করিবার মতো—সাঁঝ-সাঁঝে, মনের মাণিক, প্রেমের পান্না, চির-আদরিণী এবং ফিরে' চল। জবাবদিহি নামক কবিতাটি অনাবশ্যক টানিয়া বড় করা হইয়াছে। সম্বলহীন দীর্ঘ কবিতা পাঠ করিতে ভালো লাগে না। আরো কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলিকে বাদ দিলে ভালো হইত—তাহাতে কেবল কথায়-কথায় মিলই আছে, অন্য কিছু প্রায় নাই বলিলেই হয়। মোটের উপর বইখানি কবিতাপাঠামোদীদের হয়ত ভালো লাগিবে।

গ্রন্থকীট

বৈদ্য-জাতির ইতিহাস। ২য় ভাগ, প্রথমাংশ, ১-২০০ পৃষ্ঠা, রয়েল আটপেজি, মূল্য ২৲। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন, বি-এল্, প্রণীত এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক নোয়াখালি হইতে প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থকারের সতর্ক দৃষ্টি ও পরিশ্রমের পরিচয় পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। এই পুস্তকের প্রথম অংশে মাত্র তিনটি অধ্যায় স্থান পাইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বৈদ্যজাতির গোত্র,প্রবর ও বংশ কর্ত্তা; ২য় অধ্যায়ে কলিতে বৈদ্য বিদ্বেষ ও বৈদ্য জাতির বেদাচার এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদ্য জাতির সমাজ ও শ্রেণী বিভাগ আলোচিত হইয়াছে।

বসন্তবাবু যেরূপ অক্লান্তভাবে বৈদ্য-সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের গাঁঠের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপিতেছেন তাহাতে তিনি শুধু বৈদ্য সমাজের নহে, ঐতিহাসিকপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহার এই নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে মুগ্ধ হইয়া বৈদ্য সমাজের প্রত্যেক সম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রত্যেক বৈদ্য পরিবার তাঁহার পুস্তক এক-এক খণ্ড ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রতি কিছু নগদ সহানুভূতি দেখাইবেন তবে তাঁহার ভুল ভাঙিতে দেরী হইবে না। বসন্ত বাবুর নিকটও এক অনুরোধ আছে। পয়সা খরচ করিয়া যখন বই ছাপিয়াছেনই তখন আরো কিছু পয়সা খরচ করিয়া কোনো মাসিক পত্রে বছরখানেক উহার বিজ্ঞাপন রাখিবেন এবং বিবরণী মুদ্রিত করিয়া বৈদ্য-সমাজের প্রধান-প্রধান ব্যক্তির নিকট ও বৈদ্যপ্রধান গ্রাম-সমূহে ডাক-যোগে বিতরণ করিবেন। পুস্তকের সার্থকতা-প্রচারে, রচয়িতার আল্‌মারিতে পচিলে কিছুমাত্র লাভ নাই।

এইসকল জাতীয় ইতিহাসে কলহের সুর এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দূর করা কঠিন। গালি একজনে পূর্ব্বে দিয়া থাকিলে ফিরিয়া তাহাকে গালি দিবার প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। সুখের বিষয় বসন্ত-বাবু এই কঠিন কাজেও প্রায়ই সফলতা দেখাইয়াছেন এবং প্রকৃত-ইতিহাস-প্রিয় ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসার পরিচয় তাঁহার পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকের সূচীপত্রের আরো বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয় এবং গ্রন্থশেষে পূর্ণাঙ্গ নামসূচী অবশ্য প্রদাতব্য।

মফঃস্বলে বসিয়া ইতিহাস আলোচনা করা বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু কত কর্ম্মী নিভৃতে বসিয়া তবু শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন, আমরা হয়ত তাহার কোনই খবর রাখি না। বৈদ্যজাতির ইতিহাস ১৩২৯ সনে বাহির হইয়াছে, অথচ আমি জানিতে পারিলাম মাত্র বহিখানি হাতে পাইয়া।

শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী

ওমর খৈয়াম। শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী গিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, ৫ মীর মহম্মদ লেন, কলিকাতা। দাম আট আনা।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। সুতরাং বইটি সাধারণের কাছে আদর পাইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। ওমর খৈয়ামের বাংলা অনুবাদ বাজারে কয়েকখানি আছে। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ বেশ নাম-করা। আলোচ্য বইটিতে অনুবাদক মূলের (ইংরেজী অনুবাদের) ভাবানুবাদ না করিয়া মূলকে যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পাঠকের সুবিধার জন্য প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বাম দিকে ইংরেজী অনুবাদ ও দক্ষিণ দিকে বাংলা অনুবাদ ছাপিয়াছেন। ইহাতে পাঠকদিগকে অনুবাদকের কৃতিত্ব বুঝিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ-যোগ্য জিনিষ হুবহু নকল করিলে সব সময়ে সুবিধা হয় না, তাহার ভাবের অনুবাদ অনেক সময় প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং তাহা সঙ্গতও হয়। কান্তিবাবু অনুবাদে খানিকটা স্বাধীনতা লইয়াছেন; বিজয়-বাবু অনুবাদ মূল-নিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিজয়-বাবুর চেষ্টা বিফল হয় নাই, কিন্তু তাঁহার অনুবাদ মাঝে-মাঝে আড়ষ্ট হইয়াছে। তবে অধিকাংশ স্থানে তাঁহার অনুবাদ ভালো হইয়াছে।

বইটির বাঁধা ও ছাপা বেশ ভালো হইয়াছে।

গুপ্ত

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কার্ত্তিকের প্রবাসীতে "রুদ্র" প্রসঙ্গে পৌরাণিকগণ যে-দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বৈদিক মূল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈদিক মূল নাই তা বলিতেছি না। কিন্তু বৈদিক দক্ষযজ্ঞ পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া মনে করি। কেননা, পৌরাণিক আখ্যানে এমন সকল কথা আছে, যাহার উপকরণ বৈদিক উপাখ্যানে পাই না। পৌরাণিক আখ্যানের মূল কথা দক্ষের ২৮ কন্যা। ২৭ জন চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহিত। একজন বাহিরে। তিনি সতী, শিবের স্ত্রী। সতীর দেহত্যাগে দক্ষের প্রাণনাশ। তার পর ছাগমুণ্ডে দক্ষের পুনর্জ্জীবন। এই কথা বৈদিক উপাখ্যান হইতে কষ্ট-কল্পনা করিয়াও পাওয়া যাইবে না। আমার মনে হয় ইহার মধ্যে কেবল মিথ (Myth) নাই, ইতিহাসও আছে রূপক-আকারে। দক্ষের ২৮ কন্যা, নক্ষত্র-চক্রের ২৮ নক্ষত্র। ২৭ জন চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহিত, একজন, সতী বা অভিজিৎ (Vega) চন্দ্রের ভ্রমণ-পথের অনেক বাহিরে বলিয়া চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহিত নয়। ভেগার অধিপতি ব্রহ্মা। কিন্তু পুরাণকারও বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মার মতন শিষ্টশান্ত ভদ্রলোকের দ্বারা দক্ষযজ্ঞের মতন এমন কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড ঘটানো চলে না। আর, পুরাণকারের দক্ষ ত ব্রহ্মারই পুত্র। সুতরাং ব্রহ্মা দক্ষের কন্যাকে বিবাহই বা করেন কিপ্রকারে? তাই সব দিক্ বিবেচনা করিয়া শিবকে টানিয়া আনা হইয়াছে। নক্ষত্রচক্র লইয়া হিন্দুরা বেশ ছিলেন। এমন সময় গ্রীকদিগের সংস্পর্শে ব্যাবিলোনিয়ার রাশিচক্র আবির্ভূত হইল। যবনদিগের সঙ্গে যে জ্যোতিষিক আদান-প্রদান হইয়াছে তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। গ্রহগণের একাধিক নাম যাবনিক। পণফর, আপ্নক্লিস, প্রভৃতি গ্রীক। সেইজন্য জ্যোতিষে শুক্র ও চন্দ্র স্ত্রীগ্রহ। রাশিচক্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া একদল উহা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন। নক্ষত্র-চক্রই বলি আর রাশি-চক্রই বলি এই আকাশ-চক্রই দক্ষ। রাশিচক্রকে নক্ষত্র-চক্রের উপরে ফেলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে ২৮ নক্ষত্র রক্ষা করা চলে না। ভেগা নক্ষত্র অনেক দূরে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। আরও সুবিধা, ২৭কে ১২ ভাগ করিলে সওয়া দুই নক্ষত্রে এক রাশি হয়, সুতরাং সহজ গণনারও অনুকূল। তাই অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইল—দক্ষের ২৮ কন্যার একজন গেলেন, সতীর দেহত্যাগ হইল। রাশি-চক্র কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইল না। এত বড় একটা সংস্কার হঠাৎ হয়ও না। ইহাই দক্ষের বিনাশ। কিন্তু পরে যে রাশিচক্র গৃহীত হইয়াছে, তাহার আর প্রমাণ দিতে হইবে না। ইহাই দক্ষের পুনর্জ্জীবন। প্রথম রাশি অজ (ছাগ ও মেষ উভয়ার্থ) বাচক বলিয়া দক্ষ এখন হইতে ছাগমুণ্ডধারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভাগবতে "প্রজাপতের্দ্দগ্ধশীর্ষ্ণো র্ভবত্বজ-মুখং শিরঃ" রহিয়াছে। প্রথম রাশি 'ছাগ' বলিয়া দশম রাশি ক্যাপরিকর্নাস্ (Capricornus) আর ছাগ হইতে পারে নাই। মকর হইয়াছে। মকর রাশির একটি নাম কিন্তু 'মৃগ'। ব্যাবিলোনিয়ানদের দশম রাশি মৃগমুখ, কিন্তু পশ্চাদ্দেশ মকরাকৃতি। এই পশ্চাদ্দেশই গৃহীত হইয়াছে প্রথম রাশির সঙ্গে গোলমালের ভয়ে। কিন্তু মুখকে অস্বীকার করা হয় নাই। "শব্দকল্পদ্রুম" বলেন, মকর রাশির অধিপতি দেবতা "মৃগাস্য মকর"। ইহা অপেক্ষা সংশয়চ্ছেদী বাক্য আর হইতে পারে না। এই আকৃতি ব্যাবিলোনিয়ানদিগের ইয়া (Ea) দেবতার এবং ইনিই তাঁহাদের দশম রাশির প্রতিকৃতি।

এই দক্ষযজ্ঞে বোধ হয় আরও একটু ইতিহাস আছে। শিব হিন্দুর প্রাচীন দেবতা নহেন। ইঁহাকে হিন্দু দেবসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করানো লইয়া অবশ্য বিবাদ হইয়াছিল। নূতন-কিছু করিতে গেলে চিরদিনই বিবাদ হইয়া থাকে। শিবকে প্রবেশ করাইতে যাইয়াও বিবাদ হওয়া সম্ভব। আর পুরাণকারও বলিয়াছেন, শিবকে যজ্ঞস্থলে দেখিয়া ব্রহ্মা'ও বিষ্ণু উভয়েই বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—ইনি আবার কে? ইঁহাকে পূর্ব্বে ত কখনও দেখি নাই। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যদের যজ্ঞস্থলে প্রথম "শৈব"দের সঙ্গে শিব-বিরোধীদের একটি "কুরুক্ষেত্র"-কাণ্ড বাধিয়া উঠা অসম্ভব ছিল না। এখনও ত বর্ত্তমান কালের যজ্ঞ-ক্ষেত্র অর্থাৎ সভা-সমিতিতে 'মহাত্মাজি' না বলিয়া 'গান্ধিজি' বলিলেই দক্ষযজ্ঞের সূচনা হয়।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

—

কেবট জাতি

আমি "কেবট জাতি" প্রবন্ধে কৃষিকৈবর্ত্তগণের সামাজিক অবস্থা ও প্রথা-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়াছিলাম। আমার সেইসকল উক্তির পশ্চাতে রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তি-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ-লিখিত সরকারী নজির রাখিয়াই যাহা-কিছু বলিয়াছিলাম। মাহিষ্যগণ ঐসকল নজিরের যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। আমার প্রবন্ধ কদাপি তাঁহাদের বিরুদ্ধে লিখিত হয় নাই। আমি প্রাচীন Ethnosদিগেরই কথা লিখিয়াছি। তাঁহারা কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঐসকল নজিরে লিখিত বিষয়গুলি ভুল। সুতরাং কৃষিকৈবর্ত্তগণের ও তাঁহাদের ব্রাহ্মণগণের সামাজিক মর্য্যাদা-সম্বন্ধে আমার ঐসকল উক্তি ভুল হইয়াছে মানিয়া লইলাম ও আপত্তিজনক অংশগুলি প্রত্যাহার করিলাম।

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উপরে মুদ্রিত লেখাটি পাঠাইয়াছেন বলিয়া আমরা অনাবশ্যক-বোধে তাঁহার লেখার প্রতিবাদগুলি ছাপিলাম না।

প্রবাসীর সম্পাদক
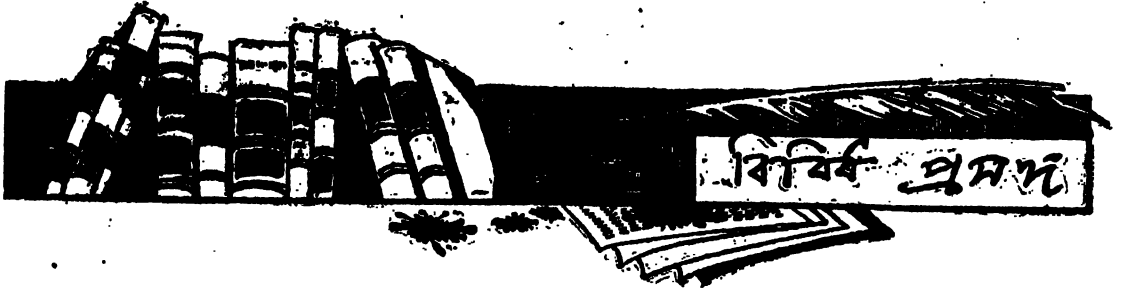
স্বরাজ কিরূপ হওয়া উচিত

দিল্লীতে সকল রাজনৈতিক দলের যে পরামর্শ-সভা হইয়াছিল, তাহার দ্বারা একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কমিটি অন্যান্য কাজের মধ্যে, ভারতীয়েরা কিরূপ স্বরাজ চান, তাহার একটা খস্‌ড়া প্রস্তুত করিবেন। ইতিমধ্যে মিসেস্ বেসাণ্ট্ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারা, ভারতবর্ষকে বর্ত্তমান অবস্থায় স্বরাজ দিতে হইলে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে যেরূপ বিল উপস্থিত করা আবশ্যক, তাহার একটি খস্‌ড়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে আলোচনার সুবিধা হইবে।

আমরা কিরূপ স্বরাজ চাই, তাহা আলোচনা করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষাও আরও অনেক অধিক সুবিধা হইয়াছে, অল্পদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়স্‌বাল্ প্রণীত "হিন্দু পলিটি" (হিন্দু রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালী) নামক গ্রন্থের প্রকাশে। ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিবেচনা করিতে হইলে আগে এদেশে কি-কিরকম শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা জানা খুব দর্‌কার; কারণ, যে-দেশে যে উৎকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভব হয়, সেই দেশের পক্ষে তাহার কতকটা উপযোগিতা আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সেই জ্ঞান সুগম করিবার জন্য জায়স্‌বাল্ মহাশয় নানা সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ, শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই মূল্যবান্ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে, যে, ভারতবর্ষে চির-কাল কেবল নিজের ইচ্ছা-অনুসারে শাসনকারী রাজাদের শাসনই প্রচলিত ছিল, এবং এই রাজারা কোন আইন বা নিয়ম-অনুসারে চলিতে বাধ্য ছিলেন না। এরকম স্বেচ্ছাচারী রাজা এদেশে ছিলেন না, এমন নয়; অনেক ছিলেন। সেরূপ রাজা অন্যান্য দেশেও ছিলেন, এবং এখনও কোথাও-কোথাও আছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাচারী রাজার শাসনই একমাত্র বা সাধারণতঃ প্রচলিত শাসন-প্রণালী ছিল, ইহা বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধারণতঃ রাজাদিগকে অনেক নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত, এবং প্রজাদের মত অনুসারেও চলিতে হইত।

তদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনেক সাধারণতন্ত্র (রিপাব্লিক্) প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনেকের ধারণা, ভারত-বর্ষে যে স্বায়ত্তশাসন ছিল, তাহা গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসন মাত্র; অর্থাৎ গ্রামগুলি কোন রাজা বা সম্রাটের অধীনে থাকিয়া নিজ-নিজ আভ্যন্তরীণ সমুদায় ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। এরূপ গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যে সাধারণতন্ত্রগুলির কথা বলিতেছি, তাহারা কোন রাজা, সম্রাট্ বা অন্য কাহারও অধীন ছিল না; তাহারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ সব কাজ নিজেরা ত করিতই; অধিকন্তু অন্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি-যুদ্ধ প্রভৃতিও করিত।

হিন্দু শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া জায়স্‌বাল্ মহাশয় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মডার্ন্ রিভিউ-মাসিকে ঐবিষয়ের উপক্রমণিকা-স্বরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহার পূর্ব্বে কোন আধুনিক ভাষায় ঐবিষয়ে কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

কথ্যমান পুস্তকটিতে প্রধানতঃ দুই খণ্ডে সাধারণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহা হইতে গ্রন্থটির বিষয়-গৌরব-সম্বন্ধে কোন ধারণা হইবে না। উহার সমগ্র সূচীটি দিতে পারিলে কতকটা ধারণা হইত। কিন্তু তাহা দিতে গেলেও প্রবাসীর ১০।১২ পৃষ্ঠা লাগিত। তাহা দিবার সময় ও স্থান এখন নাই। সেইজন্য আমরা নীচে কেবল এই গ্রন্থে উল্লিখিত বা বর্ণিত সাধারণতন্ত্রগুলির নাম দিতেছি:—

অগ্রশ্রেণী, অম্বষ্ঠ, অন্ধক, অঙ্গ, আরট্ট বা অরিষ্ট,

ঔদুম্বর, অবন্তি -(এখানে বৈরাজ্য প্রচলিত ছিল), আভীর, আর্জ্জুনায়ন, ভগল, ভর্গ, ভোজ, ব্রাহ্মগুপ্ত, ব্রাহ্মণক, বুলি, চিকৃকলিনিকায়, দক্ষিণমল্ল, দামনি, দাণ্ডকী, গান্ধার, মৌচুকায়নক, গোপালব, জালমানি, জানকি, কাক, কাম্বোজ, কর্প্‌ট, কঠ, কেরলপুত, কৌণ্ডিবৃষ, কৌণ্ডোপরথ, কৌষ্টকি, কোলিয়, ক্ষত্রিয়, ক্ষুদ্রক, কুকুর, কুণিন্দ, কুরু, লিচ্ছবি, মদ্র, মহারাজ, মালব, মল্ল, মৌণ্ডিনিকায়, মোরিয়, মুচুকর্ণ, নাভক ও নাভ পংক্তি, নেপাল বৈরাজ্য, নাইসা, পর্শ্ব, পতল, পাঞ্চাল, পিতিনিক, প্রার্জ্জুন, প্রস্থল, পুলিন্দ, পুষ্যমিত্র, রাজন্য, রাষ্ট্রিক, সাত্বৎ, শাক্য, শালঙ্কায়ন, সনকানীক, সতিয়পুত, শয়ণ্ড, শাপিণ্ডি-নিকায়, সৌভূতি, শিবি, সুরাষ্ট্র, শূদ্র, ত্রিগর্ত্ত, উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, উৎসব-সঙ্কেত, বসাতি, বামরথ, বিদেহ, বৃজি, বৃক, বৃষ্ণি, যৌধেয়, যোন। *

সর্ব্বসমেত ইহাদের সংখ্যা একাশি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র ছিল, কিন্তু বড় রাষ্ট্রও অনেকগুলি ছিল। ইহাদের শাসনবিধি বা কন্সটিটিউশ্যন্ নানারকমের ছিল। বস্তুতঃ পুরাকালে পৃথিবীর অন্যত্র যত-রকম সাধারণতন্ত্রের বর্ণনা ও উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে সে-সবরকম ছাড়া আরও নূতনতরও কিছু ছিল দেখা যায়।

রাজা ও সম্রাট্ যাঁহারা ছিলেন, সকল অঞ্চলে ও সকল যুগে তাঁহাদের শাসনপ্রণালীও একরকম ছিল না। রাজতন্ত্র ও শাসনবিধিসকলের মধ্যেও খুব বৈচিত্র্য ছিল।

এই কারণে মনে হয়, যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কন্সটিটিউশ্যনের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতীয় প্রাচীন শাসনবিধিগুলি জানিলে হয়ত আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানের ও নানাবিধ শাসনপ্রণালীর বর্ণনার বহি পড়িবার পরিশ্রম অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞান ও আধুনিক নানা শাসনপ্রণালী-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অনাবশ্যক বলিতেছি না। তাহা নিশ্চয়ই আবশ্যক। কারণ কালক্রমে সকল জিনিষেরই উন্নতির সম্ভাবনা আছে; এবং পৃথিবীর আধুনিক অবস্থার জন্য যাহা দরকার, পুরাকালেই তাহার উপযোগী সমুদয় ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল, ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু, আমরা যেমন অনেক বিষয়ে স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশের কথা অধিক পড়িয়া থাকি, এক্ষেত্রে তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। মোগল শাসন-প্রণালীর যেরূপ বর্ণনা অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তাঁহার তদ্বিষয়ক ইংরেজী বহিতে করিয়াছেন, তাহাও এসময় পাঠ করা উচিত।

—

বঙ্গে নারী-নির্য্যাতন

শাসক ও অন্যবিধ বিদেশীদের দোষ দেখাইয়া কিছু লিখিলে তাহাতে দেশের লোকদের বিরাগভাজন হইতে হয় না; রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে কিছু লিখিলেও দেশের লোকদের বিরাগ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দেশের লোকদের দোষ দেখাইয়া কিছু লিখিলে তাহাতে দেশবাসীদিগের অপ্রিয় হইতে হয়। এরূপ কিছু লিখিতে আমাদেরও ভাল লাগে না। কিন্তু কর্ত্তব্য বোধে লিখিতে হয়।

আমরা পূর্ব্বে একাধিক বার দেখাইয়াছিলাম, যে, পাশ্চাত্য দেশসকলে নারী অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব বেশী, কিন্তু ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রচলন অধিক এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে আত্মঘাতিনীর সংখ্যা অধিকতম। কেরোসিন তৈলে সাড়ী ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া বাংলা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশ বা দেশের স্ত্রীলোকেরা আত্মহত্যা করে বলিয়া অবগত নহি।

ইহা হইতে এই অনুমান হয়, যে, বাংলা দেশে স্ত্রীলোকদের জীবন বড় দুঃখময়, এবং সেই দুঃখ সহ্য করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার ও তাহার উপর জয়ী হইবার মত শিক্ষা, মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা সাধারণতঃ বাঙালী স্ত্রীলোকদের নাই; এবং এরূপ সংগ্রামে বাঙালী পুরুষেরা সাধারণতঃ তাহাদের সাহায্য করেন না।

বঙ্গে নারী-নির্য্যাতন ঘরে ও বাহিরে উভয়ত্রই হইয়া থাকে। অন্তঃপুরে বালিকা ও তরুণী বধূ ও বিধবাদের উপর যে-সব অত্যাচার হয়, তাহার অতি অল্প

অংশই প্রকাশ পায়; কিন্তু মধ্যে-মধ্যে আদালতে মোকদ্দমা হওয়ায় নানাবিধ ভীষণ অত্যাচারের প্রথা জানা পড়ে। সচরাচর কিন্তু অত্যাচারিতারা লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যাচার সহ্য করিতে-করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঘরের বাহিরে অত্যাচার রেলগাড়ীতে, মাঠে, ঘাটে, পথে, সর্ব্বত্র হয়। দুর্বৃত্ত পশুর অধম লোকেরা দল বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ী হইতে, কখন-কখন পুরুষ আত্মীয়ের সম্মুখেই, নারীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করে। কখন-কখন প্রতিবেশীরা বাধা দেয়, কখন-কখন ভয়ে বাধা দেয় না। অত্যাচারিতারা প্রাণপণ করিয়া বাধা দিয়াছেন, এরূপ ঘটনার কথা কখন-কখন শুনা যায়; কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহারা ভয়ে বাধা দানে অসমর্থ হইয়া পড়েন।

অত্যাচারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে; কিন্তু মুসমানের সংখ্যাই খুব বেশী। মুসলমান অত্যাচারীরা মুসলমান স্ত্রীলোকদের উপরও অত্যাচার কখন-কখন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা সাধারণতঃ হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচারই হইয়া থাকে। দুর্বৃত্ত হিন্দু দ্বারা মুসলমান নারীর নির্য্যাতনের কথা শুনা যায় না।

ভারতবর্ষের মধ্যে এইপ্রকার অত্যাচার বাংলাদেশে যত হয়, অন্য কোথাও তত হয় না। তাহার একটা কারণ এই, যে, বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং তাহাদের মধ্যে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও খুব বেশী। হিন্দু সমাজের দোষের কথা আগে কিছু বলিয়াছি, পরে আরও বলিব। হিন্দুরা হিন্দুসমাজের এবং মুসলমানেরা মুসলমান সমাজের দোষ দেখাইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিলেই ভাল হয়। কিন্তু সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে উভয় সমাজের কথাই লিখিতে হইতেছে। ইহাতে আমাদের কোন ভুল হইলে তাহার সংশোধন ও তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

মুসলমান ধর্ম্ম কোন-কোন বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা নারীদিগকে অধিকতর অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই অধিকার কার্য্যতঃ কতটা পান, এবং কতটাই বা শুধু কেতাবে আবদ্ধ থাকে, তাহা বলিতে পারি না। কেতাবে যাহাই থাক্, কয়েকটি কারণে মুসলমান সমাজে নারীদের অবস্থা হীন হইয়া আছে, এবং সেই জন্য নারী-সম্বন্ধে ধারণা ও পুরুষ ও নারীর পরস্পর-সম্পর্ক-সম্বন্ধে ধারণা হীন হইয়া আছে। তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। (১) শিক্ষার অভাব, (২) অবরোধ-প্রথা, (৩) একপুরুষের বহুপত্নী ও উপপত্নী গ্রহণ। এই তিনটি যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবনতির কারণ, তাহা বর্ত্তমানে প্রবলতম মুসলমানরাষ্ট্র তুরস্ক কার্য্য দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। তুরস্কে নারীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার দ্রুত বিস্তার হইতেছে, এবং অবরোধ প্রথা ও বহুবিবাহ লুপ্ত হইয়াছে। মুসলমান সমাজে স্ত্রীলোকদের সহিত পুরুষদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে হীন ধারণার আর-একটি কারণ উপপত্নীর আধিক্য। মুস্লিম ব্যবস্থা-অনুসারে পত্নীর ও উপপত্নীর পুত্রেরা পিতার ধনে সমান অধিকারী। যাহারা উপপত্নীর পুত্র, তাহারা যে বৈধ পুত্র নহে তজ্জন্য দায়ী ও দোষী তাহারা নহে; সুতরাং তাহাদিগকে পিতৃধনে সমান অধিকারী করা ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। অধিকন্তু উপপত্নীদের ও তাহাদের পুত্রদের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করায় ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে শিশুহত্যার একটা কারণ দূরীভূত হইয়াছে—যদিও তাহা অন্য ও উচ্চতর উপায়ে দূরীভূত হইতে পারে এবং কোথাও-কোথাও হইতেছে।

কিন্তু সমাজে উপপত্নীদের স্থান হীন না হওয়ায় * মুসলমান-সম্প্রদায়ের যে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই অবনতির অন্যতম প্রমাণ, নারীর উপর অত্যাচার-ঘটিত কোন-কোন মোকদ্দমায় পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বৃত্তান্তে দেখা গিয়াছে, যে অত্যাচারীরা কখন-কখন মুসলমান আত্মীয়বন্ধুপ্রতিবেশীর বাড়ীতে তাহাদের পরিবারের মেয়েদের মধ্যে অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীকে রাখিয়াছে, এবং উক্ত

* "Under Muslim law the sons of concubines are entitled to their patrimony equally with sons born in wedlock, and they occupy no inferior position in society." *History of Aurangzib* by Prof. Jadunath Sarkar, Vol. V, page 459.

অন্তঃপুরিকা মুসলমান নারীদিগের দিক্ হইতে এরূপ দুষ্কার্য্যে কোন বাধা পায় নাই।

এই বিষয়টির প্রতি আমরা শিক্ষিতা মুসলমান ভদ্র-মহিলাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং তাঁহাদের মত জানিতে চাহিতেছি।

বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যও এবং বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে যথেষ্ট শিক্ষার অভাব নারীনির্য্যাতনের একটি কারণ বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহাকে একমাত্র বা প্রধান কারণ বলিতে পারি না। পঞ্জাব-প্রদেশেও হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাও অনেক কম। কিন্তু বাংলা দেশে দুর্বৃত্ত লোকদের দ্বারা যেরকমের নারীনির্য্যাতনের যত সংবাদ আমরা খবরের কাগজে দেখি, পঞ্জাবে সেরকমের নারী নির্য্যা-তনের তত সংবাদ দেখিতে পাই না। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের কোন-কোন জেলা হইতে স্বাধীন বা অর্দ্ধ-স্বাধীন পাঠানজাতীয় লোকদের দ্বারা নারী অপহরণের সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গের ঘটনাগুলি হইতে উহা অন্যধরণের।

মুসলমানস-মাজে স্ত্রীজাতির হীন অবস্থা ও তাহাদের সম্বন্ধে হীন ধারণার যে-যে কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা বঙ্গে যেমন পঞ্জাবেও তেম্নি বিদ্যমান আছে। তথাপি বঙ্গে নারী-নির্য্যাতন অধিক হয়, পঞ্জাবে কম হয়, তাহার কারণ কি? আমরা আগে বলিয়াছি, দুর্বৃত্ত মুসলমানদের দ্বারা মুসলমান নারীরও উপর অত্যাচার বঙ্গে হইয়া থাকে, এবং তৎপ্রতি মুস্লিম সমাজ-হিতৈষী শিক্ষিত ভদ্রমুসলমানদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ ঘটনা পঞ্জাব অপেক্ষা বঙ্গে কেন অধিক ঘটে, আমরা তাহার কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ। এ-বিষয়ে শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা আলোচনা করিলে ভাল হয়।

আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, বাঙালী মুসলমান সমাজের নৈতিক হাওয়া অন্যসব প্রদেশের মুসলমান সমাজের নৈতিক হাওয়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বরং অন্যরূপ মনে করিবার কিছু কারণ আছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে বহুলক্ষপতি এক মুসলমান যুবকের হত্যাঘটিত বহু বিস্তৃত সংবাদ অনেক খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে এবং তাহার হত্যার কারণীভূত একটি স্ত্রীলোকের ছবি ও পূর্ব্বজীবনের কথাও বিস্তারিতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। এই যুবকের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না, এবং তাহার পিতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ আটত্রিশ লক্ষ টাকার অধিকাংশ সে বিলাস-ব্যসনে ও পাপে অপব্যয় করে। সে প্রকাশ্য-ভাবে তাহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের সহিত মোটর চড়িয়া বেড়াইত। এইসব কথা সর্ব্ব-সাধারণে বিদিত থাকা সত্বেও বোম্বাইয়ে মুসলমানদের ও অন্য-লোকদের একাধিক প্রকাশ্যসভায় নিহত যুবকের গুণগান করা হইয়াছে। আমরা বলিতেছি না, যে, কাহারও কোন গুরুতর দোষ থাকিলেও তাহার সদ্গুণ স্বীকার করিতে হইবে না। কিন্তু তাহার দোষসমূহ সম্পূর্ণ চাপা দিয়া প্রকাশ্যসভায় কেবল তাহার গুণ কীর্ত্তন করিলে জাতীয় জীবনে এরূপ লোককে যে স্থান দেওয়া হয়, সেরূপ স্থানের কি তাহারা যোগ্য? পূর্ব্বে-পূর্ব্বে কোন-কোন দুশ্চরিত্র হিন্দু-সম্বন্ধেও এইরূপ একদেশ-দর্শী গুণকীর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহাও দূষণীয় ও অনিষ্টকর।—আমরা বক্তব্যবিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা এই, যে, বোম্বাইয়ের হত্যাকাণ্ড-ঘটিত নানা সংবাদকে যেরূপ গৌরবের স্থান খবরের কাগজে দেওয়া হইয়াছে, বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রধান মুখপত্র, সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত, ইংরেজী "মুসলমান" নামক কাগজ তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন :—

We do not quite understand why the Bombay Mumtaz Begum case—the case concerning a mere dancing girl—has created such a sensation throughout the length and breadth of India. Murders are being often committed in this country but they do not cause such sensation as this case has done. Journals have been printing the photographs of Mumtaz Begum and others concerned in the case and giving extraordinary importance to the whole incident. What does it show? Does it not show that our taste is vitiated?

তাৎপর্য্য। আমরা পুরাপুরি বুঝিতে পারিতেছি না, বোম্বাইয়ের মমতাজ বেগমের ঘটানাটা—একটা নর্ত্তকী সম্বন্ধীয় একটা ঘটনা—কেন

সারা ভারতবর্ষে এরূপ হুজুকের সৃষ্টি করিয়াছে। এদেশে নরহত্যা ত সচরাচরই ঘটে, কিন্তু তাহাতে এই ঘটনাটার মত হুজুকের সৃষ্টি হয় না। অনেক কাগজে মমতাজ বেগমের ও ঘটনা-সংসৃষ্ট অন্য লোকদের ছবি ছাপিতেছে, এবং ঘটনাটাতে অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। ইহাতে কি মনে হয়? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না, যে, আমাদের রুচি কলুষিত হইয়াছে?

এরূপ মন্তব্য বোম্বাইয়ের বা অন্য কোন প্রদেশের মুসলমান কোন কাগজে আমাদের চোখে পড়ে নাই। অমুসলমান কাগজগুলির মধ্যে কলিকাতার "সার্ভেণ্ট" কলুষিত রুচির পরিতৃপ্তির জন্য উক্তপ্রকার বিস্তৃত বিবরণাদির প্রকাশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। "বেঙ্গলী"তে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের অনুপস্থিতি-কালে তাঁহার অজ্ঞাতে নর্ত্তকী মমতাজের ও নিহত যুবকের ছবি প্রকাশে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। "মুসলমান" পত্রিকার মন্তব্যে ইহাই মনে হয়, যে, বঙ্গে এমন মুসলমান অনেক আছেন যাঁহাদের রুচি সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ের মুসলমান-সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহাদের অধিকতর নৈতিক সাহস আছে।

বঙ্গের হিন্দু-সমাজ নারী-নির্য্যাতনের জন্য যে অনেকটা দায়ী, তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অনেক দুর্বৃত্ত মুসলমানের মতন অনেক দুর্বৃত্ত হিন্দু নারী-নির্য্যাতন করে, এরূপ সংবাদ মধ্যে-মধ্যে কাগজে দেখা যায়। সব অত্যাচারের কথা কাগজে প্রকাশিত হয় না। পঞ্জাবে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষরের অনুপাতও বাঙালী মুসলমান-সমাজ অপেক্ষা বেশী, এবং ঐ প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধও বাংলা অপেক্ষা প্রবলতর। তাহা সত্ত্বেও তথায় হিন্দুনারীর নির্য্যাতন কম হইবার কারণ, এই বিষয়ে তথাকার পুরুষ ও নারীদের দৃঢ়তা ও সাহসের আধিক্য বলিয়া অনুমিত হয়। একথা বলিতে আমাদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে; সুতরাং অন্য কোন সত্য কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে আমরা আহ্লাদিত হইব।

আমরা এরূপ মনে করি না, যে, বাঙালী হইলেই তাহাকে ভীরু হইতে হইবে। জাতিগত এমন কোন কারণ নাই, যাহার জন্য বাঙালীর ভীরু হওয়া অনিবার্য্য। আগেও সাহসী বাঙালী অনেকে ছিলেন, এখনও আছেন। ভারতবর্ষের যুদ্ধপ্রিয় ও যুদ্ধব্যবসায়ী জাতিদের চেয়েও অনেক বাঙালী যে সাহসী, তাহা সম্প্রতি একজন ইংরেজের লেখায় অপ্রত্যাশিত স্থানে পড়িয়াছি। "ব্ল্যাক্‌উড্‌স্ ম্যাগাজিন্" একখানি শ্রেষ্ঠ ইংরেজী ম্যাগাজিন্; কেহ-কেহ ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরেজী ম্যাগাজিন্ মনে করেন। ইহা একশত বৎসরেরও আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার গত আগষ্ট্ মাসের সংখ্যায় "ইয়ুথ্ এণ্ড্ দি ঈষ্ট্" ("যুবজন ও প্রাচ্য মহাদেশ")-শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতে অধ্যাপকের কাজে ও পরে যোদ্ধার কাজে ব্যাপৃত একজন ইংরেজ সুলেখক আজকালকার বাঙালীদের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"Generalisations as to racial characteristics are, as a rule, only partially true, but I think it is safe to include the Bengalis among the non-military races of India. Not that they are wanting in courage. The Bengali Police and the Bengali Anarchists have proved themselves very brave, individually quite as brave as the police and anarchists in other provinces. And those obscure Bengali surveyors of the secret service who penetrated forbidden Tibet, counting their paces by the rosary, deserve the Indian Order of Merit. They carried their lives in their hands. Kim's Hurec Babu is not idealised. But, collectively, the military spirit is wanting. I met the regiment who volunteered for active service in Mesopotamia during the war.

"It was in Baghdad where they were detained for garrison duty, though they were very keen to get to the front and prove that the Bengali could fight as well as other races. In spite of this keenness, however, I was not convinced that they were a martial breed, though I could believe that they were ready to suffer death to prove it. They were braver, that is to say, than sepoys of a genuinely military stock………………"

তাৎপর্য্য। জাতীয় চারিত্রিক গুণ-সম্বন্ধে কোন সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা প্রায়ই কেবল আংশিকভাবেই সত্য হইয়া থাকে। তাহা হইলেও বাঙালীদিগকে ভারতবর্ষের অসামরিক জাতিদের মধ্যে গণনা করা নিরাপদ্ বলিয়া মনে করি। ইহার মানে এ নয়, যে, তাহাদের সাহসের অভাব আছে। বাঙালী পুলিস্ ও বাঙালী বিপ্লবপন্থীরা আপনাদিগকে খুব সাহসী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে; ব্যক্তিগতভাবে ঠিক অন্যান্য প্রদেশের পুলিসের ও বিপ্লবপন্থীদের সমান সাহসী বলিয়া আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে। গোপনীয় রাজকার্য্য বিভাগের যেসকল অবিখ্যাত জরীপকারীরা বিদেশীর পক্ষে নিষিদ্ধপ্রবেশ তিব্বৎ দেশে কোনপ্রকারে প্রবেশ করিয়া, হাতে মালা জপ করিতে-করিতে

কর পা যাইতেছে, তাহা গণনা করিয়া দূরত্ব স্থির করিয়াছিল, তাহারা [তাহাদের সাহসের জন্ত] ইণ্ডিয়ান্ অর্ডার অব্ মেরিট্ পাইবার যোগ্য। তাহারা প্রাণটি হাতে লইয়া—মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করিয়া—কাজ করিয়াছিল।

কিপলিঙের "কিম" নামক পুস্তকের হরিবাবুর চরিত্র কল্পনার জোরে আদর্শানুরূপ করিয়া আঁকা হয় নাই (অর্থাৎ সে-রকম লোক বাঙালীদের মধ্যে বাস্তবিক আছে)। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ধরিলে, বাঙালীদের মধ্যে সামরিক ভাব ও আগ্রহ নাই।

"গত মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ করিবার জন্ত যাহারা স্বেচ্ছায় সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল, সেই বাঙালী রেজিমেণ্টের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাৎ হইয়াছিল বাগ্‌দাদে। সেখানে তাহারা নগর-রক্ষীর কাজে মোতায়েন হইয়াছিল, যদিও তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে এবং বাঙালীরা যে অন্তজাতিদের মতন যুদ্ধ করিতে পারে, তাহা প্রমাণ করিতে খুব ব্যগ্র ছিল। এই ব্যগ্রতা-সত্ত্বেও আমার কিন্তু এ-বিশ্বাস জন্মে নাই যে, তাহারা খাঁটি যুদ্ধপ্রিয় জাতির লোক, যদিও আমি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহারা ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। অল্পকথায় বলিতে গেলে, তাহারা খাঁটি সামরিক জাতিদের সিপাহীদিগের অপেক্ষা সাহসী ছিল।"

বাঙালীরা যে যুদ্ধপ্রিয় যুদ্ধব্যবসায়ী জাতি নহে, তাহা আমরা লজ্জার বিষয় মনে করি না। যুদ্ধব্যবসাটাকে চীনদেশের লোকেরা সম্মানজনক মনে করে না; অন্য-সব দেশের মতন সেদেশে ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ যোদ্ধার সম্মান নাই কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন বিদেশী জাতি চীনকে স্থায়ী-ভাবে জয় করিতে পারে নাই। মাঞ্চুজাতি চীন জয় করিয়া তাহাদের সম্রাট্‌কে চীনের সম্রাট করিয়াছিল বটে; কিন্তু ফলে তাহাদের দেশ মাঞ্চুরিয়া চীনের সামিল হইয়া গিয়াছে, অথচ সম্রাট্‌দের বংশ আর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নাই। মাঞ্চুজাতিও চীন মহাজাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। খুব সাহসী বাঙালী আছে; সবাই সাধনা দ্বারা সাহসী হইতে পারে। নারীদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এই উপলব্ধি জন্মিলে সাহসের অভাবে নারীরক্ষার কাজে অগ্রসর হইবার লোকের অভাব হইবে না।

বাঙালী হিন্দুনারীর দৃঢ়তা ও সাহস থাকিতে পারে না, ইহাও সত্য নহে। যখন সহমরণ প্রচলিত ছিল, তখন অনেকে স্বেচ্ছায় "সতী" হইতেন। নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করায়, প্রজ্বলিত আগুনে আঙুল ধরিয়া রাখিয়া দাহ সহ্য করিবার শক্তি প্রমাণ করিয়াছেন, এরূপ "সতী"র ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে। এখনও ত অনেকে জানিয়া-শুনিয়া কাপড়ে আগুন ধরাইয়া পুড়িয়া মরে। সহমরণ বা এইরূপ আত্মহত্যা ভাল নহে; আমরা কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ এগুলির উল্লেখ করিলাম। কেননা এইগুলি হইতে বুঝা যায়, যে, সুশিক্ষা পাইলে হিন্দুনারীর অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা ও সাহস কাজে লাগিবে।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ থাকায় কোন এক জা'তের (বিশেষতঃ তথাকথিত "নীচ" জা'তের) নারীর উপর অত্যাচার হইলে অনেক সময় অন্যান্য জা'তের লোকদের প্রাণে তেমন আঘাত লাগে না। মুসলমানদের মধ্যে দলবদ্ধতা ইহা অপেক্ষা বেশী। বীরভূম জেলায় কিছুদিন হইল একটি হিন্দু স্ত্রীলোককে রাস্তা হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া কতকগুলি দুর্বৃত্ত মুসলমান তাহার উপর অত্যাচার করে। যাহাতে তাহার শাস্তি না হয়, তাহার জন্য, যে-অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে, তথাকার মুসলমানেরা চাঁদা তুলিয়া আদালতে তাহার পক্ষ সমর্থন করাইয়াছিল; কিন্তু জেলার জজের সুবিচারে অপরাধীর শাস্তি হইয়াছিল।

সংস্কৃত নানা গ্রন্থে নারীর নিন্দা ও কুৎসা আছে। আবার নারীর প্রতি শ্রদ্ধার কথাও বিস্তর আছে। পুস্তকে যাহা লেখা থাকে, মানুষ যদি জীবনে তদনুসারে কাজ করে, তাহা হইলে উহা মূল্যবান্ হয়। নতুবা পুস্তকে ভাল বা মন্দ, যাহাই লেখা যাক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অতএব, শাস্ত্রে কি আছে, তাহার আলোচনা না করিয়া বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই ভাল।

তাহা করিলে দেখা যায়, নারীর যথেষ্ট আদর ও সম্মান আমাদের সমাজে নাই। তাঁহারা যে জননীর জাতি, কেবল ইহাই ত যথেষ্ট আদর-যত্নের হেতু হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা পুরাতন কথা বলিয়া লোকে ইহা যেন ভুলিয়াই থাকে। ইংলণ্ডে নারীদিগকে পৌর ও জানপদ রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার চেষ্টা আধ-শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছিল। তাহার পর গত মহাযুদ্ধ আসিল। তখন সমর্থ বয়সের ও দেহের পুরুষেরা যুদ্ধে যাওয়ায় দেশের নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, পণ্যশিল্প, রেল, ট্রাম, যুদ্ধসম্ভার জোগানো, প্রভৃতি সব কাজ বন্ধ হইয়া যাইত, যদি ইংরেজ-নারীরা সকল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইতেন এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে তাঁহাদের অত্যাবশ্যকতা

প্রমাণ না করিতেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পর প্রধানতঃ এই কারণেই ইংরেজ নারীরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াছেন।

ইংরেজরা যেমন যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের দরুন্ নারীদের কদর বুঝিয়াছিল, আমাদের দেশেও তেম্‌নি, নারীদের যে শ্রদ্ধা ও আদর স্বভাবতঃই পাওয়া উচিত, তাহা আমরা তাঁহাদের প্রাপ্য বলিয়া বুঝিতে পারিব হয়ত তাঁহাদের বিশেষ কোন সামাজিক কার্য্যকারিতা দ্বারা। কিন্তু সেই কার্য্যকারিতা তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের এইপ্রকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভ করিতে হইলে তাঁহাদের অগ্রণীদিগকে খুব চেষ্টা করিতে হইবে, এবং দেশের পুরুষ নেতাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সহায় হইতে হইবে। কি-কি উপায় অবলম্বন করিলে বঙ্গ-নারীগণ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের শিক্ষাও সর্ব্বাঙ্গীণ হইবে, তাহার সম্যক্ আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এখানে ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে, যে, বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব দূরীভূত না হইলে, বঙ্গনারী সুস্থ দেহমন এবং সর্ব্বাঙ্গীণ সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন না। বঙ্গনারী বলিতে আমাদিগকে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান্ বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নারীদিগকেই বুঝিতে হইবে।

নারীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি হইয়া তাঁহাদের সামাজিক কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন যে কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ। আপাততঃ অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে এবং বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই-রূপ কোন-কোন উপায় "নারী-রক্ষা-সমিতি" অবলম্বন করিয়াছেন, এবং "মাতৃমঙ্গল ও শিশু-সহায়-সমিতি"ও কিছু করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের শাখা সর্ব্বত্র স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং অর্থ-সাহায্যও ইঁহাদের আরও অনেক পাওয়া উচিত।

আমাদের দেশে একদল লোক আছেন, যাঁহারা নারীদের শিক্ষার কথা উঠিলেই পাশ্চাত্য নানা দেশের দুর্নীতির কথার উল্লেখ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষাকেই তাহার মূল কারণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। এ বিষয়ে এখন তর্ক করিতে চাহি না। কিন্তু যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের নারী-সমাজের নিন্দা করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের দেশের সমাজের অবস্থা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা বাংলাদেশে বিধবা, সধবা, কুমারী নারীদিগকে দল বাঁধিয়া দুর্বৃত্তেরা ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তাহার মতন **একটি মাত্র দৃষ্টান্ত** কোনও পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক খবরের কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিতে আহ্বান করিতেছি। আমরা এরূপ একটিও দৃষ্টান্তের বিষয় অবগত নহি। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত ত নাই-ই। এই কারণে আমাদের ধারণা, এই যে, অন্য যে-যে বিষয়েই পাশ্চাত্য পুরুষ ও নারী-সমাজ আমাদের দেশের সমাজ-অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক না কেন, নারী-নির্য্যাতন ও পাশব বল দ্বারা নারী-ধর্ষণ-বিষয়ে বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি বলিয়া বিস্তর লোকের ক্রোধ-ভাজন হইব জানি। তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যে, আমাদের ভ্রম হইয়া থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিলে অনু-গৃহীত হইব এবং তাহা স্বীকার করিব।

নারীদের উপর অত্যাচারের সাক্ষাৎ কারণ যে দুর্বৃত্ত পুরুষদের কুপ্রবৃত্তি, তাহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু পরোক্ষ কারণ নানাবিধ। আগে তাহার কোন-কোন কারণের আভাস দিয়াছি। আরও কিছু বলিবার আছে।

যে-কোন প্রথা, রীতি, কুসংস্কার, প্রভৃতি নারীদের সম্বন্ধে হীন ধারণা জন্মায়, তাহাই পরোক্ষভাবে মানুষকে তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত করে কিম্বা অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকার হইতে নিবৃত্ত রাখে। হিন্দু-সমাজে বরপণ-প্রথা প্রচলিত থাকায় লোকে কন্যা-সন্তানের জন্ম-গ্রহণকে পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল বলিয়া মনে করে, কন্যাদিগকে গলগ্রহ মনে করে, পুত্র কামনা করে কিন্তু কন্যা কামনা করে না। কন্যাদায় কথাটাই তাহার প্রমাণ। অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, যেন কন্যাগুলা মরিলেই লোকে বাঁচে। এ অবস্থায় নারীদের সম্বন্ধে হীন ধারণার

উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। যাহারা হেয় বিবেচিত হয়, তাহাদের প্রতি অত্যাচার খুব গায়ে না-লাগিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

মুসলমান-সমাজে বহুপত্নীগ্রহণের প্রথা থাকায় যে নারীদের অবস্থা হীন হইয়াছে ও তাহাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ আগে খুব প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে। ইহাতে যে সামাজিক নানা দুর্নীতির এবং নারীদের হীন অবস্থার কারণ হইয়াছিল, তাহা সুবিদিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহের বিরুদ্ধে কলম চালাইয়াছিলেন; তাহাতে কিছু সুফল ফলিয়াছিল। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ও ইহার বিরুদ্ধে নানা-প্রকারে আন্দোলন করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের বিদ্রূপ-বাণও এই কুপ্রথার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ইংরেজী শিক্ষা দ্বারাও বহু বিবাহ অনেকটা নিবারিত হইয়াছে। তথাপি ইহা এখনও নির্ম্মূল হয় নাই। নারী-শক্তি জাগ্রত হইলে ইহা নির্ম্মূল হইবে।

মুসলমানদের শাস্ত্রে যাহাই থাক্, মুসলমান নারীশক্তি জাগিলে তাঁহাদের সমাজ হইতেও ইহা দূর হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত তুরস্ক। তুরস্কের নারীশক্তির নিকট মোল্লা মৌলানাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে—বহু-বিবাহ ও অবরোধ-প্রথা তথায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে উপপত্নীগ্রহণ-কুরীতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হিন্দুদের মধ্যেও ইহা এক সময়ে খুব প্রচলিত ছিল, এবং অনেক স্থলে ইহা সম্ভ্রান্ততার লক্ষণ বিবেচিত হইত। এই কুরীতি ও দুর্নীতি অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু নির্ম্মূল হয় নাই। নারীশক্তি সমাজের সকল স্তরে জাগিলে ইহা নির্ম্মূল হইবে। এই কুরীতি সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজে কিছু প্রভেদ আছে। হিন্দু সমাজে নারীর পদস্খলন হইলে সে হয় "পতিতা" নারী, ভদ্র-সমাজে তাহার এবং সন্তান জীবিত থাকিলে তাহার, স্থান থাকে না, তাহাদের ভবিষ্যৎ আঁধার হয়; কিন্তু তাহার পাতিত্যের সহচর ও কারণ দুশ্চরিত্র পুরুষের কোন অসুবিধা হয় না, তাহার পাতিত্য ঘটে না। মুসলমান-সমাজে এই প্রকার পুরুষ ও নারীর মর্য্যাদা বা অমর্য্যাদার এতটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয় না, এবং তাহাদের সন্তানদেরও প্রাণ সংশয় বা জন্মগত অসুবিধা হিন্দু সমাজে যেরূপ হয়, সেরূপ হয় না।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, পুরুষ ও নারীর মিলন কেবল বিবাহ-সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই হওয়া উচিত, এবং অন্যবিধ মিলন ঘটিলে তাহার জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েরই উপর সামাজিক শাসন সমানভাবে হওয়া উচিত; কিন্তু তাহাদের সন্তানদের পিতৃমাতৃধন লাভে বাধা হওয়া উচিত নহে, তাহাদের সুশিক্ষা-সৎসংসর্গ-আদির বন্দোবস্ত সর্কার পক্ষ হইতে হওয়া উচিত।

হিন্দু সমাজে অল্পবয়স্কা ও নিঃসন্তানা বিধবাদেরও বিবাহ সচরাচর না হওয়ায় তাহাদের লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ও দুর্দ্দশা নানা-প্রকারে হয়, এবং তাহাদের উপর অত্যাচারও হয়। এই কারণে সামাজিক দুর্নীতিও বৃদ্ধি পায়। উক্তপ্রকার বিধবাদের বিবাহ প্রচলিত হইলে অন্যান্য সুফল যাহা হইবে, এবং অন্যান্য কুফল যাহা নিবারিত হইবে, তাহার উল্লেখ এখানে করিব না। কিন্তু একটি সুফল এই হইবে, যে, নারীর উপর অত্যাচার অনেক কমিবে। সধবা ও কুমারীদের উপর অত্যাচার হয় না, এমন নহে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বিধবাদেরই উপর অত্যাচার হয়।

ভারতে বিধবাদের দুরবস্থা বহু শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন বিধবা-বিবাহের প্রচলন ছিল, তখনও বেশী প্রচলন হয়ত ছিল না। সেইজন্য বৌদ্ধ-যুগেও বিধবাদের দুর্দ্দশার বর্ণনা দেখা যায়। একজন লেখক মডার্ন রিভিউ-মাসিকে বৌদ্ধযুগে সামাজিক জীবনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে একটি বৌদ্ধ জাতকের অনুবাদ হইতে বৈধব্যের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"Terrible is widowhood; the meanest harries her about; she eats the leavings of all; a man may do her any hurt; unkindly speeches never cease from brother or friend; a widow may have ten brothers, and yet is a naked thing; oh! terrible is widowhood."

তাৎপর্য্য—"বৈধব্য বড় ভয়ানক; হীনতম লোকেও বিধবাকে আক্রমণ ও উত্যক্ত করে; সে পরিবারের সকলের ভুক্তাবশেষ ভোজন করে; মানুষ তাহার যে-কোন-রকম অনিষ্ট করিতে পারে; ভাই বা

বন্ধুর নিকট হইতে তাহার প্রতি নির্ম্মম কথা কখন থামে না ; বিধবার দশটি ভাই থাকিতে পারে, অথচ সে নয় (অর্থাৎ অরক্ষিত) জীব ; অহো ! বৈধব্য অতি ভয়ানক।"

সামাজিক রীতি ও প্রথা-আদির পরিবর্ত্তন সময়-সাপেক্ষ ; নারীদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিধান এবং সুশিক্ষার দ্বারা সুফল-লাভও সময়-সাপেক্ষ ; তাহার জন্য নারীদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ অপেক্ষা করিতে পারে না। যে-দেশে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের জন্য যুবকেরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং অনেকে প্রাণ দিয়াছেনও, সেই দেশে নারী রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে লোকের অভাব হওয়া উচিত নহে। অত্যাচার হইতে অসহায় ও দুর্ব্বলকে রক্ষা করা রাষ্ট্র-নীতি ও সেবানীতি উভয়েরই অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি হইবে না ; তথাকথিত রাষ্ট্রীয় উন্নতি যদি কিছু হয়, তাহার মূল্য বেশী হইবে না, এবং তাহা স্থায়ী হইবে না।

—

রেলে "ইউরোপীয়ে"র বিনিপয়সার বিশিষ্টতা লোপ

ভারতে রেলওয়ের প্রবর্ত্তনের সময় হইতে এযাবৎ কোন-কোন শ্রেণীর গাড়ীর এক-একটি কাম্‌রা "ইউরোপীয়"দিগের জন্য স্বতন্ত্র রক্ষিত থাকিত। অন্য সব কাম্‌রায় ভয়ানক ভীড় হইলেও এই "ইউরোপীয়" কাম্‌রাগুলিতে দেশীলোক ঢুকিতে পারিত না ; "ইউরোপীয়" কাম্‌রা হয় খালি থাকিত, কিম্বা তাহাতে একটি পয়সাও বেশী ভাড়া না দিয়া দুই-একজন মাত্র ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত লোক আরামে ভ্রমণ করিত। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ বৈষম্য-লোপের জন্য রেলওয়ে আইনের সংশোধক একটি-বিল্ উপস্থিত করেন। তাহা অধিকাংশের মতে পাস্ হইয়াছে। এই বিল্‌টি গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-মেম্বর ইংরেজ প্রভু "সিলি" অর্থাৎ আহাম্মকি-প্রসূত বলিয়াছেন। তাহা ত বলিবেনই। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কেবল তাঁহার জাতভাইরা।

—

ইণ্ডিয়া আফিস্ লাইব্রেরী ও "প্রবাসী"

লণ্ডনে ভারতবর্ষের ব্যয়ে ইণ্ডিয়া আফিসে যে লাইব্রেরী আছে, তাহাতে নানা ভারতীয় ভাষার পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি রক্ষিত হয়। ঐসকল বহি ও মাসিক পত্রিকার তালিকা খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাহার দ্বিতীয় ভল্যুমের ৪র্থ খণ্ড "মডার্ন্ রিভিউ" কাগজে সমালোচনার জন্য পাওয়া গিয়াছে। এইখণ্ডে বাংলা বহি ও মাসিকাদির তালিকা আছে। মাসিক কাগজগুলির মধ্যে "প্রবাসীর" নাম নাই। তালিকা-প্রণেতার ইহাতে কোন দুরভিসন্ধি আছে, মনে করি না ; বরং সদভিপ্রায় থাকাই সম্ভব। অথবা, কোনপ্রকার অভিপ্রায়ই না থাকিতে পারে। এদেশে পুস্তক, মাসিক পত্র প্রভৃতি যাহা-কিছু ছাপা হয়, সর্ব্বগুলিরই তিনখণ্ড সরকার-বাহাদুরকে জরিমানা-স্বরূপ দিতে হয়। তাহার এক-এক খণ্ড লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিস্ লাইব্রেরীতে থাকিবার কথা। এই জরিমানা আমরা বরাবর দিয়া থাকি। সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্ট "প্রবাসী" বিলাতে পাঠান না, কিম্বা পাঠাইলেও তাহা ইণ্ডিয়া আফিসে রাখা হয় না ; কিম্বা রাখা হইলেও ক্যাটালগভুক্ত করা হয় নাই। ক্যাটালগে "প্রবাসী"র নাম না থাকার জন্য দায়ী যিনিই হউন, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও মিতব্যয়িতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহা সকলেই জানেন, যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম থাকিবেই, এবং তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী-সম্বন্ধেও বহি লিখিত হইবেই। তাহাতে সম্ভবতঃ ইহাও লিখিত হইবে, যে, তাঁহার "জীবনস্মৃতি", "গোরা", "অচলায়তন", "মুক্তধারা," "রক্তকরবী", "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" প্রভৃতি প্রথমে "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছিল ; সুতরাং "প্রবাসী"র নামটাও কোনপ্রকারে থাকিয়া যাইতেই পারে। অতএব ওটা ইণ্ডিয়া আফিস্ লাইব্রেরীর ক্যাটালগে ছাপিয়া অনর্থক উহার কলেবর-বৃদ্ধি ও মুদ্রণব্যয়-বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি ? এম্‌নই ত ক্যাটালগটির পৃষ্ঠার সংখ্যা ৫২৩। রাজনৈতিক কারণে "প্রবাসী"র নাম কোন-প্রকারে বাদ পড়িয়াছে, ইহা মনে করিলেও রাজদ্রোহ হইবে।

ইতালীতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকায় সম্বৰ্দ্ধিত হইবেন ইতালীতেও সম্বৰ্দ্ধিত হইবেন, ইহা ত বলিয়াই রাখিয়াছিলাম। তথাপি খবরের কাগজে তাঁহার সম্বৰ্দ্ধনার বৃত্তান্ত পড়িয়া আহ্লাদিত হইলাম।

ইতালীর লোকেরা তাঁহাকে অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে ইতালীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ উপহার দিবেন, এবং বিশ্বভারতীতে ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য দুই বৎসরের জন্য একজন ইতালীয় অধ্যাপককে নিজ ব্যয়ে নিযুক্ত রাখিবেন। ইতালীয় অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক যোগ্য ছাত্র পাঠাইয়া ভারতীয় জনগণ ইতালীবাসীদের এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্মান রক্ষা করিলে ও নিজেরা লাভবান্ হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব। নতুবা দুঃখের বিষয় হইবে।

—

হিন্দু মহিলার উচ্চ উপাধি লাভ

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় সম্প্রতি তথাকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশা অধিকারী সংস্কৃতে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম্-এ উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইঁনি অন্যান্য পরীক্ষাতেও বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় পরলোকগত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা বসু ইংরেজীতে প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক এবং সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাবাজারের মহারাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রবংশোদ্ভব।

—

বাংলার অর্ডিন্যান্স্

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মান্দ্রাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ডোরাইস্বামী আয়েঙ্গার এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, "বাংলাদেশে বড়লাট যে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন (যাহার বলে অনেক লোক ধৃত হইয়া বিনা বিচারে বন্দী আছেন), তাহা রদ করিবার জন্য অবিলম্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক আইন প্রণীত হউক।" এই প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে ধার্য্য হইয়াছে।

অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্রু, প্রভৃতি সভ্যগণ বক্তৃতা করেন। প্রস্তাবক-মহাশয় বলেন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাত্মক উপদেশ ও চারিত্রিক প্রভাবে বিপ্লববাদ-প্রসূত খুন-জখম বন্ধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দী করায় তাঁহার প্রভাব আর কার্য্যকর ছিল না; এই হেতু আবার বিপ্লববাদ-প্রসূত অপরাধের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। এই কারণ দেখাইয়া প্রস্তাবক বলেন, গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর উপর বাংলা দেশের ভার অর্পণ করিয়া দেখুন, ফল কিরূপ হয়।

তর্কবিতর্কের মধ্যে ভারতগবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান্ বলেন, যে, গবর্ণর জেনার‍্যাল যেরূপ অর্ডিন্যান্স বাংলা দেশে জারী করিয়াছেন, তদ্রূপ ব্যবস্থা দ্বারা আগে-আগে ফল পাওয়া গিয়াছে এবং এবারেও তাহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তিনি পুনর্ব্বার খুব জোর দিয়া বলেন, গবর্ণমেণ্ট অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া অনেক লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখায় ইতিমধ্যেই বিপ্লবপন্থীরা এমন একটা প্রকাণ্ড আঘাত ও ধাক্কা পাইয়াছে, যে, তাহাতে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদিগকে প্রায় পিষিয়া ফেলা হইয়াছে। এ-বিষয়ে পরে আমাদের বক্তব্য কিছু বলিব।

যখন মাডিম্যান্ সাহেব বক্তৃতা করিতে-করিতে বলেন, "যাহার কিছু আক্কেল আছে এমন কোন লোক কি মনে করিতে পারেন, যে, অবিলম্বে বিপ্লবপন্থীদের এইসব ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধনের বন্দোবস্ত না করিয়া, গবর্ণমেণ্টের তৎপূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা করা উচিত ছিল", তখন শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, ইংলণ্ডে এইপ্রকার অবস্থায় কিরকমে কাজ করা হয়?" তাহার উত্তরে মাডিম্যান বলেন, "সেখানে এরূপ ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে।"

মাডিম্যানের এই উত্তরের পর জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, "বিলাতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কেন কচিৎ ঘটে?" তাহার উত্তর গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে কিছু দেওয়া হইত কি না এবং দেওয়া হইলে কি উত্তর দেওয়া হইত, তাহা ঠিক্ বলা যায় না, কিন্তু জানিতে কৌতূহল হয়।

প্রকৃত উত্তর অবশ্য এই, যে ইংলণ্ডে প্রজাদের স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্ব আছে, যে-গবর্ণমেণ্ট তাহাদের মত-অনুসারে চলে না, কালক্রমে ভোটের জোরে তাহারা তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিজেদের ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইতে পারে, সেইজন্য সেখানে বিপ্লববাদের প্রাদুর্ভাব নাই। আমাদের দেশেও আমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিলে বিপ্লব-বাদ বিনষ্ট বা ক্ষীণবল হইবে, একথা অনেকেই বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কান দেন নাই।

কর্ণেল ক্রফোর্ড তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিবার পূর্ব্বে বলেন, গবর্ণমেণ্ট সঙ্কট-সময় উপস্থিত হইলেই ক্রমাগত অর্ডিন্যান্সের মতন নিয়মের দ্বারা নিজ হস্তে প্রভূত ক্ষমতা লইয়া কখন বরাবর দেশ শাসন করিতে পারিবেন না। উপদ্রবের প্রকৃত কারণ দূর করিবার জন্য শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এবং প্রত্যেকেরই সেই অবস্থা আনয়ন করিবার নিমিত্ত সাহায্য করা উচিত, যাহাতে অর্ডিন্যান্স অচিরে প্রত্যাহৃত হইতে পারে। বিপ্লববাদের মূল কারণ আর্থিক কারণজাত অসন্তোষ। অতএব তিনি (কর্ণেল ক্রফোর্ড) ভারতীয় নেতৃবর্গকে অনুরোধ করেন, যে, তাঁহারা ভারতীয় যুবকদের কর্ম্মশক্তিকে এরূপ পথে চালিত করুন যাহাতে দেশের উপকার ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

দেশের দারিদ্র্য, বিস্তর শিক্ষিত ও নিরক্ষর লোকদের বেকার অবস্থা, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা-বশতঃ রোগের প্রাদুর্ভাব চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট বন্দোবস্তের অভাব, অসন্তোষের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব কারণ দূর করিতে হইলেও যে, ভারতীয় জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক শক্তি আসার প্রয়োজন, তাহা কর্ণেল ক্রফোর্ড এবং তাহার জাত-ভাইরা স্বীকার করিতেছেন না ও তদনুসারে কাজ করিতেছেন না।

—

বিশ্বভারতীর বৈদেশিক অধ্যাপকগণ

বিশ্বভারতীতে শিক্ষা দিবার জন্য বিদেশ হইতে বিখ্যাত অধ্যাপকগণের আগমন ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি আসিয়া এখানে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। চেকোস্লোভাকিয়া হইতে প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিদ্যাবিৎ অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্ এবং অধ্যাপক লেজ্‌নী তাহার পর এখানে আসিয়া অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বাংলা বৎসরে নরওয়ে হইতে ক্রিষ্টিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচীন-লিপিবৎ ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক ষ্টেন্ কোনো এখানে আসিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রধানতঃ তিনি ভারতীয় ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তার বিকাশ-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র ধর্ম্মপদের ব্যাখ্যা করেন, পুরাতন খোটানীয় ভাষায় বজ্রচ্ছেদিকা ও অন্যান্য পুঁথির পাঠনা করেন এবং কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতাতেও কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ভট্ট শ্রী শৈল কণ্ব এবং তাঁহার পত্নীকে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নাম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় ও অন্যান্য কথায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে নানা উক্তি বহুবার শ্রুত হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের গৌরব বোধ হয় বটে; কিন্তু তাহাতে আমরা যেন মনে না করি, ভারতীয় ধর্ম্মমত-সমূহের সবই ভাল, কুসংস্কার-গুলিও ভাল। বস্তুতঃ বৈদেশিক সুধীবর্গ কর্তৃক ভারতীয় চিন্তার প্রশংসা হইতে এইরূপ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়াই এবিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যাহা হউক এই অবান্তর মন্তব্য হইতে আমরা আমাদের বক্তব্য-বিষয়ে প্রত্যাগমন করি। আমরা বলিতেছিলাম, যে, বিদেশ হইতে অনেক সুপণ্ডিত অধ্যাপক এখানে আসিয়া অধ্যাপনা করিয়াছেন।

চীনদেশ হইতে চৈনিক অধ্যাপক ডো চিয়াং লিম্ মহাশয় আসিয়া এখনও চৈন ভাষা শিক্ষা দিতেছেন, এবং চীনের সাহিত্য ও সভ্যতা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। ফ্রান্সের অধ্যাপক বেনোয়া এখানে স্থায়ীভাবে থাকিয়া ফরাসী ও জার্মান্ ভাষা শিখাইয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় বিদেশ হইতে যেসকল অধ্যাপক এখানে আসিয়া শিক্ষা দেন, ভারতীয় যুবক বিদ্যার্থীরা যথেষ্ট সংখ্যায় আসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন না। অথচ ইঁহাদের সমান কিম্বা ইঁহাদের চেয়ে কম পণ্ডিত লোকদের নিকট শিক্ষা-লাভ করিবার জন্য অনেক ভারতীয় ছাত্র হাজার-হাজার টাকা খরচ করিয়া ইউরোপ যাত্রা ও তথায় অবস্থান করেন।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যে, যদি ইতালীয় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষালাভের জন্য যথেষ্ট ছাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে।

বিপ্লবোত্তেজক পুস্তিকা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্যতম প্রতিনিধি পটেল-মহাশয় একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য, বাংলা দেশের ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশ্যন (যাহারা বলে মানুষকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে কারারুদ্ধ বা নির্ব্বাসিত করা যায়), মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের তদ্রূপ রেগুলেশ্যন্-দ্বয়, রাজদ্রোহ-উত্তেজনক-সভা-নিবারক আইন, প্রভৃতি রদ করা। মাডিম্যান্ সাহেব এই বিল্ পেশ করিবার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা করিতে-করিতে তিনি বিপ্লব-উত্তেজক কোন-কোন পুস্তিকার কোন-কোন অংশ পাঠ করেন এবং বলেন,

"..... remember the conspiracy is increasing. Only this morning a pamphlet was laid on my table. It was a copy of a pamphlet called "the Revolutionary."

ভট্ট শ্রী শৈল কণ্ ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী
(অধ্যাপক সেটন্ কোনো ও তাহার পত্নী)

তাৎপর্য্য। মনে রাখিবেন, বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র বাড়িতেছে। আজই প্রাতে আমার টেবিলে একটি পুস্তিকা রক্ষিত হয়। তাহা "দি রিভলিউ-শ্যনারী" নামক পুস্তিকার এক খণ্ড।

ইহা বলিয়া মাডিম্যান্‌সাহেব উহা হইতে কয়েকটি

বাক্য পাঠ করেন। তখন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল জিজ্ঞাসা করেন,—

Mr. B. C, Pal.—"I should like to know from the Home Member what evidence is there to show that these pamphlets were not manufactured by people other than the revolutionaries."

Sir Alexander.—"Does the Hon. Member suggest that they were manufactured by me and the police?

Mr. Pal. "I don't say that they were manufactured by you or your police. But we have it on the statement of Sir Reginald Clarke that there have been agents provocateurs, in your service in Bengal and elsewhere and all the world over these things have been dumped on you."

Sir Alexander.—"I repudiate the suggestion in the strongest terms."

At this stage several members stood up to speak and confusion prevailed.

The President.—"Order, Order. Hon. Members will have full opportunity of ventilating their views when the Bill enters the next stage.

তাৎপর্য্য। "আমি স্বরাষ্ট্রসচিব মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে চাই, এই পুস্তিকাগুলি যে বিপ্লবপন্থীগণ হইতে স্বতন্ত্র অন্তলোকদের দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই, তাহার কি প্রমাণ আছে?"

স্যার্ মাডিম্যান্। "মাননীয় সভ্য মহাশয় কি এই ইঙ্গিত করিতেছেন, যে, পুস্তিকাগুলি আমার ও পুলিসের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে?"

মিঃ পাল। "আমি বলিতেছি না, যে, ওগুলা আপনার দ্বারা বা আপনার পুলিশের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস্ কমিশনার স্যার্ রেজিন্যাল্ড ক্লার্কের কথা হইতে বঙ্গে ও অন্যত্র গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত অপরাধ-উত্তেজক চরের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছি, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই চরেরা উত্তেজক পুস্তিকা প্রস্তুত প্রচার করে, এবং গবর্ণমেণ্টকেও দ্যায়।" স্যার্ মাডিম্যান। "আমি এই ইঙ্গিতের অসত্যতা দৃঢ়তম ভাষায় অস্বীকার করিতেছি।"

এইসময় অন্ত অনেক সভ্য বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন ও খুব গোলমাল হয়। তখন সভাপতি বলেন, "থামুন, থামুন, বিল্‌টি যখন প্রথমবার পড়া হইবে, তখন সভ্যেরা সকলেই নিজ-নিজ বক্তব্য বলিবার সুযোগ পাইবেন।"

আমরা দু-একটা কথা বলিতে চাই। এই বিল্-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া মাডিম্যান্ সাহেব বলেন, যে, বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র বাড়িতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু ইহার আগে শ্রীযুক্ত ডোরাইস্বামী আয়েঙ্গারের বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে-করিতে মাডিম্যান্ সাহেব বলিয়াছিলেন, যে, বিপ্লবীদিগকে প্রায় পিষিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাঁহার কথাগুলির তাৎপর্য্য আগে দিয়াছি। ইংরেজীতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও অবিকল তুলিয়া দিতেছি।

His reply was that these had proved effective in the past and he hoped these would prove effective on this occasion as well......

......The Home Member emphatically declared that the Government action had already given terrorists a rude shock. It had dislocated their organisation and had gone far to crush the movement.

মাডিম্যান্ সাহেবের কোন্ কথাটা সত্য? বিপ্লববাদের দলকে গবর্ণমেণ্ট প্রায় গুঁড়া করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা সত্য? না, তাহাদের ষড়যন্ত্র বাড়িতেছে, তাহা সত্য?

বিপ্লব-উত্তেজক পুস্তিকাগুলি বিপ্লবীরা প্রস্তুত করিয়াছে, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত গুপ্তচরেরা করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না, কারণ বিপ্লবীরা কিম্বা গুপ্তচরেরা সর্ব্বসাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যে সব দেশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত নাই, তথায় অসন্তোষের উৎপত্তি হয়, এবং ক্রমে তাহা হইতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হয়। তাহার ফলে নানা রাজনৈতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সেইসব দেশের গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্র-আদির খবর পাইবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করে। ষড়যন্ত্রের ও অপরাধের খবর দেওয়াই যখন এইসব লোকের কাজ, তখন খবর দিতে না পারিলে তাহাদের চাকরি থাকিবে না, তাহারা তাহা জানে। সুতরাং সত্যিকার খবর না থাকিলে তাহারা খবর তৈরী করে। অর্থাৎ তাহারা মিথ্যা করিয়া আপনাদিগকে বিপ্লবী বলিয়া অন্যের নিকট পরিচিত করিয়া তাহাদের দ্বারা উত্তেজক বক্তৃতা দেওয়ায়, নিজেরা উত্তেজক পুস্তিকা প্রস্তুত ও প্রচার করে, বা অন্যদের দ্বারা তাহা করাইয়া গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীদের ও সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহা প্রেরণ করে; তাহারা কখন-কখন অস্ত্র-শস্ত্র ও বোমা অন্যের বাড়ীতে গোপনে রাখিয়া বা রাখাইয়া দিয়া পুলিস্‌কে খবর দেয়; এ-দেশের খবর ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু অন্য কোন কোন দেশে তাহারা রাজনৈতিক হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে বা করাইয়াছে, এবং পরে তৎসম্বন্ধে গোপনীয় খবর পুলিস্‌কে দিয়াছে। এইসব চরকে ফ্রেঞ্চ বা ইংরাজীতে আর্জাঁ প্রোভোকাৎর্ (Agent Provocateur) বলে। নামটি হইতেই ইহাদের বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। অল্পবয়স্ক লোকেরা স্চরাচর সহজেই

লোককে বিশ্বাস করে, সহজে কাহাকেও সন্দেহ করে না। এইজন্য স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা অনেক স্থলে এই চর-দিগকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ও বিপ্লবপন্থী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বিপথগামী হয়, এবং তাহাদের জালে আবদ্ধ হয়।

"দি রিভল্যুশনারী" নামক পুস্তিকাগুলি গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে এইরূপ গুপ্তচরদের দ্বারা প্রস্তত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্যার অ্যালেক্‌জাণ্ডার মাডিম্যান্‌কে মিথ্যাবাদী বলিয়া বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়াও এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং বিপিন বাবুর প্রশ্নে তাঁহার উত্তেজিত না হইলেই ভাল হইত।

তাঁহাকে ও গবর্ণমেণ্ট পক্ষের অন্য লোকদিগকে একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। যখন যেরূপ ঘটনা-মূলক প্রমাণ পাইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুবিধা হয়, তখন সেইরূপ ঘটনা কেন ঘটে? খবরের কাগজের ফাইল ঘাঁটিলে ইহার বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। আমরা ২।১টার উল্লেখ করি-তেছি। যখন বাংলা গবর্ণমেণ্টের ইহা দেখানো দরকার হইয়াছিল, যে, দেশ এইরূপ ঠাণ্ডা হয় নাই যাহাতে রাজ-নৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দেওয়া চলে, তখন বিপ্লবী 'লাল-পুস্তিকা' (red pamphlet) প্রচারিত হয়, এবং, যতটা মনে পড়িতেছে, ইংলিশম্যান্‌ কাগজ প্রথম তাহার প্রাপ্তিসংবাদ প্রকাশ করেন। যখন লী-কমিশনের সুপারিস-অনুযায়ী ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌দের বেতনাদি বৃদ্ধির প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইবার কথা, তখন গবর্ণমেণ্টের ইহা দেখানো প্রয়োজন হইয়াছিল, যে, হিন্দু মুসলমানের মারামারি কাটাকাটি নিবারণের জন্য ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু বেতানাদি বাড়াইয়া না দিলে ইংরেজ যুবকেরা আর এদেশে শাসক ও বিচারকের কাজ করিতে আসিবে না। "ভাগ্য"-ক্রমে কিম্বা তদ্রূপ "আর কিছু"-ক্রমে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যখন ঐ বিষয়ের আলো-চনা হইবে, তাহার অল্পদিন আগেই লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানের ভয়ানক দাঙ্গা হইল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ কোহাটের দাঙ্গা, নরহত্যা, গৃহ-দাহ, লুট প্রভৃতি হইল। ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশ্যন্‌ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দিয়াছে, দেশে অতিমাত্রায় অশান্তি, উপদ্রব, অরাজকতা, প্রভৃতি থাকিলে বা তদ্রূপ অবস্থা-উৎপাদনের কোন বন্দোবস্ত বিপ্লবীদের পক্ষ হইতে থাকিলে, সেইরূপ ক্ষমতা যে গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত তাহা প্রমাণ করা সহজ হয়। তিন নম্বর রেগুলেশ্যন্‌ প্রভৃতি রদ করিবার বিল পটেল মহাশয় উপস্থিত করিবেন জানা ছিল। তাহার পূর্ব্বেই "দি রিভল্যুশনারী" পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া প্রমাণ হইল যে, বিপ্লবীদের ক্রিয়াশীলতা বন্ধ হয় নাই, চলিতেছে। সুতরাং তাহাতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের ইহা বলিবার সুবিধা হইল, যে, অসাধারণ ক্ষমতাটা এখন লুপ্ত হওয়া উচিত নহে।

কিন্তু এই যুক্তি প্রয়োগ করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ সম্ভবতঃ ইহা ভাল করিয়া মনে রাখেন নাই, যে, তাহার আগে আর-একটা যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, যাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সঙ্গতি নাই।

ভারতীয় লোকদের পক্ষ হইতে বরাবর বলা হইতেছে, যে, যদি বঙ্গে বিপ্লবীদল থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সাধারণ আইনই যথেষ্ট, এবং সাধারণ আইন প্রয়োগ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের লোককে আরও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে হইবে; পুলিস্‌ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে অসাধারণ ক্ষমতা দিবার প্রয়োজন নাই, এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে শুধু ঐরূপ ক্ষমতার দ্বারা বিপ্লব প্রয়াস নিবারিত হইবে না।

ইহার উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, অসাধারণ ক্ষমতার দরকার আছে, তাহা প্রয়োগ করিয়া আগে-আগে ফল পাওয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানেও ফল পাওয়া যাইবে, এবং বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই বিপ্লবীদলের কর্ম্ম-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিতে পারা গিয়াছে ও তাহাদিগকে প্রায় গুঁড়া করিয়া ফেলা হইয়াছে।

তাহার পর "দি রিভল্যুশনারী" নামক পুস্তিকার আবির্ভাবে প্রমাণ হইল, যে, ষড়যন্ত্র বাড়িতেছে, অতএব তিন নম্বর রেগুলেশ্যন প্রভৃতি রদ্‌ করা চলে না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সরকার পক্ষের অপর উক্তি—"বিপ্লবীদিগকে

প্রায় গুঁড়া করিয়া ফেলা হইয়াছে”—অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

—

গাজী আব্‌দুল করিম।

মরক্কোর রিফ্‌-সাধারণতন্ত্রের নেতা আব্দুল করিমের জয়লাভ আহ্লাদের বিষয়। ইউরোপীয়েরা নিজেদের স্বাধীনতাটি বেশ বুঝেন; কিন্তু অপরের বেলায় তাঁহারা

গাজী আবদুল করিম

স্বাধীনতাবাদী থাকেন না। এইজন্য সাধারণতন্ত্রের ভক্ত ফরাসীরাও মরক্কোর কোন অংশের স্বাধীনতা-লাভ পছন্দ করিতেছেন না।

—

রবীন্দ্রনাথের বহির অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের কোন-না-কোন বহি নিম্নলিখিত ভাষা-গুলিতে অনুবাদিত হইয়াছে:—হিন্দী, উর্দ্দু, মরাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, কন্নাড, আর্মীনিয়ান্, চীন, জাপানী, ইংরেজী, জার্মেন্, ডাচ, ডেনিশ, সুইডিশ্, নরউইজিয়ান্, ফরাসী, ইতালীয় স্প্যানিশ, রুশীয়, চেক্, এস্থোনিয়ান্।

রবীন্দ্রনাথ

শুনিয়াছি, যে, আরবী, হিব্রু এবং হাঙ্গেরীয় ভাষাতেও অনুবাদ হইয়াছে।

—

গবর্ণমেণ্টের আফিং নীতি

আমেরিকার নেতৃত্বে জেনিভায় জাতিসংঘের (লীগ্‌ অব্‌-নেশ্যন্সের) বৈঠকে এই চেষ্টা হইতেছে, যে, আফিং-উৎপাদক দেশসকলকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ করা হউক, যে, চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের জন্য ঠিক্ যত আফিং দরকার, তাহা অপেক্ষা বেশী আফিং তাঁহারা উৎপন্ন করিবেন না। ভারত-গবর্ণমেণ্ট নানা বাজে কথা বলিয়া ইহাতে বাধা দিতেছেন। এদেশে আফিং উৎপাদন গবর্ণমেণ্টের এক চেটিয়া ব্যবসা। চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকেও যে-কেহ এদেশে আফিং কিনিতে পারে। তা-ছাড়া গবর্ণমেণ্ট নানা দেশে আফিং চালান করেন। এই প্রকারে গবর্ণমেণ্ট আফিং বেচিয়া খুব পয়সা করেন; বাৎসরিক অনেক কোটি টাকা আয় হয়। কিন্তু ভারত-বর্ষের লোকদের মত এই, যে, চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ছাড়া, নেশার জন্য আফিং উৎপাদন করা যেন না হয়। তাহারা স্বদেশে ও বিদেশে মানুষকে আফিং-খোর ও গুলিখোর বানাইয়া রাজস্ব বাড়াইতে চায় না। ভারতবাসীদের এই মত নানা সংবাদ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, কংগ্রেসে ব্যক্ত হইয়াছে, জেনিভায় প্রেরিত গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ দেশবাসীদিগের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনে ব্যক্ত হইয়াছে। অথচ ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ক্যাম্বেল্ নামক একব্যক্তি জেনিভায় লিখাইয়াছে, যে, সে কেবল ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি নহে, ভারতবর্ষের লোকদেরও প্রতিনিধি। নিলর্জ্জতা আর কাহাকে বলে?

ভারত-গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার প্রস্তাব-অনুসারে আফিং-উৎপাদন হ্রাস করিতে রাজী হইতেছেন না। অথচ রাজস্বসচিব স্যার্ বেসিল ব্লাকেট বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট টাকার জন্য আমেরিকার প্রস্তাবে রাজী

হইতেছেন না, ইহা ঠিক্ নহে। সুতরাং চতুর্বর্গের মধ্যে "অর্থ"টা বাদ পড়িল! আর তিনটির মধ্যে কোন্‌টির জন্য গবর্ণমেণ্ট আফিং উৎপাদন কমাইবেন না, তাহা প্রমাণসহ বলিলে বাধিত হইব।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এরূপ যুক্তিও শুনা গিয়াছে, যে, "চীন নিজেই খুব আফিং উৎপন্ন করিতেছে—যদিও পূর্ব্বে চীন বলিয়াছিল, যে, আফিং উৎপাদন বন্ধ করিবে; সুতরাং আমরা কেন চীনে আফিং রপ্তানি বন্ধ করিব?" ইহা বড় চমৎকার যুক্তি! গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে যাহা বলা হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবল এইটুকু সত্য আছে, যে, চীনে কোন-কোন দলের সামরিক নেতারা টাকার টানাটানি হওয়ায় আফিং উৎপাদনে সোৎসাহ অনুমতি দিয়া টাকার জোগাড় করিতেছে; কিন্তু চীনের শ্রেষ্ঠ লোকদের ইহাতে সম্মতি নাই, চীনের গবর্ণমেণ্টের সম্মতি নাই, চীনের কোটি-কোটি লোকদের যে ইহাতে সম্মতি আছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু যদি মানিয়া লওয়া যায়, যে, চীনের গবর্ণমেণ্ট ও সব লোকেরই ইহাতে সায় আছে, তাহা হইলেই কি আমরা মানিয়া লইব, যে, চীনে রপ্তানির জন্য আফিং উৎপাদন ভারতবর্ষের পক্ষে ঠিক্ কাজ হইবে? অন্য-একটা দেশের লোক যদি রসাতলে যাইতে চায়, যদি তাহারা দৈহিক মানসিক ও নৈতিক আত্মহত্যা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের রসাতলে যাইবার এবং দৈহিক মানসিক ও নৈতিক অবনতি সাধনের উপায় জোগানো কি আমাদের কাজ? এরূপ অধর্ম্ম করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করা ও অন্য কোন পাপ কার্য্য করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করায় প্রভেদ কি?

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের আমলে আফিং রপ্তানি আরম্ভ হয়। কিন্তু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ আফিংকে মহা অনিষ্টকর বলিয়া জানায় ভারতে উহার অবাধ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি চীন-দেশবাসীদের অনিষ্ট-কারিতা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করে নাই।

—

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক আধা সরকারী ব্যাঙ্ক। গবর্ণমেণ্টের টাকার (অর্থাৎ আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের) জোরে ইহার এত পসার-প্রতিপত্তি। কিন্তু ইহার মোটা-মাইনার সব কর্ম্মচারী বিদেশী। ইহার অনেকগুলি নূতন কর্ম্মচারী দরকার। তাহার বিজ্ঞাপন বিলাতে বাহির হইয়াছে। কোন সুবিদিত ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা কর্ম্মপ্রার্থীদের থাকা চাই। ভারতবর্ষে অনেক সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক আছে এবং তাহাতে অনেক ভারতীয় দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ইংরেজ নহে বলিয়া তাহাদিগকে দরখাস্ত করিবার সুযোগও দেওয়া হয় নাই।

—

ভাষা-অনুসারে প্রদেশ পুনর্গঠন

ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ প্রস্তাব ধার্য্য হয়, যে, উৎকল প্রদেশের সমুদয় টুক্‌রাগুলিকে একই প্রদেশে সমাবিষ্ট করা হউক। বর্ত্তমান সময়ে উৎকলের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ বাংলা, বিহার, মধ্য-প্রদেশ ও মাদ্রাজের সহিত যুক্ত আছে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে ওড়িয়ারা কোনপ্রকার উন্নতির জন্যই আপনাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। এবং কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরই মনোযোগ ভাল করিয়া পায় না। এই হেতু উৎকল প্রদেশ পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সহিত উৎকলের যে-অংশ যুক্ত আছে, তথাকার উৎকলীয়দিগের ইচ্ছা জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ঐ অঞ্চলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, যে, তত্রত্য উৎকলীয়দিগের সত্য-সত্যই অন্য সব উৎকলীয়দিগের সহিত যুক্ত হইবার ইচ্ছা আছে।

এই ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ করা উচিত। তাহা দুই উপায়ে করা যায়। যথা—সমগ্র উৎকলকে একত্র করিয়া অন্য কোন-একটি বড় প্রদেশের সহিত যুক্ত করা, কিম্বা সমগ্র উৎকলকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিয়া তাহার স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিয়োগ এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা গঠন। দ্বিতীয় উপায়ই শ্রেষ্ঠ; স্বতন্ত্র-প্রদেশ গঠন করিলে তবে উৎকলীয়দিগের সম্পূর্ণ সুবিধা হইবে। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট তাহা না করিতে চান, তাহা হইলে উৎকলকে বঙ্গের সহিত যুক্ত করা ভাল; কারণ উৎকলের জাতীয়

জীবনে যে ধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বঙ্গের জাতীয় জীবনেও তাহার প্রভাব অধিক। বস্তুত উভয়ের ধর্ম্মবিকাশের ইতিহাস অনেকটা এক। অন্য অনেক বিষয়ে বাংলাদেশ ও উৎকলে যত সাদৃশ্য ও সংস্পর্শ আছে, অন্য কোন প্রদেশের সহিত উৎকলের তাহা নাই। তাহা হইলেও আমরা উৎকলের একটি-স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

শ্রীহট্ট জেলাকে বাংলাদেশের সামিল করিবার প্রস্তাবও আসাম ব্যবস্থাপক সভায় পাস হইয়াছে। শ্রীহট্টের ভাষা বাংলা, এবং ইহা ত মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর ব্যতীত বরাবরই বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল। ইহাকে বঙ্গের অন্তর্ভূত করাই উচিত।

আর-একটি জেলাকেও বাংলার সহিত যুক্ত করা উচিত; কারণ উহা বরাবরই উহার সহিত যুক্ত ছিল। এই জেলা ভূতত্ত্ব, ভাষা, নৃতত্ত্ব, প্রভৃতি সব দিক্ দিয়া পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মত ও তাহার অব্যবহিত সান্নিধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ লোক বাঙালী এবং আদিম নিবাসীদের অনেকেও নিজ-নিজ আদিম ভাষা ছাড়িয়া দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় বাংলা বলিতেছে। বঙ্গের বাঙালীদের এবং মানভূমের বাঙালীদের মানভূমকে বাংলার সামিল করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন করা উচিত।

—

"ভারতবর্ষের প্রতারণা"

মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত বেঙ্কটপতি রাজুর প্রস্তাব-অনুসারে ভারতীয় একটি মুদ্রা-কমিটি-নিয়োগ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক ধার্য্য হইয়াছে। উহার অধিকাংশ সভ্য ভারতীয় ও বেসরকারী হইবেন, এবং সভাপতিও একজন ভারতীয় হইবেন। এই প্রস্তাব-সম্পর্কে যেসব বক্তৃতা হয়, তাহার মধ্যে বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহ্‌তা নিজের বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণার অপরাধে অপরাধী বলেন। তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিলে জেলে যায়, কিন্তু যে রাজস্বসচিব ভারতবর্ষকে চল্লিশ কোটি টাকা ঠকাইয়াছেন, তিনি এখন একটি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার গদিতে আরূঢ়।' মেহ্‌তা মহাশয়ের ইংরেজী কথাগুলির রিপোর্ট এই :—

"………in a ringing voice he declared, much the dismay of the Treasury Benches, that Government was committing a fraud on India wh under pressure from Whitehall they spent 40 cro by the sale of reverse councils. A person w committed fraud went to jail, but the finance Meml who committed the fraud to the extent of 40 cro was now on a provincial gadi!"

—

ইংলণ্ডের উদারনীতিক দল

পার্লেমেণ্টের গত সভ্য-নির্ব্বাচনে বিলাতের উদা নীতিক দল প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে। কি উদারনীতিকেরা তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া আগা নির্ব্বাচনের সময় সর্ব্বত্র সভ্যপদপ্রার্থী খাড়া করিয়া লড়ি বার জন্য দেড় কোটি-টাকা তুলিতেছেন। তাহার দ্বার ভোটারদিগকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়া নিজের দ তাঁহারা টানিতে চান। ইহাই ত মানুষের মতন কাজ হার মানা কখনও উচিত নয়।

রক্ষণশীলেরা চেষ্টা করিতেছেন, দেশের সর্ব্বত্র য স্বায়ত্তশাসক সমিতি আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে যাহাতে প্রতি সাত জনে চারিজন করিয়া শ্রমজীবি-শ্রেণীর লো রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে ঢুকিতে পারে। এইপ্রকা রক্ষণশীল দল শ্রমজীবী দলকে পরাজিত রাখিতে চাহিতেছে।

—

দেবোত্তর-সম্পত্তি-সম্বন্ধে আইন

বঙ্গে যেমন তারকেশ্বরে, চন্দ্রনাথে, তেম্‌নি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বহু মন্দিরের প্রভূত সম্পত্তি ও আয় আছে। এই আয়ের সদ্ব্যয় হয় না বলিলেই চলে; অধিকন্তু ইহার সাহায্যে অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয়, সামাজিক অপবিত্রতা বাড়ে, এবং নানাবিধ অত্যাচার হয়। মান্দ্রাজে এইরূপ সম্পত্তির সদ্ব্যবহারের জন্য আইন হইয়াছে। তাহার দ্বারা যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে, তাহারা উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে ও করাইতেছে। কিন্তু উহার সামান্য দোষ-ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে, ওরূপ আইন প্রণয়ন ঠিক্ই হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার্ হরিসিং গৌড় সমুদয় ভারতবর্ষের জন্য, ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত ও ন্যস্ত সম্পত্তির সদ্ব্যবহার যাহাতে হয়, তন্নিমিত্ত একটি বিল্ পেশ্ করিয়াছেন। এরূপ আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তারকেশ্বর লইয়া কত হুজুক ও কত অর্থনাশ হইল, চিত্তরঞ্জন দাশ উহার সংস্কারের জন্য প্রাণ দিবেন বলিলেন; কিন্তু ফল কি হইয়াছে? শক্ত আইন না হইলে মহন্তদের কদাচার ও অত্যাচার দূর হইবে না।

—

ইংলণ্ড ও নেপাল

বিলাতের রাজকীয় ভৌগোলিক সভার এক অধিবেশনে মেজর নর্থী নামক এক ব্যক্তি নেপালের গুর্খাদের ক্রমবর্দ্ধনশীল বিদেশ যাত্রার ইচ্ছার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহাতে এই ক্ষুদ্র সাহসী জাতীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও সমৃদ্ধির ব্যাঘাত হইবে; অতএব শীঘ্র এই ইচ্ছা কমাইবার ও নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

গুর্খারা বিদেশ গেলে তাহাদের চোখ ফুটিবে, এবং তাহারা কয়েকটা টাকার জন্য আর ইংরেজদের হাতের তলোয়ারের মত থাকিয়া তাহাদের আদেশ পালনে সম্মত হইবে না, মেজর বাহাদুরের সম্ভবত এই ভয় হইয়াছে। কিন্তু সত্য কথাটা না বলিয়া তিনি গুর্খাদের কল্যাণ-কামী সাজিয়াছেন।

—

আমেরিকার ও ইংলণ্ডের রণতরী

আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের সমুদয় রণতরীর দ্বারা যুদ্ধ কৌশল দেখাইবেন। উদ্দেশ্য বোধ হয় নিজের সামুদ্রিক শক্তি দেখান। জাপান ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সিঙ্গাপুরে রণতরীর আড্ডা করিবার কল্পনা শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন, রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। তা ছাড়া ইংলণ্ডের চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতীয় রণতরী বিভাগগুলির সেনাপতিদের একটা মন্ত্রণাসভা শীঘ্রই সিঙ্গাপুরে বসিবে।

অতএব পৃথিবীতে খৃষ্টীয় জাতি সকলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শান্তিময় স্বর্গরাজ্যের আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই!

—

টাটার লোহা ইস্পাত কার্‌খানা

টাটার লোহা ইস্পাত কার্‌খানায় গবর্ণমেণ্ট এক বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিবেন। তা ছাড়া রক্ষণ শুল্ক ত আছেই। এই কার্‌খানা স্থায়ী হউক, ইহা আমরা চাই। কিন্তু টাকা দিবে ভারতবর্ষ ও তাহার ফল ভোগ করিবে প্রধানতঃ উহার অংশীদারেরা ও বিদেশী মোটা মাহিনার চাকরেরা, ইহা আমরা চাই না। ইহার এমন কোন কাজ নাই, যাহা ভারতীয়েরা করিতে পারিবেনা। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র ইহার সব কাজ ভারতীয়দের দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এবং ইহার শ্রমিক ও কারিগরদিগের সমিতির ন্যায় সঙ্গত সমুদয় দাবী গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

—

কুষ্ঠের প্রতিকার।

কুষ্ঠ ব্যাধির প্রতিকারের জন্য প্রিন্স অব ওয়েলস্, বড়লাট প্রভৃতি টাকা তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এই চেষ্টার সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

—

সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি ও ঈর্ষা

পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা স্যার্ ম্যাল্‌কম্ হেলী সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি ও ঈর্ষা-সম্বন্ধে কয়েকটি খুব ভাল কথা বলিয়াছেন।

Both Hindus and Mahomedans have complained to me of inadequate representation in your local bodies. They cannot both be right. I beg of you to give less thought to these things and to bend yourselves to the task of improving your own communities within their own sphere, for the real solution of communal differences lies rather in bringing each community to a level with its neighbours in point of intellectual and material advance than in attempts to obtain political advantages for one section of the public over another. That is a word of friendly warning to all. It is no benel

to the administration of this country to see the great communities disunited. Our object (and it should be yours also) is to see a common and harmonious advance throughout the province benefiting all communities alike and working to its general betterment without distinction of sect on creed."

অর্থাৎ—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আমার কাছে স্থানীয় সমিতিগুলিতে নির্ব্বাচনের স্বল্পতা-সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ের অভিযোগই যথার্থ হইতে পারে না। আমি আপনাদের কাছে অনুনয় করিতেছি, এসব বিষয়ে আপনারা একটু কম মনোযোগ দিয়া স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে উন্নতি-সাধনের কাজে লাগুন। কারণ এইসব সাম্প্রদায়িক বিরোধের মীমাংসা করিতে হইলে একের উপর অন্যে রাজনীতিক সুবিধা লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়কে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সহিত মানসিক ও আর্থিক উন্নতিতে সমতা লাভ করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এ-কথা আমি সকল সম্প্রদায়কেই বন্ধুভাবেই বলিতেছি। দেশের বৃহৎ সম্প্রদায়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে রাজকার্য্য-চালনে সুবিধা হয় না। আমাদের যেমন উদ্দেশ্য, আপনাদেরও তেমনি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যে যাহাতে প্রদেশের সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে সর্ব্বসাধারণের উন্নতি হয়, ও তাহাতে সকল সম্প্রদায়ই উন্নতি লাভ করিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমগ্র প্রদেশের সাধারণ উন্নতির কাজে ব্যাপৃত থাকে।

—

যক্ষ্মা-রোগের ব্যাপ্তি ও প্রতিকার

বাংলা দেশে যক্ষ্মা-রোগ খুব বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার প্রতিকারার্থ কলিকাতার অনেক খ্যাতনামা ডাক্তার একটি স্বাস্থ্য-নিবাস ও চিকিৎসালয়ে প্রতিষ্ঠার্থ অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আশা করি ইঁহারা সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রচুর পরিমাণে পাইবেন। এই বিষয়ে সকল কথা জানিতে হইলে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়কে ৪৪ ইয়োরোপীয়ান্ অ্যাসাইলাম লেন, কলিকাতায় পত্র লিখিতে হইবে।

—

শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত

গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। শ্রীমতী সরোজনলিনী—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের পত্নী। ইনি বাঁকুড়া ও বীরভূমে অবস্থানকালে নানা-প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরে কলিকাতায় আগমনের পরেও নারীশিক্ষা-সমিতি ক্যাল্‌কাটা লীগ অব উইমেন ওয়ার্কার্স বেবি উইক প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। পর্দ্দানসীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও শিল্প প্রচারের জন্য শ্রীমতী সরোজনলিনী অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। শিশু-মঙ্গল, হাঁসপাতাল-স্থাপন ধাত্রীদিগকে আধুনিক শিক্ষাদান ইত্যাদি নানান প্রচেষ্টার মধ্যেই ইঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখা গিয়াছে। ইঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন যথার্থ কর্ম্মী হারাইল। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে এই দারুণ শোকে আমরা সহানুভূতি জানাইতেছি। তাঁহার পত্নীর মৃত্যুতে বাংলার বহুস্থলে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে বন্ধুভাবে যাঁহারা শ্রীমতী সরোজনলিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ করিয়া এই গুণবতী সহৃদয়া মহিলার মৃত্যুতে শোক অনুভব করিতেছেন। অকালে ইঁহাকে হারাইয়া দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হর-পার্ব্বতী

চিত্রশিল্পী—শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

ঝড়

সুপ্তির জড়িমা-ঘোরে
তীরে থেকে তোরা, ও'রে
করেছিস ভয়,
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জ্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"
তোরা বলেছিলি তা'কে,
"বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখীর ডাকে
তরুর মর্ম্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।"
ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘ-মন্দ্রে,—
"নয়, নয়, নয়॥"

সমুদ্রে আমার তরী ;
আসিয়াছি ছিন্ন করি'
তীরের আশ্রয়।
ঝড় বন্ধু তাই কানে
মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
"জয়, জয়, জয়।"
আমি যে সে প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রের নিঃশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,—
"আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহ-বন্ধন ছিঁড়ি' লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত—
"তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়॥"
যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে,—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে',—
"এ দেখি প্রলয়।"
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পারো, তাই
রয়, রয়, রয়।"
চলেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।
ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা, তা'ই বোঝা,
তা'রে খোওয়া, তা'রে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তা'রে, তা'রি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, "এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে' দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়॥"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঞ্ঝার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে সে, "বাসনা অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ
দূর, দূর, দূর।"
গাহে "পশ্চাতের কীর্ত্তি,
সম্মুখের আশা,
তা'র মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাঁধিস্‌নে বাসা
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।
যত লোভ, যত শঙ্কা,
দাসত্বের জয়-ডঙ্কা
দূর, দূর, দূর॥"
এস গো ধ্বংসের নাড়া,
পথ-ভোলা, ঘর-ছাড়া,
এস গো দুর্জ্জয়।
ঝাপটি' মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
"নয়, নয়, নয়।"
আবেশের রসে মত্ত
আরাম-শয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়,—
কার্পণ্যের বন্ধ দ্বারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্ম-সঙ্কোচ নিত্য গুপ্ত হ'য়ে রয়,
হানো তা'রে, হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
"নয়, নয়, নয়॥"

২৬ অক্টোবর, ১৯২৪, ষ্টীমার এণ্ডিস্

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্ভাবনার দুর্ভাবনা *

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সবদিক্ দিয়ে নির্ভাবনা যাকে পেয়ে বস্‌লো, সে বিষম দুর্ভাবনায় ফেল্‌লে লোককে! খাওয়া-পরা, চুল বাঁধা, রান্না করা, আমোদ করা, আহ্লাদ করা, পড়াশুনো এমন কি নিজের বিয়েটির বিষয়েও নির্ভাবনা করে' মেয়েটিকে যখন শ্বশুর-ঘরে পাঠানো গেল, তার পর থেকে কি বিষম দুর্ভাবনা জেগে রইলো মেয়ের জন্যে ভাবছে যে তা'র প্রাণে, তা মেয়েটাও বুঝলে না কেননা নির্ভাবনার মধ্যে সে মানুষ, মা-বাপও নয় তা'রা মেয়ে পার করে' খালাস, এই মেয়েগুলির মতো আমাদের ছেলেগুলিও এবং আমরাও নির্ভাবনা হ'য়ে বসেছি প্রায় সবদিক্ দিয়ে কেমন তা বলি—

বই পড়বো কিন্তু বইটার অর্থ বুঝতে ভাববার আবশ্যকই হয় না, অন্যে ভেবে-চিন্তে ব্যাখ্যাসমেত নোট লিখেছে—কিনে' পড়ো, হ'য়ে যাও পাস। কিছু বুঝতে মাথা ঘামাতে হয় না, এমন কি বোঝার ভাবনাই নেই মনে। আলো জাল্‌বো ঘরে তা'রও ভাবনা নেই—Electric Supply & Co., তা'র ভাবনা ভাবছে! আলো জ্বল্‌বে মনের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপে তা'র ভাবনাও নেই—Education Board তা ভাবছে। আগে ছাত্রদের নিজের হাতে যখন তেল-বাতি জ্বালাতে হ'ত, তখন আলোর পরিস্ফুতি পেতে ভাবতে হ'ত সল্‌তের তুলোর সরুমোটা হিসেব তেলের কৌটারও সঠিক পরিমাণ—এখন নির্ভাবনায় সুইচ টেপো, আলো দপ করে' এসে হাজির। কত ন্যায়বাগীশ, তত্ত্ববাগীশের সংসারের ভার আর ভাবনা ভেবে তবে জ্বল্‌তো আগেকার ছেলেদের জ্ঞানের প্রদীপ এখন মাষ্টার সবংশে মর্‌লেও ভাবনা হয় না, গুরু ভাবনাই চলে' গেছে! আগে ভোরে উঠতে ভাবনা ছিল—যদি না পাখি ডাকে, যদি না ঘুম ভাঙ্গে—সেই দুর্ভাবনায় লোক ছটফট্ কর্‌তো এবং যাতে ঠিক সময়ে জাগে তা'র নানা আয়োজনের ভাবন ভাবতো! এখন প্রহরী ঘড়ী যে বানিয়েছে সে ভাবছে আমার ঠিক টাইমে জাগার ভাবনা, আমি নির্ভাবনায় নিদ্রা যাচ্ছি। ছেলে ঘুমোবার সময় আগেকার মায়ের ভাবনা ছিল—ছড়া কাট্‌তে কাট্‌তে কোনোদিন ছেলে ঘুমোতো, কোনোদিন বা ঘুমোতোই না, এখন ছড়া বলার ভাবনা গেছে, গড়ের মাঠের কেল্লা সেখান থেকে তোপ বলে—"ওইরে হুমো, ঘুমোরে ঘুমো" তোপ পড়ল আর ঘুমোলো ছেলে, পোড়ো বন্ধ কর্‌লে বই, যেন কলে কালীমাকে ও মহাদেবকেও ডাকা হ'য়ে গেল। এবং কলিকাতার প্রত্নতত্ত্বও খানিক মুখস্থ হ'ল, যথা—কলকাত্তাওয়ালী! রাত্রে মশা এখনো একটু-একটু জ্বালায় সুতরাং তা'র ভাবনা একটু-একটু ভাবি আধঘুমে কিন্তু ম্যালেরিয়া কমিটি, কালাজ্বর কমিটি সে ভাবনাও ঘুচিয়ে দিলে ব'ল' আমাদের! আমোদ কর্‌তে হবে—তা'র ভাবনা ম্যাডান সাহেবের, নয় ত শিশির-বাবুর, ছবি দিয়ে ঘর সাজাতে হবে—তা'র ভাবনা অবনী-বাবুর, চিত্র পরিচয় করে' ছবি বুঝতে হবে তা'রও লোক আছে যাতে আমাদের না ভাবতে হয়, কবিতা চাই—আছেন রবি-বাবু, নভেল চাই আছেন শরৎ-বাবু! আগে নিজেরা ভেবে ছেলেখেলা খেল্‌তো বালকেরা, এখন কলেজের মাঠে খেল্‌তে হবে—তা'র ভাবনা, তা'র হিসেব ছেড়ে দেওয়া আছে কলেজের প্রিন্সিপালের উপরে, সভা করে' পাঁচজনে এক হবো—সেক্রেটারী আছে সময়-মতো ডাক দিতে, আছেন সভাপতি ঠিক এসে সভা জমাতে, সভা সাজাতে ভাবছে ঠিকে' সাজানদার, বাজা বাজাতে ভালো করে' ভাবনা ভাবছে ঠিকে' বাজনদার, এমন কি মরে' গেলেও ভাবনা নেই, একটা দল আছে যারা এখন থেকে স্মৃতিরক্ষার ফর্দ্দ করে' সব ভাবনা থেকে আমাদের নিশ্চিন্ত করে' বসেছে।

---

* ২৪শে মাঘ রামমোহন লাইব্রেরী-হলে কুমার-লাইব্রেরীর তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।

বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের দরকার, কিন্তু ভাবনা ভাবছে তা'র মিউনিসিপাল আফিস নয় ডাক্তার বাবু। টেলিফোঁ আফিস ভাবছে আমি কি করে' ঘরে বসে' দূরের খবর পেয়ে নির্ভাবনা হই—ছুটে' গিয়ে কারো খবর নিয়ে আসার ভাবনা নেই! টাকা পৌঁছে দিতে হবে বিদেশে চুরি না হয় বাটপাড়ি না হয় পথে এ ভাবনা নেই, কি করে' টাকা সাম্‌লাই—পোষ্ট আফিস আছে! হঠাৎ মরে' যাই ত ছেলেপিলে কি খাবে, এ ভাবনাও নেই, Royal Insurance সে ভাবনা ভাবছে আমার জন্যে, দিল্লীশ্বরও হিংসা করে এমন নির্ভাবনায় জীবনযাত্রা চলেছে আমাদের! আকবর সা থেকে সবাই ভেবে গেল, বিধাতা তিনি ভাবছেন সৃষ্টির ভাবনা, আমাদের মতো এত বড় এমন চমৎকার নির্ভাবনা নিয়ে জীবন যাপন কেউ করতে পারলে না।

আমাদের ঋষি, ঋষি-বালক—তাঁদেরও কি ভাবনার অন্ত ছিল—হোমের আগুন জ্বলে কি না জ্বলে তা'র ভাবনা, জ্বল্‌লো যদিবা তক্ষে-রাক্ষস এসে যজ্ঞ নাশ না ক'রে তা'র ভাবনা, যজ্ঞের শেষে দেবতার কাছে আহুতি পৌঁছায় কি না তা'র ভাবনা এবং তা'র উপরে রাজ্যে অনাবৃষ্টি, অজন্মা না হয়, গোধন চুরি না যায়, এমনি ভাবনার সীমা ছিল না। এখনকার দিনে এসব উৎপাত, ভাবনা-চিন্তা নেই, থাকলেও তা'র ভাবনা ভাবতে লোক আছে, ছুটি হ'লে বাড়ী ফিরতে হবে চট্‌পট—আগে আমাদের ভাবনা হ'ত গাড়ি পাই কি না, নৌকো পাই কি না এখন দরজায় ট্যাক্সী অপেক্ষা করছে, উড়োকল সেও হয়তো উড়ে' এল বলে' তুলে' নিতে আকাশ-পথে, বাড়ীর মধ্যে কার উঠোনে একেবারে পৌঁছে দিতে।

চীন এককালে কি বিষম ভাবনাই ভেবেছিল নিজকে বাঁচাতে! কত প্রাচীর এবং তা'র মতলব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছিল তা'কে! এখন একখানা চালাঘর বাঁধারও ভাবনা আমাদের করতে হয় না—নতুন চুনকাম করা ফার্ণিশড্-সংসার পেতে রেখেছে আগে থাকতে ভেবে সহরের বাড়ী-ওয়ালারা। বিষ্টি হ'লে বাড়ীর গিন্নিদের বাড়ীর কর্ত্তাদের জল আনা, মাছ কেনার ভাবনা নেই, ঘরের মধ্যে কল-জল, টিনের কৌটোয় মাছ, মায় ইচ্ছা করলে মাছ চচ্চড়ি, তা পর্য্যন্ত আগে থেকে ভাববার লোক প্রস্তুত করে' রেখেছে—আমাদের পাছে ভাবতে হয় সেজন্যে। এও কোং-রা পয়সা করতে পাছে আমাদের ভাবতে হয় তা'র জন্যে বছরে বছরে অর্দ্ধমূল্য সিকিমূল্য নিলেম পর্য্যন্ত ডেকে জিনিষ ভালো অথচ সস্তা বস্তা বেঁধে ঘরে-ঘরে বিলিয়ে গৃহস্থদের পয়সা বিষয়ে, অনটন-বিষয়ে কি নির্ভাবনাই করে' দিয়েছে।

আমাদের নিজের মান বজায় কি করে' হয় তাও ভাবার লোক মজুৎ, আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হয় কিসে তা'রও ভাবনা ভাবছে এমন লোক আছে। পুরাকীর্ত্তি রক্ষার জন্যে ভাবনা আমাদের ভাবতেও হয় না, মন্দিরে-মন্দিরে ঘাটিতে-ঘাটিতে ভূত-তত্ত্বের পাহারা বসে' গেছে একখানি ইঁট না খসে, সে ভাবনা তাদের ভূততত্ত্ব আফিস ভাবছে, ফসলের ভাবনা, গুপ্ত ধনের ভাবনা। ঝড়ে পাছে চাল উড়ে' যায়, তা'র ভাবনা ভাবছেন আমাদের প্রশান্ত মহলানবিশ, আলাদিনের প্রদীপ ফিরে' পেয়ে গেছি আর কি! আর শুধু একটু খুঁৎ রয়ে' গেছে, সেটা হচ্ছে চাকরির ভাবনা; ওইটে হ'লেই সব ভাবনার পারে অলস-পুরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা মেরে বলি, open sesame আর অমনি দরজা খুলে' যায়। অলস-পুরের আল্‌সে বেশে বকম্ পায়রা মাথার উপরে আমাদের কেবলি পুষ্পবৃষ্টি, রত্নবৃষ্টি, খই, মুড়কি, বাতাসা কত কি বর্ষণ করতে থাকে তা'র ঠিক নেই। নবৎখানায় ভূতকালের রসুনচৌকী ফুকরে বলে'

চুকিল ভাবনা চুকিল নালিশ
আলিস করিতে পাইয়া বালিশ,
হইলা হরিশ।

সভাপতি হ'য়ে যেটুকু আজ ভাবতে হ'ল সেটুকু ভাবনাও কাঁধ থেকে তুলে' নেয় তখন ভাববার লোক এসে। আমি কেবল সভা জম্‌কে বসে থাকি, নির্ভাবনায় বসে'ই থাকি, নয়তো শুয়েই থাকি আর দেখি ছেলেপুলে, নাতি-নাৎনী হাউ টু প্লে, হাউ টু সিং, হাউ টু রিড্, হাউ টু রাইড্ এম্‌নি সব হাউটু'র মধ্যে হাঁটুগেড়ে হামাগুড়ি দিতে-দিতে মানুষ হচ্ছে, কোনো ভাবনা নেই—কোনো কিছুর জন্যে দুর্ভাবনা নেই—হবু যা, হ'তে পারতো যা, তা হ'য়ে গেছে—পাখার বাতাস সে হ'য়ে গিয়ে শরীর জুড়িয়ে দিয়ে গেছে, গরম আসার

ভাবনা ভাববার আগেই জল সে আগেভাগে ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে তেষ্টা পাবার আগেই, ছবি আঁকা হ'য়ে গেছে—ডিজাইন মাথায় আসার আগেই Designoscope বলে' একটা চমৎকার দূরবীন্ বাজারে হাজির হয়েছে যার বিজ্ঞাপন বল্‌ছে—তোমার আর ভেবে কিছু নক্সা কর্‌তে হবে না, এইটার মধ্যে দেখ আর বসে'-বসে' নকল ওঠাও, না পারো ক্যামেরাকে হুকুম করে' সে এসে একাজ করে' দেবে, আধ সেকেণ্ডও লাগবে না।

গান গাইতে হবে ওস্তাদের খোঁজে যাবার দরকার হচ্ছে, গ্রামোফোন বল্‌বে কিনে' বসে' যাও শিখতে,—কিন্‌তেও যেতে হবে না, V. P.তে এসে যাবে এবং তুমিও এমন ওস্তাদ বনে' যাবে দেশী-বিলাতী দুই সঙ্গীতে যে বুকের কপাট দুখানা সোনারূপোর মেডেলে নিরেট হ'য়ে যাবে একদম।

ভাষা শিখতে চাও, তাও V. P.তে এসে যাচ্ছে lessonএর পর lesson, D. Lit.দের কাছ থেকে। ভালো সিম্‌লের ধুতি, ঢাকাই সাড়ী কি করে' বোনা যায়, কেমন করে'ই বা পরা যায়, তা'র জন্যে আগে ভাবনা ছিল, এখন টোলের ব্যবস্থা পাওয়া গেছে—ও দুটোই যে বোনে এবং যে পরে তাদের ভদ্রলোকের স্বর্গ থেকে পতন অবশ্যম্ভাবী সুতরাং সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেছি।

প্রজাপতি সভা হ'য়ে গেছে, ঘটকালির ভাবনা নেই, বিয়ের রাতে কতখানি কবিত্বরস বরক'নে, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবের জাগতে পারে, তা'র সঠিক পরিমাপ তাপ-মান যন্ত্রে ধরে' প্রজাপতি আফিস নানা-ওজনের বিয়ের কবিতা ছাপিয়ে রেখেছে, রঙীন কাগজে যত খুসি চাই পাই। সংকার-সমিতি—তা'রাও সব ঠিক করে' রেখেছে! ছেলের নাম-করণ, ছবির নাম-করণ, এর ভাবনা এখন আর ভাবিনে, লোক আছে নামের ফর্দ্দ ডিক্‌শনারী ইত্যাদি নিয়ে ফরমাস খাটতে।

আমি যে আছি এও ভাবিনে এখন, লোক আছে যে কানে বল্‌ছে—তুমি আছ তুমি আছ, আমি যখন নেই তখনও স্মৃতিসভা করে' বল্‌ছে—সে আছে, সে আছে!

ইচ্ছে কর্‌লে তবে আগে সৃষ্টির জিনিষ হ'তে পার্‌তো, এখন সে নিয়ম উল্‌টে গেল, ইচ্ছা করার ভাবনা ও পরিশ্রম চুকে' গিয়ে এখন আগেভাগেই যো হুকুম বলে' সব এনে হাজির আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যটা—কখন নেতা সেজে, কখন চিত্রকার সেজে, কাব্যকার সেজে, গিট্‌কিরি দিয়ে গীতকার সেজে টিট্‌কিরি দিয়ে শ্রোতা সেজে এবং চিৎকার করে' বক্তৃতা দিয়ে সভাপতি সেজে।

এই নির্ভাবনার অভাবনীয় স্বর্গ দেবদুর্লভ জিনিষ, তারি জন্যে গত তিন মাস আমি হিমালয়ে বসে' তপস্যা করে' ফিরে' এসে দেখ্‌ছি, এখনো তপস্যা-সিদ্ধির ব্যাঘাত আমার অনেক। ছেলের দল তাদের মাঝে বসে' সভা-পতিত্ব করা ভাবনার বিষয় হ'তে পারে না, কিন্তু আমি ভাবি—এখনো কি বল্‌বো কি লিখবো, হয়তো কিছু বেফাঁস কথা বল্‌বো, যাতে করে' পরে ভুগতে হবে, সত্যি বল্‌ছি বড় খারাপ দিনকাল, এখন লেখা, বক্তৃতা এসব ভাবনা ছাড়তে পার্‌লেই মঙ্গল নিজের এবং পরেরও। ছেলেরা ছবির Exhibition কর্‌বে, দেয়ালে খাটিয়ে দিলেই হয় ছবি-কখানা, লোক এসে দেখে' যায়, কিন্তু আমি এখনো ভাবি প্রত্যেক ছবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এটা চল্‌বে না, চল্‌বে না, আমি এখনো ভাবি কোন্ ছবির পাশে কোন্ ছবিটা দিলে ঘরখানা মানায়।

আমি সঙ্গীত সমাজে গিয়ে এখনো ভাবি, গানের উন্নতি কর্‌তে হ'লে, সোনার মেডেল না শোনার আকাঙ্ক্ষা, কোন্‌টা বড়। আমি এখনো ভাবি ভূতপূর্ব্ব কালের রাগরাগিণী ভেঁজে চলা, না একালের সুরে গেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক আমাদের কাছে।

আমি এখনো বাইরে যেতে হ'লে চাদরখানার কথা ভাবি, শুধু ধুতির উপরে একটা হাপকোট কি কলারওয়ালা কামিজ পরে' বা'র হ'তে আমার ভাবনা হয়, ঠাণ্ডা লাগবে। আলখাল্লা ছেলে-বেলা থেকে পরে' আস্‌ছি, কিন্তু তবু এখনো ভাবনা হয়, বুঝি বা যারা ধুতি পরে' তা'র উপরে কোট পরে, তা'র উপরে কলার পরে, অথবা যারা খদ্দর পরে' তা'র নীচে বিলিতি ঘড়ি টেঁকে পরে' বিলিতি জুতোর বার্নিশ দিশি জুতোর উপরে লাগিয়ে পরে, তা'রা আমার বেশকে ছদ্মবেশ বলে' ঠাওরায় বুঝি বা!

আমি থিয়েটারে যাই এখনো ভাবনা হয়, বুঝি নাচ গান সিন্ সবই বিশ্রী দেখবো।

আমি সভায় যাই, এখনো ভাবি নতুন কিছু পাবো অথবা সেই পুরোনো হ'য়ে-যাওয়া সভার বাঁধা সভাপতি থেকে সভাপতিকে ধন্যবাদ পর্য্যন্ত প্রোগ্রামটা পাবো। আমি সত্যি বল্‌ছি, এখনো ভাবছি এই সভায় বসে'— পুরোনো ঘিয়ে লুচি ভেজে সবাইকে যদি একটা ভোজ দেওয়া হয়, তা হ'লে ভোক্তারা ভোজ্যদাতাকে আশীর্ব্বাদ করে কি না। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" এই শ্লোক পুরোনো ঘিয়ের কথা বল্‌ছে না, নতুন ঘিয়ের কথা বল্‌ছে, জীবন সুখে কাটে নতুন ঘিয়ের লুচি খেয়ে না পুরোনো ঘি পান করে, এ-ভাবনা এখনো ব্যস্ত করে আমাকে।

আমার চাকর বাড়ী গেলে এখনো আমার ভাবনার সীমা থাকে না—সময়ে পান-জল, কাপড়চোপড়গুলো গুছিয়ে দেয় কে?

গাড়ি ভাঙ্‌লে এখনো ভাবনা আসে বিয়ের নিমন্ত্রণ সভার নিমন্ত্রণ রাখতে যাই কেমন করে'।

এখনো ভাবনা হয় আমার ছাত্ররা কে কেমন কাজ কর্‌ছে, কে চাকুরি পাচ্ছে না পাচ্ছে, কে মেয়ের বিয়ে দিলে না দিলে, কে মেডেল পেলে না পেলে তা'র জন্যে আজও ভাবি!

ছিষ্টির ভাবনা এখনো মাথায় ঘোরে—ছেলেদের গল্প লেখার ভাবনা, ছবি লেখার ভাবনা, প্রবন্ধ লেখার ভাবনা ঠেলে তোলে ঘুম থেকে এখনো।

এখনো ঘুমিয়ে স্বপন দেখে' ভাবি আকাশে উড়ছি! এসবই যে হ'য়ে গেছে, হ'য়ে বসে' আছে—তা ভাবতেও পারিনে।

ভাবতে পারিনে যে সভাপতি ছাড়াও সভা জমে' উঠেছে, সভাস্থ সকলের উৎসাহ-আনন্দে। ভাবতে পারিনে যে আমি নেই, এই সভায় আছে সেই কোন্-এককালের একটা সভার কোনো-এক ভূতপূর্ব্ব সভাপতির পুনরাবৃত্তি কর্‌তে এক্‌জন যে আমার মতো দেখতে নয়, আমার মতো ভাবতে নয়, কিন্তু প্রোগ্রাম-দোরস্ত আমার চেয়ে ঢের বেশি মাত্রায়।

এত ভাবনা নিয়ে নির্ভাবনার স্বর্গে গিয়ে ঠেলে' ওঠা আমার কোনোদিন হবে না, সুতরাং হিমালয়ে তপস্যা আমার ব্যর্থ হ'তে—যাকে ইংরাজীতে বলে—'বাউণ্ড' একবার দুবার তিনবার নয় তা'র চেয়ে বেশি বার করে' 'বাউণ্ড'। নির্ভাবনার স্বর্গে যাই না যাই, তা'তে দুঃখ নেই, একটা দুঃখ এই যে, তোমরা যদি সবাই সেখানে গিয়ে পৌছলে, তখন ত আর সভা সভাপতি এসবের ভাবনাই রইলো না, আমরা দু'চারজন যে তখন পড়ে' থাক্‌বো—কি নিয়ে কা'কে নিয়ে থাক্‌বো? জাগা ত হ'য়ে যাবে তখন, গান গেয়ে কবিই বা কা'কে ডাক দেবে—জাগো, ছবি দেখিয়ে কা'কেই বা ডাক্‌বো দেখোসে, বক্তৃতা লিখে' কা'কেই বা বলি শোনোসে, সব জিনিষের ভাবনা যে তোমাদের চুকে' যাবে—পাখি ডাক্‌বে ডালে, ছেলে ঘুমোবে ঘরে, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই বল্‌বে—আমি জেগেছি, থাম্ পাখি! জাগার ভাবনা ঘুচে' গেছে ঘুমের ভাবনা নেই, খাবার ভাবনা চুকে' গেছে ক্ষিদের জ্বালা নেই, এই অবস্থা যখন তখন পোটো, কবি, নটনটী, গাইয়ে-বাজিয়ে, কথক, গ্রন্থকার, মাষ্টার প্রভৃতি সবাই মিলে কি কর্‌বো তাও ভাবছি এবং ভেবে-ভেবে দুর্ভাবনাগ্রস্ত হ'য়ে একটা তখনকার আমাদের জীবনযাত্রার প্রোগ্রাম সৃষ্টি করে' ফেলেছি এরি মধ্যে, বলি শোনো—

ভাবুক সভার এই প্রথম অধিবেশন এবং এইভাবে এর সব অধিবেশন চলিবে, নির্ভাবনায় যাঁরা চলিয়া গেছেন তাঁদের পরিত্যক্ত নাট-মন্দিরে, সভাগৃহে, শিক্ষাগারে, আফিসঘরে এবং যথা-তথায় ঘাটে মাঠে হাটে! কার্য্য-তালিকা—সকল ভাবুকের একত্র মিলন ও সেক্‌স্‌পিয়র হইতে ওথেলোর নিম্নলিখিত ছত্রটি সমস্বরে চিৎকৃতি—

Othello's occupation gone

সভাভঙ্গ ইতি—

আলেখ্যরচনায় কৃতিত্ব

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য আর্ট রূপপ্রধান, প্রাচ্য আর্ট ভাবপ্রধান, কিন্তু প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সকল শ্রেষ্ঠ আর্টেই ভাব ও রূপের সমন্বয় দেখিতে পাই। সাহিত্যই বলুন, কাব্যই বলুন, ভাস্কর্যই বলুন, আর চিত্ররচনাই বলুন, সকল ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।"

ছবি ও portrait বা আলেখ্য দুটি স্বতন্ত্র জিনিস,

শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

শিল্পী দেবীপ্রসাদের শিল্পাগার

কলিকাতা ফাইন্ আর্টস প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত—
শিল্পী দেবীপ্রসাদ নির্ম্মিত মূর্ত্তি

—ভবিষ্যতের পানে—
[শিল্পী দেবীপ্রসাদ অঙ্কিত একখানি জলচিত্র হইতে]
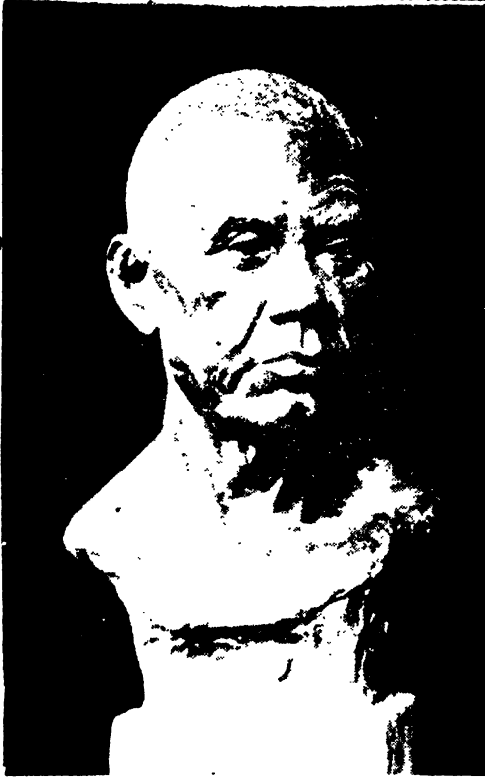
শিল্পী দেবীপ্রসাদ নির্ম্মিত আর-একটি মূর্ত্তি

কিন্তু উহাদের রচনাপদ্ধতির মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। প্রকৃত শিল্পীরচিত আলেখ্য মুখ্যত হয় ছবি, গৌণত হয় প্রতিকৃতি। সর্ব্বকালের সকল দেশের উচ্চাঙ্গের আলেখ্যরচনার এই ধারা; উহা প্রতিকৃতিকে খর্ব্ব করিয়া ছবি হইয়া উঠে। ভাবপ্রধান বলিয়াই সেগুলি দীর্ঘজীবী। কাহার প্রতিকৃতি, দর্শক তাহা না জানিয়াও উহার ভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়। এখানে বলা আবশ্যক, উচ্চাঙ্গের আলেখ্যমাত্রেই যে সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবাস্তব হইবে এমন কথা নাই। সেগুলির মধ্যে ভাব ও বাস্তবতার চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়—সেগুলি একাধারে ছবি ও প্রতিকৃতি।

ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত মূর্ত্তি ও portrait বা আলেখ্যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি বিশেষভাবে প্রকাশিত। আলেখ্যরচনায় তিনি চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

আলেখ্য-রচয়িতার আনাটমি বা শরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান অভ্রান্ত হওয়া প্রয়োজন, তদুপরি তাঁর subjectএর অর্থাৎ যে-মানুষটির ছবি আঁকা হয় তাঁর, pose বা ভঙ্গী নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতাও থাকা আবশ্যক। কারণ ঐ ভঙ্গীর দ্বারাই প্রধানত subjectএর individuality'র বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। দেবীপ্রসাদ এই গুণদ্বয়ের বিশিষ্ট অধিকারী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ চিত্ররচনা-পদ্ধতিই তাঁর অধিগম্য, সেহেতু তাঁর রচিত শিল্পে পাশ্চাত্যের নিখুঁত পর্য্যবেক্ষণ, (close attention to details) এবং প্রাচ্যের ধ্যানপরায়ণতা (inwardness) দেখিতে পাই। আস্‌বাবপত্রের সাহায্যে আলেখ্যের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের চেষ্টা তিনি করেন না। তিনি কেবল মানুষটিকে আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু তাহাকে এমন জীবন্ত করিয়া আঁকেন, যে তাহাকে ফুটাইবার জন্য অবান্তর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তূলিকা চালনায় তাঁর দক্ষতা অসামান্য। তাঁহার রচিত আলেখ্যে বিভিন্ন বর্ণধারা অনায়াসে অগোচরে মিশিয়া যায়, তা'র অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দর্শককে মুগ্ধ ও মোহিত করে। এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ও প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু ব্যতীত কেহই তাঁর সমকক্ষ নহেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আলেখ্য সাধারণত oil-colour বা তেলের রঙে অঙ্কিত হয়, সেহেতু বাংলায় উহা তৈলচিত্র নামে পরিচিত। দেবীপ্রসাদের রচিত আলেখ্য জলচিত্র, অর্থাৎ সেগুলি water-colourএ অঙ্কিত। আলেখ্যরচনার এই অভিনব প্রণালী অনেকটাই তাঁর নিজস্ব, স্বোদ্ভাবিত; এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় নাই। দেবীপ্রসাদের এই জলচিত্রগুলি (water-colour portraits) একটি অ...র্বচনীয় পেলব সুষমায় সমাহিত। তা'র মধ্যে বিকশিত কুসুমের কমনীয়তা ও লাবণ্য বিদ্যমান। সেগুলি 'জীবন্ত', অসীম তাহাদের ভাবৈশ্বর্য্য। সেগুলি দেখিলে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে—

"ভারতশিল্পের কাছে আমরা যদি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি চাহিতাম, তবে সে আমাদের গোলদিঘীর ধারে ইতালীয় শিল্পশাস্ত্রানুসারে গঠিত জরাজীর্ণ কুঞ্চিত মুখশ্রী ওই ক্ষীণবল বৃদ্ধমূর্ত্তিটি দিতে চেষ্টা করিত না; কিন্তু

সাগরের ন্যায় প্রশান্তগম্ভীর জ্ঞানজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তাঁহার তেজোময় অমর মূর্ত্তি, যে-মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মনে আছেন সেই মানসমূর্ত্তি, দিবার চেষ্টা পাইত।"

সাধারণ আলেখ্যরচয়িতা আলেখ্য বলিতে হুবহু প্রতিকৃতি বুঝে। ইহা মস্ত ভুল। কারণ, তাহা হইলে আলেখ্য ও ফোটোগ্রাফে কোনো তফাৎ থাকিত না। কিন্তু ঐ দুটির মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান, যেহেতু প্রথমটির স্রষ্টা প্রাণবান্ শিল্পী, শেষোক্তের উদ্ভব যন্ত্র হইতে। উচ্চাঙ্গের আলেখ্য বা portrait কেবল প্রতিকৃতি নহে, উহাতে আরও কিছু থাকে যাহা রূপাতীত, শিল্পী চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখিতে পায় না, কেবলমাত্র ধ্যানের দ্বারাই শিল্পী যাহার ধারণা করিতে পারে। দেবীপ্রসাদ যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন এবং যে মূর্ত্তি গড়িয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে, তিনি একজন সার্থক ধ্যানী শিল্পী। তাঁ'র হাতে ভারতশিল্পের ধারা ক্ষুণ্ণ না হইয়া সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

সান্ত্বনা

শ্রী অমিয় বসু

পাশাপাশি দুটি বাড়ী; যেন আলোর কোলে আঁধার। একটিতে যেমন পূর্ণতা ও আতিশয্য অপরটিতে তেমনি অভাব ও দৈন্য। গায়ে-গায়ে হ'লে কি হয়, এ দু-বাড়ীতে পরিচয় বড় ছিল না, আর তা থাকারও কথা নয়। সূর্য্যের আলোয় উদ্ভাসিত পাহাড়ের চূড়া আর আঁধারে-ঘেরা সাগরের তল, এ-দুয়ের কেউ কি অপরের সাহচর্য্য কামনা করে?

হরিচরণ দাস থ্যাকার স্পিঙ্কের দোকানে চাকুরি করেন, বেতন পান ২৫৲ টাকা। অনেক দিন আগে যখন তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সংসার এবং বেশ মোটা-রকমের কিছু পৈতৃক দেনা তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল তখন কোঠাবাড়ীর মায়া কাটিয়ে তাঁকে কম-ভাড়ার মেটে-বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল! প্রথ প্রথম তাঁদের এই খোলায়-ছাওয়া মেটে-বাড়ীতে এসে মন খারাপ হয়েছিল; কি যেন এক দারুণ আত্ম-অভিমানে বারে-বারে ঘা লাগত। সময়ের শীতল প্রলেপে সে-সব গ্লানি যদিও আর নেই, তবুও মাঝে-মাঝে হরি-চরণের দীর্ঘশ্বাস যে না পড়ত তা নয়। হরিচরণের তিন মেয়ে, এক ছেলে। বড় দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েচেন সুদূর ঢাকা ও মৈমনসিং জেলায়; বিয়ের পরেই প্রথম-প্রথম এক-আধবার তাদের এনেছিলেন, তার পর আর আনেননি বা আন্‌তে পারেননি। ছোটো মেয়ে রাধা-রাণীর বয়েস ৯ বছর, আর ছেলে কানাইলালের বয়েস ৬ বছর। সংসারে আর-লোকের মধ্যে তাঁর বুড়ী মা ও খুড়ীমা, আর তাঁর স্ত্রী। এই দরিদ্র পরিবারটির আমোদ-আহ্লাদ বা উৎসবের সুযোগ বড় ঘটে' উঠত না, তথাপি অভাবের মধ্যেও তাঁদের দিন একরকম শৃঙ্খলাতেই কেটে যেত। রাধারাণী পাড়ার কৃশ্চান্ ইস্কুলে পড়ত, তা'র মাসে মাইনে লাগত চার আনা করে'; কানাইলাল বাড়ীতে অ-আ পড়ত।

পাশের সুসজ্জিত তে-তলা বাড়ীটির মালিক বীরেন্দ্র-নাথ চৌধুরী বেশ সৌখীন হাল-ফ্যাশানের লোক। তিনি বেশ বড়-একটা সরকারী চাকুরি করেন, তা ছাড়া পৈতৃক সম্পত্তিও তাঁর ঢের। পরিবারের মধ্যে তাঁর স্ত্রী, আর চার মেয়ে ও দুই ছেলে। আসল সংসারটি যদিচ বিশেষ বড় ছিল না, তবু লোকজন চাকর-বাকর ধরে' সেটিকে নেহাৎ ছোটোও বলা চলে না। পাড়ার লোকে নাকি কবে হিসেব করে' দেখেছিল যে এঁদের মাথা-পিছু দুটি করে' ঝি-চাকর; কি যে এত কাজ তা'র ফর্দ্দ যদি কেউ শুন্‌তে চান্ তা হ'লে বাড়ীর কর্ত্রী বিমলা-

সুন্দরীকে জিজ্ঞেস করে' দেখবেন; তিনি স্বীকার করিয়ে ছাড়বেন, যে হ্যাঁ সত্যই তাঁদের এত কাজ! বীরেন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখতে শুধু সুবিধাই দিয়েছিলেন তা নয়, তাদের একরকম বাধ্য করেছিলেন; এদিক্ দিয়ে তিনি ভারি কড়া ছিলেন। তাঁর বড় দুই মেয়ে তৃপ্তি ও প্রীতি বেথুনে আই-এ পড়ত; ছোটো-দুটি কল্পনা ও সান্ত্বনা পড়ত ভিক্টোরিয়াতে, কল্পনা বুঝি তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল, আর সান্ত্বনা পড়ত সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীতে। সে ছিল পাশের বাড়ীর রাধারাণীর সমবয়সী। ছেলে-দুটির নাম শোভন ও মোহন, তা'রা সান্ত্বনার চেয়ে দু-এক বছর করে' ছোটো। মাষ্টারের কাছে বাড়ীতেই তা'রা পড়ত।

সান্ত্বনা মেয়েটি ছিল ভারি জেদী ও একগুঁয়ে; এই ধরুন না কেন, তা'র মা আর দিদিরা তা'কে কতদিন বারণ করেচেন—ঐ খোলার বাড়ীর ছোটোলোকদের সঙ্গে কথা বলিস্‌নে, কিন্তু সে-কথা তা'র কানেও ঢুকৃত না। সকাল নেই, বিকেল নেই, যখন খুসি সে দালানের জানালায় দাঁড়িয়ে খোলার ঘরের গরীব গৃহস্থটির ঘর-কন্নার কাজ দেখবে, কখন বা রাধারাণীকে ডেকে গল্প জুড়ে' দেবে। রাধারাণী কিন্তু একটু ভয়ে-ভয়েই যেন কথা বল্‌ত। খানিক পরেই সে বলে' উঠত, "না ভাই, তুমি যাও তোমার দিদিরা যদি রাগ করেন।" সান্ত্বনা তা'তে ঠোঁটটা উল্‌টিয়ে বল্‌ত, "ওঃ রাগ কর্‌লে আমার ভারি বয়ে'ই গেল কিনা!" এই দরিদ্র পরিবারটিকে সান্ত্বনা যে কি চোখে দেখেছিল, তা জানিনে। দিনের পর দিন সে দেখে' এসেচে এই পরিবারটি ঠিক্ একই-ভাবে চলেচে; এক দিন থেকে আর-একদিনের প্রভেদ কিছু ছিল না; তবুও তা'র জান্‌লায় দাঁড়ানোর এক দিনের তরে কামাই ছিল না।

সান্ত্বনাদের বাড়ীর মধ্যে সকলের চেয়ে ভোরে ঘুম থেকে উঠত সান্ত্বনা; তা'র জন্যে তা'র দিদিরা তা'কে ঠাট্টা করে' বল্‌তেন, "ওটা নিশ্চয়ই গেল-জন্মে মোরগ ছিল।" কিন্তু মোরগের মতন ভোরে উঠে'ও সে দেখত যে তা'র উঠবার কত আগে রাধারাণীর মা বাসন-কোসন মেজে স্নান-আহ্নিক সেরে রান্নার জোগাড় কর্‌চেন। যেদিন শুধু তাঁর কোনো বেশী অসুখ কর্‌ত, সেদি সান্ত্বনা দেখত রাধারাণী কলতলায় বসে' বেশ নির্বি মনে বাসন মেজে চলেচে। একবার শীতকালে খু ভোরে সান্ত্বনা গরম জামা-মোজা পরে' একটি আলোয়া মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে ঢেকে জানলায় এসে দেখলে রাধা রাণী এই ঠাণ্ডাতে শুধু আঁচলের কাপড়টা গায়ে দিে বাসন মাজচে; একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে রাধারাণীকে জিজ্ঞে কর্‌লে, "হ্যাঁ ভাই, এই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় ভোর বেল শুধু গায়ে জল ঘাঁট্‌তে তোমার কষ্ট হয় না?" রাধারাণ গিন্নীপনা করে' বল্‌লে, "কষ্ট হ'লে চল্‌বে কেন ভাই। বাবার ত নটার সময় ভাত চাই। তার পর শীতকে ভাই যত ভয় করে' চল্‌বে, তত তোমাকে পেয়ে বস্‌বে। প্রথমটা জলে হাত দিতে যা একটু কষ্ট, তার পর কৈ মনেই ত হয় না জলে রয়েচি; ঠাণ্ডা বাতাস এলে অবিশ্যি হি হি কর্‌তে হয়, তা ভাই উপায় ত নেই।" তার পর সে ব্যস্ত-ভাবে ধোয়া বাসনগুলি রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেল।

এই রাধারাণী মেয়েটিকে ভারি অদ্ভুত লাগত সান্ত্বনার, আর সেইজন্যেই বোধ হয় সে এত ভালো-বাস্‌ত তা'কে। রাধারাণীকে ঘরকন্নার কাজ কিছু-কিছু কর্‌তে হ'ত, কিন্তু তবুও ইস্কুল থেকে সে বছর-বছর কত প্রাইজ এনেচে। আর সান্ত্বনা কৈ কখন কোনো প্রাইজ এনেচে বলে' ত তা'র মনে হয় না। এতে তা'র আত্ম-মর্য্যাদায় ঘা লাগত, তাই সে ভাবত, তা'র দিদিরা যা বলে নিশ্চয় তা ঠিক্, "রাধারাণীর ইস্কুল্ আবার একটা ইস্কুল্! অমন ইস্কুলে আবার কেউ পড়ে, কি না ছিরি, চার আনা ত মাসে মাইনে!" ওখানে পড়লে সেও অমন কত প্রাইজ পেত। কিন্তু তখুনি তার মনে হ'ত রাধারাণী কেমন ভালো সেলাই জানে, পুরোনো কাপড়ের পা'ড় থেকে সুতো নিয়ে কেমন সুন্দর-সুন্দর ফুল তুল্‌তে পারে; কানাইলালের জামা-টামা ত ওই করে। তখন সান্ত্বনা এই বলে' নিজের মনকে প্রবোধ দিতে থাকৃত, আমাকে ত আর দর্জী হ'তে হবে না! রাধারাণীর কথা আলাদা, বেচারীরা বড় গরীব যে, না শিখলে চল্‌বে কেন? কিন্তু এসবে

তা'র মন সত্যি প্রবোধ মা'ন্‌ত না, তাই মাঝে-মাঝে দেখা যেত-যে সান্ত্বনা তা'র মেজদির বন্ধু হাসিদিদির বাড়ী গিয়ে খুব মন দিয়ে সেলাই শিখতে সুরু করেচে কিন্তু দু-এক দিনেই সে হাঁপিয়ে উঠ্‌ত আর ভাব্‌ত—বাবা রে! ঐ রাধারাণীটা কী যেন, রোজ-রোজ কেবলই সেলাই কর্‌তে যে কি ক'রে ওর ভালো লাগে! হাসিও এটা বেশ জান্‌ত, যে সান্ত্বনার সেলাই শেখা দুতিন-দিনের বেশী নয়। শেষ অবধি সান্ত্বনাকে অন্তত মনে মনেও রাধারাণীর কাছে হা'র মান্‌তে হ'ত। এতে কিন্তু রাধারাণীর প্রতি তা'র শ্রদ্ধা-ভালোবাসা বেড়েই উঠ্‌ত। সান্ত্বনার ভারি ইচ্ছে কর্‌ত যে, রাধারাণীর সঙ্গে খেলা করে; কিন্তু তা'র উপর যে কড়া হুকুম ছিল ছোটো লোকদের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মিশতে পাবে না। জান্‌লা থেকে গল্প কর্‌লেই তা'র মা আর দিদিরা কত অসন্তুষ্ট, কত বিরক্ত হন। একবার সে রাধারাণীদের বাড়ী গিয়েছিল বলে' কয়েকদিন ধরে' কী বকুনিটাই না তা'কে খেতে হয়েছিল; সভ্য হবার ভদ্র হবার কত উপদেশ আর নীতিবাক্যই না তা'কে শুন্‌তে হয়েছিল! এর পর রাধারাণীকেই বা কি করে' সে তাদের বাড়ীতে আস্‌তে বলে? তাই তা'র মনের ইচ্ছে মনের মধ্যেই বন্দী রইল।

ভাই-ফোঁটার দিন সান্ত্বনাদের বাড়ীতে খুব ঘটা হ'ত। ভাই-ফোঁটার কয়েক দিন আগে থেকেই চারটি বোনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ত এবার শোভন-মোহনকে কে কি দেবে তাই নিয়ে; কত জল্পনা-কল্পনা করে'ও কিছুতেই যেন তাদের ঠিক্ হ'ত না, কি জামা-কাপড় সব দেওয়া হবে, ফোঁটা দিয়ে কি খাওয়ানো হবে, আর দুপুরে আর রাতেই বা কি খাওয়ানো হবে। তা'র দিদিদের দেখাদেখি, ভাই-ফোঁটার দিন কিছু-একটা রেঁধে ভায়েদের খাওয়াবে বলে' কয়েক বছর ধরে' সান্ত্বনা আব্দার ধরে' আস্‌চে; কিন্তু ছোটো বলে' তা'র দিদিরা তা'কে আগুনের কাছে যেতে দিত না। এতে তা'র ভারি রাগ হ'ত,—সে কি চির কালই সেই ছোটোটি থাক্‌বে নাকি? তাই গেল-বছর তা'র বড়দির পাশে বসে' দুখানা কাট্‌লেট ভেজে দু-ভাইকে খাইয়ে সে আহ্লাদে নেচে উঠেছিল। এ-সময়টিতে প্রতি বছর এই ভাইবোন-কটির মধ্যে যে নিবিড় স্নেহ ও প্রীতির প্রকাশ পেত তা'তে সকলের চেয়ে মেতে উঠত ওই দুষ্ট অবাধ্য মেয়ে সান্ত্বনা; সে এমন কি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে' ফেল্‌ত যে এবার থেকে আর কিছুতেই শোভন-মোহনের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। অবশ্য এ-প্রতিজ্ঞা বেশী দিন রক্ষা হ'ত না, কারণ ঝগড়াকে বাদ দিলে সান্ত্বনার মতন মেয়ের জীবন নেহাৎ ভ্যাপসা ও আলুনি হ'য়ে পড়ে। খুব খানিকটা ঝগড়া করে' আড়ি করে' কথা বন্ধ করার পর আবার নতুন করে' যে ভাব হয়, সেটা কত সুন্দর কত মিষ্টি!

প্রতিবছর ভাই-ফোঁটার দিন সান্ত্বনা দেখে' এসেচে রাধারাণীও তা'র ভাইটিকে সকালে চান করিয়ে দিয়ে, একখানি নতুন কাপড় পরিয়ে, তা'র কপালে ফোঁটা দিয়ে যত্ন করে' জল-খাবার খাওয়াচ্চে; আবার দুপুরেও ভাই-টিকে নিজে হাতে খাইয়ে দিচ্ছে। এই দরিদ্র পরিবারটিও আজকের দিনে যথাসাধ্য আহারাদির আয়োজন কর্‌ত। সান্ত্বনার কাছে অবশ্য তা অত্যন্ত সামান্যই ঠেক্‌ত। প্রথম-প্রথম এমন কি সে একটু অবাক্‌ও হ'ত। রাধারাণীর স্নেহ-মমতা যেন এদিন হাজার গুণ বেড়ে উঠত; ভাইটিকে সারাদিন কাছে-কাছে রেখে, সাজিয়ে-গুজিয়ে, আদর করে', একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে' তুল্‌ত। ইস্কুলের প্রাইজ পাওয়া পুতুল খেল্‌না প্রভৃতি তা'র অতি প্রিয় জিনিস-গুলিও সে আপনা হ'তে আজ ভাইটিকে দিয়ে দিত। কানাইলালের কাছেও তাই এদিনটা ছিল একটা বিশেষ আনন্দ ও উৎসবের দিন।

মানুষের জীবন-যাত্রা তা'র আকস্মিক বিপদ্-আপদের কোনো হিসাবই রাখে না, সে হঠাৎ একদিন চম্‌কে উঠে' দেখে, কত বড় একটা দুর্দ্দিনের মধ্যে সে এসে পড়েচে। তাই সেবার ভাদ্র মাসে যখন রাধারাণী দুদিনের জ্বরে বাপ-মা ও ভাইটির মায়া কাটিয়ে চলে' গেল, তখন হরিচরণের সংসারটি কি-রকম যে মূঢ় হত-বুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিল, তা বলা যায় না। কয়েক দিনের জন্যে যেন তাদের চেতনা লুপ্ত হয়েছিল; একটা নিদারুণ শোকের ছায়াতে সমস্ত বাড়ীটি আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল, মাঝে-মাঝে শুধু এই দুঃসহ নীরবতা ভেদ করে' মথিত মাতৃ-

হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন আছাড় খেয়ে গুমরে' উঠত। নিঃসঙ্গ কানাইলালকে ভুলিয়ে রাখা বড় শক্ত হয়েছিল, মাঝে-মাঝে স্বপ্নেতেও সে দিদি বলে' কেঁদে উঠত। •

সবই মানুষের সয়, কারণ তা'র প্রতিদিনের সংসার-যাত্রার গতিকে কিছুতেই রোধ করা যায় না। এত বড় একটা শোককেও তাই সকলকে ভুল্‌তে হয়েছিল।

দু-মাস পরে কার্ত্তিক মাসে আবার ভাই-দ্বিতীয়া ঘুরে' এসেছে। সান্ত্বনাদের বাড়ী আগের মতনই আনন্দের কল-হাস্যে মুখরিত হ'ল; শুধু তা'রই এক-আধটা ধ্বনি পাশের বাড়ীর কন্যা-হারা মায়ের বুকে করুণ সুরে বেজে উঠল। আজ রাধারাণীর কথা যে বড় বেশী করে' তাঁর মনে পড়চে; গেল-বছরের ভাই-ফোঁটার দিনের সমস্ত ছবি তাঁর চোখের সাম্‌নে ভাসচে।......তাঁর ঐটুকুন্ মেয়ে রাধু তা'কে নিয়ে বিধাতার কি সমৃদ্ধি বাড়ল।...... সাম্‌নে কানাইলালকে খেলা করতে দেখে' বুঝলেন, এবার সে জানেও না যে আজ ভাই-ফোঁটা। তিনি মা—আর সাম্‌লাতে পার্‌লেন না, চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝর্‌তে লাগল। একটু পরেই হারানো-মেয়ের চিন্তাকে জোর করে' দূরে ঠেলে দিয়ে রান্নাঘরে চলে' গেলেন; নটার সময়ে যে ভাত চাই। গরীব-মায়ের শোক করার অবসর কোথায়?

আজ ভোর থেকে সান্ত্বনার কয় বোনে ভাই-দুটিকে নিয়ে ভারি ব্যস্ত ছিল। বেলা আটটার সময় ভায়েদের ফোঁটা দেওয়া হ'লে পর, সান্ত্বনা, কি জানি বোধ হয় অভ্যাসের বশেই, একবার দালানের জান্‌লায় এসে দাঁড়াল। রাধারাণীদের বাড়ীতে দেখলে, কানাইলাল একখানা ময়লা কাপড় পরে' উঠানের একধারে একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁক কেটে-কেটে নিজের মনে খেলা করচে। আজ কানাইকে একলাটি এমন-ভাবে খেলা কর্‌তে দেখে' সান্ত্বনার বুকটা যেন কেমন করে' উঠল। গেল-বারের ফোঁটার কথা তা'র মনে পড়ল; সেদিন রাধারাণী ভাইটিকে নিয়ে কি-রকম মেতে উঠেছিল! ছোটো দুটি ভাই-বোনের আনন্দ-কোলাহলে সমস্ত বাড়ীটি মুখরিত হয়েছিল; আর আজ রাধারাণীর অভাবে সব ক্ষুব্ধ নিস্তব্ধ। রাধারাণী নেই; কেন নেই তা সে অনেকবার ভেবেচে, কিন্তু কিছু সে বুঝতে পারে নি; কেবল মনে হয়েচে এ অন্যায়, ভারি অন্যায় ভগবানের। সান্ত্বনার চোখ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়তে লাগল; তা'র কচি প্রাণের সমস্ত করুণা ও মমতা আজ উথলে' উঠল বেচারা ঐ কানাইলালের জন্যে।

সান্ত্বনা তা'র বাবার কাছে গিয়ে আদর করে' বল্‌লে, "বাবা, আমি একজনকে ফোঁটা দেবো, ভিখুকে দিয়ে এক-খানা সাতহাতি কাপড় আর কিছু খাবার আনিয়ে দাও।"

বীরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন,"কা'কে ফোঁটা দিবি রে পাগলী? কার সঙ্গে আবার ভাই পাতালি?"

সান্ত্বনা বল্‌লে, "তা আমি বল্‌ব না; তুমি শীগগির আনিয়ে দাও বাবা—"

বীরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "কাপড় জলখাবার ত ঘরেই আছে, বড়দির কাছ থেকে চেয়ে নে না। কিনে' আর মিছিমিছি কি হবে?"

বাবার গলা জড়িয়ে সান্ত্বনা আদর কাড়িয়ে বল্‌লে, "না বাবা, তুমি আলাদা আনিয়ে দাও; দিদিদের আমি বল্‌তে-টল্‌তে পার্‌ব না।"

বীরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "তুই যদি বল্‌তে না পারিস্, আচ্ছা আমি না হয় চেয়ে পাঠাচ্ছি।"

সান্ত্বনা বলে' উঠল, "হুঁ, দিদিরা ত তা হ'লে সব জান্‌তে পার্‌বে। না, তুমি আলাদা আনিয়ে দাও বাবা, কত আর খরচ হবে? মিছিমিছি শুধু তুমি দেরি কর্‌চ!"

বীরেন্দ্রনাথ তাঁর এই আদুরে-আব্দারে মেয়েটিকে খুব চিন্‌তেন। তা'র সঙ্গে তর্ক করে' অনেক অদ্ভুত মজাদার যুক্তি ও কারণ শুন্‌তে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ঐ এক-রত্তি মেয়েটিকে পরাস্ত কর্‌তে আজ পর্য্যন্ত তাঁরা কেউ পেরে ওঠেননি। এইজন্যেই তিনি তাঁর সান্ত্বনকে একটু যেন বেশী স্নেহের চোখে দেখতেন; যদিও গিন্নী এবং অন্য মেয়েরা ঠিক্ এইকারণেই মেয়েটির উপর বিরক্ত হতেন।

বীরেন্দ্রনাথ তাই তাঁর চাকরকে ডেকে কাপড় ও খাবার কিন্‌তে দিলেন। সান্ত্বনা খুসী হ'য়ে বাড়ীর ভেতরে চলে' গেল। তা'কে দেখে' শোভন-মোহন জিজ্ঞেস কর্‌লে,

"কোথায় গিয়েছিলে ভাই ছোড়দি, আমাদের সঙ্গে আজ খেলা কর্‌বে না?" সান্ত্বনা ভাই-দুটিকে আদর করে' ভুলিয়ে নিজের অতিপ্রিয় খেল্‌নার বাক্সটি তাদের খুলে' দিয়ে বল্‌লে "তোরা এই নিয়ে ততক্ষণ খেলা কর্‌না ভাই, আমি জল্‌দি একটা কাজ সেরে আসি।" এই খেল্‌নার বাক্সটিতে হাত দেওয়া শোভন-মোহনের এতদিন নিষেধ ছিল, তাঁদেরও তাই জান্‌বার ভারি ঔৎসুক্য ছিল, ছোড়দির এই প্রিয় গুপ্ত-ভাণ্ডারে কি আছে। সান্ত্বনার যখন মেজাজটা খুব ঠাণ্ডা থাকৃত, তখন বড়-জোর বাক্স থেকে এটা-ওটা বা'র করে' ভায়েদের সে দেখিয়েচে। শোভন-মোহন তাই আজ ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; ছোড়দির এরকম অনাসক্তির ভাব তা'রা কখনো দেখেনি। এক-একবার তাদের ইচ্ছে হচ্ছিল, গিয়ে দেখে, ছোড়দি কি কর্‌চে, কিন্তু খোলা বাক্সটাকে ফেলে' যেতে কিছুতেই তাদের মন সর্‌ছিল না।

সান্ত্বনা একটা শিউলি-পাতায় একটু চন্দন আর এক-টুক্‌রো কাগজে চা'রটি ধানদূর্ব্বা নিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখলে তা'র বাবা বসে' খবরের কাগজ পড়চেন, আর তাঁর সাম্‌নে টেবিলে একখানা কোঁচানো "দিশি" কাপড় আর এক চাঙারি খাবার। বীরেন্দ্রনাথ তা'কে দেখে' বল্‌লেন, "এই যে সান্ত্বন, এতে হবে ত?" সে একটু ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

কাপড় ও খাবার নিয়ে যখন সান্ত্বনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্চে তখন বীরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "কা'কে ভাই-ফোঁটা দিবি, বল্‌বি নে মা?" সান্ত্বনা থম্‌কে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "ওদের বাড়ীর কানাইকে, তুমি কারুকে বোলো না যেন, বাবা।" বীরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে মেয়ের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বল্‌লেন, "বেশ ত মা, তা কানা-ইকে দুপুরে এখানে খেতে বল্‌লে হয় না?" সান্ত্বনা শুধু "নাঃ" বলে' ঘর থেকে চলে' গেল। বীরেন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "কাপড় আর চাঙারিটা ভিখুর হাতে দে না সান্ত্বন, সে তোকে পৌঁছে দিক।" সান্ত্বনা যেতে-যেতে বল্‌লে, "দর্‌কার কি বাবা, আমিই পার্‌ব।"

সান্ত্বনা চলে' গেলে বীরেন্দ্রনাথ একটা নিশ্বাস ফেলে' ভাবলেন, পৃথিবীর সব মেয়েরা যদি তাঁর সান্ত্বনের মতন অত দুষ্টু, অত অবাধ্য আর অত মমতাময়ী হ'ত!

কানাইদের বাড়ীর দরজা খোলা ছিল; সান্ত্বনা উঠানে ঢুকতে কানাই তা'কে দেখে' আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। পাশের বাড়ীর বড়-লোকদের মেয়ের তাদের বাড়ী আসা, সে যে একেবারে অভাবনীয় কাণ্ড! তাই সে বিস্ময়ে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে থেকেই "মা" বলে' ডাক্‌লে। কানাইয়ের মাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সান্ত্বনাকে দেখে' কম বিস্মিত হননি। তাঁকে দেখে' সান্ত্বনা বল্‌লে, "কানাইকে চান্ করে' আস্‌তে বলুন্ না শীগ্‌গির, আমি ওকে ফোঁটা দিয়ে যাবো।" কিন্তু তিনি কিছু বল্‌বার আগেই কানাইয়ের দিকে ফিরে' সে বল্‌লে, "যাও ত ভাই কানাই, একটু জল্‌দি করে' চান করে' এস ত, আজ যে ভাই-ফোঁটা।" আজ ভাই-ফোঁটা শুনে' কানাই যেন একটু অবিশ্বাসের সঙ্গেই মাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "হ্যাঁ মা, আজ ভাই-ফোঁটা?" তাঁর হৃদয়ে তখন দুঃখ ও সুখের এক অপূর্ব্ব আলোড়ন চল্‌ছিল; গলা দিয়ে তাঁর স্বর উঠল না, তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, "হ্যাঁ"। কানাইলালের মুখটা কি রকম শুকিয়ে গেল; সে ভাবছিল আর-একদিনের কথা, যেদিন তা'র দিদি ছিল, তা'র পর আর-একদিনের কথা, যেদিন তা'র দিদিকে একটা বিশ্রী ছোটো খাটিয়ায় করে' সকলে কোথায় যে নিয়ে গেল! তা'র চোখ-দুটো ছল্‌ছল্ করে' এল, বহু-কষ্টে সে অশ্রুরোধ কর্‌ছিল। সান্ত্বনা আবার তাড়া দিয়ে বল্‌লে, "যাও ভাই কানাই, আর দেরি কোরো না।" কানাইলালের মা এতক্ষণে একটু সাম্‌লে' উঠেচেন। কানাই-লাল চান কর্‌তে গেলে, সান্ত্বনাকে তিনি ঘরে নিয়ে গেলেন। তা'কে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বার-বার তা'র মস্তক চুম্বন কর্‌তে লাগলেন; চোখ দিয়ে তাঁর টপ-টপ করে' জল পড়তে লাগল। তাঁর কেমন যেন মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে আবার তাঁর হারানো রাধুকে ফিরে' পেয়েছেন। শাশুড়ী ও খুড়শাশুড়ী ঘরে ঢুক্‌তে তাঁর মুহূর্ত্তের স্বপ্নজাল ছিন্ন হ'য়ে গেল। তিনি চোখ মুছে' বৃদ্ধা-দুটিকে বল্‌লেন, "পাশের বাড়ীর সান্ত্বনা, কানাইকে ফোঁটা দিতে এসেচে, এর সঙ্গে যে রাধুর বড্ড ভাব ছিল।"

বৃদ্ধা-দুটি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, এইটুকুন্ মেয়ের এত দরদ, আর এত বিবেচনা দেখে'।

নতুন কাপড়খানা পরিয়ে ফোঁটা দিয়ে সান্ত্বনা যখন কানাইকে তা'র পাশে বসিয়ে খাওয়াচ্ছিল, কানাইয়ের মা তখন কিছুতেই কান্না চাপতে পার্‌ছিলেন না। এ-কান্না শুধু দুঃখের নয়, শুধু সুখের নয়, দুঃখ ও সুখের যুগপৎ এ কান্না তাঁর হৃদয় মথিত করে' উঠছিল। কানাইয়ের খাওয়া শেষ হ'লে, তিনি বল্‌লেন, "হ্যাঁরে কানাই, তোর সান্ত্বনা দিদিকে তুই কি দিয়ে প্রণাম কর্‌বি?" তাঁর ঘরে এমন-কিছু ছিল না, যা ধনীর দুহিতা সান্ত্বনাকে দেওয়া যায়, কিন্তু তা'তে কিছু আসে যায় না; কারণ কোন্ ধনীর গৃহেই বা কি আছে, যা দিয়ে এই ছোট্ট মেয়েটির মমতা ও সমবেদনার সমুচিত প্রতিদান দেওয়া যায়? তিনি চাইছিলেন শুধু জান্‌তে, তাঁর ছেলের মনে আজ কি তরঙ্গ ছুটেচে। মায়ের কথা শুনে' কানাইলালের যেন হুস্ হ'ল, যে এই নতুন-পাওয়া দিদিকে তা'রও ত কিছু দেওয়া চাই। সে তখুনি ঘরে থেকে খুব যত্নে-রক্ষিত কাগজে মোড়া একটি পুরানো ইংরেজী ছবির বই এনে সান্ত্বনার পায়ের কাছে রেখে তা'কে প্রণাম কর্‌লে। সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি তা'কে উঠিয়ে নিলে; তার পর ছবির বইটা তুলে' নিয়ে কানাইকে বল্‌লে, "আমি তোমায় আবার দিচ্ছ, তুমি এটা ফিরিয়ে নাও কানাই।" কানাই-লাল যেন এতে একটু ব্যথিত হ'ল, সে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বল্‌লে, "নেবে না?" সান্ত্বনার আর আপত্তি কর্‌বার উপায় রইল না। বইখানা নিয়ে কানাইয়ের মা ও ঠাকুমাদের প্রণাম করে' যখন বেরিয়ে এল, তা'র যেন মনে হ'ল, সে যা দিয়ে এসেচে তা'র চেয়ে নিয়ে এসেচে ঢের বেশী। এই ছবির বইখানাকে সে অনেকবার তাদের দালানের জানালা দিয়ে দেখেচে, এটা কানাইয়ের বাবা আপিস্ থেকে এনে তা'কে দিয়েছিলেন—বোধ হয় থ্যাকার স্পিঙ্কের গুদাম-ঝাঁটাই মাল থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। এই বইখানি কানাইয়ের এত প্রিয় ছিল, যে প্রাণ ধরে' এমন-কি রাধারাণীর হাতেও সে দিতে পার্‌ত না। সান্ত্বনা কতবার দেখেচে, যে রাধারাণীকে পাশে বসিয়ে কানাই ছবির বইটিকে নিজের কোলে রেখে কত আস্তে সন্তর্পণে ছবি দেখাচ্চে; এই দাগ-ধরা পুরানো বইটার প্রতি এ মায়া দেখে' সান্ত্বনা আগে কত হেসেচে, কারণ তাদের বাড়ীতে ওর চেয়ে কত ভালো নতুন-নতুন ছবির বই পড়ে' গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আজ সেই পুরানো ছবির বইটা তা'র কাছে পরম সম্পদ্ বলে' মনে হচ্ছিল। এখন তার কেবল এই চিন্তা হচ্ছিল, কি করে' এই বইটিকে তা'র মা ও দিদিদের শ্লেষ-বিদ্রূপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। বই-খানাকে সে কাপড়ে ঢাকা দিয়ে বাড়ী ঢুক্‌ল। তা'র বাবার সাম্‌নে দিয়েই সে ভেতরে চলে' গেল; কিন্তু তিনি তা'কে আর ডাক্‌লেন না। আজ তাঁর অন্তর পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল; মেয়ের জন্যে তাঁর গর্ব্ব ও আনন্দ দুই হচ্ছিল।

সান্ত্বনা এত লুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা'র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। সে যখন কানাইকে ফোঁটা দিচ্ছিল, তা'র বড়দি তৃপ্তি কি জানি কি ভেবে দালানের সেই জান্‌লায় এসে একবার দাঁড়াতে যা দেখল তা'তে সে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেল; আশ্চর্য্য হ'ল এই ভেবে, যে তারই হাতে একইরকমে মানুষ ঐ সান্ত্বনটাকে এতদিন সে মোটেই চিন্‌ত না; এত ছোট্ট বুকে যে এতটা দরদ বাসা বেঁধে আছে তা'র কিছুই ত সে জান্‌ত না। তা'রা সকলে মিলে' এই মেয়েটাকেই আবার "ভদ্র" কর্‌বার জন্যে "সভ্য" কর্‌বার জন্যে কতই না চেষ্টা করেচে; নিষেধ অগ্রাহ্য করে' এই জান্‌লায় দাঁড়িয়ে রাধারাণীর সঙ্গে গল্প কর্‌ত বলে' তা'কে কত তিরস্কার, কত লাঞ্ছনা তা'রা করেচে। আজ তাই সে-সব আত্ম-গ্লানি নতুন হ'য়ে তৃপ্তির মনে ফিরে' আস্‌চে। সে যেন হঠাৎ কোন্-এক নতুন জগতের সাম্‌নে এসে পড়েচে। "সম-বেদনা", এই সমাসে বাঁধা কথাটার অর্থ যেন সে আজ প্রথম বুঝ্‌লে। উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত মূর্খ ধনী-দরিদ্র, এসব শত ব্যবধানের মধ্যেও মানুষের সঙ্গে মনুষ্যের হৃদয়ের যোগ কেমন সহজ সরল-ভাবে হ'তে পারে তা কেতাবে দুচার-বার পড়ে' তারিফ করে' থাক্‌লেও কখনো এমন করে' প্রাণ দিয়ে অনুভব কর্‌বার সৌভাগ্য তা'র হয়নি। তৃপ্তি জান্‌লায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফোঁটা দেওয়া থেকে সান্ত্বনার ফিরে' আসা পর্য্যন্ত সমস্তই দেখলে। তা'র ইচ্ছে কর্‌ছিল মাকে ডেকে আনে, কিন্তু তিনি

যদি বিমুখ হন এই ভেবে সে একলাই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কানাইলাল যখন ময়লা ছবির বইটা দিয়ে সান্ত্বনাকে প্রণাম করলে, তখন প্রথমে তৃপ্তির হাসি আস্‌ছিল, কিন্তু' এর ভেতর কানাইলালের কতটা আনন্দ কতটা কৃতজ্ঞতা যে লুকিয়েছিল তা তা'র বুঝতে বেশী দেরী হয়নি। আজ ঐ "ছোটোলোকদের" ছেলে কানাইকে তা'র ছোটো মনে হ'ল না।

সান্ত্বনা যখন চুপে-চুপে ঘরে ঢুকে' ছবির বইটা তা'র কাপড়ের দেরাজের মধ্যে পুরে ফেলেচে তখন তৃপ্তি এসে তা'কে কোলে টেনে নিয়ে বললে, "তোর সব দেখেচি রে সান্ত্বন, তুই মনে করেচিস্ আমাদের চোখে ধুলো দিবি।" সান্ত্বনার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, যেন কি-এক অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে' গেচে। তৃপ্তি তা'র মাথায় চুমু দিয়ে বললে, আমি ভারি খুসী হয়েচি সান্ত্বন, তুই কেন আমায় বল্‌লিনি কানাইকে আমাদের বাড়ী নিয়ে আস্‌তুম।" সান্ত্বনার যেন প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল বড়দি বুঝি বা বিদ্রূপ করছেন; কিন্তু দিদির আদর-আপ্যায়নে তার ভুল ভেঙে গেল। তখন তৃপ্তিকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে' সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে "মা জানেন বড়দি?" তৃপ্তি বললে, "না কেউ জানে না। মা জানলে কিন্তু খুসী হবেন।" সান্ত্বনা বললে, "না দিদি, তুমি বোলো না বাবা কারুকে, তা হ'লে আমাকে সকলে যা ক্ষ্যাপাবে! বাবা সব জানেন; তাঁকে বলে'ই ত কাপড়খান আনিয়েছিলুম সকালে।"

পাঁচ-ছ দিন যেতে না যেতে তা'র মা ও অন্য সকলে কি করে' সবই জান্‌তে পেরেছিলেন। সান্ত্বনার প্রথমে রাগ আর অভিমান হচ্ছিল, "ভারি অন্যায় কিন্তু এ বাবার আর বড়দির।" কিন্তু তা'র বড় আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছিল, যে কেউ তা'কে তিরস্কার বা বিদ্রূপ কিছুই করলে না। বরং মনে হ'ল তা'র মাও যেন তার উপর একটু খুসী হয়েছেন। সান্ত্বনার এতে ভারি লজ্জা করতে লাগিল; এমন কি দু'তিন দিন সেই দুষ্ট চপল মেয়ে সান্ত্বনকে আর চেন্‌বারই জো ছিল না, সে একেবারে বাঙালীদের আদর্শ মেয়ে শান্তশিষ্ট গৌরীটি হ'য়ে উঠেছিল।

এসব গেল বছর-ষোলো আগেকার কথা। কানাইরা অনেক-দিন রেঙ্গুনে না কোথায় চলে' গেচে। সান্ত্বনাও এখন খুকীটি নেই, তা'রই এক ছোটো ফুট্‌ফুটে খুকী তা'কে মা বলে' ডাকে। তা'র স্বামী কলকাতার এক বড় ডাক্তার। বিয়ের আগে থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত কত দামী-দামী গয়না, কত সুন্দর-সুন্দর উপহার সে পেয়েচে; কিন্তু তাদের ভিড়ে কানাইলালের দেওয়া সেই অতি তুচ্ছ ছবির বইটাকে সে হারিয়ে ফেলেনি।

অজাতশত্রুর ব্রহ্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

অজাতশত্রু কাশীদেশের রাজা ছিলেন। কথিত আছে, একসময়ে বালাকি-নামক গর্গবংশীয় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, যে, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে চাই। রাজাও ছিলেন একজন ব্রহ্মবিৎ; তিনি অতি আনন্দের সহিত তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে যে-আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (২।১) এবং কৌষীতকি উপনিষদে (৪র্থ অধ্যায়ে) বর্ণিত আছে। আমরা প্রধানতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অবলম্বন করিয়াই

অজাতশত্রুর ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু কৌষীতকি উপনিষদে যাহা-কিছু অতিরিক্ত আছে, তাহাও আবশ্যক-মত যথাস্থলে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইবে।

বালাকির ব্রহ্মবাদ

(১)

গার্গ্য বালাকি বলিলেন—"আদিত্যে ঐ যে পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি"। অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূতের মূর্দ্ধা ও দীপ্তিমান্' এইভাবে ইহাকে উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি ইহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূতের মূর্দ্ধা ও দীপ্তি-মান্ হন।" ২।১।২

(২)

ইহার পরে গার্গ্য বলিলেন—"চন্দ্রে ঐ যে পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি"।

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি মহান্, শ্বেতবাস, সোম, ও রাজা'—এই-ভাবেই ইহার উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁহার গৃহে অহরহ সুত ও প্রসুত সম্পন্ন হয় এবং তাঁহার কখন অন্নের ক্ষয় হয় না।" ২।১।৩

(৩)

ইহার পরে গার্গ্য বলিলেন—'বিদ্যুতে ঐ যে পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।'

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি তেজস্বী'—এইভাবেই আমি ইহাঁর উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন এবং তাঁহার সন্ততিও তেজস্বী হয়।" ২।১।৪

(৪)

নিম্নলিখিত মন্ত্রটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে নাই—ইহা কৌষীতকি উপনিষৎ হইতে গৃহীত হইল।

বালাকি বলিলেন—"মেঘে এই যে পুরুষ, আমি তাঁহারই উপাসনা করি"।

অজাতশত্রু বলিলেন—"না এবিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি শব্দের আত্মা', এইভাবেই আমি ইহার উপাসনা করি। যিনি এইভাবে ইহার উপা[সনা] করেন, তিনি শব্দের আত্মা হন"। কৌঃ উঃ ৬।

(৫)

ইহার পরে গার্গ্য বলিলেন—"আকাশে এই যে পুরু[ষ] আমি ইহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দি[বেন] না। 'ইনি পূর্ণ ও অচঞ্চল', এইভাবে আমি ইহ[ার] উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইভাবে উপাসনা কর[েন] তিনি সন্ততি ও পশুতে পূর্ণ হন এবং জগতে তাঁহা[র] সন্ততির কখনও উচ্ছেদ হয় না।" বৃহঃ ২।১।৫

(৬)

ইহার পরে গার্গ্য বলিলেন—"বায়ুতে ঐ যে পুরু[ষ] ইহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি"।

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দিবে[ন] না। 'ইনি ইন্দ্র, বৈকুণ্ঠ (অপ্রতিহত-প্রভাব), অপরাজিত সেনা'—এইভাবেই ইহার উপাসনা করি। যি[নি] ইহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল, অজে[য়] এবং শত্রুঞ্জয় হন।" ২।১।৬

(৭)

গার্গ্য বলিলেন—"অগ্নিতে ঐ যে পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি"।

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এ-বিষয়ে এপ্রকার উপদেশ দিবেন না। 'ইনি বিষাসহি (অর্থাৎ সহনশীল)'—এই-ভাবেই আমি ইহার উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এই-ভাবে উপাসনা করেন, তিনি 'বিষাসহি' হন এবং তাঁহার সন্তানও বিষাসহি হয়।" ২।১।৭

(৮)

গার্গ্য বলিলেন—"জলে ঐ যে পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি"।

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে এপ্রকার উপদেশ দিবেন না। "ইনি অনুরূপ", এইভাবেই আমি ইহাকে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে ইহার উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট অনুকূল বিষয়ই গমন করে। প্রতিকূল বিষয় গমন করে না, আর ইহা হইতে প্রতিরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়।" ২।১।৮

(৯)

গার্গ্য বলিলেন—"দর্পণে ঐ যে পুরুষ, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি রোচিষ্ণু (অর্থাৎ দীপ্তি-স্বভাব)', এই-ভাবেই আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি রোচিষ্ণু হন এবং তাঁহার সন্তানও রোচিষ্ণু হয় এবং তিনি যাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হন, তাহাদিগের সকলের অপেক্ষাই তিনি অধিকতর দীপ্তিশালী হন।" ২।১।৯

(১০)

গার্গ্য বলিলেন—"গমনশীল ব্যক্তির পশ্চাতে যে শব্দ হয়, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এ-বিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি অসু অর্থাৎ প্রাণ'—এইভাবে আমি ইঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন এবং কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে প্রাণ তাঁহাকে ত্যাগ করে না।" ১২।১।১০

(১১)

গার্গ্য বলিলেন—"দিক্‌সমূহে যে পুরুষ, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এ-বিষয়ে উপদেশ দিবেন না। ইনি 'অনপগ' (নিত্য সঙ্গী), এইভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি এইভাবে ইঁহার উপাসনা করেন তিনি দ্বিতীয়বান্ (অর্থাৎ সহায়যুক্ত) হন এবং তাঁহা হইতে স্বজন ছিন্ন হয় না।" ২।১।১১

(১২

গার্গ্য বলিলেন—"এই যে ছায়াময় পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি মৃত্যু', এইভাবেই ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ইহকালে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু তাঁহার নিকটে আগমন করে না।" ২।১।১২

(১৩)

গার্গ্য বলিলেন—"দেহেতে এই যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এ-বিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি আত্মবান্ (অর্থাৎ দেহবান্)', এইভাবে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি আত্মবান্ হন এবং তাঁহার সন্তানও আত্মবান্ হয়।" ২।১।১৩

বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে যে, ইহার পরই গার্গ্য তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কৌষীতকি উপনিষদে দেখা যায় যে, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে বালাকি আরও তিনটি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে তিনটি এই :—

(১৪)

বালাকি বলিলেন—"এই যে প্রাজ্ঞ আত্মা—যাঁহার ক্ষমতায় পুরুষ সুপ্ত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এ-বিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি যম (নিয়ন্তা) রাজা'—এইভাবে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি এইপ্রকারে উপাসনা করেন, এ-সমুদায়ই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নিয়মিত হয়।" কৌঃ উঃ ৪।১৬

(১৫)

বালাকি বলিলেন—"দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ, আমি তাঁহারই উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এবিষয়ে উপদেশ দিবেন না। 'ইনি নামের আত্মা, অগ্নির আত্মা, জ্যোতির আত্মা' —এইভাবে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি এই-ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সমুদায়ের আত্মা হন।" কৌঃ ৪।১৭

(১৬)

বালাকির শেষ উক্তি এই :—"বাম চক্ষুতে যে পুরুষ, আমি তাঁহারই উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এ-বিষয়ে উপদেশ দিবেন

না। 'যিনি সত্যের আত্মা, বিদ্যুতের আত্মা, তেজের আত্মা'—এইভাবে আমি ইহার উপাসনা করি। যিনি এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সকলের আত্মা হন।" কৌঃ ৪।১৮

ইহার পরে বালাকি নীরব হইলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে বালাকি যথাক্রমে ১২ জন পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং কৌষীতকি উপনিষদের মতে এইসমুদায় পুরুষের সংখ্যা বারো জন নহে—১৬ জন।

ইহার পরে অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পর্য্যন্তই কি?"

গার্গ্য বলিলেন—"হাঁ, এই পর্য্যন্ত।"

তখন অজাতশত্রু বলিলেন—"এইমাত্র জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায় না।"

কিন্তু কৌষীতকি উপনিষদে অজাতশত্রুর উক্তি অন্য-প্রকার। এই গ্রন্থে লিখিত আছে—

"অজাতশত্রু বলিলেন—"বৃথা আমাকে বলিয়াছিলে—আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব।"

অবশেষে গার্গ্য বলিলেন—"আমি শিষ্যভাবে আপনার নিকট 'উপনীত' হইতেছি বৃঃ।" ২।১।১৪

অজাতশত্রু বলিলেন—"ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট'উপনীত'হইবেন—ইহা প্রতিলোম্ (যাহা হউক উপনয়ন ব্যতীতই) আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব"। অনন্তর তিনি বালাকির হস্ত ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহারা দুইজন কোনো নিদ্রিত পুরুষের নিকট আগমন করিলেন এবং অজাতশত্রু তাঁহাকে এই নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন—'হে বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ, সোম, রাজন্'। কিন্তু সে জাগ্রত হইল না। তখন তিনি হস্তদ্বারা সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে জাগরিত করিলেন; তখন সে উত্থিত হইল।

অজাতশত্রু তখন বালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যখন এই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল, তখন এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, এ-পুরুষ কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আগমন করিল?"

গার্গ্য এ-সমুদায় কিছুই জানিতেন না।

তখন অজাতশত্রু বলিলেন, "যখন এই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ (নিজ) বিজ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের বিজ্ঞানকে (অর্থাৎ সামর্থ্যকে) গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশে অবস্থান করে। যখন এই পুরুষ এইসমুদায় বিজ্ঞান গ্রহণ করে, তখন সে নিদ্রিত হয়। তখন (এই পুরুষ কর্ত্তৃক) প্রাণ (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়) গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষু গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয় এবং মন গৃহীত হয়। যখন এই পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করে, ইহাই তাহার লোক অর্থাৎ ভোগ্য স্থান। তখন সে যেন মহারাজ হয়, যেন মহাব্রাহ্মণ হয়, যেন উর্দ্ধে ও অধঃ-তে বিচরণ করে। যেমন মহারাজ জনপদবাসীদিগকে নিজায়ত্ত করিয়া স্বীয় জনপদে যথেচ্ছ আচরণ করেন, তেম্নি এই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীরে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয়, এবং কোনো বিষয়ই জানিতে পারে না, তখন হিতা নামক যে ৭২০০০ 'নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া হৃদয়-বেষ্টনে বিস্তৃত হইয়াছে,—সেই হিতা নাড়ী দ্বারা বিস্তৃত হইয়া পুরুষ হৃদয় বেষ্টনে শয়ন করিয়া

ব্রহ্ম কে?

ঠিক ইহার পরেই লিখিত আছে—"তিনি আরও বলিলেন, **যিনি এইসমুদায় পুরুষের কর্ত্তা এ-সমুদায় যাঁহার কর্ম্ম,তাঁহাকেই জানিতে হইবে।"**

ব্রহ্ম কে?—এস্থলে অজাতশত্রু তাহাই বলিলেন।

কিন্তু এই অংশের মৌলিকত্ব বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রাচীনতম উপনিষৎ এবং এই গ্রন্থে এ-অংশ নাই।

দ্বিতীয়তঃ উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, বালাকি ইহার পরে অজাতশত্রুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বালাকিকে ব্রহ্মতত্ত্বের শেষ কথা বলা হইবে, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতি প্রাচীন কালেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং ঋগ্বেদের এক শাখায় ইহা অজাতশত্রুর মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

থাকে। যেমন কোনো কুমার বা মহারাজ, বা মহাব্রাহ্মণ পরমানন্দ লাভ করিয়া অবস্থান করে, তেম্‌নি এই পুরুষ শয়ন করিয়া থাকে।

যেমন ঊর্ণনাভি নিজ শরীরস্থ সূত্র দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করে, যেমন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, এইপ্রকার এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ, সমুদায় লোক, সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূত, নির্গত হয়।

'সত্যস্য সত্যম্‌' অর্থাৎ সত্যের সত্য—ইহাই এই আত্মার উপনিষদ্‌ (অর্থাৎ গুহ্য নাম বা গুহ্য তত্ত্ব)। প্রাণসমূহই সত্য এবং এই আত্মা সেই প্রাণসমূহের সত্য।" ২।১।১৫-২০

সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

বালাকির ব্রহ্ম

জগতে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বহু বস্তু রহিয়াছে। বালাকি বিশ্বাস করিতেন, ইহাদিগের প্রত্যেকেরই এক অধিপুরুষ আছেন। তিনি এই-প্রকার বহু অধিপুরুষের নাম করিয়া প্রত্যেককেই ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অজাতশত্রুর মত

অজাতশত্রু বলেন—এইসমুদায় ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন-ভিন্ন অধিপুরুষ রহিয়াছে—ইহা সত্য এবং ইহাও সত্য যে ইহাদিগকে ভিন্ন-ভিন্নভাবে উপাসনা করা যায় এবং এই উপাসনা দ্বারা পার্থিব কল্যাণও সাধিত হয়। কিন্তু ইহারা কেহই ব্রহ্ম নহেন।

আত্মাই ব্রহ্ম

অজাতশত্রুর মতে আত্মাই ব্রহ্ম। মানবদেহেই এই আত্মা বর্ত্তমান। হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশে এই আত্মা বাস করেন। এখানে যে আত্মার কথা বলা হইল, সাধারণতঃ ইহাকে মানবাত্মা বলা হয়। আত্মা একই, ইহার জাতিভেদ নাই। কেহ ইহাকে বলেন জীবাত্মা, কেহ বলেন পরমাত্মা। কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণ এপ্রকার কোনো ভেদ করেন না। তাঁহাদিগের নিকটে ইনি আত্মাই।

সুষুপ্তির অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি এই আত্মাতে বিলীন হয়। আবার মানব যখন জাগ্রত হয়, তখন এই আত্মা হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয়, সমুদায় লোক, সমুদায় দেবতা এবং সমুদায় ভূত নির্গত হয়।

বালাকি যে-সমুদায় পুরুষের কথা বলিয়াছেন—তাহারাও এই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

জগৎ সত্য

অজাতশত্রু আর-একটি কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদে জগতের স্থান নাই। কিন্তু অজাতশত্রুর মতে এই জগৎও সত্য। তিনি বলেন এ জগৎ সত্য কিন্তু ব্রহ্ম সত্যের সত্য (সত্যস্য সত্যম্‌)। 'এ-জগৎ সত্য'—ঠিক এ ভাষা অজাতশত্রু ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ভাষা "প্রাণাঃ বৈ সত্যম্‌—অর্থাৎ "প্রাণসমূহ নিশ্চয়ই সত্য।" প্রাণ-সমূহ অর্থ 'ইন্দ্রিয়সমূহ'। অজাতশত্রু ইন্দ্রিয়সমূহকে 'সত্যম্‌' বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়সমূহকে সত্য বলায় দেহমন, ইন্দ্রিয়ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইত্যাদি সমুদায়কেই সত্য বলা হইল। অর্থাৎ আমরা যাহাকে জগৎ বলি, অজাতশত্রুর মতে সেই জগৎ সত্য।

অন্যভাবেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অজাতশত্রু বলিয়াছেন—"এই আত্মা হইতে প্রাণসমূহ, লোকসমূহ, দেবতাসমূহ, এবং ভূতসমূহ নির্গত হয়। এস্থলে চারি শ্রেণীর বস্তুর কথা বলা হইল—(১) প্রাণ, (২) লোক, (৩) দেবতা এবং (৪) ভূত। ইহারা সকলেই আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আত্মার সহিত ইহা-দিগের সকলের সম্পর্ক একইপ্রকার। এই চারি শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে এক-শ্রেণীর বস্তুই সত্য, আর অপর তিন শ্রেণীর বস্তু অসত্য, এপ্রকার বলা অজাতশত্রুর কখনই অভিপ্রায় হইতে পারে না। তিনি একটিকে সত্য বলিয়াই বুঝাইতেছেন—অপরগুলিও সত্য। সুতরাং বলা যাইতে পারে, অজাতশত্রুর মতে এজগৎ সত্য। ব্রহ্ম এই জগদ্রূপী সত্য বস্তুর সত্য অর্থাৎ তিনি সত্যস্য সত্যম্‌।

অজাতশত্রুর মত আলোচনা করিয়া আমরা এই-সমুদায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি :—

(১) আত্মাই ব্রহ্ম।

(২) এজগৎ সত্য এবং আত্মা "সত্যের সত্য'
(৩) এজগতের বাস্তব সত্তা আছে কিন্তু স্ব-তন্ত্র সত্তা নাই। যাহা-কিছু আছে, সমুদায়ই আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতে লীন হয়।

বাংলা ভাষার দৈন্য

শ্রী সত্যভূষণ সেন

বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিলে বহু প্রাচীন কাল হইতে বাংলা ভাষার প্রচলনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়—কেহ-কেহ নজীর দেখাইয়াছেন, যে একসময়ে বুদ্ধদেব বাংলা লিপি শিক্ষা করিতেছিলেন। বঙ্গভাষা-তত্ত্ববিদ্‌দের গ্রন্থে দেখিতে পাই, যে, প্রথমে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়া বাংলা ভাষা নানা-প্রকার অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া বিবিধভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে দেবদেবীর স্তুতি-বন্দনা, নানা-প্রকার কথা-কাহিনী, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি রচনা; পরে বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। তা'র পরে আবার রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের অনুবাদ। সাহিত্য কখনও লোক-সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। আমাদের দেশে এক-সময়ে হিন্দুধর্ম্ম নিস্তেজ হইয়া পড়িলে বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল; আবার বৌদ্ধধর্ম্মের পতন অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইল, তার পরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্লাবনে একবার দেশ ছাইয়া গেল; বাংলা সাহিত্যে এই ধর্ম্মবিপ্লবের ইতিহাস, ভিন্ন-ভিন্ন যুগের বিশিষ্ট ধারার শতচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এইরূপে গড়িয়া উঠিতে-উঠিতে বাংলা সাহিত্য এমন-এক যুগে আসিয়া পড়িল যখন প্রাচ্য জাতির সহিত পাশ্চাত্যের সংঘাত বা মিলন আরম্ভ হইল। এই সংঘাতের ফলে জাতীয় জীবনে যে একটা নব জাগরণ আসিল, সাহিত্যেও তাহার ছাপ সুস্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিল।

যখন রাজা রামমোহন রায় নব্যভারতে প্রভাত-নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার বাণী ঘোষণা করিতে গিয়াই বাংলার গদ্যসাহিত্য অসাধারণরূপে সম্প্রসারিত হইল। তাহার পরে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন দুই কৃতী পুরুষ সাহিত্য-জগতে আবির্ভূত হইয়া বাংলার সাহিত্যধারা নূতন পথে প্রবাহিত করিলেন। পূর্ব্বের ধারা ছিল "কানু বিনা গীত নাই।" গীত বা কবিতা হইলেই বৈষ্ণব সাহিত্যের সেই রাধা আর কৃষ্ণ। আর কথা-কাহিনী বিবৃত করিতে হইলেই সেই রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদির উপাখ্যানের অনুবাদ বা চর্ব্বিত চর্ব্বণ। বঙ্কিম-চন্দ্র যখন নব্যবাংলার কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তখন সেই অভিনব সৃষ্টি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইলেন। কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন রামায়ণ-মহাভারত হইতে আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তিনি তাহার রচনাভঙ্গীতে যে ওজঃশক্তির পরিচয় দিলেন, তাহাতে সাহিত্য এক নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করিল। তার পরে হেম-নবীনের কাব্য প্রতিভায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্যসাহিত্যরচনায় এবং গিরীশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির নাট্য-সাহিত্যে প্রভূত-পরিমাণে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। সর্ব্বোপরি রবীন্দ্র-প্রতিভার নব-নব উন্মেষে বাংলা সাহিত্য যেমনই অলঙ্কৃত হইল, তেমনই বিশ্বসাহিত্যেও ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা সাহিত্যসম্ভার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কাহার প্রতিভা কিরূপভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে। এইসব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাংলা সাহিত্য লইয়া আমাদের গৌরব করিবার যথেষ্ট হেতু

আছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, বিশ্বসাহিত্যের সহিত তুলনায় আমাদের সাহিত্যে কত দিকে কত অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে।

এপর্য্যন্ত সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ খাঁটি সাহিত্যের কথাই ধরিয়া লইয়াছি, যথা কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত' কথাটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যেক বিষয়ের লিপিবদ্ধ জ্ঞানই সেই-সেই বিষয়ের সাহিত্য বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। এই অর্থে ঐতিহাসিক সাহিত্য, রাজনীতিক সাহিত্য, ধর্ম্মসাহিত্য, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, ভৌগোলিক সাহিত্য, চিকিৎসা-সাহিত্য ইত্যাদি পর্য্যন্তও দেখা যায়, অর্থাৎ এমন কোনো বিষয়ই নাই যে-সম্বন্ধে সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। ইহার কারণ তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উদ্যোগে যে-সব কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, সে-সব বিষয়ের বিবরণ এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা যত্নের ত্রুটি করেন না। এইরূপে তাঁহাদের সমগ্র সাহিত্য যে কত বড় বিপুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ধারণা করাও সাধারণ লোকের কাজ নয়। ইংরেজী ভাষার এই বিরাট্ সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম Encyclopedia Britannica.

আমাদের দেশেও সাহিত্যের এই ব্যাপকভাব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রমাণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সাহিত্য-শাখা, ইতিহাস শাখা, দর্শন-শাখা, বিজ্ঞান-শাখা ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে নানা বিভাগে নানা-প্রকার কাজ হইতেছে। সাহিত্য-বিভাগে অনেক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত, সংগৃহীত এবং কতকগুলি মুদ্রিতও হইতেছে। কিন্তু এইসকল পুঁথি লইয়া কালক্রম-হিসাবে, ইহাদের গ্রন্থকর্ত্তা-হিসাবে, বিষয়-হিসাবে অথচ ইহাদের মধ্যে কোনো এক বা ততোধিক মূলসূত্র ধরিয়া সমগ্রভাবে কোনো ইতিহাস রচিত হইয়াছে কি? এইসকল পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তৎকালে জাত বাংলা সাহিত্যের কোনো গ্রন্থে এইসকল পুঁথি-সম্বন্ধে কোনো প্রকার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছিল কি না, অথবা এইসকল পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়াতে বাংলা সাহিত্যের কোনো-একটা বিশেষ দিকে বিশেষভাবে কোনো-একটা আলোকপাত হইল কি না, সে-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে কি? এই ত গেল প্রাচীন সাহিত্যের কথা। আধুনিক সাহিত্যে প্রধান-প্রধান কবি এবং সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহাতে সাধারণ লোকেও কাব্যগ্রন্থ বা সাহিত্য-পুস্তক পাঠ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে টীকা-সমন্বিত কোনো গ্রন্থাবলী দেখা যায় না। দুই-এক-খানা বিশেষ পুস্তক ঐরূপভাবে প্রকাশিত করিয়া কেহ কেহ এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

ইংরেজী সাহিত্যে ম্যাথ্ আর্নল্ড্ (Matthew Arnold) প্রভৃতির ন্যায় বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে সমালোচনার ভার কেহ গ্রহণ করেন নাই।

অভিধানের ক্ষেত্রে দুইএকখানা ভালো গ্রন্থ বাহির হইয়া থাকিলেও চরিতাভিধান-সঙ্কলনে পথ প্রদর্শন মাত্র হইয়াছে বলা যায়।

বাংলা বিশ্বকোষ-রচনায় ব্যক্তিবিশেষের কৃতিত্ব থাকিলেও ইংরেজী Encyclopedia Britannicaর সহিত ইহার তুলনা হয় না।

ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আবিষ্কার, সংগ্রহ, অনুসন্ধান, গবেষণা, আলোচনা অনেক হইয়াছে এবং হইতেছেও; কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক ইতিহাস-পুস্তক এখনও রচিত হয় নাই। "বাংলার ইতিহাস" বাহির হইয়া থাকিলেও, ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষের কোনো একটা যুগের ইতিহাস সম্বন্ধেও বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জগৎ-প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ঔরঙ্গজেব"ও ইংরেজী ভাষায় রচিত।

ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি", "কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি" গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁহার "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থে যে মিশরে একটা ঐতিহাসিক অভিযান প্রেরণের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ সাড়া দেন নাই। বিদেশের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য একটা অভিযান লইয়া গিয়া সেই দেশে

অনুসন্ধান করিবার মতন এরূপ বিরাট্ কল্পনা বোধ হয় এখনও বাংলার প্রাণে স্পন্দন জাগায় না। এইরূপে চীনদেশ এবং তিব্বত সম্বন্ধে তত্ত্ব উদ্ঘাটন বোধ হয় কোনো পাশ্চাত্য জাতির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

ইতিহাসের সহিত যে-বিষয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ভূগোল বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রায় কোনো আলোচনাই হয় না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা অনিশ্চিত যাত্রায় বাহির হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, প্রাচ্য দেশে আসিবার জলপথ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অভিযান করিয়া চিরহিমাবৃত উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রে পতাকা প্রোথিত করিলেন এবং সেইসকল স্থলের ভূ-তত্ত্ব, বায়ু-তত্ত্ব, প্রাণী তত্ত্ব, খনিজ-তত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়ে কত তথ্য সংগ্রহ করিলেন। আফ্রিকার অরণ্য ভূমিতে, মধ্য এসিয়ার মরু-বক্ষে, অষ্ট্রেলিয়ার বিজন প্রান্তরে কত পর্য্যটন করিলেন; আবার আমাদের বুকের উপরে হিমালয় অভিযানেও তাঁহারাই অগ্রসর হইয়াছেন। আর আমাদের দেশে কেহ রেলপথ ছাড়িয়া পদব্রজে দার্জিলিং পর্য্যন্ত পথটুকু গিয়া হিমালয়ের গরিমাময় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও করেন কি না সন্দেহের বিষয়। বিদেশীরাই আসিয়া আমাদের গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান খুঁজিয়া বাহির করেন, আর আমাদের দেশে কেহ একখানা নৌকা লইয়া কোনো একটা নদীর সমস্ত প্রবাহ-পথটা দেখিয়া আসিবার জন্যও আগ্রহ বোধ করেন না। কাজেই আমাদের দেশে ভৌগোলিক সাহিত্যও গড়িয়া উঠে না।

একবার বিষয়টা লইয়া আন্দোলন জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকায় অধিবেশনে একটা ভৌগোলিক অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিবার জন্য একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিষয়ের সারবত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সম্মিলনীর পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করিয়া পরে আমাকে জানাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ বা সম্মিলনী হইতে আমাকে ঐ বিষয়ের শেষ জবাব এ-পর্য্যন্তও দেওয়া হয় নাই; অর্থাৎ দেওয়ার মতন কিছু হইয়া উঠে নাই। পরে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। অতএব দেখা যাইতেছে বাংলা দেশে এখনও ভৌগোলিক অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই। অথচ বিলাতে ১৮৩০০ সাল হইতে রয়্যাল্ জিওগ্রাফিক্যাল্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মৌলিকভাবে অনুসন্ধান না করিলেও কিছু ভৌগোলিক সাহিত্য রচিত হইতে পারে। যাঁহারা দেশ পর্য্যটন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া ভৌগোলিক তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে সঙ্কলন করিয়া অনুবাদ করিয়াও বাংলা সাহিত্যে অনেক তথ্য আনয়ন করা যায়। কিন্তু এবিষয়েও বাংলা সাহিত্যে দৈন্য অতি সাংঘাতিক। উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরু অভিযান বা আমেরিকা আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়া অভিযানের কথা দূরে থাকুক, হিমালয় বা সুন্দরবন-সম্বন্ধেও বাংলা সাহিত্যে এপর্য্যন্ত কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নাই। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদী শুধু প্রধান নদী বলিয়া নয়, পুণ্য তীর্থ হিসাবেও ইহারা দেশে অনাদিকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহাদের মূল উৎপত্তি-স্থানের অনুসন্ধান করিতে হইলে বিদেশীয় সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই। ভূগোলবিদ্যা-সম্বন্ধে উদাসীনতার একটা কারণ ঘটিতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা হইতে ইহার নির্ব্বাসনে। এইসব বিবেচনা করিয়া ভূগোল যাহাতে বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, সে-সম্বন্ধে আন্দোলন করা আমার মনে হয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটা কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

বিজ্ঞান-সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় কতকগুলি বিষয় লইয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রসময় লাহা একটা বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু কোনো বিষয় লইয়া ধারাবাহিকভাবে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বাংলা দেশে কয়েক জন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হইয়াছেন; যে কারণেই হউক

তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্য ইংরেজী ভাষার সাহায্যে প্রচারিত হইতেছে। কাজেই তাঁহাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইতেছে না।

দর্শন-বিষয়ে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, দর্শনের বিভিন্ন বিষয় লইয়া অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তদনুপাতে গ্রন্থ রচনা এখনও খুব বেশী হইয়া উঠে নাই।

বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি বিষয়ে প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনার পক্ষে একটা বিশেষ অন্তরায় পরিভাষার অভাব। পরিভাষার অভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনাদি আলোচনা কখনও সুসম্পূর্ণ হইতে পারে না। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় এ-বিষয়ে অনেক শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আর কোনো আন্দোলন দেখা যায় না। পরিভাষা গঠন-সম্বন্ধে এখন মনোযোগ দেওয়ার সময় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয় সাহিত্য-পরিষদ্ এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি লইয়া একটি সমিতি গঠন করিয়া এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে যথোপযুক্ত কাজ হইতে পারে।

যে সাহিত্য যতই পুষ্ট হউক না কেন, অনুবাদ-সাহিত্যে তাহার দরকার নাই এমন কথা বলা যায় না, কারণ বিশ্ব-জগতের খবর না লইয়া কোনো সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই অনুবাদ-সাহিত্য থাকার দরুনই আমরা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যের, এমন-কি সমস্ত বিশ্ব-জগতের খবর পাইতেছি। যে-কোনো জাতির সাহিত্য তাহার জাতীয় জীবনের অনুপাতেই গড়িয়া উঠে, কাজেই ইয়োরোপের তুলনায় আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দৈন্য অবশ্যম্ভাবী। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এক স্থলে বলিয়াছেন—"ভারতীয় দেশীয় ভাষায় সাহিত্য অনেক স্থলে এখনও মধ্য-যুগের ইয়োরোপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।" আমাদের বাংলা ভাষায় এই অনুবাদ সাহিত্যের অভাবও অতি শোচনীয়। বাংলা সাহিত্যের এই অভাব কতক-পরিমাণে দূর করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অধ্যাপক যদুনাথ সরকার "বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ" করিবার জন্য এক সমিতি গঠন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।* কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বাংলা দেশের এত বড় দুই জন কৃতী পুরুষের চেষ্টাও সফল হইল না; খবর লইয়া জানিলাম যে, বর্ত্তমানে এই সমিতির আর অস্তিত্ব নাই।

ইংরেজী ভাষাতে ইয়োরোপের সমস্ত দেশের কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান সমস্তই অনূদিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এমন-কি চীন, জাপান, তিব্বত, আরব, পারস্য এবং ভারতের সাহিত্য এবং দর্শনের অনুবাদও কিছু-কিছু হইতেছে। আর আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, যে ইংরেজী ভাষারও অতি সামান্য কয়েকখানা মাত্র গ্রন্থের অনুবাদ এপর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় বাহির হইয়াছে। আমাদিগকে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই হউক বা মূল গ্রন্থ হইতেই হউক ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমস্ত কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যের অভাব পূরণ করিতে হইবে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রকৃতই বলিয়াছেন—"ভারতকে বিশেষ চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘকালের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্ত্তমান যুগের কঠোর জীবন-সংগ্রামে নব্যতম-জ্ঞানের পথ্যে বঞ্চিত ভারতীয় জনসাধারণ মুমূর্ষুতা প্রাপ্ত হইবে।"

বাংলা দেশের বিজ্ঞতম সুধীগণের মৌলিক গবেষণা-প্রসূত অমূল্য জ্ঞান-সম্পদ্ ইংরেজী ভাষাতেই প্রচারিত হইতেছে; যথা ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস, অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের ঔরঙ্গজেব, শিবাজী এবং মহারাষ্ট্র ও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস ইত্যাদি। এইসকল গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় রচিত হইবার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু বাংলা ভাষায়ও এইসকল গ্রন্থের অনুবাদ অবশ্যকরণীয়। বাংলা সাহিত্যের যখন এমন অবস্থা হইবে যে, বিদেশীয়েরা বাংলার জ্ঞান-সম্পদ্ লাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া বাংলা সাহিত্য হইতে অনুবাদ করিয়া নিজ-নিজ সাহিত্য পুষ্ট করিতে বাধ্য হইবেন, তখন

* প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৪।

এইসকল মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থসমূহও বাংলা ভাষাতেই রচিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে বিদেশীয়দের নিকট অবশ্যপঠনীয় বলিয়া সম্মানের আসন প্রদান করিবে।

ভারতবর্ষের কংগ্রেস আদি জাতীয় সমিতির ইতিহাস, অধিবেশনের কার্য্য-প্রণালী এবং রাজনৈতিক বক্তৃতা-সমূহের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের এবং জেলার বিবরণ (Gazetteer) ইংরেজী ভাষাতেই রচিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এই-সকল তথ্য প্রচার অবশ্যকরণীয়। থ্যাকার্স্ ডিরেক্টরীতে ভারতবর্ষের যাবতীয় তথ্য বৎসর-বৎসর প্রচারিত হয়। ইহার অনুরূপ কোনো তথ্য-পুস্তক বাংলা ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক।

সংস্কৃত ভাষার কাব্য-সাহিত্য, দর্শন, বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ ইত্যাদির বঙ্গানুবাদ কতক-পরিমাণে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এগুলি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। যে-পর্য্যন্ত না এমন কথা বলা যায় যে, সংস্কৃত ভাষায় এমন একখানা পুস্তকও নাই যাহার বঙ্গানুবাদ হয় নাই, সেপর্য্যন্ত একার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলা চলিবে না। তার পরে চীন, জাপান, তিব্বতের সাহিত্যে এবং মুসলমানদের কাব্য-সাহিত্যে, পুরাণে, ইতিহাসে এবং ভারতের বিভিন্নপ্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদের অতি বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অনুবাদ-সাহিত্য রচনার এরূপ গুরুভার বহন করা কোনো ব্যক্তি-বিশেষ বা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকেই এবিষয়ে একটা কার্য্যতালিকা গঠন করিয়া এইরূপ অবশ্যপ্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

ইংরেজী সাহিত্যে যাহা হইয়াছে, তাহাই যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শ এমন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। আবশ্যকমত আমাদের নিজেদেরই নূতন-নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে ব্রতী হইতে হইবে।

পরিশেষে দিনে-দিনে বাংলা সাহিত্যের নানাদিকে কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বৎসরে-বৎসরে সাহিত্য-পঞ্জিকা বাহির করিতে হইবে। অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এই কার্য্যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ না হইলে সাহিত্যপরিষৎকেই এই কার্য্যের ভারও গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীতে যে-সকল প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহার একটা বিস্তারিত তালিকাও সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হয় না।

সাঁওতালী গান

শ্রী কালীপদ ঘোষ

গানটা যেন মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রেরণা হ'তে উৎপন্ন, কারণ দেখতে পাই যে এটা দুনিয়ার সব জাতির মধ্যেই আপনার আসন আদিযুগ থেকে পেতে' বসে'আছে। গানের প্রাণ হচ্ছে তার সুর, পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ের তার এই একসুরে বাঁধা। এক জায়গায় এর একটা ঝঙ্কার উঠ্‌লে, সকল মানুষের হৃদয়ই তা'তে সাড়া দেয়। গানের কাছে ধরা দেয় না এমন প্রাণ বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই আছে; পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই সুরের কাছে মাথা নত করে, অবশ্য সে-সুরের যদি প্রাণ থাকে। সুরের প্রাণই গানের প্রাণ—সুতরাং সুরকে ঠিকভাবে জাগাতে না পার্‌লে সেটা গান হ'ল না। সেটা হ'ল একটা গোলমাল। স্বরের বিভিন্ন স্তরের শৃঙ্খলিত মিলনের মধ্যে একটা নেশা আছে, যা মানুষকে অভিভূত করে' ফেলে। তা'র আকর্ষণী

শক্তি এত বেশী যে বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

সাঁওতাল জাতটা একটা অনুন্নত জঙ্গলী জাত,—এদের লেখবার কোনো ভাষা নেই, পড়াশুনার তোয়াক্কা এরা মোটেই রাখে না অথচ গানের ছড়াছড়িটা এদের মধ্যে খুব বেশী। ফুলের মতন গানটাও এদের একটা অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝেও একটু অবসর পেলেই এরা একতারা বাজিয়ে গান করতে থাকে। এদের মেয়েরাও খুব গানের ভক্ত। এটা তাদের মুখে চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে। গানের তাদের সময়-অসময় নেই। এমন গানে-পাওয়া জা'ত জগতে বোধ হয় আর একটি নেই। মাটী কাটছে, গাঁইতী চালাচ্ছে, তা'র মাঝেও তা'রা দু-তিনজনে মিলে আনমনে গান আরম্ভ করে' দেয়, বোধ হয় খাটুনিকে লঘু করবার জন্যে। রাস্তায় চলে' যাবে, বসে' একটু জিরুবে, বা কাজ করবে তা'র মাঝেই তা'রা মিহিসুরে গান গাইতে সুরু করে। আমার মনে হয়, তাদের অনাড়ম্বর, সরল জীবনের অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে তাদের এই গানে।

পৃথিবীর সকল জা'তের গানের সুরই আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। এক-জা'তের গানের সুর অপর জা'তের গানের মধ্যে প্রায় খুঁজে' পাওয়া যায় না। এই বিশিষ্টতা সাঁওতালী গানেও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। সাঁওতালী সুর পৃথিবীর আর কোনো গানের ভিতর বোধ হয় খুঁজে' পাওয়া যায় না। এর মধ্যে সবটাই তাদের নিজেদের, পরের কাছ থেকে আমদানি করা কিছু নেই।

গানের সঙ্গে বাজনা থাকলে গানটা যে আরও মধুর হয়, সেটাও এরা বেশ বুঝেছে; তাই এদের বাজনার মধ্যেও সাঁওতালী বিশিষ্টতা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এদের যেসব বাজনা আছে, তা এদের নিজেদেরই। হাতে বাজাবার যন্ত্র, তারের যন্ত্র, আর হাওয়ার যন্ত্র—সবই এদের আছে, তবে খুব নীচু স্তরের। মাদল ত' এদের একচেটে বাজনা, তার পর একতারা, বাঁশের বাঁশী তাও এদের নিজেদেরই তৈরী।

এদের গানের সুর সব একঘেঁয়ে। কেবল নাচের গান ছাড়া আর দোসরা সুর এদের নেই। কোলেদের মধ্যে দেখতে পাই অনেক-রকমের সুর আছে, কিন্তু এদের এক বাঁধা সুর। এদের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, পুরুষ বা মেয়ে যেই গান করুক না কেন সবই চাপা গলায় মিহি সুরে গাইবে, গলা ছেড়ে গান করার চলন এদের মধ্যে একদম নেই।

কোন্ কবি যে এদের গান বাঁধে তা ঠিক জানিনে, তবে গান এদের অজস্র। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথের গানের মতন এদের কবিদের এক-একটা গান প্রায় সকল সাঁওতালের কাছেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে অধিকাংশ গানই এক-জায়গার সাঁওতালের রাজ্য ছাড়িয়ে অপর-জায়গার সাঁওতালের কাছে পৌঁছায়নি। মুখে-মুখে শিখে'ই এদের গান বরাবর চলে' আস্‌ছে। আজকাল অন্য-জা'তের সঙ্গে মেলামেশার দরুন্ অনেক-ধরণের উড়িয়া গান এদের মধ্যে এসে পড়েছে।

আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন পর্য্যায়ের গান আছে, এদের মধ্যেও তেম্‌নি বিভিন্ন পর্য্যায়ের গান আছে। সেই সব গানের নমুনা নিয়ে দিলাম। গানের সাঁওতালী পরিভাষা হচ্ছে সেরেঁই।

লাগড়েঁ সেরেঁই—অর্থাৎ সকল সময়ের গান বা সকলের কাছে গাইবার গান। এটা শুধু বাংলা ভাষাতেই হয়।

গান।

পাশে পাশে ঘর দিদি, কবে লো কবে দিদি জাতি ঘুচাল,
বুটগড়া মাঝে ঝড়াঙিটেশন্ রাস্তা সহরে,
* চোরা ছোঁড়া সঙ্গে গাড়ীর উপর বসিয়া গেল।

বীর সেরেঁই—অর্থাৎ জঙ্গলের গান। এইটাই এদের যুবক-যুবতীর প্রেমের গান। এর অধিকাংশই অশ্লীল,—আর এমন অশ্লীল যে, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। এগুলি সবই সাঁওতালী ভাষায়।

গান।

হাতোম্ গড় দিব, হাতোম্ সালাম দিব
হাতোম্ দিকু কোড়া, হাতোম্ পিরীত মিনায়।

গানের অর্থ:—পিসী তোমায় আমি প্রণাম কচ্ছি, একটা বিদেশী যুবকের সঙ্গে আমার প্রণয় হয়েছে।

* চোরা অর্থে কেওট্।

বাপ্লা সেরেঁই—অর্থাৎ বিয়ের গান। এই গান দু-রকম আছে, দং অর্থাৎ বরের ঘরে ক'নে এলে গান, আর একটা বিয়ে দিতে গিয়ে ক'নের ঘরে গান—বারিয়েৎ। এটা বাঁকুড়া, মানভূম, প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত। বরেদ্ প্রথা থেকে এদের মধ্যে এই বারিয়েৎ গানের সৃষ্টি, এটা সব বাংলা বা উড়িয়া ভাষায়।

গান—(বাপ্লা)

কুচিৎ কুলি সুপারাসিনাতু
দাদাঁকাতে সুপাল্ বাআম্বোলন্,
সারজোম সাকাম্ সুপল কিয়া সিন্দুর।
তিমিরেচ সুপল ওটাব আদিং।

গানের অর্থ—খুব বড় গাঁয়ের রাস্তাটা খুব ছোট, হাসি হাসি গাঁয়েতে ঢুকব না। শাল-পাতাতে কেয়া সিন্দুর ছিল, কখন সেটা উড়ে গেছে।

(দং)

সেতারেগে বাবু, দোক্তা বাড়গে বাবু, ডুগিটুপ্তে
বাবু বলয়িন্
ঘোড় ঘোড় মে তাড়াম্ তাড়াম্ মেড়াল ঘাটরে বাবু
চৌডাল ডাক্তে
মলম্ মলম্ তেকো সিন্দুর কাটা,
নেলোকান্দ বাবু বোঙা লেকা,
সিন্দুর সাড়ীতে বাবু টোপারাকাদিয়া।

গানের অর্থ—সকাল বেলায় দোক্তাবাড়ীতে ঢুকে' দোক্তার ডগ তুল্ছে। (তা'কে বল্ছে) তাড়াতাড়ি দৌড়ে' যা চৌদল আমলকীর ডালে আট্কে' গেছে। কপালে সিন্দুর দেওয়াতে যেন দেবতার মতন দেখাচ্ছে, আর সিন্দুর-সাড়ীতে তা'কে (ক'নেকে) ঘিরে' দিয়েছে।

(বারিয়েৎ)

উজাড়া দিয়া কিরি এউই বায়েঙ্গন্ রোপালন্
এউই বায়েঙ্গন্ ফড়রেঁসে
দালা ভারি ধরে চেন
থাঁচি ভারি করেছেন
এউই বায়েঙ্গন বাজারে বিকালন্।
ইকুলিমান্ যাইবার বাবা রাণীকার বিটিহ,
ইয়ার্ বুলিমে যাইবার বাবা রাজা কার বেটা হ;
ছাড় ছাড় রাণীর বিটি,
ছাড় ছাড় রাজার বেটা,
হামি যাব বাজার্ বিকালন্।

গানের অর্থ—আমি ক্ষেত তৈরী ক'রে এই বেগুন গাছ লাগিয়েছিলুম, বেগুন খুব ফলেছে—ডালা ভরে' তুলে' ঝুড়িতে ভর্ত্তি করেছি, এই বেগুন বাজারে বেচ্ব এ রাস্তায় যেতে রাণীর বেটী, এ রাস্তায় রাজার বেটা ওগো রাজার বেটা, রাণীর বেটী আমার রাস্তা ছেড়ে দাও আমি বাজারে বেগুন বেচ্ব।

(দং)

আমা তিরেদ হড় গেগে
ইঁয়া তিরেদ মিহু জোড়া
আলাংঝড়েলাং নাপামলেন্ খান্।
নাতুরিন্কা গুণি গুরিবনাং নামুল কোয়া।

গানের অর্থ—তোমার হাতে ধানের শীষ আমার হাতে বাছুর-বাঁধা দড়ি, তোমায়-আমায় বিয়ে হ'লে সকল গরীব লোককে পালন কর্ব।

ঝীকা সেরেঁই—অর্থাৎ রাত্রের নাচের গান। এটা সাঁওতালী বা বাংলা দু-ভাষাতেই হয়।

গান (১)

বণে বনে বণে বনে কি খেয়ে রহিলি হনুমান।
পান পতর খাইয়া রহিলি হনুমান
মাররে রাবণ রাজ লঙ্কা হে ডাহা।*

(২)

নিউরীগড় নিউরীগড়
কায়সে মোর্ বাসায় নিউরীগড়;
এক ফুল্মা হাতে লেলেন্,
এক ফুল্মা মাথা লেলেন
মাঝ কুলি,
আধা কুলি মা বাসাতে যায়,
দিনে দিনে ফুল ফুটে দিনে দিনে মাডেওয়া,
দিনে দিনে মানুষ জনম।

নিউরীগড়—একরকম ফুল, বাসায়—সুগন্ধ দেয়, কুলি—রাস্তা, মাডেওয়া—লোক ঘোরে।

বাহা সেরেঁই—অর্থাৎ বসন্তকালে যখন সাঁওতালরা শালপূজা করে, সেইসময়ের গান। এগুলো সব সাঁওতালী ভাষাতেই হয়।

গান

আবো বাড়গেরে কোচা বাড়গে,
মন্দর্ মুলিবাহারে রহয়া কাণ
নালপে পেটেজা নালপে চাগাড়া
সিং বোঙা সেবাকাতে রহয়াকাণ।

গানের অর্থ—আমাদের বাড়ীর এক-কোণেতে একটা মন্দরমুলি ফুলের গাছ পোঁতা হ'য়েছে। গাছটা কেউ

---
* ডাহা অর্থে পোড়ান

ভেঙোনা বা ছিঁড়োনা, কারণ ওটা দেবতার পূজার জন্য পোঁতা হয়েছে।

ডাহার সেরেঁই—অর্থাৎ গোটা ফাগুন মাসের গান। এগুলি সব সাঁওতালী ভাষাতে হয়।

গান

বাড়গেরে বাড়গেরে টেলা বাহা
গুতুরীলাং ঝাংকা ঝাকু
বাহায়ালাং ফুল দলপ দলপ

এর অর্থ—ক্ষেতেতে, আঁকড় ফুল আছে, আমরা লম্বা করে' মালা গাঁথব, আর গলায় পর্‌ব মালা দুল্‌বে।

তুতুঃৎ সেরেঁই—অর্থাৎ বীজ-ভাঙায় গান।

গান

পানি বর্ষা ঝিপির্ ঝিপির্
বাতাস্ উড়ে হালায় হালায়
দেগো আয়ো ছাতা কিনি দে, দেগো আয়ো গামছা বুনি দে
হামি আয়ো ঘুগি উড়ি যায়।

গানের অর্থ—ঝুপঝুপ করে' জল হচ্ছে, খুব বাতাস দিচ্ছে, মা আমাকে ছাতা কিনে' দে, আমাকে গাম্‌ছা বুনে' দে, আমি মাছ মার্‌তে যাবো।

রহোয় সেরেঁই—অর্থাৎ ধান রোয়ার গান।

বারোরে বছর্ তেরোরে বছর্
কুসুমি ফুলমা ফুটিঁয়া রহিল গাছে
হায় হায় ঘরে নাই পুরুষ
কাহাকে গাঁথিয়া দিব যেগো কুসুমিকা ফুল্।

হেৎড় হেৎ সেরেঁই অর্থাৎ ধান-নিড়ানোর গান।

গান

ইয়ং নাহি রাঁধব বহিন পিঁড়া বাইশোন্ শুতাব,
দিন চাহি উঠি চলে যায়;
ইয়রে ইয়রে কালিমেঘ ইয়রে ইয়রে কালি বরষা,
যন্ টিনে ভাইএর ক্ষেত
সেই টিনে নাইরে বরষা।

গানের অর্থ—আজ আমি রাঁধব না, পিঁড়ায় বসো, শোও, সকালে উঠে' চলে' যাবে। এখানে খুব কালো মেঘ রয়েছে, খুব বর্ষা কর্‌ছে যেখানে ভাইয়ের ক্ষেত সেখানে বর্ষা নাই।

সহরায় সেরেঁই—অর্থাৎ সাঁওতালী বাঁধনা পরবের গান। এগুলি শুধু বাঁশী বাজিয়ে গাওয়া হয়। এগুলি সব সাঁওতালী ভাষায় হয়।

চিতান্ টলারে গাইকতলে কাণ বাঁধি বাবেরতে
লাতা টলারে কাড়া কবতলে কাণ্ শুতামতে।

গানের অর্থ—নদীর ওপারে ঢিপায় বড় দিয়ে গাইগুলোকে বেঁধেছে, আর নীচের ঢিপায় গাছের ছালের দড়িতে মহিষগুলোকে বেঁধেছে।

ডান্‌টা সেরেঁই—এগুলিও বাঁধনা পরবের গান, নাচ ও বাজনার সঙ্গে গাওয়া হয়।

সকল স্থানে এগান না হওয়ায় গান দিতে পারা গেল না। এ-গান শুধু পুরুষেরা জানে তাও খুব কম। সাঁওতালদের কতকগুলি গান আছে যা মেয়েরা জানে, পুরুষে জানে না; আবার পুরুষে জানে ত মেয়েরা জানে না এমন গানও আছে।

রিজা সেরেঁই—অর্থাৎ সাঁওতালী গোমহা পরবের গান। এগুলি সব বাংলা ভাষার গান।

গান

কুড়্তা কাঠা কিরি বাহুন বেনায়,
চিহড়া লতা কিরি শিকাহে বেনাও;
চলরে কান্‌হাই দধি দুধ বিকে,
বিকেত যাব নদী পারে;
ষুলশায় গোপিনী মনে-মনে হাসায়,
কান্‌হায় ত নেল দুধ ভার।

গানের অর্থ—কুড়তার (জঙ্গলের একরকম গাছ) কাঠে বাঁক তৈরী করেছে, চহড়া লতার (এক-রকম জঙ্গলের লতা) শিকা তৈরী করেছে। চলো কানাই, নদী পারে দই দুধ বেচতে যাব। যোলোশ' গোপিনী তা'তে মনে-মনে হাস্‌ছে কিন্তু কানাই দুধের ভার তুলে' নিলে।

করম্ সেরেঁই—অর্থাৎ সাঁওতালী চিতাও পরবের গান। এ গান কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে হয়। এগুলি সব বাংলা ভাষায়।

দোয়াদশ বছর ত পিতা মোর আজ্ঞা দিলা
সত্য ক'রে কেকেয়ীর সঙ্গে, গৃহে ফিরো সীতা
তুমি না যাও বনে;
থাইলে বনফল নাই মিলে অন্ন জল
কোনোদিনে মিলে কি নাই মিলে
গৃহে ফিরো সীতা না যাও বনে।
অতি সুকুমার গায়, চলিতে বাজিবে পায়
বিদুদিয়ায় বুঝাই দেখ মনে
গৃহে ফিরো সীতা না যাও তুমি বনে।

এই গানের মধ্যে এদের স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের উক্তিরই গান আছে। এক-একটা গানের উত্তরকে এরা জোড়ন বলে। এদের গানের মধ্যে রামায়ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা স্থান্ পেয়েছে। এগুলি বোধ হয় হিন্দুজাতির সংশ্রবে এসে তারা সংগ্রহ করেছে, কারণ রাম বা শ্রীকৃষ্ণ যে কে ছিলেন তা তারা মোটেই জানে না। এ-সকল গান সব বাংলা ভাষায়। এরা দেবতা মানে, কিন্তু দেবদের মহিমা কীর্ত্তন এদের কোনো গানে নাই। দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা এদের ঠিক ভয়োভক্তি। বিপদ্-আপদ্ থেকে দেবতা তাদের রক্ষা করবে, এই বিশ্বাসেই দেবতাকে তা'রা পূ করে, সুতরাং ভক্তিমূলক গান তা'রা রচনা করে নাই তবে মায়ের উপর এদের ভালোবাসা খুব বেশী, সে-সম্বে গানও আছে।

গান

তুমি দাদা বড়রে,
হামি দাদা ছোটরে,
মাকে জলধি কেনে মার ;
মায়ের মত ধন কোথায় পালেরে,
ছাতির উপর দুধ হে পিয়ালে।

চর্‌কা স্বরাজের সোপান

(শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সংবাদ)

দ্বিজেন্দ্রনাথ :—আমাদের দেশে কখনও কিছু ভালো হবে, সে-আশা কিছুকাল পূর্ব্বে আমার মন থেকে লোপ পেয়েছিল। কিন্তু আপনাদের দেখে' সে-আশা আবার জেগে উঠেছে। আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল, যে, আমাদের দেশের লোক আমাদের দেশের নিজস্ব চিরার্জ্জিত জ্ঞানধর্ম্মকে জাগিয়ে তুলে' তা'র উপরে মঙ্গলের গোড়া পত্তন করবে। ঐসকল বস্তুর জন্ম পরের দ্বারে ভিক্ষা করতে যাওয়া নিতান্তই একটা অনর্থকর কাজ। যে আগুন নেবো-নেবো কর্‌ছিল সে আগুন যে কিছুতেই নিববার নয়, আপনাদের দেখে' এআশা এতকাল পরে আমার মনে বলবতী হ'য়ে উঠেছে। সভায় বাক্যাড়ম্বর করে' আর নানা-রকম ভুজং দেখিয়ে লোকদের মনে একটা মিথ্যা সংস্কার এতদিন তৈরী করে' তোলা হয়েছিল যে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আমাদের দেশের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় পথ নেই। আমাদের দেশে ইংরেজদের মতন পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কলকারখানা বসাতে হবে, স্বার্থকে পরমার্থের স্থলাভিষিক্ত করতে হবে—এরকম করলেই আমাদের দেশের মঙ্গলের আর কিছুই বাকী থাক্‌বে না, এই ঘোরতর কুসংস্কার দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। ঈশ্বরের প্রসাদে আপনাদের মত লোকের সদুপদেশের এবং দৃষ্টান্তের আলোতে এ-সব মোহ কেটে যাচ্ছে। এতে যে আমার কত আনন্দ হচ্ছে তা আমি বলতে পারব না। স্বরাজ পেতে হ'লে প্রথম দর্‌কার মিলে'-মিশে' কাজ করা। এমন কাজ দেশের সাম্‌নে ধরা চাই, যে-কাজ দেশের ছোট-বড় সকলে করতে পারে। আপনারা দেশের কাছে আজ সেইটি ধরেছেন। অনেকে বল্‌ছেন চর্‌কা দ্বারা কি করে' স্বরাজ লাভ হবে? তাঁরা এই সহজ কথাটা বুঝতে পার্‌ছেন না, এটা হচ্ছে কেবল মিল্‌বার প্রণালী। ইংরেজেরা প্রথম যখন এদেশে এল, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশে ছোটোখাটো ব্যবসার কাজ চালাতো, সে-সব ছিল thin end of the wedge। সেইসব ব্যবসার সূত্রে মিলে তা'রা ক্রমশ এখানে রাজ্য ফেঁদে বস্‌ল। চর্‌কাও আমাদের তেমনি thin end of the wedge। সমস্ত দেশের ছোটো বড় সকল লোকই একাজ করতে পারে। চর্‌কা সামান্য জিনিষ, তা কাউকে বক্তৃতা দিয়ে শেখাতে হয় না। অথচ এই সামান্য জিনিষ চর্‌কার উপরে আমাদের দেশের কত মঙ্গল যে নির্ভর করে, তা আপনারা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। কত অল্প সূত্রে যে কত মহৎ কাজ ঘটিয়ে তোলা যায়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনারা দেখাচ্ছেন। যারা নাম চায় না, কাজ চায় তাদের কাজই এরকম। তাঁরা ক্ষুদ্র বীজ নিক্ষেপ করেন, কিন্তু লাভ করেন মহৎ ফল। যাঁরা কাজ চান না, নাম চান, তাঁদের কাজ আর-একরকম। তাঁরা বাক্যে সোনারূপা বর্ষণ করেন বটে, কিন্তু কাজে রাশি-রাশি কাদামাটি লাভ করেন। কথায় কিছুই হয় না—"ফলেন পরিচীয়তে।"

লোকে ভাবে, মস্ত বড় কাজ কিছু আরম্ভ না করলে বুঝি হয় না, কিন্তু সে-সব যে কত মিথ্যা, তা দুদিন পরেই ভেঙ্গে যায়। আসল দর্‌কার কাজ। মহাত্মা গান্ধী, আপনি, আজ তাই দেশের সাম্‌নে এই অত্যন্ত একটি ছোটো কাজ ধরেছেন, যে-কাজ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা করতে পারে।

আমাদের দেশে বড় কোনো কলের কাজে সব লোককে একসঙ্গে লাগানো যাবে না, তাই এই চর্‌কার মতন কাজে সকলকে ডাক দেওয়া যায়। যারা এই সামান্য কাজে এক সঙ্গে না মিশতে পারবে, তা'রা স্বরাজের জন্ম কোনো বড় ত্যাগের কাজে যে মিল্‌তে পারবে, সে-আশা দুরাশা।

আচার্য্য রায় :—আপনি যা বল্‌ছেন, আমিও ঠিক তাই বলি। কিন্তু মুস্কিল আমাদের দেশের একদল লোকের বিশ্বাস, চর্‌কায় বিশেষ কিছু কাজ হবে না। তাঁ'রা কাউন্‌সিলে বড়-বড় বক্তৃতা দিয়ে জয়লাভ করাকেই পরম গৌরব এবং স্বরাজলাভের সোপান বলে' মনে করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ :—বক্তৃতা করে' কি হবে? বক্তৃতা অনেক দিন ধরে' হচ্ছে। এখন দর্‌কার সত্যিকার কাজ, একটা কিছু লক্ষ্য স্থির রেখে

কাজ কর্‌তে হবে। কেবল হাঁস-ফাঁস করে' যা-তা কতগুলো কাজ করাকে কাজ করা বলে না। আর কিছু কাজ পাওয়া গেল না, অতএব আজ একটা সভা করা যাক। আর কাউন্‌সিলে বক্তৃতা দিলে কি ইংরেজদের স্বভাব বদ্‌লাবে? ইংরেজরা তা'তে একটুও স্বার্থ ছাড়বে না। বক্তৃতা দিয়ে কাউকে কি স্বার্থত্যাগ করানো যায়? ধরুন জমিদার সে তার জমিদারিতে খুব অর্থশোষণ কর্‌চেন, তখন প্রজারা কি তাঁকে বক্তৃতা শুনিয়ে তাঁর স্বভাব বদ্‌লাতে পাবেন? বড় জোর, তিনি তাঁর নামের জন্য, যশের জন্য জমিদারিতে ২।১টা পুকুর কাটিয়ে দিতে পারেন। তা'র বেশী তিনি আর কিছুই কর্‌বেন না। আসল দর্‌কার, প্রজাদের চেষ্টা করে' নিজেদের ভালো করা, নিজেদের বড় করে' তোলা। তা হ'লে আর জমিদার সেইসব প্রজাদের উপর অত্যাচার কর্‌তে সাহস পাবে না।

ইংরেজরা এই সাম্রাজ্য শাসন করে'-করে' তাদের হাত পাকিয়েছে, তাদের অভ্যাসের মধ্যে এটা এত ব'সে গিয়েছে যে তা'রা ইচ্ছা কর্‌লেও তাদের স্বভাব বদ্‌লাতে পার্‌বে না। সুতরাং বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের বদ্‌লানো যাবে না। বুড়ো বয়সে কি সহজে সারাজীবনের অভ্যাসটা ফস্ করে' বদ্‌লায়? আফিং খাওয়া যার ছোটো বেলা থেকে অভ্যাস হয়েছে, সে কি বক্তৃতা শুনে' আফিং খাওয়া ছেড়ে দেয়? এক হ'তে পারে ক্রমশ রোগে ভুগে', ঠেকে'-ঠেকে' শিখে' একদিন ছাড়তেও পারে' কিন্তু কথা বলে' তা'কে ছাড়ানো যায় না।

তাই দর্‌কার আমাদের দেশের লোকের চরিত্রের (moral state) উন্নতি করা। আমাদের নিজেদের মধ্যে মিল হ'লে এমন দিন আস্‌বেই যখন সমস্ত পৃথিবীর সাম্‌নে লজ্জার খাতিরেও তাদের এদেশ ছেড়ে দিতে হবেই। আমাদের উপর এরকম প্রভুত্ব করে'-করে' ওদের নিজেদের মধ্যেই civil war বাধ্‌বে। পৃথিবীর অন্য-অন্য দেশের দ্বারাও বাধা হ'য়ে তখন ওরা না ছেড়ে পার্‌বে না। কিন্তু তা'র জন্যই-দর্‌কার আমাদের নিজেদের মধ্যে মিলিত হওয়া। এই চর্‌কার কাজে আমরা সকলে মিল্‌তে পারি। হিন্দু মুসলমানের মিল এটিও আমার মনে হয় খুব শক্ত নয়। অবশ্য, হিন্দু মুসলমান দুই দলেই কতগুলো গোঁড়া লোক আছে, তা'রা নিজেদের (অন্ধ সংস্কার) নিয়ে বসে' আছে। কিন্তু আবার এমন অনেক হিন্দু মুসলমানও আছেন, যাঁরা এসব ছেড়ে দেশের কাজে মিলিত হ'তে পারেন।

ইংরেজদের দেখাদেখি কতকগুলো সভাসমিতি, কতগুলো organisation কর্‌লে কিছু হবে না। একমুটো চিনি জলে গুলে' রেখে তা'তে যদি একটা দড়ি ফেলে' দেওয়া যায় তা হ'লে একটু উত্তাপাদির সুযোগে তাহা আপনা-আপনি crystallised হ'য়ে মিছরির দানা হ'য়ে ওঠে—তাই ছোট হোক আর বড়ই হোক কোনো একটা সত্যিকার কাজে কোমর বেঁধে উঠে' পড়ে' লাগলে ছোট কাজও আপনা-আপনি organised হ'বে বড় কাজ হ'য়ে দাড়াবে—আর বড় কাজ হ'তেও আশাতীত উৎকৃষ্ট ফল ফল্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। এখন আমরা যে-কাজে হাত দিচ্ছি সেই কাজই ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্চে, তখন যে-কাজে হাত দেবো সে-কাজ থেকেই সোনা ফল্‌বে।

দর্‌কার হচ্চে আমাদের দেশের সব লোকে যে-সব কাজ কর্‌তে পারে এমন কাজ দেশের সাম্‌নে ধরা। বড় বড় কল করা আমাদের দেশের ধাতে নেই। একবার ইংরেজদের দেখাদেখি আমাদের বাড়ীর জ্যোতি এবং কেউ-কেউ জাহাজ, কলকারখানা কর্‌তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে-সব দুদিনেই মিলিয়ে গেল। আসল কথা, যে যা কাজ পারে না, তা'কে দিয়ে সে-কাজ করানোর চেষ্টা বৃথা।

আচার্য্য রায়:—এই দেখুন না, অনেক চেষ্টা করে' বঙ্গলক্ষ্মী একটা মিল কোনো রকমে দাঁড়িয়েছে। আরো কত মিল হয়েছিল, কিন্তু তেমন টিঁক্‌ল না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ:—কথা হচ্চে কাজ নিয়ে, এ কাজ ত নামের জন্য নয়। নাম ক'দিনই বা থাকে? কিছুদিন খুব খ্যাতি না হয় পাওয়াই গেল, কিন্তু সে-নাম, সে-খ্যাতি ত চিরদিন থাক্‌বে না। সেক্‌স্‌পীয়র ত জগদ্বিখ্যাত লোক, তাঁর নাম আজও জগৎ থেকে যায়নি, কিন্তু সে নামের অর্থ কি? ক'জন মানুষ আজ সত্যি-সত্যি সেক্‌স্‌পীয়রের এমন ভক্ত যে ভোরে উঠে' এমন কি, তাঁর নাম জপ করে? ওসব নাম, যশ, একটা-একটা মায়া। এরকম অনেক illusion আমাদের আছে। তাই দর্‌কার, এসব illusion ছেড়ে দিয়ে কাজ করে' যাওয়া।

আপনি আজ যে কাজ কর্‌ছেন, এসবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্চে। এরকম কাজের দ্বারা আপনি ভবিষ্যৎ বংশের কাছে একটা আদর্শ রেখে যাচ্চেন। দর্‌কার হচ্চে এরকম কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে' যাওয়া, পৃথিবীর ভবিষ্যতে কি হবে, না হবে, সে ভাবনা করে' কোনো লাভ নেই। তবে একটা লক্ষ্য স্থির রেখে কাজ করা দর্‌কার।

আচার্য্য রায়:—আপনার অফুরন্ত ভাণ্ডার; আপনার কাছে এলে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা করে না। মনে হয় আপনি যেন ভীষ্মদেবের মতন শরশয্যায় শুয়ে আছেন আর আমরা আপনার কাছ থেকে শান্তি-পর্ব্বের উপদেশ শুন্‌ছি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ:—আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা যে দর্শন আলোচনা কর্‌তেন, তা'র মধ্যেও একটা স্থির লক্ষ্য ছিল, মুক্তিলাভের উপায় বলে দেওয়া। এই মুক্তির কথা নানা ছলে কত রকমে আমাদের দেশে বলা হয়েছে। মহাভারতের মতন অত বড় কাব্যখানা'র মধ্যে এক জায়গায় গ্রন্থকার ভীষ্মকে শরশয্যায় শুইয়ে তাঁর মুখ থেকে উপদেশ শোনালেন। সাহিত্যের দিক্ থেকে শান্তিপর্ব্ব একেবারে অসংলগ্ন, এসব ওদের দেশে [illegible]-এর Ilia[illegible] প্রভৃতি কাব্যে পাওয়া যায় না। এ কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব। মোট কথা, লোকের উপকার করা আমাদের দেশের সকলের লক্ষ্য ছিল। ধরুন, কুরুক্ষেত্রে ভীষণ লড়াইয়ের মধ্যেও গীতাকার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়ালেন। ধর্‌তে গেলে একেবারে অসম্ভব বলে'ই মনে হয়। কিন্তু গীতাকার চান মুক্তির উপায় বলে' দিতে, তাই তিনি এরকম অসম্ভব জিনিষও ঘটিয়ে তুলতে পিছপাও হন্‌নি। এই মুক্তির আবহাওয়া আমাদের দেশে আছে। এভাবটা ওদের দেশে খুবই অভাব আছে। মহাত্মা গান্ধী ত ব্রাহ্মণ না, কিন্তু আমাদের দেশের নগণ্য লোকেরাও সেদিকে তাকালে না। তা'রা বুঝেছে, এ-লোকটিই সত্যিকার ব্রাহ্মণ, তাই তাঁকে ভক্তি কর্‌তে কারো বাধেনি।

আচার্য্য রায়:—একথা আপনি ঠিকই বলেছেন। মুসলমান পীরের কাছে হিন্দু মাথা নোয়াতেও লজ্জা করেনি। তামিলদের মধ্যে যাঁরা সাধু বলে' পূজা পান, তাঁরা পঞ্চম শ্রেণীর অতি নীচ জাতের। সে-জায়গায় হিন্দু জাতি বিচার করেনি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ:—আমাদের দেশের এই ভিতরকার সম্পদ্ ভুলে আমরা ওদের অনুসরণ কর্‌তে ছুট' গিয়েছিলুম। এমন সময় ভগবান্ মহাত্মা গান্ধীর মতন লোক, আপনার মতন লোক, দেশে পাঠালেন। পরের অনুসরণ করে' আমাদের দেশের লোক ভাবে Parliament তৈরী কর্‌বে। Parliament এর মধ্যে কত গলদ আছে, তা কি আমরা জানিনে? আমাদের পঞ্চায়েৎ প্রথা ত চমৎকার ছিল। কিন্তু মুস্কিল হচ্চে এসব বললেই লোকে ভাবে বুঝি, আবার ভট্টাচার্য-ব্রাহ্মণদের কালে ফিরে, যাওয়ার কথা বল্‌ছি। তা নয়, আমাদের যে-সব ভালো জিনিষ ছিল সেগুলো পুনরুদ্ধার কর্‌তে হবে।

একটা জিনিষ দেখছি যে সত্যের বীজ যেখানে যতটুকুই পড়ুক না কেন সেটা একদিন না একদিন অঙ্কুরিত হবেই, আজ আপনারা যে-কাজ আরম্ভ করেছেন, এ কাজ দেশের অল্প লোক গ্রহণ না কর্‌লেও

এ মর্‌বে না ; কেননা এযে সত্যিকার জিনিষ, ভবিষ্যৎবংশ এই বীজের দ্বারা ফল লাভ কর্‌বেই।

আর এই যে এইরকম দুঃসময়ে মহাত্মা গান্ধি, আপনার মতন লোক এদেশে এলেন, ও সবই বিধাতার কাজ। তবে আমরা ভদ্রতার খাতিরে বলি যে আপনি করছেন বা মহাত্মা গান্ধী করছেন, কিন্তু সত্যি সব করছেন তিনি। ভগবানের বিধানেও economy দেখতে পাই। আমরা মনে কর্‌তে পারি যে দেশে পাঁচ জন মহাত্মা গান্ধীর মতন লোক, দশজন আপনার মতন লোক হ'লে সুবিধা হ'ত! কিন্তু তা'তে হয়ত কাজের অসুবিধাই হ'ত। ভগবান্ economically উপযুক্ত লোক দিয়েই উপযুক্ত কাজ করাচ্ছেন।

আমি যদিও আপনার মতন এসব কাজ কর্‌তে পার্‌ব না, আমি এখন অক্ষম, কিন্তু আপনারা যে মহৎ কাজ কর্‌ছেন তা স্বীকারও যদি না করি, তা হ'লে সে যে আমারই দুর্ভাগ্য। এই সঙ্কটের সময় আপনাদের দিয়ে ভগবান্ যে-কাজ করাচ্চেন আমি নিজে যে-কাজ কর্‌তে না পার্‌লেও সে-কাজ যাঁরা কর্‌ছেন তাঁদের আমার স্বীকার করা উচিত। আজ ভগবান্ অনুগ্রহ ক'রে' এই যে দেশে মহাত্মা গান্ধীর মতন, আপনার মতন লোক পাঠিয়েছেন, এ'দের ছাড়লে আমরা নিজেরাই ঠক্‌ব। কেননা, এমন হ'তে পারে, এর পরের যুগে হয়ত এরকম লোকের অভাবে মানুষ হাহাকার কর্‌বে।

তাই অনেক দিন ধরে'ই আপনাকে আমার দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। এখন যদিও আমি ভাল চোখে দেখতে পাইনে, আপনাকে চাক্ষুষ দেখতে পেলুম না, কিন্তু এই যে আপনি এসেছেন, এতে মনে হচ্ছে ধন্যোঽহম্ কৃতকৃতার্থোঽহম্।

আচার্য্য রায় :—অনেক দিন ধরে' আপনার কাছে আমার আসার খুব ইচ্ছা ছিল, এত দিন পরে সে-আশা আমার পূর্ণ হ'ল। তখন আমার বয়স আট, প্রথম আপনার কবিতা পড়ি। তার পর আপনার স্বপ্নপ্রয়াণ যখন বের হ'ল তখন তা'র ভিতরকার দার্শনিক তত্ত্ব ভালো বুঝতে পার্‌তাম না। তবে, সেই সময় আপনার মুখে আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা নামে আপনার বক্তৃতা শুনি। সেটা খুব ভালো লেগেছিল। তার পর, আমি তখন আপনাদের তত্ত্ববোধিনীর নিয়মিত পাঠক ছিলুম। তা'তে আপনার, অক্ষয় দত্তের, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের, কাশীশ্বর মিত্রের প্রভৃতির লেখা বেরুত। সেই তত্ত্ববোধিনীর লেখা পড়ে'ই ত আমি অনুপ্রেরণা লাভ করি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ :—তাই বলুন, তা হ'লে ত আপনার বনিয়াদ পাঁটি এদেশীয়।*

* সম্প্রতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতন-আশ্রম দেখিতে আসিয়া শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাই উপরে একজন শ্রোতা কর্ত্তৃক অনুলিখিত হইয়াছে।

আনাতোল ফ্রাঁস

শ্রী কালিদাস নাগ

হাসি দিয়ে গড়ে' গেলে এ যুগের গূঢ় ইতিহাস—
নীচতা অন্যায় শাঠ্য লাঞ্ছিতেছে বিরাট্ আকাশ
মৃত্যুভরা ঔদ্ধত্যের ভরে ; তুমি আসি জ্বালাইলে
পূত হাস্য হোমানল—তাহে ভস্ম করি উড়াইলে
সমাজের যত মিথ্যা ; সে দাহনে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে
ভণ্ডেরা বর্ষিল গালি, আক্রমিল দলবল লয়ে',
তোমারে বলিল ঘৃণ্য শূন্যবাদী নাস্তিক পামর ;
হাসিলে তাদের পানে ; শান্তমনে ভুলি আত্মপর
আরম্ভিলে মহারণ—বিশ্ব জুড়ে' গর্জ্জে তব ডাক !
বারে-বারে টঙ্কারিলে মন্ত্রপূত বিদ্রূপ পিনাক
চূর্ণি অসত্যের বর্ম্ম—হে সত্যের বীর সেনাপতি !
ধ্বংস তব জ্যোতির্ম্ময়, সুন্দরের পরম আরতি !
তাই ত বিদ্রূপ তব বেদনার শাশ্বত ভিত্তিরে
করেছে আশ্রয় ; তাই রহস্যস্তনিত মৃত্যুতীরে
অমর জীবন তব স্নিগ্ধ দীপ্ত তারকার মত
বিদীর্ণিয়া অন্ধকার আলোক বর্ষিছে অবিরত।

রাজপথ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৩৯]

গোলদিঘি হইতে সুরেশ্বর যখন গৃহে ফিরিল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল অদূরে রন্ধনগৃহে। দেখিল নিবিষ্ট-ভাবে পাক-পাত্রের দিকে চাহিয়া উনানের সম্মুখে একটা নীচু টুলের উপর মাধবী বসিয়া আছে। আর উপরে না গিয়া সুরেশ্বর তথা হইতে নীচে নামিয়া গেল, এবং ধীর-পদক্ষেপে রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

চুল্লী-গহ্বর হইতে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিপ্রভায় মাধবীর মুখের এক অংশ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আলো-ছায়ার কঠিন এবং কোমল রেখায় অঙ্কিত হইয়া তাহার মৌন-মধুর মুখমণ্ডলে এমন অপরূপ একটা ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যেমনটি ইতার পূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া সুরেশ্বরের মনে পড়িল না! আজ দ্বিপ্রহরে মাধবী যখন তাহাকে নূতন-কাটা সূতা, নব-প্রস্তুত বস্ত্রাদি এবং তাহার হিসাবপত্র দেখাইতেছিল তখন সমস্ত দেখিতে-দেখিতে এবং শুনিতে শুনিতে তাহার এবং চরকাঘর সংক্রান্ত এমন-কোনো ব্যাপারই সুরেশ্বর খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মাধবীর অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং কার্য্যক্ষমতার কথা জানা থাকিলেও সতের-আঠার বৎসরের একটি মেয়ে দুইটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্য্য কলাপ অপরের সাহায্য-ব্যতিরেকে ঠিক এরূপ সুচারু-ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার চিত্ত ভরিয়া গিয়াছিল! বারম্বার সে মনে-মনে প্রশ্ন করিয়াছিল, এত শক্তি মাধবী কোথা হইতে পাইল! এখন মাধবীর এই সুগম্ভীর আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া সুরেশ্বর তাহার সে-প্রশ্নের উত্তর লাভ করিল; দেখিল ধরিত্রীর গর্ভে প্রচ্ছন্ন অগ্নির মতন মাধবীর ভিতরে যে-শক্তি আছে তাহা তাহার বাহিরের মূর্ত্তি দেখিয়া সব সময়ে বুঝা যায় না।

"ভাতের হাঁড়ি নিয়ে অত কি ভাবছিস্ মাধবী?"

আকস্মিক শব্দে ঈষৎ চমকিত হইয়া মাধবী সুরেশ্বরের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল। তাহার পর স্মিতমুখে বলিল, "ভাব্‌ছিলাম আরও দেরি করে' তুমি এলে ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে তখন কি করব। বাপ্‌রে! তোমাদের কথা আর শেষ হয় না! এতক্ষণ কি এত কথা হচ্ছিল বলো দেখি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি বিপদ! বাংলা অভিধানে কথা কি এতই অল্প আছে, যে দু-তিন ঘণ্টাও কথা কওয়া যায় না?"

একটা কথা সহসা মনে পড়িয়া মাধবীর মুখ হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল, "দু-তিন ঘণ্টা কেন? দু-তিন দিন ধরে'ও কওয়া যায়, যদি সেটা অভিধানে কোনো উষ্ম বর্ণ দিয়ে আরম্ভ কোনো কথা হয়। তাই হচ্ছিল না কি দাদা?"

রহস্যটা হঠাৎ ধরিতে না পারিয়া সুরেশ্বর সবিস্ময়ে বলিল, "কোনো উষ্ম বর্ণ দিয়ে আরম্ভ কোন্ কথা রে?' তাহার পরই বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ও! তা হ'লে তুই বুঝি এতক্ষণ প-বর্গের কোনো কথা নিয়ে তন্ময় হ'য়ে ছিলি?"

প-বর্গের অক্ষরগুলি মনে-মনে তাড়াতাড়ি আওড়াইয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে মাধবী বলিল, "না দাদা! এখনো ভাতের হাঁড়ি উনোন থেকে নামেনি, এখন যা-তা কথা ও-রকম করে' বোলো না!"

মাধবীর দুর্ভাবনায় পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর হাসিতে-হাসিতে বলিল, "প-বর্গের যে কথা উচ্চারণ করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়, আমি যে সেই বিপিন বোসের কথাই বল্‌তে চাই, তা তুই ভাব্‌ছিস্ কেন মাধবী? সে কথাটা ছাড়া প-বর্গে আর অন্য কথা কি নেই?"

মাধবী রুষ্ট-ভাবে বলিল, "তা থাক্‌বে না কেন? কিন্তু তোমার দুষ্ট মিও ত আমার জানা আছে!" কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প-বর্গের আর-একটা কথা মনে পড়ায় সে সন্দিগ্ধ নেত্রে সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সুরেশ্বর মৃদু-মৃদু হাসিতেছে!

সুরেশ্বরের সে-হাসি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক মনে করিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু অপরে ধরিবার পূর্ব্বেই যাহাতে নিজেই না ধরা দিতে হয়, তজ্জন্য নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিল, "না, না, সত্যি করে' বলো দাদা, সুমিত্রার কথা কিছু হ'ল?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "কিছু কেন, শুধু সেই কথাই ত এতক্ষণ হচ্ছিল। বিমানের ভাব-গতিক আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। সে আমাকে বোঝাতে চায়, যে সুমিত্রার উপর তা'র আর কিছুমাত্র অধিকারও নেই, আকর্ষণও নেই।"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা এ আর না বোঝ্‌বার মতন এমন কি শক্ত কথা? তিনি যা বোঝাচ্ছেন, তাই বুঝ্‌লেই ত হয়!"

সুরেশ্বর বলিল, "বোঝানো আর বোঝা অত সহজ কথা নয়, মাধবী! সুমিত্রার উপর বিমানের অধিকার নেই, তা না হয় মান্‌লাম, কিন্তু আকর্ষণের কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বিমান নেই বল্‌ছে বলে'ই যে তা নেই—তা নয়।"

সুরেশ্বরের সতর্কতার এই অতিনিষ্ঠায় মনে-মনে বিরক্ত হইয়া মাধবী বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তবে, তুমি বল্‌ছ বলে'ই তা থাক্‌বে নাকি? এ কিন্তু তোমার অনধিকার-চর্চ্চা দাদা!

সুরেশ্বর কহিল, "না, আমি আছে বল্‌লেই যে তা থাক্‌বে তা নয়, কিন্তু বিমান নেই বল্‌লেও যদি থাকে, তা হ'লেই বিপদ্! লোহার উপর চুম্বকের আকর্ষণ আছে কি না, সেটা শুধু চুম্বককে দেখ্‌লেই বোঝা যায় না,—লোহার কাছে চুম্বককে দেখ্‌লে তবে বোঝা যায়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মাধবী কহিল, "চুম্বক-লোহার কথা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু এদের দুজনের মধ্যে যে এখন আর কোনো আকর্ষণ নে[ই] তা বোধ হয় বল্‌তে পারি।"

মাধবীর প্রতি উৎসুক-নেত্রে দৃষ্টিপাত ক[রিয়া] সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দুজনেরই কথা বল্[তে] পারিস্?"

হাঁড়ি হইতে অন্নের কয়েকটা দানা একটা থা[লায়] ফেলিয়া টিপিয়া দেখিতে-দেখিতে মাধবী বলিল, "হ[্যাঁ,] দুজনেরই কথা।"

মনে-মনে একটা কথা বিশেষরূপে সন্দেহ ক[রিয়া] সুরেশ্বর বলিল, "সুমিত্রার মনের অবস্থা জান্‌বার জ[ন্যে] আমি তত ব্যস্ত নই মাধবী, কারণ তা'র মনের অব[স্থা] আমি নিজেও কতকটা আন্দাজ কর্‌তে পারি। বিমানে[র] মনের ঠিক অবস্থাটা ধর্‌তে পার্‌লে, অনেক কথা সহজ হ'[য়ে] আসে। তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

হাঁড়ির মুখে পাত্র চাপা দিতে-দিতে মাধবী বলিল, "[কেন] জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরেশ্বর মৃ[দু] মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিল, "তুই কেমন করে' জান্[লি] যে সুমিত্রার উপর বিমানের আর কোনো আক[র্ষণ] নেই?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মাধবী বলিয়া উঠিল, "অ[ত] কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারিনে! আমার যা বিশ্বাস, ত[া] তোমাকে বলেছি।"

কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করিয়া জানিবার উদ্দে[শে] সুরেশ্বর অন্য কৌশল অবলম্বন করিল, বলিল, "তা হ'[লে] অপরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হ'লে বিমান নিশ্চয়ই দুঃখি[ত] হবে না?"

করতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া ঈষৎ আনত হইয়া মাধব[ী] পাক-পাত্রের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল; একটু চিন্ত[া] করিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "বোধ হয় না।"

মনে-মনে পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাস[া] করিল, "আজকাল বিমানের কার উপর আকর্ষণ হয়েছে[,] তাও জানিস্ নাকি মাধবী?"

একথার কোনো উত্তর না দিয়া মাধবী যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

সুরেশ্বর বুঝিতে পারিল মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাই

আর-কোনো প্রশ্ন না করিয়া নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করিল, "আমার মনে হচ্ছে মাধবী, এই কয়েক মাসে বিমান যে এই সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তিটি ধারণ করেছে, এর মধ্যে তোর কল-কৌশল চালানো আছে! বল্ সত্যি কি না?"

সুরেশ্বরের দিকে পিছন করিয়া থাকিয়াও মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে একটু বেগের সহিত বলিল, "কল-কৌশল চালাবার উপায় থাক্‌লে নিশ্চয়ই চালাতাম। তবে এখন থেকে চালাবো। বাপ্‌রে! তোমার হুকুমের জন্যে কারো সঙ্গে ভালো করে' কথা কওয়ারই উপায় ছিল না তা আবার কল-কৌশল চালানো! এক-একসময়ে দম আট্‌কে যাবার মতন হ'ত! কাল সুমিত্রার সঙ্গে ত রীতিমত অভদ্র ব্যবহার করে' এলাম!"

দ্বিপ্রহরে সুরেশ্বর মাধবীর নিকট সুমিত্রার জন্মদিনের বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়াছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "অভদ্র ব্যবহারের মধ্যে ত দেখ্‌লাম আস্‌বার সময়ে সুমিত্রার কাছ থেকে একরাশ সুতো নিয়ে বাড়ী ফিরেছিলে!"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাধবী বলিল, "তুমি যে-শাড়ী সুমিত্রাকে দিয়েছিলে, তা'র হিসাবে সুতো নিয়ে আসাতেও একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল? এ কিন্তু তোমার বড় বেশী বাড়াবাড়ি, দাদা!"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে বলিল। "একটুখানি সূত্র অবলম্বন করে' কত বড়-বড় ব্যাপার বেড়ে চলে, মাধবী, আর তুই ত একরাশ সুতো নিয়ে এলি! তা আবার শাড়ীর বদলে ধুতির সুতো! প্রতিশ্রুতি না থাক্‌লে এর বেশী আর কি কর্‌তিস্ শুনি?"

মাধবীর মুখে দুষ্টমির মিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "তা হ'লে কি আর ও-সুতো দিয়ে তোমার ধুতি কর্‌তে দিতাম? একেবারে গাঁটছড়া করাতাম!"

"একেবারে গাঁটছড়া? একখানা, না এক-জোড়া রে?" বলিয়া সুরেশ্বর উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

"যাও, যাও দাদা! বেশী ফাজ্‌লমি কোরো না। ভাত হ'য়ে গেলে ডাকব, তখন এসো!" বলিয়া মাধবী তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ লুকাইবার জন্ম তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া পাক-পাত্রে মনোনিবেশ করিল।

সুরেশ্বরও হাসিতে-হাসিতে প্রস্থান করিল।

উপরে বারাণ্ডায় তারাসুন্দরী বসিয়াছিলেন। আজ সকালে সুরেশ্বর বাড়ী আসা পর্য্যন্ত তাঁহার মনটা এমন-একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের হিল্লোলে আলোড়িত হইয়া রহিয়াছে যে দৈনন্দিন কোনো কাজ-কর্ম্মে তাহা যথারীতি নিবিষ্ট হইতেছিল না; এমন-কি, সন্ধ্যার পর জপমালার সাহায্যেও যখন তাহা লৌকিক আনন্দকে অতিক্রম করিতে পারিল না, তখন অগত্যা মালা মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিয়া তারাসুন্দরী সুরেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন। মনে করিলেন, রাত্রি বেশী হইলে মনের নিশ্চিন্ত অবস্থায় জপে বসিবেন।

সুরেশ্বর উপরে আসিলে তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে সুরেশ, অত হাস্‌ছিলি কেন? কি হয়েছে?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "কিছু হয়নি, মা; তোমার মেয়েটির আবোল-তাবোল কথা শুনে' হাস্‌ছিলাম।" তাহার পর তারাসুন্দরীর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "গায়ে কিছু না দিয়ে বসে' রয়েছ মা? তোমার দুর্ব্বল শরীর, এমন করে' নূতন হিম লাগানো উচিত নয়।" বলিয়া ঘর হইতে একটা গাত্র-বস্ত্র আনিয়া সযত্নে তারা-সুন্দরীর অঙ্গে জড়াইয়া দিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

তারাসুন্দরী সস্নেহে সুরেশ্বরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে স্মিতমুখে বলিলেন, "তুই আজ নূতন এলি বলে' কি আমার শরীরও আবার নূতন করে' দুর্ব্বল হ'ল, সুরেশ? আর আমার একটুও দুর্ব্বলতা নেই।"

সুরেশ্বর বলিল, "না মা, অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা থেকে এখন অনেকটা সেরে উঠেছ বলে' তোমার মনে হয় যে আর দুর্ব্বলতা নেই। কিন্তু আমি আজ প্রথম তোমাকে দেখ্‌ছি বলে' বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কত দুর্ব্বল তুমি এখনও আছ।"

দুই-চারিটা অন্যান্য কথার পর সুরেশ্বর মাধবীর বিবাহের কথা তুলিল। বলিল, "আমার কিছু ঠিক নেই,

ডাক পড়লেই আবার গিয়ে ঢুকতে হবে। তখন আবার কত দিন দেরি হবে, কে বল্‌তে পারে? এই বেলা একটি সৎপাত্র দেখে' বিয়ে দিলে হয়।"

কথাটা তারাসুন্দরীও কিছুদিন হইতে ভাবিতেছিলেন এবং মনে-মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে সুরেশ্বরের কারা-মুক্তি হইলেই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি বলিলেন, "ভগবানের অনুগ্রহে আর যেন তোমার ডাক না হয়, কিন্তু আমার ত ডাক আস্‌বার সময় হ'য়ে আস্‌ছে। বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌লেই ভালো হয়। কিন্তু বিয়ে দেওয়া ত শক্ত নয় সুরেশ, সৎপাত্র পাওয়াই শক্ত।"

"তেমন কোনো সৎপাত্র তোমার নজরে পড়ে' মা?"

একটু চিন্তা করিয়া, ইতস্তত করিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "হাঁ, একটি পড়ে।"

আগ্রহ-সহকারে সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

তারাসুন্দরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আজ থাক্; তেমন যদি বুঝি, কয়েক দিন পরে তোমাকে সে-কথা বল্‌ব।"

সুরেশ্বর বলিল, "আমারও নজরে একটি পড়্‌ছে মা। আমিও আর-একটু দেখে' তার পর তোমাকে বল্‌ব। কিন্তু তুমি দেখো মা, তোমার নজরে যে পড়েছে আমার নজরেও সেই পড়্‌ছে।"

তারাসুন্দরী কিছু না বলিয়া একটু হাসিলেন।

সুরেশ্বরও হাসিল। তাহার মনে হইল, আকাশ এক দিক্ হইতে নির্মেঘ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিয়া মাধবীর বহুক্ষণ ঘুম হইল না। এতদিন যে কথাটা তাহার মনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহার কতক অংশ রন্ধন-শালায় সুরেশ্বরের নিকট সংক্রমিত হইবার পর হইতে তাহার চিত্তে একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। যে-চিন্তা এতদিন ডিম্বের মতন অচল অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছিল, আজ তাহা খোলা-ভাঙা পক্ষী-শাবকের মতন ঘটনারূপে সচল হইয়া উঠিল, এবং তাহার সদ্য-উন্মুক্ত পক্ষপুটের নিরন্তর তাড়নায় মাধবীকে অস্থির করিয়া তুলিল।

অথচ যে-সকল বাক্য হইতে সুরেশ্বরের মনে তাহার সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা সুরেশ্বরের নিকট ব্যক্ত করিবার তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বিম বিহারীর কথা বলিতে গিয়া বাধ্য হইয়া সুরেশ্বরের ম সে-সংশয় উৎপন্ন করিতে হইয়াছিল;—সাপকে মারি শিবকে লাগিয়াছিল।

(৪০)

পরদিন প্রত্যূষে সুরেশ্বরের চর্‌কা কাটা শেষ হই তারাসুন্দরী বলিলেন, "আজ মনে কর্‌ছি বিমানে খেতে বল্‌ব; তুই এই বেলা গিয়ে তা'কে বলে' আ সুরেশ। কথা ছিল, তুই বাড়ী এলে একদিন তোরা দু ভাইয়ে পাশা-পাশি বসে' খাবি।"

এ-প্রস্তাবটা সুরেশ্বর খুব পছন্দ করিল; এবং অবিলম্বে একটা খদ্দরের ফতুয়া পরিয়া তদুপরি একটা খদ্দরের গাত্র বস্ত্র জড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার কয়েক মিনি পরেই বিমানবিহারী আসিয়া ভিতরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া, "সুরেশ্বর, সুরেশ্বর" বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

নীচের বারাণ্ডায় বসিয়া মাধবী তরকারী কুটিতেছিল বিমানবিহারীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল, "দাদার সঙ্গে পথে দেখা হয়নি আপনার? তিনি ত এখনি আপনাদের বাড়ী গেলেন।"

ব্যস্ত হইয়া বিমান বলিল, "এখনি? কতক্ষণ?"

"চার-পাঁচ মিনিটের বেশী হবে না।"

"আমি ত বাড়ী থেকে সোজা আস্‌ছিনে, তাই দেখা হয়নি। আচ্ছা তা হ'লে আমি চল্‌লাম, তাড়াতাড়ি গেলে এখনও হয় ত তা'কে ধর্‌তে পার্‌ব।" বলিয়া বিমানবিহারী প্রস্থানোদ্যত হইল।

মাধবী বলিল, "কিন্তু আমার ত মনে হয়, তা পার্‌বেন না। আপনি বাড়ী নেই দেখে' তিনি এতক্ষণ বেরিয়ে পড়েছেন, আর কোন্ পথ দিয়ে ফিরে' আস্‌ছেন তা'র ঠিক কি? তা'র চেয়ে আপনি এখানেই একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এখনি এসে পড়্‌বেন।"

"আর সেও যদি আমারি মতন সেখানে অপেক্ষা করে' বসে' থাকে?"

"না, তা থাক্‌বে না। যে-কাজে তিনি গেছেন তা'তে মিনিট খানেকের বেশী সময় লাগ্‌বে না।"

সবিস্ময়ে বিমান জিজ্ঞাসা করিল, "মিনিট-খানেকের কি কাজে সে গেছে?"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আজ মা আপনাকে আর দাদাকে খাওয়াবেন, তাই বল্‌তে গেছেন।"

বিমানবিহারী প্রফুল্ল-মুখে বলিল, "আজ তা হ'লে ত সুপ্রভাত! আজ মা'র হাতের অমৃত পাওয়া যাবে। তা হ'লে অপেক্ষা কর্‌ছি, যাক্। কিন্তু তুমি হয়ত মনে কর্‌বে, এ এমন পেটুক যে নিমন্ত্রণের কথা শুনে'ই বসে' পড়্‌ল!"

অন্যদিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া মাধবী বলিল, "নিমন্ত্রণ পেয়ে যিনি কাজের ছুতো করে' নিমন্ত্রণ ছেড়ে দেন, তিনি যে কত বড় পেটুক, তা আমার জানা আছে!"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল। বলিল, "পেয়ে গ্রহণ করিনে এত বড় ত্যাগী আমি নই। তবে না পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার দুর্ব্বলতা আমার আছে, তা স্বীকার করি।"

এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়া মাধবী বলিল, "তা হ'লে চলুন, উপরে গিয়ে বস্‌বেন।"

বিমানবিহারী বলিল, "না, না, উপরে কেন? বাইরের ঘরটা খুলে দাও, এইখানে বসে'ই ততক্ষণ খবরের কাগজটা পড়ি।" বিমানবিহারীর হস্তে একটা সংবাদপত্র ছিল।

ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মাধবী বাহিরের ঘরটা খুলিয়া দিল। তাহার পর বিমানবিহারী আসন গ্রহণ করিলে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, খবরের কাগজটা কি কিনে' আন্‌লেন?"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "তা ভিন্ন আর কি করে' আন্‌ব?"

"দু আনা দিয়ে?"

"দু আনা কেন? চার পয়সা দিয়ে।"

অন্য দিকে একটু মুখ ফিরাইয়া মাধবী বলিল, "আজ কিন্তু আনায় দু-আনা দেওয়াই উচিত ছিল।"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী বলিল, "কেন?'

"আজ আপনার কথাটাই ওতে খুব বড় করে' লেখা আছে!"

"সত্যি নাকি? তা ত এখনো দেখিনি! বলিয়া বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি কাগজটা খুলিয়া দেখিল জরুরী সংবাদের পৃষ্ঠায় বড়-বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, A Magistrate Throws up the Yoke এবং তৎপরে যেসকল কথা রহিয়াছে তাহার দুই-চারিটা পড়িয়াই সে তাড়াতাড়ি কাগজটা মুড়িয়া টেবিলের আর প্রান্তে ফেলিয়া দিল; তাহার পর মাধবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এত মিথ্যে কথাও ছাপার অক্ষরে রোজ এই খবরের কাগজগুলোতে বের হয়! এরা অবলীলাক্রমে যেসব কথা আমার বিষয়ে বলেছে, আমার ষোলো আনা আত্মাভিমানও সে-সব দাবি কর্‌তে সঙ্কোচ বোধ করে। তুমি যে আমাকে সতর্ক করে' দিলে, তা'র জন্যে ধন্যবাদ মাধবী! নিশ্চিন্ত-মনে যে জিনিস বয়ে' বেড়াচ্ছিলাম তা'র মধ্যে যে এ-ব্যাপার ছিল, তা জান্‌তাম না! লোকে দেখ্‌লে মনে কর্‌ত, সকলকে পড়িয়ে শুনিয়ে বেড়াচ্ছি!"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন, আমি ত দেখেছি! আমিও ত একজন লোক!"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমান হাসিতে লাগিল; বলিল, "হ্যাঁ, সে-কথাও ত ঠিক! তবে তুমি আমার এত দুর্ব্বলতার খবর জানো, যে তা'তে আর-একটা যোগ হ'লে বিশেষ কিছু ক্ষতি হ'ত না!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাধবী বলিল, "একটা ত নয়, দুটো।"

বিস্মিত হইয়া বিমান বলিল, "দুটো? আর-একটা কি?"

মাধবীর মুখে একটা ফিকা রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে বলিল, "একটু আগে ত বল্‌ছিলেন যে না পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার দুর্ব্বলতাও আপনার আছে। তা আমি বলি, আপনি ছাড়লেন কেন? না ছাড়লেই ত হ'ত।"

বিমান একটু হাসিল। ছাড়ার কথা মাধবী কি মনে করিয়া বলিল তাহা সে ভাবিয়াও দেখিল না, বুঝিতেও পারিল না, উপস্থিত যাহা তাহা মনের পাওয়া এবং না-পাওয়ার সমস্যার মধ্যে দুলিতেছিল, সে অন্যমনস্কতায় তাহারই কথা মনে-মনে মানিয়া লইয়া বলিল, "সব

জিনিসই ত মনের মধ্যে চেপে ধরে' থাকা যায় না, তাই ছেড়ে দিলাম। মানুষে কি সহজে ছাড়ে?"

কোথা হইতে একটা তীক্ষ্ণ অভিমান আসিয়া মাধবীর মনের মধ্যে কাঁটার মতন বিঁধিতে লাগিল। একটু কঠিন-স্বরে সে বলিল, "কিন্তু আমি যতটা জানি, আপনি ত কতকটা সহজেই ছেড়ে দিলেন—অন্ততঃ শেষের দিক্‌টা।"

হঠাৎ মাধবীর মুখের উপর বিহ্বল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বিস্মিতভাবে বিমান বলিল, "তুমি কার কথা বল্‌ছ? সুমিত্রার?"

ততোধিক বিস্মিতভাবে মাধবী বলিল, "আপনি তবে কার কথা মনে কর্‌ছিলেন?" কিন্তু প্রশ্ন করিয়াই তাহার সম্ভাবিত উত্তর মনে করিয়া মাধবীর মুখ বিমানবিহারীর দৃষ্টির সম্মুখেই একেবারে লাল হইয়া উঠিল! এতই অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল যে সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইবার সময় পর্য্যন্ত পাইল না।

বিমানবিহারী শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি কার কথা মনে কর্‌ছিলাম, সে-কথা নাই বল্‌লাম, কিন্তু সুমিত্রার কথা যে মনে করিনি, তা তোমাকে জানাচ্ছি। তার পর তোমাকে অনুরোধ কর্‌ছি, যে আমাকে জড়িয়ে সুমিত্রার বিষয়ে এধরণের আলোচনা তুমি আর কোরো না; কারণ, যে ব্যাপার একবার শেষ হ'য়ে চুকে' গেছে সে-বিষয়ে বারম্বার এ-রকম অনাবশ্যক আলোচনা কর্‌লে যে-ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে, সেটা বাধা পায়। সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ের ব্যাপারে তুমি যে আমার সহায় হবে না বলেছ, ঐই যথেষ্ট—তা'র বেশী আর কিছু কোরো না, মাধবী!"

এই অনুযোগ এবং ভর্ৎসনার মধ্যে যতখানি অভিমান ছিল, সবটাই মাধবী অনুভব করিল, তাহার পর যতটা রক্ত তাহার মুখমণ্ডলে ক্ষণপূর্ব্বে সঞ্চিত হইয়াছিল, নিমেষের মধ্যে তাহা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পাংশুমুখে নতনেত্রে সে বলিল, 'আপনি যখন এ-বিষয়ে আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন আমার ইচ্ছা থাক্‌লেও সাহায্য কর্‌বার উপায় ছিল না। এখন কিন্তু এ-বিষয়ে আমি আপনার সব-রকম আদেশ পালন কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

বিস্মিত হইয়া আগ্রহভরে বিমান জিজ্ঞাসা করিল "তখন উপায় ছিল না, কেন?"

কেন ছিল না, তাহা মাধবী সুরেশ্বরকে জানাইল।

শুনিয়া বিমানবিহারী স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল মাধবীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রগাঢ়স্বরে বলিল "তোমার দাদার আর তোমার পরিচয় কিছুদিন থেকে পেয়েছি, কিন্তু তোমরা যে এত মহৎ তা জান্‌তাম না তোমাদের কাছে আমি কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র! তোমার বিষয়ে আমি মনে-মনে যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর্‌তাম, আর একদিন যা ইঙ্গিতে তোমার কাছে প্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা করেছিলাম তা'র জন্যে আমি লজ্জিত মাধবী! তুমি আমার সে-ধৃষ্টতা ক্ষমা কোরো!'

প্রতিবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, মাধবীর মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। হেমন্ত-প্রভাতের অব্যাহত রশ্মিজালের মধ্যে তাহার ব্যথিত-বিহ্বল মূর্ত্তিটি সকরুণ চিত্রের মতন প্রতিভাত হইয়া রহিল, এবং দুইটি নেত্রপ্রান্তে উচ্ছলিত দুইবিন্দু অশ্রু তাহার নির্ম্মল অন্তঃকরণের অনির্ব্বচনীয় বেদনা ব্যক্ত করিল।

বিমানবিহারী বিমুগ্ধ নির্ণিমেষ-নেত্রে একমুহূর্ত্ত মাধবীর এই অপরূপ রূপমাধুরীর প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর মৃদুস্বরে ডাকিল, "মাধবী!"

মাধবী ধীরে-ধীরে বিমানবিহারী প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল।

'একটা কথা বল্‌ব, মাধবী?"

কিন্তু মাধবীরও উত্তর দেওয়া হইল না, বিমান-বিহারীরও কথা বলা হইল না, অকস্মাৎ সুরেশ্বর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'দুজনে মিলে একটা কোনো ষড়যন্ত্র চল্‌ছিল বুঝি?'

সুরেশ্বরের আকস্মিক প্রবেশে বিমানবিহারী এবং মাধবী উভয়েই এমন বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল যে কাহারো মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না।

সুরেশ্বর সহাস্যে বলিল, 'আমি না হ'য়ে যদি কোনো সি আই ডি অফিসর ঘরে ঢুকৃত, তা হ'লে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে' তোমাদের দুজনকে পত্রপাঠ একসঙ্গে চালান করে' দিত। কি চক্রান্ত চল্‌ছিল বলো দেখি?'

এবার বিমানবিহারী কথা কহিল ; স্মিতমুখে বলিল, "চক্র ত অনেক দিন থেকেই চল্‌ছে, এখন সেই চক্র কি করে' থামানো যায় তারি চক্রান্ত চল্‌ছিল।"

"কি ঠিক হ'ল ?"

"ঠিক এখনও তেমন কিছু হয়নি। বেলা নটার সময়ে স্ত্রী এবং কন্যার সহিত প্রমদাচরণ বাবু তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বেন ; আশা করি তখন সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" বলিয়া সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর মনে-মনে একটা কথা ভাবিয়া লইল, তাহার পর সহসা গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি দেখো, কোনো মীমাংসাই এ-বিষয়ে হবে না যতক্ষণ না একটা-কথার মীমাংসা হচ্ছে।"

উদ্বেগের সহিত বিমানবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কথার ?"

"বলেছি ত, যতক্ষণ না আমি নিঃসংশয়ে জান্‌ছি, যে সুমিত্রার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হ'লে তুমি দুঃখিত হবে না, ততক্ষণ এ-বিষয়ে কোনো কথাই হবে না।"

ব্যগ্রভাবে বিমান বলিল, "কি আশ্চর্য্য। আমি ত সে-কথা তোমাকে কতবার বলেছি।"

সুরেশ্বর বলিল, "শুধু তুমি কেন, তোমার চক্রান্তের সহযোগিনীটিও আমাকে সে-কথা অনেকবার বলেছে। কিন্তু, শুধু মুখের কথা এ-বিষয়ের প্রমাণ হ'তে পারে না।"

বিমানবিহারী উৎফুল্লনেত্রে একবার লজ্জানতনেত্রে মাধবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর একটু বিরক্তি-ভরে বলিল, "দেখ সুরেশ্বর, অনর্থক গোলযোগের সৃষ্টি কোরো না।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "গোলযোগের সৃষ্টি আমি কর্‌ছিনে, তুমিই কর্‌ছ।"

নানা-প্রকার অনুরোধ-উপরোধ, যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা বিমানবিহারী সুরেশ্বরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। সুরেশ্বর তাহার প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত রহিল।

তখন মুখ বক্র করিয়া বিমানবিহারী বলিল, কি কর্‌লে তোমার মনে সে-বিশ্বাস হবে শুনি ?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি কর্‌লে সে-বিশ্বাস হবে, তা, বিশ্বাস হবার আগে নিশ্চয় করে' বলা কঠিন !"

ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বিরক্তি-ব্যঞ্জক-স্বরে বিমান বলিল, "তোমার এ-আচরণে আমি একটুও মুগ্ধ হচ্ছিনে, সুরেশ্বর। এর দ্বারা তোমার একটুও মহত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না।"

মনে-মনে যথেষ্ট পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তবে কি প্রকাশ পাচ্ছে ?"

"বুদ্ধিহীনতা, ছেলেমানুষি। সুমিত্রার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কি এতই সামান্য মনে করো, যে আমার মনে আঘাত লাগবে কি লাগবে না, তা'র উপর তোমার এতটা মনোযোগ দেওয়া চল্‌তে পারে ?"

কোনোপ্রকারে হাসি চাপিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর বলিল, 'এ-যুক্তি নূতন নয়, একটু আগেও ত এই তর্ক তুমি তুলে-ছিলে।'

তখন নিরুপায় হইয়া বিমানবিহারী মাধবীর দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া মাধবী মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছে। তাহার মুখের সে আনন্দ-অভিব্যক্তি দেখিয়া বিমানবিহারী মনে-মনে আশ্বাস লাভ করিল। ধীরে-ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সে মাধবীর সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর অবিচলিতভাবে বলিল, 'মাধবী একটু আগে তুমি আমাকে বল্‌ছিলে যে এখন তুমি এ-বিষয়ে আমাকে সবরকমে সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত আছ। সুরেশ্বর নিজের মনে যে-বিশ্বাস পেতে চায়, অনেক-রকমে চেষ্টা করে'ও আমি তা উৎপন্ন কর্‌তে পার্‌লাম না। এ-দিকে প্রমদাবাবুদের আস্‌বার সময় হ'য়ে এসেছে। তাদের সাম্‌নে এই ব্যাপার নিয়ে যদি একটা গোলযোগ উপস্থিত হয় তা হ'লে সমস্যাটা ভবিষ্যতের জন্যে হয়ত আরও জটিল হ'য়ে দাঁড়াবে। এ-সঙ্কটে আমি দেখছি তোমার সহায়তা ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই। সেইজন্যে তোমার সাহায্য পাবার আশায় আমি একান্তভাবে তোমার কর প্রার্থনা কর্‌ছি।' বলিয়া সে তাহার দক্ষিণ হস্ত মাধবীর দিকে অসঙ্কোচে প্রসারিত করিয়া দিল।

বিমানবিহারীর কথা শুনিতে-শুনিতে মাধবীর মুখ

রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং দেহ মৃদু-মৃদু কাঁপিতেছিল। কিন্তু বিমানবিহারীর হস্ত যখন ঐকান্তিক প্রার্থনা লইয়া তাহার দক্ষিণ করতলের অতি নিকটে উপস্থিত হইল তখন ভাবাবেশে মাধবীর সকল অনুভূতি প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। একবার অপাঙ্গে সে বিমানবিহারীর মুখে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর হঠাৎ দেখা গেল কোন্ এক অনতিবর্ত্তনীয় মুহূর্ত্তে তাহার দক্ষিণ করতল বিমানবিহারীর করতলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে।

নিকটে দাঁড়াইয়া সুরেশ্বর পুলকিত-চিত্তে এই অপূর্ব্ব মিলনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিতেছিল। সে উভয়ের যুক্ত কর নিজ হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রসন্নমুখে বলিল, "বেশ! বেশ! আমি ঠিক এইটেই ভালো করে' জান্‌তে চাচ্ছিলাম। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি ভাই, তোমাদের এ-মিলন সব দিক্ দিয়ে শুভ হোক!"

* * * *

বাহিরে রাজপথে সুরেশ্বরদের গৃহ-সম্মুখে একটা মোটরকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ্বর চাহিয়া দেখিল তদুপরি পিতামাতার মধ্যবর্ত্তিনী সুমিত্রার সকরুণ মূর্ত্তি-খানি ঠিক তপস্যা-কৃশ পার্ব্বতীর মতন দেখাইতেছে।

সমাপ্ত

বাদল-প্রিয়া

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

বাদল-প্রিয়া, মেঘলা মেয়ে,
শাঙন-সাকী, আয়লো আয়,
কাজল-দেশের স্বপন-সখী
আয়লো মৃদুল দোদুল পায়!
হাতছানি দেয় ঝাউয়ের শাখা
চাতক মেলে তাতল পাখা,
মাছরাঙারা কাতর-চোখে
আকাশ পানে ঝিমিয়ে চায়,
আয়লো বাদল, ঘুম-কিশোরী,
আয়লো শীতল আদুল গায়!
তোর ডাগর কালো চোখের তারায়
হানুক চিকুর পুলক-ভরে,
সেই নয়নের লাজুক কোণে
কান্না ঝরুক অঝোর-ঝরে!
মেঘের জটা উড়ুক পিঠে,
মেঘ-বরণী মুখটি মিঠে,
মেঘের মতন বুকটি কাঁপুক
মলিন মাটির মিলন-তরে,
তোর ভোম্‌রা-কালো চটুল চোখে
তড়িৎ নাচুক চমক-ভরে।

জোয়ার-লাগা গাঙের মতন
গাটি দুলাও ঠমক্-দোল,
চপল পায়ে ঝর্‌ঝরানির
ঝর্ণা-ঘুঙুর ছন্দ তোল্!
হাওয়াতে হান্ হাতের তালি,
খুসীর মাতাল মাতন খালি,
তোর মোহন মেদুর মেঘ-মোলায়েম
নিটোল বাহুর আগল খোল্,
আবছা চুমায় নে ভরে' তোর
মেঘ্‌লা কোমল গালের টোল!

ঝিঙে শ্যামা বুলবুলি গায়,
কানাকানি লাগল ঘাসে,
হাস্নাহানা জুই কদমের
আগ ডালেতে খবর আসে!
পথের বাঁকে আমের শাখে,
বউ-কথা কও ডাক্‌তে থাকে,
শাল-হিজলের পাতার বীণা
বাজ্‌ল রে তোর সুবাস-শ্বাসে,
চাঁপা তাহার ঘোম্‌টা খোলে
তোর চুমনের পরশ-আশে!
পাঁয়জোরে তোর কঠিন ভুঁয়ের
থিতিয়ে-পড়া পরাণ মাতা,
আল্‌গোছা তোর আঙুল ছোঁয়ায়
কর্‌লে উতল তেঁতুল-পাতা!
দাদুরীরা দাদ্‌রা সুরে
তোর বরণের বাজনা জুড়ে,
শ্যাম-তুলিকায় লেখ্ কবিতা
ধরণী হোক্ সবুজ খাতা,
আম্‌লকী-বন ঘুমায় চুপে,
নাম্ লো, তাহার পরাণ মাতা।

সরম-ভরা রূপের গরব
ছ'ড়িয়ে দিয়ে ডাইনে-বাঁয়,
আয় রূপসী, এই উপোসী
ডাক্‌চে, বাদল; আয় লো আয়!
চষা ক্ষেতের গন্ধখানি,
সঙ্গে করে' আয় উজানী,
শিথিল করে' নীল আঁ'ওয়া,
দিল্-দুলানো অলস-পায়,
বাদল-প্রিয়া মেঘ্‌লা মেয়ে
শাঙন-সাকী, আয়লো আয়!

নারী

শ্রী সজনীকান্ত দাস

স্তব্ধ সাধনার মূর্ত্তি, অবরুদ্ধ গতির প্রবাহ,
নিঃশব্দ স্পন্দন
হেরিতেছি নেত্রে তব, হে বিনম্রা কল্যাণী রমণী!
সংসার বন্ধন—
তন্তুজালে দৃঢ় করে' বেঁধেছে তোমায় দেশে-দেশে
যুগ যুগ ধরি;
তুমি অকম্পিত বুকে স্মিতহাস্য চৌদিকে বিস্তারি'
রাখিয়াছ ভরি,
বেদনা-বিশীর্ণ এই সংসার অঙ্গন চিরকাল
হাস্যে লাস্যে তব;
হৃদয়ের ব্যথা নিয়ে ঢালিতেছ করুণার ধারা,
আনন্দ বিভব
নিত্য নব নব। এই নিরানন্দ সংসার-মরুতে
মরুস্রোত-সম;
নিজেরে জ্বালায়ে আছ স্নিগ্ধালোকে উজ্জলিত করি,
সংসার নির্ম্মম।
গুপ্ত করি আপনারে, লুপ্ত করি শিক্ষা দীক্ষা যত
ক্ষোভ অভিমান
প্রচ্ছন্ন বেদনা বুকে, শান্ত স্নিগ্ধ সস্মিত বয়ানে
করিতেছ দান
তিলে-তিলে পলে-পলে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব আপন
অতৃপ্ত পুরুষে;
ক্ষুব্ধ সন্তাপিত মনে ফিরিয়াও নাহি দেখ তুমি
কে লইল শুষে
জীবনের শান্তি-সুধা-ধারা! কে হরিল বক্ষ হ'তে
নারীত্ব তোমার!
আপনি সংসার বাঁধি, নিঃশেষে বিলায়ে আপনারে
কত বার-বার;
রূঢ় পুরুষেরে করো মৌন স্নেহ ক্ষমা প্রতিদিন
স্নিগ্ধ আঁখি তুলে';
নিঃস্ব ভিখারীর লাগি' অন্নপূর্ণা অন্নের ভাণ্ডার'
রাখিয়াছ খুলে'॥

ক্লান্ত হিয়া ক্ষুব্ধ বুকে দিবসের কর্ম্ম গ্লানি হ'তে
আসে যবে ফিরে'—
আপনার ব্যগ্রবাহু প্রেমাবেশে করিয়া বিস্তার
রাখো তা'রে ঘিরে',
মুছি' দাও ললাটের স্বেদজল, হৃদি-অবসাদ
করো তা'র দূর,
ভোগদ্রব্য সম রাখি আপনারে সম্মুখে সাজায়ে
দাও করি চূর
গৌরব সে আপনার। জননীর স্নেহে, ভগিনীর
আনন্দ-সম্ভাষে
হাস্যে লাস্যে বচন-বিন্যাসে রাখো মুগ্ধ করি তা'রে
প্রেম পরিহাসে।
স্রোতস্বিনী-সম তুমি অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি',
প্লাবিয়া ধরায়
চলেছ যে নিরুদ্দেশ, কোন্ পরিচিতের সন্ধানে
কোন্ অসহায়
কোথা পড়ে' কাঁদে তোমা লাগি। পথে-পথে যুগে-যুগে
সর্ব্ব দেশে-দেশে
সেই একই ইতিহাস; ভাসায়ে চলেছ দুই কূল;
বহু ভালোবেসে
সিক্ত করি রৌদ্রদগ্ধ ভূমি; শ্যামলিয়া এ ধূসর
বিশুষ্ক ধরারে
উল্লাসে নাচিয়া চলো গভীর অতল তলে রাখি
গুপ্ত আপনারে
নিঃশব্দ—স্পন্দনে। স্বেচ্ছায় বন্ধন নিলে আপনার
দেহ 'পরে তুলে',
শাস্তির কণ্টক যত নিঃশেষে মস্তকে রাখো ধরি'
পুরুষের ভুলে।
নীলকণ্ঠ-সম সংসারের আবিলতা-বিষে, হ'ল
তব কণ্ঠ নীল;
করুণায় শূন্যতারে রাখিয়াছ ভরি'—পূর্ণ আজি
অনন্ত নিখিল

তব স্নেহরসসুধালোকে। অন্তরের প্রতিবিন্দু
রক্তকণাদানে
জীয়াইয়া রাখো তুমি শুষ্ক শীর্ণ পুরুষ-পাদপে ;
সে ত নাহি জানে
কোথা কোন্ অন্ধকার ভূমিবক্ষ হ'তে, লুব্ধ প্রেমে
করে আহরণ
আপন জীবনীরস-ধারা ; অন্তঃপুর অন্তরালে
রহিয়া গোপন
কে জোগায় প্রাণের পীযূষ ! কত স্নেহ, কত ব্যথা
শঙ্কা, দ্বিধা কত
বিনিদ্ররজনী, অনাহার, দেবতা দুয়ারে শত
প্রার্থনা নিয়ত
আজন্ম রেখেছে তা'রে ঘেরি ! সেকি জানে কভু হায়
নিয়ে কত ব্যথা
সংসারের জয়যাত্রা-পথে বাহিরে পাঠালে তা'রে
আর্ত্ত ব্যাকুলতা
জননীর ! নিষ্ফল ক্রন্দনে দীর্ণ করি জীর্ণ বক্ষ
দেবতা চরণে
জানায়েছে করুণ মিনতি। উল্লাসে যে ছুটে' চলে
মরণ বরণে
সে কি জানে প্রেয়সীর নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা
মরণ অধিক,
সে কি জানে ভগিনীর অশ্রু ছলছল ; কত শুষ্ক
শূন্য চারিদিক্
জননীর নয়নে বিরাজে ! সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে
আজো তুমি নারী
অন্তরালে রয়েছ গোপনে, আঁধার মৃত্তিকা হ'তে
সঞ্জীবনী বারি
যুগে-যুগে করিছ প্রদান। সৃষ্টি-দিবসের সেই
সহাস্য আনন
আজো তব তেম্নি রয়েছে—খুঁজি যবে কোথা তব
নারীত্ব আপন,
কভু নাহি পাই দিশা—আপনারে রেখেছ ছড়ায়ে
সংসারের পথে,
সন্তান, সোদর, পিতা, ক্লান্ত ও ব্যথিত জন লাগি'
কত শত মতে
কত শাখা-প্রশাখায় শত দিকে নিজেরে বিস্তারি
করিতেছ দান,
শান্তছায়া সংসার-মরুতে, তোমারে না পাই খুঁজি'।
গাহি তব গান—
শুধু হেরি হাস্যভাতি স্নিগ্ধ স্নেহজাল ; বিদূরিয়া
এ সংসার তমঃ ;
জননী, ভগিনী, প্রিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে নারী
নমো নমো নমঃ।

পল্লীসঙ্গীতে ভক্তকবি ফকির লালন সা

শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

বনে মানুষের চোখের আড়ালে কত ফুল ফোটে ; নিজের রঙের প্রভায় সারা বনকে রাঙিয়ে তোলে, পাগল হাওয়া তা'র সুবাসরাশি নিয়ে দিগদিগন্ত আমোদিত করে' তোলে ; তা'র পর একদিন বৃন্ত থেকে জগতের সেই চিরন্তন প্রথানুযায়ী করাল কালের গভীর নিঃশ্বাসে ঝরে' পড়ে' যায়। জগতের কেউ তা'র খোঁজ করে না,—সে আপনার সুবাস আপনিই বিলিয়ে যায়। অথবা, সে জগতের কোলাহল ও লোকচক্ষু থেকে নিভৃতে একপ্রান্তে অজ্ঞানিতভাবে থাক্‌তেই ভালোবাসে।

মানুষের মধ্যেও ঐরকম দেখা যায়। কত সাধু মহাপুরুষ লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে জগতের কত মহৎ কাজ করে' গেছেন ; ঈশ্বর-প্রেমে বিভোর হ'য়ে কত কঠোর সাধনা করে' গেছেন। মানুষের সম্মান পাবার ইচ্ছা তাঁরা একটুও করেননি। এমন-কি যাতে লোকে তাঁদের নামটি পর্য্যন্তও না জানে, তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতি মানব চক্ষুর অগোচর থাকে, তা'র জন্যে তাঁরা অনেকখানি সঙ্কুচিত হ'য়ে থাক্‌তেন। তাঁরা চান নিরিবিলি স্থানটি, যেখানে আর কেউ না যায়। আর লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা সাধকের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। লোকের দেওয়া সম্মান বা ভক্তি সাধকের মনে অহং ভাব জাগাতে পারে। এটা এঁদের পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক। এছাড়া আরও অনেক-রকম ক্ষতি আছে। এইজন্যেই বোধ হয় তাঁরা জগতের কোলাহল থেকে নিজেকে দূরে রাখ্‌তে চান।

বাঙ্গালাদেশে এখনও অনেক সাধকের রচিত খেয়াল, টপ্পা, বৈতালিক সঙ্গীত প্রভৃতি শোনা যায়। তা'র মধ্যে অনেকের নামই অজ্ঞাত। দুই-একজনের নাম ঐ গানের মধ্যে একটু-আধটু পাওয়া যায় এইমাত্র। তাঁরা আপন-আপন আখড়ায় বা আস্তানায় থেকে সাধনা

করে' গেছেন। আর সময়ে-সময়ে একতারা সংযোগে ভক্তির উচ্ছ্বাসে দিগদিগন্ত সঙ্গীত-স্রোতে মগ্ন করে' দিয়েছেন। তা'র অনেক গান এখনও ফকির-উদাসীনের মুখে শোনা যায়।

ভক্ত-কবি সাধকপ্রবর ফকির লালন সা ইঁহার অন্যতম। বাঙ্গালা দেশে—বিশেষতঃ নদীয়া জেলায়—ইঁহার তৈরী গানগুলি সাধক, ফকির, বাউল, উদাসীনদের মধ্যে খুব প্রচলিত। তা'রা তাঁর সুমধুর গান একতারা সংযোগে গেয়ে বেড়ায়। এমন-কি গৃহস্থদের মধ্যে যাঁরা একটু ভক্ত, তাঁরা সন্ধ্যায়-বিকালে তাঁর গানগুলি ভক্তিগদগদ-চিত্তে গেয়ে থাকেন। *

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত ছিঁয়ড়ে নামক গ্রামে তাঁর আস্তানা ছিল। ছিঁয়ড়ে গড়াই নদীর ধারে ও কুষ্টিয়া সহর হইতে আনুমানিক ১ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জানা যায় না। তবে সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে ও তাঁর আস্তানা থেকে যা জানা যায় এইমাত্র। ঐ গ্রামে এখনও তাঁর আস্তানা আছে, ও সেখানে তাঁর এখনও অনেকগুলি শিষ্য আছেন। তিনি ৭৫।৭৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। আনুমানিক ত্রিশ বৎসর হইল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ১২৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জান্‌তেন কি না, সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কিন্তু তাঁর গানগুলি বেশ ভক্তি-উদ্দীপক ও উদার ভাবপূর্ণ। তাঁর তৈরী কতকগুলি গান দেওয়া গেল, ইহা হইতেই তাঁর পরিচয় স্পষ্টরূপে বোঝা যাবে। তাঁর মত খুব উদার ছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে তাঁর কোনো সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যজ্ঞান ছিল না। তাঁর সকল ধর্ম্মেই অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি কোন্ জাতি, বা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা কেহ সহজে অনুমান করতে পারত না। তিনি কোন্ জাতি জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তেন ;--

"সবলোকে কয় লালন কি জা'ত সংসারে।
বামুন চেনা যায় পৈতা দিলে বামুনী চেনা যায় কিসে ?"

* *

এই গানটির অবশিষ্টাংশ জানা যায় নাই। অর্থাৎ তিনি যে কোনো জাতির গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ তাহা তিনি স্বীকার করতেন না।

তিনি ঈশ্বরকে গুরু, দয়াল প্রভৃতি বলে' ডাক্‌তেন। তিনি যদিও নিজে কোন্ জাতি তাহা বল্‌তেন না, তবুও তিনি যে মুসলমান ছিলেন এটা ঠিক। তাঁর গানের মধ্যে অধিকাংশ শব্দই মুসলমানী, অর্থাৎ আরবী, এবং পারসীক শব্দ। তাঁর নামটিও ছিল মুসলমানী-ধরণের। মুসলমান সাধক, ভিক্ষুক, উদাসীন প্রভৃতিকে, ফকীর দেওয়ানা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে। কোনো হিন্দু সাধক কোনো দিন নিজেকে "ফকির" বলে' পরিচয় দেননি। লালন সা তাঁর গানের মধ্যে নিজেকে "ফকির" বলে' উল্লেখ করে' গেছেন। আর তাঁর গ্রামের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন, তাঁরা তাঁকে মুসলমান বলে'ই জানেন।

এইসমস্ত বিবরণ ছিঁয়ড়ে গ্রামের ও তা'র আশেপাশের অন্যান্য গ্রামের লোকদের মুখ থেকে ও আস্তানা থেকে অনেক অনুসন্ধান করে' সংগৃহীত হয়েছে।

নদীয়া জেলার প্রত্যেক পল্লীতেই তাঁর সঙ্গীতসুধা এখনও প্রচলিত। যখন তারা দিবসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর ভক্তিগদগদচিত্তে ঐ গানগুলি গায়, তখন বাস্তবিকই উহা মর্ম্মস্পর্শী হয়। লালন সা বড়একটা শিষ্য গ্রহণ করতেন না। লোকের মধ্যে তিনি কখনও নিজের মত প্রচার করে' বেড়াননি। তিনি একলা-একলা নিরিবিলি থাক্‌তে ভালোবাস্‌তেন। নীচে তাঁর কয়েকটি গান দেওয়া গেল।—

(১)

ক্ষম অপরাধ,
ওহে দীননাথ।
কেশে ধরে' আমায়
লাগাও কিনারে।
তুমি হেলায় যা কর,
তাই করতে পারো ;
দয়াল! তোমা বিনে পাপী
কে তারণ করে ?
শুন্‌তে পাই পরম পিতা গো তুমি
অতি অধম বালক আমি ;
ভজন ভুলে' কুপথে ভ্রমণ,—
তবে দাও না কেন কুপথ
সরল করে' ?
হেথায় তরঙ্গ আতঙ্কে মরি ;
কোথায় হে ভবপারের কাণ্ডারী
ফকির লালন বলে তরাও হে তরী
ও তোর দয়াল নামের দোসর
রবে সংসারে।

(২)

আয়গো যাই নবীর (১) দিনে (২)।
তরীগ (৩) দিচ্ছেন নবী জাহের (৪) বাতুল (৫)।
রোজা (৬) আর নমাজ (৭)
ব্রেক্ত* এহি কাজ ;
গুপ্ত পদ মিলে
ভক্তির সন্ধানে।
অমূল্য দোকান খুলেছেন নবী,
সে ধন চাবি সে ধন পাবি ;
সে যে বিনে-কড়ির ধন,—
সেধে দেয় এখন।
সে ধন না নিলে
আখেরে (৮) পস্তাবি মনে।
নবীর সঙ্গে ইয়ার (৯)
ছিলেন চারি জন
চার জনকে তিনি
দিলেন চার যোজন,
নবী বিনে পথে
গোল হ'ল চার মতে
ফকির লালন বলে
মন তুই গোলে পড়িস্‌নে।

* এ শব্দটির অর্থ বোঝা গেল না। এশব্দটি পারসী কিংবা আরবী বলে' আমার ধারণা ছিল। কিন্তু ঐ শব্দটি ঐ ঐ ভাষায় নাই। যাদের কাছ থেকে গান শোনা তা'রা লেখাপড়া জানে না। তাদের উচ্চারণের জড়তা এবং অশুদ্ধতাবশতঃ "বৃথা" প্রভৃতি কোনো শব্দের রূপান্তর এরূপ হ'য়ে থাকবে। অর্থাৎ ঐ শব্দের জায়গায় বৃথা দিলে ভক্তির সন্ধানে গুপ্তপদ লাভ হয়, কিন্তু সেই ভক্তি বিনা মামুলি-ধরণের রোজা-নমাজ বৃথা এরূপ অর্থ প্রকাশ করে।

(১) Prophet ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অর্থাৎ মহম্মদ। (২) ধর্ম্ম। (৩) পথ। (৪) প্রকাশ। (৫) গোপন। (৬) উপবাস। (৭) উপাসনা। (৮) পরিণামে। (৯) বন্ধু।

এই সঙ্গীতটির মধ্যে অনেকগুলি আরবী শব্দ আছে। আর এর মধ্যে যে-সমস্ত কথা দেওয়া হয়েছে, সমস্তই মুসলমানী ধর্ম্মশাস্ত্রের।

(৩)

আমি চরণ পাবো কোন্ দিনে ?
আমি ঘাটে-ঘাটে পথে-পথে
কাঁদ্‌ছি তোমার জন্তে।
গুরু আমার দয়াল ভারি,
করলেন আমায় বনচারী
গুরু দীনের অধম করলে
হাতে দিয়ে শিঙে।
চরণ পাবার আশে গুরু!
ফিরি তোমার দাসের দাসী (মন রে),
গুরু দীনের অধম করলে
হাতে দিয়ে শিঙে।
আমি ঘাটে-ঘাটে পথে-পথে
কাঁদ্‌ছি তোমার জন্তে।

এই সঙ্গীতটির ভিতর দিয়ে সাধকের ঈশ্বর-লাভের ব্যাকুলতা বেশ ফুটে' উঠেছে।

(৪)

কার বাড়ীতে করো গো বসত,
এবাড়ী ত তোমার না।
বাড়ী করার বাঞ্ছা করো,
আগে গিয়ে মানুষ ধরো ;
গুরুর কাছে পাট্টা করো,
অনুমানে রেখ না।
আপন ঘরের নাই ঠিকানা,
বাঞ্ছা করো মন পরকে চেনা ;
ফকির লালন বলে পাট্টা করো
অনুমানে হবে না।

আপনাকে সংযত না করে', আত্মজ্ঞান লাভ না করে' ঈশ্বর লাভেচ্ছায় ধ্যান ধারণা প্রভৃতি ভিত্তিহীন, এবং আত্মজ্ঞান লাভ করতে হ'লে সৎসঙ্গের প্রয়োজন; ইহাই সাধক প্রকাশ করছেন। এখানে "মানুষ" অর্থে মহদ্ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। কর্ত্তাভজারা মহৎলোকদিগকে "মানুষ" বলেন।

(৫)

কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী!
এ ভব তরঙ্গে আমার,
এসে কিনারায় লাগাও তরী,
তুমি হে করুণা-সিন্ধু,
অধম জনের বন্ধু,
দেও হে আমায় পদারবিন্দ
যাতে তুফানে তরী তরিতে পারি।
সকলেরেই নিলে পারে,
আমা হতে চেলে না ফিরে' ;
লালন বলে ইহাই ছিল!
দয়াল! আমি কি তোর এতই ভারী!

(৬)

আমার এ ঘরকন্নায়
কে বিরাজ করে ?
আমি জনম ভরে' একদিনও
দেখলাম না তারে।
নড়ে-চড়ে ঈশান কোণে,
দেখতে পাইনে দুনয়নে ;
হাটের কাছে ঘর
ভবের হাট বাজার ;
আমায় কেউ দিল না
একটা নির্ণয় করে'।
সবে বলে প্রাণ পাখী,
শুনে' চুপে-চুপে থাকি ;
(ও সে) জল কি হুতাশন
ক্ষিতি কি পবন ;
আমি ধর্‌তে গেলে
পাইনে তারে।
আপন ঘরের খবর হয় না,
বাঞ্ছা করো মন পরকে চেনা
ফকির লালন বলে পর
বল্‌তে পরমেশ্বর,
(ও সে) সে কেমন রূপ
আমি কোন্ রূপেরে!

ফকির লালন সার গানগুলি পুস্তিকাকারে লিখিত বা রক্ষিত হয় নাই; সমস্তই লোকের মুখে। যারা এঁর গান করে, তা'রা প্রায়ই অশিক্ষিত। সেইজন্ত উচ্চারণের অশুদ্ধতাবশতঃ অনেক গানের অনেক জায়গায় শব্দের বিকৃতি ঘটেছে, এবং কোথাও বা শব্দের বিকৃতির জন্ত অর্থের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

ইঁহার গানগুলি বেশ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। প্রত্যেক গানটিই যেন ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভরা। লালন সার শিষ্যের মধ্যে একজন শিষ্যের নাম ছিল তিনু। তিনুই বোধ হয় তাঁর শিষ্যগণের ভিতর প্রধান ছিলেন। তাঁদেরই রচিত কোনো-কোনো ভণিতার মধ্যে ফকির লালন সা ও তিনু—এই দুইজনের নামেরই উল্লেখ দেখা যায়।

এই পুণ্যভূমি বাঙ্গালা দেশে এরূপ আরও কত সাধু মহাপুরুষ ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে কঠোর সাধনা করে' গেছেন, তা'র ইয়ত্তা নেই। তাঁরা নিজেকে লোক-সমাজে প্রকাশ করেননি; তাই তাঁদের নাম ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি চিরদিনের জন্ত গুপ্ত রয়ে' গেছে। আমাদেরও এম্‌নি দুর্ভাগ্য যে আমরা তাঁদের বিষয় কিছুই জানতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করিনে। এই শ্রেণীর সাধকসম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই অশিক্ষিত। অথচ তাঁদের চিন্তা, বাণী ও সঙ্গীত কিরূপ উচ্চ এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ও উপদেশপূর্ণ! ইহাতে মনে হয় এঁদের উচ্চভাবগুলি ঈশ্বরদত্ত। উচ্চাঙ্গের সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা আজকাল সর্ব্বজন-বিদিত, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত। তাঁরা অনেকে উচ্চভাবসম্পন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়তেন, তাঁদের সৎসঙ্গেরও অভাব ছিল না। কাজেই তাঁদের ভাবগুলি এক-রকম পরের কাছে ধার করা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এইরূপ সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ নিরক্ষর সাধকদেরও সেরকম কোনো সুবিধা ছিল না। অথচ তাঁরা উচ্চ-ভাবসম্পন্ন ঈশ্বর ভক্ত হ'য়ে গেছেন। সেইজন্তে মনে হয় এদের এই উচ্চভাব, সাধনা শক্তি সমস্তই ঈশ্বরদত্ত।

দুইখানি প্রাচীন ইতালীয় চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

গান

মিশ্র পিলুখাম্বাজ—দাদরা

কথা ও সুর—শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন] [স্বরলিপি—শ্রী দিলীপকুমার রায়

ও গো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন্ বিমানে।
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ করুণ গানে।
জগতের গহন বনে ছিনু আমি সঙ্গোপনে,
না জানি কি লয়ে' মনে এলে উড়ে' আমার প্রাণে।
লয়ে' তোমার মোহন বরণ (তুমি) শুক্‌নো ডালে রাখ্‌লে চরণ,
আজ আমার জীবন মরণ কোথায় আছে কেবা জানে।
ঝরে' গেছে সকল আশা ফোটে না আর ভালোবাসা,
আজ তুমি বাঁধ্‌লে বাসা আমার প্রাণে কোন্ পরাণে।

। । ন্‌া I ন্‌া ন্‌া সা I সা সরা জ্ঞা I রা রজ্ঞা রজ্ঞা I সা । সা I রা মা মা I গা -া মগা I রা সা -া I
-- ও আমার নবীন শাখী - --ছি লে তু মি কোন্ বি মানে -

সা সরা মজ্ঞা I রসা সরা সন্‌া I সা সা -া I রা রগা রগা I সা।সা I র; পা মপা I গা-া রগমগা I রা সা -া I -া -া -া I -া
ও গো - - আমার নবীন শাখী ছি লে তু মি কোন্ বি মানে - - - - -

সা সা I সা গা -া I গ্মা গা -া I মা -া গমগা I রা রগা মা I রগা -া সা I রপা মা -া I গা রগা মগা I রা সা -া I
আমার সকল হিয়া - মু - ঞ্জ রিছে তো মার ও ই করু ণ গানে -

II { । । সা I ন্‌া ন্‌া সা I সা সা -া রা রা গা I সা রগা মপা I মপা মা মপা I গা -া রগমগা I রসা সা -া I } II -া -া
-- ও আমার নবীন শাখী ছিলে - - তু মি কোন্ বি মানে - --
[পা দা দা পা -া -া ।]

সা I রা মা মা I পা পা -া I দা পা দা I পা । মা I মা পা পধা I মা -া পধপা I মা মগা রগা I রগা -া
জ গতের গহন বনে - --ছি নু আমি সঙ্গো পনে - - -

সা I গা গা গা । গা গা মা I গা গা মা গা রা রা I রগা পা মপা I গা গা গা I রা সা -া I -া -া
না জানি কি লয়ে - মনে - --এ লে উ ড়ে আমার প্রাণে -

সা I গা গা গা I গা গা মা I গা গা মা I রা গমা ধপা I ক্ষপা গা মা I গা গা গা I সা সা -া I II II
না জানি কি লয়ে - মনে - এ লে - - উ ড়ে আমার প্রাণে -

সা I রা মা মা I পা পা । I দা পা দা I পা ।-া I -া মা মা I মা মা মা I পা পা ধা I মা-া মপধপা I মা মগা রগা I রগা।
ল য়ে তোমার মোহন বরণ --- -তুমি শু ক্‌নো ডালে - রাখ্‌লে চ র - ণ -

{ সা I গা গা -া I গা গা ম্‌া I গা মাগা মগা I রা গমা ধপা I ক্ষপা গা মা I গা । গা I সা সা -া I (-া -া) } II II
আজ আমার জীবন ম র ণ কোথা - য় আছে কে-বা জানে - --

{ সা I রা মা মা I পা পা -া I দা পা -া I -া -া মা I মা পা পধা I মা মপা ধপা I মা মগা রগা I রগা -া }
ঝ রে গেছে স কল আশা - --ফো টে না আর ভা লো - বা সা - --

সা I গা গা -া I গা -া মা I গা মগা মা I রা গমা ধপা I ক্ষপা গা মা I গা । গা I সা সা -া I (-া -া) } I II II
আজ তু মি - বাঁধ্‌লে বা সা - আমা - র প্রাণে কোন্ প রাণে - - -

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

ভারত-সরকারের বার্ষিক বাণিজ্য-বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৯০৪ ৫ সালে আমাদের রপ্তানি ১৫০ কোটি টাকার এবং আম্‌দানি ছিল ১১০ কোটি টাকার; ১৯১৪-১৫ সালে যুদ্ধের প্রারম্ভে, রপ্তানি ছিল ১৮৭ কোটি টাকার ও আম্‌দানি ছিল ১৬৭ কোটি টাকার। কিন্তু ১৯২৩ ২৪ সালে সেই রপ্তানি ৩৬৭ কোটি টাকায় এবং আম্‌দানি ২৯০ কোটি টাকায় গিয়া পৌছিয়াছে। সুতরাং গত বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতের বহির্বাণিজ্য শনৈঃশনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সময় এই বিষয় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য-ব্যাপারের সকল বিষয়েই বিশেষত্ব আছে। আমাদের এই বহু জনাকীর্ণ দেশে মজুর অতি সস্তায় পাওয়া যায় এবং উৎপন্ন-দ্রব্যের ক্ষেত্রও আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষে। অথচ ইয়োরোপের সহিত কোনো-প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ দাঁড়াইতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ, ভারত কৃষি-প্রধান দেশ; সমুদায় দেশের প্রায় শতকরা ৭২ জন লোক চাষবাস করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। এখানে কল-কারখানার পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি অল্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছায়াযুক্ত শান্ত পল্লী-জীবন এখনও আমাদের প্রীতিকর ও আকাঙ্ক্ষণীয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্প পরিশ্রমেই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি। কল-কারখানার হাড়ভাঙা পরিশ্রম আমাদের ধাতে সহ্য হয় না। এতদ্ভিন্ন, বহির্বাণিজ্য করিতে গেলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী, বীমা, আনয়ন-প্রেরণের নৈকট্য বা জাহাজ ভাড়ার স্বল্পতা ইত্যাদির সমবেত সুবিধা স্বাধীন জাতিদিগের পক্ষে যত সাহায্যকারী, আমাদের পক্ষে ততটা নহে। এতদ্ব্যতীত বলবান্ ও ধনশালী জাতিরা ব্যাঙ্কের সাহায্য যতটা গ্রহণ করিতে পারে, আমাদিগের সে সুযোগ-সুবিধা নাই। তথাপি, কর্ম্মপ্রবণ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষ কল-কারখানার দিকে একটু-একটু নজর দিতেছে। এই বিশ বৎসরের বাণিজ্য-বিবরণী তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

ভারত হইতে প্রধানতঃ ভূমিমাল বা কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি হয়। আমরা ভূমিমালের পরিবর্ত্তে তৈয়ারী-মাল ক্রয় করিয়া থাকি এবং যে-পরিমাণ টাকার মাল আম্‌দানি করি, তদপেক্ষা অধিক টাকার মাল রপ্তানি করিয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা ভারতবর্ষে তুলা উৎপাদন করি, আর সেই তুলা বস্ত্রে পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে; আমাদের দেশের উৎপন্ন চামড়া জুতায় পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের শ্রীচরণের শোভা বর্দ্ধন করে, রঞ্জন-শিল্পের উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি একমাত্র আমাদের দেশ হইতেই বিদেশে রপ্তানি হয়, এবং রং প্রস্তুত হইয়া আসিলে তাহা আমরা শতগুণ বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করি। এইরূপে, আমাদের যাবতীয় উৎপন্নদ্রব্যই বিদেশী কর্ত্তৃক কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতের আম্‌দানি-রপ্তানির হিসাব খতাইয়া দেখিলে মোটামুটি দেখা যায় যে, আম্‌দানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী অর্থাৎ ভারতের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু, রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য বেশী হইলেও, ভারতের দারিদ্র্যাপবাদ ঘুচিতেছে না কেন, তাহা অর্থনীতি-শাস্ত্রের কথা। তাহার আলোচনা সময়-স্থান-ও ধৈর্য্য-সাপেক্ষ; বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহা আলোচ্য বিষয় নহে। তবে মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে, কল কারখানা স্থাপন করিয়া, যে পরিমাণ কাঁচামাল আমরা বিদেশে প্রেরণ করি, তাহা এ-দেশেই ব্যবহার করিয়া, তাহা হইতে শিল্প-দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিলে বৈদেশিক পণ্যের আম্‌দানি অনেকটা কমিতে পারে এবং দেশের দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে না দূর হইলেও বেকার-সমস্যা যে বেশীর ভাগ ঘুচিবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এ-বিষয়ে অর্থ-নীতিজ্ঞের অভিমতই গ্রহণীয়।

১৯২৩-২৪ সালে মোট ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৬৫৭১১৮৫৫২৯৭ টাকার; ১৯২২-২৩ সালে ছিল ৬২৮৮৬০৮৯৬৫ টাকার। তন্মধ্যে খাঁটি ভারতীয় জিনিসের রপ্তানি পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ১৯২৩-২৪ সালে ৪৯৫ ৪ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে এবং পুনঃ রপ্তানি অর্থাৎ বিদেশী [illegible]ল ভারতে একবার আম্‌দানি হইয়া যাহা আবার অন্যান্য বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহা ২০৯ লক্ষ টাকার কম হইয়াছে। আম্‌দানি পণ্যের মধ্যে সাধারণ বণিক্‌গণের দ্বারা আনীত মাল, খাস সরকারের প্রয়োজনীয় মাল এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রধান। নিম্নে ১৯২২-২৩ ও ১৯২৩-২৪ সালের বাণিজ্যের মোট হিসাব দেওয়া হইল :—

আম্‌দানি—	১৯২২-২৩ টাকা	১৯২৩-২৪ টাকা	হ্রাস (—) ও বৃদ্ধি (+)
বে-সরকারী পণ্য	২৩,২,৭০,৭৬,৮৯৩	২,২৭,৬২,৬৫,০০৬	—৫০৮,১১,৮৮৭
বে সরকারী স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬৩০৪,৪০,০১৭	৫২২০,২৭,৪০৩	—১০৮৪,১২,৬১
খাস-সরকারের পণ্য	১৩৪৮,৪৭,২১৬	৯৫৪,৫৩,৮৫৯	—৩৯৩৯৩৩৫৭
খাস সরকারের স্বর্ণ ও রৌপ্য	৫৩,৫৬,০৭৯	১০০,১৩,১৬৩	+৪৬,৫৭,০৮৪
মোট আম্‌দানি	৩০৯৭৭,২০,২০৫	২৯০৩৭,৫৯,৪৩১	—১৯৩৯, ৬০,৭৭৪
রপ্তানি—			
খাঁটি ভারতীয় জিনিস	২৯৯১৬,১৯,৩২২	৩৪৮৫৯,৬০,৯৩৭	+৪৯৪৩,৪১,৬১৫
পুনঃরপ্তানি	১৫১৬,৩৩,২৭৬	১৩০৭,৪৭,৬৩১	—২০৮,৮৫,৬৪৫
সরকারী পণ্য	১৭৪,৬৪,৩১৭	১৪৬৫৪,৭৮৫	—২৮,০ ৯,৫২৯
সরকারী স্বর্ণ ও রৌপ্য	২৩,৫৮৫৬৭	১১,৯১,৮৫৫	—১১,৬৬,৭১২
বে-সরকারী স্বর্ণ ও রৌপ্য	২৭৮,১৩,২৭৮	৩৫৫,৪০,৬৫৫	+ ৭৭,২৭,৩৭৭
মোট রপ্তানি	৩১৯০৮,৮৮,৭৬০	৩৬৬৮০,৯৫,৮৬৬	+৪৭৭২,০৭,১০৬

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে (সরকারী পণ্য ও স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত) ১৯২৩-২৪ সালে বিভিন্ন প্রদেশের অংশ :—

	আম্‌দানি লক্ষ টাকা	রপ্তানি লক্ষ টাকা	মোট লক্ষ টাকা
বঙ্গদেশ	৮২,৪৮	১৩২,২৮	২১৪,৭৬
বিহার ও ওড়িশা	——	৪	৪
বোম্বাই	১৩৬,৪৭	১১৭,৯২	২৫৪,৩৯
সিন্ধুদেশ	২২,৩১	৩৯,৮৩	৬২,১৬
মাদ্রাজ	২০,০৭	৩৫,৯১	৫৫,৯৮
ব্রহ্মদেশ	১৮,৫০	৩৯,২৪	৫৭,৭৪

যে সকল দেশ ভারতবর্ষে মাল রপ্তানি করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ১৯২২-২৩ সালে গ্রেট্‌ব্রিটেন শতকরা ৬০ অংশ, জার্ম্মানী ৫ অংশ, জাভা, জাপান ও মার্কিন্ যুক্তরাজ্য প্রত্যেকে ৬ ও বেলজিয়ম শতকরা ৩ অংশ সরবরাহ করিয়াছে। আর ভারতবর্ষ হইতে ঐ বৎসর গ্রেট্‌ব্রিটেনে শতকরা ২৩ অংশ, জাপানে শতকরা ১৩ অংশ, মার্কিনে শতকরা ১১ অংশ, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর প্রত্যেকে শতকরা ৫ ও বেলজিয়মে ৪ অংশ মাল রপ্তানি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে (১৯১৩-১৪ সালে ভারতের আমদানির শতকরা ৭ ও রপ্তানির ১০ অংশ জার্ম্মানীর ছিল) গ্রেট্‌ব্রিটেনের পরই জার্ম্মানীর সহিত ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-পরিমাণে [আমদানি ও রপ্তানি] বাণিজ্য চলিয়াছিল। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলতা ও জার্ম্মান মুদ্রার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ ভারতের বাজার হইতে তাহাকে একরকম বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। গত বৎসর হইতেই জার্ম্মানী একটু-একটু বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য প্রধান দেশসমূহের তুলনায় তাহা অতি কম। বিলাতী বণিক্ ভারতের বাজারে একাধিপত্য করিতে উৎসুক হইলেও তাহাদের বন্ধু জাপান ও মার্কিনকে কিছু বলিতে পারে নাই। এই চক্ষুলজ্জার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিদ্যায় শিক্ষিত জাপান ভারতের বাজারে পসার বিস্তৃতি করিতে কোনো কার্পণ্য করে নাই। বর্ত্তমানে গ্রেটব্রিটেনের পরই ভারতের কাঁচামাল খুব বেশী পরিমাণে ক্রয় করিয়াছে জাপান। যুদ্ধের পূর্ব্বে, জাপান ভারতের আমদানির শতকরা ৩ অংশ সরবরাহ করিয়াছিল ও রপ্তানির ৯ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

গত দুই বৎসরে কোন্-কোন্ দেশের সঙ্গে কি-পরিমাণে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল। ইহা হইতে পরস্পর দেশসমূহের বাণিজ্যের হ্রাসবৃদ্ধি স্পষ্ট দেখা যাইবে।

	১৯২২-২৩		১৯২৩-২৪	
	আমদানি লক্ষ টাকা	রপ্তানি লক্ষ টাকা	আমদানি লক্ষ টাকা	রপ্তানি লক্ষ টাকা
গ্রেট্‌ব্রিটেন	১৪০,০৫	৬৫,৯১	১৩১,৬০	৮৬,৮১
জাপান	১৪,৪২	৪,০,৭০	১৩,৬৫	৪,২,২০
মার্কিণ	১৩,১৮	৩৪,৩৩	১২,৭৯	৩৩,৪৭
জাভা	১২,৮৯	৩,১৩	১৪,০৩	৩,৬৮
জার্ম্মানী	১১,৮৯	২২,৫০	১১,৮৯	২৩,০৫
বেলজিয়ম্	৬,৩২	১১,৩০	৫,৫৪	১০,৮৮
নেদারল্যাণ্ড	২,২২	৪,০৩	২,২৯	৫,৭১
ইতালি	২,১০	১০,১৫	২,৭৫	২,১৮৬
ফ্রান্স	১,৯৬	১৫,৩৯	২,২৩	১৯,৮৫
কেনিয়া উপনিবেশ	১,১৫	৮৯	২,১৯	৮৫

আমরা যে-সকল দ্রব্য বিদেশে কাঁচামালরূপে রপ্তানি করি, তন্মধ্যে তুলা, পাট, তৈলবীজ, রঞ্জন-শিল্পের উদ্ভিজ্জ পদার্থ, চামড়া, লাক্ষা, চা, রবার ইত্যাদিই প্রধান।

ভারতীয় তুলা আমাদের বস্ত্র বাণিজ্যে কি স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই হিসাব রাখেন না। আমাদের দেশ-জাত রপ্তানি তুলার মূল্য যাবতীয় আমদানি তুলা-জাত দ্রব্যাদির মূল্যের অপেক্ষা অধিক। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সালে ভারত হইতে তুলা রপ্তানি হইয়াছিল ৯৮ কোটি টাকার এবং তাহার পরিবর্ত্তে আমরা ভারতে আমদানি করিয়াছিলাম ৭০ কোটি টাকার সর্ব্বপ্রকারের তুলা-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি। এত-পরিমাণ তুলা আমাদের দেশে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে আবার আমাদিগকে তুলা আমদানি করিতে হয়। অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে তুলার চাষ আদৌ হয় না, সেই ইংলণ্ড হইতেই এখানে বেশীর ভাগ তুলা রপ্তানি হয়। ইহার কারণ, ইংলণ্ড ধনশালী ও বলবান্। ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রায়শঃ ইংরেজের হাতে। তাহারা তাহাদের আপন-আপন ব্যাঙ্কের সাহায্যে তুলা-উৎপাদনকারী দেশসমূহ হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল কিনিয়া রাখে এবং অন্যান্য দেশগুলিকে সেই তুলা অধিক মূল্যে কিনিতে বাধ্য করে। নিম্নের হিসাব হইতে ভারতের তুলার আমদানি ও রপ্তানির ধারা বুঝা যাইবে :—

		১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪
আমদানি	টন,	২৪,৪৫০	১০,৭০৮	১২,৭১৮
	লক্ষ টাকা,	৩,৪৪	১,৭৩	২,৫০
রপ্তানি	টন,	৫৩৩,৮০২	৬০০,৩৯৭	৬৭১,২৯৩
	লক্ষ টাকা,	৫৩,৯৭	৭০,৯৭	৯৮,৩৫

পাট বাংলার সর্ব্ব-প্রধান কৃষি-জাত দ্রব্য। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে যত টাকা মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়, পাটের মূল্যই তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ হইবে। ১৯২৩-২৪ সালে ভারতের সমস্ত রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৩৬৭ কোটি টাকা ; তন্মধ্যে পাটের কাঁচামালের মূল্য ২০ কোটি ও তৈয়ারী মালের মূল্য ৪২ কোটি টাকা ; এই ৬২ কোটি টাকা মোট পাটের মূল্য। ইহা ভিন্ন, এদেশে মজুত ও ব্যবহৃত পাটও ছিল ; তাহার মূল্যও কম নহে। এ-সমস্তই বাংলার ঐশ্বর্য্য। সমগ্র ভারতে ৩৩২টি কাঁচা পাটের গাঁইট বাঁধার কল আছে। ইহার অধিকাংশই বিদেশীয় কর্ত্তৃক পরিচালিত। মোট ৩৭৬৮৭ জন মজুর দৈনিক এই কলে কাজ করে। পাট ভারত সাম্রাজ্যের কিরূপ মূল্যবান্ সম্পত্তি তাহা একবার দেখা যাক্। কলিকাতাস্থিত কলসমূহে গত তিন বৎসরে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে। বিলাতের কলের উৎপন্ন দ্রব্যের লাভও এইরূপ ধরিলে, গড়ে বৎসরে পাটের লাভ প্রায় ১০ কোটি টাকা হয়। কলে কর্ম্মচারীদের বেতন, দালালী কমিশন ও অন্যান্য খরচের বহু টাকাও বিদেশীয়দের হস্তেই যায়। তৎপরে রেল-ষ্টিমারের ভাড়া, বীমা ইত্যাদি প্রায় সবই বিদেশীয়েরা পায়। এইসব খরচের টাকার হিসাব ধরিলে প্রায় আরও ১০ কোটি টাকা পাট হইতে আদায় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রায় ২০ কোটি টাকা পাট হইতে বৎসরে উৎপন্ন হয়। এখন এই পাটের কারবার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে থাকিলে এবং ভারতীয় ভিন্ন অপর কোনো জাতির মূলধন দ্বারা পরিচালিত না হইলে, এই ২০ কোটি টাকা পাটের লাভ এদেশেই থাকিয়া যাইবে।

গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে যত পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব :—

		১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪
পাট (কাঁচামাল)	টন,	৪৬৭,৬৮৫	৫৭৭,৯৫৫	৬৫৯,৯৬৩
	লক্ষ টাকা,	১৪,০৫	২২,৫৩	২০,০০
সর্ব্বপ্রকার থলে, চট ইত্যাদি	লক্ষ টাকা,	৩০,০০	৪০,৪৯	৪২,২৮

তৈলবীজ ভারতবর্ষের একচেটিয়া বলিলেও হয়। পৃথিবীর কুত্রাপি এরূপ নানা-প্রকারের তৈলবীজ এত অধিক-পরিমাণে উৎপন্ন হয় না বলিলেও চলে। এখানে উৎপন্ন বীজের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়। এদেশে অতি অল্প-পরিমাণ বীজ হইতে তৈল নিষ্পেষিত হয়। ১৯২৩-২৪ সালে ২৯,৮১,৭১,৬৪৩ টাকা মূল্যের (১২,৫৫,১২৩ টন) তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানি হয়। এত অধিক-পরিমাণে তৈলবীজ রপ্তানির পরিণাম এই হয়

যে, এদেশ হইতে অল্প মূল্যে বীজ বিদেশে যায় এবং সেখানে তৈল নিষ্পেষিত হইয়া আসিয়া এখানে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। অধিকন্তু তৈলের খইল হইতে আমরা বঞ্চিত হই। ভারতের গো-জাতির অবনতি ও ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি হ্রাস—এই দুই সমস্যার সহিত খইল-সারের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আলোচ্য বৎসরে ১,৯৪,০৯,৮৫২ টাকা মূল্যের (১,৭৮,০৪৪ টন) খইল এখানের নিষ্পেষিত বীজ হইতেও বিদেশে রপ্তানি হয়। আবার তৈল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়ায় তৈল-সংক্রান্ত-শিল্পগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে না। কেবল আমরা পরের মুখাপেক্ষী হইয়াই পড়িতেছি। গভর্ণমেণ্ট এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য কোনো চেষ্টা করিতেছে না, বরং যাহাতে তৈল অপেক্ষা তৈলবীজ এখান হইতে বিদেশে বেশী রপ্তানি হয়, শুল্কের দিক্ হইতে তাহাই করিয়াছে। ব্যবসায়িগণও তৈল রপ্তানি না করিয়া বীজ রপ্তানি করে, কারণ তাহাতে তাহাদের লাভ বেশী।

ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণে কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয় ও জুতা তৈয়ারির উপযুক্ত চামড়া বা তৈয়ারী জুতা হইয়া এদেশে আমদানি হয় এবং তখন তাহার মূল্য প্রায় দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। ১৯২৩-২৪ সালে ৪৮,৮৯৫ টন কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। চামড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এখন ১৪৭টি ট্যানারি আছে এবং সেই ট্যানারিগুলিতে প্রায় ১৪,২৮০ জন লোক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। পূর্ব্বে লিখিত ট্যানারিগুলির মধ্যে ৮৮টি মান্দ্রাজ প্রদেশে ও ৮০টি পঞ্জাবে আছে। কানপুরের ট্যানারি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এইসকল ট্যানারিতে জুতা ব্যতীত ঘোড়ার লাগাম, জিন ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে আনীত বুট ও শুএর পরিমাণও ভারতে দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২২-২৩ সালে ১৮লক্ষ টাকার ও ১৯২৩-২৪ সালে ২৫ লক্ষ টাকার বুট ও শু বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৈয়ারী চামড়াও ৫২ লক্ষ টাকার দুই বৎসরের প্রতিবৎসরে গড়ে আসিয়াছে।

রং প্রস্তুতের উদ্ভিজ্জ পদার্থ, লাক্ষা, হাড়ের গুড়া (সার) ইত্যাদিও আমাদের দেশ হইতে বিদেশে প্রতিবৎসর যথেষ্ট-পরিমাণে রপ্তানি হয়। তিন বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ক্রমে রপ্তানির পরিমাণ বর্দ্ধিতই হইতেছে; সুতরাং ইহা দ্বারা এই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের লোক এই কাঁচা মাল দ্বারা আমাদের ব্যবহার-উপযোগী শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইতেছে না। বিদেশীয়েরা উহা দ্বারা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের অর্থ শোষণ করিতেছে। জমিতে সাররূপে ব্যবহার্য্য কোনো পদার্থ যাহাতে দেশ হইতে রপ্তানি না হইতে পারে এবং কেবল চিকিৎসা ও ও বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার চেয়ে বেশী আফিম যাহাতে উৎপন্ন না হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের এমন আইন করা উচিত।

বিবিধ রপ্তানির হিসাব।

		১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪
রং প্রস্তুতের উদ্ভিজ্জ পদার্থ	হন্দর,	১৩,৯৪,৮১১	১৬,১১,৮০২	১৫,১৭,১২৮
	লক্ষ টাকা,	১,৩৩	১,২০	১,২২
লাক্ষা	হন্দর,	৩,৩৪,৯৩৪	৪,৭০,০১১	৪,৮৫,৬৭১
	লক্ষ টাকা,	৭,৯২	১০,২৭	৯,০৭
হাড়ের গুঁড়া (সার)	টন,	১,০৫,১১০	১,১০,৬৬০	১,৩০,৭২৯
	লক্ষ টাকা,	১,১৭	১,২৪	১,৫৯
আফিম	হন্দর,	৮,৯৩৯	৮,৮৪৮	৯,০৪২
	লক্ষ টাকা,	২,০৬	২,৪৫	২,৬৭

ভারতে বিদেশ হইতে যে-সমস্ত পণ্যদ্রব্য আমদানি হয়, তা লৌহ-জাত-দ্রব্য, কল-কারখানা-জাত-দ্রব্য, ধাতব-দ্রব্য, রেলওয়ে-সং জিনিস, তুলা-জাত-দ্রব্য, ও পশমী বস্ত্রাদি প্রধান। এইসকল বি দ্রব্যের ভিতরে আমরা বস্ত্র-শিল্প ও চিনির আমদানি বিষয় আলো করিব। কারণ, ভারতে আমদানি-পণ্যের ভিতরে এই দুইয়ের পরিম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং ইচ্ছা করিলে এ-বিষয়ে ভারতবর্ষ বিদেশীর উ নির্ভর না করিয়া আপনার ব্যবহার্য্য জিনিষ আপনি প্রস্তুত করিতে স হইতে পারে।

তুলা-নির্ম্মিত প্রধান-প্রধান দ্রব্যাদির আমদানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দি দেওয়া হইল :—

	১৯২১-২২ পরিমাণ	১৯২২-২৩ পরিমাণ	১৯২৩-২৪ পরিমাণ	১৯২১-২২ মূল্য	১৯২২-২৩ মূল্য	১৯২৩-২ মূ
১। সূতা (হাজার পাঃ)				লক্ষ টাকা		
	৫,৭১,২৫	৫,৯২,৭৪	৪,৪৫,৮০	১২,৫১	৯,২৬	৭,:
২। মোজা, গেঞ্জি,রুমাল						
	—	—	—	৭৩	৯১	
৩। বস্ত্রাদি (হাজার গজ)						১,:
(ক) কোরা	৬৩,৫৬,০৮	৯৩১০২৫	৭০৩৯,৫৬	২২,৬৫	৩০,৪৪	২৩০
(খ) ধোয়া	৩০,৬১৬৭	৪০২৪,৯২	৪১৫৩৫৭	১২৬৭	১৫,০১	১৫,৪
(গ) রঙীন	১৩,৮২৭৯	২৪৩৭,৮৯	৩৪,৭৪,৯৩	৭,৫৯	১২,৬০	১৭,৬
(ঘ) ফেল্ট	৯৭,৪৬	১,৫৯,৮৯	১,৯০,২০	২৫	৪৬	৬৫
৪। সেলায়ের সূতা (হাজার পাউণ্ড)	১০,০৪	১২,৩০	১৫,৩৪	৭২	৭০	৭১
৫। অন্যান্য	—	—	—	৮১	৬৯	৮·
মোট আমদানি				৫৬৯৪	৭০১৩	৬৯৯:

এক-সময় ভারতের চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত। আর, বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ চিনিই জাভা, মরিসস্ জার্ম্মানী হইতে এদেশে আমদানি হয়। কৃষিকার্য্যে অবহেলাবশতঃ ইক্ষুর চাষের হ্রাস হওয়া ইহার অন্যতম কারণ। তাহা ছাড়া, চিনির কল আমাদের দেশে বেশী নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চিনি বলিতে গুড়, পরিষ্কার চিনি, চিনির মিষ্টান্ন, স্যাকারিন ও বিট্ চিনি সকলই বুঝিতে হইবে।

ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১টি চিনির কল আছে। তন্মধ্যে ৩৫টি বিহার ও উড়িষ্যায় ও ১৬টি সংযুক্ত প্রদেশে। এই কারখানাগুলিতে যে-পরিমাণ পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাতে এদেশের সমস্ত খরচ সংকুলান হয় না। কাজেই বিভিন্ন দেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে হয়। চিনির বাজারের অবস্থা জানিতে সকলেরই মনে কিছু কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা। নিম্নে যে হিসাব দেওয়া গেল, তাহা হইতে বৎসর-বৎসর এদেশে কি-পরিমাণ চিনি আমদানি হয় বুঝা যাইবে :—

	১৯২১-২২ পরিমাণ	১৯২২-২৩ পরিমাণ টন	১৯২৩-২৪ পরিমাণ	১৯২১-২২ মূল্য	১৯২২-২৩ মূল্য লক্ষটাকা	১৯২৩-২৪ মূল্য
পরিষ্কার চিনি	৭,০৩,৪৩৯	৪,২৫,৬৪৮	৩,৮১,৪৭৫	২৬,২১	১৪,১৬	১৩,৬৪
বিট চিনি	১৩,৬৯৭	১৬,৫৯৩	২৯,৬৮০	৬০	৬৮	১,১৩
গুড়	৬৪,৬৮৩	৬১,০১০	৬৪,০৩৯	৫১	৪৩	৪৬
চিনির প্রস্তুত মিষ্টান্ন	৬৪৮	৭৩৯	৮২৭	১৯	১৮	২১
স্যাকারিন্	২১	৪৪	১৪	৫	৪	১
মোট আমদানি	৭,৮২,৬৬৮	৫,০৪,০৩০	৪,৭৬,০৩৫	২৭,৫০	১৫,৪৯	১৫,৪৫

পর-পর দুই বৎসর আম্‌দানি কম হওয়ায় একটি প্রধান কারণ এই যে, আম্‌দানি-শুল্কের হার শত করা ১০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা হইয়াছে। ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষে ২৩,৯৪ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সালে সেইস্থানে ২৭,২১ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। ইহাও আম্‌দানি হ্রাসের একটি কারণ সন্দেহ নাই। গত তিন বৎসরে কোন্ প্রদেশ মোট কত চিনি আম্‌দানি করিয়াছে, তাহা একবার দেখা যাক্ :—

	১৯২১-২২ পরিমাণ	১৯২২-২৩ পরিমাণ	১৯২৩-২৪ পরিমাণ	১৯২১-২২ মূল্য	১৯২২-২৩ মূল্য	১৯২৩-২৪ মূল্য
	টন				লক্ষটাকা	
বাংলা	৪,০৭,৬৭৩	২,১৯,২৫০	২,১৪,২৪০	১২,৪৫	৫,৫৫	৬,২৫
বোম্বাই	১,৬২,৬৫৬	১,৫৩,২৩৯	১,২৮,৮৮১	৬৭৪	৫,১৬	৪,৩৭
সিন্ধুদেশ	১,৭৬,৯২১	৯৭,৪২৫	৯৮,২৩০	৭,০০	৩,৫১	৩৪৮
মাদ্রাজ	১৫,১১১	৯,৮৬৪	১২,২০৩	৫৭	৪১	৪৮
ব্রহ্মদেশ	২০,৩০৭	২৪,২৫২	২২,৪৮১	৭৫	৮৬	৮৭
মোট	৭,৮২,৬৬৮	৫,০৪,০৩০	৪,৭৬,০৩৫	২৭,৫১	১৫,৪৯	১৫,৪৫

এখন চিনির উপর আম্‌দানি-শুল্ক খুব বেশী আছে : সুতরাং চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার এই উপযুক্ত সময়। এই সময় দেশের ধনীরা অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য লইয়া চিনির কারখানা খুলিলে, তাহাতে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইবে এবং দেশের বেকার-সমস্যাও সমাধান হইবে। জাভার সমস্ত ঐশ্বর্য্য এই চিনির ব্যবসায়ের ফল। ভারতের বিস্তর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিদেশীর মুখাপেক্ষী হওয়া ও তাহাদের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করা অতীব দুঃখের বিষয়।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির আম্‌দানিও লক্ষ্য করিবার বিষয় :—

দ্রব্য	একক	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩ ২৪
লবণ	টন,	৪,৭২,৪২৭	৫,৪২,১৩৩	৪,৭৪,৬৯৬
	লক্ষ টাকা,	১,৫২	১,৬৯	১,১০
কাগজ	হন্দর,	৮,০৪,৩১৬	১২,০৬,৯৩২	১৩,৯৩,৩৬৪
	লক্ষ টাকা,	২,৩৪	২,৭৯	২,৭১
দিয়াশলাই	হাজার গ্রোস্,	১৩,৬৮০	১১,২৮৬	১১,২৪৪
	লক্ষ টাকা,	২,০৪	১,৬২	১,৪৬
মদ	হাজার গ্যালন,	৪৫,০৭	৪৬,০৫	৪৭,৪০
	লক্ষ টাকা,	৩,৭৭	৩,৪৩	৩,১৫
সিমেণ্ট	টন,	১,২৪,৭২৭	১,৩৪,১১৫	১,১৩,১৩৭
	াকা,	১,৩৯	১,০৬	৭৫
রং—লক্ষ টাকা—		৩,২১	২,৭৯	২,৯৪
কাঁচ— " —		২,২২	২,৬০	২,৪৬
পাকা চামড়া "—		৬৬	৫২	৪২

ভারতের আম্‌দানি-রপ্তানি বাণিজ্যে যুদ্ধের পূর্ব্ব ও পর তুলনা করিলে জাপান গত ২০ বৎসরে কিরূপ শনৈঃশনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতেছে তাহা দৃষ্ট হইবে :—

ভারতের সহিত জাপানের মোট বাণিজ্য

১৮৯৪-৯৫—	১৯৭,০০,০০০ টাকা
১৯০৪-৫—	১০৯২,০০,০০০ "
১৯১৪-১৫—	২০১০,০০,০০০ "
১৯২২-২৩—	১১৯৪৮,০০,০০০ "

টেয়া

শ্রী প্রমথনাথ রায়

চরিত্র

টেয়া—গথদিগের রাজা।
বালুটিলডা—ঐ রাণী।
আমালাবের্গা—রাণীর জননী।
আগিলা—বিশপ।
অররিথ—
টেরোডেমির—
আটানারিথ—
} পূর্ব্বতন গথরাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
ইল্ডিবাড্‌—রাজার বর্শাধারী।
হারিবার্ণ্ট—একজন সৈনিক।
দুইজন প্রহরী।

টেয়া

(দৃশ্য—রাজার শিবির। পশ্চাতে উন্মুক্ত যবনিকা-পথে গথসৈন্যদিগের শিবির অতিক্রম করিয়া বিসুবিয়সের এবং তৎপশ্চাৎস্থিত সান্ধ্যসূর্য্য-রাগরঞ্জিত সাগরের দৃশ্য দেখা যাইতেছে। বামদিকে, অনিপুণভাবে নির্ম্মিত, উন্নত রাজসিংহাসন। মাঝখানে একটি আসনাবৃত টেবিল।—দক্ষিণে, পুঞ্জীকৃত চর্ম্ম দ্বারা গঠিত রাজশয়ন। তাহার পার্শ্বে একটি ফ্রেমে নানাবিধ অস্ত্র রহিয়াছে। ইতস্ততঃ মশাল রাখিবার আংটা।)

প্রথম দৃশ্য

দুইজন শিবির-প্রহরী

১ম প্র। কি হে, ঘুমোলে নাকি?

২য় প্র। ঘুমোব কেন?

১ম প্র। কারণ তুমি বল্লমটাকে শিথিলভাবে ধরে' অমন করে' দাঁড়িয়ে আছ যে, তোমাকে ধনুকের মতন বাঁকা দেখাচ্ছে।

২য় প্র। অমন বেঁকে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ ক্ষিধের আমার পেট জ্বলে' যাচ্ছে।

১ম প্র। উপায় নেই। কষে' বেঁধে রাখলেও একটু সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই আবার সেখানে দ্বিগুণ আগুন জ্বলতে থাকে।

২য় প্র। এভাবে আর কতকাল চলবে বলো ত।

১ম প্র। যতদিন না জাহাজগুলি আসে—অতি সোজা উত্তর।

২য় প্র। তা জানি, কিন্তু কবে আসবে?

১ম প্র। তা আমি কি ক'রে জানি? ঐ যে * দুগ্ধাচল দেখা যায়—তা'র উপর একজন শাস্ত্রী নিযুক্ত আছে। সেখান হ'তে, সমুদ্রের উপর পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত তা'র দৃষ্টি চলে। সেই জানে না! মিজেনাস অন্তরীপের অপর দিক্ থেকে তাদের আসার কথা।

২য় প্র। অবশ্য যদি বাইজেনতিয়ানটা † পথ ছেড়ে দেয়।

১ম প্র। তা'র কোনো জাহাজ নেই।

২য় প্র। বটে! তা'র এত জাহাজ যে তা দিয়ে সমগ্র ইতালী রাজ্যের চারিদিকে সে বেড়া দিয়ে দিতে পারে। আর তাও তেমন ঘন-সন্নিবিষ্ট-ভাবে, যেভাবে' এই সাত সপ্তাহ ধরে বাইজেন্তীয় নপুংসকটা ‡ আমাদের ঘিরে' রেখেছে।

১ম প্র। সাত সপ্তাহ ধরে'!

২য় প্র। আজ দুপুর বেলা কি খেতে পেয়েছি জানো? সেই শুক্‌নো লোণা মাংস-খণ্ডটা আট দিন আগে যা খেতে গিয়ে আমার দাঁত ভাঙবার উপক্রম হয়েছিল। সেদিন চিনে' রাখার জন্ত আমি তা'র উপর ছুরি দিয়ে তিনটে যোগচিহ্ন এঁকে রেখেছিলাম। আজ আবার সেইটেই এসে জুটল। কিন্তু আজ আমি সেটাকে খেয়ে ছেড়েছি...রাজোচিত বিবাহের আহারই হয়েছে।

১ম প্র। তবে কি তুমি মনে করো আমাদের রাজার আরো বেশী দেবার ক্ষমতা আছে?

২য় প্র। আমাদের চেয়ে তা'র যদি বেশীই থাকবে, তা হ'লে কি মনে করো—তা'র জন্ত আমরা এখানে এমনভাবে অপমান, অত্যাচার, অপযশ সহ্য করে' তিলে-তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি? তুমি কি মনে করো, চৌকী দেবার মতন এখানে কিছু নেই না জানলে, আমরা কুকুরের মতন চৌকী দিতুম?

১ম প্র। আছে হে, অনেক সোনা আছে।

২য় প্র। সোনা! ছাই সোনা! সোনা আমার নিজেরই প্রচুর আছে। ক্যানোজার * খাড়ীতে আমি মাটির ভিতর অনেক ধন লুকিয়ে রেখেছি। এঃ! ওহে! † শকট-দুর্গের ভিতরে মেয়েরা নাকি এখনো মাংস পায়...মদও পায় শুনেছি।

১ম প্র। হাঁ, মেয়েরা সেখানে তা পায় বটে, কি করা যায়। তোমার কেউ সেখানে নেই?

২য় প্র। আমার যে ছিল, এক গ্রীক তা'কে বেইজ্জৎ ক আমি তা'কে হত্যা করেছি! (বিরাম) মেয়েরা মাংস পায়, মদও প বেশ! কিন্তু আর কতক্ষণ—[কোলাহল এবং অস্ত্রঝঞ্ঝনা। ধী ধীরে তাহা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল] বাক্ বিয়ে শেষ হ'ল।

১ম প্র। সম্রাটের ঢাল হাতে বৃদ্ধ ইল্ডিবাট এদিকে আসছে।

[উভয়ে নীরবে ঠিক হইয়া দাঁড়াইল।]

২য় দৃশ্য

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। ইল্ডিবাট্

ইল্ডি। [যথাস্থানে ঢাল স্থাপন করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্ত্র রাইতে লাগিল।] কোনো সংবাদ এল?

১ম প্র। না!

ইল্ডি। তোমাদের ক্ষিধে পেয়েছে?

২য় প্র। ও ভয়ানক!

ইল্ডি। ক্ষুধায় কাতর হওয়া মেয়ের লক্ষণ।—বুঝেছ? রাণীকে দেখে' কালো মুখ কোরো না যেন—বিবাহের দিনে তা ভালো দেখায় না

তৃতীয় দৃশ্য

(শিবির-সম্মুখে কোলাহলপূর্ণ জনতা কর্ত্তৃক বেষ্টিত টেয়া, বালটি লডা, এবং বিশপ আগিলা। শেষোক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাদের সম্মুখে দুইজন ধুনিবাহী গায়ক বালক এবং তাহাদের পশ্চাতে আমালাবের্গা, অররিথ, আটানারিথ টেয়োডেবি এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সৈন্যাধ্যক্ষ। চন্দ্রাতপ নামাইয়া দেওয়া হইল প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান। বিশপ নবদম্পতীর হস্ত মুক্ত করিয়া আমালাবের্গার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। টেয়া বিষণ্ণ এবং চিন্তামগ্ন বালটিলডা চারিদিকে সলজ্জ কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল যন্ত্রণাদায়ক নিস্তব্ধতা।)

ইল্ডিবাট। [নম্রস্বরে] সম্রাট্, এবার আপনার স্ত্রীকে সাদর সম্ভাষণ করুন।

টেয়া। [শান্তভাবে] তাই কি? (একটি বালকের স্কন্ধে হাত দিয়া) এত দ্রুত নয়, ধোঁয়াটা আমাদের নাকে এসে লাগে। যখন ধুনচি দোলাতে হয় না, তখন তুমি কি করো?

বালক। তখন আমি তলোয়ার চালাই।

টেয়া। বেশ! শীঘ্র তলোয়ার চালাতে শেখো, নতুবা অনেক বিলম্ব হবে। (নম্রস্বরে) ইল্ডিবাট, জাহাজগুলি আসার কোন চিহ্ন দেখা গেল না?

ইল্ডি। না, সম্রাট্। কিন্তু আপনার স্ত্রীর সহিত আলাপ করুন।

টেয়া। হুঁ...এখন তা হ'লে আমার একজন স্ত্রী হ'ল, বিশপ?

বিশপ। হাঁ সম্রাট্, এই যে আপনার স্ত্রী, আপনার সম্ভাষণ অপেক্ষা করছেন।

টেয়া। আমি সম্ভাষণ খুঁজে পাচ্ছিনে বলে' আমায় ক্ষমা করো.

রাণী। সমরক্ষেত্রের আবহাওয়ার ভিতর লালিতপালিত হ'য়ে আমি এত বড় হয়েছি, তা ভিন্ন অন্যকোনোরূপ গৃহ আমি কোনোদিন জানিনি...আমার সঙ্গে তোমাকে বড় কষ্ট পেতে হবে।

বাল্টিলডা। সম্রাট্—মার কাছে—আমি শিখেছি—[স্বর রুদ্ধ হইল]

টেয়া। [কৃত্রিম বিনয়ের সহিত] মার কাছে তুমি কি শিখেছ?

---

* দুগ্ধাচল—মূলপুস্তকে Milchberg. Milch দুগ্ধ; berg পাহাড়। এই পাহাড়ের রোমান নাম—Mons Locterus। প্রবাদ আছে এই গিরিতলেই নাকি গথদিগের শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

† Justinian I, তেওদারিকের মৃত্যুর পর এঁর সৈন্যদল ইতালীতে গথ ক্ষমতা চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

‡ Narses—সৈন্যাধ্যক্ষ যে ৫৫৩ খৃঃতে গথ ক্ষমতা নষ্ট করিয়াছিল।

* ইতালীর পূর্ব্বকূলস্থ বর্ত্তমান Canosa di Puglia নগরী।

† Wagonburg. Wagon (গাড়ী) burg (সহর)—মালগাড়ী প্রভৃতি দিয়া দেয়াল তুলিয়া যে স্থানকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

আমালা। আমার কাছে শিখেছে যে সম্পদে-বিপদে চিরদিন স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হবে।

টেয়া। হ্যাঁ, স্ত্রীর পক্ষে এ সত্য......যদি স্বামীও বিপদের দিনে স্ত্রীর পার্শ্ব পরিত্যাগ না করে। আরেকটা কথা, আমালাবের্গা। শুনেছি, প্রতিদিন সকালবেলা শকটদুর্গের ভিতর মেয়েদের ওখানে মোরগ ডাকে। আমাদের সৈন্যগণ এক সপ্তাহ ধরে' কোনোরূপ মাংস পায়নি। আমার আদেশ, সেগুলি তাদের দিয়ে দিও।

[আমালাবের্গা নত হইল।]

বিশপ। রাজন্!

টেয়া। কি? একবার বেদীর সম্মুখে আপনার সুন্দর বক্তৃতা শুনেছি। আবারও বক্তৃতা হবে নাকি?

বিশপ। হাঁ, তা দিতে হবে বৈ কি, কারণ দুশ্চিন্তা আপনার মনকে ক্লিষ্ট করে' তুলেছে।

টেয়া। তাই নাকি?......উত্তম! আমিও শুনতে প্রস্তুত।

বিশপ। শুনুন সম্রাট্,—বিধাতার রোষের প্রতিমারূপে আপনি আমাদের ভিতর বিরাজমান......প্রজাগণ আপনার বয়স দেখেনি, আপনার কার্য্য দেখেছিল। প্রবীণেরা আপনাকে অপরিণতবয়স্ক জেনেও নত মস্তকে আপনার অধীনতা স্বীকার করে' গিয়েছিল আর আপনিও আমাদের সম্রাট্‌রূপে দীর্ঘকালাবধি সমানভাবে ছোটোবড় সকলের সেবা পেয়ে এসেছেন। যে-স্বর্ণসিংহাসনে বসে' থেওডোরিক্ একদিন অনুকম্পা বিতরণ করেছিলেন, যেখানে আসীন হয়ে টোটিলাস্ হাস্য মুখে অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করতে শিখেছিলেন, সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আজ আপনি কঠোর মরণাজ্ঞা উচ্চারণ করেন......তথাপি বিষাক্ত ক্ষতের মতন দুর্ভাগ্য আমাদের অঙ্গে লেগে রয়েছে......স্থান হ'তে স্থানান্তরে বিতাড়িত হ'য়ে অবশেষে আমরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিসুবিয়সের এই আগ্নেয় গিরিতটে আশ্রয় নিয়েছি কিন্তু বাইজান্ত নগরী তা'র ক্রীত সৈন্যবল দ্বারা আমাদিগকে এখানেও ঘিরে' রয়েছে।

টেয়া। তা'তে কি আর সন্দেহ আছে, হাঃ হাঃ! এমন ভাবে ঘিরেছে যে একটা মূষিকেরও পালাবার পথ নেই।

বিশপ। আমাদের দৃষ্টি কাতরভাবে সমুদ্রের উপর দিয়ে দূরদিগন্তপানে ভেসে যায়, কারণ সেই দিকে বিধাতা—আমাদের খাদ্য-ভাণ্ডার রেখে দিয়েছেন।

টেয়া। (শান্ত-স্বরে) জাহাজগুলির কোনো সংবাদ আসেনি?

ইল্ডিবাট্। (শান্তস্বরে) না।

বিশপ। পুনরায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বার পূর্ব্বে, আমরা স্বাধীন গথ জাতি, আমাদের প্রাচীন প্রথানুসারে আপনাকে ভার্য্যা যুক্ত করা স্থির করেছি। কারণ, গথগণ কেন মরণ ভালোবাসে সম্রাটকে নিজের জীবনে তা উপলব্ধি করতে হবে।

টেয়া। কেন কখনো দেখেছ কি, জীবনের প্রতি তোমাদের সম্রাটের মায়া খুব বেশী?

বিশপ। রাজন্!

টেয়া। না, অমন স্থির করা তোমাদের উচিত ছিল না, কারণ এজন্য আজীবন তোমাদিগকে উপহাসাস্পদ হ'তে হবে......আর এই যদি তোমাদের প্রাচীন রীতির অনুশাসন হ'য়ে থাকে তা হ'লেও তোমরা আমাকে এই ভয়বিহ্বলা জননীর অশ্রুলাশ্রুময়ীলা তরুণীর সঙ্গে যুক্ত করে' দিলে কেন? আর যদিই বা দিলে তাও এমন দিনে, যেদিন অনশনে আমাদিগকে পরিণয়োৎসব সম্পন্ন করতে হবে। আমার দিকে মুখ তুলে' চাও রাণী—আমায় তোমাকে এই ক্ষুদণ্ডের অর্জ্জিত পদবী দিয়েই অভিহিত করতে হবে, কারণ, হা ঈশ্বর! আমি তোমার নামও ভালোরূপে জানিনে যে, তোমার নাম ধরে ডাকব। আমি অনুরোধ করি, আমার দিকে মুখ তুলে' চাও। আমি কে জানো?

বাসটিলতা। আপনি সম্রাট্।

টেয়া। হাঁ। কিন্তু তোমার কাছে আমি সম্রাট্ নই, একজন মানুষ মাত্র......আর কিরূপ মানুষ জানো?......এদিকে চাও। এই বাহুযুগল এযাবৎ কাল শুধু তপ্তশোণিতে রঞ্জিত হ'য়ে এসেছে;—পুরুষের যুদ্ধে পাতিত পুরুষের শোণিতে নয়,—তা'তে গৌরব আছে—অসহায়, ভয়পাংশু কচি শিশুদের শোণিতে—(কম্পিত হইল) এই বাহু দিয়ে যদি আমি তোমার গ্রীবা বেষ্টন করতে আসি, তা হ'লে কি তোমার বড় আনন্দ হবে...শুনেছ? আমার কণ্ঠস্বর বেশ সুন্দর, বড় সুমিষ্ট, নয় কি? মরণাজ্ঞা দিতে-দিতে গলা ভেঙে যাওয়ায় এখন তা একটু রূঢ় হ'য়ে গেছে...কিন্তু এই ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারিত প্রেমবাণীও তোমাকে কম প্রীতি দেবে না। আমাকে দেখে' কি ঠিক প্রেমিকের মতন মনে হয় না? এইসব বিজ্ঞলোকদের কিন্তু তাই মনে হয়, আর সেই অনুসারে তাঁরা কার্য্যও করেছেন...কিংবা, নপুংসক সৈন্যদিগকে গথগণের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে—স্বর্ণকিরীটিনী বাইজান্ত নগরীতে জাষ্টিনিয়ান যেরূপ আনন্দ সাগরে মগ্ন আছেন, এরা বোধ হয় তাঁদের রাজাকে শিবির-জীবনের ক্লান্তির ভিতর সেইরূপ আনন্দসাগরে নিমগ্ন রাখা তাঁদের কর্ত্তব্য ব'লে' মনে করেন। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিশপ। সম্রাট্, আপনি অপ্রকৃতিস্থ হবেন না।

টেয়া। ধন্যবাদ। সে ভয় নেই,...এ আমার বিবাহ-দিনের একটা খেয়াল...থাক এখন থেকে আর পরিহাস নয়...[সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া] থেওডোরিকের এই কনক-সিংহাসন, যার উপর একদিন অনুকম্পা অধিষ্ঠিত ছিল, হায়, আজ আর সেখানে আমার আসন গ্রহণ করার অধিকারটুকু নেই, কারণ, অচিরেই এর কলেবর বাইজান্ত নগরের অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে...আর টোটিলাসের মতন হাস্যমুখে অপরাধ ক্ষমা করতেও আমি শিখিনি; কারণ, কেউ আর এখন আমাদের ক্ষমা ভিক্ষা চায় না...এই দীপ্তিশালী গথজাতি আজ বুভুক্ষু নেকড়ের দলে পরিণত হয়েছে, তাই তা'রা অপর এক নেকড়েকে তাদের নেতৃপদে বৃত করেছে। বিশপ, আপনি আমাকে বিধাতার রোষের প্রতিমারূপে অভিহিত করেছেন—কিন্তু আমি তা নই,—আমি আপনাদের নিরাশার প্রতিমা। এজীবনে যার কোনোদিন কোনো আশা ছিল না, কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না, সেইরূপ কোনো প্রাণীর মতন আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আর তা'রই মতন নিরাশা বহন করে' আপনাদের সম্মুখে মারা যাবো। আপনারা তা জানেন, সুতরাং মনে-মনে আমার প্রতি তিরস্কার পোষণ করা আপনাদের অন্যায়। অস্বীকার করবেন না!...আপনাদের কুঞ্চিত ভ্রূরেখার ভিতরে আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি...এখন আমাদের বড় অসময় পড়েছে; কিন্তু সেজন্য আমাকে নিন্দা করবেন না—এই আমার অনুরোধ।

থেওডেমির। সম্রাট্, অমন কথা বলে' আমাদের প্রাণে ব্যথা দেবেন না—আমাদের শেষ শোণিত-বিন্দু আমরা আপনার জন্য পাত করব। আমরা এখনও ওদের মত স্থবির হইনি।

অয়রিক। স্থবির হ'লেও আমরা তোমাদেরই মতন সমরপটু। আর, আপনাকেও আমরা তাদেরই মতন ভালোবাসি।

টেয়া। উত্তম, তা হ'লে এইখানেই ক্ষান্ত হও। বিপদের দিনে কিরূপে বন্ধু-বিবাদ উপস্থিত হয়, তোমাদের রাণীকে আর সে-অভিজ্ঞতা লাভ করতে দিও না। যাক, শোনো, তোমরা যখন শিবিরের ভিতর দিয়ে যাবে তখন আমার সৈন্যদের প্রত্যেককে বলো, তাদের রাজার বড় দুঃখ যে আজ এই আনন্দের দিনে—আনন্দের দিনই বটে...নয় কি?

তিনি তাদের যথোচিত পানাহার দিয়ে আপ্যায়িত করতে অক্ষম... কিংবা...ইল্‌ডিবাট্...

ইল্ডিবাট্। [ডানদিকে সে এতক্ষণ ভিতরে আগত প্রহরীর সহিত গোপনে আলাপ করিতেছিল। ত্রস্ত হইয়া] প্রভো;

টৈয়া। ভাণ্ডারে এখনো কিছু আছে?

ইল্ডি। [ত্রস্তভাব দমন করিয়া] ভাণ্ডারের প্রায় সমস্তই আপনি বিতরণ করে' দিয়েছেন, প্রভো।

টৈয়া। অবশিষ্ট কি আছে, তাই প্রশ্ন করছি।

ইল্ডি। একপাত্র বাসী দুগ্ধ আর খান-দুই পুরাতন রুটি।

টৈয়া। হা হা হা! এখন দেখ, রাণী, কেমন গরীবের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে! কিন্তু জাহাজগুলি এখনো এসে পৌঁছায়নি। তাদের বলো সেগুলি এলে আমি তাদের রাজার মত করে' ভোজ দেবো—তা তাদের উচিত প্রাপ্য। দেখো, তাদের আনন্দে ব্যাঘাত জন্মায় তেমন-কিছু তাদের কাছে বলো না। তাদের বলো, যখন তূর্য্যধ্বনি শুনা যাবে তখন বৃহৎ টেবিলের উপর তাদের জন্য মাংস আর সুরা—(ইল্ডিবাট্‌কে ত্রস্তভাবে পার্শ্বে লুকাইতে দেখিয়া) কি হ'ল?

ইল্‌ডি। (আস্তে) প্রহরী সংবাদ নিয়ে এসেছে। জাহাজগুলি অপহৃত হয়েছে।

টৈয়া। (কোনোরূপ মুখ বিকৃত না করিয়া) অপহৃত—কি করে'? কেমনভাবে?

ইল্‌ডি। বিশ্বাসঘাতকতায়।

টৈয়া। উত্তম! এইবার বড়-বড় টেবিলের উপর—মদ আর মাংস—যে যত চায় আমি বিলিয়ে দেব—মেয়েদের আমি সিসিলির ফল, ম্যাসিনিয়ার মিষ্ট খাবার—খেতে দেবো—[কাঁপিতে-কাঁপিতে সিংহাসনে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে শূন্যে চাহিয়া রহিল]

পুরুষেরা। সম্রাটের কি হ'ল? দেখ, দেখ!

বাল। মা, নিশ্চয় তিনি ক্ষুধিত হয়েছেন। (নিকটে গেলে পুরুষগণ সরিয়া দাঁড়াইল) সম্রাট্!

টৈয়া। কে তুমি নারী? কি চাও!

বাল। আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি, প্রভো?

টৈয়া। আ! রাণী! ক্ষমা করো! [পুরুষগণের প্রতি] তোমরাও ক্ষমা কর! [উঠিল]

বিশপ। সম্রাট্, আপনার শক্তি-অনুযায়ী আপনি উৎসব করুন।

থেওডেমির। আমরাও তাই বলি।

অন্যান্য। আমরাও তাই বলি।

টৈয়া। হাঁ! তোমরা অন্যায় বলনি, [মেয়েদের প্রতি] তোমরা এবার নিজেদের শিবিরে ফিরে' যাও—আমাদের পরামর্শ আছে। বিশপ! আপনি এদের সঙ্গে নিয়ে যান।

আমালাবের্গা। [শান্তভাবে] আসি তবে!

বাল। [শান্তভাবে] মা, আমাকে ত তিনি কিছু বলেন না?

আমালা। আসি তবে। [নমস্কার করিল। বাল্‌টিলডাও তাহাই করিল।]

টৈয়া। এস।

[বাল্‌টিলডা, আমালাবের্গা এবং বিশপের প্রস্থান। বাহিরে অভ্যর্থনাসূচক আনন্দধ্বনি]

চতুর্থ দৃশ্য

টৈয়া, টৈওডেমির, অয়রিখ, ইল্ডিবাট্, প্রহরী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ।

টৈয়া। মেয়েদের বিশপের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হ'ল, কারণ এ যা হবে তা শুধু আমাদের সৈনিকদের ব্যাপার। প্রহরী কোথা এদিকে এস।

পুরুষগণ। (কলরব করিয়া] প্রহরী! পাহাড়ের প্রহরী!

টৈয়া। এই সঙ্গে এও জেনে রাখো জাহাজগুলি অপহৃত হয়েছে

[কলরব এবং ভয়সূচক ধ্বনি]

টৈয়া। শান্ত হও, বন্ধুগণ, শান্ত হও!......তুমি হ্যারিবাণ্ট?

প্রহরী। হাঁ, প্রভো!

টৈয়া। কখন থেকে তুমি কাজে নিযুক্ত আছ?

প্র। কাল সকালবেলা হ'তে, প্রভো!

টৈয়া। তোমার সাক্ষী-দুজন কোথায়?

প্রহরী। আপনার আদেশ-মত তা'রা নিজ-নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

টৈয়া। উত্তম; তুমি কি দেখেছ?

প্র। প্রভো! মিজেনাস অন্তরীপের দিকে সমগ্র সাগর বিসুবিয়সের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায়, আজ সন্ধ্যা ছয়টার পূর্ব্বে আমরা কি লক্ষ্য করার সুযোগ পাইনি। কিন্তু আজ ছয়টার সময় সহসা তীরে অতি নিকটে যেখানে প্রাচীন রোমান নগরী ভূবিলীন হ'য়ে আছে সেখানে পাঁচটা জাহাজ দেখা গেল।...আমাদের একজন ছুটে' সেগুলির নিকটে যাবে এমন সময়—

টৈয়া। চুপ! জাহাজগুলিতে কিরূপ সঙ্কেত ছিল?

প্রহরী। সম্মুখের পালগুলি আড়াআড়িভাবে বাঁধা, আর।

টৈয়া। আর?

প্র। পিছনে হালের কাছে একটি তালবৃন্ত।

টৈয়া। তালবৃন্তটা তুমি দেখেছিলে?

প্র। হাঁ, প্রভো! আপনাকে যেমন দেখছি, তেমনই দেখেছিলাম

টৈয়া। উত্তম। বলে' যাও

প্র। তার পর বাইজান্‌তাইনগণ, খাদ্যদ্রব্যাদি অধিকার করার উদ্দেশ্যে, কতকগুলি ডিঙি নিয়ে এসে জাহাজগুলি ঘিরে' দাঁড়াল:—তখন—

টৈয়া। তখন কি?

প্র। তখন তারা দাঁড় ফেলে আনন্দের সহিত শত্রুশিবিরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে গেল। সেখানে তা'রা মাল নামিয়ে দিয়েছে। [সকলেই মস্তকাবৃত করিল। নিস্তব্ধতা।]

টৈয়া। [হাস্যমুখে সকলের প্রতি চাহিয়া] বেশ হয়েছে...কিন্তু বাইরে কিছু বলো না...আমিই তাদের এ দুঃসংবাদ দেবো। [প্রহরীর প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

টৈয়া, টৈওডিমির, আয়রিখ, আটানারিখ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

টৈয়া। এখন কি কর্ত্তব্য বলো!

থেও। কি বলব জানিনে, প্রভো।

টৈয়া। আয়রিখ, তুমি ত প্রবীণ হয়েছ, তুমিও কিছুই জানো না?

অয়। প্রভো! আমি মহান্ টৈওডিরিকের অধীনে কাজ করেছি। বোধ হয় তিনিও এসময় কি করা উচিত ভেবে পেতেন না।

টৈয়া। হুঁ, বুঝেছি...অতি সোজা কর্ত্তব্য—মৃত্যু!...অমন সন্দিগ্ধ-চক্ষে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?...আমি কি বলি বুঝতে পারো না? তোমরা কি মনে করো, আমি এই চাই যে কাপুরুষ গ্রীকদের মতন তোমরাও নিজেদের মস্তক বস্ত্রাবৃত করে' প্রতিবেশীর নিকট থেকে প্রাণ-

ভিক্ষা মেগে নাও ? না বন্ধুগণ, আমি তোমাদের কোনো দিন যশোমন্দিরে না নিয়ে যেতে পারলেও, তোমাদের অপযশ আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না।—যতদিন আমাদের ভিতর ত্রিশ জন সৈনিকও বল্লম চালাতে সক্ষম থাকবে, ততদিন আমাদের এই অবস্থান দুর্ভেদ্য। কিন্তু হায়, অ'চিরেই সেদিন আসছে, যখন আমাদের এই হস্ত বল্লম চালানো দূরের কথা অনশনে ক্লিষ্ট হ'য়ে আক্রমণকারী ঘাতকের নিকট হ'তে অনুকম্পা ভিক্ষা করে' নিতেও সক্ষম হবে না।

টেওডেমির। সে সম্পূর্ণ অসম্ভব, প্রভো!

টৈয়া। এখন একথা বল্‌লে বটে কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা যায় না। এখনো আমাদের মান অক্ষুণ্ণ আছে, তাই আমার আদেশ—আজ রাত্রে তোমারা শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কাল প্রভাতের সঙ্গে-সঙ্গে আমরা এইসব গিরিরন্ধ্র হ'তে বের হয়ে, উন্মুক্ত মাঠে বাইজান্তাইন-দের সম্মুখীন হবো।

সকলে। সে অসম্ভব, প্রভো!

থেওডেমির। সম্রাট্, ভেবে দেখুন, তাদের একশত জনের বিরুদ্ধে আমাদের একজন।

টৈয়া। অয়রিখ, তোমার মত ?

অয়রিখ। প্রভো! আপনি আমাদিগকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেন।

টৈয়া। তা আমি জানি। আমি কি তোমাদের অন্যরূপ বলেছি? তোমরা কি মনে করো, যুদ্ধ-ব্যাপারে এতটুকু জানার মতন অভিজ্ঞতা আমার নেই? তা হ'লে আর কাঁপছ কেন? যখন টোটিলাস্ আমাদের নেতা ছিলেন, তখন আমরা লক্ষাধিক ছিলাম,—এখন আমরা মাত্র পাঁচ সহস্র। তাঁরা সকলে আত্মনাশ করে' গেছেন, আর আমরা কি এখন আত্মরক্ষা করব ?

সকলে। না, না!

অয়রিখ। প্রভো, সঙ্কটের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হ'তে দিন।

টৈয়া। শঙ্কট? শঙ্কট কোথায় দেখ? তোমাদের ভিতর কি এমন একজন আছে যার বক্ষ শৈবালাবৃত শিলার মতন, ক্ষত দ্বারা আচ্ছন্ন নয়? এই বিংশতি বৎসর ধরে' তোমরা মৃত্যুর সঙ্গে ছেলে-খেলা খেলে' এসেছ, আর আজ কিনা এই দায়িত্বপূর্ণকালে, গথ হ'য়ে তোমাদের মুখে সঙ্কটের কথা?......কি করবে তোমরা? এইখানে এই গিরিরন্ধ্রে বসে' ক্ষুধিত, পীড়িত হ'য়ে মারা যাবে? কিংবা বুভুক্ষু মূষিকের ন্যায় পরস্পরের দেহ ভক্ষণ করতে সুরু করবে?—উত্তম......কিন্তু আমি তা'তে নেই। মনে রেখো! কাল প্রভাতের সঙ্গে আমি একাকীই ঢাল এবং বর্শা নিয়ে মরণাভিযানে বের হবো। যেদিন থেকে তোমরা আমাকে তোমাদের নষ্ট-স্বার্থ পুনরুদ্ধার-কল্পে নেতৃপদে নিযুক্ত করেছ, সেই দিন থেকে আমি নিশীথ-তস্করের মতন সর্ব্বদা এর অন্বেষণ করে' বেড়াচ্ছি।—আমার আজীবনের বৃদ্ধ সহচর, তুমি অন্ততঃ আমার সঙ্গে যাবে?

ইল্ডিবাট্। [নতজানু হইয়া] সে-কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভো?

সকলে। আমরাও যাবো, প্রভো! আমরাও! আমরাও!

থেওডেমির। সম্রাট্, আপনি আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ। এতক্ষণ আমরা আপনার কথার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারিনি বলে' আমাদের উপর রুষ্ট হবেন না। এখন আমি আপনার মহত্ত্বাব স্পষ্ট বুঝতে পারছি।—আপনি আমাদিগকে এই নিরাশা এবং দুঃখ-বিষাদের ঊর্দ্ধে মৃত্যুর পরপারে কোন্ অমর লোকে নিয়ে যেতে চান......হাস্‌তে-হাস্‌তে আমরা মৃতদেহের উপর দিয়ে হেঁটে চলে' যাবো, হাস্‌তে-হাস্‌তে আমরা আমাদের পূর্ব্বগামীদের মতন মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব......আমাদের আদর্শের কিরণে জগত আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌বে...ও। সে কি সুখের হবে! সম্রাট্, আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার ঐ রাজোপাধি এতদিন আমার মনে অনেকবার হিংসার উদ্রেক করেছে, কিন্তু আজ থেকে আমার আর সে-ভাব নেই।—

টৈয়া। তুমি যেরূপ কল্পনা করেছ, টেওডেমির, কার্য্যতঃ সেরূপ নাও হ'তে পারে, কিন্তু আজও গথদিগের ভিতর একটা উৎসাহ অবশিষ্ট আছে দেখে', আমার আনন্দ হচ্ছে।

অয়রিখ। সম্রাট্, যদি অনুমতি দেন, তা হ'লে আমিও একটা কথা বলি, কারণ এ বৃদ্ধের একদিন গথ-রাজ্যের সুবর্ণ যুগ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল......আপনি শুধু সকলের শ্রেষ্ঠ বীর নন, আপনি তাদের সকলের চেয়ে প্রধান......এখনোও যদি আমরা দ্বিধা বোধ করি, তা হ'লে আমাদের—শুধু আমাদের নয়, শিশু রোগী এবং স্ত্রীলোকদের—সকলের মৃত্যু অবধারিত।

টৈয়া। হুঁ, স্ত্রীলোক আছে বটে, তাদের কথা আমি মোটেই ভাবিনি।

অয়রিখ। কিন্তু যদি কাল প্রভাতে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, আর অন্ততঃ দুই-একদিনও আমরা বাইজান্ত-বাহিনীর ভীম আক্রমণ সহ্য করে' টিঁকে থাকতে পারি......তা হ'লে তাদের নিঃশেষ না করতে পারলেও আমাদের রক্তপাত দ্বারা তাদের ক্লান্ত করে' দিতে সক্ষম হবো...এইরূপে ক্রমে তা'রা তীর আর বর্শা চালাবার শক্তি-রহিত হ'লে নপুংসককে বাধ্য হ'য়ে শান্তিতে চলে' যাবার অনুমতি দিতে হবে। তখন আমাদের যে কয়জন অবশিষ্ট থাকবে, তা'রা, শিশু এবং স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে উন্নত শিরে উন্মুক্ত তরবারির সহিত বাইজান্ত-শিবিরের ভিতর দিয়ে, খাদ্য আহরণের জন্য নিয়াপোলিস নগরাভিমুখে গমন করবে। এইরূপে, আমাদের জীবনোৎসর্গ করলে শিশু এবং স্ত্রীলোকদের জীবন রক্ষা হবে।

টৈয়া। কেবল শিশু আর স্ত্রী! শিশু আর স্ত্রী! ওদের জন্য আমাদের কি!

আটানারিখ। সম্রাট, আমাদের যা সকলের চেয়ে প্রিয়, তা'র প্রতি আপনি অসম্ভ্রম দেখাচ্ছেন।

টৈয়া। হ'তে পারে!—কিন্তু আমি শুধু জানি, এরা খাবারের ভাগ বসাবার জন্যেই আছে—এরা না থাকলে হয়ত আমাদের খাদ্যাভাব হ'ত না। আরেকটা কথা তোমাদের বলে' রাখি—বাহিরেও পুরুষদিগকে আমি সে-শপথ নেওয়াব—মেয়েদের ভিতর কেউ যেন আমাদের এই সঙ্কল্পের কথা ঘুণাক্ষরেও না জানে!—আমি চাই না যে মেয়েদের কান্না আর অশ্রুজলে কোনো পুরুষের হৃদয় বিগলিত হয়।

আটানারিখ। প্রভো, মেয়েদের নিকট হ'তে বিদায় না নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে নৃশংসতার পরিচায়ক হবে।

টৈয়া। বিদায় নেও, তা'তে ক্ষতি নেই, কিন্তু কিছু বোলো না। যাদের এখানে স্ত্রী-পুত্র আছে, তা'রা শকট-দুর্গে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসুক, সেখানে এখনো খাবার পাওয়া সম্ভব; কারণ মেয়েরা ভাঁড়ার কখনো একেবারে খালি রাখে না। যারা অবিবাহিত, তাদেরও যেন তা থেকে অংশ দেওয়া হয়।

অয়রিখ। প্রভো, এসম্বন্ধে বাক্য-বিনিময় যখন আপনার নিষেধ, তখন স্ত্রীদের কাছে তা'রা কি বল্‌বে?

টৈয়া। যা খুসী বলুক! শুধু এই কথাটা যেন প্রকাশ না পায়।

টেওডেমির। রাণীর সঙ্গে কি আপনি আর সাক্ষাৎ করবেন না?

টৈয়া। কি? না......আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই। হুঁ, এই-বার সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করতে হবে। আমার যদি তোমার মতন

বাক্‌নৈপুণ্য থাকৃত, টেওডেমির! আমার পক্ষে এ বড়ই অপ্রিয় কাজ, কারণ আমি এত সব বল্‌ব, অথচ নিজে তা উপলব্ধি করব না—এস!

[সকলের প্রস্থান; ইল্ডিবার্ট্‌ ধীরে-ধীরে তাদের অনুসরণ করিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

দৃশ্যভূমি কিছুক্ষণের জন্য শূন্য রহিল। বাহিরে সম্রাটের কণ্ঠস্বর এবং অভিনন্দন-ধ্বনি। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে প্রচ্ছন্ন আর্ত্তধ্বনি। ইল্ডিবার্ট্‌ ফিরিয়া আসিল এবং যবনিকার নিকটে কোনো কর্ত্তিত বৃক্ষকাণ্ডের উপর গুড়িসুড়ি হইয়া বসিল। তার পর সে দুইটা মশাল জ্বালাইয়া আংটার ভিতরে রাখিল এবং সম্রাটের অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বাহিরে উৎসাহসূচক ধ্বনি উচ্চ গ্রামে উত্থিত হইয়া পুনরায় নিম্ন হইয়া আসিল।

সপ্তম দৃশ্য

ইল্ডিবার্ট্‌। বিশপ আসিলা! (ক্লান্ত এবং ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া)

ইল্ডিবার্ট্‌। আপনি কি উপবেশন কর্‌বেন না?

বিশপ। রাজা কি বলেছেন তা শুনবে না?

ইল্ডিবার্ট্‌। তা শুনে' আমার কাজ নেই। সম্রাট্‌ আর আমি উভয়েই এখন একমত।

বিশপ। (স্বগত) দাঁড়িয়ে আছ ঠিক যেন শমনের মতন!

ইল্ডিবার্ট্‌। শমনের মতন কিংবা শয়তানের মতন, তা'তে আমার কিছু যায় আসে না।

[পুনরায় উৎসাহধ্বনি। ক্রমে তাহা তাঁবুর নিকট আসিল]

অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। সম্রাট্‌ (শান্ত, পাংশু এবং উজ্জ্বল নেত্রে)

টেরা। অস্ত্রাদি প্রস্তুত?......আ! বিশপ, আপনি!

বিশপ। (হস্তদ্বারা মুখমণ্ডলে আঘাত করিয়া) সম্রাট্‌! সম্রাট্‌!

টেরা। এবার থেকে আপনাকে নূতন শিষ্যদল অন্বেষণ করে' নিতে হবে। আপনি কি আমাকে আশীর্ব্বাদ দিতে চান? তা হ'লে শীঘ্র দিন... টেওডমিরকে নিয়ে এস। [ইল্ডিবার্টের প্রস্থান]

বিশপ। আপনি কি মনে করেন মৃত্যু-যন্ত্রণার হাত থেকে আপনি নিষ্কৃতি পাবেন?

টেরা। বিশপ, আমি আপনাদের ধর্ম্ম-মণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সেবক ছিলাম। টোটিলাসের ন্যায় আমি কোনো পুণ্য মন্দির নির্ম্মাণ করে' দিতে পারিনি বটে, কিন্তু আমি তা'র উন্নতির জন্য হত্যাসাধন করেছি অনেক......এইবার বলুন স্বর্গে পুণ্যশ্লোক আচিরয়ুসের নিকট আপনাদের কোনো অভিপ্রায় আমাকে বহন করে' নিয়ে যেতে হবে।

বিশপ। কি বল্‌ছেন বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

টেরা। সেজন্য আমি দুঃখিত।

বিশপ। আপনি বিদায় নিয়েছেন?

টেরা। বিদায়? কার নিকট থেকে? বরং বলুন অভিনন্দন করেছি কি না; কিন্তু অভিনন্দনের সামগ্রী এখনো আসেনি।

বিশপ। (সকোপে) আমি আপনার স্ত্রীর কথা বল্‌ছি!

টেরা! এখন আমি শুধু পুরুষদের কথাই ভাবছি, কোনো স্ত্রীর চিহ্ন আমার মনে নেই। বিদায়!

(টেওডেমির এবং ইল্ডিবার্টের প্রবেশ)

বিশপ। বিদায়! বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন।

টেরা। ধন্যবাদ!......আ! এই যে থেওডেমির।

[বিশপের প্রস্থান

নবম দৃশ্য

টেরা। টেওডেমির। ইল্ডিবার্ট্‌ (পশ্চাতে সম্রাটের অস্ত্রাদি লইয়া ব্যাপৃত। মাঝে-মাঝে নিঃশব্দে সে ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিতেছে)

টেরা। সৈন্যগণ কি কর্‌ছে?

টেওডেমির। যাদের স্ত্রী এখানে আছে, তা'রা শকটদুর্গে গিয়েছে... সেখানে বোধ হয় তা'রা আহারাদি করে' সন্তানদের সঙ্গে খেলা কর্‌ছে।

টেরা। তোমার স্ত্রীও এখানে?

টেওডেমির। হাঁ, প্রভো!

টেরা। ছেলেপিলে কি?

টেওডেমির। দু'টি ছেলে, প্রভো!

টেরা। তুমি গেলে না যে?

টেওডেমির। আমি আপনার আদেশের অপেক্ষায় ছিলাম, প্রভো!

টেরা। কটা বেজেছে?

টেওডেমির। নয়টা, প্রভো!

টেরা। যাদের কোনো বালাই নেই অর্থাৎ যারা অবিবাহিত আর যাদের স্ত্রী এখানে নেই তা'রা কি কর্‌ছে?

টেওডেমির। তা'রা চুপ করে' আগুনের পাশে শুয়ে' আছে।

[ইল্ডিবার্টের প্রস্থান]

টেরা। তাদের আহারের দিকে দৃষ্টি রেখো। এই আমার আদেশ। কারো নিদ্রার প্রয়োজন আছে?

টেওডেমির। না প্রভো, কারো নেই।

টেরা। দুপুর রাত্রে আমাকে নিয়ে যেতে এসো।

টেও। যে আজ্ঞা, প্রভো! (যাইতে উদ্যত)

টেরা। (চিন্তিতভাবে) দাঁড়াও, টেওডেমির!......তুমি সকল সময় আমার বৈরিতা করে' এসেছ।

টেও। হাঁ, প্রভো! কিন্তু আর আমার ভিতর বৈরিভাব নেই।

টেরা। (হস্ত প্রসারিত করিয়া) এস! (উভয়ের আলিঙ্গন তা'র পর হস্তপীড়ন।) তোমাকে এখানেই রাখ্‌তাম, কিন্তু তোমাকে স্ত্রীর কাছে যেতে হ'বে। (ইল্ডিবার্টের পুনঃ প্রবেশ) যারা আগুনের পাশে শুয়ে আছে, তাদের আহারের দিকে দৃষ্টি রাখতে ভুলো না। তাদের কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। এমন সময় চিন্তার অবসর দেওয়া ভালো নয়।

টেওডেমির। হাঁ, প্রভো! (প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

টেরা। ইল্ডিবার্ট্‌

টেরা। এ পৃথিবীতে তা হ'লে আমাদের কাজ ফুরিয়ে এল। এখন এস একটু আলাপ করা যাক, কেমন?

ইল্ডিবার্ট্‌। যদি একটি নিবেদন শুনেন, প্রভো!

টেরা। এখনো নিবেদন? বোধ হয় তোষামোদ হচ্ছে।

ইন্ডি। প্রভো! আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার এই বাহু আপনার জীবন রক্ষার জন্ত আজীবন বর্শা বহন করে' এসেছে...আমার কোন ক্রুটির জন্ত আপনার পতন হ'তে দেবো না, প্রভো...আর কেউ নিদ্রিত নয় বটে, তথাপি যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে, আমি ঘণ্টা-দুই নিদ্রা যেতে চাই......

টেয়া। (নূতন উদ্বেগের সহিত) কিন্তু বেশী দূরে যেয়ো না।

ইন্ডি। প্রভো! আমি এত দিন সর্ব্বদা কুকুরের মতন আপনার শিবিরে চৌকি দিয়েছি—আজ রাত্রেও তা'র অন্তথা হবে না...তা হ'লে আজ্ঞা হয়, প্রভো?

টেয়া। যাও। (ইন্ডিবাটের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

টেয়া। (পরে) বালুটিলতা। (টেয়া একাকী নিজকে শয্যার উপর নিক্ষেপ করিল এবং মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। দ্বিধার সহিত প্রবেশ করিয়া বালুটিলতা একহস্তে খাবারের ঝুড়ি এবং অন্ত হস্তে সুরাপূর্ণ পাত্র লইয়া টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল।)

টেয়া। (সোজা হইয়া) কে?

বালুটিলতা। (সলজ্জভাবে এবং মৃদুস্বরে) আমাকে চেনেন না?

টেয়া। (শয্যা হইতে উঠিয়া) মশালগুলি ভালো জ্বল্‌ছে না...কিন্তু তোমার স্বর যেন আমার পরিচিত।...কি চাও?

বালুটিলতা। আমি যে আপনার স্ত্রী।

টেয়া। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) কি চাও?

বালুটিলতা। মা আমাকে আপনার খাবার আর পানীয় রেখে যাবার জন্ত পাঠিয়ে দিলেন। সকলেই আহারাদি কর্‌ছে, তাই মা বল্‌লেন—(থামিয়া গেল)

টেয়া। ভিতরে এলে কি করে'?...প্রহরীরা বাধা দেয়নি?

বালুটিলতা। (মস্তকোত্তোলন করিয়া) সম্রাট্, আমি রাণী!

টেয়া। হাঁ, তা বটে। ইন্ডিবাট্ কি বল্‌লে?

বালুটিলতা। আপনার সে বৃদ্ধ বল্লমধারী নিদ্রিত ছিল। আমি তা'কে ডিঙিয়ে এসেছি।

টেয়া। ধন্তবাদ, বালুটিলতা।—আমার ক্ষিধে পায়নি। ধন্তবাদ। (নিস্তব্ধতা। বালুটিলতা দাঁড়াইয়া কাতর-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিল।)

টেয়া। কোনো প্রার্থনা আছে, বুঝি? বলো!

বালুটিলতা। সম্রাট্, আমি যদি এই পূর্ণ খাবারের ঝুড়ি নিয়ে শিবিরে ফিরে' যাই, তা হ'লে মেয়েদের কাছে আমাকে উপহাসাস্পদ হ'তে হবে...আর পুরুষেরা বল্‌বে—

টেয়া। (হাসিয়া) পুরুষেরা কি বল্‌বে?

বালুটিলতা। বল্‌বে তিনি রাণী হবার এমনই অযোগ্য যে সম্রাট্ তাঁর হাত থেকে খাবার নিতেও দ্বিধা বোধ করেন।

টেয়া। (হাসিয়া) কিন্তু বালুটিলতা পুরুষদের এখন এসব মন্তব্য করার সময় নেই, তাদের এখন অন্ত ভাবনা আছে...সে যা হোক আমার জন্ত তোমাকে অপমানিত হ'তে হবে না...ঝুড়িটা রাখো...এসব জিনিষ কি আরো আছে?

বালুটিলতা। মা আর আমি এবং অন্তান্ত মেয়েরা আজ দু-সপ্তাহ ধরে' আমাদের খাবারের অংশ থেকে এই রুটি আর কল বাঁচিয়ে রেখেছি; আর মুরগীগুলিকেও আমারা আজ পর্য্যন্ত হত্যা করিনি।

টেয়া। তা হ'লে, তোমরা না খেয়ে আছ, বলো?

বালুটিলতা। তা'তে, আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি, প্রভো...উৎসবের জন্ত আমরা অমন করেছি।

টেয়া। তাই কি? তোমরা ভেবেছ, আজ উৎসব হবে?

বালুটিলতা। কেন—এ কি উৎসব নয়?

টেয়া। (নীরবে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। বালুটিলতা পার্শ্ব হইতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।) বস্‌বে না, বালুটিলতা? ফিরে' তোমায় যেতে দেবো না! তা হ'লে অপমান হবে, নয় কি?

বালুটিলতা। (নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল)

টেয়া। কিন্তু আমি যদি অনুরোধ কর্‌তাম তা হ'লে থাক্‌তে?

বালুটিলতা। স্ত্রী কিরূপে স্বামীর পাশে না থাক্‌তে পারে?

টেয়া। তুমি কি তা হ'লে তোমার অন্তরে অনুভব করো যে, আমি তোমার স্বামী?

বালুটিলতা। অন্তথা কিরূপে সম্ভব, প্রভো? বিশপ স্বয়ং যে আমাদিগকে মিলিত করেছেন।

টেয়া। তাতে তোমার আনন্দ হয়েছিল!

বালুটিলতা। হাঁ...না তা'তে আনন্দ হয়নি।

টেয়া। না কেন?

বালুটিলতা। কারণ, বোধ হয়...আমার ভয় হয়েছিল আমি প্রার্থনা কর্‌ছিলাম।

টেয়া। কি প্রার্থনা কর্‌ছিলে?

বালুটিলতা। যে বিধাতা যেন আমায় আপনাকে সুখী করার ক্ষমতা দেন, কারণ আপনি সুখের কাঙ্গাল, আর আমার নিকট থেকেই আপনি তা পেতে আশা করেন।

টেয়া। তোমার নিকট থেকে পেতে...এই প্রার্থনা কর্‌ছিলে?

বালুটিলতা। খাবারটা এনে দেবো?

টেয়া। না, না,।—শোনো, বালুটিলতা, বাইরে আগুনের পার্শ্বে সৈন্তেরা রয়েছে—ক্ষুধা যদি কারো পেয়ে থাকে, তবে তাদেরই...আমার ক্ষিধে পায়নি।

বালুটিলতা। প্রভো, এ খাবার তা হ'লে তাদেরই দিন—।

টেয়া। ধন্তবাদ, বালুটিলতা। (যবনিকা উত্তোলন করিয়া) প্রহরী, ভিতরে এস, কিন্তু সাবধান, বৃদ্ধকে জাগিয়ো না যেন, এই খাবার আর সুরা নিয়ে গিয়ে সৈন্তদের ভিতর সমানভাবে বিলিয়ে দাও...তাদের বলো, এ তাদের রাণীর দান!

প্রহরী। রাণীকে ধন্তবাদ জানাতে পারি কি, প্রভো?

টেয়া। (সম্মতি জানাইল)

প্রহরী। (আন্তরিকভাবে রাণীর হস্ত পীড়ন করিয়া, প্রস্থান)

টেয়া। উত্তম—এবার আমার জন্ত খাবার নিয়ে এস।

বালুটিলতা। (হতবুদ্ধি হইয়া) প্রভো—আপনি—উপহাস কর্‌ছেন কেন?

টেয়া। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। আমি বলেছি, আমাকে আমার জিনিষ দিয়ে পরিচর্য্যা করো, তোমার জিনিষ দিয়ে নয়।

বালুটিলতা। যা আমার সে কি আপনার নয়, প্রভু?

টেয়া। হুঁ! (নিস্তব্ধতা। বালুটিলতার হাত ধরিল।) আমাকে প্রভুও বলো না, সম্রাট্‌ও বলো না—আমাকে কি বলে' ডাকে জানো না?

বালুটিলতা। জানি, টেয়া বলে'!

টেয়া। আবার বলো ত।

বালুটিলতা। (মুখ ফিরাইয়া, মৃদুস্বরে) টেয়া!

টেয়া। নামটা কি তোমার অপরিচিত?

বালুটিলতা। (মাথা নাড়িল)

টেয়া। তা হ'লে উচ্চারণ কর্‌তে দ্বিধাবোধ করো কেন?

বালুটিলতা। (সৌজন্ত নয় প্রভো! যখন থেকে জেনেছি যে, আপনার স্ত্রীরূপে আমাকে আপনার পরিচর্য্যা কর্‌তে হবে, তখন থেকে

নিশিদিন আমি মনে-মনে ঐ নাম জপ করেছি। শুধু কোনো দিন মুখ-ফুটে' তা উচ্চারণ করিনি—

টৈয়া। তা জানার আগে তুমি কি ভাবতে ?

বালুটিলতা। ও প্রশ্ন কেন, প্রভো ?

টৈয়া। উত্তরই বা দাও না কেন ?

বালুটিলতা। প্রভো! যখন আমি আপনার সংহার বিধানের কথা আর আপনার নামে লোকের মনে মহাত্রাসের কথা শুন্‌তাম তখন মনে হ'ত, কি অসুখী তিনি, গথজাতির ভাগ্যরক্ষার জন্ত যাঁকে অমন কাজ করতে হয়!

টৈয়া। তোমার তাই মনে হ'ত ?—তাই তোমার ?

বালুটিলতা। প্রভো, অমন ভাবা কি আমার অন্যায় হয়েছিল ?

টৈয়া। তুমি আমাকে আগে কোনো দিন দেখনি, অথচ তুমি আমার মন বুঝতে পেরেছিলে ? আর যারা আমাকে দিনরাত ঘিরে' রয়েছে, এই সব বিজ্ঞ এবং সমরাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তা'রা আমাকে বুঝতে পারেনি!... কি তুমি, নারী ? কে তোমাকে আমার হৃদয় বুঝতে শেখালে ?

বালুটিলতা। প্রভো—আমি—

টৈয়া। তা'রা সকলে আমার ভয়ে ভীত হ'য়ে এক পাশে সরে' দাঁড়াত, কোন্ পথে পালিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করবে তা খুঁজে পেত না। ঘাতকের ছুরি যখন গ্রীবার উপর এসে পড়ত, তখনও তা'রা মূর্খের মতন কল্পির স্বপ্ন দেখত! অবশেষে চতুর গ্রীকগণ এসে তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে' সকলকে এক করে' হত্যা করলে। এইরূপে একলক্ষ লোক মারা গেল। শুনে' ক্ষোভে রোষে আমার অন্তর জ্বলে' গেল, আমি একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলাম্! সেই দিন হ'তে আমি সকল আশা, রক্তাক্ত ছিন্ন বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করেছি। সেই দিন থেকে আমি আমার চারিদিকে ভীতি সঞ্চার করে' চলেছি, এত ভীতি যে, তা দেখে ভয়ে আমারি অন্তর আঁৎকে উঠেছে,—আমি রক্তপাত করেছি, কিন্তু রক্তে আমি কোনো দিন মাতাল হইনি। আমি হত্যার পর হত্যা করেছি; কিন্তু আমার মন বলেছে—এ বৃথা! (বেদনায় অভিভূত হইয়া একটা আসনের উপর বসিয়া পড়িল এবং শূন্যে চাহিয়া রহিল।)

বালুটিলতা। (সলজ্জভাবে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া) সম্রাট্! সম্রাট! টৈয়া!

টৈয়া। (মস্তকোত্তোলন করিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল) ঈশ্বর, কি করেছি ?......কেন তোমাকে এসব বল্‌লাম ? কিছু মনে কোরো না,—এতটা প্রগল্‌ভ হ'য়ে পড়েছিলাম বলে'......ভেবো না মনের ক্ষোভে আমি অমন করেছি......অভাগাদের জন্ত সহানুভূতি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার বিবেক এসবের বহু ঊর্দ্ধে......অমনভাবে আমার দিকে চেয়ো না......তোমার দৃষ্টির ভিতর যেন কি আছে, যা দেখলে আমি আর মনের কথা গোপন রাখতে পারিনে......কে তোমাকে আমার উপর এই দিব্য শক্তি দিলে ?......এখন যাও!......না, যেয়ো না! তোমাকে আমার গোপনে কিছু বলার আছে।......জোরে বল্‌লে প্রহরীরা শুন্‌তে পারে......কানে-কানে শোনো, কারণ কোনো দিন কোনো মানুষের কাছে আমি তা বলিনি, কোনো দিন বলা সম্ভবও মনে করিনি......আমি মনে-মনে একজনকে হিংসা করি, সেই হিংসার জ্বালায় আমি নিশিদিন জ্বলে' পুড়ে' মর্‌ছি;—কার প্রতি এ হিংসা জানো ?......টোটিলাসের প্রতি।... যে টোটিলাস্ এখন মাটির নীচে কবরের ভিতর রয়েছে......তা'রা তা'কে "জ্যোতির্ম্ময়" টোটিলাস্ আখ্যা দিয়েছিল; এখনো তা'রা মনে-মনে তা'রই স্মৃতির তর্পণ করে......এখনো তা'র নাম নিলে তাদের চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে।

বালুটিলতা। প্রভো, তা'র কথা মনে করে' কেন নিজকে ক্লেশ দিচ্ছেন ?

টৈয়া। (উদ্বেগপূর্ণ) তুমি তা'কে কখনো দেখেছ ?

বালুটিলতা। না।

টৈয়া। তবু ভালো! কারণ, যে-সময়ে তা'র মৃত্যু হয়, সেই সময় প্রাতে আমি তা'কে যেমন দেখেছিলাম, তুমি তা'কে যদি সেইরূপ দেখতে·· নৃত্যশীল শুভ্র অশ্বোপরে সেই বীরোচিত মূর্ত্তি, পরিধানে সেই সোনালি যোদ্ধৃবেশ, দীর্ঘসুন্দর কেশরাজি কিরণ-পরিবেশের ন্যায় মস্তকের চারিপাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শিশুর মতন হাস্‌তে-হাস্‌তে সে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিল......হায়! যদি তা'র মত হাস্‌তে-হাস্‌তে মরতে পারতাম!

বালুটিলতা। প্রভো, তা'র পক্ষে তা সহজ ছিল। তিনি চলে' গেছেন, কিন্তু আপনাকে তাঁর নষ্টপ্রায় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করে' গেছেন...... আপনার পক্ষে সে-হাসি কিরূপে সম্ভব ?

টৈয়া। (ব্যগ্রভাবে) তাই কি ?—তাই কি ?—...আঃ! তবু ভালো! তুমি একটু সান্ত্বনা দিলে!

বালুটিলতা। ও কথা বলে' আমাকে গর্ব্বিত করবেন না, প্রভো।

টৈয়া। কিন্তু যদি তুমি তা'কে দেখতে, যদি আমার সঙ্গে তা'র তুলনা করার সুযোগ পেতে, তা হ'লে আমাকে আর এত উচ্চে স্থান দিতে না।

বালুটিলতা। (আবেগের সহিত আমি শুধু আপনাকেই দেখেছি, প্রভো—

টৈয়া। (পার্শ্ব হইতে লজ্জা এবং অবিশ্বাসের সহিত বালুটিলতার দিকে চাহিল। তার পর নীরবে বামদিকে গিয়া সিংহাসনের সম্মুখে বসিয়া পড়িল এবং আনন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

বালুটিলতা। (লজ্জিতভাবে তাহার অনুগমন করিয়া পার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন করিল) স্বামিন্, যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে আমায় ক্ষমা করুন।

টৈয়া। (সোজা হইয়া বালুটিলতার হস্ত ধারণ করিল) কারো কাছে বোলো না।

বালটিলতা। কি, প্রভো ?

টৈয়া। যে আমাকে তুমি কাঁদ্‌তে দেখেছ! শপথ করো!

বালটিলতা। প্রভো, শুনেছি স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী......তা'র আত্মারও অর্দ্ধভাগিনী......তা হ'লে আর শপথ কেন ?

টৈয়া। যদি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'য়ে থাকো, তা হ'লে আমার আরো কাছে এস, তবেই আমার চোখে জল দেখবে না।

বালুটিলতা। আসুন আপনার চোখ মুছিয়ে দিই! সেইজন্য ত আমি এখানে আছি।

টৈয়া। যাক্, এখন একটু ভালো......গথ হ'য়ে চক্ষে জল, ওঃ! লজ্জায় আমার মরে' যাওয়া উচিত! যখন টোটিলাসকে সমাধি দিয়েছিলাম, তখন আমাদের চোখে জল আসেনি......আর এখন,—তবু আমার লজ্জা নেই ....সহসা এতটা আনন্দ বোধ করছি কেন জানিনে! ......বালুটিলতা, তোমাকে একটা কথা বল্‌ব কিন্তু শুনে' হেসো না যেন।

বালুটিলতা। হাস্‌ব কেন, প্রিয় ?

টৈয়া। আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

বালুটিলতা (আশ্চর্য্যের সহিত উঠিয়া) তা হ'লে উপায়, সব খাবার ত আপনি বিলিয়ে দিয়েছেন।

টৈয়া। না, এখনো সব দিইনি। ওখানে যাও ত......আমার বিছানার পিছনে অগ্নিকুণ্ডটা দেখেছ ?

বালুটিলতা। যেখানে খানিকটা ছাই পড়ে' আছে, সেখানে ?

টৈয়া। হাঁ, ওখানে একটা সিন্দুক আছে না ?

বালুটিলতা। হাঁ।

টৈয়া। ডালাটা তোলো।

বালুটিলতা। ওঃ! যা ভারী!

টেয়া। এইবার হাতটা ভিতরে দাও! আরো ভিতরে……কৃপণ ইল্ডিবাটু সেখানে কিছু—

বালুটিলতা। মাত্র দু'টুক্‌রো রুটি, আর কিছু নেই।

টেয়া। বেশী থাকার কথাও নয়।

বালুটিলতা। শকটদুর্গে গেলে হয় না?…সেখানে বোধ হয়…

টেয়া। না, না…তাদের নিজেদেরই খাদ্যের প্রয়োজন আছে…যা আছে নিয়ে এস। তাই ভাগ করে' খাওয়া যাবে—কেমন? ওতেই দু'জনার হবে'। রাজি আছ?

বালুটিলতা। হাঁ।

টেয়া। দাও! আঃ বেশ লাগছে! নয়? তুমিও কিছু খাও।

বালুটিলতা। এতে তোমারই হবে না।

টেয়া। বাঃ, এমন ত কথা ছিল না!…এইত…বেশ লাগছে, না?

বালুটিলতা। হাঁ, আমি কোনো দিন এমন সুস্বাদু কিছু খাইনি।

টেয়া। আরো কাছে এস…তোমার কোলের উপর রুটির টুকরো-গুলি রাখো, আমি সেখান থেকে তুলে খাবো…বেশ…হঠাৎ এত ক্ষুধাই বা এল কোথা থেকে? এইবার আমরা আমাদের বিবাহের খাওয়া খাচ্ছি, নয়?

বালুটিলতা। যারা সুরা আর মাংস খাচ্ছে, তাদের চেয়ে আমরা ভালো খাচ্ছি, নয়?

টেয়া। হুঁ, আমি ত আগেই বলেছি…আরো আরামে বোসো।

টেয়া। কেন, বেশ ত বসেছি।

টেয়া। একটু দাঁড়াও ত।

বালুটিলতা। [উঠিয়া] তার পর?

টেয়া। ওতে বোসো।

বালুটিলতা। (ভীত হইয়া) সিংহাসনে—সে কি করে' হয়—?

টেয়া। কেন, তুমি কি তা হ'লে রাণী নও?

বালুটিলতা। (দৃঢ়ভাবে) হাঁ, যদি রাণী হ'য়ে বস্‌তে বলেন, বস্‌ব। কিন্তু কৌতুকের জন্যে,—কখনো না।

টেয়া। তুচ্ছ কাষ্ঠখণ্ড। (নামাইয়া আনিয়া) এইবার তুই একটু কাজে লেগেছিস……এতে হেলান দিয়ে বোসো।

বালুটিলতা। কিন্তু প্রিয়, এ উচিত হবে কি?

টেয়া। (আশ্চর্য্য হইয়া) হবে না! (সিংহাসনটাকে পুনরায় স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া তাহাতে বালুটিলতার মস্তক রাখিল) এম্‌নি বেশ আছ। ……এতে বসে' আর পাপের ভার বাড়ানো কেন! বিশপ যে দেখে' ফেলেনি……হা হা হা! আমাকে আরো খে'তে হবে!

বালুটিলতা। এই নাও।

টেয়া। ব্যস্ত হোয়ো না! নিচ্ছি! (নতজানু হইয়া) তোমার সম্মুখে আমি নতজানু হয়েছি……কত কি নূতন শিখছি!…তুমি সুন্দর!…আমার মাকে আমি কোন দিন দেখিনি।

বালুটিলতা। কোনো দিন না?

টেয়া। না, কোনো দিন কোনো ভগ্নীও আমার ছিল না……এ জীবনে কোনো দিন আমি খেলা করিনি……জীবনের অবসানকালে আমি তাই শিখছি……

বালুটিলতা। অবসান-কাল কেন?

টেয়া। সে প্রশ্ন কোরো না!—হায় তুমি—তুমি! হা হা হা! খাও না কেন! আমার অংশটা থেকে দাঁত দিয়ে ভেঙে নাও—বেশ! বিশপ কি বলেছে জানো?

বালুটিলতা। (উঠিয়া) কিছু পান করবেন না?

টেয়া। হাঁ! দুগ্ধপাত্রটা নিয়ে এস।……সেইটে, ইল্ডিবাটু যার কথা বলেছিল।

বালুটিলতা। (নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া) এটা কি?

টেয়া। (উঠিয়া) এটাই বোধ হয়। তুমি আগে পান করো।

বালুটিলতা। ভালো দেখাবে কি?

টেয়া। তা জানিনে। দেখাবে!

বালুটিলতা। বেশ, তা হ'লে পান করছি। (পান করিয়া এবং হাসিয়া) এঃ, বিশ্রী!

টেয়া। দেখি? কোথায় বিশ্রী! তোমার জিভের দোষ!…আচ্ছা বলো ত তুমি কে? কি করে' এখানে এলে? আমার কাছে কি চাও?

বালুটিলতা। আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই।

টেয়া। তুমি—আমার স্ত্রী! তুমি— (উভয়ে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল) আমাকে চুমা দিতে পারো না?

বালুটিলতা। (লজ্জিতভাবে মাথা নাড়িল)

টেয়া। না কেন?

বালুটিলতা। (পুনর্ব্বার মাথা নাড়িল)

টেয়া। বলো, না কেন?

বালুটিলতা। কানে-কানে বল্‌ব।

টেয়া। বলো।

বালুটিলতা। কারণ তোমার পাকা দাড়ি।

টেয়া। (টেয়া আশ্চর্য্য হইয়া মুখে হাত দিল, তার পর কৃত্রিম রোষের সহিত) আমার কি? জানো না, আমি কে?—সম্রাটের কাছে অমন কথা, এত সাহস!—আবার বলে' দেখ! মজা টের পাবে।

বালুটিলতা। (হাসিয়া) তোমার পাকা দাড়ি।

টেয়া। (হাসিয়া) আচ্ছা দাঁড়াও।

দ্বাদশ দৃশ্য

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। ইল্ডিবাটু।

ইল্ডিবাটু। সম্রাট্ কি?—(বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত)

টেয়া। (সহসা বাধা-প্রাপ্ত হইল, যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডলে পুনরায় পূর্ব্বকার কঠোর ভাব ফিরিয়া আসিল) দাঁড়াও যেয়ো না। বাইরে কি চলেছে?

ইল্ডি। সেনাগণ শকটদুর্গ হ'তে ফিরে এসেছে, মেয়েদেরও অনেককে সঙ্গে এনেছে।

টেয়া। পথ দেখাবার লোকেরা একত্র হয়েছে?

ইল্ডি। হাঁ, প্রভো!

টেয়া। তাদের আর একটু অপেক্ষা করতে বলো।

ইল্ডি। যে আজ্ঞা, প্রভো!

টেয়া। কারণ, এখন আমারও স্ত্রী আছে।

ইল্ডি। নিশ্চয়ই, প্রভো! (প্রস্থান।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

টেয়া। বালুটিলতা।

বালুটিলতা। টেয়া, প্রিয়তম, কি হয়েছে তোমার?

টেয়া। (বালুটিলতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হস্তদ্বারা তাহার মস্তক ধারণ করিল) আমার মনে হচ্ছে, বালুটিলতা, যেন এই মাত্র আমরা দুজনে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিত করে' কোন্ সুদূর পৃথিবী পরিভ্রমণ করে' এসেছি। কিন্তু সে অনুভূতি মিলিয়ে যাচ্ছে, সমস্তই মিলিয়ে যাচ্ছে

আমি যে মানুষ ছিলাম, পুনরায় সেই মানুষ হয়েছি—না, ঠিক তা হইনি—সকল রমণীর উপরে তুমি রাণীর মতো হও—হবে?

বালুটিলডা। কি আদেশ তোমার?

টেয়া। প্রার্থনা কিংবা কান্নাকাটি করবে না?

বালুটিলডা। না।

টেয়া। রাত্রি প্রভাত হ'য়ে আস্‌ছে। আমাদের সম্মুখে মৃত্যু।

বালুটিলডা। কি বল্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমাদের ত আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই, তা ছাড়া যতদিন না জাহাজগুলি আসে—

টেয়া। জাহাজগুলি আর আসবে না।

বালুটিলডা। (কপোলে আঘাত করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

টেয়া। আমরা—পুরুষেরা—কাল যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবো।

বালুটিলডা। সে হ'তে পারে না......সে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

টেয়া। কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। রাণী হ'য়ে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না যে আমাদের অবতীর্ণ হ'তেই হ'বে?

বালুটিলডা। হাঁ—পার্‌ছি।

টেয়া। সম্রাটকে প্রথম দলে থেকে যুদ্ধ করতে হবে, সুতরাং জীবন্তে আর আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই...বুঝেছ?

বালুটিলডা। হাঁ, বুঝেছি!

(নিস্তব্ধতা। বালুটিলডা নিজেকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল)।

টেয়া। আমায় আশীষ দাও। (নতজানু হইল, বালুটিলডা তাহার শিরোদেশে হস্ত রাখিল এবং কাঁপিতে-কাঁপিতে অবনত হইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিল।)

টেয়া। (উঠিয়া যবনিকা সরাইয়া) কে আছ, ভিতরে এস!

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। আমালাবের্গা, অয়রিখ, আগিলা, আটানা্ টেওডেমির এবং অন্যান্য পথ-প্রদর্শক।

আমালা। সম্রাট্, আপনার কাছে আমি আমার কন্যাকে পাঠি ছিলাম......শুন্‌লাম, এখন পুরুষদের অনেক কাজ...আমার কন্যা ফিরিয়ে দিন।

টেয়া। এই যে তোমার কন্যা।

[আমালাবের্গা এবং বালুটিলডার প্রস্থান

পঞ্চদশ দৃশ্য

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ।

টেয়া। [বিশপকে দেখিয়া] বিশপ, আজ সন্ধ্যায় আপনার স আমি বড় অপ্রিয় ব্যবহার করেছি। সেজন্য আমায় ক্ষমা কর এখন আমি বুঝেছি গথগণ কেন মৃত্যু ভালোবাসে...(তরবারি গ্র করিয়া) তা হ'লে তোমারা প্রস্তুত? বিদায়ের পালা শেষ হ'য়েছে?

টেও। প্রভো, আমরা আপনার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছি কে তাদের বল্‌লে জানিনে, কিন্তু তাদের সকলেই তা জানে।

টেয়া। তা'রা কান্নাকাটি করেনি?

টেও। প্রভো; তা'রা নীরবে আমাদের ললাটে আশীষ-চুং দান করেছে।

টেয়া। তা'রাও আমাদের রাজার জাতিই বটে। এ আমাদে বড়ই দুর্ভাগ্য। এস! (টেয়া অগ্রসর হইল। সকলে তাহার অনুগম করিল। বাহিরের সমবেত জনমণ্ডলীর সম্রাটের অভিনন্দন-কলরবে সহিত যবনিকা পতন।)

* হারমান্ জুদারমান্-এর মূল জার্ম্মান্ হইতে।

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নৌকা ঘাটে ভিড়িলে যে ভদ্রলোকটি সঙ্গে ছিলেন তিনি সংবাদ দিবার জন্য ডাঙায় গেলেন। কিছুক্ষণ পরে লোক-লস্করের সঙ্গে সমারোহ করিয়া পাল্কী বেহারা আসিল। ইতিমধ্যে শান্তি, বলাই-এর একপ্রস্ত পরিচ্ছদ লইয়া কানাইলালকে সাজাইয়াছিল। তাহাকে ত আর যেমন-তেমন বেশে কুটুম্বদের সামনে বাহির করা চলে না! শান্তি যাইয়া পাল্কীতে উঠিল। বালকেরা পাল্কীর সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। তাহাতেই তাহাদের মহা আনন্দ।

কানাই ও বলাই পাল্কীর সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে অন্দরে আসিয়া হাজির হইল। জনৈক স্ত্রীলোক আসিয়া আদর করিয়া শান্তিকে তুলিয়া লইলেন। বলাই ও কানাই তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতেছিল। শান্তির স্বামী নৃপতি রকের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহারা যখন সে-স্থান অতিক্রম করিয়া যায়, তখন হঠাৎ যেন বাধা দিয়া নৃপতি কহিলেন,—

"এই যে কানাই এসেছ, বেশ, তা তুমি বা'র বাড়ীতে গিয়ে বোসো, বলাই একটু বাদেই যাচ্ছে।"

কানাই তাহার প্রবেশ-পথেই এই অতর্কিত আঘাতে

কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে মাথা হেঁট করিয়া একটু বিষণ্ণ-মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ক্রমে ধীরে-ধীরে কয়েকটি দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি সুবিস্তৃত ঘরে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে ফরাসের উপর বসিতেও তাহার মনে একটু দ্বিধা জন্মিল। অলঙ্ঘ্য গিরির মতন যে-ব্যবধানটা তাহার ও ভদ্র সমাজের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, কেমন করিয়া সে-বাধাকে অমান্য করিয়া সে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিতে পারে? ফরাসের পাশ হইতে সরিয়া আসিয়া সে তাহারই নিকটবর্ত্তী একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল।

নৃপতিদের গৃহের মেয়েরা কৌতূহলী হইয়া শান্তির সঙ্গের বালকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নৃপতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিলে বালককে দেখিবার অভিপ্রায়ে মেয়েরা তাহাকে একবার আনিবার জন্য নৃপতিকে পাঠাইলেন। নৃপতি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বারান্দার নীচে উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। কানাইলাল বর-পাত্রের মতন কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইল। সে দেখিল, কতকগুলি ব্যগ্র চক্ষু তাহার মোজা-দুইটি লইয়া যেন হাসাহাসি করিতেছে। তা ছাড়া ফুস্‌ফাস্—গা টেপাটিপি, চক্ষুর ভঙ্গিমা, কত কি চলিতেছে। কানাই-লালের শুভ্র কপোলদেশ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল,—বোধ হয় বলাই-এর কাপড়-চোপড় তাহার গায়ে তেমন মানায় নাই, কোনোটা ছোটো কোনোটা বড় হইয়াছে, নতুবা ইহারা হাসাহাসি করিবে কেন? কিন্তু মোজা জোড়া ত পায়ে ঠিকই হইয়াছে। এটার প্রতি ইহারা এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেছে কেন?

এই অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্র হৃদয়টি উপলক্ষ্য করিয়া রমণীরা মুখে যে সকৌতুক দুষ্ট হাসির স্ফূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন তাহাতে কানাইলালের চক্ষে তাহাকে যেন জগৎসংসার হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছিল। নৃপতি কহিলেন,—

"কানাই, তুমি যাও—এখন সেইখানে গিয়ে বোসো।"

কানাই সেখানে সেই বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিয়া তাহার পায়ের মোজা-দুইটি আগে তাড়াতাড়ি খুলিয়া পকেটে পুরিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অঙ্গের জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল; কোনোটিই ত ছোটো বড় অশোভন হয় নাই! সে আবার উপবেশন করিল! সে বুঝিতে পারিল না যে, কোন্ কাঁটাটি তাহার অঙ্গের কোন্ স্থানে ফুটিয়া ভদ্র সমাজে প্রচলিত এসব বেশ-ভূষাও তাহার পক্ষে কাঁটার বস্তু করিয়া তুলিয়াছে!

কিছুক্ষণ পরে একটি ভৃত্য আসিয়া তাহাকে স্নানের জন্য হাতের তেলোয় খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিয়া গেল। একটু বাদে বলাইও সুগন্ধি তৈলে অঙ্গ আমোদিত করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কানাইলাল সরিষার তৈলটুকু মাথায় দিয়া বলাইএর সঙ্গে-সঙ্গে স্নান করিতে গেল। উভয় ভ্রাতা স্নান করিয়া আসিলে বলাই অনায়াসে সহজভাবেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। কানাই বাহিরের ঘরে ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। যখন বস্ত্র পাঠাইবার আর কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না তখন সে অঙ্গনে নামিয়া পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ মাটির উপর বিছাইয়া দিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। বলাই সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুভ্র নূতন বস্ত্র পরিয়া আসিয়া বলাইকে তদবস্থ দেখিয়া যেন কিছু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল,—

"ওকি কানাই দা, কাপড় পাওনি? দাঁড়াও, দিদির বাক্স থেকে আমার কাপড় একখানা এনে দিচ্ছি।" সে ছুটিয়া দিদির ঘরে চলিয়া গেল।

বলাই-ব্যস্ত হইয়া কাপড় আনিয়া দিলে কানাই তাহা পরিয়া আর্দ্র-বস্ত্রখানি শুকাইতে দিল। ভিতর-বাড়ী হইতে ঝি বলাইকে জলযোগের জন্য ডাকিতে আসিল। কানাই একলাটি সেইখানেই বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে জনৈক ভৃত্য ছোটো একখানি কলার পাতায় করিয়া তাহাকেও জলযোগের জন্য কিছু খাদ্য তথায় আনিয়া দিল।

বলাই-এর জলযোগ শেষ হইলে তাহাকে সেইখানেই ভাত দেওয়া হইল। নৃপতিও তাহার সঙ্গে বসিলেন। কিন্তু হঠাৎ বলাই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া নৃপতি কহিলেন, "ভাত দেওয়া হয়েছে যে, কোথায় যাবে এখন?"

সে-কথার উত্তর না দিয়া বলাই কহিল, "আপনি একটু বসুন, আমি আস্‌ছি।"

সে উপরে যাইয়া মুখ ভারী করিয়া শান্তিকে কহিল, "দিদি, কানাই-দা খাবে না ?" বিস্মিত হইয়া শান্তি বলিল, "খাবে না কেন ?"

বলাই কহিল, "নীচের ঘরে কেবল দাদা-বাবুকে আর আমাকে ভাত দিয়েছে, কানাই-দা খাবে কখন ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তি কহিল, "সে ত তোমাদের সঙ্গে বস্‌তে পার্‌বে না—তাই দেয়নি। আর কোথাও হয়ত দিচ্ছে—গিয়ে দেখ।"

বলাই নীচে নামিয়া আসিল। নৃপতি এতক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এইবার বলিলেন, "এস—বোসো।"

একটু কুণ্ঠিতভাবে বলাই জিজ্ঞাসা করিল, "কানাই-দাকে দেওয়া হয়েছে ?"

"হাঁ, তা'কে এখুনি দেবে, এস, আমরা বসি।"

বলাই আহারাদি করিয়া বাহির-বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, কানাই শুষ্কমুখে সেইখানে সেইভাবে বসিয়া রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "খেয়েছ ?"

কানাই কহিল, "না।"

বলাই চোখ বড়-বড় করিয়া বলিল, "সে কি! দাঁড়াও, আমি আসি।"

কানাই উঠিয়া যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বসাইল। শান্তভাবে কহিল, "এই ত জল খেলাম। তুই অমন ছেলে-মানুষি করিস্‌নে, কুটুম্ব বাড়ী যে!"

বলাই আর উচ্চবাচ্য করিল না। দুই ভ্রাতা সেইখানে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে কানাইলালের ডাক পড়িল। কানাই ভিতরে গিয়া দেখিল, ঢেঁকিঘরে তাহারই জন্য কদলীপত্রে অন্নমণ্ডপটি ভাগে-ভাগে তরকারী-পত্রে মেশামিশি হইয়া চিত্র-বিচিত্র হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে যাহা দেওয়ার, একেবারেই একপাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সে উপস্থিত হইলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিবার আর কেহই তথায় রহিল না। কানাইলাল সেই পাঁচ-মেশালি তরকারীর দ্বারা অন্নকয়টি কোনো রকমে উদরস্থ করিয়া আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল, কোনো কথা বলিল না। বাড়ীতে মহেশ্বরী তখনও পর্য্যন্ত পাতের গোড়ায় বসিয়া তাহাকে মাখিয়া-জুকিয়া না দিলে তাহার খাওয়াই হইত না। মহেশ্বরী অঞ্চলের বাহিরের স্থানটি যে এমন ফাঁকা—এমন মমতা-হীন, এমন বেদনায় ভরা—ভাবিয়া তাহার চোখের কোণে দু ফোঁটা জল আসিয়া জমিল।

শান্তির ননদ ঢেঁকিশালায় গিয়া দেখিলেন বালক তাহার উচ্ছিষ্ট রাখিয়া গিয়াছে। তিন চারিটা কাক লভ্যসামগ্রী লইয়া বিবাদ করিতে-করিতে এঁটো-কাঁটা সমস্ত ঘরময় হইয়া পড়িয়াছে। ঢেঁকিশাল সক্‌ড়িতে একাকার হইয়া গিয়াছে। নৃপতির দিদি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সেখান হইতে নৃপতিকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"দাদা দেখে' যাও, দেখে' যাও, ছোঁড়াটা কি করে' গেছে।"

ভগিনীর ডাকে নৃপতির সঙ্গে-সঙ্গে বলাইও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্তি তখন রান্নাঘরে ছিল। কথা শুনিয়া সে সেখান হইতে ঘোম্‌টার কাপড় ঈষৎ তুলিয়া দেখিল এবং সমস্ত বুঝিতে পারিল। নৃপতি কহিলেন,—

"ছেলেমানুষ, বোঝে না, একজনকে দিয়ে ডেকে পাঠাও—পরিষ্কার করে' দিয়ে যাবে।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। শান্তি আসিয়া কহিল, "দিদি, আমি এঁটোটা পরিষ্কার করে' গা ধুয়ে আসি, ও থাক, ওকে ডেকো না।"

তাহার ননদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন "হ্যঁ—তুমি এখন পাঁচজনকে দেবে-থোবে, তুমি যাবে এখন এই-সব ছুঁতে ? বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে!"

শান্তি কহিল, "তাড়াতাড়ি করে' ডুব দিয়ে এলেই ত হবে।"

"না গো, এখন এসকল ছোঁয়া-ছুঁয়ি লেপালেপি কর্‌তে পার্‌বে না।"

শান্তি ভাবিল,—"একটার জায়গায় না হয় পাঁচটা ডুবই দিতাম, তবুও কি শুদ্ধ হ'তে পার্‌তাম ?' কিন্তু সে আর-কিছু বলিতে সাহস না করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার ননদীর অনুমতিক্রমে চাকরটি গিয়া, কানাই-লালকে ডাকিয়া আনিল। ননদ ঠাকুরাণী আঙুল নাচাইয়া,

মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "দেখ দেখি কি করে' গেছ। বামুন-পণ্ডিতের ঘর, তোমার এঁটো-কাঁটা কে ছোঁবে বলো ত? পাতাটা ওদিকে ফেলে' দিয়ে এস; এই জল নাও, গোবর নাও এঁটোটা পেড়ে ফেলো।

কানাই তাঁহার উপদেশ-মত সমস্ত করিল, কিন্তু সহসা নিষ্কৃতি পাইল না। ননদিনী দেখান,—এই যে এখানে এঁটো রয়েছে। সেখানটা পাড়া হইলে, আর একখানে; এইরূপে কানাইলের হস্তে সমস্ত ঢেঁকি-ঘরটা মাজা-ঘষা হইয়া নূতন কলেবর ধারণ করিল। তার পর সে অব্যাহতি পাইল।

বলাই শান্তিকে একাকী পাইয়া কহিল, "দিদি, দেখলে কানাই-দাকে নিয়ে এরা কি-রকম করছে?

এইসকল দেখিয়া-শুনিয়া শান্তি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে বলিল, "কি করব ভাই? ওকে দেখছি না আনলেই ভালো ছিল।'

বলাই অভিমানের সুরে কহিল, 'কেন, বড়-মা পারেন আর এরা পারে না? তুমিও যেমন কিছু বল্‌তে পারো না?

শান্তি কহিল, 'আমার কথা কে বা শুন্‌বে! বড়-মা এসকল শুন্‌লে না জানি কি মনে করবেন। সঙ্গে একটা লোক নিয়ে নৌকা করে' তোরা বাড়ী চলে' যা।"

কানাই বাহিরের ঘরে আসিয়া সেই বেঞ্চের উপরেই শুইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল,—তাহার উচ্ছিষ্ট তাহার মহেশ্বরী-মা ভিন্ন বোধ হয় আর কেহ ছুঁইতে পারেন না। সে এম্‌নি অস্পৃশ্য হতভাগ্য। কিন্তু তরকারী-গুলো একসঙ্গে একাকার করে' না দিলেও ত পারিত! তাহাতে কাহারো মর্য্যাদার ত হানি হইত না। বরং কানাই বোধ হয় ভালোভাবে না খাইতে পারিয়া এইরূপে নানা স্থানে নানা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া একটা এলোমেলো অবোধ্য অভিজ্ঞতা কানাইলালের মনের মাঝে বোঝার মতন জমা হইয়া উঠিতে লাগিল। কেন যে এমন হইতেছে তাহা সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আঘাত ও অপমান যে নানাদিক্ দিয়া তাহার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে তাহা অনুভব করিতে তাহার দেরী হইল না।

রাত্রিকালে শয্যার জন্য কানাইলালকে একটি মাদুর ও একটি বালিশ দেওয়া হইল। সে ভূমিতলে মাদুরটি বিছাইয়া গায়ের র‍্যাপারখানি মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু যতই রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই শীতে তাহাকে কাঁপাইয়া-কাঁপাইয়া আড়ষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। শেষ রাত্রে যে এমন অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, বাহিরে চাকরদের ধূমপানের জন্য যে আগুনের মাল্‌সা রক্ষিত ছিল, যে তথায় আসিয়া তাহাই ক্রোড়ে লইয়া বসিল এবং র‍্যাপারখানির দুই-তিন জায়গায় দগ্ধ করিয়া তাহাতে শান্তির শ্বশুরালয়ের স্মৃতি-চিহ্ন চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়া দিল।

এই বন্ধুহীন নির্ম্মম গৃহ হইতে উড়িয়া পলাইয়া মহেশ্বরীর অঙ্কে স্থান লইবার জন্য তাহার প্রাণ অনুক্ষণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। পাছে শান্তি কিছু মনে করে, এ-জন্য সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। নীরবে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিল, সমস্ত অপমান গায়ে মাখিয়া লইল। যেন এমনি আচরণ চিরকাল সকলেই তাহার সহিত করিয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে মহেশ্বরী তাহাদের আনিবার জন্য লোক ও নৌকা পাঠাইলেন।

কানাই নৌকায় আসিয়া মুক্তি পাইল, বলাই লজ্জার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। কেবল শান্তির মনটা, কানাইলাল যে-বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহা ভাবিয়া অশান্ত হইয়া উঠিল।

বালকেরা বাড়ী পৌঁছিলে মহেশ্বরী কানাইকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিদির বাড়ী আদর যত্ন কেমন?

দুঃখের কথা চাপা দিয়া কানাই কহিল, 'বেশ, ভালো।'

মহেশ্বরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাত মেখে খাওয়াত কে? তুই ত নিজে মেখে খেতেও জানিস্‌নে। এম্‌নি পণ্ডিত।'

কানাই কহিল, 'আমি বুঝি আর মেখে-জুকে খেতে পারিনে? বড়-মা, ভালো কথা, প্রথম দিন যা মজা হয়েছিল।'

"কি মজা হ'ল আবার?"

"খেতে বসে' আমার মনে ছিল না যে, তুমি নেই। খেয়ে'-দেয়ে পাতা রেখে' চলে' গেলাম। তার পর আবার আমার ডাক পড়্ল। কাকগুলো এমন দুষ্ট, আমার সেই এঁটো-কাঁটা সকল ঘর ছড়াছড়ি করে' ফেল্লে। দিদির ননদ এসে,—এখানে এঁটো—সেখানে এঁটো—এইরকম করে' সমস্ত ঘরটাই আমাকে দিয়ে নিকিয়ে নিলে। আচ্ছা, বড়-মা, তুমি ছাড়া আর কেউ আমার এঁটো ছুঁতে পারে না?"

মহেশ্বরী বুঝিলেন বালক তাহার দিদির বাড়ীতে গিয়া তাহার জীবনচরিতের আরো কয়েকটি পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তবু চোখের জল না ফেলিয়া যেন কৌতুকের ছলেই তিনি বলিলেন, "পার্বে না কেন? কাজ এড়াতে পার্লে কি কেউ কর্তে চায়?"

কানাই কিছু বলিল না। মহেশ্বরীও আর-কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

রাত্রিকালে শয়ন করিয়া মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেখানে শুতিস্ কোথায়?'

"মাটিতে—মাদুর পেতে। সে আর-এক মজা—সে আমি বল্‌ব না।'

'কেন?'

'হ্যাঁ—তুমি আবার যদি দিদির কাছে বলে' দাও।

'বারণ করিস্ ত বল্‌ব কেন?'

কানাই মাতার গলা জড়াইয়া বলিল, 'বল্‌বে না ত—ঠিক বল্‌ছ?'

'না।'

কানাই কহিল, "শুধু র‍্যাপার গায়ে দিয়ে কি শীত যায়?'

কন্‌কনে শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে যখন আমার হাতে পায়ে এক হ'য়ে যেত, তখন সেই যে জোয়ানের গল্প বল্‌তে—শক্তি দেখানোর জন্য জোয়ানটা খালি-গায়ে বাহিরে শীতে শুয়ে সেই যে—

'প্রথম রাত্রিতে প্রভু ঢেঁকি-অবতার,
দ্বিতীয় রাত্রিতে প্রভু ধনুকে টঙ্কার,
তৃতীয় রাত্রিতে প্রভু কুকুর-কুণ্ডলী,
চতুর্থ রাত্রিতে প্রভু বেনের পুঁটুলী।'

সেই গল্পটা আমার মনে পড়ে' যেত—আর হাসি পেত।"

এমন নিষ্ঠুর হাসির গল্প শুনিয়া মহেশ্বরীর প্রাণ বেদনায় আন্‌চান্ করিয়া উঠিল। ইহার পর কোনো কথা তাঁহার মুখে আসিতেছিল না। তিনি বলিলেন, "এখন ঘুমো—আমার শরীরটে আজ ভালো নেই।"

মহেশ্বরী কানাইলালের নিকট শাস্তির বাড়ী-সম্বন্ধে আর কোনো দিন কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। না জানি আরো কত বেদনার কত দুঃখ-অপমানের ইতিহাস ইহার আড়'লে লুকাইয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

আকন্দ

(ভূমিকা)

সন্ধ্যা আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগনপারে
অকূল অন্ধকারে,
ছমছমিয়ে এল রাতি ভুবনডাঙার মাঠে,
এক্‌লা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুন-ফোটা গানের কুঁড়ি দেব বলে' দিনুর হাতে আনি'
মনে নিয়ে সুরের গুন্‌গুনানি
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিল বিনা-ভাষার বাণী।
বল্‌লে আমায়, "দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ওগো পথিক, তোমার লাগি' চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে',
সেই সুলগন এল এত দিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁধ্‌ব আমার ভাষা।"

দেখা হ'ল, চেনা হ'ল, সাঁঝের আঁধারেতে,
বলে' এলেম, "তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আজ পড়্‌ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে,
সাগরপারের দেশে।
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে',
তারি মধ্যে উঠ্‌ল বেজে সুরে—
"ভুলো না গো, ভুলো না এই পথবাসিনীর কথা,
আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা?"
তাই ত আমার লিখনখানি রাখিনু এইখানে—
বোলো তা'রে, চোখের দেখা ফুটেচে আজ গানে।

আকন্দ-বল্লভ রবি।

(১)

যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসব-সভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি',
ছুটে' এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী,
সুরের বরণমাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি।
কি সঙ্কোচে এলে না যে, সভার দুয়ার হ'ল বন্ধ,
সব পিছে রহিলে আকন্দ।

(২)

মোরে তুমি লজ্জা কর নাই,
আমার সম্মান মানি তাই ;—
আমারে সহজে নিলে ডাকি'।
আপনারে আপনি জানালে ;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি'।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা,
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কি জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি—তোমার করুণ ভীরু গন্ধ—
বায়ুভরে পাঠালে আকন্দ।

(৩)

হিয়া মোর উঠিল চমকি',
পথমাঝে দাঁড়ানু থমকি',
তোমারে খুঁজিনু চারি ধারে।
পল্লবের আবরণ টানি'
আছিলে কাব্যের দুয়ো রাণী
পথপ্রান্তে গোপন আঁধারে।

সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে' তা'রা সবে নামগোত্রহীন,
কাড়িতে জানে না তা'রা পথিকের আঁখি উদাসীন।
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ,
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

(৪)

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুসুম-কাননে
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড়নি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জ্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি',
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদু মন্দ,
নম্রহাসি উদাসী আকন্দ।

(৫)

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরাণ ডুবাইলে,
শিখে' নিলে অনন্তের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।
দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখো গৌরব তোমার,
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ,
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ॥

১৬ ডিসেম্বর
১৯২৪
চাপাড মালাল

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে
পড়ে' আছে ঘাসে,
যে-ঘাস একদা তা'রে দিয়েছিল বল,
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল ॥

পড়ে' আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, "একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে' রবে অমনি ধূলায় অনাদরে।"

আমি বলিলাম, "মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব্ব বিত্ত রিক্ত করি' যার হয় যাত্রা অবসান;
ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ ঋণ।
ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধরেনি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্ত্যে তা'র কোথা পরিমাণ?

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চির-সুন্দরের সুর-পুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তা'র পরিমাপ নয়;
পদাঘাতে জীর্ণ তা'রে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্ব্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি॥

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্ব্বনাশ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে ফরাসীদের আদিস্থান নির্ণয়

শ্রী হরিহর শেঠ

অনূন সার্দ্ধ দুইশত বৎসর ধরিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে চন্দননগর বলিতে যে সহরটি বুঝাইতেছে, সেই সহরটির প্রাচীনত্ব কতদিনের এবং উক্ত সময়ের পূর্ব্বের উহার ঐতিহাসিক কথা বিশেষ-কিছু আছে কি না তাহা অপরিজ্ঞাত। ফরাসীদের আগমনের সময় হইতে এই স্থানের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরের অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পর্য্যন্ত ইহার তেমন কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না।

স্থানের প্রাচীনতা ও নামের উৎপত্তি।

চন্দননগর এই নামটি কত দিনের তাহা কোনো গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফরাসীদের এইস্থানে আগমনের পূর্ব্বের কোনো গ্রন্থে এই নাম আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। যতদূর জানা যায় তাহাতে ১৬৯৬ খৃঃ অব্দের ২১ শে নভেম্বর মার্টিন (Martin), দেলান্দ (André Boureau Deslande) এবং পেল্ এ (Pellé) স্বাক্ষরিত তদানীন্তন ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রেই চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ১৬৬৪র পূর্ব্বের প্রস্তুত ব্রক্ (Brouck) এর মানচিত্রে চন্দননগরের কুঠি ও পতাকা অঙ্কিত আছে, কিন্তু উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান হয়। (২) হস্ত-লিখিত

(১) La Compagnie des Indes Orientales

(২) Diary of William Hedges Esq. Vol. III. উইলসন-সাহেব তাঁহার Early Annals of the English in Bengal Vol. I গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দীর হুগলী নদীর একখানি মানচিত্রে চন্দননগর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তখন এ নাম ছিল না ইহা ঠিক।

বা মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথিতে এইস্থানের যে উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চন্দননগর নাম নাই। বোড় খলিসানি ও গোন্দলপাড়া এবং গোন্দলপাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী পাইকপাড়া নামক গ্রামের উল্লেখ আছে।

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস কৃত মনসা-মঙ্গল পুঁথিতে বোড় ও পাইক-পাড়া নামক স্থানের উল্লেখ আছে।(৩) প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বের লেখা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ভাগীরথীর উভয় কূলের বর্ণনায় গোন্দলপাড়ার নাম দেখা যায়। (৪) এই উভয় স্থানের বর্ণনা দৃষ্টে উহা যে বর্ত্তমান চন্দননগরান্তর্গত বোড়, যাহাকে পূর্ব্বে বোড়কিশনপুর বা কৃষ্ণপুর বলিত এবং সহরের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত গোন্দলপাড়া, তাহাতে আর কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' গ্রন্থে অতি প্রাচীনকালে খলিসানীতে এক ধীবর রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে (৫); ইহা যে বর্ত্তমান চন্দননগরের পশ্চিম প্রান্তস্থ পল্লী খলিসানী তাহা সুনিশ্চিত। কারণ উহাতে জগদ্দল, সিঙ্গুর, হরিপাল
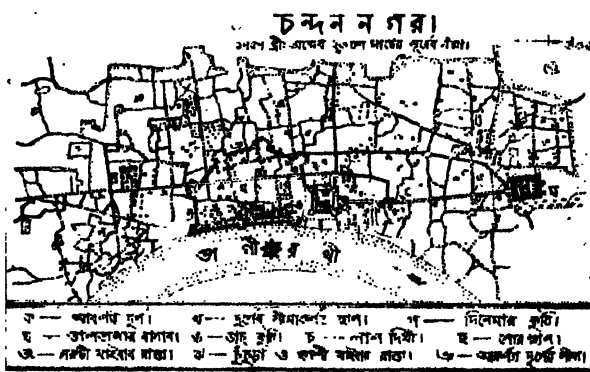
মূল নক্সার কোনো পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ভিন্ন অংশগুলি যেরূপ আছে সেই-মতই রাখা হইয়াছে। অন্ত পুস্তক বা মানচিত্র দৃষ্টি স্থান নির্দ্দেশ নাম দেওয়া হইল

প্রভৃতি স্থানের কথা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। ধীবর রাজা বলিয়া যাহা লিখিত আছে, তাহার সাপক্ষে জানা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্ত্তমান হুগলী জেলায় ধীবরদিগের বাসই অধিক ছিল। (৬) শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান চণ্ডীর কথা নামক হস্ত-লিখিত আর-একখানি পুঁথিতে "বোড়তে বোড়াইচণ্ডী করিলা স্থাপন" এইরূপ লিখি বলিয়া শুনিয়াছি। (৬)

পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট করিয়াও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের কোনো গ্রন্থে বা চন্দননগরের নামোল্লেখ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। ইহ প্রতীয়মান হইতেছে যে বোড়, গোন্দলপাড়া ও খলিসানী স্থানগুলি উল্লিখিত গ্রন্থরচনার কালে বর্ত্তমান থাকিলেও, যখন চন্দ বা উহার অন্ত নাম ফরাসডাঙ্গার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় ন সে সময় চন্দননগর নামে কোনো স্থান ছিল না বা সমষ্টিগত-ভা ভিন্ন পল্লীগুলির কোনো একটি নাম ছিল না। থাকিলে অবশ্য সেই নামে বর্ণনা করাই স্বাভাবিক হইত।

১৬৭৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজ-কোম্পানীর প্রতিনিধি ষ্ট্রেন্‌শাম্ (Streynsham Master) যিনি পরে মান্দ্রাজের গভর্নর হইয়া তিনি হুগলীর কুঠিসকল পরিদর্শনার্থ আসিয়া ফরাসীদের যেস্থ ছিল, তাহাকে বৃহৎ একখণ্ড জমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৮

সুতরাং দেখা যাইতেছে চন্দননগর নামে যখন এই স্থানের ছিল না, তখন খলিসানী, গোন্দলপাড়া ও বোড়নামক গুলির অস্তিত্ব ছিল। শুনা যায় প্রাচীনকালে বোর নাম হইতে এই স্থানের বোড় নাম হয়। এ-কথা ঠিক না পারে, কারণ সাতগাঁর অন্তর্গত বোড় নামক পরগণার বোড় একটি স্থান ছিল। (৯) বোড় পরগণা হুগলী জেলার একটি বড় প এখনও দলিল পত্রে এ নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোন্দলপাড়া ন জেহানখাঁর সম্পত্তি ছিল, ফরাসী কোম্পানি উহা পত্তনি লন। সাবিনাড়া, চক্ নসিরাবাদ, গঞ্জ-শুক্রাবাদ প্রভৃতি এখানকার কতিপয় পল্লী প্রাচীন বলিয়া জানা যায়। খলিসানির প্রাচীনতা হাজার বৎসরের, তাহা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায়। পূ কবিদের বর্ণনায় এইসকলের নাম না থাকার স্বপক্ষে এই বলা পারে, যে, এইসকল গ্রাম গঙ্গার ঠিক তীরে না থাকায় ভাগীরথীর কূলের বর্ণনার মধ্যে উহা স্থান পায় নাই। আর-একটি কথা, পূর্ব্বে সমগ্র দেশ এক-শাসনের অধীন ছিল, তখন কতিপয় গ্রাম একত্র একটি সহর বলিয়া পরিচিত হইবার এমন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে না।

এইসকল প্রমাণ হইতে নিঃসংকোচেই ধরিয়া লইতে পারা যায় সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর লইয়া ইংরেজ অধিকারের সহিত বর্ত্তমান কলিকাতা সহরের উৎপত্তি, সেইরূপ বোড়কিশনপুর, খ

(৩) "ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে রহিল বোরো পূর্ব্বে কাঁকিনাড়া
মূলাজোড় গাড় লিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর"।
বিপ্রদাসকৃত 'মনসা-মঙ্গল'।

(৪) "নায়ে তুলিয়া সাধু লইল মিঠা পাণি।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে করমানি॥
পরিফা বহিয়া সাধু বাকে গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন ন পাড়া॥"
অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'।

(৫) "খলসানি মহাগ্রামে যত্র রাজাচ ধীবরঃ॥"
বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত ১ম ভাগ।

(৬) Bengal District Gazetteer—Hooghly, Vol. xxix

(৬) এই পুঁথি আমার দেখিবার সুযোগ হয় নাই। হিতবাদীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিষয় জ্ঞাত করেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার সাহগেছের নিক ধান্যখেড়ু নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বা এই হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথিখানি দেখিয়াছিলেন।

(৮) Diary of William Hedges Vol. II & III. যখন হুগলী, বরানগর প্রভৃতি কোনো কোনো স্থানের নাম করিয়া তখন চন্দননগরের নাম পাইলে অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন।

(৯) রাজারাম চৌধুরীর পাট্টা হইতে ইহা জানা যায়।—পণ্ডিত অপ্রকাশিত রেকর্ড।

(১০) A Sketch of the Administration of Hoogl District.
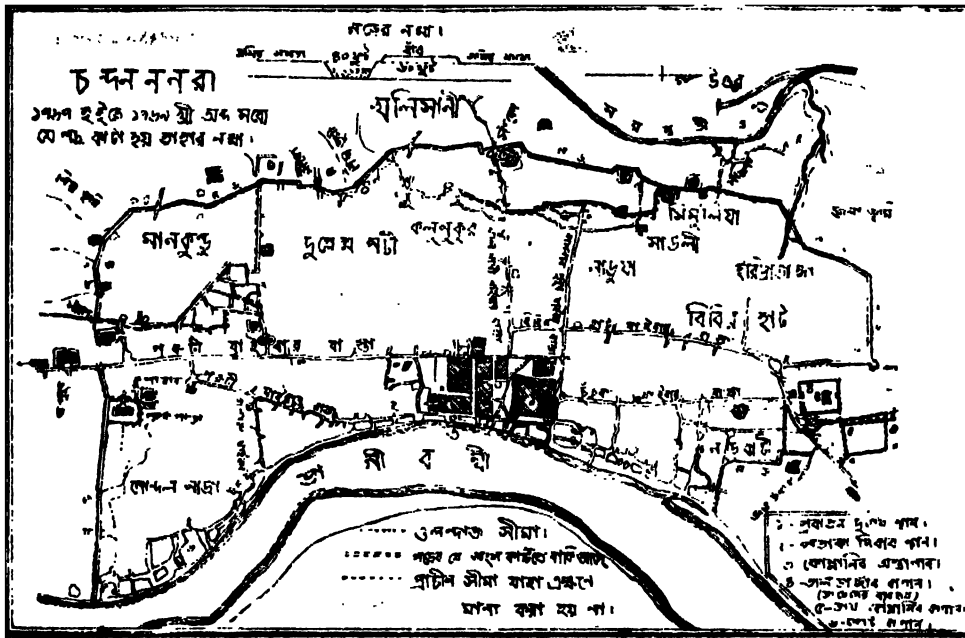
এই নক্সা গভর্নর মসিয়ে শেভালিয়ের (Monsieur Chevalier) আদেশে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তুত হইয়াছিল

ও গোন্দলপাড়া প্রধানতঃ এই তিনটি পল্লী লইয়াই ফরাসী কোম্পানীর আগমনের সহিত এবং তাঁহাদের উহা একসঙ্গে হস্তগত হওয়ার পর চন্দননগর নামের উৎপত্তি। এই তিনটি ভিন্ন সাবিনাড়া, চকনসিরাবাদ প্রভৃতি আরও দুই-একটি গ্রাম থাকিতেও পারে। সমষ্টিভাবে এই স্থানকে বা ভগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বের অন্য নিকটবর্ত্তী স্থান-সকলকে বরং তখন সাধারণতঃ হুগলী বলিত, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (১১)

চন্দননগর এই নাম কাহার দ্বারা বা কিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহাও বেশ পরিষ্কার-রূপে জানা যায় না। এ-সম্বন্ধে তিনপ্রকার কথা জানা যায়। বহু গ্রন্থকার বলিয়াছেন, চন্দ্র হইতে চন্দ্রনগর বা চন্দন হইতে চন্দননগর নাম হইয়াছে। (১২) কিন্তু চন্দ্র হইতে বা চন্দন হইতে, কি, কি কারণে এই নাম হইল সে-সম্বন্ধে পূর্ব্বের একখানি স্থানীয় সংবাদ-পত্র "প্রজাবন্ধু" ভিন্ন কেহই স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। ধনুরাকৃতি ধূর্জ্জটি-ললাটে চন্দ্রকলার সাদৃশ বলিয়া এই নামোৎপত্তি ইহাই প্রজাবন্ধু বলিয়াছেন। (১৩) ফরাসী গ্রন্থে বলিয়াছে "Vil de la lune" ভাগীরথী-বক্ষ হইতে চন্দননগরের দিকে চাহিলে বা চন্দননগরের মানচিত্রের দিকে দেখিলে এ-কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। চন্দন কাঠের দেশ "Land of Sandal-wood" বা "Ville du Bois de Santal", ইহাই গ্রন্থ-সকলে পাওয়া যায়। চন্দনকাঠের ব্যবসায় হইতে চন্দননগর নাম হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, কারণ পূর্ব্বকালে এই স্থান হইতে চন্দনকাষ্ঠ রপ্তানির কথাও জানিতে পারা যায়। (১৪) পরবর্ত্তী-কালে কোনো লাল কাষ্ঠ বহুল-পরিমাণে এখান হইতে যাইত, ইহারও উল্লেখ আছে। (১৫) সুতরাং উহা বকম না হয় রক্ত চন্দন হওয়া সম্ভব। আরও জানা যায় যে নদীয়ার ধার্ম্মিক রাজা কৃষ্ণ হুগলীর সান্নিধ্য হইতে চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১৬) হুগলীর নিকট চন্দননগর হওয়া অসম্ভব নহে। এ-সম্বন্ধে একমাত্র শম্ভুচন্দ্র দে মহাশয় বলিয়াছেন যে, একসময় এখানে প্রচুর-পরিমাণে চন্দন কাষ্ঠ উৎপন্ন হইত। (১৭) সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই উভয় কারণ হইতেই চন্দননগর নাম হইতে পারে, কিন্তু চন্দনকাঠের বন বা চন্দনকাঠের আমদানি-রপ্তানি হইতেই এই নাম হওয়া অধিকতর সম্ভব মনে হয়।

(১১) Gracin's Journal ও La Compagnie des Indes Orientals.

(১২) (ক) The Imperial Gazeetter of India, vol. II.
(খ) Les Colonies Francaises.
(গ) Statistical Account of Hugli.
(ঘ) L' Inde Francaise.
(ঙ) Bengal District Gazetteers—Hooghly.
(চ) Histoire des Missions de l' Inde Vol. I
(ছ) Carey's Tour in the Hugli and Howrah Dist.
(জ) প্রজাবন্ধু—২৭ কার্ত্তিক ১২৮৯ সাল।
(ঝ) Hooghly—Past and Present.

(১৩) প্রজাবন্ধু, ২৭ কার্ত্তিক ১২৮৯ সাল।

(১৪) ১৭০০ খৃঃ অব্দে ফেলিপো (Phélypeaux) নামক জাহাজে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত চন্দন কাষ্ঠ পাঠানো হইয়াছিল।

La Compagnie des Indes Orientales.

(১৫) La Compagnie Francaise Des Indes (1604-1875).

(১৬) ক্ষিতীশ-গ্রন্থাবলী।

(১৭) Hooghly—Past and Present.

আর-একটি কথা জানা যায়, স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স (Sir William Jones) যখন শহরটী প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন, তখন তিনি তাঁহার রোজনামায় লিখিয়া গিয়াছেন,—ফরাসীরা "চন্দন সেঁা লিপোয়ারে থাম" প্রথানুসারে নগরটিকে সুসজ্জিত করিত বলিয়াই ; সহরের নাম চন্দননগর হইয়াছে। (১৮) যদি ইহাই প্রকৃত কারণ হয়, তবে যাঁহারা চন্দন-কাষ্ঠ হইতে নামের উৎপত্তি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সহিতও ইহার যে মিল না হইতেছে তাহা নহে।

এই নাম কে দিয়াছিলেন, তাহা কোনো স্থানে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেহ-কেহ অনুমান করেন দেলান্দ কর্ত্তৃক এই নাম প্রদত্ত হয়। দেলান্দ কর্ত্তৃক ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে এই নামের উল্লেখ ভিন্ন, এই উক্তির স্বপক্ষে আর কিছু প্রমাণ পাই নাই। যদি ফরাসীদের অধিকারে আসার সঙ্গে এই নাম হইয়াছে, এ অনুমান সত্য হয়, তবে দেলান্দের দ্বারা হোক বা না হোক অন্ততঃ ফরাসীদের দ্বারাই যে এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে ইহাই মনে হয়।

চন্দননগরকে লোকে ফরাসডাঙ্গাও বলিয়া থাকে। এ-নামের উৎপত্তি ও প্রাচীনতার কথাও ঠিক কিছু বলা যায় না। এই স্থানের পূর্ব্ব দিকে জাহ্নবী এবং অপর সকল দিকে অধিকাংশ স্থানেই জলা ও নিম্নভূমি ছিল। (১৯) সুতরাং স্থানটির এই অপেক্ষাকৃত উচ্চতা এবং ফরাসীদের অধিকারে আসায় 'ফরাসীডাঙ্গা' হওয়া এবং তাহা হইতে ফরাসডাঙ্গা নামকরণ সম্ভব মনে হয়। ১১৭৫ সালের ফার্সিতে মহম্মদ ওয়াজিদ্ হোসেন-স্বাক্ষরিতও একটি অস্পষ্ট ফার্সি-মোহরাঙ্কিত একখানি বাঙ্গালা দলিলে ফরাসডাঙ্গা লেখা আছে দেখিয়াছি। (২০) ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ্চ নবাবকে পত্রে "ফ্রাসডঙ্গী" কথা ব্যবহার করিয়াছেন। (২১) উভয়। বাক্যই সম্ভবতঃ ফরাসডাঙ্গারই অপভ্রংশ। সুতরাং ফরাসডাঙ্গা নাম যে পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে।

এস্থানে কুঠি-স্থাপনের কারণ ও সময়

ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার কোন্ স্থানে কখন ব্যবসার্থ প্রথম কুঠি স্থাপন করেন এবং উহা চন্দননগর কি না, তাহার সম্বন্ধেও মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ব্যবসায়কেন্দ্র স্থাপনের কারণ নির্দ্দেশ বিষয়েও বিভিন্ন মত দেখা যায়। বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক্ জাতিগণ যে কারণে বা যে সুবিধা বিবেচনা করিয়া হুগলী নদীর তীরে হুগলীর মধ্যে বা আশে-পাশে নিজ-নিজ ব্যবসা-স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন ; ফরাসীরাও সেই একই কারণে বা একই সুবিধা মনে করিয়া এস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রচুর শিল্পজাত পণ্য-সম্ভারই যে তাঁহাদের এ-স্থানে কুঠি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনয়ন করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ফরাসী কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টর ক্যারঁ (Caron) এখান হইতে রপ্তানির উপযুক্ত শিল্পজাত মূল্যবান্ দ্রব্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়া কুঠি স্থাপনের জন্য দেলান্দকে পাঠান। (২২) অন্যত্র জানিতে পারা যায় প্রথম ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গলা হইতে বিবিধ প্রকার পণ্যের কতকগুলি নমুনা পণ্ডিচারীতে প্রেরিত হয়। পরবৎসর মার্টিন ৪০০০০ এক্যু (ecu) মুদ্রা (২৩) সমেত দেল্টর (Deltor) নামক এক-ব্যক্তিকে একখানি জাহাজে করি প্রথম প্রেরণ করেন। তৎপর-বৎসর কুঠি চালাইবার জন্য দেলান্দ প্রেরিত হন। এই কুঠি প্রথম হুগলীতে স্থাপিত হয়। (২৪) কেপলিন্ বলিয়াছেন ব্যাণ্ডেলে পোর্টুগীজ কুঠির নিকটে দেলান্দ প্রথম তাঁহাদের স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। (২৫) তৎকালে এখানকার মস্‌লিন বস্ত্র ফরাসী বিলাসীদের যেরূপ আদরের সামগ্রী ছিল, তাহাতে উহা সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য যে এখানে কুঠি স্থাপনের অন্যতম কারণ নহে, তাহাও বলা যা না। পূর্ব্বকালে চন্দননগরে প্রচুর-পরিমাণে মস্‌লিন উৎপন্ন হইত এব এস্থান হইতে মস্‌লিন ও অন্যান্য বস্ত্র অনেক-পরিমাণে রপ্তানি হইত (২৬) পরবর্ত্তীকালের লেখা হইতে জানা যায়, চন্দননগরে উৎপন্ন বস্ত্র অন্য স্থানের তুলনায় অধিক লাভে বিক্রয় হইত। (২৭)

ইংরাজী নথি-অনুসারে ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গলায় কুঠি স্থাপন, একটি দৈব ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে জানা যায় ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেলা হে (De la Haye) কর্ত্তৃক প্রেরিত বহরের ফ্লেমিং নামক জাহাজখানি সেণ্ট থোম্-এ প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, বাত্যা-বিতাড়িত হইয়া দলচ্যুত হইয়া করোম্যাণ্ডেলের পরিবর্ত্তে বালেশ্বরের পথে আসিয়া পড়ে, এবং তিনখানি ওলন্দাজ জাহাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া উহা হুগলীতে আনীত হয়। পরে এই জাহাজের লোকেরাই হুগলীতে ডাচেদের কুঠির সন্নিকটে একটি ছোটো বাড়ি করিয়া প্রথম কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। (২৮)

ফরাসী কোম্পানির বাঙ্গলায় পাকা-রকম ব্যবসায় স্থাপনের ইহাই ভিত্তি না হইলেও, বা ফরাসী ইতিহাসে ইহার উল্লেখ না পাওয়া যাইলেও, এই কাহিনী মিথ্যা নাও হইতে পারে। কারণ তাঁহারা এস্থানে স্থায়ীভাবে আসিবার প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ১৬৭৩।৭৪ খৃঃ অব্দে হুগলী হইতে দেড় লিগে (২৯) দক্ষিণে দুপ্লেসি (Du Plessis) চন্দননগরে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার দক্ষিণে বর্ত্তমান চন্দননগরে ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ফরাসীরা ৪০১৲ টাকা মূল্যে কুড়ি আরপাঁ (৩০) arpents পরিমিত একটি পল্লী খরিদ করিয়াছিলেন, ইহাও জানিতে পারা যায়। (৩১) অন্য ঐতিহাসিক এই জমির পরিমাণ ২০ আরপাঁর অধিক নহে এবং ইহা বোড় কিশনপুরের (Boro-quichempour) অন্তর্গত

---

(১৮) বসন্তক। (প্রাচীন সাময়িক পত্র, ৩৩৬নং চিৎপুর হইতে প্রকাশিত হইত।) আমি উহার অর্থ ঠিক করিতে পারি নাই।

(১৯) ১৭৬৭-৬৯ খৃঃ অব্দের মানচিত্র।

(২০) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের বৃত্তির সনন্দপত্র।

(২১) ......to destroy the fortifications of Francedongy......Bengal in 1756-57.

(২২) La Compagnie Francaise des Indes (1604-1875).

(২৩) তৎকালে এক এক্যু ইংরাজি অর্দ্ধ ক্রাউন মুদ্রার সমান ছিল।

(২৪) (ক) Histoire de la Compagnie Royale des Indes Orientales.

(খ) Bengal District Gazetteer—Hughly.

(২৫) La Campagnie des Indes Orientales.

(২৬) ১৭০০ খৃঃ অব্দে ফেলিপো (Phelypeaux) জাহাজে ১৫০ গাঁইট কাপড় এবং পার্ল দোরিয়াঁ (Perle d' Orient) তে বহুপরিমাণে মস্‌লিন পাঠান হইয়াছিল।

La Compagnie des Indes Orientales.

(২৭) The Private Diary of Ananda Ranga Pillai, Vol. I.

(২৮) Bengal District, Gazetteer—Hooghly, Vol. xxix.

(২৯) এক লিগ (league) প্রায় ১॥ ক্রোশের সমান।

(৩০) ফ্রান্সের পূর্ব্বেকার জমির এক-প্রকার মাপ।

(৩১) La Mission du Bengale Occidental, Vol. 1.
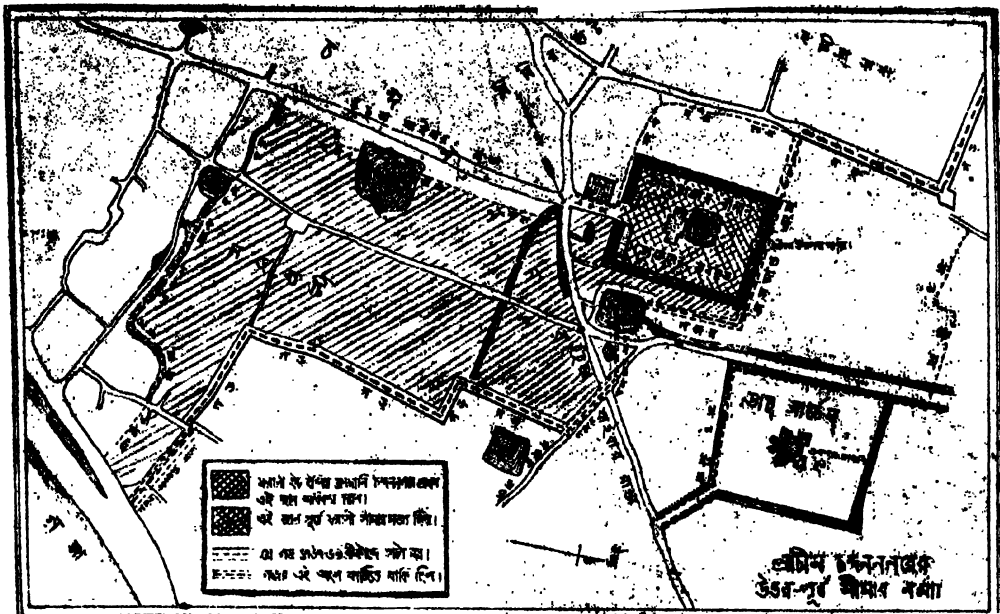
ছিল বলিয়াছেন। (৩২) হুগলীর কুঠি-সংক্রান্ত নথি পুস্তকে (Factory Records Hugli) লিখিত আছে,—হুগলীতে ডাচ্ কুঠির নিকটে ফরাসীরা একটি ছোটো বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ডাচেদের কর্ত্তৃক মুসলমান নবাবকে আবেদন-উপঢৌকনে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার দ্বারা দূরীভূত হন। এই অছিলায় ফরাসীরা ঐ স্থান ত্যাগ করিলেও তাঁহাদের আর ঋণ না পাওয়াই ত্যাগের প্রকৃত কারণ। তাঁহারা ৮০০০৲ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (৩৩)

ইংরাজ কোম্পানির প্রতিনিধি ষ্ট্রেন্‌শ্যাম্ মাষ্টার (Streynsham Master) ১৬৭৬খৃঃ অব্দে হুগলীর কুঠি পরিদর্শনার্থ আসিয়া, তথা হইতে ফিরিবার কালে হুগলীর দুই মাইল দূরে প্রথম ওলন্দাজ দিগের বাগান "ডাচ্ গার্ডেন্" অতিক্রম করেন এবং অল্পদূরে ফরাসীদের বৃহৎ একখণ্ড জমি দেখিতে পান, যাহাতে, তিনি বলিয়াছেন, ফরাসীরা পূর্ব্বে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এ কুঠির ফটক তখন বিদ্যমান ছিল। এবং ঐ জমি সে সময় ওলন্দাজদের অধিকারে ছিল। উহার পর ডাচেদের সুনির্ম্মিত একটি কুঠি দেখিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি চালাঘর মাত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। (৩৪) উইলসন সাহেব (C. R. Wilson H. A.) এই ডাচ্ গার্ডেন চন্দননগরের মধ্যে ছিল বলিয়াছেন। (৩৫)

হুগলীর ফ্যাক্টরি রেকর্ডে হুগলীতে ডাচ্ কুঠির নিকট যে ছোটো বাড়ীর কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাই ষ্ট্রেন্‌শ্যাম্ মাষ্টারের বর্ণিত কুঠি বলিয়া ওম্যালে (L.S.S. O' Malley) সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই কুঠি চুঁচুড়ার ঠিক দক্ষিণে বর্ত্তমান চন্দননগরের একেবারে উত্তর সীমায় অবস্থিত ছিল। (৩৬) ব্রাডলেবার্ট্ ও (F. B. Bradley Birt, I.C.S.) ইহা বর্ত্তমান চন্দননগরের উত্তরাংশে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উহাই ভাগীরথীর তীরে প্রকৃত প্রথম ফরাসী অধিকৃত স্থান বলিয়াছেন। (৩৭)

পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বর্ণনায় উভয় গ্রন্থকার ফরাসী কুঠি বা বাড়ীটিকে হয় ডাচেদের বাগান না হয় ডাচ কুঠির নিকট বলিয়াছেন। কিন্তু একজন উহা হুগলীর দুই মাইল দূরে এবং অপর গ্রন্থকার হুগলীর মধ্যে বলিয়াছেন। ইহাতে উভয়ই যে স্বতন্ত্র নহে, তাহা হঠাৎ মনে করিতে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক লেখক ওম্যালে ও ব্রাড্‌লে-বার্টের সিদ্ধান্ত এই দুইটি যে ভিন্ন নহে এক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার নাই। চন্দননগর প্রসঙ্গে এই হুগলী ও চন্দননগর লইয়া চন্দননগরের পুরাবৃত্ত-অন্বেষী ইতিহাসের পাঠকের কাছে সহজেই মনোমধ্যে একটা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

চন্দননগরে স্থায়ীভাবে আসিবার পূর্ব্বে সত্যই কিছু দিনের জন্য

(৩২) L' Inde Francaise. এইগ্রন্থে বুরো দেলান্দকে এই-জমির খরিদদার বলিয়া উল্লেখ আছে, একথা সত্য হইতে পারে না। কারণ দেলান্দ ১৬৮৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় আসেন নাই। করদিএর (M. Cordier) অপ্রকাশিত নোটে দেলান্দের আগমন-কাল ১৬৯১ লেখা আছে, উহাও ঠিক নহে। কারণ পণ্ডিচারীর অন্য কাগজ-পত্রে ১৬৯০ খৃঃ অব্দে ঢাকার নবাবের নিকট হইতে চন্দননগরে তাঁহার পরয়ানা-প্রাপ্তির কথা লেখা আছে।

পণ্ডিচারী রেকর্ড।

(৩৩) Bengal District Gazetteer, Hooghly. Vol.

(৩৪) Hedges Diary, Vol. II.

(৩৫) The Early Annals of the Fnglish in Bengal.

(৩৬) Bengal District Gazetteer—Hooghly. Vol. xxix.

(৩৭) Chandernagoı—The Calcutta Review 1918.

ব্যাণ্ডেলে ফরাসী কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। (৩৮) তথায় ফরাসী কোম্পানীর ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তাহা যে অধিক দিনের জন্য, এরূপ কথা বহু ইংরাজী ও ফরাসী ইতিহাস আলোচনা করিয়াও পাই নাই। হুগলীতে তাহাদের কথা কোনো কোনো ইতিহাসে, বা পুরাতন কোনো-কোনো ফরাসী কাগজপত্রে চন্দননগরের পরিবর্ত্তে হুগলীর নাম থাকিলেও, তাহা বর্ত্তমানে চন্দননগর যে স্থানের নাম, সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। হুগলীর অধীনে চন্দননগর "ce lien de Chandernagore de le dependance d' Ougly" বা "ce lien de Chandernogor dependance de cette ville et Government d'Ougly" যাহা পুরাতন ফরাসী কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়, উহা হইতে হুগলীর কুঠির অধীনে চন্দননগর ইহা বুঝিবার কোনো কারণ নাই। বোড় পরগণার অন্তঃপাতী চন্দননগরের বোড় কিশনপুর-সম্বন্ধেও সাতগাঁর অধীন "Boroquichempur capitale du paragonate de Boro dependont de Satgan" এইরূপ দেখা যায়। (৩৯) ফরাসী ঐতিহাসিক পল কেপলস্ত (Paul Kaeppelin) এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—লোকে বহুদিন পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী হুগলীর নামেই এই ফরাসী উপনিবেশটিকে অভিহিত করিত। (৪০) লুরা গারস্যাঁ (Lourent Garcin

অর্ল্যাঁ দুর্গ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের নক্সা।
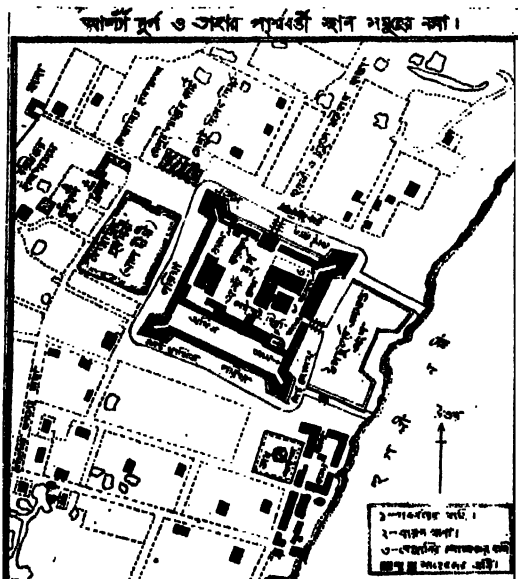
তাঁহার গ্রন্থখানেও এই কথার পক্ষে লিখিয়াছেন,—হুগলী নদীর পশ্চিম কূলের সমস্ত দেশটিকেই হুগলী বলিত) চুঁচুড়াকেও হুগলী বলিয়া লোকে অভিহিত করিত। (৪১) ওয়েবার (H. Weber) আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, হুগলীর কাছে থাকায় সেই সময় সব দলিলে চন্দননগরকে হুগলী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছে। (৪২)

দ্বিতীয়বার ফরাসী কোম্পানীর চন্দননগরে আগমন ও কুঠি স্থাপনে সময় ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। বহু ঐতিহাসিক ইহাকেই চন্দননগরে ফরা উপনিবেশ স্থাপন বা সহরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার, অথবা মোগল রাজার নি হইতে সনন্দ পাইবার কাল বলিয়াছেন। (৪৩) যদিও ১৬৮৮ খ্রীষ্টা ফরাসীরা আরঙজেবের নিকট হইতে ৯৪২ হেক্টর (৪৪) জমি ৪০০০ টাকায় খরিদ করিয়া (৪৫) মোগলদের অনুমতি লইয়া, এই সময় হই পাকা রকম করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৬৭৩ বা ৭৪ খৃষ্টা দু প্লেসি (Du Plessis) নামক একব্যক্তির দ্বারা যে জমি সংগ্রহ একটি কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাই যে প্রথম,সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই (৪৬) এই দুপ্লেসির কথার কোনো স্থলে উল্লেখ না পাওয়া যাইলে ১৬৭৩।৭৪ খৃষ্টাব্দে যে তাঁহারা প্রথম চন্দননগরে আগমন কে সে-বিষয় বহু গ্রন্থেই জানা যায়। (৪৭) ঐতিহাসিক হিল (S. C. Hil মানুচি (Niccolas Manucci) গ্রাণ্ট (James Grant) ষ্টুয়া (Charles Stewart) প্রভৃতি, আগমনকাল ১৬৭৬ বলিয়াছেন ঐতিহাসিক ম্যালিসনের (G. B. Maleson) গ্রন্থ (৪৮) হইতে বু যায়, যেন তাঁহারা প্রথম আসার পর আর যান নাই। ষ্ট্রেন্‌শ্যাম্ মাষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ১৬৭৩।৭৪ হওয়াই সম্ভব মোগল বাদশার নিকট ফারমান লাভের কাল-সম্বন্ধে অনেকেই ১৬৮ খৃষ্টাব্দ বলিলেও ঐ সময় পাকা ফর্‌মান পাওয়া যায় নাই। তখন কু স্থাপনের অনুমতি মাত্র দিয়াছিলেন। ১৬৮৯ হইতে লেখা-লেখি, অং

(৩৮) La Compagnie des Indes Orientales.

(৩৯) বোড় কিশনপুর বিক্রী সংক্রান্ত দলিল—পণ্ডিচারী রেকর্ড।

(৪০) La Compagnie des Indes Orientales.

(৪১) A Brief History of the Hughli District.

(৪২) La Compagnie Francaise des Indes (1604-1875).

(৪৩)(ক) Histoire des Missions de l' Inde.

(খ) La Mission du Bengala Occidental, Vol. I

(গ) Three Frenchmen in Bengal.

(ঘ) History of the French in India.

(ঙ) A Sketch of the Administrations of th Hoogly District. (চ) Imperial Gazetteer. (ছ) Early Annals of the English in Bengal..

(৪৪) এক হেক্টর ৮ বিঘা ১৩ কাঠার সমান।

(৪৫) La Mission du Bengale Occidental Vol. I গ্রন্থে এই-জমি খরিদের কথা জানা যায়, কিন্তু পণ্ডিচারীর দপ্তরের নথি পত্রে এ-সময় এ-পরিমাণ জমি ফরাসীদের ছিল, এরূপ জানিতে পারি নাই। বরং যাহা জানিতে পারা যায় তাহাতে ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

(৪৬) La Compagnie des Orientales ও La Mission du Bengale Occidental, Tome I.

(৪৭) (ক) The Travels of a Hindoo (খ) L' Inde Francaise.

(গ) La Compagnie Francaise des Indes (1604-1785) (ঘ) Bengal District Gazetteers—Hughly (ঙ) La Compagnie des Indes Orientales (চ) Hedges Diary Vol. III. (ছ) Statistical Accounts of Hugli (জ) Calcutta Review 1918 Chandernagore (ঝ) Imperial Gazetteer-এ ১৬৭২ বা ৭৬ লিখিয়াছে। পণ্ডিচারীর দপ্তরে ১৬৯০-এর পূর্ব্বের কোনো কথা পাই নাই বা দুপ্লেসির নাম পাই নাই। তবে তৎপূর্ব্বে অন্ততঃ ৬১ বিঘা জমি তাঁহাদের ছিল ইহা ইব্রাহিম খাঁর ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরওয়ানা হইতে জানা যায়।

(৪৮) History of the French in India.
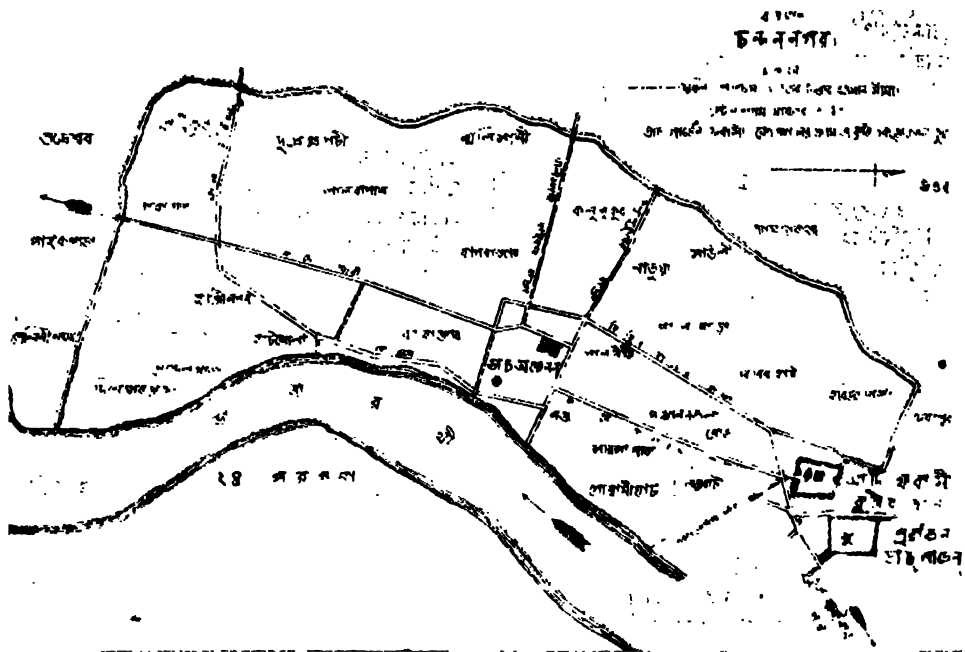
ব্যয় ও বহু চেষ্টা করিয়া ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে উহা প্রাপ্ত হন। (৪৯) ফরদিয়ের টীকায় ইহা ১৬৯৫ লেখা আছে। (৫০)

দ্বিতীয় বার যিনি কোম্পানির অধিনায়ক হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি বালেশ্বরের কুঠি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার নাম দেলান্দ। ইনি প্রকৃত প্রথম ব্যক্তি না হইলেও চন্দননগরের ভিত্তি সংস্থাপকের গৌরব ইনিই লাভ করিয়া আসিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বোক্ত দুপ্লেসিই ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে বালেশ্বরে প্রথম জমি পাট্টা করিয়া লইয়া তথায় কুঠি প্রতিষ্ঠা করিলেও দেলান্দকে অনেক ঐতিহাসিক বালেশ্বরের কুঠি সংস্থাপক বলিয়াছেন। (৫১) ইনি ১৬৪০—৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তুর (Tours) নামক প্রদেশে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ঘরের বংশধররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত ভারতে আগমন করেন। পণ্ডীচারীর প্রতিষ্ঠাতা মার্টিনের (Francois Martin) কন্যার সহিত পরে ইঁহার বিবাহ হয়। (৫২)

ফরাসী কোম্পানীর চন্দননগরের তথা বঙ্গে কুঠিস্থাপনের ইতিহাস সংক্ষেপত এইরূপ।—১৬৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে দুপ্লেসি হুগলী হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া বর্ত্তমান চন্দননগরের উত্তরাংশে জমি সংগ্রহ করিয়া একটি কুঠি স্থাপিত করেন। সম্ভবতঃ ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গড়বন্দি করা হয়। (৫৩) এই সময় ওলন্দাজরা নবাবকে আবেদন উপঢৌকন দ্বারা সন্তোষ করিয়া ফরাসীদের হয় বিতাড়িত করে, না হয় তাঁহারা অসুবিধা বুঝিয়া আপনা হইতেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাণ্ডেলে দেলান্দ একটি ছোটো আড্ডা স্থাপন করিয়া ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে তথায় আগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় ভুক্ত রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্ম যাজকদের সহিত বিবাদ হওয়ায় (৫৪) বা অন্যরূপ অসুবিধার কারণ (৫৫) ঐস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুগলীতে অন্য কোনো স্থানে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করেন। (৫৬) তথায় সুবিধা মত জমি না পাওয়ায়, দুপ্লেসি চন্দননগরে যে জমিখণ্ড খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন তথায় নুতন করিয়া স্বতন্ত্র কুঠি স্থাপনের অভিলাষী হইয়া নবাবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজরা ইহা অবগত হইয়া এবারও হুগলীর শাসনকর্ত্তাকে ও বাঙ্গলার নবাবকে লেখায়, কোম্পানী প্রথম এই কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান না। পরিশেষে গ্রেগরী বুতে (Gregory Boutet) মারফৎ চেষ্টা করিয়া, মোগল সরকারে ৪০০০০৲ টাকা দিয়া ডাচেদের যে-সকল সর্ত্ত ছিল সেই সর্ত্তে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সম্পর্কে মাকারা Maccarah নামক এক ব্যবসাদার ভদ্রলোক সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে দশ হাজার তৎক্ষণাৎ এবং অবশিষ্ট বৎসরে ৫০০০৲ টাকা হিসাবে দিবার কথা স্থির হয় এবং কর শতকরা ৩।০ টাকা

(৪৯) La Compagnie des Indes Orientales.

(৫০) পণ্ডিচারীর অপ্রকাশিত রেকর্ড।

(৫১) L' Inde Francaise ও La Compagnie des Indes Orientales.

(৫২) Storia di Mogor Vol. I. Introduction.

(৫৩) La Mission du Bengale Occidental Vol. I.

(৫৪) Storia di Mogor Vol. I.

(৫৫) La Compagnie des Indes Orientales.

(৫৬) La Mission du Bengale Occidental Vol. I. গ্রন্থে বিবাদের সময় ১৬৯১ বলিয়া লেখা আছে।

ধার্য্য হয়। পরে উহা শতকরা ২।০ টাকা হইয়াছিল। এই ফারমানের জন্য প্রথম ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে লেখা হয়। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে উহা পাইবার সংবাদ আইসে এবং ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নবাবের দেওয়ানের মারফৎ উহা প্রাপ্ত হন (৫৭)। এই সময় হইতেই আইনসঙ্গত-রূপে চন্দননগরে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকত্ব স্বত্ব জন্মে। ইহাই চন্দননগরে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ৯৪২ হেক্টর জমির কোনো উল্লেখ না করিয়া টয়েনবি Gorge Toynbee (৫৮) ব্রাড্‌লে বার্ট Bradley Birt (৫৯) প্রভৃতি কেহ কেহ ফরাসী অধিকারে মাত্র সাত বিঘা জমির কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহার ঠিক ইতিহাস কোথাও পাই নাই। পণ্ডিচারী কাউন্সিলের পুস্তকেও ৮১ আর (are) অর্থাৎ প্রায় ৭ বিঘা নিষ্কর জমির কথাই জানা যায়। (৬০) ইহার মধ্যে কোনো ভুল আছে কি না জানি না।

দেলান্দ পাকা রকম সনন্দ না পাওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। মোগল রাজার সহিত সর্ত্তসকল পাকা না হইলেও, বা কুঠি নির্ম্মাণ না হইলেও তিনি এখানে আসিয়া পূর্ণ উৎসাহেই ব্যবসায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে এই নূতন উপনিবেশে ফরাসী কোম্পানির ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছিল ইহা ইংরেজি কাগজপত্র হইতে জানা যায়। (৬১) ইতিমধ্যে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে আর্কিটেক্ট (Aumonier) জেসুইট্ ডুসাট্ (Dutchetz) দ্বারা কুঠি, গুদাম, বাড়ী, প্রাচীর প্রভৃতির নক্সা প্রস্তুত করাইয়া ২৬০০০৲ মুদ্রা ব্যয়ে বিশেষ উৎসাহের সহিত ঐসকল নির্ম্মাণ করান। (৬২) পর বৎসর জুলাই মাসে উহা প্রায় সমাপ্ত হয়। (৬৩) এইরূপে চন্দননগরে ফরাসীদের একটি বৃহৎ কুঠি নির্ম্মিত হয়। ১৬৯১-৯৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে অর্ল্যাঁ দুর্গ (Fort de Orleans) নির্ম্মাণের কথা যে-সকল গ্রন্থকার বলিয়াছেন, (৬৪) তাঁহারা সম্ভবতঃ এই নবনির্ম্মিত কুঠিকে দুর্গ বলিয়া থাকিবেন। কারণ কুঠি ও পল্লী রক্ষার্থ যে দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত কুঠির সহিত সংলগ্ন হওয়াই সম্ভব হইলেও, তাহা প্রকৃত পক্ষে শোভা সিংহের বিদ্রোহের পর কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম্ ও চুঁচুড়ার ফোর্টগষ্টেভাস্ নামক দুর্গ নির্ম্মাণের সমসাময়িক ইহা বহু গ্রন্থে দেখা যায়। (৬৫) কুঠিকে দুর্গ বলাও অসম্ভব নহে। কারণ উহা তাঁহাদের ব্যবসার তুলনায় অনেক বড় ছিল। (৬৬) তাহা হইলে যাঁহারা ইহার নির্ম্মাণ কাল ১৬৯৬-৯৭ ব[...] ছেন তাঁহাদের কথাই ঠিক মনে হয়।

এই দুর্গের বিশদ বিবরণ এখানে দিবার স্থান নাই। (৬৭) এখনকার তুলনায় একটি সামান্য দুর্গ হইলেও, হুগলীর ওলন্দা[...] অপেক্ষা অনেক দৃঢ় (৬৮) ও ইংরাজদের তৎকালীন কলিকাতা অপেক্ষা মজবুত এবং খুব জমকালো ছিল (৬৯) এই দুর্গের স্থান ভাগীরথীর কূল সমীপে সহরের প্রায় মধ্যস্থলে, বর্ত্তমান লালা[...] পূর্ব্বাংশের জমিখণ্ডে। (৭০) এক্ষণে এই লাল দিঘী এবং গঙ্গার রাস্তার পার্শ্বে অসমাপ্ত উপদুর্গের ইষ্টক নির্ম্মিত খাদরি এবং উত্তর [...] পরিখার অংশ মাত্র ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না।

চন্দননগরে ফরাসী কুঠি তথা উপনিবেশ স্থাপনের ইহাই সং[...] ইতিহাস। এখানে কুঠি প্রতিষ্ঠার পর হুগলীর কুঠির আর কোনো স[...] কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পরন্তু ইংরাজী নথিপত্র হইতে এই [...] উপনিবেশ তাঁহাদের ব্যবসার ক্রমোন্নতির কথাই জানা যায়। [...] চন্দননগরে ফরাসী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে এতাবৎ প্রধানতঃ [...] জনের নাম পাওয়া যায়। প্রথম ডুপ্লেসি, দ্বিতীয় ডেলটর্ এবং [...] দেলান্দ। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনো কার্য্যের প্রকাশ নাই। ডুপ্লেসি প্রথম আসিয়া একখণ্ড জমি সংগ্রহ ক[...] তাহাতে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহার অধিক তাঁহার কোনো কা[...] পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃত কাজ করিয়াছিলেন দেলান্দ। ক[...] খানি গ্রাম সমেত বিস্তৃত জমি সংগ্রহ, কুঠি স্থাপনের প্রথম অনুমতি, ফারমান-সংগ্রহ দ্বারা ব্যবসার ক্ষমতার সহিত এখানকার মালিকত্ব সমস্তই তিনি সংগ্রহ করিয়া কুঠি নির্ম্মাণ, দুর্গ নির্ম্মাণ, [...] প্রতিষ্ঠা করিয়া চন্দননগরে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সংস্থ[...] করিয়াছিলেন।

প্রথম অবস্থায় কোম্পানী কিরূপ ছিল জানা যায় না। কতিপয় ব[...] পরে কোম্পানী বলিতে, ১জন ডিরেক্টর, ৫জন সভ্য লইয়া এক কাউন্সি[...] ১৫ জন ব্যবসাদার ও দোকানদার, ২ জন ডাক্তার, ১ জন সূত্রধর, ২ [...] পাদরি আর দুই জন নতের। পদাতিক ১০৩, তন্মধ্যে ২০ জন ভার[...] ও ৩টি কামান ছিল। (৭২) দেলান্দ যে-পরিমাণ জমির উপর কোম্পা[...] অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজিও সমস্ত চন্দননগরের পরিমাণ [...] তাহাই। এখন মোট পরিমাণ প্রায় ২৩৭৭ একার [৭৩] অর্থাৎ ৯৪০[...] হেক্টর। এক্ষণে ভৌগোলিক সীমা প্রভৃতির কিছু কিছু পরিব[...] হইলেও, এখনকার চন্দননগরের সহিত মোটামুটি বিশেষ তফাৎ [...] না। পুরাতন নক্সা দৃষ্টে বুঝা যায় পূর্ব্বকালে পশ্চিম দিকটা [...] এখনকার মতন ছিল না। তখন বড় গড় না থাকিলেও সামান্য ভা[...] গড়বেষ্টিত ছিল। দিরো (M. Dirois) প্রথম গড় কাটাই[...] চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হন। পরে ডুপ্লে ইহা খ[...]

(৫৭) La Compagnies des Indes Orientales.

(৫৮) A Sketch of the Administration of the Hoogly District.

(৫৯) Calcutta Review, 1918—Chandernagore.

(৬০) Procesverbal de Counsiel General de Inde Francise, 1887.

(৬১) Irvine's Introduction Storia di Mogor Vol. I

(৬২) La Compagnies des Indes Orientales

(৬৩) La Compagnies des Indes Orientales

(৬৪) Thacker's Guide to Calcutta, Early History and Growth of Calcutta.

(৬৫) (ক) Hooghly Past and Present (খ) The Early History and Growth of Calcutta (গ) Old Fort William in Bengal. (ঘ) Bengal District Gazetteers—Bengal. (ঙ) History of the Bengal Army Vol. I ইত্যাদি।

(৬৬) Storia do Mogor Vol. I.

(৬৭) উল্লিখিত গত আষাঢ়ের মাসিক বসুমতীতে চন্দননগর পরি[...] প্রবন্ধে এই দুর্গের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(৬৮) Hooghly Past and Present.

(৬৯) Calcutta Past and Present.

(৭০) চন্দননগরের পুরাতন মানচিত্র ও মুশে [Mouchet] অঙ্কি[...] আলেখ্য দুর্গের নক্সা হইতে দুর্গের স্থান ঠিকমত নির্ণয় করা যায়।

(৭১) Introduction, Storia do Mogor Vol 1.

(৭২) La Mission du Bengale Occidental Vol. I.

(৭৩) সার্ভে ম্যাপ ১৮৭০-৭১।

করেন। (৭৪) দক্ষিণ দিকেও সমস্তটার কোনো সীমাচিহ্ন ছিল না। উত্তরাংশের সীমা কতকটা এক-প্রকারই আছে। ফরাসী গভর্ণর মসিয়ে শেভালিয়ে (Mons. Chevalier) দ্বারা চন্দননগরের চতুষ্পার্শ্বে গড় কাটানোর পর যে পূর্ব্ব আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ১৭৬৭-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেভালিয়েরের আদেশে প্রস্তুত নক্সা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। চন্দননগর হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে গঙ্গার নিকট যে স্থানের নাম এক্ষণে বৃটিশ চন্দননগর, তাহা বা তাহার যে অংশ তখন ফরাসী অধিকারের মধ্যে ছিল এবং যাহা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত চন্দন-নগরের সীমা-নির্দ্ধারণ বিষয়ক চুক্তিপত্রে উল্লেখ ও তৎসহিত নক্সায় দেখানো নাই,(৭৫) পূর্ব্বোক্ত নক্সা দৃষ্টে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।(৭৬) ইংরেজ কর্ত্তৃক এই অংশের গড় সমস্ত মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করিয়া (৭৭) দেওয়া সত্বে এখনও উহার চিহ্ন কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়। কিঙ্কর-সেনের গড় যেস্থানে আছে উহাকে এখন বৃটিশ চন্দননগর বলে, কিন্তু ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি চন্দননগরে গড় কাটাইয়াছিলেন। (৭৮) এই নক্সা দৃষ্টে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, যে ঐ স্থান গড়ের ভিতরের মধ্যে হইলেও, সর্ব্ব প্রথম উহা ফরাসী সীমান্তর্গত ছিল কি না-সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

যে নক্সা হইতে পূর্ব্বের সীমা বা আকার-সম্বন্ধে লিখিত হইল, তাহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বের, এই পর্য্যন্ত জানা যায়। কত পূর্ব্বের তাহা কিছু লেখা নাই। ইহাতে কিছু লেখা না থাকিলেও আলেখাঁ, দুর্গ, দুর্গ সীমা, দিনেমারদের দুর্গাকৃতি কুঠি, লালদিঘী, তাল-ডাঙ্গার বাগান, চুঁচুড়া যাইবার রাস্তা, গরুটী যাইবার রাস্তা, উদ্যান, জলাশয় ও নগরে সীমাপ্রান্তে গড় প্রভৃতি সুস্পষ্ট বুঝা যায়। দু-প্লেসি এখানে যে জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বা মুসলমান নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত যে ৬০ বিঘা জমির কথা একটা শুনিয়া আসা যাইতেছে, সেই প্রথম ফরাসী অধিকৃত জমিখণ্ড কোথায় বা কোন্‌টি তাহার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না বা তাহার কথা কেহ বলিতে পারেন না। ইহার বিষয় উল্লিখিত কোনো চিহ্ন বা পরিচয় কোনো দলিলেও পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিচারীর দপ্তরে একখণ্ড ৬১ বিঘা জমির কথা নবাব ইব্রাহিম খাঁর ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মের পরওয়ানায় পাওয়া যায় মাত্র। করদিয়ের (Cordier) নোটে যে ৬০ বিঘা জমির কথা লেখা আছে উহা সম্ভবতঃ উক্ত জমি। ৭৯)

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে দুর্গ ও কুঠি প্রভৃতি যে স্থানে ছিল সেই স্থানের কথাই বলিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না, তাহা সত্য নহে।

ঐতিহাসিক হিল বলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর চন্দননগরের নক্সা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, দুই তিনখানি মাত্র প্যারিতে আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কোন নক্সা আছে বলিয়া তিনি জানেন না। প্যারিতে পরবর্ত্তী সময়ের যে নক্সা আছে তাহাতে প্রথম খরিদা জমির কোনো নির্দ্দেশ করা আছে কি না বলা যায় না। আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর যে দুইখানি বিভিন্ন নক্সা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার প্রথমখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের বা আরও পূর্ব্বের হওয়া বিচিত্র নহে। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত জমি কোন্‌টি
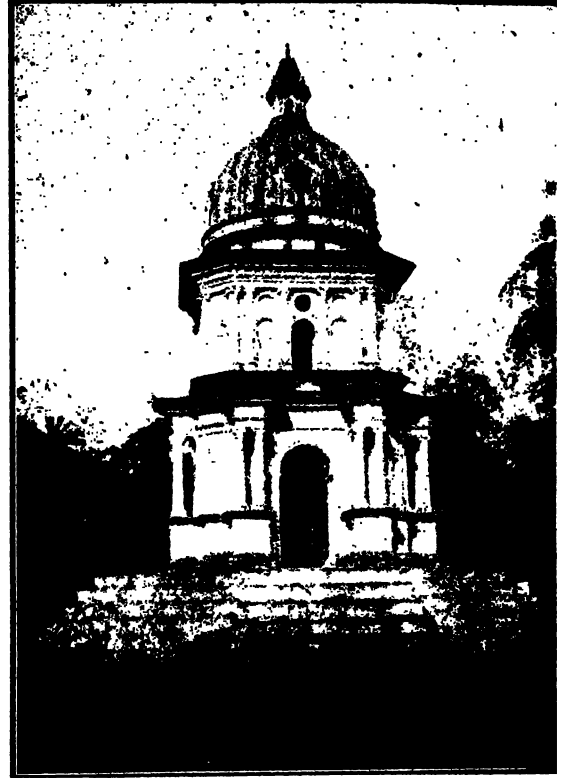
পুরাতন ডাচ্ গার্ডেনের মধ্যস্থিত সমাধি মন্দির

তাহার উল্লেখ বা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা নাই। যুদ্ধের পর চন্দননগর ইংরেজাধিকারে আসায়, উহা তাহাদের দ্বারা ধ্বংসের পর এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, যে, পূর্ব্বেকার নক্সা দৃষ্টে প্রাচীন ভূ-সীমাসকলও অনেক ক্ষেত্রে ঠিক-মত নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য। (৮১)

যে ফরাসীদের সাহস ও বিক্রম তাঁহাদের প্রথম এদেশে আগমনের পর লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল, সেই ফরাসীদের যে বঙ্গীয় উপনিবেশে বসিয়া একদিন দুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন। (৮২) সেই স্থানের কোনো নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড প্রথম ফরাসী কোম্পানি অধিকার করিয়াছিলেন। চন্দননগর আজিও সেই ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অধীনে থাকিলেও তাহার বিষয় কেহই জ্ঞাত নহেন। এ-সম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ গবেষণা দ্বারা আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা লিখিত হইতেছে। কতদূর অভ্রান্ত তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

(৭৪) পণ্ডিচারী রেকর্ড।

(৭৫) Aitchisons Treaties, Engagements and Sanads Vol. II.

(৭৬) রেনেল [Rennel] ও জেসেফের মানচিত্রের অনেক পূর্ব্বে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।

(৭৭) Chandanagor Calcutta Review 1918.

(৭৮) বাঙ্গালার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৭৯) পণ্ডিচারীর অপ্রকাশিত রেকর্ড।

(৮১) Three Frenchmen in Bengal.

(৮২) Notes on the Right Bank of the Hooghly, The Calcutta Review 1845.

আদিস্থান নির্ণয়

এখানে প্রথম জমি খরিদ-সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি।

(১) ফরাসী কোম্পানী ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে পল্লী বা জমিখণ্ড খরিদ করেন, তাহার পরিমাণ প্রায় কুড়ি আর্পা (arpents)।

(২) উহা বোড় কিশনপুরে অবস্থিত।

(৩) প্রথম যে ফরাসী কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ওলন্দাজ কুঠির নিকট।

(৪) ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জমি বা কুঠি গড়বন্দী করা হয়।

(৫) ওলন্দাজদের চেষ্টায় উক্ত জমি হইতে ফরাসীরা বিতাড়িত হন।

(৬) ষ্ট্রেনশ্যাম্ মাষ্টার ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতে আসিতে, হুগলীর দুই মাইলের মধ্যে "ডাচ গার্ডেনের" নিকট ফরাসীদের বড় একখণ্ড জমি দেখিয়াছিলেন, যাহাতে পূর্ব্বে কুঠি ছিল, যাহার ফটক তখনও দৃষ্ট হইয়াছিল এবং যাহা তখনও ওলন্দাজদের অধিকারে ছিল।

(৭) উক্ত মাষ্টার আরও কিছু দক্ষিণে যাইবার সময় একটি ডাচ্‌দের কুঠি দেখিয়াছিলেন।

ফরাসীদের উক্ত জমি, কুঠি বা বাড়ীর যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় উহা এক জমি বা একই জমির উপরে নির্ম্মিত কুঠি বা অট্টালিকা হয় ভালো নচেৎ উহার মধ্যের কোনো একটিই যে প্রথম অধিকৃত তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। যেসকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাতে এই সকলগুলিই যে একই জমির কথা, সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই।

প্রথম নির্ম্মিত কুঠি বা অধিকৃত জমির চৌহদ্দি কোথাও পাওয়া যায় না, মাত্র জানা যায়। হুগলী হইতে দুই বা তিন মাইল দূরে ডাচ গার্ডেনের নিকট বোড়কিশনপুরে অবস্থিত। ওয়্যালে সাহেব বলেন উহা বর্ত্তমান চন্দননগরের উত্তরের শেষ প্রান্তে ছিল। মাষ্টারের বর্ণনায় আর একটু পাওয়া যায়, যে, উহার আরও দক্ষিণে তিনি একটি সুবৃহৎ ওলন্দাজ কুঠি দেখিয়াছিলেন। দক্ষিণে একথা স্পষ্ট লেখা না থাকিলেও হুগলী হইতে আসার বর্ণনা, সুতরাং উহা যে দক্ষিণে তাহা সুনিশ্চিত।

হেজের ডায়ারিতে এই "ডাচ্ গার্ডেনের" নাম কয়েক বার উল্লেখ দেখা যায়। উহা ডাচ কুঠি বলিয়াও অন্যত্র উল্লেখ আছে। (৮৩) উহা বর্ত্তমান কোন্ স্থানটি তাহা কোথাও উল্লেখ বা ঐ বাগানের কিম্বা বাগানস্থিত কুঠির কোনো নিদর্শন-সম্বন্ধে কোথাও প্রকাশ নাই। চন্দননগরের যে পুরাতন মানচিত্র দুইখানির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একখানিতে চন্দননগরের সীমার ঠিক উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটি পরিখাবেষ্টিত স্থানের নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ওলন্দাজদিগের বাগান বলিয়া লেখা আছে। এই বাগানকেই আমি হেজ (Hedge) সাহেবের বর্ণিত পুরাতন "ডাচ্ গার্ডেন" বলি। আমি এই স্থান মাপিয়া এবং উহার আকার মিল করিয়া এবং হুগলীর কলেক্টরি হইতে যতটুকু সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে এ-বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়াছি যে, উহা সেই পুরাতন "ডাচ গার্ডেন" ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহা ধরমপুরের নিকট গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত, এবং "সাহেব বাগান" নামে এক্ষণে খ্যাত। ইহার মধ্যে ইট্স্ (Madame Yeats) নাম্নী এক ডাচ্ রমণীর গোরের উপর একটি সুন্দর সুবৃহৎ সমাধি-মন্দির আছে। আরও এক কথা, ইহা একটি বিশেষ বিখ্যাত স্থান না হইলে চন্দননগরের বাহিরের স্থান চন্দননগরের নক্সায় বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হ কেন? এই বাঁশঝাড় ও সমলজলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত নির্জ্জন জঙ্গ উদ্যানের মধ্যে তুষার-শ্বেত সমাধি-মন্দিরের দিকে চাহিয়া, উহা এক সুনিপুণ উদ্যান-রচক ওলন্দাজদিগের বাঙ্গালার আদি কুঠি ও উদ্যান। একথা দ্বিধাশূন্যভাবে মনে হওয়ায়, যে এক অভূতপূর্ব্বভাবে হৃদয় ভ উঠিল, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। এই সমাধি-মন্দির গাত্রে ডাচ্ ভ গোরের সবিশেষ বিবরণ লেখা আছে। হুগলী কলেক্টারিতে সন্ধান ল জানিলাম, উহা রমণীর স্বামীপ্রদত্ত টাকার সুদ হইতে গভর্ণমেণ্টক মেরামতাদি হইয়া থাকে। নক্সায় অঙ্কিত দুর্গের আকারের কুঠির কে চিহ্ন জঙ্গলের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার বিশ্বাস মাটিকা করিলে হয় ত তাহার চিহ্নও পাওয়া যাইতে পারে। এই বাগান এ সামান্য টাকায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট একজনকে জমা-বিলি ক রাখিয়াছেন।

এই ডাচ গার্ডেন্ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলে ফরাসীদের বৃহৎ ভূমি বা ডাচ কুঠির সন্নিকটে ফরাসী কুঠির স্থান নির্ণয় সহজসাধ্য হইয়া প এ বিষয়েও উক্ত মানচিত্র যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জমিখণ্ড বর্ত্ত তালডাঙ্গার পরিখাবেষ্টিত বাগান, যাহাকে বর্ত্তমানে লোক 'তাউৎ' 'তাবুৎখানার' বাগান নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহাই ব ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আদি অধিকৃত স্থান। ইহা ডাচগার্ডে অতি নিকটে, ইহাই পরে ডাচেদের অধিকারে বা ব্যবহার ছিল। কথাও স্পষ্ট করিয়া দ্বিতীয় নক্সায় লিখিত আছে। ইহা যে স্থানে অ তাহার নাম বোড়' পূর্ব্বে নাম ছিল বোড় কিশনপুর। ১৮৭০-১১ খৃষ্টা সার্ভে মানচিত্রে এই স্থানের নাম বোড় নির্দ্দেশ করা আছে। এ উহার কিছু দূরে বোড়, কৃষ্ণপুর নামে একটি স্থানও দেখা যায়। ত দলিলে এই বাগান হুজুরী বোড়োর মধ্যে বলিয়া উল্লেখ দেখা যা চন্দননগর কলেক্টরি হইতে জানিয়াছি, পূর্ব্বে সাহেবদের অধিকারে সকল স্থান ছিল, তাহার নামের গোড়ায় হুজুরী কথা ব্যবহার হইত।

এই বাগানের পরিমাণ ভিন্ন-ভিন্ন দলিলে ও বিবিধ প্রাচীন আধুনিক নক্সায় ভিন্ন-ভিন্ন দেখা যায়। প্রকৃত মাপিয়া প্রায় কিছু ব ৫০ বিঘা পাওয়া যায়। ১৮১৯খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের কোনো দলিল কলেক্টরি বা বাগানের স্বত্বাধিকারী ৺প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রদের নিব পাই নাই। কোনো দলিলেই আরপাঁর মাপ নাই। আরপাঁর ম এখানে কত প্রচলিত ছিল তাহা কোনো মতেই জানিতে পারি নাই কলেক্টারির প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম আরপাঁ কথা তিনি শুনেন নাই। অভিধানে জানা যায়, ফ্রান্সে এক আরপাঁ ৫১০ ৪২২০ ও ৩৪১৯ Metre carre, তথায় ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন মা ব্যবহৃত হইত। (৮৪) ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে আইন দ্বারা এখান হইতে এই মা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটামুটি প্রায় কুড়ি আরপাঁ জমি অন্যূন ৬ বিঘা বা কিছু কম হইবে। যে ৬০ বিঘা জমির কথা সচারাচর শু যায়, এই বাগান ঠিক ৬০ বিঘা না হইলেও ইহাই সেই জমি। শ্রীরামপু সম্বন্ধে ৬০ বিঘা জমির কথা পুস্তকে পাওয়া যায়। (৮৫) কিন্তু চন্দননগ সম্বন্ধে উহার কোনো কথা প্রামাণ্য ইতিহাসে দেখা যায় না পণ্ডিচারীর কাগজ-পত্রে যে ৬১ বা ৬০ বিঘার কথা পাওয়া যায় ইহা সে জমি কি না তাহা তথা হইতে জানিতে পারা যায় না।

(৮৩) La Compagnie des Indes Orientales.

(৮৪) Dictionnaire Francaise illustre et Encyclope die Universelle.

(৮৫) The Good Old days of Honorable Joh Company.

একটি ফটকের কথা উল্লেখ আছে। তালডাঙ্গার ফটক নামে একটি ফটক উক্ত বাগানে প্রবেশের পথের ঠিক পার্শ্বেই এখনও দেখা যায়। উহা এখন সহরে প্রবেশের ফটক, কিন্তু উহা বাগানে প্রবেশ পথের এত নিকটে, যে, একজন আগন্তুকের পক্ষে একবার এই স্থান দিয়া যাইতে-যাইতে উহাকে বাগানের ফটক মনে করা বিচিত্র নাও হইতে পারে। উহা ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন মাষ্টার এই স্থান দেখিয়াছিলেন, তখন বর্ত্তমান ছিল এরূপ প্রমাণ দিবার মতন কিছু পাওয়া যায় না। উহার নির্ম্মাণ কাল বহু চেষ্টাতেও জানিতে পারি নাই। শেভালিয়ের সময় যখন সহরের চতুর্দ্দিকে ভ্যালো করিয়া গড় খোদিত করিয়া নগরকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন বা অন্য সময় যদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এ প্রমাণ পাওয়া না যায়, তবে উহা সেই ফটকও হইতে পারে। এ বিষয়টিতে যাঁহাদের সংশয় হইবে, তাঁহারা ইহার কথা না ধরিলেও কোনো ক্ষতি নাই।
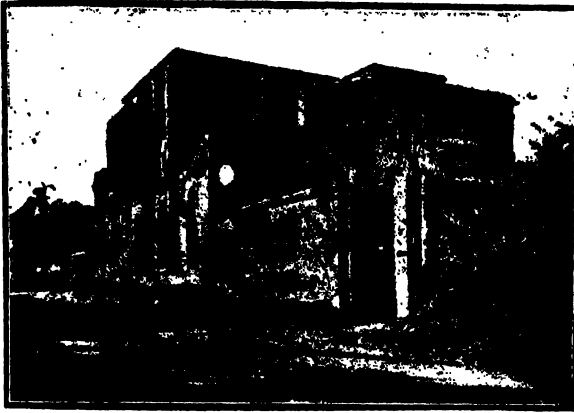
সরকারদের এই বাড়ী যুদ্ধের সময় অস্থায়ী হাঁসপাতাল-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল

শেষ কথা, এই ফরাসী কুঠির স্থান অতিক্রম করিয়া মাষ্টার যে আর একটি ডাচ্ কুঠি দেখিয়াছিলেন এবং তথায় যাইতে-যাইতে তিনি পথিপার্শ্বে মাটির বা চালার ঘর দেখিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে আমার মত এই যে, বর্ত্তমান স্থলে বেনারস বা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামে যে রাস্তা আছে, তিনি সেই রাস্তা দিয়া যাইয়া বর্ত্তমান উর্দ্দু বাজারে যে 'ডাচ্ অক্টেগণ' ছিল, তাহার কথাই বলিয়াছেন। এই ওলন্দাজদের অট্টালিকা বা কুঠির কথা স্থানে-স্থানে উল্লেখ পাওয়া যাইলেও মুশে (Mouchet) কর্ত্তৃক ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের অঙ্কিত আলেঁয়া দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নক্সায় ইহা সুস্পষ্ট দেখানো আছে। ইহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হিল বলেন, ফরাসীদের সীমার মধ্যে হইলেও মোগল বাদশার নিকট ফারমান পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা ওলন্দাজদের ছিল এবং তাঁহারা ইহা বিক্রয় করিতে সর্ব্বদাই অস্বীকৃত ছিলেন। (৮৬)

পথিপার্শ্বে যেসব কাঁচা বাড়ী বা চালা ঘরের কথা মাষ্টার বলিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এখন কোনো বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করা সুকঠিন বা অসম্ভব। তবে যুদ্ধের পূর্ব্বের যে নক্সা পাওয়া গিয়াছে, উহাকেই সেই প্রাচীন সময়ের নক্সা ধরিলে, উহাতে লেখা না থাকিলেও মূল ...আর কৃষ্ণবর্ণ-চিহ্নিত বাড়ীগুলি কাঁচা বাড়ী বা চালা বলিয়াই মনে হয়। দুর্গমধ্যস্থ গির্জ্জা, গভর্নরের বাড়ী প্রভৃতি যেসব পাকা বাড়ীর কথা উল্লেখ আছে, (৮৭) তাহা সব লালবর্ণে চিহ্নিত এবং তালডাঙ্গার বাগানের উত্তর সীমার মধ্যস্থলে যে অষ্টভুজ বাড়ীটির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও উক্ত নক্সায় স্পষ্ট করিয়া রক্তবর্ণে চিহ্নিত আছে। এই-সকল হইতে পথিপার্শ্বের কৃষ্ণবর্ণ-চিহ্নিত বাড়ীগুলিকে কাঁচা বাড়ী বা চালা ঘর ধরিয়া লওয়া কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না।

গরুটীর প্রাসাদ

তালডাঙ্গার জমিগুও কোন্ সময় ডাচদের ছিল ইহা উক্ত অষ্টভুজ-বিশিষ্ট ভগ্ন অট্টালিকাটি দেখিয়াও মনে হয়। কারণ, চুঁচুড়ার অষ্টকোণ ডাচ্ গির্জ্জা, চুঁচুড়ায় স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের ডাচভিলা নামক বাড়ীর পুরাতন অংশের কোণগুলি দেখিয়া এবং চন্দননগরের 'ডাচ অক্টেগনের' নক্সা হইতে উহাও যে ডাচ নির্ম্মিত ভজনালয়ের ভগ্নাবশেষ তাহা সহজেই মনে হয়।

গরুটী-প্রাসাদের শেষ চিহ্ন

সুতরাং তালডাঙ্গার 'ভাউৎ থানার বাগান' যে ফরাসী কোম্পানীর চন্দননগর তথা বঙ্গের প্রধান সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশ এ-সম্বন্ধে বোধ হয়

(৮৬) Three Frenchmen in Bengal.

(৮৭) A Brief History of the Hughli District. ও Three Frenchmen in Bengal.

আর অধিক কিছু প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। ডাচদের অধিকারে সে-সময় বা পরে চন্দননগরে আর কোনো বৃহৎ ভূমিখণ্ড ছিল বলিয়াও জানা যায় না। ডাচদের সহিত বিদেরার বড় যুদ্ধের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু উহাতে ফরাসীদের কোনো কথা ছিল না এবং ঘটনাও পরের। ফিনিক্স দর (Phoenix d'Or) নামক ওলন্দাজ জাহাজ কাড়িয়া লওয়া উপলক্ষ করিয়া ডাচদের সহিত ফরাসীদের যে সংঘর্ষের কথা জানা যায়, উহাও ১৭০৫ খৃষ্টাব্দের কথা। (৮৮) ইংরাজ বা ফরাসী ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ হইতে ফরাসী কোম্পানীর আদিস্থান-সম্বন্ধে যতটুকু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহা যে তালডাঙ্গার বাগান তাহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন না অনুরূপ বিবরণযুক্ত স্থানের কথা জানা যায়, ততদিন কোম্পানীর আদিস্থান বা তাহার অংশ যে উহাই তাহা-ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। আরও এক কথা, তালডাঙ্গার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ এক্ষণে জঙ্গল পূর্ণ হইলেও, এইসকল স্থানের রাজকরের হার সহরের প্রায় অন্যসকল স্থান অপেক্ষা অধিক। এই স্থান পূর্ব্বে যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল তাহার বহু প্রমাণ আজিও বিদ্যমান। শুনা যায় এখানে পূর্ব্বে চারি পাঁচ শত ঘর লোকের বাস ছিল। এইসকল হইতেও ফরাসীদের এই স্থানে প্রথম জমি নির্ব্বাচন করা কতকটা সম্ভবই মনে হয়।

তালডাঙ্গার বাগানের প্রথম হইতে পর-পর একটা ইতিহাস এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পুরাতন মানচিত্র হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, প্রথম সমস্ত জমির উপরই কোনোরূপ গৃহাদি ছিল, মধ্যে ও উত্তরের শেষপ্রান্তে পাকা বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ এই বাটীতেই কারখানা বা কুঠি ছিল বা তদুদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তৎপরবর্ত্তী কালে চারিটি স্থানে পাকা বাড়ী এবং মধ্যে একটি বড় পুষ্করিণী এবং সুবিস্তৃত উদ্যান ছিল। কথিত আছে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ-কালে ফরাসীদের এই আদি ভূমি হইতেই স্থলে যুদ্ধ ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া, শেষে ভারতে ফরাসী অভ্যুত্থানের সকল আশা চিরদিনের জন্য নির্ম্মূল করেন। এবং সম্ভবতঃ এই স্থান হইতেই ঐ বৎসরের ১২ই জুন তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া পলাশীর প্রাঙ্গণে জয়লাভ দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। (৮৯) চন্দননগরে যুদ্ধের সময় এই স্থান অস্থায়ী হাসপাতাল-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। (৯০) লুই বুনো (Louis Bounand) নামে প্রথম ইউরোপীয় যিনি বঙ্গে নীলের চাষ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তালডাঙ্গার এই বাগান জমা লইয়াই তাঁহার প্রথম কাজ আরম্ভ হয়। (৯১) তালডাঙ্গার বাগানে বার্গ এণ্ড্রেস্ (Berg Andres) নামে একজন দিনেমারের নীলের কাজ ছিল বলিয়াও জানা যায়। (৯২) ইহার পর এই বাগান কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল বা সেই পর্য্যন্ত এতাবৎ ইহা এখনকার মতন একটি উদ্যান রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে কি না তাহার কথা কিছু জানিতে পারি নাই।

গরুটী প্রাসাদের গঙ্গাতীরের পোস্তার ভগ্নাবশেষ

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের প্রেভো (Eduard le Prevort) সাহেব এই জমি পাট্টা করিয়া লন। তৎপরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রমথ ও আশুতোষ ঘোষ ইহা মানিকে (Maniquet) নামক একব্যক্তিকে বিক্রয় করে। পর বৎসর উহা গার্ণে সাহেব খরিদ করে। ১৮৬২ সালে উহা শ্রীরামপুরের মুসাজান বদ্ সাহেব খরিদ করে এবং এইব্যক্তি ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ২৫শে আগষ্ট প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়কে ২৬৫০৲ টাকায় বিক্রয় করে। তদবধি ইহা চৌধুরী মহাশয়ের সম্পত্তি হইয়া আছে।

তাউৎখানা নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ঠিক কিছু প্রকাশ নাই। আরবী

(৮৮) La Compagnie des Indes Orientales.

(৮৯) Bengal District Gazetteers—Bengal.
History of the Rise and Progress of Bengal Army তে এই তারিখ ১৩ই জুন লেখা আছে।

(৯০) Eduard le Prevort এর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর রেজেষ্ট্রি করা পাট্টা হইতে জানা যায়।

(৯১) Carey's Good Old Days.

(৯২) Hughly Past and Present.

'তাবুৎ কথা' হইতে 'তাবুৎ খানা' অর্থাৎ মুর্দ্দাখানা হইতে পারে। কাহারও কাহারও ধারণা হাঁসপাতাল হইতেই এই নাম হইয়াছে। তাহা হইলে তাবুৎ খানা হইতে তাউৎ খানা হওয়াও সম্ভব হইতে পারে। আরবী 'তাইদ' কথা হইতে ইহার উৎপত্তি কি না তাহাও বলা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় ওলন্দাজ কোম্পানীর পূর্ব্ববর্ণিত ভজনাগার বা উপাসনা মন্দির আরবী "তাঅৎ খানা" হইতে তাউৎ খানা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার অন্যদিকে জলাভূমির পার্শ্বে হরিদ্রাডাঙ্গা তালডাঙ্গা হইতে ইহা ফরাসীদের হস্তে যাইবার পর ফরাসডাঙ্গা নামও ইহা হইতে উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব নহে। ১৮৪১-৪২র নক্সায় তাইঅৎ খানা লেখা আছে। (৯৩)

তালডাঙ্গার বাগান ফরাসীদের বাঙ্গলায় প্রথম কুঠি স্থাপনের স্থান। এই স্থানেই বৃটিশ সৌভাগ্য লক্ষ্মীর প্রথম পরিণয় ক্ষেত্র। ইহা আজি জনকোলাহলশূন্য গড়-বেষ্টিত একটি সাধারণ আম নারিকেল প্রভৃতির বাগান, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য পুরাতন নিদর্শন বলিতে মাত্র এখন এখানে একটি বিচিত্র গঠনের ভগ্ন-মন্দির দৃষ্ট হইলেও, প্রত্ন-তাত্ত্বিকের চক্ষে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যান্বেষীর এখানে কিছুকালের জন্য একান্তে বসিয়া পুরাতন দিনের কত ছবি মানস-চক্ষে অবলোকন করিবার আছে, আমার মতন একজন সাধারণ মানুষ তাহার কি ইয়ত্তা করিবে। এই-প্রসঙ্গে অন্য কাহাকেও না হইলে চন্দননগরের গবর্ণমেণ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করি, চন্দননগরের অন্যসকল পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন যাহা এখনও এখানে-ওখানে সামান্যভাবে দেখা যায়, তাহা রক্ষার চেষ্টা যদি নাও করেন, আমার এই গবেষণার ফল অভ্রান্ত মনে হইলে, অন্ততঃ তাউৎ খানার বাগানের যে স্মৃতি চিহ্ন আছে বা ঐ স্থানে আর যাহা এখনও চেষ্টা করিলে উদ্ধার করিতে পারা যাইতে পারে, তাহা সযত্নে রক্ষা করুন। নচেৎ যাহা আছে, কালের ধর্ম্মে তাহাও শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

ক্লাইভের দ্বারা প্রায় সমস্ত পুরাতন বিশিষ্ট অট্টালিকাই নষ্ট হইয়াছিল। আর্‌লঁ্যা দুর্গের চিহ্নমাত্রও এখন নাই। এখন আছে মাত্র দুর্গের পশ্চাতের কোম্পানীর বৃহৎ জলাশয় 'লাল দিঘী,' পুরাতন কুঠির মাঠ, ইটালীয় মিশনের গির্জ্জা, শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর ও শ্রীশ্রীনন্দ-দুলালের মন্দির, চুঁচুড়ার গবর্ণর রসের(Johannes Matthias Ross) পত্নী সিরাজদ্দৌলার বেগমের বন্ধু ম্যাডাম রসের ব্যবহৃত বাড়ী, যুদ্ধের সময় হাঁসপাতাল-রূপে ব্যবহৃত একটি বাড়ী প্রভৃতি কয়েকটি অট্টালিকা-দিনেমার কুঠির স্থান যাহা পরবর্ত্তী মানচিত্রে (৯৪) ডেনমাক নগর নামে উল্লিখিত আছে এবং যাহাকে এক্ষণে দিনেমারডাঙ্গা বলে, তাহা পুরাতন নক্সায় বুঝা যাইলেও, কুঠির অতি সামান্য অংশ যাহা ১৫ বৎসর পূর্ব্বেও দেখা যাইত, তাহা আর নাই। ছোটো বাগান নামে জাহ্নবী তীরে যে বাগানটি মানচিত্রে চিহ্নিত আছে,উহা বোনো সাহেবের নীল চাষের বাগান ছিল কি না তাহা বলা যায় না। (৯৫) পুরাতন মানচিত্র বা নক্সা মাত্রেই বর্ত্তমান রূদ্যে প্যারি রাস্তাটিকে গরুটীর বা কোম্পানীর বাগানে যাইবার রাস্তা বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। অতি পূর্ব্বকালে গরুটীকে ফ্রেঞ্চ-গার্ডেন (৯৬) বলিত। কোন্ সময় কিরূপে ইহা ফরাসীদের হস্তগত হয় তাহা কোথাও উল্লেখ পাই নাই। পরবর্ত্তীকালে দুপ্লের সময়ের ঐ স্থানের প্রাসাদের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায়, যে, একসময় উহা অতীব মনোহর ছিল। বিশপ্ কুরি Right Rev. Daniel Corrie (৯৭) Grandpre ও গ্রাঁপ্রি(৯৮)এই প্রাসাদকে ভারতের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভবন বলিয়াছেন। ঐ স্থান সর্ব্বদা আমোদ-উৎসবে মুখরিত থাকিত। কথিত আছে সময়-সময় নিমন্ত্রিতগণের একশতাধিক যানের দ্বারা উহার সুবিস্তৃত বৃক্ষবীথিকা পরিপূর্ণ থাকিত। (৯৯) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথায় যেসব ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইত, এখন আর তাহাও নাই। আছে মাত্র কুতূহলী দর্শককে যেন দেখাইবার জন্যই একটি অশ্বত্থ তরুক্রোড়ে সযত্ন-রক্ষিত একটি স্তম্ভের অংশ, গঙ্গার ধারের ভগ্ন পোস্তার সামান্য অংশ ও দুই তিনটি ইষ্টক স্তূপ।*

(৯৩) গত পৌষের "বঙ্গবাণী" তে মল্লিখিত প্রাচীন চন্দননগরের ফরাসী শাসন প্রবন্ধের সহিত মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

(৯৪) সার্ভে ম্যাপ ১৮৭০-৭১।

(৯৫) Carey's Good Old days.

(৯৬) বোল্টের মানচিত্রে "ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" এবং জোসেফ সার্ভে ম্যাপে "ওল্ড ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" নাম আছে।

(৯৭) Hebers Journey through the Upper Provinces of India.

(৯৮) A Voyage in the Indian Ocean and Bengal undertaken in the years 1789 and 1790.

(৯৯) Selections from Unpublished Records of Government for the year 1748 to 1767.

* ফরাসী ভারতের গভর্ণরের মাননীয় মসিয়ে জারফিনিস্ (Mons. Gerfinis) মহোদয় পণ্ডিচারী দপ্তরের অপ্রকাশিত রেকর্ড হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যেসকল পুরাতন ঐতিহাসিক কথা জানাইয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধ লেখার পর আমার হস্তগত হয়। উহার সহিত আমার লিখিত দুই-একটি বিষয়ের সামান্য পার্থক্য থাকিলেও, প্রধান বিষয় অর্থাৎ আদিস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে আমার লেখার মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না।

পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয় প্রভৃতি যাঁহারা গ্রন্থ বা মানচিত্র সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে চন্দননগর-বিষয়ক আমার যেসকল লেখা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার কোনো-না-কোনো প্রমাণ বা নথি ব্যতিরেকে না লিখিলেও, এক্ষণে গবেষণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় দুই-এক স্থানে সামান্য বিভিন্ন কথা বলিতে হইয়াছে।

—লেখক

নতুন-ধরণের সাইড্-কার—

লণ্ডন সহরে সম্প্রতি একটি প্রদর্শনীতে একপ্রকার নতুন-ধরণের মোটর-বাইকের সাইড-কার দেখানো হইয়াছে। এই সাইডকারখানি দেখিতে একটি ছোটো নৌকার মতন। দরকার মতন একমিনিটেরও কম সময়ে এই নৌকা-সাইডকারটিকে মোটর বাইক হইতে খুলিয়া জলে

নৌকা-সাইড্-কার

ভাসানো যায়। আবার প্রয়োজন মতন জল হইতে সাইড-কারখানিকে জল হইতে তুলিয়া মোটর-বাইকে জুড়িয়া দেওয়া যায়। সাইড-কাররূপে ব্যবহার করিয়া এই নৌকাখানিতে দুইজন লোক বসিতে পারে। দূরের পথ যাইতে হইলে নৌকা-সাইড-কারে একজন লোক এবং মাল-মসলা অনেক-কিছু থাকিতে পারে। নৌকাখানি চারফুট লম্বা হইলেও ইহাতে বাইক চালাইবার কোনোপ্রকার অসুবিধা হয় না।

—

নৌকা-ছাত মোটর-কার—

একদল ইংরেজ আবিষ্কর্ত্তা আফ্রিকার সকল অজ্ঞাত বনভূমি বিজয় করিবার জন্য যাইতেছে। এইজন্য নানা প্রকার যান-বাহনের আয়োজন করা হইতেছে।

নৌকা-ছাত মোটর-কার

এই বিজয়যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য বা প্রধান উদ্দেশ্য আফ্রিকা মহাদে মোটর চালাইবার মতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা যায় কি না। নদ নদী ও বিল পার হইবার জন্য নৌকার দরকার, সেই কারণে মোটরকারে ছাতগুলিকে নৌকার মতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দরকার কয়েকটি মোটরের ছাতকে একসঙ্গে যুক্ত করিয়া পণ্টুনের মতন করি তাহার উপর মোটরকারগুলিকে বসাইয়া নদী পার করা যাইতে পারে গাড়ীগুলিকে মশক-নিবারক জালের দ্বারা ঘেরাও করা যায়। ইহার সহি বিশুদ্ধ পানীয় জল বহন করিবার বন্দোবস্তও আছে। মেজর সি কো টেগার্ট এই দলের নেতারূপে যাইবেন। সময়-সময় হয়ত এই দ সভ্যতার আবাস হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকিবে, সেইজ বহু দিনকার মতন নানা-প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি এই দলের সঙ্গে রাখিব বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

—

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু বাড়ী—

মুসোলোনি এখন ইতালির সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি রোমে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার মতলব করিয়াছেন। এই বাড়ীখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু বাড়ী হইবে। বাড়ীটি ১১০০ ফুট উঁচু হইবে। এই বাড়ীতে ৪২০০ কামরা ও ১০০টি বড় বড় মিটিং করিবার মতন হল থাকিবে। রি-এন্‌ফোর্স্‌ড কন্‌ক্রি এই বিশাল বাড়ীখা নির্ম্মাণ করা হইবে মুসোলোনি এই বাড়ীখা কেমন হইবে তাহা একখানি নক্সা প্রস্তু করাইয়াছেন। এই বাড়ী মধ্যে—হোটেল, সাঁত রাইবার পুকুর, লাইব্রেরী ক্রীড়াভূমি ইত্যাদি কোনে কিছুরই অভাব থাকি না।
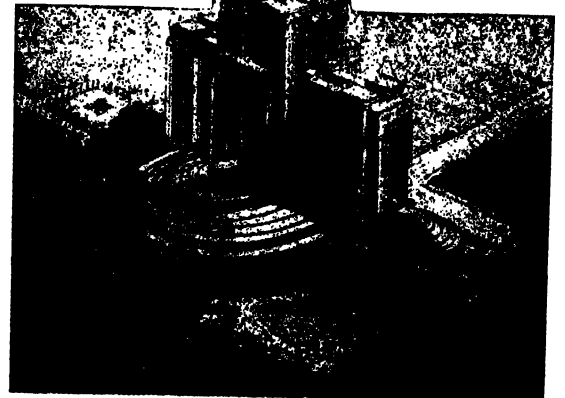
রোম-সহরে এই বাড়ীখানি তৈয়ার করিবার কথা হইতেছে

রোমের স্থপতি এবং শিল্পীগণ কিন্তু এই-ধরণের বাড়ী নির্ম্মাণ করার বিরুদ্ধে নানা-প্রকার আপত্তি তুলিতেছেন। তাঁহাদের মতে ইহাতে রোমের পুরাতন সৌন্দর্য্যের হানি হইবে।

—

৪র্থ শতাব্দীর বৌদ্ধ-কীর্ত্তি—

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী কিম্বা তাহারও পূর্ব্বের কতকগুলি বৌদ্ধকীর্ত্তির চিহ্ন আফগানিস্থানের জেলালাবাদের নিকট আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে স্থানে এইসকল গুহা এবং মূর্ত্তি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে সেই স্থানটির নাম হাড্ডা—জেলালাবাদের দক্ষিণ পশ্চিমের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এই স্থানের সম্বন্ধে বলেন

বামিয়া উপত্যকার এইখানে গুহায় এবং পর্ব্বতগাত্রে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং শিল্প পাওয়া গিয়াছে

যে কয়েকজন বৌদ্ধ-ভক্ত প্রভু বুদ্ধের মাথার খুলির একটি হাড় এই স্থানে আনিয়া স্বর্ণময় সিংহাসনের উপর একটি স্ফটিকময় ঘণ্টার নীচে রক্ষা করেন। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টার ফলে এই স্থানে এখন যে সকল মূর্ত্তির আবিষ্কার হইয়াছে সেগুলিকে বৌদ্ধ এবং গ্রীক্ শিল্পের মিশ্রণ বলা চলে। কতকগুলি মূর্ত্তি একেবারে পুরাপুরি গ্রীক্-ধরণের। ইহাতে মনে হয় যে এই মূর্ত্তিগুলি হয় গ্রীক্ শিল্পীরা করিয়াছিল, কিম্বা ঐ-স্থানের লোকেরা গ্রীক্ শিল্পীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ঐ-সকল মূর্ত্তি গঠন বা খোদাই করিয়াছিল।

মিনার চক্রি

জেলালাবাদ সহরের চারিদিকে অনেক মনোহর স্তূপ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্তূপটির নাম "খায়েস্তা টোপ"—অর্থাৎ বিপুল সুন্দর স্তূপ। বৌদ্ধযুগের কাবুল সহরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এখানে কোনো লোকজন এখন বাস করে না। এই সহরের উপরের পাহাড়ের চূড়ায় এখনও একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ দেখা যায়,—ইহার নাম মিনার চক্রি—অথবা চাকার স্তম্ভ। এই স্তম্ভ দূরের পথিকদিগকে নগর-আহারা সহরের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত।

বামিয়া উপত্যকাতে পাথরের উপর খোদাই কতকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি আবিষ্কার হইয়াছে। তিনটি মূর্ত্তি উপবিষ্ট-অবস্থায় আছে। মূর্ত্তিগুলিকে খোদাই করিয়া তাহার উপর ধাতু ঢালাই করিয়া দেওয়া হয়। হিয়েন-সাং এই মূর্ত্তিগুলির ছোটো মূর্ত্তিটিকে ব্রোন্জ্ ধাতুর বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। আরো কয়েকটি পর্ব্বত-গাত্র-হইতে-খোদাই-করা বুদ্ধমূর্ত্তি

বামিয়া উপত্যকার পর্ব্বতগাত্রে বুদ্ধমূর্ত্তি-নীচে একদল আফগান-পূজারী দেখা যাইতেছে

পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি ১১৪ ফুট উচ্চ, আর-একটি প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। ইহাদের মাথার সাসানিদ মস্তকাবরণ আছে—তাহাতে মনে হয় এই মূর্ত্তি-দুটি সাসানিদ-শিল্পের চিহ্ন। সাসানিদ শিল্প-সম্বন্ধে আর বিশেষ-কিছুই জানা নাই।

—

কথা বলার ভঙ্গীতে রোগ নির্ণয়—

একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর একখানা ধোঁয়ালাগানো কাগজে (smoked paper) মানুষের গলার শব্দের রেকর্ড করিয়া চিকিৎসকেরা নানা-প্রকার রোগ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন এবং সফলও হইতেছেন। স্নায়বিক রোগের প্রতিকার এই-প্রকারে বহুল-পরিমাণে হইতেছে। কথা-বলার ধরণের খারাপ-ভালোর উপরেই স্নায়বিক রোগ ধরা পড়ে। কাগজের উপর শব্দের একটি রেখা পড়ে—কথা-বলার

স্নায়বিক রোগ নির্ণয় করিবার কল

ধরণ নির্দ্দোষ হইলে দাগটি সোজা হইবে—এবং তাহাতে প্রমাণ হইবে যে বক্তার কোনপ্রকার স্নায়ুবিক রোগ নাই—কিন্তু স্নায়বিক রোগ থাকিলে কথা বলা নির্দ্দোষ-ধরণে হইবে না এবং উচ্চারণ স্পষ্ট হইবে না—জিহ্বার জড়তা দোষ থাকিবে এবং কাগজের উপর যে রেখা পড়িবে তাহা আঁকাবেঁকা হইবে। এই-প্রকারে পক্ষাঘাত এবং epileptic রোগীর চিকিৎসার অনেক সুবিধা হইবে।

—

গোয়েন্দা হইবার শিক্ষা—

প্রায় সকল ছেলেই বাল্যকালে এই ইচ্ছা পোষণ করে, যে, সে বড় হইলে একজন পাকা গোয়েন্দা-পুলিশ হইবে, এবং ক্রমাগত দাগী চোর

জার্ম্মান-পুলিসে হস্ত-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—এইভাবে ধরিলে অপরাধী পলায়ন করিতে পারে না

পাক্‌ড়াও করিবে। ছেলেবেলায় চোর-পুলিশ খেলাও ইহার একটি প্রমাণ। ছেলেবেলায় পুলিশ হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও বড় বয়সে সকলেই পুলিশ হয় না।
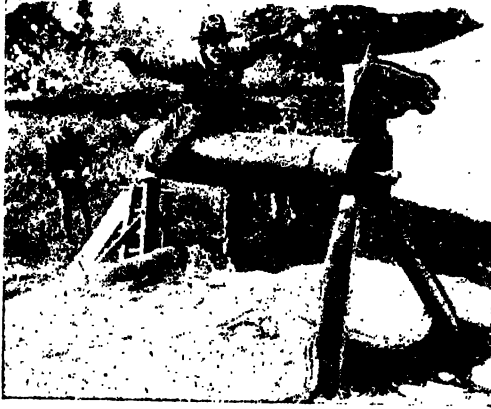
পুলিস্‌ম্যানকে একটি ঘূর্ণায়মান রোলারে বসিয়া-বসিয়া পিছন হইতে সামনে আসিবার কসরৎ করিতে হয়

পুলিশের কাজকে বাহির হইতে যতটা সহজ এবং আরামপ্রদ বলিয়া মনে হয়—কার্য্যত ততখানি নয়। বরং পুলিশ বিভাগের লোকেদের জীবন বেশীর ভাগ সময়ই দুঃখ কষ্ট এবং বিপদের মধ্যেই থাকে। (ভারতবর্ষের পুলিশের কথা বলিতেছি না।) পাকা গোয়েন্দা পুলিশ হইতে হইলে তাহার পূর্ব্বে অনেক-কিছু কষ্টকর ব্যাপার শিক্ষা করিতে হয়। সাধারণ পুলিশ হইতে হইলেও শিক্ষার দরকার, তবে এই শিক্ষা খুব বেশী শক্ত বা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নহে।

একসময় সকল দেশে ভুঁড়িওয়ালা পুলিশম্যানের খাতির ছিল, এখন সে দিন নাই। পাৎলা ছিপছিপে কিন্তু বলিষ্ঠ লোকেরাই পুলিশের কাজে তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করিতে পারে—এবং কাজ-কর্ম্মেও তাহারা খুব তৎপর হয়। গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্ম্মচারীদের কিছু-কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারও শিক্ষা করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ বিভাগের লোক প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষালয় আছে। এই শিক্ষালয় হইতেই লোক বাছাই করিয়া বিশেষ-বিশেষ বিভাগে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থীর প্রথম শিক্ষা—শারীরিক ব্যায়াম। কি-ভাবে চলিতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, মাথা সোজা রাখিতে হয়, বন্দুক ধরিতে হয়, লক্ষ্যভেদ কেমন করিয়া করিতে হয়, ইত্যাদি সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হয়।

আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক বড় সহরেই এক-একটি করিয়া পুলিশ শিক্ষালয় আছে। এইসকল শিক্ষালয়ে কুচ্‌কাওয়াজ ইত্যাদির সাহায্যে পুলিশ তৈয়ার করা হয়। মোটর-চড়া, চালানো, কলকব্জা জানা ইত্যাদি কোনো বিষয়ই শিক্ষার বাহিরে নয়।

গোয়েন্দা পুলিশের শিক্ষা আরো বেশী শক্ত, যদিও তাহার খাটুনী বেশীর ভাগ মানসিক। আঙুলের ছাপ দেখিয়া দোষী ধরা, নানাপ্রকার সঙ্কেতের সাহায্যে অপরাধীর স্থিতিস্থান বাহির করা, নানাপ্রকার বাজে খবর হইতে দরকারী এবং কাজের খবর বাছিয়া লওয়া, ইত্যাদি সকল বিষয়ই তা'কে শিক্ষা করিতে হয়। জেরা করিবার পদ্ধতি, ব্যবহার দেখিয়া লোক চিনিবার উপায়-বিধি, বিখ্যাত পাকা বদমায়েসদের বিশেষ বিশেষ কার্য্য-ধারা এবং তাহাদের চরিত্র, ইত্যাদি সকল বিষয় গোয়েন্দা পুলিশের শিক্ষার বিষয়। আজকাল নানাপ্রকার বদমায়েসী এবং চুরি বৈজ্ঞানিক-ভাবে হইতেছে। এইসকল ব্যাপার বৈজ্ঞানিকভাবে ধরিবার উপায়ও অবশ্যশিক্ষণীয়।

বর্ত্তমান কালে সভ্য-জগতের পুলিশদের প্রধান চেষ্টা, চুরি হইবার পরে চোর ধরা নয়—চুরি হইবার পূর্ব্বেই চোরের সন্ধান পাওয়া এবং তাহাকে ধরা। এই কাজটি করিবার জন্য গোয়েন্দা পুলিশকে বিশেষ শক্ত অনেক-প্রকার ব্যাপার শিক্ষা করিতে হয়। ভারতবর্ষেও পুলিশ শিক্ষালয় আছে—সেখানেও নানা-প্রকার কুচকাওয়াজ শিক্ষা দেওয়া হয় দেখিয়াছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো-প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয় কি না জানি না। তবে ভারতবর্ষের পুলিশ চুরি হইবার পূর্ব্বে দূরের কথা—চুরির হইবার পরেও অনেক সময় চোরের কোনো পাত্তাই পায় না।

কয়েকখানি চিত্র দেওয়া হইল। এইসকল চিত্র হইতে পুলিশদের শিক্ষার কিছু-কিছু নমুনা পাওয়া যাইবে।

—

মরণ-রশ্মির কথা—

একপ্রকার আলোর আবিষ্কার হইয়াছে, এই আলো যাহার উপর ফেলা যাইবে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। এই রশ্মি ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত ফেলা যাইবে। যাহারা এই রশ্মি নিক্ষেপ করিবে, তাহাদের বিপদ্ আছে, কারণ কোনো প্রকারে তাহাদের দেহে এই রশ্মি একবার পড়িলে তাহাদের

শিক্ষার্থী পুলিসদের ব্যায়ামাভ্যাস
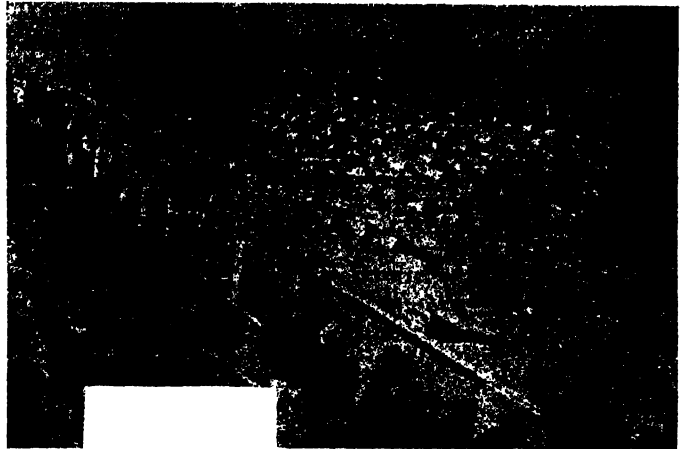
মরণ হইবে। এই জন্য যে সব লোকেরা এই রশ্মি নিক্ষেপ করিবে, তাহারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য রবার-সুট পরিধান করিয়া থাকে। রশ্মি নিক্ষেপ করিবার মুখটিও এমনভাবে তৈরী যে কলের অন্যান্য অংশ রশ্মি নিক্ষেপ করিবার সময় গরম হইবে না। চিত্রে সমস্ত ব্যাপারটি

মরণ-আলোক-নিক্ষেপকারী কল

স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে। এই মরণ-রশ্মি নিক্ষেপকারী কলটি ২০ ফুট উচ্চ।

১৮০০ ফলা-যুক্ত ছুরি—

একটি ইংরেজ কোম্পানি নিজেদের কারখানার বাহাদুরির বিজ্ঞাপন দিবার জন্য একটি ১৮০০ ফলাওয়ালা ছুরি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

১৮০০ ফলা যুক্ত ছুরি

প্রত্যেকটি ফলাই বেশ ধারালো এবং প্রত্যেকটিকেই দরকার-মত খোলা বা বন্ধ করা যায়। একটি ফলার গায়ে আর-একটি ফলা বসানো আছে—এইপ্রকারে ফলার ওপর ফলা বসাইয়া ১৮০০ ফলার স্থান করা হইয়াছে। ছুরিখানি দেখিতে অবশ্য সাধারণ ছুরির মতন ছোটো নয়—প্রকাণ্ড একখানি ব্যাপার। ছবি দেখিলেই ছুরিটির পরিমাণ এবং আকার বুঝা যাইবে।

—

শাদা ভল্লুকের বাচ্চা—

একটি সাদা ভল্লুকের বাচ্চা প্রিন্‌সেস্ রয়্যাল্ দ্বীপে ধৃত হওয়াতে কুড়ি বছর-ব্যাপী এক ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইল। একদল প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলিতেছিলেন যে এইপ্রকার ভালুক পৃথিবীতে নাই—তাঁহাদের বাক্য এখন ভুল প্রমাণ হইল। ভালুকটি কালো-ভালুক অপেক্ষা দেখিতে ক্ষুদ্র। ইহাদের দাঁতও একেবারে অন্য-ধরণের। ইহাদের ধুসর-বর্ণের চক্ষু দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা সাধারণ আলোক সহ্য করিতে পারে না। এই বহুমূল্য ভালুক

শাদা-ভল্লুকের বাচ্চা

বাচ্চাটিকে এখন ভিক্টোরিয়া চিড়িয়াখানাতে রাখা হইয়াছে—এবং ইহাদের আরো বংশ-বিবরণ সংগ্রহ করা হইতেছে।

রেডিওর কেরামতি—

একদিন লণ্ডনের রাস্তার লোকজনেরা অবাক্ হইয়া দেখিল যে একখানি ছোটো মোটর-কার বেশ দ্রুতবেগে লণ্ডনের পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। মোটর-কারে কোনো চালক বা আরোহী নাই—সে যেন আপন খেয়ালেই চলিয়াছে। মোটর-কারের অধিকারী নিজের বাড়ীতে বসিয়া radiodynamicsএর—অর্থাৎ দূর হইতে র‍্যাডিওর সাহায্যে

কোনো যানের গতি এবং পথ নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন ইংরেজ radiodynamicsএর সাহায্যে একখানি নৌকা চালাইবার প্ল্যানের পেটেণ্ট লন। গত ১০ বৎসরে নিকোলা টেস্লা এবং জনুহেস্ হ্যামণ্ড এই-প্রকারের নৌকা কৃতকার্য্যতার সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

চালকহীন মোটর-কার পথ দিয়া চলিয়াছে

সামরিক বিভাগে radiodynamicsএর ব্যবহার বহুল পরিমাণে হইতেছে টর্‌পেডো চালানয়। ১৯২৪ সালের ৭ই মার্চ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাপ্তান মার্‌ফি পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম বিনা-চালকে radiodynamicsএর সাহায্যে এরোপ্লেন চালনা করেন। তাহার পর একজন ইতালিয়ান্ বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কর্ত্তা—জি, ফিয়ামোয়া, রেডিওর সাহায্যে ডুবো-জাহাজ চালনা করেন। এই কাজটিকে ব্যর্থ করিবার জন্য নানা-প্রকার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কেহই কোন-প্রকার বাধা দিতে পারে নাই। Radiodynamicsএর সাহায্যে গাড়ী বা নৌকার কেবল গতি নির্দ্দেশ বা চালনা করা যায়—গাড়ী বা নৌকার গতি দিবার জন্য পেট্রল ইত্যাদি অন্যান্য সকল-প্রকার দ্রব্যেরই প্রয়োজন থাকে।

১৭২৭ খৃঃ অব্দে ষ্টিফেন গ্রে সর্ব্বপ্রথম লণ্ডন সহরে ৭০০ ফুট তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক-প্রবাহ চালনা করিয়া জগতকে অবাক্ করিয়া দেন—তার পর ক্রমশ বৈদ্যুতিক ব্যাপারে মানুষ দক্ষতা লাভ করিতে-করিতে ১৮৩৬ অব্দে মোর্স সর্ব্বপ্রথম তাঁহার টেলিগ্রাফ সঙ্কেত তারে পাঠাইতে সক্ষম হন। তাঁহার নামেই (মোর্স্-কোড) এই সঙ্কেত এখন জগতে চলিত আছে। মোর্সকে ঠিক টেলিগ্রাফ-আবিষ্কর্ত্তা বলা যায় না, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে আরো অনেকে এই বিষয়ে চিন্তা এবং চেষ্টা করিয়াছিলেন—মোর্স সেইসকল চিন্তা এবং চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

Radiodynamicsএর পূর্ব্বে teledynamics আবিষ্কার হয়, অর্থাৎ তারের সাহায্যে তাড়িত-প্রবাহ বহন করিয়া লইয়া গিয়া কোনো জিনিষ দূর হইতে চালানো হয়। এই কার্য্যে মানুষ অনেক বাধা পায়—তারের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাড়িত প্রবাহের জোর ভয়ানক কমিয়া যাইত। ইহাতে কোনো কিছু চালানো অসম্ভব হইত। টেলিগ্রাফিতেও প্রথমে এই বাধা বর্ত্তমান ছিল। তাহার পর মানুষের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে 'Relay'র আবিষ্কারে এই বাধা দূর হয়। Relay অতি sensitive এবং সরল-প্রকারের ইলেকট্রিক লেভার (electric lever), অতি অসম্ভব-রকম

বৈজ্ঞানিক ঘরে বসিয়া দূরের গাড়ী চালাইতেছেন

অল্প তাড়িত শক্তিতে এই লেভার সাড়া দেয়। এই লেভার আবিষ্কারে বহু দূর হইতে তাড়িত প্রবাহ প্রেরণ করিয়া নানা-প্রকার কলকব্জা ইত্যাদি চালানো সহজ হইয়া গেল। বড় বড় কল থামানো বা চালানো electric leverএর সাহায্যে অতি সামান্য তাড়িত শক্তিতে সম্পন্ন করা যায়। এই relay system না থাকিলে দূর হইতে এই কাজ করা কোনো দিনও সম্ভব হইত কি না বলা যায় না। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, ঘড়ি, টেলিফোন সঙ্কেত ইত্যাদি teledynamicsএর উদাহরণ-স্বরূপে দেওয়া যাইতে পারে।

বেতারের ব্যবহার আরম্ভ হইবামাত্র চেষ্টা হইতে লাগিল—রেডিওর সাহায্যে relay চালানো যায় কি না। ডাঃ কোবলেন্‌ৎস্‌এর (Coblentz)

চালকহীন কলের লাঙ্গলে মাঠ চষিতেছে

আবিষ্কৃত "microradiometer"—অর্থাৎ দূর হইতে তাপ-মাপক যন্ত্রের শক্তি এতই বেশী যে ৫৩ মাইল দূর হইতে একটি জলন্ত মোমবাতির তাপ কত, তাহা ইহার সাহায্যে বলা যায়—এই চেষ্টায় অনেক সাহায্য করিয়াছে। ক্রমাগত চেষ্টার পর চেষ্টা করিয়া এবং বিফলতার পর বিফলতা লাভ করিয়া মানুষ আজ rediodynam এর সাহায্যে প্রায় সকল প্রকার কল-চালাইতে কাজই করিতে সক্ষম হইয়াছে।

—

শক্-প্রুফ্ বা ঝাঁকানি আট্‌কানো বাইসাইকেল—

ই-এম্ ফোরে (E. M. Faure) নামক এক ভদ্রলোক এক-প্রকার সাইকেলে বসিবার সিট আবিষ্কার করিয়াছেন—এই সিটে বসিয়া
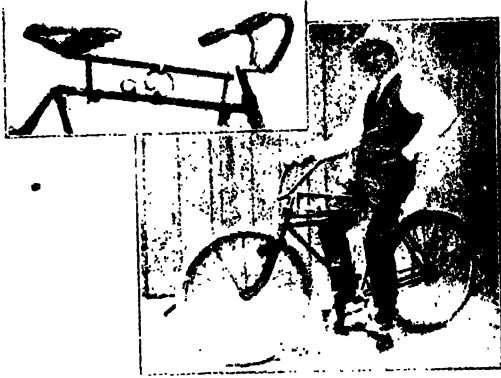
শক্-প্রুফ্ সাইকেল

সাইকেল চালাইলে আরোহীকে উঁচুনীচু রাস্তার দরুন্ কোনো প্রকার ঝাঁকানি খাইতে হইবে না—ইহাতে সাইকেল চালাইবার আরাম অনেক বাড়িয়া যাইবে। ঝাঁকানি থামাইবার স্প্রিংগুলি এমনভাবে লাগানো আছে যে আরোহীর এবং সিটের ওজন সাইকেলের মাঝখানে পড়ে। এই স্প্রিংগুলির দরুন্ সাইকেলের ভার-সমতা বাড়ে—এবং দুইটি চাকার উপর প্রায় সমান চাপ পড়ে, ইহাতে প্যাডেল করা সহজ-সাধ্য হয়।

—

মাটি হইতে খোঁটা তুলিবার উপায়—

মোটরকারেরা চাকা তুলিবার জন্য যে "জ্যাক" নামক যন্ত্র ব্যবহার হয়—তাহার সাহায্যে ৪।৫ ফুট লম্বা খোঁটা মাটি হইতে অতি কম

জ্যাকের সাহায্যে মাটি হইতে খোঁটা তোলা হইতেছে

পরিশ্রমে এবং সময়ে তুলিতে পারা যায়। জ্যাকটিকে খোঁটার গায়ে (মাটির কাছে) লাগাইয়া পেরেকের সাহায্যে খোঁটাকে জ্যাকের সঙ্গে ভালো করিয়া আট্‌কাইয়া দিতে হয়। তার পর জ্যাকটির সাহায্যে আস্তে-আস্তে খোঁটাকে মাটি হইতে তুলিয়া ফেলা যায়।

আত্মরক্ষার নতুন উপায়

পিছন হইতে একজন আপনার গলা টানিয়া ধরিল এবং সামনে একজন আপনার নাকের কাছে একটি পিস্তল ধরিল, এমন অবস্থায় দুটি হাত উপরদিকে তুলিয়া আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু হাত বেশীক্ষণ ধরিয়া তুলিয়া রাখিবেন না—হঠাৎ বাঁ-হাত নামাইয়া পিস্তলধারীর পিস্তল-ধরা হাতের উপর হাতের থাবা দিয়া জোরে মারিতে হইবে। এই আঘাতেই তাহার হাত হইতে পিস্তল পড়িয়া যাইবে। সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ডা'ন হাত ধরিয়া হঠাৎ আপনাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইবে। ঝুঁকিয়া পড়া মাত্র নিজের দেহকে বাঁ দিকে ঘুরাইতে হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ হাত তুলিয়া পিছনের লোকের বাঁ হাত ধরিয়া ফেলিতে হইবে। দেখা যাইবে যে পিছনের লোকটা আপনার পিঠের উপর দিয়া গিয়া সাম্‌নের আক্রমণকারীর উপর মুগুরের মতন পড়িবে। এই-প্রকারে আক্রান্ত-ব্যক্তি দুই জন আক্রমণকারীকেই একসঙ্গে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

যদি কেহ আপনার গলা বা কোটের বুকের দুই খোলা অংশ চাপিয়া ধরে তবে, বেশী কিছু করিতে হইবে না। আপনার দুই হাত জোড়া লাগাইয়া আক্রমণকারীর কাঁধের উপর ফেলুন। এই-প্রকার করা মাত্রই সে মাথা

নীচু করিবে, সঙ্গে-সঙ্গে আপনিও আপনার হাঁটু উপরে উঠাইবেন—বাস্ আর কিছু করিবার দর্‌কার হইবে না। (ছবিতে দেখুন।)

স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় নানা-প্রকার বিপদে পড়েন। যদি কোনো লোক কোনো স্ত্রীলোককে হঠাৎ জড়াইয়া ধরে, তবে স্ত্রীলোকটি যদি তাঁহার ডা'ন হাত আক্রমণকারীর চিবুকের উপর রাখিয়া আঙ্গুলগুলি দাঁতের মাড়ি এবং নাকের ভিতর প্রবেশ করাইয়া চাপ দেন তবে তিনি সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন।

কেহ আপনাকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিলে, প্রথমে তাহার হাত বাঁ হাত দিয়া চাপিয়া ধরুন, তার পর আপনার ডা'নহাত তাহার হাতের মাঝখান দিয়া চালাইয়া নিজের বাঁ হাতের কব্জী ধরুন। এবং তাহার পর আক্রমণকারীকে পিছনের দিকে চাপ দিন। এইরকম-ভাবে ক্রমাগত চাপ পড়িলে আক্রমণ কারীর দেহের
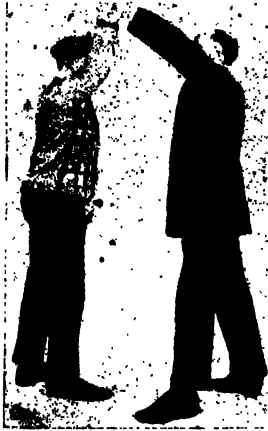
অসীমশক্তি কোনো কাজেই লাগিবে না—তাহার হাত হইতে অস্ত্র পড়িয়া যাইবে। সে যদি বেশী জোর করে তবে একটু জোরে চাপ পড়িলেই তাহার হাত একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আক্রমণকারী যদি আপনাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া আপনার বুকের উপর চাপিয়া বসে, তবে আপনার নিরাশ হইবার কারণ নাই। আক্রমণকারীর ডা'ন হাতের কব্জী আপনি বাঁ হাত দিয়া জোরে ধরুন, এবং ডা'ন আপনার দুইটি পায়ের মাঝখানে গিয়া পড়িবে। তখন আপনি তাহাকে আপনার দুইটি পায়ের মধ্যে যতক্ষণ ইচ্ছা চাপিয়া রাখিতে পারিবেন। বেশী জোর করিলে আক্রমণকারীর দম বন্ধ হইয়া যাইবে।

হাত দিয়া তাহার ডা'ন হাতের কনুইএর একটু উপরে ধরুন তার পর কব্জীর উপর চাপ দিলে এবং বাহুতে সামান্য ঠেলা দিলেই আপনার আক্রমণকারীর হাত আপনার গলা হইতে খসিয়া পড়িবে এবং সে যাতনায়

এই সকল প্যাঁচ বা কায়দাগুলি কাজে লাগাইবার সময় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অতি তৎপরতার সহিত কাজ করিতে হইবে। সামান্য বিলম্বেও প্যাঁচগুলি কোনো কাজেই না লাগিতে পারে।

স্ত্রীলোকদের আত্মরক্ষার আর-একটি ভালো উপায় আছে। খুব ত্বরিতভাবে আক্রমণকারীর পিছনে গিয়া

আক্রমণকারীর গলা জড়াইয়া ধরিতে হইবে এবং ডা'ন হাত দিয়া তাহার বাঁ হাত ধরিতে হইবে।

রাস্তায় হঠাৎ আক্রান্ত হইলে আক্রমণকারীর পায়ে হাঁটুর পিছনে গোড়ালি দিয়া লাথি (প্যাঁচ) মারিতে হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে খোলা হাত দিয়া তাহার বুকে ধাক্কা দিতে হইবে। এই প্যাঁচটি শুনিতে অতি সহজ

বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার মতন চমৎকার ফলদায়ক প্যাঁচ খুব কমই আছে। পরীক্ষা করিবার সময় আক্রমণকারী যেন নরম জায়গার উপর পড়ে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

রাস্তায় কেহ আপনাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সে আপনার কাছাকাছি আসিবামাত্র তাহার কব্জী এবং বাহুর উপর চট করিয়া ধরিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর তাহার কব্জীতে উপর-চাপ এবং বাহুতে নিম্ন-চাপ দিতে হইবে। এই-প্রকার চাপ দিতে থাকিলে আক্রমণকারী ক্রমশ ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিবে।

ত্রিপিটকের ভাষা

আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ মৎপ্রণীত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া কয়েকটি ভুল করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার বিশ্বাস "ত্রিপিটক মাগধী ভাষায় লিখিত"। ইহা শুধু আমার বিশ্বাস নহে। মাগধী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই ইহা বিশ্বাস। ত্রিপিটকের ভাষা 'পালি' নহে, মাগধী। মগধের ভাষায় বুদ্ধ সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশাবলী মাগধী ভাষায় গ্রথিত। তাঁহার উপদেশ ব্যতীত তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে যে-সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই মাগধী ভাষায় রচিত। মহাবংসে লিখিয়াছে—

> 'পরি বত্তেসি সব্বাপি সীহলট্‌ঠ-কথা তদা,
> সব্বেসং মূলা ভাসায় মাগধায় নিরুত্তিয়া।
> সত্তানং সব্ব ভাসানং সা অহোসি হিতা বহা,
> থেরিয়াচারিয়া সব্বে পালিং বিয় তমগ্‌গহুং।

এই শ্লোক এবং এইরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যায় যে, এখন যে-সকল বই পালিতে লিখিত বলিয়া বিশ্বাস তৎসমুদয়ই মাগধী ভাষায় লিখিত। পালি বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো ভাষা নাই। এই শ্লোক দ্বারাও আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। বুদ্ধঘোষ সিংহলী অট্‌ঠ-কথাসমূহ "মাগধায় নিরুত্তিয়া" মাগধ নিরুক্তিতে পরিবর্ত্তন করিলেন এবং থের ও আচার্য্যগণ তাহা 'পালির' মতন গ্রহণ করিলেন। এইখানে যে 'পালি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ মূল ত্রিপিটক বা বুদ্ধবাক্য। বুদ্ধবাক্যকে মাগধী ভাষায় লিখিত অপর গ্রন্থকারগণের মত হইতে পৃথক্ দেখাইবার জন্য "পালি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত মহাবংস গ্রন্থের নানা স্থানে এই অর্থে প্রযুক্ত "পালি" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা :—

"থেরবাদেহি পালীহি পাদেহি ব্যঞ্জনেহি চ।' ইত্যাদি

"অনাগত বংস" এবং "অঙ্গুত্তরনিকায়" গ্রন্থে "পরিয়ত্তি-অন্তরধানং" সন্দর্ভে লিখিত আছে তেপিটকে বুদ্ধ বচনে সাট্‌ঠ-কথা 'পালি' "যাব তিট্‌ঠতি তাব পরিয়ত্তি-অন্তরধানং নাম ন ভবিস্সতীতি।" এই স্থলেও পালি শব্দ ভাষা অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই।

"সা মাগধী মূলা ভাসা নরা যা আদিকপ্পিকা" ইত্যাদি পয়োগসিদ্ধির শ্লোক হইতেও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে মাগধী নামে একটি ভাষা ছিল।

গোতম আলাড়কালাম এবং রামপুত্র উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তিনি বোধিসত্ত্ব গোতম। বুদ্ধ গোতম তাঁহাদের কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। আমিও যে "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ" লিখিয়াছি তাহা বুদ্ধ গৌতমের দেশিত মার্গ। বোধিসত্ত্ব গোতমের কোনো দেশনা আমি লিখি নাই। ভগবান্ গোতম বুদ্ধ হইবার পর আলাড়কালাম এবং রামপুত্র উদ্দকের খোঁজ লইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহারা কেহ জীবিত ছিলেন না।

অরিয়-পরিয়েসনা-সুত্ত ("অরিয়-পরিবেসনা" নহে) পাঠে জানা যায় চতুর্থ অরূপসমাপত্তি পর্য্যন্ত বোধিসত্ত্ব গোতম উদ্দক রামপুত্রের নিকট শিখিয়াছিলেন। ইহা লৌকিক সমাপত্তিসমূহের একটি। কিন্তু লোকোত্তরসমাপত্তি শিক্ষার জন্য তিনি কাহারও নিকট যান নাই। স্বয়ম্ভু-জ্ঞানে তিনি লোকোত্তরসমাপত্তি-সমূহ অবগত হইয়া নিরোধ সাক্ষাৎকার করেন। অষ্টলৌকিক সমাপত্তি লাভ করিয়া সে-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা পাইয়া তিনি নয় লোকোত্তরসমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই নয় সমাপত্তির শিক্ষক তাঁহার ছিল না। এবং তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইসকল অবগত ছিলেন না।

ভগবান্ গোতমের শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞার সহিত তুলনায় আমি রামপুত্রের শ্রদ্ধাদিকে অকিঞ্চিৎকর বলাতেও মহেশবাবু আপত্তি করিয়াছেন। অবশ্য "অরিয়-পরিয়েসনা" সুত্তন্তে গোতম কিছু বলেন নাই। কিন্তু যে শ্রদ্ধাদির বলে তিনি বোধি (সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞান) লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন হইতে অত্যন্ত গম্ভীর, দুর্দৃশ্য, দুরনুবোধ, শান্ত, প্রণীত, তর্করহিত ও অতুলনীয় নিরোধ সাক্ষাৎকার করিলেন, রামপুত্রের সে শ্রদ্ধাদি ছিল না। আর যে শ্রদ্ধাদির বলে সংজ্ঞ-বেদয়িত-নিরোধ সাক্ষাৎকার সম্ভব, রামপুত্রের তাহা কোথায় ?

শ্রী বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া।

—

প্রত্যুত্তর

(১)

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া মহাশয়ের একটি বক্তব্য এই যে "অরিয়-পরিবেসনা" শুদ্ধ কথা নহে ; শুদ্ধ কথা 'অরিয়-পরিয়েসনা'। তিনি মনে করিয়া লইতে পারিতেন যে 'অরিয় পরিবেসনা'—মুদ্রাকরের প্রমাদ ; অপ্রচলিত শব্দের 'যে' স্থলে 'বে' মুদ্রিত হওয়া খুবই সম্ভব, আর 'বে' ছাপাইলে যদি শব্দটি প্রচলিত শব্দের ন্যায় হয়, তাহা হইলে ত কোনো কথাই নাই। লেখকের একটা প্রবন্ধ এই প্রবাসীতেই একসময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে "অরিয়-পরিয়েসনা"ই ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে আরও বলা হইয়াছে যে "অরিয়-পরিয়েসনা"=আর্য্য পর্য্যেষণা (প্রবাসী, ১৩৩০, ভাদ্র, পৃ ৫৮৯, ১ম স্তম্ভ, ১ম পংক্তি)। এই তুচ্ছ ভুল-বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

(২)

গ্রন্থ-সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম—

"গ্রন্থকার আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন যে, গোতম আলাড়কালাম এবং রামপুত্র উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই"।

এখন গ্রন্থকার বলিতেছেন, "গোতম আলাড়কালাম ও রামপুত্র উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য। কিন্তু তিনি বোধিসত্ত্ব গোতম। বুদ্ধ গৌতম তাঁহাদের কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই।"

কিন্তু তিনি গ্রন্থে অন্য-প্রকার বুঝিতে দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"বোধিসত্ত্ব তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণের পর যখন বৈশালীতে গমন করেন তখন আরারের পুত্র কালাম নামক জনৈক খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর তিন শত শিষ্য ছিল। আরারকালাম 'অকিঞ্চন্‌-আয়তন' যোগ শিক্ষা দিতেন। বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহ কালামের এই ধর্ম্ম অনির্ব্বাণিক—চরম নির্ব্বাণ লাভের অযোগ্য জানিয়া বৈশালী ত্যাগ করেন"। পৃঃ ৬৯।

গৌতম যে কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনেক দিন সাধনা করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা গোপন করা হইল। প্রত্যুত গ্রন্থকারের ভাষা পড়িলেই বুঝা যায় যে গৌতম ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই।

রুদ্রকের বিষয়েও গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"অনন্তর শাক্যসিংহ রুদ্রকের নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া কোনো নির্জ্জন প্রদেশে গমনপূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলেন। পূর্ব্বোপার্জ্জিতা পরমিতা বিশেষের বলে ও তপশ্চরণের প্রভাবে ব্রহ্মচর্য্য-সহকৃত প্রণিধান সহস্রের ফলে শত-শত-প্রকারের সমাধি তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। এইক্ষণে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া রুদ্রকের সমাধি বিনা উপদেশে আপনা-আপনি জ্ঞাত হইতে পারিলেন"। পৃঃ ৭০।

এখানে তিনি সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌতম রুদ্রকের উপদেশ গ্রহণ করেন নাই; বিনা উপদেশে সমুদায় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ গৌতম রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা ইহাই বুঝিয়াছি। যাহা হউক প্রতিবাদে যে তিনি এই মত প্রত্যাহার করিয়াছেন, ইহাও শুভ কথা।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরে গৌতম কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা জগতে কেহ কখনে বলে নাই, আমরাও বলি নাই। ভূত লাগাইয়া ভূত ছাড়ানো—ন্যায় শাস্ত্রের একটি বিশেষ দোষ।

(৩)

আমরা একস্থলে লিখিয়াছিলাম—"গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন 'বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন রুদ্রকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর।' পৃঃ ৭০।"

প্রতিবাদে তিনি বলিতেছেন, "ভগবান্ গৌতমের শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞার সহিত তুলনায় আমি রামপুত্রের শ্রদ্ধাদিকে অকিঞ্চিৎকর বলাতে মহেশ বাবু আপত্তি করিয়াছেন! অবশ্য—'অরিয় পরিয়েসনা' সুত্তন্তে গৌতম কিছু বলেন নাই!"

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই :—

এখন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে রুদ্রকের শ্রদ্ধাদি যে অকিঞ্চিৎকর তাহা তাঁহার নিজের মন্তব্য; তাহা গৌতমের মনোগত ভাব নহে। কিন্তু গ্রন্থে তিনি ইহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষা এই—"বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, রুদ্রকের শ্রদ্ধা......অতি অকিঞ্চিৎকর।"

এখন তিনি আরও বলিতেছেন, "অবশ্য 'অরিয়-পরিয়েসনা' সুত্তন্তে গৌতম কিছু বলেন নাই"।

একথাও ঠিক নহে। উক্ত সুত্তন্তে লিখিত আছে যে গৌতম এইরূপ চিন্তা করিলেন—

"কেবল যে রামেরই শ্রদ্ধা আছে তাহা নহে (ন খো রামস্স এব অহোসি সদ্ধা), আমারও শ্রদ্ধা আছে। কেবল যে রামেরই বীর্য্য আছে তাহা নহে, আমারও বীর্য্য আছে ইত্যাদি"।

অথচ তিনি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে গৌতমের মতে রামের শ্রদ্ধাদি অকিঞ্চিৎকর। প্রতিবাদে সরলভাবে নিজের ভুল স্বীকার করিলেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা পাইত।

(৪)

শেষ এবং প্রধান কথা—"বর্ত্তমান ত্রিপিটক কোন্ ভাষায় লিখিত?" গ্রন্থকার প্রতিবাদে বলিতেছেন "মাগধী ভাষায় লিখিত—বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই ইহা বিশ্বাস। ত্রিপিটকের ভাষা পালি নহে, মাগধী। মগধের ভাষায় বুদ্ধ সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশাবলী মাগধী ভাষায় গ্রথিত।......পালি বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো ভাষা নাই"।

নিজমত সমর্থন করিবার জন্য তিনি 'মহাবংস' নামক গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে বুদ্ধ-ঘোষের পুস্তক হইতে আরো কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

এস্থলে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই—

(ক)

মহাবংসাদি গৌতমের অভ্যুদয়ের সহস্রাধিক বৎসরের পরে রচিত। আমরা বিচার না করিয়া এই সমুদায় গ্রন্থের উক্তিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না এবং বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণও তাহা করেন নাই।

(খ)

দ্বিতীয় বক্তব্য :—বড়ুয়া-মহাশয় যে বলিয়াছেন "বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই ইহা বিশ্বাস"—এস্থলে "বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই" অংশের অর্থ বোধ হয় "তাঁহার জানা-চেনা ২।৪ জন লোকের"।

আমরা পরে দেখাইব যাঁহারা বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ তাঁহারা অনেকেই বিরোধী কথা বলিয়াছেন।

(গ)

তৃতীয় বক্তব্য :—লোকে 'মাগধী' বলিলে যাহা বুঝে—ত্রিপিটকের ভাষা তাহা নহে। বররুচি চারিটি প্রাকৃত ভাষার নাম করিয়াছেন—তাহার মধ্যে 'মাগধী' একটি। হেমচন্দ্র নাম করিয়াছেন আরও তিনটি বেশী; এই তিনটির মধ্যে এস্থলে অর্দ্ধমাগধীর নাম উল্লেখযোগ্য। বররুচির মাগধী এবং হেমচন্দ্রের মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী পালি হইতে ভিন্ন। বহু নাটকে মাগধী ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। মাগধী ও পালি—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা এস্থলে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। যাঁহারা ইংরেজী গ্রন্থ পড়িয়া ইহা অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা R. G. Bhandarkar-এর Wilson Philological Lectures এবং P. D. Gune প্রণীত Introduction to Comparative Philology গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী-মহাশয়কৃত পালিপ্রকাশের 'প্রবেশক' অংশ বাঙ্গালী পাঠকগণের বিশেষ উপযোগী।

(ঘ)

চতুর্থ বক্তব্য :—ত্রিপিটকের ভাষা যদি মাগধী হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে এই মাগধী এবং নাটকাদির মাগধী এক নহে। শাস্ত্রী মহাশয় নাটকাদির মাগধীকে 'প্রাকৃত মাগধী' নাম দিয়াছেন এবং ত্রিপিটকের ভাষাকে পালি ও 'বৌদ্ধ মাগধী' এই উভয়ই বলিয়াছেন। এইসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ মাগধী ও প্রাকৃত মাগধী এই উভয় ভাষা পরস্পর দূর বিভিন্ন "প্রবেশক, পৃঃ ১৬।—

(ঙ)

পঞ্চম বক্তব্য :—যদি কল্পনা করিয়া লওয়া যায় যে নাটকাদির মাগধীই ত্রিপিটকের মূল ভাষা তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কোনো বিশেষ সময়ে এই মাগধী ত্রিপিটককে পালি ত্রিপিটকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল।

(৮)

ষষ্ঠ বক্তব্য :—ত্রিপিটকের-মূল ভাষা কোন্ দেশে প্রচলিত

ছিল. সে-বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। ইতিহাস, প্রাকৃতাদি ভাষা, স্তম্ভ ও পর্ব্বতে খোদিত অনুশাসনাদি বিচার করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন-ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

Rhys Davids বলেন, পালি অবন্তীর ভাষা ছিল। Franke বলেন, ইহা উজ্জয়িনীর ভাষা।

Westergard এবং Kuhn বলেন, উজ্জয়িনীর প্রচলিত প্রাকৃত-কেই সংস্কৃত করিয়া সাহিত্যিক পালি করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া Oldenberg এবং Edward Muller এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কলিঙ্গ দেশে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। Windisch এবং Grierson বলেন, অশিক্ষিত লোকে মাগধী ভাষা ব্যবহার করিত; ইহারই সাহিত্যিক ভাষা পালি। সংস্কৃত মাগধীর নাম পালি। কেহ-কেহ বলেন, 'অর্দ্ধমাগধী' হইতে পালির উৎপত্তি। Keith বলেন সুত্তপিটক ও বিনয়পিটক প্রথমে কোনো প্রাকৃত ভাষার লেখা হইয়াছিল। বহুপরে ইহার বর্ত্তমান পালি সংস্করণ প্রস্তুত হয়। কিন্তু অভিধম্মপিটক প্রথমেই পালিতে রচিত হইয়াছিল। ইহাদিগের মতামতের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত তিনখানা পুস্তক; বিদ্যাভূষণ এবং Edward Mullerএর পালি ব্যাকরণের ভূমিকা; Oldenbergএর বিনয়পিটকের ভূমিকা; Rhys Davidsএর Buddhist India এবং Cambridge History of India; Bhandarkar Comm. Essay প্রভৃতি গ্রন্থের যথাস্থান দ্রষ্টব্য।

এইসমুদায় আলোচনা করিয়া আমরা কেবল এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, যে-ভাষা মাগধী নামে পরিচিত, তাহা বর্ত্তমান ত্রিপিটকের ভাষা নহে।

পালির নাম পালি হইল কেন, ইহার মৌলিক অর্থ কি, কি-প্রকারে ইহা ভাষা অর্থে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রী-মহাশয়ের পালি-প্রকাশের প্রবেশকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ সেই গ্রন্থ পাঠ করুন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

জাতি-গঠন ও বিচার-বুদ্ধি *

বিশ্বাসের কার্য্যকরী শক্তি প্রভূত। প্রেম ও আশার ক্ষমতাও কম নয়। কিন্তু বিশ্বাস যেন অন্ধ গোঁড়ামিতে পরিণত না হয়; স্বদেশপ্রেম যেন বিদেশের প্রতি ঘৃণা আনয়ন না করে এবং আশা যেন মৃগতৃষ্ণিকার মতন নিষ্ফল স্বপ্নে পর্য্যবসিত না হয়। বিশ্বাস, আশা ও প্রেমের সহায়তায় মহৎ হইতে বা মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে বিচারবুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

মানুষকে ভয়াবহ অপরাধ হইতে বিরত করিতে শুধু 'বিশ্বাস' যথেষ্ট নয়। সর্ব্বদেশপ্রচলিত সত্যনীতিকে উপেক্ষা করিয়া কদর্য্য জীবন যাপন করায় কোনো ব্যক্তি গোঁড়া ধার্ম্মিকদিগের হস্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই, অথচ বিভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণ করার জন্য অসংখ্য লোকের এই গোঁড়াদিগের হস্তে মৃত্যু ঘটিয়াছে। অন্যায় কার্য্য করিয়া বর্ত্তমান যুগে কাহারও লোষ্ট্রাঘাতে মৃত্যু হয় নাই, অথচ সেদিন আফগানিস্থানে ভিন্ন ধর্ম্মমতের জন্য একব্যক্তিকে ঐভাবে মরিতে হইল। অপবিত্র জঘন্য জীবন যাপন করিয়াও উচ্চ-বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ-সন্তান অপবিত্র বলিয়া গণ্য হয় না বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত পবিত্র জীবন যাপন করিয়াও কুকুর-শূকরাপেক্ষাও ঘৃণ্য গণ্য হইয়া লাঞ্ছিত হইতেছে। নিরীহ লোকে এই শাস্তি পাইয়াছে ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের হাতে। সুতরাং কেবল মাত্র বিশ্বাস থাকিলেই চলিবে না; দেখিতে হইবে যেন আমরা ভ্রান্ত ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন না করি। বিশ্বাস করিবার ক্ষমতার সঙ্গে-সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির অনুশীলন করাও প্রয়োজন।

জাতিগঠন-সমস্যা বহুদিন হইতে এদেশে আলোচিত হইলেও, লোকে এ-আলোচনায় বিরক্ত হয় না। ইহা ভালোই। কারণ, ভারতবর্ষের লোকের জাতি-গঠন-সমস্যা যে একটি প্রকাণ্ড সমস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাদেশিকতার মন্দ দিক্‌টা সম্প্রতি ক্রমশঃ নিন্দিত হইতেছে। এমন-কি গোঁড়া দেশ-প্রেমিকরাও আন্তর্জাতিকতা বা মানবিকতাকে মৌখিক অর্ঘ্য

* Welfareএ লিখিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের Nation-building and the Critical Spirit প্রবন্ধটির অনুবাদ।

আন্‌মনা

চন্দ্রকলা
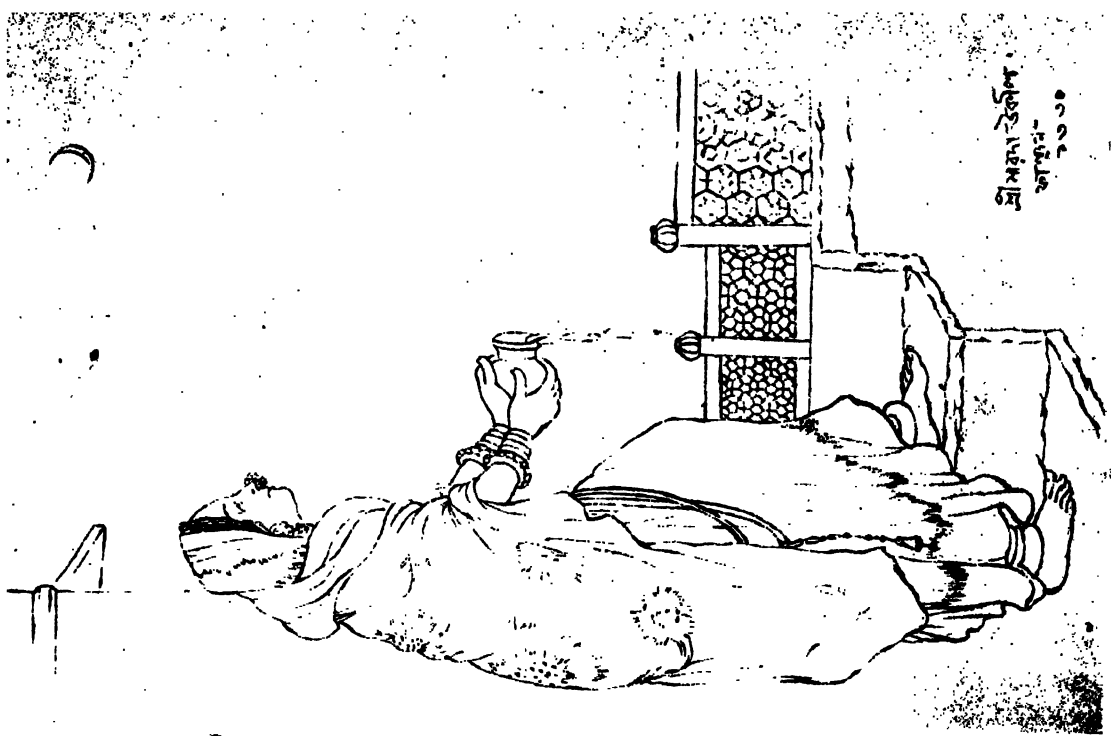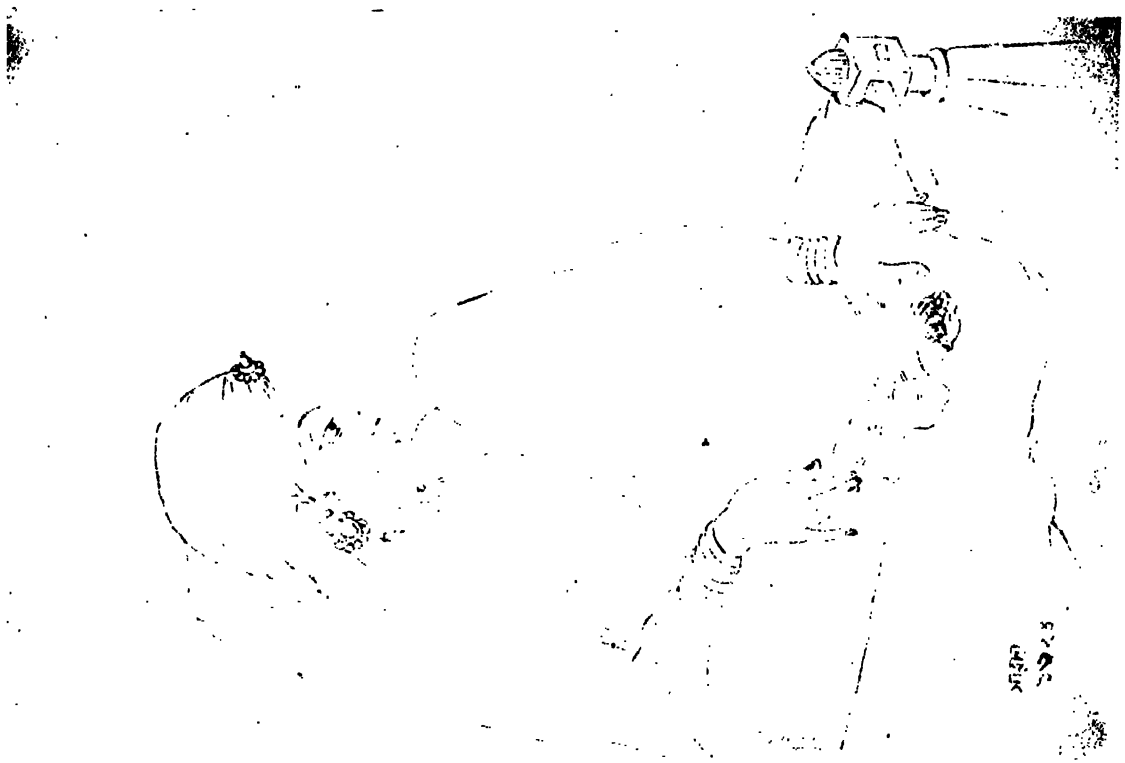
দিতেছে ;—অন্যায় চিরদিনই কপটতার আবরণে সত্যের প্রাধান্য স্বীকার করে।

কিন্তু স্বাদেশিকতার একটা ভালো দিক্ আছে বলিয়া আমরা মনে করি এবং শুধু সেই অর্থেই আমরা উহাতে আস্থাবান্। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। যিনি আপন পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন এবং পরিবারস্থ প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন রাখিতে চান অন্য পরিবারের সঙ্গে তাঁহার কোনো বিরোধ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাঁহাকে শুধু দেখিতে হইবে যে, স্বপরিবারের প্রতি অত্যধিক প্রীতি দেশের কাজে তাঁহাকে যেন অমনোযোগী বা বিরোধী না করিয়া তোলে। পক্ষান্তরে তাঁহাকে সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে যে তাঁহার পরিবারের মঙ্গল দেশের অন্য সকলের মঙ্গলের সহিত জড়িত। একথা যেমন পরিবারের পক্ষে সত্য তেম্‌নি জাতীয় ব্যাপারেও সত্য। ন্যাশন্যালিজম্ বা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিকতা অর্থে ভিন্নদেশের সুবিধা অসুবিধার সহিত সংঘাত নহে। আবার একজাতির মঙ্গল অন্য-জাতির মঙ্গলের উপর নির্ভর করে বলিয়া, অন্য জাতির ক্ষতি করিয়া স্বদেশের স্বার্থসাধন-চেষ্টা মূঢ়তা ও পাপ ছাড়া কিছুই নহে। বস্তুতঃ মানবিকতাকে যদি এক বিশাল সুন্দর প্রাসাদরূপে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতিগুলি সেই প্রাসাদ-নির্ম্মাণের ইষ্টক। সুতরাং প্রাসাদটি দৃঢ় করিতে হইলে প্রত্যেকটি ইঁটই সুন্দর ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন।

যেমন আন্তর্জাতিক ব্যবহারে অন্য জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া কোনো একটি-বিশেষ জাতিকে সমৃদ্ধ করা মূর্খতা, তেম্‌নি জাতি-গঠনেও অন্য সকল সম্প্রদায়কে অসুবিধায় ফেলিয়া কোনো-একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করা মূর্খতা মাত্র।

গৃহনির্ম্মাতা অপেক্ষা জাতি-গঠনকারীর কার্য্য অনেক আয়াসসাধ্য। গৃহ-নির্ম্মাতার কাজ প্রাণহীন জড় লইয়া, ইষ্টক ও মালমশলাদির ইচ্ছা-শক্তি ভাব প্রবণতা বা উত্তেজনা নাই। আপনার ইচ্ছামত ইষ্টক বা মশলাদি লইয়া কাজ আরম্ভ করা যায়। কিন্তু জাতিগঠনে যে উপাদানগুলি লইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা চেতনা-সম্পন্ন এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই স্ব-স্ব অনুভূতি আছে।

এইরূপ উপাদান লইয়া স্থায়ী হর্ম্ম্য গঠন করা সহজ কার্য্য নহে। কারণ, যদিও মানুষ দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালোবাসে বলিয়া মানুষে মানুষে আকর্ষণ আছে, তথাপি নানা কারণে মানুষ পরস্পর-বিরোধী হইয়া দূরে থাকিতেও চায়। স্বার্থ, প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, জাতীয়তা, ধর্ম্মমত বা কোনো সংস্কার, জাতিভেদ ইত্যাদি ঐ কারণ-গুলির মধ্যে কয়েকটি। সম্পূর্ণভাবে ঐ কারণগুলির উচ্ছেদ-সাধন সম্ভবপর নহে এবং পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাও অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া জাতিগঠনকারীকে সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হইবে, যেন বিকর্ষণী শক্তি আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর না হয় এবং যেন দলবদ্ধ থাকিবার স্পৃহা সকল স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট না করে।

সকল ধর্ম্মেই প্রেম ও প্রীতি শিক্ষা দেয়; সুতরাং ধর্ম্ম কি আন্তর্জ্জাতিকতা কি স্বাদেশিকতা দুইয়েরই সহায় হওয়া উচিত; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি যে ধর্ম্মের পরার্থপরতার শিক্ষা মাত্র অল্প কয়েক জনকে দেশ, জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-গত ক্ষুদ্রতাকে পরিত্যাগ করিতে সাহায্য করিয়াছে। একই ধর্ম্মমতাবলম্বী বিভিন্ন দলে কেবল মাত্র জাতি বা সম্প্রদায়গত পার্থক্যের জন্য ভীষণ বিরোধের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বর্ত্তমান।

এই কারণে প্রকৃত জাতিগঠনকারীর লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসের দোহাই পাড়িয়া কার্য্য সাধন করিতে গিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গোঁড়ামির দিক্‌টায় অধিক দৃষ্টি না দেন, কারণ এই গোঁড়ামিকে প্রাধান্য দিলে বা বড় করিয়া দেখাইলে মানুষে-মানুষে বিরোধ ঘনাইয়া উঠে এবং ঘৃণাবৃত্তি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ জাতিগঠনকারীর উচিত মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা একেবারে না তোলা; কারণ, তাহা হইলে যে মতগুলি কেবলমাত্র পরমত অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি প্রচার করে তাহাদের যথাযথ নিন্দা বা বিচার তিনি যুক্তি যুক্ত মনে করিবেন না। অবশ্য আমরা নিখিল মানবীয় ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের কথা বলিয়া আবেদন করার বিরোধী নহি।

পক্ষান্তরে ঐসমস্ত গোঁড়া ধর্ম্মমতের যথার্থ বিচার সহ করা ও প্রচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। অবশ্য জাতিগঠন করিবার চেষ্টা করা যাঁহার পেশা তাঁহার পক্ষে ঐরূপ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা—উভয় দিক্ হইতেই সাম্প্রদায়িক শিক্ষাগার স্থাপন ও তথায় ধর্ম্ম-শিক্ষার নামে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় আমরা তাহার বিরোধী। ঐসমস্ত শিক্ষালয় এবং ঐধরণের শিক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামির সৃষ্টি করে। যাঁহারা ঐসমস্ত স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিয়া ঐধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী, তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের গোঁড়াদল ভুক্ত। এই প্রবন্ধে কোনো গোঁড়া ধর্ম্মমত বা চলিত ধর্ম্মের বিরোধী কোনো মতের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গোঁড়ামি হিন্দুর হউক অথবা মুসলমানের হউক, যুক্তি দ্বারা ইহার শেষ পর্য্যন্ত বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, তাহা জাতীয় একতার বিরোধী। একজন যথার্থ গোঁড়া, নিজের সম্বন্ধে সচেতন হিন্দু ও একজন গোঁড়া অনুরূপ মুসলমান একসূত্রে বাঁধা থাকিতে পারে না। মিঃ গান্ধী ও মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কেহ-কেহ আমাদের এই মত খণ্ডন করিতে চাহিবেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রকৃত হিন্দু হইলেও কোনো ক্রমেই গোঁড়া নহেন। যদি হিন্দু ও মুসলমানে মিলিয়া এক সম্মিলিত জাতি হইতে চায় তাহাদের পরস্পরকে কতকগুলি গোঁড়া মত ও সংস্কার বর্জ্জন করিতেই হইবে। আমরা অনেক সংস্কার ও আচারকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি, তথাপি এরূপ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

যদি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দু কিম্বা শুধু মুসলমানের বাসভূমি হইত, তাহা হইলেও আধুনিক অর্থে কার্য্যক্ষম জাতি গঠিত হইতে পারিত না, যদি না তাহারা কতকগুলি গোঁড়া সংস্কার পরিত্যাগ করিত। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি উচ্চ জাতিদিগের সহিত একত্রে কাজ করিতে পায় না। গান্ধীজির মতানুযায়ী অস্পৃশ্যতা নিবারিত হইলেও কিছু ভরসা হয় বটে, কিন্তু শিক্ষিত ও নিজেদের অবস্থা-সম্বন্ধে সচেতন অস্পৃশ্যজাতির লোকেদের স্বাভাবিক দাবি-অনুসারে তাহাও যথেষ্ট নহে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, গান্ধীজির কথা-অনুযায়ী অস্পৃশ্যদিগকে কতকগুলি সুবিধা দেওয়াতে তাহারা সন্তুষ্ট হইল, তবুও মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগকে সন্তুষ্ট করা হইবে কেমন করিয়া? তাহারা ত অস্পৃশ্য নহে; অথচ, ব্রাহ্মণেরা সকল সুখ ও সুবিধার অধিকারী বলিয়া তাহারা আপত্তি করিতেছে। ইহা কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় বিরোধ নহে, সামাজিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক বিরোধও বটে। ইহাদের মধ্যে কেহ-কেহ সকল ধর্ম্মকার্য্য ও পূজা-পার্ব্বণে ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য বর্জ্জন করিতে চাহিতেছে।

সুতরাং কেবলমাত্র গান্ধীজির কথানুযায়ী চলিলে হিন্দুর গোঁড়ামি অংশতঃ বর্জ্জিত হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে যথার্থ রোগোপশম হইবে না। জাতিভেদের ভূত পুরাপুরি ছাড়াইতে হইবে। হিন্দুদের গোঁড়ামি রক্ষা করিতে গেলে তাহা সম্ভবপর নহে।

মুসলমানদের গোঁড়ামি-সম্বন্ধে আমরা বেশী-কিছু অবগত নহি। তবে আমরা এইটুকু জানি যে, স্বাদেশিকতায় উদ্বোধিত হইয়া যে-সমস্ত নরনারী নবীন তুর্কীস্থানকে জগতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে গণনীয় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা গোঁড়া নহেন। বস্তুতঃ তুরস্কের নারীজাতিও মুসলমান-গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অথচ ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা বেশী ধর্ম্মপরায়ণ ও রক্ষণশীল। ইজিপ্টকেও যথেষ্ট গোঁড়া বলিয়া মনে হয় না; কারণ, মৌলানা মহম্মদ আলি অনুযোগ করিয়াছেন যে, ইজিপ্ট-বাসীদের স্বধর্ম্ম অপেক্ষা স্বজাতীয়তার দিকে দৃষ্টি বেশী। এইসকল জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ যদি সম্পূর্ণ বা মুখ্যতঃ মুসলমান রাজ্য হইত, তাহা হইলেও কতকগুলি অন্ধ সংস্কার ও আচার বর্জ্জন না করিলে কর্ম্মক্ষম জাতি বলিয়া ভারতবাসীরা গণ্য হইত না। আফগানিস্থানে গোঁড়ামির দরুন্ আহ্‌মদীয়া-মত-বিশ্বাসী একজন নিরীহ ব্যক্তিকে লোষ্ট্রাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে এবং এই বর্ব্বরতা প্রকাশ্যে কয়েকদল ভারতবর্ষীয় মুসলমান কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। অবশ্য কেহ-কেহ ইহার নিন্দাও করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, যদি ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা আপনাদের গোঁড়ামি

অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে ভারতবর্ষে গঠিত এই আহম্মদীয় সম্প্রদায় অচিরেই বিনষ্ট হইত।

কেহ-কেহ বলিতে পারেন যে, ইউরোপের গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিগুলির একতা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রচুর-পরিমাণে বিদ্যমান; জাতিগঠনে গোঁড়ামি না ছাড়িলেও যে চলে ইহা তাহার প্রমাণ; কারণ গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্ম যদি জাতির একতাসাধনে বিরোধী না হয়, হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম্মই বা কেন বিরোধী হইবে? উত্তরে ইহা বলা যায় যে, ইউরোপের ধর্ম্মের গোঁড়ামির সহিত রাষ্ট্রের যোগ নাই বলিলেও চলে। রাষ্ট্রব্যাপারে লোকে জাতি ও দেশের সুবিধা-অসুবিধাই গণনা করে। অর্থাৎ জার্ম্মান্, ফরাসী, স্কচ, ইংরেজ হিসাবেই রাষ্ট্রব্যাপার পর্য্যালোচিত হয়—রোমান ক্যাথলিক্, লুথার-সম্প্রদায়, অ্যাংলিকান্ মেথডিষ্ট বা প্রেস্‌বিটারিয়ান্ হিসাবে নয়। আসলে, ধর্ম্মযাজক বা পেশাদার ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ভিতর ছাড়া সকল-প্রকার গোঁড়ামি পশ্চিম হইতে লোপ পাইতেছে। গির্জ্জার উপস্থিতির সংখ্যার উত্তরোত্তর হ্রাসই ইহার প্রমাণ। ইউরোপ যদি অদ্যাপি গোঁড়া হইত তাহা হইলে আজিও য়িহুদী ও বিধর্ম্মীদিগকে দগ্ধ করা হইত; রোমান্ ক্যাথলিক্ য়িহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচুর বিরোধ দৃষ্ট হইত এবং সম্ভবত দাসত্ব প্রথা অদ্যাপি থাকিত।

বস্তুতঃ আমরা ইহা চাই যে, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ দেশবাসিগণ আশৈশব জীবনের কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বভাবে বিস্তৃত দেখিতে শেখে। এই কারণে আমরা অসাম্প্রদায়িক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত দেখিতে চাই—যেখানে আমাদের বালকবালিকাগণ যে-কোনো ধর্ম্মাবলম্বী যে-কোনো সম্প্রদায়ের সহপাঠীর সহিত মেলামেশা করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জিত হইবে, এবং তাহারা সকল-সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকের মহত্ত্ব ও প্রেমের আদর্শ উপলব্ধি করিয়া আপন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরের লোককেও বিশ্বাস করিতে ও ভালোবাসিতে সক্ষম হইবে। ইহারাই তখন পরস্পর কি অকৃত্রিম বন্ধু ও প্রতিবেশী হইবে!

লোকে যাহাতে কতকগুলি গোঁড়া বিশ্বাস ও সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে, তজ্জন্য আমাদিগের মধ্যে যথার্থ বিচারশক্তির উদ্রেক করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পৃথক্‌ভাবে এই বিচারবুদ্ধির বিকাশ ও চর্চ্চা স্পৃহনীয়। প্রথম যখন হিন্দুসম্প্রদায়ে এই বিচারবুদ্ধি দেখা দিল, তখন যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহাদের কেহ-কেহ নিরীশ্বর-বাদী, কেহ-কেহ অজ্ঞেয়বাদী, কেহ কৎমতাবলম্বী কেহ খৃষ্টিয়ান এবং কেহ বা ব্রাহ্ম হইয়া পড়েন, ক্রমশঃ হিন্দু-গোঁড়ামির প্রভাব এতদূর হ্রাস পাইয়াছে যে, হিন্দুদের মধ্যে অনেক লোকের বিশ্বাস ও সংস্কার সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, অবশ্য চিন্তাশীল ও বিচারপরায়ণ নরনারী দলে-দলে নিন্দা ও অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন বলিয়া আজ হিন্দুধর্ম্মের এই উন্নত অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে।

আমরা জানি যে মুসলমান-সমাজেও সংস্কারমুক্ত বিচার-পরায়ণ লোক আছেন। কিন্তু ইঁহারা আজিও নিন্দা-গ্লানি ও অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে তেমন প্রস্তুত নহেন। বর্ত্তমানে মুসলমান-সমাজে মোল্লা ও মৌলানারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। ইহারা সময়ে-অসময়ে ফতোয়া বা প্রত্যাদেশ-পত্র জাহির করেন। এইসব ফতোয়ার সহায়তায় অসহযোগ প্রচার ও কাউন্‌সিল-প্রবেশের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য মুসলমানসমাজের রাষ্ট্রীয় নেতারা এই-সকল লোকের ক্ষমতা ও প্রভাব অনেক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ করিলে প্রকৃত জাতিগঠন সম্ভবপর হয় না।

আমাদের মধ্যে এই বিচারবুদ্ধির প্রবর্ত্তন, বর্দ্ধন ও সংরক্ষণ করিতে হইলে আমাদিগকে যথার্থ উদার জাতীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অসাম্প্রদায়িক, যথার্থ স্বাধীন, সংস্কারমুক্ত শিক্ষায় কেবলমাত্র অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীন জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক মনের সৃষ্টি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া না হইলেও কতকগুলি সংস্কার হইতে সে-শিক্ষায় মনকে বিমুক্ত রাখে। যদি নানা ভাবের 'জাতীয়' বিদ্যালয়গুলিতে এবিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বিত হয় তাহা হইলে তাহাই প্রার্থনীয়। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বুঝাইতে হিন্দুরা অধি-কাংশ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব গোঁড়ামিপূর্ণ শিক্ষাই বুঝিয়া থাকে। তথাকথিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী এবং

অন্যান্য নানা পুস্তাই ইহার প্রমাণ। মুসলমানেরাও স্বতন্ত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে।

শিক্ষা ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বাধীন, বিচারপরায়ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মনোভাব বিকাশ করিতে হইলে আমাদিগকে পুরোহিত ও অন্ধ-ধর্ম্মমতবাদীদিগের প্রভুত্ব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক কোনো ধর্ম্মের অন্ধতা ও গোঁড়ামি আলোচনা অপেক্ষা স্বধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক আলোচনা অধিকতর ফলপ্রদ, কারণ পূর্ব্বোক্তক্ষেত্রে কেবল দলাদলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং নিজ-নিজ সম্প্রদায়েই বিচারশক্তির প্রসারের চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়।

শুধু ধর্ম্ম এবং সামাজিকতার ক্ষেত্রেই যে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাহা নহে। রাষ্ট্র,ধন-বিজ্ঞান,শিল্প প্রভৃতি জাতীয় জাগরণের সকল বিভাগেই ইহা অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী পরিবর্ত্তনবিরোধী দলকে কার্য্যতঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আজ তাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, রাষ্ট্রীয় বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা ও প্রভুত্বে সন্দিহান হইতেছে, অথচ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সকল মতামত,এমন-কি চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অমোঘ ও অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি এত বড় সাধু ও ঋষি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, অ্যালোপ্যাথী শাস্ত্র মিথ্যা ও ভ্রান্ত এই মত প্রচার করা সত্ত্বেও তিনি যখন নিজে অ্যালোপ্যাথী ঔষধ সেবন ও অস্ত্রোপচারে নিজের জীবন রক্ষা করিলেন, তখনও লোকে তাঁহার মত অভ্রান্ত জ্ঞান করিত।

পরিবর্ত্তনবিরোধী দল (No-changer), স্বরাজ্যদল, উদারপন্থী দল (Liberal), স্বাধীনপন্থী দল (Independent) ও সনাতনপন্থী দল, মুসলমান লীগ ও খিলাফৎ দল প্রত্যেকেরই পুঁথিগত ভ্রান্ত বুলিকে অবিশ্বাস করা আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে একপ্রকার রাষ্ট্রীয় জাতি-বিভাগ (political caste) হইয়াছে। করিয়া স্বাধীন ও ধীর চিন্তাকে স্থান দিতে হইবে। অবশ্য আমরা ইহা বলিতেছি না যে, আমাদের সকল রাষ্ট্রীয় দল এবং তাহাদের সকল মতামত ভ্রান্ত। আমরা শুদ্ধমাত্র এই বলিতে চাই যে, তাহাদের সহিত মত ও ব্যবহারে যাহারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে, তাহাদের মতে ও কার্য্যে ভালো যতটুকু আছে তাহা স্বীকার করার অভ্যাস করিতে হইবে এবং যেখানে উভয়েরই মত এক, সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজের চেষ্টা করিতে হইবে।

জাতিকে সমৃদ্ধ ও বলশালী করিতে হইলে বাণিজ্য-শিল্পের প্রসার আবশ্যক। শিল্পবিভাগে চর্‌কাকে সর্ব্বরোগহর কল্পনা করা এবং সকল-প্রকার কলে চালিত যন্ত্রকে খারাপ চক্ষে দেখার প্রবল চেষ্টা এখনও বর্ত্তমান। আমরা বরাবরই এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে, লোককে স্বাধীনভাবে তাহাদের যন্ত্র (চর্‌কাও যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়) নির্ব্বাচনের ও কাজ করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। আমাদের এ মত ভ্রান্ত হইতে পারে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হস্ত চালিত চর্‌কা হস্ত-চালিত লাঙ্গলের ন্যায়ই কার্য্যকর হইতে পারে, পরন্তু অন্য ক্ষেত্রে এইরূপ না হইতেও পারে। শ্রম-লাঘব-কারী যন্ত্র দ্বারা সত্য-সত্যই যদি শ্রমের লাঘব হয়, যদি সত্যই তাহা শ্রমিকদিগকে অবকাশ দেয়, স্বাস্থ্যকর ও নীতিপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যদি তাহারা স্বাধীন-ভাবে কাজ করিতে পায় এবং যদি তাহারা লাভে ও পরি-চালনায় অংশীদার হয়, তাহা হইলে কল-চালিত যন্ত্রকে একেবারে লোপ করিয়া দিবার কোনোই কারণ দেখি না। তবে আদর্শবাদীরা দেশের দ্রব্য হিসাব-মত উৎপন্ন করিতে চাহিবেন,যাহাতে নানা উপায়ে অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত টক্কর দিয়া সে-সব দেশের ক্ষতি করা না হয়।

চিরকাল একাদিক্রমে অবাধ বাণিজ্য কিম্বা সংরক্ষণ-নীতি অনুসারে বাণিজ্য করিয়াছে, কোনো দেশের ইতিহাসেই একথা লেখে না; অবস্থা-অনুসারে এক বা অন্যটির সুবিধা লওয়া হয়। কোনো-কোনো দ্রব্যে হয়ত কোনো জাতি অবাধ বাণিজ্য-নীতির অনুসরণ করে, আবার কোনো-কোনো দ্রব্যে তাহারা সংরক্ষণ-নীতির সাহায্য লয়। আমরাও যেন অবাধ বা সংরক্ষিত (trotected) কোনো-ধরণের বাণিজ্যকেই একান্তভাবে গ্রহণ না করি। আমা-দের বুদ্ধি-বৃত্তির যথেষ্ট সদ্‌ব্যবহার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, কখন কি-কি ব্যবসায়ে আমাদিগকে কোন্ নীতি

অনুসরণ করিতে হইবে। দেশের মঙ্গল সাধনই যেন সর্ব্বদা আমাদের লক্ষ্য হয়। কিন্তু অন্য দেশের ক্ষতি করিয়া যেন কখনও স্বদেশের হিতসাধন করিতে না চাই। ব্যবসায়ের ও শিল্পের কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা অন্যায় ও গর্হিত উপায়ে নিগৃহীত হইয়াছি। সেই শিল্পের পুনর্জাগরণ করিতে হইলে আমাদের পীড়নকারীদের কিছু সম্পদ্ হস্তচ্যুত হইবে। তাহা করিতেই হইবে—অন্যের ক্ষতি না করা অর্থে আমরা অন্যায়ভাবে ভিন্ন দেশের বাজারে নানা ফন্দীতে আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্য চালাইয়া সেখানকার দেশবাসীর ক্ষতি করা বুঝাইতেছি। যে-দেশে যে-যে দ্রব্য উৎপাদিত বা প্রস্তুত হয় না, সেই-সেই দেশে আমাদের দেশের উৎপাদিত ও প্রস্তুত দ্রব্য ন্যায্যভাবে বিক্রয়ের চেষ্টায় অন্যায় নাই।

আমাদের জমিসংক্রান্ত আইনগুলি নির্ব্বাচনের সময়ও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিচালনা বিশেষ প্রয়োজন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা দশশালা বন্দোবস্ত ইত্যাদি কোনো-প্রকার বন্দোবস্তই যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চালাইবার চেষ্টা না করা হয়। যদি চাষার হাতে জমির অধিকার দিয়া, কিম্বা সকল জমিকে জাতীয় সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত করিয়া কৃষি-বিষয়ক লাভের উপর ট্যাক্স বসাইয়া দিয়া কোনোরূপে চাষাদের উপকার হয় আমাদের সেইসকল উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনে—সহর ও গ্রামের তুলনামূলক ও স্বাধীন মূল্য বিচার এবং তৎসঙ্গে গ্রামসকলের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া ঐসমস্ত সমস্যার মীমাংসা ও সমাধান করিতে হইবে। জাতীয় সকল সমস্যার নাম করা এখানে সম্ভবপর নহে। যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা দিয়াছি, তাহাতেই জাতি-গঠনে বিচার বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রকট হইবে। আমরা জানি যে কার্য্যকরী শক্তি না থাকিলে, প্রচুর বিচার-বুদ্ধি থাকিলেও আমরা জাতীয় জীবনে অগ্রসর হইতে পারিব না। সেই শক্তির কথা আমরা প্রকারান্তে বলিয়াছি—সেই শক্তি ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আত্মা দ্বারা উদ্বোধিত হইবে। বিচার-বুদ্ধি আমাদিগের বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিবে ও ভুল-ভ্রান্তি হইতে সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করিবে।

শ্রী :—

সত্য-যাত্রী

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সহজের লোভ হ'তে যেন আমি, নাথ,
নিজেরে বাঁচাতে পারি! চিত্তে দিনরাত
অশান্তির বহ্নিজ্বালা উদ্দীপ্ত অনলে
সুখস্বপ্ন দহি' যদি নিদারুণ জ্বলে
সে-ও স'বে; শুধু এই শক্তি দাও মোরে
দুর্গমের সুবিপুল আহ্বান যেন রে
নিবিড় অন্তরে পশি' সম্মুখের পথে
নিত্য মোরে টানি' লয়। জন্মিয়া জগ
বৃথা হাস্যে পরিহাসে আঙিনার কোণে
গম্ভীর আরামে ভুলি' যেন অন্যমনে
দিন নাহি চলি' যায় মায়ার লালসে
অভ্যাসের ঘূর্ণাপাকে মোহের রভসে।
দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভালোমন্দে সজাগ-পরাণে
যেতে যেন পারি একা সত্যের সন্ধানে

কষ্টিপাথর

অগ্নি

অগ্নিপূজা প্রায় সকল জাতির মধ্যে একটি সাধারণ ব্যাপার। ভারতবর্ষ হইতে পেরু পর্য্যন্ত সকল স্থানের সকল মানব-জাতি বেদীর উপর অগ্নি. প্রজ্বলিত করিয়াছে। সকল জাতির মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত, যাহাতে অগ্নি নিবিয়া না যায় সেইজন্য তাঁহারা অনবরত অগ্নিতে কাষ্ঠ যোগাইয়া আসিয়াছেন। সাগ্নিকদিগের রক্ষিত অগ্নিমধ্যে কোন অপবিত্র বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই। সকল জাতিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে—অগ্নি সর্ব্বোচ্চ শক্তির বরেণ্য আদর্শ। জ্যোতিরূপে অগ্নি সত্যের আদর্শ। বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই অগ্নি হইতে উৎপন্ন; অনু-পরমাণুসকল অগ্নিরই লীলা-সম্ভূত। অগ্নি বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

অ্যাসিরিয়া, কাল্‌ডিয়া, ফিনিশিয়া প্রভৃতি দেশবাসীরা প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল। পারস্যবাসীদের অগ্নির উপাসনা সুবিখ্যাত, ইহাদের বংশীয় বোম্বাইয়ের পার্সীরা আজও অগ্নির পূজা করিয়া থাকে।

এসিয়ায় অগ্নির পূজা বড় কম ছিল না। জাপানের য়েসো-প্রদেশবাসীদের অগ্নিই প্রধান দেবতা। এসিয়ার কক্‌ড়লেরা অন্যান্য দেবপূজার সহিত. অগ্নির পূজা করে। তুঙ্গুজ মোগল ও তুর্কীরা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে।

ইউরোপেও গ্রীক্‌দিগের মধ্যে ভল্‌কান (Vulcan), হেফাইস্‌টোস্ (Hephaistos,) হেস্‌টিয়া (Hestia) অগ্নি-দেবতা। প্রাচীন প্রুশীয় জাতি, রুশ ও লিথুয়ালিয়ান্ জাতি অগ্নির পূজা করিত। এখনও ইউরোপে অগ্নিপূজার ছিটেফোটা আছে।

ভারতবাসী ও ইরাণীদের ধর্ম্মে অগ্নি-উপাসনা একটি প্রধান ব্যাপার। অগ্নিদেব ভারতবাসীদের যেমন ছিল, ইরাণীদেরও তেমনই ছিল। কিন্তু উভয় জাতির অগ্নিদেবের নাম এক নয়। ইরাণীদের অগ্নিদেবের নাম 'অতর', ভারতবাসীদের এই দেবতার নাম 'অগ্নি'। স্লাভদিগের মধ্যেও অগ্নিদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাহাদের অগ্নির নামের সঙ্গে ভারতবাসীদের অগ্নিদেবের নামের পার্থক্য প্রায় নাই। আমাদের এই দেবতার নাম অগ্নি, স্লাভদিগের অগ্নিদেবের নাম Ogiin, প্রাচীন স্লাভ রূপ Ogni। স্লাভ, ভারতবাসী এবং ইরাণী ইহারা সকলেই আর্য্য। একসময়ে ইহারা সকলেই অগ্নিদেবের উপাসক ছিল এবং ইহাদের সকলের অগ্নিদেবের নামও ছিল 'অগ্নি'—সংস্কৃতে যেমন অগ্নি, লাতিন ভাষায় ইহার রূপ ignis, লিথুয়ানিয়ানে ugnis। অগ্নি, ignis, ugnis, ogni যে এক সাধারণ শব্দ হইতে জাত তাহা বেশ বোঝা যায়। আর্য্যদের পরস্পর ছাড়াছাড়ির পূর্ব্বে সকলেরই অগ্নিবোধক এক সাধারণ শব্দ ছিল। কিন্তু অগ্নিদেবের উপাসনা কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা এইভাবে স্থির করা বড়ই কঠিন। আমরা দেখিতে পাই, স্লাভদিগের অগ্নিদেববোধক একটি শব্দ আছে, এবং বেদের অগ্নির সঙ্গে সেই শব্দটির আবার বেশ সাদৃশ্য আছে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যেমন অগ্নি-উপাসক ছিলেন, স্লাভেরাও তেমনই অগ্নি-উপাসক ছিলেন। ইরাণীদের অগ্নিদেবের নাম এতটা পরিবর্ত্তিত হইল কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে বুঝিতে না পারিলেও উহাদের মধ্যেও যে অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহা তাহাদের অগ্নিদেবের নামের অস্তিত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভারতীয় আর্য্য ও ইরাণীদের মধ্যে প্রধান একটি দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবতার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈদিক "অপাম্ নপাতে" বেশ একটু পরিচয় পাওয়া যায়। স্পীগেল (Spiegel) বলেন, 'অপাম্ নপাৎ' অতি প্রাচীন ও বিশেষভাবে সম্পূজিত দেবতা। 'অপাম্ নপাৎ' শব্দটি অতি প্রাচীন। ইহার অর্থ 'জলজাত'। জলদ হইতে যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, 'অপাম্ নপাৎ' বলিতে সেই বিদ্যুতের দেবতা বোঝায়। ইনি দেব ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী। অবেস্তায় এই দেবতাকে একবার মাত্র অপর একজন আগুন দেবতার সঙ্গে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম ন ই রো স ঙ্ঘ (Nairosangha)—অর্থ দেবদূত। পরবর্ত্তী গ্রন্থে নইরোসঙ্ঘের আরাধনা খুব বেশী পাওয়া যায়। 'যস্ত' নামক গ্রন্থে (১৯.২২) ইহাকে মানবের নির্ম্মাতা ও রূপ-দেবতা বলা হইয়াছে। বেদের একটি শব্দ আছে—'নরাশংস'। ইহাও দেবদূত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইরাণীদের 'নইরোসঙ্ঘ' ও বৈদিক 'নরাশংস' অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

ইরাণী অগ্নিদেবকে 'অতর' বলে। অগ্নিদেবের এই নামটি বহু প্রাচীন, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যেরা অগ্নির এই নামটি ভুলিয়া গিয়াছে। তবে এই নামটি হইতে অথ্রবন্ বলিয়া যে-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বেদে তাহা 'অথর্ব্বন্'রূপে স্থান পাইয়াছে এবং তাহার অর্থ 'অগ্নি পুরোহিত'। ইরাণীরা কিন্তু 'অথ্‌বন' শব্দে পুরোহিতই বুঝিয়া থাকেন। অথর্ব্বন শব্দের 'অথরে'র সহিত 'অতরে'র সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। আমরা ভারতবাসী তাহাদের অগ্নিকে আমরা 'অতর' বলি না বটে, কিন্তু তাহাদের অগ্নির পুরোহিতকে 'অথর্ব্বন্' বলি। 'অতর' শব্দটির অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন ইহার অর্থ 'ভক্ষক'; কারণ অতর্ শব্দের মূলাংশ 'অদ্' ধাতু। এই 'অদ্' ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা। তদনুসারে 'অতর্' বলিতে 'ভক্ষক' বুঝিতে হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অগ্নিদেবের নামের সার্থকতা ইরাণী ভাষায় ঠিক বজায় থাকে।

অগ্নিকে আমরা সর্ব্বভুক্ বলিয়া থাকি। অগ্নিকে যাহাই অর্পণ করা যায়, অগ্নি তাহাই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সুতরাং অগ্নিকে ভক্ষক বলা অন্যায় নয়। প্রাচ্য আর্য্যদের সময়ে অগ্নিদেব অতর্ নামেই অভিহিত হইতেন, এইরূপও কেহ-কেহ অনুমান করিয়াছেন। এইরূপ অনুমানের কারণ এই যে, বেদে অগ্নিপুরোহিতকে অথর্ব্বন্ বলা হইয়াছে, আর অগ্নিপুরোহিতেরা স্বর্গ হইতে অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথাও বেদে উক্ত হইয়াছে।

ভারতবাসী ও ইরাণীরা স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব পদ্ধতি অনুসারে অগ্নি-উপাসনা করিত।

ভারতবাসীদের ন্যায় ইহাদের অগ্নিযাগ ও সোমযাগ প্রচলিত ছিল। ভারতবাসীদের সোমযাগ যাহা, ইরাণীদের মধ্যে 'হওম' (Haoma) যাগ প্রায় তাহাই। ভারতবাসী সোমরসকে দেবভোগ্য অমৃত বলিত। অমৃত দেবভোগ্য উপাদেয় দিব্য পেয়। ইরাণীদেরও দেবভোগ্য দিব্য পেয় ছিল, তাহার নাম 'অমেরেতাৎ' (Ameretat); অমৃতও অমেরেতাতের শব্দগত সাদৃশ্য যথেষ্ট আছে। ইরাণীদের এ-ছাড়া আর-একটি দেবভোগ্য পবিত্র বস্তু ছিল, তাহাকে তাহারা 'হউরবতাৎ (Hauravatat) বলিত। এই দুইটি শব্দকে সর্ব্বদা একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া

যায়, ইহারা বর্ত্তমান ও অনাগত, সম্পূর্ণ মুক্তিদ্যোতক। হওরবতাৎ খাদ্য—অমেরেতাৎ পেয়। শুধু খাদ্য ও পেয় নয়—ইহারা যমজ দেবতা; স্বর্গবাসীদের ইহারা পোষণ করে। ভারতীয় দেব—বিবস্বান, যম, ত্রিত, অপ্ত্য, সোম উপাসক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে বিবস্বৎ যিমের পিতা ত্রিত ও অথব্য (Athvya) প্রাচীনতম হওম-উপাসক। সোমরস পান করিলে মনের যে-অবস্থা হয় বেদে তাহাকে 'মদ' বলিত, অবেস্তায় তাহার নাম—"মধ"। সুতরাং সোমযাগ যে অতি প্রাচীন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

সোমযাগ ও অগ্নিযাগ

আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়া সোমযাগ করিতেন। সোমযাগ ভারতবর্ষে বিশেষ উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সোমযাগের আরম্ভ ভারতবর্ষে হয় নাই। এই যাগটি ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও আছে। একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়। গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে সোমলতা উৎপন্ন হইত। আজকাল যেমন শুষ্ক করিয়া চরস সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, পূর্ব্বকালে কিঞ্চিৎ আয়াস সহকারে ঐসকল অঞ্চল হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইত। কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্য্যগণ সোমলতা কিরূপ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; শেষে এমনকি সোমলতার পরিবর্ত্তে অন্য একপ্রকার লতা সোম নামে ব্যবহৃত হইত। সোমলতা যে পারস্য, গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের পার্ব্বত্য স্থানে জন্মিত, এখানে পাওয়া যাইত না, বেদমন্ত্রেই তাহা উল্লিখিত আছে। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান, প্রাচীনকালে পারস্যদেশে সোমযাগের প্রাচুর্ভাব হয়। সোমযাগ খাঁটি ভারতীয় যাগ নয়।

অতি প্রাচীনকালে সোমযাগের ন্যায় অগ্নিযাগেরও প্রাদুর্ভাব পারস্যদেশে ছিল। তবে ভারতের অগ্নিযাগে ও পারস্যের অগ্নিযাগে কিছু প্রভেদ আছে। পার্থক্য এই যে, ভারতীয় আর্য্যেরা নিবেদিত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু পারসিকেরা বলির পশু-শরীরের অংশবিশেষ অগ্নিকে দেখাইয়া অন্যদিকে ফেলিয়া দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, মাংস অগ্নিতে স্পর্শ করাইলে অগ্নি অপবিত্র হইবে।

অগ্নিসম্পর্কে আর্য্য ও দস্যু

নিরুক্তকারগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত বেদের প্রত্যেক ব্যাখ্যাতা আর্য্য বলিতে অগ্নি উপাসকগণকেই বুঝিয়াছেন। বেদের বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিরগ্নি বলা হইয়াছে। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল—দেবগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যস্থ অগ্নি; তিনি দেব ও মানবের দূত। অগ্নি দেবগণের মুখস্বরূপ, অর্থাৎ দেবগণ অগ্নির মুখেই আহার করেন। আর্য্যগণের ন্যায় দস্যুরাও যজ্ঞ করিত, যজ্ঞে পশুবধ করিত; কিন্তু তাহারা অগ্নির সাহায্যে দেবগণকে তুষ্ট করিত না। এই অপরাধে তাহারা আর্য্যগণের নিতান্ত অপ্রিয় ছিল। আর্য্যগণ অগ্নির উপাসনা করিত বলিয়া দস্যুরাও তাহাদের ঘৃণা করিত—তাহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিত। নিরুক্তেও ইহার সমর্থন আছে।

দ্রাবিড় ও মুণ্ডা অগ্নিপূজক নয়

বেদের ভাষা অগ্নি-সোম-উপাসকদিগের পবিত্র ভাষা। অগ্নিসোম-উপাসক আর্য্যগণ এদেশে আগমন করিবার পূর্ব্বে বৈদিক ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল না। তখন ভারতবর্ষে দুইটি বিভিন্ন-জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের একটি দ্রাবিড়, আর একটি মুণ্ডা। এই দ্বিবিধ ভাষাভাষী জাতি অগ্নি-উপাসক নহে। ইহাদের মধ্যে এখনও যাহারা আর্য্যরীতি অবলম্বন করে নাই, তাহাদের কোনো ক্রিয়কলাপের সহিত অদ্যাপি অগ্নির সম্পর্কমাত্রই নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যে জাতি ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ চান্দ্রমাসে বর্ষগণনা প্রবর্ত্তিত করে, সেই জাতি পূর্ব্বে ইউফ্রেটিস্ উপত্যকার অধিবাসী ছিল। ইহারা উত্তরাঞ্চলের অক্কডীয় উপাসক ছিল। ইহারা অক্কডীয় দেবের উপাসনা করিত, সেমাইটরা (Semites) সেই দেবকে 'অদর্' বলিত। এই অদর দেবই প্রথম অগ্নিদেব। ইউফ্রেটিসের উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে অক্কডরা বাস করিত। উত্তরাঞ্চলের অক্কডরা অগ্নিপূজক ছিল। ইহারা ভারতবর্ষে কশ্যপপুত্র বলিয়া পরিচিত হইত। প্রসিদ্ধি আছে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে কাবুলাঞ্চলে কশ্যপের রাজ্য ছিল।

অক্কডরা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে এখানে চন্দ্রোপাসকেরা বাস করিত। অক্কডরা দ্রাবিড়জাতির একটি শাখা। ইহাদিগকে সুমেরো-অক্কডও বলা হয়। এই অক্কড জাতি যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষালোচনার সূচনা করে।

আর্য্যদের আগমনের বহুপূর্ব্বে দ্রাবিড়েরা ভারতবর্ষে তাহাদের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দ্রাবিড়দিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভাব জড়াত্মক ছিল। আর্য্যেরা এদেশে আসিয়া তাঁহাদের জড়াত্মক ধর্ম্মভাবে আধ্যাত্মিকভাব সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

দ্রাবিড়জাতীয় লোকদের দুইটি দল ভারতবর্ষে ছিল। একদল পৃথ্বী-দেবী ও চন্দ্রের উপাসক ছিল। চন্দ্র তাহাদের নিকট দেবী বলিয়া পরিগণিত হইত। আর-একদল সর্পোপাসক ছিল। বহুকাল ধরিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের দ্রাবিড়জাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল। ইহারা একসময়ে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত শাসন করিত। ইহাদের পরে ভারতবর্ষে অগ্নি-উপাসকেরা অসিয়াছিল।

বেদে অগ্নি

অগ্নি ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা। ইনি অমর, মানুষের অতিথিরূপে মানুষের সঙ্গে বাস করিতেছেন। বেদে অগ্নিকে হোতা, ঋত্বিক্ ও পুরোহিত বলা হইয়াছে। দেবতা ও মনুষ্য দ্বারা ইনি যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অগ্নি জ্ঞানী, সকল-প্রকার যজ্ঞের বিষয় তিনি অবগত আছেন। ইনি কর্ম্মকুশল ও সকল যজ্ঞের রক্ষক। অগ্নি অত্যন্ত আশুগতি। ইনি দেবপুরোহিত। দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইঁহাকে দূতরূপে নিযুক্ত করেন। মনুষ্যেরা দেবগণের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে সেই মন্ত্রের বার্ত্তা ইনি দেবগণের নিকট নিবেদন করেন এবং মনুষ্যেরা দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আহুতি প্রদান করিলে, অগ্নি যজ্ঞহবি দেবগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। আকাশের সকল স্থানের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় আছে, সেইজন্য যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিবার পক্ষে ইনি বিশেষ উপযোগী। অগ্নি কখন-কখন আহূত দেবগণের সহিত একরথেই আরোহণ করিয়া আসেন, আবার কখন-কখন তাঁহাদের পূর্ব্বেই যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসেন।

অগ্নি বরুণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন, ইন্দ্রকে আকাশ হইতে এবং মরুৎগণকে বায়ুমণ্ডল হইতে আনয়ন করেন। অগ্নিব্যতীত দেবতাদের তৃপ্তি হয় না। অগ্নি না থাকিলে মনুষ্য ও দেবগণ যজ্ঞের আস্বাদ পাইতেন না।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ ১৩৩১)

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

বেনে-বৌ

মাথা-কালো আর গা-হলদে একরকম পাখী বাংলা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাখীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে যে জনপ্রবাদ আছে সেটা এই :—

এক গিন্নীর অনেকগুলি বৌ ছিল। গিন্নী ছোট বৌকে মোটে দেখিতে পারিত না। বাড়ীতে যখনি কোনো অতিথি-অভ্যাগত আসিত গিন্নী ছোট-বৌর বরাদ্দ ভাত তাহাদিগকে জোর করিয়া দেওয়াইত। তার পর আর ভাত রাঁধিত না। সুতরাং ছোটো-বৌকে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হইত। একদিন বাড়ীতে এক আত্মীয় আসিয়াছে; ছোটো-বৌ তাহার ভাতগুলি তাহাকে ধরিয়া দিল। তাহার জন্ত আর রান্নাও হইল না। তাহাকে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইল।

শাশুড়ীর অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া ছোটো বৌ একদিন সর্ব্বাঙ্গে হলুদ মাখিয়া এক ভুসোমাখা কালো হাঁড়ি মাথার উপর চাপাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, আর যাইতে-যাইতে বলিতে লাগিল—"কুটুম আয়, কুটুম আয়।" প্রবাদ—এই বৌ বেনে-বৌ পাখী হইয়াছে। বেনে-বৌ পাখীর রং হলদে আর মাথা কালো।

(কোয়ার্টার্লি জার্নাল্ অভ দি মিথিক্ সোসাইটি)

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

—

প্রাচীন ভারতে কাচের ব্যবহার

লোকের বিশ্বাস মুসলমানদের সময়ে ভারতবর্ষে বিদেশীদের দ্বারা কাচের আমদানি হয়। কিন্তু তক্ষশিলার খনন-কার্য্যে এ-বিশ্বাসের বৈপরীত্য প্রমাণিত হইয়াছে। পাটলিপুত্রে যে-সব খনন হইয়াছে তাহাতে অনেক কাচের জিনিষ-পত্র পাওয়া গিয়াছে; সেগুলির উপর যাহা লেখা আছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে প্রাচীন ভারতে কাচ উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইত। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়—অতি প্রাচীনকালে ভারতে কাচের ব্যবহার ছিল; এবং বুদ্ধের সময় হইতে পরবর্ত্তীকালে পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে কাচের উল্লেখ পুনঃপুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

শতপথব্রাহ্মণের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী। এই গ্রন্থে কাচের উল্লেখ আছে। বিনয়পিটক, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, কথা-সরিৎ সাগর এবং সুশ্রুতের মধ্যে কাচের উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক যে-সব খনন-কার্য্য হইয়াছে, তাহাতে অনেক জায়গায় কাচ পাওয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে মণিক্যাল স্তূপের মধ্যে কাচ রক্ষিত ছিল। এই স্তূপ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর। পঞ্জাবে হরপ্পায় পণ্ডিত দয়ারাম সহানী অনেক কাচের চুড়ি ও যন্ত্রপাতি পাইয়াছেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরসমূহে (তক্ষশিলায়) সার জন্ মার্শাল্ নীল রঙের কাচের টালি পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, তক্ষশিলায় আর যে-সব কাচের জিনিষ-পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর।

শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে মোহেঞ্জদড়োয় কাচের মালা ও অন্যান্ত জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, এগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ বৎসরের প্রাচীন। তিনি আরো বলেন, এ দ্রব্যগুলির সহিত আর্থার ইভান্স্ কর্ত্তৃক ক্রীট দ্বীপে খনিত ঐজাতীয় দ্রব্যের খুব নিকট সম্পর্ক আছে।

ভারতের বাহিরে কাচের প্রাচীন ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়,—মিশরে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ সালে। ঐ সময়েই তুতান্খামেনের অভ্যুদয়। তুতান্খামেনের কবরে অনেক কাচের মালা ও রঙীন কাচ পাওয়া গিয়াছে।

(জার্নাল অভ্ দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটি)

শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ

—

ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা

ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষার বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে-ভাষা ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা হইবে তাহার এই গুণগুলি থাকা চাই—

(১) ইহা সহজে লেখ্য হওয়া চাই।

(২) ইহা সহজে স্মরণযোগ্য হওয়া চাই।

(৩) ইহা বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া চাই।

(৪) মোটামুটি শিক্ষা ও জ্ঞানবুদ্ধি যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষে ইহা যেন সহজে বোধগম্য হয়।

(৫) ইহা এক ভারতের ভাষা বলিয়া আমাদের অতীতের সহিত ইহার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ থাকা চাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা একই ভাষা-জননীর সন্তান এবং সব ভাষাই কম-বেশী জননীর বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। সমস্ত ভারতকে একটি ভাষার সূত্রে গাঁথিবার এই যে চেষ্টা ইহা নূতন নহে। সম্রাট্ অশোক যখন সমস্ত ভারতের রাজা ছিলেন তখনই ভারতে একটি সার্ব্বজনীন ভাষা ছিল। ইহা ব্রাহ্মী বর্ণমালা। আইজাক্ টেলর্ এই বর্ণমালা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের প্রাচীন লিখনের নিদর্শন প্রস্তরলিপিসমূহ। এইসব প্রস্তরলিপি ভারতের ভাষা-বৈষম্য ঘটিবার পূর্ব্বে লেখা। এইসব নিদর্শনে যে-সব অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি সুগঠিত এবং সুন্দর ও এমন-কি বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যে পৃথিবীর সমস্ত অক্ষরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন।

এই অক্ষর পরিষ্কার, সাদা সিধা, সুন্দর, স্বসম্পূর্ণ, সহজে মনে রাখা যায়, পড়িতে সহজ ও ইহাতে ভুল হয় না এবং শব্দের ক্রমোন্নত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ইহা সঙ্গতিযুক্ত। আধুনিক ভাষা-তত্ত্ববিদরা যে-সব কৃত্রিম অক্ষরের ইঙ্গিত করিয়াছেন সেগুলির কোনোটিই ভারতের ঐ অক্ষর অপেক্ষা কোমলতায়, নৈপুণ্যে, ব্যাপকতায় উন্নত নয়।"

অতএব আমাদের নিজেদের মধ্যেই ২৫০০ বৎসর ধরিয়া এমন এক ভাষা বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা একটি স্বসম্পূর্ণ সার্ব্বজনীন ভাষা হইবার উপযোগী। আমাদের বিশেষ-বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে পারে এমন ভাষা আমাদের রহিয়াছে। ব্রাহ্মী ভাষার সন্তান আধুনিক নাগরী বা দেবনাগরী; ইহাই সার্ব্বজনীন ভাষা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

(ওয়েল্‌ফেয়ার) আই জে এস্ তারাপুরওয়ালা

—

ভারতের ও জাপানের চিত্রকলা

ভারতের চিত্রে ভূমিদৃশ্যের স্থান নাই। কেবল মোগল ও রাজপুত চিত্রকলায় ভূমিদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানেও অন্ত চিত্রের পশ্চাৎদৃশ্য হিসাবে। কারণ এই ভারতবর্ষের চিত্রকলা মানুষের জীবনের নানা অনুভূতিকে রূপ দিয়াছে, আর জাপানের চিত্র প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে রূপ দান করিয়াছে; আমাদের চিত্রকলায় মানুষ মুখ্য, প্রকৃতি গৌণ।

জাপানী চিত্রকলার প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণ। পুরুষ বা স্ত্রীলোকের শারীরিক সৌন্দর্য্য জাপানী চিত্রকরের অনুভূতি উদ্রিক্ত করে নাই। মানুষের শরীরের প্রতি জাপানী চিত্রকরের অনুরাগ নাই। এইজন্তই জাপানী চিত্রে অনাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তি দৈবাৎ দেখা যায়।

উকিয়োয়ী চিত্রকরদের সময় জাপানী কলা জন-শিল্প হইয়া উঠে। ভারতে এরূপ জন-শিল্পের বিস্তার হয় নাই। অজন্টা-শিল্প কখনও জন-শিল্প হয় নাই, কিন্তু রাজপুত শিল্প হইয়াছিল। মোগল চিত্রকলাকে জন-শিল্প বলা চলে না, কেননা তখনকার চিত্রকররা ছিল রাজসভার চিত্রকর। কেবল বাঙালী চিত্রকররা, যাহাদিগকে পোটো বলে, প্রকৃত জন-চিত্রকর ছিল। এই জাতীয় চিত্রকররা দিন-দিন লোপ পাইতেছে।

(কারেন্ট থট্) শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

—

সুলতান মাহমুদ

গজনীর সৈন্যদল ভারতবর্ষের মন্দিরসমূহের যে যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন করে সে-কথা গোপন করিতে যাওয়া কোন সত্যপরায়ণ ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য নয়; এবং নিজ ধর্ম্মের সবিশেষ সংবাদ রাখেন এমন কোনো মুসলমানেরই ঐসব ধ্বংস-কার্য্যের সমর্থন করা উচিত নয়। আজকালকার এবং পূর্ব্বেকার ঐতিহাসিকগণ এইসব ধ্বংস-কার্য্যকে ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং গর্ব্বের সহিত ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। সাংসারিক স্বার্থ সাধনের জন্ত লোকে যাহা করে তাহা সমর্থন করিবার জন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একটা সম্মতি খাড়া করা যে কত সহজ তাহা আমরা জানি। ইস্‌লাম ধর্ম্ম কখনই দস্যুতা ও লুটপাট-প্রবৃত্তির সমর্থন করে নাই। মাহমুদের এবং তাঁহার প্রজাদিগের যাহারা কোনোই ক্ষতি সাধন করে নাই, এরূপ নিরীহ হিন্দু রাজাদিগকে বিনা কারণে আক্রমণের সমর্থক কোনো নীতিই শারিয়াতে নাই। পূজা মন্দিরসমূহকে নির্লজ্জের মতন ধ্বংস করা সকল ধর্ম্মের নীতিতেই নিন্দার্হ। স্বার্থসাধনের জন্য যাহা করা হইল তাহারই সমর্থনের কাজে কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মকে নিযুক্ত করা হইল। এইরূপে কোরাণের ধর্ম্মোপদেশের বিকৃত অর্থ করা হইল, বা তাহা অগ্রাহ্য করা হইল; দ্বিতীয় কালিফের উদার মতবাদকে ঠেলিয়া রাখা হইল,—যাহাতে মাহমুদ ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ অসঙ্কুচিত বিবেকের সহিত হিন্দু মন্দিরসমূহের ধ্বংস সাধন করিতে পারে।

নূতন কোনো ধর্ম্ম যখন জন্মলাভ করে তখন সাধারণের নিকট তাহাকে উপস্থিত করিবার প্রণালীর উপরই তাহার উন্নতি নির্ভর করে। যদি সে-ধর্ম্ম আশার বাণী বহন করিয়া আনে তবে তাহা সানন্দে গৃহীত হইবে, আর যদি তাহা পাশবিক অত্যাচারের মুখোষ পরিয়া আসে তবে তাহা ঘৃণিত হইবে। জগৎ-শক্তি হিসাবে বিচার করিতে হইলে মহম্মদের জীবন দ্বারা ও দ্বিতীয় খালিফের নীতিবাদের দ্বারা ইস্‌লামের বিচার করিতে হইবে। যে-সব ধর্ম্ম লোকের মনের উপর আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছিল না এবং যে-সব সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম-কানুন নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে পিষিয়া ফেলিতেছিল, তাহাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়াতেই গোড়ায়-গোড়ায় ইস্‌লামের সাফল্য ঘটিয়াছিল। দেশের ঐরূপ অবস্থা থাকায় বিজিত জনসাধারণের মধ্যে ইস্‌লাম বাঞ্ছনীয় ধর্ম্মরূপে প্রসার লাভ করিয়াছিল। অভিজাত পৌরোহিত্য এবং দুর্নীতিপর রাজ-শাসনের অবসান ইস্‌লাম ঘটাইয়াছিল; অপর দিকে প্রাচ্য দেশে সাম্যের বাণী প্রথম প্রচার করিয়া ইস্‌লাম অবনত শ্রেণীসমূহের বুদ্ধিবৃত্তি মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; ফলে আরব, সিরিয়া, পারস্য ও ইরাকের সমস্ত অধিবাসী এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের চরিত্র দ্বারাই ধর্ম্মের বিচার হয়। ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের দোষ ও গুণ সেই ধর্ম্মের ফলরূপেই গণ্য হয়। ইস্‌লামের অনুবর্ত্তকরা যখন ক্ষমা ও ন্যায়ের পথ হইতে বিচ্যুত হইল তখন হিন্দুরা যে ইস্‌লামকে সত্য হইতে বিচ্যুত মনে করিল তাহা অস্বাভাবিক নয়। যাহা-কিছু প্রিয় তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে লোকে সন্তুষ্ট থাকে না, আর যে-ধর্ম্মের মুখোষ পরিয়া লুণ্ঠনকারী সৈন্যদলের অভিযান সে-ধর্ম্মকে প্রীতির চক্ষে লোকে দেখে না। একজন পারস্যের অধিবাসী তাঁহার দেশের উপর মোগল-আক্রমণের বর্ণনা করিয়াছেন—"মোগলরা আসিল—পুড়াইল—মারিল—লুট করিল—দখল করিল—চলিয়া গেল।" হিন্দুস্থানে মাহমুদ যাহা করেন তাহারও বর্ণনা ঐরূপ হইতে পারে। মহম্মদ আরবে এরূপ উপায়ে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, হিন্দুর মনে যে বিদ্বেষ জাগিল তাহাতেই নবজাত ইস্‌লামের অগ্রসর বাধাপ্রাপ্ত হইল। আল্‌-বেরুনি বলেন—"মাহমুদ দেশের (হিন্দুস্থানের) সমৃদ্ধি একেবারে নাশ করেন এবং লুণ্ঠনের দ্বারা হিন্দুদিগকে ধূলিমুষ্টির মতন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করেন। তাহাদের বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষসমূহ সমস্ত মুসলমানের প্রতিই ঘৃণা পোষণ করিতেছে। এই কারণেই আমাদের অধিকৃত স্থানসমূহ হইতে হিন্দু শাস্ত্রাদি সরিয়া আসিয়াছে, এবং কাশ্মীর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে, যেখানে আমাদের হস্ত এখনও প্রসারিত হইতে পারে নাই।......"

মাহমুদের অধিকার তাঁহার লুণ্ঠনের ১৫ বৎসর পরেই হিন্দুদের পুনর্জাগরণের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। হিন্দুদের নীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে তাহা টলাইতে পারে নাই; বরং মাহমুদের ধর্ম্মের প্রতি চিরন্তন ঘৃণাই জাগাইয়া দিয়াছিল। দুই শতাব্দী পরে মাহমুদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রকৃতির লোকে এদেশে আবার ইস্‌লামকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মঙ্গোলিয়াবাসীদের দ্বারা আজাম অধিকারের ফলে মুসলমানদের ঔদ্ধত্য লোপ পায়। পারস্যে নব জাগরণ ঘটে ও লুপ্ত হয় এবং দুই ধর্ম্মের সমন্বয়ের যে-আশা আল্‌বেরুনি বৃথাই পোষণ করিয়াছিলেন তাহা সম্ভব হইয়া উঠে। উদার বিশ্বহিতসাধক মতবাদ-সমন্বিত নূতন অতীন্দ্রিয়বাদের জাগরণে—যে-জাগরণ প্রাচীন কালের হিন্দু ঋষিদের প্রচারিত ধর্ম্মনীতি হইতে বিভিন্ন নয়। অর্থলোভী আক্রমণকারীর বদলে মধ্য এসিয়ার উত্তপ্ত স্থানসমূহ হইতে এমনসব লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যাহারা আর জন্মভূমিতে ফিরিতে অভিলাষী নয়, এবং এখানে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে চাহিল। সাপ আসিল, কিন্তু তাহার বিষ নাই। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ হইতেছে আজমীরের শেখ মৈনুদ্দিনের আগমনের সঙ্গে, এবং রাজনৈতিক ইতিহাস আরম্ভ হইতেছে আলাউদ্দিন খিলিজির কাল হইতে। আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস-গঠনে মাহমুদের কোনো সম্পর্ক নাই। ইস্‌লামের শত্রু হইতেছে তাহারই ক্ষিপ্ত অনুবর্ত্তকগণ।

(হিন্দুস্থান রিভিউ) এম্ হাবিব

—

জৈন ধর্ম্ম

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি। উভয় ধর্ম্মেই প্রত্যেক লোককে একটি স্বসম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে বলিতেছে। আত্মার পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফল-সম্বন্ধে যে প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস তাহারই উপর উভয় ধর্ম্ম নির্ব্বাণলাভের ভিত্তি

স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম জোর দিয়াছে নীতিশাস্ত্রের উপর, জৈন ধর্ম তত্ত্ববিদ্যার উপর। বৌদ্ধ ধর্ম বলে, আত্মার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; জৈন ধর্ম বলে, আত্মা অমর ও ইহা দেবত্ব লাভ করিতে পারে।

দুইটি ধর্মের ইতিহাস পরস্পর বিপরীত। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রায় লুপ্ত, এসিয়ার পূর্ব্বভাগে ইহার অসংখ্য অনুবর্ত্তক। জৈন ধর্ম কিন্তু কেবল ভারতেই বাঁচিয়া আছে। এক সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহা প্রবল ছিল, এবং এখনও অনুবর্ত্তকগণের চরিত্র ও সমৃদ্ধি হেতু ইহার প্রভাব আছে। ভারতে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টানদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা যত, জৈনদের মধ্যে তাহা অপেক্ষা কম। ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলায় জৈন ধর্ম তাহার প্রভাব রাখিয়াছে। আবু পাহাড়ের উপর অদ্ভুত ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্য-মণ্ডিত শ্বেতপ্রস্তরের উপর যে জৈন মন্দির তাহা ভারতের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য-নিদর্শন এবং কেবল তাজমহলের সঙ্গেই তাহার তুলনা চলে।

(মিউজিয়ম্ অভ্ ফাইন্ আর্ট্স্ বুলেটিন্)

—

স্বাধীন প্রেম—Free Love

পাশ্চাত্য দেশে এবং অতি অল্পপরিমাণে আমাদের দেশেও স্বাধীন প্রেমের (free love) একটা প্রচেষ্টা চলিতেছে। একনিষ্ঠ জীবনব্যাপী প্রেম ও অনুরাগকে মানুষ মানিতে চাহিতেছে না। মনে করিতেছে এই চিরন্তন প্রেমের অম্লান পুষ্পমাল্য একটা লৌহ-শৃঙ্খল মাত্র; এই নিগড় নাকি মানুষের প্রাণকে পঙ্গু করিতেছে,জীবনের বিকাশের পথে বিষম বাধা হইয়া দাঁড়াইতেছে; ক্ষণিকের ভ্রান্তিকে স্মৃতির শাসনের জোরে চিরস্থায়ী করিয়া সত্যতা ও যুক্তিকে কুসংস্কারে আবিল করিয়া তুলিতেছে; মানুষের ভবিষ্যৎকে বিজ্ঞানের সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে দিতেছে না। তাই মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিবার দুরাশায় মানুষ পুষ্প-মালাকে পদদলিত করিয়া পথে-বিপথে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে।

একথা যখন সহস্র মানুষের মনে জাগিয়াছে, এই বিকৃত ক্ষুধা যখন বহু-বহু নরনারীকে অনুক্ষণ পীড়া দিতেছে, তখন অবশ্যই ইহার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে; ইহা মানুষের খেয়াল মাত্র নয়। কি সে কারণ, কেনই বা তাহা মানুষকে এমন বিপথে ছুটায়, কেই বা সে মানুষ, ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন আছে।

দেখা যায় দুইদল মানুষ এই স্বাধীন প্রেমের প্রচেষ্টায় প্রাণ মাতাইয়া তুলিয়াছে। যাহাদের প্রতি ভাগ্যবিধাতা বিরূপ, যাহারা অন্তরে কি বাহিরে প্রেমের পারিজাতকুঞ্জের আশ্রয় পায় নাই, জীবনের কঠোর রুদ্র দাহন যাহাদের দিবানিশি তিল-তিল করিয়া ভস্ম করিতেছে, মরুভূমির দিগন্ত-বিস্তৃত বর্ণহীন বালুকারাশি যাহাদের চক্ষু জ্বালাইয়া দিতেছে, অনা-বৃত আকাশের তলায় শীত আতপ ঝড় ঝঞ্ঝা কুয়াসা ও বৃষ্টি যাহাদিগকে নিরুপায় নিরাশ্রয় গৃহহারা নিঃসঙ্গ ভিক্ষুকের মতন সহিয়া যাইতে হইতেছে, বাহিরে ইন্দ্রিয়লোকে যাহাদের কোনো মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধ-জ্যোতি শান্তি দেয় না, অন্তরে কল্পলোকে যাহাদের কোনো অপার্থিব অম্লান জ্যোৎস্না সকল জ্বালা জুড়াইয়া দেয় না, তাহারা, সেই দুর্ভাগ্য দুর্ব্বল নরনারীরাই দাবানল জ্বালাইয়া ঘর-বাহির আলো করিতে চায়, সহস্র শতদলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আনিয়া পুষ্পমালা রচনা করিতে চায়, যে অমৃত অমূল্য তাহাও মূল্য দিয়া হরণ করিয়া শুষ্ক পিপাসিত কণ্ঠ সরস করিয়া তুলিতে চায়। তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিলেই চলিবে না; ভাবিয়া দেখিতে হইবে কি উপায়ে তাহাদের শান্তি দেওয়া যায়, আশ্রয় দেওয়া যায়, তৃষ্ণা মিটাইয়া প্রাণ সরস করিয়া তোলা যায়।

আর-এক দল মানুষ আছে, যাহারা এমন গৃহহারা নয়, পথবাসী নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ নয়; অন্তর বাহির এমন অন্ধকার এমন শূন্যময় যাহাদের নয়। তাহাদের গৃহ আছে, আশ্রয় আছে, বহু সঙ্গীসাথী আছে, অন্তর বাহিরের ফাঁক নানা উপচারে ভরাট করা আছে। কিন্তু তবুও এই বিকৃত ক্ষুধা, এই পাগলকরা নেশা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে; আশ্রয় তাহারা ভাঙিয়া ফেলিতে চায়, সকল সাথীকে তাহারা দূরে ঠেলিয়া দিতে চায়, প্রদীপের আলো তাহারা নিভাইয়া দিতে চায়, পথেই তাহারা ছুটিয়া বাহির হইতে চায়—ধূলিরাশির ভিতর রত্ন খুঁজিয়া পাইবার আশায় মরুপথে পরশপাথর কুড়াইয়া পাইবার লোভে। কেন এমন করে? করে, গৃহ তাহাদের গৃহ নয় কারাগার বলিয়া, আশ্রয় তাহাদের আশ্রয় নয় প্রাচীর-ঘেরা শুষ্ক প্রয়োজনের গণ্ডী বলিয়া, সঙ্গীসাথী তাহাদের সঙ্গীসাথী নয় মূল্য দিয়া ক্রীত ভৃত্য অথবা অপরাধের সহযোগী বন্দী বলিয়া (একই কারার প্রাঙ্গণে দ্বার তাহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে)। অন্তর বাহিরের শূন্যতার ফাঁকে-ফাঁকে যে সহস্র উপচার আসিয়া জমিয়াছে, তাহা গান নয়, রং নয়, পুষ্প নয়, গন্ধ নয়, তাহা জমা-খরচের হিসাব, প্রয়োজনের বোঝা, দেনা-পাওনার দোকান। সেখানে প্রেম-মন্দাকিনীর গতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; ডোবার জল, পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে, তাই পীড়িত মানুষ নির্ঝরের স্বপ্ন দেখিয়া উদ্ধারের কথা ভুলিয়া পথ ছাড়িয়া বিপথে ছুটিতেছে। সেখানে চিরহরিৎ অমর তরুর অনন্ত বিকাশ অন্তে আসিয়া থামিয়াছে; তাই মানুষ আগাছা তুলিয়া উদ্যানে সাজাইতে চায়, ভুলিয়া যায়, আগাছার অরণ্যে কণ্টক মিলে, অসংখ্য পুষ্প মিলে কচিৎ।

সত্য প্রেম চিরন্তন অশেষ অম্লান। ইহার সীমা নাই, ইহার বিকাশ কখনও বাধা পায় না, গতি কোনোদিন রুদ্ধ হয় না। সংসার ইহার পথে বহু জঞ্জাল আনিয়া ফেলিয়া ইহাকে অসীম আকাশের কথা ভুলাইয়া গৃহ-প্রাচীরের সীমায় আনিয়া ফেলিতে চায় বটে; মহাসাগরমুখী ইহার গতির পথে পর্ব্বত আসিয়া হ্রদ সৃষ্টি করিতে চায় বটে। কিন্তু এইসকল বিঘ্নকেই প্রকৃত প্রেম অতিক্রম করিতে চায়, করিতে পারে। এই অতিক্রমের পথে প্রতি পাদে সে পরশপাথর খুঁজিয়া পায়, পথপার্শ্বে ঘাসের ফুল হইতে পারিজাত পর্য্যন্ত তাহার মন আলো করিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে। পথশেষের বৈকুণ্ঠ তাহার তুষারশুভ্র কিরীট লইয়া পথিকের প্রাণ হাসিতে সুন্দর করিয়া রাখে, তুচ্ছ দাবানল জ্বালিয়া বহু অভাগার স্বর্গ জ্বালাইয়া দিয়া অন্তর আলোকিত করিতে হয় না।

মানুষ যদি মনে রাখে, যদি মনে রাখিতে চেষ্টা করে যে, অন্তরে হোক বাহিরে হোক তাহার প্রাণের কোনো একটা প্রতিষ্ঠা আছে, জীবনের একটা বহির্মুখী কি অন্তর্মুখী অমৃত-স্রোত আছে; যদি সেই প্রতিষ্ঠার প্রতি সেই অমৃত-স্রোতের প্রতি তাহার নিষ্ঠা থাকে তবে প্রয়োজন হয় না এমন দীন ভিখারীর মতন দ্বারে-দ্বারে অঞ্জলি পাতিয়া ফিরিবার,এমন দস্যুর মত তস্করের মতন বণিকের মতন অমৃত লুণ্ঠন কি হরণ কি ক্রয় করিবার।

বাহিরের কোনো প্রতিষ্ঠাও যে পাইয়াছে সে যদি মনে রাখে যে গৃহ তাহার কারাগার নয়, সাথী তাহার ভৃত্য কি বন্দী নয়, লীলা তাহার প্রয়োজন মাত্র নয়,বিশ্ব তাহার ভাগীদার নয়,প্রেম তাহার একটা সীমাবদ্ধ হিসাবের খাতা নয়; যদি চিরদিন স্মরণ রাখে যে গৃহদ্বার আমার মুক্ত অবারিত, সাথী আমার পুষ্পবনের সহচর, লীলা আমার প্রয়োজনাতীত, বিশ্ব আমার বন্ধু, প্রেম আমার চিরমন্দাকিনী, তবে গৃহ-প্রাচীর ভাঙিয়া তাহাকে পথে ছুটিতে হয় না।

প্রেমকে যে পায় নাই, যে অনুভব করে নাই আর প্রেমকে যে নিঃশেষ করিয়াছে, হিসাবের খাতায় লিখিয়াছে, বিপদ্ সেই দুই অভাগার, বিশ্বকে পঙ্কিল করে তাহারাই।

(শনিবারের চিঠি, ২৬ পৌষ ১৩৩১) শ্রী মঙ্গলচন্দ্র শর্ম্মা

—

স্বাস্থ্যরক্ষার ক খ গ

কখনও হাত-পা না ধুয়ে খেতে বোসো না। সদাচার রোগের বিষম শত্রু।

খাবার সময় যত কম পারো জল খাবে; খাদ্য যেন টাট্‌কা সারবান্‌ ও লঘু হয়।

গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেল্‌লে পরমায়ু বাড়ে; শোবার আগে অন্তত পাঁচ মিনিট কাল মুক্ত বায়ুতে এইভাবে ব্যায়াম করবে।

ঘরের দরজা জানালা সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখ্‌বে। দিন-রাত্রের বাতাস উপকারী।

চায়ের মতন অপকারী পানীয় আর নাই। চা আর মদের মধ্যে অতি অল্প প্রভেদই আছে।

ছয়টি রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এদের যত দমনে রাখবে তত সুখী ও স্বাস্থ্যবান্‌ হবে।

জননীর স্বাস্থ্য না থাক্‌লে শিশু পরিপুষ্ট হয় না, শিক্ষিত না হ'লে শিশুর জীবন স্বাভাবিকভাবে সহজে গড়ে' উঠে না।

ঝগড়া-ঝাঁটিতে যেমন মনের অস্বচ্ছন্দতা জন্মে, তেম্‌নি দেহের অসুস্থতা বাড়ে। ক্রোধান্বিত মাতার স্তন্যপান করে' শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে—এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

টক জিনিসের মধ্যে দই ও পুরাতন তেঁতুলের অম্বল সবচেয়ে ভালো। প্রত্যহ আহারের সঙ্গে যোগ থাকলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়।

ঠাকুর-দেবতাকে যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা হয় তা'তে আধ্যাত্মিক উন্নতির যেমন সম্ভাবনা আছে, শারীরিক সৌষ্ঠববৃদ্ধির তেম্‌নি খুবই কারণ আছে।

ডাক্তার-বৈদ্যকে যত এড়াতে পারো ততই ভালো; নিজের দোষে ও পিতৃপুরুষের দোষে রোগ দেখা দেয়, ঔষধে রোগ চাপা দেয়—স্বভাবে রোগ আরাম করে।

দাঁতের কদর

যে দাঁতের কদর জানে না, সে শরীরেরও কদর জানে না। দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা করো।

মুখ শরীর-প্রাসাদের সিংহ-দ্বার; দাঁতগুলি সেখানকার জীবন্ত জাগ্রত প্রহরী। দেউড়ী অরক্ষিত থাক্‌লে কি দেহ নিরাপদ থাকে?

মুখের বহির্ভাগ পরিষ্কার রাখতে সবাই যত্ন করে, ভিতরটা পরিষ্কার করতে তা'র চেয়ে যে বেশী যত্ন চাই। অপরিষ্কৃত মুখ বহুতর রোগ উৎপাদন করে।

ঘন-ঘন পান-দোক্তা খাওয়ায় দাঁতের যেমন ক্ষতি করে, শরীরের তেম্‌নি ক্ষতি করে। মধ্যাহ্নে খাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য একটি মাত্র পান চিবিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলো। রাত্রে মোটে পান খাবে না। নিরামিষা-শীর দাঁতের ব্যায়াম কম হয়।

দাঁতের ফাঁকে ময়লা জম্‌তে দিও না; সদাসর্ব্বদা যা-তা জিনিষ দিয়ে দাঁত খুঁটো না—বড় বদ অভ্যাস। দাঁত বেশী ফাঁক্ হ'লে খড়কে খেতে পার। সামান্য আহারের পরও ভালো করে' কুল্লি করতে ভুলো না।

দাঁতের মধ্যস্থল কতকটা ফাঁপা ও ছোট-ছোট শিরা-ধমনী-নাড়ী-বহুল নরম মাংসময়, চারিদিকে ডিমের খোলার মত একটা পাতলা শক্ত চকচকে জিনিষ দিয়ে মোড়া; খাদ্যকণা জমে' ও পচে' এই খোলায় একটি আল্‌পিনের আগার মতন ছোট গর্ত্ত হ'লেই দাঁতের দফা রফা।

সকালে উঠে'ই শয্যাত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর ছেলে-বুড়ো সবারই দাঁত মাজা ও জিভ ছোলা উচিত। ছেলেদের তিন বছর বয়স থেকে দাঁত মাজা শিক্ষা দেবে; দুধে দাঁত খারাপ হ'লে আসল দাঁতও খারাপ হয়। রোজ কিছু-না-কিছু শক্ত জিনিষ চর্ব্বণ করবে।

রাত্রে শোবার পূর্ব্বে দুই-একটি অম্লমধুর ফল ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা বা ঈষদুষ্ণ জল খাবে, ও লবণের মিহি গুঁড়া দিয়ে দাঁত মেজে শয়ন করবে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, আশ্বিন ১৩৩১)

বৃদ্ধাধাত্রীর রোজনামচা—শ্রী সুন্দরীমোহন দাস প্রণীত এবং শ্রী জ্ঞানাঞ্জন পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সুন্দরী-বাবু একজন প্রবীণ ও সুযোগ্য চিকিৎসক। ধাত্রীবিদ্যায় তিনি বিশেষজ্ঞ। প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও কুমারতন্ত্রে তাঁহার নিপুণতা কলিকাতার সর্ব্বজনবিদিত। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ধাত্রীশিক্ষা ও শিশুপালন-সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া জনসাধারণের যথেষ্ট উপকার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে তিনি গল্পচ্ছলে ম্যালেরিয়া, সন্তান-সম্ভাবিতা প্রসূতির রোগ বিশেষ এবং কতিপয় কুৎসিৎ ব্যাধির উৎপত্তি, ভয়াবহ পরিণাম ও প্রতিকার-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উহাদিগের প্রতিষেধ এবং প্রসূতি-পরিচর্য্যা-সম্বন্ধে সহজ ও সরস ভাষায় সরলভাবে নানা সদুপদেশ দিয়াছেন। সুচতুর গ্রন্থকার এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন। রোগ-প্রতিকার-ব্যবস্থার সহিত রোগ-প্রতিষেধ উপলক্ষে তিনি বহু নৈতিক উপদেশ গ্রন্থ-মধ্যেও সন্নিবেশিত করিয়া প্রকৃত সমাজহিতৈষীর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক পাঠে বাংলার অনেকানেক স্থানের চিত্তরঞ্জক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও লৌকিক কাহিনী অবগত হওয়া যায় এবং তাঁহার লেখায় স্বদেশপ্রেম, পল্লীপ্রাণতা, ভাবুকতা ও কবিত্বের পরিচয়ের অভাব নাই।

গ্রন্থকার কতিপয় কুৎসিত রোগ-সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, আমাদিগের মতে তাহা স্থানে-স্থানে অত খোলাখুলিভাবে না লিখিয়া একটু চাপা ইঙ্গিতে জানাইলেই সঙ্গত হইত।

স্বাস্থ্য-রক্ষা, রোগপ্রতিকার ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা বিষয়ে গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়া পুস্তক বাংলা ভাষায় অধিক নাই। বলা বাহুল্য যে এরূপ গল্পের মধ্য দিয়া উপদেশ প্রদান অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক পাঠ অপেক্ষা বেশী কাজ করে; ইহার দ্বারা লোকের মনে শিক্ষিতব্য বিষয়ে সহজেই একটা গভীর সংস্কার জন্মিয়া যায়।

আমাদের ধারণা যে গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে এবং এই পুস্তকের বহুল প্রচারে রোগমূলক ও ব্যভিচারঘটিত সামাজিক অমঙ্গল কতক পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

শ্রী চুনীলাল বসু

বেদান্ত-গ্রন্থ—রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত মুখবন্ধ সমেত। প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রী গুরুপ্রসাদ মিত্র ৬৮ বেচারাম দেউরী, ঢাকা। পৃঃ ১৮৭; মূল্য ১।০।

রামমোহনের এই গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থের মুখবন্ধ মূল্যবান্।

সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থের প্রত্যেক পাদের শেষে ঐ পাদের মর্ম্ম সংযোজন করিয়াছেন। ইহাতে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। রামমোহনই সর্ব্বপ্রথমে বেদান্ত-গ্রন্থকে বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদন-মুদ্রিত করেন। তাঁহার সময়ে বেদান্ত-সংক্রান্ত কোনো পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। এইপ্রকার অসুবিধার মধ্যে তাঁহাকে বেদান্ত-গ্রন্থ সম্পাদন ও অনুবাদ করিতে হইয়াছিল। এগ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ১৭৩৭ শকে; এখন ১৮৪৫ শক। এই পুস্তককে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিতে হইলে অনেক টীকা-টিপ্পনি ও মন্তব্য সহ সম্পাদন করা আবশ্যক ফ্রেজার সাহেব বার্কলী গ্রন্থ-সমূহকে যেভাবে সম্পাদন করিয়াছেন সেই ভাবে রামমোহনের গ্রন্থ সম্পাদন করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

সাধন-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিত। পৃঃ ১২৮, মূল্য ।০।

গ্রন্থকার ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রবীণ জ্ঞানপিপাসু ভক্ত সাধক তিনি ধর্ম্মশিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় এই:—

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, সাধ্য কি, লভনীয় কি, সাধনের প্রয়োজনীয়তা, সাধন প্রতিনিয়ত—সাময়িক নহে, সাধনের প্রকৃতি, সাধন কি, উপাস্যের স্বরূপ, সাধনের অধিকারী, ব্রহ্মোপাসনা—সজন ও নির্জ্জন উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতাসাধনের বাহ্য উপকরণ, ব্রহ্মোপাসনা।

এ সাধন কেবল ব্রাহ্ম সমাজের জন্য নহে; হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের জন্যও এ প্রণালী অত্যন্ত উপযোগী।

প্রণবাদির অধিকারী—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এক-আর-জি-এস্, এণ্ড সন্স্, ৮২ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৫৯; মূল্য ।০।

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে "শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত সংসিদ্ধান্ত এই যে বর্ণাশ্রম-লিঙ্গ-নির্ব্বিশেষে মুমুক্ষু-মাত্রেই সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রীর অধিকারী।"

ভক্তিকথা—রাণী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী। প্রকাশক শ্রীমধুসূদন দাস, কণিকা রাজবাটী, কটক। পৃঃ৩৭৭; মূল্য ১।০।

বাবাজী শ্রীপদ্মচরণ দাস মহাশয় শ্রীচৈতন্যের জীবন হইতে বিবিধ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া উৎকল ভাষায় 'ভক্তিকথা' নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া সেই গ্রন্থই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

ভগবৎ-প্রসঙ্গ—শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থল ১৫২ হরিশ মুখুয্যে রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। পৃঃ ২২৭; মূল্য ১।০।

আলোচ্য বিষয়—ব্রহ্ম ও জগৎ, বেদান্তে সৃষ্টিতত্ত্ব, অদ্বৈতবাদ, বাঙ্গালা ভাষায় মঙ্গল-কাব্য, শক্তি-কাব্য, ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ, সন্ধ্যার দুইটি মন্ত্র, গায়ত্রীর তাৎপর্য্য, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতারবাদ, 'অনন্তং ব্রহ্ম', গীতায় জ্ঞান ও ভক্তি, গীতায় কর্ম্মযোগ, গীতায় অদ্বৈত-বাদ, গীতা পুরুষোত্তমতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ, জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায় এবং হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব।

এইসমুদায় প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, উদ্বোধন, সাহিত্য, নারায়ণ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন—'কোনো কোনো প্রবন্ধে দার্শনিক তত্ত্বগুলি অদ্বৈতবাদ-অনুসারে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু সকল প্রবন্ধে অদ্বৈতবাদের প্রচলিত মত অনুসরণ করা হয় নাই। কোথাও

কোথাও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত, কোথাও বা বেদান্ত-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রচলিত মত হইতে ভিন্ন নূতন মতও প্রচার করা হইয়াছে।”

কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, প্রবাসীর সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথের মতামত সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদিগের মতামত খণ্ডন করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

গ্রন্থকার প্রাচীন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিজ মন্তব্য করিয়াছেন। সমুদায় বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। লেখক চিন্তাশীল; গ্রন্থের ভাষা সংযত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

হিমালয়ে ঋষি-সঙ্ঘ ও শুদ্ধধর্ম্মমণ্ডল (২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও ৫নং নূর মহম্মদ লেনস্থিত এল্‌বিয়ন্‌ প্রেস হইতে বেঙ্গল পাবলিশিং হোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্‌ ক্রাউন ১৬ পেজি ২১১ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। প্রথম খণ্ড অবতরণিকা—মূল্য চারি আনা মাত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উক্ত পুস্তকের ১ম খণ্ড বা অবতরণিকা ভাগের সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ২য় খণ্ড—শুদ্ধ ধর্ম্ম ও শুদ্ধ যোগ, ব্রহ্মবিদ্যা ভাগ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠান্তে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেছি। এই খণ্ড প্রধানতঃ "অনুষ্ঠান-চন্দ্রিকা" বা "সনাতন ধর্ম্ম-দীপিকা" নামধেয় সংস্কৃত গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদ। প্রকাশ যে হিমালয়-বাসী সিদ্ধবর্গের গুহ্য গ্রন্থাগার হইতে এই অনুষ্ঠানবিধিগুলি শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক 'দাস' শ্রেণীর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের এবং প্রধানতঃ উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তমান মানব-জগতের উন্নতিসাধনকল্পে প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, বর্ত্তমানে ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল ও ব্রাহ্মণ সভা-সমিতি কতিপয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেও, ইহা বর্ণ, আশ্রম, জাতি বা ধর্ম্মের পার্থক্যকে বিশিষ্টতা না দিয়া সর্ব্বসাধারণের উপযোগী চিরন্তন ধর্ম্মকেই ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতেছে। ইহাতে প্রকাশ যে, প্রভেদ নয় পরন্তু অভেদের দিক্‌ই বর্ত্তমান কলিযুগের উপযোগী ধর্ম্ম—কারণ এই যুগ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগত্রয়ের সমন্বয়সাধক বই আর কিছুই নহে। কৃত (সত্য), ত্রেতা ও দ্বাপর নামক পূর্ব্ববর্ত্তী যুগত্রয়ে জ্ঞান (বিষ্ণু—সত্ত্বগুণ), ভক্তি (শিব—তমোগুণ) ও কর্ম্মের (ব্রহ্মা—রজোগুণ) প্রাধান্য ঘটিয়া আসিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে সমাহার বা সমন্বয় ব্যতীত মানব ধর্ম্মের আর দ্বিতীয় কোনো বিভাবনাকে একান্তভাবে গতিশীল করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে ফলবতী হইবে না। ইহাই এক্ষণে ঋষি-সঙ্ঘ ও তাঁহাদের অদ্বিতীয় দীক্ষাগুরু পরমর্ষি নারায়ণের অভিমত। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের বাণীও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনূদিত শ্লোকগুলির ইংরাজী ব্যাখ্যাও বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। স্থানাভাবে আমরা গ্রন্থখানির ভিতরকার অজস্র উপ-ভোগ্য জিনিষের যথাযথ পরিচয় দিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমরা আশা করি যে বর্ত্তমানের এই নাস্তিকতা, সম্প্রদায়-বিদ্বেষ ও ঐহিক সুখ-প্রবণতার দিনে যথার্থ হিন্দুত্বের উপর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ-খানির সমাদর করিবেন। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ যখন মণ্ডলের কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে, তখন সকলেরই এই সদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ঋষি-প্রদত্ত রাজযোগ ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থকার তাঁহার ৩য় খণ্ডে "রাজযোগ-প্রদীপ" নামে বাহির করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা গ্রন্থকারের সদুদ্দেশ্যের প্রশংসা করি।

মিত্র

আমার ভারত উদ্ধার—৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। দাম চার আনা। ১৩৩১।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চিন্তার সহিত পরিচয় নাই এমন শিক্ষিত বাঙালী আজ বিরল। যাঁহাদের চিন্তা ও সাধনার ফলে বাংলাদেশে স্বদেশী যুগের উদ্ভব হইয়াছিল উপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। মাত্র বক্তৃতার জোরে দেশ উদ্ধার করা তাঁহার ব্রত ছিল না। দেশের অধীনতা ও দুর্দ্দশার ছবি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্তে আগুনের মত জ্বলিতেছিল, এবং সেই দহন নিবারণ করিবার আশায় মাত্র ১৫।১৬ বৎসর বয়সে উপাধ্যায় প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় সুদূর গোয়ালিয়রে সৈনিক হইবার ও যুদ্ধ-কৌশল শিখিয়া দেশের দাসত্ব দূর করিবার জন্য ছুটিয়াছিলেন। আর-একবার গিয়াছিলেন আঠার বৎসর বয়সে। এই গোয়ালিয়র-যাত্রা ও সেখানে অবস্থানের কাহিনী বইটিতে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। পড়িতে উপন্যাসের মত কৌতূহল জাগায়। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় কাহিনীটি অসম্পূর্ণ। তবুও আমরা ইহা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রকেই পাঠ করিয়া তাঁহাদের দেশহিতৈষণাকে পরিপুষ্ট করিতে অনুরোধ করি। ছাপা ও বাঁধাই ভালো হইয়াছে।

নীল পাখী—শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রী আশুতোষ ঘোষ, ১৬ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা। ১৩৩১।

বেল্‌জিয়মের বিখ্যাত লেখক ম্যারিস্‌ মেটার্‌লিঙ্কের "ব্লু বার্ড" বই-খানির ছেলেদের উপযোগী অনুবাদ। সেই বইটি এত প্রসিদ্ধ যে তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে; ছেলেমেয়েদের হাতে সম্পূর্ণ শোভা পাইবে। ছাপা ও বাঁধাই বেশ নূতন-ধরণের হইয়াছে।

শতবর্ষের বাংলা—(প্রথম খণ্ড)—শ্রী মতিলাল রায়। প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। দাম বারো আনা। ১৩৩১।

রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি যে-সব মনীষী কর্ম্মী বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিন্তা ও কর্ম্মের দ্বারা দেশ-জননীর দুরবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন-কথা বেশ চিন্তাশীলতার সহিত বইটিতে আলোচিত হইয়াছে। এ আলোচনা প্রবর্ত্তকে যখন বাহির হয় তখন আমরা আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকারের চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্র-ব্যাখ্যান-কৌশল সুন্দর। বইখানি আধুনিক সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। বড়-বড় লোকদের কয়েকখানি ছবি দিয়াও বইটির মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। একটি কথা কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি। বাংলা দেশের গত শতবর্ষের দেশনায়কদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা নাই কেন? নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও দেশের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রের দৃপ্ত প্রতিবাদ-পূর্ণ লেখনীর প্রভাব কি আমরা এখনই ভুলিয়া যাইব? পুরাতন হিন্দু পেট্রিয়টের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার চিন্তা-সারকে অনেক অত্যাচারকেই বিদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলার শতবর্ষের দেশনায়কদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের স্থান অবিসম্বাদিত। তাঁহাকে বাদ দিয়া শত বর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। এই একটি মাত্র ত্রুটি ছাড়া বইটিতে আমরা আর কোনো ত্রুটি দেখিতে পাই নাই। ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভালো হইয়াছে। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আমরা আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

কবির স্বপ্ন—শ্রী রাধাচরণ দাস। পাবনা রজনীকান্ত পুস্তকা-গার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম চার আনা। ১৩২৯।

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। যে 'খেয়া' কাব্য রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার-যুগ-বিভাগ সাধন করিয়া তাহাকে বিভিন্ন স্তরে উন্নীত করিয়াছে, সে খেয়া কাব্যের আলোচনা এত সংক্ষেপে হইতে পারে না। আলোচনায় অন্তর্দৃষ্টি মোটে নাই, কয়েকটি ছত্রের গদ্য করা হইয়াছে মাত্র। এত বড় কাব্যকে এরূপ-ভাবে আলোচনা করিতে যাওয়া সঙ্গত হয় নাই।

মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী—শ্রী অনাথনাথ বসু। প্রকাশক বিচিত্রা প্রেস, ৪৯এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা। ১৩২৯।

মহাত্মা গান্ধী আফ্রিকার জেলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, Jail Experiences নাম দিয়া তাহাই বই করিয়াছেন। আলোচ্য বইটি তাহারই অনুবাদ। শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্তও ইহার একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। দুইটি অনুবাদই প্রায় এক সময়ে বাহির হয়। আলোচ্য বইটির অনুবাদ মন্দ নয়।

গুপ্ত

বোলশেভিকবাদ (সচিত্র)—শ্রী শৈলেশনাথ বিশী প্রণীত ও বুক কোম্পানী কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। পৃঃ ১০৫। ১৩৩১।

চিন্তাশীল লেখক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের "থিওরী এণ্ড প্র্যাক্‌টিস্ অব বল্‌শেভিজম্" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। রাসেল্ বলশেভিক্ রুশিয়ার যথাযথ বিবরণ এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শৈলেশ-বাবু উহার বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়া বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন।

প্র

হারামণি

সংগ্রাহক—শ্রী প্রদ্যোতকুমার সেন ও
শ্রী অনাথনাথ বসু

(রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে শুনিয়া লেখা—কেন্দুবিল্ব, বীরভূম।)

আমায় যেতে হ'ল দেশ ছেড়ে কাম মশার কামড়ে
মশা উড়ে গিয়ে ঘুরে' এসে কানের গোড়ায় ডাক ছাড়ে।
মানব দেহ সুখের বিছানা।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দের ঘুম ছাড়ে না মশার যাতনায়
হ'ল বেহ সারী অনুরাগী রে
রাগের মুশারি রইল ছিঁড়ে
কাম-মশার কামড়ে।
আমার ঘরে ভাঙা দরজা,—
মশা পেয়েছে মজা
মশা ঝাঁকে-ঝাঁকে আস্‌ছে-যাচ্ছে,
আমায় খাচ্ছে ছিঁড়ে
গোঁসাই আমার করছে আনন্দ—
সেথা নাই কাম-মশার গন্ধ;
সে দিবা নিশি কৃষ্ণপ্রেম-ধূপ-ধুনার গন্ধ
হ'ল অনন্ত তোর কপাল মন্দ রে
তুই বইসে রইলি বাঁশ-ঝাড়ে।*

[* শেষ লাইনের মানে জিজ্ঞেস করায় বাউলটি বল্‌লে—"বাঁশ-ঝাড়ে বসে' থেকে কি নদীর খবর দেওয়া যায়?"]

ব্রজের ভাব কি বুঝিতে পারে সব জনে?
গুরুদেব যারে জানায় সেই জানে।
সাগর বেয়ে নৌকা যায়—
জল চেনে তার মাঝি ভাই।
সারাদিন কলেতে ফিরায়
আবার কলের ভিতর নল পরায়ে তা'রা চালাচ্ছে জল উজানে।
সন্ধানেতে বস্তু রয়,
উল্টো প্যাঁচে খুল্‌তে হয়;
ভাই রে তা জীবের সাধ্য নাই।
আবার পঞ্চভাবের ভাবী যে জন
কেবল রাস্তা দেখায় তিন জনে।*

[* গুরু, বৈষ্ণব, কৃষ্ণ]

ওরে অনুমানে ভাবলে মানুষ ধরা যাবে না।*
যদি বর্ত্তমানে ধর্‌তে পারো নইলে পার্‌বে না।
সেই মানুষে কর্‌ছে খেলা,
অরে সেই মানুষে কর্‌ছ লীলা,
যদি মানুষ দেখে কর্‌ছ হেলা তবে কিছুই হবে না।
আমি শুনি সাধুজনার কাছে
এই মানুষে সেই মানুষ আছে;
তুমি যুক্তি নাওগে গুরুর কাছে, নইলে পাবে না।
সেই মানুষরূপে নন্দের ঘরে
আর মানুষ-রূপে বলীর দ্বারে
সেই মানুষ আছে সবাধারে;—
(পাগল মন) চিন্‌তে পারো না।+
দাস রঘুনাথের এই বাসনা
সেই মানুষ করি উপাসনা—
আবার গোঁসাই সুচাঁদের এই চরণ বিনা
আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না।

[* বাউলটি বল্‌লে—"মানুষ গুরুরূপে শিক্ষা দীক্ষা জগৎকে দিচ্ছেন, তিনি গর্ভমাঝারে রক্ষা কর্‌ছেন, এখানে এসে একজন কর্ণধার গুরু শিক্ষা দিচ্ছেন।"

+ "এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি; তিনি যা কর্‌ছেন তারা ব্যতীত কর্‌বার জো নেই।"]

প্রেমের কাহিনী

শ্রী সুরেশচন্দ্র নন্দী

তখনো সন্ধ্যা হয় নাই; রক্তিম রবির শেষ রশ্মি তরুশীর্ষ ও সমুদ্র-তরঙ্গকে আবীর-রঞ্জিত করিয়া গড়াইয়া-গড়াইয়া পূর্ব্বদিকে ধীরে-ধীরে মিশিয়া যাইতেছিল। সমুদ্র তীরবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় প্রকৃতি-শিশুরা দিবসের শেষগান করিতেছে! গোধূলির এই ম্লান প্রকৃতির কোলে বসিয়া আমরা কয়েক জন বন্ধুতে চাপান করিতে-করিতে প্রেমের গল্প—সেই পুরাতন মামুলী প্রেমের গল্প করিতেছিলাম। চা-রস-বিভোর কোনো বন্ধু প্রণয়িনীর অধরসুধা পানের মতন চিত্রবিচিত্রিত রজত-পিয়ালায় অধর স্পর্শ করিয়া চাপান করিতে-করিতে চা-রসসিক্ত সরসকণ্ঠে প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী আইভি ভিলার উপকক্ষে বসিয়া আমরা গল্প করিতেছিলাম; সেই কক্ষের জানালা দিয়া সমুদ্র-তরঙ্গলীলা দেখা যাইতেছিল। সমুদ্র-শীকর-সম্পৃক্ত মৃদু-মধুর বাতাস আমাদের ললাটের ঘর্ম্ম মুছাইতেছিল। দূরে—অতিদূরে—দক্ষিণ দিকে অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ আকাশগাত্রস্পর্শী পর্ব্বতচূড়া সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ম্লান গোধূলির সহিত মানব-হৃদয়ের কি সম্বন্ধ আছে জানি না, তবে দিনের আলো যত ম্লান হইয়া আসিতেছিল, আমাদের মনোমধ্যেও কি জানি কি-এক বিষণ্ণ উদাস ভাবের উদয় হইতে লাগিল। আমাদের চা-রসসিক্ত সরস কণ্ঠস্বর তখন সঙ্গে-সঙ্গে নরম হইয়া আসিতেছিল। "প্রেম" শব্দটি ধীরে-ধীরে একবার পুরুষের উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে, পুনরায় নারীর কোমল কণ্ঠে বীণা ধ্বনির মতন ঝঙ্কৃত হইয়া কক্ষটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

"আচ্ছা, কাহারও প্রেম কি চিরস্থায়ী হয়?"

"হ্যাঁ, হয়।"

বন্ধু জোফার উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন—"না কখনই না—অসম্ভব। এ কখনও হ'তে পারে না,—আর জানো, সেদিন——"

তৎক্ষণাৎ মহা তর্ক-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হেন্‌রী সাইমন একখানি বুলেটিন-বিশেষ। সে সহরের সব খবর রাখিত। গম্ভীরভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনেক উদাহরণ দিয়া বিশেষ-বিশেষ প্রেমের ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিজ বক্তব্যকে আমাদের মনের মধ্যে গাঁথিয়া দিবার জন্য হাতমুখ নাড়িয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

বন্ধু হেকৃতর লোকটি বড় ধীর ও শান্ত-প্রকৃতির; সে তর্কের ধার ধারিত না—বেশ সহজ শান্তভাবে বলিল, "আচ্ছা হেন্‌রী, অত বাজে তর্ক করে' এমন জমকালো আড্ডাটি মাটি করে' লাভ কি?—তা'র চেয়ে নিজ-নিজ প্রেমের কাহিনী বলো না শুনি; তা হ'লেই বোঝা যাবে, কার প্রেমের কত বৎসর, কত মাস, কত ঋতু, কত দিনের মেয়াদ। তা'র পর তোমার তর্ক।" মুহূর্ত্তে তর্কজাল-মুখরিত কক্ষ শান্ত ভাব ধারণ করিল। সকলেই শান্ত-ভাবে নিজ-নিজ প্রেমের স্মৃতির দোলায় দুলিতে লাগিল। স্ত্রী এবং পুরুষের দুটি হৃদয়ের মিলন-রহস্যের কথা গভীর আবেগে উৎসাহের সহিত কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়া জিহ্বায় আসিয়া মিশিয়া যাইতে লাগিল। সকলেই নীরব।

এদিকে ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; সন্ধ্যার বায়ুস্পর্শে ধীরে-ধীরে এক-একটি নক্ষত্র ফুটিতেছে। সমুদ্র-তীরলগ্ন ফুলবাগানে শুক্ল-মুকুল নয়ন মেলিতেছে; মুকুল-অধরে হাসি ফুটিতেছে। ভূমধ্যসাগর বীচিবিক্ষোভ-শূন্য—স্থির। লবণাম্বুরাশির উপর নক্ষত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন অসংখ্য হীরকখণ্ড জল্‌জল্ করিতেছে।

"দেখ, দেখ, ওকি! চেয়ে দেখ!' জর্জ্জ তুপোর্টিন সন্ধ্যার এই নীরব গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওকি, দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ!" সমুদ্রের উপর দিঙ্‌মণ্ডলের নীচে এক বৃহদাকার পুঞ্জীভূত ধূসরবর্ণ অপরিচ্ছন্ন স্তূপীকৃত বস্ত

আমাদের নয়নের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল! সকলেই অবাক্ ও স্তম্ভিতভাবে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল! জোকার বলিল,—"এ যে কর্সিকা দ্বীপ! এমন আশ্চর্য্য জিনিষ আর কি আছে? এই দ্বীপটি বছরে দু-তিন বারের বেশী দেখা যায় না। কতকগুলি প্রাকৃতিক বিশেষ নিয়ম এবং বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব-অনুসারে কখনও-কখনও কুজ্ঝটিকার আবরণ ভেদ করে' দেখা দেয়। তা নইলে বরাবর কুয়াসা-যবনিকার অন্তরালেই থাকে। আমি আরও শুনেছি যে, কর্সিকার পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যেও বিশেষ বিশেষত্ব আছে।" জোকারের কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়া সমুদ্রোত্থিত হঠাৎ-আবির্ভূত এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

কিছু দূরে একটি বৃদ্ধ বসিয়াছিল। এতক্ষণ বৃদ্ধটি আমাদের—উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের—কথায় যোগ দেয় নাই; একদৃষ্টে আমাদের তর্ক-যুদ্ধের অভিনয় দেখিতেছিল। বৃদ্ধটি এতক্ষণ পরে গা ঝাড়া দিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "দেখ, এই কর্সিকা দ্বীপ-সম্বন্ধে আমি কিছু জানি; শোনো বলিতেছি। প্রথমেই বলিয়া রাখি কিন্তু যে-কথাগুলি আজ তোমাদিগকে শুনাইব, সে অনেকদিনের কথা—আমাকে স্মরণ করিয়া বলিতে হইবে। যাহা লইয়া এতক্ষণ তোমরা মাতামাতি করিলে এটিও সেইরকম একটি প্রেমের ঘটনা। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবে, আমার এই গল্পের মানুষ-দু'টির প্রেম সত্যই চির-স্থায়ী হইয়াছিল। আজ এই যে দ্বীপটি আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে আমার কিন্তু মনে হইতেছে ওটি তোমাদের এই তর্কের মীমাংসার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছে। আরও আমার মনে হয়, আমার যৌবনের সেই বিশেষ স্মৃতিটিকে জাগাইবার জন্যই যেন ও মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসিয়াছে।" বৃদ্ধ বলিতে লাগিল:—

"আমি যৌবনে একবার এই কর্সিকা দ্বীপে গিয়াছিলাম। তখন এই অর্দ্ধসভ্য দ্বীপবাসীদের কথা কচিৎ-কখনো শুনিতে পাওয়া যাইত। আজ আমরা ফ্রান্সের তটপ্রান্ত হইতে কর্সিকাকে যেমন নিকটে দর্শন করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু এই অর্দ্ধসভ্য দ্বীপটা এত নিকটে নহে—আমেরিকার অপেক্ষাও দূরবর্ত্তী! এমন একটি জগৎ কল্পনা করো, যে স্থানটি ঠিক এইরূপ রহস্যপূর্ণ—তাহার অস্তিত্ব এখন পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। কতকগুলি ভীষণ পাহাড় কল্পনা করো, তাহার চারি ধারে প্রবাহিত ঘূর্ণীর স্রোত; বাসোপযোগী সমতল ভূমির লেশমাত্র নাই—শুধু চারি ধার লতা গুল্ম ও বাদাম বৃক্ষে আচ্ছন্ন। প্রথম দর্শনেই মনে হইবে, এই স্থানটির ভূমি উর্ব্বরতাশূন্য, অকর্ষিত, অবহেলিত; মনুষ্য-বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এই দুর্গম অরণ্যে দু'একখানি কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাওয়া যাইবে; আর দেখিতে পাইবে পর্ব্বত-শিখরে স্তূপীকৃত শিলা কাষ্ঠ। এই অসভ্য দ্বীপবাসীদের কোনো-প্রকার শিল্পনৈপুণ্য কিছুই নাই। ইহারা কখনও শিল্পীর মানসিক প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফল—কারুকার্য্যময় খোদিত প্রস্তর বা কাষ্ঠফলক দেখে নাই। মানুষের কল্পনা প্রতিভা ও মনীষা যে শিল্প-দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে, এ-সংবাদ তাহাদের স্বপ্নের অগোচর। তাহারা চিরদিনই আদিমনিবাসীর মতন অর্দ্ধসভ্য—যেন যুগযুগান্তর হইতে বংশানুক্রমে বাস্তব জগতে বাস করিয়াও পার্থিব বিষয়ে উদাসীন।

"ইতালী!—কি সুন্দর, কি সুসভ্য এই ইতালী! সভ্য জগতের শিরোমণি ইন্দ্রভবন ইতালীতে যাও। সেখানে দেখিতে পাইবে, দীন দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর হইতে রাজার রাজ-প্রসাদ প্রতিভা-শালী শিল্পীর কলানৈপুণ্যে মণ্ডিত। চারিধার সভ্য জগতের প্রাণের রুচির নিদর্শনে ভূষিত! অনন্ত সৌন্দর্য্য-ময়ী ইতালী প্রকৃতই সুকুমার শিল্পকলার চরম নিদর্শন! মনে হইবে, ইতালীই যেন শিল্পীর মানসকল্পনা-প্রসূত সুকুমার শিল্পদ্রব্য-বিশেষ; কলালক্ষ্মীর জন্য আনন্দ-ভবন। ইহার পার্শ্বে অসভ্য কর্সিকা?—স্বর্গ আর নরক!"

বৃদ্ধ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিল। সজোরে ফুসফুস সঞ্চিত বাতাস ছাড়িয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিল—"অতি প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দ্বীপবাসীরা সভ্য জগতের সম্মুখে আপনাদিগকে দাঁড় করাইতে পারিল না; চিরদিনই অসভ্য অবস্থাতেই রহিয়া গেল। সেখানকার অধিবাসীরা নিজ জীবিকা ও কলহ ছাড়া জগতের আর সকল বিষয়ে উদাসীনের মতন, সামান্য অবস্থাতেই কাল কাটাইতেছে।

তাহারা হিংসা-কলহ-পরায়ণ ভীষণ রক্তপিপাসু। এত দোষ সত্ত্বেও তাহাদের কয়েকটি গুণ আছে। তাহারা অতিশয় অতিথিপরায়ণ, উদার, অনুগত ও সরল। তাহারা অপরিচিত আগন্তুক পথিককে অসঙ্কোচে সাদরে গৃহে স্থান দিবে, পরম আত্মীয়ের মতন তাহাদের সেবা ও যত্ন করিবে; সামান্য সহানুভূতিতে তাহাদের নয়নে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখিতে পাইবে।

"হ্যাঁ—শোনো, আমি যাহা বলিতেছিলাম। আমি একবার ঘটনাচক্রে পড়িয়া এই চমৎকার দ্বীপে এক মাস কাটাইয়াছিলাম। যে কয়দিন সেখানে ছিলাম, আমার মনে হইত, যেন পৃথিবীর অপর কোনো এক অনাবিষ্কৃত প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে কোনো সরাই নাই, কোনো-প্রকার পান্থশালা নাই। রাজ-পথের চিহ্নমাত্র নাই। অশ্বতর-পৃষ্ঠে চড়িয়া এদেশের ছোটো-ছোটো গ্রামে যাও, দেখিবে, এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রামগুলি যেন পর্ব্বত-গাত্র হইতে বহির্গত হইয়াছে। কি প্রাতঃকাল, কি দিবা, কি রাত্রি—সকল সময়েই নির্ঝরমুক্ত বারিরাশির সুগভীর পতন-শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গ্রামের প্রতি দরজায় ঘা দাও—আশ্রয় প্রার্থনা করো, গৃহ-স্বামী তৎক্ষণাৎ সানন্দে আশ্রয় দিবে; নৈশ আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। দীন কুটীরে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে যখন দীন পরিবারের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিবে তখন তাহারা সকলে আসিয়া তোমাকে পল্লীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। কর্সিকা দ্বীপ-বাসীগণ অসভ্য বর্ব্বর বটে, কিন্তু তাহাদের অতিথি-বৎসলতা, অতিথির প্রতি উদারতা ভুলিবার নহে।"

বৃদ্ধ গল্প বলিতেছিল, আর মধ্যে-মধ্যে জানালার দিকে তাকাইয়া কুয়াসাচ্ছন্ন কর্সিকা তখনও দৃশ্য-পথের পথের মধ্যে আছে কি না দেখিতেছিল। পল্ বৃদ্ধের এই গল্প শুনিতেছিল কি না বলিতে পারি না, তবে বৃদ্ধের ঘৃণা ও হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী এবং মধ্যে-মধ্যে স্ফুরিত মহা উৎসাহ ও আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাগুলি বলিবার ভঙ্গীটি চুরুটে টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িবার সময় বেশ লক্ষ্য করিতেছিল। আর তার্কিক জোফার তাহার পাইপের জন্য ছুরি দিয়া গম্ভীরভাবে তামাক কাটিতেছিল। বৃদ্ধ আমাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই ধূমপানরত দেখিয়া পকেট হইতে নস্যদানি বাহির করিয়া বিশেষ তৃপ্তির সহিত একটিপ নস্য নাসাগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দিল। পরে পুনরায় বলিতে লাগিল,—

"হ্যাঁ, তার পর বলি শোনো, একদিন দশ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে হাঁটিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় উপত্যকার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই উপত্যকা হইতে সমুদ্রতীর বেশী দূর নহে; তরু-লতা গুল্ম-সমাচ্ছন্ন দুইটি পর্ব্বত আছে; দেখিলেই মনে হইবে যেন এই পর্ব্বতদ্বয় নীরব উপত্যকাটিকে মাতৃ-স্নেহালিঙ্গন দ্বারা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র কুটীরের চারিধারে দ্রাক্ষাবন; একটি ছোট পুষ্পোদ্যান এবং অনতিদূরে কতকগুলি বাদাম-বৃক্ষ। ইহাতেই এই ক্ষুদ্র সংসারটি বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়; তা ছাড়া ইহাই এই দরিদ্র দেশের ঐশ্বর্য্য-বিশেষ। আমি যখন এই দীন কুটীরের দরজায় ঘা দিলাম একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে গৃহ-মধ্যে লইয়া গেল। দেখিলাম এই বৃদ্ধাটি বেশ গম্ভীর এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গৃহমধ্যে একটি বৃদ্ধ মোড়ায় বসিয়াছিল। সে আমাকে দেখিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত উঠিয়া অভিবাদন করিল এবং কিছু না বলিয়া বসিয়া পড়িল। এই বৃদ্ধটিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বৃদ্ধের দিকে আমাকে তাকাইতে দেখিয়া বৃদ্ধা বেশ ধীরভাবে ফরাসী ভাষায় বলিল—'ওঁকে ক্ষমা করবেন। উনি একেবারেই বধির, ওঁর বয়স বিরাশী বৎসরের উপর।' এই মনুষ্য-সমাগম শূন্য দুর্গম অরণ্যে বৃদ্ধাকে ফরাসী ভাষায় অতি শুদ্ধ ও পরিষ্কার করিয়া কথা বলিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলাম। ইহাদের ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলেই নয়ন জুড়ায়; সুন্দর সুপ্রশস্ত ঘরগুলির সর্ব্বাঙ্গে বিলাসিতার উপকরণ ঝলমল করিতেছে, অথচ সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ এমন করিয়া ঘরগুলিকে সাজাইয়াছে যে কোথাও বাহুল্য আছে বলিয়া মোটেই মনে হয় না। গৃহ দেয়ালে নানা রঙের ছবি; ইহাদের সৌন্দর্য্যের অন্তরালে ঘরগুলির ইট-কাঠের কাঠিন্য একেবারেই নির্ব্বাসিত। চারিধারে কোমলতা। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! যতই

চারিধারে তাকাই, বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তার পর বৃদ্ধা আবার পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় কথা কহিল। আমি মহাবিস্মিত হইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি এদেশিকার লোক নন?' বৃদ্ধা বলিল—'না, আমরাও আপনার মতন মহাদেশের লোক; আমরা এস্থানে পঞ্চাশ বৎসরের উপর বাস করিতেছি।" আমি আরও আশ্চর্য্য হইলাম, কেমন করিয়া তাহারা মনুষ্য-সমাগমশূন্য বিপৎ সঙ্কুল অরণ্য-মধ্যে বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। বৃদ্ধার সহিত যতই কথোপকথন করি, ততই আমার বিস্ময় বাড়ে। কিছুক্ষণ পরে এক কৃষক আসিলে আমরা একত্রে আহারে বসিলাম। আহার্য্য দ্রব্য সামান্য; মহাদেশবাসী আমাকে এই সামান্য আহার্য্য দিবার সময় বৃদ্ধার মুখে চোখে একটি সঙ্কোচের ভাব দেখিয়া আমি মহা আনন্দের সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম বৃদ্ধার আনন্দের সীমা নাই; নারীচিত্তের কোমলতা-মাধুর্য্য বৃদ্ধার জরাগ্রস্ত লোল মুখমণ্ডলেও ফুটিয়া লীন হইয়া গেল। আজ বহু যুগ পরে একজন মহাদেশবাসীকে অতিথিরূপে পাইয়াছে—অত্যন্ত আদরের সহিত অতিথি-সৎকার করিয়াছে—এই আনন্দই বৃদ্ধার হৃদয়ে উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

"সামান্য আহার অল্পক্ষণ পরেই শেষ হইয়া গেল; আমি ঘরের দরজার নিকট গিয়া বসিলাম। আমার মনের মধ্যে নানা চিন্তা জাগিতে লাগিল। এ কোথায় আসলাম? ইহারা কাহারা? কেনই বা ইহারা মহাদেশ ছাড়িয়া এই দুর্গম অরণ্যে অসভ্য বর্ব্বর দ্বীপবাসীদের সহিত বাস করিতেছে? রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল—চারিধারের অন্ধকারই ততই ক্রমশঃ গাঢ় হইতে লাগিল। অরণ্য-মধ্যে হিংস্র জন্তুদের যাতায়াতের খস্‌খস্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। জনহীন অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে একাকী বসিয়া আমার মনের মধ্যে ঝিল্লির করুণ সুর হৃদয়-তন্ত্রীর পর্দায় পর্দায় ঘা দিয়া করুণ তান তুলিতে লাগিল। আমি যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

বৃদ্ধা গৃহকর্ম্ম সারিয়া আমার নিকট আসিয়া বসিল। নিজ মোড়াটি আমার সম্মুখবর্ত্তী করিয়া বসিয়া বলিল,—'আপনি, তা হ'লে ফ্রান্স থেকেই আস্‌ছেন?'

হাঁ, আমি সখের ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

'আপনি তা হ'লে নিশ্চয় বরাবর আমাদের প্যারিস্ থেকেই আস্‌ছেন্?'

'না, আমি ন্যান্‌সি থেকেই আস্‌ছি।'

"ন্যান্‌সির কথা শুনিয়াই কেন জানি না বৃদ্ধার মুখে-চোখে উত্তেজনার—কেমন একটা যেন কি ভাব ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধা আমার দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাইয়া সোৎসাহে বলিল, 'তা হ'লে ন্যান্‌সি থেকেই?'

"ঘরের বাহিরে দরজার নিকট উপবিষ্ট বৃদ্ধ বধিরটিকে অন্যান্য বধিরের মতনই জগতের সুখ-দুঃখ-বোধশূন্য দেখিলাম।

"বধিরের দিকে তাকাইতে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, 'আপনি বলে' যান,—ওঁর জন্য অপেক্ষা কর্‌বার কোনো দর্‌কার নাই, আগেই বলেছি, উনি একেবারে বধির। আমাদের কোনো কথাই উনি বুঝতে পার্‌ছেন না।' কিছুক্ষণ অবনত-মুখে আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে-খুঁটিতে বৃদ্ধা ধীরস্বরে বলিল,—'আপনি তা হ'লে ন্যান্‌সির সকল লোককেই চেনেন, কেমন?"

'হ্যাঁ, প্রায় সকলকেই।'

সকৌতূহল দৃষ্টিতে বৃদ্ধা বলিল—'সাঁট এালজ পরিবারকেও?'

'হ্যাঁ—খুব ভালো করে'ই জানি, তা'রা যে আমার পিতার পরম বন্ধু।'

'আচ্ছা,—তা হ'লে আপনার নামটি কি জান্‌তে পারি?'

'আমি আমার পুরা নামটি বলিলাম। বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তার পর নত দৃষ্টিতে লোকে যেমন কোনো বিষয় চিন্তা করিতে-করিতে আপন মনে বকিতে থাকে, সেইরূপভাবে বিগত স্মৃতিকে জাগারিত করিয়া বৃদ্ধা আপন মনে বলিতে লাগিল, 'হাঁ, হাঁ, আমার বেশ মনে পড়ছে; আচ্ছা তা হ'লে ত্রিস মেয়েদের খবর কি?'

'তাঁরা সকলেই মরে' গেছেন।'

'আহা-হা!' বৃদ্ধা দুঃখসূচক মুখ-ভঙ্গী করিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনি সাইরেমণ্টকে চেনেন কি?'

'হ্যাঁ,—তাদের শেষ পুরুষ একজন সৈন্যদলে প্রবেশ করেছে।'

আমার কথা শুনিয়া যেন বৃদ্ধার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখ এবং চোখের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, এতদিন যে কথাগুলি তাহার হৃদয়ের গোপন প্রদেশে লুকানো ছিল—আজ সেই পুরাতন কথাগুলি বলিবার জন্য বৃদ্ধা বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

'দেখুন, এই হেন্‌রী সার ডি সাইরেমণ্টই আমার ভ্রাতা।'

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া আমি মহা বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ক্রমে আমার মনে প'ড়তে লাগিল—অনেক দিন পূর্ব্বে—আমার যৌবনের প্রারম্ভে—লোরেনের এই সম্ভ্রান্ত বংশে কি যেন একটা গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সব ঘটনা ঠিক মনে পড়িল না; তবে এইটুকু আমার বেশ মনে পড়িল যে, এই বংশের সুজেন ডিস্‌রামণ্ট নাম্নী এক কিশোরী এক সৈনিকের প্রেমে মুগ্ধ হয়। কিশোরীর পিতা এই সৈন্য-দলের অধিনায়ক ছিল। আরও মনে পড়িল, এই সৈনিক পুরুষটি এক কৃষকের পুত্র। কিন্তু তাহাকে কৃষকের পুত্র বলিয়া চেনা যাইত না। সে অতিশয় সু-পুরুষ ছিল। তাহার উন্নত ললাট, বিরাট্ বক্ষঃস্থল, উন্নত নাসিকা ও দিব্য কান্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গী, কথা-বার্ত্তা বীরত্বের পরিচায়ক ছিল। সর্ব্বদা মূল্যবান্ এবং নানাবিধ আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে তাহার দিব্য-কান্তিপূর্ণ দেহ সজ্জিত থাকিত। ইহা ছাড়া তাহার মানসিক প্রতিভাও যথেষ্ট ছিল। ঈশ্বর তাহাকে যেরূপ দেহ সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তেমনি মানসিক সৌন্দর্য্যেও মণ্ডিত করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। সৈনিক পুরুষ নিপুণ চিত্রকর ছিল। সে তাহার প্রিয়তমার চারু চিত্র নিজ হস্তে অঙ্কিত করিয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিল। যে-ঘরে বসিয়া এইসব কথা ভাবিতেছিলাম, —সেই ঘরটিও নানা রঙের ছবিতে পূর্ণ ছিল। একদিন সন্ধ্যার পর শুনা গেল সৈনিক অদৃশ্য!—সৈন্যাধ্যক্ষ-কন্যা সুজেনও অদৃশ্য! বিস্তর অনুসন্ধান হইল, কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলিল না। এ-রকমই যে হইবে ইহা তাহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

"কিছুকাল পরে সকলেই—অবশ্য আমিও তাহাদের মধ্যে একজন—ভাবিল, সুজেন মরিয়াছে। কিন্তু এখন, সেইসকলেরই মধ্যে একজন আমি দেখিতেছি, সেই কিশোরী সুজেন এখন লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা; এই জনমানব-শূন্য নিবিড় অরণ্য-মধ্যে তাহার প্রণয়াস্পদের সহিত বেশ সুখে বাস করিতেছে! আর ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি তাহারই অতিথি!"

বৃদ্ধ গল্প বলিতে-বলিতে একবার থামিল। পকেট হইতে বাম হাত দিয়া নস্যদানি বাহির করিয়া আর-এক-বার বেশ তৃপ্তির সহিত নস্য গ্রহণ করিল। আর বন্ধু পল্ চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ-মিলিত করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া মুখ-গহ্বরে সঞ্চিত ধূমরাশি ধীরে-ধীরে ছাড়িতেছিল।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিল,—

"আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম,—'আপনিই তা হ'লে সেই সুজেন?' বৃদ্ধা অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'আমিই সেই!' আর ইঙ্গিতে বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'ইনিই সেই সৈনিক!'

"আমি দেখিলাম বৃদ্ধা সুজেন এখন পর্য্যন্ত তাহাকে ভালোবাসে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা বেশ সুখী হয়েছিলেন?"

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'বৃদ্ধা গদগদ এবং গাঢ় স্বরে, যেন প্রাণের অন্তস্তল হইতেই বলিল, 'আমরা অত্যন্ত সুখী হয়েছিলাম; আমাকে উনি যথেষ্ট সুখী করেছিলেন—কখনও আমাকে অনুতাপ করতে হয়নি। বৃদ্ধার মুখে-চোখে উচ্ছ্বসিত মোহময় যৌবনের নবানুরাগের দীপ্তি যেন পুনরায় সগৌরবে ফুটিয়া ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেল। আমি প্রেমের মহিমময়ীশক্তির আকর্ষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইতেই পুনরায় সে বলিল— 'জীবনে যে-সুখ ভোগ করেছি, তার তুলনা মেলে না। এই জীবন-সায়াহ্নেও আমরা বেশ সুখে আছি। এখন কেবল পরপারের খেয়াঘাটে বসে' ভাবছি যেন

একবৃন্তে ছু'টি ফুলের মতন ফুটে' ভগবানের কৃপায় আমাদের ছুটি হৃদয় মিলিত হয়েছিল; আজও যেন তেমনি আমাদের ছুটি হৃদয় ভগবানের চরণ-সান্নিধ্যে পৌছে।'

"আমি ভাবিলাম—কি সুন্দর! কি চমৎকার! আমি ভাবিতে লাগিলাম—কোথায় এই ধনী এবং পদস্থ সেনা-নায়কের কন্যার বিবাহ দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধনীর সহিত হইবে; মর্ম্মর-অট্টালিকায় বাস করিয়া কোথায় ইহারা কপোত-কপোতীর মতন—সদা প্রেমপূর্ণ নয়নে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া কত সুখ-স্বপ্ন দেখিবে—সহকার ও মাধবীলতার মত ঘনভুজবন্ধনে ছু'টি হৃদয় বাঁধা থাকিবে—না, একজন কৃষক-পুত্রকে সে পতিত্বে বরণ করিয়াছে! পথিক-নয়ন-মোহকর বিলাসীর প্রমোদ উদ্যান, প্যারিসের সাজসজ্জা, নয়ন-মনোহর দৃশ্য—বিলাসিতার প্রচুর উপকরণ ত্যাগ করিয়া এই দুর্গম অরণ্যে বৈচিত্র্যহীন বিশ্বাসশূন্য জীবন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে; তাহার স্বামীটি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা—সুন্দর মূল্যবান্ কারুকার্য্যপূর্ণ হীরক মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কার প্রভৃতি নারী-জীবনের কাম্য কোনো দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি তাহার মোটেই নাই। প্রস্ফুটিত যৌবনেই পার্থিব জগতের সমস্ত সুখ উপেক্ষা করিয়াছে। আমরণ তাহার স্বামীই পার্থিব জগতের একমাত্র সুখ-কল্পনা—আশা—চিন্তা—ধ্যান! ইহা অপেক্ষা উচ্চ, অধিকতর সুখ-করী কল্পনা তাহার আর নাই।

"বৃদ্ধ সৈনিকের নাসিকা-গর্জ্জন শ্রবণ ও বৃদ্ধার সহিত গল্প করিয়াই সমস্ত রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যূষে এই প্রেমিক-যুগলের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্য পথে পুনরায় যাত্রা করা গেল—"

* * *

দিগ্বলয়ের নিম্নে কর্সিকা দ্বীপ রজনীর কুয়াসা ও অন্ধকারে ধীরে-ধীরে মিশিয়া যাইতেছিল; মনে হইতেছিল, এই ছায়াচিত্র ঠিক যেন রামধনুর মতন আকাশ-গাত্রে মিলাইয়া যাইতেছে! আমারও মনে হইতে লাগিল, এই কর্সিকার ছায়াচিত্র ছু'টি আত্মহারা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের কাহিনী বলিবার জন্যই বুঝি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল।*

* মোপাসাঁর মর্ম্মানুবাদ।

আগমনী

হে শোভনে!
কোন্ শুভক্ষণে
লভিয়া তোমারে বক্ষে
রাঙিয়া উঠিল বিশ্ব মোর চক্ষে।
উন্মত্ত কি রাগিণীর প্রলয়ঝঙ্কারে
স্তব্ধ করে' দিলে মোর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষিপ্ত অহঙ্কারে।
স্বপ্নময় জীবনের হইল কি ভ্রান্তি অবসান?
পরাজয়জর্জ্জরিত অন্তরে বাজিল কোন্ বিজয়বিষাণ!
অবসন্ন হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত একপ্রান্তে মম
মায়াবীর কল্পতরুসম—
মুহূর্ত্তে লভিল প্রাণ স্বপ্নপুষ্প যত,
সুখভারে মালঞ্চ আমার হ'ল চির অবনত।

হে সুন্দরী!
এল তব তরী
অজানার স্রোতে ভেসে,
দেখিনু আশার আলোমুক্ত তব দীর্ঘ কালো কেশে;
নয়নে তোমার
হেরিয়া কিসের ছবি, বাজিয়া উঠিল সুপ্ত তন্ত্রীগুলি
অন্তরে আমার।
এল তব তরী
মরমের সর্ব্ব দুঃখ হরি';
নিরুদ্দেশে নিবিষ্ট নয়ন মম হেরিল তোমারে,
লভিল নূতন দৃষ্টি সুখ-অশ্রুধারে।
হ'ল মোর স্বপ্ন অবসান
লভিয়া গো স্নিগ্ধ তব দান।

বাংলা
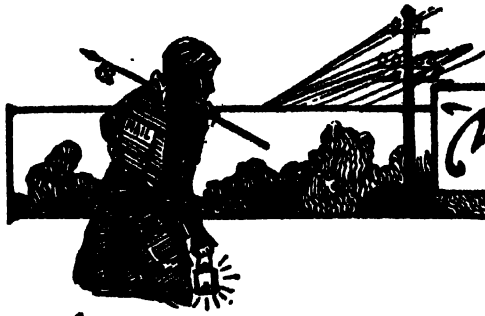
বাংলা গবর্ণমেণ্টের ১৯২৫-২৬ সালের নতুন বজেট বাহির হইয়াছে। এবারেও ঘাটতি বাজেট। রাজস্ব যত আদায় হইবে, বাংলা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় তাহা অপেক্ষা ২৬ লক্ষ টাকা বেশী হইবে।

লী কমিশনের মত অনুসারে কাজ হইবে বলিয়া ব্যয় কিছু বাড়িবে এবং পুলিসের উপর কৃপা দৃষ্টিতেও ব্যয় কিছু বাড়িবে। পুলিসদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি গবর্ণমেণ্ট পুরামাত্রায় দিতেছেন—কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের মোট ব্যয় গত বৎসর হইতে এ-বৎসর ২ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে। দেশের স্বাস্থ্য যে ভালো হইয়াছে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কচুরী-পানা নষ্ট করিবার জন্য ২৫ হাজার টাকা খরচ করা হইবে। উপায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তবে বোধ হয় গ্রিফিথ সাহেবের নতুন পেটেণ্ট ও দাওয়াই 'স্প্রে'র ব্যবহার হইবে। স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু এই দাওয়াইএর ব্যর্থতা প্রমাণ করিয়াছেন। সম্ভবত তাহা ভুল।

বাংলা দেশের পল্লীগুলির স্বাস্থ্যের জন্য জেলা বোর্ডগুলিকে এবার ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশী দেওয়া হইবে।

৩নং আইনের বন্দীদিগকে ব্রহ্মদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে। বাংলা দেশের আবহাওয়া খারাপ বলিয়াই বোধ হয় তাহাদিগকে এখান হইতে সরাইয়া ফেলা হইল। কিন্তু "রেঙ্গুন-মেল" কাগজ পাঠে জানা গেল যে এই সমস্ত বন্দীদের উপর সাধারণ চোর বদমায়েস ইত্যাদি কয়েদীদের মতন অত্যাচার করা হইতেছে। মৌলমেন জেলখানার বন্দীদিগকে ফাঁসীর আসামীদের সেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কথার কোনো প্রতিবাদ এখন পর্যন্ত করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

বাংলা দেশের পাগলা-গারদ সমূহের ১৯২৩-২৪ সালের একটি রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্ট দেখা যায় যে বাঙ্গলাদেশে দুইটি পাগলাগারদ আছে একটি ঢাকায় ও একটি বহরমপুরে। ভবানীপুরেও একটি পাগলাগারদের ছোটো বিভাগ আছে। ভবানীপুরের বিভাগটিতে ৩২ জন লোক আছে। ঢাকার পাগলাগারদের পরিসর বৃদ্ধি হওয়াতে বর্ত্তমানে উহাতে ৩৪৩ জন আছে, পূর্ব্বে উহাতে ৩১৯ জন ছিল। আগামী জুলাই মাসে রাঁচিতে পাগলাগারদ খোলা হইলে, ঢাকা ও বহরমপুরের সকলকেই উক্ত গারদে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই সকল গারদে সর্ব্বসমেত মোট ১১২১ জন লোক আছে, তন্মধ্যে ৯২৪ জন পুরুষ ও ১৯৭ জন স্ত্রীলোক। এই তিন বৎসরে গড়ে ১২১৫ জনের চিকিৎসা হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে তিন বৎসরে ১৩১৫ জনের চিকিৎসা হইয়াছিল। রোগীদের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালো ছিল না। বৎসরে গড়ে ৭০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তিন বৎসরে গড়ে ১০২ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। গড়ে বার্ষিক ব্যয় ৩১৭৯২৫৲ টাকা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিন বৎসরে ব্যয় ২৮৯০৭১৲ টাকা হইয়াছিল। প্রত্যেক রোগীর পিছু বার্ষিক ২৫৯৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিন বৎসরে ২১৮৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যে-সমস্ত রোগীর টাকা লইয়া চিকিৎসা হইয়াছিল, তাহাদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৬০৭৫৲ টাকা এবং রোগীদের প্রস্তুত জিনিষ হইতে মোট আনুমানিক আয় ১০৭৯২৲ টাকা। রোগীদের স্বচ্ছন্দতার জন্য খুব চেষ্টা করা হইয়াছে। বহরমপুরে পাঠাগার ও ক্লাব-ঘরের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের বিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য একটি মহিলা পরিদর্শক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সংবাদপত্র পাঠে বাংলা দেশে এখনও মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু-নারী ধর্ষণের কথা জানা যাইতেছে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য অনেকগুলি সমিতি হইয়াছে। কিছু-কিছু কাজও তাহারা করিতেছে। এইসমস্ত ব্যাপারে নারীর কোনো দোষ নাই। সুতরাং অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্য তাহার কোন শাস্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজ সে-কথা শুনিতে রাজি নয়। কোনো নারীর প্রতি যখন দুষ্টেরা আসিয়া অত্যাচার করে বা ধরিয়া লইয়া যায়, তখন পাড়া-প্রতিবেশী কেহই প্রাণের ভয় তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। কিন্তু সেই অসহায়া ধর্ষিতা নারী পুনরায় নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিলে সমাজ তাহার শাস্তি-বিধানে পরম যত্নবান্ হয়। রংপুরের সুহাসিনীর কথা অনেকে পাঠ করিয়াছেন। জোর করিয়া তাহার উপর নানা-প্রকার অত্যাচার হয়। কিন্তু তাহার স্বামী সমাজ শাসন ভয় ত্যাগ করিয়াও তাহাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মহাবীর সমাজপতিগণ এই ভীষণ অপরাধ ক্ষমা না করিয়া তাঁহাকে এক-ঘরে করিয়াছেন। সমাজপতিদের নিজেদের বিষয় ভাবিয়া দেখিবার সময় বোধ হয় নাই, কারণ তাঁহারা পর-চিন্তাতেই দিনরাত ব্যস্ত। সমাজের এইপ্রকার অন্যায় অত্যাচারের জন্যেই হিন্দু সমাজ দিন-দিন হীনবল হইতেছে।

ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড বিলাতী পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে, ১৯০৭—৮ সালের তুলনায় বাঙ্গালা দেশের অবস্থা বর্ত্তমানে শান্তিপূর্ণ। আর ৩নং রেগুলেশন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতির মহিমাতেই এরূপ হইয়াছে। অতএব ঐ বে-আইনী আইনগুলি প্রত্যাহার করা সঙ্গত নহে। লর্ড বার্কেনহেডের মতে যদি সত্যিই বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ তবে রেগুলেশন থ্রির দরকার কি? কিন্তু যদি রেগুলেসন্ থ্রি এবং অর্ডিন্যান্সের দরকার থাকে তবে দেশকে শান্তিপূর্ণ বলা যায় কেমন করিয়া!

শ্রমিক-সদস্য মিঃ স্কার এই উপলক্ষে কয়েকটি সুন্দর কথা বলেন;— "দুই-একজন লোক উত্তেজিত হইয়া যা-তা বকিতেছে বলিয়া, বিলাতী পার্লামেণ্টের পক্ষে উত্তেজিত হইয়া উঠা উচিত নহে। একশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের পরেও ভারতের শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবী লোক নিরক্ষর ব্রিটিশ শাসনের এই ঘোর কলঙ্ক দূর করিবার জন্যই আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইলে, বিপ্লবের ভয় দূর হইবে।"

মিঃ স্কার কেবল একটি কথা ভুল বলিয়াছেন। ১০০ বৎসর ইংরেজ-রাজত্বের পরেও ভারতের শতকরা ৯৫ জন লোক লিখিতে-পড়িতে জানে না। সম্ভবত ইংরেজরা ভারতবর্ষে সভ্যতা বিস্তার করিতে আসিবার পূর্ব্বেও শতকরা ঐ পাঁচ জন লোক লেখা-পড়া জানিত।

কলিকাতার একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালিকা নিম্নলিখিত পত্রখানি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্রোধ এবং লজ্জা দুই হয়। বঙ্গবাসী কলেজের "মেসের' ছেলেদের ব্যবহার দণ্ড পাইবার উপযুক্ত, এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলিয়া মনে করিতেছি। পত্রখানি নিম্নলিখিত-রূপ।

"গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার আমাদের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছিল। স্কুলের মধ্যে স্থানাভাব হওয়াতে ছাদের উপরে সভার জায়গা করা হয়। কলিকাতায় ছাদের উপর চারিদিক্কার বাড়ী হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা আর 'পর্দ্দার' ব্যবস্থা করি নাই। আমাদের স্কুলের পর একটা বড় বাড়ী, তার পর স্কটস্ লেন, তার পর বঙ্গবাসী কলেজের 'মেস' বা ছাত্রাবাস। অনেকে 'মেসের' কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বালিকাদের পুরস্কার বিতরণ অনেক সময় প্রকাশ্য সভাতেই হয়, তাহা 'গোপনীয়' ব্যাপার নয়। সুতরাং দূর হইতে যদি মেসের ছাত্রগণ পুরস্কার বিতরণ দেখিতে পায়, কিম্বা গান ইত্যাদি শোনে, তাহা আমরা কোনো দোষের বিষয় মনে করি নাই।'

"কিন্তু বেলা ১টা-১॥ টার সময় যখন ছাদের উপরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মেয়েদের গানের জন্ত লইয়া যাওয়া হইল, তখন দলে-দলে মেসের ছেলেরা আসিয়া বারান্দায় জমা হইয়া 'বাহবা' "এন্‌কোর, এন্‌কোর" শব্দে চীৎকার করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে চাদর, কাপড় ইত্যাদি যাহা-কিছু ছিল, তাহাই দিয়া মেসের দিকে পর্দ্দার ব্যবস্থা করিতে হইল। আজকালকার দিনে ছাত্রদের এ-রকম অসভ্য বর্ব্বরের মতন আচরণ আমরা আশা করি নাই। আজকাল স্ত্রীশিক্ষা সকলেই খুব দরকারী মনে করেন। কিন্তু সব গৃহস্থের পক্ষে গাড়ীভাড়া দিয়া স্কুলে মেয়ে পাঠানোর ক্ষমতা নাই। ছাত্রদের দৌরাত্ম্যে যদি বারো বৎসরের মেয়েদের রাস্তায় হাঁটা বন্ধ করিতে হয়, ৯।১০ বৎসর বয়সেই মেয়েদের পর্দ্দার ভিতরে বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে "স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা" করিয়া চীৎকার বৃথা। ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলেদের দৌরাত্ম্য গুণ্ডা বদমায়েসদের দৌরাত্ম্যের চেয়েও ভীষণ।"

কলিকাতা কর্পোরেশন ব্যয়-সঙ্কোচের পথ নির্দ্দেশ ব্যবস্থা করিবার জন্ত ১০ হাজার টাকা বেতনে একজন মান্দ্রাজী বিশেষজ্ঞের আমদানি করিয়াছেন। বাংলা দেশে বোধ হয় এই কার্য্যের উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই—তাই এই ব্যবস্থা। আমাদের মনে হয়, এই কর্ম্মচারীর পদটি উঠাইয়া দিলেই বছর-বছর ১০ হাজার টাকা বাঁচিয়া যাইবে—তাঁহার পর অন্তান্ত বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচ করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই-রকম করিয়া খাজনা দেনেওয়ালাদের অর্থ নষ্ট করিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কোনো অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী কাথিয়ার হইতে মোট ১৪,৪০০৲ টাকা সাহায্য পাইয়াছে। ইহার মধ্যে পোরবন্দরের মহারাজা রাণাসাহেব ৭৫০০৲, ধরণধরের মহারাজা ৫০০০৲ টাকা, সার প্রভাশঙ্কর পট্টনী ৭৫০৲ টাকা ও ভবনগরের জনসাধারণ চাঁদা করিয়া ১১৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

—

ভারতবর্ষ

অধ্যাপক রাশব্রুক্ উইলিয়াম্‌সের "India in 1923-24" পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া কতকগুলি কথা Manchester Guardian সংবাদপত্র বলিয়াছেন। কথাগুলি এই:

"Nobody who knows India can suppose that because we ruled India for 150 years, therefore we can rule her three hundred million people for ever. We rule India not by Englishmen only but chiefly through hosts of Indian civil officials and an army of Indian soldiers.

"When these men transfer allegiance from the British Raj to the idea of the Indian nation, then our raj will be at an end.

"True, India is not and will never be a nation in the sense in which France or Ireland is a nation but there is underlying unity throughout India. Mahomedanism is, doubtless, fundamentally antagonistic to Hinduism, but even Mahomedanicm in India has been powerfully influenced by its enemy and the abolition of the Khilafat must weaken the anti-nationalist tendencies of the Indian Mahomedan.

"It is folly to brush aside politically-minded classes, because they do not represent the masses or because they have no martial tradition.

"The intelligentsia can excite passions in the masses far móre readily than our officials can allay them. If anyone wishes to persuade us that the Brahmins are incapable of utilising or directing an armed force, he had better re-write the history of India."

ভাবার্থ:—"আমরা ভারতবর্ষকে গত ১৫০ বছর শাসন করিয়াছি বলিয়াই যে এই ৩০ কোটি লোককে অনন্তকাল ধরিয়া শাসন করিব, এমন কোনো কথা নাই। ভারতবর্ষ-শাসন আমরা ভারতবর্ষীয়দের দ্বারাই করাইয়া থাকি। যে মুহূর্ত্তে এইসকল কর্ম্মচারীর দল আমাদের প্রভুত্ব অস্বীকার করিবে সেই মুহূর্ত্তে আমাদের রাজত্ব শেষ হইবে। ইহা সত্য যে ফ্রান্স বা আয়ল্যাণ্ডকে আমরা যে অর্থে একজাতি মনে করি, ভারতবাসীরা সে অর্থে এক জাতি নয়, কিন্তু তবুও ভারতবর্ষে চিন্তাধারার একটা ঐক্য আছে। মুসলমান ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধী হইলেও এই ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের দ্বারা বহুল-পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিজ্ঞদের ধ্বংস করিবার চেষ্টা বৃথা কারণ তাহারা ভারতের জনগণকে অতি সহজে মাতাইতে পারে। যদি কেহ বলে যে ব্রাহ্মণেরা সৈন্যদলকে কাজে লাগাইতে পারে না বা চালনা করিতে পারে না, তবে তাহাকে নতুন করিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিতে হইবে।"

এই কথাগুলি ইংরেজ রাজ-পুরুষদের পড়িয়া এবং ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত।

ভারতবাসীর অবস্থা—

India in 1923-24 পুস্তকে অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়াম্‌স্ ভারতবাসীদের সমৃদ্ধিপূর্ণ অবস্থার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। আমাদের গড় পড়তা আয় যে মাত্র ৩০৲ একথা তিনি স্বীকার করিতে চান না, তাঁহার মতে আমাদের আয় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু তিনি "বেশী" বলিয়াই থামিয়া আছেন, কোনো বিশেষ প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার লেখার প্রকাশ যে, কোনো-কোনো প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট নাকি জনসাধারণের অবস্থা-সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন এবং তাহার ফলে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মান্দ্রাজের জন সাধারণের অবস্থা তদন্ত করিয়া নাকি জানা গিয়াছে যে, সেই প্রদেশের লোকের বার্ষিক আয় গড়ে ১০০৲ শত টাকা এবং বোম্বাই প্রদেশের লোকের বার্ষিক আয় গড়ে ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা। যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি সত্যকার তদন্ত করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের তদন্তের ফল সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছেন না কেন?

বরং ইহাই দেখিতেছি যে, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা-সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমিশন বা কমিটি বসাইবার প্রস্তাবে ভারতগবর্ণমেণ্ট পুনঃপুনঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

মিঃ উইলিয়াম্‌সের বর্ণিত 'রূপকথা' সত্ত্বেও ভারতের মূক-জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা মিঃ উইলিয়াম্‌স্ নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ১৯৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতের অধিকাংশ লোক এত দরিদ্র যে, তাহাদের অবস্থার তুলনা পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং যাহা কিছু উন্নতি হইতেছে, তাহা অতি "ধীরে-ধীরে"।

বিহারে একটি দিয়াশালাই-কারখানা খুলিবার জন্য ৮৫০০০টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই কারখানাটি লোকজনকে দেখাইয়া শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই খোলা হইবে। ইহার আর-একটি উদ্দেশ্য এই যে, এই কারখানাতে দিয়াশালাই তৈয়ার করিয়া লোকজনকে দেখানো হইবে যে ভারতবর্ষে অন্ততঃ বিলাতী দিয়াশালাইএর মতন দিয়াশালাই তৈয়ার করিয়া লাভজনক ব্যবসা করা যায়। এবং যদি কেহ এই ব্যবসা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সে তাহা পাইবে। আশা করি, এই কারখানার সাহায্যে সমস্ত না ভারতবর্ষ হউক বেহার প্রদেশে দিয়াশলাই কারখানার এবং ব্যবসার প্রসার হইবে এবং দেশের লোককে আর বিলাতী দিয়াশলাই এর জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না।

আকালীদের প্রতি আমলাতন্ত্রের প্রতিহিংসার ভাব এখনও দূর হয় নাই। দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস্" সংবাদ দিতেছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেল এক গুপ্ত হুকুমনামা (secret memorandum) জারি করিয়াছেন। উহাতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যে-সমস্ত গ্রামের লোকেরা আকালী আন্দোলনে যোগ দিয়াছে, সেইসব গ্রাম হইতে সৈন্যবিভাগে কোনো লোক লওয়া হইবে না। কেবল ইহাই নয়,—গুপ্ত হুকুমনামায় আরও আছে, যে-সমস্ত শিখ নিজে বা তাহাদের পরিবারের মধ্য দিয়া কোনোরূপে আকালী আন্দোলনের সহিত জড়িত, তাহাদিগকেও সৈন্যদলভুক্ত করা হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এইরকম করিয়া আকালীদের দমন করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। প্রায় তিন বছর ধরিয়া দমননীতি চলিতেছে—কিন্তু আকালীদের মনকে ভয়-পীড়িত করিতে গবর্ণমেণ্ট এখনও পারেন নাই।

শিবনেরী দুর্গের যে-বাড়ীতে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন সেই বাড়ীটি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট হইতে মেরামত এবং সংস্কার করা হইবে। এই কার্য্যদ্বারা গবর্ণমেণ্ট সত্যই শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমস্ত বিভাগের কেরানীসমূহের নিয়োগকালে, অনুন্নতশ্রেণীর মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার লোক লইতে হইবে। ঐ সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ জেলা ও বিভাগানুসারে শতকরা ৩৩ জন হইতে ৬০ জন পর্য্যন্ত হইতে পারে। মুসলমানদিগকে লোক সংখ্যার ন্যায্য অনুপাতে লওয়া হইবে এবং সিন্ধুপ্রদেশে শতকরা ৫৫ জন মুসলমান লওয়া হইবে।

বোম্বাই-দিল্লী টেলিফোন লাইন বর্ত্তমানে সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে। সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক "কলে"র জন্য ৫, ভাড়া। সংবাদপত্রের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রত্যেক "কলে"র জন্য আড়াই টাকা দিতে হইবে। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে প্রত্যেক "কলে"র জন্য আড়াই টাকা দিতে হইবে, কিন্তু সংবাদপত্র সমূহকে ঐ সময়ের জন্য ১।০ দিতে হইবে। প্রত্যেক "কল" তিন মিনিটের জন্য হইবে।

কিছুকাল যাবৎ সালেমের ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ভীরনমের আদি-দ্রাবিড়দিগের মধ্যে নবজাগরণ পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছে না, সুতরাং তাহাদের স্বার্থও যথারীতি সংরক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য তাহারা নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণার্থ একটি সমিতি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়। তাহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া তাহারা কুপ্পন নামক জনৈক নেতার নেতৃত্বে মন্দির প্রবেশ ও সংক্রান্তি মেলায় বিশেষভাবে যোগদানের আন্দোলন চালাইতে থাকে। কেহ-কেহ হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অশিক্ষিতেরা জোর করিয়া মন্দির প্রবেশ, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের গ্রামে গমন করিয়া তাহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে। কল্লারগণ আদি-দ্রাবিড়দের এইসকল উদ্যোগ দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উহাদিগকে বাধা দিতে প্রস্তুত হয়। আদি-দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের যুবকগণ ম্যারিয়াম্মন মন্দিরে প্রবেশ করিতে ও সংক্রান্তি উৎসবে যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। প্রকাশ যে, গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করে এবং রথের দড়ি ধরিয়া টানে। ইহাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে এবং দুইদলে মারপিট আরম্ভ হয়। আদি-দ্রাবিড়দের প্রায় ২০ খানি ঘর পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই দলেরই নেতা বিশেষরূপে জখম হইয়াছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা, আদি-দ্রাবিড়দিগকে গ্রামে কাজ করিতে দিতেছে না, দোকানদারগণও তাহাদের প্ররোচনায় পড়িয়া আদি-দ্রাবিড়দের নিকট খাদ্যসামগ্রী কিছুই বিক্রী করিতেছে না।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী দুই দলের বিবাদ আরও পাকাইয়া উঠে এবং ভয়ঙ্কর মারপিট হয়। ফলে আদি-দ্রাবিড়দের নেতা কুপ্পন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর তিনজন আদি-দ্রাবিড়ও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। এই ব্যাপারে পুলিশ এক অভিযোগ আনয়ন করা ছাড়া আর কি করিয়াছে, তাহার কোনো খবর নাই। দেশের যাঁহারা নেতা, তাঁহারা কাউন্সিলে দেশ উদ্ধার এবং স্বরাজ লাভ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সুতরাং এইসকল ছোট কাজে মন দিবার সময় তাঁহাদের নাই। হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে শুনিয়া অনেকেই চমকাইয়া উঠে, কিন্তু দলে-দলে লোক যখন খৃষ্টান বা মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে, তখন সেদিকে কাহারো চোখ পড়ে না। আর্য্য সমাজ এ-বিষয়ে কিছু-কিছু কাজ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ জাতির লোকেরাই দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

ডাঃ মুথু বলিতেছেন যে ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগের ক্রমবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষ করিয়া সহরগুলিতে এই রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে সহর হইতে ক্রমে-ক্রমে গ্রামেও এই রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে। ডাঃ মুথু বলেন যে ভারতে প্রতি তিনজন মৃত লোকের মধ্যে একজন যক্ষ্মা রোগী। তাঁহার মতে বোম্বাই এবং কলিকাতার যত লোক সংখ্যা, তাহা অপেক্ষাও বেশী লোক ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগে মরে। এই সংখ্যা প্রায় ২৫।৩০ লাখ হইবে। ঔষধ দিয়া এই রোগের প্রতিকারের চেষ্টা, বড়ি দিয়া ভূমিকম্প থামাইবার মতন ব্যর্থ প্রয়োগ হইবে। পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই রোগ বেশী—যেমন মুসলমান নারীদের মধ্যে। কিন্তু যাহাদের মধ্যে পর্দ্দার চলন নাই তাহাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায় না। ব্রহ্মদেশের নারীদের মধ্যে এই রোগ নাই বলিলেই হয়। অনেকের মতে গরুর দুধ ব্যবহারের জন্যই যক্ষ্মার প্রকোপ বেশী হয়, কিন্তু তাহা ভুল কারণ ভারতবর্ষের গরুদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের জল-হাওয়া ম্যালেরিয়া এবং সামাজিক রীতিনীতি যক্ষ্মা-প্রসারে অনেক সহায়তা করে। বাল্য-বিবাহও একটি প্রধান কারণ।

ডাঃ মুথুর মতে যক্ষ্মাকে চিকিৎসা-সমস্যা অপেক্ষা সামাজিক-

সবচেয়ে বড়ই ভালো। সকল খাদ্যের মূল উপযুক্ত আহার লাভ করা। যে শরীর উপযুক্ত আহারে বঞ্চিত, সেই শরীর সকল রোগেই অতি সহজে আক্রান্ত হয়। কোনো রোগকেই বাধা দিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। ভারতবর্ষে যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসার জন্ত তেমন ভালো কোনো বন্দোবস্ত নাই। ৩১ কোটি লোকের জন্ত মাত্র ৬টি খোলা-হাওয়া স্যানিটোরিয়াম্ বা স্বাস্থ্যনিবাস ভারতবর্ষে আছে।

ডাঃ মুথু এই রোগ সম্বন্ধে আজীবন অনেক অনুসন্ধান এবং পাঠ করিতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থা-মত যদি ভারতবর্ষে যক্ষ্মা রোগ তাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে অনেক উপকার হইবার আশা আছে।

বহুকাল হইতে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত ভাগে অবস্থিত পার্ব্বত্য কাচিন, চিনস এবং নাগা জাতির মধ্যে নরবলি ও দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান আছে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের গভর্ণর সার হারকোর্ট বাট্‌লার, ঐ সমুদয় পার্ব্বত্য স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীগণকে ঐ বর্ব্বর প্রথা দুইটি উঠাইয়া দিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু নাগাজাতি নরবলি দেওয়া সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহারা বলে যে, পুরুষানুক্রমে ঐ-প্রথা তাহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে; ঐ প্রথা বন্ধ করিয়া দিলে পূর্ব্বপুরুষের আত্মা রুষ্ট হইবে এবং তাহদের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইবে। কাজেই তাহারা ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।

সম্প্রতি ব্রহ্মের গবর্ণর ঐ-সমুদয় পার্ব্বত্য বাসীগণকে লইয়া একটি সভা আহূত করেন এবং উপস্থিত লোক-সমূহকে নানাপ্রকার উপদেশ দ্বারা ঐ হিংস্র প্রথা বন্ধ করিয়া দিতে বলেন। যে কয়েক জন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে সূচ কাঁচি প্রভৃতি উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়। লাট বাহাদুর পার্ব্বত্যবাসীগণকে গ্রামোফোন শুনাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত করেন। এই উপলক্ষে কয়েক জন দাসকে মুক্তি-প্রদান করা হয়। আশা করা যায় এই প্রচেষ্টার ফলে ব্রহ্মদেশ হইতে নর-বলি এবং দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন হইবে।

কোচিনের বিখ্যাত সম্পাদক এবং মিউনিসিপ্যালিটির সদস্ত শ্রীযুক্ত এম ভি পিলাই মিউনিসিপ্যাল গৃহে আগুন লাগাইবার অভিযোগে ধৃত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এই পত্রে জানা যায় যে তিনি পুলিসের অতি-অপমান-জনক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের জীবন শেষ করিয়াছেন। এই সংবাদ পুলিশের পক্ষে অতি প্রশংসনীয়! গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার কোন-প্রকার প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

লেডী রেডিং দিল্লীতে শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছেন। মৌলানা মহম্মদ আলী উক্ত প্রদর্শনীতে শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি, যাহাতে শিশুদের প্রতি পিতামাতারা বিশেষ যত্ন অবলম্বন করেন, তাহার জন্ত আবেদন করেন। তিনি বলেন যে পিতামাতা শিশুদের জীবন গঠন-সম্বন্ধে উপযুক্ত যত্ন অবলম্বন করেন না, তাহাদের সন্তান জন্মাইবার কোনো অধিকার নাই। মৌলবী সরফরাজ হোসেন বলেন, যাঁহারা দুর্ব্বল শিশু জন্ম দান করেন, তাঁহাদের জরিমানা হওয়া উচিত।

উদয়পুর রাজ্য-সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্ট অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, মহারাণা অবশ্য ঐইসম্বন্ধে একটি তদন্ত কমিটির উপর নির্ভর করিতে পারিতেন এবং প্রকাশ যে, তিনি সেরূপ চেষ্টাও বাকি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যেখানে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের উপর কোনো বিষয় নির্ভর করে, সেখানে তদন্তের ফল যে কিরূপ হয়, ভারতের জনসাধারণ সেই অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত নহে। উদয়পুর রাজ্যের সহিত ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সন্ধির ব্যত্যয় করিয়া এমন-এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে দেশীয় রাজন্তবর্গের কাহার ভাগ্যে কখন কি উপস্থিত হয়, বলা অসম্ভব।

মহারাণা, তদীয় পুত্রকে যথারীতি শিক্ষিত এবং রাজ্যশাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্ত ইংরেজ শিক্ষক রাখিয়া তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ে যাহাতে বিশেষ উন্নতি হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহারাজকুমারের স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো না থাকায় মহারাণা সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্ত ভালো-ভালো ডাক্তারও নিয়োগ করিয়াছিলেন। যাহাতে মহারাজ-কুমার মহারাণার গৌরবান্বিত বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হন, সেইজন্ত মহারাণা তাঁহাকে মাঝে-মাঝে রাজ্য-শাসন বিষয়ে কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিতেন। কিন্তু মহারাণার এই প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই ব্যর্থ হইয়াছে এবং মহারাজ-কুমার সর্ব্বদাই তাঁহার স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখাইয়া এইসকল গুরুতর বিষয় এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই ইহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে যে, বর্ত্তমানে যখন মহারাণাকে বাধ্য হইয়া তদীয় পুত্রের হস্তে রাজ্য-শাসন ক্ষমতা বহুলাংশে অর্পণ করিতে হইয়াছে, তখন তিনি অনেক সময়েই এই ক্ষমতা উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিবেন না। মহারাজ কুমার চতুর্দ্দিকে অসৎ ও অশিক্ষিত উপদেষ্টা কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। কারণে-অকারণে অযথা রাজ্যের বহু অর্থ এজন্ত নষ্ট হইতেছে, এবং অকারণে নূতন-নূতন পদের সৃষ্টি হইয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছে। একটি ঘটনার প্রকাশ যে, মহারাজকুমার মহারাণার আদেশ অমান্য করিয়া একজন মন্ত্রীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই-প্রকার অনেক ব্যাপারে, যেসমস্ত সর্ত্তে মহারাণা পুত্রের হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যত্যয় করা হইতেছে। মহারাজকুমার তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্তই হউক বা অন্ত কারণেই হউক, শাসন বিষয়ে অভিজ্ঞানলাভ না করিতে পারায় তাঁহার শাসনকার্য্যে প্রতিনিয়তই এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। তাঁহাকে তাঁহার এই অনভিজ্ঞ অবস্থায় শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিতে মহারাণাকে বাধ্য করিয়া রাজ্যের যে ক্ষতি সাধিত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। গবর্ণমেণ্টের যদি মহারাজকুমারকে শাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে মহারাণার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াই শাসন বিষয়ে দক্ষ করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্যে ভারত-গবর্ণমেণ্টের এইপ্রকার কোনো ইচ্ছা আছে কিনা, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।
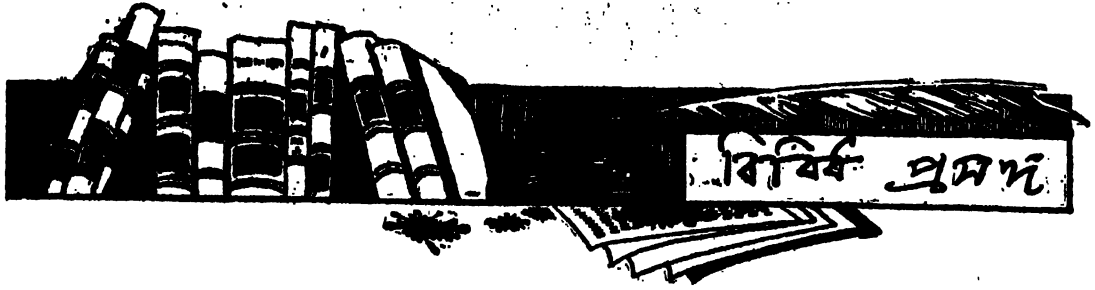
সম্মতির বয়স

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নারীদের সম্মতির বয়স বাড়াইয়া দশ হইতে বার বৎসর করা হয়। তখন দেশে হিন্দুদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে শ্রীযুক্ত (এখন স্যার্) হরি সিং গৌড় ইহা পুনর্ব্বার বাড়াইয়া চৌদ্দ করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের খস্ড়া উপস্থাপিত করেন। সভ্যদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত এক কমিটির হস্তে এই বিল্‌টি বিবেচনার জন্য অর্পিত হয়। কমিটি সাধারণতঃ সম্মতির বয়স চৌদ্দ রাখিতে সম্মত আছেন, কিন্তু বিবাহিতা বালিকাদের স্বামীর সম্পর্কে উহা তের করিতে বলিয়াছেন।

অপরিণতদেহা বালিকার শারীরিক মিলন স্বামীর সহিত হউক বা অপর কোন পুরুষের সহিতই হউক,—শারীরিক কুফল উভয়ক্ষেত্রেই সমান হইবে। সুতরাং সম্মতির বয়স স্বামীর সম্বন্ধে কম করিবার কোন কারণ নাই। তবে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে, যে, এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় অতি অল্প বয়সে পুরুষজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয় মানুষেরা স্বামীস্ত্রীরূপে একত্র বাস করিয়া থাকে; এবং কখন-কখন, স্ত্রীর বয়স কত, তাহা স্বামীর ঠিক জানা না থাকিতেও পারে। এইজন্য কোন স্বামী প্রস্তাবিত আইন ভঙ্গ করিলে অন্য পুরুষের চেয়ে তাহার দণ্ড কিছু লঘু করা অসঙ্গত বা অযৌক্তিক না হইতে পারে। এইরূপ লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা হইলে, তাহা অবশ্য আগামী দুই তিন বা জোর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিয়া, পরে সকল অপরাধী পুরুষেরই শাস্তি এক করা উচিত হইবে।

আমরা সম্মতির বয়স ১৪ করার পক্ষপাতী এইজন্য, যে, উহা কতকটা আদর্শের দিকে উন্নতির লক্ষণ; কিন্তু আমরা উহা যথেষ্ট মনে করি না। তাহার দুই-একটি কারণের উল্লেখ করিতেছি।

স্বামীর সহিত পত্নীরূপে জীবন যাপন করিবার এবং মাতা হইবার শারীরিক যোগ্যতা বালিকাদের চৌদ্দ বৎসর বয়সে জন্মে না; মানসিক যোগ্যতা ত জন্মেই না। নিতান্ত বালিকা বয়সে মাতা হওয়া সত্ত্বেও কতকটা দীর্ঘজীবী নারীর দুই-চারিটা দৃষ্টান্ত, কিম্বা এরূপ মাতার দুই চারিজন কতকটা বিখ্যাত ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী সন্তানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বাল্য-মাতৃত্বের ফলাফল নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। সমুদয় জাতির মধ্যে জননীদের জীবনের দৈর্ঘ্য ও স্বাস্থ্য এবং সন্তানদের দুর্বলতা সবলতা ও দীর্ঘজীবিতার দ্বারা বাল্য-মাতৃত্বের ফলাফল বিবেচিত হইবে। আমাদের দেশে পনর (১৫) বৎসরের ও তাহার কাছাকাছি বয়সের নারীদের মৃত্যুর হার, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় রিপোর্টে হঠাৎ খুব বেশী দেখা যায়। বাল্য-মাতৃত্ব এই বৃদ্ধির কারণ। দারিদ্র্য ব্যাধি এবং বাসগৃহের, গ্রাম ও নগরের এবং দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা প্রভৃতি মৃত্যুর অন্য যে-সকল কারণ আছে, তাহা সকল বয়সের এবং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়জাতীয় মানুষের পক্ষে সমভাবে বিদ্যমান; কেবল বাল্য-মাতৃত্ব পনর (১৫) ও তাহার কাছাকাছি বয়সের বালিকাদের মৃত্যুর একটি অনন্য-সাধারণ ও বিশেষ কারণ। এইজন্য উহাই তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই ভয়ানক অবস্থা দূর করিতে হইলে বাল্য-মাতৃত্ব নিবারণ করা আবশ্যক। তাহার জন্য দুইপ্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। প্রথম, বাল্য-বিবাহ নিবারণ। অনেকে মনে করেন ও বলেন, যে, বালিকাদের বিবাহ অল্পবয়সে দিলেও যদি তাহাদিগকে বেশী বয়সে শ্বশুর-বাড়ী পাঠানো যায় এবং তৎপূর্ব্বে তাহাদের পত্নী-জীবন আরম্ভ যাহাতে না হয় সে-দিকে দৃষ্টি রাখা হয়, তাহা হইলে বাল্য-মাতৃত্ব নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু

কার্য্যতঃ তাহা হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। বধূ বালিকা হইলেও, অধিকাংশ স্থলে স্বামীরা যুবক বা প্রৌঢ় হওয়ায়, শাস্ত্রীয় আচারও অনেক স্থলে পালিত হয় না। এইজন্য বাল্য-বিবাহই বন্ধ করা দরকার। দ্বিতীয় উপায়, আইনে সম্মতির বয়স বৃদ্ধি। সমাজ যদি নিজ হিতাহিত-সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে সমর্থ থাকিত, তাহা হইলে আইনের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সমাজের অবস্থা বুঝিয়া আইন করা আবশ্যক মনে করি।

আইনে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, একুশ বৎসর বয়স হইবার আগে মানুষ নিজের সম্পত্তির দান-বিক্রয়াদি কোন ব্যবস্থা করিবার মত বুদ্ধির পরিপক্কতা লাভ করে না। কিন্তু বর্ত্তমান আইনে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, কাহাকেও নিজের দেহ সমর্পণ করিবার ফলাফল বুঝিবার উপযুক্ত বুদ্ধির পরিপক্কতা বার (১২) বৎসরের বালিকারও জন্মিয়া থাকে! ইহা অপেক্ষা শোচনীয় সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে? নারীর দেহের সহিত কোন সম্পত্তির তুলনাই হইতে পারে না। দেহের সহিত তাহার মনের আত্মার সর্ব্ববিধ কল্যাণ জড়িত। এইহেতু সম্মতির বয়স ১৪ (চৌদ্দ) হইলেও কমই হইবে, বেশী হইবে না। আমাদের বিবেচনায় সম্মতির বয়স স্বামীর পক্ষে আঠার এবং অন্য পুরুষের পক্ষে একুশ হওয়া উচিত। ন্যূনকল্পে এখন উহা সকল পুরুষের পক্ষেই চৌদ্দ থাকিতে পারে। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে উহা সংশোধন করিয়া আমাদের প্রস্তাব-মত ১৮ ও ২১ করা কর্ত্তব্য।

কিছু দিন পূর্ব্বে মিশর দেশে বিবাহিত জীবনে পত্নীর সম্মতির বয়স ষোল (১৬) করা হইয়াছে।

পাপ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার জন্য কেহ নারী সংগ্রহাদি করিলে, আইন-অনুসারে তাহার দণ্ড হয়। অপরাধী ব্যক্তি, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যদি বলে, যে, এইরূপ সংগ্রহে নারীর সম্মতি ছিল, তাহা হইলে তাহাকে দেখাইতে হইবে, যে, নারীর বয়স ন্যূনকল্পে আঠার (১৮) হইয়াছে—গত বৎসর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা বয়সের এই নিম্ন সীমা গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আলোচ্যমান আইনেও পরপুরুষের পক্ষে নারীর সম্মতির বয়স আঠার (১৮) করিতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কোন আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

—

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

রেলের প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া কমিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমে নাই কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভারত গবর্মেণ্টের বাণিজ্যসচিব স্যার্ চার্লস্ ইন্‌স্ দেখাইয়াছেন, যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি করায় ঐ-ঐ শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা এবং ভাড়া হইতে প্রাপ্ত মোট আয় কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাড়া বৃদ্ধি সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বাড়িয়াছে এবং মোট আয়ও বাড়িয়াছে। এই কারণে প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া কমিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমানো হয় নাই। অর্থাৎ বাঁধিয়া মারিলে যাহারা সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের কষ্টের লাঘব করিবার প্রয়োজন নাই।

বাণিজ্যসচিব যে-কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক খুঁত আছে। ভাড়া বৃদ্ধি করায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ও আয় কমিয়া যাওয়ার অনেক কারণ আছে। ঐ-ঐ শ্রেণীতে সম্পন্ন লোকেরা ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভ্রমণ সখের ও প্রয়োজনের, দুই রকমের। ভাড়া বৃদ্ধি করায় তাঁহারা সখের ভ্রমণ কিছু কমাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। তা ছাড়া, প্রথম শ্রেণীর নীচে আছে দ্বিতীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচে আছে মধ্যম শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণীর নীচে আছে তৃতীয় শ্রেণী; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর নীচে চতুর্থ শ্রেণী নাই। এই কারণে উচ্চতর শ্রেণীগুলির ভাড়া বৃদ্ধি হওয়ায়, ঐসব শ্রেণীর যে-সকল যাত্রী প্রয়োজনবশতঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ-কেহ নিম্নতর বা নিম্নতম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকিবেন। তজ্জন্য উপরের শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে যাত্রী কমিয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যাপুষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর নীচে অন্য কোন শ্রেণী না থাকায় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভ্রমণ কোনো কোন স্থলে সখের ভ্রমণ না হইয়া সকল স্থলেই প্রয়োজনের ভ্রমণ

হওয়ায় যাত্রী কমে নাই; বরং ভাড়া বৃদ্ধির পূর্ব্বে যেমন স্বভাবতঃ বৎসরের পর বৎসর যাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছিল, সেইরূপ বৃদ্ধিও কতকটা হইয়াছিল।

চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী থাকিলে তৃতীয় শ্রেণীরও যাত্রী এবং মোট আয়ও কমিতে দেখা যাইত। কথিত আছে, ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সাহেবকে তিনি কেন তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যেহেতু চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী নাই।" তিনি অবশ্য ইচ্ছা করিলে প্রথম শ্রেণীতেও ভ্রমণ করিতে পারিতেন, সেরূপ সঙ্গতি তাঁহার ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী না থাকায় বাধ্য হইয়াই বেশী ভাড়া দিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। কথিত আছে, কলিকাতায় এক ফেরীওয়ালা চুনাগলির এক ফিরিঙ্গীর একতলা খোলার ঘরের নিকট চীৎকার করিয়া নিজের জিনিস ফেরী করিতেছিল। তাহাতে ফিরিঙ্গী-গৃহিণীর মেজাজ বিগড়াইয়া যাওয়ায় তিনি দ্বিতলত্রিতলবাসিনী মেম সাহেবদের অনুকরণ করিয়া বলেন, "নীচু যাও, নীচু যাও।" ফেরীওয়ালা বলিল, "মেমসাহেব, নীচেই ত আছি, আরো নীচে কোথায় যাই; আরো, নীচে যাইতে হইলে গর্ত্ত খুঁড়িতে হয়।" আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকেও আরো নীচে যাইতে হইলে মালগাড়ী ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু মালগাড়ীতে যাত্রী লইয়া যাওয়া কেবল খুব ভিড়ের সময় হয় এবং তখনও ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীরই লওয়া হয়; সাধারণতঃ মালগাড়ীতে যাত্রী লইয়া যাইবার বা কম ভাড়া লইবার নিয়ম নাই।

বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইলে আয় কমিয়া যাইবে। ভাড়া কমাইলে যাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া আয় সমান থাকিতে বা বাড়িতে পারে। কিন্তু তাহার উত্তরও ইন্‌স্ দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সংখ্যা কতক বাড়ানো হইবে বটে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইবার মতন কার্‌খানা রেলওয়ের নাই। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী যথেষ্টসংখ্যক বাড়াইবার নিমিত্ত কার্‌খানা আরও বাড়ানো হউক, এবং বিদেশ হইতে অনেক গাড়ী ফর্‌মাইস দিয়া ক্রয় করা হউক, যেমন রেলের এঞ্জিন্ প্রভৃতি অনেক জিনিষ ক্রয় করা হইয়া থাকে। টাকা নাই, বলিবার জো নাই। কেননা, দুই হাজার মাইলেরও উপর নূতন রেল-লাইন পাতিবার জন্য বহু কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে; কিছু কম মাইল পাতিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার টাকাটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা যাইতে পারিত। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপরই যদিও রেলের যাত্রী-বহন-বিভাগের আয় প্রধানতঃ নির্ভর করে, তথাপি তাহারা গরীব ও বর্ত্তমানে শক্তিহীন বলিয়া তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণে রেলওয়ে বোর্ড যথেষ্ট মন দেন না।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে, বিশেষতঃ দূরগামী ট্রেনে ভিড় লাগিয়াই আছে। অনেক গাড়ীতে বসিবার জায়গা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, রাত্রে শুইবার জায়গা ত দূরের কথা। বিলাতের প্রভাবশালী দৈনিক ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান্ লিখিয়াছেন :—

"Third class sleeping accommodation is a railway reform that is long overdue. It is a public convenience which ought to be supplied on public ground, the test ought not to be whether it can be done without involving the railway companies in loss.'

"তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ঘুমাইবার জায়গার বন্দোবস্ত বহু পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। ইহা এরূপ একটি সার্ব্বজনিক সুবিধার জিনিস যাহার ব্যবস্থা লোকহিতার্থ ই করা উচিত; যা রেলওয়ে কোম্পানীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া ইহা করিতে পারেন কি না, সে দিক্ দিয়া উহার বিচার হওয়া উচিত নয়।"

ভারতবর্ষ গ্রেটব্রিটেন্ অপেক্ষা অনেক বড় দেশ, এখানে বিলাত অপেক্ষা রেলে অনেক বেশী দূর যাইতে হয়। সেইজন্য এখানে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে—বিশেষতঃ রাত্রিচর ও দূরগামী ট্রেন্‌সকলে—ঘুমাইবার জায়গায় বন্দোবস্ত বিলাত অপেক্ষাও আবশ্যক। এখানে অনেককে গাড়ীতে দুইতিন রাত্রি কাটাইতে হয়। রেলওয়ে বোর্ডের ১৯২৩-২৪ সালের রিপোর্টে লিখিত আছে, যে, জি আই পি রেলওয়েতে (যাহা জব্বলপুর হইতে বোম্বাই যায়) শুইবার জায়গাওয়ালা নূতন একরকম তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সকল রেলওয়ে লাইনে ইহার প্রচলন হওয়া উচিত।

তৃতীয় শ্রেণীর সকল গাড়ীতে পায়খানা ও তাহাতে প্রচুর জলের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। অনেক গাড়ীতে পায়খানা থাকে না। তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর অনেক পায়খানা অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় থাকে, জল প্রায়ই থাকে না। অনেক পায়খানায় রাত্রে আলো থাকে না। সকল ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বিশ্রামের ঘর থাকা উচিত। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কোন-কোন ষ্টেশনে তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে অনাবৃত স্থানে রোদে-বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিতে হয়। কোম্পানী টিকিট-ঘরগুলি নির্ম্মাণ করাইবার সময় ইহা বিবেচনা করেন নাই যে, তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর যাত্রীরা মানুষ, গাছ-পাথর নহে। লিখিতে যাইতেছিলাম, "কুকুর বিড়াল নহে", কিন্তু মনে পড়িল, গ্রীষ্মের রোদ ও বর্ষার জল কুকুর বিড়ালও পরিহার করে।

যাঁহারা জেণ্টল্‌মেন্, অর্থাৎ পাজামা-হ্যাট্‌কোট্-পরিহিত নহেন, তাঁহাদের জন্য ষ্টেশনসকলে যেসব পায়খানা আছে, তাহা সচরাচর এরূপ অপরিষ্কৃত থাকে, যে, তাহা পশুরাও পরিহার করিবে, মানুষের কথা ত দূরে থাক্।

—

নূতন রেলওয়ে লাইন

রেলওয়ে দ্বারা দেশের কোন সুবিধা ও উপকার হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু অনিষ্ট এবং ক্ষতিও অনেক হইয়াছে। রেলওয়ে দ্বারা জল বাহির হইবার স্বাভাবিক পথ বন্ধ হওয়ায় অনেক প্রদেশে ম্যালেরিয়ার উদ্ভব ও বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অনেক প্রদেশে মারাত্মক জল-প্লাবন হইয়া থাকে। রেলওয়ে থাকায় প্লেগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ সহজে বহুব্যাপী হইয়া যায়। বিদেশী কার্‌খানায় কলে নির্ম্মিত নানা পণ্যদ্রব্য সস্তায় দেশের ছোট-ছোট গ্রামে পর্য্যন্ত নীত হইয়া দেশী হস্তনির্ম্মিত নানা পণ্য-দ্রব্যকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করায় দেশী প্রাচীন বহু পণ্যশিল্প লুপ্ত কিম্বা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, এবং ফলে নানা শ্রেণীর লোক নিরুপায় হইয়া কৃষক ও সাধারণ মজুরের ইতিপূর্ব্বেই সংখ্যাবহুল দলকে পুষ্ট করিয়াছে। তাহাতে অনশন, অর্দ্ধাশন ও দুর্ভিক্ষ বাড়িয়াছে। রেলওয়ের সাহায্যে দেশের খাদ্য নানা শস্য এত বেশী রপ্তানি হয় যে, দেশের লোকদের জন্য যথেষ্ট শস্য দেশে থাকে না, এবং যাহা থাকে তাহাও দুর্ম্মূল্য হয়। এই রপ্তানি ও দুর্ম্মূল্যতার সুবিধা কৃষকেরা পূর্ণ মাত্রায় বা যথেষ্ট পরিমাণে পাইলে অবস্থাটা কিয়ৎ-পরিমাণে মন্দের ভাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা তাহারা পায় না।

রেল বিস্তার হওয়ায় দেশের জল-পথ-সমূহ নানা অঞ্চলে অবহেলিত এবং কোথাও-কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যহানি, এবং অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে। অনেক-রকম জিনিষের বাণিজ্য আছে, যাহাতে খুব দ্রুত মাল বহিবার প্রয়োজন নাই; সেইসব মাল দেশী নৌকায় জলপথে লইয়া গেলেও চলে। বহিবার কাজটি দেশী নাবিকদের হাতে থাকিলে তাহার দ্বারা উপার্জ্জনের একটি পথ দেশী এক-শ্রেণীর লোকদের হাতে থাকে; তা-ছাড়া নৌকা-নির্ম্মাণ-শিল্পটিও জীবিত থাকিয়া এক-শ্রেণীর লোকের জীবনধারণের উপায় হয়। এইজন্য জল-পথ-সকল সুসংস্কৃতভাবে থাকা দর্‌কার। রেলওয়ের দিকে গবর্ণমেণ্টের বেশী ঝোঁক থাকায় জল-পথের প্রতি অবহেলা হইয়াছে।

এইসব কারণে আমরা যত্র-তত্র অবিচারিতভাবে রেল-লাইন বিস্তারের পক্ষপাতী নহি। রেলওয়ের যে-সব অনিষ্টকারিতা দেখাইয়াছি, তাহা না বাড়াইয়া যে-সব অঞ্চলে রেলপথ বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা হউক। কিন্তু তাহারও আগে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সমুদয় অসুবিধা দূর করা একান্ত আবশ্যক।

—

রেলে দেশী কর্ম্মচারী

রেলওয়ে বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে একজনও দেশী লোক নাই। দেশী লোক নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করায়, গবর্মেণ্ট পক্ষ হইতে বলা

হইয়াছে, যে, ঐরূপ পদের জন্ম যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-শালী দেশী লোক নাই। কিন্তু এরূপ যোগ্য কয়েক-জন লোকের নাম অনেক খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। তা-ছাড়া, সাধারণভাবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, মৈশূরের সমুদয় রেল-পথের কাজ দেশী লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়, ঐ রাজ্যে রেলের সব শ্রেণীর কাজ যদি দেশী লোকে করিতে পারে, তাহা হইলে ব্রিটিশশাসিত ভারতে কেন পারিবে না? মৈশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার্ মোক্ষগুণ্ডম্ বিশ্বেশ্বর আইয়া এক-জন বড় এঞ্জিনিয়ার; তিনি রেলের কাজও জানেন। রেলওয়ে বোর্ডের সভ্যেরা তাঁহার মত লোকদের চেয়েও যোগ্য, বলা হাস্যকর।

স্যার্ চার্লস্ ইনস্ বলেন, রেলের উচ্চতম কাজ-সকলে দেশী লোক যে বেশী-পরিমাণে এখনও দেখা যায় না, তাহার কারণ দেশী লোকেরা উচ্চ-শ্রেণীর গেজেটেড কাজে বহুপূর্ব্বে নিয়োগ লাভ করেন নাই, অল্পকাল পূর্ব্বে করিয়াছেন; এইজন্য, উন্নতিলাভ করিতে-করিতে উপরে উঠিতে তাঁহাদের দেরী লাগিবে। কিন্তু দেশী লোকেরা যে বহুপূর্ব্বে গেজেটেড্ শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত হন নাই, কিম্বা তাহার কোন-কোন কাজে নিযুক্ত হইতে হইলে যেরূপ শিক্ষার দর্‌কার তাহার ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্ম করা হয় নাই, সে-দোষটা দেশের লোকদের নহে—দোষ গবর্ন্মেণ্টের ও রেলওয়ে কোম্পানীসকলের।

নীচের দিকের কাজসকলে দেশী লোক যে খুব বেশী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্ম স্যার্ চার্লস্ ফিরিঙ্গীদিগকেও ভারতীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ফিরিঙ্গীরা অবশ্য দেশী লোক বটে। কিন্তু যখন তাহা-দিগকে ভলাণ্টিয়ার্ বা সখের সৈন্য করা হয় ও বন্দুকাদি দেওয়া হয়, যখন তাহাদের জন্য রেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ রাখা হয়, তখন তাহারা ইউরোপীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বাদুড়ের ডিম হয় না, একেবারে ছানা হয়। সেইজন্য তাহারা পাখী নয়, অথচ তাহারা অন্য অনেক স্তন্যপায়ী জীবদের মতন ডাঙায়ও নামে না। এই-জন্য তাহারা কোন দলেই আমল পায় না। ফিরিঙ্গীদের বুদ্ধি থাকিলে তাহারা বাদুড়ের অবস্থা পছন্দ করিত না, এবং বুঝিতে পারিত, যে, ইউরোপীয়েরা বস্তুতঃ তাহা-দিগকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদিগকে অধিকাংশ ভারতীয় হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

স্যার্ চার্লস্‌এর জানা উচিত, যে, রেলের অনেক বিভাগ ফিরিঙ্গীদের একচেটিয়া আছে বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি না, যে, তাহাতে ভারতীয় লোকেরা যথেষ্ট সংখ্যায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, ঐসব বিভাগে অন্যান্য শ্রেণীর ভারতীয়েরা তাহাদের সংখ্যাবাহুল্য-অনুসারে স্থান পাইয়াছে, এবং ফিরিঙ্গীরা তাহাদের সংখ্যার অনুপাত-অনুসারে অল্প-সংখ্যায় কাজ পাইয়াছে।

—

জনৈক কৃতী প্রবাসী বাঙালী

"প্রবাসী"তে আমরা বিস্তর প্রবাসী বাঙালীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ছাপিয়াছি এবং তাঁহাদের কৃতিত্বের কথা লিখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্‌কারী চাকরি করিতেন, তাঁহাদের কথা সে-কারণে "প্রবাসী" হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই। স্যার্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালী; বাংলা দেশেই তিনি জন্মগ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করেন। বিলাতের সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষায় ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন। তাহার পর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে এবং পরে দিল্লী ও সিমলায় নানা রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়া সিবিল্ সার্বিসে পদত্যাগ করিয়া বিলাতে গিয়াছেন। সেই উপলক্ষে গত ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদের দৈনিক "লীডার" যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। লীডার্ বাঙালীর কাগজ নহে, এবং উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকগণও বাঙালী নহেন। এই-জন্য ঐ কাগজের মন্তব্য নিরপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। লীডার যখন এই মন্তব্য প্রকাশ করেন, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্যার্ উপাধি লাভ করেন নাই; এইজন্য তিনি মিষ্টার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"THE HON. MR. CHATTERJI has left for England. While we are confident that he will prove to be a most competent and altogether admirable High Commissioner for India, we cannot but regret that his association with the Government of India has been prematurely determined. Not a public man, Mr. Chatterji still holds liberal views in politics, unlike some other Indian I. C. S. officers nearer home whose antics remind us of the helots who cried with the Spartans. He is an administrator of the first quality and in the sphere of industrial development has to his credit a record of achievement of which any Indian may be proud. Mr. Chatterji being an officer of the United Provinces where he has hosts of friends and admirers, nothing will gratify them more, as nothing can be more in the public interest, than that in due course he may return to us in a more exalted capacity. One word of explanation. It is only because Mr. Chatterji is resigning the Civil Service that we express this wish. Not even for a Chatterji shall we reconcile ourselves to an I. C. S. Governor."

তাৎপর্য্য।—"মাননীয় চাটুজ্যে মশায় ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। যদিও আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে, তিনি একজন খুব যোগ্য ও সম্পূর্ণরূপে প্রশংসার্হ ভারতবর্ষের হাই কমিশনার হইবেন, তথাপি আমরা দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অকালে ছিন্ন হইল। যদিও তিনি একজন বেসরকারী জনসেবক নহেন, তথাপি রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি উদার মত পোষণ করেন। তিনি এবিষয়ে আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী অন্য কোন-কোন দেশী সিবিলিয়ানদের মতন নহেন! এইসব কর্ম্মচারীর হাস্যকর চালচলন আমাদিগকে স্পার্টাবাসী হেলট্‌নামধেয় সেইসকল দাসের কথা মনে পড়াইয়া দেয়, যাহারা আপনাদিগকে তাহাদের প্রভু স্পার্টান্‌দিগের সমশ্রেণীস্থ ভাবিয়া তাহাদের সহিত চীৎকার করিত। তিনি একজন প্রথম-শ্রেণীর যোগ্যতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালক, এবং পণ্যশিল্প-বিস্তার-ক্ষেত্রে তাঁহার এরূপ কৃতিত্ব আছে, যাহা যে-কোন ভারতীয় নিজের গৌরবের বিষয় মনে করিতে পারেন। চাটুজ্যে মশায় আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের রাজপুরুষ ছিলেন, এবং সেখানে তাঁহার বিস্তর বন্ধু ও অনুরক্ত লোক আছেন। এইজন্য যদি তিনি যথাকালে উন্নততর পদে (অর্থাৎ গবর্ণরের পদে) নিযুক্ত হইয়া এই প্রদেশে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা তাঁহার বন্ধু ও অনুরক্ত লোকদিগের বেশী সন্তোষের বিষয় আর কিছুই হইবে না, এবং তাহা অপেক্ষা সার্ব্বজনিক মঙ্গলের অধিকতর অনুকূল ঘটনাও আর কিছু হইবে না। একটা কথা খুলিয়া বলা দরকার। চাটুজ্যে মশায় সিবিল্‌ সার্ভিসে ইস্তফা দিতেছেন বলিয়াই আমরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি নতুবা, চাটুজ্যে মশায়ের মতন একজন যোগ্য লোকের খাতিরেও আমরা সিবিলিয়ানের গবর্ণর-পদপ্রাপ্তিতে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম না।"

—

বঙ্গের বার্ষিক সরকারী আয়

ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বমন্ত্রী আগামী ১৯২৫-২৬ সালের সমগ্র ভারতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ্ করিয়া দেখাইয়াছেন আনুমানিক আয় হইতে আনুমানিক ব্যয় বাদ দিয়া তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। আলোচ্য বৎসরে যদি কোন আকস্মিক কারণে অনুমিত আয় না হয়, কিম্বা যদি কোন আকস্মিক কারণে ব্যয় বেশী হয়, সেইজন্য উদ্বৃত্ত টাকা হইতে চুয়াত্তর লক্ষ টাকা হাতে রাখিয়া তিনি ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক যে টাকা পান, কোন-কোন প্রদেশের সেই কর আংশিক মাফ করিবার প্রস্তাব করেন। যথা মান্দ্রাজকে ১২৬ লাখ, আগ্রা-অযোধ্যাকে ৫৬ লাখ, পাঞ্জাবকে ৬১ লাখ এবং ব্রহ্মদেশকে ৭ লাখ মাফ করা হইবে। তদ্ভিন্ন বাংলা দেশের বার্ষিক দেয় যে ৬৩ লাখ টাকা আগে যে-সময়ের জন্য মাপ করা হইয়াছিল, তদুপরি তাহা আরও তিন বৎসরের জন্য মাফ্ করা হইবে।

কি কারণে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, রাজস্ব-মন্ত্রী তাহা তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এবং সেই বক্তৃতা সমুদয় দৈনিক কাগজে আদ্যোপান্ত বা অধিকাংশ বাহির হইয়াছে। অনুমিত রাজস্বের যে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপও হইতে পারিত। যথা, লবণের কর কমান যাইতে পারিত, পোষ্টকার্ড ও চিঠির মাশুল প্রভৃতি ডাক-মাশুল কমান যাইতে পারিত, দেশী মিলের সূতা ও কাপড়ের শুল্ক রহিত করা যাইতে পারিত। তাহা না করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা উত্তম হইয়াছে কি না, তাহার আলোচনা এখন করিব না। এখানে কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, দেশী সূতা ও কাপড়ের মিলসকলকে যে-শুল্ক দিতে হয়, তাহা রহিত না হওয়ায় বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা চটিয়াছে; কারণ অধিকাংশ মিল ঐ প্রদেশে স্থিত। তা-ছাড়া, প্রাদেশিক কর যে-যে প্রদেশের সম্পূর্ণ বা আংশিক মাফ করা হইয়াছে, বোম্বাই তাহার মধ্যে না থাকাতেও বোম্বাইয়ের রাগ হইয়াছে। এই রাগের মাত্রা এত বেশী হইয়াছে, যে, এই বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্য গত ২রা মার্চ্চ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে আগে হইতে যে-কাজ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার আলোচনা স্থগিত

রাখা হয়। ঐ অধিবেশনে উক্ত ব্যবস্থাপক সভার কোন-কোন সভ্য বাংলা দেশের উপরও ঝাপ ঝাড়েন। তাহা করা উচিত হয় নাই। কারণ, বাংলা দেশকে যদি ভারত-গবর্মেণ্ট কোন অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা বাংলা দেশের হুকুমে বা তাহার প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া করেন নাই। যুদ্ধটা ভারত-গবর্মেণ্টের সহিতই হওয়া উচিত; প্রদেশে-প্রদেশে রেষারেষি ও যুদ্ধ করিয়া কোন লাভ নাই।

বাংলা দেশের প্রতি বোম্বাইয়ের ঈর্ষ্যা হইবার যে কোন ন্যায্য কারণ নাই, তাহা আমরা নীচে দেখাইতেছি।

প্রত্যেক প্রদেশে যত-প্রকারের যত ট্যাক্স, খাজনা, বা অন্য নামে যাহা-কিছু আদায় হয়,-তাহার সমস্তটাই সেই প্রদেশের গবর্মেণ্টের ব্যয়ের জন্য তাহার হাতে থাকে না; কোন-কোন অংশ ভারত গবর্মেণ্টের হাতে যায়, বাকী প্রাদেশিক রাজকোষে থাকে। যেমন জমির খাজনা, জলসেচন ট্যাক্স, আবকারী শুল্ক, ও বিচার-বিভাগের ষ্ট্যাম্পের আয় প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট পান, এবং ইন্‌কম্ ট্যাক্স ও সাধারণ ষ্ট্যাম্পের আয় ভারত-গবর্মেণ্ট পান। তা-ছাড়া, ভারত গবর্মেণ্টের অবশ্য আরও আয় আছে, এবং প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট-সমূহ ভারত গবর্মেণ্টকে নয় কোটি টাকার উপর প্রতিবৎসর দিয়া থাকেন।

এইপ্রকার বন্দোবস্তের দোষ-গুণ আলোচনা করা বর্ত্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই দেখাইতে চাই, যে, এইরূপ বন্দোবস্তে বাংলা দেশের এবং অন্য কয়েকটি বড় প্রদেশের সরকারী আয় কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমরা চারিটি প্রদেশের আনুমানিক সরকারী আয় নীচে তালিকায় দেখাইতেছি।

১৯২৫-২৬ সালের আনুমানিক প্রাদেশিক সরকারী আয়

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	আয়	জনপ্রতি আয়
বোম্বাই	২৬৭০১১৪৮	১৫৬৮০০০০০৲	৫৸৶০
মান্দ্রাজ	৪২৭৯৪১৫৫	১৬৫১৭৯১০০৲	৩৸৶০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৬৫১০৬৬৮	১৩৪২৯৩০০০৲	২৸৵০
বাংলা	৪৭৫৯২৪৬২	১০৪৫০০০০০৲	২৶০

উপরের তালিকায় আমরা অঙ্ক কষিয়া দেখিতেছি, যে, বাংলা দেশে সরকারের হাতে দেশের কাজ চালাইবার জন্য বড় উক্ত চারিটি প্রদেশের মধ্যে জন প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা কম টাকা থাকে। বোম্বাইয়ের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু জন প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা বোম্বাই সরকারের হাতে থাকে। ইহার মানে ভাল করিয়া বুঝা দরকার। যদি বঙ্গের শাসনকর্ত্তারা সর্ব্বান্তঃকরণে কেবলমাত্র দেশের ও দেশ-বাসীর মঙ্গলের জন্য সরকারী আয়ের টাকাটি খরচ করিতে চান, তাহা হইলেও তাঁহারা বাংলার অধিবাসীদের প্রত্যেকের জন্য কেবল ২৶০ খরচ করিতে পারিবেন। অন্য তিনটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদের ঐরূপ শুভ ইচ্ছা হইলে বোম্বাইয়ে প্রত্যেক মানুষের জন্য ৫৸৶০, মান্দ্রাজে প্রত্যেক মানুষের জন্য ৩৸৶০, এবং আগ্রা-অযোধ্যায় প্রত্যেক মানুষের জন্য ২৸৵০ খরচ করা চলিবে। ইহার কারণ এই, যে, বাংলার লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অথচ সরকারী আয় সর্ব্বাপেক্ষা কম। পঞ্জাবকে আমরা আমাদের তালিকার মধ্যে ধরি নাই। কিন্তু তাহারও অবস্থা এবিষয়ে বাংলার চেয়ে ভাল। কারণ ১৯২৫-২৬ সালে পঞ্জাবের আনুমানিক আয় হইবে এগার কোটি টাকার উপর এবং উহার লোকসংখ্যা ২৫১০১০৬০। অর্থাৎ উহার শাসকেরা কেবলমাত্র দেশবাসীদের হিতার্থ সরকারী রাজস্ব ব্যয় করিতে চাহিলে প্রত্যেক মানুষের জন্য ৪৷৵০ ব্যয় করিতে পারিবেন।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে ভারত-সরকারের "আদুরে" ছেলে প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা উচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত এ ভি ঠক্করে নামক একজন সভ্যের মেজাজ বিগড়াইয়া যাওয়ায় তিনি বলেন, বোম্বাই প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গের সরকারী রাজস্ব কম নহে। একথা যে সত্য নহে, তাহা উপরের তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে।

অনেকে এইরূপ মনে করেন, বাংলা দেশে জমির খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ায় উহার সরকারী আয় কম হইয়াছে; সুতরাং অন্য প্রদেশসকলের সহিত তুলনায় যদি বঙ্গের সরকারী আয় কম হয়, তাহা হইলে তাহাতে

বাঙালীদের অভিযোগ করিবার কিছু নাই। এজন্য আমরা অভিযোগ করিতেছিও না। কিন্তু এই খাজনা-সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। তাহা বলিবার পূর্ব্বে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গবর্ন্মেণ্ট করিয়াছিলেন, বাংলা দেশের লোকেরা করেন নাই। সুতরাং উহাতে কোন কুফল বা অসুবিধা হইয়া থাকিলে তাহার জন্য বাংলার অধিবাসীদিগকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দণ্ডিত করা উচিত হইবে না। উহাতে কোন সুবিধা হইয়া থাকিলে, তাহা বাংলার জমিদারেরা ভোগ করিতেছেন, সর্ব্বসাধারণে নহে।

আমরা ১৯১১ ১২ হইতে ১৯২০-২১ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের "ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট"নামক পুস্তক হইতে ১৯২০-২১ সালের কতকগুলি অঙ্ক নীচের তালিকায় দিতেছি।

প্রদেশ	বর্গ-মাইলে ভূমির পরিমাণ	নেট্ ভূমি-রাজস্ব
মান্দ্রাজ	১৪২২৬০	৩৯৯৬৫১১৪৲
বোম্বাই	১২৩৬১১	২৯৯০৪৩২৪৲
বাংলা	৭৬৮৪৩	২২৯০৩০১৩৲
আগ্রা-অযোধ্যা	১০৬২৯৫	৫৪৪৮২৪৬৯৲

প্রদেশের বিস্তৃতি বা আয়তন বিবেচনা করিলে বোম্বাইয়ের লোকেরা গবর্ন্মেণ্টকে বাংলার লোকদের চেয়ে বেশী খাজনা দেন না, বরং কম দেন; আগ্রা-অযোধ্যার লোকেরা বেশী দেন বটে। কিন্তু তাঁহারা বঙ্গের বিরুদ্ধে চীৎকার জুড়েন নাই। মান্দ্রাজের লোকেরাও সে-প্রদেশের আয়তন অনুসারে জমির মোট খাজনা বাংলা অপেক্ষা বেশী দেন না। তাঁহারাও অবশ্য চীৎকার জুড়েন নাই।

বলা যাইতে পারে, যে, প্রদেশ বিস্তৃত বা বৃহৎ হইলেই ত হইবে না, কত জমিতে বাস্তবিক চাষ হয়, তাহা দেখিতে হইবে। ১৯২০-২১ সালে কোন্ প্রদেশে কত একার্ কর্ষিত (cultivated) জমি ছিল, তাহার তালিকাও নীচে দিতেছি।

প্রদেশ	কর্ষিত জমি (একারে)
মান্দ্রাজ	৪২৯৫২১২১
বোম্বাই	৪২৬৩৬০৮২
বাংলা	২৮৯৭০৭২৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৮৫৯৪৮৮৩

বোম্বাইয়ের কর্ষিত জমির পরিমাণ বাংলার প্রায় দেড়-গুণ, কিন্তু বোম্বাই বাংলার দেড়গুণ মোট খাজনা দেন না।

কোন্ প্রদেশের জমির গড় উর্ব্বরতা কিরূপ, তাহা জানিবার উপায় আমরা অবগত নহি।

ইন্‌কম্ ট্যাক্স অর্থাৎ আয়ের উপর নির্দ্ধারিত কর ভারত-গবর্ন্মেণ্টের পাওনা। উহা কোন্ প্রদেশ কি পরিমাণে দিয়া থাকেন, তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ১৯১১-১২ হইতে ১৯২০-২১ পর্য্যন্ত ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট (Statistical Abstract for British India from 1911-12 to 1920-21) হইতে শেষ দুই বৎসরের অঙ্ক দিব। ১৯২০-২১এর পরের ঐরূপ কোন বহি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশের প্রথম পংক্তির অঙ্কটি আদায়ী টাকা, দ্বিতীয় পংক্তির টাকাটি আফিস-খরচা; প্রথম হইতে দ্বিতীয় সংখ্যা বাদ দিলেই নেট্ রাজস্ব পাওয়া যাইবে। বড় বড় কয়েকটি প্রদেশের মাত্র উল্লেখ করিব।

ইন্‌কম্ ট্যাক্স

প্রদেশ	১৯১৯-২০ সাল	১৯২০-২১ সাল
মান্দ্রাজ	১৬২৩৫৯৬৫	১৬৬৪৯২৮৪
	১৪৯৩৪১	৩৪৮৭২২
বোম্বাই	৭২৬৫৪৯৮৬	৬৭৯০২২৮৯
	৪৪২৮৮৫	৫৮৪৬৩০
বাংলা	৯৫১২৬৩৩৭	৮৩৯৭৫২৯১
	২৬৬৬২৩	৩১১৪৬৮
আগ্রা-অযোধ্যা	১০৫৫৯৫১৬	৯৫৭২৯০০
	২৬৪৬০১	৩৭২১৬৯

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাংলা দেশ অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা কম ইনকম্ ট্যাক্স দেয় না, বেশীই দেয়। বঙ্গে যত ইনকম্ ট্যাক্স আদায় হয়, তাহা এই প্রদেশের ব্যয়ের জন্য পাওয়া গেলে বিশেষ সুবিধা হইত।

বোম্বাইয়ের একটা অহঙ্কারের বিষয় এই আছে যে, ঐ প্রদেশ কার্পাস পণ্যদ্রব্যের জন্য গবর্ন্মেণ্টকে অনেক টাকা শুল্ক দেয়। কিন্তু কার্পাস শিল্প বোম্বাইয়ের যতটা একচেটিয়া, পাট ও পাটের পণ্য-শিল্প তাহা অপেক্ষাও

বেশী পরিমাণে বঙ্গের একচেটিয়া। ১৯২০-২১ সালে কার্পাস-পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় হইয়াছিল ২,৩০,৯২,৮৭০ টাকা, কিন্তু কাঁচা ও পণ্যদ্রব্যে পরিণত পাটের উপর শুল্ক আদায় হইয়াছিল ৩,২১,১২,৬২৮ টাকা। অতএব এবিষয়েও গবর্ন্মেণ্টকে বাংলা অপেক্ষা বোম্বাই বেশী রাজস্ব দেয় নাই।

বাংলাদেশকে অসুবিধায় ফেলিবার ও জব্দ করিবার জন্য কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বন্দোবস্ত করিয়াছে, বলিতেছি না; কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট-সমূহকে ও ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে যে-যে রকমের রাজস্ব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বাংলাদেশের অসুবিধা হইয়াছে। জমির খাজনার বন্দোবস্ত বঙ্গে চিরস্থায়ী; সুতরাং উহা বিশেষ-রকম বাড়িতে পারে না। উহা প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের পাওনা। ১৯১৬-১৭ হইতে ১৯২০-২১ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গে উহার আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩০৮৮৪১৮৪, ২৯৯৮১৫৮৭, ৩০৫৩০৭৯৬, ৩০০৯৬৫২৭, এবং ৩০৩৯১১৮৩ টাকা। ভিন্ন-ভিন্ন বৎসরে হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর বঙ্গে ভূমির রাজস্ব আগে যেমন হইত, এখনও সেইরূপ হইতেছে, বিশেষ-কিছু বাড়ে নাই। অন্য দিকে, ইন্‌কম্ ট্যাক্স ভারত-গবর্ন্মেণ্টের পাওনা, এবং তাহা ক্রমবর্দ্ধনশীল। ১৯১৬-১৭ হইতে ১৯২০-২১ পর্য্যন্ত বঙ্গে উহা কিরূপ বাড়িয়াছে দেখুন। ১৯১৬-১৭তে উহা ছিল ১৬৮৫৫৪২৮ টাকা। তাহার পর-পর বৎসর উহা হইয়াছে ৩৩৯৬০২৮০, ৩৫০৮৪৬৪২, ৯৫১২৬৩৩৭, এবং ৮৩৯৭৫২৯১ টাকা। জল-সেচনের আয় প্রাদেশিক, কিন্তু অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বঙ্গে উহার আয় অতি সামান্য; কারণ, জলসেচনের খাল প্রভৃতি বাংলাদেশে খুব কম আছে। যথা, বঙ্গে ২৩৬১৩৬; আগ্রা-অযোধ্যায় ১৪০২৮৭৬৭; পঞ্জাবে ৪৬৭৫৫৮৯২; ব্রহ্মে ১৪০৪৮৪৩; বিহার-উৎকলে ২৭৫২১২৭; মান্দ্রাজে ১১৭৩২৪৪৫; বোম্বাইয়ে ২৬১৫১৬৩ টাকা। আবকারীর আয় প্রাদেশিক কিন্তু উহা দেশহিতৈষীরা সর্ব্বত্র কমাইবার চেষ্টা করিতেই বাধ্য। কোর্ট-ফীর আয় প্রাদেশিক; উহাও কমাইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কারণ মোকদ্দমা করিবার প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি এবং উহার সংখ্যা যত কমিবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

কারণ যাহাই হউক, আমরা উপরে দেখাইলাম, যে, বাংলাদেশের লোক-সংখ্যা অন্য যে-কোন প্রদেশের লোক-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলেও উহার কাজ চালাইবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের হাতে পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অপেক্ষা মোট এবং জন প্রতি টাকা কম থাকে। সুতরাং সরকারী টাকার উপর দেশের উন্নতি যে-পরিমাণে নির্ভর করে, বাংলা দেশে তাহা অন্য বড় প্রদেশগুলি অপেক্ষা কম হইবার কথা। তাহার মানে এই, যে, দেশের উন্নতির জন্য বঙ্গের অধিবাসীদিগকে নিজের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও তাহাই করিতে হইবে। দূর ও সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। বাংলা দেশের প্রাদেশিক বজেটে যত টাকা আয় দেখা যায়, তাহা নানা বিভাগের নানা কাজে যেমন করিয়াই ভাগ করা যাক্, কোনটির জন্যই যথেষ্ট হইবে না; কারণ মোট টাকাটাই কম। এইজন্য বজেটের ভিন্ন ভিন্ন বরাদ্দের পরিমাণ-সম্বন্ধে আলোচনা যিনি যত করিতে চান করুন, কিন্তু বঙ্গের মোট আয়টা যাহাতে বাড়ে, ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের মধ্যে টাকা বাঁটিবার নিয়মটা সেইভাবে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

—

বঙ্গে পুলিশের ব্যয়

১৯২৪-১৯২৫ সালে বঙ্গে পুলিশের ব্যয়ের জন্য যত বরাদ্দ ছিল, ১৯২৫-২৬ সালের বজেটে তাহা অপেক্ষা তিন লাখ টাকা বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। তা-ছাড়া, সাড়ে আট লাখ টাকা ধার করিয়া কলিকাতায় পুলিশের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে।

মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় আইন ভঙ্গ অপরাধ নিবারণের জন্য এবং অপরাধীদিগকে ধরিয়া শাস্তি দিবার জন্য পুলিশের প্রয়োজন সকল দেশেই আছে। সুতরাং পুলিশের জন্য ব্যয় করা উচিত নয়, কিম্বা উহা প্রয়োজন-মত বাড়ানোও উচিত নয়, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু অপরাধ নিবারণের জন্য আর-আর যে-সব উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, আমাদের দেশে ব্রিটিশ

গবর্মেণ্ট তাহাতে কখনও যথেষ্ট মন দেন নাই, এখনও দিতেছেন না, ইহা আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি।

এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে অপরাধ-সম্বন্ধে বিলাতের পূর্ব্বতন কারাগার পরিদর্শক মেজর গ্রিফিথস্‌এর লেখা একটি প্রবন্ধ আছে। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলিতেছেন :—

"The growth of criminals is greatly stimulated where people are badly fed, morally and physically unhealthy, infected with many forms of disease and vice. In such circumstances, moreover, there is too often the evil influence of heredity and example. The offspring of criminals are constantly impelled to follow in their parents' footsteps by the secret springs of nature and pressure of childish imitativeness.

"Wherever crime shows itself it follows certain well-defined lines and has its genesis in three dominant mental processes, the result of marked propensities. These are malice, acquisitiveness and lust.........The proportions in which these three categories are manifested have been worked out in England and Wales to give the following figures. The percentage in any 100,000 of the population is :—

Crimes of malice	15 per cent.
Crimes of greed	75 „
Crimes of lust	10 „

তাৎপর্য্য।—"যেখানে লোকেরা ভাল করিয়া খাইতে পায় না, নৈতিক ও দৈহিক অস্বাস্থ্যগ্রস্ত এবং কোন-প্রকার ব্যাধি ও পাপের অধীন, সেখানে অপরাধ খুব বাড়ে। এরূপ অবস্থার বংশের ও দৃষ্টান্তের কুপ্রভাবই কার্য্যকর হয়। অপরাধীদের সন্তানেরা স্বভাবের গুপ্ত কারণে এবং অনুচিকীর্ষা-বশতঃ সর্ব্বদা পিতামাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রণোদিত হয়।......

"যেখানে অপরাধ দেখা দেয়, তথায় তাহার উৎপত্তি প্রধানতঃ মানুষের তিনটি প্রবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। যথা—দ্বেষ, আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি, এবং যৌন প্রবৃত্তি। অপরাধ শতকরা কি-পরিমাণে কোন্ প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন, বিলাতে তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিবাসীদের প্রতি-লক্ষে অপরাধের উদ্ভব হয়—

দ্বেষ হইতে	শতকরা	১৫,
আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি হইতে শতকরা		৭৫
যৌন প্রবৃত্তি হইতে	শতকরা	১০

বিলাতে গড়ে যে-ফল পাওয়া গিয়াছে, অন্য সব দেশেও ঠিক তাহা সত্য না হইতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, সকল দেশেই চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যাই বেশী।

যে-যে প্রবৃত্তি হইতে অপরাধের উদ্ভব হয়, তাহা সব সময়েই স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে না; তাহারা পরস্পর সম্পৃক্ত।

পুলিশ নিযুক্ত রাখিয়া ও শাস্তি দিয়া অপরাধের মূল উচ্ছেদ কখন করা যায় না। নৈতিক ও দৈহিক অস্বস্থতা ও ব্যাধি, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, প্রভৃতি দূর করিতে পারিলে অপরাধ নিবারণের সুবিধা হয়। মানুষ যদি পেট ভরিয়া খাইতে পায়, লজ্জা ও ভব্যতা রক্ষার উপযোগী কাপড় পায়, সুনীতি ও ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী বাসগৃহ পায়, পরিশ্রমান্তে যথেষ্ট অবসর পায়, নির্দ্দোষ এবং পাশব প্রবৃত্তির অনুত্তেজক ক্রীড়া ও আমোদে এবং জ্ঞানধর্ম্মানুশীলনে অবসর-কাল কাটাইবার সুযোগ পায়, এবং বাল্যকাল হইতে দৈহিক, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইয়া সৎসংসর্গে সুনীতির পরিপোষক সমাজে বাস করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে অপরাধ অনেক কমিয়া যায়। পুলিশের সংখ্যা-বৃদ্ধি, দক্ষতা-বৃদ্ধি ও ক্ষমতা-বৃদ্ধির দ্বারা এবং দণ্ডের আধিক্য ও কঠোরতা দ্বারা কখনও সে-ফল পাওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু এদেশে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কখনও এদিকে যথেষ্ট মন দেন নাই, তাহার জন্য কখনও যথেষ্ট টাকা খরচ করেন নাই।

যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য কোটি-কোটি টাকা সরকার ধার করিয়াছেন, পুলিশের জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা ধার করিয়াছেন, নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সুদ নিশ্চয় দেওয়া হইবে এরূপ গ্যারেণ্টী দিয়া রেলওয়ের জন্য কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করাইয়াছেন এবং নিজেও করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, গরীব দুঃখীদের নিমিত্ত বাসগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য, কখনও টাকা ধার করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

—

ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ

১৯১৪ সালে ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ ছিল ৫৫১ কোটি টাকা। ১৯২৩-২৪ সালের শেষে উহা বাড়িয়া ৯১৮ কোটি ৯৮ লক্ষ হইয়াছে। রেলের জন্য দেনা ৫৫৬ কোটি, টেলিগ্রাফের জন্য দেনা ১৬ কোটি ৩৬ লক্ষ,

এবং জলসেচনের খাল-আদির জন্য দেনা ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ হইয়াছে। যাহা হইতে মুনফা হয় বা হইতে পারে, সেইরূপ কাজের জন্য দেনা বাড়িয়া ৪৫২ কোটি হইতে ৫৭৬ কোটি হইয়াছে, অর্থাৎ উহা শতকরা ৩৬ বাড়িয়াছে; কিন্তু যাহা হইতে মুনফা হয় না, সেইরূপ দেনা ২৬ কোটি ৫৮ লক্ষ হইতে ২৪৩ কোটি ৫২ লক্ষ হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ৮০০এরও অধিক বাড়িয়াছে!

যুদ্ধের জন্যই হউক বা রেলের জন্যই হউক, যত দেনা হইয়াছে, সবগুলিই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজের প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ও খাদ্য বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ করা হইয়াছে। আনুষঙ্গিকভাবে তাহাতে দেশের লোকদের ইষ্টানিষ্টও হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে এবং কেবলমাত্র ভারতীয় লোকদের সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য এই হাজার কোটি টাকা ঋণের জন্য কয় কোটি বা কয় লক্ষ, বা কয় হাজার, বা অন্ততঃ কয় শত টাকা ঋণ ভারত-সরকার করিয়াছেন তাহা জানি না। পাঠকদের মধ্যে কেহ জানিলে প্রমাণসহ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন।

—

রাষ্ট্রীয় পরিষদ্

সমগ্র ভারতের জন্য আইন করিবার নিমিত্ত ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কার্য্যের নিমিত্ত দুটি সভা আছে। তাহার একটি ব্যবস্থাপক সভা, অন্যটি কৌন্সিল্ অভ ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ্। ইংলণ্ডে যেমন হাউস্ অব লর্ডসের প্রধান কাজ হাউস্ অব কমন্সের কাজে ও অভিপ্রায়ে বাধা দেওয়া, তেম্নি এদেশী রাষ্ট্রীয় পরিষদেরও প্রধান কাজ ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ উন্টাইয়া দিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্বের বিজয়-নিশান উড্ডীন করা! নতুবা আরসুলা যেমন পক্ষী নহে, আমাদের কৌন্সিল্ অব ষ্টেট্ও তেম্নি হাউস্ অব লর্ড্স্ নহে।

সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী একটা বিল্ মঞ্জুর করাইয়াছিলেন, যে, রেলওয়েতে ইউরোপীয়, তথাকথিত ইউরোপীয় বা অন্য-কোন জাতি-বর্ণের লোকদের জন্য আলাদা রিজার্ভ গাড়ী থাকিবে না। রাষ্ট্রীয় সভাতেও তাহা পাস্ হইলে পাকা হইয়া যাইত; কিন্তু উক্ত সভা তাহা নাকচ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে দমন ও নিগ্রহের কাজ "ভাল" করিয়া চালাইবার জন্য বিস্তর আইন আছে। স্যার্ হরি সিং গৌড় তাহার কতক-গুলা রদ্ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় একটা বিল্ পাস্ করান। রাষ্ট্রীয় সভাতেও তাহা পাস্ হইলে তবে বিল্টা আইনে পরিণত হইত। কিন্তু আমাদের "অভিজাত"-সভা তাহা মঞ্জুর করেন নাই।

এক-প্রকারের বাত আছে, যাহাকে ইংরেজীতে গাউট্ বলে। পল্লীগ্রামের কোন একজন অল্প-শিক্ষিত ধনী লোক শুনিয়াছিলেন, যে, বিলাতের লর্ডদের কাহারো-কাহারো পানাহারের আধিক্য ও অন্যান্য কারণে ঐ পীড়া হয়। "সৌভাগ্য"-ক্রমে আমাদের পাড়াগেঁয়ে ধনীটিরও ঐ গাউট্-নামক পীড়া হইল। তিনি যখন শয্যাশায়ী থাকিতেন, তখন কেহ দেখিতে আসিয়া যদি কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "ঐ যে গো, ঐ গৌট না কি বলে, যা বিলেতের নড়দের হয়।" "গৌট" হওয়াটা যেমন ঐ ধনী ব্যক্তি বিলাতের "নড়"দের সমশ্রেণীস্থ হইবার একটা লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন, আমাদের কৌন্সিল্ অভ ষ্টেটের সভ্যেরাও বোধ হয় তেম্নি রাজনৈতিক স্থাণুতা ও পঙ্গুতা লর্ডদের সমকক্ষ হইবার একটা দাবি বলিয়া মনে-মনে ধার্য্য করিয়াছেন।

—

"প্রবাসী" ও মডার্ন্ রিভিয়ু"

বাংলাদেশের অনেকের মনে এইরূপ ধারণা এখনও আছে, যে, "প্রবাসী" ও "মডার্ন্ রিভিয়ু" একই জিনিষের বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ মাত্র। এইজন্য অনেক বাঙালী "মডার্ন্ রিভিয়ু" পড়া অনাবশ্যক মনে করেন। অবশ্য যাঁহারা উহা পড়িবার অযোগ্য মনে করেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, "প্রবাসী" পড়িলেই "মডার্ন্ রিভিয়ু" পড়া হইল, তাঁহাদের ভ্রম দূর করা আমরা আবশ্যক মনে করি। একই প্রবন্ধ ও ছবি উভয় মাসিকপত্রেই অল্প-পরিমাণে থাকে বটে; কিন্তু প্রধানতঃ এই দুটি মাসিক স্বতন্ত্র, একটি পড়িলে অন্যটি পড়ার কাজ হয় না। "মডার্ন্ রিভিয়ুতে"দেশী ও বিদেশী

অনেক লেখকের এরূপ বিস্তর লেখা বাহির হয়, যাহা ভারতের ও বিদেশের নানা কাগজে উদ্ধৃত হয়, কিন্তু প্রবাসীতে তাহার অনুবাদ বা তাৎপর্য্য দেওয়া হয় না। সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যেও এমন অনেক জিনিষ থাকে, যাহা প্রবাসীতে লিখি মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখি না, মডার্ন্ রিভিয়ুতে লিখি, প্রবাসীতে লিখি না। যাঁহারা প্রবাসী ও মডার্ন্ রিভিয়ু দুই মাসিকই পড়েন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন।

—

দেব-মন্দিরের সম্পত্তি

তারকেশ্বরের ব্যাপার হইতে সকলেই জানেন, সকল স্থলে দেবোত্তর জমি ও দেবমন্দিরের অন্যবিধ সম্পত্তির সদ্ব্যবহার হয় না, বরং অনেক স্থলে তাঁহার অপ-ব্যবহার দ্বারা পাপ বৃদ্ধি হয়, এবং নানা-প্রকার অত্যাচার—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের উপর—হইয়া থাকে। অখ্যাতিটা তারকেশ্বরেরই খুব রটিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য অনেক তীর্থ-স্থানেও ঐরূপ অপব্যবহার ও অত্যাচার হয়।

মান্দ্রাজে দেবমন্দিরের সম্পত্তির সদ্ব্যবহারের জন্য একটি আইন হইয়াছে। কোন আইন বা মানুষের অন্য কোন কাজই নিখুঁত হইবার কথা নয়; মান্দ্রাজেরও ঐ আইনটিকে সম্ভবতঃ অনেক দোষ থাকিতে ও তাহার উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে আইনের প্রয়োজন আছে, যাহার সংস্কার আমরা সামাজিক-ভাবে করিতে পারিব না, রাজা বিধর্ম্মী ও বিদেশী বলিয়া তাহার সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তিরও সাহায্য লইব না, বলিলে সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় না।

সমুদয় ভারতবর্ষের জন্য দেবমন্দিরের সম্পত্তি বা ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তির অপব্যবহার নিবারণ এবং সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা বর্দ্ধন জন্য আইন হওয়া আবশ্যক। ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমুদয় দেবমন্দিরের সম্পত্তি যদি আংশিকভাবেও ঐসব সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বড়-বড় বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

—

রাজকর্ম্মচারীদের বেতন

আমাদের দেশের রাজকর্ম্মচারীদের বেতন অন্য অনেক দেশের সমতুল্যপদারূঢ় কর্ম্মচারীদের বেতনের চেয়ে যে অনেক বেশী, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি। কোন-কোন স্থলে, বেতনটা মোটা হইলেও বস্তুতঃ ঐ রাজপুরুষের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ শুধু বেতন হইতে বুঝা যায় না। ধরুন ভারতে বড় লাটের কথা। তাঁহার পদমর্য্যাদা, যোগ্যতা, বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলাতের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, ফ্রান্সের সভাপতি, বা জাপানের প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা বেশী নহে। কিন্তু বেতনের পরিমাণটা কিরূপ দেখুন।

আমেরিকার সভাপতি পান বাৎসরিক ২,২৫,০০০ টাকা, ফ্রান্সের সভাপতি ৬০,০০০ টাকা, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ৭৫,০০০ টাকা, জাপানের প্রধান মন্ত্রী ১৮০০০ টাকা; কিন্তু ভারতের বড়লাট কেবল বেতনই পান বার্ষিক ২,৫০,৮০০ টাকা। যদি বেতনটাই বড়লাটের জন্য আমাদের একমাত্র ব্যয় হইত, তাহা হইলেও উহা বেশী হইত, কিন্তু উহা ছাড়া অন্য ব্যয় আরও আছে। তাঁহার একটা ভাতার পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা, কণ্ট্র্যাক্ট ভাতার পরিমাণ ১,৫৬,০০০, তাঁহার ঘরকন্নার ব্যয় ৪,৭১,০০০, তাঁহার ভ্রমণ-ব্যয় ৩,৬৫,০০০, এবং তাঁহার বাদ্যকর, শরীররক্ষী ও খাস্ কর্ম্মচারীদের ব্যয় ৪,৩৬,০০০। তাঁহার জন্য ভারতবর্ষকে মোট ১৭,১৮,৯০০ টাকা খরচ করিতে হয়।

—

নেশ্যনত্ব ও ফৌজী স্বাদেশিকতা

ইংরেজদের তরফ হইতে এই একটা কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে, "তোমরা চাও স্বরাজ, অথচ স্বদেশ রক্ষা করিবার সামর্থ্য তোমাদের নাই; বিদেশী গোরা সৈন্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে তোমাদের দেশ রক্ষা করে। সিপাহীরাও এই কাজে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তাহাদের নেতৃত্ব করে ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারী বা অফিসারেরা।"

জবাবে ভারতীয় নেতারা বহুদিন হইতে বলিতেছেন,

আমাদের দেশী লোককে বাছিয়া-বাছিয়া অফিসার কর, ১০।১৫।২৫ বৎসর ভারতবর্ষের সৈন্যদল কেবল মাত্র দেশী অফিসারদের দ্বারা চালিত হউক। ইংরেজ তাহাতে রাজী নয়, ইংরেজ বিলাতী স্যাণ্ড্‌হার্ষ্টের মত সামরিক শিক্ষালয় এদেশে স্থাপিত করিতে রাজী নয়। কেনই বা হইবে।

সিবিলিয়ান্‌দের মধ্যে কালক্রমে অর্দ্ধেক দেশীলোক হইবে, এইটুকু পর্য্যন্ত কাগজে-পত্রে ইংরেজ অগ্রসর হইয়াছে; সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন শাসনকর্ত্তা ভারতীয় হইয়া যাইবে, এ-রকম পাগলের স্বপ্ন ইংরেজের কাছে প্রশ্রয় পাইতে পারে না। ফৌজের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত সব ভারতীয় লোকে পূর্ণ হইবে, এ ত আরো উৎকট স্বপ্ন। কেন না, সব ইংরেজ জানে, তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র হইতেছে জেনারেল ডায়ার্‌ এবং জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ।

সেইজন্য সেদিন সেনাপতি রলিন্সন্‌ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতীয়েরা একটা নেশ্যন্‌ নহে, সুতরাং ভারতবর্ষের ফৌজে স্বাদেশিকতা খাটিতে পারে না—উহার সৈন্যদলকে এখন আগাগোড়া ভারতীয় করা যাইতে পারে না।" ইহাতে কোন-কোন ভারতীয় সভ্য উত্তেজিত হইয়া প্রতিবাদ করেন; কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন কত দিনে সৈন্যদলের ভারতীয়তা সাধন (Indianisation) হইতে পারে। তাহাতে রলিন্সন্‌ অবজ্ঞা বা ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্নকারীকেই তাহা অনুমান করিবার বরাত দেন।

ইংলণ্ড ও ইউরোপের অধিকাংশ জাতি যে-অর্থে নেশ্যন্‌ ভারতবর্ষে আমরা সে-অর্থে নেশ্যন্‌ নহি, ইহা সত্য কথা। কিন্তু প্রাচীন কালে কোন-কোন গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট্‌দের আমলেও ভারতবর্ষে নানা জাতি ও নানা ভাষা ছিল; তাহাতে নিজস্ব একটা সৈন্যদল ভারতবর্ষের থাকিবার পক্ষে বাধা ঘটে নাই। মধ্যযুগে আকবরের সময় হইতে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূখণ্ড এক-সম্রাটের অধীন ছিল, এবং তখনও এদেশে নানা জাতি ও নানা ভাষা ছিল। প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সেরূপ বৈবাহিক আদান-প্রদানও ছিল না, যেরূপ এখন ইউরোপে আছে। অর্থাৎ প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে ভারতীয়েরা সে-অর্থে নেশ্যন্‌ ছিল না, যে-অর্থে ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান্‌, জার্ম্যান্‌রা নেশ্যন্‌। কিন্তু তথাপি প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষের নিজের সৈন্যদল ছিল। অতএব, আধুনিক ইউরোপীয় অর্থে কোন জাতি নেশ্যন্‌ না হইলেই যে তাহার একটি স্বদেশী ফৌজ থাকিবে না, এমন কথা নাই।

প্রকৃত কথা এই, যে, আমরা অধীন জাতি বলিয়া যে-কোন-রকম যুক্তি সহ্য করিতে বাধ্য। বর্ত্তমান কালে রুশিয়ায় নানাভাষাভাষী নানাধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির বাস; কিন্তু সে-কারণে তাহাদের পূরা দেশী ফৌজ থাকিতে পারে না, বিদেশী অফিসারেরা আসিয়া তাহাদের সৈনিকদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, একথা কেহ বলে না। কেননা, তাহারা স্বাধীন; ওরূপ কুযুক্তি শুনিবার মত দুর্দ্দশা তাহাদের হয় নাই।

আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ বা যুক্ত-রাষ্ট্রে নানা-ভাষাভাষী নানাধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির বাস; অনেক বা অধিকাংশ রাষ্ট্রে নিগ্রোর সহিত শ্বেতকায়ের বিবাহ আইনবিরুদ্ধ এবং কোথাও-কোথাও দণ্ডনীয় (ভারতবর্ষে এরূপ কোন আইন নাই)। তথাপি ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের নিজের সৈন্যদল আছে।

ভারতবর্ষের নিজের সৈন্যদল নাই বলিয়া ভারত স্বরাজের উপযুক্ত নহে ও স্বরাজ পায় নাই; না, ভারতের স্বরাজ নাই বলিয়াই উহার নিজের ফৌজ নাই, এবিষয়ে বেশ একটা তর্ক চলিতে পারে। কোন্‌ কথাটা সত্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, ইহা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা যাইতে পারে, যে, ইংরেজরা আমাদের পুরাপুরি দেশী সৈন্যদল হওয়ার বিরোধী এইজন্য, যে, তাহা হইলে আমরা স্বরাজ বা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া ফেলিতেও পারি।

নেশ্যন্‌ কথাটার বাচ্য আমরা নাই হইলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন-একটা সাদৃশ্য সারা দেশময় ব্যাপিয়া আছে, যে, তাহা বিদেশীদের চোখে পড়ে। নানা ভাষার, ধর্ম্মের, জাতির, পরিচ্ছদের অস্তিত্ব এই সাদৃশ্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। সেইজন্য বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান্‌ লিখিয়াছেন :—

"If you travel through India from north to south, you must recognize an underlying unity as remark-

able as the superficial diversity. The outlook on life and the socio-economic background are almost everywhere essentially the same and radically unlike anything in western Europe. Face to face with their European ruler, Sikh and Tamil farmers can be made to see that they have a common tradition and a common cause. A pedant may deny the name of nationalism to the force thus generated, but it is worse than pedantry to suppose that by denying the name we can destroy the force."

তাৎপর্য্য।—"যদি তুমি উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ কর, তাহা হইলে তোমাকে, উপরের একটা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মতই, জীবনের ভিত্তিগত একটি একতাকেও স্বীকার করিতে হইবে। লোকেরা জীবনকে যে-চোখে দেখে তাহা, এবং জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রায় সর্ব্বত্র একই-রকমের, এবং পশ্চিম ইউরোপের সব-কিছু হইতে একেবারে ভিন্ন। শিখ ও তামিল কৃষকদিগকে তাহাদের ইউরোপীয় শাসকদের সঙ্গে তুলনায় সহজেই বুঝানো যায়, যে, তাহাদের সমষ্টিগত স্বার্থ এবং চিরাগত সংস্কার এক। এই অনুভব হইতে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকে পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি ন্যাশন্যালিজম্ নাম দিতে রাজী না হইতে পারেন; কিন্তু ঐ নামটা না দিলেই শক্তিটাকেও নষ্ট করিতে পারা যাইবে মনে করা পণ্ডিতম্মন্যতা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট।"

আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক রেষারেষি আছে স্বীকার করি। কিন্তু তাহার জন্য আমাদের স্বরাজ পাওয়া উচিত নয়, কিম্বা স্বদেশী সৈন্যদল আমাদের হওয়া উচিত নয়,ইহা স্বীকার করিতে পারি না। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত এবং এক্ষণে স্বশাসক একটি উপনিবেশের ইতিহাস হইতে আমাদের পক্ষসমর্থন করা যাইতে পারে। ১৮৩৯ সালে কানাডা-সম্বন্ধে লর্ড ডারহাম তাহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রিপোর্ট লেখেন। তখন কানাডা আত্মশাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। সেই রিপোর্টে লর্ড ডারহাম কানাডায় অধিবাসী ইংরেজ ও ফরাসী ঔপনিবেশিকদিগের সম্বন্ধে লেখেন:—

"The entire mistrust which the two races have thus learned to conceive of each other's intentions, induces them to put the worst construction on the most innocent conduct: to judge every word, every act and very intention unfairly, to attribute the most odious designs and reject every overture of kindness or fairness, as covering secret designs of treachery and malignity.

"Indeed the difference in manners in the two races renders a general social intercourse almost impossible."

তাৎপর্য্য—"পরস্পরের অভিপ্রায়-সম্বন্ধে এই দুটি জাতি যেরূপ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস পোষণ করিতে শিখিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে নির্দ্দোষতম ব্যবহারেরও অত্যন্ত কদর্থ করিতে প্রবৃত্ত করে;—প্রত্যেক কথার,কাজের, উদ্দেশ্যের অন্যায্য-রকম ব্যাখ্যা ও বিচার করিতে ও যারপরনাই ঘৃণ্য অভিসন্ধি আরোপ করিতে প্রবৃত্ত করে, এবং বন্ধুতার বা ন্যায়বুদ্ধি-প্রসূত কোন প্রস্তাবকেও, গোপনীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রসূত অভিসন্ধির আচ্ছাদন বলিয়া সন্দেহ করিয়া, তাহা অগ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্ত করে।

"বস্তুতঃ দুটি জাতির রীতিনীতি চালচলনের পার্থক্য তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোন-প্রকার সামাজিক ব্যবহার প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।"

এইপ্রকারে কানাডা যখন ইংরেজ-ফরাসীর গুরুতর দলাদলিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, যখন উহা কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় মজ্জিত, তখন লর্ড ডার্হাম উহাকে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। তখন এবং বহু বৎসর পর পর্য্যন্ত কানাডা আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছিল। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় নাই; কারণ, যখন দরকার তখনই ইংলণ্ড কানাডার সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল, এমন-কি তাহাকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিবার পরে ইংলণ্ড কুইবেক্‌কে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিল। কানাডাকে আত্ম-কর্ত্তৃত্বে অযোগ্য মনে করা দূরে থাক্, অথবা অকালে তাহাকে বেশী ক্ষমতা দিলে বিপদ হইতে পারে মনে করা দূরে থাক্, লর্ড ডার্হাম বরং ইহাই বলিয়াছিলেন, যে, কানাডাকে স্বশাসন-ক্ষমতা দিবার প্রত্যেক দিনের বিলম্বে অবস্থা জটিলতর এবং সমস্যা দুঃসমাধেয় হইতেছে। তজ্জন্য তিনি এই পরামর্শ দেন, যে, অবিলম্বে সাহসের সহিত কাজ করা হউক। লর্ড ডার্হামের এই "অবিমৃষ্যকারিতা" ইতিহাসে রাজনীতি-কুশলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার "অধৈর্য্যে" যে সুফল ফলিয়াছে, ইতিহাসে তাহার মত দৃষ্টান্ত কচিৎ দৃষ্ট হয়।

—

বাংলার মন্ত্রী

শুনা যাইতেছে, বাংলাদেশে এবার চারিজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন দু-জন হিন্দু, দু-জন মুসলমান। ইহাতে ঠিক ন্যায়-বিচার হইবে না। কারণ বঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী। অতএব মানুষের ভগ্নাংশ জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা, সন্ধান লওয়া উচিত। তাহা হইলে মুসমানদিগকে ২জনের উপর আরও একটা

মানুষের কোন ভগ্নাংশ দেওয়া হইবে, হিন্দুদিগকে এক জনের উপর আরো কোন মানুষের ভগ্নাংশ দেওয়া হইবে, এবং খৃষ্টিয়ান্‌দিগকে, বৌদ্ধদিগকে, জৈনদিগকে, শিখদিগকে, ইহুদীদিগকে, তাহাদের সংখ্যা-অনুসারে এক-একটা মানুষের কোন ভগ্নাংশ দেওয়া যাইতে পারিবে।

যদি গবেষণা দ্বারা স্থির হয়, যে, মানুষের ভগ্নাংশ জীবিত অবস্থায় বোতলে স্পিরিটেও রক্ষা করা যায় না, তাহা হইলে চারিজন মন্ত্রী রাখিয়া গরীব রায়তদের টাকাটার অপব্যয় না করিয়া তিনজনই রাখা হউক, এবং ঐ তিনজন মুসলমান সম্প্রদায় হইতেই লওয়া হউক।

এই পর্য্যন্ত লিখিত হইবার পর, কাগজে দেখিলাম, গুজব রটিয়াছে, লাট লিটনের ইচ্ছা, কেবল দুজন মন্ত্রী রাখিবেন—একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। দুজন মন্ত্রী রাখিবার প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু তা'র চেয়েও ভাল হয়, একেবারেই মন্ত্রী না রাখা। যখন তিনজন মন্ত্রী ছিলেন, তখন বাংলা দেশ নন্দন কাননে পরিণত হয় নাই; এই যে কতদিন মন্ত্রী নাই, তাহাতেও ত বাংলা-দেশ রসাতলে যায় নাই। অকারণ এতগুলো টাকা মন্ত্রীদিগকে দিয়া লাভ কি? তা'র চেয়ে পুলিশের লোকদের সংখ্যা বাড়ানো হউক, তাহাদের খাটপালঙ্ক মশারি হউক, সকলের জন্য পাকা বাড়ী হউক, এবং গুপ্ত আইন দ্বারা একটা রেট্‌ বাঁধিয়া দেওয়া হউক, যে, এখন যে-সব পুলিশের লোক যত ঘুঁস লইয়া থাকে, ভবিষ্যতে তাহার দ্বিগুণ লইতে পারিবে। এইপ্রকার বন্দোবস্ত করিলে, দেশের "ভয়ানক" উন্নতি হইবে। তবে যদি নিতান্তই মন্ত্রী রাখা হয়, তাহা হইলে এক দুই তিন বা চারিজন মুসলমান মন্ত্রী রাখা হউক। তাহা হইলে মুসলমানেরা কতকটা বুঝিতে পারিবেন, তাহাতে দেশের ও তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের (দুচা'র জন চাকরি-প্রার্থীর নয়) কিরূপ সুবিধা হয়।

—

বড়লাটের ছুটি গ্রহণ

বড়লাট ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন। ব্রহ্মের লাট, বিহার-উৎকলের লাট, রাজস্বমন্ত্রী, প্রভৃতিও ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন। ইঁহাদের সাহায্যে বড়লাট ভারতসচিব লর্ড্ বার্কেন্‌হেডের সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গুরুতর সমস্যাসমূহ-সম্বন্ধে সলা করিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করিয়াও কিন্তু জানা যায় নাই, যে, আম্‌লাদের মতে সে সমস্যাগুলি কি। যাহা হউক ভারতের উচ্চতম কর্ম্মচারীদেরও ছুটি লইবার যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই প্রস্ত রাজপুরুষের জন্য ভারতবর্ষের টাকা আগেকার চেয়ে বেশী খরচ হইবে, এবং আম্‌লাতন্ত্রের মুখপাত্রেরা স্বশরীরে বিলাতে গিয়া ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকার বা অন্য কোনো সুবিধা লাভের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষেরই টাকায় ওকালতি করিতে পারিবেন। অথচ ভারতসচিবের কাম্‌রায় মন্ত্রণার নামে তাঁহারা যে ওকালতি করিবেন, তাহা গোপন থাকিবে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের বেসর্‌কারী নেতারা তাঁহাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লাট সাহেবদের সঙ্গে-সঙ্গে যদি বিলাত পাঠান, তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ, ভারতসচিবের সঙ্গে কি মন্ত্রণা হইবে, তাহা বিলাতে হুবহু বাহির না হইলেও তাৎপর্য্যটা বাহির হইয়া যাইবে। কেননা, তথাকার খবরের কাগজওয়ালারা উদ্যোগী ও প্রভাবশালী; কোন-প্রকারে খবর সংগ্রহ করিবেই। তাৎপর্য্যটা জানা পড়িবা মাত্র ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি তাহার যথাযোগ্য প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের তরফের কথাও বিলাতের লোকেরা জানিতে পারিবে।

অনেকে মনে করেন, ইহাতে কোন লাভ নাই। আমরা মনে করি লাভ আছে। বিলাতে, আমেরিকায়, পৃথিবীর নানাদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আধা-সত্য ও মিথ্যা কথা প্রচার করিবার জন্য ইংরেজদের তরফের লোক আছে। তাহার ফলে জগতের জনমত ভারতের পক্ষে গঠিত হইতে পায় না। এই সব পুরামিথ্যা ও আংশিক-মিথ্যার প্রতিবাদ করিবার লোক ঐ-সব দেশে থাকা উচিত। বিলাতে ত থাকা উচিতই। দেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র মিথ্যা কথার ও মিথ্যাসংবাদের প্রতিবাদ হওয়া চাই। জনমতের জয় হইবেই হইবে।

—

গান্ধী কেন গবর্মেণ্টকে শয়তানী বলেন

ভারতবর্ষ-সম্পৃক্ত কিরূপ মিথ্যা কথা বিদেশে প্রচারিত হয়, তাহার একটা মাত্র নমুনা দিতেছি। আমেরিকায় নিউ-ইয়র্ক টাইম্‌স্ নামক একটা দৈনিক আছে। সেটা ইংরেজ পক্ষের কাগজ; সম্ভবতঃ ইংরেজের টাকা খায়। উহার একজন প্রতিনিধিকে বোম্বাইয়ের অটো রথফেল্ড (Otto Rothfeld) নামক একজন ইউরোপীয় সিবিলিয়ান আমেরিকায় বেড়াইতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"Gandhi's main principle was a revolt against capitalism and industrialism. To him the British Government was Satanic simply because it supported or tolerated factories and banks."

উদ্ধৃত দ্বিতীয় বাক্যটির মানে এই, যে, মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে শয়তানী গবর্মেণ্ট কেবলমাত্র এই কারণে বলিয়াছিলেন, যে, ঐ-গবর্মেণ্ট কলকারখানা ও ব্যাঙ্কের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক, অন্ততঃ ঐ-জিনিষগুলাকে তিষ্ঠিতে দিয়াছেন। অর্থাৎ গবর্মেণ্টকে শয়তানী বলিবার কোন রাজনৈতিক কারণ মহাত্মা গান্ধীর ছিল না।

এ-রকম একটা মিথ্যা কথাও আমেরিকায় বিনা প্রতিবাদে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা শুধু যে মিথ্যা তাহা নহে, ইহার এমন একটি অনিষ্টকারিতা আছে, যাহা সহজে চোখে পড়ে না। আমেরিকায় মহাত্মাজির বহু ভক্ত আছে; আবার আমেরিকা কলকারখানা ও ব্যাঙ্কের দেশও বটে। মহাত্মাজি আমেরিকানদের এমন প্রিয় জিনিষগুলির বিরোধী তাহা ভাল করিয়া প্রচার করিয়া তাঁহার প্রতি ও তাঁহার দেশ ভারতবর্ষের প্রতি বিরাগ উৎপাদনের মৎলব সিবিলিয়ান রথফেল্ডের ছিল কি না কে বলিতে পারে?

ভাল কথা—ঐ-ব্যক্তি কাহার টাকায় আমেরিকায় বেড়াইতেছে? ভারত গবর্মেণ্টের টাকায় নয় কি?

—

বঙ্গের লাটের একটিনি

বড়লাট ছুটি লইয়া গেলে বঙ্গের লাট লিটন তাঁহার জায়গায় একটিনি করিবেন, এবং ষ্টেটস্‌ম্যান্ কাগজ প্রথমে গুজব রটাইয়াছিল, যে, লাট লিটনের জায়গায় বঙ্গের শাসনপরিষদের পুরাতনতম মেম্বর স্যার্ আব্দর্ রহিম বঙ্গের লাটগিরিতে একটিনি করিবেন। পরে শুনা যাইতেছে, যে, একটিনিটা তাঁর অদৃষ্টে নাই, উহা একজন ইংরেজ মেম্বরের ললাটে লিখিত আছে। যিনিই একটিনি করুন, তাহাতে দেশের হিতাহিতের বেশী প্রভেদ হইবে না। কিন্তু অন্য কারণে আমরা স্যার্ আব্দর্ রহিমের নিয়োগের পক্ষপাতী। তিনি দেশী লোক বলিয়া তাঁহার বেলায় পুরাতনতম মেম্বরের একটিনি লাটগিরি-প্রাপ্তির নিয়ম বদলিয়া যাওয়া উচিত নয়। তা-ছাড়া, তিনি বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা হিসাবেও অযোগ্য লোক নহেন। অবশ্য তাঁহার রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির আমরা বিরোধী। কিন্তু এরূপ ভেদবুদ্ধি ও দলাদলি ইংরেজ লাটরাও প্রকাশ্যে বা গোপনে করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা তাঁহার নিজস্ব একচেটিয়া ত্রুটি নহে।

তাঁহার একটিনিগিরির সমর্থন করিবার আর একটা কারণ আছে। বুদ্ধিমান্ মুসলমানেরা দেখিতে পাইবেন, যে, ২।৪ জন চাকরি-প্রার্থী-ছাড়া দেশের সব লোকের বা সব মুসলমানের কোন কল্যাণ তিনি লাট হইলেও করিতে পারিবেন না; সেরূপ কল্যাণ দেশের শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে, এবং সেরূপ পরিবর্ত্তন হিন্দু মুসলমান ও অন্য সব ধর্ম্মের লোকদের সমবেত চেষ্টায় ভিন্ন হইবে না।

—

কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল্ লাইব্রেরী

আগে একবার কথা উঠিয়াছিল, কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল্ লাইব্রেরী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে। আবার সেই গুজব রটিয়াছে।

উহার নাম আগে ছিল পাব্লিক্ লাইব্রেরী এবং উহা মেট্‌কাফ হলে অবস্থিত ছিল। পরে উহা লর্ড কার্জ্জন ইম্পীরিয়্যাল্ লাইব্রেরীতে পরিণত করেন।

উহার জন্য বাঙ্গালী কত টাকা দিয়াছে ও কত শ্রম করিয়াছে, গবর্মেণ্ট কত ব্যয় করিয়াছেন, এবং সেই জন্য বাঙ্গালীর উহাতে দাবী কতখানি, সে-সব কথা তুলিতে চাই না। কারণ, এরূপ প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা করিবার মত উপকরণ আমাদের কাছে নাই।

আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া গেলেও জ্ঞানানুশীলনের প্রধান স্থান এখনও কলিকাতাই আছে। কলিকাতায় ভাল একটা লাইব্রেরীর সদ্ব্যবহার যত হয়, দিল্লীতে তাহার সমান ব্যবহার হইতে ন্যূনকল্পে আরও পঞ্চাশ বৎসর লাগিবে, অনর্থক কতকগুলা বহি রেলভাড়া দিয়া দিল্লীর একটা বড়-বাড়ীতে আলমারীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে কি লাভ হইবে?

ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান মন্ত্রী লর্ড রোজবেরী একবার একটি লাইব্রেরীর দ্বারোদ্‌ঘাটন-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, লাইব্রেরী বেশ কাজের জিনিষ হইতে পারে, আবার গ্রন্থের গোরস্থানও হইতে পারে। দিল্লী ত নানা সাম্রাজ্যের ও সম্রাটের গোরস্থান হইয়া আছে; তাহার উপর সেখানে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিবারও প্রয়োজন আছে কি?

—

কার্পাস-পণ্যের শুল্ক

কয়েক মাস হইল, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব ধার্য্য হয়, যে, দেশী-মিলে প্রস্তুত কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রের উপর যে শুল্ক আছে, তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে। ইহা অতীব সঙ্গত প্রস্তাব। বজেটে উদ্বৃত্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও ইহা উঠাইয়া না দেওয়া বিলাতী কাপড়ের কলওয়ালেদের প্রভাবের ফল। জাপান হইতেও সূতা ও কাপড় আসিয়া ভারতীয় সূতা ও কাপড়ের সঙ্গে টক্কর দেয়। সুতরাং ইংলণ্ডের জাপানকে খুসী রাখার মৎলবও থাকিতে পারে। কারণ স্যার্ দীনশা ওয়াচা একটা কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন, যে, তুলা রপ্তানির উপর ইংলণ্ড শুল্ক বসাইবেন না, জাপানের সহিত এইরূপ একটা গুপ্ত সন্ধি আছে। গবর্ন্মেণ্ট তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ যখন পাট ও পাটের জিনিষ, কাঁচা চাম্‌ড়া, ধান, চাল ও চায়ের রপ্তানির উপর শুল্ক আছে, তখন রপ্তানী তুলার উপর না থাকা অত্যন্ত অন্যায়। এরূপ শুল্ক বসাইলে ইংলণ্ডের মিলওয়ালাদের ব্যয় বাড়িবে, জাপানেরও বাড়িবে।

বিশেষ করিয়া জাপানকে খুসী রাখিবার কারণ এই, যে, একসময়ে জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ডের এই সন্ধি ছিল, যে, ভারতবর্ষে কোনো বিদ্রোহ বা হাঙ্গামা হইলে জাপান তাহা দমনে প্রয়োজন-মত ইংলণ্ডের সাহায্য করিবে।

—

বাংলার লাটের এক্‌টিনি

এ-বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পর কাগজে দেখিলাম, স্যার্ আব্দর্ রহিমকে বাংলার অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা করা হইল না, আসামের গবর্নর স্যার্ জন্ কার্‌কে এই-কাজ দেওয়া হইল। স্যার্ আব্দর্ রহিম দেশী লোক বলিয়া উপেক্ষিত হইলেন, বুঝা যাইতেছে। কাজটা ভাল হইল না।

—

বাংলার মন্ত্রী

এ-বিষয়েও পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পর খাঁটি খবর বাহির হইয়াছে, যে, লাট লিটন নবাব নবাবআলী চৌধুরী এবং রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এই দুজন লোককে মন্ত্রী মনোনীত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্যে যাঁহাদের মন্ত্রীগিরি করিতে আপত্তি হইত না, তাঁহাদের মধ্যে নবাব বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর অপেক্ষা শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায় ও কার্য্যদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ লোক আছেন। সুতরাং মনোনয়ন ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

নবাব নবাব-আলী চৌধুরী নিরক্ষর লোক নহেন, ইহা অনায়াসেই স্বীকার করা যায়। কিন্তু তিনি শিক্ষিত লোক নহেন, ইহা বলিলেও তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয় না। অথচ, তিনি অন্য-দুটি বিভাগের সহিত শিক্ষা-বিভাগেরও ভার পাইলেন, কোন পরিহাস-রসিক এসংবাদ প্রকাশ করেন নাই, ইহা সরকারী খবর। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের একটি ধারা-অনুসারে গবর্ন্মেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশক বা অবজ্ঞা-উৎপাদক কিছু কেহ করিলে, তাহার সাজা হয়। শিক্ষা-বিভাগের ভার নবাব-বাহাদুরকে দেওয়ায় এই ধারার উদ্দিষ্ট কাজ হইয়া থাকিলে, শাস্তি হইবে কি, এবং হইলে কাহার হইবে?

বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্যে নবাব-বাহাদুর অপেক্ষা যোগ্য লোক আছেন।

—

শাসনসংস্কার অনুসন্ধান কমিটি

রিফর্মস্ ইন্‌কোয়ারি কমিটির অর্থাৎ শাসনসংস্কার অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ সভ্যের মতে এক-আধটু জোড়াতালি দিলেই চলিবে, অন্য সভ্যেরা সংস্কারের পথে গবর্ন্মেণ্টকে আরও অগ্রসর হইতে বলেন। কমিটির রিপোর্ট এইরূপ হইবে, এইরূপ অনুমান অনেকেই আগে হইতে করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রভু ইংরেজরা অধিকাংশের মতের দিকেই ঝুঁকিবেন।

—

বিজাতীয় মূলধন চাই কি না

ভারতবর্ষে বাহিরের মূলধন অবাধে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য দিল্লীতে একটি কমিটি বসিয়াছে। এই কমিটি হইতে একটি প্রশ্ন-তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিসংঘের নিকট হইতে উত্তর সংগ্রহ করা হইতেছে; উদ্দেশ্য—সুবিচারের জন্য দেশবাসীর মত-নির্দ্ধারণ।

বেঙ্গল চেম্বার্ অভ্ কমার্সের মতে যে-কোনপ্রকার বিজাতীয় মূলধনই অবাধে দেশে প্রবেশ করিলে ভারতবর্ষের লাভ বই ক্ষতি নাই। এইপ্রকার মত পোষণের কারণ দেখানো হইয়াছে অনেকগুলি; তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই অতি পুরাকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। যথা, বাহিরের মূলধন না পাইলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটিবে, সর্‌কারী ও বেসর্‌কারী কার্য্যের জন্য ঋণ করিতে হইলে অধিক সুদ দিতে হইবে, শেয়ারের বাজারে বাহিরের ক্রেতার অভাব উপস্থিত হইয়া শেয়ারের মালিকদিগের ক্ষতি হইবে, ভারতের মূলধন পরিমাণে অল্প ও তদুপরি সহজলভ্য নহে ইত্যাদি। নূতন-প্রকার কথাও শুনিতেছি। যথা, বিজাতীয় মূলধনের সঙ্গে বিজাতীয় শিল্পজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কার্‌খানা পরিচালনা প্রণালী প্রভৃতিও নাকি দেশে আসিবে এবং ফলে দেশের উৎপাদনীশক্তি প্রভূত-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। সকল কথা শুনিয়া আমরা দেখিতেছি যে বিজাতীয় মূলধনের অবাধ-প্রবেশ-নীতির অনুগামীদিগের মতামত মূলতঃ একটি সূত্রের উপরই নির্ভর করিতেছে। সেটি এই:—ভারতবর্ষের পক্ষে কার্‌খানা-প্রধান অর্থনীতিই প্রয়োজন; কার্‌খানা উত্তমরূপে গড়িতে ও চালাইতে হইলে যে-পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন ভারতবর্ষের তাহা নাই; সুতরাং বাহির হইতেই ভারতবর্ষকে মূলধন সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

ধরা যাউক যে ভারতবর্ষের পক্ষে কার্‌খানাপ্রধান অর্থনীতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনে এই কার্‌খানা-প্রাধান্য কি অতিক্রুত আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, না এই গঠন-কার্য্য ক্রমশ সহজগতিতে সম্পাদন করিলেই ভালো? যাঁহারা বাহিরের মূলধন (অর্থাৎ নিজেদের মূলধন) ভারতে নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, শুভস্য শীঘ্রম্। কিন্তু "শীঘ্রম্" স্পর্শে "শুভ" যদি অশুভরূপ ধারণ করে, তাহা হইলেও কি 'শুভস্য শীঘ্রম্' নীতি একইভাবে প্রযোজ্য? যে-সকল দেশে কার্‌খানা-জীবন বিশেষরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইসকল দেশের অর্থনীতিক ইতিহাসে দেখা যায় যে জাতীয় জীবনে কোনো গভীর পরিবর্ত্তন দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িলে তাহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, নূতন গঠিত কার্‌খানাবহুল সহরগুলিতে টাইফয়েড্ কলেরা ও বসন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। জ্বরের প্রকোপে শ্রমিকগণ চিরদারিদ্র্যে মগ্ন ছিল। মানুষের জীবনকাল খুবই কমিয়া গিয়াছিল; যথা ১৮৩৭—৪৩ খৃঃ অব্দে সাধারণত ভদ্রলোকে ৪৭·৩৯ বৎসর, ব্যবসাদারেরা ৩১·৬৩ বৎসর ও শ্রমিকেরা ১৮·২৪ বৎসর বাঁচিত। ভদ্রলোকদের মধ্যে ৫ বৎসরের অধিক বয়সে মারা যাইত ৮২·৪৩ জন, ব্যবসাদারদিগের মধ্যে ৬১·৭৮ ও শ্রমিকদিগের মধ্যে ৪৪·৫৮। ৫ বৎসরের অল্প বয়সে মারা যাইত ভদ্রলোক ১৭·৫৭, ব্যবসাদার ৩৮·২২ ও শ্রমিক ৫৫·৪২ (অর্থাৎ অর্দ্ধেকের অধিক শ্রমিক-শিশু ৫ বৎসরবয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই মারা যাইত)। ইহা ব্যতীত ময়লা, জলকষ্ট, অল্পাহার,

গোরস্থানের অভাব, কারখানায় অত্যাচার, কয়লার খনিতে পাশবিকতা ইত্যাদির কথা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, অকস্মাৎ বা অতিদ্রুত গঠিত কারখানাপ্রাধান্যের ফলে জাতীয় জীবনের কি নিদারুণ পরিণতি হয়। আমরা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথা ভাবিয়াই কারখানাবাদে বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি বিজাতীয় মূলধনের সাহায্যে অতি দ্রুতগতিতে এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করা হয়, তাহা হইলে আমাদের "লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইবে"। অধিকন্তু আনুষঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্যে জাতীয় জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। তাই বলি যে, এইরূপ একটা বড় ব্যাপারে আরও গভীর চিন্তার প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষকে **যে-কোন** উপায়ে একটা চিম্নির বাগানে পরিণত করিয়া দিলেই যে ভারতবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হঠাৎ খুব বাড়িয়া যাইবে, এরূপ কথা বাতুলেও বলিবে না। জাতীয় ধন সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে তখনই, যখন সেই ধন-সম্পদ্-উৎপাদনের প্রণালী দেশবাসীর পক্ষে অসুখকর ও অসম্মানকর নহে। বাহিরের মূলধনের বন্যায় জাতীয় অর্থনৈতিক নির্জ্জীবতার সঙ্গে-সঙ্গে যদি স্বাধীনতা ও জীবন-যাত্রার লাবণ্যও ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে শুধু অন্য দেশের সমান হইবার অর্থহীন আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া কারখানা-গঠনে মাতিয়া উঠিবার কোন কারণ দেখি না। যদি মূলধনের সুদ ও লাভ, পরিচালনার গৌরব ও মোটা মাহিনা এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্ব, এইসকলের প্রত্যেকটিই অথবা বেশীর ভাগই বিদেশীর হস্তে পড়ে, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নবীন না হইয়া প্রাচীন থাকাই ভাল। নিজের লাভের ও গৌরবের জন্য গোযান-চালনা কি অপরের সুবিধা ও দাসত্বের জন্য মোটরকার্-চালনা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় নহে? স্যার্ উইলিয়াম্ কারী বলিতেছেন—"একস্ট্রিমিষ্ট রাজনীতিবিদ্গণ আমাদিগকে (অর্থাৎ ইংরেজদিগকে) বিদেশী ভাবিয়া ভীষণ ভুল করিতেছেন।" তাঁহার একথা বলার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, ইংরেজগণ বিদেশী হইলেও ভারতবাসীদিগের প্রতি তাহাদের অধিক ভালোবাসা থাকাতে তাহাদিগকে আমাদিগের স্বদেশীয় বলিয়া মানিয়া লওয়াই উচিত। ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ইতিহাস পাঠ করিলে স্যার্ উইলিয়ামের সহিত মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। আজ যদি আমরা বাহিরের মূলধন অবাধে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে দিই, তাহা হইলে আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল আরও কঠিন হইয়া উঠিবারই কথা। চীনের ইতিহাসে এই কথার প্রমাণ রহিয়াছে। চীন "স্বাধীন" দেশ, কিন্তু বাহিরের মূলধনের অবাধ প্রবেশে তাহার আজ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। বাহিরের মূলধন সেই-দেশই নিরাপদে গ্রহণ করিতে পারে, যে-দেশের বন্দুক, কামান, যুদ্ধ-জাহাজ ও সৈন্যবল আছে। দুর্ব্বলের পক্ষে কাবুলীওয়ালার নিকট ঋণ-গ্রহণ ও অসামরিক জাতির পক্ষে বিজাতীয় মূলধন গ্রহণের ফল কখনই ভালো হয় না। আমরা যেটুকু ব্রিটিশ মূলধন লইয়াছি, তাহার ফলেই আমাদের কোন দিন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ অদৃষ্টে আছে কি না সন্দেহ; ইহার উপর বোঝা আরও বাড়াইলে কি যে হইবে তাহা না বলিলেও চলে!

আর-একটি কথা এই যে, ভারতবর্ষের নিজস্ব মূলধন যত অল্প বলিয়া বাহিরে প্রচার, তাহা ততটা অল্প নহে। অল্পতা অপেক্ষা নিরাপদে লোহসিন্দুকে বাস করিবার অভ্যাসই ভারতীয় মূলধনের বড় ব্যাধি। এই ব্যাধি দূর করিবার উপায়—বিজাতীয় মূলধন অবাধে দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া নহে। সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মূলধনলব্ধ লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে, নিজ হইতেই ভারতীয় মূলধন সজাগ ও সহজলভ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই বাহিরের মূলধন দেশে অবাধে প্রবেশ করিলে, সংরক্ষণ ও শিল্প-প্রচারের সুফল হইতে মন্দগতি ভারতীয় মূলধন বঞ্চিত হইবে ও বিদেশী ক্ষিপ্র-হস্তে সর্ব্বক্ষেত্রে লাভের অধিকাংশ আত্মসাৎ করিবে। এই বিপদ্ হইতে দেশীয় মূলধনকে বাঁচাইবার উপায় অধুনা কিছু কাল বিজাতীয় মূলধনের অবাধ প্রবেশে বাধা দেওয়া। মূলধনের মালিকেরও সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয় পাইবার অধিকার আছে। বিদেশী ধনিক সর্ব্বদা জাগ্রত ও ভারতে স্থান লাভ করিবার জন্য লালায়িত। তাহার হস্ত হইতে দেশীয় ধনিককে বাঁচাইবার জন্য জাতীয় চেষ্টার প্রয়োজন। বাহিরের মূলধন যদি একান্তই আমাদের লইতে হয় তাহা হইলে সে মূলধন আহরণ করিবার অধিকতর নিরাপদ

উপায় খুঁজিতে হইবে। উপায় কি, তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

তার পর বিদেশীদিগের মত এই যে, তাহারা মূলধনের সহিত আমাদিগকে কার্য্য-পরিচালনা ও উৎকৃষ্টতম শিল্প-শিক্ষাও দিবে। ইহা তাহারা আশার কথা বলিয়াই আমাদের বুঝিতে বলে। আমরা কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়ের কারণ দেখিতেছি। যদি বিজাতীয় মূলধন গ্রহণের অর্থ এই হয় যে, তাহার সহিত বিদেশী কারিগর ও পরিচালকগণও ভারতে আসিবে, তাহা হইলে বিজাতীয় অর্থ দেশের বাহিরে থাকাই আমাদিগের পক্ষে মঙ্গল। আমাদিগের উন্নতির জন্ম মোটা মাহিনা দিয়া বিদেশীয় লোক আনয়ন নূতন-কিছু নহে। তাহার ভালো-মন্দ বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানের অভাব নাই। সুতরাং পুনর্ব্বার এরূপে উপকৃত হইতে আমরা যে রাজি হইব না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অ

—

পরলোকে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

বিষ্ণুপুর-নিবাসী সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় গত ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার বেলা দেড় ঘটিকার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত-কনফারেন্স হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিষ্ণুপুর গমন করেন এবং তথায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি বাঙ্গলার গৌরব ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একজন বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য হারাইল। রাধিকা-প্রসাদ মৃদঙ্গ-বিশারদ স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন।

পঞ্চম বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হইলে তিনি বিষ্ণুপুরের বঙ্গ-বিদ্যালয়ে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠ করেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর জীবন যাপন করিবার জন্ত সৃষ্টি করেন নাই। সুরের মহিমা মানবের মনের গোচর করিবার নিমিত্ত ভাগ্য-দেবতা ধীরে-ধীরে তাঁহাকে সঙ্গীতের দিকে লইয়া চলিলেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই গোস্বামী মহাশয় কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরক্ত ছিলেন। ইহা দেখিয়া পিতা জগচ্চন্দ্র গোস্বামী এই-বালকের সঙ্গীত-শিক্ষার ভার তৎকালীন অদ্বিতীয় গায়ক স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করেন। অনন্তলাল এই বালককে নিজের পুত্রের ন্যায় অতি যত্নে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতগুরু অনন্তলালের নিকট রাধিকাপ্রসাদ ১১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার গুরুদেবের সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং পারদর্শিতা বহুল পরিমাণে অনুকরণ করিয়াছিলেন তাঁহার পরিণত-বয়সে তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়াছিল।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে রীতিমত দক্ষতা লাভ করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া, আদি-ব্রাহ্মসমাজে গায়কের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় থাকিয়া তিনি এই সময়ে গুরুপ্রসাদ মিশ্র, শিবনারায়ণ মিশ্র এবং গোপাল-চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (নুলোগোপাল) নিকট অনেক গান সংগ্রহ করেন। ঐ-সময়ে কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ভারত-সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় তিনি সঙ্গীতাচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত ছয় বৎসর কাল কাজ করেন। অনন্তর মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় তাঁহার অনুপম সঙ্গীত-পারদর্শিতার পরিচয় পাইয়া, গোস্বামী-মহাশয়কে কাশীমবাজারে আনয়ন করিয়া সেখানকার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করেন। বহুদিন যাবৎ কাশীমবাজারে থাকিয়া, তিনি মাত্র ৩ বৎসর কাল কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কাশীম-বাজারে অবস্থিতি-কালে তিনি কয়েকজন ছাত্রকে উত্তম-রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রী :—

—

কৃষ্ণভাবিনী স্মৃতিসভা

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পরলোকগতা সাধ্বী কৃষ্ণ-ভাবিনীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ মহিলাদের একটি সভা হইয়াছিল। তাঁহার বহু সহকর্ম্মিণী বন্ধু ও ভক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা নিজে উপস্থিত হইতে পারেন

নাই তাঁহারাও অনেকে দূর হইতে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করেন। সেদিন সভাতে মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে যে, স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতিরক্ষার্থে মেয়েরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়টিকে কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়-নামে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার নামে অসহায়া বিধবাদের শিক্ষার জন্য একটি বা ততোধিক মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হউক এইরূপ আর-একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

যাঁহারা অর্থসাহায্য করিতে চান তাঁহারা নারীশিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসুর নিকট (৯৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা) অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত রসিদ সকলকে দেওয়া হইবে এবং কাগজে দাতাদের দান স্বীকার করা হইবে।

সভায় বহু প্রবন্ধ পঠিত হয়। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার আদর্শ জীবন-সম্বন্ধে কিছু জানাইয়া স্মৃতিপূজার কার্য্য শেষ করিতেছি :—

"আজ যাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিতে আসিয়াছি, তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না, কিন্তু তাঁহার তেজস্বিনী তপস্বিনী মূর্ত্তি, তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও সৌজন্য, তাঁহার সেবা ও ত্যাগ আমাকে বহুদিন হইতেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা আজ বাঙালীর মেয়ে বলিতে যাঁহাদের দেখি ও বুঝি, তাঁহারা অধিকাংশই অতীতের উচ্চ আদর্শকে ভুলিয়া ভারত-নারীর গৌরব রক্ষা করিতে অক্ষম হইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই সে পূর্ণ আদর্শের সহিত পরিচিতই নহেন। আবার পাশ্চাত্য জগতের নব-জাগ্রত আদর্শকেও তাঁহারা চিনেন না, তাই অবজ্ঞা-ভরে তাহাও উপেক্ষা করিয়া চলাই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া অনেকে ভ্রম করেন। এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলেনা কারণ শিক্ষার অভাবই তাহাদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই অন্ধতা না ঘুচিলে ভারত নারীর দুঃখ ও সমস্যার অবসান হওয়া কঠিন হইবে। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী অতি আধুনিক বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে যুগে তিনি বাংলার কোলে আসিয়াছিলেন, সে-যুগে বঙ্গ-নারীর ভবিষ্যৎ এখনকার চেয়েও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তবু নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর গৃহে জন্মিয়া এবং শিশু বয়সেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহে বিবাহিত হইয়াও তিনি নারীর জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল আদর্শকে যথাসাধ্য নিপুণতার সঙ্গে একত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তপস্যায় নিষ্ঠায় সেবায় ত্যাগে ও পাতিব্রত্যে হিন্দু-নারীর জীবনের আদর্শকে তিনি সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছিলেন। শোক দুঃখ তাঁহার নিষ্ঠাকে, তাঁহার ত্যাগের আদর্শকে টলাইতে পারে নাই, অন্তর-লোকের সকল সংগ্রামেই তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। জীবনকে কেবলমাত্র নিজ গৃহের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিয়া ত্যাগকে নিষ্ঠাকে কেবল পরিবারের সেবায় উৎসর্গ করিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই। পাশ্চাত্যের আদর্শও তাঁহার জীবনে জলন্ত হইয়াই দেখা দিয়াছিল। তিনি আপনার স্বাধীনতাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন স্বাধীন মুক্ত নারীর জীবনের উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া। কর্ম্মের পথের যে-সকল বাধা বাঙালীর মেয়েকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তিনি অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় কর্ম্ম-জীবনকে সফল ও সুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতেই দেশের এত বড় একটা অনুষ্ঠান এমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপমান, দারিদ্র্য, ঋণ, অন্ধ সংস্কার, ভীরুতা, অবরোধ, সমাজ-গ্লানি প্রভৃতি কত বাধা কতরূপে তাঁহার কর্ম্মের পথে পর্ব্বতের মতন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তেজস্বিনী মহীয়সী কৃষ্ণভাবিনীকে টলাইতে পারে নাই। অগ্রসর হইয়া চলাই যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, কে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া পিছু হঠাইতে পারে? জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি আগেই চলিয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত সেবায় ও কর্ম্মে জগৎকে ঋণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই জীবন ধন্য, তাঁহারই নারী-জন্ম সার্থক। তাঁহাকে স্বদেশবাসিনী বলিয়া স্মরণ করিতে গৌরবে মন ভরিয়া উঠে, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে হৃদয় নত হয়। জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু পূজার অর্ঘ্য দিয়া দূর হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মানিত হইতে আনন্দ অনুভব করিতেছি।"

শ

ডাক-মাশুলের বৃদ্ধিহ্রাস

গত বড় যুদ্ধের সময় বিলাতে ডাকমাশুল বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার পর কিছু কমিয়াছে। এখন চেষ্টা হইতেছে যাহাতে উহা আরও কমাইয়া বহু পূর্ব্বের মত সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য এক পেনী অর্থাৎ এক আনা করা যায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মুদ্রণ ও কাগজ নির্ম্মাণ ব্যবসায়ের প্রতিনিধিরা বিলাতে পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের নিকট গিয়া তাঁহাকে চিঠির ডাকমাশুল আগেকার মত এক পেনী করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা করিলে কেবল যে তাঁদের ব্যবসার সুবিধা হইবে, তাহা নহে, অন্য ব্যবসারও সুবিধা হইবে। তাহার একটা

উপায়ও তাঁহারা পরোক্ষভাবে দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞাপন কেবল যে খবরের কাগজে দেওয়া যায়, তাহা নহে। ডিরেক্টরী দেখিয়া ও অন্য উপায় যাহাদের কোন বিশেষ একটা জিনিষ কিনিবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ লোককে পোষ্টকার্ড ও চিঠি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ঐ জিনিষের বিজ্ঞাপন পাঠানো যাইতে পারে। মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা এই-প্রকারে বিজ্ঞাপন-প্রেরণের সমর্থন করিয়া শীঘ্রই হাজার-হাজার পুস্তিকা বিতরণ করিবেন। যদি ডাকমাশুল কম করা হয়, তাহা হইলে বিলাতের সকল-রকম জিনিষের ব্যবসাদারেরা তাঁহাদের বিজ্ঞাপন সাক্ষাৎভাবে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র হাজার-হাজার লোককে পাঠাইয়া ব্যবসা বাড়াইতে পারিবেন। তাহাতে ডাক-মাশুলের আয় বাড়িবে, এবং অন্য ব্যবসার আয় বাড়ায় ইন্‌কম্ ট্যাক্স প্রভৃতি বেশী পাওয়া যাইবে।

আমাদের দেশেও সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞাপন-প্রেরণের রীতি অল্প-পরিমাণে প্রচলিত আছে। ডাক-মাশুল কমিলে উহার প্রচলন বিস্তার লাভ করিতে পারে এবং বিলাতে তাহার ফল যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিয়ৎ-পরিমাণে এদেশেও তাহা হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু আমরা এদেশে ডাক-মাশুল হ্রাস করিবার অন্য নানা কারণ আছে মনে করি। বিলাত অপেক্ষা এদেশ অনেক বেশী গরীব, ধনের তুলনা করিলে বিলাতে চিঠির মাশুল যদি দুই আনা হয়, তাহা হইলে এদেশে এক-পয়সা করিলেও যথেষ্ট সস্তা হইবে না। কিন্তু আমরা চিঠির মাশুল পূর্ব্ববৎ দুপয়সা, পোষ্টকার্ডের মাশুল পূর্ব্ববৎ এক পয়সা, এবং পুস্তকাদি ডাকে পাঠাইবার মাশুল পূর্ব্ববৎ প্রতি দশ তোলায় দুই পয়সা করিতে বলিতেছি। পুস্তকের মাশুল দ্বিগুণ করায় শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উপর ট্যাক্স বসানো হইয়াছে। পোষ্টকার্ড ও চিঠির মাশুল দ্বিগুণ করায় আগে যত কার্ড ও চিঠি ডাকে যাইত, এখন তত যায় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে, গরীব লোকে ইচ্ছা ও প্রয়োজন-সত্ত্বেও কখন-কখন চিঠি লিখিতে পারিতেছে না। আমরা নিজে দেখিয়াছি, আগে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে ব্যক্তিগত চিঠি যত সহজে ও সংখ্যায় যত লিখিতাম, এখন তত সহজে ও সংখ্যায় তত লিখি না, দ্বিধা বোধ করি। বৈষয়িক চিঠিও পূর্ব্বাপেক্ষা কম লিখি।

সব ভ্যালু-পেয়েব্‌ল্ প্যাকেট আজকাল রেজিষ্টরী করিতে হয়, মনিঅর্ডারের কমিশনও দুই আনার কম নাই, বহির মাশুলও দ্বিগুণ হইয়াছে। এইজন্য মফঃস্বলের কেহ কলিকাতা হইতে একটি চারি পয়সার বহি ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ ডাকে আনাইতে চাহিলে তাঁহার খরচ হয় ছয় আনা। যদি তিনি চিঠির খামের মধ্যে ডাকটিকিট পাঠাইয়া চা[রি] পয়সার বহি আনান, তাহা হইলেও ন্যূনকল্পে দশ পয়[সা] খরচ হয়। তাহাতে আবার ডাকটিকিট সহ খামটি পুস্ত[ক] বিক্রেতার হস্তগত হইবে কি না, সে-সন্দেহ থাকে।

ডাক-মাশুল কমাইয়া আগেকার মত করিলে পোষ্টকা[র্ড] চিঠি, পুস্তকের প্যাকেট প্রভৃতি অনেক বেশী-পরিমা[ণে] ডাকে যাইবে। সেইজন্য মাশুল কমাইলেও ডা[ক] বিভাগের আয় দুই-এক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট হই[য়া] আসিবে, তদ্ভিন্ন ইহাতে লোকের সুবিধা হইবে, ব্যব[সা] বাড়িবে, শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানবিস্তার হইবে এবং মো[টে]র উপর ব্যক্তিগত, সামাজিক, সার্ব্বজনিক ও বৈষয়িক সংব[াদ] এখনকার চেয়ে সহজে অধিকতর লোকে পাওয়[ায়] অলক্ষিতভাবে দেশ অগ্রসর হইবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক কালে বাংলা দেশে স্বাদেশিকতার প্র[থম] যুগে যাঁহারা ইহার সূত্রপাত করেন, তাঁহাদের একজ[ন] মহামনা অগ্রণী পরলোক গমন করিয়াছেন—আনুমানি[ক] ৭৫ বৎসর বয়সে রাঁচীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশ[য়ের] মৃত্যু হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"র "স্বাদেশিকতা" শীর্[ষক] অধ্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার কিছু বৃত্ত[ান্ত] লিখিত আছে। তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। কে[বল] গোড়ার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি।

"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ র[াজ]নারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের স[ভা]। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসি[ত]। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল।"

অতঃপর এই গোপনীয় সভার আরও কিছু বর্ণ[না] করিয়া রবি-বাবু লিখিতেছেন :—

"ভারতবর্ষের একটা সর্ব্বজনীন পরিচ্ছদ কি হইতে পারে এই সং[কল্প] জ্যোতিদাদা তাহার নানা-প্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আ[রম্ভ] করিলেন। ধুতিটা কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জা[মা] বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করি[লেন] যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ [তিনি] পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম [মালা]কোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মি[শাল] করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লো[কেও] শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বজনীন পোষা[কের] নমুনা সর্ব্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই একলা নিজে ব্যবহার ক[রিতে] পারা যে সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই ক[াপড়] পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়ীতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয়